বিচিত্রা

সচিত্র মাসিক পত্র

দ্বিতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় খণ্ড

অগ্রহায়ণ ১৩৩৫—আষাঢ় ১৩৩৬

সম্পাদক

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

কলিকাতা,

৪৮, পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট্

বার্ষিক মূল্য—৬।৷৹ টাকা

২৮৭

বিষয়-সূচী

ষাণ্মাসিক সূচী

ষাণ্মাসিক সূচী

লেখক-সূচী

ষাণ্মাসিক সূচী

ষাণ্মাসিক সূচী

ষাণ্মাসিক সূচী

ষাণ্মাসিক সূচী

চিত্র-সূচী

(কেবল পূর্ণপৃষ্ঠা)

পসারিণী

শিল্পী—শ্রীমনীষী দে

দ্বিতীয় বর্ষ, ২য় খণ্ড | পৌষ, ১৩৩৫ | প্রথম সংখ্যা

বীজ-ধর্ম্ম

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কাল রাত্রে যখন জানালা খুলে বাইরের দিকে চেয়েছিলুম তখন আমার মনে হ'ল, নিজের অন্ধকারের মধ্যে নিহিত প্রচ্ছন্ন সম্পদটিকে উপলব্ধি করবার জন্যে তপস্বিনী রাত্রি ধ্যানে বসেচে। নিজেকে যখন বিলুপ্ত ক'রে দেবে, অন্ধকার আবরণ যখন খ'সে যাবে, তখনি সে আপনার অন্তরের জগৎটিকে প্রকাশ করতে পারবে।

মানুষের মধ্যেও তেমনি একটি পরম শক্তি গোপন রয়েচে। কত বড় যে সেই শক্তি তা দেখাই যাচ্চে না। তার প্রভাত তার রাত্রির আবরণে ঢাকা আছে। এমন সম্পদ তার অগোচরে রয়েচে ব'লে সে নিজেকে জন্মদরিদ্র ব'লেই জান্‌চে; সেই জন্যেই সংসারের কাছে তার ভিক্ষার অন্ত নেই; এবং তার ভিক্ষার ঝুলি থেকে একটি কণা খস্‌লেই আক্ষেপের সীমা থাকে না।

বীজ যতক্ষণ বীজ ততক্ষণ সে কৃপণ। তখন তার সকল দরজা আঁটা। কিন্তু তারই ভিতরে একটি চিরপ্রবাহিত মহারণ্যের ধারা অদৃশ্য হ'য়ে রয়েচে। ঐ অতি ক্ষুদ্রের ভিতরে অতি বৃহৎ যে কেমন ক'রে ধরল, তা ভেবেই পাওয়া যায় না। কিন্তু এই বীজ যতক্ষণ বস্তার মধ্যে রইল ততক্ষণ সেই বিরাট চাপা রইল, ততক্ষণ ছোটোরই জয়। এমন ক'রে হাজার বছর কেটে যেতে পারে। কিন্তু উপযুক্ত মাটির ভিতর যখন সে প্রবেশ করলে, যখন এক দিকে রস আর এক দিকে তাপ তার অন্তরের শক্তিকে চঞ্চল ক'রে তুল্‌লে—তখন সেই শক্তি নিজের আবরণ বিদীর্ণ ক'রে বীজের সত্যকে প্রকাশ করতে লাগল।

মানুষেরও আত্মার সত্য তার অহং-আবরণের মধ্যে অব্যক্ত হ'য়েই থাকে যতক্ষণ না তার প্রকাশশক্তি জাগ্রত হয়। মানুষের সকল ধর্ম্মশাস্ত্রেই এই প্রকাশশক্তিকে বাধামুক্ত করবার উপদেশ আছে। প্রবৃত্তির একান্ত প্রবলতাই হচ্চে সেই বাধা। কেন বাধা, সেটা ভেবে দেখা যাক।

মানুষের একটা ধর্ম্ম হচ্চে পশুধর্ম্ম। তাকে খেতে শুতে হবে, শীত গ্রীষ্ম বর্ষার আক্রমণ থেকে নিজেকে বাঁচাতে হবে, সন্তানকে জন্ম দিতে এবং পালন করতে হবে। এই ধর্ম্ম-পালনের জন্যে আমাদের প্রবৃত্তিগুলি সত্য। অর্থাৎ আমাদের প্রবৃত্তি না থাকলে দৈহিক জীবনরক্ষার ও বংশ-রক্ষার জন্যে আমাদের চেষ্টাই থাকৃত না।

এই পশুধর্ম্মই যদি মানুষের পক্ষে একমাত্র এবং চরম হ'ত তা' হ'লে প্রবৃত্তিকে সংযত কর্‌বার কথা কেউ তাকে

বল্‌তই না। কারণ সেই একমাত্র ধর্ম্মপালনের শক্তিকে খর্ব্ব করতে বলা আত্মহত্যা করতে বলা। মূলধনের চেয়ে বড় ধন যদি কোথাও কিছু না থাকে, তা' হ'লে সেটাকে নষ্ট করা বিষম ক্ষতি। কিন্তু লাভের ধন মূলধনের চেয়েও বড় ব'লেই বণিককে সহজেই বলা যায় লোহার সিন্দুকের ভিতরে যে-টাকাটা আছে সেইটেই লোকসান। সেটাকে খরচ ক'রে খাটালেই লাভ।

পশুধর্ম্মের উপরে একটা মানবধর্ম্ম আছে। অর্থাৎ দৈহিক জীবনের চেয়েও বড় জীবন হচ্চে মানুষের। দৈহিক জীবনের প্রবৃত্তি দৈহিক জীবনের শক্তি; এই জন্যে সে শক্তি একান্ত হ'য়ে বড় জীবনকে যখন বাধা দেয় তখন আমাদের মানবধর্ম্ম বলে, "আধ্যাত্মিক শক্তির দ্বারা ঐ শক্তিটাকে কাটিয়ে ওঠ।" মানুষকে উপলব্ধি করতে হবে যে তার আত্মার জীবনটাই তার পক্ষে সকলের চেয়ে বড় সত্য—অতএব সেই জীবনটাকেই যদি না পাই, না বাঁচাই, তা' হ'লে সেইটেই হবে মানুষের পক্ষে যথার্থ আত্মহত্যা, মহতী বিনষ্টি। এই জন্যেই মানুষ আপন পশুধর্ম্মের মধ্যে আবৃত হ'য়ে থাকাকেই বন্ধন বলে। এরই থেকে আত্মার জীবনে মুক্তি পাবার জন্যে প্রবৃত্তির নাড়ি-বন্ধন সে ছিন্ন করতে চায়। তাই আধ্যাত্মিক জীবনের গোড়ার উপদেশ—প্রবৃত্তিকে শাসন কর, মনকে নির্ম্মল কর।

এইগুলি হ'ল নীতি-কথা, এবং নীতি-কথা শুষ্ক। কিন্তু নীতি ত নিজের মধ্যে নিজে সমাপ্ত নয়—নীতির মানেই হচ্চে যাতে ক'রে আমাদের নিয়ে যায়। নীতি যদি বলে আমাতেই শেষ, আমার ঊর্দ্ধে আর কিছু নেই, তা' হ'লে মানুষের বলবার অধিকার আছে আমি নীতি মানব না। কাউকে যদি বলি পথই পথের লক্ষ্য, পথ কোথাও পৌঁছে দেয় না, তাহলে সে লোক পথ চলা বন্ধ করলে তাকে দোষ দেওয়া যায় না। নীতি-উপদেষ্টা সেই ভাবেই কথা বলেন ব'লে নীতি-উপদেশ শুষ্কতার চরমে গিয়ে পৌঁছয়; এবং মানুষ যদি বলে স্বার্থত্যাগের ক্ষতিকে এবং প্রবৃত্তিদমনের শুষ্কতাকে গ্রহণ করব কেন, তার উত্তর পাওয়া যায় না।

কিন্তু বীজকে এই জন্যই বলা যেতে পারে, "তুমি নিজেকে বিদীর্ণ কর বিলুপ্ত কর" যেহেতু সেই বিলোপ তার ক্ষয় নয়, তাতেই তার আত্মোপলব্ধি। মানুষ আপনার ক্ষুদ্র জীবনের শক্তিকে অতিক্রম করবে আপনারই বড় জীবনের শক্তি লাভ করবার জন্যে। সেই অতিক্রম করার পথই হচ্চে নীতির পথ, বুদ্ধদেব যাকে শীল বলেচেন সেই শীলের পথ। বীজের ভিতরকার গাছের মত মানুষকে এক জীবন থেকে আরেক জীবনে যেতে হবে ব'লেই মাঝখানে এত তার দ্বন্দ্ব, এত তার দুঃখ। কিন্তু বড় জীবনকে যে মানুষ সুনিশ্চিত সত্য ব'লে জেনেচে এই দুঃখের মূল্য দিতে সে চিন্তা মাত্রও করে না। এই জন্যেই মানুষকে এত ক'রে বলতে হয় আত্মাকে জান। আত্মাকে সত্য ব'লে জান্‌লে সেই আত্মাকে প্রকাশ করবার পরম শক্তি নিজের মধ্যে সহজেই আবিষ্কার করি। কিন্তু আত্মাকে সত্য ব'লে জান্‌তে গেলেও তার আবরণ দূর করতে হবে। সেই আবরণকে দূর করবার জন্যেই প্রবৃত্তিকে দমন করা, স্বার্থকে ত্যাগ করা। বাধার ভিতর দিয়েও আত্মাকে যতক্ষণ না সত্য ব'লে নিশ্চিত জানব ততক্ষণ এই কাজ বড়ই কঠিন, যখন সত্য ব'লে জানব তখন এই কাজ আনন্দময়।

২৪৫
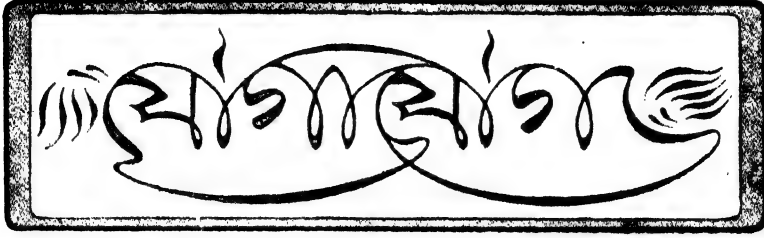
—উপন্যাস—

—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫১

শোবার ঘরে কুমু মোতির মাকে নিয়ে বস্‌ল। কথা কইতে কইতে অন্ধকার হ'য়ে এল, বেহারা এলো আলো জ্বালতে, কুমু নিষেধ ক'রে দিলে।

কুমু সব কথাই শুনলে; চুপ ক'রে রইল।

মোতির মা বল্‌লে, "বাড়িকে ভূতে পেয়েচে বৌরাণী। ওখানে টিঁকে থাকা দায়. তুমি কি যাবে না?"

"আমার কি ডাক পড়েচে?"

"না, ডাকবার কথা বোধ হয় মনেও নেই। কিন্তু তুমি না গেলে তো চল্‌বেই না।"

"আমার কি করবার আছে? আমি তো তাঁকে তৃপ্ত করতে পারব না। ভেবে দেখতে গেলে আমার জন্যেই সমস্ত কিছু হয়েছে, অথচ কোনো উপায় ছিল না। আমি যা দিতে পারতুম সে তিনি নিতে পারলেন না। আজ আমি শূন্য হাতে গিয়ে কি করব?"

"বলো কি বৌরাণী, সংসার যে তোমারই, সে তো তোমার হাতছাড়া হ'লে চল্‌বে না।"

"সংসার বলতে কি বোঝো ভাই? ঘর দুয়োর, জিনিষ পত্র, লোকজন? লজ্জা করে এ কথা বলতে যে, তাতে আমার অধিকার আছে। মহলে অধিকার খুইয়েচি, এখন কি ঐ সব বাইরের জিনিষ নিয়ে লোভ করা চলে?"

"কি বলচ ভাই, বৌরাণী? ঘরে কি তুমি একেবারেই ফিরবে না?"

"সব কথা ভালো ক'রে বুঝতে পারচিনে। আর কিছুদিন আগে হ'লে ঠাকুরের কাছে সঙ্কেত চাইতুম, দৈবজ্ঞের কাছে শুধোতে যেতুম। কিন্তু আমার সে সব ভরসা ধুয়ে মুছে গেছে। আরম্ভে সব লক্ষণই তো ভালো ছিল। শেষে কোনোটাই তো একটুও খাট্‌ল না। আজ কতবার ব'সে ব'সে ভেবেচি দেবতার চেয়ে দাদার বিচারের উপর ভর করলে এত বিপদ ঘটত না। তবুও মনের মধ্যে যে দেবতাকে নিয়ে দ্বিধা উঠেচে, হৃদয়ের মধ্যে তাঁকে এড়াতে পারিনে। ফিরে ফিরে সেইখানে এসে লুটিয়ে পড়ি।"

"তোমার কথা শুনে যে ভয় লাগে। ঘরে কি যাবেই না?"

"কোনো কালেই যাব না সে কথা ভাবা শক্ত, যাবই সে কথাও সহজ নয়।"

"আচ্ছা, তোমার দাদার কাছে একবার কথা ব'লে দেখব। দেখি তিনি কি বলেন। তাঁর দর্শন পাওয়া যাবে তো?"

"চলনা, এখনি নিয়ে যাচ্চি।"

বিপ্রদাসের ঘরে ঢুকেই তার চেহারা দেখে মোতির মা থম্‌কে দাঁড়ালো, মনে হোলো যেন ভূমিকম্পের পরেকার আলো-নেবা চূড়ো ভাঙা মন্দির। ভিতরে একটা অন্ধকার আর নিস্তব্ধতা। প্রণাম ক'রে পায়ের ধূলো নিয়ে মেজের উপর বসল।

বিপ্রদাস ব্যস্ত হ'য়ে বল্‌লে, "এই যে চৌকি আছে;"

মোতির মা মাথা নেড়ে বল্‌লে, "না, এখানে বেশ আছি।"

ঘোমটার ভিতর থেকে তার চোখ ছলছল করতে লাগল। বুঝতে পারলে দাদার এই অবস্থায় কুমুকে ব্যথাই বাজ্‌চে।

কুমু প্রসঙ্গটা সহজ ক'রে দেবার জন্যে বল্‌লে, "দাদা, ইনি বিশেষ ক'রে এসেচেন তোমার মত জিজ্ঞাসা করতে।"

মোতির মা বল্‌লে, "না, না, মত জিজ্ঞাসা পরের কথা, আমি এসেচি ওঁর চরণ দর্শন করতে।"

কুমু বল্‌লে, "উনি জান্‌তে চান, ওঁদের বাড়িতে আমাকে যেতে হবে কিনা।"

বিপ্রদাস উঠে বস্‌ল; বললে, "সে তো পরের বাড়ি, সেখানে কুমু গিয়ে থাকবে কি ক'রে?" যদি ক্রোধের সুরে বল্‌ত তা' হ'লে কথাটার ভিতরকার আগুন এমন ক'রে জ্ব'লে উঠ্‌ত না। শান্ত কণ্ঠস্বর, মুখের মধ্যে উত্তেজনার লক্ষণ নেই।

মোতির মা ফিস ফিস ক'রে কি বল্‌লে। তার অভিপ্রায় ছিল পাশে ব'সে কুমু তার কথাগুলো বিপ্রদাসের কানে পৌঁছিয়ে দেবে। কুমু সম্মত হোলো না, বললে, "তুমিই গলা ছেড়ে বলো।"

মোতির মা স্বর আর একটু স্পষ্ট ক'রে বল্‌লে, "যা ওঁর আপনারি, কেউ তাকে পরের ক'রে দিতে পারে না, তা সে যেই হোক্ না।"

"সে কথা ঠিক নয়। উনি আশ্রিত মাত্র। ওঁর নিজের অধিকারের জোর নেই। ওঁকে ঘরছাড়া করলে হয়তো নিন্দা করবে, বাধা দেবে না। যত শাস্তি সমস্তই কেবল ওঁর জন্যে। তবু অনুগ্রহের আশ্রয়ও সহ্য করা যেত যদি তা মহদাশ্রয় হোত।"

এমন কথার কি জবাব দেবে মোতির মা ভেবে পেলে না। স্বামীর আশ্রয়ে বিঘ্ন ঘটলে মেয়ের পক্ষের লোকেরাই তো পায়ে ধরাধরি করে, এ যে উল্টো কাণ্ড।

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বল্‌লে, "কিন্তু আপন সংসার না থাক্‌লে মেয়েরা যে বাঁচে না, পুরুষেরা ভেসে বেড়াতে পারে, মেয়েদের কোথাও স্থিতি চাইতো।"

"স্থিতি কোথায়? অসম্মানের মধ্যে? আমি তোমাকে ব'লে দিচ্চি কুমুকে যিনি গড়েচেন তিনি আগাগোড়া পরম শ্রদ্ধা ক'রে গড়েচেন। কুমুকে অবজ্ঞা করে এমন যোগ্যতা কারো নেই, চক্রবর্ত্তী সম্রাটেরও না।"

কুমুকে মোতির মা খুবই ভালো বাসে, ভক্তি করে, কিন্তু তবু কোনো মেয়ের এত মূল্য থাক্‌তে পারে যে তার গৌরব স্বামীকে ছাপিয়ে যাবে এ কথা মোতির মার কানে ঠিক লাগল না। সংসারে স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া ঝাঁটি চলুক, স্ত্রীর ভাগ্যে অনাদর অপমানও না হয় যথেষ্ট ঘটল, এমন কি তার থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যে স্ত্রী আফিম্ খেয়ে গলায় দড়ি দিয়ে মরে সেও বোঝা যায়, কিন্তু তাই ব'লে স্বামীকে একেবারে বাদ দিয়ে স্ত্রী নিজের জোরে থাক্‌বে এটাকে মোতির মা স্পর্দ্ধা ব'লেই মনে করে। মেয়ে জাতের এত গুমর কেন! মধুসূদন যত অযোগ্য হোক, যত অন্যায় করুক, তবু সে তো পুরুষ মানুষ; এক জায়গায় সে তার স্ত্রীর চেয়ে আপনিই বড়ো, সেখানে কোনো বিচার খাটে না। বিধাতার সঙ্গে মামলা ক'রে জিতবে কে?

মোতির মা বল্‌লে, "একদিন ওখানে যেতে তো হবেই, আর তো রাস্তা নেই।"

"যেতে হবেই এ কথা ক্রীতদাস ছাড়া কোন মানুষের পক্ষে খাটে না।"

"মন্ত্র প'ড়ে স্ত্রী যে কেনা হ'য়েই গেছে। সাত পাক যেদিন ঘোরা হ'ল সেদিন সে যে দেহে মনে বাঁধা পড়ল, তার তো আর পালাবার জো রইল না। এ বাঁধন যে মরণের বাড়া। মেয়ে হ'য়ে যখন জন্মেচি তখন এ জন্মের মতো মেয়ের ভাগ্য তো আর কিছুতে উজিয়ে ফেরানো যায় না।"

বিপ্রদাস বুঝ্‌তে পার্‌লে মেয়ের সম্মান মেয়েদের কাছেই সব চেয়ে কম। তারা জানেও না যে, এই জন্যে মেয়েদের ভাগ্যে ঘরে ঘরে অপমানিত হওয়া এত সহজ। তারা আপনার আলো আপনি নিবিয়ে ব'সে আছে। তার পরে কেবলি মর্‌চে ভয়ে, কেবলি মর্‌চে ভাবনায়, অযোগ্য লোকের হাতে কেবলি খাচ্চে মার, আর মনে করচে সেইটে নীরবে সহ্য করতেই স্ত্রী-জন্মের সর্ব্বোচ্চ চরিতার্থতা।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

না,—মানুষের এত লাঞ্ছনাকে প্রশ্রয় দেওয়া চলবে না। সমাজ যাকে এতদূর নামিয়ে দিলে সমাজকেই সে প্রতিদিন নামিয়ে দিচ্চে।

বিপ্রদাসের খাটের পাশেই মেজের উপর কুমু মুখ নীচু ক'রে ব'সে ছিল। বিপ্রদাস মোতির মাকে কিছু না ব'লে কুমুর মাথায় হাত দিয়ে বল্‌লে, "একটা কথা তোকে বলি, কুমু, বোঝবার চেষ্টা করিস্। ক্ষমতা জিনিষটা যেখানে প'ড়ে পাওয়া জিনিষ, যার কোন যাচাই নেই, অধিকার বজায় রাখবার জন্যে যাকে যোগ্যতার কোন প্রমাণ দিতে হয় না, সেখানে সংসারে সে কেবলি হীনতার সৃষ্টি করে। এ কথা তোকে অনেকবার বলেচি, তোর সংস্কার তুই কাটাতে পারিস নি, কষ্ট পেয়েছিস্। তুই যখন বিশেষ ক'রে ব্রাহ্মণভোজন করাতিস্ কোন দিন বাধা দিই নি, কেবল বার বার বোঝাতে চেষ্টা করেচি, অবিচারে কোনো মানুষের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার ক'রে নেওয়ার দ্বারা শুধু যে তারই অনিষ্ট তা নয়, তাতে ক'রে সামাজের শ্রেষ্ঠতার আদর্শকেই খাটো করে। এ রকম অন্ধ শ্রদ্ধার দ্বারা নিজেরই মনুষ্যত্বকে অশ্রদ্ধা করি এ কথা কেউ ভাবে না কেন? তুই তো ইংরেজি সাহিত্য কিছু কিছু পড়েচিস্, বুঝতে পার্‌চিস নে, এই রকম যত দল-গড়া শাস্ত্রগড়া নির্ব্বিকার ক্ষমতার বিরুদ্ধে সমস্ত জগতে আজ লড়াইয়ের হাওয়া উঠেচে। যত সব ইচ্ছাকৃত অন্ধ দাসত্বকে বড়ো নাম দিয়ে মানুষ দীর্ঘকাল পোষণ করেচে, তারি বাসা ভাঙবার দিন এলো।"

কুমু মাথা নীচু ক'রেই বল্‌লে, "দাদা, তুমি কি বলো স্ত্রী স্বামীকে অতিক্রম করবে?"

"অন্যায় অতিক্রম করা মাত্রকেই দোষ দিচ্চি স্বামীও স্ত্রীকে অতিক্রম করবে না—এই আমার মত।"

"যদি করে, স্ত্রী কি তাই ব'লে—"

কুমুর কথা শেষ না হ'তেই বিপ্রদাস বল্‌লে, "স্ত্রী যদি সেই অন্যায় মেনে নেয় তবে সকল স্ত্রীলোকের প্রতিই তাতে ক'রে অন্যায় করা হবে। এমনি ক'রে প্রত্যেকের দ্বারাই সকলের দুঃখ জ'মে উঠেচে। অত্যাচারের পথ পাকা হয়েচে।"

মোতির মা একটু অধৈর্য্যের স্বরেই বল্‌লে, "আমাদের বউরাণী সতীলক্ষ্মী, অপমান করলে সে অপমান ওঁকে স্পর্শ কর্‌তেও পারে না।"

বিপ্রদাসের কণ্ঠ এইবার উত্তেজিত হ'য়ে উঠ্‌ল, "তোমরা সতীলক্ষ্মীর কথাই ভাবচ। আর যে কাপুরুষ তাকে অবাধে অপমান কর্‌বার অধিকার পেয়ে সেটাকে প্রতিদিন খাটাচ্চে তার দুর্গতির কথা ভাবচ না কেন?"

কুমু তখনি উঠে দাঁড়িয়ে বিপ্রদাসের চুলের মধ্যে আঙুল বুলোতে বুলোতে বললে, "দাদা, তুমি আর কথা কোয়োনা। তুমি যাকে মুক্তি বলো, যা জ্ঞানের দ্বারা হয়, আমাদের রক্তের মধ্যে তার বাধা। আমরা মানুষকেও জড়িয়ে থাকি, বিশ্বাসকেও; কিছুতেই তার জট ছাড়াতে পারিনে। যতই ঘা খাই ঘুরে ফিরে আটকা পড়ি। তোমরা অনেক জানো তাতেই তোমাদের মন ছাড়া পায়, আমরা অনেক মানি তাতেই আমাদের জীবনের শূন্য ভরে। তুমি যখন বুঝিয়ে দাও তখন বুঝতে পারি হয়তো আমার ভুল আছে। কিন্তু ভুল বুঝতে পারা, আর ভুল ছাড়তে পারা কি একই? লতার আঁকড়ির মতো আমাদের মমত্ব সব কিছুকেই জড়িয়ে জড়িয়ে ধরে, সেটা ভালই হোক আর মন্দই হোক, তার পরে আর তাকে ছাড়তে পারিনে।"

বিপ্রদাস বল্‌লে, "সেই জন্যেই তো সংসারে কাপুরুষের পূজার পূজারিণীর অভাব হয় না। তারা জানবার বেলা অপবিত্রকে অপবিত্র ব'লেই জানে, কিন্তু মানবার বেলায় তাকে পবিত্রের মতো ক'রেই মানে।"

কুমু বল্‌লে, "কি করবো দাদা, সংসারকে দুই হাতে জড়িয়ে নিতে হবে ব'লেই আমাদের সৃষ্টি। তাই আমরা গাছকেও আঁকড়ে ধরি, শুকনো কুটোকেও। গুরুকেও মান্‌তে আমাদের যতক্ষণ লাগে—ভণ্ডকে মান্‌তেও ততক্ষণ; জাল যে আমাদের নিজের ভিতরেই। দুঃখ থেকে আমাদেরকে বাঁচাবে কে? সেই জন্যেই ভাবি দুঃখ যদি পেতেই হয়, তাকে মেনে নিয়েও তাকে ছাড়িয়ে ওঠবার উপায় করতে হবে। তাইতো মেয়েরা এতো ক'রে ধর্ম্মকে আশ্রয় ক'রে থাকে।"

বিপ্রদাস কিছুই বল্‌লে না, চুপ ক'রে ব'সে রইল।

সেই ওর চুপ ক'রে ব'সে থাকাটাও কুমুকে কষ্ট দিলে। কুমু জানে কথা বলার চেয়েও এর ভার অনেক বেশি।

ঘর থেকে বেরিয়ে এসে মোতির মা কুমুকে জিজ্ঞাসা করলে, "কি ঠিক করলে বৌরাণী ?"

কুমু বললে, "যেতে পারব না। তা ছাড়া, আমাকে তো ফিরে যাবার অনুমতি দেন নি।"

মোতির মা মনে মনে কিছু বিরক্তই হোলো। শ্বশুর বাড়ীর প্রতি ওর শ্রদ্ধা যে বেশী তা নয়, তবু শ্বশুর বাড়ী সম্বন্ধে দীর্ঘকালের মমত্ব-বোধ ওর হৃদয়কে অধিকার ক'রে আছে। সেখানকার কোনো বউ যে তাকে লঙ্ঘন করবে এটা তার কিছুতেই ভালো লাগ্‌লো না। কুমুকে যা বল্‌লে তার ভাবটা এই, পুরুষ মানুষের প্রকৃতিতে দরদ কম আর তার অসংযম বেশি, গোড়া থেকেই এটা তো ধরা কথা। সৃষ্টি তো আমাদের হাতে নেই, যা পেয়েচি তাকে নিয়েই ব্যবহার করতে হবে। "ওরা ঐ রকমই" ব'লে মনটাকে তৈরি ক'রে নিয়ে যেমন ক'রে হোক সংসার-টাকে চালানোই চাই। কেন না—সংসারটাই মেয়েদের। স্বামী ভালোই হোক মন্দই হোক সংসারটাকে স্বীকার ক'রে নিতেই হবে। তা যদি একেবারে অসম্ভব হয় তা হ'লে মরণ ছাড়া আর গতিই নেই।

কুমু হেসে বল্‌লে, "না হয় তাই হোলো। মরণের অপরাধ কি ?"

মোতির মা উদ্বিগ্ন হ'য়ে ব'লে উঠ্‌ল, "অমন কথা বোলো না।"

কুমু জানে না, অল্পদিন হোলো ওদেরই পাড়াতে একটি সতেরো বছরের বউ কার্ব্বলিক এসিড খেয়ে আত্মহত্যা করেছিল। তার এম্ এ পাশ করা স্বামী --গবর্মেণ্ট আপিসে বড় চাকরী করে। স্ত্রী খোঁপায় গোঁজবার একটা রূপোর চিরুনি হারিয়ে ফেলেচে, মার কাছ থেকে এই নালিশ শুনে লোকটা তাকে লাথি মেরেছিল। মোতির মার সেই কথা মনে প'ড়ে গায়ে কাঁটা দিলে।

এমন সময় নবীনের প্রবেশ। কুমু খুসি হ'য়ে উঠ্‌ল। বল্‌লে, "জানতুম ঠাকুরপোর আস্‌তে বেশি দেরি হবে না।"

নবীন হেসে বল্‌লে, "ন্যায় শাস্ত্রে বৌরাণীর দখল আছে। আগে দেখেছেন শ্রীমতী ধোঁয়াকে, তার থেকে শ্রীমান আগুনের আবির্ভাব হিসেব করতে শক্ত ঠেকেনি।"

মোতির মা বল্‌লে, "বৌরাণী, তুমিই ওকে নাই দিয়ে বাড়িয়ে তুলেচ। ও বুঝে নিয়েচে ওকে দেখ্‌লে তুমি খুসি হও, সেই দেমাকে—"

"আমাকে দেখ্‌লেও খুসি হ'তে পারেন যিনি, তাঁর কি কম ক্ষমতা ? যিনি আমাকে সৃষ্টি করেচেন তিনিও নিজেই হাতের কাজ দেখে অনুতাপ করেন, আর যিনি আমার পাণিগ্রহণ করেচেন তাঁর মনের ভাব দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ।"

"ঠাকুরপো, তোমরা দুজনে মিলে কথা কাটাকাটি করো, তৃতীয় ব্যক্তি ছন্দোভঙ্গ করতে চায় না, আমি এখন চল্‌লুম।"

মোতির মা বল্‌লে, "সে কি কথা ভাই! এখানে তৃতীয় ব্যক্তিটা কে ? তুমি না আমি ? গাড়ি ভাড়া ক'রে ও কি আমাকে দেখ্‌তে এসেচে ভেবেচ ?"

"না, ওঁর জন্যে খাবার ব'লে দিই গে।" ব'লে কুমু চ'লে গেল।

৫২

মোতির মা জিজ্ঞাসা করলে, "কিছু খবর আছে বুঝি ?"

"আছে। দেরি করতে পারলুম না, তোমার সঙ্গে পরামর্শ করতে এলুম। তুমি তো চ'লে এলে, তার পরে দাদা হঠাৎ আমার ঘরে এসে উপস্থিত। মেজাজটা খুবই খারাপ। সামান্য দামের একটা গিল্‌ট করা চুরোটের ছাইদান টেবিল থেকে অদৃশ্য হয়েছে। সম্প্রতি যাঁর অধিকারে সেটা এসেচে তিনি নিশ্চয়ই সেটাকে সোনা ব'লেই ঠাউরেচেন, নইলে পরকাল খোওয়াতে যাবেন কোন্ সাধে। জানো তো তুচ্ছ একটা জিনিষ ন'ড়ে গেলে দাদার বিপুল সম্পত্তির ভিৎটাতে যেন নাড়া লাগে, সে তিনি সইতে পারেন না। আজ সকালে আপিসে যাবার সময় আমাকে ব'লে গেলেন শ্যামাকে দেশে পাঠাতে। আমি খুব উৎসাহের সঙ্গেই সেই পবিত্র কাজে লেগেছিলুম। ঠিক করেছিলুম তিনি আপিস থেকে ফেরবার আগেই কাজ সেরে রাখব। এমন

যোগাযোগ

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সময়ে বেলা দেড়টার সময় হঠাৎ দাদা একদমে আমার ঘরে এসে ঢুকে পড়লেন। বল্লেন, এখনকার মতো থাক্। যেই ঘর থেকে বেরতে যাচ্চেন, আমার ডেস্কের উপর বৌরাণীর সেই ছবিটি চোখে পড়ল। থম্‌কে গেলেন। বুঝলুম আড় চাহনিটাকে সিধে ক'রে নিয়ে ছবিটিকে দেখতে দাদার লজ্জা বোধ হচ্চে। বললুম, দাদা একটু বোসো, একটা ঢাকাই কাপড় তোমাকে দেখাতে চাই। মোতির মার ছোট ভাজের সাধ, তাই তাকে দিতে হবে। কিন্তু গণেশরাম দামে আমাকে ঠকাচ্চে ব'লে বোধ হচ্চে। তোমাকে দিয়ে সেটা একবার দেখিয়ে নিতে চাই। আমার যতটা আন্দাজ তাতে মনে হয় না তো তেরো টাকা তার দাম হ'তে পারে। খুব বেশি হয় তো ন টাকা সাড়ে ন টাকার মধ্যেই হওয়া উচিত।"

মোতির মা অবাক হ'য়ে বল্‌লে, "ও আবার তোমার মাথায় কোথা থেকে এল? আমার ছোট ভাজের সাধ হবার কোনো উপায়ই নেই। তার কোলের ছেলেটির বয়স তো সবে দেড় মাস। বানিয়ে বল্‌তে তোমার আজকাল দেখচি কিছুই বাধে না। এই তোমার নতুন বিদ্যে পেলে কোথায়?"

"যেখান থেকে কালিদাস তাঁর কবিত্ব পেয়েচেন, বাণী বীণাপাণির কাছ থকে।"

"বীণাপাণি তোমাকে যতক্ষণ না ছাড়েন ততক্ষণ তোমাকে নিয়ে ঘর করা যে দায় হবে।"

"পণ করেচি, স্বর্গারোহণকালে নরকদর্শন ক'রে যাব, বৌরাণীর চরণে এই আমার দান

"কিন্তু সাড়ে ন টাকা দামের ঢাকাই কাপড় তখনি তখনি তোমার জুট্‌ল কোথায়?"

"কোথাও না। কুড়ি মিনিট পরে ফিরে এসে বল্লুম, গণেশরাম সে কাপড় আমাকে না ব'লেই ফিরিয়ে নিয়ে গেছে। দাদার মুখ দেখে বুঝলুম, ইতিমধ্যে ছবিটা তাঁর মগজের মধ্যে ঢুকে স্বপ্নের রূপ ধরেচে। কি জানি কেন, পৃথিবীতে আমারি কাছে দাদার একটু আছে চক্ষুলজ্জা, আর কারো হ'লে ছবিটা ধাঁ ক'রে তুলে নিতে তাঁর বাধত না।'

"তুমিও তো লোভী কম নও। দাদাকে না হয় সেটা দিতেই।"

"তা দিয়েচি, কিন্তু সহজ মনে দিইনি। বল্লেম, দাদা, এই ছবিটা থেকে একটা অয়েল পেন্টিঙ করিয়ে নিয়ে তোমার শোবার ঘরে রেখে দিলে হয় না? দাদা যেন উদাসীন ভাবে বললে, 'আচ্ছা দেখা যাবে।' ব'লেই ছবিটা নিয়ে উপরের ঘরে চ'লে গেল। তার পরে কি হোলো ঠিক জানিনে। বোধ করি আপিসে যাওয়া হয়নি, আর ঐ ছবিটাও ফিরে পাবার আশা রাখিনে।"

"তোমার বৌরাণীর জন্যে স্বর্গটাই খোওয়াতে যখন রাজি আছ, তখন না হয় একখানা ছাবই বা খোওয়ালে।"

"স্বর্গটা সম্বন্ধে সন্দেহ আছে, ছবিটা সম্বন্ধে একটুও সন্দেহ ছিল না। এমন ছবি দৈবাৎ হয়। যে দুর্লভ লগ্নে ওঁর মুখটিতে লক্ষ্মীর প্রসাদ সম্পূর্ণ নেমেছিল, ঠিক সেই শুভ যোগটি ঐ ছবিতে ধরা প'ড়ে গেছে। এক একদিন রাত্তিরে ঘুম থেকে উঠে আলো জ্বালিয়ে ঐ ছবিটি দেখেছি। প্রদীপের আলোয় ওর ভিতরকার রূপটি যেন আরো বেশি ক'রে দেখা যায়।"

"দেখ, আমার কাছে অত বাড়াবাড়ি করতে তোমার একটুও ভয় নেই?"

"ভয় যদি থাকত তা হ'লেই তোমার ভাবনার কথাও থাকত। ওঁকে দেখে আমার আশ্চর্য্য কিছুতে ভাঙে না। মনে করি আমাদের ভাগ্যে এটা সম্ভব হ'ল কি ক'রে? আমি যে ওঁকে বৌরাণী বলতে পারচি এ ভাবলে গায়ে কাঁটা দেয়। আর উনি যে সামান্য নবীনের মতো মানুষকেও হাসি মুখে কাছে বসিয়ে খাওয়াতে পারেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এও এত সহজ হোলো কি ক'রে? আমাদের পরিবারের মধ্যে সব চেয়ে হতভাগা আমার দাদা। যাকে সহজে পেলেন তাকে কঠিন ক'রে বাঁধতে গিয়েই হারালেন।"

"বাস্‌রে, বৌরাণীর কথায় তোমার মুখ যখন খুলে যায় তখন থামতে চায় না।"

"মেজ বৌ, জানি তোমার মনে একটুখানি বাজে

"না, কখখনো না।"

"হাঁ অল্প একটু! কিন্তু এই উপলক্ষ্যে একটা কথা মনে করিয়ে দেওয়া ভালো। নূরনগরে ষ্টেশনে প্রথম বৌরাণীর দাদাকে দেখে যে সব কথা বলেছিলে চলতি ভাষায় তাকেও বাড়াবাড়ি বলা চলে।"

"আচ্ছা, আচ্ছা, ওসব তর্ক থাক, এখন কি বলতে চাচ্ছিলে বলো।"

"আমার বিশ্বাস আজকালের মধ্যেই দাদা বৌরাণীকে ডেকে পাঠাবেন। বৌরাণী যে এত আগ্রহে বাপের বাড়ি চ'লে এলেন, আর তার পর থেকে এতদিন ফেরবার নাম নেই, এতে দাদার প্রচণ্ড অভিমান হয়েচে তা জানি। দাদা কিছুতেই বুঝতে পারেন না সোনার খাঁচাতে পাখীর কেন লোভ নেই। নির্ব্বোধ পাখী, অকৃতজ্ঞ পাখী।"

"তা ভালোই তো, বড়োঠাকুর ডেকেই পাঠান না। সেই কথাই তো ছিল।"

"আমার মনে হয়, ডাকবার আগেই বৌরাণী যদি যান ভালো হয়, দাদার ঐটুকু অভিমানের না হয় জিৎ রইল। তা ছাড়া বিপ্রদাস বাবু তো চান বৌরাণী তাঁর সংসারে ফিরে যান. আমিই নিষেধ করেছিলুম।"

বিপ্রদাসের সঙ্গে এই নিয়ে আজ কি কথা হয়েচে মোতির মা তার কোনো আভাস দিলে না। বল্‌লে, "বিপ্রদাস বাবুর কাছে গিয়ে বলই না।"

"তাই যাই, তিনি শুন্‌লে খুসি হবেন।"

এমন সময় কুমু দরজার বাইরে থেকে বল্‌লে, "ঘরে ঢুকব কি?"

মোতির মা বল্‌লে, "তোমার ঠাকুরপো পথ চেয়ে আছেন।"

"জন্ম জন্ম পথ চেয়ে ছিলুম, এইবার দর্শন পেলুম।"

"আঃ ঠাকুরপো, এত কথা তুমি বানিয়ে বল্‌তে পারো কি ক'রে?"

"নিজেই আশ্চর্য্য হ'য়ে যাই, বুঝতে পারিনে।"

"আচ্ছা, চল এখন খেতে যাবে।"

"খাবার আগে একবার তোমার দাদার সঙ্গে কিছু কথাবার্ত্তা ক'য়ে আসিগে।"

"না, সে হবে না।"

"কেন?"

"আজ দাদা অনেক কথা বলেচেন, আজ আর নয়।"

"ভালো খবর আছে।"

"তা' হোক, কাল এসো বরঞ্চ। আজ কোনো কথা নয়।"

"কাল হয়তো ছুটি পাব না, হয়তো বাধা ঘটবে। দোহাই তোমার, আজ একবার কেবল পাঁচ মিনিটের জন্যে। তোমার দাদা খুসি হবেন, কোনো ক্ষতি হবে না তাঁর।"

"আচ্ছা আগে তুমি খেয়ে নাও, তার পরে হবে।"

খাওয়া হয়ে গেলে পর কুমু নবীনকে বিপ্রদাসের ঘরে নিয়ে এল। দেখলে দাদা তখনো ঘুমোয়নি। ঘর প্রায় অন্ধকার, আলোর শিখা ম্লান। খোলা জানালা দিয়ে তারা দেখা যায়; থেকে থেকে হুহু ক'রে বইচে দক্ষিণের হাওয়া; ঘরের পর্দ্দা, বিছানার ঝালর, আলনায় ঝোলানো বিপ্রদাসের কাপড় নানারকম ছায়া বিস্তার ক'রে কেঁপে কেঁপে উঠ্‌চে, মেজের উপর খবরের কাগজের একটা পাতা যখন তখন এলোমেলো উড়ে বেড়াচ্চে। আধ-শোওয়া অবস্থায় বিপ্রদাস স্থির হ'য়ে ব'সে। এগোতে নবীনের পা সরে না। প্রদোষের ছায়া আর রোগের শীর্ণতা বিপ্রদাসকে একটা আবরণ দিয়েচে, মনে হচ্চে ও যেন সংসার থেকে অনেক দূর, যেন অন্য লোকে। মনে হোলো ওর মত এমনতরো একলা মানুষ আর জগতে নেই!

নবীন এসে বিপ্রদাসের পায়ের ধূলো নিয়ে বল্‌লে. "বিশ্রামে ব্যাঘাত করতে চাইনে। একটি কথা ব'লে যাব। সময় হয়েচে, এইবার বৌরাণী ঘরে ফিরে আসবেন ব'লে আমরা চেয়ে আছি।"

বিপ্রদাস কোনো উত্তর করলে না, স্থির হ'য়ে ব'সে রইল।

খানিক পরে নবীন বল্‌লে, "আপনার অনুমতি পেলেই ওঁকে নিয়ে যাবার বন্দোবস্ত করি।"

ইতিমধ্যে কুমু ধীরে ধীরে দাদার পায়ের কাছে এসে বসেচে। বিপ্রদাস তার মুখের উপর দৃষ্টি রেখে বল্‌লে,

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

"মনে যদি করিস তোর যাবার সময় হয়েচে তা হ'লে যা, কুমু।"

কুমু বল্লে, "না, দাদা, যাব না।" ব'লে বিপ্রদাসের খাটুর উপর উপুড় হ'য়ে পড়ল।

ঘর স্তব্ধ, কেবল থেকে থেকে দমকা বাতাসে একটা শিথিল জানালা খড় খড় করচে, আর বাইরে বাগানে গাছের পাতাগুলো মর্ম্মরিয়ে উঠ্‌চে।

কুমু একটু পরে বিছানা থেকে উঠেই নবীনকে বল্লে, "চলো আর দেরি নয়। দাদা, তুমি ঘুমোও।"

মোতির মা বাড়িতে ফিরে এসে বল্লে, "এতটা কিন্তু ভালো না।"

"অর্থাৎ চোখে খোঁচা দেওয়াটা যেম্‌নি হোক না, চোখটা রাঙা হ'য়ে ওঠা একেবারেই ভালো নয়।"

"না গো, না, ওটা ওদের দেমাক। সংসারে ওঁদের যোগ্য কিছুই মেলে না, ওঁরা সবার উপরে।"

"মেজ বৌ, এতবড়ো দেমাক সবাইকে সাজে না, কিন্তু ওঁদের কথা আলাদা।"

"তাই ব'লে কি আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি করতে হবে?"

"আত্মীয়স্বজন বল্লেই আত্মীয়স্বজন হয় না। ওঁরা আমাদের থেকে সম্পূর্ণ আর এক শ্রেণীর মানুষ। সম্পর্ক ধ'রে ওঁদের সঙ্গে ব্যবহার করতে আমার সঙ্কোচ হয়।"

"যিনি যত বড়ো লোকই হোন্ না কেন, তবু সম্পর্কের জোর আছে এটা মনে রেখো।"

নবীন বুঝতে পারলে এই আলোচনার মধ্যে কুমুর পরে মোতির মার একটুখানি ঈর্ষার ঝাঁজও আছে। তা ছাড়া এটাও সত্যি, পারিবারিক বাঁধনটার দাম মেয়েদের কাছে খুবই বেশি। তাই নবীন এ নিয়ে বৃথা তর্ক না ক'রে বল্লে, "আর কিছুদিন দেখাই যাক্ না। দাদার আগ্রহটাও একটু বেড়ে উঠুক, তাতে ক্ষতি হবে না।"

(ক্রমশঃ)
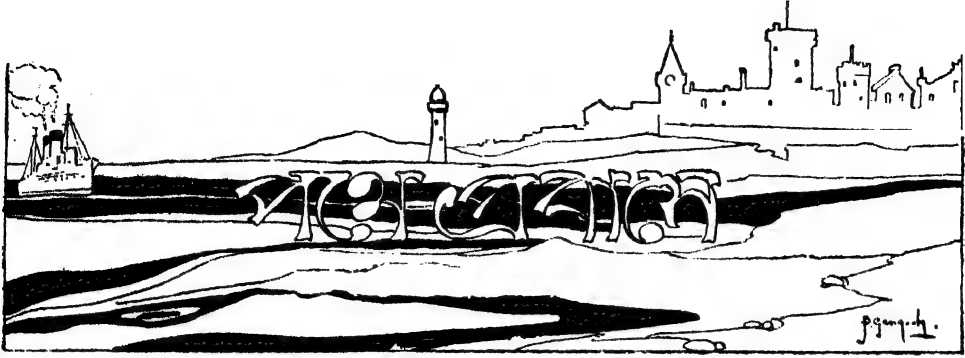
—শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়

১৫

যতগুলো রাজপ্রাসাদ দেখ্‌লুম তাদের কোনোটাই মনে ধর্‌ল না, কেননা কোনোটাই যথেষ্ট আড়ম্বরপূর্ণ নয়। পোষাকে—প্রাসাদে—যানে—বাহনে—বেগমে—গোলামে আমাদের রাজ রাজড়ারাই দুনিয়ার সেরা। আগ্রা দিল্লি লক্ষ্ণৌ বেনারসের সঙ্গে ভার্সেলস্ ভিয়েনা মিউনিক বুডাপেষ্টের এইখানেই হার যে রাজাতে প্রজাতে ভারতবর্ষে যেমন আস্‌মান জমীন্ ফরক্, সম্ভবত এক রাশিয়া ছাড়া ইউরোপের আর কোথাও তেমন ছিল না। আমরা ধাতে এক্‌সট্রীমিষ্ট্। আমরা রাজ বাদ্‌শা ও ভিখারী ফকির ছাড়া কারুকে সম্মান করিনে। তাই আমাদের দেশে ভোগের নামে লোকে মূর্চ্ছা যায়, ভাবে না জানি কোন রাজা-রাজড়ার মতো ভোগ করতে গিয়ে ভিখারীতে সমাজ ভরিয়ে দেবে! আর ত্যাগের নাম করলে ধড়ে প্রাণ আসে,—হাঁ, সমাজের পাঁচজনের উপরে লোকটার দরদ আছে বটে। দেখ্‌ছো না, আমাদেরি জন্যে উনি কৌপীন ধর্‌লেন! "অধমতারণ পতিতপাবন জয় আমাদের—"ইত্যাদি।

ভোগের আড়ম্বর ও ত্যাগের আড়ম্বর বোধহয় কেবল ভারতবর্ষের নয়, প্রখর সূর্য্যালোকিত দেশগুলির দুর্ভাগ্য। ঈজিপ্টে ও গ্রীসে সমাজের একটা ভাগ দাসত্ব করেছে, অপর ভাগ সেই দাসত্বের উপরে পিরামিড্ খাড়া করেছে। অতটা এক্‌সট্রীমিজ্‌ম্ প্রকৃতির সহ হয় না—ঈজিপ্ট্ ও গ্রীস্ ট'লে পড়েছে। দাসও মরেছে, দাসের রাজাও। ভারতবর্ষেও কোনো একটা রাজবংশ দু'চার পুরুষের বেশী টেঁকেনি, যত বিজেতা এসেছে সবাই দু'চার পুরুষ পরে বিজিত হয়েছে। ইংরেজের বেলা এর ব্যতিক্রম হ'লো, কেননা ইংরেজ ভারতবর্ষের জল-হাওয়া কিম্বা ধাত কোনোটাকেই স্বীকার করেনি, ইংরেজ দূর থেকে শাসন করে এবং ঘরের প্রভাববশত মনে প্রাণে নাতিশীতোষ্ণ থাকে। ইংরেজের temper গরমও নয়, নরমও নয়; অসহিষ্ণুও নয়, সহিষ্ণুও নয়। ইংরেজ আশ্চর্য্য রকম মধ্যপন্থী। তবে এও ঠিক যে ইংরেজ অত্যন্ত বেশী মাঝারি। এই মাঝারিত্বকে লোকে গালাগাল দিয়ে বলে conservatism; আসলে কিন্তু ইংরেজের conservatism স্থাণুত্ব নয়, ধীরে সুস্থে চলা, slow but sure—কচ্ছপ-গতি। সূর্য্যের আলোর মদে মাতাল ফরাসীরা কতকটা আমাদেরি মতো এক্‌সট্রীমিষ্ট্, তাই তারা সুদীর্ঘ কাল মহাশয়ের মতো যাই সওয়াবে তাই সয়, অবশেষে একদিন এট্‌না আগ্নেয়গিরির মতো অগ্নিবৃষ্টি ক'রে আবার চুপচাপ ব'সে মদে চুমুক দেয়। তার ফলে খরগোসকে ছাড়িয়ে কচ্ছপ এগিয়ে যায়।

তবে ফরাসী বলো জার্ম্মান বলো ইংরেজ বলো—কেউ আমাদের মতো ছোটতে বড়তে আস্‌মান জমীন ব্যবধান ঘটতে দেয় না, সময় থাক্‌তে প্রতীকার করে। এই যে

শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়

সোশ্যালিষ্ট্ মুভ্মেণ্ট্, এটার মতো মুভ্মেণ্ট্ প্রতি শতাব্দীতে ইউরোপের প্রতি দেশে দেখা দিয়েছে। আজ যদি এ মুভ্মেণ্ট্ অতি বৃহৎ হ'য়ে থাকে তবে যার বিরুদ্ধে এ মুভ্মেণ্ট্ সেও আজ অতি বৃহৎ হ'য়ে উঠেছে। সমাজের একটা পা আজ বিপর্য্যয় লাফ দিয়ে এগিয়ে গেছে ব'লেই অপর পা'টা বিপর্য্যয় লাফ দিয়ে সঙ্গ রাখ্‌তে ব্যগ্র। ইউরোপের ধনীরা আজকের এই উন্মুক্ত পৃথিবী থেকে যে প্রচুর ধন আহরণ ক'রে ঘরে আন্‌ছে, ইউরোপের শ্রমিকরা সেই প্রচুর ধনেরই একটা সমানানুপাত বণ্টন চায়।

ইংরেজ নিজে পাঁউরুটিটা মাছটা খেয়ে আমাদের ছিব্‌ড়েটা কাঁটাটা ফেলে দেয় ব'লে আমাদের একটা মস্ত অভিমান আছে। এ অভিমানটা যে এক হাজার বছর আগেও ছিল এর প্রমাণ তখনকার দিনেও আমাদের দেশে বৈরাগ্যাভিমানী ছিল বিস্তর, এরা সমাজের সেই ভাগটা যে ভাগ বৃহৎ ব্যবধান সইতে না পেরে সুতো-ছেঁড়া ঘুঁড়ির মতো আকাশে নিরুদ্দেশ হ'য়ে যায়। এরা ধনীলোকের ধনভার লাঘব ক'রে দরিদ্রের দারিদ্র্যতার লাঘব করেনি, কেননা সেজন্যে অনেক দুঃখ ভুগ্‌তে হয় এবং কোনোদিন সে ভোগের শেষ নেই। প্রকৃতির অনাদ্যন্ত এই যে সাধনা এই ভার সাম্যের সাধনায় প্রকৃতির সঙ্গে সন্ন্যাসী যোগ দেয় না, সে চিরকালের মতো সিদ্ধি চায়। যে জগতে প্রতিদিন বড় বড় গ্রহ নক্ষত্র ভাঙ্ছে, মহাশূন্যের গর্ভে বড় বড় নৌকাডুবি ঘট্‌ছে, প্রতিদিন ছোট ছোট অনুপরমাণু থেকে নব নব গ্রহ নক্ষত্র গ'ড়ে উঠ্‌ছে, ছোট ছোট প্রবালকীট মিলে অপূর্ব্ব প্রবালদ্বীপ গেঁথে তুল্‌ছে—এই প্রতিদিনের খেলাঘরে সন্ন্যাসীকে কেউ পাবে না। সে তার কাঁথা-কম্বল ছাল-বল্কল আঁকড়ে ধ'রে বিরাগী হয়ে গেছে। এদিকে মহারাজের অন্তঃপুরে রাণী মক্ষিকার সংখ্যা বাড়্‌ছে এবং দাসমক্ষিকাদের ক্রন্দনগুঞ্জনে সংসারচক্র মুখর হ'লো। প্রাসাদে আর কুটীরে ভারতবর্ষের মাটি আর মর্ত্ত্য নয়, একাধারে স্বর্গ—পাতাল। আল্‌স্ পর্ব্বত ও ভূমধ্য সাগর সহ্য হয়, কেননা উঁচু নীচু হ'লেও তাদের ব্যবধান দুরতিক্রম নয়, কিন্তু হিমালয় পর্ব্বত ও ভারতসাগর সহ্য হয় না। উপরে ত্রিশ হাজার ফিট্ ও নীচে বিশ হাজার ফিট্—পঞ্চাশ হাজার ফিটের ব্যবধান দুরতিক্রম। ভারতবর্ষের রাজা মহারাজারা যে চালে থাকেন ইউরোপের সম্রাটদের পক্ষেও তা স্বপ্ন এবং ভারতবর্ষের চাষা মজুররা যে চালে থাকে ইউরোপের ভিখারীদের পক্ষেও তা দুঃস্বপ্ন। এবং এই ব্যাপার খুব সম্ভব হাজার হাজার বছর থেকে চ'লে আস্‌ছে কেননা আমরা চিরকাল In-temperate Zoneএর লোক। আর আমাদের দেশটাও চিরকাল এত বেশী উঁচু নীচু যে আমাদের চোখে জীবনের বিশ্রীরকম উঁচু নীচুও একটা সহজ উপমার মতো স্বাভাবিক ঠেকে।

রাজ প্রাসাদগুলি পরিদর্শন কর্‌বার সময় লক্ষ্য করেছি সেগুলি কেবল রাজপ্রাসাদ নয়, সেগুলির প্রত্যেকটি একটি পুরুষ ও একটি নারীর দুঃখ সুখের নীড়—এক একটি "home"। ইংরেজী "home" কথাটির ভারতীয় প্রতিশব্দ নেই, কেননা "home" কেবল গৃহ নয়, একটি নারীর ও একটি পুরুষের কাঠ-পাথরে রূপান্তরিত প্রেম। ইংরেজ যুবক যখন বিবাহ করে তখন তার স্ত্রী তার কাছে এমন একটি গুহা প্রত্যাশা করে যেখানে সে সিংহীর মতো স্বাধীন, যেখানে তার স্বামী পর্য্যন্ত তার অতিথি, শাশুড়ী শ্বশুর জা দেবর তার পক্ষে ততখানি দূর, শাশুড়ী শ্বশুর শ্যালক শ্যালিকা তার স্বামীর পক্ষে যতখানি। গুহার বাইরে তার স্বামীর এলাকা, গুহার ভিতরে তার নিজের; কেউ কারুর এলাকায় অনধিকার প্রবেশ কর্‌তে পারে না। বাড়ীতে একটা চাকর বাহাল কর্‌বার অধিকারও স্বামীর নেই, কিম্বা চাকরকে জবাব দেবার। বাজার করাটাও স্ত্রীর এলাকা, কেবল দাম দেবার বেলা স্বামীকে ডাক পড়ে। এক আফিসে এবং ক্লাবে ছাড়া স্বামীকে কেউ চেনে না, আস্‌বাবের দোকানে গহনার দোকানে পোষাকের দোকানে ধোপার বাড়ীতে ছেলে মেয়েদের ইস্কুলে বাড়ীওয়ালার কাছে নিমন্ত্রণে আমন্ত্রণে পার্টিতে নাচে সর্ব্বত্র স্ত্রীর বৈজয়ন্তী। এ সমস্তই "home"এর এলাকায় পড়ে। অতএব "home"কে আপনারা কেউ চারখানা দেয়াল ও একখানা সীলিং ঠাওরাবেন না। ছেলের দোল্‌না থেকে ছেলের বাপের

খাবারটেবিল্ পর্য্যন্ত যাঁর রাণীত্ব তিনি সুগৃহিণী নন্, সমাজে তাঁর নিন্দা, তিনি কুণো। গির্জ্জায়, চ্যারিটি bazaarএ, সমাজসেবার সব আয়োজনে যাঁর হাত (বা হস্তক্ষেপ) তিনিই সুগৃহিণী !

এত যদি স্ত্রীর অধিকার তবে feminismএর ঝড় উঠ্লো কেন? কারণ industrial revolutionএর ফলে সমাজে একটা ভূমিকম্প ঘটে গেছে, ছেলেরা সারা-জীবন দেশ দেশান্তরে ঘুরছে, মেয়েরা "home" করবে কাকে নিয়ে? "Home"এর মধ্যে একটা স্থায়িত্বের ভাব আছে, স্থানিক স্থায়িত্ব না হ'ক্, সাময়িক স্থায়িত্ব। প্রেম স্থায়ী না হ'লে "home" হয় না। স্বামী স্ত্রী ঠাঁই-ঠাঁই হ'লেও ভাবনা ছিল না, দুজনের হৃদয়ও যে ঠাঁই-ঠাঁই হ'তে আরম্ভ করেছে। আমরা হ'লে বল্তুম, দুয়ো-সুয়ো চলুক্ না? অন্ততঃ সদর মফঃস্বল? মুস্কিল এই যে, এতটা পতিব্রতা হ'তে এদেশের মেয়েরা এখনো শিখ্লো না। সুয়োকে কোথায় বোন ব'লে আপনার ক'রে নেবে ও স্বামীর শয্যায় পাঠিয়ে দেবার পাট্ গ্রে করবে—তা নয়, আরে ছি ছি, রাম রাম, স্বামীদেবতাকে বিগ্যামীর অপরাধে পুলিশে দেয়! আর মফঃস্বলের খবর পেলে, একেবারে ডাইভোর্স্ কোর্ট্—ধিক্! এরি নাম নাকি সভ্যতা!

ইংরেজ—জার্ম্মান—স্কাণ্ডিনেভিয়ান মেয়েরা নিজের পাওনা গণ্ডাটি চিরকাল বুঝে নিয়েছে। অতীতকালে এরা স্বামীকে বলেছে, তোমাকেই আমি চিনি, তোমার মা-বাবাকে না। তাই এদের স্বামীরা পিতৃ-পিতামহের সনাতন ট্রাইব্ ছেড়ে স্ত্রী পুত্রকে নিয়ে ফ্যামিলী সৃষ্টি করেছে—ফ্যামিলী ও পরিবার এক কথা নয়, যেমন "home" ও গৃহ এক কথা নয়। এই মজ্জাগত পাওনা-গণ্ডা বুঝে নেবার স্বভাব থেকেই বর্ত্তমানকালে feminismএর উৎপত্তি। এর মূল সুরটি এই যে, "home"এর দায়িত্ব যখন তোমরা স্বীকার করছো না তখন আমরাও স্বীকার করবো না, তোমরা মুক্ত হও তো আমরাও মুক্ত হই।" আপনারা বলবেন, সহিষ্ণুতাই নারীর ধর্ম্ম, মা বসুমতী কত সইছেন! কিন্তু ম্লেচ্ছ মেয়েরা এত বড় তত্ত্বকথাটা বোঝে না, তাই তাদের স্বামীদের পদভারে মা বসুমতী টলমল, এবং তাদের পদভারে তাদের স্বামীরা শিবের মতো চীৎপাত।

ভিয়েনার রাজপ্রাসাদগুলিতে মেরিয়া থেরেসার ব্যক্তিত্বের ছাপ সুস্পষ্ট। অপরাপর রাজপ্রাসাদে রাণীর ব্যক্তিত্বের চেয়ে বাড়ীর রাণীত্বই লক্ষ্য করবার বিষয়। রাণী বল্তে অসপত্ন রাণী বুঝ্তে হবে—এবং জা-শাশুড়ী-হীন। এবং সামাজিক প্রাণী। দিল্লি—আগ্রা—ফতেপুর সিক্রীতে বেগমের ব্যক্তিত্বের চিহ্ন-াবশেষ যদি বা দেখা যায় তবু ও সব রাজপ্রসাদকে "home" মনে করতে পারিনে। এবং সামাজিক প্রাণী হিসাবে বেগমদের অস্তিত্ব ছিল না। সমাজের পাঁচজন পুরুষ তাঁদের চোখে দেখেননি, তাঁদের আতিথ্য পাননি; রাজন্যশ্রেণীর পাঁচজন পুরুষ তাঁদের সঙ্গে দু'দণ্ড আলাপ করতে পারেননি, দু'দণ্ড নাচ্বার আস্পর্দ্ধা রাখেন নি। বাঁদী ও বান্দায় ভরা বিশাল বেগমমহলে বাদ্শা মাসে একবার পূর্ণচন্দ্রের মতো উদয় হন্, পুত্রকন্যারা মা-বাবার সঙ্গে দু'বেলা আহার করবার সৌভাগ্য না পেয়ে দাস দাসীর প্রভাবে বাড়েন। এমন গৃহকে গৃহিণীর সৃষ্টি বল্তে প্রবৃত্তি হয় না। তাই প্রাচ্য রাজ-প্রাসাদ আড়ম্বরে অপ্সরাপুরীর মতো হ'য়েও দুঃখে সুখে নীড়ের মতো নয়। এখানে ব'লে রাখা ভালো যে, লুই-রাজার বা নেপোলিয়নেরও মফঃস্বল ছিল, কিন্তু সেটা নিপাতন ও সমাজের স্বীকৃতি পায়নি। বস্তুত প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে রাজার সঙ্গে সমাজের সম্বন্ধ এক নয়। আমাদের রাজারা সমাজের আইন-কানুনের উপরে, তাঁরা সমাজহীন। এদের রাজারা সামাজিক মানুষ, কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত পোপের নির্দ্দেশ অনুসারে রাজা ও প্রজা উভয়েই চালিত হোতো। ইংলণ্ডের রাজা চার্চ্চ অব্ ইংলণ্ড ও পার্লামেণ্টের কাছে এতটা দায়ী যে যে তাঁর বিবাহ বা বিবাহচ্ছেদ পর্য্যন্ত সমাজের এই দুটি হাতে। রাশিয়ার অত বড় স্বেচ্ছাচারী জারও স্ত্রী বিদ্যমানে পুনর্ব্বার বিবাহ করতে পারতেন না কিম্বা সুয়োরাণীর ছেলেকে রাজ্যাধিকার দিয়ে যেতে পারতেন না। সে-ক্ষেত্রে তিনি গ্রীক্ চার্চ্চের নির্দ্দেশসাপেক্ষ। তবে এও অস্বীকার করছিনে যে পোপ বা প্যাট্রিয়ার্করা মাঝে মাঝে ঘুষ খেয়ে ছাড়পত্র লিখে দিতেন না। কিন্তু সেটা নিপাতন ও তার বিরুদ্ধে সমাজের বিবেক চিরদিন বিদ্রোহ করেছে। প্রোটেষ্টাণ্টিজম্ তো এই জাতীয় একটা বিদ্রোহ!

শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়

ওটাও আধুনিক সোশ্যালিষ্ট মুভ্‌মেণ্ট বা এর আগের গণতান্ত্রিক আন্দোলনেরই মতো মানুষে মানুষে দুরতিক্রম ব্যবধানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।

আস্‌বাব-শিল্পের জন্যে ভিয়েনার খ্যাতি আছে। এই মুহূর্ত্তে ইউরোপের সর্ব্বত্র আস্‌বাব-শিল্পের বিপ্লব চ'লেছে। কোলোনে মিউনিকে ও ভিয়েনায় নতুন ধরণের ঘর ও নতুন ধরণের আস্‌বাবের কত রকম নমুনা দেখা গেল। গত মহাযুদ্ধের পর ইউরোপের অধিকাংশ দেশেই এখন দরিদ্র ও মধ্যবিত্তদের মাঝখান থেকে আর্থিক ব্যবধান ঘুচে গেছে। চাষা-মজুরদের অবস্থার যতটা উন্নতি হয়েছে মধ্যবিত্তদের অবস্থার ততটা উন্নতি হয়নি। কাজেই দুই শ্রেণীর জন্যে অল্প দামের মধ্যে মজবুত অথচ বৈশিষ্ট্যসূচক বাড়ী ও আস্‌বাব দরকার হয়েছে লাখে লাখে। যার যে নমুনা পছন্দ হয় সে অবিলম্বে জিনিষটি পায়। Large scale productionএর নীতি অনুসারে খরচ বেশী পড়ে না, হাঙ্গামাও নেই, পছন্দ করবার পক্ষে নমুনাও যথেষ্ট। হাজার দেড় হাজার টাকায় ছোট্ট একটি কাঠের বাড়ী, তিন চারটে ঘর, যথোপযুক্ত সজ্জা। মনে রাখ্‌তে হবে যে ঘরের সাইজ ও রঙ্‌ ইত্যাদি অনুসারে আস্‌বাবের সাইজ, রঙ্‌, রেখা ও গড়ন। দুই দিকেই বিপ্লব ঘটেছে—বাড়ী ও আসবাব দুই দিকের দুই বিপ্লব পরস্পরের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেছে। দুই-ই সরল, লঘুভার, নাতিবৃহৎ, বাতালোকপূর্ণ, বিরল-বসতি, নিরলঙ্কার। মানুষের রুচি এখন সভ্যতার অতি-বৃদ্ধিকে ছেড়ে প্রকৃতির উদার উন্মুক্ত বলকারক সত্যগুলির দ্বারস্থ হয়েছে। সেই জন্যে নতুন ধরণের চেয়ার, টেবিল, খাট বা দেরাজের উপরে পাগ্‌লামীর ছাপ যদি বা দেখ্‌তে পাওয়া যায় চালাকীর মারপ্যাঁচ বা বড়মানুষীর চোখে-আঙুল-দেওয়া ভাব এক রকম অদৃশ্য। এর একটা কারণ, আগে যে-শ্রেণী slumএ থাক্‌তো তাদেরও চাহিদা অনুসারে এ সবের জোগান। এবং তাদের রুচি অতি সূক্ষ্ম বা অতি খুঁৎখুঁতে নয় ব'লে তাদের সঙ্গে তাদের নামমাত্র উপরিতন মধ্যবিত্ত শ্রেণীকেও রুচি মেলাতে হচ্ছে। Mass productionএর মজা এই যে চাষা মজুরের সিকিটা দুয়ানিটার জন্যে যে সিনেমার ফিল্ম—তার রুচির সঙ্গে কলেজের ছাত্রের রুচি না মেলে তো কলেজের ছাত্র নাচার। সিকি দুয়ানির দিক থেকে কলেজের ছাত্র ও চাষা মজুর দু'পক্ষই সমস্কন্ধ, অগত্যা রুচির দিক থেকেও দু'পক্ষকে সাম্যবাদী হতে হবে।

বোট্যানিক্যাল গার্ডেনের দৃশ্য
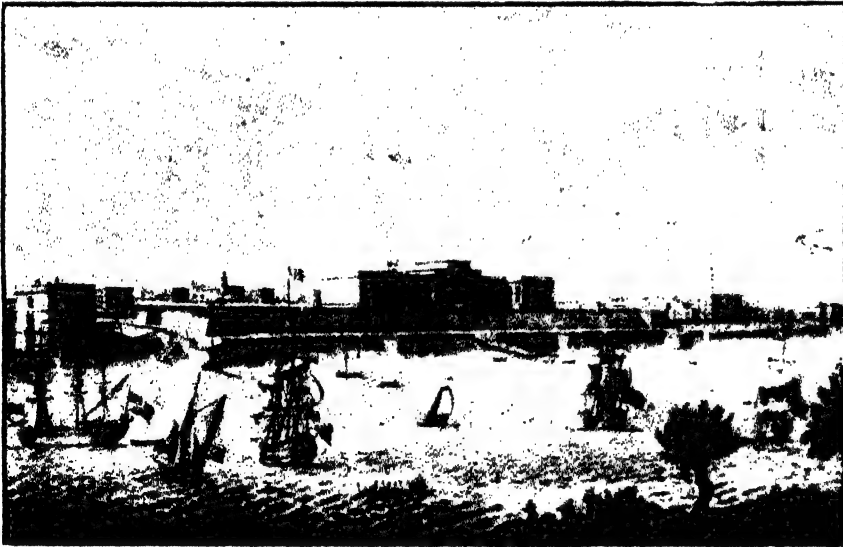
ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ফোর্ট উইলিয়াম্

চৌরঙ্গি

চাঁদপাল ঘাটের একটি দৃশ্য
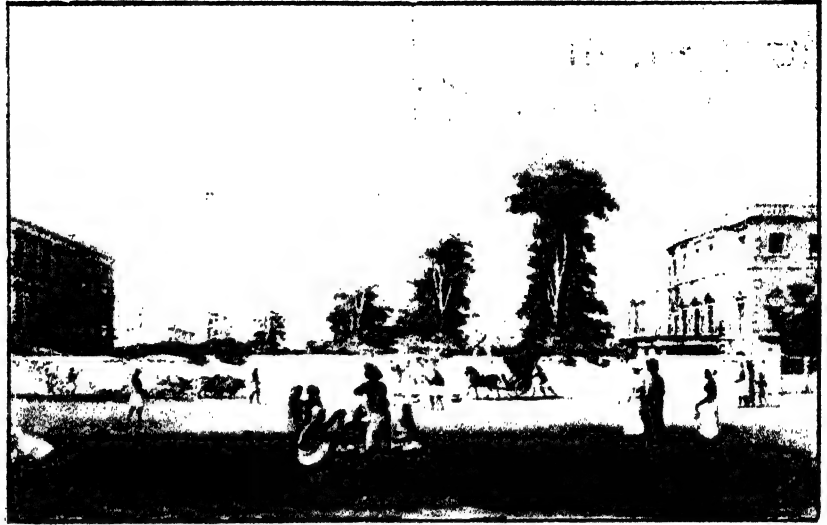
চৌরঙ্গি---বিশপ্ ভবন
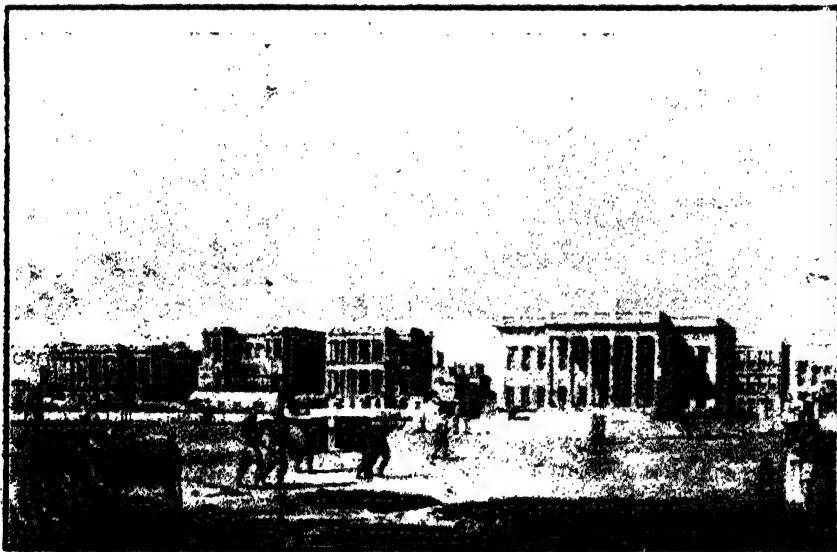
টাউন হল—এস্‌প্লানেড্ রো
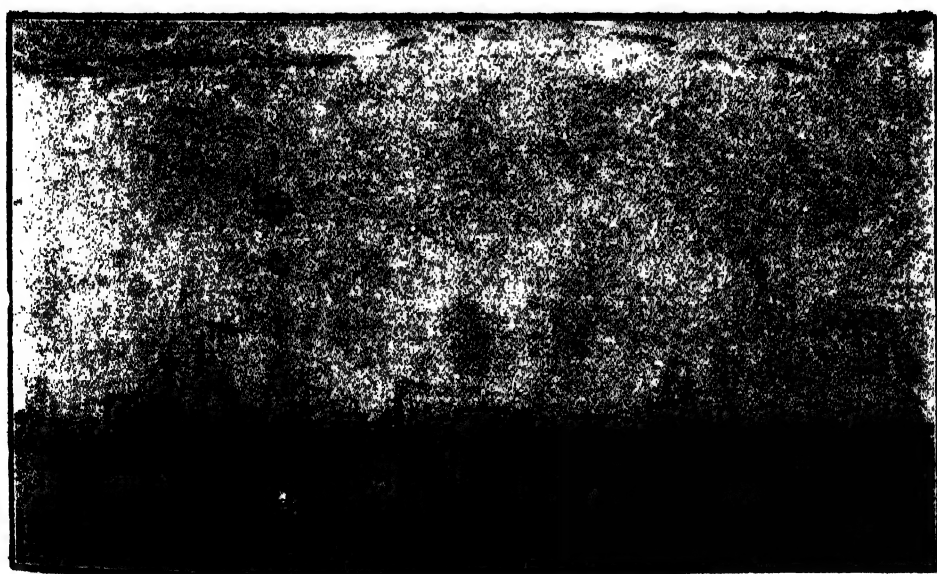
চৌরঙ্গি

১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা

কাশীটোলা রোড, এসপ্ল্যানেড রো, ধর্ম্মতলা রোড,
তেলিবাজার—চৌরঙ্গি

লালবাজার ষ্ট্রীট
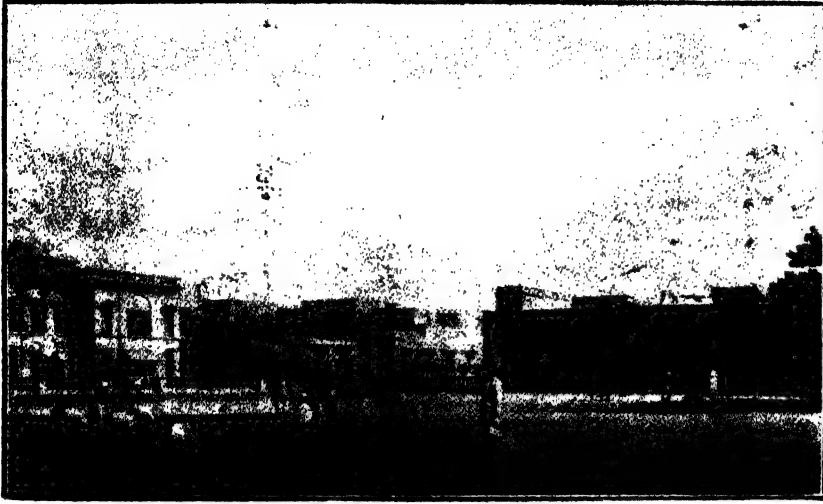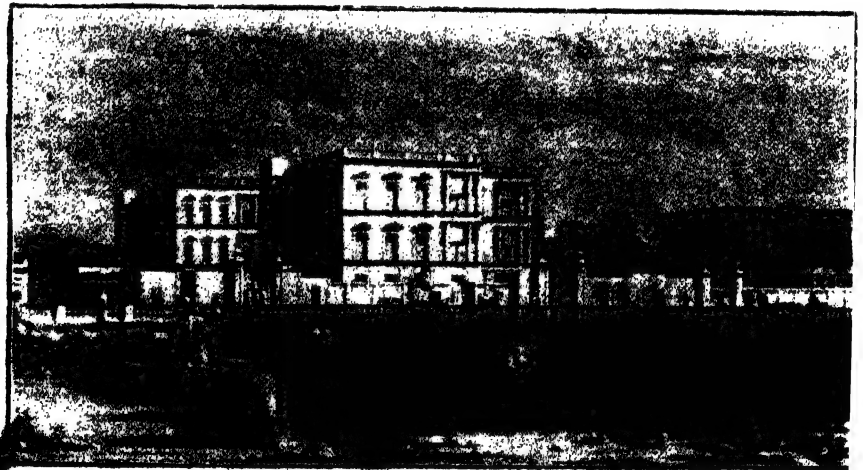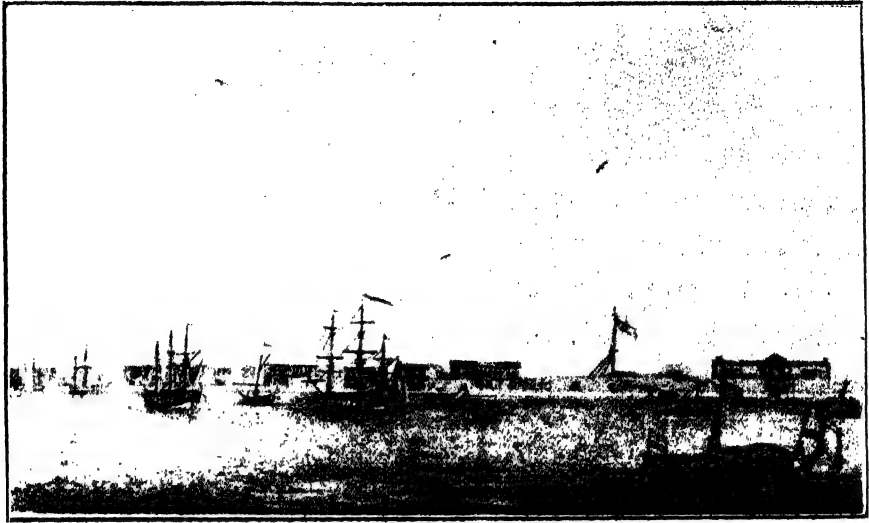
কলিকাতা—১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে
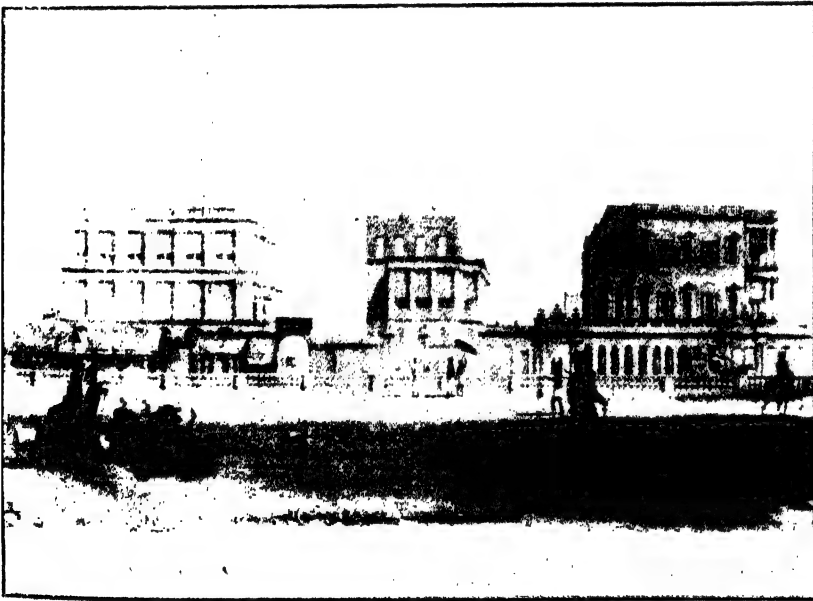
চৌরঙ্গি রোড্

এই চিত্রগুলি হইতে তদানীন্তন কলিকাতার অনেকগুলি সৌধের রিচয়ের সহিত, পথ ঘাট জাহাজ নৌকা অশ্বযান গোযান পাল্কি পাহি প্রভৃতিরও একটা ধারণা করা যায়। পথে লোক জনের চলাচলও যে খুবই কম ছিল তাহা বেশ লক্ষ্য করিতে পারা যায়। ক্ষিদিরপুর ও আলিপুরের সেতু দুইটি হইতে তখনকার সাদাসিদা সেতু সকলেরও একটা ধারণা করা যায়।

শ্রীহরিহর শেঠ।

এই ছবিগুলি চন্দননগর নিবাসী শ্রীযুত হরিচরণ রক্ষিতের নিকট হইতে পাইয়াছি। এই সুযোগে তাঁহাকে আমার ধন্যবাদ নাইতেছি।

বর্ণিকাভঙ্গম্

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রঙে আর রূপে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। রূপ যেখানে রঙ সেখানে, রঙ যেখানে রূপ সেখানে, এই হ'ল স্বভাবের নিয়ম।

এক রঙা রূপ, পাঁচ রঙা রূপ এ রয়েছে, বদ-রঙ রূপ তাও আছে; কিন্তু রঙ ছাড়া রূপ তা কোথায়? রূপ ছাড়া রঙ তাও নেই! কচি পান্ পাকা পান্ শুক্‌নো পান তিন অবস্থাতেই রূপ ও রঙ নিয়ে বর্ত্তে আছে। নতুন পাতার অরুণিমা সবুজ থেকে ক্রমে শুকনো পাতার গেরুয়াতে গিয়ে পৌছয়! পাতার রূপেরও অদল বদল হ'য়ে চলেছে কালে কালে। রূপে রঙের কোথাও বিচ্ছেদ নেই।

বিশ্বজগতে রচনার কাজ এই নিয়মেই চলেছে দেখি, মানুষের শিল্প রচনাতেও এই নিয়ম বরাবর। খাতার সাদা পাতা সেটা খানিক সাদা রঙ মাত্র নয়, চতুষ্কোণ একটা রূপও আছে তার। কাগজের উপরে কালো পেন্সিলে ছবি দাগলেম—সাদা রঙ কালো রঙ, দুই রঙের মিলনে তবে রূপটি ফুটলো। এমনি কালো সেলেটে সাদা রূপ, নানা বর্ণের কাগজে নানা বর্ণ দিয়ে দাগা রূপ, এই হ'ল ছবির পত্তন। লালে নীলে কালোয় সাদায় হলুদে মিলিয়ে নিছক রঙের কাজ করলেম রূপ না ফুটিয়ে, এমনটি হবার জো নেই একেবারেই। পাঁচ রঙের হিজিবিজি সেও পাঁচ রঙা একটা রূপ। আকাশ আর সমুদ্রের নীল রঙ কতকটা রূপ ছাড়া রঙের আভাস দিলেও ভাবরূপ দিয়ে পুরোপুরি ভর্ত্তি। মরুভূমি—সেখানে রূপ রঙ ছাড়াছাড়ি ভাবে নেই। আকাশের নীল রূপের ভাবনা দিয়ে ভরা, সমুদ্রের জলে ও ধু ধু বালুচরেও এই রূপভর্ত্তি রঙ। একটা চিত্র করি যদি মরুভূমির, তবে মরুভূমির রূপ এবং রঙ দুটোকেই টান্‌তে হয়। মরুভূমির পারে আকাশের নীল এইটুকু দুই বর্ণের বিভিন্নতা দিয়ে ছবিতে বোঝাতে চল্লেম,—আকাশ থাকে উপরে মাটি থাকে নীচে, অতএব কাগজের উপরটা রঙালেম নীল আর নীচেটা করলেম বেলে রঙ। শুধু এইটুকু কাজ ক'রে দিয়ে ছবিটাকে মরুপারের নীলমরীচিকাতে পরিণত করা চল্লোনা, রঙের সঙ্গে রূপকে এনে মেলাতে হল তবে ধরলো কাগজের একটা অংশ মরুরূপ অন্য ভাগ আকাশরূপ, এবং দুয়ে মিলে দৃশ্যটি পরিপাটী রূপে বর্ণিত হ'ল।

সুতরাং ছবির কোন্‌খানে কি রঙ দেবো সেটা যেমন ভাববার কথা, কোন রঙ কি কি ভাবে ফলাবো তাও জানা দরকার। আকাশ সমুদ্র ভাব রূপ দিয়ে ফলানো রঙ, ভাব রূপ চোখে দেখা যায় না কিন্তু রঙের রূপক দিয়ে ধরা থাকে জলে স্থলে আকাশে; চিত্র করার কৌশলই হচ্ছে এই ভাব রূপে গোলা রঙ সমস্তকে আয়ত্ত করা। নীল লাল ইত্যাদি রঙ এমনি লাগালেই হ'ল না—জলের বেলায় পানসে-নীল, আকাশের বেলায় হাওয়াই-নীল, বালির জায়গায় বেলে রঙ, সন্ধ্যার আকাশে আকাশী-পাটল না দিলে রঙের কাজে ভুল র'য়ে যায়, কাজেই চিত্র ষড়ঙ্গের গোড়া যেমন আরম্ভ হ'ল রূপের ভেদ ও ভাবভঙ্গী নিয়ে, তেমন ষড়ঙ্গের শেষ রইলো শুদ্ধ বর্ণ মিশ্র বর্ণ সমস্ত নানা ভেদ ও ভঙ্গ নিয়ে।

সচরাচর আমরা আকাশটি নীল ব'লে থাকি, কিন্তু এইটুকু জ্ঞান নিয়ে বর্ণিকের কাজ চলে না। আকাশ পলকে পলকে রঙ ফিরিয়ে চলেছে, গেরুয়া ধূসর সাদা সবুজ হলুদ কালো কত কী। রাতের আকাশ দিনের আকাশ একটাও যে অবিমিশ্র নীল নয় তা ছবি আঁকতে গেলেই ধরা পড়ে। ইউনিয়ান জেক্ পতাকা কি স্বদেশী-পতাকা তার রঙ অবিমিশ্র নীল সবুজ সাদা লাল ইত্যাদি দিয়ে বাঁধা; রঙের বাক্সর রঙও কতকটা অবিমিশ্র ভাবে সাজানো থাকে, কিন্তু ছবির পটে এসে মেলামেশা সুরু হয়—রঙে রঙে রূপে রঙে, বিশ্ব রচনাতে এই নিয়ম, মানুষের রচনাতেও এই নিয়মের বাঁধাবাঁধি—অমিশ্র রঙ ক্বচিৎ, মিশ্র রঙই প্রচুর প্রয়োগ হচ্ছে।

রূপের বিভিন্নতার কথা পূর্ব্বে ব'লে চুকেছি, এখন রঙের বিভেদগুলো একটু পরিষ্কার ক'রে ধরার চেষ্টা

শ্রী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

করি। প্রথমত দেখি অমিশ্র ও মিশ্র এই দুই ভেদ, তারপর চিক্কণ ও রুক্ষ এই দুই ভেদ; মোটামুটি এই চার বিভাগে সব রঙকেই রাখা চল্লো। অমিশ্র রঙ সে বাঁধা রঙ, মিশ্রণের দ্বারায় তার মুক্তি। খড়ির বাঁধা সাদা তার সঙ্গে মিশলো একটুখানি পীত একটু লাল একটু নীল, তবে হ'ল দন্তধবল বা দাঁতি-সাদা; এমনি অন্যান্য রঙের মিশ্রণে খল্লিসাদা হল-পাথুরে, পান্‌সে, আবোর, ফেণি এবং কত কী সাদা তার ঠিকঠিকানা নেই। শিউলী সাদা আর শঙ্খ সাদা একই সাদা নয়। মিশিকালো মোষেকালো নিকষকালো চিকণকালো আলাদা আলাদা রঙ আলাদা আলাদা রূপ।

মিশ্রণের দ্বারায় এক বর্ণের বহুল বিস্তার ও বৈচিত্র্য সম্পাদন করাই হ'ল নিয়ম। দপ্তরীর টানা কালো রেখার একটা রূপ আছে বটে, কিন্তু ছবিতে শ্যামল রঙ দিয়ে যে দিগন্ত রেখাটি টানা গেল তার সঙ্গে খাতার টানা রেখার অনেক প্রভেদ। অলঙ্কারশিল্প—সেখানে নানা বর্ণের মণিমুক্তা সোনা রূপার একত্রীকরণ দিয়ে একটা রূপ গড়া হয়; ফুলের মালাতেও এই কৌশল; আল্পনা ও কাশ্মেরী শাল সেখানেও এবং ইউরোপে মেজেইক চিত্রেও এই প্রথার প্রচলন দেখি। কাজেই ধ'রে নিতে পারি যে অলঙ্কারকলায় অমিশ্র বর্ণ সমস্তকে ভিন্নতা এবং অভিন্নতা দেওয়াই হ'ল কৌশল, বহুরঙের বহুরূপ। প্রজাপতির ডানা নানা অমিশ্র রঙের আল্পনা দিয়ে সাজানো, অপরাজিতার পাপড়িতে নীল আর সাদা দুই রঙ পাশাপাশি, আবার আকাশের ইন্দ্রধনু—সেখানে এক রঙ আর এক রঙে ঢ'লে প'ড়ে চমৎকার ভাবে মিলতে চল্লো!

দিনের আলো পাতার সবুজে ঘটালে বিকার—মাঠের ঘাস, রোদে-দেখানো সোনালি গাছের পাতা আলো অন্ধকারে নিজের রঙ হারিয়ে পেলে অপরূপ শ্যামবর্ণ যা আঁকতে গিয়ে কতবার হারতে হ'ল কত আর্টিষ্টকে! রাতের অন্ধকার যে বর্ণ-বিকার ঘটালে তা আরো সুস্পষ্ট—সবুজ হ'ল কালো, হিমাচলে দিনের কুয়াসা সে সাদার পোঁচ দিয়ে কালো ক'রে দিলে গাছের সবুজ রঙ! প্রথম দর্শনে দূরের পাহাড়কে মেঘ ব'লে কে না ভুল করেছে?—কবি কালিদাস অনেকবার মেঘকে গিরিচূড়া ক'রে দেখেছেন, আর আমার জানত একটা বুড়ি সে প্রথম সমুদ্র দেখে সেটাকে জগন্নাথের মন্দিরের প্রাচীর ব'লে ভুল ক'রে বসেছিল!

কাজেই রঙের একটা কাজ হ'ল ভ্রান্তি জাগানো এও বলতে পারি। আবার এও বলতে পারি যে সঠিক রূপকে সম্পূর্ণ ক'রে দেখানো সেও রঙের কাজ। ধর পটে একটা ঘটের রূপটুকু মাত্র দাগা গেল পেন্সিলে, কিন্তু রঙটুকু রইলো বাদ—বস্তুটা পাথরের কি মাটির কি সোনা-রূপোর পিতল-কাঁসার কিছুই বোঝা গেল না, চিকণ কর্কশ ইত্যাদি রঙ দিতে হ'ল তবে ধাতে এল রূপটা। আকাশের মেঘমণ্ডল জলভরা না জলঝরা শুধু মেঘের রূপটা লিখে কিছুতেই বোঝানো চল্লো না, প্রতিকৃতি-চিত্রণে গায়ের চোগা চাপকান সব ঠিক ঠাক পেন্সিলে দেগে চিত্রটা সম্পূর্ণ হ'ল বলতে পারলেম না—সুতোর কাপড়, না সিল্কের কাপড়, না মখমল, এসব রঙ দিয়ে দেখিয়ে তবে নক্‌সা সম্পূর্ণ করতে হ'ল।

সূর্য্যরশ্মি নানা ধাতের নানা বস্তুর রঙ কালো আর সাদায় বিভক্ত ক'রে ফটোগ্রাফের কাগজের উপরে এমন চমৎকার ক'রে ধ'রে দেয় যে সেখানে কালো সাদার ছন্দেই পাটের কাপড় সুতোর কাপড় বনাত মখমল চামড়া এ সবের তারতম্য সহজে ব্যক্ত হ'য়ে পড়ে। একখানা ভাল ড্রয়িং তাতেও রামধনুকের সাত রঙ কালো সাদার ভাষায় তর্জ্জমা হ'য়ে আসে, জল মেঘ পর্ব্বত সবই সেখানে নানা নানা ছাঁদের কালো সাদা অর্থাৎ রঙ্গীন কালো সাদা। আর্টিষ্টের হাতের পেন্ কি পেন্সিল এই ভাবে কালো সাদার ভাষায় রঙের নানা সুরের আভাসগুলি লেখাতে রেখে যায় তবেই না করি ড্রয়িংয়ের আদর!

কবিতার বই কালো সাদায় ছাপা হ'য়ে হ'য়ে বাজারে এল। সাদা কাগজে ছাপা অক্ষর ও বর্ণমালা নিছক সাদা আর কালো লাইনবন্দি ক'রে সাজানো; এরি ফাঁকে ফাঁকে কবি বর্ণনার মধ্যে দিয়ে রঙকে পেয়ে গেলেন। শরতের নীল, কাশ ফুলের সাদা, মেঘের শ্যাম, রৌদ্রের পাটল কিছুই বাদ গেল না, কেননা কবি রঙ দিয়ে কথা ব'লে গেলেন, শুধু খবরওয়ালার মতো খবরটার বিজ্ঞাপন সাদায় কালোয় দিয়ে চল্লেন না।

কবিতা লিখেই কিছু বলি, আর ছবি দিয়েই বা কিছু জানাতে চলি বর্ণন ছাড়া গতি নেই; নিছক রূপ নিয়ে

রচক মানুষ কোথায় কারবার করলে তার উদাহরণ হ'ল—বিজ্ঞানের বই এবং তার পাতায় পাতায় নানা নক্সাগুলো, অঙ্ক শাস্ত্রের পাতার নকড়া ছকড়া টানগুলো। কিন্তু মানুষ যেখানে রস দিয়ে কিছু বলতে গেল সেই খানেই রূপের সঙ্গে রঙও এসে পড়লো।

নানা বর্ণ দিয়ে একটা রূপ ফোটাতে নিপুণ ছিলেন মহাকবি বাণভট্ট। রঙের প্রচুর ব্যবহার 'কাদম্বরী কথায়' যেমন দেখা যায় এমন আর কোথাও নেই। মহাশ্বেতার রূপ বর্ণন করলেন কবি, মহাশ্বেতা নামটাই যথেষ্ট বর্ণনা হ'তে পারতো কিন্তু কবি সুনিপুণ ভাবে হাজারো রকমের সাদা রঙের অবতারণা ক'রে বসলেন এক মহাশ্বেতাকে দেখাতে—সাদা রঙের ঝাঁক উড়লো যেন শ্বেত পদ্মের চারিদিকে, শ্বেত অলঙ্কারের ঝঙ্কারে বাঁধা শুভ্রতার প্রতিমূর্ত্তি হ'য়ে উঠলো মহাশ্বেতা। এমনি সন্ধ্যারাগটুকু পাতার পর পাতা রঙের হিসেবে বাঁধলেন কবি দেখতে পাই—"অস্তমুপগতে ভগবতি সহস্রদীধিতি, অপরার্ণবতটাজ্জন্নসন্ত্যা বি-মলতেব পাটলা সন্ধ্যা সমদৃশ্যত:" (কাদম্বরী)। এমনি সকালেরও রাগবর্ণন সুরু হল দেখি—"একদা তু প্রভাতসন্ধ্যারাগলোহিতে গগনতলে কমলিনীমধুরক্ত পক্ষসম্পুটে বৃদ্ধহংস ইব, মন্দাকিনীপুলিনাদপরজলনিধিতলমবতরতি চন্দ্রমসি।" ইত্যাদি ইত্যাদি কত রঙ, কত রঙের রকম, তার ঠিকানা নেই।

সূচীভেদ্য অন্ধকার, এ বল্লে শক্ত রঙটা স্পষ্ট হ'ল, কোমল শ্যামল অন্ধকার এ অন্য কালোর কথা ব'লে চল্লো। এমনি নানা ধাতে রঙ কালো সাদা ইত্যাদি দিয়ে রচনা সম্পূর্ণ হ'তে চলে।

রাজনীতি উপদেশ করলেন বিষ্ণুশর্ম্মা,—এখনকার টেক্‌স্ট বুকের মতো বেরঙা সাদা কালোয় লিখলে না উপদেশ—'চিত্রবর্ণ' পক্ষিরাজ 'মেঘবর্ণ' দূত পাখী এরা সব এসে গেল ঝাঁকে ঝাঁকে। পোলিটিকাল সায়াঙ্গ রঙীন হ'য়ে এল রাজপুত্রদের সামনে!

একটা কথাই রয়েছে রঙ্গ-রস, রঙ হ'ল তো রস হ'ল জানলেম। সরস সুরঙ্গ রূপ রূপকারের কাছ থেকে পাই; রূপ রঙ একত্রে মিলিয়ে পাই সমস্ত রূপরচনাতে; বিচ্ছিন্ন ভাবে রূপ বিচ্ছিন্ন ভাবে রঙ আর্টের কাজে আসে না। দু' একটা নমুনা দেওয়া ছাড়া কথাটা পরিষ্কার হবে না।

এটা জানা কথা যে ভক্ত মাত্রেই নামরূপ জপ ক'রে রস পেয়ে থাকেন। এখানে রূপটাই হ'ল যথেষ্ট, রঙ না হলেও চল্লো। সুন্দর সৎগুরুয়েঁ কহা সকল শিরোমণি নাম, তাকোঁ নিশিদিন সুমরিয়ে..." রাম নামটা হ'লেই যথেষ্ট হ'ল ভক্তের পক্ষে, রামের নবদূর্ব্বাদল শ্যামবর্ণ দরকারই নেই নাম রসের উপভোক্তার কাছে। "সুন্দর ভজিয়ে রামকো, তজিয়ে মায়া মোহ"। রাম একটা নাম মাত্র, রূপও নেই রঙও নেই। অবর্ণ অরূপ রামকে নিয়ে নামজপ্ চলে, ছবি লেখা চলে না কোনো কালেই!

—সুন্দর মছরী নীর মেঁ বিচরত আপনে খ্যাল।
বগুলা লেত উঠাইকে তোহি প্রলয়োঁ কাল॥

উপদেশ হ'লেও এর মধ্যে ছবি রয়েছে মাছ জল বক; বেশির ভাগ এখানে পাচ্ছি রূপ, এবং সঙ্গে সঙ্গে একটু একটু রঙও পেয়ে যাচ্ছি। বিষ্ণুশর্ম্মার হিতোপদেশ—সেখানেও কাক বক নিয়ে কথা, কিন্তু একেবারে বেরঙা কথা নয়, বেরঙা কাক বকও নয়। 'কর্পূরদ্বীপে পদ্মকাল নামে এক সরোবর সেখানে থাকে হিরণ্যগর্ভ নামে এক রাজহংস'—এখানে রূপরঙ একত্রে মিলে গেল। খানিক পরেই আবার নাম রূপের দেখা পাই, যেমন—'একদিন সেই রাজহংস সুবিস্তৃত পদ্মময় পর্য্যঙ্কে সুখে বসিয়া আছেন এমন সময় দীর্ঘমুখ নামে এক বক কোন এক দেশ হইতে তথায় উপস্থিত হইল।' এখন বকের নাম দীর্ঘমুখই রাখি বা দীর্ঘচঞ্চুই রাখি যেমনি বল্লেম কথায় 'বক' অমনি বকের রঙটাও এসে জোড়া লাগলো শ্রোতার মনে। ধর যদি বলতেম—শঙ্খধবল বক, তো রঙের সঙ্গে বকের রূপটা এসে জোড়া লাগতো—সরু পা লম্বা চোঁচ কিছুই বাদ যেতো না বক রূপটির। কিন্তু শুধু শঙ্খধবল বল্লে কি যে বোঝায় বা কি যে না বোঝায় তা বলা মুস্কিল—সাপ বেঙ সবই হতে পারে!

রূপে রঙে মিলিয়ে দেখা হ'ল সহজ ও স্বাভাবিক দেখা। তবে সময়ে সময়ে এমনো হ'য়ে থাকে যে রঙের আকর্ষণ রূপের চেয়ে কি রূপের আকর্ষণ রঙের চেয়ে কম বেশ কাজ করলে। দুই দল মেয়েতে কথা হচ্ছে রথের সময়। প্রথম দল বল্লে,—'ওপারেতে ময়রা বুড়ো রথ দিয়েছে তেরো চূড়ো,

বানরে ধরেচে ধ্বজা, দিদি গো দেখতে মজা'—শুধু এখানে রূপের কথা হল। দ্বিতীয় দল এর জবাব দিলে—'তোদের হলুদ মাখা গা, তোরা রথ দেখতে যা, আমরা হলুদ কোথায় পাবো উল্টো রথে যাবো'। রূপ-দেখার দল আর রঙ-দেখার দল—একদল রঙ্গিনী উল্টো রথের সওয়ারী, আর একদল রূপসী সোজা রথের যাত্রী !

যখন দূরে থেকে হিমগিরি দেখি তখন রূপরঙ সমভাবে মনের উপরে কাজ করে। রঙের সঙ্গে মিলিয়ে না দেখলে রূপ দেখা সম্পূর্ণ হয় না এবং সে দেখায় রসও পাওয়া যায় না—নিরর্থক দৃষ্টি বদল হয় মাত্র বস্তুর সঙ্গে। যেমন,—তাজমহলটা গিয়ে দেখলেম না কিন্তু চীফ ইঞ্জিনিয়ারের নক্সার সাহায্যে দেখলেম, ভাল ফটোগ্রাফ আর একটু বিস্তার ক'রে আলো ছায়া ফেলে দেখালে, কিন্তু তাতেও দেখা সম্পূর্ণ হলনা, ই আই রেলওয়ের টাইমটেবেলের মলাট খানা তাজমহলটি বদরঙ দিয়ে দেখালে তাতে ক'রে ভুল ধারণা জন্মালো বস্তুটির, পাকা শিল্পী রূপ রঙ মিলিয়ে লিখলে তাজমহলের ছবি কি কবিতা, সত্য তাজমহলের দেখা পেয়ে গেলেম তখনই !

রূপের চেয়ে রঙ যেখানে জোর করছে মনে, তার দুএকটা উদাহরণ দেখা যাক্।

যেমন—"নিরুপম হেম জ্যোতি জিনি বরণ,
সঙ্গীতে রঞ্জিত রঙ্গিত চরণ,
নাচত গৌরচন্দ্র গুণমণিয়া—"

এখানে কেবলি রঙ আর রঙ চোখে পড়ছে ! আবার—

"নাখবান কনক কষিত কলেবর
মোহন সুমেরু জিনিয়া সুঠাম—"

এখানে রঙের ছাঁদ রূপের ছাঁদ পরে পরে আসা যাওয়া করলে।

কিন্তু—"নমো নিরঞ্জন নিরাকার অবিগত পুরুষ অলেখ
জিন সন্তনকে হিত ধরো যুগ যুগ নানা ভেখ" !

এখানে রঙছাড়া রূপ ছাড়া ধ্যানটাই পাচ্ছি পরমপুরুষের।

ঠিক এই কথাই উপনিষদে—'য একো অবর্ণ বহুধাশক্তি যোগাৎ বর্ণন্ অনেকান্ নিহিতার্থো দধাতি'' ! জল এবং আকাশ অবর্ণের কাছাকাছি, কিন্তু জল আকাশ দুয়েরই রঙের অন্ত নাই। বায়ুস্তরের রূপও নেই রঙও নেই, কিন্তু রঙ ধরবার শক্তি ওতে আছে। বাতাসে ডোবা দূরের গাছ পর্ব্বত ঘর বাড়ি রঙ ফেরায়, এটা জানতে সায়ান্স পড়তে হয় না, চোখ থাকলেই দেখা যায়। প্রকৃতির নিয়মে কোনো কিছুর রঙ অবিমিশ্র ভাবে বর্ত্তে থাকতে পায় না, বিকার ঘ'টে যায়, আলো পড়ে ছায়া পড়ে,—তৃণভূমি, সে গাছের তলাটায় নীলাভ রঙ, গাছের ছায়া যেখানে পড়্লে না সেখানে পীতাভ সবুজ রঙ ধরলে ! স্ববর্ণে বর্ত্তে আছে এমন কোনো কিছু নেই বল্লেও চলে ; জগতে এ ওর রঙে রাঙিয়ে উঠছে দিনরাত !

এই যে রঙের মিশ্রণ ও আদান-প্রদান এ যেমন দেখছি বিশ্বছবিতে, তেমনি আবার পাশাপাশি দুই বস্তুর রঙে রঙে কঠিন ব্যবধান তাও দেখছি। কালোর পাশে আলো, একই জাতের দুই গাছ একটির পাশে আর একটি রূপ ও রঙের তারতম্য নিয়ে সুন্দর ফুটলো, সবুজের কোলে রঙীন ফুল, অন্ধকারের বুকে তারাফুলের বাহার, ঘন মেঘের গায়ে সাদা বকের সারি, আলোর গায়ে কালো কাকের দল,—রঙের এসব হিসাব শিখতে আর্টস্কুলে যেতে হয় না। কত বার দেখেছি রঙে রঙ মিশিয়ে পাখির ছানা কুকুর বেরাল বাঘ মানুষ দিব্বি গা ঢাকা দিলে, তেলাকুচো ফল বর্ণচোরা আম রঙ দিয়ে রসের অপদার্থতা লুকিয়ে চল্লো !

ফুলের রঙটাই পৌঁছে দেয় মধুর সংবাদ মৌমাছিকে, এটা জানা কথা। উৎসবের রঙ শোকের রঙ এসবই ধার ক'রে নিয়েছে মানুষ প্রকৃতির কাছে কোন্ আদিকালে তার ঠিক ঠিকানা নেই।

সরল রূপ বাঁকা রূপ এমনি নানা রূপ-রেখা যেমন ভাবের প্রতীক হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে, তেমনি রঙও প্রতীক হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে। আমাদের শাস্ত্রকার বল্লেন—"শ্যামোভবতি শৃঙ্গারঃ, সিতোহাস্য প্রকীর্ত্তিত, কপোতো করুণশ্চৈব, রক্তোরৌদ্র প্রকীর্ত্তিত, গৌরোবীরস্তু বিজ্ঞেয়, কৃষ্ণশ্চৈব ভয়ানকঃ নীলবর্ণস্তু বীভৎস পীতশ্চৈবাদ্ভুত স্মৃতঃ ॥"

ঠিক এই ভাবে আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে রঙের নানা প্রতীক ও হিসেব দেখতে পাই, যেমন—

কালো রঙ হল—শোকের নিরাশার, মেটে এবং ধূসর রঙ বোঝায়—শুষ্কতা মৃত্যু ইত্যাদি, পীত নীল রক্ত—

পরিণতি শক্তি ঐশ্বর্য্য ইত্যাদি, সবুজ রঙ তারুণ্য আশা ইত্যাদি, শুভ্রবর্ণ বোঝায়—শান্ত সুন্দর ভাবটুকু, উষার নির্ম্মলতা শুচিতা ইত্যাদি। আদিম যুগের মানুষ হ'লেও এই সব জাতি রূপ ও রঙের অচ্ছেদ্য মিলন বিষয়ে অজ্ঞ রইলোনা।

বাদলের দিনে হঠাৎ সূর্য্যালোক তাদেরও মনে রস জাগিয়ে দিলে এবং আদিম আর্টিষ্ট কালো রঙের উপরে লাল রঙে ডোরা দিয়ে সেকালের বর্ষামঙ্গলের উৎসবমণ্ডপ সাজাবার নিয়ম ক'রে গেল। বাদলের সন্ধ্যায় তাদের মেয়েরা পীতডোরা কালো কসির আল্পনা দিয়ে বসুধারা ব্রত ক'রে গেল। কাজেই দেখা যাচ্ছে, কি আদিম যুগে, কি আজকের যুগে, রঙ আর রূপ অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধাই রইলো—এ থেকে ওকে স্বতন্ত্র করার সামর্থ্য নেই কোনো আর্টিষ্টের।

বলবার বেলায় রূপ রঙ ভাব ইত্যাদিকে পৃথক ক'রে দেখি, কিন্তু ছবিরচনার বেলায় এদের আর আলাদা ক'রে রাখা চলে না, এ ওর সঙ্গে মিলে দেয় পরিপূর্ণ-রূপটির ছন্দ। এই যে বিচিত্র সব রূপে রঙে মিলিয়ে মায়াজাল বিস্তৃত হয়েছে বিশ্বে, তারি রহস্যভেদ হ'ল বর্ণিকাভঙ্গের শিক্ষার লক্ষ্য।

রাগ আর রঙ এক ক'রে দেখেছেন পণ্ডিতেরা,—নানা রঙের অনুরাগ তারি লক্ষণ দিচ্ছেন, যেমন—নীলিরাগ অর্থাৎ নীল অনুরাগ, যে ভালবাসার রঙ বদলায় না তাকেই বলা হয় নীলিরাগ; এমনি বাইরে বাইরে কপট ভালবাসা একটুতে উপে যায় রঙ, এমন ভালবাসার নাম দিলেন কবিরা কুসুম্ভরাগ; মঞ্জিষ্ঠারাগ হল পাকা রঙের ভালবাসা বা অনুরক্তি যাই বল। সবল, দুর্ব্বল, কাঁচা, পাকা নানা রঙের নানা হিসেব শাস্ত্রে দেখি এবং চারিদিকে চোখেও পড়ে।

রঙীন রূপ নিয়ে রঙ্গী মানুষের হ'ল কারবার, রঙীন ছবি দিয়েই পাঠশালের বর্ণ পরিচয় সুরু ক'রে দিয়েছে অমৃতের পুত্র মানুষ, অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে আমাদের টেক্‌ষ্ট-বুক কমিটি রঙছুট বর্ণপরিচয় দিয়ে আমাদের ছেলেদের শিক্ষা সুরু করতে বলছে! আনা কতকের বর্ণপরিচয় বিদ্যেসাগরের আমলেও যে-বেরঙা আজকের আমলেও তাই। কাক লিখে তার পাশে কালো ছবি, বক লিখে কালো ছবি, আম লিখে কালো ছবি, জাম লিখে কালো ছবি, কিন্তু সবকটাই বেরঙা কালো। এই পর্য্যন্ত এগিয়েছে আমাদের নতুন বাংলার বর্ণপরিচয়। কিন্তু এটাকে অগ্রসর হওয়া বলা ভুল কেননা দেখতেই পাচ্ছি, রূপ রঙ ওখানে মিল্লোই না, রসও পেলে না ছেলেগুলো; কিন্তু অর্থ পেলেন যথেষ্ট একালে সেকালে অনেকেই। ঐ লাল কালিতে ছাপা টুকটুকে বইয়ের যা কিছু রঙ ঐ খানেই শেষ। বিলাতি বর্ণপরিচয় ঠিক আমাদের উল্টো রাস্তা এবং স্বাভাবিক শিক্ষার পথ ধরলে; রূপে রঙে মিলিয়ে বর্ণপরিচয় আরম্ভ হল সেখানে। কাজেই ওরা এগিয়ে গেল, আর আমরা বেরঙা বর্ণপরিচয় প'ড়ে প'ড়ে হয়রাণ হ'তে থাকলেম। কলেজ স্কোয়ারে ছেলে ভোলাবার বাংলা বই ভালরকম একখানা আছে ব'লে তো মনে হয় না। বইয়ের দোকান যথেষ্ট, দামও বেশ চড়া, কিন্তু যত রঙ মলাটেই, অনেকটা মাকাল ফলের অনুরূপ। বইগুলো চোখ ভোলায় কিন্তু ছেলের কাজে আসে না। বিলিতি দোকানে যাই, শিশু-শিক্ষাকে দেখি তারা রঙের ছক্কা পাঞ্জা খেলার মতো আনন্দদায়ক ক'রে তুলেছে।

রঙের উৎসবে ছেলে মেয়েদের ডাক দেওয়া যে দরকার, না হ'লে জীবনটাই যে তাদের বিশ্রী হ'য়ে যায় এটা জানতে কারু বাকি নেই, কিন্তু তবু আজও বাজারে বেরঙ ছাড়া সুরঙ বাংলা হিন্দি বর্ণপরিচয় পাওয়াই যায় না। এর কারণ এখনো রস ধরেনি বর্ণপরিচয় লিখিয়েদের মনে, কাজেই রঙও ধরছে না বর্ণমালায় আমাদের।

মহাদেব যখন পার্ব্বতীকে বর্ণমালার পাঠ দিয়েছিলেন তখন রূপের সঙ্গে রঙেরও আমদানি করেছিলেন তিনি। যথা, অ হ'ল—শরচ্চন্দ্র প্রতীকাশং আ হ'ল—শঙ্খজ্যোতির্ম্ময়ম্, ই হ'ল—পরমানন্দসুগন্ধকুসুমচ্ছবিম্ উ হল—পীতচম্পকসঙ্কাশং, ঋ হল—রক্তবিদ্যুল্লতাকারম্, ৯ হল— চঞ্চলাপাঙ্গী কুণ্ডলী পীতবিদ্যুল্লতা। এমনি সত্যিকার ফুল বিদ্যুৎ কুণ্ডল এই সব দিয়ে পার্ব্বতীর বর্ণপরিচয় আরম্ভ করে দিয়েছিলেন শিব, রূপে রঙে মিলিয়ে শিক্ষা।

রূপ ও রঙ বাক্য এবং অর্থের মতো মিলে আছে এটা পুরোনো কথা, কিন্তু নতুন যুগেও আর্টিষ্টদের একথাটা বুঝে না চ'ল্লে যে বিপদ আছে সেটা বলাই বাহুল্য।

অতসী মামী

—গল্প—

—শ্রীমাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়—

—এক—

যে শোনে সেই বলে, হ্যাঁ, শোনবার মত বটে !

বিশেষ ক'রে আমার মেজ মামা। তাঁর মুখে কোন জিনিষের এমন উচ্ছ্বসিত প্রশংসা খুব কম শুনেছি।

শুনে শুনে ভারি কৌতূহল হ'ল। কি এমন বাঁশী বাজায় লোকটা যে সবাই এমন ভাবে প্রশংসা করে! একদিন শুনতে গেলাম। মামার কাছ থেকে একটা পরিচয় পত্র সঙ্গে নিলাম।

আমি থাকি বালিগঞ্জে,আর যাঁর বাঁশী বাজানর ওস্তাদীর কথা বল্লাম তিনি থাকেন ভবানীপুর অঞ্চলে। মামার কাছে নাম শুনেছিলাম, যতীন। উপাধিটা শোনা হয়নি। আজ পরিচয় পত্রের উপরে পুরো নাম দেখলাম, যতীন্দ্রনাথ রায়।

বাড়ীটা খুঁজে বার ক'রে আমার তো চক্ষুস্থির! মামার কাছে যতীন বাবুর এবং তাঁর বাঁশী বাজানর যে রকম উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুনেছিলাম তাতে মনে হ'য়েছিল লোকটা নিশ্চয় একজন কেষ্টবিষ্টু গোছের কেউ হবেন। আর কেষ্টবিষ্টু গোছের একজন লোক যে বৈকুণ্ঠ বা মথুরার রাজ-প্রাসাদ না হোক,অন্তত বেশ বড় আর ডিসেণ্ট্ লুকিং একটা বাড়ীতে বাস করেন এও তো স্বতঃসিদ্ধ কথা। কিন্তু বাড়ীটা যে গলিতে সেটার কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, এযে ইঁট বার করা তিনকালের বুড়োর মত নড়বড়ে একটা ইঁটের খাঁচা! সামনেটার চেহারাই যদি এরকম, ভেতরটা না জানি আবার কি রকম!

উইয়ে ধরা দরজার কড়া নাড়লাম।

একটু পরেই দরজা খুলে যে লোকটি সামনে এসে দাঁড়ালেন তাঁকে দেখে মনে হ'ল ছাইগাদা নাড়তেই যেন একটা টকটকে আগুন বার হ'য়ে পড়ল।

খুব রোগা আর গায়ের রঙও অনেকটা ফ্যাকাসে হ'য়ে গেছে। একদিন চেহারাখানা কি রকম ছিল অনুমান করা শক্ত নয়। এখনও যা আছে, অপূর্ব্ব !

বছর ত্রিশেক বয়স, কি কিছু কম। মলিন হ'য়ে আসা গায়ের রঙ অপূর্ব্ব, শরীরের গড়ন অপূর্ব্ব, মুখের চেহারা অপূর্ব্ব! আর সব মিলিয়ে যে রূপ তাও অপূর্ব্ব। সব চেয়ে অপূর্ব্ব চোখ দুটি। চোখে চোখে চাইলে যেন নেশা লেগে যায়।

পুরুষেরও তা' হ'লে সৌন্দর্য্য থাকে! ইঁট বার করা নোনা ধরা দেওয়াল আর উইয়ে ধরা দরজা, তার মাঝখানে লোকটিকে দেখে আমার মনে হ'ল ভারি সুন্দর একটা ছবিকে কে যেন অতি বিশ্রী একটা ফ্রেমে বাঁধিয়েছে!

বল্লেন, আমি ছাড়া ত বাড়ীতে কেউ নেই, সুতরাং আমাকেই চান। কিন্তু কি চান ?

আমার মুগ্ধ চিত্তে কে যেন একটা ঘা দিল। কি বিশ্রী গলার স্বর! কর্কশ! কথাগুলি মোলায়েম কিন্তু লোকটির গলার স্বর শুনে মনে হ'ল যেন আমায় গালাগালি দিচ্ছেন! ভাবলাম, নির্দ্দোষ সৃষ্টি বিধাতার কুষ্ঠিতে লেখে না। এমন চেহারায় ঐ গলা! সৃষ্টিকর্ত্তা যত বড় কারিগর হোন, কোথায় কি মানায় সে জ্ঞানটা তাঁর একদম নেই।

বল্লাম, আপনার নাম তো যতীন্দ্রনাথ রায় ? আমি হরেন বাবুর ভাগ্নে।

পরিচয় পত্রখানা বাড়িয়ে দিলাম।

এক নিঃশ্বাসে প'ড়ে বল্লেন, ইস্! আবার পরিচয় পত্র কেন হে? হরেন যদি তোমার মামা, আমিও তোমার মামা। হরেন আমায় দাদা ব'লে ডাকে কিনা! এসো, এসো, ভেতরে এস।

আমি ভেতরে ঢুকতে তিনি দরজা বন্ধ করলেন।

সদর দরজা থেকে দুধারের দেয়ালে গা ঠেকিয়ে হাত পাঁচেক এসে একটা হাত তিনেক চওড়া বারান্দায় প'ড়ে ডান দিকে বাঁকতে হ'ল। বাঁ দিকে বাঁকবার যো নেই, কারণ দেখা গেল সেদিকটা প্রাচীর দিয়ে বন্ধ করা।

ছোট্ট একটু উঠান, বেশ পরিষ্কার। প্রত্যেক উঠানের চারটে ক'রে পাশ থাকে, এটারও তাই আছে দেখলাম। দুপাশে দুখানা ঘর, এ বাড়ীরই অঙ্গ। একটা পাশ প্রাচীর দিয়ে বন্ধ করা, অন্য পাশটায় অন্য এক বাড়ীর একটা ঘরের পেছন দিক, জানালা দরজার চিহ্ন মাত্র নেই, প্রাচীরেরই সামিল।

আমার নবলব্ধ মামা ডাকলেন, অতসী, আমার এক ভাগ্নে এসেছে, এ ঘরে একটা মাদুর বিছিয়ে দিয়ে যাও। ও ঘরটা বড় অন্ধকার।

এঘর মানে আমরা যে ঘরের সামনে দাঁড়িয়েছিলাম। ওঘর মানে ওদিককার ঘরটা। সেই ঘরটা থেকে বেরিয়ে এলেন এক তরুণী, মস্ত ঘোমটায় মুখ ঢেকে।

যতীন মামা বল্লেন, একি! ঘোমটা কেন? আরে, এ যে ভাগ্নে!

মামীর ঘোমটা ঘুচাবার লক্ষণ নেই দেখে আবার বল্লেন, ছি ছি, মামী হ'য়ে ভাগ্নের কাছে ঘোমটা টেনে কলা বৌ সাজবে?

এবার মামীর ঘোমটা উঠল। দেখলাম, আমার নূতন পাওয়া মামীটি মামারই উপযুক্ত স্ত্রী বটে! মনে মনে বল্লাম, মামার গলায় বিশ্রী স্বরটা দিয়ে যে ভুলটা করেছ ভগবান, মামীকে দিয়ে সেটুকু শুধরে নিয়েছ বটে! তোমার কসুর মাপ করা গেল।

মামী এঘরের মেঝেতে মাদুর বিছিয়ে দিলেন। ঘরে তক্তপোস, টেবিল, চেয়ার ইত্যাদির বালাই নেই। এক পাশে একটা রঙ-চটা ট্রাঙ্ক আর একটা কাঠের বাক্স। দেওয়ালে এক কোণ থেকে আর এক কোণ পর্য্যন্ত একটা দড়ি টাঙ্গানো, তাতে একটি মাত্র ধুতি ঝুলছে। একটা পেরেকে একটা আধ ময়লা খদ্দরের পাঞ্জাবী লটকান, যতীন মামার সম্পত্তি। গোটা দুই চার-পাঁচ বছর আগে-কার ক্যালেণ্ডারের ছবি। একটাতে এখনও চৈত্রমাসের তারিখ লেখা কাগজটা লাগান রয়েছে, ছিঁড়ে ফেলতে বোধ হয় কারো খেয়াল হয়নি।

যতীন মামা বল্লেন, একটু সুজিটুজি থাকে তো ভাগ্নেকে ক'রে দাও। না থাকে এক কাপ চাই খাবে'খন।

বললাম, কিচ্ছু দরকার নেই যতীন মামা। আপনার বাঁশী শুনতে এসেছি, বাঁশীর সুরেই খিদে মিটবে এখন। যদিও খিদে পায়নি মোটেই, বাড়ী থেকে খেয়ে এসেছি।

যতীন মামা বল্লেন, বাঁশী? বাঁশী তো এখন আমি বাজাই না।

বললাম, সে হবে না, আপনাকে শোনাতেই হবে।

বল্লেন, তা' হ'লে বোস, রাত্রি হোক। সন্ধ্যার পর ছাড়া আমি বাঁশী ছুঁই না।

বল্লুম, কেন?

যতীন মামা মাথা নেড়ে বল্লেন, কেন জানি না ভাগ্নে, দিনের বেলা বাঁশী বাজাতে পারি না। আজ পর্য্যন্ত কোন দিন বাজাইনি। হ্যাঁ গা অতসী, বাজিয়েছি?

অতসী মামী মৃদু হেসে বল্লে, না।

যেন প্রকাণ্ড একটা সমস্যার সমাধান হ'য়ে গেল এমনি ভাবে যতীন মামা বল্লেন, তবে?

বললাম, মোটে পাঁচটা বেজেছে, সন্ধ্যা হবে সাতটায়। এতক্ষণ ব'সে থেকে কেন আপনাদের অসুবিধা করব, ঘুরেটুরে সন্ধ্যার পর আসব এখন।

যতীন মামা ইংরাজীতে বল্লেন, Tut! Tut! তারপর বাংলায় যোগ দিলেন, কি যে বল ভাগ্নে! অসুবিধাটা কি হে, এ্যাঁ? পাড়ার লোকে তো বয়কট করেছে। বলে, অতসী আমার স্ত্রী নয়! তুমি থাকলে তবু কথা ক'য়ে বাঁচবো।

এ আবার কি কথা! অতসী আমার স্ত্রী নয়, একথার মানে?

যতীন মামা আবার বল্লেন, জমিদারীর আয় বছরে পাঁচশো, তাই দিয়ে আমি একটি স্ত্রীলোক পুষছি! কি বুদ্ধি লোকের! তিন আইনে রেজিষ্ট্রী করা বিয়ে, রীতিমত দলিল আছে, কেউ কি তা দেখতে চাইবে? যতো সব—

ত্রস্তভাবে অতসী মামী বল্লে, কি যা-তা বলছো?

অতসী মামী

শ্রীমানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

যতীন মামা বললেন, ঠিক ঠিক, ভাগ্নে নতুন লোক, তাকে এসব বলা ঠিক হচ্ছে না বটে। ভারি রাগ হয় কিনা! ব'লে হাসলেন। হঠাৎ বল্লেন, তোমরা যে কেউ কারু সঙ্গে কথা বলছ না গো!

মামী মৃদু হেসে বললেন, কি কথা বলব?

যতীন মামা বললেন, এই নাও! কি কথা বলবে তাও কি আমায় ব'লে দিতে হবে নাকি? যা হোক কিছু ব'লে সুরু কর, গড় গড় ক'রে কথা আপনি এসে যাবে।

মামী বললে, তোমার নামটি কি ভাগ্নে?

যতীন মামা সশব্দে হেসে উঠলেন। হাসি থামিয়ে বললেন, এইবার ভাগ্নে, পাল্টা প্রশ্ন কর, আজ কি রাঁধবে মামী? বাস্, খাসা আলাপ জ'মে যাবে। তোমার আরম্ভটি কিন্তু বেশ অতসী।

মামীর মুখ লাল হ'য়ে উঠল।

আমি বললাম, অমন বিশ্রী প্রশ্ন আমি কখখনো করব না মামী, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমার নাম সুরেশ!

যতীন মামা বললেন, সুরেশ কিনা সুরের রাজা, তাই সুর শুন্‌তে এত আগ্রহ। নয় ভাগ্নে?

হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বল্লেন, ইস্! ভুবন বাবু যে টাকা দুটো ফেরত দেবে বলেছিল আজ! নিয়ে আসি, দুদিন বাজার হয়নি। বসো ভাগ্নে, মামীর সঙ্গে গল্প কর, দশ মিনিটের ভেতর আসছি।

ঘরের বাইরে গিয়ে বল্লেন, দোরটা দিয়ে যাও অতসী। ভাগ্নে ছেলে মানুষ, কেউ তোমার লোভে ঘরে ঢুকলে ঠেকাতে পারবে না।

মামীর মুখ আরক্ত হ'য়ে উঠল এবং সেইটা গোপন করতে চট ক'রে উঠে গেল। বাইরে তার চাপা গলা শুনলাম, কি যে রসিকতা কর, ছি! মামা কি জবাব দিলেন শোনা গেল না।

মামী ঘরে ঢুকে বল্লে, ঐ রকম স্বভাব ওঁর। বাক্সে দুটি মোটে টাকা, তাই নিয়ে সেদিন বাজার গেলেন। বল্লাম, একটা থাক্। জবাব দিলেন কেন? রাস্তায় ভুবন বাবু চাইতে টাকা দুটি তাকে দিয়ে খালি হাতে ঘরে ঢুকলেন।

আমি বল্লাম, বেশ লোক তো যতীন মামা!

মামী বল্লে, ঐ রকমই। আর ন্যাখো ভাই—

বললাম, ভাই নয়, ভাগ্নে।

মামী বল্লে, তাও তো বটে! আগে থাকতেই যে সম্বন্ধটা পাতিয়ে ব'সে আছ! ওঁর ভাগ্নে না হ'য়ে আমার ভাই হলেই বেশ হ'ত কিন্তু। সম্পর্কটা নতুন করে পাত না? এখনো এক ঘণ্টাও হয়নি, জমাট বাঁধেনি।

আমি বললাম, কেন? মামী ভাগ্নে বেশ তো সম্পর্ক!

মামী বল্লে, আচ্ছা তবে তাই। কিন্তু আমার একটা কথা তোমায় রাখতে হবে ভাগ্নে। তুমি ওঁর বাঁশী শুন্‌তে চেয়ো না।

বললাম, তার মানে? বাঁশী শুনতেই তো এলাম!

মামীর মুখ গম্ভীর হ'ল, বল্লে, কেন এলে? আমি ডেকেছিলাম? তোমাদের জ্বালায় আমি কি গলায় দড়ি দেবো?

আমি অবাক হ'য়ে মামীর মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। কথা যোগায় না।

মামী বল্লে, তোমাদের একটু সখ মেটাবার জন্য উনি আত্মহত্যা করছেন দেখতে পাওনা? রোজ তোমরা একজন না একজন এসে বাঁশী শুনতে চাইবে। রোজ গলা দিয়ে রক্ত পড়লে মানুষ কদিন বাঁচে?

রক্ত! রক্ত নয়? দেখবে? ব'লে মামী চ'লে গেল। ফিরে এল একটা গামলা হাতে ক'রে। গামলার ভেতরে জমাট বাধা খানিকটা রক্ত।

মামী বল্লে, কাল উঠেছিল, ফেলতে মায়া হচ্ছিল তাই রেখে দিয়েছি। রেখে কোন লাভ নেই জানি, তবু—

আমি অনুতপ্ত হয়ে বল্‌লাম, জানতাম না মামী। জানলে কখখনো শুনতে চাইতাম না। ইস্, এই জন্যেই মামার শরীর এত খারাপ?

মামী বল্লে, কিছু মনে কোরো না ভাগ্নে। অন্য কারো সঙ্গে তো কথা কইনা তাই তোমাকেই গায়ের ঝাল মিটিয়ে ব'লে নিলাম। তোমার আর কি দোষ, আমার !

আমি বল্‌লাম, এত রক্ত পড়ে তবু মামা বাঁশী বাজান?

মামী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বল্লে, হ্যাঁ, পৃথিবীর কোন বাধাই ওঁর বাঁশী বাজান বন্ধ করতে পারবে না। কত বলেছি, কত কেঁদেছি, শোনেন না। আমি চুপ করে রইলাম।

মামী ব'লে চল্ল, কতদিন ভেবেছি বাঁশী ভেঙ্গে ফেলি, কিন্তু সাহস হয়নি। হয়ত বাঁশীর বদলে মদ খেয়েই নিজেকে শেষ ক'রে ফেলবেন, নয়ত যেখানে যা আছে সব বিক্রি করে বাঁশী কিনে না খেয়ে মরবেন।

মামার শেষ কথাগুলি যেন গুমরে গুমরে কেঁদে ঘরের চারিদিকে ঘুরে বেড়াতে লাগল। আমি কি বলতে গেলাম, কিন্তু কথা ফুটল না।

মামী একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বল্লে, অথচ ঐ একটা ছাড়া আমার কোন কথাই ফেলেন না। আগে আকণ্ঠ মদ খেতেন, বিয়ের পর যেদিন মিনতি ক'রে মদ ছাড়তে বল্লাম সেইদিন থেকে ওজিনিষ ছোঁয়াই ছেড়ে দিলেন। কিন্তু বাঁশীর বিষয়ে কোন কথাই শোনেন না।

আমি বলতে গেলাম, মামী—

মামী বোধ হয় শুনতেই পেল না, বলে চল্ল, একবার বাঁশী লুকিয়ে রেখেছিলাম, সেকি ছট্ ফট্ করতে লাগলেন! যেন ওঁর সর্ব্বস্ব হারিয়ে গেছে।

বাইরে কড়া নাড়ার শব্দ হল। মামী দরজা খুলতে উঠে গেল।

যতীন মামা ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বল্লেন, দিলে না টাকা অতসী, বল্লে পরশু যেতে।

পিছন থেকে মামী বল্লে, সে আমি আগেই জানি।

যতীন মামা বল্লেন, দোকানদারটাই বা কি পাজী, একপো সুজি চাইলাম দিল না। মামার বাড়ী এসে ভাগ্নেকে দেখছি খালি পেটে ফিরতে হবে।

মামী ম্লান মুখে বল্লে, সুজি দেয়নি ভালই করেছে। শুধু জল দিয়ে তো আর সুজি হয় না!

ঘি নেই?

কবে আবার ঘি আনলে তুমি?

তাওতো বটে! ব'লে যতীন মামা আমার দিকে চেয়ে হাসলেন। দিব্য সপ্রতিভ হাসি।

আমি বল্লাম, কেন ব্যস্ত হচ্ছেন মামা, খাবারের কিছু দরকার নেই। ভাগ্নের সঙ্গে অত ভদ্রতা করতে নেই!

মামী বল্লে, বোস তোমরা, আমি আসছি। ব'লে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

মামা বল্লেন, কোথায় গো?

বারান্দা থেকে জবাব এল, আসছি।

মিনিট পনের পরে মামী ফিরল। দুহাতে দুখানা রেকাবিতে গোটা চারেক ক'রে রসগোল্লা আর গোটা দুই সন্দেশ।

যতীন মামা বল্লেন কোত্থেকে যোগাড় করলে গো? ব'লে, একটা রেকাবি টেনে নিয়ে একটা রসগোল্লা মুখে তুল্লেন।

অন্য রেকাবিটা আমার সামনে রাখতে রাখতে মামী বল্লে, তা দিয়ে তোমার দরকার কি?

যতীন মামা দিব্য নিশ্চিন্তভাবে বল্লেন, কিছু না! যা খিদেটা পেয়েছে, ডাকাতি ক'রেও যদি এনে থাক কিছু দোষ হয় নি। স্বামীর প্রাণ বাঁচাতে সাধ্বী অনেক কিছুই করে!

আমি কুণ্ঠিত হয়ে বলতে গেলাম, কেন মিথ্যে—

বাধা দিয়ে মামী বল্লে, আবার যদি ঐ সব সুরু কর ভাগ্নে, আমি কেঁদে ফেলব।

আমি নিঃশব্দে খেতে আরম্ভ করলাম।

মামী ওঘর থেকে দুটো এনামেলের গ্লাসে জল এনে দিলেন।

প্রথম রসগোল্লাটা গিলেই মামা বল্লেন, ওয়াক্! কি বিশ্রী রসগোল্লা! রইলো পড়ে খেয়ো তুমি, নয়ত ফেলে দিও। দেখি সন্দেশটা কেমন!

সন্দেশ মুখে দিয়ে বল্লেন, হ্যাঁ এ জিনিষটা ভাল, এটা খাব। ব'লে, সন্দেশ দুটো তুলে নিয়ে রেকাবিটা ঠেলে দিয়ে বল্লেন, যাও তোমার সুজির ঢিপি ফেলে দিও'খন নর্দ্দামায়।

অতসী মামীর চোখ ছল ছল ক'রে এল! মামার ছল-টুকু আমাদের কারুর কাছেই গোপন রইলনা। কেন যে এমন খাসা রসগোল্লাও মামার কাছে সুজির ঢিপি হয়ে গেল বুঝে আমার চোখে প্রায় জল আসবার উপক্রম হল।

শ্রীমানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

মাথা নীচু করে রেকাবিটা শেষ করলাম। মাঝখানে একবার চোখ তুলতেই নজরে পড়ল মামী মামার রেকবিটা কপালে ছুঁইয়ে দরজার ওপরের তাকে তুলে রাখছে।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এলে মামী ঘরে ঘরে প্রদীপ দেখাল, ধূনো দিল। আমাদের ঘরে একটা প্রদীপ জ্বালিয়ে দিয়ে মামী চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে কি যেন ভাবতে লাগল।

যতীন মামা হেসে বল্লেন, আরে লজ্জা কিসের! নিত্যকার অভ্যাস, বাদ পড়লে রাতে ঘুম হবেনা। ভাগ্নের কাছে লজ্জা করতে নেই।

আমি বল্‌লাম, আমি না হয়—

মামী বল্লে, বোস, উঠতে হবেনা অত লজ্জা নেই আমার। ব'লে, গলায় আঁচল দিয়ে মামার পায়ের কাছে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করল।

লজ্জায় সুখে তৃপ্তিতে আরক্ত মুখখানি নিয়ে অতসী মামী যখন উঠে দাঁড়াল, আমি বল্‌লাম দাঁড়াও মামী, একটা প্রণাম করেনি।

মামী বল্লে, না না ছি ছি—

বল্‌লাম, ছিছি নয় মামী। আমার নিত্যকার অভ্যাস না হ'তে পারে, কিন্তু তোমায় প্রণাম না ক'রে যদি আজ বাড়ী ফিরি রাত্রে আমার ঘুম হবে না ঠিক। ব'লে মামীর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলাম।

যতীন মামা হো হো করে হেসে উঠল।

মামী বল্লে, গ্যাখোতো ভাগ্নের কাণ্ড!

যতীন মামা বল্লেন, ভক্তি হয়েছে গো! কলিযুগের সীতাদেবীকে দেখে।

মেয়েটির মত সলজ্জে 'ধ্যেৎ' বলে মামী পলায়নকরল। বারান্দা থেকে ব'লে গেল, আমি রান্না করতে গেলাম।

যতীন মামা বল্লেন, এইবার বাঁশী শোন।

আমি বল্লাম, থাকগে, কাজ নেই মামা। শেষকালে রক্ত পড়তে আরম্ভ করবে আবার

যতীন মামা বল্লেন, তুমিও শেষে ঘ্যান ঘ্যান প্যান প্যান আরম্ভ করলে ভাগ্নে? রক্ত পড়বে তো হয়েছে কি? তুমি শুনলেও আমি বাজাব, না শুনলেও বাজাব। খুসী হয় রান্না ঘরে মামীর কাছে ব'সে কানে আঙ্গুল দিয়ে থাকগে।

কাঠের বাক্সটা খুলে বাঁশীর কাঠের কেসটা বার করলেন। বল্লেন বারান্দায় চল, ঘরে বড় শব্দ হয়।

নিজেই বারান্দায় মাদুরটা তুলে এনে বিছিয়ে দিলেন দেওয়ালে ঠেস দিয়ে ব'সে বাঁশীটা মুখে তুললেন।

হঠাৎ আমার মনে হল আমার ভেতরে যেন একটা উন্মাদ একটা ক্ষ্যাপা উদাসীন ঘুমিয়ে ছিল আজ বাঁশীর সুরের নাড়া পেয়ে জেগে উঠল। বাঁশীর সুর এসে লাগে কানে কিন্তু আমার মনে হল বুকের তলেও যেন সাড়া পৌছেচে। অতি তীব্র বেদনার মধুরতম আত্মপ্রকাশ কেবল বুকের মাঝে গিয়ে পৌছয়নি, বাইরের এই ঘর দোরকেও যেন স্পর্শ দিয়ে জীবন্ত ক'রে তুলেছে, আর আকাশকে বাতাসকে মৃদু ভাবে স্পর্শ করতে করতে যেন দূরে বহুদূরে যেখানে গোটা কয়েক তারা ফুটে উঠেছে দেখতে পাচ্ছি, সেইখানে স্বপ্নের মায়ার মাঝে লয় পাচ্ছে। অন্তরে ব্যথা বোধ ক'রে আনন্দ পাবার যতগুলি অনুভূতি আছে বাঁশীর সুর যেন তাদের সঙ্গে কোলাকুলি আরম্ভ করেছে।

বাঁশী শুনেছি ঢের। বিশ্বাস হয়নি এই বাঁশী বাজিয়ে একজন একদিন এক কিশোরীর কুল মান লজ্জা ভয় সব ভুলিয়ে দিয়েছিল, যমুনাকে উজান বইয়েছিল। আজ মনে হল, আমার যতীন মামার বাঁশীতে সমগ্র প্রাণ যদি আচমকা জেগে উঠে নিরর্থক এমন ব্যাকুল হয়ে ওঠে তবে সেই বিশ্ব বাঁশীর বাদকের পক্ষে ঐ দুটি কাজ আর এমন কি কঠিন!

দেখি, মামী কখন এসে নিঃশব্দে ওদিকের বারান্দায় ব'সে পড়েছে। খুব সম্ভব ঐ ঘরটাই রান্না ঘর, কিম্বা রান্না ঘরে যাবার পথ ঐ ঘরের ভেতর দিয়ে।

যতীন মামার দিকে চেয়ে দেখলাম, খুব সম্ভব সংজ্ঞা নেই। এ যেন সুরের আত্ম ভোলা সাধক সমাধি পেয়ে গেছে।

কতক্ষণ বাঁশী চলেছিল ঠিক মনে নেই, বোধ হয় ঘণ্টা দেড়েক হবে। হঠাৎ এক সময়ে বাঁশী থামিয়ে যতীন মামা ভয়ানক কাসতে আরম্ভ করলেন। বারান্দার ক্ষীণ আলোতেও বুঝতে পারলাম, মামার মুখ চোখ অস্বাভাবিক রকম লাল হয়ে উঠেছে।

অতসী মামী বোধ হয় প্রস্তুত ছিল, জল আর পাখা নিয়ে ছুটে এল। খানিকটা রক্ত তুলে মামীর শুশ্রূষায় যতীন মামা অনেকটা সুস্থ হলেন। মাদুরের ওপর একটা বালিশ পেতে মামী তাকে শুইয়ে দিল।

উঠে দাঁড়িয়ে বল্লাম, আজ আসি যতীন মামা।

মামা কিছু বলবার আগেই মামী বল্লে, তুমি এখন কথা কয়ো না। ভাগ্নের বাড়ীতে ভাববে, ; আজ থাক, আর একদিন এসে খেয়ে যাবে এখন। চল আমি দরজা দিয়ে আসছি।

দরজা খুলে বাইরে যাব, মামী আমার একটা হাত চেপে ধ'রে বল্লে, একটু দাঁড়াও ভাগ্নে, সামলে নি।

প্রদীপের আলোতে দেখলাম, মামীর সমস্ত শরীর থর থর ক'রে কাঁপছে! একটু সুস্থ হয়ে বল্লে, ওঁর রক্ত পড়া দেখলেই আমার এরকম হয়। বাঁশী শুনেও হ'তে পারে। আচ্ছা এবার এসো ভাগ্নে, শীগগির আর একদিন আসবে কিন্তু।

বল্লাম, মামার বাঁশী ছাড়াতে পারি কিনা একবার চেষ্টা ক'রে দেখব মামী?

মামী ব্যগ্র কণ্ঠে বল্লে, পারবে? পারবে তুমি? যদি পার ভাগ্নে, শুধু তোমার যতীন মামাকে নয়, আমাকেও প্রাণ দেবে।

অতসী মামী ঝর ঝর ক'রে কেঁদে ফেললে।

রাস্তায় নেমে বললাম, খিলটা লাগিয়ে দাও মামী।

—দুই—

কেবলই মনে হয়, নেশাকে মানুষ এত বড় দাম দেয় কেন। লাভ কি? এই যে যতীন মামা পলে পলে জীবন উৎসর্গ ক'রে সুরের জাল বুনবার নেশায় মেতে যান, মানি তাতে আনন্দ আছে। যে সৃষ্টি করে তারও, যে শোনে তারও। কিন্তু এত চড়া মূল্য দিয়ে কি সেই আনন্দ কিনতে হবে? এই যে স্বপ্ন সৃষ্টি এ তো ক্ষণিকের! যতক্ষণ সৃষ্টি করা যায় শুধু ততক্ষণ এর স্থিতি। তারপর বাস্তবের কঠোরতার মাঝে এ স্বপ্নের চিহ্নও তো খুঁজে পাওয়া যায় না। এ নিরর্থক মায়া সৃষ্টি ক'রে নিজেকে ভোলাবার প্রয়াস কেন? মানুষের মন কি বিচিত্র! আমারও ইচ্ছে করে যতীন মামার মত সুরের আলোয় ভুবন ছেয়ে ফেলে, সুরের আগুন গগনে বেয়ে তুলে পলে পলে নিজেকে শেষ করে আনি! লাভ নেই? নাই বা রইল।

এতদিন জানতাম, আমিও বাঁশী বাজাতে জানি। বন্ধুরা শুনে প্রশংসাও করে এসেছে। বাঁশী বাজিয়ে আনন্দও যে না পাই তা নয়। কিন্তু যতীন মামার বাঁশী শুনে এসে মনে হল, বাঁশী বাজান আমার জন্যে নয়। এক একটা কাজ করতে এক একজন লোক জন্মায়, আমি বাঁশী বাজাতে জন্মাইনি। যতীন মামা ছাড়া বাঁশী বাজাবার অধিকার কারো নেই।

থাকতে পারে কারো, অধিকার। কারো কারো বাঁশী হয়ত যতীন মামার বাঁশীর চেয়েও মনকে উতলা ক'রে তোলে, আমি তাদের চিনি না।

একদিন বল্লাম, বাঁশী শিখিয়ে দেবে মামা?

যতীন মামা হেসে বল্লে, বাঁশী কি শেখাবার জিনিষ ভাগ্নে? ও শিখতে হয়।

তা ঠিক। আর শিখতেও হয় মন দিয়ে, প্রাণ দিয়ে, সমগ্র সত্তা দিয়ে। নইলে আমার বাঁশী শেখার মতই সে শিক্ষা ব্যর্থ হয়ে যায়।

অতসী মামীকে সেদিন বিদায় নেবার সময় যে কথা বলেছিলাম সে কথা ভুলি নি। কিন্তু কি ক'রে যে যতীন মামার বাঁশী ছাড়াবো ভেবে পেলুম না। অথচ দিনের পর দিন যতীন মামা যে এই সর্ব্বনাশা নেশায় পলে পলে মরণের দিকে এগিয়ে যাবে একথা ভাবতেও কষ্ট হল। কিন্তু করা যায় কি? মামীর প্রতি যতীন মামার যে ভালবাসা তার বোধ হয় তল নেই, মামীর কান্নাই যখন ঠেলেছেন তখন আমার সাধ্য কি তাকে ঠেকিয়ে রাখি!

একদিন বল্লাম, মামা আর বাঁশী বাজাবেন না।

যতীন মামা চোখ বড় বড় করে বল্লেন, বাঁশী বাজাব না? বল কি ভাগ্নে? তাহলে বাঁচবো কি ক'রে?

বললাম, গলা দিয়ে রক্ত উঠছে, মামী কত কাঁদে।

তা আমি কি করব? একটু আধটু কাঁদা ভাল। ব'লে হাঁকলেন, অতসী! অতসী!

মামী এল।

শ্রীমাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

মামা বল্লেন, কান্না কি জন্যে শুনি? বাঁশী ছেড়ে দিয়ে আমায় মরতে বলো নাকি? তাতে কান্না বাড়বে,কমবেনা।

মামী ম্লানমুখে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল।

মামা বল্লেন, জান ভাগ্নে, এই অতসীর জ্বালায় আমার বেঁচে থাকা ভার হয়ে উঠেছে। কোথেকে উড়ে এসে জুড়ে বস্‌লেন, নড়বার নাম নেই। ওর ভার ঘাড়ে না থাকলে বাঁশী বগলে মনের আনন্দে দেশ বিদেশে ঘুরে বেড়াতাম। বেড়ানো টেরানো সব মাথায় উঠেছে।

মামী বল্লে, যাওনা বেড়াতে, আমি ধ'রে রেখেছি?

রাখোনি? ব'লে মামা এমনি ভাবে চাইলেন যেন নিজের চোখে তিনি অতসী মামীকে খুন করতে দেখেছেন আর মামী এখন তাঁর সমুখেই সে কথা অস্বীকার করছে।

মামীর চোখে জল এল। অশ্রু জড়িত কণ্ঠে বল্লে, অমন করতো আমি একদিন—

মামা একেবারে জল হয়ে গেলেন। আমার সামনেই মামীর হাত ধ'রে কোঁচার কাপড় দিয়ে চোখ মুছিয়ে দিয়ে বল্লেন, ঠাট্টা করছিলাম, সত্যি বলছি অতসী,—

চট্ ক'রে হাত ছাড়িয়ে মামী চ'লে গেল।

আমি বল্‌লাম, কেন মিথ্যে চটালেন মামীকে?

যতীন মামা বল্লেন, চটেনি। লজ্জায় পালালো।

কিন্তু একদিন যতীন মামাকে বাঁশী ছাড়তে হল। মামীই ছাড়াল।

মামীরএকদিন হটাৎ টাইফয়েড জ্বর হল।

সেদিন বুঝি জ্বরের সতর দিন। সকাল নটা বাজে। মামী ঘুমুচ্ছে, আমি তার মাথায় আইস ব্যাগটা চেপে ধ'রে আছি। যতীন মামা একটা টুলে ব'সে ম্লানমুখে চেয়ে আছেন। রাত্রি জেগে তাঁর শরীর আরও শীর্ণ হয়ে গেছে, চোখ দুটি লাল হয়ে উঠেছে। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, চুল উস্কো খুস্কো।

হটাৎ টুল ছেড়ে উঠে মামা ট্রাঙ্কটা খুলে বাঁশীটা বার করলেন। আজ সতর দিন এটা বাক্সেই বন্ধ ছিল।

সবিস্ময়ে বল্লাম, বাঁশী কি হবে মামা?

ছেঁড়া পাম্পসুতে পা ঢুকোতে ঢুকোতে মামা বল্লেন, বেচে দিয়ে আসব

তার মানে?

যতীন মামা ম্লান হাসি হেসে বল্লেন, তার মানে ডাক্তার রায়কে আর একটা কল দিতে হবে।

বল্‌লাম, বাঁশী থাক, আমার কাছে টাকা আছে।

প্রত্যুত্তরে শুধু একটু হেসে যতীন মামা পেরেকে টাঙ্গান জামাটা টেনে নিলেন।

যদি দরকার পড়ে ভেবে পকেটে কিছু টাকা এনেছিলাম। মিথ্যা চেষ্টা। আমার মেজ মামা কতবার কত বিপদে যতীন মামাকে টাকা দিয়ে সাহায্য করতে চেয়েছেন, যতীন মামা একটি পয়সা নেননি। বল্‌লাম, কোথাও যেতে হবেনা মামা, আমি কিনবো বাঁশী।

মামা ফিরে দাড়ালেন। বল্লেন, তুমি কিনবে ভাগ্নে? বেশতো!

বললাম, কতদাম?

বল্লেন, একশ পঁয়ত্রিশে কিনেছি, একশো টাকায় দেবো। বাঁশী ঠিক আছে, কেবল সেকেণ্ড হ্যাণ্ড এই যা।

বললাম, আপনি না সেদিন বলছিলেন মামা, এরকম বাঁশী খুঁজে পাওয়া দায়, অনেক বেছে আপনি কিনেছেন? আমি একশো পঁয়ত্রিশ দিয়েই ওটা কিনবো।

যতীন মামা বল্লেন, তাকি হয়! পুরোনো জিনিষ—

বল্‌লাম, আমাকে কি জোচ্চোর পেলেন মামা? আপনাকে ঠকিয়ে কমদামে বাঁশী কিনবো?

পকেটে দশটাকার তিনটে নোট ছিল বার ক'রে মামার হাতে দিয়ে বল্‌লাম, ত্রিশ টাকা আগাম নিন্, বাকী টাকাটা বিকেলে নিয়ে আসবো।

যতীন মামা কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে নোটকটার দিকে তাকিয়ে রইলেন, তারপর বললেন, আচ্ছা!

আমি অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলাম। যতীন মামার মুখের ভাবটা দেখবার সাধ্য হল না।

যতীন মামা ডাকলেন, ভাগ্নে—

ফিরে তাকালাম।

যতীন মামা হাসবার চেষ্টা ক'রে বল্লেন, খুব বেশী কষ্ট হচ্ছে ভেবোনা, বুঝলে ভাগ্নে?

আমার চোখে জল এল তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে মামীর শিয়রে গিয়ে বসলাম।

মামীর ঘুম ভাঙ্গেনি, জানতেও পারল না যে রক্তপিপাসু বাঁশীটা ঝলকে ঝলকে মামার রক্ত পান করছে, আমি আজ সেই বাঁশীটা কিনে নিলুম।

মনে মনে বল্লাম মিথ্যে আশা। এযে বালির বাঁধ! একটা বাঁশী গেল, আর একটা কিনতে কতক্ষণ? লাভের মধ্যে যতীন মামা একান্ত প্রিয়বস্তু হাতছাড়া হয়ে যাবার বেদনাটাই পেলেন।

বিকালে বাকী টাকা এনে দিতেই যতীন মামা বল্লেন, বাড়ী যাবার সময় বাঁশীটা নিয়ে যেও।

আমি ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বল্‌লাম, থাকনা এখন কদিন, এত তাড়াতাড়ি কিসের?

যতীন মামা বল্লেন, না। পরের জিনিষ আমি বাড়ীতে রাখি না। বুঝলাম, পরের হাতে চলে যাওয়া বাঁশীটা চোখের ওপরে থাকা তাঁর সহ্য হবে না।

বল্‌লাম বেশ মামা, তাই নিয়ে যাব এখন।

মামা ঘাড় নেড়ে বল্লেন, হ্যাঁ, নিয়েই যেও। তোমার জিনিষ এখানে কেন ফেলে রাখবে। বুঝলে না?

উনিশ দিনের দিন মামীর অবস্থা সঙ্কটজনক হয়ে উঠল।

যতীন মামা টুলটা বিছানার কাছে টেনে এনে মামীর একটা হাত মুঠো ক'রে ধ'রে নীরবে তার রোগশীর্ণ ঝরা ফুলের মত ম্লান মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

হটাৎ অতসী মামী বল্ল, ওগো আমি বোধ হয় আর বাঁচবো না।

যতীন মামা বল্লেন, তাকি হয় অতসী, তোমায় বাঁচতে হবেই। তুমি না বাঁচলে আমিও যে বাঁচবো না।

মামী বল্লে, বালাই, বাঁচবে বৈকি। ত্যাখো, আমি যদি নাই বাঁচি, আমার একটা কথা রাখবে?

যতীন মামা নত হয়ে বল্লেন, রাখবো। বল।

বাঁশী বাজান ছেড়ে দিও। তিল তিল ক'রে তোমার শরীর ক্ষয় হচ্ছে দেখে ওপারে গিয়েও আমার শান্তি থাকবে না। রাখবে আমার কথা?

মামা বল্লেন, তাই হবে অতসী। তুমি ভাল হয়ে ওঠো, আমি আর বাঁশী ছোঁব না।

মামীর শীর্ণ ঠোঁটে সুখের হাসি ফুটে উঠল। মামার একটা হাত বুকের ওপর টেনে শ্রান্তভাবে মামী চোখ বুজল।

আমি বুঝলাম যতীন মামা আজ তাঁর রোগশয্যাগতা অতসীর জন্য কতবড় একটা ত্যাগ করলেন। অতি মৃদুস্বরে উচ্চারিত ঐ কটি কথা, তুমি ভাল হয়ে ওঠো, আমি আর বাঁশী ছোঁব না, অন্যে না বুঝুক আমিত যতীন মামাকে চিনি, আমি জানি, অতসী মামীও জানে, ঐ কথাকটির পেছনে কতখানি জোর আছে! বাঁশী বাজাবার জন্য মন উন্মাদ হয়ে উঠলেও যতীন মামা আর বাঁশী ছোঁবেন না।

শেষ পর্য্যন্ত মামী ভাল হয়ে উঠল। যতীন মামার মুখে হাসি ফুটল। মামী যেদিন পথ্য পেল সেদিন হেসে মামা বল্লেন, কি গো, বাঁচবে না বটে? অমনি মুখের কথা কি না! চাঁড়াল খুরোর কাছ থেকেই তোমায় ছিনিয়ে এনেছি, যম ব্যাটা তো ভাল মানুষ।

আমি বললাম, চাঁড়াল খুড়ো আবার কি মামা?

মামা বল্লেন, তুমি জান না বুঝি? সে এক দ্বিতীয় মহাভারত।

মামী বল্লে, গুরুনিন্দা কোর না।

মামা বল্লেন, গুরুনিন্দা কি? গুরুতর নিন্দা করব। ভাগ্নেকে দেখাওনা অতসী, তোমার পিঠের দাগটা!

মামীর বাধা দেওয়া সত্তেও মামা ইতিহাসটা শুনিয়ে দিলেন। নিজের খুড়ো নয়, বাপের পিসতুতো ভাই। মা বাবাকে হারিয়ে সতর বছর বয়স পর্য্যন্ত ঐ খুড়োর কাছেই অতসী মামী ছিল। অত বড় মেয়ে তাকে কিল চড় লাগাতে খুড়োটির বাধত না, আনুষঙ্গিক অন্য সব তো ছিলই। খুড়োর মেজাজের একটি অক্ষয় চিহ্ন আজ পর্য্যন্ত মামীর পিঠে আছে। পাশের বাড়ীতেই যতীন মামা বাঁশী বাজাতেন আর আকণ্ঠ মদ খেতেন। প্রায়ই খুড়োর গর্জ্জন আর অনেক রাতে মামীর চাপা কান্নার শব্দে তাঁর নেশা ছুটে যেত। নিতান্ত চ'টে একদিন মেয়েটাকে নিয়ে পলায়ন করলেন এবং বিয়ে ক'রে ফেল্লেন।

মামার ইতিহাস বলা শেষ হলে অতসী মামী ক্ষীণ হাসি হেসে বল্লে, তখন কি জানি মদখায়! তাহলে কখ্‌খনো আসতুম না।

মামী

শ্রীমাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

মামা বল্লেন, তখন কি জানি তুমি মাথার রতন হয়ে আঠার মত লেপ্টে থাকবে! তাহলে কখ্‌খনো উদ্ধার করতাম না। আর মদ না খেলে কি এক ভদ্রলোকের বাড়ী থেকে মেয়ে চুরি করার মত বিশ্রী কাজটা করতে পারতাম গো! আমি ভেবেছিলাম, বছর খানেক—

মামী বল্লে, যাও, চুপ কর। ভাগ্নের সামনে যা তা ব'কো না।

মামা হেসে চুপ করলেন।

মাস দুই পরের কথা।

কলেজ থেকে সটান যতীনমামার ওখানে হাজির হলাম। দেখি, জিনিষ পত্র যা ছিল বাঁধা ছাঁদা হ'য়ে প'ড়ে আছে।

অবাক হ'য়ে প্রশ্ন করলাম, এসব কি মামা?

যতীন মামা সংক্ষেপে বল্লেন, দেশে যাচ্ছি।

দেশে? দেশ আবার আপনার কোথায়?

যতীনমামা বল্লেন, আমার কি একটা দেশও নেই ভাগ্নে? পাঁচশো টাকা আয়ের জমিদারী আছে দেশে, খবর রাখো?

অতসীমামী বল্লে, হয়ত জন্মের মতই তোমাদের ছেড়ে চল্লাম ভাগ্নে। আমার অসুখের জন্যই এটা হল।

বললাম, তোমার অসুখের জন্য? তার মানে?

মামা বল্লেন, তার মানে বাড়াটা বিক্রি ক'রে দিয়েছি। যিনি কিনেছেন পাশের বাড়ীতেই থাকেন, মাঝখানের প্রাচারটা ভেঙে দুটো বাড়ী এক ক'রে নিতে ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছেন।

আমি ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বল্লাম, এত কাণ্ড করলে মামা, আমাকে একবার জানালে না পর্য্যন্ত! কবে যাওয়া ঠিক হ'ল?

বাঁধা বিছানা আর তালাবন্ধ বাক্সের দিকে আঙুল বাড়িয়ে মামা বল্লেন, আজ। রাত্রে ঢাকা মেলে রওনা হ। আমরা বাঙ্গাল হে ভাগ্নে, জান না বুঝি? ব'লে মামা হাসলেন। অবাক মানুষ! এমন অবস্থায় হাসিও আসে!

গম্ভীর ভাবে উঠে দাঁড়িয়ে বল্লাম, আচ্ছা, আসি যতীনমামা, আসি মামী। ব'লে দরজার দিকে অগ্রসর হ'লাম।

অতসীমামী উঠে এসে আমার হাতটা চেপে ধ'রে বল্লে, লক্ষ্মী ভাগনে, রাগ কোর না। আগে থাকতে তোমায় খবর দিয়ে লাভ তো কিছু ছিল না, কেবল মনে ব্যথা পেতে। যে ভাগ্নে তুমি, কত কি হাঙ্গামা বাধিয়ে তুলতে ঠিক আছে কিছু?

আমি ফিরে গিয়ে বাঁধা বিছানাটার ওপর ব'সে বল্লাম, আজ যদি না আসতাম, একটা খবর ও তো পেতাম না। কাল এসে দেখতাম, বাড়ী ঘর খাঁ খাঁ করছে।

যতীন মামা বল্লেন, আরে রামঃ! তোমায় না ব'লে কি যেতে পারি? দুপুর বেলা সেনের ডাক্তারখানা থেকে ফোন ক'রে দিয়েছিলাম তোমাদের বাড়ীতে। কলেজ থেকে বাড়ী ফিরলেই খবর পেতে।

বাড়ী আর গেলাম না। শিয়ালদ' ষ্টেসনে মামামামীকে উঠিয়ে দিতে গেলাম। গাড়ী ছাড়ার আগে কতক্ষণ সময় যে কি ক'রেই কাটল! কারো মুখেই কথা নেই। যতীন মামা কেবল মাঝে মাঝে দুএকটা হাসির কথা বলছিলেন এবং হাসাচ্ছিলেনও। কিন্তু তাঁর বুকের ভেতর যে কি করছিল সে খবর আমার অজ্ঞাত থাকেনি।

গাড়ী ছাড়বার ঘণ্টা বাজলে যতীন মামা আর অতসী মামীকে প্রণাম ক'রে গাড়ী থেকে নামলাম। এইবার যতীন মামা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। আর বোধ হয় মুখে হাসি ফুটিয়ে রাখা তাঁর পক্ষে সম্ভব হল না।

জানালা দিয়ে মুখ বার ক'রে মামী ডাকল, শোনো। কাছে গেলাম। মামী বল্লে, তোমাকে ভাগ্নে বলি আর যাই বলি, মনে মনে জানি তুমি আমার ছোট ভাই। পারত একবার বেড়াতে গিয়ে দেখা দিয়ে এসো। আমাদের হয়ত আর কলকাতা আসা হবেনা, জমির ভারি ক্ষতি হয়ে গেছে। যেও, কেমন ভাগ্নে?

মামীর চোখ দিয়ে টপ্ টপ ক'রে জল ঝরে পড়ল। ঘাড় নেড়ে জানালাম, যাব।

বাঁশী বাজিয়ে গাড়ী ছাড়ল। যতক্ষণ গাড়ী দেখা গেল অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম। দূরের লাল সবুজ আলোক বিন্দুর ওপারে যখন একটি চলন্ত লাল বিন্দু অদৃশ্য হয়ে গেল তখন ফিরলাম। চোখের জলে দৃষ্টি তখন ঝাপসা হয়ে গেছে।

—তিন—

মানুষের স্বভাবই এই যখন যে দুঃখটা পায় তখন সেই দুঃখটাকেই সবার বড় ক'রে দেখে। নইলে কে ভেবেছিল, যে যতীন মামা আর অতসী মামীর বিচ্ছেদে একুশ বছর বয়সে আমার দুচোখ জলে ভ'রে গিয়েছিল সেই যতীন মামা আর অতসী মামী একদিন আমার মনের এক কোণে সংসারের সহস্র আবর্জ্জনার তলে চাপা প'ড়ে যাবেন।

জীবনে অনেকগুলি ওলোট পালট হ'য়ে গেল। বি, এ পাশ ক'রে বার হ'তে না হ'তে ভাগ্য আমার ঘাড় ধ'রে যৌবনের কল্পনার সুখস্বর্গ থেকে বাস্তবের কঠোর পৃথিবীতে নামিয়ে দিল। ব্যবসা ফেল পড়ল। বাবা মনের দুঃখে ইহলোক ত্যাগ করলেন। বালিগঞ্জের বাড়ীটা পর্য্যন্ত বিক্রি ক'রে পিতৃঋণ শোধ দিয়ে আশি টাকা মাইনের একটা চাকরি নিয়ে শ্যাম বাজার অঞ্চলে ছোট একটা বাড়ী ভাড়া ক'রে উঠে গেলাম। মার কাঁদা কাটায় গ'লে একটা বিয়েও ক'রে ফেল্লাম

প্রথমটা সমস্ত পৃথিবীটাই যেন তেতো লাগতে লাগল, জীবনটা বিস্বাদ হ'য়ে গেল, আশা আনন্দের এতটুকু আলোড়নও ভেতরে খুঁজে পেলাম না।

তারপর ধীরে ধীরে সব ঠিক হ'য়ে গেল। নূতন জীবনে রসের খোঁজ পেলাম। জীবনের জুয়াখেলায় হারজিতের কথা কদিন আর মানুষ বুকে পুরে রাখতে পারে?

জীবনে যখন এই সব বড় বড় ঘটনা ঘটছে তখন নিজেকে নিয়ে আমি এমনি ব্যাপৃত হ'য়ে পড়লাম যে কবে এক যতীন মামা আর অতসী মামীর স্নেহ পরম সম্পদ ব'লে গ্রহণ করেছিলাম সে কথা মনে ক্ষীণ হ'তে ক্ষীণতর হ'য়ে গেল। সাত বছর পরে আজ কচিৎ কখনো হয়ত একটা অস্পষ্ট স্মৃতির মত তাদের কথা মনে পড়ে।

মাঝে একবার মনে পড়েছিল, যতীন মামাদের দেশে চ'লে যাওয়ার বছর তিনেক পরে। সেইবার ঢাকা মেলে কলিসন হয়। মৃতদের নামের মাঝে যতীন্দ্রনাথ রায় নামটা দেখে যে খুব একটা ঘা লেগেছিল সে কথা আজও মনে আছে। ভেবেছিলাম একবার গিয়ে দেখে আসব, কিন্তু হয়নি। সেইদিন আপিস থেকে ফিরে দেখি আমার স্ত্রীর কঠিন অসুখ। মনে পড়ে যতীন মামার দেশের ঠিকানায় একটা পত্র লিখে দিয়ে এই ভেবে মনকে সান্ত্বনা দিয়েছিলাম, ও নিশ্চয় আমার যতীন মামা নয়। পৃথিবীতে যতীন্দ্রনাথ রায়ের অভাব নেই তো। সে চিঠির কোন জবাব আসেনি। স্ত্রীর অসুখের হিড়িকে কথাটাও আমার মন থেকে মুছে গিয়েছিল।

তারপর গড়িয়ে গড়িয়ে আরও চারটে বছর কেটে গেছে।

আমার ছোট বোন বীণার বিয়ে হয়েছিল ঢাকায়। বীণার স্বামী তারক সেখানে কলেজের প্রফেসার।

পূজোর সময় বীণাকে তারা পাঠাল না। অগ্রহায়ণ মাসে বীণাকে আন্‌তে ঢাকা গেলাম। কিন্তু আনা হ'ল না। গিয়েই দেখি বীণার শাশুড়ীর খুব অসুখ। আমি যাবার আগের দিন হু হু ক'রে জ্বর এসেছে। ডাক্তার আশঙ্কা করছেন নিউমোনিয়া।

ছুটি ছিল না, ক্ষুণ্ণ হ'য়ে একাই ফিরলাম। তারক বল্লে, মা ভাল হ'লেই আমি নিজে গিয়ে রেখে আসব, সুরেশ বাবু।

গোয়ালন্দে ষ্টিমার থেকে নেমে ট্রেণের একটা ইণ্টারে ভিড় কম দেখে উঠে পড়লাম। দুটি মাত্র ভদ্রলোক, এক কোণে র‍্যাপার মুড়ি দেওয়া একটি স্ত্রীলোক, খুব সম্ভব এঁদের একজনের স্ত্রী, জিনিষ পত্রের একান্ত অভাব। খুসী হ'য়ে একটা বেঞ্চিতে কম্বলের ওপর চাদর বিছিয়ে বিছানা করলাম। বালিশ ঠেসান দিয়ে আরাম ক'রে ব'সে, পা দুটো রাগ দিয়ে ঢেকে একটা ইংরাজী মাসিক পত্র বার ক'রে ওপেনহেমের ডিটেকটিভ গল্পে মনঃসংযোগ করলাম।

যথাসময়ে গাড়ী ছাড়ল এবং পরের ষ্টেশনে থামল। আবার চলল। ওটা ঢাকা মেল বটে, কিন্তু পোড়াদ' পর্য্যন্ত

শ্রীমাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রত্যেক ষ্টেশনে থেমে থেমে প্যাসেঞ্জার হিসেবেই চলে। পোড়াদ'র পর ছোটখাটো ষ্টেসনগুলি বাদ দেয় এবং গতিও কিছু বাড়ায়।

গোয়ালন্দের পর গোটা তিনেক ষ্টেসন পরে একটা ষ্টেসনে গাড়ী দাঁড়াতে ভদ্রলোক দুটি জিনিষপত্র নিয়ে নেমে গেলেন। স্ত্রীলোকটি কিন্তু তেমনি ভাবে ব'সে রইলেন।

ব্যাপার কি ? একে ফেলেই দেখছি সব নেমে গেলেন। এমন অন্যমনস্কও তো কখন দেখিনি! ছোটখাট জিনিষই মানুষের ভুল হয়, একটা আস্ত মানুষ, তাও আবার এক-জনের অর্দ্ধাঙ্গ, তাকে আবার কেউ ভুল ক'রে ফেলে যায়!

জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখলুম পিছনে দৃকপাত মাত্র না ক'রে তাঁরা ষ্টেসনের গেট পার হচ্ছেন।

হয়ত ভেবেছেন, চিরদিনের মত আজও স্ত্রীটি তার পিছু পিছু চলেছে।

চেঁচিয়ে ডাকলুম, ও মশায়— মশায় শুনছেন ?

গেটের ওপারে ভদ্রলোক দুটি অদৃশ্য হ'য়ে গেলেন। বাঁশী বাজিয়ে গাড়ীও ছাড়ল।

অগত্যা নিজের জায়গায় ব'সে প'ড়ে ভাবলাম, তবে কি উনি একাই এসেছেন নাকি ? বাঙালীর মেয়ে নিশ্চয়ই, র‍্যাপার দিয়ে নিজেকে ঢাকবার কায়দা দেখেই সেটা বোঝা যায়। বাঙালীর মেয়ে, এই রাত্রি বেলা নিঃসঙ্গ যাচ্ছে, তাও আবার পুরুষদের গাড়ীতে—

আরে! এটা পুরুষদেরগাড়ী ঠিক ত ?

চট ক'রে দুদিকের জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে চাঁদের আলোতে ভাল ক'রে বাইরেটা দেখে নিলাম। মেয়ে-গাড়ীর কোন চিহ্নই তো লটকান নেই !

একটু ভেবে বল্লাম, দেখুন, শুনছেন ?

সাড়া নেই।

বল্লাম, আপনার সঙ্গীরা সব নেমে গেছে, শুনছেন ?

কথাগুলি যে আলোয়ান ভেদ করে ভেতরে গেল তার কোন চিহ্নই দেখা গেল না।

কি মুস্কিল! অপরিচিতা মেয়েদের সম্বোধন করবার কোন শব্দই তো বাঙলা ভাষায় নেই! মা বলা যায়, কিন্তু সেটা কেমন কেমন ঠেকে। শেষকালে এক সঙ্গী-পরিত্যক্ত নারীর ঝুঁকি ঘাড়ে পড়বে নাকি ?

বেঞ্চের কাছে স'রে গিয়ে বল্লাম, দেখুন, আপনার স্বামী আগের ষ্টেসনে নেমে গেছেন।

এইবার আলোয়ানের পোঁটলা নড়ল, এবং আলোয়ান ও ঘোমটা স'রে গিয়ে যে মুখখানা বার হ'ল দেখেই আমি চমকে উঠলাম।

কিছু নেই, সে মুখের কিছুই এতে নেই। আমার অতসী মামীর মুখের সঙ্গে এ মুখের অনেক তফাৎ। কিন্তু আমার মনে হ'ল, এ আমার অতসী মামীই !

মৃদু হেসে বল্লে, গলা শুনেই মনে হয়েছিল এ আমার ভাগ্নের গলা। কিন্তু অতটা আশা করতে পারিনি। মুখ বার করতে ভয় হচ্ছিল, পাছে আশা ভেঙে যায়।

আমি সবিস্ময়ে ব'লে উঠলাম, অতসী মামী !

মামী বল্ল, খুব বদলে গেছি, না ?

মামীর সিঁথিতে সিঁদুর নেই, কাপড়ে পাড়ের চিহ্নও খুঁজে পেলাম না।

চার বছর আগে ঢাকামেল কলিশনে মৃতদের নামের তালিকায় একটা অতি পরিচিত নামের কথা মনে পড়ল। যতীন মামা তবে সত্যিই নেই !

আস্তে আস্তে বল্‌লাম, খবরের কাগজে মামার নাম দেখেছিলাম মামী, বিশ্বাস হয়নি সে আমার যতীন মামা। একটা চিঠি লিখেছিলাম, পাওনি ?

মামী বল্লে, না। তারপরেই আমি ওখান থেকে দুতিন মাসের জন্য চ'লে যাই।

বল্লাম, কোথায় ?

আমার এক দিদির কাছে, দূর সম্পর্কের অবশ্য।

আমায় কেন একটা খবর দিলেনা মামী ?

মামী চুপ ক'রে রইল।

ভাগ্নের কথা বুঝি মনে ছিল না ?

মামী বল্লে, তা নয়, কিন্তু খবর দিয়ে আর কি হোত! যা হবার তা তো হয়েই গেল। বাঁশীকে ঠেকিয়ে রাখলাম, কিন্তু নিয়তিকে তো ঠেকাতে পারলাম না! তোমার মেজ মামার কাছে তোমার কথাও সব শুনলাম, আমার

দুর্ভাগ্য নিয়ে তোমায় আর বিরক্ত করতে ইচ্ছে হ'ল না। জানিত, একটা খবর দিলেই তুমি ছুটে আসবে!

চুপ ক'রে রইলাম। বলবার কি আছে? কি নিয়েই বা অভিমান করব? খবরের কাগজে যতীন মামার নাম প'ড়ে একটা চিঠি লিখেই তো আমার কর্ত্তব্য শেষ করেছিলাম।

মামী বল্লে, কি করছ এখন ভাগ্নে?

চাকরী। এখন তুমি যাচ্ছ কোথায়?

মামী বল্লে, একটু পরেই বুঝবে। ছেলে পিলে কটি?

আশ্চর্য্য! জগতে এত প্রশ্ন থাক্‌তে এই প্রশ্নটাই সকলের আগে মামীর মনে জেগে উঠল!

বল্লাম, একটি ছেলে।

ভারি ইচ্ছে করছে আমার ভাগ্নের খোকাকে দেখে আসতে। দেখাবে একবার? কার মত হয়েছে? তোমার মত, না তার মার মত? কত বড় হয়েছে?

বল্লাম, তিন বছর চলছে। চলনা আমাদের বাড়ী মামী, বাকী প্রশ্নগুলির জবাব নিজের চোখেই দেখে আসবে?

মামী হেসে বল্লে, গিয়ে যদি আর না নড়ি?

বল্লাম, তেমন ভাগ্য কি হবে! কিন্তু সত্যি কোথায় চলেছ মামী? এখন থাক কোথায়?

মামী বল্লে, থাকি দেশেই। কোথায় যাচ্ছি, একটু পরে বুঝবে। ভাল কথা, সেই বাঁশীটা কি হ'ল ভাগ্নে?

এইখানে আছে।

এইখানে? এই গাড়ীতে?

বল্লাম, হুঁ। আমার ছোট বোন বীণাকে আনতে গিয়েছিলাম, সে লিখেছিল বাঁশীটা নিয়ে যেতে। সবাই নাকি শুনতে চেয়েছিল।

মামী বল্লে, তুমি বাজাতে জান নাকি? বার করনা লক্ষ্মী বাঁশীটা—

ওপর থেকে বাঁশীর কেসটা পাড়লাম। বাঁশীটা বার করতেই মামী ব্যগ্র হস্তে টেনে নিয়ে এক দৃষ্টিতে সেটার দিকে চেয়ে রইল। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বল্লে, বিয়ের পর এটাকে বন্ধু ব'লে গ্রহণ করেছিলাম, মাঝখানে এর চেয়ে বড় শত্রু আমার ছিল না, আজ আবার এটাকে পরম বন্ধু ব'লে মনে হচ্ছে। কি ভালই বাসতেন এটাকে! শেষ তিনটা বছর বাঁশীটার জন্য ছটফট ক'রে কাটিয়েছিলেন। আজ মনে হচ্ছে বাঁশী বাজান ছাড়তে না বল্লেই হয়ত ভাল হ'ত। বাঁশীর ভেতর দিয়ে মরণকে বরণ করলে তবু শান্তিতে যেতে পারতেন। শেষ কটা বছর এত মনকষ্ট ভোগ করতে হ'ত না।

বাঁশীর অংশগুলি লাগিয়ে মামী মুখে তুলল। পরক্ষণে ট্রেণের ঝমঝমানি ছাপিয়ে চমৎকার বাঁশী বেজে উঠল। পাকা গুণীর হাতের স্পর্শ পেয়ে বাঁশী যেন প্রাণ পেয়ে অপূর্ব্ব বেদনাময় সুরের জাল বুনে চলল।

আমার বিস্ময়ের সীমা রইল না। এ তো অল্প সাধনার কাজ নয়। যার তার হাতে বাঁশীতো এমন অপূর্ব্ব কান্না কাঁদে না! মামীর চক্ষু ধীরে ধীরে নিমীলিত হ'য়ে গেল। তার দিকে চেয়ে ভবানীপুরের একটা অতি ক্ষুদ্র বাড়ীর প্রদীপের স্বল্পালোকে আলোকিত বারান্দার দেয়ালে ঠেস দেয়া এক সুর-সাধকের সমাধিমগ্ন মূর্ত্তির ছবি আমার মনে জেগে উঠল।

মাঝে সাতটা বছর কেটে গেছে। যতীন মামার যে অপূর্ব্ব বাঁশীর সুর একদিন শুনেছিলাম, সে সুর মনের তলে কোথায় হারিয়ে গেছে। আজ অতসী মামীর বাঁশী শুনে মনে হ'তে লাগল সেই হারিয়ে যাওয়া সুরগুলি যেন ফিরে এসে আমার প্রাণে মৃদুগুঞ্জন সুরু ক'রে দিয়েছে।

এক সময়ে বাঁশী থেমে গেল। মামীর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ঝ'রে পড়ল। আমারও।

কতক্ষণ স্তব্ধ হ'য়ে থেকে বল্লাম, মামী, এ কথাটাও তো গোপন রেখেছিলে!

মামী বল্লে, বিয়ের পর শিখিয়েছিলেন। বাঁশী শিখবার কি আগ্রহই তখন আমার ছিল! তারপর যেদিন বুঝলাম বাঁশী আমার শত্রু সেইদিন থেকে আর ছুঁইনি। আজ কতকাল পরে বাজালাম। মনে হয়েছিল, বুঝি ভুলে গেছি!

ট্রেণ এসে একটা ষ্টেসনে দাঁড়াল। মামী জানালা দিয়ে মুখ বার ক'রে আলোর গায়ে লেখা ষ্টেসনের নামটা প'ড়ে ভেতরে মুখ ঢুকিয়ে বলল, পরের ষ্টেসনে আমি নেমে যাব ভাগ্নে।

শ্রীমাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

পরের ষ্টেসনে ! কেন ?

মামী বল্লে, আজ কত তারিখ, জান ?

বল্লাম, সতরই অঘ্রাণ।

মামী বল্লে, চার বছর আগে আজকের দিনে—বুঝতে পারছ না তুমি ?

মুহূর্ত্তে সব দিনের আলোর মত স্বচ্ছ হ'য়ে গেল। ঠিক্ ! চার বছর আগে এই সতরই অঘ্রাণ ঢাকা মেলে কলিশন হয়েছিল। সেদিনও এমনি সময়ে এই ঢাকা মেলটির মত সেই গাড়ীটা শত শত নিশ্চিন্ত আরোহীকে পলে পলে মৃত্যুর দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল !

ব'লে উঠলাম, মামী !

মামী স্থির দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চেয়ে থেকে বল্লে, সামনেরই ষ্টেশনের অল্প ওদিকে লাইনের ধারে কঠিন মাটির ওপর তিনি মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফট করেছিলেন। প্রত্যেক বছর আজকের দিনটিতে আমি ঐ তীর্থ দর্শন করতে যাই। আমার কাছে আর কোন তীর্থের এতটুকু মূল্য নেই !

হঠাৎ জানালার কাছে স'রে গিয়ে বাইরের দিকে আঙুল বাড়িয়ে মামী ব'লে উঠল, ঐ ঐ ঐখানে ! দেখতে পাচ্ছ না ? আমি তো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তিনি যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে একটু স্নেহশীতল স্পর্শের জন্য ব্যগ্র হ'য়ে রয়েছেন। একটু জল, একটু জলের জন্যেই হয়ত !—উঃ মাগো, আমি তখন কোথায় !

দুহাতে মুখ ঢেকে মামী ভেতরে এসে ব'সে পড়ল।

ধীরে ধীরে গাড়ীখানা ষ্টেসনের ভেতর ঢুকল।

বিছানাটা গুটিয়ে আমি বল্লাম, চল মামী, আমি তোমার সঙ্গে যাব।

মামী বল্লে, না।

বললাম, এই রাত্রে তোমাকে একলা যেতে দিতে পারব না মামী।

মামীর চোখ জ'লে উঠল, ছিঃ ! তোমার তো বুদ্ধির অভাব নেই ভাগ্নে। আমি কি সঙ্গী নিয়ে সেখানে যেতে পারি ? সেই নির্জ্জন মাঠে সমস্ত রাত আমি তাঁর সঙ্গ অনুভব করি, সেখানে কি কাউকে নিয়ে যাওয়া যায় ! ঐখানের বাতাসে যে তার শেষ নিশ্বাস রয়েছে ! অবুঝ হয়ো না—

গাড়ী দাঁড়াল।

বাঁশীটা তুলে নিয়ে মামী বল্ল, এটা নিয়ে গেলাম ভাগ্নে ! এটার ওপর তোমার চেয়ে আমার দাবী বেশী।

দরজা খুলে অতসী মামী নেমে গেলেন। আমি নির্ব্বাক হ'য়ে চেয়ে রইলাম।

আবার বাঁশী বাজিয়ে গাড়ী ছাড়ল। খোলা দরজাটা একটা করুণ শব্দ ক'রে আছড়ে বন্ধ হ'য়ে গেল।

কবি-প্রিয়া

শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু

কবিদের প্রিয়তমা কেমন ধারা,
দেখেনি যারা কভু, শুধায় তারা—
আকাশের আলোর মতন, রবির মতন ?
বাতাসের গতির মতন লক্ষ্যহরা ?

তারা কি ফুলের মতন হাওয়ায় দোলে ?
তারা কি ক্ষণপ্রভা— মেঘের কোলে ?
কোকিলের মাতাল গলায় 'কুহু'র মতন
ফাগুনের আগুনবাণী যায় কি ব'লে ?

বাদলের ধারা তারা ঝরঝর ?
বনেরি দ্বিপ্রহরের মরমর ?
সাঁঝেরি আধা আলো অন্ধকারে
জলেরি কাঁপন কি গো থরথর ?

যে নারী দেখছি সদা চোখের পরে,
বিরাজে এ সংসারের সকল ঘরে,
যে নারী হাসে-কাঁদে সুখে-দুখে,
নিজেরি স্বার্থ নিয়ে বাঁচে মরে ;—

কবিদের প্রিয়ারা কি তেমনি হবে ?
চলে সব গড্ডলিকার প্রলয়-রবে ?
তারা কি দেহ মনে এমনি ধারাই ?—
কবিদের নেশা কি সে জাগায় তবে ?

কবিরা গানে যে গো বন্যা আনে !
প্রেমে হয় উচ্ছ্বসিত মনে-প্রাণে !
ভুবনে দেখে সবে প্রিয়া-ভরা !—
তবে কি প্রিয়া তাদের যাদু জানে ?

কবিরা মাতাল হ'ল প্রেমে যারি,
কি জানি কেমন ধারা সেই সে নারী !
যেখানে যত রূপের আভা আছে,
গেল কি একটি মুখের প্রভায় হারি' ?

হবে কি কবি-প্রিয়া যেমন তেমন ?
ভালো সে ? ভালো ? তবু কেমন-কেমন ?
সবারে বাঁধতে পারে মায়ার ডোরে,
তারি সেই চলায় বলায় আছেই এমন ?

তবু তার রূপের আলো, গুণের আলো,
শুধু এক কবির চোখেই লাগুক ভালো !
প্রিয়া মুখ সুধাপানে ছন্দে-গানে
কবিরা, দিকে দিকে শান্তি ঢালো !

কথা-পুরাতনী

শ্রীভূতনাথ ভট্টাচার্য্য

মরণের দ্বারা নিমন্ত্রিত অতিথি এই দীন লেখকের অন্তর আজি শৈশব-স্মৃতির যে পবিত্র পুলকস্পর্শে সুধাময় হইতেছে, সহৃদয় পাঠক-মহোদয়দিগকে তাহার যৎসামান্য আভাস-প্রদর্শন এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য।

বেদোদিত সনাতন ধর্ম্ম ভারতীয় হিন্দু নর-নারীগণের অস্থি-মজ্জাগত। "অহং ব্রহ্মাস্মি" "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি মহাবাক্য স্বতঃসিদ্ধ সত্য।

অতি প্রাচীন সময় হইতে সর্ব্ববর্ণের হিন্দু-সাধারণ ঐ সকল অভ্রান্ত অধ্যাত্ম তত্ত্বে কতদূর আস্থাবান্ হইয়া রহিয়াছে, নিম্নলিখিত ব্যাপারটি তাহার প্রতিরূপ-প্রদর্শক।

অন্যূন অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে আমরা যখন অল্পবয়স্ক বালক ছিলাম, তখন আমাদের গ্রামে এক শ্রেণীর যাদুকর দল মধ্যে মধ্যে আসিত ও বিবিধ ঐন্দ্রজালিক কৌতুক দেখাইয়া অর্থোপার্জ্জন করিত। ক্রীড়ারম্ভের প্রাক্কালে তাহারা "আত্মারাম সরকারের ভাদর বৌ" এই কথাগুলি বারংবার উচ্চৈঃস্বরে আবৃত্তি করিত। উত্তরকালে আমার জনৈক বন্ধু বলিয়াছিলেন যে, কথাগুলি নিরর্থক শব্দসমষ্টি মাত্র নহে, ঐ গুলি একটি মন্ত্র; ঐ মন্ত্রের উচ্চারণ দ্বারা যাদুকর "আত্মসার" অর্থাৎ শক্তিসঞ্চয় করিয়া থাকে।

এখন এই অন্তিম বয়সে উক্ত "আত্মসার" শব্দের যে অর্থ উপলব্ধি করিয়াছি, পাঠকগণকে তাহা বলিবার চেষ্টা করিব।

আত্মারাম সরকার স্বয়ং জীবাত্মা আর তাঁহার ভ্রাতৃবধূ (ভাদর বৌ) দেহেন্দ্রিয়-সংঘাত। দেহেন্দ্রিয়-সংঘাতে আত্ম-প্রত্যয়, মায়া; এই মায়া নিরাকৃত হইলে আত্মচৈতন্যের অবরোধ জন্মে। আত্মা বা দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ মৈত্রেয্যাত্মনি খল্বরে দৃষ্টে শ্রুতে মতে বিজ্ঞাতে ইদং সর্ব্বং বিদিতং। যোগী যাজ্ঞবল্ক্য।

আত্মাই দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য, মন্তব্য, ধ্যাতব্য, হে মৈত্রেয়ি! আত্মা দৃষ্ট, শ্রুত, জ্ঞাত হইলে নিখিল-তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়।

দেহের সহিত আত্মার সম্বন্ধ সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করিয়া কলা-কুশল কৌতুক-প্রদর্শক যেন ব্রহ্মভাবে বিভাবিত হয়েন এবং বিস্ময়-বিভ্রান্ত দর্শকগণকে মায়ামুগ্ধ করেন। এই অবস্থায় নিপুণ যাদুকর মায়া-রচিত যে সকল কৌতুক প্রদর্শন করেন, সমবেত জনগণ সে-সমস্ত সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে বাধ্য হয়।

যদি দেহং পৃথক্ কৃত্বা চিতি বিশ্রম্য তিষ্ঠসি।
অধুনৈব সুখীঃ শান্তো বন্ধ-মুক্তো ভবিষ্যসি॥

যোগ-বাশিষ্ঠ—১-৩

আপনাকে দেহেন্দ্রিয়ের অতীত সত্তা অনুভব করিয়া চিৎস্বরূপে অবস্থান করিবামাত্র সাধক সুখী, শান্ত ও মায়া-মুক্ত হইয়া থাকেন।

গীতায় উপদিষ্ট দেহ ও দেহী, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ বা প্রকৃতি পুরুষের পার্থক্যজ্ঞান আর্য্যসন্তানদিগের স্বভাবজাত সংস্কার।

আত্মার সহিত দেহের ভাশুর ভ্রাতৃবধূ সম্বন্ধ, এই সম্বন্ধের প্রত্যক্ষ অনুভূতিই বস্তুতঃ ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-বিবেক।

ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞয়োরেব মন্তরং জ্ঞানচক্ষুষা।
ভূত-প্রকৃতি-মোক্ষঞ্চ যে বিদুর্যান্তি তে পরং॥

গীতা—১৩-৩৫

বাজীকরেরা সাধারণতঃ ইতর শ্রেণীর লোক ও নিতান্ত নিম্নস্তরের হিন্দু, তাহাদের হৃদয়ে বেদান্ত প্রতিপাদ্য "জীব ব্রহ্মৈব নাপরঃ", শ্রুত্যুক্ত "সোঽহং" প্রভৃতি গভীর দার্শনিক তত্ত্ব কি প্রকারে সমুদিত হইল, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়।

যতন্তো যোগিনশ্চৈনং পশ্যন্ত্যাত্মন্যবস্থিতং।
যতন্তোপ্যকৃতাত্মানো নৈনংপশ্যন্ত্যচেতসঃ॥

গীতা ১৫-১১

যোগিগণ যত্নপূর্ব্বক শরীরস্থ আত্মাকে দর্শন করিয়া থাকেন, কলুষিত-চিত্ত মূঢ়েরা চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে দেখিতে পায় না।

জীবের সুখ দুঃখ ভোক্তৃত্বই সংসারিত্ব। মানব আপনার সুখ দুঃখের অতীত আনন্দময় সত্ত্বা উপলব্ধি করিতে পারিলে সংসারের অর্থাৎ বিশ্বমায়ার হস্ত হইতে চিরতরে পরিত্রাণ লাভ করে।

ক্ষরং প্রধানমমৃতাক্ষরং হরঃ।
ক্ষরাত্মানাবীশতে দেব একঃ॥
তস্যাভিধ্যানাৎ যোজনাৎ তত্ত্বভাবাৎ।
ভূয়শ্চান্তে বিশ্বমায়ানিবৃত্তিঃ॥

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ১-১০

ভোজবাজী হইতে আমরা এই এক পরম উপাদেয় শিক্ষা লাভ করি যে, দেহাদিতে মমত্ব-বুদ্ধি পরিহারপূর্ব্বক আমরা মুক্তিলাভ করিতে ও অমরত্বের অধিকারী হইতে পারি।

তমেব বিদিত্বা অতি মৃত্যু মেতি।
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়॥

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ৩—৮।

কাজের লোক

শ্রীনিকুঞ্জমোহন সামন্ত

পাখী গান গেয়ে বলে, "শুন মোর স্বর।"
কাজের মানুষ বলে, "নেই অবসর।"
ফুল বলে, "চেয়ে দেখ ফুটেছি কেমন।"
কাজের মানুষ বলে, "রাখ প্রলোভন।"
নদী বলে, "তীরে ব'সে শোন গান"
কাজের মানুষ বলে, "অবসর নাই।"
পূর্ণিমার চাঁদ বলে, "প্রদীপ নিভাও।"
কাজের মানুষ বলে, "কাজ আছে, যাও।"
প্রেম বলে, "এসো দোঁহে বসি পাশাপাশি।"
কাজের মানুষ বলে, "দূর সর্ব্বনাশী।"
মৃত্যু এলো অবশেষে দ্বার তার ঠেলে,
চলিল কাজের লোক কাজকর্ম্ম ফেলে।
"এ বিশ্ব জগতে এলি বৃথা!" কবি কয়,
"হায় হায়, বিনা কাজে কাটালি সময়" ॥

ভ্রাম্যমাণের উড়ো চিঠি

শ্রীদিলীপকুমার রায়

নন্দী পাহাড়,
মহীশূর
২৪-৭-২৮

ভাই সুভাষ,

হঠাৎ আমার কাছ থেকে বহুদিন বাদে একটা বড় চিঠি পেয়ে হয়ত তুমি আশ্চর্য্য হবে। কিন্তু যেহেতু আজ বড়-চিঠি-লিখ্‌ব বড়-চিঠি-লিখব গোছের মনটা করছে, সেহেতু আমি লিখবই, তা তোমার বড় চিঠি পড়ার সময় থাক্‌ বা না থাক্‌। বড় চিঠি লেখার এ দুর্দ্দমনীয় ইচ্ছে কেন যে আমার মনের মধ্যে ঠিক আজই দেখা দিল জানি না। হয়ত অনেকদিন ধ'রে একাদিক্রমে উড়ু-উড়ু বা ভ্রাম্যমাণ হ'লে মনটা চিঠির নিগড়ে ধরা দিতে একটু ব্যগ্র হ'য়েই ওঠে, কিন্তু সে কারণ নিয়ে গবেষণা এখন থাকুক। আমি ভেবেছিলাম যে অব্যবহারে ও অকেজো অভ্যাসটিতে আমার মরচে ধ'রে গেছে, তোমার যেমন গেছে। কিন্তু আজ এ শৈলশিখরে সুখাসীন হ'য়ে হঠাৎ আবিষ্কার করা গেল যে স্বভাব না যায় ম'লে। তুমি হয়ত জিজ্ঞাসা করবে যে বড় চিঠি লেখার স্বভাবটা তোমার তা হ'লে বেঁচে থাক্‌তে থাক্‌তেই বা গেল কি ক'রে? তার উত্তর—তোমাকে যে দেশোদ্ধার করতে হচ্ছে—আমার মতন উড়ো ভ্রমণের মধ্যে থেকে সময়কে কোনো মতে বধ করতে ত হচ্ছে না। কিন্তু তবু জেল থেকে তুমি বড় চিঠি লেখার অভ্যাসটা অন্যের অলক্ষিতে আবার একটু একটু মক্স ক'রে নিচ্ছিলে—এমন সময়ে কর্তৃপক্ষগণ ঠিক করলেন যে এ অকেজো কাজটিতে তোমাকে ব্যাপৃত না রেখে আবার দেশোদ্ধার-রূপ ঘরের খেয়ে-বনের-মোষ-তাড়ানো কাজে জুড়ে দেওয়াই ঠিক। তুমিও চিঠি পত্র লেখা ছেড়ে দিয়ে দেশোদ্ধারের দেশোদ্ধারে লেগে গেলে—শরৎবাবুর কথা ভুলে "সুভাষ, দেশোদ্ধার করতে যেয়ো না, কেন অনর্থক জেলে যাবে?"—বিশেষত যখন দেশ উদ্ধার হ'তে চায় না, ও দেশের মধ্যে বিভিন্ন দল কাজের চেয়ে কলহেতেই বেশি রস পায়। তুমি একা কি করবে বল?—তবু বোধ হয় সব চেয়ে বড় গরজ এই রকম অ্যাব্‌ষ্ট্রাকট্‌ কিছু একটারই গরজ! আমার সে গরজ নেই। তাই তুমি প্রাণপণে মীটিং ও বক্তৃতা ও নানা গঠনমূলক কাজে ব্যগ্র, আর আমি ভ্রমণ-সুখালস্যে স্তিমিতনয়ন হ'য়ে দীর্ঘ চিঠি লেখা-রূপ অকেজো কাজে রত। কেম্ব্রিজের আমাদের "ত্রয়ী"—বন্ধুর মধ্যে একা আমিই অকেজো র'য়ে গেলাম, তুমি ও ক্ষিতীশ দিলে কর্ম্মে গা ঢেলে।

কিন্তু এই সুখনিলয় হরিৎ-সমৃদ্ধ শৈলশিখরের পান্থাবাসে ব'সে মনের মধ্যে আজ নানা রকম ভাবাবেশ আলস্যের আলোড়নে মনের তলানি ভেদ ক'রে উঠে লেখনীর মুখে ধরা দিতে চাচ্ছে—স্নানার্থীর চরণাঘাতে পুষ্করিণীর তলদেশ-উত্থিত বুদ্‌বুদের মতনই। তাই মনে করলাম কলম ধ'রে একবার দেখাই যাক্‌ না—বিশেষত যখন বাইরে মেঘের মেদুরচ্ছায়ায় মনটার অবস্থাও ঘোরালো হ'য়ে এসেছে ও গাছের পাতার মধ্যে দিয়ে বাতাসের মর্ম্মরধ্বনি মনটাকে আরো সঙীন গোছের নেশার মধ্যে ফেলে দিয়েছে। তাই বিজ্ঞ মনটি বল্‌ছে যে এ সময়ে চিঠি লেখার মাধ্যাকর্ষণে উড্ডনোন্মুখ প্রাণটাকে একটু ধরাধামের দিকে দাবিয়ে ধরা'র চেষ্টার মধ্যে আনন্দ আছে; যেহেতু এ-প্রয়াসের মধ্যে আছে দুটো প্রবণতার টাগ্‌-অফ-ওয়ার—একটা মন্থর গতিতে গা এলিয়ে দিয়ে ভেসে চলা; আর একটা এ-ভেসে-চলার মধ্যে থেকে থেকে মাথা তুলে আশপাশের তীরের একটু খবর নেওয়ার বাসনা; এবং সব প্রয়াসের মধ্যেই একটা-না-একটা সার্থকতা আছে।

তুমি হয়ত বলবে—যদি তুমি না-ও বল জহরলাল নেহরু নিশ্চয়ই বলবেন—এরকম দিবাস্বপ্ন দেখলে চলবে না, জাগ,

জাগ সবে ভারত সন্তান, নইলে—ইত্যাদি। ভ্রামামাণ হওয়াটা একটা মস্ত বিলাস সন্দেহ নেই—কাজেই ওটা হচ্ছে সময়ের নিছক অপব্যয়, একেবারে "বুর্জোয়া" প্রবণতা। এ সম্বন্ধে ছচারটে কথা ক'দিন ধ'রে মনের মধ্যে ভারি গজ্

উটকামাণ্ডের রেস্-কোস

গজ্ ক'রে বেড়াচ্ছে। সেগুলো খুলে না বল্‌লে বোধ হয় তাদের অশরীরী প্রেতাত্মার স্বস্ত্যয়ন হবে না। তাই তোমার সময়ের ওপর একটু অত্যাচার করা যাক্।

তুমি জান যে সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলওয়েতে ভারি একটা গোলমাল চলেছে ও দু তিনটে ট্রেণ ধর্ম্মঘটীরা ধ্বংস করেছে। লিলুয়ার মতনই ষ্ট্রাইক্ করেছে এদের রেলের শ্রমিকগণ; এবং কতদিন যে ধর্ম্মঘট চলবে বলা যাচ্ছে না। ফলে উটাকামণ্ড থেকে ট্রেণে আসা হ'ল না—মোটরবাসে ক'রে মহীশূর হ'য়ে বাঙ্গালোর আসতে হোল। আসতে না আসতে দু তিনটে গাড়ী জখম—মেলশুদ্ধ। কতলোক যে মারা গেছে কেউ জানে না এখনো। মনটা তাই একটু উদ্বিগ্ন আছে।

দেশময় শ্রমিকদের চাঞ্চল্য। উটাকামণ্ডে একটি বাঙালা মহিলার সঙ্গে আলাপ হ'ল। তিনি একজন মান্দ্রাজী জমিদারকে বিবাহ করেছেন। তিনি বলছিলেন ধর্ম্মঘটকারাদের চেষ্টায় একবার একটি ট্রেণ উল্‌টে যায় ও হবি ত' হ' সেই ট্রেনেই তিনি ও তাঁর স্বামী ছিলেন। তারপর থেকে তিনি ষ্ট্রাইক-রূপ সিঁদুরে মেঘের ছায়াপাত হ'লেও ডরিয়ে ওঠেন।

বেলুড়ের দুর্ঘটনার কথাও কাগজে পড়লাম। তারপরই এখানে একটা নয়, দুটো নয়, তিন তিনটে দুর্ঘটনা। এতে ভ্রাম্যমাণেরও ভাবনা আসে।

আমি এখানে, অর্থাৎ বাঙ্গালোরে, আমার একটি ইংরাজ বন্ধুর অতিথি। তিনি সেদিন কথায় কথায় বলছিলেন যে শুধু এভাবে লোকজনের প্রাণহরণ ক'রে যে সমাজের কোনো স্থায়ী হিত সাধিত হবে একথায় আস্থা স্থাপন করা কঠিন; ইংলণ্ডে অনেকেই আজকাল তাই বলেন যে তাঁরা শ্রমিকগণের আদর্শ পছন্দ করেন, কিন্তু শ্রমিকদলকে করেন না।

সেদিন পড়ছিলাম একজন চিন্তাশীল লেখকের লেখা। তিনি বল্‌ছেন যে যেহেতু বর্ত্তমান সমাজে মানুষী শক্তির বিপুল অপচয় হচ্ছে সেহেতু সকলেই স্বীকার করছেন আজকাল যে সমাজব্যবস্থার একটা গভীর পরিবর্ত্তন সাধিত হওয়া আবশ্যক হ'য়ে পড়েছে। কিন্তু একটা কথা ঠিক্,

শ্রীদিলীপকুমার রায়

যে শুধু বেপরোয়া, নিরপেক্ষ ভাঙার মধ্যে দিয়েই একটা কিছু গ'ড়ে উঠ্‌বে না। সমাজে কোনো শুভ পরিবর্ত্তন সাধিত করতে হ'লে সব আগে চাই সজাগ পরীক্ষা, আন্তরিক চেষ্টা ও অল্পসংখ্যক বুদ্ধিমান্ লোকেরই প্রতিভার নেতৃত্ব। তিনি dictatorship of the proletariatএ বিশ্বাস করতে পারছেন না। বলছেন রুষদেশে সর্ব্বজ্ঞ প্রলেটারিয়েটদের কর্তৃত্ব শুধু বাজে ফোঁশ ফাঁশ—সেখানে সত্য যা কিছু হচ্ছে সে হচ্ছে চিরকালকার মতনই—ঐ জনকয়েক মাত্র বুদ্ধিমান গঠন-মনীষীর প্রচেষ্টায়। তিনি বলছেন, একটা কথা বুঝবার আজ সময় এসেছে ও সেটা এই যে একগুঁয়েমি ও চিন্তালেশহীন আবেগ দিয়ে বড় কিছু গ'ড়ে তোলা যায় না, ও অন্ধ প্রলেটারিয়েটরা শুধু গালি দেওয়া ও ধ্বংস করা ছাড়া আর কিছুই করতে পারে না। জগতে সৃষ্টি যা কিছু হয়েছে তা সবই অল্পসংখ্যক মানুষের বুদ্ধি ও প্রাণপাত পরিশ্রমে হয়েছে। অন্তত আজ অবধি ইতিহাস এই কথাই বলে।

কথাটার মধ্যে সবটুকু সত্য না হোক্ অনেকটা সত্য আছে মনে হয়।

ব্যক্তিগত দিক দিয়ে কয়েকটা কথা কাল সন্ধ্যাবেলা মনে হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল বুর্জোয়া ব'লে আজকাল যে-একটা কথা উঠেছে, সে কথাটা বড় বিপজ্জনক। কেননা কথা জিনিষটা যখন একটা লেবেল হ'য়ে দাঁড়ায় তখন তার মোহ বড় প্রবল হ'য়ে ওঠে ও সে মোহের ফলে মানুষ বড় বেশি সহজে সব-কিছুরই সম্বন্ধে একটা রায় দিতে ব্যগ্র হ'য়ে ওঠে, ভাবতে চায় না। কেন না ভাবা শক্ত, রায় দেওয়া সহজ

আজকালকার শ্রমিকতন্ত্রীরা তাই অত্যন্ত অম্লানবদনে যা-কিছু বুর্জোয়া তাকেই হেয় ব'লে উড়িয়ে দিতে চাচ্ছেন। রুষদেশে আজকাল প্রলেটারিয়েট কবিরা বলছেন শেক্সপীয়র, গেটে, দান্তে, রবীন্দ্রনাথ—সব হচ্ছেন তৃতীয় শ্রেণীর কবি—যেহেতু তাঁদের সৃষ্টির ওপর নাকি বুর্জোয়া ছাপটি অত্যন্ত স্পষ্ট। আজকাল সেখানকার কবিরা সত্যিই কাব্যে লিখছেন, "বুর্জোয়াদের মাথার খুলি ভাঙো, তাদের মস্তিষ্ককে গুলির তালে পরিণত কর, সবাইকে গুলি কর—" ইত্যাদি *। শুধু তাই নয় তাঁদের আইডিয়া এই যে এই রকম কাব্যই হচ্ছে আসলে বড় কাব্য; তবে আমরা যে আজও শেক্সপীয়র প্রভৃতিকে পছন্দ করি সে কেবল আমাদের দুরারোগ্য বুর্জোয়া মনোভাবের দরুণ। কাল এই নিয়ে নানা কথাই মনে তোলপাড় করছিল। মনে হচ্ছিল, হয়ত আমরা নিজেরা বুর্জোয়া ব'লেই নিজেদের সৃষ্টি-প্রতিভাকে একটু বেশি বড় ক'রে দেখে থাকি। হয়ত প্রলেটারিয়েট সৃষ্টির মধ্যেও এমন সত্যিকার বড় কিছু দেখা দিতে পারে যা নূতন ও জীবন্তের প্রেরণা-উদ্ভূত। এ সব সম্ভাবনায় সায় দিতে আপত্তি নেই,—কিন্তু তাই ব'লে শুধু বুর্জোয়া হওয়ার দরুণই শেক্সপীয়র প্রভৃতি যে অবজ্ঞেয় একথায় সায় দেওয়া কঠিন—শুধু এইটুকুই আমার বক্তব্য।

মনে প্রশ্ন জাগছিল বুর্জোয়া সভ্যতা কি মানুষের কাছে একটা মস্ত সত্যের আভাষ বহন ক'রে এনে দেয়নি—যেটা স্ফুট হ'য়ে না উঠ্‌লে শ্রমিকেরা কখনো জাগতে পারত না?

নিজেকে জিজ্ঞাসা করলাম—কি সে সত্য? উত্তর এল—সে সত্যটি হচ্ছে এই যে মানুষের গৌরব ও মনুষ্যত্ব শুধু বাঁচায় নয়—সৃষ্টিতে, ও সে সৃষ্টি বিকশিত হ'তে পারে কেবল অবসরের সুনিয়োগে। এখন, একথা যদি মেনে নেওয়া যায় তাহ'লে মান্‌তেই হবে যে এ অবসর অধিকাংশ মানুষকে না হোক অনেক মানুষকে দিয়েছে—এই বুর্জোয়া সভ্যতা। সুতরাং আজ যে সকলেই এই অবসর পেতে চাচ্ছে ও পেয়ে সত্য মনুষ্যত্বে গরীয়ান হ'বার আকাঙ্ক্ষা বোধ করেছে সেটার মূল কারণ বলা যেতে পারে—বুর্জোয়াদের এই অবজ্ঞাত সৃষ্টিরই দৃষ্টান্ত। মেটারলিঙ্ক কোথায় বলেছেন যে আমাদের—অর্থাৎ বুর্জোয়াদের—একটা মস্ত দায়িত্ব হচ্ছে এই যে আমাদেরই সত্য সভ্যতা ও বৈদগ্ধ্যের পতাকাবাহী হ'তে হবে, কাজেই যদি আমরা সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে টলষ্টয়ের মতন শ্রমিকদের দারিদ্র্যকেই বরণ করি তা'হলে মানুষ কখনো উঠ্‌বে না।

* Rene Fulop Miller প্রণীত The mind and Face of Bolshevism ব'লে বইখানিতে এসব কবিদের কাব্যের নমুনা দ্রষ্টব্য। বইখানি য়ুরোপে Eucken, Wells, Thomas Mann, Russel, Rolland প্রভৃতি সকলের দ্বারাই প্রসংশিত হ'য়েছে।

কথাটার মধ্যে সার আছে মনে হয়। শ্রমিকরাও মানুষ এ সত্যও যেমন আমাদের স্বীকার করবার সময় এসেছে তেম্নি এ সত্যসম্বন্ধেও তাদের সচেতন হবার সময় এসেছে যে বুর্জোয়ারা সমাজের "বিষধর সাপ" (viper) মাত্র নয়। তাদের বোঝবার সময় এসেছে যে বুর্জোয়ারা দৃষ্টান্ত স্বরূপ হয়েছিল ব'লেই তারা আজ অবসর ও স্বাচ্ছন্দ্যের দাবী করতে পারছে, এবং বুর্জোয়াদের উত্তব না হ'লে এত বেশি সংখ্যক লোক কখনোই এত সেদিন লিখেছেন যে আমেরিকায় (যেখানে শ্রমিকরা সব চেয়ে ভাল থাকে, সেখানে) তারা অবসরের নিয়োগ করে শুধু নেচে ও বাজে সিনেমা দেখে। কিন্তু তাই ব'লে কি সত্যিই বল্‌তে হবে, "ওদের অবসর দিয়ে কি হবে—যখন অবসরের সদ্ব্যবহার তারা জানে না?" হাক্সলি মহোদয়ের মনে এ প্রশ্নটি জেগেছে ব'লেই এ কথার উল্লেখ করলাম। মানুষের মধ্যে সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বকালেই যে ভক্তির চাইতে কীর্ত্তন বেশি হ'য়ে এসেছে তার আর
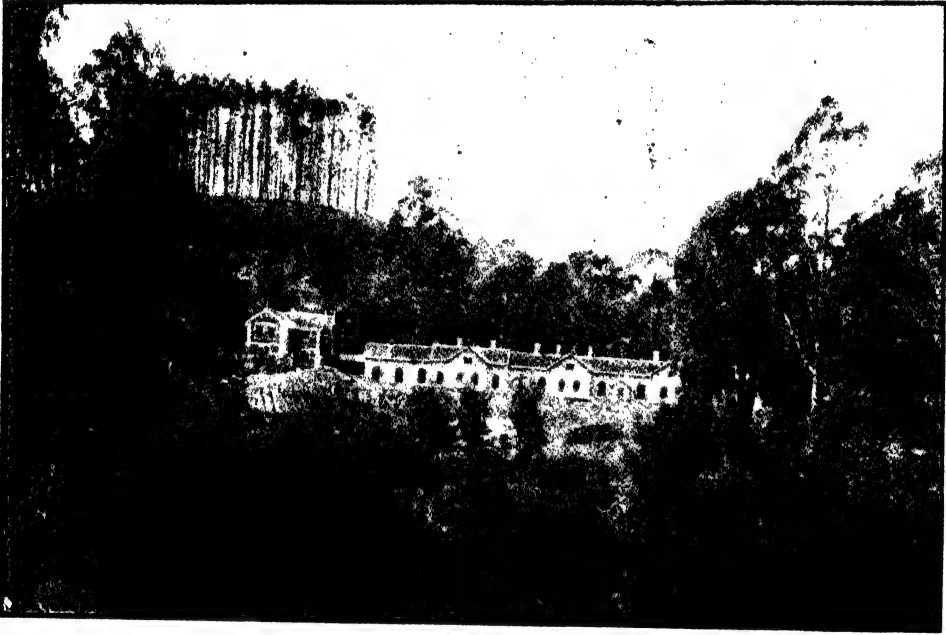
উটমাকাণ্ডের দৃশ্য

শীঘ্র এ সত্যটি শিখ্‌ত না যে man does not live by bread alone.

মানি যে বুর্জোয়াদের মধ্যেও অধিকাংশই তাদের দায়িত্বের প্রতি সচেতন হয় নি। কিন্তু তার মধ্যে দায়ী শুধু কি তাদের বুর্জোয়াত্ব? তাহ'লে ত' বলতে হয় যে য়ুরোপে আজকাল শ্রমিকদের মধ্যে যে ঈর্ষা দ্বেষ, কুটিলতা ও নীচতা দেখা দিচ্ছে তার জন্যে দায়ী তাদের "শ্রমিকত্ব"? আসল কথা মানুষের মধ্যে অধিকাংশই সুখপ্রিয়, অলস ও দায়িত্বজ্ঞানহীন। কি করা যাবে? আলডুস হাক্সলি কি করা যাবে! সে দোষ ভক্তিরও নয় কীর্ত্তনেরও নয়—সে দোষ মানুষের মধ্যে অধিকাংশের অসারতার।

কাল মানুষের অসারতার এ নিদান মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মনে হচ্ছিল অনেক কথা। মনে হচ্ছিল যে আমাদের দেশের শ্রমিকরা য়ুরোপের দেখাদেখি যতই কেননা বাহবাস্ফোট করুক, সুযোগ পেলেই যে তাদের মধ্যে ঝাঁকে ঝাঁকে সুভাষচন্দ্র, জহরলাল, শরৎচন্দ্র জন্মাবে এ আশা দুরাশা। বুর্জোয়াদের মধ্যেও যেমন মাত্র অল্প সংখ্যক মানুষ আজ তাদের সত্য দায়িত্বের প্রতি সচেতন,

শ্রীদিলীপকুমার রায়

শ্রমিকদের মধ্যেও ভবিষ্যতে ঠিক্ তাই হবে। কাজেই কেবল এইটুকুর বেশি জোর ক'রে বলা চলে না যে তাদের মধ্যে সুযোগ পেলে যারা সত্যিকার মানুষ হ'তে পারত, শুধু তাদের খাতিরেই সকলকে মানুষ হবার সুযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু এ সুযোগ দেবার সময় যদি আমরা এ আশা পোষণ করি যে তা পেলেই তারা জীবনের নিগূঢ় উপলব্ধির জন্যে দলে দলে ব্যগ্র হ'য়ে উঠবে তা হ'লে সে আশা প্রকৃতির পরিহাসে দুদিনে ধুলোয় লুটোবেই লুটোবে। অন্তত "অদূর ভবিষ্যতে" অধিকাংশ মানুষ যে সত্যিকার সভ্যতা সম্বন্ধে সজাগ হ'য়ে উঠবে না এটা ঠিক—"সুদূর ভবিষ্যতে" যাই হোক না কেন।

তোমায় এত বড় চিঠি লিখব ভাবিনি। ভেবেছিলাম আমার ভ্রমণ সম্বন্ধে এ চিঠিতে দুচারটে কথা জানাব। কিন্তু মানুষ ভাবে এক হয় আর।

কেন এত কথা লিখলাম জানো? আমার ব্যাখ্যাটা শোন তা হ'লে। কদিন থেকে নানা রকম প্রাকৃতিক দৃশ্যশোভার মধ্যে ছাড়া পেয়ে মনটা বেশ বিকশিত হয়ে উঠেছে ও মনে হচ্ছে যে আমাদের সমাজ অনেকেই আমার মতন একটু আধটু ভ্রাম্যমাণ হওয়ায় সুযোগ দিলে কাজটা নেহাৎ মন্দ করত না। অথচ এ ভাববিলাসিতার জন্যে ক্ষোভও জাগে এবং মানুষ শুধু ক্ষোভ নিয়ে ঘর করতে পারে না, খানিকটা আটপৌরে আত্মসম্মানও তার পক্ষে একান্ত আবশ্যক। তাই নিজের raison d'etre অপিচ আত্মসমর্থন খুঁজতে বাধ্য হ'লাম। মানুষ এম্‌নি ক'রেই সাফাই গায় ও নানা রকম জীবনের ফিলসফি গ'ড়ে তোলে বোধহয়।

কিন্তু এ ফিলসফির মধ্যে আত্মপ্রবঞ্চনার উপাদান খানিকটা থাকলেও খানিকটা সত্যও যে আছে একথা আশা করি তুমি অস্বীকার করবে না। সেদিন একজন বড় লেখকের লেখায় একজায়গায় পড়ছিলাম:—Success, power, wealth—those aims of profiteers and premiers, pedagogues and pandemoniaes, of all, in fact who could not see God in a dew-drop, hear him in distant goat-bells, and scent him in a pepper tree—had always appeared to me as akin to dry-rot. (গল্‌স্‌ওয়ার্দ্দি)

কাল সন্ধ্যায় ধূসর সূর্য্যাস্তের রঞ্জিত মেঘালোকে মনে হচ্ছিল যে প্রতি সভ্যতায় এ রকম সূক্ষ্ম উপলব্ধি যদি এক আধজনের মধ্যেও ফুটে ওঠে তবে তাতে ক'রে তার অনেক অসারতারও মস্ত ক্ষতিপূরণ মেলে। মানবহৃদয়ের নানান্ সুকুমার অনুভূতি, নানান্ ললিতরাগের রক্তরাগ, নানান্ আধছায়া আধআলো আবেগের সমষ্টি, নানান্ ধরা-ছোঁয়া-যায়-না-এমন আশানিরাশার ইন্দ্রজাল, জীবনের রূঢ় অভিঘাতে নানান্ স্বপ্নভঙ্গ—এসবের মধ্যেই কোথায় একটা গুপ্ত সার্থকতার রেশ নিহিত। যে-মুহূর্ত্তে মানুষ এমন একটা অনুভূতির পরশ পায় যে "নাভিনন্দেত মরণং নাভিনন্দেত জীবিতম্। কালমেব প্রতীক্ষেত নির্দ্দেশম্ ভৃত্যকো যথা।" (মরণকেও অভিনন্দন করবে না, জীবনকেও না; শুধু অপেক্ষা ক'রে থাকবে ডাকের জন্যে —যেমন ভৃত্য থাকে) সে-মুহূর্ত্তে সে তার আশে-পাশের মানুষকে একটা অপরূপ সুষমাদীপ্ত ভাবরাজ্যের সন্ধান বহন ক'রে এনে দেয় ও মানুষ তার জীবত্ব ছেড়ে খানিক পরিমাণে দেবত্বের কোঠায় ওঠে। শরৎচন্দ্রকে আজ যে সমগ্র বাংলাদেশ অভিনন্দন দিচ্ছে তার ভিতরকার কথাটাও ত এই যে আমরা বল্‌তে চাচ্ছি—"হে শিল্পী, তুমি যে আমাদের জীবনের শত গ্লানির ম্লানিমার মালিন্যের মাঝেও সুন্দরের অনুভূতি, সমবেদনার তৃপ্তি, সূক্ষ্ম কারুকার্য্যের সান্ত্বনা বহন ক'রে এনে দিয়েছ আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করছি যে তার ফলে আমাদের অনুভবজগত সমৃদ্ধতর হয়েছে।" নয় কি? কাজেই (এখন নিজের সাফাইয়ে ফিরে আসি) আমি যদি সঙ্গীত ও ভাববিলাসিতার চর্চ্চায় একটু গুল্ফদেশে চাড়া দিয়ে আমার আলস্যের সমর্থন একটু খুঁজতেই যাই তাতে তোমরা একটু করুণার হাসি হাসো ত হেসো কিন্তু দোহাই, মুখ ফিরিও না, বা আমি যে এ যাত্রা মান্দ্রাজ, তাঞ্জোর, ত্রিচিনপল্লী, মাদুরা, পণ্ডপম্, সেতুবন্ধ, উটাকামণ্ড বাঙ্গালোর, নন্দীপাহাড়, মহীশূর, হায়দ্রাবাদ, মসলিপট্টম

প্রভৃতি স্থলে চরকীর মতন ভ্রাম্যমাণ হ'য়ে বেড়াচ্ছি তার জন্যে আক্ষেপ কোর না। অপিচ—তোমরা দেশোদ্ধারে নিরত আছ ভেবে সময়ে সময়ে আমারও যে বিবেক দংশন হয় একথা অবিশ্বাস কোর না।

কিন্তু এবার বাজে বকা রেখে একটু ভ্রমণবৃত্তান্ত নিয়ে উঠে প'ড়ে লাগি।

প্রাকৃতিক দৃশ্যের দিক দিয়ে সব চেয়ে ভাল লাগল উটাকামণ্ড। এমন সবুজের আগুন সেখানে এখন লেগেই আছে যে আমার কেবল মনে হ'ত তোমায় জোর ক'রে ধ'রে নিয়ে আসতে পারলে কাজটা হ'ত চমৎকার। কিন্তু বিলেতে তোমাকে তোমার দেশোদ্ধার-স্বপ্ন-মগ্নমনটাকে যদি বা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যোপভোগের নিন্দনীয় আলস্যপরায়ণতার দিকে সময়ে সময়ে ফেরাতে পারতাম—এখানে তা হ'য়ে উঠেছে—স্রেফ অসম্ভব, যদিও আমি চেষ্টার ত্রুটি করিনি। ক্ষিতীশ সেদিন ঠিকই বলছিল যে তোমার পক্ষে কোনো কিছু উপভোগ করা মুস্কিল—তোমার কেবল মনস্তাপ হ'তে থাকবে এ-সময়টা যে পরিমাণে মীটিং করা যেত দেশোদ্ধারের দিনটা সেই পরিমাণেই এগিয়ে আসত তবু বিলেতে তোমাকে ডার্বিশায়ার, লঙ্কাশায়ার প্রভৃতি স্থানে টেনে নিয়ে যাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু এখানে ?—হায়, তুমি হেসে বলতে চাও "তে হি নো দিবসা গতাঃ।

কিন্তু আমার "তে দিবসাঃ" এখনো "গতাঃ" নয়, বিধাতাকে ধন্যবাদ। "গতাঃ" হ'তে হয়ত সে চাইত। কিন্তু বিবেক-প্রভুটিকে একটু আধটু আমল দেওয়া চললেও বেশি আমল দেওয়াটা যে কিছু নয় এ বিশ্বাস আমার আজকের নয় তুমি জানো।—এমন কি দেশোদ্ধারের খাতিরেও নয়—তা তুমি যতই রাগ কর না কেন একথা শুনে। তাই শোনো একটু উটাকামণ্ডের ও নন্দীশৈলের কথা। প্রবন্ধ লিখলে ত পড়বে না—কিন্তু চিঠিটা অন্তত পড়তেই হবে—সুযোগ পাওয়া গেছে মন্দ নয়।

তুমি যদি কখনো দেশোদ্ধার কাজের মধ্যে একটু ফুরসৎ পাও ত যেয়ো উটাকামাণ্ডে একবার।

সেখানে আমার সবুজের শোভা দেখে প্রায়ই মনে হ'ত শেলির সেই লাইনটি :—"The emerald green of leaf-enchanted beams।"

কী স্ফটিকের মতন ঝকঝকে সবুজ! বোধ হয় বর্ষার সময় ব'লেই এত সবুজ হয়েছে! এমন সবুজের মেলা দেখতে পাওয়াটা একটা সৌভাগ্য সত্যি! নিছক্ সবুজ রঙের বাহার যে আমাদের মনকে কতটা উতলা করতে পারে তার পরিচয় পেতে হ'লে একবার উটাকামাণ্ডে যাওয়া ভাল। সাধ কি "কিরণমালা পত্রমুগ্ধা" হ'ল ?

তার ওপর কী দীর্ঘাকৃতি গাছের শোভা! কী সুপারি, দেবদারু পাইন প্রভৃতির ঘন নিকুঞ্জের মনোহারিত্ব! আর কী সে ঋজুতার তৃপ্তি।

বস্তুত উটির বৈশিষ্ট্যই বোধ হয় এইখানে। এত অপর্য্যাপ্ত ঋজু ও লম্বা গাছ বোধ হয় আর কোথাও দেখিনি। আর সে সব গাছের মধ্যে কত শাখাই যে "স্তবকাবনম্রা" সে কি বলব! বিলেতের weeping willow গাছ মনে পড়ে? এখানে সে রকম সবুজ অশ্রুভারে-লম্বিত গাছ অজস্র।

কেবল এ সময়ে উটির আকাশ খুব সদয় নন্—এই যা দুঃখ। সারাদিনই মেঘে ঢাকা; কালিদাসের "বপ্রক্রীড়া-পরিণত গজের" বাহার সমতলভূমিতে লাগে ভাল—কিন্তু শৈলশিখর এই নন্দীপাহাড়ের মতন মেঘমুক্ত হ'লেই বেশি মনোমদ হয়। হয়ত তুমি বলবে তা হ'লে শাপেনাস্তংগমিত মহিমা যক্ষের কাছে রামগিরির মেঘমালা কেমন ক'রে এত প্রিয় হ'য়ে উঠেছিল? উত্তর—তার যে, সে "কামরূপ মঘবানের" কাছে নিজের "যাচ্ঞা" জ্ঞাপন করবার স্বার্থ ছিল! তবু আমার মনে উটাকামণ্ডে নিরন্তর সংশয় জাগ্‌ত যে বিষম শীকরসম্পৃক্ত শৈত্যের মাঝখানে সে-যক্ষের মনে দয়িতার কথাই বেশি জাগত না দেহের ক্লিষ্টভাবের দিকেই বেশি দৃষ্টি পড়ত! সে যাই হোক্—যেহেতু আমি যক্ষ নই সেহেতু আমি যে উটাকামাণ্ডের মেঘের বিরতিহীন আলিঙ্গনের মধ্যে খুব আনন্দ পেতাম না এটা ধ্রুব।

কিন্তু তবু সেখানকার নিসর্গশোভার প্রতি অমনোযোগী হওয়া ছিল—অসম্ভব।

শ্রীদিলীপকুমার রায়

বিশেষ ক'রে ভাল লেগেছিল সেখানকার বটানিকাল গার্ডেনটি। আধঢাকা ঘোমটায় বাগানটি মাঝে মাঝে এমন একটা অপরূপ শোভায় দীপ্ত হ'য়ে উঠত যে সে "মেঘালোকে" একটু "অন্যথাবৃত্তিচেতঃ" না হ'য়েই আমার উপায় ছিল না। এমন সুন্দর বাগান আমি আর কখনো দেখেছি ব'লে মনে হয় না। রাস্কিনের কথা কেবল মনে হ'ত যে সমতলভূমির মোহ নিতান্তই স্বচ্ছ— প্রকৃতি রহস্যের ঘোমটা পরেন কেবল তখন—যখন মাটি উচ্চনীচতার ঢেউ-খেলানোর মধ্যে দিয়ে নিজেকে এলিয়ে দিতে চায়।

উটকামাণ্ডের দৃশ্য

আর প্রশংসা করতে হ'ত ওদের রাস্তাঘাট রাখার ক্ষমতাকে। তুমি চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার হ'লেও সম্ভবত সেখানকার রাস্তাঘাটের সৌন্দর্য্য আর বেশি বাড়াতে পারতে না। কী সাধনক্ষমতা ও কর্ম্মনিষ্ঠতা ওদের! এমন একটা সহর শুধু করা নয়—রেখেছে কি সুন্দর ক'রে! সাত সমুদ্র তের নদী পার হ'য়ে এসে মাকড়সার জালের মতন ওরা রেলপথ বিস্তার করার শক্তি ধরে—শৈল দেখলেই ওরা শুধু চ'ড়ে ক্ষান্ত হয় না—দুদিনে সেখানে সুরম্য হর্ম্ম্যপূর্ণ সহর গ'ড়ে তোলে—রাস্তাঘাট ত রাস্তা নয়—যেন ক্ষীর-সরোবর পেতে রাখে—ও সর্ব্বোপরি আমাদের দিয়ে খাটিয়ে নিয়েই ওরা রাজার হালে শোভমান থাকবার গুহ্য তত্ত্বটি সম্বন্ধে স্বয়ং বিশ্বকর্ম্মার কাছ থেকে তালিম নিতে জানে।

যাক্, এবার উটকামাণ্ড ছেড়ে মহীশূর-ভ্রমণের কথা ব'লে প্রবন্ধটি শেষ করি; কি বল? নইলে উদ্ব্যস্ত হ'য়ে উঠ্‌বে যে!

কদিন থেকে বাঙ্গালোরে আমি অতিথি হ'য়ে আছি আমার একটি ইংরেজ বন্ধুর। আরও দুটি য়ুরোপীয় মহিলা তাঁর অতিথি।

এদের সঙ্গে মিলেমিশে থাকতে যতই ভাল লাগছিল ততই মনে হচ্ছিল যে আমরা ক্রমশ য়ুরোপীয় মনের কি রকম কাছে গিয়ে পড়ছি! শুধু তাই নয়—আমার মনে হচ্ছিল যে রাষ্ট্রীয় ও নাগরিক গুণের অনেকগুলিই আমরা এদের কাছ থেকে নিত্য নিয়ত কি দ্রুত রেটে শিখ্‌ছি ও শেখ্‌বার সঙ্গে সঙ্গে দেশবাসীদের মন থেকে কী দ্রুতবেগে দূরে স'রে যাচ্ছি! কথাটা পরিষ্কার ক'রে বলি।

আমার মনে হচ্ছিল যে আমাদের দেশবাসীদের মধ্যে যারা তাঁদের আচারগত ভারতীয় বৈশিষ্ট্যটি বজায় রেখেছেন তাঁরা ক্রমেই আমাদের মনের রাজ্যে কি রকম অজ্ঞাতসারে অনাত্মীয় হ'য়ে পড়ছেন ও সঙ্গে সঙ্গে আমরা অজ্ঞাতে চরিত্রগত অনেকগুলি নতুন গুণ কি রকম স্থায়ীভাবে ওদের কাছ থেকে গ্রহণ ক'রে হজম করছি! দৃষ্টান্ত চাও? তোমার নিজেরই নেও না কেন। তোমার নিষ্ঠা, তোমার কর্ম্মশীলতা, তোমার ত্যাগ, তোমার নিয়মানুগত্য—ভেবে দেখ দেখি এসব কী পরিমাণে য়ুরোপের দ্বারা প্রভাবিত! এসবের মধ্যে ভারতীয়ত্ব কতটুকু? অবশ্য আমার এই যে হয়ত পুরাকালে আমাদের মধ্যেও এ ধারণাটা ছিল—(তার কোনো পুঙ্খানুপুঙ্খ ইতিহাস ত নেই)—কিন্তু সম্প্রতি আমরা যে আমাদের গার্হস্থ্য জীবনে ক্রমেই বেশি আত্মকেন্দ্র হ'য়ে পড়ছিলাম এটা অস্বীকার করা যায় না। Civic life যাকে বলে সে জীবনের যে-সব দাবী-দাওয়া আছে সে-সব দাবী-দাওয়ার মর্য্যাদা রাখাটা যে আচারের দাবী-দাওয়ার মর্য্যাদা রাখার চেয়ে বেশি দরকার এ সত্যটির প্রতি আমরা উদাসীন হ'য়ে পড়ছিলাম। য়ুরোপের একটা বড় উপলব্ধি মানুষকে জানা ও মানুষের নিকটে আসা। আমরা ক্রমশই হ'য়ে পড়েছিলাম গৃহবদ্ধ,

উটকামাণ্ড থেকে মহীশূর 'বাসে' ক'রে আস্‌তে পথের দৃশ্য

ভারতে ত্যাগ ছিলনা একথা বল্‌তে চাই মনে কোরো না যেন। কারণ কে না জানে যে ব্রাহ্মণদের মধ্যে জ্ঞানচর্চ্চার জন্যে বিলাসবর্জ্জনের আইডিয়া ছিল, ক্ষত্রিয়দের মধ্যে প্রজানুরঞ্জনের জন্যে নিজের বিশ্বাসত্যাগের আইডিয়া ছিল—ইত্যাদি। কিন্তু রাষ্ট্রীয় জীবনের জন্যে যে প্রতি নাগরিকের দৈনন্দিন জীবনের অনেকখানি স্বার্থ ছাড়তে হবে এ সত্যটি আমরা য়ুরোপের কাছেই নতুন ক'রে শিখেছি এই আমার বল্‌বার কথা। নতুন ক'রে শিখেছি কথাটা বলার সদর্থ আচারবদ্ধ, ছুৎমার্গপন্থী। দক্ষিণ ভারতের সত্যকার ভারতীয় ব্রাহ্মণদের সঙ্গে সংস্পর্শে এলে এটা আরও উজ্জ্বল ভাবে উপলব্ধি করা যায়। কী বিরাট টিকি এদের! কী দগ্‌দগে তিলক! আর—সর্ব্বোপরি কী অবজ্ঞা নিম্নবর্ণের লোকদের প্রতি!—যেন ব্রাহ্মণেতর সব জাতিই বিধাতার অভিশপ্ত সন্তান! একথা এখানে আমার একটি য়ুরোপীয় বান্ধবী কাল ব'লে আক্ষেপ করছিলেন। তাই ভেবে দেখ দেখি, তুমি-আমি যে আজ য়ুরোপীয়দের সঙ্গে এত সহজে

শ্রীদিলীপকুমার রায়

...তে পারি তার কারণ কি এই নয় যে আমরা আর ...টি ভারতীয় নেই ? বস্তুত তুমি-আমি যে-পরিমাণে দেশের ...গে বেদনা বোধ করি ঠিক সেই পরিমাণেই আমরা য়ুরোপীয় ...বাপন্ন নয় কি ? তাই এক কথায় বলা চলে যে দেশাত্মবোধ জিনিষটা য়ুরোপীয়—ভারতীয় নয়, অন্তত গত কয়েক শতাব্দীর মধ্যে যে এটা দেশের লোকের মন থেকে অদৃশ্য হ'য়ে গিয়েছিল এটা খুবই বেশি সম্ভব মনে হয়।

এটা কথার কথা নয়। আমার সত্যিই মনে হয় তুমি-আমি আজ খাঁটি ভারতীয়ের মনের কাছে অনাত্মীয়। আমার একটি উদারহৃদয় ভারতীয় বন্ধু তাঁর দেশে নিমন্ত্রণ পান না—তিনি নিষিদ্ধ মাংস ভক্ষণ করেছিলেন ব'লে। এটা আমাদের কাছে আজ যে অসঙ্গত মনে হয় তাইতেই প্রমাণ হয় যে আমরা সে খাঁটি ভারতীয় নেই ; যদি ভারতীয় হ'তাম তাহ'লে বলতাম বেশ হয়েছে—নিষিদ্ধ মাংসভক্ষণ ! উঃ, কী মহাপাপী ! ওর সঙ্গে একত্রে বসতে আছে

গত কয়দিন আমার য়ুরোপীয় বন্ধু বান্ধবী ক'জনের সঙ্গে একত্রে হাসি গল্প, খেলাধূলো প্রভৃতি করার সঙ্গে সঙ্গে একথা আমার বড় বেশি ক'রেই মনে হচ্ছিল। আর সঙ্গে সঙ্গে মনে প্রশ্ন উঠ্‌ছিল—মান্দ্রাজে কয়টি সত্যকার ভারতীয়ের ঘরে আমি এত সহজে প্রবেশাধিকার পেতে পারতাম বা পেলেও এত সহজ হৃদ্যতার সঙ্গে মিশতে পারতাম ? একথাটা এখানকার একটা ছোট্ট অভিজ্ঞতা দিয়ে আর একটু ...ফুট ক'রে তুল্‌ব।

য়ুরোপ আমাদের যে কতটা অ-ভারতীয় ক'রে তুল্‌ছে ও তার প্রভাব যে ধীরে ধীরে কী ব্যাপক হ'য়ে উঠ্‌ছে সেটার যেন নতুন ক'রে পরিচয় পেলাম সেদিন এখানে একটি দক্ষিণী তরুণীর সঙ্গে একটু আলাপ করতে করতে। মেয়েটির বয়স হবে বছর বাইশ তেইশ ; তার মাতৃভাষা ...থিত ভাষামাত্র—কোঙ্কনী—তার কাল্‌চার বিশেষ ক'রে ...রাঠী ও সে এম্‌ এ পাশ করেছে হায়দ্রাবাদ থেকে। ...জেই দেখা যাচ্ছে তার বিশেষ ক'রে ভারতীয় হবারই ...া ছিল। কিন্তু সে হ'য়ে পড়েছে ঠিক্ উলটো একটি ...ব, অর্থাৎ একটি পূর্ণবিকশিত য়ুরোপীয় মেয়ে ; বেশভূষায় ... কিন্তু মনে। বুদ্ধিদীপ্ত মুখ ; আমার সঙ্গে এক ঘণ্টার মধ্যে ভাব ক'রে নিল ঠিক য়ুরোপীয় মেয়েরই মতন। চাল চলন গতি ভঙ্গী,হাসি গল্প সবের মধ্যেই য়ুরোপীয় ছাপ। এমন কি পুরুষ যে তাকে দেখলেই একটু আকৃষ্ট বোধ করে সে সত্যটির প্রতিও সে যেমন সহজেই সচেতন,এজন্যে তেমনি কুণ্ঠালেশহীন। তার ব্যক্তিত্বের মধ্যে যেটা সব চেয়ে প্রত্যক্ষ সেটা হচ্ছে তার অকুতোভয় ভাব। সে আদর্শ হিন্দুরমণীর মতন লজ্জাবনতা, সঙ্কোচবিজড়িতা কথায় কথায় বেপথুমানা ও আলো-হাওয়া-বিরাগিনী নয়। শুধু তাই নয়—তার জীবনের ফিলসফি সম্বন্ধেও সে সচরাচর এমন অসঙ্কোচে কথা বলে যে, ভালও যেমন লাগে আশ্চর্য্যও তেম্‌নি বোধ হয়।

কিন্তু মনে কর কি যে, এরকম মেয়ে এখানকার গড়পড়তা ব্রাহ্মণের হাতে পড়লে সুখী হবে ? অথচ যদি সে য়ুরোপীয় সভ্যতা ও আইডিয়ার সংস্পর্শে না আস্‌ত তা হ'লে যে সে অতি অবলীলাক্রমেই যে-কোন অর্দ্ধমুণ্ডিত, কচ্ছাহীন তিলকধারীকে বিবাহ করত এটা ত অবধারিত ? কি বদ্‌লেই আমরা যাচ্ছি ভিতরে ভিতরে—যদিও বাইরে একথা স্বীকার করতে কুণ্ঠা বোধ করি !

না—সত্যি ভারতের ভারতীয় বৈশিষ্ট্য যদি কিছু স্থায়ী হয় তবে সেটা হয়ত হ'তে পারে দর্শনের রাজ্যে ; কিম্বা ললিতকলার রাজ্যেও হয়ত হ'তে পারে। কিন্তু দৈনন্দিন জীবনে, আলো হাওয়ার এলাকায়, নৈতিক আচরণে ও নাগরিক কর্ত্তব্যজগতে আমরা আর ভারতীয় থাক্‌ছি না—এবং মোটের ওপর আমাদের মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে এটা অতি শুভ চিহ্ন। মানুষ একবার এগিয়ে এলে ফিরে যেতে আর পারে না—যতই কেননা তার কানে কানে বলা হোক্ যে মুক্তি আছে কেবল পশ্চাদ্গমনে।

অথচ তবু মনোরাজ্যে, ভাবজগতেও জীবনটাকে দেখার ভঙ্গীতে কোথায় যেন আমরা একটা মস্ত সম্পদের উত্তরাধিকারী—একথাও আমার মনে হয়। হয়ত তুমি বলবে আমার এ দুটি উক্তি পরস্পরবিরোধী ; ও সেই সঙ্গে হয়ত একথাও বল্‌বে যে "নৈতিক আচরণ, ব্যবহারিক জীবন প্রভৃতিতেও আমাদের ভারতীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রাখা দরকার —নইলে এ-সব বিষয়ে য়ুরোপীয় প্রভাব শেষটায় আমাদের জীবনের ফিলসফির ওপরেও ছাপ ফেল্‌বে।"

ওটা অসম্ভবও নয়। কিন্তু তবু মনে হয় যে আমাদের জীবনে য়ুরোপীয় প্রভাব ক্রমশ বড়ই হ'য়ে উঠ্‌বে; ছোট আর হবে না। সে প্রভাবকে আমরা আত্মসাৎ ক'রে একটা নতুন ধরণের ভারতীয় অবদান জগতকে দিতে পারব কিনা জানি না। হয়ত পারলেও পারতে পারি। তবে এ-বিষয়ে আমার নিজের কাছে নিজের ধারণা বড় অস্পষ্ট, তাই এখানেই আজ স্তম্ভিত হ'য়ে গেলাম।

না—স্তম্ভিত হ'লে চলবে না। মহীশূর থেকে উটাকামণ্ডের পার্ব্বত্য রাস্তা সম্বন্ধে কিছু লিখতেই হবে যে।—কিন্তু না—বেশি লেখা বৃথা। এটা দেখাই ভাল। তাই যদি কখনো উটাকামণ্ড অঞ্চলে যাও ত সেখান থেকে মহীশূর অবধি যে মোটর বাস যায় তাতে একবার চ'ড়ো—ভুলো না। এমন চমৎকার পার্ব্বত্য রাস্তা ও দৃশ্যবৈচিত্র্যে এরকম পথ এক নরওয়ে ছাড়া কোথাও দেখেছি ব'লে ত মনে হয় না। জায়গায় জায়গায় প্রকৃতি ঠিক্ যেন য়ুরোপের মতন, জায়গায় জায়গায় উষ্ণপ্রদেশসম্ভব, আবার জায়গায় জায়গায় স্রোতস্বিনী, ঝরণা প্রভৃতিতে সমৃদ্ধ। এক কথায় সমস্ত পথটি অত্যন্ত উপভোগ্য। মেঘ ও রৌদ্র, ঘন গাছ ও বৃহৎ বিরলতা, ঢেউয়ের পর ঢেউ পাহাড় আবার সমতল ভূমির শোভা—যা চাও সবই পাবে। সত্যি এ পথটুকু অপূর্ব্ব—নিছক্ বৈচিত্র্যের দিক দিয়ে।

তরশু দিন বাঙ্গালোরে এসেছি উটাকামাণ্ড থেকে। পরশু দিন বাঙ্গালোরে ছুটি মেয়ের গান শুনলাম। এদের নাম তঙ্গমা ও নঞ্জমা। বড়টি বেশ বীণা বাজায়। ছোটটি বেশ গায়। বাঙালী মেয়েদের মতন গলা এদের নেই—কিন্তু নৈপুণ্যে এরা কারুর চেয়ে হীন নয়। কেবল এদের দক্ষিণী সঙ্গীতের মধ্যে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের প্রাণের পরশটি মেলে না। সেই কোঙ্কনী মেয়েটি সেদিন তার সহজ সাবলীল ভঙ্গীতে জোরের সঙ্গেই বল্‌ল আমাকে, "মান্দ্রাজীরা দক্ষিণী গায়কদের মধ্যে কে প্রথম শ্রেণীর, কে দ্বিতীয় শ্রেণীর, কে তৃতীয় শ্রেণীর এ নিয়ে নানা রকম আলোচনা করে—কিন্তু আমার কাছে মনে হয় দক্ষিণী গায়ক বা বাদক সবই তৃতীয় শ্রেণীর।" আমি হেসে জিজ্ঞাসা করলাম হায়দ্রাবাদে তিনি খুব ভাল হিন্দুস্থানী গান শুনে একথা বলছেন কিনা। মেয়েটি নির্ভয়ে উত্তর দিল—"হায়দ্রাবাদে রাস্তায় ঘাটে গাড়োয়ানে যে-গান গায় এদের শ্রেষ্ঠ গায়কের গানও তার কাছে দাঁড়াতে পারে না।"

কিন্তু গান বাজনা সম্বন্ধে বেশী আলোচনা করব না—তুমি মহা বিব্রত হ'য়ে পড়বে বোধহয়। তোমার উপর আবার বেশি উপদ্রব করাও কিছু নয়।

পরশু বাঙ্গালোর থেকে বাসে চ'ড়ে আসা গেল এই নন্দী পাহাড়ের পাদমূলে—মাইল পঁয়ত্রিশ। তারপর সেখান থেকে এখানে—অর্থাৎ নন্দীপাহাড়ের শিখরস্থিত পান্থাবাসে—হেঁটে এলাম আমরা চার জন। আমি, আমার এক মান্দ্রাজী সঙ্গীতানুরাগী বন্ধু, আমার এক চিত্রকরী বান্ধবী—সুইস—ও একটি আমেরিকার মহিলা—দার্শনিক।

বাঙ্গালোরের উচ্চতা হাজার তিনেক ফিট; এ পাহাড়ের উচ্চতা হাজার দুই। কাজেই বুঝছ নন্দী পাহাড়ের উচ্চতা কাসিয়াঙের চেয়ে কম নয়।

ফল—শৈত্য—কিন্তু মনোরম শৈত্য—দুঃসহ শৈত্য নয়। শুধু তাই নয়, এখানে সূর্য্যদেব নির্দ্দয় নন্। বরুণদেবও সদয় নন্। কাজেই কাল সমস্ত দিন রূপালি তপন-কিরণে খুব হৃষ্ট হওয়া গিয়েছিল ও রাত্রে অর্দ্ধ চন্দ্রের আলোকে চারিদিকের শোভা উপভোগ করা হয়েছিল।

অতি চমৎকার স্থান এ। অবশ্য হেঁটে দু হাজার ফিট উঠতে আমাকে একটু কষ্ট পেতে হ'লেও, ওঠবার পর শ্রম সার্থক হয়েছিল পুরোপুরি। বিশেষত যখন এখানে টিপুসুলতান প্রায়ই আসতেন। ঐতিহাসিক নরপুঙ্গবদের পীঠস্থানে আস্‌তে রোমাঞ্চ হবে না এমন টুরিষ্ট কে আছে?

য়ুরোপীয় বান্ধবীদ্বয়ও মহাসুখী। এঁরা সত্যই নিসর্গ শোভা ভালবাসেন, নইলে অত কষ্ট ক'রে উঠ্‌তে পারতেন না এ পাহাড়ে। তবে এঁদের শরীরও ভাল—আমাদের আধুনিক-শিক্ষিতা বাঙালী মেয়ের মতন ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যান না। জীবনী শক্তিতে এরা এমন ভরপূর যে এখানে এসে দুজনে মিলে নেচেই অস্থির। আমাকে বলে নাচতে হবে। অনেক কষ্টে এঁদের বুঝিয়ে নিরস্ত করা

শ্রীদিলীপকুমার রায়

যে ভারতীয় শিল্পীর আদর্শ—গতি নয় স্থিতি—যেহেতু তে শিল্পী হচ্ছে দার্শনিকেরই ভায়রা ভাই। ভাগ্যে তীয় দার্শনিকের ওপর এঁদের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা! নইলে মাকেও এ-বয়সে ঘূর্ণ্যমান হ'তে হ'ত হয়ত! য়ুরোপের বে বড় জোর ভ্রাম্যমাণ হওয়া গেছে—কিন্তু তাই ব'লে মান হ'তে বল্‌লে চল্‌বে কেন? শরৎবাবুর সেই গল্প মনে ড়ে; "আরে, মদ খেতে প্রেজুডিস থাক্‌বে না ব'লে কি ল হ'তেও প্রেজুডিস থাক্‌বে না?"

দেখা যায়। আর দেখা যায় অজস্র ডোবা। বেশ লাগে। অনেকটা চেরাপুঞ্জী থেকে সিলেটের দৃশ্যের মতন। আমার মান্দ্রাজী বন্ধু এখানে পল রিশারের সঙ্গে এসে অনেক দিন ছিলেন। কাল বলছিলেন যে এক দিন চন্দ্রালোকে অজস্র ডোবায় চাঁদের প্রতিবিম্ব দেখে পল রিশার বলেছিলেন; "প্রতি ডোবাই চন্দ্রদেবের প্রতিবিম্ব বুকে ধ'রে মনে করে শশী বুঝি তারই জন্যে কিরণ দিচ্ছেন। মানুষ ঠিক্ তেম্‌নি তার নিজের ধর্ম্ম সম্বন্ধে মনে করে যে ভগবান কেবল তার

উটকামাণ্ডের দৃশ্য

কালরাত্রি এই পান্থাবাসেই কাট্‌ল। কী চন্দ্রালোক! দৃশ্য! আর কী মধুর বাতাস! তার ওপর প্রচণ্ড কালাপও হ'ল ও শেষটায় গানের চর্চ্চাও হোল। রা সকলেই সঙ্গীতপ্রিয়; কাজেই কালকে কাট্‌ল ভাল।

নন্দী পাহাড়টা উঠেছে একেবারে খাড়া। কাজেই ওপর ক চারদিকেই সমতলভূমি ক্ষেত্র, হর্ম্ম্য, তরুরাজি প্রভৃতি

ধর্ম্মেই প্রকাশ।"

ফ্রান্সে গত বছর পল রিশার এ রকম সুন্দর সুন্দর কথা প্রায়ই আমাকে বলতেন তাই এ উপমাটি তোমায় না ব'লে থাকতে পারলাম না। একদিনের জন্যে এখানে আসা গিয়েছিল, কিন্তু এসে এত ভাল লাগ্‌ছে যে আজও থেকে যাওয়া গেল। কাল বাঙ্গালোরে ফিরব।

আলো

শ্রীমৈত্রেয়ী দেবী

ওরে আলো, তোরে যদি ভালবেসে থাকি,
চির রাত্রি চির দিন যদি তোর গীতে
ভ'রে থাকে মোর চিত্ত অপূর্ব্ব অমৃতে,
প্রভাতে সুদূর হ'তে এসে তোর বাণী
নূতন পাতার সাথে করে কানাকানি,
রাতের শিশির-মাখা নব শষ্পদল
তোমার চরণ লেগে হইত বিহ্বল—
দেখে তাই পূর্ণ হ'ত, দৈন্য মোর
না রহিত বাকি ;
ওরে আলো, তোরে যদি ভালবেসে থাকি !

শারদ প্রভাতে সেই শুভ্র খণ্ড মেঘে
তোমার চমক যবে উঠিত গো জেগে,
সদ্যস্ফুট করবীর মঞ্জরীর তলে
তোমার চমক যেত নেচে পলে পলে,
সুপ্তি তার কেড়ে নিয়ে তারে প্রাণ দিত
মোর প্রাণে তার সাড়া জাগায়ে তুলিত,
তন্দ্রা যেত ঘুচে জীবনের হ'ত ভোর
সে আলোয় ঢাকি' ;
ওরে আলো, তোরে যদি ভালবেসে থাকি

তবে যবে দিবাশেষে রাতের ছায়ায়
আমারে লুকাবে এসে বিপুল মায়ায়,
দূরে ঝঞ্ঝা দেখা যাবে, পুষ্প যাবে ঝ'রে,
বায়ু কেঁদে কেঁদে যাবে নব পত্র পরে,
গভীর আঁধার এসে আপনা হারায়ে
আমারে কাড়িতে চাবে দু'হাত বাড়ায়ে,
বিদ্যুত বিষম লাজে লুকায়ে হাসিবে
মেঘ যাবে ডাকি' ;
ওরে আলো, তোরে যদি ভালবেসে থাকি !

তবে আজ ব'লে যা রে হেন কোন বাণী,
দিয়ে যা রে কোন দান তারে লব মানি' ।
সে-বাণীর গুঞ্জরণে দানের মহিমা
মুগ্ধ প্রাণে ছড়াইবে নাহি রবে সীমা,
দেহ মনে একটি সে লীলা হবে সুরু
তোর কাছে দীক্ষা মাগি, তোরে বলি গুরু,
সে তোর একটি কথা তার ধ্বনি স্মরি'
কেটে যাবে ঝঞ্ঝাময়ী মত্ত বিভাবরী,
সে-আঁধারে তোর বাণী টেনে নেবে মোয়ে
তোর কাছে ডাকি' ;
ওরে আলো, তোরে যদি গুরু ব'লে থাকি ।

বিনায়ক

-গল্প—

-শ্রীসমীরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়

গ্রীষ্মকাল। বেলা প্রায় দুইটা। ক'দিন হইতে অসহ্য গরম পড়িয়াছে। মাথার উপর বন্ বন্ করিয়া বৈদ্যুতিক পাখা ঘুরিতেছে। ঘাড় গুঁজিয়া কাজ করিয়া যাইতেছি। ফাইলের পর ফাইল আসিতেছে, চিঠির পর চিঠি সহি হইতেছে। এমন সময় টেবিলস্থিত টেলিফোনটা রিম ঝিম্ করিয়া বাজিয়া উঠিল—রিসিভারটা তুলিয়া লইলে নিম্নলিখিত কথোপকথন চলিল—

"হ্যালো।"

"আপনি মিঃ জ্যোতির্ম্ময় দাস?"

"হ্যাঁ, আপনি কে?"

"আমাকে চিন্‌তে পারবেন কিনা জানি না; অনেক দিনের কথা কি না।"

"তবু, কে বলুন না, দেখি যদি চিনতে পারি।"

"কি ক'রেই বা পারবেন, আপনি এখন মস্ত লোক, আমার সঙ্গে যখন আলাপ তখন ত কে কি হবে তা কল্পনার বস্তুই ছিল। যা হ'ক্, চুঁচুড়া ফ্রি চার্চ্চ স্কুলের কথা মনে পড়ে?"

"পড়ে।"

"সেখানে বিনায়ক বোস ব'লে কারুকে চিন্‌তেন? মনে আছে?"

"বি-না-য়-ক বোস?"

"হাঁ, তার সঙ্গে পড়তেন, এক পাড়ায় থাকতেন, এমন দিন যেত না যে তার সঙ্গে না দেখা করতেন।"

"ও হ্যাঁ তুমিই বিনায়ক? বাঃ, ১৭।১৮ বছর পরে কোথা থেকে কথা বলছ? কি করছ এখন?"

"করব আর কি, এক ইলেক্‌ট্রীক কোম্পানীতে সামান্য বেতনের কেরানীগিরি করি—সেদিন ফ্রিচার্চ্চের অতুল মাষ্টারের কাছে শুনলুম তুমি বিলেত থেকে খুব বড় চাকরি নিয়ে কলকাতায় এসেছ। আমার কিন্তু তোমার সঙ্গে দেখা করতে ভয় করে।"

"ভয় কি? এক দিন বাড়ীতে দেখা করো।"

"বড় ভয় করে। তুমি মস্ত সাহেব। আচ্ছা জোতি, গঙ্গার ধারে আমাদের সেই শপথ মনে পড়ে?"

"কি শপথ?"

"মনে পড়ছে না?"

"ও, হ্যাঁ পড়েছে বটে।"

"কিন্তু দেখ, তুমি সে কথা ভুলেছ, আমি কিন্তু ভুলিনি। আর ভুলবই বা কি ক'রে। সূর্য্য কত লোকের দিকে চেয়ে দেখে, কিন্তু সূর্য্যমুখী এক সূর্য্যের দিকেই চেয়ে থাকে।"

"ও তুমি ত দেখছি মস্ত কবি হ'য়ে পড়েছো, যা হ'ক এক দিন নিশ্চয় এসো। আচ্ছা! গুড্‌বাই।"

"গুড্‌বাই।"

টেলিফোনটা রাখিয়া দিলাম।

বহুদিনের কথা, শৈশব ছাড়াইয়া কৈশোরের প্রথম ধাপে সবে পা দিয়াছি। চুঁচুড়ার ইংরাজী স্কুলে ভর্ত্তি হইলাম। তখন বোধহয় সাত আট বৎসর বয়স। আজ ২৮শের কোঠায় পা দিয়া ঠিক মনে করিতে পারি না তাহার সহিত প্রথম আলাপ কি করিয়া হইল। তবে সেদিনের কথাটা বেশ মনে পড়ে—অতুল মাষ্টার একটা কঠিন রকম অঙ্ক বোর্ডে লিখিয়া দিয়া বাহিরে গেলেন। অতুলবাবু বড়ই প্রহার-প্রিয় ছিলেন এবং অঙ্ক-শাস্ত্রটার প্রতি আমার শ্রদ্ধা বড়ই কম ছিল। কাজেই কোমল পিঠের উপর কত ঘা বেত পড়িবে ইহারই একটা পরিকল্পনা প্রায় সজল-নয়নে করিতে বসিয়াছিলাম এমন সময় কোথা হইতে বিনায়ক আসিয়া আমার পাশে ঘেঁসিয়া বসিয়া অঙ্কটা জলের মত বুঝাইয়া দিয়া কসাইয়া দিল। অতুল বাবুর ক্লাসে বাঁচিয়া গেলাম। কিন্তু ইতিহাসটাও ভাল মুখস্থ ছিল না। ইতিহাসের

ঘণ্টা আসিলে বিনায়ক বলিল, "পেছনের গ্যালারীতে চল।" তার পর সেখানে পাশ হইতে এমন বেমালুম prompt করিয়া দিল যে, মাষ্টার মশায় পড়ার রীতিমত তারিফ্ করিলেন। শুধু তাই নয় ইহার পর কত বিষয়েই যে ঐটুকু ছেলেটি আমায় সাহায্য করিত তা ভাবিয়া শেষ করিয়া উঠিতে পারি না। আমার এতটুকু সাহায্য করিতে পারিলে সে যেন ধন্য হইত। আমার বেশ মনে আছে হেডমাষ্টার মহাশয়ের ক্লাশে তাড়াতাড়ি প্রবেশ করিবার সময় আমার ধাক্কা লাগিয়া হেডমাষ্টার মহাশয়ের টেবিলের উপর দোয়াত উল্টাইয়া হাজিরা-খাতার উপর কালি পড়িয়া যায়। দুর্দ্দান্ত হেডমাষ্টার বেত উঁচাইয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে কালি ফেলেছে?"– কেহ কথা বলিবার আগেই বিনায়ক দাঁড়াইয়া কহিল "সার, আমি।" অমনি পটাপট্ করিয়া পাঁচ ঘা বেত তাহার হাতের উপর পড়িল। সে অম্লান বদনে সহ্য করিয়া নিজের জায়গায় বসিল। সেদিন স্কুল ছুটী হইলে আমি কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিয়াছিলাম, "কেন তুই অমন মিছে নিজের ঘাড়ে দোষ নিয়ে আমার হ'য়ে মার খেলি?" সেদিন সে আবেগে আমার অশ্রুসজল চোখ দুটি মুছাইয়া দিয়া কি গভীর দরদের সহিত উত্তর দিয়াছিল, "জ্যোতি, আমরা গরীব, আমাদের কত মার ধর খাওয়া অভ্যাস আছে; তোরা বড়লোক, সুখী, ওই গুণ্ডার মার খেলে হয়ত ম'রে যাবি, ছি ভাই, কাঁদিস নে।" ইহার পর জীবনবিধাতার হাতে কতবারই না বেত খাইয়াছি, কতই না কাঁদিয়াছি—কিন্তু সেই যে স্ফুটনোন্মুখ কৈশোরের প্রাক্কালে এক বন্ধুর সাক্ষাৎ পাইয়াছিলাম সেই এক আমার হইয়া বুক পাতিয়া মার খাইয়াছিল আর ত কাহাকেও পাই নাই।

সে ছিল গরীব। বাস্তবিকই বড় গরীব। কিন্তু কি অসাধারণ মেধাবী, ও বুদ্ধিমান। তাহার যে কত অভাব কত দিক দিয়া ফুটিয়া উঠিত তাহা প্রাণে প্রাণে বুঝিতাম কিন্তু কোন দিন তা সাহস করিয়া দূর করিতে চেষ্টা করি নাই। সেই অতটুকু বয়সেও বেশ বুঝিয়াছিলাম যে যদি একবার সাহায্য করিবার বা সহানুভূতি দেখাইবার এতটুকু চেষ্টা করি তাহা হইলে এই আত্মসম্ভ্রমপূর্ণ বালকটি হয়ত এক নিমেষে তাহার সমস্ত বন্ধুত্ব একেবারে ধুইয়া মুছিয়া ফেলিবে। সে ছিল আমার অতি প্রিয়, অতি আবশ্যকের বন্ধু, আমার সে কৈশোরের স্বপ্নময় দিনে সে যেন আমার চারিদিকে এক অদ্ভুত মায়াজাল সৃষ্টি করিয়া আমাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল।

তাহার সহিত চার বৎসর একত্র পড়িবার পর বাবা চুঁচুড়া হইতে বদলি হইলেন, আমার স্কুল ছাড়িতে হইল। সে দিনের কথাটা আজও ভুলিব না। সে দিন সমস্ত বিকালটা দুজনে কি কান্নাটাই না কাঁদিয়াছি। অতি ক্ষুদ্র বালক তখন আমরা, জগতটা কি চিনিতাম? তবে নিজেদের যে জগতটা নিজেরা গড়িয়া তুলিয়াছিলাম সে জগৎটায় ছিল জ্যোতি আর বিনায়ক, বিনায়ক আর জ্যোতির সে প্রেমের মূল্য কি আজও বুঝি নাই। জীবনে তাহার কোনও সার্থকতা আছে কিনা সে প্রশ্নেরও সমাধান করিতে পারি নাই, তবে এইটুকু বলিতে পারি যে, সেই কৈশোরে বন্ধুবিচ্ছেদটা যত প্রগাঢ় ভাবে হৃদয় দিয়া অনুভব করিয়াছিলাম তাহা বুঝি আর কখনও করি নাই। তখন বুঝি নাই যে পরস্পরকে ছাড়িতে হইবে, তাহা হইলে হয়ত অত নিবিড় ভাবে পরস্পরকে ভাল বাসিতাম না।

অনেকক্ষণ কান্নার পর বিনায়ক জিজ্ঞাসা করিয়াছিল— "আচ্ছা জ্যোতি, তুই কি আমায় চিরকাল মনে রাখবি?"

—"নিশ্চয়; তুই কি অন্য রকম ভাবতে পারিস বিনায়ক?"

তখন বিনায়ক আমায় হাত ধরিয়া গঙ্গার ভিতর এক হাঁটু জলে টানিয়া লইয়া গিয়া বলিল—"এইখানে দাঁড়ায়ে আয় আজ দুজনে শপথ করি—জীবনে কেউ কাউকে ভুলব না। এবং যদি একজন বড়লোক হয় ত, আর একজন বিপদে পড়লে—সে তাকে প্রাণ দিয়েও সাহায্য করবে।" তারপর ১৪।১৫ বৎসর তাহার কোন খবর পাই নাই। প্রথম দু'এক মাস পত্র চলিয়াছিল তাহার পর ধীরে ধীরে সব স্মৃতি মুছিয়া গেল। তাহার পর কত বন্ধু পাইলাম, কত হারাইলাম। আবার পাইলাম। কিন্তু জীবনযাত্রার আরম্ভসময়ে বিনায়ক বলিয়া এক সুহৃদের নিকট যে কত বড় শপথ করিয়াছিলাম তাহা ত ভুলিয়াই ছিলাম—এমন

বিনায়ক

শ্রীসমীরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়

কি বিনায়ক বলিয়া যে কাহাকেও চিনিতাম তাহাও এই টেলিফোনে কথা বলিবার আগে হয়ত সহস্রবার চেষ্টা করিয়া মনে আনিতে হইত। সে শপথের হয়ত কোন মূল্য নাই, হয়ত সে বালকোচিত খেয়াল—কিন্তু মনে হয়, মাথার উপর অনন্ত নীলাকাশ, অসংখ্য তারা, পরিপূর্ণ চন্দ্র, পদতলে তরঙ্গচঞ্চলা লীলাময়ী ভাগীরথী, আর আশেপাশে স্বচ্ছ জলরাশি যেন সে শপথের চিরন্তন সাক্ষীস্বরূপ আজও বর্ত্তমান রহিয়াছে।

সে দিনও দুইটার সময় টেলিফোন বাজিয়া উঠিল।

"হ্যালো।"

"আপনি কি জ্যোতির্ম্ময় বোস্?"

"হ্যাঁ, কে, বিনায়ক?"

"হ্যাঁ, গঙ্গাতীরে সেই শপথের কথাটা মনে আছে ত জ্যোতি?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ আছে, আচ্ছা—এ কি পাগলামি হচ্ছে বলতো, টেলিফোন ক'রে। একদিন এসে দেখা কর না কেন?"

"বড় ভয় করে ভাই, বড় ভয় করে। আচ্ছা যাব এক দিন, যাব। আজ চল্লুম।"

"আচ্ছা।"

আশ্চর্য্য লোকটি ত।

তাহার পর দিন কি বার ছিল জানি না। কিন্তু আফিসে প্রচণ্ড কাজ পড়িয়াছিল। ঠিক দুইটার সময় আবার টেলিফোনটা বাজিয়া উঠিল—এবার বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলাম। টেলিফোনটা তুলিয়া লইয়া কহিলাম—"কে, বিনায়ক?"

"হাঁ।"

"গঙ্গাগর্ভে শপথের কথাটা বেশ মনে আছে আমার। তোমায় রোজ মনে করাতে হবে না বুঝলে।" চোঙ টা রাখিয়া দিলাম। একটু রাগিয়াছিলাম। এ শপথ বার বার স্মরণ করানোর উদ্দেশ্য কি!

এই ঘটনার প্রায় আট দিনের পরের কথা বলিতেছি। বেলা প্রায় বারটা। পুরাদমে আফিস চলিতেছে এমন সময় চাপরাশি আসিয়া খবর দিল, যে একজন পুলিসের দারোগা ও দুজন কনেষ্টবল একটি চোরকে ধরিয়া লইয়া আসিয়াছে—আমার সাক্ষাৎ চায়। আফিসের মধ্যে একি কাণ্ড; তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিলাম। দেখিলাম হলের ভিতর একজন সার্জ্জেন ও দুইটি পুলিশ একটি যুবকের হাতে হাতকড়ি লাগাইয়া, কোমরে দড়ি বাঁধিয়া, দড়িটা ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। যুবকটি ছিপ্‌ছিপে লম্বা ধরণের, অতিশয় কৃশ। চোখে মুখে অত্যাচারের একটা নিষ্ঠুর ছাপ লাগিয়া আছে। চুলগুলা উস্ক খুস্ক, চোখের জ্যোতি অস্বাভাবিক রকমের উজ্জ্বল। আমাকে দেখিয়াই সস্মিত মুখে কহিল—"জ্যোতি, আমি বিনায়ক।"

তাহার কথার উত্তর না দিয়া ইংরাজিতে দারোগাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনারা কি চান্?"

দারোগা যাহা বলিল তাহা সংক্ষেপে এই—এই ব্যক্তি বিনায়ক বোস, পটলী নাম্নী কোন কুচরিত্রা স্ত্রীলোকের গহনা চুরির অপরাধে ধৃত হইয়াছে এবং জামিন হইবার জন্য আমার নাম বলিতেছে, পুলিস জানিতে চায় আমি উহাকে চিনি কি না এবং উহার জামিন হইতে ইচ্ছুক কি না। বিষম ক্রুদ্ধ হইলাম। আশেপাশে অধীনস্থ কর্ম্মচারীদের কৌতূহলী দৃষ্টি, চাপরাশিদের ব্যস্ততা সমস্ত ব্যাপারটাকে যেন রঙ্গমঞ্চের অভিনয়ের আকার দিয়া দিল। জ্যাক্‌সন্ কোম্পানীর কলিকাতা আফিসের ম্যানেজার মিঃ জে দাসকে জামিন হইতে বলিতেছে একটা চোর, যে বেশ্যার গহনা চুরি করিয়াছে! মাথার উপর যেন অগ্নিবৃষ্টি হইয়া গেল। ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে একবার লোকটার দিকে চাহিলাম। সে সঙ্কুচিত ভাবে মাটির দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহার পর দারোগাকে কহিলাম—"আপনি কি মনে করেন যে এই লম্পট চোরটার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব বা আলাপ থাকা সম্ভব? আমি অনুরোধ করি এরূপ ভাবে আমার সময় নষ্ট করার আগে আমায় টেলিফোন ক'রে জানাবেন।" দ্রুতবেগে ঘরের ভিতর প্রস্থান করিলাম। শুধু যেন মুহূর্ত্তের জন্য একটা ক্ষীণ আওয়াজ কানে আসিল—"জ্যোতি!"

আজও ভাবিতে পারি না কেন তাহাকে অত নিষ্ঠুর ভাবে কুকুরের মত তাড়াইয়া দিয়াছিলাম। তাহার যে মূর্ত্তি

দেখিলাম তাহা যেন দেখিবার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। মনে হইল এ যেন কোন নরকঙ্কাল বিনায়কের নাম লইয়া বিশ্বপৃষ্ঠে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে! ওর যত শীঘ্র হয় চলিয়া যাওয়া উচিত। বহুদিন চলিয়া গিয়াছে তবুও বেশ মনে করিতে পারি বিনায়ক বড় হইলে কেমন দেখিতে হইত। তাহার মত সুন্দর ভ্রূ, উন্নত নাসিকা, আয়ত চক্ষু আজও ত চক্ষে পড়িল না; তবে ও কাহাকে দেখিলাম, লম্পট, স্বেচ্ছাচারী কঙ্কালসার! এই কি বিনায়ক! ভাবিতেও কষ্ট হয়।

তবু মনে হইল ইহাকেই একদিন প্রাণ দিয়া রক্ষা করিবার কথা হইয়াছিল। সময়ের ঘূর্ণাবর্ত্তে ঘুরিতে ঘুরিতে এত দিন কে কোথায় ছিল জানি না, যখন প্রবল স্রোতের টানে পরস্পরে এক স্থানে আসিয়া মিলিল, তখন একজন শস্যশ্যামল চন্দ্রকরোজ্জ্বল দ্বীপাবলির মধ্যে আশ্রয় গড়িয়া তুলিয়াছে আর একজন সেই দ্বীপের এক কোণে এতটুকু আশ্রয় পাইবার জন্য বাত্যাক্ষুব্ধ সাগর হইতে চীৎকার করিতেছে।

উহাকে আশ্রয় দিতে হইবে, রক্ষা করিতে হইবে। নহিলে যে জ্ঞানের প্রথম উন্মেষ-দিনের এক মহা-সত্য হইতে ভ্রষ্ট হইতে হয়। তবুও কি করিব ঠিক করিতে পারিলাম না। জামিন হইতে প্রবৃত্তি হইল না, বন্ধু বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জা হইল। এ যে কত বড় মিথ্যার মোহে কত বড় নির্ম্মম সত্যকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলাম আজ তাহাই বসিয়া বসিয়া ভাবি। যেদিন খরস্রোতা গঙ্গার জলে দাঁড়াইয়া দুইটি বালক পরস্পরকে বন্ধুত্বের অটুট বন্ধনে বাঁধিতে প্রয়াস পাইয়াছিল সেদিন কি তাহারা একবারও ভাবিয়াছিল—যে প্রায় ষোল বৎসর পরে, বিধাতার নিকট সেই সত্য-পালনের কঠোর পরীক্ষা দিতে হইবে। সেদিন তাহা হইলে হয়ত তাহারা অত বড় প্রতিজ্ঞা করিত না। আর করিলেই বা কি, তখনও কেহ ভাবে নাই সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভের সঙ্গে সঙ্গে যা কিছু অ-প্রিয়, অ-সমকক্ষ তাহাদের ঘৃণা করিবার মত মনের গতি হইয়া যায়। মিথ্যার জন্য সত্যকে গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলে।

আমার ছোট-বোনের শ্বশুর সত্যব্রতবাবু পুলিস কোর্টের বেশ বড় উকিল। তাঁহাকে গিয়া বলিলাম, ঐ লোকটিকে বাঁচাইতে হইবে। পরে শুনিয়াছিলাম সত্যব্রতবাবু বিনায়কের জন্য অনেক বাক্‌যুদ্ধ করিয়াছিলেন কিন্তু বিশেষ ফল হয় নাই, শুধু অনেক চেষ্টার পর তাহার শাস্তির পরিমাণ কমিয়া গিয়া ছয়মাস সশ্রম কারাবাসের আদেশ হইল। সেই দিনের পর হইতে তাহার সহিত আর সাক্ষাৎ করি নাই, কেমন যেন একটা অপরিসীম লজ্জায় মনটা সঙ্কুচিত হইয়া উঠিয়াছিল।

ইহার পর আটমাস পরের কথা বলিতেছি। অফিস হইতে ফিরিয়া সন্ধ্যার সময় বালিগঞ্জে আমার বাসার পশ্চিম দিকের বারান্দায় আরাম-কেদারার উপর পড়িয়া আছি। সন্ধ্যার ম্লান আবছায়া অন্ধকারে সমুখের সমস্ত মাঠটি ভরিয়া গেছে। এমন সময় একটি লোক ধীরে ধীরে সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। সন্ধ্যার অন্ধকারে তাহার মুখ ভাল রকম দেখা যাইতেছিল না, ভাবিলাম বোধ হয় আফিসের কর্ম্মচারী, তাই জিজ্ঞাসা করিলাম—"কে আপনি, কি চান্?"

লোকটি সংক্ষেপে উত্তর করিল—"জ্যোতি, আমি বিনায়ক।"

আবার সেই কথা। তাড়াতাড়ি উঠিয়া আলো জ্বালিলাম। তীব্র বিদ্যুতালোকে দেখিলাম সেই মূর্ত্তি, আরও কৃশ, চোখ দুটি আরও অস্বাভাবিক রকমের উজ্জ্বল, মাথা মুণ্ডিত। হঠাৎ দেখিলে মনে হয় একটি চর্ম্মাবৃত কঙ্কাল। ইচ্ছা করিলে আজও তাড়াইয়া দিতে পারিতাম। কিন্তু পারিলাম না, কেমন যেন একটা ব্যথায় মনটা টন্ টন্ করিয়া উঠিল। বলিলাম—"বিনায়ক, বোস।" বিনায়ক বসিলে বলিলাম—"বিনায়ক, আমার সেদিনের ব্যাপারের জন্য তুমি আমায় ক্ষমা কর।"

বিনায়ক সে কথার উত্তর দিল না। কহিল—"চুরি আমি কোনদিন করিনি জ্যোতি, আর বোধহয় করতুমও না; কিন্তু কত বড় দুঃখে যে ও কাজ করেছি সেই কথাটাই তোমায় ব'লে যেতে চাই। এ ভালই হয়েছে জীবনযাত্রার

বিনায়ক

শ্রীসমীরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়

অরেন্তসময়ে তোমায় প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছিলুম আজ যাবার দিনে তেমনি একবুক ঘৃণা নিয়ে চ'লে যাচ্ছি, কিন্তু যাবার আগে সব কথা তোমায় পরিষ্কার ক'রে ব'লে যেতে চাই।"

বিনায়কের তিরস্কারটা মাথা পাতিয়া লইলাম সাহেবি-আনার সমস্ত মোহ, বিলাত-ফেরতের সমস্ত গর্ব্ব ছাপাইয়া মনটা ঠিক আট বছরের বালকের মনের মত দুর্ব্বল, অসহায় হইয়া পড়িয়াছিল। আজ জোর করিয়াও রাগিতে পারিলাম না। মনে হইল এই কৃশ, মরণাপন্ন, মাতালটিই একদিন আমার জীবনে কি পূজনীয়ই না ছিল, সেদিন ওর প্রতিভা, ক্লাসে সমস্ত বিষয়ে ওর প্রথম হওয়া দেখিয়া কি অবাক বিস্ময়েই না ওর চরণে নীরব শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়াছি। তাই তাহার হাতদুটি চাপিয়া ধরিয়া বলিলাম—"রাগ করিস না বিনায়ক, কি বল্‌বি সমস্ত খুলে বল্।"

কি বলব সেইটেই ত ভেবে পাই না জোতি, কোন খান থেকে বলব। গত জীবনটার দিকে চোখ ফেরালেই দেখ্‌তে পাই সেখানে সংঘাতের পর সংঘাত। কিন্তু আমার সর্ব্বনাশ কে করলে জান? ঐ পটলী। কি কুক্ষণেই না ওর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল! মাইনে যা পেতুম সমস্ত ওর পায়ে ঢেলে দিতুম। ঘরে বউ, ছয় বছরের মেয়ে তাদের দিকে ফিরেও দেখতুম না। মেয়েটা কিসে মর্‌ল, জান? এত রকম রোগও জগতে আছে!" বলিয়া বিনায়ক হাসিল; সে হাসির কি অর্থ বুঝিলাম না।

"—ডাক্তারে বললে, মেয়েটা ছয় বছর ধ'রে আধ-পেটা, সিকি-পেটা খেয়ে, মেরুদণ্ড বেঁকে ম'রে গেল।"

শিহরিয়া উঠিলাম। মনে হইল যেন চোখের সম্মুখে বিশ্বের দারিদ্র্য এক ছয় বৎসরের মেরুদণ্ডহীন শিশুর আকৃতি লইয়া কোঁকাইয়া কাঁদিয়া উঠিতেছে।

"এততেও আমার সুন্দরীর শাস্তি হ'ল না। এক দিন বললে—অত যে ভালবাস, ভালবাস বল, কই দাও দিকিনি বউয়ের গহনা গুলো এনে।" তখন মদের নেশায় চুর হয়ে আছি—বল্লাম, "পারিনা?" সে বললে—"কখনো না, আমার সব মুখে।" ব'লে পট্‌লী হাসলে—পট্‌লীকে তুমি জাননি, তাই সে যে কত বড় ডাইনী তা আমি তোমায় আজ ব'লে বোঝাতে পারি না। তার সে হাসি আমায় পাগল ক'রে দিলে, ছুটে বাড়ী গেলুম। আমার বউ অনেক সহ্য করত। মাতালের বউরা সাধারণত যা সহ্য করে তার চেয়ে একটু বেশীই; কেন না, তুমি ত জান, আমার মার-হাতটা ছেলে বেলা থেকেই একটু বেশী। কিন্তু যখন তার বাপের দেওয়া চুচারখানা ভারী গহনা ভরা বাক্সটায় হাত দিলুম তখন সে বাঘিনীর মত আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লে—এক থাপ্পড়ে আর দুই লাথিতে তাকে অজ্ঞান ক'রে ফেলে তার বাক্সটা নিয়ে বেরিয়ে গেলুম। যখন ফিরে এলুম তখন ভোর চারটে, এসে—এসে—"তার গলার স্বর যেন সহসা বন্ধ হইয়া গেল, সে যেন দারুণ আতঙ্কে একেবারে কাঠ হইয়া বসিয়া রহিল—আমি ভীত হইয়া বলিলাম, "বিনায়ক, জল খাবে?"

সে বলিল—"কই দাও।" তাহার পর জল খাইয়া কতকটা প্রকৃতিস্থ হইয়া কহিল—"এসে দেখ্‌লুম আমার চির-অনাদৃতা বউ গলায় দড়ি দিয়ে কাঠ হ'য়ে ঝুলছে।"

স্তব্ধ হইয়া রহিলাম। মনে হইল যেন সহসা সান্ধ্য বাতাস বন্ধ হইয়া গিয়া আমার দম বন্ধ করিয়া দিতেছে।

"সমস্ত দিন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরলুম। সন্ধ্যার সময় ঠিক করলুম—যে গহনার জন্যে একটা নারীহত্যা ক'রে ফেল্‌লুম সে গহনার বাক্স পট্‌লীর হাত থেকে উদ্ধার ক'রে গঙ্গার জলে বিসর্জ্জন দেব। সেইদিন রাত্রে পটলীর বাড়ী থেকে গহনার বাক্স চুরি ক'রে পালাই। যখন ধরা পড়তে আর দেরী নেই তখন তোমার কথা শুনতে পেয়ে তোমাকে টেলিফোন করি। কিন্তু আর পারি না। এখন মনে হয় এ জ্বালার হাত থেকে যত শীঘ্র নিষ্কৃতি পাই ততই ভাল।"

সমস্ত শুনিয়া কহিলাম—"যাক্, সমস্তই ত হ'ল, এখন কি করবে ঠিক করেছ।"

"কি আর করব, একরকম ভিক্ষে ক'রেই কটা দিন চালাচ্ছি আর ধীরে ধীরে ওপারের দিকে এগিয়ে চলেছি। এই রকম ক'রেই কাটাব।"

"তার মানে?"

"মানে আর কি। অনবরত মদ খেয়ে শরীরে আর কিছু আছে রে ভাই।"

ঘরের ভিতর উঠিয়া গিয়া একখানা পাঁচশত টাকার চেক লিখিয়া বিনায়কের হাতে দিয়া কহিলাম—"আমার এ অনুরোধটা রাখতেই হবে বিনু, চিকিৎসা করা, বাঁচ্। যখন আমার সঙ্গে দেখা করেছিস্ তখন এমন বেঘোরে তোকে মারা যেতে দেব না।"

বিনায়ক চেকটা হাতে লইয়া ধীরে ধীরে কহিল—"আমি জানতুম জ্যোতি—আমার ধারণা ভুল হয় না—তোর ভিতর যে কত বড় মহৎ প্রাণ লুকিয়ে আছে তা জানতুম ব'লেই সেদিন টেলিফোন করতে সাহস করেছিলুম। ওরে জ্যোতি, আমার জীবনের যে কত কী নষ্ট হ'য়ে গেছে সে সব ভুলে গিয়ে আজ কি নিয়ে বাঁচব রে। আজ কি মনে হয় জানিস্, মনে হয় যদি শীঘ্র না মরি তা হ'লে কোনদিন হয়ত ঐ পটলীকে খুন ক'রে ফাঁসি যেতে হবে।"

আর্দ্রকণ্ঠে কহিলাম—"না না তোকে বাঁচতেই হবে বিনু, এমন ক'রে নিজের মূল্যবান্ প্রাণটাকে নষ্ট করিস না। যা গেছে তা গেছে, এখন আবার নতুন ক'রে জীবনটা গড়্।"

বিনায়ক হাসিয়া আমার পিঠের উপর হাতটা রাখিয়া কহিল—"বেশ ত ব'লে গেলি যা গেছে তা গেছে, কিন্তু কত যে গেছে তা ত তোকে আজ বোঝাতে পারি না। তবে যখন বলছিস্ তখন চেষ্টা করব। তবে কি জানিস্, চিরদিন ব্যর্থ হ'য়ে হ'য়ে নিজের উপর বিশ্বাস হারিয়েছি—এখন মনে হয় বুঝি ব্যর্থতাই জীবন, আর সেইটেই তার চরম সার্থকতা।" বলিয়া সে চলিয়া গেল।

তাহার যাবার পর পত্নী সরমা আসিয়া বলিল—"একটা মাতালের সঙ্গে কি বকবক করছিলে বল ত, প্রায় আধঘণ্টা হল ডিনারের বেল দিয়েছে।" কোন কথা বলিলাম না। কিন্তু ইচ্ছা হইয়াছিল বলি যে, যেদিন তোমায় স্বপ্নেও কল্পনা করিবার শক্তি হয় নাই, সেদিন সেই জীবনের প্রথম প্রভাতে হৃদয়ের সমস্ত সঞ্চিত প্রীতিসম্ভার নিঃশেষ করিয়া ঐ মাতালটির হাতেই সঁপিয়া দিয়াছিলাম।

৪

ইহার পর অনেক দিন তাহার আর কোন খবর পাই নাই। আমার জীবনাকাশে সে ধূমকেতুর মত সহসা উদিত হইয়া আবার যে কোথায় মিলাইয়া গেল তাহা বুঝিতে পারিলাম না।

একদিন বিকালে পোলোক ষ্ট্রীটে কয়েকজন পাটের দালালের সহিত দেখা করিয়া শ্যামবাজারের দিকে যাইতেছি এমন সময় টেরিটিবাজারের মোড়ে মোটরের গতি থামিয়া গেল; ব্যাপার কি জানিবার জন্য মুখ বাড়াইতে দেখিলাম ফুটপাথের ধারে বেশ একটু জনতা হইয়াছে। মোটরচালক জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল একটি মাতাল চলিতে চলিতে ফুটপাথের উপর পড়িয়া গিয়া অজ্ঞানের মত হইয়া আছে, এবং তাহারই আশে-পাশে এই জনতার সৃষ্টি।

অন্য সময় হইলে হয়ত মোটর চালককে গাড়ী ঘুরাইয়া অন্য রাস্তা দিয়া চলিতে বলিতাম। কিন্তু বিনায়কের কাহিনী শোনার পর হইতে সমস্ত দরিদ্র অসহায় জাতির উপর নিজের অলক্ষিতে কখন যে একটা আকর্ষণ ধীরে ধীরে বাড়িয়া উঠিয়াছিল তাহা বুঝিতে পারি নাই। মনে হইত ভারতের প্রত্যেক দরিদ্রটির ভিতর একটা করুণ ইতিহাস লুকাইয়া আছে; একটু চেষ্টা করিলেই তাহা জানা যাইবে, আর তাহাদের সমবেত ইতিহাস হয়ত একদিন দেশের অন্তরকে নাড়া দিয়া যাইবে।

গাড়ী হইতে নামিয়া মাতালের নিকট গিয়া দেখিলাম সে বিনায়ক। বিস্মিত হইলাম না। মোটর চালকের সাহায্যে তাহাকে মোটরে তুলিয়া লইয়া বাড়ীর দিকে লইয়া চলিলাম। একেবারে বেহুঁস মাতাল। নগ্নপদ, গায়ে জামা নাই। পরনের কাপড় অসংযত। সমস্ত মাথায় লম্বা লম্বা চুল—তাহাতে কাদা ও ধূলা। সমস্ত গায়ে কাদা। মাঝে মাঝে ভুল বকিতেছে। মদের উগ্র গন্ধে আমার প্রাণ যেন অতিষ্ঠ হইয়া উঠিতেছিল।

ডাক্তার আসিয়া বলিল ডিলিরিয়াম ট্রিমেন্স; জ্ঞান নাও হইতে পারে। বড় আশা করিয়া সমস্ত রাত্রি শিয়রে বসিয়া রহিলাম, যদি একবার জ্ঞান হয় তাহা হইলে এইবার পারের যাত্রীর নিকট করজোড়ে ক্ষমা চাহিয়া লইব। যেদিন বড় আশায় বুক বাঁধিয়া আমার আশ্রয়ে আসিয়াছিল, সেদিন কেন বিন্দুমাত্র সাহায্য করিয়া তাহাকে এই ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করি নাই!

শ্রীসমীরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়

কিন্তু জ্ঞান তাহার হইল না। কোথায় মরিতেছে, কাহার কাছে মরিতেছে কিছুই বুঝিতে পারিল না।

রক্তনেত্র ললাটে তুলিয়া সারারাত্রি ভুল বকিতে লাগিল। কি যে বলিল অনেক কথাই মনে নাই, তবে এইটুকু মনে আছে, একবার বলিয়াছিল—"তুমি আমায় বাঁচ্‌তে বলছ জ্যোতি, কিন্তু কি ক'রে বাঁচি বল ত। মদ না খেলেই দেখি বউ গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলছে, মেয়েটা অনাহারে শুকিয়ে মরছে, একটা ডাইনী অনবরত টাকা আর গহনা চাইছে, এর পর মদ না খেয়ে কি ক'রে থাকি।" আবার নিস্তেজ হইয়া পড়িল। কত ডাকিলাম, কত ঔষধ দিলাম। রাত্রি সাড়ে তিনটার সময় তাহার যেন পরিষ্কার জ্ঞান হইল। আমার দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল—"বড় সুখেই মরছি, তোর বাড়ীতে, তোর কাছে। তুই ছাড়া আজ যে আমার কেউ নেই।" বলিয়া সহসা হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। সেদিন আর আত্মসংবরণ করিতে পারি নাই, মুহূর্তের জন্য নিজের কপট গাম্ভীর্য্য ভুলিয়া, সমস্ত চাকর বেয়ারাদের সামনে একবারে বালকের মত হুহু করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলাম।

বৈকালে যখন তাহার সৎকার করিয়া বাড়ী আসিলাম তখন অস্তগামী সূর্য্যের লেলিহান রক্তশিখা সমস্ত পশ্চিমাকাশকে চাটিয়া চাটিয়া খাইতেছে। সেই দিগন্ত-বিতত ধ্বংসলীলার পানে চাহিয়া বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম কেমন করিয়া জীবনের প্রারম্ভে এক মহাপ্রাণের সাক্ষাৎ পাইয়াছিলাম। কেমন করিয়া তাহাকে হারাইলাম। তবুও মনে হয়, একটা অত বড় জীবন হয়ত পুড়িয়া ছারখার হইয়া যাইত না, যদি জগতের কাছে সে এতটুকু সাহায্য, এতটুকু দয়া, এতটুকু সহানুভূতি পাইত। বিধাতার কালচক্র যদি ঠিক নিয়মমত ঘুরিত।

ইস্‌লামি প্রেম কাব্য

শ্রীবিমল সেন

১

পল্লীগ্রামে যারা 'গাজির গান' ইত্যাদি লোকপ্রিয় অভিনয়ের ছড়া বাধেন, তাঁদের অধিকাংশই মুসলমান। মুসলমানপ্রধান পল্লীর অধিবাসী বলিয়া বাল্য হইতেই আমার এই ছড়াগানের দিকে বিশেষ ঝোঁক ছিল। গানগুলির ভিতর দোষ একটু-আধটু থাকিলেও কৃত্রিমতা মোটেই ছিল না। অশিক্ষিত পল্লী-কবিদের প্রাণে যে সহজ কবিত্বের স্রোত প্রবাহিত, এ যেন তার লীলায়িত উচ্ছ্বাস। যথারীতি হয়তো তা বহিয়া চলিতে জানে না, কিন্তু শৈলগাত্রোৎক্ষিপ্তা নির্ঝরিণী যেমন আঁকিয়া-বাঁকিয়া উচ্ছৃঙ্খল আনন্দে, উদ্দাম ছন্দে নাচিয়া চলে, এ গানগুলিও তেম্‌নি রীতিকে লঙ্ঘন করিয়াও সুন্দর ভাবে নাচিয়া চলিয়াছে।

এ সুন্দর কবিত্বের ডালি আজও গ্রামের নিভৃতচ্ছায়ে আবৃত। দু-চারখানি মাত্র মাঝে-মাঝে সাহিত্য-রসপিপাসুগণের দৃষ্টিলাভে সমর্থ হয়। আমাদের বেশীর ভাগ লোকই এদের কোন সংবাদ রাখেন না। অবশ্য তার অনেক কারণও আছে

প্রথমত, পল্লী-কবিরা অশিক্ষিত বলিয়া তাদের বর্ণবিন্যাস প্রায়ই অশুদ্ধ। সর্ব্বদা প্রচলিত অনেক শব্দের বানানও এমন ভাবে করা হয় যে বোঝে কার সাধ্য! 'রূপোশীরা' শব্দটা পড়িয়া প্রথমেই একটু ধাঁধাঁ লাগে—কিন্তু পরে বোঝা যায় ইহা আমাদের চির-পরিচিত 'রূপসীরা' শব্দ। বর্ণাশুদ্ধিদোষ প্রায় প্রত্যেক শব্দেই আছে—এর উপর আবার উর্দ্দু ফার্সী শব্দের অকারণ প্রয়োগ।

দ্বিতীয়ত—পল্লী-কবিদের শোচনীয় দারিদ্র্য। প্রায়ই তাহাদের বই ছাপিবার মত অর্থ-সামর্থ্য থাকেনা। যে দু-একজন বা বই ছাপান, তাঁহারাও বিশ্রী মেটে কাগজে সাধারণ হরফে বই ছাপান। সকল রকমের ছন্দ গদ্যের ছাঁচে ঢালা—কাজেই তর্-তর্ করিয়া পড়িয়া যাওয়ার পক্ষে বিশেষ অসুবিধা। আধুনিক সাহিত্যসেবকদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিবার মত সৌষ্ঠব বা চাক্‌চিক্যের ইহাতে একান্তই অভাব। ইস্‌লামীয় পুস্তকবিক্রেতাদের দোকানে ইহা অনাদরে পড়িয়া থাকে।

এই প্রেমকাব্যের কবিগণ প্রায়ই মৈমনসিংহ, ঢাকা, চট্টগ্রাম ইত্যাদি স্থানের অধিবাসী। ইহাদের শত করা একজনও হয়ত বই ছাপান না। উৎসবাদি উপলক্ষে নিজেদের মন হইতে ছড়া-গান বিবৃত করিয়া পল্লী-শ্রোতৃবৃন্দকে তুষ্ট করিয়া থাকেন। সহর পর্য্যন্ত তাঁদের কণ্ঠ আসিয়া পৌছায় না। পল্লী-কবিরা ভীত, সন্ত্রস্ত। পল্লীগ্রামের সীমার বাহিরে যে তাঁদের রচনা সমাদর লাভ করিবার যোগ্য, একথা তাঁহারা স্বপ্নেও বোধহয় কল্পনা করেন না।

কিন্তু একটি ভালো ঝর্ণা দেখিলে যেমন পিপাসুগণকে ডাকিয়া দেখাইতে ইচ্ছা করে, আমারও তেম্‌নি ইচ্ছা করে এই পল্লী-কবিগণ সুধীবৃন্দের অগোচরে পল্লীর নিভৃতকুঞ্জে যে মধুচক্রের রচনা করিয়াছেন, তাহার ক্ষরিত মধুপাত্র সাহিত্য-রসিকদের সম্মুখে তুলিয়া ধরি। তাই আমার এই ক্ষুদ্র উদ্যম। কয়েক শত ইস্‌লামি কাব্য পড়িয়া আমার যে কয়খানি সব চেয়ে ভালো লাগিয়াছে তারই কিছু কিছু পরিচয় দিতে চেষ্টা করিব।

হিন্দু ধর্ম্ম ও সাহিত্যের প্রভাব

এই প্রেমকাব্যগুলি পড়িয়া প্রথম লক্ষ্য হয়, তাহাদের কবিদের উপর হিন্দু ধর্ম্ম ও সাহিত্যের প্রভাব। প্রেমকাব্যের ছত্রে ছত্রে হিন্দু ভাব, গল্প, উপমা, এবং ধর্ম্ম ইস্‌লামি ভাবে ঢালাই হইয়া এক অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে। ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ অপ্সর কিন্নর—সকলেই আছেন; অবশ্য সকলের উপরে আছেন আল্লা-হ-তাল্লা। হিন্দু দেব-

শ্রীবিমল সেন

দেবীগণ মুসলমানী ধর্ম্মের বিরোধী, কিন্তু মুসলমানদের সঙ্গে তাহাদের নানারকম সম্পর্ক হইতে পারিত। ইন্দ্রের সভায় প্রেমকাব্যের অনেক নায়িকাই নাচগান করিতেন। প্রেমকাব্যে পাই—

গঙ্গা দুর্গা শিব জায়া, তাহাকে করিত দয়া,
মাসী তারা গাজির হইত।
(গাজী কালু ও চম্পাবতী)
নাগোপরি আরোহিয়া, গেল পদ্মা গাজির কাছেতে !
হাসিয়া সেলাম করে,
ভগ্নী ভগ্নী বলি করে
ধরি গাজি লইল কোলেতে।
(গাজি কালু ও চম্পাবতী)

গঙ্গা, দুর্গা, কালী, মনসা, ইন্দ্র, চন্দ্র প্রভৃতি কোন দেবতাই কবিদের কাছে মিথ্যা নয়। কিন্তু মজা এই, হিন্দু দেবদেবীতে সম্পূর্ণ আস্থাবান্ এই কবিগণ হিন্দুদের মুসলমানী ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার চেষ্টা করিতে কসুর করিতেন না। কি যে তাঁহাদের যুক্তি, তাহা স্পষ্ট করিয়া কোথাও বলেন নাই। তবে—হিন্দুধর্ম্ম সত্য নয়, মুসলমানী ধর্ম্ম একমাত্র সত্য, অতএব গ্রহণ কর—এমন যুক্তি তাঁহারা কোথাও প্রয়োগ করেন নাই। মুসলমানের দল ভারি করাই বোধ হয় ইঁহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। তাই জনৈক কবি তাঁর নায়কের মুখ দিয়া বাহির করিতেছেন—

করাইতে পারি যদি গঙ্গার দর্শন,
হৈবা কিনা মুসলমান করহ স্বীকার।

গঙ্গায় বিশ্বাসী যাহারা, তাহারা গঙ্গাদর্শন করিয়াই আপনাদের সিদ্ধ মনে করেন। তারপর তাহারা কেন মুসলমান হইবেন, একথা কবি ভাবিয়া দেখেন নাই। আসল কথা, পল্লীবাসী মুসলমান কবিদের ধর্ম্ম খাঁটি ইস্‌লাম ধর্ম্ম নয়—উহা হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্মের সংমিশ্রন।

পল্লীবাসিগণ এ কথার মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে পারিবেন। আজকাল একটু অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিলেও সেদিনও দেখিয়াছি মুসলমানগণ হিন্দু পূজায় রীতিমত উৎসব করিয়া থাকেন। দুর্গা প্রতিমা নদীতে ডুবাইত মুসলমান,—বিজয়া দশমীর প্রণাম জানাইয়া মুসলমান সন্দেশ আদায় করিত। হিন্দুদের ন্যায় তাহারাও কালী শীতলা প্রভৃতি উগ্রচণ্ড দেবতার খোলায় কলেরা বসন্তের প্রকোপশান্তির জন্য মানৎ করিয়া থাকে। অতএব তাহাদের উপর হিন্দু ধর্ম্মের কতখানি প্রভাব, তাহা সহজেই অনুমেয়।

শুধু ধর্ম্ম সম্বন্ধে নয়, সাহিত্য সম্বন্ধে কবিরাও হিন্দুদের প্রভাবে প্রভাবান্বিত। গ্রামে রামায়ণ গান, ঢপ্ কীর্ত্তন, রয়ানি (মনসামঙ্গল গান), যাত্রা, কথকতা প্রভৃতি হিন্দু অনুষ্ঠান আবহমান কাল ধরিয়া এত বেশী প্রচলিত যে, মুসলমান্ হ'ক্, খ্রীষ্টান হ'ক্, কোন সম্প্রদায়ের পক্ষেই তাহার প্রভাব অতিক্রম করা সহজ ছিল না। এই মুসলমান কবিগণও জানিয়া এবং না-জানিয়া হিন্দুর পুরাণাদি অবলম্বনে কাব্য রচনা করিয়াছেন। উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি বলা যাইতে পারে।

ভেলোয়া সুন্দরী বনাম সীতা-দময়ন্তী-চিন্তা

আমির সাধুর বণিতা ভেলোয়া সুন্দরী আদর্শ সতী। একবার তিনি নদীতে জল নিতে যান্। ভোলা সাধু তখন ডিঙি সাজাইয়া সেইখান দিয়া যাইতেছিলেন। ভেলোয়ার অসামান্য রূপলাবণ্য দেখিয়া মুগ্ধ ভোলা ভেলোয়াকে বলপূর্ব্বক নৌকায় তুলিয়া স্বদেশে লইয়া গেলেন। তারপর তাহাকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

সুচতুরা ভেলোয়া বলিলেন, এ ছ'মাস আমার একটা ব্রত আছে, এ ছ'মাস না গেলে পুনর্বিবাহ করিতে পারিব না।

আমির সাধু নিরস্ত হইলেন, কিন্তু ভেলোয়া সুন্দরী নিরস্ত হইলেন না। তিনি নিজের কাহিনী বিবৃত করিয়া একটি গান রচনা করিলেন, এবং দেশে দেশে দূতী পাঠাইয়া সেই গান গাওয়াইলেন। কেউ সে গানের জবাব দিতে পারিল না—পারিলেন শুধু ভেলোয়ার স্বামী আমির সাধু। আমির সাধু তখন ভেলোয়ার সন্ধান পাইয়া তাহাকে উদ্ধার করিয়া নিয়া গেলেন। কিন্তু দেশে গিয়া এক বিভ্রাট উপস্থিত হইল। এতদিন ভেলোয়া সুন্দরী পরবাসে বন্দিনী ছিলেন, তাঁর চরিত্র যে অটুট আছে, তার প্রমাণ কি ? প্রবাসিনী ভেলোয়ার অগ্নিপরীক্ষা হইল। ভেলোয়া সুন্দরী অগ্নিতে দগ্ধ হইলেন না বটে, তবে অভিমানে এ মর্ত্ত্য ছাড়িয়া

অন্যলোকে চলিয়া গেলেন। এই কাহিনীরচয়িতার উপর যে চিন্তা, দময়ন্তী এবং সীতার কাহিনীর প্রভাব আছে, তা পুঁথিখানি পড়িলেই অনায়াসে বোঝা যায়।

বদিউজ্জামাল বনাম বিদ্যাসুন্দর

বদিউজ্জামাল বলিয়া যে একখানি বই আছে, তাহা হুবহু বিদ্যাসুন্দরের নকল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পড়িতে পড়িতে মনে হয় যেন ভিন্ন দেশকাল পাত্রের অবতারণা করিয়া কবি সেই পুরাতন বিদ্যাসুন্দরের কাহিনীই আমাদের শুনাইতেছেন। ইহার গল্পাংশ, বর্ণনা, এবং রচনাপ্রণালী সবই বিদ্যাসুন্দরের ন্যায়, তবে যে অসামান্য কবিত্বপ্রভাব রায়গুণাকর বিদ্যাসুন্দরের ভাষা রসাল করিয়াছে, বদি-উজ্জামালের কবির তাহা অণুমাত্র নাই। তাই তাঁহার ভাষা রহিয়া রহিয়া অসংযত এবং অপাঠ্য হইয়া পড়িয়াছে। গল্পটা হইল—বাদশাজাদা ছয়ফলমুলুক পরমাসুন্দরী কন্যা লালমতির চিত্র দেখিয়া উন্মাদ হইলেন, এবং নায়িকালাভের আশায় বিদেশ যাত্রা করিলেন। বহু পর্যটনের পর তিনি সেই দেশে আসিয়া পৌঁছিলেন, যেখানে লালমতি থাকেন। কিন্তু লালমতি রাজকন্যা অন্তঃপুরচারিনী। তাহাকে কি করিয়া পাওয়া যায়? তখন কৌশলী ছয়ফলমুলুক রাজবাটীর মালিনীর শরণাপন্ন হইলেন এবং এক দিন মালিনীর পুত্রবধূ সাজিয়া রাজকন্যার অন্দরে প্রবেশলাভ করিলেন। তারপর বিদ্যাসুন্দরের মত প্রেমের অভিনয় চলিল। সেই শৃঙ্গার, সেই প্রেমাভিনয়, সেই বর্ণনা, সেই বিচারের পালা। পড়িতে পড়িতে মনে হয় এ যেন দ্বিতীয় বিদ্যাসুন্দর পড়িতেছি।

কাব্যরচনার প্রণালী

এই সব কাহিনী ব্যতীত কাব্যরচনার সাধারণ প্রণালীও হিন্দু কবিগণেরই অনুরূপ। ইহাতে বারমাসী বর্ণনা আছে, বিরহিনীর কোকিল বা ভ্রমরের উপর ক্ষুব্ধ-করুণ কটাক্ষ আছে, মদনের ফুলশর, পদপল্লব ধরিয়া মানভঞ্জনের পালা আছে। শৃঙ্গারাদির বর্ণনা নায়ক নায়িকাদের দেহে সম্ভোগ-চিহ্নের বর্ণনা, নায়ক-নায়িকাদের রূপবর্ণনা প্রভৃতি সবই হিন্দু কবিদের ন্যায়। এই কবিরা বর্ণনা করিতে করিতে সময় সময় ভুলিয়া যাইতেন, তাঁহারা মুসলমান। প্রায় কবিই মুসলমানী নায়িকার দেহে সম্ভোগ-চিহ্নের বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন, নায়িকার এয়োতি-চিহ্ন কপালের সিঁদুর বিপর্য্যস্ত হইয়াছে। মুসলমান রমণীরা যে সিঁদুর পরেন না, বর্ণনাকালে একথা বোধ হয় কবিদের মনে ছিল না। হিন্দুপ্রভাবের ইহা একটি স্পষ্ট নিদর্শন।

কাব্যের পরিকল্পনা

এই প্রেমকাব্যকে নিছক্ কাব্য বলা চলে না। লোক-মতনিরপেক্ষ হইয়া আত্মানন্দে বিভোর কবি যে কাব্যরচনা করেন, ইহা তাহা নয়। এই প্রেমকাব্য সাধারণত পল্লীতে পল্লীতে গীত অথবা অভিনীত হয়। অতএব ইহার নাম দেওয়া যায় লোকসাহিত্য। লোকপ্রিয় করার জন্য কবির ইহাকে ঘটনাবৈচিত্র্যবহুল করিতে হয়। কবি বিশেষ বিশেষ অবস্থার অবতারণা করিয়া পল্লীশ্রোতৃবৃন্দকে চমকিত, আগ্রহান্বিত, এবং উৎফুল্ল করিয়া তোলেন। এক কথায় বলিতে গেলে—কবি কাব্যে ঘটনাবৈচিত্র্য পরিস্ফুট করিতে গিয়া এক-একটা সংঘর্ষের অবতারণা করিয়াছেন।

বস্তুত, সংঘর্ষ না থাকিলে পল্লীসাহিত্য জমে না। পল্লী-শ্রোতারা সাধারণ জীবনযাত্রার দার্শনিক ব্যাখ্যা শুনিতে উৎসুক নয়। জনৈক মুসলমান এক মুসলমান রমণীকে বিবাহ করিলেন, এবং তাহার সঙ্গে দিনের পর দিন সুখে অতিবাহিত করিতে লাগিলেন—এতে পল্লীবাসীর তৃপ্তি হইবে না। কবিকে বাধ্য হইয়া সংঘর্ষমূলক কাব্যের পরিবেশন করিতে হয়। ইহাই লোকসাহিত্যের জন্মকথা। ইহার উপর এই প্রেমকাব্যের পরিকল্পনা প্রতিষ্ঠিত।

এই কাব্যের বিষয় হইতেছে নায়ক-নায়িকার মিলন। মিলন যাহাতে আকাঙ্ক্ষায় আগ্রহে সুন্দর হইয়া উঠে, তজ্জন্য এই মিলনের পথে কবি বিষম অন্তরায় উপস্থিত করিয়া থাকেন। ইস্‌লামি প্রেমকাব্যে নায়কগণ সকল ক্ষেত্রেই মুসলমান। এখন নায়িকারা নায়কদের সহজলভ্য হইবেন না, হইলে আসর জমিবে না, কাজেই নায়িকাগণ প্রায়ই হিন্দুকন্যা বা হিন্দুবধূ। যে ক্ষেত্রে নায়িকা

শ্রীবিমল সেন

মুসলমানী, সেখানে হয় নায়িকা নায়কের শত্রুকন্যা, অথবা পরস্ত্রী, অথবা নায়কের গুরুজন এ মিলনে বাদী। নায়কের পিতার দিক হইতে যদি বা বাধা না আসিল, নায়িকার দিক হইতে এই বাধা আসিবে। এই বাধা অতিক্রম করিয়া নায়ক-নায়িকা মিলিত হইবেন।

কিন্তু দুর্ভাগাক্রমে যে নায়ক-নায়িকারা প্রেমের প্রতাপ বুঝিবার আগেই বাল্যবিবাহে বদ্ধ হইয়াছেন, তাহাদের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থার প্রয়োজন। তাহাদের মিলনে বিচ্ছেদ ঘটানো চাই। এর জন্য শাশুড়ী-ননন্দী আছেন অথবা অভাবিত আকস্মিক কোন বিপদ আছে। মোট কথা নায়কনায়িকা পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইবেন। নায়ক শতসহস্র বিপদ বাধা অতিক্রম করিয়া নায়িকার সহিত মিলিত হইবেন। এই পুনর্মিলনের বর্ণনাস্থলে প্রেমকাব্য বেশ জমিয়া উঠে।

অনেক সময় নায়িকা স্বয়ং এ বাধা জন্মান। বুদ্ধিমতী হইলে এমন দুরূহ প্রশ্নের উত্থাপন করেন যে নায়করা তাহার জবাব দিতে গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া উঠেন। পাণিপ্রার্থীরা নায়িকার সমস্যাপূরণে অসমর্থ হইয়া প্রায়ই রাজকন্যার বন্দী অথবা ক্রীতদাস হইয়া থাকেন। নায়ক শুধু সে সমস্যাপূরণে সমর্থ হ'ন। অনেক সময় সমস্যাপূরণের পরিবর্ত্তে পাশাখেলার অবতারণা করা হয়। নায়ককে নানান্ ফিকির-ফন্দি করিয়া এই পাশায় জয়লাভ করিতে হয়।

কিন্তু পূর্ব্বকথিত কোনো দিক হইতেই যদি বাধা না আসে তো, নায়িকাকে পরীরাজ্যের কন্যা বলিয়া দুর্লভা করিয়া তোলা হইবে। মোট কথা, নায়িকাকে অসহজলভ্যা করা চাই। কবির ধারণা,

'বিনাশ্রমে পেলে রত্ন, কে করে তাহার যত্ন ?'

নায়ককে দিয়া তাই তিনি অনেক মানুষের অসাধ্য কাজ করাইয়াছেন। মস্ত বড় বিখ্যাত বাদ্‌শার একমাত্র ছেলে হইয়া নায়ক ফকির সাজিলেন, তারপর রাজকন্যার সন্ধানে একাকী নিরুদ্দেশ যাত্রা করিলেন। পথে কত রাক্ষস বধ করিলেন, কত শত যুদ্ধ জয় করিলেন ইত্যাদি সম্ভব অসম্ভব অনেক বর্ণনায় কাব্য পরিপূর্ণ। যেখানে কোন কার্য্য মানুষের পক্ষে একান্তই অসম্ভব, সেখানে দৈবশক্তি বা দৈব সাহায্যের অবতারণা করা হইয়াছে। বাঘ, কুমীর মাছ সকলে নায়কের পক্ষ হইয়া লড়িয়াছেন। নায়কের ক্রোধপূর্ণ দৃষ্টি পড়িল আর শত্রু-পুরী দাউ-দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল।

এই ধরণের কল্পনার চাতুর্য্য সকল সাহিত্যেই আছে। হিন্দুর রামায়ণ মহাভারত পুরাণাদিতে এ কল্পনা অতিরিক্ত পরিমাণেই আছে। কাব্য জনপ্রিয় করিতে হইলে যে সংঘর্ষের প্রয়োজন, তাহার জন্য প্রায়ই ইহা অপরিহার্য্য।

রূপবর্ণনা

কাব্যের দুই প্রধান শাখা—রূপবর্ণনা এবং প্রেমবর্ণনা। রূপ এবং প্রেমের মধ্যে কোন অঙ্গাঙ্গীসম্বন্ধ আছে কিনা জানি না, তবে সকল দেশের ক্লাসিক্ সাহিত্যেই কবিদের প্রেমসৃষ্টির প্রধান দ্যোতক হইয়াছে রূপ। নায়ক-নায়িকার রূপবর্ণনা-চ্ছলে সকল কবিই তার মানসী মূর্ত্তির সৌন্দর্য্য বর্ণনা করিয়াছেন। নায়ক-নায়িকার চরিত্র নিখুঁত রূপও নিখুঁত। প্রত্যেক কবিই সৌন্দর্য্য বর্ণনাচ্ছলে তাঁর কবিত্বের ভাণ্ডার উজাড় করিয়াছেন। এক বিষয়ে সকল কবিদের মধ্যে একটা আশ্চর্য্য মিল আছে। নায়ক-নায়িকা সাধারণত এমন সুশ্রী হইবেন যে যে-কেউ তাঁহাদের চোখ তুলিয়া দেখিবেন, তিনিই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িবেন। নর নারী পরস্পরের সৌন্দর্য্যে দগ্ধ হইয়া মূর্চ্ছা যায়, এ বরং কল্পনা করিতে পারি, কিন্তু আমাদের আশ্চর্য্য লাগে তখনই যখন দেখি নরের রূপদর্শনে নর মূর্চ্ছিত হন, নারীর সৌন্দর্য্যে নারী মূর্চ্ছিতা হন। কথাটা কতদূর সত্য, মনস্তত্ত্ববিদ্‌রাই তাহা বলিতে পারেন।

এই দর্শন-মোহের বর্ণনাচ্ছলে জনৈক কবি বলিতেছেন—

দেলের আখেতে তার আছু ব'য়ে যায়,
ফুকারি কাঁদিতে নারে, করে হায় হায়!
ছুরতের ফাঁদে মোরে কৈল গ্রেপ্তার,
কেমনে বাঁচিব আর বিহনে তাহার।
(বড় নিজামপাগলার কেচ্ছা)

'প্রাণের মাঝে যে চক্ষু, তাহাতে আমার অশ্রু বহিয়া যাইতেছে। ফুকারিয়া কাঁদিতে পারি না, শুধু হায় হায় করিতেছি। রূপের ফাঁদে আমায় গ্রেপ্তার করিয়াছে। তাহাকে ব্যতীত আমি কেমনে বাঁচিব ?'

এর পরেই মূর্চ্ছা।

এই জায়গাতেই কবিগণ থামেন নাই। সুন্দর নায়কগণের দর্শনে মদনবাণাহত ক্ষুব্ধ চঞ্চল নারীগণের খেদোক্তিও ভূরি ভূরি প্রয়োগ করিয়াছেন।

'আর জন কহে বুয়া পাই যদি এরে।
গাঁথিয়া গলাতে আমি রাখি হার ক'রে॥
কেউ বলে ওগো বুয়া মোর কথা শোন।
যৌবন সঁপিয়া ওরে জুড়াই জীবন॥
আর জন বলে যদি হেন রূপ পাই।
সদা লয়ে বুকে আমি রজনী পোহাই॥
কেহ বলে যদি আমি পাই এ নাগরে।
খোপাপরে রাখি সুবর্ণের ডেরা ক'রে॥

(গোলেনুর ও নূরহোসেন)

এখানে একথা বলা দরকার যে কবিগণ শুধু রূপ বলিতে বাহ্য সৌন্দর্য্যই বোঝেন নাই। কবির সুন্দর কল্পনা-মাধুর্য্যমণ্ডিত হইয়া রূপের আর এক দ্যুতি পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে—তাহা পবিত্র এবং প্রকৃত ভালোবাসা! রূপকে প্রশংসা করিয়াই মানুষ তৃপ্ত হয় না,—তাহাকে পূজা করিবার একটা বুভুক্ষা অন্তরে অন্তরে জাগিয়া উঠে। কবির ভাষায় তাহাই প্রেম। এই প্রেমে বিহ্বল আত্মহারা নায়ক বলেন,—

'আমি বলি যাই-যাই, মন কিন্তু মানে নাই,
যদি বা বুঝাই মনে, না বোঝে নয়ন,
যদি যাই ক'রে জোর, প্রাণ নাহি যাবে মোর,
খালি ধড় নিয়ে মোর কিবা প্রয়োজন।'

(গুল বকাওলী)

এ প্রেম যেন চুম্বকের মত নিরন্তর আকর্ষণ করে। সুনীতির দোহাই দিয়া মনকে যদি বা কতকটা সামাল করিতে পারি, চক্ষু কোন মানা মানে না,—কোন অজ্ঞাত মুহূর্ত্তে যেন বাহিরের রূপজাল ভেদ করিয়া প্রাণও নায়িকার প্রাণের সহিত মিলিত হইয়াছে। তাই কবির আক্ষেপ—

'খালি ধড় নিয়ে মোর কিবা প্রয়োজন'।'

নয়ন-মন-প্রাণের এই দ্বন্দ্বই বিশ্বের চিরন্তন প্রেমলীলার উপাদান। দ্বন্দ্বে প্রাণ জয়ী হয়। সুন্দরী নারী যেন শ্যামলা পুষ্পশোভিতা একখানি উদ্যান। তার সৌন্দর্য্যে যে আকৃষ্ট হয়, সে শুধু বাহিরেই দাঁড়াইয়া থাকে না। কম্পিত সাহসে দৃঢ়পদে সে তার অন্তরে আসিয়া আসন গ্রহণ করে।

এ প্রেমকাব্যাবলিতেও রূপের সেই অর্থটিই ফুটানো হইয়াছে। পাঠকবর্গের অবগতির জন্য আমি তার সামান্য কয়েকটি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

হেন রূপ না পাইছে দেবতা কিন্নর।
মুখের লাবণ্য জিনি কোটি শশধর॥
আর যে বত্রিশ দাঁতে মিশি লাগাইছে।
লক্ষকোটি তারা যেন উজ্জল করিছে॥
জবা ফুল জিনি জিহ্বা, তাতে খায় পান।
না খাটে উপমা কিবা করিব বাখান॥
মৃগের নয়ন তুল্য শোভিত লোচন।
জিনিয়া চন্দ্রের ছটা তাহার কিরণ॥
চক্ষু মেলি সেই ধনী যার পানে চায়।
প্রাণহারা হইয়া সেই করে হায় হায়॥
ভ্রমরের বর্ণ জিনি লম্বা কেশ মাথে।
দাঁড়াইলে পড়ে কেশ পায়ের তলাতে॥
জেলেখার কটিতুল্য কটি তার সরু।
তাদৃশ নিতম্ব আর পেট-পিঠ-উরু॥
সুগঠন হস্তপদ, কি কহিব মরি।
তাহার উপমা নাহি ত্রিভুবন জুড়ি॥
আকাশের দিকে যদি চম্পাবতী চায়।
প্রাণহারা হইয়া সেই করে হায় হায়॥

(গাজি কালু ও চম্পাবতী)

আকাশও প্রাণহারা হইয়া হায়-হায় করে যাকে দেখিয়া, না জানি সে কত সুন্দরী!

২

কন্যার ছুরতের খুবি কি কব জানে।
ফজরেতে ভানু যেন উঠেছে আশমানে॥
বুকেতে নূতন কুচ, কি কব বাহার।
কুন্দে বানাইছে যেন ঢেপুয়া সোনার॥
আঁখির জোড়া ভুরু যেন দুই কামানি।
মুখের বচন যেমছা কোকিলার বাণী॥

আশ্রয়

শিল্পী—শ্রীপ্রভাত মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীবিমল সেন

দিঘল মাথার কেশ যেন মেঘকালি।
হাসিতে চমকে যেয়ছা মেঘের বিজলী॥
মুখের ছুরত রঙ্‌ জিনি জবা ফুল।
মুখ দেখে চেহে-চেহে করেন বুল-বুল॥

(ছয়ফলমুলুক)

৩

'কন্যার ছুরতের খুবি' এখনই শেষ হয় নাই। কবি তাহার বিশদ বর্ণনা করিতেছেন—

মুখ চেহারা আপ্তার মেক্‌!
দন্ত আনারের দানা
যেয়ছা বেলোয়ারী আয়না!
হাসি মুখের বিজলী চটক্‌॥
ঠোঁট দুই জিনি জবাফুল।..
নাসিকার ছন্দ যেন বাঁশী!..
তাহাতে বোলাক্‌ বোলে।
মতির ঝালর ঝোলে!..
ঝিনুকের মত দুই কান!
তাহাতে সোণার ঝুম্‌কা,
জাল বাঁধি মতি লট্‌কান্‌॥
আঁখি দুই করে টল্‌ টল্‌।
ধলা কালা বিচে পুতি,
টল্‌ টল্‌ তারার জ্যোতি!
দ্বিতীয়ার চন্দ্রলেকা।
কালো কাজলের রেখা॥
কপালে সুবর্ণটীকার ফুল।
কাকই করিয়া মাথার চুল,
বাঁধিছে লোটন খোঁপা;
সুবর্ণ-মতির ছাপা,
কত রঙ্গ মাণিকের ফুল॥
বিউনির আগায় বাঁধিছে রতন।
ছাতি দোন ডালিম্ব আকার।
যেন নয়া পদ্মকলি,
যেমন চালের ঢুলি॥
চিকণমাজা, পাত্‌লি কোমর॥
হাতে পায়ে বিশে আঙুল,
যেন কুন্দকারি তুল।
চন্দ্র হৈতে নাগুন্‌ সুন্দর॥

বদিউজ্জামাল

কিবা দুটি ভুরুছাঁদ, যেন পাতিয়াছে ফাঁদ।
রসিকের মনপাখী করিতে বন্ধন।
উর্দ্ধ নাসা দীর্ঘকেশী, চক্ষে কাজল দাঁতে মিশি,
কুচস্তম্ভ, দেখে ধৈর্য্য নাহি করে প্রাণ॥

(গুলে বকাওলী)

এই রূপবর্ণনায় অনুপম সৌন্দর্য্য ও সংযম পরিস্ফুট। অল্প কথায় ইহার চেয়ে সুন্দরতর বর্ণনা খুব বেশী মেলে না।

কন্যার জামাল লাল যেমন মাকাল ফল,
দাগ তার কোন অঙ্গে নাই॥
বেলুন সমান হাত, দেখে লাগে বজ্রাঘাত,
সরুমাজা ভ্রমর সমান।
কমল বরণ ধনী, দেখে রূপ ভোলে মুনি,
রূপ দেখি হয়ত অজ্ঞান॥
মুখে দন্ত মুক্তা-মতি, মনচোরা সে যুবতী
দুটি ঠোঁট পুষ্পের সমান।
চাহনি মদন বাণ, দেখিলে হারায় প্রাণ,
ভুরু দুটি যেমন কামান॥
গোল বদন, চিকন সিতা, তোতা মুখে কহে কথা,
শুনে কাঁদে মালুখাঁর প্রাণ।
কালনাগ যেন কেশ, হুরপরী হইতে বেশ,
মুখশোভা চাঁদের সমান॥
আঁখি দেখে হরিণ ভাগে, সরম অন্তরে জাগে,
চলন দেখে রাজহংস পালায়।
রূপ যেন কাঁচা সোনা, ভ্রমর করে আনাগোনা,
গেল বিঁধে মালুর হৃদয়॥

(মালুখাঁ ও রসনেছা কন্যা)

৬

আকাশের চন্দ্র যেন ভেলোয়া সুন্দরী।
দূরে থাকি লাগে যেন ইন্দ্রকুলের পরী॥
কাছে গেলে যায় রে দেখা সোনার প্রতিমা।
আর ভালো লাগেরে ভেলোয়ার চক্ষের ভঙ্গিমা॥
আঁখির উপর কন্যার অতি মনোহর।
পদ্ম ফুলের মাঝারে যেমন রসিক ভ্রমর॥

ভাল পুষ্প পাইয়া রে ভ্রমর মধু করে পান।
তেকারণে সুন্দর লাগায় বাঁকা তুনয়ান॥
চন্দ্রসূর্য জিনিয়ারে ভেলোয়ার উজ্জ্বল বদন।
কুন্দের কলিকা জিনি হস্তপদের গঠন॥
সারি সারি দন্তগুলি মুকুতা বাহার।
হাসিতে বিজলী ছট্‌কেরে অতি চমৎকার॥
সিনার উপরে দুটি কনককোটরা।
মধু লোভে মত্ত হইয়া গুঞ্জরে ভ্রমরা॥
(ভেলোয়া সুন্দরী)

* * * * * *

ধপ্‌ ধপ্‌ জ্বলে যেন আঁধারের বিচে।
নূতন যৌবন তাতে বাহার দিয়াছে॥
কি কব মাথার কেশ, কাল নাগ হেন।
মঞ্জরি চুলেতে খোস্‌বু আতর যেমন॥
আসিয়া পড়িছে কেশ নীচেতে জানুর।
যেমানি উপরে যেন চমকিছে নূর॥
কি কহিব দুটি আঁখি বয়ান করিয়া।
যেন দুচক্ষেতে পানি চলেছে বহিয়া॥
আহা কি চক্ষের পরে ভুরুজুটি জোড়া।
যেকারাতে কামানেতে দিইয়াছে চড়া॥
নাসিকার কথা আর কি কব সাবাসি।
রাধিকার মনলোভা শ্রীকৃষ্ণের বাঁশী॥
কি দিব তুলনা আমি সে দুটি ঠোঁটের।
যেন আলতা গোলা আছে উপরে মুখের॥
আর সে বত্রিশ দাঁত কি কহিব আর।
আনারের দানা হেন আয়না চমৎকার॥
কি কব গলার কথা নাহি যায় লেখা।
পান খেলে লালি তার সব যায় দেখা॥
আর তার দুটি হাত বেলুন সমান।
কুন্দকার কুন্দে কাটি রাখিল যেমন॥
আর কোমর তার এমন বারিক।
ধরিলে পাঞ্জায় তায় ধরা যায় ঠিক॥

এই বর্ণনা পাঠ করিলে কবিগণের সুন্দরীর আদর্শের একটা আঁচ পাওয়া যায়। এই কবিগণের মতে সুন্দরী হইলেন তিনি—যাঁর রূপ দেবী পরী কিন্নরী বিদ্যাধরী সকলের রূপকে পরাজিত করিয়াছে—যেন প্রভাতাকাশে নবোদিত সূর্য্য অথবা অন্ধ নিশীথিনী বুকে দীপ্তোজ্জ্বল চন্দ্রমা।

—মুনিজনমনোহর তনুলতা পদ্মবর্ণ, মাকাল ফলের ন্যায় লাল. অথবা কাঁচা সোনার মত শোভন।

—যার কেশপাশ দীর্ঘ, আজানু বা আগুল্‌ফলম্বিত, ভ্রমর মেঘ অথবা কালনাগের মত কৃষ্ণবর্ণ। সুন্দর চিক্কণ সিঁথি—কেশের স্বাভাবিক গন্ধ আতরের ন্যায়।

—যার ভুরুজুটি কামান তুল্য অথবা রসিকের মনপাখী বন্ধন করিবার ফাঁদস্বরূপ।

—যার নয়ন মৃগোপম, বক্রকটাক্ষসঙ্কুল অক্ষিপত্রে কালো কাজলের রেখা। অক্ষিতারকা যেন পদ্মের পাপ্‌ড়িতে আসীন ভ্রমর। দৃষ্টি হইতে তরল জ্যোৎস্না ক্ষরিয়া পড়িতেছে। চাহনিতে মদনবাণাহত হইয়া সকলে নিঃসংজ্ঞ হইয়া পড়ে, এমন কি আকাশ পর্য্যন্ত হাহাকার করিয়া উঠে। হাসি দেখিয়া বিজলী চমকের কথা মনে হয়।

—যার নাসিকা উর্দ্ধ-সুন্দর, রাধিকার মনোলোভা শ্রীকৃষ্ণের বাঁশীর মত।

—যার কান ঝিনুকের মত।

—যার বদন কোটি শশধর লাবণ্যে মণ্ডিত, গোল, জবা ফুল তুল্য রক্তিম। পুষ্পভ্রমে ভ্রমর উড়িয়া আসিয়া পড়িতেছে।

—যার দাঁত আনারের দানা, মুক্তা, অথবা আয়নার মত শুভ্র স্বচ্ছ, অথবা মিশিরঞ্জিত।

—যার জবা ফুলের মত লাল জিহ্বা পানের ছোপে আরো সুন্দর হইয়াছে।

—যার বচন কোকিল কুহরণের ন্যায় সুললিত, তোতার বুলির ন্যায় আধ-আধ, আদরমাখানো।

—যার ঠোঁট জবা ফুলের অথবা আলতার মত লাল।

—যার গলা এত স্বচ্ছ ও পাতলা যে পান খাইলে তার লালিমা দেখা যায়।

—যার কুচদ্বয় দেখিলে মনে হয় যেন একজোড়া ডালিম, অথবা নয়া পদ্মকলি—তার চারিপাশে মনভ্রমর

শ্রীবিমল সেন

গুঞ্জরণ করিতেছে, অথবা কোন কুন্দকার যেন সোনায় কুন্দিয়া বানাইয়াছে।

—যার কটিদেশ ভ্রমরসমান চিক্কণ ও সরু, অথবা এত পাতলা যে মুঠোয় করিয়া ধরা যায়।

—যার উরু রামরম্ভা বৃক্ষসম।

—যার হস্ত-পদ বেলুনের মত গোল, কুন্দকলিকার মত পেলব। কবিগণ কোন কারণে তাঁদের সৌন্দর্য্যের আদর্শ ম্লান হইতে দেন নাই।

প্রেমোদ্ভব

সকল দেশের সকল যুগে প্রেমোদ্ভবের একটা বিশিষ্ট ধারা আছে। মানুষের চিত্ত শুধু পারিপার্শ্বিক অবস্থা লইয়া তুষ্ট নয়, মানুষের প্রেমও এম্‌নি পারিপার্শ্বিক অবস্থায় অসন্তুষ্ট। যাহা হাতের বাহিরে, শক্তির বাহিরে, দৃষ্টির বাহিরে তাহাকে আয়ত্ত করিবার একটা দুরন্ত লোভ বরাবরই মানুষের আছে। এই ইস্‌লামি প্রেম কাব্যের নায়ক-নায়িকারাও এই দুর্ল্লভকে আয়ত্ত করিবার সাধনা করিয়াছেন। কাহারও মুখে শুনিয়া হউক্ বা কোন পুস্তক পাঠ অথবা চিত্র দর্শন করিয়া হউক্, নায়ক যখন জানিলেন এক দেশে এক সুন্দরী কন্যা আছে, অমনি নায়ক সেই অদৃষ্টপূর্ব্বা ও অশ্রুতপূর্ব্বা কন্যার প্রেমে 'দেওয়ানা' অর্থাৎ উদাসীন হইলেন। ঘর-সংসার ছাড়িয়া সেই কন্যার উদ্দেশে নিরুদ্দেশ যাত্রা করিলেন। এই যাত্রা সফল হইবে কি না, নায়ক তা ভাবিলেন না—নির্ঝরিণী যেমন পর্ব্বত-গাত্র বাহিয়া বাহিয়া নিজের কক্ষ, নিজের পথ খুঁজিয়া লয়, নায়কও তেম্‌নি এই ভরসায় যাত্রা করিলেন যে এই যাত্রার শেষে তাঁর ঈপ্সিতা প্রিয়ার সঙ্গে মিলন হইবে। প্রেম চিরকালই অন্ধ বটে, কিন্তু চিরকালই সে সাহসী। বাহিরের রূপকে সে দেখিবে না বলিয়া সে অন্ধ। বাহিরের বাধা মানিবে না বলিয়াই সে সাহসী। ইস্‌লামি কাব্যেও প্রেমের এ দ্বৈত রূপ।

বাদ্‌শার ছেলে ছয়ফলমুলুক পিতৃদত্ত একখানা কার্পেটে বর্ণিত একখানি চিত্র দেখিলেন।

'বদিউজ্জামালের ছবি দেখিয়া নমুনা।
হুঁস্‌হারা সাহজাদা হইল দেওয়ানা॥
থর থর কাঁপে অঙ্গ, রতি নাহি স্থির।
কলিজায় বিঁধিল তার পেলোদের তীর॥
ক্ষণে ছবির গলে ধরে, ক্ষণে ধরে পায়।
ক্ষণে মুখে চুমে, ক্ষণে করে হায় হায়॥
ডাইনে বায়ে চাহে ক্ষণে, কখন আশ্‌মানে।
আছাড়ে-পাছাড়ে কখন লোটায় জমিনে॥
হাত মারে কপালেতে মুখে হায়, হায়।
লোটন পায়রার মত জমিনে লোটায়॥'
(ছয়ফলমুলুক)

ছয়ফলের চিত্ত এইরূপে একখানি চিত্রের সঙ্গে প্রেমে পড়িল। কে সে চিত্রিতা নারী, বিবাহিতা কি অবিবাহিতা, হিন্দু কি মুসলমান, হুর্ কি পরী, বৃদ্ধা কি তরুণী, মৃতা কি জীবিতা—এ সব কোন সন্ধান লওয়ার অপেক্ষা না রাখিয়া ছয়ফল প্রেমে পড়িলেন। এই প্রেমাভিভূত অবস্থার উপরই কাব্যখানি জমিয়া উঠিয়াছে। বাদশাহের ছেলে, কত শত পরমাসুন্দরী নারী তার পায়ে-পায়ে ঘুরিতেছে, কিন্তু তাহাদের দিকে তিনি চোখ তুলিয়াও চাহেন না। তাহাদের শত প্রলোভনে তাঁর হৃদয় টলে না। চাতক যেমন নিম্নের নীলনির্ম্মল জল উপেক্ষা করিয়া ফটিক জলের তৃষ্ণায় ঊর্দ্ধে ছুটিয়া যায়, ছয়ফলও তেম্‌নি সেই অজ্ঞাত অখ্যাত চিত্র-নায়িকার আশায় সুদূরের পথে যাত্রা করিলেন। তাঁর চিত্ত নায়িকার চরণে সমর্পিত। তাঁর হৃদয় অস্থির, চঞ্চল। রহিয়া রহিয়া শুধু মনে হয়,—

কি করিনু, কি করিনু, প্রাণ কেমন করে!
হেন চিত্রদরশন, হৈল মন উচাটন,
আর কি পাব সে রতন,
কে আনিয়া দিবে মোরে॥
এ হেন নব কমল, দেখে মন টলটল,
ভুলিব কেমনে বল,
ধৈর্য্য নাহি মানেরে॥
দেখে চিত্র ভ্রূভঙ্গ, ডগমগ করে অঙ্গ,
উথলিল প্রেম তরঙ্গ,
রসেরি ভরে॥
(বড় নিজামপাগলার কেচ্ছা)

প্রেমের এই আবেগে নায়কের অবস্থা দাঁড়ায় অনেকটা রোগীর মত—নায়িকার সঙ্গে মিলন এই প্রেমরোগের একমাত্র মহৌষধ। অন্য কোন রকমেই এ রোগ প্রশমিত হয় না।

> ওগো সখি, প্রেমরোগ, নিষেধে কি যায়।
> ধিকি ধিকি জ্বলে ওঠে, যত বল তায়॥
> রোগের ঔষধি পেলে, তবে রোগ যায় চলে।
> অমিলনে অঙ্গ জ্বলে, করে হায়, হায়॥
> (গোলেনূর)

ইস্‌লামি কাব্যের প্রাণ এই প্রথম দর্শনে প্রেমসঞ্চার। সে দর্শন চিত্রে হউক, দূতীর মুখে হউক অথবা স্বপ্নে হউক, সে দর্শন জলন্ত আগুনের মতই নায়ককে দগ্ধ করিবে।

অভিসার

প্রেমের এই দাহ হইতেই অভিসারের জন্ম। নদী যেমন সিন্ধুমিলন বাসনায় দুর্গম পার্ব্বত্য পথ অগ্রাহ্য করিয়া দুর্দ্দমনীয় বেগে ছুটিয়া চলে, নায়কও তেম্‌নি সংসারের শত সহস্র বাধা উপেক্ষা করিয়া নায়িকা-মিলনে ছুটিয়া চলেন। নায়িকার উদ্দেশে দেশে-বিদেশে পরিভ্রমণ করেন। নদ-নদী, পাহাড়-পর্ব্বত, বন-জঙ্গল তাহাকে বাধা দিতে পারে না। আকাশেও হয়ত তাহার গতি অপ্রতিহত। দৈবশক্তি-সম্পন্ন কোন কার্পেট বা আসনে চড়িয়া সহস্র সহস্র মাইল পথ অতিক্রম করিয়া নায়ক আসিয়া নায়িকার নগরে উপস্থিত হ'ন। কিন্তু নায়িকালাভের অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায় অন্দরমহলের দৃঢ় পাষাণপ্রাচীর—পুরুষের সে মহলে প্রবেশ নিষেধ। অথচ মন মানে না। যে নায়কের সাহস খুব বেশী নয়, তিনি হয়ত নায়িকা যে ঘাটে স্নান করিতে আসেন সেই ঘাটের কাছটিতে বসিয়া নায়িকা-শিকারের জন্য প্রেমের ফাঁদ পাতেন। এ কাজ খুব সহজসাধ্য নয়, এবং সহজসাধ্য নয় বলিয়াই এর বর্ণনা অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। কোন নায়ক হয়ত নিজামপাগলার মত আপনাকে ভৃত্য বলিয়া পরিচয় দিয়া নায়িকার গৃহে ভৃত্যভাবে প্রবেশ করিলেন, এবং নায়িকার মন হরণ করিয়া বাহির হইয়া আসিলেন।

কিন্তু যে নায়ক সাহসী, তিনি হয়ত তিলে-তিলে একটু-একটু করিয়া নায়িকার চিত্তজয় করার অপেক্ষা না রাখিয়া মালিনীর পুত্রবধূ সাজিয়া রাজকন্যার মহলে ঢুকিয়া পড়িলেন, অথবা কোন পরী বা দৈবশক্তির সাহায্যে প্রহরীদের চোখ এড়াইয়া একেবারে রাজকন্যার শয়নগৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কবিগণের বর্ণনা পড়িয়া মনে হয়, রাজকন্যার যেন 'পেটে ক্ষুধা, মুখে লাজ' যাহাকে বলে, সেই অবস্থা। একজন সুন্দর নায়ক যে তাহারই রূপাবিষ্ট হইয়া দূর দূরান্তর হইতে মৃত্যুকে তুচ্ছ করিয়া তাহাকে বরণ করিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছেন এ কথা ভাবিয়া নায়িকা অন্তরে অন্তরে খুবই আনন্দিত হ'ন, এবং প্রথমদর্শনেই 'মন প্রাণ যা ছিল তা' নায়কের পদে সমর্পণ করিয়া বসেন। কিন্তু সংস্কারের বশেই হউক্ বা নায়কের প্রেমকে আরও উদ্দীপিত করার বাসনায়ই হউক্, প্রথমটা তিনি কোপ এবং বিতৃষ্ণা প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু উদ্দাম প্রেমপ্রবাহের মুখে সে বাধা তৃণের মত ভাসিয়া যায়।

> চম্পা বলে—আরে চোর নাহি তোর ভয়।
> রজনী প্রভাত হ'লে যাবি যামলয়॥
> গাজি বলে প্রাণ মোর তোমার কাছেতে।
> কাহার ক্ষমতা আছে, আমাকে মারিতে॥
> তুমি যদি মার তবে মরণ আমার।
> পিরীতে ডুবিয়া প্রাণ করে হাহাকার॥
> (গাজি কালু ও চম্পাবতী)

নায়িকা নায়ককে নিজ প্রাসাদে গোপনে সমাগত দেখিয়া ভয় দেখাইলেন, কিন্তু দু একটি চাটুবাক্যে নায়ক তাহাকে জল করিয়া দিলেন। নায়ক-নায়িকার প্রেমলীলা আরম্ভ হইল—গোপন প্রেমের বিপদও ওৎ পাতিয়া রহিল, কখন তাদের গোপনতার জাল ছিন্ন করিয়া দিবে। কিন্তু প্রেমের দেবতা—ইস্‌লামি কবিদের আসক্ যিনি—তিনি অন্ধ। অভিসারের পথ যে বিপদ্-বাধা মৃত্যুভয়ের মধ্য দিয়া পাতা, এ কথা জানিয়াই তিনি অভিসারে বাহির হইয়াছেন।

ইস্‌লামি প্রেম কাব্য

শ্রীবিমল সেন

মরণের ভয় যদি রইত আসকেরে।
তবে কি ঝাঁপ দিতে পারে এস্কের সাগরে॥
যে জন আসক হয়,
মরণের ভয় তার কি রয়।
কেবল মাশুকের কথা জাগে তার অন্তরে॥
(গুলে বকাওলী)

অভিসার শুধু নায়কেরই একচেটিয়া নয়। নায়িকা যেখানে মিলনের উৎকণ্ঠায় একান্ত অধীরা, সেইখানেই তাহার অভিসারিকার বেশ। অভিসারিকার অন্তরে একটা আকাঙ্ক্ষা ঘুরিয়া-ফিরিয়া বাজে।

যদি বিধি মিলায় আমার সেই পুরুষরতন।
যতনে রাখিব সদাই, দিয়া প্রাণ মন॥
হৃদ্‌পালঙ্কে বসাইব, মধুপান করাইব।
প্রেমের দক্ষিণা দিব এ নব যৌবন॥
(গুলে বকাওলী)

এই বাণী গুঞ্জরণ করিয়া নায়িকা অভিসারে বাহির হইলেন। কবি পয়ারের পর পয়ার বাঁধিয়া প্রেমকাব্য বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু যেখানেই অন্তরের আবেগ পুঞ্জীভূত হইয়া চরমে পৌঁছিয়াছে, সেখানেই তিনি গানের মূর্চ্ছনা তুলিয়াছেন। চিত্রকর যেমন চিত্রকে জীবন্তসদৃশ করার উদ্দেশে কোনখানে রঙ গাঢ়, কোনখানে রঙ পাতলা করিয়া দেন, কবির ভাষাও তেম্‌নি কখনও গানে, কখনও পয়ারে বা অন্য কোন ছন্দে লীলায়িত হইয়া উঠিয়া নায়ক-নায়িকার অন্তরের সংঘাতকে মূর্ত্তিমন্ত করিয়া তোলে। মনের কোণের একটুখানি ব্যথাও কবির চোখ এড়ায় নাই। নায়িকাকেও কবি প্রেমাবেগে সাহসিকা করিয়া তুলিয়াছেন। অভিসারিকা নায়িকা বলিতেছেন—

কোথা গেলে মনচোরা আমারই মন চুরি করে।
তব অন্বেষণে ফিরি দেখে দেখে ঘরে ঘরে॥
যদি দেখা পাই তোমারে, ধরিয়া আপন জোরে।
রাখিব আটক করে, পালাতে কি দিব তোরে॥
রেখে তোরে ভুজপাশে, বাহুডোরা বাঁধিব কসে।
মনোমত সাজা দিব, যখন ইচ্ছা হয়ত মোরে॥
মনবেড়ী দিয়ে পায়ে, যৌবন হাতকড়া দিয়ে।
প্রেমগারদে রাখব কয়েদ্ যাবজ্জীবনের তরে॥
[গুলে বকাওলী]

'দেখে দেখে ঘরে ঘরে' ফিরিয়া নায়িকা হয়ত নায়কের সাক্ষাৎ পাইলেন। শিকারে যে বাহির হয়, ফাঁদও সে পাতে। নায়িকা অভিসারে বাহির হইয়াছেন, কাজেই নায়ককে বন্দী করিবার জন্য প্রেমের জাল তাঁকেই বিস্তার করিতে হয়। কবিদের মত নায়িকারা চিরকালই এ কার্য্যে বিশেষদক্ষ।

নারীর আঠারো কলা বুঝে ওঠা ভার।
কে বুঝিতে পারে ছলা, সাধ্য আছে কার॥
এমনি নারীর গুণ, পাকা বাঁশে লাগায় ঘুণ।
পুরুষে করে খুন, প্রাণেতে করে সংহার॥
নারী এমনি সর্ব্বনাশী, ভুলায় কত যোগী ঋষি।
কহে মহম্মদ্ মুন্সী, নারীর রাঙা পায়ে নমস্কার॥
[বড় নিজামপাগলার কেচ্ছা]

প্রেমকাব্য যখন বিশেষ রূপে জমাইয়া তুলিতে ইচ্ছা হয়, তখনই কবি নায়কের বদলে নায়িকাকে অভিসারে বাহির করেন—নায়িকাকে সাহসিকা করেন। নায়িকা প্রায়ক্ষেত্রেই এক বাণেই শিকার বিদ্ধ করেন। যেখানে নায়ক একান্তই বিমুখ, সেখানেই তিনি শরসন্ধান করিতে ছাড়েন না।

শুনরে রসের ভ্রমর, চাও মোর পানে।
রঙ্গরসে রসখেলা খেলি দুইজনে॥
নারীর যৌবন মোর রসে টলমল।
ভোমর হইয়া লোট রসের কমল॥
নূতন কমলকলি রয়েছে বিকশি।
খাওরে ফুলের মধু ফুলমধ্যে বসি॥
[ছয়ফল মুলুক]

তিলে তিলে নায়িকা নায়কের চিত্ত জয় করিয়া লয়েন। কবিগণের মতে এইখানেই নারীর নারীত্ব।

যৌবন ও প্রেম

প্রেমের শ্রেষ্ঠঋতু বসন্ত, শ্রেষ্ঠ কাল যৌবন। বসন্ত অবসান হইলে যেমন কোকিলের কণ্ঠ বাজেনা, যৌবন অতিক্রান্ত হইলে প্রেমও তেমনি জমাট বাঁধে না। যৌবন যেন একটা পূর্ণপ্রস্ফুটিত পদ্ম, প্রেম তার সুরভিসম্ভার। এক একদিন যায় আর সুরভিবাহী একএকটি পাপ্‌ড়ি ঝরিয়া পড়ে। তাই বাংলার সাধক কবি চণ্ডীদাস গাহিয়াছিলেন,

> জীবন থাকিলে বঁধুরে পাইব.
> যৌবন মিলান ভার।

প্রেমকাব্যের ছত্রে ছত্রে যৌবনের এই প্রেমময়তা, প্রেমের এই যৌবনকে অবলম্বন করিয়া বিকাশ ও পরিণতি। নায়িকার অঙ্গে অঙ্গে যৌবনের প্লাবন আসিয়াছে, আর তার সঙ্গে আসিয়াছে দুরন্ত প্রেমাকাঙ্খা। কিন্তু কোথায় সেই পরমকাঙ্খিত নায়ক, যার স্পর্শে এই প্রেম পল্লবিত হইয়া উঠিবে? নায়িকা হয়ত আজিও অনূঢ়া। বিবাহিতা হইলেও হয়ত তার স্বামী তার প্রতি বিতৃষ্ণ। কাজেই নিরাশায় প্রেম যেন দ্বিগুণিত বেগে ঈপ্সিতকে আশ্রয় করিতে চায়।

'গোলেনূর' ইহার দৃষ্টান্তস্থল। গোলেনূর যখন বালিকা মাত্র তখন তাহার বিবাহ হয়। কিন্তু বিবাহের পর হইতে তিনি স্বামীসঙ্গ বঞ্চিতা, স্বামী তাঁহার কোন সংবাদ নেন না। প্রথমটা গোলেনূর হাসিয়া খেলিয়া দিন কাটাইলেন। কিন্তু ক্ষুদ্র বালিকার দেহে একদিন যৌবনের জোয়ার আসিল, তৃপ্তির নিঃশ্বাসের পরিবর্ত্তে একদিন দারুণ অতৃপ্তির ঝড় বহিল। গোলেনূর যৌবনের চাঞ্চল্যকে প্রশমিত করিতে না পারিয়া বলিলেন,

> এ নব যৌবন কালে, পতি মোর না আইলে,
> কিসে মন রাখি বুঝাইয়া।

চির বিরহিণী নায়িকার এই যৌবনজ্বালা অন্তরকে বিশেষ করিয়া স্পর্শ করে। তার মুখে হাসি নাই, চক্ষে নিদ্রা নাই, সারা রাত্রি বাতি জ্বালাইয়া প্রিয়তমের প্রতীক্ষায় উৎকণ্ঠিত থাকেন। কিন্তু যামিনী পোহায়, প্রিয়তম ত কই আসেন না।

> আমার অমিলনে অঙ্গ জ্বলে করি কি উপায়।
> সারা রাতি জ্বালাই বাতি নিশি যে পোহায়॥
> এ নব যৌবনজ্বালা কত সয় আর।
> সহেনা সহেনা দুঃখ মদনজ্বালার॥

নারীর নব যৌবন যেন জীবন সমুদ্রে ক্ষুদ্র তরণীর ন্যায়। নায়ক তার একমাত্র কর্ণধার। নারীর যৌবন যেন বিকশিত মধুকমল, একমাত্র নায়ক তার মধুপানে অধিকারী। কিন্তু

> পুরুষ নিদয়, না দেখি কোথায়,
> এমন সময়, ফিরে না চায়।
> যার তরে মরি, সে করে চাতুরি।
> কি করি, কি করি, না দেখি উপায়॥
> আমি এ অবলা, যৌবনের জ্বালা,
> কত সব জ্বালা, মদনের দায়।
> কাণ্ডারী বিহনে, এ নৌকা তুফানে,
> রাখিব কেমনে, অকূল দরিয়ায়॥
> এ নব যৌবন, গেল অকারণ,
> পতির বিহনে, রাখা নাহি যায়।

নায়িকা যদি স্বাধীনা হইতেন তবে হয়ত এ যৌবনজ্বালা প্রশমন করা সহজ হইত। কিন্তু প্রায় ক্ষেত্রেই তিনি কুলবতী কুলবধূ। ইচ্ছা না থাকিলেও লজ্জা-ভয়ে তাঁহাকে বেদনাময় গণ্ডীর মধ্যে থাকিয়া যৌবনের জ্বালা পোহাইতে হয়।

> আমি নারী কুলবালা, কত সব প্রেমজ্বালা,
> করতে পাইনা প্রেমের খেলা, বঁধু আমার বাম হৈল।
> থাক্‌তে কাছে ভোম্‌রা বঁধু, শুকায়ে গেল পদ্মের মধু,
> অলি বিনে যায়রে যাদু, কপালেতে এই কি ছিল॥

এ নবযৌবন কি করিয়া রাখা যায়, ইহাই হইল যুবতী নায়িকার প্রধান সমস্যা।

ইস্‌লামি প্রেম কাব্য

শ্রীবিমল সেন

প্রিয় বিনা নারীর যৌবন অকারণ।
কাহারে সঁপিব আমি একাল যৌবন॥
খাওয়ানের দ্রব্য নহে, কাটিয়া খাইব।
বেচিবার চিজ্ নহে, বাজারে বেচিব॥
বাটিবার চিজ্ নহে, দিব ঘরে ঘরে।
প্রিয় বিনা এ যৌবন সঁপিব কাহারে॥
যৌবন অমূল্য ধন নবীন বয়সে।
ফুরাইয়া গেলে আর না পাইব শেষে॥

ফুল শুকাইয়া গেলে যেমন পূজা করিয়া তৃপ্তি হয় না, যৌবন অতীত হইলে তেমনি প্রেম-নিবেদনেও তৃপ্তি হয় না। তাই নায়িকার এ আক্ষেপ, এ করুণ মর্ম্মবেদনা। ধরণীর কক্ষে কক্ষে নরনারী প্রেমের লীলায় বিভোর। নারী তার বাঞ্ছিতের জন্য নিজকে সুন্দর করিয়া সাজাইয়া তাহার প্রতীক্ষা করে, ফুলের মালা গাঁথিয়া বসিয়া থাকে, কখন তিনি আসিবেন, কখন তাঁর গলায় মালা পরাইবে। এই চির-বিরহিনী নারী ফুলের মালা গাঁথিয়া উন্মনা হইয়া বসিয়া থাকে।

'গাঁথিয়া ফুলের মালা দিব কার গলে ?'

দিন আসে দিন যায়। পলে পলে বর্ষচক্র নবীন ঋতু-লীলার ছন্দে আবর্ত্তিত হইতে থাকে, কিন্তু বিরহিণীর বুকে বোঝার পর বোঝা চাপিতে থাকে। ঋতুলীলার বিচিত্র ছন্দ তাহার সহ্য হয় না। তাহার শুধু মনে হয়,

যার প্রিয় ঘরে আছে আনন্দিত মন।
আমি অভাগার চিত্তে তুষের আগুন॥
একেলা যৌবন রাখি নাহি মোর ফল।
তেজিব পরাণ আমি খাইয়া গরল॥
নতুবা পরিয়া মালা হব বৈরাগিণী।
দেশে দেশে বিচ্‌রাইব (=পুঁজিব) প্রিয় গুণমণি॥

এই গেল পতিবিচ্ছিন্না নারীর অবস্থা। পতিগৃহবাসিনী কিন্তু পতি কর্ত্তৃক অনাদৃত নারীর ভাগ্য আরও বেদনাময়। এ যেন পেয় জল সাম্‌নে থাকিতে তৃষ্ণার জ্বালা সহিতে হইতেছে।

থাক্‌তে পতি শুয়ে কাছে উপবাসে যাই।
এমন কপালে কেন পড়ে নাকো ছাই॥

এই খেদোক্তির মধ্যে শুধু যৌবনের জ্বালাই নয়, অসীম গ্লানি এবং আত্মধিক্কারও আছে। যুবতী হইয়া যদি পুরুষকে জয় করিতে না পারে তবে নারী নিজেদের জীবনকে ব্যর্থ মনে করে। নারী পরাজয়ের গ্লানিতে ক্ষুব্ধ ও লজ্জিত হইয়া পড়ে। রবীন্দ্রনাথ 'চিত্রাঙ্গদা'য় নারী-চরিত্রের এই দিক্‌টা সুন্দর করিয়া ফুটাইয়াছেন। ইস্‌লাম কবিগণও এ দিক্‌টা ফুটাইতে চেষ্টার কসুর করেন নাই।

অনাদৃতা নারী কেমন ?

যেমন

'মণিহারা ফণী, জল বিনে মীন,'
জীবন বিনে তনু ক্ষীণ॥'

কারণ স্বামীই নারীর শ্রেষ্ঠ ভূষণ।

যেমন

জাহাজের শোভা জালি বোট। কোমরের শোভা গোট্॥
দাঁতের শোভা মিশি। ছেলের শোভা হাসি॥
বুড়োর শোভা কাশি। রাজার শোভা মুন্সী॥
মুলুকের শোভা বাদ্‌শা। জমির শোভা চাষা।
হাতির শোভা সরা। আয়নার শোভা পারা॥
মোল্লার শোভা দাড়ি। হাতের শোভা ছড়ি॥
পাখোয়াজের শোভা খোল। বাদ্যের শোভা ঢোল॥
গলার শোভা হাঁসুলি। পায়ের শোভা পাঁসলি॥
হাতের শোভা চুড়ি। ছোড়ার শোভা ছুড়ি॥
(গোলেনুর)

এমন যে স্বামী, তাহার বিহনে নারীর জীবন ব্যর্থ হইয়া যাইবে না তো কি! তার বর্ত্তমান হাহাকারে ভরিয়া যায়, তার ভবিষ্যৎ উদ্বেগ আশঙ্কায় কালো হইয়া উঠে। ব্যথিত বক্ষপঞ্জর হইতে যে দীর্ঘনিঃশ্বাস উঠে, তাহাতে একটা অভি-যোগ ধ্বনিত হয়!

যে জানে পিরীতের মর্ম্ম, সে অধর্ম্ম করে না॥
রত্ন বলি যত্ন করে।. ....

মদনজ্বালায় আমি মরি, সে কেন করে চাতুরি,
বল না কি উপায় করি, সে ত ফিরে চাহেনা ॥
(গোলেনুর)

প্রণয়ীর এই অনাদর সময় সময় নারীর মনে প্রতিক্রিয়ার সূত্রপাত করে। নারী ভাবেন, হায়রে! 'এত সাধের প্রেম ক'রে অদৃষ্টে আর সুখ হ'ল না',—'সাধেতে বিষাদ' উপস্থিত হইল। এই প্রতিক্রিয়া শুধু হাহাকারেই পর্য্যবসিত হয় না। পতি প্রবাসে থাকিলে নারীর সান্ত্বনা থাকে, কিন্তু পতি বিমুখ হইলে নারী অশান্ত হইয়া ওঠে। শৈলসমাহিত নদীস্রোত যেমন যেখানে পথ পায় সেইখানে ছুটিয়া চলে, নারীর যৌবনও তেমি যেখানে আদর পায় সেইখানে লুণ্ঠিত হইয়া পড়ে। কুলের বাঁধন খসিয়া পড়ে। সতীত্বের বাঁধন শ্লথ হয়।

ইসলাম কবিরা অনাদৃতা নারীর ছবি আঁকিয়াই থামেন নাই। পুরুষজীবনের সার্থকতাও যে নারীকে পাওয়া, একথা বুঝাইতেও চেষ্টা পাইয়াছেন। নায়িকার রূপ গুণ বর্ণনা শুনিয়া নায়ক আক্ষেপ করিতেছেন,

… …এমন বেকুফ্ নাহি দেখি তোর মত ॥
না দেখিলি তোতা মুখ নয়ন ভরিয়া,
না দেখিলি রঙ-রূপ সেখানেতে গিয়া ॥
না দেখিলি সে গঠন, মরি হায়, হায়!
খাইলি চক্ষের মাথা হইয়া নিদয় ॥
কানে বলে, ওরে কান, কালা তুই হলি।
সে তোতার মুখে কথা গিয়া না শুনিলি ॥
নাকে বলি, ওরে নাক, আছ কি জন্মেতে।
সে গুলের খোসবু তুই নারিলি শুঁকিতে ॥
মুখে বলে, আরে মুখ, কি কর এখন।
সে চাঁদ-মুখেতে নাহি করিলি চুম্বন ॥
কোন কথা নাহি কৈলে মাশুকের সাথে।
আপ শোষ্ রৈল তেরা জেন্দেগী থাকিতে ॥
হাতে বলে, ওরে হাত, বল কি আক্কেলে।
লাজুক্ বদনে হাত কেন না ফেরালে।
(নিজাম পাগলা)

যৌবনজ্বালার পালা গাহিয়া সকল কবিই মিলনের পালা ধরিয়াছেন।

মিলন

নায়কনায়িকার চির-ঈপ্সিত মিলন-মাঙ্গলিক গাহিতে গিয়া কবি বলিতেছেন,

দুজনায় তার পরে, নজরে নজরে গেরে,
গলিতে লাগিল প্রেমের ফাঁস ॥
চার চক্ষু মেলে যদি, উথলিল প্রেমনদী,
প্রেমবদন দিইল সাঁতার।
কেহ কিছু কার তরে, কহিতে নাহিক পারে,
রহে দোঁহে মূরত আকার ॥
(নিজাম পাগ্লার কেচ্ছা)

প্রথমে চোখে চোখে মিলিল। তারপর প্রেমের নদী উথলিয়া উঠিল। নায়ক নায়িকার চক্ষে সমস্ত বহির্জগৎ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। একমাত্র জাগিয়া আছে সেই উদ্বেলিত নদীতে একখানি প্রেমাপ্লুত মুখ। কথা নাই, সাড়া নাই, নিষ্পলক পাষাণমূর্ত্তির মত একে আর এককে দেখিতেছেন! আনন্দাতিশয্যের এই বিহ্বলতা ক্রমে কাটিয়া আসে। নায়ক নায়িকার তখন মনে জাগরিত হয়, যার জন্য তার বুকে এত তৃষ্ণা ছিল, এই সে।

বহুকালের পিয়াশা, সাম্‌নে মিঠাপানি।
নিষেধ না মানে চিত্ত ধরাবে কেমনি ॥
(ছয়ফলমুলুক)

নায়ক নায়িকা পরস্পরকে তপ্ত আলিঙ্গনে বন্দী করিয়া লইলেন। তাহাদের মুখে ফুটিয়া উঠিল পুষ্পের মত লাবণ্য, চোখে আনন্দের আপ্লুত ধারা—

সাহাজাদি নিজামেরে যখনই দেখিল।
বাগে গোলেস্তার মত ফুটিয়া উঠিল ॥
কি বলিতে কিবা বলে, ঠিকানা না মেলে।
ঝরঝর কাঁদে ধ'রে নিজামের গলে ॥
(নিজাম পাগলা)

শ্রীবিমল সেন

এ মধুর মিলন দেখিয়া মনে হয় যেন, 'সোঁদা গাছে পত্র মেলে বসন্ত পানে।' 'কাঙাল' যেন পরশমাণিক পাইয়া ধন্য হইয়াছে।

শুক্‌না গাছেতে যেন ধরিলেক ফল।
শুক্‌না তালাব যেন সরোবরজল ॥
সারাদিন রোজা থাকি যেন রোজাদার।
সাম্‌নে পাইলখানা রোজার ইপ্তার ॥
(গোলেনুর)

প্রেমিক প্রেমিকার মিলনের বাসনা অফুরন্ত। যুগ যুগ মিলনেও এ বাসনার তৃপ্তি হয় না। তাই বৈষ্ণব কবি বিদ্যাপতি গাহিয়াছিলেন,

লাখো লাখো যুগ, হিয়া হিয়ে রাখনু.
তবু হিয়া জুড়ন না গেল।

ইস্‌লাম কবিরাও এই অন্তহীনমিলনের ভাবটিকে ফুটাইতে চেষ্টা করিয়াছেন।

শোন ওহে প্রাণধন !
ইচ্ছা হয় তোমারে রাখি হৃদয়ে আপন ॥
এ বাসনা হয় মনে, রাখি তোমায় সর্ব্বক্ষণে,
হারের সহিত গলে করিয়া যতন।
(গুলে বকাওলী)

নায়িকার পূর্ণ যৌবন, অপরিসীম প্রেম উপেক্ষা করিয়া নায়ক দূরে চলিয়া যাইবে, এ চিন্তাও তাহার পক্ষে অসহ্য। নায়িকা এই আসন্ন বিপদাশঙ্কায় ব্যাকুল হইয়া বলিতেছেন,

কেমনে তেজিয়ে প্রিয় মোরে ছেড়ে যাবে।
দিনে দিনে অলি বিনে কমলকলি শুকাইবে ॥
দেহের জীবন তুমি, কেমনে ছাড়িব আমি।
সময়ে কে ছাড়ে স্বামী ? অসময়ে কিবা হবে ॥
ছিনু বড় আশা করি, প্রিয় হবে প্রেমকাণ্ডারী
বাহিবে প্রেমের তরী। কিরূপে প্রাণ বাঁচিবে ॥
(মালুখাঁ ও রসনেছা কন্যার পুথি)

নায়ক উত্তর দিলেন,

ওরে প্রাণ প্রেয়সি গো ! চাঁদবদনি ! চাঁদের কণা।
না দেখে তোমার তরে আর ত প্রাণ বাঁচে না ॥
তুমি প্রাণ থাক হেথা, আমি যাই পেয়ে ব্যথা।
দিবানিশি তেরা কথা, ও প্রেয়সি ! ভুল না ॥
যাই যাই দেশে যাই, তুমি বই প্রিয়া নাই।
পথে যাই, ফিরে চাই, মন বলে, পাও চলে না ॥ (ঐ)

পা না চলিলেও নায়ককে জোর করিয়া পা চালাইতে হয়। প্রেমকাব্যের প্রাণ যে সংঘর্ষ, তারই আঘাতে নায়ক নায়িকা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন। এ আঘাতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করা অত্যন্ত কঠিন। ভেলোয়াসুন্দরীর পুঁথিতে এ চিত্র সুন্দর ভাবে ফুটিয়াছে।

আমির ভেলোয়াকে প্রাণের অধিক ভালবাসিতেন—এক মুহূর্ত্ত চক্ষের আড় করিতে চাহিতেন না। কিন্তু

শাশুড়ী ননন্দা জান রে যার ঘরে আছে।
কোন মতে সুখ নাইরে, সে বধূর কাছে ॥

ভেলোয়ার কপালেও এত সুখ টিঁকিল না। ভেলোয়া সুন্দরী, ভেলোয়া স্বামীসোহাগিনী, আদরিণী, তার ননদী বিরলা তার সুখ দেখিয়া ঈর্ষান্বিতা হইয়া উঠিল।

এই মত দেখিয়া বিরলার বাড়িল বিদ্বেষ।
আপনি ছিঁড়িয়া ফেলে রে আপনার কেশ ॥

শুধু কেশ ছিঁড়িয়াই বিরলা ক্ষান্ত হইল না। স্থির করিল, যেমন করিয়া হ'ক, ভেলোয়ার এ সুখের স্বপ্ন ভাঙিতে হইবে। আমির এবং ভেলোয়ার এ মিলনকে বিচ্ছিন্ন করিতে হইবে। বিরলা মাকে আপনদলে টানিয়া লইল। মায়ে-ঝিয়ে চক্রান্ত করিয়া আমিরকে ঘরছাড়া করিবার চেষ্টায় লাগিয়া গেল। বলিল, 'ঘরে বসিয়া থাকিলে রাজার ভাণ্ডারও ফুরায়। ঘরে বসিয়া না খাইয়া আমির বাণিজ্যে যাউক।'

মা-বোনের পীড়াপীড়িতে আমির রোজই বলিত, কাল বাণিজ্যযাত্রা করিব, কিন্তু কাল আর ফুরাইত না। বিরলা

রোজই উঠিয়া দেখিত আমির-ভেলোয়ার মুখে সেই মিলনানন্দ, সেই হাসি, সেই প্রেম। অবশেষে বিরলা ভর্ৎসনার বোমার মত ভাইয়ের পরে ফাটিয়া পড়িল। আমির বুঝিলেন, না যাইয়া উপায় নাই। আমির ভেলোয়াকে বুঝাইল, 'পুরুষ মানুষ আমি, আয় না করিলে চলিবে কেন।' ভেলোয়া এ যুক্তি মানিল না। সামান্য অর্থের জন্য এ মিলন-নাটকে অসময়ে যবনিকাপাত হইবে। না না, এ যে সে কল্পনাও করিতে পারে না।

না যাইও, না যাইও সাধু,
বল্‌লাম তোমারে।
হাতের বাজু বেচিয়ারে সাধু
খাবামু তোমারে ॥
না যাইও, না যাইও সাধু
কহি বার বার।
তোমারে খাবামু বেচি
সপ্তনড়ির হার ॥
না যাইও, না যাইও সাধু
আমি করি মানা।
তোমারে বেচিয়ারে খাবামু
গলার সোনার দানা ॥
না যাইও, না যাইও সাধু
মোর প্রাণ ধন।
তোমারে বেচিয়ারে খাবামু
হস্তের কঙ্কণ ॥
না যাইও, না যাইও আমার
আসকের পাগল।
তোমারে খাবামুরে বেচি
কানের শিকল ॥
না যাইও, না যাইও সাধু
মোর জীবনের ভর।
তোমারে খাবামুরে বেচি
সোনালি চাদর ॥
না যাইও, না যাইও সাধু
তোমার পায়ে ধরি।
তোমারে খাবামুরে বেচি
পিন্ধনের শাড়ী ॥

না যাইও, না যাইও সাধু
আমি তোমায় বলি।
তোমারে খাবামুরে বেচি,
গলার হাঁসুলি ॥
না যাইও, না যাইও সাধু
আমারে ফেলিয়া।
ঘরে ঘরে মাগি খাইমু
তোমারে লইয়া ॥

স্বামী যে নারীজীবনের কতখানি জুড়িয়া থাকেন, এ বিলাপ হইতে তাহা স্পষ্ট বোঝা যায়।

কিন্তু নায়িকার এ আকুল আর্তনাদ সংসারচক্রকে থামাইয়া রাখিতে পারিল না। বিচ্ছেদ তাহার বেদনাবিপুল কালিমা লইয়া ঘনাইয়া আসিল। আমির ভেলোয়ার নিকট হইতে বিদায় নিলেন, এবং যাইবার সময় বলিয়া গেলেন, আদরিণী ভেলোয়াকে দিয়া যেন কোন শক্ত কাজ করানো না হয়। গোবর ফেলিলে কন্যার গায়ে দাগ লাগিবে, উঠান কুড়াইলে ধূলা লাগিবে, মরিচ বাটিলে হাত জ্বালা করিবে, পানি আনিলে কাঁকাল ব্যথা করিবে—অতএব ভেলোয়াকে যেন এর একটা কাজও না করিতে হয়। পরিবার পরিজনকে সাম্‌লাইয়া আমির বাণিজ্যযাত্রা করিলেন।

ভেলোয়ার বিরহের প্রথম সপ্তাহ কোন মতে কাটিয়া গেল। এক সপ্তাহ পরে এক পরীর অনুগ্রহে এক রাত্রির জন্য আমির সুদূর হইতে শূন্যমার্গে উড়িয়া ভেলোয়ার কাছে আসিলেন। সে রাত্রি দুইজনের অপরিসীম আনন্দে কাটিল। শেষরাত্রে আমির যেমন নিঃশব্দে আসিয়াছিলেন, তেমনি নিঃশব্দে অন্তর্হিত হইলেন। ভেলোয়াসুন্দরী বিহ্বল অসংযতবেশে ঘুমের কোলে ঢলিয়া পড়িলেন।

প্রভাতে উঠিয়া ননন্দী বিরলা ভেলোয়ার বিহ্বল অবস্থা দেখিয়া পাড়া-পড়শী ডাকিয়া আনিল। তারপর সকলের সাম্‌নে ভেলোয়াকে অভিযুক্ত করিল—

বাণিজ্যেতে গেলেরে ভাই সাত দিন হইল।
সুন্দরী সতী ভেলোয়ারে কোন রসিকে পাইল ॥
সারারাত্রি মজা করে রসিকবন্ধু পাই।
তেকারণে ভেলোয়ার হোঁস কোঁস নাই ॥

শ্রীবিমল সেন

ভেলোয়া প্রাণপণে আত্মসমর্থন করিলেন, কিন্তু তাঁহার কাহিনী অলীক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া হইল। স্থির হইল ভেলোয়া অসতী। তাহার তীব্র শাস্তিবিধান করিতে হইবে পাড়া পড়শীরা নানানরকম শাস্তির বিধান দিতে লাগিল। কুটিলা বিরলা এইবার ভেলোয়ার উপর তীব্র প্রতিহিংসা গ্রহণ করিল। সে বলিল, ওকে আমার ক্রীতদাসী করিয়া রাখি না কেন, তাহা হইলে ওর উচিত শাস্তি হইবে। সকলে অনুমোদন করিলে ভেলোয়াকে জোর করিয়া বিরলার বাঁদীত্বে নিযুক্ত করা হইল। বিরলার সেবা করিয়া, গোবর ফেলিয়া, উঠান কুড়াইয়া, মরিচ বাটিয়া, ভেলোয়ার দিন কাটিত।

> অকান্দনে কান্দেরে ভেলোয়া মরিচ দেখিয়া।
> সাড়ে তিন সের মরিচ বাটেরে ভেলোয়া চক্ষের জল দিয়া॥

বিচ্ছেদের এই করুণ চিত্র দেখাইয়া কবি আবার নায়ক নায়িকার মিলন ঘটাইলেন।

বিরহ

আলোক যে মানুষের কত বড় বন্ধু, অন্ধকারে বসিয়া তা উপলব্ধি করিতে পারি। প্রেমরাজ্যের আলোক—মিলন; অন্ধকার—বিরহ। মিলনে প্রেমের পূর্ণ বিকাশ হয় না, হয় বিরহে। যুগ যুগ ধরিয়া কবিকুল প্রেমের গভীরতা দেখাইতে বিরহের অবতারণা করিয়াছেন। ইস্‌লামি প্রেম-কাব্যে শ্রেষ্ঠ আসন এই বিরহের। রাধাকৃষ্ণের যে চিরন্তন বিরহ-লীলা বাংলার পল্লীতে পল্লীতে কীর্ত্তন হয়, কবি যেন তাহারই ভাবে ভাবিত হইয়া বিরহচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। যখন পড়া যায়, নায়িকা বলিতেছেন—

> বিরহ-বেদনা বিষম যন্ত্রণা সহিতে না পারি বালা।
> দহে মোর চিত, সদা সন্তাপিত, মথুরানগরে কালা॥
> জীব হৈল দায়, প্রাণ না বাঁচায়, ভাবিয়া বিষম জ্বালা।
> (ভেলোয়া সুন্দরী)

তখন মনে হয় চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির বীণা আজিও একবারে নীরব হইয়া যায় নাই। বাঙালী পল্লীকবি আজও 'মথুরা নগরে কালা' গাহিয়া প্রেমের সে অভিনব কল্পলোক সৃজনে ব্যস্ত। এ কল্পলোকের ভিত্তি বিরহ। কবির বিরহিণী নায়িকা আজিও বলেন,

> ভেবে ভেবে তনুক্ষীণ, রাতকে করিনু দিন,
> এই দুখ বলিব কাহারে। (গোলেনূর

এই রাতকে-দিন-করা বিরহসন্তাপে সন্তপ্তা নায়িকার মনে একটা অভিমানের মেঘ সঞ্চিত হইয়া উঠে। দিন-দুয়েকের কড়ারে সে দূরে গিয়াছে, কিন্তু আর ত সে আসিল না।

> মেরা সাথে দুদিনের করিয়া কড়ার।
> আসিবে বলিয়া গেছে, আসিল না আর॥
> (নিজাম পাগলা)

দিনের পর দিন এই বিলাপ করুণ হইতে করুণতর হইতে থাকে।

> আহা মোর প্রাণনাথ, কঠিন রে হিয়া।
> অবলা দাসীরে গেলে সাগরে ফেলিয়া॥
> বিরহ সাগর হেন—কূল নাহি যার।
> পার কর প্রাণনাথ না জানি সাঁতার॥
> একবার দেখা দিয়া শান্ত কর মন।
> নহে ত তোমার শোকে তাজিব জীবন॥
> 'পর' যদি দিত বিধি ডানায় আমার।
> উড়িয়া উদ্দেশ আমি করিতো তোমার॥
> চক্ষু প্রাণ তুমি মোর গেছ রে লইয়া।
> খালি তনু রহিয়াছে জীতে মরা হইয়া॥
> তোমার পালঙ্ক আর অঙ্গুরী তোমার।
> দেখিতেই জ্বলে যেন অগ্নির আকার॥
> মরণের রোগ এই পালক অঙ্গুরী।
> দেখিতে দেখিতে জানি কোন সময়ে মরি॥
> (গাজিকালু ও চম্পাবতী)

আত্মধিক্কারে বিরহের ঘনীভূত অবস্থা বিরহিণীর চিত্ত তাই বিলাপ করিতে করিতে বলে,

আমি অভাগিনী, কঠিন পরাণ
অখিল গর্জ্জ হানে।
হেন প্রাণনিধি, হ'রে নিল বিধি,
অভাগী বাঁচিনু কেনে॥
নবীন বয়সে, প্রেমের আবেশে,
পীরিতি করিলু বাটা।
মোর কল্পফলে, হৃদয়কমলে,
ফুটিল বিচ্ছেদ কাটা॥
(ছয়ফল মুলুক)

মিলনে যে প্রেম থাকে তরল, চপল,—বিরহের উত্তাপে তাহা হয় গাঢ়, ঘনীভূত। নয়নের বহির্ভূত প্রিয়তম লক্ষরূপে বিরহিণীর অন্তরে ফিরিয়া আসেন। বৃক্ষের মর্ম্মরধ্বনিতে চমকিতা বিরহিণী ভাবেন, ঐ বুঝি প্রিয়তম আসিতেছেন। নদীর বুকে চাঁদের প্রতিবিম্ব দেখিয়া বিরহিণী মনে করেন, ঐ বুঝি প্রিয়তমের হাস্যরঞ্জিত মুখখানি নদীর বুকে ভাসিয়া উঠিয়াছে।

চাঁদের দেখিয়া রূপ পানির মাঝার।
সাহাজাদি বুঝিলেন মনে আপনার॥
প্রাণকান্ত বুঝি মোরে চুম্বিতে আইল।
দেখা না পাইয়া তাই পানিতে ডুবিল॥
এমন সময় চাঁদে আবরে আসিয়া।
একেবারে চাঁদে তবে দিল যে ঢাকিয়া॥
আর সেই ছাওা বিবি দেখিতে না পায়।
দেখে ভাবে নাথ বুঝি পলাইয়া যায়॥
'প্রাণনাথ মোর তরে খুঁজে না পাইয়া।
তাই বুঝি পানি-বিচে গেলেন ডুবিয়া॥'
এতেক বলিয়া বিবি কোমর বাঁধিয়া।
কুঁদিয়া পানির পরে ঝাঁপ দিল গিয়া॥
(বড় নিজামপাগলার কেচ্ছা)

নদীবক্ষে প্রতিবিম্ব চাঁদ দেখিয়া অনেক বিরহিণীরই হৃদয়চাঁদের কথা মনে পড়ে, কিন্তু এত বিহ্বল-ব্যাকুল কয়জনে হন যে নদীতে ঝাঁপ দিয়া থাকেন? বিরহিণী বিহ্বলা, দুঃখম্লানা। যত উৎসবের বাঁশী, তার দুঃখ উথলিয়া উঠে। সে যে কত নিঃস্বা, উৎসব যেন তারই পরিচয় দিতে আসে। এই নর নারীর শাশ্বতী প্রকৃতি। যাহা শোভন, যাহা মনোরম, তাহা একাকিনী উপভোগ করিয়া তৃপ্তি নাই। উপভোগের বা আনন্দের ক্ষণে বিরহিণী যার অভাব মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করেন, যে আসিলে তাঁর আনন্দযজ্ঞে পূর্ণাহুতি হয় সে তাঁর প্রবাসী স্বামী। তাহাকে ফিরিয়া পাইবার জন্য নারীহৃদয়ে সে কী আকুলতা, সে কী আর্ত্তনাদ! বর্ষার সঘন ধারায় যখন দিঙ্মণ্ডল কালো হইয়া আসে, যখন বাহিরের সব কিছু লুপ্ত হইয়া অন্তরের অব্যক্ত জাগ্রত হইতে থাকে, তখন বিরহিণীর ব্যথা সেই বর্ষারই মত ঝরিয়া পড়ে। বসন্তের মলয় সমীরণ, কোকিলের মধু গুঞ্জরণ—সকল মধুরতাই তার বিরহব্যথাকে উদ্দীপিত করিয়া তোলে।

আর ডাকিস্ না ওরে কোকিল, সহেনা মদনের জ্বালা।
দ্বিগুণ দ্বিগুণ ওঠে জ্বলে, মদনেতে মন উতালা॥
একে তোর রূপ কালো, আর তুমি নহ ভালো।
সৌরভেতে প্রাণাকুল, মজাইলি কুলবালা॥
এই নিবেদন তোমায় করি, মের না বিচ্ছেদের ছুরি।
অলিকুলে জন্ম তোমার, কলঙ্কের নিয়ে এ ডালা॥
(গোলেনুর)

বাঁশীর তানে বিরহের যমুনা আরও উজান যায়। বাঁশীর তানে কী যেন একটা মাদকতা মাখানো আছে! তাই নন্দ-নন্দনের বাঁশীর তানে একদিন ব্রজনারীবৃন্দ উন্মাদিনী হইয়াছিলেন। বিরহিণীর কর্ণে যখন বাঁশীর তান আসিয়া বাজে, তখন তিনিও আত্মহারা হইয়া ভাবেন ঐ বংশীতানের লহরে লহরে তাহারই কাঙ্ক্ষিত প্রিয়ের আহ্বান আসিতেছে।

একরোজ শুয়েছিনু ঘরেতে আমার।
পতির বিহনে ছিনু বড় বেকারার॥
চেতন হইল মোর আওয়াজে বাঁশীর।
বিরহ-আগুনে ফের হইনু অস্থির॥
টিকিতে না পারি দিল গেল বিগড়িয়া।

শ্রীবিমল সেন

দেখিনু বহুৎ রাত আস্‌মান চাহিয়া ॥
সেই অক্তে নেকালিনু মাকান হইতে।
বাঁশীর আওয়াজ ধরি যাই সে দিনেতে ॥
একেলা রাতকালে নেকালিয়া গেনু।
ভয়ডর কিছু আমি সে সময় না পেনু ॥
আজিম দরিয়া এক সামনে মিলিল
দরিয়ার পাশে বাঁশী বাজিতে লাগিল ॥

বিরহিণী নায়িকা কাষ্ঠভ্রমে মড়ার ভেলায় সে দরিয়া পার হইলেন। তারপরই গতিরোধ করিল এক দেয়াল। তিনি তাহাও অতিক্রম করিলেন দড়িভ্রমে সাপের লেজ ধরিয়া। এই সর্পতে রজ্জুভ্রম বিরহের প্রগাঢ় অবস্থা। বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের কাহিনীর ছায়া এইখানে আসিয়া পড়িয়াছে। বিরহিণীর এই আত্মহারা অবস্থা অতি স্বাভাবিক। যাহা মানুষের প্রাণের চেয়ে প্রিয়, তাহা সে হারাইয়াও হারাইতে চায় না। মনে ভাবে, যে গিয়াছে সে চিরদিনের মত যায় নাই। আবার সে আসিবে, আবার তার অনাবিল ভালবাসার সুধাধারায় আমার এ বিরহব্যথিত চিত্ত শীতল করিবে। যাহাকে হারাইয়াছি, তাহাকে চিরদিনের মত হারাইয়াছি, এ চিন্তা পর্য্যন্ত তাহার পক্ষে অসহ্য।

ইস্‌লামি কবিদের বর্ণনায় নায়িকা মালঞ্চের মত। বসন্তের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে বৃক্ষ হইতে পুষ্পসমূহ ঝরিয়া পড়িয়াছে। পড়ুক্ না। আবার বসন্ত আসিবে, আবার ফুল ফুটিবে।

শোনহে মালঞ্চ তুমি খেদচিন্তা কর না।
আসিবে বসন্ত ফিরে, তাকি তুমি জাননা ॥
পর্ণপুষ্প বিকশিবে, বুলবুলা আসিয়া তবে,
মত্ত হইয়া প্রেমভাবে পুরাইবে বাসনা ॥
(ভেলোয়া সুন্দরী)

অথবা বিরহিণী নায়িকা যেন রৌদ্রম্লান প্রদীপ।

না কাঁদ প্রদীপ বেশী, যদি গত হইল নিশি,
পুনঃ ফের আসিবে নিশি, সেই সমন্ধে ভেবনা ॥

বিরহিণীর সমস্ত অন্তরাত্মাও যেন তখন এই আশ্বাসে সঞ্জীবিত হইয়া উঠে।

তব আসার আশে, থাকি চেয়ে দিবারাতে,
কতদিন প্রাণনাথ আসিবে হেথায় ॥
কই কোথা এলে তুমি, তোমার লাগিয়ে আমি,
দিবানিশি ঘুরে মরি বিরহজ্বালায় ॥
(ছহীগুলে বকাওলী)

বিরহ-বারমাসী

এই বিরহজ্বালা বুকে লইয়া বিরহী-বিরহিণীর মাসের পর মাস কাটাইতে হয়। প্রত্যেক মাসেরই এক একটা বৈশিষ্ট্য আছে, তাই প্রত্যেক মাসেই বিরহবেদনা বিশেষ করিয়া অনুভূত হয়। কবি তাহারই বর্ণনা করিবার উদ্দেশ্যে বারমাসীর আম্‌দানি করিয়াছেন। বাংলা প্রাচীন সাহিত্যে অসংখ্য বারমাসীর বর্ণনা আছে। ইসলামি কবিরা তাহারই অনুকরণ করিয়াছেন।

বৈশাখ

প্রবেশ বৈশাখ, সময় নিদাঘ,
রাগতাপ খরতর।
আদিত্যকিরণ, না যায় সহন,
শান্তি নাহি মনে মোর ॥
যাহার কারণ, রাখিলাম যৌবন,
সেই কেন নাহি পায়।
যৌবনরমণী, জোয়ারের পানি,
ভাটি লক্ষো চ'লে যায় ॥

বৈশাখে প্রবেশ করিয়াই বিরহিণী অনুভব করেন তাঁর যৌবনযমুনায় ভাটি লাগিয়াছে। বৈশাখের দাবদাহ বিরহজ্বালাকে প্রখরতর করিয়া তোলে। শুধু তাই নয়।

বৈশাখ মাসেতে ফোটে ফুল নানা রসি।
ভোম্‌রায় মধু খায় ফুলমধ্যে বসি।
ভোমরার গুণগুণে দগধে পরাণ।
আমার ফুলের মধু কে করিবে পান ॥

ফোটা গন্ধভরা ফুল দেখিয়া মনে হয়, সে-ও তো একটি ফুলের মত সংসারবৃক্ষে ফুটিয়া আছে, কিন্তু যাহার জন্য ফুটিয়া আছে, কোথায় সে ভ্রমর? তাহার মধু যে বিফলে বিরহ-মরুর বাতাসে বিলীন হইয়া গেল।

আর বিরহীর মনের অবস্থাও এইরূপ।

এহিত বৈশাখ মাস, নানা পুষ্পের বাহার।
যাহার প্রিয়া কাছে, গলে দেয় পুষ্পহার হে॥
মোর প্রিয় নাহি কাছে কারে দিব হার।
এ ফুলের বাহার আমার অগ্নি-অবতার হে॥

জ্যৈষ্ঠ

প্রবেশ জ্যৈষ্ঠল, হৃদয় কমল,
ভাঙিয়া আমার পড়ে।
মোর কর্ম্মফলে, কান্ত নাই কোলে,
এ দুঃখ কহিনু কারে॥

এ বিলাপের ছন্দে-ছন্দে বিরহিণীর বুকের রক্ত যেন টস্-টস্ করিয়া ঝরিতেছে। কাহারে এ দুঃখ সে কহিবে। আমের বনে আম পাকিয়াছে। সকল নারী নিজের হাতে অতি যত্নে আম কাটিয়া তাদের প্রিয়তমদের খাওয়াইয়া ধন্যা হইতেছে। কিন্তু সে কি অভাগিনী।

'পতি বিনে কারে আমি চিপড়িয়া দিব?'

বিরহীও দূরে বসিয়া ভাবে, হায়, আজ সে যদি কাছে থাকিত, তবে এই আম পাকা সার্থক হইত। সে আমাকে খাওয়াইত, আমি তাকে খাওয়াইতাম।

এ হিত জ্যৈষ্ঠ মাস আম্র পাকে গাছে॥
হাসিমুখে খায় খাওয়ায়, যার প্রিয়া কাছে হে॥
মোর প্রিয়া নাহি কাছে, কে খাওয়াবে মোরে।
তাহাতে বঞ্চিত আমি পরাণ বিদরে হে॥

আষাঢ়

আষাঢ়-আকাশে ঝম্-ঝম্ করিয়া বর্ষার ধারা বয়। বিরহ আকাশেও তখন অশ্রু বর্ষার ঘন ধারা। বাহিরের বর্ষা দেখিয়া মনে হয় সমস্ত প্রকৃতি যেন বিরহী বিরহিণীদের দুঃখে সমবেদনার অশ্রু ঢালিতেছে। বিরহিণী বিভোর অশ্রুসিক্তা হইয়া গলিত মেঘরাজ্যের দিকে চাহিয়া আছেন। হঠাৎ নীলোজ্জ্বল বিজলী-প্রভায় কৃষ্ণাভ ধরণী মুহূর্ত্তের জন্য আলোকিত হইয়া উঠিল, তারপরই ভীষণ গর্জ্জন!

আইল আষাঢ়, বৃষ্টি অনিবার,
চমকে সঘনে দামিনী।
মেঘের গর্জ্জন, শুনি ভয় মন,
লাগে অতি একাকিনী॥

একাকিনী নারী বজ্রধ্বনিতে শিহরিয়া উঠিয়া একাকিনীই শয্যাতলে লুণ্ঠিতা হইয়া পড়েন। আর এই ভাবিয়া আকুল হন যে, আজ যদি সে কাছে থাকিত, তাহা হইলে এই মুহুর্মুহুঃ বজ্রধ্বনি-কম্পিতা বিহগীকে সে তার বক্ষের কুলায়ে আশ্রয় দিয়া বাঁচাইত—নারী সে, তাকে এমন একাকিনী শয্যাতলে ভয়ে কাঁপিতে হইত না।

আষাঢ় মাসেতে হয় ঘন বরিষণ।
ঘোর অন্ধকার হয় বিজলী গর্জ্জন॥
প্রাণ করে থর থর, বিজলী গড় গড়ে।
পতি যার কাছে আছে জড়াইয়া ধরে॥

ভয়ের মুহূর্ত্তে ভালোবাসার জনকে জড়াইয়া ধরায় যে কী শান্তি, তাহা যাহার ভালোবাসার জন কাছে নাই সেই জানে।

বিরহীও দূরে বসিয়া ভাবে, এ বর্ষাব্যাকুলা ধরণীর তারে তারে যে করুণ সুর ধ্বনিয়া যাইতেছে, এ যেন তাহারই অব্যক্ত বেদনার অভিব্যক্তি। এক একবার বজ্রধ্বনি হয়, আর সে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ভাবে, এই এমন সময় একখানি তনুলতা ভয়ে-ভয়ে তাহারই বুকে আসিয়া আশ্রয় নিত। আজ সে বুক শূন্য, আজ প্রিয়া দূরে, আজ এ বুক জড়াইয়া ধরিবার জন কাছে নাই।

এহিত আষাঢ় মাস, মেঘের গর্জ্জনি।
প্রিয়া নাহি কাছে মোর মেঘনাদ শুনি হে॥
ভয়েতে হইয়া ব্যস্ত ধরে সাপটিয়া।
মোর প্রিয়া নাহি কাছে, কে ধরে আসিয়া হে॥

ইস্‌লামি প্রেম কাব্য

শ্রীবিমল সেন

শ্রাবণ

শ্রাবণ মাসেতে পানি উথলে সাগরে।
খাল-নালা-চলাচল জোয়ারের তোড়ে ॥
অভাগীর যৌবন জোয়ার হইল কেমন।
পতি বিনে সে জোয়ার না হবে বারণ ॥

ভাদ্র

ভাদ্রল প্রবেশ, বরিষার শেষ,
বন্ধু মোর না আসিল।'

বন্ধু বিদেশে গিয়াছেন। আষাঢ়-শ্রাবণের বর্ষণের অত্যাচারে তিনি ফিরিতে পারেন নাই। আজ ভাদ্রের গাঙে তিনি তরী ভাসাইয়া আসিবেন!

কী সুন্দর! কী আনন্দচঞ্চল এই ভাদ্রের নদী! ভাদরে আদরিণী সাজিয়া নদী আজ সমুদ্রমিলনে চলিয়াছে—আজ জলরাণীর স্বয়ম্বর, আজ নদীর লহরে মিলনগীতি। সে মিলনগীতির মূর্চ্ছনা প্রেমিক-প্রেমিকার হৃদয়েও মিলন-বাসনা জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছে। প্রেমিক প্রেমিকাকে লইয়া তরী ভাসাইয়াছেন। তরী ঢেউয়ের দোলায় নাচিতেছে, আর প্রেমিকা ভয়কম্পিত কলেবরে প্রিয়ের বুক সবলে জড়াইয়া ধরিতেছেন। আজ বিরহী একাকী।

এহিত ভাদ্র মাস জলের অতি বেগ।
'কোষ' আরোহণে বেড়ায় আসক্-মাশুক্ হে ॥
মোর প্রিয়া নাহি বেড়াইব কাকে নিয়া।
প্রিয়া বিনা দিবানিশি জ্বলে মোর হিয়া ॥

আর বিরহিণী? তাহার মনের অবস্থা আরও ব্যথাতুর। তাহার চোখে শুধু বাহিরের ভরা গাঙই ছল-ছল করে না, তাহার নিজের অন্তরের মধ্যেও যে একটা প্রেমের গাঙ উচ্ছলিত, তার দেহের অণুতে অণুতে আজ যে একটা যৌবনের গাঙ উচ্ছ্বসিত, তাই তাহার চোখে বেশী করিয়া জাগে। সে হাহাকার করিয়া বলে,

ভাদ্র মাসেতে হয় পানির স্বয়ম্বর।
আনন্দে চালায় রথী সাউদ সদাগর ॥
আমার যৌবননদী কেবা দিবে পাড়ি।
পতি বিনে কে হইবে যৌবনের বাপারি ॥

আশ্বিন

আগমনী সুরে নাচিতে নাচিতে শিউলি-ফুলের মুক্তা ছড়াইয়া শরৎ আসিয়াছে। প্রবাসী আজ দূর দেশান্তর হইতে ঘরে ফিরিয়াছে। অভাগিনী বিরহিণীর পতি শুধু আজও ফিরে নাই।

আশ্বিনের শেষ, না আইলা দেশ,
মোর অতি দুখভার।

এই দুঃখভারজর্জ্জরিতা বিরহিণীর চোখে শরতের সকল শোভা ব্যর্থ হইয়া যায়। বিরহিণী দেখে শুধু আকাশজোড়া দুঃখ। ঐ যে শরতের উদ্যানে ফুল ধরিয়াছে, উহাতে অলি বসিতেছে না। উহা অনাদরে ঝরিয়া পড়িতেছে। হায়, আশ্বিন কি ভাগ্যহীন! যাহার জন্য সে ফুলের পসরা সাজাইয়া আছে, সে অলি ত কই আসিল না।

হৈব আমি অভাগিনী আশ্বিন মতন।
ফুল না বসিল অলি থাকিতে যৌবন ॥

কার্ত্তিক

কার্ত্তিকে ধানের ক্ষেত শস্যভারে অবনত। তাই ঘরে ঘরে আনন্দ। বিরহিণী শুধু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া ভাবেন, আমার ক্ষেত আজও শূন্য,—ফসল কাটার সময় আসিল—আমি কি কাটিব?

রাত্রে টুপ্‌টুপ্ করিয়া শিশির পড়ে। বিরহিণী ভাবেন, আকাশ যেন তাঁহারই মত বিরহব্যথায় গলিয়া পড়িতেছে।

'নিশির শিশির, অঙ্গ নহে স্থির
কোথা যাব বিরহিণী ॥'

অগ্রহায়ণ

কুটীরের সাম্‌নে উদ্যানে তিলের চাষ করা হইয়াছিল। আজ সেই তিলে ফুল ধরিয়াছে। তাহাদের ঘিরিয়া মধুপদল আজ গুঞ্জনরত। আজ আবার আনন্দের বাঁশী বাজিয়াছে। কিন্তু

'আমি অভাগীর অঙ্গ অনলে দাহন।'

বিরহিণী সে। তার তো প্রিয় বিনা কোন সুখই মনে জাগে না।

পৌষ

পৌষ হইল বৈরী, আমি একেশ্বরা,
হেমন্তের বাণ অতি।
উত্তর সমীর, শুকায় শরীর,
অভাগীর কিবা গতি॥
হেমন্তের বাণ, মর্ম্ম খান্ খান্,
অঙ্গ কাঁপে থর থর।
আহা প্রাণপতি, নিষ্ঠুর প্রকৃতি।
না লইলা সঙ্গে মোর॥

গৃহে বসিয়া বিরহিণী বিলাপ করেন। প্রবাসে বিলাপ করেন বিরহী।

এহিত পৌষ মাস নানা খাদ্যের বাহার।
সকলে খাবে সুখে, কে খাওয়াবে মোরে হে॥

প্রিয়ার হাতের পেলব স্পর্শ না থাকিলে কোন খাবারই যে সুমিষ্ট হয় না, বিরহী প্রবাসে বসিয়া মর্ম্মে মর্ম্মে তা উপলব্ধি করেন।

মাঘ

বিরহিণী—মাঘের জারে বাঘের অঙ্গ কাঁপে থর থর।
পতির বুকে যেই নারী শোয় একান্তর॥
শীত জার নাহি কিছু সেই নারীর অঙ্গে।
অভাগিনী মরি জারে, পতি নাহি সঙ্গে॥

প্রবেশ মন্দিরে, যুবতী সকল,
হিম ভয় মনে গুণি।
স্বামী সঙ্গে মিলি, করে কোলাকুলি
অভাগিনী একাকিনী॥
হিমেতে দহিয়া, মম অঙ্গ হিয়া,
হইল আমার কালা।
হেন শীতকালে, কান্ত নাহি কোলে,
কত সহে প্রাণে জ্বালা।

বিরহী—এহিত মাঘ মাস, শীতের অতি বেগ।
লেপ গাত্রে নারী পুরুষ থাকে এক সাথ॥
মোর প্রাণ-প্রিয়া নাই, কে রহিবে কাছে।
বিরহ-অনলে প্রাণ দাহন হইছে॥

ফাল্গুন

কোকিল বসন্তের আগমনী গাহিয়া বিরহীর দুয়ারে আসিয়া ঘা দিয়াছে। বিরহী ভাবিতেছেন—

এহিত ফাল্গুন মাস, বসন্তের বাহার।
কোকিল করিছে গান, কুহু কুহু স্বর॥
বিরহবিচ্ছেদে পোড়া অন্তর যাহার।
কোকিলের স্বরে প্রাণ বাঁচা তার ভার॥

বিরহিণীর কাছেও ফাল্গুন আগুনের অবতার।

ফাল্গুনে বসন্তবায়ে কুহরে কোকিলে।
নারীর শরীর দহে বিচ্ছেদ-অনলে॥
যার পতি ঘরে আছে নিভায় অনল।
অভাগীর পতি নাই কে ঢালিবে জল॥

কোকিলের কুহরণে প্রাণে আগুন জ্বলিয়া উঠে। প্রিয়তমের আদর সে আগুন নিভাইবার একমাত্র জল। কিন্তু তিনি তো কাছে কাছে নাই। এ অগ্নিকুণ্ডে সে জল ঢালিবে কে?

এই আগুনে এমন করিয়া দগ্ধ হইতে হইবে, এ জানিলে কে এ প্রেম করিত। এ যে সাধ করিয়া কাটারি গিলিয়াছি; গিলিতেও পারি না, ফেলিতেও পারি না।

শ্রীবিমল সেন

মদনের বাণ, অঙ্গ খান্ খান্
নিজ কান্তে মনে স্মরি।
সহিতে না পারি, খাইমু কাটারি,
যৌবন হইল বৈরী॥

চৈত্র

এম্‌নি ব্যথায় ব্যথায় বর্ষ শেষ হইয়া চৈত্র আসিল গ্রীষ্ম তাহার অনললীলা লইয়া আকাশের কোণে দেখা দিল। হুহু করিয়া উতলা বাতাস বয়, আর তপ্ত ধূলিজাল বাতায়ন পথ বাহিয়া উদাসিনী বিরহিণীর গায়ে তপ্ত লৌহশলাকার মত বিদ্ধ হয়। বিরহিণী অশ্রুপূর্ণ নয়নে ভাবেন,

চৈত্র মাসেতে বড় ধূলের তাড়ন।
চট্ ফট্ করে অঙ্গ জ্বালায় দাহন॥
যার পতি ঘরে আছে, শীতল সে নারী।
পতি বিনে অভাগিনী জ্বলে পুড়ে মরি॥

শুধু কি ধূলির তাড়ন? বসন্ত-চারী কোকিল আজিও কুহরণক্ষান্ত হয় নাই।

বাতায়নপার্শ্বে উদ্যান—উদ্যানে ফুলে ফুলে উন্মুখ ভ্রমরের গুঞ্জন। যেন নবযৌবনা পরীর দল পাখা ছড়াইয়া ভ্রমর বঁধুকে হৃদি-সঞ্চিত মধুপানে আহ্বান করিতেছে, আর মধুকরবৃন্দ সে আহ্বানের প্রতিধ্বনি তুলিতেছে!

চৈত্রেতে তপন, অগ্নির পবন,
সদা হানে প্রেমবাণ।
শুনি পিকনাদ, ঘটায় প্রমাদ,
বিকল সদাই প্রাণ॥
আহা প্রাণেশ্বর, দহে কলেবর,
হইল অলি প্রাণ বৈরী।
সদাই গুঞ্জরে, বসি পুষ্পপরে,
মধু খায় মোরে হেরি॥

বিরহের বার মাস এইরূপ এক অবিচ্ছিন্ন দুঃখের দীর্ঘ ইতিহাস। প্রাণ দিয়া অনুভব না করিলে এ বারমাসীর সার্থকতা বোঝা যায় না।

পীরিতি

প্রেমতত্ত্বের আলোচনা বা উদাহরণ প্রসঙ্গে ইস্‌লামি প্রেমকাব্যসমূহে প্রেমের যে স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে তাহা বাস্তবিকই অপূর্ব্ব। প্রেম বা পীরিতি কবির চক্ষে শুধু যুবক-যুবতীর আসক্তি বা বহির্মিলন নয়। ইহা হইল পবিত্র আন্তরিক একাত্মতা। এই পীরিতির উপর ভগবানের অজস্র আশীর্ব্বাদ। ভগবদ্-অনুগ্রহ ব্যতিরেকে কেহ এই পীরিতির মর্ম্ম অনুধাবন করিতে পারে না। প্রেম আমাদের দেহের অণু-পরমাণুতে পরিব্যাপ্ত; কিন্তু তাহা আমরা উপলব্ধি করিতে পারি না, যদি না ভগবানের কৃপায় আমাদের দিব্য নেত্র উন্মীলিত হয়।

'কেরামন কাত বিনে, তনু জ্ঞান চক্ষু কানে,
নাহি জানে থাকিয়া অঙ্গেতে।'

আমার দেহ, চক্ষু, কান, আমার বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান কেহ তাহার সন্ধান দিতে পারে না ভগবানের কৃপা চাই। কারণ, এই প্রেম স্বয়ং ভগবানের সৃষ্টি। এমন এক দিন ছিল, যখন ভগবান ছিলেন একা, আদি, অব্যক্ত। তখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ছিল না, গ্রহ উপগ্রহ ছিল না, বিচিত্র জীবজগৎ ছিল না। সে একাকীত্ব বুঝি ভগবানের ভালো লাগিল না। তাঁহার ইচ্ছা হইল তিনি প্রেমের লীলা করেন তাই বিশ্বভুবন সৃষ্ট হইল, জীবজগৎ সৃষ্ট হইল। আর বিশ্বের অণুপরমাণু ব্যাপ্ত করিয়া রহিল প্রেম। এ প্রেম আস্বাদ করিবার জন্য ভগবান মহম্মদরূপে অবতীর্ণ হইলেন।

পূর্ব্বে প্রভু নিরাকারী, প্রেমধন সৃষ্টি করি,
সেই প্রেমে মজিয়া নিজেতে।
আপনার তেজ দিয়া, আজ্ঞা কৈল, গেলা হইয়া
সাকার মহম্মদ নামেতে॥

তাই প্রেমময় ভগবান্ তাঁহার সৃষ্ট নরনারীর কাছে ভয় চাহেন না, ভক্তিও চাহেন না। চাহেন হৃদয়ভরা বিরাট ব্যাকুল প্রেম। কিন্তু প্রশ্ন হইতে পারে, নিরাকার যিনি,

কেমন করিয়া তাঁহাকে ভালবাসিব? কবিগণ এর উত্তর দিয়াছেন। মানুষকে ভালবাসিলেই ভগবানকে ভালবাসা হয়।

সাকারে কি নিরাকারে, যাহাতেই প্রেম করে,
লভ্য তাহে প্রেমেতে মজিলে।

ইসলামি শাস্ত্রের কথা জানি না, কিন্তু ইসলামি এই প্রেমকাব্যের কথা বলিতে পারি, কবিগণ মানুষকে পরমেশ্বরের সাকার বিগ্রহ বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। আমি গাজি-কালুর তর্ক হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব, এ ধারণা তাঁদের মনে কতদুর ভিৎ গাড়িয়া বসিয়াছে।

কালু বলে, নাহি আছে খোদার আকার।
গাজি বলে যত মূর্ত্তি সকলই তাঁহার।।

তাই মানুষকে ভালবাসিলে সে ভালবাসা ভগবানের চরণেই পৌঁছে। প্রেমিক-প্রেমিকার শুদ্ধ প্রেম উভয়ের হৃদয়কে শুদ্ধ নির্ম্মল উজ্জ্বল করিতে থাকে। তারপর এক শুভ মূহূর্ত্তে তুই প্রাণ এক হইয়া যায়। তুই দেহ, এক প্রাণ। প্রেমময় ভগবান সেই একাত্ম প্রেমিক-প্রেমিকার হৃদয়ে আসন পাতেন।

প্রেমিক গাজী ও প্রেমিকা চম্পাবতী শুদ্ধ প্রেমে এমনই একাত্ম হইয়া গিয়াছিলেন। কালু গাজী তুই ভাই ধ্যানে বসিয়াছেন। কালু ভগবানের ধ্যান করিতেছেন, কিন্তু গাজির ধ্যানস্তিমিত নেত্রের সম্মুখে চম্পাবতীর মূর্ত্তি ভাসমান।

কালু বলে, এই ধ্যানে খোদাকে হারাবে।
গাজি বলে, এই ধ্যানে খোদা লভ্য হবে।।
'চম্পাকে পাইবে কবে' কালু সাহা বলে।
গাজি বলে তুই মন এক হইয়া গেলে।।

তুই মন যখন এক হইয়া যায়, তখন লালসা বা কামের কথার উদয় হয় না। অন্তরে তখন অনন্ত রূপের সমুদ্র ঢেউ খেলিয়া যায়। তাহার তলে পরমমাণিক। প্রেমিক সে-প্রেমসাগরে ডুব্ দিয়া সে-মাণিকের সন্ধান করেন।

কালু বলে কি করিবে পাইলে তাহারে।
গাজি বলে মিশে যাব সে রূপসাগরে।

রূপ! রূপ! রূপ! সর্ব্বত্র প্রিয়তমার রূপের সমুদ্র লীলা। যেদিকে চাই, সেইদিকে সে।

কালু বলে, চম্পাবতী কোথায় এখন।
গাজি বলে, চাহি দেখ মেলিয়া নয়ন।।
কালু বলে, এইভাবে কতদিন রবে।
গাজি বলে ছাড়াছাড়ি আর নাহি হবে।।

অল্পপরিসরের মধ্যে যাহারা প্রিয়তমার সঙ্গে মিলন চায়, তাহাদের বিরহের ভয় আছে, কিন্তু মিলনের ক্ষেত্র যাহাদের বিরাট্ তাহাদের বিরহ কোথায়? এই জড়দেহ দিয়া পাওয়াকেই তাহারা চরম পাওয়া মনে করে না। তাহারা মিলন উপভোগ করে অন্তর দিয়া। প্রিয়ার কথা ভাবিতে ভাবিতে বিশ্ব তাহাদের প্রিয়াময় হইয়া যায়। গাজি সেই মিলনের সাধক।

গাজির যোগ্যা সহধর্ম্মিনী চম্পাবতী এই মিলনানন্দে বিভোর। গাজি কাছে নাই, তাই বলিয়া চম্পাবতী তাঁহাকে হারান নাই।

বিরলে বসিয়া ধ্যান করে চম্পাবতী।
ভাবিতে ভাবিতে চম্পা হইল এমন।
যেদিকে যখন চায় মেলিয়া নয়ন।।
দেখেন গাজির রূপ করে ঝিকিমিকি।
নয়ন ভরিয়া রূপ দেখে চন্দ্রমুখী।।
আকাশ পাতাল আর চতুর্দ্দিকেতে।
গাজি বিনে আর কিছু না দেখে চক্ষেতে।।
ভাবিতে ভাবিতে সেই রূপ মনোহর।
পার হইয়া গেল চম্পা রূপের সাগর॥
আপনার কায়া-ছায়া সব পাশরিয়া।
একেবারে চম্পাবতী গেল গাজি হইয়া।।
গাজী হইয়া চম্পাবতী ভাবে আপনায়।
কেবা ছিল চম্পাবতী খুঁজিয়া না পায়।।

চম্পা সাধনার শেষ অবস্থায় চির-মিলনের রাজ্যে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। ইহার পরেই খোদা তাঁহাকে উদ্ধার করিবেন।

ইস্‌লামি প্রেম কাব্য

শ্রীবিমল সেন

কী সুন্দর প্রেমের এই পরিকল্পনা। পড়িতে পড়িতে মনে হয়, এক নূতন রাজ্যের অর্গল ধীরে ধীরে খুলিয়া যাইতেছে। সেখানে ভালবাসার মঞ্চে দাঁড়াইয়া ভগবানের নাগাল পাওয়া যায়। সেখানে কবির বীণা ঝঙ্কার তুলিয়া বলে,

ভাবিতে ভাবিতে সেই রূপ মনোহর।
পার হইয়া গেল চম্পা রূপের সাগর ॥

প্রেমিকের উপমা

প্রেম বিরাট। মানুষের ভাষা তাহার বিরাটরূপ ব্যক্ত করিতে পারে না। কিন্তু দুরন্ত অবুঝ্ শিশু যেমন চাঁদ ধরিবার আশায় হাত বাড়াইয়া থাকে, কবিকুলও তেম্‌নি এই অসাধ্যসাধনে তাহাদের সমস্ত উপমা প্রয়োগ করিয়াছেন।

প্রেমিকার কাছে প্রেমিক কি? না—

প্রাণনাথ, প্রেমরসের চাঁদ, মুখের হাসি, অমূল্য রতন, ধড়ের জীবন, জেন্দেগীর বাস, রঙ্গের উল্লাস, ভুখের ভক্ষণ, গ্রীষ্মের পবন, নিশিকালের রঙ্গ, কানের কর্ণফুলী, চক্ষের পুতুলী, মধুর ভাণ্ডার, অগ্নির শীতল, আনন্দমঙ্গল, জোটের খেলোয়ার, রঙ্গের পোষাক, ফানুসের চেরাগ, ছামনের আয়না, রঙ্গের ছামান, নিশিরাত্রের সাথী, আঁধারের বাতি, নয়নের জ্যোতি, হার গজমতি, ফুলের ভোমর, যৌবনের চোর, কমলের অলি, রূপের মুরলী, জসনের জসিক, রসের রসিক, ধুপকালের ছায়া, নয়াবাগের মেওয়া, কস্তুরী কাফুর, সিঁথির সিঁদুর, নয়নের কাজল ইত্যাদি ইত্যাদি।

প্রেমিক ও প্রেমিকাকে অনুরূপ বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন।

রসিক

ইস্‌লামি কবিদের ভাষায়, যার প্রেম একনিষ্ঠ, তিনি রসিক। রসিক যাহাকে একবার ভালবাসেন তাহাকে চিরদিনই ভালবাসেন। শত দুঃখ কষ্টের মধ্যেও তার প্রেম অব্যাহত।

প্রেম এমনি বিষয়।
জ্বলে, পোড়ে, তবু নাহি
ভোলেতো প্রিয়ায় ॥

(গুলে বকাওলি)

রসিকের কাছে প্রেম পরশমণিসদৃশ। রূপনদীতে সুখের তরঙ্গ উঠিতেছে, তাহারই তীরে বসিয়া রসিক প্রেমের সাধনা করিতেছেন।

পীরিতির রীতি ভাই, শুনতে চাও যদি।
পীরিতি পরশ তুলা, রূপন্ মেলে যদি ॥
নয়নে নয়ন মিশায়ে থাকে নিরবধি।
সুখের তরঙ্গে রঙ্গে বয়ে যায় নদী ॥

(গোলেনুর)

অরসিক ভ্রমরের মত মধু-পিয়াসী। যতদিন যৌবন-মধু থাকে, ততদিন তার আনাগোনা। শুষ্কদল ফুলের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া সে নতুন ফুল খুঁজিয়া লয়। নারী হয়ত তাহাকে পীরিতি-মাখা প্রাণখানি উপহার দেয়,—সে পীরিতির মর্ম্ম না জানিয়া তাহাকে অবহেলা করিয়া তাহার যৌবনকেই আকাঙ্ক্ষা করে। তাই যৌবনের সঙ্গে সঙ্গে অরসিকের প্রেমও অন্তর্হিত হয়।

অরসিকের কাছে রস যদ্দিন থাকে।
যেমন, পাকা আমে ফাঁকি দিয়ে খেয়ে যায় দাঁড়কাকে ॥
দেখ, পদ্মের নাগর ভোম্‌রা বেটা, কোমর ভেঙে গেছে।
তবু, স্বভাবদোষে মরতে যায় অন্য ফুলের কাছে ॥
অরসিকের প্রেম তেম্‌নি ঠিক্ থাকে না আর।
বিরহানল জ্বেলে দিয়ে নেভায়নাক আর ॥
পোড়াকপাল পুড়িয়ে মারে, আর বল্‌ব কি।
এমন পোড়া পীরিতের মুখে আগুন দি ॥
এমন, কঠোর সঙ্গে করলে পীরিত মজে নাকো মন।
পথিকে কি যত্ন জানে রত্ন সে কেমন ॥

মানভঞ্জন

প্রণয়ে অবিশ্বাস হইতে মানের জন্ম। মেঘ যেমন মাঝে-মাঝে সূর্য্যকে ঢাকে, মানও তেম্‌নি মিলনকে বিচ্ছেদের

কালিমায় অন্তর্হিত করে। রাধা কৃষ্ণের মানলীলাই গীতি-কাব্যে মানের আদর্শ। ইস্‌লামি কবিরাও ইহার অনুকরণ করিয়াছেন। এ বিষয়ে তাঁদের মৌলিকত্ব কিছুই নাই।

নায়ক খণ্ডিতা নায়িকার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া স্তুতি করিতেছেন,—

কেন মান ক'রে বসেছ ও বিধুমুখী!
হেসে হেসে ফিরে ব'সে কথা কওনা দেখি।
(গোলেনুর)

নায়িকা মুখ বাঁকাইয়া সমানে জবাব দিলেন,—

যে দাগা দিয়েছ প্রাণে, ভুলিতে কি পারি আর!
যাও যাও শাহজাদা, তোমার পীরিতে নমস্কার॥
আগে নাহি বুঝে মনে, মজিলাম নিঠুরের সনে:
কুল গেল, কলঙ্ক হ'ল, (এখন) প্রাণে বাঁচা ভার॥
জ্বালায় জ্বলেছি যত, তোর গুণের গুণ কব কত!
এই হ'তে হ'লেম খেস্ত, পীরিত না করব আর॥
(গুলে বকাওলী)

নায়ক তখন খোসামুদির সুর আর এক পর্দ্দা চড়াইয়া দিলেন,

ফিরে ব'সে কথা কও, তুলে আজি শির॥
মান লাজ ছেড়ে দাও, মোর পানে চাও:
বিধুমুখে মধু কথা আমারে শুনাও॥ (গোলেনুর)

নায়িকা নিরুত্তর। নায়ক অগত্যা বলিলেন,

শোন প্রাণেশ্বরী, রূপসী সুন্দরী,
চন্দ্রমুখী মম প্রাণ।
আমি তো তোমার, তুমি তো আমার,
নাহি করি অন্য জ্ঞান॥
বটে সাহা হই, তব ছাড়া নই,
দাস তব চরণেতে।
গোস্ত-পোস্ত মোর, সকলি যে তোর,
প্রাণ মম তব হাতে॥
এ দাস তোমার হুকুম-বরদার,
যাহা বল তাহা করি।
আগুন-বিচেতে, কিম্বা যে কূয়াতে,
কহ, ঝাঁপ দিয়ে পড়ি॥
(গুলে বকাওলী)

নায়িকা তবু নিরুত্তর। 'চরণের দাস' 'হুকুমবরদার' নায়ক তখন বলিলেন, পায়ে ধরি, ভিক্ষা করি, কথা কও।

নায়িকা এত সহজে কথা কহিবেন না। নায়ককে দিয়া সত্য সত্যই পা ধরিয়া মান ভাঙ্গাইতে হইবে,—নায়ককে নিজের পায়ের তলায় লোটাইয়া তাহার গোমর ভাঙ্গাইতে হইবে। তাই নায়িকা মুখ ফিরাইয়া শ্লেষ করিয়া কহিলেন,

সখা, পায় ধরিতে কেন চাও হে
তুমি যারে ভালোবাসে, তার কাছে যাও হে॥
(নিজাম পাগলা)

নায়ক তখন—

একথা শুনিয়া নিরাশ হইয়া
কাঁদে সাহা জারে জারে।
কাঁদিয়া কাঁদিয়া অস্থির হইয়া,
গিরিল পায়ের পরে॥
গেরে যবে পায়, বিবি দেখে তায়,
কাঁদিয়া উঠাল ধ'রে।
গায়ে লাগাইয়া কাছে বসাইয়া,

ইত্যাদি রূপে পুনর্মিলন হইল।

শেষ কথা

শৃঙ্গারবর্ণনা ইস্‌লামি প্রেমকাব্যে অত্যন্ত অশ্লীল এবং অপাঠ্য। কবিরা সকল কথাই খোলাখুলিভাবে লিখিয়াছেন। শুধু একজন কবি সংযত লেখনী চালাইয়াছেন বলিয়া শৃঙ্গার লীলা সম্বন্ধে প্রাথমিক দু-এক কথা বলিয়া বলিয়াছেন,

যে জন রসিক হবে, বুঝ ইসারায়।
খোলসা করিয়া লেখা উচিৎ না হয়॥
(নিজাম পাগলা)

ইস্‌লামি কাব্যে একনিষ্ঠ প্রেমের নিদর্শন খুব কম। নায়ক প্রায় ক্ষেত্রেই বহু নারীতে আসক্ত। এক কবি এই বহু-প্রেমকে কটাক্ষ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কথা তুলিয়া দিয়া এ প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম।

তরুণ কিশোর

জসীমউদ্‌দীন

তরুণ কিশোর, তোমার জীবনে সবে এ ভোরের বেলা,
ভোরের বাতাস ভোরের কুসুমে জুড়েছে রঙের খেলা।
রাতের কুহেলি-তলে,
তোমার জীবন উষার আকাশে শিশু রবিসম জ্বলে।
এখনো পাখীরা উঠেনি জাগিয়া, শিশির রয়েছে ঘুমে,
কলঙ্কী চাঁদ পশ্চিমে হেলি' কৌমুদীলতা চুমে।
বধূর কোলেতে বধূরা ঘুমায় খোলেনি বাহুর বাঁধ,
দিঘীর জলেতে নাহিয়া নাহিয়া মেটেনি তারার সাধ।
এখনো আসেনি অলি,
মধুর লোভেতে কোমল কুসুম দুপায়েতে দলি' দলি'।
এখনো গোপন আঁধারের তলে আলোকের শতদল
মেঘে মেঘ লেগে বরণে বরণে করিতেছে টলমল।
এখনো বসিয়া সেঁউতীর মালা গাঁথিছে ভোরের তারা,
ভোরের রঙীন শাড়ীখানি তার বুনান হয়নি সারা।

হায়রে তরুণ হায়,
এখনি যে সবে জাগিয়া উঠিবে প্রভাতের কিনারায়।
এখন হইবে লোক জানাজানি, মুখ চেনাচেনি আর,
হিসাব নিকাশ হইবে এখন কতটুকু আছে কার।
বিহগ ছাড়িয়া ভোরের ভজন, আহারের সন্ধানে
বাতাসে বাঁধিয়া পাখা-সেতু-বাঁধ ছুটিবে সুদূর-পানে।
শূন্য হাওয়ার শূন্য ভরিতে বুকখানি করি শূন্য
ফুলের দেউল হবে না উজাড় আজিকে প্রভাতে পুন।
তরুণ কিশোর ছেলে,
আমরা আজিকে ভাবিয়া না পাই তুমি হেথা কেন এলে?
তুমি ভাই সেই ব্রজের রাখাল, পাতার মুকুট পরি'
তোমাদের রাজা আজো নাকি খেলে গেঁয়ো মাঠখানি ভরি'।
আজো নাকি সেই বাঁশীর রাজাটি তমালতার ফাঁদে
চরণ জড়ায়ে নূপুর হারায়ে পথের ধূলায় কাঁদে।

কেন এলে তবে ভাই,
সোনার গোকুল আঁধার করিয়া এই মথুরার ঠাঁই।
হেথা যৌবন মেলিয়া ধরিয়া জমা-খরচের খাতা
লাভ লোকসান নিতেছে বুঝিয়া খুলিয়া পাতায় পাতা।
ওপারে গোকুল এপারে মথুরা মাঝে যমুনার জল,
পাপ মথুরার কাল বিষ ল'য়ে চলিছে সে অবিরল।
ওপারে কিশোর এপারে যুবক, রাজার দেউল বাড়ী—
পাষাণের দেশে কেন এলে ভাই রাখালের দেশ ছাড়ি?
তুমি যে কিশোর তোমার দেশেতে হিসাব নিকাশ নাই,
যে আসে নিকটে তাহারেই লও আপন বলিয়া তাই।
আজিও নিজেরে বিকাইতে পার ফুলের মালার দামে,
রূপকথা শুনি তোমাদের দেশে রূপকথা দেয়া নামে।
আজো কানে গোঁজ শিরীষ কুসুম, কিংশুক-মঞ্জরী,
অলকে বাঁধিয়া পাটল ফুলেতে ভ'রে লও উত্তরী।
আজিও চেননি সোনার আদর, চেননি মুক্তাহার,
হাসি মুখে তাই সোনা ঝ'রে পড়ে তোমাদের যার তার।
সখালী পাতাও সখাদের সাথে বিনা মূলে দাও প্রাণ,
এপারে মোদের মথুরার মত নাই দান প্রতিদান।
হেথা যৌবন যত কিছু এর খাতায় লিখিয়া লয়,
পাণ হ'তে এর চুণ খসে নাক—এমনি হিসাবময়।
হাসিটি হেথায় বাজারে বিকায়, গানের বেসাত করি'
হেথাকার লোক সুরের পরাণ ধনে মানে লয় ভরি।

হায়রে কিশোর হায়!
ফুলের পরাণ বিকাতে এসেছ এই পাপ-মথুরায়।
কালিন্দী-লতা গলায় জড়ায়ে সোণার গোকুল কাঁদে,
ব্রজের দুলাল বাঁধা নাহি পড়ে যেন মথুরার ফাঁদে।
মাধবীলতার দোলনা বাঁধিয়া কদম্ব-শাখে-শাখে
কিশোর, তোমার কিশোর সখারা তোমারে যে ওই ডাকে।

ডাকে কেয়াবনে ফুলমঞ্জরী ঘন-দেয়া-সম্পাতে
মাটির বুকেতে তমাল তাহার ফুল-বাহুখানি পাতে

ঘরে ফিরে যাও সোণার কিশোর, এ পাপ-মথুরাপুরী
তোমার সোনার অঙ্গেতে দেবে বিষবাণ ছুঁড়ি ছুঁড়ি।
তোমার গোকুল আজো শেখে নাই ভালবাসা বলে কারে,
ভালবেসে তাই বুকে বেঁধে লয় আদরিয়া যারে তারে।
সেথায় তোমার কিশোরী বধূটি মাটির প্রদীপ ধরি'
তুলসীর মূলে প্রণাম যে আঁকে হয়ত তোমারে স্মরি'।
হয়ত তাহাও জানেনা সে মেয়ে, জানেনা কুসুমহার,
এত যে আদরে গাঁথিছে সে তাহা গলায় দোলাবে কার?
তুমিও হয়ত জান না কিশোর, সেই কিশোরীর লাগি'
মনে মনে কত দেউল গেঁথেছ কত না রজনী জাগি'।
হয়ত তাহারি অলকে বাঁধিতে মাঠের কুসুম ফুল
কত দূর পথ ঘুরিয়া মরিছ কত পথ করি' ভুল।
কারে ভালবাস কারে যে বাস না তোমরা শেখনি তাহা
আমোদের মত কামনার ফাঁদে চেননি উহু ও আহা!
মোদের মথুরা টলমল করে পাপ-লালসার ভারে,
ভোগের সমিধ জ্বালিয়া আমরা পুড়িতেছি ভারে ভারে।
তোমাদের প্রেম 'নিকষিত হেম কামনা নাহিক তায়',
কিশোরভজন শিখিয়াছে কবি তাই ও ব্রজের গাঁয়।
তোমাদের সেই ব্রজের ধূলায় প্রেমের বেসাত হয়,
সেথা কেউ তার মূল্য জানে না এই বড় বিস্ময়।
সেই ব্রজধূলি আজো ত মুছেনি তোমার সোনার গায়,
কেন তবে ভাই, চরণ বাড়ালে যৌবন-মথুরায়।

হায়রে প্রলাপী কবি!
কেউ কভু পারে মুছিয়া লইতে ললাটের লেখা সবি।
মথুরার রাজা টানিছে যে ভাই কালের রজ্জু ধ'রে
তরুণ কিশোর, কেউ পারিবে না ধরিয়া রাখিতে তোরে।
ওপারে গোকুল এপারে মথুরা মাঝে যমুনার জল,
নীল নয়নেতে তোর ব্যথা বুঝি বয়ে যায় অবিরল!
তবু যে তোমারে যেতে হবে ভাই, সে পাষাণ মথুরায়,
ফুলের বসতি ভাঙিয়া এখন যাইবি ফলের গাঁয়।

এমনি করিয়া ভাঙা বরষায় ফুলের ভূষণ খুলি'
কদম্ব-বধূ শিহরিয়া উঠে শরৎ হাওয়ায় দুলি।'
এমনি করিয়া ভোরের শিশির শুকায় ভোরের ঘাসে,
মাধবী হারায় বুকের সুরভি নিদাঘের নিশ্বাসে।

তোরে যেতে হবে চ'লে
এই গোকুলের ফুলের বাঁধন দুপায়েতে দলে' দ'লে।
তবু ফিরে চাও সোনার কিশোর, বিদায়-পথের ধার
কি ভূষণ তুমি ফেলে গেলে ব্রজে দেখে লই একবার।
ওই সোনা মুখে আজো লেগে আছে জননীর শত চুমো
দুটি কালো আঁখি আজো হ'তে পারে ঘুম গানে ঘুমঘুমো।
ওই রাঙা ঠোঁটে গড়াইয়া গেছে কত না ভোরের ফুল,
বরণ তাদের আর পেলবতা লিখে গেছে নির্ভুল।
কচি শিশু ল'য়ে ধরার মায়েরা যে আদর করিয়াছে,
সোনা ভাইদের সোনা মুখে বোন যত চুমা রাখিয়াছে,
সে সব আজিকে তোর ওই দেহে করিতেছে টলমল;
নিখিল নারীর স্নেহের সলিলে তুই শিশু শতদল।

রে কিশোর, এই মথুরার পথে সহসা দেখিয়া তোরে
মনে হয় যেন ও মণি কাহারে দেখেছিনু এক ভোরে,
সে আমার এই কৈশোরহিয়া জীবনের এক তীরে
কোথা হ'তে যেন সোনার পাখীটি উড়ে এসেছিল ধীরে।
পাখায় তাহার বেঁধে এনেছিল দূর গগনের লেখা
আর এনেছিল রঙীন ঊষার একটু সিঁদুর-রেখা।
সে পাখী কখন উড়িয়া গিয়াছে মোর বালুচর ছাড়ি,
আজিও তাহারে ডাকিয়া ডাকিয়া শূন্যে দুহাত নাড়ি।

সোনার কিশোর ভাই,
তোর মুখ হেরি মনে হয় যেন কোথায় ভাসিয়া যাই।
এত কাছে তুই তবু মনে হয় আমাদের গেঁয়ো নদী
তার ওই পারে সাদা বালুচর শুকায় মিঠেল 'রোদি'।
সেইখানে তুই দুটি রাঙা পায়ে আঁকিয়া পায়ের রেখা
চলেছিস একা বালুকার বুকে পড়িয়া ঢেউএর লেখা।

জসীমউদ্‌দীন

সে চরে এখনো মাঠের কৃষাণ বাঁধে নাই ছোট ঘর,
কৃষাণের বউ জাঙলা বাঁধেনি তাহার বুকের পর।
লাঙল সেথায় মাটিরে ফুঁড়িয়া গাহেনি ধানের গান,
জলের উপর ভাসিতেছে যেন মাটির এ মেটো থান।
বর্ষার নদী এঁকেছিল বুকে ঢেউ দিয়ে আলপনা,
বর্ষা গিয়াছে ওই বালুচর আজো তাহা মুছিল না।
সেইখান দিয়ে চলেছ উধাও, চখা-চখি উড়ে আগে,
কোমল পাখার বাতাস তোমার কমল মুখেতে লাগে।
এপারে মোদের ভরের 'গেরাম', আমরা দোকানদার,
বাটখারা ল'য়ে মাপিতে শিখেছি কতটা ওজন কার।
তবু রে কিশোর, ওইপারে যবে ফিরাই নয়নখানি
এই কালো চোখে আজো এঁকে যায় অমরার হাতছানি।

ওপারেতে চর এপারেতে ভর মাঝে বহে গেঁয়ো নদী
কিশোর কুমার, দেখিতাম তোরে ফিরিয়া দাঁড়াতি যদি
তোর সোনা মুখে উড়িতেছে আজো নতুন চরের বালি,
রাঙা দুটি পাও চলিয়া চলিয়া রাঙা ছবি আঁকে খালি।
তুই আমাদের নদীটির মত দুপারে দুইটি তট
দুই মেয়ে যেন দুইধারে টানে বুড়ায়ে কাঁখের ঘট।
ওপারে ডাকিছে নয়া বালুচর কিশোর কালের সাথী,
এপারেতে ভর, ভরা যৌবন কামনা-ব্যথায় ব্যথী।
তুই হেথা ভাই ঘুমাইয়া থাক্ গেঁয়ো নদীটির মত,
এপার ওপার দুটি পাও ধ'রে কাঁদুক বাসনা যত।

ভ্রমণ-স্মৃতি

শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ

আমরা তিনটি বন্ধু রেলগাড়ির একটি কামরা দখল করিয়া বসিয়া আছি। সুফলা শস্যশ্যামলা বঙ্গপল্লীর মধ্য দিয়া আমরা চলিয়াছি। স্পেশাল গাড়ী কোন ষ্টেশনে অপ্রয়োজনে থামিবে না; কাজেই খুব দ্রুতবেগে চলিতে লাগিল। ক্রমে সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল। কোন খান দিয়া রাত্রি দশটা বাজিয়া গেল, বুঝিতে পারিলাম না, রেস্টুরেণ্ট-কারে আহারের ডাক পড়িল। সেখানে আমরা সকলেই সমবয়স্ক; কোন জাতি-ভেদ নাই, কাজেই আনন্দসহকারে আহার চলিল। মানুষ আপনার মধ্যে কল্পিত উচ্চ নীচ প্রভেদের গণ্ডী টানিয়া দিয়াছে—দিয়া আপনি বঞ্চিত হইয়াছে।

আহারশেষে আমরা নিজেদের কামরায় ফিরিয়া আসিলাম। ক্রমে বন্ধু দুইজন ঘুমাইয়া পড়িল, কিন্তু আমার ঘুম হইল না। আমি জানালা খুলিয়া বাহিরে তাকাইয়া রহিলাম। তখন গভীর রাত্রি। সূচীভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে বড় কিছু দেখা যায় না। আকাশে তারা দুই একটি মাত্র মিটিমিটি জ্বলিতেছে। তিমিরাবগুণ্ঠিত রজনীতে অভিসারিকার শাড়ীতে খচিত হীরকমালা মৃদু দীপ্তি বিকাশ করিতেছে। দূরে কয়েকটা পাহাড় দেখা যায়। তরঙ্গায়িত উপত্যকারাজির মাঝে মাঝে কুটীরগুলি দেখিলে মনে হয় যেন সেগুলি শত্রু সৈন্যের দৃষ্টির অন্তরালে অবস্থিত শিবিরশ্রেণী। অন্ধকারে তরুরাজি নিস্তব্ধ হইয়া পরস্পর মাথাগুলি স্পর্শ করিয়া কোন গোপন বাণী প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিতেছে কিন্তু ভাষায় বঞ্চিত বলিয়া মূক বেদনা প্রকাশ করিয়া নিবৃত্ত হইয়াছে। সে গুলি কি গাছ জানি না, তবু 'তমাল-তালীবনরাজিনীলা'র কথা মনে পড়ে। বাতাসের আসা যাওয়ার মধ্যে কত কিছুর আভাস পাওয়া যায়। তিমির-রাত্রির এই শব্দবিহীন স্রোতে হৃদয়ে কি মন্ত্র পড়িয়া দেয়। নৃত্যদোলায় রাত্রি কাটিয়া যায়। কখন ঘুমাইয়া পড়িলাম জানি না।

ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। আমরা তিনজন পাশাপাশি চুপ করিয়া বাহিরে তাকাইয়া আছি। চারিদিকে জীবনের সাড়া পাওয়া যাইতেছে। রাখাল গরুগুলিকে লইয়া বাহির হইয়াছে। আমার মনও ওই জাগরণোন্মুখ জীবনরাগিণীতে যোগ দিবার জন্য উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছে। দূরে পথের উপর পলাশ বকুল আত্মদানের জন্য ব্যাকুল হইয়া ঝরিয়া পড়িয়াছে। নীল আকাশ-পটে তরুণ অরুণের দীপ্তি প্রকাশ হইয়াছে। গ্রাম-ছাড়া ওই রাঙ্গামাটির পথ আমাকে কোন অজানার অভিসারে ভুলাইয়াছে। ও পথ জানি না কোথায় শেষ হইয়াছে, ভাবিয়া কূল পাই না। দূরের দুষ্প্রাপ্যের জন্য এই আকাঙ্ক্ষা, এই ব্যাকুলতা এ যে মানবমনের পক্ষে চিরন্তন। দূরের নেশা, গ্রাম-ছাড়া পথের নেশা মৃগচঞ্চলা আশারই মত মানবকে এই জীবনমরুতে ঘুরাইয়া বেড়ায়। তাহার শেষ কোথায় কেহ জানে না—জানে না বলিয়াই তাহা এত আকর্ষণ করে।

পথে মোগলসরাই ষ্টেশনে আমাদের চা-পান পর্ব্ব শেষ হইল। তারপর আমরা কাশী কান্টন্‌মেণ্ট ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিলাম। তখন বড় তাড়াহুড়ার পালা লাগিয়া গেল। আমরা ব্যাগের মধ্যে স্নানের কাপড় লইয়া মোটরবাসে উঠিয়া বসিলাম। আমাদের প্রথম দ্রষ্টব্য ছিল সারনাথ। সারনাথ সেখান হইতে সাত মাইল দূরে। সেখানে বৌদ্ধ যুগের অনেক নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট অনেক অর্থ ব্যয় করিয়া এই ধ্বংসাবশেষগুলিকে সাজাইয়া রাখিয়াছেন। পাথরের উপর সুন্দর কারুকার্য্যময় নানা প্রকার মূর্ত্তি আমাদের বড় ভাল লাগিয়াছিল। চারিদিকে কত ধ্বংসস্তূপ

শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ

হিয়াছে। অতীতের এক গৌরবময় যুগের এই মূক মূর্ত্তি গুলি যদি কোনরকমে ভাষা পাইত তাহা হইলে কত কথাই শুনিতে পাইত'ম। এইখানে মাত্র একদিন থাকিবার কথা, কাজেই আমাদের বাস দ্রুতবেগে সেণ্ট্রাল কলেজ, রামকৃষ্ণ মিশন প্রভৃতি ঘুরিয়া হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়ে আসিল। বিশ্ববিদ্যালয় দেখিবার বস্তু বটে। এমন বিস্তীর্ণ মাঠের মধ্যে চারিদিকে বিকীর্ণ কারুকার্য্যময় মনোহরঅট্টালিকা গুলি দেখিলে কোন রাজার আবাস বলিয়া মনে হয়। ইহার পাশে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে দাঁড় করাইলে পাখীর খাঁচা বলিয়াই মনে হইবে।

অতঃপর আমরা রাণী ভবানীর দুর্গাবাড়ীতে আসিলাম। মন্দিরটি বড় সুন্দর; তাহা ছাড়া বিদেশে বাঙ্গালীর মন্দির বলিয়া আমার চক্ষুতে আরও সুন্দর। এই মন্দির কাশীর মত দেবতাও মন্দিরবহুল স্থানেও অতি প্রসিদ্ধ।

পরদিন প্রত্যুষে আমরা লক্ষ্ণৌয়ে পৌঁছিলাম। দূর হইতেই সহর দেখিয়া মনে হইল "হ্যাঁ, এ অযোধ্যার নবাবদের রাজধানী বটে। পঞ্চাশখানি টোঙ্গায় যখন আমরা রাজপথ দিয়া যাইতেছিলাম তখন দুই ধারের বাড়ী হইতে সাহেব মেমগণ উৎসুকনয়নে এই শোভাযাত্রা দেখিতেছিলেন। কয়েকজন বাঙ্গালী আসিয়া আমাদের সকল বৃত্তান্ত জানিয়া লইলেন। কাউন্সিল হাউস, উইঙ্গস্ফিল্ড পার্ক, রেসিডেন্সি প্রভৃতি ঘুরিয়া বেড়াইলাম। যেদিকে তাকাই খালি প্রাসাদশ্রেণী। আজ অযোধ্যার সে নবাব নাই; লক্ষ্ণৌয়ের সে ঐশ্বর্য্যও নাই। এক সময় লক্ষ্ণৌ ভোগবিলাসের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। এখনও ছত্রমঞ্জিল, মতিমহল, সিকান্দির বাগ, কৈশরবাগ রহিয়াছে। এখনও হাসেনাবাদ প্রাসাদে সিংহাসন রহিয়াছে; দ্বিতলে নবাব ইচ্ছামত বেগমদের কাছে যাইতেন, কিন্তু গোলকধাঁধার সিঁড়ি দিয়া তাঁহারা নীচে আসিতে পারিতেন না। সে সিঁড়ি আজ রুদ্ধ। দিলখুসা প্রাসাদ এখন ভগ্নাবশেষ মাত্র। এই সকল প্রাসাদ আর নৃত্যগীতে মুখরিত হয় না; আর বিলাসের অবাধ স্রোত তাহাদের মধ্য বহে না। কালস্রোতে সবই লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। তবুও মুসলমানী শিল্পকলার নিদর্শনগুলি আজও বর্ত্তমান। কলিকাতার বড় বড় প্রাসাদে নানাপ্রকার শিল্পধারা মিশিয়া খিচুড়ীর সৃষ্টি হইয়াছে; কিন্তু লক্ষ্ণৌ একটা বিশেষ শিল্প-প্রণালীকে অল্পবিস্তর কৃতকার্য্যতার সহিত অনুসরণ করিয়াছে। শাহ্‌নজফে গাজীউদ্দিন ও তাঁহার বেগমদ্বয়ের কবর আছে। এই নবাবের কবরে আসিয়া আমরা একটা নূতন অনুভূতি পাইলাম। অবশ্য শাহ্‌জাহান তাজমহলে একটি সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার সহিত শাহ্‌নজফের তুলনা হয় না, তবু মনে রাখিতে হইবে যে সকলের অদৃষ্টে মঠ বা কবর প্রতিষ্ঠা করা ঘটে না; তাই বলিয়া অর্থ বা খ্যাতির মানদণ্ডে প্রেমের তুলনা করা চলে না।
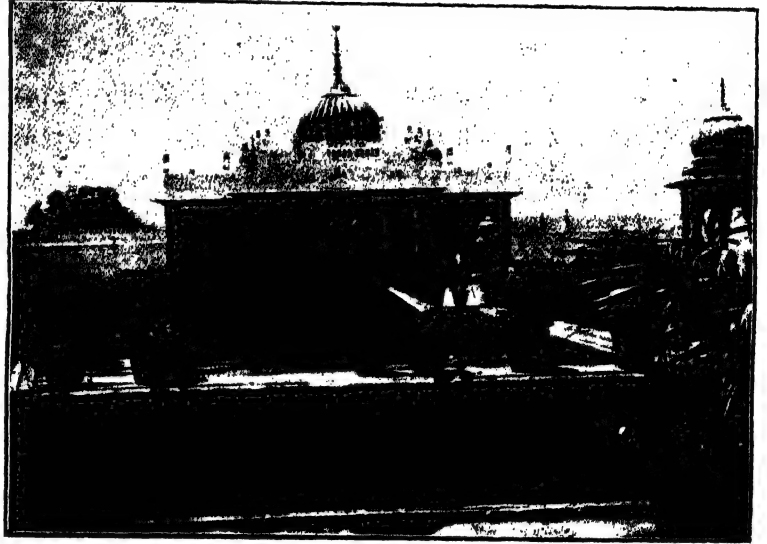
মাচ্ছি ভবন—লক্ষ্ণৌ

লক্ষ্ণৌ ত্যাগ করিয়া আমরা হৃষীকেশে আসিলাম। তখন প্রথম উষার আগমনী গাথার সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দ্দিক আনন্দময় মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। নিশাশেষের আকাশ সুনীল। সেই নীলিমা সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া মাঠের উপরে, পর্ব্বতের তলে,

নিজেকে বিস্তার করিয়াছে। দূর বনান্তের বৃক্ষলতার উপর মূর্চ্ছিত হইয়া রহিয়াছে। ধীরে ধীরে বার্চ্চ পাইনের অন্তরাল হইতে বালার্ক দেখা দিতে লাগিল। উষার পিছনে পিছনে সূর্য্যের এই অনন্তকাল ধরিয়া অনুসরণের শেষ নাই, সমাপ্তি নাই। সূর্য্যের স্নিগ্ধ কিরণমালা আমার মুখের উপর আসিয়া পড়িল। এ কার স্নেহস্পর্শ! মন নিবিড় আনন্দে ভরিয়া গেল। অরণ্যানীর তলে ছায়ারৌদ্রের খেলা যেন আমাদের সুখদুঃখময় জীবনের ছবি। আমাদের জীবনে এমনি সূর্য্যোদয় হয় কিন্তু তাহার মধ্যে মেঘেরও ছায়া পড়ে; পূর্ণ আলোক কোথাও ত পাই না। এ অনন্ত শোভাময় স্থানে কবে কোন্ সময়ে জীবনের বনে যৌবনবসন্ত প্রথম মলয়ময় নিঃশ্বাস ফেলিয়াছিল, সে সময় যে চিরনবীন আনন্দ-পুষ্পদল ফুটিয়াছিল, আজও তাহার শুকাইয়া যাইবার লক্ষণ দেখা যায় নাই, এখানে আছে কেবল স্বচ্ছ নীলাম্বরের মধ্যে একটা প্রসন্ন কল্যাণ দৃষ্টি ; প্রভাত শিশিরে ধৌত স্থির হাসি যেন স্বর্ণবীণার তন্ত্রী হইতে কোন সুরবালিকার চম্পক-অঙ্গুলির আঘাতে রণিয়া রণিয়া কাঁপে। সেই অনাহত ধ্বনি কি সকলের কর্ণে প্রবেশ করে? তরঙ্গের গতির মত, পুষ্পের সুগন্ধের মত, শিশিরসিক্ত তৃণদলের মুক্তালাবণ্যের মত তাহা শুধু কারো মনে গোপন চরণ ফেলিয়া একটা নিভৃত স্থান অধিকার করে। এ সৌন্দর্য্যসাগরের অস্ফুট কল্লোলধ্বনি মৃদু মৃদু আঘাতে হৃদয়বীণাতে যে তান জাগাইয়া তুলে তাহা আমাদের মনে বিদ্যুতের মত ক্ষণিক শিহরণ তুলিয়া কোথায় যেন চলিয়া যায়। সে সৌন্দর্য্য বুঝি আজ বিশ্বময় ব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছে। সে যে সকলকে অব্যক্ত ভাষায় ডাকে।

আমরা পর্ব্বতের উপর উঠিবার পূর্ব্বে হৃষীকেশের মন্দির দেখিতে গেলাম। নিকটেই খরস্রোতা গঙ্গা ; নদীতে এত স্রোত যে হাত ডুবাইতেও ভয় হয়। মাছগুলি নির্ব্বিঘ্নে খেলা করিতেছে। এখানে কেহ মাছ খায় না ; মাছ নাম পর্য্যন্ত উচ্চারণ করিতে নাই। শুনিলাম বাঙ্গালীরা মাছ খায় বলিয়া সকলে তাহাদের ঘৃণা করে। আমরা চারিদিকে ঘোরাঘুরি করিয়া অবশেষে পাহাড়ে উঠিতে লাগিলাম। আমাদের গন্তব্যস্থল লছমন ঝোলা এখান হইতে প্রায় পাঁচ মাইল দূরে। অবিরত চড়াই ও উৎরাই ভাঙ্গিয়া যাইতে হইবে। দূরে গাড়োয়ালের রাজপ্রসাদ দেখা যাইতেছে। অতি উৎসাহে আমি দ্রুতবেগে চলিতে লাগিলাম। সকলে বারণ করিল কিন্তু ইহা বারণ শুনিবার বয়স নহে। জানি চিরদিন এ উৎসাহ থাকিবে না। জানি জীবনের অবসাদময় অপরাহ্নে যখন প্রাণের রস শুকাইয়া আসিবে, যখন চক্ষুতে সবই নিরানন্দ লাগিবে তখনও এই চিন্তার একটা ক্লিষ্ট ক্লান্ত সুর মনে বাজিবে।

প্রাচীন কালের তপোবন আজ আকার ধরিয়া আমার সম্মুখে প্রতিভাত হইল। চারিদিকে শৈলমালা, নিম্নে প্রখর-বাহিনী, কলনাদিনী জহ্নুকন্যা। চারিদিকে অরণ্যের খেলা, উচ্চ পর্ব্বতচূড়া দৃষ্টি অবরোধ করে; অনন্ত আকাশের কেবল একটি খণ্ডের অখণ্ড রূপ দেখা যায়। দূরে তেমনই বিটপীবেষ্টিত প্রান্তর, তেমনই স্নিগ্ধশীকরসিক্ত পর্ব্বতপথ, তেমনই বিহঙ্গকাকলী। ইন্দ্রিয় অতীন্দ্রিয়ের সহিত এক হইয়া গিয়াছে। ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত উপত্যকাগুলির মধ্যে গঙ্গা বালিকা-কন্যার ন্যায় খেলা করিতেছে; ধ্যানগম্ভীর ভূধরের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। আপন মনে হিমালয় যোগ সাধনা করিতেছেন। চারিদিকে বৃদ্ধ তপস্বীর গভীর অথচ মধুর, ভয়ানক অথচ আনন্দদায়ক মূর্ত্তি, চারিদিকে সাধকগণের মুখে দেবত্বের ছায়া। ঘন তরুরাজির অভিনব সবুজের নয়ন-মনোহর আবেদন, ক্ষণে ক্ষণে সিক্ত বায়ুর মধুর শিহরণ উপভোগ করিতে করিতে আমরা চলিয়াছি। ক্ষণে ক্ষণে মেঘ পর্ব্বতচূড়াকে ঢাকিয়া দিতেছে। এখানে বুঝি অসুখ বলিয়া কিছু নাই, অশান্তি বলিয়া কিছু নাই, আছে কেবল অফুরন্ত জীবননদের অফুরন্ত অমৃতধারা। এখানে সন্ন্যাসিগণ আমাদের সভ্যতাক্লিষ্ট জীবনের সকল কৃত্রিম আবরণ ফেলিয়া দিয়া এই অনাবিল আনন্দস্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে।

আমরা ক্লান্ত না হইয়াই লছমনঝোলায় পৌঁছিলাম। এখানে গঙ্গার উপরে একটি দড়ির সেতু ছিল। পরে গভর্ণমেন্ট একটি লোহার সেতু করিয়া দেন। তাহাও তিন বৎসর হইল জলের স্রোতে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। আমরা অতি কষ্টে নৌকায় গঙ্গা পার হইয়া স্নান করিতে প্রস্তুত হইলাম। এই তুহিনশীতল স্রোতে অবগাহন বড় সুবিধাজনক নহে। তবুও আমরা দল বাঁধিয়া একটি বড় পাথরের পাশে

শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ

জলে নামিয়া কোনরকমে স্নান করিলাম সেখানে শীতল জলে স্নান করিয়া গঙ্গার ওপারেই কিছু দূর চলিলাম। অকস্মাৎ পর্ব্বতচূড়াগুলির উপরে ঘননীল মেঘসঞ্চার হইল। তাহার পরেই গুরুগর্জ্জনে নীল অরণ্যে শিহরণ জাগাইয়া প্রবল বৃষ্টি হইতে লাগিল। আমরা সেখানে একটি মন্দিরে আশ্রয় লইলাম। এদিকে বাহিরে বর্ষার অবিশ্রান্ত মৃদঙ্গধ্বনি হইতেছে।

সেদিন অপরাহ্ণে আমরা হরিদ্বারে। কনখলের দক্ষ মন্দির দেখিয়া ফিরিয়া আসিয়া হরকী পিয়ারী (হরপ্রিয়া)-তে দাঁড়াইয়া আছি। এখনকার সে সৌন্দর্য্য তাহা একেবারে অতুলনীয়। মধ্যখানে একটি ইষ্টকবেদী। চারিধারে স্রোতস্বিনী আপন মনে ছুটিয়াছে। সম্মুখে হিমালয়ের চূড়ার পর চূড়ার অনন্ত শ্রেণী। মুগ্ধচিত্তে দেখিলাম অসীম তরঙ্গায়িত মেঘপুঞ্জসদৃশ ঘনায়মান পর্ব্বতশ্রেণী। দূরে বহুদূরে সর্ব্বশেষ স্তরে অস্তগামী সূর্য্যের স্বর্ণ-কিরণে রচিত শাড়ীখানির মত দূরপ্রসারী দৃষ্টির তলায় ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্তন-শীল অপরূপ দৃশ্য উদ্ভাসিত। শত শত সুরবালিকা দেবতাত্মা নগাধিরাজের সুদূর প্রান্তে বুঝি বিচরণ করে। তাহাদের স্বর্ণসূত্রখচিত অম্বরের ঝিকিমিকি আলো, সুবর্ণভূষণের অজস্র হীরকদ্যুতি এই অপরাহ্ণের অস্তরাগে আমাকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া ফেলিতেছে। সান্ধ্য গগনের তরল রক্তহৃদয় বাহিয়া যেখানে সীমা অসীমের নিবিড় সঙ্গ চায়, যেখানে রূপ ও কল্পনা এক হইয়া যায়, সেখানে আকাশ ও ধরণী নিভৃত মিলনে আলিঙ্গনবদ্ধ হইয়া পরস্পরের সকল সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিয়া দিয়াছে। নিখিল বিশ্ব আত্মহারা হইয়া সেই সৌন্দর্য্যের মোহে স্তব্ধ; কোন সাড়া শব্দ নাই। বহু দিবসের সুখ দিয়া আঁকা, বহুযুগের সঙ্গীতে মাখা ধরাতলে সংসারধূলিজালে কত ক্লান্তি, কত ব্যর্থতা রহিয়াছে, তাই

আঁকো দুঃখে দৈন্যে আঁধারে মরণে অমর জ্যোতির শিখা,
এসগো আলোকলিখা।"

ধরণীর তলে গগনের ছায়াতে, পর্ব্বতের গায়ে ও অরণ্যে যে রঙ্গীন আভা অনন্ত নব বসন্তের মায়া বিস্তার করিয়াছে সে-আলো চিরদিন অম্লান উজ্জ্বল হইয়া নন্দনবনমধুর স্বাদ বিতরণ করে না; মাত্র ক্ষণিকের জন্য স্বর্ণচ্ছায় ও পারের আলোকশিখাকে মরীচিকার মত প্রকাশ করে, সুখ শান্তির একটু আভাস দিয়া আবার লুকাইয়া যায়। চারিদিকে শৈলমালা; মধ্যে নিরলায় স্বচ্ছ নির্ম্মলগঙ্গাপ্রবাহ। গিরিশ্রেণীর উপর যত দূর দৃষ্টি চলে কেবল একটা তরঙ্গায়িত রেখা দেখা যায়। সূর্য্যের আলো ক্রমেই সন্ধ্যাচ্ছায়ায় মিলাইয়া আসে; দূরের অপরূপ জ্যোতিচ্ছটা একটা মিশ্র আলোকের মধ্যে পড়িয়া ম্লানায়মান হইয়া যায়। মৃগতৃষ্ণিকার মত সেই অলকাপুরী ধীরে ধীরে মিলাইয়া যায়। নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতের গায়ে 'বার্চ্চ' ও 'চিড়ের' শ্যামলতা সন্ধ্যা তখনও অধিকার করিয়া লইতে পারে নাই; দূরের দেবদারু ও ঝাউবন তাহাদের ঘন শ্যামলিমার উপর অনন্ত নীলিমার আবরণ টানিয়া দিয়া সেই অসীম বর্ণসমুদ্রে আত্মবিলোপ করিতেছে। ইচ্ছা হয়, ওই যেখানে সন্ধ্যার কূলে আকুল-প্রাণ অকূল পর্ব্বতমালার উপর দিনের চিতা জ্বলিতেছে,

গঙ্গাবক্ষে—হরিদ্বার।

যেখানে দিগ্বধূ অশ্রুজলে ছলছল আঁখি, ওইখানে ওই কনক-লাবণ্যসায়রে তরণী ভাসাইয়া দিই ; সুখ দুঃখের ছায়ারৌদ্র-করে মাথা উর্ম্মিমুখর সাগর পশ্চাতে পড়িয়া থাক ; কেবল ওপারের সুদূরতা ও অস্পষ্টতাময় মধুর রহস্যলোকে নির্ভাবনায় চলিয়া যাই।

সূর্য্য ধীরে ধীরে ডুবিল। দ্রবীভূত গাঢ়রক্তিমা পরপারের চিত্রার্পিত পর্ব্বতমালার উপরে বৃক্ষাবলীর উজ্জ্বল শাখাপল্লবের মধ্য দিয়া নামিয়া গেল। সম্মুখে সূর্য্যাস্ত ; পশ্চাতে চন্দ্রোদয়। অপর দিগন্তের দূর আকাশপটে মুদ্রিত ছায়াবৎ তরুরাজির প্রচ্ছন্ন নিবিড়তার অন্তরাল হইতে চন্দ্রমা ক্লান্ত রবির পানে তাকাইয়া আছে। পশ্চিমাকাশের বিচিত্র বর্ণগৌরবের উপর দিয়া গেরুয়াবসনা সন্ধ্যা ধূসর আচ্ছাদন টানিয়া দিয়াছে। পত্রের মর্ম্মরে কত ব্যাকুলতা! চঞ্চল স্রোতের জলে অশ্রুবৃষ্টি ভরা কোন্ মেঘের একখানি অচঞ্চল ছায়া পড়িয়াছে। পূর্ব্বসীমায় মাধুরীমথিত স্নিগ্ধোজ্জ্বল লাবণ্যের মধ্য দিয়া অর্দ্ধপরিস্ফুট চন্দ্রমা উঠিতেছে—আরও ধীরে ধীরে আরও নীরবে।

গঙ্গায় হৃদয় যেন চন্দ্রোদয়ে আরও চঞ্চল। মৃদু সান্ধ্য পবনে আন্দোলিত হইয়া দূর বৃক্ষান্তরাল হইতে দুই একটি শুভ্র নগ্ন রশ্মি তাহার প্রবহমান হৃদয় স্পর্শ করিয়া কি এক মধুময় বারতা প্রকাশ করিয়া গেল। এক দিকে ক্ষীণপ্রায় অবসান ঘনীভূত ছায়ার মধ্যে আলোক ধীরে ধীরে মিলাইয়া যায় ; অপর দিকে ছায়াময় নিবিড়তা ভেদ করিয়া অল্পে অল্পে প্রশান্ত স্নিগ্ধালোক ফুটিয়া উঠে। দূরস্থিত ক্ষীণ তটভূমিতে সে সন্ধ্যার ছায়া আর থাকে না। চতুর্দ্দিকে শ্যামলা বসুন্ধরার উচ্ছ্বসিত মূর্ত্তি। দূরে দিগন্তবেলায় আকাশ ধরণীকে স্পর্শ করিয়াছে। আর দেরী নাই ; এখনই যাইতে হইবে। শুক্লাপঞ্চমীর বিবর্ণ পাণ্ডুর চন্দ্রমা পশ্চিম গগনপ্রান্তে ঢলিয়া পড়িবে। হে ধ্যানমগ্ন গিরি! সুখমৌন আকাশ! হে ছায়াচ্ছন্ন অরণ্যানী! অয়ি স্বপ্নমুগ্ধে নদী! তোমাদের সকলের কাছে পরিপূর্ণ হৃদয়ে বিদায় চাহিতেছি। আমার দিবার মত কিছুই ছিল না, তাই কিছুই দিই নাই ; কিন্তু অনেক লইয়া গেলাম। বড় সৌন্দর্য্যময় ছবি দেখিয়াছি, আজ ইহাদিগকে অশ্রুজলের স্ফটিক দিয়া বাঁধাইয়া স্মৃতির মর্ম্মরমন্দিরে প্রতিষ্ঠা করিব।

(ক্রমশঃ)

ত্রয়ী

—গল্প— —হুমায়ুন কবির

মানুষ কোনদিনই মানুষের মনের সন্ধান পাবে না? যার সঙ্গে আত্মার যোগ রয়েছে ভাবি, যাকে সমস্ত অন্তর দিয়ে ভালবাসি, শ্রদ্ধা করি, হঠাৎ বিস্ময়ের সঙ্গে দেখি আমি যাকে ভালবেসেছি এতো সে নয়, একে তো আমি চিনি না জানি না। অথচ সেই তার মুখ সেই তার হাসি, সেই তার রূপ। দিগন্তের চক্রবালরেখা যেমন চিরদিন এমন ক'রে দূরেই থাকবে চিরদিন এমনি ক'রে আমাদের অভিজ্ঞতার সীমানার পরপার থেকে আমাদের টানবে তেমনি মানুষের মনও বুঝি চিরদিন সুদূর রহস্যময় বিস্ময়ের পূর্ণপাত্র হ'য়ে থাকবে! যতই কাছে আসতে চাই যতই ব্যাকুল বাহু বাড়িয়ে তাকে ধরতে চাই, ততই যেন সে দূরে স'রে যায়, সকল মায়া সকল প্রলোভন এড়িয়ে কেবলি পালিয়ে বেড়ায়। নিয়ত প্রেমের উচ্ছ্বসিত লীলাভঙ্গে জীবন তরঙ্গিত হ'য়ে ওঠে, চন্দ্রকিরণের জোয়ারে মানুষের মন দখিন বাতাসের মত সৌরভে মদির হ'য়ে ওঠে, কিন্তু প্রেমের পরিতৃপ্তি কোথায়? বড় বেশী ক'রে যাকে পেতে চাই, তাকেই আমরা হারাই। সমস্ত অন্তর সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে যাকে আকাঙ্ক্ষা করি, তারই হৃদয় বারে বারে ভুল করি, মিছামিছি তার ওপর রাগ করি, আপনাকে ধিক্কার দিই। একটু হাসি একটু চোখের চাওয়া একটু করুণ দৃষ্টিতে মন কৃতজ্ঞতায় ভ'রে যায়, একটু প্রীতির ছোঁয়া পেলেই ভাবে যে এই বুঝি পেলাম, এই বুঝি আমার সন্ধান সফল হ'ল। কিন্তু হায়, তার পরে দেখি হাসিতে যে চোখের জল মেশানো ছিল সে তো দেখতে পাইনি, ফুলের তলায় কাঁটা ছিল, সুধাপাত্রের কানায় যে বিষ ছিল সে তো জানিনি। হৃদয়ের একটি কোণ মাত্র দেখেছিলাম, মহাসাগরের তরঙ্গলীলা একবার মাত্র চকিতে আভাসে দেখা দিয়েছিল, কিন্তু অজানা জীবনসাগর তো অজানাই র'য়ে গেল; তার তরঙ্গভঙ্গের যে কোন দিগন্তে অবসান, সে সন্ধান তো মিলল না।

তখন হৃদয় কাঁদে, অভিমান করে, ব্যাথায় জর্জ্জর হ'য়ে ওঠে। ভাবে যাকে এত বিশ্বাস করেছিলাম, সেই এমন ক'রে আমায় আঘাত দিল! হায়, বারে বারে ভুলে যাই এ আঘাত সে তো ইচ্ছা ক'রে দেয়নি, হয়ত জেনেও দেয়নি, এ শুধু তারই হৃদয়সিন্ধুর আর একটি তরঙ্গ।

সে দিন একথা ভাবিনি। তাই নিজেও কেঁদেছিলাম, তাদের দুজনাকেও কাঁদিয়েছি। আজ শুধু ভাবি যে জীবন আবার প্রথম থেকে সুরু করা যেতো! হয়তো সে ভুল আবার করতাম না, হয়তো তেমনি ক'রে আবার বারে বারে ভুল বুঝে ব্যথা পেতাম ব্যথা দিতাম। হয়তো জীবনের গতি আবার সে দিনেরই মতন হোত, সেই আশঙ্কা সেই আনন্দ সেই সন্দেহে হৃদয় সেই দিনের মতনই দুলত।

তাদের দুজনাকেই আমি ভালবাসতাম। তাদের নাম আজো আমাকে উতলা ক'রে তোলে—তাদের নাম আমি বলতে পারব না। কাকে যে বেশী ভালবাসতাম সে বিচার আজ করতে বসব না—তবে বোধ হয় তাদের দুজনাকে আমি দু'রকমে ভালবেসেছিলাম। দীপ্তির সঙ্গে যে আমার প্রথম কেমন ক'রে কোথায় পরিচয় হ'ল সে কথা আজ মনে নাই, কিন্তু সেই প্রথম পরিচয়েই আমার মনে পড়ে যে তার চেহারায় এমন একটা তেজ একটা দীপ্তি দেখেছিলাম যে তার স্মৃতি আমাকে আজো মুগ্ধ করে। বাঙলা দেশের লোকের চোখে হয়তো তাকে সুন্দর লাগবে না কারণ তার রঙ ছিল শামলা কিন্তু তার মুখে চোখে কথায় ভাবে ইঙ্গিতে এমন একটা আভা ফুটে বেরোত যে তাকে দেখলে মনে হ'ত এখানে প্রাণ যেন মূর্ত্তিমতী হ'য়ে এসে দাঁড়িয়েছে। কোথাও যেন তার কোন দৌর্ব্বল্য নেই, কোন দ্বিধা নেই, কোন সঙ্কোচ নেই। তীরের মতন কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ না ক'রে সে আপনার মনে চ'লে যেত, চারিদিকের কথা তার

গায়ে লেগে যেন ঠিকরে পড়ত, তাকে স্পর্শও করতে পারত না।

আমি তাকে প্রথম দৃষ্টিতেই ভালবেসেছিলাম। আমার হৃদয়ের যৌবন বোধ হয় প্রেমের জন্য বুভুক্ষ হ'য়ে ছিল, সে আসতেই বিনা দ্বিধায় বিনা প্রশ্নে তাকে বরণ ক'রে নিল। সেও বোধ হয় আমাকে প্রথম থেকেই ভাল বেসেছিল কিন্তু তার বিষয়ে জোর ক'রে আমি কিছু বলতে পারি নে, আজ পর্য্যন্ত সে আমার কাছে রহস্যই র'য়ে গেছে। আমার মনে আছে আমি তাকে প্রথম যেদিন বল্লাম, দীপ্তি আমি তোমাকে ভালবাসি, সে বেশ অসঙ্কোচে তীক্ষ্ণনয়ন দুটি আমার দিকে তুলে উত্তর দিল, সে তো আমি অনেক দিন জানি।

আমি উদ্বেগাকুল হৃদয়ে আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলাম —আর তুমি? তুমি কি আমার হবে?

চাপাহাসিতে চোখমুখ ভ'রে বিদ্রূপের তরল সুরে সে বল্লে, হ্যাঁ একটু বাসি বই কি? ফুল ভালবাসি, বই ভালবাসি আকাশ বাতাস মানুষ পশু পাখী সব কিছু ভালবাসি। তুমি কি অপরাধ করেছ যে কেবল তোমাকে ভাল বাসব না?

আমি তার হাত টেনে নিয়ে কাতরভাবে বল্লাম, দেখ দীপ্তি, সব জিনিষ নিয়ে তুমি এমন বিদ্রূপ ক'রো না। আমার অন্তরের ভালবাসাকে যদি তুমি এমন ক'রে অবহেলা কর সে আমি সইতে পারব না।

সে হাত না ছাড়িয়ে নিয়ে বেশ সহজ সুরেই বল্ল, তা আমি কি করব বল ত? আমি যদি তোমার মত গম্ভীর না হ'তে পারি, বা নাটকের নায়িকার মত প্রেম-বিগলিত স্বরে তোমায় প্রাণনাথ ব'লে জড়িয়ে ধরতে না পারি, তবে সে কি আমার বড় বেশী দোষ?

আমি তার হাত ছেড়ে দিলাম। বল্লাম, আমারই অপরাধ হয়েছে, ক্ষমা কর, আমি চল্লাম। তোমায় যদি কথনো অসন্তুষ্ট ক'রে থাকি তবে ক্ষমা কোরো, আর আজকার কথা ভুলে যেও।

আমি ফিরতেই দীপ্তি বাধা দিয়ে বল্ল, এত সহজেই চ'লে যাচ্ছ—এই তোমার ভালবাসা? আর ভোলা কি এতই সহজ কথা? আমি কিন্তু এত সহজেই চ'লে যেতাম না।

আমি ব্যগ্রভাবে তার হাত বুকে চেপে ধ'রে জিজ্ঞাসা করলাম, তবে তুমি আমাকে ভালবাস? এত ক্ষণ ছল করছিলে?

দীপ্তি হেসে উঠ্‌ল, বল্ল, এই দেখ আবার তুমি আমায় এমন তাড়া দিতে সুরু করলে যে তোমাকে আর আমি শেষে সামলাতে পারব না! এত অশান্ত কেন হও?

আমি বল্লাম, মনে শান্তি নেই ব'লেই অশান্তি—আমার প্রশ্নের তবে উত্তর দেবে না?

আজ নয়, আর একদিন, ব'লেই আমাকে কোন কথার অবসর না দিয়ে সে চ'লে গেল—বহুক্ষণেও যখন ফিরে এল না, তখন আমি অবশেষে চ'লে এলাম।

২

দীপ্তিকে সঙ্গে ক'রে বটানিকৃসে বেড়াতে গিয়েছিলাম। আগের দিন সন্ধ্যা বেলা তাকে বলতেই সে যখন রাজি হ'ল তখন একটু আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলাম। সে যে বিনা-প্রশ্নে এমন ক'রে যেতে স্বীকার করবে সে আমি ঠিক আশা করতে পারিনি। সকাল বেলা দুজনে এসে চাঁদপালে ষ্টীমারে উঠতেই দীপ্তি হঠাৎ ব'লে উঠ্‌ল, শোন, আজ নাই বা গেলে। আমার একটু কাজ আছে।

আমি আশ্চর্য্য হ'য়ে বল্লাম তুমি তো বেশ! কাল রাজি হ'লে, আজ চাঁদপালে এলে, এতক্ষণ কোন কিছু বলনি, আর এখন জাহাজে উঠে মনে প'ড়ে গেল যে দরকারি কাজ প'ড়ে রয়েছে, আজ যাওয়া হবে না। তার চেয়ে সোজাসুজি বল না কেন যে একা আমার সঙ্গে যেতে ভয় পাচ্ছ?

দীপ্তি চুল দুলিয়ে মাথা নাড়া দিয়ে বল্ল, ঈস, ভয়? তুমি বাঘ না ভালুক যে তোমাকে দেখে ভয় পাব? আমার কাজ ছিল, বল্লাম আজ থাক, তা তুমি যখন শুনলে না তখন চলো।

আমি বল্লাম, না, সত্যি যদি তোমার কাজ থাকে, তবে আজ না হয় নাই বা গেলাম।

হুমায়ুন কবির

দীপ্তি আবদারের সুরে বল্ল, বেশ তার চেয়ে বল না কেন যে আমাকে নিয়ে যেতে তোমার ইচ্ছে নেই, যেই একটা ওজর পেয়েছ অমনি পালাবার জন্য ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছ! তা তুমি থাকবে তো থাক—আমি ত চল্লাম। না হয় একাই যাব।

আমি কিছু না ব'লে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম, সে পরম নির্ব্বিকার ভাবে বহুদূরে যে দুয়েকটি সাদা গাঙচিল ভাসছিল তাদের গতি লক্ষ্য করতে লাগল। জাহাজ ছেড়ে দিল। জলের শব্দ শুনে সে চকিত হ'য়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল যে আমি তখনো তার মুখে তাকিয়ে আছি। জানি না আমার মুখে কি দেখে যেন একটু ভয়ই পেল, হঠাৎ ত্রস্ত কণ্ঠে ব'লে উঠ্‌ল, তবে থাক, আজ যাব না। চল ফিরে যাই।

তখন ষ্টীমার অনেকটা চ'লে এসেছে। আমি বল্লাম, আর তো ফেরা যায় না, দীপ্তি। আর আমার ফেরবার বিশেষ ইচ্ছাও নাই। সেই কবিতাটি মনে আছে—It is too late to say farewell?

সে কিছু না ব'লে মুখ ফিরিয়ে চুপ ক'রে ব'সে রইল। আমি ব'সে ব'সে তাকে দেখতে লাগলাম। হাতখানি শিথিল ভাবে কোলের উপর প'ড়ে রয়েছে, দুয়েকটি চুল ঘোমটার পাশ দিয়ে বাতাসে উড়ছে, সমস্ত দেহ শিথিল দুর্ব্বল, কিন্তু কতখানি প্রাণশক্তি ওরই মধ্যে। দুহাতে ধরে ওকে তো মাটির মত নোয়াতে পারি, কিন্তু ওই বিদ্যুতের মতন দীপ্ত মনকে কি কোনদিন বশ মানাতে পারব? সাপের মত নিষ্ঠুর আর সুন্দর লাগছিল ওকে —কিন্তু সত্যি সত্যি ওর হৃদয় করুণায় ভরা সে কথা ভুলব কেমন ক'রে?

হঠাৎ আমার দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে বল্ল, তুমি কি আমায় কোন অদ্ভুত জানোয়ার পেয়েছ যে হাঁ ক'রে আমার দিকে তাকিয়ে আছ? জাহাজের সবাই যে তোমাকে দেখে হাসছে।

আমি লজ্জা পেয়ে চোখ নামিয়ে নিলাম। সারা দুপুর বেলা দুজনে বাগানের চারিদিকে ঘুরে দেখলাম। আমি তো প্রায়ই ওখানে বেড়াতে যেতাম—দীপ্তি আগে কখনো আসেনি—তাকে আমার যত প্রিয় পরিচিত জায়গাগুলি খুঁজে খুঁজে দেখাতে লাগলাম। যেখানে বাগানের শেষে নদীটা হঠাৎ বেঁকে গেছে সেখানটা ভারী সুন্দর দেখায়, সূর্য্যাস্তের সময় তার অপূর্ব্ব শোভার কথা ওকে বল্লাম। সকাল বেলা দুজনের মধ্যে কেমন একটা সঙ্কোচ, একটা লজ্জার ছায়া এসে পড়েছিল, তাও ক্রমে কেটে গেল। ওকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত থাকতে বলায় তখুনি রাজি হ'ল।

বিকেল যতই ঘনিয়ে আসতে লাগল ততই আমার মনও যেন চঞ্চল হ'য়ে উঠতে লাগল। দেখলাম দীপ্তিও যেন কেমন বিবর্ণ অথচ চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে। তার যে এত হাসি এত গান এত কথা সব যেন বন্ধ হ'য়ে গেল। কথায় কথায় তার বিদ্রূপ শাণিত তরবারির মত ঝিকমিক ক'রে উঠেছে, এখন তার মুখে যেন আর কথা আসছে না। আমিও কিছু বলতে পারছিলুম না, দুজনে নীরবে পাশাপাশি চলেছি, একএকবার আমাদের দেহ স্পর্শ করছে, আর দুজনেই শিউরে উঠছি।

তখন ফাল্গুনের সূর্য্য তপ্ত আলোকে পৃথিবী পূর্ণ ক'রে পশ্চিমে ঢ'লে পড়েছে। সারাদিন কোথায় ছায়ায় ব'সে একটা কোকিল ডাকছিল, এতক্ষণ আমরা নিজেদের কথায় মগ্ন ছিলাম, বাইরের পৃথিবীর কোন কিছু যেন আমাদের স্পর্শ করে নি। কিন্তু এখন সে নীরবতার মধ্যে কোকিল যেন বড় বেশী আকুল স্বরে গাইতে লাগল—তার সুর যেন আরো মদির, আরো মোহময় হ'য়ে উঠ্‌ল। দক্ষিণের বাতাস সারাদিন ভ'রেই বয়েছে, এখন ফুল ঝরিয়ে পাতা ছড়িয়ে আমাদের হৃদয়েও এসে যেন মাতামাতি করতে লাগ্‌ল।

সে নীরবতা অবশেষে আমার অসহ্য হ'য়ে উঠ্‌ল। আমি বল্লাম, ঐ একটা কোকিল ডাকছে, শুনছ না?

দীপ্তি মাটির থেকে মুখ না তুলেই বল্ল, হ্যাঁ।

আমার কথাও আবার ফুরিয়ে গেল। দুজনে চলেছি, সরুপথ, তার দেহসৌরভ আমাকে উন্মন ক'রে তুলছে, এক একবার আমি তার দিকে তাকিয়ে দেখছি, চোখে চোখ

পড়তেই দুজনে তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নিচ্ছি। আমার বুক দুরুদুরু ক'রে কাঁপছে, বুঝতে পারছি যে দীপ্তিরও বুক কাঁপছে। হৃদ্‌স্পন্দনের শব্দ আর মাঝে মাঝে শুকনো পাতায় পা পড়লে মরমর ক'রে উঠছে। তরুশাখায় দক্ষিণ বাতাসের অশ্রান্ত কল্লোল।

আমি হঠাৎ ব'লে উঠলাম, এস, এখানে বসা যাক।

দীপ্তি যেন চমকে উঠ্‌ল, বল্ল, না চল।

পরক্ষণেই কি ভেবে বল্ল, আচ্ছা, চল, বসি।

দুজনে একটা গাছের তলায় ঘাসে বসলাম। আবার খানিকক্ষণ কারো মুখে কোন কথা নেই। দীপ্তি তার পায়ের তলার ঘাস ছিঁড়ছিল, আর থেকে থেকে দাঁতে কাটছিল। আমি একবার তার দিকে একবার দূরে গাছ-গুলির গায়ে সবুজ পাতা লক্ষ্যহীন চোখে দেখছিলাম।

অবশেষে আমি বল্লাম, দীপ্তি তুমি তো জানই যে আমি তোমাকে ভালবাসি। তুমি কিন্তু কোনদিন আমায় বল্‌নি যে আমাকে তোমার ভাল লেগেছে কিনা। আজি আমি তোমার উত্তর চাই। এমন ক'রে দোটানার মধ্যে আমি আর টিঁকতে পারছি না।

আম কথা বলতে আরম্ভ করতেই দীপ্তি আমার দিকে তাকাল। পরক্ষণেই দৃষ্টি নামিয়ে নিয়ে দূরে একটা গাছের গুঁড়ির দিকে অপলক নেত্রে চেয়ে রইল। আমি কিন্তু দেখছিলাম যে ঘাস ছিঁড়তে ছিঁড়তে তার আঙুলগুলো একটু কাঁপছে।

আমার কথা শেষ হ'তেই সে উত্তর দিল, তাই বুঝি আজ আমাকে তোমার কবলের মধ্যে পেয়ে জোর ক'রে আমার কাছ থেকে উত্তর আদায় করতে চাও। এই জন্যেই বুঝি আমাকে বেড়াবার ছল ক'রে বটানিক্‌সে নিয়ে এসেছ?

আজ তার এ খোঁচায় আমি চটললাম না। লক্ষ্য করলাম যে তার মুখে হাসি এল না কেবল ঠোঁট দুখানি একটু কাঁপছে। চোখে ব্যাকুল চঞ্চল দৃষ্টি, সর্ব্বাঙ্গে ভয়ের চিহ্ন।

আমি উত্তর দিলাম, বিদ্রূপ ক'রে আমায় অনেকদিন ঠেকিয়ে রেখেছে, দীপ্তি—আজ আর পারবে না। আজ আমি তোমার মন জানবই—এ সন্দেহ আর আমি সইতে পারছি না। আমার পরে তুমি এত নিষ্ঠুর কেন, দীপ্তি?

দীপ্তি লাফিয়ে দাঁড়িয়ে বল্ল, আমি চল্লাম, তুমি আসবে তো এসো। আমার কাজ আছে আগেই তো বলেছি। এখন তাড়াতাড়ি না গেলে এ জাহাজ আর পাবো না—বড্ড দেরী হ'য়ে যাবে তা' হ'লে।

আমি তার হাত ধ'রে তাকে বসিয়ে বল্লাম, ষ্টীমার আসবার এখনো অনেক দেরী। তোমাকে আমি জানি বাপু, এরকম ক'রে তুমি আমার কাছ থেকে পালাতে পারবে না। আজ যদি সারারাত্তির এখানে থাকতে হয়, তবু আমি আমার কথার উত্তর না দিলে তোমাকে যেতে দেবো না।

দীপ্তি ভয়ব্যাকুল কণ্ঠে বল্ল, কি আমাকে সারা রাত্তির তুমি আটকে রাখবে, আমি উত্তর না দিলে?

আমি বল্লাম, হাঁ।

দীপ্তির মুখ নিমেষে কঠিন হ'য়ে উঠ্‌ল, বল্ল, এই আমি চল্লাম, যদি পারো তো আমাকে আটকাও।

ব'লেই সে দাঁড়িয়ে চলতে লাগল। আমি উঠে তার হাত জোরে চেপে ধ'রে বল্লাম, দেখ এ ছেলেখেলা নয়। তোমাকে গায়ের জোরে আটকে রাখবার অধিকার আমার নেই সে আমি জানি। কিন্তু তুমিও জেনে রেখো যে আমি আর বেশীদিন আমাকে নিয়ে এ রকম খেলা সইব না। হয় আমি জোর ক'রে তোমাকে নেবই, নইলে তোমার সঙ্গে আমার সমস্ত সম্বন্ধের শেষ হবে।

দীপ্তি কিছু না ব'লে চলতে সুরু করল। আমিও সঙ্গে সঙ্গে চল্লাম। বল্লাম, তুমি কি মানুষ, না পাষাণ?

সে কোন উত্তর দিল না।

ষ্টীমার এল। একটা কথাও না ব'লে দুজনে পাশাপাশি বসলাম। সারা পথ কেউ কোন কথা বলিনি। তাকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে চ'লে আসছি, এমন সময় হঠাৎ সে বল্ল, কাল আসবে না? এসো কিন্তু।

আমি গম্ভীর মুখে 'আচ্ছা' ব'লে চ'লে এলাম।

৩

পরদিন দীপ্তির বাসায় গিয়ে যখন শুনলাম সে কোথায় বেড়াতে বেরিয়ে গেছে, তখন কেবল নিজের ওপর রাগ

হুমায়ুন কবির

হ'তে লাগ্‌ল। আমার মনে হ'তে লাগ্‌ল যে সে এ রকম ক'রে বিদ্রূপ করতেই আমাকে ডেকেছিল। তবু কেন যে তার কথায় বিশ্বাস ক'রে এসেছিলাম তা ভেবে নিজেরই আশ্চর্য্য লাগতে লাগ্‌ল। একটু দুঃখও পেলাম কিন্তু তার চেয়ে বেশী হচ্ছিল রাগ। বাড়ী ফিরেই তাকে একটা চিঠি লিখলাম—তোমার ব্যবহারে আশ্চর্য্য আমি মোটেই হইনি ; তবে নিজের দৌর্ব্বল্য ও নির্ব্বুদ্ধিতায় নিজেকে ধিক্কার দিতে ইচ্ছা করছে। থাক্, সে কথা নিয়ে তোমাকে কোন অনুযোগ আজ করতে চাই না। আমি দুয়েকদিনের মধ্যেই কলকাতা ছেড়ে চ'লে যাচ্ছি, বোধ হয় শিগ্‌গির ফেরবার কোন সম্ভাবনা নাই। কারণ হয়তো তুমি বুঝতে পারবে। তোমায় যদি কখনো বিরক্ত ক'রে থাকি তবে আমার এ অজ্ঞানকৃত অপরাধ ক্ষমা কোরো। তোমার সঙ্গে হয়তো এ জীবনে আর দেখা হবে না—অন্তত আমি তো সেই চেষ্টা করব।

মনটা ভারী খারাপ হ'য়ে গেল। সেদিন বা তার পরদিন কোথাও বাইরে গেলাম না। জিনিষপত্র গুছিয়ে বহুদিনের পুরাতন চিঠিপত্র সাজিয়ে ঘরে কি কাজ করছিলাম, এমন সময় দীপ্তির একটা চিঠি পেলাম, তোমার সঙ্গে ভয়ানক দরকারি কথা আছে, আজ বিকেলে অবশ্য অবশ্য এসো। আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করব।

কোন রকমে অশান্ত মনকে বশে এনেছিলাম—সে আবার উতলা হ'য়ে উঠল আবার আকাশকুসুম রচনা করতে সুর ক'রে দিল।—হায়রে মানুষের মন, এত সহজেই আনন্দে নেচে ওঠে, আবার একটু আঘাতেই চোখে পৃথিবীর আলো ম্লান হ'য়ে যায়। মনের অবস্থা যে কি রকম হ'ল ঠিক ক'রে বল্‌তে পারব না। আবেগ, আশা, আশঙ্কায় পৃথিবী যেন দুলছিল, আমার দেহমন ভ'রে যেন পাগল হাওয়ার মাতামাতি।

দীপ্তি বল্ল, তুমি বাড়ী যাবে শুনলাম, তোমার সঙ্গে তো বহুদিন দেখা হবে না তাই ডেকেছিলাম।

আমি প্রায় হতাশ হ'য়ে বল্লাম—এই তোমার দরকারি কথা ?

দীপ্তি আমার কথা গ্রাহ্য না ক'রে বল্ল, এমন সময় হঠাৎ বাড়ী যাওয়া কেন ? তোমার কি না গেলেই নয় ?

আমি বল্লাম, সে কথা শুনে আজ আর কি হবে, দীপ্তি ?

সে বল্ল, তুমি যেও না, এখন থাক।

আমি বল্লাম, না সে আর হয় না, দীপ্তি। এ সন্দেহ সংশয়ের মধ্যে আমি আর থাকতে পারব না—আমি তোমার কাছে থেকে দূরে চ'লে যেতে চাই—

মাটির দিকে মুখ নামিয়ে অত্যন্ত ধীরে ধীরে প্রায় জড়িত কণ্ঠে দীপ্তি বল্ল, আমি যদি বলি, তবু থাকবে না ?

আমি তার মুখে তাকিয়ে উত্তর দিলাম, তুমি যদি বল, তবে থাকব। কিন্তু তার অর্থ কি সে তো জান !

আমি তার মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। সে চোখ তুলে একবার আমার চোখে চাইল। চোখে চোখ পড়তেই চকিতে মুখ নামিয়ে নত হ'য়ে নিস্তব্ধ হ'য়ে রইল। দেখলাম তার মুখ বিবর্ণ, ললাটে স্বেদবিন্দু, সমস্ত শরীর অবসন্ন, অসহায়।

দীর্ঘ মুহূর্ত্তগুলি যেন কাটে না। দুজনের হৃদয়ের স্পন্দন আর বাইরে বহু দূরের একটা অস্পষ্ট অস্ফুট অবিশ্রান্ত গুঞ্জন ভিন্ন কোথাও কোন শব্দ নেই। বহুক্ষণ পরে সেই নিবিড় নিস্তব্ধতা ভেদ ক'রে দীপ্তি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেল্‌ল, বল্ল, না তবে থাক্। বাড়ী থেকে ফিরবে কবে ?

কোন রকমে উত্তর দিলাম, জানিনে।

আবার নীরব মুহূর্ত্তগুলি মন্থর পদক্ষেপে চলতে লাগল। আমার সামনে নত মস্তকে নীরব বাক্যহীনা দীপ্তিকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন মূর্ত্তিমতী প্রাণধারা এখানে এসে নিস্তব্ধ হ'য়ে গেছে। আমার হৃদয় করুণায় ভ'রে গেলো, আমি বল্লাম, দীপ্তি, কেন তুমি আমাকে কষ্ট দিচ্ছ, নিজেও কষ্ট পাচ্ছ। তুমি যে আমাকে ভালবাস সে কথা আর লুকোতে পারবে না—আর আমার কথা তো জানই। তুমি এসে আমার ভার না নিলে আমার সমস্ত জীবন ছারখার হ'য়ে যাবে। দুটো জীবনকে এমন ক'রে ব্যর্থ করবে কেন দীপ্তি ? বল, আমি থাকব ?

দীপ্তি মাটির থেকে মুখ না তুলেই বলতে সুরু করল—ওর মুখে আমি কখনো এত আস্তে কথা শুনিনি, প্রত্যেকটি

কথা যেন অন্তরের অন্তর থেকে বেরিয়ে আসছে—অত্যন্ত ধীরে ধীরে বল্ল, তোমাকে ভালবাসি সে কথা অস্বীকার করব না। তুমিও আমাকে যে ভালবাস সে কথা জানি। কিন্তু এখন যেমন আছি চিরদিন তেমনি থাকতে পারব না কেন? তুমি কেন আমাকে আরো কাছে চাও? না, না, না, সে আমি পারব না, তুমি আমার কাছে যা চাও, সে আমি দিতে পারব না।

আমার মন কঠিন হ'য়ে উঠ্‌ল, বল্লাম, তোমার ভালবাসার অর্থ আমি বুঝি না। ভালবাসার ধর্ম্মই আরো নিবিড় ক'রে চাওয়া, তুমি যদি আমাকে ভালবাস তবে অসঙ্কোচে আমার কাছে ধরা দিতে পারবে না কেন?

দীপ্তি হতাশ কণ্ঠে বল্ল, না, সে তুমি বুঝবে না।

আমি বল্লাম, তবে যাই দীপ্তি। আশা করি এ জীবনে যেন আমাদের আর দেখা না হয়। দূরে থেকে তুমি সুখী হয়েছো শুনলেই আমি খুসী হ'বো।

দীপ্তি আর্ত্ত কণ্ঠে বল্ল, আমায় ক্ষমা কর—যাবার সময় আমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করেছ ব'লে যাও। আমি তোমার যোগ্য নই—কেন তুমি আমাকে ভালবাসলে?

এত দুঃখেও আমার হাসি এলো। বল্লাম, তুমি ত আমার সকল অপরাধ ক্ষমা কোরো। অনেকদিন তোমাকে অনেক আঘাত দিয়েছি, সেগুলো ভুলে যেও।

দীপ্তি আরও গভীর বিষন্ন নয়নে আমার দিকে চেয়ে রইল।

৪

বহু জায়গা ঘুরে অবশেষে দার্জ্জিলিংয়ে গিয়ে আড্ডা গাড়লাম। জীবনে যেন সব বিস্বাদ হ'য়ে গেছে—কোন কিছুর কোন অর্থ নেই যেন। সবার সঙ্গে কথা বলি, গল্প করি, গান গাই, ঘুরে বেড়াই, সবাই ভাবে লোকটা কী সুখে আছে। অথচ অন্তর যে আগ্নেয়গিরির মতন দিনরাত্রি জ্বলছেই, তার খোঁজ কে রাখে?

সেদিন ভিক্টোরিয়া পার্কে বেড়াতে গিয়ে দেখি, একটা ফুটন্ত ডালিয়া গাছের পাশে প্রীতি দাঁড়িয়ে। আমাকে দেখে সে আশ্চর্য্য হ'য়ে গেল—আমিও চমকে বল্লাম, আরে প্রীতি, তুই এখানে? অনেকটা বড় হয়েছিস তো!

প্রীতি সলজ্জ হাসির সঙ্গে মুখ নত করল। তার মুখের দিকে তাকিয়ে আমি আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলাম, বল্লাম, তুই এত সুন্দর হ'লি কবে থেকে?

লজ্জায় সে ঘেমে লাল হ'য়ে উঠ্‌ল। সত্যি, ডালিয়া গাছের পাশে দাঁড়িয়ে তাকে একটা ডালিয়া ফুলের মতনই দেখাচ্ছিল। পরনের নীল সাড়ি উজ্জ্বল গৌরবর্ণকে আরো উজ্জ্বল ক'রে তুলেছে। শিশুর মত সরল মুখখানিকে ঘিরে দুয়েকটি কোঁকড়া চুল বাতাসে উড়ছে। প্রভাতের সকল হাসি এসে যেন তাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে, আর তারই মধ্যে প্রভাতের প্রাণের মত সে দাঁড়িয়েছিল। তাকে এমন সবুজ, এমন সরস, এমন নবীন দেখাচ্ছিল যে হঠাৎ নিজের কথা মনে প'ড়ে গেল। বিদ্যুতের দীপ্তিতে সেখানে সব জ্ব'লে গেছে—ধূসর বিদগ্ধ মরুভূমি। অজ্ঞাতসারে বুক থেকে একটা নিশ্বাস পড়ল।

প্রীতিকে আমি ছেলে বেলা থেকেই জানি। যখন ও এক বছরের শিশু তখন থেকেই আমার সঙ্গে ওর ভাব—তারপরে যখন একটু বড় হ'ল তখন তো সে আমার মস্ত ভক্ত। ওর বিশ্বাস ছিল যে আমি জানি না, আমি করতে পারি না এমন কিছু দুনিয়ায় নেই। আমার মা ওর মা'র ছেলেবেলার সই—মা মারা যাবার পর থেকে আর ওদের কোন খবর পাইনি। তার পরে আজ পাঁচ ছয় বছর পরে এই দার্জ্জিলিংয়ে দেখা।

প্রীতির মা আমাকে দেখে খুব খুসী হলেন। কয়েকদিন বেশ আনন্দেই কাটল। দেখলাম প্রীতি সেই ছেলেবেলার মত নেহাৎ ছেলেমানুষই রয়েছে। তাকে যা বলি তাই বিশ্বাস করে, কোন সন্দেহ, কোন দ্বিধা কোন সংশয় তার শৈশবের স্বর্গপুরীতে প্রবেশ করেনি। প্রায় যৌবনের সীমানায় এসে দাঁড়ালেও সে আজো মনে বালিকাই র'য়ে গেছে। বালিকার চাঞ্চল্য বালিকার উল্লাসে তার দেহ মন এখনো উজ্জ্বল।

হুমায়ুন কবির

আমার মনের অন্তর্দ্দাহ ধীরে ধীরে নিভে এল। কিন্তু প্রীতির প্রতি আমার যে মনের ভাব সে সম্বন্ধে আমার কোনদিনই ভুল হয়নি। তাকে আমি ভালবাসতাম, কিন্তু সে ভালবাসায় কোন দাহ ছিল না কোন উত্তাপ ছিল না। মনে হ'ত সে বুঝি অসহায় শিশু—সংসারের আঘাত থেকে তাকে না বাঁচালে সে বুঝি বাঁচবে না। সর্ব্বদা ভয় হ'ত এই বুঝি ওকে ব্যথা দিলাম।

সেও আমায় ভালবেসেছিল। কিন্তু সেদিন আমি তা জানতাম না। ভাবতাম যে আমি তাকে বোনের মত স্নেহ করি, সেও বুঝি তেমনি আমাকে ভাইয়ের মত ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে। সে বোধ হয় নিজেও তখন জানত না যে সে আমাকে ভালবাসে—তা হ'লে অমন অসঙ্কোচে সে আমার সকল বিষয়েই কথা কইতে পারত না।

আমার মনে আছে আমি তাকে নিয়ে একদিন জলা-পাহাড়ে বেড়াতে গিয়েছিলাম। অত উঁচুতে উঠতে পরিশ্রমে সে হাঁপাচ্ছিল। আমি তাকে বল্লাম, তুই আমার কাঁধে ভর দিয়ে ধীরে ধীরে ওঠ্। সে অসঙ্কোচে আমার দেহে ভর রেখে আমার সঙ্গে উঠতে লাগল।

সেদিন ফেরবার পথে একটা পাথরের ওপর ব'সে বিশ্রাম করছি, হঠাৎ প্রীতি জিজ্ঞেস ক'রে বসল, তুমি আজো বিয়ে করনি কেন?

আমি হঠাৎ এ রকম প্রশ্নে অপ্রস্তুত হ'য়ে গেলাম। পরক্ষণেই সামলে তার দিকে তাকাতেই দেখলাম তার গভীর স্বচ্ছ বিশ্বাসভরা চোখ দুটি আমার দিকে মেলে ও চেয়ে রয়েছে। সেখানে কোন ছল নেই, কোন সন্দেহ নেই। ও যেন স্বর্গচ্যুতির পূর্ব্বের ঈডেন-বনের দেবশিশু। ওই শিশুর মত সরল আয়ত চোখ আমাকে নিরুপায় ক'রে ফেলে—ওর কাছে কিছু লুকোতে লজ্জা করে।

বল্লাম, সে যে অনেক কথা, প্রীতি।

প্রীতি বল্লে, হোক অনেক কথা। আমি আজ শুনবই। তুমি এ রকম গম্ভীর হ'য়ে রইলে কেন? আমাকে বলবে না?

তার কালো চোখের তারায় জল জ'মে এল। আমি ব্যস্ত হ'য়ে বল্লাম, বলছি, বলছি, তোকে কাঁদতে হবে না।

যতদূর সংক্ষেপে এবং বহু কথা বাদ দিয়ে তাকে দীপ্তির কথা বল্লাম। সে শুধু একবার বল্লে, দীপ্তিদি?

আমি বল্লাম, হ্যাঁ, চিনিস নাকি?

সে কোন উত্তর না দিয়ে দাঁড়িয়ে বল্লে, চল, বাড়ী ফিরে যাই।

৫

তার পরে কয়েকদিন প্রীতিদের বাড়ী যাইনি। সেদিন তাকে দীপ্তির কথা বলার পর থেকেই দীপ্তির ছবি এসে আমার হৃদয় থেকে আর সব মুছে ফেলেছে—দিনরাত এ কদিন শুধু দীপ্তির কথাই ভেবেছি। কি প্রাণময়, কি সতেজ অথচ কি কঠিন। আমার মনে হ'তে লাগল সে যেন পাষাণে-গড়া মূর্ত্তি। শিল্পী যত্নে পাথর কুঁদে তাকে তৈরি করেছে; সেখানে একটু বাহুল্য নেই, একটু জঞ্জাল নেই। পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত সমান কঠিন, সমান মসৃণ, সমান উজ্জ্বল।

হঠাৎ দীপ্তির চিঠি পেলাম সে দার্জ্জিলিং আসচে। তার সঙ্গে বিচ্ছেদের পরে এই প্রথম তার খবর পেলাম। ভারি আশ্চর্য্য লাগল—কিন্তু মন তবু খুসী হ'য়ে উঠল। সেদিন সন্ধ্যায় প্রীতিকে বল্লাম, প্রীতি, দীপ্তি এখানে আসচে।

প্রীতি স্থির অবিচল দৃষ্টি মেলে বল্লে, সে আমি জানি।

আমি অবাক হ'য়ে চেয়ে রইলাম. প্রীতি মাটীর দিকে চেয়ে ধীরে ধীরে বল্লে, আমি দীপ্তিদিকে আসতে লিখেছিলাম।

কতকটা বিস্ময়, কতকটা কৌতূহলের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি তাকে কি লিখলে?

এই বোধ হয় জীবনে আমি তাকে প্রথম তুমি সম্বোধন করলাম। আমি সেটা লক্ষ্য করিনি কিন্তু প্রীতি লক্ষ্য করেছিল। আমার কথার উত্তর না দিয়ে সে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল।

বিশেষ কিছু বুঝতে পারলাম না। অথচ মন না বুঝে অকারণেই আনন্দে ভ'রে উঠ্‌ল। আমার কেবলি মনে হতে লাগল, দীপ্তি আসছে—সে আসছে। এবার কি আমাদের দুজনের দ্বন্দ্ব ঘুচবে? ভালবাসার টানে সে কি আমার কাছে আত্মদান করবে; ভাল সে আমাকে নিশ্চয়ই করবে, তা নইলে কেন এখন হঠাৎ দার্জ্জিলিং

আসবে? আর প্রীতি? তার প্রতি গভীর স্নিগ্ধ ভালবাসায় আমার হৃদয় পূর্ণ হ'য়ে উঠ্‌ল। ছোট বোনটির মত সে আমার বেদনার তপ্তজ্বালার পর শীতল কোমল মঙ্গল হাত বুলিয়ে দিল—মঙ্গল হোক তার মঙ্গল হোক।

আজ কিন্তু বুঝ্‌তে পেরেছি যে প্রীতির প্রতি আমার ভালবাসা কেবলমাত্র ভাইয়েরই ভালবাসাই নয়। হয় তো সে ভালবাসায় কোন উত্তাপ ছিল না, কোন দাহ ছিল না, কিন্তু উত্তেজনা না থাকলেই কি ভালবাসা গভীর হ'তে পারে না? তার প্রতি আমার ভালবাসায় ছিল গভীর প্রশান্তি আর সান্ত্বনা। দীপ্তির জন্য আমার আকাঙ্ক্ষা ছিল উগ্র মদের মত জ্বালাময়, তীব্র অথচ মদির, মধুর। তার ভালবাসা আমাকে সচেতন ক'রে রাখত—সমকক্ষের ওপর অধিকারের দাবী ছিল তার মধ্যে। আর প্রীতির প্রতি আমার ভালবাসা ছিল স্বপ্নের মত, ধীরে ধীরে সকল দেহমন ছেয়ে আসে, মনে হয় আপনকে ভুলে যাই। তবু জীবনে চিরদিন দীপ্তিই চেয়েছি, দীপ্তিকে চেয়েই মরব।

দীপ্তি এল। ষ্টেশনে তাকে নামাতে গিয়েছিলাম। মনে হ'ল আমাকে দেখে তার চোখের তারা নিমেষের জন্য উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌ল, পরক্ষণেই জিজ্ঞাসা করল, কেমন আছ?

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি কেমন ছিলে এদ্দিন? সে কোন উত্তর না দিয়ে চলতে লাগল। দেখলাম যেন আগের চেয়ে একটু কৃশাঙ্গী হ'য়ে গেছে গলার হাড়টা যেন একটু বেশী স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে। হঠাৎ ঘাড় বাঁকিয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করল, তুমি না বলেছিলে এ জীবনে আর আমার সঙ্গে দেখা করবে না, কই তোমার কথা তো রইল না?

আমি বল্লাম, তোমার ইচ্ছার কাছে আমার কথা কবেই রয়েছে?

দীপ্তি সে কথার উত্তর না দিয়ে বল্ল, চ'লে যেতে বল; তবে আজই ফিরে যাচ্ছি, এখনো ফেরবার সময় আছে।

আমি কোন উত্তর না দিয়ে তার দিকে চাইলাম।

আমার দৃষ্টির সামনে সে মুখ নত করল। খানিকক্ষণ পরে আবার জিজ্ঞেস করল, প্রীতি তোমার ছোট বোন নয়?

আমি বল্লাম, না, কেন বল ত?

সে বল্ল, ও আমার বোন হয়। তোমারো যদি বোন হত তবে তোমার আমার একটা সম্বন্ধ হ'তে পারত। সেখানে আমাদের কোন সঙ্কোচ থাকত না।

আমি বল্লাম, তোমার আমার সম্বন্ধ শুধু একটিই হ'তে পারে সে তুমিও জানো আমিও জানি। তা ছাড়া আর কোন সম্বন্ধ হ'তে পারে না আমিও চাই না।

দীপ্তি ধীরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বল্ল, তুমি বড় নিষ্ঠুর।

আমি তার মুখে চেয়ে শুধু একটু হাসলাম।

আবার দুজনে নীরবে পথ চলেছি। দীপ্তি হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, প্রীতি তোমাকে খুব ভালবাসে, না?

আমি একটু বিরক্ত ভাবেই বল্লাম, তা কেমন ক'রে জানব?

দীপ্তি বল্ল, আর তুমি?

আমি রাগ ক'রে বল্লাম, কেন মিছামিছি এ-সব কথা জিজ্ঞেস করছ? আমি কাকে ভালবাসি সে তুমি জানো। তবে নিরর্থক এ প্রশ্ন কেন? সে আমার ছোট বোনের মত, সেও আমাকে ছেলেবেলা থেকে দাদা ব'লে জানে।

প্রীতির মা দীপ্তিকে পেয়ে মেতে উঠলেন। বহুদিনের অসাক্ষাতের অনেক কথা জ'মে উঠেছিল, প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে আর উত্তর দিতে সন্ধ্যে হ'য়ে এলো। বল্লেন, তোমরা এখন বেড়াতে যাও।

প্রীতি বল্ল, তার মাথা ধরেছে সে যেতে পারবে না। তাই শুনে দীপ্তিও যেতে চাইল না, তাকে বল্ল, কাল একসাথে বেড়াতে যাওয়া যাবে, আজ না হয় থাক।

প্রীতি কিছুতেই শুনল না—প্রায় জোর ক'রে দীপ্তিকে আমার সঙ্গে বেড়াতে পাঠিয়ে দিল। দীপ্তির যেতে ইচ্ছা ছিল না বুঝতে পারছিলাম, কিন্তু তবু সে এল। তাকে যে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেউ কিছু করাতে পারে সে-কথা কোনদিন ভাবি নি। চিরদিন দেখেছি সকলে দীপ্তিরই ইচ্ছা মেনে এসেছে এবং সে নিজেও খেয়ালের হাওয়ায় ভেসে চলেছে, কিন্তু আজ দীপ্তিকেই অন্যের খেয়ালে চলতে হ'ল। তখনই ভেবেছিলাম প্রীতি এত জোর কোথায় পেল? আজ বুঝি, তার নিজের কোন দাবী ছিল না ব'লে তার দাবী কেউ ঠেলতে পারত না। আমাকে সে

ভালবেসেছিল এবং সে-ভালবাসার মধ্যে তার কোন কামনা ছিল না—সেই নিছক ভালবাসার জোরেই সে দীপ্তিকে একদিনের মধ্যে বশ ক'রে ফেলল।

দীপ্তির সঙ্গে পথে বেরোলাম। তখন সন্ধ্যা হ'য়ে এসেছে। উত্তরে চারিদিকের ছায়াস্নিগ্ধতার মধ্যে তখনও কাঞ্চনজঙ্ঘার স্বর্ণকীরিট কিরণ-দীপ্ত—একটা কুয়াসার পর্দা ধীরে ধীরে ওপরের দিকে উঠে আসছে। পথে আলোর মালায় সহর যে কি সুন্দর দেখাচ্ছিল বলা যায় না। গাছপালার ফাঁক দিয়ে ওপরে নীচে যেখানে সেখানে আলোর দীপ্তি—আলোর মালা গলায় প'রে রাস্তাগুলি কোথায় নীচে নেমে গেছে কোথাও বা ওপরে উঠছে—দূরে দূরে দুয়েকটি পাহাড়ের গায় বাংলোতে বাতি জ্ব'লে উঠেছে।

দীপ্তির হাতটা টেনে আমার মুঠোয় ভ'রে দুজনে পথ চলতে লাগলাম। বললাম, দীপ্তি এত দিন তোমার অভাবে যে আমার জীবন কি ছন্নছাড়া হ'য়ে গেছে সে যদি তুমি জানতে তবে তোমার দয়া হোত। মনে আছে সব কথা?

দীপ্তি কোন উত্তর দিল না। খানিকক্ষণ নীরবে আবার দুজনে চলেছি। রাস্তার ওপরে এক এক জায়গায় শাল গাছের ঘন ছায়া—কোথাও বা ঝোপমত হ'য়ে খানিকটা অন্ধকার ক'রে রয়েছে। চলতে চলতে একটা ইউকেলিপটাস গাছের ছায়ায় একটা শূন্য বেঞ্চ দেখে দুজনে গিয়ে সেখানে বসলাম—দীপ্তির হাতটা আমার কোলেই রইল।

আমি আস্তে আস্তে তার হাতে চাপ দিয়ে বল্লাম, দীপ্তি আমার কথার উত্তর দেবে না? দার্জ্জিলিং থেকে কি দুজনে একসাথে ফিরব?

দীপ্তি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বল্ল, সে আর হয় না।

আমি বল্লাম, কেন হবে না, দীপ্তি? তুমি আমার চোখে তাকিয়ে বল যে তুমি আমার, দেখো পৃথিবীর কোন শক্তি তোমাকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না। বল তুমি একান্ত আমারই।

আমার বাহু যে কখন তার কটিতট বেষ্টন ক'রে তাকে আমার বুকে টেনে নিয়েছে টের পাইনি। হঠাৎ দেখলাম আমার মুখের ঠিক নীচেই তার মুখ, তার বক্ষ আমার বক্ষস্পন্দনে ধ্বনিত হচ্ছে, তার সমস্ত দেহের কোমলতা ও উত্তাপ আমার দেহকে বিহ্বল ক'রে ফেলেছিল। কালো চোখ দুটি অন্ধকারে তারার মতন জ্বলছে—কী উন্মন দৃষ্টি তার গভীর গহ্বরে। আমি আত্মহারা আবেগে তার সরস রক্তাধরে প্রগাঢ় চুম্বন করলাম—বেশ বুঝতে পারলাম যে বিদ্যুতপ্রবাহে দুজনের দেহই যেন ট'লে উঠল। পাগলের মতন তাকে বারে বারে চুম্বন ক'রে কঠিন বাহু-বন্ধনে তাকে আমার দেহে নিষ্পেষণ ক'রে তার মুখের উপর মুখ রেখে বল্লাম, তুমি আমার একান্ত আমার। বিশ্বসংসারে কেউ তোমাকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না। শুধু একবার বল তুমি আমার।

দীপ্তি আরক্তমুখে প্রায় নিরুদ্ধকণ্ঠে বল্ল, ছেড়ে দাও।

আমি তাকে মুক্ত ক'রে বল্লাম, ক্ষমা কর, আমার খেয়াল ছিল না যে তোমাকে ব্যথা দিচ্ছি। আমার কথার উত্তর দাও না ব'লেই তো আমি আত্মহারা হ'য়ে পড়ি তখন তোমাকেই আঘাত ক'রে বসি।

দীপ্তি দাঁড়িয়ে উঠে আনত নয়নে ত্রস্ত কণ্ঠে বল্ল, আমায় ক্ষমা কর। বাড়ী ফেরবার যে বড্ড দেরী হ'য়ে গেল। আমি এখুনি চল্লাম।

ব'লেই ফিরে না তাকিয়ে সে দ্রুতপদক্ষেপে চ'লে গেল—আমি যে উঠে তার সঙ্গে যাব সে শক্তিও আমার ছিল না।

৬

পরদিন যখন দীপ্তির সঙ্গে দেখা হ'ল তখন সে সবে স্নান ক'রে উঠেছে। মোটা লালপেড়ে আল্‌পাকার সাড়ীতে খোলা চুলে তাকে যে কি সুন্দর দেখাচ্ছিল সে কথা আমার আজো স্পষ্ট মনে আছে। আমাকে দেখেই এক ঝলক রক্তে তার সমস্ত মুখ রাঙা হ'য়ে উঠল—চোখ দুটি নিজে থেকেই নত হ'য়ে এল। পরক্ষণেই চোখ তুলে আমার চোখে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, কাল কখন বাড়ী ফিরলে? তখন তার চোখে সঙ্কোচের লেশ ছায়া নেই।

বিস্ময়ে শ্রদ্ধায় প্রেমে আমার সমস্ত হৃদয় পূর্ণ হ'য়ে উঠল। বল্লাম, অনেকটা রাত্তিরে। কিন্তু তুমি অমন ক'রে আমার কথার উত্তর না দিয়ে চ'লে এলে কেন? ভয় পেয়েছিলে বুঝি?

দীপ্তি স্থির দৃষ্টিতে আমার চোখে তাকিয়ে বল্ল, কালকের কথা যদি আবার আমাকে বল তবে তোমার সঙ্গে আর কোন সম্বন্ধ আমার রইবে না। কোনদিন যদি আবার তোমার সঙ্গে কথা বলি তবে আমার নাম বদলে রেখো।

আমি আহত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বল্লাম, আমার জীবনে যার মূল্য অনেক, তাকে তুচ্ছ করবার মত শক্তি আমার কোথায়? তুমি আমায় তো কেবলি ঠকাতে চেয়েছ—যদি বা অনুগ্রহ ক'রে কিছু ভিক্ষা দিয়েছিলে তাও আবার এখন ফিরিয়ে নেবে?

দীপ্তির চোখে হাসি ঠিকরে পড়্‌ল—আমি তোমায় দিয়েছি না আমায় অসহায় পেয়ে অতর্কিতে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে? দস্যুর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব নেই সে কথা স্পষ্ট ব'লে দিচ্ছি।

পরক্ষণেই কণ্ঠস্বর কোমল ক'রে বল্ল, দেখ তোমায় দোষ দিচ্ছি না বা কোন কথা ভুলতেও বলছি না। তবে ও-সব কথা ভবিষ্যতে কখনো আমায় বলতে পারবে না। আর তোমার আচরণটা যে আদর্শ হয়নি সেটা কি অস্বীকার করবে?

স্নিগ্ধ হাসিতে তার মুখ ভ'রে গেল। আমি বেদনাতুর কণ্ঠে বল্লাম, দীপ্তি তোমাকে বোঝা অসম্ভব। সত্যি কি আমার হবে না কোনদিন?

দীপ্তি বল্ল, না।

জিজ্ঞাসা করলাম, এই কি তোমার শেষ কথা?

সে স্থির অবচলিত কণ্ঠে উত্তর দিল, হ্যাঁ। উত্তরের অপেক্ষা না ক'রেই রাণীর মত অটুট মহিমায় সে চ'লে গেল। আমি মুগ্ধ বিস্মিত ব্যথিত চোখে তার দিকে চেয়ে রইলাম।

৭

প্রায় এক মাস পরের কথা। দীপ্তি আমাকে এড়িয়ে চলেনি বটে কিন্তু তাকে আর কখনো একা পাইনি। হাসি বিদ্রূপ তার ঠিক আগের মতনই ঝলসে উঠেছে, ঠিক তেমনি করেই সে আমাদের সকলের সকল অনুরোধ অনুনয় অনুযোগ পাশ কাটিয়ে আপনার খেয়ালে চলেছে, কিন্তু একটু সাবধানতা তার সব সময়েই ছিল। তাই সে-দিন সন্ধ্যাবেলা সে যখন নিজে এসে আমাকে বল্ল, প্রীতিরা কোথায় গেছে যেন, চল বেড়াতে যাই। তখন একটু বিস্মিতই হয়েছিলাম। একবার তার মুখে তাকালাম, কিছু বুঝতে পারলাম না।

পথে বেরিয়েই দীপ্তি বল্ল, দেখ সেদিনের মত যেন করতে চেষ্টা কোরোনা। তুমি ব'লে সেদিন তোমাকে কিছু বলিনি আজ করলে আর কিন্তু ক্ষমা করব না।

আমি হাস্‌লাম। বল্লাম, দীপ্তি, তোমার ক্ষমা দিয়ে আমার কি হবে? আর সেদিন অপরাধ করেছি মনে হয় না। তুমি নিজে এসে আমার বাহুবন্ধনে ধরা যে কোনদিন দেবে সে ভরসা তো আর নেই।

দীপ্তি দীপ্তনয়নে আমার দিকে তাকাল। হঠাৎ ব'লে উঠ্‌ল, আমার একটা কথা রাখবে? যদি রাখ তবে বলি।

আমি বল্লাম, কবে তোমার কথা রাখিনি দীপ্তি? অবশ্য যদি আকাশের চাঁদ এখনি এনে দিতে হবে বল তবে হয়ত পারব না—কিন্তু তাও বোধ হয় তোমার আদেশ পেলে একবার চেষ্টা ক'রে দেখতে পারি।

দীপ্তি বল্ল, প্রীতি তোমাকে ভালবাসে, তুমি তাকে বিয়ে কর। তোমরা দুজনেই সুখী হবে।

আমি কোন কথা না ব'লে তীব্রদৃষ্টিতে তার মুখে তাকালাম—আমার দৃষ্টির সামনে সে চোখে নত করল।

ধীরে ধীরে সে বলতে লাগল, আমাকে পেয়ে তুমি কোন-দিন সুখী হতে পারবে না। আমার মধ্যে যে দাহ আছে সে তো তুমি জান। তুমি নিজেও অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, তুমি আমায় সইতে পারবে না। প্রীতির স্নিগ্ধ স্নেহই তোমার পক্ষে মঙ্গল। তোমাকে যে ভালবাসি সে কথা কি আজ নতুন ক'রে বলতে হবে? তবু দেখেছ তো যে যখনি আমার কাছে এসেছ তখনি পরস্পরকে বাধা দিয়েছি।

আমি তার চোখে চোখ রেখে বল্লাম, আমাদের মধ্যে যে সংঘাতের কথা বলছ সেটার কারণ তো জান। ভালবাসায় আমরা পরস্পরকে আত্মদান করতে পারি নি—কেবলি আত্মরক্ষা ক'রে এসেছি। তুমি আমার হও, আমিও তোমারই হব যখন, তখন এ দ্বন্দ্ব আর থাকবে না। এ বিরোধের একমাত্র কারণ আমাদের পরস্পরের প্রতি আকাঙ্ক্ষা এবং তার বিরুদ্ধে আমাদের বিদ্রোহ।

হুমায়ুন কবির

দীপ্তি হাস্‌ল, বল্ল, তোমার কথা সত্য ব'লে মানি। তোমাকে পেলে আমার জীবন ধন্য হ'য়ে যাবে সে-কথা জানি। নিবিড় ক'রে তোমাকে পাওয়ার পরে জীবন যদি আমার মরুভূমি হ'য়ে যায় তবু আমার খেদ থাকবে না। কিন্তু সে তো আর হয় না, বন্ধু। অদৃষ্টের সুতোয় পাক খেয়ে গেছে। এখন সে গ্রন্থি আর খোলা যাবে না। হৃদয়তন্ত্রী ছিঁড়ে ফেলে আজ মুক্তি পেতে হবে। আমাকে তুমি ক্ষমা কোরো।

আমি অবাক নয়নে তার দিকে চেয়ে রইলাম। ধূপছায়া সাড়ী তার তেজোময় মুখখানিতে অপূর্ব আভা এনে দিয়েছিল—স্নিগ্ধ নয়ন প্রেমের কিরণে পরিপূর্ণ ক'রে সে আমার দিকে চেয়ে বল্ল, আমার কথা ঠিক বুঝতে পারছ না ?

আমি তার হাতদুটি বুকে টেনে নিলাম। বল্লাম, আমরা দুজনে দুজনকে ভালবাসি। আমাদের মিলনে কেউ বাধা দেবে না—দিতে চাইলেও পারত না। তবে কেন তুমি এমন ক'রে নিষ্ঠুর প্রাণে আমায় ছেড়ে চ'লে যেতে চাও ?

সে সঙ্কোচে আমার বুকের একান্ত কাছে এসে দাঁড়াল। আমি বাহু দিয়ে তাকে ঘিরে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। সে বলতে লাগল, তোমার বিরহে কি আমি বেদনা পাইনি ? তুমি কলকাতা থেকে চ'লে এলে, আমার সমস্ত জীবন যেন মরুভূমি হ'য়ে গেল। দার্জ্জিলিংয়ে যখন এসেছিলাম তখন প্রথম ভেবেছিলাম যে তোমার কাছে এবার ধরা দেব। এমন ক'রে তোমাকে আঘাত দিয়ে নিজেকেও কাঁদব না। কিন্তু এখন তো সে আর হবে না। প্রীতি তোমাকে ভালবেসে ফেলেছে। আমি যদি তোমাকে তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিই তবে সে আঘাত সে সইতে পারবে না। মুখে সে কিছুই বলবে না জানি, খুসীই হ'তে সে চাইবে, কিন্তু বুকের মধ্যে যখন আগুন জ্বলে তখন হাসি দিয়ে কি তাকে আর চেপে রাখা যায় ? তুমি ওকে বিয়ে কর, তোমরা সুখী হবে। আমি তো তখন তোমার গুরুজন হব, তোমায় আশীর্ব্বাদ করব, ভাগ্যমন্ত হও !

শেষের দিকে চাপা হাসিতে তার কণ্ঠস্বর তরল হ'য়ে উঠ্‌ল। আমি আমার বাহুবন্ধন আরো একটু নিবিড় ক'রে বল্লাম, এখনই কেন আশীর্ব্বাদ কর না আমাকে ? যে আশীর্ব্বাদ আমি চাই সে তো তুমি জান, আর তুমিই কেবল দিতে পারো। ছিনিয়ে নেবার অভ্যাস তোমার আছে কি না জানি না। কিন্তু আমি তো কারো সম্পত্তি নই যে আমাকে না জিজ্ঞেস ক'রেই এমন ক'রে আমাকে প্রীতির অধিকারী সাব্যস্ত করলে। তুমি ভুল বুঝেছ। প্রীতি আমাকে বোনের মত ভালবাসে। সে তোমার কথা জানে আর জেনেই তো সে তোমাকে আসতে চিঠি লিখেছিল।

দীপ্তি বিষণ্ণ ভাবে মাথা নাড়ল, বল্ল, তুমি প্রীতিকে বোঝনি, অথবা বুঝেও না বোঝার ভাণ করচ। আমি এত বড় স্বার্থপর হ'তে পারব না। আমাকে তুমি ক্ষমা কোরো। আমার জীবন বোধহয় আমি ব্যর্থ ক'রে দিলাম, কিন্তু এ কথা জেনো যে তুমিই আমার প্রিয়তম—চিরদিন তুমিই আমার প্রিয়তম থাকবে।

আমি হতাশ কণ্ঠে বল্লাম, দীপ্তি, তাই কি হবে ?

কান্নায় আমার বুক ভ'রে এলো। দেখলাম তার চোখের কানায় কানায় জল। বল্ল, বন্ধু, এ আমাদের অদৃষ্টের পরিহাস। আমাকে তুমি ক্ষমা কর।

আমি নীরবে তাকে আরো কাছে টেনে নিলাম। তার মুখের ওপর মুখ রেখে কতক্ষণ ছিলাম জানি না, হঠাৎ সে চমকে উঠে বল্ল, এবার ছেড়ে দাও। ফিরে যেতে হবে, কিন্তু ফেরার পথ যে বড় কঠিন।

তার দিকে চেয়ে করুণায় বুক ভ'রে গেল। বল্লাম, যাদের প্রতি ভগবানের করুণা, তাদের পথ কোন দিন সহজ হয় না। তোমার কঠিন পথে তুমি চলতে পারবে, কিন্তু আমার বোঝা কি আমি সইতে পারব ?

সে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বল্ল, সইতে পারবে, খুব সইতে পারবে। তুমি না সইলে বেদনার ভার কে সইবে ? তোমার পথ সহজ হোক বলব না—কঠিন পথে চলবার কঠোর গৌরব তোমার হোক।

আমি আবার তাকে বুকে টেনে নিলাম। এক মুহূর্ত্ত স্থির থেকে সে বল্ল, এবার তবে বিদায়। আমার পথে

তুমি আর এসো না—কাছে এলে আমরা দুজনেই এ ব্যবধান সইতে পারব না। যদি আমার কোন দিন দরকার হয় তোমাকে ডাকব, তুমিও যখন তোমার দরকার হবে অসঙ্কোচে আমাকে ডেকো। আমি যেখানে থাকি আসবই।

সে চ'লে গেল। সন্ধ্যা-আকাশের রক্ত-রেখার দিকে তাকিয়ে আমি একা ব'সে রইলাম। পশ্চিমের অস্তরাগ কখন যে মুছে গেল, নিশীথিনীর মৌন যবনিকায় আকাশ বাতাস ঢাকা পড়ল জানিনে।

সহসা চমকে দেখলাম, কৃষ্ণা পঞ্চমীর ক্ষীণ বঙ্কিম চাঁদ পাণ্ডুর লোহিত আভায় আকাশকোণে দেখা দিয়েছে। জনহীন পথ, নিদ্রিত পুরী। হতাশা গৌরবগরবদীপ্ত হৃদয়ে কেমন ক'রে যে বাড়ী ফিরে এলাম বলতে পারব না।

তারপরে আর কোন দিন প্রীতি বা দীপ্তি কারু সঙ্গে দেখা হয়নি। তবু ভরসা ক'রে ব'সে আছি যে দীপ্তি একদিন আমাকে ডাকবেই—সেদিনের প্রতিক্ষায় আমার সমস্ত জীবন উন্মুখ।

গোধূলি

শ্রীমাখনমতী দেবী

কে তোমারে পরিয়ে দিল
সন্ধ্যা তারার টিপটি মরি,
আদর ক'রে ললাটপটে
খণ্ড শশীর দীপটি ধরি।
সান্ধ্য মেঘের রঙিন নায়
কে তুই এলি মৃদুল বায়
উড়িয়ে দিয়ে মত্ত ব্যোমে
মাথার চারু নীলাম্বরী ?
উড়িয়ে পায় পথের ধূলি
গৃহপানে আস্‌ছে ধেনু ;
রাখালবালক উৎসাহেতে
ফিরছে ঘরে বাজিয়ে বেণু।
অরুণিমা ধূপ গোধূলি
বেণুরবে দিক উজলি'
অতীতের এক কোনও কালে
এই রূপেতে ফিরত হরি॥
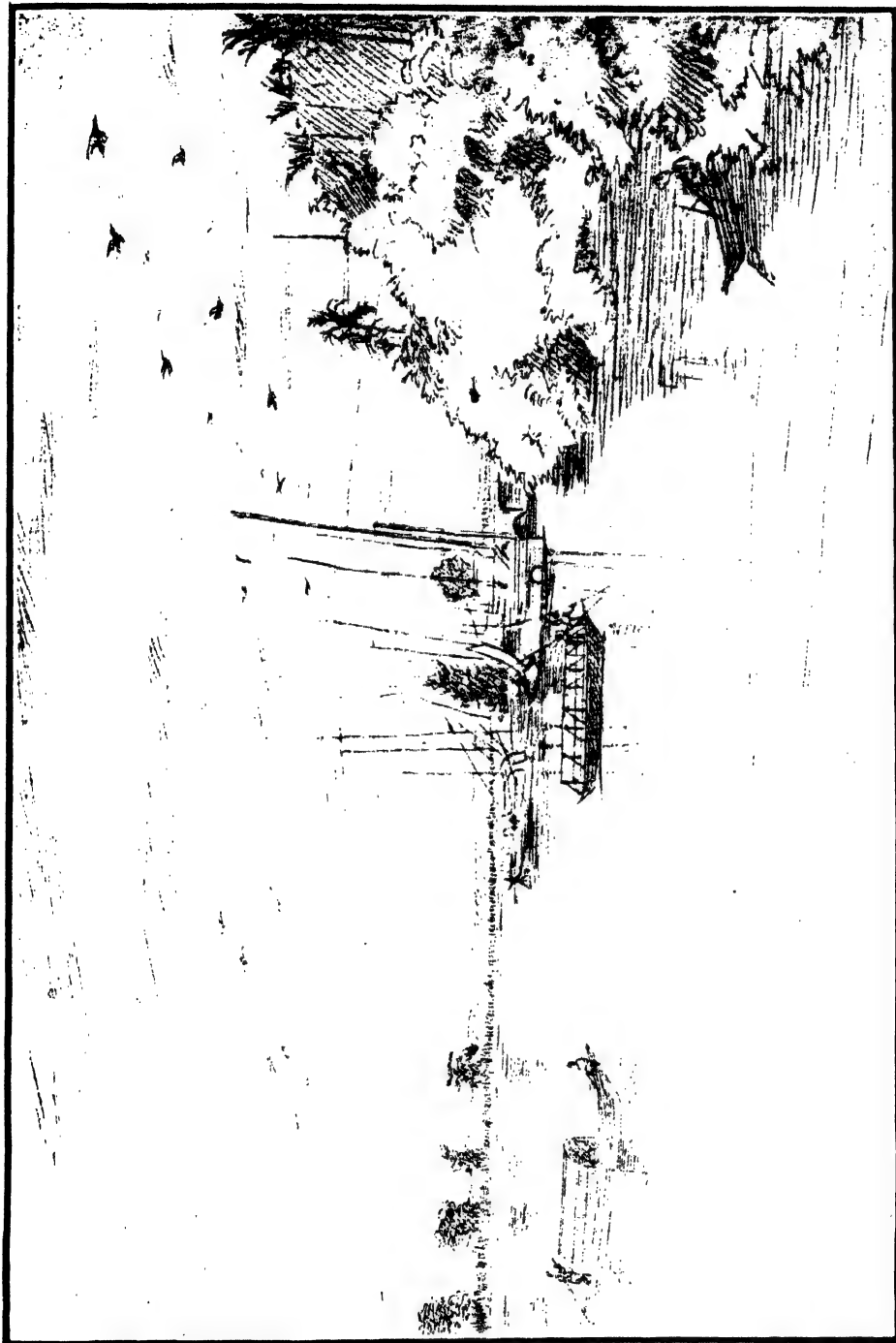
খেয়া-ঘাট, তিপকাই নদী, আসাম

শিল্পী—ডি, দত্ত

গুজরাটি ও বাঙ্গলা সাহিত্য

শ্রীননীগোপাল চৌধুরী

প্রাচীন যুগ

পূর্ব্ব ভারতের বাঙ্গলা সাহিত্য ও পশ্চিম ভারতের গুজরাটি সাহিত্যের মধ্যে যে সাদৃশ্য দেখা যায়, বিশেষত প্রাচীন যুগে, তাহা প্রণিধানযোগ্য, সাদৃশ্য কেবল ভাবে ও রীতিতে নহে, এমন কি উৎপত্তি এবং ক্রমবিকাশেও পরিলক্ষিত হয়। উভয় ভাষার প্রাচীন যুগ বলিতে তাহাদের উৎপত্তি হইতে আরম্ভ করিয়া চতুর্দ্দশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বুঝায় এবং আমাদের আলোচ্য বিষয় এই সীমাদ্বয়ের মধ্যে বদ্ধ থাকিবে।

ভারতীয় ভাষার মধ্যে কেবল গুজরাটি ভাষার গৌরব করিবার একটি বিষয় এই যে ভাষাটির উৎপত্তির ইতিহাসে কোথাও ফাঁক নাই কিংবা কোন একটা স্তর অস্পষ্ট নহে। নদীর মত এই ভাষাটি ভারতীয় সংস্কৃতজ ভাষা-সমূহের উৎস সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন হইয়া প্রাকৃত ও অপভ্রংশ ভাষার বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত। নদীসৈকতে স্বর্ণরেণুর ন্যায় অনেক বৈদিক শব্দ ও ভাষার স্রোতে প্রবাহিত হইয়া প্রাকৃত ও অপভ্রংশ যুগে রূপান্তরিত হইয়া গুজরাটি ভাষায় স্থান পাইয়াছে। বাঙ্গলা ভাষার উৎপত্তির ইতিহাসে স্রোত কোথাও প্রবলা, কোথাও ক্ষীণকায়া আবার কোথাও লুপ্ত হইয়া পুনর্ব্বার বহুদূরে দেখা দেয়। এই বাঙ্গলা ভাষার অপভ্রংশ যুগের চিহ্ন খুবই কম পাওয়া যায়, সুতরাং অনেক সংস্কৃত শব্দ প্রাকৃতে রূপান্তরিত হইয়া হঠাৎ বাঙ্গলা ভাষায় দেখা দেয় কিন্তু অপভ্রংশ যুগে ঐ শব্দটি কি আকার ধারণ করিয়াছিল তাহার কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না।

মুখ্যত অপভ্রংশ ভাষা হইতে ভারতীয় ভাষাসমূহের উৎপত্তি। সৌরসেনী অপভ্রংশ কখন যে ধীরে ধীরে লোক-চক্ষুর অন্তরালে গুজরাটি ভাষায় পরিণত হইল তাহা অনুসরণ করা দুষ্কর। প্রায় দশম শতাব্দীতে চারণগণ গুজরাটের রাজপুত রাজন্যবর্গের স্তুতিগান অপভ্রংশ ভাষায় রচনা করিতে আরম্ভ করে এবং জৈন সাধুগণ জনসাধারণের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য উক্ত ভাষায় 'রাস' রচনা করেন। প্রচারের জন্য এই 'রাস' রচিত হইত বলিয়া জনসাধারণের বোধগম্য করিবার জন্য তাহাদের ভাষাতে সে সময়ে প্রচলিত দেশীয় শব্দের অনেক প্রয়োগ হইত। এই অপভ্রংশ ভাষার মধ্যে ভাবী গুজরাটি ও মাড়ওয়াড়ি প্রভৃতি ভাষার আগমন ঘোষিত হয়। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক সম্পাদিত সমসাময়িক "বৌদ্ধ গান ও দোঁহা"র ভাষা সম্বন্ধে যেমন বাঙ্গলার পণ্ডিতমণ্ডলের মধ্যে মতদ্বৈধ দেখা যায় সে রকম এই 'রাসের' ভাষা সম্বন্ধেও গুজরাটি পণ্ডিতসমাজে মতবৈষম্য দৃষ্ট হয়। কাহারও মতে এই 'রাসের' ভাষা খাঁটি গুজরাটি, আবার কাহারও মতে গুজরাটি নহে তবে গুজরাটি ভাষার উন্মেষকালীন চিহ্ন ইহাতে বর্ত্তমান অর্থাৎ ইহা গঠন যুগের ভাষা। ভাব ও ভাষার অস্পষ্টতানিবন্ধন অনেকে "বৌদ্ধগান ও দোঁহার" ভাষাকে সান্ধ্যভাষা নামে অভিহিত করিয়াছেন। 'রাস' সাহিত্যের ভাষাও সে সান্ধ্য যুগের ভাষা। 'রাস' সাহিত্যের নমুনা হিসাব নিম্নে দুইটি পদ উদ্ধৃত হইল।

> "কাতী করবত কাপতাঁ বহিলউ আব্ই ছহ।
> নারী বি্ধা টলবলহ, জাজীব্হ তা দহ ॥"

ছুরিকা কিংবা করাত দিয়া কাটিলে শীঘ্রই মৃত্যু হয়। নারী দ্বারা যে বিদ্ধ হইয়াছে সে যাবজ্জীবন দগ্ধ হয়। "কাপতাঁ" শব্দটি গুজরাটি "কাপবুঁ" (কর্ত্তন করা) ক্রিয়ার বর্ত্তমান কৃদন্ত এবং "আব্ই ছহ" হইতে গুজরাটি ক্রিয়া "আবে ছে"র (আসিতেছে অর্থাৎ মৃত্যু আসিতেছে) উৎপত্তি হইয়াছে।

এই 'রাস' সাহিত্যের ভাষার কুক্ষিতে গুজরাটি ভাষা

গর্ভশয্যায় শায়িত ছিল এবং মধ্যে মধ্যে তাহার স্পন্দন দেখা যাইতেছিল। ১৩৯৪ খৃষ্টাব্দে জনৈক গুজরাটি জৈন "মুগ্ধাব্‌বোধ মৌক্তিক" নামে একটি সংস্কৃত ব্যাকরণ দেশীয় ভাষায় প্রণয়ন করেন। মাতা এবং সন্তানের মধ্যে অবয়বের যে সাদৃশ্য থাকে, এই উভয় ভাষার মধ্যে সে সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। এই ব্যাকরণের ভাষা অপভ্রংশও নহে, আধুনিক গুজরাটিও নহে। এই ব্যাকরণের ভাষাটি 'রাস' সাহিত্যের অপভ্রংশ ও নরসিংহ মেহেতার সময়কালীন গুজরাটি ভাষার সংযোজক। এ যাবৎ বৈষ্ণব যুগের আদি কবি নরসিংহ মেহেতা গুজরাটি সাহিত্যের জনক বলিয়া অভিহিত হইত কিন্তু এই 'রাস' সাহিত্যের আবিষ্কারের ফলে নরসিংহ মেহেতাকে সে পদবী হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে।

বৈষ্ণব যুগের পূর্ব্বে গুজরাটি সাহিত্যের একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় অথচ এ যাবৎ উপেক্ষিত অংশের আলোচনা করা কর্ত্তব্য। সে অংশটি হইতেছে কাথিওয়াড়ের লৌকিক সাহিত্য—গীতিকা (Ballads) ও "ভডলী বাক্য"। "ভডলী-বাক্য" ও গীতিকাগুলির এ পর্য্যন্ত সন তারিখ নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। আমার মনে হয় ইহাদের অনেকগুলি বৈষ্ণব যুগের পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল।

বাঙ্গলা দেশের "খনা"র বচনের ন্যায় গুজরাট প্রদেশেও "ভডলী বাক্যে"র বহুল প্রচলন আছে। খনা ও ভডলী উভয়েই স্ত্রীলোক। বাঙ্গলা দেশের খনার বচনের রচয়িত্রী যেমন খনা নহে, এই গুজরাট প্রদেশের (কাথিওয়াড়) "ভডলী বাক্যে"র রচয়িত্রীও ভডলী নহে। এই সব বাক্য ও বচন কৃষকদের বহুযুগের সঞ্চিত কৃষিবিদ্যার অভিজ্ঞতার ফল। প্রকৃতির অবস্থাভেদে শস্যের ও সমস্ত বৎসরের ফলাফল দুই একটি পদে ব্যক্ত হইয়াছে এবং কার্য্যকালেও এই সব বাক্যের সত্য উপলব্ধ হইয়াছে। বাঙ্গলা দেশের খনার বচনে রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন বৌদ্ধ যুগের প্রভাব দেখিতে পাইয়াছেন এবং তাঁহার মতে সেগুলির রচনাকাল ৮০০—১২০০ শতাব্দীর মধ্যে। এই সব "ভডলী বাক্যে" বৌদ্ধ কিংবা কোন জৈন প্রভাব দৃষ্ট হয় না এবং কতকগুলি শব্দ যে দুরূহ তাহা প্রাচীন বলিয়া নহে, প্রাদেশিক এবং রূপান্তরিত বলিয়া। কৃষি যে-দিন দেশের লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল সে-দিন হইতে এই সব বাক্য ও বচন রচিত হইতেছিল এবং লোকমুখে অধিক প্রচলনহেতু ভাষার পরিবর্ত্তন হইতে থাকে। উদাহরণস্বরূপ একটি "ভডলী বাক্য" নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"শ্রাব্‌ন পহেলা পাঁচদিন, মেহ ন মাঁডে আল।
পিয়ু পধারো মালবে, হমে ডাশুঁ মোসালে॥"

শ্রাবণের পাঁচদিন পূর্ব্বে যদি বৃষ্টি আরম্ভ না হয়, প্রিয়! তুমি মালবে যাইও, আমি বাপের বাড়ী যাইব (অর্থাৎ বৃষ্টি হইবে না সে জন্য শস্যাদির অভাবে দুর্ভিক্ষ হইবে।)

কাথিওয়াড়ের লৌকিক সাহিত্যের অন্য অংশ হইতেছে "গাথা" সাহিত্য (Ballads)। ভারতের প্রত্যেক প্রদেশেই নগর হইতে বহুদূরে পল্লীগ্রামে একপ্রকার লৌকিক গীতিকার প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। বাঙ্গলার বিভিন্ন জেলার অনেকগুলি "গীতিকা" কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সৌজন্যে প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু কাথিওয়াড় প্রদেশে এইপ্রকার অনেক "গীতিকা" বন্য কুসুমের ন্যায় সমস্ত প্রদেশে ছড়াইয়া আছে—কেহই তাহাদিগকে ভারতীর চরণযুগলে অঞ্জলি দিবার উপযুক্ত মনে করে নাই। নগরের দূষিত বায়ু হইতে বহুদূরে পল্লীগ্রামে অজানা কৃষাণ-কবিদের হৃদয়-রস আহরণ করিয়া তাহারা পরিপুষ্ট, কবে কোন অজ্ঞাত দিবসে কোন অজানা কৃষক-কবির দ্বারা রচিত হইয়াছিল ইতিহাস তাহার খবর রাখে না। কৃষাণদের সুখের দুঃখের গীতি, রাজপুতকুলতিলকদের শৌর্য্য-গাথা, প্রেমিক প্রেমিকার বিচ্ছেদের মেঘদূত, এই সব গীতিকা আমাদের হৃদয়ের সুপ্ত ভাবরাশিকে আলোড়িত করে। প্রাচীন কাথিওয়াড়ের সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের উপাদান এই সব গাথার মধ্যে এত প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে যে কাথিওয়াড়ের ইতিহাসপ্রণয়নকালে তাহাদের দান অমূল্য বলিয়া বিবেচিত হইবে। যদিও অনেকগুলি গাথার সময় নির্দ্দেশ করা দুষ্কর, তথাপি দুই একটির রচনার সময় সহজে ধরা যায়। অনহিলওয়াড় পাটনের রাজা সিদ্ধরাজ জয়সিংহ কর্ত্তৃক রাণকদেবীর হরণবৃত্তান্ত নিয়া যে গীতিকাটি রচিত হইয়াছে তাহা দ্বাদশ কিংবা ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যে রচিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। সিদ্ধরাজ জয়সিংহের

শ্রীননীগোপাল চৌধুরী

...জত্বকালে একাদশ শতাব্দীতে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল। সুতরাং দ্বাদশ কিংবা ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যে রচিত হওয়া সম্ভব। এইপ্রকার একাদশ দ্বাদশ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া চতুর্দ্দশ এবং পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যে অনেক গীতিকা রচিত হইয়াছিল, এখনও কাথিওয়াড়ের ঘাটে, মাঠে কৃষকেরা দল বাঁধিয়া এই সব অতীতের গীতিকা গাহিয়া থাকে।

এই আলো আঁধারের যুগে গুজরাট তন্দ্রাভিভূত। নরসিংহ মেহেতা ও মীরাবাঈয়ের বন্দনাগানে গুজরাটের হৃদয়ে দ্রুত স্পন্দন হইতে লাগিল—জাগিয়া উঠিয়া দেখিল নরসিংহ মেহেতা ও মীরাবাঈ প্রমুখ গুজরাটবাসী কৃষ্ণকীর্ত্তনে মত্ত, কী যেন নব জীবনের সাড়া পাইয়া আনন্দে মাতোয়ারা। পুরাতনকে বিদায় দিয়া নরসিংহ মেহেতা ও মীরাবাঈ উদীয়মান সূর্য্যের দিকে মুখ করিয়া গুজরাটের নব উদ্বোধনগীতি আরম্ভ করিল। ঠিক সে সময়েই বাঙ্গলা দেশেও চণ্ডীদাস এবং বিদ্যাপতি * পুরাতনকে বিদায় দিয়া নব বাঙ্গলার উদ্বোধনগীতি গাহিয়াছিল—ভক্তিধারায় বঙ্গদেশকে প্লাবিত করিয়াছিল। প্রাচীন গুজরাটি ও প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিত্যে এই কবি চতুষ্টয়ের একই স্থান। বাঙ্গলার চণ্ডীদাস খাঁটি বাঙ্গালী, গুজরাটের মেহেতা খাঁটি । বাঙ্গলায় বিদ্যাপতি ও গুজরাটে মীরাবাঈ উভয়েই বিদেশী। মিথিলার কবি বিদ্যাপতিকে বাঙ্গালীরাও যেমন দাবী করিতে পারে, সে রকম মেবারের মীরাবাঈকে গুজরাটবাসীরাও দাবী করিতে পারে। নরসিংহ মেহেতা ও মীরাবাঈ পঞ্চদশ শতাব্দীর কবি, সুতরাং আমাদের আলোচ্য সময়ের বহির্ভূত। সে জন্য বিস্তারিত ভাবে তাহাদের আলোচনা করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। তবে প্রাচীন এবং নবীনের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া একের বিদায় এবং অপরের আহ্বানগীতি গাহিয়াছিল বলিয়া তাহাদের উল্লেখ করা হইল। ভবিষ্যতে গুজরাটি ও বাঙ্গলা সাহিত্যের বৈষ্ণব যুগের তুলনামূলক সমালোচনায় তাহাদের সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিতে পারিব বলিয়া আশা করি।

* বিদ্যাপতি কবি হইলেও তাঁহার মৈথেলি ভাষায় রচিত গানগুলি বঙ্গদেশে লোকমুখে মিথিলার বঙ্গভাষায় অনূদিত হইয়া গিয়াছে। সে জন্য তাঁহাকে বাঙ্গলার কবি বলিলাম।

১৮
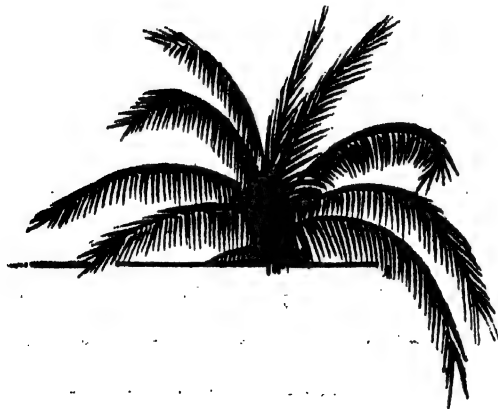
বেলা হইয়া যাওয়াতে ব্যস্ত অবস্থায় সর্ব্বজয়া তাড়াতাড়ি অন্যমনস্ক ভাবে সদর দরজা দিয়া ঢুকিয়া উঠানে পা দিতেই কি যেন একটা সরু দড়ির মত বুকে আট্‌কাইল ও সঙ্গে সঙ্গে কি একটা পটাং করিয়া ছিঁড়িয়া যাইবার শব্দ হইল ও দুদিক হইতে দুটা কি, উঠানে ঢিলা হইয়া পড়িয়া গেল। সমস্ত কার্য্যটি চক্ষের নিমেষে হইয়া গেল, কিছু ভাল করিয়া দেখিবার কি বুঝিবার পূর্ব্বেই।

কিন্তু তাহার দেখিবার অবকাশও ছিল না—একবার চাহিয়া দেখিয়া ভাবিল—দ্যাখো দিকি যত উদ্‌ঘুট্টি কাণ্ড ঐ ছেলেটার—পথের মাঝখানে আবার কি একটা টাঙিয়ে রেখেছে—

অল্প খানিক পরেই অপু বাড়ী আসিল। দরজা পার হইয়া উঠানে পা দিতেই সে থম্‌কিয়া দাঁড়াইয়া গেল—নিজের চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিল না- এ কি! বারে? আমার টেলিগিরাপের তার ছিঁড়লে কে?

ক্ষতির আকস্মিকতায় ও বিপুলতায় প্রথমটা সে কিছু ঠাহর করিতে পারিল না। পরে একটু সাম্‌লাইয়া লইয়া চাহিয়া দেখিল উঠানের মাটিতে ভিজা পায়ের দাগ এখনও মিলায় নাই তাহার মনের ভিতর হইতে কে ডাকিয়া বলিল—মা ছাড়া আর কেউ নয়। কক্‌খনো কেউ নয় ঠিক মা। ...ড়ী ঢুকিয়া সে দেখিল মা বসিয়া বসিয়া বেশ নিশ্চিন্তমনে কাঁটাল-বীচি ধুইতেছে। সে হঠাৎ দাঁড়াইয়া পড়িল এবং যাত্রাদলের অভিমন্যুর মত ভঙ্গিতে সাম্‌নের দিকে ঝুঁকিয়া বাঁশীর সপ্তমের মত রিন্‌রিনে তীব্র মিষ্ট সুরে কহিল—আচ্ছা মা, আমি কষ্ট ক'রে ছোটা গুলো বুঝি বন বাগান ঘেঁটে নিয়ে আসিনি? সর্ব্বজয়া পিছনে চাহিয়া বিস্মিতভাবে বলিল—কি নিয়ে এসেচিস্? কি হয়েচে—

—আমার বুঝি কষ্ট হয় না? কাঁটায় আমার হাত পা ছ'ড়ে যায় নি বুঝি?—

—কি বলে পাগলের মত? হয়েচে কি?

—কি হয়েচে? আমি এত কষ্ট ক'রে টেলিগিরাপের তার টাঙালাম, আর ছিঁড়ে দেওয়া হয়েচে, না?

—তুমি যত উদ্‌ঘুট্টি কাণ্ড ছাড়া তো একদণ্ড থাকো না বাপু?—পথের মাঝখানে কি টাঙানো রয়েচে—কি জানি টেলিগিরাপ কি কি গিরাপ—আসচি তাড়াতাড়ি ছিঁড়ে গেল—তা এখন কি করবো বলো—

পরে সে পুনরায় নিজ কাজে মন দিল।

উঃ কি ভীষণ হৃদয়হীনতা! আগে আগে সে ভাবিত বটে যে তাহার মা তাহাকে ভাল বাসে অবশ্য যদিও তাহার সে ভ্রান্ত ধারণা অনেক দিন ঘুচিয়া গিয়াছে—তবুও মাকে এতটা নিষ্ঠুর, পাষাণীরূপে কখনো স্বপ্নেও কল্পনা করে নাই। কাল সারাদিন কোথায় নীলমণি জেঠার ভিটা, কোথায় পালিতদের বড় আমবাগান, কোথায় রাজুগুরু

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

পাড়ের বাঁশবন—ভয়ানক জঙ্গলে একা ঘুরিয়া বহু কষ্টে উঁচু ডাল হইতে দোলানো গুলঞ্চ লতা কত কষ্টে যোগাড় করিয়া সে আনিল...এখুনি রেল রেল খেলা হইবে সব ঠিক ঠাক আর কি না...

হঠাৎ সে মাকে একটা খুব কড়া, খুব রূঢ়, খুব একটা প্রাণ-বিঁধানোর মত কথা বলিতে চাহিল—এবং খানিকটা দাঁড়াইয়া বোধ হয় অন্য কিছু ভাবিয়া না পাইয়া আগের চেয়েও তীব্র নিখাদে বলিল—আমি আজ ভাত খাবো না যাও—কখ্‌খনো খাবো না—

তাহার মা বলিল—না খাবি না খাবি যা—ভাত খেয়ে একেবারে রাজা ক'রে দেবেন কিনা? এদিকে তো রান্না নামাতে ভস সয় না—না খাবি যা দেখবো খিদে পেলে কে খেতে দ্যায়?

বাস্! চক্ষের পলকে—সব আছে, আমি আছি, তুমি আছ—সেই তাহার মা কাঁটাল বীচি ধুইতেছে—কিন্তু অপু কোথায়? সে যেন কর্পূরের মত উবিয়া গেল! কেবল ঠিক সেই সময়ে দুর্গা বাড়ী ঢুকিতে দরজার কাছে কাহাকে পাশ কাটাইয়া ঝড়ের বেগে বাহির হইয়া যাইতে দেখিয়া বিস্মিত সুরে ডাকিয়া বলিল—ও অপু, কোথায় যাচ্ছিস্ অমন ক'রে—কি হয়েচে ও অপু শোন্—

তাহার মা বলিল—জানিনে আমি যত সব কাণ্ড বাপু তোমাদের, হাড় মাস কালি হ'য়ে গেল—কি এক পথের মাঝখানে টাঙিয়ে রেখেচে, আস্‌চি, ছিঁড়ে গেল—তা এখন কি হবে? আমি কি ইচ্ছে ক'রে ছিঁড়িচি? তাই ছেলের রাগ আমি ভাত খাবো না—না খাস্ যা ভাত খেয়ে সব একেবারে স্বগ্‌গে ঘণ্টা দেবে কিনা তোমরা?

মাতা পুত্রের এরূপ অভিমানের পালায় দুর্গাকেই মধ্যস্থ হইতে হয়—সে অনেক ডাকাডাকির পরে বেলা দুইটার সময় ভাইকে খুঁজিয়া বাহির করিল। সে শুষ্ক মুখে উদাস নয়নে ওপাড়ার পথে রায়েদের বাগানে পড়ন্ত আম গাছের গুঁড়ির উপর বসিয়াছিল।

বৈকালে যদি কেহ অপুদের বাড়ী আসিয়া তাহাকে দেখিত, তবে সে কখনই মনে করিতে পারিত না যে এ সেই অপু—যে আজ সকালে মায়ের উপর অভিমান করিয়া দেশ ত্যাগী হইয়াছিল। উঠানের এ প্রান্ত হইতে ও প্রান্ত পর্য্যন্ত তার টাঙানো হইয়া গিয়াছে। অপু বিস্ময়ের সহিত চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছিল কিছুই বাকী নাই, ঠিক যেন একেবারে সত্যিকার রেলরাস্তার তার। বনের দিক্‌টায় তার খাটানোর সময় কেবলই মনে হইয়াছে যদি বেশী ছোটা পাওয়া যায়, তবে সে এগাছে ওগাছে বাঁধিয়া বাঁধিয়া তাহার তারকে পাঠাইয়া দিত দূর হইতে বহু দূরে, একেবারে ওই বাঁশবনের ভিতর দিয়া কোথায়। বনের নিবিড় গাছ-পালাকে জয় করিয়া তাহার খেলাঘরের রেল-লাইনের তারটা সত্যিকারের টেলিগিরাপের মত নিরুদ্দেশযাত্রা করিত এই বাঁশবন, কাঁটাঝোপ, শিশিরসিক্ত, অজানা সবুজ বনের ভিতর দিয়া দিয়া। সে সতুদের বাড়ী গিয়া বলিল—সতুদা, আমি টেলিগিরাপের তার টাঙিয়ে রেখেচি আমাদের বাড়ীর উঠোনে, চল রেল রেল খেলা করি—আস্‌বে?

—তার কে টাঙিয়ে দিলে রে?

—আমি নিজে টাঙালাম। দিদি ছোটা এনে দিয়েছিল—

সতু বলিল—তুই খেল্‌গে যা আমি এখন যেতে পারবো না—

অপু মনে মনে বুঝিল বড় ছেলেদের ডাকিয়া দল বাঁধিয়া খেলার যোগাড় করা তাহার কর্ম্ম নয়। কে তাহার কথা শুনিবে? তাহাদের বাড়ীটা গ্রামের এক প্রান্তে, নির্জ্জন বাঁশবনের মধ্যে, কেই বা সেখানে খেলিতে আসিবে? তবুও আর একবার সে সতুর কাছে গেল। নিরাশ মুখে রোয়াকের কোণটা ধরিয়া নিরুৎসাহভাবে বলিল—চল না সতুদা, যাবে? তুমি আমি আর দিদি খেল্‌বো এখন? পরে সে প্রলোভন-জনক ভাবে বলিল—আমি টিকিটের জন্যে এতগুলো বাতাবী নেবুর পাতা তুলে এনে রেখেচি। সে হাত ফাঁক করিয়া পরিমাণ দেখাইল।—যাবে?

সতু আসিতে চাহিল না। অপু বাহিরে বড় মুখ-চোরা, সে আর কিছু না বলিয়া বাড়ী ফিরিয়া গেল। দুঃখে তার চোখে প্রায় জল আসিয়াছিল—এত করিয়া বলিয়াও সতু-দা শুনিল না।

পরদিন সকালে সে ও তাহার দিদি দুজনে মিলিয়া ইট দিয়া একটা বড় দোকানঘর বাঁধিয়া জিনিষপত্রের যোগাড়ে

বাহির হইল। দুর্গা বনজঙ্গলে উৎপন্ন দ্রব্যের সন্ধান বেশী রাখে—দুজনে মিলিয়া নোনাপাতার পান, মেটে আলুর ফলের আলু, রাধালতা ফুলের মাছ, তেলাকুচার পটল, চিচ্চিড়ের বরবটি, মাটির ঢেলার সৈন্ধব লবণ—আরও কত কি সংগ্রহ করিয়া আসিয়া দোকান সাজাইতে বড় বেলা করিয়া ফেলিল। অপু বলিল—চিনি কিসের করবি রে দিদি?

দুর্গা বলিল—বাঁশতলার পথে সেই ঢিবিটায় ভাল বালি আছে—মা চাল ভাজা ভাজ্‌বার জন্য আনে?...সেই বালি চল্ আনি গে—সাদা চক্ চক্ কচ্ছে—ঠিক একেবারে চিনি—

বাঁশবনে চিনি খুঁজিতে খুঁজিতে তাহারা পথের ধারের বনের মধ্যে ঢুকিল। খুব উঁচু একটা বনচট্‌কা গাছের আগ্‌ডালে একটা বড় লতা উঠিয়া সারা মাথাটা যেন চক্ চকে সবুজ পাতার থোকা করিয়া ফেলিয়াছে—তাহারই ঘন সবুজ আড়ালে টুক্‌টুকে রাঙ্গা, বড় বড় সুগোল কি ফল দুলিতেছে! অপু ও দুর্গা দুজনেই দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেল। এ রকম ফল তাহারা জীবনে কখনো দেখে নাই তো! অনেক চেষ্টায় গোটা কয়েক ফল নীচের দিকে লতায় খানিকটা অংশ ছিঁড়িয়া তলায় পড়িল। মহা আনন্দে দুজনে একসঙ্গে ছুটিয়া গিয়া ফলগুলি মাটি হইতে তাহারা তুলিয়া লইল। খাসা তেল চুক্‌চুকে, তুমি হাত দাও, তোমার সারা দেহ যেন সুস্পর্শ মসৃণতায় শিহরিয়া উঠিবে! কি সুন্দর ফলগুলা?...

পাকা ফল মোটে তিনটি। প্রধানত বিপণি-সজ্জা উদ্দেশ্যেই তাহা দোকানে এরূপ ভাবে রক্ষিত হইল যে খরিদদার আসিলে প্রথমেই যেন নজরে পড়ে। পুরাদমে বেচাকেনা আরম্ভ হইয়া গেল। দুর্গা নিজেই পান কিনিয়া দোকানের পান প্রায় ফুরাইয়া ফেলিল। খেলা খানিকটা অগ্রসর হইয়াছে এমন সময় দরজা দিয়া সতুকে ঢুকতে দেখিয়া অপু মহা আনন্দে তাহাকে আগাইয়া আনিতে দৌড়িয়া গেল—ও সতুদা, দ্যাখোনা কি রকম দোকান হয়েচে কেমন ফল এই দ্যাখো—আমি আর দিদি পেড়ে আন্‌লাম—কি ফল বলো দিকি? জানো?...

সতু বলিল—ও তো মাকাল ফল—আমাদের বাগানে ক-ত ছিল।...

সতু আসাতে অপু যেন কৃতার্থ হইয়া গেল। সতু-দা তাহাদের বাড়ীতে তো বড় একটা আসে না—তা ছাড়া সতু-দা বড় ছেলেদের দলের চাঁই। সে আসাতে খেলায় ছেলেমানুষিটুকু যেন ঘুচিয়া গেল।

অনেকক্ষণ পুরা মরসুমে খেলা চলিবার পর দুর্গা বলিল—ভাই আমাকে দুমণ চাল দাও, খুব সরু, আমার কাল পুতুলের বিয়ের পাকাদেখা, অনেক লোক খাবে—

অপু বলিল—আমাদের বুঝি নেমন্তন্ন না?

দুর্গা মাথা দুলাইয়া বলিল—না বৈ কি? তোমরা তো হোলে কনে-যাত্রী—কাল সকালে এসে নকুতো ক'রে নিয়ে যাবো—সতুদা রাঙুকে বল্‌বে আজ রাত্তিরে একটু চন্দন বেটে রাখে?—সত্যিকারের চন্দন কিন্তু—সেই যেমন পুন্যিপুকুরের দিন ক'রে রেখেছিল—কাল সকালে নিয়ে আস্‌বো—

অপু বলিল—এক কাজ করবি দিদি—কাল তোর পুতুলের বিয়েতে সন্দেশ তৈরী কর না কেন? নেড়াকে ডেকে নিয়ে এসে—নেড়া দেখিয়ে দেবে এখন—

দুর্গা বলিল—নেড়া না দেখিয়ে দিলে বুঝি আমি আর গড়্‌তে পারব না—কাল সকালে দেখিস্ এখন—মাটি বেশ ক'রে জল দিয়ে মেখে আমি কত কি গ'ড়ে দেবো—মেঠাই, নারকোলের সন্দেশ, পাঠাইল—পণ্যের মধ্য হইতে দোকানের রক্ষিত বিক্রয়ার্থ দুর্গার কথা ভাল করিয়া শেষ হয় নাই এমন সময় সতু কি একটা তুলিয়া লইয়া হঠাৎ দৌড় দিয়া দরজার দিকে ছুটিল—সঙ্গে সঙ্গে অপুও ওরে দিদিরে—নিয়ে গেল রে—বলিয়া তাহার রিন্‌রিনে তীব্র মিষ্ট গলায় চীৎকার করিতে তাহার পিছনে পিছনে ছুটিল!

বিস্মিত দুর্গা ভাল করিয়া ব্যাপারটা কি বুঝিবার আগেই সতু ও অপু দৌড়াইয়া দরজার বাহির হইয়া চলিয়া গেল! সঙ্গে সঙ্গে খেলা-ঘরের দিকে চোখ পড়িতেই দুর্গা দেখিল সেই পাকা মাকাল ফল তিনটির একটিও নাই।...

দুর্গা একছুটে দরজার কাছে আসিয়া দেখিল সতু গাব-তলার পথে আগে আগে ও অপু তাহা হইতে অল্প নিকটে পিছু পিছু ছুটিতেছে। সতুর বয়স অপুর চেয়ে ৩।৪ বৎসরের বেশী, তাহা ছাড়া সে অপুর মত ও রকম ছিপ্‌ছিপে মেয়েলি

বন্দ্যোপাধ্যায়

ড়নের ছেলে নয়—বেশ জোরালো হাত-পা-ওয়ালা ও শক্ত—তাহার সহিত ছুটিয়া অপুর পারিবার কথা নহে—তবুও যে সে ধরি-ধরি করিয়া তুলিয়াছে, তাহার একমাত্র কারণ এই যে সতু ছুটিতেছে পরের দ্রব্য আত্মসাৎ করিয়া এবং অপু ছুটিতেছে প্রাণের দায়ে।

হঠাৎ দুর্গা দেখিল যে সতু ছুটিতে ছুটিতে পথে একবারটি যেন নীচু হইয়া পিছন ফিরিয়া চাহিল—সঙ্গে সঙ্গে অপু ও হঠাৎ দাঁড়াইয়া পড়িল—সতু ততক্ষণ ছুটিয়া দৃষ্টির বাহির হইয়া চাল্‌তেতলার পথে গিয়া পড়িল।

দুর্গা ততক্ষণে দৌড়িয়া গিয়া অপুর কাছে পৌঁছিল। অপু একদম চোখ বুজাইয়া একটু সাম্‌নের দিকে নীচু হইয়া ঝুঁকিয়া দুই হাতে চোখ রগড়াইতেছে—দুর্গা বলিল—কি হয়েচে রে অপু?

অপু ভাল করিয়া চোখ না চাহিয়াই যন্ত্রণার সুরে দু'হাত দিয়া চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে বলিল—সতুদা চোখে ধুলো ছুঁড়ে মেরেচে দিদি—চোখে কিছু দেখ্‌তে পাচ্ছি নে রে—

দুর্গা তাড়াতাড়ি অপুর হাত নামাইয়া বলিল—সর্ সর্ দেখি—ওরকম ক'রে চোখ রগড়াস্ নে—দেখি?—

অপু তখনি দুহাত আবার চোখে উঠাইয়া আকুল সুরে বলিল—উহু ও দিদি—চোখের মধ্যে কেমন কচ্ছে—আমার চোখ কানা হ'য়ে গিয়েচে দিদি—

—দেখি দেখি ওরকম ক'রে চোখে হাত দিস্‌নে—সর্—পরে সে কাপড়ে ফুঁ পাড়িয়া চোখে ভাপ দিতে লাগিল। কিছু পরে অপু একটু একটু চোখ মেলিয়া চাহিতে লাগিল—দুর্গা তাহার দুই চোখের পাতা তুলিয়া অনেকবার ফুঁ দিয়া বলিল—এখন বেশ দেখ্‌তে পাচ্ছিস্?—আচ্ছা তুই বাড়ী যা—আমি ওদের বাড়ী গিয়ে ওর মাকে আর ঠাক্‌মাকে সব ব'লে দিয়ে আস্‌চি—রানুকেও বল্‌বো—আচ্ছা দুষ্টু ছেলে তো—তুই যা—আমি আস্‌ছি এখ্‌খুনি—

রানুদের খিড়্‌কি দরজা পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া দুর্গা কিন্তু আর যাইতে সাহস করিল না। সেজঠাক্‌রুণকে সে ভয় করে—খানিকক্ষণ খিড়্‌কির কাছে দাঁড়াইয়া ইতস্তত করিয়া সে বাড়ী ফিরিল। সদর দরজা দিয়া ঢুকিয়া সে দেখিল অপু দরজার বাম ধারের কবাটখানি একটুখানি সাম্‌নে ঠেলিয়া দিয়া তাহারই আড়ালে দাঁড়াইয়া নিঃশব্দে কাঁদিতেছে। সে ছিঁচ্‌কাঁদুনে ছেলে নয়, বড় কিছুতেই সে কখনো কাঁদে না—রাগ করে, অভিমান করে বটে, কিন্তু কাঁদে না। দুর্গা বুঝিল আজ তাহার অত্যন্ত দুঃখ হইয়াছে, অত সাধের ফলগুলি গেল....তাহা ছাড়া আবার চোখে ধুলা দিয়া এরূপ অপমান করিল! অপুর কান্না সে সহ্য করিতে পারে না—তাহার বুকের মধ্যে কেমন যেন করে।

সে গিয়া ভাইয়ের হাত ধরিল—সান্ত্বনার সুরে বলিল—কাঁদিস্ নে অপু—আয় তোকে আমার সেই কড়িগুলো সব দিচ্চি—আয়—চোখে কি আর ব্যথা বাড়্‌চে?...দেখি কাপড়খানা বুঝি ছিঁড়ে ফেলেচিস্?

১৯

খাওয়া দাওয়ার পর দুপুর বেলা অপু কোথাও বাহির না হইয়া ঘরেই থাকে। অনেক দিনের জীর্ণ পুরাতন কোঠা বাড়ীর পুরাতন ঘর। জিনিষপত্র, কাঠের সেকালের সিন্দুক, কটা রংএর সেকালের বেতের পেঁট্‌রা, কড়ির আল্‌না, জল চৌকিতে ঘর ভরানো। এমন সব বাক্স আছে যাহা অপু কখনো খুলিতে দেখে নাই,তাকে রক্ষিত এমন সব হাঁড়ী কলসী আছে, যাহার অভ্যন্তরস্থ দ্রব্য সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

সব শুদ্ধ মিলিয়া ঘরটিতে পুরানো জিনিষের কেমন একটা পুরানো পুরানো গন্ধ বাহির হয়—সেটা কিসের গন্ধ তাহা সে জানে না, কিন্তু সেটা যেন বহু অতীত কালের কথা মনে আনিয়া দেয়। সে অতীত দিনে সে ছিল না, কিন্তু এই কড়ির আল্‌না ছিল, ঐ ঠাকুর দাদার বেতের ঝাঁপিটা ছিল, ঐ বড় কাঠের সিন্দুকটা ছিল, ওই যে সোঁদালি গাছের মাথা বনের মধ্য হইতে বাহির হইয়া আছে, ওই পোড়ো জঙ্গলে ভরা জায়গাটাতে কাহাদের বড় চণ্ডীমণ্ডপ ছিল; আরও কত নামের কত ছেলে মেয়ে একদিন এই ভিটাতে খেলিয়া বেড়াইত, কোথায় তাঁহারা ছায়া হইয়া মিলাইয়া গিয়াছে কতকাল আগে!

যখন সে একা ঘরে থাকে, মা ঘাটে যায়—তখন তাহার অত্যন্ত লোভ হয় ওই বাক্সটা, বেতের ঝাঁপিটা খুলিয়া জিনিষ আলোয় বাহির করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখে কি অদ্ভুত রহস্য

উহাদের মধ্যে গুপ্ত আছে। কাঠের সিন্দুকটার উপর তাহাদের বড় ধামাটা উপুড় করিয়া তাহার উপর দাঁড়াইয়া ঘরের আড়ার সর্ব্বোচ্চ তাকে কাঠের বড় বারকোসে যে তাল-পাতার পুঁথির স্তূপ ও খাতাপত্র আছে বাবাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিয়াছিল সেগুলি তাহার ঠাকুরদাদা রামচাঁদ তর্কালঙ্কারের—তাহার বড় ইচ্ছা ওইগুলি যদি হাতের নাগালে ধরা দেয়, তবে সে একবার নীচে নামাইয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দেখে। এক একদিন বনের ধারের জানালাটায় বসিয়া দুপুর বেলা সে সেই ছেঁড়া কাশীদাসের মহাভারত খানা লইয়া পড়ে, সে নিজেই খুব ভাল পড়িতে শিখিয়াছে, আগেকার মত আর মার মুখে শুনিতে হয় না, নিজেই জলের মত পড়িয়া যায় ও বুঝিতে পারে। পড়াশুনায় তাহার বুদ্ধি খুব তীক্ষ্ণ, তাহার বাবা মাঝে মাঝে তাহাকে গাঙ্গুলি বাড়ীর চণ্ডীমণ্ডপে বৃদ্ধদের মজ্‌লিসে লইয়া যায়, রামায়ণ কি পাঁচালী পাড়িতে দিয়া বলে, পড়ো তো বাবা, এঁদের একবার শুনিয়ে দাও তো? বৃদ্ধেরা খুব তারিফ করেন, দীনু চাটুয্যে বলেন—আর আমার নাতিটা, এই তোমার খোকারই বয়স হবে, দুখানা বর্ণ পরিচয় ছিঁড়্‌লে বাপু, শুন্‌লে বিশ্বেস করবে না, এখনো ভাল ক'রে অক্ষ চিন্‌লে না—বাপের ধারা পেয়ে ব'সে আছে—ঐ যে ক'দিন আমি আছি রে বাপু, চক্ষু বুঁজ্‌লেই লাঙলের মুঠো ধরতে হবে। পুত্রগর্ব্বে হরিহরের বুক ফুলিয়া ওঠে। মনে মনে ভাবে—ওকি তোমাদের হবে? কর্ম্মে তো চিরকাল সুদের কারবার!—হোলামই বা গরীব, হাজার হোক পণ্ডিতবংশ তো বটে, বাবা মিথ্যেই তালপাতা ভরিয়ে ফেলেন নি, পুঁথি লিখে বংশে একটা ধারা দিয়ে গিয়েচেন, সেটা যাবে কোথায়?

তক্তপোষের পাশেই জলচৌকিতে মায়ের টিনের পেঁট্‌রাটা। চিনে মাটির একরাশ পুতুল তার মধ্যে আবদ্ধ দুটা বড় বড় মেম পুতুল, একটা হাতী, একটা হরিণ, মায়ের বাক্স খুলিবার সময় সে দেখিয়াছে। চিনেমাটির পুতুলে তাহার মন তেমন টানে না কিন্তু তাহার দিদি সেগুলার জন্য একেবারে পাগল। কতদিন দুপুরে সকালে, সন্ধ্যায় বাড়ীতে যখন মা না থাকে, দিদি প্রলুব্ধ মনে মায়ের পেঁট্‌রার আশে-পাশে ঘুরিয়া বেড়ায়, একবার দুজনে ষড়যন্ত্র করিয়াছিল ঘুমন্ত অবস্থায় মায়ের আঁচল হইতে চাবির রিংটা খুলিয়া লুকাইয়া রাখিবে এবং—কিন্তু কার্য্যে কিছুই হয় নাই। অপু দিদিকে বুঝাইয়াছে যে বিবাহের পর সে যখন শ্বশুর বাড়ী যাইবে, সব চীনে মাটির পুতুলগুলা বাহির করিয়া মা তাহার পেঁট্‌রা সাজাইয়া দিবে, পাছে সে ভাঙিয়া ফেলে এজন্য এখন দেয় না।

তাহাদের ঘরের জানালার কয়েক হাত দূরেই বাড়ীর পাঁচিল এবং পাঁচিলের ওপাশ হইতেই পাঁচিলের গা ঘেঁসিয়া কি বিশাল আগাছার জঙ্গল আরম্ভ হইয়াছে। জানালায় বসিয়া শুধু চোখে পড়ে সবুজ সমুদ্রের ঢেউয়ের মত ভাঁট্‌-শেওড়া গাছের মাথাগুলা, এগাছে ওগাছে দোদুল্যমান কত রকমের লতা, প্রাচীন বাঁশবনের শীর্ষ বয়সের ভারে যেখানে সোঁদালি, বন-চাল্‌তা গাছের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, তাহার নীচেকার কালো মাটির বুকে খঞ্জন পাখীর নাচ। বড় গাছপালার তলায় হলুদ, বনকচু, কটুওলের ঘন সবুজ জঙ্গল ঠেলাঠেলি করিয়া সূর্য্যের আলোর দিকে মুখ ফিরাইতে প্রাণপণ করিতেছে, এই জীবনের যুদ্ধে যে গাছটা অপারগ হইয়া গর্ব্বদৃপ্ত প্রতিবেশীর আওতায় চাপা পড়িয়া গিয়াছে, তাহার পাতাগুলি বিবর্ণ, মৃত্যুপাণ্ডুর, ডাঁটা গলিয়া আসিল. মরণাহত দৃষ্টির সম্মুখে শেষ-শরতের বন-ভরা পরিপূর্ণ ঝল্‌মলে রৌদ্র, পরগাছার ফুলের আকুল আর্দ্র সুগন্ধ মাখানো পৃথিবীটা তাহার সকল সৌন্দর্য্য, রহস্য, বিপুলতা লইয়া ধীরে ধীরে আড়ালে মিলাইয়া চলিয়াছে।

তাহাদের বাড়ীর ধার হইতে এ বনজঙ্গল একদিকে সেই কুঠীর মাঠ, অপর দিকে নদীর ধার পর্য্যন্ত একটানা চলিয়াছে। অপুর কাছে এ বন, অসীম অফুরন্ত ঠেকে, সে দিদির সঙ্গে কতদূর এ বনের মধ্যে তো বেড়াইয়াছে, বনের শেষ দেখিতে পায় নাই—শুধুই এই রকম তিত্তিরাজ গাছের তলা দিয়া পথ, মোটা মোটা গুলঞ্চলতা ঝুলানো, থোলো বন-চাল্‌তার ফল চারিধারে। সুঁড়ি পথটা এক একটা আমবাগানে আসিয়া শেষ হয়, আবার এগাছের ওগাছের তলা দিয়া বন-কলমী, নাটা-কাঁটা, ময়না-ঝোপের ভিতর দিয়া চলিতে চলিতে কোথায় কোন্‌ দিকে লইয়া গিয়া ফেলিতেছে, শুধুই বন-ধুঁধুলের লতা কোথায় সেই ত্রিপুরে

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

...লে, প্রাচীন শিরীষ গাছের শেওলা-ধরা ডালের গায়ে ...রগাছার ঝাড় নজরে আসে।

এই বনের মধ্যে কোথায় একটা মজা, পুরানো পুকুর আছে, তারই পারে যে ভাঙ্গা মন্দিরটা আছে, আজকাল যেমন পঞ্চানন্দ ঠাকুর গ্রামের দেবতা, কোন্ সময়ে ঐ মন্দিরের বিশালাক্ষী দেবী সেইরকম ছিলেন। তিনি ছিলেন গ্রামের মজুমদার বংশের প্রতিষ্ঠিত দেবতা, এক সময় কি বিষয়ে সফলমনস্কাম হইয়া তাঁহারা দেবীর মন্দিরে নরবলি দেন, তাহাতেই রুষ্ট হইয়া দেবী স্বপ্নে জানাইয়া যান যে তিনি তিনি মন্দির পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন, আর কখনো ফিরিবেন না। অনেক কালের কথা, বিশালাক্ষীর পূজা হইতে দেখিয়াছে এরূপ কোনো লোক আর জীবিত নাই, মন্দির ভাঙিয়া চুরিয়া গিয়াছে, মন্দিরের সম্মুখের পুকুর মজিয়া ডোবায় পরিণত হইয়াছে, চারিধার বনে ছাইয়া ফেলিয়াছে, মজুমদার বংশেও বাতি দিতে আর কেহ নাই।

কেবল—সেও অনেকদিন আগে—গ্রামের স্বরূপ চক্রবর্ত্তী ভিন-গাঁ হইতে নিমন্ত্রণ খাইয়া ফিরিতেছিলেন—সন্ধ্যার সময় নদীর ঘাটে নামিয়া আসিতে পথের ধারে দেখিলেন একটি সুন্দরী ষোড়শী মেয়ে দাঁড়াইয়া। স্থানটা লোকালয় হইতে দূরে, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল, পথে কেহ কোথাও নাই, এ সময় নিরালা বনের ধারে একটি অল্পবয়সী সুন্দরী মেয়েকে দেখিয়া স্বরূপ চক্রবর্ত্তী দস্তুর মত বিস্মিত হইলেন। কিন্তু তিনি কোনো কথা কহিবার পূর্ব্বেই মেয়েটি ঈষৎ গর্ব্বমিশ্রিত অথচ মিষ্টসুরে বলিল—আমি এ গ্রামের বিশালাক্ষী দেবী। গ্রামে অল্পদিনে ওলাউঠার মড়ক আরম্ভ হবে—ব'লে দিও চতুর্দ্দশীর রাত্রে পঞ্চানন্দ তলায় একশ আটটা কুমড়ো বলি দিয়ে যেন কালীপূজা করে। কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই স্তম্ভিত স্বরূপ চক্রবর্ত্তীর চোখের সাম্নে মেয়েটি চারিধারের শীত সন্ধ্যার কুয়াসায় ধীরে ধীরে যেন মিলাইয়া গেল। এই ঘটনার দিন কয়েক পরে সত্যই ...বার গ্রামে ভয়ানক মড়ক দেখা দিয়াছিল

এ সব গল্প কতবার সে শুনিয়াছে। জানালার ধারে দাঁড়ালেই বিশালাক্ষী ঠাকুরের কথা তাহার মনে ওঠে। দেবী বিশালাক্ষীকে একটিবার দেখিতে পাওয়া যায় না? হঠাৎ সে বনের পথে হয়ত গুলঞ্চের লতা পাড়িতেছে—সেই সময়—

খুব সুন্দর দেখিতে, রাঙা পাড় শাড়ী পরনে, হাতে গলায় মা-দুর্গার মত হার বালা।

—তুমি কে?

—আমি অপু।

—তুমি বড় ভাল ছেলে, কি বর চাও?

একটু পরে তাহার মনে হয় সে ঠাকুরদাদার বেতের ঝাঁপিটা—খুলিবার চেষ্টা করিবে। লেপের খোলে ছেঁড়া চেলির টুক্‌রায় বাঁধা চাবির গোছা থাকে, সে টানিয়া বাহির করে। কিন্তু অন্যান্য দিনের মত অনেক খুট্‌খাট্ করিয়াও কিছুতেই কোনো চাবিটাই সে লাগাইতে পারে না, অগত্যা চেলির টুক্‌রা যথাস্থানে রাখিয়া সে বিছানায় গিয়া শোয়। এক একবার ঝির্‌ঝিরে হাওয়ায় কত কি লতাপাতার তিক্ত মধুর গন্ধ ভাসিয়া আসে, ঠিক দুপুর বেলা, অনেক দূরের কোনো বড় গাছের মাথার উপর হইতে গাঙ্-চিল টানিয়া টানিয়া ডাকে, যেন এই ছোট্ট গ্রাম খানির অতীত ও বর্ত্তমান সমস্ত ছোটো খাটো দুঃখ সুখ শান্তি দ্বন্দ্বের উর্দ্ধে শরৎ-মধ্যাহ্নের রৌদ্রভরা, নীল নির্জ্জন আকাশপথে এক উদাস, গৃহ-বিবাগী পথিক-দেবতার সুকণ্ঠের অবদান দূর হইতে দূরে মিলাইয়া চলিয়াছে।

কখন সে ঘুমাইয়া পড়ে বুঝিতে পারে না, ঘুমাইয়া উঠিয়া দেখে বেলা একেবারে নাই। জানালার বাহিরে সারা বনটায় ছায়া পড়িয়া আসিয়াছে, বাঁশঝাড়ের আগায় রাঙা রোদ। প্রতিদিন এই সময়—ঠিক এই ছায়া-ভরা বৈকালটিতে, নির্জ্জন বনের দিকে চাহিয়া তাহার অতি অদ্ভুত কথা সব মনে হয়। অপূর্ব্ব খুসিতে মন ভরিয়া ওঠে, মনে হয় এ রকম লতা পাতার মধুর গন্ধভরা দিন গুলি ইহার আগে কবে একবার যেন আসিয়াছিল, সে সব দিনের অনুভূত আনন্দের অস্পষ্ট স্মৃতি আসিয়া এই দিন গুলিকে ভবিষ্যতের কোন্ অনির্দ্দিষ্ট আনন্দের আশায় ভরিয়া তোলে মনে হয় একটা যেন কিছু ঘটিবে, এ দিনগুলি বুঝি বৃথা যাইবে না—একটা বড় কোনো আনন্দ ইহাদের শেষে অপেক্ষা করিয়া আছে যেন। এই অপরাহ্ণগুলির সঙ্গে

আজন্ম সাথী, সুপরিচিত এই আনন্দ-ভরা বহুরূপী বনটার সঙ্গে কত রহস্যময়, স্বপ্ন দেশের বার্ত্তা যে জড়ানো আছে! বাঁশঝাড়ের উপরকার ছায়া-ভরা আকাশটার দিকে চাহিয়া সে দেখিতে পায় এক তরুণ বীরের উদারতার সুযোগ পাইয়া—কে প্রার্থী একজন তাহার অক্ষয় কবচকুণ্ডল মাগিয়া লইতে হাত পাতিয়াছে, পিটুলি-গোলা পান করিয়া কোথাকার এক ক্ষুদ্র দরিদ্র বালক খেলুড়েদের কাছে 'দুধ খেয়েছি' 'দুধ খেয়েছি' বলিয়া উল্লাসে নৃত্য করে,—ঐ যে পোড়ো ভিটার বেলতলাটা—ওই খানেই তো শরশয্যা শায়িত প্রবীণ বীর ভীষ্মদেবের মরণাহত ওষ্ঠে তীক্ষ্ণ বাণে পৃথিবী ফুঁড়িয়া অর্জ্জুন ভোগবতীধারা সিঞ্চন করিয়াছিলেন। প্রথম যৌবনে সরযূতটের কুসুমিত কাননে মৃগয়া করিতে গিয়া রাজা দশরথ মৃগভ্রমে যে জল-আহরণরত দরিদ্র বালককে বধ করেন—সে ঘটিয়াছিল ওই রানু দিদিদের বাগানের বড় জাম গাছটার তলায় যে ডোবা?—তাহারই ধারে।

তাহাদের বাড়ী একখানা বই আছে, পাতাগুলা সব হলদে, মলাটটার খানিকটা নাই, নাম লেখা আছে, 'বীরাঙ্গনা কাব্য', কিন্তু লেখকের নাম জানে না, গোড়ার দিকের পাতা গুলি ছিঁড়িয়া গিয়াছে। বইখানা বড় ভাল লাগে—তাহাতে সে পড়িয়াছে:—

অদূরে দেখিনু হ্রদ; সে হ্রদের তীরে
রাজরথী একজন যান গড়াগড়ি
ভগ্নউরু!...

কুলুইচণ্ডী ব্রতের দিন মায়ের সঙ্গে গ্রামের উত্তর মাঠে যে পুরানো, মজা পুকুরের ধারে সে বন-ভোজন করিতে যায়—কেউ জানে না—চারি ধারে বনে ঘেরা সেই ছোট্ট পুকুরটাই মহাভারতের সেই দ্বৈপায়ন হ্রদ। ঐ নির্জ্জন মাঠের পুকুরটার মধ্যে সে ভগ্নউরু, অবমানিত বীর থাকে একা একা, কেউ দেখে না, কেউ খোঁজ করে না। উত্তর মাঠের কলা বেগুনের ক্ষেত হইতে কৃষাণেরা ফিরিয়া আসে কেউ থাকে না কোনো দিকে—সোনাডাঙা মাঠের পারের অনাবিষ্কৃত বসতিশূন্য, অজানা দেশে চন্দ্রহীন রাত্রির ঘন অন্ধকার ধীরে ধীরে বিস্তার লাভ করে তখন হাজার হাজার বছরের পুরাতন মানব বেদনা কখনো বা দরিদ্র পিতার প্রবঞ্চনামুগ্ধ অবোধ বালকের উল্লাসে, কখনো বা এক ভাগ্যহত, নিঃসঙ্গ, অসহায় রাজপুত্রের ছবিতে তাহার প্রবর্দ্ধমান, উৎসুকমনের সহানুভূতিতে জাগ্রত সার্থক হয়। ঐ অজ্ঞাত নামা লেখকের বইখানা পড়িতে পড়িতে কতদিন যে তাহার চোখের পাতা ভিজিয়া আসিয়াছে!

তাহার বাবা বাড়ী নাই। বাড়ী থাকিলে তাহাকে এক মনে ঘরে বসিয়া দপ্তর খুলিয়া পড়িতে হয়। একেবারে বেলা শেষ হইয়া যায় তবুও ছুটী হয় না। তাহার মন ব্যাকুল হইয়া ওঠে। আর কতক্ষণ বসিয়া বসিয়া শুভঙ্করীর আর্য্যা মুখস্থ করিবে? আজ আর বুঝি সে খেলা করিবে না? বেলা বুঝি আর আছে? বাবার উপর ভারী রাগ হয়, অভিমান হয়। হঠাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবে ছুটী হইয়া যায়। বই দপ্তর কোনোরকমে ঝুপ্ করিয়া এক জায়গায় ফেলিয়া রাখিয়া ছায়াভরা উঠানে গিয়া খুসিতে সে নাচিতে থাকে। অপূর্ব্ব অদ্ভুত বৈকালটা···নিবিড় ছায়াভরা গাছপালার ধারে খেলাঘর··· গুলঞ্চ-লতার তার টাঙানো···খেজুর ডালের বাঁশ···বনের দিক থেকে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা গন্ধ বাহির হয়...রাঙা রোদটুকু জেঠামশায়দের পোড়ো ভিটায় বাতাবী নেবু গাছের মাথায় চিক্ চিক্ করে...চক্‌চকে বাদামী রংএর ডানাওয়ালা তেড়ো পাখী বনকলমী ঝোপে উড়িয়া আসিয়া বসে···তাজা মাটির গন্ধ...ছেলেমানুষের জগৎ ভরপুর আনন্দে উছ্‌লিয়া ওঠে... কাহাকে সে কি করিয়া বুঝাইবে সে কি আনন্দ!

সন্ধ্যার পর সর্ব্বজয়া ভাত চড়াইয়াছিল। অপু দাওয়ায় মাদুর পাতিয়া বসিয়া আছে। খুব অন্ধকার, একটানা ঝিঁ ঝিঁ পোকা ডাকিতেছে।

অপু জিজ্ঞাসা করিল—পুজোর আর কদিন আছে মা?

দুর্গা বঁটি পাতিয়া তরকারী কাটিতেছিল। বলিল—আর বাইশ দিন আছে না মা?

সে হিসাব ঠিক করিয়াছে। তাহার বাবা বাড়ী আসিবে, অপুর, মায়ের, তাহার জন্য পুতুল কাপড়, তাহার জন্য আল্‌তা।

আজকাল সে বড় হইয়াছে বলিয়া তাহার মা অন্য পাড়ায় গিয়া নিমন্ত্রণ খাইতে দেয় না। কতদিন যে সে কোথাও

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়

নিমন্ত্রণ খায় নাই! লুচি খাইতে কেমন, তাহা সে প্রায় ভুলিয়া গিয়াছে। ফুটফুটে কোজাগরী পূর্ণিমার জ্যোৎস্না-ভরা রাত্রে বাঁশবনের আলো-ছায়ায় জাল-বুনানি পথ বাহিয়া সে আগে আগে পাড়ায় পাড়ায় বেড়াইয়া লক্ষ্মীপূজার খই-মুড়ি ভাজা আঁচল ভরিয়া লইয়া আসিত, বাড়ীতে বাড়ীতে শাঁক বাজে, পথে লুচি-ভাজার গন্ধ বাহির হয়, হয়তো পাড়ার কেউ পূজার শীতলের নৈবেদ্য একখানা তাহাদের বাড়ীতে পাঠাইয়া দেয়, সেও অনেক খই-মুড়ি আনিত, তাহার মা দুই দিন ধরিয়া তাহাদের জলপান খাইতে দিত, নিজেও খাইত। সেবার সেজ ঠাকরুণ বলিয়াছিল—ভদ্দর লোকের মেয়ে আবার চাষা লোকের মত বাড়ী বাড়ী ঘুরে খই মুড়ি নিয়ে বেড়াবে কি? ওসব দেখতে খারাপ...ওরকম আর পাঠিও না বৌমা,—সেই হইতে সে আর যায় না।

দুর্গা বলিল—মা তাস খেল্‌বে?

—তা যা ও ঘর থেকে তাসটা নিয়ে আয়—একটু খেলি—

দুর্গা বিষণ্ণমুখে অপুর দিকে চাহিল। অপু হাসিয়া বলিল—চল্‌ আমি দাঁড়াচ্চি

তাহাদের মা বলিল—আহা হা, মেয়ের ভয় দেখে আর বাঁচিনে—সারাদিন বলে হেঁটে মাটি ওপর ক'রে বেড়াবার বেলা ভয় লাগে না আর রাত্তিরে এঘর থেকে ওঘর যেতে একেবারে সব আড়ষ্ট!

বধূদের বাড়ী হইতে আনা অপুর সেই তাস জোড়াটা। তাস খেলায় তিনজনের কৃতিত্বই সমান। অপু এখনও সব রং চেনে না—মাঝে মাঝে হাতের তাস বিপক্ষ দলের খেলোয়াড় মাকে দেখাইয়া বলে—এটা কি রুইতন—দ্যাখো না মা? পরে সে বলে—তাস খেল্‌তে খেল্‌তে সেই গল্পটা বলো না—সেই শ্যামলঙ্কার গল্পটা? খানিকটা খেলা অগ্রসর হইতেই সে হঠাৎ সরিয়া গিয়া মায়ের কোলে মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়ে। মায়ের গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে আবদারের সুরে বলে—সেই ছড়াটা বলো না মা—সেই শামলঙ্কা বাট্‌না বাটে মাটিতে লুটায়ে কেশ? দুর্গা বলে—খেলার সময় ছড়া বল্‌লে খেলা হবে কি ক'রে—ওঠ্‌ অপু—

তাহার মা সস্নেহে বার বার ছেলের দিকে চাহিয়া দেখিতেছিল—সেদিনকার সেই অপু—আয় চাঁদ আয় চাঁদ খোকনের কপালে টী-ই-ই-ই দিয়ে যা—বলিলে বার বার কলের পুতুলের মত চাঁদের মত কপালখানি অঙ্গুলিবদ্ধ হস্তের দিকে ঝুঁকাইয়া দিত—সে কি না আজ তাস খেলিতে বসিয়াছে! তাহার মায়ের কাছে দৃশ্যটা অপূর্ব্ব, বড় অভিনব ঠেকে।

দুর্গা বলে—আজ কি হয়েচে জানো না মা—বল্‌বো অপু? বলি?

তাহার মা জিজ্ঞাসা করে—কি হয়েচে?...

—বল্‌বো অপু?...এই—

—যাঃ তা হোলে তোর সঙ্গে যা আড়ি করবো—ব'লে দ্যাখ্‌—

অপু মুখে বলিল বটে কিন্তু দিদিকে সে আজকাল বড় ভালবাসে। সেই যে যেদিন তাহার পাকা মাকাল ফলগুলা সতু-দা লইয়া পালাইয়াছিল, সেদিন তাহার দিদি সারাদিন বন বাগান খুঁজিয়া সন্ধ্যার সময় কোথা হইতে আঁচলে বাঁধিয়া এক রাশ মাকাল ফল আনিয়া তাহার সম্মুখে খুলিয়া দেখাইয়া বলিয়াছিল—কেমন হোলো তো এখন? বড্ড যে কাঁদ্‌ছিলি সকাল বেলা? সে সন্ধ্যায় কিসে সে বেশী আনন্দ পাইয়াছিল—মাকাল ফলগুলা হইতে কি দিদির মুখের বিশেষ করিয়া তাহার ডাগর চোখের মমতা-ভরা স্নিগ্ধ হাসি হইতে—তাহা সে জানে না।

—ছক্কার খেলা অপু বুঝে সুজে খেলিস্‌?—দুর্গা মহাখুসির সহিত তাস কুড়াইয়া সাজাইতে লাগিল।...

—কি ফুলের গন্ধ বেরুচ্চে না দিদি?

তাহাদের মা বলিল তাহাদের জেঠামশায়দের ভিটার পিছনে ছাতিম গাছ আছে, সেই ফুলের গন্ধ। অপু ও দুর্গা দুজনেই আগ্রহের সুরে জিজ্ঞাসা করিল—হাঁ মা ওই ছাতিম তলায় একবার বাঘ এসেছিল—বলেছিলে না? কিন্তু তাহার মা তাড়াতাড়ি তাস ফেলিয়া উঠিয়া বলিল—ঐ যাঃ, ভাত পুড়ে গেল, ধরাগন্ধ বেরিয়েচে—ভাতটা নামিয়ে দাঁড়া বল্‌চি—

খাইতে বসিয়া দুর্গা বলিল—পাতাল কোঁড়ের তরকারীটা কি সুন্দর খেতে হয়েছে মা ? সঙ্গে সঙ্গে অপুও বলিল—বাঃ। খেতে ঠিক মাংসের মত, না দিদি ? পাতাল কোঁড়ে এক জায়গায় কত ফুটে আছে মা, আমি ভাবি ব্যাঙের ছাতা, তাই তুলিনে—উভয়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসিত বাক্যে সর্ব্বজয়ার বুক গর্ব্বে ও তৃপ্তিতে ভরিয়া উঠিল। তবুও কি আর উপযুক্ত উপকরণ সে পাইয়াছে ? লোকের বাড়ীতে ভোজে রাঁধিতে ডাকে সেজ ঠাক্‌রুণকে ডাকুক না দেখি একবার তাহাকে রান্না কাহাকে বলে সেজঠাকরুনকে সে—হঁ। সর্ব্বজয়া বলিল—অপুর হাতে জল ঢেলে দে দুগ্‌গা, ওকি ছেলের কাণ্ড ? ঐ রাস্তার মাঝ খানে মুখ ধোয় ? রোজই রাত্রে তুমি ওই পথের উপর—

অপু কিন্তু আর এক পাও নড়িতে চাহেনা, সম্মুখে সেই ভাঙ্গা পাঁচিলের ফাঁক অন্ধকার বাঁশবন ঝোড় জঙ্গলের অন্ধকার ঝিঙের বিচির মত কালো। পোড়ো ভিটেবাড়ী...বাঘ...আরও অজানা কত কি বিভীষিকা! সে বুঝিতে পারেনা যেখানে প্রাণ লইয়া টানাটানি সেখানে পথের উপর আঁচানটাই কি এত বেশী ?

তাহার পরে সকলে গিয়া ঘুমাইয়া পড়ে। রাত্রি গভীর হয়, ছাতিম ফুলের উগ্র সুবাসে হেমন্তের আঁচলাগা শিশিরার্দ্র নৈশ বায়ু ভরিয়া যায়। মধ্য রাত্রে বেণুবনশীর্ষে কৃষ্ণ পক্ষের চাঁদের ম্লান জোৎস্না উঠিয়া শিশিরসিক্ত গাছপালায় ডালে পাতায় চিক্‌চিক্ করে। আলো আঁধারের অপরূপ মায়ায় বনপ্রান্তে ঘুমন্ত পরীর দেশের মত রহস্য ভরা। শন্ শন করিয়া হঠাৎ হয়তো এক ঝলক হাওয়া সোঁদালির ডাল দুলাইয়া তেলাকুচো ঝোপের মাথা কাঁপাইয়া বহিয়া যায়।

এক একদিন এই সময় অপুর ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইত। সেই দেবী যেন আসিয়াছেন সেই গ্রামের বিস্মৃতা অধিষ্ঠাত্রী দেবী বিশালাক্ষী। পুলিনশালিনী ইচ্ছামতীর ডালিমের রোয়ার মত স্বচ্ছ জলের ধারে, কুচা শেওলা ভরা ঠাণ্ডা কাদায়, কতদিন আগে যাহাদের চিহ্ন লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তীরের প্রাচীন সপ্তপর্ণটাও হয়তো যাদের দেখে নাই, পুরানো কালের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর মন্দিরে তারই এক সময়ে ফুল ফল নৈবেদ্যে পুজা দিত, আজকালকার লোকেরা কে তাঁহাকে জানে ? তিনি কিন্তু এ গ্রামকে এখনও ভোলেন নাই।

গ্রাম নিশুতি হইয়া গেলে অনেক রাত্রে, তিনি বনে বনে ফুল ফুটাইয়া বেড়ান, বিহঙ্গশিশুদের দেখা শুনা করেন, জোৎস্না রাত্রের শেষ প্রহরে ছোট্ট ছোট্ট মৌমাছিদের চাক গুলি বুনো-ভাঁওরা নট্‌কান, পুঁয়ো ফুলের মিষ্ট মধুতে ভরাইয়া দেন।

তিনি জানেন কোন ঝোপের কোণে বাসক ফুলের মাথা লুকাইয়া আছে, নিভৃত বনের মধ্যে ছাতিম ফুলের দল কোথায় গাছের ছায়ায় শুইয়া, ইচ্ছামতীর কোন্ বাঁকে সবুজ শেওলার ফাঁকে ফাঁকে নীল পাপ্‌ড়ি কলমী ফুলের দল ভিড় পাকাইয়া তুলিতেছে, কাঁটা গাছের ডাল পালার মধ্যে ছোট্ট খড়ের বাসায় টুন্‌টুনি পাখীর ছেলেমেয়েরা কোথায় ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিল।

তাঁর রূপে স্নিগ্ধ আলোয় বন যেন ভরিয়া গিয়াছে। নীরবতায় জোৎস্নার সুগন্ধে, অস্পষ্ট আলো আঁধারের মায়ায় রাত্রির অপরূপ শ্রী।

দিনের আলো ফুটিবার আগেই বনলক্ষ্মী কোথায় মিলাইয়া যান, স্বরূপ চক্রবর্ত্তীর পর আর তাহাকে কেহ কোনদিন দেখে নাই।

প্রথম খণ্ডের শেষ

(ক্রমশঃ)

লাইব্রেরী আন্দোলন

শ্রীসুশীলকুমার ঘোষ

লাইব্রেরী আন্দোলন প্রধানত শিক্ষাবিস্তারের আন্দোলন। যাহাতে শিক্ষার বীজ জনসাধারণের মনে অতি সহজে বপন করিতে পারা যায় তাহার প্রচেষ্টা লাইব্রেরী আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য শিক্ষিত সমাজে নানা রূপ চেষ্টা চলিতেছে। বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া যাহাতে অল্প আয়াসে লাইব্রেরীর সাহায্যে শিক্ষা বিস্তার করিতে পারা যায়, তাহার জন্য সভ্য জাতি মাত্রেই এখন বিশেষ সচেষ্ট

কোন আদর্শ ধরিয়া কার্য্য করিতে হইলে তাহা একাকী করাও চলে, পরকে লইয়া করাও যায়। তবে যে কার্য্য পরকে লইয়া, তাহা সুসম্পন্ন করিতে হইলে একাকী তাহা লইয়া থাকিলে চলিবে না। যে আদর্শ সমাজের মধ্যে ফুটাইতে চাই, তাহা পরিপুষ্টির জন্য লোকমতের প্রয়োজন। যে প্রথা দেশের মধ্যে প্রবর্ত্তিত করিবার কামনা হৃদয়ে পোষণ করি, তাহা সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে, জনসাধারণের মধ্যে তাহার অভিব্যক্তি একান্ত বাঞ্ছনীয়। লাইব্রেরী আন্দোলন দেশের মধ্যে চালাইতে হইলে আমাদের সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া আবশ্যক যে কোন আদর্শ কোন এক প্রতিষ্ঠানের ভিতর দিয়া প্রচার করিতে আরম্ভ করিলে তাহা যেরূপ কার্য্যকরী হয়, স্বতন্ত্র চেষ্টায় সেরূপ ফল কামনা করা দুরাশা মাত্র। এই জন্য দেখা যায় সমবেত চেষ্টায় Froebelian Movementএর

লাইব্রেরী প্রদর্শনী

কর্ত্তৃপক্ষগণ kindergarten পদ্ধতি দ্বারা বালক বালিকাদের মধ্যে শিক্ষাপ্রচারের চেষ্টা করিয়া ছিল। এই জন্য Shakespeare Society একত্র সমাবেশে অমরকবি শেক্ষপীয়রের গ্রন্থাবলী আলোচনার জন্য ও ইংলণ্ডের ষোড়শ শতাব্দীর গৌরবমণ্ডিত অতীতমহিমা জাগ্রত রাখিতে বিশেষ ব্যস্ত। আমেরিকার লাইব্রেরী এসোসিয়েশনও সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে চেষ্টা করিতেছে কিসে লাইব্রেরীর সাহায্যে আপামর জনসাধারণের জ্ঞানপিপাসা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত পাঁচ বৎসর যাবৎ দেশের মধ্যে লাইব্রেরী আন্দোলন চালাইবার চেষ্টা করিতেছে। তাহারই অন্তর্ভূক্ত হইয়া বঙ্গীয় গ্রন্থালয় পরিষদ্ বাঙ্গলা দেশে লাইব্রেরীগুলির অবস্থার উন্নতিবিধান ও জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের ভার লইয়াছে। যেখানে লাইব্রেরী বা গ্রন্থালয়ের সংখ্যা অল্প সে স্থানে গ্রন্থালয় প্রতিষ্ঠা এবং যে স্থানে গ্রন্থালয় আছে, তাহার পাঠকসংখ্যা বৃদ্ধি করার চেষ্টা গ্রন্থালয় পরিষদের কর্ত্তব্য। ইহা কার্য্যে পরিণত করিতে

ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান ও আমেরিকা হইতে সংগৃহীত লাইব্রেরী আন্দোলন সম্বন্ধে গ্রন্থ ও চিত্রাদি

করা যায়। লাইব্রেরী আন্দোলন চালাইবার জন্য আমাদের দেশেও গ্রন্থালয় পরিষদ্ (Library Association) বিশেষ প্রয়োজন।

বাঙ্গলা দেশে লাইব্রেরী আন্দোলনের সূত্রপাত অল্পদিন হইলেও বরোদা, মহীশূর, মাদ্রাস প্রভৃতি দেশে ইহা বেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। "নিখিল ভারত গ্রন্থালয় পরিষদ্" নাম দিয়া ভারতবর্ষের যাবতীয় গ্রন্থালয় গুলির অবস্থা পরিবর্ত্তনের উদ্দেশ্যে, ঐ প্রতিষ্ঠানটি প্রায় হইলে, প্রতি জেলায় একটি জেলা গ্রন্থালয়পরিষদ্ স্থাপন করা অতীব আবশ্যক। ঐ জেলা গ্রন্থালয়ের কার্য্য হইবে জেলার মধ্যে কতকগুলি লাইব্রেরী বা রীডিং রুম আছে, তাহার সংবাদ সংগ্রহ করা, তাহাদের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞাত হওয়া আর কোথায় কোথায় নূতন গ্রন্থালয় (Library) বা পাঠাগার (Reading Room) প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন তাহা নির্ণয় করা। বঙ্গীয় গ্রন্থালয় পরিষদের অধীনে অধুনা চারিটি জেলা গ্রন্থালয় পরিষদ্

শ্রীসুশীলকুমার ঘোষ

কার্য্য করিতেছে, একটি হুগলী জেলায়, একটি মৈমনসিংহে, একটি নোয়াখালিতে আর একটি ২৪ পরগণায়।

লাইব্রেরী আন্দোলন এই কথাই দেশবাসীকে জানাইতে চায় যে লাইব্রেরীগুলিকে শিক্ষার কেন্দ্র করিয়া তুলিতে হইবে। পড়া শুনার চর্চ্চা, গবেষণার কার্য্য প্রভৃতি, যে কোন জ্ঞাতব্য বিষয়ের সন্ধান বলিয়া দিয়া সাধারণকে সাহায্যপ্রদান প্রভৃতি লাইব্রেরীর অন্যতম কার্য্য হওয়া উচিত। যাহাতে পাঠানুরাগ বৃদ্ধি পায়, সে জন্য নানা

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্
২৪৩।১ অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

প্রকার চিত্তাকর্ষক ছবি, chart, map, motto বরোদা-রাজ্যের লাইব্রেরীগুলির দেওয়াল পরিশোভিত করিয়া থাকে। যেন তাহারা অলক্ষ্যে পাঠক পাঠিকার হৃদয় আকর্ষণ করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে। সে mottoগুলি লাইব্রেরীর সভ্যদের নীরব ভাষায় বলিয়া দিতেছে—"যদি আনন্দ চাও, বই পড় আনন্দ পাইবে।" "যদি শিক্ষা চাও, বই পড় শিক্ষা পাইবে।" "যদি মানুষ হইতে চাও, বই পড় মানুষ হইবে।" বরোদা-মহারাজ্যের Library Department আমেরিকার মত, প্রত্যেক লোকের বাড়ী বাড়ী পুস্তক সরবরাহ করে। বিনা আয়াসে, বিনা পয়সায়, ঘরে বসিয়া যাহারা বই পায়, তাহারা বই না পড়িয়া ছাড়ে না। এই রূপে ক্রমশ পাঠের নেশা জমিয়া গেলে, তাহারা আপনই পুস্তকপাঠের ব্যবস্থা করিবে এবং ইহার উপকারিতা উপলব্ধি করিয়া, পুত্র কন্যাদের পুস্তকপাঠে উৎসাহ দিবে।

মহীশূর রাজ্যের সাধারণ লাইব্রেরীর ব্যবস্থা আরও চমকপ্রদ। সেখানে লাইব্রেরীগুলিকে এরূপ একটি আকর্ষণের কেন্দ্র করিয়া রাখা হইয়াছে যে, সকলেরই মন ঐদিকে আকৃষ্ট হয়। অতি সযত্নে ঐখানে পড়াশুনার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বাঙ্গালোরের Central Public Libraryতে যে সুন্দর সুন্দর ব্যবস্থা আছে, তাহা অনেক লাইব্রেরীর আদর্শ হইতে পারে। তথায় আমরা দেখিয়াছি, সকল প্রকার লোককে সুবিধা দিবার জন্য লাইব্রেরীটি এই কয়টি বিভাগে বিভক্ত:—পাঠাগার বা Reading

Room; Lending Section; Childrens' Department (তরুণ বিভাগ); Ladies' Department (মহিলা বিভাগ); Reference Section; এমন কি স্নানাগার ও ভোজনালয় পর্য্যন্ত মহীশূরবাসীদের শিক্ষাপ্রচারস্পৃহা এত প্রবল যে তাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাতৃভাষা Vernacular languageএর সাহায্যে শিক্ষা প্রচার করিতে বিশেষ ব্যগ্র হইয়াছেন।

আমেরিকার লাইব্রেরী এসোসিয়েশন নানাপ্রকার পুস্তক প্রকাশ করিয়া লাইব্রেরী পরিচালনা সম্বন্ধে জনসাধারণের জ্ঞানবৃদ্ধির ব্যবস্থা করিয়াছে। সর্ব্বসাধারণের সুবিধামত classificationএর পদ্ধতি এবং বিষয় অনুসারে পুস্তক-বিভাগ সম্বন্ধে নানারূপ গবেষণামূলক পুস্তক তাহারা প্রায়ই প্রকাশ করে। এতদ্ভিন্ন প্রতি মাসে নূতন প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর তালিকা পাঠাইয়া তাহাদের সংশ্লিষ্ট লাইব্রেরী-গুলিকে পুস্তকনির্ব্বাচনবিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করিয়া থাকে। লাইব্রেরীপরিচালনা সুকৌশলে সংসাধিত করিবার জন্য, নিয়মিতরূপে লাইব্রেরীয়ানদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। যাঁহারা ঐরূপ শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন, তাঁহারাই সাধারণ পাঠাগারে কার্য্য করিবার যোগ্যতা লাভ করেন।

প্রাচীন পুস্তক, হস্তলিখিত পুঁথি, এখনও দেশের অনেক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। উচিত মত রক্ষার ব্যবস্থা না করিলে, অল্পদিনের মধ্যে অনেক মূল্যবান গ্রন্থ নষ্ট হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। খ্যাতনামা গ্রন্থকারদের পাণ্ডুলিপি অতি যত্নে রক্ষিত হওয়া উচিত। ব্যক্তিবিশেষের যত্ন বা আগ্রহের উপর নির্ভর না করিয়া সাধারণ পাঠাগারগুলি যদি এ সকল সংরক্ষণের ভার লয়, তাহা হইলে অনেক অমূল্য গ্রন্থ কালের কবল হইতে রক্ষা পায়। কোথায় কোন গ্রামে, লোকচক্ষুর অন্তরালে, কি অমূল্য রত্ন নিহিত আছে, তাহার সংবাদ সংগ্রহ করা যেমন বিশেষ প্রয়োজন, সেগুলি সাধারণের গোচর করিতে পারা বা পুনরায় প্রকাশিত করিবার সুবিধা করিয়া দেওয়া ততোধিক লোকহিতকর। এই সংবাদসংগ্রহ ও প্রকাশের ফলে গবেষণাকারী বিদ্বন্মণ্ডলী প্রয়োজন মত পড়াশুনা করিয়া সেইগুলি হইতে নানা তথ্য আহরণ করিতে পারেন। সেগুলি পুনঃপ্রচারে উহাদের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ ঘুচিয়া যায়। নব জীবন লাভ

বঙ্গীয় গ্রন্থালয় পরিষদের লাইব্রেরী প্রদর্শনীর অন্তর্গত বরোদা-বিভাগ

শ্রীসুশীলকুমার ঘোষ

করিয়া উহারা নানাবিধ জ্ঞান রত্নের অপূর্ব্ব আকরস্বরূপে জনসাধারণের অশেষ কল্যাণসাধনে নিযুক্ত হইতে পারে। এই সকল প্রাচীন গ্রন্থ, হস্তলিখিত পুঁথি, পাণ্ডুলিপি, দুষ্প্রাপ্য পুস্তক প্রভৃতি উদ্ধার করিয়া ও সযত্নে সংরক্ষণ ও সুবিধামত প্রকাশ করিয়া, জ্ঞানবিস্তারকার্য্যে লাইব্রেরীগুলি যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারে।

লাইব্রেরীর কাজ পড়াশুনার নেশা জাগানো। যাহার যেদিকে রুচি সেই মত পুস্তক তাহাকে দিতে পারিলে, অধুনাতম শ্রেষ্ঠ মনীষিগণ যাঁহারা সম্প্রতি Behaviourist আখ্যা পাইয়াছেন, তাঁহারাও এ সিদ্ধান্তের প্রভাব এড়াইতে পারেন নাই। অতএব বুঝিতে পারা যায়, যুবকদের পাঠানুরাগ বর্দ্ধিত করিবার উদ্দেশ্যে, যে সকল পুস্তকে পূর্ব্ব-লিখিত প্রবৃত্তির বিশদ রূপে বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, সেইগুলি লাইব্রেরীতে সংগৃহীত করিতে পারিলে, যুবকের দল লাইব্রেরীর নেশা কোনও মতে কাটাইয়া উঠিতে পারিবে না। বিচক্ষণ ব্যক্তিকে যদি লাইব্রেরীয়ান

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ গৃহে বঙ্গীয় গ্রন্থালয় কর্তৃক প্রথম শিল্প-প্রদর্শনী

জনসাধারণ লাইব্রেরীর দিকে ছুটিয়া আসিবে। আত্মার সন্তুষ্টিবিধান যাহার নিকট হইতে যে পরিমাণে পাওয়া যায়, মানব-মন সেই পরিমাণে তাহার প্রতি আকৃষ্ট হয়। যুবকহৃদয় কাব্যকলা, সাহসিকতা, উন্মাদনা, ভ্রমণেচ্ছা, অনুসন্ধিৎসা প্রভৃতি মনোবৃত্তির অধিক বশবর্ত্তী বলিয়া মনস্তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। মানব-মনের প্রকৃতি নির্ণয় করিয়া করা যায়, তাহা হইলে অনুসন্ধিৎসু আগন্তুকের পাঠেচ্ছা, লাইব্রেরীতে আসিলে, ক্রমশ বাড়িয়া যাইবে। কোন্ পুস্তকে কি কি সংবাদ পাওয়া যায়, সাধারণ ভাবে তাহা লাইব্রেরীয়ানের জানা যেরূপ প্রয়োজন, কোন বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিতে হইলে, কোন্ কোন্ পুস্তকের সাহায্য লইতে হইবে, জিজ্ঞাসা করিবামাত্র, লাইব্রেরীয়ানকে তাহারও সদুত্তর দেওয়া চাই। সেইখানে লাইব্রেরীয়ানের কৃতিত্ব।

গীতাঞ্জলি

শ্রীনবেন্দু বসু

পরলোকগত অজিত চক্রবর্ত্তী তাঁর সমালোচনায় গীতাঞ্জলিকে কবির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ ব'লে গ্রহণ করতে চান নি। তিনি বইখানিকে দেখেছিলেন বিশেষ ক'রে ধর্ম্মকাব্য বা Sacred Poetry ভাবে। কিন্তু এই সঙ্গীতসমষ্টিতে কাব্যরসের যে বৈচিত্র্য দেখ্‌তে পাই তা থেকে মনে হয় যে গীতাঞ্জলি বুঝি কবির কল্পনাকুসুমহারের উৎকৃষ্টতম পারিজাত। সে রস শুধু বিচিত্র নয়, বড়ই গুণসমৃদ্ধ। লেখার নাম দেবার অধিকার লেখকের নিজের। পাঠক সেই নামানুযায়ী পরিচয় গ্রহণ করতে বাধ্য। গীতাঞ্জলি নাম কবির দেওয়া,তবে গীতাঞ্জলি তুল্যপরিমাণে কাব্যকুসুমাঞ্জলিও বটে। গীতাঞ্জলির গানগুলিকে দুটি প্রধান অংশে ভাগ করা যায়; সঙ্গীতপ্রধান এবং কাব্যপ্রধান। ভাবের প্রেরণা এক হ'লেও গানগুলিতে কাব্যরূপগত পার্থক্য আছে। এই দুই প্রধান অংশের মধ্যে আবার ভাবের ঐক্য, স্তর, আর রূপের বিভিন্নতা অনুসারে আরো সূক্ষ্মতর শ্রেণীবিভাগ আছে। রূপের বৈচিত্র্যই গীতাঞ্জলির বৈশিষ্ট্য।

এ ভাবে শ্রেণীবিভাগ করা যে কবির কল্পিত বা আদিষ্ট তা বল্‌তে চাই না। তবে যেখানে বিশ্লেষণী সমালোচনায় রসগ্রহণের সহায়তা হয় সেখানে সেটার প্রয়োগই বাঞ্ছনীয়। বিশেষত বর্ত্তমান ক্ষেত্রে কবির ভূমিকা এই :—"এই গ্রন্থের প্রথম কয়েকটি গান পূর্ব্বে অন্য দুই একটি পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু অল্প সময়ের ব্যবধানে যে সমস্ত গান পরে পরে রচিত হইয়াছে তাহাদের পরস্পরের মধ্যে একটি ভাবের ঐক্য থাকা সম্ভবপর মনে করিয়া তাহাদের সকলগুলিই এই পুস্তকে একত্রে বাহির করা হইল।" ১৩১৭ সালের এই বিজ্ঞাপনই ১৩২১ সালে ইণ্ডিয়ান প্রেস থেকে প্রকাশিত চতুর্থ সংস্করণ গীতাঞ্জলিতে দেওয়া হয়েছে, এবং ঐ সংস্করণই এ প্রবন্ধে ব্যবহৃত হয়েছে।

সঙ্গীত আর কাব্যের প্রকৃতি এবং রীতিগত পার্থক্য আলোচনা ক'রে দেখ্‌লে উপরোক্ত অংশবিভাগের সার্থকতা সহজেই বোঝা যায়। ধ্বনিরাজ্যে অবচ্ছিন্ন ভাবাবেগের নিরলম্ব মধুর বিকাশকেই সঙ্গীত বলি। কথার সাহায্যে চিন্তারাজ্যে সে ভাবের প্রকাশ হ'ল কাব্য। গানের লেখা কথাগুলি এই দুই রাজ্যের সংযোগস্থল। তবে লিখিত ভাষার সাহায্যে প্রকাশ পেতে হয় ব'লে সেই রচনা নির্দ্দিষ্ট সীমারেখা মেনে যেতে চায় না। কখন এদিকে কখন ওদিকে ঝোঁক দেয়। শ্রেণীবিভাগের এই ভিত্তি। আরো স্পষ্ট ক'রে বলি।

ভাবপ্রকাশের দিক থেকে গান কবিতার পূর্ব্বাবস্থা। অতএব সব গানের মধ্যে কবিত্ব না থাকতে পারে কিন্তু সব কাব্যের মধ্যে গানের অবস্থা নিহিত আছে। সঙ্গীতভাব কাব্যের প্রাণস্বরূপ। তাকেই পরিচ্ছদ দান ক'রে লিখিত আর পঠিত কবিতার সৃষ্টি। কবিতার মূর্চ্ছনা গানের সত্তার ভিন্নরূপ। কবিতার ছন্দ, মিল, গতি প্রভৃতিতে সে মূর্চ্ছনা বা সঙ্গীতভাব পরিস্ফুট হয়। ভাবমাত্রেরই প্রকাশকে সঙ্গীত বলি না। যে ভাবের উচ্চারণে আমাদের মনে একটা আবেগের স্পন্দন জাগে, আর হর্ষ, শোক, আশা, নিরাশা, সাহস, ভয় প্রভৃতি অনুভূতিগত রসের ক্ষরণ হয়, সেই ভাবই সঙ্গীতগ্রাহ্য। আর মানুষের সুপ্ত স্বরগ্রামে এই স্পন্দনের অনুরণনকেই সঙ্গীত বলি। আবার এই স্পন্দন বা উন্মাদনা যখন ভাষার সাহায্যে অন্যের মধ্যে সঞ্চারিত করবার চেষ্টা করি তখন সেটা ভাবের কাব্যরূপ। এই কাব্যরূপ দিতে গিয়ে কবি বাইরের অনুভূতি চাঞ্চল্যের মধ্যে তলিয়ে গিয়ে অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে ভিতরকার সুষ্ঠু সত্য রূপটি দেখতে পান। তখন উদ্বেল কল্পনা ধারণার মোহানার মধ্যে প'ড়ে মন্থর হ'য়ে আসে। চঞ্চল ক্ষণিকা মূর্ত্তি সংহত আকারে বিরাজ করতে থাকে। এই ভাবে সঙ্গীতের ধ্বনিবিচ্ছিন্ন অংশটি

শ্রীনবেন্দু বসু

কাব্যের মেরুদণ্ডরূপে অবস্থান করে, এবং বাক্যপরম্পরা দিয়ে সুরবেষ্টিত শব্দের স্থান পূরণ করা হয়। কথার বাধুনিতে গানের উপলব্ধিটুকু বাহিত হয়। সেই সাহায্যে আমাদের চিন্তারাজ্যে সুরবোধ আর সৌন্দর্য্যানুভূতির একটা সাড়া তোলে। বাক্যযোজনার সামঞ্জস্য মনে একটা ধ্বনিমূলক অনুরণন জাগায় আর মর্ম্মের অন্তরতম প্রদেশে যা কিছু বিরাট, যা কিছু মহান, যা কিছু সুন্দর, সে ভাবগুলি স্বতই বিকাশ পায়। কার্লাইল বলেছেন গানময় চিন্তাই কাব্য।

অতএব দেখতে পাই যে গান আর কবিতা ভাবাবেগের দুটি বিভিন্ন প্রকাশরূপ। যখন ভাবতরঙ্গের উচ্ছল, সাবলীল আন্দোলন আর প্লাবনী বেগ ভাষার বাঁধের মধ্যে আটক হ'য়ে একটা স্থির বাহ্য রূপ পায়, সেই মুহূর্ত্তে গান কবিতায় রূপান্তর গ্রহণ করে। গানের রূপ ভাবের নিজস্ব অনাড়ম্বর রূপ, বা তার আকার ও গঠনপ্রকৃতি। কবিতার রূপ সামাজিক রূপ। তাতে বসন ভূষণ আছে।

সঙ্গীত আর কাব্যের এই প্রকৃতিগত প্রভেদটুকু স্বীকার ক'রে নিয়েই গানরচয়িতা গানের কথাগুলি রচনা করেন। গানের কথা সুরের অবলম্বনস্বরূপ, তার আত্মপ্রকাশের সহায়ক মাত্র। সুতরাং মূল ভাবাবেগের নগ্ন, আত্মবর্ণনাতেও সুরের কাজ চলতে পারে। মাত্র সঙ্গীত-ভাবটুকুকে সার্থক ক'রে তুলতে গানের কথাগুলিকে কাব্য-গুণে ভারাক্রান্ত করবার তেমন প্রয়োজন নেই। প্রকৃত অনির্ব্বচনীয় ভাব একটি হৃদয় থেকে উৎসারিত হ'য়ে আর একটি হৃদয়কে স্পর্শ করতে গিয়ে মধ্যপথে ভাষা ও অলঙ্কার রূপের ধাঁধার মধ্যে আত্মহারা হবার অবসর পায় না। গানেতে মূলভাব যথাসম্ভব গোড়াতেই ব্যক্ত হয় এবং শেষপর্য্যন্ত নানা আবেদনের মধ্যে তার পুনরুল্লেখ হ'তে থাকে। গানের প্রধান পরিচয় ভাবের নিরলম্ব নিশ্চল রূপটিকে মূর্ত্ত ক'রে তোলাতে। কবিতায় ভাব নিজেতেই নিজে বিকশিত নয়। সে মানুষের জীবনকে আশ্রয় ক'রে তাকে নানা রূপে, রসে, গন্ধে, বর্ণে সাজিয়ে দেয় এবং জীবনের অবস্থাক্রম আর ঘটনা-বিপর্যায়ের মধ্যে দিয়ে আনাগোনা, ওঠানামা করতে থাকে। অনেক গান চোখে পড়ে যেগুলিকে গান না ব'লে সুরবদ্ধ কবিতা বলাই সঙ্গত, যেমন, 'ঘন তমসাবৃত অম্বর ধরণী' নামক স্বর্গীয় ডি এল রায়ের জনপ্রিয় গানটি। এর কথাগুলি বর্ণনাপূর্ণ এবং সমগ্র গানটি বিবৃতিমূলক কবিতা। কোন অবচ্ছিন্ন আবেগের ধ্বনিত প্রকাশ এতে নেই। অতএব বলতেই হবে যে এই গানটি সঙ্গীত অপেক্ষা কাব্যসম্পদে অধিকতর সম্পন্ন, যদিও সুরসংযোগে যে গানটি গাওয়া চলে না তা নয়।

আশা করি এতক্ষণে দেখাতে পেরেছি যে গীতাঞ্জলির গানগুলি মোটের ওপর ধর্ম্মভাবপ্রণোদিত হ'লেও সেগুলিকে রূপভেদে শ্রেণীবদ্ধ করা অসম্ভব নয়। সেই অনুসারে প্রথমে সঙ্গীতপ্রধান গানগুলির কথাই বলবো। এগুলি যে পরিমাণে কাব্য-অলঙ্কারপরিচ্ছিন্ন সেই পরিমাণে সঙ্গীত-ভাবপ্রবুদ্ধ। এতে প্রকৃতিবর্ণনা বা কল্পনার লীলা যে একেবারে নেই তা নয়, তবে কম। গানগুলি ভাবের দিক থেকেই বড়। এই গানগুলিই গীতাঞ্জলির ভিত্তি এবং সংখ্যায় বেশী। এইখানে ব'লে রাখি যে প্রবন্ধে অনুল্লিখিত গানগুলি এই ধর্ম্মসঙ্গীত শ্রেণীতেই পড়ে, কেবল তার মধ্যে ১০৭, ১০৯, আর ১১০ নং গান তিনটি বিশেষভাবে স্বদেশসঙ্গীত যদিও ধর্ম্মভাবেই প্রণোদিত।

গান আর কবিতার প্রভেদ অনুসারে এ গানগুলি সমস্তই সঙ্গীতপদবাচ্য। আত্মনিবেদনে যে আকুলতা থাকে, যেটা তার উদ্বেল উচ্ছ্বাসে মনকে দ্রবীভূত করে আর প্রাণে সমবেদনা জাগায়, এ গানগুলিতে সেই ভাবেরই ব্যঞ্জনা। এতে আছে ব্যাকুল প্রার্থনার একটা সরল বিশ্বস্ততা যেটা ধর্ম্ম বা নীতিকাব্যের প্রধান লক্ষণ। এ গান সরাসরি মনে গিয়ে লাগে, এতে কোন যুক্তির মারপ্যাঁচ নেই। এর প্রথম কথা প্রেম, আর সে প্রেমের নিতান্ত সরল অভিব্যক্তি এ শ্রেণীর গান বা কবিতার প্রধান সৌন্দর্য্য। এখানে মৌলিকতার কোন আয়াস নেই এবং এগুলি একটা বিশেষ মুহূর্ত্তের চিন্তার বিদ্যুৎচমক নয়, এগুলি কবির চব্বিশ ঘণ্টার জীবনের মনোভাবচালিত সরল নিবেদন। এ শ্রেণীর গান বা কবিতার সুর বা ছন্দও সেই কারণে

একটা ভাবগত সরলতার ওপর নির্ভর করে। সেটা গভীর এবং আত্মনিহিত, আকুল অথচ সংযত, উল্লাস আছে অথচ চপলতা নেই, সহজ কিন্তু লঘু নয়, পারিপাট্যহীন কিন্তু মনোহারী। কবি লেখেন তাঁর প্রেমে আপ্লুত মনকে চোখের জলে ধুয়ে উজ্জ্বল, শুচি আর স্নিগ্ধ ক'রে তোলবার জন্যে, অন্যের মনে চমক লাগবার জন্যে নয়। এই সকল কারণে এ গানগুলিতে যত কিছু কল্পনাসম্ভার, ছবি রং প্রভৃতির আয়োজন আছে সে সমস্ত মূল বাণীকে ফুটিয়ে তোলবার জন্যেই। সে গুলি উপকরণ মাত্র, নিবেদন নয়।

গীতাঞ্জলির ধর্ম্মসঙ্গীতগুলি এই সকল সত্যে অনুপ্রাণিত। কিন্তু মূল প্রার্থনার সুরটি কত বিচিত্র ছন্দেই বেজে ওঠে। একটা সহজ প্রকৃতিগত বিনয়ের মধ্যে দিয়ে নানাভাবে এবং মানুষের মনের নানাদিক থেকে এই চিরন্তন আবেগটুকু ফুটে ওঠে। প্রত্যেকবার নতুন নতুন আবেদনের মধ্যে দিয়ে বার বার মনকে চঞ্চল ক'রে তোলে। তা ছাড়া সমগ্র গানগুলির মধ্যে এমন একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ ঐক্য আছে যেটা পূর্ণ অনুভূতির মনোমত প্রকাশের একমাত্র নিদর্শন।

প্রথমে চারিদিকে চেয়ে দেখতেই কবির মনে জাগে একটা বিস্ময়ের ভাব। সে দেখে একজন পূর্ব্ব পরিচিতের মূর্ত্তি। এখানে এভাবে তার আনাগোনা কেমন ক'রে হ'ল? এ স্পষ্ট সজীব রূপ কোথা থেকে আবির্ভূত হ'ল? কবি জিজ্ঞাসা করেন—'কোন্ আলোতে প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে তুমি ধরায় আস?' (৫২)। কবি লক্ষ্য করেন যে তিনি আকাশে, বাতাসে, জলে, স্থলে, মানুষের মনে সর্ব্বত্র বিরাজিত। ৬,৩১,৩৭,৪৩,৪৬,৭৪,১১৬,১২১ নং গানগুলি এই ভাবের। কবি শুন্‌তে পান তাঁর আসার পায়ের ধ্বনি। 'নিখিল দ্যুলোক ভুলোক' প্লাবিত ক'রে তাঁর 'অমল অমৃত' ঝ'রে পড়ে। শুধু বাইরের প্রকৃতিতে নয়, সে আলো কবির গায়ে তার ভালবাসার পরশ ছুঁইয়ে দেয়, কবির গায়ে 'পুলক লাগে,' চোখে ঘোর ঘনিয়ে আসে।

তাঁর এই আপনভোলা হ'য়ে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া, অজস্রতার এই বাহুল্য, অসীম হ'য়ে সীমার মাঝে এই সুর বাজনোতে একটা রহস্য আছে। কবি বুঝতে পারেন যে পরে এই ছোঁয়াচ সংক্রামক হবে, এবং তখন হয়ত তাঁরও ঐ আনন্দের লীলায় যোগ দেওয়া সম্ভব হ'য়ে উঠবে; কারণ ইতিমধ্যেই যে তাঁর প্রাণেও সাড়া জেগে উঠেছে। এ ভাবটি বড় হৃদয়গ্রাহী ভাবে প্রকাশ পায় ২,৩,২২,২৯,৩৫, ৩৮,৫৩,৫৫,৬৭,৯৫, এবং ১০২ নং গানের মধ্যে। কবি খুব উৎসুক হয়ে জিজ্ঞাসা করেন—'হে মোর দেবতা, ভরিয়া এ দেহ প্রাণ, কি অমৃত তুমি চাহ করিবারে পান'। নইলে কেনই বা 'আপনারে তুমি দেখিছ মধুর রসে, আমার মাঝারে নিজেরে করিয়া দান?' তা ছাড়া আয়োজন কি এক দিনের, সে যে অনেক কাল থেকে চ'লে আসছে, অনেক কাল ধ'রে এ আনন্দের রস সঞ্চার হচ্চে। একটি গানে যেন এই সমস্ত গানগুলির সুবাস নিষ্কাসন করা হয়েছে। তাই তার সবটা উদ্ধৃত করলুম—

জানি জানি কোন্ আদিকাল হ'তে
ভাসালে আমারে জীবনের স্রোতে,
সহসা হে প্রিয় কত গৃহে পথে
রেখে গেছ প্রাণে কত হরষণ!
কতবার তুমি মেঘের আড়ালে
এমনি মধুর হাসিয়া দাঁড়ালে,
অরুণ কিরণে চরণ বাড়ালে,
ললাটে রাখিলে শুভ পরশন।
সঞ্চিত হ'য়ে আছে এই চোখে
কত কালে কালে কত লোকে লোকে,
কত নব নব আলোকে আলোকে
অরূপের কত রূপদরশন।
কত যুগে যুগে কেহ নাহি জানে
ভরিয়া ভরিয়া উঠেছে পরাণে
কত সুখে দুখে কত প্রেমে গানে
অমৃতের কত রসবরষণ॥

এই সকল আভাস পেয়ে কবির মনে হয় "যেন সময় এসেছে আজ।" তাই এখন তাঁর নতুন ঝোঁক হয়েছে যে "সব বাসনা যাবে আমার থেমে, মিলে গিয়ে তোমার এক প্রেমে" আর তখন "দুঃখ সুখের বিচিত্র জীবনে তুমি ছাড়া আর কিছু না র'বে।"

শ্রীনবেন্দু বসু

কিন্তু কেমন ক'রে আশা সফল হবে? কবি প্রভুকেই প্রার্থনা জানান, "আজি তোমার দক্ষিণ হাত রেখো না ঢাকি," (৪৪)। তিনি নিজে ব্যাকুলতা সহ্য করতে না পেরে নানা উপায় পরীক্ষা করেন। তিনি মানের আসন ত্যাগ ক'রে (১২৬), বলেন—"আমার মাথা নত করে' দাও হে তোমার চরণ ধূলার তলে" (১) কেননা "তোমার কাছে খাটে না কবির গরব করা" (১২৬)। ৮৬, ৯৮, ১২৪ নং গানগুলিও দ্রষ্টব্য। নানাভাবে নিজকৃত পাপ আর দোষ স্বীকার ক'রে কবি চিত্তশোধন করবার প্রয়াস পান। তিনি স্বীকার করেন যে "অনেক দেরী হ'য়ে গেল, দোষী অনেক দোষে" (১৫১)। তাঁর প্রধান দোষ এই যে "ঢেকে তোমার হাতের লেখা কাটি নিজের নামের রেখা" (১৪৪)। তিনি তাঁকে জীবনের "শ্রেয়তম" জেনেও ভাঙ্গাচোরা ঘরেতে যা পোরা আছে তা ফেলে দিতে পারেন না (১৪৫)। নানাদিক থেকে এই স্বীকারোক্তিপূর্ণ কবিতা অনেকগুলি, যেমন ৪০, ৪১, ৫৪, ৬৪, ৯৬, ১০৮, ১২৭, ১২৮, ১২৯, ১৩৭, ১৪৩ নং প্রভৃতি।

দোষ স্বীকার মাত্র ক'রেই কবি বসে' থাকেন না। তিনি দেখেন এ ছাড়া আরো অনেক বাধা রয়েছে। জগতের যত তুচ্ছ ঐশ্বর্য্য আর বন্ধন সেগুলোও ছাড়তে হবে। এখনও "ধনে জনে" জড়িয়ে আছে (৩০)। তাই তো চোখে আবরণ নামে (৩৪)। ফলে যদিও "দ্বারের সমুখ দিয়ে সে জন করে যাওয়া আসা" এদিকে কিন্তু "ঘরে হয় নি প্রদীপ জ্বালা, তারে ডাকবো কেমন ক'রে?" পথ দেখতে না পেয়ে এই ফিরে ফিরে যাওয়া দেখে কবি আজ পণ করেছেন যে মলিন অহঙ্কারের বস্ত্র ছেড়ে, স্নান ক'রে এসে প্রেমের বসন প'রে (৪২) নিভৃতে থালা সাজিয়ে তিনি আজ এগিয়ে যাবেনই যাবেন—

> "যেথা নিখিলের সাধনা
> পূজালোক করে রচনা
> সেথায় আমিও ধরিব
> একটি জ্যোতির রেখা।" (৫১)

কিন্তু এ সাধনায় শক্তির প্রয়োজন। সেই বরই তিনি চান, "নয় তো যত কাল তুই শিশুর মতন রইবি বলহীন, অন্তরেরি অন্তঃপুরে থাক রে ততদিন" (১৩৭)।

শক্তিপ্রার্থনার পর তাঁর দ্বিতীয় প্রার্থনা সাহস আর বিশ্বাসের (৪, ৩৩), যাতে তিনি নিজের সকল চিন্তা সকল জীবনটাকে একাগ্রতায় বেঁধে উৎসর্গ করতে পারেন (৯৯), আর তার পর যেন সেই "অন্তরতর" কবির অন্তর বিকশিত করেন (৫)।

একাগ্র সাধনা করতে হ'লে আবার সব নৈরাশ্য দুর হ'য়ে গিয়ে মনের শান্তির নিতান্ত প্রয়োজন। সেটাও কবিকে খুঁজে নিতে হয়। তাই তাঁর প্রার্থনা, এবার যেন মুখর কবি নীরব হ'য়ে যায় (৬০), যেন সপ্তলোকের নীরবতা সেখানে এসে বিরাজ করে (৬৫)। তিনি যেতে চান "অশান্তির অন্তরে যেথায় শান্তি সুমহান" (৭৫)। যেন তিনি তাঁকে তাঁর স্নিগ্ধ শীতল গভীর পবিত্র আঁধারে ডেকে নেন, (৯৬) যেন তিনি তাঁর মধ্যে "ধুয়ে মুছে" ঘুচে যান (১৩৮), যেন তিনি সকল দিয়ে তাঁর মাঝে মিশতে পারেন" (১৩৯)। তিনি মনকে কায়াকে ঐ চরণে গলিয়ে দিতে চান (১৪২)।

তারপর কবির শেষ প্রার্থনা সেই অরূপের আনন্দময় প্রেমাশীর্ব্বাদের জন্যে (১০৩, ৯০), যাতে তিনি তাঁর "আসন-তলের মাটির পরে লুটিয়ে" প'ড়ে তাঁর "চরণ ধূলায় ধূসর" হ'য়ে যেতে পারেন (৪৭) এবং আত্মনিবেদনের সেই পরম মুহূর্ত্তে—

> "ধায় যেন মোর সকল ভালবাসা
> প্রভু, তোমার পানে, তোমার পানে, তোমার পানে।" (৮০)

আজ কবি অনেক আয়াস ক'রে, 'অনেক যত্নে নিজেকে প্রস্তুত ক'রে, দেবতার দ্বারে এনে উপস্থিত হয়েছেন। এখন প্রধান ভয় দেবতা সন্তুষ্ট হয়েছেন কিনা। তিনি তাই তাঁকে বলতে চান যে বোধ হয় এতদিনে সময় হয়েছে, বোধ হয় এইবার তিনি তাঁর মহাদানের যোগ্য হয়েছেন। হয়ত তাঁর চেষ্টা অসম্পূর্ণ হ'লেও ব্যর্থ হয়নি, কেননা তার মধ্যে তো কোথাও কপটতা বা কার্পণ্য ছিল না। সুতরাং তিনি নিশ্চয় মনে মনে ভক্তের ওপর সন্তুষ্ট হয়েছেন (১৪৭, ১৫২)। এই সকল কথা ভেবে কবির মনে সাহস হয়। তিনি জানতে চান "প্রেমের দূতকে পাঠাবে নাথ কবে?" (১৫৩) সাহস পেয়ে কবি নিজের সাধনায়

পূর্ণ ইতিহাস বলতে আরম্ভ করেন। স্থান, কাল, প্রকারের একটা বিস্তৃত বিবরণ দেন (৬৬, ১২৬)—

"কবে আমি বাহির হলেম তোমারই গান গেয়ে
সে ত আজকে নয়, সে আজকে নয়!"—

শুধু দীর্ঘ সাধনাই নয়, তাছাড়া আজকে "এ গান ছেড়েছে তার সকল অহঙ্কার"। অতএব আজকে তাঁর যা কিছু সঞ্চিত ধন, যা কিছু আয়োজন, সম্পূর্ণই হোক বা অসম্পূর্ণই হোক তাঁর পায়ের কাছে ঢেলে দিয়ে নিজেকেও গ্রহণ করতে বলেন (১১৫, ১৩০, ১৪৯, ১৫০)।

গ্রহণ করার এই অনুরোধের মধ্যেও বৈচিত্র্য আছে। শুধু গ্রহণ করতে ব'লেই ক্ষান্ত হন না। অধীর হ'য়ে অপেক্ষা করেন শেষে অসহিষ্ণু ভাবে প্রশ্ন করেন—"যেথায় তুমি বস দানের আসনে, চিত্ত আমার সেথায় যাবে কেমনে" (৯৭); কবেই বা "প্রাণের রথে বাহির হতে পারব" ৮৫); "জগত জুড়ে উদার সুরে আনন্দ গান বাজে, সে গান কবে গভীর রবে বাজিবে হিয়া মাঝে" (১৬)।

এই অসহিষ্ণুতার ভাবটি ও আবার কত রকমে দেখা দেয়। কখন তাতে বাজে একটা ক্রীড়াসুলভ সুর—"অমন আড়াল দিয়ে লুকিয়ে গেলে চলবে না" (২৪); কখন আবার প্রবল আত্মবিশ্বাসে বলে যে আঘাত সইতে তিনি ভয় পান না; যেন "মৃদু সুরের খেলায় এ প্রাণ ব্যর্থ" না হয় (৯১)। তখনকার ভাব বেশ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কেউ আর তাঁকে ধ'রে রাখতে পারবে না (১১৮); তিনি আর নিজেকে নিজের শিরে বইবেন না (১০৬)। কখন ধৈর্য্য ধারণ করেন (৯২)। আবার মধ্যে মধ্যে মিনতিতে ভেঙ্গে প'ড়েন (১১২) নিজের অক্ষমতা স্বীকার করেন (৭৬)। কখন দেখি আত্মভর্ৎসনার ভাব আর নিজেকে সজাগ রাখবার চেষ্টা (২৫, ১১৩, ১১৪,); কখন সাদর আবাহন (৭,৫৮, ৫৯, ৭৮, ১০৫)।

কবির ধৈর্য্য, অনুরাগ, আবেগ ব্যর্থ হয় না। তাঁর প্রার্থনা সফল হয়। বোধ হয়, সেই মুহূর্ত্তে তিনি আনন্দে ধন্য ধন্য ক'রে ওঠেন (১৫)। তখন তিনি তাঁরই আদেশে গান গান, গর্ব্বে তাঁর বুক ভ'রে ওঠে (৭৯), পরম তৃপ্তিতে বলেন—"আছে আমার হৃদয় আছে ভ'রে, এখন তুমি যা খুসি তাই কর" (১১১)। তিনি উল্লাসে তাঁর রথ টানতে এগিয়ে যান (১১৯), তাঁর সঙ্গে কর্ম্মযোগে যোগ দেন (১২০), এবং শেষ ধন্যবাদে অন্তরের কৃতজ্ঞতাটুকু জানিয়ে দেন—"যা দিয়েছ আমায় এ প্রাণ ভরি, খেদ র'বে না এখন যদি মরি" (১৪০)।

এই খানেই ধর্ম্ম সঙ্গীতগুলির ভাবের পূর্ণ বিকাশ আর বিরাম। ভাবের আবেগের তীব্র শব্দিত প্রকাশে এগুলি কাব্যের সঙ্গীত রূপ, বর্ণনার সম্ভার বা কল্পনার রঙে জাজ্জ্বল্যমান নয়। তার স্থানে আছে একটা অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি আর ঐকান্তিক নিবেদনের প্রবল উন্মাদনা। এই পার্থিব জীবনে মানুষের মনে যত রকম আবেগের সঞ্চার হয় সে সকল এখানেও তেমনি সহজ সরল ভাবেই দেবতার কানে ভক্তের প্রার্থনাটুকু পৌঁছে দেয়। আমাদের দৈনিক জীবনের সাধারণ হাসি কান্নার সুরের সঙ্গে এই গানগুলির সুর এবং ভাবের এত যোগ আছে ব'লেই এ গানগুলি আমাদের এত ব্যক্তিগত ভাবে স্পর্শ করে। ভগবৎপ্রেম এখানে মানুষের প্রেমের কোঠার মধ্যেই ব্যক্ত হয়েছে। কবির পরম নিজস্ব সুদূরের আশা আকাঙ্ক্ষাগুলিকে আমাদের এই নীচেকার জগতের আশা, নিরাশা, হর্ষ, শোকের মতন চিনতে পারি ব'লেই তাঁর ব্যাকুলতায় নিজেরা আকুল হই, তাঁর ভরসাতে নিজেরাও সান্ত্বনা পাই, তাঁর আবদারে নিজেদের সুর মেলাই, তাঁর আনন্দেই নিজেদের শান্ত আর তৃপ্ত করি।

এইবার ভাবরাজ্য থেকে রূপরাজ্যের দিকে যাব। এ শ্রেণীর গানগুলিতে যে ভাব মর্য্যাদাহীন তা নয়, তেমনি গরিমার ছটায় উজ্জ্বল, তবে অলঙ্কৃত। তার পূর্ণ অভিব্যক্তি রূপের বিলাসের মধ্যে দিয়ে। রূপই এখানে প্রধান অবলম্বন। সেই জন্যে এই গানগুলিতে ছবি আঁকা, অলঙ্কারদান, প্রকৃতির ছদ্মবেশ পরান প্রভৃতি সহজ হয়েছে।

এই রূপপ্রধান গানগুলি বিশেষ ভাবে দুরকম—স্বভাব-বর্ণনা আর কল্পনাকাব্য। এর মধ্যেও সূক্ষ্মতর শ্রেণীবিভাগ আছে, স্বভাববর্ণনামূলক গানগুলিতে বহিঃপ্রকৃতির রূপ-সম্ভার আর তার বিচিত্র প্রকাশলীলাই গানের প্রধান রস বা উপকরণ। দ্বিতীয় বিভাগে বিশেষ ক'রে স্বপ্নজগতের কল্পনাসৃষ্টি।

শ্রীনবেন্দু বসু

১। প্রথম শ্রেণীর কবিতাগুলির মধ্যে কতকগুলি গান চোখে পড়ে যেগুলি প্রাগুক্ত ধর্ম্মসঙ্গীত আর প্রকৃতিকাব্যের মাঝামাঝি। সেগুলি যেন সংযোগস্থল— যেখানে ভাব অল্পে অল্পে রূপকে প্রাধান্য দিচ্ছে। আনন্দটা প্রকাশ পায় প্রকৃতিভূত বস্তুরূপের সাহায্যে। ২৬ নং গানটি থেকে উদাহরণ দিই। প্রথম দুটি কলি এই :—

হেরি অহরহ তোমারি বিরহ
ভুবনে ভুবনে রাজে হে,
কত রূপ ধরে' কাননে ভূধরে
আকাশে সাগরে সাজে হে।

সারা নিশি ধরি তারায় তারায়
অনিমেষ চোখে নীরবে দাঁড়ায়
পল্লবদলে শ্রাবণ ধারায়
তোমারি বিরহ বাজে হে।

প্রথম কলিটিতে ভাবটুকুই ব্যক্ত হয় যে, বিরহ নানারূপ ধারণ ক'রে কাননে ভূধরে, আকাশে, সাগরে বিরাজ করছে,—কিন্তু দ্বিতীয় কলিতে সেই বিরাজিত রূপ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়, আমরা তাকে দেখতে পাই তারার চেয়ে-থাকাতে পাতার ওপর বর্ষার জল-পড়ার মধ্যে। ৯, ১২, ১৪, ২৭, ৫০, ৭০, ৭২, ১৪১ নং গানগুলিও এই মধ্যবর্ত্তী শ্রেণীর। এখানে ভাবের ছায়া বহির্জ্জগতের গায়ে লুটিয়ে প'ড়ে তার মোহন স্পর্শে প্রতি মুহূর্ত্তেই স্পষ্টতর হ'য়ে যেন আমাদের মনের পটে স্থায়ীভাবে এঁকে যায়। কবির প্রেরণা ক্রমাগত প্রকৃতিকে আশ্রয় ক'রে বিকশিত হয়। প্রকৃতি-দৃশ্যের যে দিকটা রবীন্দ্রনাথের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় এ গানগুলির মধ্যে সেই দিকটাই উদ্ভাসিত হয়েছে—রবীন্দ্রনাথ বর্ষায় বাংলার নদীসুশোভিত পল্লীদৃশ্যের কবি।

২। স্বভাববর্ণনার মধ্যে দ্বিতীয় ধরণের গানগুলি ৮, ৭১, এবং ১০০ নং। এখানে ভাবের ব্যক্ত রূপ আরো ক্ষীণ, এবং সমস্ত রসটুকু বর্ণনার মধ্যেই পর্য্যবসিত। দৃশ্যবর্ণনাও সেই জন্যে খুব উজ্জ্বল রেখাতেই আঁকা। গানগুলি সাধারণের পরিচিত—"আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্রছায়ায় লুকোচুরি খেলা," "আবার এসেছে আষাঢ়" এবং "চিত্ত আজ হারাল আমার মেঘের মাঝখানে।" এখানেও বর্ণনার উপকরণ সেই একই, উদার আকাশ, বিস্তৃত মাঠ, খরবেগে প্রবাহিতা উচ্ছল নদী, শ্যামল শস্যক্ষেত্র, মেঘ, ঝড়, বিদ্যুৎ, বজ্র—বাংলার বর্ষার সমারোহ,—বড়ই বাস্তব আর মনোজ্ঞ।

৩। কখন কখন প্রকৃতির কোন বিশিষ্ট রূপ এত প্রবলভাবে কবিকে আকর্ষণ করে যে তিনি সেই রূপের ধ্যানে একেবারে আত্মহারা হ'য়ে গিয়ে একান্তভাবে সেই রূপটিরই বন্দনা করেন, এবং সেই স্তবগানের মধ্যেই তাঁর দেবতার আবাহন হয়। রূপের সংহত মূর্ত্তি শিল্পীর আঁকবার জিনিষ, আর রূপের গতিশীল ছবিই কবির বর্ণনার সম্পদ। এ গানগুলিও তাই। একটিতে ভরা বাদরের ঝর্ ঝর্ বৃষ্টি পড়ার কলরোলজনিত উল্লাস যখন—

শালের বনে থেকে থেকে
ঝড় দোলা দেয় হেঁকে হেঁকে,
জল ছুটে যায় এঁকে বেঁকে
মাঠের পরে।
যখন মেঘের জটা উড়িয়ে দিয়ে
নৃত্য কে করে! (২৮)

একটিতে পাই শরতের স্নিগ্ধ চরণসম্পাতে আবির্ভাবজনিত কবির মনের শান্ত তৃপ্তি যখন সে অতিথি হয়ে "প্রাণের দ্বারে" এসে উপস্থিত হয় (৩৯), আর কত মনোরম সে আসা—

শিউলী তলার পাশে পাশে
ঝরা ফুলের রাশে রাশে
শিশির ভেজা ঘাসে ঘাসে
অরুণ রাঙা চরণ ফেলে। (১৩)

তার "আলো ছায়ার আঁচলখানি লুটিয়ে লুটিয়ে পড়ে বনে।" আবার বসন্তের আগমনে আনন্দে কবির ভ্রমর-গুঞ্জন শুনি তাঁর বন্দনায়—"আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে; অতি নিবিড় বেদনা বন মাঝেরে, আজি পল্লবে পল্লবে বাজে রে; এই সৌরভ-বিহ্বল রজনী কার চরণে ধরণীতলে জাগিছে?" (৫৬)। বহিঃ-প্রকৃতিকে ভাবের বাহন করা, ভাব আর রূপের মিলনসাধন করা, রূপের অভিনন্দনের মধ্যে দয়িতের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করা এই কবিতাগুলি রবীন্দ্র-কাব্যে বড়ই উজ্জ্বল, বড়ই সজীব, বড়ই স্পষ্ট। তিনি মৃত্যুকেও রূপ দেন যখন বলেন—"ওগো আমার এই জীবনের শেষ পরিপূর্ণতা, মরণ আমার মরণ, তুমি কও

আমারে কথা,'' (১১৭)। ৩৩ ও ১০১ নং গানে বর্ষার রূপ খুব উজ্জ্বল রঙে আঁকা। আবার একটি গানে শরতের যে বাহ্য রূপ দেখি সে-রকম উচ্চ মূল্যের objective poetry সহজে চোখে পড়ে না। শরৎ ঋতুর আবাহন—

এস গো শারদ লক্ষ্মী, তোমার
শুভ্র মেঘের রথে,
এস নির্ম্মল নীল পথে।
এস ধৌত শ্যামল
আলো ঝলমল
বনগিরি পর্ব্বতে।
এস মুকুটে পরিয়া শ্বেত শতদল
শীতল শিশির-ঢালা॥

এমন সত্য স্বভাববর্ণনা, এত উজ্জ্বল রূপসাধন গীতাঞ্জলিতেও বেশী নেই।

৪। স্বভাববর্ণনার গানগুলির মধ্যে বিরহভাবের গান কয়েকটি এক বিশিষ্ট শ্রেণীর মধ্যে পড়ে। এগুলির মূল রস,—বিচ্ছেদ, বেদনা। বিরহের এই বিষাদব্যথাকে মূর্ত্ত ক'রে তুলতে বাইরের প্রকৃতিদৃশ্য কবিকে যথেষ্ট সাহায্য করে। প্রকৃতির প্রশান্তি আর স্থৈর্য্যের রূপ-কল্পনায় যে গোপন বেদনার ভাব নিহিত থাকে সেটুকু কবির মনে প্রতিক্ষণেই বাজতে থাকে। কবির ভাষাতেই বলতে গেলে—"এই নিশ্চেষ্ট নিস্তব্ধ নিশ্চিন্ত নিরুদ্দেশ প্রকৃতির মধ্যে এমন একটি বৃহৎ সৌন্দর্য্যপূর্ণ নির্ব্বিকার উদার শান্তি দেখ্‌তে পাওয়া যায় এবং তারি তুলনায় নিজের মধ্যে এমন একটা সতত সচেষ্ট পীড়িত জর্জ্জর ক্ষুদ্র নিত্য নৈমিত্তিক অশান্তি চোখে পড়ে যে অতিদূর নদীতীরের ছায়াময় নীল বনরেখার দিকে চেয়ে নিতান্ত উন্মনা হ'য়ে যেতে হয়।" ("জলপথে" শীর্ষক প্রবন্ধ)। অতএব বহিঃপ্রকৃতির চিন্তার মধ্যে বিরহের ভাব সহজেই ঘনিয়ে ওঠে। তাই প্রকৃতির রূপের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে, তার সুরে সুর বেঁধে, তারই পটে ছবি এঁকে, তাতেই প্রাণ প্রতিষ্ঠা ক'রে, তার মধ্যেই সহানুভূতি খুঁজে পেয়ে, তাতেই নিষ্ঠুরতা আরোপ ক'রে, কবির অন্তরের কান্না ঘণিয়ে ওঠে। জল, ঝড়, মেঘ, বিদ্যুৎ, অন্ধকার রাত, গহন বন, নিরালা পথ—তার মাঝখান দিয়ে কবিমনের দিশাহারা বিরহিনী তার জীবনের প্রেয়তমের খোঁজে বার হয়। বৈষ্ণব কাব্যের কমনীয় পরিণতি!

বিরহ কবিতাগুলিকেও ভাবের ঐক্য অনুসারে সাজাতে পারি। প্রথমে আছে বিচ্ছেদের তীব্র বেদনা আর খুঁজে পাবার জন্যে একটা ব্যাকুলতা যখন "গগনতল গিয়েছে মেঘে ভরি, বাদলজল পড়িছে ঝরি ঝরি" (১৮)। সেই সময়ে প্রাণ জেগে ওঠে, কিন্তু কাউকে দেখতে না পেয়ে দুরন্ত বাতাসে কেঁদে বেড়ায়, কেবল "দূরের পানে মেলে আঁখি" চেয়ে থাকে, আর ভাবে, যদি দেখা না পায় তো এমন বাদল বেলা কেমন ক'রে কাটবে (১৭)। চোখে ঘুম নেই, আকাশও তার সঙ্গে হতাশ ভাবে কাঁদে। বারে বারে সে দুয়ার খুলে দেখে প্রিয়তম আসছে কিনা, কিন্তু—"বাহিরে কিছু দেখিতে না পাই" (২১)। শেষে আর থাকতে না পেরে, যত বন্ধন সব কাটিয়ে সে নিজেই বেরিয়ে পড়ে। বলে—"একলা আমি বাহির হলেম তোমার অভিসারে" (১০৪)।

তখন এই ঘনিয়ে-আসা আষাঢ় সন্ধ্যার মধ্যে বাধনহারা বৃষ্টিধারার মধ্যে, যূথীর বনে সজল হাওয়ার শিহরে সে যেন তার মনস্কামনা পূর্ণ হবার আভাস পায় (২০)। তারপর দেখে হঠাৎ কখন নিশার মত নীরব হ'য়ে সবার দিঠি এড়িয়ে "শ্রাবণ ঘন গহন মোহে" গোপন চরণ ফেলে তার প্রাণকান্ত এসে দাঁড়িয়েছেন।

গীতাঞ্জলিতে প্রকৃতিকবিতা উপরোক্ত চার প্রকারের। আমরা আরও বুঝতে পারি যে প্রকৃতিদেবী অনেক ভাবেই কবির কাব্যে আসন গ্রহণ করেন। কখন ভাবের স্থূল আধার স্বরূপ, কখন ঋতুসম্ভারে বা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের প্রকাশ-লীলায়, কখন রূপমূর্ত্তি পরিগ্রহণ ক'রে, আবার কখন বিরহভাবের মূর্চ্ছনা জাগিয়ে।

এই সব বর্ণনার মধ্যে কিন্তু একটি বিশেষত্ব প্রত্যেক ক্ষেত্রেই বর্ত্তমান। কথাটা রবীন্দ্রনাথের বস্তুমূলক (objective) কবিতার মর্য্যাদা সম্বন্ধে মতভেদ নিয়ে। টমসন সাহেবই এই বিতণ্ডাটুকু একটু যেন স্পষ্ট ক'রে তুলতে চেয়েছেন এবং সে সম্বন্ধে দু'একটি কথা এস্থানে খুব প্রাসঙ্গিক ভাবেই এসে পড়ে। যে বিশেষত্বের কথা বলছি

শ্রীনবেন্দু বসু

... এই যে প্রকৃতির বর্ণনা স্থানে স্থানে সতেজ বা স্পষ্ট হ'লেও সর্ব্বত্র তাতে একটা আত্মস্থ ভাবের মন্থর ছায়া পড়ে। যেন কিসের টানে তাকে পিছন ফিরে দেখতে হয়। সময় সময় উদ্দাম গতিতে ছুটেও আবার পরক্ষণে দার সংযত হয়ে পড়ে। মনে হয় বুঝি বস্তুবর্ণনা করতে কবি আত্মদ্রষ্টা হ'য়ে ওঠেন। তাঁর কাব্যে জড়জগতের রূপের যত লীলার অভিব্যক্তি মানুষের মর্ম্মের আবেগের সঙ্গে একসঙ্গে জড়ানো, এক তারে বাঁধা। একটার মধ্যে অন্যটা পর্য্যবসিত। একটা কাঁপলে অন্যটা কাঁপে। মনে হয় কবি মানুষের কথা কিছুতেই ভুলতে পারেন না—তাকে কেবল প্রকৃতির কোলে পাঠাতে চান জ্বালা জুড়োতে, কেননা সেখানে আছে একটা সান্ত্বনার প্রলেপ। কবির কথায়—"সৌন্দর্য্য আত্মার সহিত জড়ের মাঝখানকার সেতু।" কাজেই সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করতে গিয়ে আত্মা আর জড় দুটিতেই টান পড়ে। তাই বুঝি কবি বর্ষার রূপ দেখে মুগ্ধ হ'লেও তিনি সেটাকে দেখেন, "মানবের মাঝে" (১০১)। আষাঢ় শুধু আকাশ ছেয়েই আসে না, সে "নয়নে এসেছে হৃদয়ে এসেছে ধেয়ে।" (১০০)। "ভরা বাদরে" ঝর ঝর বারি ঝরার একটা খুব শব্দিত এবং সরস বর্ণনার মধ্যেও কবির অন্তরে কলরোল ওঠে, হৃদয়-মাঝে পাগল জাগে, যার ফলে ভেতর বা'র এক হ'য়ে গিয়ে যেন "কে মেতেছে বাহিরে ঘরে।" প্রকৃতির বর্ণনা আছে, কিন্তু বর্ণনার মধ্যে নিজেকে ভুলে যাওয়া নেই, একটা সংবরণের বাঁধ রয়েছে। প্রকৃতি ছাড়া মানবজীবনের কোন অবস্থাক্রম কাব্যে বিন্যাস করতে গেলেও কবি ঐভাবেই সে বর্ণনার সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেন। বর্ণিত ছবিখানি যেন নিজেতেই যথেষ্ট নয়, তার যা কিছু সার্থকতা যেন কবি-প্রাণের আকাঙ্ক্ষা ...লের অবলম্বন বা প্রতীকরূপে। বস্তুবর্ণনার চেয়ে যেন মর্ম্মকাহিনীই বেশী মূল্যবান হ'য়ে ওঠে। কিন্তু কবি নিজে ... আভাসবর্ণনার মধ্যেই স্থূল দেহের সাহচর্য্যের সবটুকু অনুরাগ আর সান্ত্বনা পেয়ে তৃপ্ত হন। তাঁর কাছে সেই ছায়াই সম্পূর্ণ প্রাণবান আর স্পষ্ট। মৃত্যু তাঁর "জীবনের শেষ পরিপূর্ণতা।" তার প্রতি তাঁর কত সনির্ভর, সপ্রেম, আবেগপূর্ণ ভাব—

মিলন হবে তোমার সাথে
একটি শুভ দৃষ্টিপাতে,
জীবনবধূ হবে তোমার
নিত্য অনুগতা।
* *
সেদিন আমার রবে না ঘর
কেই বা আপন, কেই বা অপর,
বিজন রাতে পতির সাথে
মিলবে পতিব্রতা।" (১১৭)

ব্যক্তিক ভাবের এই চরম কবিতায় নিবিড় মিলনের কি উষ্ণ পরশ!

তা হ'লে কি রবীন্দ্রনাথের স্বভাবকবিতা বা Nature poetry তাঁর মানবগীতার বাহন মাত্র? স্বভাববর্ণন ব'লে এ গানগুলিকে পৃথকভাবে শ্রেণীবদ্ধ করবার কোন আবশ্যকতা ছিল না? এবং কবিতাগুলি কি তাঁর ধর্ম্মসঙ্গীতগুলিরই একটা রূপান্তরিত সংস্করণ? এ প্রশ্নের উত্তরে বলি যে উপরোক্ত আলোচনা সত্ত্বেও এই স্বভাবসঙ্গীতগুলির প্রকৃতি-কবিতা হিসাবে একটা বৈশিষ্ট্য আছে।

প্রথমত সঙ্গতভাবে গীতিকল্পনা (lyric imagination) যতটা বস্তুমূলক হ'তে পারে এগুলি তাই। কাব্যমাত্রই কবির ব্যক্তিত্বের প্রকাশ, কিন্তু গীতিকবিতায় সে প্রকাশ আত্মপরিবৃত, egotistic। গীতিকবির পক্ষে শুধু বিস্ময়-ভাব যথেষ্ট নয়। তার সঙ্গে একটা জীবন-চঞ্চল বিশিষ্ট প্রাণের যোগ থাকে। অতএব এ কবিতায় কবির মন প্রকৃতির রূপ দেখে ছবিটি দেখার আনন্দ পেয়েই তৃপ্ত এবং ক্ষান্ত হয় না, একটা অবস্থা সংস্থানের রসমূল্য মাত্র তাকে অভিভূত করে না। তার চোখে সে দৃশ্য হয়ে দাঁড়ায় তার মনোভাব রঞ্জিত বাসনা আর আবেগের একটা সঞ্চারিণী প্রতীক। তাই কবির প্রেরণায় দৃষ্ট রূপটি তাকে সম্পূর্ণভাবে প্রবুদ্ধ করলেও আংশিকভাবে ব্যক্ত হয়। অথচ সে কায়ার ছায়া ব'লে অবিচ্ছেদ্যও বটে,—বিচ্ছুরিত লাবণ্যের স্নিগ্ধ পরিমণ্ডল। চোখেদেখা রূপের অবিকল বাঞ্জনায় কবিকল্পনার আনন্দ এবং তৃপ্তি আছে, আবার "কবিহৃদয়ক্ষত" বেদনার স্মারক বা উত্তেজকভাবে প্রকৃতিরূপবর্ণনাও কাব্যগ্রাহ্য এবং তার নামও স্বভাবকবিতা। একজনের কাছে যেটা মাত্র রূপ,

অন্যের কাছে সেটা রূপক, একজনের উল্লাস অন্যের সৌম্য শান্তি। তার কাছে কাব্যের পূর্ণ সৌন্দর্য্য ও গরিমা বর্ণনাতেই সম্পূর্ণ নয়। তার কাছে বর্ণিত দৃশ্য বর্ণিত ভাবের পশ্চাত দৃশ্য, মাঝে থাকে স্মৃতি চাঞ্চল্যের ছায়ায় আচ্ছন্ন middle distance—মধ্যভূমি। সে ছবি কেমন? কবির অন্যত্র ব্যবহৃত বর্ণনার ভাষায় বলি—"পরপারে দেখি আঁকা তরুছায়া মসীমাখা, গ্রামখানি মেঘে ঢাকা প্রভাতবেলা।" আলোচ্য স্বভাব কবিতাগুলির প্রথম বৈশিষ্ট্য তাই গীতি কবিতার প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য।

দ্বিতীয়ত এই কারণেই সম্ভবত বর্ণনায় বর্ণিত দৃশ্যের বৈচিত্র্যও নেই, অন্য কথায় সেগুলি মোটের ওপর অনেকটা একই ভাবাপন্ন বর্ষায় বাংলার পল্লীশোভার ছবি। কবি দেখেন যে তাঁর মনোভাব সব চেয়ে বেশী অনুরণিত হয় বাংলার পল্লীর শ্যামল শান্ত শোভায় আর সকল ঋতুর মধ্যে বর্ষার ঘন রসাপ্লুতির মধ্যে। তিনি তাইতেই আত্মহারা হ'য়ে যান। নিসর্গের সৌন্দর্য্যের অন্যান্য অভিব্যক্তির দিকে দৃষ্টিপাত করবার অবসর হয় না। এই বৈচিত্র্যের অভাবকে কল্পনাশক্তির দৈন্য মনে ক'রে টমসন সাহেব একটু বিচলিত হয়েছেন, কিন্তু তিনি ভুলে যান যে অনেক ক্ষেত্রে সংখ্যার চেয়ে গুণের পরিমাপটাই প্রশস্ত। "Great genial power, one would almost say, consists in not being original at all, in being altogether receptive."—Emersonএর কথা। রস-সঞ্চারে নতুনত্ব আর সজীবতা দান করতে পারলে একের মধ্যেই ডুবে থাকা কেন কল্পনার দৈন্য হবে? ইচ্ছার মিতব্যয় সব সময়ে শক্তির অপব্যয় নয়। একের বহু রূপ দেখতে পাওয়াটা বিশ্বস্ততার শ্রেষ্ঠ কষ্টিপাথর, উৎকৃষ্ট বৈচিত্র্য, মহান মৌলিকতা। এই দিক থেকেই এই প্রকৃতিসঙ্গীতগুলির বৈশিষ্ট্য আছে ব'লে মনে করি। একে মগ্ন থাক্‌লেও কবি বৈচিত্র্য সাধন করেন কল্পনার প্রাখর্য্য আর অনুভূতির প্রাবল্য দিয়ে। এও কাব্যের একটা রীতি। আরো মনে হয় যে পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা কবির প্রকৃতিবিরুদ্ধ। তাঁর দৃষ্টি সমগ্র সম্পূর্ণতার দিকে নিবদ্ধ। ইংরেজ কবির তুলনায় প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক অন্য রকম। কবি স্বয়ং বলেন—

"আমরা জন্মাবধিই আত্মীয়, আমরা স্বভাবতই এক। আর ইংরাজ প্রকৃতির বাহির হইতে অন্তরে প্রবেশ করিতেছে ·· আমরা আবিষ্কার করি নাই, কারণ আমরা সন্দেহও করি নাই, প্রশ্নও করি নাই"—(পঞ্চভূত)।

এই থেকে প্রতীয়মান হবে যে রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি-কবিতার রূপকের মধ্যেও রূপের প্রাধান্য যথেষ্ট। গভীর আত্মগত ভাব বহির্দৃষ্টির বর্ণচ্ছটায় যথেষ্ট উজ্জ্বল। Sense এর ওপর sensationএর মোহন পরশ, সংযমের ওপর সরসতার আবেশ।

মাত্র কল্পনার তীব্রতার ফলে কেমন ক'রে একটা ঔজ্জ্বল্যের ধারা গ'লে ব'য়ে যায়, মাত্র অনুভূতির প্রাবল্যে কেমন করে' সমবেদনার উৎস ছুটে উচ্ছ্বাসে ভাসিয়ে নিয়ে যায়, তার দু'একটি উদাহরণের প্রতি পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই। প্রথমে একটা সমতল ভূমির দৃশ্যে প্রাকৃতিক পরিবেষ্টনের মধ্যে একটা ঘটনা সংস্থানের ছবি।

প্রভাত আজি মুদেছে আঁখি,
বাতাস বৃথা যেতেছে ডাকি,
নিলাজ নীল আকাশ ঢাকি
নিবিড় মেঘ কে দিল মেলে?
কূজনহীন কাননভূমি
দুয়ার দেওয়া সকল ঘরে
একেলা কোন পথিক তুমি
পথিকহীন পথের পরে? (১৯)

স্পষ্টতা হিসাবে এই কয় ছত্র যদি প্রকৃতিকবিতা না হয় তবে আর কোথায় পা'ব? খুঁটিনাটি বা details নেই, তবে কবির দেশও তো উদার আকাশ মাঠের বিস্তৃতির দেশ! কবিও উচ্চ নীচের প্রভেদ লুপ্ত করা সমতলের প্রেমিক। তাঁর দেশে তীব্রোজ্জ্বল আলো আর ঘনঘোর আঁধারের দিগন্তপ্রসারী একাকার করা স্বর্ণগৈরিক আর ধূসর শ্যামল রূপের যে উদাস বৈরাগ্য তাই তাঁর মনকে ছেয়ে থাকে। তাই সে দেশের দৃশ্যবর্ণনায় পাহাড়ের খোপে, বনের ঝোপে, বাঁকের মুখে half lightsএর সরস কোমল ইন্দ্রজাল সচরাচর চোখে পড়ে না। কিন্তু এত অল্প কথায়

শ্রীনবেন্দু বসু

দৃশ্যের সম্পূর্ণতাটুকু আর কোন্ কবি ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন? বাংলার বর্ষার দুপুরের এমন মনোজ্ঞ ছবি আর কয়টা পেয়েছি? এমন একটা দিনের অলস নিশ্চল ভাব অস্বাভাবিক চকিত নিস্তব্ধতা, থেকে থেকে উতল বাতাসের আস্ফালন, আকাশ আর পৃথিবীর মাঝের দূরতাটুকু কমিয়ে এনে, গাছের মাথার ওপর দিয়ে লুটিয়ে গিয়ে, কাজল ধূসরতার মাঝখানে সবুজের শ্যামলিমা আরো উজ্জ্বল ক'রে, মেঘের বুকে পাখীর ডানার কাঁপন আরো স্পষ্ট ক'রে তুলে, মানুষের চোখে একটা স্নিগ্ধ আবেশের অঞ্জন লাগিয়ে, প্রাণে নবীনতার সরস সিঞ্চন এনে দিয়ে, মেঘের আবরণের ভেতর তার দৃষ্টিকে একটা সুদূরের বাসনায় বিভোল ক'রে, নিবিড় আঁধারের আবেষ্টনের মধ্যে বিশ্বপ্রকৃতির আয়তন ছোট ক'রে এনে তার মনে পরম নির্ভর আর বিশ্বাসের ভাব জাগিয়ে দিয়ে বরষাদিনের যে পূর্ণ রূপটি আমাদের চোখের সামনে এসে দাঁড়ায় তার সম্পূর্ণ প্রকাশ, নিখুঁত চিত্রণ, কি উদ্ধৃত লাইনগুলিতে পরিস্ফুট নয়? অল্প কথায় স্খলিতচরণ পথিকের কী স্পষ্ট জীবন্ত ছবি—সমস্ত চরাচর তখন নিস্তব্ধ, হয়ত বা পাতার ফাঁকে একটি দুটি পাখীর করুণ স্বর আর নিঃসহায় চাহনি সেখানে একমাত্র প্রাণের পরিচয়; গাছগুলি নিঃঝুম, কেবল দিগন্ত থেকে ঝর ঝর বৃষ্টি পড়ার শব্দ কানে আসে। চোখে পড়ে বাতাসের দোলায় ধানের শিষগুলির হিল্লোল। মনে লাগে পল্লীগৃহগুলির বন্ধ দুয়ার নিরুদ্বেগ, আর বৃষ্টির কাছে বুক পেতে দিয়ে খোলা মাঠের নম্র নত ধৈর্য্যের ভাব। তার মাঝখানে দেখি গ্রামের ঈষৎ উঁচু একটিমাত্র সরু পথ দিয়ে পথিকের শিথিল চরণে চ'লে যাওয়া, তার চোখে আশ্রয়বঞ্চিতের নিঃসহায় ভাব, প্রত্যেক কুটীরখানির দিকে ব্যগ্র চঞ্চল দৃষ্টিপাত, সামনে ঘন অন্ধকার। অনুভূতির আবেগপ্রাবল্যই কাব্যের প্রাণবস্তু, আর তারই উচ্ছ্বাসে সিঞ্চিত ব'লে বর্ণনা এত সরস, এত নবীন, এত হৃদয়গ্রাহী, এত মূল্যবান। তেমনি যখন কবি তাঁর চিরপরিচিতকে দেখ্‌তে পা'ন না তখনকার অবস্থা—

বাহিরে কিছু দেখিতে নাহি পাই
তোমার পথ কোথায় ভাবি তাই।
সুদূর কোন্ নদীর পারে
গহন কোন্ বনের ধারে
গভীর কোন্ অন্ধকারে
হতেছ তুমি পার,
পরাণসখা বন্ধু হে আমার! (২১)

অকম্পিত হাতের দুটি একটি সরল ঋজু রেখার ক্ষিপ্র টানে কেমন সারা বনানীর দৃশ্য চোখের ওপর ভেসে ওঠে। ঝড়ের রাতে, ঝাপসা অন্ধকারে, যত অলীক কালো ছায়ার মধ্যে অন্বেষী মনের সঙ্গে সঙ্গে যেন আমরাও নিজেদের হারিয়ে ফেলি। ঐ দূরত্ব আর গভীরত্বজ্ঞাপক কথাগুলি কেমন ক'রে দৃশ্যের অস্পষ্টতা আরো বাড়িয়ে তোলে, যা থেকে আমরা বুঝতে পারি কত আয়াসসাধ্য এই অনুসন্ধান। সুদূর নদী, গহন বন, গভীর অন্ধকার! তার মাঝখান দিয়ে যে চ'লে যায় সে নিজে আরো কত অস্পষ্ট! এই অন্ধকারে কি ক্ষিপ্র তার গতি! গানের ছন্দের লঘু ত্বরিত গতিতে তার প্রতিধ্বনি শুনতে পাই; হয়ত ক্ষীণভাবে আরো শুনতে পাই খরস্রোতা নদীর তর্ তর্ বেগ, নিস্তব্ধ বনের মধ্যে গাছের মাথায় ক্ষুব্ধ বাতাসের স্বনন, গভীর অন্ধকারে শুকনো পাতা আর তৃণের ওপর ত্রস্ত পা পড়ার শব্দ; হয়ত কাঁটা গুল্মের মধ্যে উদ্বিগ্ন গোপনচারী পথিক চলতে চলতে কতবার থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। কোন্ সে বিস্তৃত নদীর ওপারে জলের ওপর রূপালি আলো আর এপারের গহন বনের অন্ধকার মিশে একটা নিবিড় রহস্যলোকের সৃষ্টি করে? তার মধ্যে উদ্বেগ-কণ্টকিত অথচ দৃঢ়চিত্ত অভিসার! সে তো এজগতের পথ চলা নয়, সে কোন কল্পলোকের পানে সুদূর-যাত্রা।

এই প্রাকৃতিক রহস্যরাজ্য থেকে বিদায় নিয়ে আমরা কল্পনার সীমানায় এসে পড়ি। এ কবিতাগুলিকে বিশেষ ক'রে কল্পনাপ্রধান বলেছি এই কারণে—এতে কোথাও দেখি বাস্তব জীবন থেকে অনুকৃত ঘটনাবলী বা চরিত্র বেছে নিয়ে তাদের একটা কাল্পনিক জগতে সংস্থান ক'রে এক বিচিত্র মায়ালোকের সৃষ্টি করা হয়েছে; কখন দেখি সামান্য একটি কথার ব্যবহারে, মাত্র তার শব্দঝঙ্কার বা

ভাবের আভাসে, সমস্ত বর্ণনা একটা অর্থাতিরিক্ত সৌন্দর্য্যের প্রভায় উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠেছে, আবার কোথাও অবচ্ছিন্ন কল্পনার সাহায্যেই নিপুণ সুঠাম বাস্তবতার মনোরম বিকাশ হয়েছে। যখন পড়ি—

"তোমার সোনার আলোয় সাজাব আজ
দুখের অশ্রুধার"।

কিংবা চন্দ্রসূর্য্য পায়ের কাছে
মালা হয়ে জড়িয়ে আছে। (১০)

তখন বুঝতে পারি এ মাত্র ধর্ম্মসঙ্গীত নয়, স্বভাববর্ণনা নয়, এ কোন শিল্পীর তুলিতে আঁকা ছবির রঙ রেখার ছন্দ। এ চিত্রকাব্যগুলি দু রকম, কোনটি নিশ্চল ছবি, কোনটি সচল। ১০, ২৩, ৪৯, ৮৪, ১৩৩, ১৩৫, ১৫৫, ১৫৬, ১৫৭ নং গানগুলি প্রথম শ্রেণীর। এতে কবির ভাবরত্ন বাহ্য জগতের কোন বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য খুঁজে পেয়ে তার প্রকাশেই নিজে প্রকাশিত হয়। তার পেছনে কোন জড়দৃশ্যের আশ্রয় নেই। জগতের সব সংযোগ থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে কেবল ভাবের অসীম শূন্যে গ্রহতারার মতন নিজের জ্যোতিতে নিজেই উদ্ভাসিত হ'য়ে প্রভা বিকীরণ করতে থাকে—স্থির অখণ্ড, নিশ্চল ভাবে। যেমন—

আনন্দ দাঁড়ায় আঁখি জলে
দুঃখ ব্যথার রক্ত শতদলে। (১৩৫)

এখানে আনন্দের একটি আঙ্গীক মূর্ত্তি তার নিজস্ব ভঙ্গিমায় প্রতিভাত হয়। রক্তশতদল জিনিষটি মনে না ভাবলে বা চোখে না দেখলে যেন বুঝতে পারি না দুঃখ ব্যথার পার্থিব কমনীয় রূপটি কেমন। এবং এ গুলি স্থির ছবি, চলচ্চিত্র নয়। আনন্দের স্থির জ্যোতির সামনে আমরা চেয়ে থাকি স্থির নির্ব্বাক বিস্ময়ে; কোন দৈহিক বা মানসিক চাঞ্চল্য প্রকাশ করি না। ভাবের এই নিঃসঙ্গ আত্মপ্রকাশের ছবিতে নানা মনোভাবের রং দেওয়া হয়—১০ নং গানটি দুঃখের চিত্রিত রূপ। ২৩ নং সুরের রূপ; সুরকে দেখি আলো, হাওয়া বা ঝরণার উৎসরূপে। ৪৯ নং গানটির আকাশের গায়ে তারা বা সোনার শতদলরূপে আনন্দের উজ্জ্বল মূর্ত্তি। ১০৫ নং গানও আনন্দের রূপ; ৮৪ এবং ১৩৩ নং গান দুটিতে ভাব নিজে কোন বিশিষ্ট বেশ না পরিগ্রহণ ক'রে একটা বিস্তৃত জীবন দৃশ্যের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হ'য়ে সেটাকে চালিত করে। ৮৪ নংএ কবির চিরদিনের সাথীর সঙ্গে জীবনসন্ধ্যায় মুক্তিসাগরে ভেসে যাওয়ার ছবি দেখতে পাই। অন্যটিতে গান গেয়ে গেয়ে দেশে বিদেশে অনুসন্ধানের আবেগে ঘুরে বেড়াবার ব্যস্ততা। বাকী তিনটি গানও ঐ রকম গীতোচ্ছ্বাসময় আত্মবিবৃতির সজ্জিত বেশ, তবে বসন বড় সূক্ষ্ম, আভরণের স্থূল রূপটি তেমন ক'রে চোখে পড়ে না—

বসন ভূষা মলিন হ'ল ধূলায় অপমানে
শক্তি যার পড়িতে চায় টুটে,
ঢাকিয়া দিক তাহার ক্ষত ব্যথা
করুণা-ঘন গভীর গোপনতা। (১৫৭)

সচল শ্রেণীর কবিতাগুলিতে কবির রূপসৃষ্টি সম্বন্ধে দক্ষতা আরো স্পষ্টভাবে লক্ষিত হয়। এই দৃশ্যমূলক গানগুলিতে একটা নাটকীয় সঙ্গতি আর পূর্ণতা চোখে পড়ে। বেশ বড় পটের ওপর ছবি আঁকা হয়েছে। এ গুলি কবির বস্তুকল্পনার উজ্জ্বলতম মুহূর্ত্তের সৃষ্টি আর ভাবের ঐক্যসূত্রে গ্রথিত। ৪৫, ৪৮, ৭৭ নং গান তিনটিতে কবির অন্তরতম বাসনার প্রকাশ। ৬১, ৬২, ৬৮, ৮৭ নং গানগুলি অবহেলাজনিত অনুশোচনা ও পশ্চাত্তাপের স্বীকারোক্তি। ৫৭, ৮১, ৮২, ১৩৬, ৬৯ নং এ বিস্ময়প্রসূত দিব্যজ্ঞানলাভ। শেষে ১৩৪ নং প্রাপ্তিজনিত হর্ষোচ্ছ্বাস। এ কবিতাগুলির বিশেষত্ব ভাবের বৈচিত্র্য অনুযায়ী কল্পনার লীলা ও বিন্যাসের বৈচিত্র্যে। সে বৈচিত্র্য এলোমেলো বা যথেচ্ছাচারপ্রসূত নয়, বড় অনিবার্য্য। উপরোক্ত শ্রেণীদুটিতে সমশ্রেণীর গানগুলিতে ভাষা আর ভঙ্গীরও আশ্চর্য্য সাদৃশ্য আছে।

বাসনামূলক গানগুলি সবই সভাদৃশ্য। রাজাধিরাজের পায়ে চরম সাধনার ফল উৎসর্গমানসে কবির বিনীত নিবেদন আর অনুমতিভিক্ষা—দেবতার পায়ে ভক্তের অর্ঘ্য। ভাবাপ্লুত বাসনার বোধ হয় সব চেয়ে সহজ ও সরল প্রকাশ। গানগুলি সুপরিচিত—

শ্রীনবেন্দু বসু

রূপ সাগরে ডুব দিয়েছি
অরূপরতন আশা করি ;
ঘাটে ঘাটে ঘুরব না আর
ভাসিয়ে আমার জীর্ণ তরী।
সময় যেন হয়রে এবার
ঢেউ খাওয়া সব চুকিয়ে দেবার,
সুধায় এবার তলিয়ে গিয়ে
অমর হয়ে র'ব মরি!
যে গান কানে যায় না শোনা
সে গান যেথায় নিত্য বাজে ;
প্রাণের বীণা নিয়ে যাবো
সেই অতলের সভামাঝে।

কাব্যে কথাচাতুর্য্য (Eloquence) একটা বড় সম্পদ। সেটা ভাবের স্বতঃস্ফূর্ত্ত ব্যঞ্জনার আর অলঙ্কারের ন্যায়সঙ্গত এবং সুবিন্যস্ত পরিণতির লক্ষণ। মিশ্রিত অলঙ্কারে ছোট গীতিকবিতার আঙ্গীকতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, আর তার ফলে রসহানি ঘটে। লেখনীর মুখে কল্পনা আর রঙীন ছবির অবিরল স্রোতকে প্রতিমুহূর্ত্তে সংযত করতে হয়। কলাজ্ঞানের এই সূত্রগুলির উদাহরণস্বরূপ এই গানটি উদ্ধৃত করলুম। কোথায় এবং কেমন সে রূপের সাগর তা কেউ জানে না, তাতে ডুব দেওয়া হয়ত কাল্পনিক জগতের ঘটনা, কিন্তু গানের শেষ লাইন পর্য্যন্ত সে ঘটনাটি চালিত হয় জাগতিক নিয়মবন্ধনের দ্বারাই, তা নইলে মরজগতের কবিপ্রাণ বিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ হয় না, তার চঞ্চল মন আশ্বাস মানে না। ডুব দেওয়ার এই ছবির ক্রম আর পরিণতি সারা কবিতাটির মধ্যে কোথাও ব্যাহত হয় না। ছবি দেখে আমাদের মনে পর পর যে আশা জাগে সে গুলি পূর্ণ হয়। রূপসাগরে ডুব দিলে সুধা ছাড়া আর কিসে তলিয়ে যেতে পারা যায়? আর তার তলায় কি মর্ম্মর প্রাসাদ, স্ফটিকের স্তম্ভ নেই? তার চারিদিকে কি জীবন মরণের ভীম পারাবারের গর্জ্জন আর আস্ফালন শুনতে পাই না? তার তোরণের সামনে মর্ম্মর সোপানে আছড়ে প'ড়ে সে ফেনোচ্ছ্বাস কি শান্ত হ'য়ে যায় না? কলরোলের মাঝখানে সে এক সুপ্তির স্বপ্নপুরী, চঞ্চল প্লাবনের মধ্যে নীরব শুভ্র প্রশান্তি। সেই সভায় গিয়ে—

চিরদিনের সুরটি বেঁধে
শেষ গানে তার কান্না কেঁদে
নীরব যিনি তাঁহার পায়ে
নীরব বীণা দিব ধরি। ৪৮)

ভাবের এই গতি, অনাড়ম্বর এবং স্বতঃস্ফূর্ত্ত সৌষ্ঠব, এই মোহন অনিবার্য্যতা সহজে উপলব্ধি করা যায়। এ সভায় শেষের গান গেয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই (৭৭)।

অনুশোচনা আর পশ্চাত্তাপমূলক গানগুলিও বড়ই সুন্দর। এগুলিতেও প্রকাশ ভঙ্গীর সাদৃশ্য লক্ষ্য করবার বিষয়। সবগুলিতেই প্রথমে বিস্ময়, বেশীর ভাগ নিদ্রাভঙ্গের পর; এবং পরে হতাশ হওয়া। সবগুলিতেই অবহেলা এবং অনবধানতাজনিত বিবেকের ভৎর্সনা। সবগুলিতেই কবির বীণা কোন অলৌকিক সুরে বেজে ওঠে; তার ঘরের বাতাস, তার রাত্রের স্বপ্ন কোন সুরভিতে ভ'রে যায়; ধূলিকণাতেও মূর্চ্ছনা লাগে, কিন্তু ঘুম ভাঙ্গে না। প্রতিবার হাতের বরণমালা হাতেই থেকে যায়। ৬৮ নং গানটিতে নাটকানুযায়ী পরিণতি আর দৃশ্যবর্ণনা রমণীয়। বর্ণনার মধ্যে দিয়ে একটি গল্প গ'ড়ে ওঠে, যার শেষের দিকের সমাধান প্রকৃতই নাটকের চমৎকৃতিপূর্ণ—

কতবার আমি ভেবেছিনু উঠি উঠি
আলস ত্যজিয়া পথে বাহিরাই ছুটি,
উঠিনু যখন তখন গিয়েছ চ'লে
দেখা বুঝি আর হ'ল না তোমার সাথে।
সুন্দর তুমি এসেছিলে আজ প্রাতে।

কল্পনার চাতুর্য্য এবং স্ফূর্ত্তির কি মনোহর উদাহরণ! কোন্ রাত্রে কবির ভাগ্যে এ আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটেছিল? তখন—

নিদ্রিত পুরী, পথিক ছিল না পথে,
একা চলি' গেলে তোমার সোনার রথে,
বারেক থামিয়া, মোর বাতায়ন পানে
চেয়েছিলে তব করুণ নয়নপাতে।

কত নীরব পুরী সে যা'র বাইরে ঠিক ভোরের পূর্ব্বক্ষণে নিথর রাজপথ প্রকম্পিত ক'রে একটি রথের চকিত ঝনঝনা শুনতে পাওয়া গেছলো? ক্ষণিকের জন্যে থেমে কত আশা

নিয়ে কে সে এক বার ব্যগ্রভাবে বাতায়নের পানে চেয়ে দেখলে এবং অমন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেই বা চ'লে গেল কেন ?

যাক্, অনেক নিষ্ফলতা, অনেক জেগে থাকার পর কোন এক কোজাগরী রাতে কবি তাঁর বাঞ্ছিতের দেখা পান। সে শুভ মুহূর্তের ইতিহাস জানা নেই, হয়ত সেটা কবিরই অগোচর কেননা তাঁর তখন ধ্যাননিরত আপন ভোলা অবস্থা—"একলা ব'সে আপন মনে গাইতেছিলাম গান", এমন সময়ে "তোমার কানে গেল সে সুর, এলে তুমি নেমে।" দেখা পেয়ে কবি বলেন—"আমারে যদি জাগালে আজি নাথ, ফিরো না তবে ফিরো না, কর করুণ আঁখিপাত" (৮৭)। এই প্রাপ্তির মুহূর্ত্ত গুলিকে কবি তাঁর সুরের আলোয়, কল্পনার রঙে অতিশয় উজ্জ্বল ক'রে রেখেছেন। নানা রূপে, নানা ভাবে তাঁর পরম প্রিয়তমাকে বরণ করেছেন। কোথাও ভক্তকে অতর্কিত অবস্থায় পেয়ে দেবতা খেলাচ্ছলে তাকে ছলনা করেন। কখন কে যেন "দরিদ্র ক্ষীণ মলিন বেশে সঙ্কোচেতে একটি কোণে" এসে লুকিয়ে থাকে, রাতে কিন্তু প্রবল হয়ে পশে দেবালয়ে আর "মলিন হাতে পূজার বলি হরণ করে" (৮১)। কখন আবার প্রাণে দেখা দিয়ে ডাক দিয়ে যায়, তার পর কোন্‌খানে লুকিয়ে থাকে তা কেউ জানে না, কিন্তু সেই হারিয়ে ফেলার হতাশার মধ্যে কোথা হ'তে আবার সাড়া দেয়" (১৩৬)। কবিকে তাই বিস্ময়বিহ্বল হ'য়ে স্বীকার করতে হয়—"তোমার অন্ত নাই গো অন্ত নাই, বারে বারে নূতন লীলা তাই।" অতএব এই জন্মের রাত্রি ভোর হবার পর নবজীবনের আলোয় গিয়ে যখন "আবার এ হাত ধরবে কাছে এসে, লাগবে প্রাণে নূতন ভাবের ঘোর" (১৩৪)। সে নূতন দেখা পরম দেখা, সব চাওয়া সব পাওয়ার সমাপ্তি। সেখানে উদ্বেগের ঝড় ঝঞ্ঝাবাত নেই, সেখানে আছে স্থির পরিপূর্ণ শান্তির স্নিগ্ধ উজ্জ্বল আলো আর চিরন্তন প্রেমের মলয় পরশ। সেই মহান প্রশান্ত নিস্তব্ধতায়—

> হঠাৎ খেলার শেষে আজ কি দেখি ছবি,
> স্তব্ধ আকাশ, নীরব শশী রবি,
> তোমার চরণপানে নয়ন করি নত
> ভুবন দাঁড়িয়ে আছে একান্ত।

কবির কল্পনার ঐশ্বর্য্যের এই সম্ভার শিল্পের মণিকোঠার সামগ্রী। ভাবের সংহত গতিবেগ এক শুভ মুহূর্ত্তে শিল্পীর তুলির অপেক্ষা করতে থাকে। কবি আর শিল্পীর সৃষ্টির সে এক পরম মুহূর্ত্ত; একটা দুর্লভ সামঞ্জস্যের মধ্য দিয়ে পূর্ণ তৃপ্তির সূচক।

নয়নামতীর চর

বন্দে আলী মিয়া

বরষার জল সরিয়া গিয়াছে জাগিয়া উঠেছে চর,
গাঙ শালিকেরা গর্ত্ত খুঁড়িয়া বাঁধিতেছে সবে ঘর।
গহিন নদীর দুই পার দিয়ে আঁখি যায় যত দূরে
আকাশের মেঘ অতিথি যেন গো তাহার আঙিনা জুড়ে।
মাছরাঙা পাখী এক মনে চেয়ে কঞ্চিতে আছে বসি'
ঝাড়িতেছে ডানা বন্যহংস—পালক যেতেছে খসি'।
তট হতে দূরে হাঁটু জলে নামি' এক পায়ে করি' ভর
মৎস্যের ধ্যানে বক দুটি চারি সাজিয়াছে ঋষিবর।
পাখনা মেলিয়া কচি রোদে শুয়ে উদাসী তিতির পাখী
বারে বারে দুটি ডানা ঝাপটিয়া ধূলাবালি লয় মাখি'।
বিরহিণী চখী চখারে পাইয়া কত কী যে কথা কয়,
গাঙচিল শুধু উড়িয়া বেড়ায় সকল পদ্মাময়।
ডুবানো না'য়ের গলুয়ের 'পরে শুয়ে শুয়ে কাঁচা রোদে
ধারে কচ্ছপ শিশু জলসাপ আলসে নয়ন মোদে।
পুরনো ঝাউ গাছে টিঁ টুভ পাখা বেঁধেছে পাতার বাসা,
বাবলার ডালে ঘুঘু-দম্পতি জানাইছে ভালোবাসা।
ভোর না হইতে ডাহুক ডাহুকী করিতেছে জলকেলি।
[illegible] ক্ষেতে খুঁজিছে শামুক পানিকো'র সারা বেলি।
কাঁচা বালুতটে চরণচিহ্ন রেখে গেছে খঞ্জনা,
পুচ্ছ নাচায় সুঁইচোর পাখী—চা'হ্ সুধু আন্‌মনা।
[illegible] খুঁজিতে শালিকের ঝাঁক করিতেছে কলরব,
লক্ষ হাজার বালিয়া হাঁসের দিন ভরা উৎসব

দুপুরের রোদে খাঁ খাঁ করে চর দূর গ্রামে মাথা কালী,
উত্তরে বায়ে শিশু মরু হতে উড়ে যায় সুধু বালি।
অশথের তলে জলিধান লাগি' চাষীরা বেঁধেছে কুঁড়ে,
কাঁচা যবশীষ আলোর ডাকেতে এসেচে সে মাটি ফুঁড়ে।
ছায়া আর রোদে ঝিকিমিকি জ্বলে হাজার উর্ম্মিদল,
কূলে কূলে তার আছাড়িয়া-পড়া দিনে রাতে কোলাহল।
দুপুরে যেদিন নেমেছে সন্ধ্যা মেঘেতে ঢেকেছে বেলা,
গাঁয়ের মেয়েরা ঘাটে জল নিতে আসিতে না করে হেলা।
কেহ আসে একা—দল বেঁধে কেহ—চলে তারা তাড়াতাড়ি,
পথে যেতে যেতে খুলে দিয়ে গরু তাড়াইয়া আনে বাড়ী।
গোহালের পাশে শুকানো যে ঘুঁটে ধামায় ভরি' তা লয়'
কঞ্চির বেড়া ধরিয়া বধূরা প্রিয়-পথ চেয়ে রয়।
দোকানীর বউ নদী পানে ধায় কোথা গেছে নেয়ে তার,
এমন বাদলে কোন্ হাটে তার বিকাইবে সম্ভার!
জাল বোনা ভুলি জেলের যুবতী বিরহ দিবস গণে,
কোথা ধরে মাছ জেলে যে তাহার এমন উতলা ক্ষণে।
কালো মেঘে ছায় পূর্ব্ব ঈশাণ জোরে জোরে বায়ু বয়,
বলাকার সারি শকুনের ঝাঁক উড়িছে আকাশময়।

আলোচনা

বাল্য বিবাহ

শ্রীমায়া দেবী

কিছুদিন হইতে দেখিতেছি শ্রীযুক্ত হরবিলাস সারদার বিল লইয়া একটা মহা আন্দোলন চলিয়াছে ; কাহারও মতে তাহা ভাল,—কাহারও মতে মন্দ। বাল্য বিবাহ ভাল কি মন্দ, তাহাতে উপকার হয় কি অপকার হয়, সে সব বিষয়ে আমি কোন কথাই বলিতেছি না, আমি শুধু তাঁহাদের প্রতিবাদ করিতেছি যাঁহারা বলিতেছেন ইহাতে ধর্ম্মের হানি হয়। তাঁহারা মনু হইতে শ্লোকের পর শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দিতেছেন, যুক্তি ও তর্কদ্বারা সপ্রমাণ করিতে চাহেন, ইহা ধর্ম্মের হানিকর। স্বীকার করিলাম ;—আমিও তাঁহাদের কয়েকটি প্রশ্ন করিতেছি, আশা করি উত্তর পাইব।

(১) কয়জন ব্রাহ্মণ সন্তান এখনও বাল্যে গুরুগৃহে ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন করিয়া পাঠাভ্যাস পূর্ব্বক যৌবনে গৃহী হন ?

(২) কয়জন ব্রাহ্মণ গৃহে যজ্ঞাগ্নি প্রজ্জলিত রাখেন ?

(৩) কয়জন ব্রাহ্মণ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় জীবন অতিবাহিত করেন ?

(৪) কে পঞ্চাশ বৎসর অতিক্রম করিলে বাণপ্রস্থ গ্রহণ করেন ?

(৫) কয়জন নির্লোভ, সত্যব্রত, বিদ্বান, ব্রহ্মবিদ্ ব্রাহ্মণ আছেন ?

(৬) ক্ষত্রিয় বা কায়স্থের মধ্যে কয়জন যুদ্ধ বিগ্রহাদিতে অংশ লয়েন ?

(৭) স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায়, দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় ? বলিবার মত শক্তি আজিও কয়জন ক্ষত্রিয়ের আছে ?

(৮) কয়জন ক্ষত্রিয় বিপন্নের রক্ষা, আর্ত্তের সাহায্য, নারীর সম্ভ্রম, এবং শিশু ও বৃদ্ধের প্রাণ রক্ষার্থে অগ্রসর হন ?

(৯) কয়জন বৈশ্য আজিও সর্ব্বতোভাবে বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন করেন ?

(১০) কয়জন গ্রাম-বৃদ্ধ জ্ঞানাবোধে পূজিত হন ?

আশাকরি মনুর পদ্ধতি ও ইহাদের আজি কালিকার জীবন যাত্রায় অনেক প্রভেদ হইয়াছে। আমার ধারণা ইহার সদুত্তর কেহই দিতে পারিবেন না।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, কায়স্থ, বৈশ্য ভারতে সমাজের শীর্ষস্থানীয় ; ইহাঁদের ভিতর হইতে সহস্র সহস্র ব্যক্তি সাগর পারে যাইতেছেন,—ইহাও ত এককালে ধর্ম্মের ক্ষতি জনক ছিল, তবে তাহা চলিল কি করিয়া ?

এ দিক ছাড়িয়া বাল্য বিবাহ ধরা যাক। এ ক্ষেত্রে জিজ্ঞাসা—যাঁহাদের আধুনিক সভ্যতার বাতাস গায়ে লাগিয়াছে, তাঁহারা সত্যই কি গৌরী দানের পক্ষপাতী ?

মুখে যিনি যাহাই বলুন, শিরোমণি, তর্কচূড়ামণি, শাস্ত্রী বা বাচস্পতি,—কেহই আজকাল স্বীয় কন্যাকে গৌরী দান করিয়া পরমার্থ লাভের বাসনা করেন না, বরং দেখা যায় কন্যা, একটু শিক্ষিতা ও বয়স্থা হয়, এবং ১০ বা ১২ বৎসরের অধিক বয়জ্যেষ্ঠের সহিত তাহার বিবাহ না হয় ইহাই প্রত্যেক পিতামাতা ইচ্ছা করেন। তদনুরূপ পাত্রও খুঁজিয়া থাকেন। অষ্টম বর্ষীয়া কন্যাকে চতুর্বিংশ বর্ষীয় যুবকের হস্তে সম্প্রদান করিবার কল্পনা ধর্ম্মপাগল হিন্দুও আজকাল করেন না।

সুতরাং দেখা যাইতেছে উচ্চবর্ণের ভিতর বাল্য বিবাহ স্বতঃই কমিয়া আসিতেছে। বাল্য বিবাহ এখনও অশিক্ষিত নিম্নশ্রেণীর ভিতরেই গণ্ডিবদ্ধ। তবে কি বুঝিতে হইবে হিন্দু ধর্ম্ম-সংরক্ষণ রূপ মহৎ কর্ত্তব্য, কেবল মাত্র হাড়ি, ডোম, কামার, কাহারের কর্ত্তব্য ? তাহারাই চতুর্দ্দশী কন্যার বিবাহ দিলে হিন্দুধর্ম্ম পতিত হইবে ?

বিবিধ সংগ্রহ

চলচ্চিত্রে ক্রাইষ্ট

দশ বৎসর পূর্ব্বে চলচ্চিত্রে খৃষ্ট মূর্ত্তি প্রদর্শন বিশেষ অপরাধের বিষয় বলিয়া পরিগণিত হইত। পাদ্রীগণের মতে উহা দ্বারা ঈশ্বরতনয়ের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করা হয়। কিন্তু বিগত দশ বৎসরের মধ্যে আর্টের দিক হইতে চলচ্চিত্রের এত উন্নতি সাধিত হইয়াছে যে পাদ্রীগণ এখন আর ঐ মত পোষণ করিতে পারেন না। এখন গির্জ্জায়

খ্রীষ্টের ভূমিকায় জঁা ডেল্ ভাল্

উপাসনার সময়ে চলচ্চিত্রে খৃষ্টচরিত প্রদর্শিত হয়। দশ বৎসর পূর্ব্বে ধর্ম্মবিষয়ক ফিল্ম যে আদৌ ছিল না তাহা নয়, তবে বাস্তবিক মনে ভক্তির উদ্রেক করিতে পারে এমন ফিল্মের প্রকৃতই অভাব ছিল।

বেন্‌হুর নামক ফিল্ম লণ্ডনে বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছিল। ইহার পূর্ব্বে এত বেশী দিন যাবৎ কোনও ফিল্ম লণ্ডনে প্রদর্শিত হয় নাই। বেন্‌হুরে যীশুর একখানি হাত মাত্র দেখান হইত।

কিং অব্ কিংস্ নামক ফিল্মেই সর্ব্বপ্রথম খৃষ্টের সম্পূর্ণ মূর্ত্তি প্রদর্শিত হয়। এই ফিল্মখানি প্রথমে গির্জ্জায় প্রদর্শনের জন্য প্রস্তুত হয় পরে যখন সর্ব্বসাধারণে প্রদর্শিত করাইবার আয়োজন হয় তখন ইহার বিরুদ্ধে নানাদিক হইতে নানা আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছিল। বিলাতের সংবাদপত্রগুলিও এই আন্দোলনের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। বিলাতের ফিল্ম সেন্সর এই ফিল্ম প্রদর্শনে অনুমতি দেন নাই, লণ্ডন কাউন্টি কাউন্সিলের অনুমতি লইয়া ইহা সাধারণে প্রদর্শিত হয়। কাউন্টি কাউন্সিল অনুমতি দিবার সময়ে কতকগুলি সর্ত্ত করাইয়া লইয়াছিলেন, যথা, এই ফিল্মের সহিত অপর কোনও ফিল্ম প্রদর্শিত হইবে না, প্রদর্শনের সময়ে দর্শকগণ ধূমপান করিতে পারিবে না ইত্যাদি।

এখন মনে হয় এই প্রকারের ফিল্ম যদি যথেষ্ট শ্রদ্ধার সহিত প্রদর্শিত হয় তবে পাদ্রীগণের দিক হইতে কোনও আপত্তি উঠিবে না।

কিং অব্ কিংসের মত এত বেশী দিন আর কোনও চিত্র প্রদর্শিত হয় নাই। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সহিত বায়োস্কোপ এমন ভাবে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। যে ধর্ম্মবিষয়ক ফিল্ম যত বেশী প্রদর্শিত হয় ততই মঙ্গল চলচ্চিত্রপ্রদর্শনের দ্বারা ধর্ম্ম ও নীতিবিষয়ক উপদেশ-দানে যথেষ্ট সাহায্য পাওয়া যাইতে পারে। আশা করা

যায়—ইংলণ্ডের ধর্ম্মযাজকগণ এই বিষয়ে আমেরিকার উদাহরণ গ্রহণ করিবেন। আমেরিকায় ইতিমধ্যেই নীতি ও ধর্ম্মপ্রচারকার্য্যে চলচ্চিত্রের দ্বারা প্রভূত উপকার পাওয়া গিয়াছে।

রিলিজিয়াস্ মোশন পিক্‌চার ফাউণ্ডেশন নামক এক সমবায় পাদ্রীগণের সাহায্যের জন্য কতকগুলি চিত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন। চিত্রগুলিতে বিশেষ করিয়া খৃষ্ট মূর্ত্তি নানাভাবে প্রতিফলিত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল। এই সমবায়টি তিন বৎসর পূর্ব্বে উলিয়ম হারমান নামক একজন মার্কিণ জনসুহৃদ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল খুব উচ্চশ্রেণীর অভিনেতা দ্বারা কতকগুলি অসাম্প্রদায়িক চিত্র প্রস্তুত করিবেন যাহাতে ধর্ম্মমন্দিরে উপাসনার সময় এই চিত্রগুলি উপাসকবৃন্দের মনে ভক্তি আনয়ন করিতে পারে।

খৃষ্টীয় উপাসকগণ উপাসনার সাহায্যকল্পে এই চিত্রগুলিকে কি ভাবে গ্রহণ করিবেন তাহা লইয়া এক আন্দোলনের উৎপত্তি হয়। কারণ খৃষ্টীয় পাদ্রীগণের মধ্যে অনেকেরই ধারণা যে চলচ্চিত্রের দ্বারা জনসমাজে নৈতিক অবনতি হইয়াছে এবং ইহা অনেক পরিবারে অনেক অশান্তি আনয়ন করিয়াছে। এখন কিন্তু তাঁহাদের আর সে মত নাই, এখন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই চলচ্চিত্রের সাহায্যে উপদেশ প্রদান করেন।
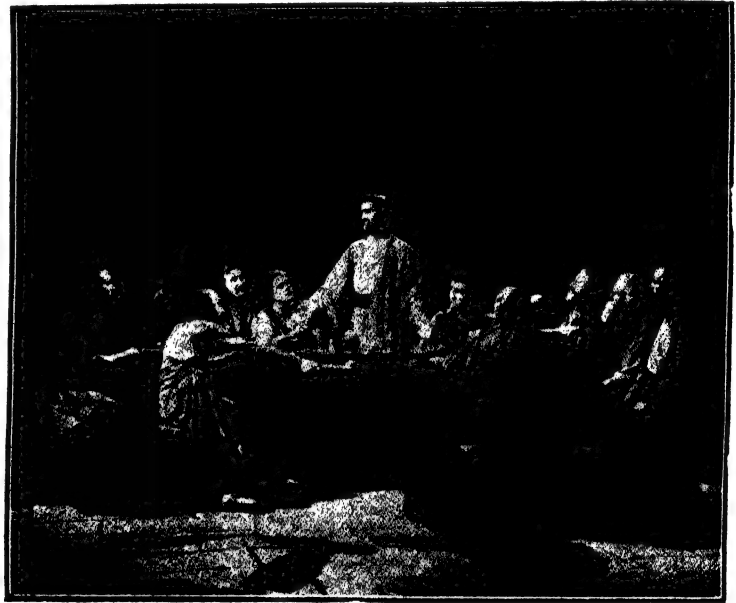
পুরাতন ধর্ম্মমন্দিরের জানালার বিচিত্র কাচ হইতেই ধর্ম্মবিষয়ক ফিল্ম পরিকল্পিত হয়। বহু শতাব্দী যাবৎ গির্জ্জার চিত্রিত জানালা ধর্ম্মমন্দিরের গৌরবের বিষয় বলিয়া পরিগণিত হইত। অবশ্য অনেকে মনে করেন ধর্ম্ম-মন্দির কোনও প্রকার চিত্র দ্বারা পরিশোভিত হওয়া উচিত নয় কিন্তু জানালার চিত্র গির্জ্জার শোভার জন্য অঙ্কিত হইত না পরন্তু য়ুরোপে মধ্যযুগে জনসাধারণের মধ্যে বাইবলের কাহিনী হৃদয়গ্রাহী করিয়া প্রচার করিবার উদ্দেশ্যেই চিত্রিত হইত। প্রাচ্য দার্শনিকগণ বলেন একখানি ভাল চিত্র দ্বারা দশ সহস্র বাক্যের কার্য্য হয়। রিলিজিয়াস মোশন পিকচার সমবায় দ্বাদশ শতাব্দীর গির্জ্জার জানালার কাচের চিত্রের অনুকরণে খৃষ্ট চরিতের ফিল্ম-গুলি প্রস্তুত করিয়াছেন।

শেষ ভোজ

এই সকল চিত্রে বাইবেলের কাহিনীগুলি সঠিক ভাবে নিরূপণ করিতে তাঁহাদের অনেক বাধা বিপত্তি অতিক্রম করিতে হইয়াছে। নানাপ্রকার লোকমতেরও অনুসরণ করিতে হইয়াছে। কারণ ক্রাইষ্টকে নানা লোকে নানাভাবে দেখিয়া থাকেন। রোমান ক্যাথলিকগণের মতে ক্রাইষ্ট পৃথিবীর দুঃখ, কষ্টে এত ব্যথিত ও মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন এবং মানবের নানাপ্রকার পাপাচারে এত ক্রোধান্বিত হইয়াছিলেন যে তিনি কখনও হাসেন নাই। আর এক সম্প্রদায়

শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ

যীশু ও মেরি মেগ্‌ডেলিন্

চারিখানি ফিল্ম প্রদর্শনের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে (১) ক্রাইষ্ট তাঁহার সমালোচকগণকে বিভ্রান্ত করিতেছেন। (২) অনাহূত অতিথি। (৩) আমাদের ঋণ হইতে মুক্ত কর। (৪) নব্য ধনী শাসক। এই ফিল্মগুলি হইতে কতকগুলি চিত্র এই সঙ্গে দেওয়া হইল। চিত্রগুলি দেখিলে বুঝিতে পারা যায় অভিনেতাগণ তাঁহাদের কার্য্যে কতটা সাফল্য লাভ করিয়াছেন। যাঁহারা সাধারণ বায়োস্কোপের চিত্রের সহিত পরিচিত তাঁহারা এই চিত্রগুলি দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন।

ক্রাইষ্টকে বলিষ্ঠ, পেশীবহুল, বলবান যোদ্ধার চক্ষে দেখেন। তাঁহারা মনে করেন বিজয়ী বীরের ন্যায় তিনি সকল বিপদ আপদের সম্মুখীন হইতেন। নিজের মনের বিষয়ে তিনি সর্ব্বদা উদাসীন থাকিতেন এবং মানবের দুঃখ দেখিয়া যেমন ব্যথিত হইতেন তেমনই তাহাদের আনন্দে তিনি আনন্দিত হইয়া উঠিতেন। এই প্রকার নানা সম্প্রদায়ের লোকের নানাপ্রকারের মনোভাবের সামঞ্জস্য করিয়া ফিল্মগুলি প্রস্তুত করিতে হইয়াছে। কোনও সম্প্রদায়ের মনে যাহাতে কোনও প্রকার আঘাত না লাগিতে পারে সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হইয়াছে।

ঐতিহাসিক তথ্যনিরূপণের জন্যও অনেক পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। ইস্রায়েলের জাতি ও পুরাতন যিরূশালেমের অধিবাসীবৃন্দ তাহাদের দৈনন্দিন জীবনের সম্পূর্ণ ভাবে কোনও প্রকার ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া যায় নাই। মেজর ডলি ও তাঁহার সহকর্ম্মিগণকে সকল বিষয়ে নানাভাবে অনুসন্ধান করিয়া সেই সময়ে প্রচলিত রীতি নীতি, পোষাক পরিচ্ছদ ও সাম্প্রদায়িক আচার ব্যবহারের বিষয় বহু গবেষণা করিতে হইয়াছে। চিত্রগুলিকে যতদূর সম্ভব সঠিক ভাবে প্রতিফলিত করিবার চেষ্টা হইয়াছে।

যীশু খ্রীষ্ট

সাধারণত বায়োস্কোপে পোষাক পরিচ্ছদ ও আসবাব ইত্যাদির দিকে বেশী মনোযোগ দেওয়া হয় কিন্তু

ল্যাজারাস্-এর পুনর্জীবন

তাঁহাদের সমস্ত মন দিয়াই অভিনয় করিতেন। এই সকল কারণে অভিনয়গুলি মনোজ্ঞ হইয়া উঠিতে পারিত।

এই ফিল্মগুলি আমেরিকায় প্রায় তিনশত গির্জ্জায় উপাসনার সময়ে ব্যবহৃত হয়। অনেক রবিবাসরীয় বিদ্যালয়ে বালক বালিকাদের নিকটও প্রদর্শিত হয়।

যদি এই ভাবে চলচ্চিত্রের উন্নতি সাধিত হয়, ত আশা করা যাইতে পারে যে এমন সময় আসিবে যখন সমস্ত ধর্ম্ম-মন্দিরে উপাসনার সময়ে চলচ্চিত্রের সাহায্য অত্যাবশ্যকীয় বলিয়া পরিগণিত হইবে

শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ

মেজর ডলি সে সব দিকে খুব বেশী মনোনিবেশ না করিয়া বাইবলের গল্পটি যাহাতে হৃদয়গ্রাহী করিয়া অভিনীত হয় সেই দিকেই তিনি তাঁহার সমস্ত উদ্যম ও চেষ্টা নিয়োজিত করিয়াছেন।

চিত্রগুলি প্রস্তুত করিবার সময়ে তিনি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্ম্মযাজকগণকে নিমন্ত্রিত করিয়া চিত্রগুলি প্রদশন করিতেন এবং তাঁহাদের উপদেশ যত্নের সহিত পালন করিতেন। এই ভাবে চিত্র-গুলিকে তিনি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া তুলিয়াছেন।

"কিং অব্ কিংস্"-নাটকে যীশুখ্রীষ্টের-ভূমিকায় এইচ্, বি, ওয়ারনার

অভিনয়ের সময়ে যখন বায়োস্কোপের সাহায্যে ফটো তোলা হইত তখন অনেক লোক আসিয়া ভিড় করিত—সেই ভিড়ের মধ্যে দেখা গিয়াছে—অনেকেই বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত দাঁড়াইয়া দেখিত কেহ কেহ বা অশ্রুসম্বরণ করিতে পারিত না।

আর একটি সুবিধা হইয়াছিল অভিনেতাগণের মধ্যে তিনশত থিয়োলজিক্যাল কলেজের ছাত্র ছিলেন—তাঁহারা

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

সাকারা মেম্‌ফিস্ নগরীর সমাধি

গত পাঁচ বৎসর যাবৎ মিশর গভর্ণমেণ্ট কায়রো সহরের বারো মাইল দক্ষিণস্থ সাকারা সমাধির খননকার্য্যে নিরত আছেন। কয়েকটা পিরামিড্ ও নানা যুগের বহু পারিবারিক সমাধি মিলিয়াই সাকারার সম্পদ। এই সকল সমাধির মধ্যে দুইটি মাত্র অপেক্ষাকৃত আধুনিক। থীব্‌স্ ভিন্ন এত বড় সমাধি মিশরে আর নাই। সাকারার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ

পঃ উঃ দঃ পূঃ

ক—সিঁড়ি-ওয়ালা পিরামিড্।

খ, খ—রাজপরিবারের সমাধি, ছোট পিরামিড্।

গ—উৎসব-গৃহ।

ঘ—প্রবেশ-দ্বারের স্তম্ভশ্রেণী।

ঙ—অচল-দ্বারবিশিষ্ট ছোট অট্টালিকা।

আকর্ষণ—রাজা জোসারের (Zoser) সিঁড়ি-ওয়ালা পিরামিড্ (Step-Pyramid) এবং পবিত্র ওসিরিস (Osiris) দেবতার প্রতীক বৃষভের সমাধি (Apis Bulls)। কয়েক বৎসরের বিপুল চেষ্টার ফলে বিগত যুদ্ধের পূর্ব্বে আরও কয়েকটা অট্টালিকার অস্তিত্বের আভাস, নানা যুগের কতকগুলি স্থাপত্যের অংশ ও প্রত্নতাত্ত্বিক কৌতূহলপূর্ণ কয়েকটা ছোট ছোট জিনিস আবিষ্কৃত হইয়াছিল।

মেম্‌ফিস্ যে প্রাচীন মিশরের সর্ব্বপ্রধান নগরী ছিল—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সকল দেশেই বড় নগরীর চতুঃপার্শ্বস্থ স্থান ক্রমে ক্রমে নগরীর অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে, ক্রমে ধনে জনে ঐশ্বর্য্যে এত সমুন্নত হয় যে, পূর্ব্ব-নগরীর প্রাধান্য বহুলাংশে কমিয়া আসে—এ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। তেমনি মিশরের রাজধানীও মেম্‌ফিস্ হইতে সরিয়া প্রথমে ফস্‌টাটে ও পরে কায়রোতে আসিয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে মেম্‌ফিসের পূর্ব্বগৌরব ও সমৃদ্ধির কথা লোকের মন হইতে মুছিয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান খননের ফলে এমন বহু প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে—যাহাতে অনায়াসেই বুঝা যায় সাকারাতে পূর্ব্বে সমৃদ্ধিশালী নগরীর মত একটা কিছু ছিল। খুব সম্ভবত "মার্‌পেবা"—নামক প্রথম রাজবংশই ইহার স্থাপয়িতা। খৃষ্ট-পূর্ব্ব ২৮০০ অব্দে ইহা মিশরের রাজধানী-রূপে পরিণত হয়। প্রায় ৫০০ বৎসর ধরিয়া মেম্‌ফিস্ তাহার এই প্রতিষ্ঠা অব্যাহত রাখিয়াছিল। পরে তাহার অবস্থা হীন হইয়া পড়িলেও থীব্‌স্ ভিন্ন অন্য কোন নগরীই তাহার অপেক্ষা অধিকতর উন্নত হয় নাই। শুধু যে রাষ্ট্রীয় কারণেই মেম্‌ফিসের এত প্রতিপত্তি ছিল তাহা নহে; আলেক্‌জেণ্ড্রিয়ার অভ্যুদয়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইহা উত্তর আফ্রিকার একমাত্র প্রধান বাণিজ্যস্থান ছিল।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে ফারাও জোসারের পিরামিড্ই (সিঁড়ি-ওয়ালা পিরামিড্) সাকারার শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ। মিশরের প্রাচীনতম রাজগণের মস্তাবা সমাধাগুলির অপেক্ষা বহু অংশে বৃহৎ এই প্রকার পিরামিড্‌জাতীয় সমাধি জোসারের কবরের উপরই সর্ব্বপ্রথম নির্ম্মিত হয়। মাত্র

ধাপে এই সমাধি মন্দির ২০০ ফিট পর্য্যন্ত উচ্চে উঠিয়াছে। ইহা হইতে এক একটি ধাপের বিশালতা সম্বন্ধে আন্দাজ করা যায়।

সিঁড়ি-পিরামিডের উত্তর-পূর্ব্ব কোণে আরও দুইটি ছোট ছোট পিরামিড্ পাওয়া গিয়াছে। এগুলি নিশ্চয়ই রাজ-পরিবারস্থ লোকদের সমাধি। এই ছোট পিরামিড্ দুইটির উত্তর দিকের দেয়াল ঘেঁসিয়া দুইটি ভজনালয়ের অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে। উন্মুক্ত আঙ্গিনা ও পিরামিড্-ঘেঁসা দেয়ালের গায়ে একটা কুলুঙ্গি ভিন্ন এই ভজনালয়ের আর কোন সাজসজ্জা নাই। তবে এই সকলের গঠনপ্রণালীতে বেশ একটু বিশেষত্ব আছে। কেন না দেয়ালের গায়ে যে রাজবংশের আমলে মিশরে যে সব স্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছে, সেগুলি মসৃণ। কিন্তু এই ভজনালয়ের স্তম্ভগুলি 'পল তোলা' (শির-বিশিষ্ট)। শীর্ষদেশে, আবার স্তম্ভের গা বাহিয়া দুইটি বৃক্ষপত্রাকৃতি পদার্থ নামিয়া আসিয়াছে। ইহা অত্যন্ত বিস্ময়ের বিষয়। কেন না, প্রত্নতাত্ত্বিকেরা নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, এইরূপ পল-তোলা স্তম্ভ বহু বহু কাল পরে বেনিহাসান্ এবং আশুয়ান-এর সমাধিতে প্রথম নির্ম্মিত হয়। তাহা হইলে বেনিহাসানের হাজার বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত সাকারার ভজনালয়ের ইহার অস্তিত্ব পরম বিস্ময়ের বস্তু নহে কি? বিশেষত এইরূপ সুদৃঢ় স্তম্ভ অদ্যাবধি মিশরের আর কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই।
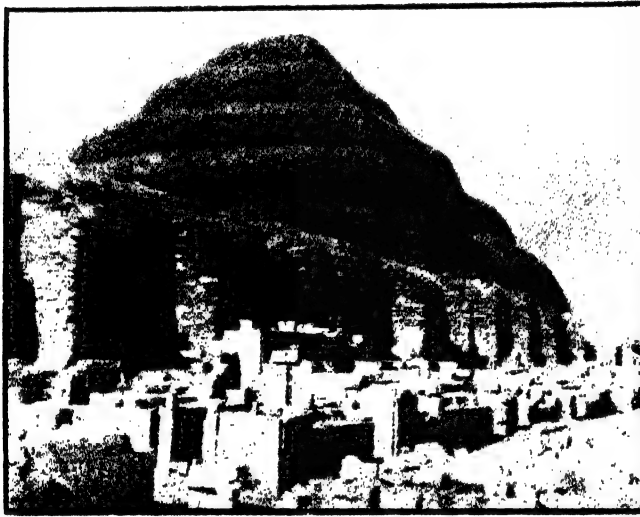
সিঁড়িওয়ালা পিরামিড্

স্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছে, তেমন স্তম্ভ এই যুগে আর কোথাও দেখা যায় না। কোনওরূপ অবলম্বন ভিন্নও যে স্তম্ভ দৃঢ় নির্ব্বিঘ্ন হইতে পারে—সেই যুগে সেই ধারণা লোকের ছিল না। কিন্তু সাকারার ভজনালয়ের এই স্তম্ভগুলি দেখিয়া মনে হয় উহার স্থপতিরা এই বিষয়ে একেবারেই অজ্ঞ ছিল না। রীতিমতভাবে স্বাবলম্বী স্তম্ভনির্ম্মাণ (মিশরের পঞ্চম রাজবংশের রাজত্বসময়ে প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়) প্রবর্ত্তিত হইবার প্রায় ২০০ বৎসর পূর্ব্বেও মেম্ফিসে ইহার অস্তিত্বের নিদর্শন প্রত্নতত্ত্বের দিক হইতে বেশ ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। পঞ্চম

প্রধান পিরামিডের দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে বিশাল একটা আঙ্গিনা আবিষ্কৃত হইয়াছে। পিরামিডের কাছাকাছি এই আঙ্গিনার একদিকে পর পর অনেকগুলি ভজনালয় সজ্জিত আছে। প্রত্যেকটি ভজনালয়ের ভিতর সমান্তরালভাবে দুইটি করিয়া প্রকোষ্ঠ। এই ভজনালয়গুলির সঠিক ইতিহাস এখনও উদ্ধার করিতে পারা যায় নাই। তবে অনেকে আন্দাজ করেন যে, মিশরের অতি প্রাচীন যুগে অনুষ্ঠিত "হেব্‌সেড্" উৎসরের সঙ্গে ইহার নিশ্চয়ই কিছু সম্বন্ধ আছে। মিশরীয় রাজগণের সিংহাসন-আরোহণের ত্রিংশবার্ষিক

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

উৎসবের নাম ছিল "হেব্‌সেড্‌ উৎসব। এই কথা মনে করিয়াই খননকারীরা এই ভজনালয়শ্রেণীর নাম দিয়াছে—"উৎসবগৃহ"। এই ভজনালয়গুলির পশ্চাতের দেয়ালেও পূর্ব্ববর্ণিতরূপ 'পল্‌-তোলা' পত্রবিশিষ্ট স্তম্ভ-সারি দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এই স্তম্ভগুলির শীর্ষস্থ পত্রের মধ্যে আবার নূতনতর কারুকার্য্য আছে। পত্রদ্বয়ের মধ্যস্থলে ছিদ্র করিয়া তাহার ভিতর দিয়া একটা তাম্রনির্ম্মিত চোঙ্‌ বা নল সম্মুখে স্তম্ভশ্রেণীর পশ্চাতস্থ ছাদের সঙ্গে লাগানো হইয়াছে। সম্ভবত ছাদের জলনিষ্কাষণের জন্যই এই ব্যবস্থা হইয়াছিল। কেহ কেহ আবার বলেন ভজনালয়ে হস্তপদাদি প্রক্ষালনের জলসরবরাহের জন্যেই এই নল লাগানো হয়।

এই সকলের অপেক্ষাও বেশি কৌতূহলোদ্দীপক ভজনালয়ের অভ্যন্তরস্থ অচল চিরস্থবির দ্বারসমূহ। এই দরজাগুলি অখণ্ডপ্রস্তরনির্ম্মিত। কিন্তু এইগুলিকে উন্মুক্ত বা বন্ধ করিবার উপায় নাই, একেবারে চিরতরে গ্রথিত। এই দ্বারের প্রস্তরগুলি এমন ভাবে কুঁদিয়া তোলা হইয়াছে যে, দেখিলে মনে হয় যেন উহা কাষ্ঠনির্ম্মিত। প্রস্তরগাত্রে খোদিত এইরূপ কাষ্ঠ-ভ্রমোৎপাদক কারুকার্য্যই এই অট্টালিকাগুলির প্রধান বিশেষত্ব।

"উৎসবগৃহের" পশ্চিমে আর একটি ছোট অট্টালিকা আছে। ইহাতে প্রস্তরনির্ম্মিত অচল দ্বার ভিন্ন আর কোনও বৈচিত্র্য খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই।

সাকারায় ব্যবহৃত প্রস্তরগুলির একটা বেশ লক্ষ্য করিবার মত বিশেষত্ব আছে। এগুলি সাধারণ প্রস্তর নহে। মেম্‌ফিস্‌ হইতে কয়েক মাইল নিম্নে 'নীল' নদের পূর্ব্ব তীরে টুরা নামক স্থানে "চূর্ণ প্রস্তরের" (Lime Stone) খনি আছে। মিশরের ধূম্রবিহীন আকাশের নির্ম্মল আলোতে এই অপূর্ব্ব প্রস্তরভবনগুলি যে কি মনোরম দেখাইত তাহা সহজেই অনুমেয়। বিশেষত প্রস্তর কাটিয়া টুরা হইতে সাকারায় আনিতে এবং এই সুবিশাল অট্টালিকাগুলি নির্ম্মাণ করিতে যে কি পরিমাণ শ্রম ও অর্থব্যয় হইয়াছে, তাহা ভাবিতে বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া যাইতে হয়।

বিশেষজ্ঞেরা স্থির করিয়াছেন, প্রাচীন সুমেরিয়ান্‌ স্থাপত্যশিল্পের সঙ্গে মিশরের এই মন্দির-শিল্পের সম্বন্ধ আছে। এই সময়ে অট্টালিকানির্ম্মাণে ইষ্টকের সঙ্গে কাষ্ঠ, কাঞ্চি প্রভৃতির ব্যবহার প্রচলিত ছিল। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে সাকারায় প্রস্তরভবনগুলিতে কাষ্ঠ কারুশিল্পের অনুকরণ-চিহ্ন যথেষ্ট পরিমাণে বর্ত্তমান। জোসারের পূর্ব্বে আর কখনও প্রস্তর-ভবন নির্ম্মাণের কথা শুনা যায় নাই। ইহাতে অনুমান হয় যে, প্রস্তর-ভবন-নির্ম্মাণ-শিল্প মিশরে একেবারেই অতি উন্নত অবস্থায় উপনীত হইয়াছিল।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

প্রসঙ্গ কথা

আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের জন্মদিনোৎসব

কলিকাতা আপার সার্কুলার রোডে বসু-বিজ্ঞানমন্দিরে গত ১লা ডিসেম্বর আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের সপ্ততিতম জন্মদিনোৎসব অনুষ্ঠিত হয়েচে। যে-সকল মহৎ ব্যক্তি নিজেদের জ্ঞান অথবা প্রতিভার সহায়তায় জগতের কল্যাণ-সাধন করেছেন তাঁদের জন্মকাল জগতের পক্ষে শুভ-ক্ষণ, অতএব সর্ব্বতোভাবে স্মরণীয় এবং বরণীয়। প্রতি বৎসর তারিখ অথবা তিথি হিসাবে একদিন সেই শুভদিন উপস্থিত হয় এবং আয়ুষ্কালের বৎসর-সংখ্যা একটি সংখ্যায় বাড়িয়ে দিয়ে চ'লে যায়। সেই শুভ-দিবসে উৎসবের অনুষ্ঠান ক'রে যাঁরা কোনো মহৎ ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন তাঁদের কারবার সেদিন শুধু দেওয়ারই নয়, পাওয়ারও। মহত্ত্বকে স্বীকার করতে হ'লে মহত্ত্বের সান্নিধ্য অনিবার্য্য। গুণীর কীর্ত্তন গুণের কীর্ত্তন ভিন্ন আর কিছুই নয়।

আচার্য্য শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু
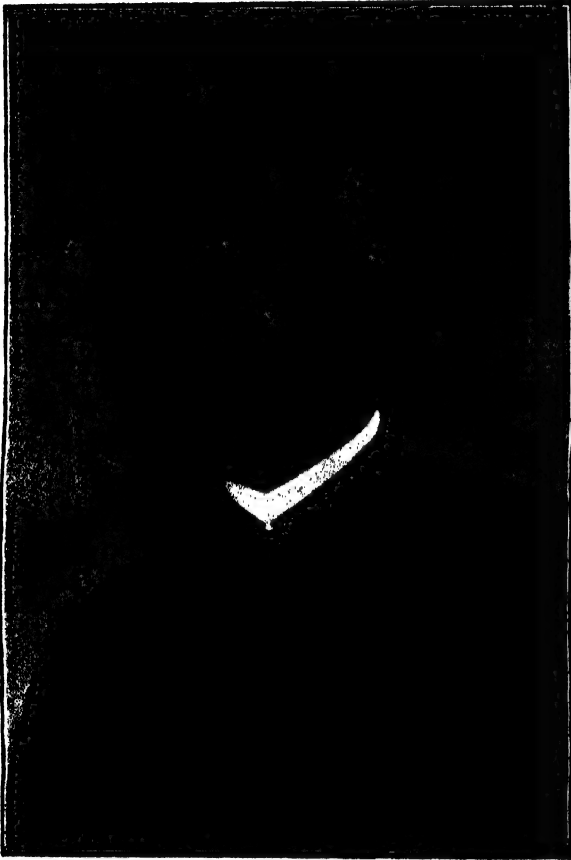
অনন্যসাধারণ প্রতিভাবলে জগদীশচন্দ্র যে খ্যাতি অর্জ্জন করেছেন তার প্রসার কেবল মাত্র ভারতবর্ষের চতুঃসীমার মধ্যেই আবদ্ধ নয়, সমস্ত পৃথিবীময় তার পরিব্যাপ্তি, বিদেশের দুষ্প্রবেশ যশোমন্দিরে সে খ্যাতি তাঁর জন্য উচ্চাসন সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়েচে। তাই সেদিন তাঁর জন্মোৎসব উপলক্ষে পৃথিবীর নানা প্রদেশের বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং সমিতির পক্ষ থেকে অভিনন্দন-লিপির অভাব হয় নি।

ইংরাজি ভাষায় একটি প্রবচন আছে,—A black hen can lay a white egg। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র তাঁর সুদীর্ঘ সাধনা এবং সুকঠোর সংগ্রামের সফলতায় এই সরল সত্যের নিগূঢ় মর্ম্মটুকু অনেককে উপলব্ধি করাতে সক্ষম হয়েছেন। যে সত্য জগদীশচন্দ্র আবিষ্কার করেছেন তার নূতনত্বের এবং অপূর্ব্বত্বের প্রভাবে অনেককে স্বীকার করতেই হয়েচে যে বিশ্ব-জ্ঞান-ভাণ্ডারে ভারতবর্ষের দান করবার কিছু থাকতে পারে।

জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কারের অভিনবত্বের মূল কারণ তাঁর অনুশীলন প্রক্রিয়ার ধারা— যা একান্তই প্রাচ্য প্রথানুগত। চিত্তকে অনুসরণ করে; চক্ষু উন্মীলিত ক'রে তিনি যা দেখেন তার চেয়ে অনেক বেশি দেখেন চক্ষু নিমীলিত

ক'রে ; তাই তিনি দেখে ভাবার চেয়ে ভেবে দেখেন বেশি।

আমরা একান্তচিত্তে আচার্য্য বসু মহাশয়ের সুদীর্ঘ জীবন কামনা করি। এতদুপলক্ষে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বন্ধুকৃত্যের অবসরে সমস্ত দেশবাসীর অন্তরের যে ছন্দোবদ্ধ নিবেদন ব্যক্ত করেছেন আমরা নীচে উদ্ধৃত ক'রে দিলাম।

বন্ধু

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

যেদিন ধরণী ছিল ব্যথাহীন বাণীহীন মরু
প্রাণের আনন্দ নিয়ে, শঙ্কা নিয়ে, দুঃখ নিয়ে, তরু
দেখা দিল দারুণ নির্জ্জনে। কত যুগ যুগান্তরে
কান পেতে ছিল স্তব্ধ মানুষের পদশব্দতরে
নিবিড় গহনতলে। যবে এল মানব অতিথি,
দিল তারে ফুলফল, বিস্তারিয়া দিল ছায়াবীথি॥

প্রাণের আদিম ভাষা গূঢ় ছিল তাহার অন্তরে,
সম্পূর্ণ হয়নি ব্যক্ত আন্দোলনে, ইঙ্গিতে, মর্ম্মরে!
তার দিন-রজনীর জীবযাত্রা বিশ্বধরাতলে
চলেছিল নানা পথে, শব্দহীন নিত্য কোলাহলে
সীমাহীন ভবিষ্যতে ; আলোকের আঘাতে তনুতে
প্রতিদিন উঠিয়াছে চঞ্চলিত অণুতে অণুতে
স্পন্দবেগে নিঃশব্দ ঝঙ্কার-গীতি, নীরব স্তবনে
সূর্য্যের বন্দনাগান গাহিয়াছে প্রভাত পবনে॥

প্রাণের প্রথম বাণী এই মতো জাগে চারিভিতে
তৃণে তৃণে বনে বনে, তবু তাহা রয়েছে নিভৃতে,
কাছে থেকে শুনি নাই।
হে তপস্বী, তুমি একমনা,
নিঃশব্দেরে বাক্য দিলে ; অরণ্যের অন্তরবেদনা
শুনেছ একান্তে বসি' ; মূক জীবনের যে ক্রন্দন
ধরণীর মাতৃবক্ষে নিরন্তর জাগাল স্পন্দন
অঙ্কুরে অঙ্কুরে উঠি, প্রসারিয়া শত ব্যগ্র শাখা,
পত্রে পত্রে চঞ্চলিয়া, শিকড়ে শিকড়ে আঁকাবাঁকা
জনম-মরণ-দ্বন্দ্বে, তাহার রহস্য তব কাছে
বিচিত্র অক্ষররূপে সহসা প্রকাশ লভিয়াছে॥

প্রাণের আগ্রহবার্ত্তা নির্ব্বাকের অন্তঃপুর হ'তে,
অন্ধকার পার করি' আনি' দিল দৃষ্টির আলোতে,
তোমার প্রতিভা-দীপ্ত চিত্ত মাঝে কহে আজি কথা
তরুর মর্ম্মের সাথে মানবমর্ম্মের আত্মীয়তা,
প্রাচীন আদিমতম সম্বন্ধের দেয় পরিচয়।
হে সাধকশ্রেষ্ঠ, তব দুঃসাধ্য সাধন লভে জয় ;
সতর্ক দেবতা যেথা গুপ্তবাণী রেখেছেন ঢাকি'
সেথা তুমি দীপ্ত হস্তে অন্ধকারে পশিলে একাকী,
জাগ্রত করিলে তারে। দেবতা আপন পরাভবে
যেদিন প্রসন্ন হন, সেদিন উদার জয়রবে
ধ্বনিত অমরাবতী আনন্দে রচিয়া দেয় বেদী
বীর বিজয়ীর তরে, যশের পতাকা অভ্রভেদী
মর্ত্ত্যের চূড়ায় উড়ে।

মনে আছে একদা যেদিন
আসন প্রচ্ছন্ন তব, অশ্রদ্ধার অন্ধকারে লীন,
ঈর্ষা-কণ্টকিত পথে চলেছিলে ব্যথিত চরণে,
ক্ষুদ্র শত্রুতার সাথে প্রতিক্ষণে অকারণ রণে
হয়েছ পীড়িত, শ্রান্ত। সে দুঃখই তোমার পাথেয়
সে অগ্নি জ্বেলেছে যাত্রাদীপ, অবজ্ঞা দিয়েছে শ্রেয়,
পেয়েছ সম্বল তব আপনার গভীর অন্তরে।
তোমার খ্যাতির শঙ্খ আজি বাজে দিকে দিগন্তরে
সমুদ্রের একূলে ওকূলে ; আপন দীপ্তিতে আজি
বন্ধু, তুমি দীপ্যমান ; উচ্ছ্বসিয়া উঠিয়াছে বাজি'
বিপুল কীর্ত্তির মন্ত্র তোমার আপন কর্ম্মমাঝে।
জ্যোতিষ্কসভার তলে যেথা তব আসন বিরাজে,
সহস্র প্রদীপ জ্বলে সেথা আজি দীপালি-উৎসবে।
আমারো একটি দীপ তারি সাথে মিলাইনু যবে

চেয়ে দেখো তার পানে, এ দীপ বন্ধুর হাতে জ্বালা ;
তোমার তপস্যা-ক্ষেত্র ছিল যবে নিভৃত নিরালা
বাধায় বেষ্টিত রুদ্ধ, সেদিন সংশয়-সন্ধ্যাকালে
কবি-হাতে বরমাল্য যে বন্ধু পরায়েছিল ভালে ;
অপেক্ষা করেনি সে তো জনতার সমর্থন তরে ;
দুর্দ্দিনে জ্বেলেছে দীপ রিক্ত তব অর্ঘ্যথালি পরে।
আজি সহস্রের সাথে ঘোষিল সে, ধন্য ধন্য তুমি,
ধন্য তব বন্ধুজন, ধন্য তব পুণ্য জন্মভূমি ॥

কংগ্রেস

নেহেরু কমিটির মন্তব্য উপলক্ষ ক'রে এ বৎসরে কলিকাতা কংগ্রেসে একটি গুরুতর সঙ্কট উপস্থিত হয়েচে। ভারতবর্ষে যদি স্বরাজ অথবা স্বরাজের সমতুল্য কিছু স্থাপিত হয় তা হ'লে বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের, প্রধানত হিন্দু মুসলমানের, স্বার্থ এবং কল্যাণের সামঞ্জস্য সাধন ক'রে সেই রাজ্য পরিচালনার বিধি-প্রণালী কিরূপ হ'তে পারে তা নিয়ে একটা কথা ওঠে, এবং সেই রাজ্য গঠন এবং পরিচালন প্রণালীর একটা খসড়া প্রস্তুত করবার ভার পড়ে পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু প্রমুখ কয়েকজন রাজনীতিক নেতার উপর। তদনুযায়ী নেহেরু কমিটির রিপোর্ট প্রস্তুত এবং প্রকাশিত হয়।

* * *

নেহেরু কমিটির মন্তব্য প্রকাশিত হওয়ার পর তা নিয়ে দেশব্যাপী আন্দোলন উপস্থিত হয়, এবং মোটের উপর বহু ব্যক্তি এবং সমিতি কর্ত্তৃক তা অনুমোদিত এবং প্রশংসিত হয়। এ কিছু কাল পূর্ব্বের কথা ;—বর্ত্তমান কংগ্রেস অধিবেশনে কংগ্রেস কর্ত্তৃক নেহেরু কমিটির মন্তব্য স্বীকৃত এবং গৃহীত হবে কি না এই নিয়ে কথাটা পুনরায় প্রবল ভাবে উঠেছে, এবং তদ্বিষয়ে নেতাদের মধ্যে বিষম মত ভেদ দেখা দিয়েছে।

* * *

নেহেরু রিপোর্টের বিরুদ্ধে প্রতিকূল নেতাদের প্রতিবাদ গুলি আলোচনা ক'রে দেখ্‌লে দেখা যায় আপত্তি প্রধানত দ্বিবিধ প্রথমত—নেহেরু রিপোর্ট সুকল্পিত এবং সুগঠিত হ'লেও তার ভিত্তি যখন ভারতবর্ষের পক্ষে মাত্র ঔপনিবেশিক অবস্থা (Dominion Status), পূর্ণ স্বাধীনতার অবস্থা নয়,—অর্থাৎ বৃটিশ রাজ্যের সঙ্গে অষ্ট্রেলিয়ার যে সম্পর্ক তাই, জাপানের সঙ্গে যে সম্পর্ক তা নয়, অথবা তা মাত্রাজ কংগ্রেসে সঙ্কল্পিত পূর্ণ স্বাধীনতা নীতির (পলিসির) পরিপন্থী, সুতরাং অগ্রাহ্য। দ্বিতীয় আপত্তি—নেহেরু রিপোর্ট পূর্ণ স্বাধীনতা নীতির পরিপন্থীই শুধু নয়, বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক অসমতার মধ্যে সাম্য বিধান ক'রে তা সর্ব্বজনোপযোগী হ'তে পারে নি।

এই দুরকমের আপত্তি থেকে উদ্ভূত হয়েচে ভারতবর্ষে স্বরাজ্যনীতি সম্পর্কে একটি সমস্যা, যথা,—ভারতবর্ষ সচেষ্ট হবে ইংরাজ বর্জ্জিত পূর্ণ স্বাধীনতার জন্যে, না, বৃটিশরাষ্ট্র সংশ্লিষ্ট ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসনের জন্যে। এইটে হয়েচে প্রথম কথা, এর পরের কথা হচ্ছে নেহেরু রিপোর্ট যে ভাবে রচিত হয়েচে তা সর্ব্বজনোপযুক্ত হয়েচে কি না ;—এ কথা বিচারের জন্যে আপাতত তেমন তাগিদ নেই।

* * *

এই সম্পর্কে স্বাধীনতা জিনিষটা যে কি বস্তু তা নিয়ে অনেক সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ হয়ে গিয়েছে। মোটের উপর দাঁড়িয়েছে ভারতবর্ষীয়ের বর্ত্তমান অবস্থা—অধীনতা ; ডোমিনিয়ন ষ্টাটসের অবস্থা—অনধীনতা ; এবং পূর্ণ স্বাধীনতার অবস্থা—স্বাধীনতা। নেহেরু প্রস্তাবের যাঁরা সমর্থক, যথা, মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, ডাঃ আনসারি, স্যার আলি ইমাম, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্ত প্রভৃতি, তাঁরা বলেন ডোমিনিয়ন্ ষ্টাটস্ পূর্ণ স্বাধীনতা না হ'লেও পূর্ণস্বাধীনতার পরিপন্থী ত নয়ই, বরং তদভিমুখে অগ্রগতি। ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা অগ্রাহ্য না করলে ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটসের অবস্থা সসম্মানে পাওয়া গেলে তা সর্ব্বথা গ্রহণীয়—এবং ভবিষ্যতে সেটা যদি অপরাপর উপনিবেশের সঙ্গে সমভাবে চলে তা হ'লে বর্জ্জনীয়ও নয়। অপর দল, যথা, মৌলনা মহম্মদ

আলি, পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু, শ্রীযুক্ত সুভাষ চন্দ্র বসু প্রভৃতি বলেন, ইংরাজের সহিত কোনো রকম সম্পর্কিত অবস্থাই স্বাধীনতার অবস্থা নয়, সুতরাং ঔপনিবেশিক অবস্থা গ্রহণ করলে মাদ্রাজ কংগ্রেসে যে নীতি অবলম্বন করা হয়েছিল তা থেকে স্খলন হবে।

* * *

ইংরাজী ভাষায় একটা কথা আছে—Prudence is the best part of valour। সম্প্রতি নেতাদের মধ্যে এই prudence এবং valour নিয়ে যুদ্ধ চলেছে। একদল Prudence কে কাপুরুষতা বলছেন, অপর দল Valour কে অবিবেচনা বলছেন। মহাত্মা গান্ধী দুই দলকে মিলিত করবার উদ্দেশ্যে prudence এবং valour কে মিলিত ক'রে বলছেন, তোমরা এক বৎসরের জন্যে prudent হও, তা'তে যদি সুফল লাভ না কর তা হ'লে valour কে পুরো দমে চালনা কোরো—অর্থাৎ ৩১ শে ডিসেম্বর ১৯২৯ সালের মধ্যে যদি ঔপনিবেশিক অবস্থা না পাও তা হ'লে পূর্ণ-স্বাধীনতার জন্যে পুনরায় অসহযোগ নীতি অবলম্বন কোরো।

* * *

প্রকৃত অবস্থাকে চোখ খুলে না দেখে কোন পথে চল্‌লে তা কখনো সফলতার সিংহদ্বারে পৌঁছে দেবে না। নিজের ত্রুটি, দুর্ব্বলতা, অপূর্ণতাকে উপেক্ষা ক'রে সবল সক্ষমের লভ্য অবস্থার জন্যে যে অপর সমস্ত অবস্থাকে উপেক্ষা করে সে স্বপ্নদর্শী। স্বপ্ন দেখায় আনন্দ থাকৃতে পারে, কিন্তু লাভ নেই, তা সে স্বপ্ন যত উজ্জ্বলই হোক না কেন। এ কথার মধ্যে উন্মাদনা নেই—কিন্তু এ হচ্চে practical politicion এর কথা। এ কথা শুন্‌তে ভাল না হ'লেও এর ফল ভাল। মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু প্রভৃতির মুখে এই ধরণের কথা শুনে আশা হয় কিছু সুফল হয়ত পাওয়া যাবে।

* * *

শক্তি চাই নিশ্চয়ই, কিন্তু শক্তি ধারণ করবার ব্যবস্থাও থাকা চাই। তরবারি যদি পেতে হয় তা হ'লে তার খাপও পেতে হবে নচেৎ তরবারি আমাদের সহায় না হ'য়ে সংহারক হবে। স্বরাজের খসড়া তৈরী হ'তেই যদি এই বিরোধ উপস্থিত হয়, তা হ'লে দৈবক্রমে অকস্মাৎ আজ যদি আমরা পূর্ণ স্বাধীনতা পেয়ে যাই এবং তার পরে যদি সেই দৈবশক্তি স'রে গিয়ে আমাদের নিজেদের শক্তির উপর নির্ভর করতে হয় তা হ'লে অবস্থাটা কি রকম দাঁড়াতে পারে তা একেবারে ভুলে থাকা উচিত নয়। সত্য অপ্রিয় হলেও তা সত্য। একথা নূতন নয়' কিন্তু পুরানো কথাও প্রয়োজন কালে ভেবে দেখা ভাল।

* * *

আমরা আশা করি কংগ্রেসে উভয় দলের মধ্যে বিশদ আলোচনার ফলে সর্ব্ব প্রকার বিরোধ এবং অনৈক্য অন্তর্হিত হবে, এবং সাহস থেকে সুবুদ্ধি বিচ্ছিন্ন না হয়ে সাহসের সঙ্গে সুবুদ্ধি যুক্ত হবে।

সম্পাদক

পুস্তক-সমালোচনা

মামুদের শিবমন্দির ঃ—ডবল ক্রাউন দামী এ্যান্টিক কাগজে ৩১৭ পাতার একখানি সুন্দর উপন্যাস। "হিন্দু মিশন" হইতে প্রকাশিত, গ্রন্থকারের নামোল্লেখ নাই, দাম দুই টাকা। নাম না থাকিলেও গ্রন্থকার যে একজন প্রবীণ ও মনস্বী লেখক, তাহা পুস্তকের ছত্রে ছত্রে প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। পাকা হাতের লেখা; সরল ভাষায় কতকগুলি জটিল সমস্যার সমাধানের মধ্য দিয়া লেখকের চিন্তাশীলতা স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল গতি প্রাপ্ত হইয়াছে। পড়িতে পড়িতে কোথাও ক্লান্তি আসেনা। নিপুণ লেখনীর মুখে প্রত্যেক চিত্রটি সজীব হইয়া যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে! "কমলার" বাৎসল্য, "ছোট-মা"য়ের প্রতি "তপস্বীর" ভালবাসা, মামুদের ভক্তি—মনকে এমনভাবে স্পর্শ করে যে স্থানে স্থানে অশ্রু সংবরণ করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। আমরা সকলকে পুস্তকখানি পড়িয়া দেখিতে বলি। স্থানাভাববশতঃ এবার অন্যান্য পুস্তকের সমালোচনা গেল না মাঘ মাসে যাইবে।

কলিকাতা কংগ্রেস ও প্রদর্শনী

শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ

সমস্ত ভারতবর্ষের দৃষ্টি এখন কলিকাতার উপকণ্ঠে দেশবন্ধু নগরে নিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। আট বৎসর পরে আবার কলিকাতায় অধিবাসীবৃন্দের নামে জাতীয় মহাসম্মেলনকে এখানে আহ্বান করা হইয়াছে। এবারকার কংগ্রেসে যে সকল প্রস্তাব গৃহীত হইবে তাহা দ্বারা দেশের রাষ্ট্রনীতি এক নূতন পথে অগ্রসর হইবে। সর্ব্বপ্রধান আলোচ্য বিষয় সভাপতি পণ্ডিত মতিলাল নেহরু যে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসনের প্রস্তাব উপস্থাপিত করিয়াছেন তাহাই গৃহীত হইবে না পণ্ডিত জওহরলাল প্রমুখ প্রস্তাবিত পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য সমগ্র দেশ চেষ্টা করিবে। এই প্রস্তাব দুইটি লইয়া তুমুল বাক্-বিতণ্ডা ও তর্ক বিতর্কের সম্ভাবনা। সর্ব্বদলসম্মেলন ও বিষয় নির্ব্বাচন সমিতির অধিবেশনে পণ্ডিত মতিলালের প্রস্তাবই গৃহীত হইয়াছে এবং সেই জন্য আশাকরা যায় সমগ্র কংগ্রেসও এই প্রস্তাবই গ্রহণ করিবে। সেই সঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, একবৎসরের মধ্যে পণ্ডিত মতিলাল প্রস্তাবিত স্বায়ত্ত শাসনপ্রথা যদি প্রবর্ত্তিত না হয় তবে আগামী বৎসরের শেষ হইতে সম্পূর্ণ অসহযোগের ব্যবস্থা করা হইবে।

পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু

কলিকাতার চারিদিকে সমস্ত দিন ধরিয়া একটা চাঞ্চল্যের ভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। প্রতিদিনের অধিবেশনে কি হয় জানিবার জন্য সকলেই ব্যগ্র। দেশবন্ধুনগরের কথা ত বর্ণনাই করা যায় না। সে স্থানের আকাশ বাতাস

কলিকাতা কংগ্রেস ও প্রদর্শনী

শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ

এক নব ভাবে এক নব উদ্দীপনায় পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। একদিকে বিরাট কংগ্রেস মণ্ডপ আর একদিকে দেশীয় শিল্পসম্ভারপূর্ণ অপূর্ব্ব প্রদর্শনী. মণ্ডপের চতুর্দ্দিকে খদ্দর পরিহিত স্বেচ্ছাসেবকগণের কার্য্যতৎপরতা, দূর হইতে প্রদর্শনীর নহবতের রাগিণী ইত্যাদি দেখিয়া শুনিয়া প্রাণে এক অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হয়, দেশমাতার উদ্দেশে মাথা আপনিই নত হইয়া যায়।

প্রদর্শনীটি নানা বিভাগে বিভক্ত। তন্মধ্যে কৃষি ও স্বাস্থ্য, শুদ্ধ খদ্দর, সামাজিক অবস্থা, বাংলার পল্লী, শিক্ষাবিভাগগুলি বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য। দেশবন্ধু পল্লীসংস্কারক সমিতি বাংলার পল্লী সমূহে কি ভাবে কাজ করিতেছেন তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহাদের অক্লান্ত চেষ্টা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। কৃষি ও স্বাস্থ্য বিভাগ হইতে বুঝিতে পারা যায় প্রচলিত কুসংস্কার ও শিক্ষার অভাবে কি সর্ব্বনাশ ঘটিতেছে তাহার দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। সেই সঙ্গে দর্শকদিগের সম্মুখে বিজ্ঞান-সমর্থিত নূতন আদর্শের কথা সরল ভাষায় বুঝাইয়া দেওয়া হয়।

কংগ্রেস প্রাঙ্গণের একটি দৃশ্য

কলিকাতা পোলট্রি ও ডেয়ারি মঞ্চ

জলের অভাবে বাংলার কৃষকগণকে কি বিপদের সঙ্গে সংগ্রাম করিতে হয় এবং পল্লীবাসিগণ জলাভাবে স্বাস্থ্যহীন হইয়া মৃত্যুমুখে অগ্রসর হয়। সামাজিক বিভাগে আমাদের

প্রদর্শনীর আর একটি মঞ্চ উল্লেখযোগ্য। কলিকাতার সন্নিকটস্থ সোদপুরে শ্রীযুক্ত গুহ ঠাকুরতা একটি পোলট্রি ও ডেয়ারি মঞ্চ খুলিয়াছেন তাঁহার মতে পোলট্রি ও ডেয়ারির

দ্বারা আমাদের দেশে এক লাভজনক ব্যবসা চলিতে পারে। পাশ্চাত্য দেশে এই ব্যবসায়ে অনেকেই সাফল্য লাভ করিয়াছেন এবং যথোচিত চেষ্টা করিলেও আমাদের দেশের যুবকগণও যথেষ্ট লাভবান হইতে পারেন।
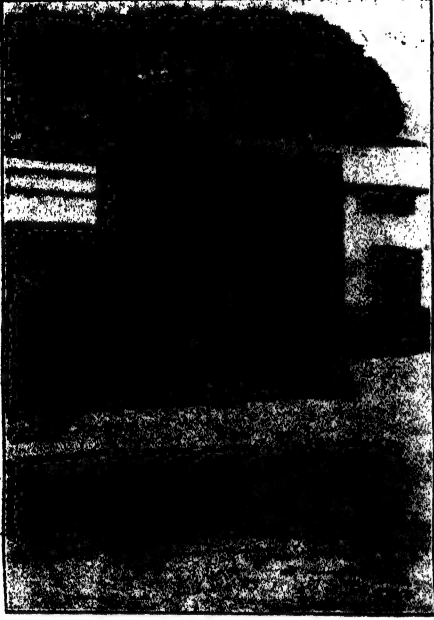
অন্তরীণের প্রতিরূপ

কলিকাতা কংগ্রেস প্রদর্শনী তোরণ

এই প্রবন্ধের চিত্রগুলি শ্রীঅজিত নাথ ঘোষ গৃহীত আলোক চিত্রের প্রতিলিপি।

নানাকথা

শোক সংবাদ

সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক যোগীন্দ্র নাথ সমাদ্দার মহাশয়ের অকাল মৃত্যুতে দেশের অত্যন্ত ক্ষতি হইল। তিনি অক্লান্ত অধ্যবসায়ী ছিলেন,—আমৃত্যু, তিনি বহুতথ্যপূর্ণ নানা গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। "গ্লোরিস্ অব মগধ" "সার আশুতোষ মেমোরিয়াল ভলুম" তাহার নিদর্শন। উত্তর কালের সাহিত্য তাঁহার নিকট চিরকাল ঋণী থাকিবে।

ভ্রম সংশোধন

গত অগ্রহায়ণ মাসের বিচিত্রার ৯০৮ পৃষ্ঠায় শ্রীনির্ম্মলা দেবীর নামে 'বঙ্গ-ভাষা প্রচলন' শীর্ষক যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার লেখক শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার বসু। অগ্রহায়ণ মাসের পত্রিকা প্রকাশিত হইবার কিছুকাল পরে সুশীল বাবুর নিকট সংবাদ পাইয়া আমরা এই ভুলের কথা জানিতে পারি, অবজ্ঞাবশত হইলেও আমরা এই ভুলের জন্য দুঃখিত। পাঠকগণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক উক্ত প্রবন্ধে এবং ষান্মাসিক সূচীপত্রে ভ্রম সংশোধন করিয়া লইবেন। সুশীল বাবুর নিকট হইতে সংবাদ পাওয়ার পূর্ব্বে ষান্মাসিক সূচীপত্র ছাপা হইয়া গিয়াছিল।

কেশব একাডেমি

কেশব একাডেমির কর্ত্তৃপক্ষ ছাত্রদের জন্য বাধ্যতামূলক জলখাবারের ব্যবস্থা করিয়া প্রতি ছাত্রের অভিভাবকের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। নিয়মিত পুষ্টিকর জলখাবার। খাওয়ায় ছাত্রদের শারীরিক উন্নতি পরিলক্ষিত হইতেছে।

Printed at the Susil Printing Works, 47, Pataldanga Street, Calcutta.
by Srijut Probodh Lal Mukherjee and published by him from 51 Pataldanga Street, Calcutta.

চিরাকাঙ্ক্ষা

শিল্পী—শ্রীসিদ্ধেশ্বর মিত্র

দ্বিতীয় বর্ষ, ২য় খণ্ড	মাঘ, ১৩৩৫	দ্বিতীয় সংখ্যা

কল্যাণ

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এই বিশ্বে আমাদের চারদিকে নানা বস্তু নানা বিষয় প'ড়ে আছে। কিন্তু সেই সঙ্গে আর একটি মস্ত জিনিষ আছে, সে হচ্চে আমি আপনি। এই যে আমার আপনি আছে তাকে জানি কি ক'রে? সে জগতের বস্তু ও বিষয়কে আপন করে। সে যখন বলে এইটি আমাদের আপন তখনি সে আপনাকে জানে। বিশ্বে কোন-কিছুই যদি কোনমতে তার আপন না হয়, তা হ'লে সে নেই। তাই উপনিষৎ বলেচেন, পুত্রকে পুত্র ব'লে জানি ব'লেই যে সে আমার প্রিয় তা নয়, পুত্রের মধ্যে আপনাকে জানি ব'লেই সে আমার প্রিয়।

যেটা আমার আপন আর যেটা আমার আপন নয় তার মধ্যে তফাৎ কত বড় সে একবার ভেবে দেখ। রাস্তা দিয়ে কত লোক চলেচে, তারা আমার কাছে ছায়া বললেই হয়, অর্থাৎ তাদের সত্য আমার কাছে ক্ষীণতম। কিন্তু যেই তাদেরই মধ্যে একজন আমার বন্ধু হয় অমনি কত বড় তফাৎ ঘটে যে তার পরিমাণ পাওয়া যায় না। আত্মা যখন কিছুর সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করে তখন তার বাহ্য আকৃতি প্রকৃতি গুণের কোন প্রভেদ ঘটে না, অথচ পূর্ব্বের থেকে এমন একটা প্রভেদ ঘটে যা অনির্ব্বচনীয়; যা সত্য ছিল না তা সত্য হ'য়ে ওঠে। যদি দেখি স্পর্শমণি ছুঁইয়ে ঢেলাকে সোনা করা হ'ল তা হ'লে সেটাকে আমরা বলি অলৌকিক। আত্মার স্পর্শমণিতে মুহূর্ত্তেই যে কাণ্ড ঘটে সে এর চেয়েও অপরূপ।

রাস্তা দিয়ে লোক যাচ্ছে, তার দিকে চেয়ে দেখিনে। কিন্তু যদি দেখি সে গাড়ি চাপা পড়ল তবে তখনই সে আমার কাছে কেন বিশিষ্টতা লাভ করে? কারণ তখন তার বেদনা আমাকে ব্যথিত করে। অর্থাৎ এতক্ষণ যে মানুষ আমার পক্ষে কেবল ছিল মাত্র, এখন সে আমার বেদনার সঙ্গে সংযুক্ত হবামাত্র অন্য সকল পথিকের থেকে স্বতন্ত্র হ'য়ে আমার পক্ষে বড় হ'য়ে উঠ্‌ল। এই ভিড়ের মধ্যে তার চেয়ে ধনে মানে এবং অন্য নানা বিষয়ে যে মানুষ বড় এই পথিক তাদের সকলের চেয়ে আমার কাছে প্রাধান্য লাভ করল। তার একমাত্র কারণ, আমার হৃদয় আপন ব্যথার দ্বারা তাকে স্পর্শ করেচে।

এমনি ক'রেই দেখ্‌তে পাই প্রত্যেক মানুষ বিধাতার সৃষ্টির মাঝখানে আবার একটি আপন সৃষ্টি রচনা করে। অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষের নিজের জানা জিনিষে এবং বেছে নেওয়া জিনিষে তৈরী একটি স্বকীয় জগৎ আছে। সেই জগতের উপকরণ প্রত্যেক মানুষের পক্ষে পৃথক। শুধু উপকরণ নয়, সেই সব উপকরণের মূল্য ও বিন্যাসও পৃথক। আমি আমার জগতে যে জিনিষকে সামনে রাখি ও তাকে যে মূল্য দিই আর একজন হয়ত সেই জিনিষকেই পিছনে রাখে এবং তাকে অন্য মূল্য দেয়। এমনি ক'রে উপাদানের বিচিত্র সমাবেশে ও মূল্যভেদে এই স্বকীয় জগৎগুলির পার্থক্যের আর অন্ত থাকে না।

এই জন্যেই দেখ্‌তে পাচ্ছি বিধাতার জগতে তারায় তারায় মিল আছে, সৌরমণ্ডলে গ্রহগুলির নৃত্যে পরস্পর তাল কাটাকাটি করচে না। কিন্তু মানুষের স্বকীয় জগতে পরস্পর সংঘাত চলেচেই। কেবল প্রতিবেশীর সঙ্গে প্রতিবেশীর বিরোধ ঘটচে তা নয়, এক পরিবারের ভাইয়ে ভাইয়েও কত বিরোধ। তার পরে রাজার সঙ্গে প্রজার, এক দেশের সঙ্গে অন্য দেশের বিরোধ। এতেই যত দুঃখ যত অমঙ্গলের উৎপত্তি হয়েচে। মানুষের সংসারে শান্তি বড় দুর্লভ, সুখ বড় অচিরস্থায়ী।

এই দুঃখ কি ক'রে গোড়া ঘেঁষে দূর করা যেতে পারে সেই আলোচনা আমাদের দেশে অনেক দিন থেকেই চলচে। সেই দুঃখের কারণ খুঁজতে গিয়ে অবশেষে আমাদের সংসারের মাঝখানে যে আমিটা আছে তাকেই অপরাধী ব'লে গ্রেফতার করা হল। সেই যত ভেদ ঘটিয়েচে। এই ভেদ না থাকলে ত কোন বিরোধই থাকে না।

এই জন্যে বিচারে তাকেই দণ্ডনীয় করা হ'ল। দণ্ডও সামান্য নয়, একেবারে প্রাণদণ্ড। কোমর বেঁধে পণ করা হ'ল এই আমিকেই একেবারে বিলুপ্ত করা হবে। তার যত রকম ইচ্ছা আছে সমস্তকেই নিড়িয়ে ফেলবার চেষ্টা চলতে লাগল। শুধু তাই নয়, অহরহ তার কানে জপ করা সুরু হল যে, দৃষ্টিতে শ্রবণে স্পর্শে যা কিছু অনুভব এবং মনের মধ্যে যা কিছু প্রতীতি সে সমস্তই ভেল্কি মাত্র, তার সত্য অস্তিত্ব নেই।

তর্কে এদের পরাস্ত করা শক্ত। কেননা একটা কথা অস্বীকার করবার জো নেই যে, এই জগৎটা তার বিশেষ বিশেষ রূপে রসে গন্ধে স্পর্শে তার বিশেষ বিশেষ অর্থে আমার আমি-বোধের উপর ভর ক'রেই দাঁড়িয়ে আছে। আমি-বোধ ঘুচলেই এই সব বোধই ঘুচবে। আমি-বোধের গুণের পরিবর্ত্তন হবামাত্র এই সব বোধেরই গুণের পরিবর্ত্তন হবে। তা ছাড়া যে ভেদ-বোধটা সকল বিরোধের মূল সেই ভেদ-বোধ যদি লুপ্ত হয় তা হ'লে কোনো বোধই থাকে না। তা হ'লেই দাঁড়াচ্চে দুঃখলোপচেষ্টায় আমিকে লোপ করলে বিশ্ব-আকারে যা-কিছু আছে সমস্তকেই ঝাড়ে মূলে লোপ করা হয়। তবু এতেও একদল পিছলো না, তারা মহা-সর্ব্বনাশের সাধনাকে স্বীকার করলে, নির্ব্বাণমুক্তির সন্ধানে প্রবৃত্ত হ'ল।

কিন্তু একটা কথা মনে রাখা দরকার, শুধু ভেদই ত বড় কথা নয়, ঐক্যও আছে। এক আমির জগৎ এবং আর এক আমির জগতে যদি আকাশ পাতাল তফাৎ থাকত তাহলে আমাদের না থাকত ভাষা, না থাকত সমাজ, না থাকত সাহিত্য শিল্প ধর্ম্ম তন্ত্র। মানুষের যা-কিছু শ্রেষ্ঠ সম্পদ, অর্থাৎ যাতে তার স্থায়ী আনন্দ, সে সমস্তেরই ভিত্তি হচ্চে মানুষের সাধারণ ঐক্যের মধ্যে।

তা হ'লে দাঁড়াচ্চে এই যে, মানুষ যখন এই ভেদটাকেই বড় ক'রে ঐক্যকে খর্ব্ব করে তখনি যত বিরোধ আর অমঙ্গল উপস্থিত হয়। জগতে যাঁরা মহাত্মা তাঁরা তাঁদের আমির মধ্যে সকল আমির ঐক্যটাকেই বড় ক'রে দেখেন। অতএব একথা সম্পূর্ণ সত্য নয় যে, "আমি" কেবল ভেদকেই দেখে, সেই ভেদের মধ্যে ঐক্যকেও সে দেখে। সেই দেখাই সতকে দেখা মঙ্গলকে দেখা সুন্দরকে দেখা।

তা হ'লে "আমিকে" লুপ্ত করা আমাদের লক্ষ্য হ'তে পারে না, "আমির" সার্থকতাসাধনই আমাদের লক্ষ্য।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সেই সার্থকতা ভেদের মধ্যে নেই, ঐক্যের মধ্যে। এই ঐক্য একাকারত্ব নয়। একটা মাত্র সোজা লাইনের ঐক্য কিছুই নয়, কিন্তু ছবির মধ্যে নানা লাইনের যে ঐক্য সেইটেই সত্যকার ঐক্য। সেখানে ঐক্য আপনার বিরুদ্ধতার ভিতর দিয়ে নিজেকে পূর্ণরূপে লাভ করেচে, সেই লাভের মধ্যে আনন্দ আছে।

"আমি" তেমনি বহু আমির মধ্যে যে ঐক্যকে উপলব্ধি করে সেই ঐক্য সত্য ঐক্য, আনন্দের ঐক্য। একে সম্পূর্ণরূপে পাবার পাশে পাশেই অনেক বিরোধ অনেক দুঃখ। তাই ব'লে সেই বিরোধকে দুঃখকেই চরম বলা যায় না। পা যেমন চলে, পা তেমনি স্খলিতও হয়, তাই ব'লে বলা যায় না যে, স্খলিত হবার জন্যেই পায়ের সৃষ্টি। কারণ স্খলন অনেক বেশী হ'লেও অল্প চলার মূল্যও তার চেয়ে অনেক বেশী।

এই কারণেই এ সংসারে বিরোধ-জনিত যতই দুঃখ পাই না কেন, মানুষ সেইটেকেই একান্ত ব'লে গ্রহণ করচে না। শিক্ষায় দীক্ষায় সাধনায় মানুষে রনিরন্তর কঠিন চেষ্টা কল্যাণকে লাভ করা, কল্যাণকে স্থায়ী ও সফল করা। এই কল্যাণই হচ্চে ভেদের মধ্য দিয়ে ঐক্যকে পাওয়া, বিরোধের মধ্য দিয়ে মিলনকে লাভ করা। যারা মন্দকেই বড় ক'রে দেখে তারা বল্‌বে এ লাভ মিল্‌ল কই? তারা এটা দেখ্‌চে না প্রতিদিনই মিল্‌চে। সেই মেলার শেষ নেই। গাছের উদ্দেশ্যে ফল ফলানো, কিন্তু সমস্ত গাছটাই আগা-গোড়া ফল হয় নি ব'লে তাকে নিন্দা ক'রে লাভ নেই। গাছের মধ্যে ফলটাই পরিমাণে কম অথচ গৌরবে বেশী। মানুষের মধ্যেও তেমনি কল্যাণ। মুখে যাই বলুক কিছুতে মানুষ তাকে অবিশ্বাস করতে পারে না। হাজার বিরুদ্ধতাতেও এই বিশ্বাস টল্‌ল না। কেন না এই বিশ্বাস মানুষের "আমির" অন্তরে নিহিত। এই জন্যেই এই বিশ্বাসমত চলাকেই মানুষ ধর্ম্ম বলে।

"আমি"র মধ্যে যে ভেদবুদ্ধি আছে তাকেই একান্ত করায় ভীষণ ফল সংসারের চারদিকেই প্রভূত পরিমাণে দেখ্‌চি অথচ তাকেই মানুষ আপনার স্বভাব বল্‌চে না; যদি বল্‌ত তা হ'লে সেই স্বভাবকেই প্রবল করা ও রক্ষা করা মানুষের একমাত্র কর্ত্তব্য হ'ত। মানুষের "আমি" নদীর ধারার মত; সে এক তটের সঙ্গে আরেক তটকে বিচ্ছিন্ন করচে, আবার মিলিত করচে—কেন না দুইয়ের মাঝখানে সে রস, সে গতি, সে গান, সে সফলতা, সে স্বাস্থ্য, সে সৌন্দর্য্য। সে এককেই বিচিত্র করেচে এবং বিচিত্রকেই এক করেচে।

-উপন্যাস-

—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫৩

মধুসূদনের সংসারে তার স্থানটা পাকা হয়েচে ব'লেই শ্যামাসুন্দরী প্রত্যাশা করতে পারত, কিন্তু সে কথা অনুভব করতে পারচে না। বাড়ির চাকর বাকরদের পরে ওর কর্ত্তৃত্বের দাবী জন্মেচে ব'লে প্রথমটা ও মনে করেছিল, কিন্তু পদে পদে বুঝতে পারচে যে তারা ওকে মনে মনে প্রভুপদে বসাতে রাজি নয়। ওকে সাহস ক'’র প্রকাশ্যে অবজ্ঞা দেখাতে পারলে তারা যেন বাঁচে এমনি অবস্থা। সেই জন্যেই শ্যামা তাদেরকে যখন তখন অনাবশ্যক ভৎসনা ও অকারণে ফরমাস ক'রে কেবলি তাদের দোষ ক্রটি ধরে। খিট খিট করে। বাপ মা তুলে গাল দেয়। কিছুদিন পূর্ব্বে এই বাড়িতেই শ্যামা নগণ্য ছিল, সেই স্মৃতিটাকে সংসার থেকে মুছে ফেলবার জন্যে খুব কড়াভাবে মাজাঘষার কাজ করতে গিয়ে দেখে যে সেটা সয় না। বাড়ির একজন পুরোনো চাকর শ্যামার তর্জ্জন না সইতে পেরে কাজে ইস্তফা দিলে। তাই নিয়ে শ্যামাকে মাথা হেঁট করতে হোলো। তার কারণ, নিজের ধনভাগ্য সম্বন্ধে মধুসূদনের কতকগুলো অন্ধ সংস্কার আছে। যে সব চাকর তার আর্থিক উন্নতির সমকালবর্ত্তী, তাদের মৃত্যু বা পদত্যাগকে ও দুর্লক্ষণ মনে করে। অনুরূপ কারণেই সেই সময়কার একটা মসী-চিহ্নিত অত্যন্ত পুরোনো ডেস্ক অসঙ্গতভাবে আপিস ঘরে হাল আমলের দামী আসবাবের মাঝখানেই অসঙ্কোচে প্রতিষ্ঠিত আছে, তার উপরে সেই সেদিনকারই দস্তার দোয়াত, আর একটা সস্তা বিলিতি কাঠের কলম, যে-কলমে সে তার ব্যবসায়ের নবযুগে প্রথম বড়ো একটা দলিলে নাম সই করেছিল। সেই সময়কার উড়ে চাকর দধি যখন কাজে জবাব দিলে মধুসূদন সেটা গ্রাহ্যই করলে না, উল্টে সে-লোকটার ভাগ্যে বকশিস জুটে গেল। শ্যামাসুন্দরী এই নিয়ে ঘোরতর অভিমান করতে গিয়ে দেখে হালে পানি পায় না। দধির হাসিমুখ তাকে দেখতে হোলো। শ্যামার মুস্কিল এই মধুসূদনকে সে সত্যিই ভালোবাসে, তাই মধুসূদনের মেজাজের উপর বেশি চাপ দিতে ওর সাহস হয় না, সোহাগ কোন্ সীমায় স্পর্দ্ধায় এসে পৌঁছবে খুব ভয়ে ভয়ে তারি আন্দাজ ক'রে চলে। মধুসূদনও নিশ্চিত জানে শ্যামার সম্বন্ধে সময় বা ভাবনা নষ্ট করবার দরকার নেই। আদর-আবদারঘটিত অপব্যয়ের পরিমাণ সঙ্কোচ করলেও দুর্ঘটনার আশঙ্কা অল্প। অথচ শ্যামাকে নিয়ে ওর একটা স্থূল রকম মোহ আছে, কিন্তু সেই মোহকে ষোল আনা ভোগে লাগিয়েও তাকে অনায়াসে সামলিয়ে চল্‌তে পারে এই আনন্দে মধুসূদন উৎসাহ পায়— এর ব্যতিক্রম হ'লে বন্ধন ছিঁড়ে যেত। কর্ম্মের চেয়ে মধুসূদনের কাছে বড়ো কিছু নেই। সেই কর্ম্মের জন্যে ওর সব চেয়ে দরকার অবিচলিত আত্ম-

কর্তৃত্ব। তারি সীমার মধ্যে শ্যামার কর্তৃত্ব প্রবেশ করতে সাহস পায় না, অল্প একটু পা বাড়াতে গিয়ে উঁচোট খেয়ে ফিরে আসে। শ্যামা তাই কেবলি আপনাকে দানই করে, দাবী করতে গিয়ে ঠকে। টাকাকড়ি সাজ-সরঞ্জামে শ্যামা চিরদিন বঞ্চিত—তার পরে ওর লোভের অন্ত নেই। এতেও তাকে পরিমাণ রক্ষা ক'রে চল্‌তে হয়। এত বড়ো ধনীর কাছে যা অনায়াসে প্রত্যাশা করতে পারত তাও ওর পক্ষে দুরাশা। মধুসূদন মাঝে মাঝে এক একদিন খুসি হ'য়ে ওকে কাপড়চোপড় গহনা-পত্র কিছু কিছু এনে দেয়, তাতে ওর সংগ্রহের ক্ষুধা মেটে না। ছোট খাটো লোভের সামগ্রী আত্মসাৎ করবার জন্যে কেবলি হাত চঞ্চল হ'য়ে ওঠে। সেখানেও বাধা। এই রকমেই একটা সামান্য উপলক্ষ্যে কিছুদিন আগে ওর নির্ব্বাসনের ব্যবস্থা হয়; কিন্তু শ্যামার সঙ্গ ও সেবা মধুসূদনের অভ্যস্ত হ'য়ে এসেছিল—পান-তামাকের অভ্যাসেরই মতো সস্তা অথচ প্রবল। সেটাতে ব্যাঘাত ঘটলে মধুসূদনের কাজেরই ব্যাঘাত ঘটবে আশঙ্কায় এবারকার মতো শ্যামার দণ্ড রদ্ হোলো। কিন্তু দণ্ডের ভয় মাথার উপর ঝুলতে লাগল।

নিজের এই রকম দুর্ব্বল অধিকারের মধ্যে শ্যামাসুন্দরীর মনে একটা আশঙ্কা লেগেই ছিল কবে আবার কুমু আপন সিংহাসনে ফিরে আসে। এই ঈর্ষ্যার পীড়নে তার মনে একটুও শান্তি নেই। জানে কুমুর সঙ্গে ওর প্রতিযোগিতা চলবেই না, ওরা এক ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে নেই। কুমু মধুসূদনের আয়ত্তের অতীত সেই খানেই তার অসীম জোর; আর শ্যামা তার এত বেশি আয়ত্তের মধ্যে যে, তার ব্যবহার আছে মূল্য নেই। এই নিয়ে শ্যামা অনেক কান্নাই কেঁদেচে, কতবার মনে করেচে আমার মরণ হ'লেই বাঁচি। কপাল চাপড়ে বলেচে এত বেশি শস্তা হলুম কেন? তার পরে ভেবেচে শস্তা ব'লেই জায়গা পেলুম, যার দর বেশি তার আদর বেশি, যে শস্তা সে হয়তো শস্তা ব'লেই জেতে।

মধুসূদন যখন শ্যামাকে গ্রহণ করেনি, তখন শ্যামার এত অসহ্য দুঃখ ছিল না। সে আপন উপবাসী ভাগ্যকে একরকম ক'রে মেনে নিয়েছিল। মাঝে মাঝে সামান্য খোরাককেই যথেষ্ট মনে হোতো। আজ অধিকার পাওয়া আর না পাওয়ার মধ্যে সামঞ্জস্য কিছুতেই ঘটচে না। হারাই হারাই ভয়ে মন আতঙ্কিত। ভাগ্যের রেল লাইন এমন কাঁচা ক'রে পাতা যে, ডিরেলের ভয় সর্ব্বত্রই এবং প্রতি মুহূর্ত্তেই। মোতির মার কাছে মন খোলাখুলি ক'রে সান্ত্বনা পাবার জন্যে একবার চেষ্টা করেছিল। সে এমনি একটা ঝাঁঝের সঙ্গে মাথা ঝাঁকনি দিয়ে পাশ কাটিয়ে গেছে যে তার একটা কোন সাংঘাতিক শোধ তুল্‌তে পারলে এখনি তুলত, কিন্তু জানে সংসারব্যবস্থায় মধুসূদনের কাছে মোতির মার দাম আছে, সেখানে একটুও নাড়া সইবে না। সেই অবধি দুজনের কথা বন্ধ, পারৎ-পক্ষে মুখ দেখাদেখি নেই। এমনি ক'রে এ বাড়িতে শ্যামার স্থান পূর্ব্বের চেয়ে আরো সঙ্কীর্ণ হ'য়ে গেছে। কোথাও তার একটুও স্বচ্ছন্দতা নেই।

এমন সময় একদিন সন্ধে বেলায় শোবার ঘরে এসে দেখে টেবিলের উপর দেয়ালে হেলানো কুমুর ফটোগ্রাফ। যে বজ্র মাথায় পড়বে তারি বিদ্যুৎশিখা ওর চোখে এসে পড়ল। যে মাছকে বঁড়শি বিঁধেচে তারি মতো ক'রে ওর বুকের ভিতরটা ধড়ফড় ধড়ফড় করতে লাগ্‌ল। ইচ্ছা করে ছবিটা থেকে চোখ ফিরিয়ে নেয়, পারে না। এক দৃষ্টে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে থাক্‌ল, মুখ বিবর্ণ, দুই চোখে একটা দাহ, মুঠো দৃঢ় ক'রে বদ্ধ। একটা কিছু ভাঙতে, একটা কিছু ছিঁড়ে ফেলতে চায়। এ ঘরে থাকলে এখনি কিছু একটা লোকসান ক'রে ফেলবে এই ভয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল। আপনার ঘরে গিয়ে বিছানার উপর উপুড় হ'য়ে প'ড়ে চাদরখানাকে টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে ছিঁড়ে ছিঁড়ে ফেললে।

রাত হ'য়ে এল। বাইরে থেকে বেহারা খবর দিলে মহারাজ শোবার ঘরে ডেকে পাঠিয়েচেন। বলবার শক্তি নেই যে যাব না। তাড়াতাড়ি উঠে মুখ ধুয়ে একটা বুটিদার ঢাকাই শাড়ি প'রে গায়ে একটু গন্ধ মেখে গেল শোবার ঘরে। ছবিটা যাতে চোখে না পড়ে এই তার চেষ্টা। কিন্তু ঠিক সেই ছবিটার সামনেই বাতি—সমস্ত আলো যেন কারো দীপ্ত দৃষ্টির মতো ঐ ছবিকে উদ্ভাসিত ক'রে আছে।

সমস্ত ঘরের মধ্যে ঐ ছবিটিই সব চেয়ে দৃশ্যমান। শ্যামা নিয়মমতো পানের বাটা নিয়ে মধুসূদনকে পান দিলে, তার পরে পায়ের কাছে ব'সে পায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগ্‌ল। যে কোনো কারণেই হোক আজ মধুসূদন প্রসন্ন ছিল। বিলাতী দোকানের থেকে একটা রূপোর ফটোগ্রাফের ফ্রেম কিনে এনেছিল। গম্ভীরভাবে শ্যামাকে বল্‌লে,—"এই নাও।" শ্যামাকে সমাদর করবার উপলক্ষেও মধুসূদন মধুর রসের অবতারণায় যথেষ্ট কার্পণ্য করে। কেন না সে জানে ওকে অল্প একটু প্রশ্রয় দিলেই ও আর মর্য্যাদা রাখতে পারে না। ব্রাউন কাগজে জিনিষটা মোড়া ছিল। আস্তে আস্তে কাগজের মোড়কটা খুলে ফেলে বল্‌লে, "কি হবে এটা?"

মধুসূদন বল্‌লে, "জানো না, এতে ফটোগ্রাফ রাখতে হয়।"

শ্যামার বুকের ভিতরটাতে কে যেন চাবুক চালিয়ে দিলে, বললে, "কার ফটোগ্রাফ রাখবে?"

"তোমার নিজের। সে দিন সেই যে ছবিটা তোলানো হয়েচে।"

"আমার এত সোহাগে কাজ নেই।" ব'লে সেই ফ্রেমটা ছুঁড়ে মেজের উপর ফেলে দিলে।

মধুসূদন আশ্চর্য্য হ'য়ে বল্‌লে, "এর মানে কি হ'ল?"

"এর মানে কিছুই নেই।" ব'লে মুখে হাত দিয়ে কেঁদে উঠ্‌ল, তার পরে বিছানা থেকে মেজের উপর প'ড়ে মাথা ঠুক্‌তে লাগ্‌ল। মধুসূদন ভাবলো, শ্যামার কম দামের জিনিষ পছন্দ হয়নি, ওর বোধকরি ইচ্ছে ছিল একটা দামী গয়না পায়। সমস্ত দিন আফিসের কাজ সেরে এসে এই উপদ্রবটা একটুও ভাল লাগ্‌ল না। এ যে প্রায় হিস্‌টীরিয়া। হিস্‌টীরিয়ার পরে ওর বিষম অবজ্ঞা। খুব একটা ধমক দিয়ে বল্‌লে, "ওঠো বল্‌চি, এখনি ওঠো।"

শ্যামা উঠে ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে চ'লে গেল। মধুসূদন বল্‌লে, "এ কিছুতেই চলবে না।"

মধুসূদন শ্যামাকে বিশেষভাবেই জানে। নিশ্চয় ঠাওরেছিল একটু পরেই ফিরে এসে পায়ের তলায় লুটিয়ে প'ড়ে মাপ চাইবে—সেই সময়ে খুব শক্ত ক'রে দুটো কথা শুনিয়ে দিতে হবে।

দশটা বাজল শ্যামা এলো না। আর একবার শ্যামার ঘরের দরজার বাইরে থেকে আওয়াজ এলো—"মহারাজ বোলায়।"

শ্যামা বল্‌লে, "মহারাজকে বোলো আমার অসুখ করেচে।"

মধুসূদন ভাবলে, তো আস্পর্দ্ধা কম নয়, হুকুম করলে আসে না।

মনে ঠিক ক'রে রেখেছিল আরো খানিক বাদে আসবে। তাও এল না! এগারোটা বাজতে মিনিট পনেরো বাকি। বিছানা ছেড়ে মধুসূদন দ্রুতপদে শ্যামার ঘরে গিয়ে ঢুক্‌ল। দেখ্‌লে ঘরে আলো নেই। অন্ধকারে বেশ দেখা গেল—শ্যামা মেজের উপর প'ড়ে আছে। মধুসূদন ভাবলে এ সমস্ত কেবল আদর কাড়বার জন্তে।

গর্জ্জন ক'রে বল্‌লে, "উঠে এসো বল্‌চি, শীঘ্র উঠে এসো। ন্যাকামি কোরো না।"

শ্যামা কিছু না ব'লে উঠে এলো।

৫৪

পরদিন আপিসে যাবার আগে খাবার পরে শোবার ঘরে বিশ্রাম করতে এসেই মধুসূদন দেখলে ছবিটি নেই। অন্য দিনের মতো আজ শ্যামা পান নিয়ে মধুসূদনের সেবার জন্তে আগে থাক্‌তে প্রস্তুত ছিল না। আজ সে অনুপস্থিতও। তাকে ডেকে পাঠানো হোলো। বেশ বোঝা গেল একটু কুণ্ঠিতভাবেই সে এল। মধুসূদন জিজ্ঞাসা করলে, "টেবিলের উপর ছবি ছিল, কি হ'ল?"

শ্যামা অত্যন্ত বিস্ময়ের ভাণ ক'রে বললে, "ছবি! কার ছবি!"

ভাণের পরিমাণটা কিছু বেশি হ'য়ে পড়ল। সাধারণত পুরুষদের বুদ্ধিবৃত্তির পরে মেয়েদের অশ্রদ্ধা আছে ব'লেই এতটা সম্ভব হয়েছিল।

মধুসূদন ক্রুদ্ধস্বরে বললে, "ছবিটা দেখোনি!"

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্যামা নিতান্ত ভালোমানুষের মত মুখ ক'রে বল্‌লে, "না, দেখিনি তো!"

মধুসূদন গর্জ্জন ক'রে ব'লে উঠ্‌ল, "মিথ্যে কথা বলচ!"

"মিথ্যে কথা কেন বলব, ছবি নিয়ে আমি করব কি?"

"কোথায় রেখেছ বের ক'রে নিয়ে এসো বল্‌চি! নইলে ভালো হবে না।"

"ওমা, কি আপদ! তোমার ছবি আমি কোথায় পাব যে বের ক'রে আনব?"

বেহারাকে ডাক পড়ল। মধু তাকে বল্‌লে, "মেজো বাবুকে ডেকে আন্।"

নবীন এলো। মধুসূদন বললে, "বড়ো বৌকে আনিয়ে নাও।"

শ্যামা মুখ বাঁকিয়ে কাঠের পুতুলের মতো চুপ ক'রে ব'সে রইল।

নবীন খানিকখন পরে মাথা চুল্‌কতে চুল্‌কতে বল্‌লে, "দাদা, ওখানে একবার কি তোমার নিজে যাওয়া উচিত হবে না? তুমি আপনি গিয়ে যদি বলো তা হ'লে বৌরাণী খুসি হবেন।"

মধুসূদন গম্ভীরভাবে খানিকক্ষণ গুড়গুড়ি টেনে বল্‌লে, "আচ্ছা, কাল রবিবার আছে, কাল যাবো।"

নবীন মোতির মার কাছে এসে বল্‌লে, "একটা কাজ ক'রে ফেলেচি।"

"আমার পরামর্শ না নিয়েই?"

"পরামর্শ নেবার সময় ছিল না।"

"তা হ'লে তো দেখচি তোমাকে পস্তাতে হবে।"

"অসম্ভব নয়। কুষ্ঠিতে আমার বুদ্ধিস্থানে আর কোনো গ্রহ নেই, আছেন নিজের স্ত্রী। এই জন্যে সর্ব্বদা তোমাকে হাতের কাছে রেখেই চলি। ব্যাপারটা হচ্ছে এই—দাদা আজ হুকুম করলেন বৌরাণীকে আনানো চাই। আমি ফস্ ক'রে ব'লে বসলেম তুমি নিজে গিয়ে যদি কথাটা তোলো ভালো হয়। দাদা কি মেজাজে ছিলেন রাজি হ'য়ে গেলেন। তারপর থেকেই ভাবচি এর ফলটা কি হবে।"

"ভালো হবে না। বিপ্রদাস-বাবুর যে রকম মুখখানা দেখলুম কি বল্‌তে কি বলবেন, শেষকালে কুরুক্ষেত্রের লড়াই বেধে যাবে। এমন কাজ করলে কেন?"

"প্রথম কারণ বুদ্ধির কোঠা ঠিক সেই সময়টাতেই শূন্য ছিল, তুমি ছিলে অন্যত্র। দ্বিতীয় হচ্চে, সেদিন বৌরাণী যখন বল্‌লেন, 'আমি যাব না' তার ভিতরকার মানেটা বুঝেছিলুম। তাঁর দাদা রুগ্ন শরীর নিয়ে কল্‌কাতায় এলেন তবু এক দিনের জন্যে মহারাজ দেখ্‌তে গেলেন না,—এই অনাদরটা তাঁর মনে সব চেয়ে বেজেছিল।"

শুনেই মোতির মা একটু চমকে উঠ্‌ল, কথাটা কেন যে আগে তার মনে পড়েনি এইটেই তার আশ্চর্য্য লাগ্‌ল। আসলে নিজের অগোচরেও শ্বশুর বাড়ির মাহাত্ম্য নিয়ে ওর একটা অহঙ্কার আছে। অন্য সাধারণ লোকের মত মহারাজ মধুসূদনেরও কুটুম্বিতার দায়িত্ব আছে একথা তার মন বলে না।

সেদিনকার তর্কের অনুবৃত্তিস্বরূপে নবীন একটুখানি টিপ্পনি দিয়ে বল্‌লে, "নিজের বুদ্ধিতে কথাটা আমার হয়তো মনে আসত না, তুমিই আমাকে মনে করিয়ে দিয়েছিলে।"

'কি রকম শুনি?"

"ঐ যে সে দিন বল্‌লে,'কুটুম্বিতার দায়িত্ব আত্মমর্য্যাদার দায়িত্বের চেয়েও বড়ো'। তাই মনে করতে সাহস হোলো যে মহারাজার মতো অত বড়ো লোকেরও বিপ্রদাসবাবুকে দেখ্‌তে যাওয়া উচিত।"

মোতির মা হার মানতে রাজি নয়, কথাটাকে উড়িয়ে দিলে, "কাজের সময় এত বাজে কথাও বলতে পারো! কি করা উচিত এখন সেই কথাটা ভাবো দেখি।"

"গোড়াতেই সকল কথার শেষ পর্য্যন্ত ভাবতে গেলে ঠক্‌তে হয়। আশু ভাবা উচিত প্রথম কর্ত্তব্যটা কি। সেটা হচ্চে বিপ্রদাস-বাবুকে দাদার দেখতে যাওয়া। দেখতে গিয়ে তার ফলে যা হ'তে পারে তার উপায় এখনি চিন্তা করতে বসলে তাতে চিন্তাশীলতার পরিচয় দেওয়া হবে, কিন্তু সেটা হবে অতিচিন্তাশীলতা।"

"কি জানি আমার বোধ হচ্চে মুস্কিল বাধবে।"

(ক্রমশঃ)

পর্দাপ্রথা

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী

পর্দা-প্রথা ভাল কি মন্দ এ আলোচনা প্রায় সমস্ত ভারতবর্ষ জুড়িয়াই চলিতেছে, আমিও এ বিষয়ে কিছু বলিবার জন্য অনুরুদ্ধ হইয়াছি এবং আমার যথাজ্ঞান দু'চার কথা বলিব।

আমার প্রথম বক্তব্য এই যে 'পর্দা' শব্দটিই আমাদের স্বদেশের নয়, এটি বৈদেশিক ফারসী শব্দ। এদেশে মুসলমান আগমনের পূর্ব্বে যে 'পর্দা' প্রথার প্রচলন ছিল না তাহা শব্দাভাব দ্বারাই প্রমাণ হয়, পর্দার মত সাধারণ-প্রচলিত অপর কোন শব্দ আমাদের শব্দকোষে লেখা নাই। যবনিকা শব্দটি সংস্কৃতের ন্যায় শুনিতে বটে, কিন্তু আসলে এটিও সংস্কৃত শব্দ নহে, যবন শব্দ হইতে উৎপন্ন বলিয়া যেন মনে হয়! যবনিকা (যাবনিক?) শব্দটি যবন অর্থাৎ গ্রীকদিগের ভারত-আগমনের পূর্ব্বের কোন কাব্য নাটকাদিতে উল্লিখিত হইতে দেখা যায় না আমার মনে হয় যবনিকার বা পর্দার ব্যবহার এদেশে সর্ব্বপ্রথম গ্রীকদিগের সংস্রব হইতেই অল্পাধিক আরম্ভ হইয়াছিল, ইহার পুর্ব্বে আমাদের দেশে পর্দা ফেলার রীতি ছিল না।

পর্দা ছিল না বটে, কিন্তু 'পর্দাপ্রথা' বলিতে যাহা বুঝায় তাহা ছিল কি না সেটা একবার বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। আর্য্যদিগের মধ্যে যে বহু প্রাচান কালে অবরোধপ্রথা ছিল না, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আমরা বেদ উপনিষদাদি গ্রন্থ হইতে জানিতে পারি। অবরোধপ্রথা প্রচলিত থাকিলে আর্য্যজাতির ধর্ম্মশাস্ত্রে, ব্যবহারশাস্ত্রে সর্ব্বত্রেই নারীর অত দূর উচ্চাধিকার দেখা যাইত না। রাজ্যাভিষেকে রাজা পট্টমহাদেবীর সহিত সভামণ্ডপে সমাসীন হইয়া অভিষিক্ত হইতেন, বিবাহ-সভায় সমবেত জনগণের সমক্ষে কন্যা-সম্প্রদান শাস্ত্রবিধি, রাজকন্যারা সহস্র রাজা ও রাজপুত্রমধ্যে একমাত্র সখী বা কঞ্চুকী সমভিব্যাহারে নিজের মনোমত পতিনির্ব্বাচন করিয়া লইতেন। মনে করিয়া দেখুন,—অবরোধবাসিনী, পুরুষ-সংস্পর্শবিবর্জ্জিতা অশিক্ষিতা বালিকা কখনই অতগুলি পুরুষের মধ্যে দাঁড়াইয়া নির্ভীকভাবে পতিনির্ব্বাচন করিতে পারিত কি?

বহু প্রাচীনকালে বৈদিক কালে যে মেয়েরা অবরোধবাসিনী এবং অশিক্ষিতা বা অল্পশিক্ষিতা হইতেন না তাহার প্রমাণস্বরূপে আমি কতকগুলি আর্য্যমহিলার নামোল্লেখ করিলাম,—ইঁহারা সকলেই বেদমন্ত্রের রচয়িত্রী। ব্রহ্ম-বাদিনী গার্গী মৈত্রেয়ীর নামই আমরা সচরাচর শুনিতে পাই। অনেকে বলিয়া থাকেন 'ও রকম দু একজন নিয়মের ব্যতিক্রমস্বরূপ সর্ব্বকালেই দেখা দেন; কিন্তু সমষ্টি ধরিয়া বিচারপূর্ব্বক দেখিলে অধিকাংশেই অশিক্ষিতা বা অল্প-শিক্ষিতা ছিলেন বলা যায়।'

কিন্তু যে দেশে মেয়েদের শিক্ষা compulsory, সে দেশেই বা লক্ষ লক্ষ লেখাপড়া-শেখা মেয়েদের মধ্যে হাজার হাজার বৎসরের কালস্রোতকে প্রতিরোধ করিয়া বাঁচিয়া থাকার যোগ্য রচনা কতগুলি সৃষ্টি হইয়াছে? বৈদিক-যুগের ঋষিকন্যা ও ঋষিপত্নীদের মধ্যে 'মন্ত্রদ্রষ্টা' অর্থাৎ বেদ-মন্ত্র রচনা-কারিণীর সংখ্যা সে হিসাবে নিতান্তই কম বলা চলে না। স্মরণ রাখিতে হইবে, তখন আর্য্য-নারীর সংখ্যাও খুব বেশী ছিল না (এ ঘটনা অনার্য্যমিশ্রণের পূর্ব্ববর্ত্তী কথা) বেদমন্ত্র-রচয়িত্রীগণের মধ্যে আমরা ইঁহাদের নাম জনিতে পারি—অগস্ত্য-পত্নী লোপামুদ্রা, যমী, বিশ্ববারা, আত্রেয়ী, শ্রুতকীর্ত্তি, সত্যশ্রবা, ঘোষা, রিজিপ্সা, জস্মিতা, সুবেদা, অগস্ত্যমাতা, ভারদ্বাজী, রেবতী, নিরাবরী, সৌপায়নী, সারদা, ঐশ্বরা, বাগাম্ভৃনী, শার্দ্দা, অপলা, আঙ্গীরসী, শাশ্বতী এই বাইশজন পূর্ণবিদ্যাপরায়ণা বিদুষী নারী ব্যতীত বিশ্ব-বিশ্রুত-কীর্ত্তি গার্গী মৈত্রেয়ীর নাম সকল শিক্ষিত নরনারীরই সুপরিচিত। ব্রহ্মবিদ্যাপরায়ণ,

অনুরূপা দেবী

বেদমন্ত্ররচয়িত্রী, মহীয়সী এই সকল মহিলা নিশ্চয়ই অবরোধ-বাসিনী ভীরুস্বভাবা অবলা ছিলেন না। যে যুগের নারী যাজ্ঞবল্ক্যের ন্যায় পরম পণ্ডিত মহর্ষির সহিত তর্ক-বিচারে জয়লাভ করিতে পারেন, সে যুগের রমণী নিতান্ত অবলা বা কামিনী ছিলেন না। তাঁহারা আর্য্যা এবং মাতারূপেই গৃহে ও তপোবনে অধিষ্ঠিতা থাকিতেন তাহাতে সন্দেহ কি!

ভারতের পুণ্য তপোবন সে-দিনে বাগ্‌বাদিনী বাণীর বীণার ঝঙ্কারে মুখরিত হইয়া উঠিয়া অনাগত নব-যুগের উদ্বোধন-সঙ্গীত গাহিয়া বিশ্বের সাক্ষাতে নবীন আলোকরেখা প্রতিফলিত করিতেছিল।

সেদিনের কথা স্মরণ করিয়াই এ দেশের কবি গাহিয়াছেন,—

"প্রথম সামরব তব তপোবনে,
প্রথম প্রচারিত তব বন-ভবনে
জ্ঞান-ধর্ম্ম কত কাব্য কাহিনী।"

সভ্যতা বাড়িল, নূতন নূতন সম্পত্তি লাভ হইতে লাগিল। ধনে জনে ভারতবর্ষ পরিপূরিত হইয়া গেল, এক বহুধা হইল। আর্য্য-সভ্যতা শত শত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনার্য্য-সভ্যতাকে নিজের মধ্যে গ্রাস করিয়া লইয়া এক বিরাট বিশাল মহাজাতি এবং মহত্তর সমাজের সৃষ্টি করিল। ইহার মধ্যে কোল, ভীল, সাঁওতাল, নাগা, মুণ্ডা, ওরাওঁ, কুকি যেমন, শক, পার্থিয়ান বা পারদ, হুন, গুর্জ্জর, তেমনই একে একে বা একসঙ্গে মহাসমুদ্রে ক্ষুদ্রতর তরঙ্গিনীসমূহের মতই আত্মবিলয় সাধন পূর্ব্বক ইহাকে পূর্ণ এবং পরিণত করিয়া তুলিল। ক্ষুদ্র বৃহৎ হইল।

সমাজ-বন্ধনের প্রয়োজন ঘটিল। নানা জাতির সম্মিলনে নব নব সভ্যতার উন্মেষে নূতন নূতন আচারের আবশ্যকতা, নবীন বিধি-নিষেধেরও সবিশেষ প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল।

নারী পুরুষের সমান অধিকার খর্ব্ব হইল। তপোবন এবং কুটীর পরিবর্ত্তিত হইয়া গ্রাম নগর এবং গৃহ প্রাসাদের সঙ্গে সঙ্গেই গৃহাধিষ্ঠাতাদিগের মধ্যেও কর্ম্ম-বিভাগের অবশ্য প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল।

জীবন-সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে, বন্য পশু এবং ফলমূলাদি মাত্রে আর সমগ্রের জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহ সম্ভব রহিল না, সঙ্গে সঙ্গেই জীবিকার্জ্জনের জন্য পথ এবং পথান্তরের সৃষ্টি হইতে লাগিল। ধর্ম্মে, কর্ম্মে, জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, শিল্পে, বাণিজ্যে, আচারে, সভ্যতায় ভারত সেদিনে জগতের শীর্ষস্থানীয় এবং বন্দনীয় ছিল। ধনজন, বিষয়, বিভব, কৃষি, বাণিজ্য এবং পুত্রাদি সম্পত্তি রক্ষা এবং ঐ সকলের অর্জ্জন একই ব্যক্তির উপর ন্যস্ত থাকা চলে না, কর্ম্ম-বিভাগের অবশ্যম্ভাবী প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল;—নর এবং নারীর শারীরিক এবং মানসিক অবস্থার উপর ব্যবস্থা করিয়া উভয়ের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইল। একজন বাহিরের কর্ম্ম-কঠিন, ধূলি-লাঞ্ছিত উপার্জ্জনক্ষেত্রে, অপরে কর্ম্ম-সরস, শান্তি-শীতল গৃহ-সাম্রাজ্যে অধিষ্ঠিত হইলেন।

নারী সৃষ্টিনিয়মে জীব-জননীরূপেই সৃষ্টা, সেই হেতু সম্পূর্ণরূপে বাহিরের কার্য্যে নিয়োজিতা হওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভবপরই হইতে পারে না।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে লিখিত আছে—

"সোঽনুবীক্ষ্য নান্যদাত্মনোঽপশ্যৎ। সবৈ নৈব রেমে। তস্মাদেকাকী ন রমতে। স দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ। সহৈতাবা-নাস যথা স্ত্রীপুমাংসৌ সম্পরিসক্তৌ। সইমমেবাত্মানং দ্বেধাঽ পাতয়ত্ততঃ পতিশ্চ পত্নী চাঽভবতাম্।"

সৃষ্টির পূর্ব্বে পরমাত্মা একা ছিলেন, একা সৃষ্টি হয় না,—তাই তিনি তাঁর দ্বিতীয় ইচ্ছা করিলেন এবং তাঁর ইচ্ছামাত্রে তাঁর শরীর দ্বিধা বিভক্ত হইয়া উহা হইতে পুরুষ ও প্রকৃতির, নর এবং নারীর সৃষ্টি হইল এবং উঁহারাই পতিপত্নীরূপে সম্মিলিত হইয়া সৃষ্টি করিতে লাগিলেন।—অনু।

অতএব সৃষ্টি এবং পালনের মধ্যে দুজনকারই সম-প্রয়োজনীয়তা সর্ব্বজনস্বীকৃত এবং অবিসম্বাদী সত্য তত্ত্ব।

পরে নারীর জন্য অন্তঃপুরের সৃষ্টি হইল। নানা কারণে সকল দেশের সুসভ্য ও অর্দ্ধসভ্য মানবসমাজমাত্রেই সামাজিক নর-নারীর মধ্যে গৃহধর্ম্ম নির্ব্বাহার্থ বাহির এবং অন্তরপুরীকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া রাখা নিয়ম আছে।

প্রাচীন ও আধুনিক সমস্ত সভ্য জগতেই এ প্রথা বিদ্যমান। কোথাও এই অন্তঃপুর বিভাগ পাঁচিল দিয়া ঘেরা, কোথাও বা পর্দ্দা দিয়া ঢাকা, কোথাও পাহারা দিয়া আবদ্ধ, কোথাও বিধি নিষেধ দ্বারায় নিবদ্ধ। নর বাহিরের শ্রমবহুল কার্য্যে নিযুক্ত রহিল, নারী গৃহিণী ও জননী রূপে অন্তঃপুরে স্থান লইলেন, গার্হস্থধর্ম্ম পালন এবং সন্তান লালনের জন্য ইহাই নিরাপদ এবং প্রশস্ত ইহাতে সন্দেহ নাই। এইরূপে কর্ম্মসমন্বয় হইল।

তা হউক, এই পর্য্যন্ত আমরা যেটুকু দেখিতে পাইলাম ইহাতে বলিবার কোন কথা নাই; সৃষ্টিনিয়মে নারী মাতা, তিনি মানবজননী, সাধারণতঃ নারীধর্ম্ম পবিত্রচেতা উন্নতিশীল সুসন্তান প্রজননার্থ একনিষ্ঠ সতীধর্ম্মরক্ষা এবং সন্তানের সুপালনেই, তবে ইহার যে ব্যতিক্রম ঘটিবে না এমনও তো হয় না। সমস্ত মানবপ্রকৃতি এক নহে, কেহ সামান্য অর্থের জন্য চুরি ডাকাতি ও ঠগীগিরি করে, কেহ বা জীর্ণ চীরখণ্ডের মতই সমস্ত রাজ্য ধন অবলীলাক্রমে ফেলিয়া যায়। এই জন্যই ঋষি বলিয়াছেন—

"কর্ম্ম বৈচিত্র্যাৎ সৃষ্টি বৈচিত্র্যম্"—এবং "ঋজু কুটিল নানা পথজুষাম্"—সকলের কর্ম্ম এক নয়,—সকলের পথ এক নয়।

পূর্ব্বে যেমন তপোবননিবাসিনী ঋষিকন্যাগণ চির কৌমার্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক বেদাধ্যয়নে ও তপস্যায় জীবনাতিপাত করিতেন, এ যুগে সে তপোবনও নাই, সে ঋষিও নাই, কিন্তু মানুষের প্রকৃতির মধ্যে বৈচিত্র্যের প্রেরণাতো আর তা বলিয়া চির-নিরুদ্ধ হইয়া যায় না!—যে সব ব্রহ্মবাদিনী মেয়েরা পূর্ব্বে চিরকৌমার্য্যে বৃত হইয়া পুরুষের সমকক্ষতা লাভ করিতেন, এ যুগেও তাঁদের সেই মনোবৃত্তি যাঁদের মধ্যে কার্য্যকরী হইয়া আছে তাঁরা অন্তঃপুরের গণ্ডী কাটাইয়া স্ত্রী এবং মা হইতে না চাহিয়া চাহিতেছেন--মেয়ে-পুরুষের তুল্যাধিকার।

ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার খুব বেশি কিছু নাই। চির যুগে যুগেই এমন হইয়াছে। আজ সে তপোবন নাই, ঋষি-নাই, বেদবিদ্যার সে পূর্ব্ব গৌরব বর্ত্তমান নাই, তাপসী বেদাধ্যায়িনী ঋষিবালা কোথা হইতে সৃষ্টি হইবে? সত্বরে ইংরাজীনবিশ পিতার ইংরেজী-পড়া মেয়ে তার কালের যা শিক্ষা দীক্ষা আদর্শ, তাহারই জন্য দাবী তুলিয়াছে মাত্র। যাজ্ঞবল্ক কোথায় যে গার্গী দেখা দিবেন? যদি সেই পূর্ব্ব-তপোবন এবং ঋষিপিতার পুনরুদ্ভব সম্ভব হয়, ব্রহ্মবিদ্যা-বিশারদা ঋষিকন্যারও অভাব ঘটিবে মনে হয় না। কিন্তু সে যতক্ষণ না ঘটিতেছে বিবর্ত্তনের বেগ কি বন্ধ থাকিবে?

এখন অবরোধের সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া দেখা যাক, এবং এই অনুসন্ধান ফলে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে ভারতবর্ষে অবরোধ-প্রথা যে আদৌ ছিল না তা' নয়। প্রাচীন সংস্কৃত এবং পালী সাহিত্য হইতে প্রমাণিত হয় পূর্ব্বকালেও রাজান্তঃপুরবাসিনী কুলকন্যাগণকে 'অসূর্য্যম্পশ্যা' বলিয়া বিশেষভাবে গর্ব্ব করা হইত। 'অসূর্য্যম্পশ্যা' বলিতে এমনই বুঝায় যে তখনকার তাঁরাও আধুনিক বিহারনিবাসিনী বড় ঘরানাদিগের মতই অবরোধবাসিনী ছিলেন। এখনকার বিহারী অন্তঃপুরিকাগণের ন্যায় তাঁদের ঘরেও দ্বার-জানালার সবিশেষ অভাব থাকিত, পথে ঘাটে বাহির তো হইতেনই না। মহাভারত স্ত্রী-পর্ব্বে দেখা যায়, কুরুকুলমহিলাবৃন্দের সম্পর্কে উল্লিখিত হইয়াছে যে, "পূর্ব্বে দেবগণও যাহাদের মুখাবলোকন করিতে পারেন নাই, এক্ষণে তাহারা অনাথা হইয়া সামান্য লোকের নেত্রপথে পতিত হইতে লাগিল।"

রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ডে রামচন্দ্রের সহিত সীতাদেবীর বনগমন উপলক্ষেও এই বাধার কথা বেশ জোরের সঙ্গেই উত্থিত হইয়াছিল।

এই সকল উদাহরণ হইতে আমরা দেখিতে পাইলাম যে প্রাচীনকালে অর্থাৎ বৈদিকযুগের পরেই রাজ-রাজড়াদিগের ঘরে সাধারণতঃ রাণী বা রাজবধূগণ লোকসমক্ষে বাহির হইতেন না, তাঁহারা 'অসূর্য্যম্পশ্যা'ই ছিলেন, কিন্তু তথাপি এই অবরোধকে আমরা এখনকার মত পর্দ্দা সিস্‌টেম বলিতে পারি না। ইউরোপে বা ইংলণ্ডে স্ত্রী-স্বাধীনতার দেশসকলেও রাণী বা রাজ-ঘরণারা সাধারণের মত পায়ে হাঁটিয়া পথে বাহির হন না, রাজরাজড়াদের গতিবিধির জন্য বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থা সর্ব্বদেশে এবং সমস্ত কালেই হইয়া থাকিত এবং এখনও হয়, ইহাতে পূর্ব্বযুগে

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী

অর্থাৎ পৌরাণিক কালে নারী মাত্রেই অবরোধ-বাসিনী অসূর্য্যম্পশ্যা ছিলেন, এমন কথাই প্রমাণ করে না। নেপালেও অবরোধ-প্রথা নাই, কিন্তু রাজবাড়ীর মেয়েদের সেখানেও খোলাখুলি ভাবে পথে বাহির হওয়া রীতি-বিরুদ্ধ।

রাণীরা রাজ্যাভিষেকে, রাজকন্যারা স্বয়ম্বর-সভায়, প্রয়োজন ঘটিলে যুদ্ধক্ষেত্রে স্বামীসহ ভীষণ দুর্গম বিপদসঙ্কুল বিজনারণ্যে, সখীসহ পতি-নির্ব্বাচন-কল্পে নগরে বা বনে যত্র তত্রই ভ্রমণাধিকার উপযুক্ত পাত্রী হইলেই পাইতেন; ইহাও ঐ সকল পুরাণ কাহিনী মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। কাজেই পর্দ্দার বিবি তাঁদের ঠিক বলিতে পারি না।

বৌদ্ধযুগেই প্রধানতঃ আমরা রাজবাড়ীর বাহিরের সাধারণের জীবনযাত্রার সহিত কতকটা পরিচিত হইবার সুযোগ পাই, সেখানে কিন্তু গৃহস্থকন্যা ও গৃহিনীদের আমরা অবরোধবাসিনা দেখিতে পাই না অর্থাৎ অন্তঃপুরিকা হইলেই অসূর্য্যম্পশ্যা নহেন। তাঁদের মধ্যে কেহ বৃক্ষতলে তপস্যামগ্ন সাধকের জন্য আহার্য্য প্রদান করিয়া আইসেন, কেহ জীবন-ভিক্ষার্থ সাধকের চরণে মৃতপুত্র লইয়া গিয়া লুটাইয়া পড়েন, তাঁদের মধ্যে ধনসম্পদ পতিপুত্র সর্ব্বত্যাগিণী হইয়া কত শতই প্রব্রজ্যাগ্রহণান্তর নবধর্ম্ম ও নূতন মার্গকে আশ্রয়পূর্ব্বক বাহিরের কাজে দূর দুরান্তরে পথে প্রান্তরে বাহির হইয়া যান। এমন কি সুদূর সিংহল দেশে পর্য্যন্ত রাজান্তঃপুরিকা ধর্ম্মপ্রচার করিয়া আইসেন। বুদ্ধপত্নী গোপা শ্বশুর প্রভৃতি গুরুজনদের সাক্ষাতে অবগুণ্ঠন প্রদান করিতেন না, তিনি এ সম্বন্ধে অনুযুক্ত হইয়া যে গাথাটি বলিয়াছিলেন সেটি এখানে উদ্ধৃত করিলে অসঙ্গত হয় না—

"শরীর যাঁহাদের সংযত, বাক্য যাঁহাদের সংযত এবং ইন্দ্রিয়সমূহ যাঁহাদের সুরক্ষিত ও মন নির্ম্মল, বদন আচ্ছাদন করিয়া তাঁহাদের কি হইবে? যাঁহাদের চিত্ত সুরক্ষিত, ইন্দ্রিয়সমূহ সুসংযত থাকে, অন্য পুরুষের দিকে যাঁহাদের চিত্তগমন করে না এবং স্ব-পতিতেই যাঁহারা সন্তুষ্ট থাকেন, চন্দ্র-সূর্য্যের ন্যায় তাঁহারা উপযুক্ত ভাবে প্রকাশ পান, তাঁহাদের বদন আচ্ছাদন করিবার প্রয়োজন কি?"

"জানন্তি আশয়ো মম ঋষয় মহাত্মা
পরচিত্ত বুদ্ধি কুশলাস্তথ দেবসঙ্ঘাঃ।
যৎ মহাশীলগুণ সংবরু অপ্রমাদো
বদনাবগুণ্ঠনমতঃ প্রকরোমি কিং মে?"—ললিতবিস্তর

"ঋষিগণ ও দেবগণ পরের চিত্ত জানিতে পারেন, আমার হৃদয়ের ভাব কি তাহা তাঁহারাই জানেন, তাঁরা আরও জানেন আমার শীলগুণ, সংযম ও অপ্রমাদ কিরূপ, অতএব আমি আমার বদনে অবগুণ্ঠন করিব কেন?"

অতএব বুঝা যায় যে মুসলমান আসার পূর্ব্ব হইতেই ধনী সম্প্রদায়ে অবরোধ এবং অবগুণ্ঠন আরও প্রাচীনকাল হইতেই ভারতবর্ষে আরম্ভ হইয়াছিল। কিন্তু মুসলমান আগমনই তো আর এ দেশে প্রথম বৈদেশিক আক্রমণ নয়। গ্রীক, শক, হুণ এ সব আক্রমণ তো সেই কবেকার পূর্ব্বতন কাল হইতেই ভারতের উপর দিয়া ঝড়ের বেগে চলিতেছে। দুর্দ্ধর্ষ ও অশিক্ষিত বহিশত্রুর হস্ত হইতে শারীর শক্তিতে স্বভাবতঃ দুর্ব্বলা নারীকে রক্ষা করিবার জন্যই অবরোধের সৃষ্টি হইয়া থাকা স্বাভাবিক বলিয়াই যেন মনে হয়। সে বহিশত্রু এদেশে আলেকজাণ্ডারের সময় হইতেই বারেবারে এবং ক্রমাগতই দেখা দিতে ক্রটী করে নাই। ইহার পূর্ব্বের কথা অবশ্য সঠিকরূপে জানা যায় না, তবে তখনও 'অসুর', 'রাক্ষস', 'পিশাচ' ও 'দানব'রূপী প্রবল শত্রুপক্ষের অবস্থিতির প্রমাণ ভূরি-ভূরিরূপে পাওয়া যায়। কাজেই বাঁধন ক্রমে দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর করিতে হইয়াছে।

তবে আমার মনে হয় অবগুণ্ঠন জিনিসটা নারীজনোচিত স্বাভাবিক লজ্জাশীলতা-সম্ভূত, এবং স্থান-কাল-পাত্র হিসাবে অবগুণ্ঠন বস্তুটিকে সর্ব্বত্র মন্দও লাগে না। লজ্জা বস্ত্রের অন্তরালে একটি সলজ্জ মধুর সৌন্দর্য্য অবকীর্ণ রহিয়াছে, যেটি নবীনা পত্নী ও বধূর আদর্শটিকে একান্তই পরিপূর্ণ করিয়া তুলে, মধুরতর করিয়া দেয়। নূতন বউয়ের নূতন মুখের ঘোমটা খোলার জন্য যে একটা অদম্য কৌতূহল এবং উন্মাদনা থাকে, সেটি অবশ্য তার মাতৃত্বকালের মধ্যে নাই, সেটুকু বধূরই নিজস্ব বস্তু; সে ভাবটুকু ভারতের নিজস্ব ভাব, ইহার উচ্ছেদ আমার কাম্য নয়। অবরোধ এবং অবগুণ্ঠন ঠিক এক বস্তু নহে। অবরোধের মধ্যে দুর্ব্বলকে দুর্ব্বলতর

করিয়া রাখার দুর্নাম আছে, দুর্ব্বলের প্রতি প্রবলের কতকটা অত্যাচারও যে না আছে তা নয়, এবং এ প্রথার কঠোরতায় সমস্ত নারী-সমাজের শারীরিক এবং মানসিক ক্ষতি ও অপচয়ের প্রবলতম কারণও নিয়তই ঘটিতেছে। কিন্তু অবগুণ্ঠনে সে সব কিছুই নাই, ইহাতে ভারত-মহিলার স্বভাবজাত নম্রতা, কম্রতা ও শোভনশীলতার একটুখানি আভাষ মাত্র প্রকটিত হয়। আজিকালিকার অর্দ্ধাবরিতবক্ষা ইউরোপিয়ার সঙ্গে তুলনা করিলেই ইহা সহজে অনুভব হইবে। নারীর নারীত্বকে পরিপূর্ণ করিয়া তোলার নামই নারীশিক্ষা, ইহার ব্যতিক্রম যাহাতে হয়, তাহা আমাদের উদ্দেশ্যসাধনের ব্যাঘাতক, সহায়ক নহে!

আমাদের 'আধুনিক' হিন্দু সমাজে অনেক বিষয়েরই সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা ঘটিয়াছে আমিও তাহা অস্বীকার করি না, কিন্তু সে সংস্কার প্রাচ্যের সমুদয় সংস্কার বিবর্জ্জিত সম্পূর্ণ ইউরোপীয় প্রথানুযায়ীভাবে হওয়া কখনই বাঞ্ছনীয় বোধ করি না। আমাদের দেশের এবং অবস্থার উপযোগিভাবেই উহা হওয়া উচিত এবং ইহাই আমাদের পক্ষে প্রকৃত মঙ্গলজনক হইবে বলিয়া আমার দৃঢ়বিশ্বাস।

মানুষমাত্রেই সংস্কারের বশীভূত। শুদ্ধবুদ্ধমুক্তাবস্থা ব্যতীত সম্পূর্ণরূপে সংস্কার বর্জ্জন করিতে কেহই পারে না, যদি কেহ করিতে চাহে সে ভ্রান্ত, ভুল পথের পথিক; অথবা সে এক সংস্কার ছাড়িয়া সংস্কারান্তর গ্রহণ করিতে বাধ্য। নিজ সমাজের সকল সংস্কারকেই কুসংস্কার আখ্যা দিয়া দুরীভূত করিতে চাওয়া স্থিরবুদ্ধি প্রাজ্ঞজনোচিত নহে। প্রত্যেক সমাজেরই কতকগুলি সমাজবিধি বা সামাজিক সংস্কার থাকে এবং আছে, সেই বিধি সংস্কারগুলিই প্রতি সমাজের বিশেষত্ব। বাঙ্গালী সমাজ তাহার সমস্ত বিধি নিষেধ ও নিয়মনিষ্ঠা হারাইলেই যে ইংরাজ সমাজভুক্ত হইয়া উঠিবে তা' নয়, এমন কি এ দেশী সংস্কার (যাহা কুসংস্কার বলিয়া উল্লিখিত হইতেছে) ত্যাগপূর্ব্বক, ইংরাজী সমাজের "কুসংস্কার" (যেহেতু ঐ সমাজেও এইরূপ সংস্কারান্তরের অভাব নাই) গ্রহণ করিলেও না। মাত্র সর্ব্বনিয়মনিষ্ঠা ও বিশেষত্ববর্জ্জিত এক নূতন কিছু হইতে পারে এই পর্য্যন্ত! তবে যে সব সাময়িক বিধি-নিষেধ, কারণ বা কারণান্তরের প্রয়োজনানুরোধে সময়-বিশেষে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, দেশ কাল ও পাত্রানুসারে সে সকলের সবিশেষ পরিবর্ত্তন বা পরিবর্জ্জন অপ্রতিবিধেয় হওয়া সঙ্গত নহে। ধর্ম্ম সনাতন কিন্তু আচার কখনও সনাতন হইতে পারে না—যেমন পর্দ্দাপ্রথা। দেখা যায় মুসলমান-অধ্যুষিত প্রদেশগুলিতেই বিশেষ করিয়া এই প্রথাটি জাঁকিয়া বসিয়াছিল।* যেমন উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ, পাঞ্জাব, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ ইত্যাদি। কিন্তু পাঞ্জাবে অবগুণ্ঠনের প্রথা থাকিলেও অবরোধের প্রথা এক্ষণে খুব কম। বাঙ্গালার সহর ভিন্ন পল্লীগ্রাম ইহার কবলে প্রায় পড়েই নাই। এখনও ইহার পূর্ণ প্রকোপ চলিতেছে বিহার ও যুক্ত প্রদেশের অধিবাসিনীদের উপর দিয়াই। এমন কি যে রাজপুত জাতির নারীগণ একসময় যুদ্ধক্ষেত্রে অস্ত্র ধরিয়াছিলেন, আজ তাঁহারা পর্দ্দার জেনানা!

বাঙ্গালার পল্লীগ্রামে পর্দ্দা বলিতে যা বুঝায়, যতটুকু দেখিয়াছি, তেমন কিছু দেখি নাই; বরং এখনই ইহা বাড়িতেছে। কলিকাতা মহানগরীর উপকণ্ঠেই দেখিয়াছি মেয়েরা পায়ে হাঁটিয়া নিমন্ত্রণ খাইতে যায়; ঠাকুর দেখিতে, গঙ্গাস্নান করিতে, পাড়া বেড়াইতে পায়ে হাঁটিয়াই যাতায়াত করিয়া থাকে, কোন নিন্দা নাই। বাঙ্গালী আব্রুপর্দ্দা বাঙ্গালা ছাড়িয়া বেহারে আসিয়াই শিখিয়াছে, বেহার-বাঙ্গালীর মধ্যে পর্দ্দাটা বেশী। তাঁহারা বাংলায় ফিরিয়াও সেই অভ্যাসটা ছাড়িতে পারেন না এবং তাঁদের দৃষ্টান্তে তাঁদের পড়সীরাও পথে বাহির হইতে কুণ্ঠিত হইয়া পড়েন। আর সহরে থাকা বাঙ্গালীও অভ্যাস বদলাইতে বাধ্য হইয়া আব্রু পর্দ্দা করিতে শিখিয়াছেন। বস্তুতঃ বাঙ্গালার মধ্যে পর্দ্দার আঁটাআটি ক্রমশঃ কমিয়া এখন নাই বলিলেই হয়।

এখন কথা হইতেছে তবে এ পর্দ্দার চাপাচাপি কাদের উপর? পর্দ্দা-প্রথা উঠানর জন্য এত হৈ চৈ পড়িয়াছেই

* অথচ এক্ষণে অনেকানেক মুসলমান-শাসিত এবং অধিবাসিত স্থান রাজ্য হইতে পর্দ্দা-প্রথা সম্পূর্ণরূপেই বহিষ্কৃত হইয়া গিয়াছে। আমাদের দেশে প্লেগ কলেরা সব কিছুই যেমন বিদেশ হইতে আসিয়া চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত লইয়াছে, এ প্রথাও তেমনি ছাড়িতে ইতস্ততঃ করিতেছে।

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী

বা তবে কেন ?—এ প্রশ্নের উত্তর এই যে পর্দ্দার কঠোরতা বাংলায় নাই বলিলেই সব কিছুই নাই এমন কথা বলা যায় না।

বাংলায় পর্দ্দার চাপ না থাক, বাংলার বাহিরে 'ডমিসাইল্‌ড্‌' বাঙ্গালীর ঘরের মেয়েদের (সে সংখ্যা তো নিতান্ত কমও নয়) অবরোধের ভার তো একটা আছেই ? আর তারই ফলে বর্ত্তমান অবস্থায় অর্থসামর্থ্যহীন গৃহস্থ সংসারে অনেক সময় অনেক অভাব ও অসুবিধা উপভোগ করিতেও হয়। ধরুন, কাহারও পাঁচটি ছেলেমেয়ে লইয়া বৈধব্য ঘটিল। ঘরে পয়সা নাই, খাটিয়া খাইতে ও খাওয়াইতে হইবে; সেলাই বোনা করিয়া পাঁচ বাড়ীতে বিক্রয় করিয়া আসিতে পারিলে দু পয়সা উপার্জ্জন হয়,—গাড়ীভাড়া করিয়া ঘুরিতে পারা কি সম্ভব ? গরীবের মেয়েটি কোন প্রকারে 'ফ্রি' করিয়া স্কুলে দিল, গাড়ীভাড়া দিবার পয়সা নাই, স্কুলে যায় কি করিয়া ? কম মাহিনার শিক্ষয়িত্রী হইয়াও কিছু রোজগার করা যায়, সহরে ত পথে বাহির হইবার রীতি নাই! এমনই এমনই ঢের অসুবিধা নিয়তই এবং সর্ব্বত্রই দেখিতে পাইতেছি।

"দুঃখ ত্রয়াভিঘাতাৎ জিজ্ঞাসা"—দর্শন-শাস্ত্রের ইহাই মূলসূত্র। ভারতবাসীর অন্তরে বাহিরে দুঃখত্রয়ের অভিঘাতের আত্যন্তিকতাবশতঃ এদেশে দর্শনশাস্ত্রের বিস্তার ও তাহার শাখা প্রশাখার সৃষ্টি ও প্রসার বোধ করি এত বেশি! বাস্তবিক দুঃখাভিঘাত ব্যতীত জিজ্ঞাসারও উদ্ভব হয় না। অভাব থাকিলেই অভাব-বোধ জাগ্রত হয়। এই যে পর্দ্দা উঠানর জন্য ভারতনারীর মধ্যে ঐকান্তিক আগ্রহ জাগিয়াছে, পর্দ্দা প্রথা যদি সকলের পক্ষে সর্ব্বাংশে ইষ্ট-জনক ও সুখকর হইত, তবে একসঙ্গে বঙ্গে বিহারে উত্তর-পশ্চিমে, উড়িষ্যায় ভারতের পর্দ্দাপ্রথাযুক্ত সকল প্রদেশের নারী সমাজ মধ্যে পর্দ্দাপ্রথা পরিবর্ত্তনের জন্য এতখানি আগ্রহ এবং বিদ্রোহ একসঙ্গে আজ জাগিয়া উঠিত না।

অবাস্তব কাল্পনিক দুঃখ লইয়া জনকতক ভাবপ্রবণচিত্ত নর বা নারী অভিভূত হইতে পারেন, কিন্তু যেখানে জন ছাড়িয়া গণের মধ্যে ব্যষ্টি ছাড়িয়া সমষ্টির মনে অভাব-বোধ সঞ্চারিত হইয়াছে দেখা যায়, সেখানে বুঝিতে হইবে সেই প্রথার মধ্যে পরিত্যক্ত হইবার মত বিরুদ্ধ বস্তু আছে, অথবা ইহার পরিবর্ত্তনের কাল আসিয়াছে।

আমাদের মধ্যে পর্দ্দাপ্রথার সবচেয়ে কঠিনতা ভোগ করিতে হয় আমাদের বিহারবাসিনী ভগ্নিদিগকে। এঁদের বড় ঘরের মেয়েরা প্রায় অসূর্য্যম্পশ্যা! ঘরে জানালা থাকে না, অঙ্গন সঙ্কীর্ণতর, ভাই বাপ স্বামীপুত্র প্রায়ই চরিত্রহীন, বোন মেয়ে স্ত্রী মায়ের সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সম্পর্ক বড় কম; বার মহলে বন্ধুবান্ধব, চাকরবাকর, রাত্রে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভাড়া করা স্ত্রীলোক এই সব লইয়াই তাঁদের জীবনযাত্রা প্রায়ই নির্ব্বাহ হয়। ঘরের মেয়েরা থাকেন বধূ অবস্থায় "কনিয়া" বনিয়া। অর্থাৎ রন্ধ্রহীন একটি কুঠরীতে তাঁরা ভোরবেলা গিয়া ঢোকেন,—সঙ্গে থাকেন বাপের বাড়ীর দাসী, তা বড়লোকের মেয়ে হইলে এই দাসীর সংখ্যা বেশ বড় হারেই বর্দ্ধিত থাকে স্বচক্ষেই দেখিয়াছি,—সেই ঘরেই সারাদিন এবং অর্দ্ধেক রাত্রির যাহা কিছু কার্য্য সম্পন্ন করিতে হয়, বহির্গমন নিষিদ্ধ। অর্দ্ধেক রাত্রে সমস্ত বাড়ী নিশুতি হইলে বধূটি পতিগৃহে প্রবেশাধিকার লাভ করিয়া থাকেন, অর্থাৎ যদি এঁর পতিদেবতা এই মধ্যরাত্রের পত্নীসম্মিলনের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া 'বাহিরের টান' ত্যাগ করিতে সমর্থ হন তবেই,—নতুবা রাত্রের সাথীও ঐ বাপের বাড়ীর দাসীটিই। ছেলের মা হওয়ার পূর্ব্বে শ্বশুরবাড়ীর কাকপক্ষীটার সহিত কথা কহিবার প্রথা নাই, তা' শাশুড়ী যদি মরিয়াও যায়, ছেলের বউ তাঁর মুখে একটু জলও দিবে না। এ পর্দ্দা কি ভাল ?

আমি জানি বিহারের এক ভূমিহার জমিদার-রাজার বাড়ীর রাণী, বর্ত্তমান রাজার খুল্লতাতপত্নী, একবার বৈশাখের এক গ্রস্তোদয় সূর্য্যগ্রহণে স্নান করিতে সমারিয়াঘাটে যাত্রা করেন। বিহারীর মধ্যে ভূমিহার ও কায়েথ এই দুই শ্রেণীই বেশীর ভাগ বড়লোক, পর্দ্দার শাসন এঁদেরই বেশী। রাণীজীর পাল্কী বনাতের ঘেরাটোপে মুড়িয়া open truckএর উপরে চড়ানো হইল, তারপর সাত আট ঘণ্টা ধরিয়া ট্রেন চলিল। বৈশাখের অগ্নিবর্ষী প্রচণ্ড রৌদ্রতাপে ঝলসিত হইতে হইতে সেই জরিদার মোটা ঘেরা ঢাকা পাল্কীর মধ্যে থাকিয়া তাঁহার যে কি অবস্থা হইল সে খবর রাখার

প্রয়োজনীয়তা বোধ করার যোগ্য বুদ্ধি নিশ্চয়ই তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গদিগের মধ্যে ছিল না। অবশেষে গঙ্গাতীরের পটাবাসের মধ্যে আনিয়া তাঁহার পাল্কীখানি পর্দ্দার মধ্যে স্থাপনপূর্ব্বক বাহকগণ চলিয়া গেলে দাইএরা আসিয়া পাল্কীর দরজা খুলিয়া দুলহীনজীকে নামিয়া আসিতে অনুরোধ করিতে গিয়া দেখিল যে তাঁহার ওঠানামার সকল শক্তিই নিঃশেষ হইয়াছে, তিনি মরিয়া কাঠ হইয়া আছেন।

এর উপর আর বেশী কথা বলার দরকার আছে মনে করি না, তবে কথায় কথায়ই কথা বাড়ে,—সেবার রেল ষ্টেসনের একটা কাণ্ড হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল! বিহারের এক বৰ্দ্ধিষ্ণু গৃহস্থ অন্যত্র যাইতেছেন, সঙ্গে বিস্তর মোটঘাটের সঙ্গে মোটা চাদরে আপাদমস্তকমণ্ডিতা গৃহিনীও সেই মোটের মধ্যে মোট বনিয়া পুঁটুলী পাকাইয়া বসিয়াছিলেন। ট্রেন আসিল, মুটিয়ারা মোট তুলিয়া দ্রুতহস্তে কামরার মধ্যে ফেলিয়া অন্য লগেজ আনিতে ছুটিবে, তাড়াতাড়ির চোটে সেই কাপড়ের মোটে পরিণত গিন্নীটিকেও তাহারা মোট ভাবিয়া তুলিয়া লইয়া কামরার মধ্যে ফেলিয়া দিল এবং অন্য কুলি সঙ্গে সঙ্গেই অপর একটা ভারী বোঝা ঐ মেয়েটির ঘাড়ের উপর ফেলিল: আশ্চর্য্য যে তথাপি ইজ্জৎ-হানির ভয়ে মেয়েটি চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠে নাই! যখন সর্ব্বত্র খুঁজিয়া অবশেষে মোট-মুট্‌রীর তলা হইতে উহাকে টানিয়া বাহির করা হইল, তখন তাহার অৰ্দ্ধমূৰ্চ্ছিত অবস্থা।

আচ্ছা, যে পর্দ্দা-প্রথায় মানুষকে তার পিতা বা পতির স্থাবর সম্পত্তির মধ্যে পরিণত করিয়া ফেলে, মানুষ রাখে না, সে প্রথার কি কোন দরকার আছে?

আমাদের দেশের লোক যে তামসিকতার জড়ত্বে ডুবিয়া দিনে দিনে জড়পদার্থে পরিণত হইয়া যাইতেছে, এই সব জড়বুদ্ধি ও জড়শরীরী মায়ের গর্ভে স্থানলাভ করিয়া তার চেয়ে ভাল আর কেমন করিয়াই বা হইবে? যাদের মায়েরা "মূঢ়গ্রাহেণাত্মনো যৎ পীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ"—তাদের সন্তানদের যে "ন সুখং ন পরাগতিম্‌", "ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ"-রূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইতে হইবে, সে এমন আশ্চর্য্য কি? এ রকম অনিষ্টকারী পর্দ্দাপ্রথা যে মন্দ এবং এখনকার দিনের পক্ষে একান্তই অপ্রয়োজনীয় তাহাতে সন্দেহ নাই। নারীর মাতৃত্বই জগতে নারীকে সর্ব্বাপেক্ষা পূজ্যা ও বন্দিতা করিয়াছে। তাঁর সেই মাতৃত্বের সম্মানন রক্ষার জন্যই তাঁহাকে সুমাতা করার জন্যই তাঁহার শিক্ষা জ্ঞান ধৰ্ম্মবুদ্ধির পূর্ণ বিকাশের প্রয়োজনীয়তা অবিসম্বাদীরূপে স্বীকৃত। পশু-জননী এবং নর-জননী একইরূপে কেবলমাত্র গর্ভধারিণী হওয়াই সঙ্গত নয়, সঙ্কীর্ণচিত্তা অশিক্ষিতা জননী তার সন্তানকে পূর্ণ মানবরূপে সুশিক্ষিত করিবেন কেমন করিয়া, তাই উচ্চতর ভাবে মাতা হইতে গেলে তাঁহাকে উচ্চতম শিক্ষা দীক্ষা সংসর্গ লাভ পূর্ণরূপেই করিতে হইবে। পর্দ্দাপ্রথা ইহার বিরোধী।

বাঙ্গালা দেশে পূর্ব্বে থাকিলেও আজকাল পর্দ্দার কড়াকড়ি নাই, তবে পূর্ব্বোত্তর বঙ্গের ধনী সম্প্রদায়ের ঘরে এখনও পাল্কীঘেরার মধ্যে গমনাগমনের রীতি কোথাও কোথাও আছে শুনিয়াছি। ও সব দিকে বড় ঘরাণাদের মধ্যে চাকর বাকরের সামনে গিয়া গৃহস্থালীর কৰ্ম্ম দেখা বড়ই নিন্দার কথা, যাকে বলে বাদসাহী চাল! এই সব হইতে দেখা যায়, আমরা কতকাল ধরিয়াই কত পরানুকরণ করিয়া আসিতেছি। আমাদের রাজার জাতির পর্দ্দাপ্রথা প্রবল ছিল, তাই তাঁদের অনুকরণে ও আদর্শে আমরাও আমাদের ঘরে পর্দ্দা খাটাইলাম! (অবশ্য সবটাই ভক্তিতে নয়, এর মধ্যে অনেকখানি ভয়ও ছিল। মেয়ে ধরার ভয় মুসলমান আমলে যে কতখানি প্রবল ছিল পদ্মিনী, দেবলা দেবী প্রভৃতির উদাহরণে সে তো কারো অজানা নয়। আর তার ছোটখাট দৃষ্টান্ত আজও পূর্ব্বোত্তর বঙ্গে হাজারটাই ঘটিতেছে তাও সংবাদ পত্র খুলিলেই দেখা যায়)। * বাদসাহের জাতি স্বভাবতঃই আলস্য এবং আমোদপ্রিয়। আমাদের বড় ঘরের মেয়েপুরুষেও তাই তাঁদের অনুকরণে 'কুড়ের বাদসা' এবং 'পটের বিবি' বনিলেন! যাক্ সে যা হইয়া গিয়াছে তা হইয়া গিয়াছে,—গতস্য শোচনা নাস্তি—এখন দিন আসিয়াছে সে ভুল শুধরাইবার। 'ভ্রম মানব ধৰ্ম্ম' এ বাণী সকল দেশেরই। যখন জানা গিয়াছে মেয়েদের জড়ত্ব ও অমানুষ

* পূৰ্ব্ব বঙ্গের কয়কটি প্রবাদ বাক্যে দেখিতে পাই তুর্ক, অর্থাৎ মুসলমানের ভয়েই মেয়েদের বাধা করার প্রয়োজনীয়তা ঘোষিত হইয়াছে; একটি এইরূপ 'বাধ্য না হ'লে ঝি, তুর্কে নিলে করবো কি?'

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী

আমাদের জাতীয় জীবনকে যেমন জড়তার নাগপাশে নিবদ্ধ করিয়া রখিয়াছে, তেমন ইংরাজরাজের আইনের পাশেও রাখে নাই। অশিক্ষিতা বা কুশিক্ষিতা জননীর গর্ভাশ্রয়ের সন্তান যে শিক্ষার বীজ বা বিষ রক্তের মধ্যে মিশাইয়া লইয়া জন্মায়, সে কি কেহ চিরজন্মেও আর ভুলাইয়া দিতে পারে? পুরাণে যে অতিপ্রাকৃতদোষদুষ্ট উপাখ্যান বলিয়া আমরা শুকদেবের সর্ব্বশাস্ত্রবিদ হইয়া জন্মগ্রহণ, মাতৃগর্ভে থাকিয়া অভিমন্যুর বূ্যহভেদ শিক্ষা প্রভৃতি কাহিনীকে উপহাস করিয়া থাকি, কিন্তু সূক্ষ্মভাবে বিচার করিয়া দেখিলে এই সকল পুরাণ কথাকে ভিত্তিহীন মনে করিবার কারণ থাকে না।

মানুষ যা কিছু শক্তির সঞ্চয় লইয়া আসে, তাহা মাতৃগর্ভে হইতেই লইয়া জন্মায়, একেবারে নূতন করিয়া কিছু সৃষ্টি করিতে পারে না। তাই জাতিকে বড় করিতে হইলে জাতির জননীকে শিক্ষায় ও স্বাস্থ্যে বড় করিতে হইবে। জেমস রাসেল সত্যই বলিয়াছেন "Earth's noblest thing; a woman Perfect.

আমরা লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি, বড় বড় জ্ঞানী গুণী পণ্ডিতের মূর্খ পুত্র, মস্ত বড় ধার্ম্মিকের অধার্ম্মিক সন্তান এই মাতৃবংশদোষে নিয়তই জন্মিতেছে। মাতৃশিক্ষার অভাবে বা প্রভাবে শত সহস্র মানব সন্তান সততই অমানুষে পরিণত হইতেছে, এ কথা আজ নূতন কথা বা গোপন কথা নয়। আদ্যাশক্তির আদ্যশক্তিই জগৎসৃষ্টির মূল, সে শক্তি যদি পরিপূর্ণ না হইত, আমরা এক অসম্পূর্ণ বিকৃতভাবাপন্ন জগৎ সৃষ্ট দেখিতাম। তেমনই যেমন সমষ্টিভাবে তেমনই ব্যষ্টিভাবে প্রতি জীবদেহ জগতের সৃজনকারিণী মহাশক্তিরূপিণী জননীদের শুধু স্থাবর সম্পত্তির মতই রক্ষণ ও পোষণ মাত্র করিয়াই পুরুষের কর্ত্তব্য সম্পূর্ণতা লাভ করিতে পারিবে না। তাঁদের সেই উপনিষদের যুগের মতই "স ইমেবাত্মানং দ্বেধাহ পাতয়ত্ততঃ পতিশ্চ পত্নীচাহ ভবতাম্" এই মহাবাক্যের অনুসরণ করিতে হইবে। আপনাকে দ্বিধা করিয়া পতি পত্নীরূপে উভয়ে মিলিয়া নূতন সৃষ্টি করিতে হইবে, ভারতে নবযুগ আনিতে হইবে। ইহার মধ্যে তুচ্ছ, ক্ষুদ্র, অবান্তর, অপ্রয়োজনীয় লোকাচারের যাহা সে দিনের প্রয়োজনে সমাজ-ধর্ম্ম হইয়া দাঁড়াইয়াছিল মাত্র, যাহা সচল দেশাচার মাত্র, অচল শাস্ত্রবিধি নয়—তাহার স্থান নাই। যদি ইহার জন্য আমাদের দেশের মেয়েদের স্বাস্থ্যহানি হইতেছে এ কথা সত্য হয়, এ বিধি উঠিয়া যাওয়া উচিত; যদি গরীব-গৃহস্থ সংসারে সাংসারিক অসংখ্য অসুখ ও অসুবিধা হইতেছে হয়, যদি এর জন্য বালিকাদের স্কুলের শিক্ষা পাওয়া কষ্টকর হয় এ নিয়ম শিথিল হওয়া বঙ্গে বা বিহারে সর্ব্বথা কর্ত্তব্য।

অবশ্য আমি পর্দ্দা-প্রথা রদ করিয়া অনুপযুক্ত মেয়েদের ও পুরুষের মতই অবাধ হন্টনের অধিকার দিতে এখনই বলিতেছি না। কিন্তু দায়ে দরকারে অবস্থাবিশেষে মেয়েদের পথে বাহির হইতে পারার অধিকার থাকা উচিত। সবারই ঘরে পুরুষ অভিভাবক থাকে না, —বেশী থাকে না; দাসী চাকর এ দিনে ক'জন গরীব গৃহস্থ রাখিতে পারেই বা? এ অবস্থায় পল্লীগ্রামে বাহিরে যাওয়া খুবই রীতি আছে, কিন্তু সহরে নাই। আর লোক এখনকার বেশীর ভাগই সহরে। তারপর গাড়ীর জন্য মেয়েস্কুল চলাই এক মহা দায়। এটায় আমি নিজে ভুক্তভোগী; ঝি-এর সঙ্গে ছোট মেয়েরা যদি হাঁটিয়া যাইতে পারে, কম টাকায় স্কুল চালান শক্ত হয় না এবং অবৈতনিক পাঠশালা খোলাও যায়। এই সব নানা কারণে পর্দ্দাপ্রথা থাকা আর চলে না। আর সত্য কথা বলিতে গেলে বলিতে হয়, 'আছে' বলিয়া যতটা শোনা যায় কাজে আর ততটা নাইও, তবে সদর দরজা খোলা না থাকিলেই যাতায়াতের পথ পাঁচিলের ভাঙ্গা পথেই চলিতে থাকে। ইহাতে যাত্রী এবং পাঁচিলের অধিকারী দুপক্ষেরই লোকসান, দর্শকের পক্ষেও দৃষ্টি শোভন হয় না। বিদেশী অনুকরণে আমাদের কাজ কি? আমাদেরই দেশে, আমাদেরই স্বজাতি এবং স্বধর্ম্মী মহারাষ্ট্রে এবং দাক্ষিণাত্যে মেয়েদের সম্বন্ধে যে উদারতাপূর্ণ ব্যবহার পূর্ব্বাপর হইতেই চলিয়া আসিতেছে (সেখানে অন্তঃপুর আছে, স্বধর্ম্মনিষ্ঠা আছে, অবরোধ নাই, কখনও ছিল না উহাই ভারতীয় আদর্শ) ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ সকলে তাহারই অনুকরণ হোক, এ ছাড়া আমার আর বেশী কিছু বলিবার নাই।

বেপরোয়াভঙ্গিগণের প্রতি আমার নিবেদন এই যে, আমাদের কর্ত্তব্য এখন আমাদের উপযুক্ততা প্রমাণ করিয়াই এই বহুকাল প্রচারিত ব্যবস্থার পাশ হইতে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করিয়া লওয়া। বেশী তাড়াতাড়ি বা বাড়াবাড়ি করিয়া ফেলিলে ধৃষ্টতা ও অসহিষ্ণুতাই প্রকাশ পাইবে, তাহাতে হয়ত স্থায়ী ফললাভ হইবে না। "শনৈঃ পন্থাঃ" এই বাক্যটির মূল্য সব দেশেরই লোকে বুঝে। ঝড়ের গতি স্থায়ী হয় না, বন্যার বেগও শীঘ্র শেষ হয়।

ধীরে ধীরে দেশকালপাত্রোচিতভাবে এই আবরণমুক্ত জীবনকে আমাদের নিয়ন্ত্রিত করিয়া তুলিতে হইবে। স্বাধীনতা খুব বড় জিনিষ বটে, কিন্তু বাঁধভাঙ্গা জল, শেকল-ছেঁড়া হাতী, বাতাসে ছড়ান আগুন এদের স্বাধীনমূর্ত্তি খুবই নিরাপদ নয়। আমরা যদি সংস্কারমুক্ত হইতে চাই প্রথমে মুক্তি দিতে হইবে বহুদিনের পুঞ্জীভূত জড়তাকে। মেয়েদের শিক্ষা-সহবতের সুব্যবস্থা না করিয়া দিয়া শুধুই অল্পমতি অশিক্ষিতা অনুপযুক্ত মেয়েদের পায়ের বাঁধন খুলিয়া দিলেই তাদের দেওয়া শেষ হইল না এই কথাটি আমাদের সর্ব্বদাই বিশেষভাবে মনে রাখিতে হইবে। আর তাদের অপরাপর সমুদয় শিক্ষার মধ্যে এ দেশের সর্ব্বপ্রধান শিক্ষা পাতিব্রত্য ও মাতৃত্ব এইটুকুও ভুলিলে চলিবে না। ঘরকে বাহির এবং বাহিরকে ঘর করিয়া নয়, ঘরকে ঘর রাখিয়া আমাদের বাহিরকে কর্ম্মক্ষেত্র করিয়া লইতে হইবে।

পুরুষের সহিত বিদ্রোহ করিয়া আমাদের স্বাধীনতার সমরঘোষণা করিবার প্রয়োজন নাই, যেহেতু আমাদের এ দাবী অন্যায় নহে। বরং হৃদ্যতার সহিত সখ্যতার সহিত তাঁদের বলিতে হইবে,—

"We mutually pledge to each other, our lives' path."
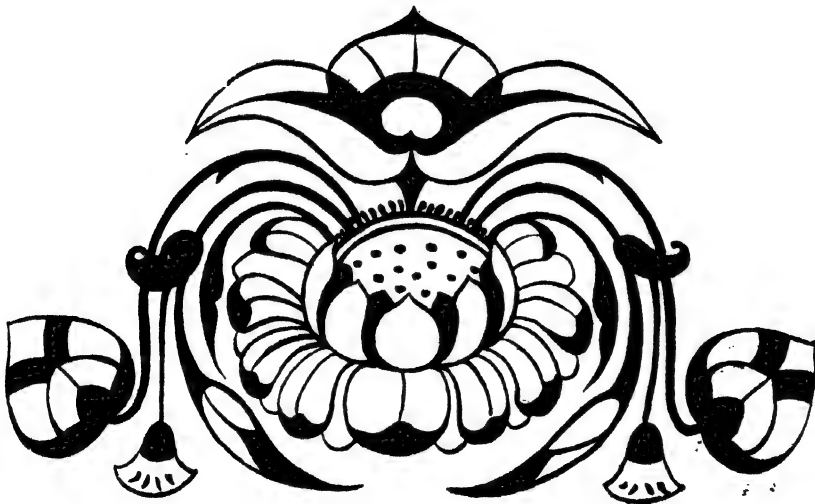
বিলম্বিতা

শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়

কত সাধনায় এলে যদি, হায়,
কেন এলে কেন এলে !
আমার সে-মন গেছে বহু খন
আমার এ-মন ফেলে ।
সে-আমি কি আর সেই-আমি আছি ?
যৌবনমুখে ভেসে চলিয়াছি ;
যে-ঘাটে তোমায় ডেকেছিনু, হায়,
সে-ঘাট রহিল পিছে ।
আজি এতদূরে আসি' বন্ধু রে
কত আসা হলো মিছে !

কেন জানিলে না রজনীর চেনা
রজনী পোহালে বাসি !
ক্ষণিক জীবন — প্রেম কতখন
বিফলে বাজাবে বাঁশী !
উতলা চরণ থির নাহি রহে
অভিসারিকার সুচির বিরহে ;
আপনি কখন ফিরে চলে মন
কুঞ্জ-বীথিকা হতে ।
নিরাশার ব্যথা নিশীথের কথা
তলায় দিনের স্রোতে ।

সারা দিন ভর কোথা অবসর
অতীতের কথা ভাবি !
নূতন রাতের সাথে আসে ফের
নূতন রাতের দাবী ।
ভাঙা বাঁশী তুলি' লয়ে আর বার
করি প্রাণপণ ; হয়তো আবার
তেমনি নিরাশা আঁখি নিদ নাশা
চূর করে দেয় হাসি !
ক্ষণিক জীবন— প্রেম কতক্ষণ
বিফলে বাজাবে বাঁশী !

কেন করিলে না প্রণয়ের দেনা
হাতে হাতে পরিশোধ ?
কেন খেলাছলে করিলে সবলে
হৃদয়-দুয়ার রোধ ?
আঘাত আবরি' যে-জন ফিরিল,
আঘাত পাসরি' যে-জন মরিল,
ডাকো ডাকো ডাকো সাড়া পাবে নাকো
আমি ত সে-জন নই !
আমার মাঝে কে কবে গেছে থেকে
ঠিকানা তাহার কই ?

আজি অকারণে জাগাও স্মরণে
কবেকার কত স্মৃতি !
স্মৃতি এলে ফিরে ফেরে কি সখি রে
হারানো দিনের প্রীতি !
প্রথম দেখার সে যে বিস্ময় !
এক-ই রূপ দেখা ত্রিভুবনময় !
মৃগনাভি বুকে মৃগসম সুখে
সে যে প্রেম ব'য়ে ফেরা !
এত দিন বাদ হলো তব সাধ
তারি অভিনয় হেরা !

বিলম্বিতা

শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়

ফোটাব কেমনে যুবার জীবনে
কিশোরের কোকনদ !
কোকনদ পরে পড়িবে কি-ক'রে
কিশোরী-তুমি'র পদ !
বধিরা দেবীর প্রসাদ প্রারথি'
পূজারী নিবায়ে গিয়াছে আরতি ;
সে-দিনের ডাকে সাড়া দিলে যা'কে
আমি সে-পূজারী নই !
যে-পূজা থেমেছে আজি তার মিছে
হবো নাকো অভিনয়ী ।

কত দাও খোঁচা বলি, "গেছে বোঝা
তোমার প্রেমের রীতি !
যত না চপল ততোধিক খল
তোমার মুখের প্রীতি ।
আজীবন নাহি রয় যে অপেখি'
আপনা-পাসরা সাঁচা প্রেম সে কি ?
সে কি সুগভীর ? সে কি অনধীর ?
সে কি প্রেম ! সে কি সোনা !
গেছে গেছে বোঝা তোমার সে-খোঁজা
নিছক্ শিকারীপনা !"

বেশ, তাই হোক ! মুছে ফেল শোক—
আমারি যতেক ত্রুটি ।
অক্ষমে ক্ষমা করো নিরুপমা,
পলাতকে দাও ছুটি ।
চিরটি জীবন একঠাঁই থেমে
কোরো তবে পূজা নিষ্ফল প্রেমে !
আপনা পরখি' মিটাইও সখি
পর-বিচারের সাধ !
আজি শুধু ক্ষমা করো নিরুপমা,
বিমুখের অপরাধ ।

জিন্ দার্ক এ্যা দোম্‌রেমি — এইচ্ সাপ্

আফ্রোদিতে, ভেনুস্ দ' মিলো
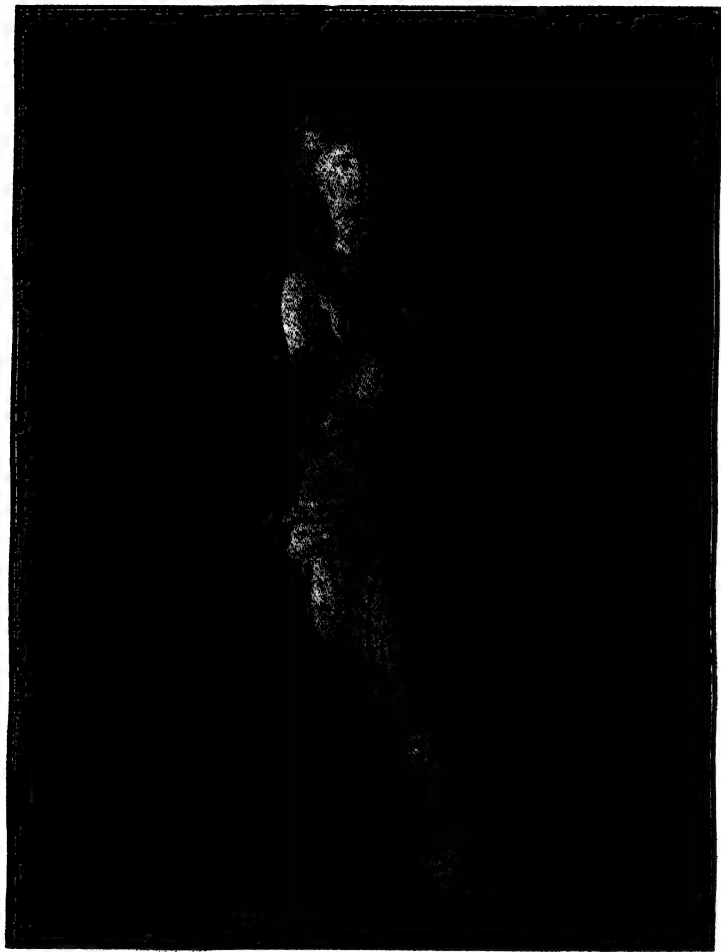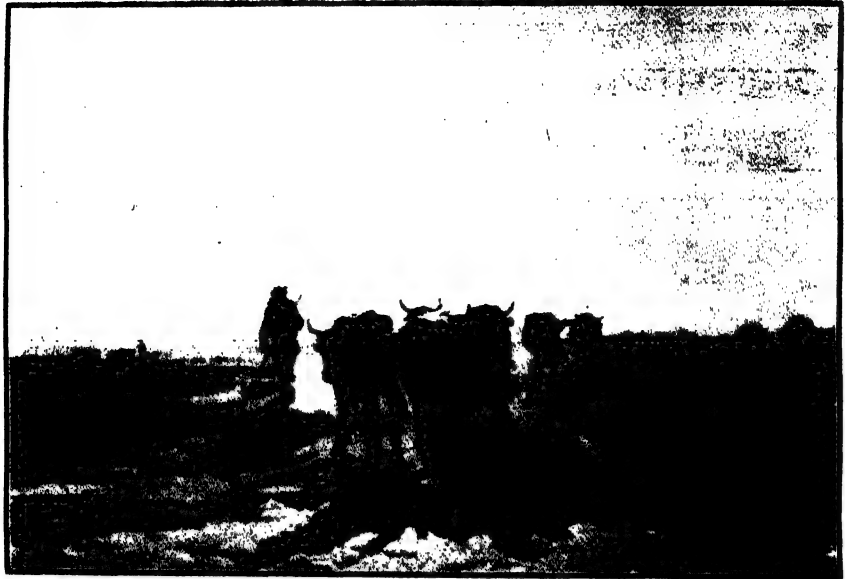
মাঠের পথে সি ত্রৈয়োঁ

মন্দিরের ডাক মিলে

বোনাপার্ত এ্যা আর্‌কোলে এ জে গ্রো

তরুণ সন্ন্যাসী ম্যুরি-ইয়ো

এসক্লাভ্   মিশেল আঁজ

অভিমান   মিসোনিয়ে

বাংলা গদ্যের ভাষা

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক

মানুষ গদ্যে কথা বলে, পদ্যে নয়। কিন্তু দেখা যায় সকল দেশের সাহিত্যই জন্ম লাভ করে পদ্যে। পদ্য যেন সাহিত্যের জননী, গদ্য পরিণত বয়সের সঙ্গিনী।

এক সংস্কৃত সাহিত্যই এই সত্যের জল-জীয়ন্ত প্রমাণ। বেদই সংস্কৃত সাহিত্যের মূলধন—কিন্তু ঐ বেদ যে পদ্যময় তা বেদ না প'ড়েও এই থেকে বোঝা যায় যে বেদের আর এক নাম ছন্দস্।

অবশ্য বেদের সংস্কৃত লৌকিক সংস্কৃত নয়, কিন্তু লৌকিক সংস্কৃতেরও আদিম গ্রন্থগুলি নিছক পদ্যে লেখা। রামায়ণ হতে মেঘদূত পর্য্যন্ত যে একটানা পদ্যের স্রোত ব'য়ে গিয়েছে, তার আশে পাশেও গদ্যের ক্ষীণ ধারাটি দেখতে পাই না। যে সব ক্ষেত্র দিয়ে গদ্যের ব'য়ে যাবার কথা—অর্থাৎ দর্শন, জ্যোতিষ, চিকিৎসা, ইতিহাস—সেখানেও দেখি পদ্যের তরঙ্গলীলা। অর্থাৎ পদ্য কাব্যের খাদে না নিবদ্ধ থেকে একদিন দু-কূল ছাপিয়ে ঐ সব ক্ষেত্রকেও ভাসিয়ে দিলে—যদিও তাতে ক'রে ঐ সব ক্ষেত্রের উর্ব্বরতা কত দূর বেড়েছিল তা বলা শক্ত।

পদ্য যখন মরিয়া হ'য়ে উঠে জ্ঞানের রাজ্যের দিগ্বিদিকে ছুটে বেড়াচ্ছিল, তখন গদ্য বেচারী যে, ভয়ে আড়ষ্ট হ'য়ে দৈনন্দিন কথাবার্ত্তার মধ্যেই গা ঢাকা দিয়ে লুকিয়ে ব'সে থাকবে তাতে আর আশ্চর্য্য কি? সে আস্তে আস্তে তখনই মাথা তুলতে সাহস করলে যখন পদ্য অনেকটা নিস্তেজ হ'য়ে হাঁপিয়ে পড়েচে। কাদম্বরী সেই যুগেরই কাব্য।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসও ঠিক এই। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী হ'তেই এই সাহিত্যের আকাশে পদ্যের নীহারিকার সন্ধান মেলে, কিন্তু চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে যখন বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের দুই উজ্জল নক্ষত্র জ্ব'লে উঠ্‌লো, তখন পর্য্যন্ত গদ্যের উত্তপ্ত বাষ্প যে একটুও জমাট বাঁধেনি তা যাঁরা দূরবীন্ কস্‌তে জানেন তাঁরাই হলপ ক'রে ব'লে থাকেন। তাঁদের মতে খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে রূপ গোস্বামীর 'কারিকায়' বাংলা গদ্যের প্রথম অস্পষ্ট নমুনা চোখে পড়ে।

কিন্তু এর কারণ কি? জীবনে যদি গদ্যই পদ্যের অগ্রণী হয় তবে সাহিত্যে তার উল্টোটা দেখি কেন? এর প্রথম কারণ বোধ হয় এই যে, সাহিত্য জীবনের প্রতিচ্ছবি হ'লেও—সাহিত্যকে মানুষ এমন রূপ দিয়ে গড়তে চায় যা জীবনে নেই। সাহিত্য যে দৈনন্দিন জীবনের দাগার উপর দাগা বুলিয়ে চলবে না—সে যে তারও অতিরিক্ত কিছু হবে, এ ইচ্ছা নিতান্ত বিষয়ী মানুষেরও অস্থি মজ্জার ভিতরে নিহিত আছে। দ্বিতীয় কারণ, পদ্যের চেয়ে গদ্য লেখা শক্ত। একথা শুনে অনেকে হয়ত চম্‌কে উঠ্‌বেন, কিন্তু তলিয়ে দেখলে ঐ আচমকার চমক এক নিমিষেই ভেঙ্গে যেতে বাধ্য। পদ্যের ছন্দে একটা সহজবোধ্য নিয়ম আছে—তার উত্থান পতন নির্দ্দিষ্ট কালের ওজন মেনে চলে। তার সুরও, গোলাম মোস্তাফা যা বলেচেন, সকলের কানেই অজ্ঞাতসারে ধ্বনিত হচ্চে—একটা মানুষের নাম, একটা রাস্তার নাম, একটা পাখীর ডাক্—সবই যেন এক এক ছন্দের কবিতার এক একটি ছত্র।

গদ্যে সুর তাল যে নেই তা নয়, কিন্তু তা যেমন সূক্ষ্ম তেমনি জটিল। তা যেন সব নিয়মকে উল্লঙ্ঘন ক'রেও নিয়ম মেনে চলে। তার ভিতরও হিসাব আছে, মাত্রা আছে, ওজন আছে, কিন্তু তা সকলের কানে বাজে না। তাই যাঁরা পদ্য লিখতে পারেন, তাঁদের পক্ষে গদ্য লেখা তত সহজ নয়, যত যাঁরা গদ্য লিখতে পারেন তাঁদের পক্ষে পদ্য লেখা সহজ। আর এই জন্যই আমরা দেখতে পাই—বড় লেখকদের পদ্যের হাতও যেমন পাকা গদ্যের হাতও

তেমনি। গদ্যের হাত কাঁচা থেকে গেলে—পদ্য গদ্যে অনেক সময় তফাৎ রাখা দায় হ'য়ে ওঠে, গদ্য ক্ষেপে উঠে প্রায়ই পদ্যের চালে চলে—কিন্তু সে ময়ূরপুচ্ছধারণের বিড়ম্বনা মাত্র। সে না হয় পদ্য না হয় গদ্য—বা ইংরাজীতে বলতে গেলে—prose run mad and poetry run lame.

রূপ গোস্বামীর কারিকার পর দেহ-কড়চা ও ভাষা পরিচ্ছেদ দুখানি নবাবিষ্কৃত পুঁথির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। দেহ-কড়চার ভাষার নমুনা এই—তুমি কে? আমি জীব। আমি তটস্থ জীব। থাকেন কোথা? ভাণ্ডে। ভাণ্ড কিরূপে হইল? তত্ত্ব বস্তু হইতে। তত্ত্ব বস্তু কি কি? পঞ্চ আত্মা একাদশেন্দ্র। ছয় রিপু ইচ্ছা এই সকল একযোগে ভাণ্ড হইল।

ভাষা পরিচ্ছেদের ভাষার নমুনা এই।

গোতম মুনিকে শিষ্য সকলে জিজ্ঞাসা করিলেন আমাদের মুক্তি কি প্রকারে হয়। তাহা কৃপা করিয়া বলহ। তাহাতে গোতম উত্তর করিতেছেন। তাবৎ পদার্থ জানিলেই মুক্তি হয়। তাহাতে শিষ্যেরা সকলে জিজ্ঞাসা করিলেন পদার্থ কতো। তাহাতে গোতম কহিতেছেন পদার্থ সপ্ত প্রকার।

তারপর বৃন্দাবনলীলা ও বৃন্দাবনপরিক্রমা নামে দুখানি বৈষ্ণব গ্রন্থ। বৃন্দাবনলীলার সামান্য একটু অংশ উদ্ধৃত করচি—

তাহার উত্তরে এক পোয়া পথ চারণ পাহাড়ির পর্ব্বতের উপরে কৃষ্ণচন্দ্রের চরণ-চিহ্ন ধেনু-বৎসের এবং উটের এবং ছেলির এবং মহিষের এবং আর আর অনেকের পদচিহ্ন আছেন। যে দিবস ধেনু লইয়া সেই পর্ব্বতে গিয়াছিলেন সে দিবস মুরলীর গানে যমুনা উজান বহিয়াছিলেন এবং পাষাণ গলিয়াছিলেন। সেই দিবস এই সব পদচিহ্ন হইয়াছিলেন।

এর পরই পাই কালীকৃষ্ণ দাসের কামিনীকুমার। এখানি অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে রচিত। যে ভাষায় টেকচাঁদ ঠাকুর আলালের ঘরের দুলাল রচনা করেছিলেন এ সেই ভাষারই পূর্ব্ব প্রবর্ত্তক। একটু নমুনা দেখুন—

"কামিনী কহিলেক ওহে চোর তুমি আমার কি কর্ম্ম করিবে, কেবল হুঁকার কর্ম্মে সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকহ, আর এক কথা তোমাকে চোর চোর বলিয়া সর্ব্বদা বা কাঁহাতক ডাকি—আজি হইতে আমি তোমার নাম রামবল্লভ রাখিলাম। এই প্রকার রামবল্লভ তামাক সাজ কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন, পরে ক্রমে ক্রমে তামাক সাজিতে সাজিতে রামবল্লভের তামাক সাজার এমত অভ্যাস হইয়া গেল যে রামবল্লভ যদ্যপি ভোজনে কিম্বা শয়নে আছেন ও সেই সময়ে কামিনী যদি বলে ওহে রামবল্লভ কোথায় গেলে হে—রামবল্লভের উত্তর আজ্ঞা তামাক সাজিতেছি।"

১৮৯১ খৃষ্টাব্দে রাজীবলোচন দাস 'কৃষ্ণচন্দ্র চরিত' নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। এ বইখানি বেশ খাঁটি বাংলায় লেখা—এর উপর ইংরাজী গদ্যের কোনই প্রভাব নেই। দুচার লাইন উর্দ্ধৃত করলেই বুঝতে পারবেন।

"যুদ্ধ ভাল হইতেছে না দেখিয়া নবাবের চাকর মোহনদাস নামে একজন সে নবাব সাহেবকে কহিলেন—আপনি কি করেন—আপনার চাকরেরা পরামর্শ করিয়া মহাশয়কে নষ্ট করিতে বসিয়াছে। নবাব সঙ্গে প্রণয় করিয়া রণ করিতেছে না—অতএব নিবেদন আমাকে কিছু সৈন্য দিয়া পলাসার বাগানে পাঠান—আমি যাইয়া যুদ্ধ করি।"

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজ সিভিলিয়ানদের বাংলা শেখাবার জন্য কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রতিষ্ঠা হয়, এবং কয়েকজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত বাংলা ভাষার অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার তার মধ্যে অন্যতম। ইনি ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে 'প্রবোধ চন্দ্রিকা' নামে নবা সাহেব-জাতের শিক্ষার জন্য একখানি বই লিখলেন। বইখানি আভাঙ্গা সংস্কৃতই, কেবল অনুস্বার বিসর্গ বাদ। এ বাংলা লোকের মুখের বাংলা নয়, দায়ে প'ড়ে সংস্কৃত ভেঙ্গে গড়া। এই কৃত্রিম ভাষাই আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে আদর্শ সাধু বাংলা হ'য়ে দাঁড়াল, এবং আজ একশ বছরের উপর হ'ল আমরা এই কৃত্রিম ভাষার খাঁড়ার চাপে ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়ছি—কিন্তু এড়াতেও পারচি না। যদি এ ভাষার নাগপাশ কাটিয়ে

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক

কেউ বাইরে বেরোবার চেষ্টা করেন, অমনি সাধুবাদীর দল ভাষার জাত নষ্ট হ'ল ব'লে চীৎকার ক'রে ওঠেন; এমনি ঐ ভাষার মোহ আমাদের ঘাড়ে চেপে বসেচে। সেদিনও বঙ্কিম বাবু ঐ ভাষার আংশিক সমর্থনে বলেচেন—"প্রায় সকল দেশেই লিখিত ভাষা এবং কথিত ভাষায় অনেক প্রভেদ। যে সকল বাঙ্গালী ইংরেজী সাহিত্যেই পারদর্শী, তাঁহারা একজন লণ্ডনী কক্‌নীর বা একজন কৃষকের কথা সহজে বুঝিতে পারেন না এবং এতদ্দেশে অনেকদিন বাস করিয়া বাঙ্গালীর সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে যে ইংরেজরা বাংলা শিখিয়াছেন তাঁহারা প্রায় একখানি বাংলা গ্রন্থ বুঝিতে পারেন না।

বাংলার লিখিত এবং কথিত ভাষায় যতটা প্রভেদ দেখা যায় অন্যত্র তত নহে। বলিতে গেলে কিছুকাল পূর্ব্বে দুইটি পৃথক ভাষা বাংলায় প্রচলিত ছিল—একটির নাম সাধুভাষা অপরটির নাম অপর ভাষা। একটি লিখিবার ভাষা, দ্বিতীয়টি কহিবার ভাষা।"

এ কথার উত্তরে এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে এদেশে কোনকালেও কাগজ কলমের বাইরে সাধুভাষার অস্তিত্ব ছিল না। ঠিক যেমন আমাদের বড় গৌরবের সংস্কৃত ভাষাও কোনদিন কথিত ভাষা ছিল না। কথিত বৈদিক ভাষা ও পরবর্ত্তী প্রাকৃত ভাষাকে চেঁচে ছুলে ব্যাকরণবদ্ধ ক'রে তৈরী করা হয়েছিল। ঐ সাধুভাষাও অনেকটা তাই। তবে দুঃখের বিষয় এ আবার সেই সংস্কৃত ভাষার অনুকারী—অন্ধের পথ প্রদর্শক অন্ধ—মৃতের স্কন্ধে মৃতদেহ।

ইংরেজী লিখিত ভাষা কক্‌নী বা কৃষকের ভাষা না হ'লেও উচ্চশ্রেণীর ইংরাজের কথিত ভাষা। যখনই লিখিত ভাষা কথিত ভাষা হতে একটু দূরে পড়চে তখনই তাকে আবার শেষোক্ত ভাষার সঙ্গে সমসূত্রে টেনে আ'না হচ্চে—এজন্যই সে ভাষা এখনো মরেনি। বারবার জীবন্ত ভাষার কষ্টিপাথরে যাচাই ক'রে ছেড়ে দেওয়া হচ্চে ব'লেই—তার খাদটুকু আপনা হ'তেই বেরিয়ে যাচ্ছে এবং সে নতুন সোনা হয়ে দাঁড়াচ্চে। প্রতি বসন্তে সাপের খোলস ছাড়বার মত এ ভাষাও যুগে যুগে তার পার্থক্যের আবর্জ্জনা দূর করে' ফেলে কথিত ভাষার সঙ্গে হাত ধরাধরি ক'রে চিন্তা ও ভাবের রাজ্যে অগ্রসর হচ্চে।

বঙ্কিমবাবু সে যুগের লোক—তাঁর কথা স্বতন্ত্র, কিন্তু শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন সেদিনও তাঁর বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে যা লিখেচেন তা কি ক'রে মানা চলে? তিনি লিখেচেন—"কথিত ভাষা কখনই লিখিত ভাষায় পরিণত হইতে পারে না। দেশের ভিন্ন ভিন্ন অংশের প্রচলিত ভাষার একীকরণ জন্য লিখিত ভাষার স্বাতন্ত্র্য আবশ্যক। যদি কলিকাতার কথিত 'গেলুম' লিখিত রচনায় স্থান পায় তাহা হইলে শ্রীহট্টের 'গ্যাছলামই' বা সে অধিকারে বঞ্চিত হইবে কেন?"

কথিত প্রাদেশিক ভাষায় বিরোধ প্রকৃতিরাজ্যের সনাতন নিয়ম অনুসারে আপনা হতেই মীমাংসিত হ'য়ে যায়। যেটি বলবত্তম সেইটিই সাহিত্যের মধ্যে টিকে থাকে—এ সত্য শুধু ইংলণ্ডে ফ্রান্সে কেন—এই বাংলা দেশেই যে প্রতিপন্ন হচ্চে তা অপক্ষপাত ব্যক্তি মাত্রেই বলবেন। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ নিজে তাঁর "ভাষার কথা" নামক প্রবন্ধে এই কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেচেন—এমন কি শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরীর হালি বাংলা ভাষা যে তাঁর ভাষার চেয়েও বেশী শক্তিমান্ এবং অস্তিত্ব-সংগ্রামে বেশী টিকবার উপযুক্ত—তা তাঁর উদার অকপট চিত্ত ব্যক্ত করতে ভোলেনি। কিন্তু যাক্ সে কথা।

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার যে ভাষার প্রবর্ত্তন করলেন সে ভাষা কতটা অযথা সন্ধিবদ্ধ ও সমাসবিড়ম্বিত—তা এই উদ্ধৃত অংশগুলি হতেই বুঝতে পারবেন।

> অকারাদি ক্ষকারান্তাক্ষরমালা যদ্যপি পঞ্চাশৎসংখ্যক কিম্বা একপঞ্চাশৎসংখ্যকা কিম্বা একপঞ্চাশৎ কিম্বা সপ্তপঞ্চাশৎ সংখ্যা পরিমিতা হউক তথাপি এতাবন্মাত্র কতিপয় বর্ণাবলী বিন্যাসবিশেষ বশতঃ বৈদিক লৌকিক সংস্কৃত প্রাকৃত পৈশাচাদি অষ্টাদশ ভাষা ও নানাদেশীয় মনুষ্যজাতীয় ভাষা বিশেষবশতঃ অনেক প্রকার ভাষাবৈচিত্র্য শাস্ত্রতো লোকতঃ প্রসিদ্ধ আছে।

* * *

> দূরবর্ত্তি হট্টগামী লোকেদের শ্রবণবিষয়ীভূত হট্টাগত ধ্বনিমাত্রাত্মক কেবল কোলাহল হয়। অনন্তর কতিপয় পদ গমনোত্তর

সমনস্কশ্রবণেন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ বশতঃ প্রথমঃ বর্ণমাত্র গ্রহণ হয়। তদুত্তর বসন ভূষণ কদলীমূলক ইত্যাদি পদমাত্র শ্রবণ হয়। তদনন্তর হট্ট নিকট প্রাপ্যুত্তর ক্রয়বিক্রয়কারি পুরুষদের বাক্য শ্রুতি হয়। অতএব অস্মদাদির ভাষা চতুর্ব্যূহরূপে প্রবর্ত্তমান ভাগাত্ হেতুক পূর্ব্বোক্ত কম হট্টস্থ পুরুষভাষার ন্যায় ইত্যনুমানে সকল মানুষ-ভাষার চতুর্ব্যূহরূপত্ব নিশ্চয় হয়।

অন্যান্য দেশীয় ভাষা হইতে গৌড়-দেশীয় ভাষা উত্তমা—সর্ব্বোত্তমা সংস্কৃত ভাষা বাহুল্য হেতুক।

অতএব হে পুত্র স্ববুদ্ধির স্থূলত্বদোষ পরিহারার্থে শাস্ত্ররূপী শাণে সতত অনুশীলন রূপে ঘর্ষণ করিয়া তীক্ষ্ণতা সম্পাদন কর। তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি তীক্ষ্ণ-শরের ন্যায় বিষয়ের কিঞ্চিন্মাত্র প্রদেশ স্পর্শন করত অভ্যন্তর প্রবিষ্ট হয়। স্থূলবুদ্ধি প্রস্তর প্রায়। বিষয়ের যাবৎ প্রদেশ স্পর্শন করিয়াও বাহিরে থাকে।

রাজা বড়াহ নদাতীরে নর্ত্তক বেতালের পাদাস্ফালনযুক্ত এবং ভয়ঙ্কর ডাকিনীর ডমরুধ্বনি সহিত ও সহস্র সহস্র শিবার ঘোররাব-সংযুক্ত এবং রাক্ষসীর ক্রীড়াযুক্ত আর বৃকপাল সহিত কৃষ্ণ চিতাঙ্গার-করণক-বিচিত্রিত মহাভয়ানক শ্মশান স্থান প্রাপ্ত হইলেন।

তবে তিনি খাঁটি চলতি বাংলাতেও লিখতে পারতেন তার নিদর্শন প্রবোধ চন্দ্রিকা গ্রন্থ হতেই দিচ্চি।

ইহা শুনিয়া বিশ্ববঞ্চক কহিল তবে কি আজি খাওয়া হবে না? ক্ষুধায় কি মরিব? তৎপত্নী কহিল—'মরুক মাগে আজি কি পিঠা না খাইলেই নয়? দেখি দেখি হাঁড়িকুড়ি খুদকুঁড়া যদি কিছু থাকে। ইহা কহিয়া ঘর হইতে খুদকুঁড়া আনিয়া বাটিতে বসিয়া কহিল। শীলটা ভাল বটে, নোড়াটা যা ইচ্ছা তা, এতে কি চিকন বাটনা হয়? মরুক যেমন হউক বাটিত। ইহা কহিয়া ক্ষুদকুঁড়া বাটিয়া কহিল—বাটাতো একপ্রকার হইল। আলুনি পিঠা খাইবা না নুন তেল আনিতে হইবে? গতিক্রিয়ার এই কথা শুনিয়া, বিশ্ববঞ্চক কহিল। ওরে বাছা ঠক! তৈল লবণ কোথা হইতে গোছেগাছে কিছু আন। ইহা শুনিয়া ঠক নামে তৎপুত্র কোন পড়সীর এক ছেলিয়াকে 'আয় আমার সঙ্গে তোকে মোয়া দিব' এইরূপে ভুলাইয়া সঙ্গে লইয়া বাজারে গিয়া এক মুদীর দোকানে ঐ বালককে বন্ধক রাখিয়া তৈল লবণ লইয়া ঘরে আসিল। তৎপিতা জিজ্ঞাসিল। কিরূপে তৈল লবণ আনিলি? ঠক কহিল 'এক ছোড়াকে ভুলাইয়া বন্ধক দিয়া মুদী শালাকে ঠকিয়া আনিলাম। ইহা শুনিয়া তৎপিতা কহিল—হাঁ মোর বাছা এই ত বটে—না হবে কেন—আমার পুত্র; ভাল অন্ন করিয়া খাইতে পারিবে।'

তিনি সর্ব্বোত্তমা সংস্কৃতভাষা বাহুল্যহেতুক গৌড় দেশীয় উত্তমা ভাষায় লিখলেও অধমা দেশীয় ভাষাকে একেবারে ভুলতে পারেন নি, যেমন বিলাসী বিদগ্ধ নাগরিক তার নিরাভরণা পল্লীবধূটিকে একেবারে ভুলতে পারে না। কেননা ঐ চল্‌তি কথার ভাষার মধ্যে যে প্রাণ আছে, চিত্র আছে, গতি আছে, রূপ আছে—যা তথাকথিত সাধু ভাষায় নেই—তা অলক্ষ্যে হৃদয়কে আকৃষ্ট করে। কখনো কখনো নগেন্দ্রনাথ যেমন ভ্রান্তিবশত সূর্য্যমুখীর সামনেও মাঝে মাঝে কুন্দের নাম উচ্চারণ ক'রে ফেলতেন, তেম্‌নি তিনিও সাধু ভাষার অঙ্গে অসাধু ভাষাকে অজ্ঞাতসারে প্রক্ষিপ্ত ক'রে এক অপূর্ব্ব খিচুড়ী তৈরী ক'রে ফেলেচেন—

ইহা শুনিয়া আর এক পক্ষী কহিল—'সে উপায় কি? যাহাতে আমাদের হইতে এ সমুদ্রের অনিষ্ট হইবে। ঐ পক্ষী কহিল, শুন। আমারদের সমুদায়ের মধ্যে কেহ চঞ্চুতে ও পক্ষদ্বয়েতে সাগর হইতে জল উঠাইয়া শুক্‌নাতে ফেলাও এবং আর্দ্র শরীরে ভূমি লুণ্ঠন করিয়া সমুদ্রে ডুব আবার সেই গাত্র-সংলগ্ন জল ডেঙ্গাতে ঝাড়। কেহ বা চঞ্চুতে তৃণাদি আহরণ করিয়া সমুদ্রে ফেলাও, আবার সমুদ্রে ডুবিয়া শুষ্ক স্থানে গা ঝাড়—এইরূপ করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে কালক্রমে পয়োনিধি শুষ্ক হইবে।

মৃত্যুঞ্জয়ী ভাষা মৃত্যুকে জয় করতে পার্ব্বে না তা নিশ্চিত, তবু যতক্ষণ বেঁচে আছে ততক্ষণ একটা বিরাট দৈত্যের মতই হাঁসফাঁস ক'রে তার অকুশল হাত পা ছুঁড়বে এবং সাহিত্য সরোবরের নির্ম্মল জলকে মথিত ও পঙ্কিল ক'রে তুলবে। মৃত্যুঞ্জয়ের পর রামগতি ন্যায়রত্ন, তারাশঙ্কর তর্করত্ন ও বিদ্যাসাগর ঐ ভাষার ব্রীফ্ হাতে তুলে নেন্—এবং সদর্পে ঐ ভাষার মামলা চালাতে থাকেন। বিদ্যাসাগরী ভাষার নমুনা একটু দিচ্ছি।

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক

এই সেই জনস্থানমধ্যবর্ত্তী প্রস্রবণ-গিরি। এই গিরির শিখর দেশ সততসঞ্চরমান জলধরপটলসংযোগে নিরন্তর নিবিড় নীলিমায় অলঙ্কৃত। অধিত্যকা প্রদেশ ঘনসন্নিবিষ্ট বিবিধ বনপাদপসমূহে আচ্ছন্ন থাকাতে সতত স্নিগ্ধ শীতল ও রমণীয়; পাদদেশে প্রসন্ন-সলিলা গোদাবরী তরঙ্গ বিস্তার করিয়া প্রবল বেগে গমন করিতেছে।

রামগতি ন্যায়রত্নের ভাষার নমুনা এইরূপ—

যে কবি বঙ্গদেশের কবি জয়দেবের প্রণীত গীত-গোবিন্দের অনুকরণে রাধাকৃষ্ণের লীলাবিষয়ক সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন, যে সকল সঙ্গীত বঙ্গদেশের ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তয়িতা চৈতন্যদেব পাঠ করিয়া মোহিত হইয়াছিলেন, যাহা বঙ্গদেশীয় প্রাচীন কবির প্রণীত এই বোধেই পরম ভক্তিসহকারে বঙ্গদেশীয় গায়কসকল বহুকাল হইতেই সংকীর্ত্তন করিয়া আসিতেছেন এবং যে সকল সঙ্গীতের অনুকরণেই বঙ্গদেশীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায় শত শত গীত রচনা করিয়াছেন, আজি আমরা সেই কবিকে মিথিলাবাসী বলিয়া বঙ্গদেশীয় কবির আসন হইতে সরিয়া বসিতে বলিতে পারিব না। ফল কথা যিনি যাহা বলুন আমরা বিদ্যাপতিকে বঙ্গদেশেরই প্রাচীন কবি মনে করিব।

নিম্নে তারাশঙ্কর তর্করত্নের ভাষার একটু নমুনা দিলাম—

একদা প্রভাতকালে চন্দ্রমা অস্তগত হইলে পক্ষিগণের কলরবে অরণ্যানী কোলাহলময় হইলে, নবোদিত রবির আতপে গগনমণ্ডল লোহিতবর্ণ হইলে গগনাঙ্গনবিক্ষিপ্ত অন্ধকাররূপ ভস্মরাশি দিনকরের কিরণরূপ সম্মার্জ্জনা দ্বারা দূরীকৃত হইলে সপ্তর্ষিমণ্ডল অবগাহন মানসে মানসসরোবর তীরে অবতীর্ণ হইলে, শাল্মলীবৃক্ষাশ্রিত পক্ষিগণ আহারের অন্বেষণে অভিমত প্রদেশে প্রস্থান করিল।

ক্রমে মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত। গগনমণ্ডলের মধ্যভাগ হইতে দিনমণি অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় প্রচণ্ড অংশুসমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। রৌদ্রের উত্তাপে পথ উত্তপ্ত হইল। পথে পাদক্ষেপ করা কাহার সাধ্য?

বিদ্যাসাগরের সময় অক্ষয়কুমার দত্ত এবং তারপরে কালীপ্রসন্ন সিংহ ঐ ভাষার জের টানলেন। তাঁদের ভাষাও খাঁটি পণ্ডিতী ভাষা। দু একটা নমুনা দিলে বুঝতে পার্বেন। প্রথমে অক্ষয়কুমার দত্তের ভাষার একটু নমুনা দিই—

এখন আমাদের মানসবিহগ সৌরজগতের অবিজ্ঞাত ভাগের প্রান্ত পর্য্যন্ত উড্ডীয়মান হইয়াছে। আর তাহাকে ক্ষান্ত রাখা যায় না। তাহার অপরিপ্রাপ্ত পক্ষসকল আর নিরস্ত হইবার নহে। অখিল বিশ্বের সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে এমন অচিন্ত্য অননুভবনীয় সৌরজগৎকেও ক্ষুদ্র বস্তু বলিয়া বোধ হয়।

* * *

যখন তিনি ভূমণ্ডলের সমীপবর্ত্তী হইয়া মনুষ্যের দৃষ্টি পথের অন্তর্গত হইলেন, তখন চতুর্দ্দিকে কতকগুলি মেঘাবলি বিস্তার দ্বারা আপনার মহামহিমান্বিত জ্যোতিঃপূর্ণ মূর্ত্তি আবৃত করিয়া তৎ-পরিবেশ স্বরূপ আলোকঘটা নানাবর্ণভূষিত ও সর্ব্বলোকের সুখদৃশ্য করিয়া বিকীর্ণ করিলেন।

তারপর কালীপ্রসন্ন সিংহের ভাষার একটু নমুনা দেখুন—

অদ্বিতীয় বীর পরশুরাম ত্রেতা ও দ্বাপর যুগের সন্ধিতে পিতৃবধবার্ত্তা শ্রবণ করতঃ ক্রোধপরায়ণ হইয়া এই পৃথিবীকে এক-বিংশতিবার নিঃক্ষত্রিয় করেন। তিনি স্ববিক্রমপ্রভাবে নিঃশেষ ক্ষত্রিয়কুল উৎসন্ন করিয়া সেই সমস্ত পঞ্চকে শোণিতময় পঞ্চহ্রদ প্রস্তুত করেন। শুনিয়াছি তিনি রোষপরবশ হইয়া সেই হ্রদের রুধির দ্বারা পিতৃলোকের তর্পণ করিয়াছিলেন।

* * *

যাদৃশ মোক্ষার্থীরা একমাত্র পারত্রিক শুভসংকল্পে বৈরাগ্য অবলম্বন করেন, তাদৃশ বিজ্ঞেরা মঙ্গললাভ প্রত্যাশায় এই সচিত্র ভারতেতিহাসের আশ্রয় লইয়া থাকেন। হে ঋষিগণ এখন বেদ প্রতিপাদ্য সনাতন ধর্ম্মে অলঙ্কৃত, অননুভূত বিষয়ের মীমাংসীকৃত সুচারুরূপে বিরচিত ভারতের পর্ব্বসংগ্রহ বলিতেছি আপনারা অবধান করুন।

ঠিক ভাষার যখন এই অবস্থা তখন ইংরাজী শিক্ষিত মহলে একটা বিদ্রোহের সুর বেজে উঠ্‌লো। একদিকে কালীসিংহ হুতোম ও অপরদিকে প্যারীচাঁদ মিত্র বা টেঁক-চাঁদ নিষ্পীড়িত অবহেলিত চলতি বাংলার তরফে কোমর বেঁধে উঠে দাঁড়ালেন। পণ্ডিতেরা যেমন পণ করেছিলেন সংস্কৃত তৎসম শব্দ ছাড়া ব্যবহার কর্ব্বোনা—তাঁরাও তেমনি পণ ক'রে বসলেন তৎভব ও দেশীয় শব্দ ছাড়া ব্যবহার কর্ব্বোনা। তাঁদের পণ ছিল, গৃহ ছাড়া ঘর লিখবোনা—এঁদের পণ হলো ঘর ছাড়া গৃহ লিখবো না। তাঁরা বড় গৃহের ছেলের মত গৃহের ভাত বেশী ক'রে খাবেন তবু রণে ভঙ্গ দেবেন না—এঁরাও ঘর-ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়ে ঘর-ত্যাগী হবেন তবু বল্‌বেন না আমরা কোন অংশে ছোট। আলালি ও হুতোমি ভাষা 'ভ্রাতা'কে নির্ব্বাসিত ক'রে 'ভাই'কে ঘরে এনে তুল্‌লে; তাতে ভাই-ভাবনা ফুটে উঠলেও ভ্রাতৃগিরির যে চূড়ান্ত হ'ল

তা বলাই বাহুল্য। 'গণ, সমূহ' প্রভৃতি শব্দ চট্ ক'রে 'রা' 'গুলা'য় রূপান্তরিত হ'ল এবং 'আর' এর আক্রমণে 'এবং' লক্ষ্মণ সেনের মত খিড়কীর দরজা দিয়ে কোথায় যে পালালো কে জানে?

কালীপ্রসন্ন সিংহের ভাষার নমুনা—

এদিকে গির্জ্জের ঘড়িতে টুং টাং ঢং করে রাত চারটে বেজে গেলো—বারফট্কা বাবুরা ঘরমুখো হয়েচে। উড়ে বামুনেরা ময়দার দোকানে ময়দা পিস্তে আরম্ভ করেচে। রাস্তায় আলোয় আর তত তেজ নাই। ফুরফুরে হাওয়া উঠেচে।

গুরুম্ করে তোপ পড়ে গ্যাল। কাকগুলো কা কা করে বাসা ছেড়ে উড়বার উজ্জুগ কল্লে। দোকানীরা দোকানের ঝাঁপতাড়া খুলে গন্ধেশ্বরীকে প্রণাম করে দোকানে গঙ্গাজলের ছড়া দিয়ে হুকায় জল ফিরিয়ে নিচ্চে। ক্রমে ফরসা হয়ে এলো। মাচের ভারিরা দৌড়ে আসতে লেগেচে—মেচুনিরা ঝগড়া করতে করতে তার পেচু পেচু দৌড়েচে।

দশটা বেজে গেছে। ছেলেরা বই হাতে করে রাস্তায় হো হো করতে করতে স্কুলে চলেচে। মৌতাতী বুড়োরা তেল মেখে গামছা কাঁদে করে আফিমের দোকানগুলির আড্ডায় জমবেন। হেটো ব্যাপারীরে বাজারে বাচা কেনা শেষ করে খালি বাজরা নিয়ে ফিরে যাচ্চে। কলকেতা সহর বড়ই গুলজার গাড়ির হর্‌রা, সহিসের পরিস্ পরিস্ শব্দ, কেঁদো কেঁদো ওয়েলার ও নম্মান্ডির টাপেতে রাস্তা কেঁপে উঠ্‌চে।

প্রতিমের দুপাশে বকা ধাৰ্ম্মিক ও ক্ষুদে নবাবের সং বড় চমৎকার হয়েচে। বকা ধাৰ্ম্মিকের শরীরটি মুচির কুকুরের মত নুদুর নাদুর—ভুঁড়িটি বিলাতী কুমড়োর মত। মাতায় কামানো চৈতন ফক্কা ঝুঁটি করে বাঁধা, গলায় মালা ও ছোট ঢাকের মত গুটী কয়েক সোনার মাদুলী—হাতে ইষ্টি কবচ চুলে ও গোঁফে কলপ দেওয়া—কালাপেড়ে ধুতি, রামজামা ও জরির বাঁকা তাজ—গত বৎসর আশি পেরিয়েচেন—অঙ্গ ত্রিভঙ্গ—কিন্তু প্রাণ হামাগুড়ি দিচ্চে—হরিনামের মালাটি ঘুরুচ্চেন।

ক্ষুদে নবাব দিব্বি দেখতে। দুধে আলতার মত রং। আলবট ফেসানে চুল ফেরানো—চীনের শূয়োরের মত শরীরটি ঘাড়ে গর্দ্দানে, হাতে লাল রুমাল ও পিচের ইষ্টিক—সিম্লের ফিন্‌ফিনে ধুতি মালকোঁচা করে পরা। হটাৎ দেখলে বোধ হয় রাজারাজড়ার পৌত্তুর—কিন্তু পরিচয় বেরোবে 'হিদে জোলার নাতি।'

প্যারিচাঁদ মিত্রের ভাষার নমুনা—

হলধর, গদাধর ও মতিলাল গোকুলের ষাঁড়ের ন্যায় বেড়ায়, যাহা মনে যায় তাই করে কাহার ও কথা শুনে না কাহাকেও মানে না—হয় তাস, নয় পাশা, নয় ঘুড়ি, নয় পায়রা, নয় বুলবুল, একটা না একটা লইয়া সর্ব্বদাই আমোদে আছে (খাবার অবকাশ নাই—শোবার অবকাশ নাই। বাটীর ভিতর যাইবার জন্য চাকর ডাকিতে আসিলে অমনি বলে—'যা বেটা যা—আমরা যাব না—' দাসী আসিয়া বলে 'অগো মা ঠাকরুণ যে শুতে পান্ না' তাহাকেও 'বলে দূর হ হারামজাদি।' দাসী মধ্যে মধ্যে বলে আ মরি কি মিষ্ট কথাই শিখেচ।') ক্রমে ক্রমে পাড়ার যত হতভাগা লক্ষ্মীছাড়া উনপাজুরে বরাখুরে ছোঁড়ারা জুটিতে আরম্ভ হইল। দিবারাত্রি হট্টগোল—বৈঠকখানায় কান পাতা ভার—কেবল হো হো শব্দ—হাসির হর্‌রা ও তামাক চরস গাঁজার ছর্‌রা; ধোঁয়াতে অন্ধকার হইতে লাগিল। কার সাধ্য সে দিক দিয়া যায়—কারই বাপের সাধ্য মানা করে। বেচারাম বাবু এক একবার গন্ধ পান—নাক টিপে ধরেন আর বলেন 'দূর দূর।'

* * *

'শ্যামের নাগাল পেলাম গো সই ওগো মরমেতে মরে রই' টক্ টক্ পটাস্ পটাস—মিয়াজান গাড়োয়ান এক একবার গান করিতেছে, টিট্‌কারি দিতেছে, ও শালার গরু চলতে পারে না বলে লেজ মুচড়াইয়া সপাৎ সপাৎ মারিতেছে। একটু একটু মেঘ হইয়াছে একটু একটু বৃষ্টি পড়িতেছে—গরু ছুটা হন হন্ করিয়া চলিয়া একখানা ছক্‌ড়া গাড়ীকে পিছে ফেলিয়া গেল। সেই ছকড়ায় প্রেমনারায়ণ মজুমদার যাইতেছিলেন—গাড়ীখানা বাতাসে দোলে—ঘোড়া দুটো বেতো ঘোড়ার বাবা পক্ষীরাজের বংশ—টঙস্ টঙস্ ডঙস্ ডঙস্ করিয়া চলিতেছে, পটাপট পটাপট চাবুক পড়িতেছে কিন্তু কোনক্রমেই চাল বেগড়ায় না।

সাধু বাংলার সঙ্গে চল্‌তি বাংলার হাস্যোদ্দীপক কলহ যে অনেকটা দুই সতীনের প্রখ্যাত ঝগড়ার মত—তুই পা দিয়ে চলবি ত আমি হাত দিয়ে চল্‌বো—তুই পাতে খাবি ত আমি ভুঁয়ে খাব—তা আর কেউ না বুঝুন্—বঙ্কিম বাবু বুঝতে পারলেন। তিনি তাঁর বাংলা ভাষা শীর্ষক প্রবন্ধে লিখলেন—পণ্ডিতী দলের বাংলা বাংলাই নয়—কেননা যে ভাষা সাধারণ লোকে বুঝে না, পড়িতে গেলে ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়ে সে ভাষায় জ্ঞান বিতরণ হয় না এবং সে ভাষায় গ্রন্থ লেখা শুধু নির্ব্বুদ্ধিতার নয়, স্বার্থপরতার পরিচায়ক। তাঁর মতে যেখানে ভাবের অনুরূপ শব্দ বাংলা ভাষায় নেই সেখানে চিরকেলে মহাজন সংস্কৃতের কাছে ধার করাই ভাল কিন্তু নিষ্প্রয়োজনে অর্থাৎ চল্‌তি বাংলা শব্দ থাকৃতে অপ্রচলিত বা অচল সংস্কৃত শব্দকে

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক

তার বিশ্রামমন্দির থেকে টেনে আনা একেবারে নির্ব্বোধ ও নিষ্ঠুরের কাজ। তারপর আলালি ও হুতমি ভাষাকে লক্ষ্য ক'রে তিনি যা বল্লেন তা এই—"বাংলার লিখন পঠন হুতোমি ভাষায় কখনই হইতে পারে না। কারণ কথনের ও লিখনের উদ্দেশ্য ভিন্ন। কথনের উদ্দেশ্য কেবল সামান্য জ্ঞাপন—লিখনের উদ্দেশ্য শিক্ষাদান চিত্তসঞ্চালন। এই মহৎ উদ্দেশ্য হুতোমি ভাষায় কখনই সিদ্ধ হইতে পারে না। হুতোমি ভাষা দরিদ্র, ইহার তত শব্দধন নাই; হুতোমি ভাষা নিস্তেজ ইহার তেমন বাঁধন নাই; হুতোমি ভাষা অসুন্দর এবং যেখানে অশ্লীল নয়—সেখানে পবিত্রতা-শূন্য। হুতোমি ভাষায় কখন গ্রন্থ প্রণীত হওয়া কর্ত্তব্য নহে। টেকচাঁদি (বা আলালি) ভাষা হুতোমি ভাষার এক কোঠা উপর মাত্র।"

আমরা স্বীকার করি হুতোমি ভাষা অসুন্দর ও স্থানে স্থানে রুচিবিগর্হিত, কিন্তু তা যে নিস্তেজ তা কখনই স্বীকার করবো না। তাতে দস্তুর মত জোর .ছ—তা চোখের সাম্‌নে ছবি এঁকে দেয়—তার প্রকৃত নুণ হচ্চে elegance বা elevation। যাই হোক্, ব বাবু চেষ্টা করলেন বিদ্যাসাগরী ভাষার সঙ্গে হুতোমি ভাষার সমন্বয় বা একটা আপোষ করতে। এ আপোষ কতদূর সার্থক ও সফল হয়েছিল তা যাঁরাই তাঁর উপন্যাস পড়েচেন তাঁরাই বলতে পার্ব্বেন। তাঁর প্রতিভা ছিল, ভাব ছিল, ভাষাচাতুর্য্য ছিল, তাই উপর উপর দেখ্‌লে মনে হয় বুঝি তিনি আপোষ করতে পেরেছিলেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এতটুকুও পারেন নি। উত্তর দক্ষিণ সাদা কালো বা তেল জলের মধ্যে আপোষ অসম্ভব—তিনি অসম্ভব সম্ভব কর্ব্বেন কি ক'রে? চল্‌তি ভাষা হাজার হ'লেও সত্য ভাষা, আর সাধু ভাষা মিথ্যা ভাষা— সত্যে মিথ্যায় মেশালে উত্তম এজাহার হ'তে পারে, কিন্তু সাহিত্য হ'তে পারে না।

বঙ্কিম বাবুর প্রথম বয়সের লেখা সাধু ভাষার দিকেই বেশী ঝুঁকে পড়লো, এবং শেষ বয়সের লেখা চল্‌তি ভাষার দিকে। পাল্লা কখনই সমান রাখতে পারলেন না, ফলে বস্তুবিশেষেরপিঠে ভাগ করারমতই সাহিত্য উঠ্‌তে নাব্‌তে লাগলো; কেননা কোনটা যে একেবারে বর্জ্জনীয় তা তিনি কিছুতেই বুঝ্‌লেন না।

বঙ্কিমের প্রথম বয়সের লেখার নমুনা—

জ্যোৎস্নালোকে, শ্বেতসৈকতপুলিনমধ্যবাহিনী নীলসলিলা যমুনার উপকূলে নগরাগণ-প্রধানা মহানগরী দিল্লী প্রদীপ্ত মণিখণ্ডবৎ জ্বলিতেছে। সহস্র সহস্র মর্ম্মরাদি প্রস্তরনির্ম্মিত মিনার গুম্বজ বুরুজ ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া চন্দ্রালোকের রশ্মিরাশি প্রতিফলিত করিতেছে। অতিদূরে কুতব মিনারের বৃহচ্চূড়া ধূমময় উচ্চ স্তম্ভবৎ দেখা যাইতেছিল।

* *

হে আলবলে কুণ্ডলাকৃত ধূমরাশিসমুদ্গারিণি, হে ফণা-নিন্দিত দীর্ঘনলসংসর্পিনি, হে রজতকিরীট-মণ্ডিত-শিরোদেশ সুশোভিনি, কিবা তোমার কিরীট-বিস্রস্ত ঝালর ঝলমলায়মান। কিবা শৃঙ্খলাঙ্গুরীয়সম্ভূষিত মুখনলের শোভা। কিবা তোমার গর্ভস্থ শীতলাম্বুরাশির গম্ভীর নিনাদ! হে বিশ্বরমে—তুমি বিশ্বজন-শ্রমহারিণী, অলসজনপ্রতিপালিনী, ভার্য্যাভর্ৎসিতজন-চিত্তবিকারনাশিনী—প্রভুভীতজনসাহসপ্রদায়িনী। মূঢ়ে, তোমার মহিমা কি জানিবে?

বঙ্কিমের শেষ বয়সের লেখার নমুনা—

কোথাও কোন পাচিকা ভাতের হাঁড়িতে জ্বাল দিয়া প্রতিবাসিনার সঙ্গে তাঁহার ছেলের বিবাহের ঘটার গল্প করিতেছেন। কোন পাচিকা বা কাঁচা কাঠে ফুঁ দিতে দিতে ধুঁয়ায় বিগলিতাশ্রুলোচনা হইয়া বাড়ীর গোমস্তার নিন্দা করিতেছেন এবং সে যে টাকা চুরি করিবার মানসেই ভিজা কাঠ কাটাইয়াছে তদ্বিষয়ে বহুবিধ প্রমাণ প্রয়োগ করিতেছেন। কোন সুন্দরী তপ্ত তৈলে মাছ দিয়া চক্ষু মুদিয়া দশনাবলী বিকট করিয়া মুখভঙ্গী করিয়া আছেন কেন না তপ্ত তৈল ছিট্‌কাইয়া তাঁহার গায়ে লাগিয়াছে। কেহ বা স্নানকালে বহু তৈলাক্ত অসংযমিত কেশরাশি চূড়ার আকারে সীমন্তদেশে বাঁধিয়া ডালে কাঠি দিতেছেন—যেন রাখাল পাচনী হস্তে গরু ঠেঙ্গাইতেছে।

* * *

কাল ৭৬ সাল ঈশ্বরকৃপায় শেষ হইল। বাঙ্গলার ছয় আনা রকম মনুষ্যকে, কত কোটি তা কে জানে, যমপুরে প্রেরণ করিয়া সেই দুর্ব্বৎসর নিজে কালগ্রাসে পতিত হইল। ৭৭ সালে ঈশ্বর সুপ্রসন্ন হইলেন, সুবৃষ্টি হইল, পৃথিবী শস্যশালিনী হইল, যাহারা বাঁচিয়াছিল তাহারা পেট ভরিয়া খাইল; অনেকে অনাহারে বা অল্পাহারে রুগ্ন হইয়াছিল—পূর্ণ আহার একেবারে সহ্য

করিতে পারিল না— অনেকে তাহাতেই মরিল। পৃথিবী শস্যশালিনী কিন্তু জনশূন্য।

* * *

বাংলায় শস্য জন্মে, খাইবার লোক নাই—বিক্রেয় জন্মে কিনিবার লোক নাই, চাষায় চাষ করে টাকা পায় না, জমিদারের খাজনা দিতে পারে না। জমিদারেরা রাজার খাজনা দিতে পারে না। রাজা জমিদারী কাড়িয়া লওয়ায় জমিদার সম্প্রদায় সর্ব্বহৃত হইয়া দরিদ্র হইতে লাগিল। বসুমতী বহুপ্রসবিনী হইলেন, তবু আর ধন জন্মে না—কাহারও ঘরে ধন নাই। যে যাহার পায় কাড়িয়া খায়—চোর ডাকাতেরা মাথা তুলিল, সাধু ভীত হইয়া ঘরের মধ্যে লুকাইল।

তারপর বঙ্কিমের রচনার ভিতর আর একটা দোষও প্রবেশ করলে—ইংরাজীর অলক্ষিত প্রভাব। তাঁর অনেক শব্দ, অনেক idiom—অনেক বাগ্‌বিন্যাসের প্রণালী যে ইংরাজীর অন্ধ অনুকরণ বা তর্জ্জমা তা একটু নজর ক'রে দেখ্‌লেই ধরা যায়। তিনি দৃষ্টিগোচর হওয়াও লিখলেন না—নজরে আসাও লিখলেন না—লিখলেন দৃষ্টিপথের অন্তর্গত হওয়া—to come within the range of vision; তিনি utilitariansদের নাম দিলেন হিতবাদী, socialistএর নাম দিলেন সমাজতান্ত্রিক; কখনো কখনো 'পাড়া মাথায় করিলেন' এর পরিবর্ত্তে 'পাড়াটি মস্তকে করিলেন'। এ রকম ভাবে চল্‌তি বাংলাকে শুদ্ধ বাংলার ছাঁচে ঢালাই করিলেন।

তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে কালীপ্রসন্ন ঘোষ, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি অনেক লেখক যশের মন্দিরে পৌঁছেচেন বটে, কিন্তু তাঁর গদদটুকু প্রথম চোখে পড়লো রবীন্দ্রনাথের। তিনি উঁচুদরের খাঁটি বাংলাতে প্রথম লিখতে সুরু করলেন অর্থাৎ যে বাংলা সংস্কৃত বা ইংরাজী কোন ভাষার ব্যকরণ দ্বারা শাসিত নয়—যে ভাষা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মৌখিক ভাষা। এ খাঁটি বাংলা হ'লেও মুদীমকালির মুখের খেলো বাংলাও নয়। শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় ঠিকই বলেচেন—"যদি ভদ্র সমাজের মৌখিক ভাষা সাধুভাষা হয় তা'হলে সাধুভাষাই সাহিত্যের একমাত্র উপযোগী ভাষা। আর আমরা যে মৌখিক ভাষার পক্ষপাতী, তার কারণ আমাদের বিশ্বাস আমাদের মাতৃভাষা রূপে ও যৌবনে তথাকথিত সাধুভাষা হ'তে অনেক শ্রেষ্ঠ।"

এই সুললিত, সুগঠিত, বলিষ্ঠ, সরল স্বচ্ছন্দ সজীব বাংলা আরো পরিণতি পেল শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরীর ভাষায়। তাঁর মতে যে শব্দ যে বাগ্‌ভঙ্গী, যে বাক্যবিন্যাসপ্রণালী আপনা হ'তে বাংলায় ঢুকেচে ও চলেচে তাই বাঙালীর গ্রাহ্য এবং অন্য কিছুই নয়। তিনি আরবী, পারশী, হিন্দী, সংস্কৃত, ইংরাজী কোন শব্দই বাদ দেন্ না যদি তা শিক্ষিত বাঙালী মহলে চ'লে গিয়ে থাকে এবং ভাবপ্রকাশের উপযোগী হয়। ইর্সাল, ইস্তমরারি, মাইফেল, মজকুরা শব্দও যেমন লাগান, evolution, art, experiment তেম্‌নি লাগান তিনি artist ছেড়ে রূপদক্ষ কথাও লাগাবেন না। এরোপ্লেনের পরিবর্ত্তে বরং উড়ো জাহাজ কি চীলগাড়ী লাগাবেন তবু পুষ্পকরথ লাগাবেন না। বায়োস্কোপকে তিনি বায়োস্কোপই বলেন, আলোকচিত্রও নয়, ছায়াচিত্রও নয়, চলচ্চিত্রও নয়। তারপর তিনি লেখেন না 'অমুক'কে পণ্ডিত মনে হয়—লেখেন 'অমুককে পণ্ডিত ব'লে মনে হয়'—'তাতে এই হ'ল' না লিখে লেখেন 'তাতে ক'রে এই হ'ল—'মোট কথা এই' না লিখে লেখেন 'মোট কথা হচ্চে এই'—অর্থাৎ ঠিক বাঙালীর মুখের কথা কলমের ডগা দিয়ে বের করেন। এটা দুঃসাহস কিনা জানি না, তবে সকলে যে তাঁর প্রণালীকে আত্মসাৎ আস্তে আস্তে করেন তা রোজই দেখতে পাচ্ছি।

এই বাংলাই আমরা অন্তরে অন্তরে চাই—এই বাংলাই যেন দেশের লোক হাতড়ে খুঁজে বেড়াচ্ছিল—তিনি হাতে তুলে দিলেন।

বঙ্গভাষার উপর মুসলমানের প্রভাব

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

মুসলমান আগমনের পূর্ব্বে বঙ্গভাষা কোনো কৃষক-রমণীর ন্যায় দীনহীন বেশে পল্লী-কুটিরে বাস করিতেছিল। এই ভাষাকে এ্যাণ্ডরসন্, স্ক্রাইন্, কেরি প্রভৃতি সাহেবেরা অতি উচ্চকণ্ঠে প্রশংসা করিয়াছেন। কেরি বলিয়াছেন, "এই ভাষার শব্দ-সম্পদ ও কথার গাঁথুনি এরূপ অপূর্ব্ব, যে ইহা জগতের সর্ব্ব প্রধান ভাষাগুলির পার্শ্বে দাঁড়াইতে পারে।" যখন কেরি এই মন্তব্য প্রকাশ করেন,—তখন বঙ্গীয় গদ্য-সাহিত্যের অপোগণ্ডত্ব ঘোচে নাই; সে আজ ১২৫ বৎসর হইল। য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন, এমন কোন ভাব নাই, যাহা অতি সহজ, অতি সুন্দর ভঙ্গীতে বাঙ্গলা ভাষায় প্রকাশ না করা যায়, এবং এই গুণে ইহা জগতের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ ভাষাগুলির সমকক্ষ। স্ক্রাইন্ বলিয়াছেন, "ইটালী ভাষার কোমলতা এবং জার্ম্মান ভাষার অদ্ভুত ভাব প্রকাশ করিবার শক্তি, এই মধুরাক্ষরা এবং স্বচ্ছন্দ-গতি বাঙ্গলা ভাষায় দৃষ্ট হয়।"

এই সকল অপূর্ব্ব গুণ লইয়া বাঙ্গলা ভাষা মুসলমান-প্রভাবের পূর্ব্বে অতীব অনাদর ও উপেক্ষায় বঙ্গীয় চাষার গানে কথঞ্চিৎ আত্ম-প্রকাশ করিয়াছিল। পণ্ডিতেরা নস্যাধার হইতে নস্য গ্রহণ করিয়া শিখা দোলাইয়া সংস্কৃত শ্লোকের আবৃত্তি করিতেছিলেন, এবং "তৈলাধার পাত্র" কিম্বা "পাত্রাধার তৈল" এই লইয়া ঘোর বিচারে প্রবৃত্ত ছিলেন। তাঁহারা হর্ষচরিত হইতে "হারং দেহি মে হরিণি" প্রভৃতি অনুপ্রাসের দৃষ্টান্ত আবিষ্কার করিয়া আত্ম-প্রসাদ লাভ করিতেছিলেন, এবং কাদম্বরী, দশকুমারচরিত প্রভৃতি পদ্য-রসাত্মক গদ্যের অপূর্ব্ব সমাস-বদ্ধ পদের গৌরবে আত্মহারা হইয়াছিলেন। রাজসভায় নর্ত্তকী ও মন্দিরে দেবদাসীরা তখন হস্তের অদ্ভুত ভঙ্গী করিয়া এবং কঙ্কণ ঝঙ্কারে অলি-গুঞ্জনের ভ্রম জন্মাইয়া "প্রিয়ে, মুঞ্চ ময়ি মানমনিদানং" কিম্বা "মুখরমধীরম,ত্যজ মঞ্জীরম্" প্রভৃতি জয়দেবের গান গাহিয়া শ্রোতৃবর্গকে মুগ্ধ করিতেছিল। সেখানে বঙ্গ-ভাষার স্থান কোথায়? ইতরের ভাষা বলিয়া বঙ্গ-ভাষাকে পণ্ডিত-মণ্ডলী 'দূর দূর' করিয়া তাড়াইয়া দিতেন, হাড়ি-ডোমের স্পর্শ হইতে ব্রাহ্মণেরা যেরূপ দূরে থাকেন, বঙ্গভাষা তেমনই সুধী-সমাজের অপাংক্তেয় ছিল—তেমনই ঘৃণা, অনাদর ও উপেক্ষার পাত্র ছিল।

কিন্তু হীরা কয়লার খনির মধ্যে থাকিয়া যেমন জহুরীর আগমনের প্রতীক্ষা করে, শুক্তির ভিতর মুক্তা লুকাইয়া থাকিয়া যেরূপ ডুবারীর অপেক্ষা করিয়া থাকে, বঙ্গভাষা তেমনই কোন শুভদিন, শুভক্ষণের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিল।

মুসলমান বিজয় বাঙ্গলাভাষার সেই শুভদিন, শুভক্ষণের সুযোগ আনয়ন করিল। গৌড়দেশ মুসলমানগণের অধিকৃত হইয়া গেল,—তাঁহারা ইরান, তুরাণ যে দেশ হইতেই আসুন না কেন, বঙ্গদেশ বিজয় করিয়া বাঙ্গালী সাজিলেন। আজ হিন্দুর নিকট বাঙ্গলাদেশ যেমন মাতৃভূমি, সেইদিন হইতে মুসলমানের নিকট বাঙ্গলাদেশ তেমনই মাতৃভূমি হইল। তাঁহারা বাণিজ্যের অছিলায় এদেশ হইতে রত্নাহরণ করিতে আসেন নাই, তাঁহারা এদেশে আসিয়া দস্তুর মত এদেশ-বাসী হইয়া পড়িলেন। হিন্দুর নিকট বাঙ্গলাভাষা যেমন আপনার, মুসলমানের নিকট উহা তদপেক্ষা বেশী আপনার হইয়া পড়িল। বঙ্গভাষা অবশ্য বহু পূর্ব্ব হইতে এদেশে প্রচলিত ছিল, বুদ্ধদেবের সময়ও ইহা ছিল, আমরা ললিত বিস্তরে তাহার প্রমাণ পাইতেছি। কিন্তু বঙ্গ-সাহিত্যকে একরূপ মুসলমানের সৃষ্টি বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। তাহা আমরা পরে দেখাইব।

চারিদিকে হিন্দু প্রজা—চারিদিকে শঙ্খ ঘণ্টার রোল, আরতির পঞ্চ প্রদীপ, ধূপ ধূনা, অগুরুর ধোঁয়া—চারিদিকে *রামায়ণ-মহাভারতের কথা, এবং ঐ সকল বিষয়ক গান।*

প্রজাবৎসল মুসলমান সম্রাট স্বভাবতই জানিতে চাহিলেন, "এ গুলি কি?" পণ্ডিত ডাকিলেন,—তিনি তিলক পরিয়া, শিখা দোলাইয়া নামাবলী গায়ে দিয়া হুজুরে হাজির হইয়া বলিলেন, "এগুলি কি জানিতে চাহিলে আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র জানা চাই। দ্বাদশ বর্ষ কাল ব্যাকরণ পাঠ করিয়া ইহার মধ্যে প্রবেশাধিকার হইতে পারে।" এই ঝুনো নারিকেল না ভাঙ্গিয়া ভিতরের শাঁস খাইবার উপায় নাই। বাদসাহ ক্রুদ্ধ হইলেন, "আমি ব্যাকরণ বুঝি না, রাজ-কাজ ফেলিয়া আমি ব্যাকরণ শিখিতে যাইব, তাহাও বামুন আমাকে পড়াইবে না,—ও সকল হইবে না। দেশী ভাষায় এই রামায়ণ মহাভারত ও ভাগবত রচনা কর।" গৌড়েশ্বর দেশী ভাষা শিখিয়াছিলেন, না হইলে প্রজা শাসন করিবেন কিরূপে? তিনি পূরো দস্তর বাঙ্গালী সাজিয়াছিলেন—সে কথা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি। দেশী ভাষায় ধর্ম্ম-গ্রন্থ রচনা করিতে হইবে, এই আদেশ শুনিয়া পণ্ডিতের মুখ শুকাইয়া গেল,—ইতরের ভাষায় পবিত্র দেব-ভাষা রচনা করিতে হইবে, চণ্ডালকে ব্রাহ্মণের সঙ্গে এক পংক্তিতে স্থান দিতে হইবে! কিন্তু শত শত কল্লুক ভট্ট, রঘুনন্দন, শত শত স্মৃতি লিখিয়া শত শত বৎসরে যাহা না করিতে পারেন, সাহেনসা বাদসাহের একদিনের হুকুমে তাহা হয়—রাজশক্তি এমনই অনিবার্য্য। অগত্যা প্রাণের দায়ে ব্রাহ্মণকে তাহাই করিতে হইল। পরাগলী মহাভারতে উল্লিখিত আছে, "শ্রীযুত নায়ক সে যে নসরত খান, রচাইল পঞ্চালী সে গুণের নিধান।" এতদ্দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে, হুসেন সাহের পুত্র নসরত মহাভারতের বঙ্গানুবাদ করিয়াছিলেন। পঞ্চালী (পাঁচালী) অর্থ মহাভারত। নসরতের আদেশে রচিত মহাভারতের উল্লেখ আমরা পাইয়াছি, কিন্তু সে পুস্তকখানি এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। এই গ্রন্থ অনুমান ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে রচিত হইয়াছিল। তখনও নসরত সম্রাট হন নাই—তাঁহাকে শুধু 'নায়ক' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। হুসেন সাহের সেনাপতি পরাগল খাঁ চট্টগ্রাম বিজয়ের জন্য পূর্ব্বাঞ্চলে প্রেরিত হন, তাঁহার বংশধরগণ ফেনী নদীর তীরস্থ পরাগলপুরে (নোয়াখালি জেলায়) এখনও বাস করিতেছেন, এখনও তাঁহারা তথাকার ভূম্যাধিকারী। এক সময়ে পরাগল খাঁ ও তৎপুত্র ছুটি খাঁর প্রতাপ সেই প্রদেশে পরিব্যাপ্ত ছিল, ছুটি খাঁর সম্বন্ধে কবি শ্রীকরণ নন্দী লিখিয়াছেন, "ত্রিপুর নৃপতি যার ভয়ে এড়ে দেশ। পর্ব্বত গহ্বরে গিয়া করিল প্রবেশ।" তখন ত্রিপুরার রাজা ছিলেন মহারাজা ধন্যমাণিক্য। তাঁহার মত এত বড় পরাক্রমশালী রাজা ত্রিপুরার ইতিহাসে আর দ্বিতীয়টি দেখা যায় না। তাঁহার প্রধান মন্ত্রী ছিলেন চাণক্য তুল্য রাজনীতিবিশারদ রায়চাগ। এহেন সম্রাটও ছুটি খাঁর ভয়ে উদয়পুরের পার্ব্বত্য দুর্গের নিভৃত কোণে আশ্রয় লইয়াছিলেন বলিয়া শ্রীকরণ নন্দী আমাদিগকে জানাইয়াছেন।

হুসেন সাহের সেনাপতি পরাগল খাঁ কবীন্দ্র পরমেশ্বর নাম জনৈক সুপণ্ডিত কবিকে মহাভারতের অনুবাদ রচনা করিতে নিযুক্ত করেন। কবীন্দ্র পরমেশ্বর বহুস্থানে পরাগল খাঁর প্রশংসা করিয়াছেন—"শ্রীযুক্ত পরাগল খান পদ্মিনী ভাস্কর", তিনি 'রস-বোদ্ধা', 'গুণগ্রাহী' ইত্যাদি বিশেষণ তাঁহার প্রতি সর্ব্বদা প্রযুক্ত হইয়াছে। কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকরণ নন্দী উভয়েই মহাভারত অনুবাদের একটা সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দিয়াছেন। কবীন্দ্র লিখিয়াছেন, "নৃপতি হুসেন সাহ গৌড়ের ঈশ্বর। তান হক্ সেনাপতি হওন্ত লস্কর॥ লস্কর পরাগল খান মহামতি। পঞ্চম গৌড়েতে যার পরম সুখ্যাতি॥ সুবর্ণ বসন পাইল অশ্ব বায়ুগতি। লস্করী বিষয় পাই আইবন্ত চলিয়া। চাটি-গ্রামে চলি গেল হরষিত হৈয়া। পুত্র পৌত্রে রাজ্য করে খান মহামতি। পুরাণ শুনন্ত নিতি হরষিত মতি॥" কবীন্দ্র পরমেশ্বর সংস্কৃতে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন এবং তিনি মহাভারতের স্ত্রীপর্ব্ব পর্য্যন্ত অনুবাদ রচনা করেন। পরাগলের বিজয়দৃপ্ত সুযোগ্য পুত্র ছুটি খাঁ শ্রীকরণ নন্দীর দ্বারা মহাভারতের অশ্বমেধ পর্ব্বের অনুবাদ সঙ্কলন করাইয়াছিলেন।

শ্রীকরণ নন্দী তাঁহার গ্রন্থের ভূমিকায় ঐতিহাসিক অনেক কথাই লিখিয়াছেন। পরাগল খাঁর আদেশে বিরচিত মহাভারতের এক জায়গায় কবীন্দ্র পরাগল-তনয় ছুটি খাঁর উল্লেখ করিয়াছেন; "তনয় যে ছুটি খান পরম উজ্জ্বল।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

কবীন্দ্র পরমেশ্বর রচিল সকল।”

শ্রীকরণ নন্দী লিখিয়াছেন :

নসরত সাহ তাত অতি মহারাজা।
রামবৎ নিত্য পালে সব প্রজা॥
নৃপতি হুসেন সাহ হএ ক্ষিতিপতি।
সামদান দণ্ড ভেদে পালে বসুমতী॥
তান এক সেনাপতি লস্কর ছুটি খান।
ত্রিপুরার উপরে করিল সন্নিধান॥
চাটিগ্রাম নগরের নিকট উত্তরে।
চন্দ্রশেখর পর্ব্বত কন্দরে॥
চারলোল গিরি তার পৈত্রিক বসতি।
বিধিএ নির্ম্মিল তাক কি কহিব অতি॥
চারিবর্ণে বসে লোক সেনা সন্নিহিত।
নানা গুণে প্রজা সব বসয়ে তথাত॥
ফণী নামে নদীএ বেষ্টিত চারিধার।
পূর্ব্বদিকে মহাগিরি পার নাহি তার॥
লস্কর পরাগল খানের তনয়।
সমরে নির্ভএ ছুটি খান মহাশয়॥
আজানুলম্বিত বাহু কমললোচন।
বিলাস হৃদয়ে মত্ত গজেন্দ্র গমন॥
চতুঃষষ্টি কলা বসতি গুণের নিধি।
পৃথিবী বিখ্যাত সে যে নির্ম্মাইল বিধি॥
দাতা বলি কর্ণ সম অপার মহিমা।
শৌর্য্যে, বীর্য্যে গাম্ভীর্য্যে নাহিক উপমা॥
তাহান যতেক গুণ শুনিয়া নৃপতি।
সম্বাদিয়া আনিলেক কুতুহল মতি॥
নৃপতি আগেতে তার বহুল সম্মান।
ঘোটক প্রসাদ পাইল ছুটি খান॥
লস্করী বিষয় পাইয়া মহামতি।
সামদান দণ্ডভেদে পালে বসুমতী॥
ত্রিপুর নৃপতি যার ভয়ে এড়ে দেশ।
পর্ব্বত গহ্বরে গিয়া করিল প্রবেশ॥
গজ বাজি কর দিয়া করিল সম্মান।
মহাবন মধ্যে তার পুরীর নির্ম্মাণ॥
অদ্যাপি ভয় না দিল খান মহামতি
তথাপি আতঙ্কে বৈসে ত্রিপুর নৃপতি॥
আপনি নৃপতি সম্ভাপিয়া বিশেষে।
সুখে বৈসে লস্কর আপনার দেশে॥
দিনে দিনে বাড়ে তার রাজ সম্মান।
যাবৎ পৃথিবী থাকে সম্ভতি তাহান॥
পণ্ডিতে পণ্ডিতে সভাখণ্ড মহামতি।
একদিন বসিলেক বান্ধব সংহতি॥
শুনন্ত ভারত তবে অতি পুণ্য কথা।
মহামুনি জৈমিনি কহিল সংহিতা॥
অশ্বমেধ কথা শুনি প্রসন্ন হৃদয়।
সভাখণ্ডে আদেশিল খান মহাশয়॥
দেশী ভাষায় এহি কথা রচিল পয়ার।
সঞ্চোরক কীর্ত্তি মম জগত সংসার॥
তাহান আদেশ মাল্য মস্তকে ধরিয়া।
শ্রীকরণ নন্দী কহে পয়ার রচিয়া॥”

সেই স্বভাবের নিভৃত পরম সুন্দর নিকেতনে—চন্দ্রশেখর পর্ব্বতের ক্রোড় দেশে, শ্যামল বনস্পতি ও সচল মুক্তাপংক্তির ন্যায় নির্ঝরধারা অধ্যুষিত পরম রমণীয় রাজধানীতে বসিয়া প্রজারঞ্জক মহাবীর মুসলমান সেনাপতিরা হিন্দু পণ্ডিতের দ্বারা রামায়ণ ও মহাভারতের অনুবাদ করাইয়াছিলেন। তাঁহাদের কীর্ত্তি জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত হউক—এই ছিল হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা—সে কামনা চরিতার্থ হইয়াছে। আজ ৪৫০ বৎসর পরে তাঁহাদের মাতৃভাষার গৌরবের সঙ্গে প্রজারঞ্জক এই রাজাদের কাহিনী দেশ-বিশ্রুত হইয়াছে। পরাগল খাঁর পিতা রাস্তি খানের সমাধি এখনও পরাগলপুরে বিরাজিত। ঐ পল্লীতে বিশাল পরাগলী দীঘি এখনও সেই মহামনা লস্কর খানের স্মৃতি বহন করিয়া তরঙ্গায়িত হইতেছে।

হুসেন সাহ এবং অপরাপর মুসলমান সম্রাটেরা দেশীয় ভাষার কতটা অনুরাগী ছিলেন, তাহার প্রমাণ প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যের অনেক স্থানেই পাওয়া যায়। কবি বিদ্যাপতি লিখিয়াছেন—“সে যে নসিরা সাহ জানে। যারে হানিল মদন বাণে। চিরঞ্জীবী রহু গৌড়েশ্বর, কবি বিদ্যাপতি ভনে॥” অন্যত্র “প্রভু গায়েশ উদ্দীন সুলতান।” পঞ্চদশ শতাব্দীতে যখন কবি বিজয় গুপ্ত তাঁহার মনসাদেবীর ভাসান গান রচনা করেন, তখন গৌড়ের তক্তায় হুসেন সাহ সমাসীন ছিলেন। কবি অতি সশ্রদ্ধভাবে তাঁহার উল্লেখ করিয়াছেন—“সনাতন হুসেন সাহ নৃপতি-তিলক।” কবি যশোরাজ

খান হুসেন সাহ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন "সাহ হুসন, জগত-ভূষণ সেত এই রস জানে। পঞ্চ গৌড়েশ্বর। ভোগ পুরন্দর ভনে যশোরাজ খানে ॥" কৃত্তিবাস রামায়ণের আদি অনুবাদ সঙ্কলন কর্ত্তা। তিনিও কোনো গৌড়েশ্বরের আদেশে রামায়ণের বঙ্গানুবাদ রচনায় হস্তক্ষেপ করেন। দুঃখের বিষয় কবি যদিও রাজসভার একটি আলেখ্য দিয়াছেন, অনেক সচিব ও মন্ত্রীর নাম করিয়াছেন, তথাপি গৌড়েশ্বরের নামটি দেন নাই। ইহা কিছু আশ্চর্য্যের কথা নহে। যেহেতু এখনও কোন সভাসমিতি বা রাজকার্য্য উপলক্ষে উপস্থিত রাজ-পুরুষগণের নাম দেওয়া হয়, কিন্তু বড়লাট অথবা ছোটলাটকে কেবল ভাইসরয় কি গবর্ণর নামে উল্লেখ করিবার পদ্ধতি দৃষ্ট হইয়া থাকে। তখন যিনি সর্ব্বজনপরিচিত ছিলেন, এখন তাঁহার পরিচয়ের দরকার হইয়াছে। সেই সভা মুসলমান প্রভাবান্বিত ছিল,—কেদার খাঁ প্রভৃতি নামের পশ্চাতে খাঁ' উপাধি দৃষ্ট তাহাই প্রমাণিত হইয়াছে। বঙ্গের ইতিহাসে সেই যুগে একমাত্র রাজা গণেশ ক্ষণেকের বিদ্যুৎ চমকের ন্যায় হিন্দু-শক্তির স্ফুরণ দেখাইয়াছিলেন এবং তৎপর মুসলমানগণের হস্তে পুনরায় রাজদণ্ড আসিয়া পড়িয়াছিল। গণেশের পুত্র যদু জালালাউদ্দিন নাম গ্রহণ করিয়া মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক পিতৃসিংহাসনে তাঁহার দাবী রক্ষা করিয়াছিলেন। রাজা গণেশ স্বয়ং হিন্দু হইলেও তাহার উপর মুসলমানী প্রভাব এত বেশী হইয়াছিল যে তিনি মুসলমান-দিগের বিশেষ সাহায্য পাইয়া রাজতক্তা অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সন তারিখের সূক্ষ্ম আলোচনা করিলে মনে হয় এই গণেশ রাজাই কৃত্তিবাসকে রামায়ণের অনুবাদ সঙ্কলনের আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। তৎপূর্ব্ববর্ত্তী গৌড়ের মুসলমান সম্রাটগণ হয়তঃ হিন্দু পণ্ডিত দ্বারা সংস্কৃত পুরাণের বঙ্গানুবাদ সঙ্কলনের প্রথা প্রচলন করিয়াছিলেন, রাজা গণেশ সেই রীতি রক্ষা করিয়াছিলেন মাত্র। তাহার একটি প্রমাণ এই যে গৌড়েশ্বর সামসুদ্দিন ইউসফসাহ, ১৩৯৫ শকে (১৪৭৩ খৃঃ), মালাধর বসুকে "গুণরাজ খাঁ" উপাধি দিয়া তাঁহার দ্বারা ভাগবতের দশম ও একাদশ স্কন্দের অনুবাদ করিয়াছিলেন। মালাধর বসু কুলীনগ্রামবাসী বিখ্যাত বসুবংশীয় এবং কৃত্তিবাসের প্রায় সমসাময়িক কবি। পর পর অনেকগুলি মুসলমান সম্রাটের সঙ্গে বঙ্গীয় পুরাণানুবাদ-রচকের নাম গ্রথিত দেখা যায়, সুতরাং—আমাদের নিঃসন্দেহ ভাবে এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে যে গৌড়েশ্বরগণের সহায়তা না পাইলে বঙ্গভাষা মুখ উঁচু করিয়া সুধী সমাজে দাঁড়াইতে পারিত না, মাথা হেঁট করিয়া পল্লীর এক কোণে চির উপেক্ষিতা হইয়া পড়িয়া থাকিত। এই সকল পুস্তক যে বাঙ্গলা ভাষায় বিরচিত হইতেছিল, ব্রাহ্মণগণ উহা কিরূপ চক্ষে দেখিতেন, তাহা তাঁহাদের রচিত কয়েকটি সংস্কৃত শ্লোক ও বাঙ্গলা প্রবাদবাক্য হইতে পরিষ্কার ভাবে জানা যায়। "অষ্টাদশ পুরাণানি রামস্য চরিতানি চ। ভাষায়াং মানবঃ শ্রুত্বা রৌরবং নরকং ব্রজেৎ" অর্থাৎ অষ্টাদশ পুরাণ ও রামায়ণ যাহারা বাঙ্গলা ভাষায় শ্রবণ করিবে, তাহারা রৌরব নামক নরকে গমন করিবে। ব্যক্তিগত ভাবে কৃত্তিবাস ও কাশীদাস এই কুকার্য্য করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহারা ব্রাহ্মণের ক্রোধ-বহ্নি হইতে নিষ্কৃতি পান নাই। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে কায়স্থকুলোদ্ভব কাশীদাস তাঁহার মহাভারতের প্রতি পত্রে ব্রাহ্মণদের এত স্তবস্তুতি করিয়াও তাঁহাদের অভিশাপ হইতে অব্যাহতি পান নাই তিনি তো ভণিতায় "মস্তকে রাখিয়া ব্রাহ্মণের পদরজঃ।" প্রতি পৃষ্ঠায় লিখিয়া তাঁহাদের মনস্তুষ্টি করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন।

কিন্তু তথাপি ব্রাহ্মণ রচিত এই প্রবাদ বাক্য—"কৃত্তিবেসে, কাশীদেসে আর বামুন ঘেঁষে এই তিন সর্ব্বনেশে" (কৃত্তিবাস আর কাশীদাস এবং যাহারা বামুনদের সঙ্গে ঘেঁষিয়া সমান হইতে চায়—এই তিনি সর্ব্বনেশে) এখনও স্মরণীয় হইয়া আছে। এ হেন প্রতিকূল ব্রাহ্মণ-সমাজ কি হিন্দুরাজত্ব থাকিলে বাঙ্গলাভাষাকে রাজসভার সদর দরজায় ঢুকিতে দিতেন? সুতরাং এ কথা মুক্তকণ্ঠে বলা যাইতে পারে, যে মুসলমান সম্রাটেরা বাঙ্গলাভাষাকে রাজদরবারে স্থান দিয়া ইহাকে ভদ্র সাহিত্যের উপযোগী করিয়া নূতন ভাবে সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

আরাকান রাজের প্রধান সচিব মুসলমানধর্ম্মী ছিলেন কিন্তু তাঁহার নাম ছিল মাগন ঠাকুর। ১৬২৬-২৭ খৃঃ অব্দে মাগন ঠাকুর সৈয়দ আলওয়াল নামক কবিকে মালিক

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

মহম্মদ রচিত পদ্মাবৎ নামক হিন্দী কাব্যের বাঙ্গলা তর্জ্জমা করিতে নিযুক্ত করেন। বাঙ্গলা পদ্মাবৎ গ্রন্থের উল্লেখ আমরা পুনরায় করিব। দৌলত কাজি নামক এক কবি "লোর চন্দ্রানি" নামক কাব্য রাজানুগ্রহে রচনা করেন।

মুসলমান রাজরাজড়ারা যে রীতি প্রবর্ত্তন করেন, তাহা ব্রাহ্মণগণের শত নিষেধ-বিধি ও উপেক্ষা অগ্রাহ্য করিয়া প্রচলিত হইয়াছিল; সাহেন সা বাদসাহগণ যাহা করিলেন, ছোট ছোট হিন্দু রাজন্যবর্গ তাহার অনুকরণ করিতে লাগিলেন। এই ভাবে বঙ্গভাষা ক্ষুদ্র বৃহৎ রাজসভায় প্রতিষ্ঠা পাইয়া বিজয়ী হইল; ব্রাহ্মণগণই স্বয়ং রৌরব নরকের ভয় অতিক্রম করিয়া শাস্ত্র গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ প্রণয়নে তৎপর হইলেন। আমরা ষোড়শ শতাব্দীর কবি ষষ্ঠীবরকে জগদানন্দ নামক মুরুব্বির আদেশে মহাভারতের অংশ-বিশেষের অনুবাদ করিতে দেখিতে পাই। এই ব্যক্তি সম্ভবত কোন জমিদার বা প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন ("অমৃত লহরী ছন্দ, পুণ্য ভারতের বন্ধ, কৃষ্ণের চরিত্র শেষ পর্ব্বে। শ্রীযুত জগদানন্দে, অহর্নিশ হরি বন্দে, কবি ষষ্ঠীবর কহে সর্ব্বে॥") বর্দ্ধমানের রাজা যশোমন্তের আদেশে রামেশ্বর তাঁহার শিবায়ণ রচনা করেন। ("যশোমন্ত সর্ব্ব গুণবন্ত, তস্য পোষ্য রামেশ্বর, তদাশ্রয়ে করি ঘর, বিরচিল শিব সংকীর্ত্তন।") বিশারদ নামক কোন প্রধান ব্যক্তির আদেশে অনন্ত রাম ক্রিয়াযোগসার রচনা করেন, ("বিশারদ পদে সেই রেণু অভিপ্রায়। পদবন্ধে রচিলেক প্রথম অধ্যায়।") লক্ষ্মণ দিগ্বিজয় নামক কাব্য প্রণেতা ভবানী দাস, জয়চন্দ্র নামক রাজার আদেশে উক্ত কাব্য রচনায় হস্তক্ষেপ করেন ("কহেন ভবানী দাসে, শ্রীরামের পদ আশে জয়চন্দ্র রাজার বচনে।") ইহা ছাড়া দামুণ্যার জগৎ বিখ্যাত কবি মুকুন্দরাম ও তাঁহার আশ্রয়দাতা রাজা রঘুনাথের নাম আমরা একসঙ্গে ভণিতায় পাইয়াছি। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে ভারতচন্দ্র 'অন্নদামঙ্গল' ও উক্ত মহারাজের আত্মীয় রাজকিশোর মুখোপাধ্যায়ের আদেশে রামপ্রসাদ "কালীকীর্ত্তন" রচনা করেন। বর্দ্ধমানের রাজা কীর্ত্তিচন্দ্রের আদেশে ঘনরামের শ্রীধর্ম্মমঙ্গল কাব্য রচিত হইয়াছিল।

এই ভাবে দেখা যায় বঙ্গভাষার শ্রীসাধনকল্পে মুসলমান সম্রাটদের উৎসাহ ও প্রেরণা কল্পতরুর ন্যায় অমৃত ফল প্রসব করিয়াছিল।

মুসলমানগণ এই ভাবে বঙ্গদেশে বাঙ্গলাভাষাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া আমাদের সাহিত্যে এক নূতন যুগ আনয়ন করিলেন। শুধু তাহাই নয় তাঁহাদের প্রভাব আমাদের ভাষার বক্ষে আরবী ও ফার্সীর ভৃগুপদচিহ্ন অঙ্কিত করিয়া দিল। প্রাকৃত ভাষার উপর ঐ সকল বিদেশী ভাষার দুশ্ছেদ্য ছাপ্ পড়িয়া গেল। মুসলমানেরা রাজতক্তায় বসিলেন, তাঁহারাই সর্ব্ব-বিষয়ে দেশে প্রাধান্য লাভ করিলেন। বিলাসের আসবাব, রাজদরবারে যাহা কিছু, শাসন সংক্রান্ত সমস্ত উচ্চ পদ তাঁহাদের অধিকৃত হইল। বাঙ্গলা ভাষার অভিধান বদলাইয়া গেল। "রাজস্ব" শব্দ "খাজনায়" পরিণত হইল, "প্রজা"রা "রায়ৎ" হইয়া গেল। "মহাপাত্র" "উজীর" হইলেন, "নিশাপতি"· "কোটাল" হইল, "ধর্ম্মাধিকারী" "কাজী" হইলেন, "ভৃত্য" "নফর" হইল। "দোষী ব্যক্তি" "আসামী" হইল, অভিযোগকারী "ফৈরাদী" হইলেন। "বিচারালয়" বা "রাজসভা" "আদালত" ও "দরবারে" পরিণত হইল। 'প্রভু' হইলেন 'হুজুর', দাস হইল "খেদমৎগার"। এইরূপ অসংখ্য শব্দ আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে জাতীয় জীবনের উচ্চস্তরের ভাষা অনেকটা পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। যেখানে বিলাস,— যেখানে আমোদপ্রমোদ, সেখানেও বিজেতাদের ভাষা প্রভাব বিস্তার করিল। যাহা দরিদ্রের, যাহা সামাজিক জীবনের অধস্তরের কথা সেই শব্দগুলি শুধু প্রাকৃত ভাবাপন্ন রহিয়া গেল। কুটির বা কুঁড়ে কথার পরিবর্ত্তন হইল না মেটে তেলের দীপটি কুঁড়ে ঘরে 'প্রদীপ' বা "পিদিম" হইয়া জ্বলিতে লাগিল, কিন্তু রাজপ্রাসাদে বা প্রাসাদোপম গৃহের আলো, ঝাঁড়, ফানুস, দেয়ালগিরি, প্রভৃতি নাম বিদেশী কায়দা অবলম্বন করিল। শেষোক্ত শব্দটির শেষাংশ ফরাসীর অপভ্রংশ। ভাত, দাইল, তেল, ঘি, ক্ষেতের শস্য প্রভৃতি শব্দ নাম বদলাইল না। কিন্তু খাদ্য যেখানে খুব উপাদেয় ও বিলাসীর ভোগ্য, তখন তাহা 'খানা' হইয়া গেল। ক্ষেত যখন প্রভুত্বের নিদর্শন

সেখানে তাহা 'জমি'। 'ভূস্বামী' জমিদার হইয়া পড়িলেন। দেশের বাণিজ্য ধীরে ধীরে মুসলমানের হস্তগত হইল, তখন উহার নাম হইল 'কারবার', কারবারের সঙ্গে "আমদানী" "রপ্তানি" ও বঙ্গভাষায় ঢুকিল। সৌখিন লোকদের সুগন্ধি—অগুরু ও চন্দনের ছড়ার স্থলে "আতর" "খোসবো" অধিকার করিয়া লইল। আকাশের বায়ু, তারা, চাঁদ, সূর্য্য এগুলি অভিধানে রহিয়া গেল, কিন্তু যেখানে বড় মানুষদের গৃহ কৃত্রিম আলোমালায় সুশোভিত হইল, সেখানে তাহা "রোসনাই" নাম ধারণ করিল। পূর্ব্বে 'মাগধা', 'সূত' ও 'বন্দীরা' শ্রুতিমধুর বন্দনা-গীতি বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গতের সঙ্গে মিল রাখিয়া প্রত্যূষে গান করিত,—সেই সংগীতের মোহিনীর গুণে রাজাদের নিদ্রাভঙ্গ হইত, কিন্তু এখন তাহার স্থলে "রসোনচৌকী" "নহবৎ" ইত্যাদি শব্দ প্রবর্ত্তিত হইল। রাজসিংহাসন এখন 'তক্তানামায়' পরিণত হইল। তাহা ছাড়া বিচারালয়ের সমস্ত শব্দ, 'মতরজ্জম', 'নাজির', 'দলিল', 'দপ্তরখানা', 'মুসাবিদা' 'পেয়াদা' 'খাজাঞ্চি খানা' 'উকীল' 'মোক্তার' 'আইন' 'আরজী' প্রভৃতি শত শত শব্দ প্রাচীন ভাষার প্রাকৃত শব্দের স্থল কাড়িয়া লইয়া নিজেদের অধিকার বিস্তার করিল।

মুসলমানেরা যে এদেশ বিজয় করিয়া প্রভুত্ব করিয়াছিলেন, এবং জীবনের "ক্ষীর-সর-নবনীত" সমস্তই ভোগ করিতেছিলেন,—তাহা কোন ইতিহাসে লেখা না থাকিলেও শুধু বাঙ্গলা ভাষা আলোচনা করিলেই স্পষ্টভাবে বুঝা যাইতে পারে।

আমরা দেখিতে পাইলাম,—বঙ্গভাষা মুসলমান সম্রাটদের কৃপায় দ্বিতীয়বার জন্মগ্রহণ করিয়া 'দ্বিজের' ন্যায় সম্মান লাভ করিল। বঙ্গভাষার উপর আরবী ও ফারসী তাহাদের সুস্পষ্ট ছাপ অঙ্কন করিয়া দিল। এইবার আমরা দেখাইব তাঁহারা শুধু বঙ্গভাষার উপর পূর্ব্বোক্ত প্রভাব বিস্তার করিয়াই নিরস্ত হন নাই, তাঁহারা বঙ্গভাষাকে অপূর্ব্ব কবিত্ব সম্পদে ভূষিত করিয়াছেন। তাঁহারা মুসলমানী কেতাব লিখিয়া বাঙ্গলাকে উর্দ্দুর দিকে টানিয়া আনিয়াছেন সত্য, কিন্তু বিকৃত মুসলমানী বাঙ্গলায় আমরা বঙ্গভাষায় তাঁহাদের রচনার উৎকর্ষের বিশিষ্ট নিদর্শন পাই নাই। তাঁহাদের অনেক পদ ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে বৈষ্ণব সাহিত্যকে অলঙ্কৃত করিয়াছে। সৈয়দ মর্ত্তুজা, সেক ভিকন, শাল বেগ, গরিব খাঁ, চাঁদ কাজি, আলোয়াল, অলিরাজা, নসীর মামুদ প্রভৃতি বহুসংখ্যক কবি রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক পদ রচনা করিয়াছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে সঙ্কলিত বৈষ্ণবদাসের পদকল্পতরু গ্রন্থে একাদশ জন মুসলমান পদ কর্ত্তার গান উদ্ধৃত হইয়াছে। স্বর্গীয় রমণীমোহন মল্লিক মহাশয় তাহা স্বতন্ত্র ভাবে প্রকাশিত করিয়াছিলেন। শালবেগের পদগুলি এত মধুর যে তাহা পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে এখনও গীত হইয়া থাকে। চাঁদ কাজির একটি গানের নমুনা এখানে দিতেছি:—

"বাঁশী বাজান জানে না।
অসময়ে বাজাও বাঁশী মন তো মানে না॥
যখন আমি বৈসা থাকি গুরুজনের মাঝে।
তুমি নাম ধরি বাজাও বাঁশী আমি মরি লাজে॥
ওপার হৈতে বাজাও বাঁশী এপার হৈতে শুনি।
অভাগীয়া নারী আমি সাঁতার নাহি জানি॥
যে ঝাড়ের বাঁশের বাঁশী সে ঝাড়ের লাগ পাও।
জড়ে মূলে উপাড়িয়া যমুনায় ভাসাও॥
চাঁদ কাজি বলে বাঁশী শুনে ঝুরে মরি।
জীমু না জীমু না আমি না দেখিলে হরি॥"

আমরা পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত একাদশ জন মুসলমান পদ কর্ত্তার কথা উল্লেখ করিয়াছি কিন্তু ইহা ছাড়া আরও বহু সংখ্যক এইরূপ কবির পদ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি। আলওয়াল কবির একটি পদ এইরূপ:—

"ননদিনী রস-বিনোদিনী ও তোর কুবোল শুনিতে নারি।

ধুয়া

ঘরের ঘরণী, জগৎ মোহিনী, প্রত্যুষে যমুনায় গেলি।
বেলা অবশেষ, নিশি পরবেশে কিসে বিলম্ব করিলি॥
প্রত্যুষে বেহানে, কমল দেখিয়ে পুষ্প তুলিবারে গেলুম।
বেলার উদনে, কুমুদ মুদনে, ভ্রমর দংশনে মলুম॥
কমল-কণ্টকে, বিষম সঙ্কটে করের কঙ্কণ গেল।

শ্রীদিনেশচন্দ্র সেন

কঙ্কণ হেরিতে, ডুব দিতে দিতে, দিন অবশেষ ভেল ॥
সীঁথার সিন্দুর, নয়নের কাজল, সব ভাসি গেল জলে।
হের দেখ মোর অঙ্গ জরজর, দারুণ পদ্মের নালে ॥
কুলের কামিনী, ফুলের নিছনি, কুলের নাহিক সীমা।
আরতি মাগনে, আলওয়াল ভনে জগৎ মোহিনী বামা ॥"

ভুবন বিজয়ী চিত্ত যুবক শাসিত।
চৌদিকে যুবতী কুল, মাঝে শুনায় রব
নৃত্যগীত অতিশয় আনন্দে বিভোরে।
রোমাঞ্চিত শরীর, শ্রমিতা প্রেম ভাবে অতিরসে
রমণী লুলিত পতি উরে ॥

অনুমান ১৫৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ফতেয়াবাদ পরগণায় সৈয়দ আলোয়ালের জন্ম হয়। ইনি বাঙ্গলা ভাষায় এতটা সংস্কৃত শব্দ আমদানী করিয়াছেন, যে স্বয়ং ভারতচন্দ্রও ততটা করিয়াছেন কিনা সন্দেহ। ইনি সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ, অলঙ্কার ও সাহিত্যে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন এবং স্বীয় পদ্মাবৎ গ্রন্থে অনেক সংস্কৃত শ্লোক নিজে রচনা করিয়া জুড়িয়া দিয়াছেন। আলওয়াল ভারতচন্দ্রের অনেক পূর্ব্বের কবি এবং ভারতচন্দ্রের সময় যে সংস্কৃতের যুগ পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছিল, আলওয়ালই তাহার আদি বার্ত্তাবহ। তাঁহার কাব্য এখনও চাটগায়ের মুসলমানেরা দল বাঁধিয়া গান করিয়া বেড়ায় এবং ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে মুসলমান শ্রোতাগণ এরূপ সংস্কৃতাত্মক একখানি কাব্যের রস আস্বাদ করিয়া থাকে। চাঁটগাঁয়ের মুসলমানদের রীতি অনুসারে এই বাঙ্গলা পদ্মাবৎ গ্রন্থ ফারসী অক্ষরে লিখিত হইয়া থাকে। পুস্তকের রচনা হইতে একটি নিদর্শন দিতেছি :—

"বসন্তে নাগরবর নাগরী বিলাসে।
বরবালা দুই ইন্দু—স্রবে যেন সুধা বিন্দু
মৃদু মন্দ অধরে ললিত মধুহাসে।
প্রফুল্লিত কুসুম, মধুব্রত ঝংকৃত
হুঙ্কৃত পরভৃত কুঞ্জে রত রাসে।
মলয় সমীর, সুসৌরভ সুশীতল,
বিলুলিত পতি অতিশয় রসভাসে।
প্রফুল্লিত বনস্পতি, কুটিল তমাল দ্রুম,
মুকুলিত চূতলতা কোরক জালে।
যুবজন হৃদয়, আনন্দে পরিপুরিত
রঙ্গ মল্লিকা মালতী মালে ॥
মধু সেনাপতি সঙ্গে, মদন মেদিনী-পতি বাহিনী
কোরক নব পল্লব পূর্ণিত।
নবদণ্ড কেশর, চামর সৌরভ,

এই কবিতাটি পড়িতে পড়িতে—

"মদন মহিপতেকনক দণ্ড
রুচি কেশর কুসুম বিকাশে,
মিলিত শিলামুখ পাটলি পটল কৃত-
স্মর তূণ বিলাসে ॥
*　　*　　*
উন্মাদ মদন মনোরথ পথিক,
বধূজন জনিত বিলাপে।
অলিকুল সঙ্কুল, কুসুম সমূহ
নিরাকুল বকুল কলাপে ॥"

প্রভৃতি জয়দেবের কবিতাগুলি স্বতঃই মনে পড়িবে। কিন্তু আলওয়ালের ছন্দ সম্পদ-ছিল অপূর্ব্ব, নিরক্ষর চাষাদের আবৃত্তিতে ও ফারসী অক্ষরের নোক্তার গোলযোগে সেই ছন্দগুলির অনেক বিভ্রাট হইয়াছে। এত বড় পণ্ডিতের রচনায় যদি ভুল পাওয়া যায়, তবে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, তাহা কখনই তাহার কৃত নহে, তাহা নিশ্চয়ই নকলের বিভ্রাটে। যিনি মগণ, রগণ, নগণ প্রভৃতি অলঙ্কার শাস্ত্রের মূল সূত্র লইয়া এতটা সূক্ষ্ম বিচার করিয়াছেন ও স্বয়ং বহু সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিয়াছেন, তাঁহার মূল রচনায় সে সকল দোষ কখনই ছিল না। বিশেষ বিশেষ ছন্দের জ্ঞান না থাকিলে আলওয়ালের সকল কবিতা আবৃত্তি করা সহজ হইবে না।

আলওয়াল জীবনে বহু কষ্ট সহ্য করিয়াছিলেন, যৌবনে এক জাহাজে চড়িয়া তাঁহার পিতা মজলিশ কাজির সঙ্গে বঙ্গোসাগরে যাইতেছিলেন। পর্ত্তুগীজ জলদস্যুরা তাঁহাদের জাহাজ আক্রমণ করে, সেই সমুদ্রবক্ষে জাহাজের উপর ছোটখাট একটি জলযুদ্ধ হয়। আলওয়ালের পিতা যুদ্ধে নিহত হন। কোন রকমে অব্যাহতি লাভ করিয়া আলওয়াল আরাকান

যাইয়া তথাকার সচিব মাগন ঠাকুরের আশ্রয় লাভ করেন। মহামনা মাগন ঠাকুর যুবকের পাণ্ডিত্য ও কবিত্ব দেখিয়া মুগ্ধ হন এবং তাঁহারই আদেশে আলওয়াল পদ্মাবৎ কাব্যের অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হন। এই সময় সুজা বাদশাহ আরাকানে উপস্থিত হন এবং তাঁহার সহিত আরাকান রাজ্যের মনোমালিন্য ঘটে। সুজা বাদসাহের গুপ্তচর বলিয়া আলওয়াল একটি মিথ্যাবাদী লোকের সাক্ষ্যে অভিযুক্ত হন,—এবং কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়া সাত বৎসর কাল কারা-যন্ত্রণা ভোগ করেন। তৎপরে উদ্ধার পাইয়া তিনি "ছয়ফুল মল্লিক ও বদিউজ্জমাল" নামক একখানি বাঙ্গলা কাব্য রচনা করেন। আলওয়ালের আরও অনেক কাব্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে এখনও সাদরে পঠিত ও গীত হইয়া থাকে। তিন শত বৎসর পরেও যে কবির কাব্য জন-সাধারণ হৃদয়ে গাঁথিয়া রাখিয়াছে—তাঁহার কবিতার গুণাগুণ আর সমালোচনা-সাপেক্ষ নহে। তিন শত বৎসর যাবৎ যে কাব্য লোকের হৃদয় আনন্দ দান করিয়াছে, তাহার সমালোচনার আর বাকী কি আছে?

বাঙ্গলার একটি প্রদেশের একখানি ক্ষুদ্র ইতিহাস আছে। ইহা এত ছোট যে ইহাকে একখানি ইতিহাসিকা বলা চলে, ইহার প্রায় ৪০০০ ছত্র কবিতা আছে। সমসের গাজি নামক এক দস্যু কালক্রমে এমন প্রবল হইয়া উঠেন, যে তিনি ত্রিপুরেশ্বরকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তৎস্থলে নিজে অধিষ্ঠিত হন। সমসের আলীবর্দ্দি খাঁর সমসাময়িক লোক ও প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন! এখনও সমসের গাজির গান ত্রিপুরার গীত হইয়া থাকে—অবশ্য ত্রিপুরার রাজমালা গ্রন্থে এই দস্যুপ্রবরের বিবরণ সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ আছে। সমসের গাজির বিবরণ সমস্তই ঐতিহাসিক। ইনি রাজ-পদ প্রাপ্ত হইয়া দেশে শিক্ষা প্রচলনের যে রীতি প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, ধান চাউল ও অপরাপর খাদ্যদ্রব্যের এবং সোনা-রূপার যে দর বাঁধিয়া দিয়াছিলেন, রাস্তাঘাট নির্ম্মাণ করিয়া দেশের যে উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন, তাহার একটি নিখুঁত ও খাঁটি চিত্র আমরা এই পুস্তকখানিতে পাইয়াছি। যখন সমসের দস্যু ছিলেন, তখনও রাজা হন নাই, সেই সময় তিনি সমস্ত দেশ লুণ্ঠন করিয়া বেড়াইতেন। সেই লুণ্ঠনপ্রাপ্ত অপর্য্যাপ্ত ধন তিনি উদয়পুরের পার্ব্বত্য প্রদেশে অরণ্যবহুল গিরিকন্দরে লুকাইয়া রাখিতেন। তাঁহার লোকেরা জনৈক সূত্রধরকে নিবিড় জঙ্গলে ডাকিয়া আনিত। সেই সূত্রধরকে সঙ্গে করিয়া তিনি একা শালবনে ঢুকিতেন। শাল তরুর কাণ্ডে গর্ত্ত করিয়া তিনি তন্মধ্যে বহু অর্থ লুক্কায়িত করিয়া রাখিতেন, তদনন্তর সূত্রধর সেই গর্ত্তের মুখ শাল গাছের বাকল দিয়া এমন কৌশলে বেমালুম ঢাকিয়া ফেলিত, যে বাহির হইতে সেই অর্থের কোন চিহ্নই পাওয়া যাইত না। তারপর সূত্রধরের পুরস্কারের পালা। সমসের মুক্ত কৃপাণ দ্বারা সূত্রধরের শিরশ্ছেদ করিয়া ফেলিতেন। তাহার মুখ এই ভাবে চিরকালের জন্য বন্ধ হইয়া যাইত—কে আর সেই অর্থের সন্ধান বাহিরের লোক কে দিবে? শুনিয়াছি, এখনও উদয়পুরের জঙ্গলে শালবৃক্ষ কর্ত্তন করিতে যাইয়া কেহ কেহ অগাধ ঐশ্বর্য্য পাইয়া থাকে। নানারূপ ঐতিহাসিক তত্ত্বে এই পুস্তকখানি পূর্ণ। যদিও গ্রন্থকারের নাম নাই, তথাপি তিনি যে মুসলমান ও সমসের গাজির অন্তরঙ্গ ভক্ত ছিলেন, বই পড়ার পর তাহাতে কোন সন্দেহই থাকিতে পারে না। কথিত আছে, ত্রিপুরেশ্বরকে যুদ্ধে আহ্বান করিয়া তিনি বিজয়-কামনায় উদয়পুরস্থিত ত্রিপুরেশ্বরীর মন্দিরে পূজা পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। এই বইখানি, রাজকৃষ্ণবাবুর কথায় বলিতে গেলে, একটি মুষ্টিভিক্ষা, কিন্তু উহা সুবর্ণ মুষ্টি, যেহেতু প্রাচীন বাঙ্গলায় ঐতিহাসিক পুস্তক অতি অল্পই আছে। প্রায় [illegible] বৎসর পূর্ব্বে নোয়াখালির জজ আদালতের সেরেস্তাদার মৌলভি লুৎফুল খবীর সাহেব এই পুস্তকখানি প্রকাশিত করিয়া আমাকে একখণ্ড উপহার পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু খবীর সাহেব তারপর কি ভাবে কোথায় গেলেন, এমন কি তিনি জীবিত কি মৃত, তাহা আমরা বহু সন্ধান করিয়াও জানিতে পারি নাই। তাঁহার বাড়ী ছিল ত্রিপুরা জেলায়। ছোটলাটের প্রাইভেট সেক্রেটারী গুরলে সাহেব একখণ্ড সমসের গাজির গানের বই খুঁজিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাহা পান নাই। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক স্বর্গীয় কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় তাঁহার রাজমালায় সমসের গাজির বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন।

বঙ্গভাষার উপর মুসলমানের প্রভাব

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

সুন্দরবনের ব্যাঘ্রের দেবতার সঙ্গে কোন গাজির যুদ্ধ প্রভৃতি মুসলমানগণ কর্ত্তৃক বাঙ্গলা বহু পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সত্যপীরের কথাও বিশুদ্ধ বাঙ্গলা পয়ারে অনেক মুসলমান লেখক বর্ণনা করিয়াছেন। সত্যপীরের একখানি কাব্য কৃষ্ণদাস নামক এক লেখক রচনা করিয়া বহুদিন পূর্ব্বে গরাণহাটা হইতে ছাপাইয়াছিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যদিও কবির নাম কৃষ্ণদাস, তথাপি তিনি খুব সম্ভব মুসলমান ছিলেন। আল্লা ও নবীর স্তোত্র দ্বারা তিনি কাব্যের মুখবন্ধ করিয়াছেন। পুস্তকখানিতে আরবী ও ফারসী শব্দ একটু বেশী পরিমাণেই আছে। বহিখানির পত্রবিন্যাসও দক্ষিণ হইতে বাম দিকে। পত্র-সংখ্যা ডিমাই আট পেজি ফর্ম্মার ২৫০ পৃষ্ঠা। ওয়াজেদ আলি নামক অপর এক কবি সত্যপীর সম্বন্ধে আর একখানি সুবৃহৎ কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, মুন্সী পিজির উদ্দিনের মানিকপীরের কথাও একখানি উল্লেখযোগ্য কাব্য। মল্লিকা রাজকন্যার কাহিনী-লেখকও একজন মুসলমান। এই কাব্যে বিশ্ববিশ্রুত বীর হানিফের সঙ্গে বরুণ রাজার কন্যা মল্লিকার যুদ্ধ-কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। রাজকুমারী হানিফকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিয়া পরাজিত হইয়া তাঁহার অঙ্কশায়িনী হন এবং বরুণ রাজা ইসলাম-ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া অব্যাহতি পান। পুস্তকখানি অতি সহজ ও অনাড়ম্বর বাঙ্গলা পদ্যে লিখিত এবং ইহার লিপি-কৌশল প্রশংসনীয় ও কৌতূহলপ্রদ। বস্তুত কৃষকদিগের রচিত গাজির গান নামধেয় বিশাল বাঙ্গলা সাহিত্যের মধ্যে আমরা এই পুস্তকখানি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনে করি। বহু মুসলমান কবি মনসাদেবীর ভাসান গান রচনা করিয়াছেন এবং পূর্ব্ববঙ্গে মুসলমানগণ দল বাঁধিয়া ঐ গান নানাস্থানে শুনাইয়া জীবিকা অর্জ্জন করিয়া থাকে। কালী সম্বন্ধে মূজা হুসেন আলির অনেক গান আমাদের নিকট সুপরিচিত। "বলে মূজা হুসেন আলি, যা কর মা জয়কালী" প্রভৃতি গানের সঙ্গে আমরা পর্ত্তুগীজ খৃষ্টান কবি এ্যাণ্টোনির "ভজন সাধন জানি না মা জেতে আমি ফিরিঙ্গী" ইত্যাদির উল্লেখ করিতে পারি। এ্যাণ্টোনিও খৃষ্টধর্ম্ম ত্যাগ করেন নাই, মূজা হুসেন আলিও হিন্দুধর্ম্ম পরিগ্রহ করেন নাই—উহা নিতান্তই সখের কবিতা। আমরা ত্রিপুরা জেলার গোল মামুদের কালী সংকীর্ত্তনের দলের গান শুনিয়াছি। সে আজ ৪০ বৎসর পূর্ব্বেকার কথা। গোল মামুদ স্বয়ং অনেক কালীসঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন। সেগুলি প্রায়ই ঝিঁঝিট রাগিণীতে গীত হইত। তদ্বিরচিত "উনমত্তা ছিন্নমস্তা এ রমণী কার" আমরা তাঁহারই মুখে শুনিয়াছি। সেই সকল গান শুনিলে মনে হইত আকাশ বাতাস ছাইয়া এলো চুলে এক কাদম্বিনী কৃষ্ণা উলঙ্গিনী রমণী তাঁহার ভৈরব নৃত্য দ্বারা লোকের বিস্ময় ও ভীতি উৎপাদন করিতেছেন।

মুসলমান কবিদের বাঙ্গলা গ্রন্থ ও গানের পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, হিন্দুর সঙ্গে মুসলমান ভ্রাতৃভাবে এক পংক্তিতে বসিয়া গিয়াছেন। কেতকাদাস প্রণীত বিখ্যাত মনসামঙ্গলে লিখিত হইয়াছে যে লক্ষ্মীন্দরের শয্যাপার্শ্বে রক্ষা-কবচের সঙ্গে একখানি কোরাণ অতি শ্রদ্ধার সহিত রক্ষিত হইয়াছিল। মুসলমানদের রচিত বহু কাব্যে হিন্দুদের দেবীর বন্দনা আছে, পীর ও সন্ন্যাসী উভয়ের প্রতি সশ্রদ্ধ নমস্কার আছে—প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্য যেন হিন্দু ও মুসলমানের কথা গলাগলি ভাবে মিশিয়া আছে। প্রতিবেশী প্রতিবেশীর আমোদে প্রমোদে উৎসবে প্রাণ খুলিয়া যোগ দিতেছেন, অথচ কেহ কাহারও ধর্ম্ম ছাড়েন নাই।

যদি মুসলমানগণ তাঁহাদের সমাজের উন্নত চরিত্রগুলি সুন্দর ও মহিমান্বিত বর্ণে চিত্রিত করিয়া বাঙ্গলা সাহিত্যে উপস্থিত করেন, তবে হিন্দু মুসলমান একসঙ্গে তাঁহাদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইবে। উত্তর পশ্চিমে অনেক হিন্দু মহরমের মর্ম্মন্তুদ কাহিনী শুনিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করে এবং উৎসবের দিনে তাজিয়া বাহির করে। নিদারুণ তৃষ্ণায় জলবিন্দুর জন্য কোমল কুসুম-কোরকের মত, সখিনা ও কাসেম শুকাইয়া মরিলেন—কারবালা ক্ষেত্রের সেই করুণ কাহিনী কি শুধু মুসলমানেরই জাতীয় সম্পত্তি, না সমস্ত বিশ্ববাসীর রস-সম্পদ? বঙ্গের যে পল্লীসঙ্গীত মুসলমান কৃষকের অতুলনীয় সম্পদ, যে গৌরব নভঃস্পর্শী, অপূর্ব্ব, আশ্চর্য্য, তাহার কথা আমি পরে লিখিতেছি। এখন এই সঙ্গীতের স্রোত মুসলমান সমাজে অবরুদ্ধ করিলে তাঁহাদের জাতীয় জীবন শুকাইয়া মরিবে—বাড়ী খানি

গঙ্গার তীরে অবস্থিত, সেই সুরনদীকে বন্ধ করিলে জাতীয় জীবনের রসধারা কে সঞ্জীবিত রাখিবে? আমির খসরু সেতারের উদ্ভাবন করিয়াছিলেন, মিঞা তানসেন সঙ্গীত বিদ্যারূপ হিমাদ্রির কাঞ্চনজঙ্ঘায় অধিরোহণ করিয়াছিলেন। ইঁহারা কি ইস্‌লামের শত্রু ছিলেন?

এ পর্য্যন্ত আমরা অনেক মুসলমান বাঙ্গলা কবির নাম করিয়াছি, কিন্তু তাহা অতি নগণ্য অংশ। পূর্ব্ববঙ্গের নিরক্ষর মুসলমান চাষা ও মাঝিরা মুখে মুখে যে সকল গান বাঁধিয়া থাকে, তাহা অনেক সময় অতি সুন্দর কবিত্বময়। মুসলমান বাউলদের 'মুরসিদা' গান দেহতত্ত্ব বিষয়ক, তাহার ভাব-সম্পদ আধ্যাত্মিক, অনেক স্থলে তাহা এত সুন্দর যে আমাদের আশ্চর্য্য বোধ হয়, সামান্য ফকির ও বাউলেরা কি করিয়া ধর্ম্মরাজ্যের সেই সকল সূক্ষ্ম তত্ত্ব আয়ত্ত করিয়াছে। শত শত মুরসিদা গান সেই সকল বাউল, মাঝি ও কৃষকের কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়া বাঙ্গলার পল্লীর আকাশ বাতাস পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। কোন নিবিড় জঙ্গলে যেরূপ শত শত বনফুল ফুটিয়া নীরবে সুরভি বিস্তার করিয়া লোকচক্ষুর আড়ালে বিলীন হয়, কেহ তাহাদিগকে দেখে না, কুড়ায় না, সেইরূপ এই সকল "মুরসিদা" গান ভদ্র সমাজের অগোচরে সর্ব্বদা ধ্বনিত হইয়া আনন্দ ও শিক্ষা দান করিয়া বিলীন হইতেছে, কে তাহাদিগের খোঁজ করে? আমাদের দেশের এখন রীতি দাঁড়াইয়াছে যে, দেশের ঠাকুর ফেলিয়া বিদেশের কুকুরকেই বেশী আদর করিয়া থাকি। এই সকল পল্লীর আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য্য গর্ব্ব করিবার সামগ্রী, তাহা কি আমরা কখনও করিয়াছি? এই বঙ্গদেশে কত মসজিদ, কত ইষ্টক ও শিলালিপি, কত কীর্ত্তি-স্তম্ভ মুসলমানদের বিজয়ের বার্ত্তা ঘোষণা করিতেছে। বঙ্গদেশে এমন পল্লী নাই, যেখানে মুসলমানদের গৌরব ও পরাক্রান্ত অভিযানের কথা নাই, যেখানকার ধূলি পীর দরবেশদের পদধূলি কিম্বা সমাধিতে পবিত্র হয় নাই। মুসলমান ভ্রাতাদের মধ্যে কত জন তাহার খবর রাখেন?

মীর মসারেফ হুসেনের "বিষাদ সিন্ধু" পড়িয়া আমরা শত শত হিন্দুকে অশ্রুবর্ষণ করিতে দেখিয়াছি। আমরা বলিয়াছি সাহিত্যে হিন্দু নাই, মুসলমান নাই, উহা মানবতার রাজ্য। হৃদয়ের মহৎ গুণরাশি, মানুষের উজ্জ্বল কীর্ত্তি-রাশির উহাই জীবন্ত চিত্রপট। উহা হিন্দু ও মুসলমান উভয় শ্রেণী হইতে প্রাপ্য চাহিয়া হস্ত প্রসারণ করিয়া আছে।

বঙ্গভাষা বঙ্গের পল্লীতে মুসলমানদের মধ্যে কিরূপ দৃঢ়-ভাবে বদ্ধমূল হইয়াছে, তাহা পূর্ব্ববঙ্গের শত শত ছোট মুসলমানী কবিতা গানে প্রকাশিত হইয়াছে। আমি অতি অল্প আয়াসে ১৮৮ খানি সেইরূপ মুদ্রিত ক্ষুদ্র পুস্তিকা সংগ্রহ করিয়াছি, তাহার অধিকাংশই মুসলমানের লেখা। স্থানীয় এমন কোন ঘটনা নাই, যাহাদের সম্বন্ধে কৃষক কবিগণ পালাগান রচনা না করিয়াছে। আরও শত শত পুস্তক ইচ্ছা করিলে সংগ্রহ করা যাইতে পারে। বৎসর বৎসর এই ভাবের বহুসংখ্যক পুস্তিকা রচিত হইতেছে। মুসলমানদিগের ঐতিহাসিক বুদ্ধি ও রুচি স্বতঃসিদ্ধ। এমন কোন ক্ষুদ্র কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনা নাই, যাহা পল্লী-কৃষকের দৃষ্টি এড়াইয়াছে। তাহারা বঙ্গদেশে যখন যাহা ঘটিয়াছে তখনই সে সম্বন্ধে পালা-গান রচনা করিয়া তাহা স্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে! বন্যা, ভূমিকম্প, অগ্নিদাহ, নৌকাডুবি, যাহা কিছু হয়, মুসলমান কৃষক তখনই তাহা লইয়া বাঙ্গলায় পালা-গান রচনা করিয়া থাকে। ঐ সকল গানে অতিরিক্ত পরিমাণে ফারসী, আরবীর দৌরাত্ম্য নাই, সংস্কৃত তো তাহাদের ধারে কাছেও থাকে না। খাঁটি বাঙ্গলায় সেগুলি রচিত হইয়াছে। বন্যায় কোন এক দন্তহীন বৃদ্ধার কাঁথাখানি এবং সঞ্চিত হলুদের গুঁড়া ভাসিয়া গেল, হয়ত পল্লীকবি তাহার সম্বন্ধে দুইচারি ছত্রে পরিহাসোজ্জ্বল চরণ লিখিয়াছেন। এক সময়ে একটা বাঘ নদীর পাড়ে বসিয়াছিল, তাহাকে একজন কৃষক গাভী মনে করিয়া ধরিতে গিয়া বড়ই বিপদে পড়িয়াছিল। কোন্ কোন্ গ্রাম অতিক্রম করিয়া পল্লীর জনতা বিতাড়িত হইয়া সেই বাঘ পলাইয়া গিয়াছিল, কোন্ কোন্ নদী সাঁতরাইয়া পার হইয়া শেষে সকলের দৃষ্টি অতিক্রম করিয়া কিরূপে জঙ্গলে ঢুকিয়া পড়িয়াছিল তাহার একটা উত্তেজক কবিত্বময়ী বর্ণনা আমরা এই গানটিতে পাইয়াছি। আর একটি গানে কোন মুসলমান মহিলা সাতজন ডাকাতকে একা গৃহের ছাদ হইতে গুলি করিয়া কিরূপে হত্যা করেন, তাহার বিবরণ দেওয়া আছে। এ

সেন

...স্পষ্ট ঐতিহাসিক ঘটনা। বঙ্গের বাহিরেও মুসলমান চাষার দৃষ্টি আছে—এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকায় কামাল-পাশা, ব্রহ্মদেশের লড়াই, থিবোর কথা ও মণিপুরের যুদ্ধ হইতে সামান্য মাঝির নৌকাডুবির বৃত্তান্ত পর্য্যন্ত সকল কথাই কবিতার ছন্দে লিখিত হইয়াছে। ঐ সকল পুস্তিকা পাড়াগাঁয়ে খবরের কাগজের কাজ করিয়া থাকে। হিন্দু চাষাদের মধ্যে পালাগান ও ঐরূপ সংবাদপূর্ণ কবিতার এতটা প্রচলন নাই। উহা দ্বারা এই কথা অতি স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, বাঙ্গলাভাষা পল্লীর নিরক্ষর মুসলমানদের হাতে আধুনিক সময় পর্য্যন্ত একটা বিশেষ ভাবে গড়িয়া উঠিতেছে—তাহাতে কিছু ফারসী কিছু আরবীর উপাদান আছে কিন্তু তাহার আতিশয্য নাই, সংস্কৃতের প্রভাব তো আদৌ নাই বলিলেই চলে।

এ পর্য্যন্ত আমরা দেখাইয়াছি বাঙ্গলা সাহিত্যের উপর মুসলমানদের কতটা প্রভাব পড়িয়াছে। কিন্তু শুধু তাহাই নহে, বাঙ্গলা সাহিত্যে মুসলমান কবি রাজসিংহাসনের দাবী করিতেছেন, বাঙ্গলা সাহিত্যে এরূপ সকল মুসলমান কবির আবির্ভাব হইয়াছে যাঁহারা কবিকুল চক্রবর্ত্তী, যাঁহাদের যশোভাতির নিকট আলাওল এমন কি ভারতচন্দ্রের খ্যাতিও পরিম্লান হইয়াছে।

সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তিনখণ্ড পল্লী-গীতিকা প্রকাশিত করিয়াছেন। তাহাতে মুসলমান কবিদের যে কাব্যের নিদর্শন আছে, তাহা অতুলনীয়। দুঃখের বিষয় এই সকল পল্লীগীতি সম্বন্ধে এদেশের লোক ততটা অবহিত নহেন। এই পল্লীগীতিকার প্রথম খণ্ডে "দেওয়ানা মদিনা" নামক একটি পালাগান প্রকাশিত হইয়াছে। এতৎসম্বন্ধে ফরাসীদেশের বিখ্যাত লেখক মহাত্মা রোম্যা রোলাঁ লিখিয়াছেন, এরূপ অদ্ভুত কাব্য তিনি গ্রাম্য কৃষকের নিকট হইতে প্রত্যাশা করেন নাই। পল্লী কৃষক-কবি কিরূপে নিপুণ শিল্পীর ন্যায় এই আশ্চর্য্য কীর্ত্তির মঠ রচনা করিয়াছেন, তাহা তাঁহার বিস্ময়ের সৃষ্টি করিয়াছে।

"দেওয়ান মদিনার" প্রসিদ্ধ গায়ক ছিলেন 'জালাল উদ্দিন'। তিনি যখন ভাটিয়াল সুরে এই গানটি গাহিতেন, তখন বেদনায় শ্রোতাদের হৃদয় ভরিয়া উঠিত ও তাঁহারা আর্ত্তনাদ করিয়া কাঁদিয়া উঠিতেন। উহা রয়াল আট পেজি ফর্ম্মার ৩৫ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। এত ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে এরূপ করুণ রসাত্মক কাব্য আমরা আর কোন সাহিত্যে পড়িয়াছি বলিয়া মনে হয় না। রোম্যা রোলাঁ সমালোচনা রাজ্যের সম্রাট, তিনি নির্ভয়ে মুক্তকণ্ঠে কবিকে তাঁহার প্রাপ্য প্রশংসা দিয়াছেন। আমরা অধীন জাতি, আমরা নিজেদের কবি সম্বন্ধে একটা বড় রকমের প্রশংসা দিতে ভয় পাই। বিদেশী কবিগণের পশ্চাতে তাঁহাদের সমালোচকেরা দুন্দুভি-নিনাদ করেন ও তাঁহাদের ডঙ্কা-নিনাদে বসুধা কম্পিত হয় এবং লোকেরা গরুড় পক্ষীর ন্যায় জোড়-হস্ত হইয়া কবির সেই উচ্চ প্রশংসায় দোহার গিরি করিয়া থাকে—কিন্তু আমাদের পল্লীর ক্ষেত্রে যদি অত্যুজ্জ্বল হীরক-খণ্ডও থাকে তাহা মাটীর ডেলার মত উপেক্ষিত হয়। ("কাঠুরে এক মাণিক পেল, পাথর ব'লে ফেলে দিল, অভিমানে কাঁদ্‌ছে মাণিক ,মহাজনে টের পেল না")—আমাদের পরাধীন দেশের কাঞ্চন কাঁচ হইয়া যায়, জয়দৃপ্ত বিদেশীদের কাঁচও কাঞ্চন-মূল্যে বিকাইয়া থাকে।

দুলাল নামক কোন দেওয়ানের ছেলে (রাজপুত্র) কর্ম্মদোষে বিমাতার ষড়যন্ত্র হইতে কোনরূপে জীবন রক্ষা করিয়া একটি কৃষক গৃহে প্রতিপালিত হয়। সেই কৃষকের কন্যা মদিনাকে সে বিবাহ করিয়া শ্বশুরের সামান্য জমিজমার মালিক হইয়া গৃহস্থালী করিতে থাকে। ২০।২৫ বৎসর পরে, তাহার ভ্রাতা তাঁহাকে আবিষ্কার করেন এবং রাজতক্তার অর্দ্ধেক ভাগ গ্রহণ করিতে আমন্ত্রণ করেন। দুলাল বলিলেন, "আমার স্ত্রী মদিনা আমাকে প্রাণ দিয়া ভালবাসে। তাহার দ্বাদশ বৎসরের সুরুজ জামাল নামক এক ছেলে, ইহাদিগকে তিনি কি করিয়া পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন?'' ভ্রাতা আলাল বলিলেন, "তুমি রাজপুত্র, একটা সামান্য কৃষকের মেয়েকে বিবাহ করিয়াছ, ইহা প্রচারিত হইলে আমাদের লজ্জায় মাথা কাটা যাইবে। তুমি তালাক দিয়া যাও। তুমি তাহার সুখের পথে বাধা দিও না, তালাক দিলেই তোমার দায় ফুরাইল, শাস্ত্রের চক্ষে তুমি নির্দ্দোষ হইবে। তাহাদের যাহা জমি জমা আছে তাহাতে তাহাদের জীবন যাত্রা স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাইবে।"

দুলাল অনেকটা ইতস্ততঃ করিয়া রাজ্যলোভে ও রাজকন্যা বিবাহ করিবার ইচ্ছায় একখানি তালাক-নামা লিখিয়া দিলেন। কিন্তু এই দলিলখানি স্বয়ং মদিনার হাতে দেওয়া তাঁহার সাহসে কুলাইল না। তিনি তাহা মদিনার ভ্রাতার হাতে দিয়া গেলেন। মদিনা প্রথমতঃ সেই তালাকনামা একবারে উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিল, তাহার মাথায় যে এত বড় বজ্র পড়িবে সে তাহা স্বপ্নেও ভাবিতে পারে নাই। সে বলিল—"আমার স্বামী আমাকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসেন, তিনি আমাকে পরীক্ষা করিবার জন্য এই কাগজটা লিখিয়াছেন।" পরমনির্ভরপরায়ণা, স্বামীগতপ্রাণা মদিনাবিবির মুহূর্ত্তের জন্য সন্দেহ হইল না যে তাহার স্বামী তাহাকে যথার্থই তালাক দিয়াছেন ও প্রিয়তম পুত্র সুরুজকে ত্যাগ করিয়াছেন। স্বামীর প্রত্যাগমনের আশায় সে কি ভাবে উদ্‌গ্রীব হইয়া পথের পানে চাহিয়া প্রতীক্ষা করিয়াছে, তাহা কবি এইভাবে উল্লেখ করিয়াছেন।

> আইজ আইসে কাল আইসে এই না ভাবিয়া।
> মদিনা সুন্দরী দিল কত রাইত গোঁয়াইয়া॥
> আজ বানায় তালের পিঠা কাইল বানায় পৈ।
> ছিকাতে তুলিয়া রাখে গামছা বাঁধা দৈ॥
> শালি ধানের চিড়া কত যতন করিয়া।
> হাঁড়িতে ভরিয়া রাখে ছিকাতে তুলিয়া॥
> এই মতন কত খাদ্য মদিনা বানায়।
> হায় রে পরাণের খসম ফিরা নাহি চায়॥
> ভাল ভাল মাছ আর মোরগের ছালুন।
> আইজ আসবে বলি রাখে খসমের কারণ॥

কিন্তু তাহার খসম রাজসিংহাসনে বসিয়াছেন, রাজকন্যা বিবাহ করিয়াছেন, মদিনাকে একবারে ভুলিয়াছেন। অবশেষে বহু বিনিদ্র রজনী কাটাইয়া ছয়মাস কাল প্রতীক্ষার পর মদিনা আর থাকিতে পারিল না। সে তাহার ভ্রাতার সঙ্গে সুরুজকে স্বামীর নিকট পাঠাইয়া দিল। বানিয়াচঙ্গ সহরে বাহির বাঙ্গলার পথে দেওয়ান দুলালের সঙ্গে ইহাদের দেখা হইল। দুলাল ইহাদিগকে দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন, "তোমরা এখুনি এস্থান হইতে বাড়ী ফিরিয়া যাও। আমি এদেশের রাজা—কৃষক কন্যা আমার পত্নী এবং সুরুজ আমার পুত্র ইহা জানিতে পারিলে প্রজাদের নিকট আমার মাথা কাটা যাইবে। তোমাদের যে সম্পত্তি আছে, সামান্য কৃষকের পক্ষে তাহা কম নহে। তাহাতে তৃপ্ত থাক। এখানে এক মুহূর্ত্ত থাকিলে রাজধানীতে আমার মাথা হেট হইয়া যাইবে, তোমরা প্রস্থান কর।

> "দুলালের মুখে এই কথা না শুনিয়া।
> দুঃখিত হইয়া তারা গেল যে চলিয়া॥
> তার পরে দুইজনে পন্থে মেলা দিল।
> কাঁদিতে কাঁদিতে সুরুজ বাড়ীতে ফিরিল॥"

তার পর কবি যে দৃশ্য উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন, তাহা দেখিলে কঠিন পাষাণও বুঝি বিগলিত হয়। অতি বিশ্বস্ত, সাধ্বী মদিনার শোক বর্ণনা করা যায় না। কৃষক ও কৃষক পত্নীর প্রেমের যে ছবি কবি দিয়াছেন, তাহা সোনার সঙ্গে সোহাগার মিলন। মদিনা বিনাইয়া বিনাইয়া আক্ষেপ করিতেছেন, একদিনও তো তুমি আমাকে ছাড়া থাকিতে পারিতে না, তুমি আমার পরাণের সাথী—আমার পরাণ লইয়া গিয়াছ, কি করিয়া এমন পাষাণ হইলে? অগ্রহায়ণ মাসে তাড়াতাড়ি হৈমন্তিক ধান তুমি কাটিতে; পাছে ঝড় জলে নষ্ট হয়, এইজন্য অতি ব্যস্ততার সহিত কাজ করিতে, আমি সেই ধান বাড়ীর আঙ্গিনায় বিছাইয়া দিতাম। আমি কুলায় ধান ঝাড়িতাম, খড় কুটার টুকরা বাছিয়া ফেলিয়া ধানের কতক বিক্রয় করিতাম, কতক গোলায় তুলিতাম। যখন পৌষ মাসে ধানে ক্ষেত পূর্ণ হইয়া যাইত, আমি কত কষ্টে তাহা পাহারা দিতাম। হুকাতে জল ভরিয়া কল্কের আগুনে ফুঁ দিতে দিতে আমি তোমার আগমনের প্রতীক্ষায় বাহিরের পথের দিকে চাহিয়া থাকিতাম। ক্ষেতের এক স্থান হইতে চারা গাছগুলি যখন তুমি অন্যত্র রোপন করিতে, আমি হাত বাড়াইয়া তাহা তোমাকে এগিয়া দিতাম। তুমি যখন ক্ষেতে কাজ করিতে, আমি তোমার জন্য কত যত্নে অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া পথের দিকে চাহিয়া থাকিতাম। তুমি সেই অন্ন ব্যঞ্জন খাইয়া আমার রান্নার কত তারিপ করিতে, লজ্জায় আমার মুখ রাঙ্গা হইয়া উঠিত। মাঘ

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

মাসের অতি প্রত্যুষে তুমি উঠিয়া ক্ষেতে জল ঢালিতে, আমি মেটে হাঁড়িতে আগুন লইয়া ক্ষেতের দিকে যাইতাম, দুইজনে একত্র হইয়া আগুন পোহাইতাম। দুইজনে একত্র হইয়া শালি ধানের মধ্যের আবর্জ্জনা বাছিয়া ফেলিতাম। তুমি খড় কাটিতে, আমি পুকুর হইতে বারংবার জল আনিতাম।

"সেই না সুখের কথা যখন হয় মনে।
মদিনার বয় পানি অক্ষর নয়নে॥"

চাষার ভাষায় ঐ সকল কথা লিখিত হইয়াছে। অনেকে তাহা বুঝিতে পারিবেন না বলিয়া আমি তাহা সাধু ভাষায় লিখিলাম। তাহাতে ভাষার উন্নতি হইলেও ভাব মাঠে মারা গিয়াছে, কারণ সেই চাষার ভাষায় করুণ কথাগুলি একবারে সোজাসুজি বুকে আসিয়া ছুরির মত দাগ বসাইয়া দেয়—সাধু ভাষায় সেই করুণ রস একবারে মাটী হইয়া গিয়াছে। মদিনা আর সহ্য করিতে পারিল না, সে পাগল হইল, চক্ষে নিদ্রা নাই, উদরে অন্ন নাই—

"ক্ষণে হাসে ক্ষণে কাদে, ক্ষণে দেয় গালি।
ক্ষণে ক্ষণে জোকার দেয় ক্ষণে করতালী।
খাওন বেগর আর এই না অবস্থায়॥
সোনার অঙ্গ মলিন হৈল হাড়েতে মিশায়।
তার পর একদিন সকল চিন্তা থুইয়া।
বেহস্তের হুরি গেল বেহস্তে চলিয়া।"

কিন্তু এইখানেই পালার শেষ নহে। দেওয়ান দুলালের অনুতাপের যে চিত্র কবি দিয়াছেন, তাহা একটা জীবন্ত করুণার ছবি। যে এরূপ ভালবাসিয়া প্রাণ দেয়, তাহার নীরব নিবেদন কি প্রণয়ী উপেক্ষা করিতে পারে? সুরুজকে বিদায় দেওয়ার পর হইতেই দুলালের মন অন্যরূপ হইয়া গেল। "এ কি করিলাম! যে সুরুজ আমার প্রাণের প্রিয়, যাহাকে বুকে রাখিয়াও আমি এক দণ্ড সোয়াস্তি পাই নাই, তাহাকে এ কি বলিলাম!" ধন দৌলত ক্রমে দুলালের নিকট বিষ বোধ হইতে লগিল। তিনি একদিন একাকী সাধারণ কৃষকের বেশে তাঁহার স্ত্রী পুত্রকে দেখিবার আশায় ছুটিলেন। 'আমার মদিনা বিবিকে কি ফিরিয়া পাইব?' মনের ভিতর এই এক প্রশ্ন, ভয়ে আশঙ্কায় তাঁহার হৃদয় দুরু দুরু কাঁপিতে লাগিল। তাঁহার বিরহ-মথিত অন্তঃকরণের তাৎকালিক অবস্থাও প্রিয়াদর্শন কামনায় অভিযানের কথা পাঠ করিলে অতি কঠিন চিত্তও করুণার্দ্র হইবে।

"লোক লস্কর নাই—"দুলাল একাকী চলিলেন, পথে যাইতে ডাইনে একটি গাভিন শিয়ালী ও তেলীর মুখ দেখিলেন—আশঙ্কায় বুক কাঁপিয়া উঠিল। যখন তিনি স্বীয় গৃহের সন্নিহিত হইলেন, তখন তিনি মদিনার বড় সাধের গাইটিকে দেখিলেন পথে পড়িয়া আছে, "ঘাস নাই, জল নাই, ডাকে ঘন ঘন।" প্রাণ থাকিতে তো মদিনা বিবি তাহার বড় আদরের গাভীকে এরূপ অবস্থায় ছাড়িয়া থাকিতে পারে নাই। দুলালের বুক আবার দুরু দুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিল।

পথিকের কত কথাই মনে হইতে লাগিল, যখন মদিনার বয়স ছয় বৎসর, সে তখন হইতে দুলালকে ছাড়া থাকিতে পারিত না। তাহার আঙ্গুল ধরিয়া পাড়ায় পাড়ায় বেড়াইত। একটা বুলবুলের বাচ্চা আকাশ হইতে উড়িয়া আসিয়া তাহাদের ঘরের চালে পড়িয়া ছিল, দুলাল পাখিটিকে ধরিয়া দিয়াছিলেন। একটা খাঁচা নিজ হাতে তৈরী করিয়া দুলাল বুলবুলটাকে তাহার মধ্যে পুরিলেন এবং তাঁহারা দুইজনে সেই পাখিটিকে এতকাল পালন করিয়াছেন। আজ দেখিলেন, খাঁচাটা আঙ্গিনায় পড়িয়া আছে, ও অতি শীর্ণ পালকহীন পাখীটা ঘরের চালের উপর বসিয়া অতি ক্ষীণ ও করুণ স্বরে চীৎকার করিতেছে। আবার দুলালের বুক কাঁপিয়া উঠিল। মদিনা বাঁচিয়া থাকিলে কি এমনটি হইতে পারিত? তাহাদের পোষা বিড়ালটা মিউ মিউ করিয়া ডাকিয়া ক্ষুধা জানাইতেছে, গোয়াল ঘরে গরুগুলি ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর—কঙ্কাল সার।

বিগত জ্যৈষ্ঠ মাসে মদিনা ও দুলাল দুইজনে খুব ভাল একটা আমের চারা রোপন করিয়া তাহার চারদিকে বেড়া দিয়াছিলেন, কত যত্নে উভয়ে তাহার মূলে রোজ জল ঢালিতেন—পাতাগুলি সুন্দর সবুজ শ্রী ধারণ করিয়াছিল,

কিন্তু আজ দুলাল দেখিলেন বেড়া ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, গাছটি গরুতে খাইয়া ফেলিয়াছে।

ক্ষিপ্তের ন্যায় দুলাল 'মদিনা'র নাম করিয়া উচ্চৈস্বরে ডাকিতে লাগিলেন। প্রথমতঃ কোন সাড়াই পাইলেন না। ঘরের চালের উপর একটা কাক কর্কশ কণ্ঠে 'কা কা' রবে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। সেই গৃহের এক কোণে শোকে-দুঃখে প্রিয় পুত্র সুরুজ জামাল মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়া ছিল। সে পিতার কণ্ঠধ্বনি শুনিয়া বাহির হইল।

> "দুলাল জিজ্ঞাসে সুরুজ মদিনা কোথায় !
> চোখে হাত দিয়া সুরুজ কবর দেখায়।"

শোকে তাহার কণ্ঠ বন্ধ হইয়াছিল। সে এক হাতে চোখের জল মুছিতেছিল, অপর হাত দিয়া গৃহ আঙ্গিনায় মাতার কবর নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিল। এই দৃশ্যটি উৎকৃষ্ট কোন চিত্রকরের অঙ্কনযোগ্য।

জামাত উল্লা বয়াতির রচিত "মাণিক তারা" বা "ডাকাতের পালা" দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। এই পালা গানটির কাব্য-ঐশ্বর্য্য অতুলনীয়। কৃষক-কবি চাষাদের জীবনের যে নিখুঁৎ ছবি আঁকিয়াছেন, বঙ্গ সাহিত্যে তাহার সমকক্ষ কবিতা কতটি আছে জানি না। ব্রহ্মপুত্র নদীর বর্ণনা হইতে আরম্ভ করিয়া একটী সরল গ্রাম্য বালক কিরূপে দুর্দ্দান্ত ডাকাতে পরিণত হইয়াছিল, এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ও তাঁহার স্ত্রীকে নৌকায় হত্যা করিয়া তাঁহাদের বিপুল ধন রত্ন লুণ্ঠন করিয়াছিল—বালককে দস্যুতে পরিণত হইতে দেখিয়া তাহার ধর্ম্মভীরু মাতা কিরূপে শয্যা গ্রহণ করিয়া অনুতাপজনিত জ্বর রোগে প্রাণ ত্যাগ করিলেন, কবিরাজ মহাশয়ের প্রচেষ্টা ও অক্ষমতা, তরুণ দস্যুর বিবাহ, তাঁহার স্ত্রী মাণিকতারার সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং ধনুর্ব্বাণে কৃতিত্ব প্রভৃতি বিষয় কবি ছবির মত আঁকিয়া গিয়াছেন। এই পালাটির কোনস্থানে নিপুণ শিল্পীর ন্যায় লিপি-কুশলতা, কোথাও হাস্যরসোজ্জ্বল হৈমন্তিক রৌদ্রের ন্যায় সুখদ-পদ-বিন্যাস, কোথাও পূর্ব্ব রাগের রমণীয়তা, ডাকাতদের ষড়যন্ত্র,—এ সমস্তই এমন দক্ষতার সহিত লিখিত হইয়াছে যে জামাত উল্লাকে সারস্বত কুঞ্জের প্রথম পংক্তিতে স্থান দিতে বোধ হয় কাহারও আপত্তি হইতে পারে না। গ্রাম্য কবির এই কাব্যখানির প্রত্যেক বাঙ্গালীর পাঠ করা উচিত। পাড়াগেঁয়ে ভাষা কোন স্থানে প্রাদেশিকতার বাহুল্যে দুর্ব্বোধ, কিন্তু ধূলিমাটিমলিন হীরকের জ্যোতি কি সেই সকল বাহিরের মলিনতা ফুটিয়া বাহির হয় না? মাণিক-তারার কবিত্ব-ভাতি গ্রাম্য ভাষার মধ্য হইতে সেইরূপ ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। দুর্ভাগ্যের বিষয় আমরা পালাটি সম্পূর্ণভাবে পাই নাই। বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী নামক এক ভদ্রলোক ময়মনসিংহ সেরপুর—দশকাহনিয়া অঞ্চল হইতে উহা আবিষ্কার করিয়া লিখিয়াছিলেন, "মানিকতারার পালা তিন ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগ পাঠাইলাম, অপর দুই অংশ উদ্ধার করিতে একটু দূরে যাইতে হইবে কিন্তু আশা করি শীঘ্র উহা উদ্ধার করিয়া পাঠাইতে পারিব।" কিন্তু যে চিঠিতে এই কথা ছিল, তাহা লেখার তিন দিনের মধ্যে তিনি জ্বররোগে প্রাণত্যাগ করেন। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিযুক্ত পালা সংগ্রাহকদের দ্বারা ঐ গানটি উদ্ধার করিবার বিশেষ চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু এখনও কৃতকার্য্য হই নাই। দ্বিতীয় খণ্ডে নিজাম ডাকাতের পালা ইশাখাঁর পালা, সুরৎ জামাল ও আধুয়া, ফিরোজ খাঁ দেওয়ান প্রভৃতি কাব্যগুলি মুসলমান কবিদের রচিত। ইহাদের প্রত্যেকটিতে কোন না কোন বিশেষত্ব আছে। ফিরোজ খাঁর পালায় রাজকুমারী সখিনার যে আলেখ্য দেওয়া হইয়াছে—তাহা যিনি দেখিয়াছেন, তিনি ভুলিতে পারিবেন না। সখিনা স্বামীকে উদ্ধার করিবার জন্য কেল্লাতাজপুরের মাঠে পিতার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিলেন—ইহা ঐতিহাসিক ঘটনা। তিন দিন তিন রাত্রি পুরুষের ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া এই নিরুপমা সুন্দরী অশ্রান্তভাবে যুদ্ধ করিয়া শত্রুপক্ষকে প্রায় হটাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু তরুণ দেওয়ান ফিরোজ খাঁ এহেন স্ত্রীরত্নের প্রেমের যোগ্য-পাত্র ছিলেন না। যে সতীলক্ষ্মী তাঁহার জন্য পিতৃস্নেহ বিস্মৃত হইলেন—কোমলা ব্রততীর ন্যায় হইয়াও যিনি অটুট বিক্রমে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিতে দাঁড়াইয়াছিলেন—ফিরোজ তাঁহার সঙ্গে নিতান্ত কাপুরুষের ন্যায় ব্যবহার করিলেন। মোগলবাহিনী

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

যখন ফিরোজ খাঁ যুদ্ধ করিতে যান, তখন স্বামীর অকল্যাণ হইবে মনে করিয়া সখিনা তাঁহার উদ্গত অশ্রু গোপন করিলেন। দাসী শুনিয়া আসিল, ফিরোজ খাঁ বন্দী হইয়াছেন, কিন্তু দাসী তাঁহাকে সে সংবাদ দিবার পূর্বে সখিনা হর্ষোজ্জ্বল চক্ষে তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আজ আমার স্বামী বিজয়ী হইয়া ফিরিবেন। তোরা কি করিতেছিস্? শীঘ্র যা, উদ্যানের উৎকৃষ্ট ফুল কুড়াইয়া মালা প্রস্তুত কর। সেই বৈজয়ন্তী মালা আমি নিজ হস্তে তাঁহার গলায় পরাইয়া দিব। উৎকৃষ্ট সরবৎ প্রস্তুত করিয়া রাখ্, তিনি পরিশ্রান্ত হইয়া আসিবেন, তাঁহার জন্য ভাল খানা, ভাল পানীয়ের প্রয়োজন হইবে। সুন্দর অভ্রখচিত পাখা শয্যায় রাখিয়া দেও, আমি নিজ হস্তে তাঁহাকে বাতাস করিব। সাজি ভরিয়া গোলাপ আর চাঁপা লইয়া আইস, আমি নিজ হস্তে তাঁর জন্য মালা গাঁথিব। গোলাপের আতর, সোনার বাটায় পান রাখিতে ভুলিস্ না। পাঁচ পীরের দরগা হইতে মৃত্তিকা লইয়া আইস—আমি তাঁহার কপালে ঠেকাইব। কিন্তু দরিয়া, আজ এই শুভ দিনে তোর মুখে হাসি নাই কেন?"

এই আনন্দের পুতুল সহসা ঘোর দুঃসংবাদের কথা শুনিয়া বজ্রহতা লতার ন্যায় ক্ষণেক স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। ফিরোজ খাঁর মাতার ক্রন্দনে রাজপুরী মুখরিত হইতে লাগিল। কিন্তু সখিনা কাঁদিলেন না, নিজের নিবিড় কুন্তল-রাশি সংবরণ করিয়া মাথায় গুচ্ছাকারে বদ্ধ করিলেন। পীনোন্নত পয়োধর বর্ম্ম-চর্ম্মে ঢাকা পড়িল। তিনি বীর বালকের বেশে নিজেকে ফিরোজ খাঁর ভ্রাতা বলিয়া পরিচয় দিয়া মোগল বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করিতে কেল্লা তাজপুরের ক্ষেত্রে রওনা হইলেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি রমণীর অদম্য সাহস ও বীরত্বের বলে শত্রুপক্ষের শক্তি টুটিয়া আসিয়াছিল, তিন দিনের পরে মোগল সৈন্য পরাজয়ের মুখে আসিয়া পড়িল। এই সময় এক অশ্বারোহী সন্ধিব্যঞ্জক শ্বেত-পতাকা হস্তে লইয়া সখিনার নিকট উপস্থিত হইল। সে একখানি চিঠি সখিনার হাতে দিয়া সেলাম করিয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। ফিরোজ খাঁ লিখিয়াছেন—"তুমি আমার পক্ষ হইয়া কে এবং কেন যুদ্ধ করিতেছ, তাহা আমি জানি না। কিন্তু আর যুদ্ধের দরকার নাই, আমি মোগলদের সঙ্গে সন্ধি করিয়াছি। আমার স্ত্রী সখিনাকে লইয়াই যত গোলমাল, তাঁহার জন্যই এই যুদ্ধ। আমি তাঁহাকে তালাক দিয়া যুদ্ধের অবসান করিলাম। আমি বন্দী ছিলাম, মুক্ত হইলাম, সখিনাকে তালাক দেওয়াতে আমার সমস্ত বিপদ চুকিয়া গিয়াছে।"

তখন সূর্য্যদেব অস্তচূড়ালম্বী—তাহার শেষ রশ্মি সখিনার শিরস্ত্রাণে ঝলসিত হইতেছিল। সখিনা একবার দুইবার তিনবার সেই চিঠিখানিতে স্বামীর হস্তাক্ষর ও দস্তখৎ ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলেন, তারপরে অশ্ব হইতে ঢলিয়া পড়িলেন। যে বক্ষের উপর মোগলের শেল শূল আঘাত করিয়াছে—কিন্তু কিছু করিতে পারে নাই, সেই বক্ষ বর্ম্মাবৃত ও দৃঢ় হইলেও তাহা কোমলা নারীর। স্বামীর এই আঘাত, ফুলশরের এই বিষাক্ত সন্ধান তাঁহার সহ্য হইল না। তিনি অশ্বপৃষ্ঠে ঢলিয়া পড়িলেন, তখনও পাদুকা অশ্বের সঙ্গে লগ্ন, হাতে লাগাম—কিন্তু প্রাণ চলিয়া গিয়াছে।

> "ঘোড়ার পৃষ্ঠ হৈতে বিবি ঢলিয়া পড়িল।
> শিপাই লস্কর যত চৌদিকে ঘিরিল ॥
> শিরে বাঁধা সোনার তাজ ভাঙ্গা হৈল গুড়া।
> রণস্থলে তারে দেখে কাঁদে দুলাল ঘোঁড়া ॥
> শিপাই লস্কর সব করে হায় হায়।
> ঘোড়ার পৃষ্ঠ ছাড়ি বিবি জমিতে লুটায় ॥
> আসমান হৈতে তারা খস্যা জমিনে পড়িল।
> এতদিনে জঙ্গল বাড়ী অন্ধকার হৈল ॥
> আউলিয়া পড়িল বিবির দীঘল মাথার কেশ।
> পিন্ধন হইতে খোলে কন্যার পুরুষের বেশ ॥
> শিপাই লস্কর সব দেখিয়া চিনিল।
> হায় হায় করি তারা কাঁদিতে লাগিল ॥

মোগল সম্রাটের বিরুদ্ধে যে বঙ্গের বারভূঞরা সর্ব্বদা ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন—এবং দিল্লীর দরবারে বৎসর বৎসর রাজস্ব প্রেরণ করা তাঁহারা কিরূপ দুঃসহ মনে করিতেন, তাহা এই গানটির প্রথম দিকে অতি সুস্পষ্টরূপে বর্ণিত আছে। বঙ্গদেশ চিরকালই স্বাধীনতা-প্রিয়, তাহা এই কাব্য পাঠ করিলে বিশেষভাবে দেখা

যায়। মলুয়ার খাঁর পালাগানেও জঙ্গলবাড়ার দেওয়ানেরা কিরূপ অদম্য সাহস ও বীরত্ব সহকারে যুদ্ধাদি করিতেন তাহার যথাযথ আলেখ্য আছে। এই সমস্ত পালা মুসলমানের লেখা এবং এই ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত সম্বলিত পালাগানগুলি সপ্তদেশ শতাব্দীর শেষ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে বিরচিত হইয়াছিল।

তৃতীয় খণ্ডেও অনেকগুলি পালাগান আছে, তন্মধ্যে "মঞ্জুর মার পালা" টি উৎকৃষ্ট। যদিও কবির নাম পাওয়া গেল না, তথাপি ইহা যে মুসলমান কবির লেখা—সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। মণির নামক এক মুসলমান সাপুড়ের কথা লইয়া এই কাব্য রচিত। মণির যৌবনে স্ত্রীলোক-বিদ্বেষী ছিল, সে স্ত্রীজাতিকে অবিশ্বাস করিত। এমন কি তাহার বাড়ীর মসজিদে কোন রমণীকে ঢুকিতে দিত না, পথে কোন স্ত্রীলোকের মুখ দেখিলে 'তোবা,' 'তোবা' বলিয়া অযাত্রাজ্ঞানে বাড়া ফিরিয়া আসিয়া যাত্রা বদলাইয়া লইত। কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে শুধু দয়া-দাক্ষিণ্যের বশবর্ত্তী হইয়া সে এক অনুপমরূপলাবণ্যবতী ষোড়শী রমণীর পাণিগ্রহণ করিল—তাহাকে সকলে "মঞ্জুর মা" বলিয়া ডাকিত। শিশুকালে মণির তাহাকে ঐ সোহাগের নাম দিয়া প্রতিপালন করিয়াছিল। এমন সুগন্ধ সুষমাময় কুসুমটি কোন্ নিষ্ঠুরপ্রকৃতি পুরুষের হাতে ছাড়িয়া দিবে, সে নির্ম্মমভাবে তাহার জীবন নষ্ট করিয়া ফেলিবে—এই আশঙ্কায় মণির নিজেই তাহার পাণি গ্রহণ করিল।

কিন্তু রমণী হাসেন নামক এক যুবকের প্রেমে পড়িয়া বিশ্বাস-ঘাতিনী হইল। একদিন মণির রোগী দেখিতে বহু দূরে চলিয়া গিয়াছে, এই সুযোগে মঞ্জুর মা তাহার প্রণয়ী হাসেনকে লইয়া উধাও হইল। মণির বাড়ী আসিয়া তাহাকে না পাইয়া পাগলের মত হইল! সে জানিত মঞ্জুর মা স্বর্গের ফুল, এতটুকু দোষ তাহাতে নাই। নিশ্চয়ই কেহ তাহাকে মুখে কাপড় বাঁধিয়া বলপূর্ব্বক লইয়া গিয়াছে কিম্বা তাহাকে বাঘে খাইয়াছে। সে যে দুশ্চরিত্রা তাহা মুহূর্ত্তের জন্য সে ভাবিতে পারিল না। সে কেন তাহাকে একা ফেলিয়া গিয়াছিল, এই অনুতাপে সে মতিচ্ছন্ন হইল। সে শিশুর ন্যায় সমস্ত প্রাণ দিয়া মঞ্জুর মাকে বিশ্বাস করিত ও ভালবাসিত। বলিহারি তাহার এই অপূর্ব্ব বিশ্বাসকে ও তাহার স্ত্রীর প্রতারণাকে! সে অবশেষে শোকে নদীগর্ভে ঝাঁপ দিয়া সংসারের সকল জ্বালা জুড়াইল। তাহার বিলাপ কবিত্ব পূর্ণ, একটি স্থল নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি:—

"মঞ্জুর মা আছিল আমার রে—
আরে দুখে—নয়নের মণি।
মঞ্জুর মা আছিল আমার রে—
আরে ভালা নারীর শিরোমণি॥
মঞ্জুর মা আছিল আমার রে—
আরে ভালা—কলিজার লউ।
মঞ্জুর মা আছিল আমার রে—
আরে ভালা—সতীকুলের বউ॥
মঞ্জুর মা আছিল আমার রে—
আরে ভালা—নয়নের কাজল।
মঞ্জুর মা আছিল আমার রে—
আরে ভালা—গঙ্গা নদীর জল॥
আমার না মঞ্জুর মা রে
আরে ভালা বুকের কালজা।
আমার না মঞ্জুর মা রে
আরে ভালা সাক্ষাৎ দশভুজা॥
আমার না মঞ্জুর মা রে আরে ভালা—
তীর্থ বারাণসী
আমার না মঞ্জুর মা রে আরে ভালা—
দেবের তুলসী।
আমার না মঞ্জুর মা রে—আরে ভালা—
আশমানের চান।
আমার না মঞ্জুর মা রে—আরে ভালা—
বেহস্তের নিশান।"

হিন্দুর দেব-দেবীর কথা হয়ত কোন কোন গোঁড়া-মুসলমানের ভালো লাগিবে না। মির্জা হুসেন আলি ও গোল মামুদের কালী কীর্ত্তন—মুসলমান কবিদের ভাসান গান, লক্ষ্মীর পাঁচালী ও রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক সঙ্গীত আজ কালকার দিনে হয়ত কোন কোন মুসলমানের অপ্রিয় হইতে পারে। এ সম্বন্ধে আমরা একবার কিছু বলিয়াছি। এখানে পুনরায় সে প্রসঙ্গটা উত্থাপন করিব। সাহিত্যে

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

কোন সাম্প্রদায়িকতা নাই। ইংরেজী সাহিত্যে গ্রীক দেবদেবীর স্তুতি ও তাঁহাদের সশ্রদ্ধ উল্লেখ সর্ব্বত্র দেখা যায়। অথচ কবিরা সকলেই ক্রিশ্চিয়ান। চসার হইতে আরম্ভ করিয়া সুইনবারণ অবধি প্রায় সমস্ত কবিই খ্রীষ্ট ধর্ম্ম বিগর্হিত প্রাচীন পৌত্তলিকগণের দেবদেবীর কথা লইয়া গান রচনা করিয়াছেন এবং তাহাদের স্তবস্তুতি করিয়াছেন—তজ্জন্য খ্রীষ্টীয় পুরোহিতেরা তাঁহাদের গির্জ্জায় যাওয়া মানা করেন নাই। চসার থিসবির উপাখ্যান লইয়া কাব্য লিখিয়াছেন, সেক্ষপীয়র তো কথায় কথায় পৌত্তলিকদের দেবতার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া উপমা দিয়াছেন। এই 'মঞ্জুর মা' গানটিতে যে ভাবে কবি গঙ্গাজল, তুলসী ও "দশ-ভুজার" উল্লেখ করিয়াছেন, ঠিক সেইভাবে সেক্ষপীয়র হ্যামলেটের স্বর্গীয় পিতার সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"তাঁহার ললাট ছিল জোভ্ দেবতার ন্যায় প্রশস্ত, তাঁহার কুঞ্চিত কেশদাম ছিল হাইপিরিয়ার ন্যায়, তাঁহার চক্ষু মার্স্ দেবতার দৃষ্টির ন্যায় প্রভুত্বব্যঞ্জক, এবং মারকারীর ন্যায় তাঁহার অসীম প্রতিষ্ঠা ছিল। ইহা ছাড়া মিড্সামার নাইটসে সেক্ষপীয়র পৌত্তলিকদের পরীরাজ ওবারণের নানা প্রসঙ্গ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং তাঁহার প্রায় সমস্ত নাটকেই হারকিউলিয়াস দেবতার কথা আছে। গ্রীকের রতি ও কামদেব স্বরূপ ভেনাস-এ্যাডোনিয়াস লইয়া কবিগুরু একখানি কাব্য লিখিয়াছেন, তাহা সর্ব্বজনবিদিত। মিল্টনের পুস্তকে গ্রীকদের দেবীর নানারূপ সশ্রদ্ধ উল্লেখ আছে, এমন কি তিনি অনেক স্থলে গ্রীকদের কল্পনা দেবী "মিউজের" স্তোত্র লিখিয়াছেন। কিট্‌স্ হাইপিরিয়ান ও এণ্ডেমাইন নামক কাব্যে এবং শেলি প্রমিথিউসের মুক্তিলাভ গীতিকায় গ্রীক দেবদেবীর প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়াছেন। এমন কি কিট্‌স্ 'সাইকির স্তোত্র' নামক গানে সেই দেবতার স্তুতিগাথা রচনা করিয়াছেন। সুইনবারণ তাঁহার এ্যাটলাণ্টা ইন সিলিডন" কবিতায় গ্রীক দেবতাদের বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আর দৃষ্টান্ত বাড়াইবার দরকার নাই। কবি কাব্য লিখিলে তাঁহার ধর্ম্ম নষ্ট হয় না, কবিরা যেখানে একটু কল্পনার লীলাখেলা দেখাইতে পারেন—সে পথ ছাড়েন না। তাঁহাদের অবাধ কল্পনার ক্ষেত্র কোন্ গণ্ডীর বাধা দিয়া কে আটকাইয়া রাখিবে? আর আজ যদি কোন হিন্দু লয়লা মজনুর কথা লইয়া একটা কাব্য কিম্বা নাটক রচনা করেন, তবে কি তাঁহাকে ব্রাহ্মণদের নিকট একটা কৈফিয়ৎ দিতে হইবে? এ সমস্তই সৌখিন বিষয়, আনন্দের আয়োজনপত্র, উৎসব-রজনীর দীপালী। আরব্যোপন্যাসে কত দৈত্য ও ও পরীর কথা আছে—তাহা পড়িয়া সকল দেশের লোকই আনন্দ পাইতেছেন। কিন্তু তাঁহারা কি ঐ সকল গল্প বিশ্বাস করিতেছেন? আল্লার রাজ্যে যাঁহারা ছোঁয়াচে রোগের আশঙ্কায় সিগ্রিগেশন শিবির তুলিবেন তাঁহারা মুক্ত আকাশ ও উদার বায়ু ভোগ করিবার যোগ্য নহেন। আমি পুনরায় বলিতেছি, যদি পীর পয়গম্বরের কথা ও পারস্য ও আরব্যের শ্রেষ্ঠ নায়ক-নায়িকা এবং ঐতিহাসিক বীর ও বীরাঙ্গনার চরিত্র লইয়া বাঙ্গলা ভাষায় মুসলমানেরা পুস্তক রচনা করেন, তবে হিন্দুর অন্দরে পর্য্যন্ত সেই পবিত্র কথার সুরভি ছড়াইয়া পড়িবে এবং আমাদের মাতৃভাষার এক উজ্জ্বল পরিচ্ছেদের নূতন সৃষ্টি হইয়া ইসলামের মহিমা ঘোষণা করিবে।

আমরা 'মঞ্জুর মা'র কবিত্বের কথা বলিতেছিলাম। এই পালায় কবি চরিত্রাঙ্কনের যথেষ্ট ক্ষমতা দেখাইয়াছেন। তিনি নিক্তির দুই দিক সমান রাখিয়া বিচার করিয়াছেন। নায়িকা ভ্রষ্টা, কিন্তু তিনি এমন করিয়া তাহাকে অঙ্কন করিয়াছেন যে, তাহাতে তাহার উপর আমাদের ক্রোধ না হয়, বরঞ্চ তাহার জন্য প্রাণ দয়ায় বিগলিত হইয়া যায়। এদিকে বৃদ্ধ সাপুড়ে সেই বয়সে তরুণী বালিকাকে বিবাহ করার জন্য কবি তাহাকে এক দণ্ডের জন্যও ক্ষমা করেন নাই, তাহাকেও যথাযথ ভাবে আঁকিয়াছেন, কিন্তু তাহার বালকের ন্যায় নির্ভর ও স্বর্গীয় বিশ্বাস কবির তুলিতে তুল্যরূপেই ফুটিয়া উঠিয়াছে। এরূপ স্থিরমস্তিষ্ক অবিচলিত কবি-সমালোচক সাহিত্য ক্ষেত্রে দুর্ল্লভ। কৃষককবির মনে কোন সংস্কারান্ধতা বা সাম্প্রদায়িক প্রভাব ছিল না, এইজন্য তাঁহার নির্ম্মল চিত্ত-মুকুরে স্বভাবের প্রতিবিম্ব এমন ঠিক ভাবে পড়িয়াছিল।

তৃতীয় খণ্ডে পল্লিগীতিকায় আর কয়েকটী উৎকৃষ্ট পালা আছে, তাহার একটী মনসুর ডাকাত বা কাঞ্চেন চোরার

পালা। এই মনস্থর ডাকাতের জীবনের গতি কি ভাবে ফিরিয়া গিয়াছিল—অতি জঘন্য নীচ ও নৃশংস দস্যু-বৃত্তি ছাড়িয়া সে কিরূপে একজন শ্রেষ্ঠ পীর ও সাধু হইয়াছিল, সেই মনস্তত্ত্বের আধ্যাত্মিক চিত্র-পটখানি কবি এই পালা গানটিতে উদ্ঘাটিত করিয়া দেখাইয়াছেন। ইহার মাঝে মাঝে এমন সুন্দর কবিত্বপূর্ণ চরণ আছে যাহা পড়িলে কবিকে পল্লী কালিদাস বলিয়া প্রশংসা করিতে ইচ্ছা হয়। একটি নববিবাহিতা নারী পল্লিপথে প্রথম শ্বশুর-বাড়ী যাত্রা করিয়াছেন। জোৎস্না ধবধবে রাত্রি, আটজন পাল্কীবাহক তাহাকে লইয়া যাইতেছে—কবি সেই রাত্রি দুটি ছত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। কবি লিখিয়াছেন জোৎস্না রাত্রি, দোলা চলিয়া যাইতেছে—কেহ যেন মুষ্টি মুষ্টি বেলফুলের কলি দ্যুলোক হইতে ভূলোকে ছড়াইয়া ফেলিতেছে, এমনই সুন্দর জোৎস্না।

এই জোৎস্না রাত্রে মনস্থর ডাকাত কুর্ম্মাই খালের একটা বাঁকের কাছে, কেতকা ঝাড়ের আড়ালে লুকাইয়া পাল্কীখানির গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছে, চাটগাঁয়ের দুর্ব্বোধ ভাষাকে কতকটা সহজ করিয়া নিম্নে সেই স্থানটি উদ্ধৃত করিলাম :

"দোলা যায়রে—যারে দোলা আট বেহারার কাধে।
দোলার ভিতরে নববধূ গুড়ি গুড়ি কাঁদে॥
মা বাপেরে মনে পড়ে আর ছোট ভাইএর মুখ।
ঝিঁঝি পোকার ডাক শুনি কেঁপে উঠে বুক॥
আগে পাছে বরযাত্রী যায়, ওরে যায়রে ধীরে ধীরে।
দখিনা হাওয়াতে, ওরে,দোলার কাপড় উড়ে॥
ধবধবা জোৎস্না যেন দিনের মতন রাইত।
কেয়া ঝাড়ের পাছে লুকাইয়া রহে রে মনস্থর ডাকাইত॥
এক স্রোতা কুম্মাইখাল ওরে হাঁটি হৈয়া পার।
আস্তে আস্তে আইল দোলা ঝাড়ের কিনার॥
বাঘে যেমন ঝাঁপ দিয়া রে গরুর ঝাঁকেতে পড়ে।
মনস্থর ডাকাত পৈল্ল তেমনি দোলার উপরে॥
দোলার উপরি পড়ি মারল এক ডাক।
কেহ বলে ভালুক এল কেহ বলে বাঘ॥
সোয়ারী ফেলিয়া বেহারা পরাণ লৈয়া যায়।
পাল্কীর দুয়ার খুলিয়া রে মনস্থর আড় চক্ষে চায়॥
নয়া বউ কাঁদি উঠল আল্লা তালা বুলি।
টান মারি লইল ডাকাইত গলার হাঁসুলী॥
কানের করম ফুল লৈল আর নাকের নথ।
তাড়াতাড়ি মনস্থর আলি লাফ দি পৈল ঝাড়ত॥"

দোলার গতি, জোৎস্নার বর্ণনা—কবিতাগুলিকে এমন একটা ছন্দ দিয়াছে যে, মনে হয় যেন আমরা বাহকদের পদশব্দ শুনিতে পাইতেছি ও মনস্থর ডাকাতের ব্যাঘ্রমূর্ত্তি চাক্ষুষ করিতেছি।

কিন্তু মনস্থরের পরিবর্ত্তনের কথাটি অতি অপূর্ব্ব। সে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, দিনে পাঁচবার নমাজ পড়িবে। এই দুর্দ্দান্ত দস্যু যে রমণীকে প্রকৃতই ভালবাসিয়াছে, তাহার নিকট এই প্রতিজ্ঞা—সুতরাং তাহা দুর্লঙ্ঘ্য। এ যেন বাঘ জালে পড়িয়াছে। সে দস্যুবৃত্তি করিবে—এই অনুমতি পাইয়াছে, কিন্তু তাহাকে পাঁচবার নমাজ পড়িতেই হইবে। একদিন এক ধনীর গৃহে তাহার লোকেরা যাইয়া সিঁদ খুঁড়িয়াছে, সে সেই সিঁদের মুখে আগে পা ঢুকাইয়া দিয়া শেষ পথ পরিষ্কার দেখিয়া মাথা ঢুকাইয়া দিয়াছে। গৃহস্বামী ও তাঁহার স্ত্রী পালঙ্কে শুইয়া আছেন। সে তাহার চাবি দিয়া লোহার সিন্ধুক খুলিয়া বহু ধনরত্ন পাইয়াছে,—তাহা সে গুছাইবে, এমন সময় সে অদূরবর্ত্তী মসজিদ হইতে আজানের করুণ স্বর শুনিয়া চমকিয়া উঠিল। জানালার ছিদ্রপথে উষার প্রথম আলোর আভাস সে দেখিতে পাইল—এবং প্রভাতের নিশ্চিত লক্ষণস্বরূপ "কুরগল" পাখীর স্বর শুনিতে পাইল। অমনই সে তাহার সংগৃহীত ধনরত্নের কথা ভুলিয়া গেল, তাহার আসন্ন বিপদ ভুলিল—সে নিজের অজ্ঞাতসারে দুর্লঙ্ঘ্য প্রতিশ্রুতি ও অভ্যাসের বশবর্ত্তী হইয়া বহুদূরাগত মোল্লাদের সুরের সঙ্গে সুর মিলাইয়া চীৎকার করিয়া হাঁকিয়া উঠিল, "লা এলাহা ইল-আল্লাহ"!

তাহার চীৎকারে গৃহস্বামী জাগিয়া উঠিলেন, দেখিলেন এক অদ্ভুত দৃশ্য; তাঁহার লোহার সিন্দুক খোলা, তন্মধ্যে বহু মূল্যবান শাড়ী ও ধনরত্ন পায়ের নিকট লুটাইতেছে—বীর-অবয়ব এক ব্যক্তি চক্ষু বুজিয়া প্রাণপণে চীৎকার করিয়া ভক্তি-গদগদ কণ্ঠে নমাজ পড়িতেছে।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

হাতীখেদার গানটি একশত বৎসর পূর্ব্বের রচনা। এমন একটা বিষয় লইয়া যে কবিতা রচিত হইতে পারে, তাহা অনেকের ধারণার অগম্য। কিন্তু গ্রাম্য মুসলমান কবি ইহাতে অপর্য্যাপ্ত কাব্যরস ঢালিয়া দিয়াছেন। কবিতাগুলির বিক্রতছন্দ যেন শিকারীদের পদশব্দের সঙ্গে তাল রাখিয়া চলিয়াছে। কবিতাগুলি একবারে স্বভাবের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে সঙ্গতি রাখিয়া কোন স্থানে বন্দুকের আওয়াজ, অগ্নিদাহের চটপট্ শব্দ, কোথাও শিবিরে দর্শকদের কোলাহল ও মশালের আলোকমালায় দীপালির শোভা—যেন পাঠককে প্রত্যক্ষ করাইয়া সেই অদ্ভুত বন্য-অভিযানের একবারে কেন্দ্রস্থলে লইয়া গিয়াছে। হাতিগুলির ভীষণতা, বুদ্ধিহীনতা, অকারণ আশঙ্কা, দলবদ্ধ হওয়ার চেষ্টা—খেদার মধ্যে ঢুকিয়া তাহাদের আর্ত্তনাদ ও না খাইয়া অস্থিচর্ম্মসার হইয়া যাওয়া,—এসমস্তই হয়ত নিতান্ত নীরস বিষয়—কিন্তু এগুলিকে যে-কবি এরূপ রসাত্মক করিতে পারিয়াছেন—তাঁহার কবিত্ব ধন্যবাদার্হ—ইহা স্বীকার করিতে হইবে। ভাষা চাটগেঁয়ে, অনেক স্থলে বুঝিয়া উঠা কঠিন, কিন্তু নারিকেলের খোলটা ভাঙ্গিয়া ফেলিলে যেরূপ ভিতরের সকলই সুস্বাদু ও সরস, ভাষার বাধাটা অতিক্রম করিলে এই কবিতাও তেমনই উপভোগ্য ও পরম উপাদেয় বোধ হইবে।

আমরা মুসলমান বিরচিত আরও অনেক পালাগানের উল্লেখ করিতে পারিলাম না—সেগুলিতে কবিত্বের অভাব নাই, কিন্তু আমাদের স্থান ও সময়াভাব।

মুসলমান সম্রাটগণ বর্ত্তমান বঙ্গ-সাহিত্যের একরূপ জন্মদাতা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহারা বহু ব্যয় করিয়া শাস্ত্রগুলির অনুবাদ করাইয়াছিলেন এবং সেগুলি আগ্রহসহকারে শুনিয়া আনন্দিত হইতেন। আরবদেশবাসীরা সংস্কৃত অনেক গ্রন্থের অনুবাদ করাইয়াছিলেন। ইসলাম ধর্ম্মাবলম্বীরা শুধু ধনরত্ন আহরণের চেষ্টায় ভিন্ন দেশ জয় করিতেন না, সেই সকল দেশে যদি জ্ঞানের ভাণ্ডার থাকিত, তাহাও তাঁহারা লুটিয়া লইতেন। আবুল ফজলের ভ্রাতা ছদ্মবেশে কাশীতে যাইয়া সংস্কৃত শিক্ষা করিয়া আসিয়া শাস্ত্রগ্রন্থ অনুবাদ করিয়া সম্রাটকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন, ইহাতে নূতন কথা কিছুই নাই। বঙ্গসাহিত্য মুসলমানদেরই সৃষ্ট, বঙ্গভাষা বাঙ্গালী মুসলমানের মাতৃভাষা, বহু পুস্তক বাঙ্গলা ভাষায় রচনা করিয়া মুসলমান কবিগণ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন,— পালাগানে তাঁহারা যে শক্তি ও কবিত্ব দেখাইয়াছেন, তাহাতে সাহিত্যিক আসরে তাঁহাদের স্থান প্রথম পংক্তিতে। কয়েকজন শিক্ষিত বাঙ্গালী হিন্দু এখন বঙ্গ-সাহিত্যের কাণ্ডারী হইয়াছেন সত্য, কিন্তু গোটা বঙ্গদেশের সাহিত্য এখনও মুসলমানের হাতে—এই কথার এক বর্ণও মিথ্যা নহে। ময়নামতীর গান হইতে আরম্ভ করিয়া গোরক্ষ-বিজয়—ভাসান গান ও পূর্ব্বোক্ত শত শত পালা গান, মুরসিদা গান, বাউলের গান, এ সমস্তই মুসলমানদের হাতে। তাঁহারাই অধিকাংশ স্থলে মূল গায়েন। তাঁহারাই তরজার গুরু। এই বঙ্গদেশ যে সুধামধুর কবিত্বরসে অভিষিক্ত, তাহার প্লাবন আনিয়াছে মুসলমান কৃষকেরা। একবার ধান কাটার পর বঙ্গদেশ—বিশেষ পূর্ব্ববঙ্গ ঘুরিয়া আসুন, দেখিবেন, মুসলমান কৃষকেরা দল বাঁধিয়া কত প্রকারে গান গাহিয়া এদেশকে আনন্দ বিতরণ করিতেছে। কত তরজা, কত বাউলের দেহতত্ত্ব বিষয়ক গান, কত মাঝির ভাটিয়াল গান, কত রূপ-কথা ও মনোহর কেচ্ছা ও গাজির গান তাহারা বাঙ্গলা দেশকে শুনাইয়া জন-সাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের সহায়তা করিতেছে। হিন্দুরা এ বিষয়ে কোন ক্রমেই মুসলমানের সমকক্ষ নহে। দুচারিজন শিক্ষিত লোক লইয়া এদেশ নহে। দুচারিজন উপন্যাস পড়ুয়ার হাতে বঙ্গদেশটি নহে। বঙ্গদেশ বলিতে যে সপ্তকোটী লোক বুঝায় তাহার শতকরা ৯০ জনেরও বেশী আধুনিক উচ্চশিক্ষার কোন ধার ধারে না। এই সুবৃহৎ জনসাধারণের শিক্ষা মুসলমান কৃষকেরা তাহাদের ক্ষমতা অনুসারে দিতেছে, সে ক্ষমতাও বড় সাধারণ নহে। যাহারা পদ্মাবতের ন্যায় এরূপ পাণ্ডিত্যপূর্ণ কাব্য বুঝিতে পারে, দেহতত্ত্ব বিষয়ক অতি সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক তত্ত্ব আয়ত্ত করিতে পারে, তাহারা কি 'মূর্খ' অভিধান পাইবার যোগ্য? এই বিপুল জনসাধারণের ভাষা বাঙ্গলা, মুসলমানগণ এখনও এই ভাষার উপর পল্লিগ্রামে আধিপত্য বিস্তার করিয়া আছেন।

যাঁহারা বাঙ্গলা ভাষার পরিবর্ত্তে উর্দ্দু ভাষা এদেশে প্রচলনের প্রয়াসী, তাঁহারা কখনই সে চেষ্টায় কৃতকার্য্য

হইবেন না। শত সহস্র মুসলমানের বাঙ্গলাই মাতৃভাষা, মায়ের মুখে তাহারা বাঙ্গলাভাষা প্রথম শুনিয়াছে—সে ভাষা তাহাদিগকে ভুলাইয়া দেওয়ার চেষ্টা বাতুলতা। ঘরের সামগ্রী তৈরী থাকিতে এরূপ চেষ্টা করিবার প্রয়োজন তো কিছু দেখিতে পাই না। যদি বড় কিছু দিতে পার, তবে ছোট জিনিষটা ছাড়িয়া দাও। সূর্য্যের আলো আনিবার ব্যবস্থা করিয়া ঘরের প্রদীপটি নির্ব্বাণ কর, নতুবা যাহা আছে তাহা ছাড়িয়া দিয়া ঘর আঁধার করিবে মাত্র।

শুনিয়াছি মুসলমান কৃষকেরা যাহাতে আর পালা গান না গায়, বাঙ্গলার পল্লীতে মোল্লারা তাহার চেষ্টা করিতেছেন। এই বিশুদ্ধ নির্ম্মল সঙ্গীত-রস হইতে বঞ্চিত করিলে মুসলমান কৃষক আনন্দের সন্ধানে তাড়ির দোকানে ছুটিবে, তাহাকে ঠেকাইবে কে? কারণ মানুষ আনন্দ ভিন্ন বাঁচিতে পারে না।

সারাটা দিন অশথ তলে

শ্রীউমা দেবী

সারাটা দিন অশথ তলে
করেছি কত খেলা,
চলেছি এবে ঘরেতে ফিরে
ফুরায়ে গেছে বেলা।
অশথ গায়ে দোঁহার নাম
খুদেছি বহু ক্লেশে,
এসেছি কবে— বসেছি কবে—
চলিয়া গেছি শেষে।

হয়তো কবে রাখাল ছেলে
ধেনু চরার আশে—
বিরাম লবে হেথায় এসে
এই লিখনের পাশে।
পড়িবে সেকি? ভাবিবে সেকি?
মনে কি হবে তার?
হেথায় কারা গিয়েছে লিখে
নামটি দুজনার?
আজি যা সুখ পেয়েছি দোঁহে
সারাটা দিনমান,
সেদিনো বুঝি বাঁশিতে তার
বাজিবে সেই গান।

ওলোট-পালোট

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

পুরুষ

সীতানাথ রায়	...	জমীদার
রমেন্দ্র	...	ঐ নাত্‌ জামাই
দীনদয়াল ঘোষ	...	ঐ আশ্রিত
শশী রায়	...	ঐ জ্ঞাতি
দীনেশ	...	শশী রায়ের পুত্র
ডাক্তার	...	দীনেশের বন্ধু
নিমাই বাবু	...	পুলিসের ইনস্‌পেক্টর
ককার মণ্ডল	...	অবস্থাপন্ন জোতদার

দীনেশের ইয়ারগণ, কালীবাড়ীর যাত্রিগণ,
জমাদার, চৌকীদার, ভিখারিগণ
গ্রামবাসিগণ

স্ত্রী

আশা	...	সীতানাথের পৌত্রী
মালতী	...	দীনেশের রক্ষিতা

গোলাপী ঝি, কুমারী বালিকা

প্রথম দৃশ্য

দেবীপুর

[শশী রায় বহুদিন হইতে কঠিন ব্যায়রামে শয্যাগত। দীনেশ ডাক্তার ও যুগল চাকর। শশী রায় রোগ-যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছে]

দীনেশ

কেমন দেখলে ডাক্তার? ক'দিনের চেয়ে আজ অনেকটা ভাল ব'লে বোধ হচ্ছে না?

ডাক্তার

নিশ্চয়ই। এবার ত সারবার পথে ফিরে এসেছেন। নাড়া খুবই ভাল,—তবে 'হার্ট'টা যা একটু 'উইক' আছে। ওষুধও দিইছি সেই জন্যে—যাতে 'হার্ট'এর 'য়্যাকসন্‌টা —মোটের ওপর এ যাত্রা আর কোন ভয় নেই।

দীনেশ

বাবা, অমন কচ্চেন কেন বাবা? শরীরে কি যন্ত্রণা হচ্ছে কোন?

শশী রায়

যন্ত্রণা?—হচ্ছে না?—যন্ত্রণাই ত হচ্ছে রে!

ডাক্তার

কি যন্ত্রণা হচ্ছে, রায় মশাই?

শশী রায়

কি যন্ত্রণা? তোমাকে তার কি বোলব, আর তুমিই বা তার কি বুঝ্‌বে ডাক্তার! তার ওষুধ ত তোমার ডাক্তারিতে নেই! উঃ—উঃ—

দীনেশ

হাওয়া কর্ব্ব বাবা? যুগলো! পাখা! শাগগীর!— কি রকম হচ্ছে বাবা?

শশী রায়

হচ্ছে? (উত্তেজিত হইয়া) বুকের ভেতরটা ফেটে যাচ্ছে! রোগে নয়—অসুখে নয়;—কিছু ক'রে যেতে পারলুম্‌ না ব'লে! সীতানাথ রায়ের সর্ব্বনাশ ক'রে যেতে পারলুম্‌ না ব'লে! বুঝতে পেরেছিস্‌?—উঃ—ডাক্তার!— জল—তেষ্টা!

দীনেশ

এই যে বাবা, জল দি।

ডাক্তার

জল দেবেন না, সোডার সঙ্গে ঐ ওষুধটা আর এক ডোজ মিশিয়ে দিন। দেখি, দিন আমার কাছে। (সোডার বোতল খুলিয়া গেলাসে তাহার সহিত ঔষধ মিশাইয়া দিল) এই, জল খান রায় মশাই। আ-হা-হা-হা— উঠতে যাবেন না—শুয়ে শুয়ে খান।

শশী রায়

(পানান্তে) আঃ! (ক্ষণেক নীরব থাকিবার পর) ডাক্তার! বলতে পার, আমি বাঁচবো কি ঠিক? বেশী দিন নয়—একটা বচ্ছর। আর একটা বছর কোনমতে যদি—পার ডাক্তার; কোনমতে একটা বছর বাঁচিয়ে রাখতে, তা' হলেও তার সর্ব্বনাশ ক'রে যেতে পারবো। কিন্তু যদি না বাঁচি—

ডাক্তার

রায় মশাই বেঁচে ত এবার উঠেছেন,—আর ভয় কিসের!

শশী রায়

ভয়? ভয় মরবার জন্যে নয় ডাক্তার! ওই যে বললুম, সীতেনাথ রায়ের সর্ব্বনাশটা তা' হ'লে ক'রে যেতে পার্ব্ব না। মরতে ভয় নেই ডাক্তার? তোমরা কেউ এখুনি খবর এনে দাও—বজ্রাঘাতে সে, তার নাতনী, নাত্‌জামাই, ছেলেটা সব মরেচে, আমি হাসতে হাসতে এক্ষুনি মরতে পারবো। (উত্তেজিত হইয়া) পার কেউ এই খবরটা এনে দিতে! পারিস্ দীনেশ? পার ডাক্তার? তোমাকে দশ হাজার টাকা দোবো। আমার এই মুখের কথাটাকে সত্যি ক'রে ফলিয়ে—আর একটু দাও, ডাক্তার—আর একটু জল। (শ্রান্তিতে হাঁপাইতে লাগিল)

ডাক্তার

রায় মশাই, স্থির হোন্। এখন ও-সব কথা ভাববেন্ না। এই নিন্—জল। (আবার সোডার সহিত ঔষধ মিশাইয়া প্রদান)

শশী রায়

(পান করিয়া) কি বোলবো ডাক্তার, গায়ের ভেতর জলে যাচ্ছে! দীনেশ, দেখ্, যদিই আর না বাঁচি, তা'হলে—আয় ত বাবা, আমার এই কাছে আয় একবার। হাত দেখি। (দীনেশ হাত আগাইয়া দিল, শশী রায় তাহা শক্ত করিয়া ধরিল) আমায় ছুঁয়ে দিব্বি ক'রে বল দেখি—বল্—

দীনেশ

কি বোল্‌বো বাবা?

শশী রায়

বল্—যতদিন বেঁচে থাকবি, সীতেনাথ রায়ের সর্ব্বনাশ করবি? বল্—আমায় ছুঁয়ে বল।

দীনেশ

বল্‌চি বাবা—করবো।

শশী রায়

করবি?

দীনেশ

করবো।

শশী রায়

করবি?

দীনেশ

করবো।

শশী রায়

করিস্, কিছুতেই ছাড়িস্ নি। তিন পুরুষের শত্রুতা এ যেন ভুলে থাকিস নি বাবা! আমি জানি, আমার চেয়ে তার ওপর তোর আক্রোশ আরও বেশী। এর শোধ কিন্তু নেওয়া চাই, নেওয়া চাই, নেওয়া চাই। ডাক্তার, ডাক্তার! সব জাননা তুমি, কী শত্রুতা আমাদের সঙ্গে ওদের। উঃ উঃ উঃ (হাঁপাইতে হাঁপাইতে) রামেশ্বর চৌধুরীর সম্পত্তি। অর্দ্ধেকের হক্‌দার আমি—অর্দ্ধেকের ও। জাল উইল তৈরী ক'রে সেই সম্পত্তি আমায়! (হাঁপাইতে লাগিল) যে দিন নরসিংপুরের মাম্‌লার রায় বেরুবে, ওর নাত্‌-জামাই—সবে তখন বে হয়েছে—কোর্টের ভেতরে দাঁড়িয়ে আমাকে কী অপমান! —উঃ—শেলের মত গায়ে সব বিঁধে রয়েচে। প্রতিশোধ! প্রতিশোধ! দীনেশ,—প্রতিশোধ চাই-ই! আর যদি না পারিস ত বল্ আমায়, আমি নিজের হাতে প্রতিশোধ দোবো—তারপর মরবো। একখানা ছোরা তা'হলে আমায় দে, আর এক 'ডোজ' ডাক্তার, তোমার খুব তেজাল ওষুধ দাও, (দাঁতে দাঁতে চাপিয়া বিশেষ উত্তেজিত হইয়া) আমি এক্ষুনি গিয়ে তার গুষ্টি শুদ্ধু সকলের বুকে—(শয়নাবস্থা হইতে বিষম উত্তেজিতভাবে উঠিতে যাইয়া শয্যায় ঢলিয়া পড়িয়া গেল)

মুখোপাধ্যায়

দীনেশ

(চীৎকার করিয়া) কি হল—কি হ'ল—ডাক্তার! এ কি? বাবা! বাবা! ডাক্তার এ কী হ'ল?

ডাক্তার

তাইত, এ কী হল! এ কি 'হার্টফেল্' নাকি? হার্টফেল্'ই ত! দীনেশ বা—

দ্বিতীয় দৃশ্য

বেলডাঙ্গা

সীতানাথ রায়ের বাটীর অন্দর

আশা

(পরিচারিকাকে হাঁকিয়া ডাকিল) হ্যাঁরে, অ গোলাপী!

[গোলাপী ঝির প্রবেশ]

গোলাপী

কি দিদিমণি?

আশা

হাঁরে, তোর দাদাবাবু বাইরে নেই?

গোলাপী

না, দিদিমণি। তেনাকে বোধ হয় ঐ চক্কোত্তি বাড়ীতে কা'র অসুখ—ডেকে নিয়ে গেছে।

আশা

আচ্ছা, তুই যা। দাদু কোথায় রে?

গোলাপী

তিনি, হাই, সানের ঘাটে ব'সে কাদের সঙ্গে গল্প ক'চ্ছেন।

আশা

দেখ,—তোর দাদাবাবু ফিরে এলে, ভেতরে পাঠিয়ে দেবি; জলখাবার খেয়ে যান্ নি ক—বুঝিচিস্ ত?—আচ্ছা, যা। (ঝিএর প্রস্থান)—খোকনের জ্বালায় হার্মোনিয়মের ঢাকাটা আর কিছুতেই দেওয়া থাক্‌বে না! যতবার দোবো, ততবারই ঢাকাটা খুলে খুলে রাখবে। কালকাতা থেকে এর একটা বাক্‌স না আন্‌লে আর চল্‌ছে না। খোলা প'ড়ে থেকে থেকে আওয়াজটাও যেন ক'মে আসছে।

(হারমোনিয়ম্ লইয়া গীত)

আমার নয়ন-ভূষণ শ্যাম দরশন, শ্রবণ-ভূষণ গানে।
করের ভূষণ শ্রীপদ সেবন, বদন-ভূষণ নামে।
(শ্যামের মধুর নামে)
কণ্ঠের ভূষণ কলঙ্কের হার, নাসার ভূষণ গন্ধ,
অন্তর ভূষণ শ্যাম প্রেমমণি,—কিরণ-ছটা আনন্দ।
নিরমল প্রেমানন্দ)

রমেন

(বাহির হইতে ঘরে ঢুকিতে ঢুকিতে) এন্‌কোর—এন্‌কোর! থাম্‌লে হবে না।

আশা

প্যালা দেবার বেলায় কিছু নেই, শুধু শুক্‌নো 'এন্‌কোর'এ কে গাইবে?

রমেন

যা পুঁজিপাটা ছিল, থলি ঝেড়ে সব ত দিয়েই দিইচি, এখন আবার নতুন ক'রে প্যালা দেবো কোথা থেকে বল?

আশা

সে সব আমি জানি নে, প্যালা কিন্তু দিতেই হবে,। (উঠিয়া দাঁড়াইল ও রেকাবীতে জল খাবার দিতে দিতে কহিতে লাগিল) নইলে, নইলে, নইলে, নইলে,—(আসন পাতিয়া জলখাবারের রেকাবী রাখিয়া) শীগ্‌গীর জল খাবারটা খেয়ে নাও।

রমেন

প্যালা বরঞ্চ এনে দিতে পারি—ভিক্ষে সিক্ষে ক'রে, কিন্তু এ-জিনিষটা আজ আর পেরে উঠ্‌বোনা আশা—পেট্ একেবারে দম্‌সম্—সত্যি বলচি।

আশা

(হাত ধরিয়া) দেখ বাজে বোক না বলছি। খেয়েছেন সেই বেলা দশটার সময়, আর এখন সন্ধ্যা হ'তে চল্লো—এখনো পেট্ দম্‌সম্!

রমেন

সত্যি বল্‌ছি; আঃ—আচ্ছা, আচ্ছা—খালি ঐ দুটো দাও।

আশা

।, তাই-ই খাও বোসো ।— জোর করিয়া হাত ধরিয়া বসাইয়া দিল) ওকি ব'স্লে রইলে যে বড় ? শুধু মিষ্টি দুটোই খাও ।

রমেন

সেই "কুঞ্জ-ফোটা ফুলে"র গানটা একবার গাও—তা না গাইলে কিছুতেই খাব না ।

আশা

আচ্ছা, গা'ব এখন, তুমি খাও আগে ।

রমেন

ঠিক গাইবে ?

আশা

ঠিক গাইব ।

রমেন

ঠিক ?

আশা

হ্যাঁ গো, হ্যাঁ । (রমেন খাইতে লাগিল । খাইয়া জল খাইয়া গেলাস রাখিয়া ডিবা ঠুকিয়া পান লইল

রমেন

কই, গাও এইবার ।

আশা

কি ?

রমেন

সেই "কুঞ্জ ফোটা" ।

আশা

কাদের কুঞ্জ ?

রমেন

সেই যে গো—"ধ্রুব তারা ,"

আশা

ধ্রুব তারা ! কোন্ আকাশের ?

রমেন

ও সব ইয়ারকী চলবে না—তিন সত্যি গেলেচ !

আশা

তাই না কি ? তা' হ'লে ত গাইতেই হবে ।

গীত

সে আমার, নীল আকাশের ধ্রুবতারা, কুঞ্জ ফোটা ফুল ।
সাগরের গহন তলের রতন আমার, কোন্ স্বপনের ভুল ।
(ধীরে ধীরে সীতানাথ রায়ের প্রবেশ ও আশার গীত বন্ধ)

সীতানাথ

হ্যাঁরে শালী,—হ্যাঁরে শালা, একটুখানির জন্যে আড়াল হয়েছি, আর অমনি দুটিতে প্রেমের বন্যে ছুটিয়েছ !

রমেন

দাদামশাই, দেখুন না কিছুতেই শুনবো না, জোর ক'রে—(বলিতে বলিতে পাশ কাটাইয়া প্রস্থান)

সীতানাথ

হ্যাঁরে শালা !—সাধু—তপস্বি ! কিছুতেই শুন্‌বেন না —ওঁকে জোর ক'রে—! পালাচ্ছিস্ কেন ? (আশার দিকে চাহিয়া) বলি, থাম্‌লে কেন গো ধ্রুবতারা ? চলুক না । বুড়োর কাছে গাইতে বুঝি গলা বুজে আসে ?

আশা

দাদু, আপনি দিন দিন বড্ড দুষ্টু হচ্চেন ।

সীতানাথ

বড্ড । তার কারণ, হিংসেটা দিন দিন বড্ড বেশী হচ্চে কিনা তাই । একরত্তি—রক্তের ডেলা থেকে, কত আশা ক'রে মানুষ কল্লুম, মাষ্টার রেখে লেখাপড়া শেখালুম— গান শেখালুম, আর এখন আমায় তোমার আর ভাল লাগে না । বলি—ওটাকেই আজ পেলি কোত্থেকে রে ? সে-ও এই বুড়ো ! ওকে যখন পেলুম, তখন ও মোটে সাত বছরেরটি । সেই তখন থেকে মানুষ ক'রে, লেখাপড়া শিখিয়ে, তবে ত এখন আকাশের ধ্রুবতারা—

আশা

সত্যি বলচি দাদু—ভাল হবে না কিন্তু ।

সীতানাথ

ভাল যে আমার হবে না, সে আর তুই বলবি কিরে শালী—সেত দেখতেই পাচ্চি । নইলে রোম্‌নেটা উড়ে এসে জুড়ে ব'সে কি আর এমনটা কত্তে পারে কখন ?

আশা

যান ; আপনার সঙ্গে আর কথা কব না ।

প্রিয় প্রতীক্ষায়

জাপানী চিত্র

ওলোট-পালোট

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

সীতানাথ

তা কইবে কেন বল—ঝগড়া ক'রে কথা বন্ধ করার একটা অছিলে চাইত ?

আশা

আচ্ছা, আপনার কি আর কোন কাজ টাজ নেই ?

সীতানাথ

তা আবার নেই ? কিন্তু সব কাজ যে পণ্ড ক'রে দেয় ঐ মুখখানি ! ঐ ঢলঢলে মুখখানি দেখ্‌লে কেমন হ'য়ে যাই কিনা—তাই আর কাজের কথা মনে থাকে না। তা আমায় তাড়াবার জন্যে এত ঝোঁক কেন বল দেখি ? আমি এখন যেন শত্রু পক্ষ হ'য়ে দাঁড়িয়েছি, না ?

(বাহিরে দূর হইতে দীনদয়ালের গান শোনা গেল ; পরক্ষণে গাহিতে গাহিতে দীনদয়াল প্রবেশ করিল।)

দীনদয়াল

আলো আমি চাই না মা গো—রাখিস আমায় আঁধার ঘরে।
আলোয় যে তুই থাকিস না গো—থাকিস যে মা অন্ধকারে।

সীতানাথ

কি দাদু খবর কি ? সমস্ত দিন আজ দেখা সাক্ষাৎ পাইনি, কোথায় ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছ ?

দীনদয়াল

পাগল ছাগল লোক, আমার কি কিছু ঠিকানা আছে ! লোকের কাছে ত যাবার উপায় নেই। পাগ্‌লা ব্যাটা ব'লে সকলেই স'রে যায়। তাই কারু কাছে ত আর যাই না, এই পথে পথে মাঠে মাঠেই ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম্।

সীতানাথ

বেড়াবার জায়গা ছিল বটে ত্রিশ বছর আগে। সে বেড়াঙ্গা আর নেই। এখন যা দেখছ—এ ত শ্মশান।

দীনদয়াল

শ্মশানই ত দরকার গো রায় মশাই ! মা আমার যে শ্মশানেই থাকেন্। শ্মশানই যে তাঁর সব চেয়ে প্রিয়। জান না—তিনি শ্মশানবাসিনী ? (সুরে)

শ্মশান পেলে ভাল বাস মা তুচ্ছ কর মণিকোটা।
আপনি যেমন, ঠাকুর তেমন, ঘুচলো না আর সিদ্ধি ঘোঁটা।
সুখে রাখ, দুঃখে রাখ, করবো কি আর দিয়ে খোঁটা ;
মায়ে পোয়ে কেমন ব্যাভার, ইহার মর্ম্ম জানবে কেটা।

সীতানাথ

দাদু, আমাকে তোমার মত পাগল ক'রে দিতে পার ? (খানিক নীরব থাকিবার পর) আচ্ছা সে হবেখন। সমস্তদিন খাওনি—এখন এস, দুটি খেয়ে দেয়ে নেবে চল।

দীনদয়াল

শ্মশান পেলে ভাল বাস মা, তুচ্ছ কর মণিকোটা।

(গাহিতে গাহিতে প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য।

দেবাপুর—দীনেশ রায়ের বাগানের ঘর

ইয়ারগণ, দীনেশ ও মালতী

(একজন একধারে ব'সে আপন মনে বিদ্যাসুন্দর হাঁকিয়া হাঁকিয়া পাড়তেছিল। অন্যদিকে আর একজন বায়াতবল সাধিতেছিল)

ধা তে রে কিটি তাক,
তা তে রে কিটি তাক,
না তে রে কিটি তাক্,
ধিন তে রে কিটি তাক্।

প্রথম ইয়ার

(সুরাবিকৃতস্বরে) চলুক চলুক—ফূর্ত্তি চলুক।

If a body meet a body
Coming from the Ry
If the body kiss the body
Should the body cry ?

দীনেশ

আহা-হা ! মতে, তোর ও চ্যাব-চ্যাবানি বন্ধ কর— না বাবা !

প্রথম ইয়ার

মালতী সুন্দরী, নাও, আর একখানা গাও।

দ্বিতীয় ইয়ার

না, বাবা! আর গানে কাজ নেই, কান ঝালাপালা হ'য়ে গেছে। তার চেয়ে, মালতী, তুই রিজিয়ার পার্টটা ব'লে যা, আমি বক্তিয়ার বলি :—

"শাহাজাদী!
এই রক্ষাশূন্য কক্ষে
এই দণ্ডে নিষ্কোষিত অসি মম
দ্বিখণ্ডিত করে তব শির,
কি করিতে পার তুমি?"

কৈ—বল, 'ফিলিং উণ্ড' হ'য়ে যাচ্ছে, বল্—বল্—অ মালতী?

মালতী

কি বলবো বাপু জানি নে!

দ্বিতীয় ইয়ার

আঃ মরণ তোর! কি বললুম তবে তোকে? তুই নেহাৎ একটা যাচ্ছেতাই!

তৃতীয় ইয়ার

ওহে শোন—শোন। 'বসুন্ধরা' কাগজে কি লিখেছে শোন,—কৈলাসপতি মহাদেব বহুকাল পরে পৃথিবী দর্শনাভিলাসে কৈলাস হইতে বোম্বায়ের কোন স্থানে আসিয়া ছদ্মবেশে গৌরীসহ পরিভ্রমণ করিতেছিলেন। গত ৭ই জুন তারিখে মধ্যরাত্রে বোম্বাইয়ের একজন পুলিশ আসিয়া জে, এস, বিলফোর্ড সন্দেহের বশে তাঁহাদের ধরিয়া ফেলেন। ফলে খুব একটা ধস্তাধস্তি হয় এবং তাহাতে ধূর্জ্জটীর জটার খানিকটা অংশ ছিঁড়িয়া আসিয়া বিলফোর্ড সাহেবের হাতের মধ্যে—

দীনেশ

থাম্ থাম্ ভজা, বাজে বকিস্ নি ক! যত সব গাঁজাখুরী—

(ডাক্তার ও পুলিস ইনস্পেক্টার নিমাইবাবুর প্রবেশ)

আরে এস এস, ইনস্পেক্টার সাহেব এস। পুলিসই ত সকলকে পাকড়াও করে,—ডাক্তার, তুমি যে দেখছি—পুলিসকে পাকড়াও ক'রে এনে ফেলেছ! তোমার বাহাদুরী আছে বটে! তারপর, পুলিস সাহেব, খবর কি বল?

ইনস্পেক্টর

খবর ত তোমার কাছেই হে। জমীদার লোক! তা'তে আবার কুমার নাম ঘুচে—এখন স্বয়ংই মহারাজ! হা—হা—হা—হা—হা

দীনেশ

পুলিস সাহেবকে আগে একটা 'পেগ' দাও হে মতি।

ডাক্তার

মতি দেবে কি রকম! তোমার কথায় বড় তালের ভুল হয় দীনেশ বাবু। মালতী থাকতে মতি দেবে কি রকম?

দীনেশ

ঠিকই বলেছ হে ডাক্তার, 'হিমালয়ান ব্লাণ্ডার'। মালতী, নতুন অতিথিদের খাতির কর।

মালতী

(সুরা হস্তে লইয়া) আসুন, ইনস্পেকটার বাবু!

ইনস্পেক্টার

(সুরা পানান্তে) আঃ!—বেড়ে জিনিষ হে! 'হোয়াইট হর্স'—না?

ডাক্তার

হাতের গুণবাবা—হাতের গুণ! হাতে ক'রে কে দিলে সেটা দেখতে হবে! হাতের গুণেতেই—খাঁটী 'চন্দননগর' 'হোয়াইট হর্স' হয়! আমাদের হাটের বিপনে সা' 'কাট্‌লার পামার' হ'য়ে যায়।

বিদ্যাসুন্দর-পাঠক-ইয়ার

(চেঁচাইয়া)—শুন শ্বশুর ঠাকুর, শুন শ্বশুর ঠাকুর,
আমার বাপের নাম বিদ্যার শ্বশুর।

তবলাবাদক ইয়ার

তেরে কেটে—ধাগ্ ধে—তিন্না—ধি নি কি টি—ধাগ্ ধে ধে রে কে টে তাক।

ইনস্পেক্টর

ওহে দীনেশ, তোমার মালতী রাণীর দু একখানা গান-টান চলুক। তোমার জিনিষ, তোমার হুকুম না হ'লে ত আর উনি—কি বল গো বিবিসাহেব?

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

মালতী

আপনারা পুলিসের লোক—আপনাদের হুকুমই যথেষ্ট! তার ওপর আর কারুর হুকুম দরকার হয় না—আর তা চা'ও দেন না।

ইনস্‌পেক্টর

ব্রেভো, ব্রেভো! তা'হলে হোক একখানা। দাও চক্রোত্তি, হার্ম্মোনিয়মটা বিবিসাহেবের কাছে—এগিয়ে দাও।

দীনেশ

গাও—গাও—মালতী,—ভাল দেখে গাও। এঁদের সন্তুষ্ট না করতে পাল্লে,—বুঝেছ ত?

মালতী

না ব'লে যায় পাছে সে, আঁখি মোর ঘুম না জানে।
তবু যে রই আমি—আমার ব্যথা জাগে পরাণে।
যে পথিক পথের ভুলে, এল মোর হৃদয়কূলে,
সে কি আর সেই মিনতির বাধা মানে।
এল যে, এল সে তার আগল টুটে,
খোলা দ্বার দিয়ে আবার যাবে ছুটে,
খয়ালের হাওয়া লেগে, যে ক্ষ্যাপা ওঠে জেগে,
সে কি আর সেই অবলার বাধা মানে।

ডাক্তার ও ইনস্‌পেক্টর

ব্রেভো! ব্রেভো!! থি চিয়ার্স ফর্ মিস মালতী সুন্দরী।

(নীলু ভট্টাচার্য্যের প্রবেশ)

বাহবাং! বাহবাং! কেয়া ফূর্ত্তিং! সকলেই বাবা দিব্বিং মজা লোটাং হচ্চেং—আর আমি শালাই শুধুং ফাঁক! আর একটাং হোক বিবিজানং।

১ম ইয়ার

তুমিং এতক্ষণ কোথায় ছিলেং নীলমণিং?

দীনেশ

ভট্‌চাজ, বোস্ বোস্—বাজে গোলমাল করিস নি। ভালকথা,—হ্যাঁহে ডাক্তার, ফকীরের বাড়ীর খবর কি বল দেখি। তার ভাই আর ভাইপোর অবস্থা কেমন?

ডাক্তার

খবর বড় সুবিধে ব'লে বোধ হয় না। একেবারে এসিয়াটিক্ কলেরা। পীরহাঠা তার ওখান থেকেই ত বরাবর আসছি। রাত্তির পর্য্যন্ত কি হয় বলা যায় না। ওই ত আপনার ফকীর আসচে।

(ফকীরের প্রবেশ)

দীনেশ

এসো—কি খবর ফকীর?

ফকীর

ছোটবাবু, খবর খুবই খারাপ। এই ত ডাক্তার বাবু দেখে এলেন। ক্রমেই অবস্থা খারাপ হচ্চে। একটিবার যেতে হবে ছোট বাবু। দোহাই ছোট বাবু!

দীনেশ

আমি গিয়ে আর কি কর্ব্ব ফকীর? বলচ—চল—যাই একবার। তোমার সময়টা খুবই খারাপ পড়েছে। এই সেদিন চৈতনপুকুর নিয়ে রমেন রায়ের সঙ্গে দাঙ্গা-হাঙ্গামা—মাথা ফাটা-ফাটি হল। আজ আবার এই বিপদ! ও মোকর্দ্দমাটার দিন ত ৭ই—না?

ফকীর

হাঁ। তা একটিবার গা তুলুন ছোটবাবু।

দীনেশ

চল—যাই একবার। এস হে ডাক্তার। তোমরা সব বস—আমরা ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ঘুরে আসছি।

(প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

বেলডাঙ্গা—সীতানাথ রায়ের বাটী

সীতানাথ

হ্যাঁ ভাই আশা?

আশা

কি দাদু?

সীতানাথ

আচ্ছা, এইটেই কি তোর উচিত হ'ল। ধর্ম্মও ত একটা আছে।

আশা

কি—গো ?

সীতানাথ

আমি তোকে ডাকলুম—"হ্যাঁ ভাই, আশা ?" তার উত্তরে তোর কি বলা উচিত নয়—'কি ভাই হৃদয়বল্লভ !'—তা' না "কি দাদু ?"—তুই কি এমনি ক'রেই আমাকে জ্বালাবি ?

আশা

দেখুন—চুপ করুন বলচি।

সীতানাথ

আচ্ছা বেশ চুপই করলুম।

আশা

দাদু !

সীতানাথ

(নীরব

আশা

ও দাদু !

সীতানাথ

(নীরব

আশা

শুনতে পাচ্ছেন না ?

সীতানাথ

শুনতে কেন পাবনা—কিন্তু চুপ করবার হুকুম হয়েছে যে !

আশা

আচ্ছা, দিদিমার জন্যে আপনার খুব কষ্ট হয় ? আচ্ছা দিদিমা খুব সুন্দরী ছিলেন, না ? দিদিমাকে আপনি ভালবাসতেন ?

সীতানাথ

না ; হ্যাঁ ; বোধহয়।

আশা

ও কি "না-হ্যাঁ-বোধহয়"— এ আবার কি ?

সীতানাথ

তিনটে প্রশ্নের একেবারে পাশাপাশি তিন রকম উত্তর।

আশা

আপনি কি কবির উতোর গাইছেন না কি দাদু ?

সীতানাথ

রামো-চন্দর ! আমি আমার প্রেয়সীর সঙ্গে প্রেমালাপ কচ্চি।

আশা

সত্যি বলুন না,—দিদিমাকে খুব ভালবাসতেন না—?

সীতানাথ

বাসতুম বটে—তবে খু-উ-ব নয়। অর্থাৎ রমেন যেমন তোকে ভালবাসে—তেমন নয়।

আশা

ভাল হচ্ছে না কিন্তু ! (খানিক নীরব থাকিয়া) দাদু একটা জিনিষ কিনে দেবেন ? আপনার পায়ে পড়ি দাদু ! তা'হলে যে আপনার ওপর কী—

সীতানাথ

অত ভূমিকা কেন, ফরমাসটা কি ব'লেই ফেল না।

(বাহিরে দীনদয়ালের গীত শোনা গেল)

এস দীনু। হাতে ও কি ? টেলিগ্রাফ ? কোত্থেকে এলো !

দীনদয়াল

খোলসে আঁটা, বাইরে থেকে ত কিছু বোঝবার জো নেই, খুলে দেখুন।

(টেলিগ্রামখানি খুলিল এবং পাঠান্তে সীতানাথ শুইয়া পড়িল)

দীনদয়াল

কি হোল রায় মশাই ? অমন হোয়ে পোড়লেন্ কেন ?

আশা

দাদু, কি হোয়েছে ? কোথাকার টেলিগ্রাম ?

সীতানাথ

(ক্ষণেক নীরব থাকিবার পর উদাস ক্ষীণ স্বরে) আশা, দীনু,—আমার সব গেল—ব্যাঙ্ক ফেল হয়েছে।

দীনু ও আশা

ব্যাঙ্ক ফেল হয়েছে !

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

সীতানাথ

হ্যাঁ! ব্যাঙ্ক ফেল! আমার যথাসর্ব্বস্ব! উঃ—পাখা!—(টলিতে টলিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া) না—পাল্‌কী। কোলকাতায় যাবো—পালকী—দীনু—শীগ্‌গীর। আচ্ছা, থাক্, আমিই যাচ্চি।

(প্রস্থান)

দীনু

জামাই বাবু কোথায় দিদি?

আশা

পীরহাটার সেই ফকীর মণ্ডলের বাড়ী—অসুখ, সেখানে ডাকে গেছেন।

দীনু

তাদেরই সঙ্গে না ফোজ্‌দারী মাম্‌লা বেঁধেছে দিদি?

আশা

হ্যাঁ দাদা। তা সে অনেক ক'রে কেঁদে কেটে এসে পড়ল। মোকদ্দমা না কি তুলে নেবে। পায়ে হাতে ধরাধরি ক'রে ত নিয়ে গিয়েছে।

(গোলাপীর প্রবেশ)

গোলাপী

দিদিমণি, কর্ত্তাবাবু শীগ্‌গীর ডাকচেন একবার।

(উভয়ের প্রস্থান)

দীনু

ভারি জবর খবর। একেবারে ব্যাঙ্ক ফেল! ব্যাঙ্ক আর হাট থাকলেই, একদিন তা ফেল হবারও ভয় থাকে। এত ক'রে বলি রায় মশায়কে যে দাদা—হাল্কা হও—কোন হাঙ্গাম থাকবে না, সে ত আর শুনবেন না। খালি বিষয় আশয়, টাকাকড়িতে নিজেকে অসম্ভব ভারি ক'রে রেখেছেন! ব্যাঙ্ক ফেল সঙ্গে সঙ্গে রায় মশায়ও ফেল! কই—করুক দেখি কেউ একবার আমাকে ফেল? সেটি বাবা হবার যো নেই। দীনদয়াল ফেল-প্রুফ হয়ে ব'সে আছে। কিন্তু বেটী পাশও ত এখনো করাচ্চে না। ছাড়চি না বাবা—ছাড়চি না—পাশ করিয়ে নোবই। পাশ না করালে বেটী তোমার ছাড়ান নেই! পাশ তোমায় করাতেই হবে।

(ধীরে ধীরে প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য

পীরহাটা—ফকীর মণ্ডলের বাটী, বাহিরের একখানি গৃহ

(ফকীর ও রমেন্দ্র)

রমেন

আর দেখছ কি ফকীর, হ'য়ে গেল আর কি! চেষ্টার ত ত্রুটী কল্লি না; আয়ু নেই দু'জনের, তার আর তুই কর্ব্বি কি? এখন আর মুষড়ে পড়িসনি, শক্ত হয়ে শেষ কাজ গুলো সেরে ফেল। আচ্ছা আমি উঠলুম্ তা হলে। আমার পাল্কী আনতে ব'লে দে কারুকে।

ফকীর

বসুন জামাইবাবু। আর একটুখানি বসুন,—আমি আস্‌চি। (প্রস্থান)

(বাটীর ভিতর অন্য একখানি ঘরে দীনেশ, ডাক্তার ও ইনস্‌পেক্টর নিমাই বাবু)

দীনেশ

ডাক্তার, বেশ ক'রে ভেবে দেখ দেখি। এমন সুযোগ হয় ত আর জীবনে নাও পেতে পারি। তুমি কি বল হে নিমাইবাবু? 'য়্যারেষ্ট' তো তোমাকেই কত্তে হবে।

নিমাই

এক্ষনি ত 'চার্জ' দিয়ে 'য়্যারেষ্ট' করা যায়। কিন্তু, এ বেটা মোড়ল তোমার রাজী হবে ত?

দীনেশ

ফকরেকে আমি যেমন ক'রে পারি রাজী করাচ্চি। কিন্তু কেসটা ঠিক দাঁড় করিয়ে প্রমাণ করান যাবে ত?

ডাক্তার

তা যাবে না কেন? ও বলবে "আমি 'পয়জন' দিই নি" কিন্তু শিশি দুটোর গায়ে তোমারি হাতের লেখা—"রমজানের জন্যে"—"লতিবের জন্যে"।

নিমাই

আর শুধু তাই নয়,—প্রমাণ ভাল ক'রে হয়ে যাবে, ফৌজদারী মাথা ফাটাফাটি কেস পেণ্ডিং রয়েছে, সুতরাং আক্রোস যে রীতিমত, সে সহজেই প্রমাণ হয়ে রয়েচে। তারপর, ভুলে না হয় একজনের শিশিতে 'পয়জন' দিয়ে

ফেলতে পারে, কিন্তু ডজনের চুটো শিশিতেত ভুলে 'পয়জন' দেওয়া? কিম্বা, হয়ত বলবে যে 'কলেরা কেস', কিন্তু "কলেরা" যে নয়, তা পাড়ার দু চার জনের সাক্ষীতে প্রমাণ করিয়ে নিতে হবে। মোট কথা, প্রমাণের অভাব হবে না। এ সব ছাড়া আরও 'ষ্ট্রং এভিডেন্স' অনেক রয়েচে। তবে, এসব ব্যাপারে পার্টিকেও রীতিমত কিছু খরচ কত্তে হয়। সেটা পেরে উঠবে ত? অবশ্য আমাকে কিছু দিতে হবে না। কিন্তু, তা ছাড়াও ত, চাই;—বুঝ্লে না? লাস ওরা জালিয়ে ফেলুক—সে 'রিস্ক' আমার—সে আমি কাটিয়ে নোবো। মরবার আগের মুহূর্ত্তের বমিটাই মেডিকেল একজামিনের জন্যে পাঠিয়ে দিয়ে কাজ সারব, আর ডাক্তারের 'উইটনেস্' সবচেয়ে কাজে লাগবে। এই ত ফকীর এসেচে—ওকে একবার জিজ্ঞেস কর তাহলে দীনেশবাবু ভাল ক'রে।

দীনেশ

ওকে সে সব আমি বলেচি। টাকা যা খরচ হয় আমি করবো। এ সুবিধে আমি ছাড়বো না নিমাইবাবু! তুমি ওকে 'ম্যারেঞ্জ' কর। তারপর যা হয় হবে।

নিমাই

তা হলে ফকীর, এক কাজ কর্। পাড়ার দু'চারজন সাক্ষী ঠিক ক'রে, এখানে হাজির থাকবার ব্যবস্থা কর। আর, একখানা চিঠি লিখে দিচ্চি—কারুকে দিয়ে থানায় হেড কনস্টেবল্ মহিমের কাছে এক্ষুনি পাঠিয়ে দাও।

দীনেশ

ফকীর, তা হলে আর দেরী কোরনা। চট্পট্ সব বন্দোবস্ত ক'রে ফেল। আমি আর এখানে থাক্বো না তা হ'লে। আমি স'রে পড়লুম। ডাক্তার, থাক সব তোমরা তা হলে। ওরে ফকীর! রমনের কাছে গিয়ে ব'সে দু'একটা এ কথা—সে কথা ব'লে ওকে আটকে রাখগে যা। আচ্ছা, আমি চল্লুম তাহ'লে। গুড্‌বাই।

(প্রস্থান)

নিমাই

ফকীর এই চিঠি নাও। যাও, তুমিও চলে যাও। দু'একটা কথা ক'য়ে ওদিকে আটকে রাখগে—আমরা তোমার পেছন পেছনেই যাচ্ছি। (ফকীরের প্রস্থান)।

(ফকীরের বাহিরের ঘর, রমেন ও ফকীর উপবিষ্ট)

রমেন

তা'হলে আমার পাল্কীখানা এইবার আনতে বলে দে,—আমি যাই।

ফকীর

হাঁ, দি জামাইবাবু। আচ্ছা, জামাইবাবু, ফৌজদারী মকদ্দমার আসামী ত দাদাও একজন ছিল। তা, ওই যখন ম'রে গেল, তখন—

রমেন

হাঁ, তোকে এই ব'লে একটা 'পিটিসান' ফাইল করতে হবে যে, দাদা তোর কলেরাতে মারা যাওয়ায়——

ফকীর

কলেরাতে মারা যাওয়ায় কি গো। তুমি বিষ দিয়ে ভাই আর ভাইপোটাকে মেরে ফেল্লে, আর বলছ "কলেরাতে"। হায়! হায়! তোমাকে বিশ্বাস ক'রে চিকিৎসা করাতে এনেছিলুম, আর তুমি বিষ খাইয়ে এমন ক'রে শত্রুতা সাধলে—

রমেন

(চমকিত হইয়া) কি বলছিস্ রে ফকীর। বিষ কি বলছিস?

[নিমাইবাবু, ডাক্তার ও অন্যান্য কয়েকজন প্রতিবেশী ও জমাদার চৌকীদার প্রভৃতির প্রবেশ]

নিমাই

জানেন না আপনি—বিষ কি?—শীগগীরই জানতে পারবেন। এই ফকীর মণ্ডলের দাদা আর তার ছেলেকে ওষুধের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে খাইয়ে হত্যা করার অপরাধে আমি আপনাকে গ্রেপ্তার করলুম। রহমৎ আলি, গণেশ-লাল,—হাতে হাতকড়ি লাগাও।

রমেন

কি? আমি বিষ—

নিমাই

হ্যাঁ—হ্যাঁ—বিষ। নিজে খাইয়েছেন, এখন কিছুই বুঝতে পাচ্ছেন না? রহমৎ, বার-বাড়ীতে নিয়ে এস। ডাক্তার বাবু, আসুন আপনারা, বার-বাড়ীতে যাই চলুন।

ওলোট-পালোট

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

[রমেনের হাতে হাতকড়ি পরান হইল। রমেন কাষ্ঠমূর্ত্তিবৎ দাঁড়াইয়া রহিল। তারপরে তাহাকে টানিয়া লইয়া বাহিরের দিকে লইয়া গেল। পিছন পিছন সকলে চলিল]

ষষ্ঠ দৃশ্য

বেলডাঙ্গা

[সিদ্ধেশ্বরীর মন্দিরের সম্মুখবর্ত্তী বারোয়ারীতলা। জনকয়েক গ্রামবাসী—বাঁধানো বকুল গাছের তলায় বসিয়া নানারূপ আলাপ আলোচনা করিতেছিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় হুঁকা হস্তে দাঁড়াইয়া তামাক খাইতেছিলেন]

ভট্টাচার্য্য

ব্যাপার ত তা'হলে 'গুরুচরণ' হ'য়ে উঠলো দেখছি, কি বলিস রে মোনা? [তামাক টানিতে টানিতে বাধানো বেদীর উপর উবু হইয়া বসিলেন]

হরিচরণ

আচ্ছা, শুনতে পাই, আশা চালাক মেয়ে,—কিন্তু এ কি রকম কাজটা ক'রে ফেল্লে! একখানা চিঠি পেলে আর অমনি একটা অজানা-অচেনা লোকের সঙ্গে টাকাকড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল?

মন্মথ

আরে যায় কি আর সাধে! কি সঙ্গীন অবস্থাটা একবার ভাব দেখি। রায় মশাই নেই বাড়ী। ব্যাঙ্ক ফেলের খবর পেয়ে তিনি পাগলের মত হয়ে চ'লে গেছেন কোলকাতায়। এ দিকে স্বামী পুলিশের হাতে য়্যারেষ্ট হয়েছে! কি অবস্থাটা একবার ভাব দেখি!

ভট্টাচার্য্য

[হুঁকায় দীর্ঘ একটা টান দিয়া] দেখ্ মোনা, এর ভেতর মস্ত একটা ষড়যন্ত্র রয়েছে, নইলে তোমার গিয়ে—

মন্মথ

আরে ষড়যন্ত্র ত রয়েছেই।

হাবুল

ষড়যন্ত্র ত বটেই। নইলে, যেই রায় মশাই পাগলের মত হয়ে কোলকাতা ছুটলেন, অমনি রমেনকে পুলিশ বিষ খাওয়ানর অপরাধে য়্যারেষ্ট ক'রে ফেল্লে। বিষ খাওয়ালে আবার কাকে? না—ফকীর মণ্ডলেরই ভাইকে আর ভাইপোকে! তারপর এক দিন পরেই হুগলী থেকে অমনি রাই মশাইএর চিঠি নিয়ে লোক এল, আর সেই রাত্রেই মেয়েটাকে যেন ভোজবাজীর মত উড়িয়ে নিয়ে গেল। বলি এ সব কি আর বুঝতে বাকি থাকে! প্রকাণ্ড ষড়যন্ত্র! প্রকাণ্ড ষড়যন্ত্র!

বিষ্ণু পাল

আচ্ছা, চক্কোত্তি মশাই, চিঠি খানায় কি লেখা ছিল, তা কিছু শুনেছ?

মন্মথ

আরে, সে আমি শুনিছি। লেখা আর ছাইপাঁস কি থাকবে। রায় মশাই যেন কোলকাতা থেকেই খবর পেয়ে তখনি হুগলী চ'লে এসে তাঁর উকীলের বাড়ী থেকে লিখচেন যে এই লোকের সঙ্গে টাকাকড়ি নিয়ে পত্রপাঠ হুগলী চ'লে আসবে। কিছু চিন্তা কোরো না—কোন ভয় নেই। রমেনকে খালাস কর্ব্বই। এই রাত্রের ট্রেণেই চ'লে আসবে। এই লোক খুব বিশ্বাসী, এর সঙ্গে আসতে দ্বিধা কোরো না। দীনুকেও সঙ্গে ক'রে এনো। রমেনের জন্যে—

ভট্টাচার্য্য

তা এই চিঠি পেয়েই, ভালমন্দ একটু ভেবে চিন্তে না দেখেই, টাকাকড়ি নিয়ে লোকটার সঙ্গে বেরিয়ে পড়া—বিশেষ রাত্রিকাল—তারপর ধর গিয়ে,—আমাদের ঘরের মেয়ের মত মুখ্যু সুখ্যু নয়—লেখাপড়া জানা মেয়ে! হাতের লেখাটাও একবার দেখলে না, যে কার হাতের লেখা! তারপর ধর গিয়ে, হুগলী থেকে বেলডাঙ্গা, এমন যে অনেক দূরের পথ—তা'ও নয়, মোট কোশ আড়াই তিন পথ ট্রেণে আসতে মিনিট পনের। রায় মশাই ত নিজেই তা'হলে বাড়ীতে এসে টাকাকড়ি নিয়ে আবার যেতে পারতেন।

মন্মথ

দেখ ভট্‌চাজ, তোমাদের মাথায় গোবর ছাড়া আর যে কিছু আছে ব'লে ত আমার মনে হয় না। তোমরা এটা মোটেই বুঝছ না যে আশার তখন মনের অবস্থা কি!

অতি-বড় পণ্ডিতেরও এ অবস্থায় বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়ে যায়।

হরিচরণ

আরে ভাই, ওসব কিছুই নয়—কিছুই নয়। এ হচ্ছে গা। গ্রহের ফের ছাড়া আর কিছুই নয়। রায় বাড়ীর গ্যেগার চাকা উল্টো ঘুরতে সুরু হল আর কি! তা' হলে, ভেবে দেখ দেখি, দেখতে দেখতে কি ব্যাপারটাই 'য়ে গেল। সাজান যাত্রার আসরে এ যেন আগুন লেগে গল! কি বল হে বিষ্টু পাল?

বিষ্ণু পাল

ঠিক—ঠিক! ভগবানের মার ছাড়া এ আর কিছুই য়। যাই হোক অমন দেবতার মত লোকের যে মন ধারা—

ভট্টাচার্য্য

দেখ, রায় মশাই লোক যে মহৎ তা ঠিকই, কিন্তু সকলে তাঁকে দেব্‌তা দেব্‌তা ব'লে গ'লে যায়, সেটাও লোকের ড়াবাড়ি।

হরিচরণ

বাড়াবাড়ি বই কি,—খুবই বাড়াবাড়ি। আমার সঙ্গে বছর—

ভট্টাচার্য্য

(সবিশেষ উৎসাহিত হইয়া অপেক্ষাকৃত উচ্চকণ্ঠে) নিশ্চয়ই বাড়াবাড়ি। আমার খেঁদির বিয়ের সময় বড়-মুখ ক'রে গিয়ে তোমার কাছে দাঁড়ালুম, তুমি একশোটা টাকা দিতে পারলে না! পঞ্চাশটা টাকা দিয়ে যেন ভিকিরী বিদেয় করলে। ছেলে নেই, পুলে নেই, বিষয়ের আণ্ডিল নিয়ে ব'সে রয়েছ,—তুমি কি না—

হাবুল

বল্‌লে যদি তবে বলি। আমার খিড়কীর পাঁদাড়ে ওঁর সেই প্রকাণ্ড শিরীষ গাছটা গেল বছর ঝড়ে প'ড়ে গেল। তা অপরাধের মধ্যে গোটা দুই মড়ুঞ্চে ছোট ডাল আমি এনেছিলুম। তা তিন দিন না যেতেই তুমি অমনি খবরটী নিয়েছ আর নগদীকে দিয়ে চেয়ে পাঠিয়েছ! এ রকম ছোট নজর কারুর আমি দেখি নি। রোজ চারটে ক'রে কিষেণ লাগিয়ে গোটা তিনটে দিন গেল আমার সেগুলো চেলিয়ে ফেলতে! পাঁচ ছ'টা টাকাই গেল আমার খরচ হয়ে। তুমি সেদিকে দেখলে না, তুমি এলে কি না সেগুলোর ওপর নজর দিতে। যাই বল, চোখের পর্দ্দা একেবারেই নেই।

মন্মথ

ওরে ভাই, 'যতটা গর্জ্জায় ততটা বর্ষায় না'। সত্যি কথা বলতে গেলে অনেক কথাই বলতে হয়। আমার সেই জমী বন্ধকের দরুণ তিয়াত্তর টাকা সুদ হয়েছিল, কত ক'রে বল্লুম, কই, সব সুদটা ছেড়ে দিতে ত আর পারলে না তুমি! ইচ্ছে করলে কি আর তা তুমি পারতে না? ছাড়লে বটে, কিন্তু সুদ বলে পাঁচটি টাকা নিলে ত! বলি, ভগবান অন্যায়টা কি চিরকাল কখন সহ্য করেন?

ভট্টাচার্য্য

আরে, লোক মোটেই ভাল নয়, তা নইলে—

হরিচরণ

ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও। যা হয়েছে—ঠিকই হয়েছে। দেবতার বিচার, বাবা, বড় সুক্ষ্ম বিচার!

বিষ্ণু পাল

(গলা খাট করিয়া) এখানে আর কেউ নেই—চুপি চুপি বলি তা' হ'লে—পাষণ্ড! পাষণ্ড! মহাপাষণ্ড—নরাধম!!

ভট্টাচার্য্য

(হুঁকায় একটা টান দিয়া একমুখ ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে উৎসাহের সহিত কথা কহিতে গিয়া গলায় ধোঁয়া লাগিয়া বিষম খাইল এবং সেই অবস্থায় কহিতে লাগিল) আরে ব্যাটা মো—মো—মো—মো—ক্ষা—ক্ষা—ক্ষা—ক্ষা—

সপ্তম দৃশ্য

কালী মন্দীর—রাত্রি দশ টার পর

একজন ভক্ত

কেমন ক'রে হরের ঘরে—
ছিলি উমা বল মা তাই।
কত লোকে কত বলে
শুনে প্রাণে ম'রে যাই।

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

শিব না কি মা নেচে রঙ্গে,
চিতা-ভস্ম মাখে অঙ্গে,
তুই না কি মা তারি সঙ্গে
সোনার অঙ্গে মাখিস ছাই।
জামাই নাকি ভিক্ষা করে,
সন্তান নিয়ে থাকিস ঘরে,
আর যা শুনি ঘরে পরে
ইচ্ছা করে বিষ খাই।

—মা—মা—ব্রহ্মময়ী, তারা! [প্রস্থান]

[একটি পুরুষ ও একটি স্ত্রীলোক যাত্রীর প্রবেশ]

পুরুষ

এস—এস—আর হাঁ করে দাঁড়িয়ে কি দেখচো? দরজা যে বন্ধ হোয়ে গেল!

স্ত্রীলোক

আজকে মায়ের মুখের ভাবটী দেখলে? যেন কত মাধুর্য্যভরা! আহা, মাগো! ফটকের আমার একটা কাজের হিল্লে ক'রে দাও মা—তোমায় আমি ভাল ক'রে পূজো দিয়ে যাব মা!

পুরুষ

আরে, এস না ছাই! মেয়েমানুষ নিয়ে আসা—এক ঝঞ্ঝাট! চলতে পার না? ধুম্‌সো গতর নিয়ে এক জায়গাতেই যে জ'মে রইলে। চ'লে এস না!

স্ত্রীলোক

আরে বাসরে! যেন রেল ছুটতে আরম্ভ কল্লে যে! একটু আস্তে চল না গা!

[উভয়ের প্রস্থান]

[দুইজন যুবকের প্রবেশ]

১ম যুবক

তুই বেটা যেমন অনড্‌বান! বললুম একটু সকাল সকাল চ', তা' এখন হোল ত? আমি জানি যে রাত দশটার পর মায়ের মন্দিরের দরজা বন্ধ হ'য়ে যায়। ওঃ তার! এই এতটা পথ এসে—

২য় যুবক

দেখ্‌ দেবা, মিছে বকিস্‌নি। তোর জন্যেই ত দেরী হল। তোর আর সাজগোজই হয় না। আসবি—মায়ের মন্দিরে, তা সাজগোজের অত দরকার কি ছিলরে ষ্টুপিড্‌?

১ম যুবক

যাঃ, যাঃ, এই পাঁচ আনা পয়সা ট্রামভাড়া কিন্তু তোর কাছ থেকে আদায় করবো আমি। তা জানিস্‌।

[দুইটি কুমারী বালিকার প্রবেশ]

১ম বালিকা

বাবু, একটি পয়সা দাও বাবু!

২য় বালিকা

লাল লাল ব্যাটা হবে তোমার, একটি পয়সা দাও বাবু!

১ম যুবক

এই, হাত ধরিস্‌নি। পয়সা টয়সা হবে না—নেই।

১ম বালিকা

রাজাবাবু তুমি, পয়সা নেই বোল না বাবু। দোহাই বাবু, একটী পয়সা দাও বাবু!

২য় যুবক

আরে আরে, কাপড় ছাড়! আচ্ছা, এই একটা পয়সা দু'জনে ভাগ করে নিগে যা। [একটি পয়সা একজনের হাতে দিল]

১ম বালিকা

রাজা হও বাবু।

২য় বালিকা

রাঙা ব্যাটার বাপ্‌ হও বাবু।

১ম যুবক

ওরে দেবা,—ওই একদল আসচে আবার। পা চালিয়ে পালিয়ে আয়—পালিয়ে আয়। কি সর্ব্বনাশ! রাত দশটা বেজে গেছে, এত রাত্রেও এরা ঠিক হাজির আছে।

[২য় যুবকের হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া প্রস্থান এবং সঙ্গে সঙ্গে একদল ভিখারীর প্রবেশ]

১ম ভিখারী

বাবু, কানাকে একটা পয়সা দিয়ে যাও বাবু।

২য় ভিখারী

খোঁড়া ল্যাংড়াকে কিছু দিও বাবা।

৩য় ভিখারী

পালিও না বাবা, পালিও না বাবা, পূর্ণিমের দিন ব্রাহ্মণকে একটা পয়সা দিয়ে যাও বাবা—

৪র্থ ভিখারী

সুরদাসকে গোটা পয়সা দিয় বাপ্পা—ভগবান তস্তার ভাল করিবা—

৫ম ভিখারী

[বুক চাপড়াইতে চাপড়াইতে] হেঁইবাবা, হেঁইবাবা, একটা পয়সা—হেঁইবাবা—হেঁইবাবা একটা পয়সা।

গোগা ভিখারী

আা—উ—অ—অউ—য়াঃ—উঃ—আ—হুয়া—উউ—আঃ—আঃ—

৫ম ভিখারী

দিলেনা বাবু, তবে জাহান্নমে যাও!

১ম ভিখারী

দূরহ—দূরহ—আমার মত কানা হয়ে থাক্।

২য় ভিখারী

জ্ব’লে পুড়ে যা’ক—জ্ব’লে পুড়ে যা’ক—

৪র্থ ভিখারী

দূর হও, এমতি ভিক্ষা কিরি কিরি খা—

গোগা

অ—উ—আ—উই—উহু হা—আউ—হস্ত ই—

(সকলের প্রস্থান)

[মালতী ও দীনেশের প্রবেশ]

মালতী

সন্ধ্যের আগে এসে দেখে গিইচি, এই মনসাতলাটায় শুয়ে প’ড়ে ছিল। কারুর কাছ থেকে চারটী মায়ের ভোগ চেয়ে চিন্তে শুয়ে শুয়ে ছেলেটাকে খাওয়াচ্ছিল। ধন্যি মেয়েমানুষ বাবা! মরতে বসেচে, তবু নোয়াতে কিছুতেই পারা গেল না! যাই হোক্ পথে বার ক’রে দেওয়াটা ভাল হয় নি। (চারিদিকে দেখিয়া) কৈ, কোথায় গেল?

দীনেশ

ঐ ভাঙ্গা বারান্দাটার ভেতর কে যেন শুয়ে রয়েচে না? ঐ যে,—ঐ কোণের বারান্দায়?

মালতী

মানুষের মতই ত ব’লে বোধ হ’চ্চে। এস দিকি দেখি। (কাছে যাইয়া) ঠিকই গো—এই যে! অ আশা! বা এসেছেন। রাগ ক’রে তোকে রাস্তায় বার ক’রে দেছ্‌লেন, তোর ওপর আর কতক্ষণ রাগ ক’রে থাক্‌তে পারেন? দেখ্ দিকি কী ভালবাসা! ওরে তোর বরাত ভাল। এমন ভালবাসা পায়ে ঠেলিস্‌নি। ওঠ্, আয়।

দীনেশ

আশা, এখনো বলছি কথার বাধ্য হ’। এখনো আয় আমার সঙ্গে। যা বলি—শোন্। এমন ক’রে ক’দিন থাক্‌বি? নিজেও মরে যাবি, ছেলেটাকেও মার্‌বি।

মালতী

আয় লো আয়। না হলে বাবু আবার রাগ করবেন। আচ্ছা, বলি এত দুঃখু তুই আর কার জন্যে সইছিস্। ভাল ক’রে বুঝে দেখ্ দেখি। এই ক’দিনে তোর কি চেহারা কী হ’য়ে গেছে, আর্শি ধ’রে একবার চেয়ে দেখ্।

আশা

আমার সর্ব্বনাশ ক’রে আবার তোমরা কেন এসেছ জ্বালাতন করতে। যাও, স’রে যাও আমার সমুখ থেকে।

দীনেশ

কথা শুনবিনি তা’হলে? এইবার জোর ক’রে তোকে কথা শোনাব।

মালতী

ছড়ি গাছটা ধর ত। ওকে জোর ক’রে এখান থেকে তুলে নিয়ে যাই, দেখি ওর কোন বাবা ওকে রক্ষে করে।

[দীনেশ স্বয়ং ধরিতে যাইল]

আশা

[উত্তেজিত হইয়া] খবরদার বলছি, গায়ে হাত দিবি ত লাথি মেরে মুখ ভেঙ্গে দেবো। জানিস পাষণ্ড, আমি মায়ের মন্দিরে মায়ের আশ্রয়ে আছি। একবার আমায় ছুঁয়ে দেখ্ দেখি—পাষাণ্ড,—পশু—নরকের কীট!

[হাঁপাইতে লাগিল]

দীনেশ

[চাপা কর্কশ কণ্ঠে] বটে! তাই না কি? মায়ের আশ্রয়ে আছিস্! তবে, চিরকালের জন্য মায়ের আশ্রয়েই থাক্। (বুকে ও পেটে লাথি মারিতে মারিতে) থাক্—থাক্—থাক্! কেমন, হ’য়েছে ত?

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

আশা

উঃ—মাগো! ওয়া…ক্…ওয়া!…ক্ঃ…

দীনেশ

মালতী, আর দেখ্‌ছিস্ কি! রক্তবমি কর্‌চে। চ'লে আয়—পালাই এইবার। ঐ কে আবার গান গাইতে গাইতে এই দিকে আসচে। পালিয়ে আয় মালতী।

দ্রুত প্রস্থান]

[গাহিতে গাহিতে ভক্তের পুনরায় প্রবেশ]

ভক্ত

এত জবা কে দিল তোর পায়।
দে না দুটো দয়া ক'রে রাখি গো মাথায়॥
রাঙ্গা জবা গঙ্গাজলে,
কে তোরে দিয়ে সাজালে,
রবি শশী পদতলে—কত শোভা পায়।

[গাহিতে গাহিতে প্রস্থান]

[সীতানাথ ও দীনদয়ালের প্রবেশ]

সীতানাথ

তাই ত দীনু, আজ সাত দিন ধ'রে এত খোঁজাখুঁজি ক'রেও দিদির আমার সন্ধান করতে পারলুম না। আচ্ছা, কালীঘাটে এসেই তোমাকে তারা তাড়িয়ে দেয়? না সে আর কোন জায়গা? দেখ দেখি ঠিক ক'রে—তোমার ভুলটুল্ হচ্চে না ত?

দীনদয়াল

না রায় মশাই। ওই দোতালা বাড়ীটায় আমার দিদিকে নিয়ে তারা ঢুকল। আর ওইখান থেকেই তারা আমায় গলাধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেয়। কারুকে ত চিন্‌তে পারলুম না রায় মশাই?

সীতানাথ

হা ভগবান! আমার এ কি কল্লে তুমি? তন্ন তন্ন ক'রে সব বাড়ীই ত খুঁজলুম দীনু, দিদিকে আমার তা হলে আর আমি পাব না! এই সাতদিন ধ'রে কোথাও ত খুঁজতে আর বাকী রাখলুম না। পাব না—পাব না!—পাবই যদি তা'হলে যাবে কেন? আমার কি হ'ল দীনু? মা গো! এ কি করলি মা! আমার সমস্ত আলো নিভিয়ে দিলি? আমার মহোৎসবের মাঝখানটায় এমন ক'রে প্রলয়ের ঝঞ্ঝা বহিয়ে দিলি মা!

আশা

(দূরে বারাণ্ডা হইতে) ওগো—মাগো! ওগো গেলুম! দাদু!

সীতানাথ

ও-ই—ও-ই যে! আমার দিদির গলা! দীনু কই—কই—দিদি—দিদি?

[ছুটিয়া বারাণ্ডায় আসিয়া] এই যে! দিদি! দিদি! আশা! দিদিমণি।

আশা

দাদু! তুমি? কি ক'রে এলে? কাছে এস। ওয়া :—দাদু, আর হল না—চ'লে গেলুম দাদু! ওয়া…ক্! ওয়া…ক্। [রক্ত বমন]

সীতানাথ

এ কি হ'ল তোর দিদি! দীনু, এ যে দিদি আমার রক্তবমি করতে লাগ্‌লো! দিদি—আশা—কে তোকে এমন কল্লে একবার বলতে পারিস দিদি? আমার বাপী কই?—বাপী—বাপী!

আশা

ওয়াঃ—য়াঃ—য়াঃ।—উঃ—উঃ—দা—দু! দা—

[মৃত্যু]

সীতানাথ

[চীৎকার করিয়া] দিদি চ'লে গেলি? দীনু, আশার যে হয়ে গেল আমার! আশা! দিদি! [অনেকক্ষণ নীরব রহিল] যাক্ সব নিশ্চিন্দি!—সব শেষ!—বেশ হ'ল! বেশ হ'ল! বড় আলো জ্ব'লে উঠেছিল—বেশ হ'ল। দীনু,—আমি চললুম্—চললুম্! তাইত! কোথায় যাই? কোথায় যাই? [ছুটিয়া একদিকে চলিয়া গেল]

অষ্টম দৃশ্য

বেলডাঙ্গা সীতানাথ রায়ের বাটী

দীনেশ

প্রতিশোধ——প্রতিশোধ—প্রতিশোধ! বাবার শেষ আদেশ এতদিনে তবে শেষ হবার মত হ'ল! রমেন!

বড় অহঙ্কার ছিল তোর,—বড় দপ্‌দপানি আরম্ভ করেছিলি! এখন কেমন হোল? জেল থেকে ফিরে এসে দেখবি—সব ফাঁক! সব অন্ধকার! তোর যাত্রার আসর ভেঙ্গে-চুরে তচ্‌নচ্‌ হ'য়ে গেছে—তোর গোলাপ বাগান মাঠ হ'য়ে গিয়েছে! কে এমন করলে জানিস্? দীনেশ রায়। হাঃ-হাঃ-হাঃ—হাঃ-হাঃ! (খানিক নীরব থাকিবার পর) ছেলেটা এখন ম'লেই হয়।—ছেলেটা ত মর্ব্বেই—যা ওষুধ ডাক্তারকে দিয়ে দেওয়া গেছে—ও আর কতক্ষণ? আমাকে কিন্তু লাখো সাবাস! গোড়া থেকে কি রকম বুদ্ধিটা খাটিয়ে আসচি! খালি ব্যাঙ্ক ফেলটা—ভগবান ঘটিয়ে দিলেন, তা ছাড়া আর সবই ত আমার দ্বারায় হ'ল—অথচ ধ'র্ত্তে ছুঁতে দিইনি। বরাবর আড়ালে থেকে কাজ করাচি। নাত্‌নি আশাটা যা জান্‌তে পেরেছিল—তা সে ত কাবার। সীতানাথ এখনো বুঝতেও পারেনি যে এ সবের মূল এই শর্ম্মা! সাম্‌নাসাম্‌নি এ সব কাজ না ক'রে আড়াল থেকে যে করা হয়েছে, তাতে খুব সুবিধেই হয়েছে। বাবা—বুদ্ধি থাকলে কি আর শ্বশুর বাড়ীতে প'ড়ে থাক্‌তে হয়"—শাস্ত্রেই আছে—"বুদ্ধির্যস্য স জীবতি।"—যাক্—ছেলেটা যে ম'রেও মরে না! আজ তিন দিন টাল্‌মাটাল্ ক'রে কাটাচ্চে! তিন বছরের ছেলেটার কি রকম কড়া প্রাণরে বাবা! আজকে ডবল ডোজ দেওয়া গেছে—আজ সাবাড় হতেই হবে। ভাগ্যিস তল্লাটট্যার মধ্যে আর কোন ডাক্তার নেই—নইলে পরে এ সুবিধেটা হয়ত ঘ'টেই উঠতো না।——এই যে! জ্যেঠামশাই, কি রকম আছে এখন?

(সীতানাথ রায়ের প্রবেশ)

সীতানাথ

দীনেশ, বাবা,—সমস্ত রাত জেগে কাটিয়েচ—এখনো একটু ঘুমোওনি। ঘুমিয়ে নাও বাবা, একটু ঘুমিয়ে নাও। তোমার ধার বাবা আর শুধতে পাল্লুম না। রমেনের মোকদ্দমাতেও যথেষ্ট করেচ—আশার জন্যেও চারিদিকে অনেক খোঁজ খবর করেছ। এখনো প্রাণ দিয়ে খাট্‌ছো—কিন্তু, বাবারে—কিছুই বুঝি আর হলনা—উঃ—ভগবান্—[হঠাৎ ভাবান্তর হইয়া অত্যন্ত দ্রুত বলিতে লাগিল]—দীনেশ! দীনেশ! কি কল্লে বাপীকে আমার বাঁচাতে পারি বলতে পারিস বাবা? ওরে, তার যন্ত্রণা আর ব'সে ব'সে চোখে দেখতে পাল্লুম না ব'লে পালিয়ে এলুম। একটুখানি—মাংসের ডেলা—কি—যন্ত্রণাই যে ভোগ কচ্চে দীনেশ—হো হো হো হো হো—কি করবো?—কি করবো আমি?—দীনেশ—বাবা, অনেক কল্লি—বাবা, তার এই যন্ত্রণাটা সারিয়ে দেবার কিছু কর্ত্তে পারিস বাবা! আমার যথা সর্ব্বস্ব তোকে দোবো।—যথা সর্ব্বস্বই আর দোবো কি? ওহো, আর ত কিছু নেই আমার। আমার যে সবই গেছে। আছে শুধু গাঁয়ের এই জমিদারীটুকু,—ওরে যা নিয়ে তোদেরি সঙ্গে বাবা, চিরকালের মামলা মোকদ্দমা! বাবারে, আমাকে তুই ক্ষমা করবি বাবা! দীনেশ আমাকে তুই——

দীনেশ

জ্যেঠামশাই! অত উতলা হবেন না। খোকা সেরে উঠবে—আপনি কিছু ভাববেন্ না।

সীতানাথ

না বাবা—তা'র ও রকম যন্ত্রণা আর আমি চোখে দেখতে পার্ব্বোনা— পার্ব্বোনা। তাই আমি পালিয়ে এলুম ওখান থেকে। যত যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ কচ্চে, ততই মা মা ক'রে খালি তার মাকে খুঁজছে। কি কর্ব্ব দীনেশ, তোমরা আমায় বলতে পার? সম্রাট বাবর যেমন হুমায়ুনের ব্যাধি ভগবানের কাছ থেকে চেয়ে নিজের দেহে নিয়েছিল, তেমনি তোমরা কেউ খোকার যন্ত্রণাটা আমার শরীরে দিতে পার? এমন কি কেউ নেই যে—এ পারে? উঃ—আর সহ্য কর্ত্তে পাচ্চি না। মাথা আর ঠিক্ রাখতে পাচ্চিনা;—সব আমার গুলিয়ে যাচ্ছে। উঃ-হু-হু-হু। কি হ'ল আমার—কি হ'ল আমার! [দৌড়াইয়া যাইবার উপক্রম]

দীনেশ

কোথায় যাচ্ছেন জ্যেঠামশাই?—জ্যেঠামশাই?

সীতানাথ

আমি আর সহ্য কর্ত্তে পারবোনা। [দৌড়াইয়া প্রস্থান]

দীনেশ

যাই—ওপরে গিয়ে একবার ব্যাপারটা দেখে আসি। [প্রস্থান]

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

পট পরিবর্ত্তন। খোকার মৃত্যু শয্যা।

দীনেশ

কোথায় গেলেন রায় মশাই? খোকন যে নেতিয়ে পড়্‌ল।

দীনেশ

ডাক্তার, একটু ভাল ক'রে দেখ। একম হয়ে গেল কেন। দেখ ডাক্তার, দেখ— দেখ। বাতাস! পাখা!
[পাখা লইয়া দ্রুত বাতাস করিতে লাগিল]

গোলাপী

[কাঁদিয়া]—ওগো—একি হল। বাবু গেলেন কোথায়?
—খোকন—খোকন?

দীনেশ

[পাখা রাখিয়া অত্যন্ত ব্যস্তভাবে] জল—জ । দীনু—বাতাস কর। জল-জল, শীগ্‌গীর জল।

গোলাপী

[কাঁদিতে কাঁদিতে] আর জল দিয়ে কি হবে গো বাবু। ওগো সব যে ঠাণ্ডা হয়ে গেল গো। ওগো, বাবুকে কেউ খবর দাও না গো!

ডাক্তার

ডেড্‌! এত চেষ্টা ক'রেও ত কিছু হোলনা। ইনি কোথায়? চলুন দীনেশ বাবু—এঁকে একবার দেখি।
(প্রস্থান)

দীনেশ

মালতী, আর দেখছিস কি? রায় মশাইকে খবরটা দিগে যা। এই রকমই হয় আর কি? নতুন নয়—নতুন নয় গোলাপী! এ আদি কালের পুরাণো ব্যাপার। এযে সংসার! সুন্দর! সুন্দর! অতি চমৎকার!

নবম দৃশ্য

বেল ডাঙ্গার—শ্মশান

(সীতানাথ ও দীনদয়াল)

দীনদয়াল

রায় মশাই!

সীতানাথ

চুপ্‌, চুপ্‌!

দীনদয়াল

বলি, সমস্ত দিনই কি এই শ্মশানে ব'সে থাকবেন?

সীতানাথ

চুপ্‌,-চুপ্‌, কথা কোয়ো না, কথা কোয়ো না দীনু—একটা গল্প শুনবে দীনু! খুব ভাল গল্প!—এই-এই-এই একটা মেয়ে ছিল—সে গেল ম'রে। আবার তার একটা মেয়ে ছিল। সে বড় আদরের ছিল গো—বড় আদরের ছিল! তার নাম ছিল—আশা। সেই আশার আশাতেই একটা বুড়ো বেঁচে ছিল—সেও গেল মরে; তার আবার ছেলে ছিল—সেও গেল মরে! [হঠাৎ উচ্চ চীৎকারে] দীনু—সেও গেল ম'রে! সব ফুলকটা—একসঙ্গে ঝ'রে গেল। দীনু!

দীনদয়াল

রায় মশাই—ওকি হচ্ছে? চুপ কর্ব্বেন না!

সীতানাথ

চুপ কর্ব্বো—চুপ কর্ব্বো—নিশ্চয় চুপ কর্ব্বো। ভুলে গিয়েছিলুম—আমিও চুপ—তুমিও চুপ!—সব চুপ। যাত্রা ভেঙ্গে গেছে—সব চুপ! আমি একটু ছুটোছুটি কর্ব্বো। আমি একটু কাঁদবো—হাসবো—গাইব। আমি কী কর্ব্বো! দীনু, [চীৎকার করিয়া] বল না, আমি কি কর্ব্বো? না-না-না, কিছু আর কর্ত্তে পারবো না আর কি পারি—কত পার্ব্বো [হাত তালি] হো হো কুকুরটা ছুটছে—কুকুরটা ছুটছে। হা-হা-হা-হা পালিয়ে গেল। ওঃ কি ছুট্‌! দাঁড়াত—আমার সঙ্গে পার্‌বি? হারাম-জাদা—বদমাস! দীনু ছুটতে পারবে? আমায় ধ'র্ত্তে পারবে?—এই চুরে রাং চাং সোনা দিয়ে বাঁধাবো ডাং—মারবো ডাংয়ের বাড়ি—পাঠাবো যমের বাড়ি—চু-চু-চু—
[ছুটিয়া প্রস্থান]

যবনিকা

স্বপ্নলব্ধা

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত

হে মোর মানস লক্ষ্মী, সুচির-বাঞ্ছিতা,
রাত্রিশেষে আজি মোর স্বপ্নে তুমি
দেখা দিলে সেই রূপান্বিতা,
সেই শ্যামা স্নিগ্ধজ্যোতি স্বর্ণদ্যুতিময়,
সেই দীর্ঘতন্বী ধীরা চাপল্য-নিলয়,
সেই কুন্দশুভ্রদন্তা সু-উন্নত নাসা,
সু উজ্জ্বল সু-ললাট স্বর্ণস্বপ্নে ভাসা,
অস্থূল অধর দুটি প্রীতি-সম্ভাষণে সদা স্ফুটন-উন্মুখ,
নয়নে করিছে বাস শিশুহাসি আর গুপ্ত দুখ,
কান্ত গণ্ডে পরিপূর্ণ স্নিগ্ধ কোমলতা,
হেমদণ্ড দুটি হস্ত যেন দুই লতা,
ও গ্রীবায় মরি মরি ধীরে রাখি' কর
আঁকড়ি' মরিতে চাহি জন্ম জন্মান্তর।

* * *

স্বপনে হেরিনু তোমা, পার্শ্বে মোর বসিয়া সুন্দরী,
বাম করে দেহ মোর কোমল আঁকড়ি'
মোর মুখপানে চেয়ে হাসিতেছ মিষ্ট-দুষ্ট-হাসি,
সৌভাগ্য-সন্দিগ্ধ আমি স্পর্শিতে তোমারে ভয় বাসি!
চাপল্য-মূরতি তুমি কভু নভে চাহিছ উদাস,
থেকে থেকে মোর মুখে ছড়াইছ হাসির
কুসুম রাশ রাশ;
স্তব্ধ তৃপ্ত ব'সে ব'সে হেরি তব লীলা;
বক্ষে বাঁধিবারে চাই তন্বী তোমা শান্ত-দুষ্ট-শীলা।
তোমারে তুলিতে বক্ষে ব্যগ্র সুখে দাঁড়াইয়া উঠি,—
একি একি লীলাময়ি, আমার চরণতলে লুটি'
আঁকড়িয়া দু চরণ কহ তুমি—"বল বল, প্রিয়,
আমারে রাখিবে কাছে চিরদিন? চির প্রীতি দিও।"
কহি আমি—"মানসী, বাঞ্ছিতা, প্রিয়া,
স্বপ্ন-জাগরণ-লব্ধা সখী,
তোমারে তোমারে আমি নিশিদিন চৌদিকে নিরখি'
গৃহে ও অরণ্যে পথে নভস্তলে চিত্ততলে খুঁজি'
সম্মুখে লভিনু আজি; নিঃস্ব জীবনের তুমি পুঁজি।
তোমারে রাখিব কাছে!—একি আজ শুধাইলে নারী!
তোমারে লভিতে বক্ষে আপনারে নিঙাড়ি' নিঙাড়ি'
বেদনায় পরিশ্রমে জেগে কাটে জীবন-প্রহর,
এস মোর স্বপ্ন-সাধ!"—বলিয়া প্রসারি' দুই কর
বক্ষে তুলি তারে আর চক্ষে রাখি সে স্নিগ্ধ বয়ান,
সেই মৃদুহাস্যভরা জ্যোতির্ম্ময় উজ্জ্বল নয়ান।
বাহুর বন্ধনে মোরে বাঁধিয়াছে মোর আকাঙ্ক্ষিতা,
দুর্ভেদ্য বেষ্টনে মোর বক্ষতটে সে রহে বেষ্টিতা,
ঊর্দ্ধমুখে মোর মুখে অপলক দিঠি দিয়ে চায়,
নত নেত্রে আমি তারে করি পান দৃষ্টির তৃষ্ণায়।
মৃদু হেসে বলে মোরে—"জেনো তুমি মোর।"
আমি বলি—"চিরদিন চিরদিন আমি তোর তোর।"
চারি নেত্র দৃঢ় বাঁধা, চারি নেত্রে হতেছে ভাষণ;
বাক্যহারা দুজনায় নয়নে নয়নে আলাপন।
বলিতে সে চাহে যাহা নয়নে তা কল্লোলিয়া জাগে;
আমি যা বলিতে চাই ঢেলে দিই দৃষ্টি-অনুরাগে।
নাহি বাক্য, নাহি গতি, দুজনে নিমগ্ন দুজনায়;
কোথায় জগৎ, দ্বন্দ্ব, কোলাহল? সূর্য্য তারা
কোথায় মিলায়?
আমি বেঁচে আর বেঁচে রহে মোর মানসী সুন্দরী,
এ দুটি জাগ্রত প্রাণে লক্ষ লক্ষ প্রাণ গেছে মরি।
জীবন্ত এ দুটি প্রাণী, আর সব মরণ-নিশ্চল;
আমি হেরি, প্রিয়া হেরে,—দুই প্রাণে জগৎ চঞ্চল।
দোঁহে দোঁহে নির্নিমেষ দেখা দেখা, নাহি তার শেষ।
সহসা টুটিল স্বপ্ন!—কোথা প্রিয়া? কোথা কল্পদেশ?

শূন্য শয্যা 'পরে মোর ব্যথা-ক্লিষ্ট বিদগ্ধ পরাণ
আছড়িয়া বারম্বার মাগে মৃত্যু, দ্রুত অবসান।
কোথা স্বপ্ন ? কোথা মোর প্রিয়া সে মানসী ?
লভিনু যে পারিজাত, কোথা গেল খসি' ?
প্রভাত-আকাশ পানে চাহি' বারম্বার
বৃথাই খুঁজিয়া মরি স্বপ্নলব্ধা মানসী আমার।
দেহে কি কভু সে মোরে এ জগতে দিবে নাকো দেখা ?
আর স্বপ্নে হেরিব না স্নিগ্ধ মুখরেখা ?
শুধু চিত্তে চিরদিন তারি আশা করিব পোষণ ?
অসহ্য এ আশাক্লেশ পলে পলে করিবে শোষণ !

নারীর মূল্য

শ্রীইলা দেবী

আশ্বিনের "বিচিত্রা"য় "নারীর মূল্য" নামক প্রবন্ধে শ্রীভবানীচরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় কত মূল্যহীনা এই নারী জাতিটা, সেটা উপলব্ধি ক'রে তারই বিশদ আলোচনা করেছেন। আর ধ'রে নিয়েছেন Ludovici-র যুক্তিসকল অখণ্ড প্রমাণ স্বরূপ।

লোকে যখন কোনও বিষয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়, তখন দরকার হয় অনেক চিন্তার, অনেক গবেষণার; ধরণী 'বিপুলা,'—এখানে যুগে যুগে বহু মনীষী বহু তথ্য শুনিয়ে গেছেন নানা বিষয়ে; নূতন কত জন এসেছেন, কত বার্ত্তা নিয়ে। সুধী যখন কোনও বিষয়ে আলোচনা করেন, তখন সকলের মতামত দেখে শুনে স্থির মনে অনুকূল প্রতিকূল সব যুক্তি মিলিয়ে দেখে, তার সঙ্গে নিজের জ্ঞান নিজের অভিজ্ঞতা মিশিয়ে যে যুক্তিপূর্ণ মতামত ব্যক্ত করেন, সেটাই ধর্ত্তব্য; আর যদি কোনও বিষয়ে পাণ্ডিত্যপূর্ণ নূতন ধরণের একখানা বই প'ড়ে, তার ভাল মন্দ, সম্ভবতা অসম্ভবতা চিন্তা করবার অবকাশ না নিয়েই মেতে উঠি, তা হলে সেটা দেখায় প্রাপ্ত বয়সে অপকবুদ্ধি বিদ্যালয়ের বালকের,—ব্যাপারটি কি অণুমাত্র না বুঝে, শুধু বাক্যের জালে বন্দী হ'য়ে বক্তাকে প্রাণপণে হাততালি দেওয়ার মত।

লেখক Ludovici-র আড়াল থেকে শিখণ্ডীর আড়ালে অর্জ্জুনের মত, প্রমাণ করতে চাচ্ছেন যে নারীর পক্ষে পুরুষের সমান অধিকার পাওয়াটা একান্ত অসম্ভব। কিন্তু "সমান অধিকার" বলতে লেখকের মতে যে কি বস্তু বোঝায়, তা তিনি আমাদের বিশদভাবে জানবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করেছেন। নারীর যে 'স্বতন্ত্র' অধিকার ব'লে একটা বস্তু আছে ও তারই জন্যে বিশ্ব-মানবীর আজ যে নিদ্রা টুটে গেছে, এ সংবাদটা বোধ হয় লেখকের মনের কোণেও স্থান পায় নি। সৃষ্টির আরম্ভ হ'তে ভগবান নারী ও পুরুষের মাঝে যে কতকগুলা নির্দ্দিষ্ট পার্থক্য রেখে দিয়েছেন, নারীর "অধিকার" বলতে নারী যে সেই সব পার্থক্যকে ঘুচিয়ে দিয়ে খোদার উপর খোদ্‌কারী করতে চায়—এমন ধারণা লেখকের নিশ্চয়ই নেই,—আশা করি। মানবজাতি মাত্রকেই বিশ্বস্রষ্টা কর্ম্মের অধিকার দিয়েছেন, আনন্দ উপভোগ করবার অনুভূতি দিয়েছেন; নারী সেই কর্ম্ম, সেই আনন্দ ভোগই চায়,—ভগবানের আশীর্ব্বাদের, প্রকৃতির দানের স্বতন্ত্র অংশটুকু সে সম্পূর্ণভাবে পেতে চায়। এই হ'ল নারীর জন্মগত স্বতন্ত্র অধিকারের দাবী; তার জন্মমাত্র ভগবান তার ললাটে এই দাবীর জয়টীকা পরিয়ে দিয়েছেন, কারুও সাধ্য নেই এই দাবীকে অক্ষুণ্ণ করে।

সন্তান ধারণে নারীর অনেক ওজঃশক্তি খরচ হ'য়ে যায় লেখকের এ যুক্তি খুবই সঙ্গত। কিন্তু তা সত্ত্বেও দেখা যায় নারীর জীবনশক্তি (vitality) পুরুষের চেয়ে অনেক বেশী। যে সব কারণে, যে সব ব্যাধিতে শিশু-পুত্র বাঁচল

না, সেই সব কারণ ও সেই সব ব্যাধি স্বত্বেও শিশু-কন্যা বেঁচে গেছে এমন ত কত দেখা যায়। "মেয়ে মানুষের প্রাণ বড় কঠিন"—এই প্রচলিত উক্তি খুবই সত্য। সন্তান ধারণ কালে নারী অশক্ত হ'য়ে থাকে বটে, কিন্তু সে সময় ছাড়া যখন সে মুক্ত থাকে, তখন যে কেন সে পুরুষের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে চলতে অক্ষমা হবে, লেখক মহাশয় তার কোনও বিশদ কারণ উল্লেখ করেন নি। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতায় কি বলে? পল্লীর অবিবাহিতা বঙ্গবালা মাথার ঝাঁকড়া চুল ঝুখিয়ে খেলার সাথী সমবয়স্ক বালকদের সঙ্গে খেলাধুলা করে, উচ্চ গাছের ডাল থেকে ফল পেড়ে আনে, বনে জঙ্গলে পাখীর সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়, এ কথা কি লেখক মহাশয় জানেন না? পাশ্চাত্য দেশে নারী ভূধর পর্ব্বত লঙ্ঘন করছে, আকাশের বুক চিরে পৃথিবীর প্রান্ত হতে প্রান্তান্তরে উড়ে যাচ্ছে, তরঙ্গায়মান সমুদ্রে অবলীলাক্রমে সাঁতার কেটে প্রতিযোগিতা করছে, যত রকম খেলা ধুলা আছে সব তাতেই অবাধে যোগ দিচ্ছে, পুরুষের সাথে চিন্তার কর্ম্মে যোগদান করতে তার কোনও বাধা নেই। এই পূর্ব্ব দেশেও ত নারী সৈন্য-নেত্রী হ'য়ে সমরাভিজান করেছে; পর্দার আবরু ঘুচিয়ে দিলে আবার যে নারী জন-নেত্রী হবে না তা কে বলতে পারে?

এখন অবশ্য আমাদের দেশে অধিকাংশ নারীই লেখকের ভাষায় "পরম নির্ভরশীল সঞ্চারিণী লতেব",—শৈশবে পুতুল খেলায় ও অজ্ঞান তিমিরে পরম নিশ্চিন্তে দিন কাটিয়ে, কৈশোর আসতে না আসতেই কোনও এক পাশের নাগপাশবদ্ধ তরুণের ভারাক্রান্ত পৃষ্ঠের উপর বোঝার উপর শাকের আঁটির ন্যায় বধূরূপে বন্দী হ'য়ে,—ঘোমটা, হেঁসেল হাঁড়িকুঁড়ি এঁঠোকাঁটা এবং তাহারই সামিল বটতলীয় নভেলের ভিতর নিমজ্জিতা হ'য়ে নির্ব্বিঘ্নে দিন কাটান। চোখে তাঁদের পর্দ্দার আবরণ বাঁধা, গলার সুর অন্দরের ঘন প্রাচীরের মাঝে বিলীন। নিজের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টাকেও তাঁরা পরম লজ্জার বিষয় ভাবেন। কিন্তু আমরা আশা রাখি, যে নিখিল নারীজাতির আলোচনা করবার সময় লেখক কেবলমাত্র এই আদর্শটাকেই চোখের সামনে ধ'রে রাখেন নি।

Oscar Schultze প্রভৃতি প্রতিভাবান্ ডাক্তারদের অভিমত না নিয়েও এটা সকলেই স্বীকার করতে পারেন যে নারীর ও পুরুষের শারীরিক গঠন-পার্থক্য অনেক। শরীরের গঠন-পার্থক্য ঘুচান এবং দেহের পরিপুষ্টি সাধন যে, সম্পূর্ণ দুইটা আলাদা জিনিষ তা সকলেই জানেন। শরীরের পুষ্টি-সাধন যে মানুষ মাত্রেরই স্বাস্থ্য, পথ্য ও ব্যায়ামের উপর নির্ভরশীল, তা ছোট বড় সকল ডাক্তারই বলবেন। এর প্রমাণও আমরা নিত্যকার জীবনে দেখতে পাই। তারাবাই-এর মত নারী দুর্লভ বটে, কিন্তু গোবর, গামার মত পুরুষও যে পরম সুলভ, বিশেষতঃ আমাদের এই "তৈলরসে স্নিগ্ধ তনু" বঙ্গদেশে,—তা নয়। লেখক আবার এও বলেছেন পুরুষ মাত্রেই নারী হ'তে দু তিন ইঞ্চ অধিক লম্বা হয়। কোনও কোনও পুরুষ কোনও কোনও নারী অপেক্ষা দীর্ঘকায় হ'তে পারে, কিন্তু এটা কি সাধারণ ভাবে বলা চলতে পারে? বেশীদূর অনুসন্ধানের প্রয়োজন নেই,—ভারতবর্ষের রাজপুতানা কিম্বা পাঞ্জাব অঞ্চলে যান, —সে দেশের মেয়েরা যে শুধু দীর্ঘকায়া তা নয়, ইচ্ছা কর্লে শ্রীমান্ হনুমান যেমন একদা সূর্য্যদেবকে বগলে পুরেছিলেন, তারাও তেমনি দুগ্ধঘৃতে পুষ্ট দু তিনটি পুরুষকে স্বচ্ছন্দে কুক্ষিগত ক'রে ফেলতে পারে। আমাদের দেশেও লম্বোদরী, ক্ষেমঙ্করী, রক্ষাকালীর দল আজিও বিলুপ্ত নয়।

লেখকের মতে, নারীর দেহের অনুরূপ চিত্তটাও অপুষ্ট থেকে যেতে বাধ্য। যখন দেখা যাচ্ছে নারী ও পুরুষের উভয়েরই দেহ অবস্থা অনুযায়ী পুষ্ট ও অপুষ্ট রাখাই প্রকৃতির ব্যবস্থা, তখন সর্ব্ব অবস্থাতেই নারীর দেহ যে অপুষ্ট থাকবেই এ যুক্তিকে সঙ্গত যুক্তি বলা যায় না। চিত্ত সম্বন্ধেও এ কথা সম্পূর্ণভাবে খাটে। প্রকৃতি বৈচিত্র্য ভালবাসে, তাই দেখা যায় নারীর মাঝে প্রকৃতির লীলা সব থেকে বেশী প্রকাশ হ'তে। নারী জন্ম দেয় প্রাণের, তাই স্বভাবতই তার মাঝে প্রাণের প্রাচুর্য্য ভরা থাকে। প্রাণের প্রাচুর্য্যকে স্বতন্ত্রভাবে আকার দিয়ে গঠন করবার জন্যেই সৃজনের প্রয়োজনীয়তা। যে পদার্থের মধ্যে সৃজন কৌশল সব থেকে বেশী আছে, ভগবান তাকেই দেন সৃজনের ভার, গঠনের ভার, সম্পূর্ণ ক'রে তোলার ভার।

শ্রীইলা দেবী

এবং তার জন্যে যে সব সরঞ্জামের প্রয়োজন, সেগুলা প্রচুর ভাবেই দেন, যাতে তার নিজের ক্ষয় না হয়। দেশকে শস্য-শ্যামলা করবার জন্যে সহস্র সরিতের প্রয়োজন, এবং যাতে সেই সরিতের ক্ষয় না হয় সে জন্য বিধাতা অভ্রভেদী গিরিশৃঙ্গে চিরন্তন তুষারাবরণ জড়িয়ে দিয়েছেন। লেখকের মতে "পুরুষ থাকে পাদমূলে অথবা সর্বোচ্চ শিখরে, আর নারীর পথ মধ্য পথ। প্রকৃতির নিয়মে কালক্রমে অযোগ্যের উচ্ছেদ হয় এবং যোগ্যতম আরও উপরে উঠতে থাকে; পুরুষ এমনি ক'রে এগিয়ে চলে, আর নারী বিকাশের অভাবে যে তিমিরে সেই তিমিরেই অবস্থান করতে থাকে।" এই কথার কি যে অর্থ তা আমরা অনুধাবন করতে পারলাম না। যোগ্যের ক্রমোন্নতি এবং অযোগ্যের উচ্ছেদ-সাধন ত প্রকৃতির নিয়ম, সেই নিয়ম লেখকের মতে শুধু পুরুষের বেলায় খাটে আর নারীর বেলা নয়; কেন, নারী কি প্রকৃতির বহির্গত? নারীও প্রকৃতির অন্তর্গত, সুতরাং তার বেলাও এই ক্রম-বিবর্ত্তন (evolution) নিয়ম চলবে না কেন লেখক মহাশয় তার জবাব দিতে একেবারে ভুলেছেন। আবার লেখকের উপরি-উদ্ধৃত কথা যদি সত্য হয় তা হলে পৃথিবীর পুরুষ অধিবাসীদের মধ্যে কতকগুলি হচ্ছেন মনীষার সুতীব্র রশ্মিতে আলোকিত এবং অবশিষ্ট সংখ্যা হীনতার নিম্নতম গহ্বর আশ্রয়ী। নিউটন, নেপোলিও, ফ্যারাডে, রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীর দল মুষ্টিমেয় বললেই হয়, সুতরাং লেখক মহাশয়ের যুক্তি অনুসারে কতিপয় অল্পসংখ্যক মনীষী ছাড়া জগতের পুরুষ অধিবাসীর প্রায় সমগ্র ভাগ অজ্ঞানতা ও হীনতার ঘন গহ্বরে অবস্থিত। নারীকে কিন্তু লেখক মহাশয় অনুগ্রহ-পরতন্ত্র হ'য়ে মধ্য পথ দিয়েছেন। অতএব লেখকের যুক্তিতেই প্রতীয়মান হয় যে, জগতের অধিকাংশ নারীই মধ্যপথে থেকে প্রায় সমগ্র অজ্ঞানতিমির মগ্ন পুরুষ অপেক্ষা সর্ব্ববিষয়েই শ্রেষ্ঠ। উর্ণনাভ যেমন কখন কখন আপনার তন্তুজালে আপনিই ধরা পড়ে, লেখকও তেমনি আপনার যুক্তিতে আপনিই জড়িয়ে পড়েছেন।

লেখক বলেছেন নারী পুরুষকে বুঝতে পারে না, তার প্রমাণ পুরুষ-চরিত্র অঙ্কনে নারী-শিল্পীর অক্ষমতা। লেখকের যদি জর্জ্জ ইলিয়ট, সার্লট ব্রঁতে, মারী করেলি হ'তে আরম্ভ ক'রে যে কোনও আধুনিক লেখিকার রচনা পড়া থাকে তবে এ ধারণা কি ক'রে স্থায়ী হয়েছে তা আমাদের জানা নেই। পুরুষ-শিল্পী যেমন নিখুঁত ভাবে চরিত্রাঙ্কন করেছেন, নারীও সমান দক্ষতায়, হয়ত আরও বেশী নিপুণতার সঙ্গে, মানুষের অন্তরটাকে বাহিরে ফুটিয়ে তুলেছেন। লেখকের অন্ততঃ এমন দু'একটা উদাহরণ দেওয়া উচিত ছিল যাতে নারী-শিল্পীর অক্ষমতা প্রতীয়মান হ'ত। এটা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করবেন যে, নারীর অন্তর্দৃষ্টি পুরুষ অপেক্ষা বেশী। নারী শুধু পুরুষের মুখের ভাব দেখেই তার অন্তরের গূঢ় চিন্তা সহজেই বুঝে নিতে পারে। স্বামী স্ত্রী দশ বছর একত্র থাকলেও স্ত্রীর হৃদয়ের অনেকটা স্বামীর কাছে অজ্ঞাত থাকতে দেখা যায়, কিন্তু স্ত্রী কয়েকদিনের মধ্যেই স্বামীর অন্তরের সমস্তটাই সম্পূর্ণ ভাবে জেনে নিতে পারে। নারী যে পুরুষকে বুঝতে পারে না ব'লে ভয় করে—এ যুক্তি নিতান্তই অসার।

পুরুষের প্রতি নারীর যে ভয়ের বর্ণনা লেখক করেছেন সেটা প্রধানতঃ আমাদের দেশের অশিক্ষিত শ্রেণীর নারীর মধ্যেই দেখা যায়। সেখানে নারীর পুরুষের প্রতি প্রেম, প্রীতিটা অনেকটা ভয়ের রূপান্তর। সে রকম হবার কারণও পূর্ব্বে কতকটা বিবৃত করা গেছে। পর্দ্দার আচ্ছাদনে চোখকে অন্ধ ক'রে তারা পুরুষের উপর একান্ত ভাবে নির্ভর ক'রেই সারা জীবনটা কাটিয়ে দিচ্ছে,—মনুর বিধানে শৈশবে পিতার, যৌবনে পতির ও বার্দ্ধক্যে পুত্রের উপর ভর দেওয়াই তার পরমার্থ। এই সংস্কার তাদের জন্ম হ'তেই মনে গাঁথা আছে, তার মনে এ ছাড়া "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে।" পুরুষ বিমুখ হ'লে তাদের পথে দাঁড়াতে হবে, সামান্য উদরান্নের জন্যও তাদের কোনও সংস্থান থাকবে না,—এই চিন্তা যাদের মনে গাঁথা, তারা যে পুরুষকে ভয় করবে এতে আর আশ্চর্য্য কি? কিন্তু এই বিপুলা পৃথ্বীর মধ্যে ভারতবর্ষই একমাত্র দেশ নয়, এই সুবিশাল মানবজাতির মধ্যে মনুই একমাত্র সমাজ-নিয়ন্তা নন। যে দেশে শিক্ষা ও চিন্তা সংস্কারকে এড়িয়ে বেড়ে উঠতে সমর্থ হয়েছে সে দেশে পুরুষ ও নারীর মধ্যে দাস্যবন্ধন রহিত

হ'য়ে বন্ধুত্ব ও প্রীতির বন্ধন গ'ড়ে উঠেছে। সে দেশে পুরুষ ও নারী পরস্পরকে শ্রদ্ধাভক্তি করতে শিখেছে, তাতে দেশের কল্যাণই সাধিত হয়েছে। মনু-মান্ধাতা-মহাক্রমের জীর্ণ শিকড়ের তলায় ব'সে মণ্ডুকের মত ভারতবাসী যে সময় আলস্য ও তন্দ্রার ঘোরে অপব্যয় করেছে, সেই সময়ের ভিতরই জগতের অনেক দেশ অনেক মানব-পরিবার উন্নতির প্রশস্ত মার্গে অনেক এগিয়ে গিয়েছে।

নারীর ভাব-ভঙ্গীর যে স্বতন্ত্র সৌন্দর্য্য আছে লেখক সেটাকে অন্তঃসারশূন্য "অভিনয়" আখ্যা দিয়েছেন। সৃষ্টির আদি যুগ হ'তে নারী ও পুরুষ উভয়ে উভয়কে পরস্পর আকর্ষণ ক'রে আসছে, বিধাতার সৃজন-লীলাই এইখানে। পুরুষ নারীকে দেখায় তার শৌর্য্য, তার শক্তি আর তার কৌশল; নারী পুরুষকে দেখায় তার কমনীয় রূপ, তার বিচিত্র মাধুর্য্য আর তার সৌন্দর্য্য। এই মুগ্ধ করবার ইচ্ছা যে কি ক'রে নিজের দৈন্য গোপন করবার ইচ্ছা হল তাহা লেখক মহাশয়ই ভাল বুঝতে পারেন, আমরা পারি না। আর জীব-জগতে মুগ্ধ করবার ইচ্ছাটা নারীর চেয়ে পুরুষেরই বেশী তা অস্বীকার করবার উপায় নেই। কেশর ফুলিয়ে সিংহ দাঁড়িয়ে সিংহীকে মুগ্ধ করে; পুংস্কোকিল গান গায়; অদম্য উৎসাহে অসভ্য মানুষ সদ্য-নিহত শত্রুর মাথা এনে তার প্রণয়িনীকে উপহার দেয়; তাকে শৌর্য্য দেখিয়ে মুগ্ধ করবার জন্যে। এই সবের ভিতর যে romance টুকু রয়েছে সেটাকে বিকৃত ক'রে থিয়েটারী ঢং ব'লে ভাবা বিকৃত বিচারের পরিচায়ক।

লেখক নারীর যত কিছু অভাবের দোষ প্রকৃতির ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে মুক্ত হয়েছেন, কিন্তু অভিযোগের সাথে প্রমাণেরও দরকার হয়, নইলে সে অভিযোগ বা বক্তব্য নেহাতই অন্তঃসারশূন্য হ'য়ে পড়ে। লেখক মহাশয়ের মতে নারীর অধিকারের দাবী চাওয়ার জন্যে দায়ী হচ্ছে পুরুষ-জাতির অবনতি; অর্থাৎ, পুরুষ যদি আজ "নিস্ব" হ'য়ে না পড়ত, তবে সাধ্য কি যে নারী তার দাবীর কথার 'টুঁ' শব্দটি করে। অনেক স্কুল-মাষ্টার আছেন যাঁরা ছাত্রদের একটু কথা বলতে শুনলেই, বেত্রাঘাতের অল্পতার জন্য আক্ষেপ করেন। ইংলণ্ডে পূর্ব্বে প্রত্যেক স্বামীর স্ত্রীকে মারধোর ক'রে শাসন করবার অধিকার ছিল; পরে যখন statute ক'রে সে অধিকার লোপ করা হ'ল, তখন common men তাদের common lawর জন্যে আক্ষেপ ক'রে আর বাঁচে না। আশা করি, লেখক মহাশয়ের এ মনোভাব নয়। নারীর স্বতন্ত্র অধিকারের দাবীর সঙ্গে পুরুষের উন্নতি-অবনতির কোনও কার্য্য-কারণ-ঘটিত সম্পর্ক থাকতে পারে না,—দু'টো সম্পূর্ণ পৃথক জিনিষ। লেখকের এটা সম্ভবতঃ বোধগম্য হয় নি যে, জগতের এই উন্নতির বিকাশ নারীরও চিত্ততটে আলোড়িত হ'য়ে তার ঘুম ভাঙাতে পারে; তাই নারীরও একদিন জেগে উঠে—তার নিজের অধিকারের দাবী করাটা স্বাভাবিক। ইতিহাসে বহু মহাদেশে বহুজাতির নিদর্শন পাওয়া যায় যারা দীর্ঘ দিন কঠিন রাজপাশে অথবা বিদেশীর শাসনদণ্ডে বন্দী হ'য়ে মৃত্যুমুখে আচ্ছন্ন ছিল। কিন্তু চিরদিনই যে এমনই একই তন্দ্রায় কাটবে না তাদের, এ তথ্য মনে মনে সকলেই জানত। এমন কি শাসকদেরও অনুমিত ছিল যে শাসিতরা একদিন জেগে উঠে—তাদের অধিকার ফিরে চাইবে। যে দিন তারা জেগে উঠেছে, সগৌরবে নিজেদের অধিকার পূর্ণ দখল ক'রে নিয়েছে,—তাদের শাসকরা অবনত বা হীনবীর্য্য হ'য়ে গেছল ব'লে নয়,—শাসিতদের ঘুমের অবসর শেষ হ'য়ে গেছল, তন্দ্রার ঘোর কেটে গেছল ব'লে। ইয়োরোপের ১৮৪৮ সালের জাতীয় নব-জাগরণের ইতিহাস তার সাক্ষী।

নারী পুরুষের দাসী ছিল, কোন্ শাস্ত্রকারের মত এ, লেখক সে কথা কিছুই জানান নি। নারী নিজের বুদ্ধি দিয়ে শক্তি দিয়ে বিশাল সাম্রাজ্য হেলায় শাসন করেছে, তার দৃষ্টান্ত পূর্ব্ব ও পশ্চিমে অনেক পাওয়া যায়। পুরুষ তাকে যদি মাত্র ভোগের সামগ্রী আদরের খেলনা ব'লে ভাবে, তাহ'তেই প্রমাণ হয় না যে নারী শুধুই পুরুষের হাতের ক্রীড়নক। এতদিন যদি নারী আপনাকে পুরুষের ক্রীড়নক ক'রেই রেখে থাকে, তা থেকেও ত প্রমাণ হয় না যে নারীর জাগরণের কোনও ক্ষমতা নেই।

নারীর ধীশক্তির অভাবের কথা লেখক উল্লেখ করেছেন, কিন্তু সে সম্বন্ধে কোনও উদাহরণ আমরা তাঁর কাছ হ'তে

শ্রীইলা দেবী

পান নি। উদাহরণ দেন নি, কারণ দেবার মত কোনও উদাহরণ নেই ব'লেই। পুরুষ-বৃদ্ধরা শুধু বুদ্ধিবলে দেশ ও সমাজ শাসন করতেন সে কালে, কিন্তু নারী নাকি কস্মিন কালেও দেশ ও সমাজ শাসন করেন নি। এলিজাবেথ, রিজিয়া, ভিক্টোরিয়াদের কথা নাই তুল্‌লাম,—কিন্তু জরাজীর্ণ মস্তিষ্ক দিয়ে দেশ-শাসন রূপ উৎকট ব্যাপারের যে একটা বিকট পরিণাম হওয়া আশ্চর্য্য নয়, এইটাই প্রমাণ হয়েছিল পরশুরামের পিতার বেলা। অগ্নিশর্ম্মা পিতা আদেশ করলেন—'যাও, তোমার মার মাথাটা কেটে ফেল।' সুবোধ পুত্র তখনি যেয়ে কেটে ফেল্লেন। কিন্তু তারপরে তাঁকে পস্তাতে হয়েছিল হয় ত কৃতকর্ম্মের জন্য; কিন্তু এইটুকু বোধ হয় তাঁর সান্ত্বনা ছিল যে, ধরণীকে নিঃক্ষাত্রিয় করবার সুযোগে নির্ব্বুদ্ধও ক'রে ফেলে অন্ততঃ ক্ষাত্রিয় সমাজটাকে তিনি প্রবীণ শাসনের বিভীষিকা হ'তে বাঁচিয়ে ফেলেছেন

Ludovici, সুতরাং লেখকেরও মতে মাতৃত্বে ও পত্নীত্বে নারীর কোনও আত্মত্যাগ নেই। নীতি-জ্ঞানও নারীর অধিক নেই। এবং তা সত্ত্বেও যে পুরুষ নারীকে সম্ভ্রম করে, তার অনেকগুলি দোষের মধ্যে একটি হচ্ছে impotency মাত্র। এই কয়টি কথার একটু আলোচনা দরকার।

প্রাচীন লেখকরা বলেন বহু যাতনা সহ্য করবার পর মাতৃত্বে নারী যে আনন্দ পায় সেটা স্বতঃই একটা নিঃস্বার্থ আনন্দ। তাঁদের মতে নারীর ধর্ম্ম হচ্ছে ত্যাগ-ধর্ম্ম। কন্যা হ'য়ে পিতাকে, পত্নী হ'য়ে পতিকে এবং সব শেষে মাতা হ'য়ে সন্তানকে সে হৃদয় উজাড় ক'রে, ভক্তি প্রেম ও স্নেহ দিয়ে আজন্ম সেবা ক'রে আসে। ত্যাগেই সে আনন্দ পায়, তাই সন্তানকে বুকের রক্ত বিলিয়ে চরম দান করে ব'লেই তার আনন্দও চরম হয়। এই আনন্দে আত্মত্যাগ নেই, এ কথা বলা একান্ত অসঙ্গত। লেখকের মতে বোধ হয় আত্মত্যাগ অর্থে নিরানন্দ আত্মত্যাগ। কিন্তু নিরানন্দ আত্মত্যাগ বস্তুটা জগতে খুবই বিরল। জেলের কয়েদীকে যে চাবুকের চোটে ঘানী ঘোরাতে হয় সেটা খুবই নিরানন্দ সন্দেহ নেই এবং চাবুকের ঘায়ে সে যেটা করতে বাধ্য হয় সেটা নিশ্চয়ই আত্মতুষ্টি নয়। কিন্তু কয়েদীর ভাঙা সর্ষপ তৈলকে জগতের খরিদদার উদরের পক্ষে উপাদেয় ব'লেই খরিদ করেন, নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগের নিদর্শন ব'লে লেবেল আঁটা শিশিতে ভ'রে কোনও প্রদর্শনীতে লটকে রেখেছেন, এর সংবাদ ত আমরা আজও পাইনি। মাতৃত্বে ও পত্নীত্বে নারীর যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকার করতে হয়, থাকুক না সে ত্যাগে তার যথেষ্ট আনন্দ।

নারীর চেয়ে পুরুষ সন্তানের ভিতর নিজের egoকে কম অনুভব করে, এই হচ্ছে লেখকের মত। আমরা কিন্তু দেখি সন্তান, হয় তার পিতার মত হয়, নয় তার মাতার মত হয়,—অধিকাংশ স্থলেই সন্তান তার পিতার মত হ'য়ে থাকে। বংশানুক্রম বলতে যা বোঝায় সেটা বোধ হয় পিতার সম্বন্ধেই বেশী খাটে, মাতার সম্বন্ধে নয়। সন্তানের মধ্যে পুরুষের সত্ব অধিক আছে ব'লেই মানবজাতি প্রধানতঃ patriarchal হয়েছে, matriarchal নয়।

লেখক বলেছেন মনস্তত্ত্ব মতে পুরুষের হ'তে নারীর দৈহিক আকাঙ্খা অধিক। কোন্ পণ্ডিতের মতবাদ এ, তা লেখক কিছু জানান নি। পরে দেখছি মারী ষ্টোপস্‌এর সাথেও লেখকের পরিচয় আছে। মারী ষ্টোপস্ বহু সংখ্যক নরনারীর চরিত্র অন্বেষণ ক'রে যে সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন তা সঙ্ক্ষেপে তাঁরই কথায় বলা যায়, "Man's desire is perpetual and woman's intermittent. ("Married Love"—৫৩ পৃষ্ঠা) এবং এই কথাটাই তিনি ঐ পুস্তকে graph দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন। এ সব যদি লেখক মহাশয় জানতেন তবে "পুরুষের হ'তে নারীর দৈহিক আকাঙ্খা অধিক" বল্‌তেন না।

লেখকের মতে নারীর নীতিজ্ঞান পুরুষের অপেক্ষা অধিক হ'তে পারে না এবং "অন্য কোনও ক্ষেত্রেও তার এমন কোনও গভীর নীতি-জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায় নি যার জন্যে সে সবিশেষ প্রশংসনীয়।" Ludovici বাঙালী নন, তিনি না হয় না জানতে পারেন, কিন্তু লেখক নিজে বাঙালী হ'য়ে এ কথা কি ক'রে বল্লেন তা আমাদের কল্পনারও বহির্ভূত। বাঙ্গলার ঘরে ঘরে যে সব ব্রহ্মচারিণী বিধবা কঠোর কৃচ্ছ্র সাধনে আজীবন কাটিয়ে যান তাঁরা

কি লেখকের "সবিশেষ প্রশংসার" উদ্রেক করেন না? পুরুষের নীতিজ্ঞান ত খুবই "টনটনে",—তাই পত্নী বিয়োগ না হ'তে হ'তেই নেহাৎ পিসী মাসীর উপরোধে প'ড়ে ঢেঁকী গেলার মতই দ্বিতীয় পত্নী গ্রহণ করতে তাঁদের বিন্দুমাত্র বাধে না। লেখকের কথাটা খুবই খাঁটি,—পুরুষের নীতিজ্ঞান, ব্রহ্মচর্য্য স্পৃহা খুবই তীব্র, কেবল যত দোষ হচ্ছে স্থান-কাল-পাত্রের। আরব দেশে খেজুর যেমন সস্তা, আমাদের দেশে কন্যা তেমনি সস্তা। কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার সজল অনুরোধ দরবিগলিত হৃদয় বিপত্নীক পুরুষের কঠোর ব্রহ্মচর্য্য বজায় রাখতে দিচ্ছে কই?—নইলে অবশ্য বিপত্নীকের ব্রহ্মচর্য্য একটা আদর্শের জিনিষ হ'য়ে থাকত, তাতে কি আর সন্দেহ আছে? পুরুষ পৌরুষহীন (impotent) না হ'লে নারীকে সম্ভ্রম করে না, এই কথাটা লেখক আমাদের দেখিয়েছেন। কিন্তু "এই রূঢ় সত্যে লোক বিচলিত হবে" ব'লে লেখক যে উদ্বিগ্ন হয়েছেন এটা নিষ্প্রয়োজন ছিল, কেননা এই তথ্যটি রূঢ় যে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই কিন্তু সত্য কিনা সে বিষয়ে খুবই সন্দেহ আছে। রাস্কিন প্রভৃতি অংশতঃ impotent ছিলেন ব'লেই তাঁরা নারীর অধিকার স্থাপনের জন্য চেষ্টিত হয়েছিলেন, Ludovici মহাশয়ের এ যুক্তি কাক-তালীয় প্রমাণ ছাড়া আর কিছুই নয়। জগতে যাঁরা চিত্রশিল্পে খ্যাতিলাভ করেছিলেন তাঁদের অনেকেরই দেখা যায় দীর্ঘ কেশ ছিল। তাহ'লে কি বলতে হবে চিত্রকলায় যশোপার্জ্জনের জন্য দীর্ঘ কেশই হচ্ছে প্রধান উপকরণ? রাস্কিন প্রভৃতি impotent সুতরাং সেই জন্য নারী-মহিমার পক্ষপাতী, এই হ'তেই কি প্রমাণ হচ্ছে যে মহাপরাক্রমশালী পুরুষেরা নারীকে দাসীরূপে দেখে এসেছেন? নারীকে যাঁরা সম্মান করেন তাঁরা impotent হবেনই এ ধার্য্য করলে বলতে হবে এই যে বিখ্যাত বীর নেপোলিঁওরও পৌরুষের অভাব ছিল, কারণ নারীর প্রতি তাঁর প্রচুর সম্ভ্রম ছিল, chivalry তাঁর খ্যাত ছিল। পশ্চিমদেশে নারীর প্রতি পুরুষের সম্ভ্রম বিখ্যাত, কিন্তু তাই ব'লে পশ্চিম দেশটাকে কি impotent-দের দেশ বলতে হবে? এরকম যুক্তির মধ্যে conviction নেই, হাস্যরস প্রচুর আছে। এই ধরুন না, আমাদের দেবাদিদেব মহাদেব,—যিনি কালীর চরণ অনন্তকাল বক্ষে ধারণ ক'রে আছেন, সুরধুনীকে যিনি শিরোভূষণ করেছেন—নারীকে এতখানি উর্দ্ধে তুলেছেন, লেখক মহাশয়ের অখণ্ড যুক্তিতে তিনিও impotent,—তা থাকুক না তাঁর কার্ত্তিক গণেশ আদি নানা সন্তান!

নারীর প্রেরণা ব্যতিরেকেও পুরুষ যে জগতে কৃতী হ'তে পারে তার কয়েকটা দৃষ্টান্ত লেখক দিয়েছেন। কিন্তু এই কয়টি গোণা-গুণতি দৃষ্টান্ত সাধারণ নিয়মকে প্রমাণ করে না, বরং সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম ব'লেই ধর্ত্তব্য। সাক্ষাৎ ভাবে নারী ত প্রেরণা দিয়েই থাকে, পরোক্ষ ভাবেও যে না দেয় তাও নয়। অনেক স্থলে দেখা গেছে নারীকে পার্থিব ভাবে না পেলেও, অন্তরে তাকেই অবলম্বন ক'রে পুরুষ প্রতিভায় অমর হ'য়ে গেছে। Dante তার এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। নারীকে সকল ক্ষেত্রেই পুরুষের প্রতিভার দীপ জ্বালাতে হয় না সত্য, কিন্তু দৈনন্দিন জীবনে এটাই দেখা যায় যে নিত্যকার কর্ম্মে পুরুষকে নারী প্রাণের যোগান দিয়ে চলে,—সেই প্রেরণা পেয়েই, সেই মমতা, আশ্বাস পেয়ে পুরুষ কঠিন জীবন-সংগ্রামে সকল সঙ্কট অতিক্রম ক'রে এগিয়ে যেতে সক্ষম হয়। নারীর প্রেরণা পেল না ব'লে জগতে কত উৎসুক উন্মুখ ভালবাসা ম্লান হ'য়ে গেছে, কত জ্বলন্ত উদ্যম নিভে গেছে, কত সাজান বাগান শুকিয়ে গেছে। পুরুষের তরবারি যুদ্ধক্ষেত্রে কতবার জয়লাভ করেছে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় সোনার আঁখরে তা লেখা আছে, কিন্তু হায়রে পুরুষের ইতিহাস! নারীর যে কত প্রেরণা, কত ত্যাগ, কত অশ্রু, কত দরদ তার মাঝে নিহিত আছে তার সংবাদ দাও নি! নারী নীরবে তার কার্য্য ক'রে চলে ব'লে পুরুষ তার কার্য্যকে সহজেই গণ্য করতে ভুলে যায়।

লেখকের মতানুযায়ী নারীর সৃষ্টিকার্য্যে অক্ষমতাই বা কোথায় এবং সেই অক্ষমতা কি ক'রে নারীর সৌন্দর্য্য-জ্ঞানের স্বল্পতার পরিচায়ক হ'ল তা আমরা বুঝতে অক্ষম হলাম। নারী যে সৌন্দর্য্যের অনুরাগী, নারীহীন গৃহের শ্রীহীনতা দেখলেই তা বোঝা যায়। নারী যে স্থানে বর্ত্তমান, তার আশে পাশে চারিদিকে সে লক্ষ্মী-শ্রী ফুটিয়ে তোলে, প্রত্যেক কাজটি করার ভঙ্গীতে—প্রতি জিনিষটি সাজাবার সৌন্দর্য্যে।

নারীর মূল্য

শ্রীইলা দেবী

লেখকের মতে নারী নিজেকে সাজাতে চায় সেটা তার coquetryর লক্ষণ মাত্র। এ কথার উত্তর আংশিক ভাবে পূর্ব্বেই দেওয়া হয়েছে। সৃষ্টির প্রারম্ভ হ'তে তার নিজের ধরণের সজ্জার কিছুমাত্র ত্রুটী করতে পুরুষকেও দেখা যায় নি। বৈষ্ণব কবিতাবলীতে রাধিকার ন্যায় শ্রীকৃষ্ণেরও অভিসার গমন কালে সজ্জার সহস্র বর্ণনা দৃষ্ট হয়। দেহকে সুন্দর ক'রে সাজাবার স্পৃহা জীব মাত্রকেই প্রকৃতি দিয়েছেন সামান্য পশুপক্ষীর মাঝেও এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয় না—তারাও নিজের দেহকে লেহন ক'রে অথবা ঝেড়ে ফুলিয়ে সুন্দর রাখতে চায়।

নারীর রূপ সম্বন্ধে অধিক কথার সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন। আগে থেকেই কবিরা কতশত কাব্য রচনা ক'রে গেছেন নারীর রূপ গান ক'রে, চিত্রকরেরা সৌন্দর্য্যকে এঁকেছেন নারীর ছবি এঁকে। দার্শনিক ও শাস্ত্রকাররা সৌন্দর্য্য ও প্রাচুর্য্যের মুর্ত্তি গড়েছেন লক্ষ্মীরূপে নারীর। নারীর যেমন স্বতন্ত্র সৌন্দর্য্য আছে, পুরুষের সৌন্দর্য্যেরও তেমনি ভিন্ন ধরণ আছে। কিন্তু নারী ও পুরুষের রূপ যেহেতু বিভিন্ন ধরণের, সেহেতু তাদের মধ্যে কোন্‌টা বড় কোন্‌টা ছোট তার বিচার করা চলে না। তবে, কার রূপের কত প্রতাপ তার তুলনা করা চলে। নারীর রূপের জন্য কত মহাদেশ ধ্বংস হ'য়ে গেছে, কত সমরের রুধির স্রোতে ধরণী প্লাবিত হয়েছে—কত দেশে লক্ষ্মীর হাসি ফুটে উঠেছে। কিন্তু কেবলমাত্র রূপের জন্যই জগৎবিখ্যাত, এমন কোনও পুরুষের নাম বড় শোনা যায় না।

পুরুষ যে পূর্ব্বের পৌরুষ হারিয়েছে—এই বিশ্বাসের উপরই লেখক বারবার জোর প্রকাশ করেছেন। কিন্তু এমন pessimistic মতবাদের কোনই সার্থকতা নেই। জগতের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে ক্রমবিকাশের পূত হোমাগ্নি প্রকৃতি জ্বলে দিয়েছেন সাগ্নিক ব্রাহ্মণের মত মানব-সমাজ সে অগ্নিকে নির্ব্বাপিত হ'তে দেয় নি, মানবজাতির শুভ-জন্মবাসরে যে উন্নতির পূত হোমাগ্নি জ্বলেছে মানব-বংশের একমাত্র চিতাভস্মেই সে অগ্নি নির্ব্বাপিত হবে, তার পূর্ব্বে নয়। উন্নতির ভেতর দিয়ে যুগের ক্রমবিকাশ চ'লে আসছে। বর্ত্তমান বিগতের চেয়ে উন্নত,—ভবিষ্যতের ক্রমবিকাশ আরো উন্নতির মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছে। সৃষ্টির ধারাটি ত চিরদিন এই নিয়মেই হ'য়ে আসে। কবির প্রাণে এ সত্যের প্রতিচ্ছবি যখন পড়েছিল তখন তিনি গেয়েছিলেন—

> "Yet I doubt not through the ages one
> increasing purpose runs ;
> The thoughts of men are widened with the
> progress of the suns."

পুরানো যা কিছু ছেড়ে দিয়ে নূতন সত্যকে গ্রহণ করাই এ যুগের যুগধর্ম্ম। মানব আজ বিদ্রোহী বীর—এবং চিরদিনই যে-যুগের যিনি অবতার তাঁকে সে যুগের গতানুগতিক মনোবৃত্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে হয়েছে। তাতে গতানুগতিক ধর্ম্মভাবকে রোধ করা হয়েছে বটে কিন্তু এতে আক্ষেপের কি আছে? মানবের আজ ধর্ম্মভাব লোপ পেয়েছে ব'লে এই যে চীৎকার, এতে কতিপয় পরম ধার্ম্মিক পাদরী ছাড়া পৃথিবীর কোনও কাজের মানুষ যে যোগ দিতে পারেন নি, এ আমরাও যেমন জানি, লেখক মহাশয়ও তেমনি জানেন। আর এও ত একটা কথা যে, গতানুগতিক ধর্ম্মটা যে লোপ পেতে বসেছে, তার কারণই হচ্চে আজ কালকার মানুষ সেই চিরন্তন-টিয়া পাখীটির মত তার চিরন্তন-দাঁড়ে ব'সে চিরন্তন-ধর্ম্মের ছোলা খাওয়ার প্রবৃত্তি থেকে সহসা ঘুরে দাঁড়িয়েছে।

লেখক বলেছেন, এ যুগের পুরুষ মস্তিস্ক দিয়ে ভাবে না, হৃদয় দিয়ে ভাবে, তাই সে এত দুর্ব্বল। এ কথাটা প'ড়ে একটু আশ্চর্য্য না হ'য়ে থাকা যায় না। আমরা ত দেখছি মানুষ আজ তার 'খনি-খনিত্র-নখ-বিদীর্ণ' পথে তড়িৎ, অঙ্গার, উদযান, অম্লজান আর রন্‌টজেন্ রশ্মির বিরাট বোঝা মাথায় নিয়ে উর্দ্ধশ্বাসে উন্নতির রথ চালিয়ে দিয়েছে,—বিরাট প্রকৃতির লীলাক্ষেত্রে এখন "যন্ত্ররাজ" মানব এসে প্রচুর বাদ্যভাণ্ডসহকারে কাঁচা মাল ও পাকা মাল সরবরাহের বিপুল আয়োজন করেছে—এ সব কি তার হৃদয়ের শক্তির লক্ষণ, না মস্তিষ্কের শক্তির ফল? হৃদয় দিয়ে আবার যখন মানুষ ভাবতে শিখবে তখন মানব সমাজের এই শ্রমিক ও আভিজাত্য-সংগ্রাম,

এই দারিদ্র্য ও অনশনের হাহাকার লুপ্ত হ'য়ে যাবে। তখন মায়াপুরীর রাজপুত্র এসে যন্ত্ররাজের যত্নে রচা বদ্ধ-ধারাকে মুক্ত-ধারা ক'রে দেবেন, তখন 'রক্ত করবীর' রক্ত-রাগে 'রঞ্জন' আবার প্রাণ পেয়ে বেঁচে উঠ্‌বে, 'নন্দিনী' আবার আনন্দে নেচে বেড়াবে, মানব-হৃদয়ের বাতায়নের পাশে সেই যে সোনার ডালিম গাছটি তাতে নীলকণ্ঠ পাখী আবার এসে বাসা বাঁধবে।

লেখক মহাশয়ের মতে নারীকে জীবিকার জন্যে নাকি অতি অল্পই পরিশ্রম করতে হয়। এটাও খুব যুক্তি-সঙ্গত কথা নয়। যেখানে নারী পুরুষের সমান হ'য়ে কর্ম্মক্ষেত্রে নেমেছে সেখানে অগ্রবর্ত্তী পুরুষদের না সরিয়ে দিলে তার স্থান হয় কোথায়? আর সে কাজ কম পরিশ্রম-সাপেক্ষও নয়। যে সব নারী গৃহ-কাজেই রয়েছেন, তাঁদেরও উদয়াস্তের খাটুনী যে একটি সামান্য বস্তু তাও নয়, তবে তাঁরা সংবাদ-পত্রে তাঁদের অতিরিক্ত শ্রমের তালিকা দিয়ে কলহ করেন না, এবং ধর্ম্মঘট করেন না—একথা সত্য।

এ কালের পুরুষ আনন্দ বলতে বোঝে 'সুখের শিহরণ', এবং সুখের ব্যর্থ অন্বেষণে সে নাকি নিজেকে 'তিলে তিলে বিনাশ' করছে, লেখক বলেছেন। এ কথা এ কালের কেন সব কালের পক্ষেই সত্য। প্রদীপ যখন জ্বলে তখন আমরা তার একটা স্থির আভা দেখতে পাই। কিন্তু আরও সূক্ষ্ম চোখ দিয়ে যদি দেখি ত দেখব, প্রদীপের ঐ একটি জ্বলার মধ্যে কোটি কোটি তৈলবাষ্প-বিন্দুর বিস্ফোটন রয়েছে। আনন্দটা হচ্ছে প্রদীপের ঐ শান্ত জ্যোতিঃর মতন, আর সেটা গ'ড়ে ওঠে অসংখ্য সুখের অসংখ্য শিহরণের সমষ্টিতে। স্বচ্ছ আভা দান ক'রে প্রদীপও যেমন নিভে যায়,—আনন্দও তেমনি শেষ হ'তে বাধ্য, কারণ মানুষ ত অবিনশ্বর নয়।

আমাদের দেশে পুরুষের মিথ্যা chivalry লেখক বলেছেন ইউরোপ থেকে আমদানী হয়েছে। এবং এটা নাকি হচ্ছে 'দাস মনোভাব'। কিন্তু মজা এই যে, যে সব দেশে লেখকেরই মতানুযায়ী chivalry অর্থাৎ এই দাস মনোভাবটা বেশী দেখা যায়, সেই সব পাশ্চাত্য দেশ স্বাধীন, আর যে দেশে এই দাস মনোভাব নব আনীত মাত্র সে দেশ এতকাল পরাধীন। Chivalrous লোককে নারী নাকি বিদ্রূপের চক্ষে দেখে। যারা নারীকে পরম অগ্রাহ্য দেখায়, দেখা হ'লে গায়ের উপর দিয়ে চ'লে যাওয়া ও ঔদ্ধত্য দেখানকে আদর্শ ব'লে মেনে নেয়, তাদের যে প্রচণ্ড পৌরুষ আছে তাতে সন্দেহ করি না। কিন্তু যারা নারীকে সম্ভ্রম দেখাতে কুণ্ঠিত হয় না, নারীকে জায়গা দিতে পৌরুষের হানি বোধ করে না, তারাই যে সকল নারীর সম্ভ্রমের পাত্র সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। নারীর কাছে পুরুষ কোমল হয় তখনই, যখন নারীর বাহিরে বিস্তীর্ণ সংসারক্ষেত্রে পুরুষের কঠিন হবার প্রচুর ক্ষমতা আছে। আর নারীর কাছেও যে পুরুষ কঠোর, তার নিশ্চয়ই এই প্রকাণ্ড পৃথিবীতে আর কোথাও কঠোর হবার জায়গা মেলে নি!

লেখকের মতে পূর্ব্বে Love institution একমাত্র পুরুষের কার্য্য ছিল, এখন সেটা একমাত্র নারীর কার্য্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু যখন দেখা যায় যে, সংসারে নারী ও পুরুষ দু জনেরই পরস্পরের প্রেমের প্রয়োজন, তখন তার প্রতিষ্ঠা ব্যাপারটাই বা এক জনের দ্বারা কি ক'রে সম্পাদিত হয়? সে রকম এক তরফা প্রেম নিয়ে মানুষ চলে কি ক'রে? শঙ্করের জন্যে গৌরীর আরাধনা, স্বামী লাভের জন্য দ্রৌপদীর পূজা, চিরন্তন কালের মেয়েদের সেই শিবপূজা,—এ সব যে অতি আধুনিক ব্যাপার তা ত মনে হয় না। রামচন্দ্রের ধনুর্ভঙ্গও যেমন ছিল, স্বামী-লাভের জন্য নারীর আরাধনাও তেমনি ছিল।

মানুষ যে আজ পেছিয়ে যায় নি,- সকল বিষয়েই অল্পে অল্পে এগিয়ে এসে আসন নিয়েছে, এই ক্রমোন্নতিশীল জগতে এইটেই দেখা যাচ্ছে। যে দেশ যত উন্নত হয়েছে সে দেশ নারীর মর্য্যাদাও তত বুঝতে পেরেছে। বিংশ শতাব্দীতে জাতির সভ্যতার ওজন নারীর অবস্থা থেকেই উপলব্ধি করা যায়। পুরুষ আজ এগিয়ে এসেছে ব'লেই, আজ তার প্রাণ উদার হতে উদারতর হয়েছে ব'লেই সে নারীর ব্যথা অনুভব করবার শক্তি পেয়েছে। যে দিন সে সকল হ'তে এগিয়ে যেয়ে জ্ঞানের সর্ব্বোচ্চ শিখরে গরিমার মুকুট প'রে বসবে, সেই দিনই সে সম্পূর্ণভাবে নারীর মর্য্যাদা

[..]তে পারবে, নিজের সিংহাসনের পাশে নারীকে [..]র নির্দ্দিষ্ট স্থান ছেড়ে দেবে। নারী আর পুরুষ ভগবানের [..]ষ্টিতে একই জিনিষের দ্বিবিধ অভিব্যক্তি, একই শরীরের [..]টি চোখের মত,—সেখানে কেউ কারো হ'তে ছোট বড় [..] কম বেশী হ'তে পারে না। নিজের অর্দ্ধেক অঙ্গকে [..]ঙ্গু রেখে যেমন কেহ দিগ্বিজয়ে বার হ'তে পারে না, নারীকে দাবিয়ে রেখে পুরুষও তেমনি বাড়তে পারে না। ভারতবাসীও যেদিন সেই সত্যটা উপলব্ধি ক'রে নারীকে তার সম্পূর্ণ অধিকার ছেড়ে দেবে, ভারতও সেইদিন তার সারা অঙ্গটাকে জড়তা হ'তে মুক্ত পেয়ে জেগে উঠ্‌বে,—বিপুল বিক্রমে ললাটের সকল কলঙ্ক সগৌরবে মুছে ফেলে।

রজনীগন্ধা

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

জন্মান্তরে ছিলে তুমি পুষ্পবতী রাজার নন্দিনী
জাতিস্মর ফুল ! গর্ব্বোন্নত গ্রীবা-ভঙ্গি ভরে,
গজদন্ত পালঙ্কের কেন্দ্রাসীনা, স্ফুট বিম্বাধরে ;
সোনার সন্ধ্যায় বেণী বিনাইত রূপসী বন্দিনী।

শ্বেত চন্দনের চিহ্ন আঁকি লয়ে চারু পয়োধরে
আয়ত-নয়ন তটে টানিয়া কজ্জল তনু লেখা
নিতম্বে দুলায়ে দিয়ে মুক্তাময়ী রশনার রেখা
দাঁড়াইতে মেঘমুক্ত চন্দ্র-করে প্রাসাদ-শিখরে।

আজ তুমি দিবালোকে দাঁড়াও সলজ্জ অভিমানে
সঙ্কুচিত নতমুখে মুদিয়া কাতর আঁখি দুটি ;
সন্ধ্যায় মেঘের ছায়া সুরভী নিঃশ্বাস তব আনে
মর্ম্মের নিগূঢ় কথা—আধো ব্যথা, আধেক ভ্রূকুটি।

বর্ষার প্লাবনে তব মুছে গেছে চোখের কজ্জল,
অভিমানে মিশে গেছে অশ্রুর কোমল পরিমল।

হরিশের দুর্গাপূজা

—গল্প—

—শ্রীশ্যামাপদ সেন

হরিশের কাণ্ড-জ্ঞান বিন্দুমাত্র ছিল বলিয়া বোধ হইত না। তাহার কাজের প্রণালী ও চিন্তার নূতনত্ব এমন অদ্ভুত রকমের অসাধারণ ছিল যে তাহাকে সময় সময় লোকে ক্ষেপা বলিয়া ঠাহর করিত। হরিশের স্ত্রী ভামিনী তাহার এই গোবেচারী স্বামিটিকে লইয়া মাঝে মাঝে বিষম বিব্রত হইয়া পড়িতেন।

হরিশের ক্ষেপামীর দুই একটি উদাহরণ, যথা—মধ্যম পুত্র বলরামের সহিত কনিষ্ঠ নিমাই এর বিরোধ বাধিলে হরিশ হয় জ্যেষ্ঠ রামলালকে অতিরিক্ত তিরস্কার করিতেন,—নতুবা ভামিনীকে ডাকিয়া বলিতেন,—"তুমিই যত নষ্টের গোড়া।" ভামিনী কাংস্যকণ্ঠে ইহার প্রতিবাদ করিতে উদ্যত হইলে হরিশ গম্ভীরভাবে জবাব দিতেন, "শাসিতকে উদাহরণ দেখাইয়া শাসন করিলে ফল লাভ হয়; অর্থাৎ উপদেশ হইতে উদাহরণই শ্রেয়ঃ।" কিন্তু উপদেশ হইতে উদাহরণ যে অনেক সময় ভীষণ আকার ধারণ করে তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইত যখন দুইটি বালকের কলহ একটা প্রকাণ্ড পারিবারিক কলহে পরিণত হইত। শোনা যায়, ইহারও উত্তরে হরিশ গম্ভীরতর ভাবে বলিতেন,—"ক্ষুদ্র কলহের মূলে যে বৃহৎ কলহের বীজ লুকাইয়া আছে,—তাহাকে জাগাইয়াই তবে তাহার শান্তি করিতে হয়। বৃথা চাপিয়া রাখিলে ফল অত্যন্ত খারাপ হয়!"

বলা বাহুল্য ভামিনী এই সকল দার্শনিক তত্ত্বের উপযুক্ত দাম দিতেন কণ্ঠের স্বর পঞ্চম হইতে সপ্তমে চড়াইয়া। গৃহকর্ম্মের জন্য রামলালকে ডাকিলে যদি অনতিবিলম্বে বলরাম আসিয়া হাজির না হইত তাহা হইলে সে দিন রামলাল এবং বলরাম উভয়েই যুগপৎ হরিশের নিকট তিরস্করণীয় বলিয়া বিবেচিত হইত। হরিশের যুক্তি এইরূপ ছিল,—আদেশ পালনের ভাবটাকেই দাম দেওয়া হইতেছে; যাহার ভিতর সেই ভাব বিশেষরূপে বর্দ্ধিত হইয়াছে সে সুযোগের অপেক্ষায় বসিয়া থাকে না, অর্থাৎ রহিমের তলব পড়িলে রাম এবং রহিম উভয়েরই যুগপৎ সেই জন্য হাজির হওয়া উচিত।

এই সমস্ত কারণে হরিশের পরিবারে বিন্দুমাত্র শান্তি ছিল না। হরিশের যুক্তি যে কখন কি রূপ অবলম্বন করিতে পারে পূর্ব্ব হইতে তাহার ঠাহরও পাওয়া যাইত না। এক একদিন পারিবারিক কলহ (স্বামী-স্ত্রীর কলহ) এরূপ বৃদ্ধি পাইত যে একপক্ষে হরিশ কেবলই দার্শনিক যুক্তিসমূহের অনর্গল অবতারণা করিতেন, অন্য পক্ষে স্ত্রী ভাবিনী কণ্ঠের স্বর এত অধিক মাত্রায় চড়াইয়া দিতেন যে, পাড়ার লোকে কোন আধিদৈবিক বিপদ ঘটিয়াছে ভাবিয়া দৌড়াইয়া দেখিতে আসিত। কিন্তু আসিলেই দেখিতে পাইত যে একটি আধ্যাত্মিক সংগ্রাম চলিতেছে। স্থূল-সূক্ষ্ম, কারণ-কার্য্যফল, নিয়ম-ব্যতিরেকের ছড়াছড়ি! অগত্যা হাসিতে হাসিতে সকলের বাড়ী ফিরিয়া যাওয়া ব্যতীত উপায়ান্তর থাকিত না।

এ হেন হরিশ একবার ভাবিলেন যে, দুর্গোৎসব করাটা নিতান্ত উচিত। পত্নী ভামিনীকে খবরটা আগে দিলে তাহার এ বিষয়ে উৎসাহ ক্রমেই মন্দীভূত হইয়া পড়িতে পারে বিবেচনায় কথাটা নিজের মনেই গোপন রাখা স্থির এবং শুভ বিবেচনা করিলেন। কুম্ভকারের বাড়ীতে প্রতিমার বায়না হইতে আরম্ভ করিয়া পুরোহিত পর্য্যন্ত খবরটা সকলেই পাইল। ফলে দাঁড়াইল যে, এক স্ত্রী ভামিনী ব্যতীত সংসারের প্রায় সকলেই হরিশের মতলব জানিতে পারিল। কিন্তু ভামিনী না জানিতে পারিলেও সে কিছু আর সংসারের বাহিরে বসতি করে না। কথাটা তাঁহার কর্ণে পৌছাইতে বড় বেশী দিন লাগিল না। সুতরাং তিনি একদিন দুর্গার রূপ লইয়া না হউক দুর্গার ভঙ্গী লইয়া আসিয়া তীব্র কণ্ঠে স্বামীকে শুধাইলেন,—"ব্যাপারটা কি?"

হরিশ বিষম ফাঁপরে পড়িয়া গেলেন। মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিতে লাগিলেন, "হাঁ, তা না,—হাঁ এই ধর গিয়ে মনুষ্য জীবনে দেবার্চ্চনার বিশেষ প্রয়োজন। কৃশ্চানরা মূর্ত্তিপূজা না করিলেও যীশু ও ক্রুশের পূজা করে।" ইত্যাদি ইত্যাদি। ভামিনী বলিলেন,—"কৃশ্চানরা কিসের পূজা করে তাহা আমি শুনিতে আসি নাই। তুমি কি করিবে তাহাই শুনিবার আছে।"

হরিশ সংক্ষেপে উত্তর দিলেন,—"দুর্গোৎসব।"

ভামিনী সহসা খ্যান্ খ্যান্ করিয়া উঠিলেন,—"ভাত পায় না তার মুড়কির জল-পান! ঘরে নাই চাল, তার দুর্গোচ্ছব! এক পয়সা রোজগার নাই অথচ নবাবীর আর পার নেই।"

হরিশ বলিতে গেলেন—"নবাবেরা দুর্গোৎসব অথবা চাকরী কিছুই করিতেন বলিয়া ইতিহাসে লেখে না।" ভামিনী ছিট্‌কিয়া উঠিলেন, "ইতিহাসের মুখে আগুন। বিদ্যে জাহির কেবল নিজের ঘরে বোসে। নিয়ে এস না বিদ্যে দেখিয়ে টাকা রোজগার ক'রে, বুঝি ক্ষমতা।" হরিশ, কহিলেন "বিদ্যা ও শক্তি এক নহে।" ভামিনী যখন দেখিলেন এরূপ লোকের সহিত তর্কে পারিয়া উঠা দায় তখন সহসা যমের স্মরণ-শক্তির অতিরিক্ত অভাব দেখিয়া খেদ করিতে করিতে কার্য্যান্তরে চলিয়া গেলেন।

যথাসময়ে দুর্গা-পূজার দিন উপস্থিত হইল। কুম্ভকার বাড়ী হইতে প্রতিমা আনা হইয়াছে। ছোট প্রতিমা। ছোট মণ্ডপ। বাদ্যবাজনার অভাব ভামিনীর দিবারাত্রব্যাপী কাংস্য-কণ্ঠে মিটিল। জ্যেষ্ঠপুত্র রামলাল বিষণ্ণবদনে ঘরের দাওয়ায় খুঁটী হেলান দিয়া বসিয়া রহিল। মধ্যমপুত্র বলরাম কনিষ্ঠ নিমাইচাঁদের সহিত উলঙ্গ হইয়া বর্ষণপুষ্ট পল্লী-গ্রামের আড়ায় আড়ায় পরিধানের জীর্ণ বসন দ্বারা খেপ দিয়া মৎস্য-উপার্জ্জনে ব্যস্ত ছিল। পূজার সময় স্ত্রীপুত্রের জন্য কয়েকখণ্ড নূতন বসন ক্রয় করিবারও সংস্থান নাই। হরিশ শান্তমুখে প্রতিমার মণ্ডপের সম্মুখে বসিয়া আছেন। পুরোহিত বলিয়া পাঠাইয়াছেন—বেগার খাটিবার মত সময় তাঁহার নাই। অগত্যা হরিশকেই পুরোহিতের আসন দখল করিতে হইয়াছে। সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী তিন দিন যাবৎ পূজা হইল। কি যে পূজা, আর কি যে তাহার মন্ত্র, কেহই বুঝিল না। তিনদিন যাবৎ হরিশ সাগু ভিজাইয়া দৈনিক আহার সম্পন্ন করিলেন। এ কয়দিন তিনি কাহারও সহিত বিশেষ আলাপ করিলেন না। স্ত্রী ভামিনী নবমীর দিন রাত্রে অনুরোধ করিয়া গেলেন এবার যেন দেবীর সহিত শুভ বিদায় গ্রহণ করা হয়। প্রতিমার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া হরিশ সংক্ষেপে কহিলেন, "মাকে জানাও।" ভামিনী কহিলেন—"মার কি কান নাই যে বিশেষ করিয়া জানাইবার প্রয়োজন আছে?"

দশমীর রাত্রি প্রভাত হইল। সকাল হইতে টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। গ্রামের জঙ্গল এত অধিক পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে যে কোন এক গৃহস্থের বাড়ী দাঁড়াইয়া মনে হয় যেন মাত্র এই একখানি বাড়ীই এ গ্রামের সম্বল! একটা অস্বাস্থ্যকর বাষ্প খাল নালা ও ডোবা হইতে উঠিয়া চারিদিক ধোঁয়ার মত কুহেলীতে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। মশক-সম্প্রদায় এতবেশী বাড়িয়া গিয়াছে যে মনে হয় যে আজই যদি ইহারা মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে তবে সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই মশক-রাজতন্ত্র স্থাপনের পক্ষে কিঞ্চিন্মাত্র বাধা নাই।

হরিশ প্রতিমার মণ্ডপ হইতে বাহির হইয়া আসিয়া দেখিলেন প্রভাত,—দশমীর প্রভাত যেন দুইহাতে মুখ ঢাকিয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতেছে। প্রতিমার মুখের দিকে চাহিলেন,—দেখিলেন, দেবীর আনন বিষাদ-আচ্ছন্ন। হরিশ মায়ের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইয়া বিদ্রূপের স্বরেই কহিলেন,—"আনন্দময়ী নাম গ্রহণ করিতে লজ্জা করে নাই? এত বিষাদই যদি,—এত দুর্গতিই যদি,—তবে দুর্গা নাম রাখিয়াছিল তোর কে মা?" মাটীর প্রতিমা কথা কহিল না। ঘর নিস্তব্ধ। চালের বাতায় একটা টিক্‌টিকি ঠিক্ ঠিক্ করিয়া যেন সায় দিয়া উঠিল।

সমস্ত প্রভাত অঝোরে কাঁদিয়া কাটাইল। মধ্যাহ্নে আকাশের মস্তকে ক্ষীণ আলো একবার রোগীর মুখের হাসির ন্যায় জ্বলিয়াই কিছুক্ষণ পরে নিভিয়া গেল। গৃহে তণ্ডুল নাই। ভামিনী মুখভার করিয়া ঘরের দাওয়ায়

বসিয়া আছেন। ছোট ছেলেটা ক্ষুধার তাড়নায় চীৎকার করিয়া গৃহ মাথায় করিয়া লইয়াছে।

অপরাহ্নের দিকে হরিশ কহিলেন, "চল মা,—স্বস্থানে গমন করিবে।" প্রতিমা কাঁধে করিয়া একা একা হরিশ নদীর দিকে চলিলেন। তিন দিনের উপবাসে শরীর থর থর করিয়া কাঁপিতেছে। নদীর কূলে যখন পৌছালেন,—তখন মুষল ধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। পথ-ঘাট জনশূন্য। ভাঙ্গনের কূলে দাঁড়াইয়া শুধু একটা তালগাছ সন্ সন্ শব্দ করিতেছে। হরিশ যখন উন্মত্তের মত নদীর কূলে প্রতিমা লইয়া দাঁড়াইয়াছেন তখন দিক্ দিগন্ত এপার ওপার বৃষ্টির কাজল পরিয়া কালো হইয়া গিয়াছে। "জয় মা আনন্দময়ী" বলিয়া হরিশ যেমন মাথার উপর হইতে প্রতিমা নদীগর্ভে নিক্ষেপ করিতে যাইবেন——ভাঙ্গন ধ্বসিয়া অমনি সশব্দে সেই গভীর প্রদেশে চির অন্ধকারে তলাইয়া গেলেন।

তারপর শুধু জলের গর্জ্জন, বাতাসের হুঙ্কার আর বৃষ্টির সাঁই সাঁই শব্দ! সৃষ্টির অনিয়ম হরিশ সৃষ্টির অনিয়মের কোলে চির শান্তিলাভ করিলেন।

* * *

পরদিন হরিশের শবদেহ নদীতে ভাসিতে দেখা গেল। ভামিনীর উচ্চ ক্রন্দনে আকাশ ক্ষুব্ধ হইল। পুত্রত্রয় কাঁদিয়া মৃত্তিকা ভাসাইতে লাগিল। কিন্তু এই সকল ক্রন্দনের দার্শনিক ব্যাখ্যা শুনাইবার জন্য আজ আর কেহ বর্ত্তমান নাই।

কাল

শ্রীঅরীন্দ্রজিৎ মুখোপাধ্যায়

আজ চলেছে রাহুর দশা, বৃহস্পতি লাগ্‌বে কাল,
আজ্‌কে মেঘা, কাল্‌কে সাঁজে উঠ্‌বে গো চাঁদ সোনার থাল।
আজ্‌কে তোমার নাইক দেখা, দিনটা বুঝি বৃথাই হয় :
কাল সকালে ডাক্‌বে পাখী, আস্‌বে তুমি সুনিশ্চয়।
জল্‌সাটা আজ জম্‌ল না'ক গানের গেল তাল কেটে ;
কাল্‌কে আসার জম্‌বে সুরে বিঘ্ন বাধার জাল কেটে।
আজ্‌কে পথে একলা চলি সঙ্গীহারা—মৌন মূক ;
কাল বিদেশী পথের সাথী আস্‌বে তুলে কী কৌতুক
আজ্‌কে যদি খেলায় হারি—নেইক তাতে কিছুই ভয় ;
কাল্‌কে দেখো পড়তা নতুন, কাল্‌কে হবে দ্বিগুণ জয়।
আজ যা কুঁড়ি রয়েই গেল, কাল তা ফুটে উঠবে ফুল,
আজ যে মাণিক পাওনি খুঁজে, কাল তা' পাবে নাই'ক ভুল।

যাদুকরের ভেল্কীভরা কুহক ঢালা দিন্‌ ত কাল,
তা'রির লাগি কাটিয়ে দেব আজ্‌কে দুপুর সাঁজ সকাল!

ভ্রমণ-স্মৃতি

শ্রীদেবেশচন্দ্র দাস

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

পরদিন সকালে জাগিয়া দেখি আমরা নূতন দিল্লী ষ্টেশনে পৌঁছিয়াছি। তখনই জল-যোগ সারিয়া আমরা দিল্লী দুর্গাভিমুখে চলিলাম। পথে জুম্মা মসজিদে নামিয়াছিলাম। সেখানে সু-উচ্চ মিনারে উঠিয়া দিল্লী শহরের একটা দৃশ্য দেখিয়া লইলাম। মনে পড়িল—সত্যেন্দ্রনাথের

"তুমি অপরূপ হে চির-জীবিনা,
ঘুমের বুড়ার চাইতে বুড়া
তরুণীর চেয়ে সুন্দরা তনু
মোহিনী তুমি লো নগরা চূড়া।"

এখানে রমজানের উপবাসের শেষ দিন খুব ভীড় হয়; দিল্লীর সকল মুসলমান সমবেত হইয়া নমাজ পড়েন। উপর হইতে দিল্লী দেখিতে দেখিতে আর একদিনের ঘটনা মনে পড়িল। সে ১৭৩৮ খৃষ্টাব্দ, যে দিন দিগ্বিজয়ী নাদের শাহ এই মিনার হইতে দিল্লীর ধ্বংশলীলা দেখিতেছিলেন। সে প্রলয় দিনে পারসিক সৈন্যগণ দিল্লীতে রক্তস্রোত বহাইয়াছিল। তাহা ছাড়াও কত বার কত আক্রমণ, কত অত্যাচারের ধারা ইহার বুকের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে। সত্যই

"স্বর্গ নরক তোমারে ঘিরিয়া
রচিল রুধির অশ্রুধারা।"

তবু আবার দিল্লী মোহন বেশ ধারণ করিয়াছে। নূতন রূপে আবার সাজিয়াছে; ভারতের ভাগ্য-বিধাতা হইয়াছে।

শাহ্‌জাহান লোহিত প্রস্তরে দিল্লী-দুর্গ প্রস্তুত করাইয়াছিলেন; দুর্গ ত নয় সবই প্রাসাদ-মালা। শিল্পের এমন সুন্দর নমুনা আর কোনও দুর্গে পাওয়া যায় না। ইহা আগ্রার দুর্গের অনুকরণে নির্ম্মিত হইলেও শাহ্‌জাহানের যুগের কারুকার্য্য আকবরের যুগের অপেক্ষা উন্নততর। দুর্গের পূর্ব্বের অবস্থা আর নাই; এখন ইহা গোরা সৈন্যের আবাসস্থল হইয়াছে। এখন আর মোগল সৈন্য দীন্ দীন্ রবে আকাশ বাতাস মুখরিত করিয়া সাম্রাজ্য-বিস্তারের জন্য অভিযানে বাহির হয় না; দিল্লীর পথের ধূলি আর তুরগ-গজভারে উড়িয়া আকাশকে ধূসর করে না; চাঁদনী-চক আর নৃত্যগীতে দ্বিতীয় 'ইন্দ্র-সভার' সৃষ্টি করে না। মোগলের সে দিন নাই; ভারতেরও সে দিন নাই। সে ঐশ্বর্য্য, সে শৌর্য্য-বীর্য্য, সে ভোগ-বিলাস সবই এখন রূপ-কথায় পরিণত হইয়াছে। মতিমহল, সাম্মাম-বরুজ, রঙ্গমহাল অতীতের সেই দৃশ্যগুলির বাক্যহারা দর্শকের ন্যায় বিষাদ-মলিন। ময়ুর-সিংহাসন মোগল রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে সঙ্গেই চলিয়া গিয়াছে। দুর্গের সারভূত প্রাসাদমালার অল্প ভূমি-খণ্ডের মধ্যে যত ধনরাশি, রূপরাশি ও পাপরাশি ছিল বিশ্বজগতে বোধ হয় তাহার উপমা নাই। ইহা কুবের ও কন্দর্পের রাজত্ব; চন্দ্র, সূর্য্য তথায় স্বরূপে প্রবেশ করিতেন না; যম গোপনে ভিন্ন চরণ ফেলিতেন না। এত নন্দনোপম উদ্যান, এত রূপলাবণ্যশালিনী রমণী, এত ভোগ-বিলাস ও এত পাপাচরণ আর কোথাও ছিল না। যে ঐশ্বর্য্যের নিকেতন নিত্য কত নগ্ন কোমল পদ-পল্লবের স্পর্শ লাভ করিয়া ধন্য হইত, আজ আমরা দর্শকবৃন্দ রূঢ় চরণে সেই অতুলনীয় কলা-কারুময় মন্মরের অবমাননা করিতেছি। স্নান-হর্ম্ম্যে উৎস-মুখ হইতে গোলাপ জল উত্থিত হইত আর শীকর-শীতল নিভৃত গৃহে শিলাসনে বসিয়া কত তরুণী দ্রাক্ষাবনের গজল গাহিত; কত নারী-কণ্ঠের কলকাকলী নির্ঝরের শতধারার ন্যায় সকৌতুকে উচ্ছ্বসিত হইত; প্রমোদচঞ্চল চেলাঞ্চলের মৃদু বীজনে কত

বসন্ত-সমীরণের নিঃশ্বাস উড়িয়া যাইত; আবার হয় ত ঈর্ষাফেনিল ষড়যন্ত্রসঙ্কুল ঐশ্বর্য্য-প্রবাহে ভাসমানা কোন অভাগিনী মরুভূমির পুষ্পমঞ্জরী গুপ্ত পথ দিয়া নিষ্ঠুর মৃত্যুনদের তটে নিক্ষিপ্ত হইত। ঐশ্বর্য্য ও ভোগবিলাস কোন দিন মানুষকে পরিপূর্ণ সন্তোষ দেয় নাই; এ প্রমোদ-পিচ্ছিল পথে যে পদার্পণ করিয়াছে তাহার শান্তি মিলে নাই, শুধু সহস্র অতৃপ্তির লেলিহান শিখাময় বাসনার অনলে পুড়িয়া মরিয়াছে, আত্মার তৃপ্তি হয় নাই। এই সকল
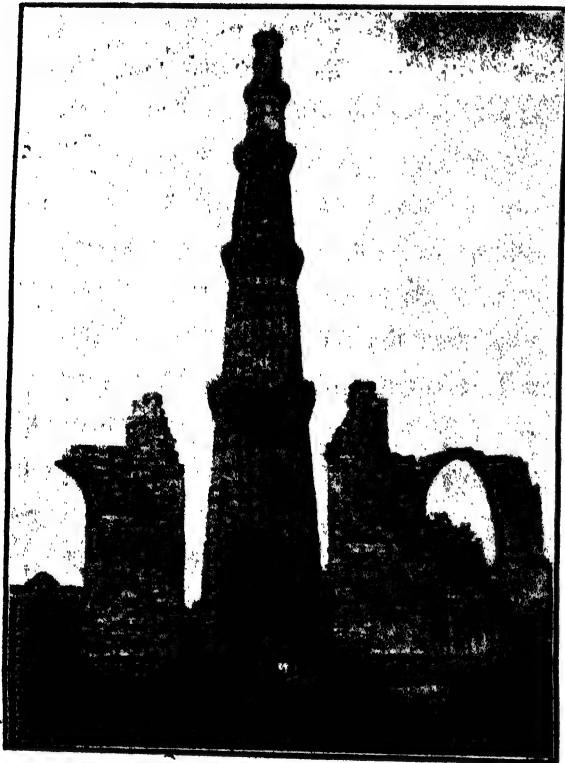
কুতব মিনার

প্রাসাদে কত উদ্দাম কামনা, কত উন্মত্ত সম্ভোগের জ্বালাময় শিখা আলোড়িত হইয়াছে; আজও বুঝি তার দু-একটী উষ্ণ স্পর্শ অনুভব করা যায়। সে চিত্তদাহের নিষ্ফল অভিশাপে বুঝি এ প্রমোদ-প্রাসাদের প্রতি প্রস্তর-খণ্ড ক্ষুধার্ত্ত, তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া আছে। যে সভাগৃহে লেখা আছে—"যদি পৃথিবীতে স্বর্গ কোথায়ও থাকে, তাহা এখানেই, তাহা এখানেই"—সে গৃহও আজ শোক-বিমলিন। হায় স্বর্গাস্পর্দ্ধী প্রাসাদ! তোমার নির্ম্মাতা জানিতেন না যে, মানুষ যাহা কষ্টে নির্ম্মাণ করে মহাকাল তাহা অনায়াসে ধ্বংশ করে; মানুষের কত ইচ্ছা, কত কামনা, কত ভবিষ্যৎবাণী অবলীলার সহিত স্বপ্ন মাত্রে পর্য্যবসিত হয়!

বিকালে আমরা কুতবমিনারের পথে বাহির হইলাম। নূতন দিল্লীর শোভাময় সরল প্রশস্ত রাজপথগুলি রাজধানীর উপযুক্ত। পথে ভারতের পার্লামেণ্ট, সেক্রেটারিয়েট, গভর্ণমেণ্ট হাউস, মান-মন্দির এ সব দেখিয়া লইলাম। কাশী, দিল্লী ও জয়পুর এই তিন জায়গার মানমন্দিরই ভারতের প্রাচীন জ্যোতির্বিদ্যার পরিচয় দেয়।

তারপর বিজন পথ। চারিদিকে সমাধি ও ভগ্নাবশেষ, গৃহগুলি ইতঃস্তত বিকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে। কেবল শফদরজঙ্গ এখনও অটুট অবস্থায় বর্ত্তমান। এই হর্ম্ম্যের দ্বিতলে উঠিয়া আমরা আর নীচে আসিবার পথ সহজে পাই নাই। অনেক ঘুরিয়া ফিরিয়া অবশেষে এই গোলক-ধাঁধার পথ পাইলাম। হুমায়ুনের পাঠাগার এখনও বর্ত্তমান, কিন্তু পুস্তকপাঠ-রত কোন মোগল সম্রাটের সৌম্য আনন আর দেখিতে পাইব না। যুধিষ্ঠিরের নির্ম্মিত পুরাতন কেল্লা দেখিলাম। শেরসাহ্ ইহার সংস্কার করাইয়াছিলেন। দুর্গে হিন্দুর শিল্প-কলার পরিচয় এখনও পাওয়া যায়। কুন্তীদেবীর মন্দির এখনও রহিয়াছে; কিন্তু সে ধর্ম্মরাজ্য আর নাই। হয় ত নরোত্তমদিগের পদধূলি এখানে এখনও পড়িয়া আছে, কিন্তু গীতার ধর্ম্ম প্রচারের গভীর বাণী আর উচ্চারিত হয় না। নিজামুদ্দীন আউলিয়ার কূপের নিকট জাহানারার মর্ম্মর সমাধির উপরে লেখা, আছে "আমি ফকীরণী, আমার কবরের উপর মাটী ও ঘাস দিও!" শাহাজাদী বোধ হয় বুঝিয়াছিলেন ঐশ্বর্য্য নশ্বর, স্মৃতিস্তম্ভ ক্ষণভঙ্গুর; তাই আজন্ম বিলাসে লালিতা রাজকন্যা মোগলের তিমির রজনীর পূর্ব্বমুহূর্ত্তেই সাবধান হইয়াছিলেন!

সেখান হইতে আমরা কুতব-মিনারে গেলাম। আমরা সকলেই তরুণ বয়স্ক, তাই আমাদের উপরে উঠিতে কোন

শ্রী দেবেশচন্দ্র দাস

কষ্ট হইল না। নীচে একটি লৌহস্তম্ভ রহিয়াছে, এই স্তম্ভ ষোল শত বৎসর পূর্ব্বেকার, তবুও আশ্চর্য্যের বিষয় এতটুকু কলঙ্ক পড়ে নাই। কুতব-মিনারের সূক্ষ্ম কারুকার্য্য এখনও বিনষ্ট হয় নাই; এই সুদৃশ্য মিনার হিন্দুরাজা পৃথ্বীরায়ের কীর্ত্তিস্তম্ভ; পরে কুতবউদ্দিন ও আলতামস উহা সংস্কার করাইয়া আরবী অক্ষরে সুশোভিত করেন। মিনারের উপরের অংশ পড়িয়া গিয়াছে। উপর হইতে দেখিলাম চারিদিকে কেবল ধ্বংসের লীলাখেলা। দিল্লী "হিন্দু সাম্রাজ্যের মহাশ্মশান, মুসলমান সাম্রাজ্যের মহাসমাধি, মহাকালের রঙ্গভূমি"। সেই ইন্দ্রপাট, সেই পৃথ্বীরায়ের দুর্গ, সেই তোগলকাবাদ, সেই শাহাজানাবাদ সবই ত রহিয়াছে; নাই কেবল আমাদের পূর্ব্বগৌরব ও স্বাধীনতা। যমুনা ঘৃণায় দূরে সরিয়া গিয়াছে। পথে বন-বৈতালিক পিকবর এখনও নাচে; কিন্তু তাহার নৃত্যে বুঝি প্রাণ নাই। মনে পড়ে ইংরেজ কবির—

"বীরত্বের গর্ব্ব আর প্রভুত্ব বিভব
সম্পদ্; সংসার সব যাহা করে দান
অলজ্য মৃত্যুর হায়! মুখাপেক্ষী সব
গৌরবের পথ মাত্র মৃত্যুর সোপান।"

আজ দিল্লীর যে দিকে তাকাই শুধু মহামেঘপ্রভা শ্যামার আত্মবিস্মরণের ছায়াতে করাল নৃত্য দেখিতে পাই। শ্মশানালয়বাসিনীর পদতলে সপ্তদিল্লী লুণ্ঠিত। তাহাতে উগ্রচণ্ডার ভ্রুক্ষেপ নাই। রিক্তা, অপহৃতা, আত্মবিস্মৃতা মাতার আজ এই মূর্ত্তি। তাঁহার অট্টহাস্ত সেই বিজন নীরবতার মধ্য হইতে চারিদিকে ধ্বনিত হইতেছে। বড় দুঃখেই একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল।

আগ্রার দুর্গ ও দিল্লীর দুর্গ প্রায় একই রকম। প্রাসাদগুলির শিল্পকার্য্যও একই প্রকার। আগ্রাদুর্গের মতি-মসজিদের প্রসারিত নিরাভরণা মূর্ত্তি বড় সুন্দর। এমন সুন্দর অথচ এত সরল; ইহা কেবল হয়ত কল্পনাতেই সম্ভব হইত। নিকটেই নওরোজের উৎসব-ক্ষেত্র। চতুর্দ্দিকে অত্যুচ্চ শ্বেত প্রস্তর নির্ম্মিত অট্টালিকার মধ্যে কৃষ্ণ প্রস্তরাচ্ছাদিত প্রাঙ্গণ। চন্দ্র-সূর্য্য যাহাদের দর্শন পাইতেন না তাঁহারা এখানে বৎসরে একদিন সমবেত হইয়া আনন্দ-উচ্ছ্বাসে ভাসিতেন।

মতিমসজিদ—আগ্রা

"করচরণোরসি মণিগণ ভূষণকিরণ বিভিন্নত মিশ্রং
বিপুলপুলকভুজপল্লব বলয়িত বল্লভ যুবতী সহস্রম্॥"

এখানে মিলিত হইয়া নৃত্যগীত কোলাহলে মত্ত থাকিতেন। তাঁহারা নিজেরাই ক্রেতা, নিজেরাই বিক্রেতা। তিনশত বৎসর পূর্ব্বের এক এক দিনের উৎসব আকার ধরিয়া আমার সম্মুখে ভাসিয়া আসিতে লাগিল। উপরের মর্ম্মরের জালির মধ্য হইতে বালারুণের যে আলোক পড়িতেছিল তাহা যেন আরব্য-উপন্যাসের একাধিক

সহস্র রজনীর এক একটী রজনীর কাহিনীর মধ্যে আলোকপাত করিয়া সব প্রকাশ করিতে লাগিল। আমরা দুর্গের অন্যভাগে চলিয়া আসিলাম, কিন্তু নওরোজ ক্ষেত্রের মায়ামন্দির আকর্ষণ আমাকে বার বার টানিতে লাগিল।

অনতিদূরে জাহাঙ্গীরের ইতিহাস-বিখ্যাত শ্বেত-কৃষ্ণ প্রস্তরের সিংহাসনখানি এখনও রৌদ্র ও বৃষ্টির অত্যাচার সহিয়া তেমনি সুন্দর রহিয়াছে। পার্শ্বেই জাহাঙ্গিরী মহল। একটি ঝরোকার উপর সম্রাট ও নুরজাহান আসিয়া দাঁড়াইতেন আর দুর্গের বাহিরে যমুনার পারে দর্শনাকাঙ্খী জনতা জয়ধ্বনি করিত। নিম্নে হস্তিযুদ্ধ হইত, উপরে আসনের উপর বসিয়া সম্রাট দেখিতেন। ভরতপুরের জাঠ রাজা আগ্রা জয় করিয়া বিজয়গর্ব্বে সেই সিংহাসনে বসিয়াছিলেন। জনশ্রুতি যে মোগলরাজলক্ষ্মী সেই অবমাননা সহ্য করিতে পারেন নাই, তাই অন্তর্জ্বালায় সিংহাসন বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। সেই সঙ্গে তপ্ত রক্তও বাহির হইয়াছিল। মোগলের সৌভাগ্যরবির অস্তরাগে রঞ্জিত সে শোনিত-লেখা এখনও দেখা যায়। নিকটেই চৌসর খেলিবার গৃহ; এখানে স্বয়ং বাদসাহ ও বেগমগণ খেলিতেন ও বাঁদীরা ঘুটি সাজিত। দূরে দেওয়ানী খাস; সেখান হইতে রাঠোরবীর অমরসিংহ প্রাণরক্ষার জন্য পলায়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার শিক্ষিত প্রভুভক্ত অশ্ব একলম্ফে দুর্গের প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়াছিল। প্রভু রক্ষা পাইলেন, কিন্তু অশ্ব আর বাঁচে নাই। তাঁহার স্মৃতি রক্ষার জন্য একটী তোরণের নাম ছিল "অমরসিংহ দরওয়াজা"।

সেকেন্দ্রা—আকবরের সমাধি

শীষ মহলে প্রবেশ করিতেই চারিদিকে আমার মুখের শত শত ছবি প্রতিফলিত হইতে লাগিল; তাহাতে বিশেষ সুখী হইতে পারিলাম না। যাহাদের চেহারা সুন্দর তাহাদিগকে প্রত্যহ শীষ্ মহলে যাইতে উপদেশ দিই। আর এক দিকে মমতাজের শয়নকক্ষ। নিকটেই একটি জলাধার রহিয়াছে; তাহা কি সুন্দর! যখন জলপূর্ণ হইত তখন বোধ হইত যেন নিম্নে অঙ্কিত পদ্মটী ভাসিয়া উঠিয়াছে। দিল্লীতে আর একটি জলাধার আছে, তাহাতে জল পড়িলেই বৈজ্ঞানিক উপায়ে আপনি গরম হইয়া যাইত। নিকটেই একটি সুন্দর বসিবার স্থান। আওরঙ্গজেব যখন পিতাকে বন্দী করিয়া রাখেন তখন শাহজাহান মমতাজের স্মৃতিবিজড়িত কক্ষটির সম্মুখে বসিয়া গালে হাত দিয়া নদীর অপর পারে তাজমহলের দিকে নির্নিমেষ নয়নে তাকাইয়া থাকিতেন। জাহানারা পার্শ্বে বসিয়া কোরাণ পড়িয়া শুনাইতেন আর বিরহী সম্রাট্ অশ্রুজলে ভাসিতেন। যখন পশ্চাতে ফিরিতেন তখনও গৃহে খচিত মণিগুলিতে তাজের সম্পূর্ণ আকৃতি প্রতিফলিত হইত। এখানে আসিলে মন আপনি বিষাদে উদাস হইয়া যায়। বিরহী-চিত্তের অব্যক্ত বেদনার একটী
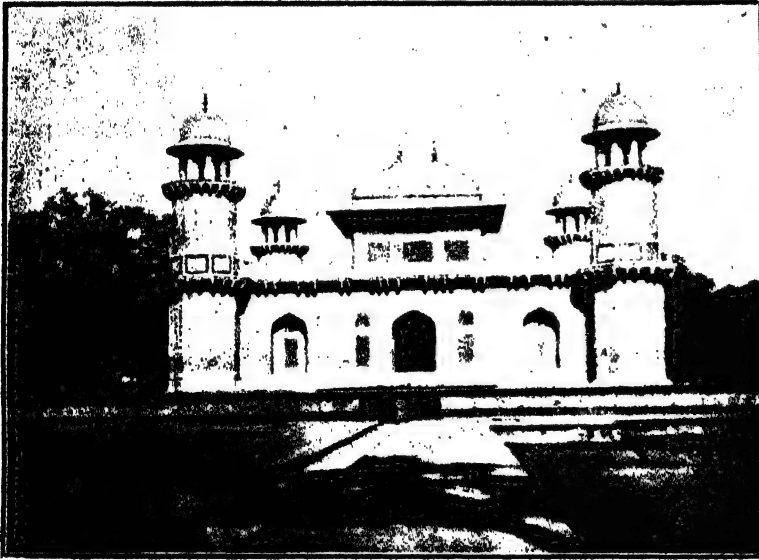
শ্রীদেবেশচন্দ্র দাস

অংশ দর্শকের মনকেও আচ্ছন্ন করে। আমরাও এই বিশ্বজনীন প্রেমব্যাকুলতার প্রভাব অনুভব করিতে লাগিলাম।

আকবরের "বিলুপ্ত সম্পদের মরণ-স্তম্ভ" সেকেন্দ্রায় আসিলাম। প্রবেশ দ্বারের কারুকার্য্য কত সরল, অথচ ইহার মধ্যে এমন এমন একটা অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য আছে যাহা দর্শকের মনকে সচেতন না করিয়া যায় না। চারিদিকে চারিটী তোরণ ও বিস্তীর্ণ উদ্যান; মধ্যস্থলে সমাধি-গৃহ। কবরের উপরে ত্রিতলে যে সুন্দর কারুকার্য্যময় মর্ম্মর আবরণ রহিয়াছে তাহা একটি সমগ্র প্রস্তর হইতে ক্ষোদিত। পার্শ্বে একটি স্তম্ভ আছে; কথিত আছে যে তাহার উপর কোহিনুর মণিটি থাকিত আর কবরের উপর মণির আলো পড়িত। অনতিদূরে হিন্দুর ত্রিশূল, মুসলমানের অর্দ্ধচন্দ্র ও খ্রীষ্টানের ক্রুশ রহিয়াছে। আকবর জীবিত কালেও সব ধর্ম্মের প্রতি সমান আস্থা দেখাইতেন। তাঁহার ভিনধর্ম্মাবলম্বী বেগম ছিলেন। এই সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়-প্রার্থী সম্রাটের নীতি অনুসৃত হয় নাই বলিয়াই আজ মোগল সাম্রাজ্য সুপ্তির অন্ধকারে লুক্কায়িত।

সেখান হইতে আমরা ইতমদ্ উদ্দৌলায় গেলাম। এখানে নুরজাহানের পিতা মির্জ্জা গিয়াসের কবর আছে। এখানকার মত এমন সুন্দর শ্বেত পাথরের জালির কাজ আর কোথাও দেখি নাই। কোথাও কোথাও এমন সুন্দর লতা-পাতা আঁকা আছে যে মনে হয় সেগুলি বুঝি রঙ্গীন পাথরে খচিত। পাশের ঘরগুলিতে আরও কয়েকটি কবর রহিয়াছে। একটি ঘরে জাঠরাজা সূর্য্যমল্ল বাবুর্চ্চিখানা করিয়াছিলেন। ঘরটি কালিমাময় হইয়া গিয়াছে। সৌন্দর্য্যে যাহা অতুলনীয় তাহার অবশ্যই একটা বিশ্বজনীন আবেদন আছে। কিন্তু পাষণ্ড লুণ্ঠনকারীদলের প্রাণে সৌন্দর্য্য-বোধ কোনও সাড়া জাগায় নাই। রূঢ় আক্রমণকারী সেনাদল প্রাসাদ ভাঙ্গিয়াছে, মণিমুক্তা হরণ করিয়াছে ও গৌরবময় স্মৃতিচিহ্নগুলি নষ্ট করিয়াছে। কেহ এই দোষ হইতে মুক্ত ছিল না। রাজা ও দস্যুতস্করের মধ্যে প্রভেদ এই খানেই; অল্প পরিমাণে যাহা করিলে দোষাবহ ও দণ্ডনীয় হয়, ব্যাপকভাবে তাহা করিলে সেরূপ কিছু হয় না। দিল্লীর প্রাসাদ, আগ্রার প্রাসাদ এমন কি মানুষিক কীর্ত্তির রাণী তাজমহল পর্য্যন্ত এই রাজদস্যুগণের হস্ত হইতে রক্ষা পায় নাই।
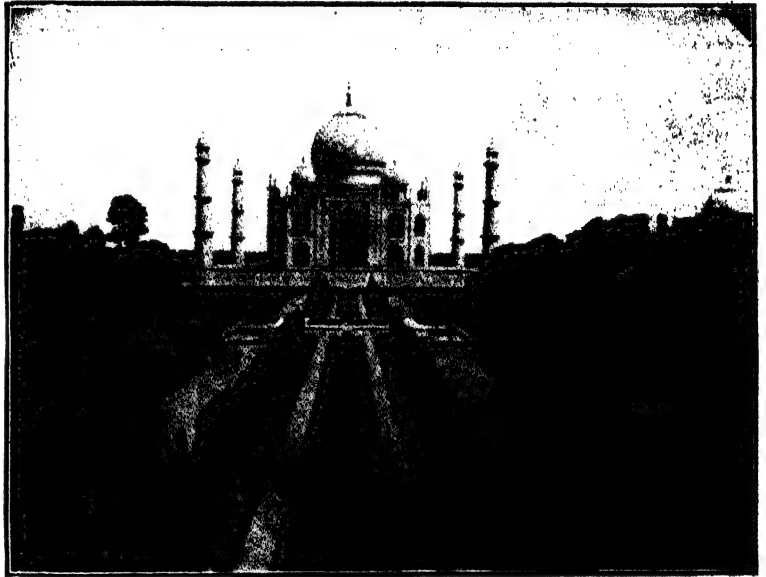
তাজের স্বপ্নসমাধি

মানুষের সৃষ্টি প্রয়াসকে উপেক্ষা করিতে পারা যায় না। প্রাকৃতিক শোভাকে মানুষ একটু দূর দূর ভাবে; কারণ সে প্রকৃতির নির্দ্দিষ্ট পথে চলে নাই। পর্ব্বতের একটা ভয়াবহ গাম্ভীর্য্য, একটা আত্মসমাহিত ভাব, মানুষিক সভ্যতাকে ভ্রূভঙ্গে তুচ্ছ করার প্রবণতা, অথবা নদীর আপন মনে গান এবং নৃত্যচ্ছন্দে অশ্রান্ত গতিকে মানুষ অসঙ্কোচে আপনার বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে নাই। তাহার মধ্যে নিরুদ্দেশের যাত্রী হওয়ার অতীন্দ্রিয় অনুভূতির ও ক্লান্তিহীন আহ্বানের সঙ্গে সঙ্গে মানব মন তাল ফেলিয়া চলিতে পারে না। তাই সেকেন্দ্রার সিংহ-দ্বারের অবর্ণনীয় কারুকার্য্য বা আগ্রার মতি মসজিদের সরল, মোহন মূর্ত্তি প্রভৃতি দেখিয়া

মনে হয় মানুষও সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি করিতে পারে ; তাহারও মনে এমন একটি কবিত্ব আছে যাহা ভূতলে স্বর্গখণ্ড রচনা করিতে পারে। সর্ব্বোপরি তাজমহলে এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে। মমতাজের প্রেমকরুণ স্মৃতিই অনন্ত ব্যাপিয়া একটি অখণ্ড স্বর্গরাজ্য সৃষ্টি করিয়াছে। পৃথিবীতে যত প্রেমিক, যত ভাবুক ও যত ব্যথার ব্যথী আছেন, তাঁহারা সকলে সেখানে সেই কল্পলোকের মানস অধিবাসী। মমতাজ ত নারী জীবনের শ্রেষ্ঠ সতেরটি বৎসর স্বামী সঙ্গে

জলকেলি—চুণার দুর্গপার্শ্বে

যাপন করিলেন, কিন্তু বিরহী সম্রাট কি করিয়া সারা জীবন একাকী যাপন করেন ? মমতাজ যাঁর—

"গেহে লক্ষ্মীরিয়মমৃতবর্ত্তির্নয়নয়োঃ
রসাবস্যাঃ স্পর্শো বপুষি বহুলশ্চন্দনরসঃ
অয়ং কণ্ঠে বাহুঃ শিশির মসৃণো মৌক্তিকসরঃ ॥"

অথবা তাঁহাকে যিনি "ত্বং জীবিতং, ত্বমসি মে হৃদয়ং দ্বিতীয়ং, ত্বং কৌমুদী নয়নয়োরমৃতং ত্বমঙ্গে" বলিয়া ডাকিতেন, তাঁহার কি জীবনের সঙ্গে সঙ্গেই সব ফুরাইয়া যায় ? তাহা ত যায় না। তাই প্রেয়সীর স্মৃতিকে অমর করিবার জন্য, নিজের প্রেমব্যাকুলতাকে একটা রূপ দিবার জন্য এই মর্ম্মর স্বপ্নের প্রতিষ্ঠা। সম্রাজ্ঞী আজ মৃত্যুর শীতল ক্রোড়ে চরমনিদ্রায় অভিভূতা কিন্তু শাহ্‌জাহানের প্রেম বোধহয় পরলোকেও তাঁহাকে অনুসরণ করিয়াছিল ; সেই জন্যই ত মৃত্যুকে বরণ করিয়াও তিনি অমর।

"জ্যোৎস্না রাতে নিভৃত মন্দিরে
প্রেয়সীরে,
যে নামে ডাকিতে ধীরে ধীরে—
সেই কানে কানে ডাকা রেখে গেলে এই খানে
অনন্তের কানে।"

সেই কানে কানে ডাকা আজও নীরব হয় নাই ; আজও প্রেমিকের উদাত্ত কণ্ঠস্বর অসীমে কাঁপিয়া কাঁপিয়া বলিতেছে, "ভুলি নাই, ভুলি নাই, প্রিয়া।" শাহ্‌জাহান বলিয়াছিলেন— "হৃদয়ের দেবতা একটি, চন্দ্রেরও সূর্য্য একটি ! পৃথিবীর তাজও একটি ।" এ 'নিদ্রিত সৌন্দর্য্যের' তুলনা নাই, হইতে পারেও না। তাজমহলের অনবদ্য মর্ম্মরকান্তি 'ফুটিল যা সৌন্দর্য্যের পুষ্পপুঞ্জে প্রশান্ত পাষাণে', 'ভাষার অতীত তীরে'. অন্তরতম অনুভূতির অরূপ রূপে হৃদয়ের নিভৃত নিলয়ে যার চিরন্তন প্রকাশ তাহাকে ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা বৃথা, ভাষা সেখানে মৌন, মূক। তাহাকে হৃদয় দিয়া উপলব্ধি করিতে হয়। এ 'মর্ম্মরীভূত শোকাশ্রু'কে পুনরায় তরল করিতে যাওয়ার চেষ্টা বৃথা। এ প্রেমের অমরাবতী এ 'বিয়োগের পাষাণ প্রতিমায়' হৃদয় মধ্যে একটি অশ্রুর সুর বিনা ভাষায়, বিনা ছন্দে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া রণিয়া উঠিতে লাগিল ; অভ্রচিক্কণ মেঘলেখা সেখানে বেদনাময় ছায়াপাত করিতে লাগিল। যমুনার অপর পারে প্রেমিক সম্রাটের ইচ্ছানুরূপ অপর কোন সৌধ নির্ম্মিত হয় নাই ; যমুনাও কোন মর্ম্মর সেতু বন্ধনে বাঁধা পড়ে নাই ; কিন্তু প্রেমিক যুগল পাশাপাশি স্থান পাইয়াছেন। জীবনে যাঁহাদের বিচ্ছেদ ঘটে নাই, মরণেও তাঁহারা একত্র মিলিত হইয়াছেন।

আমরা শেষবার তাজ দেখিলাম সন্ধ্যার পর সেতুর উপর হইতে। তখন চতুর্দ্দিক চন্দ্র কিরণে হাসিতেছে; যমুনার জলরাশি বিষাদে উদাস হইয়া বহিয়া যাইতেছে; দূরে তাজের শুভ্র নীরবতা আরও সুন্দর, আরও মধুর। কেবল সেই স্বপ্নালোকে একটা করুণ রহস্যের সৃষ্টি হইয়াছে। হয় ত রাজদম্পতীর আত্মা ওই প্রাসাদে এখনও পূর্ণিমা রজনীতে ঘুরিয়া বেড়ায়।

আমাদের সপ্তাহ-ব্যাপী ভ্রমণ কাহিনী শেষ হইয়া গেল। পরদিন চুনারে থাকিয়া আমরা প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

"ভ্রমণ-স্মৃতি" প্রবন্ধের চিত্রগুলি শ্রীযুক্ত আবুল হাসান কর্ত্তৃক গৃহীত আলোক-চিত্রের প্রতিলিপি।

বাসন্তী

শ্রীরমেশচন্দ্র দাস

বসন্তেরি প্রথম হাওয়া বইছে—
কোন্ বিরহীর গোপন কথা কইছে।
দীর্ঘশ্বাসের বুকের ব্যথা থাম্‌ল,
স্বর্গ হ'তে মন্দাকিনী নাম্‌ল।
ফুল্-ফোটানোর দিনটি যে ঐ ফির্‌ছে,
সুরের আলো চৌদিকে ঐ ঘির্‌ছে,
নীল্-আঁচলে আকাশখানি ঢাক্‌ল
রঙ-বেরঙে বনের পাতা আঁক্‌ল;
হাই-তোলা ঐ ফুলের হাওয়ার ছন্দে—
মন-উপসী! আজ্‌কে ওরে মন দে!

হাজার যুগের নতুন নেশা জাগ্‌ল,
মনের তারে সুরের পরশ লাগ্‌ল।
ছন্দ-চমক হাওয়ায় কত ফুট্‌ছে,
তাল-ফেরতার তালে তালে ছুট্‌ছে।
কোন্ দরদীর ডাগর চোখের চাউনি,
মনের বাগে কাঁপন নাচের ছাউনি;
মন ছোটে না হাঁটা পথের তীর্থে,
চায় যে শুধু ফুলঘরেতে ফির্‌তে।
বসন্তেরি প্রথম হাওয়া বইছে,
কোন্ বিরহীর গোপন কথা কইছে;

দ্বিতীয় খণ্ড

১

গ্রামের অন্নদা রায় মহাশয় সম্প্রতি বড় বিপদে পড়িয়াছেন।

গ্রামে জরীপ আসাতে উত্তর মাঠে তাঁবু পড়িয়াছে। জরীপের বড় কর্ম্মচারী মাঠের মধ্যে নদীর ধারে অফিস্ খুলিয়াছেন, ছোট খাটো আমলাও সঙ্গে আসিয়াছে বিস্তর। গ্রামের সকল ভদ্রলোকই কিছু জমিজমার মালিক, পিতৃপুরুষের অর্জ্জিত এই সব সম্পত্তির নিরাপদ কূলে জীবন-তরণীর লগি কসিয়া পুঁতিয়া গতিহীন, নিষ্কর্ম্মা অবস্থায় দিনগুলি একরূপ বেশই কাটিতেছিল, কিন্তু এবার সকলেই একটু বিপদগ্রস্থ হইয়া পড়িয়াছেন। রাম হয়তো শ্যামের জমি নির্ব্বিবাদে নিজের বলিয়া ভোগ করিয়া আসিতেছে, যদু দশ বিঘার খাজনা দিয়া বারো বিঘা নিরুপদ্রবে দখল করিতেছে, এতদিন যাহা পূর্ণ শান্তিতে নিষ্পন্ন হইতেছিল, এইবার সে সকলের মধ্যে গোলমাল পৌছিল। বিপদ একরূপ সার্ব্বজনীন হইলেও অন্নদা রায়ের বিপদ একটু অন্য ধরণের বা একটু বেশী গুরুতর। তাঁহার এক জ্ঞাতি ভ্রাতা বহুদিন যাবৎ পশ্চিম-প্রবাসী। এতদিন তিনি উক্ত প্রবাসী জ্ঞাতির আমকাঁটালের বাগান ও জমি নির্ব্বিঘ্নে ভোগ করিতেছিলেন এবং সম্পূর্ণ ভরসা ছিল জরীপের সময় পারিয়া উঠিলে সবই, অন্ততঃ পক্ষে কতকাংশ নিজের বলিয়া লিখাইয়া লইবেন, কিন্তু কি জানি গ্রামের কে উক্ত প্রবাসী জ্ঞাতিকে কি পত্র লিখিয়াছে—ফলে অদ্য দিন দশেক হইল জ্ঞাতি ভ্রাতার জ্যেষ্ঠপুত্রটি জরীপের সময় বিষয়-সম্পত্তি দেখাশোনা করিতে আসিয়াছে।

মুখের গ্রাস তো গেলই, তাহা ছাড়া বিপদ আরও আছে। ঐ আত্মীয়ের অংশের ঘরগুলিই বাড়ীর মধ্যে ভাল, রায় মহাশয় গত বিশবৎসর সেগুলি নিজে দখল করিয়া আসিতেছেন, সেগুলি ছাড়িয়া দিতে হইয়াছে—জ্ঞাতিপুত্রটা সৌখীন ধরণের কলেজের ছেলে, একখানিতে শোয়, একখানিতে পড়াশুনা করে—উপরের ঘরখানি হইতে লোহার সিন্দুক, বন্ধকী মাল, কাগজপত্রাদি সরাইয়া ফেলিতে হইয়াছে। নিচের যে ঘরে পালিত-পাড়া হইতে সস্তাদরে কেনা কড়িবরগা রক্ষিত ছিল, সে ঘরও শীঘ্র ছাড়িয়া দিতে হইবে।

বৈকাল বেলা। অন্নদা রায়ের চণ্ডীমণ্ডপে পাড়ার কয়েকটী লোক আসিয়াছেন—এই সময়েই পাশা খেলার মজলিস্ বসে। কিন্তু অদ্য এখনও কাজ মেটে নাই। অন্নদা রায় একে একে সমাগত খাতকপত্র বিদায় করিতেছিলেন।

উঠানে রোয়াকের ঠিক নীচেই একটি অল্পবয়সী কৃষক বধূ একটা ছোট ছেলে সঙ্গে অনেকক্ষণ হইতে ঘোমটা

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

দিয়া বসিয়াছিল, সে এইবার তাহার পালা আসিয়াছে ভাবিয়া দাঁড়াইল। রায় মহাশয়ে মাথা সাম্‌নে একটু নীচু করিয়া চশমার উপর হইতে তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন—কে! তোর আবার কি!

কৃষক-বধূটি আঁচলের খুঁট খুলিতে খুলিতে নিম্নকণ্ঠে বলিল—মুই কিছু টাকার যোগাড় করিচি অনেক কষ্টে, মোর টাকাডা নেন্—আর গোলার চাবীডা খুলিয়া গ্যান্, বড্ড কষ্ট যাচ্চে মনিব ঠাকুর, সে আর কি বল্‌বো—

অন্নদা রায়ের মুখ প্রসন্ন হইল, বলিলেন—হরি, নেওতো ওর টাকাটা গুণে? খাতা খানায় দেখো তারিখটা, সুদটা আর একবার হিসেব ক'রে দেখো—

কৃষক-বধূ আঁচলের খুঁট হইতে টাকা বাহির করিয়া হরিহরের সম্মুখে রোয়াকের ধারে রাখিয়া দিল। হরিহর গুণিয়া বলিল—পাঁচ টাকা?

রায় মশায় বলিলেন—আচ্ছা জমা ক'রে নাও—তার পর আর টাকা কৈ?

—ওই এখন গ্যান্ তার পর দোব—মুই গতর খাটিয়ে শোধ ক'রে তোল্‌বো, এখন ওই নিয়ে মোরে গোলার চাবীডা খুলিয়ে গ্যান্, মোর মাতোরে দুটো খেইয়ে তো আগে বাঁচাই, তারপর ঘরদোর ফুটো হ'য়ে গিয়েছে, সে না হয়—সে এমন নিরুদ্বেগে কথা বলিতেছিল যেন গোলার চাবী তাহার করতলগত হইয়াই গিয়াছে। রায় মহাশয়কে চিনিতে তাহার বিলম্ব ছিল।

রায় মহাশয় কথা শেষ করিতে না দিয়াই বলিলেন—ওঃ ভারী যে দেখচি মাগীর আবদার—চল্লিশ টাকার কাছাকাছি সুদে আসলে বাকী, পাঁচ টাকা এনিচি নিয়ে গোলা খুলে গ্যান্, ছোট লোকের কাণ্ডই আলাদা—যা এখন দুপুর বেলা দিক্ করিস্ নে—

কৃষক-বধূ চণ্ডীমণ্ডপের অন্য কাহারও বোধ হয় অপরিচিতা নহে, দীনু ভট্টাচার্য্যি চোখে ভাল দেখিতেন না, বলিলেন—কে ও অন্নদা?

—ওই ওপাড়ার তম্‌রেজের বৌ—দিন চারেক হোল তম্‌রেজ না মারা গিয়েচে? সুদে আসলে চল্লিশ টাকা বাকী, তাই মঙ্গলবার দিনই বিকেল থেকে গোলায় চাবী দিয়ে রেখেচি, এখন গোলা খুলিয়ে দিন্—হেন্ করুন—তেন করুন—

পায়ের তলা হইতে মাটী সরিয়া গেলেও তম্‌রেজের বৌ অত চম্‌কিয়া উঠিত না—সে ব্যাপারটা এখন অনেকটা বুঝিল, আগাইয়া আসিয়া বলিল—ও কথা বলবেন না মনিব ঠাকুর, মোর খোকার একটা রূপোর নিমফল ছেল, ও বছর গড়িয়ে দিইছিল তাই ভোঁদা সেক্‌রার দোকানে বিক্রী কল্লে পাঁচটা টাকা দেলে—ছেলে মানুষের জিনিস ব্যাচবার ইচ্ছে ছেল না, তা কি করি এখন তো ওকে দুটো খেইয়ে বাঁচি, ভাবলাম এরপর দিন দেন মালিক তো মোর বাছারে মুই আবার নিমফল গড়িয়ে দেবো? তা দেন মনিব ঠাকুর, চাবিডা গিয়ে—

—যা যা এখন যা—এ সব টাকাকড়ির কাণ্ড কি নাকে কাঁদ্‌লেই মেটে—তা মেটে না। সে তুই কি বুঝ্‌বি, থাক্‌তো তোর সোয়ামী তো বুঝতো, যা এখন দিক্ করিস্ নি—ওই পাঁচটাকা তোর নামে জমা রৈল—বাকী টাকা নিয়ে আয় তারপর দেখা যাবে—

অন্নদা রায় চশ্‌মা খুলিয়া খাপের মধ্যে পুরিতে পুরিতে উঠিয়া পড়িলেন ও বাড়ীর ভিতরে চলিয়া যাইবার উদ্যোগ করিলেন। তম্‌রেজের বৌ আকুলস্বরে বলিয়া উঠিল—কনে যান্ ও মনিব ঠাকুর। মোর খোকার একটা উপায় ক'রে যান, ওরে মুই খাওয়াবো কি, এক পয়সার মুড়ি কিনে দেবার যে পয়সা নেই—মোর গোলা না খুলে গ্যান্, মোর টাকা কডা মোরে ফেরৎ গ্যান্—

রায় মহাশয় মুখ খিঁচাইয়া বলিলেন—যা যা সন্দে বেলা মাগী ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ করিস নে—এক মুঠো টাকা জলে যাচ্চে তার সঙ্গে খোঁজ নেই, গোলা খুলে গ্যাও, টাকা ফেরৎ দাও—গোলায় আছে কি তোর? জোর শলি চারেক ধান, তাতে টাকা শোধ যাবে? ও পাঁচ টাকাও উসুল হ'য়ে রৈল, আমার টাকা আমি দেখ্‌বো না! ওঁর ছেলে কি খাবে ব'লে গ্যাও—ছেলে কি খাবে তা আমি কি জানি? যা পারিস্ তো নালিশ ক'রে খোলাগে যা—

রায় মশায় বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেলে দীনু ভট্‌চার্য্যি বলিলেন—হাঁগা বৌ, তম্‌রেজ কদিন হোল, কৈ তা তো—

বুধবারের দিন বাবা ঠাকুর হাট থে ভাঙন মাছ আন্‌লে, পেঁয়াজ দিয়ে রাঁধলাম—ভাত দেলাম—সক্ক মানুষ ভাত্র খালে দিবা—খেয়ে বল্‌লে মোর শীত কর্‌চে, কাঁথা চাপা দিয়ে দ্যাও, দেলাম—ওমা পঁইতে তারা উঠ্‌তি না উঠ্‌তি মানুষ দেখি আর সাড়াশব্দ দেয় না, ডুপুর হতি না হতি মোরে পথে বসিয়ে—মোর খোকারে পথে বসিয়ে—চোখের জলে তাহার গলা আট্‌কাইয়া গেল। মিনতির সুরে বলিল—আপনারা এট্টু বলেন—ব'লে গোলার চাবিটা দিইয়ে দ্যান, সংসারের বড্ড কষ্ট হয়েচে—কর্জ্জ কি মুই বাকী রাখ্‌বো—যে ক'রে হোক্—

দীনু বলিলেন, কে বলতে যাবে বাপু, জানোই তো সব—দ্যাখো যদি—এই সময়ে নবাগত জ্ঞাতি-পুত্রটী আসিয়া পড়াতে কথাবার্ত্তা বন্ধ হইল। দীনু বলিলেন—এস হে নীরেন বাবাজি, মাঠের দিকে বেড়াতে গিয়েছিলে বুঝি?... এই তোমার বাপ ঠাকুরদাদার দেশ বুঝ্‌লে হে, কি রকম দেখ্‌লে বল?

নীরেন একটু হাসিল। তাহার বয়স একুশ বাইশের বেশী নয়, বেশ বলিষ্ঠ গড়ন, সুপুরুষ। কলিকাতা কলেজে আইন পড়ে, অত্যন্ত মৌনী প্রকৃতির মানুষ—কাজ-কর্ম্ম দেখিবার জন্য পিতা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইলেও কাজকর্ম্ম সে কিছুই দেখে না, বোঝেও না, দিন রাত নভেল পড়িয়া ও বন্দুক ছুঁড়িয়া কাটায়। সঙ্গে একটী বন্দুক আনিয়াছে, শিকারের ঝোঁক খুব।

নীরেন উপরে নিজের ঘরে ঢুকিতে গিয়া দেখিল, গোকুলের স্ত্রী ঘরের মেজেতে বসিয়া পড়িয়া মেজে হইতে কি খুঁটিয়া খুঁটিয়া তুলিতেছে। দোরের কাছে যাইতেই তাহার নজর পড়িল তাহার দামী বিলাতী আলোটা মেজেতে বসানো। উহার কাঁচের ডুমটা ভাঙিয়া চুরমার হইয়াছে, সারা মেজেতে কাঁচ ছড়ানো। দোরের কাছে জুতার শব্দ পাইয়া গোকুলের স্ত্রী চম্‌কাইয়া পিছন ফিরিয়া চাহিল, সে আঁচল পাতিয়া মেজে হইতে কাঁচের টুক্‌রাগুলি খুঁটিয়া খুঁটিয়া তুলিতেছিল,—ভাবে মনে হয় সে প্রতিদিনের মত ঘর পরিষ্কার করিতে আসিয়া আলোটি জ্বালিতে গিয়াছিল, কি করিয়া ভাঙিয়া ফেলিয়াছে, এবং আলোর মালিক আসিবার পূর্ব্বেই নিজের অপরাধের চিহ্নগুলি তাড়াতাড়ি সরাইয়া ফেলিবার চেষ্টায় ছিল হঠাৎ বামাল ধরা পড়িয়া অত্যন্ত অপ্রতিভ হইল।

ক্ষতিকারিণীর লজ্জার ভারটা লঘু করিয়া দিবার জন্যই নীরেন হাসিয়া বলিয়া উঠিল—এই যে বৌদি, আলোটি ভেঙে ব'সে আছেন বুঝি? এই দেখুন ধরা প'ড়ে গেলেন, জানেন তো আইন পড়ি? আচ্ছা এখন একটু চা ক'রে নিয়ে আসুন তো বৌদি চট্ ক'রে, দেখি কেমন কাজের লোক? দাঁড়ান আলোটা জ্বেলেনিই, ভাগ্যিস্ বাক্সে আর একটা ডুম্ আছে? নৈলে আপনি বৌদি—ঐ খানেই সে কথাটা শেষ করিয়া ফেলিল।

গোকুলের স্ত্রী সলজ্জসুরে বলিল, দেশ্‌লাই আন্‌বো ঠাকুর পো?

নীরেন কৌতুকের সুরে বলিল—দেশলাই আনেন নি তবে আলো পেড়ে কি করছিলেন শুনি?

বধূ এবার হাসিয়া ফেলিল, নিম্নসুরে বলিল—ঝুল্ প'ড়ে রয়েচে, ভাবলাম একটু মুছে দিই তা যেমন কাঁচটা নামাতে গেলাম কি জানি ও সব ইংরিজি কলের আলো—কথা শেষ না করিয়াই সে পুনরায় সলজ্জ হাসিয়া নীচে পলাইল।

নীরেন দশ বারো দিন আসিয়াছে বটে, সম্পর্কে বৌদিদি হইলেও গোকুলের স্ত্রীর সঙ্গে তাহার বিশেষ আলাপ হয় নাই। কাঁচ ভাঙ্গার সন্ধ্যা হইতে কিন্তু উভয়ের মধ্যে নূতন পরিচয়ের সঙ্কোচটা কাটিয়া গেল। নীরেন অবস্থাপন্ন পিতার পুত্র, তাহার উপর বাংলাদেশের পাড়াগাঁয়ে এই প্রথম আসা, নিঃসঙ্গ, আনন্দহীন প্রবাসে দিন কাটিতে চাহিতেছিল না। সমবয়সী বৌদিদির সহিত পরিচয়ের পথটা সহজ হইয়া যাওয়ার পর সকাল সন্ধ্যায় চা-পানের সময়টি সহজ আদান-প্রদানের মাধুর্য্যে আনন্দপূর্ণ হইয়া উঠিল।

সকালে সেদিন দুর্গা বেড়াইতে আসিল। রান্নাঘরের দুয়ারে উঁকি মারিয়া বলিল—কি রাঁধ্‌চো ও খুড়ীমা? বধূ বলিল—আয় মা আয়, একটা কাজ ক'রে দিবি লক্ষ্মীটি? আয় মাছগুলো কুটে দিবি? একা আর পেরে উঠ্‌চিনে। দুর্গা মাঝে মাঝে যখনই আসে, খুড়ীমার কার্য্যে সাহায্য করে। সে মাছ কুটিতে কুটিতে বলিল—হ্যাঁ খুড়ীমা, এ কাঁক্‌ড়া কোথায় পেলে? এ কাঁকুড়া তো খায় না?

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

—কেন খাবে না রে ? দূর ! বিধু জেলেনী ব'লে গেল এ কাঁকড়া সবাই খায়—

হ্যাঁ খুড়ীমা, ওমা সেকি, একি তুমি কিন্‌লে ?

—কিন্‌লামই তো, ওই অতগুলো পাঁচ পয়সায় দিয়েচে বিধু

দুর্গা কিছু বলিল না। মনে মনে ভাবিল—খুড়ীমার আর সব ভাল, কেবল একটু বোকা ; এ কাঁকড়া আবার পয়সা দিয়ে কেনেই বা কে, খায়ই বা কে ? ভাল মানুষ পেয়ে বিধু ঠকিয়ে নিয়েচে। সঙ্গে সঙ্গে সরলা খুড়ীমার উপর তাহার অত্যন্ত স্নেহ হলো। সে দিন নাকি গোকুল কাকা খুড়ীমার মাথায় খড়মের বাড়ী মারিয়াছিল, স্বর্ণ গোয়ালিনী তাহাদের বাড়ী গল্প করে। সেও সে দিন নদীর ঘাটে স্নান করিতে গিয়াছিল—খুড়িমা স্নান করিতে আসিয়া মাথা ডুবাইয়া স্নান করিল না, পাছে জ্বালা করে। সে দিন দুঃখে তাহার বুক ফাটিয়া যাইতেছিল. কিন্তু কিছু বলে নাই পাছে খুড়ীমা অপ্রতিভ হয় কি একঘাট লোকের সাম্‌নে লজ্জা পায়। তবুও রায় জেঠী জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—বৌমা নাইলে না? খুড়ীমা হাসিয়া উত্তর দিল—নাবো না আজ আর দিদিমা, শরীরটা ভাল নেই। খুড়ীমা বুঝি ভাবিয়াছিল তাহার মার খাওয়ার কথা কেউ জানে না। কিন্তু খুড়ীমা ঘাট হইতে উঠিয়া গেলেই রায় জেঠী বলিল—দেখেচো বৌটাকে কিরকম মেরেচে গোকৃলো, মাথার চুলে রক্ত একেবারে আটা হ'য়ে এঁটে আছে!—রায় জেঠীর ভারি অন্যায়, জানো তো বাপু তবে আবার জিজ্ঞেস্ করাই বা কেন, সকলকে বলাই বা কেন ?

মাছ ধুইয়া রাখিয়া চলিয়া যাইবার সময় দুর্গা ভয়ে ভয়ে বলিল—খুড়ীমা তোমাদের চিঁড়ের ধান আছে ? মা বল্‌ছিল অপু চিঁড়ে খেতে চেয়েছে, তা আমাদের তো এবার ধান কেনা হয়নি। গোকুলের বৌ চুপি চুপি বলিল—আসিস্ এখন দুপুরের পর। দালানের দিকে ইসারায় দেখাইয়া কহিল—ঘুমুলে আসিস্. একটু দাঁড়া। পরে সে রান্নাঘরের ঝুলন্ত শিকা হইতে গোটাকতক নারিকেলের নাড়ু পাড়িয়া হাতে দিয়া বলিল—দুটো অপুকে দিস্,দুটো তুই খেয়ে যা। জলদি খাইতে খাইতে দুর্গা জিজ্ঞাসা করিল—খুড়ীমা, তোমাদের বাড়ী কে এসেছে, আমি একদিনও দেখিনি।—ঠাকুরপোকে দেখিস্‌নি ? এখন নেই.কোথায় বেরিয়েচে,বিকেলবেলা আসিস্ আস্‌বে এখন—পরে গোকুলের বউ হাসিয়া বলিল—তোর সঙ্গে ঠাকুরপোর বিয়ে হলে দিব্বি মানায়! দুর্গা লজ্জায় রাঙা হইয়া বলিল—দূর্—

গোকুলের বৌ আবার হাসিয়া বলিল—কেন রে,দূর কেন? কেন আমার মেয়ে কি খারাপ? দেখি? পরে সে দুর্গার চিবুকে হাত দিয়া মুখখানা একটু উঁচু করিয়া তুলিয়া ধরিয়া বলিল—গ্যাখ্ তো এমন টুকটুকে শান্ত মুখখানি হোলই বা বাপের পয়সা নেই। দুর্গা ঝাঁকুনি দিয়া নিজেকে ছাড়াইয়া লইয়া কহিল—যাও, খুড়ীমা যেন কি—পরে সে একপ্রকার ছুটিয়াই খিড়কী দোর দিয়া বাহির হইয়া গেল। যাইতে যাইতে সে ভাবিল—খুড়ীমার আর সব ভাল, কেবল একটু বোকা, নৈলে গ্যাখো না ? দূর !

দুর্গা চলিয়া যাইতে না যাইতে স্বর্ণ গোয়ালিনী দুধ দুহিতে আসিল। বধূ ঘর হইতে বলিল—ও স্বর্ণ, আমার হাত জোড়া, বাছুরটা অই বাইরের উঠোনে পিটুলি গাছে বাঁধা আছে নিয়ে আয়, আর রোয়াকে ঘটিটা মাজা আছে গ্যাখ্। সখী ঠাক্‌রুণের এতক্ষণে পূজাহ্নিক সমাপ্ত হইল। তিনি বাহিরে আসিয়া উত্তর দিকে স্থানীয় কালী মন্দিরের দিকে মুখ ফিরাইয়া উদ্দেশে প্রণাম করিতে করিতে টানিয়া টানিয়া আবৃত্তির সুরে বলিতে লাগিলেন—দোহাই মা সিদ্ধেশ্বরী, দিন দিওমা মা, ভব সমুদ্দুর পার কোরো মা—মা রক্ষেকালী, রক্ষে কোরো মাগো—

গোকুলের বৌ রান্নাঘর হইতে ডাকিয়া বলিল—ও পিসিমা, নারকোলের নাড়ু রেখে দিইচি খেয়ে জল খান—

হঠাৎ সখীঠাক্‌রুণ রোয়াক্ হইতে ডাক দিলেন—বৌমা, দেখে যাও এদিকে।

স্বর শুনিয়া গোকুলের বৌএর প্রাণ উড়িয়া গেল। সখীঠাক্‌রুণকে সে যমের মত ভয় করে, মায়াদয়া বিতরণ সম্বন্ধে ভগবান সখীঠাক্‌রুণের প্রতি কোনো পক্ষপাতিত্ব দেখান নাই, একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। রোয়াকের কোনে জড়ো-করা মাজা বাসনগুলির উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া তিনি কি দেখিতেছেন আঙুল দিয়া দেখাইয়া কহিলেন—গ্যাখো তো চক্ষু দিয়ে—দেখ্‌তে পাচ্ছো ?

একেবারে সপষ্ট জলের দাগ্‌ দেখ্‌লে তো? এই খেন থেকে সন্ন ঘটা তুলে নিয়ে গিয়েচে তার পর সেই শূদ্দূরের ছোঁয়া এঁটো বাসন আবার হেঁসেলে নিয়ে সাত রাজ্যি মজানো হয়েচে, যাঃ জাতজন্মো একে বারে গেল!

সখী ঠাকৃরুণ হতাশভাবে রোয়াকে বসিয়া পড়িলেন। উপযুক্ত পুত্রের মৃত্যুসংবাদ পাইলে ইহার বেশী হতাশ তিনি হইতে পারিতেন না।

হা'ঘরে হাড়হাভাতে ঘরের মেয়ে আন্‌লেই অমনি হয়, ভদ্দরলোকের রীত্‌ শিখ্‌বে কোথা থেকে, জান্‌বে কোথা থেকে? বাসন মাজ্‌লি তা দেখ্‌লি নে এঁটো গেল কি রৈল? তিনপহর বেলা হয়েচে, ভাব্‌লাম একটু জল মুখে দি শূদ্দূরের এঁটো, একখুনি নেয়ে মর্তে হোত, তা ভাগ্যিস ঘটিটা ছুঁই নি।

গোকুলের বৌ বিষণ্ণমুখে দাঁড়াইয়া ভাবিতেছিল কেন মত্তে সন্ন পোড়ারমুখীকে ঘটা তুলে নিতে বল্লাম, নিজে দিলেই হোত!

সখীঠাকৃরুণ মুখ খিঁচাইয়া বলিলেন—ধিঙ্গী সেজে দাঁড়িয়ে রৈলে যে? যাও হাঁড়িকুড়ি ফেলে দাও গিয়ে—বাসন কোসন মেজে আনো ফের্‌। রান্নাঘর গোবর দিয়ে নেয়ে এসো, যত লক্ষ্মীছাড়া ঘরের মেয়ে জুটে সংসারটা ছারে খারে দিলে? সখীঠাকৃরুণ রাগে গর্‌গর করিতে করিতে ঘরে ঢুকিলেন, বাহিরের খর রৌদ্র তাঁহার সহ্য হইতেছিল না।

হুকুম মত সকল কাজ সারিতে বেলা একেবারে পড়িয়া গেল। নদীতে সে যখন পুনরায় স্নান করিতে গেল, তখন রৌদ্রে, ক্ষুধাতৃষ্ণায় ও পরিশ্রমে তাহার মুখ শুকাইয়া ছোট হইয়া গিয়াছে। ঘাটে বৈকালের ছায়া খুব ঘন, ওপারের বড় শিমুল গাছটায় রোদ চিক্‌ চিক্‌ করিতেছে। নদীর বাঁকে একখানা পাল-তোলা নৌকা দাঁড় বাহিয়া বাঁক ঘুরিয়া যাইতেছে, হালের কাছে একজন লোক দাঁড়াইয়া কাপড় শুকাইতেছে, কাপড়টা ছাড়িয়া দিয়াছে, বাতাসে নিশানের মত উড়িতেছে। মাঝ নদীতে একটা বড় কচ্ছপ মুখ তুলিয়া নিঃশ্বাস লইয়া আবার ডুবিয়া গেল—সোঁ-ও-ও-ও-ভুস্‌! নদীর জলের কেমন একটা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা সুন্দর গন্ধ আসে; ছোট্ট নদী, ওপারের চরে একটা পানকৌড়ি মাছ-ধরা বাঁশের দোয়াড়ির উপর বসিয়া আছে।

এই সময় প্রতিদিন তাহার শৈশবের কথা মনে পড়ে।

পান কৌড়ি, পান কৌড়ি, ডাঙায় ওঠোসে—

গোকুলের বৌ খানিকক্ষণ পানকৌড়ির দিকে চাহিয়া রহিল। মায়ের মুখ মনে পড়ে। সংসারে আর কেহ নাই যে মুখের দিকে চায়। মায়ের কি মরিবার বয়স হইয়াছিল? গরীব পিতৃকুলে কেবল এক গাঁজাখোর ভাই আছে, সে কোথায় কখন থাকে, তার ঠিকানা নাই; গত বৎসর পূজার সময় এখানে আসিয়া দুদিন ছিল। সে লুকাইয়া লুকাইয়া তাহাকে নিজের বাক্স হইতে যাহা সামান্য কিছু পুঁজি সিকিটা, দুয়ানিটা বাহির করিয়া দিত। পরে একদিন সে হঠাৎ এখান হইতে চলিয়া যায়। চলিয়া গেলে প্রকাশ পাইল যে এক কাবুলী আলোয়ান-বিক্রেতার নিকট একখানি আলোয়ান ধারে কিনিয়া তাহার খাতায় ভগ্নীপতির নাম লিখাইয়া দিয়াছে। তাহা লইয়া অনেক হৈ চৈ হইল। পিতৃকুলের অনেক সমালোচনা, অনেক অপমান—ভাইটির সেই হইতে আর কোনো সন্ধান নাই।

নিঃসহায়, ছন্নছাড়া ভাইটার জন্য সন্ধ্যাবেলা কাজের ফাঁকে মনটা হুহু করে। নির্জ্জন মাঠের পথের দিকে চাহিয়া মনে হয়, গৃহহারা পথিক ভাইটা হয়তো এতক্ষণে দূরের কোন্‌ জনহীন আঁধার মেঠো পথ বাহিয়া একা কোথায় চলিয়াছে, রাত্রে মাথা গুঁজিবার স্থান নাই, মুখের দিকে চাহিবার কোনো মানুষ নাই।

বুকের মধ্যে উদ্বেল হইয়া ওঠে, চোখের জলে ছায়াভরা নদীজল, মাঠ, ঘাট, ওপারের শিমুল গাছটা, বাঁকের মোড়ের সেই বড় নৌকাখানা সব ঝাপসা হইয়া আসে।

অপু সেদিন জেলেপাড়ায় কড়ি খেলিতে গিয়াছিল। বেলা দুই বা আড়াইটার কম নহে, রৌদ্র অত্যন্ত প্রখর। প্রথমে সে তিনকড়ি জেলের বাড়ী গেল। তিনকড়ির ছেলে বঙ্কা পেয়ারাতলায় বাখারী চাঁচিতেছিল, অপু বলিল ওই, কড়ি খেল্‌বি? খেলিবার ইচ্ছা থাকিলেও বঙ্কা বলিল

তাহাকে এখনই নৌকায় যাইতে হইবে, খেলা করিতে গেলে বাবা বকিবে। সেখান হইতে সে গেল রামচরণ জেলের বাড়ী। রামচরণ দাওয়ায় বসিয়া তামাক খাইতেছিল, অপু বলিল—হৃদে বাড়ী আছে? রামচরণ বলিল—হৃদেকে কেন ঠাকুর? কড়ি খেলা বুঝি? এখন যাও, হৃদে বাড়ী নেই—

ঠিক দুপুর বেলায় ঘুরিয়া অপুর মুখ রাঙা হইয়া গেল। আরও কয়েক স্থানে বিফল মনোরথ হইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে বাবুরাম পাড়ইয়ের বাড়ীর নিকটবর্ত্তী তেঁতুলতলার কাছে আসিয়াই তার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তেঁতুলতলায় কড়িখেলার আড্ডা খুব জমিয়াছে! সকলেই জেলেপাড়ার ছেলে, কেবল ব্রাহ্মণ পাড়ার ছেলের মধ্যে আছে পটু। অপুর সঙ্গে পটুর তেমন আলাপ নাই কারণ পটুর যে পাড়ায় বাড়ী, অপুদের বাড়ী হইতে তাহা অনেক দূর। অপুর চেয়ে বয়সে পটু অনেক ছোট, অপুর মনে আছে প্রথম যেদিন সে প্রসন্ন গুরু মশায়ের পাঠশালায় ভর্ত্তি হইতে যায় এই ছেলে-টাকেই সে শান্তভাবে বসিয়া তালপাতা মুখে পুরিয়া চিবাইতে দেখিয়াছিল। অপু কাছে গিয়া বলিল—কটা কড়ি? পটু কড়ির গেঁজে বাহির করিয়া দেখছিল। রাঙা সূতার বুনানি ছোট্ট গেঁজেটি,—তার অত্যন্ত সখের জিনিস। বলিল সতেরোটা এনিচি—সাতটা সোনা গেঁটে—হেরে গেলে আরও আন্‌বো—পরে সে গেঁজেটা দেখাইয়া হাসিমুখে কহিল—কেমন, গেঁজেটা একপণ কড়ি ধরে—

খেলা আরম্ভ হইল। প্রথমটা পটু হারিতেছিল, পরে জিততে সুরু করিল। কয়েকদিন মাত্র আগে পটু আবিষ্কার করিয়াছে যে কড়িখেলায় তাহার হাতের লক্ষ্য অব্যর্থ হইয়া উঠিয়াছে, সেই জন্যই সে দিগ্বিজয়ের উচ্চাশায় প্রলুব্ধ হইয়া এতদূর আসিয়াছিল। খেলার নিয়মানুসারে পটু উপর হইতে টুক্ করিয়া বড় কড়ি দিয়া মারিয়া ছক্ কাটা ঘরের সব কড়ি জিতিয়া লইলে থাক্ ঠিক করিয়া মারিতেই যেমন একটা কড়ি বোঁ করিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া যায়, অমনি পটুর মুখ অসীম আহ্লাদে উজ্জ্বল হইয়া ওঠে। পরে সে জিতিয়া পাওয়া কড়িগুলি তুলিয়া গেঁজের মধ্যে পুরিয়া লোভে ও আনন্দে বার বার গে

দিকে চাহিয়া দেখে, সেটা ভর্ত্তি হইবার আর কত বাকী।

কয়েকজন জেলের ছেলে কি পরামর্শ করিল। একজন পটুকে বলিল—আর এক হাত তফাৎ থেকে তোমায় মারতে হবে ঠাকুর, তোমার হাতে টিপ্ বেশী —

পটু বলিল—বারে তা কেন—টিপ বেশী তাই কি? তোমরাও জেতোনা, আমি তো কাউকে বারণ করিনি—

পরে সে চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, জেলের ছেলেরা সব একদিকে হইয়াছে। পটু ভাবিল—এত বেশী কড়ি আমি কোনোদিন জিতি নি, আজ আর খেল্‌চি নে—খেল্লে কি এই কড়ি বাড়ি নিয়ে যেতে পারবো? আবার একহাত বাধ্ বেশী! সব হেরে যাব। হঠাৎ সে কড়ির ছোট্ট থলিটি হাতে লইয়া বলিল—আমি এক হাত বেশী নিয়ে খেল্‌বো না, আমি বাড়ী যাচ্ছি। পরে জেলের ছেলেদের ভাবভঙ্গী ও চোখের নিষ্ঠুর দৃষ্টি দেখিয়া সে নিজের অজ্ঞাতসারে নিজের কড়ির থলিটি শক্ত মুঠায় চাপিয়া রাখিল।

একজন আগাইয়া আসিয়া বলিল—তা হবে না ঠাকুর, কড়ি জিতে পালাবে বুঝি? পরে সে হঠাৎ পটুর থলিশুদ্ধ হাতটা চাপিয়া ধরিল। পটু ছাড়াইয়া লইতে গেল কিন্তু জোরে পারিল না, বিষণ্নমুখে বলিল—বারে, ছেড়ে দাও না আমার হাত? পিছন হইতে কে একজন তাহাকে ঠেলা মারিল সে পড়িয়া গেল বটে, কিন্তু কড়ির থলি ছাড়িল না—সে বুঝিয়াছে এইটিই কাড়িবার জন্য ইহাদের চেষ্টা। পড়িয়া গিয়া সে প্রাণপণে থলিটা পেটের কাছে চাপিয়া রাখিতে গেল কিন্তু একে সে ছেলেমানুষ, তাহাতে গায়ের জোরও কম, জেলেপাড়ার বলিষ্ঠ ও তাহার চেয়ে বয়সে বড় ছেলেদের সঙ্গে কতক্ষণ পারিবে! চারিধার হইতে ঘিরিয়া তাহাকে মারিতে সুরু করিল—চারিদিকের উদ্যত আক্রমণ সাম্‌লাইতে সে দিশাহারা হইয়া পড়িল। এক জনকে ঠেকাইতে যায়, আর দিক হইতে মারে; হাত হইতে কড়ির থলিটা অনেকক্ষণ কোন্ ধারে ছিট্‌কাইয়া পড়িয়াছিল—কড়িগুলি চারিধারে ছত্রাকার হইয়া গেল; অপু প্রথমটা পটুর দুর্দ্দশায় একটু যে খুসী না

হইয়াছিল তাহা নহে, কারণ সেও অনেক কড়ি হারিয়াছে। কিন্তু পটুকে পড়িয়া যাইতে দেখিয়া, বিশেষ করিয়া তাহাকে অসহায়ভাবে পড়িয়া মার খাইতে দেখিয়া তাহার বুকের মধ্যে কেমন করিয়া উঠিল—সে ভিড় ঠেলিতে ঠেলিতে আগাইয়া গিয়া বলিল—ছেলেমানুষ ওকে তোমরা মারচ কেন? বারে, ছেড়ে দাও—ছাড়ো! পরে সে পটুকে মাটী হইতে উঠাইতে গেল, কিন্তু পিছন হইতে কাহার হাতের ঘুসি খাইয়া খানিকক্ষণ সে চোখে কিছু দেখিতে পাইল না, ঠেলাঠেলিতে পড়িয়াও গেল।

অপুকেও সেদিন বেদম প্রহার খাইতে হইত নিশ্চয়ই, কারণ তাহার মেয়েলি ধরণের হাতে পায়ে কোনো জোর ছিল না; কিন্তু ঠিক সেই সময়ে নীরেন এই পথে আসিয়া পড়াতে বিপক্ষদল সরিয়া পড়িল। পটুর লাগিয়াছিল খুব বেশী, নীরেন তাহাকে মাটী হইতে উঠাইয়া গায়ের ধূলা ঝাড়িয়া দিল—একটু সাম্‌লাইয়া লইয়াই সে চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল—ছড়ানো কড়িগুলার দু একটী ছাড়া বাকীগুলি অদৃশ্য, মায় কড়ির থলিটি পর্য্যন্ত! পরে সে অপুর কাছে সরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—অপু দা, তোমার লাগে নি? এতদূরে ঠিক দুপুর বেলা জেলের ছেলেদের দলে মিশিয়া কড়ি খেলিতে আসিবার জন্য নীরেন দুজনকেই বকিল। সময় কাটাইবার জন্য নীরেন পাড়ার ছেলেদের লইয়া অন্নদা রায়ের চণ্ডীমণ্ডপে পাঠশালা খুলিয়াছিল, সেখানে গিয়া কাল হইতে পড়িবার জন্য দুজনকেই বার বার বলিল। পটু চলিতে চলিতে শুধুই ভাবিতেছিল—কেমন সুন্দর কড়ির গেঁজেটা আমার, সে দিন অত ক'রে ছিবাসের কাছে চেয়ে নিলাম—গেল! আমি যদি কড়ি জিতে আর না খেলি তা ওদের কি? সে তো আমার ইচ্ছে—

মধুসংক্রান্তির ব্রতের পূর্ব্বদিন সর্ব্বজয়া ছেলেকে বলিল—কাল তোর মাষ্টার মশায়কে নেমন্তন্ন ক'রে আসিস্—বলিস দুপুর বেলা এখানে খেতে;

মোটা চালের ভাত, পেঁপের ডাল্‌না, ডুমুরের সুক্তনি, থোড়ের ঘণ্ট, চিংড়ি মাছের ঝোল, কলার বড়া ও পায়েস। দুর্গাকে তাহার মা পরিবেশন কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছে, নিতান্ত আনাড়ি—ভয়ে ভয়ে এমন সন্তর্পণে সে ডালের বাটী নিমন্ত্রিতের সম্মুখে রাখিয়া দিল—যেন তাহার ভয় হইতেছে এখনি কেহ বকিয়া উঠিবে। অত মোটা চালের ভাত নীরেনের খাওয়া অভ্যাস নাই, এত কম তৈল ঘৃতে রান্না তরকারী কি করিয়া লোকে খায়, তাহা সে জানে না। পায়েস পান্‌সে—জল-মিশানো দুধের তৈরী, একবার মুখে দিয়াই পায়েস ভোজনের উৎসাহ তাহার অর্দ্ধেক কমিয়া গেল। অপু কিন্তু মহা খুসি ও উৎসাহসহকারে খাইতেছিল; এত সুখাদ্য তাহাদের বাড়ীতে বৎসরে দু একদিন মাত্র হয়—আজ তাহার উৎসবের দিন। বেশ খেতে হয়েচে না? আপনি আর একটু পায়েস নিন্ মাষ্টার মশায়—নিজে সে এটা ওটা বার বার মায়ের কাছে চাহিয়া লইতেছিল।

বাড়ী ফিরিলে গোকুলের বৌ হাসিমুখে বলিল—দুগ্‌গাকে পছন্দ হয় ঠাকুর পো? দিব্যি দেখতে শুন্‌তে. আহা, গরীবের ঘরের মেয়ে, বাপের পয়সা নেই, কার হাতে যে পোড়বে? সারা জীবন পোড়ে পোড়ে ভুগবে—তা তুমি ওকে কেন নেও না ঠাকুরপো, তোমাদেরই পাল্‌টি ঘর—মেয়েও দিব্যি, ভাই বোনের দুজনেরই কেমন বেশ পুতুল পুতুল গড়ন—

জরীপের তাঁবু হইতে ফিরিতে গিয়া নীরেন সে দিন গ্রামের পিছনের আমবাগানের পথ ধরিয়াছিল। একটা বনে-ঘেরা সরু পথ বহিয়া আসিতে আসিতে দেখিল বাগানের ভিতর হইতে একটি মেয়ে সম্মুখের পথের উপর আসিয়া উঠিতেছে। সে চিনিল—অপুর বোন্ দুর্গা। জিজ্ঞাসা করিল—কি খুকী, তোমাদের বাগান বুঝি এইটে?

দুর্গা পিছন ফিরিয়া চাহিয়া দেখিয়া লজ্জিত হইল, কিছু বলিল না।

নীরেন পুনরায় বলিল—তোমাদের বাড়ী বুঝি নিকটে?

দুর্গা ঘাড় নাড়িয়া বলিল—এই পথের ধারেই একটু আগিয়ে—

পরে সে পথের পাশে দাঁড়াইয়া নীরেনকে পথ ছাড়িয়া দিতে গেল। নীরেন বলিল—না না খুকী, তুমি চল আগে আগে, তোমার সঙ্গে দেখা হ'য়ে ভাল হোল, ঐ দিকে

একটা পুকুর ধারে গিয়ে পড়েছিলাম, তারপর পথ খুঁজে হয়রান, যে বন তোমাদের দেশে ?

দুর্গা যাইতে যাইতে হঠাৎ থামিয়া অবাক্‌ভাবে নীরেনের মুখের দিকে চাহিল। একধারে একটু ঘাড় হেলাইয়া বলিল—পুকুরের ধারে ? একটা বড়, পুরোনো পুকুর ? ওখানে কি ক'রে গেলেন ?

তাহার কাপড়ের ভিতর হইতে কিসের ফল গোটাকতক পথের উপর পড়িয়া গেল। নীরেন বলিল—কি ফল প'ড়ে গেল খুকী—কিসের ফল ওগুলো ?

দুর্গা নীচু হইয়া কুড়াইতে কুড়াইতে সঙ্কুচিতভাবে বলিল—ও কিচ্ছু না, মেটে আলুর ফল—

—মেটে আলুর ফল ? খেতে ভাল লাগে বুঝি ? কি ক'রে খায় ?

এ প্রশ্ন দুর্গার কাছে অত্যন্ত কৌতুকজনক ঠেকিল। একটি পাঁচ বছরের ছেলে যা জানে, চশ্‌মা-পরা একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি তাহা জানে না! সে বলিল, এ ফল তো খায় না, এ তো তেতো—

—তবে তুমি যে—

দুর্গা সলজ্জস্বরে বলিল—আমি তো নিয়ে যাচ্ছি এম্‌নি খেল্‌বার—। একথা তাহার মনে ছিল যে, এই চশমা-পরা ছেলেটির সঙ্গেই সেদিন খুড়ীমা তাহার বিবাহের কথা তুলিয়াছিল, তাহার ভারী কৌতূহল হইতেছিল ছেলেটিকে সে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখে। কিন্তু মধু সংক্রান্তির ব্রতের দিনও তাহা সে পারে নাই, আজও পারিল না।

—অপুকে বলো কাল সকালে যেন বই নিয়ে যায়—বলবে তো ?

দুর্গা চলিতে চলিতে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িল।

—বাড়ীতে পড়ে টড়ে খুকী ?

ভাইয়ের কথা ওঠাতে দুর্গা আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। বলিল—খুব পড়ে। কিছুক্ষণ থামিয়া পুনরায় বলিল, বাবা বলে অপুর পড়াশোনায় বড্ড ধার। আর একটু গিয়া পাশের একটা পথ দেখাইয়া বলিল—এই পথ দিয়ে গেলে আপনার খুব সোজা হবে।

নীরেন বলিল,—আচ্ছা, আমি চিনে যাব এখন, তোমাকে একটু এগিয়ে দিই, তুমি কি একলা যেতে পারবে ?

দুর্গা আঙুল দিয়া দেখাইয়া কহিল—ঐ তো আমাদের বাড়ী একটু এগিয়ে গিয়ে, আমি তো এইটুকু একলা যাবো এখন—

দুর্গাকে এবার অত্যন্ত নিকট হইতে দেখিয়া নীরেনের মনে হইল এখনও ছেলেমানুষ। এর আগে সে কখনও ভাল করিয়া দেখে নাই—চোখ দুটির অমন সুন্দর ভাব কেবল সে দেখিয়াছে ইহারই ভাই অপুর।

যেন পল্লী-প্রান্তর নিভৃত চ্যুত বকুল বীথির সমস্ত শ্যাম স্নিগ্ধতা ডাগর চোখ দুটীর মধ্যে অর্দ্ধসুপ্ত আছে। প্রভাত এখনও হয় নাই, রাত্রি শেষের অলস অন্ধকার এখনও জড়াইয়া...তবে তাহা প্রভাতের কথা স্মরণ করাইয়া দেয় বটে—কত সুপ্ত আঁখির জাগরণ, কত কুমারীর ঘাটে যাওয়া, ঘরে ঘরে কত নবীন জাগরণের অমৃত উৎসব—জানালায় জানালায় ধূপ গন্ধ।

দুর্গা খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া কেমন যেন উস্‌খুস্ করিতে লাগিল। নীরেনের মনে হইল সে কি বলিবে মনে করিয়া বলিতে পারিতেছে না। সে বলিল—কি খুকী তোমাকে দেবো এগিয়ে ? চল তোমাদের বাড়ীর সামনে দিয়ে যাই।

দুর্গা ইতস্ততঃ করিতে লাগিল, পরে সে একটু আনাড়ির মত হাসিল। নীরেনের মনে হইল এইবার এ কথা বলিবে! পরক্ষণে কিন্তু দুর্গা ঘাড় নাড়িয়া তাহার সহিত যাইতে হইবে না জানাইয়া দিয়া বাড়ীর পথ ধরিয়া চলিয়া গেল।

দুপুর বেলা। ছাদে কাপড় তুলিতে আসিয়া গোকুলের বৌ নীরেনের ঘরের দুয়ারে উঁকি দিয়া দেখিল। গরমে নীরেন বিছানায় শুইয়া খানিকটা এপাশ ওপাশ করিবার পর নিদ্রার আশায় জলাঞ্জলি দিয়া মেজেতে মাদুর পাতিয়া বাড়ীতে পত্র লিখিতেছিল।

গোকুলের বৌ হাসিয়া বলিল—ঘুমোও নি যে ঠাকুর পো ? আমি ভাবলাম ঠাকুর পো ঘুমিয়ে পড়েচে বুঝি, আজ মোচার ঘণ্ট যে বড় খেলে না, পাতেই রেখে এলে, সে দিন তো সব খেয়েছিলে ?

—আসুন বৌদি, মোচার ঘণ্ট খাবো কি ? বাঙালে কাণ্ড সব, যে ঝাল তাতে খেতে ব'সে কি চোখে দেখ্‌তে পাই, কোন্‌টা ঘণ্ট, কোনটা কি ?

গোকুলের বৌ ঘরের দুয়ারে কবাটে মাথাটা হেলাইয়া ঠেস্ দিয়া অভ্যস্তভাবে মুখের নীচুদিক্‌টা আঁচল দিয়া চাপিয়া দাঁড়াইল।

—ইস্, ঠাকুর পো, বড্ড সহরে চাল দিচ্চ যে, ওইটুকু ঝাল আর তোমাদের সেখেনে কেউ খায় না—না ?

—মাপ করবেন বৌদি, এতে যদি 'ওইটুকু' হয়, তবে আপনাদের বেশীটা একবার খেয়ে না দেখে আমি এখান থেকে যাচ্চি নে, যা থাকে কপালে—যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপ্পান্ন, দিন্ একদিন চক্ষু-লজ্জা কাটিয়ে যত খুসি লঙ্কা।

গোকুলের বৌ খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

—ওমা আমার কি হবে! চক্ষু-লজ্জার ভয়েই শিল-নোড়ার পাট্ তুলে দিয়ে চুপ ক'রে ব'সে আছি না কি ঠাকুর পো ? শোনো কথা ঠাকুর পোর—বলে কি না—আমার—ব'লে—হি হি—হাসির চোটে তাহার চোখে জল আসিয়া পড়িল। খানিকটা পরে সামলাইয়া লইয়া বলিল—আচ্ছা, তোমাদের সেখানে গরম কেমন ঠাকুর পো ?

—সেখানে কোথায় ? কল্‌কাতায় না পশ্চিমে ? পশ্চিমের গরম কি রকম সে এখান থেকে কি বুঝ্‌তে পারবেন। সে বাঙ্গলাদেশে থেকে বোঝা যাবে না, আজকাল রাত্রে কি কেউ ঘরের মধ্যে শুতে পারে ? ছাদে বিকেলে জল ধ'রে ছাদ ঠাণ্ডা ক'রে রেখে তাইতে রাত্রে শুতে হয়।

—আচ্ছা তোমরা যেখানে থাক এখান থেকে কত দূর ? অনেক দূর ?

—এখান থেকে রেলে দুদিনের রাস্তা, আজ সকালে গাড়ীতে মাঝের পাড়া ষ্টেশনে চড়্‌লে কাল দুপুর রাত্রে পৌঁছানো যায়।

—আচ্ছা ঠাকুর পো, শুনিচি নাকি গয়াপানীর দিকে পাহাড় কেটে রেল নিয়ে গিয়েচে—সত্যি ? পাহাড় কেটে রেল নিয়ে গিয়েচে ?

—অনেক অনেক, বড় বড় পাহাড়, ওপরে জঙ্গল, তার তলা দিয়ে যখন রেল যায় একেবারে অন্ধকার, কিছু দেখা যায় না, গাড়ীর আলো জ্বেলে দিতে হয়।

গোকুলের বৌ অবাক্ হইয়া গেল। উৎসুকভাবে বলিল—আচ্ছা ভেঙে পড়ে না ?

—ভেঙে পড়বে কেন বৌদি, বড় বড় এঞ্জিনিয়ারে তৈরী করেচে—কত টাকা খরচ করেচে, ভাঙ্‌লেই হোল, এ কি আপনাদের রায়পাড়ার ঘাটের ধাপ যে দুবেলা ভাঙ্‌চে ?

এঞ্জিনিয়ার কোন্ জিনিষ গোকুলের বৌ তাহা বুঝিতে পারিল না। বলিল—পাহাড়টা মাটীর না পাথরের ?

মাটীরও আছে, পাথরেরও আছে। নাঃ বৌদি, আপনি একেবারে পাড়াগেঁয়ে—আচ্ছা আপনি রেল গাড়ীতে কতদূর গিয়েছেন ?

গোকুলের বৌ আবার কৌতুকের হাসি হাসিয়া উঠিল। চোখ প্রায় বুঁজাইয়া মুখ একটুখানি উপরের দিকে তুলিয়া ছেলে মানুষের ভঙ্গিতে বলিল, ওঃ ভারী দূর গিইচি, একেবারে কাশী গয়া মক্কা গিইচি! সেই ও বছর পিস্‌শাশুড়ী আর সতুর মার সঙ্গে আড়ংঘাটার যুগলকিশোর দেখ্‌তে গিইছিলাম, সেই আমার বেশীদূর যাওয়া—

এই মেয়েটি অল্পক্ষণের মধ্যেই সামান্য সূত্র ধরিয়া তার চারিপাশে এমন একটা হাসি কৌতুকের জাল বুনিতে পারে যা নীরেনের ভারী ভাল লাগে। এক একজনের মনের মধ্যে আনন্দের অফুরন্ত ভাণ্ডার থাকে, কারণে অকারণে তাহাদের অন্তর্নিহিত আনন্দের উৎস মনের পাত্র উপ্‌চাইয়া পড়িয়া অপরকেও সংক্রামিত করিয়া তোলে। এই পল্লীবধূটী সেই দলের একজন। আজকাল নীরেন মনে মনে ইহারই আগমনের প্রতীক্ষা করে—না আসিলে নিরাশ হয়, এমন কি যেন একটু গোপন অভিমানও হইয়া থাকে।

—আচ্ছা, বৌদি আপনাদের সব্বাই চলুন, একবার পশ্চিমে সব বেড়িয়ে নিয়ে আসি।

—এ বাড়ীর লোকে বেড়াতে যাবে পশ্চিম তুমিও যেমন ঠাকুরপো ? তাহোলে উত্তর মাঠের বেগুন ক্ষেতে চৌকী দেবে কে ?

কথার শেষে সে আর একদফা ব্যঙ্গ মিশ্রিত কৌতুকের হাসি হাসিয়া উঠিল। একটু পরে গম্ভীর হইয়া বলিল, হ্যাঁ ত্যাখো ঠাকুরপো, একটা কথা রাখ্‌বে ?

—কি কথা বলুন আগে—

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

—যদি রাখো তো বলি—

—বারে, শাদা কাগজে সই করা আমার দ্বারা হবে না বৌদি, জানেন তো আইন পড়ি, আগে কথাটা শুন্‌বো, তবে আপনার কথার উত্তর দেবো।

গোকুলের বৌ দুয়ার ছাড়িয়া ঘরের মধ্যে আসিল। কাপড়ের ভিতর হইতে একটা কাগজের মোড়ক বাহির করিয়া বলিল, এই মাকড়ী দুটো রেখে আমায় পাঁচটা টাকা দেবে?

নীরেন একটু বিস্ময়ের সুরে বলিল, কেন বলুন তো?

—সে এখন বোল্‌বো না। দেবে ঠাকুরপো?

—আগে বলুন কি হবে? নৈলে কিন্তু—

গোকুলের বৌ নিম্নস্বরে বলিল, আমি এক জায়গায় পাঠাবো। ত্যাখো তো এই চিঠিখানার ওপরের ঠিকানাটা ইংরিজিতে কি লেখা আছে!

নীরেন পড়িয়া বলিল, আপনার ভাই, না বৌদি?

—চুপ্ চুপ্ এ বাড়ীর কাউকে বোলো না যেন? পাঁচটা টাকা চেয়ে পাঠিয়েচে, কোথায় পাবো ঠাকুরপো, কি রকম পরাধীন জানো তো? তাই ভাবলাম এই মাকড়ী দুটো—টাকা পাঁচটা দেও গিয়ে ঠাকুরপো হতভাগা, ছোঁড়াটার কি কেউ আছে ভূভারতে? গোকুলের বৌএর গলার সুর চোখের জলে ভারী হইয়া উঠিল। দুজনেই খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল।

নীরেন বলিল, টাকা আমি দেবো বৌদি, পাঁচটা হয়, দশটা হয়, আপনি যখন হয় শোধ দেবেন, কিন্তু মাকড়ী আমি নিতে পারবো না—

গোকুলের বৌ কৌতুকের ভঙ্গিতে ঘাড় দুলাইয়া হাসিমুখে বলিল, তা হবে না ঠাকুরপো, বাঃ বেশ তো তুমি! তারপর আমি তোমার ঋণ রেখে ম'রে যাই আর তুমি—সে হবে না, ও তোমায় নিতেই হবে আচ্ছা। যাই ঠাকুরপো, নীচে অনেক কাজ পড়ে রয়েচে—

সে দ্রুতপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল, কিন্তু সিঁড়ির কাছে পর্যান্ত গিয়াই পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া নিম্নস্বরে বলিল, কিন্তু টাকার কথা যেন কাউকে বোলো না ঠাকুরপো! কাউকে না—বুঝ্‌লে?　　(ক্রমশঃ)

চীনে হিন্দু-সাহিত্য

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসুধাময়ী দেবী

ইৎসিং

ইৎসিং-এর নাম সুপরিচিত। ভারত ও মালয় উপদ্বীপে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁহার যে গ্রন্থ আছে তাহার ইংরাজী অনুবাদ জাপানী পণ্ডিত তাকাকাসু করিয়াছেন। কিন্তু কেবল যে তিনি ভারত পর্যটক বলিয়া বিখ্যাত তাহা নহে, বহুসংস্কৃত গ্রন্থেরও তিনি অনুবাদক।

৬৩৫ খৃষ্টাব্দে ইৎসিং জন্মগ্রহণ করেন, তখন তাঙ সম্রাট তাওৎসাং এর রাজত্বকাল। শৈশবে প্রচলিত চীনা পদ্ধতি অনুসারে তিনি শিক্ষালাভ করেন। কিন্তু বারো বৎসর বয়স হইতে বৌদ্ধ গ্রন্থ সমূহ পড়িতে আরম্ভ করেন। চৌদ্দ বৎসর বয়সে তিনি প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিলেন। আঠার-বৎসর বয়সেই ভারত ভ্রমণের বাসনা তাঁহার মনে উদিত হয়, কিন্তু তাহা পূরণ করিয়া উঠিতে পারেন নাই। সাঁইত্রিশ বৎসরে এই ইচ্ছা তাঁহার সফল হয়। এই উনিশ বৎসরের মধ্যে তাঁহার যৌবনের সকল উদ্যম তিনি বৌদ্ধ সাহিত্য আলোচনায় নিয়োজিত করেন; অন্যান্য বিষয়ের দিকে মনকে বিক্ষিপ্ত করিয়া জীবনকে ব্যর্থ করিতে চাহেন নাই।

ফাহিয়েন ও হুয়েন সাঙের প্রতি তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা ছিল। খুব সম্ভব চাঙ্ আনে তিনি হুয়েনসাঙকে কার্য্য করিতে দেখিয়াছিলেন। হুয়েনসাঙের মৃত্যুর পর রাজার আদেশে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া যে বিরাট সমারোহের সহিত সম্পন্ন হয়, তাহার ছবি বালক ইৎসিংএর মনে মুদ্রিত হইয়া যায়। তদবধি ভারতভূমি দেখিবার আগ্রহ উত্তরোত্তর তাঁহার বাড়িতে থাকে।

৬৭১ খৃষ্টাব্দে ক্যান্টন্ হইতে দক্ষিণে সমুদ্র পথ দিয়া তিনি ভারতাভিমুখে যাত্রা করেন। [illegible] হিন্দুরাজ্য শ্রীবিজয়ে আসিয়া তথায় কয়েকমাস অবস্থান করেন। এখানে তিনি সংস্কৃত শিখিয়া লন। তৎপরে পুনরায় যাত্রা করিয়া ৬৭৩ খৃষ্টাব্দে ভারতের বিখ্যাত বন্দর তাম্রলিপ্তিতে আসিয়া পৌছান। নালন্দাবিহার, গয়া ও অন্যান্য প্রসিদ্ধস্থান তিনি দেখেন ও বৌদ্ধবিনয় অতি উত্তমরূপে অধ্যয়ন করেন। অবশেষে ৬৮৫ খৃষ্টাব্দে পুনরায় তাম্রলিপ্তি হইতে স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করেন। ৬৮৯ খৃষ্টাব্দে শ্রীবিজয়ে আসিয়া ৬৯৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তথায় গ্রন্থ অনুবাদ কার্য্যে রত থাকেন। ৬৯৫ খৃষ্টাব্দে স্বদেশে ফিরিয়া যান। শ্রীবিজয় তখন হিন্দুসভ্যতার একটী বড় কেন্দ্রভূমি ছিল ইৎসিং সেইজন্যই এইখানে থাকিয়া কয়েক বৎসর কার্য্য করেন। এখান হইতে ৬৯৩ খৃষ্টাব্দে এক চীনা শ্রমণ দেশে ফিরিতেছিলেন, ইৎসিং তাঁহার সহিত কতকগুলি সূত্র ও শাস্ত্রের একটি অনুবাদ ও তখনকার শ্রেষ্ঠ শ্রমণদিগের কতক-গুলি জীবনকাহিনী পাঠাইয়া দেন।

পঁচিশ বৎসরকাল ইৎসিং বিদেশে ছিলেন, তিরশটী স্থানে তিনি গিয়াছিলেন। ৬৯৫ খৃষ্টাব্দে বহু গ্রন্থ সঙ্গে লইয়া তিনি চীনে ফেরেন। তাঁহার সহিত ৪০০টী বিভিন্ন বৌদ্ধ গ্রন্থ ছিল; বুদ্ধ গয়ার বুদ্ধের বজ্রাসনের একটী নিখুঁৎ প্রতিলিপিও তিনি আনিয়াছিলেন। ৫৬টী গ্রন্থ তিনি নিজে অনুবাদ করেন। ৭১৩ খৃষ্টাব্দে ৭৯ বৎসর বয়সে ইৎসিং মারা যান।

সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগে ভারতবর্ষে যে কয়টী বৌদ্ধধর্মের শাখা ছিল তাহাদের সুস্পষ্ট একটী বিবরণ আমরা ইৎসিংএর নিকট হইতে পাই। বৌদ্ধধর্মের আঠারোটী শাখা গড়িয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু সব শাখাগুলি তাহাদের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিতে পারে নাই; ক্রমশঃ কোন কোনটী একে অন্যের সহিত যুক্ত হইয়া যায়। ইৎসিং তদানীন্তন বৌদ্ধ শাখাগুলিকে প্রধানত চারটী ভাগে ভাগ করিয়াছেন, চারটী ভাগকে চারটী নিকায় বলা হইয়াছে।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসুধাময়ী দেবী

১। মহাসাঙ্ঘিকনিকায়—ইহার মধ্যে সাতটী বিভাগ। এই সকিন্ত নিকায়ের প্রভাব ইৎসিংএর সময় তেমন অধিক ছিল না।

২। স্থবীর নিকায় ইহার তিনটী বিভাগ। পালী গ্রন্থগুলি এই শাখারই অন্তর্গত। দক্ষিণ ভারত, সিংহল ও পূর্ববঙ্গে ইহার প্রভাব খুব অধিক।

৩। মূলসর্বাস্তিবাদ নিকায়ের চারিটী বিভাগ। উত্তর ভারতের প্রায় সর্বত্র ইহার প্রভাব ছিল; মগধ ছিল ইহার কেন্দ্রভূমি।

৪। সম্মিতীয় নিকায়ে চারটী বিভাগ। লাট ও সিন্ধু প্রভৃতি স্থানে ইহার প্রাধান্য ছিল।

মগধে এই সকল মতেরই ন্যূনাধিক প্রাদুর্ভাব দেখা যাইত; কারণ মগধ ও নালন্দায় সকল মতবাদী ব্যক্তির সমাবেশ হইত। বঙ্গদেশও ছিল এ বিষয়ে উদার।

বৌদ্ধবিনয় উত্তমরূপে অধ্যয়ন করিবার উদ্দেশ্যেই প্রধানত ইৎসিং ভারতে আসেন। তিনি একটি গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, "চীনে ব্যবহারিক জীবনে বিনয়ের কিছু কিছু ব্যভিচার চলিয়া আসিতেছিল, কারণ বিনয়ের অর্থ ও ব্যাখ্যাও কোন কোন স্থলে অন্যরূপ করা হইত; বিনয়ের মূলগত যে নীতি তাহা হইতে এই নীতির প্রভেদ হইত অলক্ষ্যে। এইজন্যই ভারতে প্রচলিত যথার্থ বিনয় যাহা তাহাই আলোচনা করিয়া আমি এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করিলাম।" গ্রন্থটীর নাম *Nan-hai-chi-kuei-nai-fa chuan*; ৪০টী অধ্যায় ইহাতে রহিয়াছে। ইহার বিষয়-সূচী হইতেই আমরা বুঝিতে পারি কি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ইৎসিং ভারতীয় বিনয় পর্য্যালোচনা করিয়াছিলেন। কয়েকটি অধ্যায়ের উল্লেখ করিতেছি। চতুর্থ অধ্যায়ে বিশুদ্ধ ও অশুদ্ধ আহারের প্রভেদ দেখান হইয়াছে; পঞ্চম অধ্যায়ে আহারের পর আচমনের ব্যবস্থা রহিয়াছে। নবম অধ্যায়ে রহিয়াছে উপবাসের নিয়মাদি। একাদশ অধ্যায়ে পরিধেয়ের প্রণালী নির্দেশ করা হইয়াছে। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে স্তূপ রচনার প্রণালী কিরূপ তাহা বলা হইয়াছে। সপ্তদশ অধ্যায়ে বলা হইয়াছে ধ্যান-ধারণার প্রকৃষ্ট উপায় কখন্। পঞ্চবিংশ অধ্যায়ে গুরুশিষ্যের ব্যবহার, ষষ্ঠবিংশ অধ্যায়ে আগন্তুক ও বন্ধুর প্রতি ব্যবহার নির্দিষ্ট হইয়াছে। চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়ে ভারতের শিক্ষাদান-প্রণালী কিরূপ তাহা বর্ণিত হইয়াছে। উনচত্বারিংশৎ অধ্যায়ে কেবলমাত্র দর্শকদিগের নিন্দাবাদ রহিয়াছে।

এই সকল নিয়ম মূল সর্বাস্তিবাদ বিনয়ের অন্তর্গত। মূল সর্বাস্তিবাদের সমগ্র বিনয় ১৭০ খণ্ডে ইৎসিং অনুবাদ করেন।

ইৎসিং তাঁহার ভ্রমণকাহিনীতে প্রাচীনযুগের, মধ্যযুগের, তাঁহার কিছু পূর্বেকার ও তাঁহার সময়কার বহু বিখ্যাত ভারতীয় পণ্ডিতদিগের উল্লেখ করিয়াছেন। ইৎসিংএর ঠিক পূর্বেকার যুগে ভারতে বহু শ্রেষ্ঠ দার্শনিকের আবির্ভাব হয়। তাঁহাদের মধ্যে দিঙ্‌নাগ সর্বশ্রেষ্ঠ। ইঁহারই প্রভাবে পরবর্ত্তীকালে একটি বিশেষ দার্শনিক-দল গড়িয়া উঠে। মধ্যযুগের এই নৈয়ায়িক আটটি গ্রন্থ লিখেন বলিয়া প্রবাদ। হুয়েনসাঙ্ তাঁহার দুইটি গ্রন্থের অনুবাদ করেন ন্যায়দ্বারতর্কশাস্ত্র ও আলম্বনপরীক্ষা। আরও একটা গ্রন্থ হুয়েনসাঙ্ অনুবাদ করেন—ন্যায়প্রবেশ; চীনা পণ্ডিতদিগের মতে শঙ্করস্বামী ইহার রচয়িতা; তিব্বতীগণের মতে দিঙ্‌নাগ। ইৎসিং দিঙ্‌নাগের কতকগুলি গ্রন্থ অনুবাদ করেন; ন্যায়দ্বার তিনি পুনর্বার অনুবাদ করেন। আলম্বনপরীক্ষার এক টীকা লিখেন নালন্দার ধর্ম্মপাল; ইৎসিং এই টীকার অনুবাদ করেন।

বসুবন্ধুর টীকাসমেত অসঙ্গের দুইটি গ্রন্থের অনুবাদ ইৎসিং করেন। ইৎসিং-এর আর দুইটি অনুবাদের বিবরণ এখানে দেওয়া প্রয়োজন। একটি হইল মাতৃচেতা রচিত একটি গান, অপরটি নাগার্জুনের লিখিত একটি পত্র। "মাতৃচেতা" অশ্বঘোষেরই অপর একটি নাম এইরূপ মনে করা হইত, কিন্তু দুইজন যে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ব্যক্তি এ সম্বন্ধে এখন আর কাহারও সন্দেহ নাই। মাতৃচেতার মূল সংস্কৃত গাথাগুলি হারাইয়া গিয়াছে, মধ্য-এশিয়ায় সম্প্রতি কোন কোন অংশ উদ্ধার করা হইয়াছে। ইৎসিং-এর বিবরণ হইতে আমরা জানিতে পারি যে ভারতীয় বৌদ্ধদিগের মধ্যে এককালে মাতৃচেতার নাম সুপরিচিত ছিল। ইৎসিং বলিতেছেন যে, ভারতে পূজার্চনার সময় গাহিবার মত

বহুস্তোত্র ও গাথা প্রচলিত ছিল, সেগুলি অতি যত্নে রক্ষা করা হইত; একযুগ হইতে পরবর্ত্তী যুগেও তাহাদের সমাদর ম্লান হইতে দেওয়া হয় নাই। মাতৃচেতা রচিত স্তোত্রটী ঐরূপ একটি স্তোত্র। মাতৃচেতার প্রতিভা ছিল অসাধারণ, তাঁহার সময়কার লেখকদিগের মধ্যে তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ। এই স্তোত্রটিতে তিনি ছয়টি পারমিতা এবং বুদ্ধের যাবতীয় উৎকৃষ্ট গুণের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইহার পর গাথা (Hymns) যাহারা রচনা করিয়াছেন সকলে তাঁহারই রচনাভঙ্গীর অনুকরণ করিয়াছেন। ভারতের সর্বত্র, যে কেহ শ্রমণ্যধর্মে ব্রতী হইতেন তাঁহাকেই মাতৃচেতার দুইটি গাথা শিক্ষা করিতে হইত। মহাযান, হীনযান—দুইটি শাখায় ঐ একই নিয়ম ছিল। মাতৃচেতার গাথাগুলির এত সমাদর হওয়ার ছয়টি কারণ ইৎসিং নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রথমত, এই গানগুলি হইতে আমরা বুদ্ধের গভীর গুণাবলীর আভাস পাই; দ্বিতীয়ত, শ্লোক-রচনার পদ্ধতি ইহা নির্দ্দেশ করিয়া দেয়; তৃতীয়ত, ইহাতে ভাষার একটি বিশুদ্ধতা দেখা যায়, বক্ষস্থল প্রশস্ত হয়; পঞ্চমত, জনসঙ্ঘের মধ্যে ইহা আবৃত্তি করিতে করিতে সঙ্কোচ দূর হইয়া যায়; ষষ্ঠত, এই গাথা গান করিবার অভ্যাস করিলে শরীর ব্যাধিশূন্য ও দীর্ঘজীবি হয়।

নাগার্জ্জুনের যে পত্রখানির ইৎসিং অনুবাদ করেন তাহার নাম সুহৃল্লেখা। ইৎসিংএর পূর্বে এই গ্রন্থখানির আরও দুইবার অনুবাদ হয়। ৪৩১ খৃষ্টাব্দে গুণবর্ম করেন প্রথম, তাহার পর ৫৩৪ খৃষ্টাব্দে করেন সঙ্ঘবম। কিন্তু ইৎসিং-এর অনুবাদের পরই গ্রন্থখানি চীনে সুপরিচিত হয়। ইৎসিং লিখিতেছেন যে, বোধিসত্ত্ব নাগার্জুন তাঁহার দানপতি জেতক শতবাহনকে উৎসর্গ করিয়া সুহৃল্লেখা নামক এক পত্র পদ্যে লিখেন। জেতক শতবাহন ছিলেন দক্ষিণ ভারতের এক রাজা। নাগার্জ্জুনের এই রচনাটির সৌন্দর্য্য অপূর্ব। সত্যপথের যে মহিমা তিনি ঘোষণা করিয়াছেন তাহা প্রকৃতই আন্তরিক। যে প্রেমের মহিমা তিনি বর্ণনা করিয়াছেন তাহা কেবল বন্ধুত্বেই (kinship) পর্য্যবসিত নয়। বস্তুত তাঁহার পত্রখানির অর্থ অতি গভীর। তিনি বলিতেছেন, "ত্রিরত্নে"র প্রতি আমাদের আস্থা ও শ্রদ্ধা রাখিতে হইবে। মাতাপিতাকে ভক্তিভরে আশ্রয়-দান করিতে হইবে। সকল প্রকার অশুভকর্ম পরিহার করিয়া শীল-রক্ষা করিতে হইবে। যে লোকের চরিত্র ভাল করিয়া আমাদের জানা নাই, তাহার সহিত মেশা অনুচিত। দেহের রূপ ও ধন—দুইটিকেই অসার বলিয়া জানিবে। সাংসারিক সকল কার্য্য উত্তমরূপে সম্পন্ন করা কর্ত্তব্য; কিন্তু সংসার অনিত্য ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে। মাথার উপর যদি অগ্নিশিখা জ্বলিতে থাকে, তথাপি বারোটি নিদানের উৎকর্ষ স্মরণ করিয়া মোক্ষ লাভের নিমিত্ত প্রয়াস পাইতে হইবে।

"তিনটি প্রজ্ঞা সাধন করা কর্ত্তব্য; এই প্রজ্ঞা দ্বারা আটটী মহাপথের সন্ধান পাওয়া যায় এবং চারিটি আর্য্য সত্যের উপলব্ধি হয়। এইরূপে দ্বিবিধ উৎকর্ষের পথে অগ্রসর হওয়া যায়। তখন অবলোকিতেশ্বরের ন্যায় আর শত্রু-মিত্রের প্রভেদ-জ্ঞান থাকেন। অমিতায় বুদ্ধের প্রভাবে তখন চিরকালের জন্য সুখাবতীতে অবস্থান করিয়া জগতের মুক্তি কামনায় আপনার শক্তি নিয়োজিত করা যায়।"

ভারতের সহিত চীনের সম্বন্ধের ইতিহাস সম্পূর্ণরূপে বলিতে হইলে যে সকল চীন পরিব্রাজক ভারত ও ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে আসিয়া ভারতের সহিত সাক্ষাৎ-পরিচয় করিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের কথা না বলিলে চলে না। ইৎসিং, হুয়েন-সাঙের সময় হইতে তাঁহার সময় পর্য্যন্ত যে সকল চীনা শ্রমণ ভারতে গিয়াছিলেন—এইরূপ ষাট জনের জীবনী-সম্বলিত একটী গ্রন্থ লিখেন। Chavaunes তাঁহার *Memoire* এর ভূমিকায় বলিয়াছেন যে, অর্দ্ধশতাব্দীর মধ্যে ভাতরভূমি দেখিবার আশায় ষাটজন চীনবাসী দুর্গম সঙ্কটময় পথ স্বেচ্ছায় অতিক্রম করিয়াছিলেন ইহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। ষাটজনের মাত্র উল্লেখ রহিয়াছে বটে, কিন্তু তাঁহারা ব্যতীত আরও অনেক চীনবাসী যে ঐ সময় ভারতে আসিয়াছিলেন তাহার কিছু কিছু প্রমাণ পাওয়া যায়। Chavaunesএর মতে কয়েক শত শ্রমণ সেই যুগে ভারতে আসেন।

ইৎসিং তাঁহার জীবন কাহিনীর ভূমিকায় ফাহিয়েন ও হুয়েনসাঙের ভারত ভ্রমণের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, বৌদ্ধ গ্রন্থ সমূহ সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত পবিত্র স্থানগুলির প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শনার্থে বিপদ্ সঙ্কুল পথে নানা কষ্টভোগ করিয়া তাঁহারা ভারতে উপনীত হন। তাঁহাদের পরবর্ত্তী

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসুধাময়ী দেবী

পরিব্রাজকগণও পথে অনুকূল আশ্রয় পান নাই, পথবর্ত্তী বিভিন্ন দেশের অধিবাসীদিগের নিকট তেমন সমাদর লাভ করেন নাই এবং সম্পূর্ণ নূতন জীবনযাত্রার মধ্যে পড়িয়া তাঁহাদিগকে অনেক অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছে।" এই ভূমিকার পর তাঁহার গ্রন্থে যে সকল পরিব্রাজকদের জীবনকাহিনী বিবৃত করিয়াছেন তাঁহাদের নামের একটা তালিকা দিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেবলমাত্র পরিব্রাজকরূপে আসেন, কেহ আসেন গ্রন্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে। ইঁহাদের অনেকেই নালন্দাবিহারে গিয়া কিছুকাল থাকেন। কাহারও কাহারও সঙ্গে চীনা গ্রন্থ কিছু কিছু ছিল। ইৎসিং ভারতে আসিয়া নালন্দা বিহারে কয়েকটী চীনা গ্রন্থ দেখেন, তাঁহার পূর্ববর্ত্তী পরিব্রাজকগণ সেগুলি সেখানে রাখিয়া যান।

ইঁহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কয়েকজনের বিবরণ আমরা এখানে দিব। হুয়েন চাও তাঁহাদের অন্যতম। Tai জিলার Sien chang নামক স্থানের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে ইনি জন্মগ্রহন করেন। সংসার ত্যাগ করিয়া যখন শ্রমণ হন তখন 'প্রকাশমতি' নাম গ্রহণ করেন। ভারতের পবিত্র স্থানগুলি দেখিবার সঙ্কল্প করিয়া ৬৩৮ খৃষ্টাব্দে তিনি চাঙ্ আনে আসেন। তথায় একটী বিহারে থাকিয়া সংস্কৃত শিখিতে আরম্ভ করেন। কিছুকাল পরে ভিক্ষুর বেশে তিনি পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা করেন। Suti (Sogdiana)র মধ্য দিয়া তুর্কীস্থান পার হইয়া তিব্বতে আসেন ও তথা হইতে জালান্ধরে আসিয়া পৌছান। পথিমধ্যে দস্যুহস্তে তাঁহার প্রাণ যাইবার উপক্রম হইয়াছিল।

জালান্ধরে চারবৎসর অবস্থান করেন। তথাকার রাজা তাঁহাকে বহু সম্মান প্রদর্শন করিয়া তাঁহার থাকিবার সকল ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। হুয়েনচাও এখানে সূত্র ও বিনয় অধ্যয়ন করেন এবং সংস্কৃত সাহিত্যে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। ইহার পর তিনি দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিয়া মহাবোধিতে পৌছান। এখানেও চার বৎসর তিনি অতিবাহিত করেন। এখানে অভিধর্ম্ম বিশেষভাবে আয়ত্ত করেন এবং বুদ্ধের কার্য্য সম্বন্ধে গভীর ভাবে ধ্যান করিতে থাকেন। মহাবোধি হইতে এই চীনাশ্রমণ নালন্দায় আসেন। এখানে তিন বৎসর তিনি নাগার্জ্জুনের মধ্যমকশাস্ত্র ও আর্য্যদেবের শতশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন ও যোগ শিক্ষা করেন।

তাহার পর গঙ্গানদীর তীরবর্ত্তী সিন্ধু বিহারের রাজা তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া যান। সেখানে তিনি তিন বৎসর থাকেন। ইতিমধ্যে হর্ষবর্দ্ধনের সভায় যে চীনা দূত আসিয়াছিলেন তিনি চীনে ফিরিয়া গিয়া হুয়েন চাওএর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। দেশ হইতে ফিরিয়া যাইবার জন্য হুয়েন চাওএর ডাক আসিল।

লোয়াংএ তাঁহার অভ্যর্থনা সমারোহের সহিত সম্পন্ন হয়। তাহার পর একদল চীনা ভিক্ষুর সহায়তায় সর্বাস্তিবাদ বিনয় সংগ্রহের অনুবাদ আরম্ভ করিয়া দেন। কিন্তু এই কার্য্য সম্পূর্ণ করিবার পূর্ব্বেই রাজার আদেশে তাঁহাকে পুনরায় ভারতাভিমুখে যাত্রা করিতে হয়। ব্রাহ্মণ লোকায়তকে চীনে লইয়া আসাই তাঁহার এই যাত্রার উদ্দেশ্য ছিল। এই ব্রাহ্মণ ছিলেন উড়িষ্যাবাসী এইরূপ অনুমান করা হয়। দীর্ঘায়ু করিবার বিদ্যায় তিনি ছিলেন পারদর্শী। হুয়েনচাও পার্ব্বত্য পথ অতিক্রম করিয়া তিব্বতে আসেন। তথা হইতে উত্তর ভারতের সীমান্তে আসিয়া পৌছান। সেখানে দেখিলেন চীনাদূত লোকায়তকে চীনে লইয়া যাইতেছেন। হুয়েনচাও তখন কয়েকটি স্থান ঘুরিয়া ফিরিয়া অবশেষে নালন্দায় আসিয়া উপস্থিত হন; এখানে ইৎসিংএর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। ইহার পর উত্তর পশ্চিম পথ দিয়া তিনি চীনে ফিরিয়া যাইতে প্রয়াস পান; কিন্তু দেখিলেন তাজিকগণ (আরবদেশীয় মুসলমান?) সে পথ বন্ধ করিয়া আছেন। তৎপরে তিব্বতের পথ দিয়া ফিরিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু এখানেও দেখিলেন বাণিজ্যের জন্য সে পথ বন্ধ। সুতরাং তাঁহাকে মগধে ফিরিয়া যাইতে হইল। সেখানে ষাট বৎসর বয়সে তিনি মারা যান।

৬৩৮ খৃষ্টাব্দে Hwui-Yeh নামক কোরিয়াবাসী জনৈক শ্রমণ ভারতে আসিয়া নালন্দা বিহারে অবস্থান করেন। ইৎসিং লিখিয়াছেন যে, যখন তিনি নিজে নালন্দায় আসেন তখন এই শ্রমণের লাইব্রেরী সেখানে দেখেন, তাহাতে চীনা গ্রন্থাবলী ও সংস্কৃত গ্রন্থসমূহের প্রতিলিপি ছিল।

তথাকার শ্রমণগণের নিকট হইতে ইৎসিং অবগত হন যে Hwui-yeh সেই বৎসরই মারা যান।

সঙ্ঘবর্ম নামক মধ্য এশিয়াবাসী এক শ্রমণের নাম ইৎসিং করিয়াছেন। Kangএর অধিবাসী ছিলেন তিনি। Kang হইল Sogdianaর চীনা নাম। অল্প বয়সেই মরুময় পথ অতিক্রম করিয়া তিনি চীনে আসেন। ৬৫৬ হইতে ৬৬০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে যে চীনাদূত ভারতে আসেন, বাঙ্গাদেশে সঙ্ঘবর্ম তাঁহার সঙ্গে যান। মহাবোধি ও বজ্রসেনের বিহারে যাইয়া সাতদিন সাতরাত্রি ক্রমান্বয়ে তিনি আলো জ্বালাইয়া রাখিয়াছিলেন। মহাবোধি বিহারের বাগানে একটি অশোকবৃক্ষের তলায় বোধিসত্ব অবলোকিতেশ্বরের একটি মূর্ত্তি তিনি খোদিত করিয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহার সমসাময়িক কয়েকজন চীনা পরিব্রাজকের সহিত কিছু কাল পরে তিনি চীনে ফিরিয়া যান।

সেখানে যাওয়ার অল্পকাল পরেই Kiao (কোচিন চীন) জিলায় দুর্ভিক্ষের ও মহামারীর প্রকোপ দেখা দেয়। রাজার আদেশে তিনি সেখানে যান। দুর্ভিক্ষপীড়িত আর্ত্তদিগকে প্রতিদিন তিনি অন্নদান করিতেন, তাহাদের দুঃখে ব্যথিত হইয়া চোখের জল ফেলিতেন। ঐখানে কাজ করিতে করিতেই ব্যাধির ছোঁয়াচ লাগিয়া তিনি মারা যান।

মহাযান প্রদীপ নামক এক শ্রমণ সমুদ্রপথে সিংহলে আসেন। মহাযান প্রদীপ নামটী হইতে বুঝা যায় যে, ঐ নাম তাঁহার প্রকৃত নাম নয়, উপাধিমাত্র। সিংহলে দন্তপুর বিহারে যাইয়া পূজাদান করেন। তাহার পর দক্ষিণ ভারতের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে হইতে তাম্রলিপ্তিতে আসেন। সেখান হইতে জাহাজ ধরিয়া পুর্বভারতে (বঙ্গদেশে) আসেন। তাম্রলিপ্তি তখন কেবল বন্দর মাত্র ছিল না, হিন্দু শিক্ষা ও সভ্যতার এক কেন্দ্র ভূমিও ছিল। ফাহিয়েন এখানে কয়েক বৎসর অতিবাহিত করেন। প্রদীপ এখানে ছিলেন বারো বৎসর। সংস্কৃত ভাষা তিনি উত্তমরূপে আয়ত্ত করেন। এইখানে নিদানশাস্ত্র ও অন্যান্য গ্রন্থের ব্যাখ্যা তিনি লিখেন। ক্রমশ নালন্দা মহাবোধিও বৈশালী পর্যটন করিয়া কুশীনগরে আসেন, এইখানে ষাঠ বৎসর বয়সে পরিনির্বাণ বিহারে তাঁহার মৃত্যু হয়।

তাও লিন নামক এক চীনা শ্রমণ 'শীলপ্রভ' এই হিন্দু নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। একটি জাহাজে উঠিয়া তাম্রময় স্তম্ভগুলি পার হইয়া তিনি দারাবতীতে (শ্যাম) আসেন। এই স্তম্ভগুলি ৪২ খৃষ্টাব্দে এক চিনা সেনাধ্যক্ষ নির্ম্মাণ করেন। দারাবতী হইতে কলিঙ্গ আসেন। পথে সর্ব্বত্রই তিনি সমাদর লাভ করেন। কয়েক বৎসর পরে কলিঙ্গ হইতে যাত্রা করিয়া তাম্রলিপ্তিতে আসিয়া পৌছান। এখানে তিন বৎসর থাকিয়া সংস্কৃত অধ্যয়ন করেন। সর্বাস্তিবাদের বিনয়, যোগ ও সম্ভবত তন্ত্রও তিনি এখানে অধ্যয়ন করেন। তৎপরে বজ্রসেন ও মহাবোধি দর্শন করিয়া নালন্দায় যান। এখানে মহাযানের সূত্র ও শাস্ত্রগুলি উত্তমরূপে অধ্যয়ন করেন এবং অভিধর্মকোষের তাৎপর্য্য বিশেষভাবে আয়ত্ত করেন। সেখান হইতে নানাদেশ ঘুরিয়া লাদকে আসেন। এখানে তিনি একবৎসর কাটান। এইখানে তাওলিন নূতন করিয়া ধারণীগুলির সন্ধান লাভ করেন। এইগুলিকে সংস্কৃতে বলা হয় বিদ্যাধর পাটক; এই মায়া বিদ্যার গ্রন্থখানিতে ১০০,০০০ শ্লোক ছিল বলিয়া প্রবাদ। ইহার অধিকাংশই হারাইয়া যায়, অল্পাংশমাত্র নষ্ট হয় নাই। নাগার্জুন প্রায় সমগ্র গ্রন্থখানি আলোচনা করিয়াছিলেন। নন্দ নামক নাগার্জুনের এক শিষ্য এই সূত্র গুলির গূঢ়ার্থ আয়ত্ত করিতে পারিয়াছিলেন। বিখ্যাত নৈয়ায়িক দিঙ্নাগ ইহার আলোচনা করিয়াছিলেন। ইহার পর আর বিশেষ কেহ এ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন বলিয়া শুনা যায় না। সেই জন্যই তাওলিন এবিষয়ে অনুসন্ধান করেন। ইৎসিং যখন নালন্দায় ছিলেন, তখন ইহার মূলমন্ত্রগুলি আলোচনা করেন; কিন্তু এ সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে কোথাও তিনি বলেন নাই। সুতরাং বিদ্যাধর পীটক সম্বন্ধে বিশেষ কিছু আমরা জানিতে পারি নাই। যাদুবিদ্যা ও রসায়ন বিদ্যা বিষয়ক এই গ্রন্থ এইরূপ অনুমান। নাগার্জুন রসায়ন বিদ্যার আলোচনা করিয়াছিলেন ইহা আমরা জানি।

উত্তর ভারতে কিছুকাল অবস্থান করিয়া তাওলিন কাশ্মীরে যান; সেখান হইতে যান উদ্যানে। তথা হইতে তিনি কপিশে যান। তাহার পর তাঁহার সংবাদ আর ইৎসিং বলিতে পারেন না।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসুধাময়ী দেবী

হর্ষবর্দ্ধনের সভায় যে চীনাদূত আসেন Che-hung ছিলেন তাঁহার ভাগিনেয়। ইনি সমুদ্রপথ দিয়া ভারতে আসেন; এবং বিখ্যাত স্থানগুলি সমস্ত পর্য্যটন করেন। মহাবোধিতে তিনি দুবৎসর থাকেন; সংস্কৃত সাহিত্য অভিধর্ম, কোষ, ন্যায়—এই সকল তিনি এখানে অধ্যয়ন করেন। নালন্দায় মহাযান সূত্রসমূহ আলোচনা করেন। উত্তর ভারতের Sin-Che বিহারে হীনযানও অধ্যয়ন করেন। ইৎসিং যখন তাঁহার জীবনী লিখেন, তখন তিনি কাশ্মীরে।

Che-hungএর সহিত Wu-hing নামক অপর এক শ্রমণ যাত্রা করিয়াছিলেন। শ্রীবিজয়ে আসিয়া তিনি তথাকার রাজার জাহাজে করিয়া পনের দিন পর মালয়ে আসেন, তথা হইতে আরও পনের দিনে আসেন Kiechaতে। Kiecha হইল যমুনার উত্তর পশ্চিম অংশ Atchen এইরূপ অনুমান। সপ্তম শতাব্দীতে এস্থানটী ছিল হিন্দু সভ্যতার একটি কেন্দ্রভূমি। সেখানে শীতকাল কাটাইয়া পরে এক জাহাজে ত্রিশ দিন ধরিয়া পশ্চিমাভিমুখে চলিয়া নাগপতনে আসিয়া পৌছান। এখান হইতে দুইদিনে সিংহলে আসেন। দন্তপুর বিহারে পূজাদিয়া অপর একটী জাহাজে করিয়া তিনি একমাস উত্তরপশ্চিমাভিমুখে চলেন। একমাস পরে জম্বুদ্বীপের পূর্বসীমান্ত আরাকানে আসিয়া পৌছান। এখানে তিনি এক বৎসর থাকেন। ইহার পর Wu-hing ও Che-hung একত্রে ভ্রমণ করেন। তাঁহারা একত্রে মহাবোধি ও নালন্দায় যান। Wu-hing যোগ (যোগাচারভূমি) অধ্যয়ন করেন ও কোষের ব্যাখ্যা শ্রবণ করেন। তাহার পর তিলাধক বিহারে যান। সেখানে দিঙ্‌নাগের ন্যায় আলোচনা করেন।

আরও কয়েকটি শ্রমণ সমুদ্র পথ দিয়া ভারতে আসেন। কেহ কেহ ভারতে আসিতে না পারিলেও ইন্দো-চীন পর্য্যন্ত আসেন। ইঁহাদের কাহারও কাহারও সহিত ইৎসিংএর শ্রীবিজয়ে সাক্ষাৎ হয়। এই সকল শ্রমণের সংক্ষিপ্ত জীবনী হইতে বোঝা যায় যে হুয়েনসাঙের ভারত ভ্রমণের পর হইতে চীন ও ভারতের মধ্যে কি নিবিড় একটি সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়া গিয়াছিল।
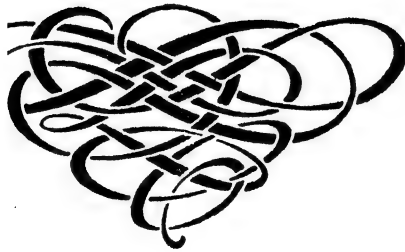
বোঝা-পড়া

—গল্প—

—শ্রীঅরবিন্দ দত্ত—

১

নন্দ ডোমের স্ত্রী মেনকা সহসা একদিন নিশুতি রাত্রে অন্তর্হিত হইল।

নন্দ ধামা-কুলা বুনিত, এবং দূরের হাটে সে সকল বিক্রয় করিয়া ঘেমে যেন নেয়ে বাড়ী ফিরিত। তাহার দেহ বেশ মজবুতই ছিল। খাটুনির জন্য সে ভয় করিত না। বেত, বাঁশ আর দা দড়ি লইয়াই সে দিবারাত্র পড়িয়া থাকিত। কাজেই সংসারে অস্বচ্ছলতা ছিল না। মেনকা বলিত, "কানের ভাঙ্গাচুরো ফুলঝুলগুলো রয়েছে, বেনে ডেকে একটু তোড়জোড় ক'রে দাও না?" নন্দ বলিত—"জোড়া-তালি দিয়ে তোকে পরাব কেনে রে? নূতন ঝুম্‌কো গড়্‌তে দিইনি বুঝি ভেবেছিস্‌? দুটো দিন সবুর কর্—এসে পড়্‌ল ত!" এইরূপে পৈঁছে তাবিজ, ঝুম্‌কো, মল—এই সকল অলঙ্কারে একে একে সে মেনকার গা হাত পা ছাইয়া ফেলিল। এ সকল করিয়াও তাহার হাতে দু'পয়সা জমিতেছিল। লোকে বলিত—"নন্দ একলা মানুষ হ'লে কি হয়—কাজ ক'রে যেন চার জোড়া হাতে!"

নন্দ হাটে যাইবে। মেনকা ভোর রাত্রে উঠিয়া রাঁধিয়া বাড়িয়া যত্ন করিয়া স্বামীকে খাওয়াইয়া দিত। আবার ফিরিয়া আসিলে এমন এক টুক্‌রা হাসি ফিন্‌কি দিয়া তাহার সমস্ত মুখে ছড়াইয়া পড়িত যে, নন্দর দেহে আর ক্লান্তি থাকিত না। সে তখনি-তখনি চুপ্‌ড়ি হইতে লিচু, পেয়ারা আনারস বা এই রকমের কিছু ক্রয়লব্ধ সামগ্রী বাহির করিয়া দিয়া ক্ষুধিত নেত্রে মেনকার হাসিটুকুর সঙ্গে বিনিময় করিত। তারপর সৌরভির তলব পড়িত। সে আসিয়া জুটিলে আনন্দ দীপ্তিতে পিতামাতার মুখ দু'খানা উজ্জ্বল হইয়া স্থানটুকু অমৃত-স্পর্শে প্লাবিত হইয়া যাইত। মেনকাকে বুঝিয়া দেখিতে এইটুকুই নন্দর হাতে ছিল।

এইরূপে সুখে স্বচ্ছন্দেই দিন কাটিতেছিল। হঠাৎ একদিন একটা হাড়সর্ব্বস্ব যুবক আসিয়া নন্দর কাছে আশ্রয়প্রার্থী হইল; এবং চোখের শুধু নিবিড় চাউনিতে মেনকার জীবন স্বপ্নবিভোর করিয়া দাঁড়াইল।

নন্দর ঘরের মুসুরির দাল এবং টাট্‌কা মাছের ঝোল খাইয়া যখন তাহার দেহটি মেদ-মাংসে পুরিয়া উঠিল, তখন নন্দর আনন্দ দেখে কে? মেনকাকে ডাকিয়া সে বলিল, "দেখ্‌লি মেনি, এমন মনুষ্য-জন্ম দোরে দোরে দুটো ভাতের পেত্যাশী হ'য়ে ক্ষইয়ে ফেল্‌ছিল। আর দু'টি মাস যদি ওর মগজে পোকামাকড় না ঢোকে—আমার মতের অপিক্ষে রেখে অমনি ধারা খেটে চলে—নন্দর হেঁসেল চেটে খায়—লোকের এ জিহ্বের নড়াই আমি ঘুচিয়ে দেব। একটুক্‌রো জমা কিন্‌তে পাঁচকুড়ি টাকা—আর ঘর একখানা কুড়ি দুই টাকা হ'লে হ'য়ে যাবে।"

কিন্তু এই লাভের বস্তুতে ইহার লোভ জন্মিল না। লোভ জন্মিল নন্দর ইজ্জতের উপরে। মেনকার চিত্ত ইতিপূর্ব্বেই সে বশীভূত করিয়া ফেলিয়াছিল। অবশেষে একদিন সংসারটি বেদনায় ভরিয়া দিয়া মেনকাকে লইয়া সে উধাও হইল। নন্দ 'হা' 'হুতাশ' করিল না সত্য, কিন্তু গ্লানিতে তাহার রক্তরাগশূন্য পাংশু ওষ্ঠ দু'খানার সকল কলরবই যেন থামিয়া গেল।

সৌরভির তখন বয়স হইয়াছে। সে-ও বুক চাপ্‌ড়াইল না। কিন্তু শুধু ঘরে নয়—পথে ঘাটেও যে লজ্জা সে ছড়াইয়া গেছে তাহারই কুণ্ঠায় পিতাপুত্রী উভয়েই যেন তন্দ্রাময় হইয়া রহিল।

পরীর মত রূপ লইয়া নন্দর মেয়ে সৌরভি পাড়ার মধ্যে বাড়িয়া উঠিতেছে দেখিয়া প্রতিবাসী নারীমহলে পতিপুত্রাদির কারণে একটা শঙ্কার সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। কি জানি এই রাক্ষসীটার কুনজরে কেহ কোনদিন পড়িয়া যায়!

শ্রীঅরবিন্দ দত্ত

ছোটলোকের মেয়ে হইলে কি হয়—মেয়েটি লেখাপড়া শিখিয়াছে। শ্রী-ছাঁদও আছে। সে যে ছেলেদের আকর্ষণ করিবে বিচিত্র কি!

জমিদার-গৃহিণী কঙ্কাবতী কিছু বেশী ত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র কুমুদ প্রতিদিন রাণার উপর ছিপ লইয়া মাছ ধরিতে বসে। সৌরভি ঘাটে না আসা পর্য্যন্ত মাছ-ধরায় তাহার অখণ্ড মনোযোগ দেখা যায়। আসিয়া ঘাট সারিয়া চলিয়া গেলে মাজা পিঠে হঠাৎ খিল ধরিয়া উঠে। চারগুলি এককালে ঝুপঝাপ করিয়া জলে ফেলিয়া দিয়া ক্ষুণ্ণ মনে সে বাড়ী ফিরে। ইহাও কঙ্কাবতীর চক্ষু এড়ায় নাই। সৌরভির দৃষ্টিতে ইহা সর্ব্বাগ্রেই পড়িয়াছিল। একদিন সে বলিয়াওছিল, "ফাৎনার দিকে চোখ না রাখলে মাছ পালিয়ে যাবে বাবু।"

কুমুদ ভুল বুঝিল। ভাবিল,—মাছের চারের চেয়ে চোখের চারই দেখি বেশী কাজ করিয়াছে। সে বলিল, "শিকার করা উদ্দেশ্য ত সৌরভি? সে যা' হোক্ একটা কিছু হ'লেই হ'ল।"

সৌরভির চোখমুখ সহসা রাঙা হইয়া উঠিল। কিন্তু সে আপনাকে সম্বৃত করিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিল,— "শিকারের অর্থটা ত বুঝলাম না বাবু! বিয়ে করবেন না কি আমাকে?"

কুমুদ বুঝিল,—ন্যাকামি। একটা কি রসিকতার উত্তর দিতে যাইয়া জিহ্বাটি কিন্তু তাহার জড়াইয়া গেল। সৌরভি বলিল, "ডোমের মেয়ে—জাত যাবে। ঘর ছাড়েন ত আপনাদের ত একান্ন পীঠ আছে—তারই এক পীঠে নিয়ে যেয়ে রাখবেন হয়ত। না হয়, জমিদার মানুষ, পয়সা আছে —ভয় নেই—বাগানের এক কোনে একখানা দোচালা তুলেও সেখানে রাখতে পারেন। এর কোন্‌টা করবেন বলুন ত?"

কুমুদ তাকাইয়া দেখিল, সৌরভির চোখ দিয়া অগ্নি-বর্ষণ হইতেছে। সে কিছু দমিয়া গেল। তাহাতে সৌরভির প্রশ্নগুলি—নিরুত্তর করিবারই প্রশ্ন। কাজেই সে চুপ্ করিয়া রহিল

সৌরভি পাড়ের চারিটা দিক একবার দেখিয়া লইল, তারপর জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার সুবিধে মত এর যে কোন একটা পথ আপনি ধরবেন। এ খুব সত্যি কথা। কিন্তু নিজের ঘরের মেয়েদের মধ্যে এই রকমের কিছু দেখতে কি আপনি পছন্দ করেন? না—ডোমের মেয়ের আর মর্য্যাদা কি!"

এই বলিয়া আর বিলম্বমাত্র না করিয়া জ্বলন্ত চোখে আগুনের হল্‌কা বিচ্ছুরিত করিতে করিতে কুমুদকে যেন সেইখানে মৃত্তিকাস্তূপের নীচে সমাহিত করিয়া রাখিয়া সে চলিয়া গেল।

সৌরভিকে সাধারণ কথায় বলিতে গেলে—ঠোঁট-কাটা মেয়ে। তাহার অন্তরে যাহা সত্য হইয়া ফুটিয়া উঠে তাহাকে দাবাইয়া রাখিয়া সৌজন্য প্রকাশ করা তাহার স্বভাব নয়। ক্রোধের সঙ্গে ভয় মিশাইয়া চলিতে কোনদিন সে শিখে নাই। মোট কথা, রাখিয়া ঢাকিয়া সহ্য করিয়া চলিবার মেয়েই সে নয়।

কুমুদ কিন্তু ছিপ লইয়া আবার আসিয়া মাছ ধরিতে বসিতেছে, এবং কুৎসিৎ চাহনিতে মেয়েটির দেহের সমস্ত সৌন্দর্য্য লেহন করিয়া লইতেছে। সংসারে শক্তিমানের উপর প্রশ্ন নাই—শাসন নাই—কাজেই তাহাদের যথেচ্ছা-চারিতা নিষ্কণ্টক। এ যেন তাহাদের সম্প্রদায়গত অবাধ অধিকার হইয়া দাঁড়াইয়াছে!

সৌরভি পারত পক্ষে ঘাটে আসে না। যখন আসে কুমুদকে দেখিতে পায়। এবং সে সময়ে কুমুদ চক্ষু-গোলকের দ্বারা কত কি পুনরাবৃত্তি করে।

কিন্তু সেদিন যখন ঘাটের পাড়ে এক হাট বৌ-ঝির মধ্যে জমিদার-গিন্নী তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোর মা এখন কোথায় রাজত্ব করছে রে সৌরভি?" তখন নিজের জাতির উপর মেয়েদের এই বৃহৎ ভালবাসার আস্বাদ পাইয়া সৌরভি ক্ষণকাল বিস্ময়ে এমন অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল যে, শ্বাস-গ্রহণের চারিদিককার বায়ুটুকু পর্য্যন্ত যেন তাহার কাছে বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছে। এরূপ আঘাত অনেক সময় অনেকে করিতেন। কিন্তু আজ তাহার মনে হইল, তাহার এই দীর্ঘ কুমারীকাল লইয়া যতদিন এই গ্রামে বসিয়া সে দিন গণিবে,ততদিন তাহাকে জবাবদিহি করিতে হইবে। সে তৎপর হইয়া উত্তর করিল, "সে ত সীমার বাইরে চ'লে

গেছে ঠাকুর মা! রাজত্ব ত অনেকে ঘরে ব'সেও করে। ঘরের হিসাবটা আগে রাখলে উপকার বেশী হয়।"

স্বল্প কথায় সৌরভি যেন সকলকে অতিক্রম করিয়া গেল। জমিদার-গৃহিণী চাহিয়া দেখিলেন, আশ-পাশের মেয়েরা সকলেই এই তুচ্ছ মেয়েটির সাহস দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেছে। কিন্তু সকলকারই চক্ষের জলন্ত রশ্মি যেন তিরস্কারের আকারে ইহার সমস্ত দেহের উপর ছড়াইয়া পড়িতেছে। তিনি আহত হইয়া গর্জ্জিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "ছুঁড়ীর সাহস দেখ! বড় যে টাস্‌টেসে কথা শিখেছিস?" এই বলিয়া তিনি ক্রোধের কতকটা চোখ দিয়া ছাড়িয়া নিজকে সাম্‌লাইয়া লইতে লাগিলেন। তারপর বলিলেন, "নন্দর বুঝি চোখ পড়ে না তোর উপর? বয়সের ত গাছ পাথর নেই। কতকাল আর ঘরে পুষে রাখবে তোকে? তোদের জেতেরও বলিহারি বাছা! শেষটা মার মত কুলে কালি দিবি না কি? না—ভিটে আগ্‌লে ব'সে ব'সে পাড়ার কচি ছেলেগুলোর মাথা চিবিয়ে খাবি?"

তরুণী বধূরা নিজ নিজ স্বামী-দেবতার আশঙ্কায় বলিয়া উঠিলেন, "এ আপদ এক্ষুনি গাঁ-ছাড়া করুন আপনি। বর ত ওর রাস্তা-ঘাটে গড়াগড়ি যাচ্ছে।"

এ প্রশ্নের জবাব সৌরভি সহসা দিতে পারিল না। ছেলেকে এই ঘাটের পাড়েই তাহার উপর নজর দিতে দেখিয়া কঙ্কাবতী মনে মনে বিরক্ত হইতেন সে ইহা লক্ষ্য করিয়া আসিতেছে। কিন্তু ছেলেকে শাসন না করিয়া মেয়ে হইয়া অপর মেয়েকে অযথা আঘাত করিয়া মেয়েদের সম্ভ্রম যে ইঁহারা ক্ষুণ্ণ করিলেন—তাহা যেন তাঁহার চোখেই পড়িল না। যে থালাখানা তুঁষ বালির দ্বারা সে ঘসিতেছিল, তাহার উপর হাতের চতুর্গুণ জোর দিয়া ঘসিতে ঘসিতে ঘাড় নীচু করিয়া সে বলিতে লাগিল, "মাথার খুলির চেয়ে দাঁতের জোর যদি বেশী হয়—চিবিয়ে খাব না ত কি!"

এই বলিয়া ধপাস্ ধপাস্ করিয়া থালা ক'খানা জলের উপর আছ্‌ড়াইয়া একত্র করিয়া জোর পায়ে সে বাড়ী চলিয়া গেল। কিন্তু সমস্ত পথটাই এই অনুশোচনায় তাহাকে বিঁধিতেছিল যে, এই রূঢ়-ভাষিণীর ছেলেটির আচরণ ধরিয়া আরও কত কথা শুনাইয়া আসিতে যেন রহিয়া গেছে।

২

নন্দ তখন নিড়েন দ্বারা একটা কুমড়াগাছের গোড়া পরিষ্কার করিতেছিল। সৌরভি দাওয়ার উপর বাসনের ঝাঁকাটা ঝনাৎ করিয়া ফেলিয়া রাখিয়া পিতার নিকটে আসিয়া বলিল, "অত মেহনত কচ্ছ, ঐ গাছের ফল খাবে নাকি তুমি? তার চেয়ে ডগাগুলো কেটে দাও, চচ্চড়ি রেঁধে দি।"

মেয়ের দিকে বিস্ময়ে তাকাইয়া নন্দ তাহার অভিপ্রায় বুঝিয়া লইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু গাছটির বৃদ্ধির কামনায় কালও ইহার গোড়ায় কলস কলস জল ঢালিতে যাহার আগ্রহের অবধি ছিল না, রাত্রি প্রভাত না হইতেই সে কেন তাহার ডগাগুলির মাথা লইবার তাগিদ দিতেছে ঠিক ঠাওর করিয়া উঠিতে পারিল না। বলিল, "গাছের ধাত ত বেশ ভালই আছে। ফল ধর্‌বে না, কে বল্‌লে তোকে?"

সৌরভি বলিল, "ফল আর খেয়েছ তুমি। সমস্ত অপযশের বোঝাটা ত তোমার আর আমার মাথার উপর চাপিয়ে দিয়ে চ'লে গেল সে। চল, বন জঙ্গলে গিয়ে বাস করি। আমার আর এ সহ্য হয় না।"

হাতের নিড়েনটা ফেলিয়া রাখিয়া নন্দ সোজা হইয়া বসিল। কিছুক্ষণ ভাবিয়া লইয়া সে বলিল, "অপযশ যে কিন্‌লে সে ত ঘরে নেই। তোর বোঝা ভারি হ'ল কিসে? অপরের কালি তোতে যেয়ে পৌঁছয় কি ক'রে?"

"কি জানি, কি ক'রে পৌঁছয় বাবা!"

এই বলিয়া সে মাথা হেঁট করিয়া রহিল। তাহার চক্ষু দুটি দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

নন্দ চোখ রাঙ্গাইয়া মেয়ের দিকে তাকাইয়া রহিল। কিন্তু মেনকার শোকটা এ সময় তাহার মনের মধ্যে আগাগোড়া তোলপাড় করিয়া উঠিতে লাগিল। মেয়েটির চোখের জলের উৎস-মুখ সেই-ই যে ভাল করিয়া হাতড়াইয়া খুঁজিয়া পাইত। তাহাকে ভুলিল সে কিসের জোরে? নিড়েনটা সেইখানেই ফেলিয়া রাখিয়া ধূলিহস্তে সে দাওয়ার উপর আসিয়া উঠিয়া বসিল। বলিল, "দেহটার মত

শ্রীঅরবিন্দ দত্ত

পরাণটাও যে শক্ত—মনে এ দেমাক আমার ছিল। সে ত মিথ্যে হয়ে গেল। ঘরের আন্ধার তুই যদি মুখ ভারি ক'রে বড় ক'রে তুলবি, আমি দাঁড়াই কোনখানে ?"

সৌরভি কোন কথা বলিল না। ঘরের মধ্যে উঠিয়া গেল। হাতের তালুতে কিছু নারিকেলের তৈল ঢালিয়া লইয়া মাথায় ঘসিতে ঘসিতে পুনর্ব্বার সে বাহির হইয়া আসিল। এবং আলিসার উপর যে জলের কলস ছিল, তাহা হইতে জল গড়াইয়া লইয়া ঘটি দুই জল মাথায় ঢালিয়া সে বস্ত্র ত্যাগ করিতে লাগিল।

নন্দ জিজ্ঞাসা করিল, "ঘাটে গেলিনে ?"

সৌরভি সংক্ষেপে উত্তর করিল, "ঘাটের পাড়ে কাঁটা পড়েছে যে ?"

এই বলিয়া চুলের ডগায় একটা গ্রন্থি বাঁধিয়া—চাঙারি বুনিবার জন্য যে চটা চাঁছা ছিল হাতে পায়ে তাহাই মড় মড় শব্দে সে ভাঙ্গিতে লাগিল।

নন্দ কিছু বিস্মিত কিছু বিরক্ত হইয়া বলিল, "বুদ্ধি শুদ্ধি হারালি নাকি তুই ? ও-গুলো দিয়ে চাঙারি বুনব যে !"

সৌরভি আপন মনে কাজ করিয়া যাইতে লাগিল। বলিল, "এখন চুলোয় ত দি। চাঙারি বোনার সময় হবে না। আর চাল চিঁড়ের মত পুঁট্‌লি বেঁধে সঙ্গে নিয়েও যাওয়া যাবে না।"

নন্দ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। মেয়েটির এই অচিন্তিত আচরণ কি যেন একটা দুঃসহ লাঞ্ছনা ও অপমানের গ্লানি অঙ্গুলি সঙ্কেতে দেখাইয়া দিতেছে। একটা বৃহৎ আঘাতের গভীরতা নিঃসংশয়ে অনুভব করিয়া অকস্মাৎ সে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। সৌরভি তখন ঘরে ঢুকিয়া উনুন ধরাইতেছে। নন্দ ধীরে ধীরে উঠিয়া আসিয়া—কবাট ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোকে কি কেউ কিছু বলেছে সৌরভি ?"

সৌরভি তখন আপনাকে একটা সুনির্দ্দিষ্ট সিদ্ধান্তের মধ্যে অনেকটা সম্বরণ করিয়া ফেলিয়াছে। পিতাকেও সে জানিত। তাই এ প্রসঙ্গ বাড়াইতে সে আর ইচ্ছুক হইল না। কড়ায় খানিকটা তেল ঢালিয়া তরকারি পত্র নাড়া চাড়ার দ্বারা 'ছ্যাঁক্' 'ছ্যাঁক্' শব্দের মধ্যে আলোচনাটা তলাইয়া দিতে সে চেষ্টা করিল। শুধু বলিল, "রান্নাটা শেষ হ'তে দাও বাবা ! এখনও কিছুমাত্র গুছিয়ে নিতে পারিনি।"

নন্দ বুঝিল, ইহার অধিক কিছু ইহার কাছে মিলিবে না। কিছুক্ষণ মৌন হইয়া সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিবার পর বাঁশের লাঠিখানা দ্বারের আড়াল হইতে সে টানিয়া লইল। বলিল, "তোর বাবা গরীব, আর জেতে ছোট—তাই ঠাওর করেছিস্ বুঝি বড় লোকের ডরে তোর অপমানটাও আমার কাছে ছোট ? দাঁড়া, একবার পুকুর ঘাটটা ঘুরে আসি।"

এই বলিয়া নন্দ দ্রুতগতি বাহির হইয়া গেল। সৌরভি রান্না ফেলিয়া বাহিরে ছুটিয়া আসিল, এবং চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিল। নন্দ সে কথায় কর্ণপাতও করিল না। সৌরভির বুকের মধ্যে ঢিপ্ ঢিপ্ করিতে লাগিল।

নন্দ ঘাটে আসিয়া দেখিল, ঘাটটি শূন্য—লোকজন নাই। সে একবার পাড়টা ঘুরিয়া আসিল। ইচ্ছা—কন্যার এই মনোভাবের যদি কিছু হেতু ধরিতে পারা যায়। সে একে স্পষ্টবাদী লোক, তাহাতে শক্তিও প্রচুর, লোকে তাহাকে ভয় করিয়া চলিত। গাঁয়ের অনেকেরই সঙ্গে দেখা হইল, কিন্তু কাহারও মুখে কোন কিছুর আভাস সে পাইল না।

বাড়ী ফিরিয়া দেখিল, সৌরভির রান্না হইয়া গিয়াছে, জিনিষ পত্র বাঁধা-ছাঁদা করিতেছে। ফিরিয়া পর্য্যন্তও অপেক্ষা করিয়া থাকা চলে নাই। ঝোঁকের মাথায় যে ইঙ্গিত সে তখন করিল, তাহার ভিতর এতটা দৃঢ়তাই ছিল। সৌরভির একান্ত পরিচিত অচঞ্চল আচরণের কথা ভাবিয়া নন্দর মনে তখন এই আতঙ্ক উঠিতে লাগিল যে, এই বাঁধা-ছাঁদার পর ইহাকে থামাইয়া দিতে কোন হিতোপদেশই কাজে লাগিবে না। কিন্তু গরুর গাড়ীতে জিনিষপত্র উঠিয়া গেলে সে যে কোন্ অজ্ঞাত স্থান নির্দ্দেশ করিয়া গাড়ী হাঁকাইতে অনুমতি করিবে এই আশঙ্কায় নন্দ যেমন চঞ্চল হইল, ঘর ছাড়িবার সংকল্পে মেয়েটি সহসা কেন যে এমন দৃঢ় হইয়া উঠিল সে প্রশ্নটাও

তেমনি মনের মধ্যে বার বার ধাক্কা দিয়া তাহাকে উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিতে লাগিল। সে ঘরে উঠিয়া সেই ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত জিনিসপত্রের মাঝখানে আসন পাড়িয়া বসিয়া পড়িল। বলিল, "কে তোকে কি বলেছে না বল্‌লে ত এক পাও নড়্‌তে পারিনে আমি। কায়েত বামুন হোক্‌ আর জমিদার লোকই হোক্‌, নামটা তুই বলে' দে, তার মাংস চিরে নুন বসিয়ে দিয়ে আমি নড়ি।"

সৌরভির হাতের কাজ বন্ধ হইল না। একটা ছালার ভিতর হাতা বেড়ি, হুঁকা কলিকা, পানের সজ্জা, তেলের বোতল, দড়াদড়ি কত কি পুরিতে পুরিতে সে বলিল, "মনের মধ্যে রাত্তির দিন লড়াই করছ তুমি—আবার মানুষের সঙ্গেও লড়্‌বে? একটু সুখ শান্তি খোঁজা যে তার চেয়ে ঢের ভাল।"

নন্দ আর কোন কথা না বলিয়া সেইখানে বসিয়া বসিয়া সৌরভির কার্য্যকলাপ দেখিতে লাগিল। সৌরভি হুঁকা কলিকাটা আবার টানিয়া বাহির করিয়া তামাক সাজিয়া পিতার হস্তে দিল। তখনকার কাজ চলার মত কলার পাতা কাটিয়া রাখিয়া বাসন কোসনগুলি মাজিয়া ঘসিয়া সে পরিষ্কার করিয়া রাখিয়াছিল। সেগুলি সেই বস্তার মধ্যে পুরিয়া ফেলিল। তোরঙ্গটি ইতিপূর্ব্বেই সাজান হইয়া গিয়াছিল।

ভিটার সঙ্গে মেয়েটি এই যে সর্ব্বপ্রকার দাবী উঠাইয়া লইতেছে ইহাতে সত্য সত্যই নন্দ একটা নিশ্বাস ছাড়িল। সে বলিল, "কিন্তু কোথায় যাবি ভেবে দেখেছিস্‌ ত?"

সৌরভি বলিল, "পিসিমার বাড়ী ছিল—জেঠাত বোনেরও বাড়ী ঘর ছিল, সে ত যাব না। সে গেলে ভাব্‌বার সময় অনেকটা লাগ্‌ত; এ আর সে বালাই নেই। খেয়ে দেয়ে গাড়ী একখানা তুমি ডেকে আন, বেলাবেলি যতটা পারি এগিয়ে নিই।"

নন্দ বলিল, "কোথায় গিয়ে থাম্‌বি তুই, যে গাড়ী চালাবে সে ত জান্‌তে চাইবে। তা'কে কি বলে' কাজে লাগাবি?"

সৌরভি বলিল, "অত ভাবতে গেলে এখানে ব'সে ব'সে লোকের ঝাঁটা লাথি খেতে হবে। গাড়ী তুমি আন, চুক্তি পত্তর যা' কর্‌তে হয় আমি কর্‌ব—তোমার ভাবনা নেই।" এই বলিয়া সে থামিল। তারপর বলিল, "কিন্তু সব চেয়ে ভাল ছিল দু'জনার মাথার দুটি পুঁটুলি ছাড়া বাকি সব পুড়িয়ে ঝুড়িয়ে যাওয়া।"

নন্দ কিছুক্ষণ ভাবিল। তারপর বলিল,—"তোরঙ্গটা একবার খুল্‌বি মা?"

সৌরভি তালাটা খুলিয়া দিল। মেনকার যে সকল পোষাকী কাপড় জামা পাটে পাটে গোছান ছিল, নন্দ সে সকল টানিয়া বাহির করিল, এবং এক জায়গায় স্তূপাকার করিয়া আগুন ধরাইয়া দিল।

সৌরভি ক্ষুব্ধ হইয়া বলিল,—"সত্যি সত্যি এ কি কর্‌লে বাবা?"

নন্দ বলিল,—"এ ভালই হ'ল সৌরভি। এ সব তুই পরবিনে সে আমি জানি। আল্‌গা যদি হলি—বোঝা ভারি করিস্‌ কেনে?"

মায়ের এই সকল পরিত্যক্ত জিনিসপত্র গুছাইয়া তুলিতে তাহারও মনে ঘৃণা হইতেছিল। যে সকল বাহুল্য জিনিসপত্র সে ইতিপূর্ব্বে গুছাইয়া লইয়াছিল, এখন তাহাও টানিয়া বাহির করিয়া সে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিতে লাগিল, বিছানা ও জিনিস-পত্তর একটা ঘরে তালা-বন্ধ করিয়া রাখিল।

নন্দ ঝিম্‌ মারিয়া বসিয়া রহিল। পরে চারিদিকে চক্ষু ঘুরাইতে ঘুরাইতে সে বলিল, "কুমড়োর ডগাগুলো রেঁধে দিস্‌নি ভালই করেছিস্‌। ওর বিচিগুলো তোর হাতের পোতাও না—আমার হাতেরও না।"

সৌরভি বুঝিল, পিতার অন্তরের নিবিড় ব্যথা যাহা এতদিন শুধু অনুভব করিবার ছিল, এখন যেন তাহা রূপ ধরিয়া ঝরিয়া পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে।

নন্দ বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছিল। বলিল, "দিনের বেলা ভিটে ছাড়বার উয্‌যুগ কর্‌লি, তাতে যত লজ্জা না—লোকের জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে দিতে পরাণটা নাজেহাল হবে—আর লজ্জায় ম'রে যাব। রেতের বেলা গেলে হয় না?"

সৌরভি বলিল, "তাই যাব।"

বোঝা-পড়া

শ্রীঅরবিন্দ দত্ত

৩

সৌরভি দেখিল, সংসারে তখনও কিছু জলের প্রয়োজন আছে। কলস ক'টি নাড়াচাড়া করিয়া দেখিল, এক ফোঁটা জলও নাই। তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়া সে জল আনিতে চলিল। কিন্তু ঘাটের সিঁড়ির উপর পা দিতেই সে থম্‌কাইয়া দাঁড়াইয়া গেল। দেখিল, কঙ্কাবতী জলে কটিদেশ পর্য্যন্ত ডুবাইয়া গাত্র মার্জ্জনা করিতেছেন। সে আর তথায় না নামিয়া আঘাটায় কলস ডুবাইয়া জল পুরিতে লাগিল। কলসের বক্ বক্ শব্দে কঙ্কাবতী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে রে?"

অত্যন্ত সঙ্কোচের সহিত সে উত্তর করিল, "আমি সৌরভি।"

"রেতের বেলা ঘাটে এলি যে? দিনে সময় পাস্‌নে? এই উপ্‌ড়পে বয়েসে—ধন্যি সাহস তোর বাপের। একবার ঘা খেয়েও হুঁস হয় না? সাঁঝ-সন্ধ্যে হাওয়া খেতে ছেলেগুলো সিঁড়ির উপর এসে বসে, দেখ্‌তে ভাল লাগে বুঝি?"

সৌরভি উত্তর করিল; বলিল, "আমার পিছু এমনি ক'রে লাগলেন, কিন্তু কি করেছি আমি আপনাদের? বয়েস ত আমার হাতে নয় যে, ঠেসেঠুসে ছোট ক'রে রাখ্‌ব? আমার দেখ্‌তে ভাল লাগে কি যারা ঘাটে এসে বসে তাদের লাগে, বিচার ক'রে দেখ্‌লে ত পারেন।

কঙ্কাবতী চটিয়া গেলেন। সক্রোধে বলিলেন, "মুখের উপর ঠোঁট কাটিস্—আঃ! মলো! সাহস দেখ্। তবু যদি সতী মায়ের মেয়ে হতিস্!"

সৌরভির গা জ্বালা করিয়া উঠিল। বলিল, "অসতীর মেয়ে কিনা আপনি ভাল জানেন না। কিন্তু আপনাদের পাড়াতেই আমি বাস করি। এটা ভাল জানেন যে, আমার জন্মের গোড়ায় কোন কালি নেই। অকারণ যে ব্যথা আমাকে আর আমার বাবাকে আপনারা দিচ্ছেন, এর চেয়ে বড় পাপ সংসারে আর কিছু নেই।"

এই বলিয়া সে আর উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া দ্রুত পদে চলিয়া গেল। গৃহত্যাগের বিধি-ব্যবস্থা সে যে পূর্ব্বক্ষণে সারিয়া ফেলিতে পারিয়াছে ইহাতে সে মনে মনে আরাম বোধ করিতে লাগিল।

বাড়ী আসিয়া বাকী কাজগুলি সে সারিয়া স্থরিয়া লইল। অবশেষে খাওয়া দাওয়া শেষ করিয়া ফেলিয়া বলিল, "এইবার ওঠ বাবা!"

সৌরভি লেখাপড়া জানে—তার ভিতরে বুদ্ধি আছে, যুক্তি আছে, বিচার আছে, এ কথা নন্দ বিশ্বাস করিত। মেয়ের গৌরবও সে করিত—তাহাকে ভালও বাসিত। সে যখন 'গোঁ' ধরিয়াছে তখন গৃহত্যাগ তাহাকে করিতেই হইবে। কিন্তু সে যে হঠাৎ সমস্ত সুখ ও স্বার্থ স্বেচ্ছায় কেন বিসর্জ্জন দিতে বসিল—এ অজানিত পীড়ন বহন করা দুঃসহ। বাসনের ঝাঁকাটা ঠেস্ দিয়া অথর্ব্বের মত সে সেখানে এলাইয়া পড়িয়াছিল। বলিল, "ঘর ছাড়্‌তে পার্‌লে আমিও বেঁচে যাই। কিন্তু এ নাগাত ত কথা পাড়িস নি—ঘাটে যাবার বেলাও কিছু বলিস্‌নি—বেশ হাসি খুসিতেই গেলি। গাঁ-টা এখনও কিন্তু আমি জ্বালিয়ে দিয়ে যেতে পারি।"

সৌরভির কাছে কোন উত্তর না পাইয়া সে বলিল, "তোর ভবিষ্যৎটা আর দু'দিন ঘরে ব'সে ভাব্‌তেও ত দিলিনে।"

সৌরভি বলিল, "এখানে ব'সে ভাবতে লোকে ফুরসৎ দেবে না। তুমি উঠে এস বাবা!"

সৌরভি দিন দিন বাড়িয়া উঠিতেছে নন্দ দেখিত। কিন্তু তাহাকে পরের ঘরে দিতে হইবে মনে হইলেই প্রাণটা ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিত। দু'এক জায়গায় সম্বন্ধ করিতে যাইয়া সামনা সামনি কিছু না শুনিলেও তাহার কানে যাহা পড়িয়াছে তাহার ভীষণতা কল্পনারও অগম্য। তাই বিষয়টা আর বেশীদুর অগ্রসর হয় নাই।

যাহা হউক নন্দ উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, "কিন্তু একটা দ্বন্দ্ব ত মিট্‌ল না মা! এখনও বল্ তোর গায়ে কেউ আঁচড় কেটেছে কিনা! যাবার আগে দেহটা তার টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে রেখে যাই!"

সবেগে মাথা নাড়া দিয়া সৌরভি বলিল, "সে সাধ্যি কারু নেই বাবা, সে সব কিছু নয়। কিন্তু এ বাড়ীটা দুষে গেছে—এখানে বাস কর্‌লে মঙ্গল হবে না।"

নন্দ বাড়ীখানা একবার প্রদক্ষিণ করিয়া আসিল। তারপর বাসনের ঝাঁকাটা মাথায় তুলিয়া লইয়া বলিল, "তোরঙ্গটা নিতে তোর কষ্ট হবে না ?"

সৌরভি বলিল, "না ও হাল্‌কা আছে।"

তারপর পিতাপুত্রী নিঃশব্দ দ্রুতপদ-সঞ্চারে গভীর অন্ধকারে মিশিয়া গেল।

আকাশে তখন চাঁদ উঠিয়াছে। খণ্ড খণ্ড মেঘে কখনও ঢাকিতেছে—কখনও ছাড়িয়া দিতেছে। নানারূপ চিন্তাভারে ক্ষিণ্ণ হইয়া, কখন বসিয়া—কখন চলিয়া—সমস্ত রাত্রিটা ইহারা পথ চলিল

সৌরভি বলিয়াছিল, লোকালয়ে থাকা হইবে না, কোন বন-জঙ্গলে যাইয়া বাস করিবে। ঘটিলও তাই। সকালে এক চল্‌তি নৌকায় ইহারা উঠিয়া পড়িল। নৌকারোহীরা সুন্দরবনে কাঠ কাটিতে যাইতেছিল।

ইহারা যে স্থানটায় নামিল, সেখানে গভীর জঙ্গল। সুন্দরবনের অংশ-বিশেষ। নিকটে বন-বিভাগের একটা অফিস। নদীর পরপারে লোকালয়।

বনের মধ্যে পোঁটলা-পুঁটুলি খুলিয়া সৌরভি যাহা রাঁধিল, নন্দর কাছে তাহা উপাদেয় ঠেকিল। উপরে গাছের শাখা-প্রশাখা পাতায় পাতায় মিশানো। নীচে ঝাঁট্‌পাট দিয়া পিতাকে সে কম্বল বিছাইয়া দিল। ছোট ছোট চারাগাছের ডগায় কাপড়-চোপড়, তৈজস-পত্র ঝুলিতেছে—শৃঙ্খলাবদ্ধ। নিকটেই রান্নার স্থান—পরিপাটি। নদী বেশী দূরে নয়। বাসনগুলি নদীর ঘাটে লইয়া মাজিয়া ঘসিয়া সে ঝকঝকে করিয়া আনিয়াছে, এবং সেগুলি সাজাইয়া রাখিবার জন্যে ইতিমধ্যে একখানা মাচাও প্রস্তুত করিয়া ফেলিয়াছে। এইরূপে আকাশের তলদেশে মুক্তির হাওয়ার মধ্যে তাহাদের সংসার চলিতে লাগিল।

বন-ক্লেশের এই দুঃখটুকু তাহারই হাতের এবং অকারণে দেওয়া—পাছে পিতার প্রাণে এই আঘাত বাজে—এই ব্যস্ততায় তাহার হাতের জোর যেন চতুর্গুণ বাড়িয়া গিয়াছে। সে একা হাতেই এই নির্জ্জন দেশে সরস গৃহস্থালী পাতাইয়া ফেলিল।

খাওয়া দাওয়ার পর একদিন সে পিতার শয্যাপার্শ্বে উপবেশন করিয়া কহিল, "বাঘ ভালুক বনের পশু এখানে যে রয়েছে—সত্যি কথা, কিন্তু মানুষের মত তত বড় হিংসে এদের নেই। তোমার মনে এখনও কি দুঃখ আছে বাবা ?"

"না মা, দুঃখ আর কিছুই নেই।"

কিন্তু একথা ঠিক সত্য নহে; নন্দর হৃদয়ের নিরুদ্ধ বেদনা—মেনকার তপ্ত-স্মৃতি—ভিতরে ভিতরে যে কাঁপিয়া উঠিতেছিল, সৌরভির সুষ্ঠু হস্তের সেবা-যত্নে হয়ত তাহা ঢাকা পড়িতে পারিত কিন্তু মেয়েটির রূপ ও যৌবন যে দিন দিন বাড়িতেছে, এ যৌবনের গতি কি হইবে—এ প্রশ্নের কোন উত্তরই তাহার মাথায় আসিত না। সৌরভির শুষ্ক চোখের জমাট-অশ্রু চোখে দেখা যাইত না, কিন্তু নন্দ ত জানিত কোথায় কি সঞ্চিত আছে! কাহাকেও ছোট করিয়া রাখিতে দিবারাত্রি চব্বিশটি ঘণ্টা কাহারও পক্ষে অচল কাহারও পক্ষে সচল হইয়া ত চলে না? সে মিনিটে মিনিটে, সেকেণ্ডে সেকেণ্ডে প্রত্যেকেরই আয়ুষ্কাল সমানভাবে চিহ্নিত করিয়া যাইতেছে। ভাবিতে ভাবিতে নন্দ পলে পলে নিজেকে হত্যা করিয়া চলিল।

সংসারে তখন অন্য কোন কষ্ট নাই। একটু দূরে যে ছাড়ের আফিস ছিল তাহার বড় বাবুটি বৃদ্ধ এবং ধর্ম্মভীরু। নন্দ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কাঠ কাটিবার জন্য কিছু জঙ্গল সুবিধাজনক সর্ত্তে বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছিল। জমি হইতে কাঠ কাটাইয়া নদীর ধারে সে জড় করিয়া রাখিত। কাষ্ঠ-ব্যবসায়ীরা আসিয়া মূল্য দিয়া লইয়া যাইত।

এদিকে অবসর সময়ে পিতার সাহায্যে সৌরভি একখানা বড় ও একখানা ছোট ঘর ও সেই সঙ্গে ঢেঁকি ও গোয়াল ঘর প্রস্তুত করিয়া লেপিয়া পুঁছিয়া তকতকে ঝরঝরে করিয়া ফেলিল। সমস্ত বাড়ীটা ডালপালার দ্বারা পাঁচিলে ঘেরা। পাঁচিলের গা ঘেঁসিয়া গাঁদাফুলের শ্রেণী। নদী পর্য্যন্ত পরিচ্ছন্ন ও বিস্তৃত রাস্তা। দু'টি দুগ্ধবতী গাভী, কয়েকটা ছাগল, একটি টিয়া পাখী, একটি ময়না।

"ঐ আসে ঐ"

শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষ মহাশয়ের প্রাচীন
চিত্র-সংগ্রহ হইতে

বোঝা-পড়া

শ্রীঅরবিন্দ দত্ত

কিন্তু এত উদ্যোগ আয়োজন করিয়াও পিতাকে সে ধরিয়া রাখিতে পারিল না। নন্দ দুর্ভাবনায় দিন দিন শীর্ণ হইয়া অবশেষে একদিন পীড়িত হইয়া পড়িল। সৌরভি চোখে অন্ধকার দেখিল।

নন্দর রোগ ক্রমেই বাড়িয়া চলিল। কখন চেতনা থাকে—কখন থাকে না—এই রকম অবস্থা। পিতার কাপড় চোপড় এবং বিছানার ওয়াড়গুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া দিবার জন্য আগের দিন রাত্রে সৌরভি সে সকল ক্ষারে সিদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। সকালে বেশ এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গেল। তখন বৃষ্টি ছিল না। গাছের পাতার সঞ্চিত জল টিপ্ টিপ্ করিয়া ঝরিয়া পড়িতেছিল। পিতাকে পথ্য দিয়া সিদ্ধ কাপড়ের চুপড়িটি লইয়া সে ঘাটে আসিল। ঘাটে আছ্ড়াইয়া কাপড়গুলি কাচিয়া শেষ করিয়া সে দম লইতেছে এমন সময় দেখিল একখানা পানসী নৌকা কূল ধরিয়া আসিতেছে। আরও দেখিল, ছাপ্পরের উপর একটি যুবক তাহার উপর দৃষ্টি প্রখর করিয়া রাখিয়াছে। সে চক্ষু নত করিল।

নৌকাখানা কাছে আসিতে যুবকটি জিজ্ঞাসা করিল, "সৌরভি না?"

সৌরভি এক নজর চাহিয়া দেখিল, তাহাদেরই গাঁয়ের জমিদার পুত্র কুমুদরঞ্জন।

কুমুদ বলিল, "হঠাৎ তোমাদের কি হ'ল বল দেখি? কেউ জান্‌লে না—শুন্‌লে না—এখানে কোথায় এসেছ?"

সৌরভি তেমনি মুখ নীচু করিয়া জবাব দিল, "এই জঙ্গলে এসে বাসা বেঁধেছি।"

কুমুদ বলিল, "এত ঠাঁই থাকৃতে বাঘ-ভালুকের দেশের উপর মায়া হ'ল—হেতু?"

সৌরভি তেমনি নতমুখে জবাব দিল, "মানুষের দেশকে আরো ভয় হ'ল ব'লে।"

যদিও এ মেয়েটির মুখে এরূপ জবাব এই নূতন নহে, তবুও অনেকদিনকার অসাক্ষাতের পর এই কথার ভিতরে এত অধিক ভর্ৎসনা ছিল যে কুমুদ লজ্জায় কিছুক্ষণ নিরুত্তর হইয়া রহিল। তারপর জিজ্ঞাসা করিল, "নন্দ কোথায়? কেমন আছে?"

সৌরভি বলিল, "বাড়ীতে। বড্ড অসুখ তাঁর।"

"কি অসুখ!"

"জ্বর, কাশী—বাহিরে ত এগুলি আছে। ভিতরে আরও কত কি—আমি সব জানিনে।"

মাঝিদের নোঙর করিতে বলিয়া কুমুদ নামিয়া পড়িল। বলিল, "কাপড় কাচা হ'য়ে গেছে তোমার? কোথায় বাসা বেঁধেছ চল, নন্দকে একবার দেখে আসি।"

এত বড় দুঃসময়ে নিঃসঙ্গ অবস্থায় ইহার আগেকার আচরণে মনের সঞ্চিত ঘৃণার অবশেষ ছাপাইয়া এই একটুখানি স্নেহের স্পর্শে সৌরভির চোখের পাতাদুটি তখন ভিজিয়া উঠিয়াছে।

সে বলিল, "একটু দাঁড়ান আপনি—কাপড়গুলো ধুয়ে নি।"

এই বলিয়া সে হাঁটু জলে নামিয়া বস্ত্রগুলি জলের উপর নাড়াচাড়া করিয়া ধুইতে প্রবৃত্ত হইল। কুমুদ তদবসরে পিছন দিক হইতে সেই পুষ্পিত পল্লবিত দেহের রূপ-যৌবন দুটি চোখে শুষিয়া লইতে লাগিল।

অঙ্গনে পা দিতেই বাড়ীখানার পারিপাট্য দেখিয়া কুমুদ মুগ্ধ হইল। সমস্ত গৃহের রচনা-কুশলতায় চেহারা ফিরাইতে যে দুখানা নিপুণ হস্ত কাজ করিয়াছে, সে ত ইহার লেপা-পোঁছা এবং শৃঙ্খলার মধ্যে প্রতি অঙ্গে ধরা দিতেছে।

কুমুদ দেখিল, ঘরের বেড়াগুলি মাটির প্রলেপে দেওয়ালের মত করা হইয়াছে। উপরে খড়ের পরিচ্ছন্ন ছাউনি। পাঁচিলও মাটি দিয়া লেপা। দুইদিকে খড়ের ছোট চালা। অঙ্গনটি পরিচ্ছন্ন। পার্শ্বে একদিকে একটা তুলসী গাছ—পিঁড়ি গাথা। চারিধারে গাঁদা ও দুমুখী ফুলের শ্রেণী। ঘরের মধ্যে আলমারী, কুলুঙ্গি, তাক্ সমস্তই মাটির। ঢেঁকি ঘর, রান্না ঘর, গোয়াল ঘর সমস্তই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। কুমুদ অবাক হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার লালসার মাত্রাও বাড়িয়া উঠিল।

ঘরের ভিতরে নন্দর রোগশয্যার পার্শ্বে সৌরভি তাহাকে বসিতে আসন দিল। নন্দর তখন জ্ঞান ছিল না।

কুমুদের কাছে অবস্থাটা ভালবোধ হইল না। করিল, "ওষুধ-পত্রের ব্যবস্থা কিছু কর নি?"

সৌরভি বলিল, "বন বাঁদাড়ে ডাক্তার বদ্দি ত নেই। এখানে জঙ্গলের এক আফিস আছে। কাল গিয়ে বড় বাবুর পা জড়িয়ে ধরি। তিনি পাইক দিয়ে চারক্রোশ দূরের এক ডাক্তারখানা থেকে আট দাগ ওষুধ আনিয়ে দেন। তাই খাওয়াচ্ছি।"

এই বলিয়া ঔষধের শিশিটা সে উঁচু করিয়া ধরিয়া দেখাইল।

কুমুদ বলিল, "না দেখে শুনে ঢিল ছুঁড়লে কি রোগের গায়ে লাগে? এখন ত ভাঁটা। জোয়ারের সময় নৌকা ছেড়ে দিয়ে ডাক্তারকে আমি সঙ্গে ক'রে আনবখন। তুমি কিছু ভেবো না।"

আরও কিছুকাল থাকিয়া সৌরভিকে সাহস সান্ত্বনা দিয়া কুমুদ খাওয়া দাওয়া করিতে নৌকায় চলিয়া গেল।

সৌরভির দেহের উপর যে একটা দুর্ব্বার লোভ কুমুদের অন্তরে দলের উপর দল মেলিতেছিল, তাহা সুপরিস্ফুট হইল সেদিন—যেদিন দুঃখের ভার মাথায় লইয়া সৌরভি দেশত্যাগী হইল।

অধীর হইয়া কুমুদ চতুর্দ্দিকে খোঁজ করিতে লাগিল। অবশেষে সে এক কাষ্ঠ-ব্যবসায়ীর নিকটে খবর পাইল যে, তাহাদেরই নৌকায় চড়িয়া ইহারা সুন্দরবনের এক গভীর জঙ্গলে নামিয়া পড়িয়াছে। সে একথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিল না। শিকারের উপলক্ষ করিয়া একদিন নৌকাযোগে বাহির হইয়া পড়িল। বিশেষ খোঁজ করিতে হইল না, পথ চলিতে চলিতে নদীর ধারেই সৌরভির সাক্ষাৎ মিলিয়া গেল।

কুমুদ সবে মাত্র খাওয়া শেষ করিয়া উঠিয়াছে, এমন সময় সৌরভি উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া বালুর চড়ার উপর দাঁড়াইল।

কুমুদ তাড়াতাড়ি মুখহাত ধুইয়া ডাঙায় নামিয়া আসিল। জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে সৌরভ?"

সৌরভি বলিল, "আপনি একবার আসুন। বাবা কেমন করছে, দেখবেন।"

তাহারা উভয়ে আসিয়া দেখিল—নন্দর জীবন-দীপ নির্ব্বাপিত হইয়া গেছে।

সৌরভি 'বাবা!' 'বাবা!' বলিয়া কিছুক্ষণ সেই মৃতদেহের উপরে বিলুণ্ঠিত হইল, তারপর স্থির হইয়া উঠিয়া বসিল।

হাঁটুর উপর মুখ রাখিয়া পিতার রক্তলেশহীন বিবর্ণ মুখের দিকে তাকাইতেই তাহার চক্ষু দুটি হইতে পুনর্ব্বার অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

কুমুদ কি সান্ত্বনা দিবে বুঝিয়া পাইল না। নিশ্চল হইয়া বসিয়া রহিল।

সৌরভি কিন্তু উঠিয়া গেল। যে ওয়াড়গুলি সে কাচিয়া কুচিয়া শুকাইতে দিয়াছিল তাহা আনিয়া তোষক ও বালিশে পরাইল, এবং একটা মাদুর টানিয়া লইয়া পরিচ্ছন্ন শয্যা রচনা করিল। ইচ্ছা—পিতাকে তাহাতে শয়ন করাইয়া শ্মশানে লইয়া যায়। কিন্তু তাহারা জাতিতে ডোম—কুমুদ ব্রাহ্মণ, সে কি মৃতদেহ স্পর্শ করিবে।

তাহার চঞ্চলভাব লক্ষ্য করিয়া কুমুদ তাড়াতাড়ি উঠিয়া যাইয়া নন্দর প্রাণশূন্য দেহ স্পর্শ করিল এবং সৌরভির রচিত শয্যার উপর শবদেহ তুলিয়া লইয়া হাত-পাগুলি সুবিন্যস্ত করিয়া দিতে লাগিল।

সৌরভি আর কোন প্রশ্ন করিল না। অন্তরের সমস্ত কৃতজ্ঞতা দুই হাতে টানিয়া লইয়া কুমুদকে সে নমস্কার করিল।

কুমুদ সেই অবধি বাড়ী যায় নাই। নৌকায় রাঁধিয়া বাড়িয়া খায়, আর সৌরভির তত্ত্ব তল্লাস লয়। কাল সে বলিতেছিল,—নৌকা সে ছাড়িয়া দিয়াছে, নদীর পরপারে একটা বাসা লইয়া সে অবস্থিতি করিতেছে। ইহারই বা সুদীর্ঘকাল ঘর-দ্বার ছাড়িয়া পড়িয়া থাকিবার হেতু কি? অযাচিত দয়ার দ্বারা এই যে একান্ত অহেতুক লীলা না জানি সতর্কতার মাঝখানেও ইহার পরিসমাপ্তিটা কি আকারে ঘটিবে? উদ্বেগে ও আশঙ্কায় সৌরভির অন্তরটি পরিপূর্ণ হইয়া রহিল।

বোঝা-পড়া

শ্রীঅরবিন্দ দত্ত

একদিন সকালবেলা নন্দর সুবৃহৎ কুঠারখানা হাতে লইয়া কোমরে কাপড় জড়াইয়া সৌরভি কাঠ কাটিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। দূর হইতে কুমুদকে আসিতে দেখিয়া সে তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পানের বাটা লইয়া বসিল।

কুমুদ ঘরে ঢুকিয়া একখানা আসন টানিয়া লইয়া বসিয়া পড়িল। আশ্চর্য্য হইয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "এত ঘেমেছ কেন?"

সৌরভি মুখ নীচু করিয়া উত্তর করিল, "কাঠ কাট্‌ছিলাম।"

"কাঠ কাট্‌তে এত ঘেমে গেলে? রান্নার কাঠ নেই বুঝি? সে ত শুক্‌নো ডালপালা কুড়িয়ে নিলেও চলে। আমাকে বলনি কেন? যোগাড় ক'রে দিয়ে যেতুম।"

জমিদার পুত্র সে। এতটা অনুগ্রহ একটা অস্পৃশ্য ডোমের মেয়ের জন্য সৌরভির ভাল ঠেকিল না। মনের ভিতর যেন খচ্ খচ্ করিয়া সূচ বিঁধিতে লাগিল। তথাপি সে হাসিতে হাসিতে কহিল, জ্বালানি কাঠ নয়।"

"তবে?"

"বাবা যে মহাজনদের কাঠ দিত, তারা কাল এসেছিল। যতটা পারি কেটেকুটে দিতে হবে তাদের।

কুমুদ ব্যগ্র হইয়া কহিল, "কতটা আর পার তুমি? ঐ সব মোটা মোটা কাঠ নিজের হাতে কেটে ব্যবসা চালান কি তোমার কাজ?"

সৌরভি কহিল, "যা পারি, একটা পেট চ'লে যাবে।"

কুমুদ খপ্ করিয়া বলিয়া বসিল, "কিন্তু আমি তা' চল্‌তে দেব না সৌরভ!"

মন্ত্র পড়িয়া কে যেন বাণ ছুঁড়িল। সৌরভির সর্ব্বাঙ্গ বিবর্ণ হইয়া মুখখানা নীচু হইয়া পড়িল। জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

এই একটি কথার প্রশ্নের কুমুদ হঠাৎ জবাব দিতে পারিল না। সে বিহ্বলভাবে সৌরভির দিকে তাকাইয়া রহিল।

অধীরভাবে সৌরভি বলিল, "বলুন না, কেন?"

শঙ্কাকুল চিত্তে জড়সড় হইয়া কুমুদ কহিল, "অনেক দিনই বলেছি সৌরভ! এমন অনেক কথা আছে, যা' কেবল চোখ দিয়েই লোকে বলে আর শোনে।"

যে কথার আভাস সে মুখ দিয়া প্রকারান্তরে ব্যক্ত করিল, তাহা একান্ত অপ্রত্যাশিত না হইলেও ইহার পশ্চাতে আশঙ্কার তীক্ষ্ণ কাঁটা ঘর-দ্বার এবং চলা-ফেরার পথটিতে পর্য্যন্ত উদ্যত হইয়া আছে সৌরভ তাহা দেখিতে পাইল। দুর্দ্দিনের সুযোগে অস্পৃশ্য লোকের মৃত দেহ ছোঁয়া, সৎকার করা—দুর্ব্বলা নারীর শ্রমের কুঠার চাপিয়া ধরা, কথায় কথায় সৌরভির দুঃখ-কষ্টলাঘবের জন্য ঔৎসুক্য প্রকাশ করা—সমস্ত সহৃদয়তার আবরণ খসিয়া গিয়া অভিসন্ধির মূর্ত্তি প্রকাশিত হইয়া পড়িল।

পানের বাটাটা দূরে ঠেলা মারিয়া ছিট্‌কাইয়া ফেলিয়া দিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল। "ওঃ! এত বড় লোভ!" এই বলিয়া খুঁট গুঁজিতে গুঁজিতে ক্রুদ্ধ সর্পের মত ঘাড় বাঁকাইয়া ঘর হইতে সে বাহির হইয়া গেল।

কুমুদ বিমর্ষ বিরস মুখে কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া চলিয়া গেল।

দিন পাঁচেক পরে সে আবার আসিল। একান্ত নিরাশ্রয় সৌরভি—এই ভাবিয়া এই পাঁচ দিনে বোধ করি তাহার অন্তরে কিছু সাহসের সঞ্চার হইয়া থাকিবে। সৌরভিও এই সময়ের মধ্যে নিজকে কতকটা শান্ত করিয়া লইয়াছে।

কুমুদকে অঙ্গনে দেখিয়া সে ঘর হইতে একখানা আসন দাওয়ার উপর ফেলিয়া দিল। ঘরের মধ্যে আড়ালে থাকিয়াই সে বলিতে লাগিল, "একটা কথা জিজ্ঞাস করি। চোখ দিয়ে কথা বলার যে কথা সেদিন বল্‌ছিলেন সে কী ভাষা? সে কি সর্ব্বত্রই চলে? না, শুধু এই ডোমের মেয়ের কাছেই চলে? সে দিন সে ভাষায় ত মনের কথা কতকটা ব'লে গেছলেন, আজ আবার কি বল্‌তে এসেছেন?"

মানুষ যখন নিম্নগামী হয় তখন তাহার অপমান পরিপাক করিবার শক্তিও বাড়িয়া যায়, তাই কুমুদ নির্লজ্জের মত সেই অনাদরের আসনখানার উপরই বসিয়া পড়িয়া বলিল, "তুমি ত নিরাশ্রয় হ'য়ে পড়েছ। তোমার একটুখানি সুখ সুবিধে—"

মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া সৌরভি বলিল, "সে দেখ্‌বার কোন অধিকারই ত নেই আপনার। এতদিন যা দেখেছিলেন সেটুকু পাওয়াও আমার উচিত হয় নি। তখন ত জানি নি, দেবতার খোলসে দানব ব'সে রয়েছে! সে জান্‌লে বাবার সৎকারের সময়ের সাহায্যটুকুও আমি নিতাম না।"

সৌরভির চক্ষু দুটি দিয়া যে নিঃশব্দে অগ্নিবর্ষণ হইতেছে কুমুদ তাহা দেখিতে পাইল না। কিছুক্ষণ জড়পিণ্ডের মত বসিয়া থাকিয়া একটা কিছু শেষ করিবার অভিপ্রায়ে প্রবল উত্তেজনা বশে হঠাৎ সে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। ডাকিল, "সৌরভ!"

সৌরভির কান জ্বালা করিয়া উঠিল। সে আর কাল বিলম্ব না করিয়া ঘর ছাড়িয়া ছুটিয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

বিস্ময়ে ও লজ্জায় হতবুদ্ধি হইয়া কুমুদ কিছুক্ষণ বসিয়া রহিল। তারপর ধীরে ধীরে সে উঠিয়া চলিয়া গেল। ইহার পর সে বহুদিন আর আসিল না। সৌরভীও হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল।

কিন্তু এই অশান্তির যবনিকাপাত এইখানেই হইল না। বাড়ী ঘর ঘুরিয়া কিছুকাল পরে কুমুদ হঠাৎ আবার একদিন ধূমকেতুর মত আসিয়া উপস্থিত হইল। সৌরভি তাহাকে দেখিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল ও কবাট বন্ধ করিল।

কুমুদ বলিল, "মানুষ দেখে—সে যে রকমেরই হোক্‌, কবাট বন্ধ করা উচিত হয় না সৌরভ?"

সৌরভি ঘরের মধ্য হইতে জবাব দিল, "খুবই অনুচিত। কিন্তু সে দিনকার ব্যবহারে প্রমাণ হ'য়ে গেছে যে, আপনার সাহস আছে—আর—আমারও সাবধান হবার দরকার আছে।" কিছুক্ষণ পরে সে বলিল, "কিন্তু এই কবাটটাই দুজনার মধ্যে বেড়া দেবার প্রধান অস্ত্র করেছি—ততটা দুর্ব্বল আমি নই। আমি ত আমার কবাটের বল্‌ জানি; তার চেয়ে আপনার লাথির জোর বেশী।" এই বলিয়া সে দরজা খুলিয়া, বাহির হইয়া আসিল; বলিল, "আপনার সবটুকু বলের পরীক্ষা আজ শেষ ক'রে ফেলুন। আপনার সঙ্গে অকারণ কথা কাটাকাটি করতে আর আমি পারি নে!"

তার চক্ষু দুটি তখন স্থির—অচঞ্চল—কিন্তু জল ঝরিতেছে। ইহার প্রতি বিন্দুটির কি ভয়ঙ্কর শক্তি! কুমুদ চোখে অন্ধকার দেখিল। সেদিন কথার কোনো শেষ হইল না—কুমুদ চলিয়া গেল।

ইহার পর সে প্রতিদিনই আসিতে লাগিল; কিন্তু কথার সুর বদ্‌লাইয়া ফেলিল। দেশ ভুঁই বাড়ী-ঘর থাকিতে এই বন-বাদাড়ে একলাটি পড়িয়া থাকা সৌরভির কোন মতেই কর্ত্তব্য হয় না, এই রকমে দেশে লইয়া-যাইবার জন্য তাহাকে সে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল।

এই হিতৈষণার মূলগত কারণ বিশেষ দুর্ব্বোধ না হইলেও কি ভাবিয়া একদিন সৌরভি সহসা রাজী হইল। বলিল, "আচ্ছা! কিন্তু এক নৌকায়?"

কুমুদ বলিল, "নৌকোর ত অভাব হয়নি। যদি বল, দু'খানাই করা যেতে পারে।"

সৌরভি বলিল, "আপনি জমিদার লোক, ভাড়াটা হয়ত নিজেই দিতে চাইবেন। কিন্তু সে অল্প-স্বল্প টাকা আমারও আছে।"

তারপর গরু দুটি বিক্রয় করিয়া স্বতন্ত্র নৌকায় কুমুদের নৌকার পাশাপাশি হইয়া দেশে চলিয়া আসিল।

সে নিজের বাড়ীতে যাইয়াই উঠিল, কিন্তু আত্ম-বিস্মৃত হইল না। এখানে নির্ভয়ে বাস করিতে পারিবে কিনা বুঝিয়া দেখিতে সে আর তিলার্দ্ধ শৈথিল্য করিল না। পরদিন প্রভাতেই কুমুদদের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল।

কুমুদ তখন রকের উপর বসিয়া হাত মুখ ধুইতেছে। কঙ্কাবতী পুত্রের নিকটে শিকারের গল্প শুনিতেছেন। সৌরভিকে দেখিয়া তাঁহার চোখের পলক থামিয়া গেল। বলিলেন, "সৌরভি যে! কোথায় ছিলি এতদিন? কখন এলি?

সৌরভি হাসিমুখে কহিল, "আপনার ছেলের সঙ্গেই ত এলাম ঠাকুরমা!"

কঙ্কাবতী পুত্রের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিলেন। কুমুদের মুখখানা তখন ভারি হইয়া মাটির দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে।

কঙ্কাবতী রোষদীপ্ত কটাক্ষে বলিলেন, "তুই বল্‌লি না কুমুদ! শিকারে গিয়েছিলি?"

ইহার উত্তর সৌরভিই দিল। বলিল, "শিকার উনি অনেক রকমের করেন। পুকুর ঘাটে মাছও ধরেন, আবা

সোঁদর বনে বাঘও মারেন।” একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, “পাছে আপনার কচি ছেলেটির মাথা চিবিয়ে খাই, সেই ভয়ে আমি নিজেই ত উয্‌যুগী হ'য়ে জঙ্গলে চ'লে গেলাম। কিন্তু আপনি কি ক'রে আমার মাথাটা চিবুতে সেই ছেলেকে জঙ্গল পর্য্যন্ত ধাওয়া ক'রে পাঠালেন?”

সৌরভির মনে যে কথা উঠে—তাহা যত রূঢ়ই হউক না কেন, বাহিরে প্রকাশ করিতে পারিলে সে যেন খালাস পায়। কঙ্কাবতীর ক্রোধোদ্দীপ্ত মুখ এবং কুমুদের অগ্নিবর্ষী চক্ষু দেখিয়াও সে হটিল না। বলিল, “কিন্তু আপনার ভয়ের কারণ নেই। অনেক দুঃখে অনেক কষ্টে ভালয় ভালয় আপনার ছেলেটিকে ফিরিয়ে এনেছি—তার মাথা চিবিয়ে খাইনি; কিন্তু তিনি যাতে আমার মাথা চিবিয়ে না খান তার ব্যবস্থা আপনাকে করতে হ'বে ঠাকুরমা!”

কঙ্কাবতীর মুখ দিয়া কোনো কথা বাহির হইল না, ক্রোধে অধর দংশন করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন।

সৌরভি কহিল, “সমাজ হিসাবে আপনি আমার একজাতি না হ'লেও মেয়ে হিসাবে আমরা একজাতি। তাই আপনার সঙ্গে একটা বোঝা পড়া করতে এসেছি। আপনি যদি নিজের ছেলেকে না সামলান, তা হ'লে আমিও পরের ছেলেকে আর সামলাব না, এই আপনাকে ব'লে গেলুম।” বলিয়া আর উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করিয়া সৌরভি দৃঢ়পদে প্রস্থান করিল।

হাস্না-হানা

শ্রীলীলা দেবী

হাস্না-হানা! হাস্না-হানা!

ছোট্ট সাদা সবুজ দানা!
ঝাড়ের বাহার দোলায় হাওয়া
গন্ধে তাহার স্বপ্ন-পাওয়া!
কার পরাণের মূর্ত্তি তুমি?
জাপান না সে স্বর্গভূমি?

হাস্না-হানা! হাস্না-হানু!
রূপের পরী জিন্না বানু
তোমায় নিয়ে সাজায় চুলে,
নৃত্য তোমার উঠ্‌ছে দুলে
রঙ্গভূমি শাখার বুকে
মৌমাছিদের ওড়ার সুখে!

হাস্না-হানা! হাস্না-হানা!
কোমল মিঠে ও-মুখখানা!
গন্ধে তোমার চাঁদের আলো
বল্ না আমায় বাস্‌বে ভালো?
দাও না আমায় একটি চুমি,
মিষ্টি তুমি! মিষ্টি তুমি!

বুড়াপেষ্ট

শ্রীমনীন্দ্রলাল বসু

বন্ধুবরেষু,

তুমি লিখেছিলে, বুড়াপেষ্টে যদি যাই, তার একটা বিবরণ তোমার চাই-ই। ইয়োরোপের অন্য সব বড় সহরের চেয়ে বুড়াপেষ্ট সম্বন্ধে তোমার ঔৎসুক্যের কারণটা আমি বেশ বুঝতে পারছি। বুড়াপেষ্ট আমাদের অজানা, ওখানে ভারতীয় ভ্রমণকারীরা খুব কমই যায়; কিন্তু সেজন্যে নয়, মাজ্যার (Magyar) জাতির সভ্যতার কেন্দ্রটি দেখ্‌বার জন্যেই বুড়াপেষ্টে গেছলুম। ভিয়েনা পর্য্যন্ত এসে বুড়াপেষ্ট দেখ্‌বার লোভ সামলাতে পারলুম না, ভিয়েনা থেকে বুড়াপেষ্ট ট্রেণে প্রায় পাঁচ ঘণ্টা।

বুড়াপেষ্টের অপেরা-হাউস

ভিয়েনাতে সবাই বল্লে, বুড়াপেষ্ট সহর খুব সুন্দর। কিন্তু বুড়াপেষ্টে এসে কিছু নিরাশ হলুম, সহরটি সুন্দর বটে কিন্তু আমি ভেবেছিলুম পূর্ব্ব ও পশ্চিমের সংঘাত ও সম্মিলনের একটা বিশেষত্ব ওখানে দেখব, তা সহরের চেহারাতে কিছু দেখ্‌তে পেলুম না; বস্তুতঃ পারি, বার্লিন, ভিয়েনার মতই বুড়াপেষ্ট ইয়োরোপের একটি আধুনিক সহর, বুড়াপেষ্টে নেমে মনে হ'ল এ ভিয়েনারই একটি ছোট সংস্করণ, তেম্নি রিং ষ্ট্রাসে, তেম্নি উনবিংশশতাব্দীর স্থাপত্যময় বাড়ীর সারি, তেম্নি কাচের সারি, তেম্নি হ্যাটকোট-পরা নরনারীর জনস্রোত; বুড়াপেষ্টের প্রধান রাস্তা 'আন্‌দ্রাসি উট'এর সহিত পারির যে কোন বুলেভারের তুলনা দেওয়া চলে; আন্‌দ্রাসি ষ্ট্রীটের অপেরার বাড়ীটি দেখে মনে হ'ল এ ঠিক ভিয়েনার অপেরা হাউস।

কিন্তু কোন স্থানকে শুধু বাহির হ'তে উপরি উপরি দেখ্‌লে তাকে সত্যরূপে সম্পূর্ণরূপে দেখা হয় না, তার সৌন্দর্য্য বোঝা যায় না। স্মৃতিই সব জিনিষকে সুন্দর করে, প্রিয় করে, সেজন্য কোন স্থানকে তার ঐতিহাসিক সফল স্মৃতি-জড়িত ক'রে না দেখলে তার মাধুর্য্য অনুভব করা যায় না। তাই, বিকেলবেলা ষ্টেসন থেকে নেমে সহরটা তেমন মনে ধরল না বটে, কিন্তু সন্ধ্যেবেলা যখন ডানিউব-নদীর ওপর ম্যারগারেট-সেতুতে দাঁড়িয়ে ডানদিকে ছোট গিরিমালার ওপর থাকে থাকে সাজানো বাড়ী, গির্জ্জা রাজপ্রাসাদ মণ্ডিত বুড়া সহরের দিকে চাইলুম, আর বামদিকে কুঠি-হোটেল দোকানের-সারি-পার্লমেণ্ট শোভিত সমতল পেষ্ট সহরে

বুড়াপেষ্ট

শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু

াকে চাইলুম তখন মুগ্ধ হ'য়ে গেলুম, নদীর দুই তীর যোড়া এই সহরটির সত্যি একটা সৌন্দর্য্য আছে। নদী ও পাহাড় যেখানে মিলেছে সেখানে একটা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য আপনিই গ'ড়ে ওঠে, তারপর মানুষ যখন সে সুন্দর স্থান তার প্রাসাদ মন্দির দিয়ে সাজায়, তখন তা আমার কাছে আরও মনোহর মনে হয়। বিশেষতঃ সেই সন্ধ্যার আলোয় গিরিমালাময় বুড়া অতীত ইতিহাসের স্মৃতি-মণ্ডিত উজ্জ্বলতর সৌন্দর্য্যে প্রকাশিত হ'ল। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে রোমানরা যখন এখানে তাদের নগর স্থাপন করেছিল, তখন এখানে এক কেল্টিক উপনিবেশ ছিল; তারপর রোমরাজ্য ভেঙে গেল, হুনেরা এল, অষ্ট্রগথেরা এল, তাদের দলও চ'লে গেল; আভাররা, তাদের পর স্লাভরা এসে ওই পাহাড় দখল ক'রে বসল; তারপর, প্রায় এগারোশ' বছর আগে মাজ্যাররা (Magyars) এল ডানিউবের নির্ম্মল জলধারা ধ'রে তাদের দিগন্তপ্রসারিত এশিয়ার সমতলভূমি থেকে; তাদের রাজা আরপাড়ের নেতৃত্বে মাজ্যারের দল স্লাভদের যুদ্ধে হারিয়ে হটাতে হটাতে এল, চারিদিকের সুবিস্তৃর্ণ আকাশচুম্বী প্রান্তরের মধ্যে সুদৃঢ় দুর্গের মত সমুত্থিত বুড়ার পাহাড়ের মালা দেখে সেইখানে তাদের বিজয় যাত্রা থামালো, তাদের নগর গ'ড়ে তুল্ল, তারপর চারিদিকে সমতলভূমির স্লাভদের তাড়িয়ে অধিকার ক'রে বসল, বুলগারদের, ক্রোঠদের, সার্ভদের হারিয়ে আপনাদের অধীনে আনলে। তারপর শত শত বৎসর কেটে গেছে; হাজার বছর আগে যে দুর্দ্ধর্ষ বন্য মাজ্যার-অশ্বারোহীর দল সমস্ত ইয়োরোপের ত্রাস ছিল, জার্ম্মানীতে রাইনল্যাণ্ড পর্য্যন্ত, ইতালীতে বুরগেণ্ডি পর্য্যন্ত তাদের মত্ত ঘোড়ার দল হাঁকিয়ে নগর গ্রাম লুঠতরাজ ক'রে ফিরত, তাদের বংশধরেরা ধীরে ধীরে দস্যু সৈনিক থেকে কৃষক হ'ল, লুঠ ক'রে আনবার ঘোড়া লাঙলে জুত্‌লে; ধীরে ধীরে তারা ইয়োরোপীয় সভ্যতার স্পর্শে এল, তাদের রাজা সাধু ষ্টিফানের নেতৃত্বে খৃষ্টানধর্ম্ম গ্রহণ করলে, হাঙ্গারীতে মাজ্যার-রাজত্ব প্রবল প্রতাপে গ'ড়ে উঠল। প্রাচীন আরপদ্-রাজবংশের শেষে যখন আনজু-রাজবংশ এল, ইতালীয়ান সভ্যতা, ফরাসী সভ্যতা হাঙ্গারীতে প্রবলরূপে এল। ভারতের ইতিহাসের গৌরবময় কাল বল্‌তে আমরা যেমন প্রাচীন ভারতের কথা এবং মুসলমান ভারতের কথা ভাবি, দেশভক্ত

সমোজের মেয়ে চরকা কাট্‌ছে

মাজ্যাররাও তেম্নি তাদের ইতিহাসের গৌরবময় যুগ বল্‌তে প্রাচীন হাঙ্গারীর কথা—রাজা মাথিয়স করভিনুসের সময় (১৪৫৮-১৪৯০) ভাবে। তুরস্কের নিকট পরাজয় ও দাসত্বের কথা বা অষ্ট্রিয়ার রাজার নিকট পরাভব ও অধীনতার গর্ব্ব তাহার অতীত ইতিহাসের এ অংশের জন্যে তারা লজ্জিত বটে, কিন্তু এখানেও তাহার গর্ব্ব করবার আছে; কোন অত্যাচারে অধীনতায় এ মাজ্যার-জাতি প্রাণহীন আশাহীন হয় নি, নত হ'য়ে পড়েনি, স্বাধীনতা লাভের জন্য বার বার প্রাণপণে সংগ্রাম করেছে। হাজার বছর আগে

মাজ্যারদের tribal spirit যেরূপ উগ্র ছিল আজও তাদের জাতি-বোধ, স্বাদেশিকতা তেম্নি তীব্র রয়েছে; এই প্রচণ্ড tribal spiritএর গুণেই মাজ্যাররা স্লাভদের হটিয়ে হাঙ্গারী দখল করতে পেরেছিল, ইহারি জোরে তারা একদিকে মুসলমান তুরস্কের সঙ্গে লড়াই করেছে, অপরদিকে স্লাভদের ঠেকিয়েছে ইয়োরোপীয় সভ্যতা গ্রহণ করেছে কিন্তু আপনাদের বৈশিষ্ট বজায় রেখেছে, জার্ম্মাণ-অষ্ট্রিয়ার অধীনে এসেছিল কিন্তু তার দ্বারা জিত হয় নি।

বুডার পাহাড়ে রাজ-প্রাসাদ

সন্ধ্যার রক্তিম আলোয় মারগারেট-সেতুর ওপর দাঁড়িয়ে এম্নি কত কথা মনে পড়ল।

মারগারেট-সেতুর প্রায় মাঝামাঝি আর একটি ছোট-পোল ডানদিকে সেতুটির সঙ্গে লম্বভাবে যোড়া, এ ছোট পোলটি মারগারেট-দ্বীপে গেছে, ডানিউব-নদীর মাঝখানে এইখানে একটি ছোট দ্বীপ আছে, তেরো শতাব্দীর হাঙ্গারীর রাজা চতুর্থ বেলার (King Bela IV) মেয়ের নামে এই দ্বীপটির নামকরণ হয়েছিল মারগারেট-দ্বীপ। দ্বীপটি হচ্ছে বুডাপেষ্ট-বাসীদের আমোদ-প্রমোদ করবার খেলবার পার্ক; ফুটবল খেলবার মাঠ, টেনিস খেলবার কোর্ট, ব্যাণ্ড বাজাবার জায়গা, স্নান করবার জায়গা, রেস্তোরাঁ, বেড়াবার পথ কিছুরই অভাব নেই দ্বীপটিতে; দ্বীপটি বুডাপেষ্ট-বাসীদের একটি গর্ব্বের জিনিষ ও বিদেশী এলেই বলে, মারগারেট-দ্বীপে গেছেন কি? বেড়াবার পক্ষে দ্বীপটি বেশ সুন্দর, দু'ধারে ডানিউব নদী ব'য়ে গেছে, তার ধার দিয়ে দ্বীপের মাঝ দিয়েও নানা পথ-বীথিকা এঁকে বেঁকে চ'লে গেছে, সহরে সমস্ত দিন কাজের পর এখানে নদীর নির্ম্মল বাতাস সেবন যেমন আরামের তেম্নি স্বাস্থ্যকর। তুমি এতদূর পড়ে হয়ত ভাবছ, কিন্তু সহরের বিবরণ কৈ? দেখো, বুডাপেষ্ট সহরের এমন কিছু বিশেষত্ব দেখ্‌লুম না যা রঙিয়ে বর্ণনা করতে পারি, ইয়োরোপের সকল আধুনিক সহরের মত তার রূপ। তবে বুডাপেষ্টে যা দ্রষ্টব্য আছে, অর্থাৎ যা সব বিদেশী ভ্রমণকারীরা এসে দেখে, তুমি এলেও যা দেখে ঘুরে বেড়াতে তাদের একটা বর্ণনা দিতে পারি। আমার এক দিনের ঘোরার ডায়েরী তোমায় লিখ্‌ছি।

সকাল বেলা হোটেলে ব্রেকফাষ্ট খেয়ে বাহির হলুম। ব্রেকফাষ্ট হচ্ছে রুটি, মাখন, আর চা; দাম নিলে দেড় পেঙ্‌গো। পেঙ্‌গো হচ্ছে হাঙ্গারীর মুদ্রার নাম। এক ইংলিশ পাউণ্ড হচ্ছে প্রায় ২৭ পেঙ্‌গো, কত টাকা হয় হিসেব ক'রে নিও। দিনটা রাজপ্রাসাদ দেখে সুরু করব ঠিক ক'রে, কোন্ ট্রামে রাজপ্রাসাদে যেতে হবে জেনে রাস্তার মোড়ে এসে দাঁড়ান গেল। ট্রামের জন্য দাঁড়িয়ে আছি বুঝে ট্রাম কোম্পানীর এক লোক এসে জিজ্ঞেস

শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু

করলে, কোথায় যাবেন? বল্লুম, রাজপ্রাসাদ দেখতে। বল্লে, বেশ টিকিট দিচ্ছি, নিন। ভাবলুম, এখন টিকিট কিনব কি, লোকটা বিদেশী দেখে ঠকাচ্ছে না ত। তারপর দেখলুম, আরও অনেক লোক টিকিট কিন্‌ছে তার কাছে থেকে; একটি লোক বল্লে, ট্রামে খুব ভিড় হয় ব'লে সেখানে টিকিট কেনা অসুবিধের ব'লে, এই রাস্তার চৌমাথায় ট্রাম থামবার স্থানে টিকিট-কেনার ব্যবস্থা। ব্যবস্থাটা ভালই বুঝে, টিকিট কেনা গেল। ট্রাম যখন এল, দেখি লোকে ভরা, তাতেই গাদাগাদি ক'রে সবাই উঠল। টিকিটের দাম ২৪ ফিলার, ১০০ ফিলারে এক পেঙ্গো; দামটা ২০ বা ৩০ ফিলার করলেই ভাল হত, অন্ততঃ বিদেশীদের দেবার সুবিধে হত, ১ বা ২ ফিলারগুলি ছোট ছোট তামার মুদ্রা, আমাদের আধ পয়সা জাতীয় তার চেয়েও ছোট হবে বোধ হয়। ভিড়ে গাদাগাদিতে এরূপ ছোট মুদ্রা নিয়ে টিকিট কেনা বেশ অসুবিধের, রাস্তায় ট্রাম-টিকিট কেনার ব্যবস্থার সুবিধেটা বুঝলুম।

একটি বড় রাস্তা শেষ ক'রে মারগারেট-সেতু দিয়ে নদী পেরিয়ে তারপর নদীর ধারের রাস্তা দিয়ে বহুদূর গিয়ে চেন্-ব্রিজের মোড়ে ট্রাম থামলে, সেইখানে নামলুম; সামনে পাহাড় উঠে গেছে, তার ওপর রাজপ্রাসাদ। ফিউনিকুলেয়ার ক'রে পাহাড়ের মাথায় উঠে একেবারে রাজপ্রাসাদের দরজায় এসে পৌছালুম। প্রাসাদটি যেমন বিরাট তেম্নি গম্ভীরমূর্ত্তি, বাকিংহাম প্যালেসের সঙ্গে বেশ তুলনা করা যেতে পারে, বিশেষতঃ নদীর ধারে পাহাড়ের ওপর ব'লে তার বিরাট মহানরূপ সুন্দর দেখায়। রাজপ্রাসাদের একটি ছবি দিলুম, তাতে বুঝতে পারবে তার স্থাপত্যটা কি ধরণের। এই পাহাড়ের মাথায় প্রাচীন রাজা চতুর্থ বেলা (King Bela IV) তাঁর দুর্গ-প্রাসাদ গড়েছিলেন, পরের রাজারা সেই প্রাসাদ বাড়িয়ে যান, তারপর তুর্কীদের হাতে সে প্রাসাদ ধ্বংসে পরিণত হয়। বর্ত্তমান প্রাসাদ রাণী মারিয়া থেরেজার গড়া, অবশ্য পরে কিছু কিছু সংস্কার হয়েছে, প্রাসাদটাতে নাকি ১৬০টি ঘর আছে। একটি পরিচালকের তত্ত্বাবধানে বিদেশী ভ্রমণকারীদের যে ঘরগুলি দেখান হ'ল, তাতে দেখলুম, ঘরের আসবাব-পত্তর সাজসজ্জা সব ভিয়েনার রাজপ্রাসাদের ধরণেরই। রাজপ্রাসাদের চারিদিকে সুন্দর বাগান আছে, এখান থেকে তলায় চেন-ব্রিজ ও ওপারে প্রাসাদ-শ্রেণী-সজ্জিত সেণ্ট ষ্টিফান চার্চ্চ-মণ্ডিত পেষ্টের সুন্দর শোভা দেখা যায়, তারও একটি ছবি দিলুম।

রাজপ্রাসাদের উত্তরে একটু গেলেই বুড়ার সব চেয়ে পুরাতন চার্চ্চ "কোরোণাজোটেম্‌প্লম্" অর্থাৎ Coronation
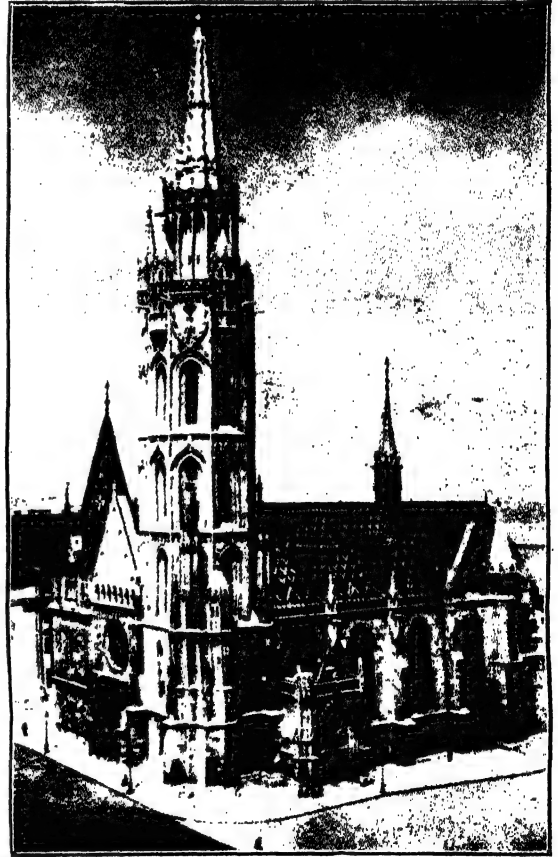
কোরোণাজোটেম্‌প্লম্ বা রাজ্যাভিষেক-গির্জ্জা

Church; বুড়ার প্রাচীন নৃপতিদের এই চার্চ্চে রাজ্যাভিষেক হোত। এই চার্চ্চটি চতুর্থ বেলা তেরো শতাব্দীতে আরম্ভ করেন, পনেরো শতাব্দীতে গড়া শেষ হয়; তুর্কীরা যখন বুড়া দখল করে তারা চার্চ্চটি ধ্বংস করে নি, সেটিকে মসজিদে পরিণত করে; চার্চ্চটির ভেতরে দেওয়ালে থামে সব নানা

রঙীন রংএর নক্সা আঁকা, চার্চ্চের ছাদটিও নানাবর্ণের রেখাঙ্কিত টালিতে ছাওয়া, এই রঙীন নক্সা ও টালি বোধ হয় মুসলমানী প্রভাবের চিহ্ন মনে হ'ল, এই ছোট চার্চ্চটিতে যেন রোমানেস্ক, গথিক, বাইজেন্টাইন সকল প্রকার স্থাপত্যের সম্মিলন হয়েছে।

চার্চ্চটির সম্মুখে প্রাচীন নৃপতি সাধু ষ্টেফানের প্রতিমূর্ত্তি। মধ্যযুগের নাইট-বেশে রাজা ষ্টেফান চারিদিকে চারি সিংহ-রক্ষিত মঞ্চের ওপর অশ্বপৃষ্ঠে, এ মূর্ত্তি যেমন মাজ্যার রাজ্য-প্রতিষ্ঠাতা খ্রীষ্টানধর্ম্ম-প্রচারক প্রাচীন নৃপতির স্মৃতিচিহ্ন তেমি চির-জাগ্রত মাজ্যার-জাতি-আত্মবোধের প্রতীক।
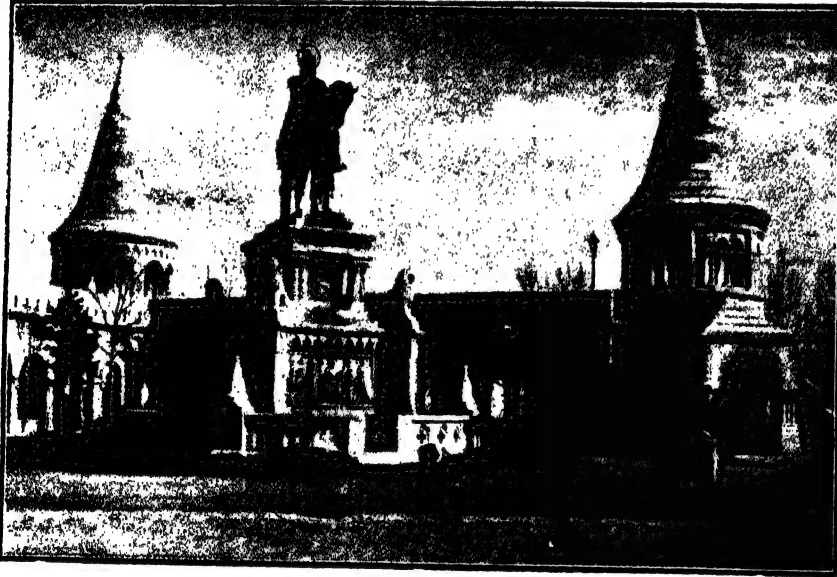
সেন্ট ষ্টেফানের স্মৃতিমূর্ত্তি

রাজপ্রাসাদের পাহাড় হ'তে সিঁড়ি দিয়ে নেমে নদীর তীরের রাস্তা দিয়ে দক্ষিণ দিকে কিছু দূর গিয়ে আর একটি ছোট পাহাড়ের সম্মুখে এলুম। পাহাড়টির নাম "ব্লক্স্‌-বেয়ার্গ" (Blocksberg); তুর্কীরা এর মাথায় 'ব্লক হাউস' গড়েছিল, তাই থেকে এর নামকরণ। এখনও পাহাড়ের ওপরে একটি দুর্গের ধ্বংসাবশেষ আছে। প্রশস্ত বাঁধান সিঁড়ি পাহাড়ের গা ঘুরে ওপরে উঠে গেছে; সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে সমস্ত বুড়াপেষ্টের বড় সুন্দর দৃশ্য পেলুম—তলায় ষ্টিমার ভরা ডানিউব নদী ঝলমল ব'য়ে চলেছে; ডানদিকে পাহাড় খাড়া নেমে গেছে, তারপর দিগন্ত-বিস্তৃত প্রান্তর, তার মাঝ দিয়ে রূপালি সূতার তার ডানিউব নদীর ধারা বেঁকে চ'লে নীলাকাশে কোথায় হারিয়ে গেছে; বাম দিকে পাহাড়ের ঢেউ খেলান, তাদের ওপর রাজপ্রাসাদ, গির্জ্জা, বাড়ীর সারি, তাদের তলায় নদীর জলধারার ওপর পোলের পর পোল; ওপারে সুন্দর পেষ্ট সহর, গির্জ্জার চূড়াগুলি আকাশে গিয়ে ঠেকেছে। প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ মণ্ডিত এই ছোট গিরিটি বিদেশী ভ্রমণকারীর চোখে অতি তুচ্ছই মনে হয়, উঁচুস্থান হ'তে বুড়াপেষ্ট সহরের সম্পূর্ণ দৃশ্য দেখার সুবিধা হিসাবে এই পাহাড়ের সার্থকতা মনে হয়, কিন্তু হাঙ্গেরীর ঐতিহাসিকের নিকট এ গিরি পুণ্যভূমি, এ গিরি যে গিরিমালার প্রথম চূড়া, প্রবেশ-দ্বার, সে গিরি-মালায় ইয়োরোপীয় সভ্যতার ভাগ্য-পরীক্ষা হ'য়ে গেছে। এ বিষয়ে একটি ফরাসী লেখক যা লিখেছেন তা তোমায় অনুবাদ ক'রে লিখ্‌ছি—

"এই প্রাচীন সহর বুডা (Buda) মারাথনের মত, সালামিসের মত, কাটালো-নিয়ার সমতলভূমির মত; পূর্ব্বের সহিত সংঘাতে সংগ্রামে পশ্চিমের সভ্যতার ভাগ্য এখানে নির্দ্ধারিত হয়েছে। এই পাহাড়ের মালা ঘেরা হাঙ্গেরীর সুবিস্তীর্ণ সমতলভূমি এসিয়াবাসীদের প্রবল আকর্ষণ ছিল, এই পাহাড়ের তলায় আটিলা (Attila) তাঁর তাঁবু গেড়েছিলেন, তার পর, তাতারের দল মোগলের দল ঘোড়া হাঁকিয়ে চ'লে গেছে; তারা ধূলির মেঘের মত এসে স্বপ্নের মত দূরদিগন্তে মিলিয়ে গেল। তারপর হাঙ্গেরিয়ানরাই এখানে তাদের গ্রাম নগর তৈরী ক'রে বসবাস আরম্ভ করলে, বহুদিন তারা পশ্চিম ইয়োরোপের ত্রাস ছিল। কিন্তু যখন তারা White Stallionর পূজা ছেড়ে রোমের নিকট খৃষ্টানধর্ম্মে দীক্ষিত হ'ল, তারা এসিয়াবাসীর বিরুদ্ধে ইয়োরোপের খৃষ্টানধর্ম্মের রক্ষক হ'ল।

শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু

শতাব্দীর পর শতাব্দী এই পাহাড়ে পূর্ব্বে ও পশ্চিমের দ্বন্দ্ব সংঘাত চলেছিল। ক্ষুদ্র-চক্ষু পীতবর্ণ মানুষের দল তরঙ্গের পর তরঙ্গে এই গিরিদুর্গ অধিকার করতে চেষ্টা করেছে, আর সমস্ত feudal ইয়োরোপ এর রক্ষার জন্যে মিলেছিল।

তারপর ইয়োরোপীয় সভ্যতার আর এক নূতন শত্রুর আবির্ভাব হল, আটিলার হুনেদের চেয়ে বা বটু খাঁর তাতারদের চেয়ে তারা আরও ভীষণ। আধ শতাব্দী ধ'রে ট্রান্‌সিল্‌ভানিয়ার বীরেরা তুর্কীদের আক্রমণ অগ্রসর হটিয়ে রেখেছিল। সেই মাথিয়াস কর্‌ভিনুসের রাজত্বকাল বুড়ার সব চেয়ে গৌরবময় সময় গেছে। রাজা কর্‌ভিনুস্ তাঁর রাজসভায় ইতালীয় শিল্পীদের জড় করলেন, তাদের সাহায্যে কত প্রাসাদ, চার্চ্চ তৈরী করালেন; তাঁর পুরাতন রুক্ষ গিরিদুর্গ টাস্কেনী বা উম্‌ব্রিয়ার সহরগুলির মত সুন্দর সহর হ'য়ে উঠল। সৈন্যরক্ষিত রথ যানে, ফ্লান্‌ড়ারস থেকে বস্ত্র আসত, রাইন থেকে মদ আসত; তুর্কী-বন্দী চালিত বড় বড় নৌকা সব ডানিউবের ওপর যাতায়াত করত, ভেনিসের বণিকদের সঙ্গে ব্যবসা চলত, বুড়াতে সমস্ত ইয়োরোপের আর্ট ও ঐশ্বর্য্য সঞ্চিত হ'ত।

তারপর সহসা বিপদ ঘনিয়ে এল, সব ধ্বংস হ'য়ে গেল তুরস্কের জানিজ্যারিসদের (janissaris) কাছে হাঙ্গেরিয়ান সৈন্য পরাস্ত নির্ম্মূল হল, তুর্কীরা বুড়া দখল করলে; হাঙ্গারীতে ইয়োরোপীয় সভ্যতা লুপ্ত হ'য়ে গেল, এসিয়া এসে এ গিরিতে বসলো; সহরের সকল ধন, সকল আর্ট-সম্পদ সুলতান সোলিমানের নৌকায় তুরস্কে চালান হ'ল। সহরের সব প্রাসাদ বাড়ী চার্চ্চ লুণ্ঠিত হ'ল। আড়াই শতাব্দী পরে চার্লস দ্যো লোরেন যখন ইয়োরোপের বিভিন্ন জাতি হ'তে সংগৃহীত এপন সৈন্যের নেতা হ'য়ে তুর্কীদের হারিয়ে এই গিরি-নগর অধিকার করলেন তখন বুড়া একটা ধ্বংসাবশেষ মাত্র, পুরাতন দিনের কোন গরিমা কোন ঐশ্বর্য্য নেই।"

'ব্লকস্‌বেয়ার্গে' দাঁড়িয়ে ভাবলুম—যারা ইয়োরোপের ত্রাস হ'য়ে এসেছিল তারাই পরে ইয়োরোপের ভরসা হ'ল, কিন্তু মাজ্যাররা যদি তাদের জাত-ভাই তুর্কীদের মত খৃষ্টানধর্ম্ম গ্রহণ না ক'রে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করত, তুর্কীও মাজ্যারে মিলে প্রবল রাজ্য গ'ড়েতুলত তা হ'লে ইয়োরোপের ইতিহাস কি রূপ নিত কে বলতে পারে। কিন্তু মাজ্যাররা যে তুর্কীদের সমজাতি মঙ্গোলীয়ানদের সগোত্র তা তারা বহুদিনই ভুলে গেছে; এমন কি কোন হাঙ্গেরিয়ানকে যদি বলা যায়, তোমরা ত বলকান দেশের লোক; তাতে সে বিশেষ ক্ষুণ্ণ হয়,

পেষ্ট্ ও চেন্-ব্রিজ

ক্রুদ্ধ হ'য়েও উঠতে পারে। কোন হাঙ্গেরিয়ানকে প্রশংসা বা খুসি করাবার সুন্দর উপায় হচ্ছে, তাকে বলা, তোমরা ত বলকান-দেশীয় নও, তোমরা পশ্চিম ইয়োরোপীয়ান, জার্ম্মাণ, ইতালীয়ানদের মত তোমাদের সভ্যতা পশ্চিমের।

'ব্লকস্‌বেয়ার্গ' থেকে নেমে পোল পার হ'য়ে পেষ্টে এসে এক রেস্তোরাঁতে লাঞ্চ খাওয়া গেল। দুপুরবেলা এই সময় অনেক রেস্তোরাঁতে সস্তায় লাঞ্চ পাওয়া যায়; কিন্তু সে লাঞ্চের মেনু রেস্তোরাঁ-ওয়ালারাই ইচ্ছামত করে। ভাল মেনুই (Menu) পাওয়া গেল, একটা সুপ, মাংস ও আলু সিদ্ধ, ফুলকপি, ও শেষে পুডিং। মাংস রান্নাটি বেশ লাগল, এ মুসলমানী ধরণে মাংস রান্না, "হাঙ্গেরীর গুলাস্" নামে এ রান্না সমস্ত ইয়োরোপে প্রসিদ্ধ। দাম নিলে, আড়াই পেঙ্গো।

লাঞ্চ খেয়ে বুড়াপেষ্টের চিত্রশালা দেখতে চল্লুম। মাজ্যার আর্ট বা সাহিত্য সম্বন্ধে আমার কিছুই জানা নেই, তোমারও বোধ হয় বিশেষ কিছু নেই। লেখকদের মধ্যে জোকাইর (Joakai) নামটি জানি, তাঁর লেখা বই ইংরাজীতে অনুবাদ হয়েছে, দু'একখানা তুমিও নিশ্চয় পড়েছ; কিন্তু তিনি হচ্ছেন উনবিংশ শতাব্দীর লেখক; হাঙ্গেরিয়ানরা বলে জোকাইর চেয়ে ভাল লেখক বর্ত্তমান মাজ্যার-সাহিত্যে আছে; তবে তাঁদের আমাদের জানা মুস্কিল, ইংরাজী

সুন্দর কাজকরা সাজে হাঙ্গেরীর গ্রামের মেয়েরা

অনুবাদ না হ'লে ত আমরা জানতে পারবো না। তবে চিত্রকলা মিউজিয়ামে কয়েকজন ভাল হাঙ্গেরিয়ান চিত্রকরের সঙ্গে পরিচয় হ'ল। অর্থাৎ তাঁদের ছবিগুলির সঙ্গে পরিচয় হ'ল; এঁরাও অবশ্য আধুনিক নন। চিত্রকলা সম্বন্ধে তোমার বিশেষ উৎসাহ আছে জানি, সেজন্য ২।৩ খানি ছবি তোমায় পাঠালুম।

গত শতাব্দীতে হাঙ্গেরীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিত্রকর ছিলেন মুংকাচি (Michael Munkasy); তাঁর আঁকা অনেকগুলি ছবি দেখলুম। তাঁর সময়ে তাঁর ধরণে আঁকা ছবির যত প্রশংসা হত, এখন সে অঙ্কন-পদ্ধতি উঁচুদরের আর্টরূপে সেরূপ প্রশংসিত হয় না, তা হ'লেও ছবিগুলি বেশ উপভোগ করা যায়। "পাইলটের সম্মুখে যিশুখৃষ্ট" ছবিটি মুংকাচির খুব প্রসিদ্ধ ছবি, তাঁর অঙ্কন-রীতি এ ছবি থেকে বেশ বোঝা যায়—ভাবের সংঘাতে ভরা একটা নাটকীয় ঘটনা বিরাট দৃশ্যে নানাবর্ণের সজ্জায় আবেগ-ক্ষুব্ধ নানাভঙ্গীর নরনারীসজ্জিত করিয়া আঁকাই তাঁর লক্ষ্য, কিন্তু ছবিটি দেখলে মনে হয় এ যেন থিয়েটারের একটি দৃশ্য, সবই যেন সাজসজ্জা ক'রে অভিনয় করছে, আঁকার কায়দা আছে, বাস্তবতা আছে, কিন্তু ছবিতে প্রাণ নেই, কোন গভীর আইডিয়ার স্পর্শে মন দুলে ওঠে না। এর চেয়ে হলোসি (Hollosy) অঙ্কিত অবসরে ছবিটি আমার বেশ ভাল লাগল,—কাজ শেষ ক'রে ভূট্টা-পরিবৃত হ'য়ে এক হাঙ্গেরিয়ান চাষা প্রিয়ার চুম্বন-অভিলাষী হ'য়ে চাষা-রমণীকে কোমরে জড়িয়ে ধরেছে। চাষা-রমণীর নীল ঘাঘরা, সাদা ব্লাউজ, পুরাতন কালো বডিস,মাথায় জড়ানো শাল, বড় রুমাল, যেন রংএর একটা কবিতা; তার পাশে সাদা ঢলঢলে সাজপরা কালো ভেলভেটের ওয়েষ্ট-কোট-ওয়ালা চাষাটি যেন একটি রঙীন ফুলের ওপর আবেগে নত হ'য়ে পড়েছে। বুড়াপেষ্টে অবশ্য এরূপ রঙীন সাজ-সজ্জা দেখা যায় না, তবে গ্রামে গেলে উৎসবের দিনে চাষাদের সম্মিলনীতে হাঙ্গেরীর পুরাতন দিনের সাজসজ্জা, সুন্দর সূচির-কাজ করা পোষাক দেখতে পাওয়া যায়। হাঙ্গেরীর গ্রামের মেয়েদের ছবি পাঠালুম। তাতে মাজ্যার-নারীদের কাজ করা বেশের নমুনা দেখতে পাবে।

হশিনিয়াই-মেয়ারসে নামে একটি হাঙ্গেরীর চিত্রকরের আঁকা "পপি-ক্ষেত" ছবিটি বেশ লাগল; ছবিটি অবশ্য নিছক রঙের জলজ্বলে সৌন্দর্য্যে চোখ ভুলোয়—ঘন সবুজ মাঠে পপি ফুলগুলি আগুনের ফুলকির মত দীপ্ত, যেন রক্তের

শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু

বিন্দু সব জ'মে লালমণির মত ঝলমল; তাদের মাঝে দু'চারটে নীলফুল সাদা ফুল ছড়ান; এই রাঙা পপিক্ষেতের পাশের রাস্তা দিয়ে একটি ছোট মেয়ে নীল ঘাঘরা মাথায় পপির মত লাল টক্‌টকে রুমাল জড়িয়ে চ'লেছে, সেও যেন একটি পপিফুল; এই রঙান শোভার

'পাইলটের সম্মুখে যিশু খৃষ্ট' মুংকাচি-অঙ্কিত

অবসরে হলোসি-অঙ্কিত

ওপর ঘন নীল আকাশ নত হ'য়ে পড়েছে, তাতে হাল্কা তুলার মত সাদা মেঘ ছড়ান। এই সহজ-সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্যটি শিল্পী তাঁর অন্তরের স্পর্শ দিয়ে এমন সজীব ক'রে এঁকেছেন, যে দেখ্‌লেই শুধু চোখ নয় মনও ভোলে। সন্ধ্যেবেলায় ডিনার খেয়ে একটা কাফেতে বেশ আরামে বসা গেল। সমস্তদিন সহরের ঘরবাড়ী প্রাসাদ মিউজিয়াম দেখেছি এবার সহরের নরনারীদের দেখতে বসলুম। কেউ খবরের কাগজ পড়ছে, কোন টেবিলে বেশ গল্পের আড্ডা জমেছে, কেউ কাফির বাটি সামনে রেখে রাস্তার জনস্রোতের দিকে চেয়ে আছে, কেউ বা কোন বান্ধবীর প্রতীক্ষায় একটু চঞ্চল হ'য়ে উঠছে। কাফের ভৃত্য কয়েকখানি খবরের কাগজ পড়তে দিয়ে গেল, দেখলুম কাফেতে শুধু হাঙ্গেরিয়ান নয়, ইংরাজী, জার্ম্মাণ, ফরাসী ইত্যাদি নানা ভাষার খবরের কাগজ পত্রিকা আছে। কিন্তু কোন কাগজ পড়তে মন লাগল না, পথের জনস্রোত, কাফের নানা বয়সের নরনারীদের দেখে বর্ত্তমান হাঙ্গেরীর কথা, ভবিষ্যৎ হাঙ্গেরীর

কথা ভাবতে লাগ্‌লুম। হাঙ্গেরী এখন ইয়োরোপের ত্রাস নেই বটে কিন্তু ইউরোপের সমস্যা হ'য়ে আছে। হাঙ্গেরী এখন শান্তির রূপ ধ'রে আছে বটে কিন্তু তার অন্তরে শান্তি নেই। একখানা পুরাতন ইয়োরোপের ম্যাপের সঙ্গে যুদ্ধের পরের নূতন ইউরোপের ম্যাপ যদি তুলনা ক'রে দেখো ত দেখ্‌তে পাবে, নতুন হাঙ্গেরী কতটুকু, মহাযুদ্ধের আগের হাঙ্গেরীর অর্দ্ধেকও নয়। যে ট্রিয়ানো-সন্ধিপত্রে (Treaty of

মোহাচ মা ও মেয়ে

Trianon) হাঙ্গেরীর সহিত Allied and Associated Powers সঙ্গে শান্তিস্থাপনা হ'ল তাতে হাঙ্গেরীকে ক্রোটিয়া স্লোভেনিয়া ও ট্রান্‌সিল্‌ভেনিয়া ছাড়তে হ'ল, তা ছাড়া হাঙ্গেরীর কিছু অংশ চেকোস্লোভাকিয়া পেল; এই অংশগুলি ছাড়াতে তার সব সোনার, রূপার, তামার, লবণের ও পারার খনিগুলি হারাতে হল, তার প্রায় সব লোহার খনি পরের হাতে চ'লে গেল, তার সব ভাল ও বড় কয়লার খনিগুলি ও প্রায় সব বন হাতছাড়া হল, এ সব সম্পদ রুমেনিয়া চেকোস্লোভাকিয়া ইউগোস্লোভিয়ার মধ্যে ভাগবটরা হ'য়ে গেল। শুধু এই ভূমি নয় এর সঙ্গে ত্রিশ লাখ মাজ্যার পরের অধীন হয়েছে, হাঙ্গেরীর জনসংখ্যা হচ্ছে প্রায় আশি লাখ, সুতরাং বুঝতে পারছ ট্রিয়ানোর সন্ধিপত্র হাঙ্গেরিয়ানদের প্রাণে কি রকম বেজেছে। মাজ্যারদের সব চেয়ে প্রাণে বেদনা হয়েছে, ট্রান্‌সিল্‌ভেনিয়ার রুমেনিয়ার হওয়াতে, এখানে পনেরো লক্ষ মাজ্যার আছে, ট্রান্‌সিল্‌ভেনিয়ার সঙ্গে হাঙ্গেরীর বিচ্ছেদ তারা কিছুতেই সইবে না, এর জন্যে হাঙ্গেরী রুমেনিয়ার মধ্যে যে মনোমালিন্য চলেছে তা ত কিছুতেই মিটছে না। ট্রান্‌সিল্‌ভেনিয়া না পেলে এ অশান্তি দূর হবে না। অথচ, ট্রান্‌সিল্‌ভেনিয়া রুমেনিয়াকে দেওয়া হবে এই প্রতিজ্ঞায় এই সর্ত্তে রুমেনিয়া ইংরাজ-ফরাসী-রুসিয়ার সহিত জার্ম্মাণী-অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমেছিল; সে জন্য যুদ্ধের পর সে অংশ তাকে দিতে হয়েছে। ট্রিয়ানোর সন্ধিপত্র স্বাক্ষরের পর সমস্ত মাজ্যার জাতির চিত্ত কিরূপ অশান্ত বিদ্রোহী হ'য়ে উঠেছিল তার চিহ্ন হয়ত সব ট্রামে ট্রামে বাড়ীর দরজায় দরজায় আছে। প্রায় প্রতি মাজ্যার-বাড়ীর প্রবেশের দরজায় একটি ছোট প্লেটে লেখা আছে, "Nem, nem, soha"—না, না, কখনও না, আমাদের দেশের এ দুর্গতি আমরা কখনও সহ্য করব না।" প্রতিদিন বার বার মন্ত্রের মত এই কথাগুলি প'ড়ে মাজ্যারেরা তাদের তীব্র জাতীয়তাবোধকে শাণিত করে। শুধু বাড়ীর গায়ে নয়, পথে ঘাটে ট্রামে অন্তরকে সজাগ রাখবার অগ্নি-বাণী সব লেখা; প্রতি ট্রামগাড়িতে মাজ্যার-জাতির বিশ্বাস-মন্ত্র লেখা—

শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু

"আমি এক ঈশ্বরকে বিশ্বাস করি। আমি আমার জন্মভূমিকে বিশ্বাস করি। আমি বিশ্বাস করি এক স্বর্গীয় মুহূর্ত্ত আস্‌ছে। আমি আমার হাঙ্গেরীর পুনরুত্থানকে বিশ্বাস করি। স্বস্তি।"

প্রতি যুদ্ধের পর শান্তিস্থাপনের সন্ধিপত্রেই আগামী যুদ্ধের বীজ থাকে, কারণ বিজেতা কখনও বিজিতের প্রতি ন্যায়বিচার করে না, আর পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা যায় অন্যায় কিছু দিন টিঁক্‌তে পারে কিন্তু চিরদিন টেঁকে না। হাঙ্গেরীর প্রতি অন্যায় বিচার করা হয়েছে কি না তা আমি ঠিক বলতে পারি না, কিন্তু প্রত্যেক মাজ্যার হাঙ্গেরিয়ান বিশ্বাস করে, তাদের স্বদেশের অঙ্গচ্ছেদ করা হয়েছে, এই অবিচারবোধের জ্বালা যদি আপোষে স্নিগ্ধ করা না হয়, ত হয়ত কোনদিন অশান্তির আগুন জ্ব'লে উঠবে।

কাফে থেকে হোটেলে ফেরবার পথে শান্ত জনস্রোতের দিকে চেয়ে ভাবতে ভাবতে এলুম, সত্যই কি এখনও হাঙ্গেরীর আত্মা একাগ্রভাবে জপ করছে, "না, না, কখনও না, আমাদের দেশের এ দুর্গতি আমরা সহ্য করবো না"; অথবা বর্ত্তমান রাজনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে সে একটা আপোষ ক'রে নিয়েছে, সে মন্ত্রধ্বনি ক্ষীণ হ'য়ে গেছে। নরনারীদের মুখের দিকে চেয়ে মনে হ'ল যেন সবার মুখে একটা বিষাদের চিহ্ন, প্রাণে আনন্দের উচ্ছ্বাস নেই।

পপি-ক্ষেত তৃশিনিয়াই-মেয়ারসে-অঙ্কিত

এইখানে শেষ করি। বুড়াপেস্ট সম্বন্ধে তোমার জানার ঔৎসুক্য বোধ হয় খুব বেশী মিট্‌ল না। বস্তুতঃ হাঙ্গেরী সম্বন্ধে উৎসুক্য জাগাবার জন্যেই আমার এতগুলি পাতা লেখা, কমাবার জন্যে নয়।
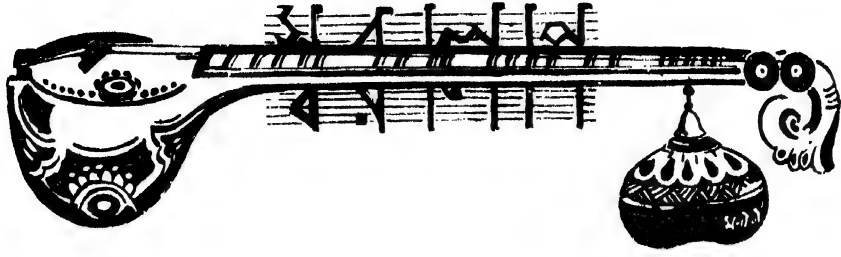
খাম্বাজ ঠুংরী

মন না রঙায়ে কি ভুল করিয়ে   কাপড় রঙাল যোগী।
মন্দির তলে আসন পাতিল   শিলা পূজনেরি লাগি।
দুর্গম বনে, গিরিশিরে,
বহু ক্লেশে মরিল সে ফিরে—
কৃচ্ছে, তাঁরে নাহি মিলে,   বলে দেবে কোন অনুরাগী॥
অন্তরবাসী অন্তরযামী   অন্তরে বন্দী একা—
দাও প্রেম, আরো প্রেম, আরো আরো আরো প্রেম,
আরো প্রেমে মিলিবে দেখা।
খোল খোল খোল দ্বার খোল,
তাঁর পানে আঁখি দুটি তোল,
তাঁর প্রেমে আপনারে ভোল,   তাঁর সাথে রহ নিশি জাগি॥

কথা, সুর ও স্বরলিপি—শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল

II না । -া না । র্সা না র্সা -া I র্সা নর্সা র্রা র্সা -ধাঃ -ধঃ র্সণা -ধপা
ম ০ ন্ না র ঙা য়ে ০ কি ভু০ ল্ ক রি ০ য়ে০ ০০

I পা ধা পা মা । মগা -রা গা মা I গমা -পা -া -া । -া -া -া -া I
কা প ড় র ঙা০ ০ ল যো গী০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I সা -ধা ধা ধা । ধা । ণধা পমা I মা ধা ধা ধা । ণাঃ -ধঃ র্সণা -ধপা
ম ০ ন্দি র ত০ লে০ ০০ I আ স ন পা তি ০ ল ০০

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল

পা ধা পা পা । মগা -রা গা মা I গমা -পা । -া । -া -া -া -া II
শি লা পূ জ নে০ ০ রি লা গি০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

{পা না না না । না না না র্সা I ধনা -র্সর্রা নর্সা -া । -া -া -া -া I
দু ০ র্গ ম ব নে গি রি শি০ ০০ রে ০ ০ ০ ০ ০

র্সা র্রা র্সা র্সা । ণা ণা ধপা ধা I ধর্সা- ণধা ক্ষপা- । । -া -া (পা-না)} I
ব ন্ধু ক্লে শে ম রি ল০ সে ফি০ ০০ রে০ ০ ০ ০ ০ ০

I মা -ধা ধা ধা । মধা -া ণা র্সর্রা I ধর্সা- ণধা পা- । । -পা -মা -গা -া I
ক্লু ০ চ্ছে তাঁ রে ০ না হি০ মি০ ০০ লে ০ ০ ০ ০

I মা ধা ধা ধা । মধা -া ণা র্সর্রা I ধর্সা- ণধা পা- । । -া -া -া -া I
ক্লু ০ চ্ছে তাঁ রে ০ না হি০ মি০ ০০ লে ০ ০ ০ ০ ০

I মা মা মা মগা । রা -া রা -গা I গমা -পা পা- । । -া -া -া -া II
ব লে দে বে কো ন্ অ নু রা০ ০ গী ০ ০ ০ ০

{মা -া মা গা । রা -া রা গা I মা- । পা মা । পা- । পা -া I
অ ০ ন্ত র বা সী অ ০ ন্ত র যা ০ মী

I গা -মা পা ধা । ধা -া ণা পা I পধা -া । -া -া -া -া I
অ ০ ন্ত রে ব ০ ন্দী এ কা ০ ০ ০ ০ ০ ০

পনা -া না -া । না না না -পা I পা না র্সা না । র্সা না নর্সা -র্রা I
দা ও প্রে ম্ আ রো প্রে ম্ আ রো আ রো আ রো প্রে ০ ম্

I র্সা ণা ধা পা । মা রা গা মা I গমা -পা -া -া । -া -া -া -া }
আ রো প্রে মে মি লি বে দে খা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

II {না না না না । পনা না না -র্সা I ধনা- র্সর্রা নর্সা- া -া -া -া
খো ল খো ল খো ল দ্বা র খো ০ ০ ল ০ ০ ০ ০ ০

I নর্সা র্রা র্সা র্সা । ণা ণা ধপা ধা I ধর্সা- ণধা ক্ষাপা- া । -া -া (পা-না) }
তাঁ র পা নে আঁ খি টি তো ০ ০ ০ ল ০ ০ ০ ০ ০ ০

I মা ধা ধা ধমা । মা ধা ণা র্সা I ধর্সা- ণধা পা- া । পা মা- গা- া I
তাঁ র্ প্রে মে আ প না রে ভো ০ ০ ০ ল ০ ০ ০ ০ ০

I মা ধা ধা ধমা মা ধা ণা র্সর্রা I ধর্সা -ণধা পা -া -া -া I
তাঁ র্ প্রে মে আ প না রে ভো ০ ০ ল ০ ০ ০

I মা -া মা গা রা রা রা গা I গমা -পা পা -া -া -া -া -া II II
তাঁ র্ সা থে র ত নি শি জা ০ ০ গি ০ ০ ০ ০ ০

সহযোগী-সাহিত্য

আধুনিক ফরাসী সাহিত্যের ধারা

শ্রীসুশীলচন্দ্র মিত্র

৩

বাস্তবতা ও বৈজ্ঞানিকতা

রোমাণ্টিক্ সাহিত্য যখন সত্যের অনুসন্ধান করিতেছিল, কল্পনার পথে আরোহণ করিয়া ;—বিজ্ঞান তখন তাহার যন্ত্রপাতি লইয়া চুপ করিয়া বসিয়াছিল না। উনবিংশ শতাব্দীর শেষাশেষি সে উড়াইয়া দিল তাহার জয়-পতাকা,—তাহার বিজয়-গৌরবে সকলের চোখ ঝল্‌সিয়া গেল,—মানুষ জীবনের একটা নূতন রূপ দেখিতে পাইল। বস্তুতঃ বিজ্ঞানের এই অভিযানটিকেও রোমাণ্টিক বলা যাইতে পারে। রোমাণ্টিজ্‌মের অন্তরে ছিল যে অনুপ্রেরণা,—ইহার মধ্যেও সেই এক অনুপ্রেরণা,—কেবলমাত্র প্রণালীর প্রভেদ। এই অনুপ্রেরণায় মানুষের মনে জাগিয়া উঠিল বিজ্ঞানের ভবিষ্যতের উপর এমন একটা অগাধ বিশ্বাস যাহা তাহার অন্তরের মধ্যে একেবারে শিকড় গাঁথিয়া বসিল। বিজ্ঞান মানুষের এক রকম ধর্ম্ম হইয়া উঠিল। বার্থলো ঘোষণা করিলেন,—বিজ্ঞান আনিয়া দিবে এমন একটা কল্যাণের যুগ, যখন ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে বিশ্বমানব এক হইয়া যাইবে।

আমাদের মনে হয় বিজ্ঞানের এই অভিযান রোমাণ্টিজ্‌মেরই একটা প্রসারণ,—একটা টানিয়া-দেওয়া ধারা ; ইহাকে রোমাণ্টিজ্‌মের বিরোধী বলিয়া মনে করা ভুল,—তাহাতে রোমাণ্টিজ্‌মের প্রতিও অবিচার করা হয়, বিজ্ঞানের প্রতিও অবিচার করা হয়। অবশ্য একথা স্বীকার করি,—রোমাণ্টিজ্‌মের মধ্যে যেটুকু ছিল ঝুটা,—যাহা উচ্ছৃঙ্খল ও অসংযত কল্পনার দ্বারা কেবলই একটা অলীক রাজ্যের সৃষ্টি করিয়া চলিতেছিল,—বিজ্ঞানের নব আবিষ্কারের ঝটিকা-বেগে সেটুকু উড়িয়া গেল ; কিন্তু যেখানে রোমাণ্টিজ্‌ম্ ছিল খাঁটি,—যেখানে কল্পনার রথ ছিল অন্তর্দৃষ্টির রজ্জুতে সংযত,—সেখানে বিজ্ঞান ও রোমাণ্টিজ্‌মের মধ্যে কোনো বিরোধ ত ছিলই না—অপর পক্ষে এই অন্তর্দৃষ্টির অস্ত্রটি আত্মসাৎ করিয়া বিজ্ঞান আপনার রাজ্যবিস্তার করিয়া চলিল,—বাহিরের অচেতন জগৎ হইতে অন্তরের চেতন জগতের মধ্যে,—পদার্থ-বিদ্যা, রসায়ন, উদ্ভিদ-বিদ্যা, অস্থি-বিদ্যা, দেহতত্ত্ব ইত্যাদি হইতে সাহিত্য, ধর্ম্ম, দর্শন, মনস্তত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, নীতিতত্ত্ব ইত্যাদির মধ্যে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—রোমাণ্টিক সাহিত্যিকেরাই ইহার সুবিধা করিয়া দিয়াছিলেন। উৎসাহের আতিশয্যে তাঁহারা চলিয়া গিয়াছিলেন,—আপনাদেরই আদর্শের বিরুদ্ধে। 'সত্যের মধ্যে প্রমাণ',—এই ছিল তাঁহাদের আদর্শ,—কিন্তু উত্তেজনায় ও অতিরিক্ত উৎসাহে তাঁহারা কল্পনার রথে আবেগের অশ্ব যোজনা করিয়া দিয়াছিলেন,—অলীক মায়া-রাজ্যের মধ্যে ছুট্‌। অবশ্য রোমাণ্টিকদের মধ্যে যাঁহারা ছিলেন মনীষী,—তাঁহারা তুচ্ছ দৈনন্দিন বাস্তবতাকে একটা আদর্শের আলোতে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিলেন, কল্পনার রঙে রাঙাইয়া দিয়াছিলেন,—আবেগের অনুপ্রেরণায় তাহার জড়ত্বটুকু নাশ করিয়া তাহাকে জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন,—কিন্তু এই মনীষার অভাব ছিল যে সকল লেখকদের মধ্যে,—তাঁহাদের মধ্যে কেবল ছিল আবেগের বাড়াবাড়ি, ভাববিলাস আর অর্থহীন শব্দের ঝঙ্কার।

সাহিত্যে এ সকল জিনিস কখনো স্থায়ী হইতে পারে না, তাই বিরুদ্ধতার ঢেউ উঠিল,—আবার ফিরিয়া আসিল, জীবনটাকে ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের সীমানার মধ্যে আবদ্ধ করিবার বাসনা,—স্থির শীতল যুক্তির বিচারে যাহার পরিমাপ করা যায় না, তাহাকে পরিত্যাগ করিবার আগ্রহ।

কিন্তু অনুপ্রেরণা সেই একই। 'সত্যের মধ্যে প্রয়াণ, সমগ্র জীবনের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর প্রকাশ,—আর্টে স্বাধীনতা'—রোমান্টিজ্‌মের এই বাণী মানুষের মর্ম্মে মর্ম্মে গ্রথিত হইয়া গিয়াছিল। এ আদর্শ মানুষ ত্যাগ করিল না, কেবল বিভিন্ন প্রণালী অবলম্বন করিল মাত্র। কল্পনার সাহায্য ত্যাগ করিয়া প্রত্যক্ষ-অনুভূতির সাহায্য গ্রহণ করিল। ফলে, অন্তরের আদর্শের যে আলো তাহা নিভিয়া গেল, কল্পনার রঙ মুছিয়া গেল,—রহিল কেবল নিছক্ প্রত্যক্ষ সত্যের একটা নিরাভরণ মূর্ত্তি,—জীবনের কিছু সৌন্দর্য্য, সবটুকু কদর্য্যতা, জীবনের আশা, জীবনের বিভীষিকার একটা হুবহু প্রতিচ্ছবি। এমনি করিয়াই হইল ফরাসী সাহিত্যে বাস্তবতার জন্ম।

বলা বাহুল্য যে, রোমান্টিক্ যুগের অবসান হইলেও ফরাসী সাহিত্যে এই বাস্তবতা বা রিয়ালিজ্‌মের আবির্ভাব রোমান্টিক আন্দোলনেরই ফল। যে সকল লেখক এই বাস্তবতার যুগের প্রবর্ত্তন করিলেন,—তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন রোমান্টিক্‌দেরই দলভুক্ত। একজন স্তাঁধল। তাঁহার লেখায় অনেক গুণ ছিল, যাহা রোমান্টিক্,—কিন্তু তাঁহার বর্ণনা-ভঙ্গী ছিল প্রধানতঃ বস্তু-তন্ত্র। তবে সাহিত্যে বাস্তবতার সুর তিনি যখন তুলিলেন, তখনো তাহার ঠিক সময় আসে নাই,—তাই জীবদ্দশায় তাঁহার লেখার তেমন আদর হয় নাই। এই দলেরই একজন লেখিকা ছিলেন Georges Sand। তাঁহার প্রথম উপন্যাসগুলি ছিল একেবারেই রোমান্টিক্,—কিন্তু পরে তিনি কতকগুলি উদ্দেশ্যমূলক উপন্যাস রচনা করিয়াছিলেন। এই দলের লেখকদের মধ্যে বিশেষ করিয়া উল্লেখযোগ্য যে দু'জনার নাম, তাঁহাদের মধ্যে একজন বালজাক্ ও আর একজন ফ্লুবেয়ার। ইঁহাদের সকলের লেখার মধ্যেই এমন অনেক জিনিস ছিল যাহা রোমান্টিক্,—তার কারণ রোমান্টিজ্‌মের বাণী তাঁহাদের মর্ম্মের মধ্যে গ্রথিত হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু স্থিরযুক্তির দ্বারা বিচার করিয়া তাঁহারা প্রচার করিতেন যে—আধুনিক উপন্যাসগুলি রোমান্টিক্ হইলে চলিবে না,—কেন না, কেবলমাত্র অবসর-বিনোদনের জন্য একটা অলীক কাহিনী বিবৃত করাই ত উপন্যাসের কাজ নয়, উপন্যাসের হওয়া চাই সত্যের একটা অবিকল প্রতিচ্ছবি। এমন কিছু উপন্যাসের মধ্যে সন্নিবিষ্ট করা উচিত নয় যাহা অলীক, কল্পনা-প্রসূত, যাহা মিথ্যা, যাহা উপন্যাস-রচয়িতা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেন নাই। এমন কি তাঁহার জীবনের অভিজ্ঞতার ভিতরে তিনি যদি এমন কিছু পাইয়া থাকেন, যাহা সাধারণতঃ দেখা যায় না বা ঘটে না, তবে সেগুলিও উপন্যাসের বিষয় হইতে বাদ দিতে হইবে,—কেননা সেগুলি সন্নিবিষ্ট করিলে উপন্যাসটি মিথ্যা ও অসম্ভব মনে হইবে। উপন্যাসের যথার্থ বিষয় হইতেছে মানুষের প্রতিদিনকার একেবারে অতি সাধারণ-জীবন-যাত্রা,—যাহার না আছে আরম্ভ, না আছে শেষ;—সেই সব নিতান্ত তুচ্ছ সাধারণ ঘটনা, যাহা প্রতিদিন সকলের জীবনেই ঘটিয়া থাকে,—হউক-না-কেন তাহা যতই নীচ, যতই ইতর, যতই কদর্য্য। বস্তুতঃ যাহা সুন্দর, যাহা মঙ্গল, যাহা কল্যাণ,—জীবনে ত তাহা বেশী ঘটে না; সেগুলির জীবনের নিয়ম নয়,—সেগুলি জীবনের ব্যতিক্রম,—তাই সেগুলি উপন্যাসের বিষয়ীভূত হইতে পারে না।

বিজ্ঞানের অনুপ্রেরণায় বাস্তবতার এই মন্ত্রগুলি সজীব হইয়া উঠিয়াছিল। জোলা বলিলেন,—উপন্যাসে শুধু বাস্তব জীবনেরই একটা অবিকল ছবি আঁকিলে চলিবে না,—বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলিকেই পরীক্ষা করিতে হইবে,—বাস্তব জীবন হইতে উদাহরণের সাহায্যে সেগুলিকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। আপনার অন্তরের মধ্যে আপনাকে আবদ্ধ রাখিলেই উপন্যাস-রচয়িতার চলিবে না,—তাঁহার কাজ নিরন্তর বাহিরে আসিয়া মানুষের দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার শত সহস্র দৃশ্যাবলী নিরীক্ষণ করা,—মানুষের সেই সব প্রবৃত্তি আকাঙ্ক্ষা, বাসনা পর্য্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করা,—যাহা লইয়া সত্যকার জীবন গড়িয়া উঠে। মানুষের যাহা যথার্থ জীবন, তাহা ত জন কয়েক বড় বড় লোকের জীবন নয়,—সে জীবন

শ্রীসুনীলচন্দ্র মিত্র

ও মিথ্যা, কৃত্রিমতায় পরিপূর্ণ,—মানুষের যাহা সত্যকার জীবন,—তাহা বহুসংখ্যক অতি সাধারণ নর-নারীর জীবন, সহজ ভাষায় যাহাদের আমরা বলি ছোট লোক,—কিন্তু যাহাদের জীবনের মধ্যেই প্রাণ-খোলা সহজ সরলতার সন্ধান মেলে। আর্টের কাজ এই অতি-সাধারণ জিনিষ সূক্ষ্মভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ভাষায়, রঙে, মূর্ত্তিতে সুস্পষ্ট করিয়া ফুটাইয়া তোলা। অতএব উপন্যাস-লেখককে সনাতন মজলিশি প্রথা পরিত্যাগ করিতে হইবে,—ধর্ম্মের জয়, অধর্ম্মের পরাজয়,—এই মামুলি আদর্শ ফুটাইয়া তুলিয়া পাঠককে আর মিথ্যার মধ্যে ডুবাইয়া রাখা চলিবে না,—তাহাতে আর যাহাই হউক, সত্যের প্রতি সম্মান দেখানো হইবে না।

এই ধরণের ফরাসী লেখকদের মধ্যে বিশেষ করিয়া উল্লেখযোগ্য নাম,—জোলা ও মোপাসাঁর। অনেক বাঙালী পাঠকই আজকাল ইঁহাদের লেখার সহিত সুপরিচিত, এবং ইঁহাদের এই বৈজ্ঞানিক বাস্তবতার বন্যা আজকাল বাংলা সাহিত্যেও আসিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু মতামতে যতই ইঁহারা বৈজ্ঞানিকতা প্রচার করুন না কেন, মনে প্রাণে ইঁহারা ছিলেন রোমান্টিক,—সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সত্যসন্ধানের জন্য যতই ইঁহারা বহিঃপদার্থের পর্য্যবেক্ষণ-প্রণালী প্রচার করুন না কেন, আসলে সত্যোপলব্ধির ও সত্যপ্রকাশের অস্ত্র ছিল ইঁহাদের অন্তরের আলো, কল্পনা, আবেগ ও অনুভূতি। বস্তুতঃ সত্য-সন্ধানের পথ ও কখনো বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ হইতে পারে না, তাই এই সব লেখকদের মধ্যে বিজ্ঞান-প্রবৃত্তি ও রোমান্টিক প্রবৃত্তির একটা সংমিশ্রণী ক্রিয়া চলিতেছিল।

কিন্তু তাই বলিয়া বিজ্ঞান ও আর্ট এক জিনিস নয়, উভয়ের মধ্যে যে প্রভেদ, তাহা উহাদের একেবারে প্রকৃতিগত। বহির্জগৎ হইতে অন্তর্জগতের মধ্যে বিজ্ঞানের যে জয়যাত্রা, তাহাতে এই প্রভেদ মুছিয়া গেল না, বরং আরো সুস্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিল। মনোবিজ্ঞানের তত্ত্বগুলি উপন্যাস-রচনার কাজে লাগাইতে গিয়া পল বুর্জে আবিষ্কার করিলেন—সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ও গভীর আলোচনা, তাহা সৃষ্টিকার্য্যের সঙ্গে ঠিক এক জাতের জিনিস নয়; কেন না যাহা কিছু বিশ্লেষণ করা যায়, তাহার মধ্যে আর প্রাণ থাকে না। তবু বুর্জের উপন্যাসগুলি এই বৈজ্ঞানিক অনুপ্রাণনা অতিক্রম করিতে পারে নাই,—যদিও তাহাদের বিষয়, ধরণ-ধারণ ও অন্তর্নিহিত সুর জোলা-পন্থীদের উপন্যাসগুলির একেবারে বিরোধী। বুর্জের উপন্যাসের চরিত্রগুলি সমাজের নিম্নস্তরের জন-সাধারণ হইতে গৃহীত নহে, এমন কি কোনো অপ্রধান চরিত্রও, জুয়াচোর, মাতাল প্রভৃতি সমাজের আবর্জ্জনা-জাতীয় নয়; তাহারা সকলেই উচ্চসমাজেরই নরনারী,—অলস বিলাসে যাহাদের দিন কাটিয়া যায়,—অন্তত পক্ষে যাহাদের কর্ম্মজীবন বুদ্ধিবৃত্তি ও কার্য্যবিস্তার চর্চ্চায় আবদ্ধ। সমাজের নিম্নস্তরেরই হউক আর উচ্চ স্তরের হউক, মানবজীবনের যে জটিলতা, তাহা সর্ব্বত্রই বৈজ্ঞানিক কার্য্য-কারণ সম্বন্ধকে ছাপাইয়া যায়। সৌভাগ্যক্রমে এই জটিলতা বুর্জের দৃষ্টি এড়াইয়া যায় নাই। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে জীবনী-শক্তির বিকাশের যে অফুরন্ত প্রাচুর্য্য—তাহাকে ঠিক বিজ্ঞানের বাঁধা নিয়মের মধ্যে ধরা যায় না। তাই মানবজীবনের যে বৈজ্ঞানিক আলোচনা, তাহা একেবারে বৃথা হইয়া যাইবে, যদি তাহার মধ্যে শুধুই একটা জীবনের জটিলতার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের প্রয়াস থাকে, যদি তাহার মধ্যে জীবনের যে অবিচ্ছিন্ন পরিবর্ত্তন, জীবনীশক্তির যে অপ্রতিহত তেজ, অন্তরের মধ্যে যে প্রচণ্ড তাগিদ,—তাহার প্রতি একটা ইঙ্গিত না থাকে।

এমনি করিয়াই বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীর প্রতি মানুষের যে অগাধ বিশ্বাস, তাহা ক্রমশঃ শিথিল হইয়া আসিতে লাগিল। যাঁহারা এই বিশ্বাস লইয়া অনুপম উৎসাহে কর্ম্ম আরম্ভ করিয়াছিলেন,—তাঁহাদের মধ্যেই অনেকে ক্রমশঃ নিরাশ হইতে লাগিলেন। এদিকে অনেকদিন হইতেই দার্শনিকেরা বলিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন যে, বিজ্ঞান যে, সত্যের সন্ধান দেয় তাহা চরম সত্য নয়,—তাহা ব্যবহারিক সত্য মাত্র, তাহাতে আমাদের প্রতিদিনের জীবনযাত্রা বেশ চলিয়া যায়, কিন্তু প্রকৃত জ্ঞান-লাভ হয় না। এমিল্ বুত্রো (E'mile Butroux) বলিলেন

যে বিজ্ঞানের নিয়মের মধ্যে আমরা যে উপলব্ধি করি একটা সন্দেহাতীত নির্দিষ্টতা ও নিশ্চয়তা,—তার কারণ শুধু এই যে, আমাদের প্রতিদিনকার জীবনযাত্রা একেবারে অনির্দিষ্টতা ও অনিশ্চয়তায় ভরা। বিজ্ঞানের নিয়ত চেষ্টা অন্তর্জগৎ ও বহির্জগতের মধ্যে একটা সন্ধি স্থাপন করা,—যাহাতে প্রতিদিনের কাজ চলিতে পারে,—মানুষের সঙ্গে আর জগতের সঙ্গে কোনো বিরোধ না বাধে। বার্গসঁ পরিষ্কার প্রমাণ করিয়া দিলেন, মানুষের যে বুদ্ধি-শক্তি তাহা কেবলই তাহার ব্যবহারিক জীবনের একটা অস্ত্র মাত্র। সত্যের মর্ম্মগ্রহণ তাহার কাজ নয়,—তা'র জন্য চাই অন্য অস্ত্র, মানুষের মনন-শক্তি (intuition)।

সাহিত্যে বৈজ্ঞানিক অনুপ্রেরণা এমনি করিয়াই সহসা আবির্ভূত হইয়া অল্পদিনেই মরিয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

দূরের কথা

শ্রীনলিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়

আমার কথা পায় না নাগাল
এমনি তাদের দূর,
তাই বেঁধেছি গানে আমি
তাই বেঁধেছি সুর।
ফুরিয়ে গেলে মুখের হাসি,
আনমনেতে বাজায় বাঁশি,
কার সে আসা কার সে যাওয়া
রূপের সাগরে,
অনেকখানি হাসি ধরে
একটু অধরে।

কে সে আমার গৃহ হারা
কে সে আমার দূর,
কভু হারায় প্রাণের কথা
কভু গানের সুর।
কভু ভাসে নয়ন কোণে,
কভু হাসে সরল মনে
সবার শেষে সেই ত জোটে
অতি গোপনে,
হঠাৎ হেরি রঙ ধরেছে
কুঁড়ির স্বপনে।

বন-ভোজন

শ্রীঅক্ষয়কুমার সরকার

"ঘরে কেন আলো?"

"গিন্নী গেছেন বন ভোজনে, সবাই আছে ভাল।"

"দুয়ারে কেন কাঁটা?"

"গিন্নী গেছেন বনভোজনে ছেলেরা লোহার ভাঁটা।"

"তারপর ঝি মা?"

"আর নেই মা, এই দুটী—"

হরিশ হাড়ির স্ত্রী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বামুন মা, কাল কি সত্যি সত্যি বন-ভোজন হবে?"

"তাইত সবাই মত করছে, মা। কাল দিনটে ভাল, পূর্ণিমা। ভাদ্র মাসে আর তেমন দিনও ত নেই।"

"বেশ, তোমার বেটা বল্'ল বামুন মাকে একবার শুধিয়ে আয়। তাহ'লে কাল সকালে মাকাল-তলাটা চেঁচে ছুলে পরিষ্কার ক'রে রাখ্‌তে হ'বে, পাঁচজন ভদ্দর লোকের মেয়েছেলে ভোজন কর্‌বেন।"

"হাঁ, হরিশকে রাস্তাঘাটগুলোও একটু ঝোপ-ঝাপ কেটে পরিষ্কার ক'রে রাখতে বলিস।"

হাড়ি বৌ চলিয়া গেল।

শশী মুচি আসিয়া বলিল, "বামুন মা, তাহলে অনুমতি হোক—বন-ভোজনের ঢোলটা দিয়ে আসি।" সে অনুমতি পাইয়া ঢোলে কাঠি দিতে দিতে চলিয়া গেল।

ভূষণ পরামাণিকের মা তাহার মেয়ের বাটী হইতে ফিরতেছিল। ঢোলের কাঠিতে বন-ভোজনের ঘোষণা শুনিয়া সে যেন একটু চটিয়া গেল। কোমরের পুঁটলিটা নিজের বড় ঘরের দ্বারে তাড়াতাড়ি নামাইয়া রাখিয়া বামুন মার বাড়ি আসিয়া বলিল—"বলি, বামুন মা, আমাদেরও একটা মত নিতে হয়। ঘরে মুড়ি বাড়ন্ত, যোগাড় নেই—"

বামুন মা একটু হাসিয়া বলিলেন, "নাপ্‌তে-বৌ, তুমি ত বাড়ীতে ছিলে না বাছা! তোমাকেও খোঁজ করা হয়েছিল। এ মাসে ত আর দিনও নেই—"

নাপিত-বধূ বামুন মার মিষ্ট কথায় একটু নরম হইয়া বলিল, "তা হোক্ বাছা। আমি এখন যে কি করি—

বামুন মার নাতিন ঝির নাম বিভা। সে বলিল, "নাপ্‌তে দিদি, ভাবনা কি? শ্যাম রক্ষিতের দোকানে চিঁড়ে, মুড়কি আছে; তোমার গোয়ালে গরু আছে।"

নাপিত দিদি একমুখ হাসিয়া বলিল, "দূর বোন্! বাজার হাটে জিনিষের অভাব কি? এদিকে যে—কি বলে, 'ভাঁড়ে নেই আমানি, ঘরে মা ভবানী'—"

বিভা হাসিতে হাসিতে বলিল, "কেন নাপ্‌তে দিদি, তোমার ত এক ভাঁড় টাকা সেই ঘরের দেওয়ালে পোঁতা আছে; আরও এক ভাঁড় ভর্ত্তি হ'য়ে এল বলে—"

"শুনছ বামুন মা, বিভার কথা। আমার কোথায় টাকা পোঁতা আছে, তুই কি দেখে এসেছিস্ না?"

সদ্গোপদের অতুলের মা আসিয়া বলিল, "খোলা-খুলি দুটো বা'র ক'রে দাও, বামুন মা, এক খোলা মুড়ি ভেজে দিয়ে যাই। বউএর আবার জ্বর এসেছে। গিয়ে আমাকেই ভাত চড়াতে হবে।"

"বউএর আবার জ্বর এল? এই সোমত্ত বয়েস, কোথায় খাবে পরবে, কাজকর্ম্ম কর্‌বে, হেসেখেলে বেড়াবে, না রোজ জ্বরে হুঁ হুঁ আর পেটজোড়া পিলে—"

"তাই ত বলি বামুন মা! গাঁটা ত নিভুম হ'য়ে গেল। এই ক'বছরে কত উঠতি বয়সের লোককেই যেতে দেখলুম—"

"তোরাই বা কি দেখেছিস্ মা! আমি যখন প্রথম ঘর করতে আসি, তখন এ গাঁয়ে দেড় হাজার লোকের বাস।

যদু রায়ের অত বড় উঠানেও মহানবমীর দিন নব-শাখেরা যখন খেতে বস্‌ত, যায়গা হ'ত না—"

"অত লোক গেল কোথা, ঝি মা ?"

"মরে গেল ! সকলকেই এক দিন না একদিন যেতে হবে, তা নয়। কি যে কাল মালেরিয়ার জ্বর এল ! আমার বেশ মনে আছে আমাদের উনি, গয়লা বামুনদের চণ্ডীমণ্ডপে পাশা খেলতে যেতেন। সে দিন রাত্তিরে ফিরতে একটু বেশী দেরি হ'য়ে গেল, আমি ভাত নিয়ে ব'সে ঢুলছিলেম, একটু একটু রাগও হচ্ছিল। উনি এসে তা বুঝতে পেরে বল্‌লেন, 'রাগ করো না, আর কোথাও যাই নি। ক্ষুত্‌ন বাঁড়ুয্যের এমন কেঁপে জ্বর এল যে তাকে তিনখানা লেপ চাপা দিয়ে তিন চার জনে ঘণ্টাখানেক চেপে রাখতে হয়েছিল। তাই রাত হ'য়ে গেল।' আমি বললুম, 'সে কি ? তুমি যে আজ অবাক করলে, ক্ষুত্‌ন ঠাকুরপোর আবার জ্বর' !"

পাশের রাঁধিবার চালাতে অতুলের মা মুড়ি ভাজিবার খোলাটা উনানে চড়াইতেছিল,—জিজ্ঞাসা করিল, "কেন, ক্ষুত্‌ন ঠাকুরের কি কখন জ্বর হ'ত না ?"

"জ্বর সেকালে কারই বড় একটা হ'ত না। তোমরা কি ক'রে জান্‌বে মা !"

বিভা বলিল, "ক্ষুত্‌ন ঠাকুরের কথা কি বল্‌ছিলে ঝি মা ?"

"হ্যাঁ। ক্ষুত্‌ন ঠাকুরপোর কথা—সে আর কি বল্‌বো ! তাঁর যেমন ছিল গায়ের জোর, তেমনি ছিল খোরাক ! আমার সঙ্গে দেওর সম্পর্ক কি না, কত যে ন্যাকরা করত ! একদিন—সে দিন ভাই-দ্বিতীয়ে—আমার ভাই দেবেশ্বর এসেছিল ; খুদন ঠাকুরপোকেও উনি খেতে বলেছিলেন। খেতে ব'সে কত ঠাট্টা মস্করাই যে সে করছিল ! যখনই পাতে কিছু দিই—ব'লে উঠে, 'ওটুকু কি দিচ্ছ বউঠাকরুণ, ওতে তোমার ভাইটির সন্তুরে পেট ভর্‌তে পারে, আমার পাড়াগেঁয়ে ডাবা পুর্‌বে না।' পায়েস দেবার সময়ে আমি ঘোমটার ভেতর থেকে ইসারা ক'রে বাটিটে পাতের উপর তুলে নিতে বল্লুম। তারপর হুড় হুড় ক'রে আর আধ হাঁড়ি পায়েস পাতে ঢেলে দিলুম। বাটি উপ্‌ছে প'ড়ে থালাটা ভ'রে যেতে ঠাকুরপোর কি ফূর্ত্তি ! ব'লে উঠল, 'এই ত দেওয়ার মত দেওয়া, বউ ঠাকরুণ।' দেবেশ্বর ঠাট্টা ক'রে বল্‌লে, 'এইবার বাঁড়ুয্যে মশাই, আর ত আমাদের মত ব'সে বাটিতে চুমুক দিলে হবে না, চতুষ্পদের মত মুখ জুব্‌ড়ে লেগে যান !' ক্ষুত্‌ন ঠাকুরপো উত্তর দিলে, "চার-পেয়ে হ'তেও রাজি আছি, ভায়া, যদি খোরাকটা তেমন জুটে।' দেবেশ্বর হেসে বল্‌লে, 'চতুষ্পদের খোরাক ত ফেন !' তারপর কথা কাটাকাটি হ'তে হ'তে ফেন খাবার বাজি হ'ল। ক্ষুত্‌ন ঠাকুরপো এক বোক্‌নো ফেন একটু নুণ মিশিয়ে চুমুক দিয়ে শোঁ শোঁ ক'রে মেরে দিলে।"

অতুলের মা মুড়ি ভাজিতে ভাজিতে বলিল, "বামুন মার কাহিনীর কিন্তু খেই হারিয়ে যায়। কোথায় জ্বরের কথা থেকে ক্ষুত্‌ন ঠাকুরের ফেন খাওয়া—

বিভাও হাসিতে হাসিতে বলিল, "ঝি-মার ঐ রকমই গল্প বলা—"

ঝি-মা উত্তরে বলিলেন—"বয়সও যে তোর ঝি-মার চার কুড়ি পেরিয়ে গেছে, অনেক দিন মা—"

"তা হোক। যে বছর প্রথম জ্বর এল, তখনকার কথা বল, শুনি।"

"কি আর বল্‌বো মা। ক্ষুত্‌ন ঠাকুরপোর রাত্রিতে এল জ্বর ; তারপর দিন সন্ধে হ'তে না হ'তে তাকে হরিবোল দিয়ে নিয়ে গেল। সেই দিন আবার ক্ষুত্‌ন ঠাকুরপোর দিদির আর ভাইপোর অসুখ হয়েছিল, তাদেরও দুদিন পেরুলো না। তারপর এ বাড়ি, ও বাড়ী, সে বাড়ী, কোন বাড়ীই ফাঁক গেল না। চাঁড়াল-পাড়া, বাগ্দী-পাড়া প্রায় নিভূত হ'য়ে গেল ; কে কাকে দেখে, কে কাকে ফেলে ! ঘোষেদের তুফানিকে তার মা আর শিশু ভাইটি পায়ে দড়ি বেঁধে সরকারদের বাঁশ-তলায় টেনে ফেলে রেখে গেল ; শ্মশানে নিয়ে যাবার লোক জুটল না। যদু রায়ের বাড়িতে যে পুরাণ চাকরাণীটা সন্ধ্যে দিত, সেটা বাড়ীর মধ্যেই কবে ম'রে প'ড়ে ছিল। সেই খানেই তাকে শিয়াল কুকুরে খেলে। কেউ জানত না। টান মালাই কতকটা থেমে গেলে ঘরের মেঝেয় তার হাড়গুলো দেখে বোঝা গেল।"

বন-ভোজন

শ্রীঅক্ষয়কুমার সরকার

বিভা বলিল—'যদু রায়ের তত বড় বাড়ীতে আর কেউ ছিল না! এখনও কত ইট কাঠ, উঁচু ভিটে—"

তাহার ঝি-মা বাধা দিয়া বলিলেন, "যদু রায়ের কথা তুমি কিছু শোন নি, অতুলের মা?"

"কিছু কিছু শুনেছি। ঐ ভিটেটায় না কি অপদেবতার আশ্রয়—"

"সত্যি মিথ্যে জানি না মা, অনেক দিন থেকে শুনে আস্‌ছি। তবে যদু রায়ের যে অপমৃত্যু হয়েছিল সে কথা সত্যি।"

বিভা ঝি-মার কাছে সরিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি রকম অপঘাত হয়েছিল ঝি-মা?"

স্বর একটু মৃদু করিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন, "অতুলের মা, সবই ত আমার দেখ্‌তা। তোমার শাশুড়ি সে বছর প্রথম ঘর করতে আসে। তখন না'বার বেলা, রায়-পুকুরে আমরা ক'জন বৌঝি নাইছি, তোমার শাশুড়িও ছিল! রায়-গিন্নির শুচিবাই ছিল, পাছে জলের ছিটে গায়ে লাগে ব'লে আমাদের থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে জপ কর্‌ছিলেন। এখন সময় সতী ঠাকুরঝি পুকুরটার ঈশান কোণের দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে ব'লে উঠল, 'দেখ বৌ, ওরা কারা যাচ্ছে।' চেয়ে দেখি, ক'জন চোয়াড়, তাদের মধ্যে আবার জন চার গালপাট্টাওয়ালা হিন্দুস্থানী, কারও হাতে লম্বা লাঠি, কারও হাতে বা গুলতি ছোঁড়বার ধনুক। রায়-গিন্নি একবার সে দিকে তাকিয়েই হন্ হন্ ক'রে বাড়ি মুখো হ'লেন।"

"কেন ঝি-মা?"

অতুলের মা বলিল, "বল্‌ছেন শোন না।"

ঝি-মা বলিয়া যাইতে লাগিলেন, "আমি ভাবছিলুম, রায়-গিন্নি ঘড়াটা ফেলে গেছেন, সেটা হাতে ক'রে দিয়ে—"

বিভা বলিল "তোমার ঘড়া?"

"আমারটা কাঁখে—"

অতুলের মা বলিল, "তোমার শরীর তো আমরা দেখেছি মা। বয়স কালে তুমি যে দু ঘড়া জল নিয়ে—"

"সে অনেকবার এনেছি।"

বিভা বলিল, "তারপর রায়-গিন্নির ঘড়াটা—"

"হ্যাঁ, বলছি। হঠাৎ একটা বিষম গোল উঠ্‌ল, এবং একটু পরে বন্দুকের আওয়াজ—"

"বন্দুকের আওয়াজ! কেন ঝি-মা?"

"আর কেন! যদু রায়ের সঙ্গে তখন গাঁ-এর নতুন জমিদারের বিবাদ চল্‌ছিল। রায়দের বাগানের খানিকটা জমিদারের লোক দখল কর্‌তে এসেছিল—"

"তোমরা ঘাটে দাঁড়িয়ে রইলে?"

"শোন কথা! পাশে অতবড় একটা দাঙ্গা হচ্ছে আর আমরা নিশ্চিন্ত হ'য়ে ঘাটে দাঁড়িয়ে থাকব! সদু পিশির হুকুম হ'ল, বৌ-ঝি সব দক্ষিণধারের রাস্তা ধ'রে পাড়ার ভিতর গিয়ে ঢুকে পড়। আর আমরা সুড়সুড় ক'রে জল থেকে উঠে পড়্‌লুম। কিন্তু, জান অতুলের মা, ধন্য বুকের পাটা ছিল সেই গয়লাদের ঝিউড়ির। তাকে তুমি দেখেছ?"

"হাঁ, একটু একটু মনে পড়ে।"

"সে আবার ঘুরে দাঙ্গা দেখ্‌তে গিছ্‌ল। দুপুর বেলা আমাদের বাড়িতে বেড়াতে এসে বললে, 'বৌ, সে কি কাণ্ড! যদু রায় পাঁচিলের উপর দাঁড়িয়ে একটা বন্দুক হাতে বাঘের মত কাঁপছে। পাঁচিলের নীচে দুটো লাশ প'ড়ে আছে আর সব জমিদারের লোক ভেগে গেছে। গাঁ শুদ্ধ লোক ভেঙ্গে পড়েছে, কিন্তু রায় মশায়ের হাত থেকে বন্দুকটা নেয় কার সাধ্যি। যেন উন্মাদ! শেষে রায়-গিন্নি এসে বল্‌লেন, 'তুমি ছেলের কাজ করেছ, নেমে এস বাবা—"

বিভা বলিল, "রায়-গিন্নির ত খুব সাহস।"

"তিনিই ত ঘাট থেকে গিয়ে রায়কে বলেছিলেন, 'যদু, তুই যদি আমার মাই খেয়ে থাকিস, তোর মায়ের দুধের মান রাখিস, ঐ চোয়াড়গুলো যেন আমার শ্বশুরের ভিটেয় না ওঠে।"

অতুলের মা জিজ্ঞাসা করিল, "শুনেছি রায়দের ভিটেয় কালীপূজার রাত্রে নরবলি হ'ত। সত্যি বামুন মা?"

'সত্যি। যদু রায়ের বৌ আমার মনের-কথা ছিল,—সে স্বচক্ষে দেখেছে—"

বিভা বলিল, "তারপর যদু রায়ের কি হ'ল?"

"কোম্পানির আমলে দু দুটো খুন হজম করা কি সহজ! যদু রায়ের তিন বছর জেল হয়েছিল।"

"ফাঁসী হ'ল না?"

"না। সে জমিদারটারও অনেক দোষ ছিল। রায় মশায় জেলে যাবার সময় তাঁর মা'র পায়ে হাত দিয়ে দিব্যি ক'রে গেলেন যে, ফিরে এসে জমিদারকে নির্ব্বংশ কর্‌বেন। তাঁকে কিন্তু আর ফির্‌তে হয় নি। কৃষ্ণনগরের জেল থেকে যে দিন খালাস পান, তার এক দিন না দু দিন পরে তাঁর লাস ত্রিবেণীর ঘাটের উপর পাওয়া গেছ্‌ল—"

"কি ক'রে মারা গেলেন?"

"শুনেছি সেই জমিদারই না কি তক্কে তক্কে লোক রেখেছিল। তাদেরই এক জন যে নৌকাতে যদু রায় আস্‌ছিলেন তাতে আশ্রয় নিয়ে তাঁকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলে।"

"লাসটা যে যদু রায়ের কি ক'রে ঠিক হ'ল?"

"লাসের সঙ্গে কাপড়ের খুঁটে একখানা ১০৲ টাকার নোট ও এক টুকরা কাগজ ছিল। তাতে লেখা ছিল 'এ ব্যক্তি সুজাপুরের যদু রায়, সৎব্রাহ্মণ। এঁর আত্মীয়-স্বজনকে খবর দিয়ে সৎকার করালে পুণ্যকার্য্য হবে।' একেই বলে গরু মেরে জুতা দান। সেই জমিদারেরই কীর্ত্তি—"

অতুলের মা বলিল, "এখনও তার বংশ আছে মা?"

বামুন মা হাসিয়া বলিলেন, "খুব বাড় বাড়ন্ত। বোধ হয় বামুনকে ব্রহ্মহত্যার পাতক লাগে না।"

বিভা জিজ্ঞাসা করিল, "যদু রায়ের ছেলেপিলে বৌ ছিল না?"

"একটি বছর খানেকের ছেলে ছিল। রায়-গিন্নির মৃত্যুর পর সেই ছেলেটিকে নিয়ে তার মা বাপের বাড়ি চ'লে যায়—"

"তারা বেঁচে আছে?"

"ছেলেটি বড় হ'য়ে পশ্চিমে কোথায় বিয়ে ক'রে সেইখানে বসবাস করছিল, শুনেছিলুম। সেও মারা গেছে। তার ছেলেপুলে কেউ আছে কি না—"

দরজা ঠেলিয়া শশী ঢুলি বাড়িতে ঢুকিয়া বলিল, "একটু পায়ের ধুলা দাও, বামুন মা।"

তার গলার স্বরে বামুন মা একটু আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি রে শশী, তুই অমন—"

অশীতিপর বৃদ্ধ শশী উঠানে বসিয়া পড়িয়া বলিল, "বল্‌তে নেই, বামুন মা, উত্তর-পাড়ায় ঢেঁড়া দিয়ে ফির্‌বার পথে রায়েদের ভিটের পাশ দিয়ে আস্‌ছিলুম, জ্যোৎস্নায় উঁচু পোঁতাটা চিক্ চিক্ কর্‌ছে, আর তার পাশে যে সেকেলে বকুল গাছটা,—তারই গুঁড়িতে হেলান দিয়ে কে একজন দাঁড়িয়ে রয়েছে, গলায় সাদা ধপধপে পইতে, গোরো রং, রায় মশায়ের মত ঠিক তার নাকটা—"

বিভা তাহার ঝি-মার গা ঘেঁসিয়া বসিল।

অতুলের মা বলিয়া উঠিল, "তা'হলে যা শোনা যায় সত্যি?"

শশী ঢুলি উত্তর দিল, "সত্যি নয় ত কি ঘোষ-বৌ? আমি স্বচক্ষে—"

খোলা দরজা দিয়া কে একজন লোক যেন প্রাণের ভয় এড়াইবার আগ্রহে বেগে সেখানে আসিয়া পড়িল। সকলেই চকিত হইয়া চাহিয়া দেখিল আগন্তুকের খোলা গা, খালি পা, বুকের উপর এক গোছা শুভ্র উপবীত। তাহার মুখের উপর দৃষ্টি পড়িবামাত্র শশী ঢুলির মোহপ্রাপ্তির অবস্থা হইয়া আসিল। কিন্তু সে দিকে কাহারও দৃষ্টি পড়িবার আগেই সে মরণার্ত্তের স্বরে বলিয়া উঠিল, "আমার পায়ে সাপে কামড়েছে!"

বামুন মা ত্রস্তে নিকটে গিয়া দেখিলেন তাহার হাঁটুর নীচে কি একটা কাঁটাফুটার কাল দাগের মত এবং তাই দিয়া রক্ত গড়াইতেছে। মুহূর্ত্ত মধ্যে তিনি ব্রাহ্মণের গাএর পৈতার গোছাটা খুলিয়া লইয়া তাহার হাঁটুর উপর জোরে তাগা বাঁধিয়া দিলেন, এবং তারপরেই হাতের কাছে একটা বোতল পাইয়া তাহা আঁছড়াইয়া ভাঙ্গিয়া তাহার একটা টুকরা দ্বারা অতি নির্ম্মমভাবে সর্পদষ্ট ব্যক্তির আহত স্থানটা চিরিয়া দিতে লাগিলেন। সে যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিতে করিতে সরিয়া যাইবার স্বাভাবিক চেষ্টা করিতেছে দেখিয়া বামুন মা শশী মুচিকে ডাকিয়া বলিলেন, "ধর বাছা, একবার ছোঁড়াটাকে চেপে ধর।" কয়েক মুহূর্ত্ত রোগী যন্ত্রণায় চীৎকার এবং ধস্তাধস্তি করিয়া যেন একটু

বন-ভোজন

শ্রীঅক্ষয়কুমার সরকার

অবসন্ন ভাব ধারণ করিল। ইতিমধ্যে কাচের ধারে ক্ষতস্থান হইতে আরম্ভ করিয়া তাহার খানিকটা নীচু পর্য্যন্ত ফালা ফালা করিয়া চেরা হইয়া গিয়াছিল, এবং তাহা দিয়া রক্ত পড়িয়া তাহার পা-এর তলার খানিকটা মাটি ভিজিয়া গিয়াছিল। এখন ব্রাহ্মণী অতুলের মাকে একটা নূতন হাঁড়ি তাতিয়ে আনতে বলাতে বিভা জিজ্ঞাসা করিল "এইবার রক্ত চুষে নিতে হবে,—নয় ঝি-মা?"

ঝি-মা তাহার মুখের উপর মুহূর্ত্ত মাত্র চাহিয়া একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া তরুণ পীড়িতের সুন্দর মুখশ্রীর উপর দৃষ্টি ন্যস্ত করিয়া নীরব রহিলেন।

"মুখটা ধুয়ে নেব, ঝি-মা?"

ঝি-মা শিহরিয়া উঠিয়া বলিলেন, "কেন মা?"

"সেই যে সে বছর মাকে যখন সর্পাঘাত হয়, সকলে বলেছিল যদি রক্তটা চুষে নেওয়া হ'ত—তা'হলে হয় ত—" বলিতে বলিতে বিভার চক্ষু ছল ছল করিয়া আসিল এবং কথা বন্ধ হইয়া গেল।

অতুলের মা বলিল, "চুষবে কে?"

"কেন আমি। আহা যদি বাঁচে—"

বামুন মা অতি গম্ভীর-ভাবে কয়েক মুহূর্ত্ত কি ভাবিয়া বলিলেন, "দেখি মা তোর মুখের ভিতরটা। একবার—হাঁ কর ত।"

বিভার মুখের ভিতরটা পরীক্ষা করিয়া বামুন মা বলিলেন, "পারবি মা? তুই যার মেয়ে সে ত পরের জন্য সর্ব্বস্ব দিতেও কাতর ছিল না। তোকে এ কাজ করতে দিতে আমার প্রাণ কিন্তু চায় না, তবে বারণ করাও ঠিক হবে না। আমার দাঁত নেই, চোষা যাবে না। অতুলের মা যদি—"

অতুলের মা বলিয়া উঠিল, "আমা হতে হবে না, বামুন মা। কোথাকার কে, আর আমার মুখেও ঘা—"

এই সময়ে সর্পদষ্ট কিশোর বলিয়া উঠিল—"না বাছা, ও সব করতে হবে না। হয় ত এমনিই বেঁচে যাব

বিভা রোগীর মরণকাতর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "ঝি-মা, আমার মুখে ত কোন ঘা টা নেই। আর তা না থাকলে কোন ভয়ই নেই, তুমি বল। আহা যদি এ বেঁচে যায়। মার মরণের পর থেকে আমার কেবলই মনে হয় সাপে-কাটা কারও রক্ত চুষে নিলে বাঁচে কিনা একবার দেখি।"

রোগী হেমন্তকুমার তরুণীর করুণ কোমল মুখের উপর একবার দৃষ্টিপাতের পর তীব্র প্রতিবাদ করিয়া উঠিল, "এ কিছুতেই হ'তে পারে না। আমি কিছুতেই হ'তে দেব না।" কিন্তু হয় ত বা বিভার সনির্ব্বন্ধ অনুনয়ে, হয় ত বা বামুনমার যুক্তির প্রভাবে, হয় ত বা প্রাণের স্বাভাবিক মায়ায়,কিছুক্ষণ বাদানুবাদের পর সে আর বাধা দিল না। বিভা তাহার কিশোর বয়সের কিশলয় তুল্য ওষ্ঠপুট দিয়া সেই তরুণ অপরিচিতের বিষাক্ত রক্ত চুষিয়া লইল।

২

গত রাত্রিতে বিভা ঘুমাইতে পায় নাই। পুণ্যকার্য্যে অমঙ্গল হয় না, আজন্ম অভ্যস্ত এই বিশ্বাসের বলে তাহার ঝি-মা আশ্বস্ত থাকিলেও তাঁহার স্নেহাকুল অনিষ্টশঙ্কী মন ভাবিয়াছিল যদি মেয়ের মুখে কোথাও কোন অজ্ঞাত ঘা থাকে। এবং ফলে যাহাতে বিভা না ঘুমায় তাহার জন্য তিনি সচেষ্ট ছিলেন।

তাহা না হইলেও হয়ত সে রাত্রিতে তাহার নিদ্রা হইত না। সর্পদষ্ট হেমন্ত পাছে ঢলিয়া পড়ে এই ভয়ে ওঝা তাহাকে ঘরের দ্বারের একটি মোটা খুঁটির সঙ্গে এমন ভাবে বাঁধিয়াছিল যে সমস্ত রাত্রি তাহার মৃত বা জীবিত শরীরের খাড়া হইয়া থাকা ছাড়া আর কোনও সম্ভাবনা ছিল না। তাহার পর ঝাড়-ফুঁক, অবোধ্য মন্ত্র এবং তাহার ভিতর দিয়া বিভিন্ন সুরে অজ্ঞাতনামা সর্পকে শত সম্ভাবিত নামে অভিহিত করিয়া, বিনয়, অনুনয়, অনুযোগ, অভিযোগ, দিব্য-দিলেসা, ক্রোধের আস্ফালন, দর্পের অভিনয়, ভয়-মৈত্রী-লোভ প্রদর্শন, বিভার কিশোর চিত্তটিকে সমস্ত রাত্রি ধরিয়া বিস্ময়-কৌতূহলে ডুবাইয়া রাখিয়াছিল

সকলের উপর যে অপরিচিতের জীবন মরণ লইয়া সে রাত্রিতে যমে মানুষে লড়াই চলিতেছিল তাহার যন্ত্রণাবিকৃত তরুণ মুখ হইতে মাঝে মাঝে যে আর্ত্তনাদ, তাহার পুরুষ-সম্মান-রক্ষার শত চেষ্টাকে বিফল করিয়া দিয়া, বাহির হইয়া আসিতেছিল তাহাতে এই কিশোরীর কোমল তরুণ অন্তঃকরণ করুণার প্রবাহে ভাসিয়া যাইতেছিল।

কিন্তু বিভার মনের উপর সব চেয়ে বেশী প্রভাব বিস্তার করিতেছিল, হেমন্তকুমারের কৃতজ্ঞ করুণ দৃষ্টিটি। সেটি যেন কৃতজ্ঞতার ভারে আক্রান্ত অবসন্ন হইয়া সেই অপরিচিতা প্রাণ-দাত্রীকে আহ্বান করিয়া বলিতে চাহিতেছিল, "তোমার সঙ্গে ত আমার এ জন্মের কোন পরিচয় নাই, কিন্তু তুমি এই অপরিচিতের জন্য যাহা করিলে তাহা করিতে হয়ত অনেকের নিকটতম আত্মীয়াও ইতস্ততঃ করে।" তত যন্ত্রণার মধ্যেও হেমন্তের দৃষ্টি যেন বিভার সরস শান্ত মুখের করুণাপ্লাবিত চক্ষু দুইটির ভিতর দিয়া গিয়া তাহার হৃদয়ের ভিতরে ঢুকিয়া সেখানকার করুণার উৎসটি উপভোগ করিতে যাইতেছিল। সেই আগ্রহ দৃষ্টির স্পর্শে কুমারীর মনোবৃত্তির মধুরতম সুপ্ত অংশ, সুষুপ্তিমগ্না রাজকন্যা যেরূপ নবাগত যুবরাজের সোনার কাঠির স্পর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল, সেই রূপ ভাবে জাগিয়া উঠিতেছিল।

একান্ত অভিনব বলিয়া এবং স্থান কাল ও অন্যান্য পারিপার্শ্বিকের প্রতিকূলতাবশতঃ এই জাগ্রত-প্রায় মনোবৃত্তির যথার্থ প্রকৃতি বিভা বেশ উপলব্ধি করিতে পারিতেছিল না; কিন্তু ইহার অনাস্বাদিতপূর্ব্ব মধুর মোহ তাহার মনটিতে প্রথম মদিরা পানের নেশার আবেশ আনিতেও ছাড়িতেছিল কি না, কে জানে? কিন্তু ইহাও স্থির যে বিভা পরমেশ্বরের নিকট হেমন্তকুমারের জন্য, প্রিয় আত্মীয়ের প্রাণ-রক্ষার জন্য লোকে যেমন আগ্রহে প্রার্থনা করে, সেইরূপ ভাবেই তাহার মনস্কামনা জানাইতেছিল।

এইরূপ করিয়াই শরতের শুভ্র রাত্রিটি কাটিয়া গেল, এবং ভোরের দিকে ওঝা রোগীকে নিরাপদ ঘোষণা করিয়া, অতুলের মা প্রভৃতি প্রতিবেশী প্রতিবেশিনীর সঙ্গে চলিয়া গেল। তখন বিভার মনে একটা সার্থকতার স্ফূর্ত্তি ও নিশ্চিন্ততার তৃপ্তি আসিল; এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতি তাহার ঘুমের দাবী এমন ভাবে জ্ঞাপন করিল যে ইচ্ছা থাকিলেও তাহা অগ্রাহ্য করিবার শক্তি তাহার রহিল না। এই সময়ে যখন তাহার ঝি-মা তাহাকে স্নেহের সুরে আহ্বান করিয়া বলিল, "ঘুম পেয়েছে মা? ঢুলছ যে, এখন আর ঘুমুতে দোষ নেই, শোবে চল।" তখন সে একটা অনাবশ্যক ব্যগ্রতার সহিত বলিয়া উঠিল, "না ঝি-মা, কই আমার ত ঘুম পায় নি!" সে কথায় বামুন মার যে হাসিটুকু আসিয়াছিল তাহা হয়ত বিভার দৃষ্টিতে না পড়াই স্বাভাবিক, কিন্তু স্তম্ভে বদ্ধ রোগীর মুখে যে স্নিগ্ধ স্নেহের হাসির অতি সূক্ষ্ম একটি রেখা ফুটিয়া উঠিতে না উঠিতেই শূন্যে মিলাইয়া গেল, তাহা সেই কিশোরীর সতর্ক লক্ষ্যের অজ্ঞাত থাকিল না; তাহার ফলে একসঙ্গে তাহার অধরে হাসির রেখা এবং নয়নে লজ্জার নম্রতা আসিয়া পড়িল। অত লক্ষ্য করিবার বয়স বিভার ঝি-মার ছিল না এবং সেরূপ কোনো সম্ভাবনার কথাও তাঁহার মনে উদয় হয় নাই, সুতরাং তিনি বিভার হাত ধরিয়া তাহাকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া "তা হোক, এইখানেই না হয় একটু ঘুমিয়ে নাও," বলিয়া নিজের অবসন্ন প্রাচীন দেহটিকে আঁচলের উপর বিছাইয়া দিলেন এবং বিভাকেও পাশে শোয়াইলেন। বৃদ্ধা ত অল্পক্ষণ মধ্যেই নিদ্রার গাঢ়তায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িলেন, কিন্তু তরুণীর মানসপটের উপর রাত্রির গত ঘটনাগুলি এত বিভিন্নবর্ণে এবং মিশ্রণে হুড়াহুড়ি করিয়া যাতায়াত করিতে লাগিল যে, শুধু অনেকক্ষণ নিদ্রাদেবীর অধিকার হইতে তাহার মনটি মুক্ত রহিল তাহা নহে, তাহার দৃষ্টিও মাঝে মাঝে বিদ্রোহীভাবে তাহার মুদ্রিত প্রায় চক্ষু দুইটির পাতা সবলে উন্মুক্ত করিয়া সম্মুখের দুর্দ্দশাগ্রস্ত বন্দীর দিকে চাহিয়া লইতে লাগিল।

সে মানুষটির পা-এর আগাঁ তখনও খোলা হয় নাই এবং দেহটি খুঁটিতে বাঁধা ছিল; সুতরাং রক্তচলাচলের অভাবে বামপদটি অত্যন্ত ভারি হইয়া এবং মশার কামড়ে সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া পুড়িয়া তাহার যে যন্ত্রণা হইতেছিল তাহা নীরবে শান্তমুখে সহ্য করা মানব প্রকৃতির সাধ্যের বাহিরে। মৃত্যুর বিভীষিকা সে সন্ধ্যা-কালে কল্পনায় দেখিয়া ভীত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু এখন ভাবিতেছিল যে এই যে অসহ্য শারীরিক যন্ত্রণা ইহা অপেক্ষা মৃত্যুই ভাল। ওঝার ঝাড়নের মধ্যে এবং সমাগত মানব নানা বক্তব্যের মধ্যে হেমন্ত একাধিকবার

শ্রীঅক্ষয়কুমার সরকার

এই অসহনীয় যন্ত্রণা জ্ঞাপন করিয়া তাহা খুলিয়া দিবার জন্য কাতর প্রার্থনা করিয়াছিল; কিন্তু তাহার কথায় কেহ কর্ণপাতও করে নাই। ফলে কয়েক ঘণ্টা ধরিয়া ক্রমাগত যন্ত্রণাভোগের পর এখন সে উন্মাদের মত হইয়া পড়িয়াছিল। দাঁতে করিয়া তাহার বন্ধনের দড়িটা কাটিয়া ফেলিবার ব্যর্থ চেষ্টার পরেই হঠাৎ তাহার দৃষ্টি বিভার করুণ-কাতর চক্ষুর উপর পড়িতেই সে উগ্র তিরস্কারের স্বরে বলিয়া উঠিল, "তোমরা নিষ্ঠুর! ম'রে গেলুম যে যন্ত্রণায়! তোমার পায়ে পড়ি একবার হাত দুটো খুলে দাও!"

তাহার করুণ মিনতির স্বর শুনিয়া এবং চক্ষুর জল দেখিয়া বিভা যেন নিজের অজ্ঞাতসারেই তাহাকে বন্ধনমুক্ত করিবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইল; কিন্তু পরক্ষণেই হাত গুটাইয়া লইয়া বলিল—"কিন্তু সবাই যে ব'লে গেছে, তা হলে আপনাকে কিছুতেই বাঁচান যাবে না।" কথা কয়টি বলিতে বলিতে সে কাঁদিয়া ফেলিল এবং তাহাকে কাঁদিতে দেখিয়া হেমন্তকুমারের উন্মাদ চাঞ্চল্যও যেন মুহূর্ত্তের জন্য শান্ত হইয়া আসিল। সে একটা দীর্ঘ নিশ্বাসের সহিত উত্তর দিল, "আমি যে আর সহ্য করতে পারছি না, বিভা! পা'টা যেন ভারি পাথর হ'য়ে এসেছে, আর দড়িটা যেন ক্রমাগত চামড়া কেটে বস্‌ছে।"

"আমি একটু চুঁচে দিই" বলিয়া তাহার ঝি-মার দিকে একটুমাত্র চাহিয়া লইয়াই বিভা অতি সন্তর্পণে এবং সঙ্কোচে তাহার পল্লবকোমল হাত দুইটি হেমন্তের পায়ে উঠাইতে এবং নামাইতে লাগিল। তাহার করতলের স্নিগ্ধতার দরুণই বোধ হয় হেমন্ত কিয়ৎকালের জন্য কতকটা শান্তভাব অবলম্বন করিল। এইরূপে শরতের জ্যোৎস্নাস্নিগ্ধ শর্ব্বরীতে সেই তরুণ তরুণী দুইটি লোক-চক্ষুর অন্তরালে নীরব সহানুভূতির সূত্রে গ্রথিত হইয়া আসিতেছিল। প্রকৃত দেবী কিন্তু এরূপ স্থলেও মানবশরীরের উপর তাঁহার যে চিরন্তন দাবী তাহা কিছুতেই ছাড়িলেন না; এবং প্রত্যুষের আলো ভাল করিয়া দেখা দিবার পূর্ব্বে যখন কাক কোকিল ডাকিতেছিল, তখন তিনি বিভার একসঙ্গে আনন্দ ও ব্যথায় ভরা মনটিকে আচ্ছন্ন করিয়া দিয়া এবং তাহার শ্রান্ত শরীরখানিকে নিদ্রাকবলিত করিয়া হেমন্তের পা'এর কাছে ভূশয্যায় শোয়াইয়া দিলেন। কতক্ষণ পরে বামুন-মা'র মুখের উপর প্রাতঃ-সূর্য্যের রশ্মি-সম্পাত হওয়াতে তিনি জাগিয়া উঠিয়া বসিলেন। বদ্ধ হেমন্তের মুখের উপর দৃষ্টি পড়াতে বলিলেন, "কাল রাত্রিতে বড় যন্ত্রণা পেয়েছ বাবা। আর ভয় নেই। বিষহরি রক্ষা করেছেন।" তাহার পর নিদ্রিতা বিভার দিকে চাহিয়া সস্নেহে বলিলেন, "মা আমার বড় ভাল মেয়ে।" তাহাকে ঠেলিয়া উঠাইয়া, হেমন্তকে বন্ধনমুক্ত করিয়া বলিলেন, "তুমি এইবার হাত মুখ ধুয়ে এস। কাল বিপদের সময় তোমার পরিচয় লওয়া হয় নি। তবে এখানে যে তোমার কোন আত্মীয় স্বজন নেই, তা বলেছিলে। এত ক্লেশের পর তোমাকে দুটি না খাইয়ে ছাড়তে পারি না

বামুন মার অনুরোধে হেমন্তকুমারকে সে দিন সেখানে থাকিতে হইয়াছিল। অথবা তেমন সস্নেহ অনুরোধ না হইলেও তাহাকে থাকিতে হইত। গত রাত্রির ব্যাপারের পর তাহার আর চলিবার সামর্থ্য ছিল না; এবং হয়ত বা এই অনাত্মীয় দরিদ্র গৃহস্থের আন্তরিক স্নেহের সেবার আকাঙ্ক্ষা এই ভবঘুরে ছেলেটির সদ্য-পীড়িত এবং বুভুক্ষু শরীরের অভ্যন্তরস্থ দুর্ব্বল মনটিকে লোভাতুর করিয়া তুলিয়াছিল। যাহা হউক যখন সে যদু রায়ের ভিটে হইতে তাহার গত রাত্রির পরিত্যক্ত গেঞ্জিটি একটি ছিটের কোট এবং এক জোড়া জুতা সমেত বিভাদের বাড়িতে ফিরিয়া আসিল তখন আত্মীয়ের আদরেই গৃহীত হইল।

বিভা রসুই-ঘরের দ্বারের উনানটি নিকাইতেছিল, পদশব্দে হেমন্তকে দেখিয়া বলিল, "ঝি-মা, এই যে ইনি এসেছেন।" ঝি-মা আদর করিয়া হেমন্তকে ডাকিয়া কাছে বসাইয়া তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন; কিন্তু হয়ত সবটুকু পাইলেন না। যেটুকু পাইলেন তাহাতে ছেলেটি যে সৎব্রাহ্মণ, ভদ্র এবং লেখাপড়া-জানা এইটুকু বুঝিলেন। সুজাপুরে আসিবার কারণ এবং রাত্রিতে সে অমন নির্জ্জন যদু রায়ের ভিটায় গিয়া কেন যে দাঁড়াইয়াছিল সে কথা

জিজ্ঞাসা করিয়া তাহার কোন সদুত্তর পাইলেন না। পরিচয় ভাল করিয়া পান আর নাই পান, তাঁহার বহুদর্শিনী দৃষ্টি হেমন্তের মুখশ্রীর অপূর্ব্বত্বে এবং তাহার আত্মীয়বৎ সহজ সদালাপের বিশেষত্বে আকৃষ্ট হইতেছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

সে দিন বামুন মার বন-ভোজনের উপবাস। বিভা যাহা কিছু রন্ধন করিয়াছিল তাহা পরম পরিতৃপ্তির সহিত আহার করিয়া হেমন্ত নিদ্রাদেবীর গত রাত্রির অনিদ্রার ঋণ-পরিশোধের জন্য শয্যা লইয়াছিল। অপরাহ্নে নিদ্রাভঙ্গ হইলে চক্ষু খুলিবার আগেই তাহার কানে ঢুকিল "হয় না, মা? দুটিতে কিন্তু বেশ মানায়—" বিভার ঝি-মা ঘরের মেঝে বসিয়াছিলেন, তিনি মুদ্রিত-নেত্র হেমন্তের মুখের উপর এক মুহূর্ত্তের জন্য দৃষ্টিপাত করিয়া উত্তর করিলেন, "জাতিকুল ত সব মিলে মা, কিন্তু আর ত কোনপরিচয়—"

বিভা পাশের বাড়িতে চুল বাঁধিতে গিয়াছিল। বন-ভোজনের জন্য সাজিয়া গুজিয়া, মুখটি মুছিয়া পুঁছিয়া, কপালের মাঝে ছোট একটি টিপ পরিয়া, শুকতারাটির মত দীপ্ত প্রফুল্ল মূর্ত্তিতে সে আসিয়া দাঁড়াইতেই তাহার ঝি-মার কথা-বন্ধ হইয়া গেল।

বিভা বলিল, "আর দেরি করছ কেন ঝি-মা? ও পাড়ার সবাই যে বেরিয়ে পড়েছে, আর রাঙ্গামাসীমারাও" —এই সময়ে বন-ভোজনের যাত্রীগুলি তাহাদের মুড়ি-মুড়কির পুঁটলি-পোঁটলা ও দুধ-দইয়ের বাটি খোরা সমেত কলরব করিতে করিতে সেখানে আসিয়া পৌঁছিল।

হেমন্ত নিদ্রা হইতে উঠিয়া বাহিরে যাইতেছে দেখিয়া ঝি-মা একটু হাসিয়া বলিলেন, "আমরা এইবার বন ভোজনে চল্লুম। তুমি ঘর আগলাও, বাবা।" ঘর হইতে বাহির হইবার পথে হেমন্তের দৃষ্টি একবার মাত্র বিভার মার্জ্জিত দীপ্ত মুখশ্রীর দিকে আকৃষ্ট হইয়াই শীলতার সম্ভ্রমে সম্মুখে ফিরিল। সদর দ্বারটি পার হইবার সময়, তাহার কানে গেল কে তরুণ কণ্ঠে প্রশ্ন করিতেছে—"বিভার বর বুঝি, কবে বিয়ে হ'ল, বামুন মা?" কে একজন উত্তর করিল, "হাঁ, চৈত্ মাসে।" একটা চাপা হাসির মধ্যে সেই তরুণী বিস্মিত হইয়া আবার বলিল, "চৈত্ মাসে বিয়ে?" আবার হাসির রোলের মধ্যে উৎকর্ণ হেমন্তকুমার শুনিল, "সে কি, দেখছ না বিভার সিঁথেয় সিন্দুর নেই!"

(ক্রমশঃ)

লাইব্রেরী

গত পৌষ মাসের প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় লাইব্রেরীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে নিম্নোদ্ধৃত সারগর্ভ প্রবন্ধটি লিখেছেন—

লুব্ধতা মানুষের একটা প্রধান রিপু। একবার যখন সে সংগ্রহ করতে আরম্ভ করে তখন সংগ্রহের লক্ষ্য সে ভুলে যায়, তাকে সংখ্যার নেশায় পেয়ে বসে। লোহার সিন্ধুক বোঝাইয়ের জন্যে টাকা সংগ্রহই হোক, বা সম্প্রদায়ের আয়তন বাড়াবার জন্যে লোক সংগ্রহই হোক, সেই সংগ্রহবায়ুর ধাক্কায় মানুষের মনকে ভাসিয়ে নিয়ে চলে, ঘাটে পৌঁছবার উদ্দেশ্যটা সেই অন্ধ বেগে অস্পষ্ট হ'য়ে ওঠে,—সত্যের সম্মান বস্তুর পরিমাণে নয় একথা মনে থাকে না।

অধিকাংশ লাইব্রেরিই সংগ্রহবাতিকগ্রস্ত। তার বারো আনা বই প্রায়ই ব্যবহারে লাগে না, ব্যবহারযোগ্য অন্য চার আনা বইকে এই অতিস্ফীত গ্রন্থপুঞ্জ কোণঠেসা ক'রে রাখে। যার অনেক টাকা, আমাদের দেশে তাকে বড়োমানুষ বলে, অর্থাৎ মনুষ্যত্বের আদর্শ বিষয় নিয়ে, আশয় নিয়ে নয়। প্রায় সেই একই কারণে বড়ো লাইব্রেরির গর্ব্ব অনেকখানিই তার গ্রন্থসংখ্যার উপরে। সেই গ্রন্থগুলিকে ব্যবহারের সুযোগদানের উপরেই তার গৌরব প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু আপন অহঙ্কারতৃপ্তির জন্যে সেটা অত্যাবশ্যক নয়। ক্রোড়পতি সভায় উপস্থিত হ'লে সসম্ভ্রমে আসন ছেড়ে তার অভ্যর্থনা করি। এই সম্মানলাভের জন্যে ধনীর বদান্যতার প্রয়োজন নেই, তার সঞ্চয়ই যথেষ্ট।

আমাদের ভাষায় যতগুলি শব্দ আছে তার দু'রকমের আধার, এক অভিধান, আর এক সাহিত্য। গণনা করে' দেখ্‌লে দেখা যাবে যে, বড়ো অভিধানে যতগুলি কথা জমা হয়েছে তার বেশী ভাগেরই ব্যবহার কদাচ হয়। অথচ তাদের সঞ্চয় আবশ্যক। কিন্তু সাহিত্যে ব্যবহৃত শব্দগুলি সজীব, প্রত্যেকটি অপরিহার্য্য। অভিধানের চেয়ে সাহিত্যের মূল্য বেশি একথা মান্‌তেই হয়।

লাইব্রেরি সম্বন্ধে সেই একই কথা। লাইব্রেরি তার যে অংশে মুখ্যত জমা করে সে অংশে তার উপযোগিতা আছে, কিন্তু যে অংশে সে নিত্য ও বিচিত্রভাবে ব্যবহৃত সেই অংশে তার সার্থকতা। লাইব্রেরিকে সম্পূর্ণ ব্যবহারযোগ্য ক'রে তোল্‌বার চিন্তা ও পরিশ্রম লাইব্রেরিয়ান স্বীকার করতে চায় না। তার কারণ সঞ্চয়বহুলতার দ্বারাই সাধারণের মনকে অভিভূত করা সহজ।

লাইব্রেরিকে ব্যবহার্য্য করতে গেলে লাইব্রেরির পরিচয় সুস্পষ্ট ও সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ হওয়া চাই। নইলে তার মধ্যে প্রবেশ চলে না। সে এমন একটা সহরের মতো হ'য়ে ওঠে যার বাড়িঘর বিস্তর কিন্তু পথঘাট নেই।

যারা বিশেষ ভাবে বই সন্ধান করবার জন্যে লাইব্রেরিতে যাওয়া-আসা করে তারা নিজের গরজেই দুর্গমের মধ্যেও একটা পায়েচলা পথ বানিয়ে নেয়। কিন্তু লাইব্রেরির নিজের একটা দায় আছে। সে হচ্চে তার সম্পদের দায়। যেহেতু তার বই আছে সেই হেতু সেই বইগুলি পড়িয়ে দিতে পার্‌লেই তবে সে ধন্য হয়। সে অক্রিয়ভাবে দাঁড়িয়ে থাক্‌বে না, সক্রিয়ভাবে যেন সে ডাক দিতে পারে। কেন না, তন্নষ্টং যন্ন দীয়তে।

সাধারণতঃ লাইব্রেরি ব'লে থাকে, আমার গ্রন্থতালিকা আছে, স্বয়ং দেখে নেও বেছে নেও কিন্তু তালিকার মধ্যে আহ্বান নেই, পরিচয় নেই, তার তরফে কোনো আগ্রহ নেই। যে লাইব্রেরির মধ্যে তার নিজের আগ্রহের পরিচয় পাই, যে নিজে এগিয়ে গিয়ে পাঠককে অভ্যর্থনা ক'রে আনে, তাকেই বলি বদান্য—সেই হ'লো বড়ো লাইব্রেরি, আকৃতিতে নয় প্রকৃতিতে। শুধু পাঠক লাইব্রেরিকে তৈরি করে, তা নয়, লাইব্রেরি পাঠককে তৈরি ক'রে তোলে।

এই কথাটি যদি মনে রাখা যায় তাহ'লে বোঝা যাবে লাইব্রেরিয়ানের কাজটা মস্ত কাজ। শেল্‌ফের উপরে গুছিয়ে বই সাজিয়ে হিসেব রাখ্‌লেই তার কাজ সারা হ'ল না। অর্থাৎ সংখ্যা নিয়ে বিভাগ নিয়ে যেটুকু কাজ সেটুকু সব চেয়ে বড়ো কাজ নয়। লাইব্রেরিয়ানের গ্রন্থবোধ থাকা চাই, কেবল ভাণ্ডারী হ'লে চল্‌বে না।

কিন্তু লাইব্রেরি অত্যন্ত বেশি বড়ো হ'লে কোনো লাইব্রেরিয়ান তাকে সত্যভাবে সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করতে পারে না। সেই জন্যে আমি মনে করি, বড়ো বড়ো লাইব্রেরি মুখ্যত ভাণ্ডার, ছোট ছোট লাইব্রেরি ভোজনশালা—তা প্রত্যহ প্রাণের ব্যবহারে ভোগের ব্যবহারে লাগে।

ছোট লাইব্রেরি বল্‌তে আমি এই বুঝি, তাতে সকল বিভাগের বই থাক্‌বে কিন্তু একেবারে চোখা চোখা বই। বিপুলায়তন গণনার বেদীতে নৈবেদ্য যোগাবার কাজে একটি বইও থাক্‌বে না, প্রত্যেক বই থাক্‌বে নিজের বিশিষ্ট মহিমা নিয়ে। লাইব্রেরিয়ান্‌ হবেন যাথার্থ সাধক, নির্লোভী, শেল্‌ফ ভর্ত্তির অলঙ্কার তাঁকে ত্যাগ করতে হবে। এখানে ভোজের আয়োজন যা থাক্‌বে সমস্তই সাদরে পাঠকদের পাতে দেবার যোগ্য, আর লাইব্রেরিয়ানের থাক্‌বে গুদামরক্ষকের যোগ্যতা নয়, আতিথ্যপালনের যোগ্যতা।

মনে কর কোনো লাইব্রেরিতে ভালো ভালো মাসিক পত্র আসে, কতকগুলি দেশের, কতকগুলি বিদেশের। যদি লাইব্রেরির যাচাই বিভাগের কোনো ব্যক্তি তাদের থেকে বিশেষ পাঠ্য প্রবন্ধগুলিকে শ্রেণীবিভক্ত ভাবে নির্দ্দিষ্ট ক'রে একটা তালিকা পাঠগৃহের দ্বারের কাছে ঝুলিয়ে রাখেন তাহলে সেগুলি পাঠের সম্ভাবনা নিশ্চিত বাড়ে। নইলে এই সকল পত্রিকা বারো আনা অপঠিত ভাবে স্তূপাকার জ'মে উঠে লাইব্রেরির স্থান ক্ষয় ও ভার বৃদ্ধি করে। নূতন বই এলে খুব অল্প লাইব্রেরিয়ান তার বিবরণ নিজে জেনে পাঠকদের জানিয়ে দেবার উপায় ক'রে দেন। যে কোন বিষয়ে কোন ভাল বই আসবামাত্র তার ঘোষণা হওয়া চাই।

ঘোষণা হবে কার কাছে? বিশেষ পাঠকমণ্ডলীর কাছে। প্রত্যেক লাইব্রেরির অন্তরঙ্গ সভ্যরূপে একটি বিশেষ পাঠকমণ্ডলী থাকা চাই। সে মণ্ডলী লাইব্রেরিকে প্রাণ দেয়। লাইব্রেরিয়ান যদি এই মণ্ডলীকে তৈরি করে তুলে একে আকৃষ্ট ক'রে রাখ্‌তে পারেন তবেই বুঝব তাঁর কৃতিত্ব। এই মণ্ডলীর সঙ্গে তাঁর লাইব্রেরীর মর্ম্মগত সম্বন্ধ স্থাপনের তিনি মধ্যস্থ। অর্থাৎ তার উপরে ভার কেবল গ্রন্থগুলির নয়, গ্রন্থপাঠকের। এই উভয়কে রক্ষা করার দ্বারা তিনি তাঁর কর্ত্তব্যপালন, তাঁর যোগ্যতার পরিচয় দেন।

যে-বইগুলি লাইব্রেরিয়ান সংগ্রহ করতে পেরেচেন কেবল তাদের সম্বন্ধেই লাইব্রেরিয়ানের কর্ত্তব্য আবদ্ধ নয়। তাঁর জানা থাকা চাই বিষয়বিশেষের জন্য প্রধান অধ্যয়নযোগ্য কি কি বই প্রকাশিত হচ্চে। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে শিশুপাঠ্য গ্রন্থের প্রয়োজন ঘটে। এই নিয়ে নানা স্থানে সন্ধান করে আমাকে বই নির্ব্বাচন করতে হয়। প্রত্যেক লাইব্রেরীর উচিত এইরূপ কাজে সাহায্য করা। বিশেষ বিশেষ বিষয়ে যে কোনো বই বৎসরে বৎসরে খ্যাতি অর্জ্জন করে তার তালিকা লাইব্রেরীতে বিশেষ ভাবে রক্ষিত হ'লে একটা অত্যাবশ্যক কর্ত্তব্য সাধিত হয়। যদি কোনো লাইব্রেরি এই সম্বন্ধে খ্যাতি অর্জ্জন করতে পারে, যদি সাধারণে জানে সেই খানে পাঠযোগ্য ভালো বইয়ের সন্ধান পাওয়া যায়, তা হ'লে গ্রন্থপ্রকাশকেরা নিজের গরজে সেখানে তাঁদের গ্রন্থের তালিকা ও পরিচয় পাঠিয়ে দেবেন।

উপসংহারে আমার বক্তব্য এই যে, নিখিল ভারত লাইব্রেরী পরিষদ থেকে ত্রৈমাসিক, ষান্মাষিক, বা বার্ষিক এমন একটি পত্রিকা প্রকাশিত হওয়া উচিত যাতে অন্তত ইংরেজী ভাষায় বিজ্ঞান ইতিহাস সাহিত্য প্রভৃতি সম্বন্ধে যে সকল ভালো বই প্রকাশ হচ্ছে যথাসম্ভব তার বিবরণ প্রকাশ করা যেতে পারে। দেশের চারিদিকে যদি লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠার উৎসাহ দিতে হয়, তবে সেই লাইব্রেরীগুলিতে কি কি বই সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য সে সম্বন্ধে সাহায্য করা এই প্রতিষ্ঠানেরই কাজ।

এই প্রবন্ধে আমি যে কথাটি বল্‌তে চেয়েছি সেটা সংক্ষেপে এই যে, লাইব্রেরীর মুখ্য কর্ত্তব্য, গ্রন্থের সঙ্গে পাঠকদের সচেষ্ট ভাবে পরিচয় সাধন করিয়ে দেওয়া, গ্রন্থ সংগ্রহ ও সংরক্ষা তার গৌণ কাজ।

বঙ্গের অভিব্যক্তি

গত পৌষ মাসের প্রবর্ত্তকে শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় লিখিয়াছেন—

সমাজের গতি spiral। যখন নীচে নামে, বেশী নামে না। কিছু নামিয়া খানিকটা উঠে, আগে যতদূর উঠিয়াছিল তাহা অপেক্ষা বেশী উঠে। এই ভাবে গত একশত বৎসরের ভিতর বাঙ্গলার সমাজে আশ্চর্য্যরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, নানা কারণে আমাদের রীতিনীতি, চিন্তার ধারা বদলাইয়া গিয়াছে, এই বদলানই সাচ্চা বদলান। প্রথমে ইংরেজী শিখিয়া যা বদলাইয়াছিলাম তাহা ছিল সাময়িক ব্যাপার, তাহা Permanent level নয়। এখন যাহা হইয়াছে, ইহাও স্থায়ী নয়, আরো বদলাইবে। মুষ্টিমেয় লোক যে এই সংস্কার গ্রহণ করিয়াছে তাহা নয়, সাধারণ লোকও গ্রহণ করিয়াছে। সমাজসংস্কার বাস্তবিক হয় সমাজ জীবনের প্রয়োজনে। সমাজ জীবধর্ম্ম বিশিষ্ট, জীব মাত্রেরই প্রধান লক্ষ্য আপনাকে বাঁচাইয়া রাখা, সমাজের ও লক্ষ্য তাহাই। সমাজ যখন

দেশের কতকগুলি সংস্কার, যাহা প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে তাহা বদলান আবশ্যক, বিনা আপত্তিতে, বিনা বিচারে, বিনা বাক্যব্যয়ে সমাজ তাহা বদলাইবে। Navigationএর অধিকার যদি আমরা পাই, Indian Navy যদি গড়িয়া উঠে, তাহা হইলে নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ যাঁহারা, সদাচারী কায়স্থ যাঁহারা তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য কেহ কি ঐ যুদ্ধ-জাহাজে যাইবে না? চাটগাঁয়ের মুসলমান খালাসীরাই কি তাহার কাপ্তেনী করিবে? তাহা ত হইবে না, আপনারা সে জন্য লালায়িত হইবেন, আপনাদের ব্যবসাবাণিজ্য যখন বাড়িয়া যাইবে তখন ছুঁৎমার্গ থাকিবে না। মাড়োয়ারীরা একদিকে খুব নৈষ্ঠিক বটে, আবার ব্যবসার খাতিরে তাহাদের সব হিন্দুয়ানী একেবারে ভাসিয়া যায়। এতদিন সমাজ রক্ষা করার ভার আমাদের হাতে ছিল, যদি স্বরাজ লাভ করেন দেশকে রক্ষা করিতে হইবে। এই সকল যদি আপনাদের দায় হইয়া উঠে, তাহা হইলে দেখিবেন—ভিজা সুতা আগুনে পুড়াইয়া দিলে যেমন ছাইএর সুতা থাকে, একটুখানি নাড়া দিলেই যেমন তাহা ভাঙ্গিয়া যায়, সেইরূপ সমাজ- বন্ধন আজকাল যেটুকু আছে তাহাও ভাঙ্গিয়া যাইবে, সমাজের প্রয়োজনে, দেশের প্রয়োজনে।

সমাজ সম্বন্ধে অনেকটা সমন্বয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, রাষ্ট্র সম্বন্ধে এখনও আমরা সমন্বয়ের পথে দাঁড়াই নাই।

গত একশত বৎসর বাংলাদেশ অনেক বিরোধের ভিতর পড়িয়াছে। জাত কখনও বিরোধের মধ্যে বাঁচিয়া থাকিতে পারে না, ইহাই জীবধর্ম। জীবতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা বহু দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে যে জীব আপনার চারিদিকের অবস্থা এবং ব্যবস্থার সঙ্গে আপোষ করিয়া চলিতে না পারে, সে আপনার জীবন রক্ষা করিয়া চলিতে পারে না। ইহাকেই প্রাণীতত্ত্ববিদ্যাতে Natural selection বলা হইয়াছে, যাহাকে বাংলাতে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন বলে। অনুবাদের ঠিক অর্থ ধরিতে গেলে, ইহা ঠিক অনুবাদ হইয়াছে অর্থাৎ জীবের প্রকৃতি এই—আপনার বাঁচিবার উপযোগী যাহা তাহা সে আপনিই বাছিয়া নেয়। ইহার ফলে জীব-জগতের যত কিছু পরিবর্ত্তন সব হয়, এমন কি জীবের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে যে সমস্ত অভিব্যক্তি হয়, তাহাও ইহার ফলে হয়। উদ্ভিজ্জগতের একটা দৃষ্টান্ত দিব। শিয়ালকাঁটা গাছের কাঁটাটা কেন হইল পাতার সঙ্গে সঙ্গে কাঁটা গজাইল কেন? প্রাণিতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা বলেন, এই যে ছোট গাছ, কোমল পাতা—সে যদি ঐরূপভাবে কাঁটা না গজাইত, তাহা হইলে সে বাঁচিতে পারিত না। যে সমস্ত প্রাণী উদ্ভিদ্ আহার করে, তাহাদিগকে নির্ম্মূল করিয়া ফেলিত এবং বহুদিন পূর্ব্বে শিয়ালকাঁটা গাছ নির্ব্বংশ হইত। অথচ আমরা তাহার কোন সন্ধান পাইতাম না। কাঁটার জন্য এখনও সে বাঁচিয়া আছে। অপরকে আঘাত করিবার জন্য সে এই কাঁটা বাহির করে নাই, আপনাকে রক্ষা করিবার জন্য বাহির হইয়াছে। এই ভাবে জীবজগতের সকল পরিবর্ত্তন জীবের জীবনের ভিতরকার প্রয়োজনে ঘটে।

আমাদের দেশের ধর্ম্ম ও সমাজে যুগযুগান্ত হইতে এইরূপ বহু পরিবর্ত্তন ঘটিয়া আসিয়াছে। বৈদিক সময় হইতে আধুনিক সময় পর্য্যন্ত যদি আপনারা ধর্ম্মের অভিব্যক্তির আলোচনা করেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন, কত ভাবে কত দিকে হিন্দুধর্ম্ম পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিয়াছে। আজ যাহাকে আপনারা ধর্ম্ম বলেন, বৈদিক ধর্ম্ম ত বাস্তবিক তাহা ছিল না। কিন্তু আমরা মুখে বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করি, কার্য্যে তাহা স্বীকার করি না। বেদে ইন্দ্র বরুণাদির পূজা আছে, এখন ত তাহা নাই। পশ্চিমবঙ্গে আছে কি না জানি না, পূর্ব্ববঙ্গে আমার জন্ম, সেখানে নৌকাপূজা বলিয়া একটা পূজা ছিল। নৌকা তৈরী করিয়া যত দেবদেবী আছে সকলের প্রতিমা গড়িয়া নৌকা পূজা হইত। দুর্গাপ্রতিমার মাথায় যে চালচিত্র থাকে, এও সেইরূপ। একব্যক্তি প্রাতঃকালে ঘুম হইতে উঠিয়া বলিত—চালচিত্র, চালচিত্র। একজন বন্ধু জিজ্ঞাসা করিল—লোকে দুর্গা, কালী, ইষ্টনাম করিয়া উঠে, তুমি চালচিত্র বল কেন? সে বলিল —হরিনাম যদি করি, শিব চটিয়া যাবেন, দুর্গানাম করিলে আর কেহ হয়ত চটিয়া যাইবেন, চটাইবার দরকার কি, চালচিত্র বলিয়া এক সঙ্গে সমস্ত দেবতাকে প্রণাম করি। নৌকাপূজায় সমস্ত দেবতার প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত হইত। খুব বৃহৎ যজ্ঞ হইত, অনেক টাকা খরচ হইত, বহুদিন ধরিয়া পূজা চলিত—ব্রাহ্মণাদি ভোজন হইত। নৌকাপূজায় বা চালচিত্রে ইন্দ্রবরুণাদির ছবি থাকে, কিন্তু তাহাদের পূজা এখন উঠিয়া গিয়াছে। অগ্নির পূজা কখন কখন হয় বটে, কিন্তু অগ্নি ব্রহ্মারূপে পূজিত হন, প্রকৃত অগ্নিপূজা এখন আর নাই। বরুণের পূজা দশহরার সময়ে হয়, কিন্তু বরুণের কোন মূর্ত্তি গড়া হয় না, গঙ্গাপূজার সঙ্গে বরুণের অর্ঘ্য দেওয়া হয়। বেদে যে সমস্ত দেবতার পূজা হইত, এখন তাহা নাই। বৈদিক যজ্ঞ নাই, বৈদিক সংস্কার পর্য্যন্ত এখন আর নাই, সামাজিক দিক দিয়া বৈদিক রীতিনীতি এখন আর খুঁজিয়া পাইবে না। বৈদিক যুগে বিধবা বিবাহ প্রচলিত ছিল না, কিন্তু নিয়োগ ছিল—তাহার অর্থ বিধবা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃবধূতে দেবর পুত্র উৎপাদন করিতেন। এখন এই নিয়ম চালাইতে পারেন কি? তাহা করিতে গেলে, সমস্ত সমাজের অন্তরাত্মা শিহরিয়া উঠিবে। সমাজ বলিবে—তাহা অপেক্ষা বিধবা-বিবাহ ঢের ভাল। পাঞ্জাবের দয়ানন্দ সরস্বতী নিয়োগ চালাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি সম্পূর্ণ বিফল হইয়াছেন। তাহাতে সমাজের অন্তরাত্মা ও ধর্ম্মবুদ্ধি বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিল, সমাজ তাহা সহিল না; সুতরাং এখনকার

হিন্দুধর্ম্ম বেদের ধর্ম্ম নহে, ব্রাহ্মণেরা যাহাকে সনাতন ধর্ম্ম বলিয়া আঁকড়িয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছে তাহা বৈদিক ধর্ম্ম নহে, পৌরাণিক ধর্ম্ম। বেদের পর উপনিষদ্, তারপর পুরাণ। পুরাণকে আশ্রয় করিয়া বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্মের আচার, বিচার, উপাসনা প্রভৃতি দাঁড়াইয়া আছে। এই পরিবর্ত্তন কেহ করে নাই, বাহিরে যখন যে অবস্থার চাপ পড়িয়াছে, সেই অবস্থার সঙ্গে আপোষ করিয়া হিন্দুধর্ম্ম বর্ত্তমান অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহা না হইলে হিন্দু এতদিন বাঁচিয়া থাকিতে পারিত না।

শিক্ষা আশ্রম সম্বন্ধে ইংরাজের ধারণা

পৌষ মাসের মাসিক বসুমতীতে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় লিখিয়াছেন,—

আমাদের বিদ্যালয় দেখবার জন্যে ইংরেজ অতিথির ভিড় হচ্চে। কিন্তু তাঁরা দেখবার চেষ্টা করলেও ত দেখতে পাবেন না। তাঁরা যে এণ্ট্রেন্স্ স্কুল দেখবার চোখ নিয়ে আসবেন—কিন্তু আমাদের এ ত স্কুল নয়। আশ্রমের ধারণা তাঁদের মনের মধ্যে নেই। তাঁরা আশ্রমকে ইংরেজী ভাষায় hermitage ব'লে তর্জ্জমা ক'রে থাকেন। তাঁরা জানেন, এ সমস্ত সন্ন্যাসধর্ম্মের উপকরণ মানবসভ্যতার মধ্যযুগের জিনিস—এখনকার কালে সে সমস্তই ঐতিহাসিক আবর্জ্জনা-কুণ্ডের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে—এখনকার ঝক্‌ঝকে নতুন জিনিস হচ্চে প্রায়মারী ইস্কুল, সেকেণ্ডারি ইস্কুল, বোর্ড অফ এডুকেশন। এঁরা চিরকালের জিনিসকে সকল কালের মধ্যে অখণ্ড ক'রে দেখতে জানেন না। এঁরা নিজেদের বানানো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঐতিহাসিক গবাক্ষের ভিতর দিয়ে শাশ্বত কালকে কৃত্রিমভাগে বিভক্ত ক'রে দেখেন—এবং মনে করেন, মানুষ গুটিপোকার মত এক একটি বিশেষ ভাবের গুটি বেঁধে তার মধ্যে এক একটি বিশেষ যুগ যাপন করে, তার পরে তার থেকে যখন বেরিয়ে আসে, তখন সম্পূর্ণ নূতন ডানা নিয়ে উড়ে বেড়ায় এবং পুরাতন গুটি অনাবশ্যক প'ড়ে থাকে। মানুষ যেন যুগে যুগে কেবল সভ্যতার চকমকি ঠুকছে—তার একটি স্ফুলিঙ্গ অন্য স্ফুলিঙ্গের সঙ্গে স্বতন্ত্র। কিন্তু ইতিহাসের ভিতর দিয়ে মানবজীবনের সমগ্রতাকে দেখাই হচ্চে যথার্থ দেখা। মধ্যযুগ আজো মানুষের মধ্যেই আছে, নইলে মধ্যযুগেও থাকতে পারত না—তবে বাহ্যরূপের হয় ত কিছু কিছু পরিবর্ত্তন হ'তে পারে। প্রাণের ক্রিয়া রাত্রিবেলাকার নিদ্রার মত মাঝে মাঝে প্রচ্ছন্নতাকে আশ্রয় করে—তখন মনে হয় বুঝি সে বিলুপ্ত হ'ল; কিন্তু জাগরণের দিনে দেখতে পাই, মৃত্যুর আবরণের মধ্যে অতি যত্নে সে রক্ষিত হয়েছিল। য়ুরোপের মধ্যযুগে একদা সাধকেরা আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার যোগসাধনাকে একান্তভাবে গ্রহণ করেছিলেন—দীর্ঘকাল য়ুরোপ তাকে Mysticism নাম দিয়ে তার ভাঙ্গা কুলোর মধ্যে ঝেঁটিয়ে রেখে দিয়েছিল। কিন্তু এককালে মানুষ যাকে সর্ব্বান্তঃকরণের ব্যাকুলতা দিয়ে স্বীকার করেছে, অন্যকালে তাকে অসত্য এবং অপ্রয়োজনীয় ব'লে বর্জ্জন করবে, এ হ'তেই পারে না। এক দিন সে জেগে উঠে দেখে, মধুযুগের সত্য এ যুগেও আছে; আত্মার যে ক্ষুধা তখন যে অমৃত স্তন্যের জন্যে কেঁদেছিল, আজকের দিনের নূতন প্রভাতে তার সেই কান্না সেই স্তন্যকেই চাচ্চে। এক দিন আমাদের দেশে বিদ্যাশিক্ষার যে ব্যবস্থা ছিল, তার মূল আশ্রয় ছিল পরাবিদ্যা—পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের উদ্বোধনকেই মুখ্য লক্ষ্য ক'রে সমস্ত বিদ্যাকে তার উপযুক্ত স্থান দেওয়া হ'ত। মানুষের জ্ঞানকে ভক্তিকে শুভ বুদ্ধিকে বিচ্ছিন্ন করা হোত না। অবশ্য তখন জ্ঞানের উপকরণ এত বহুবিস্তৃত ছিল না। এখন অনেক শিখতে হয় ব'লে শিক্ষাব্যাপারকে ভাগ করতে হয়েছে। কিন্তু মানুষের প্রকৃতিকে ত ভাগ ক'রে ফেলা যায় না। হাতের দরকার বেড়েছে ব'লেই ত পা-কে শুকিয়ে ফেল্লে চলে না। বিদ্বান্ মানুষ বা ব্যবসায়ী মানুষেরই খাতিরে পরম মানুষের চরম লক্ষ্যকে ত কোনো একটা মধ্যযুগের জীর্ণ বস্তার মধ্যে অনাবশ্যক ছাপ মেরে ফেলে রাখা যায় না। এই জন্যে আশ্রমেই মানুষকে শিক্ষা করতে হবে, ইস্কুলে নয়। তার মুখ্য প্রয়োজনের সঙ্গেই তার গৌণ প্রয়োজনকে মিলিয়ে দেখতে হবে—বিচ্ছিন্ন করতে গেলেই মানুষের মর্ম্মে আঘাত দেওয়া হবে—তাতে এমন সকল সমস্যার সৃষ্টি হবে, কোনো কৃত্রিম উপায়ের দ্বারা যার সমাধান সম্ভবপর হ'তে পারে না। এখনকার ইস্কুল বিদ্যা-শিক্ষার কল, কিন্তু কলের মধ্যে ত জীবনের সৃষ্টি হয় না,—মানুষের জীবনপ্রবাহকে চিরজীবনের পথে পরিপূর্ণ ক'রে তোলাই হচ্চে শিক্ষার লক্ষ্য। সেই লক্ষ্য বর্ত্তমান যুগ কিছু কালের জন্য বিস্মৃত হয়েছে ব'লেই যে সে প্রাচীন যুগের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হ'য়ে উঠেছে, এ কথা একেবারেই অগ্রাহ্য। তাকে পুনর্ব্বার বুঝতে হবে, তার সেই প্রয়োজন আছে এবং তাকে তদুপযুক্ত প্রণালী অবলম্বন করতে হবে। আমাদের আত্মার সেই নিগূঢ় প্রয়োজনবোধই আশ্রমকে আশ্রয় করেছে এবং নানাপ্রকারে এখানে আপনার বাসা বাঁধছে। এই আশ্রমে গুরুর সঙ্গে শিষ্যের গভীর যোগ, কেন না, এখানে উভয়েই ছাত্র—এখানে বিদ্যার সঙ্গে ধর্ম্মের ভেদ নেই, কেন না, উভয়েই এক লক্ষ্যের অন্তর্গত। এখানে জীবনের সাধনা নদীর স্রোতের মত সমগ্র ভাবে সচল; স্নানাহার, পাঠাভ্যাস, খেলা, উপাসনা সমস্তই সাধনার পথে প্রবাহিত। এখানে শিক্ষক যে শিক্ষাদান করচেন, সে তাঁর ব্যবসায়গত কর্ত্তব্য বা নৈতিক কর্ত্তব্য নয়, সে তাঁর সাধনা—তার দ্বারা তিনি তার হৃদয়গ্রন্থি মোচন করচেন, ভূমা-উপলব্ধির পথকে প্রশস্ত করচেন। এ কথা বলতে পারিনে, আমাদের আশ্রমে এই সাধনাকে অবাধ ক'রে

তুলেছি। কিন্তু আমাদের বীজমন্ত্র এই ভূমাত্বের বিজিজ্ঞাসিতব্য— আমরা ভূমাকে জানতে এসেছি। আমাদের সমস্ত জিজ্ঞাসা এই জিজ্ঞাসার অঙ্গ। এ কথা হঠাৎ কোনো ইস্কুল-পরিদর্শককে বুঝিয়ে দেওয়া যাবে না, কিন্তু এ কথা আমাদের প্রত্যেককে সুস্পষ্ট ক'রে বুঝতে হবে।

ইসলামে পর্দ্দাপ্রথা

গত কার্ত্তিকের "মোয়াজ্জিনে" শ্রীযুক্ত সাহাদত আলী খাঁ মহাশয় "ইসলামে পর্দ্দাপ্রথা" বিষয়ে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহা এই পর্দ্দা-প্রথা সম্বন্ধে আন্দোলনের দিনে কৌতূহলোদ্দীপক হইবে বলিয়া উক্ত প্রবন্ধ আংশিকভাবে আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

* * * প্রাথমিক যুগে মানুষ যখন অসভ্য ছিল তখন- (তাহারা ইতর প্রাণীদের ন্যায়ই একত্র বিচরণ করিত), পর্দ্দা-প্রথা ছিল না। সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সকল দেশে সকল জাতির মনুষ্যই স্ত্রীজাতির সতীত্ব ও পবিত্রতার প্রতি যাহাতে বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করে তজ্জন্য পর্দ্দাপ্রথা প্রচলিত হইয়াছে। ক্রমে সভ্যতার যতই উন্নতি হইতে লাগিল, মানুষ ততই বুঝিতে পারিল, স্ত্রীজাতি অতি সম্মানার্হ অতি পবিত্র; স্ত্রী জাতির অঙ্কেই মানবের ভবিষ্যৎ জাতীয় জীবন গঠিত হয়। তাই তাহারা সমাজের নিকট অতি আদরণীয়া। অতএব তাহাদিগকে অতি যত্নে রক্ষা করা কর্ত্তব্য। যাহা আদরের, যাহা যত্নের তাহা যত্নেই রাখিতে হয়। কোনও কঠোর কাজের ভারও তাহাদের প্রতি ন্যস্ত হওয়া সঙ্গত নয়। ইসলাম স্ত্রীজাতিকে কেবল পুরুষের সমান অধিকার প্রদান করে নাই, বরং পর্দ্দাপ্রথা দ্বারা স্ত্রীজাতিকে পুরুষের অনেক উচ্চে আসন দান করিয়াছে। পুরুষ নারীকে পর্দ্দা পুসিদায় রাখিয়া সর্ব্বপ্রযত্নে রক্ষা করিতে বাধ্য, তাহাকে কোন কঠোর কার্য্যে ব্রতী হইতে প্রায়ই ঘরের বাহিরে যাইতে হয় না। বোরখা পরিহিতা নারী পর্দ্দার অন্তরালে থাকিয়া সকলই দেখিতে পায় কিন্তু কেহ তাহাকে দেখিতে পায় না। এজন্য তাহারা অসৎ লোকের স্বভাব-সিদ্ধ কুদৃষ্টিজনিত অপমান হইতে অব্যাহতি পায়। পর্দ্দা সম্বন্ধে পবিত্র কোরান ব্যবস্থা দিতেছে:—"এবং বিশ্বাসিনী (মুমেন) নারীদিগকে বল যেন তাহারা স্ব স্ব দৃষ্টি-সকলকে বদ্ধ করে, ও স্ব স্ব গুহ্যেন্দ্রিয় সকলকে সংযত রাখে, ও স্ব স্ব ভূষণ যাহা তাহা হইতে ব্যক্ত হয় তদ্ব্যতীত প্রকাশ না করে, এবং যেন তাহারা আপন কণ্ঠদেশে আপন বস্ত্রাঞ্চল ঝুলাইয়া রাখে, আপন স্বামী, বা আপন পিতা, বা আপন শ্বশুর, বা আপন পুত্র (এবং পৌত্র) বা আপন স্বামীর পুত্র (সপত্নীজাত পুত্র) বা আপন ভ্রাতা, বা আপন ভ্রাতুষ্পুত্র, বা আপন ভাগিনেয়, বা আপন (ধর্ম্মাবলম্বিনী) নারীগণ, বা তাহাদের দক্ষিণ হস্ত যাহাদের উপরে স্বত্বলাভ করিয়াছে সেই (দাসীগণ), বা অকাম অনুগামী পুরুষগণ এই সকলের ও যাহারা নারীগণের লজ্জা-জনক ইন্দ্রিয় সম্বন্ধে জ্ঞান রাখে না সেই শিশুদিগের নিমিত্ত ভিন্ন তাহারা আপন আভরণ যেন প্রকাশ না করে এবং তাহারা যেন আপন শব্দায়মান (ভূষণযুক্ত) চরণ বিক্ষেপ না করে, তাহাতে তাহারা আপন ভূষণ যাহা গোপন করিয়া থাকে তাহা (লোকে) জানিতে পারিবে, এবং হে বিশ্বাসীগণ, তোমরা এক যোগে আল্লার দিকে ফিরিয়া আইস, সম্ভবতঃ তোমরা মুক্ত হইবে।" (সুরা নুর—৩১শ আয়ত)। "হে বিশ্বাসীগণ, তোমরা আপন গৃহ ব্যতীত (অন্য) গৃহে যে পর্য্যন্ত তাহার স্বামীর নিকটে অনুমতি প্রার্থনা ও সালাম না কর—প্রবেশ করিও না, ইহা তোমাদের জন্য কল্যাণ হয়। সম্ভবতঃ তোমরা উপদেশ লাভ করিবে।" (২৭ আয়ত)

মানব দেহে পশুভাব বিদ্যমান আছে। যৌবন কালে ঐ স্বভাব প্রবল হয়। এসময় স্ত্রী পুরুষের একত্র সমাবেশ কদাপি অনুমোদনীয় নহে। এজন্য চাণক্য বলিয়াছেন, "ঘৃতকুম্ভসমা নারী, তপ্তাঙ্গার সমঃ পুমান।" এজন্য কোরান দৃষ্টিকে বদ্ধ করিতে বলিতেছে, পরপুরুষের সংসর্গে যাইতে নিষেধ করিতেছে এবং কামোত্তেজক ভূষণশিঞ্জন ও ভূষণ প্রদর্শন করিতে নিষেধ করিতেছে। কেন না ইহাতে চক্ষু ও মনের ব্যভিচার হইবেই। এই জন্যই অপ্সরাগণ দেবতাদিগকে মুগ্ধ করিত, এমন কি বিশ্বামিত্র, পরাশর প্রভৃতি ঋষিগণ অপাত্রে উপগত হইয়াছেন। কোরাণের আদেশ— স্ত্রীলোকে মস্তকাবরণ দ্বারা কণ্ঠ ও বক্ষস্থল আবৃত করিবে, অর্থাৎ আপন রূপ প্রদর্শন করিবে না, রমণীর রূপের জ্যোতি বজ্রাগ্নি অপেক্ষাও তীক্ষ্ণ। ক্লিওপেট্রার রূপে রোম দগ্ধ হইয়াছে, সীতার রূপে স্বর্ণলঙ্কা ছারখারে গিয়াছে। পুরাণে উল্লিখিত আছে, ব্রহ্মা স্বীয় কন্যার রূপদর্শনে কামাবিষ্ট হইয়াছিলেন। এই সমস্ত চিন্তা করিয়াই পর্দ্দাপ্রথার প্রচলন হইয়াছে। রাজপথে বা পার্কের সান্ধ্য ভ্রমণে ও স্নানের ঘাটে অর্দ্ধ-উলঙ্গ অবস্থায় যুবক যুবতীগণের একত্র সমাবেশ কতদূর সুরুচি সঙ্গত তাহা সাধারণে বিচার করিবেন। বর্ত্তমানে নারী নিগ্রহের সংবাদের যে আধিক্য শুনা যাইতেছে তাহার সমস্ত পর্দ্দাহীন সাধারণ লোকের মধ্যে। ইদানীং রাজকীয় কঠোর বিধি-দ্বারা লোকের চরিত্র-সংশোধনের ব্যবস্থা করা হইতেছে, ইসলাম তের শত বৎসর পূর্ব্বে ধর্ম্মের অনুশাসন দ্বারা তাহা নিষিদ্ধ করিয়াছে। পর্দ্দা ইসলামকে গৌরব-মণ্ডিত করিয়াছে, পর্দ্দা দ্বারা ইসলামের মর্য্যাদা রক্ষিত হইতেছে। ইহা বুঝিয়াই ইউরোপীয় মহিলা লেডি ওফারিন বলিয়াছেন

—"Indeed I can imagine many a weary and toiling woman, in this our overcrowded and busy world sighing for such a harbour of refuge as the zenana might appear to afford ** and I, certainly, am able to have a more kindly sentiment towards the nation as a whole, because I have seen happy wives and happy mothers in India, and because I believe in happy Indian homes."—অর্থাৎ—"আমি প্রকৃতই অনুমান করিতে পারি যে, আমাদের এই জনতা ও ব্যস্ততাময় পৃথিবীতে অসংখ্য শ্রান্তি-ক্লান্ত নারী এমন একটি শান্তিধামের আশ্রয় অনুসন্ধান করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন, ভারতের 'জানানা' সেই অভাব পুরণ করিতে পারে * * * এবং নিশ্চয়ই আমি সমগ্র জাতির পক্ষে এই অধিকতর শুভ-বার্ত্তা জ্ঞাপন করিতে সক্ষম, কেননা আমি ভারতে ভাগ্যবতী হৃষ্টা স্ত্রী ও মাতা দর্শন করিয়াছি, সেই জন্যই আমি মনে করি ভারতের গৃহ আনন্দময়।" উল্লিখিত উক্তি হইতে প্রতীয়মান হয়, পর্দ্দামুক্ত পাশ্চাত্য রমণীগণ প্রাচ্যের রমণীদের গার্হস্থ্য জীবনকে সুখকর মনে করেন, কেন না বিলাতের পুরুষ ও রমণীরা মানসিক শান্তির জন্য রাস্তায় ও ক্লাবে ঘুরিয়া বেড়ান। পর্দ্দাওয়ালাদের গৃহ প্রকৃতই শান্তিনিকেতন। এই জন্য ভন-হ্যামার (Von Hommer) বলিয়াছেন; 'Harem is a sanctuary; it is prohibited to strangers, not because women are considered unworthy of confidence, but on account of the sacredness with which custom and manners invest them. The degree of reverence which is accorded to women throughout higher Asia or Europe (among muslim communities) is a matter capable of the clearest demonstration." অর্থাৎ হারেম বা জেনানা দেবালয়স্বরূপ; তথায় অপরিচিতগণের প্রবেশ নিষেধ.তাহা নারীগণের প্রতি অবিশ্বস্ততার জন্য নহে, বরং তাহারা যে প্রথায় পরিচালিত তাহার পবিত্রতার জন্য। ইয়ুরোপ ও এশিয়ার মুসলমান রমণীগণের প্রতি যে প্রকার সম্মান প্রদর্শিত হইয়াছে ইহা তাহার চাক্ষুষ প্রমাণ।"

* *অবশ্য আমরা স্ত্রী জাতির সৎ প্রবৃত্তির প্রতি বাধা প্রদান করিয়া তাহাদের স্বাধীনতা বা অধিকার হরণ করিতে বলি না। অপর তাহাদিগকে পুতুল সাজাইয়া রংমহলে আবদ্ধ রাখারও পক্ষপাতী নহি। স্ত্রী পুরুষের অবাধ সংমিশ্রণই আমরা পর্দ্দার বিরুদ্ধাচরণ মনে করি। ইস্‌লামের যাহা আদেশ তাহাতে পর্দ্দায় থাকিয়া স্বজনগণের তত্ত্বাবধানেও মোসলেম রমণী সকল কার্য্যই করিতে পারে। শিক্ষা বিষয়ে স্ত্রীগণ পুরুষের সমান অধিকারিণী। "আল ইল্‌মে ফারিজাতুন আলা কুল্লে মুসলেমুন অমুস্‌লিমাতুন"। প্রাথমিক যুগের মোসলেম নারীগণ সকল বিষয়েই উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। বিদ্যা শিক্ষা করিলেই কি নারীকে অর্দ্ধ-অনাবৃত বক্ষে মস্‌লিনের ব্লাউজ ও পাতলা পাজামা পরিয়া নগ্ন মস্তকে রাস্তায় বাহির না হইলে মর্য্যাদা বৃদ্ধি পাইবে না? সাধ্বী রাবিয়ার নাম কে না শুনিয়াছে? তাঁহার কবরস্থান তীর্থক্ষেত্র। হজরত আয়েশা একজন বিখ্যাত মহিলা আইনজ্ঞ ছিলেন। চিকিৎসা বিদ্যা, প্রভৃতিতে তাঁহার অগাধ জ্ঞান ছিল। তিনি সমরক্ষেত্রে সৈন্য চালনা পর্য্যন্ত করিয়াছেন। ফখরুন-নেছা শেখা স্বহদা বাগদাদের মসজিদে প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতা করিয়াছেন। আহমদ-বিন-আবিতাহির কর্ত্তৃক লিখিত 'বালাগাতুন্নিসা' নামক গ্রন্থে শিক্ষিতা মুস্‌লিম নারীগণের বিশেষ পরিচয় আছে। নূরজাহান, রিজিয়া প্রভৃতি নারীগণ রাজত্ব করিয়াছেন। এই সেদিন আমাদের মাতৃস্বরূপা আলী-জননী বাই-আম্মা বোরখা পরিয়া কংগ্রেস মণ্ডপে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ইহা হইতেই প্রমাণিত হইবে, ইসলাম নারী জাতিকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিতে বলে না। তবে ইসলামের নীতি-বিরুদ্ধ বিজাতীয় উচ্ছৃঙ্খলতার নেশায় মুগ্ধ ও মত্ত হওয়াকেই আমরা দূষণীয় মনে করি।

দক্ষিণ বারাণসী

কাঞ্চীপুরম্

দক্ষিণ ভারতকে প্রধানতঃ মন্দিরের দেশ বল্লে অত্যুক্তি হয় না। দাক্ষিণাত্যের মন্দির-স্থাপত্যের সহিত তুলনা করলে উত্তর ভারতীয় মন্দির-স্থাপত্য সৌন্দর্যাজ্ঞ ব্যক্তির চোখে লাগে না বা ততটা বেশী মনোযোগ আকর্ষণ করে না। তথাকার অধিকাংশ মন্দির সে দিনকার—আধুনিক বল্লেও চলে, আকারে অপেক্ষাকৃত ছোট, কারুকার্য্যে ও সৌন্দর্য্যে দক্ষিণের মন্দিরের চেয়ে উৎকৃষ্ট নয়। এমন কি সুবিখ্যাত কাশীর মন্দিরও কাঞ্চীপুরম্, মাদুরা, শ্রীরঙ্গম্ ও দক্ষিণের অন্যান্য প্রসিদ্ধ মন্দিরের তুলনায় চিত্তাকর্ষক বা অসাধারণ কিছু নয়। দক্ষিণ ভারতে বিশেষতঃ তামিল প্রদেশে হিন্দুধর্ম্মের বিরাট মন্দির সব বিদ্যমান। তন্মধ্যে উত্তরদিকে কাঞ্চীপুরম্ হ'তে দক্ষিণে রামেশ্বরম্ পর্য্যন্ত অন্তর্ভুক্ত স্থানে সর্ব্বাপেক্ষা সুবিখ্যাত মন্দির বর্ত্তমান। মাদ্রাজীরা উত্তর ভারতীয় সভ্যতা সম্পূর্ণরূপে অনুকরণ করতে গিয়ে প্রায়ই ভুলে যায় যে তাদের নিজের গৃহের কাছে এত সব গৌরবান্বিত বস্তু রয়েছে।

কাঞ্চীপুরম্ সমুদয় প্রসিদ্ধ মন্দির নগরীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা মাদ্রাজের নিকটে অবস্থিত। মহাবলী পুরম্ নামক স্থানে পাহাড়ে ক্ষোদিত মন্দিরের কথা উপেক্ষিত হবার যোগ্য নয়। কারণ এক হিসাবে এসব অতুলনীয়। কিন্তু তথাকার সপ্ত দেব-মন্দির কাঞ্চীপুরমের মন্দিরের সহিত তুলিত হ'তে পারে না—আকারে—বেষ্টিত স্থানে, বা মন্দির স্থাপত্যের সৌন্দর্য্যে। মাদ্রাজ থেকে কাঞ্চীপুরম্ ৪৫ মাইল দূরে—মোটরে যেতে লাগে দু ঘণ্টা। ট্রেনেও যাওয়া চলে কিন্তু ঘুরে যেতে হয়। বর্ত্তমান নগর দৈর্ঘ্যে প্রায় ৪ মাইল, প্রস্থে দেড় মাইল। তবে প্রাচীন নগরী অপেক্ষাকৃত বড় ছিল। বর্ত্তমানে লোকসংখ্যা ৫৫,০০০। এ নগরী যখন উন্নতির সর্ব্বোচ্চ শিখরে উঠেছিল, তখন লোক-সংখ্যা কত ছিল তা অনুমান করা অসম্ভব—তবে এর চেয়ে অনেক বেশী ছিল তদ্বিষয়ে সন্দেহ নেই।

এ নগরীর এত প্রাচীন—যে তার তুলনায় মাদ্রাজ সহর কালকের বল্লেও চলে। এর ইংরেজী অভিধা Conjeveram কাঞ্চীপুরম্ শব্দের অপভ্রংশ। মহাভারতের আদি পর্ব্বে এর উল্লেখ আছে। তামিল ভাষায় লিখিত স্থলপুরাণের মতে প্রসিদ্ধ চোলরাজ কুলোত্তুঙ্গ চোল এ নগর স্থাপন করেন। তাঁর পুত্র অদণ্ডী তোণ্ডীরের রাজ্যকালে এই নগরী বিশেষ সমৃদ্ধিশালী হ'য়ে ওঠে। ফার্গুসনের মতে পূর্ব্বে এ স্থান জঙ্গলসমাকীর্ণ ও অসভ্য কুরম্বর জাতি অধ্যুষিত ছিল। একাদশ বা দ্বাদশ শতাব্দীতে অদণ্ডী চক্রবর্ত্তী এ নগর পত্তন করেন। কিন্তু প্রাচীন সংস্কৃত পুস্তকে ও অন্যান্য প্রাচীন শিলালিপিতে যে প্রমাণ পাওয়া যায়—তাতে এ মত সমীচীন ব'লে বোধ হয় না। সম্ভবতঃ চোলরাজগণের অভ্যুদয়ের বহু পূর্ব্বে দক্ষিণাপথের রাজন্যবর্গ এই নগরীকে রাজধানীতে পরিণত করেছিলেন। বর্ত্তমানে যদিও ইহা ছোট নগর কিন্তু এক সময়ে বিস্তীর্ণ জনপদ ছিল। মহাভারতের সময়ে কলিঙ্গের ক্ষত্রিয় রাজগণের অধীন ছিল—দ্রাবিড় রাজ্যের অন্তর্গত ছিল না। এর পরে পাণ্ডরাজদল এ নগরী অধিকার করেন। তারপর পল্লবরাজগণের অধীনে আসে। পল্লবরাজগণ হিন্দু ছিলেন—

কিন্তু সেই সময়ে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্ম বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল।

পাণিনির ব্যাকরণের পাতঞ্জলি কৃত টীকায় কাঞ্চীর উল্লেখ দেখা যায়। পাতঞ্জলির সময় খ্রীষ্ট পূঃ দু'শতাব্দীর পূর্ব্বে। ৪র্থ ও ৫ম শতাব্দীর শিলালিপি পাঠে জানা যায় যে অনেক পূর্ব্ব সময় হ'তে এখানে জৈনধর্ম্ম প্রচলিত ছিল। বিখ্যাত চীন-পরিব্রাজক হিউয়েন সাং তাঁর ভ্রমণ-বৃত্তান্তে তিনি একাকী এখানে এসেছিলেন—তার উল্লেখ ক'রে লেখেন যে তাঁর পূর্ব্বে বুদ্ধদেব ঐ নগরী দর্শন করতে আসেন—এতৎসম্বন্ধে জনরবের বিষয় শুনেছেন। তাঁর গ্রন্থে কাঞ্চীপুরম্ কি-এন- চি-পু-লো এই ভাবে চীন ভাষায় উল্লিখিত। সে সময় ইহা দ্রাবিড় রাজ্যের রাজধানী ছিল। বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্ম্ম উভয়ই খুব প্রবল ছিল। সেসময় সেখানে ১০০টি সঙ্ঘারাম (বৌদ্ধ-মঠ) ও ৮০টি দেব-মন্দির ও দিগম্বর জৈনদিগের মঠ বিদ্যমান ছিল।

৪র্থ শতাব্দী হ'তে ৯ম শতাব্দী পর্যান্ত পল্লব জাতি তাদের ক্ষমতার উচ্চ-শিখরে উঠেছিল। তাদের রাজ্য অন্ধ্রদেশ হ'তে দক্ষিণে কাঞ্চী পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। ৪র্থ শতাব্দীতে তাঁরা কিছুকালের জন্য কাঞ্চীকে রাজধানী করেছিলেন। কিন্তু এ নগরী শুধু রাজধানী হিসাবে প্রসিদ্ধ হয় নি—দক্ষিণে উত্তর ভারতীয় সভ্যতার কেন্দ্র ও বিদ্যাবত্তা ও ধর্ম্মের জন্য খ্যাত হ'য়ে পড়ে। ধর্ম্ম-অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি ও দার্শনিকেরা সমস্ত ভারত হ'তে এস্থানে আসতে লাগলেন ও ক্রমশঃ এস্থান সংস্কৃত শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র হ'য়ে উঠল। এ সুনাম এখনও নষ্ট হয় নি—ঠিক পূর্ব্বের মত বজায় আছে। এমন কি পল্লবরাজগণের সময় শুধু যে হিন্দুধর্ম্ম উন্নতি লাভ করেছিল তা নয়। হিউয়েন সাংএর বৃত্তান্ত থেকে জানা যায় যে ৭ম শতাব্দীতে এনগরী বৌদ্ধ-ধর্ম্মের কেন্দ্র হ'য়ে ওঠে, এমন কি তথায় জৈন-সম্প্রদায় কিয়ৎপরিমাণে বিদ্যমান ছিল। ৮ম শতাব্দীর শিলালিপি পাঠে অবগত হওয়া যায় যে এস্থানের সেই সময়ের রাজা নরসিংহ বর্ম্মা শৈব ছিলেন। তাঁর সময় শৈব-ধর্ম্ম বিশেষ প্রবল হ'য়ে ওঠে। ৯ম শতাব্দী চোলরাজ কুলোত্তুঙ্গ কাঞ্চীপুর স্ব-শাসনে আনয়ন করেন। তৎপুত্রের সময় এ নগরী বিশেষ সমৃদ্ধিশালী হয়েছিল। ১০ম ও ১১শ শতাব্দীতে চালুক্য রাজারা এ নগরী স্বাধিকারে আনবার জন্য অনেক বার আক্রমণ করেন কিন্তু প্রত্যেকবারই তাঁরা বিফলমনোরথ হন। ১৪৭৭ খৃষ্টাব্দে বাহমনী-বংশীয় মহম্মদ কাঞ্চী জয় করেন। তাদের হাত হ'তে বিজয়নগররাজ এ নগরী উদ্ধার করেন। তৎপুত্র কৃষ্ণদেব রায় রাজপদে অভিষিক্ত হন (১৫০৮); ও ১৫১৫ খ্রীঃ অঃ এ নগরী দর্শন করতে এসে শত-স্তম্ভ-মণ্ডপ ও শিব-মন্দিরের সংস্কার করেছিলেন। ১৬৪৪ খ্রীঃ অঃ বিজয়নগর ধ্বংসের পর গোলকুণ্ডার সুলতানের অধীনে আসে। ১৭৫১ খ্রীঃ অঃ লর্ড ক্লাইব ফরাসীদের নিকট হ'তে কাঞ্চী কেড়ে নেন—কিন্তু রাজা সাহেবকে এ নগরী ছেড়ে দিতে হয়। ১৭৫৭ খ্রীঃ অঃ

বরদারাজ স্বামীর দেউল ও তৎসংলগ্ন সরোবর

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী

ইংরাজেরা পুনরায় ফরাসীদের হাত হ'তে উদ্ধার করেন।

এ নগরী বহুদিন হ'তে পুণ্য তীর্থ ব'লে গণ্য। জনসাধারণের বিশ্বাস এ পুণ্য নগরী দর্শনে পাপ-বিমোচন ও সিদ্ধি-লাভ হয়। মোক্ষদায়িকা সপ্ত তীর্থের মধ্যে অন্যতম ব'লে গণনীয়। এ তীর্থ সর্ব্ব তীর্থ হ'তে শ্রেষ্ঠ ব'লে পরিচিত। কথিত আছে—মহাদেব সমস্ত শাস্ত্রকে আম্রবৃক্ষ রূপে রেখে নিজে লিঙ্গরূপে একাম্রনাথ নামে অভিহিত; এ স্থান দক্ষিণাপথের বারাণসী ব'লে খ্যাত। উত্তর ভারতের লোকেরা যেমন শেষ জীবনে কাশীবাস করে দক্ষিণাপথের লোকেরা তেম্নি মুক্তিলাভের আশায় কাঞ্চীতে বাস ক'রে থাকে।

যে সব প্রাসাদ ও দেব-দেউলাদির জন্য আজও কাঞ্চী-পুরম্ প্রখ্যাত তার অধিকাংশই পল্লবরাজবংশের সময় আরম্ভ হয়। প্রাচীন সময়ে রাজরাজড়ারা এরূপ নানাবিধ অনুষ্ঠানে তাদের আন্তরিক ধর্ম্মানুরাগ প্রকাশ করতে অভ্যস্ত ছিল। অনুশাসন হ'তে জানা যায় যে চোল রাজারা এ কার্য্য চালিয়েছিলেন। কিন্তু প্রসিদ্ধ বিজয়রাজবংশের সময় অধিকাংশ মন্দির বর্ত্তমান বৃহদাকারে পরিণত হয়েছিল। সেকালের কতক দেউল সংস্কৃত ও অলঙ্কৃত হ'ল। অধিকাংশ বৃহৎ গোপুরম্ এ সময় নির্ম্মিত হয়েছিল। এ সব এত বিরাট যে অনেক ক্রোশ দূর থেকে দৃশ্যমান। বিজয়নগর-রাজারা বহুমূল্য দ্রব্যাদি তাদের ভক্তির চিহ্নস্বরূপ দেব-মন্দিরে উপহার দেন। মন্দিরের খোদিত লিপিতে এ সব বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায়। যদিও ১৭শ ও ১৮শ শতাব্দীতে এ নগরী কিছু কালের জন্য মুসলমান-শাসনাধীনে আসে—তবুও সৌভাগ্যক্রমে উত্তর ভারতীয় দেব-মন্দিরের মত এ সব মন্দির কঠোর ভাবে মুসলমান কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত হয় নি।

এ নগরী ইতিহাসপ্রসিদ্ধ খ্যাতনামা বৈদান্তিক শঙ্করাচার্য্য ও বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচারক রামানুজের লীলাভূমি বলে মনে করা হয়। শঙ্করাচার্য্য ৯ম শতাব্দীর প্রথম ভাগে আবির্ভূত হন। তিনি এস্থানে অদ্বৈতবাদ প্রচার করেন, তদবধি এস্থানে অদ্বৈতবাদ প্রচলিত আছে। তাঁর নগরীতে আগমন সম্বন্ধে একটা প্রবাদ আছে। কামাক্ষী দেবী বলিদানের পক্ষপাতী রক্ত-পিপাসু ছিলেন, কিন্তু শঙ্করাচার্য্যের আগমনের পর তাঁর সহিত তর্কে হেরে গিয়ে তিনি দমিত হন। এই বিজয় চিহ্ন-স্বরূপ শঙ্করাচার্য্যের মূর্ত্তি কামাক্ষী দেবীর মন্দিরে আজও বিরাজমান আছে। জনশ্রুতি এরূপ যে শঙ্করাচার্য্যের অনুমতি-ব্যতিরেকে তাঁর মন্দিরের বাইরে যাবার ক্ষমতা পর্য্যন্ত নেই। এটা আশ্চর্য্যের বিষয় যে এর পূজকেরা এখনও নম্বুদ্রি ব্রাহ্মণ। এতে অনুমিত হয় যে বিখ্যাত কেরল-গুরুর সহিত এর কিছু সংশ্রব আছে। কাঞ্চী ৯ম ও ১০ম শতাব্দীতে শৈব ধর্ম্মের কেন্দ্র হ'য়ে ওঠে।
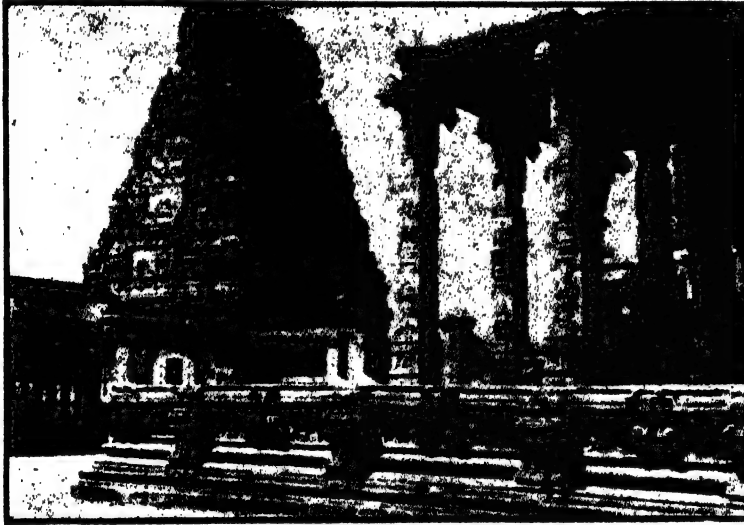
কামাক্ষী দেবীর গো-পুর ও মণ্ডপ

মাদ্রাজ হ'তে কাঞ্চী যাবার পথে—এ স্থান হ'তে দশ-ক্রোশ পূর্ব্বে শ্রীপরক্রমবুদুর রামানুজের জন্ম স্থান ব'লে খ্যাত। তিনি বৈষ্ণব বংশে জন্মগ্রহণ করেন, প্রথমে তিনি কাঞ্চীর

নিকটস্থ কোন এক অদ্বৈতবাদী গুরুর নিকট শিক্ষা লাভ করেন। অদ্বৈতবাদ তাঁর মনে সম্পূর্ণ রেখাঙ্কন করতে না পারায় পরে তিনি এক বৈষ্ণব গুরুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। যে পর্য্যন্ত তিনি শ্রীরঙ্গমের বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রধান পুরোহিত পদে নিযুক্ত না হন তদবধি তিনি এখানে বাস করেন। তিনি বিশিষ্টবাদ মত প্রচার করেন। এই মতে বিষ্ণুই হচ্ছে এক মাত্র উপাস্য দেবতা। এই বিখ্যাত ধর্ম্ম-সংস্কারক যে গৃহে ধর্ম্ম শিক্ষা দিতেন—সে গৃহ পর্যটকদের এখনো দেখানো হয়।

কারুকার্য্যময় শতস্তম্ভমণ্ডপের অন্যতম স্তম্ভ

শঙ্করাচার্য্যের শিষ্যেরা শৈব—রামানুজের শিষ্যেরা বৈষ্ণব। কাঞ্চীর মত কম নগরী দেখা যায় যেখানে এক সঙ্গে দুটি ধর্ম্মসম্প্রদায় বাস করে ও দুটি ধর্ম্মই সমান উন্নত ও প্রবল। হয়ত এর কারণ হতে পারে যে দুজন ধর্ম্ম-সংস্কারক এস্থানে থেকে অতীত কালে শিক্ষা দিতেন। শিব-জায়া কামাক্ষা দেবীর মন্দিরে শঙ্করাচার্য্যের মূর্ত্তি বিদ্যমান ও সেখানে তাঁর পূজা হয়। রামানুজ বরদারাজস্বামীর মন্দিরে অন্যান্য বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সহিত পূজিত হন। এক সময় এ দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ভীষণ বিরোধ ছিল কিন্তু বর্ত্তমানে তার কিছুমাত্র চিহ্ন নেই। সব ঝগড়া-বিবাদের শেষ হ'য়ে গেছে।

কাঞ্চী দুই সম্প্রদায়ের নামানুযায়ী দুভাগে বিভক্ত শিবকাঞ্চী ও বিষ্ণুকাঞ্চী। কিন্তু এই নামের অর্থ এই নয় যে শিবকাঞ্চীতে শিবের অর্চ্চনা হয় আর বিষ্ণুকাঞ্চীতে বিষ্ণুর উপাসনা হয়—কারণ উভয় স্থানেই উভয় দেবতারই পাশাপাশি পূজা হয়। শুধু এ পার্থক্য হচ্ছে তাদের বিরাট মন্দিরাদির জন্য। শৈবদের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ মন্দিরে একাম্রনাথের পূজা হয়। এ মন্দিরের সহিত শঙ্করাচার্য্যের সংশ্রব ছিল। এঁর মন্দির অত্যন্ত বিখ্যাত, সুন্দর কারুকার্য্যময় ও পুরাতন। এ মন্দির কোন এক সময়ে নির্ম্মিত হয় নি—ইহা ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন রাজা এই মন্দির সংস্কৃত ও বর্দ্ধিত করেছেন, তার ফলে বর্ত্তমানে এই মন্দিরের আয়তন ২৫ একরে পরিণত হয়েছে। এর একটা গোপুরম্ ১৮৮ ফীট উঁচু। প্রাচীর সরল ভাবে গঠিত হয় নি—প্রকোষ্ঠগুলি পরস্পরের সম্মুখীন নয়। মন্দিরের মূলস্থান চোল রাজারা গঠিত করেন—আর রাজা কৃষ্ণ রায় এই সর্ব্বপ্রধান নয়-তল গোপুরম্ নির্ম্মাণ করিয়ে দেন। প্রাঙ্গণে একটা আম গাছ আছে, ইহা তিন চারশ' বৎসরের পুরাতন। জনশ্রুতি এরূপ যে প্রত্যহ এই গাছ হ'তে একটা পাকা আম পাওয়া যেত ও তা থেকে একাম্রনাথের ভোগ হ'ত। তা থেকেই এই শিবের নাম—একাম্রনাথ। কিছুদিন আগে চেটীরা এই মন্দিরের সংস্কারের জন্য দেড় লাখ টাকা খরচ করেন।

মন্দিরের একটি স্থান খুব কৌতূহলোদ্দীপক। এস্থানে পার্ব্বতী দেবী তাঁর পাপক্ষালনের জন্য তপস্যা করেছিলেন।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী

জনশ্রুতি এই যে—কোন এক সময়ে পার্ব্বতী দেবী কৌতুকচ্ছলে, মহাদেবের পশ্চাতে গিয়ে হাত দিয়ে তার চক্ষুত্রয় আবৃত করেন। ত্রি-নয়ন আচ্ছাদিত হওয়াতে সমস্ত সংসার অন্ধকার হ'য়ে গেল। এই অন্যায় কার্য্যের জন্য দেবী পার্ব্বতীর পাপ সংঘটিত হওয়ায় এ পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ মহাদেবের আদেশে কাঞ্চীপুরে একাম্রনাথের মন্দির-প্রাঙ্গণে কম্পানদী নামক তীর্থে তিনি ছয়মাস তপস্যা করেন। এই তপস্যার ফলে তাঁর পাপ-ক্ষালন হ'লে মহাদেব পুনরায় তাঁকে গ্রহণ করেন। সপ্ত সরোবরের মধ্যে একটি ক'রে সপ্তাহের প্রতিদিনের কাজের জন্য উৎসর্গিত। কথিত আছে যে, সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ সরোবরে পার্ব্বতী দেবীর তপস্যা দেখবার জন্য ভারতের সমুদয় নদী এইস্থানে মিলিত হয়। কামাক্ষা দেবীর স্বতন্ত্র মন্দির আছে—তা পূর্ব্বে উল্লিখিত হয়েছে। ফাল্গুন মাসের দশ দিন ধ'রে একাম্রনাথের মহোৎসব হয়। এই মহোৎসবের দশম দিনে কামাক্ষা দেবীর ও একাম্রনাথের মূর্ত্তি একত্র করা হয়।

কামাক্ষী দেবীর মন্দির অপেক্ষাকৃত ছোট এবং প্রাঙ্গণে শঙ্করাচার্য্যের সমাধি। উপরে তাঁর প্রস্তরনির্ম্মিত মূর্ত্তি বিরাজিত। একাম্রনাথের মন্দিরের দক্ষিণাভিমুখে কিয়দ্দূরে স্থাপিত। মন্দির অপেক্ষাকৃত বৃহৎ—প্রকাণ্ড তাম্র কবাট বিজয়নগররাজ হরিহর নির্ম্মাণ করিয়ে দেন। বরদারাজ স্বামীর মন্দির সর্ব্বাপেক্ষা বৃহদাকার। তিনি কল্পতরু নামে খ্যাত। দৈর্ঘ্যে ১২০০ ফীট ও প্রস্থে ৮০০ ফীট—২০ একর জমি নিয়ে আছে। শত স্তম্ভমণ্ডপ ও দরদালানের প্রাচীর বিজয় নগর রাজাদিগের সময়ের খোদিত কাজের নমুনায় পূর্ণ। এতে সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ কারুকার্য্য বর্ত্তমান। কিন্তু অনেকের মতে একাম্রনাথের মন্দিরের কারুকার্য্যের মত সুন্দর নয়। মন্দিরপ্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে একটা কিম্বদন্তী চলিত আছে। কোন এক ব্রাহ্মণের বিষ্ণুর কৃপায় পুত্র সন্তান লাভ হওয়ায় তিনি ব্রত নিয়েছিলেন যে প্রত্যহ অন্ততঃ দশ টাকা মন্দিরপ্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রহ না ক'রে জলগ্রহণ করবেন না। এ উপায়ে তিনি ২৪,০০০ টাকা সংগ্রহ করেন। কাঞ্চীপুরে বরদারাজের বিষ্ণু-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। অবশ্য পৌরাণিক বৃত্তান্ত অন্যরূপ। এ বিষ্ণু-মন্দির থেকে নাম হয়েছে বিষ্ণুকাঞ্চী। বিষ্ণু-মন্দিরের দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠে কৃষ্ণরাজ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত শতস্তম্ভ বিদ্যমান। একখানি পাথর কেটে এ মণ্ডপ নির্ম্মিত। মন্দিরের দেবসেবার জন্য ৩০০০ টাকার আয়ের জমিদারী ও মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ৯৯৬১ টাকা বরাদ্দ আছে। মন্দির অতিশয় সমৃদ্ধিশালী। লর্ড ক্লাইব একবার যুদ্ধে বিজয় লাভ ক'রে ৩৬৬১ টাকার মূল্যে একখানি কণ্ঠাভরণ দেন। কাঞ্চীতে অনেক মহোৎসব হয়—সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান হচ্ছে এ মন্দিরের সম্পর্কে। বৈশাখ মাসে এ মহোৎসব নিষ্পন্ন হয়; দশ দিন যদিও এই উৎসবের জন্য নির্দ্দিষ্ট—আরো দু' চার দিন বেশী হয়ে যায়। রথযাত্রা-উৎসব এর সহিত গণিত হয়। কিন্তু রথ-যাত্রা-উৎসবের সময় এ

কৈলাসনাথের মন্দির

আর হয় না। বরদারাজ স্বামী শোভাযাত্রার সময় বিভিন্ন বাহনের পিঠে ক'রে বাহিত হন। এই সব বাহনের মূর্ত্তি কৌতূহলোদ্দীপক ;—সিংহ, হস্তী, ময়ূর ও গরুড় মূর্ত্তি। কিন্তু তৃতীয় দিনে বিষ্ণুর নিজস্ব বাহন গরুড়ে ক'রে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয়। শোভাযাত্রায় দ্রাবিড়-এর ছোট মন্দিরের প্রতিনিধি পূজকরা বরদারাজের মূর্ত্তি * মাল্যভূষিত করেন। দশম দিনে দেবমূর্ত্তি বাহনের পরিবর্ত্তে রথে ক'রে বাহিত হন। হাজার হাজার লোক এ রথ টেনে থাকে। এ মহোৎসব দেখবার জন্য বহুদূর থেকে নানা দেশীয় লোকে এ স্থানে আগমন করে। এ মহোৎসব উপলক্ষে নানাবিধ আতস বাজী পোড়ান হয় ও বহুবিধ আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা থাকে।

মন্দিরস্থ দেবমূর্ত্তির রত্নালঙ্কার প্রভৃতি দেখ্‌তে অনুমতি পাওয়া সৌভাগ্যের বিষয়। দেব-ভক্তির নিদর্শনস্বরূপ বহুমূল্য রত্নাদি অলঙ্কার—রত্নভূষিত হার, কাঞ্চী প্রভৃতি। পূজকদের মুখে শোনা যায়—বর্ত্তমান ও অতীত কালে এ সব বহুমূল্য রত্নালঙ্কার প্রসিদ্ধ ব্যক্তিরা দেবতাকে উৎসর্গ করেছেন। বাৎসরিক মহোৎসবের সময় দেবমূর্ত্তিকে সমুদয় অলঙ্কারে সজ্জিত ক'রে শোভাযাত্রায় বার করা হয়। কখনও সমস্ত সেবায়ত উপস্থিত না থাকায় সমুদয় অলঙ্কার প্রদর্শিত হয় না; ভিন্ন ভিন্ন রত্নপেটিকার চাবী ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির হেপাজতে।

একটি মন্দিরের অলঙ্কার প্রায় দশ লাখ টাকার হবে, আর একটি মন্দিরের প্রায় চার লাখ।

কাঞ্চীর প্রাচীন মন্দিরের মধ্যে কৈলাসনাথের মন্দির বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নগরের পশ্চিম দিকে অবস্থিত। পূর্ব্বে এর নাম রাজ-রাজেশ্বর ছিল। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে নরসিংহ বিষ্ণু কৈলাসনাথে মন্দির নির্ম্মাণ করান—তা শিলালিপি থেকে জানা যায়। ফার্গুসনের মতে এই প্রাচীন মন্দির খুব চিত্তাকর্ষক। এই মন্দিরের দুই ধারে অপেক্ষাকৃত বৃহৎ গোপুরম্ আছে।

বৃহৎ মন্দির ব্যতীত আরো ছোট ছোট মন্দির আছে। বৌদ্ধমন্দির ও জৈন-মন্দিরের অভাব নেই—এ সব মন্দির প্রকৃত নগরীর বহির্দ্দেশে। লৌকিক প্রবাদ যে, সমুদয় হিন্দু-দেউল পূর্ব্বে জৈন-মন্দির ছিল। প্রাচীন দ্রাবিড় ধর্ম্মের চিহ্ন দেখা যায়—কতকটা হিন্দুধর্ম্মের মন্দিরের সংশ্রবে—আর কতকটা প্রাচীন দ্রাবিড়-দেবতার নামে উৎসর্গীকৃত মন্দিরে। এখানে শিখ্‌দের একটা ছোট মন্দির আছে। মুসলমান অধিকারের চিহ্নস্বরূপ কতকগুলি মস্‌জিদেরও অভাব নেই। এমন কি খ্রীষ্টিয়ান্‌দের একটা ছোট গির্জ্জা আছে। এক কথায়—এ নগরী এখন সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় স্থান হ'য়েছে বল্লেও চলে।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী

* দক্ষিণাত্যের প্রত্যেক দেবতার দুটি ক'রে মূর্ত্তি আছে--মূলমূর্ত্তি ও ভোগ ভোগ মূর্ত্তি শোভাযাত্রার সময় বার করা হয় কিন্তু মূলমূর্ত্তি বারকরা হয় না।

প্রাচীন ভারতের সমাধি স্তূপ

মানুষ সর্ব্বদাই নিজের কীর্ত্তিকে চিরজাগ্রত রাখিবার জন্য উন্মুখ, কাজেই আমরা আদিম যুগ হইতেই দেখিতে পাই যে, সে তাহার জীবিতাবস্থায় নিজের ব্যক্তিত্বকে যতদূর সম্ভব বড় করিয়া জগতের সম্মুখে ধরিতে চেষ্টা করে; শেষে তাহার নশ্বর দেহাবসানের পর তাহার প্রিয়জনেরা তাহার স্মৃতি জাগ্রত রাখিবার জন্য নানা প্রকারের উপায় উদ্ভাবন করিয়া থাকে। ইহাই চিরন্তন রীতি, ধরাপৃষ্ঠে মানুষের প্রথম আবির্ভাব হইতে আজ পর্য্যন্ত ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই।

আদিম যুগে মৃতদেহ ভূমিতে প্রোথিত করিবার পর তাহার উপর কয়েকখণ্ড প্রস্তর রাখিয়া অথবা মাটির ঢিপি দ্বারা সমাধি-স্তূপের রচনা শেষ করা হইত। এ প্রকারের সমাধির প্রচলন আজ পর্য্যন্তও আসাম, ছোটনাগপুর ও মধ্যভারতের আদিম অধিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত রহিয়াছে। ক্রমশঃ এই সব অসংলগ্ন পাথরগুলিকে সাজাইয়া গৃহ বা মন্দিরের আকারে গড়িয়া তোলা হইল এবং পরবর্ত্তী যুগে

শ্রীহিমাংশুকুমার বসু

যে সব ইটের ও পাথরের সুদৃশ্য স্মৃতিমন্দির দেখিতে পাওয়া যায় তাহা এই সব স্তূপ প্রথমাবস্থারই চরম উৎকর্ষ। কোন কোন মহাত্মা ব্যক্তি আবার ইহার সহিত স্বীয় জীবনের স্মরণীয় ঘটনাবলীর প্রতিকৃতি অথবা নিজেদের বাণী স্মৃতি-ফলকে ক্ষোদিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন।

ভারতবর্ষে এই প্রকারের বহু পুরাতন সমাধি-স্তূপ ও স্মৃতিসৌধ আছে, বিশেষতঃ বৌদ্ধযুগের। প্রথম প্রথম মৃত্তিকার স্তূপ, তাহার পর প্রস্তরের এবং শেষ পর্য্যন্ত ইষ্টকাদির দ্বারা নির্ম্মিত স্মৃতি-সৌধ দেখিতে পাওয়া যায়। অর্দ্ধ-গোলাকার হইতে উচ্চ চূড়ার আকৃতির এবং শেষ পর্য্যন্ত গম্বুজাকারের স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছে। বারাণসীর অন্তঃপাতী সারনাথের বিখ্যাত স্তূপ তাহার একটি নিদর্শন। সাদাসিধা স্মৃতিসৌধগুলির গাত্রে ক্রমে ক্রমে চিত্রাদি ও কারুকার্য্য খচিত হওয়ায় উহার অঙ্গের সৌন্দর্য্য ও গঠন-সৌষ্ঠবও বৃদ্ধি পাইল। স্তূপ গাত্রের চতুর্দ্দিকে প্রদক্ষিণ-পথ ও মূল স্তূপটিকে ঘিরিয়া বাহিরে চতুর্দ্দিকে প্রাচীর নির্ম্মিত হইল। শীর্ষদেশে প্রথম প্রথম কাষ্ঠের ছত্র ও পরবর্ত্তী যুগে প্রস্তরের ছত্র সন্নিবেশিত হইল। অধিকাংশ বৌদ্ধস্তূপই সমতল পর্ব্বতের শীর্ষদেশে নির্ম্মাণ করা হইয়াছে।

ভগবান বুদ্ধ অথবা তাঁহার কোন উপযুক্ত শিষ্যের চিতা-ভস্মের উপর তাঁহাদের কোন অস্থিকে সমাধিস্থ করিয়াই বেশীর ভাগ বৌদ্ধ-স্তূপগুলি রচিত হইয়াছিল। কোন কোন স্থানের স্তূপগুলি কেবলমাত্র তাঁহাদের স্মারকচিহ্ন-স্বরূপই নির্ম্মিত হইয়াছিল, উহার মধ্যে অস্থি বা ভস্ম কিছুই প্রোথিত করিয়া রাখা হয় নাই। বোধিসত্ত্বের দেহত্যাগের পর তাঁহার চিতাভস্মের উপর মাত্র সাত-আট স্থানেই স্তূপ রচিত হইয়াছিল, কিন্তু রাজা অশোকের সময় এই স্তূপগুলিকে পুনরায় খনন করান হয় এবং তাহার চিতাভস্ম বা স্মৃতিচিহ্নের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ ভারতবর্ষের নানা স্থানে লইয়া গিয়া তদুপরি অসংখ্য স্তূপ রচনা করা হইয়াছিল। বর্ত্তমান যুগে এই সকল স্তূপ খনন করিয়া কোন স্থানে বুদ্ধদেবের অস্থির কোন অংশ, কোথাও তাঁহার ভিক্ষাপাত্রের কিয়দংশ ভগ্নাবশেষ, কোথাও তাঁহার দাঁতের টুকরা, আবার কোথাও বা কৌটার মধ্যে তাঁহার মাথার চুল প্রভৃতি পাওয়া গিয়াছে। স্তূপগুলির বাহিরের চতুর্দ্দিকে সাধারণতঃ পাকা ইট বা পাথর দিয়াই প্রস্তুত, ভিতরটা কাঁচা ইট বা মাটী দিয়া ভরাট করা থাকে। এই সকলের অভ্যন্তরে আর একটি পাকা ইটের ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ থাকে এবং ইহার মধ্যেই স্মৃতিচিহ্নগুলিকে রাখা হইত। কোন কোন স্তূপে উপরোক্ত আভ্যন্তরীণ প্রকোষ্ঠের মধ্যে ভক্তবৃন্দের প্রদত্ত কেবলমাত্র উপঢৌকনাদি পড়িয়া রহিতে দেখিতে পাওয়া গিয়াছে, কোন প্রকারের স্মৃতিচিহ্নাদি পাওয়া যায় নাই।

স্তূপগুলি ক্রমশঃ তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হইল। ভক্তেরা দলে দলে আসিয়া স্তূপ-পাদমূলে পূজার অর্ঘ্য দিতে আরম্ভ করিল। বুদ্ধ-মূর্ত্তি অথবা তাঁহার জীবনের কোন স্মরণীয় ঘটনার চিত্র অঙ্কিত করিয়া নানা প্রকারের মাটির বা পাথরের চাকৃতি মানত করিয়া ভক্তেরা স্তূপ-পাদমূলে রাখিয়া যাইত। বড় বড় স্তূপের চতুর্দ্দিক ঘেরিয়া অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্তূপও মানত রাখিয়া ভক্তেরা নির্ম্মাণ করাইয়াছেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, সমস্ত স্তূপগুলিই যে কোন না কোন স্মৃতিচিহ্নের উপর নির্ম্মিত হইয়াছে তাহা নয়, বুদ্ধদেব বা তাঁহার শিষ্য-বৃন্দ-বিশেষের কোন বিশেষ কার্য্য, ঘটনা বা কোন স্থানে শুভাগমনের স্মরণ-চিহ্নস্বরূপ অনেক স্তূপ রচিত হইয়াছিল ; যেমন বুদ্ধগয়া বুদ্ধের নির্ব্বাণ-প্রাপ্তির স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ, সারনাথে তিনি প্রথম ধর্ম্ম-প্রচার করিয়াছিলেন ও কাশীয়ায় তাঁহার দেহাবসান হয়। রাজা অশোক এই প্রকারের বহু স্তূপ ও স্তম্ভ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। আমরা প্রসিদ্ধ চীনা পরিব্রাজক হুয়েন সাংয়ের বিবরণী হইতে দেখিতে পাই যে, তিনি রাজা অশোককে সিন্ধু প্রদেশে যে যে স্থানে বুদ্ধদেব পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন সেই সকল স্থানেই স্তূপ নির্ম্মাণ করাইতে দেখিয়াছেন। ভূপালের অন্তঃপাতী 'সাঞ্চীর' প্রসিদ্ধ স্তূপও সম্ভবতঃ এইরূপ কোন ঘটনার সহিত সংশ্লিষ্ট, কারণ খনন করিয়া এ পর্য্যন্ত কোন প্রকারের স্মৃতিচিহ্নাদি ইহার মধ্য হইতে পাওয়া যায় নাই।

'সাঞ্চীর' স্তূপ বলিতে যদিও ভূপাল রাজ্যের অন্তর্গত সাঞ্চী ষ্টেশন হইতে কয়েকশত গজ দূরের স্তূপাবলীকেই বুঝায়, তবু এই প্রাচীন স্তূপটি হইতে বিক্ষিপ্ত আরও অনেক স্তূপ ইহার বারো মাইলের মধ্যে রহিয়াছে। জি, আই, পি রেলওয়ের 'ভিলসা' নামক ষ্টেশন হইতে এই সব স্তূপে যাওয়া যায়; ইহার মধ্যে 'সোনারী'র, 'শতধারা'র, 'পিপালিয়া'র ও 'অন্ধেরে'র স্তূপগুলিই প্রসিদ্ধ। বর্ত্তমানে পর্ব্বতের উপর নির্জ্জন স্থানে নির্ম্মিত হওয়ায় বহু উপাসক ও উপাসিকা সর্ব্বদাই তথায় গিয়া ভগবান বুদ্ধের চরণে অর্ঘ্য প্রদান করিতে পারিত। সমবেত ভক্তমণ্ডলীর মিলিত কণ্ঠের "বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি, সংঘং শরণং গচ্ছামি"-ধ্বনি চতুর্দ্দিকের আকাশ, বাতাস ও পৃথিবীকে এক অপূর্ব্ব ভক্তিরসে আপ্লুত করিয়া ফেলিত। সাঞ্চীতেই আমরা বৌদ্ধ স্থপতি-বিদ্যার ও ভাস্কর্য্যের চরম উৎকর্ষ দেখিতে
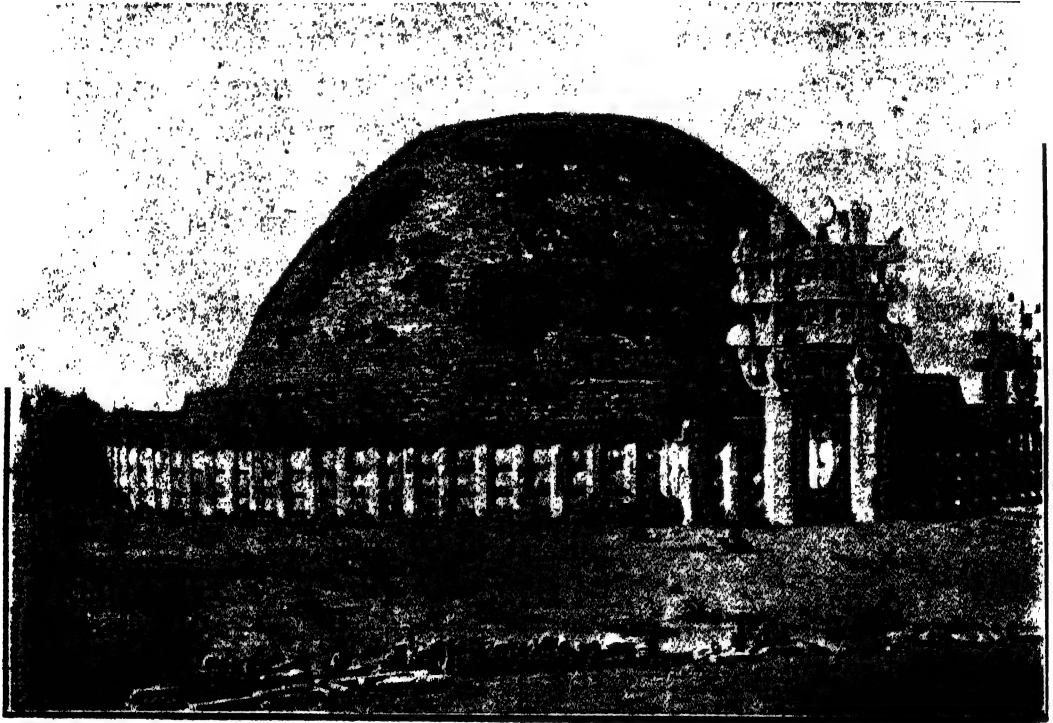
মহাস্তূপ সাঞ্চী

পরিত্যক্ত ও লোকালয়বর্জ্জিত স্থানে কি করিয়া যে এতগুলি স্তূপ ও বৌদ্ধ-বিহারের একত্র সমাবেশ হইল তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, রাজা অশোকের রাজত্বকালে বর্ত্তমান 'ভিলসা' নগরীর সন্নিকটেই 'বিদিসা' নামক এক জনাকীর্ণ নগরী ছিল। তথাকার বৌদ্ধ-ভিক্ষু ও শ্রমণেরা নির্জ্জন স্থান বাছিয়া সহরের চতুর্দ্দিকে পর্ব্বতোপরি এই সব স্তূপ ও মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। মন্দিরগুলি পাই এবং ইহার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির মূলে রাজা অশোকের ধর্ম্মপ্রবণতা ও কর্ম্মকুশলতার ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না।

সাঞ্চীর প্রায় সমস্ত স্মৃতিসৌধ গুলিই প্রস্তর-প্রাচীর দিয়া বেষ্টিত এবং ইহাদিগকে মোটামুটি তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। (১) স্তূপ—ইহার বিষয় পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ভগবান বুদ্ধের কোন না কোন স্মৃতিচিহ্নের উপরেই সাধারণতঃ ইহা নির্ম্মিত হইত; বুদ্ধদেবের পূর্ব্ব জন্মের যে

শ্রীহিমাংশুকুমার বসু

সব কাহিনী বা 'জাতক' আছে সেইগুলিকে স্মরণীয় করিবার জন্যও অনেক স্তূপ রচিত হইয়াছিল। (২) চৈত্য বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দির—এই সকল মন্দিরে ভক্তবৃন্দেরা সাধারণতঃ একত্র হইয়া বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি স্থাপনা করিয়া তাহার পূজা করিতেন। (৩) ধর্ম্মশালা—বা বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের বসবাসের জন্য স্থায়ী গৃহ। তৎকালে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম-প্রচারে স্ত্রীলোকদেরও পুরুষের ন্যায় সমান অধিকার ছিল এবং

সাঞ্চি স্তূপের পূর্ব্ব দ্বারের পশ্চাদ্ভাগ

ভিক্ষুণীদের জীবনের আদর্শ ও ধর্ম্মের উচ্চাঙ্গের ব্যাখ্যাই অনেকাংশে বৌদ্ধ ধর্ম্মকে সেই সময় মহিমান্বিত করিয়াছিল।

সাঞ্চীর স্তূপগুলি খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দী হইতে খৃঃ দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে নির্ম্মিত হইয়াছিল। বিরাটাকারের স্তূপও রহিয়াছে এবং তাহার সন্নিকটে আবার মাত্র এক ফুট উচ্চ স্তূপও রহিয়াছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্তূপগুলি ধর্ম্মপ্রাণ বৌদ্ধেরা এই আশা করিয়া করাইয়াছিলেন যে, তাহা দ্বারা তাঁহারা নির্ব্বাণের পথে অগ্রসর হইতে সমর্থ হইবেন। সর্ব্ব বৃহৎ স্তূপটি একটি প্রকাণ্ড গম্বুজের আকারে তৈয়ারি, কেবল চূড়ার দিকটা একটু কাটা এবং সেই স্থানে পাথরের একটি ছত্র সন্নিবেশিত আছে। ছত্রটি বুদ্ধের একছত্র আধিপত্যের নিদর্শন, উহার চতুর্দ্দিক পাথরের রেলিং দিয়া ঘেরা। সমস্ত স্তূপটি ঘেরিয়া মাঝামাঝি জায়গায় ও পাদমূলে দুইটি প্রদক্ষিণ-পথ আছে, তাহাদের চারিদিকও পাথরের রেলিং দিয়া ঘেরা। স্তূপগাত্র ঘেরিয়া যে দুইটি রেলিং আছে তাহার উপর কোন কারুকার্য্য নাই, কেবলমাত্র পাদমূলে রেলিংটার উপরেই নক্সা ও চিত্রাদি ক্ষোদিত। অনাড়ম্বর মূল স্তূপটির চারিধারে চারিটি ৩০ ফুট উচ্চ অত্যন্ত সুদৃশ্য ও কারুকার্য্য-খচিত তোরণদ্বার প্রথমেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পাথরের উপরে যে এইরূপ সুন্দর সুন্দর মূর্ত্তি খোদাই করা সম্ভবপর তাহা না দেখিলে বিশ্বাস করা যায় না। তখনকার যুগে দূর দূর হইতে এই সব বিরাটাকার পাথর আনিয়া একটির উপর আর একটি বিনা মশলার সাহায্যে বসান

অতিশয় শ্রমসাধ্য ও বুদ্ধির কার্য্য ছিল, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। চারিটি তোরণই একই ধাঁচে তৈয়ারি এবং প্রায় দুই হাজার বৎসর হইল নির্ম্মিত হইবার পর এখনও পর্যন্ত প্রত্যেকটি খোদাই-করা চিত্র পরিষ্কার ও সুন্দর রহিয়াছে। প্রত্যেকটি তোরণ দুইটি করিয়া খাড়া স্তম্ভের উপর পর পর চারিটি করিয়া খিলানের আকারে আড়াআড়ি লম্বা পাথর বসাইয়া নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। খাড়া স্তম্ভ দুইটির শীর্ষদেশে হস্তী বা সিংহের কেবলমাত্র সম্মুখভাগ, দুইদিকে দুইটি সম্মুখে

কণিষ্কের স্তূপ হইতে প্রাপ্ত সম্পুটক
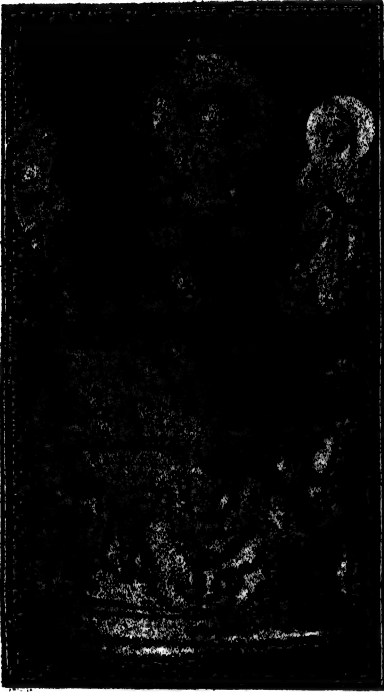
ও পশ্চাতে লাগালাগি ভাবে বসান আছে। আড়াআড়ি ভাবে রক্ষিত চারিটি পাথরের মধ্যের ফাঁক প্রায় তাহাদের নিজেদের উচ্চতারই সমান এবং প্রত্যেকটির দুই দিকেও কোন না কোন মূর্ত্তি সন্নিবেশিত। সমস্ত তোরণের উপরেই মানুষ, পশু-পক্ষী, ফুল-ফল, ধর্ম্মচক্র ও বিভিন্ন 'জাতকের' বিষয় অতি সূক্ষ্মভাবে ক্ষোদিত।

মাদ্রাজ যাদুঘরে ঐ প্রদেশের একটি ভগ্নাবশেষ স্তূপের অনেকগুলি চিত্রসম্বলিত পাথরের টুকরা রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে। এইগুলি কৃষ্ণা নদীর মোহানার নিকট অমরাবতী নামক স্থানে পাওয়া গিয়াছে। আরও কয়েকটি ধ্বংসাবশেষ স্তূপের ক্ষোদিত চিত্রসম্বলিত পাথরের টুকরা গিমাদিরু ও যজ্ঞপেটা নামক স্থানে পাওয়া গিয়াছে। এই সব পাথরের উপরকার চিত্রের নক্‌সা অনেকটা গান্ধার ভাস্কর্য্যের সহিত মিলিয়া যায়।

স্তূপগুলি খনন করিবার সময় যথেষ্ট অধ্যবসায় ও ধৈর্য্যের প্রয়োজন। প্রত্যেক কোদালির আঘাতেই প্রত্নতাত্ত্বিক কিছু না কিছু আবিষ্কার করিয়া থাকেন, অথচ অযথা কোদালির আঘাতে কোন জিনিষ নষ্ট হইতে দেন না। এইরূপে অনেক স্তূপই খনন করা হইয়াছে এবং পুনরায় উহাদিগকে যতদূর সম্ভব পূর্ব্বের ন্যায় মেরামত করিয়া রাখা হইয়াছে। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে নেপাল রাজ্যের সীমান্ত প্রদেশে পিপ্রত নামক গ্রামে একটি স্তূপ খনন করিয়া অনেক জিনিষ আবিষ্কার করা হয়। একটি পাথরের সিন্দুক হইতে পিতলের ফুলদান, অস্থির-টুকরা ও কিছু গহনাপত্র পাওয়া যায়। এই সব জিনিষ পরে বুদ্ধদেবের বলিয়া স্থিরীকৃত হইলে উহার কিয়দংশ শ্যামের রাজা, ব্রহ্মদেশের ও সিংহলের প্রধান বৌদ্ধ-পুরোহিতদিগের নিকট পাঠাইয়া দেওয়া হয়।

বোম্বাই সহর হইতে সাঁইত্রিশ মাইল দূরে সুপারা নামক গ্রামে ১৮৮২ খৃঃ একটি স্তূপ খনন করা হয়। স্তূপের মাঝামাঝি জায়গায় আধুনিক যুগের জাঁতার ন্যায় গোলাকার একটি সুন্দর প্রস্তরের সিন্ধুক পাওয়া যায়। সিন্ধুকের ঢাকনা উল্টাইতে দেখা গেল যে ভিতরে ঠিক মাঝখানে একটী পিতলের ডিম্বাকৃতি ক্ষুদ্র পেটিকা এবং উহাকে ঘিরিয়া চতুর্দ্দিকে বৃত্তাকারে বুদ্ধদেবের বিভিন্ন বয়সের আটটি পিতলের মূর্ত্তি রহিয়াছে। পিতলের পেটিকার মধ্যে আর একটি করিয়া যথাক্রমে রৌপ্যের, প্রস্তরের, কাঁচের ও স্বর্ণের পেটিকা ছিল। সর্ব্বশেষ স্বর্ণ-পেটিকার মধ্যে বুদ্ধদেবের ভিক্ষাপাত্রের তেরোটি টুক্‌রা ছিল। এই ভিক্ষাপাত্রের কয়েকটি টুক্‌রা সিংহলের প্রধান বৌদ্ধ-পুরোহিতকে পাঠাইয়া দেওয়া হয়, বাকী জিনিষগুলি বোম্বাইয়ের এশিয়াটিক্ সোসাইটির যাদুঘরে রক্ষিত আছে।

শ্রীহিমাংশুকুমার বসু

বোম্বাইয়ের নিকটবর্ত্তী কাঠিওয়াড়ের জুনাগড় নামক স্থানেও আর একটি স্তূপ ১৮৮৯ খৃঃ খনন করা হয়। এখানে অনেকগুলি অশোকস্তম্ভ মূল স্তূপের চতুর্দ্দিক ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। এই স্তূপের মধ্য হইতে স্মৃতিচিহ্নটিকে বাহির করিতে বিশেষ ধৈর্য্যের প্রয়োজন হয়, কারণ এই স্তূপটি আগাগোড়াই ইটের তৈয়ারি। অনেক পরিশ্রমের পর মসৃণ পাথরের দুইটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চতুষ্কোণ টুক্‌রা প্রথমে আবিষ্কার করা হয়। উপরের পাথরের টুকরাটিকে সরাইবার পর নীচের পাথরের মধ্যে ক্ষুদ্র বাটীর আকারের একটি গর্ত্ত দেখা গেল এবং সেই গর্ত্তের মধ্যে ক্ষুদ্র পিতলের একটি পেটিকা পাওয়া যায়। এই পিতলের পেটিকার মধ্যে সর্ব্বশেষ স্বর্ণ-পেটিকায় এক টুক্‌রা কৃষ্ণবর্ণের প্রস্তরের ন্যায় পদার্থ ও তৎসঙ্গে পঞ্চ-অর্ঘ্য দেখিতে পাওয়া যায়। কৃষ্ণবর্ণ পদার্থটি প্রস্তরের টুক্‌রা বলিয়াই প্রতীয়মান হয়, তবে ইহা বুদ্ধদেবের ব্যবহৃত কোন বস্তুর টুক্‌রা কি না বলা কঠিন। এইগুলিকে জুনাগড়ের যাদুঘরে রাখা হইয়াছে।

পাঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশের অনেক স্থানেই অনেক স্তূপাদির ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল স্তূপগুলির অধিকাংশই পাকা ইটের দ্বারা প্রস্তুত। দেয়ালের কোণ ও বহিরাভরণ মৃত্তিকা-নির্ম্মিত চিত্রাদি ও অলঙ্কারাদির দ্বারা সজ্জিত করা হইত; তাহার অংশ-বিশেষও পাওয়া গিয়াছে। মিরপুর-খাস নামক স্থানের স্তূপটির মধ্য হইতে একটি পিনের মাথার ন্যায় অতিশয় ক্ষুদ্র একটি স্মৃতি-চিহ্ন আবিষ্কৃত হয়। এই স্মৃতিচিহ্নটি স্বর্ণের পাতে মুড়িয়া একটি স্বর্ণ-পেটিকার মধ্যে রাখা হইয়াছিল।

পেশওয়ারের সন্নিকটে তক্ষশীলার কাছে রাজা কণিষ্কের নির্ম্মিত একটি স্তূপ আছে। এই স্তূপটির কথা চৈনিক পরিব্রাজকেরা পর্য্যন্ত লিখিয়া গিয়াছেন, এবং ইঁহারা সকলেই এই স্তূপটীকে ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্ব-বৃহৎ
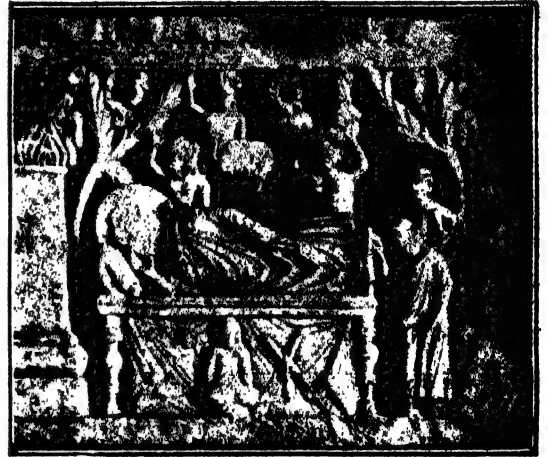
গান্ধার দেশীয় ভাস্কর্য্য বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ

বলিয়াছেন। ইহা প্যাগোডার আকারে অতি সুন্দর ভাবে নির্ম্মিত, এবং ইহার চতুর্দ্দিক ঘেরিয়া বহুমূল্য প্রস্তরাদি বসানো আছে। এই স্তূপের মধ্য হইতেও একটি কারুকার্য্য-খচিত ব্রঞ্জের পেটিকার মধ্যে আর একটি প্রস্তরের পেটিকায় তিন টুক্‌রা অঙ্গারীভূত অস্থি পাওয়া গিয়াছে।

শ্রীহিমাংশুকুমার বসু

২৪

পরদিন সকালে নিদ্রাভঙ্গের পর বিনয় দেখলে স্নুকুমার স্নুট্ প'রে অতিশয় ব্যস্ত হ'য়ে কোন একটা জিনিস অন্বেষণ করছে—একবার দেরাজ টান্ছে, একবার বাক্স হাতড়াচ্ছে, একবার টেবিলের উপরের কাগজপত্রগুলো উল্টে পাল্টে দেখচে, কিন্তু ঈপ্সিত বস্তুর যে সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না তা তার মুখ-চোখের ভাবে প্রতীয়মান।

শয্যার উপর উঠে ব'সে বিনয় দেখ্লে বেলা অনেক খানি হ'য়ে গেছে। আর আলস্য না ক'রে শয্যা ত্যাগ করতে করতে স্নুকুমারের দিকে চেয়ে বল্লে, "কি হে, সকালে উঠে রাজবেশ ধারণ ক'রে চলেছ কোথায়?"

"চীফ্ এঞ্জিনিয়ারের বাড়ি ভাই।"

"কিন্তু সে পথে বাধা হচ্চে কি?"

"বাধা হচ্চে টেষ্টিমোনিয়ালের ফাইলটে কোথায় রেখেছি খুঁজে পাচ্ছিনে। আর সমস্ত জিনিস—এমন কি যে সব জিনিস বহুদিন থেকে হারিয়েছে ব'লে জানতুম, পাচ্ছি—শুধু পাচ্ছিনে উপস্থিত যেটার একান্ত দরকার।"

মৃদু হেসে বিনয় ব'ল্লে, "ভগবান এমন কৌতুক সকলেরই সঙ্গে মাঝে মাঝে ক'রে থকেন। কিন্তু সে যা হ'ক, টেষ্টিমোনিয়ালের ফাইল ব্যাপারটা কি তা ত' বুঝলাম না স্নুকুমার? কাজে সন্তুষ্ট ক'রে টেষ্টিমোনিয়াল লাভ করলে কোন্ সব ব্যক্তির কাছ থেকে, এ জান্বার কৌতূহল কম হচ্চে না!"

ওষ্ঠাধরে সলজ্জ হাসির ক্ষীণ রেখা টেনে স্নুকুমার বল্লে, "দূর! কাজই কখনো করলাম না ত টেষ্টিমোনিয়াল্ আমি কোথায় পাব? ও সব দাদামশায়ের টেষ্টিমোনিয়াল্।"

চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে ক্ষণকাল স্নুকুমারের দিকে চেয়ে থেকে বিনয় বললে, "তোমার দাদামশায়ের টেষ্টিমোনিয়ালের জোরে সাহেবের কাছ থেকে তুমি কাজ জোগাড় করবে?" তার পর খুব খানিকটা উচ্চস্বরে হেসে নিয়ে বললে, "এ সত্যি সত্যিই অদ্ভুত! সে দিন যেমন দরখাস্ত দিয়ে এসেছ, আজ ঠিক তার উপযুক্ত টেষ্টিমোনিয়াল নিয়ে যাচ্ছ,—যেমন প্রার্থনা, তেমনি দাবী—উভয়ের মধ্যে কোন গরমিল নেই! কাজ জোগাড় করবার এ-ও যে একটা উপায় হ'তে পারে তা আমার ধারণাই ছিল না!"

ঈষৎ অপ্রতিভমুখে স্নুকুমার বল্লে, "তুমি বুঝ্চ না বিনু, এ ছাড়া আমার আর দ্বিতীয় উপায় নেই।"

বিনয় হাস্তে হাস্তে বল্লে, "তুমিও বুঝচ না স্নুকুমার, নিরুপায় অবস্থা ব'লেও একটা অবস্থা আছে। Theory of heredityর নিশ্চয়তা বিষয়ে চীফ্ এঞ্জিনিয়ারের মনে সম্পূর্ণ বিশ্বাস জন্মাতে না পারলে তোমার কিছুমাত্র আশা নেই। সে যদি ব'লে বসে 'তোমার দাদামশায়ের টেষ্টিমোনিয়ালের জোরে তোমার দরখাস্ত মঞ্জুর করলাম বটে—কিন্তু কাজ দোবো তুমি যার দাদামশায় হবে

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

ওঁকে তা হ'লে এ রকম যুক্তির বিরুদ্ধে তোমারই বা বলবার কি থাক্‌বে বল?"

পর্দ্দা ঠেলে প্রবেশ করলে শৈলজা; বল্‌লে, "ঠাকুরপোর হাসি শুনে দেখ্‌তে এলাম ব্যাপার কি।" সুকুমারের দিকে চেয়ে বল্‌লে, "আমাকে অত তাড়া দিয়ে তুমি এখনো যাও নি যে?"

বিষণ্ণ মুখে সুকুমার বল্‌লে, "দুঃখের কথা বল কেন, টেষ্টিমোনিয়ালের তাড়াটা কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছি নে।"

"কোথায় রেখেছিলে?"

"সে-টা মনে থাকলে সেই খান থেকে বার ক'রে নিতাম।"

বিনয় বল্‌লে, "বল্‌তেই হবে, এ যুক্তি অকাট্য!"

সহাস্যমুখে শৈলজা জিজ্ঞাসা করলে, "সব জায়গা খুঁজে দেখেচ?"

"দেরাজ, টেবিল, বাক্স—সবই ত খুঁজে দেখ্‌লাম; কোথাও নেই।"

"পকেট দেখেচ?"

শৈলজার কথা শুনে ব্যস্ত হ'য়ে পকেটের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে একটা কাগজের বাণ্ডিল বার ক'রে প্রসন্ন মুখে সুকুমার বল্‌লে, "এই! পকেটে রয়েছে!—ধন্যবাদ শৈলজা, তোমাকে ধন্যবাদ! তুমি নইলে আমি দেখচি একেবারে—"

বিনয় বললে, "অচল।"

"ঠিক বলেছ—অচল। আচ্ছা চল্লাম ভাই। তুমি চা-টা খাও—আমি ঘণ্টা খানেকের মধ্যে ঘুরে আসচি।" ব'লে সুকুমার দ্রুত পদে বেরিয়ে গেল।

বিনয় বল্‌লে, "আপনার অনুমানশক্তি ত' খুব উঁচু দরের বৌদি! কি ক'রে জানলেন পকেটে টেষ্টিমোনিয়ালের তাড়া আছে?"

স্মিতমুখে শৈলজা বল্‌লে, "অনুমান নয়,—অভিজ্ঞতা। ওঁর যা জিনিস হারায় তার অর্দ্ধেক পাওয়া যায় ওঁর পকেট থেকে—অথচ কোনো বার যদি প্রথমে পকেট দেখবেন। একবার একটা হাতুড়ি হারিয়েছিল, তিন দিন পরে হঠাৎ পাওয়া গেল ওঁর ওভার-কোটের পকেটের ভিতর থেকে। চার পাঁচদিন পকেটে হাতুড়ি নিয়ে মর্ণিং ওয়াক্‌ করেছেন—অথচ পকেটটা যে অত ভারী কেন হ'ল তা খেয়াল হয় নি।"

শৈলজার কথা শুনে বিনয় হাসতে লাগল।

শৈলজা বল্‌লে, "ওঁর ভুলের গোটা তিন চার গল্প যদি শোনেন ত' হাস্‌তে হাস্‌তে পেটের নাড়ী ছিঁড়ে যাবে। যাক্‌, সে আর এখন কাজ নেই, অন্য সময়ে হবে, এখন আপনি তয়ের হ'য়ে নিন্—আমি শোভাকে চায়ের ব্যবস্থা করতে বল্‌ছি।" ব'লে প্রস্থানোদ্যতা হ'য়ে ফিরে এসে বল্‌লে, "হ্যাঁ, ভাল কথা, কাল ফন্তুদাদার সঙ্গে ত' আপনার আলাপ হ'ল, কেমন লাগল ওঁকে? বেশ মানুষ; না?"

"সন্তোষবাবুর নাম ফন্তু?"

"হ্যাঁ, বাড়িতে ওঁর ডাক-নাম ফন্তু। আমাদের সঙ্গে ছেলে বেলা থেকে পরিচয় ব'লে আমি ফন্তুদাদা ব'লে ডাকি।"

বিনয় বললে, "হ্যাঁ, বেশ মানুষ।"

এক মুহূর্ত্ত চুপ ক'রে থেকে মুখে চাপা মৃদু হাসির উচ্ছ্বাস ছড়িয়ে শৈলজা বল্‌লে, "কাল না কি স্ত্রী-স্বাধীনতা নিয়ে কমলার সঙ্গে আপনার রীতিমত বাগ্‌যুদ্ধ হ'য়ে গেছে?"

সহাস্যমুখে বিনয় বল্‌লে, "হ্যাঁ কতকটা। তবে সন্ধিও তারপর হয়েচে। কে বল্‌লে আপনাকে?—সুকু বুঝি?"

শৈলজা বল্‌লে, "হ্যাঁ, বাড়ি এসেই শুনলাম। সেখানে টের পেলে কমলাকে একটু ঠাট্টা ক'রে আস্‌তাম,—বল্‌তাম এখনি ফন্তুদাদার পক্ষ নিয়ে এমন ক'রে লড়াই করলে, একটু খানি চোট্‌ সহ্য করতে পারলে না, বিয়ে হ'য়ে গেলে না জানি কি কাণ্ডই করবে।"

রৌদ্রোজ্জ্বল আকাশের উপর দিয়ে একখানা লঘু মেঘ চ'লে গেলে নিম্নে প্রদীপ্ত ভূমি সহসা যেমন মলিন হ'য়ে যায়, বিনয়ের মুখমণ্ডলের অবস্থাও ঠিক তেমনি হ'ল। এক মুহূর্ত্ত কি চিন্তা ক'রে সে বললে, "সন্তোষবাবুর সঙ্গে কমলার বিয়ে হবার কথা হচ্চে?"

শৈলজা বল্‌লে, "কথা হচ্চে কেন, অনেকদিন থেকেই সে কথা ঠিক হ'য়ে আছে। জামাইয়ের মতই ফন্তুদাদা আসেন যান থাকেন। এতদিন বিয়ে হ'য়েই যেত—শুধু

কমলার মার শরীর খারাপ, চেঞ্জে গেলেন, ব'লেই হ'ল না। তিনি শীঘ্রই ফিরে আসচেন, তারপর অঘ্রাণ মাসে বিয়ে হবে।"

ছোট একটি 'ও' ব'লে বিনয় তোয়ালেটা আলনা থেকে নিয়ে কাঁধে ফেলে বাথরুমে যাবার জন্যে উদ্যত হ'ল।

"যাই, তোমার চা-টা পাঠিয়ে দিই গে", ব'লে শৈলজা প্রস্থান করলে।

ভিতরে গিয়ে শোভার কাছে উপস্থিত হ'য়ে শৈলজা সদ্যোত্থিত শোভার শ্লথ মূর্ত্তি আর কুঞ্চিত বসনের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে বললে, "কি কাঠকুড়ুনির মত চেহারা ক'রে রয়েছিস্! একদিন রাত্রি বারোটা পর্য্যন্ত জেগে, উঠ্‌তে একেবারে বেলা আট্‌টা! যা, শীগগির বাথরুমে গিয়ে হাত পা মুখে সাবান দিয়ে একখানা কাপড় ছেড়ে চুলটা ঠিক ক'রে আয়।"

সবিস্ময়ে শোভা জিজ্ঞাসা করলে, "কেন, কি হবে?"

ভ্রুকুঞ্চিত ক'রে শৈলজা বললে, "তোকে দেখতে আসবে!"

পাশে ঠাকুরঘরে গিরিবালা পূজার আয়োজন করছিলেন, শৈলজার শেষ কথাটা শুনতে পেয়ে ঈষৎ উচ্চস্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, "বউমা, কি হয়েচে গা?"

শৈলজা বললে, "ও কিছু নয়। তুমি পূজো কর মা।"

আর কোনো কথা না ব'লে গিরিবালা পুনরায় চন্দন ঘষায় মন দিলেন।

আধ ঘণ্টাটাক্ পরে যখন একটি কাঠের ট্রের উপর চা ও খাবার সাজিয়ে শোভা বিনয়ের নিকট উপস্থিত হ'ল তখন বিনয় মুখ হাত ধুয়ে বারান্দায় একটা চেয়ারে ব'সে নিজের মনের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া ক'রে নিতে ব্যস্ত। নিজের মনকে একটি স্বতন্ত্র পৃথক সত্তা দিয়ে তার পিঠে হাত বুলিয়ে সে তখন বোঝাচ্চে,—দেখ বাপু চিত্রকর, তুমি হচ্ছ ব্যবসাদার মানুষ, মাত্রাজ্ঞান ভুল ক'রে বেতালা হ'লে তোমার চলবে কেন? ভদ্রলোকের মেয়ের চিত্র আঁকতে গিয়ে তার চিত্ত ধ'রে টানাটানি করা তোমার পক্ষে একান্ত অনুচিত—বিশেষতঃ ও বস্তুটি যখন এমন যে, টান্‌লেই সব সময়ে আসে না, আবার না টান্‌লেও সময়ে সময়ে এসে উপস্থিত হয়। তোমার রং-তুলির কারবার শেষ ক'রে দক্ষিণা বুঝে নিয়ে যথাসম্ভব শীঘ্র স'রে পড়। চিত্ত নিয়ে লীলা যদি করতেই হয় ত' অন্যত্র;—অর্থাৎ যত্র-তত্র নয়। চাওয়ার পিছনে যেখানে পাওয়ার একটা প্রবল সম্ভাবনা থাকে না, সেখানে চাওয়া একটা মস্ত বড় অকল্যাণ। পাওয়ার সম্ভাবনার অঙ্ক ক'ষে যে চায় সেই বুদ্ধিমান, সে অঙ্ক না ক'ষে যে চায় সে নির্ব্বোধ।

মৃদু মৃদু মাথা নেড়ে মন বললে, "তোমার এ হিসেবের অঙ্ক সংসারের মোটামুটি জিনিসেরই বিষয়ে খাটে—কিন্তু যে-সব বস্তু মানুষের সাধারণ খাতাপত্রের বাইরে তার হিসেব শুভঙ্করী ধারাপাতের নিয়মে চলে না। বিবেচনার লাঠি ধ'রে যদি মাটির উপর ঘুরে বেড়ানো যায় তা হ'লে অকল্যাণের ভয় অনেকটা কম থাকে বটে, কিন্তু বাসনার পক্ষ বিস্তার ক'রে যদি আকাশপথে পাড়ি দিতে হয় তখন বিবেচনার লাঠিটিকে অনাবশ্যক ভারবোধে পরিত্যাগ ক'রে যেতে হবে। মানুষের মন শুধু পায়ে হেঁটে বেড়ায় না, ডানা মেলে ওড়ে। ওড়ার বিপদ থেকে নিরাপদ করবার জন্যে মনকে যদি শুধু বিবেচনার লাঠি ধ'রে পায়ে হেঁটে বেড়াতে বল তা হ'লে কেবল মাত্র মাটির অঙ্ক ক'ষে ক'ষে মন মাটি হবে।

মনের এরূপ অভিব্যক্তিতে বিনয় শঙ্কিত হ'য়ে উঠল; তীব্রকণ্ঠে সে বললে, আচ্ছা, বিবেচনার কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, কিন্তু বিবেক ব'লেও ত' একটা জিনিস আছে?—যে বস্তু প্রায় অপরের অধিকারভুক্ত হয়েচে, সে বস্তুর প্রতি লোভ করা নীতিসঙ্গত হয় কি?

সঙ্কুচিত হ'য়ে এতটুকু হ'য়ে গিয়ে মন বললে, এবার সংযমের কথা তুলবে ত?

আরক্ত নেত্রে বিনয় বললে,—তুমি নিজেই যদি না তুলতে তা হ'লে নিশ্চয় তুলতাম।

ঠিক্ এমনি ভাবে বিনয়ের মন বাসনা আর বিবেকের তাড়নায় কাঁপচে এমন সময় শোভা উপস্থিত হ'য়ে বললে, "বিনু দা, আপনার চা এনেছি।"

পাশ ফিরে শোভার প্রতি দৃষ্টিপাত করতে প্রথমেই বিনয়ের চোখে পড়ল শোভার স্নিগ্ধ শান্ত মাজা-ঘষা

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

মুখখানিতে কপালের উপর একটি বড় সিঁদুরের টিপ। সহসা মনে হ'ল এই টিপটিই যেন সমস্ত সমস্যার সমাধান,—এ যেন দিগন্তের উপর পূর্ণিমার চাঁদের রূপটি বহন ক'রে এনেছে, এর কিরণে সূর্য্যকিরণের মত উজ্জ্বলতা না থাকুক, কমনীয়তা কম নেই।

শোভার হাত থেকে ট্রেটি নিয়ে পাশের টেবিলে রেখে বিনয় বল্‌লে, "সক্কালে উঠেই অতবড় একটি সিঁদুরের টিপ পরেছ যে শোভা ?"

এই টিপ্‌টি পরবার সময় শোভা বারম্বার আপত্তি করেছিল, কিন্তু শৈলজা জোর ক'রে পরিয়ে দিয়েছিল, শোভার কথা শোনে নি। সেই টিপ নিয়ে প্রথমেই কথা উঠতে শোভা লজ্জিত হ'ল, মনে মনে শৈলজার উপর রাগও একটু করলে। আরক্ত মুখে সে বল্‌লে, "বউদিদির কাণ্ড!"

"ও—তাই।" ব'লে বিনয় একটু হাস্‌লে। সে বেশ বুঝতে পারলে সিঁদুরের এই টিপটিকে আশ্রয় ক'রে রয়েছে শৈলজার কত আশা, কত আগ্রহ, কত চেষ্টা ;—আর তার সঙ্গে হয়ত জড়িত হ'য়ে রয়েছে একটি কুমারীহৃদয়ের কত আশঙ্কা, কত লজ্জা, কত বেদনা! নিয়তির এ কি নিষ্ঠুর কৌতুক! যে বেদনা সে নিজে পেয়ে ব্যথিত হচ্চে সে বেদনায় অপরকে ব্যথিত ক'রে সে নিশ্চিন্ত হ'য়ে আছে। উদগ্র আগ্রহ, উচ্ছ্বসিত আবেদনকে অগ্রাহ্য ক'রে সে চলেছে যেখানে কোনো সাড়া নেই কোনো অনুভূতি নেই তার পিছনে! স্রোতস্বতীকে পরিত্যাগ ক'রে চলেছে মরীচিকার প্রলোভনে।

।"

"আজ্ঞে ?"

"বউদিদির এখন অবকাশ আছে ?"

"আমি দেখে এসেছি তিনি স্নানের ঘরে ঢুকেছেন।"

"কত দেরি হবে ?"

একটু ভেবে শোভা বল্‌লে, "আধ ঘণ্টাটাক্‌। ডাক্‌ব ?"

মাথা নেড়ে বিনয় বল্‌লে, "না, তাও কি হয়! একটা কথা ছিল, তা সে অন্য সময়ে বল্‌ব অখন। গাড়ি এসে পড়ল, এখনি আবার কমলার ছবি আঁকতে যেতে হবে।"

আঙুলে আঁচলের কোণ জড়াতে জড়াতে শোভা বল্‌লে, "আমাকে যদি ব'লে যান আমি বউদিদিকে বল্‌তে পারি।"

মনে মনে একটুখানি কি ভেবে বিনয় বল্‌লে, "তোমারই বিষয়ে কোনো কথা—কিন্তু সে বউদিদিকেই প্রথমে বল্‌ব। আর একটি কথা শোভা, যে সব কথা তোমার সঙ্গে এখন হ'ল সে কথাও বউদিদিকে এখন বোলো না—বুঝলে ?"

আরক্ত মুখে শোভা ঘাড় নেড়ে জানালে বল্‌বে না।

তাড়াতাড়ি চা আর জলখাবার খেয়ে ছবি আঁকবার সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে বিনয় গাড়ি ক'রে বেরিয়ে গেল।

(ক্রমশঃ)
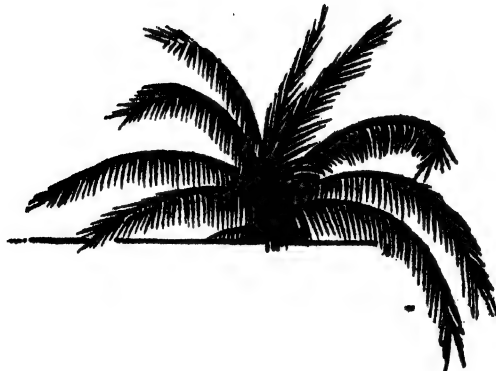
দেহাতীত

শ্রীরামেন্দু দত্ত

চোখের দেখায় স্মুধু বাড়ে জ্বালা,
বুকে এসো, ম'রে যাই !
যদি তব হিয়া নাহি দিতে পারো
স্মুধু হাসি নাহি চাই !
চাহিনা ও তব মিঠে মধু বুলি,
নয়নে কি হ'বে ও নয়ন তুলি' ?
বাহুর পীড়নে স্মুধু ধরা দিলে
তোমারে ত নাহি পাই !
অন্তরে মনে প্রেমের বাঁধনে
গোপনে বাঁধিতে চাই !

আমি চাহি তব ব্যাকুল হৃদয়,
আমি চাহি ভালবাসা,
আসল প্রেয়সী ধরা নাহি দিলে
করিনা দেহের আশা।
প্রিয়ে, তুমি নও তনু সুকোমল,
লীলা-চঞ্চল নয়ন-যুগল !
নশ্বর, রঙীন, অধর কেবল,
সরস, মধুর ভাষা !
তনু-মাধুরীর অতীত সুধায়
মিটিবে আমার আশা !

কে চাহে তোমার মঞ্জু দেহের
কোমল পরশখানি
অন্তর দিয়া কাঙালের হিয়া
রাঙাইয়া তোলো রাণী !

দেহাতীত

শ্রীরামেন্দু দত্ত

তুমি যাহা মোরে দাও দয়া করি'
ভালবাসা নয় যখনি তা' স্মরি,
কে যেন আমার সোনার সৌধে
মিশায়, ধূলায় টানি' !
তোমার ও তনু চাহিনে রূপসী,
তোমারেই চাহি রাণী !

আঁধার আকাশে মেঘ জমে' আসে,
কাল-বৈশাখী মাতে,
আমি প্রাণপণ ক'রে চলি রণ
প্রতিকূল গ্রহ সাথে।
তখন তোমার চিন্তা-সুধায়
ক্লান্ত হৃদয় নব-বল পায়,
মরণ বেলায় নেহারি তোমায়
অমৃত-কুম্ভ হাতে !
সঞ্জীবনীর মন্ত্র তুমি-ই
মৃত্যু-গহন-রাতে !

আমার সকল সাধের তৃপ্তি,
সুখের আকর মম !
অসুখী হিয়ার এই বাসনার
অসন্তোষেরে ক্ষম !
তোমার ও রূপ ভুলিবারে চাই !
শান্তি, তৃপ্তি, নাই ওতে নাই !
অন্তর মাঝে অরূপ সুষমা
ঝরুক্ তৃপ্তি সম !
প্রেম-সুন্দর অন্তর আলো,
সুন্দরী প্রিয়া মম !

নানাকথা

ধর্ম্ম মহাসম্মিলন

গত ১৪ই মাঘ কলিকাতা সেনেট্ হলে কবি রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে সর্ব্বধর্ম্ম সম্মিলনের অধিবেশন হয়। অভিভাষণের একস্থলে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন বর্ত্তমান কালের আদেশ এই যে, আমাদের মনকে এমনভাবে প্রস্তুত করিতে হইবে যাহাতে মন যে কেবল নিষ্ক্রিয় সহিষ্ণুতা অভ্যাস করিবে তাহা নহে, যাহা আমাদের ধর্ম্ম নহে, সেই পরের ধর্ম্ম প্রকৃত প্রস্তাবে বুঝিতে অভ্যস্ত হইতে হইবে। বুঝিতে হইবে যে পরের ধর্ম্ম আর কিছুই নহে,—সনাতন সত্যের বিশেষ একটা রূপ, ঈশ্বরানুভূতির একটা বিশেষ প্রণালীর অভিব্যক্তিমাত্র। তিনি আরো বলেন,—সাম্প্রদায়িকতা নাস্তিকতা অপেক্ষা ধর্ম্মের বড় শত্রু। পরমেশ্বরের প্রতি আমরা যতটুকু হৃদয়ের ভক্তি নিবেদন করিয়া দিতে পারি, তাহার প্রধান অংশটাই সাম্প্রদায়িকতা তাহার নিজের প্রাপ্য বলিয়া দাবী করে। সাম্প্রদায়িকভাবে অন্ধ হইয়া আমরা ঈশ্বরকে পূর্ণ ভক্তি নিবেদন করিতে পারি না।

কংগ্রেস

গত ২৯শে ৩০শে ও ৩১শে ডিসেম্বর কলিকাতার কংগ্রেসের ৪৩ তম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। এবারকার প্রধান আলোচ্য বিষয়—ডোমিনিয়ন ষ্টাটস্ মূলক নেহেরু কমিটির রিপোর্ট কংগ্রেস অনুমোদন করিবে অথবা মাদ্রাজ কংগ্রেসে অবলম্বিত পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শই অক্ষুণ্ণ রাখিবে--এই সমস্যা সম্পর্কে একটা বিরোধের আশঙ্কা আসন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু বিভিন্ন মতাবলম্বী নেতৃবর্গের সুবিবেচনার ফলে কংগ্রেস কর্ত্তৃক এ সমস্যার এই সমাধান হইয়াছে যে,১৯২৯ সালের শেষ পর্য্যন্ত,অর্থাৎ একবৎসর কাল, ব্রিটিশ গভর্মেণ্ট কর্ত্তৃক নেহেরু রিপোর্ট অনুমোদন এবং অবলম্বনের জন্যে অপেক্ষা করা হইবে, কিন্তু এক বৎসরের মধ্যে উক্ত রিপোর্ট গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক গ্রাহ্য না হইলে কিম্বা তৎপূর্ব্বে অগ্রাহ্য হইলে অসহযোগ নীতি অবলম্বনে পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য সচেষ্ট হইতে হইবে।

এবারকার কংগ্রেস জন-সমাগমের বিপুলতায় এবং সাজ-সরঞ্জামের গৌরবে পূর্ব্ব অধিবেশন গুলিকে পরাস্ত করিয়াছে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। বিরাট মণ্ডপটিতে অন্যূন বিশ হাজার লোকের বসিবার স্থানের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। এই বিপুল জন মণ্ডলীর প্রত্যেক ব্যক্তি যাহাতে বক্তৃতার প্রত্যেক কথা স্পষ্টভাবে শুনিতে পান তজ্জন্য লাউড্ স্পীকার যন্ত্রের সহায়তা লওয়া হয়াইছিল।

কংগ্রেস সংশ্লিষ্ট প্রদর্শনীও এবার আয়তন হিসাবে অন্যান্য বৎসরের প্রদর্শনী অপেক্ষা বৃহত্তর হইয়াছিল; কিন্তু শিল্পজাত বস্তু সম্পদে অন্যান্য বারের প্রদর্শনীর উপর প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল তাহা বলা যায় না। কয়েকটি বিষয়ে ১৯০৬ সালের কলিকাতা কংগ্রেস-প্রদর্শনী এবারকার প্রদর্শনী অপেক্ষা উচ্চস্তর অধিকার করিয়াছিল বলিয়া মনে হয়—নারী বিভাগ সম্ভবতঃ তন্মধ্যে অন্যতম।

বর্ত্তমান প্রদর্শনীতে লোক শিক্ষার্থে যে বিভাগগুলি প্রদর্শিত হইয়াছিল তন্মধ্যে স্বাস্থ্য,জনকল্যাণ, কৃষি, শিশুপালন প্রভৃতি বিভাগগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রদর্শনীর ক্ষেত্র-বিন্যাস, পথ-প্রণালী বিভাগ-বিচার, সাজ-সজ্জা দর্শকবর্গ সকলেরই প্রশংসা উদ্রেক করিয়াছিল।

কংগ্রেস এবং প্রদর্শনী শৃঙ্খলার সহিত পরিচালনা এবং নিয়মনের জন্য পুরুষ এবং নারী লইয়া একটি বৃহৎ স্বেচ্ছাসেবক-সঙ্ঘ গঠিত হইয়াছিল। সাধারণ কার্য্যপদ্ধতি, তৎপরতা এবং সর্ব্ববিষয়ে জনসাধারণকে, বিশেষতঃ মহিলাগণকে, সহায়তা দান বিষয়ে এই সঙ্ঘ যে খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহারা তাহার যথার্থ অধিকারী। তবে স্বেচ্ছাসেবকগণের বিদেশী সামরিক প্রথায় নামকরণ এবং সাজসজ্জা সকলের মনঃপূত হয় নাই।

স্বেচ্ছাসেবক-সঙ্ঘের অধিনায়ক শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু মহাশয় এবারকার সঙ্ঘটি গঠিত করিয়া উন্নত সংগঠন-শক্তির পরিচয় দিয়াছেন।

লণ্ডন বাঙলা সাহিত্য সম্মিলনী

কিছুকাল হইল লণ্ডনের প্রবাসী বাঙ্গালীদের উদ্যোগে লণ্ডনে একটি বাঙলা সাহিত্য সম্মিলনী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বিলাতে বাঙলা সাহিত্য চর্চ্চার এই বীজ বপন হওয়ার সংবাদে আমরা আনন্দিত হইয়াছি এবং সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করিতেছি যে,এই নবজাত প্রতিষ্ঠানটি উত্তরোত্তর পরিপুষ্টি এবং পরিণতির পথে গতিশীল হউক। সম্মিলনীর কর্ম্মসচিব শ্রীযুক্ত বীরেশচন্দ্র গুহ, শ্রীমতী লাবণ্যবালা দাস ও শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেনের সাক্ষরিত উক্ত সম্মিলনীর যে বিবরণটি আমরা পাইয়াছি সাধারণের অবগতির জন্য নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"লণ্ডনে অনেক বাঙালী ছাত্র। অথচ তাদের পরস্পরের সঙ্গে জানাশুনা আলাপ পরিচয় হ'তে পারে এমন কোনও বৈঠক লণ্ডনে ছিল না। অনেকদিন ধ'রেই বাঙালী ছেলেরা এ রকম একটা সমিতির অভাব অনুভব ক'রে আস্‌ছিলেন। তাই কয়েকজনের উৎসাহে, বিশেষ ক'রে শ্রীযুক্ত নীহারেন্দু দত্ত মজুমদারের চেষ্টায়, গত ৫ই চৈত্র ইং ১৮ই মার্চ্চ এই সম্মিলনীর প্রতিষ্ঠা হয়। এর উদ্দেশ্য এই যে, বাঙ্‌লাভাষী লোকদের একত্র ক'রে তাদের মধ্যে বাঙ্‌লা ভাষায় নানা রকম প্রসঙ্গ আলোচনা করার সুবিধা ক'রে দেওয়া। সম্মিলনীর অধিবেশনগুলি সাধারণতঃ দু'সপ্তাহ অন্তর অন্তর হ'য়ে থাকে। এর মধ্যে শ্রীযুক্ত প্রিয়লাল গুপ্ত, নলিনাক্ষ সান্যাল, নীহারেন্দু দত্ত-মজুমদার ও ভুপেন্দ্রনাথ ঘোষ অতি-সুন্দর রকমে সমিতির কাজ চালিয়েছেন। সভায় যে সমস্ত লঘু-গুরু বিষয় আলোচনা হ'য়ে গেছে তার কয়েকটির নমুনা নীচে দেওয়া গেল।

"বঙ্গীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্‌লা ভাষার পরিবর্ত্তে ইংরাজী ভাষায় বিজ্ঞানাদি বিবিধ শাস্ত্রের আলোচনা হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।"

"বিবাহ-অনুষ্ঠান সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জনীয়।"

"প্রাচ্যসভ্যতা প্রাচ্যের অর্থনৈতিক বিকাশের অন্তরায়।"

"আন্তর্জ্জাতিক শান্তি ও মানবসভ্যতার উন্নতির উদ্দেশ্যে যুদ্ধবিগ্রহ সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জনীয়।"

"ভারতীয় নারীর আদর্শ।"

"ভারতে পল্লী-সংগঠন।"

"ভারতে প্রজনন-শাসনের প্রয়োজনীয়তা।"

"উত্তরাধিকারসূত্রে অর্থলাভ বিধিবিরুদ্ধ হওয়া উচিত।"

এই সমস্ত বাদানুবাদের ভেতর দিয়ে আমাদের ছেলেদের মনস্তত্ত্বের খানিকটা পরিচয় পাওয়া যায়। "বিবাহ অনুষ্ঠান বর্জ্জনীয়" এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বেশীর ভাগ সভ্য মত দিয়েছিলেন, "প্রজনন-শাসনের প্রয়োজনীয়তা" সম্বন্ধে সকলেই একমত এবং অধিকাংশ সভ্যই মনে করেন যে "উত্তরাধিকারসূত্রে অর্থলাভ বিধিবিরুদ্ধ হওয়া উচিত।"

লণ্ডন প্রবাসী সমস্ত বাঙ্‌লা-ভাষী লোকদের সম্মিলিত করার জন্য ও নূতন ছাত্র ছাত্রীদের অভিনন্দন করার উদ্দেশ্যে গত ১৪ই অক্টোবর একটা উৎসবের আয়োজন হয়। এই উৎসবে প্রায় ৩০০ জন লোক উপস্থিত ছিলেন। শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক ও তাঁহার পত্নী, লর্ড সিংহ প্রভৃতি এই উৎসবে যোগদান ক'রেছিলেন। একাজে স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে অনেকে আমাদের সাহায্য ক'রেছিলেন—মেয়েদের মধ্যে শ্রীমতী তটিনী দাস ও শ্রীমতী মৃণালিনী সেনের নাম বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য।

গত ২৪শে নভেম্বর শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত "গঠনের কাজ" সম্বন্ধে সম্মিলনীতে তাঁর স্বাভাবিক চিত্তাকর্ষক ভাষায় একটি বক্তৃতা দেন। সমিতির কাজ আরও বেড়ে চল্‌ছে বলে কিছু টাকা সংগ্রহ করা হচ্ছে। তাই দিয়ে সমিতির কর্ম্মক্ষমতা বাড়্‌বে বলে আশা করা যায়। আপাততঃ এই সম্মিলনীর সভ্যদের জন্য একটি পুস্তকাগারের বন্দোবস্ত করা হচ্ছে।

আমরা আমাদের দেশ থেকে এই কাজে উৎসাহ ও সাহায্য পাব বলেই আমাদের স্বদেশবাসীদের কাছে আমাদের ইতিবৃত্ত জানাচ্ছি।"

নিখিল ভারত মহিলা সম্মিলনী

বিগত কংগ্রেস উপলক্ষে কলিকাতায় বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন দলের অনেকগুলি সভা সমিতি হইয়াছিল—নিখিল ভারত মহিলা সম্মিলনীর অধিবেশন তন্মধ্যে একটি। উক্ত অধিবেশনে ময়ূরভঞ্জের রাজমাতা শ্রীযুক্তা সুরুচি দেবী অভ্যর্থনা সমিতির, এবং ত্রিবাঙ্কুরের মহারাণী মাননীয়া সেতু-পার্ব্বতী বাঈ মূল সভার অধিনেত্রী হইয়াছিলেন। পর্দ্দা প্রথা, বাল্য বিবাহ ও বৈধব্য-বিপত্তি, ডাইভোর্স রীতি অবলম্বন প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা হয়। উক্ত অধিবেশনে বিশিষ্ট সাহিত্যিক শ্রীমতী অনুরূপা দেবী অবরোধ প্রথার বিরুদ্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং পর্দ্দা প্রথা বর্জ্জন সম্বন্ধে সভা সমীপে একটি প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন যাহা সভাকর্ত্তৃক গৃহীত হয়। বিচিত্রার বর্ত্তমান সংখ্যায় স্থানান্তরে উক্ত প্রবন্ধটি প্রকাশিত হইল।

* * * *

বাঙ্গালা সাহিত্যে মুসলমানের দান

বিগত ২৯শে পৌষ রবিবার অপরাহ্ণে কারমাইকেল হষ্টেল গৃহে একটি সাহিত্যিক বৈঠক বসে;—সুসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত এস্ ওয়াজেদ আলি মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। উক্ত সভায় প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ডক্টর দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয় সভার আলোচ্য বিষয়ে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। বিচিত্রার এই সংখ্যায় সে প্রবন্ধটি মুদ্রিত হইল।

বাংলা দেশের মুসলমানগণের মাতৃভাষা বাংলাভাষা পরিত্যাগ করিয়া উর্দ্দু ভাষা পরিগ্রহ করা উচিত বাংলাদেশের মুসলমান সম্প্রদায় ভুক্ত কয়েকজন ব্যক্তির এই মতবাদের বিরুদ্ধে শ্রীযুক্ত মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন এম্, এ একটি প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাবটি সভাকর্ত্তৃক গৃহীত হয়। সভাস্থলে শতাধিক মুসলমান যুবক ও ভদ্রব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

বাংলা ভাষায় মুসলমানের দান এবং বঙ্গীয় মুসলমানের বঙ্গ ভাষা পরিবর্জ্জনের অসমীচীনতা ও অসম্ভবতা বিষয়ে চিন্তাশীল ও সারগর্ভ বক্তৃতার দ্বারা সভাপতি মহাশয় শ্রোতৃবর্গকে পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন।

সরোজ নলিনী নারীমঙ্গল সমিতি

গত ১৯শে জানুয়ারি কবি শ্রীমতী কামিনী রায়ের সভাপতিত্বে কলিকাতা এলবার্ট হলে উক্ত সমিতির চতুর্থ বার্ষিক স্মৃতিসভার অধিবেশন হইয়াছে। বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। নারীর শিক্ষাবিস্তার ও কল্যাণসাধনের জন্য এই সমিতির প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। এই সমিতি ভারতবর্ষের বাহিরেও শাখা-সমিতি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে,—সমিতি উত্তরোত্তর শ্রীসম্পন্ন হ'ক, ও ইহার মধ্য দিয়া ভারতবর্ষের নারী বরেণ্যা হইয়া উঠুক, ইহাই কামনার বিষয়।

শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা

আগামী দোসরা চৈত্র শনিবার গঙ্গার পূর্ব্ব পারে প্রাচীন নবদ্বীপস্থ শ্রীমায়াপুরের শ্রীচৈতন্য মঠ হইতে বিরাট শোভা যাত্রাসহকারে সহস্র সহস্র যাত্রী পরিক্রম আরম্ভ করিয়া নয় দিনে নয়টি দ্বীপ (অন্তর্দ্বীপ, সীমন্তদ্বীপ, মধ্যদ্বীপ, গোদ্রুমদ্বীপ, কোলদ্বীপ, ঋতুদ্বীপ, জহ্নুদ্বীপ, মোদদ্রুমদ্বীপ, রুদ্রদ্বীপ) পরিভ্রমণ করিবেন। শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার সদস্যগণ সর্ব্বসাধারণকে এই পরিক্রমা-উৎসবে যোগদান করিবার জন্য সাদরে নিমন্ত্রণ করিতেছেন। শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকগণ বিনাব্যয়ে সমগ্র যাত্রিগণের আহার, বাসস্থান ও দ্রব্যাদি বহনের সমস্ত ব্যবস্থা করিবেন। মহিলাদের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা থাকিবে। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠের সম্পাদকের নিকট হইতে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়।

Printed at the Susil Printing Works, 47, Pataldanga Street, Calcutta.
by Srijut Probodh Lal Mukherjee and published by him from 51 Pataldanga Street, Calcutta.

মৈত্রী

শিল্পী— শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

বিদ্যাসমবায়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এলাহাবাদ ইংরেজি-বাংলা স্কুলের কোনো ছাত্রকে একদা এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, "River" শব্দের সংজ্ঞা কি। মেধাবী বালক তার নির্ভুল উত্তর দিয়েছিল। তার পরে যখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হ'ল, "কোনোদিন সে কোনো river দেখেছে কিনা," তখন গঙ্গাযমুনার তীরে ব'সে এই বালক বল্‌লে, "না, আমি দেখিনি"। অর্থাৎ এই বালকের ধারণা হয়েছিল যা চেষ্টা ক'রে কষ্ট ক'রে বানান ক'রে অভিধান ধ'রে পরের ভাষায় শেখা যায় তা আপন জিনিষ নয়, তা বহুদূরবর্ত্তী, অথবা তা কেবল পুঁথিলোকভুক্ত। এই ছেলে তাই নিজের জানা দেশটাকে মনে মনে জিয়োগ্রাফী বিদ্যা হ'তে বাদ দিয়েছিল। অবশ্য, পরে এক সময়ে সে শিখেছিল যে, যে-দেশে তার জন্ম ও বাস সেও ভূগোল বিদ্যার সামগ্রী, সেও একটা দেশ, সেখানকার riverও river। কিন্তু মনে করা যাক্ তার বিদ্যাচর্চ্চার শেষ পর্য্যন্ত এই খবরটি সে পায়নি, শেষ পর্য্যন্তই সে জেনেছে যে, আর সকল জাতেরই দেশ আছে কেবল তারই দেশ নেই, তাহ'লে কেবল যে তার পক্ষে সমস্ত পৃথিবীর জিওগ্রাফী অস্পষ্ট ও অসমাপ্ত থেকে যাবে তা নয়, তার মনটা অন্তরে অন্তরে শ্রদ্ধাহীন গৌরবহীন হ'য়ে থাক্‌বে। অবশেষে বহুকাল পরে যখন কোনো বিদেশী জিয়োগ্রাফী-পণ্ডিত এসে কথাচ্ছলে তাকে বলে যে, তোমাদের একটা প্রকাণ্ড বড় দেশ আছে, তার হিমালয় প্রকাণ্ড বড় পাহাড়, তার সিন্ধু গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র প্রকাণ্ড বড় নদী, তখন হঠাৎ এই মস্ত খবরটায় তার মাথা ঘুরে যায়, নূতন জ্ঞানটাকে সে সংযতভাবে বহন করতে পারে না, অনেক কালের অগৌরবটাকে একদিনে শোধ দেবার জন্যে সে চিৎকার শব্দে চারিদিকে ব'লে বেড়ায়, আর-সকলের দেশ দেশ-মাত্র, আমাদের দেশ স্বর্গ। একদিন যখন সে মাথা হেঁট ক'রে আওড়েছে যে, পৃথিবীতে আর সকলেরই দেশ আছে কেবল আমাদেরই নেই, তখনো বিশ্বসত্যের সঙ্গে তার অজ্ঞানকৃত বিচ্ছেদ ঘটেছিল, আর আজ যখন সে মাথা তুলে অসঙ্গত তারস্বরে হেঁকে বেড়ায় যে, আর সকলের দেশ আছে আমাদের আছে স্বর্গ, তখনো বিশ্বসত্যের সঙ্গে তার বিচ্ছেদ। পূর্ব্বের বিচ্ছেদ ছিল অজ্ঞানের, সুতরাং তা মার্জ্জনীয়, এখনকার বিচ্ছেদ শিক্ষিত মূঢ়তার, সুতরাং তা হাস্যকর এবং ততোধিক অনিষ্টকর।

সাধারণত ভারতীয় বিদ্যা সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণা সেও এই শ্রেণীর। শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে আমাদের নিজ দেশের বিদ্যার স্থান নেই, অথবা তার স্থান সব পিছনে,—সেই জন্য আমাদের সমস্ত শিক্ষার মধ্যে এই কথাটি প্রচ্ছন্ন

থাকে যে, আমাদের নিজ দেশের বিদ্যা ব'লে পদার্থই নেই, যদি থাকে সেটা অপদার্থ বল্‌লেই হয়। এমন সময়ে হঠাৎ বিদেশী পণ্ডিতের মুখে আমাদের বিদ্যার সম্বন্ধে একটু যদি বাহাবা শুনতে পাই অমনি উন্মত্ত হয়ে বলতে থাকি, পৃথিবীতে আর সকলের বিদ্যা মানবী আমাদের বিদ্যা দৈবী। অর্থাৎ আর সকল দেশের বিদ্যা মানবের স্বাভাবিক বুদ্ধি-বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ ভ্রম কাটিয়েবেড়ে উঠ্‌ছে, কেবল আমাদের দেশেই বিদ্যা ব্রহ্মা বা শিবের প্রসাদে একমুহূর্ত্তে ঋষিদের ব্রহ্মরন্ধ্র দিয়ে ভ্রমলেশ-বিবর্জ্জিত হ'য়ে অনন্তকালের উপযোগী আকারে বার হ'য়ে এসেছে। ইংরেজীতে যাকে বলে Special Creation এ তাই, এতে ক্রমবিকাশের প্রাকৃতিক নিয়ম খাটেনা; এ ইতিহাসের ধারাবাহিক পথের অতীত, সুতরাং এ-কে ঐতিহাসিক বিচারের অধীন করা চলে না; এ-কে কেবল মাত্র বিশ্বাসের দ্বারা বহন করতে হবে, বুদ্ধি দ্বারা গ্রহণ করতে হবে না। অহঙ্কারের আঁধি লেগে এ-কথা আমরা একেবারে ভুলে যাই যে, কোনো একটি বিশেষ জাতির জন্যই বিধাতা সর্ব্বাপেক্ষা অনুকূল ব্যবস্থা স্বহস্তে ক'রে দিয়েছেন, এসব কথা বর্ব্বর কালের কথা। Special Creation এর কথা আজকের দিনে আর ঠাঁই পায় না। আজ আমরা এই বুঝি যে, সত্যের সহিত সত্যের সম্বন্ধ, সকল বিদ্যার উদ্ভব যে নিয়মে বিশেষ বিদ্যার উদ্ভব সেই নিয়মেই। পৃথিবীতে কেবলমাত্র কয়েদীই অপর সাধারণের সহিত বিচ্ছিন্ন হ'য়ে Solitary cell এ থাকে, সত্যের অধিকার সম্বন্ধে বিধাতা কেবলমাত্র ভারতবর্ষকেই সেই Solitary cell এ অন্তরায়িত ক'রে রেখেছেন, একথা ভারতের গৌরবের কথা নয়।

দীর্ঘকাল আমাদের বিদ্যাকে আমরা একঘরে ক'রে রেখেছিলাম। দু'রকম ক'রে একঘরে করা যায়—এক অবজ্ঞার দ্বারা, আর এক, অতি-সম্মানের দ্বারা। দুইয়েরই ফল এক। দুইয়েতেই তেজ নষ্ট করে। এক কালে জাপানের মিকাডো তাঁর দুর্ভেদ্য রাজকীয় সম্মানের বেড়ার মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাক্‌তেন, প্রজাদের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ ছিলনা বল্‌লেই হয়। তার ফলে, শোগুন ছিল সত্যকার রাজা, আর মিকাডো ছিলেন নাম মাত্র রাজা। যখন মিকাডোকে যথার্থই আধিপত্য দেবার সঙ্কল্প হ'ল তখন তাঁর অতি-সম্মানের দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর ভেঙে তাঁকে সর্ব্বসাধারণের গোচর ক'রে দেওয়া হ'ল। আমাদের ভারতীয় বিদ্যার প্রাচারও তেমনি দুর্লঙ্ঘ্য ছিল। নিজেকে তা সকল দেশের বিদ্যা হ'তে একান্ত স্বতন্ত্র ক'রে রেখেছিল, পাছে বিপুল বিশ্ব-সাধারণের সম্পর্কে তার মধ্যে বিকার আসে। তার ফলে আমাদের দেশে সে হ'ল বিদ্যারাজ্যের মিকাডো; আর যে বিদেশী বিদ্যা বিশ্ববিদ্যার সঙ্গে অবিরত যোগ রক্ষা ক'রে নিয়তই আপন প্রাণশক্তিকে পরিপুষ্ট ক'রে তুল্‌চে সে-ই শোগুন হ'য়ে আমাদিগকে প্রবলপ্রতাপে শাসন করচে। আমরা অন্যটিকে উদ্দেশে নমস্কার ক'রে এ-কেই প্রত্যক্ষ সেলাম কর্‌লুম; এ-কেই খাজনা দিলুম এবং এ-রই কান-মলা খেলুম। ঘরে ব'সে এ-কে ম্লেচ্ছ ব'লে গাল দিলুম, এর শাসনে আমাদের মতিগতি বিকৃত হচ্চে ব'লে আক্ষেপ কর্‌লুম; এদিকে স্ত্রীর গহনা বেচে, নিজের বাস্তবাড়ি বন্ধক রেখে এ-র খাজনার শেষ কড়িটি শোধ করবার জন্যে ছেলেটাকে নিত্য এ-র কাছারিতে হাঁটাহাঁটি করাতে লাগলুম।

শিশু যে, সে-ই ধাত্রীর কোলে থাকে। সাধারণের ভিড় হ'তে তাকে রক্ষা ক'রেই মানুষ কর্‌তে হয়। তার ঘরটি নিভৃত, তার দোলাটি নিরাপদ। কিন্তু তাকে যদি চিরদিনই ঢাকাঢুকি দিয়ে ঘরের কোণে অঞ্চলের আড়াল ক'রে রাখ তা হ'লে উল্টো ফল হয়। অর্থাৎ যে-শিশু একদা অত্যন্ত স্বতন্ত্র ও সুরক্ষিত ছিল ব'লেই পরিপুষ্ট হ'য়ে উঠেছিল, সেই শিশুই বয়ঃপ্রাপ্ত হ'য়ে তার নিভৃত বেষ্টনের মধ্যে অকর্ম্মণ্য কাণ্ডজ্ঞানবিবর্জ্জিত হ'য়ে ওঠে। সুঁটির মধ্যে যে বীজ লালিত হয়েচে, ক্ষেতের মধ্যে সেই বীজের বর্দ্ধিত হওয়া চাই।

একদিন চৈন পারসিক মৈসর গ্রীক রোমীয় প্রভৃতি প্রত্যেক বড় জাতিই ভারতীয়ের মতই ন্যূনাধিক পরিমাণে নিজের সুরক্ষিত স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে নিজ সভ্যতাকে বড় ক'রে তুলেছিল। পৃথিবীর এখন বয়স হয়েচে; জাতিগত বিদ্যা-স্বাতন্ত্র্যকে একান্ত ভাবে লালন কর্‌বার দিন আজ আর নেই। আজ বিদ্যাসমবায়ের যুগ এসেচে। সেই সমবায়ে যে-বিদ্যা যোগ দেবে না, যে বিদ্যা কৌলীন্যের অভিমানে অনূঢ়া হ'য়ে থাক্‌বে, সে নিষ্ফল হ'য়ে মরবে।

বিদ্যাসমবায়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অতএব আমাদের দেশে বিদ্যাসমবায়ের একটি বড় ক্ষেত্র চাই, যেখানে বিদ্যার আদানপ্রদান ও তুলনা হবে, যেখানে ভারতীয় বিদ্যাকে মানবের সকল বিদ্যার ক্রমবিকাশের মধ্যে রেখে বিচার করতে হবে।

তা করতে গেলে ভারতীয় বিদ্যাকে তার সমস্ত শাখা-উপশাখার যোগে সমগ্র ক'রে জানা চাই। ভারতীয় বিদ্যার সমগ্রতার জ্ঞানটিকে মনের মধ্যে পেলে তার সঙ্গে বিশ্বের সমস্ত বিদ্যার সম্বন্ধনির্ণয় স্বাভাবিক প্রণালীতে হ'তে পারে। কাছের জিনিষের বোধ দূরের জিনিষের বোধের সহজ ভিত্তি।

বিদ্যার নদী আমাদের দেশে বৈদিক, পৌরাণিক, বৌদ্ধ, জৈন, প্রধানত এই চারি শাখায় প্রবাহিত। ভারত চিত্ত-গঙ্গোত্রীতে এর উদ্ভব। কিন্তু দেশে যে নদী চল্‌ছে কেবল সেই দেশের জলেই সেই নদী পুষ্ট না হ'তেও পারে। ভারতের গঙ্গার সঙ্গে তিব্বতের ব্রহ্মপুত্র মিলেচে। ভারতের বিদ্যার স্রোতেও সেইরূপ মিলন ঘটেচে। বার হ'তে মুসলমান যে জ্ঞান ও ভাবের ধারা এখানে বহন ক'রে এনেচে সেই ধারা ভারতের চিত্তকে স্তরে স্তরে অভিষিক্ত করেচে, তা আমাদের ভাষায় আচারে শিল্পে সাহিত্যে সঙ্গীতে নানা আকারে প্রকাশমান। অবশেষে সম্প্রতি য়ুরোপীয় বিদ্যার বন্যা সকল বাঁধ ভেঙে দেশকে প্লাবিত করেচে, তাকে হেসে উড়োতেও পারিনে, কেঁদে ঠেকানোও সম্ভবপর নয়।

অতএব আমাদের বিদ্যায়তনে বৈদিক, পৌরাণিক, বৌদ্ধ, জৈন, মুসলমান ও পার্সি বিদ্যার সমবেত চর্চ্চায় আনুষঙ্গিক ভাবে য়ুরোপীয় বিদ্যাকে স্থান দিতে হবে।

সমস্ত পৃথিবীকে বাদ দিয়ে যারা ভারতকে একান্ত ক'রে দেখে তারা ভারতকে সত্য ক'রে দেখে না। তেমনি যারা ভারতের কেবল এক অংশকেই ভারতের সমগ্রতা হ'তে খণ্ডিত ক'রে দেখে তারাও ভারত-চিত্তকে নিজের চিত্তের মধ্যে উপলব্ধি করতে পারে না। এই কারণবশতই পোলিটিকাল ঐক্যের অপেক্ষা গভীরতর উচ্চতর মহত্তর যে ঐক্য আছে তার কথা আমরা শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করতে পারিনে। পৃথিবীর সকল ঐক্যের যা শাশ্বত ভিত্তি তাই সত্য ঐক্য। সে ঐক্য চিত্তের ঐক্য, আত্মার ঐক্য। ভারতে সেই চিত্তের ঐক্যকে পোলিটিকাল ঐক্যের চেয়ে বড় ব'লে জান্‌তে হবে; কারণ এই ঐক্যে সমস্ত পৃথিবীকে ভারতবর্ষ আপন অঙ্গনে আহ্বান করতে পারে। অথচ দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষা এমন যে, সেই শিক্ষার গুণেই ভারতীয় চিত্তকে আমরা তার স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে পারচি নে। ভারতে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, মুসলমান শিক, পার্সি, খৃষ্টানকে এক বিরাট চিত্তক্ষেত্রে সত্যসাধনার যজ্ঞে সমবেত করাই ভারতীয় বিদ্যায়তনের প্রধান কাজ। ছাত্রদিগকে কেবল ইংরেজি মুখস্থ করানো, অঙ্ক কষানো, সায়ান্স শেখানো নয়। নেবার জন্যে অঞ্জলিকে বাঁধ্‌তে হয়, দেবার জন্যেও;—দশ আঙুল ফাঁক ক'রে দেওয়াও যায় না, নেওয়াও যায় না। ভারতের চিত্তকে একত্র সন্নিবিষ্ট করলে তবে আমরা সত্য ভাবে নিতেও পারব দিতেও পারব।
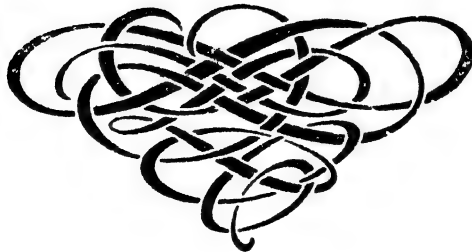
—উপন্যাস-

—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫৫

সেদিন সকালে অনেকক্ষণ ধ'রে কুমু তার দাদার ঘরে ব'সে গান বাজনা করেচে। সকাল বেলাকার সুরে নিজের ব্যক্তিগত বেদনা বিশ্বের জিনিষ হ'য়ে অসীমরূপে দেখা দেয়। তার বন্ধনমুক্তি ঘটে। সাপগুলো যেন মহাদেবের জটায় প্রকাশ পায় ভূষণ হ'য়ে। ব্যথার নদীগুলি ব্যথার সমুদ্রে গিয়ে বৃহৎ বিরাম লাভ করে। তার রূপ বদলে যায়, চঞ্চলতা লুপ্ত হয় গভীরতায়। বিপ্রদাস নিঃশ্বাস ছেড়ে বল্‌লে, "সংসারে ক্ষুদ্র কালটাই সত্য হ'য়ে দেখা দেয় কুমু, চিরকালটা থাকে আড়ালে ; গানে চিরকালটাই আসে সামনে, ক্ষুদ্র কালটা যায় তুচ্ছ হ'য়ে, তাতেই মন মুক্তি পায়।"

এমন সময়ে খবর এলো,"মহারাজ মধুসূদন এসেছেন।"

এক মুহূর্ত্তে কুমুর মুখ ফ্যাকাসে হ'য়ে গেল ; তাই দেখে বিপ্রদাসের মনে বড়ো বাজ্‌লো, বল্‌লে, "কুমু, তুই বাড়ির ভিতরে যা। তোকে হয়তো দরকার হবে না।"

কুমু দ্রুতপদে চ'লে গেল। মধুসূদন ইচ্ছে ক'রেই খবর না দিয়ে এসেচে। এ পক্ষ আয়োজনের দৈন্য ঢাকা দেবার অবকাশ না পায় এটা তার সঙ্কল্পের মধ্যে। বড় ঘরের লোক ব'লে বিপ্রদাসের মনের মধ্যে একটা বড়াই আছে ব'লে মধুসূদনের বিশ্বাস। সেই কল্পনাটা সে সইতে পারে না। তাই আজ সে এমন ভাবে এল যেন দেখা করতে আসেনি, দেখা দিতে এসেচে।

মধুসূদনের সাজটা ছিল বিচিত্র, বাড়ির চাকর দাসীরা অভিভূত হবে এমনতরো বেশ। ডোরা কাটা বিলিতি সার্টের উপর একটা রঙীন ফুলকাটা সিল্কের ওয়েষ্ট কোট, কাঁধের উপর পাটকরা চাদর, যত্নে কোঁচান কালাপেড়ে শান্তিপুরে ধুতি, বার্ণিশ করা কালো দরবারী জুতো, বড়ো বড়ো হীরে পান্নাওয়ালা আঙটিতে আঙুল ঝলমল করচে। প্রশস্ত উদরের পরিধি বেষ্টন ক'রে মোটা সোনার ঘড়ির শিকল, হাতে একটি সৌখীন লাঠি, তার সোনার হাতলটি হাতীর মুণ্ডের আকারে নানা জহরতে খচিত। একটা অসমাপ্ত নমস্কারের দ্রুত আভাস দিয়ে খাটের পাশের একটা কেদারায় ব'সে বল্‌লে, "কেমন আছেন বিপ্রদাস বাবু, শরীরটা তো তেমন ভালো দেখাচ্চে না।"

বিপ্রদাস তার কোনো উত্তর না দিয়ে বললে, "তোমার শরীর ভালোই আছে দেখচি।"

"বিশেষ ভালো যে তা' বলতে পারিনে—সন্ধের দিকটা মাথা ধরে, আর ক্ষিদেও ভালো হয় না। খাওয়া দাওয়ার অল্প একটু অযত্ন হ'লেই সইতে পারিনে। আবার অনিদ্রাতেও মাঝে মাঝে ভুগি, ঐটেতে সবচেয়ে দুঃখ দেয়।"

শুশ্রূষার লোকের যে সর্ব্বদা দরকার তারই ভূমিকা পাওয়া গেল।

বিপ্রদাস বল্‌লে, "বোধকরি আপিসের কাজ নিয়ে বেশী পরিশ্রম করতে হচ্চে।"

"এমনিই কি! আপিসের কাজকর্ম্ম আপনিই চ'লে যাচ্চে, আমাকে বড়ো কিছু দেখ্‌তে হয় না। ম্যাক্‌নটন সাহেবের উপরই বেশির ভাগ কাজের ভার, সার আর্গা পীবডিও আমাকে অনেকটা সাহায্য করেন।"

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গুড়গুড়ি এল, পানের বাটায় পান ও মসলা নিয়ে চাকর এসে দাঁড়ালো, তার থেকে একটি ছোট এলাচ নিয়ে মুখে পুরল, আর কিছু নিলে না। গুড়গুড়ির নল নিয়ে দুই একবার মৃদু মৃদু টান দিলে। তারপরে গুড়গুড়ির নলটা বাঁ হাতে কোলের উপরেই ধরা রইল। আর তার ব্যবহার হ'ল না। অন্তঃপুর থেকে খবর এলো জলখাবার প্রস্তুত। ব্যস্ত হ'য়ে বল্‌লে, "ঐটি তো পারব না। আগেই তো বলেচি, খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধে খুব ধর্‌কাট্ ক'রেই চলতে হয়।"

বিপ্রদাস দ্বিতীয়বার অনুরোধ করলে না। চাকরকে বললে, "পিসিমাকে বলগে, ওঁর শরীর ভালো নেই, খেতে পারবেন না।"

বিপ্রদাস চুপ ক'রে রইল। মধুসূদন আশা করছিল, কুমুর কথা আপনিই উঠবে। এতদিন হ'য়ে গেল, এখন কুমুকে শ্বশুর বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার প্রস্তাব বিপ্রদাস আপনিই উদ্বিগ্ন হ'য়ে করবে—কিন্তু কুমুর নামও করে না যে। ভিতরে ভিতরে একটু একটু ক'রে রাগ জন্মাতে লাগ্‌ল। ভাবলে এসে ভুল করেচি। সমস্ত নবীনের কাণ্ড। এখনি গিয়ে তাকে খুব একটা কড়া শাস্তি দেবার জন্যে মনটা ছটফট করতে লাগল।

এমন সময় সাদাসিধে সরু কালাপেড়ে একখানি সাড়ি প'রে মাথায় ঘোমটা টেনে কুমু ঘরে প্রবেশ করলে। বিপ্রদাস এটা আশা করে নি। সে আশ্চর্য্য হ'য়ে গেল। প্রথমে স্বামীর, পরে দাদার পায়ের ধূলো নিয়ে কুমু মধুসূদনকে বললে, "দাদার শরীর ক্লান্ত, ওঁকে বেশি কথা কওয়াতে ডাক্তারের মানা। তুমি এই পাশের ঘরে এসো।"

মধুসূদনের মুখ লাল হ'য়ে উঠ্‌ল। দ্রুত চৌকি থেকে উঠে পড়ল। কোল থেকে গুড়গুড়ির নলটা মাটিতে প'ড়ে গেল। বিপ্রদাসের মুখের দিকে না চেয়েই বললে "আচ্ছা, তবে আসি।"

প্রথম ঝোঁকটা হোলো হন্ হন্ ক'রে গাড়িতে উঠে বাড়িতে চ'লে যায়। কিন্তু মন প'ড়েচে বাঁধা। অনেক দিন পরে আজ কুমুকে দেখেচে। ওকে অত্যন্ত সাদাসিধে আটপৌরে কাপড়ে এই প্রথম দেখলে। ওকে এত সুন্দর আর কখনো দেখে নি। এমন সংযত, এত সহজ। মধুসূদনের বাড়িতে ও ছিল পোষাকী মেয়ে, যেন বাইরের মেয়ে, এখানে সে একেবারে ঘরের মেয়ে। আজ যেন ওকে অত্যন্ত কাছের থেকে দেখা গেল। কি স্নিগ্ধ মূর্ত্তি! মধুসূদনের ইচ্ছে করতে লাগল, একটু দেরি না ক'রে এখনি ওকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যায়। ও আমার, ও আমারি, ও আমার ঘরের, আমার ঐশ্বর্য্যের, আমার সমস্ত দেহ মনের, এই কথাটা উল্‌টে পাল্‌টে বল্‌তে ইচ্ছে করে।

পাশের ঘরে একটা সোফা দেখিয়ে কুমু যখন বস্‌তে বল্‌লে, তখন ওকে বসতেই হোলো। নিতান্ত যদি বাইরের ঘর না হোত তাহ'লে কুমুকে ধ'রে সোফায় আপনার পাশে বসাত। কুমু না ব'সে একটা চৌকির পিছনে তার পিঠের উপর হাত রেখে দাঁড়াল। বল্‌লে, "আমাকে কিছু বলতে চাও?"

ঠিক এমন সুরে প্রশ্নটা মধুসূদনের ভালো লাগ্‌ল না, বল্‌লে, "যাবে না বাড়িতে?"

"না।"

মধুসূদন চমকে উঠ্‌ল—বললে, "সে কি কথা!"

"আমাকে তোমার তো দরকার নেই।"

মধুসূদন বুঝলে শ্যামাসুন্দরীর খবরটা কানে এসেচে, এটা অভিমান। অভিমানটা ভালোই লাগ্‌ল। বল্‌লে, "কি যে বলো তার ঠিক নেই। দরকার নেই তো কি? শূন্য ঘর কি ভালো লাগে?"

এ নিয়ে কথা কাটাকাটি করতে কুমুর প্রবৃত্তি হ'ল না। সংক্ষেপে আর একবার বললে, "আমি যাব না।"

"মানে কি? বাড়ির বৌ বাড়িতে যাবে না—?"

কুমু সংক্ষেপে বল্‌লে, "না।"

মধুসূদন সোফা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বল্‌লে, "কি! যাবে না! যেতেই হবে।"

কুমু কোনো জবাব করলে না। মধুসূদন বল্‌লে, "জানো পুলিশ ডেকে তোমাকে নিয়ে যেতে পারি ঘাড়ে ধ'রে! 'না' বল্‌লেই হোলো!"

কুমু চুপ ক'রে রইল। মধুসূদন গর্জ্জন ক'রে বল্‌লে, "দাদার স্কুলে নূরনগরী কায়দা শিক্ষা আবার আরম্ভ হ'য়েচে?"

কুমু দাদার ঘরের দিকে একবার কটাক্ষপাত ক'রে বললে, "চুপ করো, অমন চেঁচিয়ে কথা কোয়ো না।"

"কেন? তোমার দাদাকে সামলে কথা কইতে হবে নাকি? জানো এই মুহূর্ত্তে ওকে পথে বার করতে পারি।"

পরক্ষণেই কুমু দেখে ওর দাদা ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েচে। দীর্ঘকায়, শীর্ণদেহ, পাণ্ডুবর্ণ মুখ, বড়ো বড়ো চোখ দুটো জ্বালাময়, একটা মোটা শাদা চাদর গা ঢেকে মাটিতে লুটিয়ে পড়চে, কুমুকে ডেকে বললে, "আয় কুমু, আয় আমার ঘরে।"

মধুসূদন চেঁচিয়ে উঠ্‌ল, বল্লে, "মনে থাকবে তোমার এত আস্পর্দ্ধা! তোমার নূরনগরের নূর মুড়িয়ে দেব তবে আমার নাম মধুসূদন।"

ঘরে গিয়েই বিপ্রদাস বিছানায় শুয়ে পড়ল। চোখ বন্ধ করলে, কিন্তু ঘুমে নয়, ক্লান্তিতে ও চিন্তায়। কুমু শিয়রের কাছে ব'সে পাখা নিয়ে বাতাস করতে লাগল। এমনি ক'রে অনেকক্ষণ কাটলে পর ক্ষেমা পিসি এসে বললে, "আজ কি খেতে হবেনা কুমু? বেলা যে অনেক হোলো?"

বিপ্রদাস চোখ খুলে বললে, "কুমু, যা' খেতে যা।— তোর কালুদাকে পাঠিয়ে দে।"

কুমু বললে, "দাদা, তোমার পায়ে পড়ি, এখন কালুদাকে না, একটু ঘুমোবার চেষ্টা করো।"

বিপ্রদাস কিছু না ব'লে সুগভীর বেদনার দৃষ্টিতে কুমুর মুখেরদিকে চেয়ে রইল। খানিকবাদে নিশ্বাস ফেলে আবারচোখ বুজ্‌লে। কুমু ধীরে ধীরে বেরিয়ে গিয়ে দরজা দিল ভেজিয়ে।

একটু পরেই কালু খবর পাঠালো যে আসতে চায়। বিপ্রদাস উঠে তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বসল। কালু বললে, "জামাই এসে অল্পক্ষণ পরেই তো চ'লে গেল। কি হোলো বলোতো। কুমুকে ওদের ওখানে ফিরে নিয়ে যাবার কথা কিছু বললে কি?"

"হাঁ বলেছিল। কুমু তার জবাব দিয়েছে, সে যাবে না।"

কালু বিষম ভীত হ'য়ে বললে, "বলো কি দাদা! এ যে সর্ব্বনেশে কথা!"

"সর্ব্বনাশকে আমরা কোনো কালে ভয় করিনে, ভয় করি অসম্মানকে।"

"তা' হ'লে তৈরি হও, আর দেরি নেই। রক্ষে আছে, যাবে কোথায়। জানি তো, তোমার বাবা ম্যাজিষ্ট্রেটকে তুচ্ছ করতে গিয়ে অন্ততঃ দু'লাখ টাকা লোকসান করেছিলেন। বুক ফুলিয়ে নিজের বিপদ ঘটানো ও তোমাদের পৈত্রিক সখ। ওটা অন্তত আমার বংশে নেই, তাই তোমাদের সাংঘাতিক পাগ্‌লামিগুলো চুপ ক'রে সইতে পারিনে। কিন্তু বাচব কি ক'রে?"

বিপ্রদাস উঁচু বাঁ হাঁটুর উপর ডান পা তুলে দিয়ে তাকিয়ায় মাথা রেখে চোখ বুজেখানিকক্ষণ ভাবলে। অবশেষে চোখ খুলে বললে, "দলিলের সর্ত্ত অনুসারে মধুসূদন ছ'মাস নোটিস না দিয়ে আমার কাছ থেকে টাকা দাবী করতে পারে না। ইতিমধ্যে সুবোধ আষাঢ় মাসের মধ্যেই এসে পড়বে—তখন একটা উপায় হ'তে পারবে।"

কালু একটু বিরক্ত হ'য়েই বললে, "উপায় হবে বই কি। বাতিগুলো এক দমকায় নিব্‌ত, সেইগুলো একে একে ভদ্র রকম ক'রে নিববে।"

"বাতি তলার খোপটার মধ্যে এসে জ্বল্‌চে, এখন যে ফরাস এসে তা'কে যে রকম ফুঁ দিয়েই নেবাক না—তাতে বেশি হা হুতাশ করবার কিছু নেই। ঐ তলানির আলোটার তদ্বির করতে আর ভালো লাগে না, ওর চেয়ে পুরো অন্ধকারে সোয়াস্তি পাওয়া যায়।"

কালুর বুকে ব্যথা বাজল। সে বুঝলে এটা অসুস্থ মানুষের কথা, বিপ্রদাস তো এ রকম হালছাড়া প্রকৃতির লোক নয়; পরিণামটাকে ঠেকাবার জন্যে বিপ্রদাস এতদিন নানা রকম প্ল্যান করছিল। তার বিশ্বাস ছিল কাটিয়েউঠ্‌বে। আজ ভাবতেও পারে না,—বিশ্বাস করবারও জোর নেই।

কালু স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে বিপ্রদাসের মুখের দিকে চেয়ে বললে, "তোমাকে কিছু ভাবতে হবে না ভাই, যা' করবার আমিই করব। যাই একবার দালাল মহলে ঘুরে আসিগে।"

পরদিন বিপ্রদাসের কাছে এক ইংরাজী চিঠি এল— মধুসূদনের লেখা।—ভাষাটা ওকালতী ছাঁদের—হয় তো বা এটর্ণিকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছে। নিশ্চিত ক'রে জানতে চায় কুমু ওদের ওখানে ফিরে আসবে কিনা, তার পরে যথা কর্ত্তব্য করা হবে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিপ্রদাস কুমুকে জিজ্ঞাসা করলে, "কুমু, ভালো ক'রে সব ভেবে দেখেছিস ?"

কুমু বল্‌লে, "ভাবনা সম্পূর্ণ শেষ ক'রে দিয়েচি, তাই আমার মন আজ খুব নিশ্চিন্ত। ঠিক মনে হচ্চে যেমন এখানে ছিলুম তেমনি আছি—মাঝে যা' কিছু ঘটেছে সমস্ত স্বপ্ন।"

"যদি তোকে জোর ক'রে নিয়ে যাবার চেষ্টা হয় তুই, জোর ক'রে সামলাতে পারবি ?"

"তোমার উপর উৎপাত যদি না হয় তো খুব পারবো।"

"এই জন্যে জিজ্ঞাসা করচি যে, যদি শেষকালে ফিরে যেতেই হয় তা' হ'লে যত দেরি ক'রে যাবি ততই সেটা বিশ্রী হ'য়ে উঠ্‌বে। ওদের সঙ্গে সম্বন্ধ সূত্র তোর মনকে কোথাও কিছুমাত্র জড়িয়েচে কি ?"

"কিছুমাত্র না। কেবল আমি নবীনকে, মোতির মাকে, হাব্‌লুকে ভালোবাসি। কিন্তু তারা ঠিক যেন অন্য বাড়ির লোক।"

"দেখ্ কুমু, ওরা উৎপাত করবে। সমাজের জোরে, আইনের জোরে উৎপাত করবার ক্ষমতা ওদের আছে। সেই জন্যেই সেটাকে অগ্রাহ্য করা চাই। করতে গেলেই লজ্জা, সঙ্কোচ, ভয় সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়ে লোকসমাজের সামনে দাঁড়াতে হবে, ঘরে বাইরে চারিদিকে নিন্দের তুফান উঠ্‌বে, তার মাঝখানে মাথা তুলে তোর ঠিক থাকা চাই।"

"দাদা, তাতে তোমার অনিষ্ট, তোমার অশান্তি হবে না ?"

"অনিষ্ট অশান্তি কাকে তুই বলিস কুমু ? তুই যদি অসম্মানের মধ্যে ডুবে থাকিস্ তার চেয়ে অনিষ্ট আমার আর কি হ'তে পারে ? যদি জানি যে, যে-ঘরে তুই আছিস্ সে তোর ঘর হ'য়ে উঠ্‌ল না, তোর উপর যার একান্ত অধিকার সে তোর একান্ত পর, তবে আমার পক্ষে তার চেয়ে অশান্তি ভাবতে পারিনে। বাবা তোকে খুব ভালো বাসতেন, কিন্তু তখনকার দিনে কর্ত্তারা থাকতেন দূরে দূরে। তোর পক্ষে পড়াশুনোর দরকার আছে তা' তিনি মনেই করতেন না। আমিই নিজে গোড়া থেকে তোকে শিখিয়েছি, তোকে মানুষ ক'রে তুলেছি। তোর বাপ-মার চেয়ে আমি কোনো অংশে কম না। সেই মানুষ ক'রে তোলার দায়িত্ব যে কি আজ তা' বুঝতে পারচি। তুই যদি অন্য মেয়ের মতো হতিস্ তা হ'লে কোথাও তোর ঠেকত না। আজ যেখানে তোর স্বাতন্ত্র্যকে কেউ বুঝবে না, সম্মান করবে না, সেখানে যে তোর নরক। আমি কোন্ প্রাণে তোকে সেখানে নির্ব্বাসিত ক'রে থাকব ? যদি আমার ছোট ভাই হতিস্ তা হ'লে যেমন ক'রে থাকতিস তেমনি ক'রেই চিরদিন থাক্ না আমার কাছে।"

দাদার বুকের কাছে খাটের প্রান্তে মাথা রেখে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে কুমু বল্‌লে, "কিন্তু আমি তোমাদের তো ভার হ'য়ে থাকব না ? ঠিক বলচ ?"

কুমুর মাথায় হাত বুলতে বুলতে বিপ্রদাস বললে, "ভার কেন হবি বোন্ ? তোকে খুব খাটিয়ে নেব। আমার সব কাজ দেব তোর হাতে। কোনো প্রাইভেট সেক্রেটারি এমন ক'রে কাজ করতে পারবে না। আমাকে তোর বাজনা শোনাতে হবে, আমার ঘোড়া তোর জিম্মেয় থাকবে। তা' ছাড়া জানিস্ আমি শেখাতে ভালোবাসি। তোর মতো ছাত্রী পাব কোথায় বল্ ? এক কাজ করা যাবে, অনেক দিন থেকে পার্শি পড়বার সখ আমার আছে। একলা পড়তে ভালো লাগে না। তোকে নিয়ে পড়ব, তুই নিশ্চয় আমার চেয়ে এগিয়ে যাবি, আমি একটুও হিংসে করব না দেখিস্।"

শুন্‌তে শুন্‌তে কুমুর মন পুলকিত হ'য়ে উঠ্‌ল, এর চেয়ে জীবনে সুখ আর কিছু হ'তে পারে না।

খানিক পরে বিপ্রদাস আবার বল্‌লে, "আরো একটা কথা তোকে ব'লে রাখি কুমু, খুব শীঘ্রই আমাদের কাল বদল হবে, আমাদের চালও বদ্‌লাবে। আমাদের থাকতে হবে গরীবের মতো। তখন তুই থাকবি আমাদের গরীবের ঐশ্বর্য্য হ'য়ে।"

কুমুর চোখে জল এলো, বললে, "আমার এমন ভাগ্য যদি হয় তো বেঁচে যাই।"

বিপ্রদাস মধুসূদনের চিঠি হাতে রাখলে, উত্তর দিলে না।

(ক্রমশঃ)
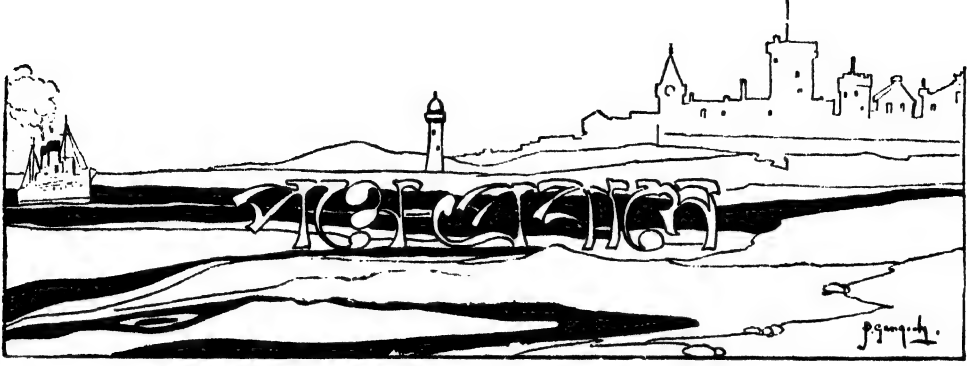
—শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়

৬

ইংলণ্ড দেশটা যে কি সাংঘাতিক ছোট একটু ঘুরে ফিরে না দেখ্‌লে বিশ্বাস হয় না। ছোট তো আমাদের এক একটা প্রদেশও, কিন্তু তাদের ছোটত্ব মানুষের হাতে গড়া। আর ইংলণ্ডের ছোটত্ব নৈসর্গিক। এর সর্ব্বাঙ্গ ঘিরেছে আঁট পোষাকের মতো সমুদ্র, এর মাথার উপরে চাপ দিয়েছে টুপীর মতো আকাশ। আকাশ? না, আকাশ বল্‌তে আমরা যা বুঝি তা এদেশে নেই। সেই জন্যেই তো দেশটাকে অস্বাভাবিক ছোট বোধ হয়। একটা অন্ধকূপ বিশেষ। এর ভিতরে যারা থাকে তারা পরস্পরের বড্ড কাছাকাছি থাকে, পরস্পরের নিশ্বাসের শব্দ শুন্‌তে পায়, হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন গোণে। ইংলণ্ডে যখনি যে এসেছে সে বেমালুম ইংরেজ হ'য়ে গেছে। এর উদরের জারক রস এতই প্রবল যে আমিষ ও নিরামিষ দুধ ও তামাক যখন যাই পেয়েছে তখন তাই পরিপাক ক'রে এক রক্ত মাংসে পরিণত করেছে। ইংলণ্ডের আশ্চর্য্য একতার কারণ ইংলণ্ড দেশটা দৈর্ঘ্যে প্রস্থে ও উচ্চতায় অত্যন্ত আঁটসাট ও ছোট।

ভারতবর্ষে যখন সারা দিনের খাটুনীর শেষে তারা-ভরা আকাশের তলে ব'সে নিশ্বাস ছাড়ি তখন সে নিশ্বাস লক্ষ যোজন দূরে নিঃসীম শূন্যে মিলিয়ে যায়, মনে হয় না যে ভারতবর্ষ আমাদের বেঁধে রেখেছে। আমাদের বিশাল দেশ, বিরাট আকাশ; আমরা কোটি তারকার সঙ্গ পেয়ে ধন্য, মানবসংসারের প্রাত্যহিক তুচ্ছতাকে আমরা তুচ্ছ ব'লেই জানি। আর এরা? এদের কিবা রাত্রি কিবা দিন—সমস্ত জীবনটাই একটা non-stop dance কিম্বা non stop flight। ছন্দহীন যতিহীন বেতালা জীবন, জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি অশ্রান্ত বন্যাবেগ, এক মুহূর্ত্ত বিশ্রাম করতে বসলে প্রতিযোগীরা লাথি মেরে এগিয়ে যায়, বৃদ্ধ বয়সেও অন্নচিন্তায় অস্থির ক'রে রাখে। দিনের পরে কখন রাত আসে, রাতের শেষ কোনো দিন হয় কি না, ঠিক নেই। এদেশের সূর্য্য সাম্রাজ্য পাহারা দিতে বেরিয়ে স্বরাজ্যে হাজিরা দেবার সময় পায় না। মাটি ও আকাশের মাঝখানে মেঘ ও কুয়াশার প্রাচীর, মানুষের প্রাণের কথা তারালোকে পৌঁছায় না, ঘরের কোণের ছোট ছোট দুঃখ সুখকে মহাজগতের বড় বড় দুঃখ সুখের সঙ্গে মিলিয়ে ধর্‌বার সুযোগ মেলে না, "the world is too much with us night and day!"

ইংলণ্ডের সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য ইংলণ্ড দেশটা সু-সীম ও আকাশহীন। ইংরেজের সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য ইংরেজ জাতটা রক্তসম্পর্কে এক ও দৈনন্দিন জীবনে perspective-হীন। একে তো এদের ইতিহাস ছোট, জাতিগত

শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়

অভিজ্ঞতায় এরা শিশু। তারপরে এদের আকাশের আঁধার এদের মনকেও আঁধার করেছে, হাৎড়াতে হাৎড়াতে যখন যেটুকু সত্য পায় তখন সেইটুকু এদের কাছে সব, এরা কত বড় একটা সাম্রাজ্য চালায় নিজেরাই জানে না, সাম্রাজ্য এরা গড়েছে অন্য-মনস্ক ভাবে। খাঁটি প্রাদেশিকতা যাকে বলে তা দ্বীপবাসীতেই সম্ভব এবং আকাশহীন দ্বীপবাসীতে। এরা তিন dimensionএর দ্বীপবাসী। ইংলণ্ডে দলাদলির অন্ত নেই, কিন্তু প্রত্যেক দলই স্বভাবে ইংরেজ অর্থাৎ আকাশহীন দ্বীপবাসী। কোনো একটা আন্তর্জ্জাতিক আন্দোলন ইংলণ্ডে টিঁক্‌বে না, খ্রীষ্টধর্ম্ম টিঁক্‌ল না, সোশ্যালিজ্‌ম্ টিঁক্‌ছে না। একদিন যেমন চার্চ্চ্ অব্ ইংলণ্ড নিজস্ব খ্রীষ্টধর্ম্ম সৃষ্টি করলে আজ তেমনি লেবার-পার্টি নিজস্ব সোশ্যালিজ্‌ম্ সৃষ্টি কর্‌ছে। নির্জ্জলা ন্যাশনালিজ্‌ম্ ইংলণ্ডেই প্রথম সম্ভব হয়, ইংলণ্ডেই শেষ পর্য্যন্ত স্থায়ী হবে। এর কারণ নৈসর্গিক। তবে নিসর্গের উপরে খোদকারী কর্‌ছে মানুষ। জাহাজের যা সাধ্যাতীত ছিল এরোপ্লেন তাকে সাধ্যায়ত্ত কর্‌ছে, channel tunnel হয় তো অসাধ্য সাধন কর্‌বে, ইংলণ্ড আর দ্বীপ থাক্‌বে না। কিন্তু মেঘের প্রাচীর?

দক্ষিণ ইংলণ্ডের নানা স্থানে ঘুরে ফিরে দেখা গেল নিসর্গ ও মানুষ মিলে অঞ্চলটাকে সর্ব্বতোভাবে একাকার ক'রে দিয়েছে। একই রকম অগুন্‌তি ছোট শহর, প্রত্যেকটাতে একই হোটেলের শাখা-হোটেল ও একই দোকানের শাখা-দোকান। স্থানীয় সংবাদপত্র ও থিয়েটারও বহুদূর থেকে চালিত। রেল্ ও বাস্ যদিও অগুন্‌তি তবু একই কোম্পানীর। একই আবহাওয়া, একই রকম ছিঁচ্‌কাঁদুনে আকাশ, অসমতল ভূমি। মানুষও বাইরে থেকে একই রকম—পোষাকে চলনে বুলিতে আদব কায়দায়। সামান্য যা ইতর বিশেষ তা বিদেশীর চোখে স্পষ্ট নয়। ঘন ঘন স্থান পরিবর্ত্তনের ফলে প্রত্যেকটি মানুষ ইংরেজ হ'য়ে গেছে, গ্রিমাথ্-ওয়ালা বা টর্‌কী-ওয়ালা ব'লে কেউ নেই। অধিকাংশ বাড়ীই এখন বাসা, পূর্ব্ব-পুরুষের ভিটা মাটির মর্য্যাদা যদি থাকে তো পূর্ব্বপুরুষের গোরস্থানে। বাড়ীর মালিকরা হয় বাড়ীতে থাকেন না, নয় বাড়ীতে বোর্ডিং হাউস্ খোলেন। এই সব শহরের সর্ব্বপ্রধান ব্যবসায় অতিথিচর্য্যা। অতিথিরা হয় ছুটীতে বেড়াতে আসে, নয় বাণিজ্যসংক্রান্ত কাজে আসে। যারা স্থায়ীভাবে বসবাস করে তাদেরও দু'ভাগে বিভক্ত করা যায়, তারা হয় দূরস্থিত পিতামাতার বোর্ডিং স্কুলে পড়্‌তে থাকা সন্তান, নয় প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানের পেন্‌সনপ্রাপ্ত পিতামাতা। ছোটদের জন্যে বোর্ডিং স্কুল ও বুড়োদের জন্যে নার্সিং হোম সমুদ্রতীরবর্ত্তী বহুশত শহরে ও গ্রামে বহুল পরিমাণে বিদ্যমান।

ইংলণ্ড যে দিন দিন socialised হ'য়ে উঠ্‌ছে, এর প্রমাণ ইংলণ্ডের এই সব বোর্ডিং স্কুল নার্সিং হোম হাঁসপাতাল পাব্লিক লাইব্রেরী ইত্যাদি। এসব অনুষ্ঠান জনসাধারণের চাঁদায় চল্‌ছে, এ সব অনুষ্ঠানে যারা থাকে তারা অনেক সময় জনসাধারণের চাঁদায় থাকে, এ সব অনুষ্ঠানের শিক্ষায় বা চিকিৎসায় কোনো একজনের প্রতি পক্ষপাত নেই। গবর্ণ্‌মেন্টের খরচে চল্লেও এগুলি এমনি ভাবেই চল্‌তো। যে দেশে জনসাধারণ যা গবর্ণমেণ্ট্‌ও তাই, সে দেশে জনসাধারণের চাঁদায় চালিত বে-সরকারী হাঁসপাতাল ও জনসাধারণের খাজনায় চালিত সরকারী হাঁসপাতালে তফাৎ কতটুকু? ইংলণ্ডের অস্বচ্ছলরা চার্চ্চ প্রভৃতির মধ্যস্থতায় স্বচ্ছলদের কাছ থেকে যে চাঁদা পায় গবর্ণমেণ্টের মধ্যস্থতায় স্বচ্ছলদের কাছ থেকে সেই চাঁদাই পেতে চায়, যদিও তার নাম চাঁদা হবে না, হবে পাওনা। কিন্তু সেই পাওনা ও এই পাওনা তলে তলে একই জিনিষ—এমনি বোর্ডিং স্কুলের অপক্ষপাত শিক্ষা, হাঁসপাতালের অপক্ষপাত চিকিৎসা, নার্সিং হোমের অপক্ষপাত সেবা। এতে আত্মীয় স্বজনের হাত নেই, হৃদয় নেই, এর উপরে সমাজের ফরমাস্ প্রবল, ব্যক্তির রুচি-অরুচি ক্ষীণ। সমাজের অলিখিত হুকুমে মা তার কোলের ছেলেকে বোর্ডিং স্কুলে দেয়, রুগ্ন ছেলেকে হাঁসপাতালে রাখে। নিজের হৃদয়ের দাবীকে সমাজের দশজনের মতো নিজেও সেন্টিমেন্টাল্ ব'লে উড়িয়ে দেয়।

তবুও বড়াই ক'রে বল্‌তে হয়, আমরা সোশ্যালিষ্ট্ নই!

এইসব হোটেল বোর্ডিং হাউস স্কুল ও নার্সিং হোম সাধারণত মেয়েদের হাতে। দুধের সাধ ঘোলে মেটাবার মতো এরা homeএর সাধ হোটেলে ও আত্মীয় স্বজনের সাধ অতিথি দিয়ে মেটায়। Community kitchen আর কাকে বলে? Collective motherhood কি এ ছাড়া অন্য কিছু? ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে একই আদর্শই উদ্‌যাপিত হ'তে চল্ল। নাম নিয়ে মারামারি ক'রে ফল নেই, এও এক রকম সোশ্যালিজম্। তলিয়ে দেখলে সোশ্যালিজ্‌মের আদত কথাটা কি এই নয় যে সমাজ ও ব্যক্তির মাঝখানে মধ্যস্থ থাক্‌বে না, সম্পর্কে ও সম্পত্তিতে "private"-অঙ্কিত বেড়া থাক্‌বে না? যে জননী জন্মের পর মুহূর্ত্তে সন্তানকে Dr Barnardoর homeএ ত্যাগ করে ও যে জননী জন্মের অল্পকাল পরে সন্তানকে বোর্ডিং স্কুলে পাঠিয়ে দেয় তাদের একজনের সন্তানের খরচা বহন করে বদান্য জনসাধারণ, অপর জনের সন্তানের খরচা বহন করে দূরস্থিত পিতামাতা; শিক্ষা উভয়েই পায় অনাত্মীয়দের অপক্ষপাত তত্ত্বাবধানে, পক্ষপাতী পিতামাতার সান্নিধ্য কেউই পায় না অধিকাংশ স্থলে। এদের আর্থিক অবস্থার উনিশ বিশ থাক্‌লেও এরা সোজাসুজি সমাজের হাতে গড়া, community kitchenএ খায় ও সার্ব্বজনীন শিক্ষয়িত্রীর কোলে collective মাতৃস্নেহের ঘোল আস্বাদন করে।

প্রবীণাদের মুখে চোখে কথাবার্ত্তায় এমন একটি স্নিগ্ধতা ও শান্তি লক্ষ্য করা গেল যা কোনো দেশবিশেষের বিশেষত্ব নয়, যা যুগবিশেষের বিশেষত্ব। অস্তগামী চন্দ্রের স্নিগ্ধতার মতো উনবিংশ শতাব্দীর স্ত্রী-মুখের স্নিগ্ধতারও দিন শেষ হ'য়ে এলো। এর পরে বিংশ শতাব্দীর স্বতন্ত্রা নারীর প্রখর জ্বালা, লাবণ্যহীন পিপাসাময় দুঃসাহসিক অরুণরাগ। ভারতের কল্যাণী নারীকে ভিক্টোরীয় ইংরেজ নারীতে কত স্থলে প্রত্যক্ষ করেছি, বহুসহোদরবিশিষ্ট প্রশস্ত গৃহাঙ্গনে এঁদের বাল্যকাল কেটেছে, যন্ত্রমুখর জীবনসংগ্রামে জীবিকার জন্যে এরা প্রাণপণ করেননি, পাঁচ জনকে খাইয়ে খুসী ক'রেই এঁদের তৃপ্তি, জগতের সামান্যই এঁদের জানেন ও একটি কোণেই এঁদের স্থিতি, উদ্যানলতার ভঙ্গী এঁদের স্বভাবে ও উদ্যানপুষ্পের সুরভি এঁদের আচরণে। অনূঢ়া হ'লেও এঁরা গৃহিণী নারী, এঁরা স্বতন্ত্রা নারী নন্। আর এঁদের পরবর্ত্তিনীরা ফ্ল্যাটে বা বোর্ডিং হাউসে থাকা সাবধানী পিতামাতার স্বল্পসহোদরবিশিষ্ট সন্তান, প্রিয় জনের সঙ্গে প্রাত্যহিক দান প্রতিদান কলহ মিলনে যে শিক্ষা হয় সে শিক্ষা অল্পবয়স থেকে বোর্ডিং স্কুলে বাস ক'রে হয় নি, তারপরে জীবিকার দায়িত্ব মাথায় নিয়ে আধুনিক সভ্যতার বেড়াজালে এঁরা যখন হরিণীর মতো ছট্‌ফট্ করেন তখন স্বভাবে আসে বন্যতা, আচরণে আসে ব্যস্ততা, এবং বিবাহের সৌভাগ্য ঘট্‌লেও ঘরকরণার নীরব নিভৃত জীবনে মন বসে না, মন চায় অভ্যস্ত মত্ততা, আগের মতো খাটুনি, আগের মতো নাচ, আগের মতো সন্তানঘটিত দুশ্চিন্তার প্রতি বিতৃষ্ণা, স্বামীঘটিত তন্ময়তার প্রতি অনিচ্ছা। এ নারী গৃহিণী নারী নয় স্বতন্ত্রা নারী। সমাজের কাজে এর অতুল উৎসাহ, প্রভূত যোগ্যতা, নার্স হিসাবে শিক্ষয়িত্রী হিসাবে হোটেলের ম্যানেজারেস্ হিসাবে আপিসের সুপারি-ণ্টেণ্ডেণ্ট হিসাবে এ নারী নিখুঁৎ, সচিব সখী ও শিষ্যা রূপে এ নারী পুরুষের শ্রদ্ধা জিনে নিয়েছে, আধুনিক সভ্যতার সর্ব্বঘটে বিদ্যমান দেখি যাকে সে নারী এই স্বতন্ত্রা নারী—গৃহহীন, পক্ষপাতহীন, জনহিতপরায়ণ, সামাজিক কর্ত্তব্যে অটল। এ নারী সব পুরুষের সহকর্ম্মিনী, কোনো একজনের রাণী ও দাসী নয়, সকলের সম্মানের পাত্রী, কোন একজনের প্রেম ও ঘৃণার পাত্রী নয়। কথাটা অবিশ্বাস্য শোনালেও বল্‌তে হবে যে ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন ধারায় socialisation of women চলেছে, ভারতবর্ষও বাদ যায়নি। এর ফলে কাব্যলোক থেকে প্রেয়সী নারী অন্তর্হিত হলো, তার স্থান নিলে সঙ্গিনী নারী, passionএর স্থানে এলো understanding।

যুগলক্ষণ থেকে বিচ্ছিন্ন করলে ইংরেজ নারীর কতক বিশেষত্ব আছে—প্রবীণা ও নবীনা এ ক্ষেত্রে সমান।

শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়

প্রথমত ইংরেজ নারী চিরদিনই স্বাধীন-মনস্ক, শক্ত-মনস্ক। ইংরেজ পুরুষও তাই। গুরুজনের ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছা মিলিয়ে দেওয়া তার দ্বারা কোন যুগে হয় নি। সে নিজের ইচ্ছাকে নিজের হাতে রেখে স্বেচ্ছায় সমাজের বাঁধন স্বীকার করেছে, সামাজিক ডিসিপ্লিন মেনেছে।

এই জন্যেই বিবাহটা দু'জন স্বাধীন মানুষের contract, এতে গুরুজনের হাত পরোক্ষ। দ্বিতীয়ত নারীত্বের কোনো ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক আদর্শ এ দেশের নারীর সামনে তেমন ক'রে ধরা হয়নি যেমন আমাদের সীতা সাবিত্রীর আদর্শ। এর ফলে এ দেশের নারী প্রত্যেকেই এক একটি আদর্শ, কোনো দু'জন ইংরেজ নারী কেবল ব্যক্তিহিসাবে নয় type-হিসাবেও এক নয়। সীতা সাবিত্রীর ছাঁচে ঢাল্‌তে গিয়ে আমাদের নারীজাতিকে আমরা সীতা সাবিত্রী জাতি বানিয়েছি, তাদের মধ্যে নারীত্বের অল্পই অবশিষ্ট আছে। তাই তাদের নিয়ে আরেক খানা রামায়ণ কিম্বা মহাভারত লেখা হলো না, অথচ হেলেন ও পেনেলোপীর পরবর্ত্তিনীদের নিয়ে আজ পর্য্যন্ত কত কাব্যই লেখা হ'য়ে গেলো, কত ছবিই আঁকা হ'য়ে গেলো। তৃতীয়ত ইংরেজ নারীর বেশভূষার প্রতি তেমন মনোযোগ নেই যেমন মনোযোগ গৃহসজ্জার প্রতি, শিশুচর্য্যা বা পশুচর্য্যার প্রতি। অধিকাংশ ইংরেজ নারীর সাজসজ্জা রূপকথার Cinderellaর মতো। কতকটা এই কারণে, কতকটা অন্য কোনো কারণে অধিকাংশ ইংরেজ নারীরই বাইরের charm নেই। পুরুষের প্রেমের চেয়ে পুরুষের শ্রদ্ধাই এদের কাম্য, সহযোগিতার চেয়ে প্রতিযোগিতার কামনা তীব্র।

(ক্রমশঃ)

আদালত

ত্রোকাদেরো মিউজিয়ম
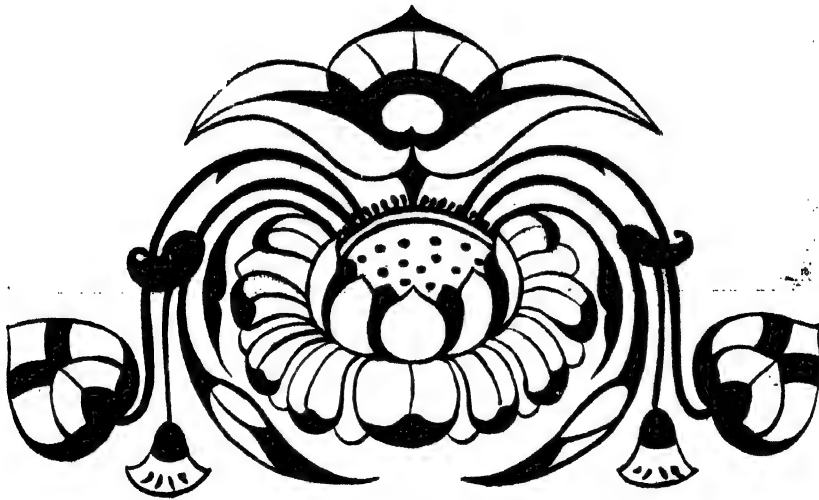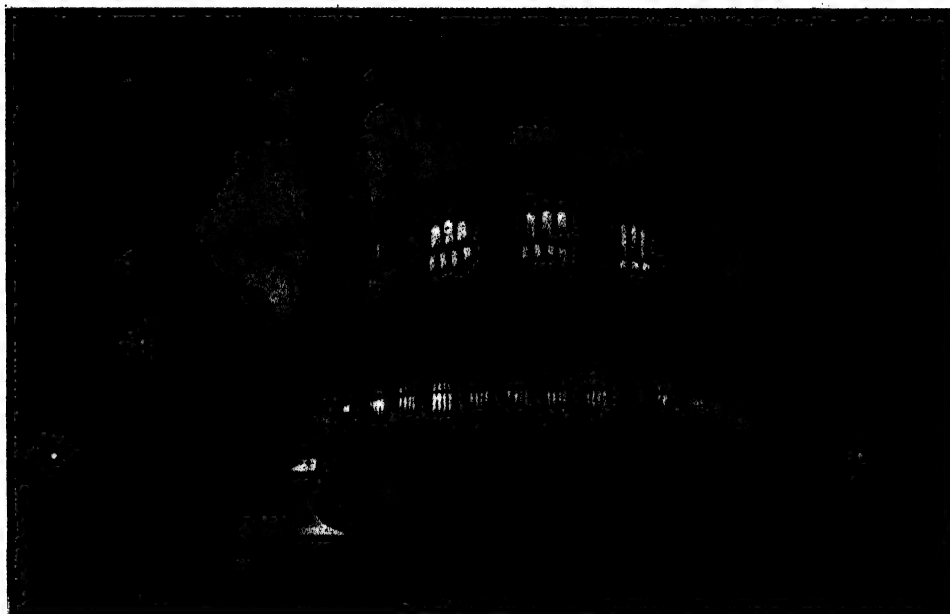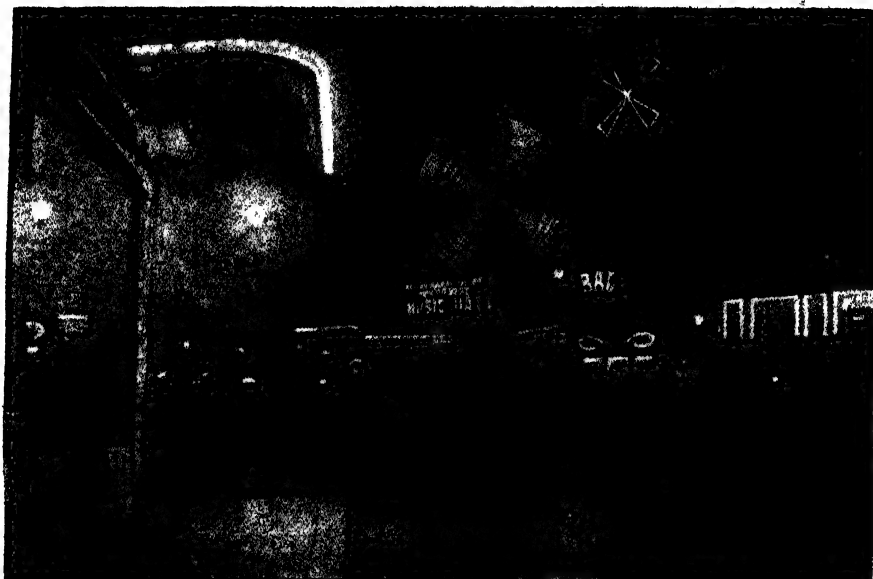
মুল্যাঁ রুজ্ সঙ্গীতশালা

অপেরা-গৃহ

নোৎর্ দাম্

প্লাস্ দ্ লা কঁকর্দ

ইফেল টাওয়ার

নাম-না-জানা সৈনিকের কবর

শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায় কর্তৃক নির্বাচিত ও প্রেরিত
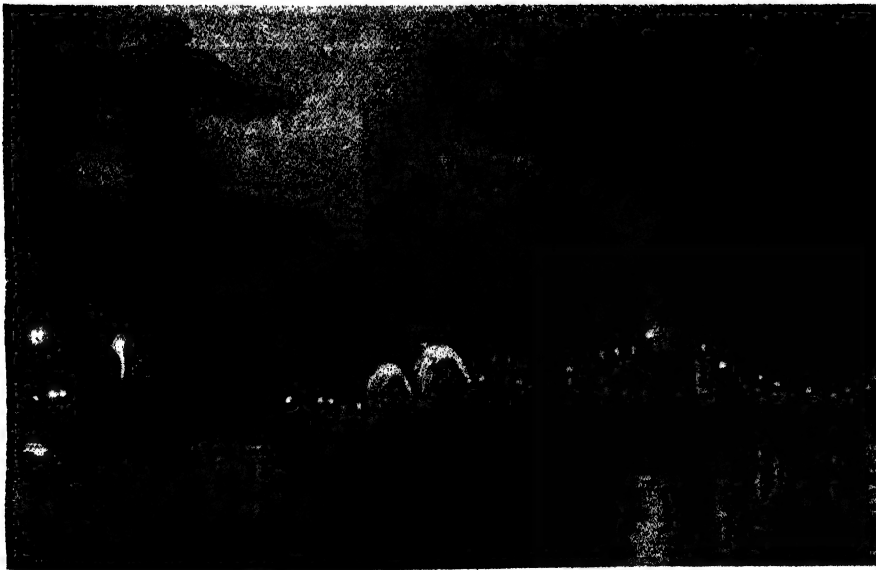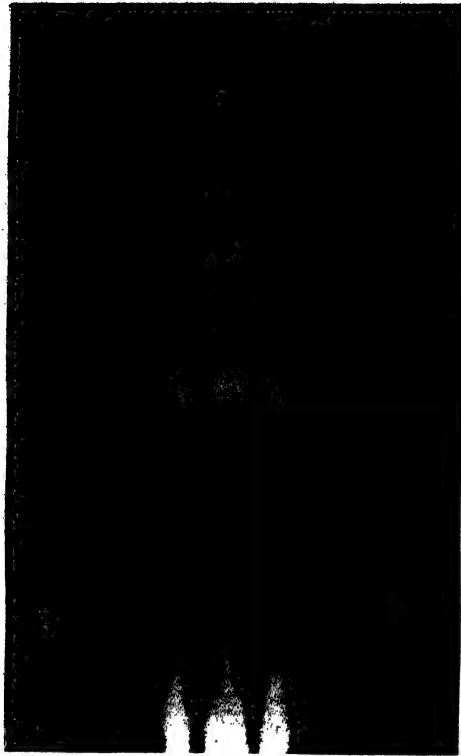
সার্ব্বজনীন নারীশিক্ষা

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী

বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ বাগর্থপ্রতিপত্তয়ে।
জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্ব্বতীপরমেশ্বরৌ॥

—প্রচুররূপে শব্দ এবং অর্থ সম্পত্তি প্রাপ্তির নিমিত্ত শব্দ এবং অর্থের ন্যায় পরস্পর নিত্য সম্বন্ধে সম্বদ্ধ, জগতের জননী পার্ব্বতী এবং জগৎপিতা পরমেশ্বর অর্থাৎ ভবানী-পতিকে বন্দনা করি।

মহাকবি কালিদাস তাঁর সুবিখ্যাত মহাকাব্য 'রঘুবংশে' প্রকৃতি পুরুষের অভিন্নত্ব, পরস্পর অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ প্রদর্শন-পূর্ব্বক এইরূপে গ্রন্থারম্ভ করিয়াছেন।

"জগতঃ পিতরৌ"—এই ক্ষুদ্র কারিকাটুকুতেই সমুদয় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিরহস্য সাংখ্যদর্শনের মূলসূত্র সুনিহিত।

"জগতঃ পিতরৌ"—'পিতরৌ' শব্দ পিতৃ-মাতৃ উভয়-বাচক; তাই জগতঃ পিতরৌ বলিতে মাতাপিতা উভয়কেই বুঝায়।

সেই জগৎপিতা এবং জগন্মাতায় কি সম্বন্ধ; না "বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ"—বাক্ এবং অর্থ যেমন পরস্পর নিত্য সম্বদ্ধ, এককে ছাড়িয়া অপরের অস্তিত্ব থাকিতে পারে না, প্রকৃতি ও পুরুষেও সেইরূপ অচ্ছেদ্য, অভেদ্য, অপরিহার্য্য নিত্য সম্বন্ধ। ক্ষুদ্র একটি শ্লোকে সুবিদ্বান মহাকবি নিজ অমর গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে সৃষ্টিরহস্যের সকল সমস্যা বিদূরিত করিয়া একসঙ্গে প্রকৃতি-পুরুষের, নির্গুণ ও সগুণ ব্রহ্মের, ব্রহ্ম ও মায়ার, জগৎপিতা এবং জগন্মাতার বন্দনা গাহিয়া ধন্য হইয়াছেন।

বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ বাগর্থপ্রতিপত্তয়ে।
জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্ব্বতীপরমেশ্বরৌ॥

নারীপুরুষের মধ্যে এই অপরিহার্য্য নিত্যসম্বন্ধ স্বতঃই সৃষ্টির প্রাক্কাল হইতে প্রাকৃতিক নিয়মেই প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। শব্দ এবং অর্থের ন্যায় ইহাও অঙ্গাঙ্গীভাবে নিত্য সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। একের ব্যতিরেকে অন্যের অস্তিত্ব বর্ত্তমান থাকিতেই পারে না। একজন সুবিখ্যাত পাশ্চাত্য লেখক লিখিয়াছেন, "নারী এবং নর একটি পাখীর দুইটি পক্ষ, ইহাদের একজনকে ছাড়িয়া যখন আর একজনকে উড়িবার চেষ্টা করিতে দেখি, তখন আমার মনে হয় পাখীটি তার একটা ডানায় ভর দিয়া উড়িতে চেষ্টা করিতেছে।"

যদি জাতীয় মঙ্গল কামনা করিতে হয়, তবে সর্ব্ব প্রথমেই সর্ব্বপ্রযত্নে দেশের সমস্ত নর এবং নারীকে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত এবং উচ্চাদর্শে দীক্ষিত করিতে হইবে। দেশবাসী স্ত্রীপুরুষকে অজ্ঞানান্ধকারে সমাবৃত রাখিয়া দেশের উন্নতির কথা কহা এবং আকাশকুসুমের মালা গাঁথা একই কথা।

এদেশে পুরুষের শিক্ষাই এ পর্য্যন্ত বাধ্যতামূলক করার চেষ্টাসত্ত্বেও তাহা কার্য্যে পরিণত হইতে পারে নাই। এক্ষেত্রে মেয়েদের শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার কথা বলিলে হয়ত তাহা অনেকেরই কানে একটু ধৃষ্টতার মতই শুনাইবে। কিন্তু আমি বলি এটা খুবই অসঙ্গত প্রার্থনা নয়। যে দেশের কবি নরনারীকে বাক্ এবং অর্থের ন্যায় পরস্পর নিত্য সম্বন্ধে সম্বদ্ধ এবং যে দেশের পণ্ডিত নারী পুরুষকে একটি পাখীর দুইটি পক্ষরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, সেই দুই দেশের জনসাধারণ এবং রাজপুরুষেরা একই সময়ে নরনারীর শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করিবার চেষ্টা করিতে এবং ঐ চেষ্টাকে সফল করিতে না পারিবেন কেন? পাখী যখন উড়িতে চাহিতেছে, তার একটি পাখা চাপিয়া ধরিয়া থাকা কি সঙ্গত?

এ বিষয়ে আর একটি প্রধান কথা এই যে, স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের জন্য সহরে দু একটি বালিকা-বিদ্যালয় সংস্থাপিত

নিখিল ভারতমহিলা শিক্ষাসমিতির পাটনা অধিবেশনের জন্য লিখিত।

থাকিলেই স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার চলিতে পারে না। সহরের বাহিরে গ্রামে গ্রামে পল্লীতে পল্লীতে পূর্ব্বে যেমন পাঠশালার ব্যবস্থা ছেলেদের জন্য,—কোথাও কোথাও ছেলেদের সঙ্গে খুব ছোট ছোট মেয়েদের জন্যও ছিল, সেইরূপ অসংখ্য পাঠশালা অথবা নিম্ন ও উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়প্রবর্ত্তন চেষ্টা ব্যতিরেকে প্রকৃতপক্ষে সার্ব্বজনীন পুরুষ ও স্ত্রীশিক্ষার বিস্তারের চেষ্টা সফল হইতে পারে না। ইহার জন্য গভর্ণমেণ্ট গুরুট্রেণিং স্কুলের ন্যায় শিক্ষয়িত্রী তৈরির জন্য বহু পরিমাণে ট্রেণিং স্কুল সংস্থাপন করেন, ইহাই আমাদের অনুরোধ।

সমগ্র ভারতে পনের কোটি ত্রিশ লক্ষ নারীর মধ্যে অক্ষরজ্ঞান-সম্পন্না নারীর সংখ্যা মাত্র তেইশ লক্ষ, পঁয়তাল্লিশ হাজার. নয়শত চারিজন! ইহাতেই বুঝা যাইতেছে যে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের জন্য আমাদের কতখানিই করিবার আছে। ভারতবর্ষেরই কয়েকটি দেশীয় রাজ্যের স্ত্রীশিক্ষার পরিমাণের তালিকা হইতেই আপনারা দেখিতে পাইবেন আমরা আমাদের বিভিন্ন প্রাদেশিক ভগ্নিগণেরও কত পশ্চাতে পড়িয়া আছি।

সমগ্র ভারতে নারীর সংখ্যা	...	১৫,৩০,০০,০০০
" " অক্ষরজ্ঞানসম্পন্নার সংখ্যা	..	২৩,৪৫,৯০৪
" " শিক্ষার বয়সী বালিকার সংখ্যা	...	৩,৯৪,৭১.৭৮১
তন্মধ্যে স্কুলে যায়	...	১১,১৫,১১০
" " শতকরা " "	...	৩টি মাত্র মেয়ে
জাপানে " " "	...	৯৮টি মেয়ে

বাঙ্গালা দেশে শিক্ষিতা নারী	১৯১১ সালে	...	শতকরা	১
	১৯২৬ "	...	"	১.৩/৪
ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে " "	১৯১১ "	...	"	৫
	১৯২৬ "	...	"	৯
মহীশূর " " "	১৯১১ সালে	...	শতকরা	৩
	১৯২৬ "	...	"	১২
বারোদা " " "	১৯১১ "	...	"	২
	১৯২৬ "	...	"	১৩

শিক্ষিত জনসংখ্যা (নারী ও পুরুষ)—ডেনমার্ক	..	শতকরা	১০০
জাপান	...	"	৯৮
আমেরিকা	...	"	৯৫
ইংলণ্ড	...	"	৯৬
বাঙ্গালা	...	"	৯'৭
ভারতবর্ষ	...	"	৫

জাপানে সমগ্র বালক বালিকার সংখ্যার অনুপাতে শতকরা ৯৯জন বালক এবং ৯৮জন বালিকা স্কুলে পড়ে, সে জায়গায় ভারতবর্ষে শতকরা মাত্র ২১টি ছেলে এবং ৩টি মেয়ে স্কুলে যায়। ইহার মধ্যে উচ্চ শিক্ষালাভ করিবার সুযোগ ও সুবিধা অতি অল্পসংখ্যকেরই ভাগ্যে হইয়া থাকে। স্বাধীন জাপানের কয়েক বৎসরের ইতিহাসের সহিত পরাধীন ভারতের পৌনে দুইশত বৎসরের ইতিহাসের এইখানেই সম্পূর্ণ প্রভেদ। ইংরাজ ভারতের প্রাচীন পদ্ধতির শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি নষ্ট করিয়া শিক্ষাবিস্তারের চেষ্টা করেন নাই, পরন্তু বাধা দিয়াছেন। পূর্ব্বে চতুষ্পাঠী, মক্তব এবং পাঠশালার অভাব ছিল না ; কথকতার দ্বারা ধর্ম্ম ও নীতিশিক্ষা সার্ব্বজনীন হইয়া উঠিয়াছিল। এখন সে সব গিয়াছে। এদিকে এক একটি বিদ্যালয় স্থাপন করায় এতই বায়বাহুল্য ও আইন-কানুনের কড়াকড়ির দড়াদড়িতে বাঁধাবাঁধি যে সে সব মানিয়া গ্রামে গ্রামে স্কুল কলেজ স্থাপন করাই এক প্রকার অসম্ভব ব্যাপার!

যাই হোক তথাপি এ কথা ঠিক যে এ সকল সত্ত্বেও দেশের নরনারী নিজেরাই উদ্যোগী হইয়া শিক্ষার বায়বাহুল্য কমাইয়া গ্রামে গ্রামে পল্লীতে পল্লীতে গাছতলায় বা পর্ণকুটিরে প্রাচীন পদ্ধতিতে আধুনিক শিক্ষাকে সহজলভ্য করার সুব্যবস্থা না করিতে পারিলে সার্ব্বজনীন শিক্ষার আশা করা সুদূরপরাহত। বিলাসবাসনাশূন্য নিঃস্বার্থ কর্ম্মীকে সাধারণের প্রদত্ত সামান্য বৃত্তি দ্বারা ভরণপোষণ নির্ব্বাহ করিয়া শিক্ষাব্রত গ্রহণ করিতে হইবে। প্রাচীন পদ্ধতিতে পূজা পার্ব্বণ নির্ব্বাহ বিবাহ এবং শ্রাদ্ধাদি উপলক্ষ্যে * সাধারণের

* যেমন ৺ ভূদেবফণ্ড স্থাপয়িতা পূজ্যপাদ পিতৃদেব ৺ মুকুন্দদেব মহাশয় করিয়াছিলেন। প্রতি পারিবারিক অনুষ্ঠানেই ৺ ভূদেব ফণ্ডে কিছু কিছু দান করা তাঁর নিয়ম ছিল। বিবাহাদিতে কখনও ১০০৮ টাকা কখনও বা ১০৮৲ টাকা উক্ত ফণ্ডে জমা দেওয়া হইত। এখনও প্রতি মাসে 'সোমদেব সৎকর্ম্ম ভাণ্ডার' হইতে ৫৲ হিসাবে দেওয়া হয়। তাঁর দৃষ্টান্তে তাঁর আত্মীয়স্বজন ও যথা ইচ্ছা কিছু কিছু জমা দিতেন। ইহার দ্বারা ৫২৲ টাকা করিয়া তিনটা সংস্কৃত বৃত্তি দেওয়া হইতেছে।

সার্ব্বজনীন নারীশিক্ষা

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী

সাহায্য গ্রহণ করিয়া ছাত্রগণের গৃহশিল্পদ্বারা যথাসম্ভব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ব্যয়নির্ব্বাহ করিয়া দেশের মধ্যে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার করিতে হইবে। স্ত্রীশিক্ষা বাধ্যতামূলক করিবার প্রচেষ্টা এবং সহজলভ্য করিবার জন্য যত্ন দেশের শিক্ষিতা নারীদেরই করা কর্ত্তব্য। গভর্ণমেণ্টের কাছে দাবী করিতে আমি বারণ করিনা, কারণ তাহা আমাদের অবশ্যপ্রাপ্য জন্মগত অধিকারেরই দাবী। আমাদের নিজের দেশের টাকা হইতেই সে সাহায্য আমরা চাহিতেছি, ইহা আমাদের নিশ্চয়ই পাওয়া উচিত। কিন্তু চাহিলেই যে পাইব সে আশা কম। কারণ আমাদের দেশে গভর্ণমেণ্টের শিক্ষাব্যয় কিরূপ অসঙ্গত তাহা নিম্নের এই তালিকাখানিতে দৃষ্টিপাত করিলেই সকলেই জানিতে পারিবেন। ভারতে মাথাপিছু শিক্ষাব্যয় বাৎসরিক ৵০ আনা মাত্র!

বাৎসরিক শিক্ষার ব্যয়, মাথাপিছু...		
ডেনমার্ক	...	১৭৲
আমেরিকা	...	১৬।০
ইংলণ্ড	...	৯৵০
ফ্রান্স	...	৯৲
জাপান	...	৯৲
ফিলিপাইন	...	৮৲
ভারতবর্ষ	...	৵০

[illegible] সালে ভারতবর্ষে ইউরোপীয় ছাত্রের জন্য মাথাপিছু ব্যয় ১০৩।০
[illegible] „ „ ভারতীয় „ „ „ „ ৵১ পাই

কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্!

পূর্ব্বে কথকতা নগরসঙ্কীর্ত্তন প্রভৃতির দ্বারাও জনসাধারণের মধ্যে কতকটা শিক্ষাবিস্তারের রীতি ছিল, এক্ষণে স্ত্রীশিক্ষার কোন ব্যবস্থাই নাই। আমার মতে শুধু গভর্ণমেণ্টের ভরসাতেই নিশ্চেষ্ট না থাকিয়া সঙ্গে সঙ্গে নিজেদেরও খাটিতে হইবে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার আশ্রমের কর্ম্মিবৃন্দ দ্বারা নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহে যেরূপ শিক্ষাবিস্তারের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা এ কার্য্যের জন্য সম্পূর্ণ উপযোগী। অবৈতনিক নৈশবিদ্যালয়, কথকতা, কীর্ত্তন, চিত্রিত বিজ্ঞাপন বিলি, ভ্রমণশীল লাইব্রেরী ও আলোক চিত্র সহযোগে বক্তৃতা প্রভৃতি কয়েকটি প্রাচীন ও আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতির সমন্বয়ে তিনি শিক্ষাবিস্তারে অগ্রসর হইয়াছেন। শিক্ষিতা ধাত্রী দ্বারা গ্রামে গ্রামে প্রসূতিপরিচর্য্যা ও শিশুলালন শিখাইবার এবং নিপুণা শিক্ষয়িত্রী দ্বারা লেখাপড়া, গৃহশিল্পশিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া বর্ত্তমানে ইঁহারা হিরণ্ময়ী দেবীর বিধবাশ্রম, সরোজনলিনী নারীসমিতি, বিদ্যাসাগর বাণীভবন, সেবাসদন প্রভৃতি আমাদের পথ প্রদর্শন করিতেছেন। এতদ্ভিন্ন যে সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দেশের অর্থে এবং চেষ্টায় নারী শিক্ষার ভার লইয়াছেন, তাঁদের মধ্যে পুনা নারী বিশ্ববিদ্যালয়, জলন্ধর কন্যা মহাবিদ্যালয়, সারদেশ্বরী আশ্রম, কাশীধামে মাতৃমঠ, মহিলাশ্রম, আর্য্যবিদ্যালয়, মহিলা আয়ুর্ব্বেদ প্রভৃতি কয়েকটি উল্লেখযোগ্য। কিন্তু যে দেশে সাড়ে চোদ্দ কোটি মেয়ে অক্ষরজ্ঞানশূন্য, সে দেশে দশ বিশটি বিদ্যাপ্রতিষ্ঠান সমুদ্রের কাছে গোষ্পদ মাত্র এবং বহুসংখ্যক শিক্ষয়িত্রী ব্যতিরেকে এ প্রচেষ্টা কার্য্যকরী হইতে পারে না। অতএব সুপটু শিক্ষয়িত্রী গঠনের জন্য গভর্ণমেণ্টের সাহায্য পাওয়ার চেষ্টা করা, প্রতি ইউনিয়ন বোর্ডে লোক্যাল বোর্ডে অথবা মিউনিসিপ্যালিটিতে যদি সমবেত চেষ্টা দ্বারা ব্যবস্থা করা হয় তাহা হইলে অতি সহজেই কার্য্যে পরিণত হইতে পারে। আমার মনে হয়, ডাইভোর্স বিল পাশ করার জন্য ব্যস্ত হওয়ার অপেক্ষা স্ত্রীশিক্ষার জন্য সর্ব্বপ্রথমে ও সর্ব্বপ্রযত্নে এই সার্ব্বজনীন বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থাটাই করার প্রয়োজন। বাঙ্গালার প্রথম স্বাস্থ্যমন্ত্রী সার সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় প্রতি থানায় এক একটি দাতব্য চিকিৎসালয় সংস্থাপনের ব্যবস্থায় কতকটা কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন বলিয়া শুনিয়াছিলাম। আমার মনে হয়, যদি চেষ্টা করা যায় ইহাও সেইরূপে প্রতি লোক্যাল বোর্ড প্রভৃতির উদ্যোগে অনায়াসেই ঘটিতে পারে

চীনে হিন্দুসাহিত্য

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসুধাময়ী দেবী

৭১৬ খৃষ্টাব্দে শুভকরসিংহ নামক মধ্য এশিয়াবাসী এক শ্রমণ চ্যাঙ্‌আনে আসেন। প্রবাদ এই যে শুভকরসিংহ হইলেন শাক্যমুনির পিতৃব্য অমৃতোদনের বংশধর। তিনি নালন্দা বিহারে বহুকাল ছিলেন। আশী বৎসর বয়সে বহু সংস্কৃত গ্রন্থ লইয়া তিনি চীনে আসেন। ইহার মধ্যে পাঁচটি মাত্র গ্রন্থ তিনি নিজে অনুবাদ করিতে পারেন।

শুভকর প্রথম চীনে তান্ত্রিক সাহিত্য প্রচার করেন। তিনি মনে করিতেন যে চীনের অধিবাসীগণ ধর্মের তত্ত্ব ও দর্শন বুঝিতে সক্ষম নহে; সুতরাং তাহাদের নিকট দার্শনিক তত্ত্ব ব্যাখ্যা করা বৃথা। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া তিনি হীনযান বা মহাযান—কোন শাখারই মত ব্যাখ্যা করিলেন না। তিনি একাধারে বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব, সকল হিন্দু দেবতা ও সমগ্র চীনা Shenদের প্রভাব মানিয়া লইলেন। এইরূপে পীড়িত ও আর্ত্ত ব্যক্তিদিগের নিমিত্ত তিনি একটি নূতন দেবতার দল সৃষ্টি করিলেন। মন্ত্রদ্বারা আহ্বান করিলে এই সকল দেবতা আসিয়া আর্ত্ত ব্যক্তিদিগের দুঃখ মোচন করিয়া দেন, ইহাই হইল এই নূতন ধর্মের মত। শুভকর সংস্কৃত মন্ত্রগুলি চীনা অক্ষরে লিখিলেন; কিন্তু এরূপ লেখাতে চীনা অধিবাসীদিগের নিকট সেগুলি সম্পূর্ণ দুর্বোধ্য হইয়া উঠিল। দুর্বোধ্য হওয়াতেই মূঢ় ব্যক্তিগণের এগুলির প্রতি আস্থা আরও বাড়িয়া গেল। বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বদিগকে আহ্বান করিবার নিমিত্ত যে সকল মন্ত্র রহিয়াছে সেগুলিতে তাঁহাদের সহস্রাধিক বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হইয়াছে; এ সকল নামই উপকল্পিত। বৈরচন ও বজ্রপাণি—এই দুইজন হইলেন প্রধান দেবতা—ইঁহারাই সকলের পালয়িতা ও রক্ষাকর্ত্তা।

শুভকর বলিলেন যে, পৃথিবীর চারিদিকে অশুভকারী দানব সকল উৎপাত ঘটাইবার জন্য ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আবার এই পৃথিবীর উপরে শক্তিমান্ দেবতাগণ রহিয়াছেন। অমঙ্গল হইতে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহাদিগকে মন্ত্রদ্বারা আহ্বান করিলেই তাঁহারা আসিয়া শরণাগতকে বিপদ হইতে উদ্ধার করেন।

শুভকরের চীনে আগমনের চারিশত বৎসর পূর্ব্বে (৩০৭ খৃষ্টাব্দে) শ্রীমিত্র নামক কুচাবাসী এক ব্যক্তি চীনে আসেন। তিব্বতী একটি ইতিহাসে দেখা যায় যে শ্রীমিত্র মহাময়ূরী ও অন্যান্য ধারণী গ্রন্থ চীন ভাষায় অনুবাদ করেন। তাঁহার সমসাময়িক আরও বহু ভারতীয় তান্ত্রিক পণ্ডিত চীনে আসিয়াছিলেন। কিন্তু সেই সময় তান্ত্রিক গ্রন্থের তেমন বহুল প্রচার হয় নাই। চারিশত বৎসর পরে শুভকর চীনে এই তন্ত্র সাহিত্য বিস্তারের অগ্রণী হইয়া যান। তাহার পর ৭১৯ খৃষ্টাব্দে আসেন বজ্রবোধি ও তাঁহার শিষ্য অমোঘবজ্র।

বজ্রবোধি এগারটি তান্ত্রিক গ্রন্থ অনুবাদ করেন। 'বজ্রবোধি' এই নামটি সম্ভবত তাঁহার সম্প্রদায়গত উপাধি। এই বৃদ্ধ তান্ত্রিক ভিক্ষু তন্ত্রবিদ্যার দায়িত্ব বিশেষ ভাবে বুঝিতেন; সুতরাং যে কোনও ব্যক্তির নিকট ইহা প্রকাশ করিতেন না। কেবল দুইজন চীনা ভিক্ষুর নিকট ইহার রহস্য তিনি উদ্ঘাটন করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার প্রিয়শিষ্য অমোঘবজ্রকে এই বিদ্যা উত্তমরূপে শিখাইয়াছিলেন। শিশুকাল হইতে এই শিষ্যটি তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছিল। একুশ বৎসর বয়সে গুরুর সহিত অমোঘবজ্র চীনে আসেন। গুরুর মৃত্যুর পর অমোঘবজ্র তাঁহার কার্য্যের ভারগ্রহণ করেন। তন্ত্রের আলোচনা ক্রমশই চীনে বিস্তার লাভ করিতে লাগিল। ক্রমশঃ তান্ত্রিক গ্রন্থাবলীর চাহিদা এতই অধিক হইল যে ভারত হইতে তন্ত্রের গ্রন্থসমূহ আনিবার জন্য চীনা সম্রাট অমোঘবজ্রকে ভারতে পাঠাইলেন। ভারত হইতে যখন তিনি ফিরেন তখন সম্রাট্ তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া Chu Tsang অর্থাৎ বিদ্যার্ণব—এই উপাধি দিলেন।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসুধাময়ী দেবী

অমোঘ সর্ব্বশুদ্ধ ১০৮টি গ্রন্থ অনুবাদ করেন। তাঁহার ব্যক্তিত্বের প্রভাব ছিল অসাধারণ; তদুপরি ছিল তাঁহার নিষ্ঠা। দলে দলে লোক আসিয়া তাঁহার সম্প্রদায়ভুক্ত হইল। একটি বিষয়ে আমরা লক্ষ্য করি যে ভারত ও তিব্বতের কোনও কোনও তন্ত্রের গ্রন্থে যেরূপ কুরুচির পরিচয় পাওয়া যায়, অমোঘের কোনও গ্রন্থে তাহার আভাসমাত্রও নাই। তাঁহার গ্রন্থাবলী হইতে কিছু কিছু অংশ উদ্ধার করিলেই বুঝা যাইবে তাঁহার বক্তব্য কি। এই সকল গ্রন্থ সংক্ষিপ্ত, এখন দুষ্প্রাপ্যও বটে। তিনি বলিতেছেন, "রম্ভার ন্যায় মানুষ অন্তঃসারশূন্য নয়। তাহার দেহের মধ্যে এক অমর আত্মা রহিয়াছে। শিশুর মুখের ন্যায় সেই আত্মা সরল ও নিষ্পাপ। দেহত্যাগের পর বিভিন্ন মানবের আত্মা যায় বিভিন্ন নরকে; সেইখানে তাহার বিচার হয়। তান্ত্রিকগণ মনে করেন যে উপরিস্থিত কোনও পুণ্যাত্মা পাপী আত্মার জন্য প্রার্থনা করেন। সেই প্রার্থনার ফলেই পাপক্ষালন হইয়া যায়। পাপীকে নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। সেই পুণ্যাত্মার প্রার্থনার বলে পাপী আত্মা নবজীবন লাভ করিয়া কোনও সৎকার্য্যের দ্বারা আপনার পূর্ব্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে। এই প্রায়শ্চিত্তই পাপীর পাপক্ষালনের উপায়, নরক যন্ত্রণা ভোগ নয়। নিষ্ঠাবান্ কোনও তান্ত্রিক যদি তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে কোনও বুদ্ধলোকে জন্মলাভ করিবার নিমিত্ত আকাঙ্ক্ষা করেন, তাহা হইলে তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ হয়। যাহাদের নিজেদের কোনও পুণ্যবল নাই, সেই সকল অবিশ্বাসী পাপীদিগের মৃত্যুর পর তাহাদের জন্য পুণ্যাত্মাগণ প্রার্থনা করিলেই তাহারা মুক্তিলাভ করে। মৃতব্যক্তির মুক্তিবিধানের নিমিত্ত তান্ত্রিকগণ অতি নিষ্ঠার সহিত সাধনা করেন।"

তান্ত্রিক শ্রমণদিগের অনুদিত ও অনুলিখিত বহু মন্ত্রের ভিতর দেখা যায় যে নানারূপ দানবের অশুভ প্রভাব দূরীভূত করিবার নিমিত্ত সেগুলি উচ্চারিত হইত। এইরূপ বহু দানবের প্রভাব তান্ত্রিকগণ মানিতেন। তাঁহাদের মতে পাহাড়, বন, তৃণভূমি, বালুকা, অগ্নি, জল, বায়ু, গাছ, পথ, মাঠ—সকলেরই অধিষ্ঠাতা এক একজন দেবতা রহিয়াছেন। এইরূপে সমগ্র পৃথিবী প্রাণময় বলিয়া তাঁহারা মনে করেন। প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে তাহার নিজস্ব আত্মা নিহিত, ইহাই তাঁহাদের ধারণা।

তন্ত্রের গুরু অমোঘবজ্রের প্রতি চীনবাসী খুবই শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, সম্রাট স্বয়ং তন্ত্রপ্রচারে সহায়তা করিয়াছিলেন; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে চীনবাসী তন্ত্রধর্ম্ম হৃদয়ের সহিত গ্রহণ করিয়া লয় নাই। জাপানে কিন্তু এই তন্ত্রের প্রভাব স্থায়ী হইল। Kobo Daishi নামক জাপানী শ্রমণ বৌদ্ধধর্ম আলোচনার জন্য চীনে আসেন; তিনি মন্ত্রের রহস্য শিক্ষা করিয়া গিয়া জাপানে Shingon নামে এক শাখার প্রবর্ত্তন করেন।

এই Shingon শাখাভুক্ত ব্যক্তিগণ মনে করেন বিশ্বের সকল বস্তু একই ঈশ্বরের দ্বারা অনুপ্রাণিত। এই ধর্মে যাবতীয় মতের সমন্বয় করিবার প্রয়াস হইয়াছে। ইহাতে একদিকে যেমন অতিসূক্ষ্ম দার্শনিক তথ্য সকল রহিয়াছে, অপরদিকে নানাপ্রকার ক্রিয়াকলাপের বিধি দেওয়া হইয়াছে। হিন্দু, বৌদ্ধ, পারসিক, চীন ও জাপানের সকল ধর্মের সকল প্রকার দেবতার সমাবেশ করিয়া বুদ্ধকেই তাহাদের কেন্দ্র বলিয়া মানিয়া লওয়া হইয়াছে। বিশ্বের মধ্যে বিভিন্ন প্রয়োজনমত, বিভিন্ন উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেবতা অধিষ্ঠিত আছেন—Shingon মতে ইহা স্বীকার করিয়া লইয়া সর্বোপরি বলা হইয়াছে যে এ সকলই একই শক্তির দ্বারা প্রভাবিত। যে সকল অসংখ্য দেবতা, অতিমানব, সিদ্ধমানব সারা বিশ্বের স্থানে স্থানে আপনাদের মহিমায় অধিষ্ঠিত আছেন, তাঁহাদিগকে অপূর্ব সৌন্দর্য্য ও শক্তিতে ভূষিত করিয়া চিত্র ও মূর্ত্তির মধ্যে প্রতিফলিত করা হইয়াছে; ইঁহাদের উদ্দেশ্যে নানারূপ ক্রিয়াকলাপের বিধি ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে। এইরূপে অভিনব একটি শিল্পকলার সৃষ্টি হইয়াছে।

মন্ত্র ও তন্ত্রযানের মধ্যে মুদ্রা অর্থাৎ দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বাহু ও অঙ্গুলীর যথাযথ সন্নিবেশের উপর বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হয়। এ সম্বন্ধে বহু বৃহৎ বৃহৎ গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন কোনও কোনও গ্রন্থে বুদ্ধকে মধ্যবিন্দু করিয়া বিচিত্র দেব, দানব, অতিমানব ও সিদ্ধমানবের যথাযথ সন্নিবেশে একটি চক্রের পরিকল্পনা দেওয়া হইয়াছে; কোথাও বা শ্রেণী

বিভাগ করিয়া এক একটি চতুষ্কোণ বা চক্রের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর দেবতাদিগের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সেই চতুষ্কোণ বা চক্রগুলির নাম মণ্ডল। মণ্ডলগুলি দ্বারা সুসম্বদ্ধ সমগ্র বিশ্বের ধারণাটি পরিস্ফুট করিয়া তোলা হইয়াছে। চীনা ও তিব্বতীতে এই সকল মণ্ডল সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ রহিয়াছে। ইহা ভিন্ন চীন, জাপান ও তিব্বতে নানারূপ চিত্রকলার দ্বারা এই মণ্ডলের স্বরূপ সুস্পষ্ট প্রতিফলিত হইয়াছে। তিব্বত, চীন ও জাপানের প্রতিভাবান্ শিল্পীগণ এই সকল মণ্ডলের বিচিত্ররূপ পরিকল্পনা করিয়াছেন এবং তাঁহাদের নিপুণ তুলিকা মন্ত্রযানের মধ্যবিন্দু বৈরোচনকে অবলম্বন করিয়া কত মনোহর শ্রেষ্ঠ চিত্র অঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছে। জাপানের বহু চিত্রকরের অঙ্কিত অচল বৈরোচনের চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। অচল বৈরোচনকে জাপানে বলা হয় Fedo।

চীনা ত্রিপিটকে বহু প্রকার মুদ্রার চিত্র রহিয়াছে। ইহা ভিন্ন অনেক মন্ত্র প্রাচীন গুপ্ত লিপিতে ইহার মধ্যে রহিয়াছে; তাহার সহিত তাহাদের চীনা উচ্চারণও দেওয়া হইয়াছে। এই চীনা উচ্চারণের সাহায্যে সংস্কৃত শব্দটি যথাযথ উদ্ধার করা যায়।

৭৮৫ খৃষ্টাব্দে প্রজ্ঞা নামক কপিশনিবাসী এক শ্রমণ চীনে আসেন। চারিটি গ্রন্থ ইনি অনুবাদ করেন। তাহার মধ্যে মহাযানমূলজাতহৃদয়ভূমিধ্যানসূত্র হইল একটি। মহাযানের কতকগুলি সুন্দর স্তোত্র ইহাতে রহিয়াছে; Suzuki সেগুলির অনুবাদ করিয়াছেন। একটী স্তোত্রের অনুবাদ এখানে দিতেছি—

"মহাপ্রলয়ের দিনে পর্ব্বত সাগর সমেত সমগ্র পৃথিবীকে অগ্নি যেমন ধ্বংস করিয়া ফেলিবে তেমনি ধর্ম্মগত বিধি অনুসারে অনুতাপ করিলে, সেই অনুতাপে সকল পাপ সমূলে বিনষ্ট হইয়া যাইবে।—পার্থিব বাসনারূপ অঙ্গার অনুতাপাগ্নিতে ভস্ম হইয়া যায়, অনুতাপ স্বর্গের পথ প্রশস্ত করিয়া দেয়। অনুতাপ চতুর্বিধ ধ্যানের আনন্দ সঞ্চার করে, অনুতাপে মণিমাণিক্যের পুষ্পবৃষ্টি হইতে থাকে।

হীরকের ন্যায় সুদৃঢ় পবিত্র জীবন অনুতাপের দ্বারা লাভ করা যায়। অনুতপ্ত ব্যক্তি ত্রিভুবনের কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করে, বোধিজ্ঞান তাহার প্রস্ফুরিত হইয়া উঠে।

তাঙ্ রাজত্বের প্রথম শতাব্দীর মধ্যে (৬১৮—৭১৯) ষাট জনেরও অধিক চীনা শ্রমণ ভারত ও ভারতীয় উপনিবেশ সমূহে গমন করেন। এদিকে প্রায় পঁচিশজন হিন্দু শ্রমণ চীনে আসিয়া গ্রন্থ অনুবাদ কার্য্যে জীবন কাটাইয়া দেন। প্রথম শতাব্দীতেই প্রায় চারশত গ্রন্থ সংস্কৃত হইতে চীনা ভাষায় অনূদিত হয়, তাহার মধ্যে এখন ৩০৮টি পাওয়া যায়।

বৌদ্ধ সাহিত্য ছাড়া এযুগে অন্যান্য ক্ষেত্রেও হিন্দুদিগের প্রভাব দেখা যাইত। I-hsing নামক এক চীনা শ্রমণ সম্রাটের আদেশে এক চীনা মাসপঞ্জী (Calender) প্রস্তুত করেন। তাহাতে হিন্দু জ্যোতিষী গৌতমসিদ্ধের প্রভাব যথেষ্ট ছিল। এই সময় চীনা গণিত শাস্ত্রের (Arithmetic) বহুল উন্নতি হয়। হিন্দু শ্রমণগণ সংস্কৃত গণিত শাস্ত্রের কতিপয় গ্রন্থ চীনায় অনুবাদ করিয়াছিলেন; Sui রাজত্বের গ্রন্থপঞ্জীর মধ্যে গ্রন্থগুলির নাম পাওয়া যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় সেগুলি এখন বিলুপ্ত। চীনা গণিতশাস্ত্রে এগুলির প্রভাব থাকা খুবই সম্ভব।

যে সকল চীনা সম্রাট্ বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে নিষ্ঠাবান্ কেহ কেহ বৌদ্ধ অনুষ্ঠান কিছু কিছু চীনা আচার অনুষ্ঠানের অন্তর্গত করিয়া লইয়াছিলেন। ৭৬০ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ Su Tsung তাঁহার জন্মদিনের উৎসব বৌদ্ধ প্রথানুসারে সম্পন্ন করেন। রাজবাড়ীর মহিলাগণ বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বদিগের ভূমিকায় সজ্জিত হইলেন। সভাসদ্‌গণ সম্রাটের সম্মুখে বৌদ্ধ অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন করেন।

৯৬০ খৃষ্টাব্দে নানারূপ অন্তর্বিরোধ দমন করিয়া Chao Kuan Yin উত্তর চীনে, সুঙ্ রাজত্ব স্থাপন করেন। দেশের ভিতর বহু চীনা রাজাদের সহিত যে কেবল Sung সম্রাট্‌দিগের পড়িতে হইয়াছিল এমন নহে, উত্তরে তাতার জাতীয় Khitan দিগের সহিতও তাঁহাদের বিরোধ বাধে। রাজনৈতিক এই সকল গোলমাল সত্ত্বেও সাহিত্য শিল্পকলার তেমন ক্ষতি করিতে পারে নাই। Li Lung Mienএর ন্যায় বিখ্যাত শিল্পীগণ বৌদ্ধভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহাদের অভিনব শিল্প সৃজন করিতেছিলেন। এই যুগে বোধিধর্ম্মের ধ্যান-শাখার প্রভাব চীনের শিল্প ও সাহিত্যকে অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিয়াছিল। ষষ্ঠ শতাব্দীতে বোধিধর্ম

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসুধাময়ী দেবী

তখনকার পাণ্ডিত্যপূর্ণ ধর্মের আড়ম্বরের বিপক্ষে 'ধ্যান'-শাখার প্রবর্ত্তন করেন। কিন্তু এই মৌনভাব সম্বন্ধেই ক্রমশ বহু গ্রন্থ লিখিত হয় এবং একটি বৃহৎ সাহিত্য গড়িয়া উঠে।

৯৬০ হইতে ১০৬২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রথম চারিজন "সুঙ্" সম্রাটের রাজত্বকালে একশত বৎসরের মধ্যে তিনশতেরও অধিক চীনা শ্রমণ ভারতে আসেন। ভারতের ইতিহাস-লেখকগণ এই সময় ভারতে মুসলমান বিজয়ের কাহিনী বর্ণনা করিয়া তাহার ইতিহাস সম্পূর্ণ হইল মনে করিয়াছেন; কিন্তু সেই সময়েই দলে দলে চীনা শ্রমণ পার্থিব রাজত্বের ঊর্দ্ধে একটি শাশ্বত সম্পদের আশায় ভারতে যাতায়াত করিতেছিলেন এবং ভারতও তাহার সন্তানগণকে মৈত্রী ও করুণার বাণী প্রচার করিবার জন্য উত্তরে চীন ও তিব্বত, এবং দক্ষিণে সিংহল, বর্মা প্রভৃতি স্থানে প্রেরণ করিতেছিল। এই গভীর বিজয়ের কাহিনী ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হয় নাই।

দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে মধ্য এশিয়ার একটি নূতন যাযাবর জাতি প্রবল হইয়া উঠিল। চীনের উত্তরে মঙ্গোলিয়া ছিল তাহাদের কেন্দ্রভূমি। দেখিতে দেখিতে একটির পর একটি দেশ জয় করিয়া তাহারা যে ভাবে পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে বিজয় নিশান উড়াইল তাহা ভাবিলে অবাক হইতে হয়। মোগল সেনাপতি Chenghis Khan ১২০৬ খৃষ্টাব্দে বিভিন্ন মোগল দলগুলিকে একত্রিত করিয়া সদলবলে এশিয়ার সর্ব্বত্র জয় করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। পশ্চিমে বুল্‌গেরিয়া, সার্বিয়া, হাঙ্গেরীও রুশিয়া, পূর্ব্বে প্রশান্ত মহাসাগর পর্য্যন্ত এবং দক্ষিণে চীন, তিব্বত ও ভারতের সীমান্ত প্রদেশগুলি তাহাদের অধীনতা স্বীকার করিল।

চেঙ্গিসের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র Ogotai, Kitan দিগকে পরাজিত করিয়া উত্তর চীন জয় করিয়া লইলেন। Ogotai এর মৃত্যুর পর Mankon Khan সিংহাসন অধিকার করেন। তাঁহার রাজত্বকালে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা 'কুব্‌লেই খাঁ' (Khublai Khan) দক্ষিণ চীন জয় করিয়া Yun-nan পর্য্যন্ত মোগল প্রাধান্য স্থাপন করেন। ১২৫৭ খৃষ্টাব্দে কুব্‌লেই খাঁ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার রাজত্বে নির্ব্বাণোন্মুখ দীপের ন্যায় বৌদ্ধধর্ম্মের শিখা একবার উজ্জ্বলভাবে জ্বলিয়া উঠিয়াছিল।

কুব্‌লেই খাঁ সম্রাট হইয়া ১২৬০ খৃষ্টাব্দে Phagspa নামক তিব্বতী এক শ্রমণকে রাজগুরুর পদে বরণ করিলেন এবং বৌদ্ধ বিহারগুলির নেতৃত্বের ভার তাঁহাকে দিলেন। এইরূপে তিব্বত ও চীনের মধ্যে বিশেষ একটি সম্বন্ধ তিনি স্থাপন করেন। এখন হইতে তিব্বতী লামাগণ চীন ও মঙ্গোলিয়ায় বৌদ্ধধর্ম প্রচারকার্য্যে অগ্রণী হইলেন। মঙ্গোলিয়ার অক্ষরগুলির সংস্কারকার্য্যে ও অন্যান্য বিষয়ে Phagspa প্রয়াস পাইয়াছিলেন সে বিষয়ে আমরা মধ্য এশিয়ার প্রবন্ধে বলিব। চীন বৌদ্ধ গ্রন্থ অনুবাদের কার্যটি পুনরায় নিয়মিতরূপে চালাইবার ব্যবস্থা তিনি করেন। স্বয়ং তিনি হীনযানবিনয়ের একটি গ্রন্থ অনুবাদ করেন গ্রন্থটির নাম মূলসর্বাস্তিবাদকর্মবাচা। মোগল সম্রাট্ তাঁহাকে খুবই সম্মান করিতেন এবং 'মহান্ অমূল্য ধর্ম্মের রাজা' (Prince of the Great and Precious Law) এই উপাধি প্রদান করেন।

মোগলসম্রাট্‌দিগের প্রায় সকলেই বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি আস্থাবান্ ছিলেন। বিহারগুলির সংস্কারকার্য্যে, গ্রন্থ ছাপাইবার নিমিত্ত এবং বৌদ্ধ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিতে তাঁহাদের বহু অর্থ ব্যয় হইত।

১৩১৪ খৃষ্টাব্দে Pagspaর শিষ্য Shalopa তাঁহার গুরুর একটি গ্রন্থ চীন ভাষায় অনুবাদ করেন। গ্রন্থটিতে কয়েকটি সূত্র ও শাস্ত্র হইতে বিভিন্ন অংশ উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

গ্রন্থ অনুবাদের যুগ এখানে একরূপ শেষ হইল। মোগল রাজত্বকালের শেষদিকে তিব্বতী তান্ত্রিকধর্ম বৌদ্ধধর্ম্মের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। শেষ মোগলসম্রাট রাজসভায় কুরুচিসম্পন্ন তান্ত্রিক অভিনয় সম্পন্ন করাইতেন। তাঁহার পতনের ইহা অন্যতম কারণ। মিং (ming) নামক পুরাতন চীনা রাজবংশ মোগলদিগকে বিতাড়িত করিয়া সিংহাসন অধিকার করে। মিং রাজাদিগের সময় গ্রন্থ অনুবাদের বিষয় কিছু জানা যায় না, তবে চীনালেখকগণ ঐতিহাসিক

ও নানা বিষয়ক বহু গ্রন্থ এই সময় রচনা করেন। তাহার মধ্যে Fio-tsu-li-tai-tang-tsai নামক বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাসটি উল্লেখযোগ্য। Nien Cheng ইহার রচয়িতা। কেবল বৌদ্ধধর্মের কয়েকটি বিবরণ ইহাতে যে আছে তাহা নয়, কুংফুৎসুর ধর্ম্ম ও তাও ধর্মেরও কিছু কিছু কাহিনী আছে।

মিং রাজত্বে ১৩৬৮ হইতে ১৩৯৬ এর মধ্যে ত্রিপিটকের ত্রয়োদশতম সংস্করণ সঙ্কলিত হয়। প্রথম মিংসম্রাটের রাজত্বকালে নানকিংএ ইহা প্রথমে প্রকাশিত হয়। দক্ষিণচীনের বৌদ্ধগ্রন্থগুলি ইহাতে সঙ্কলিত হয়। তৃতীয় মিংসম্রাটের রাজত্বে কতকগুলি নূতন গ্রন্থ যোগ করিয়া ইহা পুনর্ব্বার প্রকাশ করা হয়। তাহার পর আবার Mi-tsang নামক এক চীনা শ্রমণ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়।

ত্রিপিটকের অন্যান্য সংস্করণের মধ্যে মিংরাজত্বের সংস্করণটিকে জাপানী পণ্ডিত Nanjio ইংরাজী অনুবাদ করিয়া সুপ্রসিদ্ধ করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার catalogue হইতে সর্ব্বপ্রথম পূর্ব্ব এশিয়ায় যে বৃহৎ বৌদ্ধ সাহিত্য ছিল তাহার একটি সম্পূর্ণ ধারণা লাভ করা যায়। ধর্মগ্রন্থ হিসাবে চীনা ত্রিপিটকের তত মূল্য নয়, যত মূল্য সাহিত্য ও ইতিহাস হিসাবে। ইহাতে জীবনী, ভ্রমণ কাহিনী, অভিধান ও নানা বিষয়ক গ্রন্থ সঙ্কলিত হইয়াছে। সুতরাং চীন ও তাহার ধর্মগুরু ভারতের বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাস ত্রিপিটকের মধ্যে বেশ স্পষ্টভাবে পাওয়া যায়।

ইহার পর হইতে চীন ও ভারতের সম্বন্ধসূত্রটি ছিন্ন হইয়া যায়। সুদীর্ঘ বিচ্ছেদের পর পুনরায় ধীরে ধীরে সেই গভীর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধটি স্থাপিত হইবার আভাস বর্ত্তমানে পাওয়া যাইতেছে। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান ভারতের বাণী চীনকে শুনাইবার জন্য ভারতের ঋষিকবি রবীন্দ্রনাথের অভিযানের বিষয় আমরা সকলেই জানি। রবীন্দ্রনাথের রচনা চীন ও জাপান উভয় স্থানেই তাহাদের দেশের যে কোনও কবির রচনার ন্যায় সুপরিচিত। তাঁহার অধিকাংশ গ্রন্থই চীন ও জাপানী ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে চীনা কবি সু-মোর ভারত ভ্রমণের কথা সকলেরই স্মরণ আছে। অন্যান্য নানা বিষয়ের সহিত বিশ্বভারতীতে চীনা সাহিত্য অধ্যয়নেরও ব্যবস্থা রহিয়াছে।

চীনের সহিত ভারতের সম্পদ আজ প্রায় সহস্র বৎসর ছিল। রবীন্দ্রনাথ পুনরায় সেই সম্বন্ধ স্থাপনের জন্যই চীন যাত্রা করিয়াছিলেন। যে গভীর আধ্যাত্মিক যোগ এই দুই দেশকে ও প্রাচীন জাতিকে একদিন এক করিয়া ছিল তাহা আজ উভয় দেশই বিস্মৃত হইয়াছে। সেই যোগসাধনের জন্যই বিশ্বভারতীতে আজ আয়োজন হইয়াছে, এবং এই নব যুগের প্রধান পুরোহিত হইতেছেন রবীন্দ্রনাথ যিনি নিজ প্রতিভাবলে জগতের সাহিত্যে স্থান পাইয়াছেন।

একুশ বছর

-গল্প-

—শ্রীচারুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

ভবিষ্যৎ জীবনের একটা মোটামুটি তালিকা সকলের মনেই থাকে। আমারও ছিল; এবং তাহার মধ্যে দুইটি জিনিষের তলায় খুব মোটা করিয়া লাইন টানিয়া রাখিয়াছিলাম—ডেপুটিগিরি এবং সেই সঙ্গে একটি বিদুষী স্ত্রী। প্রথমটার বেলায় বিশেষ বেগ পাইতে হয় নাই,—কেননা, কপাল ও মুরুব্বি দুই-ই ছিল। কিন্তু অনেক বাছিয়া খুঁজিয়া দ্বিতীয় দফায় যখন পৌঁছানো গেল, বয়সও তখন তিরিশের কোঠা পাড়ি দিয়া ফেলিয়াছে। ইতিমধ্যে বন্ধুমহলে ছেলের অন্নপ্রাশন পুরানো হইয়া গিয়াছে। কাহারও কাহারও মেয়ের বিবাহের চিন্তাকাল আসন্ন হইয়া আসিয়াছে। আশ্চর্য্য নয়। বাঙালী ছেলেরা এই বিষয়ে পিতামাতার অতি বাধ্য ভক্ত সন্তান। বিশ্ববিদ্যালয়ের বোঝা এড়াইবার পূর্ব্বেই একটি ঘোমটা-ঘেরা, নলকপরা চলন্ত পুতুল জোগাড় করিয়া পঞ্চশর এবং মা ষষ্ঠীর পূজা একসঙ্গেই সুরু করিয়া দেন। আমি এই দেবতাদ্বয়কে দূর থেকেই নমস্কার জানাইয়াছি। সুতরাং আমার কৃতবিদ্য বন্ধুদের মত প্রতি শনিবারে সাজিয়া গুজিয়া ষ্টেশনে ছুটিবার সৌভাগ্য আমার হয় নাই; কিংবা কোন্ এক কথামালা পর্য্যায়ের গ্রাম্য দেবীর উদ্দেশ্যে রাত জাগিয়া লম্বা লম্বা মহাকাব্যে স্তুতি-নিবেদনেরও প্রয়োজন বোধ করি নাই। এজন্য কোনদিন আপশোষ করিয়াছি, এমন কথা আমার অতি বড় শত্রুও বলিতে পারিবে না।

বিবাহ করিয়া কতটা সুখী হইয়াছি, প্রৌঢ়বয়সে সে কথা আর এখানে তুলিবার প্রয়োজন নাই। কেননা লেখাটা গৃহিনীর হাতে পড়িবার আশঙ্কা আছে। তবে তের'র বদলে তেইশ এবং প্রণয়িনীর স্থলে গোড়া থেকেই গৃহিণী লাভ করিয়া যে কোন-কিছুতে বঞ্চিত হইয়াছি এমন সন্দেহ তো কোন কালেই হয় নাই। কিন্তু বন্ধুরা মানিতে চাহেনা। সেই ঝড়ের রাত্রির ঘটনাটাকে কোন কোন ফ্রয়েডের ছাত্র এমন সব ব্যাখ্যা দিতে সুরু করিয়াছেন, যাহার পরে আর চুপ করিয়া থাকিবার উপায় নেই। সুতরাং ব্যাপারটা এবার খুলিয়াই বলিতে হইল।

বেশি দিনের কথা নয়। সবে ফরিদপুরে বদলি হইয়া আসিয়াছি। একটা খুনী মোকদ্দমার তদন্তের ভার পড়িল। পাকা তিরিশ মাইল পথ; আগাগোড়া নৌকায়। কবিদের জিহ্বায় জল আসিবার কথা, কিন্তু আমার আসিল চোখে। উপায় নাই; চাকরি।

যতদূর দৃষ্টি যায়, জল, জল, জল। তাহারি উপরে ধানগাছের পাতাগুলি কোনরকমে মাথা জাগাইয়া দাঁড়াইয়া আছে। দাঁড়ের জলে নাচিয়া নাচিয়া বজরা চলিয়াছে। আর আমি ভিতরে চিৎপাত হইয়া পড়িয়া আছি। মাথা তুলিবার উপায় নাই। বিকালের দিকে দেখিলাম উত্তর পশ্চিম কোণে কালো মেঘ গাঢ় হইয়া উঠিয়াছে। দেখিতে দেখিতে তাহার রঙ্ আগুনের মত হইয়া গেল। মাঝিরা প্রাণপণে তীরে পড়িতে না পড়িতেই ঝড় আসিল। সে যে কি আসা, বুঝাইবার মত স্পর্দ্ধা আমার নাই। মনে হইল আমরা যেমন করিয়া কাগজ ছিঁড়িয়া টুকরা করিয়া ফেলি, তেমন করিয়া কে সেই আকাশ জোড়া গাঢ় মেঘটাকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ছুঁড়িয়া ফেলিতে লাগিল। বৃষ্টিধারা গুঁড়াইয়া, গাছের মাথা নিঙড়াইয়া, দুর্দ্দান্ত নদীটাকে ক্ষেপাইয়া তুলিয়া যে ক্ষুধার্ত্ত মাতাল তাহার তাণ্ডবনৃত্যে সমস্ত সৃষ্টিকে লইয়া ধ্বংসক্রীড়ার গোলকের মত খেলিতে লাগিল, তাহাকে চোখে দেখা গেলনা, কিন্তু তাহার রক্তাক্ত

অগ্নিচক্ষু পাকিয়া থাকিয়া আকাশের এপার ওপার দুর্ভেদ্য অন্ধকার চিরিয়া চিরিয়া দেখিতে লাগিল; এবং তাহার ক্রোধান্ধ গর্জ্জনে আকাশ, মাঠ, বাড়ী ঘর দুয়ার ফাটিয়া পড়িতে লাগিল। আমার বজরার পাশেই একটা প্রকাণ্ড বটগাছ তাহার আশীবছরের গর্ব্ব মাথায় করিয়া নদীর জলে লুটাইয়া পড়িলেন। বনস্পতির পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া তাহার আর কোন অনুচর পাছে আমাকে নিয়াই পড়েন, সেই আশঙ্কায় তীরের মত বৃষ্টিধারা মাথায় করিয়াই ছুটিলাম, এবং কাছেই যে বাড়ী পাইলাম, উঠিয়া পড়িলাম।

গরীবের ঘরে আয়োজনের বাহুল্য ছিলনা। কিন্তু যেটুকু ছিল, তাহা আতিথ্যে কোমল এবং সৌজন্যে মধুর। বিছানায় শুইয়া এই কথাই বোধ হয় ভাবিতেছিলাম। বাহিরে তখন ঝড়ের বেগ পড়িয়াছে, কিন্তু আক্রোশ পড়ে নাই। মাঝে মাঝে শন্ শন্ শব্দ শোনা যায়। কিন্তু তাহাকে উপেক্ষা করিয়া নিশ্চিন্ত মনে বৃষ্টি পড়িতেছিল। হঠাৎ মনে হইল, অন্ধকারের মধ্যে কী একটা জ্বলিয়া উঠিল। দেখিলাম বেড়ায় টাঙানো একখানা ছবি—একটি বিগত-যৌবনা মহিলা, চারিদিকে গুটিতিনেক ছেলে মেয়ে। ভাবিলাম, বোধ হয় গৃহিনীর প্রতিমূর্ত্তি;—কেননা, আমার শোবার ব্যবস্থা কর্ত্তার ঘরেই হইয়াছিল। বোধ হইল যেন চেনা মুখ; যেন বহুদিন আগে কোথায় দেখিয়াছি। কিন্তু আর কিছুই মনে করিতে পারিলাম না। হঠাৎ আলোটা নিবিয়া গেল, ছবিখানাও আর দেখা গেল না। কিন্তু সে যেন বেড়ার পাশ থেকে উঠিয়া আসিয়া আমার মনের মধ্যে জুড়িয়া বসিল। তাহার প্রত্যেকটি রেখা রুদ্ধ স্মৃতির নানা অলিগলির মধ্য দিয়া আনাগোনা করিয়া বেড়াইতে লাগিল। আবার আলো জ্বলিতেই দেখি আমার মশারির ঠিক পাশেই একটি অনিন্দ্য সুন্দর কিশোরী সকুণ্ঠ লজ্জায় আমার দিকে চাহিয়া আছে। চমকিয়া উঠিলাম। এ যে বিষবৃক্ষের আয়োজন দেখিতেছি। কিন্তু সাবধান। নগেন্দ্রনাথের মত ভুল যেন কিছুতেই না করিয়া বসি। তাহার সূর্য্যমুখী লোক ভালো ছিল। কিন্তু আমার।—একটু ভয়ের সুরেই কহিলাম, কে? জবাব নাই। এবার রুক্ষভাবে বলিলাম, কে তুমি? জবাব আসিল। মৃদু গুঞ্জনের স্বরে যেন বহুদূর কোন্ স্বপ্নলোকের ওপার থেকে কহিল, আমায় চেনো না? আমি তোমার প্রথম প্রেম।

সর্ব্বনাশ! কোন প্রেমই চিনিলাম না, তা আবার প্রথম! এর পরে দ্বিতীয়ও আছে নাকি? কহিলাম, তোমার বোধ হয় ভুল হচ্ছে। ঐ প্রেম-ট্রেমের সুযোগ আমার জীবনে একদম হয়নি।

কিশোরী খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল, সে কি ডেপুটি-বাবু? বিয়ে করেছ আর প্রেমের সুযোগ হয় নি? কেন, তোমার তেইশ বছরের কনে বৌ'এর সঙ্গে? একদিনও না? ফুলশয্যার রাতেও না?

মেয়েটা তো অত্যন্ত জ্যাঠা। একটা কড়া ধমক লাগাইব ভাবিতেছি, সহসা অপূর্ব্ব করুণ কণ্ঠে শুনিলাম, কেমন ক'রে হ'বে? তার কি আর উপায় ছিল? সে তখন কোথায়?

বলিলাম, কে সে? কার কথা বলছ?

সহজ কণ্ঠে কহিল, সে তোমারি ছিল। কিন্তু তুমি তো জাননি? সে তোমার একুশ বছর।

একটু ব্যঙ্গের সুরেই বলিলাম ওঃ তা হ'লে দেখছি একুশ না পেরিয়েই একেবারে চল্লিশে এসে ঠেকলাম।

সস্নেহে হাসিয়া উত্তর করিল, তুমি যাকে পেয়েছিলে সে তো পঞ্জিকার একুশ। কোষ্ঠির পাতায় তার পায়ের চিহ্ন রেখে গেছে, কিন্তু মনের পাতা স্পর্শ করতে পারেনি।

একটু থামিয়া যেন আপন মনে বলিয়া চলিল, "কত কাল! কিন্তু আজো যেন চোখের উপরই দেখছি। কলেজ লাইব্রেরীর পশ্চিম ধারে এক সার আলমারী। ফাঁকে ফাঁকে এক একখানা চেয়ার টেবিল। তারি একটিতে সে ব'সে আছে। কোলের কাছে দর্শনের বই খোলা। চোখে তার স্বপ্ন —একুশ বছরের স্বপ্ন। সেই রঙীন আলোয় একবার জানালা দিয়ে তাকাল। নারিকেল গাছের পাতাগুলো শরতের রৌদ্রটিকে ঘনঘন কাঁপিয়ে দিয়ে গেল। চোখে পড়ল সমুখের বস্তিটায় বড় বেহারার বৌ একমনে ব'সে কাঁথা সেলাই করছে। তাদের ছোট বাছুরটি আরামে শু'য়ে প'ড়ে চোখ বুজে জাবর কাটছে। অদূরে একসারি দেবদারু গাছ জড়াজড়ি ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। তারি ফাঁক দিয়ে দেখা

শ্রীচারুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

গেল দূর আকাশের এক টুক্‌রা গাঢ় নীল। একটা চিল উড়ে যাচ্ছিল। মনে হ'ল আর একটু উঠলেই তার ক্লান্ত ডানায় নীল জড়িয়ে যাবে। একুশ বছর মুগ্ধ হ'য়ে চেয়ে রইল। এক নিমেষ, শুধু একটি নিমেষের তরে আমি তার মুকুলিত হৃদয়ের পাপড়িটির উপরে গিয়ে দাঁড়ালাম। যৌবন-নেশায় আকাশ বাতাস মাতাল হ'য়ে উঠল। দেবদারুর বীথিকায়, আকাশের শ্যামলিমায়, রৌদ্রের কম্পনে ভেসে উঠল একটি সন্ধ্যার পল্লীপথ, একটি পরিচিত পুকুরের ঘাট, একটি লাজ-কোমল কিশোরীর চঞ্চল গতি। তার মুখ-খানি—একি? একুশ বছরের গোপন হৃদয় বারবার চমকে উঠল। ক্ষণেকের জন্য। তারপর চোখদুটি আবার নেমে এল কাণ্টের পাতায়। কিন্তু তার সমুখে শুকনো অক্ষরগুলো যেন নেচে বেড়াতে লাগল।"

মাঝখানে হঠাৎ আসিয়া করিল, 'মনে পড়েছে?' আমার সমস্ত দেহমন যেন আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। জবাব দিতে চেষ্টা করিলাম, পারিলাম না। সে বলিয়া চলিল,—"আর এক দিন এবং সেই শেষ। সেদিনও আকাশ-ভরা এমনি মেঘের ঘটা। শ্রাবণ রাত্রির বুক ভাসিয়ে এমনি ব্যাকুল কান্না। ইডেন হষ্টেলের আলোগুলো অনেকক্ষণ নিবে গেছে। দোতালায় পূব ধারের ছোট ছোট কাঠের ঘরগুলোতে সবাই হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছে। একুশ বছর জেগে ব'সে ছিল। জানালা দিয়ে অন্ধকার রাত্রির বুকের মধ্যে কী দেখছিল, সেই জানে, অথবা জানেনা। সেই আনত বর্ষার অক্লান্ত অশ্রু দুচোখ ভ'রে নিয়ে ধীরে ধীরে তার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। দিগন্ত জোড়া আঁধার সায়রে ভেসে উঠল দুটি পথ চাওয়া চেনা চোখ। কি যেন তারা বলতে চাইল, কিন্তু ভাষা খুঁজে পেল না। শ্রাবণের অশ্রুধারায় গ'লে গ'লে ঝ'রে প'ড়ে গেল। একুশ বছরের অনাহত যৌবন শিউরে উঠল। তার সমস্ত দেহমন ফুলের বুকে চুম্বন-নত প্রজাপতির ডানা দুটির মত কেঁপে কেঁপে বিবশ হ'য়ে আসতে লাগল। তারপর সহসা সে মুহ্যমান চেতনাকে রূঢ় ধাক্কায় জাগিয়ে তুলে সোজা হ'য়ে দাঁড়াল। সশব্দে জানালা বন্ধ ক'রে একটা মোমবাতি জালিয়ে খাতা পেন্সিল নিয়ে আঁক কষতে সুরু ক'রে দিল। সেই শেষ।"

একটু থামিয়া আবার কহিল, "কেমন, সত্য নয়? একুশ বছরের এই আর্ত্তরূপ সকলের কাছেই লুকানো ছিল। শুধু জেনেছিলাম আমি। জেনেও, তার জীবনের চরম বঞ্চনা থেকে তাকে বাঁচাতে পারিনি। সেই রাত্রে প্রতিহত কামনার গোপন লজ্জা গোপন রেখে অন্ধকারের মধ্যে যখন অদৃশ্য হ'য়ে গেলাম, একুশ বছরের স্বপ্নপেলব চক্ষু দুটি বুকে লেগেই রইল। একটা প্রশ্ন কেবল বরাবর ক'রে মনের মধ্যে ঠেলে উঠতে লাগল, কী পেল সে? কী পেল?"

একটানা কবিত্বের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিলাম। বিরক্তির ধাক্কায় আচ্ছন্ন ভাবটা কাটিতেই বলিয়া উঠিলাম, কী পেল, সে তুমি কি বুঝবে? পেল—

কিশোরী বাধা দিয়া চেঁচাইয়া উঠিল, "জানি, জানি। তুমি বলবে, সবই পেল। পৃথিবীর সমস্ত দান, অনাদি মানবের সমস্ত চিন্তা-সম্ভার। এই না? কিন্তু হায়রে, প্রকাণ্ড জ্ঞান সমুদ্রের চেয়ে কি বড় নয় এক ফোঁটা অশ্রু? একটি তরুণীর গোপন হৃদয়ের রহস্য-কোণটিতে এতটুকু আসন—সে কি তোমার কীর্ত্তি সাম্রাজ্যের সিংহাসনকে হার মানিয়ে দেয় না? সে কথা কেমন ক'রে বোঝাবো! জন্মান্ধকে আলো দেখাবো কেমন ক'রে? সে কথা যে বুঝত সে চ'লে গেল; নিয়ে গেল সেই সোনার কাঠি যার স্পর্শে পৃথিবী হ'য়ে ওঠে স্বপ্নময়, জীবন হ'য়ে যায় মায়াকানন। তাকে যে হারাল সে কোথায় পাবে সেই সৃষ্টি-শক্তি, একটি তুচ্ছ কিশোরীর বুকের মধ্যে যে রচনা করে স্বর্গ, মানুষকে যে ক'রে তোলে কল্পনা। সে মোহ কেটে গেল। সে অজ্ঞান-স্বপ্নের আত্ম-সমাধি রইল না। কেমন ক'রে থাকবে? একুশ বছর যখন চ'লে যায়, চোখের ভিতর থেকে নিঙড়ে নিয়ে যায় চন্দ্ররশ্মির মাদকতা, আর নারীর উপর থেকে খুলে নিয়ে যায় রহস্যের আবরণ। তারপর আর কীই বা থাকে? কীই বা পেলে?"

এমন অদ্ভুত প্রশ্ন নিজেও নিজেকে কোনদিন করি নাই, অপরের কাছেও শুনি নাই। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলাম, "এই লম্বা বক্তৃতা শোনাবার জন্যেই কি রাতদুপুরে আমার স্কন্ধে ভর করেছ? কিন্তু তোমার জানা-

উচিত ছিল, আমি মোটেই তরুণ প্রেমিক নই, একটি বিবাহিত প্রৌঢ় ভদ্রলোক। সুতরাং নারীসম্পর্কে জ্ঞান নেহাৎ কম হয়নি।"

কিশোরী উচ্চ কণ্ঠে হাসিয়া উঠিল, "তাই নাকি? তাই নাকি? বিবাহিত! আচ্ছা বিয়েটা কেমন লাগল ডেপুটি বাবু? বিয়ের রাতে কি কথা হল? বলনা?"

ইহার নির্লজ্জতায় আমারও লজ্জা হইল। সহসা মুখে কথা যোগাইল না। একটা দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে কোমল কণ্ঠে কহিল, "তা বটে। তোমাকে ব'লে আর কি লাভ? কিন্তু একুশ বছর যে আমার চিরকালের বন্ধু। তার জন্যে বড় লাগে। সেদিন তার বিমুখ দুয়ার থেকে বিদায় নিয়ে, তাই, ফিরে গেলাম সেই ছোট্ট গ্রামে, যেখানে তার ভোলা শৈশব গান গাইত, তার পূজারী কৈশোর ধ্যান করত। দেখলাম সেই ছায়াদীঘি, যেখানে সে ডুবে ডুবে চোখ রাঙা ক'রে অবেলায় বাড়ী ফিরে বকুনি খেত; সেই বটের তল, যেখানে সে গেছোমেছো খেলত, সেই খ'ড়ো ঘরের কোণে শিউলি গাছটি যেখানে সে ভোর বেলায় ফুল কুড়িয়ে মালা গাঁথত। সব তেমনি আছে। কেবল সে শিশুদস্যুর দলটি আর নেই। সঙ্গীরা সব চ'লে গেছে, কোন সহরের কোনখানে হয়তো কেউ জানে না। সঙ্গিনীরা কোথায় গিয়ে কে নীড় বেঁধেছে খুঁজে পাওয়াই দায়। কারো নীড় হয়তো এরি মধ্যে ভেঙে গেছে; ফিরে এসেছে, সিঁথির কোলে সিন্দুর নেই। কেউ হয়তো তিন ছেলের মা—রোগে আর ওষুধে জর্জ্জর, কারুর হয়তো শূন্য কোলে চোখের জলে রাত কাটে না। শুধু সব চেয়ে যে ছোট্ট মেয়েটি তার কাছে কাছে ঘুরে বেড়াত, আর সময়ে অসময়ে চড় চাপড় আর বকুনি খেয়ে ঠোঁট ফুলিয়ে কাঁদ্‌তে গিয়ে কাঁদ্‌ত না, সে এখনো ঘর বাঁধেনি। দেখলাম আজ তার চোখের কোণে যৌবনের আসন্ন ছায়া, পায়ে কিশোরীর চঞ্চল ছন্দ। দুপুর বেলা সবার খাওয়ার শেষে সে এ বাড়ীতে চ'লে আসে। আমার বন্ধুর মা রামায়ণ শুনতে ভালবাসেন। লীলাকে না হ'লে তাঁর চলেই না। কখনো হয়তো বলেন, দ্যাখ তো মা, খোকা কি লিখেছে?—ব'লে একটা সযত্নে তুলে রাখা পোষ্টকার্ডের চিঠি এনে লীলার হাতে দেন। দুটি লাইন। পড়তে গিয়ে বুক কেঁপে উঠে, কথা বেধে যায়। মা একটু চেয়ে দেখে মনে মনে হাসেন, ভাবেন আমার খোকার সঙ্গে বেশ মানায়। লীলা চিঠিখানি ভুল ক'রে বাড়ী নিয়ে যায়। একলা ঘরে ব'সে বার বার পড়ে। চোখের জলে অক্ষরগুলো ঝাপসা হ'য়ে আসে। মাঝে মাঝে তার মা বলেন, বলি ওগো, মেয়ের বয়স কি বাড়ছেনা? বাপ মেয়ের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। এমন সোনা কেউ চিনলেনা! সবাই চায় রূপোর চাক্‌তি। বলেন, এইতো মিঠাপুরের, কি বলে, রাম চাটুয্যের কাছে তো লোক পাঠালাম, দেখি কি হয়। ব্যাটার চোপে তো— ইত্যাদি। লীলার কানে সে কথা যায়। সে শিউরে ওঠে। সেদিন রাত্রে ঘুম হয় না। বালিস ভিজে যায়।"

"তারপর এল গ্রীষ্মের ছুটি। বন্ধু বাড়ী ফিরল। সমস্ত গ্রামখানি চঞ্চল হ'য়ে উঠল। কিন্তু গ্রামের ছেলেটি আর চঞ্চল হ'তে পারলো না। খুড়িমার ভাঁড়ারের আমসত্ব আর কাশী দিদির বাগানের কচি আম এবার নিরুপদ্রবে নিদ্রা দিতে লাগল। মায়ের সঙ্গেও তেমন কথা জমল না। যার জালায় এতদিন গ্রামের পাখীটি পর্য্যন্ত অস্থির হ'য়ে উঠত, সে এবার দু'মাইল হেঁটে নূতন হেড্‌ মাষ্টারের সঙ্গে ভাব ক'রে এল; ভাঙা লাইব্রেরির কোণে ব'সে দেড়ঘণ্টা অমৃতবাজার পড়ল; আর বাকী সময়টা ঘরের কোণে মোটা মোটা বই নিয়েই প'ড়ে রইল। মা ব্যথা পেলেন। কিন্তু পরক্ষণেই মনে মনে হেসে বললেন, ছেলের আমার মাকে নিয়ে আর চলছে না; এবার একটি বউ চাই। একদিন জল খেতে দিয়ে কথাটা ব'লেও ফেললেন। অন্যান্য বারে ছেলের আনত মুখ লাল হ'য়ে উঠত। আজ নিঃসঙ্কোচে মুখ তুলে মায়ের দিকে তাকিয়ে শুধু একবার উচ্চাঙ্গের হাসি হাসল। তাঁর বুকের ভিতরটা চমকে উঠল। ছেলে 'না' বলল না বটে, কিন্তু সে হাসি দেখে মাও নিজের মধ্যে কোন আশ্বাস পেলেন না। দীর্ঘ নিঃশ্বাস চেপে চুপ ক'রে গেলেন। পরদিন আবার মায়ের ঘরে ডাক পড়ল। গিয়ে দেখে লীলা। কচি মুখখানার উপর একটি কৈশোর-সন্ধ্যার আনম্র ছায়া। সমস্ত দেহে একটি স্ফুটনোন্মুখ লাবণ্যের স্থির জ্যোতি। মুহূর্তের জন্য

শ্রীচারুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

তার বুকখানা ন'ড়ে উঠল। পরক্ষণেই নিজেকে চোখ রাঙিয়ে সহজভাবে দু'একটা কথা ব'লে চ'লে গেল। লীলার মুখে ভাল জবাব জুটল না। চোখ তুলেও চাইতে পারলো না। মা খুসী হ'লেন। দুদিন পরেই বন্ধু হঠাৎ কোলকাতায় চ'লে গেল, এবং মাসিকপত্রে প্রবন্ধ লিখে যুবকদের কিশোরী-প্রেম এবং মনশ্চাঞ্চল্যকে খুব ক'সে গাল দিল। এদিকে মা অপেক্ষা ক'রে রইলেন। কিন্তু লীলার বয়স অপেক্ষা করল না।"

"পাত্রীদেখা কুটুম্বের দল যত ভিড় করতে লাগল, তাদের সুমুখে দাঁড়িয়ে লীলার মাথাটা ততই বেশি ক'রে ঝুঁকে পড়তে লাগল। বরের যুবক বন্ধু গলাটাকে যথাসাধ্য মিষ্টি করবার বৃথা চেষ্টা ক'রে দন্ত বিকাশ ক'রে যখন প্রশ্ন করতেন, আপনি রবিবাবুর কোন বই পড়েছেন? লীলা প্রাণপণ চেষ্টায় 'না' এই ছোট্ট কথাটাও যেন মুখ দিয়ে বা'র করতে পারত না। সবাই ভাবত, বয়স হ'য়েছে, লজ্জা হ'বেই তো। আমি তার বুকের মধ্যে ব'সে মাথা নাড়তাম। কুটুম্বেরা চ'লে গেলেই সে ছুটে এ বাড়ীতে আসত। মা সবই বুঝতেন। ধীরে ধীরে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেন। বলতেন, ভয় কি মা? সে কি আমার কথা ঠেলতে পারবে? তারপর শিবনগরের দোজবরে নারায়ণের সঙ্গে যখন এক রকম কথা ঠিকঠাক হবার উপক্রম, তখন মা রীতিমত ভয় পেয়ে ছেলেকে চিঠি লিখলেন। সব কথাই জানালেন। শেষের দিকে দিয়ে লিখলেন, লীলাকে তিনিই পুত্রবধূ করেন, এই তাঁর শেষজীবনের সাধ। ঠিক সময়েই উত্তর এল,—এবং লীলাই প'ড়ে শোনাল। ছেলে মায়ের অনুরোধ রাখতে না পেরে ক্ষমা প্রার্থনা জানিয়েছে; আর সকলের শেষে লীলাকেও আশীর্ব্বাদ করেছে, সে যেন তার নূতন সংসারে গিয়ে সুখী হয়। লীলা চিঠি শেষ ক'রে মাথা নীচু ক'রে ব'সে রইল। মা ধীরে ধীরে ডাকলেন, লীলা। জবাব দিতে গিয়ে লীলা মুখ ঢেকে ফুঁকিয়ে কেঁদে ফেলল। মা তার মাথাটা কোলের উপর টেনে নিয়ে অন্য দিনের মত আজও ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে দিলেন কিন্তু একটাও সান্ত্বনার কথা বলতে পারলেন না। শুধু তার শিথিল চক্ষু দুটির অব্যক্ত স্নেহধারা সেই অপর্য্যাপ্ত কালো চুল ভিজিয়ে দিতে লাগল।"

"পরদিন লীলা কাগজ কলম নিয়ে নিজেই চিঠি লিখতে বসল। কয়েকখানা ছিঁড়ল, কয়েকখানা কাটল। কি লিখবে ভেবে পেল না। যাও পেল, তাও লেখা হ'ল না। অবশেষে অনেক চোখের জলের ছাপ নিয়ে আঁকা বাঁকা অক্ষরে যেটা হ'য়ে দাঁড়াল, তাও পাঠান হ'ল না।"

"তারপর—আরো বলতে হবে? আচ্ছা শোন—তারপর একদিন ছোট্ট গ্রামখানি চকিত ক'রে ভোরের শানাই বাজল। ছেলে মেয়েরা ভিড় ক'রে কলরব করতে লাগল। লীলা কাঠের মত সমস্ত স্নেহের উপদ্রব স'য়ে যেতে লাগল। মনে মনে আশা ছিল, এমন কিছু ঘটবে, যাতে সমস্ত লণ্ডভণ্ড হ'য়ে যাবে। হয় তো আগুন লাগবে; হয় তো সে এসে বলবে, লীলা, আমি এসেছি; হয় তো বা অন্য কিছু। বেলা গেল। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। পাল্কী চ'ড়ে বর এলেন। শাঁখ বাজল, এয়োরা উলু দিলেন। ছালনা-তলায় সাতপাক ঘোরা শেষ হ'য়ে গেল। বর বাসর ঘরে ঢুকে কাশতে সুরু করলেন। কনে তার পাশে মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়ল। একজন প্রবীণা স্নেহের সুরে বললেন, আহা সারাদিন উপোস ক'রে আছে। আর একজন চোখ দুটো টেনে বললেন, নাও আমাদের যেন আর বিয়ে হয় নি। আজকালকার মেয়েদের ঐ এক ঢঙ্। ফিট্ না ফ্যাসান। শুধু তরুণীরা চুপ ক'রে রইল। আর আমি আঁচলে চোখ মুছলাম।"

কিশোরীর একটানা গুপ্ত গুঞ্জন ধ্বনি হঠাৎ থামিয়া গেল। সহসা উত্তেজিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলাম, তারপর—তারপর? কেহ জবাব দিল না। দেখিলাম কেহ কোথাও নাই। তাড়াতাড়ি উঠিতে গিয়া সেই ছবিটা আবার চোখে পড়িল। দেখিতে দেখিতে ছেলেমেয়ে কয়টি কোথায় মিলাইয়া গেল। মহিলাটির মুখের উপর থেকে একটি একটি করিয়া বয়সগুলি ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। ধীরে ধীরে ভাসিয়া উঠিল একটি লাজনম্র কিশোরী—আঁা এ কার মুখ! বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িলাম। স্পষ্ট শুনিতে পাইলাম, কে যেন ফুঁপাইয়া কাঁদিতেছে। মনে হইল ঠিক

আমার পাশের ঘরেই। সে কী কান্না। বুক ফাটিয়া যাইবে, তবু শেষ নাই। যেন সে কতদূর—কত বৎসরের সমাধির ভিতর থেকে গুমরিয়া ঠেলিয়া উঠিতেছে।

তখন সবে বেলা উঠিয়াছে। বসিবার ঘরে একটা হাতলভাঙা চেয়ারে বসিয়া কি ভাবিতেছিলাম, জানি না। মনটা যেন কেমন আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। বৃদ্ধ গৃহকর্তা কাশিতে কাশিতে একটা লাঠিতে ভর করিয়া আসিলেন এবং আমাকে একটা নমস্কার করিয়া কি বলিতে গিয়া সহসা মুখের দিকে চাহিয়া চমকিয়া উঠিলেন, আপনার কি অসুখ করেচে?

বলিলাম, না।

তিনি সহানুভূতির স্বরে বলিলেন, কাল বড্ড কষ্টহয়েছে। একে তো দেশে কিছুই মেলেনা; বর্ষাকাল। তাতে আবার যে দুর্যোগ। তা' আজকার এ বেলাটা অন্তত গরীবের বাড়ী চাট্টি যাহোক—বেশি দেরি হবে না।

আমি জানাইলাম, সে সময় হইবে না।

বৃদ্ধ কুণ্ঠিত নৈরাশ্যের স্বরে বলিলেন, আপনার মত ব্যক্তিকে এ অনুরোধ করা অবিশ্যি—। কিন্তু আমরা একেবারে পর নই। খুঁজে দেখলে—যাক্ সে সব। আমার স্ত্রী আপনাকে একবার ডেকেছেন। দয়া ক'রে যদি—

একটু বিস্ময়ের সঙ্গেই উঠিলাম। মহিলাটি আমার জন্যই অপেক্ষা করিয়াছিলেন। চিনিলাম। কিন্তু না চিনিলেও দোষ ছিল না। সেই ভগ্ন মন্দিরের দিকে চাহিয়া ক্ষণকাল স্তম্ভিত হইয়া রহিলাম। সে-ই কথা কহিল। প্রশ্ন করিল, শরীর কেমন আছে, ছেলেমেয়েরা কেমন হ'য়েছে, বৌ কেমন আছে—ইত্যাদি। আমি যন্ত্র-চালিতের মত 'হাঁ,' 'না' বলিয়া গেলাম। সহসা অসংলগ্ন ভাবে বলিয়া ফেলিলাম, "কাল রাত্রে তুমি কাঁদ্‌ছিলে?" বলিয়াই অপ্রস্তুত হইলাম। সে কিছুক্ষণ বিহ্বলের মত চাহিয়া রহিল। আস্তে আস্তে সেই বিগতশ্রী ওষ্ঠদুটির উপরে একটি তুষার প্রান্তরের রক্তহীন হাসি সর্পিল কুঞ্চনে আঁকিয়া বাঁকিয়া উঠিল। কোটরগত চক্ষুদুটি কোথা হইতে একরাশ আগুন জড়ো করিয়া ফেলিল। অজ্ঞাতসারে চক্ষু নামাইয়া লইলাম। একটি উলঙ্গ ছেলে মা বলিয়া ছুটিয়া আসিয়াই সহসা সেই দিকে চাহিয়া চেঁচাইয়া উঠিল।

পরদিন যখন বাসায় ফিরিলাম, শরীর রীতিমত অসুস্থ। মনটাও কেমন অভিভূত হইয়াই ছিল। গৃহিনী আসিতেই জোর করিয়া একটু সজীব ভাব আনিবার জন্য বলিলাম, "কি ব্যাপার? পরশু মাছের ঝোলে সিদ্ধি টিদ্ধি দিয়েছিলে নাকি?" গৃহিনী ব্যস্তভাবে কহিলেন, "তোমার এত দেরি হ'ল যে? হাঁ ছাখ, আমি এখখুনি বেরোচ্ছি। মহিলা-সমিতির মিটিং রয়েছে। আসতে রাত হবে।"

বলিলাম, "আচ্ছা।"

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

যে মহাপুরুষের স্মৃতি-পূজার আমরা ব্রতী হয়েছি, আমাদের মধ্যে অনেকেই তাঁর নাম শুনেছি—তিনি বিশ্ব-কবি রবীন্দ্রনাথের পিতা। কিন্তু শুধু এই ভাবে তাঁকে জানলে তাঁর প্রতি অন্যায় করা হয়। তাঁর জীবনের নিজস্ব বিশিষ্টতাই তাঁকে আমাদের স্মৃতিতে চির-জাগরূক ক'রে রাখবার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু আমার মনে হয় তাঁর প্রতি যথাযোগ্য সম্মান আমরা করিনি। ৺দেবেন্দ্রনাথকে আমাদের যতভাবে যতটুকু জানা দরকার ততটুকু আমরা জানিনি। তাঁর চরিত-ইতিহাস আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গী হওয়া উচিত। এই প্রবন্ধে আমরা তাঁর জীবনের বিশিষ্ট ধারা বুঝতে চেষ্টা করব।

ভগবানের চরণে সমস্ত মন প্রাণ অর্পণ ক'রে তিনি যে ভাবে নির্জ্জন এবং শান্তিময় জীবন যাপন করেছিলেন, তা থেকে আমরা যদি তাঁকে কেবল একজন শ্রেষ্ঠ সাধক ব'লে ধ'রে নেই তা হ'লে বোধ হয় তাঁকে সম্যক ভাবে বলা হয় না। তার চাইতে মহর্ষি কথাটাই তাঁকে ভালো ক'রে বুঝিয়ে দিতে পারে। বেদের মন্ত্র যাঁদের কাছে এসে ধরা দিয়েছিল, যাঁরা সাধনার বলে মন্ত্রকে দেখ্‌তে পেয়েছিলেন তাঁদের আমরা ঋষি বলি। দেবেন্দ্রনাথ ঠিক তাঁদেরই মত একজন মহাপুরুষ। সারা জীবনের সাধনার দ্বারা তিনি তত্ত্বদ্রষ্টা হয়েছিলেন,—ঠিক বেদের ঋষির মতই আধ্যাত্মিক উন্নতির ভিতর দিয়ে নানা তত্ত্বকে দেখ্‌তে পেয়েছিলেন। সে তত্ত্ব কেবল ধর্ম্ম-গত নয়, সমাজ এবং জাতীয়তার অন্তর্গত।

রামমোহন রায় দেশে নবযুগ আনয়ন করেছিলেন,—ধর্ম্ম-পথের ভ্রান্ত পথিককে সত্য-পথের সন্ধান দিয়েছিলেন—কুসংস্কারের অন্ধ-কারা হ'তে দেশকে মুক্তি-পথের আলোকে টেনে এনেছিলেন,—মৃত সমাজ-দেহে একটা প্রাণের স্পন্দন জাগিয়ে তুলেছিলেন—এক কথায়, ধর্ম্ম সমাজ এবং দেশের বিরাট কল্যাণ সাধন ক'রেছিলেন; দেবেন্দ্রনাথ হয়ত অতটা পারেন নি। বিবেকানন্দের মত একটা প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে, একটি বিশ্ব-গ্রাসী কর্ম্ম-প্রেরণা নিয়ে হয় ত তিনি জন্মাননি,—তাঁর কর্ম্ম-জীবন তাঁদের চাইতে খাটো ছিল, কিন্তু এটা অতিবড় সত্য কথা যে আধ্যাত্মিক জ্ঞান তাঁদের কারোর চাইতে কম ছিল না। পর-ব্রহ্মে একান্ত বিশ্বাস, সমস্ত বিশ্বকে ভগবানের পূর্ণ অভিব্যক্তিরূপে ধারণা করা, পরমাত্মার সঙ্গে নিবিড়তম যোগ-সাধনা—এই ছিল তাঁর জীবনের মূল লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে পৌঁছুবার চেষ্টায় তিনি প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের তত্ত্ব-জ্ঞানের ভাণ্ডারকে আলোড়িত ক'রে, ক্ষীরমিব অম্বুমধ্যাৎ—রাজহংসের মত সারভাগ আহরণ করেছিলেন। ভগবৎ-তত্ত্ব মনে প্রাণে উপলব্ধি করতে তিনি কোথাও থামেন নি। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ধর্ম্মকে এই উদারচেতা মহাপুরুষ সমভাবে বুঝ্‌তে চেষ্টা করেছিলেন। সুফীধর্ম্ম, কবীর এবং নানক-পন্থী ধর্ম্ম তাঁর ভগবৎ-প্রেমকে ভক্তি-রসের মধুর সংমিশ্রণে রসাল ক'রে তুলেছিল; সৌন্দর্য্য-উপাসনার একটি কমনীয় স্নিগ্ধ ভাব সেই প্রেমকে প্রাণবন্ত করে দিয়েছিল। বিশ্ব-প্রকৃতির ভিতর ভগবানের স্বরূপ উপলব্ধি করতে, প্রকৃতির অফুরন্ত সৌন্দর্য্য রাশির মধ্যে সুন্দর পরব্রহ্মকে দেখতে তিনি কতই না প্রয়াস পেয়েছেন। হিমালয়ের শান্ত গম্ভীর পরিবেষ্টনের মধ্যে শান্তিনিকেতনের নির্জ্জন তপোবনে,—প্রকৃতির লীলা-নিকেতনে তাঁর জীবনের অনেক দিন তিনি কাটিয়েছিলেন ভগবানকে মনে প্রাণে অনুভব করবার জন্য। তাঁর সৌন্দর্য্য-উপাসনার স্বাভাবিক প্রেরণা পুত্রকন্যাদের মধ্যে সংক্রমিত হয়েছিল। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ যে আজ সমস্ত জগতের উপর দিয়ে অমৃত-ধারা প্রবাহিত ক'রে দিয়েছেন যাতে ক'রে সমস্ত বিশ্ববাসী অভিষিক্ত হচ্ছে, বিশ্ব-প্রেম বিশ্ব-মানবতার বাণী নিয়ে তিনি

যে আজ পূর্ব্ব এবং পশ্চিমের মধ্যে একটি মিলন-সূত্র গেঁথে দিয়েছেন, তার অনেক কিছুই ঐ ভগবৎ-প্রেমিক ঋষি-কল্প পিতার জন্য।

সমাজ-সংস্কারক রূপে আমরা দেবেন্দ্রনাথকে বাদ দিতে পারি না। অবশ্য এ কথা সত্য যে তাঁর ধর্ম্মজীবন কর্ম্ম-জীবনের চেয়ে বেশী ব্যাপক, বেশী বিকশিত। কিন্তু ইহাও ঠিক যে, রামমোহনের মত তিনিও সমাজ-সংস্কার যে অবশ্য প্রয়োজনীয়, সেটা বেশ বুঝতে পেরেছিলেন। যা কিছু কুসংস্কার সমাজে প্রবেশ করেছিল তাদের দূর ক'রে দিয়ে যা সত্য এবং কল্যাণময় তা-ই তিনি রাখতে চেয়েছিলেন। তবে পুরাতন সমাজকে আগাগোড়া বদ্‌লে ফেলা, পুরাতনকে ভেঙে ফেলে একেবারে নূতনের প্রতিষ্ঠা ইহা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। হিন্দু সমাজের ভিতরে থেকেই ব্রাহ্ম-সমাজকে গ'ড়ে তুল্‌তে হবে, হিন্দু সমাজ হ'তে ব্রাহ্মসমাজকে বিচ্ছিন্ন করা চলে না—কারণ তাতে সামাজিক এবং জাতীয় কল্যাণ সাধিত হবেনা, এটা তিনি বেশ ক'রে বুঝেছিলেন। পাশ্চাত্য সব কিছুকেই যে অনুকরণ করতে হবে সেটা তিনি ভাল মনে করেন নি। নিজস্ব যা আছে তারই উপর প্রতিষ্ঠিত ক'রে সমাজ, ধর্ম্ম এবং জাতিকে গ'ড়ে তুলতে হবে. প্রয়োজন মত অন্যের কাছ থেকে হাত পেতে নিতে হয় আপত্তি নেই—এই ছিল তাঁর কর্ম্মজীবনের মূল মন্ত্র। এখানে তাঁর স্বদেশ-প্রাণতার পরিচয় পাই।

তাঁর চরিত্রের একটি বিশেষত্ব ছিল, ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সম্মান-রক্ষা। নিজে যা ভাল বুঝব তা-ই সবাইকে মেনে নিতে হবে এটা তাঁর জীবনে কখনও দেখতে পাওয়া যায় না। পারিবারিক, সামাজিক এবং ধর্ম্ম জীবনে তিনি পূর্ব্বাপর এই নীতি অনুসরণ করেছিলেন। সমস্ত জীবনকে একটি বিশিষ্ট নিয়মের ভিতর দিয়ে চালিয়ে নওয়া ছিল তাঁর লক্ষ্য; বিধিলঙ্ঘন তিনি নিজে কখনও করেন নি অপরকেও করতে দিতেন না। কোন কাজ করবার পূর্ব্বে তিনি বহুদিন পর্য্যন্ত ভাবতেন। এই জন্য অনেক সময় তাঁকে নির্জ্জন বাস করতে হত। ভগবানের সঙ্গে যোগ রেখে, ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি—এই ভাবটি নিয়ে তিনি জীবনের প্রত্যেক সমস্যার সমাধান করতে চেষ্টা করতেন।

ব্রাহ্ম সমাজ তাঁর কাছে অশেষ ভাবে ঋণী। রামমোহন যার গোড়া পত্তন ক'রে গিয়েছিলেন তাকে প্রাণময় ক'রে তোলার ভার পড়েছিল মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের উপর। রামমোহন সত্যের সন্ধান ব'লে দিয়েছিলেন; লোক মনে সেই সত্যের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন দেবেন্দ্রনাথ। ব্রাহ্ম ধর্ম্ম এবং ব্রাহ্ম সমাজ আত্ম-প্রসার করেছিল তাঁরই চেষ্টায়।

আর তাঁর কাছে ঋণী বাংলা ভাষা ও সাহিত্য। সেই আত্ম-সমাহিত যোগী তাঁর সমগ্র জীবনের সাধনার ফল দিয়ে তাদের ভাণ্ডার সম্পন্ন ক'রে গেছেন।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ

শ্রীসুরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

ধর্ম্মজীবনের গূঢ় রহস্য সম্বন্ধে বল্‌তে চেষ্টা করা তারই সাজে যার কাছে সেই রহস্য পরিচিত। দৈনন্দিন জীবনে, সকাল থেকে সন্ধ্যা, আবার সন্ধ্যা থেকে সকাল, নিজ নিজ ক্ষুদ্র স্বার্থ নিয়ে সময়ক্ষেপ ক'রে হঠাৎ বৎসরে একদিন গম্ভীরভাবে দাঁড়িয়ে কোন ঋষির বা মহৎ ব্যক্তির জীবনী আলোচনা করতে চেষ্টা করায় বিশেষ কোন ফল হয় না। তাই অনেক কুণ্ঠা ও দ্বিধার সহিত আজ আপনাদের সাম্‌নে দাঁড়িয়েছি। তবে এর আর একটা দিক্‌ও আছে। সাধক না হ'লে যে সাধকের কথা বলার অধিকার নেই তা নয়। যদি প্রকৃত শ্রদ্ধা ও অনুরাগ আমার ভেতরে থাকে সেই সাধনার দিকে, তবে তা বুঝতে তা বল্‌তে চেষ্টা করবার অধিকার আমার আছে। আর শ্রোতার দিক্ থেকেও তাই। যদি শ্রদ্ধাবান্ হ'য়ে, প্রকৃত অনুরাগ মনে নিয়ে সেই মহাপুরুষের স্মৃতি-পূজা করতে ও তাঁকে আমাদের হৃদয়ের পুষ্পাঞ্জলি দিতে এসে থাকি, তবে নিশ্চয়ই এখানে আজ আসার অধিকার আমাদের আছে। নতুবা এখানে এসে শুধু আত্ম-প্রবঞ্চনা করেছি মাত্র।

জীবনের প্রথম উন্মেষে আমাদের প্রকৃত মনুষ্যত্ব ফুটিয়ে তোল্‌বার জন্য অন্তরের এই শ্রদ্ধা ও অনুরাগই হচ্ছে আমাদের প্রধান উপাদান ও সহায়। আমাদের মধ্যে সে-ই হতভাগ্য যার এই শ্রদ্ধা নেই, যে যুবক "অকালপক্ক" হ'য়ে চারিদিকে প্রশংসাযোগ্য কিছুই পায় না, সবই যার কাছে পুরাতন সে বাস্তবিকই কৃপার পাত্র। নূতন নূতন সৌন্দর্য্য যতই আমাদের চিত্ত আকর্ষণ ক'রে শ্রদ্ধাবান্ ক'রে তোলে, ততই আমরা প্রকৃত মনুষ্যত্বের দিকে এগোতে থাকি। এ যুগের আব্‌হাওয়া কিন্তু উল্টো দিকে ব'য়ে চলেছে এবং শ্রদ্ধা জিনিষটাকে "সেকেলে" ব'লে "কোণঠাসা" ক'রে রেখেছে। নিজের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় ও অধিকার নিয়ে আমরা এখন এত ব্যস্ত যে বৃহত্তর জগতের সুন্দর ও মহৎ তত্ত্বগুলির খবর আমাদের "স্বার্থ-প্রাচীর" ভেদ্ ক'রে আসতে পায় না। আমরা সকলেই এ যুগে স্ব স্ব প্রধান ও প্রত্যেকেই এক একটি জ্ঞানের ভাণ্ডার স্বরূপ; মাথা নত ক'রে শ্রদ্ধাভরে শিক্ষা গ্রহণ করাটা নেহাৎ বাপ মা জোর ক'রে ধ'রে স্কুল কলেজে না পাঠালে—একটা penance বা দণ্ড ব'লে মনে হয়। কিন্তু এ হচ্ছে অজ্ঞানতার ও মূঢ়তার ভঙ্গী! যা কিছু সুন্দর, যা কিছু মহৎ ও উদার তার প্রতি ভক্তি ও আকর্ষণই প্রকৃত মনুষ্য-জীবনের ভিত্তি। যদি মানুষ ভক্তিবিহীন হয় এবং উচ্চ হ'তে উচ্চতর সত্যের অনুসন্ধানে না ছুটে কেবল নিজের জীবনের ক্ষুদ্র গণ্ডীর ভিতর থেকে নিজের জ্ঞানের জমাখরচ নিয়েই ব্যস্ত থাকে, তবে তার মনুষ্যজন্ম একরূপ বিফলেই যায়।

শিশু যখন মার আদরের "আয় চাঁদ, আয় চাঁদ"-বুলিতে মুগ্ধ হ'য়ে প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের প্রথম স্বাদ গ্রহণ করে, তখন তার মনে কি ভাব হয় অবশ্য আমরা বিশ্লেষণ ক'রে বল্‌তে পারি না। তবে সে ভাবটা যে আনন্দের তা বেশ বুঝি। আমরা "অমৃতের পুত্র"—এই আনন্দ নিয়েই আমরা এসেছি—সেটা আমাদের "birth right," জন্মগত অধিকার। এই আনন্দের অধিকারী আমরা সকলেই। এবং যত দিন ভক্তি অনুরাগ ও শ্রদ্ধা আমাদের চিত্তবৃত্তি-গুলিকে জাগিয়ে রাখে এবং জ্ঞানের ও সত্যের দিকে উন্মুখ করে, তত দিন এই আনন্দের অধিকার আমাদের থাকে। কিন্তু আমরা জীবনপথে যত অগ্রসর হ'তে থাকি ততই আমাদের শ্রদ্ধা, ভক্তি পেছনে ফেলে আসি, এবং এই আনন্দের আস্বাদ ক্রমে হারাই। যাঁরা ভগবানের অসীম করুণায় ও আশীর্ব্বাদে নিজ নিজ অনুভূতিকে শ্রদ্ধা ও ভক্তিবারিসিঞ্চনে সজীব রেখে এই আনন্দ চারিদিক হ'তে গ্রহণ কর্‌তে পারেন তাঁরাই ধন্য, তাঁরাই রূপসাগরে ডুব দিয়ে

"অরূপ রতনের" সন্ধান পান। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এইরূপ ডুবুরির অন্যতম। দিদিমার মুমূর্ষু শয্যাপার্শ্বে ব'সে, চাঁদের আলোতে ও বায়ুর মর্ম্মরধ্বনিতে যখন মধুর হরিনাম ভেসে এসে তাঁর কানে পশ্‌লো, তখন পার্থিব ঐশ্বর্য্যের উপর একটা বিতৃষ্ণায় তাঁর মন ভ'রে গেল, আর অসীম ভূমানন্দে প্রাণ উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠলো। এই আনন্দই তাঁর জীবনকে ক্রমশঃ মধুময় ক'রে অসীমের মধ্যে ডুবিয়ে রেখেছিল। মহর্ষি নিজেই বলেছেন, "এই আনন্দ তর্ক ও যুক্তিদ্বারা কেউ পাইতে পারে না, সেই আনন্দ ঢালিবার জন্য ঈশ্বর অবসর খোঁজেন"। আমাদের মধ্যে অধিকাংশ সেই অবসর সেই সুযোগ সব সময় হারায়। এই সাংসারিক জীবনের মধ্যেই যদি আমরা ঠিক ভাবে এই জীবনকে বুঝতে ও গ্রহণ করতে শিখি, আমাদের এই অবসর আসে এবং আনন্দের স্বাদ দিয়ে যায়, তাহ'লে মনে হয় "সুন্দর ভব, সুন্দর সব, সুন্দর পশু-পাখী"। আমাদের দৈনিক জীবনে সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, তারকা, নদ, নদী, ফল, ফুলে যে সৌন্দর্য্য দেখ্‌তে পাই, তার মধ্যে যে আনন্দের সন্ধান আছে তার খোঁজ কি আমরা রাখি? মহর্ষি প্রকৃতিতে 'Divine Immanence' অর্থাৎ ভগবানকে ওতঃপ্রোত ভাবে জড়িত সব সময় অনুভব করতেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা চ'লে যেতো ঋষি-কবি Wordsworth-এর ন্যায় তিনি তাঁর ধ্যানমগ্ন দৃষ্টি অসীমের সৌন্দর্য্যরাশিতে ডুবিয়ে রাখ্‌তেন, এবং নিজেকে হারিয়ে ফেলতেন। আবার পারিবারিক জীবনের কঠোর কর্ত্তব্যের মধ্যে যে নিগূঢ় আনন্দ রয়েছে, তাই কি আমরা যথাযথ-ভাবে অনুভব করতে সক্ষম হই? সংসারের বন্ধুর কঠোর পথে নিজ কর্ত্তব্যবুদ্ধিকে ভগবদ্বিশ্বাস দ্বারা চালিত ক'রে নিতে পারলে যে কত লাভ কত আনন্দ হয় তার দৃষ্টান্ত মহর্ষির জীবনে আমরা দেখ্‌তে পাই।

তিনি সংসার ত্যাগী হ'য়ে 'ভূমার' 'অনন্তের' সন্ধানে ছোটেন নি। সংসার যে সেই অনন্তেরই ক্রীড়াভূমি এই সত্য, শুধু কবির বা দার্শনিকের ভাষায় নয়, নিজ বাস্তব জীবনে উপলব্ধি করেছিলেন। অসীম ও সসীমের মধ্যে দাঁড়িয়ে তিনি লীলাময়ের অপূর্ব্ব লীলা দেখতেন। পিতার স্নেহ, বন্ধুর ভালবাসা তিনি দু'হাতে বিলিয়ে গেছেন। তাঁর ব্যবহারিক বা সামাজিক জীবনে কোথাও এমন ফাঁক নেই যা তাঁর তীক্ষ্ণ ও প্রেমিক প্রাণ পরিপূর্ণ ক'রে না দিয়েছে। কঠোর শাসক, অথচ কোমলতায় পূর্ণ তাঁর হৃদয়। তাঁর শাসন-নিষ্ঠার প্রভাব তাঁর পুত্র কন্যার উপর ছিল প্রগাঢ়। এই নিয়মে শাসিত সাংসারিক জীবন,—কিন্তু ইচ্ছা মাত্র সব বাঁধ ভেঙ্গে অনন্তের ডাকে পর্ব্বতে কান্তারে, ঘাটে মাঠে অবাধ গতিতে ঘুরে বেড়াতো! যেন তিনি একজন ভবঘুরে, যেন সংসারের কোন বন্ধনই তাঁকে জড়ায়নি, যেন মুক্ত সন্ন্যাসী অনন্ত সত্তার জ্ঞানে উদ্বুদ্ধ. অসীম সৌন্দর্য্যের অধিকারী—যে অবস্থায় ভক্ত ভাবে, 'তুমি আছ, আর আমি আছি; 'Thou art' and 'I am.'

এরূপ অপূর্ব্ব সমন্বয় ও অদ্ভুত মিলন—ত্যাগীর ও ভোগীর, সাংসারিক ও সন্ন্যাসীর জীবনে (জনক ঋষি ছাড়া) আর বড় দেখা যায় না। মহর্ষির জীবনের এই দিকটাই আজ আমার বিশেষ ক'রে মনে হচ্ছে। তাঁর জীবনের ঘটনাবলী সম্বন্ধে আমি কিছুই বল্‌বোনা। তাঁর প্রভাবে হিন্দু-ধর্ম্ম কতখানি লাভবান বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, ব্রাহ্ম ধর্ম্মের ভিত্তি কতটা দৃঢ়ীভূত হয়েছিল, তিনি বাঙ্গালার নবজাগরণ (Renaissance) বা বাঙ্গলার সাহিত্য ও cultureকে কতখানি উন্নতির পথে নিয়ে গিয়েছিলেন এসব প্রশ্ন আজ আমার মনে উদিত হচ্ছে না; আমার মনে হচ্ছে শুধু তাঁর মহান্ ভক্ত জীবনের উজ্জ্বল দিক্‌টা।

এই মহান্ জীবন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে কতখানি উদ্বুদ্ধ ও প্রভাবান্বিত করেছে তা আমরা সকলেই জানি। দেবেন্দ্রনাথের সঞ্চিত পুণ্য ও সাধনা আশীর্ব্বাদরূপে আমাদের যুগপ্রবর্ত্তক মহাপুরুষ রবীন্দ্র নাথের উপর বর্ষিত হয়েছিল—তাই তাঁর গানে আজ জগত মুখরিত, জাতিনির্ব্বিশেষে নর-নারী মুগ্ধ, আর তাই তাঁর ভাব ও ছন্দ আজ অসীমের সঙ্গীতে ও সৌন্দর্য্যচ্ছটায় ভরপুর।

শ্রীহট্ট ব্রাহ্মসমাজে মহর্ষির স্মৃতিসভায় পঠিত

বালির কথা

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কর

বালি (ডেনপাসার) মন্দুক

রথীবাবু,

১৬ই আগষ্ট আমরা পেনাঙ ছাড়ি, তার পর দিন সকালে সুমাত্রার বন্দর বলওয়ানদেলীতে পৌঁছই। সেখানে Dr. Rodgers ও কয়েকজন ভারতবাসী উপস্থিত থেকে গুরুদেবকে অভ্যর্থনা করেন। Dr. Rodgers একজন সিংহলী ক্রীশ্চান, খুব ধনী। ম্যালেতে ও অন্যত্র তাঁর টিনের খনি আছে; একটা খনির মুনফা মাসে চার লক্ষ ডলার পান। এখানে খনির সন্ধানে এসেছেন।

অন্য জাহাজে মালপত্র তুলে দিয়ে আমরা মেডান সহর অভিমুখে রওনা হ'লুম। চব্বিশ মাইল দূরে সহর, সেখানে সব চেয়ে বড় এক হোটেলে আমাদের কয়েক ঘণ্টা যাপনের ব্যবস্থা হয়েছিল। সহরে ঢোকার আগে প্রায় শ দুই ভারতবাসী বাদ্যভাণ্ড সহযোগে গুরুদেবের পুরোগমন করতে লাগলেন। আমাদের দেশে এটা চোখে পড়ে না, কিন্তু এখানে বড় চোখে পড়ছিল, আর ওজনজ্ঞানের খুব অভাব ব'লে মনে হচ্ছিল। যাই হোক্, হোটেলে পৌঁছে শানাইয়ের হাত থেকে উদ্ধার পাওয়া গেল। সেখানে Royal Dining Roomএ খাবার ব্যবস্থা হয়েছিল। এই বিখ্যাত মধ্যাহ্ন ভোজন, যাকে হলাণ্ডীয়রা Rystaffel বলেন, প্রথম খাওয়া গেল। পরিবেশন যখন করতে আসে, সে একটা রীতিমত procession। প্রায় বিশ জন জাভানীস বিচিত্র পোষাকে সার বেঁধে দ্রব্যসম্ভার নিয়ে দাঁড়াল। নানারকম মাংস, মাছ, তরিতরকারী; ভাত খাবার জন্য এত আয়োজন দেখে খাওয়াটা একটা বিড়ম্বনা ব'লে মনে হচ্ছিল। এত রকম বিচিত্র তরকারী, শেষটা আর ফুরয় না। প্রথমে নেবার পালা, তারপর ধীরে সুস্থে আহার। সবগুলোই সত্যিকার রান্না তরকারী; কেবল সিদ্ধ করা নয়, ঝালের পরিমাণ বেশ বেশী; আমাদের অনেককেই হার মানতে হয়। এত খাদ্য খাবার পর বিছানা আশ্রয় না ক'রে উপায় নেই, তাই ড্যচরা সকালে ৮টা থেকে ১২টা পর্য্যন্ত অফিস ও দোকানদারি করে, মধ্যাহ্নে এই গুরুপাক আহারের পর ঘণ্টা দুই ঘুমোয়, তারপর আবার ৫টা থেকে ৭টা পর্য্যন্ত অফিসাদি করে। এই জাতটা দেশের আবহাওয়াকে স্বীকার ক'রে নিয়েছে, আমাদের প্রভুদের মত নয়। বেশভূষায় বেশ ঢিলে ঢালা, বাহিরে যাওয়া ছাড়া প্রায় সব সময়েই রাত-কাপড়ে থাকে!

বৈকালে চা খেয়ে জাহাজ ধরতে বেরুনো গেল। ৫টায় জাহাজ ছাড়ল; জাহাজটা খুব বড়, অনেক যাত্রী, বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। গুরুদেবের ভাড়া নিল না, আমাদেরও অর্দ্ধেক ভাড়ায় নিয়ে গেল। জাহাজের দুদিন এক রকম ক'রে কেটে গেল। সিঙ্গাপুরে ভিড়ল জাহাজ সকাল বেলা। আমেরিকান এক্সপ্রেস্ কোম্পানীর ওখানে গেলাম, গুরুদেবও সঙ্গে গেলেন, খুব আশা ক'রে যে এতদিনে নিশ্চয়ই চিঠি এসেছে, কিন্তু হতাশ হ'য়ে ফিরতে হ'ল। পথে গুরুদেব কিছু বই কিনলেন পড়বার জন্য। আমরা কয়েকটা প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র কিনে জাহাজে ফিরলাম।

সন্ধ্যের দিকে জাহাজ ছাড়ল। এই পথে অনেকগুলো ছোট ছোট দ্বীপ পড়ে। ঘুরে ঘুরে জাহাজ চলল। ডান দিকে সুমাত্রা দেখা যাচ্ছে। জলের ধার থেকেই ঠাসা বন, যতদূর চোখে পড়ে কেবলি বন, বসবাস কিছুই নেই। মাঝে বাঙ্কা ব'লে একটা দ্বীপের কাছে ঘণ্টা দুই জাহাজ থামল যাত্রী তুলে নিতে। এখানে নাকি কয়েকটা টিনের খনি আছে। মোটর বোট ক'রে সব যাত্রীরা এল। সম অংশটা হাঙ্গর-সঙ্কুল, কিন্তু অনেক চেষ্টা ক' চোখে পড়ল না। শুনলাম কিছুদিন আ থিয়েটার পার্টি ব্যাটেভিয়াতে যাচ্ছিল, হচ্ছিল, কাপ্তানও তাতে মেতে

ধাক্কা লেগে জাহাজটা ডুবে যায়। যারা নৌকা ক'রে তীরের দিকে গিয়েছিল তাদের সকলকে হাঙ্গরে ধরে, কেবল একজন ছাড়া।

আমরা সকালে ব্যাটেভিয়ায় পৌছলুম। জাহাজঘাটায় অনেক ভারতবাসী, চীনা ও ডাচ উপস্থিত ছিলেন। জাহাজ পৌছতেই বিভিন্ন দল এসে, সম্বর্দ্ধনা করার পর গুরুদেবকে হোটেলে নিয়ে গেল। বরের জন্য আমাদের দেশে যেমন ফুলপাতা দিয়ে মোটর সাজায়, সেই রকম ক'রে একখানা মোটর সাজিয়ে এনেছিল; গুরুদেব ত তাতে উঠলেন না, কিন্তু সেখানে পিছনে পিছনে হোটেল পর্য্যন্ত গিয়েছিল। বাকেতে (Mr Bake) আর আমাতে মালপত্র খালাস ক'রে হোটেলের busএ তুলে দিয়ে বারো মাইল দূরবর্ত্তী সহর অভিমুখে যাত্রা করলাম। বন্দরগুলো সবই প্রায় এক চেহারা,—এমনকি মালেতে সহরগুলো ছোট ছোট, কিন্তু চেহারাগুলো সব এক ছিল, কারও কোনও বিশেষত্ব ছিল না। পেনাঙ ও সিঙ্গাপুর ছাড়া অন্য সহর গুলো একই সহর, কেবল নাম বদলাত। ব্যাটেভিয়ায় প্রথম চোখে পড়ে রাস্তার মধ্যে দিয়ে কেনাল, আর তাই বেয়ে সাধারণ লোকের জীবনযাত্রা চলেছে। বেশ ভাল লাগল। ডাচরা প্রথম যখন সহর পত্তন করেছিল অভ্যাসবশতঃ তাদের মনে হয়েছিল কেনাল না থাকলে বসবাস কেমন ক'রে করা যাবে, তাই প্রথমেই কেনাল করেছিল। আজকালকার সহরে এমন বাজে খরচ আর করচে না।

সব চেয়ে বড় হোটেলেই আমাদের স্থান ঠিক ছিল। প্রত্যেকের আলাদা ঘর, bath room ইত্যাদি, বেশ আরামের জায়গা, তবে আমরা যেদিন পৌছলুম, সেদিন রবিবার, লোক-জনে ভরা, সকাল থেকে ব্যাণ্ড্ চ'লে, অস্থির ক'রে তুলে-ছিল; তবে এখানে তিন দিন কাটালে পর আমরা বালির অভিমুখে যাব সেইটে ছিল বাঁচওয়া।

প্রথম দিন সন্ধ্যে বেলা Kunstkring Societyর সভ্যরা গুরুদেবকে তাঁদের সভাগৃহে অভ্যর্থনা করেন। অল্প জলযোগের পর ছোট ছোট কয়েকটি সম্বর্দ্ধনা হয়। এখানে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উচ্চ কর্ম্মচারী ও পণ্ডিতবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। পরদিন ভারতীয়রা এক অভিনন্দন দেন, এবং রাত্রে British Consul ভোজ দেন। British Consul লোকটিকে বেশ ভাল লাগল, জাতের বিমুখতা নেই, গুরুদেবের প্রতি অগাধ ভক্তি, এমন কি সময়ে সময়ে একটু বেশী ব'লে মনে হচ্ছিল। প্রতিদিন তিনি হোটেলে এসে খবর নিতেন। আমরা মাঝে মাঝে যে সময়টুকু পেতাম একবার চক্কর দিয়ে আসতাম। তিনবার খাওয়াতে এত সময় যেত যে অবকাশ পাওয়া বড় মুস্কিল হ'ত, তার উপর বালিতে যাবার ব্যবস্থা করা, জিনিষপত্র কেনা-কাটা, ব্যাঙ্কে যাওয়া, টেলিগ্রাম করা,—দেখবার খুব অল্পই অবসর পেয়েছিলাম। এখানকার মিউজিয়ামটি খুব ভাল, কিন্তু ঘণ্টা দুয়ের বেশী দেখার সুবিধা হয় নি।

জিনিসপত্র এই এক মাসে এতবার খোলা বাঁধা করতে হয়েছে ভাবলে ভয় করে, কিন্তু উপায় নেই। জিনিসপত্র গুছিয়ে গাছিয়ে তৃতীয় দিনে লঞ্চের পর আমরা জাহাজ ঘাটায় রওনা হলুম। Mrs. Bake আমাদের দলে ভিড়েছেন, তা ছাড়া গবর্মেণ্টের তরফ থেকে একজন ডাচ ভদ্রলোক আমাদের সঙ্গে যাবেন দোভাষীর কাজ করবার জন্য। তিনি সুরবায়াতে উঠবেন, তারপর বালিতে Dr. Kuperburg আছেন, সব বন্দোবস্ত করচেন, তিনিও বরাবর সঙ্গে থাকবেন। কাজেই আমাদের দলটি নেহাত কম হ'ল না—মোট আট জন; তাদের লটবহর নিয়ে বালির মত জায়গায় পনের দিন দৌড়াদৌড়ি করা সহজ ব্যাপার নয়।

জাহাজটা ছোট, যাত্রীর সংখ্যা যথেষ্ট। সন্ধে বেলা জাহাজ ছাড়ল।

পরদিন সকাল বেলা শ্যামারঙে পৌছলুম। সমস্ত দিন জাহাজঘাটায় অপেক্ষা ক'রে আবার রওনা হ'য়ে পরদিন সকালে সুরবায়াতে পৌছন গেল। স্থানীয় ভারতবাসীরা এসে গুরুদেবকে অভ্যর্থনা করলেন ও দ্বিপ্রহরে ভোজনের জন্য নিয়ে গেলেন। আমি আর নামলুম না। সকলে বৈকালে ফিরলেন। আবার জাহাজ ছেড়ে পরদিন সকালে বালি পৌছলুম। মাঝ সমুদ্রে জাহাজ থামল, নৌকাতে জিনিষপত্র বোঝাই দিয়ে আমরা তীরের দিকে চললাম। Dr. Kupersburg এসেছিলেন, তিনি আমাদের সব বন্দোবস্তর ভার নিয়েছেন। লোকটি ভারি সাদা

কর

সদ, কিসে আমাদের সুবিধা ও স্বাচ্ছন্দ্য হবে তাঁর সেদিকে সব সময়ই দৃষ্টি আছে, তবে দু'চারটা ইংরাজি কথা ছাড়া কথা বলতে পারেন না—তাতেই হিঁচড়ে মিচড়ে তিনিও বোঝান, আমরাও বোঝাই। অপর ভদ্রলোক Dr. Draws, তিনি একজন কর্ম্মী, খুব কম বয়েস, ভারতীয় সব খবর রাখেন, সংস্কৃতও জানেন।

বালির বন্দর হচ্চে বুলালাঙ। এটা এখনও ঠিকমত বন্দর হ'য়ে ওঠেনি, তাই তীরটা স্বাভাবিক অবস্থায় আছে; তাকে বড় বড় গোডাউন ক্রেন্ ইত্যাদি দিয়ে ছাপ দেয়নি। প্রথমে Custom Houseএ (একখানি ছোট চালাঘর) মালপত্র জমা করা গেল। ইতিমধ্যে রাজকুমারী ফতিমা, ইনি মোটর গাড়ীর মালিক, তাঁর সঙ্গে কথাবার্ত্তা ঠিক ক'রে তিনখানা গাড়ীতে আমাদের জিনিসপত্র ও আমরা বোঝাই হলুম। বন্দর থেকে মাইল খানেক দূরে বালির আধুনিক রাজধানী স্গুরাজ। সব জায়গায় যেমন আধুনিক কালের ছাপ পড়েছে, এখানকার বাড়ী ঘর রাস্তা ঘাটে ছোট আকারে বর্ত্তমান সভ্যতা ছাপ মেরে দিয়েছে। সৌভাগ্যবশতঃ এখানে আমাদের থাকতে হবে না তাই বাঁচওয়া, তা না হ'লে এত কল্পনার পর সব মাটি হ'য়ে যেত।

আমাদের যাত্রা সুরু হ'ল। এ দ্বীপটা পাহাড়ে, সোজা রাস্তা নেই, কখন উঠ্‌চে কখন নামচে। পাহাড়ের গা কেটে থাক থাক শস্যক্ষেত, ঘন সবুজ গাছপালা, অসংখ্য ঝরণায় দ্বীপটা ভারি মনোরম। গ্রামগুলো রাস্তার দু ধারে, প্রত্যেক বাড়ীর সামনে একটা ক'রে প্রবেশদ্বার—প্রায়ই সেটা চোখে পড়বার মত নানা রকম গড়ন ও কারুকার্য্যে সুশোভিত, রাস্তা থেকে বাড়ীকে ছোট্ট পাঁচিল দিয়ে আলাদা করা, বাড়ীগুলি বাঁশের খোলা দিয়ে বা খড় দিয়ে ছাওয়া। কাঠের খুঁটির উপর বা পাথরের বেদীর উপর এক একটি ছোট ছোট ঘর, খানিকটা প্রাঙ্গণ, আর তার ধারে ছোট ছোট দেবমন্দির ও মৃতদের আবাসস্থান। সবই ছোট্ট, চোখটা চারিদিক ঘুরে আসতে পারে; সম্পূর্ণ দেখতে পায় ব'লে একটা দেখার আনন্দ পাওয়া যায়।

আমাদের গন্তব্যস্থান হচ্চে বাঙলি ব'লে একটা জায়গায়। সেখানকার রাজা কি একটা অনুষ্ঠান করচেন, খুব ধুমধাম হবে। পথে একটি বিশ্রামাগারে আমরা নামলাম, এবং মুখ হাত পা ধুয়ে সামান্য রকম প্রাতরাশ সেরে নিয়ে আবার রওনা হওয়া গেল। বিশ্রামাগারটি একটি পাহাড়ের উপর অবস্থিত, নিকটে গ্রাম নেই, চারিদিকে পাহাড়, সামনেই বালির সব চেয়ে বড় গিরিচূড়া এবং তার নীচে Crater Lake। তার পাশের একটা ছোট চূড়া থেকে ধোঁয়া উঠচে, আর তার ঢালু গা কাল অঙ্গার ও ছাইয়ে ঢাকা; গতবৎসর এই ঘটনা হয়। তার গা ঘেঁসে রাস্তা গিয়েছে। এক বিরাট ধ্বংসের চেহারা চোখে পড়ে।

আমরা এগিয়ে চললুম। পথে মাঝে মাঝে গ্রাম মন্দির, থাক থাক ধানক্ষেত, নারিকেল ও অপরাপর পরিচিত গাছের মধ্য দিয়ে ইতিমধ্যেই বালিনীরা কেউবা পসরা মাথায় কেউ বা কলসী মাথায় চলেছে,—চোখে পড়তে লাগল। পরনে কাল লুঙ্গির মত একখানা ক'রে কাপড়, বাকি দেহ অনাবৃত, কিন্তু পোষাকের ন্যূনতা তাদের চেহারায় নেই। পুরুষরা বাটিকের লুঙ্গি ও মাথায় একটা ক'রে ফেটি বেঁধে চলেছে; কোমরে একখানা ক'রে কিরিচ।

বেলা প্রায় ১২টায় আমরা বাঙ্‌লির কাছাকাছি হ'তেই দেখি দলে দলে পুরুষ ও মেয়ে নানারকম বিচিত্র অর্ঘ্য মাথায় নিয়ে অনুষ্ঠানস্থলে চলেছে। কাল লুঙ্গির নীচে রঙ্গিন একখানা ক'রে কাপড় পরা, কেউ কেউ বসন্ত রংয়ের ছোট ছোট চাদর একখানা ক'রে গায়ে রেখেছে, দেহাবরণের জন্যে নয়, কারণ ঠিক সেরকম ভাবে এরা আবরণ ব্যবহার করে না। কোমরে কেউ বা সবুজ কেউ বা লাল রঙের চওড়া ফিতে দিয়ে কোমরবন্দ পরেছে, মাথায় বড় বড় এলো চুলের কবরী—যাকে শিথিল বলা যেতে পারে, কারণ আঁট ক'রে মোটেই এরা কবরী বাঁধে না এবং বিনুনী বা ফিতে কোন কিছুর বালাই নেই। গহনার মধ্যে কানে তাল পাতা, সেটা সোনার মতই দেখায়; অন্য কোনও গহনা পরে না, বোধ হয় প্রয়োজনও নেই।

ক্রমশঃ আমরা অনুষ্ঠানস্থলে গিয়ে পৌছলুম। চারিদিকে উঁচু মাচা কাপড় দিয়ে ঢাকা, নানারকম ভাবে বিচিত্র ক'রে বিবিধ অর্ঘ্যসম্ভারে সাজান। কোথাও উচ্চ মাচায় ব'সে পুরোহিতরা রাজবেশের মত বেশ ভূষায় ভূষিত

হ'য়ে মন্ত্র উচ্চারণ করচে, পিঠে একখানা ক'রে কিরিচ তখনও আছে, কোথাও গামালন বাজচে, কোথাও যাত্রা হচ্চে। এরই মধ্যে শত শত নর নারী বিবিধ অর্ঘ্যসম্ভার মাথায় নিয়ে আসচে। প্রথম দৃষ্টিতে মনে হ'ল যেন ছবি দেখচি সেই অজন্তা যুগের ; মনে হ'ল এরা ঠিক আমাদের মত মানুষ নয়, যেন একটা স্বপ্নপুরীতে আমরা এসে পড়েছি। বাঙ্‌লির রাজা ও বালির গভর্ণার গুরুদেবকে অভ্যর্থনা ক'রে মণ্ডপে নিয়ে গেলেন ; আমরা যে কোন্ দিকে দেখব কিছু বুঝতে পারলাম না, ব্যস্ত হ'য়ে পড়লাম। সবই নূতন, মানুষ, বেশভূষা, সজ্জিত মণ্ডপাবলী ও তারি মধ্যে চারিদিকে গামালানের সঙ্গীতধ্বনি। রাজা চলেছে যেন অজন্তার রাজা! কারুকার্যাখচিত পোষাক, পরিহিত বসনের প্রান্ত ভূমিতে লুটিয়ে চলেছে, পিছনে পিছনে রাজদণ্ডবাহী ছত্রধারী, তাম্বুলকরঙ্কবাহী চলেছে; চারিদিকে লোকজন, ত্রস্ত হ'য়ে রাস্তা ছেড়ে জোড়হাত ক'রে ব'সে পড়ছে।

আমরা ঘণ্টা দুই চারিদিকে ঘুরলাম ; কিন্তু সবই এত নূতন যে শেষটা মনে হ'ল কিছুই দেখলাম না। ইতিমধ্যে lunchএর জন্য ডাক পড়ল। চার পাঁচজন বড় বড় রাজা ও অনেকগুলি অফিসার জড় হয়েছেন, তাড়াতাড়ি যে lunch সারা হবে তার আশা নেই ; ভারি আপশোষ হ'তে লাগল, কারণ lunchএর পরই গুরুদেবের সঙ্গে কর্ণাসন রাজার বাড়ীতে যেতে হবে প্রায় ৬০ মাইল দূরে। উপায় নেই। কর্ণাসনের রাজা, গুরুদেব ও আমি যাত্রা করলাম, বাকি সকলে পিছনে রইলেন; তাঁরা ঘণ্টা দুই বাদে যাবেন। ছেড়ে যেতে মন চাইছিল না।

মোটর ঘণ্টায় ৪০।৫০ মাইল বেগে ছুটে চলল। পথের দুধারে কত রকমের বিচিত্রতা—বাড়ী ঘর, মন্দির লোকজন, হাট বাজার,—কিন্তু চোখের গতি মোটরের চেয়ে ঢের কম ; সেকেণ্ডের মধ্যে দেখতে না দেখতে আর একটা নূতন জিনিষ এসে পড়ে। মোটরের উপর ভয়ানক রাগ হচ্ছিল, ইচ্ছে করছিল যদি কল বিগড়ে খানিকক্ষণ অচল হ'য়ে থাকে একটু দেখা যায়। রাজার মোটর সবল সুস্থ, ছুটেই চলল।

কর্ণাসনের রাজা মালয় ভাষা জানেন, কিন্তু আমরা আবার জানি না। নেহাত প্রয়োজনীয় দুচারটা কথা ছাড়া অন্য পুঁজি নেই, তাও ইসারায় বোঝাতে হয়। সকলে চুপচাপ চলেছি, খানিকক্ষণ বাদে রাজা সংস্কৃত, মন্তর, নদনদী, মহাভারত, রামায়ণ ইত্যাদি কয়েকটা সংস্কৃত কথা বলতে লাগলেন, কিন্তু উচ্চারণ থেকে কথাগুলো সহজে ধরা যায় না। যাক, কোন রকমে পথের শেষ এল, রাজবাড়ীর সিংহদ্বারে গাড়ী থামল।

প্রথমে একটা আঙ্গিনার দুধারে লোকজন অপেক্ষা করবার জন্য ঘর ; তারপর আবার একটা তোরণ পেরিয়ে আর একটা আঙ্গিনা, তাতে গাছপালা জলাশয়, তার মধ্যে জলটুঙ্গি ঘর। দ্বিতীয় তোরণ পেরতে দেখি শাদা কাপড় দিয়ে সজ্জিত ও কচি নারিকেল পাতা দিয়ে সাজান প্রকাণ্ড চন্দ্রাতপ,—তার শেষের দিকে বেদীর উপরে ব'সে চারজন ব্রাহ্মণ বেশভূষা ক'রে মাথায় বড় বড় কারুকার্য্যখচিত মুকুট কতকটা টুপির মত প'রে ঘণ্টা বাজিয়ে মন্ত্র আবৃত্তি করছেন ; সামনের বেদীতে নানা রকম অর্ঘ্য সাজান রয়েছে। গুরুদেবের কল্যাণকামনায় ও তাঁর শুভাগমনে দেশের যাতে শুভ হয় তার জন্য ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব বুদ্ধকে স্তব করচেন। তারপর স্তব থামতেই জলটুঙ্গির উপরে গামালান বাজতে লাগল,—অনেকটা জলতরঙ্গের মত শুনতে, তবে আরো গম্ভীর নাদ।

এই প্রাঙ্গণের একধারে অভ্যর্থনাগৃহ ; সেইখানে আমাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। একটা ঘর গুরুদেবের জন্য, একটা আমার জন্য, ও একটা আমাদের সঙ্গে দোভাষী যিনি সন্ধ্যে নাগাৎ এসে পৌঁছবেন তাঁর জন্য। এক রকম ক'রে দিন কাটতে লাগল—তবে গুরুদেবের পক্ষে Rystaffel রোজ দুবেলা খাওয়া ও চান ইত্যাদিতে একটু অসুবিধা হ'ত। তাতে হ'ল এই যে উনি বালিতে থাকতে চাইলেন না, জাভাতে ফিরে গিয়ে কলকাতার অভিমুখে রওনা হবার মতলব করলেন।

বালিতে পা দিয়ে প্রথম দিনেই মন খারাপ হ'য়ে গেল। কি হবে আমরা ত ভেবে অস্থির। রাজা বেচারী সব সময়ে সামনে হাজির, তার আর বিশ্রাম নেই! রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর নাচের বন্দোবস্ত ছিল, ঘণ্টা দুই নাচ দেখা গেল। ছোট ছোট মেয়ে গামালানের সুর ও তালের সহযোগে মহাভারতের একটা অংশ অভিনয় করতে লাগল। প্রথমে নাকি সুরে

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কর

...নিকটা গান গায়, তারপর সেইটেকে নাচের ভিতর দিয়ে ...বটা প্রকাশ করে। গানটা অশ্রাব্য, তবে নাচটা সমস্ত শরীর দিয়ে নাচে, খুব ভাল লেগেছিল।

আমাদের বাকি দলবল, মাইলখানেক দূরে একটা বিশ্রাম আবাস আছে, সেখানে থাকবে তার ব্যবস্থা হয়েচে। তিনদিন এখানে কাটিয়ে আমরা তামপকশিরিং নামে একটা জায়গায় পাহাড়ের উপর বিশ্রামালয়ে যাব ঠিক হয়েচে। দেখতে দেখতে তিনদিন কেটে গেল। গ্রাম, বাজার, মন্দির ইত্যাদি একটু আধটু ঘুরে দেখে গিয়েছিলাম, বেশী সময় পেতাম না, গুরুদেবের কাছাকাছি থাকতে হ'ত কখন কি প্রয়োজন হয়, তার উপর ভয়ানক মন খারাপ। বেলা ৫টায় তামপকশিরিংএর জন্য মোটর ছাড়ল, সঙ্গে Dr. Kuperburs ও আমি আছি।

বিশ্রামালয় একেবারে পাহাড়ের উপরে নির্জ্জন জায়গায়, নিকটে গ্রাম নেই, তবে ঠিক নীচে একটা তীর্থ-স্থান আছে সেখানে প্রায় সমস্তদিনই মেয়েরা জল নিতে আসে। আমাদের ওপারে আর একটা পাহাড়, তার গা বেয়ে গ্রামের মেয়েরা জল নিতে আসে যায়, মধ্যে একটা ছোট নদী আছে। বিশ্রামালয়ের সামনে একটা বসবার জায়গা আছে, তারি খাড়া নীচে ঝরণাগুলো; কাজেই সেখানে বসলে যা দেখবার তা সবই দেখা যায়। এখানে আমরা তিনদিন কাটালাম। গুরুদেব একদিন এক রাত্রের জন্য গিনয়ারের রাজার অতিথি হবেন, এবারে সুনীতিবাবু সঙ্গে থাকবেন। সব বন্দোবস্ত ক'রে ওঁরা গিনয়ারের জন্য রওনা হলেন, সঙ্গে দোভাষীও গেলেন, বাকি আমরা চললুম ক্লুং ক্লুং ব'লে একটা জায়গায়। এটা একটু সহুরে স্থান। বিশ্রামালয়ে রাত কাটিয়ে, পরদিন lunch খেয়ে গিনয়ারের জন্য বাহির হওয়া গেল।

পথে উবুদ পড়ে, এইখানেই সেই বড় অনুষ্ঠান হবে। তার খানিকটা বন্দোবস্ত দেখলাম, দেখে গিনয়ার পৌঁছলাম। সন্ধ্যে বেলা প্রথমে মুখোস প'রে নাচ ও অভিনয় হ'ল। তারপর dinnerএরপর মেয়েদের নাচ। মুখোসগুলো এক একটা চরিত্র ধ'রে করেছে, লোকগুলোও ঠিক তার ভাব বজায় রেখে চলাফেরা ভাব ভঙ্গি করে, কোনও রূপ বেমানান দেখায় না, তবে বেশিক্ষণ ভালও লাগে না। বালিনীরা হাস্যকৌতুকপ্রিয়, এই রকম অভিনয়ে খুব আনন্দ পায়।

রাত্রে আহারের পর মেয়েদের এক রকম নাচ হ'ল. দুজন মেয়ে সাজ সজ্জা ক'রে গামালানের সঙ্গে কেবল নাচলে, গান নেই; শরীরটা এমন নমনীয় যে, প্রতি নড়াচড়াতে সমস্ত অঙ্গ সাড়া দেয়। ভারি চমৎকার লাগল। রাত অনেক হ'ল, ফিরতে হবে,—কাজেই নাচ শেষ ক'রে দিলে,—আমরাও ফিরলাম।

পরদিন সকলে মিলে Denpasar ব'লে বালির দক্ষিণে একটা সহরে যাওয়া গেল। প্যাক করা বোঝাই দেওয়া একটা বিষম কাণ্ড, উপায় নেই। আমাদের থাকার সব ঠিক হয়েছিল Assistant Controllerএর বাড়ীতে, সেটা খালি ছিল। হোটেল থেকে খাওয়া দাওয়া আসত। বালির মধ্যে এই খানেই একটি হোটেল আছে, কিন্তু এই উৎসব উপলক্ষ্যে ভয়ানক ভিড় হয়েছে, আট জন থাকার জায়গায় চল্লিশ জন এসেছেন। আস্তাবল, গুদাম, চাকরদের ঘর সব ব্যবহার ক'রেও কুলতে পারছে না। তবে সৌভাগ্যক্রমে আমাদের বেশ আরামেই কেটেছিল। এ ছাড়া অন্য সব বিশ্রামাগারও ভরতি। মোটর ক'রে উবুদ, যেখানে উৎসব হচ্ছিল, যাতায়াত করতে হ'ত। সেখানে যেতে আমাদের প্রায় এক ঘণ্টা লাগত।

উবুদে উৎসব তিন দিন। আমরা রোজই যেতাম। দুপুরে উবুদের রাজার বাড়ি lunch খাওয়ার বন্দোবস্ত ছিল। গুরুদেব কেবল দুদিন গিয়েছিলেন। রাজবাড়ীতে বড় বড় মঞ্চ করেছে, নানারকম ক'রে কাপড় দিয়ে সাজিয়েছে, কোন মঞ্চে পণ্ডিতরা মন্ত্র পড়চেন, কোথাও রামায়ণ পাঠ হচ্চে, কোথাও পূজা হচ্চে, কোথাও বাজনা বাজচে, কোথাও নৈবেদ্য সাজিয়ে রাখচে। এই রকম বিরাট ব্যাপার। অসংখ্য লোকজন ঢুকচে বেরুচ্চে, তাদের বেশভূষা, এমন কি বসনবিরলতা, সবই ভাল। সকলেরই সুন্দর সুপুষ্ট শরীর।

একটা মঞ্চের মধ্যে মৃতদের ও তাদের উৎসর্গ করবার জিনিস সাজিয়ে রেখেছে। বৈকালে মিছিল বেরুল।

প্রাঙ্গণের মধ্যে এই মিছিলের যাতায়াতের জন্য রাস্তা থেকে একটা বাঁশের মঞ্চ-সিঁড়ি করেছে যাতে রাস্তা থেকে সিঁড়ির উপর দিয়ে একেবারে উৎসব স্থানে আসতে পারা যায়। বাহিরের প্রাঙ্গণ ও রাস্তা ঘাট লোকে লোকারণ্য। প্রথম চলল পুরুষেরা চামর নিয়ে, বল্লম নিয়ে, ছাতা নিয়ে। এই রকমে প্রায় শ তিন চার লোক দু লাইন ক'রে গেল। তারপর সজ্জাদ্রব্য গন্ধ পুষ্প ইত্যাদি নিয়ে প্রায় শ দুই মেয়ে চলল। সকলেই সুন্দরভাবে সজ্জিত, মাথায় একটা ক'রে আধার আছে, তার উপর জিনিসগুলো নানা রকম ক'রে রাখা। তারপর নৈবেদ্য নিয়ে প্রায় পাঁচশত মেয়ে ধীরে ধীরে জলস্রোতের মত চলল। সব শেষে রাজ-অন্তঃপুরের প্রায় জন পঞ্চাশ লোক বিবিধ সামগ্রী ঐ রকম আধারের উপর নিয়ে গেল। তাদের পোষাক--ভিতরে রঙ্গিন বাটিক কাপড়, উপরে কাল কাপড় বুকের উপর থেকে পরা, তার উপরে খালি, উপরের অংশটা একখানা ক'রে হলদে কাপড়ে আচ্ছাদিত, কোমরে সবুজ, লাল নানা রংএর কোমরবন্ধ। মাথায় বড় বড় এলো খোঁপা, কানে তালপাতার গহনা, কাহারও বা হাতে এক গাছি সোনার চুড়ি। ধীর মন্থর গমনে চলছে। অন্য মেয়েরা, কেহ বা বুকে কাপড় দিয়েছে, কাহারাও বা খোলা। উৎসবের জন্যেই যে বিশেষ ক'রে সেজেচে তা নয়, তবে এত লোকের ভিতরের কাপড় বিভিন্ন রংএর হ'লেও কেবল বাহিরের কাপড়ের কাল রং সমগ্র জনতাকে একত্ব দিয়েছে। আগে ও পাছে গামালন বাজনার দল। এই মিছিল,—সিঁড়ি বেয়ে ওঠা-নামা ও মন্থর গতিতে আগিয়ে চলা, মাইল খানেক লম্বা এক সারে শোভাযাত্রা, তার পর বড় বড় প্রায় একশ ফুট উঁচু, বাঁশের রথের মত নানা রকম মঞ্চ, তার মধ্যে মৃতেরা আছে,—পুরুষেরা ব'য়ে নিয়ে চলল। তারপর নাগ, বৃষ, নানা রকম ভূত প্রেত। মিছিল আর ফুরোয় না। বৃষ গুলো কাঠের, বিচিত্র ক'রে সাজান। তাদের বড় বড় পেটের মধ্যে মৃতদের পুরে পোড়ান হবে। সব চলল সৎকারস্থানে রাজপুরী থেকে এক মাইল দূরে। সেখানে নানারকম মঞ্চ তৈয়ারি হয়েছে, মৃতদের তার উপর রেখে পোড়ান হবে। ঐ বড় বড় মঞ্চগুলোয় মৃতদেহ উঠাতে নামাতে প্রকাণ্ড সঁড়ি লাগে।

তারপর পোড়ানর পালা।

এদের সামাজিক জীবনে অন্য কোনও খরচ নেই, মৃতের সৎকারই একমাত্র খরচ, সেইজন্যে সব টাকা কড়ি সৎকারে লাগায়। আমার খুব ভাল লেগেছিল মিছিল। নানাবিধ জিনিষ নিয়ে মেয়েরা লাইন বেঁধে চলেছে, বিচিত্র তাদের গড়ন, বিচিত্রতর তাদের পোষাক—সমস্ত জিনিষটার সমগ্র একীভূত মূর্ত্তি সত্যিই চক্ষু আর মন উভয়কেই মুগ্ধ করে।

যাক, এরই জন্য একদিন কেটে গেল, আমাদেরও বালির পালা শেষ হল। ৫ই গুরুদেব, সুনীতিবাবু ও আমি মন্দুক ব'লে পাহাড়ের উপরে একটা বিশ্রামালয় আছে সেখানে যাব। Bakeরা আর একটা বিশ্রামালয়ে যাবে। তারপর ৭ই কিম্বা ৮ই স্ওরাজা যাওয়া হবে; সেখান থেকে জাহাজ নিয়ে ৯ই সুরবায়ায়, তারপর দিন পনেরো জাভায় ঘোরার পর ২৪শে।২৫শে নাগাৎ দেশের দিকে রওনা হওয়া যাবে। এই রকম ঠিক আছে, তবে বদ্‌লাতে এক, মিনিটও লাগে না।

মন্দুকে আমরা এসেছি। বিশ্রামালয়টি মন্দ নয়, পাহাড়ের উপরে। সামনে পিছনে পাহাড়, তার গায়ে ছোট ছোট গ্রাম, থাক থাক ক্ষেত, একটি সদর রাস্তা ঠিক বিশ্রামালয়ের সামনে দিয়ে এঁকে বেঁকে চ'লে গেছে, সেই পথ দিয়ে গ্রামের মেয়েরা অনাবৃত দেহে স্বচ্ছন্দ চিত্তে যাতায়াত করছে, চারি পাশের দৃশ্যাবলীর সঙ্গে তারা বেশ মিলে মিশে আছে, এটা অদ্ভুত ব'লে মোটেই মনে হয় না, বরঞ্চ এইটাই স্বাভাবিক ব'লে ভারি সুসঙ্গত মনে হচ্ছে। সামনের পথের পাশ দিয়ে ঝরণার জলের ধারা ব'য়ে চলেছে, তাতে পুরুষ মেয়ে একত্রে নির্ব্বিকারচিত্তে স্নান করচে। হাটের পথে সকাল থেকে মেয়েরা পসরা নিয়ে চলেছে। এখানে হাট বাজার কেনা বেচা সবই মেয়েরা করে।

বালির কথা

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কর

গ্রামে গ্রামে সাধারণের বসবার জন্য দু তিনটি ক'রে ছোট ছোট ঘর রাস্তার ধারে থাকে; তাতে পুরুষরা জটলা পাকিয়ে গল্প গুজব করে। তা ছাড়া প্রত্যেক গ্রামে একটা ক'রে ঘণ্টাঘর আছে। ঘণ্টাগুলো বড় বড় কাঠের, কোন আপদ বিপদ হ'লে ঘণ্টা বাজে। তা ছাড়া তথায় প্রত্যহ পুরুষেরা একত্র হ'য়ে পানাদি করে, তাদের একত্র করবার জন্যও এই ঘণ্টা বাজে। মেয়েরা সাংসারিক সব রকম কাজই করে, তা ছাড়া চাষবাসেতে সাহায্য করে। পুরুষরা প্রধানত জমি তৈয়ারী, ফসলবপন, জঙ্গল থেকে কাঠ সংগ্রহ করা, ও বাড়ীঘর তৈয়ারি ইত্যাদি করে। কিন্তু অনেক স্থানে দেখেছি যে, এই সব ব্যাপারেও মেয়েরা সাহায্য করছে।

দেশটা মেয়ে-প্রধান। পুরুষকে গ্রহণ করা ইত্যাদি ব্যাপার মেয়ের মতামতের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। বিয়ে ব্যাপারটা পরস্পরের পছন্দের উপর হয়। তাতে যদি পিতামাতার অমত থাকে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করে। আবার অবনিবনা হ'লে ছেড়েও দিতে পারে। কুমারী মেয়েরা কবরীর এক গোছা চুল ছেড়ে রেখে দেয়। তাতেই কুমারী ও বিবাহিতা চিনতে পারা যায়। পুরুষ ও মেয়ে সকলেই খুব পান খায়, তা ছাড়া দোক্তার মত খানিকটা তামাকপাতা খুব কুচি কুচি ক'রে কাটা সব সময়ে মুখে রাখে, তার জন্য পিক ফেলে সর্ব্বত্র চিহ্নিত ক'রে ফেলেছে। বাজারে তৈয়ারি অন্ন এবং অন্যান্য খাদ্য সবই পাওয়া যায়, অনেকে তাই কিনে খায়; শূকর মাংসের খুব বেশী চলন; এদের খাওয়ায় কোনও বাচ-বিচার নেই, শূকর মুরগী সকলেই খায়।

ভোজ টোজ ব্যাপারে গ্রামের সকলে খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করতে সাহায্য করে। গরুর দুধ এরা ব্যবহার করে না; গাই বলদ কেবল চাষের জন্য রাখে। গরুগুলো দেখতে অনেকটা হরিণের মত, গলকম্বল, বা ককুদ নেই, রং সবই লাল, বেশ সুস্থ সবল। গ্রামে প্রায় একখানা ক'রে ঠেলা-গাড়ী আছে, তাতে ভারি মালপত্র চাপিয়ে লোকজনে ঠেলে নিয়ে যায়, বা বাঁশে ঝুলিয়ে নিয়ে যায়; অন্য কোনও বাহন নেই। কোথাও কোথাও দুই একটা ছোট ছোট ঘোড়া দেখতে পাওয়া যায়, তার পিঠে ধান ইত্যাদি বোঝাই ক'রে নিয়ে যাচ্ছে। বাসন কোসন হয় কাঠের, নয় বাঁশের, কেবল মাত্র জলের জন্য মাটির ঘড়া ব্যবহার করে। পূজার জন্য জল কিন্তু বাঁশের চোঙ্গে পুরে নিয়ে যায়; মাটি শুদ্ধ নয়।

ভাতই এখানকার প্রধান খাদ্য; যথেষ্ট পরিমাণে ধান এখানে উৎপন্ন হয়। বারমাস এখানে চাষ চলে, জলের অভাব নেই। জলসেচনের ব্যবস্থা খুব চমৎকার, খুব উঁচু জমিতেও অনায়াসে জল সেচন করতে পারে। ধান, তামাক, আখ প্রধান ফসল। এ ছাড়া তরিতরকারিও নানারকম হয়। পেঁপে, আম, নারিকেল, কাঁটাল, জামরুল, ম্যাঙ্গোষ্টিন ও কলা প্রচুর পরিমাণে অযাচিতভাবে সর্ব্বত্র ফ'লে আছে। খাবার অভাব এ দেশে নেই।

গরীব বড়লোকে কাপড় চোপড়ে আহার ইত্যাদিতে বিশেষ ভেদ নেই। কাপড় ছিঁড়ে গেলে সেলাই করেনা, নূতন কাপড় পরে। আবহাওয়াও খুব ভাল। অসুস্থ বা বিকল-অঙ্গ লোক চোখে পড়ে না; দুই এক জনকে দেখেছি কেবল গলগণ্ড আছে। সাধারণত চীনে-মুদ্রার (দড়িতে গাঁথা) চলন, ডাচ মুদ্রারও চলন আছে। পুরুষরা সকলেই একখানা ক'রে কিরিচ পিঠে বেঁধে রাখে আর সেগুলো নানা রকম কারুকার্য্যে খচিত দেখতে পাওয়া যায়। চীন থেকে প্রস্তুত একরকম মদ্য এরা ব্যবহার করে। ভুট্টার খোসায় তামাকপাতা জড়িয়ে একরকম চুরুট ক'রে খায়। নানা রকম ফুল সর্ব্বত্রই দেখতে পাওয়া যায়। পুরুষরা প্রায় কানে ফুল গুঁজে রাখে, মেয়েরা কখন কখন খোঁপায় ফুল দেয়।

এখানে মন্দিরগুলো ঠিক আমাদের দেশের মত নয়, চারিদিকে প্রাচীর দিয়ে ঘেরা একটা জায়গা—তোরণ ও প্রাচীরে খুব কারুকার্য্য থাকে, অনেক স্থানে কাঁচা ইটের তৈয়ারি। ভিতরে দুই তিনটি প্রাঙ্গণ, সে গুলোরও প্রাচীর ও প্রবেশদ্বারগুলো কারুকার্য্য করা। প্রত্যেক প্রবেশ-দ্বারের দুপাশে নানা রকম দ্বারপাল থাকে, প্রায়ই ভয়াবহ মূর্ত্তি। ভিতরে ছোট ছোট চালাঘর পাথরের বা কাঠের উচ্চ মঞ্চের উপর তৈয়ারি করা। তার ভিতর

কিন্তু দেবতা থাকেন না; শুধু নৈবেদ্য ও ফুল এবং জল দিয়ে সেই বেদীতে পূজা করে; কখন কখন বা বাড়ী থেকে দেবতার বিগ্রহ এনে পূজা করে, আবার বাড়ী ফিরিয়ে নিয়ে যায়। ব্রাহ্মণ পৌরহিত্যের কাজ করেন, পূজার সময় মেয়েরা হাঁটু গেড়ে বসে। মন্দির প্রদক্ষিণও আছে, দেবতার মাথায় ছাতা ধরাও আছে। নারিকেল পাতার নানারকম বিচিত্র ছোট ছোট পাত্র তৈয়ারি ক'রে তাতে নৈবেদ্য সাজায়।

পুরুষেরা একখানা ছোট বাটিকের কাপড় দিয়ে মাথায় ফেটি বেঁধে রাখে, মেয়েরা পূজার সময় বুকে একখানা ক'রে কাপড় জড়ায়। স্নানের সময় প্রায় উভয়েরই কোন রকম আবরণ থাকে না।

বালিতে আমরা এসেছিলাম ২৬শে আগষ্ট, আজ হ'ল ৮ই সেপ্টেম্বর, আজ ছেড়ে যাব। এই কটা দিনের মধ্যে মোটামুটি যা দেখার একরকম দেখা হয়েচে।

যাভায় কি হয় সবই অনিশ্চিত, গুরুদেব মাঝে মাঝে সব সঙ্কল্প ভেস্তে দেন; তবে ভরসা আছে কিছু দেখা হবেই। এখানে হল চোদ্দ দিন, চিঠি লিখলাম চোদ্দ পাতা, লিখতে লিখতে হাত ব্যথা করছে, অভ্যাস নেই তার উপর ভাষা জোগায় না, আবার বানান চোখ রাঙ্গায়। এত উপদ্রবও মানুষ সৃষ্টি করেছে!

এই পত্রখানি শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে লিখিত

এই যে ছুঁয়েচি আজি

প্রাচীন আসামী হইতে অনুবাদ

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

এই যে ছুঁয়েছি আজি তোমার অঙ্গুলি,
গীতি-ক্ষুব্ধ বক্ষ তব হে স্তুতি-চঞ্চলা,
দীপশিখাসম কম্প্র নাড়ীতে আকুলি
বিরহ-মিলন-বার্ত্তা করে ফেরা-চলা।
এই যে কপোলে তব প্রভাতেরো আগে
উষার আভাস কাঁপে—পূর্ব্বরাগসম,
রহস্য-গভীর তব কুন্তলের রাগে
অন্ধকার মুরছায়—এই কিবা কম!

জানি জানি গ্রহ সূর্য্য কিসের পিয়াসে
পুঞ্জনীহারিকা হ'তে সূত্র তুলি তুলি
আলোকবসন বোনে; জানি জানি সখি,
চিহ্নহীন কোন্ পথে বর্ষে বর্ষে আসে
শিশিরকুণ্ঠিত শাখে ভ্রান্ত ফুলগুলি
হঠাৎ সৌরভ যায় দেয় রে চমকি!

তথৈব

—গল্প—

—শ্রীবুদ্ধদেব বসু

ট্যাক্সিটা মোড় ফেরার সঙ্গে সঙ্গে বাঁ দিকে ঝুঁকে' পড়ে' তারপর ঠিক হ'য়ে বসে' নিয়ে পরিতোষ বলে' উঠ্‌লো, "সুতরাং ?"

গায়ের তসরের পাঞ্জাবির ওপর একটু যে সিগ্রেটের ছাই পড়েছিলো, বাঁ হাতের দু'টি আঙুল দিয়ে তাই ঝাড়তে ঝাড়তে শ্রীহর্ষ জবাব দিলে, "সুতরাং কাল কল্‌কাতা ছাড়্‌ছি। এটা হচ্ছে সেই মাস, শিশুপাঠ্য বইতে যা'কে বলে' থাকে শরৎকাল। দেখ্‌তে পাচ্ছি, কল্‌কাতার আকাশই ম্যাপের মহাসমুদ্রের মত নীল হ'য়ে উঠেছে—কাজেই রাঁচির আকাশ অ্যাদ্দিনে ধারালো ইস্পাতের মত ঝক্ ঝক্ কর্‌তে সুরু করেছে। তা ছাড়া, সেখানে আছে ইলা, যা'র চোখ দু'টি সেই আকাশেরই মত—কিন্তু তা'র চেয়েও—"

"তা ইলা তো আর দু'দিনেই মিলিয়ে যাচ্ছে না! বরং রাঁচির আকাশের রঙ্‌টা ইলার চোখের আরেকটু কাছাকাছি আসুক্, ইঁদারার জল আরো ঠাণ্ডা হোক্—"

"সঙ্গে-সঙ্গে ইলার হৃদয়টিও ঠাণ্ডা হ'য়ে যাক্ আর কি! না হে—কাল আমি যাবোই। ইলা লিখেছে—যাক্, কি লিখেছে তা আর না-ই শুন্‌লে। আজ্‌কেই যেতাম, কিন্তু নাট্য-মন্দিরে কি-একটা নতুন প্লে হচ্ছে, খুব নাকি চলেছে শুন্‌লাম। কি না বইটার নাম ?"

" 'ষোড়শী' ?"

"হ্যাঁ, 'ষোড়শী'ই বটে। শরৎ চাটুয্যে লেখেন ভালো।...তা, ওটা দেখে যেতে হ'বে। কখন আরম্ভ ? তোমার সঙ্গে যে যাচ্ছি, ওদিকে দেরি হ'য়ে যা'বে না তো ?"

"কিসের দেরি হ'বে ? আজকে বেস্পতিবার—সাড়ে আটটায় আরম্ভ, এখন তো ছ'টাও বাজেনি। এই ডা'ন্ দিকে।"

"এলাম নাকি ?"

"প্রায়। ও, একটা কথা বল্‌তে তোমায় ভুলে' গেছি। আজ্‌কে সকালে আমার দাদা-বৌদি এসেছেন। তাঁরা থাকেন মুঙ্গেরে—বহুদিন পর এবার দেশে এলেন। দাদা করেন ইস্কুলমাষ্টারি—বার-বার যাওয়া-আসার খরচ পোষাতে পারেন না। বৌদি মানুষটি বেশ।"

"বটে ?" শ্রীহর্ষ একটা হাসিকে ঠোঁটের মাঝ-পথে এনেই ছেড়ে দিলে।

তারপর ট্যাক্সিওলার হাত থেকে খুচ্‌রো নিতে-নিতে বল্‌লে, "চলো দেখে আসা যাক্।"

হরিশ মুখার্জির রোড্-এর ওপর ছোট একটি দোতলা বাড়ি। বাইরের বস্‌বার ঘরটি এমন ভাবে সাজানো, যা'তে অধিবাসীদের চট্ করে' বড়লোক বলে' ভুল হ'তে পারে, কিন্তু আসলে সে সাজসজ্জা ভেতরকার দারিদ্র্যের লজ্জা ঢাক্‌বার একটা কৌশলমাত্র। ঘরটির মেঝেয় সতরঞ্চি পাতা, মাঝখানে একটি ফর্সা কাপড়ে-ঢাকা বেতের গোল টেবিল, তা'র ওপর রঙীন্ চীনেমাটির ফুল্‌দানিতে এক গুচ্ছ রজনীগন্ধা। চার্‌দিকে গদি-আঁটা বেতের চেয়ার, দু'একখানি সোফাও আছে। দেয়ালে গৃহস্বামীর দু'চারজন পূর্ব্বপুরুষের এন্‌লার্জ্‌ড্ ফোটোগ্রাফ্, একখানা মোনা লিসা ও একটি landscape ছবি। জান্‌লা-গুলি সব বন্ধ ছিলো; পরিতোষ সেগুলো খুলে' দিতে-দিতে বল্‌লে, "বাড়িতে কেউ নেই বলে' মনে হচ্ছে। তুমি একটু বোসো, হর্ষ—আমি দেখে আস্‌ছি। যদি সবাই বেরিয়ে গিয়ে থাকে, তা'লেই হয়েছে। তোমাকে খেতে বল্‌লাম—"

আপন মনে বিড়্‌বিড়্ কর্‌তে কর্‌তে পরিতোষ লাল বনাতের পর্দ্দা সরিয়ে বাড়ির ভেতরে ঢুক্‌লো। যেন সে

জীবনের ভার আর বইতে পারছে না, এইভাবে ঈষৎ কাঁধ নেড়ে, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেল্‌তে গিয়েও না ফেলে, শ্রীহর্ষ একটি চেয়ারে বসে' পড়্‌লো।

পাশের বাড়ির চিল-ছাত ডিঙিয়ে, মাঝখানকার পাঁচিলটা টপ্‌কে, পশ্চিমের জান্‌লা বেয়ে একরাশ সোনার গুঁড়োর মত খানিকটা সূর্য্যাস্তের আলো তখন সেই ঘরে লুটিয়ে পড়েছে। সে আলো যেন হাত দিয়ে ছোঁয়া যায়, হাতের মুঠোয় ভরে' ধরে' রাখা যায়, হাত তুলে' নিয়ে মুখেও মাখা যায়। শাদা রজনীগন্ধার গুচ্ছ অনেকগুলো দীপশিখার মত জ্বলে' উঠ্‌লো, মোনা লিসার ছবির কাঁচে আগুন ধরে' গেছে, শ্রীহর্ষর ফেনার মত শাদা চাদরের যে-অংশ মেঝেয় লুটোচ্ছে, সেটুকুতে কে যেন এইমাত্র আবীর ঢেলে দিয়ে গেলো। প্রকৃতির শোভা-টোভা শ্রীহর্ষর মনকে কোনোদিনই বিশেষ টান্‌তে পারে নি;—কিন্তু আজ যেন তা'র কি হয়েছে—সে চুপ করে' সেই লাল রজনীগন্ধার দিকে তাকিয়ে প্রায় আবিষ্টের মতই বসে' রইলো।

আসলে পাঁচ মিনিট মাত্র গেছে; কিন্তু শ্রীহর্ষর মনে হ'তে লাগ্‌লো সে অন্তত আড়াই ঘণ্টা ধরে' ঐ চেয়ারে বসে' আছে। সন্ধ্যার আলোও নিবে' আস্‌ছে—অন্ধকার হ'য়ে এলো বলে'—পরিতোষ হতভাগাটা এতক্ষণ ধরে' কর্‌ছে কি?

বিরক্ত হ'য়ে শ্রীহর্ষ উঠে' দাঁড়িয়ে আলোটা জ্বাল্‌বার জন্য সুইচ্‌-এর ওপর হাত রাখ্‌লো। কিন্তু কয়েক সেকেণ্ড্‌-এর জন্য সুইচ্‌টা টেপ্‌বার মত শক্তিও তা'র দেহে ছিলো না।

অতসীর পেছনে লাল বনাতের পর্দ্দা, মুখে, গলায়, হাতে টাট্‌কা রক্তের মত গাঢ় লাল আলোর ছিটে, কপালের সিঁদুর টক্‌টকে লাল, শাড়ির পাড় আরো উজ্জ্বল লাল। সারা ঘর সোনার ধূলিতে ধূলিময়, অতসীর চোখ দু'টি স্বপ্নের মত, চার বছর আগেকার মত।

অতসী ঘরে ঢুকে'ই ভয়ানক চম্‌কে উঠে' একটুক্ষণ চুপ করে' দাঁড়িয়ে রইলো; তারপর টেবিলটির দিকে এগিয়ে এলো।

টক্ করে' শব্দ হ'ল, উগ্র হল্‌দে আলোয় ঘর ভেসে গেলো, মোহ গেলো কেটে।

পরিতোষ বল্‌তে লাগ্‌লো, "ইনি শ্রীমতী অতসী মিত্র, আমার বৌ-দি, আর ইনি আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত শ্রীহর্ষ সরকার বি-এ (অক্সন্), ডি-লিট্ (লণ্ডন্)।"

শ্রীহর্ষ শেষ পর্য্যন্ত শুনে' আস্তে-আস্তে দু'টি হাত একত্রিত করে' অর্দ্ধোচ্চারণ কর্‌লে, "নমস্কার।" তারপর অতসী প্রতিনমস্কার কর্‌লে কিনা, তা না দেখ্‌বার ভাণ করে' বল্‌লে, "ওহে পরিতোষ, আমার দেরি হ'য়ে যা'বে না তো? I say—আমি বরং এখুনি চলে' যাই।"

পরিতোষ বল্‌লে, "সে কি কথা? না খেয়ে কি করে' যাবে? মা, দেখ্‌লাম, তোমার জন্য কত-সব আয়োজন কর্‌ছেন।"

শ্রীহর্ষ তখন চেয়ার ছেড়ে উঠে' দাঁড়িয়েছে। যে-জান্‌লাটি দিয়ে একটু আগে সোনার গুঁড়োর মত আলো আস্‌ছিলো, সেই জান্‌লা দিয়ে বাইরে মাথা গলিয়ে দিয়ে বল্‌লে, "আজ্‌কের দিনটা হঠাৎ ভারি গরম পড়েছে—না? চলো না পরিতোষ, বাইরে থেকে একটু ঘুরে' আসি। মার্কেট্‌ এ যা'বে? নাঃ—আইস্‌-ক্রীমগুলো আর তেমন খাসা নেই।"

অতসী ফুলদানি থেকে রজনীগন্ধার গুচ্ছটি একবার তুলে' আবার ঠিক করে' বসাতে বসাতে প্রত্যেকটি কথা স্পষ্ট উচ্চারণ করে' বল্‌লে, "আপনি কি 'ষোড়শী' দেখ্‌তে যা'বেন, শ্রীহর্ষ বাবু? চলো না ঠাকুরপো, আমরাও যাই।"

শ্রীহর্ষ জান্‌লা থেকে সরে' এসে টেবিলের উল্টো দিকে অতসীর একেবারে মুখোমুখী দাঁড়ালো। তারপর অতসীর চোখের ওপর চোখ রেখে—যে-শুক্‌নো, নীরস গলায় বিলেতে থাকৃতে সে ল্যাণ্ড্‌লেইডিকে থ্যাঙ্ক্‌স বল্‌তো—সেই স্বরে বল্‌লে, "আপনি যাবেন? তা বেশ, চলুন্ না—আমার একটা পুরো বক্সই আছে"—তারপর পরিতোষের দিকে তাকিয়ে, "ডক্টর্ চ্যাটার্জির বাড়ির মেয়েদের আস্‌বার কথা ছিলো কিনা—তা ওঁদের আজ হঠাৎ প্রফেস্যর্ পুচ্চিনির বাড়িতে নেমন্তন্ন হ'য়ে গেলো। পুচ্চিনির নাম শোনো নি? মস্ত বড় orientalist—জুরিকে একবার আমার সঙ্গে দেখা হয়েছিলো। চমৎকার লোক—সারাটা জীবন কাজের ঘানিতে ঘুর্‌লেন, কিন্তু মনে যদি একটু ঘুণ ধরেছে! তাঁর দু'হাতের আঙুলে যে ক'টা কড়া আছে, প্রায়

শ্রীবুদ্ধদেব বসু

ওতটা ভাষা জানেন—মায় তামিল-তিব্বতী। আর অদ্ভুত অধ্যবসায়! ছেলেবেলায় মিলান্-এর রাস্তায় খবরের কাগজ ফিরি করে' বেড়াতেন, তারপর আল্প্স্ ডিঙিয়ে জেনেভায়—কিন্তু সে যাক্!...আপনি যাচ্ছেন তা'লে? শিশির বাবুকে কখনো দেখেন নি বুঝি? হ্যাঁ, দেখ্‌বার মত বটে—বাঙ্‌লা দেশের পক্ষে আশ্চর্য্যই। তবে এ-দেশের stage এখনো যদ্দূর crude হ'তে হয়—এখনো সীন্ টাঙায়—হাসিই পায় দেখ্‌লে। তা আপনার—ওহে, পরিতোষ, তোমার দাদার সঙ্গে তো পরিচয় হ'ল না!"

ইতিমধ্যে অতসী একটি সোফায় গিয়ে বসেছিলো; সে-ই জবাব দিলে, "উনি বায়োস্কোপ্ দেখ্‌তে গেছেন—এম্প্রেস্-এ—"

পরিতোষ ভুরু কুঁচ্‌কে বলে' উঠ্‌লো, "এম্প্রেস্-এ? 'জয়দেব' দেখ্‌তে? নাঃ, দাদা একেবারে গেঁজে গেছেন দেখ্‌ছি! তোমাকে নিয়ে গেলেন না যে বৌদি?"

মুখ যা'তে লাল হ'য়ে না ওঠে, সেই চেষ্টা কর্‌তে কর্‌তে অতসী বল্‌লে, "আমি যাই নি। মাণিকের একটু জর হয়েছে কিনা"—চোরাবালিতে ডুব্‌তে-ডুব্‌তে হঠাৎ যেন অতসীর পায়ের নীচে পাথর ঠেক্‌লো—"এই তো সারাদিন পর এখন একটু ঘুমিয়েছে, জেগে উঠ্‌লেই আমাকে খুঁজ্‌বে।—আপনি বুঝি বায়োস্কোপ-টায়োস্কোপ বিশেষ ভাখেন না, শ্রীহর্ষ বাবু?"

"খুব কম। সিনেমা জিনিসটাই আমার কাছে কেমন জোলো-জোলো ঠেকে, তবে কয়েকটা ফিল্‌ম্ দেখেছি বটে খুব ভালো। সেবার নোয়েল্ কোয়ার্ডের পাল্লায় পড়ে'—সেই যে হে, যা'র কথা তোমায় বল্‌ছিলাম, পরিতোষ—ছোক্‌রা নাটক লিখে' এরি মধ্যে দিব্যি নাম করে' ফেলেছে—হ্যাঁ, নোয়েল্ কোয়ার্ডের পাল্লায় পড়ে' একটা ছবি দেখ্‌তে যাই—নাম, 'Grass'। সে এক আশ্চর্য্য জিনিষ! পৃথিবী তৈরী হওয়া থেকে আরম্ভ করে' আজ পর্য্যন্ত মানুষের—না, প্রাণী জাতির ইতিহাস! এ-দেশে এখনো আসে নি ওটা, না?...না হে, সাতটা বাজ্‌তে চলেছে"--

"ভয় নেই তোমার, রাম্না এই হ'ল ব'লে। কি বৌদি, তা'লে তোমার থিয়েটার যাওয়ার কথাটা সব ভুয়ো?"

"না—ভাব্‌ছিলাম, মা যদি একটু ওর কাছে বসেন—থাক্ গে, আজ না-ই বা গেলাম—" অতসীর আবার বোধ হ'ল, তা'র গলার প্রতি শিরাটি বেয়ে সমস্ত রক্ত যেন সুড়সুড় করে' মুখে উঠে' আস্‌ছে। হাত দিয়ে একবার মুখ মুছে নিয়ে বল্‌লে, "যাও না ঠাকুর পো, একবার দেখে এসো রান্নার কদ্দূর। মিছিমিছি এঁকে আট্‌কে রেখে লাভ কি?—আমরা কেউ যাচ্ছি না যখন।"

"কেন, চলুন্ না। পরিতোষ না হয়—ম্-মাণিকে না হয় পরিতোষ রাখ্‌বে!"

যে-দুর্ব্বোধ্য অর্থে-ভরা দেখা-যায়-কি না-যায় হাসি এক মেয়েরাই হাস্‌তে পারে, সেই হাসি হেসে, চোখ কপালে টেনে, বাঁ হাতের কড়ে' আঙুল দিয়ে শূন্যে টোকা মেরে অতসী বল্‌লে, "ওঃ! পরিতোষ! রাখ্‌বে! তা'লেই হয়েছে!"

পরিতোষ আর শ্রীহর্ষে চট্ ক'রে চোখের বেতার হ'য়ে গেলো।

পরিতোষ উঠ্‌তে উঠ্‌তে ব'লে গেলো, "চা, হর্ষ? আপত্তি নেই? বৌদি? না? ইস্—কোর্ম্মার যা গন্ধ বেরিয়েছে! অ্যাপিটাইট্, হর্ষ?"

পরিতোষ যে মুহূর্ত্তে ঘর ছেড়ে গেলো, সে মুহূর্ত্তে অতসী সোফা থেকে উঠে পড়্‌লো, এবং সঙ্গে সঙ্গে শ্রীহর্ষ পেছন দিকে হাঁট্‌তে হাঁট্‌তে একেবারে জান্‌লার কাছে গিয়ে শার্সির কাঁচের ওপর মাথা হেলান্ দিয়ে দাঁড়ালো শ্রীহর্ষের চাদরের প্রান্তভাগ স্পর্শ না করে' তা'র যতটা কাছে দাঁড়ানো সম্ভব, অতসী তা'র ততটা কাছে গিয়ে দাঁড়ালো, এবং গলা দিয়ে স্বরস্ফুরণ না করে' যতটা জোরে কথা বলা সম্ভব, ততটা জোরে বলে' উঠ্‌লো, "শীগ্‌গির! কবে দেশে ফির্‌লে?"

কঙ্কাল কথা কইতে পার্‌লে যে স্বরে কথা বল্‌তো, সেই স্বরে শ্রীহর্ষ জবাব দিলে, "জুন্ মাসে।"

"কি কর্‌ছ?"

"আপাতত আল্‌সেমি।"

"এখানে আছ কোথায়?"

আপ্রাণ চেষ্টাসত্ত্বেও শ্রীহর্ষ সত্যি কথা না বলে' পার্‌লে না—"বকুলবাগান।"

"ও, তোমার মামার বাড়িতে ?"

"হ্যাঁ।"

"রেবা—রেবা কি এখন এখানে ?"

"আমি বিলেত যাওয়ার আগেই রেবার বিয়ে হয়। বছর খানেক পর খবর এলো সে ছেলে হ'তে মারা গেছে।"

"সত্যি ?" অতসী প্রায় চেঁচিয়ে উঠেছিলো। তাড়াতাড়ি নিজকে সাম্‌লে নিয়ে বল্‌লে, "তা তুমি—তুমি এখানেই আছ ?"

শ্রীহর্ষ বাইরের দিকে তাকিয়ে যেন নিজের মনে মনেই বল্‌লে, "কোথায় আর যাবো ?"

অতসীর গলা চিরে' বেরিয়ে এলো, "কিন্তু তুমি এখানে এ বাড়িতে আর এসো না—বুঝলে ? আর কক্ষণো এসো না,—আমার এই একটা কথা তুমি রাখো, শ্রী।"

শ্রীহর্ষ মনে মনে ভাব্‌লে, অতসী জীবনে এই দ্বিতীয়বার তা'কে এ কথা বল্‌লে। একবার—ক' বছর আগে ? ক'দিন আগে ?—একবার অতসীর বাবা যখন তা'কে নীরবে বাইরে যাবার দরজা দেখিয়ে দিয়েছিলেন, শ্রীহর্ষ একটু হেসে শুধু বলেছিলো, "কিন্তু আমি তো আপনার কাছে আসি নি !" তারপর অতসী তা'কে—থাক্, থাক্, সে সব কথা সে আর মনে করতে চায় না ;—কিন্তু সে-দিনো অতসী এম্‌নি করে'ই এই কথাই বলেছিলো, "কেন তুমি আমার জন্যে অপমান সইতে যাবে ? তুমি আর এসো না—কক্ষণো এসো না—কক্ষণো এসো না,—আমার এই একটা কথা তুমি রাখো, শ্রী।"

সেই অতসী ! আর কিছু নয়, শ্রীহর্ষ আজ শুধু তা'কে একবার ভালো করে' বুঝিয়ে দিতে চায়, কত বড় ভুল সে করেছে, সে যা হারিয়েছে তা কত মূল্যবান—অথচ একটু ইচ্ছে কর্‌লেই সে-সবই তা'র হ'তে পার্‌তো।

তাই, কণ্ঠস্বরে হঠাৎ অপূর্ব্ব কোমলতা এনে, একটু নত হ'য়ে অতসীর দু'টি চোখ তা'র দৃষ্টি দিয়ে বিঁধে রেখে, সেদিন ও-কথার উত্তরে সে যা বলেছিলো, আজ একটু বদ্‌লে সেই কথাগুলি উচ্চারণ কর্‌লে, "তাই হ'বে, সী। তোমার জন্ম সহস্রবার মর্‌তে পেলেও আমার তৃপ্তি হ'বে না।"—তারপর বেশ ধীরে-ধীরে উল্টো দিকের দেয়ালের কাছে গিয়ে আবার সেই শুক্‌নো স্বরে বল্‌তে লাগ্‌লো, "হ্যাঁ, বুঝলেন—'মোনা লিসা'র কত যে নকল হয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। প্যারিসের ল্যুভ্‌র্‌-এ আসল ছবিখানা আছে—সে-ঘরে আর কোনো ছবি নেই। সে যে কী জিনিস, এই wretched print দেখে তা কল্পনাও করা যায় না। ছবিটার কত দাম নিয়েছে হে পরিতোষ ? একখানা ভ্যান্ ডাইক্ রাখ্‌লেই পার্‌তে ! জানি নে কেন, ফ্লেমিশ্ পেইন্টিং আমার কাছে সব চেয়ে ভালো লাগে। একবার ব্রাসেল্‌স্‌-এ—কিন্তু কদ্দূর ? পরিতোষ ? আর তো থাকা যায় না।"

"রান্না রেডি। কিন্তু চা ? ওটাকে অ্যাপিটাইট্-কিলার বলে' বর্জ্জন করবে না তো ?..."

দরজার কাছে এসে অতসী মিষ্টি হেসে বল্‌লে, "কাল আবার আস্‌ছেন তো, শ্রীহর্ষ বাবু ? আপনার সঙ্গে আলাপ হ'লে পরিতোষের দাদা খুব খুসি হ'বেন ;—বিলেত-টিলেত-সম্বন্ধে তাঁর ভক্তিশ্রদ্ধা এখনো যে কি অসাধারণ, দেখ্‌লে অবাক্ হ'য়ে যাবেন। এমন কি, মাণিককে পাঠাবেন বলে' এখন থেকেই একটা এন্‌ডাউমেণ্ট করেছেন।"

পরিতোষ হতাশভাবে বল্‌লে, "হর্ষ কাল্‌কেই রাঁচি চলে' যাচ্ছে ;—কত করে' বল্‌লাম—"

অতসীর মুখ ভালো করে' ম্লান হ'তে না হ'তেই আবার উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো।—"তাই তো ! কিছুতেই আর থাকতে পারেন না বুঝি ? ফিরে এসে ওঁর যা আপ্‌শোষটাই হ'বে। যাক্—তবু ভাগ্যিস্ আমার সঙ্গে দেখা হ'ল।"

বল্‌তে বল্‌তে অতসী দেহের এমন একটি ভঙ্গী কর্‌লে যে শ্রীহর্ষ কখন যে রাস্তায় বেরিয়ে হারিয়ে গেলো, তা পরিতোষের চোখেই পড়্‌তে পারলো না।

রাস্তার প্রত্যেকটি লাইট্‌পোস্‌ট্ তখন শ্রীহর্ষর কানে চীৎকার করে' বল্‌ছে, "যাও, যাও, পালাও—পালাও এখান থেকে, শীগ্‌গির যাও !" কোথায় যাবে সে ? যেন একশোটা ভূতে তা'কে তাড়া করেছে, এই ভাবে ছুটতে-ছুটতে—হ্যাঁ, ছুটতে-ছুটতেই সে রসা রোডে এসে উপস্থিত

শ্রীবুদ্ধদেব বসু

·'ল। "এই, ট্যাক্সি!" কোথায় যা'বে? নাট্য-মন্দির? চুলোয় যাক্ নাট্য-মন্দির! "যাও—হাঁকাও, জোর্‌সে হাঁকাও!" কোথাও যা'বে না—এম্‌নি ঘুরে' বেড়াবে খানিকক্ষণ, যতক্ষণ তা'র ঘুম পায়

এইমাত্র যা'কে চিতেয় তুলে' দিয়ে, নিজ হাতে কাঠে আগুন ধরিয়ে শুধু এক মুঠো ছাই হাতে করে' নিয়ে এলাম, বাড়ি ফিরে'ই যদি দেখি, সে চেয়ারে বসে' আমার জন্য অপেক্ষা কর্‌ছে—সে বিস্ময়ও বুঝি এর চেয়ে নিদারুণ, এতখানি মর্ম্মান্তিক নয়! তা'র চেয়েও আশ্চর্য্য বোধ হয় এই যে একটা সাধারণ বাঙালী মেয়ে একদিন তা'র মনে যে-শিকড় গেড়েছিলো, এতদিনেও সে সেটাকে উপ্‌ড়ে ফেল্‌তে পার্‌লো না। একদিন দক্ষিণা হাওয়া দিয়েছিলো, ফুল ফুটেছিলো—তারপর চার বছরের অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ! ফুলগুলি তো মরে' গেছে, কিন্তু তা'র গন্ধ এখনো ঘুরে' বেড়ায় কেন?... এই চার বছরে শ্রীহর্ষ সারা পৃথিবী চষে' বেরিয়েছে; পাশ করেছে ছ'টা, কিন্তু প্রেম করেছে প্রায় দু'শো। তারপর দেশে ফেরামাত্র জুটলো ইলা—সে কোনোমতে একটা চাক্‌রি বাগাতে পার্‌লেই তা'কে বিয়ে কর্‌বে, এ-কথা সে তা'কে বেশ পরিষ্কার করে'ই বুঝ্‌তে দিয়েছে। শ্রীহর্ষ তো জান্‌তো, অতসী তা'র মন থেকে একেবারে মুছে' গেছে—শিশুর আঙুলের ঘষায় স্লেটের সকল আঁকিবুঁকি যেমন মুছে' যায়; অতসী মরে' গেছে; এক ফাল্গুনে যে-ফুল ফোটে, আরেক ফাল্গুনে সে আবার দেখা দেয় বটে, কিন্তু যে-মানুষ আজ মরে, কাল তো সে ফিরে' আসে না! সত্যি কথা বল্‌তে কি, এই চার বছর সে অতসীকে বিশেষ স্মরণও করেনি;—অতসীর প্রতি যে-রোষ ও আক্রোশ নিয়ে সে বম্বে থেকে জাহাজে উঠেছিলো, বিলেতে মাসখানেক কাটানোর পর তা'র কোনোটাই বেঁচে ছিলো না; তারপর কিছুদিন রেস্তরাঁয় বসে' অতসীর কথা বলে' জেইন্ বা জুলিয়ার সঙ্গে সে হাসাহাসি কর্‌তো বটে, কিন্তু ক্রমে অতসীকে অতখানি প্রাধান্য দিয়ে ধন্য কর্‌তেও তা'র মন বিমুখ হ'য়ে উঠ্‌লো। তারপর—শ্রীহর্ষ সেই সব দিনগুলিকে তন্ন-তন্ন করে' খুঁজে দেখ্‌লে—তারপর সে বিদেশে যদ্দিন ছিলো, অতসীর কথা কদাচিৎ মনে পড়েছে, আর যা-ও পড়েছে, তা কোনো সুখ, দুঃখ, ক্রোধ, ঘৃণা, ঈর্ষা, লজ্জা, অনুতাপ, বাসনা—কিছুর সঙ্গেই নয়। এম্‌নি।

সেই অতসী! দু'নদীর জল এক গ্রাসে মেশালে যেমন কিছুতেই তা'দের আর আলাদা করে' নে'য়া যায় না, তেম্‌নি তা'দের দু'জনের জীবনের ছাড়াছাড়ি হওয়াও অসম্ভব—এই ধারণা নিয়ে পনেরো থেকে বাইশ বছর পর্য্যন্ত সে কাটিয়েছে। এক সন্ধ্যায় জ্যোৎস্না উঠেছিলো—ছাতে বসে' থাক্‌তে-থাক্‌তে হঠাৎ অতসী তা'র বুকে মুখ লুকিয়ে কাঁদ্‌তে সুরু করে' দিলে। শ্রীহর্ষ ব্যাকুল হ'য়ে বলেছিলো, "ও কি? কি হ'ল?" অতসী তখন মুখ তুলে' কান্নার ভেতর দিয়ে হাস্‌তে-হাস্‌তে জবাব দিয়েছিলো, "কিছু মনে কোরো না,শ্রী; আজ আমার এত ভালো লাগ্‌ছে যে আমি না কেঁদে পার্‌ছি না।"

সেই অতসী! সেই সী! সে তা'কে ডাক্‌বার জন্য তা'র নামের শেষের অক্ষরটি বেছে নিয়েছিলো; সে তা'র কাছে কবিতার সেই চির-রহস্যময়ী "সী"; শত জান্‌লেও তা'র জানা ফুরোয় না, আকাশের মেঘের মত সে ক্ষণে-ক্ষণে রঙ্ বদ্‌লায়, জলের মত সে অবাধ, আলোর মত সে সহজ। সে তা'র চুল বা চোখ বা হাসি বা কাপড়-পরার ভঙ্গী কিছুই নয়, সব মিলে' বা সব বাদ দিয়ে সে এমন একটা-কিছু, মানুষে যা'কে চেনে না এবং কবিরা যা'র একটু আভাষ পায় মাত্র। সেই সী!

কিন্তু শ্রীহর্ষরো শেষে কবিতা লেখ্‌বার মত নৈতিক অবনতি হ'ল নাকি? এতক্ষণ সে গা ছেড়ে দিয়ে শুয়ে ছিলো; এইবার খাড়া হ'য়ে উঠে' বসে' একটা সিগ্রেট্ ধরালে সাত সমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে শেষে কিনা একটা সাধারণ বাঙালী মেয়ের কাছে এসে সে হালে পানি পাচ্ছে না, তা'র নৌকোডুবি হ'তে চলেছে! অসম্ভব! এ সে কিছুতেই হ'তে দেবে না। নিজের ওপর রাগ করে' সে একটা স্কচ্ গান গুন্‌গুন্ কর্‌তে লাগ্‌লো। গানের অংশ-বিশেষ নিয়ে তা'র বিলেতি বন্ধুদের সঙ্গে কত যে হাসাহাসি করেছে, সে কথা মনে ক'রে সে শব্দ করে' হেসে উঠ্‌লো।

ট্যাক্সিটা তখন চৌরঙ্গীর ঠাসা রাস্তা দিয়ে আস্তে-আস্তে যাচ্ছিলো; হঠাৎ ট্রামলাইনের পাশে এক সাহেবী

মূর্ত্তিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে শ্রীহর্ষ ট্যাক্সি থামিয়ে নেমে পড়্‌লো।

"হেল-ও! গু'ড্‌নিং!"

সাহেব আই, সি, এস্ পাশ করে' সবে কালো দেশের মাটিতে পা দিয়েছে, অক্সফোর্ডে শ্রীহর্ষর সঙ্গে পড়তো। একবার শ্রীহর্ষর ঘরে বসে' তা'রা দু'জন এক ভাড়াটে লেইডি-ফ্রেণ্ডকে নিয়ে চা খাচ্ছিলো, এমন সময়—ব্যাপারটা জানাজানি হ'য়ে যায় এবং তাদের প্রত্যেকের দু'গিনি করে' ফাইন্ হয়। সেই থেকে তা'দের দু'জনে খুব ভাব!

এমন সময়ে এ-হেন বন্ধুর দেখা পেয়ে শ্রীহর্ষ যেন দুঃস্বপ্ন থেকে জেগে উঠে' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেল্‌লো। দু'জনেই যদ্দূর খুসি হ'তে হয়! রাস্তা পার হ'য়ে তা'রা ঢুক্‌লো গিয়ে কণ্টিনেণ্টল্ হোটেলে। খেতে-খেতে কথার বর্ষণ, হাসির শিলাবৃষ্টি! সে কত পুরোণো কথা। চার্লি কি কর্‌ছে, ভেঙ্কটরত্নম্ অঙ্কে কি ভীষণ নম্বর পেয়েছিলো, নিরামিষভোজী সুন্দর সিংকে একদিন ওরা ফাঁকি দিয়ে মাংস খাইয়ে দিয়েছিলো—তারপর টের পেয়ে লোকটা কেমন ক্ষেপে গিয়েছিলো, পামেলার বিয়ে হ'ল কিনা—ঈজিপ্টলজির ছাত্র ঐ হাঁদারামটার সঙ্গেই তো! —মার্গারেট্ কেনেডি আর কোনো বই লিখ্‌লে কিনা. কার্লো প্যারিসে গিয়ে সত্যি ছবি আঁকা শিখ্‌ছে তো! রোজামণ্ড্ লেহ্মান্-এর সঙ্গে আর দেখা হয়েছিলো? কে? রোজামণ্ড্— ? ও, সেই নভেলিস্ট! হ্যাঁ—তা'র শরীর ভালো না, এখন ব্রিস্‌টলে আছে, বুড়ো বাপকেও নিয়ে গেছে সঙ্গে—খাসা মেয়ে! খাসা চেহারা! সেই দাড়িওলা জাঁদ্রেল চেহারার রুশ ভদ্রলোক সেই যে মির্‌টাঙ্কাপাখিওভিক্কি না কি কাঁচকলার নাম—ভদ্রলোক ওকে দেখেই ক্ষেপে গেলেন—এম্‌নি লাখ কথা!

কিন্তু লাখ কথার এক কথাটা শ্রীহর্ষ বল্‌লে বাইরে এসে: "জানো, এইমাত্র আমার বয়্‌হুড্ সুইট্‌হার্ট্-এর সঙ্গে দেখা হয়েছিলো।"

"কা'কে বিয়ে করেছে? বুড়ো বড়লোক, না গরীব আর্টিস্‌ট্?"

"গরীব, কিন্তু আর্টিস্‌ট্ নয়।"

"তারপর? তোমার অবস্থাটা কি? সেই যে কি একটা পদ্য আছে—মনে নেই?—

'When the swift-spoken *when?* and the slowly-breathed *hush!*

Make us half-love the maiden and half-hate the lover,'

না কী?—তেমনি কি? কা'র লেখা হে ওটা? হ্যাঙ্গিট্! নাম টামগুলো আমার কোনো কালেও যদি মনে থাকতো!"—বল্‌তে-বল্‌তে সাহেব গলা ছেড়ে গেয়ে উঠ্‌লো, "My Rosemarie, I love you!"

ড্রেসিং টেবিলের ধারে ছোট চেয়ারটির গায়ে চাদর আর পাঞ্জাবি ছুঁড়ে' ফেলে শ্রীহর্ষ দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ছাড়্‌লে—"উহ্‌হ্!"

বাঁচলে। এক দমকে চার ঘণ্টা কলম পিষে' পরীক্ষার হল্ থেকে বেরিয়েও এত ক্লান্ত সে হয় নি। সারাটা দিন আকাশে সাঁতার কেটে ছোট পাখীটি যে-ক্লান্তি নিয়ে সন্ধ্যের সময় তা'র নীড়ে ফিরে' আসে, শ্রীহর্ষর দুই চোখে সেই ক্লান্তি ঘুম হ'য়ে ঢুল্‌ছে। শাদা, নিভাঁজ, মখ্‌মলের মত কোমল তা'র বিছ্‌নার দিকে তাকিয়ে সে গভীর আরামে একটা হাই তুল্‌লে। আর—এইবার শোয়া যাক্।

ড্রেসিং আয়নার দিকে তাকিয়ে সে হঠাৎ চম্‌কে উঠ্‌লো। আয়নার ভেতর থেকে ইলা তীক্ষ্ণ-উজ্জ্বল দুই চোখ মেলে তা'র পানে তাকিয়ে আছে, তা'র ঠোঁটের এক কোণ ঈষৎ বাঁকা। বিলেত-ফের্‌ত ডক্টরের বুকটাও একবার ধ্বপ্ করে' উঠ্‌লো। ও, ইলার সেই ফোটোগ্রাফ্! শ্রীহর্ষ সেটা শিয়রের কাছে রেখে শোয়, কিন্তু কে যেন ভুলে' সেটা আয়নার দিকে মুখ ঘুরিয়ে রেখেছে। কি কাণ্ড! আর একটু হ'লেই সে ভয় পেয়ে গেছ্‌লো আর কি!

ছবিটি সরিয়ে এনে সে ভালো করে' দেখ্‌তে লাগ্‌লো। হ্যাঁ, সুন্দর বটে! অতসীর চেয়ে—কথাটা সে যেন নিজের

শ্রীবুদ্ধদেব বসু

অজানিতেই ভেবে ফেল্‌লো—অতসীর চেয়ে অন্তত দশগুণ সুন্দর! এই মেয়ে তা'কে বিয়ে কর্‌তে পার্‌লে বেঁচে যায়, এ-কথা ভাব্‌তে আত্মপ্রশংসায় সে নিজের মনে একটু হাস্‌লে। অতসীকে এই ছবিখানা দেখালে কেমন হয়;—তা-ই বা কেন?—আসলটিই কি দেখানো যায় না? অতসী কী মনে কর্‌বে? মুহূর্ত্তের জন্য একটা অনির্দ্দিষ্ট ব্যাকুলতা কি তা'কে ম্লান করে' দেবে না? একটুখানি ক্ষোভ, দুঃখ বা ঈর্ষা—কিছুই কি হ'তে নেই? আচ্ছা পরখ্‌ করে'ই দেখা যাক্ না। এক মাসের মধ্যেই ইলাকে সে বিয়ে করবে—এই কল্‌কাতায়। সে-বিয়েতে অতসীর নেমন্তন্ন হ'বে—স্বামীপুত্রসমভিব্যাহারে সে আস্‌বে—ঝল্‌সানো চোখ আর নিঙ্‌ড়ানো হৃদয় নিয়ে ফিরে' যাবে।

দূর হোক্ অতসী! ইলা—ইলা! সে প্রায় চেঁচিয়ে ডেকে উঠেছিলো! ছবিটি হাতে তুলে' সে একবার চুম্বন কর্‌লো। ছবির ঠাণ্ডা ঠোঁট তা'র এ আদরে একটুও সাড়া দিলে না। তা'র কেমন যেন ভয়-ভয় কর্‌তে লাগ্‌লো। ইলার ঠোঁটও এম্‌নি ঠাণ্ডা, নিরুত্তর হ'য়ে গেলো না তো? না, না—আর দেরি নয়! সে আজই রাঁচি যা'বে;—এক্ষুণি! ইলার সুস্নিগ্ধ চিঠির কথা স্মরণ করে' সমস্ত হৃদয় তা'র গান গেয়ে উঠ্‌লো

সাড়ে-দশটা! রাঁচি এক্‌স্‌প্রেস্ ছেড়ে গেছে। কম্পিত হস্তে সে সেদিনকার "স্‌টেট্‌স্‌ম্যান্"-এর পাতা উল্টাতে লাগ্‌লো। হাঁ—এই যে, একখানা স্পেশল্ দিয়েছে—এগারোটা বাইশ মিনিটে হাওড়া ছাড়্‌বে, কাল বেলা দশটা-নাগাদ পুরুলিয়া—দুপুরবেলা স্নানাহারের পর ঝাউয়ের ছায়ায় দু'খানা রকিং চেয়ার টেনে নিয়ে সে আর ইলা—!

তিন মিনিটের মধ্যে সে জিনিসপত্তর গুছিয়ে ফেল্‌লো। বিছ্‌না? থাক্‌গে—অত হাঙ্গাম কর্‌বার সময় নেই। তারপর এইমাত্র পরিত্যক্ত পাঞ্জাবি পরে', চাদরটা কোনো-মতে গায় জড়িয়ে আয়নার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে সে চুলটা একটু আঁচ্‌ড়ে' নিতে লাগ্‌লো। ড্রেসিং আয়নায় নিজেকে আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ ক'রে সে বেশ খুসিই হ'ল। লোকে বলে, সে নাকি দেখ্‌তে খুব সুন্দর! হাঁ, তা-ই বটে। ছোট চেয়ারটিতে বসে' পড়ে' সে নিজের মুখ ভালো করে' দেখ্‌তে লাগ্‌লো। চওড়া কপাল—তা'তে ছোট-ছোট নীল শিরাগুলো একটু-একটু দেখা যায়, চুল আসলে কালো, কিন্তু এখন একটু হাল্কা বাদামীর আমেজ লেগেছে, চোখ দু'টো খাঁটি বাঙালী—অর্থাৎ মিশ্‌মিশে কালো, নাকটা গ্রীক্, ওপরের ঠোঁট নীচেটার চাইতে একটু পুরু হওয়াতে মুখে কেমন একটা লুব্ধতার ছাপ পড়েছে—কীট্‌স্-এরও নাকি ঐ রকম ছিলো—থুত্‌নিটা ঈষৎ সংক্ষিপ্ত হওয়ায় হঠাৎ দেখ্‌লে লোকটাকে দৃঢ়চিত্ত বলে' ভুল হয়; রঙ্‌ চিরকালই ফর্সা, তবে বিদেশ ঘুরে' এসে আরো হয়েছে। ইয়োরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন জায়গায় নানা লোকে তা'কে জিজ্ঞেস্ করেছে, "তুমি কোন্ জাতি?" এ-প্রশ্নের তা'র এক বাঁধা জবাব ছিলো, "Guess"। কেউ বলেছে ইতালিয়ান্, কেউ স্প্যানিশ্, কেউ বা জু, বেশির ভাগই বলেছে ফ্রেঞ্চ্, একজন বলেছিল পোল্, এমন কি অনেকে তা'কে ইংরেজ বা আইরিশ্‌ও ভেবেছিলো—কিন্তু বাঙালী বলে' কেউ মনে করে নি। এবং সে যখন তা'র পরিচয় ব্যক্ত কর্‌তো, তখন সবারই চোখে সে যে-বিস্ময় ফুটে' উঠ্‌তে দেখেছে, তা'র মানে এই: "সত্যি? বাঙালীর এমন চেহারা হয়?"...নিজের প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে সে গর্ব্বিতভাবে হাস্‌লে।

আচ্ছা, অতসীর কি কপালের নীচে দু'টো চোখ ছিল না? আজ্‌কে—এখন, এই মুহূর্ত্তে একা বিছ্‌নায়—না, না, একা তো নয়! স্বামীপুত্র নিয়ে বিছ্‌নায় শুয়ে'-শুয়ে' কি ওর মনে একটুখানি অনুতাপও হচ্ছে না? সব মিলে' শ্রীহর্ষ কি যথেষ্ট লোভনীয় নয়? কিন্তু অতসী তো ইহজীবনে আর ছাড়া পাবে না! অতসীর কাছে সে এখন আকাশের চাঁদের মতই সুস্পষ্ট অথচ দুষ্প্রাপ্য। রবীন্দ্রনাথের কবিতার সেই ক্ষ্যাপার মত সে যতই না কেন তা'র পানে হাত বাড়িয়ে কাঁদুক্, কখনো নাগাল পা'বে না। বাঃ, কী মজা!

আচ্ছা, এক কাজ কর্‌লে কেমন হয়? অতসীকে কি খুব স্পষ্ট করে' জানিয়ে দে'য়া যায় না যে, সে যা হাতের মুঠোয় নিয়ে তারপর পায়ের তলায় ফেলে দিয়েছে, তা তা'র বুকের মণি হ'লেই মানাতো, কিম্বা তা-ও মানাতো না! কীর্ত্তিতে প্রশংসায় গৌরবে সম্মানে আনন্দে উজ্জ্বল

তা'র জীবনের সবগুলো রশ্মি একত্র করে' সেই মায়াময় দীপ্তি সে অতসীর মুখের ওপর ছুঁড়ে' মারবে; অতসী চম্‌কে উঠ্‌বে, ব্যথায় তা'র বুকের কলকজাগুলি মোচড় দিয়ে উঠ্‌বে; যা সে হারিয়েছে, অথচ যা তা'র হ'তে পার্‌তো, তা'রি জন্যে প্রবল ব্যাকুলতায় সারা মন তা'র ফেটে পড়্‌বে। সে ভারি মজা হয়, না?

এ কি? এগারোটা-বারো? হোক্‌গে—আজ সে যাচ্ছে না। আজ তো নয়ই, শীগ্‌গিরও না। ইলাকে লিখে' দেবে তা'র অসুখ করেছে—আর পরিতোষ, পরিতোষকে যা-তা একটা-কিছু বলে' দিলেই চল্‌বে। গুছোনো স্যুটকেস্‌টির দিকে একবার তাকিয়ে সে আলো নিবিয়ে দিলে।

জাগরণ ও নিদ্রার মাঝামাঝি যে-একটা ক্ষণস্থায়ী অবস্থা আছে, সেইটুকু সময়ে তা'র মাথায় খেলে গেলো,... "half-love the maiden and half-hate the lover!"

পরদিন সকালে—শ্রীহর্ষর তখন ঘুম ভেঙেছে, কিন্তু তখনো সে বিছ্‌না ছেড়ে ওঠেনি—পরিতোষ নিজেই এসে হাজির। তা'কে দেখেই শ্রীহর্ষর আশা হ'ল যে সে তা'কে আবার কল্‌কাতায় আরো কিছুদিন থেকে যাবার জন্য অনুরোধ কর্‌তে এসেছে;—তা হ'লে শ্রীহর্ষর পক্ষে সবি সহজ হ'য়ে আসে! বানিয়ে কথা-বলার ব্যাপারে সে চিরকালই কেমন একটু কাঁচা।

কিন্তু পরিতোষ প্রথম যে-কথা শুধোলে, তা হচ্ছে এই, "কাল্‌কে 'ষোড়শী' কেমন লাগ্‌লো?"

অসম্ভব নয়—শ্রীহর্ষর মনে হ'ল—অতসী হয়তো পরে পরিতোষকে নিয়ে নাট্য-মন্দিরে গিয়েছিলো, এবং তা'কে দেখ্‌তে পায় নি। তাই একটু ভয়ে-ভয়ে সে বল্‌লে, "মিড্‌লিং। কিন্তু লোকে বল্‌লে, শিশির বাবুর অভিনয় নাকি খুব কম রাত্তিরেই এমন perfect হয়েছে। গেলেই পার্‌তে।"

"কোথায় আর যাওয়া হ'ল ভাই! তুমি চলে' যাওয়ার পর বৌদির শুধু পায়ে ধর্‌তে বাকি রেখেছি—অথচ উনি কেন যে কিছুতেই রাজি হ'লেন না ভগবানই জানেন। তারপর আমার আর একা-একা যেতে ইচ্ছে কর্‌লো না।"

"তা কর্‌বে তো না-ই। থিয়েটার-ফিয়েটার দেখ্‌তে গেলে একজন সঙ্গী নইলে ভাল লাগে না। আমি একা ছিলুম বলে'ই বোধ হয় ততটা ভালো লাগেনি। কিন্তু শিশির বাবু—হ্যাঁ, আশ্চর্য্য বটে, মানে বাঙ্‌লা দেশের পক্ষে। বিলেত যাওয়ার আগে আমি একদিন মাত্র বাঙ্‌লা থিয়েটার দেখেছিলুম—কিন্তু যাই বল, শিশির-বাবুর দৌলতে বাঙ্‌লা থিয়েটার এক ধাপে পঞ্চাশ বছর এগিয়ে গেছে..." শ্রীহর্ষর মুখে খই ফুটতে লাগ্‌লো। পরিতোষ কিছুতেই অন্য কোনো কথা পাড়্‌বার ফুর্‌সৎ পাচ্ছিলো না, এমন সময় চাকর এসে জিজ্ঞেস্ কর্‌লে যে, এখন চা আন্‌তে হ'বে কি না।

লুনাচার্‌স্কি'র কীর্ত্তি-কাহিনীর মাঝখানে হঠাৎ থেমে গিয়ে শ্রীহর্ষ জবাব দিলে, "হ্যাঁ, নিয়ে এসো। দু'জনের মত। না হে, উঠ্‌তে হয়।"

পরিতোষ ড্রেসিং টেবিলের ধাপের ছোট চেয়ারটিতে বসে' ছিলো; সেই সময় মেঝের ওপর দৈবাৎ চোখ পড়্‌তেই সে বলে' উঠ্‌লো, "এ কি?" তারপর নীচু হ'য়ে ইলার ফোটোগ্রাফ্‌টি তুলে' চোখ মিট্‌মিট্ করে' বল্‌লে, "এত অনাদর যে?"

শ্রীহর্ষ ফোটোটি নিজের হাতে নিয়ে গলাটা হঠাৎ ছুঁচ্‌লো করে' বল্‌লে, "ও ডিয়ার্, ডিয়ার্!" কি করে' পড়্‌লো হে? আমি তো শোবার আগেও একবার দেখে রেখেছিলাম!"

"লক্ষণ বিশেষ ভালো নয় হে। ইলাকে লিখে দাও —না, লিখে আর দেবে কি?—আজ তো যাচ্ছই। দেখা হ'লে বোলো—"

শ্রীহর্ষ ভাব্‌লে, এ সুযোগ হারানো উচিত নয়। চুলগুলির ভেতর হাত চালাতে-চালাতে সে অলসভাবে বল্‌লে, "না হে, আজ যাওয়া হয় কি না সন্দেহ।"

"কেন?" পরিতোষ সত্যিই অবাক হ'ল।

শ্রীবুদ্ধদেব বসু

ভাব্‌বার জন্য একটু সময় পাবে ব'লে শ্রীহর্ষ বিছ্‌না থেকে উঠে পড়্‌লো, তারপর চটিজোড়া খুঁজে বা'র করতে যতো সম্ভব দেরি করে, জান্‌লার কাছে গিয়ে খামকা একবার থুতু ফেলে বল্‌লে, বোলো না ভাই বিপদের কথা।" ব'লেই থেমে গেলো।

পরিতোষ উৎকণ্ঠিত কণ্ঠে শুধোলে, "কি ?"

এতক্ষণে শ্রীহর্ষর মনে গল্পটা আগাগোড়া তৈরী হ'য়ে গিয়েছিলো ; সে তাড়াতাড়ি বল্‌তে লাগ্‌লো. "কাল হঠাৎ মিঃ কাউলিঙ্‌য়ের সঙ্গে দেখা। নাট্যমন্দিরের পথে একবার স্যাঙ্গু ভ্যালিতে গেছ্‌লাম সিগ্রেট্‌ কিন্‌তে—ফুট্‌পাথ্‌-এ নাব্‌তেই দেখা। ছিলো লীড্‌স্‌ ইউনিভারসিটিতে একটা লেক্‌চারার, এখন নাকি রেঙ্গুন্‌-এ প্রফেস্সর্‌ হয়েছে —মাইনে টান্‌ছে লম্বা। বল্‌লে, ওখানে একটা চাক্‌রি খালি হয়েছে, আমি যদি---ইত্যাদি। কাউলিঙ্‌ এখানে কিছুদিন থাক্‌বে, ওকে পটাতে পার্‌লে চাক্‌রিটা বাগানো যায় বোধ হয়। ছ'শোতে স্টার্ট্‌—লোভ হচ্ছে যে! তাই ভাব্‌ছিলুম—" কি ব'লে যে শ্রীহর্ষ কথাটা শেষ করলে, ভালো ক'রে বোঝা গেলো না।

পরিতোষ কিন্তু খুসি হ'তে একটুও দ্বিধা করলে না। পরম উৎসাহে বলে' উঠ্‌লো, "বাঃ, ওয়ান্ডার্ফুল! যাই বলো, কপাল বটে তোমার! মাসে ছ'শো, পাশে ইলা—বাঃ, এই পৃথিবীটা 'is paradise anow' ! আর কি চাই!"—

শ্রীহর্ষ পরিতোষের উৎসাহে বাধা দিয়ে বল্‌লে, "এই যে, চা।" তারপর চা-য়ে এক চুমুক দিয়ে এক টুক্‌রো রুটি আঙুল দিয়ে নাড়্‌তে-নাড়্‌তে গম্ভীর ভাবে বল্‌লে, "Seriously, এটার জন্য চেষ্টা কর্‌বো, ভাব্‌ছি। একটা-কিছু না করলে চল্‌বে না যখন। তাই আজ বোধ হয় আমার যাওয়া হ'ল না।

শ্রীহর্ষ যেন সত্যি-সত্যি চলে' যায়, আর যেন কখনো না আসে—সে-রাত্রে সে যতক্ষণ জেগে ছিলো, এবং ঘুমোবার পরও স্বপ্নের মধ্যে—অতসী এই প্রার্থনা করেছে। নিজের কাছে সে বার বার বল্‌ছিলো যে, শ্রীহর্ষকে সে ঘৃণা করে—কিম্বা তা-ও করে না,—মোট কথা, তা'র বর্ত্তমান জীবনের সুনির্দ্দিষ্ট আয়োজনে শ্রীহর্ষর আদৌ কোনো প্রয়োজন নেই। পূর্ণিমার আকাশে একটা মস্ত কালো পাখী ডানা ঝাপ্‌টে উড়ে' গেলে নীচে নদীর বুকে মুহূর্ত্তের জন্য যে-ছায়াখানি টল্‌মল্‌ করে' ওঠে, এ-দেখা, মুমূর্ষু গোধূলির সুবর্ণ-লগ্নে এই চকিতের দৃষ্টি-বিনিময়, যেন তা'র চেয়েও ক্ষণিক, তা'র চেয়েও অবাস্তব হয়। এ-জীবনটা যেন একটা প্রকাণ্ড গোলকধাঁধা ;—লক্ষ-লক্ষ পথ এঁকে-এঁকে, বার-বার পরস্পরকে অতিক্রম করে' চলে' গেছে,--আমরা সারা-জীবন অন্ধের মত ঘুরে-ঘুরে হেঁটে চলেছি—বেরুবার পথ এক মৃত্যুই জানে। আজ হঠাৎ শ্রীহর্ষর পথ অতসীর পথের ওপর এসে পড়েছে ;—কিন্তু—অতসী প্রার্থনা করে—তা'র পথের পরের বাঁকই যেন তা'কে অন্য দিকে নিয়ে যায়। এ-ফাঁড়া কাট্‌লে হয়তো চিরজন্মের মত সে বেঁচে যাবে।

কিন্তু পরের সন্ধ্যায় আবার শ্রীহর্ষকে দেখে সে যতটা প্রকাশ করেছিলো, আসলেও ততটা বিস্ময় অনুভব করেছিলো কি ? অতসীই জানে। তা'র না-যাওয়ার যে-সব অনিবার্য্য কারণ শ্রীহর্ষ বিড়্‌বিড়্‌ করে' উচ্চারণ করলে, সে-গুলো যেন সে গায়েই মাখ্‌লো না। শেষ পর্য্যন্ত না দেখে কিছুই বলা যায় না—এই ধরণের একটা অনিশ্চিত সন্দেহের উদ্বেগ কি তা'র মনে আগাগোড়াই ছিলো ? গতরাত্রে যখন সে সর্ব্বান্তঃকরণে শ্রীহর্ষর বিদায়-কামনা কর্‌ছিলো, তখন সেই প্রার্থনার অন্তরালে আর একটি ক্ষীণ ঈষৎ-স্ফুট প্রার্থনা প্রচ্ছন্ন হ'য়ে ছিলো—তা কিসের জন্য ? অতসী নিজেই ভেবে পেলো না।

বছর-দু'য়েকের একটি নিকার-পরা ছেলেকে কোলে করে' যে-ভদ্রলোকটি ঘরে এলেন, পরিচয় না থাক্‌লেও শ্রীহর্ষর তাঁকে চিন্‌তে ভুল হয় নি। প্রত্যেক মানুষের মুখেই কিছুকাল পরে তা'র পেশার একটা বিশিষ্ট ছাপ পড়ে' যায় ; কিন্তু ইস্কুলমাষ্টারিতে সে-ছাপ যত শীগ্‌গির ও যত দৃঢ়ভাবে পড়ে, তেমন আর-কিছুতেই নয়। ভদ্রলোকের মুখে ইস্কুলমাষ্টারির সবগুলি লক্ষণ করতলে অজস্র রেখার মত

সুস্পষ্ট বর্ত্তমান। অকালেই যেন বুড়িয়ে গেছেন, কপালের নীচেকার চাম্‌ড়ায় এখুনি চির্ ধরেছে, চশ্‌মার পেছনের চোখ দু'টি মাছের চোখের মতই বড় ও পরিষ্কার, কিন্তু তেম্‌নি নিষ্প্রাণ। শ্রীহর্ষ গতরাত্রে আয়নায়-দেখা একটি প্রাণরসোচ্ছল মুখশ্রীর কথা না ভেবে পার্‌লে না; নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বে তা'র ঠোঁটে হাল্‌কা একটি হাসি উঠে' এলো।

মাণিককে সতরঞ্চির ওপর নামিয়ে রেখে সুরথ একটু ভয়ে-ভয়ে শ্রীহর্ষর দিকে এগিয়ে এসে নিতান্ত মামুলিভাবে আলাপ আরম্ভ কর্‌লে, "আপনার সঙ্গে আলাপ কর্‌বার সৌভাগ্য হ'বে, আশা করিনি, ডক্টর্ সরকার। কাল ফিরে এসে পরিতোষের মুখে যখন শুন্‌লাম—এত খারাপ লাগ্‌ছিলো। যাক্, আপনি এখান থেকে শীগ্‌গির যাচ্ছেন না যখন—"

"কিছুই ঠিক নেই আমার। যদি ডাক পড়ে, তা'লে দিন-সাতেকের মধ্যে রেঙ্গুনের জাহাজেও চাপ্‌তে হ'তে পারে। ওদের নাকি আবার পুজোর ছুটি-ফুটি না থাক্‌বার মধ্যেই। আর, এটা ফস্‌কালে কবে যে আবার একটা জুটবে, কেউ বল্‌তে পারে না।"

"আপনাদের আবার ভাব্‌না কি, ডক্টর সরকার! আপনারা হ'লেন গিয়ে দেশের গৌরব, যে-কোনো কলেজ আপনাকে পেলে ধন্য হ'য়ে যা'বে।"

লজ্জিত হ'লে মানুষ যা-যা করে শ্রীহর্ষ সব জান্‌তো, সে ভেবে-ভেবে তা-ই কর্‌লে। প্রথমে মাথা নীচু কর্‌লে, তারপর চুলে একবার হাত বুলিয়ে আম্‌তা-আম্‌তা করে' জবাব দিলে, "না, না, ও-সব গৌরব-টৌরব কিছু কাজের কথা নয়। দয়া করে' কেউ একটা নক্‌রি দেয় তো তরে' যাই।"

পরিতোষ ফস্ করে' বলে' ফেল্‌লো, "কেন রে বাপু, তোমার এমন কি দায় ঠেকেছে যে চাকুরির জন্য মাথা খুঁড়ে' মর্‌তে হ'বে? আমি যদি তুমি হ'তুম, তা'লে কি কর্‌তুম জানো?—অর্থাৎ কিছুই না। কিছু-না-করার বিদ্যেটা কিছুতেই তোমার আয়ত্ত হ'ল না;—ছট্‌ফটানি তোমার একটা ব্যাধি।"

"এ-ব্যাধি ও-দেশে সব লোকেরই আছে কিনা—আমারো বোধ হয় ছোঁয়াচ লেগেছে। সত্যি, হাতে কোনো কাজ-কর্ম্ম না থাক্‌লে প্রতিটি দণ্ড আমার কাছে যেন বিষম দণ্ড মনে হয়। আপনিই বলুন সুরথ বাবু, না খাট্‌লে কি আর দিন কাটে?"

"আপনি এ-কথা বল্‌তে পারেন, ডক্টর সরকার"—সুরথ একবার কাশ্‌লে—"কিন্তু আমরা—যা'রা খালি খেটে-খেটে জীবনটা ক্ষয় কর্‌ছি, তা'দের পক্ষে একটু আরাম বা বিশ্রাম এম্‌নি দুর্লভ যে ক্রমে কাজ বল্‌তেই আমাদের গায়ে যেন কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসে।"

"অথচ সেই কাজই তো করে' যেতে হচ্ছে! নিষ্কৃতি যখন নেই-ই তখন প্রতিদিন নিজের সঙ্গে কলহ না করে' ভালোয়-ভালোয় একটা আপোষ করে' ফেলাই কি শ্রেয় নয়? দেখুন, ওদের সঙ্গে আমাদের গোড়াতেই তফাৎ। অর্থাৎ মনের দিক থেকে—বাইরের বিত্ত বা রিক্ততার কথা ছেড়ে দিলেও। কাজ জিনিষটা আমাদের কাছে হচ্ছে একটা সাজা, আর ওদের কাছে মজা। জীবনকে আমরা একটা অসুখ বলে' ভাব্‌তে শিখি, আর ওদের মতে বেঁচে থাকাটাই হচ্ছে সুখ। না কর্‌লেই নয় বলে' আমরা কাজ করি, তাই কাজে মন বসে না—এবং সেই কাজের চাপে মন আমাদের মরে' যায়।"

শ্রীহর্ষ বোধ হয় বাড়ি থেকে প্রতিজ্ঞা করে' বেরিয়েছিলো যে, আজ সে তাক্ লাগাবে। লাগালেও। সুরথ তা'র বাক্‌চালনায় অবাক হ'য়ে হাঁ করে' তাকিয়ে আছে, পরিতোষ তা'র সমস্ত চোখ মুখ দিয়ে শ্রীহর্ষর কথায় সায় দিচ্ছে। শ্রীহর্ষ একবার অতসীর দিকে তাকালে—সে তা'দের দিকে পেছন ফিরিয়ে বসে' মাণিককে হাঁটুর ওপর বসিয়ে তা'র সঙ্গে গল্প কর্‌ছে।

মুহূর্ত্তের জন্য শ্রীহর্ষ এই একটুখানি দমে' যাচ্ছিলো, কিন্তু সুরথের প্রবল কৌতূহল ও প্রকাণ্ড প্রশংসা ঠেল্‌তে না পেরে সে আবার আলাপে জমে' গেলো। অতসী খানিকক্ষণ সেই ভাবে চুপ করে' বসে' রইলো, তারপর এক সময় উঠে' মাণিককে নিয়ে ওপরে চলে' গেলো।

শ্রীবুদ্ধদেব বসু

খাবার সময় পরিতোষের জিজ্ঞাসু দৃষ্টির উত্তরে জানিয়ে গেলো যে, মাণিকের দুধ খাবার সময় হয়েছে।

তিন ঘণ্টা পরে অতসী একা বাইরের ঘরে বসে' ছিলো। একটু আগে আড্ডা ভেঙেছে—স্বামীর প্রতি পদক্ষেপের সঙ্গে যেন শ্রীহর্ষর প্রশংসা উথ্‌লে পড়্‌ছে, পরিতোষেরো খুসি আর ধরে না—তা'রি বন্ধু কিনা! শ্রীহর্ষ অতসীরই শুধু কেউ নয়—কিছু নয়। অতসীর চেঁচিয়ে হেসে উঠ্‌তে ইচ্ছে কর্‌লো।

ইস্—ঘরটা কী নোঙ্‌রা হয়েছে! সিগ্রেটের টুক্‌রো আর ছাইয়ে সারা ঘর একাকার! এখনো তেম্‌নি বুড়ো আঙুলে টোকা দিয়ে ছাই ঝাড়ে! সে একটা টুক্‌রো হাতে তুলে' দেখ্‌লে;—সেই স্‌টেট্‌ এক্‌স্‌প্রেস্‌! আর—কাল থেকে একটা অ্যাস্‌-ট্রে-ফ্রে কিছু রাখ্‌তে হ'বে। চাকরটাকে ডেকে এক্ষুণি ঝাঁট দে'য়াতে হয়—থাক্‌ গে, সে নিজেই দেবে'খন। কাল্‌কের ফুলগুলো একেবারে শুকিয়ে গেছে, বদ্‌লে ফেল্‌তে হয়! ফুল্‌দানি থেকে সেই রজনীগন্ধার গুচ্ছ তুলে নিয়ে ফেল্‌বার জন্য বাইরের দরজার কাছে যেতেই ফুলগুলো আপনা হ'তেই তার হাত থেকে খসে' পড়ে' গেলো।

"এ কী? আবার এসেছো কেন?"

শ্রীহর্ষ পাথরের মত মুখ করে' বল্‌লে, "সিগ্রেট-কেস্‌টা ফেলেই যাচ্ছিলাম।"

মানুষের সর্ব্বনাশ যখন হয়, একটা মুহূর্ত্তেই হয়। সেই মুহূর্ত্ত অতসীর জীবনে এসেছে। একটা মুহূর্ত্তের জন্য তার মনের শাসন আল্‌গা হ'য়ে গেলো; কেন, কেউ বল্‌তে পারে না—সেই মুহূর্ত্তে, সে কে এবং কোথায়, সবি যেন সে একেবারে ভুলে' গেলো। সেই পুরোনো হাসি হেসে সেই পুরোনো কণ্ঠস্বরে বল্‌লে, "সত্যি?"

প্রকাণ্ড একটা বাড়ির তলাকার মাটি পদ্মার ধারালো জল যেমন চুপে চুপে খেয়ে যায়, তারপর একদিন হঠাৎ একটা ঢেউয়ের ঝাপটেই সারাটা বাড়ি গুঁড়িয়ে চুরমার হ'য়ে যায়, তেম্‌নি অতসীর মুখে এই একটি কথা শুনে' শ্রীহর্ষের সুদৃঢ় আত্ম-আস্থা ও প্রগাঢ় আত্মস্থতা ফেটে ভেঙে চৌচির হ'য়ে গেলো। মুহূর্ত্তপূর্ব্বে যে-মুখ ছিলো জগন্নাথের মূর্ত্তির মতই দারুময়, সেখানে প্রাণরঞ্জিত মাংসের সজীব আভা ফুটে' উঠ্‌লো, চঞ্চল রক্তের চলাফেরায় সে-মুখ গরম হ'য়ে উঠেছে। শ্রীহর্ষের কণ্ঠে আর সেই শান-বাঁধানো পালিশ-করা স্বর নেই; ছোট্ট একটু "হ্যাঁ" বল্‌তে গিয়েই তা এস্রাজের আওয়াজের মত কেঁপে উঠ্‌লো।

যেন ঘুমের ঘোরে অতসী কথা কয়ে' উঠ্‌লে, "ভালোই হ'ল। তবু তোমাকে দেখ্‌লাম। কিন্তু ছি-ছি—তুমি এ কী ছেলেমানুষি আরম্ভ করেছো বলো তো?"

শ্রীহর্ষের ঘন-ঘন নিঃশ্বাস পড়তে লেগেছে। চুপ করে' সে দাঁড়িয়ে রইলো।

"আজ্‌কে সন্ধ্যায় তোমার নিজের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ কর্‌বার জন্যে কী কাণ্ডটাই কর্‌লে! চেঁচিয়ে, হাত পা ছুঁড়ে, মাপা-জোকা মুখভঙ্গী করে' নিজেকে বেশ সঙ্‌ সাজিয়েছিলে যা-হোক! তোমার সব কস্‌রৎ দেখে আমার এত হাসি পাচ্ছিলো! কিন্তু কেন বলো তো? কা'কে জয় কর্‌বার জন্যে?"

শ্রীহর্ষ নিরুত্তর।

"দ্যাখো শ্রী, বাইরের জাঁক-জমক ঠাট্‌-ঠমকের তখনই সব চেয়ে প্রয়োজন বেশি, আসল জিনিসটির যখন মরণ-দশা ঘটে। সজ্জার আতিশয্যমাত্রই হৃদয়ের দারিদ্র্যের পরিচয়। নিজকে পদে-পদে জাহির করে' চল্‌বার তোমার তো কোনো দর্‌কার নেই! কিন্তু আমি কা'কে কি বোঝাচ্ছি? কপাল আর কা'কে বলে!" অতসী রুদ্ধশ্বাসে থেমে গেলো।

খানিকক্ষণ দুজনেই চুপ্‌চাপ্‌। রাস্তা দিয়ে খট্‌খট্‌ আওয়াজ কর্‌তে-কর্‌তে একখানা ট্যাক্‌সি ছুটে গেলো, আকাশ থেকে একটা তারা হঠাৎ ছুটে' পড়্‌লো, একটা আকস্মিক দম্‌কা হাওয়ায় সাম্‌নের একটুখানি অন্ধকার যেন শির্‌শির্‌ ক'রে কেঁপে উঠ্‌লো। তারপর শ্রীহর্ষ ডাক্‌লে, "সী।"

"কি, শ্রী?"

তারপর আবার দু'জনে চুপ ক'রে পরস্পরের নিঃশ্বাস-টানার শব্দ শুন্‌তে লাগ্‌লো। দু'জনে মুখোমুখী দাঁড়িয়ে, কিন্তু আব্‌ছা আলোয় কেউ কারো মুখ ভালো ক'রে দেখ্‌তে

পাচ্ছে না। অথচ, একজন একটু হাত বাড়ালেই আর একজনের আঙুলে গিয়ে ঠেকে।

কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্ত্তে পরিতোষের চীৎকার শোনা গেলো, "বৌদি!"

অভিনয় ভেঙে গেলো, মুখোস্ খসে' গেছে। এইবার নিজেকে সে লুকোবে কি করে'?

শ্রীহর্ষের ভাব্‌বার ক্ষমতা যখন ফিরে' এলো, তখন সে আবিষ্কার কর্‌লে যে সে অনেক সুস্থ ও স্বচ্ছন্দ বোধ কর্‌ছে। মনকে চব্বিশ ঘণ্টা শিখিয়ে পড়িয়ে তোতাপাখীর মত তৈরী রাখার দরকার নেই আর;—মন খালাস পেয়ে তা'র উপর এই অত্যাচারের প্রতিশোধ নিতে সুরু করেছে, এখন আর তাকে কোন মতেই বাগানো যাচ্ছে না।

কিন্তু বদ্‌মেজাজী বাপের কড়াকড়ির মাঝখান থেকে সে যা কেড়ে নিয়েছে, আজ এক ভালোমানুষ স্বামীর সঙ্গে কাড়াকাড়ি করে' তা কুড়িয়ে নিতে হ'বে—এই কথা ভাব্‌তেই ঘৃণায় তার সর্ব্বাঙ্গ কাঁটা দিয়ে উঠ্‌লো। এসব ব্যাপারে কোনো ভাঙাচোরা জোড়া-তালিতে সে বিশ্বাস করে না; মানুষের মনটাকে টাকা-আনা-পাইতে ভাগ করা চলে না বলে' সে-ক্ষেত্রে হিসেব-করা ব্যবসাদারী খাটে না, তা'র এ সংস্কার বিলেতের দু'টো ডিগ্রীও ঘোচাতে পারে নি। নির্জ্জলা একাদশী বরং ভালো, কিন্তু একবেলা আলুসেদ্ধ-ভাতে সে নারাজ।

কাজ কি আর ফ্যাসাদ বাধিয়ে? মান থাক্‌তে থাক্‌তে সরে' পড়া যাক্! কিন্তু আগের রাত্রে প্যাক্-করা স্যুট্‌কেশটির দিকে তাকিয়ে সে নিজকে বিশ্বাস কর্‌বার মত ভরসা পেলো না।...

সুরথ বিছানার সামনে আলো নিয়ে একখানা উপন্যাস পড়তে পড়তে উপন্যাস-বর্ণিত চরিত্রের সঙ্গে শ্রীহর্ষকে মেলাবার চেষ্টা কর্‌ছিলো;—অতসী এসে তা'র হাত থেকে বইখানা কেড়ে নিয়ে ধুপ ক'রে তা'র পাশে ব'সে পড়্‌লো।

সুরথ একটু বিরক্ত হ'য়েই ব'লে উঠলো, "ও কি? আহা—দাও বইখানা, একটা ভারি মজার—"

"কি ছাই বই নিয়েই যে আছ দিন-রাত!" অতসী বইখানা বেশ জোরেই টেবিলের ওপর ছুঁড়ে ফেল্‌লে। তারপর স্বামীর গা ঘেঁষে আধ-শোয়া অবস্থায় ছোট খুকীর মত আব্‌দারের সুরে বল্‌লে, "সাড়ে দশটার পর বই খুল্‌লে প্রত্যেক মিনিটে এক আনা জরিমানা—বুঝ্‌লে? আজ থেকে এই নিয়ম হ'ল। জরিমানার পয়সা আমার কাছে জমা থাক্‌বে, এবং পরে তা মাণিকের পোষাকের বাবদ খরচ হবে।"

সুরথের বাস্তবিকই উপন্যাসের পরিচ্ছদটা শেষ করতে ভয়ানক লোভ হচ্ছিলো, কিন্তু অতসীর কোমল ও ঈষদুষ্ণ গাত্রস্পর্শ তা'র কাছে ভালোই লাগ্‌ছিলো, তাই সে কোনো কথা বল্‌লে না।

অতসী হঠাৎ গম্ভীর হ'য়ে বল্‌লে, "তোমার নামে একটা নালিশ আছে।"

সুরথ স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস্ কর্‌লে, "কি?"

অতসী স্বামীর একখানা হাত গালের ওপর টেনে নিয়ে বল্‌তে লাগলো, "ঐ যে তোমাদের ডক্টর্ সরকার না কি"—

"হাঁা, তাঁর কি হয়েছে?"

"ঐ লোকটাকে কাল আবার আস্‌তে বলেছো নাকি?"

"কাল ব'লে বিশেষ-কিছু নয়, পার্‌লে রোজই যেন আসেন, এই অনুরোধ—"

"আমাকে উদ্ধার করেছো একেবারে। লোকটাকে একটুকো ভালো লাগে না।"

"সে কি কথা, অতসী? এমন চমৎকার—"

"চমৎকার না হাতী! ভদ্রলোক যেন আর না আসেন—বুঝ্‌লে?"

সুরথ চশ্‌মা-জোড়া চোখ থেকে নামিয়ে রেখে একটু বিস্ময়সহকারে প্রশ্ন কর্‌লে, "কেন বলো তো?"

"কেন আবার? আমার ইচ্ছে। তোমরা যাই বলো, আমার ভালো লাগে না—"

সুরথ প্রাণ খুলে হো হো ক'রে হেসে উঠলো। হাসি থাম্‌লে পর বল্‌লো, "সত্যি, তোমরা বাঙালী মেয়েরা

শ্রীবুদ্ধদেব বসু

...থু কাপড়ের বস্তা হ'য়েই রইলে! তোমাদের ...সব কেরদানি ঐ রান্নাঘর আর ভাঁড়ার পর্য্যন্তই। তা'র বাইরে একটু পা বাড়াতে হ'লেই তোমরা হিম্‌শিম্‌ খেয়ে একেবারে বেকুব্‌ ব'নে যাও। বাইরের প্রকাণ্ড জগৎ থেকে আমদের মেয়েরা বিছিন্ন হ'য়ে আছে বলে'ই তো আমাদের দেশের এত দুর্গতি।...আর ছাখো গে বিলেতে! সাধে কি ওরা সারা পৃথিবীর ওপর প্রভুত্ব খাটাচ্ছে!"

অতসী স্বামীর আঙুলগুলো নিয়ে খেলা করতে করতে বল্‌লে, "বিলেতে যা ইচ্ছে তা-ই হোক্‌গে! আমাদের এই ভালো।"

সুরথ একটা হাই তুলে বল্‌লে, "তা তোমার ইচ্ছে না হয়, ডক্টর সরকারের কাছে বেরিয়ো না। কিন্তু এমন লোক আমাদের দেশে খুবই বিরল। যেমন বিদ্বান, তেম্‌নি বিনয়ী! ওঁর মত লোকের কাছে আমাদের কত শেখ্‌বার, কত জান্‌বার আছে! চেহারাটা দেখ্‌লেই কেমন শ্রদ্ধা হয়! কী আশ্চর্য্য—তোমার এই সেকেলে কুণ্ঠা এখনো কাট্‌লো না, এখনো ঘেরাটোপ্‌ দে'য়া কলা-বো হ'য়ে থাক্‌তে পার্‌লে বেঁচে যাও! নাঃ—এ-দেশের কোন আশা নেই।"

কিন্তু এ-সব কথা বলবার সঙ্গে-সঙ্গেই সুরথ বেশ একটু তৃপ্তির সঙ্গেই এ-কথা ভাবছিলো যে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য তো অনেক লোকেরই থাকে, কিন্তু অতসীর মত স্ত্রী দুর্লভ—বাস্তবিকই দুর্লভ।

অতসী আর কোনো কথা বল্‌লে না; শুধু মুখে এমন একটি অপরূপ হাসি টেনে এনে স্বামীর মুখের ওপর ঝুঁকে পড়্‌লো যে ঘাগী ইস্কুলমাষ্টারেরো মনের জীর্ণ দেয়াল ফেটে হঠাৎ ফুটে উঠ্‌লো অজস্র পুষ্পমঞ্জরী; একটি ভঙ্গুর স্বপনের বৃন্তে ভর্‌ ক'রে হৃদয়বসন্তের প্রশান্ত আকাশের নীচে একবার তাদের বর্ণবিকশিত শতদল মেলে ধ'রে প্রজাপতি-জন্ম সাঙ্গ করলে।

অতসী আলো নিবিয়ে দিয়ে স্বামীর পাশে এসে শুয়ে পড়্‌লো। তার মন এতক্ষণে হাল্‌কা হয়েছে। মনকে সে এই ব'লে প্রবোধ দিলে যে প্রকারান্তরে সে স্বামীকে সব কথা বুঝ্‌তে দিয়েইতোছিলো—তথাপি তিনি যদি কোনো সন্দেহের কারণ খুঁজে না পেয়ে থাকেন, সে কি তা'র দোষ? মন বেচারা প্রথমটায় আপত্তিসূচক ঘাড় নেড়েছিলো, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সে তা'কে ভুলিয়ে ভালিয়ে নিজের মতের সঙ্গে সায় দিইয়ে ছাড়্‌লে। মনের পিঠে হাত বুলোতে-বুলোতে মিষ্টি ক'রে বল্‌লে, "ছাখো বাপু, আর বেয়াড়াপনা কোরো না, আজ থেকে তোমার সঙ্গে সন্ধি।" দু'মিনিটের মধ্যে সে তার নিয়তকলহপরায়ণ মনের সঙ্গে বন্ধুতা পাতিয়ে ফেল্‌লে—সে আশ্চর্য্য!

স্বামীর সঙ্গে এই আলাপ হ'বার পর অতসী যেন রাস্তার ঐ গ্যাস্‌পোস্‌টটার মতই স্পষ্ট ক'রে তা'র পথ দেখ্‌তে পাচ্ছে;—দড়িদড়া সব টলমল্‌ ক'রে উঠ্‌ছে, হাওয়ার বেগে পাল ফুলে উঠ্‌লো, নীল দিগন্তরেখা একখানি আকাশবিস্তৃত স্মিতহাস্যে যেন এই যাত্রাকে অভিনন্দন করছে—নৌকো ছাড়্‌লো বলে'।...স্বামীকে অতসী যে-সামান্য দু'একটি কথা বলেছে, তা'তে সে যেন নিজের কাছ থেকে মুক্তি পেলো; কথায় বল্‌লে এর চেয়ে স্পষ্ট ক'রে সে স্বামীকে জানাতে পার্‌তো না, কিন্তু তিনি নিরুদ্বেগ নিশ্চিন্তচিত্তে তা'কে আশীর্ব্বাদ—হ্যাঁ, আশীর্ব্বাদই করেছেন যাক্‌—স্বামীর অনুমতি সে পেলো।

হঠাৎ মাণিক ঘুমের ঘোরে কেঁদে উঠ্‌লো; অতসী তা'কে বুকের ওপর চেপে ধ'রে চুমোয়-চুমোয় ছেলেটার নিঃশ্বাস প্রায় বন্ধ ক'রে আন্‌লে। একটু পরেই মাণিক ঠাণ্ডা হ'য়ে গেলো। অতসী ভাব্‌লে—মাণিক কেন আরো খানিকক্ষণ কাঁদ্‌লে না? ও যদি আজ মা-র সঙ্গে জেদ্‌ ক'রে সারারাত ভ'রে খালি কাঁদে, অতসী তা'লে সারারাত ওর পাশে জেগে ব'সে থাকে, ওকে শান্ত করবার নানা অদ্ভুত ও কষ্টসাধ্য উপায় আবিষ্কার করে। মাণিকের কাছে কী যেন তা'র অপরাধ—তা'রি প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্য তা'র চিত্তের স্নেহ-উৎসুকতার আজ সীমা নেই।

পরদিন ওপরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে অতসী রাস্তা থেকেই শ্রীহর্ষকে দেখ্‌তে পেলে; দেখ্‌লে আস্‌তে-আস্‌তে শ্রীহর্ষ কা'র একখানা চিঠি কুটি-কুটি ক'রে ছিঁড়ে ফেল্‌ছে,—ছেঁড়া টুক্‌রোগুলো দু'মুঠি ভ'রে হাওয়ায় উড়িয়ে দিলে।

চিঠিখানি ইলার।—অতসী কি তা জানে?

অতসী তাড়াতাড়ি ছুটে নেমে এসে শ্রীহর্ষ ডাকাডাকি বা ধাক্কাধাক্কি কর্‌বার আগেই সুপ্রসন্ন মুখে বাইরের দরজা খু'লে দিলে।

তোমারেই ভালবাসি

শ্রীসরলকুমার অধিকারী

আমি গাঁথি নাই মাধবী কুঞ্জে প্রস্ফুট ফুল মালা,—
গন্ধে মধুর বর্ণে বর্ণে অপরূপ রূপ ঢালা।
কৃষ্ণ চূড়ার মঞ্জরী আমি ছিঁড়ি নাই কভু ভুলে
পরাতে তোমার অলকগুচ্ছে, সাজাতে কর্ণমূলে।
আমার মাল্য তোমার কণ্ঠে দুলিবে না তাই জানি'
করি নাই কভু দুরাশা এমন আপন ভাগ্য মানি।

ভক্ত তোমার কতজন ঐ হৃদয়ের উপকূলে
নিত্য অর্ঘ্য করে বিরচন কত বরণের ফুলে।
যাচে সন্তোষ, করে গুঞ্জন, শোনায় কত না কথা।
অনুরাগ ভরা কত উচ্ছ্বাস, কত হৃদয়ের ব্যথা!
দীনতম এক ভক্ত আমিও, এই গৌরব নিয়া
অর্ঘ্য আমার রচিয়াছি রাঙা রক্তপদ্ম দিয়া।

তোমার শ্রীমুখ পঙ্কজ রাঙা, রাঙা সে আমার ফুল,
রঙের আভাসে রাঙা হ'ল হের আশা-বাসনার মূল!
চ'লে গেলে দ্রুত নয়নের কোণে বিদ্যুৎ পরকাশি।
বিজ্ঞেরা বলে, ব'লে গেলে তুমি 'তোমারেই ভালবাসি'।

"দিন ত গেল"

শিল্পী—শ্রীপাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায়

প্রেমের খেলা

আর্থার স্নিত্‌স্লার

অনুবাদক—শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু

পরিচয়

আর্থার স্নিত্‌স্লার হচ্ছেন একজন শ্রেষ্ঠ জার্ম্মান নাট্যকার, জার্ম্মান সাহিত্যে তাঁর স্থান হাউপ্টমান সুডারমানের সঙ্গে। কিন্তু স্নিত্‌স্লারের নাটকগুলি হাউপ্টমান ভেড়েকিণ্ড প্রভৃতি অন্যসব নাটককারদের নাটকগুলির অপেক্ষা সম্পূর্ণ বিভিন্ন; কেবল লিখনভঙ্গীতে নয়, মানবজীবনকে একটি বিশেষ রূপে দর্শনে ও বিশেষ ভঙ্গীতে অঙ্কনে স্নিত্‌স্লারের নাট্যসাহিত্য পরম বিশেষত্ব লাভ করেছে।

আর্থার স্নিত্‌স্লার

১৮৬২ খৃঃঅব্দে ভিয়েনা সহরে স্নিত্‌স্লারের জন্ম হয়। তিনি প্রথমে বিশ্ববিদ্যালয়ে ডাক্তারী পড়েন, ও ডাক্তারী পাশ ক'রে কিছু দিন ডাক্তাররূপে জীবিকা-অর্জ্জনের চেষ্টা করেছিলেন। পরে ডাক্তারী ছেড়ে লেখকজীবন গ্রহণ করেন।

স্নিত্‌স্লারের নাটকগুলিতে কোন সামাজিক সমস্যা বা অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বা মানবজীবনকে সত্যরূপে দৃঢ়রূপে ধ'রে তার দার্শনিক তত্ত্বের সন্ধান করা নেই; হাউপ্টমানের "সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে" (Vor nenaufgong) বা "তাঁতিরা" (Die Weber) এই সব নাটকগুলির সহিত স্নিত্‌স্লারের "প্রেমের লীলা" (Liebelie) বা "আনাতোল" (Anatol) প্রভৃতি নাটকগুলি তুলনা করলে যেন বোঝা যায়, স্নিত্‌স্লারের নাট-জগৎ যেন কোন অনিশ্চিত জগতের মত হাউপ্টমান বা ভেড়েকিণ্ডের স্থির-প্রতিষ্ঠিত জগতের পাশে দুলছে; এ জগৎ ভিয়েনার প্রাচীন সভ্যতার ভাঙনের রূপ। বস্তুত, যুদ্ধের পূর্ব্বের ভিয়েনার প্রেমলীলাচঞ্চল সহজসুখগতিময় জীবনধারার বেষ্টনীর মধ্যেই স্নিত্‌স্লারের এই নাট্যজগতের সৃষ্টি সম্ভব হয়েছিল; রোকবো-আর্ট-সজ্জিত তাহার প্রাচীন রাজসভা, সুখসম্ভোগমত্ত অলসজীবন অভিজাতগণের চাকচিক্যবহুল অন্তঃসারশূন্য মন্দগতি জীবনধারা, গুঞ্জরণ-মুখর কাফে কাফেতে গল্প-প্রিয় ক্ষণিকপ্রেমলীলামুগ্ধ নরনারী যুবকযুবতী-সমাজ—ভিয়েনার এই সুখপ্রিয় প্রেমাভিনয়মধুর জগতের চিত্রই স্নিত্‌স্লারের নাটকে পাই। জীবনটা একটা খেলা, প্রেম একটা অভিনয়।

> "Es fliessen ineinander Traum und Wachen,
>
> Warheit und Luge. Sicherheit ist nirgends.
>
> Wir nissen nicht ron andern, nichts ron uns;
>
> Wir spielen immer, wer es weiss ist klug."
>
> (Paracelsus)

পারসেল্‌সাস্ নাটকে পারসেল্‌সাস যে কথাগুলি বলছে, তা হচ্ছে স্নিত্‌স্লারের নাট্যজগতের মর্ম্ম-কথা—স্বপ্ন ও জাগরণ একাকার হ'য়ে মিশে গেছে, যেন দুই ধারা এক হ'য়ে ব'য়ে চলেছে, সত্য ও মায়াতে জড়িয়ে গেছে। সুনিশ্চিত ভাব কোথাও নেই, ধ্রুব প্রতিষ্ঠিত কিছু নেই; আমরা অপরদের কথা কিছুই জানিনা, নিজেদেরও কিছু জানিনা; আমরা খেলা ক'রে চলেছি; আমরা যে অভিনয় ক'রে চলেছি এ কথা যে জানে সেই বুদ্ধিমান।

জীবন একটা অভিনয়, সত্য জীবন একটা নাটক. তাই স্নিত্‌স্লারের নাটকে সত্যজীবন যেন স্বপ্নের মত বোধ হয় ও নাটকের অলীক

'Liebelie" Von Aurthur Schnitlerz—সহজ বাংলা অনুবাদ।

জীবন সত্য হ'য়ে ওঠে; "সবুজ কাকাতুয়া" (Grune Kakadu) নাটকটিতে সত্যে ও অলীকতায় মিলে মিশে কি অপূর্ব্ব সুন্দর নাট্য-জগৎ সৃষ্ট হয়েছে।

কিন্তু জীবন যে একটা অভিনয় সে বোধ আছে; এ অভিনয় পূর্ণ করতে হবে, পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করতে হবে। কিন্তু জীবন যে একটা অভিনয় এ অনুভূতিতে বিষাদ লুকানো, এ অভিনয়ে শ্রান্ত হ'য়ে মানুষ শান্তি চায়, কোন স্থির সত্য জীবনের দৃঢ় ভূমিতে দাঁড়াতে চায়। "আনাতোল" নাটকটিতে জীবনের এই সন্দেহবাদ এই শ্রান্তির ছায়া রয়েছে, কিন্তু যুবক আনাতোল আপনার প্রেমের লীলায় মসগুল; তাহার সুমধুর বিষণ্ণতার মধ্যে কোন অনুতাপ বা জ্বালা নেই। ভালবাসাও ত একটা খেলা, ক্ষণিকের লীলা, নব নব প্রেমের ঘটনার মধ্যে দিয়ে স্বপ্নের মত চলা, এ যেন নব নব মনোগতির মধ্য দিয়ে নানা প্রেমভাব আস্বাদন করা; এ প্রেমের খেলায় কোথাও ট্র্যাজেডি নেই, আজ এক প্রেমিকার সঙ্গে প্রেমের লীলা ভাঙলো, বিরহের বেদনা চোখের জল দুর হ'তে না হতেই নব প্রেমিকা জুটবে, নূতন প্রেমের নূতন ভঙ্গীতে খেলা আরম্ভ হবে। ভালবাসা এখানে চির-জীবনের নয়, যতক্ষণ লীলাসুখ দেবে, যতক্ষণ আপন ইচ্ছায় ধরা দেবে শুধু ততক্ষণের; বিরহ এখানে তীব্রবেদনাময় নয়, যতক্ষণ নব প্রেমলীলা না আরম্ভ হবে শুধু ততক্ষণের।

কিন্তু এই ক্ষণিক প্রেমলীলার জগতে যদি কোন সত্যিকার প্রেমিকা আসে সে ট্র্যাজেডি নিয়ে আসবে, তার কাছে ভালবাসা ত ক্ষণিকের সুখলীলা নয়, তা যে আজীবনের সত্য, আত্মার আত্মসমর্পণ; তার কাছে বিরহ ত নবপ্রেমিকের জন্য প্রতীক্ষা নয়, তা জীবনের সফলসুখস্বপ্নের শেষ, তার চেয়ে মৃত্যু মধুর। তাই Liebelie নাটকটিতে দেখি যে, ভিয়েনার বিলাসী world of flirtingতে যখন সহরতলির একটি সত্যিকার প্রেমিকা হ'ল, সে তার ভাগ্যে দুঃখ মৃত্যু নিয়ে এল, বিলাসীসমাজের ভালবাসার লীলাখেলার মধ্যে তার সত্য প্রেম দাবানলের মত জ্বলজ্বল করছে। এই বেহালাবাদকের মেয়ে ক্রিস্‌টিনের সঙ্গে ভিয়েনার এক বিলাসী যুবক ফ্রিট্‌স্ লীলাচ্ছলেই ভাব করেছিল; ফ্রিট্‌স্ একটি বিলাসিনী বিবাহিতা মহিলার সহিত যে প্রেমের লীলা আরম্ভ করেছে, সে লীলা থামাবার জন্যেই ফ্রিট্‌সের মনকে অন্যপথে আনবার জন্যেই ফ্রিট্‌সের বন্ধু ক্রিস্‌টিনেকে তার সঙ্গে ভাব করিয়ে দেয়; কিন্তু ফ্রিট্‌স যা দু'দিনের খেলা ভেবে আরম্ভ করেছিল, তা ক্রিস্‌টিনের কাছে আজীবনের সত্য হ'য়ে উঠ্‌ল। ফ্রিট্‌স্ যখন তা বুঝতে পারল, সে পরমবেদনার সঙ্গে বলেছিল, "অনন্তকালের কথা বোলোনা। হয়ত জীবনে এমন ক্ষণ আসে যখন অনন্তকালের স্পর্শ অনুভব করা যায়।"

"সবুজ কাকাতুয়া" (Der Grune Kakadu) নাটকটিতে বাস্তব ও অবাস্তবের কি অপূর্ব্ব গতিময় সংমিশ্রণ পরম শিল্পনৈপুণ্যে স্পষ্ট অঙ্কিত হয়েছে। ভিয়েনা সমাজের প্রভাব এ নাটকটিতেও বিশেষ ভাবে দেখা যায়। নাটকটির পরিকল্পনা খুবই মৌলিক. ১৭৮৯র ১৪ই জুলাই ফরাসীবিপ্লবের সূচনার সময় পারির একটি মাটির তলার innএ নাটকের দৃশ্য; সরাইখানাটি আবার অপূর্ব্ব, সেটি অদ্ভুত রঙ্গালয়, সেখানে পারির বিলাসী অভিজাত নরনারীগণ আসেন, তাঁ'দের আমোদপ্রমোদের জন্য অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ চোর জোচ্চোর, মাতাল, খুনী, ইত্যাদি পাপী আইনভঙ্গকারী সেজে নানা রঙ্গ অভিনয় করে; চুরী, বাড়ীতে আগুন দেওয়া, ভালবাসার প্রতিহিংসার জন্য হত্যা ইত্যাদি উত্তেজনাকর গল্প বলে। এই "সবুজ কাকাতুয়ার" রঙ্গালয়ে বিলাসী অভিজাতগণের গল্পগুঞ্জরণের সঙ্গে ফরাসীবিপ্লবের গতিময় ঘটনা জড়িয়ে রঙ্গ ও বাস্তব এমন মিলে মিশে জড়িয়ে গেছে যে কোনটা সত্য কোনটা অভিনয় তা বুঝতে মন সন্দেহে ভ'রে যায়, এই সত্য ও রঙ্গের স্পন্দনময় জগতে মন যেমন মুগ্ধ তেমি ভীত ত্রস্ত হ'য়ে দিশাহারা হ'য়ে যায়।

নাইট আলবার প্রশ্নের উত্তরে রেঁলা বলছেন, "সত্যভাবে ব্যবহার করা আর অভিনয় করা···আপনি তার মধ্যে তফাৎ বুঝতে পারেন নাইটমশাই? আমিত পারিনা। আর এই সবুজ কাকাতুয়া'তে এই আমার সব চেয়ে ভাল লাগে যে, এখানে সত্য ও মিথ্যা স্বরূপের প্রতীয়মান প্রভেদ যেন চ'লে যায়,— সত্য অভিনয়লীলার মত হয়,—অভি নয় সত্যহ'য়ে ওঠে।"

কবি রোলাঁর এই কথাগুলি শ্নিত্‌শ্লার-নাট্যজগতের মর্ম্ম-কথা। এরূপ পরমবিশেষত্বপূর্ণ মৌলিক নাটক প'ড়ে বিশেষভাবে মুগ্ধ ও আনন্দিত হ'য়ে বাংলার পাঠকপাঠিকাদের জন্য শ্নিত্‌শ্লারের নাটক অনুবাদ করলুম। একটি নাটককে ঠিকভাবে ভাষান্তরিত করা খুবই শক্ত, তা ছাড়া আমি জার্ম্মান-ভাষার নবীন ছাত্র, সেজন্য অনুবাদে কিছু ভুল ত্রুটি আছে, । আশা করি পাঠকপাঠিকারা আমাকে ক্ষমা করবেন।

অনুবাদক

প্রেমের খেলা

শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু

পাত্র-পাত্রী

হান্স ভাইরিং ... জোসেফ ষ্টাড থিয়েটারের বেহালাবাদক
ক্রিস্‌টিনে ... ভাইরিংএর মেয়ে
মিৎসি স্লাগার ... ক্রিস্‌টিনের বান্ধবী
কাথারিনা বিন্‌ডার ... এক মোজা তৈরী করা তাঁতির স্ত্রী
লিনা ... কাথারিনা বিন্‌ডারের ন'বছরের মেয়ে
ফ্রিট্‌স্ লোব হাইমার } তরুণ যুবকদ্বয়
থিওডর বাইজার }
একজন ভদ্রলোক

স্থান—ভিয়েনা

কাল—বর্ত্তমান সময়

প্রথম অঙ্ক

(ফ্রিট্‌স লোবহাইমারের ঘর—বেশ সাজান আরামজনক ঘর)

(ফ্রিট্‌স্ ও থিওডর প্রথমে প্রবেশ করিল, তাহার এক হাতে ওভারকোট, ঘরে প্রবেশ করিয়াই মাথা হইতে টুপিটি খুলিল, হাতে ছড়ি)

ফ্রিট্‌স্

(বাহিরে) তা হ'লে দেখা করতে কেউ আসে নি ?

চাকরের গলা

না, হুজুর কেউ আসেনি।

ফ্রিট্‌স্

(ঘরে প্রবেশ করিয়া) গাড়ী রেখে দেবার কোন দরকার নেই, যেতে বলি ?

থিওডর

হাঁ, নিশ্চয়, আমি ভাবছিলুম, তুমি চ'লে যেতে ব'লে দিয়েছ।

ফ্রিট্‌স্

(আবার বাহিরে গিয়া, দ্বারের কাছে ভৃত্যের প্রতি) গাড়ীটাকে চ'লে যেতে বলো, আর...তুমিও যেতে পারো; আমার কোন দরকার নেই। (ঘরে প্রবেশ করিল। থিওডরের প্রতি) তোমার ছড়ি, ওভারকোট রাখো ?

থিওডর

(লেখবার টেবিলের কাছে) কয়েকখানা চিঠি রয়েছে তোমার। (সে টুপি ও ওভারকোট আরাম কেদারার ওপর ফেলিয়া রাখিল, ছড়িটি কিন্তু হাতে রহিল)

ফ্রিট্‌স্

(তাড়াতাড়ি লিখিবার টেবিলের দিকে গিয়া] আ !

থিওডর

ওহে, তোমার চিঠি খুলে দেখ।

ফ্রিট্‌স্

এ বাবার চিঠি...(আর একটি চিঠি খুলিয়া) লেন্‌স্কি লিখেছে...

থিওডর

তার জন্যে ভেবো না।

ফ্রিট্‌স্

[চিঠির ওপর চোখ বুলাইয়া গেল]

থিওডর

বাবা কি লিখেছেন ?

ফ্রিট্‌স্

বিশেষ কিছু না...লিখছেন উইট্‌সেন্‌টাইডে আট দিনের জন্য গাঁয়ের বাড়ীতে যেতে।

থিওডর

খুব ভাল কথা। আমার ইচ্ছে তোমায় পাঁচ ছ' মাসের জন্যে বাইরে পাঠিয়ে দি।

(ফ্রিট্‌স্ টেবিলের দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, ঘুরিয়া থিওডরের মুখোমুখি হইয়া দাঁড়াইল)

থিওডর

হাঁ, সেখানে ঘোড়ায় চড়বে, খোলা বাতাস পাবে—গ্রামের গোপিনীরা আছে—

ফ্রিট্‌স্

আমাদের ওখানে কোন গোপিনীদল নেই !

থিওডর

হুঁ, আমি কি বলতে চাই, তুমি বুঝতে পারছ...

ফ্রিট্স্

তা, আমার সঙ্গে তুমিও চল না ?

থিওডর

আমি যেতে পারি না।

ফ্রিট্স্

কেন ?

থিওডর

দেখ্‌চ ত সামনে আমার পরীক্ষা! তা, তোমার সঙ্গে যেতে পারি, তোমায় সেখানে রেখেই চ'লে আসব।

ফ্রিট্স্

থাক, থাক! আমার জন্যে অত ভাবতে হবে না!

থিওডর

দেখ, তোমার যা দরকার, আমি বেশ বুঝছি; খোলা জায়গায় নির্ম্মল বাতাস হচ্ছে তোমার সব চেয়ে দরকার। সেদিন যে আমরা সহরের বাইরে গেছলুম, সেই খোলা মাঠের মধ্যে সত্যিকার বসন্ত এসেছে, সেখানে তুমি একেবারে বদলে গেছলে। তোমার মন কত শান্ত তোমার প্রকৃতি কত মধুর হয়েছিল।

ফ্রিট্স্

ধন্যবাদ!

থিওডর

আর এখন, এখন তুমি আবার ভেঙে পড়েছ। এখন এই বিপদভরা আবহাওয়ার মধ্যে—

ফ্রিট্স্

(বিরক্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল)

থিওডর

দেখ, সেদিন যে আমরা সেই বাইরে বেড়াতে গেছলুম, সেদিন তুমি কি রকম স্বাভাবিক ফুর্ত্তিতে ভ'রে উঠেছিলে, তা তুমি নিজে কিছু বোঝ নি—তোমার মধ্যে তোমার পুরোনো দিনের সরল সহজ আনন্দভরা রূপ ফিরে এসেছিল—তবে অবশ্য আমাদের সঙ্গে সেই চমৎকার মেয়ে দুটি ছিল। আর এখন,—এখন আর মনে কোন ফুর্ত্তি নেই, এখন (বাঙ্গময় করুণতার সহিত) এখন 'সেই মেয়েমানুষটির' কথা ভাবাই তোমার বিশেষ দরকার। (ফ্রিট্স্ বিরক্তভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল

থিওডর

দেখ বন্ধু, তুমি আমায় ভাল ক'রে জান না দেখছি। কিন্তু ব'লে রাখছি, আমি আর এ ব্যাপারটা বেশীদূর গড়াতে দিচ্ছি না।

ফ্রিট্স্

মাই গড্! তুমি একেবারে নাছোড়বান্দা!

থিওডর

দেখ, আমি বলছি না যে তুমি তোমার মেয়েমানুষটিকে ভুলে যাও...আমি এই চাই...দেখ ভাই ফ্রিট্স্, তোমার এই হতচ্ছাড়া ব্যাপারটার জন্যে তুমি যে সব সময়ই মনের ভেতর কাঁপছ এটাকে তুমি কোন সাধারণ এ্যাড্‌ভেন্‌চার ব'লে ভেবো না...দেখ ফ্রিট্স্, একদিন যখন তুমি ওই মেয়েমানুষটিকে আর পূজো করবে না, তখন তুমি ভেবে অবাক হবে ওর সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কত সুন্দর হতে পারত; তখন তুমি বুঝবে ওর মধ্যে একটা কিছু ভয়ঙ্কর বা অসাধারণত্ব নেই, তখন বুঝবে সে এক মাধুর্য্যময়ী যুবতী। অন্য সব সুন্দরী যৌবনচঞ্চলা মেজাজ-ওয়ালা নারীদের সঙ্গে যেমন প্রেমের লীলা আমোদপ্রমোদ চলে, তার সঙ্গে তেমনিই চলতে পারত।

ফ্রিট্স্

তুমি কেন বল্লে, আমি সব সময়ে "মনের ভেতর কাঁপছি ?"

থিওডর

তুমি তা জান...আমি তোমায় খুলেই বলছি, আমার সব সময় ভয় হয়, বুঝি কোনদিন তুমি ওকে নিয়ে পালাও।

ফ্রিট্স্

তার মানে ?

থিওডর

(একটু স্তব্ধতার পর) আর এইটাই একমাত্র বিপদ নয়—আর এক বিপদ আছে।

ফ্রিট্স্

ঠিক বলেছ, থিওডর,—আর একটা বিপদ আছে।

থিওডর

তাই বলি, কোনরকম বোকামি কোরো না।

শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু

ফ্রিট্স্

(যেন নিজেকে বলছে) আর একটা বিপদ—

থিওডর

কি ?...তুমি যেন তা নিশ্চিত ব'লে ভাবছ।

ফ্রিট্স্

না, না, নিশ্চিত ব'লে মোটেই ভাবছি না...(জানালা দিয়ে একবার উঁকি মেরে) সে সেদিনও আর একবার ভুল করেছিল।

থিওডর

কি ?...কি বলছ ?...আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

ফ্রিট্স্

না, কিছু না।

থিওডর

না, কি লুকোচ্ছ, খুলে বল।

ফ্রিট্স্

গেল বার সে মাঝে মাঝে বড় ভয় পাচ্ছিল।

থিওডর

কেন ? নিশ্চয় এর কোন কারণ আছে।

ফ্রিট্স

কিছু না। নার্ভ্যাস্ (ব্যঙ্গের সহিত) বিবেকের দংশন বলতে পার।

থিওডর

তুমি বল্লে, সে আগেও একবার ভুল করেছিল।

ফ্রিটস্

হ্যাঁ—আবার আজও।

থিওডর

আজ? না, এর মানে কি ?

ফ্রিট্স্

(অল্পক্ষণ নীরবতার পর) সে ভাবে...সে ভাবে, কেউ আমাদের লুকিয়ে দেখেছে।

থিওডর

কি ?

ফ্রিট্স্

সে মনের ভয়ে কাল্পনিক অলীক মূর্ত্তি দেখে। (জানালার নিকট যাইয়া) এই পর্দ্দার ফাঁক দিয়ে সে দেখেছে একজন ওই রাস্তার বাঁকে দাঁড়িয়ে, সে ভাবে সে হচ্ছে ওর স্বামী। (সহসা থামিয়া গেল) আচ্ছা, এতদূর থেকে কোন মানুষের মুখ চেনা খুব সম্ভব ?

থিওডর

খুব সম্ভব নয়।

ফ্রিট্স্

আমিও তাই বলি। কিন্তু তারপরই ভয়ঙ্কর! এখান থেকে বাহির হ'তে তার সাহস হয় না, তার অবস্থা ভয়ঙ্কর হ'য়ে ওঠে, খুব কাঁদে ; বলে আমার সঙ্গে আত্মহত্যা করবে—

থিওডর

বটে !

ফ্রিট্স্

(একটু নীরবতার পর) আজ আমি বাইরে গিয়ে পথে চারিদিক দেখে এলুম—কোথাও কোন জানা মুখ দেখলুম না...

থিওডর

(নীরব)

ফ্রিট্স

এ বিষয় আমরা নিশ্চিন্ত থাকতে পারি, তোমার কি মনে হয় ? একটা লোক কিছু আর হঠাৎ মাটির মধ্যে ঢুকে যায় না ?...কি, উত্তর দাও ?

থিওডর

কি উত্তর দেব ? হাঁ, লোকে হঠাৎ মাটির মধ্যে ঢুকে অদৃশ্য হয় না। তবে বাড়ীর দরজার পেছনে কিছুক্ষণের জন্যে লুকোতে পারে।

ফ্রিট্স্

আমি সব বাড়ীর দরজা দেখেছি।

থিওডর

তা হ'লে কোনরকম সন্দেহ জন্মাতে দাওনি।

ফ্রিট্স্

কেউ পথে ছিল না। আমি জানি, ও কাল্পনিক অবাস্তব মূর্ত্তি।

থিওডর

নিশ্চয়। কিন্তু তোমার এ থেকে খুব সতর্ক হওয়া উচিত।

ফ্রিট্‌স্‌

ওর স্বামীর মনে যদি কোন সন্দেহ থাকত, আমি তা নিশ্চয় বুঝতে পারতুম। কাল রাতে তার সঙ্গে আমি থিয়েটারের পর খেয়েছি—তার সঙ্গে ও তার স্বামীর সঙ্গে—আমাদের রাতের ভোজ এত সুন্দর প্রীতিকর হয়েছিল।… হাসির ব্যাপার!

থিওডর

দেখ ফ্রিট্‌স্‌, আমার আন্তরিক অনুরোধ, এই হতচ্ছাড়া ব্যাপারটা তুমি এইখানে শেষ ক'রে দাও, আর নয়—আমার কথাটা শোন। আমিও সব বুঝতে পারি।…আমি জানি, তুমি যখন একটা প্রেমের অ্যাড্‌ভেন্‌চার সুরু করেছ, তা যে সহসা ছেড়ে দেবে তা মোটেই সম্ভব নয়, সেজন্যে আমি তোমার এই বিপদ-ভরা প্রেমের অ্যাড্‌ভেন্‌চার থেকে আর একটা প্রেমের লীলার মধ্যে নিয়ে যেতে চেষ্টা করেছি…

ফ্রিট্‌স্‌

তুমি?

থিওডর

হ্যাঁ, তুমি কি ভাব? এই যে কিছুদিন আগে তরুণী মিত্‌সির সঙ্গে আমরা একসঙ্গে বেড়াতে গেছলুম, তখন মিত্‌সি যে তার সুন্দরী বান্ধবীটিকে এনেছিল, আমিই ত সে বান্ধবীটিকে আনতে বলেছিলুম। আর সে তরুণীটিকে তোমার যে খুবই ভাল লেগেছিল, তা তুমি অস্বীকার করতে পার কি?

ফ্রিট্‌স্‌

সত্যি, বেশ মেয়েটি।…কি মিষ্টি! সত্যি, এই রকম কোমলতার জন্যে আমার অন্তর তৃষিত কোন মলিনতা থাকবে না, শুধু স্নিগ্ধ মাধুর্য্য। বাস্তবিক সে মেয়েটির সঙ্গে আমি যে মাধুর্য্য যে শান্তি অনুভব করেছিলুম তাতে আমার মনের এই সর্ব্বক্ষণের উদ্বেগ ও বেদনা দূর হ'য়ে গেছল—আমি যেন বেশ সেরে উঠেছিলুম—

থিওডর

ঠিক! তুমি ঠিক বলেছ! তোমার এই বর্ত্তমান মানসিক অবস্থা দূর করতে হবে—এই উদ্বেগ ও বেদনা। আমাদের মনকে অস্বাভাবিক পীড়িত করবার জন্যে নয়, সহজ আনন্দিত করবার জন্যেই মেয়েদের সৃষ্টি। সেই জন্যে ত আমি তোমার ওই interesting মেয়েমানুষটির বিরুদ্ধে। নারীর interesting হওয়ার দরকার নেই, মধুর স্নিগ্ধ হওয়া দরকার। দেখ আমি যেখানে আমার হৃদয়ের সুখ খুঁজে পেয়েছি, তুমি সেখানে তোমার অন্তরের সুখ খুঁজে পাবে। এতে কোন বেদনা আশঙ্কাভরা প্রণয়ের লীলা নেই, কোন বিপদ নেই, কোন ট্রাজেডির ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাত নেই; এতে প্রেমের খেলা সুরু করতে বিশেষ বাধা পার হতে হয় না, আর খেলা শেষ হ'য়ে গেলেও তীব্র বেদনায় জ্বলতে হয় না। এ প্রেমের প্রথম চুম্বন মিষ্টি হাসির সঙ্গে আরম্ভ হয়, আর শেষ চুম্বনে অন্তরে শুধু একটু স্নিগ্ধ উদাসতা থাকে।

ফ্রিট্‌স্‌

হুঁ—

থিওডর

অতি স্বাভাবিকভাবে মেয়েদের দেখ, তারা সহজ সুখে ভরা—আর আমরা কেন তাদের হয় দানবী নয় স্বর্গের পরী ক'রে তুলব?

ফ্রিট্‌স্‌

বাস্তবিক তোমার ওই মিত্‌সির বান্ধবীটি একটি রত্ন—কি মিষ্টি! লতার মত জড়িয়ে থাকতে চায়। অনেকবার আমার মনে হয়েছিল, বড় বেশী সুন্দর আমার পক্ষে।

থিওডর

তুমি দেখছি সংশোধনের বাইরে। দেখ, আবার যদি এ ব্যাপারটাও তুমি একেবারে সত্যিভাবে নিতে চাও—

ফ্রিট্‌স্‌

না, আমি তা বলছি না। আমি তোমার মত মেনে নিচ্ছি—মনটাকে সুস্থ স্বাভাবিক ক'রে তোলবার জন্যে।

থিওডর

না, তোমার আর কোন ব্যাপারে আমি থাকতে চাই না। তোমার এই সব প্রেমের ট্রাজেডি আমার ভাল লাগে না, যথেষ্ট হয়েছে। তোমার ওই অতি সাধের বিবেকটিকে তুমি যখন দূর করতে পারবে তখন, ইচ্ছে হয়, আমার কাছে এসো, এ সব বিষয় আমার সহজ সরল মত তোমায়

শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু

বুঝিয়ে বলব। অপর কারুর কাছে না গিয়ে আমার কাছে এসো—

(বাহিরে দরজার বেল্ বাজিয়া উঠিল)

ফ্রিট্স্

কি? কে এখন?

থিওডর

দেখ না—তুমি যে একেবারে ফ্যাকাসে হ'য়ে গেলে! না, শান্ত হও, সেই মেয়ে দু'টি এসেছে।

ফ্রিট্স্

(অবাক হইয়া) বল কি?

থিওডর

হ্যাঁ, আমি তোমার অনুমতি না নিয়েই এখানে তাদের আসতে নিমন্ত্রণ করেছি।

ফ্রিট্স্

(বাহিরে যাইতে যাইতে) বেশ! তা আগে বল্লে না কেন! আমি এখন চাকরটাকে চ'লে যেতে বলেছি!

থিওডর

সে ত ভালই।

ফ্রিট্সের স্বর

(বাহিরে) নমস্কার, মিত্সি!—

(ফ্রিট্স্ ও মিত্সি প্রবেশ করিল, মিত্সির হাতে একটা প্যাকেট)

ফ্রিট্স্

আর, ক্রিস্টিন্ কোথায়?

মিত্সি

সে একটু পরেই আসছে, নমস্কার ডোরি।

থিওডর

(মিত্সির হস্ত চুম্বন করিল)

মিত্সি

মিষ্টার ফ্রিট্স্, আপনি নিশ্চয় অপরাধ নেবেন না. থিওডর আমাদের এখানে নিমন্ত্রণ করেছে।

ফ্রিট্স্

তা বেশ করেছে, চমৎকার আইডিয়া। কিন্তু থিওডর একটা জিনিষ ভুলে গেছে—

থিওডর

না হে, থিওডর কিছু ভোলেনি। (মিত্সির হাত হইতে প্যাকেট লইয়া) আমি যা লিখে দিয়েছিলুম তা সব আনা হয়েছে?

মিত্সি

হ্যাঁ, ঠিক সব এসেছে। (ফ্রিট্সের প্রতি) কোথায় রাখব?

ফ্রিট্স্

আমাকে দিন, এই সাইডবোর্ডে রেখে দি।

মিত্সি

ডোরি—আমি আরও কিছু জিনিষ বেশী কিনেছি, তুমি তা লেখোনি।

ফ্রিট্স্

আপনার টুপিটা দিন—(টুপি ও ফার্ পিয়ানোর উপর রাখিয়া দিল)

থিওডর

(সকৌতুহলে) কি?

মিত্সি

কফি-ক্রীম-কেক।

থিওডর

মিষ্টির জোঁক!

ফ্রিট্স্

হ্যাঁ, ক্রিস্টিন্ কেন আপনার সঙ্গে এলো না?—

মিত্সি

ক্রিস্টিন্ তার বাবাকে থিয়েটারে পৌঁছে দিতে গেছে, তার পর ট্রামে ক'রে সে এখানে আসবে।

থিওডর

কি পিতৃপরায়ণা কন্যা দেখছ—

মিত্সি

হ্যাঁ, বিশেষত এই মৃত্যুর পর—

থিওডর

কার মৃত্যু হল?

মিত্সি

বুড়ো ভাইরিংএর বোনের।

থিওডর

ও! আমাদের পিসিমার।

মিত্‌সি

তিনি অবিবাহিতা প্রৌঢ়া ছিলেন—ওর বাবার সঙ্গেই বরাবর থাকতেন, সেজন্য বুড়োর এখন বড় একা একা মনে হয়।

থিওডর

ক্রিস্‌টিনের বাবা ত দেখতে খাট, আধ-পাকা ছোট চুল—

মিত্‌সি

(মাথা নাড়িয়া) না, লম্বা চুল।

ফ্রিট্‌স্‌

তুমি কোথায় দেখেছ?

থিওডর

কিছুদিন আগে আমি লেন্‌স্কির সঙ্গে জোসেফস্টাড-থিয়েটারে গেছলুম, ওখানে যারা কনট্রাবাস্‌ বাজায় তাদের ভাল ক'রে দেখেছিলুম।

মিত্‌সি

ওর বাবা ত কনট্রাবাস বাজান না, বেহালা বাজান।

থিওডর

তাই নাকি? আমি ভেবেছিলুম তিনি কনট্রাবাস বাজান! (মিত্‌সি হাসিয়া উঠিল) তা হাসবার কি আছে, আমি কি ক'রে জানব।

মিত্‌সি

মিষ্টার ফ্রিট্‌স্‌—আপনার এখানটি বেশ, সুন্দর ঘর। জানলা দিয়ে কি দেখা যায়?

ফ্রিট্‌স্‌

জানলা দিয়ে ষ্ট্রেগাসে আর তার বাড়ীগুলো বেশ দেখা যায়—

থিওডর

আচ্ছা, তোমরা এত formal হচ্ছ কেন বলত? এখনও 'আপনি' 'আপনি'।

মিত্‌সি

আচ্ছা, আজ খাবার সময় আমরা মদ খেয়ে 'তুমি' বলার বন্ধুত্ব স্থাপন করব।*

থিওডর

ও, সব একেবারে প্রথা-অনুযায়ী হওয়া দরকার। ভাল— তারপর, তোমার মা কেমন আছেন?

মিত্‌সি

(থিওডরের দিকে ঘুরিয়া বসিয়া, সহসা মুখ গম্ভীর উদ্বিগ্ন) ধন্যবাদ, জান তাঁর—

থিওডর

জানি—দাঁতের ব্যথা! তোমার মা'র ত সব সময়েই দাঁতে ব্যথা। অবশেষে একদিন দাঁতের ডাক্তারের কাছে যেতে হবে।

মিত্‌সি

কিন্তু ডাক্তার বলে, ও বাতের জন্য।

থিওডর

(হাসিয়া) হ্যাঁ—যদি বাত হয়—

মিত্‌সি

(একটি এ্যালবাম হাতে করিয়া) খুব সুন্দর সব ফটো ত রয়েছে (পাতা উল্টাইয়া যাইতে লাগিল) ...এ কে? আপনি ফ্রিট্‌স্‌? ...অ্যাঁ, ইউনিফর্ম? আপনি কি মিলিটারীতে আছেন?

ফ্রিট্‌স্‌

হ্যাঁ।

মিত্‌সি

একজন ড্রাগুন!—আপনি হল্‌দে না কালো ড্রাগুন সৈন্যদের দলে?

ফ্রিট্‌স্‌

(হাসিয়া) হল্‌দে।

মিত্‌সি

(যেন স্বপ্নাবিষ্ট) আ, হল্‌দে ড্রাগুন!

* দুই যুবকের মধ্যে বা যুবক যুবতীর মধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব পাতাইবার 'তুমি' বলা আরম্ভ করিবার এক সুন্দর প্রথা জার্মানীতে, বিশেষত ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে, প্রচলিত আছে। পরস্পর পরস্পরের শুভকামনা ও বন্ধুত্ব জানাইয়া মদ্য পান করিয়া, 'তুমি' বলিতে আরম্ভ করে। ইহাকে Bruderschaft trinken or Fellowship drinking বলে। এই 'তুমি' বলার মদ্যপান কি ভাবে হয় তাহা পাঠক পাঠিকারা এ নাটকেই একটু পরে জানিতে পারিবেন।

শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু

থিওডর

কি মিত্‌সি, কি স্বপ্নে বিভোর হ'য়ে গেলে, জেগে ওঠ !

মিত্‌সি

আপনি তা হ'লে কি রিজার্ভড্ লেফ্‌টেনান্ট ?

ফ্রিট্‌স্

হাঁ।

মিত্‌সি

ও, সেই জারের সাজ প'রে আপনাকে নিশ্চয় খুব সুন্দর দেখায়।

থিওডর

এ বিষয় তোমার বেশ জ্ঞান দেখছি—মিত্‌সি, আমিও ত সৈন্যবিভাগেই আছি।

মিত্‌সি

তুমি ওই ড্রাগুন সৈন্যদলে ?

থিওডর

হাঁ—

মিত্‌সি

হাঁ ? তা কোনদিন তুমি আমায় বল নি ..

থিওডর

দেখ, তুমি আমাকে শুধু এই সাধারণ আমি জেনেই ভালবাস এই আমি চাই।

মিত্‌সি

আচ্ছা ডোরি, এবার আমরা যখন একসঙ্গে বেড়াতে যাবো তুমি তোমার ইউনিফর্ম প'রে আসবে !

থিওডর

এই আগষ্ট মাসে আমাদের কুচকাওয়াজ হবে।

মিত্‌সি

ও, সেই আগষ্ট মাস—কতদিন দেরী—

থিওডর

হাঁ, তা বটে, এই অসীম প্রেম অতদিন পর্য্যন্ত টেঁকে থাকবে না।

মিত্‌সি

আচ্ছা, মে মাসে কে আগষ্ট মাসের কথা ভাবে। বলুন ত ফ্রিট্‌স্ ?—আচ্ছা ফ্রিট্‌স্, কাল আপনি কেন অমন ক'রে আমাদের কাছ থেকে পালিয়ে গেলেন ?

ফ্রিট্‌স্

কি রকম ?

মিত্‌সি

বা—কা'ল থিয়েটারের পর।

ফ্রিট্‌স্

থিওডর কি আপনাদের কাছে আমার হ'য়ে ক্ষমা প্রার্থনা করেনি ?

থিওডর

হাঁ, আমি ত করেছিলুম।

মিত্‌সি

রেখে দিন আপনার ক্ষমা প্রার্থনা, তাতে আমার—আর আসল কথা ক্রিস্‌টিনে তা শুন্‌বে কেন ! আপনি যা কথা দিয়েছিলেন তা আপনার রাখা উচিত ছিল।

ফ্রিট্‌স্

সত্যি, আমি যদি আপনার সঙ্গে যেতে পারতুম তা হ'লে অতিশয় সুখী হতুম।

মিত্‌সি

সত্যি ?

ফ্রিট্‌স্

কিন্তু আমি তা কিছুতেই পারলুম না। আপনি ত দেখেছিলেন, বক্সেতে আমি পরিচিতদের সঙ্গে ছিলুম, তাঁরা আমায় কিছুতেই ছাড়লেন না।

মিত্‌সি

হাঁ, সেই সুন্দরী মহিলাটিকে আপনি বুঝি ছেড়ে আসতে পারলেন না। ভাববেন না যে, আমরা গ্যালারি থেকে আপনাদের সব দেখিনি।

ফ্রিট্‌স্

আমিও আপনাদের দেখেছি।

মিত্‌সি

আপনি বক্সে পেছনে বসেছিলেন—

ফ্রিট্‌স্

সব সময় নয়।

মিত্‌সি

প্রায় অধিকাংশ সময়। ভেলভেটের বেশ-পরা একটি মহিলার পেছনে আপনি বসেছিলেন, আর সব সময় (দেখার ভঙ্গীর রঙ্গাভিনয় ক'রে) এম্নি ক'রে উঁকি মেরে দেখছিলেন।

ফ্রিটস

আপনি আমায় খুব ভাল ক'রেই লক্ষ্য করছিলেন দেখছি।

মিত্‌সি

না, আমার কি! কিন্তু আমি যদি ক্রিস্‌টিন্ হতুম... কিন্তু থিওডরের ত থিয়েটারের পর বেশ সময় ছিল? সে কেন পরিচিতদের সঙ্গে নৈশ ভোজন করতে যাবে না?

থিওডর

(গর্ব্বিত) হাঁ, বন্ধুদের সঙ্গে কেন সে নৈশ ভোজে যাবে না?

(দরজার ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল)

মিত্‌সি

এই, ক্রিস্‌টিন্ আসছে।

ফ্রিট্‌স্

(তাড়াতাড়ি বাহিরে গেল)

থিওডর

মিত্‌সি, লক্ষিটি, আমার প্রতি একটি অনুগ্রহ কর।

মিত্‌সি

(জিজ্ঞাসুভাবে)

থিওডর

দেখ, ওটা ভুলে যাও,—অন্তত কিছুদিনের জন্যে—তোমার ওই মিলিটারি-স্মৃতিটি আর মনে এনো না।

মিত্‌সি

আমার কোন মিলিটারি-স্মৃতি নেই।

থিওডর

না! দেখ, এই মিলিটারি সাজসজ্জা সম্বন্ধে তোমার এতটা জ্ঞানলাভ যে মিউজিয়েমের মডেল দেখে তবুনি তা সবাই বুঝতে পারে।

(ফ্রিট্‌স্ ও ক্রিস্‌টিনের প্রবেশ, ক্রিস্‌টিনের হাতে ফুলের তোড়া)

ক্রিস্‌টিনে

(একটু লাজুকতার সহিত) শুভসন্ধ্যা! (ফ্রিট্‌সের প্রতি) কি, আমরা এসেছি ব'লে খুসি?—না, চোটোনা?

ফ্রিট্‌স্

কি বলে দেখ!—হাঁ, কখন কখন থিওডরের মাথায় আমার চেয়ে ভাল আইডিয়া আসে—

থিওডর

কি, বাবা এখন থিয়েটারে বেহালা বাজাচ্ছেন?

ক্রিস্‌টিনে

হাঁ, আমি তাঁকে থিয়েটার পর্য্যন্ত পৌঁছে দিয়ে এলুম।

ফ্রিট্‌স্

মিত্‌সি তা বলেছেন।

ক্রিস্‌টিনে

(মিত্‌সির প্রতি) তারপর কাথারিন আমাকে কিছুক্ষণ দাঁড় করিয়ে রাখলে।

মিত্‌সি

হাঁ, কি দুষ্টু মেয়েমানুষ।

ক্রিস্‌টিনে

না, না, আমার সঙ্গে ও খুব ভাল ব্যবহার করে।

মিত্‌সি

হাঁ, তুমি ত সবাইকে ভাল ব'লে মনে কর।

ক্রিস্‌টিনে

কেন, আমার ও কি মন্দ করবে?

ফ্রিট্‌স্

কাথারিনা আবার কে?

মিত্‌সি

ওই এক মেয়েমানুষ আছে, তার স্বামী মোজা তৈরী করে; কাথারিনার সব সময় এই রাগ যে আমরা সবাই তার মত বুড়ী নই, সব তরুণী।

ক্রিস্‌টিনে

তারও ত বয়স খুব বেশী নয়।

ফ্রিট্‌স্

যাক্ কাথারিনার কথা—তুমি ও কি এনেছ?

শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু

ক্রিস্‌টিনে

কিছু ফুল

ফ্রিট্‌স্‌

(ফুলগুলি লইয়া তাহার হাতে চুম্বন করিল) তুমি স্বর্গের পরী! রোসো, ফুলদানিতে রাখা যাক...

থিওডর

আরে না! ফুল সাজাবার তোমার কোন আইডিয়া নেই। ফুল খাবার টেবিলের চারিদিকে ছড়াব...যখন খাবার টেবিল সাজান হবে, তখন এমন ক'রে ফুল সাজাতে হবে যেন তারা ওপর থেকে আমাদের ওপর ঝ'রে পড়েছে। কিন্তু সে রকম হয় না বুঝি।

ফ্রিট্‌স্‌

(হাসিয়া) বোধ হচ্ছে ত না।

থিওডর

আচ্ছা ততক্ষণ এইখানে থাক্ (ফুলগুলি ফুলদানিতে রাখিয়া দিল)।

মিত্‌সি

অন্ধকার হ'য়ে আসছে।

ফ্রিট্‌স্‌

(ক্রিসটিনেকে তাহার ওভারকোট খুলিতে সাহায্য করিল, তাহার ওভারকোট ও টুপি পেছনের এক চেয়ারে রাখিয়া দিল) হাঁ, এখন ল্যাম্পটা জ্বালাতে হয়।

থিওডর

ল্যাম্প! তোমার মাথায় কোন আইডিয়া নেই। আমরা বাতির সারি জ্বালাব, সে কি সুন্দর বল ত। মিত্‌সি, আমায় সাহায্য কর।

(থিওডর ও মিত্‌সি বাতি জ্বালাইতে লাগিল,—ওয়ার্ডরোবের ওপর দুই বাতিদানে দুই বাতি, লেখবার টেবিলের ওপর এক বাতি ও চেস্ট অফ ড্রয়ারের ওপর দুইটি বাতি জ্বালান হইল।

(থিওডর ও মিত্‌সি বাতি জ্বালাইতে ব্যস্ত, ফ্রিট্‌স্‌ ও ক্রিস্‌টিনে পরস্পর কথা কহিতে লাগিল)

ফ্রিট্‌স্‌

তারপর, কেমন আছ?

ক্রিস্‌টিনে

এখন ত বেশ ভাল আছি।

ফ্রিট্‌স্‌

হুঁ, আর অন্য সময়?

ক্রিস্‌টিনে

তোমার জন্যে এত মন কেমন করছ।

ফ্রিট্‌স্‌

কেন, কাল ত আমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল।

ক্রিস্‌টিনে

দেখা...দূর থেকে...না, ও তোমার মোটেই ভাল হয়নি ...কাল তুমি—

ফ্রিট্‌স্‌

হাঁ, জানি, মিত্‌সি আমায় বলেছে। কিন্তু তুমি একেবারে ছেলেমানুষ। আমি কিছুতেই আসতে পারলুম না, এ তোমার বোঝা উচিত।

ক্রিস্‌টিনে

হাঁ,...আচ্ছা ফ্রিট্‌স্‌, কালকে ওরা বক্সে ছিল, কে?

ফ্রিট্‌স্‌

আমার আলাপী,—তুমি ওদের জাননা, নাম জেনে কি হবে।

ক্রিস্‌টিনে

ওই যে কালো ভেলভেট প'রে মহিলাটি ছিলেন, উনি কে?

ফ্রিট্‌স্‌

দেখ, বেশভূষা সম্বন্ধে আমার স্মৃতিশক্তি বড় কম।

ক্রিস্‌টিনে

তাই না-কি?

ফ্রিট্‌স্‌

অর্থাৎ, কারুর কারুর বেলা অবশ্য আমার মনে থাকে, যেমন ধর, তোমার সঙ্গে আমার যেদিন প্রথম দেখা হয়েছিল সেদিন তুমি যে একটি ঘনধূসর ব্লাউজ পরেছিলে, তা আমার মনে আছে। আর কাল থিয়াটারে সাদা-কালো ব্লাউজ...

ক্রিস্‌টিনে

আজ এখনও ত সেই ব্লাউজই প'রে।

ফ্রিট্স্

তাইত, ... দেখ দূর থেকে আবার অন্যরকম দেখায়। --সত্যি! আর তোমার গলার সেই লকেট আমার মনে আছে!

ক্রিসটিনে

(হাসিয়া) কখন পরেছিলুম ?

ফ্রিট্স্

সেই যে—হাঁ, সেই যেদিন আমরা বাগানে বেড়াতে গেছলুম, গাছের তলায় ছেলেমেয়ের দল খেলা করছিল .. সেখানে, তাই নয় ?

ক্রিসটিনে

হাঁ, আমার কথাও কখন কখন মনে থাকে দেখছি।

ফ্রিট্স

ও, প্রায়ই ...

ক্রিস্টিনে

কিন্তু আমি যত তোমার কথা ভাবি তত নয়। আমি সব সময় তোমাকে ভাবি . সমস্ত দিন...আর তোমার দেখা না পেলে মন ভাল থাকে না!

ফ্রিট্স

আমাদের ত প্রায়ই দেখা হয়।

ক্রিসটিনে

প্রায়ই...

ফ্রিট্স্

নিশ্চয়। তবে আসছে গ্রীষ্মে আমাদের এত ঘন ঘন দেখা হবে না... হয়ত আমি কয়েক সপ্তাহের জন্যে বাইরে বেড়াতে যাবো। কি বল ?

ক্রিস্টিনে

(উদ্বিগ্নভাবে) কি ? তুমি বাইরে চ'লে যাবে ?

ফ্রিট্স্

আরে না,. .তবে আমার খেয়ালও হ'তে পারে ত সাত আট দিন একা নির্জ্জনে থাকতো।

ক্রিস্টিনে

কেন ?—না।

ফ্রিট্স্

কি বিপদ! আমি বলছি, 'হ'তে পারে', সবই ত সম্ভব, বিশেষত আমি যে রকম খামখেয়ালী। আর তোমারও ইচ্ছে হ'তে পারে, কয়েকদিন আমার সঙ্গে দেখা করবে না...তোমার এরকম ইচ্ছে করাটা আমি ভুল বুঝব না।

ক্রিস্টিনে

কখনও আমার ওরকম ইচ্ছে হবে না, ফ্রিট্স্।

ফ্রিট্স্

তা কেউ নিশ্চিত ক'রে বলতে পারে না।

ক্রিস্টিনে

আমি জানি...আমি তোমায় ভালবাসি।

ফ্রিট্স্

আমিও তোমায় খুব ভালবাসি।

ক্রিস্টিনে

কিন্তু, তুমি আমার সর্ব্বস্ব, ফ্রিট্স, তোমার জন্যে আমি...(থামিয়া গেল) না, আমি কখনও কল্পনা করতে পারি না যে, ভবিষ্যতে এমন কোন সময় আসবে যখন তোমাকে আমি দেখতে চাইব না। যতদিন বেঁচে থাকব, ফ্রিট্স্, আজীবন—

ফ্রিট্স্

(তাহার কথায় বাধা দিয়া) আরে খুকি, থাম্,...ওরকম সব কথা না বলাই ভাল···ওসব বড় বড় কথা আমার ভাল লাগে না, ও সব চিরদিনের অনন্তকালের কথা থাক ..

ক্রিস্টিনে

(করুণভাবে হাসিয়া) তার জন্যে চিন্তিত হোয়ো না ফ্রিট্স্...আমি জানি, এ চিরদিনের জন্যে নয়...

ফ্রিট্স্

তুই আমায় ভুল বুঝছিস্, ও খুকি! হতে ত পারে, (হাসিয়া) হয়ত কোনদিন আমরা কেউ কাউকে মোটেই ভালবাসব না ? আমরা মানুষ বৈ ত নয়।

থিওডর

(জ্বলন্ত বাতিগুলিকে দেখাইয়া) ওহে, অনুগ্রহ ক'রে আমাদের এদিকে দেখো দিকি···কি রকম, তোমার ওই ল্যাম্পের আলোর চেয়ে অনেক ভাল দেখাচ্ছে না ?

শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু

ফ্রিট্স্

সাজাবার তোমার জন্মগত প্রতিভা আছে দেখছি।

থিওডর

ও হে, এখন তা হ'লে খেতে বসলে হয় না ?

মিত্‌সি

হাঁ....ক্রিস্‌টিন্, আয়!

ফ্রিট্স্

রোসো, প্লেট কাঁটা চামচ কোথায় আছে আমি দেখিয়ে দিই।

মিত্‌সি

আগে টেবিল ক্লথ চাই।

থিওডর

(ইংরেজদের উচ্চারণ অনুকরণ ক'রে থিয়েটারে ক্লাউনেরা যেমন বলে তেমি সুরে) "একটি টেবল্ ক্লথ।"

ফ্রিট্স্

কি ব্যাপার ?

থিওডর

আরে, মনে নেই অরফেউমতে সেই ক্লাউনটা কেমন বলছিল, "এই একটা টেব্‌ল্ ক্লথ"..."এই একটা ছোট্ট প্লেট"..."এই একটা ছোট্ট খোকা"।

মিত্‌সি

ডোরি, বলি কবে আমায় অরফেউম দেখাতে নিয়ে যাচ্ছ বল ত, তুমি ত কদ্দিন থেকে আমায় বলছ। হাঁ, ক্রিস্‌টিনেও আমাদের সঙ্গে আসবে, আর মিষ্টার ফ্রিট্‌স্‌ও। (ফ্রিট্স্ সাইডবোর্ড হইতে টেবিল ক্লথ বাহির করিয়া দিল, মিত্‌সি তাহার হাত হইতে লইল) তখন আমারই কিন্তু বক্সের আলাপী বন্ধু...

ফ্রিট্স্

হাঁ, হাঁ...

মিত্‌সি

তখন ওই কালো ভেলভেট-পরা মহিলাটিকে একাই বাড়ী ফিরতে হবে।

ফ্রিট্স্

কি সব সময় কালো ভেলভেট পরা মহিলা—এ সত্যি পাগলামি!

মিত্‌সি

আচ্ছা, তাঁর সঙ্গে আমাদের কি...হুঁ, খাবার সব কোথায়? (ফ্রিট্স্ খোলা সাইডবোর্ড দেখাইল) বেশ, আর প্লেট কাঁটা চামচ ?.. ধন্যবাদ.. এখন আমরা একাই সব সাজিয়ে ঠিক করছি...যান, যান, আপনাকে কোন সাহায্য করতে হবে না।

থিওডর

(সোফাতে হেলান দিয়া শুইয়া পড়িয়াছিল। ফ্রিট্স তাহা সম্মুখে আসিল)

(মিত্‌সি ও ক্রিস্‌টিনে টেবিল সাজাইতে লাগিল)

মিত্‌সি

আরে, ফ্রিট্‌সের ইউনিফর্ম-পরা ফটো দেখেছিস ?

ক্রিস্‌টিনে

না।

মিত্‌সি

দেখিস্, খুব smart!

থিওডর

(সোফা হইতে) এই রকম সন্ধ্যাগুলিকে মনে হয় স্বপ্ন!

ফ্রিট্স্

সুন্দর!

থিওডর

বড় চমৎকার লাগে, নয় ?

ফ্রিট্স্

আ, এই রকম যদি সব সময় হ'ত।

মিত্‌সি

মিষ্টার ফ্রিট্স্, কফি কি মেসিনে * দেওয়া আছে ?

ফ্রিট্স্

হাঁ, তবে স্পিরিট ল্যাম্পটাতে কফি ক'রে নিন, মেসিনে করিতে গেলে এক ঘণ্টার ওপর লাগবে...

থিওডর

(ফ্রিট্‌সের প্রতি) এমন একটি লক্ষ্মী মেয়ের জন্যে আমি দশটা দানবী মেয়েমানুষকে ছাড়তে পারি।

---

* ভাল কফি করিবার এক প্রকার বিশেষ যন্ত্র আছে। কফি চা'র মত গরম ফুটন্ত জলে ফেলিয়া করা হয় না। এই যন্ত্রের সাহায্যে জল ফুটিয়া বাষ্প হইয়া কফির আধারের মধ্য দিয়া গিয়া আবার জল হইয়া অপর পাত্রে জমা হয়।

ফ্রিট্‌স্‌

দেখ ওরকম ওদের মধ্যে তুলনা করা চলে না।

থিওডর

হাঁ, আমরা যে মেয়েদের সত্যি ভালবাসি তাদের আমরা ঘৃণা করি—আর যারা আমাদের জন্যে কেয়ার করে না তাদের আমরা ভালবাসি—

ফ্রিট্‌স্‌

(হাসিয়া উঠিল)

মিত্‌সি

কি? আমাদের বলো!

থিওডর

ও তোমাদের জন্যে নয় বাছারা, আমরা একটু philosophise করছি। [ফ্রিট্‌সের প্রতি] ধরো, এই যদি আমাদের শেষবারের মিলন হয়, তাতেও আমরা ফুর্ত্তি করব না, কি বলো?

ফ্রিট্‌স্‌

শেষবার...দেখ, তা ভাবলেই মন ভারী হ'য়ে আসে, বিদায়ের ভাবনা সব সময়ে মনে বেদনা আনে—এমন কি যখন মানুষ ছেড়ে যেতেই চায় তখনো!

ক্রিস্‌টিনে

ফ্রিট্‌স্‌, খাবারগুলো কোথায়?

ফ্রিট্‌স্‌

(সাইডবোর্ডের কাছে গিয়া) এই, এইখানে ডিয়ার!

মিত্‌সি

(সামনে আসিল, সোফায় আধ শোওয়া থিওডরের মাথার চুলে হাত বুলাইল)

থিওডর

কি লক্ষ্মী মেয়ে!

ফ্রিট্‌স্‌

(মিত্‌সি যে প্যাকেট আনিয়াছিল, তাহা খুলিল) চমৎকার!

ক্রিস্‌টিনে

(ফ্রিট্‌সের প্রতি) দেখ, কেমন সব সুন্দর সাজান হয়েছে!

ফ্রিট্‌স্‌

হাঁ...(প্যাকেট হইতে খাবার জিনিষ সব সাজাইয়া রাখিতে লাগিল—সার্ডিন মাছের বাক্স, ঠাণ্ডা মাংস, মাখন, চিজ ইত্যাদি)

ক্রিস্‌টিনে

ফ্রিট্‌স্‌, আমায় বল্লে না?

ফ্রিট্‌স্‌

কি?

ক্রিস্‌টিনে

সেই মহিলাটি কে?

ফ্রিট্‌স্‌

দেখ, আমায় জ্বালিও না। (ধীরভাবে) দেখ, আমাদের মধ্যে খোলাখুলি বোঝাপড়া হয়েছে—কোন প্রশ্ন নয়। কোন কথা জিজ্ঞেস নয়, এই হচ্ছে সব চেয়ে ভাল। যখন আমরা দু'জনে একসঙ্গে, বাহিরের পৃথিবীর কোন অস্তিত্ব নেই।—আমিও তোমাকে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছি না।

ক্রিস্‌টিনে

তুমি আমাকে তোমার যা ইচ্ছা হয় জিজ্ঞেস করতে পারো।

ফ্রিট্‌স্‌

কিন্তু আমি ত কিছু জিজ্ঞেস করছি না, আমি কিছু জানতে চাই না।

মিত্‌সি

(ফিরিয়া আসিয়া) আ, কি অগোছাল করছেন টেবিলে—(খাবার জিনিষগুলি লইল, প্লেটেতে সাজাইয়া রাখিতে লাগিল) এই রকম...

থিওডর

ফ্রিট্‌স্‌, কিছু মদ আছে ত?

ফ্রিট্‌স্‌

হাঁ, খুব ভাল জিনিষই পাবে। (ভেতরের ঘরে চলিয়া গেল)

থিওডর

(সোফা হইতে উঠিল, টেবিলের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল) বা, বেশ!

মিত্‌সি

সব ঠিকঠাক!

শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু

ফ্রিট্‌স্

(কয়েকটি বোতল হাতে করিয়া প্রবেশ করিল) এই যথেষ্ট ...ব।

থিওডর

হাঁ, গোলাপ ফুলগুলি কোথায়, সেগুলো ত ওপর থেকে ঝ'রে পড়বে, না ?

মিত্‌সি

ঠিক্, ঠিক্, গোলাপগুলো ভুলে গেছলুম ! (গোলাপ ফুলগুলি মিত্‌সি ফুলদানি হইতে লইল, একটি চেয়ারে উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং ওপর হইতে ফুলগুলি টেবিলের ওপর ছড়াইয়া ফেলিয়া দিল) এই, হয়েছে।

ক্রিস্‌টিনে

গড্, মিত্‌সি ক্ষেপে গেছে নাকি !

থিওডর

কিন্তু ডিসের ওপর নয়...

ফ্রিটস্

ক্রিস্‌টিন্, তুমি কোথায় বসবে ?

থিওডর

কর্কস্ক্রু কোথায় ?

ফ্রিট্‌স্

(সাইডবোর্ড হইতে বাহির করিয়া) এই নাও।

মিত্‌সি

(মোদের বোতল খুলিতে গেল)

ফ্রিট্‌স্

ও, আমাকে দিন, খুলছি।

থিওডর

আরে, আমায় দাও...(বোতল ও কর্কস্ক্রু হাত হইতে লইয়া) তুমি ইতিমধ্যে একটু...(পিয়ানোবাদকের লীলায়িত চঞ্চল আঙ্গুলের মত আঙ্গুলের ভঙ্গী করিল)

মিত্‌সি

হাঁ, সে বেশ। (মিত্‌সি তাড়াতাড়ি পিয়ানোর নিকট গেল, পিয়ানোর ওপর জিনিষগুলি একটি চেয়ারে রাখিয়া দিয়া পিয়ানো খুলিল)

ফ্রিট্‌স্

(ক্রিস্‌টিনের প্রতি) বাজাবো ?

ক্রিস্‌টিনে

হাঁ, নিশ্চয় ! আমি তোমায় আগেই বল্‌ব ভাবছিলুম।

ফ্রিট্‌স্

(পিয়ানোর টুলে বসিয়া) তুমিও ত কিন্তু বাজাতে পারো।

ক্রিস্‌টিনে

(কথাটা কাটাইয়া দিবার জন্য) ও, না।

মিত্‌সি

হাঁ, ক্রিস্‌টি, তুই ত বাজাতে পারিস...ও গাইতেও পারে।

ফ্রিট্‌স্

সত্যি ? একথা ত তুমি আমায় বলনি।

ক্রিস্‌টিনে

তুমি আমায় কোনদিন জিজ্ঞেস করোনি।

ফ্রিট্‌স্

কোথা থেকে গান গাইতে শিখলে ?

ক্রিস্‌টিনে

আমি নিয়মিতরূপে কোথাও শিখিনি। এই বাবা মাঝে মাঝে একটু শিখিয়েছেন—কিন্তু আমার তেমন গলা নেই। তারপর জানো, পিসিমা মারা যাবার পর, তিনি আমাদের সঙ্গে বরাবর থাকতেন—তারপর থেকে এখন বাড়া চুপচাপ।

ফ্রিট্‌স্

সারাদিন কর কি ?

ক্রিস্‌টিনে

ও, আমার কত কাজ, বহুৎ।—

ফ্রিট্‌স্

বাড়ীতে এত কাজ—কি রকম ?—

ক্রিস্‌টিনে

হাঁ, তারপর স্বরলিপি কপি করি, অনেক স্বরলিপি—

থিওডর

স্বরলিপি ?—

ক্রিস্‌টিনে

হাঁ।

থিওডর

তা থেকে অনেক টাকা পাও, তা হ'লে। (অপর সকলে হাসিয়া উঠিল) নিশ্চয়, আমি হ'লে ত অনেক টাকা নিতুম। স্বরলিপি লেখা নিশ্চয় খুব পরিশ্রমের কাজ।

মিত্‌সি

বাস্তবিক, ও যে কেন এত খেটে মরে! (ক্রিস্‌টিনের প্রতি) আমার যদি তোর মত গলা থাকত, আমি এতদিনে থিয়াটারে যেতুম।

থিওডর

তার জন্যে তোমার গলার দরকার নেই...তুমি সারা-দিনই ত থিয়েটার ক'রে বেড়াচ্ছ।

মিত্‌সি

হাঁ, জানো মশাই, আমার দু'টি ছোট ভাই আছে, তারা স্কুলে যায়, রোজ সকাল বেলা তাদের জাগান, খাওয়ান, কাপড় পরান সব আমায় করতে হয়, তারপর তাদের স্কুলের পড়া শিখিয়ে দিতে হয়—

থিওডর

এর একটি কথাও সত্যি নয়।

মিত্‌সি

তা যদি বিশ্বাস না করতে চাও!—আর গত শরৎকাল পর্য্যন্ত আমি যে দোকানে কাজ করেছি সকাল আটটা থেকে রাত আটটা পর্য্যন্ত—

থিওডর

(ঈষৎ উপহাসের সুরে) কোথায়?

মিত্‌সি

এক টুপির দোকানে। মা'র ইচ্ছে আবার আমি সেখানে কাজ নি।

থিওডর

তা সেখান থেকে ছেড়ে এলে কেন?

ফ্রিট্‌স

(ক্রিস্‌টিনের প্রতি) আমাদের গান শোনাতে হবে!

থিওডর

এস হে, এস খেতে আরম্ভ করা যাক। আর তুমি বাজাবে নাকি?

ফ্রিট্‌স্

(উঠিয়া, ক্রিস্‌টিনের প্রতি) এসো! (তাহাকে টেবিলে লইয়া গেল)

মিত্‌সি

কাফি! কাফি এদিকে ফুটে গেল, আমরা এখনও খেতে আরম্ভ করিনি!

থিওডর

তাতে কিছু আসে যায় না।

মিত্‌সি

এদিকে যে উথলে পড়ছে! (সে স্পিরিটল্যাম্প নিভাইয়া দিল)

(সকলে টেবিলে খাইতে বসিল)

থিওডর

কি প্রথমে আরম্ভ করা যায়, মিত্‌সি? কেক কিন্তু সেই সবশেষে। প্রথমে তেতো জিনিষ, তারপর মিষ্টি।

ফ্রিট্‌স্

(মদ আনিয়া গেলাসে ঢালিতে গেল)

থিওডর

না হে ওরকম নয়, তুমি মদ ঢালবার নূতন কেতা জান না বুঝি? (থিওডর উঠিয়া দাঁড়াইল, বোতল হাতে করিয়া ক্রিস্‌টিনের প্রতি চাহিয়া কেতাদুরস্ত খান্‌সামার মত মাথা নত করিয়া সম্ভ্রমের অভিবাদন করিল, তাহার পর তাহার গ্লাসে মদ ঢালিতে ঢালিতে, যে কোম্পানী মদ তৈরী করিয়াছে ও যে বৎসরে মদ তৈরী হইয়াছে, তাহা বলিতে লাগিল) ভোস্‌লাউ আর আউস্‌টিস, আঠারোশত...('আঠার শতের' পর সংখ্যা এত তাড়াতাড়ি বলিল যে কেহ বুঝিতে পারিল না। তারপর মিত্‌সির সম্মুখে আসিয়া তাহাকে নত হইয়া অভিবাদন করিয়া তাহার গেলাসে মদ ঢালিতে ঢালিতে বলিতে লাগিল) ভোসলাউ আর আউসটিস্ আঠারো শত...(পূর্ব্বের মত। তারপর ফ্রিট্‌সের প্রতি পূর্ব্বের মত) ভোস্‌লাউ আর আউস্‌টিস আঠারো শত...(তারপর নিজের স্থানে আসিয়া নিজের গেলাসে ঢালিল, পূর্ব্বের মত) ভোসলাউ আর আউস্‌টিস...(তারপর নিজের চেয়ারে বসিল)

মিত্‌সি

আ! সব সময়ই এর রঙ্গ!

প্রেমের খেলা

শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু

থিওডর

(তাহার মদের গ্লাস তুলিল, সকলে গ্লাসে গ্লাসে ঠোকাঠুকি করিল) পোজিট !

মিত্সি

দীর্ঘজীবি হও, থিওডর।

থিওডর

(উঠিয়া দাঁড়াইয়া) ভদ্রমহোদয়া ও ভদ্রমহোদয়গণ...

ফ্রিট্স্

আরে এখন নয় !

থিওডর

(বসিয়া পড়িল) আচ্ছা আমি অপেক্ষা করতে পারি।

(সকলে খাইতে আরম্ভ করিল)

মিত্সি

দেখ, খাবার টেবিলে বক্তৃতা শুনতে আমার এত ভাল লাগে। আমার এক পিসতুতো ভাই আছে, সে আবার কবিতায় বক্তৃতা দেয়।

থিওডর

কোন রেজিমেণ্টে সে আছে ?

মিত্সি

যা থামো...ক্রিস্টিন, শুনছিস, অবশ্য আগে থাকতে মুখস্থ ক'রে আসে, কিন্তু সে কবিতায় বক্তৃতা দেয় চমৎকার, কিন্তু তার বেশ বয়স হয়েছে।

থিওডর

হাঁ, বেশী বয়সের লোকেরা অনেক সময় কবিতায় কথা বলে বটে।

ফ্রিট্স্

কিন্তু তুমি কিছু খাচ্ছনা ক্রিস্টিনে। (ক্রিস্টিনের মদের গ্লাসের সহিত তাহার মদের গ্লাস ঠেকাইয়া মদ পান করিল)

থিওডর

(মিত্সির মদের গ্লাসে তাহার গ্লাস ঠেকাইয়া) যে প্রৌঢ় লোকটি কবিতায় কথা বলেন তাঁর শুভকামনা করি।

মিত্সি

(ফুর্ত্তির সহিত) যে তরুণ যুবকেরা কোন কথা বলে না তাদের শুভকামনা করি...যেমন মিষ্টার ফ্রিট্স্...কি মিষ্টার ফ্রিট্স্, এখন যদি ইচ্ছে করেন, আমরা বন্ধুত্বপাতানোর মদ্য-পান (Followship drinking) করতে পারি—আর ক্রিস্টিন, তুমিও থিওডরের সঙ্গে তাই করবে।

থিওডর

কি, এ মদ দিয়ে নয়, এ মদ বন্ধুত্বপাতানোর মদ নয়। (থিওডর উঠিল, আর একটি বোতল আনিল, আগেকার মত অভিনয় করিয়া সবার গ্লাসে মদ দিতে লাগিল—জেরে স্ দে লা ফ্রনতেরা মিল উইথ স্যা স্যাকাত—জেরেস্ দে লা ফ্রনতেরা—জেরেস্ দে লা ফ্রনতেরা জেরেস্ দে লা ফ্রনতেরা)

মিত্সি

(এক চুমুক দিয়া) বেশ।

থিওডর

তোমার বুঝি আর তর সইল না ?—আচ্ছা বন্ধুরা... এস, প্রথমে, এই সুখময় ঘটনার কল্যাণকামনা ক'রে মদ্য-পান করি...

মিত্সি

(একটু মদ খাইয়া) বেশ মদ !

(ফ্রিট্স্ মিত্সির হাত ধরিল, থিওডর ক্রিস্টিনের হাত ধরিল, সকলে মদের গ্লাস তুলিয়া ধরিল, তারপর ফ্রিট্স্ ও মিত্সি তাহাদের গ্লাস ঠোকাঠুকি করিল, থিওডর ও ক্রিস্টিনে তাহাদের গ্লাস ঠোকাঠুকি করিল, সকলে মদ্যপান করিল। তারপর, ফ্রিট্স্ মিত্সিকে চুম্বন দিল। থিওডরও ক্রিস্টিনেকে চুমো খাইতে গেল)

ক্রিস্টিনে

(হাসিয়া) ওটা করতেই হবে ?

থিওডর

নিশ্চয়ই এরি জন্যেই ত এত কাণ্ড (ক্রিস্টিনে চুম্বন দিল) এখন যে যার জায়গায় !

মিত্সি

ঘর যেন আগুন হ'য়ে উঠেছে।

ফ্রিট্স্

থিওডর যে এক গাদা বাতি জ্বালিয়েছে।

মিত্সি

হাঁ, এত মদ খেয়ে...(সে চেয়ারের পেছনে হেলান দিয়া একটু এলাইয়া বসিল)

থিওডর

আরে মিত্‌সি—এবার সব চেয়ে ভাল জিনিষ (বড় কেকের এক টুকরা কাটিয়া সে মিত্‌সির মুখে পুরিয়া দিল) নাও খাও মিষ্টির জোঁক—ভাল ?

মিত্‌সি

বেড়ে ! (থিওডর তাহাকে আর এক টুকরা দিল)

থিওডর

নাও, ফ্রিট্‌স্—এখন তুমি একটু পিয়ানো বাজাতে পারো।

ফ্রিট্‌স্

বাজাবো ক্রিস্‌টিন্ ?

ক্রিস্‌টিনে

হাঁ, নিশ্চয় !

মিত্‌সি

একটা chic কিছু !

থিওডর

(গ্লাসগুলি আবার মদে ভরিয়া দিল)

মিত্‌সি

আমার আর চাই না (মদ্যপান)

ক্রিস্‌টিনে

(একটু চুমুক দিয়া) মদটা বড় ভারী।

থিওডর

(মদের গ্লাসের দিকে দেখাইয়া) ফ্রিট্‌স্ !

ফ্রিট্‌স্

(মদের গ্লাস শূন্য করিয়া পিয়ানোতে গিয়া বসিল)

ক্রিস্‌টিনে

(তাহার কাছে গিয়া বসিল)

মিত্‌সি

মিষ্টার ফ্রিট্‌স্, 'ডপেল আডলারটা' * বাজাও না

ফ্রিট্‌স্

'ডপেল আডলার'—কি রকম সুরটা ?

মিত্‌সি

ডোরি, 'ডপল আডলার' বাজাতে পারো ?

থিওডর

দেখ, পিয়ানো বাজাতে আমি মোটেই পারি না।

ফ্রিট্‌স্

আমি জানি, তবে ঠিক মনে পড়ছে না।

মিত্‌সি

আমি সুরটা গাইছি......লা...লা...লালালালা...লা...

ফ্রিট্‌স্

ও মনে পড়েছে। (পিয়ানোতে বাজাইল কিন্তু ভুল বাজাইল)

মিত্‌সি

(পিয়ানোর সামনে গিয়া) না, এই রকম (সে আঙুল দিয়া সুরটি বাজাইয়া গেল)

ফ্রিট্‌স্

ঠিক ঠিক...(ফ্রিট্‌স্ পিয়ানো বাজাইতে লাগিল, মিত্‌সি তাহার সহিত গাহিতে লাগিল)

থিওডর

আর একটি সুমধুর স্মৃতি, নয় ?

ফ্রিট্‌স্

(কিছুক্ষণ ভুল বাজাইয়া থামিয়া গেল) না, হচ্ছে না, আমার ঠিক কান নেই। (সে নিজের খুসিমত বাজাইতে লাগিল)

মিত্‌সি

ও ঠিক হচ্ছে না !

ফ্রিট্‌স্

(হাসিয়া) এ আমার তৈরী !—

মিত্‌সি

কিন্তু এটা নাচের সুর নয় !

ফ্রিট্‌স্

দেখোনা চেষ্টা ক'রে, দেখ একবার...

থিওডর

(মিত্‌সির প্রতি) আয়, দেখা যাক (থিওডর মিত্‌সির কোমর জড়াইল, তাহারা নাচিতে সুরু করিল)

---

* অর্থাৎ Double Eagles "দুই ঈগলপক্ষী"--এক যুদ্ধযাত্রার সঙ্গীত।

শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু

ক্রিস্‌টিনে

(পিয়ানোর কাছে দাঁড়াইয়া পিয়ানোর কী গুলির দিকে চাহিয়া রহিল)

(বাহিরে দরজার বেল বাজিয়া উঠিল)

ফ্রিট্‌স্‌

(পিয়ানো বাজান বন্ধ করিয়া দিল। থিওডর ও মিত্‌সি কিন্তু নাচিতে লাগিল)

থিওডর ও মিত্‌সি

(একসঙ্গে) কি হ'ল? থামালে কেন?

ফ্রিট্‌স্‌

কেউ দরজার বেল বাজাচ্ছে...(থিওডরের প্রতি) তুমি কি আরও কাউকে নিমন্ত্রণ করেছ?

থিওডর

মোটেই না—তা দরজা খোলবার কোন দরকার নেই।

ক্রিস্‌টিনে

(ফ্রিট্‌সের প্রতি) কি হয়েছে?

ফ্রিট্‌স্‌

কিছু না...

(দরজার বেল আবার বাজিয়া উঠিল)

ফ্রিট্‌স্‌

(টুল হইতে উঠিল, দাঁড়াইয়া রহিল)

থিওডর

তুমি বাড়ীতে নেই, বেরিয়ে গেছ।

ফ্রিট্‌স্‌

কিন্তু বাইরে পিয়ানো বাজান শোনা যায়।

থিওডর

তুমি বেরিয়ে গেছ, দরজা খোলার কি দরকার!

ফ্রিট্‌স্‌

আমাকে nervous ক'রে তোলে।

থিওডর

কে আর হবে? একটা চিঠি!—অথবা কোন টেলিগ্রাম —(ঘড়ির দিকে দেখিয়া) এত রাতে কেউ তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে না।

(বেল আবার বাজিয়া উঠিল)

ফ্রিট্‌স্‌

আঃ, যেতেই হবে দেখছি! (বাহিরে গেল)

মিত্‌সি

তোমরা কি কাণ্ড লাগিয়েছ—(পিয়ানোর কয়েকটা কীর ওপর আঙুল বুলাইয়া গেল)

থিওডর

আ, থাম্‌! (ক্রিস্‌টিনের প্রতি) তোমার কি হ'ল? বেল শুনে তুমিও যে nervous হ'লে?—

ফ্রিট্‌স্‌

(ফিরিয়া আসিল, কৃত্রিম শান্তভাব)

থিওডর ও ক্রিস্‌টিনে

(একসঙ্গে) কে? কে?

ফ্রিট্‌স্‌

(কৃত্রিম হাসিয়া) দেখ, তোমরা যদি অনুগ্রহ ক'রে আমায় ক্ষমা কর, কয়েক মিনিটের জন্যে পেছনের ঘরটায় যেতে হবে।

থিওডর

কি ব্যাপার?

ক্রিস্‌টিনে

কে এসেছে?

ফ্রিট্‌স্‌

ও একটি ভদ্রলোক, আমার সঙ্গে কয়েকটা কথা ব'লেই চ'লে যাবে...(পাশের ঘরে দরজা খুলিয়া দিল, মেয়ে দু'টি তাড়াতাড়ি প্রবেশ করিল, থিওডর ফ্রিট্‌সের মুখে জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল)

ফ্রিট্‌স্‌

(অতি ধীরে, ভীতভাবে) সে!

থিওডর

বটে!

ফ্রিট্‌স্‌

যাও, ভেতরে যাও, ঢোকো—

থিওডর

দেখ, বোকামি কোরোনা, এ একটা ফাঁদ হ'তে পারে...

ফ্রিট্‌স্

যাও, যাও...

(থিওডর পাশের ঘরে ঢুকিয়া গেল। ফ্রিট্‌স্ তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া বাহিরের দরজার দিকে গেল। কয়েক মুহূর্ত ষ্টেজ্ জনহীন রহিল। তারপর পঁয়ত্রিশ বছরের কাছাকাছি বয়সের এক বিশিষ্টভাবে পরিচ্ছদিত ভদ্রলোককে সঙ্গে করিয়া ফ্রিট্‌স্ আবার ঘরে প্রবেশ করিল। ভদ্রলোকটিকে প্রথমে ঘরে প্রবেশ করিতে দিয়া তাহার পশ্চাতে ঘরে ঢুকিল। ভদ্রলোকটির গায়ে হলদে রংএর ওভারকোট, হাতে গ্লাভ্‌স্, হ্যাট হাতে ধরিয়া]

ফ্রিট্‌স্

(ঢুকিতে ঢুকিতে) ক্ষমা করবেন, আপনাকে দাঁড় করিয়ে রেখেছিলুম—

ভদ্রলোক

(সহজ সুরে) তার জন্যে কি। আমি বিশেষ দুঃখিত যে আপনাকে এমিভাবে বিরক্ত করতে হ'ল।

ফ্রিট্‌স্

না, না। অনুগ্রহ ক'রে কি আপান—(তাহাকে একখানি চেয়ার দেখাইয়া দিল)

ভদ্রলোক

দেখ্‌ছি, আপনাকে সত্যিই disturb করলুম, একটু আমোদ প্রমোদ হচ্ছিল?

ফ্রিট্‌স্

এই কয়েকজন বন্ধু মিলে।

ভদ্রলোক

(চেয়ারে বসিয়া, সদ্ভাবের সহিত) কার্ণিভাল বোধ হয়?

ফ্রিট্‌স্

(লজ্জিত ভাবে) কেন?

ভদ্রলোক

না, আপনার বন্ধুদের সব মেয়েদের টুপি, মেয়েদের ম্যাণ্টল—

ফ্রিট্‌স্

হুঁ,...(হাসিয়া) বান্ধবীরাও ত আসতে পারে। (নীরবতা)

ভদ্রলোক

জীবনটা মাঝে মাঝে আমোদে ভ'রে ওঠে...নয়... (কঠোরদৃষ্টিতে ফ্রিট্‌সের প্রতি চাহিল)

ফ্রিট্‌স্

[এক নিমেষের জন্য ভদ্রলোকের দিকে চাহিয়া অন্যদিকে চাহিল] অনুগ্রহ ক'রে আপনার আগমনের কারণ জানতে পারলে বিশেষ বাধিত হব।

ভদ্রলোক

নিশ্চয়...(শান্তভাবে) আমার স্ত্রী আপনার এখানে তাঁর veilটা ভুলে ফেলে গেছেন।

ফ্রিট্‌স্

আপনার স্ত্রী? আমার এখানে?...তাঁর...(হাসিয়া) না, আপনার পরিহাস কিছু অদ্ভুত রকমের...

ভদ্রলোক

(সহসা দাঁড়াইয়া উঠিল, দৃঢ় কঠোর ভাব, মত্তের মত চেয়ারের পেছনটা হাত দিয়া দৃঢ়ভাবে ধরিল) হাঁ, সে ভুলে ফেলে গেছে।

ফ্রিট্‌স্

(উঠিয়া দাঁড়াইল, তাহারা পরস্পরের মুখোমুখি কিছু কাছাকাছি আসিয়া পড়িল)

ভদ্রলোক

(হস্ত দৃঢ়মুষ্টি করিয়া ওপরে উঠাইল, যেন সে ফ্রিট্‌স্‌কে ঘুসি মারিতে চায়—ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ স্বরে) ওঃ!

ফ্রিট্‌স্

(যেন ঘুসি এড়াইতে কয়েক পা পেছনে সরিয়া গেল)

ভদ্রলোক

(কিছুক্ষণ নীরবতার পর) এই আপনার চিঠি! (সে ওভারকোটের পকেট হইতে একতাড়া চিঠির প্যাকেট বাহির করিয়া লিখিবার টেবিলে ছুঁড়িয়া ফেলিল) আপনি যে সব চিঠি পেয়েছেন অনুগ্রহ ক'রে দেবেন কি...

ফ্রিট্‌স্

(আত্মসম্বরণ করিল)

ভদ্রলোক

(কঠোর ভাবে, নিগূঢ় অর্থের সহিত) আমি ইচ্ছা করি না যে চিঠিগুলি পরে আপনার ঘর থেকে পাওয়া যায়।

ফ্রিট্‌স্

(দৃঢ়স্বরে) কেউ তা পাবে না।

ভদ্রলোক

(তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। নীরবতা)

শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু

ফ্রিট্‌স

আর কি চান আপনি আমার কাছ থেকে ?...

ভদ্রলোক

(বিদ্রূপের স্বরে) আর কি আমি চাই ?--

ফ্রিট্‌স্

আমি আপনার disposal এ...

ভদ্রলোক

(একটু শান্ত হইয়া) বেশ—(ভদ্রলোকটি ঘরের চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, খাবারভরা সাজান টেবিল, মেয়েদের টুপি ইত্যাদি দেখিয়া তাহার মুখ ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল, যেন আর একবার সে ক্রোধে মত্ত হইয়া উঠিবে)

ফ্রিট্‌স্

(তাহা দেখিয়া আবার বলিল) আমি সম্পূর্ণরূপে আপনার disposal এ--কাল আমি বারটা পর্য্যন্ত বাড়ীতে থাকব।

ভদ্রলোক

(নত হইয়া অভিবাদন করিয়া যাইবার জন্য ঘুরিল)

(ফ্রিট্‌স্ তাহাকে দরজা পর্য্যন্ত আগাইয়া দিয়া আসিল। ভদ্রলোক চলিয়া গেলে ফ্রিট্‌স্ লিখিবার টেবিলের সম্মুখে আসিয়া এক মুহূর্ত্ত দাঁড়াইল। তারপর জানলার কাছে ছুটিয়া গিয়া পর্দ্দার ফাঁক দিয়া ভদ্রলোকটির চলন্ত মূর্ত্তি দৃঢ়দৃষ্টিতে অনুসরণ করিতে লাগিল। তারপর জানালা হইতে যেন পালাইয়া আসিয়া মেজের দিকে চাহিয়া এক সেকেণ্ড দাঁড়াইল। তারপর পাশের ঘরের দরজায় গিয়া অর্দ্ধেক খুলিয়া ডাকিল)—

ফ্রিট্‌স্

থিওডর, এক মিনিটের জন্যে এসো...

(থিওডর প্রবেশ করিল)

থিওডর

(চঞ্চল) কি...

ফ্রিট্‌স্

ও জানে।

থিওডর

না। তুমি নিশ্চয় ওর ফাঁদে পড়েছ! কি, শেষকালে confess করেছ ? তুমি একটা fool...কি বল...তুমি···

ফ্রিট্‌স

(চিঠিগুলি দেখাইয়া) ও আমার চিঠিগুলো দিয়ে গেল—

থিওডর

(বিমূঢ়ভাবে) ও !...(একটু থামিয়া) আমি সর্ব্বদা তোমায় বলেছি, কখনও চিঠিপত্তর লিখবে না।

ফ্রিট্‌স

আজ বিকেলে ও নীচে রাস্তায় ছিল।

থিওডর

আচ্ছা, তার পর কি হোলো ?—বলো !

ফ্রিট্‌স্

দেখ থিওডর, তোমাকে আমার এ কাজটি করতে হচ্ছে—

থিওডর

আমি ব্যাপারটা সব ঠিকঠাক ক'রে দিচ্ছি।

ফ্রিট্‌স্

ঠিকঠাকের আর উপায় নেই।

থিওডর

কি...

ফ্রিট্‌স্

সব চেয়ে ভাল হয়···(কথা শেষ না করিয়া) না, বেচারা মেয়েরা কতক্ষণ আটকে থাকবে।

থিওডর

আরে ওরা আরও কিছুক্ষণ থাকতে পারে, তা তুমি কি বলতে চাইছিলে ?

ফ্রিট্‌স্

সব চেয়ে ভাল হয় যদি তুমি আজ এখনই লেন্‌স্কির কাছে যাও।

থিওডর

বেশ, তুমি যদি তাই চাও।

ফ্রিট্‌স্

এখন তুমি লেন্‌স্কির দেখা পাবে না...তবে এগারোটা থেকে বারোটার মধ্যে ও নিশ্চয় কাফে-হাউসে আস্‌বে... তখন তুমি ওকে নিয়ে আমার নিকট আসতে পারো...

থিওডর

যা, অমন মুখ করিস না···এ ব্যাপারে শতকরা নিরানব্বইটাতে শেষে বিশেষ কিছুই হয় না।

ফ্রিট্‌স্

কিন্তু এ ব্যাপারটাতে একটা এস্পার কি ওস্পার হবে।

থিওডর

দেখ, গত বছরের ঘটনাটা মনে আছে, সেই ডাক্তার বিলিংগার ও হারত্‌সের মধ্যে ব্যাপারটা—সে ত ঠিক এই রকম।

ফ্রিট্‌স্

সে ছেড়ে দাও, তুমি তা জানো—কিন্তু এ, এ এক্ষুনি এই ঘরে আমাকে গুলি করতে পারলে—আ, তা' হ'লে সব চুকে যেত।

থিওডর

(প্রতিবাদ ক'রে) বা, বেশ! ব্যাপারটা বেশ বুঝেছ বটে…আর আমরা, লেন্‌স্কি আর আমি, আমরা কিছু নই? তুমি কি ভাব আমরা এ হ'তে দেব?

ফ্রিট্‌স্

থিওডর, ও সব কথা ছাড়ো!…তারা যা চাইবে তোমাদর তাই স্বীকার করতে হবে।

থিওডর

ও!—

ফ্রিট্‌স্

তা হ'লে কি থিওডর। তা তুমি যদি না ইচ্ছে কর।

থিওডর

ননসেন্স! দেখ, আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে ভাগ্য…

ফ্রিট্‌স্

(থিওডরের কথা না শুনে) হাঁ, তার এই ভয় আগেই হয়েছিল…আমরা দু'জনেই এই ভয় করেছি…আমরা জানতুম এই রকম হবে…

থিওডর

যা তা বল্‌ছিস্ ফ্রিট্‌স্।

ফ্রিট্‌স্

(লিখিবার টেবিলে গেল, চিঠিগুলি ভিতরে রাখিয়া দিল) সে এখন এই মুহূর্ত্তে কি করছে কে জানে। তার স্বামী যদি তাকে…থিওডর.. তুমি কাল নিশ্চয় খবর আনবে ওখানে কি হ'ল।

থিওডর

আমি চেষ্টা করব।

ফ্রিট্‌স্

আর দেখো, অকারণে কোন দেরী করা যেন না হয়।

থিওডর

পরশুদিনের আগে কিছু হ'তে পারে না।

ফ্রিটস্

(উদ্বিগ্নভাবে) থিওডর!

থিওডর

না, দ'মে যেয়ো না—সাহস কর!—দেখ, মনের ভেতরে জোর দরকার—আর আমার ত বেশ মনে হচ্ছে, সব ভালয় ভালয় কেটে যাবে…আমি জানিনা কেন, কিন্তু আমার এই মনে হচ্ছে।

ফ্রিট্‌স্

(হাসিয়া) তুমি বাস্তবিকই বন্ধু!—কিন্তু মেয়েদের কি বল্‌বে?

থিওডর

যা হয় একটা কিছু, ওদের এখন পাঠিয়ে দেওয়া যাক।

ফ্রিট্‌স্

না। আজ আমরা খুব ফুর্ত্তি করব। ক্রিসটিনে যেন কোন রকম কিছু না ভাবে। আমি পিয়ানোতে বসছি, তুমি ওদের ডাক। তুমি ওদের কি বলবে?

থিওডর

বলব, ওদের জানার কিছু দরকার নেই।

ফ্রিট্‌স্

(পিয়ানো বাজাইতে বসিয়াছিল, ঘুরিয়া বলিল) না, না,—

থিওডর

বলবে, এক বন্ধু তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল।

ফ্রিট্‌স্

(পিয়ানো বাজাইতে লাগিল)

থিওডর

(দরজা খুলিয়া) অনুগ্রহ ক'রে তোমরা এবার—

(মিত্‌সি ও ক্রিস্‌টিনের প্রবেশ)

মিত্‌সি

যাক্! চ'লে গেছে?

শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু

ক্রিস্‌টিনে

(ফ্রিট্‌সের নিকট ছুটিয়া আসিয়া) কে এসেছিল, ফ্রিট্‌স্? কে?

ফ্রিট্‌স্

(পিয়ানো বাজাইতে বাজাইতে) আবার তোমার সব জানতে হবে, কি curious!

ক্রিস্‌টিনে

ফ্রিট্‌স্, তোমাকে অনুরোধ করছি, বল বল।

ফ্রিট্‌স্

দেখ, তোমায় বলবার জো নেই, এমন লোকেদের সঙ্গে ব্যাপার, যাদের তুমি মোটেই জান না।

ক্রিস্‌টিনে

(অনুনয়ের সুরে) না, আমায় সত্যিকথা বল ফ্রিট্‌স্।

থিওডর

ওকে খুব জ্বালাচ্ছ ত...

মিত্‌সি

ক্রিস্‌টিন, অবুঝ হস না। কেন আর বার বার জিজ্ঞেস করছিস,—ও ভাবছে ওকে খুব না সাধলে!—

থিওডর

আমাদের নাচটা শেষ হয়নি (থিয়াটারের ক্লাউনের সুরে) অনুগ্রহ ক'রে বাজাবেন কি মিষ্টার কাপেলমাইষ্টার—একটা নাচের গান।

ফ্রিট্‌স্

(পিয়ানো বাজাইতে লাগিল)

(থিওডর ও মিত্‌সি নাচিতে লাগিল। একটু নাচার পর)

মিত্‌সি

আমি আর পারছি না! (সে এক চেয়ারে বসিয়া পড়িল)

থিওডর

(তাহাকে চুম্বন দিয়া তাহার পাশে চেয়ারের হাতের ওপর বসিয়া পড়িল)

ফ্রিট্‌স

(পিয়ানোর টুলে বসিয়া ক্রিস্‌টিনের দুটি হাত ধরিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিল)

ক্রিস্‌টিনে

(যেন জাগিয়া উঠিয়া) কি তুমি আর বাজাচ্ছ না?

ফ্রিট্‌স্

(হাসিয়া) আজকের মত যথেষ্ট...

ক্রিস্‌টিনে

জানো, আমার ভারি পিয়ানো বাজাতে ইচ্ছে করে...

ফ্রিট্‌স্

তুমি খুব বাজাও?

ক্রিস্‌টিনে

আমার সময় কোথায়—বাড়ীতে এত কাজ, আর তা ছাড়া আমাদের পিয়ানোটা যা খারাপ।

ফ্রিট্‌স্

আমি একবার তোমার পিয়ানো বাজাতে চাই। হাঁ, তোমার ঘরটি দেখতে আমার এত ইচ্ছে করছে, কেমন সে ঘর।

ক্রিস্‌টিনে

(হাসিয়া) তোমার ঘরের মত এত সুন্দর নয়।

ফ্রিট্‌স্

তা হ'লেও, সে ঘরটি দেখতে বড় ইচ্ছে করছে। আর তুমি এক সময় তোমার সব কথা বলবে...অনেক কথা... আমি তোমার কথা এত কম জানি।

ক্রিস্‌টিনে

আমার বিষয় কিছুই বিশেষ বলবার নেই—আমার জীবনে কোন রহস্য গোপন নেই—যেমন আর সবাইর সাধারণ জীবন—

ফ্রিট্‌স্

আচ্ছা, আমার আগে কখনও আর কাকেও ভাল বাসনি?

ক্রিস্‌টিনে

(ফ্রিট্‌সের মুখে চাহিল)

ফ্রিট্‌স্

(তাহার হাত চুম্বন করিল)

ক্রিস্‌টিনে

আর, পরেও আর কাকেও ভালবাসব না।

ফ্রিট্‌স্

(সহসা বেদনাময় ভঙ্গীতে) ও কথা বোলোনা...বোলোনা, তুমি কি জান?...তোমার বাবাকে খুব ভালবাসো, ক্রিসটিন্?—

ক্রিস্‌টিনে

ও!—আগে তাঁকে আমি আমার সব কথা বলতুম—

ফ্রিট্‌স্

না, তার জন্যে নিজেকে দোষ দিও না—মানুষের জীবনে এরকম ত ঘটেই—সে কথা সে নিজের মনের মধ্যে লুকিয়ে রাখতে চায়—এই রকম জীবনের স্রোত—

ক্রিস্‌টিনে

আমি যদি শুধু জানি যে আমাকে তোমার ভাল লাগে—তা হ'লেই সব ভাল।

ফ্রিট্‌স্

তুমি জাননা কি?

ক্রিস্‌টিনে

তুমি যদি সব সময় আমার সঙ্গে এম্নি ভাবে এম্নি সুরে গল্প কর, হাঁ, তা হ'লে—

ফ্রিট্‌স্

ক্রিস্‌টিন্—তোমার বসতে বড় অসুবিধে হচ্ছে।

ক্রিস্‌টিনে

না না, আমি বেশ আছি (ক্রিস্‌টিনে পিয়ানোর ওপর তাহার মাথা ঠেকাইয়া বসিল। ফ্রিট্‌স্ দাঁড়াইয়া উঠিয়া ক্রিস্‌টিনের চুলগুলির ভিতর দিয়া আঙুল চালাইয়া মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল)

ক্রিস্‌টিনে

আ! বেশ!

(ঘর নিস্তব্ধ)

থিওডর

ফ্রিট্‌স্, সিগারেট আছে?

ফ্রিট্‌স্

(থিওডর সাইড্‌বোর্ডে সিগারেট খুঁজিতেছিল, ফ্রিট্‌স্ তাহার কাছে আসিল, তাহাকে এক বাক্স সিগারেট দিল) আর কালো কফি?

(দুই কাপে কফি ঢালিল)

মিত্‌সি

(ঘুমাইয়া পড়িয়াছে)

থিওডর

কি, তোমার এক কাপ কালো কফি চাই?

ফ্রিট্‌স্

মিত্‌সি—তোমার জন্যে এক কাপ…

থিওডর

ও, থাক ঘুমুক…কিন্তু তুমি আজ কফি খেয়োনা—তুমি আজ সকাল সকাল শোবে, আর ভাল ঘুম হওয়া দরকার।

ফ্রিট্‌স্

(থিওডরের দিকে চাহিয়া ব্যঙ্গের ভঙ্গীতে হাসিল)

থিওডর

না, দেখ, অবুঝ হোয়োনা, সত্যি কি ব্যাপার বুঝছ ত…

ফ্রিট্‌স্

দেখ আজ রাতেই লেন্‌স্কির কাছে যাও, তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো।

থিওডর

ননসেন্স! আজ রাতেই? কাল গেলে খুব হবে।

ফ্রিট্‌স্

আমি তোমায় অনুরোধ করছি—

থিওডর

আচ্ছা, আচ্ছা…

ফ্রিট্‌স্

মেয়েদের বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে আসবে নাকি?

থিওডর

হুঁ, আচ্ছা…মিত্‌সি! ওঠ, ওঠ!—

মিত্‌সি

তোমরা ত বেশ কালো কফি খেলে—! আমায় একটু দাও!—

থিওডর

এই নাও, মিত্‌সি…

ফ্রিট্‌স্

(ক্রিস্‌টিনের প্রতি ঘুরিয়া) কি, ক্লান্ত ম'নে হচ্ছে? ক্রিস্‌টিনে…

ক্রিস্‌টিনে

তুমি যখন ওই রকম ক'রে বল, আমার কী ভাল লাগে।

শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু

ফ্রিট্‌স্

বড় ক্লান্ত ?

ক্রিস্‌টিনে

(হাসিয়া) —মদ খেয়ে—একটু মাথাও ধরেছে···

ফ্রিট্‌স্

ও, বাইরে খোলা বাতাসে গেলেই সেরে যাবে!

ক্রিস্‌টিনে

আমরা এখনি যাবো ?—তুমি আমাদের সঙ্গে আস্‌ছ ?

ফ্রিট্‌স্

না, ক্রিস্‌টিন। আমি বাড়ীতে থাকছি,...দেখো, কিছু কাজ রয়েছে।

ক্রিস্‌টিনে

(পূর্ব্ব ঘটনা স্মরণ করিয়া) এখন...এখন তোমার কি কাজ ?

ফ্রিট্‌স্

(সামান্য একটু কড়া সুরে) দেখ, ক্রিসটিন্, তোমার এ অভ্যাস ছাড়তে হবে!—(স্নিগ্ধসুরে) দেখ, বড় ক্লান্ত মনে হচ্ছে···আজ আমি আর থিওডর বাইরে মাঠে দু'ঘণ্টা দোড়াদৌড়ি করেছি—

থিওডর

ও সে কি সুন্দর—আসছে বার সবাই একসঙ্গে সহরের বাইরে বেড়াতে যাবো।

মিত্‌সি

হাঁ, চমৎকার হবে! আর তোমরা ইউনিফর্ম প'রে আসবে।

থিওডর

হাঁ, সেটা তোমার প্রকৃতি-উপভোগের অঙ্গ হবে।

ক্রিস্‌টিনে

আবার কবে দেখা হবে ?

ফ্রিট্‌স্

(একটু বিচলিত) আমি তোমায় শীগগির লিখে জানাব।

ক্রিস্‌টিনে

(বিষণ্ণভাবে) আচ্ছা, এখন আসি। (চলিয়া যাইবার জন্য ঘুরিল)

ফ্রিট্‌স্

(তাহার বিষণ্ণতা দেখিয়া) কাল তোমার সঙ্গে দেখা করবো, ক্রিস্‌টিন্।

ক্রিস্‌টিনে

(আনন্দিতা) সত্যি ?

ফ্রিট্‌স্

হাঁ, বাগানে...সেই লাইনের কাছে আমাদের জায়গায়... ধরো, ছ'টার সময়···কেমন ? তোমার কোন অসুবিধে হবে না ?

ক্রিস্‌টিনে

(ঘাড় নাড়িল)

মিত্‌সি

(ফ্রিট্‌সের প্রতি) ফ্রিট্‌স্, আমাদের সঙ্গে আসছো ?

থিওডর

'তুমি' বলবার তোমার ক্ষমতা আছে দেখছি।

ফ্রিট্‌স্

না, আমি বাড়ীতে থাকছি।

মিত্‌সি

তোমার দিব্যি মজা! আর আমাদের কতদুর যেতে হবে···

ফ্রিট্‌স্

মিত্‌সি, অতবড় সুন্দর কেকটার প্রায় সমস্তই যে প'ড়ে রইল। রোসো, কেকটা একটা কাগজে মুড়ে দিচ্ছি—কেমন ?

মিত্‌সি

(থিওডরের প্রতি) রীতিবিরুদ্ধ ?

ফ্রিট্‌স্

(কেকটি প্যাক করিয়া দিল)

ক্রিস্‌টিনে

তুমি একেবারে ছেলে মানুষ...

মিত্‌সি

(ফ্রিট্‌সের প্রতি) থামো, বাতিগুলো নিবিয়ে যাই। (বাতিগুলি ফুঁ দিয়া নিবাইয়া দিল, কেবল লিখিবার টেবিলের ওপর একটি বাতি জ্বলিতে লাগিল)

ক্রিস্‌টিনে

তোমার জানলা খুলে দেব? ঘরটা যা গরম। (জানালা খুলিল, সম্মুখের বাড়িটির দিকে চাহিল)

ফ্রিট্‌স্‌

আচ্ছা, বন্ধুরা, দাঁড়াও, পথে আলো ধরছি।

মিত্‌সি

এর মধ্যে সিঁড়ির আলো নেভানো?

থিওডর

নিশ্চয়ই।

ক্রিস্‌টিনে

আঃ কি সুন্দর বাতাস, কি মিষ্টি বাতাস আসছে!

মিত্‌সি

বসন্তের বাতাস...(দরজার নিকট ফ্রিট্‌স্‌ বাতি হাতে দাঁড়াইয়া) আচ্ছা, তোমার এই সাদর নিমন্ত্রণের জন্যে আমাদের অশেষ ধন্যবাদ!—

থিওডর

(তাহাকে ঠেলিয়া) চলো, চলো...চলো...

(ফ্রিট্‌স্‌ সকলের সঙ্গে বাহিরে চলিয়া গেল। ঘরের খোলা দরজা দিয়া বাহিরের লোকদের কথাবার্তা শোনা যাইতে লাগিল)

মিত্‌সি

আচ্ছা, বেশ!

থিওডর

সাবধান, এখানে সিঁড়ি।

মিত্‌সি

কেকটির জন্য অশেষ ধন্যবাদ...

থিওডর

চুপ, বাড়িশুদ্ধ জাগিয়ে তুলে চলেছ!

ক্রিস্‌টিনে

গুটে নাখ্‌ট্‌!

থিওডর

গুটে নাখ্‌ট্‌!

(ফ্রিট্‌স্‌ তাহার ঘরের প্রবেশের দরজা বন্ধ করিল, চাবি দিল, তাহার শব্দ শোনা গেল। সে যখন আবার ঘরে প্রবেশ করিল, টেবিলের ওপর বাতি রাখিল, তলার বড় দরজা খোলা ও বন্ধের শব্দ শোনা গেল)

ফ্রিট্‌স্‌

(জানালায় গিয়া দাঁড়াইল এবং তলায় বন্ধুদের বিদায় সম্ভাষণ জানাইল)

ক্রিস্‌টিনে

(রাস্তা হইতে) গুটে নাখ্‌ট্‌।

মিত্‌সি

(আনন্দ উচ্ছ্বসিতা) 'গুটে নাখ্‌ট্‌, যাদু ছেলে'...

থিওডর

(বকুনি দিয়া) মিত্‌সি!

(তাহাদের কথাবার্তা, তাহাদের হাসি তাহাদের পদধ্বনি—সকল মৃদুশব্দ জানালা দিয়া ভাসিয়া আসিতে লাগিল। সবশেষে শোনা যাইতে লাগিল থিওডর 'ডপেল আডলারের' সুরটি শিশ দিয়া বাজাইতেছে; তাহাও ক্ষীণ হইয়া মিলাইয়া গেল। ফ্রিট্‌স কয়েক সেকেণ্ড বাহিরের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর জানলার পাশে বড় চেয়ারে বসিয়া পড়িল।)

যবনিকা পতন

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

নারী

শ্রীজ্যোতির্ম্ময় দাসগুপ্ত

আজকাল মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলিতে নারী-বিষয়ক প্রবন্ধের খুব প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়, সুখের বিষয় অধিকাংশ প্রবন্ধই মেয়েদের লেখা। এই নারীজাগরণ ও নারীস্বাধীনতার যুগে নারীরা নিজেদের নিজেরা চালাইবেন, নিজেদের কথা নিজেরাই বলিবেন ইহাই বাঞ্ছনীয়। তাঁহাদের এই আত্মনিয়ন্ত্রণের চেষ্টা আমরা মুগ্ধ প্রশংসমান দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহাদের কল্যাণপ্রচেষ্টায় সহানুভূতি প্রদর্শন করি, ইহাই সঙ্গত। এই নারীজাগরণের স্রোত যুবকদের মধ্যেও চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিয়াছে দেখিতে পাইতেছি। সাহিত্যসভা তর্কসভা প্রভৃতিতেও দেখিতেছি যুবকেরা নারীর কর্ম্মক্ষেত্রের পরিধি সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন—তবে নারীদের ঘাড়ে মতামত চাপাইবার চেষ্টা না করিয়া নিজেদের মধ্যে এ সব আলোচনা ভাল, কারণ তাহাতে নিজেদের স্বার্থহীন হইয়া বিচার করিবার ক্ষমতার প্রসার হইয়া থাকে।

বর্ত্তমান যুগ হইতেছে আত্মনিয়ন্ত্রণের যুগ। ছোট বড় কেহই বলিতে ছাড়ে না, self-determination is our birth right। কাজেই বর্ত্তমানে পুরুষদের উচিত নারীদের আত্মনিয়ন্ত্রণের পথ মুক্ত করিয়া দেওয়া—এবং তাঁহারা যখন নারীর কথা বলেন তখন সে সম্বন্ধে নির্ব্বাক থাকা। তবে কেহ যদি নারীর কথা বলিতে গিয়া পুরুষ ও নারীর কথা আলোচনা করেন তখন পুরুষদেরও সে সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করা উচিত বলিয়া মনে হয়, কারণ তাহা হইলে পরস্পরের পরস্পরকে দেখিবার দৃষ্টি সহজ ও স্বচ্ছতর হইয়া উঠিবে।

গত আষাঢ়ের বিচিত্রায় শ্রীমতী আশালতা দেবী নারী-বিষয়ক একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি বস্তুত পুরুষ ও নারী সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন এবং অনেক গুরুতর কথার অবতারণা করিয়াছেন। কিন্তু প্রবন্ধে স্বচ্ছতার অভাববশত বক্তব্য বিষয় ভাল করিয়া বুঝাইয়া বলিতে পারেন নাই। মনে হয়, চিন্তা গুলি ভাল করিয়া দানা বাঁধিবার পূর্ব্বেই প্রবন্ধ লেখা হইয়াছে এবং তজ্জন্যই তাহাতে উপরোক্ত দোষ ঘটিয়াছে।

প্রবন্ধের প্রথমেই তিনি মেয়েদের charm ও coquetry সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলিয়াছিলেন যে, মেয়েদের coquetry কখনও তাহাদের charm নয়। কিন্তু লেখিকা বলিতেছেন charm coquetry ছাড়া অন্য কিছু নয়। এখানে অনেকেই বোধ হয় লেখিকার সহিত একমত হইবেন না। আমার মনে হয় যেখানে coquetry নাই সেখানেও মেয়েরা charmful, এবং coquetry বাদ দিয়া যখন মেয়েরা স্বাভাবিক শ্রীমণ্ডিত হইয়া কাছে আসেন তখনও নারীলাবণ্য পুরুষের কর্ম্মশক্তির উপর কম কার্য্যকরী নয়। তিনি বলিতে চান, নারী ও পুরুষ যখন পরস্পরের সান্নিধ্যে আসিয়াছে তখন সেখানে তাহারা নিজেদের সত্তা মধুর ভাবে প্রকাশ করিতে চাহে—অতি সত্য কথা, এবং ইহারই ফলে coquetryর জন্মলাভ। কিন্তু ইহাই যে হ্লাদিনী শক্তির মূল রহস্য, যুক্তি দিয়া বিচার করিলে তাহা ত মনে হয় না। ছোট ছোট ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি ব্যবহার দেখিলে মনে হয় যে, নর নারীর পরস্পরের উপর যে charm তাহাকে instinct বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তিন চারিটি ক্রীড়ারত ছোট ছেলেদের মধ্যে যদি সমবয়স্ক একটি বালিকা আসিয়া দাঁড়ায়, যাহারা কেহই chivalry বা নারীত্ব কোনটা সম্বন্ধেই বিশেষ সচেতন নয়, তাহা হইলে দেখা যায় যে, বালিকাটির সুদৃষ্টিতে পড়িবার জন্য বালকদের মধ্যে একটু প্রতিযোগিতার ভাব উপস্থিত হইয়াছে, এবং বালিকাটির যে আকর্ষণী শক্তি আছে ইহা অস্বীকার করা যায় না। ইহার সহিত

coquetryর কোন সম্বন্ধ নাই। এই স্বাভাবিক আকর্ষণই charmএর মূল রহস্য। এই প্রাকৃতিক আকর্ষণের মূল ভিত্তি কি, তাহা ফ্রয়েড যৌন আকর্ষণের দিক দিয়া বিশ্লেষণ করিয়াছেন। আমারও মনে হয় প্রকৃতিদেবী সৃষ্টিরক্ষার জন্য যে যৌনমিলনের আকাঙ্ক্ষা স্ত্রী পুরুষের মধ্যে দিয়াছেন এবং তদুপরি যে দৈহিক ও মানসিক পার্থক্য দিয়া সেই মিলনাকাঙ্ক্ষাকে তীব্রতর করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, সেই যৌন আকর্ষণই charmএর মূল ভিত্তি। দৈহিক ও প্রকৃতি-গত বৈষম্য রহিয়াছে বলিয়াই পুরুষ মনে করে নারীর চারিদিকে একটা রহস্যের আবরণ রহিয়াছে যাহা ছিন্ন করিয়া নারীকে পুরুষের পাইতে হইবে; এবং নারীও মনে করে পুরুষের খামখেয়ালী মনের স্বরূপনির্ণয়ের জন্য তাহাকে ভাল করিয়া বিশ্লেষণ করিয়া তাহার মনের অন্তঃস্থল দেখিতে হইবে। এই charm-এর মধ্যে খানিকটা কৌতূহলপ্রবৃত্তি খানিকটা সভ্যতার সহচরী কল্পনার বিকার এবং বাকী সমস্তটাই প্রাকৃতিক যৌন আকর্ষণ। এই প্রাকৃতিক যৌন আকর্ষণকে মানসলোকের অবচেতন অবস্থার যৌন আকর্ষণ বলিয়া মানিয়া লওয়া যায়। সোজা কথায় charmই হইতেছে পরস্পরকে পরস্পরের নিকট মধুর ভাবে ব্যক্ত করিবার প্রচেষ্টার মূল, ব্যক্ত করিবার চেষ্টাটা ও তজ্জন্য coquetryর ছলাকলার আশ্রয় লওয়া হইতেছে—ফল। লেখিকা মূল এবং ফল (cause ও effect) উভয়কে এক মনে করিয়া ভুল করিয়াছেন।

Coquetry সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিতে চাহি না, তবে লেখিকা এক স্থানে দৃঢ় ভাবে বলিয়াছেন "যদি সে কোথাও বিদ্যুদ্দাম কটাক্ষের মধ্যে একটু অধিক তীব্রতা থাকে, কেশ-পাশের সৌরভ স্বাভাবিক মৃদুতাকে অতিক্রম ক'রে যায়, বসনপ্রান্তের যতটুকু বায়ুভরে বিচ্যুত হ'লে সহজ হ'য়ে প্রকাশ পেত তার চেয়েও স্খলিত হ'য়ে পড়ে, তাতে কি হয়েছে?" তাতে কি হয়েছে বা কি হয় তার উত্তর হঠাৎ দেওয়া শক্ত, তবে সে খসিয়া-পড়া আঁচল গলায় বাঁধিয়া অনেকে যে আত্মহত্যা পর্য্যন্ত করে এইরূপ শোনা গিয়াছে—ইহাতেই আপত্তি। লেখিকা coquettish মেয়েদের পক্ষ লইয়া coquetryর যতই মহিমাকীর্ত্তন করুন না কেন—তাহাতে coquetryকে অনেকে যে সুনজরে দেখিবেন ইহাত মনে হয় না। আমার মনে হয় coquetry জিনিষটা cultureএর বিরোধী। মনের সুস্থ স্বাভাবিক অবস্থা থাকিলে পুরুষেরা কখনই লেখিকার মতে মত দিয়া বলিতে পারিবে না যে, coquetryর ছলনা তাহাদের জীবনে একটা মস্ত বড় "প্রাপ্তি", এবং নারীজাতির পুরুষকে ওটা একটা মস্ত বড় "দান"। Coquetry যে নারীর মাধুর্য্যবিকাশের একটা প্রধান লক্ষণ ইহাও মন মানিতে চাহিতেছে না। Coquetryর ভিতর নিজেকে বাহ্যত সুন্দরতর ও মোহময় করিয়া অপরের চিত্ত আকর্ষণ করিবার প্রচেষ্টা আছে সত্য কথা, কিন্তু তাহাতে নারীর অন্তর্লোকের মাধুর্য্য ও সৌন্দর্য্য তাহাকে পুরুষের নিকট মহনীয় ও বরণীয় করিয়া তোলে, বা তাহার কোন প্রকাশের পরিচয় আছে, ইহা স্বীকার করি না। তবে নারীর নারীত্বের শ্রেষ্ঠ বিকাশ কিসে হয় এবং কিসে হয় না তাহা নারীরাই ভাল বলিতে পারিবেন;—আর সত্যকথা বলিতে কি নারীত্ব কথাটার অর্থ সব সময় ভাল করিয়া বোধগম্য হয় না বলিয়াই বোধ হয় নারীত্বের বিকাশের সহিত coquetryর সম্বন্ধবিচার ভাল করিয়া করিতে পারিলাম না। সাহিত্যে নারীত্ব কথাটার এত বেশী প্রচলন হইতেছে যে, মনে হয় নারীত্বের সংজ্ঞা নির্ণয়ের সময় আসিয়াছে, এবং বিদুষী নারীদের মধ্যে কেহ এই ভারটা লইলে পুরুষদের পক্ষে ও জিনিষটা বুঝিবার সুবিধা হয়।

ইহার পর লেখিকা এক স্থানে বলিতেছেন, "তরুণ তরুণী যখন একত্র হয় তখন তাদের বক্ষঃস্পন্দন এত দ্রুত হ'য়ে ওঠে, তাদের ভিতর এমন প্রবলতার সৃষ্টি হয় যে, কোথায় গিয়ে তারা থামবে, তাদের পরস্পরের মানস-সৌন্দর্য্যকে উত্তেজিত করবার চেষ্টা কতদূর নিয়ে গিয়ে নিরস্ত করতে হবে—এসব কি স্পষ্ট ক'রে স্মরণ থাকে? এই খানেই হয়ত একটু ভাববার রয়েছে।" ভাবে মনে হয় সত্য সত্যই যে এখানে ভাবিবার কিছু আছে সে সম্বন্ধে বিদুষী লেখিকা স্থির-নিশ্চয়া নহেন। যদি বা ভাবিবার কিছু থাকে তাহাও "একটু", বেশী নয়। তরুণ তরুণীর একত্র হইয়া পরস্পর পরস্পরের মানস-সৌন্দর্য্যকে উত্তেজিত করিবার প্রথাটা অবশ্য এদেশে কম। লেখিকা বিদুষী; দেশ বিদেশের সংবাদ

শ্রীজ্যোতির্ম্ময় দাসগুপ্ত

খবর রাখেন সন্দেহ নাই এবং কিছুদিন পূর্ব্বে বিলাতের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে তরুণ তরুণীদের কলেজের সময়ে অবাধ মেলামেশা সম্বন্ধে যে নিষেধাজ্ঞা প্রচার হইয়াছে তাহা জানেন বোধ হয়। ব্ল্যাকপুল প্রভৃতি সমুদ্রতীরে ছুটির দিনে যে জঘন্য দৃশ্য দেখা যায় তাহার খবর রাখেন কি? কাজেই ভাবিবার যে যথেষ্ট আছে ইহা অস্বীকার করা যায় না। যে সমাজে তরুণ তরুণীরা একত্র হইয়া পরস্পর মানস-সৌন্দর্য্য উত্তেজিত করে সেখানে সে-সব দেশে যে সামাজিক বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে তাহার সংবাদ ঐ আষাঢ়ের "বিচিত্রা"তেই শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায়ের লেখায় পাইবেন।

তৎপরে লেখিকা বলিয়াছেন, "Traditional moralityর উপর আমার স্পৃহা একেবারেই নাই—।" কোনো বিষয়ে তাঁহার স্পৃহা না থাকিলে তাহাতে অবশ্য প্রতিবাদের কিছু নাই; কোনও বিষয়-বিশেষে প্রচলিত মত অপেক্ষা তাঁহার ভিন্নতর মত থাকিতে পারে,—ইহাতেও বলিবার কিছু নাই। আর J. S. Mill ত বলিয়া গিয়াছেন—The whole mankind is not justified in silencing that man। সুতরাং আমি একা তাঁহাকে চুপ করাইবার চেষ্টা করিব না। তবে traditional moralityর স্থান artistic temperament কিরূপে গ্রহণ করিতে পারে তাহা ভাল বোধগম্য হয় না। এবং প্রকৃতই পারে কিনা সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। অবশ্য artistic temperament কি, সেটা তিনি বুঝাইয়া বলিতে পারেন নাই। বলাও শক্ত। প্রথমত art জিনিষটা কি তাহাই আমাদের মত সাধারণ অল্পশিক্ষিত লোকের সহজে বোধগম্য হয় না—তারপর artistic temperament কোন পথ দিয়া চলিবে বোঝা খুবই শক্ত। যেদিক দিয়া তিনি ইহার অর্থ বুঝিতে চাহিয়াছেন সেদিক দিয়া সবাই বুঝিবেন কিনা সন্দেহ। লেখিকা artistic temperament কি পদার্থ বুঝাইয়া বলিতে পারেন নাই অথচ তাহাকে traditional moralityর স্থানে বসাইতে চাহিয়াছেন। এইখান হইতে কিছুদূর পর্য্যন্ত লেখিকা তাঁহার প্রবন্ধকে শুধু দুর্ব্বোধ্য নয়, প্রায় অবোধ্য করিয়া তুলিয়াছেন। এইখানে আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, "সৌন্দর্য্যের সঙ্গতি-বোধ" মনের ভিতর কতক্ষণ কাজ করে? তরুণ তরুণীর মানস-লোকের সৌন্দর্য্য উত্তেজিত করিবার সময় সে সঙ্গতি-বোধ কয়জনকে শেষ পর্য্যন্ত রক্ষা করিবে? আবেগকে traditional moralityই সংযত বেশী করে, না artistic temperament বেশী সংযত করে? এইখানে Emersonএর একটা কথা লেখিকাকে ভাবিয়া দেখিতে বলি। একস্থানে Emerson লিখিয়াছেন, "Those who are esteemed umpires of taste are persons who have acquired some knowledge of admired pictures or sculptures *and have an inclination for whatever is elegant*; but if you inquire whether they are beautiful souls, and whether their own acts are like fair pictures you learn that they are selfish and sensual." তবে লেখিকার artistic temperamentএর সংজ্ঞাবোধ অন্যরূপ হইলে তাঁহার নিকট ইহা অবান্তর মনে হইতে পারে।

তারপর লেখিকা হঠাৎ বলিয়া বসিলেন যে, "concubinage জিনিষটা পৃথিবীর সর্ব্বত্র সর্ব্বকালেই রয়েছে কিন্তু এখন আমাদের দৃষ্টিতে কেমন একটা অশ্রদ্ধা ঘনিয়ে এসেছে।" সেকালে যে concubinageএর উপর লোকের শ্রদ্ধা ছিল ইহা লেখিকা হঠাৎ আবিষ্কার করিলেন কিরূপে, স্থির বুঝা যায় না। সেকালের রাজনৈতিক ইতিহাসই ভাল পাওয়া যায় না, সামাজিক ইতিহাস ত দূরের কথা। যে টুকু পাওয়া যায় তাহার ওপর কোন আস্থা না করাই উচিত। আমাদের পুরুষশক্তিকে জাগ্রত করিবার জন্য মেয়েদের যে সাহায্য দরকার, concubinage দ্বারা তাহা সুসম্পন্ন হয় বলিলে পুরুষ জাতির মনোবৃত্তির উপর যথেষ্ট অবিচার করা হয়। Illicit loveএর কথায় রোমান যুগের যে নজির উদ্ধৃত করিয়াছেন জিজ্ঞাসা করি তাহা কোন সময়ের—রোমানরা যখন সভ্যতার এক এক ধাপ উপরে উঠিতে ছিলেন তখনকার, না যখন তাহাদের অবনতির অবরোহণ সুরু হইয়াছিল তখনকার? Illicit love রোমান সভ্যতার উন্নতিপথের সহায়ক হইয়াছিল—না তাহার অবনতির শনিরূপে আসিয়াছিল? আমাদের দেশেও ত concubinage সেদিন পর্য্যন্ত ছিল,

একটু অবস্থাপন্নের ঘরে বিশেষ ভাবেই; কিন্তু তাহা যে পুরুষের কর্ম্মশক্তিকে জাগ্রত রাখিতে পারিয়াছিল তাহা ত মনে হয় না বরং বিপরীতই মনে হয়। যে নারীশক্তি পুরুষের কর্ম্মশক্তিকে উদ্বোধিত করে, লেখিকা তাহার সহিত concubinageএর খিচুড়ি করিতে চাহিয়াছেন কি উদ্দেশ্যে তাহা ত বুঝিলাম না। পাশ্চাত্য সমাজে পুরুষ নারীকে প্রকৃত সহকর্ম্মিণীরূপে পায় এবং এইরূপে পায় বলিয়াই তাহাদের নিকট হইতে কর্ম্মের অনুপ্রেরণা পায়। এদেশে নারীদের সহধর্ম্মিণী বা সহকর্ম্মিণী রূপে পাওয়া শক্ত। Tolstoyএর সাহিত্যজীবনে তাঁহার স্ত্রী সে ভাবে তাঁহাকে সাহায্য করিতেন। Madame Curie তাঁহার স্বামীর বৈজ্ঞানিক প্রতিভাকে কিরূপ চালনা করিতেন, তাহা বোধ হয় অনেকেই জানেন। ও দেশে সাধারণ ভাবে সমস্ত ক্ষেত্রে পুরুষ নারীর সাহচর্য্য লাভ করে বলিয়াই পুরুষের কর্ম্মশক্তি অতিশয় স্ফূর্ত্তি পায়। কিন্তু traditional moralityর সংস্কারমুক্তা বিদুষী লেখিকা কি কারণে concubinageএর স্বপক্ষে যুক্তি প্রকাশ করিলেন তাহা বুঝিতে পারিলাম না।

লেখিকা প্রবন্ধের শেষ ভাগে যাহা লিখিয়াছেন সে কথাগুলি সত্য সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহার সহিত তাঁহার পূর্ব্বেকার মতের কোন সঙ্গতি নাই। "প্রেমের সর্ব্বাঙ্গীন পূর্ণতার জন্য প্রেমই যথেষ্ট নয়"—ঠিক কথা; এবং এই কারণেই traditional moralityর উপর লোকের স্পৃহা থাকা দরকার। যাঁহারা সৌন্দর্য্যসৃষ্টি ও artistic temperament প্রকাশের জন্য ব্যস্ত তাঁহাদের সম্বন্ধে আমার মনে হয় Emersonএর ঐ উক্তি প্রযোজ্য। সুন্দরের সত্য শিব মূর্ত্তি coquetryর ছলনায় বা concubinageএর আঁচলে পাওয়া যাইবে কি? যে সৌন্দর্য্যে সত্য ও শিব নাই সেখানে ক্ষণিকের মোহজাল থাকিতে পারে বটে, কিন্তু প্রকৃত সৌন্দর্য্যসৃষ্টির স্থান সেখানে নাই।

মরণে

সোহানী মোহাম্মদ রিয়াজউদ্দিন চৌধুরী

বেদনা-কাতর দুটি নয়নের পাতে
ধীরে ধীরে নেমে আসে মৃত্যু-যবনিকা।
আঁখিজলে ধুয়ে যায় তব রূপ-শিখা,
শ্রবণ বধির হ'ল তারি বেদনাতে।
হৃদয়-স্পন্দন ধীরে থেমে আসে, হাতে
তোমারে ধরিতে তবু দেখি মরীচিকা!
অনাগত হাতছানি দেয় বিমানিকা,—
আজ রাতে যাত্রাশেষ...যাত্রা পুনঃ প্রাতে।
কে বলে মরিবে নর? মরে নাই কভু,
মৃত্যু তার জন্ম-পথে—ভেবে সারা তবু।
মৃত্যু সে তো তুচ্ছ কথা বুঝিবে কি মন?
নিয়তির ভাঙা-গড়া সৃষ্টির বিধান।
মরণপরশে লাভ অনন্ত জীবন,
হোক না আজিকে মোর আয়ুর নিদান!

পাতিয়ালা-রাজধানী

শ্রীহরিহর শেঠ

অমৃতসর হইতে রাজপুরায় গাড়ী বদল করিয়া পাতিয়ালা যাইতে হয়। অমৃতসর হইতে ইহার দুরত্ব ১৫৪ মাইল। আমরা সচরাচর পাতিয়ালা বলিয়া উচ্চারণ করিয়া থাকি, কিন্তু পাতিয়ালা রাজ্যে এবং পশ্চিমের সকল স্থানেই লোকে পাটিয়ালা বলিয়া থাকে। এখানে বেড়াইতে আসিবার কথায় লাহোর ও অমৃতসরে কেহই আমাদের উৎসাহিত না করিলেও, দেশীয় রাজ্যে প্রাচীন ভারতীয় রীতি ও ব্যবস্থাদি যদি কিছু দেখিতে পাই এই প্রত্যাশায় আমার এ সব স্থান দেখিতে ভাল লাগে; সেই কারণ কাহারও কথায় কর্ণপাত

মহারাজা বাবা আলা সিং

(ইনি পাতিয়ালার প্রথম রাজা)

না করিয়া কষ্ট ও ব্যয়স্বীকার করিয়াও ফিরিবার পথে এখানে আসিলাম।

পাতিয়ালা উত্তর ভারতের প্রধান সামন্ত রাজ্য। রামের পর সর্দ্দার আলা সিংহ কর্তৃক ১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দে এই নগরী প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহা পাতিয়ালা রাজ্যের রাজধানী। আমরা যখন এখানে পৌঁছিলাম তখন সকাল আটটা। লাহোরে কালীবাড়ীর পূজারি মহাশয় আমাদের বলিয়া দিয়াছিলেন এখানে হিন্দু ভদ্রলোকদের থাকিবার জন্য তেমন সুবিধা-জনক হোটেল বা ধর্ম্মশালা নাই, পাতিয়ালা-প্রবাসী তথাকার জজ্ শ্রীযুক্ত এম, এন, বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ীতে যাইলে তিনি যথেষ্ট আহ্লাদসহকারে তাঁহার বাটীতে স্থান দিবেন। আমরা আসিবারকালীন ট্রেনে পাতিয়ালা-বাসী কতিপয় ভদ্রলোকের নিকট জানিলাম লালা সালিগ্রাম নামক এক ভদ্রলোকের প্রতিষ্ঠিত একটি ধর্ম্মশালা আছে; উহা থাকিবার পক্ষে উপযুক্ত স্থান। নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে উপস্থিত হওয়ায় ভদ্রলোকের যদি অসুবিধা হয় এই মনে করিয়া আমরা উক্ত ধর্ম্মশালাতেই আমাদের লাগেজ পত্র রাখিয়া রাজপ্রাসাদ দুর্গ প্রভৃতি দেখিবার জন্য পাশ সংগ্রহার্থ, বেলা অধিক হইলে বন্দোপাধ্যায় মহাশয় পাছে কাছারিতে বাহির হইয়া যান এই আশঙ্কায়, বরাবর বণ্ডহারা রোডে তাঁহার বাটীতে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। তিনি সত্যই তখন কাছারি যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। আমাদের দেখিয়া সাদরে আহ্বান করিয়া অল্পক্ষণ আলাপের পর তাঁহার অগ্রজ রাজকুমারদের গৃহ-শিক্ষক শ্রীযুক্ত মাখনলাল বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত পরিচয় করিয়া দিয়া উঠিলেন। স্থানাভাবে তাঁহার সহিত স্থানীয় ও ব্যক্তিগত অন্যান্য বহু বিষয়ের যে সকল কথোপ-কথন হইল তাহার উল্লেখ না করিলেও তাঁহার স্বদেশবাসীর প্রতি আদর আপ্যায়নের কথা ও মাধ্যাহ্নিক ভোজনের অনু-রোধ উপেক্ষা করা যে আমাদের পক্ষে সাধ্যাতীত হইল তাহা না বলিয়া পারি না।

মাখন বাবুর নিকট জানিলাম মহারাজার পরিবারবর্গ সম্প্রতি পাহাড় হইতে ফিরিয়া প্রাসাদে আসিয়াছেন, সুতরাং ঐ প্রাসাদ দেখার এখন আর কোন উপায় নাই, তবে দুর

হইতে বাহিরাংশ যতটুকু দেখা যায় তাহাই দেখা হইতে পারে। আর দুর্গ বা প্রাচীন প্রাসাদ দেখিবার কোন ছাড়পত্র আবশ্যক হয় না।

প্রথমেই বলি সহর দেখার হিসাবে সুদূর বাঙ্গালা হইতে আসিয়া আগ্রা দিল্লি লক্ষ্ণৌ লাহোর প্রভৃতি দেখার পর

মহারাজা সাহেব সিং

পাতিয়ালা রাজধানীর মধ্যে দেখিবার মত আর কিছু থাকে, তাহা যিনি ইহা দেখিয়াছেন তিনি কখনই বলিতে পারিবেন না; তবে যিনি দেশীয় নৃপতির রাজ্য বলিয়া এখানে দেখিতে আসেন তাঁহার কাছে যে দেখিবার জানিবার এখানে কিছুই নাই এমন কথা আমি বলি না।

দেখিবার মধ্যে এখানে পুরাতন রাজপ্রাসাদ, যাহাকে কেল্লা বলিয়া থাকে, এবং সতীবাগের প্রাসাদই প্রধান। তাহা হইলেও আরও কতিপয় দ্রষ্টব্য আছে। সহরের ঠিক কেন্দ্র-স্থলেই প্রাসাদ বা দুর্গ অবস্থিত। কোনো দিকে কোনো পরিখা নাই, কখন ছিলও না, তবে সমস্ত নগরটি পূর্ব্বে সুদৃঢ় প্রাচীরবেষ্টিত ছিল এবং মধ্যে মধ্যে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তোরণ ছিল। এখন সে প্রাচীর আর নাই, কিন্তু সোনারি গেট্, লাহোরি গেট্ প্রভৃতি নামীয় কয়েকটি তোরণ এখনও দেখা যায়।

দুর্গপ্রবেশের প্রধান দ্বারটি লোহিতপ্রস্তরশোভিত; আর সমস্তই যাহা দেখা যায় তাহা ইট চুন বালির দ্বারা গঠিত। দ্বারদেশে দুইজন প্রহরী উন্মুক্ত তরবারি হস্তে সমস্ত দিন-রাত্রি প্রহরায় নিযুক্ত আছে। স্থানীয় প্রথানুসারে অনাবৃতমস্তক লোকেদের ভিতরে প্রবেশ নিষেধ থাকায়, টুপি পাগড়ির অভাবে আমরাও কেহ গায়ের কাপড় কেহ রুমাল মাথায় বাঁধিয়া ভিতরের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলাম। চারিদিকে সৌধবেষ্টিত সুপ্রশস্ত প্রাঙ্গণের সম্মুখদৃশ্য দেখিলেই তথাকার গোলাপি বর্ণের কাজগুলি জয়পুরের স্থাপত্যের কথা মনে করিয়া দেয়। সম্মুখের এই অট্টালিকার আড়ম্বর-পূর্ণ দ্বারদেশেও তরবারি হস্তে প্রহরী নিযুক্ত রহিয়াছে। তাহারা ভিতরে প্রবেশ করিতে নিষেধ করায় আমাদের অভ্যন্তরভাগ দেখা হইল না। লোকমুখে শুনিলাম উহার ভিতরে দেখিবার মত বিশেষ কিছু নাই। প্রাঙ্গণের দক্ষিণ দিকে প্রস্তরসোপান অতিক্রম করিয়া প্রায় একতলা

মহারাজা রণধীর সিং

উপরে প্রশস্ত চত্বরপার্শ্বে রাজকীয় দরবার কক্ষ, উহাকে দেওয়ানখানা বলে। কক্ষটি খুবই বড়, লম্বে অন্ততঃ শত ফুট এবং প্রস্থে চল্লিশ অপেক্ষা কম হইবে না। ভিতরে ঊর্দ্ধাংশ অতি পরিপাটি সোনালি কাজ করা, তলদেশে সবুজ বনাতের আস্তরণ বিস্তৃত। আসবাব পত্রের

শ্রীহরিহর শেঠ

মধ্যে প্রধানতঃ ত্রিশ পঁয়ত্রিশটি মূল্যবান বেলোয়ারি ঝাড় ও দেওয়ালগিরি এবং কতকগুলি সুন্দর জীবন্ত জীবনপ্রমাণ প্রতিকৃতি দেওয়ালে লম্বিত আছে। একদিকে পাতিয়ালার প্রথম রাজা বাবা আলাসিংহ হইতে সকল রাজাগণের, অন্যদিকে মহারাণী ভিক্টোরিয়া সপ্তম এডোয়ার্ড ও তৎপত্নী রাজ্ঞী এলেকজেণ্ড্রা এবং রাজা পঞ্চম জর্জ্জ ও রাণী মেরীর সুন্দর তৈলচিত্রসকল আছে। এখানকার ঝাড়গুলি যেমন বৃহৎ তেমনই সুন্দর। এখানকার রাজভবনের এইগুলিই শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার। লক্ষ্ণৌয়ের ছোট ইমামবাড়ীতেও পাতিয়ালা-রাজের উপহারস্বরূপ প্রদত্ত দুইটি সুন্দর স্ফটিক দীপাধার দেখিয়াছিলাম। শুনিলাম এক সময় কলিকাতার অসলার কোম্পানীর দোকানে রাজার একজন বিশিষ্ট কর্ম্মচারী তাঁহার আদেশে কয়েকটি ঝাড় ক্রয় করিতে যান। দোকানের লোক উক্ত কর্ম্মচারীকে একটা সামান্য লোক মনে করিয়া তাঁহার প্রতি বিশেষ মনোযোগ না দেওয়ায় পরদিন রাজা স্বয়ং দোকানে গিয়া উপস্থিত হন এবং তাঁহাদের বিপণিতে সে সময় যাহা কিছু মালপত্র ছিল সমস্তই কিনিয়া লন। এই সুরম্য হর্ম্ম্য মধ্যেই রাজ্যসংক্রান্ত দরবারাদি হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত মাখনবাবুকে এ রাজ্যে ভারতীয় আদব কায়দা সম্বন্ধে কোথায় কি দেখা যাইতে পারে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিয়াছিলেন, অন্য কোথাও কিছু সে-সব দেখিবার কিছু নাই, শুধু দরবারের সময় উপস্থিত থাকিতে পারিলে এখনও অনেক পুরাতন ভারতীয় প্রথা ও কায়দা দেখিতে পাওয়া যায়।

দেওয়ানখানার পার্শ্বে একটি প্রাঙ্গণপ্রান্তে একটি ছোটখাটো প্রদর্শনী আছে। উহার মধ্যে যে-সকল দ্রব্যসম্ভার আছে তন্মধ্যে একখানি রজতনির্ম্মিত সুদৃশ্য অশ্বযান ও বিভিন্ন প্রকারের কতিপয় তঞ্জাম চতুর্দ্দোলা আশাশোঁটা, কতিপয় মৃত ব্যাঘ্র সিংহ ও বিভিন্ন জাতীয় পক্ষী আর একটি সুবৃহৎ মনোরম স্ফটিকপ্রস্রবণ উল্লেখযোগ্য। প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে কয়েকটি ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের তোপ আছে তন্মধ্যে একটির আকার অসাধারণ বৃহৎ। উহা লাহোরের সুপ্রসিদ্ধ ঝমঝমা নামক তোপ অপেক্ষাও বৃহৎ। সাজসজ্জা ছাড়া এই তাম্রনির্ম্মিত কামানটিই লম্বায় প্রায় উনিশ ফুট। এই দুর্গমধ্যে অপর পার্শ্বে একটি অস্ত্রাগার আছে, উহাতে বিবিধ প্রকারের পুরাতন ও নূতন বন্দুক তরবারি পিস্তল তীর ধনুক প্রভৃতি সংগৃহীত আছে। সংগ্রহের হিসাবে ইহা মন্দ না হইলেও যে কক্ষে যে ভাবে ইহা সজ্জিত আছে তাহা প্রশংসা করিবার মত নহে। এই প্রাসাদ বা দুর্গের সর্ব্বত্র দেখিয়াই মনে হইল এখানকার সকল বিষয়েই বিশেষভাবে দৃষ্টির অভাব আছে। পরিচ্ছন্নতা ও প্রদর্শনীর জন্য কক্ষাদি যেরূপ আশা করা যায় তদনুরূপ নহে।
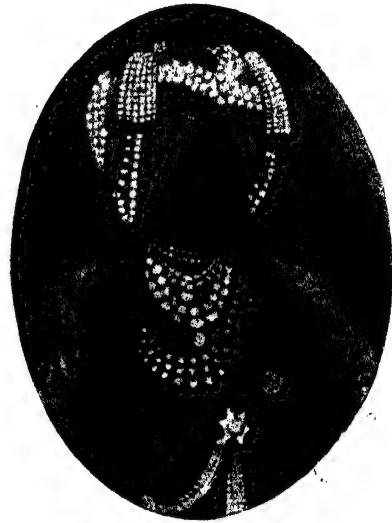
মহারাজা মহেন্দ্র সিং

এখান হইতে আমরা মহেন্দ্র নাথ কলেজ দেখিতে যাইলাম। ইহা রাজার এবং পাতিয়ালা রাজ্যের একটি সুন্দর । ইহা একটি প্রথম শ্রেণীর কলেজ, এম-এ পর্য্যন্ত পড়ান হইয়া থাকে। ইহাতে অবৈতনিক এবং অনেকগুলি কৃতবিদ্য যোগ্যতম অধ্যাপক আছেন, তন্মধ্যে বাঙ্গালী দুই তিন জন আছেন। কলেজ-ভবনটিও সুন্দর, এখানকার সৌধাবলীর মধ্যেও ইহার স্থান অনেক উচ্চে। যুবকদের খেলা ও বেড়ানর জন্য সংলগ্ন জমিও অনেক আছে। অদূরে একটি বোর্ডিংও আছে।

সতীবাগ ও উহার মধ্যস্থ রাজভবন ইহারই অনতিদূরে। মহারাজা এখন বিলাতে থাকিলেও মহারাণী ও পরিবারবর্গ

এখানে রহিয়াছেন এই কারণ প্রাসাদ বা সতীবাগের ফটক পার হওয়া সাধারণের পক্ষে নিষিদ্ধ, ইহা জানিয়াও বাহির হইতে উহা দেখিবার মানসে আমরা নিকটে যাইলাম। দূর হইতে একটি অতি সুন্দর বৃক্ষবীথিকার প্রান্তে বৃক্ষরাজির ফাঁক দিয়া প্রাসাদের অতি সামান্য অংশই দেখিতে পাওয়া যায়। যতটুকু দেখিতে পাইলাম তাহাতে মনে হইল উহার আকার ও গঠন সুবৃহৎ এবং সুন্দর। শুনিলাম, এখানে শিবামহল নামক বাড়ীটি অতি সুদৃশ্য এবং বহু ফলফুল ও তরুরাজিপূর্ণ উদ্যানমধ্যস্থ কৃত্রিম নির্ঝরিণীটি

মহারাজা অমর সিং

বড়ই শোভাময়। পাতিয়ালায় মাত্র দুই তিনটি দেখিবার মত জিনিষ, তন্মধ্যে যেটি প্রধান তাহা দেখিতে না পাওয়ায় হতাশ হইয়াই ফিরিলাম। এই উদ্যানের পশ্চাৎভাগে একটি বিস্তৃত সরসী আছে। ইহার মত বৃহদায়তনের জলাশয় এ প্রদেশে আর দ্বিতীয় নাই বলিয়া শুনিলাম।

এদিককার পথ গুলি পরিষ্কার ও প্রশস্ত। আমাদের আর একটু ঘুরিতে ইচ্ছা হইলেও ধর্ম্মশালায় ফিরিয়া স্নানাদি সারিয়া বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ীতে সন্ধ্যাহ্নিক-কার্য্যের জন্য যখন নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছি তখন আর বিলম্ব করা চলে না বলিয়া ফিরিলাম। যথা সময়ে বন্দোপাধ্যায় মহাশয়-দের বাটীতে উপস্থিত হইয়া অতি পরিতোষসহকারে প্রসাদ পাইলাম। একথা স্বীকার করিতে হইবে, বাঙ্গলা ছাড়িয়া অবধি একমাত্র লাহোরের কালীবাড়ীতে কতকটা মাত্র ছাড়া আমাদের আজন্মপরিচিত এমন সুন্দর ভোজ্য একটি দিনও আমাদের অদৃষ্টে জুটে নাই। আহার করিতে করিতে মাখনবাবুর সহিত পাতিয়ালা রাজ্য সম্বন্ধে ও অন্যান্য বহু বিষয়ের অনেক কথা হইল। তাঁহাদের দেশ ও জন্মস্থান কলিকাতার উত্তর দক্ষিণেশ্বর, তাঁহার পিতৃদেব স্বর্গীয় বিহারী লাল বন্দোপাধ্যায় মহাশয় প্রথম এদেশে আসেন। তিনি লাহোরেও অনেকদিন ছিলেন, তথায় এবং পাতিয়ালায় অনেক সাধারণের কার্য্যে তিনি অগ্রণী ছিলেন। নবীন চন্দ্র রায় নামে আর একজন শিক্ষিত বাঙ্গালীও এ-প্রদেশে অনেক কাজ করিয়াছিলেন। তাঁহার কন্যা এখানকার বালিকা-বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন, এক্ষণে রাজ-অন্তঃপুরে মেয়েদের শিক্ষকতাকার্য্যে নিযুক্তা আছেন। বর্ত্তমান মহারাজা নিজে যেমন শিক্ষিত, রাজ্যমধ্যে শিক্ষাবিস্তারের জন্য যে ব্যবস্থা আছে তাহাও তেমনি প্রশংসনীয়। পাতিয়ালায় শুধু উচ্চ শিক্ষা অবৈতনিক নহে, সমস্ত শিক্ষাই অবৈতনিক। বাদ্যাদি শিক্ষার জন্যও এখানে একটি বিদ্যালয় আছে। এখানকার প্রবাসী বাঙ্গালীদের নাম করিতে হইলে স্বর্গীয় অবিনাশ চন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের নাম প্রথমেই উল্লেখ করা উচিত। প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে তিনি তদানীন্তন মহারাজার প্রাইভেট সেক্রেটারির পদে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার যুক্তি পরামর্শে রাজ্যের বহু বিষয় উন্নতিলাভ করিয়াছিল বলিয়া শুনা যায়। এখানে এক্ষণে মোট ছয় সাত ঘরের অধিক বাঙ্গালীর বাস নাই।

পাতিয়ালায় ক্রিকেট পোলো প্রভৃতি খেলার খুব ধুম। ক্রিকেট্ বীর রণজিতের নাম ক্রিকেট্ খেলার অনুরাগী জগতে কাহার নিকট অবিদিত আছে? তিনি এবং তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র দলীপ সিং, যিনিও ক্রমে খুল্লতাতের ন্যায় খেলায় যশস্বী হইয়া উঠিতেছেন, তাঁহাদের জন্মভূমি এই পাতিয়ালায়। পাতিয়ালা আজ তাঁহাদের নামে গৌরবান্বিত। শুনিলাম এখানকার ক্রিকেট-গ্রাউণ্ডের মত খেলার স্থান আর কোথাও নাই, পোলো-গ্রাউণ্ডও খুব ভাল। মাখন বাবুর

শ্রীহরিহর শেঠ

...দের মণিবাবুর সহিত একটু ভাল করিয়া আলাপ করিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সময়াভাবে তাঁহার ফিরিয়া আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে পারিলাম না। তথা হইতে এই দূর প্রবাসে প্রবাসী বাঙ্গালী ভদ্রলোকদের আতিথেয়তার কথা ভাবিতে ভাবিতে বিদায় লইয়া বরাবর বিখ্যাত ক্রিকেট-গ্রাউণ্ডটি দেখিবার জন্য বাহির হইলাম

মহারাজা করণ সিং

পোলো গ্রাউণ্ডটি তাঁহাদের বাটীর নিকটেই। উহার ভাল মন্দ বুঝিবার মত জ্ঞান আমার নাই, আমরা আর টাঙ্গা হইতে নামিলাম না, উহা দেখিতে দেখিতে যাইলাম। আমার দৃষ্টিতে উহা একটি পরিষ্কার তৃণসমাচ্ছন্ন মাঠ মাত্র। এ স্থান হইতে যে সকল পথ অতিক্রম করিয়া বারদুয়ারি ও ক্রিকেট-গ্রাউণ্ড দেখিতে হয় তাহা বেশ পরিচ্ছন্ন প্রশস্ত এবং সরল। টাঙ্গাওয়ালা বলিল উহার নাম ঠাণ্ডি সড়ক। এ জনবিরল পথপার্শ্বে এখানে-সেখানে ছোট ছোট উদ্যান-মধ্যে কয়েকটি পরিষ্কার ও আধুনিক ভাবের বাড়ী দেখিলাম। পুরাতন সহরের পার্শ্বে এই স্থানগুলিকে দেখিয়া স্পষ্টই বুঝা যায় যে একটা অভিনবত্বের মোহ আগন্তুকের অপেক্ষা না রাখিয়াই যেমন ভারতের রাজধানী হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় সকল প্রধান সহরগুলিতে প্রবেশ করিয়াছে, এখানেও তাহাই।

ঠাণ্ডি সড়কের পরই বারদুয়ারি। বারদুয়ারি একটি সুবৃহৎ সৌধের নাম হইলেও যে বিস্তৃত উদ্যানের মধ্যে উহা বিরাজিত তাহাকেও লোকে বারদুয়ারি বলিয়া থাকে। এই উদ্যানটি বেশ সুরচিত ও রমণীয়। ইহার ভিতরের তরুচ্ছায়াসমাচ্ছন্ন বক্র পথগুলিও চমৎকার। এই বারদুয়ারি ভবনটি ভিন্ন দেশীয় রাজা মহারাজা ও লাট বেলাটদের অস্থায়ী বাসভবনরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এখানে অন্য একটি গেষ্ট্ হাউসও আছে, উহা একটি সাধারণ দ্বিতল অট্টালিকা মাত্র। এই বাগানে মহারাজা রাজেন্দ্র সিংহের একটি জীবনপ্রমাণ পাষাণমূর্ত্তি আছে। অদূরে গাছের ভিতর দিয়া আর একটি মূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম, উহা কাহার প্রতিমূর্ত্তি জানি না।

এই বারদুয়ারির পার্শ্বেই একটি চিড়িয়াখানা আছে। চিড়িয়ার মধ্যে দশ পনেরটি টিয়া কাকাতুয়া প্রভৃতি পাখী

মহারাজা নরেন্দ্র সিং

আর অন্য জন্তুর মধ্যে সিংহ সিংহী সাতটি, বাঘ আটটি ভল্লুক একটি ও মেড়া দুইটি মাত্র আছে। এই চিড়িয়াখানার পার্শ্বেই প্রসিদ্ধ ক্রিকেট-গ্রাউণ্ড ও রাজেন্দ্র জিমখানা

ক্লাব্। ক্রিকেট্ সম্বন্ধেও আমার কিছু মাত্র জ্ঞান না থাকিলেও এই মাত্র বলিতে পারি এত পরিষ্কার ও এমন সমতল প্রশস্ত ভূমিখণ্ড অন্য কোথাও দেখি নাই।

নিকটে আর একটি লতাগুল্ম কৃত্রিম পাহাড় গুহা-উৎস ও বিবিধ প্রস্তরময়ী রমণীমূর্ত্তিময় ছোট বাগান

মহারাজা রাজেন্দ্র সিং

দেখিলাম। বারদুয়ারি উদ্যানের শোভা সৌন্দর্য্য এখানে না থাকিলেও ইহা রৌদ্রতাপিত মধ্যাহ্নে একটি বেশ শান্তিপূর্ণ শীতল স্থান। এখান হইতে বারদুয়ারি উদ্যানের মধ্যস্থ দেবদারুবীথিকা দিয়া লাহোরি গেট পার হইয়া ফিরিলাম। এই পথটি অতি মনোরম।

লাহোরি গেটের বাহিরে রাজেন্দ্র হাঁসপাতাল নামে স্ত্রী ও পুরুষদের দুইটি স্বতন্ত্র হাঁসপাতাল আছে। নার্সদের শিক্ষা দিবার জন্য এখানে ব্যবস্থা আছে। এই বিভাগের জন্য বাড়ীটি লেডি কর্জ্জনের নামে উৎসর্গ করা হইয়াছে। সনাতন ধর্ম্মসভা ও আর্য্যসমাজও এই স্থানেই অবস্থিত।

নগরের মধ্যে লালবাগ নামে আর একটি দেখিবার মত উদ্যানভবন আছে। রাজকুমাররা সে স্থানে থাকেন বলিয়া সাধারণের তথায় প্রবেশোধিকার নাই, সুতরাং আমাদের উহাও দেখা হইল না। পাতিয়ালা-রাজধানীর মধ্যে যাহা কিছু দেখিবার তাহা এই; তাহা হইলেও একটি রাজ্য চালাইতে হইলে বর্ত্তমান কালে যাহা যাহা আবশ্যক তাহার কিছুরই প্রায় অভাব নাই। এখানকার বর্ত্তমান অধিবাসীর সংখ্যা মোট প্রায় ষাট সহস্র হইলেও ছয় সহস্র সৈন্য আছে। এই প্রবন্ধে পাতিয়ালা-রাজধানীর কথাই লিখিত হইল। সমগ্র পাতিয়ালা ষ্টেটের পরিমাণ প্রায় সাড়ে পাঁচহাজার বর্গ মাইল এবং ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে লোক
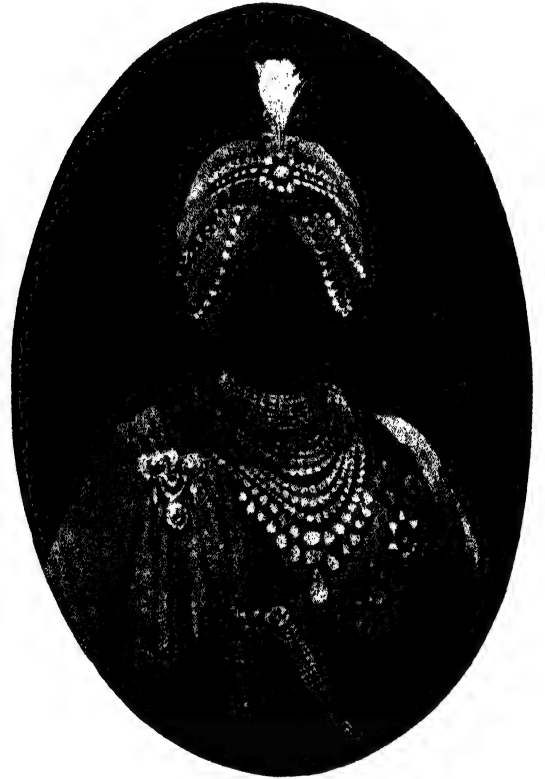
মহারাজা ভূপেন্দ্র সিং

সংখ্যা ছিল প্রায় ষোল লক্ষ। সিমলা পাহাড় পাতিয়ালা রাজ্যের অন্তর্গত ছিল, উহা বারউলি জেলার কোন স্থান বিশেষের বিনিময়ে প্রদত্ত হয়। পাতিয়ালা রাজ্য শ্লেট, শিশা, তাম্র ও মারবেল্-খনি দ্বারা সমৃদ্ধ হইলেও একটি কৃষিপ্রধান স্থান।

এখানে উল্লেখযোগ্য বড় শিল্প বিশেষ কিছু আছে বলিয়া জানিতে পারি নাই, কেবল জরির ও রেশমের কোমরবন্ধ তৈয়ারির জন্য কিছু প্রসিদ্ধি আছে। শুনিলাম সমগ্র ভারতে যে কোমরবন্ধ ব্যবহৃত হয় তাহা এই স্থানেই প্রস্তুত হয়। এই স্থান ভাল পারাবতের জন্যও খ্যাত।

এখানে অধিবাসীদের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান উভয়ই আছে। কালী ও শিবমন্দির যেমন আছে, মুসলমানদের মসজিদদরগাও আছে। উভয়ে পাশাপাশি বসবাস করিয়া নিজনিজ ধর্ম্ম স্বচ্ছন্দে পালন করিয়া থাকেন। কিন্তু বৃটিশ ভারতবর্ষে অধুনা যাহা প্রায় নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে, সেই হিন্দু মুসলমানের বিবাদ এখানে বড় একটা দেখা যায় না। *

* Imperial Gazetteer of India Vol VII হইতে সামান্য সাহায্য লইয়াছি।

সতীর্থ

শ্রীঅমিয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী

চলার পথেই মিলন মোদের
নিত্য প্রেমের দান,
ফুরায় না তাই পরিচয়ের
অচিন্ অভিযান!
সেই অসীমের পথের পরে
বারেবারেই মরণ মরে,
নূতন বেশে নূতন দেশে
ডাকে দোঁহার প্রাণ!
চলার পথেই মিলন মোদের
নিত্য প্রেমের দান॥

পাতার দোলায় কোকিল ডাকে
মুগ্ধ কানন ছায়ে,
নদীর ধারে বনের পারে
পথ চলেছে গাঁয়ে।
প্রাণের সাথী, স্বপন ব'য়ে
লগ্ন আসে মধুর হ'য়ে!
বাঁশির ব্যথা দোঁহায় ঘেরে
কোন্ করুণার বায়ে!
পাতার দোলায় কোকিল ডাকে
মুগ্ধ কানন ছায়ে॥

ভিড়ের মাঝে সে পথ ঘুরে
নামল্ কোলাহলে,
প্রেমের প্রাণে জীবন মোদের
রৌদ্রবরণ জ্বলে!
বিচিত্র ঘোর হাওয়ার বুকে
চেনার লীলা ঢেউএর মুখে,
আপন যেন নিবিড় হ'ল
সবার সাথেই চলে'!
ভিড়ের মাঝে সে পথ যখন
নামল্ কোলাহলে॥

দিন ফুরালে রাত্রি মোদের
তারার অভিসারে,
চাওয়ার সুধা ভরবে আবার
নিবিড় অন্ধকারে!
যাত্রী মোরা এই ত জানি
পথে পথেই নূতন বাণী,
তুমি আমি এম্নি ক'রেই
মিলেছি কোন্ দ্বারে—
দিন ফুরালে রাত্রি মোদের
ডাক্‌বে অভিসারে॥

পঞ্চদীপ

-গল্প—

—শ্রীশচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

পূজার ছুটির শেষে দীনেশের বাড়ীতে আড্ডাটি আজ বেশ জমিয়া উঠিয়াছে।

বৈঠকখানার সাজানো-গোছানো এই ঘরটিতে রাজ্যের বৈষম্য ও বৈশিষ্ট্যের সমাবেশ। সেখানে একদিকে যেমন পিয়ানো ব্যাঞ্জো, অন্যদিকে আবার তেমনি বাঁয়া-তবলা ও সারেঙ। খেলাধুলাও তাই—ব্রীজের পাশে বিন্তি। কিন্তু সকলের চেয়ে বেশী বিরোধ দেখা যায় বন্ধুদেরই ভিতর। কুমুদ বাবুর বয়স পঞ্চাশের উপর, চুলও পাকিয়াছে—পত্নী-বিয়োগ ঘটিল তাহার দুইবার, কিন্তু আবার বিবাহ করিবার জন্য অনুরোধ করিতে হয় নাই তাহাকে একবারের অধিক। পরেশের বয়স চল্লিশের নীচে, চুলও পাকে নাই—বন্ধুরা অনুরোধ করিয়া হায়রান, কিন্তু তবু সে বিপত্নীকই রহিয়া গেছে।

এই মজলিশে যুবা যেমন হয় বুড়া আর বুড়া যুবা, তেমনি আবার ধার্ম্মিক হয় অধার্ম্মিক এবং অধার্ম্মিক ধার্ম্মিক। শশী বাবু মদ্য মাংসের যম হইলেও সন্ধ্যা আহ্নিকও করেন, কাজেই সে একজন ধার্ম্মিক খ্রিষ্ট। পরেশ স্নানও করে না, আহ্নিকও করে না, কাজেই সে একজন অধার্ম্মিক এথিষ্ট। কান্তি বাবুর কলপ করা চুল, সরুপেড়ে কুঁচানো কাপড় এবং ফিন্‌ফিনে পাঞ্জাবি—দেখিয়া কে বলিবে, সে বৃদ্ধ। আর পরেশ থাকিত বুড়ার মত চুপটি করিয়া বসিয়া—পুরু একজোড়া চশমা চোখে, মাথায় টেরি নাই, আস্তিনের বোতাম নাই।

সকলে উৎসুক হইয়া দীনেশের কথা শুনিতেছে। প্রতি বৎসর ছুটিতে কাছারি আদালত বন্ধ হইলে সে পশ্চিমে বেড়াইতে যায়, এবং যেমন সে ফিরিয়া আসে বন্ধুর দল অমনি ঝাঁকে ঝাঁকে আসিয়া জুটে বিজয়ার কোলাকুলির পর মিষ্টি মুখ করিবার জন্যও বটে, গল্প শুনিবার লোভেও বটে।

দীনেশ বলিতেছিল,—বৃন্দাবন গিয়ে সারাদিন ঘোরা-ঘুরির পর সন্ধ্যার একটু আগে মথুরায় ফিরলুম। যে ধর্ম্মশালায় আমি উঠেছিলুম তারি সামনে রাস্তায় দাঁড়িয়ে গাড়োয়ানের ভাড়া মিটিয়ে দিচ্চি, এমন সময় শুনলুম পেছন থেকে কে ডাক্‌চে—বাবু মশায়! ফিরে দেখি, একটি চমৎকার মেয়ে। বয়স অল্প, দশ কি এগারো হবে। পরনের আধ-ময়লা কাপড়খানা তার গায়ের সোনালি রংটিকে বরঞ্চ বাড়িয়েই তুলেছিল। নাকটি টিকোলো, চোখ দুটি ডাগর আর মাথায় একরাশ চুল। তার কপালে সরু ক'রে একটি তিলক কাটা, তাতে তাকে দিব্যি মানাচ্ছিল।

আমি তার পানে অবাক হ'য়ে চেয়ে আছি দেখে মেয়েটি মুখ নামিয়ে বল্‌লে, আমাদের আখ্‌ড়ায় রাধাগোবিন্দের মূর্ত্তি একবার দর্শন করবেন কি?

বাঙালী বোষ্টমের মেয়ে। ভাবলুম, ভিক্ষাই এদের বৃত্তি—রাধা কৃষ্ণের মূর্ত্তি দেখিয়ে দু'চার পয়সা রোজগার ক'রে থাকে।

মনিব্যাগটি হাতেই ছিল। তার ভিতর থেকে একটি আধুলি বের ক'রে তাকে দিতে যাচ্ছি, সে ঘাড় নাড়্‌লে—একটু অভিমানভরেই যেন বললে, বাবু মশায়, আমি ভিক্ষা চাই না।

আমি অপ্রতিভ হ'য়ে বললাম, ঠাকুরদর্শন যে আমার ভাগ্যে ঘ'টে উঠছে না মা। আমি আজ সন্ধ্যার গাড়ীতে এখান ছেড়ে চ'লে যাব।

সে বল্‌লে, এই গলির ভিতর কাছেই আমাদের আখ্‌ড়া। আপনার বেশিক্ষণ দেরী হ'বে না।

আমি তখনও ইতস্তত করছি দেখে মেয়েটির চোখ দুটি ছলছল ক'রে উঠলো। সে কাঁদো কাঁদো স্বরে বল্‌লে, দেখুন আমার মার ভারি অসুখ। আজ সারাদিন তিনি কিছু খান নি। আপনি যা দর্শনী দেবেন তাই দিয়ে ঠাকুর সেবা হবার পর তিনি প্রসাদ পাবেন।

শ্রীশচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

আমার মন মমতায় ভ'রে গেল, আর কিছু না ব'লে আমি তার অনুসরণ করলাম।

আখ্‌ড়াটি একটি সরু গলির ভিতর। উঠান রাস্তার চেয়ে নীচু, কোণে একটি তুলসী মঞ্চ। ইঁট-বের-করা জীর্ণ দালান, এতই ছোট্ট যে দেখলে মনে হয় কোন বালখিল্যের জন্য সেটি তৈরী হয়েছিল তারই বারান্দার এক পাশে রয়েছে—সেই রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্ত্তি।

ঘরের ভিতর থেকে একটি রমণীর ক্ষীণ গলা শোনা গেল,—কে? রুণু এসেছিস?

রুণু বল্‌লে, হাঁ মা। একজন ভদ্রলোক এসেছেন ঠাকুর দর্শন করতে।

স্ত্রীলোকটি দু'হাত মাটিতে চেপে হামাগুড়ি দিয়ে দরজা অবধি এগিয়ে এলো। কী শীর্ণ চেহারা! এইটুকু আসতেই সে যেন হাঁপিয়ে পড়েছিল। তার বয়স সাতাশ আঠাশের বেশী নয়, কিন্তু এরি মধ্যে তার যৌবনের গাঙ্‌টি ভ'রে গিয়ে সবখানি মাধুর্য্য সেই উজ্জ্বল চোখ দুটির ডোবার ভিতর এসে জমেছিল।

সে বল্‌লে, জয় হোক বাবা। গোপাল আপনার মঙ্গল করুন। রুণু, গোপালের একটু চরণামৃত বাবাকে দে ত মা।—ব'লে সে বেজায় কাশ্‌তে লাগলো।

তার চেহারা দেখে আর কাশির শব্দ শুনে বুঝতে আমার বাকি রইলো না যে সে যক্ষ্মার কবলে পড়েছে। মনে ভারি কষ্ট হ'ল, বললাম—তুমি শুয়ে থাক, মা। তোমার দেখছি খুব অসুখ।

সে ভ্রূকুটি ক'রে বললে, না, না। গোপালের ইচ্ছায় শিগ্‌গিরই আমি ভালো হ'য়ে উঠবো। নৈলে আমার মেয়ের গতি কি হবে বাবা?

আমার চোখে জল দেখা দিল। হায় রে অন্ধ মা! যেন তার মেয়েটির একটা গতি ক'রে না দেওয়া পর্য্যন্ত গোপালের মনে শান্তি নেই! দুখানি দশ টাকার নোট তার হাতে গুঁজে দিয়ে বললাম,—এই টাকা দিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা কর।

হাত দুটি কপালে ঠেকিয়ে সে বল্‌লে, গোপালের চরণামৃতই আমার অষুধ। অন্য চিকিৎসার দরকার নেই। ও-টাকা তুমি ফেরৎ নাও বাবা।

আমি বললাম, বেশ। ঠাকুরের ভোগ দিও।

নোট দুখানি নাড়্‌তে নাড়্‌তে সে যেন নিজ মনেই ব'লে যেতে লাগলো,—রোজের ভোগ রোজের পয়সায় দিতে হয়। আনা চারেক পয়সা যথেষ্ট। এতগুলি টাকা—

সে আবার কাশ্‌তে লাগলো। কাশ্‌তে কাশ্‌তে তার মুখ থেকে একটু রক্তও বোধ করি বেরিয়ে পড়েছিলো। এই আসন্নমৃত্যু স্ত্রীলোকটির কাছ থেকে টাকাগুলি ফিরিয়ে নিতে আমি পারলাম না। মিনতি ক'রে বললাম, কথা শোন—রাখ তুমি ও টাকা। তোমার মেয়ের কাজে লাগবে।

একটু চিন্তা ক'রে সে বল্‌লে, আচ্ছা দাঁড়ান, আপনাকেও একটি জিনিস দেব। রুণু, তাক্ থেকে পেড়ে আনত মা ঐ পঞ্চদীপ।

রুণু ঘরের ভিতর ঢুকলো সেই পঞ্চদীপ আনতে। সে বলতে লাগলো,—পঞ্চভূতের আধার ঐ পঞ্চদীপ। আমার দীক্ষাগুরু, আজ এক বছর তিনি বৈকুণ্ঠে—পঞ্চদীপটি ছিল তাঁরই। কৃষ্ণের আরতি করতেন তিনি ঐ দীপের শিখায়।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ও দীপ নিয়ে আমি কি করবো?

সে বল্‌লে, ভক্ত বৈষ্ণবকে দিয়ে কৃষ্ণের আরতি করিয়ো। ঠাকুর তৃপ্ত হবেন।

আমি সেখান থেকে বেরিয়ে চ'লে এলাম—পঞ্চদীপটি আমায় গ্রহণ করতে হয়েছিল। তারপর দুটো একটা জায়গা ঘুরলাম, কিন্তু যে দৃশ্য মথুরায় দেখে এসেছিলাম তা আর ভুলতে পারি নি। সব সময় কেবলি মনে হ'ত, আহা! কি হবে ঐ মেয়েটির?...

শ্রোতা বন্ধুবর্গের ধৈর্য্য ফুরাইয়া আসিতেছিল। তাহার কথাও শেষ হইল যতীনও বলিয়া উঠিল,—আরে রেখে দাও দীনেশ। ওরকম ত কতই দেখা যায়। ও নিয়ে ভাবতে গেলে আর সংসার করা চলে না, হাঁ।

খিন্নিষ্ট শশী বাবু কহিলেন, কর্ম্মফল—ভগবানের বিচার। ফলভোগ যার যা আছে, বুঝেচ কিনা—সে তা ভুগবেই। ওর ওপর হাত দিতে যাওয়া আর জেল থেকে কয়েদী বের ক'রে আনা দুই সমান অপরাধ।

এথিষ্ট পরেশ দীনেশের পাশের চেয়ারটিতে আসিয়া বসিল। ঠোঁট দুটি মুখের উপর শক্ত করিয়া চাপিয়া মুখের প্রশ্ন সে যেন চোখ দিয়াই বাহির করিতেছিল, কিন্তু কি ভাবিয়া তখনি আবার সকলের পিছনে নিজের স্থানটিতে ফিরিয়া আসিল।

তাহার পানে চাহিয়া কুমুদ বাবু জিজ্ঞাস করিলেন, তুমি যে বড় ন'ড়ে-ন'ড়ে বেড়াচ্চো? ব্যাপার কি হে?

শশী বাবু পরিহাস করিয়া বলিলেন, ব্যাপার নাস্তিকের যা হ'য়ে থাকে তাই—সহানুভূতির দরদ, আর কি? দুঃখ দৈন্য সবই ঈশ্বরের সৃষ্টি, এই সোজা কথাটি ভুলে অলট্রুইজ্‌ম্‌-এর ঝণ্ডা খাড়া করলে জীবন হ'য়ে উঠে বিষময়। তখন আস্তিকের কোঠায় নাস্তিকের পা না দিয়ে উদ্ধার নেই।

চায়ের পেয়ালা ও খাবারের প্লেট্ আসিয়া পড়ায় আলোচনাটা অমনি চাপা পড়িয়া গেল।

যথা সময়ে সভা ভঙ্গ হইলে একে একে সকলে উঠিয়া গিয়াছে—যায় নাই শুধু পরেশ। উজ্জ্বল আলো ঘরের আস্‌বাব পত্রগুলিকে স্পষ্ট পরিস্ফুট করিয়া অস্পষ্ট অপরিস্ফুট যা-কিছু সবই দিয়াছে বাহিরে ঠেলিয়া—সেই অস্পষ্টের সন্ধানেই যেন তাহার দৃষ্টি বাহিরের অন্ধকারে ফিরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

—দীন দা।

দীনেশ বারান্দায় ছিল। ভিতর পানে ফিরিয়া কহিল, পরেশ এখনো ব'সে বুঝি? আমি ভেবেছিলাম, তুমিও চ'লে গেছ।

পরেশ কহিল, দীনদা আমি সেই সেই পঞ্চদীপটি একবার দেখতে চাই।

—তাই ত। আসল জিনিসই কাউকে দেখানো হয় নি। দেখবার জিনিস বটে। রোস আনচি, বলিয়া সে বাড়ীর ভিতর হইতে পঞ্চদীপ লইয়া আসিল।

অনন্তনাগের ফণার উপর পাঁচটি প্রদীপ অর্দ্ধচন্দ্রাকারে বসানো। ক্ষুদ্র জিনিস, পিতলের। কিন্তু কারুকার্য্য অসাধারণ—শিল্পীর নিপুণ কল্পনা রূপে রেখায় অম্লান গৌরব লইয়া বিকশিত।

আলোর ধারে সেই পঞ্চদীপ যত্নের সহিত পরীক্ষা করিতে করিতে পরেশের মুখের উপর চাঞ্চল্যের আভাস ফুটিয়া উঠিয়াছিল। হাতের স্নায়ুগুলি ঈষৎ কাঁপিতে লাগিল, নিশ্বাস ঘন হইয়া আসিল।

দীনেশ চাহিয়া ছিল। তাহার ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া বিস্ময়ের সহিত জিজ্ঞাসা করিল,—কি হে, অমন ক'রে কি দেখচ?

পরেশ কি-যে বলিল বোঝা গেল না।

—কি বল্‌লে?

—কিছু না। আমি এখন আসি দীন-দা,—বলিয়া পঞ্চদীপ রাখিয়া সে তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল।

পরদিন সন্ধ্যাকালে মজলিসে ব্রীজ্ খেলা চলিতেছে। কান্তি বাবু ফ্রি ডায়মণ্ডে ডবলের ধাক্কা সামলাইতে বিব্রত—দীনেশ পাশে দাঁড়াইয়া এদিক-ওদিক চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—পরেশকে দেখচি না যে! সে কোথা?

কান্তি বাবু জবাব দিলেন না, করিলেন তুরুপ—কুমুদ বাবু তুরুপ করিলেন না, দিলেন জবাব। কহিলেন, সে উড়নচণ্ডী ও! কতবার বলেচি, বিয়ে কর—মন স্থির হোক।

যতীন বলিল, ঠিক কথা। জীবনে ওর কোনো লক্ষ্যই নেই। লক্ষ্যহারা লক্ষ্মীছাড়ারও বেহদ্দ। ও এখানে আসে কেন বোঝা ভার। খেলেও না, গল্পও করে না।

পরেশের সেই বিষাদ-ভরা চেহারা আপন-ভোলা চলন স্ফূর্ত্তির আসরে সকলের সমকক্ষ ছিল না বলিয়াই দীনেশের স্নেহ ঝরিয়া পড়িত তাহারি উপর সব চেয়ে বেশি, যেমন পাহাড়ের জল গড়াইয়া নামে নীচু গুহার ভিতর। ক্ষুব্ধ স্বরে সে কহিল,—যতীন, সকলেই যদি তোমার মত হেসে খেলে জীবন কাটায় তা হ'লে সংসার হ'য়ে ওঠে নেহাৎ একঘেয়ে কুচ্‌কাওয়াজের মত। তুমি আনন্দে কাটাচ্ছ, কাটাও। কিন্তু দোহাই তোমার, পরেশকে নিয়ে টানাটানি করো না। যেমন আছে ও, তেমনি থাক।

তিন দিন কাটিল, তথাপি তাহার দেখা নাই! দীনেশ সত্যই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। অসুখ করে নাই ত? আহা, বিদেশে বিভূঁয়ে বেচারি একলা—বাপ মা স্ত্রী কেহই বাঁচিয়া নাই। পত্নীর মৃত্যুর পর কত দুঃখে সে দেশ ছাড়িয়া এখানে

দি ভার্জ্জিন অন দি রক্‌স্

শিল্পী—দা ভিঃ

শ্রীশচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

... করিতেছে, বর্ষের পর বর্ষ জুড়িয়া কী অন্তর্যাতনা তাহার মর্মমাঝে বাজিতেছে, যাহা ভুলিবার জন্য প্রতিদিন সে আসিত এই মজলিসের আমোদে অবগাহন করিতে, কিন্তু ভুলিতে পারিত না—সেই ব্যথার সুরটির পরিচয় দীনেশ পাইয়াছিল।

পরেশের বাড়ীতে খোঁজ লইয়া সে জানিতে পারিল যে, আজ কয়েকদিন সে বাড়ী নাই। কোথায় গিয়াছে? ভৃত্য তাহা জানে না। দীনেশ ভাবিল, কোনো জরুরি কাজে হঠাৎ হয়ত তাহাকে দেশে যাইতে হইয়াছে।

এক পক্ষ কাল পর সে-দিন দুপুর বেলা স্নান সারিয়া দীনেশ আহার করিতে যাইবে এমন সময় সে পরেশের হাতে লেখা একখানি চিঠি পাইল। সে পড়িল,—দীন দা, আমি কাল এসে এখানে পৌঁছেছি। আজ সন্ধ্যাবেলা আমার বাড়ী একবার আসবে কি? বিশেষ কথা আছে।

সন্ধ্যাকালে পরেশের বাড়ী যাইতে সে যখন রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল, বৈঠকখানা ঘরে বন্ধুর দল তখনো জুটে নাই।

ডাকাডাকির পর ভৃত্য দরজা খুলিয়া দিলে দীনেশ জিজ্ঞাসা করিল, বাবু কোথা?

সে কহিল, খুকীমণির কাছে।

খুকীমণি! সে কে? কিন্তু ঘরে ঢুকিতেই বিস্ময়ের চমক তাহার অঙ্গের ভিতর এমনি খেলিয়া গেল যে তেমনটি বোধ করি সে জীবনে কখনো অনুভব করে নাই। সে দেখিল, পরেশের পাশে রুণু বসিয়া আছে—যেন একটি ফুটন্ত গোলাপ!

বালিকার পানে ফিরিয়া পরেশ কহিল, রুণু, দীন-দাকে প্রণাম কর। দুজনাই আমরা তার কাছে কৃতজ্ঞ।

রুণু উঠিয়া প্রণাম করিল।

দীনেশ অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল—মুখে তার একটিও কথা ফুটিল না। শুধু সন্দেহ-মিশ্র কৌতূহলী দৃষ্টি সেই বালিকার পানে নিবদ্ধ করিয়া রহিল। কোথায় তার সে তিলকের ফোঁটা আর কোথায় বা কি? পরনে আকাশ-রঙের সুন্দর একখানি সাড়ি, চুল বেণী বাঁধা, পায়ে জরির কাজ করা জুতা।

পরেশ কহিল, ভাগ্যিস সেই রাত্রে রওনা হয়েছিলাম। নৈলে কমলাকে দেখতে পেতুম না দীন-দা। পৌঁছবার পরদিন সে মারা গেল।

দরজার কাছে এক প্রৌঢ়া মহিলা আসিয়া ডাকিল,—রুণু, এস।

পরেশ সস্নেহে রুণুর গাল দুটি ঈষৎ টিপিয়া নত হইয়া চুম্বন করিল। কহিল, যাও মা—পড় গে।

সে চলিয়া গেলে পরেশ কহিল, উনি শিক্ষয়িত্রী। রুণুকে লেখা-পড়া শেখাবার জন্য নিযুক্ত করেছি।

—রুণু কে?

—আমার মেয়ে।

দীনেশ প্রতিধ্বনি করিল, তোমার মেয়ে!

পরেশ কহিল, হাঁ দীন-দা! রুণু এখনো জানে না। সময় হ'লে একদিন তাকে বলবো—আজ নয়, যেদিন সে বুঝতে শিখবে।

বাতি বাড়াইয়া দিয়া সে উঠিয়া ঘরটির এধার ওধার ঘুরিতে সুরু করিয়াছিল। দীনেশের কাছে দাঁড়াইয়া বলিয়া গেল, আমি দেব ওকে এক আশ্চর্য্য শিক্ষা দীন-দা। বোষ্টম মায়ের মেয়ে—ধর্ম্মের সঙ্কীর্ণতা ওর রক্তে মিশানো রয়েছে। সেই সংস্কার ওর মন থেকে একেবারে উপড়ে ফেলতে হবে। শেখাতে হবে যে সে-মানুষ স্বার্থপর যে-মানুষ শুধু নিজের বৈকুণ্ঠচিন্তা নিয়ে থাকে, সংসারের দিকে চায় না। শেখাতে হবে, জগতের সুখ-শান্তি জলাঞ্জলি দেওয়ার নাম ত্যাগ নয়—ত্যাগ, জগতের সেবায়।

লক্ষ্য-আদর্শকে সে যেন তুলি দিয়া আঁকিয়া রাখিয়াছে এবং সেই ছবি দেখিয়াই সে এখন মুগ্ধ এমনি ভাবে সে কথাগুলি বলিতেছিল। সে ছিল তখন ভাবের পরিকল্পনায় বিভোর—ভাবিতেও পারিল না যে দীনেশের মন শঙ্কা ও সংশয় দিয়া তাহারি অতীতকে যাচাই করিতেছে।

সে কহিল, সত্য বল পরেশ—কমলা কি তোমার স্ত্রী?

পরেশ চমকিয়া ফিরিয়া কহিল, হাঁ দীন-দা, সে আমার স্ত্রী। সে-সব বলবার জন্যই আজ তোমাকে এখানে আসতে লিখেছিলাম। আমার নালিশ, ধর্ম্মের উপর। কিসের জন্য এই ধর্ম্ম? আগুন জ্বালাবার জন্য না নিভাবার জন্য?

পৃথিবীর অর্দ্ধেক অশান্তি নির্ম্মমতা মূঢ়তার উপশম হ'ত ধর্ম্ম যদি নীতির সঙ্গে বিরোধ বাধিয়ে না বসতো। আমায় নাস্তিক বলতে চাও, বল—কিন্তু এ কথা ঠিক জেনো যে নাস্তিক পান করে বিষকে বিষ ব'লেই, সুধা ব'লে আপনাকে ও জগৎকে প্রতারণা করে না।

মাথা নীচু করিয়া খানিকক্ষণ সে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। গোটা অতীতটাই একখানি ছাপা বই-এর মত তাহার নয়নের সম্মুখে মেলা, কোথা হইতে আরম্ভ করিবে তাই ভাবিয়া সে যেন ঐ পাতাগুলি লইয়া নাড়িতেছিল। দ্বিধা কাটিয়া গেলে মুখ তুলিয়া সে ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল,—আমরা খণ্ডগ্রামের জমিদার। বাবার এক ছেলে—মার মৃত্যুর পর বয়স্থা সুন্দরী দেখে তিনি কমলার সঙ্গে আমার বিবাহ দিয়েছিলেন। কমলার বাবা ছিলেন একজন পরম বৈষ্ণব। নবদ্বীপ ও বৃন্দাবনের বড় বড় ভক্তেরা এসে তাঁর বাড়ীতে পায়ের ধূলো দিয়ে যেতেন। রোজই সন্ধ্যাকালে খোল করতাল নিয়ে প্রসিদ্ধ কীর্ত্তনিয়ারা এসে জুটতো, গান অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত চলতো, এবং সেই গানে সমস্ত পরিবার এমন কি কমলাও যোগ দিত। এমনি ক'রে কমলার মনে ধর্ম্মের প্রতি একটা অতর্কিত অন্ধ-ভক্তি ছেলেবেলা থেকে বদ্ধমূল হ'য়ে গিয়েছিল—যা জ্ঞানকে রাখতো আচ্ছন্ন ক'রে, সত্যকে চালাতো বাঁকা পথে, আর কল্যাণকে দেখতো জগৎ থেকে পৃথক করে।

ধর্ম্মসম্বন্ধে আমাদের বাড়ীতে কোনরূপ বাঁধাবাঁধি না থাকলেও ধর্ম্মকে বাবা শ্রদ্ধার চক্ষেই দেখতেন, বিশেষ বৈষ্ণব ধর্ম্মকে। তিনি মনে করতেন ধর্ম্মে আস্থাবান লোকের পক্ষে অনাচারী হওয়া ততটা সহজ নয়, অবিশ্বাসীর পক্ষে যত—তাই, কমলার ধর্ম্মনিষ্ঠাকে তিনি বরাবর উৎসাহ দিতেন। কমলার অনুরোধে তিনি একটি মন্দির নির্ম্মাণ করলেন, জয়পুর থেকে কারিগর এনে গোবিন্দজীর সুন্দর একটি মর্ম্মর মূর্ত্তি গড়িয়ে সেই মন্দিরে করলেন তার প্রতিষ্ঠা। সামনে ক্ষুদ্র একটি চত্বর—কাজ-করা থামের উপর কাজ-করা ছাদ, মন্দিরটি ছিল যেন সেই দেবাত্মারই দিব্য দেহ, আর চারদিকের বাগানে ফুটন্ত ফুলগুলি তাঁর প্রসাধন।

এই মন্দির ও বাগানের কাজে কমলার সঙ্গে যোগ দিয়ে তার ছোঁয়াচটা বোধ করি শেষকালে বাবার মনেও গিয়ে লেগেছিল। রোজই তিনি সকাল বেলা মন্দিরে যেতেন পূজো দেখতে, সন্ধ্যা বেলা যেতেন আরতি দেখতে। আরতির পর কোনদিন বা কমলা তার সুমিষ্ট গলায় কীর্ত্তন গাইতো, তাই শুনে ভক্তির আনন্দে বিভোর হয়ে তিনি এসে আমায় বলতেন—কমলা আমার সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। দেখো বাবা, তার মনে যেন কখনো আঘাত দিও না, কষ্ট সে যেন কোনদিন না পায়।

বাবা যে অমন ক'রে আমায় কেন সাবধান ক'রে দিতেন তখন আমি তার মানে বুঝি নি। কমলাকে আমি খুবই ভালবাসতাম, তা তিনি বিলক্ষণ জানতেন। কিন্তু এটা বোধ করি তাঁর দৃষ্টি এড়ায় নি যে কমলার এই সব অনুষ্ঠানকে আমি মন-ভুলানো খেলার চেয়ে বড় ক'রে দেখতে পারি নি। বিরুদ্ধাচরণ আমি তার কোনো কাজে করি নি, দেখে শুনে আমি বরঞ্চ কৌতুকই অনুভব করতাম। কিন্তু আভাসে ইঙ্গিতে মনের অবহেলা ঘর-ছাড়া ছেলের মত কোন ফাঁকে বেরিয়ে প'ড়ে কমলাকে যেমন ক'রে তুলতো ক্ষুণ্ণ বিরক্ত, আমিও হ'য়ে পড়তাম তেমনি ক্ষুব্ধ অপ্রতিভ।

যে বছর রুণুর জন্ম হ'ল বাবাও মারা গেলেন সেই বছর। শেষ কয়েকটা মাস সংসারে তাঁর আর তেমন মন ছিল না। সর্ব্বক্ষণ ঠাকুর-বাড়ীতে থাকতেন, কমলাকে কাছে রেখে ভাগবত পাঠ শুনতেন আর ধর্ম্ম আলোচনা করতেন। যথারীতি দীক্ষা গ্রহণ করেন নি ব'লে শেষ পর্য্যন্ত তাঁর মনে একটা দুঃখ থেকে গিয়েছিল। মৃত্যুকালে কমলাকে ডেকে বললেন, মা ভবের ঘাটে নৌকা বেঁধে সারাটি জীবন শুধু ছাই মাটির সওদা করেছি। এখন ভরা গাঙে ভেসে যাবার সময় দেখি মাঝিকেই সঙ্গে নেওয়া হয় নি।

বাবার অন্তিম কথাগুলিই কমলার মনে দীক্ষা-গ্রহণের ইচ্ছা জাগিয়ে তুলেছিল কি না জানি না, কিন্তু তার সেই অভিলাষটি যখন বুঝতে পারলাম তখন আমি সেটা একটা অত্যন্ত বাড়াবাড়ি মনে করেছিলাম, এবং তাই নিয়ে তাকে বিদ্রূপ করতেও ছাড়ি নি।

পঞ্চদীপ

শ্রীশচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

আমি হেসে বললাম, অমন কাজও কর না, কমলা।

সে বললে, বাধা কি?

—বাধা তোমার রূপ যৌবন। দীক্ষা যিনি দিতে আসবেন তিনি নিজেই যদি দীক্ষিত হ'য়ে ফিরে যান তবেই বিপদ!

আমার কথা শুনে কমলা যেন আমোদ অনুভব করলে—কৌতুকভরে সে এমনি ক'রেই কথাটা হেসে উড়িয়ে দিলে। বললে, ভয় নেই। তুমি থাকবে আমার রূপ যৌবনের ভাণ্ডারী, তা হ'লে আর তা কাণ্ডারীর চোখে ধরা পড়বে না।

আমি বললাম, কমলা,ও জিনিস সাবধানে আড়াল ক'রে রাখলেই চোখে লাগে বেশী। বাশুলদত্তার কথা জান?

সে ঘাড় নাড়লে।

আমি বললাম, বাশুলদত্তা ছিলেন অবন্তীর রাজকন্যা। অবন্তীর রাজা কৌশম্বীপতি উদেনকে ছল ক'রে আটক করেছিলেন তার কাছ থেকে কোনো গুপ্ত বিদ্যা শিক্ষার জন্য। কিন্তু দীক্ষিত শিষ্য ছাড়া আর কাউকে উদেন সে-মন্ত্র দান করবে না দেখে তিনি একটি চমৎকার ফন্দি স্থির করলেন। কন্যা বাশুলদত্তাকে পর্দ্দার আড়ালে দাঁড় করিয়ে বললেন, ওধারে যে আছে সে একজন বামন—তার পানে চাইবে না, শিষ্যত্ব গ্রহণ ক'রে মন্ত্র শিক্ষা করবে। তারপর উদেনকে ডেকে এনে বললেন, পর্দ্দার ও পাশে একজন কুঁজী ব'সে আছে তোমার শিষ্যত্ব গ্রহণ করবার জন্য—তাকে মন্ত্র দান কর। এমনি ক'রে মন্ত্র শিক্ষা চলতে লাগলো। শেষে একদিন পর্দ্দার আড়াল গেল খ'সে, তখন উদেন দেখলে, সে কুঁজী নয়—পরমা সুন্দরী এক রাজকন্যা! আর বাশুলদত্তা দেখলে, সে বামন নয়—পরম সুন্দর এক রাজপুত্র!

কমলা হেসে ব'লে উঠ্‌লো,—বাঃ, বেশ গল্প ত। তারপর?

আমি বললাম, তারপর যা ঘটলো সে আর শুনে কাজ নেই

কিন্তু, তাকে বলা হয়েছিল যেটুকু তা হয়ত না বললেও চলতো, আর বলি নি যা সেটা স্পষ্ট ক'রে বললেই হ'ত ভাল। যাক্, সে পরের কথা।

ব্রাহ্মণরূপী তক্ষক যেমন পরীক্ষিতের কাছে এসেছিল, পরীক্ষিত জানতেও পারে নি সে তক্ষক, ঠিক তেমনি যেদিন এক কথক ঠাকুর মন্দিরে কমলার কাছে এসে দেখা দিয়েছিল সেদিন সে-ও বোঝেনি যে সেই উদেনেরই আবির্ভাব হয়েছে তার অ-দৃষ্ট ভবিষ্যতের পর্দ্দার আড়ালটিতে। কথকঠাকুর যুবা, গৌর কান্তি—চোখ দুটি যেন স্নিগ্ধ নম্র ভক্তির কমলাসন, তারই বিচিত্র বর্ণের ছটা ভ্রূযুগল রাঙিয়ে দিয়ে গণ্ডের পরে অধরোষ্ঠের পরে ঝলমল ক'রে উঠতো। সে ছিল সুকণ্ঠ ও সুগায়ক। তার গানের সুরটিতে যে পূর্ব্বরাগ প্রেম মান অভিমান ঝঙ্কার দিয়ে বেজে উঠতো তা যেমন দেবতাকে ক'রে তুলতো একান্ত আপনার,তেমনি আপনাকে বসিয়ে দিত সেই দেবতারই আসনে। সে আর শুধু একজন কথক মাত্র থাকতো না,—তার চেতনায় তখন মানবের কোন আদিম অনুরাগ ফেনিয়ে উঠে বিধি-নিষেধের বাঁধটিকে দিত ভাসিয়ে এবং সেই অনাহত অনুভূতির প্রবল উচ্ছ্বাসে প্রবৃত্তি হয়ে উঠতো উন্মাদিনী, চিন্তা হ'য়ে উঠ্‌ত উচ্ছৃঙ্খল

মন্ত্রশক্তি বিশ্বাস আমি কখনো করি নি। কিন্তু তার কথকতায় শব্দের মধুর ঝঙ্কার আমার মনে যেন সেই বিশ্বাসকেই অঙ্কুরিত করেছিল। ভাব ও ভাষার তরল আবেগ বেদানার দানার মত ফেটে পড়তো ধ্বনি-পুঞ্জের মাথায় মাথায়। শ্রোতা বিহ্বল আনন্দে মুগ্ধ হ'ত—কমলা বিকল হ'য়ে পড়তো। কথকতা আরম্ভ করবার পূর্ব্বে পঞ্চদীপ জ্বেলে সে ঠাকুরের আরতি করতো। পাঁচ রং-এর পাঁচটি শিখা জ্বলতো পঞ্চদীপের আধারে—সেই বর্ণ-জ্যোতির মিলিত আভায় মুখখানি তার দীপ্ত হ'য়ে উঠতো এবং তা যেন সেই পাথরের ঠাকুরটিকেও ঈর্ষার ধূমে মলিন ক'রে দিত।

সে বলতো, বিশ্বচেতনার মূলাধার ঐ পঞ্চদীপ। পঞ্চ-শিখার পাঁচটি বর্ণ পঞ্চভূতের তন্মাত্রা এবং তাতেই নারায়ণ সচেতন। পঞ্চেন্দ্রিয়ের সঙ্গে পঞ্চভূতের সামঞ্জস্য করবার জন্য আরতির প্রয়োজন

কথায় আলাপে এমনি একটা রহস্যের আকর্ষণ তার দিকে আমায় টানছিল সত্য, কিন্তু সেই সঙ্গে বিদ্বেষও এসে দেখা দিত যখন দেখতাম যে তার সেই যাদুমায়ার প্রভাব

কমলার উপর প'ড়ে তাকেও একেবারে অভিভূত ক'রে ফেলেছে। এমন নিবিড় শ্রদ্ধা গভীর বিশ্বাস আর আকুল হর্ষভরে সে তার কথা ও গান শুনতো যে তা দেখতে দেখতে আমার মনের ভিতর কিসের যেন একটা জ্বালা ইস্পাতের মত লিক্ লিক্ করতো—মনে হ'ত, এ যেন কার রাজ্য নিয়ে জুয়োখেলা চলছে, হারলেই বুঝি সর্ব্বস্বান্ত হ'য়ে পথে বেরুতে হবে। কিন্তু অন্তরের জাগ্রৎ পুরুষটি আমায় নিরন্তর সাবধান ক'রে বলতো—তুমি কে? পরস্বাপহারীর মত তুমি কেন তার উপর নিজের অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখতে চাও? রাজ্য যার তাকে ছেড়ে দাও শাসন করতে।

দিন কাটছিল, এমন সময় এক ঘটনা ঘট্‌লো যা আমার মনোবৃত্তির সাজানো ঘুটিগুলিকে উলটে পালটে একেবারে ছত্রাকার ক'রে দিলে। আমি মহালে গিয়েছিলাম কাজের দরুণ—সারাদিন সেখানে থেকে প্রহর দেড়েক রাত্রে যখন বাড়ী ফিরেছি, কমলা তখনো মন্দিরে। কথক ঠাকুরের মধুর কণ্ঠের কীর্ত্তন গান বাতাসের স্তরে স্তরে ভেসে আসছিল, ঢেউয়ের মাথায় জঞ্জালের মত। আমার স্বাচ্ছন্দ্য ও যত্নের প্রতি কমলার যে বিন্দুমাত্র দৃষ্টি নেই, সে-কথা যেন ঐ সুরের পর্দ্দায় ব্যঙ্গভরে উঠে নেমে আমায় অধীর ক'রে তুল্‌ছিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে জেগে উঠ্‌ছিল অস্ফুট গুঞ্জনের মত আমার চিরদিনের অভিযোগগুলি—মনের অমিল, মতের অমিল, শিক্ষার অমিল। আমি বিস্মিত হলাম এই ভেবে যে আমাদের মনের মান-মন্দিরে তাপ-যন্ত্রের এমন বৈষম্য থাকা সত্ত্বেও কেন এতদিন ঝড় ওঠে নি—কেমন ক'রে আমার নিজের পরাভবগুলিকে নির্ব্বিকল্পে উড়িয়ে দিতে পেরেছিলাম, শান্তি-কল্পনার একটা মিথ্যা আবরণ দিয়ে তুচ্ছ সংসারটিকে ঘিরে রাখবার জন্য অকস্মাৎ যেন সেই পরাভবেরই রুদ্ধ অভিমান স্ফুলিঙ্গস্পৃষ্ট বারুদের মতন জ্ব'লে উঠলো, এবং তার লেলিহান শিখা কমলার সঙ্গে আর কথক ঠাকুরের সঙ্গে একটা চরম বোঝাপড়া করবার উদ্দেশ্যে লক্ লক্ ক'রে বেরিয়ে এলো।

মন্দিরের খিলানের নীচে থামে ভর ক'রে আমি এসে দাঁড়ালাম। বারান্দায় গান চলছিলো। কয়েকজন নর-নারীর মাঝে দাঁড়িয়ে কথক ঠাকুর, সামনে কমলা। মৃদঙ্গ ও করতাল সহযোগে সকলেই তারা তখন তালে তালে পা ফেলে বাহু দুটি উর্দ্ধে তুলে নৃত্যের ছন্দে যেন কোন প্রেমসিন্ধু মন্থন করতে করতে চারিদিকে তার ঢেউ ছুটিয়ে দিচ্ছিল। ক্ষণেকের জন্য তারই উচ্ছ্বাস আমার সঙ্কল্পকে বাধা দিয়ে মুগ্ধ আবেশে আমায় নিয়ে চললো উজান পথে তাদেরি সঙ্গে ভাসিয়ে। আমিও গাইতে সুরু করলাম।

পরক্ষণে কমলার পানে চেয়ে আমার চমক ভাঙ্‌লো। সেই চোখের কটাক্ষে, সেই অধরের বাঁকচুটিতে—সারা মুখখানির উপর অপরিসীম প্রেমের জ্যোতি প্রতিবিম্বিত হ'য়ে পড়েছিল সেই কথক ঠাকুরের উপর, আর সে-ও তেমনি পরম আনন্দে প্রীতি ও তৃপ্তির সহিত দেবতার পাওনাগুলিকে আপনার ব'লে গ্রহণ করছিল। আমার সর্ব্বাঙ্গে তাড়িত প্রবাহ ছুটে গেল। আমি তৎক্ষণাৎ দৃষ্টি ফিরিয়ে চাইলাম মন্দিরের ভিতর সেই দেবমূর্ত্তির পানে। বাসুকীর মাথার উপর পঞ্চদীপের পঞ্চবর্ণ শিখাগুলি তখনো জ্বলছিল এবং তার উদ্গত ধূমের আড়াল থেকে দেবতাটিকে মনে হ'ল যেন হাসচে—বক্র ক্রুর মর্ম্মান্তিক হাসি। দেবতার প্রেম অভিনয় ক'রে মানুষ করেছে তাকে আপনার পংক্তি-ভুক্ত, তাই এখন তার সংযম ও সংস্কারের বেড়াগুলিকে ভেঙ্গে দেবতা যদি প্রতিফলই দিয়ে থাকে—বিচিত্র কি! এ যে তার অপমানের প্রতিশোধ!

অন্ধকারে অগোচরে আমি সেখান থেকে চ'লে এলাম। ধীরে ধীরে নিজের বিছানায় এসে শুয়ে পড়লাম, কিন্তু চোখে আমার ঘুম ছিল না। এইমাত্র আমি যা স্বচক্ষে দেখে এসেছি—সেই প্রেমের ব্যঞ্জনা, অনুরাগের অভিব্যক্তিকে এখন আমি আর কমলার খেলাঘরের উৎসব ব'লে মেনে নিতে পারলাম না। মিথ্যা যখন সত্য হয় সে হয় তখন সত্যেরও বাড়া, তাই দেবতার প্রতি কৃত্রিম প্রেম হ'য়ে দাঁড়ায় যেন মানুষের উপর অকৃত্রিম লালসা!

আমার ধৈর্য্য তিতিক্ষা সব ভেসে গিয়েছিল। অন্ধ সহিষ্ণুতার ফলে এতদিন আমায় হারকেই স্বীকার করতে হয়েছে, আজ তবে সজাগ সহিষ্ণুতার বলে জিতের বাজি কেড়ে নিতে হবে।

শ্রীশচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

দুপুর রাত্রে কমলা ফিরে এলে আমি বললাম, কাল থেকে মন্দিরে গিয়ে আর তোমার কীর্ত্তন গাওয়া চলবে না, কমলা।

সে জিজ্ঞাসা করলে, কেন?

আমি বললাম, কথক ঠাকুরকে আজই আমি বিদায় ক'রে দিচ্ছি।

কমলা চ'টে বললে, না—আমি থাকতে সে হবে না।

রুক্ষস্বরে আমি জবাব দিলাম, বাড়ীর কর্ত্তার হুকুম তোমাকেও মানতে হবে।

অবাক হ'য়ে ক্ষণকাল সে আমার পানে চেয়ে রইলো। আমার মুখে এমন জোর কথা আগে সে কখনো শোনে নি।

সে বললে, বেশ, তা হ'লে বাড়ীর বাইরে যেখানে কর্ত্তার হুকুম পৌঁছয় না সেইখানে গিয়ে দাঁড়াবো।

রাগে আমার সর্ব্ব শরীর কাঁপছিল। বললাম, আমার অধিকার এড়িয়ে যাওয়া অত সহজ নয়, কমলা।

দৃঢ় মুষ্টিতে তার হাত চেপে ধ'রে আমি তাকে টেনে নিয়ে চললাম শুভ্র শয্যার উপর। রুণু ঘুমোচ্ছিলো—কুঁড়ির মত কোমল মুখখানির উপর যেন কোন দেব-লোকের কিরণ হাসি ও সৌরভ ছড়িয়ে দিচ্ছিলো। মুগ্ধ দৃষ্টিতে তার পানে চেয়ে দুজনাই আমরা ক্ষণকাল নীরবে দাঁড়িয়ে রইলাম।

কমলার হাত তখনো আমি ছাড়ি নি। একটু ঝাঁকি দিয়ে বললাম, রুণু তোমার মেয়ে। তার প্রতি তোমার কোনো কর্ত্তব্য নেই তাই কি তুমি মনে কর?

তৎক্ষণাৎ বললে, না, তা আমি মনে করি না। ওর প্রতি আমার সব চেয়ে বড় কর্ত্তব্য হচ্ছে তোমার কাছ থেকে ওকে দূরে সরিয়ে রাখা।

—তবে তোমাকেই দূরে থাকতে হবে। এই ব'লে পাশের ঘরে তাকে জোর ক'রে ঠেলে দিয়ে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ ক'রে দিলাম। সে যে মেজের উপর ছিটকে প'ড়ে গেল, আমি তা চেয়েও দেখলাম না।

উঃ!—সে রাত্রি যে কি ভাবে কেটেছিল তা ভগবান জানেন। আমার শাসনের খড়্গ শুধু কমলার উপর প'ড়েই ক্ষান্ত হলো না, এখন তা রক্ত চক্ষু ক'রে আমারি প্রতি উদ্যত হ'য়ে উঠলো। প্রেমকে নামিয়ে প্রভুত্বকে বড় ক'রে আমি যেন জবরদস্তির লাভের ঘরেও বিসর্জ্জনের লোকসানেরই অঙ্ক লিখে বসলাম। যে-যুগে নারী ছিল শুধু পণ্যবস্ত—পণ্যবস্তুর মতই যখন তাকে যুদ্ধ ক'রে লাভ করা যেত, সেই যুগকেই আবার ফিরিয়ে এনে মনুষ্যত্বের গৌরবকে দিলাম হাঁকিয়ে, এবং তারই লাঞ্ছনা আমার মনে এখন মাথা কুটতে লাগলো।

পরদিন সকালে আমি নৌকা প্রস্তুত করতে আদেশ দিলাম। নিজের প্রতি একটা ধিক্কার এ-বাড়ীতে আমার তিষ্ঠানো ভার ক'রে তুলেছিলো।

দিনের পর দিন ভেসেই যাচ্ছি—বজ্‌রা বাঁধছি না কোথাও। পাল তুলে, দাঁড় বেয়ে, নদীর ঢেউ কাটিয়ে, খালের স্রোতে ব'য়ে কোথায় যে চলেছি তা নিজেই জানি না। দাঁড়ি মাঝিরা সব পরিশ্রান্ত—হাত আর চলে না, দেহ আর সয় না। তাদের দুর্দ্দশা দেখে বললাম,—যা করিম-গঞ্জের হাটে নৌকা বেঁধে বিশ্রাম কর্‌।

আজ হাটের দিন নয়। তবু পাড়ের উপর অসংখ্য লোকের ভিড়। তাদের মধ্যে কারু কারু হাতে লাঠি। তারা সকলেই উত্তেজিত—উচ্চকণ্ঠে কলহ করছিল। দেখে মনে হ'ল এখনি বুঝি একটা দাঙ্গা বেঁধে বসে—এমনি ক'রেই তারা হাত নাড়ছিল আর রুখে রুখে পরস্পরের দিকে এগুচ্ছিল। ব্যাপারটা কি জানবার জন্য কৌতুহলী হয়ে তাদের মোড়লদের ডেকে আনতে আমি একজন পাইক পাঠিয়ে দিলাম।

খানিকক্ষণ পরে সে ফিরলো—সঙ্গে কয়েকজন মুসলমান। তাদের মধ্যে একজন কৃষ্ণবর্ণ ব্যক্তি অগ্রসর হ'য়ে সেলাম ক'রে বললে, হুজুর, আমার নাম মেহের আলী—আমরা হুজুরের কলাকাটা মহালের প্রজা। আমার স্ত্রী রাজিয়া এ গাঁয়ের করিমবক্সের বাড়ীতে পালিয়ে চ'লে এসেছে। আমি তাকে ছিনিয়ে নিতে এসেছিলাম। হুজুর যখন এসেছেন তখন আর ভয় কি?

আমি হতভম্ব হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। মনে হল যেন আমারি অন্তর্যাতনা মেহেরআলীর ছদ্মবেশ ধ'রে হঠাৎ বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে আমায় পরীক্ষা করবার জন্য। কিন্তু তৎক্ষণাৎ দোলায়মান মনকে সংযত ক'রে সযত্নে মেহের

আলীর থস্‌থসে হাত ছুখানি ধ'রে আমি তাকে বজরার কামরার মধ্যে নিয়ে এলাম।

বললাম,—মেহের, সত্যই কি তুমি রাজিয়া বিবিকে ভালবাসো?

সে বললে, হাঁ হুজুর, তার জন্য আমি জান্ দিতে পারি।

আমি ঘাড় নেড়ে বললাম, তা'হলে তুমি জোর ক'রে তাকে ফিরিয়ে নিতে চাইতে না। পাখীকে খাঁচায় পুরে সোহাগ করা ভালবাসা নয়—সখ!

আমার কথায় সে কি-যে বুঝলে বলতে পারি না। তার চোক ছুটো ছল ছল ক'রে উঠলো। অনেকক্ষণ সে চুপ ক'রে ব'সে রইলো, তারপর একটি দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে আমার পানে চেয়ে বললে, ঠিক কথা হুজুর। চিঁড়িয়া যখন উড়ে গেছে তখন তার খালি খাঁচাটা দিয়ে ঘর সাজিয়ে রাখলে সখ মেটে না, বরং আপশোষই বাড়ে।

সে চ'লে গেল। কিন্তু তার কথার স্বরে সত্যকার বেদনার সুরটি সারাটিক্ষণ জুড়ে আমার কানে বাজতে লাগলো। পশ্চিমে নদীর ওপারে গ্রামের আড়ালে সূর্য্য তখন ধীরে ধীরে নেমে যাচ্ছিল। নদীর ঘাটে গ্রামবধূরা এসে জমেছিল, তাদের কাঁখে কলসী—ঘোম্‌টার ফাঁক দিয়ে বজরার দিকে চকিত-দৃষ্টিতে চেয়ে দেখছিল। কেন জানি না, আমার মনে হ'ল তারা সব গ্রহ নক্ষত্র! সংসারকে কেন্দ্র ক'রে নির্দ্দিষ্ট পথে নির্দ্দিষ্ট নিয়মে চলেছে এক আনন্দ সঙ্গীতের তালে তালে—তাদের স্বেচ্ছা-স্বচ্ছন্দ গতিকে মণ্ডলীর গণ্ডী মধ্যে নিয়ন্ত্রিত ক'রে রেখেছে, কেন্দ্রশক্তির অস্বাভাবিক শাসন নয়, মমতার সহজ বন্ধন!

মাঝিকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলাম,—সোজা পথে খণ্ডগ্রামে পৌছতে কতক্ষণ লাগবে?

সে বললে, হুজুর খাল দিয়ে পুরো একদিনের পথ।

বললাম, বেশ! আজই রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর নৌকা ছেড়ে দিবি। কালকের মধ্যে পৌছানো চাই।

পরদিন যখন খণ্ডগ্রামে পৌছলাম তখন রাত্রি হয়েছে। ঘাটে জন মানব নেই—বাড়ী অন্ধকার। চিলছত্রের গম্বুজটিকে দেখা যাচ্ছিল যেন আম বাগানের জ্বলন্ত জোনাকীর ঝাড়গুলিকে তুচ্ছ ক'রে নীলাকাশে নক্ষত্রপুঞ্জের সঙ্গে মিলেছে। মন্দিরে গান বন্ধ—সব নিস্তব্ধ নিঝুম।

দেউড়ির দরজা খুলে দিয়ে দরোয়ান চুপচাপ স'রে দাঁড়ালো। বিস্মিত হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলাম, এরি মধ্যে আলো সব নিভিয়ে দিয়েছিস যে? তোদের আজ হয়েছে কি?

বৃদ্ধ গোমস্তা অম্বুরীশ এসে বললে, সর্ব্বনাশ হয়েছে বাবু, রাণীমা চ'লে গেছেন।

তার স্বর কেঁপে উঠলো। ছু হাতে চোখ ঢেকে ব'লে গেল, বাঁধুলীগ্রামে বিশালাক্ষীর মন্দিরে কথক ঠাকুরের গান চলছে শুনে সেখানে গিয়েছিলাম রাণীমাকে আনতে।

আমি ব'লে উঠলাম,—কেন গিয়েছিলে? কে বলেছিলো?

মুখ নত ক'রে সে বললে, রাগ করবেন না বাবু, আমার দোষ নেই। আমার যা সাধ্য করেছি, কিন্তু তিনি কিছুতে এলেন না।

আমার মনে পড়েছিল, মেহের আলীর কথা,—চিঁড়িয়া উড়ে গেছে—তার খালি খাঁচা দিয়ে কি হবে?

ঘরে বারান্দায় সব আলো জালতে আদেশ দিলুম। একে একে বাতিগুলি যেমন জ্ব'লে উঠলো, বাড়ীটিও তেমনি ইন্দ্রপুরীর শোভা ধারণ করতে লাগলো। প্রতিমা বিসর্জ্জনের দিনে দীপালির দীপ নিরানন্দকে দেয় দূর ক'রে, এও কি তাই?

সেই দীপ্ত ঘরগুলির উৎসব সজ্জার মধ্যে আমি একলা অকারণ ছুটে বেড়াতে লাগলাম। চারদিক হাহাকার ক'রে উঠছিল।

বিছানার উপর লুটিয়ে প'ড়ে অধীর হ'য়ে ডাকলাম, —অম্বুরীশ!

বৃদ্ধ ছুটে এসে বললে, আজ্ঞা করুন।

বালিসের মধ্যে মুখ গুঁজে কাতরকণ্ঠে বললাম, ওরা কণুকে নিয়ে গেছে। যেমন ক'রে পার তাকে নিয়ে এস।

—যে আজ্ঞে।

সে চ'লে যাচ্ছিলো, আমি তৎক্ষণাৎ উঠে তার হাত চেপে ধ'রে বললাম, তুমি কি মনে কর সে আর আসবে

না? আমি বলচি, রুণুকে সঙ্গে নিয়ে একদিন সে আমারি কাছে ফিরে আসবে। সে-দিন তাকে ফিরিয়ে দিও না— যত্ন ক'রে আমার কাছে নিয়ে এসো। আমি সেই শুভদিনের প্রতীক্ষায় রইলুম।

অম্বুরীশ চোখে কাপড় দিয়ে কেঁদে উঠ্‌ল।

*　　*　　*

কথা শেষ করিয়া পরেশ কহিল, তখন বুঝি নি যে সকল মোহের ঘোরই হয়ত এককালে কেটে যায়, কিন্তু ধর্ম্ম যার চোখ দুটি অন্ধ ক'রে বেঁধে রেখেচে তার মোহ কাটে না কোনদিন। না দীন-দা, রুণুকে নিয়ে সে আর ফেরে নি। শেষ দিন পর্য্যন্ত সহজ বুদ্ধি দিয়ে একটিবারও সে চেয়ে দেখেনি যে আর একজনের কি সর্ব্বনাশই সে করেছে। এর চেয়ে শোচনীয় আর কি হতে পারে?

দীনেশ উঠিয়া দাঁড়াইল। পরেশকে আলিঙ্গন করিয়া আবেগভরে কহিল, ধর্ম্মাধর্ম্ম জানি নে ভাই। তবে এটুকু বুঝতে পেরেছি—ঐ-যে পঞ্চদীপ একদিন কমলাকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল মৃত্যুর মধ্যে, সেই আবার রুণুকে ফিরিয়ে দিয়ে তোমায় এনেছে জীবনের পথে। তোমার দুঃখ করবার কারণ নেই পরেশ।

রিক্ত ও মুক্ত

শ্রীমৈত্রেয়ী দেবী

সে কোন্ রাতে ভেবেছিলেম একলা বাহির হ'ব,
　সঙ্গে আমার সঙ্গী নাহি ল'ব,
শয্যা ছেড়ে উঠে এসে খুলে দিলেম দ্বার,
সম্মুখেতে স্তব্ধ আকাশ গভীর অন্ধকার—
পৃথিবী যে সর্ব্বহারা মন্ত্র-ছায়াময়
আজ আমাকে বিশ্ব-মাঝে নিঃস্ব মনে হয়।

পথের পাশে বাঁশের ঝোপে কৃষ্ণচূড়ার গাছে
আমার বুকের বেদন যেন নিবিড় হ'য়ে আছে!
সম্মুখে মোর চলেছে পথ কোথায় নাহি জানি,
মৃত্যু যেন মূর্ত্ত হ'য়ে ফেলেছে জাল খানি!
　আমি এলেম নেমে
ক্ষণেক আমার মুক্ত দুটি দ্বারের পাশে থেমে।
মনে ভাবি অন্ধকারে সকল হ'ল লয়,
চক্ষে কিছু দেখতে নারি, একলা মনে হয়!
অন্তবিহীন অন্তরেতে চিন্তা নাহি জাগে,
আপনারে ভিন্ন ব'লে মুক্ত ব'লে লাগে॥

কখন্ দেখি সম্মুখে মোর বাঁধন গেছে ছুটে,
রক্ত-উষার ওষ্ঠপুটে হাস্য ফুটে উঠে।
রাতের মায়া পড়ল ছিঁড়ে দীর্ঘ পথ-মাঝে
হৃদয়ে মোর এমন ক'রে দৈন্য কেন বাজে?
পুষ্প মেলে মুগ্ধ আঁখি, পক্ষী উড়ে জেগে,
উচ্ছ্বসিত পূর্ব্বাকাশের রশ্মিরেখা লেগে।
চলতে নারি বেদন্ লাগে, চিত্তকলরোলে
স্নিগ্ধ আলোয় আত্মারে মোর ব্যক্ত ক'রে তোলে
রাত্রি-ঘেরা স্বপ্ন-মাঝে গর্ব্বে ছিনু ভরি'
আপনারে শূন্য দেখে মুক্ত মনে করি।
　এখন মনে হয়
আপনারে রিক্ত করা মুক্ত করা নয়॥

হাত বাক্সে বেতার যন্ত্র

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ রায়

সাধারণত বেতার যন্ত্রের Valve এর তিনটি অংশ থাকে, 'Plate', 'Grid' ও 'Filament'। সম্প্রতি কতকগুলো Valve বেরিয়েছে যাদের চারটি অংশ আছে, বাড়তি অংশটি হচ্ছে 'Extra Grid'। একরকম Valve-

Theoretical Diagram

এর নাম Four Electrode Valve। ('বেতার যন্ত্র নির্ম্মাণ' পুস্তক দ্রষ্টব্য)। এই ধাঁজের দুটি Valve দিয়ে একটি set তৈরীর কথা এবার লেখা হবে। সেটটি, সমস্ত ব্যাটারি, aerialএর তার, earthএর তার ও মাটিতে পুঁতে দেবার জন্যে একটা ভাল লোহার খোঁটা, এমন কি একজোড়া Headphoneশুদ্ধ সমস্ত সাজ সরঞ্জাম ছোট একটি ১২"×৭" হাত বাক্সের ভেতরই fit করা চলে। পাঁচ বছরের ছেলে পর্য্যন্ত যন্ত্রটিকে খেলনার মত হাতে ক'রে নিয়ে যেখানে খুসী যেতে পারবে, যন্ত্রটি এতই হালকা। টেলিফোনে শুন্‌লে এই যন্ত্রে প্রায় আশি-নব্বই মাইল দূর থেকেও বেতারের গান বাজনা শোনা যাবে আর বেতার প্রেরকযন্ত্রের দশ-পনরো মাইলের ভেতর বেশ সুন্দর স্বরবর্দ্ধক যন্ত্র বা Loudspeakerএ গান শোনা যায়। এই যন্ত্রে চার জোড়া টেলিফোন একসঙ্গে ব্যবহার করা যায়। সুতরাং কলকাতা থেকে চল্লিশ-পঞ্চাশ মাইল দূরে যাঁরা বেড়াতে বা চড়ুইভাতি করতে যাবেন, তাঁরা এইরকম একটা ছোট্ট হাতবাক্স নিয়ে গেলে বেশ মজা পাবেন। সাইকেলে চ'ড়ে যাঁরা বেড়াতে বেরুবেন তাঁদের পক্ষে এই 'হাত বাক্স বেতার' সবচেয়ে উপভোগ্য বস্তু হবে। এখন কি কি যন্ত্র দিয়ে set টি তৈরী সে কথা বলা যাক্—

প্রথমেই দরকার একটা হাতবাক্স যার ভেতরের মাপ হবে প্রায় 12"×7½"।

একখানা এবনাইটের টুকরো 7½"×7¼"×¼"।
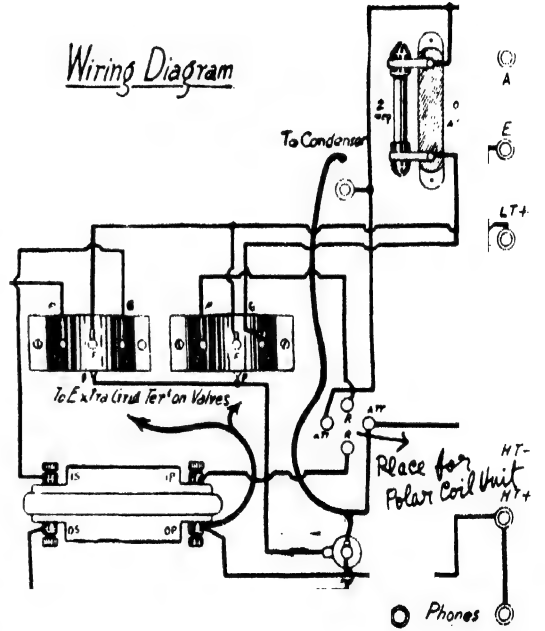
একটা Grid Condenser ·0003

একটা Grid Leak 2 megolims

আটটা Terminal (Aerial, Earth, L. T., H. T +, H. T. – ও দুটো phones মার্কা হ'লেই ভাল।

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ রায়

One 'polar' coil unit *

One Eureka 'Dial-0-Condenser' '0005 *

One Euergo L. F. Transformer 5-1 ratio

One Lisseustal " Minor"

(এটা filament resistance এর জন্য ব্যবহার হচ্ছে, এটা না পাওয়া গেলে অন্য ভাল Fil. Res. ব্যবহার করা যেতে পারে)

দুইটি four-electrode valve এবং দুইটি ভাল valve holder ('Aermonie' E type-এতেই চলিবে।)

জন্যে করবেন কি, একগাছা ষাট ফিট লম্বা রবারের insulation দেওয়া flexible তার একটা সরুলম্বা কাঠের কাঠিমের ওপর জড়িয়ে রাখবেন। তার তলার দিকে একটা ভারী পাথরের টুকরো বেঁধে, উঁচু একটা গাছের ওপর তারটা ছুঁড়ে দিয়ে শেষটা aerial terminal এ লাগিয়ে দিলেই বেশ ভাল aerial হবে। Four-electrode Valve এর H. T. ব্যাটারি সাধারণত কুড়ি ভোল্টের বেশী লাগে না—সুতরাং দুটো ৯ ভোল্ট ক'রে Grid-bias এর
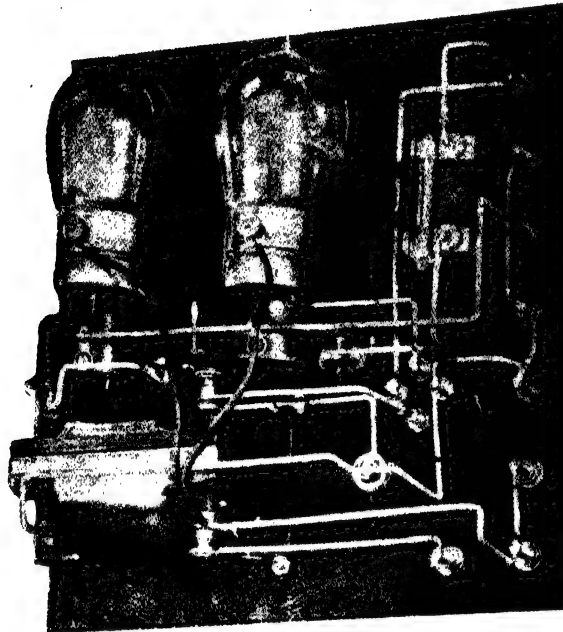
একটি extra valve holder 'Polor' coil unitএর জন্য। এছাড়া স্ক্রু, connection এর তার এসমস্তও চাই। এখন দূরে এই set নিয়ে বেড়াতে যেতে হ'লে ভাল earth করবার জন্য একটা ১০ ইঞ্চি লম্বা copper rodএর মাথায় একটা বোতলের terminal রাঙ্ দিয়ে জুড়িয়ে নেবেন। মাটিতে rodটা একেবারে ঢুকিয়ে দিয়ে ওপরের terminalএ earth connectionএর তার এঁটে দিলেই বেশ সুন্দর earth হবে। Aerial এর

ব্যবহারের উপযোগী dry battery কিনে seriesএ অর্থাৎ একটা ব্যাটারীর ৯ ভোল্টের জায়গা থেকে একটি তার নিয়ে গিয়ে আর একটির zero ভোল্টের জায়গায় জুড়ে দেবেন, তাহলেই আঠারো ভোল্ট হবে। L. Zর জন্যে একটা Portable type ও Nonspillable Accumulator কিনবেন। Oldham কোম্পানীর তৈরী এক রকম আছে সেগুলি বেশ কাজে লাগে, অন্য হ'লেও হবে। এখন যন্ত্রটির theoretical diagram দেখুন ১নং ছবিতে। ২নং ছবিতে

জোড়া তাড়া দেবার একটা ম্যাপ দেখান হয়েছে। তার পরের ছবিতে কেমন ক'রে যন্ত্র গুলো বসিয়ে connection করা হয়েছে সেটাও বেশ ভাল ক'রে দেখে নিন। এবনাইটের ওপর যন্ত্রের অংশগুলি সমস্ত বসিয়ে, জোড়াতাড়ার কাজ শেষ হ'য়ে গেলে, হাতবাক্সটিতে এবনাইটের ওপর যে সেটটি ছবির '৩' চিহ্নিত অংশ। টেলিফোন receiverএর মাথার Band দুটোও খুলে '১' চিহ্নিত জায়গায় setএর ওপর কেমন ক'রে রাখা হয়েছে তা স্পষ্টই দেখতে পাবেন। এই বেতার গ্রাহক যন্ত্রের, তা হ'লেই দেখছেন, যা' কিছু দরকার সমস্তই এই ছোট্ট হাত বাক্সটির ভেতর চমৎকারভাবে রাখা

তৈরী করা হোল সেটি fit ক'রে ফেলুন। চার নম্বর ছবির বাঁ দিকে '১' চিহ্নিত জায়গায় set টি fix করা হয়েছে। H. T. Battery, L. T. Accumulator, 'Polar' Coil unit, telephoneএর headpiece দুটো ও aeriel তারের কাঠিমটি '২' চিহ্নিত অংশে দেখতে পাবেন। Earth এর জন্য যে copper rod তৈরী করা হয়েছে সেটি চারনম্বর যায়। আর একটি মজা হ'চ্ছে, যন্ত্রটিতে Four electrode valve ছাড়া ordinary valveও ব্যবহার করা চলে, তখন ২নং ছবিতে যে দুটি তার 'To extra grid of valves' লেখা আছে, সে দুটি খালিই থাকে। পরের সংখ্যায় অন্য ধাঁজের নূতন রকম গ্রাহক যন্ত্রের আলোচনা করবার ইচ্ছা আছে।

২৪

রৌদ্র উঠিয়াছে কিনা দেখিবার জন্য দুর্গা জানালা খুলিয়াছিল, আর বন্ধ করে নাই। খোলা জানালা দিয়া ঝিরঝিরে ভোরের বাতাস বহিতেছে—নীলমণি রায়ের পোড়ো ভিটার বাতাবী লেবুগাছটা হইতে ফুটন্ত লেবুফুলের মিঠা গন্ধ ভাসিয়া আসিতেছে।

দুর্গা কাঁথার তলা হইতে অত্যন্ত খুসির সহিত ডাকিল অপু—ও অপু—

অপু জাগিয়াই ছিল, কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত কোন কথা বলে নাই। বলিল—দিদি, জানালাটা বন্ধ ক'রে দিবি? বড্ড ঠাণ্ডা হাওয়া আস্‌চে—

দুর্গা উঠিয়া জানালা বন্ধ করিয়া দিয়া বলিল—রাণুর দিদির বিয়ে কবে জানিস্? আর কিন্তু বেশী দেরী নেই। খুব ঘটা হবে, ইংরিজি বাজ্‌না আস্‌বে। দেখিচিস্ তুই ইংরিজি বাজ্‌না?

—সেই সব মাথায় টুপি প'রে বাজায়, এই বড় বড় বাঁশি—মস্ত বড়, আমি দেখিচি—আর এক রকম বাঁশি বাজায়, কালো কালো, অত বড় নয়, ফুলোট্ বাঁশি বলে—এমন চমৎকার বাজে! ফুলোট্ বাঁশি শুনিচিস্?

দুর্গা আর একটা কথা ভাবিতেছিল।

কাল সে বৈকালে ওপাড়ার খুড়ীমার কাছে বেড়াইতে যায়। একথা সেকথার পর খুড়ীমা জিজ্ঞাসা করিল, দুগ্‌গা তোর সঙ্গে ঠাকুরপোর কোথায় দেখা হয়েছিল রে?

সে বলিল—কেন খুড়ীমা?...পরে সে সেদিনের কথা বলিল। কৌতুকের সুরে বলিল, পথ হারিয়ে খুড়ীমা ওতেই—একেবারে গড়ের পুকুর—সেই বনের মধ্যে—

খুড়ীমা হাসিয়া বলিল—আমি কাল ঠাকুরপোকে বল্‌ছিলাম তোর কথা—বল্‌ছিলাম—গরীবের মেয়ে ঠাকুরপো, কিছু দেবার থোবার সাধ্যি তো নেই বাপের—বড্ড ভাল মেয়ে—যেন একালেরই মেয়ে না—তা ওকে নাওগে না? তাই ঠাকুর পো তোর কথা-টথা জিগোস্ করছিল—বল্লে, ঘাটের পথে সেদিন কোথায় দেখা হোল—পথ ভুলে ঠাকুর পো কোথায় গিয়ে পড়েছিল—এই সব। তারপর আমি আজ তিনদিন ধ'রে বল্‌চি শ্বশুর ঠাকুরকে দিয়ে তোর বাবাকে বলাবো। ঠাকুরপোর যেন মত আছে মনে হোল, তোকে যেন মনে লেগেচে—

দুর্গা গোয়াল হইতে বাছুর বাহির করিয়া রৌদ্রে বাঁধিল বটে, কিন্তু অন্যদিন বাড়ীর কাজ তবু ত যাহোক্ কিছু করে আজ সে ইচ্ছা তাহার মোটেই হইতেছিল না। এক একদিন, তাহার এরকম মনের ভাব হয়—সেদিন সে কিছুতেই বাড়ীর গণ্ডীতে আট্‌কাইয়া থাকিতে পারে না—কে তাহাকে পথে

পথে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরাইয়া লইয়া বেড়ায়। আজ যেন হাওয়াটা কেমন সুন্দর, সকালটা না গরম না ঠাণ্ডা, কেমন মিষ্ট গন্ধ পাওয়া যায় নেবুফুলের—যেন কি একটা মনে আসে, কি তাহা সে বলিতে পারে না।

বাড়ীর বাহির হইয়া সে রানুদের বাড়ী গেল। ভুবন মুখুয্যে অবস্থাপন্ন গৃহস্থ, এই তাঁর প্রথম মেয়ের বিবাহ, খুব ঘটা করিয়াই বিবাহ হইবে। বাজিওয়ালা আসিয়া বাজির দরদস্তুর করিতেছে, সীতানাথ এ অঞ্চলের বিখ্যাত রসুন চৌকীবাজিয়ে, তাহারও বায়না হইয়াছে, বিবাহ উপলক্ষে নানাস্থান হইতে কুটুম্বের দল আসিতে সুরু করিয়াছে, তাহাদের ছেলেমেয়েতে বাড়ীর উঠান সরগরম।

দুর্গার মনে ভারি আনন্দ হইল—আর দিনকতক পরে ইহাদেরই বাড়ীতে কত বাজি পুড়িবে। সে কোনো বাজি কখনও দেখে নাই কেবল একবার গাঙ্গুলী বাড়ীর ফুলদোলে একটা কি বাজি দেখিয়াছিল হুস্ করিয়া আকাশে উঠিয়া একেবারে যেন মেঘের গায়ে গিয়া ঠেকে, সেখান হইতে আবার পড়িয়া যায়, এমন চমৎকার দেখায়!···অপু বলে হাউই বাজি।

দুপুরের পর মা দালানে আঁচল বিছাইয়া একটু ঘুমাইয়া পড়িলে সে সুড়ুৎ করিয়া পুনরায় বাড়ির বাহির হইল। ফাল্গুনের মাঝামাঝি, রৌদ্রের তেজ চড়িয়াছে, একটানা তপ্ত হাওয়ায় বাঁশপাতা ও রানুদের বাগানের বড় নিমগাছটার হলদে পাতাগুলা ঘুরিতে ঘুরিতে ঝরিয়া পড়িতেছে—কেহ কোনোদিকে নাই, নেড়াদের বাড়ীর দিকে কে যেন একটা টিন বাজাইতেছে। বু-উ-উ উ করিয়া কি একটা শব্দ হইল। কাঁচপোকা! দুর্গা নিজের অনেকটা অজ্ঞাতসারে তাড়াতাড়ি আঁচল মুঠার মধ্যে পাকাইয়া চকিত দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিতে লাগিল। এ কাজ করিয়া সে এরূপ অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে যে, দিক্‌চক্রকালে শত্রুপক্ষের ঘোড়ার খুরের প্রথম ধূলি উড়িতেই সে তৎক্ষণাৎ কর্ত্তব্য ঠাহরাইয়া লইয়া হাতিয়ার বন্দ হইয়া প্রস্তুত হইতে পারে; চোখ, কান, হাত সব কলের মত আপনা আপনি নিজ নিজ কাজ করিয়া যায়; দেহীর কোনো চেষ্টার প্রয়োজন হয় না।

কাঁচপোকা নয় সুদর্শন পোকা।

তাহার মুঠার আঁচল আপনা আপনি খুলিয়া গেল... আগ্রহের সহিত পা টিপিয়া টিপিয়া সে পোকাটার দিকে আসিতে লাগিল। সাম্‌নের পথের উপর বসিয়াছে, পাখার উপর শ্বেত ও রক্ত চন্দনের ছিটার মত বিন্দু বিন্দু দাগ। সুদর্শন পোকা—ঠিক পোকা নয়—দেখিতে পাওয়া অত্যন্ত ভাগ্যের কাজ—তাহার মার মুখে, আরও অনেকের মুখে সে শুনিয়াছে। সে সন্তর্পনে ধুলার উপর বসিয়া পড়িল...পরে হাত একবার কপালে ঠেকাইয়া আর একবার পোকার কাছে লইয়া গিয়া বার বার দ্রুতবেগে আবৃত্তি করিতে লাগিল—সুদর্শন, সুভালাভালি রেখো··· সুদর্শন, সুভালাভালি রেখো...সুদর্শন, সুভালাভালি রেখো। (অবিকল এই রূপই সে অপরের মুখে বলিতে শুনিয়াছে।) পরে সে নিজের কিছু কথা মন্ত্রের মধ্যে জুড়িয়া দিল—অপুকে ভাল রেখো, মাকে ভাল রেখো, বাবাকে ভাল রেখো, ওপাড়ার খুড়ীমাকে ভাল রেখো—পরে একটু ভাবিয়া ইতস্তত করিয়া বলিল—নীরেনবাবুকে ভাল রেখো, আমার বিয়ে যেন ওখানেই হয় সুদর্শন, রুনুর দিদির মত বাজি বাজ্‌না হয়।

ভক্তের অর্ঘ্যের আতিশয্যে পোকাটা ধুলার উপর বিষণ্ণভাবে চক্রকারে ঘুরিতেছিল, দুর্গা মনের সাধ মিটাইয়া প্রার্থনা শেষ করিয়া শ্রদ্ধার সহিত পাশ কাটাইয়া উঠিয়া গেল।

পাড়ার ভিতরকার পথে পথে মাথার উপর প্রথম ফাল্গুনের সুনীল, এমন কি অনেকটা ময়ূরকণ্ঠী, রংএর আকাশ গাছ পালার ফাঁকে ফাঁকে চোখে পড়ে।

সেওড়া বনের মাঝখান দিয়া নদীর ঘাটের সরু পথ। সুঁড়ি পথের দুধারেই আম বাগান। তপ্ত বাতাস আম্র-বউলের মিষ্ট গন্ধে, বনে বনে মৌমাছি ও চাক পোকার গুঞ্জনরবে, ছায়াগহন আম বনে কোকিলের ডাকে, স্নিগ্ধ হইয়া আসিতেছে।

বাগানগুলি পার হইয়া চড়ক তলার মাঠ। ঘাসে ভরা মাঠে ছায়া পড়িয়া গিয়াছে। দুর্গা ঝোপের মধ্যে মধ্যে সেঁয়াকুল খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল—কিন্তু সেঁয়াকুল এখন

বন্দোপাধ্যায়

আর বড় থাকে না, শীতের শেষেই ঝরিয়া যায়। একটা উঁচু ঢিবিতে ঝোপের মধ্যের একটা গাছে অনেক সেঁয়াকুল ছিল; এই সেদিন ত সে খাইয়া গিয়াছে কিন্তু এখন আর নাই, সব ঝরিয়া গিয়াছে, গোলমরিচের মত শুক্‌না সেঁয়াকুল ঘন ঝোপের তলা বিছাইয়া পড়িয়া আছে। এক ঝাঁক শালিখ্‌পাখী ঝোপের মধ্যে কিচ্‌ কিচ্‌ করিতেছিল, দুর্গা নিকটে যাইতে উড়িয়া গেল।

তাহার মনে খুসির আবার একটা প্রবল ঢেউ আসিল। উৎসবের নৈকট্য, বাসরে রাত জাগা ও গান শুনিবার আশা, সকলের উপর একটা অজানা, অননুভূত আনন্দের প্রত্যাশায় তাহার মন ভরিয়া উঠিল।

তাহারা তেরো বৎসর বয়সে এই অজ পাড়াগাঁয়ে এরূপ উৎসবের দিন কয়টা বা আসিয়াছে; দু একটা যা আসে, প্রত্যেক বারই শতাব্দীর সমুদয় উৎসব-পুলক এক সঙ্গে লইয়া আসিয়া উদয় হয় গরীব ঘরের এই মেয়েটার কাছে।

খুসিতে তাহার ইচ্ছা হইল সে মাঠের এধার হইতে ওধার পর্যন্ত ছুটিয়া বেড়ায়। একবার সে হাত দুটা ছড়াইয়া ডানার মত লম্বা করিয়া দিয়া খানিকটা ঘুরপাক খাইয়া খানিকটা ছুটিয়া গেল। সে উড়িতে চায়!...শরীর তো হালকা জিনিস—হাত ছড়াইয়া ডানার মত বাতাস কাটিতে কাটিতে যদি যাওয়া যাইত!

নদী বেশী দূরে নয়, দুর্গার মনে হইল এই সময় অক্রুর জেলের নৌকা হয়তো ঘাটে লাগিয়াছে, তাহা হইলে সে মাছ কিনিয়া আনিবে। রোদ-পোড়া মাটির সোঁদা সোঁদা গন্ধের সঙ্গে ঝরা শুক্‌না পাতা-লতার গন্ধ মিশিয়া এক এক দমকা গরম বাতাস বহিতেছে...মাঝে মাঝে ফুটন্ত ঘেঁটু ফুলের তেতো গন্ধ। মাঠের কোণে একটা জঙ্‌লা পাতা-ঝরা আমড়া গাছের ডালগুলি নতুন কচি মুকুলে ভরিয়া গিয়াছে। ঝোপে ঝোপে ঈষৎ লাল আভাযুক্ত কচি পাতা সাজানো বৈঁচি গাছ। শুধু শব্দ করিবার আনন্দে সে শুক্‌না ঝরা পাতার রাশির উপর ইচ্ছা করিয়া জোরে জোরে পা ফেলিয়া মচ্‌ মচ্‌ শব্দ করিতে করিতে চলিল। পাতা ভাঙিয়া গিয়া শুক্‌না শুক্‌না, ধূলা-মিশানো, খানিকটা সোঁদা সোঁদা, খানিকটা তিক্ত গন্ধে জায়গাটা ভরিয়া গেল।

এই গন্ধ তাহার বড় ভাল লাগে···এই গন্ধ পাইলেই সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে হয়,—সমস্ত বন জঙ্গলের পরিষ্কার তলাগুলি, কাঁটা-ওয়ালা ডালপালার আড়ালটি—সব একেবারে ঝরিয়া পড়া নাটাফল ও রড়ার বীচিতে ভরিয়া গিয়াছে। কিন্তু ইহা যে কত বড় মরীচিকা, তাহা সে কতবার দেখিয়াছে; এত করিয়া বনে জঙ্গলে খুঁজিয়া আজও সে তাহার ছোট মাটির ছোবাটায় পুরাপুরি একছোবা নাটাফলও সংগ্রহ করিতে পারে নাই।

সাম্‌নে একটু দূরে সোনাডাঙার মাঠের দিকে যাইবার কাঁচা সড়ক। একখানা গরুর গাড়ী ক্যাঁচ্‌ ক্যাঁচ্‌ করিয়া মাঠের পথের দিকে যাইতেছে। ছই নাই, টাট্‌কা কাটা কঞ্চির ঘেরা বাঁধিয়া তাহার উপর কাঁথা ও ছেঁড়া লাল নক্সা পাড় কাপড় ঘিরিয়া ছই তৈয়ারী করিয়াছে। ছইএর মধ্যে কাহাদের একটা ছোট্ট মেয়ে একঘেয়ে, একটানা ছেলেমানুষি ধরণে কাঁদিতে কাঁদিতে যাইতেছে—কোন্‌ গাঁয়ের চাষাদের মেয়ে বোধ হয় বাপের বাড়ী হইতে শ্বশুর বাড়ী যাইতেছে। গাড়ীর গাড়োয়ান পথের দুধারের পুষ্পিত আম্রকুঞ্জের ঘন মিষ্ট গন্ধে ঝিমাইতে ঝিমাইতে চলিয়াছে। ছইএর পিছনদিকে একটা ধামাতে লাউ, বেগুন আরও কি কি তরকারী। গাড়ীর বাঁশে দুটা ঠ্যাং-বাঁধা জীবন্ত মুর্গী ঝুলানো—কুটুম্ব বাড়ীর সওগাত।

দুর্গা অবাক্‌ হইয়া একদৃষ্টে গাড়ীখানার দিকে চাহিয়া রহিল।

পরে সে একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল। বিয়ে হইলে মা, বাবা, অপু—সব ছাড়িয়া এই রকম কোথায় কতদূর চলিয়া যাইতে হইবে; যখন তখন সেখান হইতে তাহারা আসিতে দিবে কি? সে এতক্ষণ একথা ভাবিয়া দেখে নাই—এই বন, বাগান, বাসকফুলের ঝাড়, রাঙী গাইটা, উঠানের কাঁটালতলাটা, যাহা সে এত ভালবাসে, এই শুক্‌না পাতার গন্ধ, ঘাটের পথ··· এই সব ছাড়িয়া যাইতে হইবে চিরকালের, চিরকালের জন্য! ছইএর মধ্যের ছোট্ট মেয়েটা বোধ হয় সেই দুঃখেই কাঁদিতেছে। দুর্গার মন বড় দমিয়া গেল।

কাঁচা সড়কটা ছাড়াইয়া আর একটা ছোট্ট পোড়ো মাঠ পার হইলেই নদী। অক্রুর মাঝির নৌকো ঘাটে

আসে নাই। বাব্‌লা গাছের নীচে কাহারা দোয়ারী পাতিয়া মাছ ধরিতেছে। দুর্গা বেশীদূর কিছু আসে নাই,—বাঁ ধারে কিছুদূরে কুঁচ ঝোপের আড়ালে তাহাদের পাড়ার স্নানের মাটীর ধাপ-কাটা কাঁচা ঘাট। দুর্গা ভয়ে ভয়ে গিয়া দেখিল মা ঘাটে নাই তো?

ওপারে জেলেরা কি মাছ ধরিতেছে? খয়রা? এপারে আসিলে সে দুপয়সার মাছ কিনিয়া বাড়ী লইয়া যাইত। অপু খয়রা মাছ খাইতে ভালবাসে।

বাড়ী ফিরিয়া সন্ধ্যার পর সে অনেকক্ষণ ধরিয়া পুতুলের বাক্স গোছাইল। ঘরের মেজেতে তাহার মা তেল পুরিতে গিয়া অনেকটা কেরোসিন তেল ফেলিয়া দিয়াছে, তাহার গন্ধ বাহির হইতেছে, হাওয়াটা যেন একটু গরম। পুতুল গুছানো প্রায় শেষ হইয়াছে অপু আসিয়া বলিল—তুই বুঝি আমার বাক্স থেকে ছোট্ট আর্শিখানা বের করে নিয়েচিস্ দিদি?

—হুঁ—আর্সি তো আমার—আমিই তো আগে দেখতে পেইছিলাম তক্তপোষের নীচে পড়েছিল—যাও, আমি আর্সি আমার বাক্সে রাখবো। বেটাছেলে আবার আর্সি নিয়ে কি হবে?

—বা রে, তোমার আর্সি বই কি? ও-পাড়ার খুড়িমাদের বাড়ী থেকে মা তো কি বের্ত্তোতে আর্সি এনেছিল, আমি তো আগেই মার কাছ থেকে চেয়ে নিছলাম। না দিদি, দাও—

কথা শেষ করিয়াই সে দিদির পুতুলের বাক্সের কাছে বসিয়া পড়িয়া তাহার মধ্যে আর্সি খুঁজিতে লাগিল।

দুর্গা ভাইয়ের গালে এক চড় লাগাইয়া দিয়া বলিল—দুষ্টু কোথাকার—আমি পুতুল গুছিয়ে রাখচি আর উনি হাতুল পাতুল করচেন—যা আমার বাক্সে হাত দিতে হবে না তোমার—দেব না আমি আর্সি—

কিন্তু কথা শেষ না হইতেই অপু ঝাঁপাইয়া তাহার ঘাড়ের উপর পড়িয়া তাহার রুক্ষ চুলের গোছা ধরিয়া টানিয়া আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিল। কান্না-আটকানো গলায় বলিতে লাগিল—কেন তুমি আমাকে মারবে? আমার লাগে না বুঝি?—দাও আমায়—মাকে বোলে দেবো—লক্ষ্মীর চুপ্‌ড়ি থেকে আল্‌তা চুরি কোরেচ—

আল্‌তা চুরির কথায় দুর্গা খেপিয়া গেল। ভাইএর কান ধরিয়া তাহাকে ঝাঁকুনি দিয়া উপরি উপরি পটপট কয়েকটা চড় দিতে দিতে বলিল—আল্‌তা নিইচি?—আমি আল্‌তা নিইচি? লক্ষ্মীছাড়া, দুষ্টু, বাঁদর! আর তুমি যে লক্ষ্মীর চুপ্‌ড়ির গা থেকে কড়ি গুলো খুলে লুকিয়ে রেখেচ, মাকে বোলে দেবো না?—

চীৎকার কান্না ও মারামারির শব্দ শুনিয়া সর্ব্বজয়া ছুটিয়া আসিল।

ততক্ষণে দুর্গা অপুর কান ধরিয়া তাহাকে মাটিতে প্রায় শোয়াইয়া ফেলিয়াছে—অপুও প্রাণপণে দুর্গার চুলের গোছা মুঠি পাকাইয়া টানিয়া এরূপ ধরিয়া আছে যে দুর্গার মাথা তুলিবার ক্ষমতা নাই।

অপুর লাগিয়াছিল বেশী। সে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, ছাখো না মা, আমার আর্সিখানা বাক্স থেকে বের ক'রে নিজের বাক্সে রেখে দিয়েচে—দিচ্চে না—এমন চড় মেরেচে গালে—

দুর্গা প্রতিবাদ করিয়া বলিল,—না মা, ছাখো না আর্সি আমার, পুতুলের বাক্স গোছাচ্ছি ও এসে বল্‌লো সেগুলো সব—

সর্ব্বজয়া আসিয়া মেয়ের পিঠের উপর দুম্ দুম্ করিয়া সজোরে কয়েকটি কিল বসাইয়া দিল; বলিল,—ধাড়ী মেয়ে—কেন তুই ওর গায় হাতে দিবি যখন তখন?—ওতে আর তোতে অনেক তফাৎ জানিস্?—আর্সি? আর্সি তোমার কোনো পিণ্ডিতে লাগ্‌বে শুনি? কথায় কথায় উনি যান ওকে তেড়ে মার্ত্তে! মরণ আর কি! পুতুলের বাক্স—রোসো—

কথা শেষ না করিয়াই সে মেয়ের গুছানো পুতুলের বাক্স উঠাইয়া এক টান্ মারিয়া বাহির উঠানে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল।

—ধাড়ী মেয়ের কোনো কাজ নেই, কেবল খাওয়া আর পাড়ায় পাড়ায় টো টো ক'রে বেড়ানো—আর কেবল পুতুলের বাক্স আর পুতুলের বাক্স! ও সব কেন

এখন বাঁশ-বাগানে ফেলে দিয়ে আসচি। দিচ্চি তোমার খেলা ঘুচিয়ে একেবারে—

দুর্গার মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। পুতুলের বাক্স তাহার প্রাণ, দিনের মধ্যে দশবার সে পুতুলের বাক্স গোছায়—পুতুল, রাংতা, ছোপানো কাপড়, আল্‌তা, কত কষ্টের সংগ্রহ করা নাটাফল, টিন-মোড়া আর্শিখানা, পাখীর বাসা—সব অন্ধকারে উঠানের মধ্যে কোথায় কি ছড়াইয়া পড়িল! মা যে তাহার পুতুলের বাক্স এরূপ নির্ম্মমভাবে ফেলিয়া দিতে পারে একথা কখনো সে ভাবিতে পারিত না। কত কষ্টে কত জায়গা হইতে জোগাড় করা কত জিনিস উহার মধ্যে!

কোনো কথা বলিতে সাহস না করিয়া সে কেমন যেন অবাক্ হইয়া রহিল।

অপুর কাছেও বোধ হয় শাস্তিটা কিছু বেশী কঠোর বলিয়াই ঠেকিল। সে আর কোনো কথা না বলিয়া চুপচাপ গিয়া শুইয়া পড়িল।

দুর্গা খানিকক্ষণ এক ভাবেই মেজের উপর বসিয়া রহিল। রাত্রি অনেক হইয়াছে, মেজেতে কেরোসিন তেলের গন্ধ বাহির হইতেছে, ঘরের মধ্যে বাঁশ বাগানের মশা বিন বিন করিতেছে। কেমন যেন একটা বদ্ধ হাওয়া ঘরের ভিতর। খানিকক্ষণ বসিয়া বসিয়া দুর্গা গিয়া চুপ করিয়া শুইয়া পড়িল।

ভাঙা জানালা দিয়া ফাগুন জোৎস্নার আলো বিছানায় পড়িয়াছে। পোড়া ভিটার দিক্ হইতে ভুর ভুর করিয়া লেবু ফুলের গন্ধ আসিতেছে। দুর্গা বালিসে মুখ গুঁজিয়া অনেকক্ষণ শুইয়া রহিল। একবার তাহার মনে হইল উঠিয়া গিয়া পুতুলের বাক্সটা ও ছড়ানো জিনিসগুলা তুলিয়া আনে—কাল সকালে কি আর পাওয়া যাইবে? কত কষ্টের জিনিসগুলা! কিন্তু সাহস পাইল না। আনিতে গেলে মা যদি আবার মারে? মার উপর তাহার কোনো অভিমান হইল না। যাহারা আমাদের দিয়া আসিতেছে এবং বরাবর দিবে জানি তাহারা যদি হঠাৎ না দেয়, তবেই তাহাদের উপর অভিমান হয়। কিন্তু দুর্গা স্বভাবত মনেও ভীরু, কাহারও কাছে বেশী কিছু দাবী করিবার সাহস তাহার নাই—কাজেই মার কাছে মার খাইয়া সে ইহাকে শান্তভাবে মানিয়া লইল, অভিমান করিবার কোনো কারণ মনে উদয়ই হইল না।

অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। হঠাৎ দুর্গা গায়ের উপর কাহার হাত অনুভব করিল। অপু ভয়ে ভয়ে ডাকিল—দিদি? দুর্গা কোনো জবাব দিবার পূর্ব্বেই অপু বালিসে মুখ গুঁজিয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল—আমি আর করবো না—আমার ওপর রাগ করিস্‌নে দিদি—তোর পায়ে পড়ি। কান্নার আবেগে তাহার গলা আট্‌কাইয়া যাইতে লাগিল।

দুর্গা প্রথমটা বিস্মিত হইল—পরে সে উঠিয়া বসিয়া ভাইয়ের কান্না থামাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল।—কাঁদিস্‌নে চুপ, চুপ, মা শুন্‌তে পেলে আবার আমায় বক্‌বে, চুপ কাঁদ্‌তে নেই। আচ্ছা আমি রাগ করবো না, কেঁদো না ছিঃ—চুপ্—

তাহার ভয় হইতেছিল অপুর কান্না শুনিলে মা আবার হয়তো তাহাকেই মারিবে।

অনেক করিয়া সে ভাইয়ের কান্না থামাইল। পরে শুইয়া শুইয়া তাহাকে নানা গল্প বিশেষত রানুর দিদির বিবাহের গল্প বলিতে লাগিল। একথা ওকথার পর অপু দিদির গায়ে হাত দিয়া চুপি চুপি বলিল—একটা কথা বল্‌বো দিদি?—তোর সঙ্গে মাষ্টার মশায়ের বিয়ে হবে—

দুর্গার লজ্জা হইল, সঙ্গে সঙ্গে তাহার অত্যন্ত কৌতূহলও হইল; কিন্তু ছোট ভাইএর কাছে এ সম্বন্ধে কোনো কথা-বার্ত্তা বলিতে তাহার সঙ্কোচ বোধ হওয়াতে সে চুপ করিয়া রহিল।

অপু আবার বলিল—খুড়ীমা বল্‌ছিল রানুর মার কাছে আজ বিকেলে। মাষ্টার মশায়ের নাকি অমত নেই—

কৌতূহলের আবেগে চুপ করিয়া থাকা অসম্ভব হইয়া উঠিল। সে তাচ্ছিল্যের সুরে বলিল—হ্যাঁ বল্‌ছিল—যাঃ—তোর সব যেমন কথা?—

অপু প্রায় বিছানায় উঠিয়া বসিল,—সত্যি বল্‌চি দিদি, তোর গা ছুঁয়ে বল্‌চি, আমি সেখানে দাঁড়িয়ে, আমাকে দেখেই তো কথা উঠ্‌ল। বাবাকে দিয়ে পত্তর লেখাবে সেই মাষ্টার মশায়ের বাবা যেখানে থাকেন সেখানে—

—মা জানে ?

—আমি এসে মাকে জিগ্যেস্ করবো ভাবলাম—ভুলে গিইচি। জিগ্যেস্ করবো দিদি ? মা বোধ হয় শোনেনি ; কাল খুড়ীমা মাকে ডেকে নিয়ে বল্‌বে বল্‌ছিল—

পরে সে বলিল—তুই কত রেলগাড়ী চড়বি দেখিস্, মাষ্টার মশাইরা থাকেন এখান থেকে অনেক দূর—রেলেযেতে হয়—

দুর্গা চুপ করিয়া রহিল।

অপু বা দুর্গা কখনও রেলগাড়ী চড়ে নাই ; চড়া তো দূরের কথা কখনও চক্ষেও দেখে নাই। মাঝের পাড়া ষ্টেশন ও রেল লাইন এ গ্রাম হইতে চার পাঁচ ক্রোশ দূরে। এমন কখনো কোনো সুযোগ ঘটে নাই, যাহাতে তাহাদের রেলগাড়ী চড়া হয়। দুর্গা কিন্তু রেলগাড়ীর ছবি দেখিয়াছে—অপুর কি একখানা বইএর মধ্যে আছে। খুব লম্বা, অনেকগুলা চাকা, সাম্‌নের দিকে কল, সেখানে আগুন দেওয়া আছে, ধোঁয়া ওড়ে। রেল গাড়ীখানা আগাগোড়া লোহার, চাকাও তাই—গরুর গাড়ীর মত কাঠের চাকা নয়। রেল লাইনের ধারে কোনো খড়ের বাড়ী নাই,থাকিতে পারে না, পুড়িয়া যায়। রেল গাড়ী যখন চলে তখন তাহার নল হইতে আগুন বাহির হয় কিনা ! সে ভাইএর গায়ে হাত বুলাইয়া বলিল—তোকেও সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাবো। তাহার পর দুজনেই চুপ করিয়া ঘুমাইবার যোগাড় করিল। ঘুমাইতে গিয়া একটা কথা বারবার দুর্গার মনে হইতেছিল—ঠাকুর সুদর্শন তাহার কথা শুনিয়াছেন ! আজই তো সুদর্শনের কাছে সে—ঠাকুরের বড় দয়া—মা তো ঠিক কথা বলে !

২৫

অপু কাউকে একথা এখনো বলে নাই—তাহার দিদিকেও না।

সেদিন চুপি চুপি দুপুরে সে যখন তাহার বাবার ঐ বই-বোঝাই কাঠের সিন্দুকটা খুলিয়াছিল সিন্দুকটার মধ্যের একখানা বইএর মধ্যেই এই অদ্ভুত কথার সন্ধান পায় !

উঠানের উপর বাঁশঝাড়ের ছায়া এখনও পূর্ব্ব-পশ্চিমে দীর্ঘ হয় নাই, ঠিক্-দুপুরে সোনাডাঙ্গার তেপান্তর মাঠের সেই প্রাচীন অশ্বত্থ গাছের ছায়ার মত এক জায়গায় একখান ছায়া জমাট বাঁধিয়া ছিল।

একদিন সে দুপুর বেলা বাপের অনুপস্থিতিতে ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া চুপি চুপি বইয়ের বাক্সটা লুকাইয়া খুলিল। অধীর আগ্রহের সহিত সে এ বই ও বই খুলিয়া খানিকটা করিয়া ছবি দেখিতে এবং খানিকটা করিয়া বইএর মধ্যে ভাল গল্প লেখা আছে কি না দেখিতে লাগিল। একখানা বইয়ের মলাট খুলিয়া দেখিল নাম লেখা আছে 'সর্ব্ব-দর্শন সংগ্রহ'। ইহার অর্থ কি, বা বইখানা কোন্ বিষয়ের তাহা সে বিন্দুবিসর্গও বুঝিল না। বইখানা খুলিতেই একদল কাগজ কাটা পোকা নিঃশব্দে বিবর্ণ মার্ব্বেল কাগজের নীচে হইতে বাহির হইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে যে দিকে দুই চোখ যায় দৌড় দিল। অপু বইখানা নাকের কাছে লইয়া গিয়া ঘ্রাণ লইল—কেমন পুরানো পুরানো গন্ধ ! মেটে রংএর পুরু পুরু পাতাগুলার এই গন্ধটা তাহার বড় ভাল লাগে—গন্ধটায় কেবলই বাবার কথা মনে করিয়া দেয়। যখনই এ গন্ধ সে পায় তখনই কি জানি কেন তাহার বাবার কথা মনে পড়ে।

অত্যন্ত পুরানো মার্ব্বেল কাগজের বাঁধাই-করা মলাটের নানাস্থানে চটা উঠিয়া গিয়াছে। এইরকম পুরানো বইএর উপরই তাহার প্রধান মোহ। সেইজন্য সে বইখানা বালিশের তলায় লুকাইয়া রাখিয়া অন্যান্য বই তুলিয়া বাক্স বন্ধ করিয়া দিল।

অবসর মত বইখানা সে খুলিল। এক খানাও ছবি নাই ! কিন্তু মার্ব্বেল কাগজে চিত্রবিচিত্র কাজ করা আছে। এ যেন পিপাসিত মরুযাত্রীকে মৃগতৃষ্ণিকায় লুব্ধ করিয়া তাহার পিপাসা আরও শতগুণ বাড়াইয়া তোলা। —মহীরাবণ বধের ছবি ! নাঃ—কোথায় ? মার্ব্বেল কাগজের ওপর ছক্ কাটা কি সব ছাইভস্ম নক্সা।

লুকাইয়া পড়িতে পড়িতে এই বইখানিতেই একদিন দৈবাৎ সে পড়িল—বড় অদ্ভুত কথাটা। হঠাৎ শুনিলে মানুষ আশ্চর্য্য হইয়া যায় বটে—কিন্তু ছাপার অক্ষরে

পথের পাঁচালী

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বইখানার মধ্যে এ কথা লেখা আছে, সে পড়িয়া দেখিল। পারদের গুণ বর্ণনা করিতে করিতে লেখক লিখিয়াছেন, —শকুনির ডিমের মধ্যে পারদ পুরিয়া কয়েকদিন রৌদ্রে রাখিতে হয়, পরে সেই ডিম মুখের ভিতর পুরিয়া মানুষ ইচ্ছা করিলে শূন্যমার্গে বিচরণ করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়।

অপু নিজের চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিল না,—আবার পড়িল—আবার পড়িল।

পরে নিজের ডালাভাঙা বাক্সটার মধ্যে বইখানা লুকাইয়া রাখিয়া বাহিরে গিয়া কথাটা ভাবিতে ভাবিতে অবাক্ হইয়া গেল।

ব্যাপারটা সে যত সহজ ভাবিয়াছিল অতটা সহজ হইল না। প্রথমটা সে অত বুঝে নাই—বুঝিল দিন পনেরো পরে। যে শকুনি মাঠে, ঘাটে, মাথার উপরে, সব সময়ই চোখে পড়ে—কে জানিত তাহার ডিম যোগাড়করা এরূপ সমস্যার বিষয় হইয়া দাঁড়াইবে! গাছের খোড়লে, ক্ষেতের আলে, নদীর ধারের গর্ত্তে, কত জায়গায় সে খুঁজিয়াছে। শকুনি তো দূরের কথা, কোনো পাখীর বাসাই চোখে পড়ে না।

দিদিকে জিজ্ঞাসা করে—শকুনিরা বাসা বাঁধে কোথায় জানিস্ দিদি?

তাহার দিদি বলিতে পারে না। সে পাড়ার ছেলেদের —যতু, নীলু, কিনু, পটল, নেড়া—সকলকে জিজ্ঞাসা করে। কেউ বলে—সে এখানে নয়; উত্তর মাঠে উঁচু গাছের মাথায়। তাহার মা বকে—এই দুপুরবেলা কোথায় ঘুরে বেড়াস্! অপু ঘরে ঢুকিয়া শুইবার ভাণ করে, বইখানা খুলিয়া সেই জায়গাটা আবার পড়িয়া দেখে—আশ্চর্য্য! এত সহজে উড়িবার উপায়টা কেউ জানে না? হয়তো এ বইখানা আর কাহারো বাড়ী নাই, শুধু তাহার বাবারই আছে; হয়তো এই জায়গাটা আর কেহ পড়িয়া দেখে নাই, শুধু তাহারই চোখে পড়িয়াছে এতদিনে।

বইখানার মধ্যে মুখ গুঁজিয়া আবার সে আঘ্রাণ লয় —সেই পুরানো পুরানো গন্ধটা! এই বইয়ে যাহা লেখা আছে, তাহার সত্যতা সম্বন্ধে অপুর মনে আর কোন অবিশ্বাস থাকে না।

পারদের জন্য ভাবনা নাই—পারদ মানে পারা সে জানে। আয়নার পেছনে পারা মাখানো থাকে, একখানা ভাঙা আয়না বাড়ীতে আছে, উহা যোগাড় করিতে পারিবে এখন। কিন্তু শকুনির ডিম এখন সে কোথায় পায়?

দুপুরে, খাওয়া দাওয়ার পরে এক একদিন তাহার দিদি ডাকে—আয় শোন্ অপু, মজা দেখবি আয়। পরে সে একমুঠা পাতের ভাত লইয়া বাড়ীর খিড়্কিদোরের বাঁশবাগানে গিয়া হাঁক দেয়—আয় ভুলো-তু-উ-উ-উ। ডাক দিয়াই দুর্গা ভাইয়ের দিকে হাসি হাসি মুখে চুপ করিয়া থাকে যেন কি অপূর্ব্ব রহস্যপুরীর দুয়ার এখনই তাদের চোখের সাম্‌নে খুলিয়া যায়! হঠাৎ কোথা হইতে কুকুরটা আসিয়া পড়িতেই দুর্গা হাত তুলিয়া বলিয়া উঠে —ওঃ এসেচে! কোত্থেকে এলো দেখ্‌লি?—খুসিতে সে হিহি করিয়া হাসে।

রোজ রোজ এই কুকুরকে ভাত খাওয়ানোর ব্যাপারে দুর্গার আমোদ হয় ভারী।—তুমি হাঁক দেও, কেউ কোথাও নাই, চারিদিকে চুপ্! ভাত মাটিতে নামাইয়া দুর্গা চোখ বুঁজিয়া থাকে; আশা ও কৌতূহলের ব্যাকুলতায় বুকের মধ্যে ঢিপ্ ঢিপ্ করে; মনে মনে ভাবে—আজ ভুলো আস্‌বেনা বোধ হয়, দেখি দিকি কোত্থেকে আসে! আজ কি আর শুনতে পেয়েচে!—

হঠাৎ ঘনঝোপে একটা শব্দ ওঠে—

চক্ষের নিমিষে বন জঙ্গলের লতা পাতা ছিঁড়িয়া খুঁড়িয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে ভুলো কোথা হইতে নক্ষত্রবেগে আসিয়া হাজির।

অমনি দুর্গার সমস্ত গা দিয়া যে একটা কিসের স্রোত বহিয়া যায়! বিস্ময়ে ও কৌতুকে তাহার মুখ চোখ উজ্জ্বল দেখায়! মনে মনে ভাবে—ঠিক শুন্‌তে পায় তো! আসে কোত্থেকে!···আচ্ছা কাল একটু চুপি চুপি ডেকে দেখ্‌বো দিকি, তাও শুন্‌তে পাবে?

এই আমোদ উপভোগ করিতে সে মায়ের বকুনি সহ্য করিয়াও রোজ খাইবার সময় নিজে বরং কিছু কম খাইয়া কুকুরের জন্য কিছু ভাত পাতে সঞ্চয় করিয়া রাখে।

অপু কিন্তু দিদির কুকুর ডাকিবার মধ্যে কি আমোদ আছে তাহা খুঁজিয়া পায় না। দিদির ও সব মেয়েলি ব্যাপারের মধ্যে সে নাই। অধীর আগ্রহে ভোজনরত শীর্ণ কুকুরটার দিকে সে চাহিয়াও দেখে না—শুধু শকুনির ডিমের কথা ভাবে।

অবশেষে সন্ধান মিলিল। হীরু নাপিতের কাঁটাল তলায় রাখালেরা গরু বাঁধিয়া গৃহস্থের বাড়ীতে তেল-তামাক আনিতে যায়। অপু গিয়া তাহাদের পাড়ার রাখালকে বলিল—তোরা কত মাঠে মাঠে বেড়া'স, শকুনির বাসা দেখ্‌তে পাস? আমায় যদি একটা শকুনির ডিম এনে দিস আমি দু-টো পয়সা দেবো—

দিন চারেক পরেই রাখাল তাহাদের বাড়ীর সামনে আসিয়া তাহাকে ডাকিয়া কোমরের থলি হইতে দুইটা কালো রংএর ছোট ছোট ডিম বাহির করিয়া বলিল—এই দ্যাখো ঠাকুর, এনিচি। অপু তাড়াতাড়ি হাত বাড়াইয়া বলিল, দেখি! পরে আহ্লাদের সহিত উল্টাইতে পাল্টাইতে বলিল—শকুনির ডিম! ঠিক্ তো! হাঁ ঠিক শকুনির ডিমই বটে। রাখাল সে সম্বন্ধে ভূরি ভূরি প্রমাণ উত্থাপিত করিল। ইহা শকুনির ডিম কিনা এসম্বন্ধে সন্দেহের কোন কারণ নাই, সে নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া কোথাকার কোন্ উঁচু গাছের মাথ্‌ডাল হইতে ইহা সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে;—কিন্তু দুই আনার কমে সে দিবে না।

পারিশ্রমিক শুনিয়া অপু অন্ধকার দেখিল। বলিল, দুটো পয়সা দেবো, আর আমার কড়িগুলো নিবি? সব দিয়ে দেবো এক টিনের ঠোঙা কড়ি—সব এই এত বড় বড় সোনাগেঁটে; দেখ্‌বি, দেখাবো?

রাখালকে সাংসারিক বিষয়ে অপুর অপেক্ষা অনেক হুঁসিয়ার বলিয়া মনে হইল। সে নগদ পয়সা ছাড়া কোনো রকমেই রাজি হইল না। যাহা হউক দরদস্তরের পর রাখাল আসিয়া চার পয়সায় দাঁড়াইল। অপু দিদির কাছে চাহিয়া চিন্তিয়া দুটা পয়সা যোগাড় করিয়া তাহাকে চুকাইয়া দিয়া ডিম দুটি লইল। তাহা ছাড়া রাখাল কিছু কড়িও লইল। এই কড়ি গুলা অপুর প্রাণ, অর্দ্ধেক রাজত্ব ও রাজকন্যার বিনিময়েও সে এই কড়ি কখনো হাতছাড়া করিত না অন্যসময়; কিন্তু আকাশে উড়িবার আমোদের কাছে কি আর বেগুনবীচি খেলা!

ডিমটা হাতে করিয়া তাহার মনটা যেন ফুঁ-দেওয়া রবারের বেলুনের মত হাল্কা হইয়া ফুলিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে যেন একটু সন্দেহের ছায়া তাহার মনে আসিয়া পৌঁছিল. এটুকু এতক্ষণ ছিল না; ডিম হাতে পাওয়ার পর হইতে যেন কোথা হইতে ওটুকু দেখা দিল—খুব অস্পষ্ট। সন্ধ্যার আগে আপন মনে নেড়াদের জামগাছের কাটা গুঁড়ির উপর বসিয়া সে ভাবিতে লাগিল, সত্যি সত্যি উড়া যাইবে তো! সে উড়িয়া কোথায় যাইবে? মামার বাড়ার দেশে! বাবা যেখানে আছে সেখানে? নদীর ওপারে? শালিখ্ পাখী ময়না পাখীর মত উ-ই আকাশের গায়ে তারাটা—যেখানে উঠিয়াছে?

সেই দিনই, কি তাহার পরদিন। বৈকালে দুর্গা সলিতা পাকাইবার জন্য ছেঁড়া নেকড়া খুঁজিতেছিল। তাকের হাঁড়ি কলসির পাশে গোঁজা ছেঁড়া-খুঁড়া কাপড়ের টুকরার তাল হাত্‌ড়াইতে হাত্‌ড়াইতে কি যেন ঠক্ করিয়া তাহার পিছন হইতে গড়াইয়া মেজের উপর পড়িয়া গেল। ঘরের ভিতর বৈকালেই অন্ধকার, ভাল দেখা যায় না, দুর্গা মেজে হইতে উঠাইয়া লইয়া বাহিরে আসিয়া বলিল—ওমা কিসের দুটো বড় বড় ডিম এখানে। এঃ, প'ড়ে একেবারে গুঁড়ো হ'য়ে গিয়েচে। দেখেচো কি পাখী ডিম পেড়েচে ঘরের মধ্যে মা!

তাহার পর কি ঘটিল, সে কথা না তোলাই ভালো। অপু সমস্ত দিন খাইল না...কান্না...হৈ হৈ কাণ্ড। তাহার মা ঘাটে গল্প করে—ছেলের সবই বিদ্‌ঘুটি! ও মা একথা তো কখনও শুনি নি—শুনেচো সেজ্ ঠাকুরঝি—কোত্থেকে একটা কিসের ডিম এনে তাকের পেছনে লুকিয়ে রেখেচে, তা নিয়ে নাকি মানুষে উড়্‌তে পারে! শোনো কাণ্ড! উনি না বাড়ী থাক্‌লে ছেলেটা যে কি ক'রে বেড়ায়—একদণ্ড যদি বাড়াতে পা পাতে! দুই-ই সমান, যেমন মেয়েটা তেম্‌নি ছেলে—

কিন্তু বেচারী সর্ব্বজয়া কি করিয়া জানিবে? সকলেই তো কিছু 'সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ' পড়ে নাই, বা সকলেই কিছু পারদের গুণও জানে না।

আকাশে তাহা হইলে তো সকলেই উড়িত।

(ক্রমশঃ)

তফাৎ

শ্রীপ্রণব রায়

পাঁচটা বাজে।

পড়ন্ত রৌদ্রের রক্তিমাটুকু ফিকা হইয়া আসিতেছে।

সিটি-কলেজের সুমুখে দাঁড়াইয়া দু'টি তরুণ ছাত্র জটলা করে। কোন্ অধ্যাপকের বক্তৃতা সব চেয়ে হৃদয়গ্রাহী—এই বিষয়েই বিতণ্ডা।

বুক-খোলা-কোট-পরা মোটা ফ্রেমের চশমা-চোখে ছেলেটি পার্শ্ববর্ত্তীকে বলে, যাই বলিস্ নরেন, প্রোফেসর মুখার্জ্জির লেক্‌চার আমার সব চেয়ে ভাল লাগে...কত পড়াশুনো ওঁর, জানিস্?

নরেন ছেলেটি দেখিতে বেশ সুশ্রী। রংটা শ্যাম হইলেও প্রসাধনের ফলে উজ্জ্বল। বেশ-ভূষায় সৌখীনতা পরিস্ফুট। গায়ে বাহারি ছিটের ঝুল্-ছোট সার্ট—বুক-পকেটে সোনালি-ক্লিপ-আঁটা 'ফাউন্‌টেন্' গোঁজা। পায়ে বম্মা চটি। বড় বড় চুলগুলি পিছন-পানে সযত্নেবিন্যস্ত।

নরেন বলে, মুখার্জ্জির চেয়ে প্রোফেসর 'রয়'-এর study কিছু কম নয়, প্রতুল! তা' ছাড়া ওঁর 'লেক্‌চার' দেবার এমন একটি সুন্দর ভঙ্গী আছে, যা' সহজেই ছাত্রদের মনোযোগ আকর্ষণ—

মুখের কথা মাঝ পথেই থামিয়া যায়।

নরেনের চঞ্চল চোখের চাহনি অনুসরণ করিয়া প্রতুল দেখে ও-ফুটপাথের ধারে বেথুন্ স্কুলের 'বাস্' থামিয়াছে। একটি সুগৌরী কিশোরী দু'হাতে বইখাতাগুলি সন্তর্পণে বুকের কাছে ধরিয়া সলজ্জ মন্থর গতিতে নামিল। পরণে—চওড়া লালপাড় শাড়ী গায়ে রূপালি জরির ফুল-পাতা-আঁকা সাদা ব্লাউস—পায়েও সাদা জুতো। পিঠের ওপর গোলাপি রেশ্‌মি-ফিতা-বাঁধা দোদুল্ বেণী।

পড়ন্ত রৌদ্রের কিরণে মেয়েটির কানের সোনার দুল্ দু'টি ঝিক্‌মিক্ করে।

সাধাসিধা বেশ, অথচ মাধুরী-মণ্ডিত!

নরেন মুগ্ধ চোখে তাকাইয়া থাকে।

প্রতুল মুচ্‌কি হাসিয়া বলে, There is the metal more attractive!

ফুটপাথের ধারেই দো-তলা একটা বাড়ীর দ্বার-পাশে শ্বেত-পাথরের বুকে নিকষ-কালো অক্ষরে লেখা—

Dr. P. C. Basu M. B....ইত্যাদি।

মেয়েটি সেই বাড়ীতেই প্রবেশ করে। হয় তো ডাক্তারেরই কন্যা। দ্বারের নিকটে গিয়া নরেনের পানে অকারণেই একবার চকিত দৃষ্টিপাত করিয়া যায়।

মুগ্ধ স্বরে নরেন বলে, চমৎকার ওর কালো চোখদুটি!

প্রতুল পরিহাসের সুরে বলে, কালো-চোখের চাউনিতে কিন্তু পেটের ক্ষিধে মেটে না! এদিকে পাঁচটা বেজে গেছে তা' হুঁস্ আছে তোর? বাড়ী যাওয়া যাক্ চল্।

দুই বন্ধুতে পথ চলে।

চলিতে চলিতে সহসা নরেন বলিয়া ওঠে, জীবনের সঙ্গিনীরূপে যদি কাউকে বরণ ক'রে নিতে হয়, অম্‌নিই একটি কিশোরীকে—সুন্দরী, শিক্ষিতা। যার সঙ্গে শুধু দেহের নয়, মনেরও আদান-প্রদান চল্‌বে—বিয়ে যদি কোনোদিন করি প্রতুল, তবে অম্‌নিই একটি মনের মতো সঙ্গিনী খুঁজে নেব। দিনের কাজের শেষে যখন ঘরে ফির্‌ব, সে হয় তো তখন অর্গ্যানটি বাজিয়ে মিষ্টি সুরে গান গাইবে—কি মধুর হ'য়ে উঠ্‌বে সন্ধ্যার সেই অবসরটুকু! কখনো বা জ্যোৎস্না-রাতে শেলি রবীন্দ্রনাথ খুলে দু'জনে মিলে কত কাব্য-আলোচনা—জীবনটাকে উপভোগ ক'রে নেব...'I will drink life to the lees!'

তরুণ-যৌবনের স্বপ্ন যেন রামধনুর মতোই রঙিন হইয়া ওঠে!

দশটা বছর কাটে।

সীমা-হারা সময়-সাগরে দশটি বুদ্‌বুদ যেন

সন্ধ্যা ছ'টা।

ছায়া-ধূসর শহরের বুকে একটির পর একটি গ্যাস জ্বলে। পথে পথে অফুরন্ত জনস্রোত।

ভিড়ের মাঝে নরেন চলে অবসন্ন পদে। পরণে আধ-ময়লা ধুতি, গায়ে তেম্‌নি একটা খদ্দরের কোট। বগলে ছিন্ন ছাতা। ম্লান দু'টি চোখের তারায় ব্যর্থতার বেদনা পুঞ্জীভূত।

চলিতে চলিতে আর একটি পথচারী পথিকের গায়ে ধাক্কা লাগে—অসাবধানেই।

চাহিয়া দেখে—প্রতুল!

প্রতুলের চোখে বিপুল বিস্ময়। শুধায়, কে, নরেন না? চিন্‌তে পারিস? ওঃ, কদ্দিন পরে দেখা!

আনন্দোজ্জ্বল মুখে নরেন বলে, না চেন্‌বার মতো এমন কোনো পরিবর্ত্তন তোর হয় নি তো, প্রতুল!

—তোকে চিন্‌তে কষ্ট হয় নরেন! কি রোগা চেহারা হ'য়ে গেচে তোর! তারপর, করছিস্ কি আজকাল?

মুখের ওপর শুষ্ক হাসির ছদ্মাবরণ টানিয়া নরেন জবাব দেয়, বাবা মারা যাবার পর কলেজ তো ঢের দিনই ছেড়ে দিয়েছিলুম, তারপর কেরাণীগিরি।

—বাড়ীর সব ভালো তো? আসি ভাই, তা হ'লে—

প্রতুল নিজের কাজে চলিয়া যায়।

নরেনও ফের হাঁটিতে সুরু করে।

শীর্ণ গলির মধ্যে দোতলা একটি ভাড়াটে বাড়ী।

নরেন কড়া নাড়ে। খানিক পরে দরজা খুলিয়া যায়।

একটি কৃশ-তনু শ্যামা তরুণী বৌ দাঁড়াইয়া থাকে—হাতে লণ্ঠন। হলুদের ছোপ্-লাগাময়লা শাড়ী পরণে। হাতে শুধু কচুপাতা-রঙের কাঁচের চুড়ি। মুখখানিতে অবসাদ।

নরেন নীরবে প্রবেশ করে। তারপর,ঘরে গিয়া আপিসের পোষাক ছাড়ে। বৌটিও দরজা বন্ধ করিয়া ঘরে আসে।

শুধায়, খোকার বিস্কুট এনেচ?

—হ্যাঁ।

—খুকীর বার্লি?

—এনেচি।

—আর দেখ, গয়লা দুধের ফর্দ্দ দিয়ে গেছে।

এদিকে, বিস্কুটের দখল লইয়া খোকা এবং খুকীর মধ্যে তুমুল সংগ্রাম বাধে। অবশেষে, কান্নার প্রতিযোগিতা!

জননী অতিষ্ঠ হইয়া দু'জনের পিঠে সশব্দে চড় বসাইয়া দেয়।

—একদণ্ডও সুস্থির হ'তে নেই হতভাগা? হাড়-মাস ভাজা-ভাজা ক'রে তুল্‌লে গা!

ঝঙ্কার তুলিয়া বৌটি হেঁসেলে গিয়া ঢোকে।

ক্লান্তি-কাতর দেহ তক্তপোষের ওপর এলাইয়া নরেন বিশ্রাম করে। একটা বিড়ি ধরাইয়া মৃদু-মন্দ টান্ দেয়।

কলরব-মুখর পাড়াটি নিদ্রা-নীরব।

রাত প্রায় এগারোটা।

বিছানায় শুইয়া নরেনের চোখে নিদ্রার পরশ লাগে না। হেঁসেলের পাট চুকাইয়া বৌটি ঘরে আসে। তারপর বাতি নিভাইয়া বিছানার এক-পাশে শুইয়া পড়ে।

অম্‌নি, জান্‌লার ফাঁক দিয়া নির্ব্বাসিতা জ্যোৎস্না দুষ্টু মেয়ের মতোই অন্ধকার ঘরে ঢুকিয়া পড়ে। ফাল্গুনের শেষাশেষি। দখিণ হাওয়ায় একটা আবেশের আমেজ।

নরেন সোহাগ-সিক্ত স্বরে ডাকে, চারু—

তন্দ্রাতুর কণ্ঠের জবাব শোনা যায়, উঁ—

—কি চমৎকার জ্যোৎস্না উঠেচে! এস না খানিক গল্প করি—

—পারি নে বাপু!...সারাদিন খেটে খেটে ঘুমে আমার চোখ ঢুলে আস্‌চে...

নরেন স্তব্ধ।

সহসা তা'র মনে পড়ে, প্রথম-যৌবনের সেই মোহময় উজ্জ্বল স্বপ্ন—এম্‌নিই জ্যোৎস্না-নিশীথে শেলি-রবীন্দ্রনাথের কাব্য-আলোচনার কল্পনা—

সেদিনকার কল্পনার সঙ্গে আজ্‌কের বাস্তবের ক... তফাৎ!

একটা উদ্‌গত দীর্ঘশ্বাস চাপিয়া নরেন পাশ ফিরি... শুইল।

সালতামামী

১৯২৮

শ্রীসুরেশচন্দ্র রায়

"হরপ্রতি প্রিয়ভাষে কন হৈমবতী
বৎসরের ফলাফল কহ পশুপতি।"

বৎসরারম্ভে পঞ্জিকা কিনেই আমরা এই বর্ষফল পড়্তে ব'সে যাই। কিন্তু বিগত বৎসরের ইতিবৃত্ত আমরা অনেক সময়েই ভেবে দেখি না। সাহিত্যে, রাষ্ট্রে, সমাজনীতিতে কত বিপর্যায় যে হ'য়ে গেছে এই অতীত বারমাসের মধ্যে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ চোখের সাম্‌নে ধর্‌লে মনে হয় বর্ষফল অপেক্ষা এই বিগত বর্ষের বিবরণ অধিক চিত্তাকর্ষক। ব্যবসায়ী যেমন বৎসরান্তে নিজের ব্যবসায়ের হিসাব নিকাশ করে, জগতের এই বিরাট কারবারেরও একটা বার্ষিক হিসাব মনে মনে পর্য্যালোচনা করা প্রয়োজন।

ইংলণ্ড

জগতের ইতিহাসের গোড়ার কথা আমাদের কাছে ইংলণ্ড। "কানু বিনা মোর গীত নাই।" ইংলণ্ডকে বাদ দিলে আমাদের রাষ্ট্রীয় ইতিহাস কোথায়? ১৯২৮ সালে ইংলণ্ডে বোধহয় সর্ব্বপ্রধান ঘটনা সম্রাটের রোগশয্যা গ্রহণ। রাজা যে দেশের লোকের কতপ্রিয় তা ইংলণ্ডে থেকে ভাল বুঝ্‌তে পার্‌ছি। কঠিন "প্লুরিসি" রোগে সম্রাট আক্রান্ত; এ ব্যাপারটা সমস্ত দেশের ওপর একটা বিষাদ কালিমা ছড়িয়ে দিয়েছে। রাজার অসুখের ভীতিকর বিবরণ পেয়ে বড়দিনের বাজারে কেনাবেচা কমে গেল, ব্যবসায়ীরা মাথায় হাত দিয়ে ব'সে পড়্‌ল। তারপর যখন সন্তোষজনক খবর পাওয়া গেল তখন আবার কেনাবেচা আরম্ভ হ'লো। বড়লোকের বিবাহ বাসরে বা জন্মতিথিতে আর সে উৎসব-আতিশয্য নাই। Lord Chancellor লর্ড হোলসাম্ নীরব পল্লীতে সঙ্গোপনে তাঁর বিবাহ সম্পন্ন কর্‌লেন। সমস্ত দেশের ওপর শোকের ছায়া প'ড়ে রয়েছে।

বেকার সমস্যা দেশবাসীর কাছে প্রবল হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। এখনও প্রায় পনের লক্ষ লোকের কোন কাজ কর্ম্ম নাই, সামান্য সরকারী ভাতার ওপর নির্ভর ক'রে দিন কাটাচ্ছে। দেশের মনীষীগণ অনুসন্ধান করছেন—বেকার সমস্যা কিরূপে সমাধান করা যায়। প্রস্তাব হচ্ছে যে, কতক লোককে সরকারী খরচায় ক্যানাডায় পাঠিয়ে দেওয়া হোক্, সেখানে কাজ জুটতে পারে। পার্লামেণ্টের শ্রমজীবী (Labour Party) দল ইস্তাহার জারি করেছেন যে, তাঁরা General Electionএ ক্ষমতা পেলে বেকারদিগকে সরকারী খরচায় সাম্রাজ্যের নানাস্থানে পাঠিয়ে কাজ জুটিয়ে দেবেন। কিন্তু General Election তো মে মাসের আগে নয়। এদিকে ওয়েল্‌সে আড়াই লক্ষ কয়লাখননকারী বেকার অবস্থায় কঠোর দারিদ্র্যের কবলে পড়েছে। কারও দু'বেলা আহার জোটে না, শীতের উপযুক্ত বস্ত্র নাই। খবরের কাগজে প্রবল আন্দোলন আরম্ভ হ'লো। লণ্ডনের লর্ড মেয়র চাঁদার খাতা খুল্‌লেন। পার্লামেণ্টে মিঃ বল্ডুইন বল্‌লেন, আশু সাহায্যের জন্য টাকা পাঠানো হচ্ছে, আর লর্ড মেয়রের ফণ্ডে যত টাকা আদায় হবে গবর্ণমেণ্ট আরও তত টাকা দেবেন। অল্পদিনের মধ্যে আড়াই লক্ষ পাউণ্ড আদায় হ'য়ে গেল। তখন যুবরাজ (Prince of Wales) পিতার অসুখের সংবাদ পেয়ে আফ্রিকা থেকে তাড়াতাড়ি দেশে ফিরে এলেন।

সম্রাটের অবস্থার একটু উন্নতি দেখেই যুবরাজ মন দিলেন বেকার সমস্যার দিকে। বড়দিনের সন্ধ্যাবেলা যুবরাজ বেতারের সাহায্যে দেশবাসীর কাছে অর্থের জন্য মর্ম্মস্পর্শী আবেদন কর্‌লেন। পরদিন থেকে হাজার হাজার পাউণ্ড চাঁদা আস্‌তে লাগ্‌লো।

ব্যবসা বাণিজ্যের বাজার মন্দা পড়েছে। ফ্রান্স ও

জার্ম্মানী দ্রুতবেগে সমৃদ্ধিশালী হ'য়ে উঠ্‌ছে। ইংলণ্ড তাদের সঙ্গে পেরে উঠ্‌ছে না। কৃষি, কয়লা, লোহা, তুলা সর্ব্বত্রই হাহাকার। নেপোলিয়ন ইংরেজদের বলেছিলেন "A nation of shopkeepers"—দোকানদারের জাত। আজ ইংরেজরা বল্‌ছে, কই আমরা তো ভাল দোকানদারও হ'তে পারছি না! বিশ্বের বাজারে ইংলণ্ড তো আর সে রকম জিনিষ বেচ্‌তে পার্‌ছেনা। এ যে দোকানদারীর যুগ! এর জন্যে রাজনীতিজ্ঞগণ নানা উপায় অবলম্বন কর্‌ছেন। প্রস্তাব হ'য়েছে আইন ক'রে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির তিন চতুর্থাংশ টেক্স কমিয়ে দেওয়া হবে। দেশের লোকও ব'সে নেই। বড় বড় কোম্পানী দুই তিনটে একত্রে মিলে যাচ্ছে (amalgamation); ফলে কম খরচায় বেশী কাজ হবে

মিউনিসিপালিটির নির্ব্বাচনে এবার শ্রমজীবীদল অধিক সংখ্যায় জয়লাভ করেছে। মন্ত্রীসংসদে (cabinet) দুইটি পরিবর্ত্তন উল্লেখযোগ্য; লর্ড চ্যান্সেলারের মৃত্যুতে তাঁহার পদে অধিষ্ঠিত হ'য়েছেন লর্ড হেলসাম্‌,—আর ভারতের ভাগ্য বিধাতা ভারতসচিব লর্ড বার্কেনহেড্‌ রাজনীতি ত্যাগ ক'রে বাণিজ্য ক্ষেত্রে লাভজনক কাজ গ্রহণ করেছেন, তাঁর শূন্য তক্তে বসেছেন লর্ড পীল। হাউস অব্‌ কমন্সের সভাপতি (Speaker) মিঃ হুইট্‌লি অবসর গ্রহণ করায় ক্যাপ্টেন ফিজ রয় তাঁহার পদে নির্ব্বাচিত হ'য়েছেন। ইংরেজ জাতি পাকা ব্যবসাদার হ'লেও তার ধর্ম্মের গোঁড়ামি এখনও আছে। গির্জ্জার Prayer Boook এর সংস্কারের প্রস্তাব পার্লামেণ্ট দ্বিতীয়বার অগ্রাহ্য কর্‌লেন। এর পরেই এক নূতন ঘটনা ঘট্‌লো। ইংলণ্ডের প্রধান ধর্ম্মযাজক (Archbishop of Canterbury) ডাক্তার ডেভিড্‌সন বার্দ্ধক্য বশতঃ অবসর গ্রহণ করলেন। ইতিপূর্ব্বে কোন ধর্ম্মযাজকই জীবিত অবস্থায় কার্য্য ত্যাগ করেন নি। ডাঃ ডেভিড্‌সন লর্ড উপাধি নিয়ে অবসর গ্রহণ কর্‌লেন; তাঁর স্থানে অভিষিক্ত হ'য়েছেন Archbishop of York, ডাক্তার ল্যাং।

মুসোলিনী (ইটালি)   প্রাইমো ডি রিভেরা (স্পেন)

পিলসুড্‌স্কি (পোলাণ্ড)

মুস্তাফা কেমাল (তুরস্ক)

এই বৎসরে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে অনেক কাজ হয়েছে, সমস্ত রাষ্ট্রের দিক দিয়ে যার একটা বিশেষ গুরুত্ব আছে। সর্ব্ব প্রথম স্ত্রীলোকের ভোটের অধিকার। স্ত্রীলোক পূর্ব্বেই ভোটের অধিকার পেয়েছিল; এবার পুরুষদের সঙ্গে সমান ভাবে পেয়েছে। একুশ বৎসরের উৰ্দ্ধবয়স্ক স্ত্রীপুরুষ সকলেই এখন পার্লামেণ্টের নির্ব্বাচক। ফলে বর্ত্তমান রাষ্ট্রীয় শক্তির ভাগ্য নির্ণয় স্ত্রীলোকের হাতে। ইংলণ্ডে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যা বেশী—প্রতি হাজার পুরুষে এগার শত স্ত্রীলোক। স্ত্রীলোকেরা সমবেত হ'লে যে-কোন দলের হাতে রাজ্য শাসন ভার তুলে দিতে পারেন। তাই সাধারণ নির্ব্বাচনের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে পার্লামেণ্টের পদপ্রার্থীগণ স্ত্রীলোকদিগকে সন্তুষ্ট করার জন্য ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছেন।

দুটি রাজকর্ম্মচারী সংক্রান্ত কেলেঙ্কারী এ বছরে দেখা গেছে—একটি নৌসেনা ও আরেকটি সিভিল সার্ভিসে। উভয় স্থলেই উপযুক্ত বিচারের পর দোষী ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়া হ'য়েছে। মিস্‌ স্যাভিজ নাম্নী একটি যুবতীর কোনরূপ সন্দেহজনক আচরণের জন্য পুলিস তাঁকে থানায় এনে নানারূপ জেরা করে। ব্যাপার আদালতে যায় এবং পুলিসের মামলা ফেঁসে যায়। তাই নিয়ে হৈ চৈ, পার্লামেণ্টে তুমুল তর্ক এবং ফলে পুলিসের কার্য্যপদ্ধতি সম্বন্ধে অনুসন্ধানের জন্য রাজকীয় কমিশন নিয়োগ। এমন সময় লণ্ডনের পুলিস কমিশনারের অবসর গ্রহণ। গবর্ণমেণ্ট পুলিশ সার্ভিসের

শ্রীসুরেশচন্দ্র রায়

বাইরে থেকে বিচক্ষণ লর্ড বীং-কে পুলিশ কমিশনার নিয়োগ করলেন। লর্ড বীং পুলিসের আমূল সংস্কারে মনোনিবেশ করেছেন; ইতিমধ্যেই অনেক পরিবর্ত্তন হ'য়ে গেছে।

এ বৎসরের বসন্তকালে রাজপ্রাসাদে আফ্‌গান রাজ ও তাঁহার মহিষী অতিথি হ'য়ে এসেছিলেন। যুবরাজের পূর্ব্ব আফ্রিকা ভ্রমণ উল্লেখযোগ্য। রাজকুমার হেনরীকে ডিউক অব্ গ্লষ্টার ক'রা হ'য়েছে।

কয়েকটি খ্যাতনামা ব্যক্তি এ বৎসরে ইহলোক ত্যাগ করেছেন—সাহিত্যিক টমাস্ হার্ডি, ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী লর্ড অক্সফোর্ড ও আস্কুইথ্, সেনাধ্যক্ষ আর্ল হেগ্, পণ্ডিত লর্ড হ্যাল্‌ডেন ও রাজনীতিজ্ঞ লর্ড কেভ্।

ক্যানাডা

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ক্যানাডা স্বায়ত্ত্বশাসন ভোগ করে। ঘরোয়া ব্যাপারে ক্যানাডা এক প্রকার স্বাধীন। প্রধান মন্ত্রী মিঃ ম্যাকেঞ্জি কিং প্রস্তাব করেন যে, প্যারী ও টোকিওতে ক্যানাডার নিজের প্রতিনিধি থাকবে। এ নিয়ে অনেক আলোচনা হ'য়ে গেছে। মিঃ কিং লণ্ডনে এসেছিলেন। সেই সময় কথা হয় যে, ইংলণ্ডের কতকগুলি বেকার লোককে ক্যানাডাতে কাজ দেওয়া হবে। ফলে কয়েক সহস্র বেকার ইংরেজ ক্যানাডাতে কাজ নিয়ে গেছে। এ বৎসর ক্যানাডার রাজস্ব উদ্বৃত্ত হ'য়েছে এবং সেই জন্য অনেক প্রকার টেক্স কমিয়ে দেওয়া হ'য়েছে। মিঃ কিং ঘোষণা করেছেন যে পূর্ব্বের মত পুনরায় ডাক মাশুলের হার কমিয়ে এক পেনী করা হবে। যুদ্ধের সময় ডাক মাশুলের হার বেড়ে গেছে—ইংলণ্ডেও দেড় পেনী হ'য়েছে। এখানে দেশের লোকেরা এক পেনী ডাক মাশুল করার জন্য আন্দোলন করছে। কিন্তু রাজস্ব-সচিব মিঃ চার্চ্চিল ব'লে দিয়েছেন তা হবে না। ক্যানাডা ইংলণ্ডকে হার মানালো। ১৯২৬ সালের Imperial Conferanceএর নির্দ্দেশ অনুযায়ী সার, উইলিয়াম ক্লার্ক ক্যানাডার প্রথম হাই কমিশনার নিযুক্ত হ'য়ে আগষ্ট মাসে সেখানে গেছেন।

অষ্ট্রেলিয়া

১৯২৮ সালে অষ্ট্রেলিয়াতে সাধারণ নির্ব্বাচন হ'য়ে গেছে। মিঃ ব্রুস্ পুনরায় অধিক সংখ্যক সদস্য পেয়ে প্রধান মন্ত্রী হ'য়েছেন। এ বৎসরে ভয়ানক শ্রমিক ধর্ম্মঘট দেশকে ব্যস্ত ক'রে তুলেছিল। হাজার হাজার শ্রমজীবী ছয় সপ্তাহকাল ধর্ম্মঘট করেছিল—এডেলেড্ ও মেলবোর্ণে দাঙ্গা হাঙ্গামা হ'য়ে গেছে। আইন পরিষদে শ্রমিক নেতা মিঃ চার্লটন পদত্যাগ করেছেন ও তাঁর স্থলে নির্ব্বাচিত হ'য়েছেন মিঃ স্কালীন।

নিউজিল্যাণ্ড

এ দেশেও এবৎসর সাধারণ নির্ব্বাচন হয়েছে। মিঃ কোট্‌স ছিলেন প্রধান মন্ত্রী। কিন্তু সমস্ত বিরুদ্ধদল সম্মিলিত হ'য়ে অভিজ্ঞ সার্ জোসেফ ওয়ার্ডের নেতৃত্বে মিঃ কোট্‌সের দলকে হারিয়ে দিয়েছেন। ফলে মিঃ কোট্‌স পদত্যাগ করেছেন এবং সার জোসেফ তাঁর পদ গ্রহণ করেছেন। রাজস্ব উদ্বৃত্ত হয়েছে এবং এক কোটী পাউণ্ড ধার ক'রে দেশের উন্নতিকর কাজে ব্যয় করা হচ্ছে। এ দেশের ইতিহাসে একজন মাওরী প্রথম বিশপ নিযুক্ত হ'য়েছেন।

দক্ষিণ আফ্রিকা

নানা রাজনৈতিক দলের মধ্যে গৃহ-বিবাদ আরম্ভ হ'য়েছে। প্রধানমন্ত্রী জেনারেল হারজগ্ উভয় দলের লোক নিয়ে শাসন সংসদ (cabinet) গঠন করেছিলেন। কিন্তু তা টিঁক্‌ল না। শ্রমজীবী সদস্যরা গোলমাল ক'রে বেরিয়ে পড়েছে। সাধারণ নির্ব্বাচন সন্নিকট। ভারতের প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী স্থির করেছেন ১৯২৯এর প্রারম্ভে কার্য্য ত্যাগ করবেন; ভারতীয়গণ তাঁকে রাখ্‌তে চাইছে। ডিসেম্বর মাসে দক্ষিণ আফ্রিকায় জাতীয় কংগ্রেস হ'য়ে গেছে।

আয়ারল্যাণ্ড

আয়ারল্যাণ্ড আধা স্বাধীন। তবু লোকে সন্তুষ্ট নয়। একদল যা পেয়েছে তাই নিয়ে কাজ চালাতে চায়; আর একদল চায় সম্পূর্ণ স্বাধীনতা। প্রথম দলের নেতা মিঃ কসগ্রেণ্ড, বর্ত্তমান প্রেসিডেণ্ট; দ্বিতীয় দলের নেতা মিঃ ডি ভ্যালেরা। মিঃ কসগ্রেণ্ড্ আমেরিকাতে বেড়িয়ে সাম্রাজ্যের সখ্যতা জানিয়ে এলেন। ফেব্রুয়ারী মাসে নূতন বড়লাট মিঃ জেমস্ ম্যাকনীল কার্য্যভার গ্রহণ করেছেন। মিঃ ডি ভ্যালেরা আইন পরিষদে প্রস্তাব কর্‌লেন, রাজভক্তি-জ্ঞাপক শপথ পরিত্যাগ করা হোক, কিন্তু ভোটে হেরে গেলেন।

ভারতবর্ষ

এই এক বৎসরের মধ্যে ভারতে যা হ'য়েছে তা ভারতবাসীর স্মরণ আছে আশা করা যায়। সাইমন কমিশনের আগমন ও ভ্রমণ, নেহেরু কমিটির রিপোর্ট, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিল প্রত্যাহার, প্রেসিডেণ্টের অতিরিক্ত ভোটের জোরে বোলশেভিক বিতাড়ন বিল অগ্রাহ্য, বেঙ্গল নাগপুর রেল লাইনে ১৩৪ দিন ধর্ম্মঘট, সুরাটে সাম্প্রদায়িক বিবাদ, বারদৌলী সত্যাগ্রহ ও তাহার জয়, লালা লাজপত রায়ের মৃত্যু, কলিকাতায় কংগ্রেস—সবই আমাদের স্মরণপথে আছে। রাজকীয় কৃষি কমিশন রিপোর্ট দিয়েছেন এবং করদরাজ্য সমস্যা সম্বন্ধে বাট্‌লার কমিটি তদন্ত করছেন।

ভারতের নিকটবর্ত্তী সিংহলের শাসন প্রণালী সম্বন্ধে নূতন রিপোর্ট হয়েছে,এবং তা নিয়ে সিংহলে বিষম আলোচনা ও তর্ক চল্‌ছে।

বৈদেশিক প্রসঙ্গ

বৈদেশিক রাজনীতিতে সর্ব্বপ্রধান ঘটনা কেলোগ্ প্যাক্ট (Kellog Pact)। আমেরিকার অন্যতম সচিব মিঃ কেলোগের প্রস্তাবে ও চেষ্টায় ভবিষ্যতে যুদ্ধ বন্ধ কর্‌বার জন্য একটা চুক্তিপত্র তৈয়ারী করা হ'য়েছে এবং গত ২৭ আগষ্ট ফ্রান্সে এটা সহি হ'য়ে গেছে। ১৫টি দেশ এই চুক্তি সহি করেছেন এবং আরও ৫০টি রাষ্ট্র জানিয়েছেন যে তাঁহারা এই চুক্তি মেনে নেবেন। কিন্তু মজা হ'লো চুক্তি পত্রের জন্মস্থান আমেরিকাতে; আমেরিকা এখনও চুক্তি অনুমোদন করে নি। জাতি সঙ্ঘ স্থাপনের সময়ও এমনি হ'য়েছিল। জাতিসঙ্ঘ (League of Nations) উদ্ভাবন করলেন আমেরিকার তদানীন্তন প্রেসিডেণ্ট ডাঃ উইলসন্; কিন্তু শেষকালে আমেরিকাই জাতিসঙ্ঘে যোগদান কর্‌লে না।

গত ইউরোপীয় যুদ্ধের পরে সমস্ত দেশের মধ্যেই একটা নূতন প্রেরণা এসেছে। সকলেই চাইছে গণতন্ত্র স্বাধীনতা। ফলে দেশে দেশে একটা ঝড় ব'য়ে যাচ্ছে এবং অনেক দেশেই গণতন্ত্রের পরিবর্ত্তে স্বেচ্ছাতন্ত্র বা One-man-rule হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। এটা যে সব যায়গায় খারাপ তা নয়, অনেক সময় জাতিকে সঞ্জীবিত কর্‌তে হ'লে একজন অতি-মানব বা superman-এর নেতৃত্ব প্রয়োজন। স্বেচ্ছাতন্ত্রে বাস ক'রে স্বাধীনতার মূল্য দিতে হয়। এ পর্য্যন্ত ইউরোপে নয়টি রাষ্ট্রে এই রকম শাসন প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে যেখানে একজন লোকের ইচ্ছানুসারে কাজ চল্‌ছে।

রাষ্ট্র	শাসক বা নেতা
ইটালি	মুসোলিনী
স্পেন্	প্রাইমো ডি রিভেরা
পোলাণ্ড	পিলসুড্‌স্কি
তুরস্ক	মুস্তাফা কেমাল পাশা
পারস্য	রেজা খাঁ
হুঙ্গারী	হর্‌থি
আল্‌বেনিয়া	আমেদ্ জগু
লিথুয়ানিয়া	ভালদে মেরাস্
যুগো শ্লাভিয়া	রাজা আলেকজাণ্ডার বা জেনারেল জিভ্‌কোভিচ্

এ সব দেশে যে লোকের উপর কোন অত্যাচার হচ্ছে তা নয়। অনেক জায়গায় পার্লামেণ্ট বা ব্যবস্থা-পরিষদ এবং রাজাও আছে। কেবল ঘটনাচক্রে সমস্ত ক্ষমতা ও প্রভুত্ব একজন লোকের করতলগত হ'য়ে পড়েছে এবং তাঁর নেতৃত্বে তাঁর দলের লোকেরা অবিসম্বাদে শাসন

শ্রীসুরেশচন্দ্র রায়

কার্য চালনা করছে। পোলাণ্ডে মার্শাল পিলসুডস্কি প্রধান মন্ত্রীত্ব ত্যাগ ক'রে তাঁহার সহকারী মসিয়ে বার্টেলকে দিয়েছেন; কিন্তু সমস্ত ক্ষমতা প্রকৃতপক্ষে পিলসুডস্কিরই হাতে। লিথুয়ানিয়ার প্রধানমন্ত্রী অধ্যাপক ভাল দেমেরাস্ পোলাণ্ডের সঙ্গে ঝগড়া চালাচ্ছেন এবং এ বিষয়ে জাতি-সঙ্ঘের (League of Nations) কথাও উপেক্ষা ক'রে ইউরোপীয় রাজনীতিজ্ঞগণের বিরাগভাজন হ'য়েছেন। যুগশ্লাভিয়াতে ক্রোট ও সার্ভ এই দুই দলের মধ্যে বিষম বাদ বিসম্বাদ চল্‌ছে। জুন মাসের ২০ তারিখে ব্যবস্থা-পরিষদের একটা সভায় তর্ক করতে করতে সার্ভ দলের একজন প্রতিনিধি বিপক্ষ দলের চারজন প্রতিনিধিকে গুলি ক'রে দিলে—তার মধ্যে তিনজন মারা গেছেন। ক্রোট্‌রা দল পাকিয়ে বস্‌ল এর একটা বিহিত করতে হবে। বেগতিক দেখে রাজা ব্যবস্থা-পরিষদ ভেঙ্গে দিলেন এবং নূতন শাসন-তন্ত্র সম্পর্কীয় আইন না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁর নিজের নির্ব্বাচিত মন্ত্রীদলের ওপর রাজ্য শাসন ভার অর্পণ করেছেন—এর প্রধান মন্ত্রী জিভকোভিচ্। এই নূতন মন্ত্রী নিয়োগটা হ'য়েছে ১৯২৯শের জানুয়ারীতে।

গত এপ্রিল মাসে বুলগেরিয়াতে প্রবল ভূমিকম্প হ'য়ে গেছে; তাতে প্রায় ৪৫ লক্ষ পাউণ্ড ক্ষতি হ'য়েছে। নিকট-বর্ত্তী রাজ্যগুলি এজন্য অনেক অর্থ সাহায্য করেছে। জুলাই মাসে বুলগেরিয়াতে ভীষণ বিদ্রোহ হয় এবং তাতে প্রকাশ্য রাস্তায় পর্য্যন্ত খুন খারাপ হ'য়েছিল। যাহোক্ ১২ই সেপ্টেম্বর লায়াপ চেফ্ নূতন মন্ত্রীদল গঠন করেছেন এবং দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে।

বিগত মহাসমরের ফলে অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্য তিন ভাগ হ'য়ে গেছে—অষ্ট্রিয়া, হুঙ্গারী ও জেকোশ্লোভাকিয়া। তিনটেই এখন সাধারণতন্ত্র। অষ্ট্রিয়ার প্রধান বিপদ ঘরোয়া কলহ; সমাজবাদী (Socialist) ও তাহার বিরুদ্ধ দলের (Anti-socialist) মধ্যে। অক্টোবর মাসে এই নিয়ে দাঙ্গা হবার উপক্রম হয়; কিন্তু গভর্ণমেণ্ট অতিকষ্টে শান্তিস্থাপন করেন। রাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট ডাক্তার হাইনিস্

রিজা খাঁ (পারস্য)

হর্থি (হুঙ্গারি)

আহমেদ জগু (আলবেনিয়া)

ভালদেমারাস্ (লিথুয়ানিয়া)

১৯১২ সালে আল্‌বানিয়া তুরস্কের অধীনতা থেকে মুক্তি পেয়ে স্বাধীন হয়। ১৯২৫ সালে আল্‌বানিয়া সাধারণ-তন্ত্র বা Republic হ'লো। আলোচ্য বর্ষে ব্যবস্থা-পরিষদ তাঁদের প্রেসিডেণ্ট আমেদ বেগ্ জগুকে রাজা ব'লে ঘোষণা করেছেন। আমেদ জগু সিংহাসন গ্রহণ করেছেন, প্রথম জগু (Zogu 1) নাম নিয়ে। কোট্টা কোট্টা হ'য়েছেন তাঁর প্রধান মন্ত্রী।

রুমানিয়াতে কৃষক বিদ্রোহ হ'য়েছে—তাদের আন্দোলনে প্রধান মন্ত্রী ব্রাটিয়ানু পদত্যাগ করেন। নূতন নির্ব্বাচনে কৃষকদল জয়লাভ করেছেন এবং তাঁদের নেতা ডাক্তার মানিউ প্রধান মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করেছেন।

পদত্যাগ করায় তাঁর স্থলে নির্ব্বাচিত হ'য়েছেন হার-মিকলাস্। হুঙ্গারীতে বিশেষ গোলমাল নাই। হরথি সেখানে প্রায় সর্ব্বেসর্ব্বা। প্রধান মন্ত্রী বেথ্‌লেন শাসন কার্য্য ভালই চালাচ্ছেন। কিন্তু সীমানা নিয়ে রুমেনিয়ার সঙ্গে একটা মনোমালিন্য এখনও মেটে নি। ২৮শে অক্টোবর জেকোশ্লোভাকিয়া সাধারণ-তন্ত্রের দশম জন্মতিথি উৎসব হ'য়ে গেছে। এই উপলক্ষে রাষ্ট্র-নায়ক প্রেসিডেণ্ট অধ্যাপক মাসারীক হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দিয়েছেন; রাষ্ট্রে অনেক জার্ম্মাণ আছে; দুইজন জার্ম্মাণ মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করেছেন এজন্য তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। রাজস্ব সচিব বলেছেন

রাষ্ট্রের আর্থিক অবস্থা এখন ভাল এবং বেকারের সংখ্যা অনেক ক'মে গেছে।

ফ্রান্স

এপ্রিল মাসে ফরাসী দেশে সাধারণ নির্বাচন হ'য়ে গেছে। মসিয়েঁ পয়াঁকারের দল অধিক সংখ্যক প্রতিনিধি পেয়েছে এবং তিনি প্রধান মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করেছেন। মসিয়েঁ পয়াঁকারে ফরাসী দেশের আর্থিক সুব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু রাইনল্যাণ্ড দখল নিয়ে তাঁর সঙ্গে জার্ম্মাণীর মনোমালিন্য চল্‌ছে। নভেম্বর মাসে মন্ত্রীপরিষদে মত-বিভেদ হওয়ায় মসিয়েঁ পয়াঁকারে পদত্যাগ কর্‌লেন কিন্তু প্রেসিডেন্টের অনুরোধে তাঁকেই আবার নূতন মন্ত্রীপরিষদ গঠন করতে হ'লো। কিন্তু বছরের শেষাশেষি আবার মন্ত্রীপরিষদে কলহ উপস্থিত হ'য়েছে—ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্যগণের বেতন বৃদ্ধির প্রস্তাব নিয়ে। স্বাধীনতা বড় খরচের জিনিষ (costly affair)। দুশো পাঁচশো প্রতিনিধি নিয়ে শাসন চালাতে হয় —তাঁদের নির্ব্বাচন রাহা খরচ সবই অর্থব্যয় চাই। তার-পর প্রতিনিধিরা তো ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে পারেন না। কাজেই প্রায় সব দেশেই ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যগণের বেতন আছে। ফরাসী সদস্যগণ তাঁদের বর্ত্তমান বেতনে সন্তুষ্ট ন'ন, বেশী চান। মসিয়েঁ পয়াঁকারে এর বিরোধী। কাজেই বাদানুবাদ চল্‌ছে। আলোচ্যবর্ষে লর্ড ক্রুর স্থানে সার উইলিয়াম টাইরেল ফরাসী দেশে ব্রিটিশ রাজদূত নিযুক্ত হয়েছেন।

জার্ম্মেণী

বিগত মহাসমরের খ্যাতনামা যোদ্ধা ভন হিন্‌ডেন-বার্গ এখন জার্ম্মাণীর রাষ্ট্রনায়ক বা প্রেসিডেন্ট। নব নির্ব্বাচনে সোশ্যালিষ্টদল জয়লাভ করেছে এবং হার মুলারের নেতৃত্বে মন্ত্রীপরিষদ গঠিত হ'য়েছে। আন্তর্জাতিক সমস্যায় জার্ম্মেণীর প্রধান দু'টি কথা আছে, রাইনল্যাণ্ড হ'তে বিদেশী সৈন্য অপসরণ এবং ক্ষতিপূরণের দাবী সম্বন্ধে সুব্যবস্থা। দু'টো নিয়েই কথা চল্‌ছে। রাইনল্যাণ্ডে ইংরেজ সৈন্য যে আর রাখা উচিত নয় এ কথা ইংরেজরাও অনেকে বল্‌ছে। ক্ষতিপূরণ সম্বন্ধে তদন্ত করবার জন্য একটি অভিজ্ঞ কমিটি নিযুক্ত হ'য়েছে।

ইটালী

ইটালীতে মুসোলিনীর একাধিপত্য অপ্রতিহত ভাবে চল্‌ছে। নানাস্থানে মাঝে মাঝে বিদ্রোহ দেখা দেয়, আবার কঠোর শাস্তির ফলে সব থেমে যায়। আলোচ্যবর্ষে সিসিলি, সারডিনিয়া ও নেপল্‌সে বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল এবং মিলানে রাজাকে বোমা ফেলে হত্যা কর্‌বার নিষ্ফল চেষ্টা হ'য়েছিল। মুসোলিনী তাঁর দলের পরিষদ Fascist Grand Councilকে আইন ক'রে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দিলেন। স্পেন ও তুরস্কের সঙ্গে ইটালীর সখ্যতা স্থাপিত হয়েছে।

স্পেন্ ও পর্টুগাল

বিশ বৎসরের মধ্যে স্পেনে প্রথম রাজস্ব উদ্বৃত্ত হয়েছে। জুলাই মাসে স্পেনের রাজা ইংলণ্ডে বেড়াতে এসেছিলেন। বিখ্যাত সাহিত্যিক ইবানেজ জানুয়ারী মাসে প্রাণত্যাগ করেছেন। ২২শে জুলাই পর্টুগালের লিস্‌বনে বিদ্রোহ হ'য়েছিল; কিন্তু শীঘ্রই শান্তি স্থাপিত হয়েছে। পর্টুগাল সাধারণ তন্ত্রে (Portugal Republic) আর উল্লেখযোগ্য কিছুই নাই।

স্কাণ্ডিনেভিয়া

নরওয়ে ও সুইডেন দু'টি পাশাপাশি রাজ্য। এ দু'টি রাজ্য ইউরোপীয় রাজনীতির মধ্যে বিশেষ আসে না। মার্চ্চ মাসে নরওয়েতে ইবসেনের শত বার্ষিক উৎসব হ'য়ে গেছে। জুন মাসে সুইডেনের লোকেরা তাদের রাজা গাষ্টাভাসের সপ্ততিবর্ষ জন্মোৎসব করেছে।

সোভিয়েট রাশিয়া

রাশিয়া ইউরোপের মধ্যে এক রহস্যময় স্থান হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। ইউরোপীয় প্রায় সব দেশের সঙ্গেই এদের সম্বন্ধ বিচ্ছেদ হয়েছে। এ দেশ সম্বন্ধে সঠিক খবরও অনেক সময় পাওয়া সুকঠিন। বিগত মহাসমরের পর রাশিয়া গণতন্ত্র

শ্রীসুরেশচন্দ্র রায়

হ'য়েছে এবং সেখানে শ্রমজীবীরাই পেয়েছে অধিনায়কত্ব। কিন্তু তাদের প্রধান নায়ক লেনিনের মৃত্যুর পর কর্ত্তৃপক্ষের মধ্যে বিবাদ আরম্ভ হ'য়েছে। রাষ্ট্রের প্রধান অধিপতি বা প্রেসিডেণ্ট—রাইকফ্। কিন্তু বর্ত্তমানে প্রকৃত আধিপত্য পেয়েছেন ষ্টালীন। ষ্টালীনের সঙ্গে মতবিভেদ হওয়ায় ট্রট্স্কিকে তুর্কীস্থানে নির্ব্বাসিত করা হয়েছে। জুলাই ও আগষ্ট মাসে রাশিয়ায় ভীষণ খাদ্যের অভাব হয়; গবর্ণমেণ্ট বিদেশ থেকে আড়াই লক্ষ টন শস্য এনে দেশবাসীর প্রাণ রক্ষা করেন। জাপান, পোলাণ্ড, গ্রীস ও জার্ম্মাণীর সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক বিচ্ছেদ হয়েছে; কিন্তু রাশিয়া পারস্য, আফগানিস্থান ও চীনদেশে ব্যবসা চালাবার বিশেষ চেষ্টা করছে।

গ্রীস্

উপর্য্যুপরি ভূমিকম্প ও ডেঙ্গু মহামারীতে গ্রীস দেশ বিধ্বস্ত হ'য়ে গেছে। ভেনিজেলস্ পুনরায় ক্ষমতা পেয়ে প্রধান মন্ত্রী হ'য়েছেন। জেনারেল প্যানাগালোসের অধিনায়কত্ব শেষ হ'য়েছে। ভেনিজেলস্ ইটালী, যুগোশ্লাভ্ ও বুলগেরিয়ার সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করেছেন।

তুরস্ক ও আফ্গানিস্থান

মুস্তাফা কেমালের অধিনায়কত্বে তুরস্ক ইউরোপীয় সভ্যতায় অনুপ্রাণিত হচ্ছে। ইংরেজি পোষাক পরা অবশ্য-বিধেয়; মেয়েদের অবগুণ্ঠন ত্যাগ করতে হয়েছে। নূতন আইন হ'য়েছে যে, আরাবী অক্ষরের পরিবর্ত্তে সকলকেই ল্যাটিন অক্ষর ব্যবহার কর্তে হবে। দেশশুদ্ধ লোক আবার বর্ণ পরিচয় করছে। আফগানিস্থানের রাজা মে মাসে তুরস্কে এসেছিলেন, তার ফলে ২৭শে মে তুরস্ক ও আফগানিস্থানের এক সন্ধিপত্র সহি হ'য়েছে। ২৯শে মে তুরস্ক ইটালীর সঙ্গেও এক সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করেছে।

আফগানিস্থানের রাজার তুরস্কের মত পাশ্চাত্য রীতিনীতি প্রবর্ত্তনের ফলে তুমুল বিদ্রোহ আরম্ভ হয়েছে। রাজা ও রাণী পাশ্চাত্যদেশ ভ্রমণ ক'রে তুরস্কের অনুরূপ ব্যবস্থা নিজের দেশে কর্তে চাইছিলেন।

আমেরিকা

যুক্তরাজ্যের (United States) প্রধান ঘটনা প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচন। প্রতি চারি বৎসরে প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচন হয়। Electoral Collegeএর সদস্যগণ প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচন করেন। কিন্তু প্রকৃত প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় এই Electoral Collegeএর প্রতিনিধি নির্ব্বাচন নিয়ে। কারণ যে দল এই নির্ব্বাচনে জয়লাভ করে তাহাদেরই মনোনীত ব্যক্তি প্রেসিডেণ্ট হয়। এই Electoral Collegeএর নির্ব্বাচনের সময়েই দলবিশেষ তাঁহাদের প্রেসিডেণ্ট মনোনয়ন করিয়া রাখেন। এবার দু'জন পদপ্রার্থী ছিলেন—মিঃ হুভার ও মিঃ স্মিথ। ৮ই নভেম্বর নির্ব্বাচনের ফলে মিঃ হুভার জয়লাভ করেছেন। কেলোগ প্যাক্টের কথা পূর্ব্বে বলা হয়েছে। দক্ষিণ আমেরিকাতে বলিভিয়া ও পারাগুয়েতে সীমানা নিয়ে যুদ্ধ আরম্ভ হয়, কিন্তু Pan-American Conferenceএর চেষ্টায় শান্তি স্থাপিত হয়েছে।

ইজিপ্ট

প্রধান ঘটনা প্রধান মন্ত্রী ও ব্রিটিশ হাইকমিশনারের বাদানুবাদ। ব্যবস্থা পরিষদ Public Assemblies Bill আলোচনা কর্‌ছিলেন; হাইকমিশনার লর্ড লয়েড সাবধান ক'রে দিলেন যে ও আইন পাশ করলে ভাল হবেনা। প্রধান মন্ত্রী মুস্তাফা পাশা নাহাস বৃথা আস্ফালন ক'রে অবশেষে আইন প্রত্যাহার করলেন। মন্ত্রী সংসদ সুপ্রতিষ্ঠিত হচ্ছে না দেখে ১৯শে জুলাই মিশর রাজ ব্যবস্থা পরিষদ ভেঙ্গে দিয়েছেন এবং তিন বৎসরের জন্য নির্ব্বাচন স্থগিত রেখেছেন।

চীন ও জাপান

দীর্ঘকাল গৃহবিবাদের পর চীনদেশে শান্তির আলোক দেখা দিয়েছে। ১৯১২ সালে চীন সাধারণতন্ত্র হয়। ১৯১৬ সালে য়ুয়ান-সি-কাইয়ের মৃত্যুর পর নানাদলে প্রভুত্বের জন্য অবিরত বিবাদ চল্‌ছিল। শেষকালে চীন প্রায় দুটো ভাগ হ'য়ে গেল। পিকিনে একদল অধিষ্ঠান ক'রে উত্তর চীনে প্রভুত্ব কর্তে লাগ্‌লেন আর দক্ষিণ চীনের আধিপত্য গেল নানকিংএর জাতীয় দলের হাতে।

১৯২৮ সালের জুন মাসে জাতীয় দল পিকিং দখল ক'রে নিয়েছে, এবং নানকিংকেই দেশের রাজধানী করেছে। বিজয়ী জাতীয় দলের সেনাপতি চিয়াং-কাই-সেক্ ১০ই অক্টোবর সাধারণ তন্ত্রের (Chinese Republic) প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হ'য়েছেন। ব্রিটিশরাজ নানকিংএর এই নূতন গবর্ণমেণ্টকে স্বীকার ক'রে নিয়েছেন এবং তার সঙ্গে একটা বাণিজ্য সম্পর্কীয় সন্ধি-স্থাপন করেছেন।

২০শে ফেব্রুয়ারী নূতন নিয়মানুযায়ী জাপানে সাধারণ নির্ব্বাচন হ'য়ে গেছে। সংরক্ষণ দল (Conservative Party) জয়লাভ করেছে। ৯ই নভেম্বর সম্রাট হিরোহিটো বিষম সমারোহে সিংহাসন আরোহণ করেছেন।

ইংরাজীতে যাকে Throes of new birth বলে (অর্থাৎ প্রসবের যন্ত্রণা) জগতের সমস্ত দেশে তাহাই পরিলক্ষিত হচ্ছে। সর্ব্বত্রই দেখা দিয়েছে নব জাগরণ ও স্বাধীনতা-লিপ্সা,—অত্যাচারী ধনবানের অধঃপতন এবং নিপীড়িত দরিদ্রের অভ্যুত্থান ও আধিপত্য। নব প্রসবের পরে মা যেমন শ্রান্ত ও মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়ে, অনেক স্থানে দেশ-মাতৃকার সেই অবস্থাই হয়েছে, কিন্তু এই নবীন শিশু যখন শুক্লপক্ষের শশিকলার মত বাড়তে থাকবে তখন মায়েরও নব শক্তি আসবে। মা সেইদিনের অপেক্ষা ক'রে আছেন যেদিন সন্তানের ললাটে রাজটীকা পরিয়ে রাজ-আসনে অধিষ্ঠিত করবেন। কিন্তু এর মাঝখানে র'য়েছে নানাবিধ বাধা বিপত্তির সঙ্গে সন্তানের সংগ্রাম এবং তার জন্য জননীর চিন্তা, যত্ন ও কষ্ট। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আবার গোকুলে জন্মগ্রহণ করেছেন। আর নৃপতি কংসের অনুচরগণ তাঁকে বধ করবার জন্য অনুসন্ধান করছে। কিন্তু অন্তরীক্ষ থেকে কে ব'লে দিচ্ছে "তোমারে বধিবে যে, গোকুলে বাড়িছে সে।"

লণ্ডন,
৯ই জানুয়ারী ১৯২৯।

ছবির কথা

-গল্প-

—এস ওয়াজেদ আলি

তারা দুজন, ঘরের ভেতর, পাশাপাশি দুটি আরাম কেদারায় ব'সে। বাইরে, আকাশ ঘন মেঘে আচ্ছন্ন। বিষাদের কালিমা যেন প্রকৃতির সুন্দর শ্যামল মুখটিকে মলিন ক'রে দিয়েছে। সেই মুহ্যমান পরিপার্শ্বিকতায় ঘরের উজ্জ্বল ইলেকট্রিক আলো কেমন যেন বেখাপ্পা দেখাচ্ছিল। উভয়ই নির্ব্বাক নিস্পন্দ। উভয়েরই দৃষ্টি প্রত্যক্ষকে ছেড়ে দূরে, অনেক দূরে বিচরণ করছিল। নিকটে দেখবার যেন কিছু নেই।

সুসজ্জিত কক্ষ। আসবাব পত্র গৃহীদের সুরুচি এবং সম্পদের পরিচায়ক। দেয়াল থেকে অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর ছবি ঝুলছিল। একটি ছবি তাদের মধ্যে সম্মানের স্থান অধিকার করেছিল। সেটী হচ্ছে মহাকবি সেকসপিয়ার-কীর্ত্তিত রোমিও এবং জুলিয়েটের নৈশ-অভিসারের একটি প্রতিকৃতি।

প্রেমিক রোমিওর এক পা দ্বিতল কক্ষের উন্মুক্ত বাতায়নের ভিতর, আর এক পা বাহিরের দোদুল্যমান রজ্জু নির্ম্মিত সোপানের উপর। বিপদের সম্ভাবনার কথা ভুলে আবেগভরে সে জুলিয়েটকে দুই হাত দিয়ে তার বক্ষের উপর চেপে ধরেছে। প্রেমের আবেশে জুলিয়েটের অধরোষ্ঠ আপনা থেকেই রোমিওর অধরোষ্ঠে এসে মিলেছে। প্রেমের দেবতা তার ছোট্ট নধর দুটি হাত দিয়ে সমস্ত বাধা বিপত্তিকে হেলায় সরিয়ে এই প্রেমিক যুগলের দেহ আর মনকে এক ক'রে দিয়েছে। ছবিটি যৌবনের তীব্র মাদকতাময় যৌন প্রেমের সুন্দর একটি প্রতীক!

আরাম কেদারায় উপবিষ্টা তরুণীর হৃদয় একদিন ছবিটি দেখে আনন্দে এবং আশায় উদ্বেলিত হয়েছিল। আনন্দ— তার রোমিওর স্পর্শ সেও অনুভব করেছে, সেই জন্য; আশা— মুহূর্ত্তের যে প্রেমাভিসার সেকসপিয়ারের নায়ক নায়িকাকে

এস ওয়াজেদ আলি

জগতে অমর করেছে সেই দুর্লভ সৌভাগ্য, কেবল মুহূর্তের জন্য নয়, সমস্ত জীবন ধ'রে সে ভোগ করবে। কেবল এই নশ্বর জীবনে কেন, অমরাবতীর নিকুঞ্জ-কাননেও তারা অনন্তকাল ধ'রে পরস্পরের প্রেম সুধা পান করবে। এত সুন্দর, এত মধুর, এত পবিত্র এই প্রেম,—এর কি কখনও মৃত্যু হ'তে পারে! বসন্তের দখিন হাওয়া তরুণ প্রাণে কি অপূর্ব্ব মায়া-লোকের সৃষ্টি করে!

জীবনের সেই অতীত বসন্তে সুন্দরী এই ছবিটি তার বাঞ্ছিত জনকে উপহার দিয়েছিল। জন্ম দিনের উপহার। কত আশা, কত আনন্দে তাদের সম্মোহিত তরুণ প্রাণ দুটি সেদিন উদ্বেলিত হয়েছিল! সে কি তার প্রেমাস্পদকে জুলিয়েটের মত ভালবাসে না! তার প্রেমাস্পদও কি রোমিওর মত তার জন্য সমস্ত বাধা, সমস্ত বিঘ্ন হেলায় অতিক্রম করতে প্রস্তুত নয়! তাদের অতলস্পর্শী প্রেমের সুন্দর একটি অভিব্যক্তি মনে ক'রেই সুন্দরী ছবিটি তার বাঞ্ছিত জনকে উপহার দিয়েছিল। আর তার প্রণয়ী! সে তার প্রণয়িনীর মনের কথা বুঝেছিল ব'লেই ছবিটিকে স্থান দিয়েছিল দেয়ালের ঠিক মাঝখানে; তার প্রণয়িনী যেমন বিরাজ করে তার প্রাণের ঠিক মাঝখানে, তার অন্তরের অন্তরতম দেশে! প্রেমের চিরন্তন রীতি!

বসন্তের মলয় মারুত প্রেমের দৌত্যগিরি আর করে না। বিহঙ্গের কাকলী হৃদয়-তন্ত্রীতে প্রেমের রাগিণী আর জাগায় না। প্রেমিকের হাসির আলো প্রেমিকার মনে অমরাবতীর মরীচিকার সৃষ্টি আর করে না।

বাহিরে এমন ঝড়ের আভাস। যে ঝড় তাদের অন্তরে বইছে, এ তারই যেন বিষাদময় প্রতীক। যে কাল মেঘ তাদের অন্তরকে আচ্ছন্ন করেছে, আকাশের মেঘ তারই যেন ক্ষীণ প্রতিচ্ছবি! জীবন চক্রের নির্ম্মম আবর্ত্তন!

কথা কেউ কারও সঙ্গে বলছেনা। বলবার কিছু নেই। নিজ নিজ মনে ব'সে তারা ভাবছে। ভাববার বিষয় যথেষ্ট আছে। প্রেমিক ভাবছে এক জনের কথা, এই সেদিন যার সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছে; প্রেমিকা ভাবছে আর এক জনের কথা, ক্ষণিক মোহের উত্তেজনায় যাকে সে পরিত্যাগ করেছিল, তার বর্ত্তমান জীবন সঙ্গীর জন্য। বৈচিত্র্যহীন বর্ত্তমানকে ছেড়ে একজন লোলুপ দৃষ্টিতে চাইছিল কুহেলিকা সমাচ্ছন্ন আলেয়া উদ্ভাসিত ভবিষ্যতের দিকে, আর একজন আক্ষেপ আর অনুশোচনার দৃষ্টিতে চাইছিল কল্পনার ইন্দ্রধনু দিয়ে মোড়া সুদূর অতীতের প্রতি। মেঘের ম্লানিমা, ঝঞ্ঝার হুঙ্কার, প্রকৃতির ক্রন্দন মুহ্যমান বর্ত্তমানকে দুজনের পক্ষেই অতিষ্ঠ ক'রে তুলেছিল।

শোঁ, শোঁ ক'রে ঝড় এল। সঙ্গে সঙ্গে মুষলধারে বারিপাত আরম্ভ হ'ল। চকিতের দৃষ্টিতে দুজনেই বাইরের দিকে চাইলে। পাখীরা আশ্রয়ের অন্বেষণে ব্যাকুলভাবে উড়ে বেড়াচ্ছিল। একটা ঝাপটা এসে, কালো, কুলক্ষণে একটা দাঁড়কাককে ঘরের ভেতর উড়িয়ে আনলে। দুজনেই তাকে দেখে শিউরে উঠলো।

ভীত চকিত বিহঙ্গটি অতীত বসন্তের স্মৃতি-ভরা রোমিও জুলিয়েটের সেই ছবিটির উপর গিয়ে বসলো। ক্ষীণ একটি রজ্জুর উপর নির্ভর ক'রে সেটি ঝুলছিল—তাদের প্রণয় জীবনেরই মত। দাঁড়কাকের ভর সে রজ্জু সইতে পারলে না। ঝনাৎ ক'রে ছবিটি মেঝের উপর এসে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে তার ফ্রেমের কাঁচ ভেঙ্গে খণ্ডখণ্ড হ'য়ে গেল।

বিরক্তির কণ্ঠে তরুণী বল্‌লে "ভালই হ'ল। ছবির নগ্ন কামুকতা আমার প্রাণে আঘাত করতো। ওটা বিদায় হ'ল, ভালই হ'ল।"

ত্রস্তে দাঁড়িয়ে, পকেট থেকে ঘড়ি বার ক'রে, তার জীবনসঙ্গী ব্যস্তকণ্ঠে বললে, "না, আর দেরী করা যায় না। ছটার appointment, সওয়া ছটা হ'তে চললো।" সঙ্গে সঙ্গে সে কক্ষ ত্যাগ করতে উদ্যত হ'ল।

তার সেই গমনোন্মুখ মূর্ত্তির উপর জলন্ত একটি দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে তরুণী বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালো—প্রকৃতির বিলাপ শুনতে।

লগ্নশেষ

শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী

আসিলেনা ফিরে। তবু আশা,
একদিন আসিবে নিশ্চয়—
তোমারে আনিবে টানি' আমার পিপাসা ;
অন্তরের এ দৃঢ় প্রত্যয়
সত্য নয় ?

যায়, চলে যায়
যৌবনের মধ্যদিবা—হায় !
কখন বৈকালী জাগে গগনের গায়
গাঢ় গেরুয়ায় ;
আঁখি মোর পথ-পানে চায়,
হায় প্রিয়া, তোমারি আশায়।

এসেছিলে প্রথম যৌবনে—
তখনো আকাশ রাঙা প্রভাত-তপনে ;
মোর ফুল-বনে
তখনো রয়েছে মাখা শিশিরের জল ;
পথ-তলে সিক্ত তৃণ-দল ;
তখন হা' প্রিয়া,
কি দিয়া তুষিব তোমা পাইনি ভাবিয়া—
যাহা তুমি চাহ তাহা পারিনাই দিতে,—
বৃথাই গেঁথেছি মালা বসিয়া নিভৃতে
কবিতা-কুসুমরাশি আহরি' আহরি',—
তোমারে আড়াল করি' সাজিয়েছি কাব্য-শতনরী,
তোমারে তুষিব বলি' তোমারে বিস্মরি' বারে বারে
তুষিয়াছি মোর কল্পনারে।

তুমি চাহনাই মোর কুসুম-সম্ভার,
আমারে চেয়েছ তুমি—যে হাতে গেঁথেছি মালা
হায় বালা
পরিতে চেয়েছ তুমি সেই হাত করি' কণ্ঠ-হার
মুখ ফুটে' বলনি সে কথা,—
অভিমানে ফিরে' গেছ বুকে ল'য়ে ব্যথা।

আজি মনে হয়,
মূল্যহীন কাব্য-কথা মিথ্যা স্বপ্নময়,—
প্রাণহীন কল্পনার রঙীন ফানুষ ;
রক্তে মাংসে গড়া এই মর্ত্তোর মানুষ,
স্বপ্ন নয়—এ যে চাহে সত্য প্রাণ, সত্য জাগরণ,
সূক্ষ্ম নয়—স্থূল কিছু পরশিতে, করিতে ধারণ,
দিতে, নিতে ;—হায়,
মানুষ যে মানুষেরে চায় !

ফিরে' এস, ফিরে' এস প্রিয়া,—
এবার তোমারে দিব মোর দেহ, মোর সর্ব্ব হিয়া ;
এবার তোমারে নিব আঁকড়ি' কাড়িয়া
একান্ত আমার করি'।
উজাড়ি' আহরি'—
এবার মানুষ হ'য়ে মুখোমুখি রহিব জাগিয়া,—
তুমি হবে মানুষের প্রিয়া !

বৌদ্ধযুগে নর্ত্তকী ও বারবনিতা

গত পৌষমাসের ভারতবর্ষের ডাক্তার শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা এম-এ, বি-এল, পিএইচ-ডি মহাশয় উল্লিখিত প্রবন্ধে লিখিয়াছেন,—

নৃত্য-গীত কুশলা নর্ত্তকীর উল্লেখ জাতকে পাওয়া যায়। রাজার আমোদ-প্রমোদের জন্য তাহারা নিযুক্ত হইত এবং রাজ-অন্তঃপুরেই অবস্থান করিত। কোনও কোনও নৃপতির ষোল সহস্র নর্ত্তকী ছিল। চুল্ল-পলোভন জাতকে নিম্নলিখিত ঘটনাটির উল্লেখ পাওয়া যায়—রাজপুত্র আমোদ-প্রমোদের প্রতি উদাসীন ছিলেন, রাজ্যের প্রতি তাহার স্পৃহা ছিল না, এবং কখনও তিনি স্ত্রীলোকের সংস্পর্শে আসিতেন না। সুতরাং রাজপুত্রের এই উদাসীনতা দূর করিবার জন্য রাজা একজন নর্ত্তকী নিযুক্ত করিলেন। নর্ত্তকীটি বয়সে তরুণী, নৃত্যগীতে সুদক্ষা। তাহার সংস্পর্শে আসিলে যে কোনও লোককে সে বশীভূত করিতে পারিত। এই রাজপুত্রকেও সে অমৃতের ন্যায় সুমধুর সঙ্গীতের দ্বারা প্রলুব্ধ করিল। তাহার চিত্ত-বিমোহনকারী সঙ্গীত শ্রবণ করিতে করিতে রাজপুত্রের অন্তরে ধীরে ধীরে বাসনাসমূহ জাগ্রত হইয়া উঠিল। তিনি সংসারের স্রোতে গা ভাসাইয়া দিলেন এবং ভালবাসার আনন্দও তাহার অপরিজ্ঞাত রহিল না। অবশেষে এই নর্ত্তকীটির প্রেমে রাজপুত্র এমন ভাবেই ডুবিয়া গেলেন যে, তাহার কাছে অন্য কোন লোকের যাওয়া তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। এক দিন ছোরা হাতে রাস্তায় ছুটিয়া বাহির হইয়া পাগলের মত তিনি লোককে আক্রমণ করিয়াছিলেন। ইহার পর রাজা রাজপুত্রকে ধৃত করিয়া নর্ত্তকীটির সঙ্গে সহর হইতে নির্ব্বাসিত করেন। এই ঘটনাটি হইতে দেখা যায় যে, রাজপুত্র বিলাসের ভিতর বর্দ্ধিত হইয়াও নারীর ছলাকলা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন, নর্ত্তকীর মোহে পড়িয়া তাঁহাকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত হইতে হইয়াছিল।

যৌবনের প্রারম্ভে গৌতমকেও এই ভাবে প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করা হইয়াছিল। যুবরাজকে আমোদ-প্রমোদে অভ্যস্ত করিবার জন্য বহু নর্ত্তকী নিযুক্ত করা হয়। তাহারা নৃত্য-গীতে বিশেষ পারদর্শিনী ত ছিলই ; দেখিতেও দেবকন্যাদের ন্যায় সুন্দরী ছিল। অপরূপ বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া মণ্ডলাকারে গৌতমকে ঘিরিয়া তাহারা বাদ্যযন্ত্র বাজাইতে মহানন্দে নাচিত ও গান করিত। দীর্ঘ নিকায় গ্রন্থে নাচের উল্লেখ পাওয়া যায়। মহাবংশ (পৃঃ ২২৭) এবং ধম্মপদভাষ্যে (৩য় অধ্যায়, পৃঃ ১৬৬ এবং ২৯৭) নর্ত্তকীদের উল্লেখ আছে।

সাধারণ গৃহস্থের গৃহে যে সব রমণীর স্থান নাই, তাহাদের মধ্য হইতেই নর্ত্তকীদের উদ্ভব। পুরুষের বিলাস-বাসনা চরিতার্থ করাই তাহাদের ব্যবস্থা ছিল। বারবনিতারূপে তাহারা তাহাদের জীবিকা অর্জ্জন করিত। যদিও তাহারা রমণী, তথাপি জীবিকার্জ্জনের জন্য তাহাদিগকে এমন সব ঘৃণ্য কাজ করিতে হইত, যাহার ফলে তাহাদের নারী-সুলভ গুণসমূহ নষ্ট হইয়া যাইত। মনোমোহিনী আকৃতি, স্বর, গন্ধ, স্পর্শ এবং আলিঙ্গন প্রভৃতি ছলাকলার দ্বারা মানুষকে প্রলুব্ধ করিতেই তাহারা অভ্যস্ত ছিল। তাহাদের স্বভাব বেণীবদ্ধ দস্যুর মত, বিষাক্ত পানীয়ের মত, আত্মপ্রশংসা-পরায়ণ ব্যবসায়ীদের মত, হরিণের বাঁকা শিংএর মত, বিষজিহ্ব সাপের মত, সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদিত গর্ত্তের মত, যে নরককে পূর্ণ করা যায় না সেই নরকের মত, যাহাকে সন্তুষ্ট করা যায় না সেইরূপ রাক্ষসীর মত, চির-ক্ষুধার্ত্ত যমের মত, সর্ব্বভুক অগ্নির মত, যে নদী সব ভাসাইয়া লইয়া যায় সেই নদীর মত, যদৃচ্ছ বহমান বাতাসের মত, অপরিমাপ্য মেরু পর্ব্বতের মত এবং চিরফলপ্রদ বিষবৃক্ষের মত। যাহাকে তাহারা ভালবাসে তাহাকে যেমন আদরে গ্রহণ করে, যাহাকে ঘৃণা করে তাহাকেও ঠিক তেমনি আদরেই বরণ

করে। জ্বলন্ত অনলে কাষ্ঠ নিক্ষেপ করিলে তাহা যেমন ভস্মসাৎ হইয়া যায়, এই সব রমণী অর্থলালসা বা কামপ্রবৃত্তির প্রভাবে যে সব ধনী সন্তানকে আশ্রয় করে তাহারাও সেইরূপ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। দুর্ব্বলচিত্ত মানুষকে প্রলুব্ধ করিবার নিমিত্ত সর্ব্বদা তাহারা বিভিন্ন হাবভাব পরিগ্রহ করে এবং এইরূপে তাহাদিগকে তাহাদের পাপের ফাঁদে জড়াইয়া লয়। একবার ফাঁদে ফেলিতে পারিলে তারা নানা অসৎ উপায়ে তাহাদের অর্থ ও চরিত্র ধ্বংস করে। প্রতি রাত্রিতে প্রচুর অর্থ দিয়া যাহারা ইহাদিগকে পরিতৃপ্ত করে, এমনি অকৃতজ্ঞ ইহারা যে তাহাদিগকেও হত্যা করিতে দ্বিধা করে না। কিন্তু নিম্নে উল্লিখিত কয়েকটি বারবনিতার জীবনী হইতে দেখা যায় যে, সমস্ত ক্ষেত্রেই তাহাদের চরিত্রের দুর্ব্বলতা আজীবন স্থায়ী হয় নাই। কোনও কোনও বারবনিতা বুদ্ধের ধর্ম্মের প্রভাবে তাহাদের জীবনের পাপপ্রবণ গতিটাকেও ফিরাইয়া আনিতে সক্ষম হইয়াছিল; প্রবৃত্তিকে সমূলে উৎপাটিত করিয়া সাংসারিক জীবন পরিহার করিয়া ইহারা আদর্শ জীবনই অতিবাহিত করিয়া গিয়াছে। নির্ব্বাণ প্রাপ্তির জন্য সংগ্রাম করিয়া অবশেষে ইহারা অর্হত্ব লাভ করিয়াছিল। যৌবনের প্রারম্ভে পতিতা নারী রূপে তাহাদের যে জীবন আরম্ভ হয়, জীবনের শেষে তাহাই ঋষির ন্যায় পবিত্র হইয়া উঠিয়াছিল। জনসাধারণও তাহাদিগকে শ্রদ্ধার অর্ঘ্য দান করিতে দ্বিধা করে নাই।

অম্বপালী। বৈশালীর রাজোদ্যানে, আম্রবৃক্ষের পাদমূলে অম্বপালীর জন্ম হয়। নগরের উদ্যান-পালক তাহার ভরণপোষণের ভার গ্রহণ করেন। আম্রোদ্যান-পালকের কন্যা বলিয়া তাহার নাম হয় আম্রপালী। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার সমস্ত অঙ্গ অনিন্দ্যসুন্দর হইয়া উঠে—কোথাও এতটুকু খুঁত থাকে না। ইহার পর সে সভা-নর্ত্তকী হয়। কারণ, বৈশালীতে এই আইন ছিল যে, সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী রমণী কখনও বিবাহ করিতে পারিবে না—জনসাধারণের আনন্দের জন্য তাহাকে উৎসর্গ করা হইবে। * * * এক দিন আম্রপালী জানিতে পারিল যে বুদ্ধ তাহার বৈশালীর বাগানে আগমন করিয়াছেন। সে বুদ্ধকে দেখিবার নিমিত্ত গমন করিল। বুদ্ধ তাহার নিকট ধর্ম্মপ্রচার করিলেন। বুদ্ধের বাণী শুনিয়া সে এতই আনন্দিত হইয়াছিল যে, সে বুদ্ধকে তাহার গৃহে আহারের জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া আসিল। ইহার পর লিচ্ছবিরা তাহাদের গৃহে বুদ্ধের আহারের ব্যবস্থা করিবার জন্য অম্বপালীর অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিল। কিন্তু অম্বপালী তাহাদের সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। এই বারবনিতার গৃহেই বুদ্ধ নানা উপচারে ভোজন করিয়াছিলেন। অতঃপর অম্বপালী তাহার "আরাম" বুদ্ধের ভিক্ষু-সঙ্ঘকে দান করে এবং বুদ্ধদেব সে দান গ্রহণ করিতেও দ্বিধা করেন নাই। বুদ্ধ এই আরামে দীর্ঘ দিন অবস্থান করিয়া বেলুব গ্রামে গমন করিয়াছিলেন। ইহার পর অম্বপালী তাহার পুত্রকে ধর্ম্মপ্রচার করিতে দেখিয়া নিজেও দিব্যজ্ঞান অর্জ্জন করিতে চেষ্টা করে। স্বীয় দেহের ক্রমধ্বংসশীল প্রকৃতি তাহার দৃষ্টিপথে পতিত হয়। পৃথিবীর সমস্ত জিনিসের নশ্বরত্ব সে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছিল। অবশেষে সে অর্হত্ব লাভ করিয়াছিল।

পদুমবতী। পদুমবতী উজ্জয়িনীর সভা-নর্ত্তকী ছিল। * * * পুত্রের মুখ হইতে ধর্ম্মের বাণী শ্রবণ করিয়া এক দিন মাতাও সংসার পরিত্যাগ করেন। ধর্ম্মের বাহিরের আবরণ এবং ভিতরের অর্থ আয়ত্ত করিয়া অবশেষে পদুমবতীও অর্হত্ব লাভ করিয়াছিল।

বারবনিতা পদুমবতীর জীবনী বৈশালীর বারাঙ্গনা অম্বপালীর জীবনীরই অনুরূপ। সর্ব্বাপেক্ষা অদ্ভুত সাদৃশ্য এই যে, একই লোকের অর্থাৎ রাজা বিম্বিসারের ঔরসেই উভয় নর্ত্তকী পুত্র সন্তান প্রসব করে এবং এই পুত্রদ্বয়ের নামও এক। উভয়ের নামই ছিল অভয়। তথাপি এই সাদৃশ্য হইতে উজ্জয়িনীর পদুমবতী এবং বৈশালীর অম্বপালীকে অভিন্ন বলিয়া মনে করা সম্ভবতঃ খুব যুক্তিসঙ্গত হইবে না।

শালবতী। রাজগৃহে শালবতী নামে একটি সুদর্শনা, লাবণ্যময়ী, মনোহারিণী এবং অসাধারণ সুন্দরী ছিল। * * * যথা সময়ে সে এক পুত্র প্রসব করিল এবং প্রসবের পরেই পুত্রটিকে আবর্জ্জনা-স্তূপের ভিতর নিক্ষেপ করিল। প্রত্যূষে রাজার পরিচর্য্যার জন্য অভয় রাজকুমার যখন যাইতেছিলেন, তখন বায়স-পরিবৃত অবস্থায় তিনি এই শিশুটিকে দেখিতে পাইলেন। অনুচরেরা তাঁহাকে জানাইল যে শিশুটিকে কেহ সেইখানে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে এবং সে তখনও জীবিত আছে। ইহার পর যুবরাজের আদেশে শিশুটি প্রাসাদে নীত হয়। জীবিত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছিল বলিয়া তাহাকে জীবক নামে অভিহিত করা হইত। রাজকুমারের দ্বারা প্রতিপালিত বলিয়া কেহ কেহ তাহার নাম দিয়াছিল কোমরভচ্চ (কোমারেন পোষাপিতো)। পরে এই জীবক কোমরভচ্চ তাহার সময়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসক বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিল।

সিরিমা বারবনিতা শালবতীর কন্যা ও বিখ্যাত বৈদ্য জীবকের কনিষ্ঠা ভগিনী। সে অসামান্য রূপলাবণ্যসম্পন্না নর্ত্তকী ছিল এবং রাজগৃহে বাস করিত। কোষাধ্যক্ষ-পুত্র সুমনের স্ত্রী এবং কোষাধ্যক্ষ পুন্নকের কন্যা বুদ্ধের গৃহী-শিষ্যা উত্তরা প্রতিরাত্রি সহস্র মুদ্রা দক্ষিণীতে তাহার স্বামীর পরিতৃপ্তির জন্য এই সিরিমাকে একপক্ষ কালের জন্য নিযুক্ত করে। এক দিন সে অন্যায় করিয়া উত্তরার বিরাগভাজন হইয়া পড়িল এবং পুনরায় সদ্ভাব স্থাপনের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেও দ্বিধা করিল না। উত্তরা উত্তর দিল, ভগবান বুদ্ধ যদি তাহাকে ক্ষমা করেন তবে তাহার ক্ষমা করিতে বিন্দুমাত্র আপত্তি নাই। ইহার পর এক দিন ভগবান বুদ্ধ শিষ্য সমভিব্যাহারে উত্তরার গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভগবান যখন তাঁহার আহার শেষ করিয়াছেন, সিরিমা তখনই

তাহার কাছে আসিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বসিল। ভগবান ধন্যবাদ উচ্চারণ করিলেন এবং উপদেশ প্রদান করিলেন। সিরিমা অত্যন্ত মনোযোগের সহিত এই উপদেশ শ্রবণ করিল। ইহার পর সে পবিত্রতার প্রথম স্তরে উপস্থিত হয়। * * * ধম্মপদভাষ্যের বর্ণনা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, সিরিমার মৃতদেহকে দাহ করা হয় নাই; কাকে ও কুকুরে যাহাতে ভক্ষণ করিতে না পারে সেজন্য একজন প্রহরী নিযুক্ত করিয়া শবাগারে তাহা রাখিয়া দেওয়া হইয়াছিল। রাজা বিম্বিসার তাহার মৃত্যুর কথা ভগবান বুদ্ধকে জ্ঞাপন করেন। বুদ্ধই মৃতদেহটি দাহ না করিয়া রক্ষা করিবার জন্য রাজাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। 'অশুভভাবনা'র জন্য ভিক্ষুরা মৃতদেহটি প্রত্যহ দেখিতে পাইবে—ইহাই তথাগতের এরূপ অনুরোধের উদ্দেশ্য। ইহাকে প্রত্যহ নিরীক্ষণ করিয়া ভিক্ষুরা এ কথা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছিল যে, যে-দেহ অনিন্দ্যসুন্দর তাহাও ধ্বংস হয়, কীটের দ্বারা ভুক্ত হয় এবং অবশেষে মাংসবর্জ্জিত হইয়া তাহার হাড়গুলিই পড়িয়া থাকে। সমস্ত নাগরিকদেরও সিরিমার এই মৃতদেহটি দেখিতে বাধ্য করা হইয়াছিল। রাজা ঘোষণা করিয়া দিয়াছিলেন, "এই মৃতদেহটি দেখিতে যে অস্বীকার করিবে তাহাকে আটখণ্ড মুদ্রা অর্থদণ্ড স্বরূপ দান করিতে হইবে।" নরদেহের সৌন্দর্য্য যে কত ক্ষণস্থায়ী তাহারই ধারণা সুস্পষ্টরূপে উপলব্ধি করাইবার জন্য এরূপ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছিল (ধম্মপদভাষ্য ৩য় খ ৯)।

শ্যামা। শ্যামা ছিল বারাণসীর বারবনিতা। তাহার এক রাত্রির দর্শনী ছিল সহস্র মুদ্রা। রাজার সে বিশেষ প্রিয়পাত্রী ছিল এবং তাহার পাঁচশত দাসী ছিল। * * *

সুলসা। বারাণসীতে একটি সুন্দরী স্ত্রীলোক বাস করিত। তাহার নাম সুলসা। বারবনিতা শ্যামার ন্যায় তাহারও পাঁচশত সহচরী ছিল এবং এক রাত্রির জন্য তাহাকেও সহস্র মুদ্রা দিতে হইত। * * *

কাশীর কোনও ধনী মহাজনের পরিবারে অর্দ্ধকাশীর জন্ম হয়। সে প্রথমে বারবনিতা হয়, পরে ধর্ম্মজীবন গ্রহণ করে। দীক্ষা গ্রহণের জন্য সে শ্রাবস্তীনগরে গমন করিতে মনস্থ করিয়াছিল; কিন্তু পথে দস্যুভয় আছে জানিতে পারিয়া ভগবান তথাগতের নিকট দূত প্রেরণ করে। ভগবান বুদ্ধ একজন জ্ঞানী এবং উপযুক্ত ভিক্ষুণী পাঠাইয়া তাহাকে উপসম্পদা দিবার জন্য ভিক্ষুদের প্রতি আদেশ করিয়াছিলেন। দিব্যজ্ঞান লাভের জন্য সে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিল এবং অনতিকাল মধ্যেই ধর্ম্মের অর্থ এবং তদ্বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিয়া অর্হত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। (থেরী গাথা ভাষ্য, পৃঃ ৩০—৩৩)।

মহাত্মা রামমোহন রায় ও শতবর্ষ

গত মাঘ মাসের 'প্রবাসী'তে শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত মহাশয় উল্লিখিত প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—

রামমোহন রায় যে ব্রহ্মজ্ঞান-প্রচারকে জীবনের মহাব্রত বলিয়া মনে করিয়াছিলেন এবং যে ধর্ম্মের বিস্তারের জন্য সমস্ত জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, সেই বিশ্বজনীন্ ধর্ম্মের এক শত বৎসর পূর্ণ হইয়াছে। * * *

রামমোহন রায় সকলের চেয়ে ধর্ম্মকেই মানব-জীবনের ও মানব-সমাজের পক্ষে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সামগ্রী বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। নিশ্চয়ই তাঁহার অন্তরে প্রাচীন ঋষির এই মহাবাক্য সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল যে, "স সেতুর্ব্বিধৃতিরেষাং লোকানাম সম্ভেদায়" অর্থাৎ ঈশ্বরই লোক-ভঙ্গ-নিবারণার্থ সেতুস্বরূপ হইয়া সকলকে ধারণ করিতেছেন। ধর্ম্মের জন্যই মানব-সমাজ রক্ষা পাইতেছে। গীতাকার বলিয়াছেন, "সূত্রে মণিগণাইব" যেমন সূত্রে মণি সকল গ্রথিত থাকে, সেইরূপ ঈশ্বরেতেই এই বিশ্ব গ্রথিত রহিয়াছে। ঐ যে তোমার হাতে মণিহারের মালাগাছি, উহার ভিতরে একটি সূক্ষ্ম সূত্র প্রচ্ছন্ন আছে। সেই সূত্র তুমি দেখিতে পাইতেছ না বটে, কিন্তু উহাই মণি-সকলকে ধারণ করিয়া আছে। এখনি সেই অদৃশ্য সূত্রটি ছিন্ন করিয়া ফেল দেখি, দেখিবে হারের মণি সকল ধূলায় পড়িয়া গড়াইতে থাকিবে। তেমনি মানব-সমাজের ভিতরের প্রচ্ছন্ন একটি ধর্ম্মসূত্রই সমাজকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে; জগতের ধর্ম্মবিহীন লোক সেই সূত্রটি ছিন্ন করিয়া ফেলুক দেখি; দেখিবে এই সুন্দর মানব-সমাজ ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে, মানুষের সভ্যতার খর্ব্ব খর্ব্ব হইবে, মানব-সমাজ হাজার হাজার বৎসর পশ্চাতে পিছাইয়া গিয়া আদিম বর্ব্বরতার যুগে উপস্থিত হইবে। প্রত্যেক ধর্ম্মজ্ঞান-সম্পন্ন জ্ঞানীই স্বীকার করিবেন, মানবজাতির উন্নতির মূলেই জ্ঞান এবং ধর্ম্ম। রামমোহন রায় এই সত্যই অনুভব করিয়াছিলেন। * * সেইজন্যই তিনি জগতের ধর্ম্মের গ্লানি এবং ধর্ম্মকে অধর্ম্মে পরিণত হইতে দেখিয়া ক্ষোভে ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িয়াছিলেন। যে ধর্ম্ম ঈশ্বরের প্রকৃতি হইতেই উৎপন্ন হয়, যে-ধর্ম্ম নরনারীর সর্ব্বপ্রকার কল্যাণ ও সুখশান্তি বিধান এবং প্রেমের বিস্তারের জন্যই স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্যে নামিয়া আসে,—মানুষ অজ্ঞানতা, মানবীয় দুর্ব্বলতা ও স্বার্থপরতার দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া সেই ধর্ম্মকেই পাপ ও দুর্নীতির দ্বারা মলিন এবং বিদ্বেষ ও নিষ্ঠুরতার দ্বারা রক্তপিপাসু রাক্ষসের মত করিয়া তোলে কেন? এই সকল প্রশ্ন রামমোহনের হৃদয়কে যে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল, তাহা তাঁহার জীবনচরিত ও পারস্য ভাষায় লিখিত "তোহ্ফাতুল মওয়াহিদ্দীন" গ্রন্থখানি পড়িলে বেশ ভাল করিয়াই বুঝিতে পারা যায়।

রামমোহন রায় সেইজন্যই ধর্ম্মকে অধর্ম্ম, হিংসাবিদ্বেষ ও নিকৃষ্ট ভাব হইতে মুক্ত করিবার ইচ্ছায় এক উদার ও উন্নত ধর্ম্ম সংস্থাপন ও

তাহার বিস্তারের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। এ কথা কে না জানে যে, রামমোহন রায়ের মত স্বাধীনতাপ্রিয় লোক এ দেশে অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। কি রাজনৈতিক, কি সামাজিক, কি আধ্যাত্মিক কোনরূপ অধীনতাই তিনি সহিতে পারেন নাই। মানুষের আত্মার মহত্ত্ব ও গৌরব যে কত, তাহা তিনি উৎকৃষ্ট রূপেই জানিতেন; জানিতেন বলিয়াই মহৎ লোকের মধ্যে গণ্য হইয়াছিলেন। এবং সেই জন্যই তিনি দেশকে—দেশের ধর্ম্ম ও সমাজকে সর্ব্বপ্রকার নিকৃষ্ট ভাব ও অধীনতা হইতে মুক্ত করিতে চাহিয়াছিলেন। * * *

রামমোহন রায় তাঁহার গভীর আধ্যাত্মিক জ্ঞানের দ্বারা স্পষ্টই বুঝিতে পারিয়াছিলেন, মানবাত্মার গূঢ়স্থানে নিহিত সহজ ও স্বাভাবিক ধর্ম্মের মূল সত্যকে ধর্ম্মব্যবসায়ী যাজকেরা অনাবশ্যক বহু অনুষ্ঠানের আড়ম্বরের দ্বারা আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে; উহাতেই ধর্ম্ম জটিল এবং অসত্য ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। ধর্ম্মসমাজের শাসনকর্ত্তারা ঐ সকল জটিল কুটিল মত এবং অর্থশূন্য বাহ্য আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানের দ্বারা ধর্ম্মসমাজের লোকদিগের বিচারবুদ্ধি বিনষ্ট ও স্বাধীনতা হরণ করেন। তাহা করেন বলিয়াই ধর্ম্ম অনেক সময় অনেক পরিমাণে অধর্ম্মে পরিণত হইয়া জনসমাজের কল্যাণের পরিবর্ত্তে অকল্যাণই করিয়া থাকে। ধর্ম্মের বহু মতের দ্বারা মানুষের বিচারবুদ্ধি ও স্বাধীনতা হরণ করা মানুষের অজ্ঞতার পরিচয় ভিন্ন আর কিছুই নহে। সেই জন্যই মানবাত্মার মহত্ত্বে আস্থাবান্, মানবহিতৈষী রামমোহন সর্ব্ব জাতির উপাস্য দেবতা একমাত্র অনন্তস্বরূপ ঈশ্বরের অর্চ্চনা ও নর নারীর কল্যাণসাধন—এই দুই সত্যের উপরেই তাঁহার বিশ্বজনীন ধর্ম্মের ভিত্তি স্থাপন করিলেন। এই দুই সত্যের দ্বারাই সমস্ত ধর্ম্মের সমন্বয় এবং সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মিলন সম্ভব।

এই স্বদেশপ্রেমিক পুরুষ আপনার মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছিলেন যে ভারতবর্ষের সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মিলন ও ভ্রাতৃভাবের উপরেই এ দেশের জাতীয় উন্নতি সম্পূর্ণ নির্ভর করে। দেশ ত এখন আর শুধু হিন্দুর নহে; হিন্দু, মুসলমান, পার্শী খৃষ্টান সকলের। আবার হিন্দুর মধ্যেও কেবল ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, বৈদ্য ও কায়স্থ প্রভৃতি উচ্চ বর্ণের নহে; যে লক্ষ লক্ষ নিম্ন বর্ণের লোক উচ্চ বর্ণের ঘৃণা ও অবজ্ঞার তলে বাস করে, দেশ তাহাদেরও বটে। কাজেই সর্ব্বলোকের পিতা ও সর্ব্বশ্রেণীর উপাস্য দেবতা একমাত্র নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা ও লোকহিত অথবা উদার ভ্রাতৃভাবের দ্বারাই ভারতবাসীর হৃদয়ের মিলন সম্ভব, নচেৎ অন্য কোনরূপ সাময়িক স্বার্থের উত্তেজনায় ক্ষণস্থায়ী বাহিরের মিলন সম্ভব হইলেও, চিরস্থায়ী প্রাণের মিলন কখনই সম্ভব হইতে পারে না। ভারতবর্ষের হিন্দু ও মুসলমান দুইটিই ধর্ম্মপ্রাণ জাতি। দুই জাতির উপযোগী এক সুমহান্ ধর্ম্মের দ্বারা ইহাদের হৃদয় প্রেমে বিগলিত করিতে না পারিলে আর প্রকৃত মিলনের আশা কোথায়? আশা নাই বলিয়াই রাজা মিলনধর্ম্মের প্রচারে আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন। এই ধর্ম্মের উপাসনা-মন্দির প্রতিষ্ঠার দিন রাজা স্বদেশী ও বিদেশী লোকদিগকে চমকিত করিয়া জলদগম্ভীরস্বরে যে বাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন, তাহা উক্ত মন্দিরের ট্রাষ্ট্ ডিড্‌পত্রে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। উহার কয়েকটি কথা এই—

"যে কোন ব্যক্তি ভদ্রভাবে শ্রদ্ধার সহিত উপাসনা করিতে আসিবেন, তাঁহারই জন্য উপাসনা-মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত। জাতি, সম্প্রদায়, ধর্ম্ম যে কোন অবস্থার হউক না কেন, এখানে উপাসনা করিতে সকলেরই সমান অধিকার।

"যাহাতে জগতের স্রষ্টা ও পাতা পরমেশ্বরের ধ্যানধারণার উন্নতি হয়, প্রেম, নীতি, ভক্তি, দয়া, সাধুতার উন্নতি হয়, এবং সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়ভুক্ত লোকের মধ্যে ঐক্যবন্ধন দৃঢ়ীভূত হয়, এখানে সেই প্রকার উপদেশ, বক্তৃতা ও সঙ্গীত হইবে। অন্য কোনরূপ হইতে পারিবে না।"

রামমোহন রায় দেশের জাতীয় একতা ও রাজনৈতিক উন্নতির জন্য ধর্ম্মসংস্কারের এবং সমুন্নত ধর্ম্মপ্রচারের প্রয়োজন যে বেশ ভাল করিয়াই অনুভব করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে তাঁহার একখানি পত্র পাঠ করিলে, মনে আর কোন রকম সংশয়ই থাকিতে পারে না। রাজা এই পত্রখানি ১৮২৮ সালের ১৮ই জানুয়ারী তাঁহার কোন ইংরেজ বন্ধুকে লিখিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনচরিতের উনবিংশ অধ্যায় হইতে উক্ত পত্রের বঙ্গানুবাদের কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করিতেছি—

"আমি দুঃখের সহিত বলিতেছি যে, হিন্দুদিগের ধর্ম্মপ্রণালী তাঁহাদের রাজনৈতিক উন্নতির অনুকূল নহে। জাতিভেদ আর বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিভিন্ন বিভাগ, তাঁহাদিগকে স্বদেশানুরাগে বঞ্চিত করিয়াছে। ইহা ভিন্ন বহুসংখ্যক বাহ্য অনুষ্ঠান ও প্রায়শ্চিত্তের বহু প্রকার ব্যবস্থা থাকাতে তাহাদিগকে কোন গুরুতর কার্য্যসাধনে সম্পূর্ণ অশক্ত করিয়াছে। আমার বিবেচনায় তাঁহাদের ধর্ম্মের কোন পরিবর্ত্তন হওয়া আবশ্যক। অন্ততঃ তাঁহাদের রাজনৈতিক সুবিধা ও সামাজিক সুখস্বচ্ছন্দতার জন্যও ধর্ম্মের পরিবর্ত্তন আবশ্যক।" * * *

হয় ত অনেকেই জানেন যে, রামমোহন রায় ১৮২৮ সালের ১৬ই ভাদ্র তাঁহার প্রচারিত উদার ধর্ম্মের উপাসনা প্রতিষ্ঠিত করেন। তাহার পরে সেই উপাসনার জন্য একটি মন্দির নির্ম্মিত হইল। রাজা ১৮২৯ সালের ১১ই মাঘ সেই মন্দিরে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিলেন। তাহার পরে ১৮৩০ সালের ১৫ই নবেম্বরই তাঁহাকে বিলাত যাত্রা করিতে হইল। ১৮৩৩ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর তিনি সেই বিদেশ হইতেই পরলোকে প্রস্থান করিলেন। কাজেই দেশের শিক্ষিত ও ধর্ম্মপিপাসু লোকদিগকে তাঁহার উপাসনা মন্দিরে আকৃষ্ট করিয়া একটি উন্নত ধর্ম্মমণ্ডলী গঠন করিবার তিনি সুযোগ প্রাপ্ত হন নাই। * * *

বৃহত্তর বাঙ্গলা

গত প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনীতে ইন্দোরে শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস "বৃহত্তর বাঙ্গলা" শাখার সভাপতির অভিভাষণে যাহা বলিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :—

* * * ভিন্ন ভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় ও সাহিত্যে, বাঙ্গলা সাহিত্য, বাঙ্গলার চিন্তা ও বাঙ্গালীর প্রতিবেশ প্রভাবে প্রবেশ করিতেছে ও অনুবাদের ভিতর দিয়া প্রতিবিম্বিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। বাঙ্গলা-পড়া, বাঙ্গলায়-কথা-বলা, বাঙ্গলা-লাইব্রেরীর পাঠক-হওয়া অ-বাঙ্গালী শিক্ষিত সমাজে নূতনত্ব ছড়াইতেছে। বাঙ্গলা নভেল নাটকাদির ভিতর দিয়া বঙ্গীয় চিন্তার অনুসরণ করিতে করিতে বেশ-ভূষায় আকার-ইঙ্গিতে পরিবর্ত্তন আসিয়াছে। আজকাল ঢিলা কাছা, লম্বা কোঁচা দিয়া ধুতি ও সার্ট পরা, অদৃশ্যপ্রায় সূক্ষ্মীকৃত শিখা অনাবৃত-মস্তক অ-বাঙ্গালী ভদ্রলোক একটি দুইটি হইতে অল্পদিনের মধ্যে দশ-বিশটা সহরে ও কলেজ-বোর্ডিংএ দেখা যাইতেছে। সেদিন সেথুপতি রাও নামে জনেক মাদ্রাজী ভদ্রলোককে বাঙ্গালী বলিয়া ভুল করিয়াছিলাম। শুধু তাঁর মুখে খাঁটি বাঙ্গালা কথা শুনিয়া নয়, তাঁহার পোষাক বা শিখাহীন অনাবৃত মস্তক দেখিয়া নয়, তাঁহার মুখশ্রীতে সুস্পষ্ট বাঙ্গালী আদল পাইয়া। তিনি বহুদিন কলিকাতা বাস করিয়া সম্প্রতি এলাহাবাদ-প্রবাসী হইয়াছিলেন। মাছ-ভাত একটা উপহাসের কথা ছিল। উহা গ্রামে এখনও নিন্দার কথা হইয়া আছে। এই দুইই এখন অ-বাঙ্গালী হিন্দু প্রতিবেশীদের মধ্যে বেশ চলিয়াছে। মাখম চর্ব্বির ভাগ কম হইয়া সাহেব মহলেও ঘী ও সরিষার তৈল বাবুর্চ্চি-খানায় স্থান পাইয়াছে, এবং সরিষার তৈলের পরিমাণ হিন্দুস্থানী-মহলে ঘৃতের ভাগকে কমাইয়া দিতেছে। পূর্ব্বে সরিষার তৈলের নিন্দা ছিল। এদেশে দুধ হইতে দধি, মালাই, রাবড়ী আর খোয়ার (জমাট ক্ষীরের) লাড্ডু হইত, এখনও হয়। বাঙ্গলার মত ক্ষীর করিতে আর ছানা কাটাইয়া সন্দেশ, রসগোল্লা, পান্তুয়া করিতে জানিত না। এখন অনেক স্থানে বাঙ্গালী ময়রার দোকান হইয়াছে। এ দেশের কোন কোন হালুয়াই সেই সব দোকানে কাজ শিখিয়া "বাঙ্গলা মিঠাইয়ের দোকান" করিয়া বসিতেছে, তাহাদের নিযুক্ত ফেরিওয়ালারা পসরা মাথায় করিয়া পথে পথে "বাঙ্গলা মিঠাই" বলিয়া হাঁকিয়া যায়। লণ্ডনের street crier "বাঙ্গলা মিঠাই" বলিয়া হাঁকে না বটে, কিন্তু তথায় কোন কোন এদেশীয় দোকানে প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। তাহা ছাড়া বাঙ্গালী স্বত্বাধিকারীর প্রথম শ্রেণীর হোটেলও লণ্ডনে দুই তিনটি দেখিতে পাইবেন। প্রধানটির নাম 'রেজিনা হোটেল'। একটিতে বাঙ্গালীর রসনা-স্বাদ মিটাইবার সুযোগও আছে। রজনী-কান্ত বাবুর ঐ হোটেলগুলিতে তকমা-পরা অনেক ভারতীয় ভৃত্য দেখিতে পাইবেন। আজকাল 'মোকাম' 'কোঠী' 'হাবেলী' এ সব নাম সহরে আর বড় শোনা যাইতেছে না। সাহেব-ঘেঁসা ও সাহেবী ধরণের ধনীদের ঐ সকল অট্টালিকা 'বাঙ্গলা' আখ্যা পাইতেছে। বাঙ্গলা ঘরের বা বাড়ীর উৎপত্তি বঙ্গে। ঐ ঘর গরীবের একচালা কুটীর হইতে দৃঢ় ও সুন্দর করিয়া বাঁধা রাজা-রাজড়ার থাকিবার মত আটচালা পর্য্যন্ত হইত, এখনও হয়। * * *

হোলকার কলেজের মান্যবর অধ্যক্ষ মহাশয় এ বৎসর "বৃহত্তর বাংলা" নামে এই নূতন class খুলিয়া আমাকে তাহাতে ভর্ত্তি করেন এবং এক নিঃশ্বাসে "সাতকাণ্ড রামায়ণ" পড়িবার task দেন, আমিও সুবোধ ছাত্রটির মত তাঁহার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া লই। * * * প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য সম্মিলন "বৃহত্তর বঙ্গ"-শাখার সৃষ্টি করিয়া বাঙ্গালী জাতির এক মহৎ উপকার করিয়াছেন—আত্মরক্ষার পথ করিয়াছেন। সর্ব্বধ্বংসী কালের মুখ হইতে স্বীয় জাতীয় জীবন বাঁচাইবার চেষ্টায় শক্তি ও দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন। স্মরণাতীত কাল হইতে বাঙ্গালীর কীর্ত্তি-হিমালয়ের অভ্রভেদী চূড়াগুলি কালের পরিণতিতে একে একে অদৃশ্য হইয়াছে। কীর্ত্তিমানদিগের নাম সাধনা ও সিদ্ধির কথা আমরাই এতদিন জগৎকে ভুলিয়া যাইতে দিয়াছি। বাহিরের যাঁহারা কৃপা করিয়া ইতিহাসের পৃষ্ঠায় ভ্রমণকাহিনীর মধ্যে লিপিবদ্ধ করিয়া দেশ-বিদেশের গ্রন্থাগারে পুরাসংগ্রহালয়ে রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদের অধমর্ণ হইয়া আমরা এখন আমাদের অতীতের ইতিহাস রচনা করিতেছি। কিন্তু, ভবিষ্যতে লিখিবার মত বর্ত্তমানের পুঞ্জীভূত উপকরণ অদূরদর্শিতার ফলে হারাইতেছি। দৃষ্টান্ত অনেক। চোখের সামনে যাহা দেখিতেছি, তাহার কথাই বলি। এলাহাবাদ এংলো-বেঙ্গলী ইণ্টারমিডিয়েট কলেজের সম্মুখে যোদ্ধা-মুন্সেফ প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভদ্রাসন ছিল। সিপাহী-বিদ্রোহের সময় যখন প্রভূত শক্তিশালী জমিদারবর্গ কয়েকখানি গ্রাম জ্বালাইয়া নিরীহ গ্রামবাসীদের উপর অমানুষিক অত্যাচার করিতে থাকে এবং দলবদ্ধ হইয়া ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে প্রকৃত যুদ্ধসজ্জায় গোলাগুলি লইয়া ইংরেজ তহশীল আক্রমণ করে, তখন উত্তরপাড়ার এই পুরুষসিংহ কলম ছাড়িয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে অসি ধারণ করেন এবং অধীনস্থ লোক-জন লইয়া সৈন্যদল গঠন করেন। অতঃপর ইজিপ্শিয়ান যাদুকরের ন্যায় মুন্সেফ হইতে সুদক্ষ সেনাপতি হইয়া শিবির সংস্থাপনপূর্ব্বক রীতিমত pitched battle যাহাকে বলে, সেইরূপ যুদ্ধে দুর্দ্ধর্ষ বিদ্রোহীদের দমন করেন। সে যুদ্ধে বিদ্রোহী-দলপতি দুরন্ত ধাথল্ সিং এবং অনুচরবর্গ বহু সর্দ্দার নিহত হয়, ব্রিটিশ সিংহের ধনাগার লুণ্ঠনের হাত হইতে রক্ষা পায় এবং অত্যাচারীর হাত হইতে গ্রামবাসীরা নিষ্কৃতি লাভ করে। লর্ড ক্যানিং তাঁহার ডেস্প্যাচে এই বাঙ্গালী-মুন্সেফের অশেষ প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে "The Fighting Munsiff" আখ্যা দেন। তখন তাঁহার

বয়স ২২ বৎসর মাত্র। তাঁহারই ভদ্রাসন এখন বিক্রীত হইয়া স্থানীয় কায়স্থ কলেজের ছাত্রাবাস হইয়াছে। * * * তাঁহার নাম এখানকারও বাঙ্গালী প্রায় ভুলিয়াছেন ও বাড়িটি হস্তান্তর হইবার পর হইতে তৎসহ-জড়িত ঐতিহ্য লোপ পাইয়াছে। * * *

পাটনার "চৈতন্য মঠ," এলাহাবাদের "লালকুঠি". ও "বাবুঘাট", বিন্ধ্যাচলের "বিন্ধ্যবাসিনী ঘাট", দেরাদুনের পথে "বাবুগড়", দশ-হাজারী মুন্সবদার বাঙ্গালীর গঙ্গানিবাস, প্রয়াগসন্নিহিত কড়ার সুদৃঢ় দুর্গ, যাহার ভগ্নাবশেষের চিত্র এখন সরকারী পুরাতাত্ত্বিক চিত্রগ্রন্থাবলীর সম্পদ্ বৃদ্ধি করিতেছে, এবং এইরূপ ভারতময় ছড়ান শতশত বাঙ্গালীর কীর্ত্তি যাহা লোপ পাইয়াছে ও পাইতে বসিয়াছে তাহার উল্লেখ করা যাইতে পারে। * ** নেপাল ও কাবুলের gun factoryর স্রষ্টা কাপ্টেন রাজকৃষ্ণ কর্ম্মকার, জয়পুরের সনাতন গোস্বামী ও বিদ্যাধর ভট্টাচার্য্য, প্রয়াগের সাধু মাধবদাস বাবাজী ও কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী, পঞ্জাবের রেভারেণ্ড গোলোকনাথ চট্টোপাধ্যায়, জয়পুরের মন্ত্রী হরিমোহন সেন, লক্ষ্ণৌএর রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, কাশীর রাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল এবং প্রবাসের এইরূপ যুগপ্রবর্ত্তক বাঙ্গালীদের স্মৃতি জাগরূক রাখিবার জন্য বর্ষে বর্ষে স্মরণ-উৎসবের ব্যবস্থা করা "বৃহত্তর বঙ্গ"-শাখার আর একটি কাজ। * * *

ইংরেজের মধ্য হইতে যেমন পণ্, ভিসিগথ্, ভাণ্ডালকে খুঁজিয়া বাহির করা যায় না, বঙ্গে তেমন নহে। আজিও বাঙ্গলা দেশে জল-চলাচলের ভিতর দিয়া মনুমহারাজের রক্ত-বাছাই জারী আছে। কিন্তু সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও বাঙ্গালী, আর বঙ্গের কোন সাঁওতাল, ওরাওঁ বাউরীও বাঙ্গালী। আমরা "প্রাচীন বৃহত্তর বঙ্গের" ইতিহাস যাহা পাইয়াছি, তাহা আর্য্যপূর্ব্ব বাঙ্গালীদের-বাদ-দেওয়া ইতিহাস। আমরা বর্ত্তমান বৃহত্তর বঙ্গের ইতিহাস সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হইতেছি পুনরায় তাহাদেরই বাদ দিয়া। কারণ, আমরা তাহাদের সমাজ জানি না, ভাষা শিখি না। আমরা তাহাদের সংস্রব রাখি না, তাহাদের সহিত আদান-প্রদান নাই। * * *

আর্য্যপূর্ব্বকালে দ্রাবিড় বাঙ্গালীর সভ্যতা কোথায় কোথায় পৌঁছিয়াছিল তাহার লুপ্ত ইতিহাসের উদ্ঘাটনের জন্য "বৃহত্তর ভারত"-পরিষদের ন্যায় "বৃহত্তর বাঙ্গলা শাখার" একটি নূতন প্রশাখা গঠন করা আবশ্যক। তাহার সদস্যগণ আর সকল কাজ রাখিয়া আর্য্যপূর্ব্ব বাঙ্গালী বা বঙ্গের আদিম অধিবাসীদের ভাষা শিক্ষা করিবেন, তাহাদের সহিত সাক্ষাৎভাবে মিশিয়া তাহাদের জীবনযাত্রা, আচার-অনুষ্ঠান, উৎসব-সঙ্গীত, কিংবদন্তী, গান ও গল্পের ভিতর দিয়া তাহাদের বংশচরিত পূর্ব্বকীর্ত্তি, তাহাদের মস্তিষ্ক এবং হৃদয়ের ও কৃতির পরিচয় পাইয়া আর্য্য-পূর্ব্ব বৃহত্তর বঙ্গের ইতিহাসের রচনায় প্রবৃত্ত হইবেন। এই শাখা বঙ্গে থাকিবে, অন্য শাখা বঙ্গের বাহিরে থাকিয়া আর্য্যোত্তর যুগের বৃহত্তর বঙ্গের ইতিহাস সঙ্কলনে ব্রতী হইবেন। তবেই 'বৃহত্তর বঙ্গের' ইতিহাস সম্পূর্ণ হইবে। * ভারতের আদিম অনার্য্যদের সহিত প্রথমাগত আর্য্যদের সজ্ঘর্ষসম্মিলন আদান প্রদান জাতীয় একীভবন ও বর্জ্জন যে ভাবে সজ্ঘটিত হইয়াছিল, তাঁহাদের অনন্তর বংশ বঙ্গে পদার্পণ করিলে তাহারই পুনরাবৃত্তি হইয়াছিল এরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে যদিও তাহার ঐতিহাসিক নজির এখনও পাওয়া যায় নাই। বঙ্গের প্রাচীন সম-সাময়িক ইতিহাস কালের গর্ভে বিলীন হইয়া থাকিবে, সময় সময় নানা স্থানের "কর্ম্মনাশার" জলে ধুইয়া মুছিয়া গিয়া থাকিবে, ধর্ম্মান্ধতা ও বর্ব্বরতার অত্যাচারে বিনষ্ট হইয়া থাকিবে কিন্তু সকলের হাত এড়াইয়া এবং মৃত্তিকার গর্ভে আত্মগোপন করিয়া এখনও যাহা বাঁচিয়া আছে, তাহার মধ্য হইতে যে সকল তথ্য ও তারিখ প্রত্নতাত্ত্বিকের খনিত্র আঘাত পাইয়া মাঝে মাঝে আত্মপ্রকাশ করিতেছে, তৎসমুদয় বৌদ্ধ মধ্য-এশিয়ার গুপ্ত গ্রন্থাগারের মত মহেঞ্জোদারোর ইতিহাস পূর্ব্ব যুগের ঐতিহাসিক ধনাগার আবিষ্কারের মত—পূর্ব্ব প্রচারিত বহু ঐতিহাসিক গৃহীত-সিদ্ধান্ত ও স্বীকৃত-তারিখ উল্টাইয়া দিতেছে। মহেঞ্জোদারোর আবিষ্কর্ত্তা স্বয়ং আজ আপনাদের ইতিহাস-শাখার সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছেন। তিনি ইহার বহু প্রমাণ দিতে পারিবেন। প্রত্নতত্ত্বের ক্ষেত্রে কর্ম্মীদের প্রচেষ্টা সঙ্ঘবদ্ধভাবে সবে মাত্র আরম্ভ হইয়াছে এবং প্রাচীন ভারতের বৈদেশিক ইতিহাস-লেখকদের সত্য-মিথ্যা-মিশ্রিত কল্পনামূলক সিদ্ধান্তের গলদ সবে মাত্র ধরা পড়িতেছে। এখন তথ্য ও তারিখ সম্বন্ধে চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার সুযোগ এবং "বৃহত্তর ভারতের" বিক্ষিপ্ত প্রমাণ সংগ্রহ ব্যতীত এখনও তাহার প্রাচীন ইতিহাস লিখিবার সময় আসে নাই। "বৃহত্তর ভারত" সম্বন্ধেও যে কথা, "বৃহত্তর বঙ্গ" সম্বন্ধেও সেই কথা। "বৃহত্তর বঙ্গ" "বৃহত্তর ভারতেরই" এক প্রধান অঙ্গ। * * * প্রাচীন "বৃহত্তর বঙ্গ" যে যুগে গড়িয়া উঠিয়াছিল, সে যুগে যদি কোন বাঙ্গালী ভূপ্রদক্ষিণ করিয়া আসিয়া তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্ত লিখিতেন, তাহা হইলে তিনি সার চাল্স্ ডিল্কির মত বুক দশহাত করিয়া বলিতে পারিতেন, "আমি পৃথিবীর সর্ব্বত্রই বঙ্গের অনুসরণ করিয়াছি। কোথাও বাঙ্গালীর উপনিবেশ, কোথাও তাহাদের বণিক্‌বাস, ধর্ম্মসজ্ঞ, আবার কোন দেশ বাঙ্গালীর দ্বারা শাসিত দেখিয়াছি। এমন এমন দেশ দেখিয়াছি, যথায় লোক বঙ্গীয় বর্ণমালা ও বাঙ্গালীর প্রচারিত ধর্ম্মগ্রহণ করিয়াছে, বাঙ্গালীর ভাবধারায় ও বঙ্গীয় ছাঁচে গড়িয়া উঠিয়াছে।" তখনকার বঙ্গ অবশ্য বৃহত্তরই ছিল। কোন সময় হইতে যে সে সমুদ্রযাত্রার নিষেধাজ্ঞা পাইয়া মগধসীমা, ব্রহ্মসীমা ওড্রসীমা এই ত্রিকলিঙ্গ মধ্যে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার তারিখ ও হিসাব দিবার মত প্রমাণ নাই। * * *

বৃহত্তর বঙ্গের ইতিহাস লিখিতে হইলে বাঙ্গালীর গোড়ার কথা একটু ভাবিতে হইবে। আর্য্যপূর্ব্বদের বাদ দিলে চলিবে না। আর্য্যপূর্ব্ব

বৃহত্তর বাঙ্গালা

... আর্য্যীভূত হিন্দু-বৌদ্ধ-বাঙ্গালীর কথা সে ইতিহাসের প্রথম ভাগ হইবে। হিন্দু, মুসলমান, অন্য অহিন্দু ও খৃষ্টান বাঙ্গালীর কথা হবে তাহার দ্বিতীয় ভাগ। সাড়ে তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বের সমাধি-মন্দির হইতে ("from tombs dating from the time of the 18th dynasty which ended in 1462 B. C.") মিশরায় "মমি"গুলি ভারতীয় মস্‌লিনে আবৃত পাওয়া গিয়াছে। মস্‌লিন ভারতের কোন্ প্রান্তের সূক্ষ্ম-বাস, উহা রোম-মিশরে, রুশ-রাশিয়ায় কাহারা লইয়া যাইত, তাহা আর যাহাদের হউক "Hand book of Indian Products"-প্রণেতা T. N. Mukherjee র দেশের লোককে বলিয়া দিতে হইবে না। সাড়ে তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বের বৈদিক আর্য্য যদি ব্রহ্মাবর্ত্ত হইতে বাঙ্গলার মাটিতে নামিয়া আসিয়া না থাকেন, তাহা হইলে উহা দ্রাবিড় বঙ্গের কথা।

দ্রাবিড়দের মধ্যে বেদের ব্রাহ্মণ তখন কোথায় ছিলেন? আধুনিক হিন্দু-বঙ্গে দ্রাবিড় ব্রাহ্মণ দাক্ষিণাত্য বৈদিক কিরূপে সম্ভব হইল? উহা কি বৈদিক সভ্যতার অগস্ত্যযাত্রার ফল নহে? য়ুরোপের নবীন আলোকে নবজাগরণের পূর্ব্বে কলম্বস্ পশ্চিম সাগর-পারে আমেরিকা আবিষ্কারের ও পূর্ব্ব সাগরপারে ভাস্কো-দা-গামার ভারত আবিষ্কারের বিশ বৎসর পূর্ব্বে বৃহত্তর ভারতে হিন্দু-রাজত্বের শেষ আলোটুকু নিবিয়া গিয়াছিল। তখন সমস্ত এশিয়ায়, সমস্ত ওশেনিয়ায় ভারতীয় সভ্যতার আলোক দান করিয়া উত্তর ভারত ঘরবাসী হইয়াছে। তখনও বাঙ্গালী বণিক এশিয়া য়ুরোপের সুদূর-পথে বাণিজ্য করিয়া ফিরিতেছে। ভারতে, বিশেষতঃ বঙ্গে মুসলমান তখন কোথায়? তারপর প্রায় তিন শত বৎসর চলিয়া গেল, অর্দ্ধ ভারত মুসলমান-প্লাবনে প্লাবিত হইল। তখন বঙ্গে স্বর্ণযুগের অবসান হইয়া আসিয়াছে। পাল রাজা কোথায় গিয়াছে; সেন রাজা অশীতিপর বৃদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে জীবন-দীপ নিবিবার দশায় পৌঁছিয়াছে। সাগর-পথে পা বাড়ান বন্ধ হইয়াছে। বাঙ্গালী তখন গৃহদ্বারে অর্গল আঁটিয়া শস্য-শ্যামলার কৃপায় নিশ্চিন্তমনে কুলীন-মৌলিকের থাক বাঁধিতেছে। ব্রিটিশ-সিংহের অস্ত্র-আইনে নিরস্ত্রীকরণের মত এক ধার হইতে শূদ্রীকরণ কাযা চালাইতেছে, অর্থাৎ পৈতা কাড়িয়া য়ুরোপের 'শান্তি-বৈঠকে'র মত উপবীতের ঝগড়া মিটাইতেছে, আর ছোট বড় ভদ্র ইতরের পোকাবাছুনি করিতেছে। কেবল বহিষ্কার মন্ত্রে বাছাগুলিকে ঘরে তুলিয়া ওঁছাগুলা বাহিরে ফেলিয়া বহির্দ্বারে অর্গল আঁটিয়া দিতেছে। উপেক্ষিতেরা তখন ঘরে থাকিয়াও তটস্থ। দ্বার যেন ঘন ঘন আঘাতে শিথিল হইয়া যাইতেছে, তাহার খবরই নাই। বাহিরে কি হইতেছে না হইতেছে, তাহার খোঁজ নাই। এমনই সময় বঙ্গের দ্বার ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল দ্বাদশ শতাব্দী-শেষের পাঠান। তখন হইতে আজ পর্য্যন্ত একটি দুইটি করিয়া নয়, ... বিশটি করিয়া বাহির হইতে বঙ্গে আসিল পাঠান ও মোগল, আর হাজারে হাজারে শেষ হইল, বঙ্গের সেই ভিতরের বহু উপেক্ষিত আর সেই বাহিরে-ফেলা, সংখ্যায় আরও অনেক ওঁছার দল—যাহাদের পূর্ব্বজরা পূর্ব্বে হইয়াছিল বৌদ্ধ ও পরে হইয়াছিল খৃষ্টান। এইরূপে বঙ্গে হিন্দুর দল কম করিয়া এখন মুসলমানের সংখ্যা হইয়াছে ২,৩৯,৮৯,৭১৯, এবং হিন্দুর সংখ্যা হইয়াছে ২,০৩,৭৭,৭৯৩। এই হিন্দু-মুসলমান-মিলিত বাঙ্গালীর জীবনে আবার অন্ধকারের যুগ আসিল। আমরা আরও সঙ্কুচিত হইয়া ক্রমে "নিজ বাসভূমে পরবাসী" হইয়া পড়িলাম। আপন হাতে দুই চোখে ঠুলি পরিয়া আমরা কি ছিলাম, আমাদের কি ছিল, তাহা কিছুই দেখিলাম না, ঘরের কথা সব ভুলিয়া পরের কথাই মানিতে লাগিলাম। মেকলে-লীওয়ার্ণরের সবজান্তার দল আমাদেরই ঘরের কথা অনেক দিন ধরিয়া শুনাইলেন, অনেক পড়াইলেন, আমরা পাঠ কণ্ঠস্থ করিয়া আবৃত্তিও অনেক করিলাম, বইয়ের তাড়া আর মেডেল পুরস্কারও পাইতে লাগিলাম। কিন্তু গালি পাইয়া তাহার প্রতিবাদের কিছু না পাইয়া অন্ধকারে হাতড়াইয়া বেড়াইতে লাগিলাম। বাঙ্গালী সমাজের পক্ষে এবার আরও কঠিন পরীক্ষা আসিল। এখন খৃষ্টানের সংখ্যা আত্মস্থ করিবার পালা পড়িল। কৃষ্ণ বন্দ্যোর মত কত অমূল্য রত্ন হারাইতে হইল। এ অবস্থা কতদিন যাইত, তাহারই পরিণতিই বা কি হইত ভাবা যায় না, কিন্তু সুকাল আবার আসিল। আচ্ছন্ন ভারতের ঘোর কাটিবার দিন দেখা দিল। সে দিনের প্রথম প্রভাত হইল বঙ্গে। রাধানগরের ঋষি রামমোহন ভূমিষ্ঠ হইলেন। তাঁহারই জ্ঞান ভারতকে এবার প্রথম প্রবুদ্ধ করিল। তাঁহার প্রবর্ত্তিত ব্রাহ্মসমাজের প্রথম দান—সেই ঋষির জ্ঞানের আলোক বাঙ্গলাকে জাগাইল, উত্তর-দক্ষিণ ভারতকে আলোকিত করিল, আর সে আলোক আসামের পার্ব্বত্য প্রদেশে ছড়াইল এবং তাহার ছটা সমুদ্রপারে সুদূর পশ্চিমেও বিকীর্ণ হইল। সুপ্তোত্থিত ভারতের সেই নব-জাগরণ। সাতশো বৎসর এক মাটিতে বাস করিয়া মুসলমান ও পরে খৃষ্টান লইয়া এখন সমগ্র বাঙ্গালীর সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে প্রায় সাড়ে চার কোটি। বঙ্গ-ভঙ্গের পূর্ব্বে বন্দেমাতরমের ঋষি আমাদের দেখিয়া গিয়াছিলেন "সপ্ত কোটি!" এখন পৃথিবীর প্রতি ছয়জনের মধ্যে এক জন ভারতীয় এবং ভারতের প্রতি সপ্তজনের মধ্যে একজন বাঙ্গালী—তা তিনিই হিন্দুই হউন, আর মুসলমানই হউন, আর্যাই হউন, আর কোল-দ্রাবিড়ই হউন। এখন "বৃহত্তর বাঙ্গলা" গঠনের গৌরবভাগীদের গর্ব্বের অধিকারী বাঙ্গলার সকলেই। ভারতের ন্যায় বাঙ্গলাও পূর্ব্বে বৃহত্তর হইয়াছিল—দানে। বাঙ্গলার নব-জাগরণের সময় হইতেও সঙ্কুচিত বঙ্গ আবার বৃহত্তর হইতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহার দিগ্বিজয় আরম্ভ হইয়াছে দানেরই ভিতর দিয়া।

* * * পূর্ব্বে ও পরে জ্ঞানে ও ধর্ম্মে বাঙ্গালী কি কি দান করিয়াছেন, তাহার হিসাব করিতে হইবে এবং এখন যদি তাহার

দানশৌণ্ডতা খর্ব্ব হইয়া থাকে, দানের শক্তি হ্রাস পাইয়া থাকে, তাহার বৃদ্ধি করিবার মত শক্তি লাভের জন্য সাধনা করিতে হইবে। উত্তর-ভারতে বিহার, আগ্রা, অযোধ্যা, পঞ্জাব প্রভৃতি প্রদেশে বৃহত্তর বঙ্গের স্রষ্টা বাঙ্গালীর বড় বড় দানবীর চলিয়া গিয়াছেন। আমাদেরও মধ্য হইতে একে একে পঞ্জাবে স্যার প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, জয়পুরের প্রধান অমাত্যদ্বয় বাবু কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও বাবু সংসারচন্দ্র সেন, এলাহাবাদে বাবু শ্রীশচন্দ্র বসু বিদ্যার্ণব, ডাক্তার সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ বাঙ্গালীর গৌরব ও গর্ব্ব করিবার মত অনেকগুলি বঙ্গমাতার সুসন্তান একে একে প্রস্থান করিলেন। এ বৎসরও আমরা যুক্ত-প্রদেশের রাজধানীতে দুই জনকে হারাইলাম। তাঁহারা বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী সমাজকে দরিদ্র করিয়া কিন্তু অতুলনীয় কীর্ত্তি রাখিয়া গেলেন এলাহাবাদ হাইকোর্টের আদর্শ এডভোকেট বাবু যোগেন্দ্রনাথ চৌধুরী এবং এলাহাবাদ ইণ্ডিয়ান প্রেসের প্রতিষ্ঠাতা স্বয়ং-সিদ্ধ পুরুষ-সিংহ বাবু চিন্তামণি ঘোষ। ইণ্ডিয়ান্ প্রেসের মত বাঙ্গালী গৃহস্থের এতবড় স্থায়ী দান বর্ত্তমান উত্তর-ভারতে উপস্থিত আর দ্বিতীয় নাই।

ঠিক মনে পড়িতেছে না, কোথায় যেন পড়িয়াছি, বুদ্ধদেব বাঙ্গালী ছিলেন। গ্রন্থকার বুদ্ধদেবের নাম লইয়া রহস্য করিবেন এত বড় অন্যায় কথা বলিতে পারি না, কিন্তু কপিলবস্তু বৃহত্তর বঙ্গের সীমাভুক্ত থাকা তখন অসম্ভব ছিল না, এবং মগধ ছিল বঙ্গ-সাম্রাজ্যের উত্তর-পশ্চিমাংশ। গঙ্গাসাগরকূলের আশ্রমবাসী কপিলমুনি ছিলেন বাঙ্গালী। শাস্ত্রী মহাশয় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, তাঁহারই মননজাত কাপিল দর্শন শাক্যমুনির ধর্ম্মমতের ভিত্তিভূমি। তাহা হইলে, বলিতে হইবে, এই ধর্ম্মের প্রেরণা বাঙ্গালীর অবদান। জগতের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক-সংখ্যক নর-নারীর ধর্ম্মের জন্মাবস্থায় জন্ম সুতরাং বঙ্গে, এবং বাঙ্গলারই উত্তর-পশ্চিমাংশে বোধি-দ্রুমতলে তাহার দ্বিজত্ব-প্রাপ্তি বা পুনর্জ্জন্ম। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে বাঙ্গলার মত এত বড় দান জগৎকে আর কেহ করে নাই। বৃহত্তর বঙ্গে বৌদ্ধ প্রচারক ও ঔপনিবেশিকদের মধ্যে বাঙ্গালীর সংখ্যাই বেশী ছিল, তাহার কারণ, উত্তর ও দক্ষিণ ভারত হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম বিলুপ্ত হইলে, বঙ্গই তাহার একমাত্র আশ্রয়স্থল ছিল। বঙ্গে বৈদিক ও হিন্দুধর্ম্ম উত্তর-ভারতের মত সাফল্য লাভ করে নাই, বরং বৌদ্ধ-বঙ্গের অনেক দান আত্মস্থ করিয়া সমগ্র হিন্দু-ভারত হইতে স্বীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়াছে। বৌদ্ধ ধর্ম্ম বাঙ্গালীর জীবনে এমন ওতপ্রোত-ভাবে অনুস্যূত হইয়া গিয়াছিল, যে, তাহা ধর্ম্ম ঠাকুরের পূজায় বাঙ্গলাময় এখনও বিদ্যমান আছে, এবং শাস্ত্রী মহাশয় ভুল ভাঙ্গিয়া দিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, হিন্দু-পূজা বলিয়াই শিক্ষিত-সমাজেও স্বীকৃত হইয়া আসিয়াছে। অনেক বৌদ্ধ মূর্ত্তি হিন্দুর মনগড়া দেবদেবীরূপে পূজা পাইতেছে, অনেক বৌদ্ধাচার হিন্দু আচারকে নিয়মিত করিয়াছে, এমন কি, এই ধর্ম্ম যোর তামসিক প্রতীচ্যখণ্ডে মিশরীয় গ্রীক থেরোপন্থী "থেরাপিউটস্" ও প্যালেষ্টাইনের ইহুদীয় বৌদ্ধ এসৃসেনীদের প্রভাব-মণ্ডলে বৰ্দ্ধিত জুডিয়ার খৃষ্ট-প্রবর্ত্তিত অহিংসার ধর্ম্মে এবং অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিক ভারতের শাক্ত-বঙ্গে নদীয়ার নিমাই-প্রবর্ত্তিত জাতি-ভেদহীন সর্ব্বজীবে দয়ার ও ঘরে ঘরে প্রেম বিলাইবার ধর্ম্মে তাহা পুনর্জ্জন্ম লাভ করিয়াছিল। সেই শ্রীচৈতন্যদেব-প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব ধর্ম্ম। বাঙ্গালীর আর একটি অতুলনীয় মহাদান।

বৌদ্ধ বাঙ্গালীরাই প্রধানতঃ ব্রহ্মের থাটন সহর (সদ্ধর্ম্ম নগর) স্থাপন করিয়াছিলেন। বাঙ্গালী যবদ্বীপে প্রাম্বানাম্ ও বরবুদুরের শিল্পসম্ভারে রামচরিত, কৃষ্ণচরিত ও বুদ্ধচরিতের প্রচারে কলিঙ্গ ও গুজরাটের সাহত বঙ্গের কৃতিত্ব-নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন। চীন-সাগরের উপকূলে বাঙ্গালীর বাণিজ্য জাহাজের যাতায়াত ছিল। পূর্ব্ব-বঙ্গের লোক স্থলপথে ব্রহ্মে, এবং পশ্চিম-বঙ্গের লোক জলপথে যবদ্বীপে বৌদ্ধ মহাযান ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। বাঙ্গালী জাপানেও ধর্ম্ম ও বঙ্গলিপি প্রচার করিয়াছিলেন। 'হরিউজী'র বৌদ্ধমঠে বাঙ্গলা অক্ষরে লিখিত বহু গ্রন্থের এখনও পূজা হইয়া থাকে। তথায় "কংকোকাই" বুদ্ধের আসন-পদ্মের এক একটি পাপড়িতে "কং" এই বীজমন্ত্র বঙ্গাক্ষরে লিখিত আছে। স্বামী বিবেকানন্দ জাপানের একমন্দিরের শীলফলকে "ওঁ নমঃ" বঙ্গাক্ষরে খোদিত দেখিয়াছিলেন। ক্রমে ইন্দোচীন ইন্দোনেশিয়া ও পলিনেশিয়ার দ্বীপপুঞ্জের কোন না কোন স্থানে একসময়ে বঙ্গলিপির প্রচারের আভাস পাওয়া যাইতেছে, ও যব দ্বীপের 'কবিভাষায়' বাঙ্গলা শব্দ বিকৃত আকারে পাওয়া যাইতেছে। "Greater Britain"-এর প্রভাবজাত চীনের "Pidgin English" জাপানের "Pie English" এবং বাঙ্গালার 'রাধা বাজারী' বা 'চুনাগলির' ইংরেজীর ন্যায় যবদ্বীপের কবিভাষায় বাঙ্গলা শব্দের ছিটা এবং উচ্চারণবিকারে প্রচ্ছন্ন অনেক বাঙ্গলা শব্দের অস্তিত্ব, যাহা ক্রমেই প্রত্নতাত্ত্বিক ও ভাষাতাত্ত্বিক পণ্ডিতদের লেখনীমুখে বিচার-সিদ্ধ হইতেছে, তাহা বৃহত্তর বাঙ্গলারই দান, এবং বাঙ্গালীপ্রভাবের ফল ব্যতীত আর কিছুই নহে। চীনের হোনানে, তিব্বতের পূর্ব্ব ও ব্রহ্মের-উত্তর সীমার অনতিদূরে বাঙ্গালীর উপনিবেশ ছিল। ভারতে বৌদ্ধশক্তি লোপ পাইবার পর হইতে তথাকার ঔপনিবেশিক বাঙ্গালীরা স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে না পারিয়া তাঁহাদের হৃদয়-মনের সমস্ত সম্পদ্ দান করিয়া চীনসমাজে বিলীন হইয়াছেন। অনুসন্ধানে এখনো তাঁহাদের খোঁজ পাওয়া যাইতে পারে। মিশরের উপকূলে বাঙ্গালী-মুসলমানের বাণিজ্য-জাহাজের যাতায়াত মোগলযুগের ইতিহাসের কথা তৎপূর্ব্বে পাঠান আমলে বাঙ্গালী মুসলমান বণিক্ সেখ ভিক্কুর পারস্য সাগরের ভিতর দিয়া রাশিয়ার বাণিজ্য করিতে যাওয়ার কথা ঐতিহাসিক হাণ্টার সাহেব লিখিয়া গিয়াছেন। বেশী পুরাতনের কথা যাক্। বাঙ্গালীর সে যুগের দানের তালিকা শুনাইবার স্থান ও সময় নাই। সার টমাস রো সপ্তদশ শতাব্দী

প্রসঙ্গ দিয়া দরবারে বাঙ্গলার পরিচয় পাইয়া স্বীয় জার্ণালে লিখিয়াছিলেন এবং সুরাটের কুঠিতে লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন, বাঙ্গালাই দেশকে চাউল, গম যোগাইয়া আহার দেয়। সমগ্র ভারতে চিনি যোগায়, সেখানে অতি সুন্দর কাপড় হয় * * আর পেগুর ধনবান্ পণ্য সংগ্রহ করিয়া এদিকে চালান দেয়।" ভাত কাপড়ের প্রশ্ন আর উঠিতে পারে না। কিন্তু এখনকার ভারত বাঙ্গালার কি কি পাইয়াছে, তাহা দুই একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিয়া তাহার আভাস দিই। উত্তর ভারতে আধুনিক বাঙ্গালী শিক্ষা দিয়াছে, এখনও দিতেছে। নিজের কথা 'পাঁচ কাহন' না করিয়া অন্যের কথায় বলি। যুক্তপ্রদেশের শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর মেকেঞ্জী সাহেব সেদিন প্রকাশ্য সভায় বলিয়া গেলেন—"আমি দেখিয়া বিস্মিত হইলাম যে, শিক্ষা বিভাগের এমন কোনও দিক নাই, শিক্ষাদানের এমন কোনও প্রতিষ্ঠান নাই যেখানে বাঙ্গালী সম্প্রদায় চিরন্তন কীর্ত্তি-চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া রাখেন আমার শিক্ষাবিভাগ এই বাঙ্গালীদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে। * * * সমস্ত যুক্তপ্রদেশের মধ্যে বাঙ্গালী সম্প্রদায়ের মত আর একটি সম্প্রদায় নাই যাহা এখানে শিক্ষাবিস্তারের জন্য এইরূপ যোগ্যতা ও উৎসাহে কাজ করিতে সক্ষম হইবে। আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি, জীবনের এমন একটি বিভাগ নাই যেখানে বাঙ্গালীরা সকলের অশেষ প্রশংসাভাজন না হইয়াছে। * * অতীতের বাঙ্গালীরা এই প্রদেশে যে কাজ করিয়াছেন, তাহাতে যে কোন সম্প্রদায় ন্যায়তঃ গর্ব্ব অনুভব করিতে পারে।"

কাশ্মীরে নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় জয়পুরে হরিমোহন সেন, লক্ষ্ণৌএর দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, কোচিন ও মৈসুরে এলবিয়ন্ ব্যানার্জ্জী, জ্ঞানশরণ চক্রবর্ত্তী, বরোদায় অরবিন্দ, রমেশচন্দ্র, এবং অন্য বহু দেশীয় রাজ্যের রাষ্ট্রনায়ক এবং কোন কোন রাজ্যের একাধিক বাঙ্গালী মন্ত্রী ও শিক্ষক কি কি দান করিয়াছেন, তাহার ইতিহাস আছে। উল্লেখ বাহুল্য। ধর্ম্মদানে চৈতন্যদেব, জয়দেব হইতে বৃন্দাবনের গোস্বামিগণ, কেশবচন্দ্র সেন, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ ব্রাহ্ম নেতৃগণ, জ্ঞানদানে কাশী প্রভৃতির বাঙ্গালী পণ্ডিতগণ, রাজনীতি শিক্ষায় এবং ভারতবাসীর অন্তরে রাষ্ট্রীয় অধিকারে রাজা প্রজার সম্বন্ধজ্ঞান ও আত্মবোধ জাগাইতে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দেশবন্ধু দাশ-প্রমুখ নেতৃগণ, রামকৃষ্ণ মিশন, আধুনিক বহু ধর্ম্মসঙ্ঘ, নানা সেবা সঙ্ঘ, নব্যবঙ্গীয় কলাশিল্পিগণ, এলাহাবাদের ইণ্ডিয়ান প্রেস, সায়েন্টিফিক ইনষ্ট্রুমেণ্ট কোম্পানী, পাণিনি অফিস, বাঙ্গালীদের নানাস্থানের স্কুল, কলেজ, পুস্তকালয় প্রভৃতির ন্যায় অসংখ্য প্রতিষ্ঠান এবং সকল প্রদেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ স্বায় জীবনের আদর্শ এবং ব্যক্তিগত চরিত্রের বলে, জনহিতকর কার্য্য দ্বারা জাতীয় গৌরব-খ্যাপক কীর্ত্তি রাখিয়া অ-বাঙ্গালী জনসাধারণকে বাঙ্গালীর কৃষ্টির অনুকূলে আনিয়াছিলেন। তাঁহাদের দান পুঞ্জীভূত হইয়া উত্তরভারতের মনোজগতে বৃহত্তর বঙ্গের সৃষ্টি করিয়াছে।

দানের ভিতর দিয়াই পাশ্চাত্য জগতেও কৃষ্টির দিগ্বিজয় আরম্ভ হইয়াছে তাহার ইতিহাসও বিস্তৃত। কয়েকটি দৃষ্টান্ত মাত্র দিব। জর্ম্মনকুমারী মিস্ ম্যারা হিপ্লার শ্রীমতী বসু হইয়াছেন তাহা লক্ষ্য করিবার মত বড় বিষয় নয়, কিন্তু এই বিদুষী ভারতীয় সভ্যতা আত্মস্থ করিয়া ও তাহার কৃষ্টির প্রতি অনুরাগবশে বঙ্গ-বধূ হইবার পূর্ব্বে যে তিনি ভারতীয়া হইয়া গিয়াছিলেন এই স্বীকৃতিই মূল্যবান্। শ্রদ্ধেয়া ভগিনী নিবেদিতা, ভক্তিমতী গৌরদাসী, স্বনামপ্রসিদ্ধা শ্রীমতী বেশান্ত, স্বামী বিবেকানন্দের য়ুরোপীয় শিষ্যাদের কথা স্মরণ করুন। ব্রেজিলের মহিলা কবি Cecilia Meirelles-এর সমালোচক-মহল তাঁহার সাফল্যের হেতু নির্দ্দেশ করিয়া বলেন, তাঁহার অলোকসামান্য দৃষ্টি দান করিয়াছে ভারতের জ্ঞান, ভারতের দর্শন। পাশ্চাত্য সংস্কার ও পরিবেশ-প্রভাবে বর্দ্ধিতা এই ব্রেজিলবালার প্রাণ ভারতের জন্য কাঁদে। তিনি পূর্ব্ব-জন্মে বিশ্বাসবতী হইয়া মনে করেন, ভারত ছিল তাঁহার পূর্ব্ব-জন্মস্থান, ভারতীয় নরনারী তাঁহার ভাইবোন। তাঁহার অধ্যয়নের বিশেষ বিষয় "রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর"। এই স্ত্রীকবি কাব্যরচনাকালে কালিদাস-মধুসূদনের মত দেবী সরস্বতীর চরণবন্দনা করেন। তিনি বলিয়াছেন যে, তিনি ভারতকে জানিয়াছেন, ভারতের বাণী পাইয়াছেন রবীন্দ্রনাথের কাছে। আর তাঁহার জন্মভূমিতে না আসিয়া, তাঁহার দেশের ভাষা না জানিয়া, সাহিত্যের স্বাদ না পাইয়াও কেবল ফরাসী অনুবাদের ভিতর দিয়া ভারতীয় ভাব এমন ভাবে আত্মস্থ করিয়াছেন যে, তিনি মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারিয়াছেন—"I am made out of the soil, sun and word of India." অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার মহাশয়ের অভিজ্ঞতা আপনারা তাঁহার "বর্ত্তমান জগৎ" গ্রন্থের ভিতর দিয়া পাইয়াছেন। তিনি জনৈক প্রসিদ্ধ রুশ ঔপন্যাসিক ও শক্তিশালী সাহিত্যিকের সহিত দেখা করিতে গিয়া তাঁহার গৃহে বিশ্বকবির ইংরেজীতে প্রকাশিত সকল গ্রন্থই সংগৃহীত দেখিয়াছিলেন। এই ভদ্রলোক তাঁহার গৃহাগতকে পরম উল্লাস ও একটু গর্ব্বের সহিতই বলিয়াছিলেন—"আমি রবীন্দ্রনাথকে রাশিয়ার জনসাধারণের নিকট প্রথম প্রচার করিয়াছি।" তখন "গীতাঞ্জলির" রুশ অনুবাদের তিন সংস্করণ হইয়া গিয়াছিল। আয়ার্লাণ্ডের ভাবুক কবি জর্জ্জ রাসেল্ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—"হিন্দুদের গভীর দর্শনতত্ত্ব ও অধ্যাত্মবাদ পাশ্চাত্যেরা বুঝিতে পারিতেন না। রবীন্দ্রনাথ সরস কাব্যে যাহা প্রচার করিয়াছেন, তাহা নব্য য়ুরোপের সহজে বোধগম্য। এইজন্যই পাশ্চাত্য-মহলে একটা আলোড়ন হইতে পারিয়াছে।"

* * * প্রাচ্যখণ্ডে যে দেশে সূর্য্যের প্রথম উদয় হয়, তথায় আর সে বৌদ্ধযুগ নাই। শিক্ষা দীক্ষা আশা-আকাঙ্ক্ষার আমূল পরিবর্ত্তন হইয়াছে, পুরাতনের সংস্কার বিদায় লইয়াছে। আজকাল

ভারতবাসী তথায় শিক্ষার জন্য ধাবিত হইতেছে। এমন দিনেও সেই সুদূর প্রাচ্যে রবীন্দ্রনাথের পদার্পণ নবযুগের সূচনা করিয়াছে। তথায় তাঁহার নামে সমিতি হইতেছে। টোকিওর "Young East" পত্রিকায় কাউণ্টেস্ মেটাস্মা লিখিতেছেন—"The man has come whom we can take for our model—Tagore, the great master of the East and today the greatest poet of the world." এই প্রাচ্য বিদুষী জনৈক পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মুখের কথা উদ্ধৃত করিয়া লিখিতেছেন—"In future they will speak of Tagore as of Homer and study Bengali as we study Greek to read him in the original."

য়ুরোপ আমেরিকার শ্রেষ্ঠ মনীষীদের চিত্ত-পটে যে সকল সত্য প্রতিভাত হয় নাই, প্রকৃতি-রাজ্যের দুরধিগম্য স্থান-নিহিত যে সকল তথ্য এখনো জগদ্বাসীর জ্ঞানগোচর হয় নাই, বঙ্গের ঋষি জগদীশচন্দ্রের মনীষায় আজ তাহা হইয়াছে। আজ তিনি বিশ্ব-পণ্ডিতদের নিকট "Revealer of a new world." তাঁহারা বলিতেছেন—"In Sir Jagadish the culture of thirty centuries has blossomed into a scientific brain of an order which we cannot duplicate in the West." তাঁহারা স্বীকার করিতেছেন, "Here Europe bows down to India."

আমেরিকার রাজধানীতে "International School of Vedic and Allied Research" বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। এই আন্তর্জাতিক বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য প্রাচ্য ভাষা ও সাহিত্য দর্শনাদির ভিতর দিয়া হিন্দু সভ্যতার পরিচয় গ্রহণ ও তদ্বিষয়ে শিক্ষা দান করা। এই কার্য্যে যোগ দিয়াছেন পশ্চিমের সেরা সেরা পণ্ডিত। কিন্তু তাহার প্রবর্ত্তক, প্রধান উদ্যোগী এবং এই বিদ্যায়তনের কর্ণধার (Director) হইয়াছেন বীরভূমের অন্যতম রত্ন পণ্ডিত জগদীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিদ্যা-বারিধি।

নরওয়েবাসী বাঙ্গালী সন্ন্যাসী শ্রীস্বামী আনন্দ আচার্য্য বহুবৎসর ধরিয়া স্কাণ্ডিনেভিয়ায় এবং সমগ্র পাশ্চাত্য জগতে তাঁহার যোগাসনে সেই শীতের দেশে নগ্ন দেহে বসিয়া ইংরেজী, নর্স ও সুইডিশ ভাষায় বহু গ্রন্থ লিখিয়া ভারতের অধ্যাত্মতত্ত্ব, ভারতের দর্শন, ভারতীয় জ্ঞানের প্রচার করিতেছেন। আমেরিকায় স্বামী যোগানন্দ "যাগদা" বিদ্যাপীঠ করিয়া শত শত নরনারীকে ভারতীয় ভাবে গড়িয়া তুলিতেছেন। স্বামী প্রেমানন্দ, বাবা ভারতী প্রমুখ অনেকেই এখনও প্রাচ্য জ্ঞানের আলোক পশ্চিমকে দান করিতেছেন।

তরুণ বঙ্গও পূর্ব্বজদিগের সৃষ্ট "বৃহত্তর বঙ্গ"কে স্থায়ী করিবার পথে অগ্রসর হইতেছেন। তাঁহারা জ্ঞানার্জ্জন ও কর্ম্মসাধনের প্রতিযোগিতায় দিগ্‌বিদিকে ধাবিত হইতেছেন এবং কোথায় না বিজয়ী হইয়া বঙ্গজননীর মুখ উজ্জ্বল করিতেছেন? রেল মোটরে, পা-গাড়ীতে পদব্রজে ভারত-ভ্রমণে পৃথিবী-পর্য্যটনে সমুদ্র-পথে আবার বাঙ্গালী বাহির হইয়া পড়িতেছেন। ক্রিকেট ম্যাচে, সন্তরণ-প্রতিযোগিতায়, শারীরিক শক্তি পরীক্ষায়, জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিযোগিতায়, দেশের কাজে, সেবা-ব্রতে, সমাজ-সংস্কারে, পল্লী-গঠনে, স্বজাতির মান রাখিতে, এমন কি পরের জন্য আপন জীবন বলি দিতে অভ্যস্ত হইতেছেন। যে ফরাসী-ক্ষেত্রে বিপ্লবের সময় বাঙ্গালী যুবক নেপোলিয়নের সহযোগে একদিন অদ্ভুত অনলক্রীড়া করিয়াছিলেন, সেই দেশের সমর-ক্ষেত্রে গত মহাযুদ্ধের সময় জার্ম্মান গোলার বর্ষণ-বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া ফরাসী সামরিক দল যখন প্রাণভয়ে খাদের মধ্যে লুকাইতেছিল, সেই সময় কর্ত্তব্যে অটল থাকিয়া চন্দননগরের যে বীর বাঙ্গালী যুবকগণ জার্ম্মান গোলার প্রত্যুত্তর দিতেছিলেন, তাঁহাদেরই ন্যায় বঙ্গের সুসন্তানগণ, আকাশ-যোদ্ধা বরিশালের রত্ন ইন্দ্রলাল রায়ের ন্যায় বীরগণ স্ব স্ব কৃতির ফলে বাঙ্গালীর পুরাতনের অম্লান-কীর্ত্তির ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া তাহার দুর্দ্দিনের যাবতীয় কলঙ্ক মোচন করিবেন। * * *
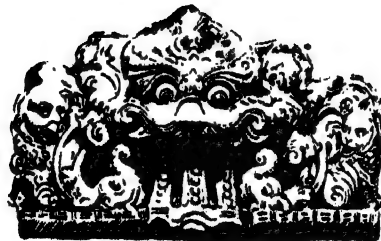
বনভোজন

শ্রীঅক্ষয়কুমার সরকার

৪

যত্ন রায়ের ভিটে হইতে খানিকটা দূরে বনভোজন হইতেছিল। সেখানে সতীদহের তীরে কতকটা স্থান চাঁচিয়া ছুলিয়া, গোবর জল লেপিয়া শুদ্ধ করা হইয়াছিল। তাহারই উপর বিভিন্ন পংক্তিতে শতাধিক স্ত্রীলোক, বালক বালিকা পরমানন্দে ফলাহার করিতেছে। প্রচলিত প্রথানুসারে ব্রাহ্মণকন্যাগণ তাঁহাদের চিঁড়ে দইএর অংশ অন্যান্য জাতের পংক্তিতে বণ্টন করিয়া দিলেন; তাঁহারাও তাঁহাদের ফল মূল সন্দেশ প্রভৃতি ব্রাহ্মণ মহিলাগণকে উপহার দিলেন। যাঁহারা ছুঁৎমার্গের সংস্কারে অস্পৃশ্য, তাঁহারাও অপর কাহারও মারফৎ আজিকার উৎসবে উচ্চ জাতীয়গণকে উপহার দিবার জন্য কিছু সামগ্রী আনাইয়া রাখিয়াছিলেন; এখন সে সকল বিতরণ করাইয়া আনন্দ লাভ করিলেন। আত্মীয় বন্ধু, জ্ঞাতি কুটুম্ব, পরিচিত অপরিচিত, সকলের মধ্যে এইরূপ উপহারের আদান প্রদানের পর, শিশুগণের আনন্দকলরব ও অপর সকলের হাস্যপ্রসন্নতার মধ্যে বনভোজন আরম্ভ হইল। মরা গঙ্গায় বান ডাকার মত আজ ম্যালেরিয়ায় ম্রিয়মাণ সুজাপুরে বৎসরান্তে যেন একটা উৎসবের উৎসাহ ও আনন্দের বন্যা দেখা দিয়াছিল। কেবল সমাগত বালক বালিকাগণের কথা নহে, বয়স্থা এবং বর্ষীয়সীগণের মধ্যেও যেন একটা প্রাণস্পর্শের স্ফূর্ত্তি এবং স্বাস্থ্যসুলভ মুখরতা তাহাদের চিরভোগ্য দুঃখ দরিদ্রতা ও অস্বাস্থ্যের মধ্যেও আসিয়া পড়িয়াছিল। আজ এই অবসরের দিনে কৃষক মজুরদিগের গৃহিনী, কন্যা এবং ভদ্র গৃহের মহিলা, বালিকা একত্রে আহার করিতে করিতে বাস্তবিকই অনুভব করিতেছিল যে তাহারা সকলেই যেন একই পরিবারের, একই সংজ্ঞের অন্তর্ভুক্ত!

বনভোজন শেষ হইল। তখনও একটু বেলা ছিল; কিন্তু সন্ধ্যার সময় ফিরিবার নিয়ম। মেয়েরা বয়স এবং প্রবৃত্তির ইঙ্গিতে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া হাতমুখ ধুইবার পর সতীদহের পাহাড়ের উপর মজলিস করিয়া বসিলেন। নীলোজ্জ্বল জলরাশি অস্তগমনোন্মুখ রবির রক্তিম কিরণ-সম্পাতে যেখানে শোভায় টল্ টল্ করিতেছিল, তাহার সন্নিকটে বসিয়া বিভার শ্বশুরালয়াগত সখী সুভাষিণী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "সত্যি সই, ওর সঙ্গে তোর বিয়ে?

"দূর! তোর যেমন আজগুবি কথা?"

"ছি ভাই, আমার কাছে লুকোনো! ঝি মার সঙ্গে যে কায়েত গিন্নী ঐ কথা বল্‌ছিলেন।"

বিভা যেন আগ্রহের সঙ্গেই বলিয়া উঠিল, "কখন?" এমন সময়ে অতুলের মা আসিয়া বলিল, "বিভা দিদি, শুন্‌তে পাচ্ছ না? বামুন মা যে ডাকাডাকি করছেন। বাড়ী ফিরতে হবে না?"

৫

বনভোজনের যাত্রীগুলি চলিয়া গেলে হেমন্ত তাহার ডাইরিতে কি লিখিয়া রাখিতেছিল। এই সময়ে কে একজন "তোমরা সব কোথায় গো" বলিয়া হাঁকিয়া বাড়ির ভিতর ঢুকিয়া, সেখানে পরিচিত কাহাকেও না দেখিয়া হেমন্তকে বলিল, "এরা সব কোথায় গেল? তুমি কে বাপু?"

"এঁরা বনভোজনে গেছেন। আমি—"

ব্যস্তসমস্ত আগন্তুক বলিয়া উঠিল, "আমি দাঁড়াতে পারছি না তোমাকেই ব'লে যাই, বিভার বিয়ের সম্বন্ধ, ম্যানেজার বাবু নিজেই দেখ্‌তে এসেছেন। এরা এলেই তাঁকে কাছারি থেকে নিয়ে আস্‌ছি।"

অল্পক্ষণ পরেই গোধূলির সঙ্গে মাঙ্গলিক শঙ্খধ্বনিতে বনভোজনের যাত্রীগুলির প্রত্যাবর্ত্তন সূচিত হইল। বিভাকে একা পৌঁছিতে দেখিয়া হেমন্ত জিজ্ঞাসা করিল, "ঝি মা?"

একটু হাসিয়া সে উত্তর করিল, "বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন। আগে আমি আলোটা জাল্‌ব, তারপর তিনি মন্তর ব'লে ঘরে ঢুক্‌বেন।"

"কি মন্তর?"

"বনভোজনের মন্তর। আপনি জানেন না?"

"না। কি?"—

বিভা মুখটি একটু নীচু করিয়া আপনার মনে একটু হাসিয়া বলিল, "ঝি মা এলে শুন্‌তে পাবেন।"

ঘরের ভিতর প্রদীপটি জালিয়া, দ্বারে একটা কুল কাঁটা রাখিয়া বিভা শাঁখ বাজাইল। তাহার ঝি মা দ্বারের নীচে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঘরে কেন আলো?"

হেমন্তকুমার সম্মুখে থাকায় প্রশ্নের উত্তর দিতে বিভার যেন কেমন বাধ বাধ ঠেকিতেছিল। সে কোন রকমে বলিল, "গিন্নি গেছেন বনভোজনে, সবাই আছেন ভালো।"

"দুয়ারে কেন কাঁটা?"

আগের চেয়েও মৃদুস্বরে উত্তর হইল, "গিন্নি গেছেন বনভোজনে, ছেলেরা লোহার ভাঁটা।"

হেমন্ত বিভার দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল, "এই বুঝি তোমার মন্তর!" তাহার পর বামুন-মাকে কৌতুকের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "ছেলেরা কোথায় ঝি'মা?" তিনি স্নিগ্ধ স্নেহের হাসি হাসিয়া উত্তর করিলেন, "কেন এই যে তুমি রয়েছ, বাবা।" হেমন্তকুমারের ভাগ্যে অনেকদিন বোধ হয় এমন স্নেহের সম্বোধন জোটে নাই। তাই তাহার স্নেহতৃষ্ণার্ত্ত মন ইহাতে পরিতৃপ্ত হইয়া গেল। হেমন্ত-কুমারের প্রশ্ন শুনিয়া বিভার উজ্জ্বল দৃষ্টি ঘরের ভিতর হইতে তাহার মুখের উপর পড়িয়াছিল, এবং ঝিমার উত্তর শুনিয়া তাহার ঠোঁটের উপর দিয়া একটা হাসির রেখা উন্মেষমাত্রেই মিলাইয়া গেল।

এই সময়ে বাহির হইতে রামেশ্বর চক্রবর্ত্তী "এরা ফিরেছে"? বলিয়া উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল। বামুন-মা তাহাকে "এস দাদা" বলিয়া অভ্যর্থনা করিতেই সে বলিল, "ডিহিতে গিয়ে হঠাৎ শুনলুম সতীশ বাঁড়ুয্যের স্ত্রীবিয়োগ হয়েছে। বিভার বিয়ের কথা—"

"বয়স কত?"

"চল্লিশের ভিতর। দেখ্‌লেই টের পাবে। স্বয়ং দেখ্‌তে এসেছেন।"

"না ব'লে ক'য়ে—"

"মাসাবধি গৃহশূন্য। মন বড় খারাপ হয়েছে। শীঘ্র শুভকার্য্য শেষ করে ফেল্‌তে চান্‌। বিভার রূপগুণের কথা শুনে শ্লোক আউড়ে ব'লে উঠলেন "চল হে মুখুয্যে, আজই একবার তোমাদের গ্রামের পরমাসুন্দরীটিকে চাক্ষুষ ক'রে আসি—"

"আর পক্ষের ছেলে পিলে আছে?"

"প্রথম পক্ষের দুই মেয়ে, তারা শ্বশুর বাড়ি। দ্বিতীয় পক্ষের বড় মেয়েটিরও বিয়ে হ'য়ে গেছে। সেও শ্বশুর বাড়িতেই থাকে তবে সম্প্রতি প্রসব হ'তে এসেছে। ৬টি মাত্র ছেলে—"

"আমার বড় ইচ্ছে নয়।"

রামেশ্বর চক্রবর্ত্তী বলিয়া উঠিল, "অবাক কর্‌লে যে ঠাকুর মা। তুমি কী বরে বিয়ে দিতে চাও শুনি? বিষয় আশয়, বাগান বেড়, গরু মরাই, জমি পুকুর, জাজ্জ্বল্যমান সংসার। আমাদের ত আর ছাপা নাই, এদিকে যে বিভার বয়স চারগণ্ডা পেরিয়ে গেছে। বিয়ে হ'লে এতদিন ছেলের মা—" হেমন্তকুমারের দৃষ্টি হঠাৎ একবার বিভার লজ্জা ও ঘৃণায় বিবর্ণ মুখের উপর পড়িয়াই ক্রোধে তীক্ষ্ণ হইয়া বক্তার মুখের উপর স্থাপিত হইল। বামুন-মাও তীব্র স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "রামেশ্বর, তোমার অত ব্যাখ্যানে কাজ নাই।" একটু চুপ করিয়া থাকিয়া হেমন্তর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "বামুনের ঘরের মূর্খ। মা সরস্বতীর কাছে দিয়েও কখনও—"

রামেশ্বরও রাগে জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু আর যাহাই হউক—জমিদারী সেরেস্তায় বহুকাল নকলনবীশি করিয়া মনের ভাব চাপিয়া রাখা যে কার্য্যোদ্ধারের প্রকৃষ্ট উপায় তাহা সে ভাল করিয়াই শিখিয়া লইয়াছিল। সুতরাং অমায়িকভাবে হাসিয়া বলিল, "আমাদেরই ত দায়, এবং আমাদেরই দেখিয়া শুনিয়া পাত্র আন্‌তে হবে। তবে অবশ্য তোমার পছন্দ না হ'লে ত আর হবে না। পাত্র ত

শ্রীঅক্ষয়কুমার সরকার

স্বয় উপস্থিত, একবার বিভাকে দেখুন, তুমিও তাঁকে দেখ—।''

বামুন-মা'র রাগ খড়ের আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিয়াই নিভিয়া গিয়াছিল, পূর্ব্বাপর বিবেচনা করিয়া তিনি একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, তাই হবে।" তাঁহার চক্ষুর কোণে হতাশাময় দারিদ্র্যের যে অশ্রুকণা ভাসিয়া উঠিতেছিল, তাহা হয়ত কাহারও লক্ষ্য হইল না, কিন্তু তাঁহার দীর্ঘশ্বাসের কাতরতা বিভা ও হেমন্ত দুইজনেই বেশ বুঝিতে পারিল।

রামেশ্বর বলিল, ''তবে নিয়ে আসি

''সতীশবাবু যে স্বয়ং এসেছেন ঠাকুর মা। কাল ভোরেই তাঁকে যেতে হবে, একটা ঘর-জ্বালানি মোকর্দ্দমা ঝুলছে। কাজের লোক, ওঁর কি একদণ্ডও ব'সে থাকবার সময় আছে? আর, শাস্ত্রেও বলে শুভস্য শীঘ্রং—''

বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী অন্যমনস্ক হইয়া কি ভাবিতেছিলেন। রামেশ্বর বলিল, "তবে যাই?"

"আচ্ছা।"

রামেশ্বর দরজার কাছ হইতে কি ভাবিয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "একখানা ফরসা কাপড় পরিয়ে চুলটা একটু বেঁধে ছেঁদে রাখ্‌তে হবে ত। হাজার হ'ক, কনে দেখা—' 'হঠাৎ ঘরের ভিতর বিভার উপর নজর পড়াতে সে বলিয়া উঠিল, ''না। কিছুই কর্‌তে হবে না। এই যে চুল টুল বেশ বাঁধা আছে!"

যাইতে যাইতে সে স্বগত বলিতে লাগিল, "ছুঁড়ি যেন পরী! একবার এ জিনিষ বুড়ো বেটাকে গছাতে পারলে, গোমস্তাগিরি একটা—হে মা কালি, জগত্তারিণি, মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিস্, বেটি!''

বিভা তাহার দিকে হয়ত চাহিয়াই দেখে নাই। আর যখন সে লোকটা তাহার চিবুকে অঙ্গুলি স্পর্শ করিয়া তাহার মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া বলিয়াছিল, "একবার এই দিকে চাও ত", তখন লজ্জা ঘৃণা বা রাগের জন্যই হউক অথবা চিরাভ্যস্ত শীলতার সংস্কারের জন্যই হউক সে সেই অসভ্য প্রৌঢ়টার মুখের উপর এমন করিয়া চাহিতে পারে নাই, যাহাতে তাহার কুৎসিত গঠনের সম্যক ধারণা করিতে পারিত। কিন্তু সেখানকার অপর সকলেরই মনে হইয়াছিল যে সমস্ত জীবনকালের মধ্যে এমন বীভৎস কদাকার লোক তাহারা কখনও দেখে নাই। বয়স তাহার চল্লিশ কি ষাট, বর্ণ তাহার তামাটে কি শ্যাম, চুল এবং গোঁফ তাহার স্বাভাবিক কটা কি কলপ-মাখান, সে সকল সূক্ষ্মভাবে পর্য্যবেক্ষণ করার কথা কাহারও মনে হয় নাই। দরিদ্র নিঃসহায় প্রজার উপর আজন্ম দস্যুবৃত্তি করিয়াই হউক, বা জাল জালিয়াতি মিথ্যা মোকদ্দমা ও সাক্ষী সৃজন করিবার কুপ্রবৃত্তিতে অভ্যস্ততার ফলেই হউক, তাহার মুখের উপর এমন একটা সয়তানী ছাপ পড়িয়া গিয়াছিল যে তাহার উপর দৃষ্টি পড়িলেই দর্শকের সমস্ত মনটা একমাত্র সেই অঙ্গটার উপরই কেন্দ্রীভূত হইয়া পড়িত। যাহা হউক বাঙ্গালীর অরক্ষণীয়া কন্যার অভিভাবকগণের অনেক স্থলে পাত্রের গুণের কথা ভাবিয়া দেখিবারই অবসর হয় না, তা আবার রূপের পরীক্ষা। এ ক্ষেত্রে যে সকল প্রতিবেশী আত্মীয়তা করিতে আসিয়াছিলেন তাঁহারা, বিশেষতঃ যাঁহারা সেই খ্যাতনামা ম্যানেজারটির একটু নিষ্কাম তোষামুদ করিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা একবাক্যে বলিয়া উঠিলেন, "বাবু যদি মেয়েটিকে পছন্দ করিয়া পায়ে স্থান দেন তাহা হইলে ব্রাহ্মণ কন্যার জাতি রক্ষা হয় ও তাহার বৃদ্ধা প্রমাতামহী নিশ্চিন্ততার সহিত পরলোকে গমন করিতে পারেন।" এবং এই অনুরোধের উত্তরে যখন বাবুটি পরম উদারতার সহিত অমত নাই জানাইলেন, তখন সমাগত সজ্জনেরা মুক্তকণ্ঠে তাঁহারই মহত্বের প্রশংসা করিতে ভুলিলেন না। কিন্তু বামুন-মা বিভার এই ভাবী বরটিকে দেখিয়া কি মনে করিলেন তাহা তাঁহার মুখের বিবর্ণতার উপর যাহারই লক্ষ্য হইল সেই বুঝিতে পারিল। অতুলের মা মুখ ফুটিয়া বলিয়া উঠিল, "ঘাটের মড়া যে মা!"

''কিন্তু কুলীনের মেয়ে হ'য়ে জন্মালে যে গঙ্গাযাত্রীরও গলায় মালা দিতে হয়, অতুলের মা!" ব্রাহ্মণী হঠাৎ অন্ধকার ঘরটার ভিতরে ঢুকিয়া পড়িলেন। বিভার সই সুভাষিণীও অন্তরাল হইতে তাহার ভাবী সয়াটিকে দেখিতেছিল। কিন্তু সেই লোকটার সঙ্গে যে বিভার বিবাহরূপ একটা বিশ্রী ঘটনা ঘটিতে পারে, তাহা সে

তেই মনে করিতে পারিতেছিল না। তাই যখন অতুলের মা দুঃখ করিয়া বলিল, "এমন সোণার প্রতিমা! বাঁদরের গলায় কি না মুক্তার হার!" তখন সুভাষিণী বলিয়া উঠিল, "তুমি ক্ষেপেছ খুড়ি! তা কি কখন হয়, ঐ বুড়ো চোয়াড়ের সঙ্গে সইএর বিয়ে! দেখেছ ওর গোঁফ গুলো, যেন খ্যাঙ্‌রার কাঠি!"

অতুলের মা বলিল, "তাই বুঝি বা বিভার অদেষ্টে আছে। আজ চার বছর ধ'রে কত যায়গা থেকে দেখ্‌তে আস্‌ছে। অমন পরীর মত মেয়ে, কিন্তু তোমাদের কায়েত বামুন জাতের মুখে আগুন! টাকা আর টাকা! টাকা নিয়ে শ'য়ে দেবে!"

সুভাষিণী বলিল, "তবে যে শুন্‌ছিলুম, সইএর সঙ্গে এই কাল যে এসেছে তার সঙ্গে সম্বন্ধ হচ্ছে।"

অতুলের মা বলিল, "বয়সে ছোট হবে না ত? জাত কুল মেলে ত আমি একবার ওই ছেলেটিকে বলি যে মেয়েটাকে বাঁচাও।"

হেমন্ত এই সময়ে ভিতরে আসাতে তাহাদের কথা বন্ধ হইয়া গেল। সে উঠান হইতে ঘরের দিকে চাহিয়া বলিল, "উনি বলছেন ওঁর মত হয়েছে. তা হ'লে দিন টিন একটা স্থির হ'য়ে গেলেই—"। অন্ধকার ঘরের ভিতর ঝি-মা বিভাকে সর্ব্বাঙ্গ দিয়া আঁকড়াইয়া বসিয়াছিলেন; যেন কে তাঁহার সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইতে আসিয়াছে। একটু যেন বিকৃত স্বরে তিনি বলিলেন, "ওঁদের বল কথা পরে হবে।"

হেমন্তের সঙ্গে সঙ্গেই রামেশ্বর চক্রবর্ত্তী ও তাঁহার পরে স্বয়ং ভাবী বর মহাশয় বাটির ভিতর ঢুকিয়াছিলেন। রামেশ্বর বলিল, "কথাত পাকাই হয়ে গেল। যখন বাবু কথা দিয়েছেন, তখন এদিকের সূর্য্যি ওদিকে গেলেও তার নড় চড় হবে না। আমাদের বিভা যে এত বড় ভাগ্যিমানি—" যিনি বিভাকে উদ্ধার করিবার আগে যাচাই করিতে আসিয়াছিলেন সেই মাননীয় ব্যক্তিটি বলিয়া উঠিলেন, "আমার খোলাখুলি কথা, কি বল হে রামেশ্বর। ঝি-মার ত অভিভাবক নেই, আমাদেরই সব ক'রে নিতে হবে ত। তা গহনা দিয়ে আমি মুড়ে নিয়ে যাব, আর তা তৈরিই আছে। অরক্ষণীয়া কন্যা ভাদ্রমাসে বাধবেনা, কাল পুরুত ঠাকুরকে দেখিয়ে দিনস্থির ক'রে ফেলতে হবে আর এই হপ্তার মধ্যেই শুভকার্য্য—" হেমন্তকুমারের দৃষ্টিটা হঠাৎ মুখোপাধ্যায়ের মুখের উপর পড়ায় তিনি কি ভাবিয়া কথাটা শেষ করিবার আগেই রামেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—এ ছোকরাটি কে হে রামেশ্বর?"

রামেশ্বর বলিল, "বামুন মায়ের শ্বশুর বাড়ীর লোক. নিকট আত্মীয়। ছেলেটি বড় ভাল, সচ্চরিত্র।"

সতীশ মুখোপাধ্যায় পরদিনই শুভকার্য্যের দিনস্থির করিয়া পাত্রীপক্ষকে সংবাদ দিবেন বলিয়া ও নির্ব্বিঘ্নে যাহাতে শুভকার্য্য সম্পন্ন হয় তাহার সমস্ত বন্দোবস্তের ভার লইবার আশ্বাস দিয়া চলিয়া যাইবার সময় হেমন্তকে আপ্যায়িত করিয়া বলিলেন—"বলি, কিছু কাজ কর্ম্ম কর হে ছোকরা, না বেকার ভবঘুরে?"

হেমন্ত কি রকম একটু হাসিয়া বেকার আছে বলায় সতীশ মুখুযো পরম উদারতার সহিত বলিয়া উঠিলেন, "হাতের লেখা কেমন? হাতটা একটু পাকাও। কুটুম হতে চল্লে, আমাকেই ত আবার চাকরির জন্যে ধরবে।"

রামেশ্বর বলিল "তা নয়ত কি। কত লোকের আপনি অন্ন ক'রে দিচ্ছেন।"

বাহিরে যাইতে যাইতে সতীশ মুখুযো বলিল, "ছোঁড়াটার চাউনিটা ভাল নয়। কতদিন এখানে আছে?" রামেশ্বর বলিল,"থাকে না। মাঝে মাঝে যায় আসে।" সতীশ একরকম আপন মনেই বলিয়া উঠিল,"আগুনের কাছে ঘি। চাণক্য পণ্ডিত ব'লে গেছেন—যাই হ'ক, এখন একবার মন্তরটা প'ড়ে নিই!"

৭

কয়দিন ধরিয়া আকাশটা মেঘে ভরিয়া আছে; কেহ সূর্য্যদেবের মুখ দেখিতে পায় নাই। অবিশ্রান্ত বর্ষণে রাস্তাঘাট জলময়, বাড়ির বাহিরে পা বাড়াইবার উপায় নাই। এমনই দুর্য্যোগের রাত্রিতে সুজাপুরের বিভাদের সেই গৃহে একটা শোকান্ত নাটকের অভিনয় প্রায় শেষ হইয়া আসিতেছিল।

সতীশ মুখোপাধ্যায়ের কথার নড়চড় হয় নাই। পর দিনই দিন স্থির করিয়া কিছু মিষ্টান্ন ও একজোড়া সোনার

শ্রীঅক্ষয়কুমার সরকার

বা দিয়া সে লোক পাঠাইয়াছিল। বিভার ঝি-মা সমস্ত রাত্রি অনিদ্র চিন্তায় কাটাইয়াও তাঁহার কর্ত্তব্য স্থির করিতে পারেন নাই। তাঁহার মনের এই আচ্ছন্ন অবস্থায় যখন রামেশ্বরের সঙ্গে তত্ত্ববাহিকা আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন তাহাকে ফিরাইতে পারিলেন না। অতুলের মা প্রভৃতি প্রতিবেশিনীগণ আশ্চর্য্য হইয়া গেল, বামুন-মা এ করিতেছেন কি? সতীশ মুখুয্যের সঙ্গে বিভার বিবাহের কথাটা পাকাপাকি স্থির হইয়া গেল বটে, কিন্তু ইহাও স্থির হইল যে, বিবাহ অগ্রহায়ণ মাসের পূর্ব্বে কিছুতেই হইতে পারে না। রামেশ্বর অনেক ফুসলাইল, মুখোপাধ্যায় নিজে দুই তিন দিন আসিয়া অনেক অনুরোধ করিল,—কিন্তু ফল কিছুই হইল না। বামুন মা অটল রহিয়া বলিলেন, "শুভ দিন ব্যতীত তিনি কন্যাদান করিতে পারিবেন না।"

সেই শুভদিন আসিবার আগেই কিন্তু বড় একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়া গেল! কয়দিনের অবিরাম বর্ষণে জমিতে জল জমিয়া গিয়া চাষ আবাদের ক্ষতি হইতেছিল. নবরোপিত ধানগাছগুলি হাজিয়া পচিয়া যাইবার সম্ভাবনা হইয়াছিল, সুতরাং যাহাতে বৃষ্টিটা ধরিয়া যায় তাহার জন্য সকলেই আগ্রহান্বিত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার উপর সেদিন ছিল মালপাড়ার বার্ষিক ঝাঁপান। কত আয়োজন হইয়াছে, বলির পাঁঠা কেনা হইয়াছে, মাল-গিন্নিদের কস্তা পাড় শাড়ি এবং তাহাদের বধূ কন্যাদের ডুরে কাপড় কেনা হইয়াছে, গ্রামান্তর হইতে আগত কুটুম্ব বন্ধুতে মালপাড়া ভরিয়া গিয়াছে, কিন্তু বুঝি বা সব পণ্ড হইয়া যায়। ঝাঁপানের আগের রাত্রিতে একটি কমিটি বসিয়াছিল। আকাশ ধরিবার কোন লক্ষণ নাই দেখিয়া একরকম হতাশ হইয়া কমিটি স্থির করিতে যাইতেছিল যে শুধু মনসাপূজাটি কোন রকমে সারিয়া ফেলিয়া অপরাপর যে সকল উৎসব আমোদের আয়োজন হইয়াছিল তাহা এবারে বন্ধ রাখা ছাড়া আর উপায়ান্তর নাই। কমিটির এই সিদ্ধান্তে মালপাড়ার ছেলে মেয়েগুলি ত স্বভাবতই নিরানন্দ হইয়া পড়িল, কিন্তু তাহাদের মাতা ভগিনী প্রভৃতি বয়স্কা স্ত্রীলোকেরাও কম মনঃক্ষুণ্ণ হইল না। তাহাদের একটা পরমর্শ-সভা বসিল, এবং তাহা হইতে নবীন সর্দ্দারের স্ত্রীর উপর ভার দেওয়া হইল যে, সে যেন পুরুষদের সমঝাইয়া দেয় যে আদিকাল হইতে যে বার্ষিক পর্ব্ব চলিয়া আসিতেছে তাহার কোন অনুষ্ঠানের ত্রুটি করিয়া ছেলেপুলের অনিষ্ট করিবার তাহাদের কোন অধিকারই নাই। আর বৃষ্টি যাহাতে থামিয়া যায় তাহার জন্য বামুন মার নিকট গিয়া বাটি পোঁতাইবার ভারও মাল-গিন্নির উপর পড়িয়াছিল। আজ সকালে বামুন-মা বাটি পুঁতিয়া আসিবার সময় পা পিছলাইয়া পড়িয়া যাওয়াতে তাঁহার বাঁ হাতে কব্জির কাছটা একেবারে ভাঙ্গিয়া যায়।

সমস্তদিন ভাঙ্গা হাতের যন্ত্রণা ভুগিয়া সন্ধ্যার পর হইতে বামুন-মা একরকম মোহগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। মাঝে মাঝে জ্ঞান ফিরিয়া আসিতেছিল বটে, কিন্তু অধিকাংশ সময়ই বিকারগ্রস্ত অবস্থায় ভুল বকিতেছিলেন। গ্রামের কৈলাস সর্দ্দার কি একটা লতা বাঁধিয়া অনেক ভাঙ্গা জোড়া লাগাইয়া দিয়াছে বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। এ ক্ষেত্রেও তাহাকে ডাকা হইয়াছিল; কিন্তু তাহার প্রক্রিয়ায় কোন ফল লাভ হয় নাই। বামুন-মার হাড়ের যন্ত্রণা ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল এবং সন্ধ্যার পর তাহা একেবারে অসহনীয় হইয়া উঠিল। গ্রামে বা নিকটস্থ কোন গ্রামান্তরে চিকিৎসা শাস্ত্রে অভিজ্ঞ তেমন কোন ব্যক্তি ছিলেন না। তবে সেইদিন সন্ধ্যার সময় মেডিকেল কলেজের একজন পঞ্চম বর্ষের ছাত্র—বিভার সইএর বর—সুজাপুরে শ্বশুরালয়ে আসিয়াছিল। সে ভাঙ্গা হাতটা দেখিয়া বলিল, "এটা একবারে কেটে ফেলতে হবে।" কিন্তু কাটে কে? সুকুমার আবার বলিল, "অনেক দেরি হ'য়ে গেছে, আরও দেরি হ'লে জীবনের কোনই আশা থাকবে না।" অশীতিপর বয়সের হিন্দু বিধবার জীবনের জন্য যাঁহার জীবন লইয়া কথা তিনি কখনই বিচলিত হন না, তাঁহার আত্মীয় স্বজনের মধ্যেও হয়ত অনেকে হয় না। সে যাহাই হউক, প্রাচীনার একমাত্র আত্মীয়া বালিকাটি—তাঁহার অতি পুরাতন প্রাণ-পাখীটি যাহাতে সেই ঘুণ-ধরা দেহ-পিঞ্জরটি ছাড়িয়া চলিয়া না যায়, তাহার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পাত করিতে উদ্যত হইয়া উঠিল। কিন্তু প্রিয়-জনকে ধরিয়া রাখিবার আগ্রহ জগদীশ্বর মানবের অন্তরে প্রচুর পরিমাণে দিলেও তাহাকে ধরিয়া রাখিবার সাধ্য

একবারেই দেন নাই। সুতরাং বিভার এই আগ্রহ যে নিষ্ফল হইতে পারে, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই ছিল না। তথাপি প্রিয়জনকে বাঁচাইবার সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা করায় যে বর্ত্তমান তৃপ্তি এবং ভবিষ্যৎ প্রবোধ আছে, তাহা লাভ করিবার জন্য অর্থের অভাব বিভাকে একান্ত অবসন্ন করিয়া ফেলিতেছিল।

এই বিপদে প্রতিবেশী অনেক ভদ্র এবং সাধারণ লোক সেখানে উপস্থিত ছিল। সেই বনিয়াদী ব্রাহ্মণ পরিবারের অতীতের কীর্ত্তি এবং বামুন-মার স্বকীয় পরোপকারিতা এবং অমায়িকতা তাঁহাকে সে গ্রামে সর্ব্বজনপ্রিয় করিয়া রাখিয়াছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। প্রতিবেশীগণের মধ্যে পুরুষ এমন কেহ ছিল না যে কখনও না কখনও বামুন-মার মিষ্ট কথায় আপ্যায়িত না হইয়াছে, এমন জননী কেহ ছিল না যাহার রোগার্ত্ত সন্তান কখনও না কখনও তাঁহার নিপুণ শুশ্রূষায় এবং অব্যর্থ 'জলপড়ায়' উপকৃত না হইয়াছে, এমন প্রসূতি কেহ ছিল না যাহার প্রসববাধা তাঁহার উপস্থিতিতে তাঁহার স্নিগ্ধ প্রবোধে উপশমিত না হইয়াছে। সেই বর্ষীয়সীর কার্য্যের এবং কথার ছাপ সেই মৃতপ্রায় পল্লীর অন্তিম জীবনের চিহ্নস্বরূপ অবশিষ্ট লোক কয়টির জীবনের উপর যে কতকাল ধরিয়া পড়িয়া আসিতেছিল, তাহা তাহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিটিরও ঠিক করিয়া বলিবার সাধ্য ছিল না। কত দম্পতীর কলহ যে তিনি স্নিগ্ধ হাসিতে উড়াইয়া দিয়াছেন, কত ভ্রাতৃবিরোধ, কত মহাজন-খাতকের স্বার্থ-সংঘর্ষ যে তাঁহার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে মিটিয়া গিয়াছে, কত সামাজিক কুৎসা যে তাঁহার নিষেধের দৃঢ়তায় প্রারম্ভেই থামিয়া গিয়াছে, তাহার সংখ্যা কেহই করিতে পারিত না। সে গ্রামের অনেকের পক্ষে তাহাদের মহাকালের পীঠস্থান ও গ্রামাধিষ্ঠাত্রী মহামায়ার প্রস্তর-মূর্ত্তির ধ্বংস হওয়া যেমন অশুভকর দুর্ঘটনা, বামুন-মার তিরোধানও প্রায় সেইরূপ। শিশুরা বুঝিতে পারিতেছিল না যে তাহাদের উপকথার উৎসটি শুকাইয়া আসিতেছে, নব বধূরা ভাবিতে পারিতেছিল না যে তাহাদের পিত্রালয়ে যাইবার সুপারিস করিবার স্নেহস্নিগ্ধ অন্তর-দেবতাটি চির-বিদায়ের উপক্রম করিতেছেন, বাল-বিধবারা বিশ্বাস করিতে চাহিতেছিল না যে তাহাদের মরু-হৃদয়ে পুরাণ উপপুরাণের, মহাভারত-রামায়ণের, পুণ্যবাণীর শান্তিধারা বহাইবার শতধার যন্ত্রটি বিকল হইয়া আসিতেছে। কিন্তু সেখানে এমন লোকও ছিল যাহারা তাঁহার অসহ্য যন্ত্রণার পরিণাম সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিয়া এক একবার মনে করিতেছিল হয়ত বা তাঁহার অচির নিবৃত্তিই বাঞ্ছনীয়।

(ক্রমশঃ)
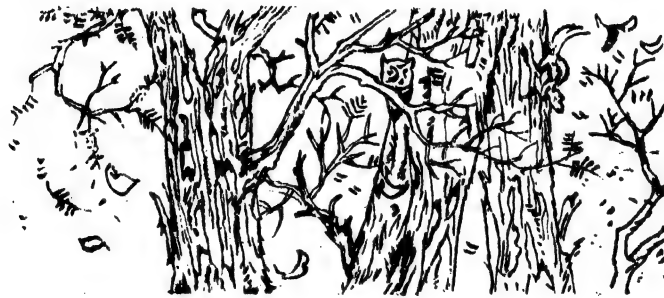
সহযোগী-সাহিত্য

আধুনিক ফরাসী সাহিত্যের ধারা

লচন্দ্র মিত্র

৪

রোমান্টিজ্‌মের রূপান্তর

সত্যের সহিত কারবার করে মানুষের যে মন, মোটামুটি তাহাকে দুটি দিক দিয়া দেখা যাইতে পারে। একদিকে সে মন ভিতরের একটা প্রচণ্ড তাগিদে বিতাড়িত হইয়া সত্যের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হয়,—অস্ত্র তাহার কল্পনা ও আবেগ; অন্যদিকে সে মন প্রদত্ত বা উপলব্ধ তথ্যগুলির বিচার করিতে বসে, অস্ত্র তাহার স্থির শীতল যুক্তি। মনের এই প্রথম প্রবৃত্তির নাম দেওয়া যাইতে পারে রোমান্টিক্, দ্বিতীয়টির ক্লাসিক। এই দুটি প্রবৃত্তিরই একটা পরস্পর সংঘাতের ছন্দ কি সাহিত্যের, কি বিজ্ঞানের ক্রম-বিবর্ত্তনের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। কোনো যুগের সাহিত্যেই,— এই দুটি প্রবৃত্তির মধ্যে একটির একেবারে বিনাশ হয়না যখনই আমরা বলি কোনো বিশেষ যুগের সাহিত্যে রোমান্টিজ্‌মের অবসান হইল, বা ক্লাসিসিজ্‌মের অবসান হইল, তখন আমরা এ কথা বলিতে চাই না, যে রোমান্টিক প্রবৃত্তির বিনাশ হইল,—বা ক্লাসিক প্রবৃত্তির বিনাশ হইল, তখন আমরা বলিতে চাই শুধু এই যে সেই যুগের মন আত্ম-প্রকাশের জন্য অবলম্বন করিয়াছিল যে প্রণালী,—তাহা রোমান্টিক-প্রধানই হউক, বা ক্লাসিক-প্রধানই হউক, সেই প্রণালী পরিত্যাগ করিল।

উনবিংশ শতাব্দীর ফরাসী রোমান্টিক সাহিত্যের উপর দিয়া যে বৈজ্ঞানিক অনুপ্রেরণার বন্যা বহিয়া গেল, তাহাতে রোমান্টিজমের বিনাশ হয় নাই। সেই বন্যায় একটি কথা প্রমাণ হইল যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যে বিরাট্ সত্তা—তাহার বৈচিত্র্য যেমন অন্তহীন,—তাহার গতিও তেমনি অনন্ত। মানুষের মন চায়, সেই সত্তার মধ্যে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে, তাহার উপর আপনার শাসনদণ্ড জাহির করিতে, তাহাকে আপনার প্রয়োজনসাধনে নিয়োগ করিতে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এই উদ্দেশ্যে বহিঃসত্তার বিচিত্র বিশিষ্টতার উপর মানুষ চাপাইয়া দিতে চায় যে একটা নির্ব্বিশিষ্ট সরলতা (simplicity of the abstract),—তাহার অন্তহীন গতির উপর জারি করিতে চায় যে কতকগুলি সহজ সর্ব্বসাধারণ-প্রযোজ্য বাঁধা নিয়ম,—তাহার ফলে হয় শুধু সেই সত্তার অঙ্গহানি, মানুষ পায় শুধু তাহার একটা সারবিহীন ছলনা মাত্র। তাই এমন-কি রেণাঁর মত লেখকও,—যাঁহার বিজ্ঞানের উপর বিশ্বাস ছিল অগাধ,—যিনি আজীবন ফরাসী দেশের তরুণ মণ্ডলীকে শিক্ষা দিয়া আসিয়াছিলেন,—এমন কিছু বিশ্বাস করিও না,—যাহাতে তোমার অন্তরের যুক্তি প্রত্যক্ষ ঘটনা বা বস্তুর উপর নির্ভর করিয়া সায় না দিবে,—সেই রেণাঁর মত লেখকও সকরুণ নিরাশায় স্বীকার করিলেন—যে, কোনো কিছু সত্যই একেবারে নিঃসন্দেহে সপ্রমাণ করিয়া দিবে,—এমন সামর্থ্য মানুষের নাই। তবে হয়ত এ অসামর্থ্যে কিছু আসে যায় না। কেননা, কে জানে যে সত্য দুঃখময় নয়? জোর করিয়া কে বলিতে পারে যে আমাদের যে ভ্রান্তি, আমাদের যে কুসংস্কার,—তাহাদেরও একটি সার্থকতা নাই? বৃথা, বৃথা,—সবই বৃথা। যদি কোথাও কিছু সত্য থাকে,—তবে হয়ত সে সত্য যথার্থ বুঝিয়াছে ঐ কীট পতঙ্গেরা,—যাহাদের মনে সন্দেহের কোনো স্থান নাই,—অনাবিল আনন্দে যাহারা ভগবানের দেওয়া এই প্রাণখানি গ্রহণ করিয়াছে,-

পরম পরিতৃপ্তিতে যাহারা এই সুন্দর ধরিত্রীকে বড় আরামের আবসভূমি বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছে। সব চেয়ে ভাল বোধহয় কোনরকম যুক্তি তর্ক না করিয়া শুধুই ভালবাসিয়া যাওয়া। প্রাণের গোপন মন্ত্র,—সে ত বিজ্ঞান নয়, ভালবাসা।

এমনি করিয়া রোমান্টিজ্‌মের মন্ত্র পুনরায় ধীরে ধীরে সঞ্জীবিত হইতে লাগিল। সাহিত্য-সমালোচনার যে সমস্ত নিয়ম ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল,—তাহার বিরুদ্ধে জুল্ ল'মেত্র্ খাড়া করিলেন,—একটি মাত্র নিয়ম,—তাহা লোকের ভালোলাগা-মন্দলাগা। ইহা ব্যতীত সমালোচনার অন্য কোনো নিয়ম নাই বা থাকিতে পারে না। যে কোনো নিয়মই প্রতিষ্ঠিত কর না কেন, তাহার প্রমাণের জন্য চাই অন্য নিয়ম, আবার সেগুলি প্রমাণের জন্য চাই অন্যতর নিয়ম,—এমনি করিয়াই নিয়মের উপর নিয়ম রাশীকৃত করিয়া যাওয়ার চেয়ে আত্ম-প্রবঞ্চনা আর কিছুই হইতে পারে না। এই রাশীকৃত নিয়মগুলিও আবার পরস্পর পরস্পরকে খণ্ড বিখণ্ড করিতে থাকে, ইহার শেষ কোথায়? তার চেয়ে প্রাণের ভালো লাগা মন্দ লাগা,—এই ত চরম নিয়ম,—ইহা অন্য কোনো প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। ফ্রাঁস বলিলেন,—যতই খাকুলি-বিকুলি কর না কেন,—প্রকৃত সত্যকথা এই যে আমরা আমাদের অন্তরের গণ্ডীর বাহিরে আসিতে পারি না। এ দুঃখ যত বড়ই হউক না কেন,—ইহা আমাদের মাথায় পাতিয়া লইতে হইবে। কোথাও এমন কোনো নিশ্চয়তা নাই, যাহা মানুষের অন্তরের সীমানা ছাড়াইয়া যাইতে পারে। এমন জ্ঞান-সমৃদ্ধ অথচ সর্ব্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ অবিশ্বাস বাদ বোধ হয় আর কোথাও কখনো দেখা যায় নাই। এমন-কি প্রচুর মানসিক স্বাস্থ্য-সম্পদে সমৃদ্ধিশালী যে মন, আনন্দ-হিল্লোলে তরঙ্গায়িত হইয়া অবাধ-লীলায় জ্ঞান-বৃক্ষের শাখা-প্রশাখায় বিচরণ করিয়াছে,—সে-মনেরও এই অবিশ্বাস-বাদ হইতে মুক্তি ছিল না। র'মি দ' গুরমঁ যে আনন্দ-তত্ত্ব প্রচার করিয়াছিলেন—তাহার মধ্যেও ছিল এই অবিশ্বাসের সুর। আনন্দ চাই,—গুরমঁ বলিয়াছিলেন,—জীবনে আনন্দ চাই। আনন্দ লুটিয়া লওয়া প্রত্যেক মানুষেরই আপনার প্রতি একটা অবশ্য কর্ত্তব্য। জগতের কোনো জিনিষেরই প্রতি আসক্ত হইয়া থাকা চলিবে না,—সকল জিনিসেরই উপরে উঠিতে হইবে,—এবং সেই উচ্চাসন হইতে,—সর্ব্বব্যাপী অবজ্ঞার ভিতর হইতেও সকলের উপর ছড়াইতে হইবে প্রেম। জীবনটা যাহাই হউক না কেন,—একটা দুর্ব্বহ ভার নহে, বেশ বহন করিবার যোগ্য। আশেপাশের সমস্ত জিনিস জানিবার ও বুঝিবার প্রয়াসের মধ্যে যতই বিরাট ব্যর্থতা থাকুক্ না কেন,—সে ব্যর্থতার মধ্যেও একটা মহিমা আছে,—এবং সেই মহিমা আমাদের সমস্ত অসারতার উপরে তুলিয়া ধরে।

এই ত আবার সেই রোমান্টিজ্‌মের আত্ম প্রতিষ্ঠা ও আত্মনির্ভরতা! কিন্তু এখন আর ইহার মধ্যে ছিল না ভিক্টর হুগোর আমলের সেই আশার প্রদীপ্ত আলো,—এখন ইহার মধ্যে ছিল অবিশ্বাসের অন্ধকার। এমন-কি, গুরমঁর আনন্দ-তত্ত্বের মধ্যেও যে সেই অবিশ্বাস,—ইহার বেদনা যাইবে কোথা? এই অবিশ্বাসের বেদনা বুকে বহন করিয়া পুনঃ-সঞ্জীবিত রোমান্টিজ্‌ম্ এখন মানুষের চিন্তা-রাজ্যের অন্ধকার পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। এ যেন গৃহহারা রোমান্টিজ্‌ম্; তাই ইহার চারিদিকই উন্মুক্ত; ইহার মধ্যে ছিল নানা প্রবৃত্তির সংমিশ্রণ,—ছিল বাস্তবতার সংযম, অন্তরের মধ্যে সত্যানুসন্ধানে ব্যর্থতার মর্ম্মবেদনা, নৈরাশ্যের সহিত দ্বন্দ্ব এবং সর্ব্বোপরি একটা সকরুণ মানবতা (humanism)। এই ধরণের একজন বিশেষ উল্লেখযোগ্য লেখক ছিলেন পিয়ের্ লোটি। তিনি বর্ণনা করিতেন যাহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন,—তাহাই; যাহা স্বপ্নে কল্পনা করিতেন,—তাহা নয়। কিন্তু বাস্তবতার এই সংযমের মধ্যেও তাঁহার কল্পনা অতীন্দ্রিয় সত্যের নাগাল পাইবার প্রয়াস পরিত্যাগ করে নাই। এবং এই প্রয়াসের ফলে তিনি পাইয়াছিলেন কেবল একটা নিরাশা-ক্লিষ্ট আমিত্ব-বোধের নিদারুণ অবসন্ন নির্জ্জনতা। তিনি বলিতেন,—কিছুরই প্রতি আমার আস্থা নাই,—কোনো মানুষের প্রতিও না,—কোনো বস্তুর প্রতিও না। কাহাকেও আমি ভালবাসি না,—আমার না আছে আশা, না আছে বিশ্বাস। তাঁহার প্রায় সমস্ত লেখার মধ্যেই ছিল,—অদৃষ্টের উপর এমনি একটা মর্ম্মভেদী ক্রন্দন। —কিন্তু তবুও তাঁর লেখার মধ্যে মধ্যে এমন একটা মানবতার

মিত্র

আশ্বাস আছে, যাহা এই নিরাশা-ক্লিষ্ট আমিত্ব-বোধের বেদনারও অনেক উপরে। তিনি বিশ্বাস করিতেন,—অন্ততঃ মনে প্রাণে বিশ্বাস করিবার চেষ্টা করিতেন—যে, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে নিহিত আছে,—একটা বিরাট অনন্ত অনুকম্পা,—যাহা মানুষের প্রতি,—এমন-কি সর্ব্ব-জীবের প্রতি মানুষের দয়া ও সমবেদনার ভিতর দিয়া নিয়ত আপনাকে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতে থাকে।

বিজ্ঞানের অসামর্থ্য অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করিবার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের এই যে রোমান্টিক আমিত্ব-বোধ ফিরিয়া আসিয়াছিল,—ইহার মধ্যে নিহিত ছিল এমন একটা বেদনা,—যে, রোমান্টিজম্ সাহিত্যে তাহার হারানো সিংহাসনটি পুনরধিকার করিতে আর পারিল না। এমন-কি নিট্‌জের যে অতি-মানবতাবাদ তখন ফরাসী অনুবাদ-সাহিত্যে প্রচুর প্রচলন লাভ করিয়াছিল,—তাহাতেও এই বেদনার অবসান হইল না। মরিস্ বার্‌রে এই আমিত্বের যে বিশ্লেষণ করিলেন, তাহার ফলে নিট্‌জের অতিমানবকে ত পাওয়া গেল না,—পাওয়া গেল এমন একটা দুর্ব্বল, বেদনা-হত সন্দেহ-বিক্ষিপ্ত 'আমি,'—যাহার একমাত্র আশ্রয়স্থল বিশ্বের সেই অন্তর্নিহিত অনন্ত অনুকম্পা,—যে অনুকম্পা মানুষের অনুভূতির করুণ কম্পনের মধ্যে নিয়ত আত্ম-প্রকাশ করে। এইখানেই সান্ত্বনা। এই অনন্ত অনুকম্পায় মানুষের হৃদয়-তন্ত্রীতে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠে এমন একটা মহান্ আদর্শের সুর যে, সেই সুরে এই আমিত্বের সংস্পর্শে আমাদের সমস্ত দুর্ব্বলতা-সত্ত্বেও আমরা একটা মহান্ আদর্শের স্পর্শ অনুভব করি। এইখানেই আমাদের বেদনার,—আমাদের সেই মর্ম্মস্পর্শী অগৌরবের সার্থকতা, কারণ এই অগৌরবই আমাদিগকে 'আমিত্বের' বাহিরে, সমস্ত সন্দেহের বাহিরে ঠেলিয়া দেয় একটা আদর্শের দিকে। এমনি করিয়াই আমাদের আমিত্বটুকু আমরা হারাইয়া ফেলি,—একটা বৃহত্তর, একটা প্রকৃততর সত্তার মধ্যে,—আমাদের সমাজের মধ্যে,—বিশ্বমানবের মহা-মিলনের মধ্যে,—অর্থাৎ এমন একটা চিরস্থায়ী সত্তার মধ্যে,—আমাদের এই আমিত্বটুকু যাহার একটুখানি ক্ষণিকের বিকাশ মাত্র।

এমনি করিয়া বার্‌রের এই আমিত্ব-বিশ্লেষণের ফলে রোমান্টিজ্‌মের পুনঃসঞ্জীবিত ক্ষীণ ব্যক্তিতন্ত্রতার উপর আবার একটা আঘাত লাগিল,—বৈজ্ঞানিক বস্তুতন্ত্রতার দিক দিয়া নয়,—রাষ্ট্রীয় সাধারণতন্ত্রতার দিক দিয়া। নিট্‌জের অতিমানবতা-বাদসত্ত্বেও পূর্ব্ব হইতেই ঐতিহাসিক এবং দার্শনিকদিগের চিন্তা এই সাধারণতন্ত্রতার দিকে অগ্রসর হইতেছিল। তাঁহারা বলিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন যে, মনীষা-সম্পন্ন বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃকই যে সমাজ সংগঠিত, সংরক্ষিত ও পরিচালিত হয়,—একথা মনে করা ভুল। সমাজ-সংগঠনের যে শক্তি,—তাহা সমাজেরই অন্তর্নিহিত;—তাহার উৎস সম্মিলিত মানবের সেই সব জীবন-ধারণের সর্ব্ব-সাধারণ প্রবৃত্তি,—যাহা জীবনকে সমাজের সহিত মানাইয়া চলিতে চলিতে সামাজিক প্রথাসকল সৃষ্টি করিতে থাকে। যত বড় ক্ষমতাশালীই হউনা না কেন,—কোনো ব্যক্তিবিশেষেরই সাধ্য নাই,—ইচ্ছামত এই সকল প্রথা উৎপাটিত বা পরিবর্ত্তিত করেন। এই সব প্রথা সমাজেরই অন্তর্নিহিত প্রয়োজন-অনুযায়ী আপনাদের সংরক্ষণ করিয়া চলে। বস্তুত এই সমাজকে বাদ দিয়া ব্যক্তি-বিশেষের কোনো অস্তিত্বই নাই। ব্যক্তি-বিশেষের যে সত্তা, তাহা উপন্যাস-রচয়িতা বা মনস্তত্ত্ববিদের একটা সুবিধা-জনক এবং প্রয়োজনীয় কল্পনা মাত্র। তার প্রমাণ এই যে সমাজ হইতে আপনাকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া আপনার মধ্যে আপনার সার্থকতার সন্ধান কেহই পাইতে পারে না। প্রকৃত-পক্ষে মানুষ ব্যক্তিতন্ত্র মনোবিজ্ঞানের নিয়ম-অনুযায়ী চিন্তা বা যুক্তি করে কতক্ষণ? সমস্তক্ষণই ত সে পরস্পর পরস্পরের অনুকরণের মধ্যে সমাজ-শক্তির অবিচ্ছিন্ন প্রবহমান স্রোতে ভাসিয়া চলে,—এমন মানুষের পৃথক অস্তিত্ব কোথায়?

এই ধরণের রাষ্ট্রতন্ত্র ভাবরাজি যখন লোকের মনে শিকড় গাঁথিয়া বসিতেছিল, ব্যক্তিতন্ত্রতার মূল্য যখন লোকের মনে ক্রমশঃ ক্রমশঃই কমিয়া আসিতেছিল,—তখন বিজ্ঞানের সত্য-উদ্ঘাটনের বিপুল প্রয়াসের ব্যর্থতার প্রতিঘাতে মানুষ যে আমিত্ববোধের মধ্যে পুনর্নিক্ষিপ্ত হইল, সেই আমিত্ব-বোধের মধ্যে সে বেশীক্ষণ টিঁকিয়া থাকিতে পারিল না।

জুল্ ল' মেত্র্ যে ব্যক্তিগত ভালো লাগা মন্দ-লাগার মধ্যে সমালোচনার মাপকাঠি খাড়া করিয়াছিলেন,—শীঘ্রই মুহূর্ত্ত মধ্যেই তাহার প্রতিবাদ আরম্ভ হইল। যদিও রুসো-প্রবর্ত্তিত যে রোমান্টিজ্‌ম্ ভিক্টর হুগোর মধ্যে পরিণতি লাভ করিয়াছিল,—তাহা আর পুনঃ সঞ্জীবিত হয় নাই,—তবুও তাহারই বিরুদ্ধে অকারণে প্রবল আন্দোলন উপস্থিত হইল। সে রোমান্টিজ্‌ম্ না-কি একটা মারাত্মক ভ্রান্তি,—মণীষাসম্পন্ন ব্যক্তি-বিশেষকে না-কি সে রোমান্টিজ্‌ম্ অধিকার দেয়,—সমাজ-নীতি এবং সামাজিক প্রথার বিচার,—এমন-কি বিরুদ্ধাচরণ করিতে, ইত্যাদি। এ আন্দোলন শুধুই যে সমালোচনা ও বক্তৃতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল তাহা নয়,—উপন্যাস ও নাটকের মধ্যেও ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। জোলা তাঁহার শেষ উপন্যাসগুলিতে আর মানব জীবনের একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করিবার প্রকাশ করেন নাই, করিয়াছিলেন কটা সামাজিক সমস্যা সমাধানের চেষ্টা।

বলা বাহুল্য,—এ আন্দোলনের কোন প্রয়োজন ছিল না,—কেন-না রোমান্টিজ্‌মের সেই নিছক কল্পনা-প্রবণ, আবেগ-বিতাড়িত, আশা-উজ্জ্বল, উৎসাহ-প্রদীপ্ত রূপ আর ফিরিয়া আসে নাই। মানুষের যে আমিত্ব-বোধ—তাহা ব্রহ্মাণ্ডের চরম সত্যের অচ্ছেদ্য অঙ্গ,—এমন-কি কেন্দ্র-স্বরূপ,—সেইখানেই সাহিত্যের উৎস,—অতএব এই আমিত্ব-বোধের বিলকুল ধ্বংস ও বিনাশ অসম্ভব। একটা বৃহত্তর সত্তার মধ্যে এই সত্তা যতই বিলীন হয়,—ততই সেই বিলুপ্তির মধ্যেই ইহার একটা গভীরতর বিশিষ্ট সত্তার সৃষ্টি হয়; আর নূতন নূতন সাহিত্যের ভিতর দিয়া সেই সত্তা নূতন নূতন রূপ গ্রহণ করে। রোমান্টিজ্‌মের আদি অনুপ্রেরণা এই আমিত্ব-বোধের মধ্যে মানুষের সচেতন আত্ম-প্রতিষ্ঠায়। সাহিত্যের ক্রম বিবর্ত্তনে নিয়তই এই অনুপ্রেরণা নানা রূপের সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে। কথনো বা ইহা আপনাকে পরিপূর্ণভাবে পাইতে চাহিয়াছে,—এবং সেই পাওয়ার মধ্যেই সমস্ত জগৎকে দেখিতে ও পাইতে চেষ্টা করিয়াছে,—কখনো বা ইহা আপনাকে অন্যের মধ্যে হারাইতে চাহিয়াছে,—এবং সেই হারানোর মধ্যেই আপনার পূর্ণতর সার্থকতা অনুসন্ধান করিয়াছে। আধুনিক ফরাসী সাহিত্যে এই অনুপ্রেরণার যে প্রথম রূপ ভিক্টর হুগোর মধ্যে পরিণতি লাভ করিয়াছিল,—তাহাকেই ইতিহাস-লেখকেরা বলিয়াছেন – রোমান্টিজ্‌ম্। পরবর্ত্তীযুগে এই অনুপ্রেরণা যে সব নব নব রূপ ধারণ করিয়াছিল,—তাহাদের অন্য নাম দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু যে নামই দেওয়া হউক না কেন,—মূল অনুপ্রেরণা সেই একই,—এই কথাটি স্মরণ রাখিলে,—আমরা বেশ পরিষ্কার বুঝিতে পারিব কেমন করিয়া কল্পনার উড্ডীয়মানতা ও যুক্তির সংযমের ছন্দের মধ্যে সাহিত্যের বিভিন্ন ধারা নব নব পথে প্রবাহিত হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

বিবিধ সংগ্রহ

টলষ্টয় ও তাঁহার স্ত্রী আঁদ্রিভ্‌না

এক শ' বছর আগে ১৮২৮ খৃঃ অব্দে দশুই সেপ্টেম্বর টলষ্টয় পৃথিবীতে প্রথম পা দিয়েছিলেন,—সেই তারিখটি সুচিরস্মরণীয় হ'য়ে আছে। টলষ্টয়ের জীবনযামিনীতে তাঁর স্ত্রী ছিলেন স্নিগ্ধ ইন্দুলেখা!

টলষ্টয়ের স্ত্রী স্বামীকে চোদ্দটি সন্তান উপহার দিয়েছিলেন; শুধু যে তিনি সন্তানপালনকুশলা ও গৃহকর্ম্মনিপুণা ছিলেন তাই নয়, তিনি ছিলেন স্বামীর লিপিকারিণী, বন্ধু, উৎসাহ-উৎস! শুধু আদর্শ মা ও স্ত্রী নন্,—স্বামীর সাহিত্যিক সখী, স্বামীর আধ্যাত্মিক আত্মীয়া ছিলেন। আঁদ্রিভ্‌নার নাম এই হিসেবে উজ্জল হ'য়ে আছে।

রাজচিকিৎসক আঁদ্রু বের্স-এর মেয়ে এই আঁদ্রিভ্‌না। বের্স অত্যন্ত সঙ্গতিসম্পন্ন ছিলেন এবং তাঁর পরিবারের সবাই শিক্ষায় বিশেষ পারদর্শী ও কলাকুশলী ছিল। তাঁর বাড়িতে মস্কোর সাহিত্যিক ও চিত্রশিল্পীদের আড্ডা বস্‌ত। আইভান্ টুর্গেনিভ্ এ বাড়ির নিয়মিত অতিথি ছিলেন। এ বাড়িতেই একদিন যুবক টলষ্টয় এসে অভিবাদন জানালেন এবং বের্সের মেজো মেয়ে আঁদ্রিভ্‌নার সঙ্গে তাঁর দেখা হ'য়ে গেল।

টলষ্টয়ের জীবনে তখন ঝড় ব'য়ে যাচ্ছে। তাঁর সময়ে বড়লোকের ছেলে যেমন ক'রে জীবনকে উড়িয়ে দেয়, টলষ্টয়ের বেলায়ও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। চৌত্রিশ বছর বয়সে তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন যে তিনি আশায় ও আনন্দে একেবারে ফকির, দেউলে হ'য়ে গেছেন,—তাঁর জন্যে সান্ত্বনাসিঞ্চিত গৃহনীড় নেই, প্রেয়সীর ঈষদুষ্ণ স্নেহ-স্পর্শ নেই,—তিনি কর্দ্দমক্লিষ্ট কণ্টকিত পথের একাকী পথিক! এই সময়ে আঁদ্রিভ্‌নার বড় বোন লিসার সঙ্গে টলষ্টয়ের হৃদ্যতার সূচনা হ'ল—একটি অর্দ্ধবিকশিত প্রেম-পুষ্প পাপ্‌ড়ি মেল্‌বার জন্য শিহরিত হচ্ছিল,—কিন্তু সেই প্রেমপুষ্পটি অবশেষে আঁদ্রিভ্‌নার হৃদয়বৃন্তে এসে ভর করলে। আঁদ্রিভ্‌না তখন ছোট, সতেরো বছরের হবে,—টলষ্টয় প্রস্তাব করতেই বোকা মেয়ে একেবারে রাজি হ'য়ে গেল। এই ব্যাপারটিই Anna Kareninaয় হুবহু লেখা আছে। Levin আর Kittyর বাগ্‌দান-প্রসঙ্গটি উক্ত ঘটনারই অনুবাদ ছাড়া আর কিছু নয়।

বিয়ের পরেই টলষ্টয় স্ত্রীকে তাঁর দেশের বাড়িতে নিয়ে এলেন,—মস্কোর দু'শ মাইল দক্ষিণে Yasnaya Polyanaয়। সে ১৮৬৮ সাল, তখনো সেখানে রেল বসেনি, ঘোড়ার গাড়ি চ'ড়ে নবদম্পতী দু'শ মাইল পথ ভাঙ্‌ল। সেখানে তারা এক সঙ্গে আটচল্লিশ বছর কাটিয়েছে।

সে-জায়গা থেকে টলষ্টয় তাঁর কবি-বন্ধু Fetকে লিখ্‌ছেন —"এই তিন সপ্তাহ মোটে আমার বিয়ে হয়েছে। আমি এত সুখী হয়েছি ভাই, যে, মনে হচ্ছে আমি ম'রে গেলেও আমার এই আনন্দের অবসান হবে না।"

এই কথার এই হয় ত' মানে যে, টলষ্টয় বিশ্বাস করে-ছিলেন তাঁর এই নবলব্ধ স্ত্রী-সাহচর্য্য থেকে এমন আনন্দ-অমৃত-সৃষ্টি হবে যা টলষ্টয়ের নশ্বর দেহের মত ক্ষীণায়ু নয়, —অনন্ত কালের জন্য তিনি সেই আনন্দ পরিবেষণ ক'রে যাবেন।

আত্মীয়বিচ্ছিন্না নববধূ নির্জ্জন আবাসে স্বামী-সেবায় আত্মোৎসর্গ করলে। সংসার-নির্ব্বাহে তার সমস্ত ত্রুটির ক্ষতিপূরণই হচ্ছে এই পতি-অনুরাগ। বহুসন্তানভাগিনী জননী সমস্ত গৃহ তত্ত্বাবধান করে, ছেলেপিলেদের লেখাপড়া শেখায়, তাদের সমস্ত জামা-কাপড় নিজ হাতে সেলাই ক'রে দেয়। তবু তার সময়ের অভাব নেই, রাত্রিদিন স্বামীর সে পার্শ্বচরী,—সমস্ত রাত জেগে কত দিন সে স্বামীর লেখা নকল ক'রে দিয়েছে।

ঋষি টলষ্টয় ও তাঁহার স্ত্রী আঁদ্রিভ্‌না

অসাধারণ তার জীবন-বল, অটুট তার স্বাস্থ্য,—অসুখ হ'লেও বেশিদিন তাকে শয্যাশ্রয়ী হ'য়ে থাকতে হয়নি। বরং প্রায় সব সময়ে স্বামীরই কোন-না-কোনো অসুখ লেগে আছে,—আঁদ্রিভ্‌না অতন্দ্র সেবিকা, স্নেহোৎসাহদাত্রী সখী! আঁদ্রিভ্‌না সত্যিকারের সহধর্ম্মিণী। সে স্বামীর তপস্যার বাধা ত' ছিলই না বরং নবায়মানা অনুপ্রেরণা ছিল।

স্বামীর স্বাস্থ্যভঙ্গ হ'লেই গ্রাম ছেড়ে আঁদ্রিভ্‌না তাঁকে ভল্‌গা হ্রদ ছাড়িয়ে 'সামারা'র প্রান্তরে বায়ু-পরিবর্ত্তনের জন্যে নিয়ে আসত। এই সুদূর প্রান্তরে এসে জীবন-যাপনে ভয়াবহ কৃচ্ছ্রসাধনা ছিল, তবু স্বামীর স্বাস্থ্য ও কল্যাণ কামনা ক'রে সে নিজের ও সন্তানদের সমস্ত কষ্ট ও অসুবিধাকে তুচ্ছ মনে করত। স্বামীর জন্যে কোনো ত্যাগই তার কাছে বড়ো মনে হ'ত না। রোগা লোকের ছোটখাটো আবদার রেখে, স্বামীর প্রতিটি মনোভাবের তারতম্য বুঝে তার সঙ্গে সুর মিলিয়ে চ'লে আঁদ্রিভ্‌না তার স্বামীকে নিরাময় ক'রে আনত। মেঘ-আনমিত আকাশের মত তার স্নেহ স্বামীকে সর্ব্বদা বেষ্টন ক'রে থাকত,—তার সেবায় অবসাদ ছিল না, সহানুভূতিতে একটি নিরুদ্বেগ সহনীয়তা ছিল।

কিন্তু বিবাহিত জীবনের ষোলো বছর বাদে স্ত্রী যেন শুধু ভক্তি ও ভালবাসা দিয়ে স্বামীর নাগাল আর পেল না,—আঁদ্রিভ্‌না পড়ল পিছিয়ে। টলষ্টয় তখন War and Peace ও Anna Karenina লিখে যশস্বী হয়েছেন। এই সময়ে তাঁর ধর্ম্মজীবনের সঙ্কট-কাল উপস্থিত হ'ল। প্রভূত যশ, প্রচুর অর্থ, প্রকাণ্ড পরিবার—তিনি সবাইর দিকে পিঠ ক'রে দাঁড়ালেন; মাটির ঢেলা তিনি আর কুড়োবেন না। তখন তিনি ধর্ম্মজীবনের সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণতার জন্য লোভী হ'য়ে উঠেছেন। তিনি তখন সত্যের ভিখারী, তাই সাহিত্যিকের আসন ছেড়ে প্রচারকের বেদীতে গিয়ে বসলেন। আঁদ্রিভ্‌না তখন বৃহৎ পরিবারের ভারে ক্লিষ্ট, পরিশ্রান্ত,—সংসার-জীবনের খুঁটিনাটি জিনিসটি পর্য্যন্ত তার মঙ্গলস্পর্শের

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

জন্য চেয়ে থাকে; তাই সে আর স্বামীর পায়ের সঙ্গে পা মেলাতে পার্‌লে না। স্বামীর আধ্যাত্মিক অনুসন্ধানের পথ থেকে আঁদ্রিভ্‌নাকে স্বভাবতই স'রে দাঁড়াতে হ'ল। আঁদ্রিভ্‌নার ছেলে কাঁদে, চাকরের অসুখ করেছে, ঝি আসেনি,—আঁদ্রিভ্‌না সংসারকে অসার মনে ক'রে স্বামীর হাত ধরতে পার্‌লে না। দু'জনের মধ্যে বেদনার কুয়াসা নেমে এলো।

টলষ্টয় তখন চাষাদের সঙ্গে মাঠে গিয়ে লাঙল চালায়, খড় নিয়ে গোলাঘরে রাশীকৃত করে, জুতো সেলাই করতে চেষ্টা করে। William Jennings Bryan একদিন টলষ্টয়কে বলেছিলেন, "আপনার বই আমি পড়্‌তে পারি, কিন্তু আপনার জুতো পায়ে দিতে পার্‌ব না।"

সোফিয়া আঁদ্রিভ্‌না অবশ্যি স্বামীর এই সব বাড়াবাড়ি পছন্দ করত না, বন্ধু টুর্গিনিভেরো আপত্তি ছিল। তবু যা তিনি প্রচার করেন তার সঙ্গে সঙ্গতি রাখ্‌বার জন্য টলষ্টয় চেষ্টার ত্রুটি করেন নি,—তবু তাঁর মহোচ্চ আদর্শের প্রান্তে এসেও দাঁড়াতে পাচ্ছেন না ভেবে তাঁর দুঃখের অবধি ছিল না। আঁদ্রিভ্‌না ধর্ম্মান্বেষণে স্বামীর সহচরী হ'তে না পারলেও তাঁর ধর্ম্মপুস্তকগুলির রসবোধ করতে কুণ্ঠিত হয়নি। টলষ্টয় যখন তাঁর দর্শনগ্রন্থ On Life শেষ করলেন, আঁদ্রিভ্‌না শুধু যে তার রসগ্রহণ ক'রেই ক্ষান্ত হ'ল তা নয়, নিজে আনুপূর্ব্বিক সমগ্র গ্রন্থটি ফরাসী ভাষায় অনূদিত করলে।

ছেলেরা তখন বড়ো হ'য়ে উঠেছে, কেউ কেউ মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়্‌ছে। টলষ্টয় যতই সংসার থেকে অপসৃত হচ্ছিলেন, স্নেহচিন্তাব্যাকুলা আঁদ্রিভ্‌না ততই দু'হাতে সংসারকে আঁকড়ে ধর্‌ছিল। এর মধ্যেই সে তার স্বামীর বহু বইয়ই নতুন সংস্করণ প্রকাশিত করেছে—প্রায় কুড়িটি ভল্যুম্‌,—নিজে প্রতিটি শব্দের প্রুফ্‌ দেখে দিয়েছে। এই নারীর কর্ম্মশক্তি প্রচণ্ড ছিল,—সহানুভূতিও ছিল তেম্‌নি অনবসায়ী। কিন্তু কত সে পড়েছে, এরি মধ্যে পিয়ানো বাজিয়ে কত সে সবাইকে আমোদ দিয়েছে। সে ছিল গৃহিনী, সচিব, শিষ্য, অন্তরবিহারী বন্ধু।

আদর্শের শিখরে উঠ্‌তে পাচ্ছেন না ব'লে টলষ্টয়ের মনে এক সুতীব্র অস্বস্তি ছিল, তাই তিনি মাঝে মাঝে সংসার ত্যাগ ক'রে সুদূরপ্রত্যাশী হ'য়ে পালিয়ে যাবার মত্‌লোব করেছিলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল, তিনি বহু দূর দেশ পর্য্যটন করেন, দুঃখী দরিদ্র চাষাভুষোদের দলে, সন্ন্যাসীর মত, বৌদ্ধ ভিক্ষুর মত। একদিন এই মত্‌লোব ক'রে তিনি তাঁর পরিবারকে উদ্দেশ ক'রে এক মামুলি বিদায়-পত্রও লিখেছিলেন। অবশ্যি সেই পত্রের কল্পনা কার্য্যে পরিণত হয় নি। তাঁর মৃত্যুর পরে সেই চিঠি পাওয়া গেছে।

তাঁর সুদৃঢ় আকৃতিসত্ত্বেও দেহ নীরোগ ছিলো না। যক্ষার ভয়ে একবার তাঁকে সামারার মাঠে এসে নিশ্বাস নিতে হয়েছিল। পরে রোগ স্থানপরিবর্ত্তন ক'রে পাকস্থলীতে গিয়ে আশ্রয় নিলে। বিরাশি বছর বয়সে মানে ১৯১০ সালে তাঁর স্মৃতিশক্তির হ্রাস হয়েছিল,—তিনি পরিবার-পরিজনকে চিন্‌তে পারতেন না।

এই সময়েই কিছু আগে তিনি লুকিয়ে-লুকিয়ে একটি উইল করেন,—তাঁর লেখার সমস্ত স্বত্ব ও অর্থমূল্য তিনি জনসাধারণকে ভোগ করবার জন্য অধিকার দিয়ে যান। সমস্ত সাহিত্যসম্পত্তি টলষ্টয়ের ছোট মেয়ে আলেক্‌জান্দ্রার হাতে যাবে, এবং সেই তা জনসাধারণের হাতে বন্টন ক'রে দেবে—এই ছিল উক্তি। জীবনের শুধু এই ঘটনাটি তিনি আঁদ্রিভ্‌নার থেকে লুকিয়ে রেখেছিলেন।

এই বার টলষ্টয়ের ছেলে লিয়োর কয়েকটি কথা তুলে দিচ্ছি—

"১৯১০ সালের অক্টোবর মাসের গোড়ার দিকে আমাকে প্যারি ফির্‌তে হ'ল। সেখানে এক খবরের কাগজে পড়্‌লাম বাবা বাড়ি থেকে পালিয়েছেন।

মা যখন জেগে দেখ্‌লেন বাবা বাড়ি নেই, তিনি তখন হতাশা ও উদ্বেগে এত বিচলিত হ'য়ে পড়্‌লেন যে আত্মহত্যা করবার জন্য তিনি একটা হ্রদে ঝাঁপ দিলেন।

তাঁকে অবশ্যি বাঁচান হ'ল, কিন্তু বেঁচে তিনি করবেন কি, —কোথায় গেলে বাবাকে পাওয়া যাবে ?

একটি ছোট রেল-ষ্টেশনের ধারে বাবা শুয়ে আছেন। বাড়ি থেকে পালিয়ে যাবার সময় ট্রেনেই তাঁর ভীষণ অসুখ হয়, তাই সেই বিভুঁয়ে তাঁকে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। বাড়িতে খবর এসে গেল। মা যখন গিয়ে পৌছুলেন, ডাক্তার ও নার্স তখন ভিড় ক'রে এসেছে। মাকে জানানো হ'ল যে, তাঁকে দেখলে বাবা খুব বেশি চঞ্চল হ'য়ে উঠতে পারেন, এবং—,তাই মাকে তাঁর রোগশয্যাপার্শ্বে যেতে দেওয়া হ'ল না। বাবা যখন শেষ নিশ্বাস নিচ্ছেন তখনই মা গেলেন,—মা'র বাহু-উপাধানে মাথা রেখে বাবা চোখ বুজলেন। ডাক্তাররা যখন মাকে আসতে দিচ্ছিল না, তখন বাবা বারে-বারে জিজ্ঞেস করেছেন,—"উনি কোথায় ? তোমরা এই সামান্য কথাটা কেন বোঝ না,—আমার অসুখ যে একান্ত তাঁরই।"

বিধবা আঁদ্রিভ্‌না সন্তানসন্ততি নিয়ে শোকাকুলনেত্রে গ্রামগৃহে ফিরে এল,—একা, সঙ্গীহীন, বেদনাবিহ্বল। এর দশ বছর বাদেই পঁচাত্তর বছর বয়সে আঁদ্রিভ্‌না স্বামী-অনুগামিনী হয়।

একটা কথা এখানে ব'লে রাখি। আঁদ্রিভ্‌না জীবদ্দশায় দৈনন্দিন ডায়রি লিখে গেছে। সে-ডায়রি পত্রিকান্তরে ছাপা হচ্ছে। তাতে আঁদ্রিভ্‌নার সঙ্গে টলষ্টয়ের সুস্নিগ্ধ ও সুমধুর বন্ধুতার পরিচয় পেয়ে আমরা মুগ্ধ হই,—এবং আমাদের দেশের মেয়েদের মধ্যে এমনি সহানুভূতিসম্পন্না সহকর্ম্মিনীর দেখা পাব ব'লে আশা করি।

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

সেণ্ট জর্জ্জ গির্জ্জায় কাঠের কাজ

কাঠের উপর ক্ষোদাইয়ের কাজ, আমাদের দেশের প্রাচীন সূত্রধরেরা যে ভালরূপেই জানিত তাহার নিদর্শন আজও বহু প্রাচীন কাঠের সিন্দুক, মন্দিরের দরজা—জানালা, পল্লীগ্রামের বনিয়াদি গৃহস্থদের কোঠাবাড়ীর শাঙায়, আড়ায়; পালঙ্কের ক্ষুরায়, পাওয়া যায়। তাহাদের এক একটির নমুনা দেখিলে অনেক সময়ই বিস্মিত হইতে হয় যে পূর্ব্বকালে, যখন উন্নত প্রণালীর যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত হয় নাই, পরিকল্পনাশিল্পীদের মস্তিষ্ক কোনো শিল্পবিদ্যালয়ের সংযোগে যন্ত্রশিল্পীদের সহিত সহযোগিতা করিয়া দারুশিল্পের উন্নতি সাধন করিতে সমর্থ হয় নাই, তখন এই অনাদৃত পল্লীকারিগরেরা কি ভাবেই না জানি এই সব সুন্দর শিল্পসৃষ্টি করিতে সমর্থ হইত !

বিলাতের দারুশিল্পের যে কয়টি নমুনা-চিত্র আমি সংগ্রহ করিয়াছি তাহা অবশ্য অস্মদ্দেশীয় প্রাচীন সূত্রধরদের শিল্পনমুনাপেক্ষা অনেক বেশী সুন্দর ও সুসম্পন্ন; কিন্তু ইহার কারণও আছে। এই কাঠের কাজগুলি খুব বেশী পুরাতন নয় আর ইংলণ্ডের যন্ত্রশিল্প এমনই সমুন্নত যে এ সকল তাহার সাহায্যে অতি সুচারুরূপে সুসম্পন্ন হইয়াছে। আমাদের দেশীয় সূত্রধরদের মত এগুলি হাতে করিয়া কেহ তৈয়ারী করে নাই। ১৩৩৫ সালের জ্যৈষ্ঠমাসের বিচিত্রায় আমার "অজন্তা ও এলোরার ভাস্কর্য্য তীর্থ" শীর্ষক প্রবন্ধে, ৮৭৪ পৃষ্ঠায় প্রথম চিত্রটি, যাহার নীচে ভ্রমক্রমে ছাপা হইয়াছে "এলোরা পাহাড় কাটিয়া গৃহ" এবং যাহা হওয়া উচিত ছিল—'সুতরকা ঝোঁপ্রা' বা 'সূত্রধরের কুটির' তাহা-ই অতীব প্রাচীন ভারতীয় দারুশিল্পের একটি চমৎকার নিদর্শন। উহা এমনই সুন্দর ও এমনই সুসম্পন্ন যে ভুল করিয়া 'পাহাড় কাটিয়া নির্ম্মিত গৃহ' বলিলেও কেহ চিত্র দেখিয়া সে ভুল ধরিতে পারিবেন না। এই কারণেই ঐ ছাপার ভুল আর সংশোধন না করিয়াই চলিয়া গিয়াছে। সংশোধন না করিবার অবশ্য আরো একটা কারণ এই যে, দেখা যায় ভ্রম করিয়া পর-সংখ্যায় ভ্রম-সংশোধন ছাপাও একটা ভ্রম। কারণ তাহাতে সেই ভুলটিকে

দন্ত

বিজ্ঞাপন দিয়া আরও প্রসিদ্ধ করিয়া তোলা হয়। যাহা হউক এখন কিন্তু দায়ে ঠেকিয়া ভ্রম সংশোধন করিতে হইল, কারণ উহা অপেক্ষা অধিকতর সুন্দর ভারতীয় দারুশিল্পের কোন নমুনা আর নাই। পাঠকেরা মনে রাখিবেন যে উক্ত গৃহটি যে সমস্ত যন্ত্রের সাহায্যে নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহা ইংলণ্ডের ভাগ্যবান আধুনিক সূত্রধরদের উন্নত প্রণালীর যন্ত্রপাতির নিকট কিছুই নহে, এবং উহা এই সংখ্যায় প্রকাশিত বিলাতী কাঠের কাজের নমুনা-চিত্র সমূহ অপেক্ষা বহু প্রাচীন। তথাপি বিলাতী কাঠের কাজের চিত্রগুলির পার্শ্বে উহাকে কতটা বে-মানান দেখাইবে তাহার বিচার-ভার পাঠকদের উপর রহিল। আমরা এখানে সেটিকে পুনর্মুদ্রিত করিলাম। যে নমুনাগুলির পরিচয় এই প্রবন্ধে প্রদত্ত হইল, সেগুলি সমস্তই সেণ্টজর্জ্জ গির্জ্জার অন্তর্গত।

প্রথম চিত্রটি, চতুর্থ এড্ওয়ার্ডের সমাধি ও ধর্ম্মযাজকদের আসনের মধ্যবর্ত্তী পর্দ্দা—ইহা দারুনির্ম্মিত। এটির কারুকার্য্য কি সুন্দর! বিশেষ করিয়া দ্রাক্ষালতার অনুকৃত ক্ষোদাইগুলি ভারী চমৎকার।

সেণ্ট জর্জ্জ গির্জ্জার কোন কোন দরজা পরবর্ত্তী সময়ে নির্ম্মিত হইলেও উহার শিল্পভঙ্গী ও আদর্শ একই রকমের। দরজার উপরকার পেরেকগুলির মাথায় যে পরিকল্পনা বিদ্যমান তাহা উহাদের অপেক্ষাকৃত আধুনিকত্বের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। যদিও গির্জ্জার অন্তর্গত সমস্ত কাঠের কাজ একই শ্রেণীর ও একই আদর্শ-সম্ভূত, তথাপি অপেক্ষাকৃত প্রাচীন কাজগুলির মধ্যে একটি কাঠের কাজ আছে যাহা পর্দ্দার (প্রথম চিত্র দেখুন) সমসাময়িক হইলেও সম্পূর্ণ অন্য কারিগরের তৈয়ারী বলিয়াই স্পষ্ট মনে হয়। কারণ তাহার সমগ্র পরিকল্পনাটি অনেক বেশী সূক্ষ্ম ও নিপুণ। ইহা বর্ত্তমান চ্যাপ্টার ক্লার্কের ঘরের ছাদের ভিতরকার অংশ। ইহাকে এক সময়ে লাইব্রেরী ঘরের ছাদের সহিত একযোগে পলেস্তারা মণ্ডিত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল (উহা সম্ভবতঃ অষ্টাদশ শতাব্দীতে হইয়া থাকিবে); পরে স্যর গিল্বার্ট স্কট্ উহার আবিষ্কার ও উদ্ধারসাধন করেন। পঞ্চদশ শতাব্দীর দারুশিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন, চ্যাপটার ক্লার্কের অফিসঘরের ভিতরকার ছাদ।

'কাষ্ঠ নির্ম্মিত সুতরুক ঝোঁপ্রা'
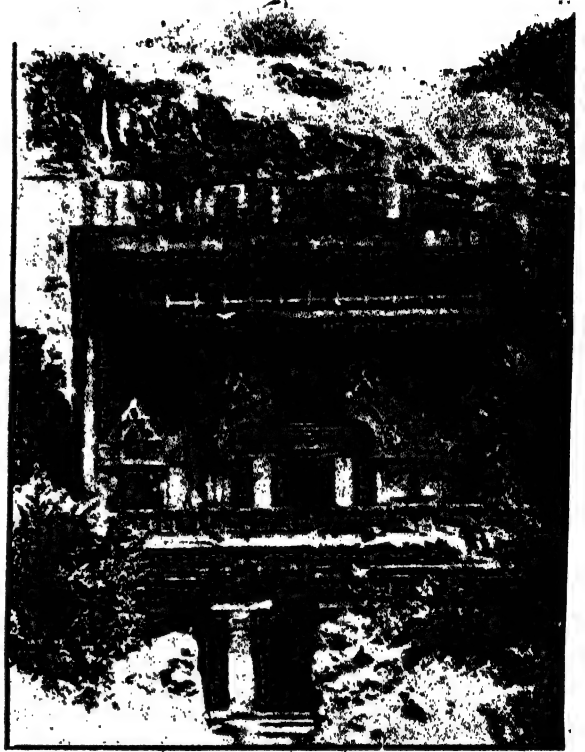
এই কারুকার্য্যটির প্রস্তুত সময় নির্দ্দেশ করা মোটেই শক্ত নয়, কারণ ইহার একটি ক্ষোদাই-চিত্রের মধ্যে ধর্ম্ম-যাজক বুচাম্পের নাম-সহি অঙ্কিত আছে। এই চ্যাপ্টার ক্লার্কের ঘরের ভিতকার ছাদের অনেকগুলি ক্ষোদাই কাজের চিত্র সংগ্রহ করিয়াছি, এখানে কয়েকটার নমুনা দিলাম উহারা এই প্রবন্ধার্গত দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম চিত্র।

যে প্রণালী অবলম্বন করিয়া কাঠের উপর এই ক্ষোদাই করা হইয়াছে, বিশেষজ্ঞেরা বলিয়াছেন যে, তাহা অতীব অদ্ভুত, নূতন, ও যে কোনো জিনিষের প্রতিকৃতি যথাযথ ফুটাইয়া তুলিবার পক্ষে সর্ব্বাধিক উপযোগী। টুক্‌রা টুক্‌রা

ভাবে কোন কোন অংশ প্রথমে তৈয়ারী করিয়া পরে 'স্ক্রু' দিয়া আঁটিয়া দেওয়া হইয়াছে। আদিম ক্ষোদাইগুলির মধ্যে এই 'স্ক্রু' একটা কাঠের চাকৃতীর আবরণে ঢাকা ছিল; পরিষ্কার হইয়াছে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। চতুর্থ চিত্রটিতে শশকের গাত্রমধ্যে একটি 'স্ক্রু'র মাথা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে।
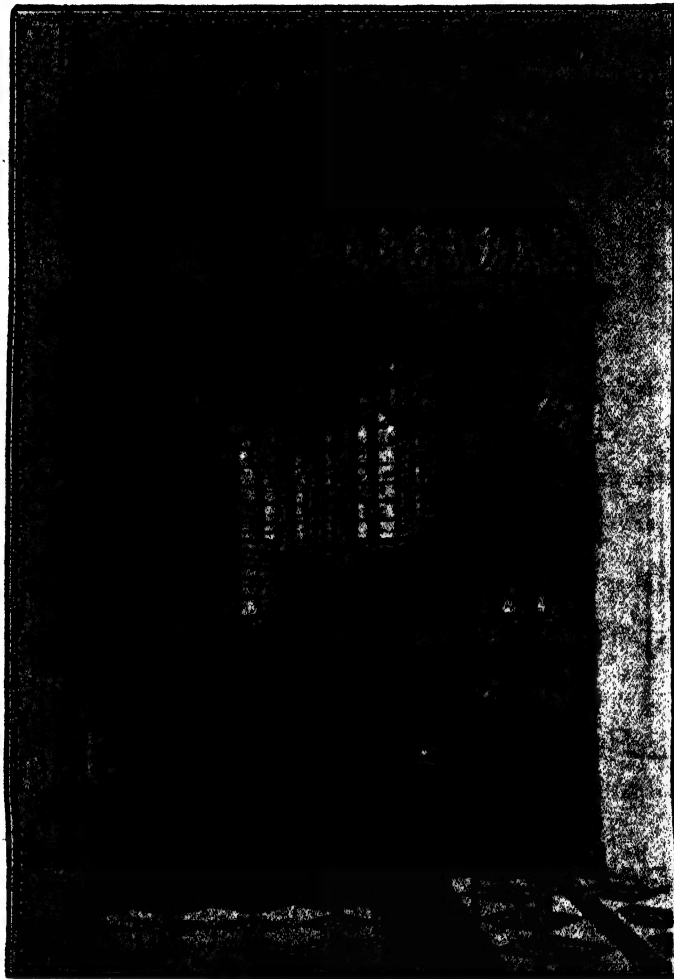
কাঠের পরদা

এখন কিন্তু এই 'স্ক্রু' গুলিকে উন্মুক্ত করিয়া রাখা হইয়াছে। ইহাতে হয়ত দেখিতে এ গুলিকে একটু খারাপ দেখায় কিন্তু কাঠের কাজগুলির নির্ম্মাণ-রহস্য ইহার জন্য যে অপেক্ষাকৃত

চ্যাপ্টার ক্লার্কের ছাদের ভিতরকার ক্ষোদাই-চিত্রের মধ্যে কতকগুলিতে ফুল লতা পাতা আঁকিয়া বাহির করিয়া আনা হইয়াছে; কোনটিতে বা জীবজন্তুর, কোনটিতে

বা সুরাপাত্রের, আবার কতকগুলিতে নরমুণ্ডের চিত্র ও ক্ষোদাই করা হইয়াছে। আমরা এখানে দুইটি নরমুণ্ডের চিত্র দিলাম। চিত্র দুইটি দেখিলেই বেশ মনে হয় যে মাথায় মুকুট-বিশিষ্ট রাজমুণ্ডটি (দ্বিতীয় চিত্র) যে হস্ত ক্ষোদাই করিয়াছে, শিরোভূষণ হীন দ্বিতীয় মুণ্ডটি (পঞ্চম চিত্র) সে হস্তের নহে। সুধু চোখে এম্নি দেখিলে এই দ্বিতীয় মুণ্ডটির কাঠের অমসৃণতা ততটা বোঝা যায় না, কিন্তু আলোকচিত্রে কে জানে কেন সেগুলি যেন একটু বেশী রকমই প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। এই মুণ্ডগুলির সম্বন্ধে জনবাদ এইরূপ—রাজমুণ্ডটি 'এডওয়ার্ড দি কন্‌ফেসার' এর বলিয়াই অনুমিত হয়, কারণ যাঁহাদিগকে এই গির্জ্জাটি উৎসর্গ করা হইয়াছিল, ইনি তাঁহাদের অন্যতম; আর শিরোভূষণ হীন অপর মুণ্ডটি নাকি সেই সূত্রধর শিল্পীর, যিনি শুষ্ক কাঠের বুকে এমন সজীব চিত্রগুলি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। কে জানে এই সকল কিংবদন্তীর মধ্যে কোন সত্য আছে কি না। যাহা হউক, যেটি সূত্রধরের মুণ্ড
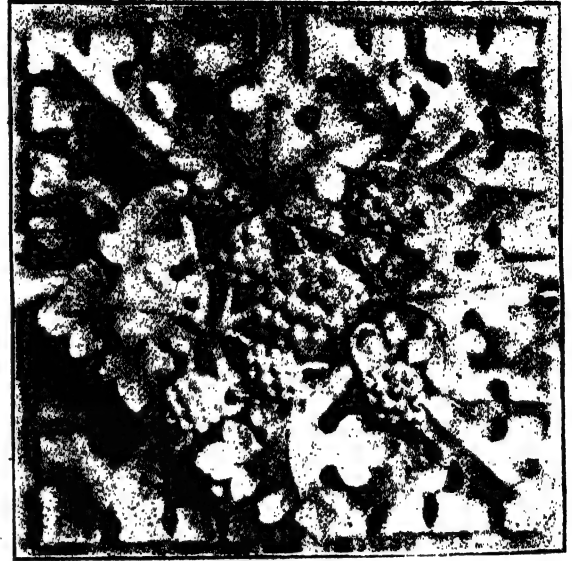
পুষ্পিত কাঠের ক্ষোদাই

বলিয়া উক্ত হয় তাহা এমনই সুন্দর, সূক্ষ্ম ও হুবহু মনুষ্য মস্তকের মত যে, উহার শিল্পকারু ও নিপুণতার নিকট এই ধরণের অন্য সকল চিত্রই পরিম্লান হইয়া যায়। তাই স্বতঃই মনে হয় যে, যে হস্ত ইহাকে নির্ম্মাণ করিয়াছে তাহা কখনই অপর চিত্রের জনক নহে। এই ছাঁদের প্রত্যেক ক্ষোদাই কাজটি বিভিন্ন প্রকারের। দু' একটি বিশেষ বিশেষ ভঙ্গীর নমুনা মাত্র দেওয়া হইল।

রাজমুণ্ড

ষষ্ঠ চিত্রটিতে ধনুকের মত বক্রাকৃতি একটি জানালা দেখা যাইতেছে, উহাকে ইংরাজিতে bow-window বলে, এবং উহা সেণ্ট জর্জ্জ গির্জ্জারই অন্তর্গত। অষ্টম হেন্‌রী, এডওয়ার্ডের কবরের উপরস্থিত গীতমন্দিরের একটি পাথরের জানালা ভাঙিয়া, রাণী ক্যাথেরিন্ অব এ্যারাগনের জন্য এই দারুময় অর্দ্ধবৃত্তাকার বাতায়নটি নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। এই জানালা হইতেই মহারাণী ভিক্টোরিয়া, প্রিন্স অব ওয়েল্‌সের সহিত ডেনমার্ক

রাজকুমারী আলেকজান্দ্রার বিবাহ দেখিয়াছিলেন। গির্জ্জার অন্তর্গত ইহার পরবর্ত্তী প্রস্তর নির্ম্মিত এই দারু বাতায়নের কারুকার্য্য যেমন সূক্ষ্ম বাতায়নের অনুকরণে প্রস্তর-বর্ণেই অনুরঞ্জিত তেমনি সুন্দর! এক সময়ে এই বাতায়নটি এই হইয়াছিল। কিন্তু ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে 'উইলিমণ্ট' কর্ত্তৃক বাতায়ন গাত্রের এই রঙ্ অপসৃত হয় ও তৎপরিবর্ত্তে সেখানে কতকগুলি চিত্র অঙ্কিত হয়।

শোক-শিশু

ক্যাথেরাইন অফ্ আরাগনের বাতায়ন

কারিগরের প্রতিমূর্ত্তি
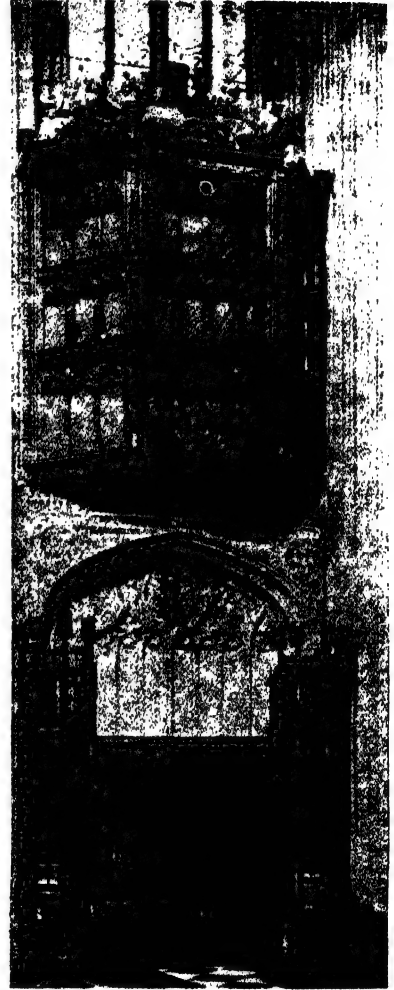
এই জানালার কারু ও চিত্রশিল্পের মধ্যে 'রেনাসেন্স' যুগের ছাপ স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান।

এই গির্জ্জার মধ্যে সর্ব্বশেষে যে সমস্ত কাঠের কাজ করানো হইয়াছিল তাহা দ্বিতীয় চার্লসের

শ্রীরামেন্দু দত্ত

সমসাময়িক। 'কমন্‌ওয়েল্‌থের' সময়ে এই গির্জ্জার উপর বহু অত্যাচার হইয়া গিয়াছে। যদিও ইংলণ্ডের অন্যান্য বহু ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠানের তুলনায় এই গির্জ্জা অনেক কম ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল তথাপি দ্বিতীয় চার্লসের সময় অনেক মেরামতীর কাজ করিতে হইয়াছিল। সে সমস্ত সংস্কার প্রচেষ্টা দেখিলে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, যথোপযুক্ত অর্থের অভাবে 'রেন্' (Wren) সাহেব যে সমস্ত সংস্কার প্রস্তাব দাখিল করিয়াছিলেন তাহার অনেকগুলিই আর কার্য্যে পরিণত করা সম্ভব হইয়া উঠে নাই। কিন্তু যতটা সম্ভব সুন্দর কাঠের কাজ দিয়া এই গির্জ্জার সংস্কার সাধিত হইয়াছিল। কিন্তু এই শেষের শিল্পকার্য্য পূর্ব্বেকার কারিগরদের হাতের কাজ অপেক্ষা অনেক হীন ও অপটুতার পরিচায়ক। এই পরবর্ত্তী দারু

কাঠের অভিষেক জলাধার

উচ্চ পার্শ্ববিশিষ্ট বেঞ্চ

শিল্পের একটা নিদর্শন স্বরূপ আমরা উচ্চপ্রান্তবিশিষ্ট একটি বেঞ্চের চিত্র দিলাম। ছবি হইতে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায় যে, ইহার শিল্পকার্য্য তত সূক্ষ্ম ও সুসম্পন্ন নহে। এরকম বেঞ্চ এই গির্জ্জার মধ্যে আরো অনেকগুলি আছে। এই ধরণের বেঞ্চ অন্য কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না।

আমরা কাষ্ঠনির্ম্মিত একটি 'অভিষেক জলাধারের' (Font) ছবি দিলাম। এই অভিষেক জলাধার, খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার সময় ব্যবহৃত হইয়া থাকে এবং এ গুলি সাধারণতঃ প্রস্তর নির্ম্মিতই হয়। কিন্তু এই চিত্রান্তর্গত জলাধারটি এমন সুগঠিত ও সুপরিচ্ছন্ন যে দেখিলে ইহাকে প্রস্তর নির্ম্মিত বলিয়াই ভ্রম হয়। শ্রীরামেন্দু দত্ত

বাংলা সাহিত্যের পথঘাট

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক

সাহিত্য একটা সহর। তার সদর রাস্তাও আছে গলি-ঘুঁচিও আছে। কেবল সদর রাস্তা জান্‌লেই সহর জানা হয় না। অনেক দেখবার জিনিষ, জানবার জিনিষ, ভাববার জিনিষ গলি-ঘুঁচির দুপাশেও থাকে। নতুন সহরে না থাকলেও পুরোনো সহরে থাকেই। তা ছাড়া বড় রাস্তার বড় বড় দোকানঘরে যে সব জিনিষ ঝকমক্ করে তার বেশীর ভাগই তৈরী হয়—গলি-ঘুঁচির ছোট ছোট কারখানায়। কত অখ্যাত অজ্ঞাত দর্জ্জি সেকরা ছুতোর আঁধার গলির স্যাঁৎসেতে কোণে ব'সে দিন রাত্তির নীরবে কাজ করচে। কাজেই সদর রাস্তার সৌন্দর্য্য ও ঐশ্বর্য্যকে ঠিকভাবে বুঝতে হ'লে গলি-ঘুঁচিতেও ঢোকা চাই।

বাংলা সাহিত্য এখনও নতুন সহর। সে একটু একটু ক'রে গ'ড়ে উঠ্‌চে। তাতে এখন পর্য্যন্ত দু চারটে মোটা মোটা রাস্তারই পত্তন হয়েচে। গল্প, কবিতা, নাটক বা এক কথায় কাব্য জাতীয় রচনাই তার একমাত্র চলাফেরার পথ। কিন্তু অন্য পথ তো এবার পাততে হবে, বোধহয় পাতবার সময়ও এসেছে। তা না পাতলে বাংলা সাহিত্য নিতান্ত ছোটই থেকে যাবে—তার সীমানাও বাড়বে না, লোক-বস্তিও নয়। কাজেই এখন দুচারজন দুঃসাহসিক লোককে কোদাল কুড়ুল ঘাড়ে নিয়ে বেরোতেই হবে—তার মাঠঘাট চাঁচতে, তার বনজঙ্গল কাটতে। এ কাজ কোনো এঞ্জিনিয়ারের নক্সা ধ'রে হবে না—কেন না সাহিত্য ফরমাসী জিনিষ নয়। আর তা নকলনবিশী নয় ব'লে, না চল্‌বে ইংরাজী সাহিত্যের হুবহু নকল, না চলবে সংস্কৃত সাহিত্যের ঐকান্তিক অনুসরণ। তবে ঐ দুই সাহিত্যকে আদর্শ বা 'মডেল্' হিসেবে দেখ্‌লে পথ পাতার সমস্যা যে খানিকটা সোজা হ'য়ে যাবে তা নিশ্চিত।

সহর ও পথের উপমা ছেড়ে দিয়ে এবার সোজা কথায় নাবা যাক্। আমরা সকলেই চাই বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্য গ'ড়ে উঠুক্। এ চাওয়ার মূলে যে কেবল আমাদের দেশপ্রীতি বা মাতৃভক্তি আছে তা নয়। শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরীর ভাষায় বল্‌তে গেলে—'মাতৃভাষাকে স্বপ্রতিষ্ঠ করবার লোভ যে আমরা কিছুতেই সম্বরণ করতে পারি নে, তার কারণ আমরা জানি যে 'সর্ব্বং আত্মবশং সুখং' আর 'সর্ব্বং পরবশং দুঃখং।' তাছাড়া ঐ লেখকই আর এক জায়গায় বলেচেন, 'মনের স্বরাজ্য একমাত্র স্বভাষার প্রসাদেই লাভ করা যায়। সুতরাং সাহিত্যচর্চ্চা আমাদের পক্ষে একটা সখ নয়, জাতীয় জীবনগঠনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়—কেন না এ ক্ষেত্রে যা কিছু গ'ড়ে উঠ্‌বে তার মূলে থাক্‌বে জাতীয় আত্মা এবং জাতীয় কৃতিত্ব।'

এ সত্য শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথও বহুদিন আগে উপলব্ধি ক'রে বলেছিলেন, "আধুনিক শিক্ষা তাহার বাহন পায় নাই। তার সর্ব্বপ্রধান বাধাটা এই দেখিতে পাই যে তার বাহনটা ইংরেজি। বিদেশী মাল জাহাজে করিয়া সহরের ঘাট পর্য্যন্ত আসিয়া পৌছিতে পারে কিন্তু সেই জাহাজটাতে করিয়াই দেশের হাটে হাটে আমদানী রফতানি করাইবার দুরাশা মিথ্যা। যদি বিলিতি জাহাজটাকেই কায়মনে আঁকড়াইয়া ধরিতে চাই তবে ব্যবসা সহরেই আট্‌কা পড়িয়া থাকিবে।

দেশের মনকে মানুষ করা কোনমতেই পরের ভাষায় সম্ভবপর নহে। আমরা লাভ করিব কিন্তু সে লাভ আমাদের ভাষাকে পূর্ণ করিবে না, আমরা চিন্তা করিব কিন্তু সে চিন্তার বাহিরে আমাদের ভাষা পড়িয়া থাকিবে, আমাদের মন বাড়িয়া চলিবে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ভাষা বাড়িতে থাকিবে না,—সমস্ত শিক্ষাকে অকৃতার্থ করিবার এমন উপায় আর কি হইতে পারে?

তার ফল হইয়াছে, উচ্চ অঙ্গের শিক্ষা যদি বা আমরা পাই, উচ্চ অঙ্গের চিন্তা আমরা করি না। কারণ চিন্তার স্বাভাবিক বাহন আমাদের ভাষা। বিদ্যালয়ের বাহিরে

বাংলা সাহিত্যের পথ ঘাট

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক

আসিয়া পোষাকী ভাষাটা আমরা ছাড়িয়া ফেলি, সেই সঙ্গে তার পকেটের সঞ্চয় আলনায় ঝোলানো থাকে। যেমন এমন রোগী দেখা যায় যে খায় প্রচুর অথচ তার হাড় বাহির হইয়া পড়িয়াছে, তেম্‌নি দেখি আমরা যতটা শিক্ষা করিতেছি তার সমস্ত আমাদের সাহিত্যের সর্ব্বাঙ্গে পোষণ সঞ্চার করিতেছে না। খাদ্যের সঙ্গে আমাদের প্রাণের সঙ্গে সম্পূর্ণ যোগ হইতেছে না। তার প্রধান কারণ আমরা নিজের ভাষার রসনা দিয়া খাই না, আমাদের কলে খাওয়ানো হয়, তাতে আমাদের পেট ভর্ত্তি করে, দেহপূর্ত্তি করে না।"

আমিও আমার এক প্রবন্ধে ঠিক এই কথাই বলেছিলাম।—'যতক্ষণ পর্য্যন্ত না মাতৃভাষা জ্ঞান ও সত্যের বাহন হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত বস্তু ও মনের মধ্যে একটা দুর্ভেদ্য ব্যবধান থেকে যাবেই। আমরা যতই বিভাষালব্ধ জ্ঞানকে মনে মনে তরজমা ক'রে নিই না কেন তবু সে জ্ঞান আলেয়ার মত দূরে দূরেই স'রে বেড়াবে। পর ভাষার পলকাটা কাচের মধ্য দিয়ে যে জ্ঞানের আলো মনের দর্পণে প্রতিফলিত হয়, তা সে জ্ঞানের স্বরূপ নয়, ছিন্ন বিচ্ছিন্ন বর্ণচ্ছটা। তার মধ্য দিয়ে বস্তুকে প্রত্যক্ষ করাও যা আর কাঁটা চামচে দিয়ে ভাত খাওয়া কি পর্দার আড়াল থেকে মুখ দেখাও ঠিক তাই।'

বাংলা-সাহিত্য যে গ'ড়ে তুলতে হবে তা অনেকেই বোঝেন, কিন্তু এটা হয় ত ঠিক বোঝেন না—সাহিত্য বলতে কি বোঝায়। কাব্য ও সাহিত্য যে সম-পরিসর নয়, অর্থাৎ সাহিত্য যে কাব্যের চেয়ে একটু বেশী ব্যাপক এই কথাটাই বোঝা আজকাল বেশী দরকার হ'য়ে পড়েচে। আজকাল মাসিকপত্রের পাতা ওল্টালেই দেখি গল্প আর কবিতা, যেন ও ছাড়া আর সাহিত্যের কোন দিক নেই। শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরীর আর একটি লেখা এইখানে না উদ্ধৃত ক'রে পারলুম না। তিনি লিখেচেন, 'বঙ্গ সাহিত্য যতদিন কেবল-মাত্র গল্প ও গানের গণ্ডীর ভিতর আটক থাক্‌বে ততদিন শিক্ষিত সমাজে বঙ্গভাষা যথার্থ প্রতিষ্ঠালাভ করতে পারবে না। কেন না, শ্রেষ্ঠকাব্য সাহিত্যের মুকুট মণি হ'লেও সমস্ত কথা ও গাথা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর পদার্থ। নিকৃষ্ট কাব্যসাহিত্যের পরিমাণ বৃদ্ধি হওয়াতে কোন সাহিত্যেরই গৌরব বৃদ্ধি হয়না এবং অক্ষম হস্তের অযত্নপ্রসূত গান ও গল্প প্রায়ই উৎকৃষ্ট হয় না; কেননা যথার্থ কাব্যসৃষ্টির জন্য চাই স্রষ্টার প্রাক্তন সংস্কার এবং অসামান্য প্রতিভা। এবং সকলেই অবগত আছেন যে প্রতিভাশালী লেখক এবেলা ওবেলা হাটে বাজারে মেলেনা।'

খুব সত্য কথা। কবিত্ব যদি না দুর্লভ বস্তু হতো তা হ'লে কালিদাস পর্য্যন্ত ভয়ে ভয়ে লিখ্‌তেন না—

'মন্দঃ কবিযশঃপ্রার্থী গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাম্
প্রাংশু লভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ।'

কিন্তু আজকালকার বামনরা গাছের ফল পাড়া দূরে থাক্ চাঁদ পাড়বার জন্য হাত বাড়ান্—উপহাসের তোয়াক্কা রাখেন না—এবং মন্দত্বের পরিচয় দিয়েও মন্দ বল্‌লে চ'টে আগুন হ'ন। তাঁদের বোঝা উচিত যে কবি শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক হ'লেও—সাহিত্যিক মাত্রেই কবি ন'ন—অর্থাৎ কবি না হ'য়েও মানুষ সাহিত্যিক হ'তে পারে।

কাব্য হৃদয়ের ভাবকে আশ্রয় ক'রে বিশেষ ভাবে আমাদের সৌন্দর্য্য বুদ্ধিকে আঘাত করে। বা বঙ্কিম চন্দ্রের ভাষায় 'চিত্তবৃত্তির বেগের সমুচিত বর্ণনা দ্বারা সৌন্দর্য্যের সৃজনই কাব্যের উদ্দেশ্য।' সুতরাং হাস, করুণা, শৃঙ্গার প্রভৃতি ভাব যখন ভাষার ভঙ্গীতে, ছন্দে, অলঙ্কারে, চিত্রে, কল্পনায় সাকার হ'য়ে কাব্যের অঙ্গীভূত হয় তখন তার নাম হয় রস। রস মানেই কবিত্ব, কবিত্ব মানেই সৌন্দর্য্য। কিন্তু কাব্যগত সৌন্দর্য্যের সারতত্ত্বের কোন মূল সূত্র এখনো আবিষ্কৃত হয়নি; সে এখনো সংজ্ঞার অতীত। সে যে বুদ্ধিকে স্পর্শ করেনা তা নয় কিন্তু তার মুখ্য উদ্দেশ্য জ্ঞান নয়, সৌন্দর্য্য, যেমন কাব্য ভিন্ন অপরাপর সাহিত্যের মুখ্য উদ্দেশ্য সৌন্দর্য্য নয়, জ্ঞান। এই অপরাপর সাহিত্যের বিষয় হচ্চে বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্ম্মশাস্ত্র, ব্যবহারশাস্ত্র, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি। কিন্তু এই সমস্ত বিষয়ের রচনা তখনই সাহিত্যপদবাচ্য হয়, যখন তা মুখ্যভাবে না হ'লেও গৌণভাবে আমাদের সৌন্দর্য্য-বুদ্ধিকে আঘাত করে। এমন বিজ্ঞানের বই আছে যা আমরা গল্পের মতই আগ্রহের সঙ্গে পড়ি—। ফরাসী

দার্শনিক বার্গসেঁার দর্শনগ্রন্থ শুধু সাহিত্য নয় উৎকৃষ্ট কাব্য।

তা হ'লে বোঝা যাচ্ছে সাহিত্যকে যে চিত্তরঞ্জন করতেই হবে তার কোন মানে নেই কিন্তু জ্ঞাপন তাকে করতেই হবে। এই জ্ঞাপনকার্য্য যতটা সুন্দরভাবে, নিপুণভাবে, সুকৌশলে (artistically) করা যায় ততই ভাল, ততই সাহিত্যের কষ্টিপাথরে তার দর বাড়বে। অলঙ্কার শাস্ত্রে যা সাহিত্যমাত্রেরই গুণ ব'লে উক্ত আছে—যাকে আধুনিক ভাষায় বলা যায় রচনাভঙ্গীর উৎকর্ষ (qualities of style) যথা, স্পষ্টতা (clearness) প্রাঞ্জলতা (perspecuity) সরলতা (directness) চিত্রবহুলতা (picturesqueness)—তা বিজ্ঞান লেখককেও মানতে হবে ইতিহাস লেখককেও মানতে হবে। এই জন্যই সাহিত্যরচনাও যার তার কাজ নয়। "ঐ ধ্যান ঐ জ্ঞান না করলে সাহিত্যের যথার্থ চর্চ্চা করা হয় না।" হেলা ফেলার পুষ্পাঞ্জলিতে অন্য যে দেবতারই হোক্, সরস্বতীর পূজা হয় না। কেননা এটা ভুল্লে চলবেনা—'মানুষে সাহিত্যে যে ভাবের ঘর বাঁধে তা খেলার ঘর নয় মনের বাসগৃহ।'

সাহিত্যকে তা হ'লে আমরা দুভাগে ভাগ করতে পারি—একভাগে পড়ে রসসাহিত্য বা কাব্য, অপর ভাগে পড়ে জ্ঞান বিজ্ঞানের সাহিত্য বা বিদ্যা। বিদ্যার কারবার প্রধানত সত্য নিয়ে—কাব্যে সত্য ও সুন্দরের অবিচ্ছেদ্য মিলন। কাব্য যে সাহিত্যের শীর্ষস্থান অধিকার করে, তার কারণ একমাত্র কাব্যেই 'জ্ঞানের ভাষা, কর্ম্মের ভাষা ও ভক্তির ভাষা এই ত্রিধারার ত্রিবেণী-সঙ্গম হয়।' কিন্তু ঐ ত্রিবেণী-সঙ্গমের ঘূর্ণিপাকে পাড়ি দিতে যাওয়া মানেই যে অবার্থ নৌকাডুবি, তা কাঁচা মাঝিদের অন্তত বোঝা উচিত।

রস জিনিষটা বড়ই মধুর। তার প্রতি লোভ শতকরা নিরনব্বই জন লোকেরই আছে। কিন্তু সারকে উপেক্ষা ক'রে শুধু রসের চর্চ্চা করা একটা দুষ্প্রবৃত্তি। এ প্রবৃত্তি গাছের নেই। তার শরীরে রসও আছে সারও আছে। আমরা নিছক রসসাহিত্যের সঙ্গে যদি একটু সারবান সাহিত্যেরও চর্চ্চা করি, তা হ'লে বোধ হয় সাহিত্য-দেহের পরিপুষ্টি হয়। বর্ত্তমানে বাংলা সাহিত্যের দিকে চাইলেই একটা অসমতা এবং অসামঞ্জস্য আমাদের নয়ন মনকে ব্যথিত করে এবং সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়ে দু একটা বিজ্ঞাপনের ব্যঙ্গ চিত্র যাতে মাথার অনুপাতে দেহটা হচ্চে ঠিক ধামার অনুপাতে খড়কেকাঠি।

অন্যদেশের ভাষার কারখানায় যেমন কাব্যও গড়া হচ্চে তেমনি বিদ্যার সাহিত্যও গড়া হচ্চে—কিন্তু আমাদের দেশে বিদ্যার সাহিত্য দু একজন অক্ষম লোকের লেখা স্কুল-বুকেই পর্য্যবসিত। কাজেই আমাদের ভাষায় আমাদের ছেলেদের উচ্চশিক্ষা দেওয়া দূরে থাক্ নিম্নশিক্ষা দেওয়াও দুর্ঘট। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষেরা যদি আজ বলেন বাংলা-ভাষাতেই সমস্ত শিক্ষা দেওয়া হবে—পাঠ্য পুস্তক নির্ণয় কর, তাহলে আমাদের মুখ চাওয়া চাওয়ি ক'রে মাথা চুলকানো ছাড়া উপায় নেই।

যারা জ্ঞানকে শ্রদ্ধা করে তারা জ্ঞানের কোন বিষয়কেই অনাদরের চক্ষে দেখেনা। তাদের কাছে কোন বিষয়ই তুচ্ছ নয়। তারা নিত্য নূতন বিষয়কে সাহিত্যের গণ্ডীর মধ্যে টেনে নেয়। ইংরাজী ভাষার দাবাখেলারও literature আছে, শিষ্টাচারেরও literature আছে, দোকানদারিরও literature আছে। সাহিত্যের যজ্ঞোপবীত গলায় দুলিয়ে চুরিবিদ্যাও একদিন তার শূদ্রত্ব হারিয়ে 'চৌর্য্য শাস্ত্র' নামে আখ্যাত হয়েছিল এবং সে আমাদেরই এই কাব্যবাতিকগ্রস্ত দেশের কোনো এক প্রাচীন যুগে। সাহিত্যিকের লেখনী স্পর্শমণি, তা ইতর ধাতুকেও স্বর্ণের আভিজাত্য দিতে পারে। কিন্তু অভাব যে সাহিত্যিকেরই।

কিন্তু কেন এ অভাব? বাংলা দেশে কি চিন্তাশীল একনিষ্ঠ সাহিত্যসাধক নেই? আছে—তবে যে সারবান বিদ্যার সাহিত্যে বাংলা ভাষা এখনো দরিদ্র, তার হয়ত এমন কতকগুলি গুরুতর প্রতিবন্ধক আছে যা অনুসন্ধান ক'রে দূর করতে হবে।

একটা কারণ আমরা পূর্ব্বেই ধরেছি। বাঙালী জাতটা বড়ই ভাবুক, রসিক, কবিত্বপ্রিয়। তার ফলে সে যত শীঘ্র উচ্চ কাব্যের সমজদার হ'তে পারে, এত শীঘ্র বোধ হয় আর কোন জাতই পারে না। কিন্তু সুন্দরের ভক্ত হ'লেই

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক

যে সুন্দরের মন্দির গড়তে পারবে এমন কি কথা আছে? তার জন্য যে শক্তির টীকার দরকার তা বেশী লোকের কপালে ভগবান আঁকেন না। কিন্তু ঐ মন্দির গড়বার রোক আমাদের অধিকাংশকেই এমন পেয়ে বসেচে—ঐ রোগ নেশার বিড়ম্বনায় আমরা এতই মত্ত যে, আমাদের খেয়াল নেই যে আমাদের পিতৃপিতামহের জ্ঞানের চালাটুকুও জীর্ণ সংস্কারের অভাবে ভেঙ্গে পড়চে—যা ছিল আমাদের যৎকিঞ্চিৎ মাথা গোঁজার সম্বল। আমাদের এ রোগের সংস্কৃত নাম হচ্চে দুর্ব্বুদ্ধি ও দুরাকাঙ্ক্ষা—এবং সাদা বাংলায় একেই বলে 'হেলে ধরতে পারি না, কেউটে ধরার সাধ'।

আর একটা কারণের ইঙ্গিত দিয়েচেন বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ দুজনেই। সে কারণ হচ্চে এই। আমরা স্বার্থপর। যে জ্ঞান আমরা বিলাতী ভাষার প্রসাদে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মারফৎ প্রাপ্ত হচ্চি তা আমাদের দু'চার-জনের মাথায় মাথায় ঘুরে বেড়াচ্চে, দেশের গায়ে বসতে পারচে না। আমাদের বাংলা-নবীশরা থেকে যাচ্ছে যে তিমিরে সে তিমিরে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—শিক্ষার ভোজে আমরা নিজেরা ব'সে খাচ্ছি, পাতের প্রসাদটুকু পর্য্যন্ত আর কোনো ক্ষুধিত পায় কি না পায় সেদিকে আমাদের খেয়ালই নেই।

বঙ্কিম চন্দ্রের ভাষা আরো স্পষ্ট, আরো তীব্র। কয়েক ছত্র হুবহু তুলে দিচ্চি :'কেন যে ইংরেজি শিক্ষা সত্ত্বেও দেশে লোক শিক্ষার উপায় হ্রাস ব্যতীত বৃদ্ধি পাইতেছে না তাহার মূল কারণ বলি—শিক্ষিতে অশিক্ষিতে সমবেদনা নাই। শিক্ষিত অশিক্ষিতের হৃদয় বুঝে না। শিক্ষিত অশিক্ষিতের প্রতি দৃষ্টিপাত করে না। মরুক্ রামা লাঙ্গল চষে, আমার ফাউলকারি সুসিদ্ধ হইলেই হইল।'

দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দুজন মনীষী যে অনুযোগের অবতারণা করেছেন, তাকে কাল্পনিক ব'লে উড়িয়ে দেবার স্পর্দ্ধা আমার নেই। আমি সাধারণ ভাবে স্বীকার ক'রে নিচ্ছি এর সত্যতা, কিন্তু এ কথা স্বীকার করতে পারচি না যে একজন শিক্ষিতেরও সমবেদনা নেই অশিক্ষিতের জন্য। তবে দুঃখের বিষয় এই যে যেখানে সমবেদনা আছে সেখানেও তা ফলপ্রদ হ'তে পারচে না। তথাকথিত শিক্ষিতেরা এতই মাতৃভাষার কোল হ'তে বিচ্ছিন্ন যে মাতৃভাষায় তারা আত্ম-প্রকাশ করতে অক্ষম। তাদের বিলাতি বিদ্যা মনের নোটবুকেই টোকা থাকে, মুখের কথায় ফুটতে সাহস করে না। তা ছাড়া সেই আড়ে-গেলা বিদ্যা এতই কম জীর্ণ হয় যে, তার কণিকামাত্রও রক্তে পরিণত হয় না। আর নীরক্তকে injectionএর সাহায্য দিতে হলে নিজস্ব রক্ত দেওয়া ছাড়া উপায় নেই।

তিন নম্বর কারণটি খুঁজতে খুজতে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ হ'তেই পেয়ে গেলাম—"বাংলা ভাষায় উঁচুদরের শিক্ষাগ্রন্থ কই? নাই—সে কথা মানি কিন্তু শিক্ষা না চলিলে শিক্ষাগ্রন্থ হয় কি উপায়ে? শিক্ষাগ্রন্থ বাগানের গাছ নয় যে, সৌখীন লোকে সখ করিয়া তার কেয়ারি করিবে—কিম্বা সে আগাছাও নয় যে মাঠে বাটে নিজের পুলকে নিজেই কণ্টকিত হইয়া উঠিবে। বাংলা ভাষায় উচ্চ অঙ্গের শিক্ষাগ্রন্থ বাহির হইতেছে না এটা যদি আক্ষেপের বিষয় হয় তবে তার প্রতিকারের একমাত্র উপায় বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলায় উচ্চ অঙ্গের শিক্ষা প্রচলন করা। দেশে টাকা চলিবে না অথচ টাঁকশাল চলিতেই থাকিবে এমন আবদার করি কোন্ লজ্জায়?"

অন্যায় আবদারের মত লজ্জার জিনিষ খুব কমই আছে সত্য, কিন্তু আমি জিজ্ঞাসু শিষ্যের ন্যায় যারপর নাই সবিনয়ে রবীন্দ্রনাথকে প্রশ্ন করি যে, টাঁকশাল না চল্‌লেই বা টাকা চল্‌বার সম্ভাবনা কোথায়? সাঁতার শিখে জলে নাবা এবং জলে নেবে সাঁতার শেখা এ দুটো সমস্যার কোন্‌টার মীমাংসা অগ্রিম? আর ইউনিভারসিটির ক্ষুরে যারা না মাথা মোড়াবে তারাই যে আধুনিক মনুসংহিতার শূদ্র, তাদের কানে যে উচ্চ শিক্ষার মন্ত্র চলবে না (আমি রবীন্দ্রনাথের ভাষাই ব্যবহার করচি) সুতরাং তাদের জন্য শিক্ষাগ্রন্থ তৈরী করা যে সৌখীন লোকের সখ ক'রে বাগান তৈরী করবার মতই বে-গরজী কাজ, তাই বা কি ক'রে বলি?

আমার মনে হয় রবীন্দ্রনাথ আসল যে কথাটি বল্‌তে গিয়েও শ্রুতিকটুত্বের জন্য মুখ ফুটে বলতে পারেননি সে

হচ্চে এই যে, যে শিক্ষাগ্রন্থ কেবল দশের মুখ চেয়েই লেখা হয়, স্কুল কলেজের পাঠ্য তালিকার দিকে চেয়ে নয়, তা বে-গরজী না হ'লেও বে-ফয়দা এবং যা বে-ফয়দা তা আখেরে বে-গরজী হ'তেও বাধ্য। আমাদের দেশের সরস্বতীর পূজারী বা সাহিত্যিকগণ এতই নিঃস্ব যে, তাঁরা ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে একান্তই অক্ষম ; তা সে মোষের শৃঙ্গের তাড়নায় যদি বুনো ভাইদের ঘর বাড়ী উৎসন্নও হ'য়ে যায়। বিদ্যার প্রতি অহেতুক অনুরাগ দশের মধ্যে এতই ক্ষীণ শিখায় জ্বলচে যে, তাদের মুখ চেয়ে বই লিখতে ব্রতী হওয়া মানেই উপবাসকে বরণ ক'রে নেওয়া। কিন্তু এ সমস্যার কি কোনই মীমাংসা নেই? কৈ আর আছে? আমাদের ধনীবৃন্দেরা বিদ্যাবিস্তারের জন্য যে বিশেষ মাথা ঘামান বা সাহিত্যগ্রন্থের দৈন্যের জন্য যে তাঁদের সুনিদ্রার বিশেষ ব্যাঘাত হয় এমন ত মনে হয় না। তাঁরা অবশ্য ইচ্ছা করলে দরিদ্র সাহিত্যিকদের দিয়ে অনেক বড় জিনিষ তৈরী করিয়ে নিতে পারেন এবং দেশের মধ্যেও তা অকাতরে ছড়িয়ে দিতে পারেন, কিন্তু তাঁদের বদান্যতা ব্যক্তিগত বিলাস বাসনকে ছাপিয়ে গিয়ে বড় জোর সরকারী খাতে পড়বার মতই অবশিষ্ট থাকে। সরকারী খাতকে ছাপিয়েও যদি কিছু উদ্বৃত্ত থাকে এবং তা যদি সরাসর ব্যাঙ্কে না গিয়ে যশোলিপ্সার মধ্যে হুমড়ি খেয়ে পড়ে—তা হ'লেও বড় জোর একটা দরিদ্রনারায়ণের ভোজের ব্যবস্থা, কি একটা অনাথাশ্রম, কি একটা দাতব্য চিকিৎসালয়েই নিঃশেষিত হয়। হায় বিবেকানন্দ! তোমার মত মূর্খেরাই চিরদিন চীৎকার ক'রে বলে—'অন্নদানের চেয়ে প্রাণদান শ্রেষ্ঠ, প্রাণদানের চেয়ে বিদ্যাদান শ্রেষ্ঠ।' তোমাদের কথার প্রতিধ্বনি পাহাড়ের গায়ে বাজতে পারে কিন্তু ধনীদের বুকে বাজেনা।

জ্ঞানের পথ অনন্ত—সাহিত্যের পথও তাই। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের পথ কে-ই কাটে, কে-ই বা পাতে? যার শক্তি আছে, তার সামর্থ্য নেই, যার সামর্থ্য আছে, তার প্রবৃত্তি নেই। সরকারের সুদৃষ্টি ছাড়া তার পথ ঘাট কি খোলসা হবে?

২৫

সেদিন রাত্রে বিদায়-কালে ছবি শেষ করবার সময়ের বিষয়ে বিনয় কমলাকে যে আন্দাজ দিয়েছিল কার্য্যকালে তা দ্বিগুণ হ'য়ে গেল। প্রত্যহ ঘণ্টা দুই ক'রে নিরবসর পরিশ্রমের দ্বারাও আটদিনের আগে ছবি শেষ হ'ল না। আট দিনের দিন ছবি আঁকার পর তুলি রং প্রভৃতি গুছোতে গুছোতে বিনয় বল্‌লে, "ছবি আঁকা শেষই হয়েছে—শুধু কাল একবার অল্পক্ষণের জন্যে এসে মিলিয়ে দেখ্‌ব। নিতান্ত দরকার বুঝ্‌লে দু একটা মাত্র টান দেবো—না দিতেও পারি। আজ অল্প সময়ের মধ্যে এত বেশি কাজ হয়েচে যে, আজ দেখে ঠিক ঠাওর করতে পারব না।" তারপর কমলার দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে মৃদু হেসে বল্‌লে, "এবার আপনার অব্যাহতি মিস্ মিত্র,—কিন্তু অনেক কষ্টভোগের পর।"

উত্তরে কমলা কিছু বল্‌লে না; শুধু মুহূর্ত্তের জন্য ওষ্ঠাধরে, অপরাহ্ণ-দিগন্তের নিঃশব্দ বিদ্যুৎপ্রভার মত, ক্ষীণ-হাসির রেখা দেখা দিয়ে মিলিয়ে গেল।

অদূরে একটা ইজি-চেয়ারে অর্দ্ধশায়িত হ'য়ে দ্বিজনাথ ছবি আঁকা দেখছিলেন, বিনয়ের কথায় সোজা হ'য়ে উঠে ব'সে বল্‌লেন, "কষ্টভোগের পর কি-না তা জানি নে, কিন্তু অনেক কষ্ট দিয়ে তা নিশ্চয়। এ ক'দিন তুমি যে-ভাবে ছবি এঁকেছ তা দেখে মাঝে মাঝে সত্যিই আমার কষ্ট হ'ত বিনয়,—মনে হ'ত, মনকে অত বেশি একাগ্র করতে গিয়ে মনকে তুমি অতি মাত্রায় পীড়ন করছ।"

একটু হেসে মৃদুস্বরে বিনয় বল্‌লে, "কিন্তু, আমি ত দেখি, একাগ্র না হ'তে পারলেই মন যেন বেশি পীড়া পায়।"

বিনয়ের কথায় মনোযোগ না দিয়ে আসন ত্যাগ ক'রে উঠে এসে কমলার ছবির সম্মুখে দাঁড়িয়ে প্রসন্নমুখে দ্বিজনাথ বল্‌তে লাগলেন, "কিন্তু কষ্ট যেমন তুমি করেছ,ফলও পেয়েছ তেম্‌নি! এ কি সহজ ছবি হয়েচে? এমন একখানা ছবি কি যেখানে সেখানে দেখ্‌তে পাওয়া যায়? এ-তো শুধু কমলার মূর্ত্তি নয়,—এ যেন কমলাকে আশ্রয় ক'রে তুমি কমলাসনার মূর্ত্তিখানি এঁকেছ বিনয়।" তারপর সন্তোষের দিকে চেয়ে বল্‌লেন, "তুমি সেদিন যে কথা বল্‌ছিলে সন্তোষ, তা'তে কোনো ভুল নেই,—এ ছবিতে কমলাকে অনুকরণ করা হয় নি—সৃষ্টি করা হয়েচে।"

বারান্দার প্রান্তে একটা চেয়ারে উপবেশন ক'রে সন্তোষ গর্কির একখানা উপন্যাস পড়ছিল, দ্বিজনাথের কথায় উঠে এসে ছবির সামনে দাঁড়িয়ে ক্ষণকাল নিঃশব্দে ছবিখানার দিকে তাকিয়ে রইল; তারপর ধীরে ধীরে বল্‌লে, "আপনি কিন্তু এ কয়েকদিনে ছবিটা অনেক বদলে দিয়েছেন বিনয় বাবু। আমি এসে যে উজ্জ্বল প্রফুল্ল মূর্ত্তি দেখেছিলাম—একটা বিষাদের ছায়াপাতে আপনি তা ঢেকে দিয়েছেন।"

দ্বিজনাথ বল্‌লেন, "কিন্তু তাতে বোধ হয় ছবিটা আরো ভালই হয়েচে। প্রফুল্লতা যত উজ্জ্বলই হ'ক না কেন, বিষাদের কমনীয়তা তাকে স্পর্শ না ক'রে থাক্‌লে সে হয় হাল্কা। তুমি ভাল ক'রে লক্ষ্য ক'রে দেখো প্রত্যেক সুন্দর হাসিকে

কমনীয় করে চোখের কোণের ছল্‌ছলে ভাব,—কিম্বা ঠোঁটের পাশের বিষাদের টান ;—তার অভাবে হাসি হয় একেবারে নীরস উগ্র—যেমন মাঝে মাঝে দেখা যায় সিগারেটের টিকিটের ছবিতে কিম্বা বিলিতি তৃতীয় দরের ম্যাগাজিনে।"

বিনয় কিছু না ব'লে দ্বিজনাথের দিকে একবার দৃষ্টিপাত ক'রে একটু হাস্‌লে, তারপর আর সকলের সঙ্গে দাঁড়িয়ে ছবিখানা দেখ্‌তে লাগ্‌ল। ছবির অধরপ্রান্তে বিষাদ-মেদুর সুমিষ্ট হাস্য, নেত্রদ্বয়ে অতল গভীর দৃষ্টি, মুখমণ্ডলে অনির্ব্বচনীয় বেদনার স্তিমিত মাধুরী ;—সমস্ত ভঙ্গিটি আলো-ছায়া-খচিত বর্ষা-দিনান্তের কথা মনে করিয়ে দেয়। মুগ্ধ চিত্তে সকলে অপরূপ রূপমণ্ডিত চিত্রখানি দেখ্‌তে লাগ্‌ল—এমন কি বিনয়-কমলাও।

যাবার সময় বিনয় বল্‌লে, "কাল আমি সকালে না এসে বিকেলের দিকে আসব। সকালে আমি দেওঘরে থাক্‌ব না।"

দ্বিজনাথ জিজ্ঞাসা করলেন, "কোথায় যাবে ?"

বিনয় বল্‌লে, "মধুপুর। আমার একটি বন্ধু পীড়িত হ'য়ে চেঞ্জে আসচেন। একবার দেখে-শুনে আস্‌ব।"

"কটার গাড়িতে যাবে ?"

"সম্ভবত আজ রাত্রি সাড়ে দশটার গাড়িতে। আমার বন্ধু পৌছবেন রাত্রি একটার সময়, আমি তার কিছু আগে মধুপুরে পৌছব। আমার আঁকবার সাজ-সরঞ্জাম গুলো আজ এইখানেই রইল—কাল পাঁচটার গাড়িতে ফিরে ষ্টেশন থেকে একেবারে এখানে আস্‌ব।"

দ্বিজনাথ বল্‌লেন, "তা হ'লে তুমি ও-বেলা সন্ধ্যার সময়ে এখানে এসো ; এখান থেকে রাত্রে খেয়ে-দেয়ে গাড়িতে গিয়ে উঠ্‌বে।"

মৃদু হেসে বিনয় বল্‌লে, "আজ্ঞে, না,—তার আর কাজ নেই। আমি রাত্রি সাড়ে দশটার গাড়িতেও যেতে পারি, সন্ধ্যা ছটার গাড়িতেও যেতে পারি, এখনো একেবারে স্থির করতে পারিনি।" তারপর নিমন্ত্রণ অস্বীকার করায় দ্বিজনাথ ক্ষুণ্ণ হয়েচেন বুঝ্‌তে পেরে সান্ত্বনার উদ্দেশ্যে [illegible], "কাল মধুপুর থেকে ফিরে এখানে এসে চা খাওয়া

বিনয়ের কথা শুনে দ্বিজনাথ হাসতে লাগ্‌লেন ; বল্‌লেন, "আজ রাত্রে খেয়ে গেলেই কি কাল চা-টা বাদ পড়ত ? আচ্ছা, তোমার যেমন সুবিধা হয় কোরো।"

বিনয় প্রস্থান করলে দ্বিজনাথ বল্‌লেন, "এমন অদ্ভুত মানুষ যদি দুটি আছে, কিছুতে যদি ধরা বাঁধা দেবে ! ছেলেবেলা থেকে জীবনটা অনাত্মীয়ের মধ্যে কেটেছে ব'লে আত্মীয়তাটা বোধ হয় ওর বরদাস্ত হয় না। নিজে কোনো-মতে ধরা দেবে না, অথচ—"

কি বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু কি ভেবে সে কথা সহসা বন্ধ ক'রে দ্বিজনাথ একটা চুরুট ধরাতে উদ্যত হ'লেন।

সকৌতূহলে সন্তোস জিজ্ঞাসা করলে, "অনাত্মীয়ের মধ্যে কেন ? ওঁর বাপ-মা নেই না কি ?"

দ্বিজনাথ বল্‌লেন, "সে কি আজ কাল নেই ? শিশুকাল থেকে নেই। তাছাড়া শুধু কি বাপ-মাই নেই ? তিন কুলের মধ্যে এক কুল ত' এখনো হয়নি—বাকি দুকুলে কে আত্মীয় কোথায় আছে তা ও কিছুই জানে না।"

সবিস্ময়ে সন্তোষ বল্‌লে, "কেন ?"

তখন দ্বিজনাথ বিনয়ের মুখে তার জীবনের যে কাহিনী শুনেছিলেন সবিস্তারে বিবৃত করলেন।

কৌতূহলী সন্তোষ দ্বিজনাথকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে লাগ্‌ল, কিন্তু কমলা একটি কথাও বল্‌লে না,—বিনয়ের জীবনের করুণ কাহিনী তার মনে যে বেদনার তরঙ্গ জাগিয়ে তুলেছিল তার আবেশে সে স্তব্ধ হ'য়ে ব'সে রইল। গৃহহীন স্বজনহীন বিনয়ের কথা মনে ক'রে করুণায় আর সহানুভূতিতে তার সমস্ত অন্তর আর্দ্র হ'য়ে উঠ্‌ল ;—কিন্তু পরক্ষণেই মনে হ'ল কার জন্যে এ আক্ষেপ করছি ? যার জন্যে, সে ত নিশ্চল নির্ব্বিকার ! প্রবৃত্তি নেই, অথচ মুখে সর্ব্বদা সংযম আর সংযম ! না কেউ তাকে বুঝতে পারে, না সে কাউকে বোঝে। বাবা ঠিক বলেছেন, নিজে ধরা ছোঁয়া দেবে না অথচ—

সহসা মনে পড়ল শোভার কথা—সে সেদিন বলছিল, শৈলজা তাকে বলেছে বিনয় কমলাকে ভালবাসে। মনে মনে মাথা নেড়ে কমলা বল্‌লে, ভুল, ভুল, ও সমস্ত ভুল ! নিজের মনের মধ্যে যে মস্ত বড় ব্রেক্ ক'ষে ব'সে আছে মনকে সে আল্‌গা দেবে কেমন ক'রে ?

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

"বাবা?"

"কি মা!"

"বেলা অনেক হ'ল। এবার নাওয়া-খাওয়ার জন্যে উঠ্‌লে ভাল হয়।"

হাতের কব্জিতে-বাঁধা ঘড়ি দেখে দ্বিজনাথ বললেন, "তাই ত', এগারটা বাজে। চল সন্তোষ, আর দেরি ক'রে কাজ নেই। কিন্তু তুমি যে কথা বলছ,—আমার ঠিক তা মনে হয় না। সংসার ব'লে কোনো জিনিসের বাঁধন নেই ব'লে বিনয় একটু উদ্ভ্রান্ত হ'তে পারে, কিন্তু সে অসামাজিক নয়। সংসার তার নেই বটে, কিন্তু সমাজ-ছাড়া সে কখনো নয়। বরঞ্চ, সাধারণত লোকের যেমন হয়, তার চেয়ে বেশি সমাজের সঙ্গে পরিচয় ঘটবার তার সুযোগ হয়েচে।"

মৃদু হেসে সন্তোষ বল্‌লে, "আপনি লক্ষ্য করেছেন কি না বল্‌তে পারিনে—গত আটদিনে ছবি আঁকবার সময়ে বিনয় বাবু সবশুদ্ধ আটবার কথা বলেছেন কি না সন্দেহ। কোনো কোনো দিন ত' একেবারেই বলেন নি—এমন কি আমাদের কথার প্রসঙ্গেও নয়।"

দ্বিজনাথ স্মিতমুখে বল্‌লেন, "ও-টা ওর খেয়ালী প্রকৃতির জন্যে; যখন যেমন মূড-এ থাকে তখন তেমন। দেখ্‌লে ত' সে দিন রাত্রে ও-ই হয়েছিল প্রধান বক্তা—মুখে যেন কথার তুবড়ি ফুট্‌ছিল।"

সন্তোষ বল্‌লে, "কিন্তু সে দিনই কি কমলার সঙ্গে ওরকম তীব্র ভাবে তর্ক করা উচিত হ'য়েছিল? বল্‌তে পারিনে আপনাদের সঙ্গে বিনয় বাবুর কি রকম ঘনিষ্ঠতা হয়েচে, কিন্তু প্রত্যহ ছবি আঁক্‌তে আসাই যদি একমাত্র পরিচয় হয় তা হ'লে সেদিন তিনি ঠিক সঙ্গত সীমার মধ্যে ছিলেন না।"

দ্বিজনাথকে কিছু বলবার অবসর না দিয়ে কমলা বল্‌লে, "বাবা, ঠিক সময়ে তোমার খাওয়া না হ'লে ও-বেলা মাথা ধরবে।" মুখে তার একটু অসন্তোষের রক্তিমা, যা সন্তোষের অন্বেষী দৃষ্টি অতিক্রম করলে না।

পদ্মমুখীর কাছ থেকে ইঙ্গিত লাভ ক'রে পর্য্যন্ত যে সংশয় সন্তোষের মনে প্রবেশ করেছিল গত কয়েক দিনে তার আয়তন ক্রমশই বর্দ্ধিত হয়েছে। কমলা অথবা বিনয়ের আচরণে অবশ্য এমন কিছু ঘটে নি যা সাধারণত সংশয় উৎপাদন করতে পারে, কিন্তু সংশয় এমন বস্তু যা মনের মধ্যে একবার আশ্রয় নিলে মৌন-ও অর্থময় হ'য়ে ওঠে এবং উপেক্ষাকেও আগ্রহের রূপান্তর ব'লে মনে হয়। তাই তার কথার বাধাস্বরূপ কমলার অন্য কথা পাড়া এবং কমলার মুখে বিরক্তির চিহ্ন উভয়ের মধ্যে কোনোটিই সন্তোষের লক্ষ্য অতিক্রম করল না। ঈষৎ উত্তপ্ত স্বরে সে বল্‌লে, "আচ্ছা, এ সব কথা তা হ'লে থাক্।"

দ্বিজনাথ বল্‌লেন, "হ্যাঁ সেই ভাল, চল, নেয়ে খেয়ে নেওয়া যাক্।"

২৬

পরদিন সকালে নিজের ঘরে ব'সে কমলা একখানা কলেজের বই ওল্টাচ্ছিল, এমন সময়ে একজন চাকর এসে খবর দিলে বিনয় এসেছে।

কমলা তাড়াতাড়ি বাইরে এসে দেখ্‌লে বিনয় ফিরে ... দ্রুতপদে বিনয়কে খানিকটা অনুসরণ ক'রে একটু কাছাকাছি এসে ডাক্‌লে, "বিনয় বাবু!"

বিনয় তখন প্রায় গেটের কাছে পৌঁচেছিল, কমলার আহ্বানে ফিরে নিকটে এসে বল্‌লে, "এঃ, আপনি আবার কষ্ট করলেন কেন? আমি ত' আর একজন চাকরকে ব'লে দিয়েছিলাম আপনাকে জানাতে, ও বেলাই আসব।"

সে কথায় কোনো কথা না ব'লে কমলা জিজ্ঞাসা করলে, "কাল তাহ'লে আপনার মধুপুর যাওয়া হয় নি?"

বিনয় বল্‌লে, "না, কাল যাওয়া হয় নি; আজ বেলা সাড়ে দশটার গাড়িতে যাচ্ছি। মনে কর্‌ছিলাম আপনার ছবিটা সেরে দিয়েই যাই; বেশিক্ষণ ত' লাগবে না—হয়ত একেবারেই কিছু করতে হবেনা। কিন্তু গেরাজে গাড়ি নেই দেখে খবর নিয়ে জানলাম মিষ্টার মিত্র বেরিয়েছেন।"

কমলা বল্‌লে, "হ্যাঁ, বাবা আর সন্তোষ বাবু রিকিয়ায় গেছেন, বেলা এগারটার মধ্যে তাঁরা ফিরবেন। রিকিয়ায় সন্তোষ বাবুর একজন আত্মীয় আছেন, তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেছেন। কিন্তু আপনি ফিরে যাচ্ছিলেন কেন? এসেছেন যখন,তখন ছবির ব্যাপারটা শেষ ক'রেই দিন না।"

একটু ইতস্ততঃ ক'রে বিনয় বল্‌লে, "থাক্, এমনই কি তাড়াতাড়ি আছে, ও-বেলাই হবে অখন। মিষ্টার মিত্র উপস্থিত থাক্‌বেন, সুবিধে হবে।"

কমলার মনের কোন্ নিভৃত কোণে একটুখানি অভিমান আহত হয়ে উঠ্‌ল; বল্‌লে, "বাবা উপস্থিত না থাক্‌লে যদি ছবি আঁকবার বিষয়ে আপনার অসুবিধে হয় তা হ'লে থাক্—কিন্তু আপনি এখন যাচ্ছিলেন কোথায়? গাড়ি ত' আপনার সাড়ে দশটায়, আর এখন সাড়ে আটটাও হয় নি,—এ দু ঘণ্টা আপনি কোথায় কাটাবেন?"

মৃদুস্মিত মুখে বিনয় বল্‌লে, "ঘণ্টা খানেক এদিক্-ওদিক একটু ঘুরে, বাকি এক ঘণ্টা ষ্টেশনে। দু ঘণ্টা ত' অল্প সময়—সময় নষ্ট করবার এমন কৌশল আমার জানা আছে যে, দুঘণ্টার পরিবর্ত্তে চার ঘণ্টা হ'লেও আমার ভাবনা হ'ত না।"

কমলা বল্‌লে, "শুধু সময় নষ্ট নয়, শরীর নষ্টর বিষয়েও আপনার ভাবনা হয় না। কিন্তু সকলেই ত আপনার মত ভাবনাকে অগ্রাহ্য করতে পারে না;—চলুন, ছবি আপনার আঁকতে হবে না, এ সময়টা আমাদের বাড়িতে ব'সে কাটাবেন, যদি না বাবা উপস্থিত নেই ব'লে সে বিষয়েও অসুবিধে বোধ করেন। এই ভাদ্র আশ্বিন মাসের রৌদ্রে খালি মাথায় এক ঘণ্টা ঘুরে বেড়াবার সখ্ পরিত্যাগ করুন।"

নীরবে একটু কি চিন্তা ক'রে বিনয় বল্‌লে, "এতখানি সময় আপনাকে আট্‌কে রাখ্‌ব?"

"রাখবেন।"

দ্বিধা-বিক্ষুব্ধ স্বরে বিনয় বল্‌লে, "তা হ'লে তাই চলুন।"

পূর্ব্বদিন দ্বিজনাথের মুখে বিনয়ের জীবন কাহিনী শুনে কমলার মনে যে বেদনা সঞ্জাত হয়েছিল আজ তা তার অন্তরকে একেবারে উদ্বেলিত ক'রে তুল্‌লে;—মনে হল, আহা! মা নেই বাপ নেই, ভাই নেই বোন নেই, গৃহ নেই সংসার নেই—তাই এমন! তাই খালি মাথায় রৌদ্রে রৌদ্রে এক ঘণ্টা ঘুরে বেড়াতেও কষ্ট হয় না, তারপর আবার আর এক ঘণ্টা চুপ ক'রে ষ্টেশনে ব'সে সময় কাটাতেও দুঃখ বোধ করে না! গৃহ যার নেই, ষ্টেশনই তার পক্ষে কম আশ্রয় কি! আত্মীয় স্বজন যার নেই, ষ্টেশনের লোক-জনেরাই তার পক্ষে অনাত্মীয় কেমন করে? একটা অনির্ব্বচনীয় মমতায় কমলার চিত্ত মথিত হ'তে লাগ্‌ল। মনে হ'ল, এই গগনবিহারী ক্লান্ত-পক্ষ পাখী শাখায় নীড় বাঁধুক, স্বজনহীন স্বজন লাভ করুক, বৈরাগী সংসারী হ'ক।

বারান্দায় উঠে বিনয় বল্‌লে, "এলামই যখন, তখন ছবিটা আন্‌তে বলুন—একবার দেখি কেমন হ'ল।"

কমলা বল্‌লে, "আচ্ছা, আপনি বসুন, সে না হয় পরে দেখ্‌বেন। আমাকে বলুন ত' আপনি যে যাচ্ছেন, তাঁরা কি জানেন,—আজ আপনি যাবেন?"

বিনয় বল্‌লে "না, তা ঠিক জানেন না।"

"তা হ'লে, আপনি ত' পৌছবেন বেলা একটা-দেড়টার সময়ে—তখন তাঁদের নিশ্চয়ই খাওয়া দাওয়া হ'য়ে যাবে—আপনার খাওয়ার কি ব্যবস্থা হবে?"

এ সব প্রশ্ন কোন্ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য উদ্ভূত তা বুঝতে পেরে বিনয় বল্‌লে, "পৌছতে একটা-দেড়টা না হ'লেও আমি তাদের গোলমালের বাড়িতে খাওয়ার গোলযোগ করব না তা স্থির ক'রেই যাচ্ছি। আমি মধুপুর ষ্টেশনে কেল্‌নারের হোটেলে খাওয়া সেরে তারপর তাদের বাড়ি যাব;—তাতে কোনো অসুবিধে হবে না।"

কমলা বল্‌লে, "তার চেয়ে কম অসুবিধে হবে আপনি যদি ঘণ্টাখানেক পরে এখানে চারটি ঝোল ভাত খেয়ে নেন তা হ'লে। তা'তে শরীরও বাঁচবে—সময়ও বাঁচবে।"

ব্যস্ত হ'য়ে উঠে বিনয় বল্‌লে, "না, না, দেখুন মিস্ মিত্র, ও-সব হাঙ্গামা আপনি করবেন না।"

কমলার ওষ্ঠাধরে মৃদু হাস্য রেখা দেখা দিলে; বল্‌লে, "মিস্ মিত্র ব'লে আমাকে না ডেকে যদি মিশ্ কালো ব'লে ডাকেন তা হ'লেও করব। আচ্ছা, আপনার এ কি অন্যায় বলুন দেখি, এত অনাত্মীয়ের মত ভদ্রতা রেখে চলতে চান কেন আমাদের সঙ্গে? বেলা দশটার মধ্যে আমাদের সমস্ত রান্না হয়ে যায়, একটু তৎপর হ'য়ে সাড়ে নটার সময়ে আপনাকে খাইয়ে দেওয়া কি এতই হাঙ্গামা হবে? না, সে আমি কিছুতেই শুনব না খেয়ে যেতেই হবে আপনাকে। তা ছাড়া, এ বিষয়ে বাবা উপস্থিত নেই, সে আপত্তি খাটবে না। তিনি থাক্‌লে আপনি যদি তাঁকে রাজী করতে

পারতেন ত' হ'তে পারত। আমি কিন্তু কিছুতেই শুনব না।"

ব্যগ্র-কণ্ঠে বিনয় বল্‌লে, "না, না, সে আপত্তি আমি একবারও করছিনে—আমি আপনাকেই অনুরোধ করছি।"

কমলা বল্‌লে, "অনুরোধ কেন, আদেশ করলেও আমি আপনার কথা শুনব না।" অদূরে একজন চাকর কাজ করছিল, তাকে ডেকে কমলা বাবুর্চিকে ডাকতে বল্‌লে। বিনয় অনেক ওজর আপত্তি করলে, কিন্তু সে তা'তে একেবারেই কর্ণপাত করলে না।

বাবুর্চি এলে কমলা বল্‌লে, "সাড়ে দশটার গাড়িতে বিনয়বাবু মধুপুর যাবেন—কতক্ষণ পরে তাঁকে খানা দিতে পারবে?"

একটু ভেবে বাবুর্চি বল্‌লে ঘণ্টা খানেকের মধ্যে দিতে পারবে।

"আচ্ছা, ঠিক সাড়ে নটার সময়ে উনি খেতে বস্‌বেন।"

বাবুর্চি সেলাম ক'রে প্রস্থান করলে।

বিনয় বল্‌লে, "এবার তা হ'লে ছবিখানা আনান্‌—আমার আপত্তি অগত্যা প্রত্যাহার করছি।"

মৃদু হেসে কমলা বল্‌লে, "আচ্ছা ,আনাচ্ছি।"

ছবি আনা হ'লে কমলাকে একখানা চেয়ারে বসিয়ে বিনয় অনেকক্ষণ ধ'রে কমলাকে এবং তার ছবিকে মিলিয়ে দেখলে—তারপর তুলি নিয়ে দু'চারটে টান-টোন দিয়ে বল্‌লে, "শেষ হ'ল। আর কিছু করবার নেই।" তারপর তুলি গুলো তুল্‌তে তুল্‌তে বল্‌লে, "এ ভারি খারাপ জিনিস—হাতে থাক্‌লে হাত নিস্‌পিস্‌ করে—তার ফলে অনেক ছবি ভাল করতে গিয়ে খারাপ ক'রে ফেলেছি। যথাসময়ে এ-কে নির্ব্বাসিত না করতে পারলে বিপদ।"

কমলা হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লে, "অমন ভয়ঙ্কর জিনিস হ'লে একেবারে তুলে ফেলুন।"

বিনয় তুলি তুলে ফেল্‌লে, কিন্তু ছবিটিকে সে অনেকক্ষণ ধ'রে দেখ্‌তে লাগ্‌ল। কাছে থেকে দূরে থেকে, সম্মুখ থেকে পাশে থেকে, নানাভাবে দেখে দেখে কিছুতেই যেন তার আশ মেটে না। একবার স্তব্ধ হয়ে ব'সে থেকে দেখলে, একবার চঞ্চল হ'য়ে ঘুরে ফিরে দেখ্‌লে, খানিকক্ষণ অন্য দিকে চেয়ে কি ভাবলে—তারপর রিষ্ট-ওয়াচ দেখে ব'লে উঠল, "নটা বেজে পনের মিনিট। এবার ছবিটা তুলে ফেল্‌তে বলুন। ও যা হবার তা হয়েচে।"

চাকর এসে ছবি তুলে রাখলে। কমলা বল্‌লে, "এবার আপনার খাওয়ার উদ্‌যুগ করি।"

ঘড়ির দিকে আর একবার দৃষ্টিপাত ক'রে বিনয় বল্‌লে, "এখনো বোধ হয় কিছু সময় আছে। লাইন ধ'রে হেঁটে গেলে ষ্টেশনে পৌছতে ক মিনিট লাগ্‌বে?"

কমলা বল্‌লে, "মিনিট দশেকের বেশি নয়।"

"ওঃ, তা হ'লে অনেক সময় আছে। আচ্ছা, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। অপরে যে যাই বলুক, আপনার নিজের ছবিটা কেমন লাগল? এ প্রশ্ন আমি যার ছবি আঁকি তাকেই করি।"

মৃদু হেসে কমলা বল্‌লে, "আমার খুব ভাল লেগেছে। যদিও ছবিটায় যেমন আমি আছি তা না এঁকে যেমন আমি হ'লে ভাল হ'ত তাই আপনি এঁকেছেন—তবু কি জানি কেন ছবিটা আমার ভারি ভাল লাগে। মনে হয়—এই রকম আমি যদি হ'তাম!"

কমলার দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে বিনয় বল্‌লে, "ওই রকমই আপনি—সন্তোষবাবুর কথা বিশ্বাস করবেন না।" তারপর কতকটা যেন নিজের মনেই বল্‌তে লাগল, "সত্যিই ছবিটা ভাল হয়েছে— এত ভাল ছবি এর আগে কখনো আমি আঁকিনি—পরেও কখনো আঁকতে পারব ব'লে মনে হয় না।" তারপর সোজাসুজি কমলাকে সম্বোধন ক'রে বললে, "দেখুন, আপনার বাবা যদি টাকা ফেরৎ নিয়েই ছবিটা আমাকে নিতে দেন তা হ'লে আমি খুসি হয়ে ছবিখানা নি'য় যাই।"

বিনয়ের কথা শুনে কমলার মুখ সহসা আরক্ত হয়ে উঠল; বল্‌লে, "বাবা রাজি হ'ন কিনা বলতে পারিনে, কিন্তু তিনি যদি টাকা ফেরৎ না নিয়েই আপনাকে ছবিখানা দিতে রাজি হন তা হলেও আমি রাজি হইনে।"

কমলার ভাবান্তর লক্ষ্য না ক'রে সবিস্ময়ে বিনয় বল্‌লে, "কেন?"

একটু উচ্ছ্বাসের সহিত কমলা বল্‌লে. "কি আশ্চর্য্য বিনয় বাবু, এই সহজ কথাটা আপনি বুঝ্‌তে পারছেন না?

আপনি আপনার কাছে আমার ছবি রাখ্‌বেন কেন ?—তার ত' একটা কারণ থাকা চাই—যাহা হয় একটা কিছু অধিকার থাকা চাই। ফটো যারা তোলে তারা অনেক সময় নেগেটিভ্‌ পর্য্যন্ত নিজেদের কাছে রাখে না—পজিটিভের কথা ত দূরের কথা। আপনাদের প্রোফেশনের নীতি আপনি ভুলে যাচ্ছেন।"

কমলার কথা শুনে বিনয়ের মুখখানা একেবারে মেঘে-ভরা শ্রাবণ আকাশের মত কালো হয়ে উঠ্‌ল ; স্তব্ধ হ'য়ে ক্ষণকাল চুপ ক'রে থেকে বল্‌লে, "আত্মীয়তার অধিকার আমার কিছু নেই তা জানি, কিন্তু তাই ব'লে কি আমি একেবারে প্রফেশনাল্‌ ? একেবারে stranger ?"

কমলা কিছু না ব'লে স্তব্ধ হ'য়ে দূরবর্ত্তী ত্রিকূট পাহাড়ের দিকে চেয়ে ব'সে রইল।

সহসা একটা কথা মনে পড়ায় বিনয় সজোরে ব'লে উঠ্‌ল, "এমনই যদি আমাকে পেশাদার ব'লে মনে করেন তবে আমাকে খাইয়ে দেওয়ার জন্যে এত পেড়াপিড়ি করলেন কেন ? আমি অনাত্মীয়ের মত ব্যবহার করি ব'লে অত অনুযোগ করছিলেন কেন ? বলুন ?"

কমলা যেন হঠাৎ তন্দ্রোত্থিত হ'য়ে উঠ্‌ল ; অনুতপ্ত-স্বরে বল্‌লে, "সত্যি, আমি আপনার খাওয়ার কথা একেবারে ভুলে গেছি—বোধ হয় দেরী হ'য়েই গেল। এ সব বাজে কথা থাক্‌—আমি চললাম আপনার খাবার আন্‌তে।" ব'লে দ্রুতপদে প্রস্থান করলে।

ভিতরে গিয়ে কমলা দেখ্‌লে পদ্মমুখী তখনো পূজার ঘরে পূজা করছেন। বাবুর্চির কাছে উপস্থিত হ'য়ে দেখ্‌লে আহার্য্য প্রস্তুত—বল্‌লে, "শীঘ্র ভাত বেড়ে ফেল, আমি ভাঁড়ার ঘর থেকে ঘি নিয়ে আসছি।" চাকরকে বল্‌লে, "বাবুর সামনে টেবিল দে আর জল তোয়ালে সাবান নিয়ে যা।"

অনুতাপে কমলার হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছিল। মনে মনে বল্‌লে, ছি ছি, কি করলাম,—জোর ক'রে মানুষকে খেতে বসিয়ে রেখে কটূক্তি করলাম ! নিজের অন্যায় আচরণের জন্য কমলা মনে মনে শতবার আপনাকে অভিশাপ দিতে লাগ্‌ল।

ভাত বাড়া হ'লে তপ্ত ভাতের উপর অনেক খানি গাওয়া ঘী ঢেলে দিলে। নিজ হাতে লেবু কেটে নুন দিয়ে ভাতের-থালাখানা নিজে তুলে নিয়ে বাবুর্চিকে মাছ মাংস নিয়ে আসতে ব'লে কমলা প্রস্থান করলে। বারান্দায় উপস্থিত হ'য়ে দেখ্‌লে চেয়ার শূন্য—বিনয় নেই। বুকের ভিতরটা ছাঁৎ ক'রে উঠ্‌ল। জীবন বাগানে কাজ কর্‌ছিল কমলা উচ্চকণ্ঠে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—"জীবন, বাবু কোথায় গেলেন ?"

জীবন দাঁড়িয়ে উঠে বল্‌লে, "বাবু চ'লে গেলেন দিদিমণি, —আপনাকে বল্‌তে ব'লে গেলেন খাবার ইচ্ছে নেই—খাবেন না।"

স্তম্ভিত হ'য়ে নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে কমলা একমুহূর্ত্ত দাঁড়িয়ে রইল, তারপর বাবুর্চির হাতে ভাতের থালাখানা দিয়ে হাত ধুয়ে ঘরে গিয়ে শয্যা গ্রহণ করলে।

(ক্রমশঃ)

পুস্তক পরিচয়

হেজাজ ভ্রমণ—খানবাহাদুর আল-হজ্জ আহছান উল্লা এম, এ, এম, আর, এ, এস, আই, ই, এস, প্রণীত; মূল্য এক টাকা মাত্র। প্রকাশক, মথদুমী লাইব্রেরী, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

হজ্জব্রত উদযাপন করা মুসলমানদের অন্যতম ধর্ম্মবিধি। মক্কা ও মদিনার পুণ্যতীর্থ স্থানগুলি দর্শন উদ্দেশ্যে আরব দেশে যেতে হয়। আমাদের আলোচ্যগ্রন্থে এই ভ্রমণকাহিনী লিপিবদ্ধ হয়েছে। লেখক চিন্তাশীল ও শিক্ষিত, এই জন্য তাঁর ভ্রমণকাহিনী সরস ও সজীব হ'য়ে উঠেছে, তাঁর তীক্ষ্ণ পর্য্যবেক্ষণশক্তি ও আন্তরিক ধর্ম্মনিষ্ঠা গ্রন্থের প্রতি ছত্রে ধরা পড়েছে। আমরা এই গ্রন্থখানি পাঠ ক'রে মুসলমান জাতির অনেক ধর্ম্মবিধি, তার অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্য ও অনেকগুলি পবিত্র তীর্থ স্থানের সঙ্গে গূঢ় পরিচয় লাভে সক্ষম হয়েছি তজ্জন্য গ্রন্থকারকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আরব মরুর দেশ। ভারতে তীর্থ ভ্রমণ হ'তে এ দেশে তীর্থ ভ্রমণ অত্যন্ত শঙ্কটসঙ্কুল ও বিপদজনক। আর তাছাড়া আরব ও ভারতের যাতায়াত ও শাসন সুবিধায় অনেক পার্থক্য রয়েছে। বেদুইনদের অনুগ্রহের উপরই ভ্রমণকারীদের সুখ সুবিধা এমন কি জীবন পর্য্যন্ত নির্ভর করে। কিন্তু বেদুইনরা যেমনি নির্ভীক আবার তেমনি নিষ্ঠুর ও হিংসাপরায়ণ, জীবন যে কোন মুহূর্ত্তে বিপন্ন হতে পারে।

আমরা এই সুখপাঠ্য কৌতূহলপ্রদ গ্রন্থখানির বহুল প্রচার কামনা করি। গ্রন্থখানি ডিরেক্টর বাহাদুর কর্ত্তৃক স্কুল কলেজ লাইব্রেরীগ্রন্থভুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

জরীন কলম

ফললাভ—শ্রীঅসিতকুমার হালদার রচিত; ইণ্ডিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ হইতে প্রকাশিত।

এই ক্ষুদ্র নাটিকাখানি 'বিচিত্রা'য় প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। গ্রন্থকার এখন তাহা পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিয়া রস-পিপাসু পাঠকবর্গের, বিশেষ করিয়া অল্পবয়স্কগণের, যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন। এ পুস্তকখানিতে আদর্শবাদের আবেদন বড় সুন্দর এবং অতি সহজ ভাবে অঙ্কিত করা হইয়াছে। নাটিকাখানির ভাষা, ছাপা, প্রচ্ছদপট সমস্তই সুন্দর। নাটিকাখানি ছেলে মেয়েদের দ্বারা অভিনীত হইতে পারে। গানগুলির অধিকাংশ রবীন্দ্রনাথের। আমরা অল্পবয়স্কদের মধ্যে এই পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি।

শ্রীগুরু গোবিন্দ সিংহের বাণী—শ্রীকালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য ছয় আনা। গ্রন্থকার কর্ত্তৃক খড়দহ হইতে প্রকাশিত।

পুস্তকখানি গুরুগোবিন্দ সিংহের বাণীর মূল গুরুমুখী হইতে বাংলা অনুবাদ। গ্রন্থকার এই অনুবাদে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। অনুবাদ যে সঠিক হইয়াছে, তাহার প্রমাণ, কলিকাতার বড় শিখ সঙ্গত এই পুস্তকখানি প্রচারের ভার লইয়াছেন। পুস্তকখানির সূচনা হিসাবে গুরু গোবিন্দ সিংহের জীবনী আলোচিত হইয়াছে। গ্রন্থকার ইহাতে যথেষ্ট পাণ্ডিত্য এবং তীক্ষ্ণ সমালোচনা-শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। এইরূপ পুস্তকের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়। এরূপ অনুবাদ-চেষ্টা বঙ্গভাষার ভবিষ্যৎ শ্রীবৃদ্ধির সূচনা জ্ঞাপন করে।

নানা কথা

রবীন্দ্রনাথের বিদেশযাত্রা

ভ্যান্‌কুভারে বিশ্বখ্যাত শিক্ষাবিদ্‌গণের যে সম্মিলনী হইবে তাহাতে ক্যানেডার National Conference of Education বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। তিনি বোম্বাই হইতে পহেলা মার্চ্চ ভ্যান্‌কুভার রওনা হইবেন। শিক্ষাসম্বন্ধীয় বক্তৃতাদানই তাঁহার এই বারের ভ্রমণের মুখ্য উদ্দেশ্য। তিনি কতকাল সেইখানে থাকিবেন তাহার নিশ্চয়তা নাই। তাঁহার পথ মঙ্গলময় হউক ও যথাসময়ে তিনি সুস্থ দেহে দেশে ফিরিয়া আসুন ইহাই আমরা প্রার্থনা করি। ভ্যানকুভার সম্মিলনীর পর ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ব-বিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে তথাকার বিদ্যার্থীদের সমীপে রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় ধর্ম্ম, দর্শন ও পরিকর্ষ সম্বন্ধে কয়েকটি বক্তৃতা দিবেন। তৎপর ডিসেম্বর মাসে ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন,—ইহাই উপস্থিত স্থির আছে।

* * * *

রচনা-প্রতিযোগিতা

আগামী বৈশাখ মাসে অক্ষয়তৃতীয়ায় পুরুলিয়া হরিপদ সাহিত্য মন্দিরের দ্বিতীয় বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইবে। সেই উপলক্ষ্যে একটি রচনা-প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা হইয়াছে। বিবাহে পণ প্রথা—তাহার মূল কারণ, প্রতিকার ও সমাজের দায়িত্ব—এই বিষয় লইয়া যাঁহারা প্রবন্ধ লিখিয়া প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানীয় বলিয়া বিবেচিত হইবেন তাঁহাদিগকে যথাক্রমে একটি স্বর্ণপদক ও একটি রৌপ্যপদক দেওয়া হইবে। আগামী পনেরোই চৈত্রের মধ্যে প্রবন্ধ নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। শ্রীঅমূল্যক সরকার, সম্পাদক হরিপদ সাহিত্যমন্দির, পুরুলিয়া, মানভূম।

* * * *

বিরাট হিন্দু-সম্মিলন

শ্রীগৌরাঙ্গদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে আগামী ৯, ১০, ১১ই চৈত্র হালুয়াঘাটে (গারোহিল) হিন্দুমিশনে সকল শ্রেণীর হিন্দুর এক মহামিলনোৎসবের আয়োজন হইয়াছে। ময়মনসিংহ হিন্দুমিশনের সম্পাদক ব্রহ্মচারী হরিবিনোদ প্রত্যেক হিন্দুকে সেই ধর্ম্মক্ষেত্রে সাদরে আহ্বান করিতেছেন। এই উৎসবান্তে গারোহিলে একটি মন্দির ও প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হইবে। তাহার জন্য যথাসাধ্য সাহায্য প্রার্থনীয়।

* * * *

নিখিল ভারতের মহিলা শিক্ষা সমিতি

গত জানুয়ারী মাসে পাটনায় নিখিল ভারত নারীশিক্ষা সমিতির অধিবেশন হইয়াছিল। উক্ত অধিবেশনে সভানেত্রীর কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন মণ্ডী রাজ্যের রাণী শ্রীমতী ললিতকুমারী সাহিবা। সুবিখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীমতী অনুরূপা দেবী উক্ত অধিবেশনে যে প্রবন্ধটি পাঠ করেন বর্ত্তমান সংখ্যায় তাহা প্রকাশিত হইল।

* * * *

ভ্রমসংশোধন

গত পৌষ সংখ্যার বিচিত্রায় শ্রীমায়া দেবীর প্রবন্ধে ১৩৬ পৃষ্ঠায় ২৭ লাইনে 'কামার' স্থলে 'চামার' হইবে।

Printed at the Susil Printing Works, 47, Pataldanga Street, Calcutta.
by Srijut Probodh Lal Mukherjee and published by him from 51 Pataldanga Street, Calcutta.

মেঘ্‌লা দিন

শিল্পী শ্রীযুক্ত দত্ত
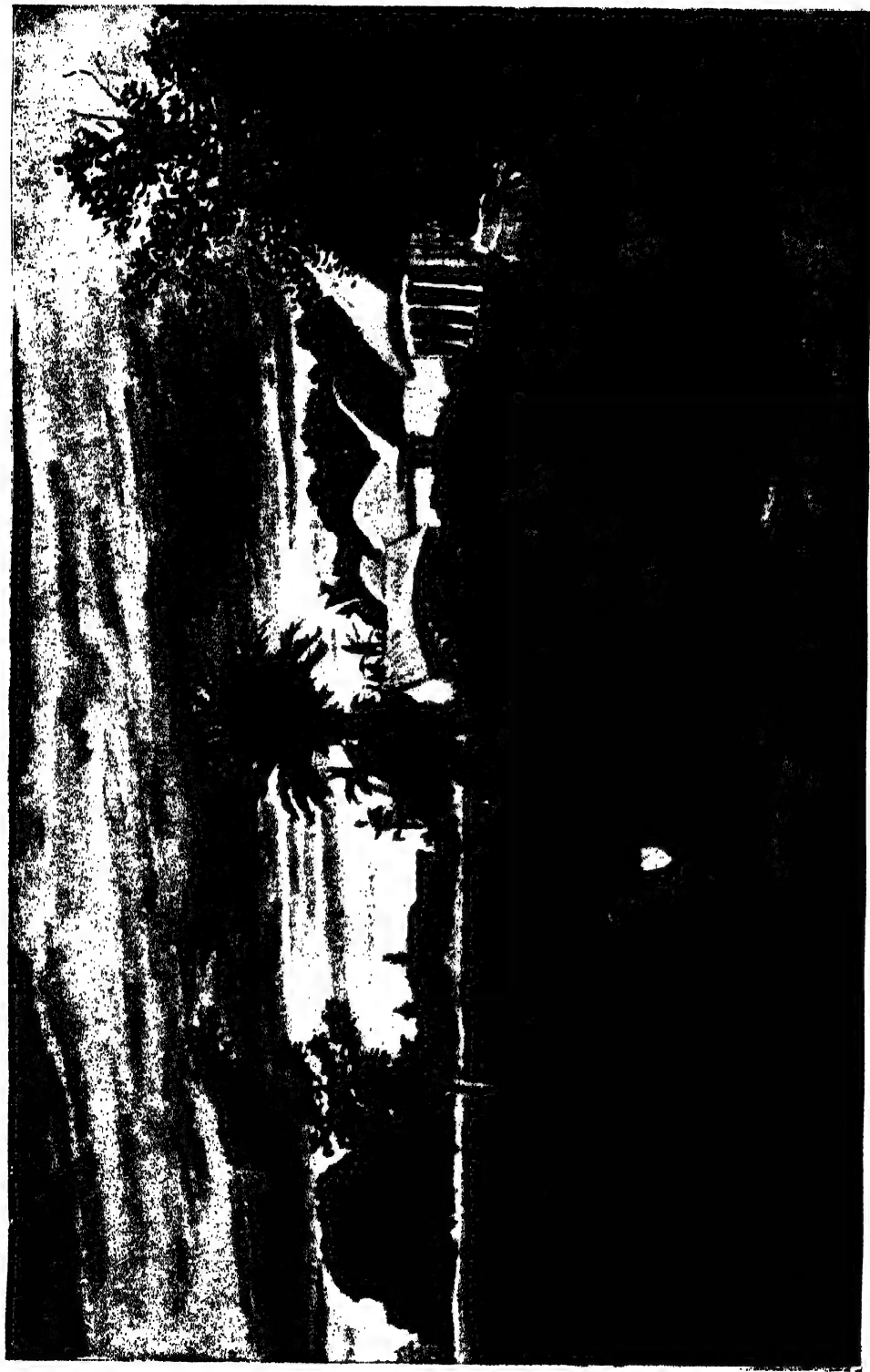
দ্বিতীয় বর্ষ, ২য় খণ্ড | চৈত্র, ১৩৩৫ | চতুর্থ সংখ্যা

মিলনের সৃষ্টি

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাইরে বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে যেখানে সৃজনের কাজ চলচে সেখানে ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছার সংঘাত নেই, সেখানে বাধার রূপ তাই প্রবল নয়। সেই জন্যে প্রভাত এবং রাত্রির উদয়ের মধ্যে এমন সুগভীর শান্তি।

আমাদের মন যখন অশান্ত হয় তখন প্রকৃতির মধ্যে গিয়ে শান্তি পায়; কেননা প্রকৃতির মধ্যে ইচ্ছার বিরোধ আমাদের ক্ষুব্ধ ক'রে তোলে না। কিন্তু মানুষের মধ্যে চারিদিকের নানা ইচ্ছার দ্বন্দ্বই সৃষ্টির সরল স্রোতকে বাধা দেয় ব'লে এত ক্লান্তি আসে, মলিনতা আসে, ক্ষোভ আসে। তখন মানুষ বলে, পাহাড়ে গিয়ে সমুদ্রতীরে গিয়ে নিজের ভিতরকার বিকলতাকে অতলস্পর্শ স্বস্তির মধ্যে ডুবিয়ে ঠিক ক'রে নিয়ে আসি। মানুষ একদিকে খেটেখুটে কেড়েকুড়ে গোলমাল ক'রে ধূলা উড়িয়ে ক্ষেপে বেড়াচ্চে; সেই সঙ্গে আবার পরিপূর্ণভাবে হয়ে-ওঠার যে প্রশান্ত সৌন্দর্য্য আছে মানুষের মন তাকেও গভীরভাবে কামনা করচে—যে রকম ফুটে-ওঠা ফুলের মধ্যে, পল্লবের মধ্যে—শান্ত সংযত সুন্দর অথচ নিরলস। আমরা নিজের ভিতরকার জটিলকে সরল ক'রে তুলতে চাই—নিজের জীবনটাকে কঠিন প্রয়াসের ঘাত অভিঘাতের থেকে উদ্ধার ক'রে একটি স্বতঃসম্ভূত প্রকাশের মধ্যে দাঁড় করাতে চাই।

মানুষ নিজেদের মধ্যে সৃজন রহস্য দেখতে পেয়েছে। কোনখানে? যেখানেই সত্যকার মিলন হয়েচে—অর্থাৎ যেখানেই ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছার দ্বন্দ্ব কেবল বিরোধের মধ্যে ক্ষুব্ধ না হয়ে প্রেমের প্রভাবে সঙ্গত হ'তে পেরেচে। সেই সত্য মিলনের মধ্যেই সমগ্র বিশ্বের সুর বেজে ওঠে। এই রকম মিলন যেখানেই হয় সেখানে অঙ্কশাস্ত্রের যোগ বা গুণের ফল ফলে না, সেখানে যোজনার দ্বারা বৃদ্ধি ঘটে না, সেখানে একটি অনির্ব্বচনীয়তার উদ্ভব হয়, সৃজন-রহস্য দেখা দেয়। সত্য সম্বন্ধই যথার্থ সৃষ্টি। সৃষ্টির অর্থ তার বস্তুপুঞ্জের মধ্যে নহে, তার সম্বন্ধের মধ্যে; এই সম্বন্ধের আশ্চর্য্য শক্তিতেই মিলনে কেবল বৃহত্ত্ব রচিত হচ্চে না, বৈচিত্র্য রচিত হচ্চে। সম্বন্ধের এই সৃজনগুণ মানুষ নিজেদের মধ্যে উপলব্ধি ক'রে তবে জগতের মূল সম্বন্ধের হেতুকে বুঝতে পেরেচে।

আকাশের নীহারিকার মধ্যে অণুপরমাণুর সংযোজনে যেমন নক্ষত্রসৃষ্টির ব্যাপার চলেচে, তেমনি মানুষদের মধ্যে

জাতিসৃষ্টি চলেচে। এক এক দেশে এক এক দল লোক আত্মীয়তার বন্ধনে দৃঢ় হয়ে মিলচে। এই মিলন বিচিত্র প্রাণশক্তিকে জাগিয়ে তুলচে। এই মিলনের ভিতর থেকে কত বিশেষ চিন্তা, বিশেষ শিল্প, বিশেষ সাহিত্য,—সবসুদ্ধ একটি বিশেষ ইতিহাস উৎসারিত হয়ে উঠচে।

মানবের ইতিহাসে দেখতে পাই যখনি জাতির এই বন্ধন বেঁধেচে তখনি মানুষ নিজেদের মিলনের কেন্দ্রস্বরূপ একটি দেবতাকে অনুভব করেচে--সে দেবতা অন্ধশক্তি নয়, ইচ্ছা-শক্তি। ঐক্যের সব চেয়ে ঘনিষ্ঠ উপলব্ধি যা মানুষের আছে সে হচ্চে নিজের আত্মার। মানুষের নিজের ভিতরকার সেই ঐক্য বাহিরে নিরন্তর বৈচিত্র্যকে প্রকাশ ক'রে চলেচে। এই ঐক্যকে সে সপ্রাণ সজ্ঞান ইচ্ছাময় ব'লে জানে। এই জন্যই আপন দেশের জনসমবায়ের মধ্যে যে-শক্তিমান ঐক্যকে সে জানে তাকেও মানুষ ইচ্ছাশক্তি ব'লেই জানে, সেই ইচ্ছার সঙ্গে নিজের ইচ্ছা সঙ্গত করাকেই সে সব চেয়ে বড় কর্ত্তব্য ব'লে বোধ করে।

সেই আদিম মানুষের দেবতা নিজ নিজ সঙ্ঘের মধ্যেই বিশেষভাবে বদ্ধ ছিল। তার কারণ, মানবের ঐক্যের অনুভূতিও সেই গণ্ডিতে রুদ্ধ ছিল। তখন এক দেশের লোকের সঙ্গে অন্যদেশের বিরোধ ছিল, এক দেশের কল্যাণ অন্য দেশের কল্যাণের সঙ্গে বাঁধা ছিল না। এই জন্যে বিশেষ জাতি নিজের বিশেষ দেবতাকে নিজেদেরই অনুকূল ও অন্যদের প্রতিকূল ব'লে জান্‌ত। এইজন্যই বহু বিরুদ্ধ দেবতাকে কল্পনা করতে হয়েছিল—এমন কি, অন্যের শক্তিমান দেবতাকে মন্ত্রের দ্বারা নিজের আয়ত্ত করবার চেষ্টাও তখন দেখা গিয়েচে।

যাই হোক্, নিজেদের মিলনের মাঝখানে এই দেবতাকে প্রতিষ্ঠিত করার ভিতরে মানুষের একটি গভীর মনের কথা আছে। এই পূজার দ্বারা মানুষ এই কথাই বলচে যে, আমাদের মিলনে নানা প্রয়োজন সাধিত হচ্চে বটে কিন্তু সেই প্রয়োজনই এর মূল নয়, এর মূল হচ্চেন দেবতা, একটি মহান্ পুরুষ। এই দেবতার ইচ্ছার মধ্যে নিজেকে অন্যের সঙ্গে বিধৃত জেনে তবে মানুষ শক্তি লাভ করেচে, গৌরব লাভ করেচে, আনন্দ লাভ করেচে। মানুষের নিজের ইচ্ছা আছে অথচ যে-বৃহৎক্ষেত্রের মধ্যে সে চালিত হচ্চে সেখানে ইচ্ছাশক্তি নেই কেবল আছে অন্ধ জড়শক্তি, সমগ্রের সঙ্গে নিজের এমন ভয়ঙ্কর অসামঞ্জস্য মানুষ ভাবতেও পারে নি। নিজের ভিতরকার একটি প্রাণময় ইচ্ছাময় ঐক্যের অব্যবহিত বোধ থেকেই মানুষ একটি বিরাট ইচ্ছাকে সহজেই আবিষ্কার করেচে।

কিন্তু একদিন যা সহজেই আবিষ্কৃত হয়েছিল তাকে আবার বাধার ভিতর দিয়ে না পেলে সম্পূর্ণ ক'রে পাওয়া হবে না। সম্প্রতি দীর্ঘকাল ধ'রে মানুষ সেই সন্দেহের ভিতর দিয়ে চলেচে। সন্দেহ জন্মাল কি ক'রে? বিজ্ঞান জগৎকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মহতী শক্তিকে ধরতে পারে, কিন্তু মহান্ পুরুষ তাকে এড়িয়ে যায়। যেখানে সেই পুরুষ নেই শক্তি আছে সেখানে সে-শক্তি যন্ত্রমাত্র; সেই যন্ত্রে কৌশল আছে সফলতা আছে, অথচ ইচ্ছা নেই আনন্দ নেই।

এমনি ক'রে ইচ্ছার দেবমন্দিরে যন্ত্র আপন কারখানা-ঘর গড়তে সুরু ক'রে দিলে, সেই যন্ত্রশক্তিকে আয়ত্ত করবার যে সফলতা তাও মানুষ প্রভূত পরিমাণে পেতে লাগল। এতে ক'রে একদিকে মানুষের ধনও যেমন বাড়চে অন্য দিকে তার পীড়াও তেমনি বেড়ে উঠ্‌চে। কলের দাসত্ব করতে করতে মানুষের হৃদয় দলিত হয়ে যাচ্চে। মানুষের জীবনের সকল বড় বড় বিভাগেই কেবলমাত্র প্রয়োজনের সম্পর্ক, কেবলমাত্র ফললাভের সম্পর্ক সব চেয়ে বড় হয়ে উঠেচে,—এইটে সৃষ্টির মিলন নয়, আত্মপ্রকাশের মিলন নয়, এর মধ্যে আত্মানন্দময় অহৈতুক পরম রহস্যটি নেই। এর মধ্যে দ্বিজ মানুষের স্থান নেই, এর মধ্যে চরম মানুষের প্রকাশ নেই। পুরাকালে মানুষ অনেক ক্রূর দেবতার কল্পনা করেচে, কিন্তু একালের ফললোলুপ যন্ত্রদেবতার মত ভয়ঙ্কর দেবতা কোনো কালে ছিল না—এই দেবতা বাহিরের পৃথিবীকে কলুষিত করচে আর মানবজীবনের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যকে নষ্ট করচে।

য়ুরোপে পলিটিক্সে বাণিজ্যব্যাপারে এই যন্ত্রদেবতা প্রতিষ্ঠিত হয়েচে। এই যন্ত্রদেবতা একতলা-বাসী, এ কেবল অর্থকেই জানে, পরমার্থকে জানে না। কিন্তু এই

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দেবতা কাণা বটে তবু পঙ্গু নয়। এ দেবতার মধ্যেও একটি বড় সত্য আছে, সেই সত্যটি হচ্চে বিশ্বনিয়ম। সুতরাং এ সত্য কথনো নিষ্ফল হতে পারে না। তাই এ দেবতা সার্থকতা যদি বা না দেয় সফলতা দেয়।

কিন্তু আমাদের সমাজের দিকে চেয়ে দেখ, এখানেও জড়দেবতা। যিনি বিশ্বমানবের কল্যাণ করেন এ সে দেবতা নয়, আর যে-নিয়ম বিশ্বব্যাপারকে চালনা করে এ সে নিয়মও নয়। এ হচ্চে আচার, অর্থাৎ নিয়ম বটে কিন্তু কৃত্রিম নিয়ম। অর্থাৎ একে যন্ত্র, তাতে নিষ্ফল যন্ত্র। য়ুরোপে যে যন্ত্রের পূজা হয় তাতে মানুষের বুদ্ধি লাগে উদ্যম লাগে, তাতে প্রকৃতির ক্ষেত্রে মানুষ নূতন নূতন পথ উদ্‌ঘাটন করচে। কিন্তু আমাদের সমাজ যে-সব নিয়মে চলচে তাতে বুদ্ধিকে প্রবেশ করতে দিলেই বিপদ, তার জন্যে কেবল পুঁথি আবৃত্তি করতে হয়। য়ুরোপে সফলতা-লাভের লোভে বহুসংখ্যক লোককে কঠোর বন্ধন স্বীকার করতে হচ্চে, আমাদের দেশে আমরা মানুষকে খর্ব্ব করচি, তাকে তার ঈশ্বরদত্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত করচি, কিসের জন্যে? কোনো ফললাভের জন্যে নয়। কৃত্রিম সমাজের যে চাকা কোথাও অগ্রসর না হয়ে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কেবলই ঘুরচে তার ব্যর্থ ঘূর্ণগতি চিরস্থায়ী করবার জন্যে। এই আচারযন্ত্রকে দেবতার আসনে বসিয়ে এর কাছে প্রতিদিন নরবলি নারীবলি দিচ্চি। এই সমাজে মানুষ বিশ্বের নামে বিশ্বদেবতার নামে মিলল না, বিভক্ত হ'ল মিথ্যা আচারের নামে, যে আচারে মানুষকে নিরর্থক এবং অন্তহীন পুনরাবৃত্তির মধ্যে নিয়ত ঘুরপাক খাওয়াতে থাকে। যিনি সত্য সম্বন্ধে মানুষকে বাঁধবার জন্যে ডাক দিয়েচেন তাঁকে অবজ্ঞা ক'রে পৃথিবীতে আজ আমরা কেউ বা রাষ্ট্রীয় কল কেউ বা সামাজিক কল স্থাপন করলুম, তার মধ্যে দয়া নেই ধর্ম্ম নেই। সৃজনের যে মূলনীতি তাকে এমনি ক'রে আঘাত করচি।

-উপন্যাস--

--শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫৬

দু'দিন পরেই নবীন মোতির মা হাবলুকে নিয়ে এসে উপস্থিত। হাবলু জেঠাইমার কোলে চ'ড়ে তার বুকে মাথা রেখে কেঁদে নিলে। কান্নাটা কিসের জন্যে স্পষ্ট ক'রে বলা শক্ত,--অতীতের জন্যে অভিমান, না বর্ত্তমানের জন্যে আবদার, না ভবিষ্যতের জন্যে ভাবনা?

কুমু হাবলুকে জড়িয়ে ধ'রে বললে, "কঠিন সংসার, গোপাল, কান্নার অন্ত নেই। কি আছে আমার, কি দিতে পারি যাতে মানুষের ছেলের কান্না কমে। কান্না দিয়ে কান্না মেটাতে চাই, তার বেশি শক্তি নেই। যে-ভালোবাসা আপনাকে দেয় তার অধিক আর কিছু দিতে পারে না, বাছারা, সেই ভালোবাসা তোরা পেয়েছিস; জ্যাঠাইমা চিরদিন থাকবে না, কিন্তু এই কথাটা মনে রাখিস্, মনে রাখিস্, মনে রাখিস্।" ব'লে তার গালে চুমো খেলে।

নবীন বললে, "বৌরাণী, এবার রজবপুরে পৈত্রিক ঘরে চলেচি; এখানকার পালা সাঙ্গ হোলো।"

কুমু ব্যাকুল হ'য়ে বললে, "আমি হতভাগিনী এসে তোমাদের এই বিপদ ঘটালুম।"

নবীন বললে, "ঠিক তার উল্টো। অনেক দিন থেকেই মনটা যাই যাই করছিল। বেঁধে সেধে তৈরি হ'য়ে ছিলুম, এমন সময় তুমি এলে আমাদের ঘরে। ঘরের আশ খুব ক'রেই মিটেছিল, কিন্তু বিধাতার সইল না।"

সেদিন মধুসূদন ফিরে গিয়ে তুমুল একটা বিপ্লব বাধিয়েছিল তা' বোঝা গেল।

নবীন যাই বলুক, কুমুই যে ওদের সংসারের সমস্ত ওলট পালট ক'রে দিয়েচে মোতির মার তাতে সন্দেহ নেই, আর সেই অপরাধ সে সহজে ক্ষমা করতে চায় না। তার মত এই যে, এখনো কুমুর সেখানে যাওয়া উচিত মাথা হেঁট ক'রে, তার পরে যত লাঞ্ছনাই হোক সেটা মেনে নেওয়া চাই। গলা বেশ একটু কঠিন ক'রেই জিজ্ঞাসা করলে, "তুমি কি শ্বশুরবাড়ি একেবারেই যাবে না ঠিক করেচ?"

কুমু তার উত্তরে শক্ত ক'রেই বললে, "না, যাব না।"

মোতির মা জিজ্ঞাসা করলে, "তা হ'লে তোমার গতি কোথায়?"

কুমু বললে, "মস্ত এই পৃথিবী, এর মধ্যে কোনো এক জায়গায় আমারো একটুখানি ঠাঁই হ'তে পারবে। জীবনে অনেক যায় খ'সে, তবুও কিছু বাকি থাকে।"

কুমু বুঝতে পারছিল মোতির মার মন ওর কাছ থেকে অনেক খানি স'রে এসেচে। নবীনকে জিজ্ঞাসা করলে, "ঠাকুরপো, তা হ'লে কি করবে এখন?"

"নদীর ধারে কিছু জমি আছে তার থেকে মোটা ভাতও জুটবে, কিছু হাওয়া খাওয়াও চলবে।"

মোতির মা উষ্মার সঙ্গেই বললে, "ওগো মশায় না, সেজন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না। ঐ মির্জ্জাপুরের অন্নজলে দাবী রাখি, সে কেউ কাড়তে পারবে না। আমরা তো এত বেশি সম্মানী লোক নই, বড়োঠাকুর তাড়া দিলেই অমনি বিবাগী হ'য়ে চ'লে যাব। তিনিও

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আবার আজ বাদে কাল ফিরিয়ে ডাকবেন, তখন ফিরেও আসব, ইতিমধ্যে সবুর সইবে, এই ব'লে রাখলুম।"

নবীন একটু ক্ষুণ্ণ হ'য়ে বল্‌লে, "সে কথা জানি মেজ বউ, কিন্তু তা' নিয়ে বড়াই করিনে। পুনর্জ্জন্ম যদি থাকে তবে সন্ন্যাসী হ'য়েই যেন জন্মাই, তাতে অন্নজলের যদি টানাটানি ঘটে সেও স্বীকার।"

বস্তুত নবীন অনেকবারই দাদার আশ্রয় ছেড়ে গ্রামে চাষবাসের সঙ্কল্প করেচে। মোতির মা মুখে তর্জ্জন গর্জ্জন করেচে, কাজের বেলায় কিছুতেই সহজে নড়তে চায়নি, নবীনকে বারে বারে আটকে রেখেচে। সে জানে ভাসুরের উপর তার সম্পূর্ণ দাবী আছে। ভাসুর তো শ্বশুরের স্থানীয়। তার মতে ভাসুর অন্যায় করতে পারে কিন্তু তাকে অপমান বলা চলে না। কুমুর প্রতি কুমুর স্বামীর ব্যবহার যেমনি হোক তাই ব'লে কুমু স্বামীর ঘর অস্বীকার করতে পারে, একথা মোতির মার কাছে নিতান্ত সৃষ্টিছাড়া।

খবর এলো ডাক্তার এসেচে। কুমু বললে, "একটু অপেক্ষা করো, শুনে আসি ডাক্তার কি বলে।"

ডাক্তার কুমুকে ব'লে গেল, নাড়ী আরো খারাপ, রাত্তিরে ঘুম কমেচে, বোধহয় রোগী ঠিক বিশ্রাম পাচ্চে না।

অতিথিদের কাছে কুমু ফিরে যাচ্ছিল, এমন সময় কালু এসে বল্‌লে, "একটা কথা না ব'লে থাকতে পারচিনে, জাল বড়ো জটিল হ'য়ে এসেচে, তুমি যদি সময়ে শ্বশুরবাড়ি ফিরে না যাও, বিপদ আরো ঘনিয়ে পরবে। আমি তো কোনো উপায় ভেবে পাচ্চিনে

কুমু চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল। কালু বল্‌লে, "তোমার স্বামীর ওখান থেকে তাগিদ এসেচে, সেটা অগ্রাহ্য করবার শক্তি কি আমাদের আছে? আমরা যে একেবারে তার মুঠোর মধ্যে।"

কুমু বারান্দায় রেলিঙ্‌ চেপে ধ'রে বল্‌লে, "আমি কিছুই বুঝতে পারচিনে, কালুদা। প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে, মনে হয় মরণ ছাড়া কোনো রাস্তাই আমার খোলা নেই।" এই ব'লে কুমু দ্রুতপদে চ'লে গেল।

দাদার ঘরে যখন কুমু ছিল, সেই অবকাশে ক্ষেমা পিসির সঙ্গে মোতির মার কিছু কথাবার্ত্তা হ'য়ে গেছে। নানারকম লক্ষণ মিলিয়ে দুজনেরই মনে সন্দেহ হ'য়েছে কুমু গার্ভিণী। মোতির মা খুসি হ'য়ে উঠল, মনে মনে বল্‌লে, মা কালী করুন তাই যেন হয়। এইবার জব্দ! মানিনী শ্বশুরবাড়িকে অবজ্ঞা করতে চান, কিন্তু এ যে নাড়ীতে গ্রন্থি লাগ্‌ল, শুধু তো আঁচলে আঁচলে নয়, পালাবে কেমন ক'রে!

কুমুকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে মোতির মা তার সন্দেহের কথাটা বল্‌লে। কুমুর মুখ বিবর্ণ হ'য়ে গেল। সে হাত মুঠো ক'রে বল্‌লে, "না, না, এ কখনোই হ'তে পারে না, কিছুতেই না।"

মোতির মা বিরক্ত হ'য়েই বললে, "কেন হ'তে পারবে না ভাই? তুমি যতো বড়ো ঘরেরই মেয়ে হও না কেন, তোমার বেলাতেই তো সংসারের নিয়ম উলটে যাবে না। তুমি ঘোষালদের ঘরের বউ তো, ঘোষাল বংশের ইষ্টি দেবতা কি তোমাকে সহজে ছুটি দেবেন? পালাবার পথ আগ্‌লে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি।"

স্বামীর সঙ্গে কুমুর তিন মাসের পরিচয় দিনে দিনে ভিতরে ভিতরে কি রকম যে বিকৃত মূর্ত্তি ধরেচে গর্ভের আশঙ্কায় ওর মনে সেটা খুব স্পষ্ট হ'য়ে উঠ্‌ল। মানুষে মানুষে যে ভেদটা সবচেয়ে দুরতিক্রমণীয়, তার উপাদানগুলো অনেক সময়ে খুব সূক্ষ্ম। ভাষায়, ভঙ্গীতে, ব্যবহারে ছোট ছোট ইসারায় যখন কিছুই করচে না, তখনকার অনভিব্যক্ত ইঙ্গিতে, গলার সুরে, রুচিতে, রীতিতে, জীবনযাত্রার আদর্শে, ভেদের লক্ষণগুলি আভাসে ছড়িয়ে থাকে। মধুসূদনের মধ্যে এমন কিছু আছে যা কুমুকে কেবল যে আঘাত করেচে তা নয়, ওকে গভীর লজ্জা দিয়েচে। ওর মনে হ'য়েচে সেটা যেন অশ্লীল। মধুসূদন তার জীবনের আরম্ভে একদিন দুঃসহভাবেই গরীব ছিল, সেইজন্যে 'পয়সা'র মাহাত্ম্য সম্বন্ধে সে কথায় কথায় যে মত ব্যক্ত করত সেই গর্ব্বোক্তির মধ্যে তার রক্তগত দারিদ্র্যের একটা হীনতা ছিল। এই পয়সা-পূজার কথা মধুসূদন বারবার তুলত কুমুর পিতৃকুলকে খোঁটা দেবার জন্যেই। ওর সেই

স্বাভাবিক ইতরতায়, ভাষার কর্কশতায়, দাম্ভিক অসৌজন্যে, সব সুদ্ধ মধুসূদনের দেহ মনের, ওর সংসারের আন্তরিক অশোভনতায় প্রত্যহই কুমুর সমস্ত শরীর মনকে সঙ্কুচিত ক'রে তুলেচে। যতই এগুলোকে দৃষ্টি থেকে, চিন্তা থেকে সরিয়ে ফেলতে চেষ্টা করেচে, ততই এরা বিপুল আবর্জ্জনার মধ্যে চারিদিকে জ'মে উঠেচে। আপন মনের ঘৃণার ভাবের সঙ্গে কুমু আপনিই প্রাণপণে লড়াই ক'রে এসেচে। স্বামীপূজায় কর্ত্তব্যতার সম্বন্ধে সংস্কারটাকে বিশুদ্ধ রাখবার জন্যে ওর চেষ্টার অন্ত ছিল না, কিন্তু কত বড়ো হার হয়েচে তা এর আগে এমন ক'রে বোঝে নি। মধুসূদনের সঙ্গে ওর রক্ত মাংসের বন্ধন অবিচ্ছিন্ন হ'য়ে গেল, তার বীভৎসতা ওকে বিষম পীড়া দিলে। কুমু অত্যন্ত উদ্বিগ্ন মুখে মোতির মাকে জিজ্ঞাসা করলে, "কি ক'রে তুমি নিশ্চয় জানলে?"

মোতির মার ভারি রাগ হোলো, সামলে নিয়ে বল্লে, "ছেলের মা আমি, আমি জানব না তো কে জান্‌বে? তবু একেবারে নিশ্চয় ক'রে বলবার সময় হয়নি। ভালো দাই কাউকে ডেকে পরীক্ষা করিয়ে দেখা ভালো।"

নবীন, মোতির মা, হাব্‌লুর যাবার সময় হ'ল। কিন্তু দৈবের এই চরম অন্যায়ের কথা ছাড়া কুমু আর কোনো কিছুতে আজ মন দিতে পারছিল না। তাই খুব সাধারণ ভাবেই শ্বশুরবাড়ির বন্ধুদের কাছ থেকে ওর বিদায় নেওয়া হ'ল। নবীন যাবার সময় বল্লে, "বৌরাণী, সংসারে সব জিনিষেরই অবসান আছে। কিন্তু তোমাকে সেবা করবার যে অধিকার হঠাৎ একদিনে পেয়েছি সে যে এমন খাপছাড়াভাবে হঠাৎ আরেকদিন শেষ হ'তে পারে, সে কথা ভাবতেও পারিনে। আবার দেখা হবে।" নবীন প্রণাম করলে, হাব্‌লু নিঃশব্দে কাঁদতে লাগ্‌ল, মোতির মা মুখ শক্ত ক'রে রইল, একটি কথাও কইলে না।

৫৭

খবরটা বিপ্রদাসের কানে গেল। দাই এল, সন্দেহ রইল না যে কুমুর গর্ভাবস্থা। মধুসূদনের কানেও সংবাদ পৌঁছেচে। মধুসূদন ধন চেয়েছিল, ধন পুরো পরিমাণেই জমেচে, ধনের উপযুক্ত খেতাবও মিলেছে, এখন নিজের মহিমাকে ভাবী বংশের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে এ সংসারে তার কর্ত্তব্য চরম লক্ষ্যে গিয়ে পৌঁছবে। মনটা যতই খুসি হ'ল ততই অপরাধের সমস্ত দায়িত্ব কুমুর উপর থেকে সরিয়ে বোঝাই করলে বিপ্রদাসের উপর। দ্বিতীয় একখানা চিঠি তাকে লিখলে, সুরু করলে whereas দিয়ে, শেষ করলে your obedient servant মধুসূদন ঘোষাল সই ক'রে। মাঝখানটাতে ছিল I shall have the painful necessity ইত্যাদি। এরকম ভয় দেখানো চিঠিতে চাটুজ্যে বংশের উপর উল্টো ফল ফলে, বিশেষতঃ ক্ষতির আশঙ্কা থাকলে। বিপ্রদাস চিঠিটা দেখালে কালুকে। তার মুখ লাল হ'য়ে উঠলো। সে বল্লে, "এ রকম চিঠিতে আমার মতো সামান্য লোকের দেহে একেবারে বাদশাহী মাত্রায় রক্ত গরম হ'য়ে ওঠে। অদৃশ্য কোতোয়াল বেটাকে হাঁক দিয়ে ডেকে বলতে ইচ্ছে করে, শির লেও উসকো।"

দিনের বেলা নানা প্রকার লেখা পড়ার কাজ ছিল, সে সমস্ত শেষ ক'রে সন্ধ্যাবেলা বিপ্রদাস কুমুকে ডেকে পাঠালে। কুমু আজ সারাদিন দাদার কাছে আসেই নি। নিজেকে লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াচ্চে।

বিপ্রদাস বিছানা ছেড়ে চৌকিতে উঠে বসল। রোগীর মতো শুয়ে থাকলে মনটা দুর্ব্বল থাকে। সামনের দিকে কুমুর জন্যে একটা ছোট চৌকি ঠিক ক'রে রেখেচে। আলোটা ঘরের কোণে একটু আড়াল ক'রে রাখা। মাথার উপর বড়ো একটা টানা পাখা হুস হুস ক'রে চল্‌চে। বৈশাখ শেষের আকাশে তখনো গুমট জ'মে আছে, দক্ষিণে হাওয়া এক একবার অল্প একটু নিশ্বাস ছেড়েই থেমে যাচ্চে, গাছের পাতাগুলো যেন একান্ত কান-পাতা মনোযোগের মত নিস্তব্ধ। সমুদ্রের মোহানার গঙ্গা যেখানে নীল জলকে ফিকে ক'রে দিয়েছে, আজকারটা যেন সেই রকম! দীর্ঘ বিলম্বিত গোধূলির শেষ আলোটা তখনো তার কালিমার ভিতরে ভিতরে মিশ্রিত। বাগানের পুকুরটা ছায়ায় অদৃশ্য হ'য়ে থাকৃত, কিন্তু খুব একটা জলজ্বলে তারার স্থির প্রতিবিম্ব আকাশের অঙ্গুলি সঙ্কেতের মতো তাকে নির্দ্দেশ ক'রে দিচ্চে। গাছতলার নীচে দিয়ে চাকরবা

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ক্ষণে ক্ষণে লণ্ঠন হাতে ক'রে যাতায়াত করচে, আর পেঁচা উঠ্‌চে ডেকে।

কুমু বোধ হয় একটু ইতস্তত ক'রে একটু দেরি ক'রেই এল। বিপ্রদাসের কাছে চৌকিতে ব'সেই বললে, "দাদা আমার একটুও ভালো লাগচে না। আমার যেন কোথায় যেতে ইচ্ছে করচে।"

বিপ্রদাস বল্‌লে, "ভুল বলচিস্‌ কুমু, তোর ভালোই লাগবে। আর কিছুদিন পরেই তোর মন উঠ্‌বে ভ'রে।"

"কিন্তু তা' হ'লে—ব'লে কুমু থেমে গেল।

"তা'জানি—এখন তোর বন্ধন কাটাবে কে?"

"তবে কি যেতে হবে দাদা?"

"তোকে নিষেধ করতে পারি এমন অধিকার আর আমার নেই। তোর সন্তানকে তার নিজের ঘরছাড়া করব কোন্‌ স্পর্দ্ধায়?"

কুমু অনেকক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে রইল, বিপ্রদাসও কিছু বল্‌লে না।

অবশেষে খুব মৃদুস্বরে কুমু জিজ্ঞাসা করলে, "তা' হ'লে কবে যেতে হবে?"

"কালই, আর দেরি সইবে না।"

"দাদা, একটা কথা বোধ হয় বুঝতে পারচ, এবার গেলে ওরা আমাকে আর কখনো তোমার কাছে আসতে দেবে না।"

"তা' আমি খুবই জানি।"

"আচ্ছা, তাই হবে। কিন্তু একটা কথা তোমাকে ব'লে রাখি, কোনোদিন কোনো কারণেই তুমি ওদের বাড়ি যেতে পারবে না। জানি দাদা, তোমাকে দেখবার জন্যে আমার প্রাণ হাঁপিয়ে উঠ্‌বে, কিন্তু ওদের ওখানে যেন কখনো তোমাকে না দেখ্‌তে হয়। সে আমি সইতে পারব না।"

"না, কুমু, সেজন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না।"

"ওরা কিন্তু তোমাকে বিপদে ফেলবার চেষ্টা করবে।"

"ওরা যা' করতে পারে তা' করা শেষ হ'লেই আমার উপর ওদের ক্ষমতাও শেষ হবে। তখনি আমি হব স্বাধীন। তাকে তুই বিপদ বল্‌ছিস কেন?"

"দাদা, সেইদিন তুমিও আমাকে স্বাধীন ক'রে নিয়ো। ততদিনে ওদের ছেলেকে আমি ওদের হাতে দিয়ে যাব। এমন কিছু আছে, যা ছেলের জন্যেও খোওয়ানো যায় না।"

"আচ্ছা,—আগে হোক ছেলে, তার পরে বলিস্‌।"

"তুমি বিশ্বাস করচ না, কিন্তু মা'র কথা মনে আছে তো? তাঁর তো হ'য়েছিল ইচ্ছা-মৃত্যু। সেদিন সংসারে তিনি তাঁর জায়গাটি পাচ্ছিলেন না, তাই তাঁর ছেলেমেয়েদেরকে অনায়াসে ফেলে দিয়ে যেতে পেরেছিলেন। মানুষ যখন মুক্তি চায়, তখন কিছুতেই তাকে ঠেকাতে পারে না। আমি তোমারি বোন, দাদা, আমি মুক্তি চাই। একদিন যেদিন বাঁধন কাটবে, মা সেদিন আমাকে আশীর্ব্বাদ করবেন, এই আমি তোমাকে ব'লে রাখলুম।"

আবার অনেকক্ষণ দুজনে চুপ ক'রে রইল। হঠাৎ হু হু ক'রে বাতাস উঠ্‌ল, টিপাইয়ের উপর বিপ্রদাসের পড়বার বইটার পাতাগুলো ফর্‌ ফর্‌ ক'রে উলটে যেতে লাগল। বাগান থেকে বেলফুলের গন্ধে ঘর গেল ভ'রে।

কুমু বল্‌লে, "আমাকে ওরা ইচ্ছে ক'রে দুঃখ দিয়েচে তা' মনে কোরো না। আমাকে সুখ ওরা দিতে পারে না আমি এমনি ক'রেই তৈরি। আমিও তো ওদের পারব না সুখী করতে। যারা সহজে ওদের সুখী করতে পারে তাদের জায়গা জুড়ে কেবল একটা না একটা মুস্কিল বাধবে। তা হ'লে কেন এ বিড়ম্বনা! সমাজের কাছ থেকে অপরাধের সমস্ত লাঞ্ছনা আমিই একলা মেনে নেব, ওদের গায়ে কেনো কলঙ্ক লাগবে না। কিন্তু একদিন ওদেরকে মুক্তি দেব, আমিও মুক্তি নেব; চ'লে আসবই এ তুমি দেখে নিয়ো। মিথ্যে হ'য়ে মিথ্যের মধ্যে থাকতে পারব না। আমি ওদের বড়ো বৌ, তার কি কোনো মানে আছে যদি আমি কুমু না হই? দাদা, তুমি ঠাকুর বিশ্বাস করো না, আমি বিশ্বাস করি। তিন মাস আগে যে রকম ক'রে করতুম, আজ তার চেয়ে বেশি ক'রেই করি। আজ সমস্ত দিন ধ'রেই এই কথা ভাবছি যে, চারিদিকে এতো এলো-মেলো, এত উলটো-পাল্‌টা, তবু এই জঞ্জাল একেবারে ঢেকে ফেলেনি জগৎটাকে। এ সমস্তকে ছাড়িয়ে গিয়েও

চন্দ্র সূর্য্যকে নিয়ে সংসারের কাজ চলচে, সেই যেখানে ছাড়িয়ে গেছে সেইখানে আছে বৈকুণ্ঠ, সেইখানে আছেন আমার ঠাকুর। তোমার কাছে এ সব কথা বলতে লজ্জা করে,- কিন্তু আর তো কখনো বলা হবে না, আজ ব'লে যাই। নইলে আমার জন্যে--মিছিমিছি ভাববে। সমস্ত গিয়েও তবু বাকি থাকে এই কথাটা বুঝতে পেরেছি। সেই আমার অক্ষুরান, সেই আমার ঠাকুর এ যদি না বুঝতুম তা' হ'লে এইখানে তোমার পায়ে মাথা ঠুকে মরতুম, সে গারদে ঢুকতুম না। দাদা, এ সংসারে তুমি আমার আছ ব'লেই তবে একথা বুঝতে পেরেছি।" এই ব'লেই কুমু চৌকি থেকে নেবে দাদার পায়ের উপর মাথা রেখে প'ড়ে রইল। রাত বেড়ে চল্‌ল, বিপ্রদাস জানালার বাইরে অনিমেষ দৃষ্টি মেলে ভাবতে লাগ্‌ল।

৫৮

পরদিন ভোরে বিপ্রদাস কুমুকে ডেকে পাঠালে। কুমু এসে দেখে বিপ্রদাস বিছানায় ব'সে, একটি এসরাজ আছে কোলের উপর, আরেকটি পাশে জোওয়ানো। কুমুকে বললে, "নে যন্ত্রটা, আমরা দুজনে মিলে বাজাই।" তখনো অল্প অল্প অন্ধকার, সমস্ত রাত্রির পরে বাতাস একটু ঠাণ্ডা হ'য়ে অশথ পাতার মধ্যে ঝির ঝির করচে, কাকগুলো ডাকতে সুরু করেচে। দুজনে ভৈরোঁ রাগিণীতে আলাপ সুরু করলে, গম্ভীর, শান্ত, সকরুণ; সতীবিরহ যখন অচঞ্চল হ'য়ে এসেছে, মহাদেবের সেই দিনকার প্রভাতের ধ্যানের মত। বাজাতে বাজতে পুষ্পিত কৃষ্ণচূড়ার ডালের ভিতর দিয়ে অরুণ-আভা উজ্জ্বলতর হ'য়ে উঠল, সূর্য্য দেখা দিল বাগানের পাঁচিলের উপরে। চাকররা দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়ে থেকে ফিরে গেল। ঘর সাফ করা হোল না। রৌদ্দুর ঘরের মধ্যে এলো, দরোয়ান আস্তে আস্তে এসে খবরের কাগজ টিপাইয়ের উপর রেখে দিয়ে নিঃশব্দ পদে চ'লে গেলো।

অবশেষে বাজনা বন্ধ ক'রে বিপ্রদাস বল্‌লে, "কুমু তুই মনে করিস্ আমার কোন ধর্ম্ম নেই। আমার ধর্ম্মকে কথায় বল্‌তে গেলে ফুরিয়ে যায় তাই বলিনে। গানের সুরে তার রূপ দেখি, তার মধ্যে গভীর দুঃখ, গভীর আনন্দ এক হ'য়ে মিলে গেছে; তাকে নাম দিতে পারিনে। তুই আজ চ'লে যচ্চিস, কুমু, আর হয়তো দেখা হবে না, আজ সকালে তোকে সেই সকল বেসুরের সকল অমিলের পরপারে এগিয়ে দিতে এলুম। শকুন্তলা পড়েছিস,—দুষ্মন্তের ঘরে যখন শকুন্তলা যাত্রা ক'রে বেরিয়েছিল, কণ্ব কিছুদূর পর্য্যন্ত তাকে পৌঁছিয়ে দিলেন। যে লোকে তাকে উত্তীর্ণ করতে তিনি বেরিয়েছিলেন, তার মাঝখানে ছিল দুঃখ অপমান। কিন্তু সেই খানেই থাম্‌ল না, তাও পেরিয়ে শকুন্তলা পৌঁচেছিল অচঞ্চল শান্তিতে। আজ সকালের ভৈরোঁর মধ্যে সেই শান্তির সুর, আমার সমস্ত অন্তঃকরণের আশীর্ব্বাদ তোকে সেই নির্ম্মল পরিপূর্ণতার দিকে এগিয়ে দিক্; সেই পরিপূর্ণতা তোর অন্তরে তোর বাহিরে, তোর সব দুঃখ তোর সব অপমানকে প্লাবিত করুক্।"

কুমু কোনো কথা বললে না। বিপ্রদাসের পায়ে মাথা রেখে প্রণাম করলে। খানিকক্ষণ জানলার বাইরের আলোর দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তার পরে বল্‌লে, "দাদা, তোমার চা রুটি আমি তৈরি ক'রে নিয়ে আসিগে।"

মধুসূদন আজ দৈবজ্ঞকে ডাকিয়ে শুভযাত্রার লগ্ন ঠিক ক'রে রেখেছিল। সকালে দশটার কিছু পরে। ঠিক সময়ে জরির কাজকরা লাল বনাতের ঘেরাটোপ-ওয়ালা পাল্কী এল দরজায়, আসাসোট নিয়ে লোকজন এল, সমারোহ ক'রে কুমুকে নিয়ে গেল মির্জ্জাপুরের প্রাসাদে। আজ সেখানে নহবৎ বাজছে, আর চলছে ব্রাহ্মণ ভোজন, ব্রাহ্মণ বিদায়ের আয়োজন।

মাণিক এল বার্লির পেয়ালা হাতে বিপ্রদাসের ঘরে। আজ বিপ্রদাস বিছানায় নেই, জানালার সামনে চৌকি টেনে নিয়ে স্থির ব'সে আছে। বার্লি যখন এলো কোনো খবরই নিলে না। চাকর ফিরে গেল। তখন ক্ষেমা পিসি এলেন পথ্য নিয়ে, বিপ্রদাসের কাঁধে হাত দিয়ে বললেন, —"বিপু, বেলা হ'য়ে গেছে বাবা।"

বিপ্রদাস চৌকি থেকে ধীরে ধীরে উঠে বিছানায় শুয়ে পড়ল। ক্ষেমা পিসির ইচ্ছা ছিল কেমন ধুমধাম ক'রে আদর ক'রে ওরা কুমুকে নিয়ে গেল তার বিস্তারিত বর্ণনা ক'রে গল্প করেন। কিন্তু বিপ্রদাসের গভীর নিস্তব্ধতা

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দেখে কোন কথাই বলতে পারলেন না, মনে হ'ল বিপ্রদাসের চোখের সামনে একটা অতলস্পর্শ শূন্যতা।

বিপ্রদাস যখন ব'লে উঠ্‌ল, 'পিসি, কালুকে পাঠিয়ে দাও' তখন এই সামান্য কথাটাও অদৃষ্টের একটা প্রকাণ্ড নিঃশব্দ ছায়ার ভিতর দিয়ে ধ্বনিত হ'ল। পিসির গা ছম্‌ছম্‌ ক'রে উঠ্‌ল।

কালু যখন এলো, বিপ্রদাস তার হাতে একখানা চিঠি দিলে। বিলেতের চিঠি. সুবোধের লেখা। সুবোধ লিখেছে, বারের ডিনার শেষ না ক'রেই যদি সে দেশে আসে তা' হ'লে আবার তাকে ফিরে যেতে হবে। তার চেয়ে শেষ ডিনার সেরে মাঘ ফাল্গুন নাগাত দেশে ফিরে এলে তার সুবিধে হয়, অনর্থক খরচের আশঙ্কাও বেঁচে যায়। তার বিশ্বাস বিষয় কর্ম্মের প্রয়োজন ততদিন সবুর করতে পারে।

আজকের দিনে বিষয় কর্ম্মের সঙ্কট নিয়ে বিপ্রদাসকে পীড়া দিতে কালুর একটুও ইচ্ছে ছিল না। কালু বল্‌লে, "দাদা, এখনো তো টাকা তুলে নেবার কোনো কথা ওঠেনি, আর কিছুদিন যদি সাবধানে চলি, কাউকে না ঘাঁটাই, তা' হ'লে শীঘ্র কোনো উৎপাত ঘটবে না। যাই হোক্‌, তুমি কোনো ভাবনা কোরো না।"

বিপ্রদাস বল্‌লে, "আমার কোনো ভাবনা নেই কালু। লেশ মাত্র না।"

বিপ্রদাসের ভাবনা কালুর ভালো লাগে না,—এও অত্যন্ত নির্ভাবনা তার আরো খারাপ লাগে।

বিপ্রদাস খবরের কাগজ তুলে নিয়ে পড়তে লাগল, কালু বুঝলে এ সম্বন্ধে কোনো আলোচনা করতে বিপ্রদাসের একটুও ইচ্ছা নেই। অন্যদিন কাজের কথা শেষ হ'লেই কালু চ'লে যায়, আজ সে চুপ ক'রে ব'সে রইল, ইচ্ছা করতে লাগল অন্য কিছু কথা বলে, যা-হয় কোনো একটা সেবায় লেগে যায়। জিজ্ঞাসা করলে, "বাইরের দিকে ঐ জানালাটা বন্ধ ক'রে দেব কি? রোদ্দুর আস্‌চে।"

বিপ্রদাস হাত নেড়ে জানালে যে দরকার নেই।

কালু তবু রইল ব'সে। দাদার ঘরে আজ কুমু নেই এ শূন্যতা তার বুকে চেপে রইল। হঠাৎ শুন্‌তে পেলে বিছানার নীচে টম কুকুরটা গুম্‌রে গুম্‌রে কেঁদে উঠল। কুমুকে সে চ'লে যেতে দেখেচে, কি একটা বুঝেচে, ভালো ক'রে বোঝাতে পারচে না।

(সমাপ্ত)
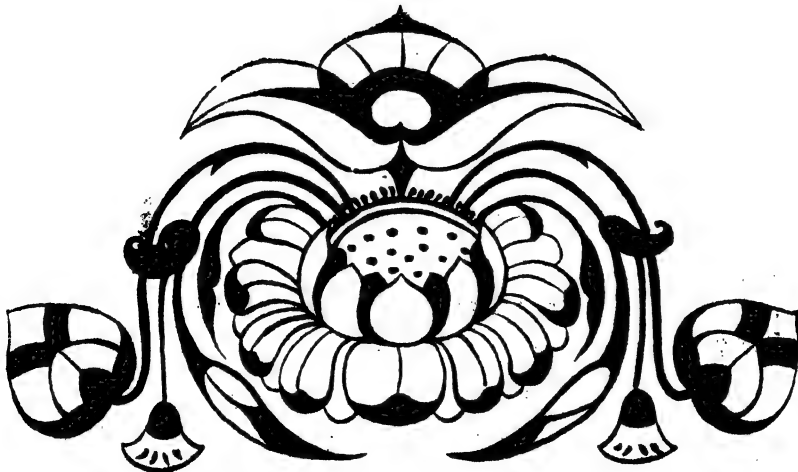
বসন্ত-বিদায়

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

আমার সকল কামনা ফোটেনি এখনো, ফোটেনি গানের শাখে,
চৈত্র নিশীথে বসন্ত কাঁদে, দ্বারে হেরি' বৈশাখে।
সিঁথীটি সাজায়ে অশোকের ফুলে,
চাঁপার মুকুল ভরিয়া দুকূলে,
কাঁদে কাম-বধূ বিদায়-বিধুর, নূপুর খুলিয়া রাখে।

আমি গোলাপের বুকে রেখেছিনু ঢেকে কস্তুরী-কর্পূর,
আফিম-ফুলের কৌটায় ছিল ললাটের সিন্দূর,—
নয়ন-নিমেষে গেল তারা ঝরি'!
লয়ে ফাগুনের চূতমঞ্জরী
অলকে পরিনু, অলিগুঞ্জনে অলীক ভাবনাতুর।

শেষে লাল হ'য়ে ওঠে বন-বনান্ত পলাশে ও কিংশুকে,
দিকে দিকে পিক কুহু কুহরিল, মহুয়ার মধু মুখে;
তরুশাখে-শাখে লতা-হিন্দোল,
পাতায় পাতায় ফুল-হিল্লোল,
সন্ধ্যা-আকাশে সাজিল কাহারা রক্ত চীনাংশুকে!

ওগো এখনি হবে কি রঙের বাসর, ফুলের দীপালি শেষ?
নিশার নেশা যে এখনো লাগেনি—নয়নে ঘুমের লেশ!
কাজল-আঁকা এ আঁখির কোণায়
এখনি অরুণ আভাটি ঘনায়,
রিনি-রিনি করে সকল শিরায় রজনীর রসাবেশ!

বসন্ত-বিদায়

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

আমার　কবরী এখনো হয়নি শিথিল—শিথানে পড়েনি খুলে,'
মুকুরে যে-হাসি দেখেছি অধরে, সে হাসি যাইনি ভুলে'।
ধূপের ধোঁয়ায় দিছি মিলাইয়া
দেহের দহনে সুরভি এ হিয়া—
প্রাণের গহনে জ্বলেনি যে দীপ বেদনার বেদীমূলে !

ওগো　মধুযামিনীর জ্যোৎস্না-কামিনী এখনো যে কানে-কানে
সুধাইছে মোরে সুধার কাহিনী—সে কথা সেও না জানে !
সুখের স্বপনে সুমধুর ব্যথা
কেন জেগে রয়—সেই রূপকথা
শুনিবারে চায়, কেবলি তাকায় আমারি মুখের পানে !

আমি　মরণেরে, তার নীলতনু ঘেরি' জীবনের পীতবাস
পরায়ে, সাধা'ব হৃদয়-রাধারে—কত না করেছি আশ !
হাসিয়া উঠিবে গোরোচনা-গোরী—
আবীরের ধূলি মুঠা-মুঠা ভরি',
শ্যাম-মুখ তার রাঙায়ে রচিবে মরণের মধুমাস !

ওগো　সে কামনা মোর জ্বলে' নিবে' গেল শিমুলের শাখে-শাখে,-
চৈত্র-নিশীথে বসন্ত কাঁদে, দ্বারে হেরি' বৈশাখে।
সিঁথীটি সাজায়ে অশোকের ফুলে,
চাঁপার মুকুল ভরিয়া দুকূলে,
কাঁদে কাম-বধূ বিদায়-বিধুর, নূপুর খুলিয়া রাখে।

কল্কি অবতার

কালিয় দমন

হরিহর শেঠ মহাশয়
কর্তৃক প্রেরিত]

পরশুরাম অবতার

নাগ-পাশ

HAR-HARI.

হর হরি

শ্রীরামচন্দ্রের বাল্যলীলা

গঙ্গাদেবী

LAKSHMI.

লক্ষ্মী

বুদ্ধ-অবতার

কৃষ্ণ অবতার

শ্রীরাম অবতার

বামন অবতার

নৃসিংহঅবতার

বরাহ অবতার

কূর্ম্ম অবতার

মৎস্য অবতার

—শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়

১৭

শরৎচন্দ্রের "শ্রীকান্তে" আছে, আশ্চর্য্য এই বাংলাদেশ, এর ঘরে ঘরে মা বোন (ঠিক কথাগুলি মনে নেই)। একথা বোধ হয় সব দেশের সম্বন্ধে বলা যায়। অন্তত ইংলণ্ডের সম্বন্ধে নিশ্চয়ই। আশ্চর্য্য এই মানুষের পৃথিবী, এর পথে পথে আপনার লোক। পথে বাহির না হ'লে কি এদের পরিচয় মেলে! সেই জন্যেই তো মানুষ ঘর ছেড়ে দিয়ে পথকে শরণ করলে। কত দেশে কত আপনার লোক, সকলের পরিচয় না নিয়ে কি তৃপ্তি আছে!

মানুষে মানুষে কত না তফাৎ—বর্ণের, রক্তের, ভাষার, সংস্কারের, শ্রেণীর, স্বার্থের। এত তফাৎ আছে ব'লেই কি এমন মিলনকামনা? এক নিশ্বাসে সকল তফাৎকে উপরে রেখে হৃদয়ের অতলে তলিয়ে যাবার প্রেরণা? সে অতলে কেউ পর নয়, সবাই আপন; এত আশ্চর্য্য রকম আপন যে, মনও সে খবর রাখে না। মন তো মহা তার্কিক, সবাকে মায়া ব'লে কুটি কুটি করাই তার স্বভাব। মানুষের যদি কেবল মনই থাক্‌তো তবে মানুষ হ'তো একটা অভিশপ্ত বিভীষিকা—Niobeর মতো বহুসন্তানবতী হ'য়েও বন্ধ্যা।

আমরা অত্যন্ত বেশী নিজেকে সাদা বা কালো, ইংরেজ বা ভারতীয়, ধনী বা দরিদ্র ভাবি—এটা আমাদের মনের কারসাজি, এটা মায়া। যখন মানুষের সাম্‌নে মানুষ দাঁড়ায় তখন কোথায় যায় এই মায়া? তখন আসে উপলব্ধির মাহেন্দ্রক্ষণ—তখন অকস্মাৎ উপলব্ধি করি, আমাদের সংজ্ঞা হয় না। আমরা যে কী তা বুঝিয়ে বল্‌বার উপায় নেই ব'লে দু'পক্ষের সুবিধার জন্যে বলতে হয়, "সাদা" বা "কালো", "ইংরেজ" বা "ভারতীয়", "ধনী" বা "দরিদ্র"; কিন্তু এগুলো আমাদের সংজ্ঞা নয়, symbol। আমরা আমরা—আমরা personalities। আমাদের পরিচয় নৃ-তত্ত্বে নেই ভূগোলে নেই ধনবিজ্ঞানে নেই, আছে আমাদের সত্তায়। আমরা যে হ'য়ে উঠেছি, এই আমাদের প্রথম ও শেষ পরিচয়। এর মতো বিস্ময় আর নেই, এ রহস্য লক্ষ বছর ধ'রে দার্শনিককে বৈজ্ঞানিককে কলুর বলদের মতো ঘোরাবে, তবু সে হতভাগ্যেরা এর সম্বন্ধে মায়াবাদীই থেকে যাবে।

যারা খবরের কাগজ প'ড়ে মানুষের খবর রাখে তারা কি কোনোমতে বিশ্বাস করবে কত বড় একটা বিদ্রোহ সকলের অলক্ষ্যে ফুলে ফুলে উঠ্‌ছে "মুক্তধারার" সেই জলপ্রপাতের মতো? মানুষের মনের বিরুদ্ধে মানুষের হৃদয়ের এ বিদ্রোহ—এর কানায় কানায় অভিমান। সর্ব্বশক্তিমান মনের বিরুদ্ধে কোমল অবল সরলবিশ্বাসী হৃদয়ের পুঞ্জীভূত অভিমান। বৈজ্ঞানিক দার্শনিকের দরবারে কবির নিরুদ্ধ কণ্ঠ বোবার মতো আভাসে ইঙ্গিতে বলতে চাইছে, আমার পরিচয় লও, আমাকে তোমার

objective চশমাখানার পক্ষে মায়া ঠাউরো না, আমাকে তোমার efficiencyর খাতিরে বিশ্ব থেকে বাদ দিয়ো না।

এই বিরাট জলতরঙ্গের এক একটা ফেনা হচ্ছে ধনীর বিরুদ্ধে দরিদ্রের বিদ্রোহ, সাম্রাজ্যবাদীর বিরুদ্ধে পরাধীনের বিদ্রোহ, সাদার বিরুদ্ধে কালোর বিদ্রোহ। কিন্তু ফেনা মাত্র, তার বেশী না। বাঁধ ভাঙ্‌বার ক্ষমতা এদের নেই, রস এদের মধ্যে স্বল্প। বাঁধ কেবলমাত্র ভাঙবে না, বাঁধ ভেসে চল্‌বে সেইদিন, যেদিন "মুক্তধারার" রাজকুমার তাঁর আত্মদানের আনন্দ হাতে ক'রে আসবেন, প্রেমের অমোঘ আঘাত হান্‌বেন। মনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ মনকে ধ্বংস করবার নয়, মনকে রসিয়ে তুল্‌বার! সেই হিসাবে এটা প্রলয় নয়, সৃষ্টি। সভ্যতাকে হৃদয়বত্তার রসে ওতঃপ্রোত না ক'রে রাখ্‌লে সে যে শুকিয়ে পাঁক হ'য়ে উঠ্‌বে। এতদিন সে রসলেশশূন্য হয় নি শুধু যীশুর মতো প্রেমিকের কল্যাণে। ইউরোপীয় মানুষের মন তাকে এতদিনে একটা ময়দানবে পরিণত ক'রে থাক্‌তো যদি না সে যীশুর হৃদয়রক্তকে Eucharist ক'রে নিতো। ভারতীয় মানুষের মনকেও শঙ্করাচার্য্যের দৌরাত্ম্য থেকে রামানুজ উদ্ধার করেছিলেন, সার্ব্বভৌমের উৎপাত থেকে শ্রীচৈতন্য।

আধুনিক কালের এই বিজ্ঞান-দৃষ্টি, কল্পনা-কুণ্ঠ, স্বাচ্ছন্দ্য-সর্ব্বস্ব, নাস্তিক সভ্যতাকে প্রোলিটারিয়ানও রসাতে পারবে না, ন্যাশনালিষ্টও না। কেন না বুর্জ্জোয়ার মতো প্রোলিটারিয়ানও এর দ্বারা সম্মোহিত, ফরাসী-ইংরেজের মতো চীনা-ভারতীয়ও একে আদর্শ করেছে। ইংলণ্ডে দেখ্‌ছি সোশ্যালিষ্ট চায় ক্যাপিটালিষ্টেরই একটু সস্তাগোছের নকল সাজ্‌তে, সেও একটি সেকেণ্ডহ্যাণ্ড্ পোষাকপরা সেকেণ্ডহ্যাণ্ড্ মতামতওয়ালা Snob। সে যেমন উন্নতি করছে আশা করা যায় সে অবিলম্বেই বুর্জ্জোয়া হ'য়ে উঠ্‌বে, অর্থাৎ উপরের লোকদের সরিয়ে দিয়ে নীচের লোকদের দাবিয়ে রাখ্‌বে। যুবক ভারতের অধুনাতন কংগ্রেস্ কন্‌ফারেন্সের বিবরণী পাঠ ক'রে যতদূর বোঝা যায়, ভারতবর্ষও একটা "Great Power" না হ'য়ে ছাড়্‌বে না। ইংলণ্ড ও রাশিয়া মিলে তার দুই কানে একই মন্ত্র দিচ্ছে—"Power," "Efficiency," "Progress"। এদের মন্ত্রশিষ্য যে এদের গুরুমারা চেলা হ'য়ে উঠ্‌বে ও এদের ছাড়া কাপড়খানার উত্তরাধিকার দাবী করবে, এমন মনে করবার কারণ আছে। বস্তুত দু'পক্ষের কাম্য এক না হ'লে যুদ্ধ বাধে না। প্রোলিটারিয়ান ও বুর্জ্জোয়া, ইম্পিরিয়ালিষ্ট ও ন্যাশনালিষ্ট ঠিক্ একই জিনিষ চায়—"Success" "Power," "Efficiency," "Civilisation," "Progress" প্রথমে কাম্যের ডিগ্রীটা থাকে নীচে, যেমন একখানা কটিবস্ত্র। ক্রমে ক্রমে ওঠে ওপরে, যেমন একরাশ মিলিটারী পোষাক। তারপরে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি—ম্যাজিনীর ইটালী হ'য়ে দাঁড়ায় মুসোলিনীর ইটালী, অষ্ট্রিয়ার নীচের লোক হ'য়ে দাঁড়ায় ট্রিপোলীর উপরের লোক।

অতএব মানবহৃদয়ের বিদ্রোহী ধারাকে মুক্তি দেবার সৌভাগ্য কোনো শ্রেণীবিশেষেরও হবে না, কোনো নেশন-বিশেষেরও না। নিগ্রো প্রভৃতি জাতিও নিজেদেরকে নিরতিশয় দুঃখী মনে করছে মনের বিরুদ্ধে মন খাটাতে না পেরে। মানুষের একমাত্র আশা মানুষ নিজে—নৃতত্ত্ব ভূগোল ধনবিজ্ঞানের মানুষ না, সংজ্ঞার অতীত personality, সৃষ্টির বিস্ময়, জ্ঞানী মুনির রহস্য, "মুক্তধারার" সেই রাজকুমার যাঁর জন্ম হয়েছিল পথে, বাইবেলের সেই King of Kings যাঁর স্থান হয়েছিল ক্রুশে। নিজের এতবড় সৌভাগ্যকে যেদিন মূল্য দিতে শিখ্‌বো সেদিন আমাদের সভ্যতা আরেক স্তরে উঠ্‌বে, সেদিন সম্পত্তিকে দেশকে বর্ণকে মনে হবে পথিকের জন্মস্বত্ব, স্থাণুর নয়। সেদিন জন্মস্বত্বের ভাবনায় আমরা একস্থানে দাঁড়িয়ে কোঁদল করবো না, জন্মস্বত্বের উপর থেকে জোর তুলে নিয়ে জোর দেবো আমাদের পথিকত্বের উপরে। তখন বৈষম্যের জন্যে আমরা ক্ষুব্ধ না হ'য়ে তাকেই ক'রে তুল্‌বো বৈচিত্র্য; পরাজয় জ্ব'লে উঠ্‌বে জয়টীকার মতো; দুঃখকে সৃষ্টিতে রূপান্তরিত ক'রে স্রষ্টার গৌরব অনুভব কর্‌বো।

হৃদয়ের বুভুক্ষা ইংলণ্ডকে কতটা পীড়িত করেছে দূর থেকে আমরা কেন, কাছে থেকে ইংলণ্ডের সকলে কিছু তা ঠাহর করতে পারে না। প্রত্যেকের এত বেশী freedom of speech যে কেউ কারুর সঙ্গে কথা বলতে সাহস করে না, কথা বল্‌লেও সেই "Is n't it cold ?" ইত্যাদি মিছে

শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়

কথা। সকলের সঙ্গে মেলামেশা করতে গিয়ে কারুর সঙ্গে অন্তরঙ্গতা হবার উপায় নেই, সবাই সবাইকে বাইরের খবর শোনাতে গিয়ে ভিতরের খবর শোনাবার অবসর বা ভরসা পায় না। পরিবার ভেঙে যাচ্ছে, স্নেহ মমতার চরিতার্থতা উপলক্ষ পাচ্ছে না। কেবল একটা ফাঁকা আত্মপ্রসাদ আছে—আমি স্বতন্ত্র, আমি স্বেচ্ছাগতি, আমি স্বাধীনজীবী! অনেকটা কুলীনের কন্যার অনূঢ়া-ত্বের জাঁকের মতো এই আত্মপ্রসাদ। কাজ কাজ কাজ দিয়ে দিনের পেয়ালা ভরে না, রাতের পেয়ালায় নাচ নাচ নাচ ঢেলেও সেই শূন্যতা। যেন জীবন পেয়ালাটার তলা-ই নেই, আগাগোড়া ফাঁকা। নিত্য নূতন সুরার সরবরাহ ক'রেও লেখক লেখিকা নটনটী পোষাকওয়ালা আস্‌বাবওয়ালা হৃদয়ের তৃষ্ণা মেটাতে পারে না; খ্রীষ্টীয় মত যেটুকু আফিং ধরিয়েছিল সেটুকুর নেশাও গত মহাযুদ্ধে কেটে গেছে, সামাজিক কল্যাণকর্ম কতকটা স্তোক দেয় বটে, কিন্তু সে কি মুক্তি দিতে পারে! ইংলণ্ডে কেবল একটি আনন্দ আছে, ছুটোছুটির আনন্দ, তাই ইংলণ্ড আছে, নইলে কি দিয়ে সে নিজেকে ভোলাতো? একে একে তার সব স্বপ্নই যে ছায়া হয়ে গেছে, মায়া হয়ে গেছে। Democracy ও Sex Equality কতক স্বপ্ন চুর ক'রে দিয়েছে, বিজ্ঞান বাকী স্বপ্নগুলোকে দূর ক'রে দিয়েছে। মস্ত একটা আদর্শবাদের অভাব ইংলণ্ডকে বড় দরিদ্র করেছে। এই দারিদ্র্যের লক্ষণ আধুনিক ইংরেজী সাহিত্যের সর্ব্বাঙ্গে। এ সাহিত্যের কোনো লেখক কোনো পাঠককে কষ্ট দিতে চায় না, পাছে বেচারার যে ক'টা স্বপ্ন বাকী আছে সেও যায়। লেখক এখন বিদূষক সেজে পাঠক হাসিয়ে পয়সা কুড়োয়, কিম্বা খুব সারগর্ভ উপদেশ দিয়ে উপকার করে।

ইংলণ্ডের মনের জোর তার গায়ের জোরেরই মতো অসামান্য। এখনো বহুকাল তার মজ্জাগত জোর তাকে "Great power" ক'রে রাখবে। জোর মাত্রেই moral force, ইংলণ্ড আমাদের চেয়ে moral, অন্যান্য অনেক নেশনের চেয়ে moral। বস্তুত সভ্যতা জিনিষটাই মানুষের moral কীর্ত্তি, এবং সভ্যতায় ইংলণ্ডের মানুষ সব মানুষের প্রথম সারিতে। এই সারিতেই উপনীত হবার কামনা আছে যুবক ভারতের, যুবক ভারত ইংলণ্ড রাশিয়া প্রভৃতির moral সমকক্ষতা চায়। কিন্তু সৃষ্টি যে করে সে moral মানুষ নয়, সে spiritual মানুষ, ইংলণ্ডে এ মানুষ আর দেখা যাচ্ছে না। সৃষ্টি যে করে সে মানুষের দেহ মন নয়, সে মানুষের হৃদয়; হৃদয় ইংলণ্ডের ক্রমেই স্তন্য হারাচ্ছে কিম্বা স্তন্যের উমেদার হারাচ্ছে। কাজ কাজ কাজ ও নাচ নাচ নাচ নিয়ে সবাই এত ব্যস্ত যে সূক্ষ্ম হৃদয়বৃত্তিগুলোকে মুক্তি দিতে যদি বা কেউ ইচ্ছুক হয় তবু সে মুক্তির উপলক্ষ জোটে না, অর্থাৎ বুকভরা মধু থাকলেও মৌমাছি আসে না। হৃদয় চায় দিয়ে সুখী হ'তে, কিন্তু দান নেবার ভিখারী যে নেই, ভিখারী হ'তে সকলের আত্মসম্মানে বাধে, সকলে চায় হক্ দাবী, ন্যায্য পাওনা, স্বাধীনতা, সমানাধিকার, শ্রদ্ধা—এক কথায় জন্মস্বত্ব। তাই নিয়ে ছুটোছুটি ও কাড়াকাড়ির ফাঁকে মানুষের সত্য পরিচয়টা কোথায় হারিয়ে গেছে, মানুষ ভুলে গেছে যে তার জন্ম হয়েছিল পথে; কিছুই দাবী করতে তাকে মানা; সে যা পাবে তা দু'হাতে ছড়াতে ছড়াতে যাবে, সে স্বভাবত দাতা; এবং অপরকে দানের উপলক্ষ দান করবার জন্যেই সে গ্রহীতা।

আশ্চর্য্য এই মানুষের পৃথিবী, এর পথে প্রবাসে আপনার লোক, কিন্তু কেউ কারুর আত্মীয়তার কামনা মেটাবার সময় পাইনে, সাধ রাখিনে। তাই মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলন নিস্ফল হচ্ছে, চরিতার্থতা পাচ্ছে না। কেবল চীৎকার ক'রে উঠ্‌ছে—বৈষম্য দূর করো, দুঃখ ঘুচাও। ভুলে যাচ্ছে যে বৈষম্যকে স্বীকার ক'রেই সৃষ্টি, দুঃখকে ধারণ ক'রেই আনন্দ।

২৭

অনুতাপ আর অভিমান সমজাতীয় বস্তু না হ'লেও উভয়ই কমলার চিত্তকে যুগপৎ অধিকার ক'রে পীড়ন করতে লাগল। ফলে, রাগ হ'ল নিজের প্রতি যেমন, বিনয়েরও প্রতি তেম্‌নি। টাকা ফেরৎ দিয়ে বিনয় কমলার ছবি অধিকার করবার ইচ্ছা প্রকাশ করায় কমলার বাক্যে যে রূঢ়তা প্রকাশ পেয়েছিল বাইরে থেকে সহজ দৃষ্টিতে তার কারণ একমাত্র ক্রোধ ভিন্ন অন্য কিছু ব'লে মনে হয় নি; কিন্তু সামান্য ক্রোধকে উপলক্ষ ক'রে পুঞ্জীভূত যে বৃহৎ অভিমান উদ্যত হ'য়ে উঠেছিল তার সন্ধান পেলে হয় ত' বিনয় ক্ষুব্ধ হ'য়ে চ'লে যেত না। নিনাদ শুনে সে মেঘকে বজ্রগর্ভ মনে ক'রেই চ'লে গেল, সে যে বারিবিন্দুরও আশ্রয়স্থল সে কথা ভেবে দেখ্‌লে না। এ কথাও সে ভেবে দেখ্‌লে না যে, মানুষ যখন তার প্রিয়জনের সঙ্গে সৌহার্দ্য বিনিময়ের সুযোগ খুঁজে পায় না তখন সে তার সঙ্গে কলহ করে। কারণ, দুর্যোগ হ'লেও কলহ একটা যোগ, যা মুখরতার দ্বারা সম্বন্ধ স্বীকার ক'রেই চলে, নীরবতার দ্বারা ঔদাসীন্য ব্যক্ত করে না। কমলার ছবির প্রতি বিনয়ের লোভাতুরতায় কমলা যে তার নিজেরও প্রতি বিনয়ের অনুরাগের একটু আভাষ পায় নি, তা নয়,—কিন্তু সে তার উদগ্র আগ্রহের কাছে এতই সামান্য যে, ততটুকুতেই সন্তুষ্ট হ'য়ে থাকতে না পেরে সমস্তটা স্পষ্টতরভাবে জানবার আগ্রহে সে বিনয়ের সঙ্গে একটা সঙ্ঘাতের সৃষ্টি করেছিল। নিস্তরঙ্গ জলের মধ্যে আলোড়ন উপস্থিত ক'রে সে তার গভীরতা নির্ণয় করতে গিয়েছিল। তাই বলেছিল, 'আপনি আপনার কাছে আমার ছবি রাখ্‌বেন কেন? তার ত' একটা কারণ থাকা চাই, যা হয় একটা অধিকার থাকা চাই।' ফলে কিন্তু বিপরীত হ'ল।

বাইরে পরিচিত হর্ণের শব্দ শুনে কমলা বুঝতে পারলে দ্বিজনাথ এসেছেন। তাকিয়ে দেখ্‌লে ঘড়িতে তখন দশটা বেজে কুড়ি মিনিট। গাড়ি ছাড়তে তখনো দশ মিনিট বাকি। একবার মনে করলে দ্বিজনাথকে সঙ্গে নিয়ে মোটর ক'রে ষ্টেশনে গেলে এখনো হয়ত ধ'রে আনা যায়; কিন্তু পরক্ষণেই মনে হ'ল বিনয় ত' ফিরে আস্‌বেই না, অধিকন্তু দ্বিজনাথের নিকট সমস্ত ব্যাপারটা প্রকাশ হ'য়ে গুরুতর লজ্জার কারণ ঘট্‌বে। দ্বিজনাথ ঘরে এসে প্রবেশ

অনুরাগ

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

করতে পারেন, এই আশঙ্কায় কমলা তাড়াতাড়ি শয্যাত্যাগ ক'রে চেয়ারে ব'সে তার পড়বার টেবিলের উপর রুপার্ট ব্রুকের একখানা কাব্যগ্রন্থ খুলে দেখতে লাগল।

পরক্ষণেই বাইরের বারান্দায় ডাক পড়্‌ল, "কমলা, কমলা, কমল!"

দ্রুতপদে বাইরে বেরিয়ে এসে কমলা বল্‌লে, "বাবা?"

একখানা চেয়ারে ব'সে প'ড়ে দ্বিজনাথ বল্‌লেন, "আমি একাই ফিরে এলাম। সন্তোষকে তার বন্ধু এ বেলা কিছুতেই ছাড়লেন না;—বিকেল বেলা তিনি তাঁর নিজের গাড়ি ক'রে পৌঁছে দিয়ে যাবেন। অতএব এ বেলা তোমাতে আমাতে এক সঙ্গে খেতে বস্‌ব।"

জসিডি এসে পর্যান্ত দ্বিজনাথ কমলাকে সঙ্গে না নিয়ে আহার করেন না, সন্তোষ উপস্থিত থাক্‌লে কিন্তু তা হয় না—কমলা আপত্তি করে। আজকের আহারে সন্তোষ অনুপস্থিত থাক্‌বে ব'লে দ্বিজনাথ কমলাকে আহারে আহ্বান করলেন।

দ্বিজনাথের কথা শুনে কমলা ত্রস্ত হ'য়ে উঠ্‌ল। যে খাদ্য অভুক্ত ফেলে অনাহারে বিনয় চ'লে গেছে, বিনয় মধুপুরে পৌঁছবার পূর্ব্বে সেই খাদ্য তাকে খেতে হবে মনে ক'রে তার মুখ শুকিয়ে গেল। তার অপরাধের এর চেয়ে কঠোরতর দণ্ড আর কিছু হ'তে পারে ব'লে মনে হ'ল না। মনের চঞ্চল অবস্থা যথাসম্ভব প্রচ্ছন্ন রেখে কমলা বল্‌লে, "আমার এখন একটুও ক্ষিদে নেই বাবা, তোমার খাবার দেবার ব্যবস্থা করি।"

দ্বিজনাথ বল্‌লেন, "আমারই কি এখন ক্ষিদে আছে?—খানিক পরেই খাওয়া যাবে অখন। এখন ত' সাড়ে দশটাও বাজেনি। তার ওপর সন্তোষের বন্ধু কিছুতেই ছাড়লে না, একটু জল সেখানে খেতেই হ'ল।"

তারপর দ্বিজনাথ রিকিয়া এবং সন্তোষের বন্ধুর বিষয়ে গল্প সুরু ক'রে দিলেন। কমলা এমনভাবে দ্বিজনাথের দিকে চেয়ে রইল এবং মধ্যে মধ্যে সামান্য দুই একটা কথা দিয়ে গল্পের সঙ্গে যোগ রক্ষা ক'রে চল্‌ল যে, মনে হচ্ছিল সব কথাই সে মনোযোগ দিয়ে শুনছে; কিন্তু কানের আর প্রাণের মধ্যে তখন এমন একটা অসহযোগ চলছিল যে, কান দিয়ে যত কথা প্রবেশ করছিল তার অর্দ্ধেকও প্রাণের তারে আঘাত করতে সমর্থ হচ্ছিল না।

কলিকাতাগামী এক্স্‌প্রেস্ গাড়ি নীচের অধিত্যকা দিয়ে সশব্দে দ্রুতবেগে ধূমোদ্গার করতে করতে চ'লে গেল। গাড়ি দেখা গেল না, কিন্তু উর্দ্ধোত্থিত ঘন কৃষ্ণবর্ণ ধোঁয়ার দিকে তাকিয়ে কমলার মন কালো হ'য়ে উঠ্‌ল। মনে হ'ল সে ধোঁয়া যেন বিনয় কর্ত্তৃক উৎসারিত অপমানের গ্লানি যাতে সমস্ত বায়ুমণ্ডল এখনি বিষিয়ে উঠ্‌বে। নিঃশ্বাস যেন ভারি হ'য়ে এল। দ্বিজনাথের কথা শুন্‌তে শুন্‌তে কমলা একটা চেয়ারেউপবেশন করেছিল, সহসা দাঁড়িয়ে উঠে বল্‌লে, "বাবা, সাড়ে দশটার গাড়ি চ'লে গেল, আর বেশি দেরি করলে তোমার অনিয়ম হবে। যাই, তোমার খাওয়ার উদ্‌যুগ দেখি গে।" ব'লেই অন্দর মহলের দিকে অগ্রসর হ'ল।

দ্বিজনাথ বল্‌লেন, "এর মধ্যে কেউ এসেছিল কমল?"

ফিরে না দাঁড়িয়ে যেতে যেতে কমলা বল্‌লে, "আমি এখনি আস্‌ছি বাবা।" তারপর দ্বিজনাথকে আর কোনো কথা জিজ্ঞাসা করবার অবসর না দেওয়ার উদ্দেশ্যে প্রথম যে দোরটা ডানদিকে পেলে তাই দিয়ে তাড়াতাড়ি ভিতরে ঢুকে পড়ল

আধ ঘণ্টাটাক্ পরে খাবার ঘরে উপস্থিত হ'য়ে দ্বিজনাথ দেখ্‌লেন কমলা যথারীতি উপস্থিত রয়েছে, কিন্তু টেবিলে মাত্র একজনের খাবার।

"তোমার খাবার কমলা?"

মৃদু হেসে কমলা বল্‌লে, "আমার এখনো তেমন ক্ষিদে হয়নি বাবা,—আমি পরে খাব অখন।"

কন্যার মুখ একটু মনোযোগের সহিত নিরীক্ষণ ক'রে দ্বিজনাথ দেখ্‌লেন সেই মৃদু হাস্যের মধ্যে চোখ দুটি ছল্‌ছল্ করছে; চিন্তিত হ'য়ে বল্‌লেন, "কি হয়েচে কমল? অসুখ বিসুখ করে নি ত?"

কমলা মাথা নেড়ে বল্‌লে, "না বাবা, অসুখ-টসুখ কিছু

করে নি। এম্‌নি এখন খেতে ইচ্ছে হচ্ছে না।"

দ্বিজনাথ বল্‌লেন, "আচ্ছা, তাহ'লে ক্ষিদে হ'লে খেয়ো।"

২৮

বেলা দুটোর সময়ে দ্বিজনাথ তাঁর বিশ্রাম-কক্ষে পদ্মমুখীকে ডেকে পাঠালেন। পদ্মমুখী এলে বল্‌লেন, "তোমার সঙ্গে একটা পরামর্শ আছে পিসি মা। ঐ চেয়ারটায় একটু বোসো।"

আসনগ্রহণ করে পদ্মমুখী সকৌতূহলে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি পরামর্শ বাবা?"

দ্বিজনাথ বল্‌লেন, "কমলের বিয়ের সম্বন্ধে তুমি বিমলকে সীলোনে বোধহয় কিছু লিখেছিলে? আজ সকালে বিমলের চিঠি পেয়েছি—তার চিঠি থেকে সেই রকম মনে হয়।"

পদ্মমুখী বল্‌লেন, "হাঁা, আমি লিখেছিলাম সন্তোষের সঙ্গে কমলার বিয়ের যে কথাটা রয়েছে সেটা আধাআধি না রেখে একেবারে পাকা ক'রে ফেলা ভাল। সন্তোষ এমন চাঁদের মত ছেলে, ওর সঙ্গে কমলের বিয়ে হ'লে ত' আমাদের সৌভাগ্যের কথা। রূপে গুণে, ধনে মানে, স্বভাবে চরিত্রে, এমন আর একটি কোথায় পাবে বল?"

দ্বিজনাথ বল্‌লেন, "বিমলও সেই কথা বলে; আমারও মত পাত্র হিসেবে সন্তোষ কমলের অযোগ্য নয়; তোমার মত ত' জান্‌তেই পারলাম। কিন্তু কমলের মনের কথা কিছু বুঝ্‌তে পার পিসি মা? তার ইচ্ছে আছে ত?"

পদ্মমুখী দেখ্‌লেন, যে বিষয়ে শৈলজা এবং তিনি সাধনা করতে আরম্ভ করেছেন তদ্বিষয়ে মহা সুযোগ উপস্থিত; সুযোগকে অবহেলা করলে পরে অনুতাপ করতে হ'তে পারে। তা ছাড়া পদ্মমুখীর মত,—সদুদ্দেশ্য সিদ্ধ করবার জন্যে অসৎ উপায় অবলম্বন করায় কোনো অন্যায় নেই; বিষ খাওয়ালে রোগীর যদি প্রাণরক্ষা হয় রোগীকে বিষ খাওয়াতে চিকিৎসকেরা দ্বিধা বোধ করে না। উচ্ছ্বসিত হ'য়ে বল্‌লেন, "ওমা! ইচ্ছে আবার নেই? খুব ইচ্ছে! সন্তোষের কথা বললেই কমলার মুখখানি কেমন হাসি হাসি হ'য়ে লাল হ'য়ে ওঠে—কান দুটি খাড়া হয়ে থাকে।" বনেদ একেবারে পাকা ক'রে ফেলবার উদ্দেশ্যে বল্‌লেন, "সুকুমার বাবুর পরিবার শৈলজা সেদিন বল্‌ছিল শোভার কাছে কমলা বলেছে সন্তোষের সঙ্গে তার বিয়ের সব ঠিক হয়ে আছে। আরও কত কি সব কথা পাগলীর মত বলেছে—সে আর তোমাকে কি বল্‌ব?" ব'লে মুচ্‌কে একটু হাস্‌লেন।

দ্বিজনাথ বল্‌লেন, "বেশ তা হ'লে আজ সন্ধ্যার পর সন্তোষের সঙ্গে কথাটা শেষ ক'রেই ফেলি। ও-ও বোধহয় চাইছে এবিষয়ে একটা পাকা কথা হয়ে যায়।"

অতিশয় উল্লসিত হ'য়ে পদ্মমুখী বল্‌লেন, "এ খুব ভাল কথা দ্বিজ, আজই তুমি সমস্ত কথাবার্ত্তা শেষ ক'রে ফেল। বিয়ে থাওয়ার কথা ত কিছু বলা যায় না বাবা, কোন্ দিক্ দিয়ে কখন কি বিঘ্ন এসে জোটে।"

মনে মনে একটা কি কথা চিন্তা ক'রে দ্বিজনাথ বল্‌লেন, "কোনো বিঘ্ন এসে জুটেচে ব'লে কি তোমার মনে হয় পিসিমা?"

উল্লাসের মত্ততায় পদ্মমুখীর সতর্কতার দিকটা আলগা হ'য়ে গিয়েছিল, বল্‌লেন, "জোটে নি তাই বা বলি কি ক'রে? তোমার ওই ছবি আঁকিয়েটিকে আমার কেমন ভাল লাগে না দ্বিজ। ওই ত' আজ সকালে এসে কি সব হাঙ্গামা বাধিয়ে দিয়ে গেল তাই না মেয়েটা এখন পর্যন্ত উপোস ক'রে প'ড়ে রয়েচে।" কথাটা ব'লেই কিন্তু নিজেরই কানে কি রকম খারাপ শোনাল; মনে হ'ল পাকা বনেদটা যেন একটু কাঁচিয়ে যাবার দিকে গেল। ব্যস্ত হ'য়ে বল্‌লেন, "সে অবিশ্যি এমন কোনো কথাই নয়—তবে কি জান? সাবধানের বিনাশ নেই।"

দ্বিজনাথ কিন্তু কথাটাকে সামান্য ব'লে একেবারেই উপেক্ষা করলেন না; ব্যগ্র কণ্ঠে বল্‌লেন, "কমল এখনো খায় নি?"

"না, কৈ আর খেয়েচে।"

"সকাল বেলা বিনয় এসেছিল?"

"এসেছিল বই কি। খানিকক্ষণ ছবি-টবি এঁকে চ'লে গেল।" আহার নিয়ে যে ব্যাপারটা ঘটেছিল সে কথাটা

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

না বলাই ভাল বিবেচনা ক'রে পদ্মমুখী সে কথার কোনো উল্লেখ করলেন না।

কিন্তু সে কথাও চেপে রাখা গেল না; পদ্মমুখীর কথার গুরুতম অংশটা দ্বিজনাথের মনে ছিল; বললেন, "তুমি যে বললে পিসিমা, বিনয় সকালে এসে হাঙ্গামা বাধিয়ে দিয়ে গেল, সে কি কথা?"

এবার পদ্মমুখীর মুখ শুকিয়ে উঠল,—মনে হ'ল নিজের কথাটা বুঝি সঙ্গে সঙ্গে এমনি ক'রেই ফ'লে গেল—বিঘ্ন সত্যি-সত্যিই এসে উপস্থিত হ'ল। খুব সংক্ষেপে কথাটাকে শেষ করবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু দ্বিজনাথ সে বিষয়ে বারংবার বিঘ্ন ঘটাতে লাগলেন,—প্রশ্নের পর প্রশ্ন ক'রে সমস্ত কথাটা জেনে নিলেন।

পদ্মমুখীর মনে পরিতাপের অন্ত ছিল না, নিজের বুদ্ধিহীনতার জন্যে মনে মনে নিজেকে অভিশাপ দিতে লাগলেন।

দ্বিজনাথ বললেন, "আচ্ছা পিসিমা, তুমি এখন বিশ্রাম কর গে।"

চেয়ার থেকে দাঁড়িয়ে উঠে সভয়ে পদ্মমুখী জিজ্ঞাসা করলেন, "আজই সন্তোষের সঙ্গে কথা কইবে কি বাবা?"

দ্বিজনাথ বললেন, "হ্যাঁ পিসিমা, আজই সন্তোষের সঙ্গে কথা শেষ করব।"

দ্বিজনাথের কথা শুনে, অমূলক আশঙ্কায় চিন্তিত হয়েছিলেন মনে ক'রে, পদ্মমুখী নিশ্চিন্ত হ'লেন। উৎসাহ-দীপ্ত কণ্ঠে বললেন, "বেশ কথা দ্বিজ, আশীর্ব্বাদ করি আমাদের কমলা সুখী হ'ক।"

প্রসন্নমুখে দ্বিজনাথ বললেন, "সেই আশীর্ব্বাদই কর পিসিমা।"

পদ্মমুখী প্রস্থান করলে বিমলার চিঠিখানা জামার পকেটে নিয়ে দ্বিজনাথ কমলার ঘরের দোরে এসে ধাক্কা দিয়ে ডাকলেন, "কমল, জেগে আছ কি?"

দোরটা ভিতর থেকে বন্ধ ছিল, কমলা তাড়াতাড়ি শয্যা ত্যাগ ক'রে উঠে এসে দোর খুলে বললে, "কেন বাবা?"

দ্বিজনাথ বললেন, "তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে মা। চল তোমারই ঘরে গিয়ে বসি।"

(ক্রমশঃ)

নামের পরিচয়

শ্রীঅমিয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী

মোর নাম লিখে দিয়ে যাই

চেয়েছ যাত্রার পথে, ওগো বন্ধু, শুভক্ষণে তাই

চিহ্ন মোর গেনু এই রাখি

প্রেমের স্মরণবর্ণে আঁকি'।

যে-আমি সহসা এসে আলোকিত এ ভুবন-লোকে

চেয়ে দেখেছিল মুগ্ধ চোখে,

পরিচয়হীন পথে যেতে

চিরসঙ্গী এল যার সমতীর্থ মুক্তির সঙ্কেতে,

মুহূর্ত্তে চৈতন্যময় স্পর্শ লভি' চকিত মিলনে

শত ব্যর্থতারে ভেদি' জেগেছে পরম উদ্বোধনে,

তারি এই নাম

তোমারে দিলাম।

ধূলিক্ষুব্ধ সংসারের ক্ষয়

কভু তা'র নয়,

অনুষঙ্গী ছায়া সে তো মিলায় আপন পরিচয়।

মর্ত্ত্যের বন্ধন দিল তা'রে

অনন্ত সন্ধানদীপ্তি মৃত্যুহীন দিগন্তের পারে;

জড়ত্বের সাথে অবিরাম

বেদনার যজ্ঞভূমে প্রাণ দিয়ে ঘোষিল সংগ্রাম।

তারি ব্যাকুলতা জেনো, প্রণমিত কৃতার্থ অন্তর

রাখিল রঙীন্ পত্রে শেষক্ষণে আপন স্বাক্ষর॥

—শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়

১৭

শরৎচন্দ্রের "শ্রীকান্তে" আছে, আশ্চর্য্য এই বাংলাদেশ, এর ঘরে ঘরে মা বোন (ঠিক কথাগুলি মনে নেই)। একথা বোধ হয় সব দেশের সম্বন্ধে বলা যায়। অন্তত ইংলণ্ডের সম্বন্ধে নিশ্চয়ই। আশ্চর্য্য এই মানুষের পৃথিবী, এর পথে পথে আপনার লোক। পথে বাহির না হ'লে কি এদের পরিচয় মেলে! সেই জন্যেই তো মানুষ ঘর ছেড়ে দিয়ে পথকে শরণ করলে। কত দেশে কত আপনার লোক, সকলের পরিচয় না নিয়ে কি তৃপ্তি আছে!

মানুষে মানুষে কত না তফাৎ—বর্ণের, রক্তের, ভাষার, সংস্কারের, শ্রেণীর, স্বার্থের। এত তফাৎ আছে ব'লেই কি এমন মিলনকামনা? এক নিশ্বাসে সকল তফাৎকে উপরে রেখে হৃদয়ের অতলে তলিয়ে যাবার প্রেরণা? সে অতলে কেউ পর নয়, সবাই আপন; এত আশ্চর্য্য রকম আপন যে, মনও সে খবর রাখে না। মন তো মহা তার্কিক, সত্যকে মায়া ব'লে কুটি কুটি করাই তার স্বভাব। মানুষের যদি কেবল মনই থাক্‌তো তবে মানুষ হ'তো একটা অভিশপ্ত বিভীষিকা—Niobeর মতো বহুসন্তানবতী হ'য়েও বন্ধ্যা।

আমরা অত্যন্ত বেশী নিজেকে সাদা বা কালো, ইংরেজ বা ভারতীয়, ধনী বা দরিদ্র ভাবি—এটা আমাদের মনের কারসাজি, এটা মায়া। যখন মানুষের সাম্‌নে মানুষ দাঁড়ায় তখন কোথায় যায় এই মায়া? তখন আসে উপলব্ধির মাহেন্দ্রক্ষণ—তখন অকস্মাৎ উপলব্ধি করি, আমাদের সংজ্ঞা হয় না। আমরা যে কী তা বুঝিয়ে বল্‌বার উপায় নেই ব'লে দু'পক্ষের সুবিধার জন্যে বলতে হয়, "সাদা" বা "কালো", "ইংরেজ" বা "ভারতীয়", "ধনী" বা "দরিদ্র"; কিন্তু এগুলো আমাদের সংজ্ঞা নয়, symbol। আমরা আমরা—আমরা personalities। আমাদের পরিচয় নৃ-তত্ত্বে নেই ভূগোলে নেই ধনবিজ্ঞানে নেই, আছে আমাদের সত্তায়। আমরা যে হ'য়ে উঠেছি, এই আমাদের প্রথম ও শেষ পরিচয়। এর মতো বিস্ময় আর নেই, এ রহস্য লক্ষ বছর ধ'রে দার্শনিককে বৈজ্ঞানিককে কলুর বলদের মতো ঘোরাবে, তবু সে হতভাগোরা এর সম্বন্ধে মায়াবাদীই থেকে যাবে।

যারা খবরের কাগজ প'ড়ে মানুষের খবর রাখে তারা কি কোনোমতে বিশ্বাস করবে কত বড় একটা বিদ্রোহ সকলের অলক্ষ্যে ফুলে ফুলে উঠ্‌ছে "মুক্তধারার" সেই জলপ্রপাতের মতো? মানুষের মনের বিরুদ্ধে মানুষের হৃদয়ের এ বিদ্রোহ—এর কানায় কানায় অভিমান। সর্ব্বশক্তিমান মনের বিরুদ্ধে কোমল অবল সরলবিশ্বাসী হৃদয়ের পুঞ্জীভূত অভিমান। বৈজ্ঞানিক দার্শনিকের দরবারে কবির নিরুদ্ধ কণ্ঠ বোবার মতো আভাসে ইঙ্গিতে বলতে চাইছে, আমার পরিচয় লও, আমাকে তোমার

objective চশমাখানার পক্ষে মায়া ঠাউরো না, আমাকে তোমার efficiencyর খাতিরে বিশ্ব থেকে বাদ দিয়ো না।

এই বিরাট জলতরঙ্গের এক একটা ফেনা হচ্ছে ধনীর বিরুদ্ধে দরিদ্রের বিদ্রোহ, সাম্রাজ্যবাদীর বিরুদ্ধে পরাধীনের বিদ্রোহ, সাদার বিরুদ্ধে কালোর বিদ্রোহ। কিন্তু ফেনা মাত্র, তার বেশী না। বাঁধ ভাঙ্‌বার ক্ষমতা এদের নেই, রস এদের মধ্যে স্বল্প। বাঁধ কেবলমাত্র ভাঙ্‌বে না, বাঁধ ভেসে চল্‌বে সেইদিন, যেদিন "মুক্তধারার" রাজকুমার তাঁর আত্মদানের আনন্দ হাতে ক'রে আসবেন, প্রেমের অমোঘ আঘাত হান্‌বেন। মনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ মনকে ধ্বংস কর্‌বার নয়, মনকে রসিয়ে তুল্‌বার! সেই হিসাবে এটা প্রলয় নয়, সৃষ্টি। সভ্যতাকে হৃদয়বত্তার রসে ওতঃপ্রোত না ক'রে রাখ্‌লে সে যে শুকিয়ে পাঁক হ'য়ে উঠ্‌বে। এতদিন সে রসলেশশূন্য হয় নি শুধু যীশুর মতো প্রেমিকের কল্যাণে। ইউরোপীয় মানুষের মন তাকে এতদিনে একটা ময়দানবে পরিণত ক'রে থাক্‌তো যদি না সে যীশুর হৃদয়রক্তকে Eucharist ক'রে নিতো। ভারতীয় মানুষের মনকেও শঙ্করাচার্য্যের দৌরাত্ম্য থেকে রামানুজ উদ্ধার করেছিলেন, সার্ব্বভৌমের উৎপাত থেকে শ্রীচৈতন্য।

আধুনিক কালের এই বিজ্ঞান-দৃষ্টি, কল্পনা-কুণ্ঠ, স্বাচ্ছন্দ্য-সর্ব্বস্ব, নাস্তিক সভ্যতাকে প্রোলিটারিয়ানও রসাতে পার্‌বে না, ন্যাশানালিষ্ট্‌ও না। কেন না বুর্জ্জোয়ার মতো প্রোলিটারিয়ানও এর দ্বারা সম্মোহিত, ফরাসী-ইংরেজের মতো চীনা-ভারতীয়ও একে আদর্শ করেছে। ইংলণ্ডে দেখ্‌ছি সোশ্যালিষ্ট চায় ক্যাপিটালিষ্টেরই একটু সস্তাগোছের নকল সাজ্‌তে, সেও একটি সেকেণ্ডহ্যাণ্ড্‌ পোষাকপরা সেকেণ্ডহ্যাণ্ড্‌ মতামতওয়ালা Snob। সে যেমন উন্নতি করছে আশা করা যায় সে অবিলম্বেই বুর্জ্জোয়া হ'য়ে উঠ্‌বে, অর্থাৎ উপরের লোকদের সরিয়ে দিয়ে নীচের লোকদের দাবিয়ে রাখ্‌বে। যুবক ভারতের অধুনাতন কংগ্রেস্‌ কন্‌ফারেন্সের বিবরণী পাঠ ক'রে যতদূর বোঝা যায়, ভারতবর্ষও একটা "Great Power" না হ'য়ে ছাড়্‌বে না। ইংলণ্ড ও রাশিয়া মিলে তার দুই কানে একই মন্ত্র দিচ্ছে—"Power," "Efficiency," "Progress"। এদের মন্ত্রশিষ্য যে এদের গুরুমারা চেলা হ'য়ে উঠ্‌বে ও এদের ছাড়া কাপড়খানার উত্তরাধিকার দাবী করবে, এমন মনে করবার কারণ আছে। বস্তুত দু'পক্ষের কাম্য এক না হ'লে যুদ্ধ বাধে না। প্রোলিটারিয়ান ও বুর্জ্জোয়া, ইম্পিরিয়ালিষ্ট ও ন্যাশানালিষ্ট ঠিক্‌ একই জিনিষ চায়—"Success" "Power," "Efficiency," "Civilisation," "Progress" প্রথমে কাম্যের ডিগ্রীটা থাকে নীচে, যেমন একখানা কটিবস্ত্র। ক্রমে ক্রমে ওঠে ওপরে, যেমন একরাশ মিলিটারী পোষাক। তারপরে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি—ম্যাজিনীর ইটালী হ'য়ে দাঁড়ায় মুসোলিনীর ইটালী, অষ্ট্রিয়ার নীচের লোক হ'য়ে দাঁড়ায় ট্রিপোলীর উপরের লোক।

অতএব মানবহৃদয়ের বিদ্রোহী ধারাকে মুক্তি দেবার সৌভাগ্য কোনো শ্রেণীবিশেষেরও হবে না, কোনো নেশন-বিশেষেরও না। নিগ্রো প্রভৃতি জাতিও নিজেদেরকে নিরতিশয় দুঃখী মনে করছে মনের বিরুদ্ধে মন খাটাতে না পেরে। মানুষের একমাত্র আশা মানুষ নিজে—নৃতত্ত্ব ভূগোল ধনবিজ্ঞানের মানুষ না, সংজ্ঞার অতীত personality, সৃষ্টির বিস্ময়, জ্ঞানী মুনির রহস্য, "মুক্তধারার" সেই রাজকুমার যাঁর জন্ম হয়েছিল পথে, বাইবেলের সেই King of Kings যাঁর স্থান হয়েছিল ক্রুশে। নিজের এতবড় সৌভাগ্যকে যেদিন মূল্য দিতে শিখ্‌বো সেদিন আমাদের সভ্যতা আরেক স্তরে উঠ্‌বে, সেদিন সম্পত্তিকে দেশকে বর্ণকে মনে হবে পথিকের জন্মস্বত্ব, স্থাণুর নয়। সেদিন জন্মস্বত্বের ভাবনায় আমরা একস্থানে দাঁড়িয়ে কোঁদল কর্‌বো না, জন্মস্বত্বের উপর থেকে জোর তুলে নিয়ে জোর দেবো আমাদের পথিকত্বের উপরে। তখন বৈষম্যের জন্যে আমরা ক্ষুব্ধ না হ'য়ে তাকেই ক'রে তুল্‌বো বৈচিত্র্য; পরাজয় জ্ব'লে উঠ্‌বে জয়টীকার মতো; দুঃখকে সৃষ্টিতে রূপান্তরিত ক'রে স্রষ্টার গৌরব অনুভব কর্‌বো।

হৃদয়ের বুভুক্ষা ইংলণ্ডকে কতটা পীড়িত করেছে দূর থেকে আমরা কেন, কাছে থেকে ইংলণ্ডের সকলে কিছু তা ঠাহর কর্‌তে পারে না। প্রত্যেকের এত বেশী freedom of speech যে কেউ কারুর সঙ্গে কথা বল্‌তে সাহস করে না, কথা বল্‌লেও সেই "Is n't it cold ?" ইত্যাদি মিছে

শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়

কথা। সকলের সঙ্গে মেলামেশা করতে গিয়ে কারুর সঙ্গে অন্তরঙ্গতা হবার উপায় নেই, সবাই সবাইকে বাইরের খবর শোনাতে গিয়ে ভিতরের খবর শোনাবার অবসর বা ভরসা পায় না। পরিবার ভেঙে যাচ্ছে, স্নেহ মমতার চরিতার্থতা উপলক্ষ পাচ্ছে না। কেবল একটা ফাঁকা আত্মপ্রসাদ আছে—আমি স্বতন্ত্র, আমি স্বেচ্ছাগতি, আমি স্বাধীন-জীবী! অনেকটা কুলীনের কন্যার অনূঢ়া-ত্বের জাঁকের মতো এই আত্মপ্রসাদ। কাজ কাজ কাজ দিয়ে দিনের পেয়ালা ভরে না, রাতের পেয়ালায় নাচ নাচ নাচ ঢেলেও সেই শূন্যতা। যেন জীবন পেয়ালাটার তলা-ই নেই, আগা-গোড়া ফাঁকা। নিত্য নূতন সুরার সরবরাহ ক'রেও লেখক লেখিকা নটনটী পোষাকওয়ালা আস্‌বাবওয়ালা হৃদয়ের তৃষা মেটাতে পারে না; খ্রীষ্টীয় মত যেটুকু আফিং ধরিয়েছিল সেটুকুর নেশাও গত মহাযুদ্ধে কেটে গেছে, সামাজিক কল্যাণ-কর্ম্ম কতকটা স্তোক দেয় বটে, কিন্তু সে কি মুক্তি দিতে পারে! ইংলণ্ডে কেবল একটি আনন্দ আছে, ছুটোছুটির আনন্দ, তাই ইংলণ্ড আছে, নইলে কি দিয়ে সে নিজেকে ভোলাতো? একে একে তার সব স্বপ্নই যে ছায়া হয়ে গেছে, মায়া হয়ে গেছে। Democracy ও Sex Equality কতক স্বপ্ন চুর ক'রে দিয়েছে, বিজ্ঞান বাকী স্বপ্নগুলোকে দূর ক'রে দিয়েছে। মস্ত একটা আদর্শবাদের অভাব ইংলণ্ডকে বড় দরিদ্র করেছে। এই দারিদ্র্যের লক্ষণ আধুনিক ইংরেজী সাহিত্যের সর্ব্বাঙ্গে। এ সাহিত্যের কোনো লেখক কোনো পাঠককে কষ্ট দিতে চায় না, পাছে বেচারার যে ক'টা স্বপ্ন বাকী আছে সেও যায়। লেখক এখন বিদূষক সেজে পাঠক হাসিয়ে পয়সা কুড়োয়, কিম্বা খুব সারগর্ভ উপদেশ দিয়ে উপকার করে।

ইংলণ্ডের মনের জোর তার গায়ের জোরেরই মতো অসামান্য। এখনো বহুকাল তার মজ্জাগত জোর তাকে "Great power" ক'রে রাখবে। জোর মাত্রেই moral force, ইংলণ্ড আমাদের চেয়ে moral, অন্যান্য অনেক নেশনের চেয়ে moral। বস্তুত সভ্যতা জিনিষটাই মানুষের moral কীর্ত্তি, এবং সভ্যতায় ইংলণ্ডের মানুষ সব মানুষের প্রথম সারিতে। এই সারিতেই উপনীত হবার কামনা আছে যুবক ভারতের, যুবক ভারত ইংলণ্ড রাশিয়া প্রভৃতির moral সমকক্ষতা চায়। কিন্তু সৃষ্টি যে করে সে moral মানুষ নয়, সে spiritual মানুষ, ইংলণ্ডে এ মানুষ আর দেখা যাচ্ছে না। সৃষ্টি যে করে সে মানুষের দেহ মন নয়, সে মানুষের হৃদয়: হৃদয় ইংলণ্ডের ক্রমেই স্তন্য হারাচ্ছে কিম্বা স্তন্যের উমেদার হারাচ্ছে। কাজ কাজ কাজ ও নাচ নাচ নাচ নিয়ে সবাই এত ব্যস্ত যে সূক্ষ্ম হৃদয়বৃত্তিগুলোকে মুক্তি দিতে যদি বা কেউ ইচ্ছুক হয় তবু সে মুক্তির উপলক্ষ জোটে না, অর্থাৎ বুকভরা মধু থাক্‌লেও মৌমাছি আসে না। হৃদয় চায় দিয়ে সুখী হ'তে, কিন্তু দান নেবার ভিখারী যে নেই, ভিখারী হ'তে সকলের আত্মসম্মানে বাধে, সকলে চায় হক্ দাবী, ন্যায্য পাওনা, স্বাধীনতা, সমানাধিকার, শ্রদ্ধা—এক কথায় জন্মস্বত্ব। তাই নিয়ে ছুটোছুটি ও কাড়াকাড়ির ফাঁকে মানুষের সত্য পরিচয়টা কোথায় হারিয়ে গেছে, মানুষ ভুলে গেছে যে তার জন্ম হয়েছিল পথে; কিছুই দাবী কর্‌তে তাকে মানা; সে যা পাবে তা দু'হাতে ছড়াতে ছড়াতে যাবে, সে স্বভাবত দাতা; এবং অপরকে দানের উপলক্ষ দান কর্‌বার জন্যেই সে গ্রহীতা।

আশ্চর্য্য এই মানুষের পৃথিবী, এর পথে প্রবাসে আপনার লোক, কিন্তু কেউ কারুর আত্মীয়তার কামনা মেটাবার সময় পাইনে, সাধ রাখিনে। তাই মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলন নিস্ফল হচ্ছে, চরিতার্থতা পাচ্ছে না। কেবল চীৎকার ক'রে উঠ্‌ছে—বৈষম্য দূর করো, দুঃখ ঘুচাও। ভুলে যাচ্ছে যে বৈষম্যকে স্বীকার ক'রেই সৃষ্টি, দুঃখকে ধারণ ক'রেই আনন্দ।

২৭

অনুতাপ আর অভিমান সমজাতীয় বস্তু না হ'লেও উভয়ই কমলার চিত্তকে যুগপৎ অধিকার ক'রে পীড়ন করতে লাগল। ফলে, রাগ হ'ল নিজের প্রতি যেমন, বিনয়েরও প্রতি তেমনি। টাকা ফেরৎ দিয়ে বিনয় কমলার ছবি অধিকার করবার ইচ্ছা প্রকাশ করায় কমলার বাক্যে যে রূঢ়তা প্রকাশ পেয়েছিল বাইরে থেকে সহজ দৃষ্টিতে তার কারণ একমাত্র ক্রোধ ভিন্ন অন্য কিছু ব'লে মনে হয় নি; কিন্তু সামান্য ক্রোধকে উপলক্ষ ক'রে পুঞ্জীভূত যে বৃহৎ অভিমান উদ্যত হ'য়ে উঠেছিল তার সন্ধান পেলে হয় ত' বিনয় ক্ষুব্ধ হ'য়ে চ'লে যেত না। নিনাদ শুনে সে মেঘকে বজ্রগর্ভ মনে ক'রেই চ'লে গেল, সে যে বারিবিন্দুরও আশ্রয়স্থল সে কথা ভেবে দেখ্‌লে না। এ কথাও সে ভেবে দেখ্‌লে না যে, মানুষ যখন তার প্রিয়জনের সঙ্গে সৌহার্দ্য বিনিময়ের সুযোগ খুঁজে পায় না তখন সে তার সঙ্গে কলহ করে। কারণ, দুর্যোগ হ'লেও কলহ একটা যোগ, যা মুখরতার দ্বারা সম্বন্ধ স্বীকার ক'রেই চলে, নীরবতার দ্বারা ঔদাসীন্য ব্যক্ত করে না। কমলার ছবির প্রতি বিনয়ের লোভাতুরতায় কমলা যে তার নিজেরও প্রতি বিনয়ের অনুরাগের একটু আভাষ পায় নি, তা নয়,—কিন্তু সে তার উদগ্র আগ্রহের কাছে এতই সামান্য যে, ততটুকুতেই সন্তুষ্ট হ'য়ে থাকৃতে না পেরে সমস্তটা স্পষ্টতরভাবে জানবার আগ্রহে সে বিনয়ের সঙ্গে একটা সজ্ঘাতের সৃষ্টি করেছিল। নিস্তরঙ্গ জলের মধ্যে আলোড়ন উপস্থিত ক'রে সে তার গভীরতা নির্ণয় করতে গিয়েছিল। তাই বলেছিল, 'আপনি আপনার কাছে আমার ছবি রাখ্‌বেন কেন? তার ত একটা কারণ থাকা চাই, যা হয় একটা অধিকার থাকা চাই।' ফলে কিন্তু বিপরীত হ'ল।

বাইরে পরিচিত হর্ণের শব্দ শুনে কমলা বুঝ্‌তে পারলে দ্বিজনাথ এসেছেন। তাকিয়ে দেখ্‌লে ঘড়িতে তখন দশটা বেজে কুড়ি মিনিট। গাড়ি ছাড়তে তখনো দশ মিনিট বাকি। একবার মনে করলে দ্বিজনাথকে সঙ্গে নিয়ে মোটর ক'রে ষ্টেশনে গেলে এখনো হয়ত ধ'রে আনা যায়; কিন্তু পরক্ষণেই মনে হ'ল বিনয় ত' ফিরে আস্‌বেই না, অধিকন্তু দ্বিজনাথের নিকট সমস্ত ব্যাপারটা প্রকাশ হ'য়ে গুরুতর লজ্জার কারণ ঘটবে। দ্বিজনাথ ঘরে এসে প্রবেশ

করতে পারেন, এই আশঙ্কায় কমলা তাড়াতাড়ি শয্যাত্যাগ ক'রে চেয়ারে ব'সে তার পড়বার টেবিলের উপর রুপার্ট ব্রুকের একখানা কাব্যগ্রন্থ খুলে দেখতে লাগল।

পরক্ষণেই বাইরের বারান্দায় ডাক পড়্‌ল, "কমলা, কমলা, কমল!"

দ্রুতপদে বাইরে বেরিয়ে এসে কমলা বল্‌লে, "বাবা?"

একখানা চেয়ারে ব'সে প'ড়ে দ্বিজনাথ বল্‌লেন, "আমি একাই ফিরে এলাম। সন্তোষকে তার বন্ধু এ বেলা কিছুতেই ছাড়লেন না;—বিকেল বেলা তিনি তাঁর নিজের গাড়ি ক'রে পৌঁছে দিয়ে যাবেন। অতএব এ বেলা তোমাতে আমাতে এক সঙ্গে খেতে বস্‌ব।"

জসিডি এসে পর্য্যন্ত দ্বিজনাথ কমলাকে সঙ্গে না নিয়ে আহার করেন না, সন্তোষ উপস্থিত থাক্‌লে কিন্তু তা হয় না—কমলা আপত্তি করে। আজকের আহারে সন্তোষ অনুপস্থিত থাক্‌বে ব'লে দ্বিজনাথ কমলাকে আহারে আহ্বান করলেন।

দ্বিজনাথের কথা শুনে কমলা এস্ত হ'য়ে উঠ্‌ল। যে খাদ্য অভুক্ত ফেলে অনাহারে বিনয় চ'লে গেছে, বিনয় মধুপুরে পৌঁছবার পূর্ব্বে সেই খাদ্য তাকে খেতে হবে মনে ক'রে তার মুখ শুকিয়ে গেল। তার অপরাধের এর চেয়ে কঠোরতর দণ্ড আর কিছু হ'তে পারে ব'লে মনে হ'ল না। মনের চঞ্চল অবস্থা যথাসম্ভব প্রচ্ছন্ন রেখে কমলা বল্‌লে, "আমার এখন একটুও ক্ষিদে নেই বাবা, তোমার খাবার দেবার ব্যবস্থা করি।"

দ্বিজনাথ বল্‌লেন, "আমারই কি এখন ক্ষিদে আছে?—খানিক পরেই খাওয়া যাবে অখন। এখন ত' সাড়ে দশটাও বাজেনি। তার ওপর সন্তোষের বন্ধু কিছুতেই ছাড়লে না, একটু জল সেখানে খেতেই হ'ল।"

তারপর দ্বিজনাথ রিকিয়া এবং সন্তোষের বন্ধুর বিষয়ে গল্প সুরু ক'রে দিলেন। কমলা এমনভাবে দ্বিজনাথের দিকে চেয়ে রইল এবং মধ্যে মধ্যে সামান্য দুই একটা কথা দিয়ে গল্পের সঙ্গে যোগ রক্ষা ক'রে চল্‌ল যে, মনে হচ্ছিল সব কথাই সে মনোযোগ দিয়ে শুনছে; কিন্তু কানের আর প্রাণের মধ্যে তখন এমন একটা অসহযোগ চলছিল যে, কান দিয়ে যত কথা প্রবেশ করছিল তার অর্দ্ধেকও প্রাণের তারে আঘাত করতে সমর্থ হচ্ছিল না।

কলিকাতাগামী এক্স্‌প্রেস্ গাড়ি নীচের অধিত্যকা দিয়ে সশব্দে দ্রুতবেগে ধূমোদ্গার করতে করতে চ'লে গেল। গাড়ি দেখা গেল না, কিন্তু ঊর্দ্ধোত্থিত ঘন কৃষ্ণবর্ণ ধোঁয়ার দিকে তাকিয়ে কমলার মন কালো হ'য়ে উঠ্‌ল। মনে হ'ল সে ধোঁয়া যেন বিনয় কর্ত্তৃক উৎসারিত অপমানের গ্লানি যাতে সমস্ত বায়ুমণ্ডল এখনি বিষিয়ে উঠ্‌বে। নিঃশ্বাস যেন ভারি হ'য়ে এল। দ্বিজনাথের কথা শুনতে শুনতে কমলা একটা চেয়ারেউপবেশন করেছিল, সহসা দাঁড়িয়ে উঠে বল্‌লে, "বাবা, সাড়ে দশটার গাড়ি চ'লে গেল, আর বেশি দেরি করলে তোমার অনিয়ম হবে। যাই, তোমার খাওয়ার উয্‌যুগ দেখি গে।" ব'লেই অন্দর মহলের দিকে অগ্রসর হ'ল।

দ্বিজনাথ বল্‌লেন, "এর মধ্যে কেউ এসেছিল কমল?"

ফিরে না দাঁড়িয়ে যেতে যেতে কমলা বল্‌লে, "আমি এখনি আস্‌ছি বাবা।" তারপর দ্বিজনাথকে আর কোনো কথা জিজ্ঞাসা করবার অবসর না দেওয়ার উদ্দেশ্যে প্রথম যে দোরটা ডানদিকে পেলে তাই দিয়ে তাড়াতাড়ি ভিতরে ঢুকে পড়ল।

আধ ঘণ্টাটাক্ পরে খাবার ঘরে উপস্থিত হ'য়ে দ্বিজনাথ দেখ্‌লেন কমলা যথারীতি উপস্থিত রয়েছে, কিন্তু টেবিলে মাত্র একজনের খাবার।

"তোমার খাবার কমলা?"

মৃদু হেসে কমলা বল্‌লে, "আমার এখনো তেমন ক্ষিদে হয়নি বাবা,—আমি পরে খাব অখন।"

কন্যার মুখ একটু মনোযোগের সহিত নিরীক্ষণ ক'রে দ্বিজনাথ দেখ্‌লেন সেই মৃদু হাস্যের মধ্যে চোখ দুটি ছল্‌ছল্ করছে; চিন্তিত হ'য়ে বল্‌লেন, "কি হয়েচে কমল? অসুখ বিসুখ করে নি ত?"

কমলা মাথা নেড়ে বল্‌লে, "না বাবা, অসুখ-টসুখ কিছু

করে নি। এম্‌নি এখন খেতে ইচ্ছে হচ্ছে না।”

দ্বিজনাথ বল্‌লেন, “আচ্ছা, তাহ’লে ক্ষিদে হ’লে খেয়ো।”

২৮

বেলা দুটোর সময়ে দ্বিজনাথ তাঁর বিশ্রাম-কক্ষে পদ্মমুখীকে ডেকে পাঠালেন। পদ্মমুখী এলে বল্‌লেন, “তোমার সঙ্গে একটা পরামর্শ আছে পিসি মা। ঐ চেয়ারটায় একটু বোসো।”

আসনগ্রহণ করে পদ্মমুখী সকৌতূহলে জিজ্ঞাসা করলেন, “কি পরামর্শ বাবা?”

দ্বিজনাথ বল্‌লেন, “কমলের বিয়ের সম্বন্ধে তুমি বিমলকে সীলোনে বোধহয় কিছু লিখেছিলে? আজ সকালে বিমলের চিঠি পেয়েছি—তার চিঠি থেকে সেই রকম মনে হয়।”

পদ্মমুখী বল্‌লেন, “হাঁ, আমি লিখেছিলাম সন্তোষের সঙ্গে কমলার বিয়ের যে কথাটা রয়েছে সেটা আধাআধি না রেখে একেবারে পাকা ক’রে ফেলা ভাল। সন্তোষ এমন চাঁদের মত ছেলে, ওর সঙ্গে কমলের বিয়ে হ’লে ত’ আমাদের সৌভাগ্যের কথা। রূপে গুণে, ধনে মানে, স্বভাবে চরিত্রে, এমন আর একটি কোথায় পাবে বল?”

দ্বিজনাথ বল্‌লেন, “বিমলও সেই কথা বলে: আমারও মত পাত্র হিসেবে সন্তোষ কমলের অযোগ্য নয়; তোমার মত ত’ জান্‌তেই পারলাম। কিন্তু কমলের মনের কথা কিছু বুঝ্‌তে পার পিসি মা? তার ইচ্ছে আছে ত?”

পদ্মমুখী দেখ্‌লেন, যে বিষয়ে শৈলজা এবং তিনি সাধনা করতে আরম্ভ করেছেন তদ্বিষয়ে মহা সুযোগ উপস্থিত; সুযোগকে অবহেলা করলে পরে অনুতাপ করতে হ’তে পারে। তা ছাড়া পদ্মমুখীর মত,—সদুদ্দেশ্য সিদ্ধ করবার জন্যে অসৎ উপায় অবলম্বন করায় কোনো অন্যায় নেই; বিষ খাওয়ালে রোগীর যদি প্রাণরক্ষা হয় রোগীকে বিষ খাওয়াতে চিকিৎসকেরা দ্বিধা বোধ করে না। উচ্ছ্বসিত হ’য়ে বল্‌লেন, “ওমা! ইচ্ছে আবার নেই? খুব ইচ্ছে! সন্তোষের কথা বল্‌লেই কমলার মুখখানি কেমন হাসি হাসি হ’য়ে লাল হ’য়ে ওঠে—কান দুটি খাড়া হয়ে থাকে।” বনেদ একেবারে পাকা ক’রে ফেলবার উদ্দেশ্যে বল্‌লেন, “সুকুমার বাবুর পরিবার শৈলজা সেদিন বল্‌ছিল শোভার কাছে কমলা বলেছে সন্তোষের সঙ্গে তার বিয়ের সব ঠিক হয়ে আছে। আরও কত কি সব কথা পাগলীর মত বলেছে—সে আর তোমাকে কি বল্‌ব?” ব’লে মুচ্‌কে একটু হাস্‌লেন।

দ্বিজনাথ বল্‌লেন, “বেশ তা হ’লে আজ সন্ধ্যার পর সন্তোষের সঙ্গে কথাটা শেষ ক’রেই ফেলি। ও-ও বোধহয় চাইছে এবিষয়ে একটা পাকা কথা হয়ে যায়।”

অতিশয় উল্লসিত হ’য়ে পদ্মমুখী বল্‌লেন, “এ খুব ভাল কথা দ্বিজ, আজই তুমি সমস্ত কথাবার্ত্তা শেষ ক’রে ফেল। বিয়ে থাওয়ার কথা ত কিছু বলা যায় না বাবা, কোন্ দিক্ দিয়ে কখন কি বিঘ্ন এসে জোটে।”

মনে মনে একটা কি কথা চিন্তা ক’রে দ্বিজনাথ বল্‌লেন, “কোনো বিঘ্ন এসে জুটেচে ব’লে কি তোমার মনে হয় পিসিমা?”

উল্লাসের মত্ততায় পদ্মমুখীর সতর্কতার দিকটা আলগা হ’য়ে গিয়েছিল, বল্‌লেন, “জোটে নি তাই বা বলি কি ক’রে? তোমার ওই ছবি আঁকিয়েটিকে আমার কেমন ভাল লাগে না দ্বিজ। ওই ত’ আজ সকালে এসে কি সব হাঙ্গামা বাধিয়ে দিয়ে গেল তাই না মেয়েটা এখন পর্য্যন্ত উপোস ক’রে প’ড়ে রয়েচে।” কথাটা ব’লেই কিন্তু নিজেরই কানে কি রকম খারাপ শোনাল; মনে হ’ল পাকা বনেদটা যেন একটু কাঁচিয়ে যাবার দিকে গেল। ব্যস্ত হ’য়ে বল্‌লেন, “সে অবিশ্যি এমন কোনো কথাই নয়—তবে কি জান? সাবধানের বিনাশ নেই।”

দ্বিজনাথ কিন্তু কথাটাকে সামান্য ব’লে একেবারেই উপেক্ষা করলেন না; ব্যগ্র কণ্ঠে বল্‌লেন, “কমল এখনো খায় নি?”

“না, কৈ আর খেয়েচে।”

“সকাল বেলা বিনয় এসেছিল?”

“এসেছিল বই কি। খানিকক্ষণ ছবি-টবি এঁকে চ’লে গেল।” আহার নিয়ে যে ব্যাপারটা ঘটেছিল সে কথাট

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

না বলাই ভাল বিবেচনা ক'রে পদ্মমুখী সে কথার কোনো উল্লেখ করলেন না।

কিন্তু সে কথাও চেপে রাখা গেল না; পদ্মমুখীর কথার গুরুতম অংশটা দ্বিজনাথের মনে ছিল; বল্‌লেন, "তুমি যে বল্‌লে পিসিমা, বিনয় সকালে এসে হাঙ্গামা বাধিয়ে দিয়ে গেল, সে কি কথা?"

এবার পদ্মমুখীর মুখ শুকিয়ে উঠ্‌ল,—মনে হ'ল নিজের কথাটা বুঝি সঙ্গে সঙ্গে এমনি ক'রেই ফ'লে গেল—বিঘ্ন সত্যি-সত্যিই এসে উপস্থিত হ'ল। খুব সংক্ষেপে কথাটাকে শেষ করবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু দ্বিজনাথ সে বিষয়ে বারংবার বিঘ্ন ঘটাতে লাগ্‌লেন,—প্রশ্নের পর প্রশ্ন ক'রে সমস্ত কথাটা জেনে নিলেন।

পদ্মমুখীর মনে পরিতাপের অন্ত ছিল না, নিজের বুদ্ধিহীনতার জন্যে মনে মনে নিজেকে অভিশাপ দিতে লাগ্‌লেন।

দ্বিজনাথ বল্‌লেন, "আচ্ছা পিসিমা, তুমি এখন বিশ্রাম কর গে।"

চেয়ার থেকে দাঁড়িয়ে উঠে সভয়ে পদ্মমুখী জিজ্ঞাসা করলেন, "আজই সন্তোষের সঙ্গে কথা কইবে কি বাবা?"

দ্বিজনাথ বল্‌লেন, "হাঁ পিসিমা, আজই সন্তোষের সঙ্গে কথা শেষ করব।"

দ্বিজনাথের কথা শুনে, অমূলক আশঙ্কায় চিন্তিত হয়েছিলেন মনে ক'রে, পদ্মমুখী নিশ্চিন্ত হ'লেন। উৎসাহ-দীপ্ত কণ্ঠে বল্‌লেন, "বেশ কথা দ্বিজ, আশীর্ব্বাদ করি আমাদের কমলা সুখী হ'ক।"

প্রসন্নমুখে দ্বিজনাথ বল্‌লেন, "সেই আশীর্ব্বাদই কর পিসিমা।"

পদ্মমুখী প্রস্থান করলে বিমলার চিঠিখানা জামার পকেটে নিয়ে দ্বিজনাথ কমলার ঘরের দোরে এসে ধাক্কা দিয়ে ডাক্‌লেন, "কমল, জেগে আছ কি?"

দোরটা ভিতর থেকে বন্ধ ছিল, কমলা তাড়াতাড়ি শয্যা ত্যাগ ক'রে উঠে এসে দোর খুলে বল্‌লে, "কেন বাবা?"

দ্বিজনাথ বল্‌লেন, "তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে মা। চল তোমারই ঘরে গিয়ে বসি।"

(ক্রমশঃ)

নামের পরিচয়

শ্রীঅমিয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী

মোর নাম লিখে দিয়ে যাই
চেয়েছ যাত্রার পথে, ওগো বন্ধু, শুভক্ষণে তাই
চিহ্ন মোর গেনু এই রাখি
প্রেমের স্মরণবর্ণে আঁকি'।
যে-আমি সহসা এসে আলোকিত এ ভুবন-লোকে
চেয়ে দেখেছিল মুগ্ধ চোখে,
পরিচয়হীন পথে যেতে
চিরসঙ্গী এল যার সমতীর্থ মুক্তির সঙ্কেতে,
মুহূর্ত্তে চৈতন্যময় স্পর্শ লভি' চকিত মিলনে
শত ব্যর্থতারে ভেদি' জেগেছে পরম উদ্বোধনে,
তারি এই নাম
তোমারে দিলাম।
ধূলিক্ষুব্ধ সংসারের ক্ষয়
কভু তা'র নয়,
অনুষঙ্গী ছায়া সে তো মিলায় আপন পরিচয়।
মর্ত্ত্যের বন্ধন দিল তা'রে
অনন্ত সন্ধানদীপ্তি মৃত্যুহীন দিগন্তের পারে;
জড়ত্বের সাথে অবিরাম
বেদনার যজ্ঞভূমে প্রাণ দিয়ে ঘোষিল সংগ্রাম।
তারি ব্যাকুলতা জেনো, প্রণমিত কৃতার্থ অন্তর
রাখিল রঙীন্ পত্রে শেষক্ষণে আপন স্বাক্ষর ॥

ফরাসি—ইংরেজ

শ্রীভবানী ভট্টাচার্য্য

এক

মানুষের দেহের সব শিরা, সব ধমনী হৃৎপিণ্ডে এসে মেশে। ফরাসি দেশের দেহের সব শিরা, সব ধমনী যে হৃৎপিণ্ডে এসে মিশেছে তার নাম প্যারিস্। প্যারিস্ যা ভাবে, দু'দিন পরে সমস্ত ফ্রান্স্ তাই ভাবে। তেমি লণ্ডন যা ভাবে, দু'মাস পরে সমস্ত ইংল্যাণ্ড্ তাই ভাবে।

প্যারিস্ সম্বন্ধে আমার প্রথম কথা এই যে, প্যারিসের রূপ নেই। তার একটা প্রতিভা আছে, আর সে প্রতিভার প্রকাশ নিত্য নবনবোন্মেষে। আজকের প্যারিস্ কালকের নয়, এবং কালকের প্যারিস্ পরশু আর এক চেহারার ছিল। পরিবর্ত্তন আর পরিবর্দ্ধন এ দুই আসলে একই কথা। প্যারিসের লক্ষ ধমনী দিয়ে কত প্রাণ ব'য়ে চলেছে যাতে তার বৃদ্ধি না হ'য়ে যায় না, এবং এ বৃদ্ধি আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির চোখে পড়ে পরিবর্ত্তনের আকারে। লণ্ডনের কিন্তু রূপ আছে; এ সহর বহুরূপী; তাই বারম্বার দেখলে দু'মাসে পুরোনো হ'য়ে পড়ে। পক্ষান্তরে, যার রূপ নেই মানুষ তাকে সর্ব্বদাই নিজের মনের মতন ক'রে গ'ড়ে নিতে থাকে, এবং এ গড়ন কালে কালে পুনঃ পুনঃ বদ্‌লানো চলে। সুতরাং সে চিরনূতন থেকে যায়।

প্যারিসে আস্‌বামাত্র মনে হয়, লণ্ডনের সঙ্গে এর আপাদমস্তক তফাৎ। রাস্তাগুলো যেন সহস্র বাহু মেলে ডাকতে থাকে; পদে পদে চোখে চমক্ লাগে। বৈচিত্র্যের শেষ নেই,—যেমন পথে তেম্‌নি পথিকে। ইংরেজের দৈহিক গঠনে প্রকৃতি অত্যন্ত কৃপণতা করেছে; অর্থাৎ ও-কাজে সে আর তিন চারটির বেশী ছাঁচ্ ব্যবহার করেনি। তার ফলে একজন ইংরেজের চেহারা ঠিক্ আর দশ জনের মতন। পোষাকেও টম্ ডিক হ্যারি সবাই এক। তফাৎ থাকলেই একে অপরের দিকে সন্দেহের চোখে চাইবে; হয়তো ভাব্‌বে সদ্য সাহারা-প্রত্যাগত। ইংরেজের ধাতে বৈচিত্র্য সয় না। সমস্ত জাতিটার অন্তর-বাহির এক ছন্দে যাতে বাজে তার জন্য এরা নিরন্তর ব্যস্ত। অপর পক্ষে ফরাসি বৈচিত্র্যের অভাবে থাকতে পারে না। জীবনে নূতন হাওয়া এরা আনবেই। লণ্ডনের পথে গান করলে পুলিসের হাতে পড়ার সম্ভাবনা; প্যারিসের পথে ঢাক্ ঢোল বাজালেও কেউ ফিরে চাইবে না।

ইংরেজ নিঃশব্দ-প্রকৃতি; ফরাসি প্রচুর কথা বলে। ইংরেজ হাসবার আগে ভাবে কতটুকু হাসা কেতাদুরস্ত হবে; তাসের আড্ডায় দেখেছি, ফরাসি এত জোরে হাসে যে, কাছে কোন ইংরেজ থাকলে ভাবতে পারে, হায় হায়, সব গেল, পশ্চিমের শিক্ষা, সভ্যতা, সম্মান!

ফরাসি সুন্দর সুনীল বর্ণ ভালবাসে,—ইংরেজের মতন কালোর ভক্ত নয়। প্যারিসের যেদিকে দৃষ্টি যায়, খানিকটা নীল বর্ণ দেখে মন প্রীত হ'য়ে ওঠে। নীলবসনা এক ফরাসি তরুণীকে প্রশ্ন করলুম, তোমরা নীল রঙ্ এত পছন্দ কর কেন? উত্তর করল, ও-রঙ্ আমরা ভারি ভালবাসি, তাই; আর তা ছাড়া, বোধ হয় আমাদের চুলের রঙের সঙ্গে নীল বেশ মানায়।

ইংরেজ মেয়ে প্রাণপণ পরিশ্রমে ক্লাসের পড়া তৈরি করে, ততোধিক পরিশ্রমে টেনিস্ খেলতে শেখে; পুরুষের সমান হওয়াই তার জীবনের আদর্শ। সেজন্য সে মাথার চুল কাটে; টাই, ব্লেজার পরে; skirtএর ঝুল্ হাঁটুর নীচে আসতে দেয় না। জানে, বিবাহ ভাগ্যে নেই, কেননা ও দেশে বিবাহযোগ্যা মেয়ের সংখ্যা সেই বয়সের পুরুষের চেয়ে তিনগুণ বেশী। (এর ফলে কুড়ি, বাইশ বছরের মেয়ের সঙ্গে চল্লিশোর্দ্ধ পুরুষের বিবাহ লেগেই আছে।) প্যারিসের মেয়েরাও বিবাহ সম্বন্ধে ইংরেজ মেয়েদের মতই দুঃখিনী। গত যুদ্ধ এদের অনেককে চিরকুমারী ক'রে রেখেছে। তবু প্যারিসের মেয়েরা মনে মনে খুব বেশী

মেয়েলি; কতকটা ভারতীয় মেয়েদের মতন। অথচ মোটেই লজ্জানতা নয়। চটপট্ কথার জবাব দেয়, চমৎকার হাসে, হাবে ভাবে মিষ্ট ব্যবহারে মুহূর্ত্তে মানুষকে মুগ্ধ ক'রে তোলে। নিজেদের ছবির মত সাজাতে এরা জানে; ফরাসি মেয়ে মাত্রেই সুবেশা। ছোটখাট গড়ন, মুখে মঞ্জুশ্রী, চোখে বিদ্যুৎ। ওষ্ঠে সদাই হাসি লেগে আছে, বুকে যতই ব্যথা থাক্, মুখে তার প্রকাশ নেই, চরণের গতি চলচঞ্চল। মনটি সাদা,—নিত্য নৃত্যশীল। চুলের রঙ কালো আর সোনালির মিশাল।

ইংরেজ মাত্রেই মনে মনে একটি বার্কেনহেড্। ফরাসি সাম্য, মৈত্রী, স্বাতন্ত্র্যের চূড়ান্ত পূজারি। লণ্ডনে সামাজিক স্থান আমার চেয়ে যাদের নীচু তারা আমাকে বলে, স্যার্। প্যারিসে বাড়ীর maid আমাকে বলে, ম্যসিউ, আমি তাকে বলি মাদ্‌মোয়াজেল্। আর একটু বর্ষীয়সী হ'লে বলতে হত, মাদাম্। পোঁয়েকারের সঙ্গে যদি আমি কথা বলি, আমি তাঁকে বলব ম্যসিউ, তিনিও আমায় বলবেন, ম্যসিউ। প্যারিসে কেউ কারো ছোট নয়; সাদায়, কালোয়, হল্‌দেয় তফাৎ নেই। সকলেরই

Sacre Coeur অঙ্কনরত ফরাসি চিত্রকর

শ্রীভবানী ভট্টাচার্য্য

একমাত্র পরিচয় দেবার আছে ; সে পরিচয়, সগর্ব্বে বলা —আমি মানুষ।

ফরাসি জাত্‌টা প্রাণময়,—ওদের ভাষায় যাকে বলে (vivant) ভিভাঁ। তার পরিচয় প্যারিসের পথে পথে। সারা সহরটায় নিত্য মহোৎসব লেগে আছে, যেন প্রকাণ্ড একটা অন্তহীন মেলা বসেছে। আমাদের দেশে বারো মাসে তেরো পার্ব্বণ ; প্যারিসে বারো মাসে ৩৬৫ পার্ব্বণ। দুটো জিনিষ এরা অত্যন্ত ভালবাসে,—সুর আর সুরা। এ দুই বস্তু এদের কাছে এক। গলা ভিজ্‌লে তবেই সে গলা থেকে সুরের ঝড় ছোটে। "খাদ্য কিছু, পেয়ালা হাতে ছন্দ গেঁথে দিনটি যায়"—এমন লোক প্যারিসে বিস্তর।

"Sacre Coeur"

ইংরেজেরও প্রাণশক্তি প্রচুর, তবে সে প্রাণ পশুপ্রাণ। পশুপ্রাণ কথাটা শুনতে মন্দ হ'লেও আসলে খুব খারাপ নয় ; অন্তত নিষ্প্রাণ হওয়ার চেয়ে পশুপ্রাণ পাওয়া ভাল পশু একদিন মানুষ হ'তে পারে, কিন্তু পাথর চিরদিন পাথরই থাকে। পশুর মধ্যে এমন অনেক বস্তু আছে যা আর কারো নেই। সিংহের শক্তির কথা আমরা সবাই জানি। তা ছাড়া পশু মাত্রেরই মনে খাট্‌বার একটা অদম্য

প্রেরণা থাকে ; যখন নিতান্ত হাতে কাজ থাকে না, তখন তারা ক্রীড়াচ্ছলে পরস্পরে যুদ্ধ করে। শক্তি আর উদ্যম ছাড়া পশুমনে আর এক জিনিষ থাকে ; তার নাম বো (instinct)। বুদ্ধি দিয়ে যা বোঝা যায় না, বোধ দিয়ে তা অনেক সময়ে ধরা যায় ; প্রতিভার যা অসাধ্য, common senseএর তা সুসাধ্য। কোন্ সুরসিক ইংরেজের John Bull নামকরণ করেছেন জানি না, কিন্তু তাঁর অন্তর্দৃষ্টির তারিফ্ করি। পূর্ব্বোক্ত ত্রিগুণ লাভ ক'রে ইংরেজ জগৎ জয় করেছে,—অবশ্য শুধু জগতের দেহটাই, কারণ জগতের মন বহুদিন থেকে বন্ধ আছে ফরাসি কাল্চারের কারাগারে। বোধ অনেক রকমের হয়, তার মধ্যে একটার নাম যূথ-বোধ। একজন ইংরেজের মত অসহায় জীব খুব বেশী নেই; কিন্তু দশজন ইংরেজ একত্র হ'লে যূথবোধের সৌজন্যে তাদের পরাক্রমের শেষ থাকে না। ইউরোপে যুগে যুগে যে সব মহাযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে তার ইতিহাস প'ড়ে দেখলে কথাটা স্পষ্ট হ'য়ে উঠবে। নেপোলিয়ন্ জন্মায় ফ্রান্সে, আর ইংলণ্ডে জন্মায় ওয়েলিংটন্। ফ্রান্সের মহাবীর মার্শাল্ ফোর্শল্ আর ইংলণ্ডের মহাবীর ডগ্লাস্ হেগ্। একজনের আগুনের মত প্রতিভা ; জ্বলে, কিন্তু একদিন নেভেও। অপরের প্রতিভা নেই, কিন্তু শক্তি (talent) আছে ; তার অমিত তেজ—যা জ্বলেও না, নেভেও না। নেপোলিয়ন্ শুধু বলে, মন্ত্রের সাধন ; তার অভিধানে ব্যর্থতা শব্দ নেই। ওয়েলিংটন বলে, মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন।

দুই

আমাদের দেশে চরিত্র বস্তুটা একাধারে নেতিমূলক এবং নীতিমূলক। নেতিমূলক, কেন না আমাদের বিশ্বাস, চরিত্র গড়া যায় নিষেধ দিয়ে ; নীতিমূলক, কেননা আমাদের ধারণা, চরিত্র গড়া যায় বিধি দিয়ে। নিষেধ যথা, 'মিথ্যা কথা কহিও না।' বিধি—যেমন, 'সদা সত্য কথা কহিবে।' অথচ চরিত্র জিনিষটা বিধি এবং নিষেধ—নীতি এবং নেতি —এ দুইয়েরই বাইরে। নীতিশীল আর সুচরিত্র এ দুইয়ের মানে এক নয়। নীতি বস্তুটা সমাজগত, আর চরিত্র ব্যক্তিগত। নীতি বাইরের জিনিষ,চরিত্র ভিতরের। চরিত্রের গঠন হয় না—বিকাশ হয়। তার গোড়ার কথা, 'আত্মানম্ বিদ্ধি,' 'Know thyself', আর শেষ কথা 'Be thyself' অর্থাৎ নিজেকে জানো, এবং নিজেকে মানো। ঘোর নাস্তিক হও ক্ষতি নেই, কিন্তু সেই নাস্তিকত্ব যদি তোমার মনে বিনা ক্লেশে, বিনা আয়াসে স্বধর্ম্ম হ'য়ে ওঠে তা হ'লে নিঃসন্দেহ তোমায় চরিত্রবান্ বলবো।

নীতি আছে অথচ চরিত্র নেই (অপরিণত শিশুচরিত্র আমার কাছে চরিত্রই নয়) এর প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত—বাঙালি এবং মাদ্রাসি। কথাটা অত্যন্ত কটু, কিন্তু ইউরোপে এসে দূর থেকে দেশের দিকে চেয়ে এ সত্য আমার কাছে আলোর মত স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে ; সত্য যতই অপ্রিয় হোক্, তাকে গোপন করায় লাভের চেয়ে লোকসান বেশী। ইংরেজের সুদৃঢ় চরিত্র আছে ; বাল্মীকির রাবণের মতন। যে বস্তু ও চরিত্রের ভিত্তি তার নাম স্থিতি। ইংরেজ পৃথিবীর যেখানেই যাক দোষে গুণে ইংরেজই থাকে। মনের দিক থেকে দূরে থাক্, বাইরের বদলও এতটুকু আসে না। রোমে যায় তবু রোমান্ হয় না ; ভারতে গিয়ে গরমে দগ্ধ হয় তবু ধুতির মত আরামের বহির্বাস ব্যবহার করে না। এখানে বলা দরকার যে, ব্যক্তির চরিত্রই ক্রমশ জাতির চরিত্র হ'য়ে ওঠে, কেননা জাতি বলতে বোঝায় বহু ব্যক্তির সমবায় এবং মানসিক আত্মীয়তা।

দুটোই চরিত্রবান্ জাতি, অথচ উভয়ের চারিত্রিক বৈষম্য বিস্তর। তার মধ্যে মূল কথা এই যে ইংরেজ-চরিত্র সামরিক আর ফরাসি-চরিত্র artistic। লণ্ডন আর প্যারিস্ পাশাপাশি দেখলে কথাটা সোজা হ'য়ে ওঠে। লণ্ডন পথের নাম রাখে Trafalgar Square, প্যারিস রাখে Rue Anatole France। লণ্ডনের পথে যাদের পাথরের মূর্ত্তি আছে তাদের অনেকেই জীবনে যুদ্ধের চেয়ে বড় কিছু করেনি। প্যারিসের রাস্তায় যোদ্ধার প্রতিমূর্ত্তি দেখেছি ব'লে মনে পড়ে না। যে সব মর্ম্মর মূর্ত্তি আছে, শিল্পের দিক থেকে তারা মহা গৌরবের জিনিষ। আইডিয়ার তারা এক একটা শিলালিপি। (১) যুদ্ধে যারা মরেছে

(১)। লণ্ডনের ডাকটিকিটে রাজার ছবি থাকে ; নরওয়ের ডাক-টিকিটে থাকে ইব্‌সেনের ; ফরাসির—পাস্তুরের।

ফরাসী—ইংরেজ

শ্রীভবানী ভট্টাচার্য্য

ওদের জন্য লণ্ডনে আছে এক জমকালো স্মৃতিস্তম্ভ ; প্যারিস্ সে স্মৃতি বাঁচিয়ে রেখেছে একান্ত সাদাসিধা একটা চিতা রচনা ক'রে। ইতিহাসের মর্য্যাদা এরা বোঝে, তাই এ চিতা রচিত হয়েছে নেপোলিয়ানের সুবিখ্যাত আর্ক দ্য ট্রিয়ঁফের তলায়। অহরহ আগুন জ্বলছে, অবশ্য বৈদ্যুতিক আগুন। রাত বারোটায় দেখেছি, একটি শিশুর হাত ধ'রে একজন নারী নীরবে সে চিতার পাশে এসে দাঁড়ায়। মুখে কথা না থাক্, দু'চোখের দৃষ্টি কথায় ভরা। অগ্নিশিখা প্রবল বাতাসে কাঁপছে, প্রতি মুহূর্ত্তে মনে হয় যেন নিভে যাবে। নতমুখে বহুক্ষণ সেদিকে চেয়ে থেকে মনে মনে কত কি ভাবে কে জানে! তারপর ধীরপদক্ষেপে দূরে, অন্ধকারে মিলিয়ে যায়।

অথচ ফরাসির রণবল এখন ইউরোপে সবার চেয়ে বেশী। বহুদিন থেকে জার্মান্ শৌর্য্যের লোলুপ দৃষ্টির তলায় বাস ক'রে ওদের আর দেহ থেকে যুদ্ধ-সাজ খোলবার উপায় নেই। (ফ্রান্সের সৈনিক সংখ্যা=৪১৭,০০০। গ্রেট্ ব্রিটন্=২১৪,৭২৩। জার্ম্মানি=১০০,০০০। ব্রিটনের —২১৪,৭২৩—এর মধ্যে ৬০,২২৩ সৈনিককে প্রতিপালন করে দরিদ্র ভারত— Daily Mail Year Book, 1928.) ওদেশের প্রত্যেক তরুণ রণবিজ্ঞান শিক্ষা করতে বাধ্য। কিন্তু ইংরেজ সেনার ভীমের মত চেহারা ওরা পায়নি। ফরাসি সৈনিককে দেখে একোল্ দে'জার্ত্ (আর্টস্কুল) এর ছাত্র ব'লে ভুল করা চলে।

ইংরেজ চরিত্র মূলত শুধু সামরিক নয়, সঙ্গে সঙ্গে সাংসারিক। এ গুণ এরা এদের ড্যানিশ্ পূর্ব্বপুরুষদের কাছ থেকে পেয়েছে। নেপোলিয়ন্ বলেছিলেন, ইংরেজ দোকানদারের জাত্। কথাটা পরিহাস নয়,—সত্য, এবং এতে গৌরব না থাক্ লজ্জারও কিছু নেই। লজ্জার কিছু নেই, কেন না পূর্ব্বেই বলেছি চরিত্র জিনিষটা স্বতঃস্ফূর্ত্ত। ব্যবসায়-বুদ্ধি এদের অস্থিমজ্জায় গাঁথা। এই কারণে সমস্ত ইউরোপ ইংরেজকে মাড়োয়ারি ভাবে; ধনী মাড়োয়ারির আড়ম্বর-বহুল বাস-গৃহের সঙ্গে লণ্ডনের তুলনা করা খুব বেশী অসঙ্গত নয়।

ইংরেজিতে দুটি কথা আছে,—discipline এবং efficiency। ও দু'কথার বাংলা হয় না, কারণ বাঙালির জীবনে ও দু'য়ের একটিও নেই। এর প্রথমটা সামরিক ধর্ম্ম, দ্বিতীয়টা সাংসারিক। জার্ম্মান্ চরিত্র বাদ দিলে ইউরোপের আর কোনো জাতির চরিত্রে এ ধর্ম্মদ্বয় এত প্রবল নয়। ফরাসীদের মধ্যে তো নয়ই। লণ্ডন সহরটা কলের মতন চলে; এতটুকু ত্রুটি নেই। প্যারিস্ চলে নিজের খেয়ালে। লণ্ডনে এ পর্য্যন্ত এমন ঘড়ি দেখিনি যা ঠিক্ সময় রাখে না। প্যারিসে এমন ঘড়ি অল্পই দেখেছি যা ঠিক্ সময় রাখে। লণ্ডনে এমন কোনো পথ নেই যা কোনো পুলিশ্‌ম্যানের অজানা; প্যারিসের পুলিশ্‌ম্যানের কাছে পথ সম্বন্ধে সদুত্তর বড় একটা পাইনি। এখন প্রশ্ন এই, কলের মানুষ হ'য়ে ইংরেজ কতদিন জগতের প্রশংসা কুড়োবে? হেন্‌রি ফোর্ড্ তাঁর সদ্য প্রকাশিত Philosophy of Industry গ্রন্থে বলেছেন, ভবিষ্যতের মানুষ শুধু ভাব্‌বে; বাকি সব কাজ করবে যন্ত্র। ফোর্ডের কল্পিত এই অবস্থা সত্যই যদি আসে, ইংরেজের পক্ষে সে মহা দুর্ভাবনার কারণ হবে, কেন না এরা ভাবে যত, যন্ত্রের মত কাজ করে তার চেয়ে বেশী। (অবশ্য প্রত্যেক নিয়মেরই ব্যতিক্রম আছে, চিন্তাশীল ইংরেজও মাঝে মাঝে দেখতে পাই; তবে আমি এখানে দু'দশ লাখের কথা বলছি, দু'দশ জনের নয়।) মানুষ-যন্ত্রে আর আসল যন্ত্রে বিরোধ বাধলে জয়ী হবে আসল। সুতরাং তখন ইংরেজকে হাতের কাজ ফেলে মাথার কাজ করতে হবে, আর তার চেয়ে কষ্টকর কাজ ইংরেজের কাছে দ্বিতীয় নেই।

সুখ এবং স্বাচ্ছন্দ্যের দ্বন্দ্ব পৃথিবীতে বহুদিন যাবৎ চ'লে আসছে। এদের একটিকে পেতে হ'লে অপরকে ছাড়তে হয়। ইংরেজ স্বাচ্ছন্দ্যের পায়ে সুখকে বলি দিয়েছে। তাই সৌন্দর্য্যের চেয়ে ব্যবহার্য্য তার চোখে বড়। তাই বীণার তার ছিঁড়ে সে টেলিগ্রাফের তার বানায়। টেলিগ্রাফের বার্ত্তা কানে পৌঁছয়, বীণার বার্ত্তা মনে। সুতরাং ইংরেজের কান যত তীক্ষ্ণ, মন তত তীক্ষ্ণ হ'তে পায় না। এক কথায় জীবনের সব ফাঁক্‌গুলো ভর্ত্তি করতে গিয়ে ইংরেজ নিজেকেই চিরদিন ফাঁকি দিয়ে এসেছে।

তিন

পূর্ব্বেই বলেছি, ফরাসি-চরিত্রের প্রধান প্রকাশ আর্টের ভিতর দিয়ে। তার একটা বড় প্রমাণ—প্যারিসের জাতীয় অপেরা। এ অপেরার খরচ চালায় ফরাসি গবর্ণমেণ্ট্। ফরাসির চোখে সমর কিম্বা শিক্ষার চেয়ে শিল্পের স্থান নীচু নয়; তাই ফরাসি ক্যাবিনেটে সমরসচিব বা শিক্ষাসচিবের মত শিল্পসচিবও থাকে। লণ্ডনে অপেরা নেই, থিয়েটার আছে বিস্তর, কিন্তু তাদের দু'চারটি বাদে বাকি সবাই হটুমনের খাবার জুগিয়ে থাকে। অর্থাৎ তারা অর্থের জন্য আদর্শ হারায়। প্যারিসের অপেরায় এমন হ'তে পারে না, কেন না অর্থ সম্বন্ধে প্যারিস দর্শকমুখাপেক্ষী নয়। শুনেছি পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রেক্ষাগৃহ Moscow Art Theatreও কতকটা এই উপায়ে তার আদর্শ বাঁচিয়ে রেখেছে।

নৃত্য, গীত, বাদ্য—এই ত্রিবিধ খাদ্য ফরাসির মনকে স্থিরযৌবন ক'রে রেখেছে। তাই ও-মন সাহিত্যে এত সৃষ্টি করতে পারে। ফরাসির সাহিত্য এত বড় হ'তে পারল তার আর এক কারণ ফরাসি ভাষার প্রকাশশক্তি। ও ভাষার সৌজন্যে ফরাসি তার মনোভাব অত্যন্ত স্পষ্টত লিখতে পারে। ফরাসি ভাষা বলতে ভাল লাগে, শুনতে ভাল লাগে, ও-ভাষায় স্বপ্ন দেখতে ভাল লাগে! এমন সুমিষ্ট ভাষা পৃথিবীর আর কোনো দেশে আছে ব'লে আমার জানা নেই। ছোট ছেলের মুখে ফরাসী ভাষা শোনা জীবনে একটা মনে রাখবার মত ঘটনা।

পরিশেষে চিত্র ও ভাস্কর্য্যের কথা বলব। পৃথিবীর সব চেয়ে ভাল চিত্র ও ভাস্কর্য্য সংগ্রহ আছে প্যারিসের Louvreএ। কিন্তু পুরাণের পূজা এরা যতই করুক, তার চেয়ে বেশী করে নূতনের সৃষ্টি। প্যারিসে চিত্রকরের সংখ্যা প্রায় দু'হাজার। ছবি বিক্রি হয় যথেষ্ট, তবু এদের অনেককেই দারিদ্র্যের সঙ্গে ঘোর সংগ্রামে বহুদিন কাটাতে হয়। মোমাত্রের (Montmartre) এক আর্টিষ্টের ঘরে গিয়ে দেখেছি, দু'হাতে দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে সে সৃষ্টি ক'রে চলেছে। সমস্ত ঘর কর্দ্দমাক্ত—অতি অভাগা শ্রমিকের ঘরের মতন। চারদিকে অসংখ্য ছবির সরঞ্জাম ছড়ানো, একটা শুধু ভাল চেয়ার। বোধ করি সেটাতে তার 'মডেল' বসে। ৫০ ফ্রাঁ (৫৲ টাকা) দামের এক ছবি দেখাল,—তার দাম ৫০০ ফ্রাঁ চাইলে আমি বিস্মিত হতুম না। এ শুধু একটা টাইপ,—আছে এমন বিস্তর।

বহুদিন হতে চিত্রচর্চ্চা ক'রে ও সম্বন্ধে ফরাসিদের একটা অন্তর্দৃষ্টি জ'ন্মে গেছে। অবশ্য এ বিষয়ে ইউরোপে ফরাসির দ্বিতীয় আছে,—ঘরের কাছেই, হলাণ্ডে। দাভিদ্ আঁগ্রের দেশে চিত্র যত সমাদর পেয়েছে, রেম্ব্রাণ্ড্, ভ্যান্ দাইকের দেশে চিত্র তার চেয়ে কম আদর পায়নি। অষ্ট্রেলিয়া-প্রত্যাগত একটি ইংরেজ মেয়ের সঙ্গে প্যারিসে পরিচয় হ'ল; অষ্ট্রেলিয়ার কলেজে তিন বছর সঙ্গীত শিক্ষা ক'রে প্যারিস্ কিম্বা ভিয়েনার কোনো বড় ওস্তাদের কাছে শিক্ষালাভার্থে ইউরোপে এসেছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা ব'লে দেখেছি, বেশ বুদ্ধি আছে, ভাব্তেও পারে, অতি সুন্দর ভায়োলিন্ বাজায়। কিন্তু এত বড় লুভ্র্ চিত্রশালা তাকে দেখাবার সময়ে 'কি সুন্দর!' 'কত চমৎকার!' এম্নি কথা ছাড়া তার মুখে উল্লেখযোগ্য আর কিছু শুনিনি। অথচ হলাণ্ডের একটি স্কুলে-পড়া মেয়ে উক্ত চিত্রায়তন দেখে এসে বল্লে, মোনা লিসার চোখ ভারি নিষ্ঠুর; আমি ওকে দেখতে পারি না।...কেন নিষ্ঠুর? সে শুধু মেয়েরাই বোঝে।

বল্লুম, নিষ্ঠুর—তা মানি। কিন্তু খুব আশ্চর্য্য হাসি নয়? রহস্যময়?

—তা হোক্; মোনা লিসার সঙ্গে দেখা হ'লে তাকে বলতুম,—বলতুম—

—কি বলতে? যে, থামো, হেসো না?

—বলতুম যে, তোমার হাসি কি ভয়ানক বিশ্রী!

ছোট মেয়ের মুখে মোনা লিসা সম্বন্ধে এত গভীর কথা শোনবার আশা করিনি। আসলে মনে হয়, বহুদিন হ'তে চিত্রচর্চ্চা ক'রে হল্যাণ্ড্ এবং ফ্রান্সের নরনারীর ও সম্বন্ধে একটা সহজ রসবোধ (art instinct) জ'ন্মে গেছে; ওরা ছবি দেখে একটা ব্যক্তিগত মত প্রকাশ করতে পারে,—এ মত 'কি সুন্দর' বলার মতন নির্বিশিষ্ট নয়, যার একটা ধরবার ভাব্বার মত অর্থ হয়।

মোনা লিসার হাসি আমার চোখেও অত্যন্ত নিষ্ঠুর লেগেছে। ও যেন শুধু নিতে চায়, দিতে চায় না, বিজয় চায়, বিজিত হ'তে চায় না। মুখখানা ক্ষুধায় ভরা, দু'চোখ চির-অতৃপ্ত। এর পরিকল্পনা কীট্‌স্‌এর কাব্যে পেয়েছি; "La belle dame sans merci"। (১) রবীন্দ্রনাথে পেয়েছি; মোনা লিসা সন্দীপের নারী-সংস্করণ।

মোনা লিসার ছবি আমার চোখে যত ভালই লাগুক, তার চেয়ে ভাল লেগেছে ভিনাস্ ডু মিলোর পাথরের প্রতিমা। ও-মুখে ভাবের বিশিষ্টতা আমি পাই নি; অথচ ওর প্রতি অঙ্গ যেন কথা বলছে। পাথর ব'লে মনে হয় না। তিল তিল সৌন্দর্য্য মিশিয়ে তিলোত্তমার সৃষ্টি হয়েছিল; সে যুগের তিলোত্তমা এ যুগের ভিনাস্। শুধু একে দেখবার জন্য সাত সমুদ্র পার হ'য়ে আসা সার্থক হয়।

শব্দকে আমি ব্রহ্ম ব'লে মানি, তাই একখানি শব্দের মালা যখন সজীব হ'য়ে ওঠে তাতে আমি বিস্মিত হই না। ছবির দেহে প্রাণসঞ্চারও খুব কঠিন নয়। কিন্তু জড় পাথর হ'তে পরম সুন্দর মানবদেহ সৃষ্টি করা আমার কাছে ভারি আশ্চর্য্য লাগে। যে দুঃসহ সাধনা আর অপরিসীম ধৈর্য্য নিয়ে সুদীর্ঘ কাল ধ'রে ভাস্কর পাথর দিয়ে কাব্য লেখে, আমার কাছে সৃষ্টিরাজ্যে তার জুড়ি নেই। ভাস্কর্য্য এখন পৃথিবীর সর্ব্বত্র মরবার মুখে,—এক ফ্রান্স্ ছাড়া। সেকালের গ্রীক্-রোমান্ প্রতিভার পরিচয় পেতে হ'লে লুভ্‌রে যেতে হয়, কিন্তু একালের ফরাসি ভাস্করের মানসসন্ততি দর্শনার্থে যেতে হয় রোদাঁ মিউজিয়মে। সেকালের পাশে একালের—মিকেল এঞ্জেলোর পাশে রোদাঁর দাঁড়াবার অধিকার আছে কি না সে বিচার করবে অনাগত কাল। কিন্তু এত বড় একটা শিল্প যে, জগতে একমাত্র ফরাসি দেশে অজস্র হ'য়ে আছে সেজন্য ওদেশের তারিফ না ক'রে থাকা যায় না। ইংলণ্ডে ভাস্কর্য্য এখনো মরেনি তার কারণ ইংলণ্ডে ভাস্কর্য্য এখনো জন্মায়নি।

ফরাসি ছবি এবং ভাস্কর্য্য সম্বন্ধে আমার শেষ কথা এই যে, ও দুই দেখবার অধিকার শুধু সেই ব্যক্তির আছে, যাঁর দু'চোখের পিছনে আছে একটা মন। সে যাঁর নেই, তাঁর কাছে উক্ত চিত্র এবং ভাস্কর্য্য অত্যন্ত অশ্লীল বোধ হবে। আর্টে নগ্নতা আমি এক মহা দোষ ব'লে মনে করি; কিন্তু সে মহাদোষ যে শিল্পীর শক্তিবলে মহাগুণে পরিণত হ'তে পারে—তার বহু চাক্ষুষ পরিচয় আমি পেয়েছি। শুধু এই দুই জিনিষে নয়,—সমস্ত প্যারিস্‌টাকেই দেখবার জন্ম নূতন মন, নূতন চোখ দরকার হয়। প্যারিসের জীবনে একটা আর্ট আছে—এ যেন বীঠোফেনের একটা সিম্‌ফনি। মাঝে মাঝে তার ছন্দোপতন হয়, সুরে সুরে ঠক্কর লাগে, কিন্তু সম্পূর্ণ সুরভঙ্গ কখনো হয় না। তাই প্যারিসে অন্ধকার যতই থাক্, সে অন্ধকারে তারা জ্বলে, কাদা যতই থাক্, সে কাদায় ফুল ফোটে। নিজেকে জানবার সুযোগ প্যারিসে যত, ইউরোপের অন্যত্র কোথাও তত নেই,—নিজের শক্তি, নিজের রুচি, নিজের মন।—

"He who has stood the test of Paris has stood the test of all humanity."—কাইজারলিঙ্।

(১) বাংলা পত্রিকার ছোট-গল্প লেখকরা অনেক সময়ে মোনালিসার আসল ছবি না দেখে, কিম্বা তার প্রতিচ্ছবি দেখে, নামের মোহে তার হাসির কথা লিখে থাকেন। এতে তাঁদের বক্তব্য এক পাও এগোয় না, তা ছাড়া মোনা লিসার ছবিকেও ছোট করা হয়। যা সৃষ্টির পরমাশ্চর্য্য তাকে এত সাধারণ ভাবে দেখা ভাল নয়। ইউরোপে এসে কত সহস্র মুখে কত সহস্র ভঙ্গীর হাসি দেখলুম, কিন্তু কোথায় সে হাসি, আর কোথায় মোনালিসার হাসি। L'Innocence-এর ছবি দেখে কত জনকে মনে পড়েছে, Three Gracesএর ছায়া দেখেছি রক্তমাংসের দেহে, কিন্তু মোনালিসা শুধু একটা অশরীরী

চস্‌মা

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক

নাটকীয় চরিত্র

পুরুষ

মহেন্দ্র ... কন্যাদায়গ্রস্ত ব্রাহ্মণ
নিবারণ ... মহেন্দ্রের ভাবী বৈবাহিক
পুরোহিত
বোষ্টম

স্ত্রী

সরযূ ... মহেন্দ্রের স্ত্রী
মোক্ষদা ... নিবারণের স্ত্রী
মলিনা ... মহেন্দ্রের কন্যা
মুক্তকেশী ... মহেন্দ্রের ঝি
ভৈরবী
বোষ্টমী
সাপুড়েনী
রঙ্গিনীগণ

প্রস্তাবনা

গান

চস্‌মা পরো চস্‌মা পরো চস্‌মা পরো ভাই।
চস্‌মা ছাড়া এ যুগে আর উপায় কিছু নাই।
(দেখো) যত আছে লোক
(ঐ যে) ঝাপ্‌সা সবার চোখ,
দুধের ছেলেও চালসে ধরা চস্‌মা চোখে চাই ;
(এবার) চোখের উপর চোখ বসাবে আঁতুড়-ঘরে ধাই।
রিম্‌লেস্ না পরলে প্রেমিক বায় নাকো জানা,
গগ্‌ল্ ছাড়া মোটর গাড়ীর সোফার তো কানা ;
(আবার) পিন্স্‌নে ছাড়া কোন্ বিদুষীর নজর হয় সাফাই ?
(আমরা) সূক্ষ্ম নজর, দিব্য নজর চস্‌মা-যোগে পাই।
(যেমন) নাবালকের বন্ধু অছি, চোরের চৌকিদার,
তেমনি ধারা চোখের বন্ধু চস্‌মা জেনো সার।
(আছে) চন্দ্র সূর্য্য দু-কাচ-আলা চস্‌মা বিধাতার,
দৃষ্টি আঁধার সৃষ্টি আঁধার হচ্চে নাকো তাই।

১ম দৃশ্য

গভীর বন। শুক্‌নো মুখ ও রুক্ষ চুলে মহেন্দ্রের প্রবেশ। তার পায়ে পেনেলার জুতো, হাতে ক্যাম্বিসের ব্যাগ, কাঁধে ময়লা চাদর। অস্তগামী সূর্য্যের লাল রশ্মি এখানে সেখানে পাতার রন্ধ্রপথ দিয়ে বনের মধ্যে পড়েচে।

মহেন্দ্র

পারলুম না। মেয়ের বিয়ে দিতে পারলুম না। তেত্রিশ দিনে হয়েচে সাতাশি টাকা, আর সাত দিনে কতই হবে? হাজার পুরবে? অসম্ভব। পারলুম না, মেয়ের বিয়ে দিতে পারলুম না।

কি করবো? ভদ্রলোকের ছেলে হ'য়ে ভিক্ষে পর্য্যন্ত করলুম। আর কি করবো? চুরি? না, না, আর নাবতে পার্ব্বোনা!

কিন্তু উপায়? আর যে মোটে সাতদিন, তার পরই লম্বা অকাল। আমার যেন কালাকাল নেই, ছেলের বাপের তো আছে। পারলুম না, মেয়ের বিয়ে দিতে পারলুম না।

টাকা—টাকা, ওঃ। নিবারণ ছেলেবেলার বন্ধু, এক গাঁয়ে বাড়ী, টাকার আণ্ডিল—সেও হাজারের কম ছেলে দেবেনা। হাতে পায়ে ধরলুম; কচ্ছপের কামড়। পারলুম না, মেয়ের বিয়ে দিতে পারলুম না।

ওগো, কে কোথায় আছ গরীব বাঙালী, ব'লে রাখচি শোনো—যেই শুনবে মেয়ে হয়েচে অমনি হয় বিলিয়ে দিয়ো, নয় ভাসিয়ে দিয়ো, নয় নুন খাইয়ে—

— হাঃ হাঃ, পার্ব্বে না! পারবেই ত না। আমিও পারিনি।

করি কি? যাই কোথায়? বাড়ী? না, না, বাড়ী আর নয়। সেই গিন্নীর বুকভাঙা নিশ্বাস, সেই মেয়েটার ছলছলে

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক

চোখ। আহা! মা আমার আজকাল সামনেও আসে না, পালিয়ে পালিয়ে বেড়ায়, পাছে দুজনেই কেঁদে ফেলি।

যাই কোথায়? যমের বাড়ী। আমার মত হতভাগার ঐ ঐ জুড়োবার জায়গা। না দেখতে হবে গিন্নীর নাক ফুলিয়ে কাঁদা, না দেখতে হবে লোকের দাঁত বের ক'রে হাসা।

তাই। একটা গাছের ডালে না চাদরটাকে বেঁধে, ব্যস্‌। এই যে একটা ডাল। কেউ নেই তো? না, এ বেহালার বন। এর কাছে বাজিতপুরও সহর। (গলার চাদর খুলে গাছের ডালে বাঁধলেন) একটা ফাঁস গেরো চাই। (ফাঁস তৈরী করতে করতে) হায় রে আমার চাদর—আমার কন্যা-দায়ের কাচা! আর তোমাকে কাচবো না। এ লাল দাগটা কিসের? আহা, গিন্নী লাল সুতোয় আমার নাম লিখেছেন। কি বাবা চোখের জল, ঢের তো বেরিয়েছ—এখন আর বেরিও না, শুভ যাত্রায় অমঙ্গল হবে। (গলায় ফাঁস পরিয়ে) এই বার ঝুলে পড়ি। গিন্নী, গিন্নী, সরয্‌, চল্লুম।

নেপথ্যে

মহেন্দ্র! মহেন্দ্র!

মহেন্দ্র

(চম্‌কে উঠে) কে নাম ধ'রে ডাকে। (দূরে গলায় দড়ির আবছায়া মূর্ত্তি দেখা গেল) ওঃ তুমি—যাচ্ছি, যাচ্ছি। (ঝুলে পড়তে গেলেন। একজন ভৈরবীর বেশে প্রবেশ, ভৈরবীর পরণে চওড়া লাল পেড়ে গেরুয়া সাড়ী, কপালে সিঁদুর ও রক্ত চন্দন। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, হাতে একটি ঝুলিসংলগ্ন ত্রিশূল।)

ভৈরবী

(মহেন্দ্রের হাত চেপে ধ'রে) মহেন্দ্র, কি করছিস্‌?

মহেন্দ্র

কে তুমি? কোথায় ছিলে? আমায় চিন্‌লে কি ক'রে?

ভৈরবী

(অলৌকিক তীব্র দৃষ্টিতে মহেন্দ্রের দিকে চেয়ে) মহেন্দ্র!

মহেন্দ্র

ওঃ ভৈরবী, তাই।

ভৈরবী

মহেন্দ্র

কেন মা, কেন বাধা দিচ্ছো?

ভৈরবী

খোল্‌ বল্‌চি।

(মহেন্দ্র যন্ত্রচালিতের মত গলার ফাঁস খুলে ফেল্লে)

ছিঃ বাবা—জানোনা আত্মহত্যার মত পাপ নেই?

মহেন্দ্র

ওই তো মা, তোমাদের মামুলি কথা। যার আঠার বছুরে মেয়ে ঘরে জিয়োনো তার বেঁচে থাকাই হচ্ছে সব চেয়ে পাপ।

ভৈরবী

(হেসে) পাগল! (স্নেহার্দ্রস্বরে) ভিক্ষে ক'রে বুঝি বেশী টাকা পাওনি?

মহেন্দ্র

(বিস্ময়ে) মা—মা!

ভৈরবী

কি ক'রে পাবে? মানষের কাছে ত ভিক্ষা করনি।

মহেন্দ্র

এই ত মা ভুল করলে। মানষের কাছেই ভিক্ষা করেছি। কলকাতার যারা সেরা মানুষ।

ভৈরবী

তার মানে বড় মানুষ তো? আমি মান্‌ষের কথা বল্‌চি।

মহেন্দ্র

বুঝতে পারচিনা।

ভৈরবী

পারচোনা? (ঝুলির ভিতর হতে একটি চস্‌মা বের ক'রে মহেন্দ্রের হাতে দিয়ে) আচ্ছা এই চস্‌মা নিয়ে যাও, এই প'রে যাকে মানুষ দেখ্‌বে, সেই আসল মানুষ।

মহেন্দ্র

সবাইকে মানুষ দেখ্‌বো না?

ভৈরবী

না। মানুষ দেখে ভিক্ষা চেয়ো।

মহেন্দ্র

চাইলেই পাবো?

ভৈরবী

নিশ্চয়।

মহেন্দ্র

আচ্ছা, দেখি মা, তোমার কেমন কথা কেমন দয়া। এতটুকু আশার ভেলা দিয়ে যখন মৃত্যুসমুদ্র থেকে টেনে তুল্‌লে, তখন (ভৈরবীর পায়ের ধূলো নিয়ে) আশীর্ব্বাদ করো যেন এই চস্‌মার ভেলা দিয়ে কন্যাদায়েরও সমুদ্র পার হ'তে পারি।

ভৈরবী

পারবে—এসো।

মহেন্দ্র

আর একবার পায়ের ধূলো দাও।

(ভৈরবীকে প্রণাম ক'রে প্রস্থান)

ভৈরবী

জয় শিব শম্ভু। বাবা, কত ছলেই এসে হাত পাতো। তোমার ধন তোমাকে দিই।

গান

তোমার বিভূতি-কণিকা যা মোরে
দিয়াছ করুণা করিয়া,
ফিরে ফিরে এসো চাহিতে তাহাই
কত জীবরূপ ধরিয়া।
একি তব লীলা হে করুণাময়,
আমারে করিতে ধন্য,
তোমার সেবায় রাখিয়াছ রত
যদিও আমি নগণ্য।
আমার বাঁশীতে তোমার রাগিণী
বাজাও জগত ভরিয়া,
ক্ষুদ্রতা মোর তোমার স্নেহের
পরশে লও গো হরিয়া।

২য় দৃশ্য

কুঁড়ে ঘরের সম্মুখস্থ আঙিনায় সরযূ একটি লাউমাচার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

সরযূ

এই লাউগাছ তিনি নিজের হাতে মাচায় তুলে গিয়েছেন, এখন লাউ ফলচে—কে খাবে? তিনি না এলে কি পাড়তে পারি? আহা! কখনো বিদেশে যান্ না। কি ক'রেই ভিক্ষে ক'রে বেড়াচ্চেন, কি ক'রেই দোকানে খাচ্চেন? তার উপর যে গাড়ী ঘোঁড়ার রাস্তা, আর তিনি যে ভাল মানুষ—ভালোয় ভালোয় বাড়ী ফিরলে বাঁচি। কেনই ঐ আবাগীকে পেটে ধরেছিলুম?—ওর জন্যেই সারা হ'য়ে গেলেন। আগে মুখে হাসি লেগেই থাক্‌তো, আজ তিন বচ্ছর আর হাসি দেখিনি।

(মলিনার প্রবেশ)

মলিনা

মা, আজ কি রাঁধবো?

সরযূ

আমার মাথা! এত বড় মেয়ে হলি, বিয়ে দিলে ছেলের মা হতিস্, এখনো শিখিয়ে দিতে হবে। যা—যা খুসী রাঁধ গে যা।

মলিনা

আমি—আমি—

সরযূ

তুমি—তুমি—কি কাপড় প'রে বেড়াচ্চো—যেন কাঠ কুড়ুনীর মেয়ে? ঐ জন্যেই গায়ে প্রজাপতি বসে না।

(মলিনা চোখে আঁচল দিয়ে ফোঁপাতে লাগ্‌লো)

শোন্, শোন্, কাঁদাস্‌নি (মলিনাকে বুকে টেনে নিয়ে) ফরসা কাপড় নেই বুঝি? তা আমাকে বলিস্‌নি কেন? এই থানাই ক্ষার থোল দে কেচে দিতুম। চল্ আমার একখানা আছে। পরিয়ে চুল বেঁধে দিই গে। তবু ফোঁপায়! কি বলেছি আমি? আমার যেমন নেই মাথার ঠিক লক্ষ্মী মা আমার, কাঁদিস্‌নি। চল্, আজ আর তোকে হেঁসেলে যেতে হবে না। আজ আমিই দুটি রাঁধবো'খন।

সতীশচন্দ্র ঘটক

মলিনা

না—মা—না—

সরযূ

আচ্ছা তুই-ই রাঁধিস্—চল্।

মলিনা

তুমি—তুমি—

সরযূ

কি মা মলু—কি ?

মলিনা

তুমি কেন বাবাকে চিঠি লেখোনা—

সরযূ

কি লিখবো ?

মলিনা

ফিরে আসতে।

সরযূ

পাগ্‌লী মেয়ে। ঐ জন্যে তোর কান্না—ভয় কি মা ? ভগবান আছেন।

(নেপথ্যে পায়ের শব্দ)

মলিনা

ঐ বাবা আসচেন—

(প্রস্থানোদ্যত)

সরযূ

(কান পেতে) ঠিক ধরেচে ! দাঁড়া না—পালাচ্ছিস্ কেন ?

মলিনা

তাঁর ভাত চড়াতে হবে না ?

(মলিনার প্রস্থান। অপর দিক দিয়ে মহেন্দ্রের প্রবেশ)

মহেন্দ্র

ওগো, আমি এসেছি।

সরযূ

(হাত জোড় ক'রে কোন অনির্দ্দিষ্ট দেবতাকে প্রণাম ক'রে) আমার চোখ আছে। আমি কানা নই।

মহেন্দ্র

তাই নাকি ? আমি আরো ভাবছিলুম, হাপিত্যেশ ক'রে পথের দিকে চেয়ে চেয়ে সত্যিই কানা হ'য়ে গেছ।

সরযূ

রস যে একেবারে উথ্‌লে উঠ্‌চে। কলকাতায় গিয়ে কার কাছ থেকে—

মহেন্দ্র

মরা গাঙ্গে বান ডাকিয়ে এলুম ?

সরযূ

হ্যাঁ গো হ্যাঁ—মুখের কথা সুদ্ধ কেড়ে নিচ্চো যে।

মহেন্দ্র

ঐ পর্য্যন্ত। মনের কথা কাড়বার সাধ্যি নেই—

সরযূ

কেন, মেয়ে মানুষের মন ব'লে ? ঐ যাঃ, প্রণাম করা হয়নি—

(পায়ের ধূলো নিলেন)

মহেন্দ্র

এ যে অতি-ভক্তির মতন ঠেকচে !

সরযূ

আরে বাপ্‌রে—পতি-দেবতা ! আচমকা এসে পড়লে তাই, নৈলে ফুল বিল্বিপত্তর জোগাড় ক'রে রাখতুম। এখন ধড়াচূড়ো ছেড়ে একটু পাখার বাতাস খাবে চল।

(চাদর খুলে নিয়ে হাত ধ'রে টানলেন)

মহেন্দ্র

আবার পাখার বাতাস ! আমি ভেবেছিলুম কুলোর বাতাস দেবে। নাঃ, এই লাউ পাতার বাতাসই যথেষ্ট।

সরযূ

আচ্ছা, এইবার একটা কথা জিজ্ঞেস করবো ?

মহেন্দ্র

ওরে, কে কোথায় আছিস্ দেখে যা—পতিব্রতা কাকে বলে। কথাটি বল্‌বে তাও অনুমতি নিয়ে।

সরযূ

যখন এত হাসি খুসী এত ফূর্ত্তি, তখন নিশ্চয় টাকার জোগাড় হয়েচে ?

মহেন্দ্র

না, টাকার জোগাড় হয়নি ; কিন্তু এমন কিছুর জোগাড় হয়েচে যা দিয়ে টাকার জোগাড় হবে।

সরযূ

আবার হেঁয়ালি ধরলে ! খুলে বলো না।

মহেন্দ্র

খুলে বলবো ? নাঃ, দেখানোই ভালো। (ব্যাগ খুলে চস্‌মা বের ক'রে) দেখেচ ?

সরযূ

ও ত চস্‌মা

মহেন্দ্র

হুঁ হুঁ, কিসের চস্‌মা ?

সরযূ

কিসের আবার, কাঁচের।

মহেন্দ্র

কাঁচের ! এ দিয়ে কি দেখা যায় ? মানুষ, মানুষ। বুঝলে না ? বলি, মানুষ কখনো দেখেছ ? সব জন্তু। এইটে চোখে দিয়ে দেখো, দেখ্‌বে আমিও হয়তো একটা গণ্ডার।

সরযূ

ও মা ! সে আবার কি ?

মহেন্দ্র

হুঁ হুঁ, খালি চোখে সবাই মানুষ—মানুষ পাবে লাখে একটা। খুঁজতে হবে শুধু এই দিয়ে।

সরযূ

খুঁজে কি হবে ?

মহেন্দ্র

ঐ তো—ঐ জন্যেই তোমাদের—বলি, আমার দরকার কি ? টাকা তো। মানষের কাছে চাইলেই পাবো।

সরযূ

ওঃ বুঝেছি। এ চস্‌মা কে দিলে ?

মহেন্দ্র

কে দিলে ! আচ্ছা শোন। কুকুর ক্ষ্যাপে মাথার ঘায়ে, মানুষ ক্ষ্যাপে কিসে ? কন্যাদায়ে। আমি ক্ষেপে উঠেছিলুম।

সরযূ

ক্ষেপে উঠেছিলে !

মহেন্দ্র

ক্ষেপেই উঠেছিলুম—

(প্রবেশ একজন বোষ্টম ও একজন বোষ্টমী। বোষ্টমের একতারা হাতে, বোষ্টমীর হাতে খঞ্জনী)

বোষ্টম

রাধে কৃষ্ণ !

মহেন্দ্র

ও রাধে কৃষ্ণ অমন সবাই বলে—পড়তে কন্যাদায়ে ত বুঝতে।

সরযূ

আঃ, ওর সঙ্গেও—দাঁড়াও ভিক্ষে এনে দিচ্চি।

(প্রস্থানোদ্যত)

মহেন্দ্র

(সরযূর কাপড় টেনে ধ'রে) কি এনে দেবে ? চাল তো ? পারবে না দিতে।

সরযূ

কেন ?

বোষ্টমী

কেন বুঝলেনি মা ? বাবা একখানি গীত শুন্‌তে চায়।

মহেন্দ্র

হ্যা,—আর গীত শোনাতে হবেনা—ধরবে ত সেই "মা যশোদার নীলমণি" ?

বোষ্টমী

না বাবা, এমন গীতটি গাইবো যে খুসী হ'য়ে যাবে। (বোষ্টমের প্রতি) ধর্‌তো সেই কন্যেদায়ের গীতটা।

গান

বোষ্টম বোষ্টমী। মেয়ের বাপের গলায় হেঁটু দিচ্চে ছেলের বাপ,
জিভ বেরিয়ে যাচ্ছে তবু ছাড়চেনাকো চাপ।
ছেলের বাপের বামুন কায়েত নেই দেশেরে ভাই,
কায়দা পেলেই চোকায় ছুরি সব যেন কসাই ;
পরদাকাটা দুই চোখে নেই দয়া মায়ার ছাপ।
কলসী-ভাঙা চাড়ার মতো হায়রে মেয়ে সস্তা !
পার করতে বাঁধতে হবে মাজায় টাকার বস্তা ;—
মেয়ের জন্ম হয় এদেশে করলে কতই পাপ।

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক

মহেন্দ্র

শুন্‌লে তো? ক্ষেপে উঠেছিলুম কি সাধে? এদের আবার তুমি চাল এনে দিচ্ছিলে। (ব্যাগ থেকে টাকা বের ক'রে বোষ্টম বোষ্টমীর হাতে দিলেন।)

(বোষ্টম বোষ্টমী অবাক্ হ'য়ে পরস্পরের দিকে চাইলে।)

বোষ্টম

গৌর নিতাই বাবাকে সুখে রাখুন।

বোষ্টমী

বাবার মেয়েটি যেন রাজার ঘরে পড়ে—রাধে কৃষ্ণ!

(প্রস্থানোদ্যত)

মহেন্দ্র

শোন, রাধে কৃষ্ণ, শোন। এ গান যেন ঐ দালান-আলা বাড়ীতে গেয়োনা—সে যে-সে নিবারণ নয়—টাকা কেড়ে নিয়ে মেরে তাড়াবে।

বোষ্টম

আজ্ঞে কেন পেরভু?

বোষ্টমী

আ মর বোরেগী—এ ও বুঝিস্ না? সে হচ্চে ছেলের বাপ।—(মহেন্দ্রের প্রতি) না বাবা, সেখানে এর পাল্টা গীতটি গাইবো। রাধে কৃষ্ণ!

(বোষ্টম বোষ্টমীর প্রস্থান)

সরযূ

তাই চাল আনতে দাওনি।—যাক্ তা হ'লে টাকাও কিছু পেয়েছ।

মহেন্দ্র

ছাই পেয়েছি। নৈলে আর ক্ষেপে উঠেছিলুম।—যাক্, যা বল্‌ছিলুম—ক্ষেপে না উঠে—নাঃ সে আর তুমি না-ই শুন্‌লে—মোদ্দা হ'য়ে গেল এক ভৈরবীর সঙ্গে দেখা—তিনিই দিলেন এই চস্‌মা।

সরযূ

তা ও প'রে মানুষ খোঁজনি?

মহেন্দ্র

খুঁজিনি আবার? পথের দুপাশ্‌ড়ি খুঁজেছি। সিগারেটের ধোঁয়া উড়িয়ে কলেজের ছেলে যাচ্ছে—বাঁদর; ফোঁটা টিকী চড়িয়ে ভট্‌চায্যি যাচ্ছেন—কুকুর; জুড়ী হাঁকিয়ে বাবু যাচ্ছেন—পাঁটা। অত কি আদালতে গিয়ে দেখি হাকিম ব'সে আছেন লম্বকর্ণ, উকীল দাঁড়িয়ে আছেন হোক্কা হুয়া, মক্কেল দাঁড়িয়ে আছেন হিঁদুর অখাদ্য। কেউ কেউ আবার দুতিনটে জানোয়ার মেশানো। লাল দীঘিতে একজন বক্তৃতা দিচ্ছিলেন, তাঁর মুখটা হচ্ছে সিংহের, বুকটা খরগোসের, পিঠটা কচ্ছপের আর পা দুটো রেসের ঘোঁড়ার।

সরযূ

একটিও মানুষ পেলে না?

মহেন্দ্র

পেয়েছিলুম মাত্র একটি—হরিণ বাড়ীর জেলের সামনে। হাতে হাতকড়ি, জাঙ্গিয়াপরা।

সরযূ

চোর বুঝি?

মহেন্দ্র

তাই ব'লেই জেলে ঢুকিয়েচে। আগে আগে যাচ্ছেন জেলার—পিছনে যাচ্ছে সে, দুদিকে দুজন পাহারা। দিলুম চোখে চস্‌মা—ও বাবা! জেলারও জন্তু, পাহারালাও জন্তু—মানুষ শুধু সেই। গেলুম কাছে এগিয়ে—কথা কি বলতে দেয়? অনেক সাধ্য সাধনার শেষে দিলে—তখন চোর কি বল্লে জানো?

সরযূ

আমি কি তোমার সঙ্গে ছিলুম নাকি?

মহেন্দ্র

বল্লে 'তাই তো ঠাকুর আমি যে এখন কয়েদী—আচ্ছা এই চিঠি নিয়ে যাও আমার স্ত্রীর কাছে।' চেয়ে নিলে একটু কাগজ পেনসিল, দিলে দু লাইন লিখে। গেলুম তাই নিয়ে তার বাড়ীতে—আহা! আর একটি মানুষ দেখলুম, মানুষ ত নয়—দেবী। কিছু নেই তিন খানি গয়না ছাড়া—তিন খানিই খুলে দিলে। বল্লে 'ভেবেছিলুম এই দিয়ে আপীল করবো—তা তিনি যখন বলেচেন, নিন্।'

সরযূ

নিলে?

মহেন্দ্র

পাগল! ফিরিয়ে দিয়ে দে দৌড়।

সরযূ

তা হ'লে আর একজন মানুষ খোঁজ।

মহেন্দ্র

কাজেই।—(একটু চিন্তার পর) আচ্ছা কেন? হয়েচে—আমি এম্নিই মেয়ের বিয়ে দোব।

সরযূ

এম্নি! না, না,—একটা তেজপক্ষের ঘাটের মড়ার সঙ্গে তো?

মহেন্দ্র

না গিন্নী, না। নিবারণের ছেলের সঙ্গেই।

সরযূ

সে কখনো খালি হাতে নেয়?

মহেন্দ্র

তার বাবা নেবে। এর নাম মৎলব। বুঝলে না? গাঁয়ে ঢুকতেই তো নিবারণের বাড়ী—দেখি নিবারণ আর তার বউ উঠোনে দাঁড়িয়ে। দিলুম চস্‌মা চোখে—যা ভেবেছি, নিবারণ বাঘ, বউ সাপ।

সরযূ

বলো কি—নিবারণ বাবু বাঘ!

মহেন্দ্র

নিশ্চয়। নৈলে আর হুমকি দেয়, ওৎ পাতে, ঘাড় ভাঙ্গে?

সরযূ

আর মোক্ষদা সাপ!

মহেন্দ্র

নৈলে অমন বিষে ভরা?

সরযূ

আর ল্যাজেও খেলে।

মহেন্দ্র

এ্যাই—এ্যাই—এখন বুঝলে তো? ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চাইচো কি? আরে, আজকে যাবো আমি নিবারণের কাছে, কালকে যাবে তুমি মোক্ষদার কাছে। এবার বুঝ্‌চো?

সরযূ

একটু একটু।

মহেন্দ্র

(চার দিক চেয়ে) মলিনা নেই তো?—আচ্ছা ঘরে চলো, পূরো পূরি বুঝিয়ে দিচ্চি।

তৃতীয় দৃশ্য

বৈঠকখানা ঘর। নিবারণ টেবিলের উপর খাতা রেখে কি যেন লিখ্‌চেন।

নিবারণ

বাবা, চালাকি নয়। গাঁ সুদ্ধ এই মুঠোর মধ্যে—হয় খাজনা, নয় কর্জ্জ, নয় দাদন (খাতা মুড়ে) এক মহেন্দ্র? তা মেয়েটি নিলে সেও কেঁচো।

(মোক্ষদার প্রবেশ)

মোক্ষদা

বলি শুন্‌চো, মহেন্দ্র যে গাঁয়ে ফিরে এসেচে।

নিবারণ

কে বল্লে?

মোক্ষদা

কে বল্লে! আমি তোমার মত নাকে তেল দিয়ে ঘুমোই কিনা। ঝি রেখেছি কি সুধু ঘরের কাজের জন্যে?

নিবারণ

তা ভালই তো।

মোক্ষদা

ভালই তো! ভাল মন্দ সব বোঝ কিনা। নিশ্চয় টাকার জোগাড় ক'রে এসেচে।

নিবারণ

সেই ত চাই।

মোক্ষদা

ওমা! তুমি তার মেয়ের সঙ্গেই বিজুর বিয়ে দেবে নাকি?

নিবারণ

টাকা পেলেই দোব।

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক

মোক্ষদা

আহাহা—যেন কত টাকাই পাবেন। হাজার বৈ ত নয়। আমার অমন সোনার চাঁদ ছেলেকে হাজার টাকায় ছাড়বে?

নিবারণ

সাধে ছাড়চি—তোমার সোনার চাঁদ যে রূপোর চাঁদের মর্ম্ম বোঝেন না। কলকাতায় ব'সে আমার টাকায় পড়চেন —আর আমাকেই লিখচেন পণ না নেওয়া হয়। এ যা নিচ্চি তাঁকে লুকিয়ে।

মোক্ষদা

তা লুকিয়েই আর কিছু নাও না।

নিবারণ

বেশী নিলে কি আর লুকোনো থাক্‌বে?

মোক্ষদা

থাক্‌বে, থাক্‌বে—তুমি মহেন্দ্রকেই আর একটু চাপ দাও।

নিবারণ

দোব? নাঃ, আর চাপ দিলে ভেঙ্গেও যেতে পারে।

মোক্ষদা

কেন ভেঙ্গে যাবে? যে হাজার দিতে পারে সে দেড় হাজার দিতে পারে না?

নিবারণ

কথা পাল্‌টাই কি ক'রে?

মোক্ষদা

আহা, যেন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির!

নিবারণ

দেখো, যুধিষ্ঠির ফুধিষ্ঠির আমায় বোল না। আমি ভীম। আমি রাগ্‌লে লোক কাঁপে। আমি দয়ামায়ার ধার ধারি না।

মোক্ষদা

আবার রাগ! যা খুসী তাই করো। আমার কথা না শুন্‌লে কানে—মোণ্ডার পাক ম'রে আসবে।

নিবারণ

এঁ্যা! তুমি স্ত্রী হ'য়ে গালাগালি দিচ্চো?

মোক্ষদা

কোথায় গালাগালি দিলুম? বুদ্ধির ঢেঁকি!

নিবারণ

এই তো গালাগালি দিচ্চো! আমার বুদ্ধি নেই তো আছে কার?

মোক্ষদা

আমার। আমার বুদ্ধি নিলে এই একতালার উপর এ্যাদ্দিন তেতলা উঠ্‌তো।

নিবারণ

ও তেতলা একতলা সমান। দালান কোঠা তো। গাঁয়ের মধ্যে কেউ দিয়েচে?

মোক্ষদা

গাঁয়ের মধ্যে না দিক্—পাশের গাঁয়ে দিচ্চে। সে তোমারি গোমস্তা ছিল। সেদিন গাঙ্গে নাইতে গিয়ে দেখি ছাদ পিট্‌চে—মনে হ'ল ছাদ তো পিট্‌চে না, আমার বুক পিট্‌চে।

(চোখে আঁচল দিলেন)

নিবারণ

আরে আরে কাঁদো কেন? কেশব তো? তাকে আমি দেখে নিচ্চি। গিন্নী, ও গিন্নী!—কি মুস্কিল! তার ঐ বাড়ী যদি না ক্রোক ক'রে নিলাম করিয়ে ছাড়ি—

মোক্ষদা

থাক্ থাক্, দরদ দেখেছি। নিলেম করাবেন! কেন? আমার কথার দাম কি? আমার কথার যদি দাম থাক্‌তো, মহেন্দ্রকে আর একটু চাপ দিতে। দেবে কেন? আমি যে পর।

(চোখে আঁচল দিলেন)

নিবারণ

আরে আরে—ও গিন্নী!—তাই হবে—দোব আর একটু চাপ—

(মোক্ষদার হাত ধরলেন)

মহেন্দ্র (নেপথ্যে)

নিবারণ দা, বাড়ী আছো? নিবারণ দা!

নিবারণ

(মোক্ষদার প্রতি) মহেন্দ্র! (চেঁচিয়ে) কে, মহেন্দ্র? এসো। (মোক্ষদার প্রতি) যাও, যাও।

মোক্ষদা

মনে থাকে যেন।

(মোক্ষদার প্রস্থান ও মহেন্দ্রের প্রবেশ)

নিবারণ

তারপর, ব্যাপার কি তোমার ? সেই ব'লে গেলে টাকার জোগাড় করচি, আর একমাসের মধ্যে দেখা নেই ! হয়েচে জোগাড় ?

মহেন্দ্র

হাঁা—তা একরকম—

নিবারণ

একরকম কি রকম ? জানো, তোমার ভরসায় আমি অনেক ভালো সম্বন্ধ হাতছাড়া করেছি—

মহেন্দ্র

জানি আর কৈ ? জানলুম, কিন্তু—

নিবারণ

তোমার কিন্তু পরে হবে, আগে আমার কিন্তু শোন। ও হাজার টাকায় হবে না, আরো পাঁচশো চাই—কেননা যে ধাড়ী মেয়ে, লোকে নিন্দে করচে। বোঝ; পার্বে ? আর না পারো ত আমি অন্য জায়গায়—

মহেন্দ্র

তুমি দাদা, অন্য জায়গাতেই দেখো।

নিবারণ

কেন কি হলো ? একের উপর আধ বৈ ত নয়। এর চেয়ে সস্তা আর কোথাও পাবে ?

মহেন্দ্র

না, সে জন্যেত নয়—একও যা আধও তাই—গুরুর কৃপায় সে এক রকম পারতুম, কিন্তু—

নিবারণ

আবার কিন্তু কি ?

মহেন্দ্র

আছে একটু কিন্তু, যদি অভয় দেও তো বলি।

নিবারণ

আঃ ! কি ছেলেমানষী—বলো।

মহেন্দ্র

লোকে শাশুড়ী দেখেই মেয়ে দেয়—তা তিনিই যখন—

নিবারণ

কি তিনি ?

মহেন্দ্র

মানুষ ন'ন, সাপ—

নিবারণ

সাপ ! তুমি এত বড় কথা বলো ?

মহেন্দ্র

আমি কেন বল্‌বো ? আমি কি জানি ? আমার গুরুদেব বলেচেন।

নিবারণ

তোমার গুরুদেবের আমি ভুরু চেটে খাই।

মহেন্দ্র

ছি ছি দাদা, ওকথা বোল না, তিনি মহাপুরুষ, সিদ্ধ।

নিবারণ

সিদ্ধ ! তাকে ভাজবো।

মহেন্দ্র

জানি তুমি রাগবে।

নিবারণ

রাগবো না ? বুজরুকীর আর জায়গা পাওনি ?

মহেন্দ্র

কি বল্লে দাদা, বুজরুকি ? এই কথাটি তাঁর মুখ দিয়েও বেরিয়েছিল। বল্লেন—"কি রে ব্যাটা, বুজরুকি ভাবছিস ? আচ্ছা নিয়ে যা এই চস্‌মা—এই দিয়ে দেখ্‌লেই বুঝবি"।

নিবারণ

চস্‌মা ! কিসের চস্‌মা ?—দেখি।

(মহেন্দ্র চস্‌মা বের ক'রে নিবারণের হাতে দিলেন)

নিবারণ

হাঃ, একখানা লোহার বাঁটের চস্‌মা, আর বলে কিনা আমার স্ত্রী সাপ। এ চস্‌মা যদি না গুঁড়ো করি—

(আছাড় মেরে চশমা গুঁড়ো করতে গেলেন)

মহেন্দ্র

করো কি করো কি দাদা !—গুঁড়ো করলে যে আর দেখতে পাবে না।

চন্দ্রমা

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক

নিবারণ

বটে ? আচ্ছা দেখ্‌চি। ওগো একবার এইদিকে এস তো। তারপর একে তো গুঁড়ো করবোই—তোমার গুরুকে সুদ্ধ—

মহেন্দ্র

আমি তা হ'লে একটু বাইরে যাই।

নিবারণ

না, না, তোমার সামনেই আসুন্—তুমিও দেখো। সাপ! ও গো আস্‌চো ? এখানে শুধু মহেন্দ্র আছে।

(লম্বা ঘোমটা দিয়ে মোক্ষদার প্রবেশ। নিবারণ চোখে চসমা দিয়েই ভয়ার্ত্ত মুখভঙ্গীর সঙ্গে পিছনে হেলে পড়লেন। তাড়াতাড়ি চসমা খুলে কম্পিত স্বরে)

যাও—যাও।

(মোক্ষদার প্রস্থান)

মহেন্দ্র

(নিবারণের হাত থেকে চসমা নিয়ে) কি দেখ্‌লে ? আমি দেখলুম না যে।

নিবারণ

আর দেখতে হবে না। ওরে বাপ্‌রে।

মহেন্দ্র

তা হ'লে সাপই ?

নিবারণ

নয়তো কি মানুষ ? আস্ত কেউটে—এই ফণা তুলে দুলচে—ওরে ব্বাপ্‌রে।

মহেন্দ্র

এঃ, কেনই দেখালুম ? না জান্‌তে সে ছিল ভাল।

নিবারণ

ওরে ব্বাপ্‌রে, সে কি কথা ? এখন তবু সাবধান হ'তে পার্‌বো। চোখে না দেখ্‌লে বুঝতুম কিসে ?

মহেন্দ্র

আচ্ছা দাদা, এখন আসি—

নিবারণ

আসবে ? তাইতো মহেন্দ্র, এখন উপায় ?

মহেন্দ্র

দেখ্‌তে পারি গুরুদেবকে ব'লে, যদি কোন ক্রিয়া টিয়া ক'রে মানুষ ক'রে দিতে পারেন।

নিবারণ

(মহেন্দ্রের হাত ধ'রে) দেখো ভাই দেখো, সিদ্ধ পুরুষ তো। একটু হাতে পায়ে ধ'রে, বুঝলে কিনা—

মহেন্দ্র

সে আমায় বলতে হবে না, আসি।

(মহেন্দ্রের প্রস্থান)

নিবারণ

একটি ছোবল মারলেই তো গেছি। কি ভাগ্যি, এতদিন ছেড়ে কথা কইচে। জান্‌তে দেওয়া হবে না। যদি বুঝতে পারে আমি টের পেয়েছি—সেই রাত্রেই—(জান্‌লা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে) ঐ একটা সাপুড়ে মাগী যাচ্ছে না ? এই মাল-বৌ—এই!

(হাতছানি দিয়ে ডাকলেন)

ওরা ত সাপ নিয়ে ঘর করে। এখন এই সব চেষ্টাই করতে হবে।

(মাথায় তিন চারটে ঝাঁপি নিয়ে সাপুড়েনীর প্রবেশ)

সাপুড়েনী

খেলা দেখবে বাপু ? তাজা সাপ আছে।

নিবারণ

আর তাজা—যে তাজা দেখেছি!

সাপুড়েনী

কি দেখেচো বাবু—এমন কখনো দেখোনি—

গান

ওমা—মাগো!
ঝাঁপির মধ্যে কেউটা গোখুর
ফোঁপায় সারাদিন,
একটি টোকা দিলে পরেই
ছোবল মারে তিন।
ওমা—মাগো!
ভুঁই ছুঁয়ে রয় ডগটি লেজের
হাওয়ায় দোলে গা,
ঢাকনি খুলেই মুখের পরে
খেলাই সরাটা
ওমা—মাগো!

শ্যাতার মতো সানকী সাপের
দুই মুখে যে বিষ,
রাজসাপে দেয় থেকে থেকে
বড়ই মিঠে শিস।
ওমা—মাগো!
সবুজ সরু লাউডগা সাপ
দেখ্‌লে ভোলে লোক,
বেত-আঁচড়া লাফিয়ে পড়ে
খুবলে নে যায় চোপ।
ওমা—মাগো!
চামনা সাপের ঢং কে বোঝে?
ঘরবুনী ঘর ঘর,
আরালবাঁকার বাঁকুনিতে
গা কাঁপে থর থর।
ওমা—মাগো!
ঝিম বিবেতে পচিয়ে মারে
চিতি আর বোড়া,
বিষ হারিয়ে কেবল জলে
নেবেছে ঢোঁড়া।
ওমা—মাগো!

এইবার বের করি?

(ঝাঁপি খুলতে গেল)

নিবারণ

থাক্ থাক্—আর বের করতে হবে না—তুই সাপের ওষুধ জানিস্?

সাপুড়েনী

জানি বৈকি বাবু—নৈলে সাপ খেলাতে পারি?—কি সাপের ওষুধ?

নিবারণ

কেউটে সাপ—

সাপুড়েনী

কত বড় কেউটে?

নিবারণ

খুব বড়—ঐ ত্যাখ—ঐ ঘুরে বেড়াচ্চে।

সাপুড়েনী

ও ত মানুষ বাবু।

নিবারণ

চুপ—চুপ—ঐ সাপ।

সাপুড়েনী

ওই সাপ! ও সাপ নয় বাবু, নাগিনী—ওরে বাপ্‌রে ওর ওষুধ নেই।

(তাড়াতাড়ি ঝাঁপি নিয়ে প্রস্থান)

নিবারণ

বলে কি? ওষুধ নেই—কি ভয়ঙ্কর!

(মোক্ষদার প্রবেশ)

মোক্ষদা

মহেন্দ্র চ'লে গেছে?

নিবারণ

(পিছিয়ে গিয়ে) আস্তিকস্য মুনের্মাতা—

মোক্ষদা

(এগিয়ে গিয়ে) আমি আরো ভাবছি সে রয়েচে—নৈলে সাপুড়ের গান শুন্‌তে আসি না?

নিবারণ

ও বাব্বা! (পিছিয়ে গিয়ে) ভগ্নি বাসুকেস্তথা।

মোক্ষদা

(এগিয়ে গিয়ে) তা তার সামনে আমাকে ডেকেছিলে কেন?

নিবারণ

(পিছিয়ে গিয়ে) জরৎকারু মুনেঃ পত্নী।

মোক্ষদা

(এগিয়ে গিয়ে) কি বিড় বিড় করচো?—খুলে বলো না।

নিবারণ

(পিছিয়ে গিয়ে) মনসা দেবী নমোঽস্তুতে।

মোক্ষদা

বা রে, কেবলই যে পিছিয়ে যাচ্ছ!

নিবারণ

গিন্নী, দোহাই তোমার—কত সময় কত বকেছি—আমার উপর যেন রাগ টাগ রেখোনা।

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক

মোক্ষদা

এ আবার কি ঢং! বলি মহেন্দ্র কি বল্লে?

নিবারণ

মহেন্দ্র? কি বল্লে?

মোক্ষদা

হ্যাঁ, হ্যাঁ—দেবে দেড় হাজার?

নিবারণ

বল্লে—চেষ্টা ক'রে দেখ্‌বো।

মোক্ষদা

আর কবে দেখবে?—একটা হেস্ত নেস্ত ক'রে নিতে হয়।

নিবারণ

হেস্ত নেস্ত! হ্যাঁ, একটা করতেই হবে।

মোক্ষদা

নাঃ, তুমি মোটেই কান দিচ্চোনা। কি ভাব্‌চো?—আচ্ছা, এখন জল খাবে এসো।

নিবারণ

জল খাবো! জলই খাবো। আমার ক্ষিদে নেই মোটেই।

মোক্ষদা

এ কথা আগে বলনি কেন, লুচি ভাজবার আগে?

নিবারণ

তখন তো ক্ষিদে ছিল।

মোক্ষদা

তখন ছিল আর এখন নেই! আমায় রাগিওনা বল্‌চি—এসো।

নিবারণ

না, না, রাগাবো কেন? যাচ্ছি।

৪র্থ দৃশ্য

(বাঁশঝাড়-ঘেরা পুকুর। পুকুরের সিঁড়িতে কলসী রেখে মলিনা উপবিষ্ট)

মলিনা

যখন গা ধুতে আসি তখনই একটু জুড়োই। ঘরে থাক্‌লে দম বন্ধ হ'য়ে আসে। উঃ, বাপ মাকে কষ্ট দেবার জন্যেই আমি জন্মেছিলুম।

কেন? নাই বা হলো আমার বিয়ে। ঐ যে বাঁশগুলো হাওয়ায় দুল্‌চে—কেমন সুখী ওরা—মা'র কোলে বড় হচ্ছে, সকলের সঙ্গে সকলের জড়াজড়ি! কেউ তো এক ঝাড়ের একটাকে তুলে নিয়ে আর এক ঝাড়ে পোঁতে না—আর ঐ যে হলদে পাখীটা ডালে ডালে উড়ে বেড়াচ্চে ওই বা কতই সুখী—ওদের মধ্যেও বিয়ে নেই, ওরাও বাপমাকে কাঁদায় না।

গান

চায় শুধু মন
একেলা কাঁদিব আমি সবার কাদন।
বাতাসে কাঁদিব আমি বাঁশের শাখায়
করি হায় হায়,
ঘন বরষায়
দীঘিজলে আঁখিজল করিব মোচন।
ফিরিব ঘুঘুর সুরে কেঁদে ফুলে ফুলে
আকাশের কূলে,
আর প্রাণ খুলে
ছড়াবো চাতক-ডাকে আকুল বেদন।

সকলের কান্না কেড়ে নিয়ে নিজে কাঁদতে পারতুম! আর নয়, সকলে হাসুক, আমিও হাসি—যেমন দিন হাসলে ফুল হাসে, খোকা হাসলে মা হাসে। সে কি ক'রে হয়? কে আমার মা বাপকে হাসাতে পারে? স্বামী, স্বামী, তুমি আমার আছো? যদি থাকো—শুনেছি তোমার চেয়ে কেউ ভালবাসতে পারে না—এসো, শীগ্‌গির এসে আমায় নাও—আমার মা বাপের মুখে হাসি ফুটুক্—আর যদি দেরী করো, নিশ্চয় আমায় পাবেনা—এই দীঘির কালো জলেই—

(চোখে আঁচল দিলে)

৫ম দৃশ্য

অন্তঃপুরের বারান্দা। বারান্দার সঙ্গে ঠাকুর-ঘর সংলগ্ন

মোক্ষদার প্রবেশ

মোক্ষদা

সকাল থেকে মাগীর দেখাই নেই—সগড়ী বাসন উঠোনে গড়াগড়ি দিচ্ছে—কাকে ডওয়া ডোম্নি করচে—ছড়া-ঝাঁট

পর্য্যন্ত পড়লো না—হতভাগী গেল কোথায়? ওরে, ও মুক্তো!

নেপথ্যে

যাই গো মা, যাই—

মোক্ষদা

হিজলতলায় যাও!

(মুক্তকেশীর প্রবেশ)

বলি হ্যাঁরে মুক্তো, চেঁচিয়ে গলা ফাটাচ্চি, তুই কোন্ চুলোয় ছিলি?

মুক্তকেশী

(হেসে) ও বাড়ীর পরাণেকে দিয়ে কানের খোল দেখাচ্ছিলুম—

মোক্ষদা

মরণ আর কি! খোল দেখাচ্ছিলেন।—ঘরের কন্না করবে কে?

মুক্তকেশী

(হেসে) এই তো করতে যাই।

(প্রস্থানোদ্যত)

মোক্ষদা

আর হ্যাঁ লা, কাল কর্ত্তার বিছানা নিয়ে সদর ঘরে পেড়েছিলি কেন?

মুক্তকেশী

(হেসে) আমি কি করবো? বাবু যে বলেছিলো।

মোক্ষদা

বলেছিলো! আমাকে জানাস নি কেন লা?

(ফুলের সাজি ও একছড়া কলা নিয়ে নিবারণের প্রবেশ)

নিবারণ

(থমকে দাঁড়িয়ে) কে, গিন্নী! আমি এই পুজোর ঘরে যাচ্ছি।

মোক্ষদা

কেন, পুজোর ঘরে আবার কি? সাতজন্মে ত ও পাঠ নেই।

নিবারণ

এ্যাঁ—না, আমি নয়। ভট্‌চায্যি এসে একটা পুজো করবেন।

মোক্ষদা

হঠাৎ আবার কিসের পুজো? আর পুজো ত করাচ্চো, কাল বাইরের ঘরে শোওয়া হয়েছিল কেন?

নিবারণ

কাল ওর নাম কি—তোমার ঘরে যে ছারপোকা—

মোক্ষদা

তা বল্লেই ত হতো। চৌকি বের ক'রে দিয়ে মেঝেয় বিছানা ক'রে দিতুম। যা মুক্তো, বিছানাগুলো ঘরে নিয়ে আয়।

(মুক্তকেশীর প্রস্থান)

ছি, ছি—খেয়ে দেয়ে ঘরে ঢুকে দেখি মানুষও নেই বিছানাও নেই, আর আমি যে সদর ঘরে যাবো তার পথটি রাখোনি—চারিদিক এঁটে সেঁটে বন্ধ করেছ। কি হয়েচে তোমার। নরদামা পর্য্যন্ত কাদা দিয়ে বুজিয়েছিলে?

নিবারণ

(স্বগত) ও বাবা! তা হ'লে নরদামাও খুঁজেছিল। তবে ত কাল ঠিক দফা সারতো।

মোক্ষদা

কি গো, চুপ ক'রে রইলে যে? বলি মুখ দিয়ে কথা বেরোয় না কেন?

(পুরোহিতের প্রবেশ)

পুরোহিত

এই যে কর্‌তা গিন্নী দুজনাই আছেন। তারপর কি পুজার সংকল্প করচেন?

নিবারণ

শুনুন না এই দিকে—

পুরোহিত

বলেন, বলেন, আমার বধিরতা সম্প্রতি কম।

নিবারণ

(স্বগত) ইসারাও বোঝে না—

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক

মোক্ষদা

বল না গো, কিসের পুজো করাবে।

নিবারণ

কিসের? এই ওর নাম কি—সেদিন স্বপ্ন দেখেছিলুম কিনা—যেন বিষহরীর অর্থাৎ কিনা মনসাদেবীর পুজো করচি—তাই – তাই—

মোক্ষদা

মন্‌সার পুজো! তা মনসা একটা ফেল্‌না দেবী নাকি? তা ক'রে পুজো করলেই হল?

নিবারণ

(স্বগত) ও বাব্বা! ফোঁস ক'রে উঠেচে। মন্‌সার চেলা না হ'য়ে যায় না।

মোক্ষদা

দাও, দাও—পুজোর জো আমিই ক'রে দিচ্চি

(নিবারণের হাত থেকে সাজি ও কলা নিতে গেলেন)

নিবারণ

(সভয়ে স'রে দাঁড়িয়ে) তুমি আর কেন ছোঁয়ান্যাঠা—তুমি আর কেন কষ্ট করবে?

পুরোহিত

থ্যান্ থ্যান্, আমিই কইর‍্যা লচ্ছি।

(নিবারণ কম্পিত হাতে সাজি ও কলা পুরোহিতের হাতে দিয়ে প্রস্থানোদ্যত)

মোক্ষদা

(নিবারণের প্রতি) শোন, একটা কথা আছে।

নিবারণ

বল না।

মোক্ষদা

এইদিকে এসো না, কানে কানে বলি।

নিবারণ

(স্বগত) আস্তিকস্য মুনের্মাতা।

মোক্ষদা

এসোনা। আমি কি সাপ, যে ছোবল মারব?

নিবারণ

(স্বগত) ও বাব্বা। ভগ্নী বাসুকেস্তথা—

মোক্ষদা

তবে যাও—আর শুনে কাজ নেই। কি যে তোমার হয়েচে জানি নে!

পুরোহিত

এই নি পূজার ঘর?

মোক্ষদা

হ্যাঁ হ্যাঁ, ভিতরে যান্।

পুরোহিত

একটু পা ধুইবার জল-

মোক্ষদা

ওই যে ঘটিতেই আছে—কি, দাঁড়ান্ আমি দিচ্চি।

(পুরোহিতের কাছে গিয়ে ঘটির জল পায়ে ঢেলে দিলেন—পরে পুরোহিতের পিছনে পিছনে ঠাকুর ঘরে ঢুকলেন)

নিবারণ

কাছে যেতেও গা কাঁপে, আবার কাছে না গেলেও চটে। কি যে করি!

(নিবারণের প্রস্থান। মোক্ষদা ঠাকুর ঘর হ'তে বেরিয়ে এলেন)

মোক্ষদা

নিজে আসন পেতেছে। নিজে চন্দন ঘষেচে। নিজে নৈবিদ্যি সাজিয়েছে। আমাকে বলেও নি—পাছে আমার কষ্ট হয়। তায় ভালো, কেবল হঠাৎ যেন একটু কেমন কেমন হয়ে উঠেছে।

(সরযূর প্রবেশ)

কি গো সরযূ যে, কি মনে ক'রে? বড়লোক ব'লে তো গরীবের বাড়ী মাড়াও না।

সরযূ

একটা কথা বল্‌তে এলুম—

মোক্ষদা

কি কথা?

সরযূ

কিছু মনে না কর তো বলি।

মোক্ষদা

বলো, বলো, আর ভণিতের কাজ নেই।

সরযূ

বড়ই ইচ্ছে ছিল তোমার সঙ্গে বেয়ান পাতাই—তা ভগবান হ'তে দিলেন না।

(বাটি হাতে মুক্তকেশীর প্রবেশ)

মুক্তকেশী

মা, কইগো মা!

মোক্ষদা

কি লা?

মুক্তকেশী

ধরো ধরো, বড্ড তপ্ত—

(মোক্ষদার হাতে বাটি দিলে)

মোক্ষদা

দুধ কলা! যা ঐ ঘরে দিয়ে আয়।

মুক্তকেশী

ঘরে দোব কেন? আপনি খাবে যে।

মোক্ষদা

আমি খাবো!

(সরযূ মুখ ফিরিয়ে হাসতে লাগলেন)

মুক্তকেশী

হ্যাঁ গো হাঁ—বাবু বলেচে।

মোক্ষদা

বাবু কি ক্ষেপেচে নাকি?

(নিবারণের প্রবেশ। সরযূ ঘোমটা টেনে ঠাকুরঘরে ঢুকে পড়লেন)

নিবারণ

খাও, খাও, ওতে তোমার উপকার হবে।

মোক্ষদা

কেন, আমার হয়েচে কি?

নিবারণ

হয়নি কিছু, তবে খেতে ভালবাসো কিনা,—

মোক্ষদা

ভালবাসি!

নিবারণ

অর্থাৎ কিনা—ওর নাম কি—খেলে মেজাজ ঠাণ্ডা থাকবে।

মোক্ষদা

যাও, যাও—আদিখ্যেতা। একটা কথা বলতে গেলুম, শোনা হলনা—মেজাজ ঠাণ্ডা থাকবে!

(সজোরে দুধের বাটি নিবারণের দিকে সরিয়ে দিলেন)

নিবারণ

দোহাই গিন্নী রেগোনা—এখন না খাও, একটু পরে খেয়ো—মোদ্দা একটা কথা বলচি কি—

মোক্ষদা

আঃ, বলোনা কি বলবে—কেউ দেখা করতে এলেই যত কথা।

নিবারণ

বলচি কি, তুমি মাঝে মাঝে নখ কামড়াও না?

মোক্ষদা

কামড়াই তো।—কি হয়েচে?

নিবারণ

কামড়াতে ইচ্ছে করে বুঝি?

মোক্ষদা

করে—করে। নখ তো ভাল, তোমার ব্যাভারে গা কামড়াতে ইচ্ছে করে।

নিবারণ

(স্বগত) ও বাব্বা! কার গা? (প্রকাশ্যে) দেখো, ডাক্তারী বইতে লিখচে ও একটা রোগ।

মোক্ষদা

রোগ না আরো কিছু—ও আমার স্বভাব।

নিবারণ

(স্বগত) স্বভাব!—ঠিক বলেচে (প্রকাশ্যে) তাও স্বভাব সেরে যায় যদি একটা কাজ করতে দাও। (পকেট থেকে সাঁড়াশী বের ক'রে) তুমি চোখ বুজে হাঁ ক'রে থাকো।

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক

আমি চট্ ক'রে তোমার বিষদাঁত,অর্থাৎ কিনা কুকুরে দাঁত দুটো টেনে তুলি—অর্থাৎ কিনা মুক্তোকে দিয়ে টেনে তোলাই।

মোক্ষদা

ওমা, সে কি কথা! কাঁচা দাঁত ওপড়াবে কি?

নিবারণ

তুমি টেরও পাবে না।

মোক্ষদা

যাও, যাও, আর রঙ্গ করতে হবে না। এর উত্তর রাত্রে দোব।

নিবারণ

এই সেরেচে!

(দ্রুতপদে প্রস্থান)

মোক্ষদা

এস গো সরযূ, এসো।

(সরযূ ঠাকুরঘর থেকে বেরিয়ে মোক্ষদার কাছে এসে বসলেন) হাঁ কি বল্‌ছিলে? দেড় হাজার দিতে পারবে না?

সরযূ

না, না, তা বলবো কেন? গুরুর কৃপায় তা এক রকম পারতুম, কিন্তু জেনে শুনে বাঘ-শ্বশুরের ঘরে মেয়ে দিই কি ক'রে?

মোক্ষদা

বাঘ-শ্বশুর! পুরুষ মানুষ তো বাঘই হবে।

সরযূ

সে বাঘ নয় দিদি, সে বাঘ নয়, সত্যিকারের বাঘ।

মোক্ষদা

আ মর্ মুখপুড়ী, ছোটলোকের মেয়ে—বাড়ী বয়ে এসেচেন যা নয় তাই শোনাতে।

সরযূ

শোনাতে আসবো কেন দেখাতেই এসেছি। দেখে নোনা এই চস্‌মা পরে। কাল উনি এসে দেখে গেছেন।

(মোক্ষদাকে চস্‌মা দেখালেন)

মোক্ষদা

এঁ্যা, এ কিসের চস্‌মা?

সরযূ

কিসের কি জানি, গুরুদেব দিয়েছেন—সিদ্ধ পুরুষ তো। বল্লেন কার ঘরে মেয়ে দিচ্ছিস্? একদিন গপ্ ক'রে মেয়েটাকে গিলবে!

মোক্ষদা

ওমা, কি অনাসৃষ্টির কথা!

সরযূ

অনাসৃষ্টি কেন? এ তো সব্বাই জানে। সুঁদরবনের দু'চারটে বাঘ মানুষ হ'য়ে নেই? কেউ কি চিন্‌তে পারে?

মোক্ষদা

ওমা শুন্‌লেও গা কাঁপে—ন্যাখ্, এ সব ন্যাকরা করিস্ বাড়ীতে গিয়ে। স'রে পড়্ বল্‌চি।

সরযূ

বটে! আচ্ছা। তা হ'লে বাঘের সঙ্গেই ঘর করো।

(উঠে চল্লেন)

মোক্ষদা

ধোঁকা লাগিয়ে দিলে। হোক্ মিথ্যে, একবার দেখতে দোষ কি? ওলো ও সরযূ!

সরযূ

আবার কেন?

মোক্ষদা

দে, চস্‌মাখান্—দেখেই আসি।

সরযূ

হাঁ দেখতে গিয়ে একটা কাণ্ড বাধাও আর কি—যদি টের পান যে সন্দ করেছ—

মোক্ষদা

কি তা হ'লে?

সরযূ

তা হ'লে অমনি নিজমূর্ত্তি—

মোক্ষদা

দূর—দূর, কথার ছিরি দেখনা—যেন সত্যিই বাঘ—দে, না হয় লুকিয়েই দেখচি।

সরযূ

(মোক্ষদার হাতে চস্‌মা দিয়ে) তাই দেখো—ঐ আসচেন।

(নিবারণের প্রবেশ ; নিবারণ হন্ হন্ ক'রে ঠাকুরঘর পর্য্যন্ত গিয়ে দাঁড়ালেন)

নিবারণ

সব পেয়েচেন তো ?

পুরোহিত

হ, পাইচি—তিল, দুর্ব্বা, আতপ চাউল।

সরযূ

দেখো—দেখো—এই বেলা দেখো।

মোক্ষদা

(চোখে চস্‌মা দিয়ে)--ও—মা—গো !—(তাড়াতাড়ি চস্‌মা খুলে সরযূর হাতে দিয়ে বিস্ফারিতনেত্রে হাঁপাতে লাগলেন)

পুরোহিত

দুগ্ধ, কদলী, মনসাপত্র—আর কিছুর দরকার নাই। আপনি স্বচ্ছন্দে যাইবার পারেন।

নিবারণ

খুব ভালো ক'রে পূজো করুন।

(নিবারণের প্রস্থান)

মোক্ষদা

কি করি ?—ও সরযূ—সত্যিই যে—

সরযূ

এখন হয়েচে বিশ্বাস ?

মোক্ষদা

হবেনা আবার ? মাথাতো নয় যেন ধামাটা—চোখতো নয় যেন আগুনের ভাঁটা—গা-ময় একহাত ক'রে ডোরা—তাইতো কি করি ?

সরযূ

কি আর করবে ? দেখবো গুরুদেবকে ব'লে যদি শান্তি স্বস্ত্যেন ক'রে মানুষ ক'রে দিতে পারেন—

মোক্ষদা

(সরযূর পায়ে হাত দিয়ে) বোন,তোর পায়ে পড়ি—দেখিস্ ভাই—তাই দেখিস্—

সরযূ

সে আর বল্‌চো দিদি ; এ ত শুধু তোমার বিপদ নয়, গাঁয়ের বিপদ—আসি।

(সরযূর প্রস্থান)

মোক্ষদা

তাই কাল থেকে কেমন কেমন। বোধ হয় নিজমূর্ত্তি ধরতে আর দেরী নেই—ঠিক জিনিষটি না জুগিয়ে দিলেই--ওরে ও মুক্তো—!

(মুক্তকেশীর প্রবেশ)

কি গো মা, কি ?

মোক্ষদা

কাল মাংস এনেছিলি কোত্থেকে ?

মুক্তকেশী

কেন, ওপাড়া থেকে। ওপাড়ার ছেলেবাবুরা রোজ একটা ক'রে খাসী বলি ত্যায় কিনা।

মোক্ষদা

চেয়ে এনেছিলি বুঝি ?

মুক্তকেশী

ওমা চেয়ে আনবো কেন ? বাবু যে কিন্‌তে পাঠিয়েছিল।

মোক্ষদা

(স্বগত) কিনতে পাঠিয়েছিল ? আঁতের টান—মাংসের নাড়ী—(প্রকাশ্যে) হ্যাঁলা, আজও আনতে পারবি ?

মুক্তকেশী

পারবোনি কেন ? ভাগা দিয়ে বেচে যে। একটা খাসীর কি কম মাংস গা। কত নিজেরা খাবে ? বলতো রোজ আনতে পারি।

মোক্ষদা

রোজই আনিস্—আমি পয়সা দোব।

মুক্তকেশী

তা এখুনি দাও না—আমি বেলা না পড়তেই---

ঝরা ফুল

চৈত্র, ১৩৩৫

শিল্পী—শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষ
দস্তিদার

চসমা

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক

মোক্ষদা

দোব এখন। আগে এক কাজ কর। কর্ত্তার বিছানা কেন সদর ঘরে দিয়ে আয়—

মুক্তকেশী

ওমা, কেন গো!

মোক্ষদা

তোর সে খোঁজে দরকার কি? যা।

(মুক্তকেশীর প্রস্থান)

ও পুরুতঠাকুর, পূজোয় বসেচেন নাকি?

পুরোহিত

হ, বসচি তো।

মোক্ষদা

(পুরোহিতের কাছে গিয়ে) দেখুন, মনসাপূজো আর করতে হবে না।

পুরোহিত

করমু না!

মোক্ষদা

না, আপনি দক্ষিণরায়ের পূজো জানেন?

পুরোহিত

দক্ষিণরায়! সে কারে ক'ন?

মোক্ষদা

ওই যে বাঘের দেবতা—

পুরোহিত

অ— ব্যাঘ্রদেব—বুঝচি।

মোক্ষদা

জানেন তাঁর পূজো?

পুরোহিত

(হেসে) জানমুনা ক্যান? মোগার সব জানতি হয়।

মোক্ষদা

তবে দক্ষিণরায়ের পূজো করুন—আমি আসচি—আর কর্ত্তা যদি আসেন ত বল্‌বেন মন্‌সাপূজোই করচেন।

পুরোহিত

(হেসে) এই নি কথা? বুঝচি।

মোক্ষদা

(স্বগত) কাল রাত্রে রাঁধতে পারিনি—সাঁতলে রেখেছি —সেই আধকাঁচা মাংসই খানিকটা কাটিয়ে রাখি গে।

(প্রস্থান

পুরোহিত

তা হইলে দক্ষিণা দুইজনাই দিবেন। বালোইত। এক, পূজার মন্তর। তা ও মন্‌সারও য্যামন জানি, ব্যাঘ্রদেবেরও ত্যামন।

(নিবারণের প্রবেশ)

নিবারণ

করচেন পূজো?

পুরোহিত

অ কর্ত্তা! হ, করচি তো—'মনসা দেব্যৈ নমোনিত্যং সর্পদেব্যৈ নমো নমঃ গোক্ষুরাস্থাং ভয়ং নাস্তি সচক্রো ফণয়াম্বিতঃ'—দক্ষিণা আনেন, দক্ষিণান্তের বিলম্ব নাই।

নিবারণ

হ্যাঁ আন্‌চি।

(নিবারণ দ্রুতবেগে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন—এমন সময় মোক্ষদার দ্রুতবেগে প্রবেশ। দুজনের মাথায় ঠেকোঠুকি হ'য়ে গেল)

মোক্ষদা

(দু চার পা পিছিয়ে, স্বগত) মামা, সুঁদর বনের মামা!

নিবারণ

(দু চার হাত পিছিয়ে, স্বগত) আস্তিকস্য মুনের্মাতা—

মোক্ষদা

হঠাৎ লেগে গেছে, রাগ করো না।

নিবারণ

তুমি রাগ করো না।

মোক্ষদা

(স্বগত) গায়ের ঘেমো গন্ধ আজ শা'ল গন্ধের মত ঠেক্‌লো।

নিবারণ

(স্বগত) দাঁত বসেনি তো? মাথায় ছোবলালে আর রক্ষে আছে? (দূর দিয়ে পাশ কাটিয়ে) আমি আসচি।

(নিবারণের প্রস্থান)

মোক্ষদা

(পুরোহিতের কাছে গিয়ে) খুব মন দিয়ে পুজো করুন, খুব ভালো ক'রে।

পুরোহিত

অ, গিন্নীমা! হ, করচি তো।—বাঘায় নমঃ সুন্দরবনায় নমঃ—ওঁ হুম্ হালুম্ ফট্—ওঁ হলুদবর্ণায় কৃষ্ণডোরায় লম্বলেজায় নমঃ।—এইবার দক্ষিণা আনেন—দক্ষিণান্তের সময় হইচে।

মোক্ষদা

আনচি।

(মোক্ষদার প্রস্থান, অপর দিক দিয়ে নিবারণের প্রবেশ)

নিবারণ

এই নিন্ দক্ষিণা।

পুরোহিত

কর্ত্তা নাকি? ছ্যান—দক্ষিণা বাক্য হর্ত্তুকী দিয়াই সারচি—এখন প্রণাম করেন—

"ধ্যায়েন্নিত্যাং ফণেশং বিকটছিরিসুতং
আশুগঙ্গাঘটস্থং দন্তাকট্ট অলজ্জাং
বক্রাভাবে চলন্তং গর্ত্তাবাস করন্তং
ফোঁস ফোঁস গর্জ্জনায় লকলকজিহ্বায় নমঃ"

—ওঠেন, প্রসাদ লয়্যা যান।

নিবারণ

(প্রসাদ মুখে দিয়ে) কালও আসবেন—কালও পূজো করতে হবে।

পুরোহিত

আগামী কল্য? উত্তম। যখন ধরচেন, প্রত্যহই কর্ব্বেন।

(নিবারণের প্রস্থান; প্রবেশ অপর দিক দিয়ে মোক্ষদা)

মোক্ষদা

দক্ষিণা এনেছি।

পুরোহিত

ছ্যান্—দক্ষিণাবাক্য সাইর‍্যা রাখচি—প্রণাম করেন।

"ব্যাঘ্রদেব মহাদেব দেব দেব নমোহস্তুতে,
গচ্ছ গচ্ছ দূরং গচ্ছ, রক্ষ রক্ষ গৃহং মম।
ওঁ দন্তাঘাতবিদারিতারিরুধিরৈঃ
সিন্দুরগোলামুখং বন্দে
নৈশহুতাহুতং বনপতিং ভীতিপ্রদং ঘামদং।"

প্রসাদ বক্ষণ করেন।

মোক্ষদা

(প্রসাদ মুখে দিয়ে) কাল আবার আসবেন।

পুরোহিত

উত্তম, উত্তম। (ট্যাঁকে টাকা গুঁজতে গুঁজতে) ব্যাঘ্রদেব সকল দেবের উপর।

মোক্ষদা

(ঠাকুরঘর থেকে বেরিয়ে) যাই, মাংসটুকু পাঠিয়ে দিইগে—মাংস পেলে মুক্তোর হাতেও খাবেন।

(মোক্ষদার প্রস্থান)

পুরোহিত

বড়ই বুদ্ধি কইর‍্যা সারচি। বাগ্যা যে তুইজন একত্র আইসা দারান্ নাই। কাল যদি দারান্? মিশ্রমন্ত্র বানাইবার হইচে। এমন মন্ত্র যা এ্যাতেও লাগে, অতেও লাগে।

(পুরোহিতের প্রস্থান; অপর দিক দিয়ে মুক্তকেশীর বাটী হস্তে প্রবেশ)

মোক্ষদা

(বাটী থেকে একখানা মাংস তুলে) বেশ লাগ্চে—দেখি আর একখান্ চেখে। (মাংস মুখে দিয়ে)—আঃ—(মাংস খুঁজে) ওমা গিন্নীর কি আক্কেল গো—কখান্ মাংস দিয়েছিল? চাক্তেই ফুরিয়ে গেল যে—আর তো সবই দেখছি হাড়—এই হাড় নিয়ে গিয়ে দিয়ে আসবো? ওমা তাও কি হয়?—তার চেয়ে এই জান্‌লা গলিয়ে ফেলে দিই। (ফেলে দিয়ে) কিন্তু গিন্নী যদি কর্ত্তাকে জিজ্ঞেস করে কেমন খেলে? নাঃ, তা আর জিজ্ঞেস করবেনা—সে জিজ্ঞেস করে ছোটলোকরা। আর কর্ত্তা যে গিন্নীর জন্যে একলা দিয়েছিল—তাও ত চাকতেই ফুরিয়ে গেছে—তা কি

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক

করলো ? নিজে সাধলে খেলেনা, আবার আমাকে বলে, "যা খাইয়ে আয়"। (হাত চেটে) আঃ গান গাইতে ইচ্ছে করচে।

গান

মাংস খেলে মাংস বাড়ে গায়ে বাঁধে বল,
কলা খেলে গলা ছাড়ে মুখে সরে জল।
আবার, দুধ খেলে খাঁটি
হয় রং যে সোনাটি
বয় ভাঁটিতে চমকা উজান এপার ওপার তল।

(নিবারণের প্রবেশ)

নিবারণ

হ্যারে মুক্তো—গিন্নীকে খাইয়েছিলি ?

মুক্তকেশী

হ্যা তো বাবু।

নিবারণ

বেশী সাধতে হয়নি—নারে ?

মুক্তকেশী

না সাধতে হবে কেন ? দিতেই তুলে নিয়ে চোঁ—

নিবারণ

বলিস্ কি, এক নিশ্বেসে—?

মুক্তকেশী

হ্যা, শেষ ক'রে তবে নিশ্বেস ফেললে—ফোঁস।

নিবারণ

ফোঁস !—(স্বগত) ঠিক মিলছে।

(নিবারণের দ্রুতবেগে প্রস্থান, প্রবেশ অপর দিক দিয়ে মোক্ষদা)

মোক্ষদা

হ্যা লা, কর্ত্তাকে খাইয়েছিলি ?

মুক্তকেশী

হ্যা তো মা।

মোক্ষদা

আধসিদ্ধ ব'লে রাগ করেনি ত ?

মুক্তকেশী

রাগ করবে কেন! দিব্যি কচমচ ক'রে চিবিয়ে—

মোক্ষদা

বলিস কি—হাড়শুদ্ধ নাকি ?

মুক্তকেশী

এ্যাঁ হাড় !—হ্যাঁ, তাও কড়মড় ক'রে—

মোক্ষদা

কড়মড় করে !—(স্বগত)—ঠিক মিলচে। (প্রকাশ্যে) এই নে আজ বেশী ক'রে মাংস আনিস।

মুক্তকেশী

(টাকা নিয়ে হেসে স্বগত) টাকায় আট আনা থাকবেই।

(প্রস্থান)

মোক্ষদা

আধপেটা খাইয়ে ভাল করিনি। ঐ রে, ঐ আসচে—মাংসের স্বদ পেয়ে—কি যেন কি করে—ও বাবা! নীচু হয়ে পা টিপে টিপে আসে কেন ? আজই সেরেচে—পালাবো ? কোথায় পালাবো ? এক লাফে ধরবে—চোখে চোখে চেয়ে থাকি— শুনেছি বাঘেরও চার চোখে লজ্জা।

(কটমট ক'রে চেয়ে রইলেন। নীচু হয়ে পা টিপে টিপে নিবারণের প্রবেশ, হাতে একমুঠো ধুলো)

নিবারণ

(স্বগত) ঐ ত দাঁড়িয়ে। কোন রকমে এই ধুলো মুঠো চোখে দিতে পারলে হয়। সাপ কাহিল ঐতেই—ও বাবা! চোখের পলক পড়চেনা—ওদের ত পলক নেই—নিজমূর্ত্তি ধরে বুঝি। আর একটু এগিয়ে ছুড়ি (পা টিপে টিপে এগোতে লাগলেন)

মোক্ষদা

তবু যে এগোয়—শুনেছি আগুন দেখ্‌লে পালায়—আঁচলে ত দেশলাইটে আছে—(আঁচল থেকে দেশলাই খুলে কাঠি জ্বালতে লাগলেন)—তবু পালায় না যে—ছুড়ে মারি—

(জ্বলন্ত কাঠি গায়ে ছুড়ে মারতে লাগলেন)

নিবারণ

আর কাছে নয় (মোক্ষদার চোখের দিকে ধুলো ছুড়ে মারলেন)—ফস্‌কে গেল যে—এইবার ত তাড়া করবে—এঁকে বেঁকে ছুটি—

(এঁকে বেঁকে এধার ওধার ছুটতে লাগলেন)

মোক্ষদা

আগুনের কাছে চালাকি ! (দেশলাইএর কাঠি জ্বালতে জ্বালতে নিবারণের পিছনে পিছনে ছুটতে লাগলেন)

নিবারণ

ও বাবা !—কে বলে এঁকতে বেঁকতে পারে না—চোঁচা দৌড় দিই।

(ছুটে প্রস্থান)

মোক্ষদা

পালিয়েচে ; আবার না আসে। চারপাশে ল্যাম্প জ্বালিয়ে ব'সে থাকি গে।

(অপর দিক দিয়ে প্রস্থান)

—০—

৬ষ্ঠ দৃশ্য

একখানি বড় খোড়ো ঘরের দাওয়ায় মাদুর পেতে মহেন্দ্র বসে আছেন। হাতে ডাবা হুঁকো।

মহেন্দ্র

(হুঁকোয় টান দিয়ে) কি মজাই এতক্ষণ বেঁধে গেছে। দুজনে দুজনকে দেখে আঁৎকাচ্চে।—ছুটে আমাদের কাছে আসতেই হবে।

(পিছনের দরজা ঠেলে সরযূর প্রবেশ)

সরযূ

ওগো, মোক্ষদা এসেচে।

মহেন্দ্র

এসেচে নাকি ?—কোথায় বসিয়েছ ?

সরযূ

ওই ওঘরের দাঁওয়ায়—ঐ যে দেখ্‌তে পাচ্ছো না ?

মহেন্দ্র

হাঁ—হাাঁ বেশ করেছো। কি বলচে ?

সরযূ

বল্‌চে—আমার পায়ে মাথা খুঁড়ে মরবে যদি না গুরুদেবকে দিয়ে মানুষ ক'রে দিই।

মহেন্দ্র

তুমি কি বল্লে ?

সরযূ

বল্লুম—এইমাত্র তাঁর কাছ থেকে আসচি। তিনি স্বস্ত্যেনে বসেচেন। যদি হবার হয় মানুষ হবেই।

মহেন্দ্র

আঃ, এই সময় নিবারণ এসে পড়তো।

সরযূ

ঐ যে আসচে গো।

মহেন্দ্র

আসচে নাকি ? যাও, চসমা নিয়ে যাও।

(সরযূর হাতে চসমা দিলেন)

সরযূ

বাঃ, বেশ কিনেছ। ঠিক সেই রকম।

মহেন্দ্র

হাাঁ, হাাঁ—শোনো। সে এসে বসলেই মোক্ষদাকে চোখে দিয়ে দেখাবে। তারপর এসে দাঁড়াবে এই দরজার আড়ালে। আমি চেয়ে নিয়ে নিবারণকেও দেখিয়ে দেবো। যাও যাও, এসে পড়লো।

(সরযূর প্রস্থান)

গুরুদেব, সে আমার ছেলেবেলার বন্ধু, এক গাঁয়ে বাড়ী—তাকে আমি দাদা ব'লে ডাকি। তোমার ত অসীম ক্ষমতা প্রভু। তোমার ক্রিয়া ত কখনো ব্যর্থ হয় না। তার স্ত্রীর সাপত্ব কি এখনো দূর হয় নি ? না হ'লে যে তার নিস্তার নেই প্রভু, সে যে অপঘাতে মরবে। (সহসা যেন নিবারণকে দেখে) ও কে, নিবারণ দা ! কতক্ষণ এসেচো ? উঠোনে দাঁড়িয়ে কেন ? এসো, এসো বসবে এসে— তামাক খাও।

চস্‌মা

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক

(নিবারণ দাওয়ার উপর উঠে বসলেন, মহেন্দ্র তার হাতে হুকো দিলেন)

নিবারণ

মহেন্দ্র !—ভাই—আমি সব শুনেছি। তা হ'লে ক্রিয়া করিয়েছ ?

মহেন্দ্র

করাবো না দাদা—তুমি তো শুধু দাদা নও, বেয়াই পর্য্যন্ত হচ্ছিলে।

নিবারণ

হচ্ছিলে কেন মহেন্দ্র, হবোই—কেবল যদি আমার স্ত্রীটি মানুষ হয়।

মহেন্দ্র

আশা করি হয়েছে, এখন তোমার অদৃষ্ট। ও কে ওই দাওয়ায় ব'সে! ঐ না বো'ঠান্! দেখো না দাদা।

নিবারণ

হ্যাঁ, তিনিই তো।

মহেন্দ্র

তা হ'লে গিন্নীর সঙ্গে দেখা করতে এসেচেন—আহা বড্ড ভাব দুজনে। ভেবেছিলেন দুজনে বেয়ান হবেন।

নিবারণ

তা হবেনই, কেবল যদি—

মহেন্দ্র

মানুষ হ'ন? আচ্ছা, হয়েছেন কিনা তা তো দেখলেই হয়। ওগো শুন্‌চো? তুমি কি এই ঘরে আছো? তোমার দিদির জন্যে পান সাজচো? আচ্ছা দুটো পান এখানেও দিয়ো—আর সেই গুরুদেবের চসমাখানা বাক্স থেকে বের ক'রে দাও তো

নিবারণ

(স্বগত) বুকটা ধড়াস্ ধড়াস্ করতে লাগলো যে।

(দরজা ঈষৎ ফাঁক ক'রে সরযূ পানের ডিবে ও চসমা ছুঁড়ে দিলেন)

মহেন্দ্র

(ডিবে খুলে) খাও দাদা, পান খাও।

নিবারণ

(চসমা তুলে নিয়ে) আগে দেখে নিই (কম্পিত হাতে চসমা প'রে) আঃ বাঁচলুম। মানুষ—মহেন্দ্র—মানুষ! তুমি আমায় বাঁচালে!

মহেন্দ্র

ও কি কথা দাদা? আমি বাঁচাবার কে? সব গুরুর কৃপা। এখন গুরুর কৃপায় মেয়েটিকে পার করতে পারলেই বাঁচি।

নিবারণ

মেয়েটিকে! মহেন্দ্র, তুমি আমার যা করলে—এখন মেয়েটিকে যদি ভিক্ষে দাও—

মহেন্দ্র

সে ত আমার সৌভাগ্য দাদা—তা ভিক্ষের সঙ্গে কত দক্ষিণা দিতে হবে—দেড় হাজার বুঝি?

নিবারণ

আর লজ্জা দিওনা মহেন্দ্র—একটি পয়সাও চাই না—মা লক্ষ্মীকে এইখানে নিয়ে এসো, আমি এখনই আশীর্ব্বাদ ক'রে যাই।

মহেন্দ্র

কিন্তু, বো'ঠান্ কি তাতে রাজী হবেন?

নিবারণ

তার বাবা হবে। তুমি জানো মহেন্দ্র, আমি ভেড়া নই।

মোক্ষদা

জানি বৈকি তুমি বাঘ।

নিবারণ

এ্যাই এ্যাই—তাকে পাঠিয়ে দাও এইখানে—আর মা লক্ষ্মীকে নিয়ে এসো।

(মহেন্দ্রের প্রস্থান)

নিবারণ

কি হবে? গিন্নী নাকে কাঁদবেন? কাঁদুন—আজ আর শুন্‌চি না।

(মোক্ষদার প্রবেশ)

মোক্ষদা

ওগো, আমার একটি কথা রাখ্‌তে হবে।

নিবারণ

না, সে আমি পার্ব্বো না।

মোক্ষদা

দেখো, আজ আমার বড় আহ্লাদের দিন—আজ আমার কথাটি রাখো—

নিবারণ

কথ্খনো না।

মোক্ষদা

ইস্—তোমাকে রাখতেই হবে। আমি বলেছি আমি খালি হাতে সরযূর মেয়েটিকে নোব।

নিবারণ

এ্যাঁ, এই কথা! তা তাই বল্লেই ত হতো।

মোক্ষদা

কিচ্ছু নিতে পার্ব্বে না।

নিবারণ

ভালোরে ভালো—আমি বুঝি নিচ্ছি? আমি আরো ভাবছি তুমি ছাড়লে হয়।—যাক্ ভালোই হয়েচে—তা আহ্লাদের দিন বলছিলে কেন?

মোক্ষদা

সে আমি বল্‌বো না—

নিবারণ

আমিও বল্‌বোনা—আমারও আজ বড্ড আহ্লাদের দিন। আমার আজ মনে হচ্চে—সে বলা যায় না।

মোক্ষদা

আমার আজ মনে হচ্ছে যেন কি হারানো ধন ফিরে পেলুম।

নিবারণ

ঐ—ঐ—আমারো ঐ মনে হচ্চে।

(প্রবেশ আগে আগে মহেন্দ্র থালায় ধান দুর্ব্বো নিয়ে, পিছনে পিছনে সরযূ মলিনার হাত ধ'রে—সরযূর হাতে শাঁখ)

মোক্ষদা

প্রণাম করো মা, প্রণাম করো—তোমার শ্বশুর শ্বাশুড়ী।

(মলিনা নিবারণ ও মোক্ষদাকে প্রণাম ক'রে, তাঁদের সামনে বসলেন)

নিবারণ

কিছু তো নিয়ে আসিনি মহেন্দ্র—এই যা সঙ্গে আছে এই দিয়েই আশীর্ব্বাদ করি (পকেট থেকে একটি হীরের আংটি বের ক'রে) গিন্নী কিছু মনে কোর না—তোমার জন্যে গড়িয়েছিলুম—

(মলিনার আঙুলে আংটি পরিয়ে দিয়ে মাথায় ধান দুর্ব্বো দিলেন—সরযূ শাঁখ বাজালেন)

মোক্ষদা

তুমি জিতে যাবে ভাব্‌চো?

(মলিনার মাথায় ধানদুর্ব্বো দিয়ে নিজের গলার হার খুলে মলিনার গলায় পরিয়ে দিলেন—সরযূ শাঁখ বাজালেন)

নিবারণ

(উঠে দাঁড়িয়ে মহেন্দ্রকে আলিঙ্গন ক'রে) বেয়াই —বেয়াই!

(মোক্ষদাও উঠে দাঁড়িয়ে সরযূকে আলিঙ্গন করলেন)

উজ্জ্বল দৃশ্য

রঙ্গিণীগণ

গান

আমরা মানুষ আমরা মানুষ সবাই বলিতো,
কিন্তু মানুষ নেইকো বেশী
তাই সেদিনও এক বিদেশী
দীপটি হাতে মানুষ খুঁজে পথটি চলিত।
মানুষ ব'লে লম্ফ দেবার নেই বটে কসুর,
আঁচড়ে তুলে দেখ্‌না খোলস মূর্ত্তিটা পশুর,
চকচকে দাঁত, খরখরে নখ হয়নি গলিত।
ল্যাজ ছেঁটেছে লোম ছেঁটেচে সভ্যতা-কাঁচি,
তাই তো মোরা হাস্য করি হাত ধ'রে নাচি;
কিন্তু আবার ফাঁকটি পেলেই ঘাড় ভেঙ্গে বাঁচি,
(দিয়ে) কম্পিটিসন নামটি করি ভাইকে দলিত।
মানুষ যদি বনবি তবে স্বার্থ কিছু ভোল্,
পরের ব্যথা বুঝতে শিখে পরকে দে রে কোল;
প্রাণের তারে তোল্ রে প্রেমের সুর সুললিত।

যবনিক

বাঙলার পল্লী-গানে বৌদ্ধ-সাধনা ও ইস্‌লাম

আবদুল কাদের

একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বাঙলার পাল-বংশীয় নৃপতিদিগের পতন এবং সেন-বংশীয়দের উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রকৃত পতন এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পুনরুত্থান আরম্ভ হয়। বাঙলার সামাজিক অবস্থা তখন অত্যন্ত বিশৃঙ্খল। ইতিপূর্ব্বেই (খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর প্রথমভাগে) কুমারিল ভট্ট এই বলিয়া বৌদ্ধ দিগকে সমূলে হত্যা করিবার আদেশ বা উপদেশ দিয়া গিয়াছিলেন যে, বৌদ্ধবধ যে না করিবে সে বধ্য। কুমারিলের পঞ্চ ব্রাহ্মণ-শিষ্য কান্যকুব্জ হইতে বাঙলায় আনীত হইয়া তখন পুনরুত্থিত ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের বহুল প্রচারে তোলপাড় আরম্ভ করিয়াছে। বৌদ্ধরা ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের তরঙ্গাঘাতে মোটেই স্থির থাকিতে পারিতেছে না। বৌদ্ধ-যুগের তখন অন্তর্দ্ধান অবস্থা; বহু শাখা প্রশাখা ও আগাছা তখন বাঙলা দেশে গজাইয়াছে। সেই "সকল মত ও সম্প্রদায় বৌদ্ধ-নামাঙ্কিত হইলেও...বৌদ্ধ ধর্ম্ম হইতে... দূরে সরিয়া পড়িয়াছিল।" (১) কৃষ্ণানন্দ পূর্ণানন্দ প্রমুখ বাঙলার তান্ত্রিকেরা ও তাহাদের শিষ্য প্রশিষ্যেরা তখন বৌদ্ধ গৃহস্থদিগকে তান্ত্রিকতার দিকে টানিতেছিল; পূর্ণানন্দ প্রচার করিয়াই বৌদ্ধ-দেব-দেবীর পূজার বিধি-বিধানাদি রচনা করিতেছিল। ধর্ম্ম পূজার বা মানতের পূজার আদিগুরু ৺ রামাই পণ্ডিত চতুর্দ্দিকের এবম্বিধ বিশৃঙ্খলায় কোনরকমে নিজেদের অস্তিত্ব বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য তখন ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া বৌদ্ধ ও হিন্দুর সমন্বয় সাধনের প্রয়াস করিয়া পশ্চিম বঙ্গে সদ্ধর্ম্মের প্রচলন-প্রচেষ্টা করিতেছিলেন। তিনি সমস্ত দেবতাকে বাদ দিয়া এক ধর্ম্ম অর্থাৎ সাক্ষাৎ বুদ্ধকে রাখিলেন; হিন্দু দেব দেবীকে তিনি অস্বীকার করিলেন না, বলিলেন:

> "ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর আদি দেবগণে।
> এক মনে স্তব করে দেব নিরঞ্জনে॥"

শিব বিষ্ণু প্রভৃতিকে তিনি বলিলেন—আবরণ-দেবতা; তিনি নিজেকেও আবরণ-দেবতার আসনে বসাইলেন। নিজের গুরুত্ব সম্বন্ধে তিনি স্পষ্ট করিয়া বলিলেন:

> "কালযুগে পণ্ডিত রামাঞি।
> কলি যুগের ভাই শুন হে উপায়॥" (২)

এই সব করিয়া পরোক্ষ ভাবে রামাই পণ্ডিত কুমারিল-শিষ্যদের কার্য্যে সাহায্যই করিলেন; তিনি ধর্ম্ম ঠাকুরের কেতাব লিখিলেন; তাঁহার রচিত ছড়া সহযোগে ধর্ম্ম ঠাকুরের পূজাপাঠ চলিতে লাগিল। ক্রমে ধর্ম্ম ঠাকুরের পূজার স্বাতন্ত্র্য লুপ্ত করিবার মানসে ধর্ম্মকে হিন্দু দেব দেবীর মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া পূজা প্রদত্ত হইতে লাগিল, এইরূপে বুদ্ধের বিলোপ সাধন করিয়া ধর্ম্মকে হিন্দুয়ানীতে নিমজ্জিত করিয়া দিবার প্রচেষ্টা চলিল। যে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রারম্ভে স্বীকার করিয়া লইয়াছিল:

> "Not by birth the outcaste label
> Not by birth the Brahmin know!
> By actions only are we able
> To judge a man or high or low." (৩)

ব্রাহ্মণত্বকে সমূলে উচ্ছেদ করিয়া দিবার জন্য এ যাবৎ প্রাণপণ সংগ্রাম করিয়াছিল, সেই বৌদ্ধ ধর্ম্মের নামের দোহাই দিয়া রামাই ব্রাহ্মণের সাফাই গাহিলেন; তিনি ধর্ম্মকে দিয়া বলাইলেন:

> "আমার দুয়ারে দ্বিজ ব্রাহ্মণের মানা নাঞি।
> ব্রাহ্মণ সয়নে আছে, কিছু নাহি জানে।
> ভৃগু রামের নাথি মুঞি রাখ্যাছি যতনে॥

---

(১) শ্রীসুশীলকুমার চক্রবর্ত্তীর বৈষ্ণব ইতিহাস, পৃঃ ৩২

(২) ধর্ম্ম পূজা বিধান পৃঃ ২২৩

(৩) The Heart of Buddism—Saunders, Page 51

এই দেখ নিরবধি বক্ষস্থলে আছে।
স্মরণ মাত্রেকে আসি থাকি তার কাছে॥" (১)

ব্রাহ্মণ-তুষ্টির জন্য তিনি শুধু এই বলিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না, উপরন্তু বলিলেন :

"মোর (ধর্ম্মের) নাম করি যত শূদ্র খায়।
পিতৃ মাতৃ শ্বশুর তার ঘোর নরক পায়॥" (১)

অনার্য্য দেশে আসিয়া বৌদ্ধদিগের চরম অধোগতি হইয়াছিল। বৌদ্ধদের মেরুদণ্ড তখন অত্যন্ত দুর্ব্বল; ব্যভিচার ও বিলাসমত্ততার স্রোতে তখন তাহারা অবাধে ভাসিতেছিল। দেশে তখন তান্ত্রিক বামাচারের প্রভাব আর রতি-পূজার উপলক্ষে উৎসব; বৌদ্ধ সাধনার নামে তখন সেই বীভৎস কাণ্ড। যে বৌদ্ধ ধর্ম্ম এক কালে সংযমকে অত্যন্ত উচ্চ স্থান দান করিয়াছিল, বলিয়াছিল—"If man and wife wish to be together in the next life as in this, let them be peers in faith, peers in morality and peers in liberality and wisdom...then shall they dwell in bliss and health." (২) সেই বৌদ্ধ ধর্ম্মই তৎকালে পারকীয়া-চর্চ্চা, কুমারী-ভজন, ইন্দ্রিয়-চরিতার্থতা ইত্যাদিকে সমর্থন ও সাধনার শ্রেষ্ঠ অঙ্গ বলিয়া প্রচার করিতেছিল। এবম্বিধ মানসিক দুর্ব্বলতার জন্যই হয়ত বৌদ্ধরা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের তরঙ্গবেগ সামলাইতে পারিতেছিল না; কেবলি অকুল পাথারে ভাসিতেছিল।

বাঙলার এমনি সামাজিক ও ধর্ম্ম-বিশৃঙ্খলার যুগে, বৌদ্ধদিগের দারুণ দুরবস্থার দিনে বখতিয়ার খিলিজী ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বাঙ্লায় সসৈন্যে পদার্পণ করিলেন। গৌড় তাঁহার করতলগত হইল। সপ্তদশ অশ্বারোহীর সহায়তায় বাঙ্লা-বিজয়, অথচ বাঙ্লার অধিবাসীর পক্ষ হইতে ইহার কোনো প্রকার প্রতিবাদ পর্য্যন্ত হইল না, ইহার কারণ হয়ত এই যে, তখন বাঙ্লার অধিবাসী বৌদ্ধরা হিন্দুর অত্যাচার অসহ্য দেখিয়া মুসলমানদের এই আগমনকে সানন্দে ও সাদরে বরণই করিয়া লইয়াছিল। হয়ত আনন্দের অতিশয্যেই রামাঞি পণ্ডিত গৌড়েশ্বরকে বিপদ-বারণ "ধর্ম্ম মহারাজ" ভাবিলেন :

"হিন্দু মুছলমান তোথা একচ্ছত্র করিঞা।
আপনা জানান্ প্রভু জানান্ জানিঞা॥
হাতে নিলা তির কামঠা পায় দিয়া মজা।
গৌড়েতে বলেন গিয়া ধর্ম্ম-মহারাজা॥" (৩)

কুমারিল-শিষ্যগণ বৌদ্ধ ধ্বংসের যে আয়োজনে হাত দিয়াছিলেন, মুসলমানের দল আসিয়া তাহাতে যে সাহায্য করিল না, এমন নয়। মুসলমানের তরবারিতে নালন্দ বিক্রমশীল জগদ্দল প্রভৃতি বিহারের বৌদ্ধ যতি ও পুরোহিত-গণ নিহত হইলেন। মুসলমানদের এই হত্যা লীলা দেখিয়াও কেন যে তখনকার বৌদ্ধরা মুসলমানদেরই ত্রাণ-কর্ত্তা ভাবিল,—ভাবিল, শুধু ধর্ম্ম কেন, হিন্দুর সমস্ত দেব-দেবী মুসলমান হইয়া আবির্ভূত হইয়াছে, এবং "শূন্য-পুরাণ"কারই বা কেন গাহিলেন :

"ধর্ম্ম হৈলা জবন রূপি মাথায়েতে কালটুপি
হাতে শোভে ত্রিরুচ কামান।
চাপিয়া উত্তম হয় ত্রিভুবনে লাগে ভয়
খোদার বলিয়া এক নাম॥
নিরঞ্জন নিরাকার হৈলা ভেস্ত অবতার
মুখেতে বলেন দম্বদার।
যতেক দেবতাগণ শভে হয়্যা একমন
আনন্দেতে পরিল ইজার॥
বৈহ্মা হৈলা মহাম্মদ বিষ্ণু হৈল পেকাম্বর
আদম্ফ হৈলা শূলপাণি।
গণেশ হইয়া গাজী কার্ত্তিক হইলা কাজি
ফকির হইল যত মুনি॥
তেজিয়া আপন ভেক নারদ হইল শেক
পুরন্দর হইল মৌলনা।
চন্দ্র সূর্য্য আদি দেবে পদাতিক হয়্যা সবে
সবে মেলি বাজায় বাজনা॥
আপুনি চণ্ডিকা দেবী তিঁহ হৈল হাওয়া বিবি
পদ্মাবতি হৈলা বিবি নুর।
যতেক দেবতাগণ হয়্যা সবে একমন
প্রবেশ করিল জাজপুর॥
দেউল দেহারা ভাঙে কাড়্যা ফিড়্যা খায় রঙ্গে
পাখড় পাখড় বলে বোল।

(১) ধর্ম্ম পূজা বিধান।
২। The Heart of Buddism P. 88.

(৩) ধর্ম্মপূজা বিধান, ২১৪ পৃঃ।

আবদুল কাদের

ধরিয়া ধর্ম্মের পায়　　রামাঞি পণ্ডিত গায়
ই বড় বিষম গণ্ডগোল ॥"

সেই যুগে মুসলমানের যেই প্রচারকেরা ইস্‌লাম-প্রচার করিতেছিলেন, তাঁহাদের আদর্শের দিকে উদার দৃষ্টি দিলে ইহার সদুত্তর মিলিতে পারে। দিগ্বিজয়ী মুসলমানের হাতে তরবারি থাকিলেও মুসলমানের মতাদর্শের সহিত বৌদ্ধাদর্শের বৈসাদৃশ্য ব্রাহ্মণ্য আদর্শ হইতে অনেক অল্প ছিল; বৌদ্ধ নিরীশ্বরবাদী, মুসলমান নিরাকারবাদী, বৌদ্ধাদর্শ পৌত্তলিকতার বিরোধী, মুসলমানও তদ্রূপ, এবং সর্ব্বোপরি ইস্‌লাম-প্রচারকেরা সুফী-মতাবলম্বী, যাহাদের সাধন ভজন প্রণালীর সঙ্গে বৌদ্ধের সাধন ভজন প্রণালীর অনেক সৌসাদৃশ্য বিদ্যমান ছিল।

পূর্ব্বোদ্ধৃত "মুখে বলেন দম্বদার" পদে দম্বদার বা দম্-মাদার বা দমের মাদার সেই সুফীদেরই একজন। অনুমান করা যায়, এই মাদার পীর বখ্‌তিয়ারের সমসাময়িক লোক। ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া তাঁহার যে কি প্রতিপত্তি ছিল, তাহা কনোজের মকানপুরে প্রতি বৎসর তাঁহার সমাধি-প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত উরুছ, বিশেষতঃ বাঙলার পল্লীতে মাদারের আখ্‌ড়া সকলের সাম্বাৎসরিক উৎসব, হইতে প্রচুরভাবে প্রমাণিত হয়। ভারতে "মাদারিয়া" নামে এক শক্তিশালী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি ইনি করেন। তাঁহার বহু আউলিয়া শিষ্য ছিল। উক্ত শিষ্য-আউলিয়াগণ বিভিন্ন গ্রামে নিষ্কর লাখেরাজ ভূমির অধিকার নিয়া পীর মাদারের "কুড়া" স্থাপন করিত। কুড়া অর্থে কাঁচা বংশখণ্ড, এর এক একটি বংশখণ্ড স্থাপনার জন্য নির্দ্দিষ্ট সিন্নি মানত করিতে হয়; হিন্দু মুসলমান নির্ব্বিশেষে নানা দেশের নানা লোক অভিলষিত সামগ্রী প্রার্থনা করিয়া আজিও এই কুড়া স্থাপন করে; প্রত্যেক বৎসর বৈশাখ মাসের প্রথম রবিবারে মেলা বসে, প্রোথিত কুড়া তোলা হয়, পর্য্যাপ্ত পরিমাণে দরিদ্রভোজন হয়। এই ভোজন-নিয়ন্ত্রণের জন্য আড্ডার লোকেরা মাটির পীঠুমে পাঁচ-সাতটা সলিতা লাগাইয়া বাতি জ্বালাইয়া কুড়া হাতে নাচিয়া নাচিয়া গান গাহিয়া ভিক্ষা সংগ্রহ করে। নিম্নে ঐ গানের একটি নমুনা প্রদত্ত হইল :—

"মাদার আইলানা, দমের মহাজন।
মাদার মাদার সবে কয় মাদার কেমন জন॥
অধম বালকে ডাকি দাও দরশন।
এমন সুন্দর মাদার চেরাগের রৌশন॥
মাদার মাদার সবে বলে মাদার পুস্ত পীর।
আইলা না দমের মাদার;—ফেলি আপের নীর॥"

মাদারিয়া পন্থীদিগের সাধনা যে বৌদ্ধ সাধনার অনুমোদন করিত, তাহা তাঁহাদের আখড়ায় অনুষ্ঠিত ক্রিয়া কাণ্ড হইতে যথেষ্ট প্রমাণিত হয়। মাদারকে তাঁহার শিষ্যেরা যে ভাবে সম্বোধন করিয়া থাকে, তাহা বৌদ্ধ গুরু বাদের কথাই স্বতঃ স্মরণ করাইয়া দেয়।

শাহ মাদারের প্রকৃত নাম—বদীউদ্দিন। ইনি শেখ মহম্মদ তৈফুর বস্তামির শিষ্য ছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে বহু কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। ইনি চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ১২৪ বৎসর বয়সে ইহলীলা সম্বরণ করেন। ইনি কাজী শাহাবুদ্দীন দৌলতাবাদীর সমসাময়িক; উক্ত কাজী সাহেব জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহীম শারকীর সময়ে জীবিত ছিলেন। শাহ মাদার সুফী-আদর্শ লইয়াই এদেশে প্রচার আরম্ভ করিলেও তাঁহার দীক্ষিতেরা যে, সর্ব্বপ্রকারে বৌদ্ধই থাকিয়া যাইতেছিল তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। মাদার দমের অর্থাৎ শ্বাসপ্রশ্বাসের সাধনা প্রচার করিতেন, সেই সাধনা দ্বারাই মুক্তি-প্রাপ্তির পন্থা বাৎলাইতেন। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, মাদার তৈফুর বস্তামির শিষ্য। তৈফুর বস্তামি কে, জানিনা; কিন্তু বস্তাম দেশের একজন সুফী বিশ্বখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তিনি বায়জিদ বস্তামি। বায়জিদ একজন জুরস্‌থিয়ানের পৌত্র। তাঁহার গুরু কুর্দ্দদেশীয় একজন সুফী, তিনি সিন্ধু দেশের আবুআলীর নিকট হইতে "ফানাহ" শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। আবু আলী ভারতবর্ষীয় শ্বাস-সাধনা (Indian practice of watching the breaths) আয়ত্ত করিয়াছিলেন। অনুমান করা যাইতে পারে, তৈফুর বস্তামি বায়জিদ-গুরুর বা ভারতীয় কোনো সাধকের নিকট হইতে স্বয়ং এই দমের সাধনা শিক্ষা করিয়াছিলেন। ফলতঃ, শাহ মাদারের এই দমের সাধনা সম্পূর্ণ ভারতবর্ষীয়

ধরণের ; এবং সম্ভবতঃ ইহারই জন্য তৎকালীন হিন্দু বৌদ্ধ প্রভৃতিরা তাঁহার বা তাঁহারই আদর্শবাদী প্রচারকগণের বিরুদ্ধাচরণ না করিয়া পক্ষান্তরে সহায়তাই করিয়াছিল।

সুফী-ধর্ম্মের সঙ্গে ভারতীয় কৃষ্টির অনেক স্থলে সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়। নিম্নে তাহার কয়েকটির মাত্র উল্লেখ করিতেছি। (ক) কেহ কেহ বলেন, ভারতের ব্রহ্মবাদই সুফীধর্ম্মের মূলে। (খ) সুফীদের পীর-ভক্তি আর ভারতীয় গুরু-ভক্তিতে আদর্শে তফাৎ অধিক নাই। মিশরের যু'ল নুন্ যিনি প্রকৃত সুফীদের সর্ব্বপ্রথম, এবং গ্রীক-বিদ্যায় অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন, তিনি বলিতেন—"The true disciple should be more obedient to his master than to God himself." হিন্দু ধর্ম্মে গুরুকে ভগবান ও ভক্তের সেতু-বন্ধন স্বরূপ জ্ঞান করা হয়। (১) বৌদ্ধ সহজিয়ারা গুরুকে পরমাত্মার স্বরূপ বলিত ; জীবনে গুরুর একান্ত প্রয়োজনীয়তার সমর্থনের জন্য তাহারা এমনও বলিত যে—"the flute of Krishna was the Guru of the Gopis." (২) সমস্ত তন্ত্রের বৌদ্ধদের কাছেই গুরু সর্ব্বেসর্ব্বা। (গ) হিন্দু অবতারবাদী, সহজিয়া ও নাথ-পন্থী "গাছা" স্বীকার করে। সুফী-প্রধান মনুসুর হাল্লাজও (incarnation) অবতার এবং গাছা সমর্থন করিতেন, তিনি তাঁহার শিষ্যদিগের কাহাকেও নুহ, কাহাকে মুসা, কাহাকেও মহম্মদ বলিতেন ; বলিতেন—তাঁহাদের spirit বা গাছাকে তিনি যোগ-বলে শিষ্যদের দেহে আনিয়াছেন। এই হাল্লাজ ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়াছিলেন। (ঘ) Hindu Pantheist এবং বৌদ্ধ সহজিয়া উভয়েই রূপের পূজারী। সহজিয়ারা বলে—রূপ-সাধনায় রসের সৃষ্টি, রসের সাধনাতেই মুক্তি। তান্ত্রিকেরাও এই পথের। সুফীরা ইস্লামের ব্যাখ্যাত আল্লাহর কল্পনাকে কাটিয়া ছাঁটিয়া সুন্দর ও প্রেমময় আল্লাহর কল্পনা করিয়াছে, সুফীর আল্লাহ এবং উপনিষদের ভগবানে পার্থক্য অধিক নাই। প্রেম ও রস-বিমণ্ডিত যে বিরাট পুরুষ, তিনি ভারতের এবং পারস্যের দুইয়েরই। (ঙ) সহজ-শাস্ত্রে বলে—"যদি তোমার বোধি-লাভের বাসনা থাকে, তবে গুরুর উপদেশ গ্রহণ কর এবং পঞ্চকামের উপভোগ করিতে থাক, কেবলি আনন্দ কর।" মানুষ সাধনা করিয়া বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে, ইহা বৌদ্ধেরা বিশ্বাস করে। ধ্যান ও সমাধি দ্বারা বিরাট পুরুষে লীন হওয়া যায়, হিন্দুও ইহা বিশ্বাস করে। নবম শতাব্দীর শেষ ভাগে সুফী ধর্ম্মে যিনি Pantheistic element ঢুকান, সেই বায়জিদ বলেন—"Whatever attains to true being is absorbed into God and becomes God". (চ) সুফী-ধর্ম্মে যে জিকিরের প্রচলন আছে, তাহার সঙ্গে মাদারের দমের সাধনার সামঞ্জস্য ছিল ; পীরের আদেশ বা নির্দ্দেশ মত নিবৃত্তি, নির্জ্জনতা, নীরবতা, ইন্দ্রিয়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, ইত্যাদি শিষ্যের সাধন-অন্তর্গত বিষয় ছিল। প্রথম যুগে জিকির নৃত্যগীত-বাদ্যাদি সহযোগে সম্পাদিত হইত ; এবং তাহারই ফলস্বরূপ বৌদ্ধসহজ-যানের মতন তাহাতেও অসংযম-চিত্ততা প্রবেশ লাভ করে। নফ্‌স্, কল্‌ব, আকেল, জেহাদ্, মুরাকাবাদ, কেরামত, ফানাফিল্লাহ ইত্যাদির সঙ্গে তান্ত্রিক-বৌদ্ধের সাধন-প্রাণালীর কিছু-কিছুর সাদৃশ্য লক্ষিত হয়।

পীর মাদার যখন এদেশে প্রচার চালাইতেছিলেন, তখন পারস্য দেশে proper Sufismএর মাত্র জন্ম হইতেছিল, এবং এই সুফী ধর্ম্মের রূপ পরিগ্রহ ব্যাপারে "The influence of Christianity, Neo-Platonism and Buddism is an undeniable fact. It was in the air and inevitably made itself felt." । (১) Von Kremer বলেন—"In later days considerable influence was exerted by Indian ideas on the development of Sufism." । সুফী-ধর্ম্মের উদ্ভবের কারণ "particulary the bitter sectarianism and barren

(১) "The Guru renders spiritual revelation possible, for he acts as a medium between God and his disciple. Throughout the life of the latter, the Guru is the spiritual guide, and receives almost divine veneration."—Census Report, O' Malley, 1911.

(২) The Post-Chaitannya Shahajia Cult by Manindra Mohan Bose.

(১) Reynold A. Nicholson.

আবদুল কাদের

dogmatism of the Ulama"। জোর করিয়া দেওয়া Semitic formalismএর প্রতিক্রিয়াস্বরূপ পারস্যের আর্য্যমনের বিদ্রোহ-ফল এই সুফী-ধর্ম্ম। ভারতেরও আর্য্যমন। অতএব পারস্যের সুফী-ধর্ম্মকে যে ভারতীয়েরা সাদরে সম্বর্দ্ধনা করিয়া নিবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি? ইস্‌লাম যদি সোজাসুজি আরব দেশ হইতে ভারতবর্ষে আসিত, তবে কখনই এত নির্ব্বিঘ্নে প্রবেশ লাভ পাইত না। এর একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ—মুহম্মদ বিন্ কাশেম। তাঁহার আক্রমণের সময়ও সিন্ধু দেশে ধর্ম্ম-বিশৃঙ্খলা বর্ত্তমান ছিল এবং সে দেশ বৌদ্ধ-প্রধান ছিল, কিন্তু তাঁহার (অর্থাৎ আরবের) ইস্‌লাম সে দেশে মোটেই সম্বর্দ্ধনা পাইল না; অথচ খিলিজী-সাঙ্গোপাঙ্গদের প্রচার-প্রচেষ্টা বৌদ্ধ-ভাব-প্রধান বাঙলায় আশ্চর্য্যভাবে জয়যুক্ত হইল।

বাঙ্‌লা দেশের দুর্ভাগ্য যে, তাহার কোনও সামাজিক ইতিহাস আজ পর্য্যন্ত লিপিবদ্ধ হইল না। খিলিজী-পূর্ব্বেকার বাঙ্‌লা দেশের সামাজিক অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহারও তেমন কোনো ইতিবৃত্ত নাই। শ্রীহর্ষ, যিনি বৌদ্ধধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক জৈন ধর্ম্ম অবলম্বন করেন, তাঁহার সময়ে (সপ্তম শতাব্দীতে) ইউয়েন চাঙ্গের ভারতভ্রমণে আসার পূর্ব পর্য্যন্ত বাঙ্‌লার যে ইতিহাস, তাহাতে আর্য্য-প্রভাব কিছু মাত্র আছে কিনা বলা দুষ্কর। তৎকালীন আর্য্যগণ দাক্ষিণাত্যের লোকদের মতন বাঙালীদিগকেও মানুষের মধ্যে গণ্য করিত না। শ্রীহর্ষ হইতে ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্মের পতন সূচিত হয়। যে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রচার প্রাচ্য ভূখণ্ড উল্লঙ্ঘন করিয়া সুদূর নীল (Nile) নদীর তীরে প্রচার লাভ করিয়াছিল, পরবর্ত্তী কালের বিকৃতির ফলে তাহাই স্বদেশ হইতে শেষে বিতাড়িত হইল। অশোক দাক্ষিণাত্যে সদ্ধর্ম্মের প্রচার করিয়াছিলেন। উত্তরাঞ্চলের বৌদ্ধরা ঘৃণা করিয়া দক্ষিণাঞ্চলের বৌদ্ধদিগকে হীনযান এবং নিজেদিগকে মহাযান বলিত। মহাযান শূন্যবাদী; তাহারা ইন্দ্রিয়সত্তা এমনকি,অশ্বঘোষের পর বস্তুসত্তাকে পর্য্যন্ত অস্বীকার করিয়াছিল। শূন্যকে নিয়া মানুষ অধিককাল চলিতে পারে না; তাই বুদ্ধদেবই ভক্ত-চিত্তে পরমেশ্বরের সিংহাসন ধারণ করিয়া উত্তরকালে বৌদ্ধদের কাছে পরমেশ্বর বলিয়া পূজা পাইলেন। তৎকালীন বৌদ্ধেরা বুদ্ধদেবের করুণাকে বিশ্লেষিত ও বিচিত্রিত করিয়া দেখাইবার মানসে বহু দেব দেবী দৈত্যাদির কল্পনা করিলেন, এবং কল্পনার অবশ্যম্ভাবী ফল পূজা দিলেন। এইরূপে বিকৃত সদ্ধর্ম্মের বিকারের মধ্যেই মন্ত্রযান, বজ্রযান, কালচক্রযান ইত্যাদি নানা বৌদ্ধ-তন্ত্রের উৎপত্তি হইল। ইহাদের সাধারণ নাম সহজায়ায় বা সহজযান। ইহারা অতীন্দ্রিয়কে অস্বীকার করিল; যে ইন্দ্রিয়গণের সহযোগে মানুষের সৃষ্টি, যাহার উপর ভিত্তি করিয়াই মানুষ, সেই সহজ ইন্দ্রিয়-সম্ভোগই যতপ্রকারে সম্ভব, করিয়া চল,—মুক্তি অবশ্য মিলিবে;—ইহাই দাঁড়াইল ইহাদের আদর্শ। এই আদর্শের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম—তান্ত্রিক বামাচার, কুমারী-ভজন, কিশোরী-ভজন, অর্থাৎ পরকীয়া-চর্চ্চায় দেশ ভাসিয়া গেল। সহজিয়ারা ভাবিত, প্রেম-সাধনায় আধ্যাত্মিক মুক্তি ঘটিবে, আর একমাত্র পরকীয়া-চর্চ্চা দ্বারাই গভীরতমভাবে এই প্রেমের চর্চ্চা চলিতে পারে। তাহারা যাহা মানিয়াছিল, সোজা কথায় তাহা এই দাঁড়ায়—

> "রূপ লাবণ্য দেখি যার জন্মে লোভ।
> প্রাপ্তি-কারণে সদা চিত্তে হয় ক্ষোভ॥
> পূর্ব্বরাগের ঘর এই—সদা চিন্ত মনে।
> বিংশতি দ্বাদশ রস ইহার পোষক॥" (১)

নানা যুক্তি দ্বারা রসের দোহাই দিয়া নাথ-মার্গ, বজ্রযান-মার্গ, মন্ত্রযান-মার্গ, সহজ-সাধনা, সকলেই হিন্দু তান্ত্রিকের দেওয়া এই পরকীয়া চর্চ্চার সমর্থন করিত। এই সমস্ত মার্গ বাঙ্‌লায় জীবিত ছিল। বিশেষতঃ নাথ-পন্থীরা, শুধু পূর্ব্ব বাঙলায় নহে, সারা ভারতবর্ষে প্রচার গাহিয়া বেড়াইতেছিল। ইহা ১১৮৪ খৃষ্টাব্দের কথা।

> "পূর্ব্বে গেল হাড়িফা, জথাতে (দক্ষিণে) কাহ্নাই।
> পশ্চিমে গেলেন্ত গোর্খ, উত্তরে মিনাই॥
> পৃথিবী ভ্রময়ে তারা জোগপথ ধ্যায়াই।" (২)

কেহ কেহ বলেন, নাথ-মার্গের উৎপত্তি বৌদ্ধধর্ম্মের বাহিরে, কিন্তু কালের চক্রে তাহা বৌদ্ধধর্ম্মের অঙ্গবিশেষে

(১) রসসার, ১৩ পৃঃ। (২) গোরক্ষবিজয়, ১৫ পৃঃ।

পরিণতি লাভ করে, এ ধারণা নির্ভুল নয়। ৯ম, ১০ম, ও ১১শ শতাব্দীতে বাঙ্‌লা দেশে যে ধর্ম্মান্দোলন আত্মপ্রকাশ করে,তাহাতে নাথদিগের গুরু অনার্য্য যোগীগণের হাত ছিল। নাথ মার্গ পরবর্ত্তী কালের বিকৃত বৌদ্ধধর্ম্ম এবং তান্ত্রিক হিন্দু-ধর্ম্মের সম্মিলনে উক্ত রূপ পরিগ্রহ করে। নাথেরা নিজেদের অলৌকিক শক্তি আছে বলিয়া গর্ব্ব করিত, তাহাদের বহু শিষ্য ছিল, তাহারা সকলেই বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী। নাথেদের শিষ্যেরা সাধারণতঃ নিম্নশ্রেণীর লোক ছিল, যথা— হাড়ি, ডোম, চণ্ডাল। হিমালয়ের পার্শ্ববর্ত্তী বাঙ্‌লা ভোটান প্রভৃতি প্রদেশ সমূহে মূল বৌদ্ধধর্ম্ম, মন্ত্রযান বিজ্রযান বজ্রযান কালচক্রযান লামাইজম (Lamaism) দৈত্যপূজা ইত্যাদির সহিত বিমিশ্র হইয়া অত্যন্ত বিকৃত হইয়া পড়িয়াছিল।— বৌদ্ধ-দর্শনে আদিবুদ্ধের কথা আছে। বৌদ্ধেরা বুদ্ধের প্রাজ্ঞ বলিয়া এক নারী-শক্তির এবং বুদ্ধ ও সেই প্রাজ্ঞের যোগ ক্রমে উৎপন্ন বোধিসত্ত্বের সৃষ্টি কল্পনা করিল। মধ্যদেশের লোকোত্তরবাদী মহাসাঙ্ঘিকারা মনে প্রাণে জানিত যে, বোধিসত্ত্বে বস্তুমাত্র নাই, সব মহাবস্তু। এই করিয়াই"অবলোকিত" ও "তারা"বৌদ্ধমনে জন্মলাভ করিল; এবং উত্তর দেশীয় বৌদ্ধ-মতে বহু বুদ্ধমূর্ত্তি ও দৈত্য-দেবতা প্রবেশ লাভ করিল; গৌড়বঙ্গে যে বজ্রযান সম্প্রদায় অত্যন্ত প্রভাব প্রতিপত্তি নিয়া বর্ত্তমান ছিল, তাহা বজ্রসত্ত্ব নামক ষষ্ঠধ্যানী বুদ্ধ ও বজ্রেশ্বরী নামে তাহার শক্তি কল্পনা করিয়াছিল। এই সকল মূর্ত্তি কল্পনায় যোগ-সাধনার Pantheistic মতবাদের উপর ভিত্তি করিয়া তান্ত্রিকের রহস্য-তত্ত্ব-সাধনা প্রবেশ লাভ করিল। তান্ত্রিক-হিন্দু-ধর্ম্মের মতন বৌদ্ধ-ধর্ম্মেও এই করিয়া বুদ্ধের নারী-শক্তি প্রধান স্থান অধিকার করিল; ইহাতে দেশে যে বীভৎসতার প্রবাহ বহিল, তাহা বলাই বাহুল্য। তিব্বতে এই আদর্শের বৌদ্ধ মতই প্রাধান্য লাভ করিল। বলা যাইতে পারে, নাথ-মার্গ এক দিকে তিব্বতের সেই লামাইজম্ (Lamaism) এবং অপরদিকে হিন্দুর গুরুবাদী আধ্যাত্মিকতা, এই দুইয়ের সেতু-বন্ধস্বরূপ। ইহা মানুষ-পূজাকে চরম মনে করিত; এবং মানুষ-পূজাই নাথ-মার্গের সার কথা। নাথ-পন্থী সহজিয়া সকলেরই লক্ষ্য ছিল মানুষ, ভগবান নয়। খিলিজীর এদেশে আগমন-সময়ে নাথেরা পূর্ব্ব বাঙ্‌লায় অত্যন্ত প্রতিপত্তিশালী। মীননাথ, দীননাথ, গোরক্ষনাথ, হাড়িফা, কানুপা প্রভৃতি নাথ-ধর্ম্মের প্রচারক। রামাঞি পণ্ডিত ধর্ম্মের পূজার সময় "আদিনাথের পুষ্পং জয়" "গোরনাথের পুষ্পং জয়" ইত্যাদি বলিয়া আদিনাথ, দীননাথ, চৌরাঙ্গনাথ গোরনাথ প্রভৃতির নামের উদ্দেশ্যে ফুল দিবার বিধান দিয়াছিলেন। রামাঞি এই সকল নাথকেও আবরণ-দেবতার আসন দিয়াছিলেন। বাঙ্‌লার গানের আলোচনায় স্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়, কি ভাবে কত দিক দিয়া এই নাথদিগের প্রভাব বাঙালী মুসলমানের জীবনে অক্ষুণ্নভাবে আজিও বর্ত্তমান রহিয়াছে। শুধু মেলার ভজনেতে নয়, বেলা শেষে বাড়ী ফিরিবার সময় আজিও পল্লী-মুসলমান গাহিয়া গাহিয়া যায়—

"সাধুরে ভাই,
দিন গেলে তিন নাথের নাম লইও।
সারা দিন কৈর রে ভাই সংসারের কাম।
সন্ধ্যা হৈতে লইঅ তিন নাথের নাম॥"

মুসলমান ফকীরদের হাতেই নাথ-পন্থীরা যে দলে দলে নিঃসঙ্কোচে সানন্দে ইস্‌লাম গ্রহণ করিয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এবং স্বভাবতঃই তাহাদের জীবনে শরিয়তী ইস্‌লামের কোন ছাপই পড়িল না। বলাবাহুল্য, বাঙ্‌লার বিরাট বাউলের দল এই নাথ-পন্থীরাই সৃষ্টি করিয়াছিল।

বক্তিয়ার খিলিজীর সময়ে বা পরে বহু সুফী সাধক যে, গৌড়ভূমিতে পদার্পণ করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ বিরল নহে। শাহ শরীফ উদ্দিন নামক একজন মুসলমান ফকীরের দরগাহ বিহারে বর্ত্তমান আছে। ইনি খৃষ্টীয় ১৩৭৬ অব্দে বা হিজরী ৭৮১ অব্দে পরলোক গমন করেন। (১) বাঙ্‌লা বিহারের কোথাও মুসলমান রাজরাজড়ার অনুষ্ঠিত প্রচার দ্বারা ইস্‌লাম তেমন প্রচারিত হয় নাই; হইয়াছে সুফীদের দ্বারা। রাজা গণেশের পুত্র যত্নমল্ল বা জিৎমল্ল ১৩৯২ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনারোহণের পর জনৈক মুসলমান ফকীরের দ্বারাই দীক্ষা-লাভ করিয়া মুসলমান ধর্ম্মে গভীর ভাবে আস্থাবান হইয়া

(১) The Oriental Biographical Dictionary. by Be P. 247.

আবদুল কাদের

পড়িয়াছিলেন। (১) বস্তুতঃ মুসলমান ফকীররাই তখন ইস্‌লাম প্রচার করিতেছিল, এবং দলে দলে বহু বৌদ্ধ এবং সদ্য দীক্ষিত বৌদ্ধ-হিন্দু মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষা নিতেছিল। মুসলমান পীরদের অলৌকিক শক্তি, সংযম, ধর্ম্মবল ইত্যাদি বাঙালীকে যথেষ্ট আকর্ষণ করিয়াছিল। একটা বিশেষ কথা এই যে, ভারতীয় মন কোনো কালেই Formalism বা dogmatism সানন্দে মানিয়া নিতে স্বীকৃত নয়, তাহা হিন্দুরই হোক্ বা মুসলমানেরই হোক্। তাই আরবের ইস্‌লাম বা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম কোনোটাই ভারতবাসীর পছন্দসই নয়। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের উত্থানের অব্যবহিত পরে পরেই দেখা গিয়াছে, প্রেম ও ভক্তির বার্ত্তা নিয়া মানুষের বন্ধু-মহাপুরুষগণ আবির্ভূত হইয়াছেন। বুদ্ধদেব রামানন্দ রামানুজ শ্রীচৈতন্য, ইহাদের প্রত্যেকেরই আবির্ভাব ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ।

* * * *

খিলিজী ও শ্রীচৈতন্যের মাঝামাঝি যুগে বাঙ্‌লায় আর কোনো ধর্ম্ম-বিপ্লব হইয়াছিল বলিয়া ইতিহাসে বলে না। বৌদ্ধ দোঁহা ও গান খিলিজীরও পূর্ব্বে, তাহার চর্য্যাপদ সমূহে রাধাকৃষ্ণের উল্লেখ আছে। এই "বৌদ্ধ দোঁহা ও গান— তার পরে শূন্য পুরাণ, তার পরে...চণ্ডীদাস।"(২) সহজযানের সাধন-প্রণালী ভগবদ ধর্ম্মে প্রবেশ লাভ করিয়া রাধা কৃষ্ণের লীলাকে সহজ-সাধনায় গ্রহণ করে। সহজ-ভজনে প্রেম ও রসের যে স্থান, তাহারই চর্চ্চা করিতে গিয়া সহজ-সম্প্রদায়ভুক্ত নরনারীগণ কেহ কৃষ্ণ হইয়া, কেহ রাধা হইয়া, কেহ বা তাহাদের সখা সখী হইয়া বৃন্দাবন-লীলার মতন নানা প্রকার রাসলীলার অনুকরণ করিত। চণ্ডীদাস সহজ-ধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন; তিনি বাশুলি মূর্ত্তির পূজা করিতেন; বাশুলি বৌদ্ধ মূর্ত্তি। "সহজ-যানের ধর্ম্ম মতের প্রভাব চণ্ডীদাসের ধর্ম্মমতকে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল এবং চণ্ডীদাসের পদাবলী সহজিয়া সাহিত্যের ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছিল।" (৩) এই কারণেই "চণ্ডীদাসের অনেক পদে সহজ-আচারের গুরুত্ব বিজ্ঞাপিত হইয়াছে।" (৪) শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্ব্বে বাঙ্‌লায় নীরবে নীরবে এই সহজিয়া সাধনাই চলিয়াছিল। যে সকল বৌদ্ধ, মুসলমান বা হিন্দু হইয়াছিল, তাহারাও সহজিয়া আদর্শ পরিত্যাগ করে নাই। অবশ্য এই বিরাট সহজিয়া-মনোধর্ম্মী জন-সমাজের পাশাপাশি ব্রাহ্মণ ও শরীয়তী মুসলমান আপনাদের গোঁড়ামী নিয়া বিরাজ করিতেছিল। তাহারা যে অন্যদিগকে গোঁড়ামির দিকে টানিতে ছিল না, এমন নয়। বাঙ্‌লা দেশে মুসলমান তরবারী সাহায্যে ইস্‌লাম প্রচার করিয়াছে তাহার প্রমাণ বিরল; রাজা গণেশের পুত্র মুসলমান হইয়া চেৎমল সুলতান জালালউদ্দীন নাম ধারণ পূর্ব্বক সমস্ত রাজ্য মধ্যে তরবারী সাহায্যে ইস্‌লাম প্রচারের সর্ব্বতোভাবে প্রচেষ্টা করিতেছিলেন; (৫) বলা যাইতে পারে, এদেশের শরিয়তী-মুসলমানের ক্ষুদ্র গোঁড়া সম্প্রদায় এমনি আদর্শের মানুষের অত্যাচারে গড়িয়া উঠিয়াছিল। সেই দীক্ষিত শরিয়তী-মুসলমানেরাও যে প্রকৃত মুসলমান হয় নাই, তাহা সহজে অনুমেয়। ব্রাহ্মণের প্রভাবও তখন উল্লেখ-যোগ্য, অবশ্য সেই ব্রাহ্মণদের জীবনে সহজিয়া-প্রভাব তখন পর্য্যন্ত সামান্যও ছিল কিনা, বলা যায় না। বাঙ্‌লার সামাজিক অবস্থা যখন এমন, সেই দিনে, ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দের এক সুপ্রভাতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নবদ্বীপে জন্ম গ্রহণ করিলেন। তিনি যৌবনে ভগবদ্গীতা ও ভাগবত পুরাণে গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী হইলেন। চব্বিশ বৎসর বয়ক্রম কালে, ভগবদ্গীতা ও ভাগবত পুরাণ অতিরিক্ত পাঠের ফলে শ্রীকৃষ্ণের প্রেমে উন্মাদ হইয়া শ্রীচৈতন্য সন্ন্যাসী হইয়া গৃহত্যাগী হইলেন। হুসেন শাহ তখন বাঙলার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। তাঁহার মন্ত্রী শ্রীরূপ ও সনাতন চৈতন্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল। বাঙলায় নতুন করিয়া আবার ধর্ম্মান্দোলন দেখা দিল; চৈতন্য-প্রভাবে ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের ও ইস্‌লাম ধর্ম্মের সিংহাসন টলিল।

কিংবদন্তী প্রচলিত আছে যে, চৈতন্যের জন্ম দিনে বৌদ্ধগণ তাহাদের ত্রাণ-কর্ত্তা পুনঃ আবির্ভূত হইতেছেন জানিয়া মহা ধূমধাম করিয়াছিল। বাস্তবিকই চৈতন্যদেবের

(১) রিয়াজ উস্‌সালাতিন।

(২) শ্রীরামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী। (৩) শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

(৪) শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়।

(৫) ষ্টুয়ার্টের বাঙ্‌লার ইতিহাস।

আবির্ভাবে আবার নতুন করিয়া বৌদ্ধাদর্শের বন্যা দেশে প্রবাহিত হইল ; নির্জিত বৌদ্ধেরা প্রাণ পাইয়া বাঁচিয়া উঠিল, দলে দলে মুসলমানত্ব বা হিন্দুত্ব ত্যাগ করিয়া চৈতন্যের প্রেম-পতাকাতলে আসিয়া সমবেত হইতে লাগিল। সহজিয়ারা রাধা-কৃষ্ণকে তাহাদের সাধনার অঙ্গীভূত করিয়া দেশে প্রেম আর ভক্তির বন্যা বহাইয়া দিল। সহজিয়া চণ্ডীদাস বলিয়াছিলেন—"সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।" চৈতন্যও বলিলেন—"ভজনের মূল এই নর বপুদেহ।" (১) সহজিয়ারা স্বকীয়া হইতে পরকীয়া যে শ্রেষ্ঠ, এবং পরকীয়া হইতে স্বকীয়াতে পরিবর্ত্তিত হইলে প্রেম যে দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, তাহা রাজপুত্র ও রাজকন্যার প্রেম-কাহিনী ব্যপদেশে "রত্ন-সারে" যাহা বলিয়াছে, তাহাই শ্রীচৈতন্য সমর্থন করিয়া বলিলেন—

"স্বকীয়া ভজনে নাহি বিচ্ছেদের ভয়।
তেকারণে ভাব তাতে নাহিক উদয়॥
উপপত্যে ভাব অনুরাগ প্রকাশ।
তেকারণে বৃন্দাবন রসের বিলাস॥" (২)
"সেই ভাব ভজে গোপী করে ব্যভিচার।" (৩)

এবং সহজিয়া ভজনায় গুরুই সর্ব্বেসর্ব্বা ; বৈষ্ণবেরাও গুরুবাদের চরমে উঠিল। "When Hari is angry, Guru is our protector, but when Guru is angry, we have none to protect us." (৪) এই গুরুপাদরজঃ ভারে বৈষ্ণবের সাধনা ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। শ্রীচৈতন্যদেব রাধাকৃষ্ণ প্রেম, গুরুবাদ, পরকীয়া-চর্চ্চা, বৈষ্ণব-সাধন-প্রণালী সমস্ত কিছুই বৌদ্ধদের হইতে লইয়াছিলেন। A. S. Geden বলেন—"His subsequent teachings also proved that he owes not a little to the example and practice of Buddism."..."Chaitanya's teachings apparently owed some of its characteristic features both of doctrine and practice to a Buddism which, though decadent, still exercised a considerable influence in Bengal and the neighbouring districts." কেহ কেহ দুঃসাহস করিয়া বলেন যে, ইস্‌লাম হইতে চৈতন্যদেব বৈষ্ণব সাধনার খোরাক জোগাইয়াছিলেন, এবং তিনি নিজেও ইসলাম দ্বারাই অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন ; তাঁহারা এ কথার স্বপক্ষে চৈতন্যের মানব-প্রেমকে দাঁড় করান ; কিন্তু এ সিদ্ধান্ত মোটেই সত্য নহে। Sir R. G. Bhandarkar বলেন, "A Spirit of Sympathy for the lower castes and classes of Hindu society has, from the beginning, been a distinguishing feature of Vaisnavsim." (৫) A. S. Geden বলেন—"Partly with the view, it is believed, of winning over those who have been attracted by the teachings of Buddism, as well as those to whom the grosser forms of the popular Hinduism were repellent, Chaitanya laid stress upon the doctrine of Ahimsa." এই অহিংসা নীতি বৌদ্ধেরা উপনিষদ হইতে গ্রহণ করিয়াছিল ; এবং একথা খুবই সত্য যে, ভাগবদ্‌ধর্ম্ম নানা ভাবে বৌদ্ধধর্ম্মের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল—যে ভগবদ্‌ধর্ম্মের পরবর্ত্তী কালের নাম বৈষ্ণব ধর্ম্ম। শ্রীহেমচন্দ্র রায়চৌধুরী এম-এ মহাশয় বলেন—"The Ahimsa doctrine foreshadowed in the Chhndagya Upanishad was afterwards taken up by the Buddists as well as the Jainas." (৬) এই সমস্ত যুক্তিতর্কের গণ্ডীর বাহিরে দাঁড়াইয়া চৈতন্যর মানব-প্রেমের দিকে তাকাইলে সহজে মনে হয়—এ তাঁহার নিজস্ব। কেহ কৃষ্ণ নাম উচ্চারণ করিলেই, সে শূদ্র হোক্ মুসলমান হোক্ ব্রাহ্মণ হোক্ তাহাকে তিনি উন্মাদের মতন মাথায় তুলিয়া নাচিতেন। এ প্রেম কাহারও নিকট হইতেই ধার করা নহে ; এই প্রেমের উদ্দামতা দেখিয়াই হয়ত একজন ইউরোপীয়ান তাঁহাকে

(১) অমৃতরসাবলী—শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় সম্পাদিত বৈষ্ণব গ্রন্থাবলী, ৩৫৫ পৃঃ। (২) দুর্ল্লভসার, ২২৩ পৃঃ। (৩) দুর্ল্লভসার, ২২০ পৃঃ। (৪) Sketch of the religious sects of Hindus P. 105.

(৫) Early History of the Vaisnava Sect P. 73.

(৬) Vaisnavism, Saivism and Minor religious sects.

আবদুল কাদের

হিষ্টিরিয়া রোগী আখ্যা দিয়াছেন। আর, মুসলমানদের তিনি খুব সুনজরে দেখিতেন না। এখানে হয়ত কেহ কাজীর কথা পাড়িবেন। অবশ্য একথা সত্য, পরে মুসলমান শাসন-কর্ত্তারা তাঁহার প্রচারের পথকে অনেকটা সহজ করিয়া দিয়াছিলেন; কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহারা ইস্‌লামের অনুপ্রেরণা তাঁহার জীবনে দিতে পারেন নাই। এখানে একটা ঘটনার উল্লেখ দ্বারা এই বক্তব্যটা সুস্পষ্ট করিতেছি। শ্রীচৈতন্য বলিতেছেন:

"হরিদাস, কলিকালে যবন অপার;
গো ব্রাহ্মণ হিংসা করে মহা দুরাচার।
ইঁহা সবের কোন্‌মতে হইবে নিস্তার?
তাহার হেতু না দেখিয়ে এ দুঃখে অপার।"
হরিদাস কহে—"প্রভু, চিন্তা না করিও,
যবনের সংসার দেখি দুঃখ না ভাবিও।
যবন সকলের মুক্তি হবে অনায়াসে;
হা রাম! হা রাম! বলি কহে নামাভাসে।
মহাপ্রেমে ভক্ত কহে হারাম! হা রাম!
যবনের ভাগ্য দেখ লয় সেই নাম।
যদ্যপি অন্যত্র সঙ্কেতে তার হয় নামাভাস;
তথাপি নামের তেজ না হয় বিনাশ।"
তথাহি নৃসিংহ পুরাণং—
দ্রংষ্ট্র দ্রংষ্ট্রাহতো ম্লেচ্ছ হারামেতি পুনঃপুনঃ।
উক্তাপি মুক্তিমাপ্নোতি কিং পুনঃ শ্রদ্ধয়া গৃনন্‌॥"—(১)

অর্থাৎ মুসলমান যে পুনঃপুনঃ হারাম (অসিদ্ধ) শব্দ উচ্চারণ করে, তাহাতেই তাহার অবশ্য উদ্ধার হইবে।—চৈতন্য মুসলমানকে "মহাদুরাচার" বলিয়াছেন, ব্রাহ্মণকেও "পাষণ্ড" বলিয়াছেন। যাহারা কৃষ্ণ ভজনা করে না, তাহারাই "চণ্ডাল"—ইহাই ছিল তাঁহার মত।

"শ্রীকৃষ্ণ...যেই ভজে সেই শ্রেষ্ঠ হয়।
যে না ভজে সে চণ্ডাল সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥" (২)

মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব এই কৃষ্ণ-জ্ঞান দ্বারাই অবধারিত হয়, তিনি বলিতেন। জাতাভিমান ব্রাহ্মণত্ব পৌরহিত্য, সকল কিছুমোর মূল তিনি উচ্ছেদ করিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন:

"যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা, সেই গুরু হয়।" (৩)

তাঁহার এই মনোবৃত্তি তাঁহার ভক্তগণের জীবনেও সার্থক হইয়াছিল; এবং তাহার উদাহরণস্বরূপ দেখিতে পাওয়া যায়, মৃত্যুর পর যবন "হরিদাসের পাদোদক ভক্তগণ" (৪) সাগ্রহে পান করিতেছেন।

সহজিয়ার সঙ্গে কণ্ঠ মিলাইয়া শ্রীচৈতন্য বলিলেন—

"সাধন ভক্তি হৈতে হয় রতির উদয়;
রতি গাঢ় হৈলে তার প্রেম নাম হয়।
প্রেম বৃদ্ধি ক্রমে তার স্নেহ মান প্রণয়;
রাগ অনুরাগ ভাব মহাভাব হয়॥" (৫)

এবং ইহারই উপর ভিত্তি করিয়া সহজ-সাধনা দেশে অবাধে চলিতে লাগিল। অসংখ্য গানে বাঙ্‌লার পল্লী ভরিয়া উঠিল। বহু মুসলমান বৈষ্ণব কবি জন্মগ্রহণ করিলেন। বহু গানের দলের সৃষ্টি হইল। দেশের তখন এমনি অবস্থা হইল যে, মুসলমান বৌদ্ধ হিন্দু চিনিবার জো রহিল না; একজন বৌদ্ধ বাউল-পন্থীর বহু মুসলমান শিষ্য, অথবা একজন মুসলমান পীরের বহু হিন্দু শিষ্য। তখন বাঙ্‌লা দেশে সংকীর্ত্তনের বন্যাও বহিতেছে:

"জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈত চন্দ্র জয় গৌর ভক্তবৃন্দ॥"...(৬)

ইত্যাদি বলিয়া কৃষ্ণ-প্রেম ও কৃষ্ণভক্তগণের জয়গান গাহিয়া খোল করতাল বাজাইয়া নেড়া নেড়ীর দল তখন বাঙ্‌লায় তোলপাড় তুলিয়া দিয়াছে। কেহ কেহ বলেন, শ্রীচৈতন্য এই কীর্ত্তন গানের ধারা বৌদ্ধদের হইতে নিয়াছিলেন; কারণ, কাহ্নপাদের চর্য্যাপদগুলিকেও নাকি কীর্ত্তনের সুরে গাওয়া যায়। যাহা হউক, চৈতন্যের এই কীর্ত্তন আর প্রেমের বন্যায় বজ্রযানমার্গ, মন্ত্রযানমার্গ, সহজযান সবই ভাসিয়া গেল, একাকার হইয়া কৃষ্ণ-প্রেমে মাতিয়া উঠিল। এই প্লাবনে একমাত্র নাথ-মার্গ আপনার স্বাধীন সত্তা লইয়া টিঁকিয়া রহিল। নাথ-পন্থী-মুসলমান সিদ্ধাইরা যে সব

(১) চৈতন্যচরিতামৃত—৬৯৫ পৃঃ। (২) পাষণ্ডদলন—৩৩৭ পৃঃ।

(৩) হরিভক্তি বিলাস। (৪) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—৭৭৮ পৃঃ। (৫) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—৪৫৪ পৃঃ। (৬) ভক্তিতত্ত্ব সার দ্রষ্টব্য।

বাউলের দল সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহাদের গানে সেই যুগ পর্য্যন্তও ইস্‌লামের কোনো রেখাপাত হইল না। যে সমস্ত বৌদ্ধ বিভিন্ন রাগ-রাগিণীতে প্রচার গাহিয়া বেড়াইত, মুসলমান পীরগণের নেতৃত্বে তাহাদের দ্বারা ইতিপূর্ব্বেই মারফতী-গানের দলের সৃষ্টি হইয়াছিল; কিন্তু সেই গানেও প্রকৃত ইস্‌লাম আসন লাভ করিতে পারে নাই।

এ যাবৎ বাঙ্‌লায় যে সমস্ত সম্ভ্রান্তবংশীয় বিদেশী মুসলমান আগমন করিয়াছিলেন তাঁহারা ইস্‌লামের শরীয়তকে কড়াকড়ি ভাবে পালন করিতেন। এই বিদেশাগতের সংখ্যাও নিতান্ত কম ছিল না। (১) কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁহাদের জীবনাদর্শ দীক্ষিতদের জীবনের উপর তেমন কোনো প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই; দীক্ষিতদের আদর্শের উন্নয়নে এবং জীবনের শ্রীবৃদ্ধিতে তাঁহাদের আকর্ষণ সামান্যই উল্লেখযোগ্য। তখনকার এই সৈয়দ পাঠান কাজী প্রভৃতিরা তথাকথিত মুসলমান নামধারীদের অবশ্যই ঘৃণা করিত।

"রোজা নামাজ না করিয়া কেহ হইল গোলা।" (২)

যাহারা রোজা নামাজ করিত না, তাহারা তাঁহাদের কাছে অশিক্ষিত ও নীচ বলিয়া ঘৃণিত হইত। কিন্তু কাজী বা সৈয়দদের পক্ষ হইতে তথাকথিত সহজিয়া মুসলমানদের নমাজ রোজা পরিপালনের জন্য কোন প্রকার প্রচেষ্টা হইয়াছিল বলিয়া জানা যায় না। এই নীচশ্রেণীর মুসলমানেরা, শরীয়তের নয়, তত্ত্বের সাধনা করিত। তাহাদের গুরু সাধকেরা যে, ইস্‌লামের বিধি-ব্যবস্থা সম্বন্ধে ওয়াকিফ্-হাল ছিলেন না, এমন নয়। কিন্তু তাঁহারা সেই সমস্ত বিধি-বিধানের এমনি সব ব্যাখ্যা দিয়াছিলেন যে, তাহার পরিণাম Puritan Islam এর আদর্শের পরিপন্থীই ছিল। সুফীরা যেমন হজ্জে যাওয়ার অর্থ করিত "to journey away from sin," হজ্জের পোষাক (ইহ্‌রাম) পরিধানের অর্থ করিত "to cast off with one's everyday clothes all sensual thoughts and feelings," তেমন করিয়াই এ দেশীয় মুসলমান সাধকরা মক্কা মদিনা আল্লা নবী রোজা নমাজের এক একটা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দিত এবং তদ্দ্বারা শরীয়তের প্রয়োজনীয়তাকে ক্ষুণ্ন করিত। 'শরীয়ত' এবং 'মারফতে' একটা স্বাভাবিক antagonism আছে। ভারতের দীক্ষিত-সাধারণেরা মারফতকেই গ্রহণ করিয়াছিল। আর ইহারই জন্য রাধা কৃষ্ণের লীলা-কথা আজ পর্য্যন্ত মুসলমানদের জীবনে বদ্ধমূল হইয়া আছে; "জন্ম জন্ম ভক্ত রাধা হরির চরণে" বলিয়া কানু ফকীরের মতন বহু মুসলমান ফকীর আবির্ভূত হইয়াছিল এবং আজিও হইতেছে।

কানু ফকীর বা আলী রাজা মরহুম দেড়শত বৎসরেরও আগেকার লোক।

"নানা ভেল করি শুদ্ধ সার যোগী নহে।
রছুলী হাল বিনা ফকির শুদ্ধ নহে॥"

এই উক্তি তিনি করিয়াছেন সত্য, কিন্তু এই রছুল ঠিক আরবের রছুল নহেন। এই রছুলকে তিনি এক ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা তাত্ত্বিকের বেশে ভূষিত করিয়াছেন।—রছুল বলিতেছেন:

"অপরূপ কথন শুন আলী তুমি।
প্রভুর গোপন রত্ন তত্ত্ব সে কাহিনী॥
এই সব বৃথা নহে জান শুদ্ধ সার।
মোর পাছে পয়গম্বর না জন্মিব আর॥
মোর পরে হইবেক কবি ঋষিগণ।
প্রভুর গোপন রত্নে বান্ধিবেক মন॥
শাস্ত্র সব ত্যাগ করি ভাবে ডুব দিয়া।
প্রভু প্রেমে প্রেম করি রহিবে জড়িআ॥" (১)

এই আদর্শের সাধকেরা বলিলেন—মানুষের জন্য শাস্ত্রের কোনো প্রকার আবশ্যকতা নাই, তাহারা নিজেদের শক্তি-সাধনায় আল্লাহর উপলব্ধি করিবে। সেই উপলব্ধির জন্য পয়গম্বরেরও প্রয়োজন হইবে না, অতএব হজরতের পর আর পয়গম্বর জন্মাইবে না।—তাঁহারা সহজিয়ার আদর্শে প্রেমকে সর্ব্বোচ্চ স্থান দিলেন; বলিলেন, একমাত্র মানুষকে প্রেম-দান দ্বারাই আল্লাহর সান্নিধ্যলাভ ঘটিবে।

(১) মুর্শীদাবাদের দেওয়ান-লিখিত "The Origin of the Mussalmans of Bengal" পুস্তক দ্রষ্টব্য। (২) কবিকঙ্কণ চণ্ডী। মুকুন্দরাম ১৬শ শতাব্দীর শেষ ভাগের লোক।

(১) জ্ঞানসাগর

আবদুল কাদের

"বেশ্যাকুলে ছিল নারী মৈক্ষ শকনাবাত।
ভক্ত হৈল দেওয়ান হাফেজ অধিক তাহাত॥
হাল-ওয়ানী সুত ছিল মোবারক সুন্দর।
ভক্ত হৈল সেই রূপে বু'আলী কালন্দর॥
পরমা সুন্দরী ছিল কৈবর্ত্ত কুমারী।
নবী ছোলেমান ভক্ত পাই সেই নারী॥
এই মত বহুৎ তপস্বী ভক্ত হইয়া।
যথা রূপ তথা ভাবে রহিল মজিআ॥
রূপ বিনু প্রেম নাহি, ভাব বিনু ভক্তি।
ভাব বিনু লক্ষ্য নাই, সিদ্ধি বিনু মুক্তি॥" (১)

এই সমস্ত উক্তিতে তিনি মানুষ-ভজনাকেই স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিলেন। বৈষ্ণব সহজিয়ার প্রেমাদর্শের সঙ্গে তাঁহার এই প্রেমের সুনিবিড় সাদৃশ্য।—সুফী-সাহিত্যে আয়নাতে আপনার ছবি দেখিয়া আপনার রূপে আপনি মুগ্ধ হইয়া প্রেমের পীড়নে আল্লাহর হজরৎ-সৃজনের কাহিনী আছে। আলী রাজাও এই একই কথা বলিলেন:—

"প্রথমে আছিল প্রভু এক নিরঞ্জন।
প্রেম-রসে ডুবি কৈল যুগল সৃজন॥
প্রেম-রসে ভুলি প্রভু যাহাকে সৃজিলা।
মোহাম্মদ করি নাম গৌরবে রাখিলা॥" (২)

পল্লীর নিরক্ষর মারফতী-পন্থীও এই কথাটিই তাহার গানে গাহিল:—

"নিরাকারে আহাদ নামে আলেপে ছিল খোদা।
সেই আলেপ হৈতে আহম্মদ আপনে করিল পয়দা॥
সফিওল উম্মতে নবি মাশুকে খোদা—
দীলে জানে কর ফেদা।
নবীজি পয়দা হ'য়ে করীম নামটি জবানে করিল আদা।
খোদা সেই নামেতে মগ্ন হ'য়ে নাম রাখিলেন মোহাম্মদা॥"

শেখ পরাণ নামক জনৈক বাউল কবি বহু পূর্ব্বে এই কথারই প্রতিধ্বনি করিয়া গাহিয়া গিয়াছেন:

"আছিল গোপনে সে নৈরূপ আকার।
নিজ রূপে নিরঞ্জন হইল প্রচার॥
পুনর্ব্বার নিরঞ্জন দেখি একাকার।
নিজ অংশে প্রচারিল নুর অবতার॥"

আলী রাজা "বৈষ্ণব সবের বন্ধু" বলিয়া বৈষ্ণবের সাধন প্রণালীকেই গ্রহণ করিবার ইঙ্গিত করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ, তাঁহার সমসাময়িক বাঙ্‌লায় বিপুলভাবে প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে বৈষ্ণব-মনের চর্চ্চা চলিতেছিল। নাথ-পন্থার প্রভাবও তখন অল্প নহে, এবং নাথ-মনের চর্চ্চার ফলেই গ্রাম-দেবতার পূজা, পীর-ভক্তি, দরগাহ-পূজা, মানতের পূজা, গানের মজ্‌লিশ ইত্যাদি ক্রমশঃ দেশে বাড়িয়া চলিয়াছিল, কিন্তু হঠাৎ ওহাবী-আন্দোলন আসিয়া এ সবের গতি-পথে প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইল।

* * * *

ওহাবী-নেতা সৈয়দ আহমদ ঘোষণা করিলেন—হজরতের বিধান মূলতঃ দুইটি জিনিষের ওপর ন্যস্ত, প্রথমতঃ কোনো প্রাণীতেই আল্লাহর গুণাবলী কল্পনা করিবে না, দ্বিতীয়তঃ তেমন সব আদর্শ বা ক্রিয়াকাণ্ড আবিষ্কার করিবে না যাহা হজরতের বা তাঁহার উত্তরাধিকারী ও খলিফাদিগের আমলে প্রচলিত ছিল না। তিনি ১৮২২ খৃষ্টাব্দে মক্কাশরীফে গমন করেন ও আবদুল ওহাবের শিষ্য হন। ভারতে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি পীরদিগের এবং 'কাফের'দিগের বিরুদ্ধে 'পবিত্র' জেহাদ ঘোষণা করেন। পাটনা এই আন্দোলনের কেন্দ্র হয়। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে সৈয়দ আহমদ ঘোষণা করিলেন যে, শিখ্‌দিগের বিরুদ্ধে জেহাদ করিবার সময় আসিয়াছে। যুদ্ধও আরম্ভ হইল; বাঙ্‌লা বিহার হইতে মানুষ ও অর্থের সাহায্য প্রচুর ভাবে আসিতে লাগিল; ১৮৩০খৃষ্টাব্দে ওহাবীরা পেশোয়ার অধিকার করিল। এই জয়ে বাঙ্‌লার ওহাবীরা তিতু মিঞার নেতৃত্বাধীনে বিদ্রোহ করিল; ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে তাহারা নদীয়া, ২৪ পরগণা, ফরিদপুর প্রভৃতি স্থানে লুটপাট ও 'কাফের' ধ্বংস করিতে লাগিল।

তিতু মিঞা ও সৈয়দ আহমদ নিহত হইলে পর, ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে এই আন্দোলন পুনরায় আত্মপ্রকাশ করে। পাটনাবাসী দুইজন প্রচারক—ওলিয়াৎ আলী ও এনায়েৎ আলী বাঙ্‌লায় পদার্পণ করেন। এনায়েৎ আলী

(১) জ্ঞানসাগর।
(২) জ্ঞান সাগর।

তাঁহার সমস্ত শক্তি সংহত করিয়া বিশেষ ভাবে মালদহ, বগুড়া, রাজসাহী, পাবনা, নদীয়া ও ফরিদপুরে প্রচার কার্য্য চালান। জৌনপুরের মৌলানা কেরামত আলী এই আন্দোলন পূর্ব্বদিকে ফরিদপুর হইতে ঢাকা ময়মনসিংহ নোয়াখালী এবং বরিশালে নিয়ন্ত্রিত করেন। হায়দরাবাদের জয়নাল আবেদীন—যিনি ওলিয়াৎ আলী কর্ত্তৃক দক্ষিণ-ভারত ভ্রমণ কালে ওহাবী দলভুক্ত হন, ত্রিপুরা, শ্রীহট্ট প্রমুখ জেলায় প্রচার-কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন। এতদ্ভিন্ন অসংখ্য ছোট ছোট প্রচারক ছিলেন। পূর্ব্বোক্তবারের আন্দোলনের পর ইঁহারা গভর্ণমেণ্টের আইনের ভয়ে ওহাবী নাম বদ্‌লাইয়া নিজদিগকে আহ্‌লে হাদীস বা গয়ের মোকাল্লেদ নাম দিলেন। ইঁহারা ইমামদের নির্দ্দেশ অগ্রাহ্য করিলেন; বিবাহে বাদ্য বাজানো, মসজীদে সিন্নি দেওয়া, সমস্তকেই অসিদ্ধ বলিলেন।

এই আন্দোলন-কারীরা বাঙ্‌লার জনসাধারণ মুসলমানকে ইস্‌লামের শরীয়ত পালনে বাধ্য করিতে লাগিল। গায়ের জোরে সঙ্গীত বাদ্য সমস্তই তাহারা বন্ধ করিয়া দিতে উদ্যত হইল। এতকাল যে ফকিরী গানের দল তত্ত্বকথার বেশাতিকেই একমাত্র শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিয়াছিল, তাহারা এ অত্যাচারে ব্যস্ত সমস্ত হইয়া সুর একটু বদ্‌লাইয়া তখন গাহিল—

"শরীয়ৎ না চিনিলে মারফৎ কোথাও না মিলে।"

এতকাল যে গানের দল হজরতের সাধন-আদর্শের প্রয়োজনীয়তা উপেক্ষাই করিয়াছিল, তাহারা হজ্‌রৎকে মুখে মুর্শীদ স্বীকার করিয়া তখন গাহিল—

"আমি আর কোনো ধন চাইনা,
মুর্শীদ ও মায়া-নদী কার জোরে তরি।
যখন আসবে শমন, হাতে গলায় বাঁধবে তখন;
রসুল বিনে কে করিবে উদ্ধার ও,
তখন আমি আর কার আশা করি॥"

পরকীয়া-চর্চ্চা আর তান্ত্রিক বামাচারের স্রোতে তখন যথাসম্ভব ভাঁটা পড়িল। সহজ-সিদ্ধি মুসলমান গাহিল—

"নফ্‌ছের উলটে নাও বাইও, রে মনুয়া।
নফ্‌ছের মুখে কাটা জিন্ দিয়া ঘোড়ার কোচ্‌মান ধরো।
আস্তে মারে ধরো তারে, দিনে রাতে বাইও॥
নফ্‌ছে কাফের দিল আল্লা আদমের কালেবে।
নফ ছেরে যে মানাইতে পারে, তারে লইব কোলে॥"...

এই ওহাবী-আন্দোলনের বেগ কিন্তু অত্যল্পকালের মধ্যেই এদেশের ইতিহাসকে একেবারে অস্বীকার করার ফলে স্বাভাবিক ভাবে মন্দীভূত হইয়া গেল। যাঁহারা এই আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় ছিলেন, তাঁহারাও অবশেষে আর পীর-পরিপন্থী না হইয়া পীর-পন্থী হইলেন। মৌলনা কেরামৎ আলী পরে মজহাব ও পীরবাদকে সমর্থন করিয়াই কথা কহিলেন, নিজেও পীরানি আরম্ভ করিলেন। তিনি হয়ত এদেশের চিত্তের পরিচয় পাইয়া পরে ইহার প্রয়োজনীয়তাকে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার এই পীরানি অন্য আদর্শের; ইহাদ্বারা ধর্ম্ম-প্রচারের সহজ পন্থা অবলম্বিত হইল। কিন্তু তাহাতে লাভ হইলনা। দেশে বহু শরিয়তী পীরের আবির্ভাব হইল, তাহারা অদ্ভুত অদ্ভুত তত্ত্বের বেশাতি করিতে লাগিল। তদুপরি তরিকৎ-পন্থী বলিয়া একদল পীরের আবির্ভাব হইল; ইহারা নমাজ রোজা অবহেলা করিল না, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে গীতি বাদ্যও চালাইল। ইহারা মানুষের চারি অবস্থা বিবৃত করিল—(১) মানুষ যখন শয়তানীতে লিপ্ত থাকে, তখন তাহার অবস্থা—ওসোয়াস; (২) মানুষ যখন স্বার্থের সংসারের কাজে এবং স্বার্থের বা বেহেস্ত-প্রাপ্তির মানসে নামাজ রোজায় লিপ্ত থাকে তখন সে নফ্‌সের অধীন; (৩) মানুষ যখন আল্লাহ্‌তায়ালার ভয়ে নাবালকের মতন অন্ধভাবে শরীয়তের সমস্ত বিধি বিধানকে হুবহু পালন করে, তখন সে এল্‌হামের অধীন, সে তখন ফেরেস্তার দরজায়, সদাসর্ব্বদা তাহার অন্তরে তখন জিকির চলিতে থাকে; (৪) এশ্‌ক্, অর্থাৎ মানুষ তখন প্রেমে আল্লাহতায়ালতে নিমজ্জিত হইয়া স্বয়ং আল্লাহ। আল্লাহ হজরৎকে প্রেম দ্বারা সৃজন করিয়াছিলেন, এবং প্রেম করেন, মুরীদকেও পীরকে প্রেম করিতে হয়, অতএব পীর মুরীদের নিকট মোহাম্মদ

আবদুল কাদের

স্বরূপ হইল; শিষ্যেরা পীরকে উদ্দেশ করিয়া গান গাহিল—

"নাবিজী, আসিবা নি আমার আসরে॥
আগ্ বাজারে আইল যারা, লাভ করিয়া গেল তারা,
শেষ বাজারে এসে আমি বিকি কিনির দর পাইলাম না॥
সেই পারে মথুরার বাজার, পার হইয়া যায় সব দোকান দার,
আমি ডাকি গুরু গুরু—
গুরুগো তোমার নামের কলঙ্ক যে রয়না॥"

বাঙ্‌লার পল্লীতে এই তরীফৎ-পন্থী নামধারী বহু পীরের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়; শরীয়তের বিধি-বিধান ইহারা অবশ্য অনেকটাই পালন করে, কিন্তু ইহাদের মন চির-বৈষ্ণব। ইস্‌লামী শাস্ত্রে অত্যন্ত পারদর্শী পীরেরাও বৌদ্ধ বা বৈষ্ণব কৃষ্টি ছাড়াইয়া উঠিতে পারে নাই। চট্টগ্রাম বিভাগ জুড়িয়া মাইঝভাণ্ডারের ফকীরের যে বিরাট দল আছে, তাহাদের গানে শূন্যবাদ, মায়াবাদ, গুরুবাদ, লীলাবাদ, সমস্ত কিছুই পর্য্যাপ্ত ভাবে বিদ্যমান; ইস্‌লামের সামান্য প্রভাব সেই গানে আছে কি না আবিষ্কার করা দুষ্কর। আর তাহাদের সাধন-প্রণালীও অনেকটা নাথ-পন্থীদের সাধন-প্রণালীর অনুরূপ। তবে তাহারা তাহাদের গানে ইস্‌লামী শব্দাবলীই যাহা কিছু ঢুকাইয়াছে। এতকাল বাউল ফকীররা গাহিয়াছে, মানুষের দেহের মধ্যেই গঙ্গা যমুনা কাশী বৃন্দাবন, ওহাবী আন্দোলনের পরের ফকীররা গানের ভাবাদর্শকে অবিকল অক্ষুণ্ণ রাখিয়া শুধু মাত্র কাশী বৃন্দাবনের স্থানে মক্কা মদীনা বসাইয়াছে; কৃষ্ণ স্থানে মহাম্মদ (১) বসাইয়া তেমনি সুরে গাহিয়াছে—

"না বাসিও পর, ওরে বন্ধু, না বাসিও পর॥
জন্ম জন্ম জানি আমি তুমি বন্ধু মোর,
ওরে বন্ধু, না বাসিও পর॥
অধীন গোনাহ্‌গার আমি, নাই রে আমার কূল।
অকূলে পড়িয়া ডাকি মোহাম্মদ রসুল।
ওরে বন্ধু, না বাসিও পর॥"

তাহারা হজরৎকে—"ও আমার শ্যামরিয়ারে—" সম্বোধন করিয়াছে: কৃষ্ণের বাঁশীর স্থানে কালামের বাঁশী, বৃন্দাবন-বিহারী স্থানে মদিনা-বিহারী, এমনি করিয়া মূল উদ্দেশ্য-আদর্শকে অবিকৃত রাখিয়া শুধু মাত্র শব্দাবলীর পরিবর্ত্তন করিয়াছে। ইহা করিয়া ইস্‌লামের বিকৃত ব্যাখ্যাই ইহারা জন-সমাজে প্রচার করিয়াছে এবং করিতেছে।

ওহাবী-আন্দোলনের পাণ্ডারা আন্দোলনকে শেষে আর পরিচালনা না করিলেও দেশের কাঠমোল্লা মৌলভীরা শরীয়ৎকে চালাইবার জন্য জনসাধারণের উপর অত্যন্ত দৌরাত্ম্য করিতে থাকে। তাহাদের দ্বারা পল্লীবাসিন্দারা অতিশয় নির্ম্মমভাবে ধর্ম্মের নামে অত্যাচারিত হইতে লাগিল। তাহাতে মানুষের বাঁচিয়া থাকিবার সহায়-সম্পদ —সঙ্গীত আনন্দ ইহার সমস্তই পল্লী হইতে বিদায় নিল, কিন্তু পল্লীজীবনের কোনো উৎকর্ষই সাধিত হইল না। পল্লী-জীবন হইল শুষ্ক নিরানন্দ, সেখানে শরীয়ৎ ও ফলপ্রসূ বা গ্রহণীয় হইল না, হইতে পারে না। এই সমস্ত মোল্লা মৌলবীর প্রধান দোষ ছিল এই যে, ইঁহারা এ দেশের পারিবেষ্টন,এ দেশের মানুষের চিত্ত,এ দেশের অতীত, কোনো কিছুর দিকে মুখ তুলিয়া চাহিতেন না; ভিন্ন-পরিবেষ্টনে পুষ্ট সেমিটিক-মনের সৃষ্ট ইস্‌লামকে আর্য্য দেশে, আরব হইতে অন্য ধরণের পরিবেষ্টনে হুবহু চালাইতে নিষ্ঠুর প্রচেষ্টা করিতেন—যাহার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম দাঁড়াইল শোচনীয় ব্যর্থতা।

বাঙ্‌লা দেশের জলবায়ুই এ দেশের মানুষের চিত্তকে চির-কোমল করিয়া রাখিয়াছে, তাই আদিকাল হইতে যত নতুন নতুন ধর্ম্মমত এদেশে জন্ম ও প্রবেশ লাভ করিয়াছে, dogmaticই হোক্ আর ভক্তিরই হোক্, তার কিছুই প্রত্যাখ্যাত না হইলেও এ দেশের মানুষ নিজেদের বৈশিষ্ট্যকে ক্ষুণ্ণ করিয়া কোনো কিছুকে গ্রহণ করে নাই। এ ধারা শুধু বাঙ্‌লা দেশ সম্বন্ধেই খাটে না, সমস্ত দেশের

(১) এই ফকীরদের অনেকেই বিশ্বাস করিয়া থাকে যে কৃষ্ণ ও মহাম্মদ অভিন্ন ব্যক্তি।

ইতিহাসেরই এই কথা। তাই ব্রাহ্মণ্য আন্দোলন, ওহাবী আন্দোলন এই দেশে আসিলেও এই দেশের সহজিয়া মন তাহার মূল আদর্শ হইতে বিচ্যুৎ হয় নাই, নিভৃতে গোপনে সে তাহারই সাধনা করিয়াছে। ওহাবী আন্দোলনের আগে যেমন অসংখ্য পীর মুর্শীদ প্রেম ও তত্ত্বের গান গাহিয়া গিয়াছে, তেমনি পরেও অসংখ্য সাধক ফকীর আবির্ভূত হইয়া তাহাদের প্রেমের তত্ত্বকে প্রচার করিয়া গিয়াছে এবং যাইতেছে। বৈষ্ণব বা সহজিয়ার দেহতত্ত্ব ও আত্মতত্ত্বই তাহাদের গানে গানে রূপ লাভ করিয়া উঠিয়াছে। এখানে পাগ্‌লা কানাইর কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইনি যশোহর জেলার ঝিনাইদহে জন্মগ্রহণ করেন।

"হায় হায় কি মজার দোকান পেতেছে নিতাই
তোরা কেউ দেখ্‌তে যাবি আয়।"

গাহিয়া গাহিয়া তিনি যশোহর হইতে ময়মনসিংহ পর্য্যন্ত সারাজীবন বিচরণ করিয়া গিয়াছেন। দেহতত্ত্ব বিষয়ক তাঁহার অনেক গান আছে। নিম্নে একটী গানের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি:—

"শোনো ভাই, আমি রথের কথা বলে যাই।
এক কামিলকর উত্তম ব্যক্তি দীন বন্ধু সাঁই॥
দিয়ে তিন শ ষাট ঘোড়া
রথ করে খাড়া দুই চাকার পর;
এমন রথ কভু দেখি নাই।
আছে কুড়ি চন্দ্র আর দশ ইন্দ্র, রথে বিরাজ করে
চৌষট্টি গোঁসাঞি॥" (১)...

বাঙ্‌লার ফকিরীদলের লোকেরা যে সমস্ত তত্ত্বের গান গাহিয়াছেন, নাথ-মার্গের লোকেদের প্রভাব তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

"গুরু মীন নাথ রে উল্টা উল্টা ধারা।
পুকুর মরে ধান শুকাইয়া, উগার তলে বাড়া॥
গুরুহে, আম গাছে শৈলের পোনা, বগায় ধরি খায়।
তা দেখিয়া খুদি পিপ্‌ড়া পল' লইয়া যায়॥...(২)

পল্লী-বাঙ্‌লায় এই ধরণের অদ্ভুত কথার গান ভূরি ভূরি পাওয়া যায়। নিম্নে একটী সাধারণ্যে বিখ্যাত গানের উল্লেখ করিতেছি:—

"গুরু আমার আলেক সাঁই ও।
ও মুর্শীদও; বাজারেতে নাই মানুষ, ঘর চালে চালে
মুর্শীদ, ঘর চালে চালে।
অঙ্কলে যে দিছে দোকান, খরিদ করে কালে ও॥
ও মুর্শীদ ও; লাহর দরীয়ার মাঝে ভাইস্তা ফিরে পানা
মুর্শীদ, ভাইস্তা ফিরে পানা।
তিন ফকীরে পড়ে নমাজ, তিন ফকীরের মানা ও॥
ও মুর্শীদ ও; সমুদ্দরের তলে পাথর, পাথর খাইল ঘুনে
মুর্শীদ, পাথর খাইল ঘুনে।
মা'র বিয়ার দিন পিতার জনম হইল কেমনে ও॥"

গোরক্ষনাথের যুগে যে-সমস্ত তত্ত্ব-প্রশ্ন তৎকালীন অনুসন্ধিৎসু মানুষের চিত্তে প্রকাশ লাভ করিয়াছিল, আজিকার যুগের বাউল ফকারও সেই সব প্রশ্ন বার বার উত্থাপন করিতেছে। গোরক্ষনাথের জন্মস্থান পাঞ্জাবের জলন্ধরে—অনুমান করা যাইতে পারে। তিনি গুরু মীননাথের উদ্ধারার্থে "কদলীনগরে" আসেন। আমাদের দেশে আজ পর্য্যন্তও গোরক্ষনাথকে গো-রক্ষাকারী ভাবিয়া মানত দিবার প্রথা প্রচলিত আছে। (৩) তাহারই উক্ত আগমন-কাহিনী ব্যপদেশে বিরচিত "গোরক্ষবিজয়ে" যে কয়েকটী তত্ত্ব-প্রশ্ন স্থান পাইয়াছে, যথা—

"গুরু তুমি কোন্ জন শিষ্য হও কার।
জল ভূমি আর আকাশ রহিছে কোন্ জোরে॥
দীপ নিভাইলে জ্যোতি কোথা গিয়া রয়।
কোথায় জন্মিলা তুমি কোথায় হৈলা স্থির॥"..

তদনুরূপ তত্ত্ব-প্রশ্ন আজিকার দিনের পল্লীগানেও প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়; যথা—

মুর্শীদ, কও সত্য-বাণী॥
অন্ধকার ধন্ধকার খোয়া নৈরাকার

(১) বাঙালীর গান— ৭৬৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

(২) শেখ ফয়জুল্লা মরহুম কৃত 'গোরক্ষ-বিজয়ের" ভূমিকা

(৩) "On the Cult of Gorakshanath in Eastern Bengal" by Sarat Chandra Mitra M. A.—Journal of the Dept of Letters, C. U. Vol. XIV. 1927 দ্রষ্টব্য।

আবদুল কাদের

গো মুর্শীদ, খোয়া নৈরাকার।
কোন্ বেলা কোন্ কারে ছিলাম, তার না পাইলাম ঠার,
গো মুর্শীদ, তার না পাইলাম ঠার॥
পঞ্চমাসের পঞ্চ আত্মা, ছয় মাসের জীব
গো মুর্শীদ, ছয় মাসের জীব।
দশ মাসের দশ দিন, আমি খাইছিলাম কী চীজ,
গো মুর্শীদ, খাইছিলাম কি চীজ॥
পানির তলে জড়া ঘাস, সেও ওঠে দিশে,
গো মুর্শীদ, সেও ওঠে দিশে।
গো মুর্শীদ, মুখ মারিল কিসে॥
ধানের মাঝে ধুরা আর সর্ষের মাঝে তেল,
গো মুর্শীদ, সর্ষের মাঝে তেল।
আণ্ডার মাঝে বাচ্চা হৈল, প্রাণ কেমনে গেল,
গো মুর্শীদ, প্রাণ কেমনে গেল॥"

শাহলালন ফকীরের নাম এখন আর শিক্ষিত বাঙালীর কাছেও অপরিচিত নহে। তিনিও তাঁর গানে বৈষ্ণব আর বৌদ্ধের তত্ত্ব কথাই গাহিয়া গিয়াছেন:—

"যার নাম আলেক মানুষ আলেকে রয়।
শুদ্ধ প্রেম রসিক বিনে কে তারে পায়॥
রস রতি অনুসারে
নিগূঢ় ভেদ জানতে পারে,
রতিতে মতি ঝরে
মূল খণ্ড হয়॥
লীলায় নিরঞ্জন আমার
আধলীলা কল্লেন প্রচার,
জান্‌লে আপন জন্মের বিচার
সব জানা যায়॥
আপনার জন্ম-লতা
জান্ গে তার মূল কোথা,
লালন কয় হবে সেথা
সাঁই পরিচয়॥"

একদাশ শতাব্দীতে এবং তাহারও পরে বৈষ্ণব প্রচারকগণ ভক্তি ও প্রেম-ধর্ম্ম দ্বারা বিশেষ ভাবে মায়াবাদকে উচ্ছেদ করিবার প্রয়াস পাইয়াছিল। বৌদ্ধেরা মায়াবাদকে স্বীকার করে; বাঙালী মুসলমানের জীবনেও এই মায়াবাদ আশ্চর্য্য ভাবে অধিকার গ্রহণ করিয়া আছে; তাহারা

"ও মৌলা, আখের দুনীয়া ফানা ও,
দুনীয়া ধন্ধের বাজি ও॥"

গাহিয়া সংসারের অনিত্যতা আর অনিশ্চয়তাকেই প্রচার করিতেছে। বৌদ্ধদের গুরুবাদকে সমর্থন করিয়া তাহাকেই তাহারা অন্যভাবে ঘুরাইয়া বলিতেছে—

"বে-তল্‌পিনা বে-মুরীদা যেবা বান্দা মরে,
শয়তানে করিব মুরীদ কবরের ভিতরে;
সোওয়া হাত কাপড় দিয়া চান্দুয়া টাঙাইয়া,
গুপ্ত ভাবে করবো মুরীদ কবরে বসাইয়া॥
মুর্দার কবরে দিয়া মোল্লা যাইব ঘর,
ক্রুদ্ধ হৈয়াচার ফিরিস্তা মিলিব কবর;
কবরের আজাবে বান্দার জীবন না থির,
—হেন কালে কোথায় রইলা দয়াল উস্তাদ পীর॥"

এই সমস্ত সাধকরা সাধারণ কথাকে এমনি তত্ত্ব-সঙ্কুল করিয়া গাহে যে, তাহার রহস্য-ভেদ করা দুঃসাধ্য ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়। যাহারা তাহাদের তত্ত্ব-সাধনাকে ঘৃণার চক্ষে দেখে, নমাজেও রহস্য বর্ত্তমান—এই উদ্দেশ্য করিয়া তাহারা সেই সমস্ত গোঁড়াদের লক্ষ্য করিয়া গায়—

"খোদার মর্মীন তুমি খিল্‌কা দিলা গাও।
কোন্ মুখে মাগো ভিক্ষা, কোন্ মুখে খাও॥
কোন্ নদীর পানি দিয়া মর্দ্দে ওজু করে।
নমাজ পড়িয়া মিঞা সালাম জানাও কারে॥"—

আলী রাজা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তীব্র ভাষায় বলিয়া গিয়াছিলেন—

"সর্ব্ব শাস্ত্র ত্যাগ করি ভাবে ডুব দিয়া।
প্রভু প্রেমে প্রেম করি রহিবে জড়িআ॥

এত বড় দারুণ নিগ্রহ-বাহী ওহাবী আন্দোলনও সেই ভাবের বিপর্য্যয় ঘটাইতে পারিল না। বাউল কবি হাছন রাজা ওহাবী আন্দোলনের বেগ থামিতে না থামিতেই গাহিলেন—

"খোদা মিলে প্রেমিক হইলে
পাবেনা পাবেনা খোদা নমাজ রোজা করিলে॥"

হাছন রাজার বাউল ও মুর্শীদি গান গুলিতে হিন্দু উপনিষদের ছায়া আশ্চর্য্যভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে। তিনি শুধু

"আমি যাইমুরে যাইমুরে আল্লার সঙ্গে"

বলিয়াই ক্ষান্ত হন নাই; প্রকৃত হিন্দু pantheistএর মতন অকুতোভয়ে বলিয়াছেন :—

"বিচার করিয়া দেখি সকলেই আমি।
সোনা মামী সোনা মামী গো,
আমারে করিলে রে বদ্‌নামী॥
আমি হৈতে আল্লা রসুল, আমি হইতে কুল,......
আমা হইতেই আস্‌মান জমিন, আমা হইতেই সব .....
মরূব মরূব দেশের লোক, মোর কথা যদি লয়......
আপন চিনিলে দেখ খোদা চিনা যায়॥"—

এই বাউল-কবি একজন নীরব মন্‌সুর হাল্লাজ; তাঁহার ভিতরে এই অহং-জ্ঞান কত প্রাণবান আর আবেগময়। তাঁহার এই আবেগ সুফী-চিত্তের।

"হাছন রাজা প্রভুরে কয় হস্তের মধ্যে ধরি—
তোমার আমার এমন বন্ধন ছাড়াইতে না পারি॥"

আল্লাহর প্রতি তাঁহার যে এই প্রেম, সুফীর অগ্নি যেন তাহা হইতে বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িতেছে।

অবশ্য একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, ইস্‌লাম এদেশের বাউল চিত্তের সুলভ প্রেমে এক জ্বালাময় দাহের সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইয়াছে। হাছন রাজা, লালন ফকীর, তিনু ফকীর, পাগ্‌লা কানাই, ভানু ফকীর, ইহাদের সকলের গানেই সাঁইয়ের আরাধনা আর বৈষ্ণব-প্রেম থাকিলেও ইহাদের গানের গোপন অন্তরে এমন একটা কিছু বৈশিষ্টের আস্বাদ পাওয়া যায়, যাহা হিন্দু সাধক বা পদাবলী লেখকদের মধ্যে আদৌ পাওয়া যায় না। মুর্শীদি গান বলিয়া ইস্‌লামের সংঘাতে যে গানের সৃষ্টি বাঙ্‌লায় সম্ভব হইয়াছে, তাহার আকুলতা আর দৃঢ়-চিত্ততার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে সুফীর আগ্নেয়-উচ্ছ্বাসের কথাই বার বার স্মরণে আসে। নিম্নে একটী মুর্শীদি গান উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি :—

"বইলা দে বইলা দে মোরে গো—
কি করিমু বান্ধবে পাইলে॥
গোপনে অনুভব করি গো বইস্তা নিরালে;
জুড়ায় না তাপিত অঙ্গ, অঙ্গ পরশিলে, পরশিলে গো॥
বিনা কাষ্ঠে জ্বলছে অনল গো, নিবে না জল দিলে,
আবার সঙ্গ গুণে রঙ্গ বাড়ে, বারণ হয় কি দিলে, কি দিলে গো॥
দীন হীনে বলে বন্ধুও, তোরে রাখিমু কোন থলে;
জুড়ায় না তাপিত নয়ন, রূপ নেহারিলে, নেহারিলে গো॥"

পদাবলী সাহিত্য বাঙ্‌লার অমূল্য সম্পদ। সেখানে রাধার যে রূপ কল্পিত হইয়াছে, তাহাতে মনে হয় রাধা অত্যন্ত দুর্ব্বল প্রকৃতির, কৃষ্ণ-প্রেমে যেন এলাইয়া পড়িয়া লুটোপুটি খাইতেছেন। বাঙ্‌লার নিরক্ষর পল্লী-মুসলমানদের দ্বারা যে ঘাটু-গানের পালার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায় রাধা কত সবলচিত্ত, তাঁহার প্রেম আধ্যাত্মিক শক্তিতে কত শক্তিমান আর দৃপ্ত। সেখানকার রাধা অপেক্ষাকৃত কাজের মানুষ; কিন্তু পদাবলীর রাধা কাজের সংসারে টিঁকিয়া থাকিয়া প্রেমিকা হইবার মতন নহেন।

ইস্‌লাম এ দেশের গানের মধ্যে কোন পরিবর্ত্তন বা বৈশিষ্ট্য যদি আনিয়া দিয়া থাকে, তবে তাহা শুধু এই টুকুই মাত্র; এবং এই ইস্‌লাম আরবের ইস্‌লাম নহে, পারস্যের ইস্‌লাম। গানের দলের মানুষের জীবনে ইস্‌লামের অমর দান এই যে—তাহা তাহাদের জীবনে আশ্চর্য্যকর সৌন্দর্য্য-বোধ সবলতা ও ইন্দ্রিয়-বশীকরণ শক্তি আনিয়া দিয়াছে, এবং ইস্‌লামের জন্যই বর্ত্তমান কালের বাঙলার মানুষের জীবন এত সুন্দর রূপে নিয়ন্ত্রিত; তাহা হইতে পুরাকালের সেই স্বেচ্ছাচারী তিরোহিত হইয়াছে।

নিছক ইস্‌লামী কাহিনী নিয়াও এ দেশে অনেক গান রচিত হইয়াছে, যেমন গাজীর গান, জারীগান। কিন্তু প্রকৃত ইস্‌লামের বীর্য্যবত্তা এই সমস্ত গানের কোনোটাতেই নাই। গাজীর গানের গায়কও বৌদ্ধদের মতন তাহার নায়কের জন্ম-পূর্ব্বের ইতিবৃত্ত কহিতে গিয়া জন্মগ্রহণ করিবার আসন্ন মুহূর্ত্তে নায়ককে দিয়া বলায় :

"মন ভোলা মন যাবো না মন
মিছা দুন্‌য়ার পরে।"

শুধু মায়াবাদই নয়, বৈষ্ণবের লীলাবাদ ও বহু রূপকথার কাহিনীতে জড়িত হইয়া এই গান গীত হয়।

"গোরক্ষ-বিজয়" নাকি নাথ গুরুদের যুগে বর্ত্তমান কালের "জারী গানের" মতন করিয়া গাওয়া হইত। নাথদের গানের অনুপ্রেরণাতেই জারী গানের উদ্ভব হইয়াছে কিনা নির্দ্ধারণ করা দুষ্কর। সাধারণতঃ, হুসেনের কারবালা

আবদুল কাদের

শহীদ উপলক্ষ করিয়া মোহর্‌রমে যে সমস্ত "মাতম্" গাওয়া হয়, মনে হয়, তাহারই অনুকরণ করিয়া এই জারী গানের আলী বংশধরদের কাহিনীই অধিক গাওয়া হয়। শরীয়তের বিধি-বিধান পর্য্যবেক্ষণের উপদেশ দিয়াও ইহাতে গান রচিত হইয়া থাকে। এই গানের সুর অতি চমৎকার; গভীর রাত্রে মনে হয় যেন দূর হইতে শুধু একটি মাত্র সুর তরঙ্গ তুলিয়া আঁধার দুলাইয়া বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছে। ইহা প্রাণ ভরিয়া উপভোগের বস্তু।

উপসংহারে শুধু এই নিবেদন করিয়া বিদায় নিতেছি যে, বাংলা দেশে শরীয়তী ইস্‌লাম প্রচারের প্রচেষ্টা যথেষ্ট হইয়াছে, কিন্তু তাহা বাঙলার মাটির মানুষের গ্রহণীয় হয় নাই, হইতে পারে না। অন্যান্য দেশের মতন এদেশেও তাহা শোচনীয় ভাবে ব্যর্থ হইয়া আছে, কোনো প্রকার জীবন্ত সৃষ্টি তাহার দ্বারা সম্ভবপর হইতেছে না। সমস্ত দোষ ত্রুটি সত্ত্বেও এ দেশের মারফতী-পন্থী ইস্‌লামের কিছু সৃষ্টি এদেশের মাটিতে সম্ভব করিয়া তুলিয়াছে, তাহার কারণ সে এ দেশের পরিবেষ্টন, এ দেশের মানুষ, এ দেশের অতীত, ইহার সকলকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়াছে। আর আলেমদের শুধু অনুকরণ-বৃত্তি; তাহারা শুধু অনাস্বাদিত শাস্ত্রের বাহক, তাই এ দেশের জীবন-গতিতে তাহারা কেবল অভিশাপ আর প্রতিবন্ধক হইয়াই রহিল, নিজেরা কিছুই সৃষ্টি করিতে পারিল না; তাহাদের দ্বারা কোনো কালে কিছু সৃষ্টি সম্ভবপরও নহে, কারণ এ দেশের মাটির দিকে তাহাদের দৃষ্টি নাই। যদি বাঙালী জীবনে ইস্‌লামের সুস্থ সবল ও সহজ প্রকাশ আমাদের কাম্য হয়, তবে আমাদের চলা-পথে মারফতী-পন্থী হইতেই আলোক সংগ্রহ করিতে হইবে, বাঙলার ঘর-মুখো মানুষকে বৃহত্তর জগতের মুখামুখি করিয়া দাঁড় করাইবার প্রচেষ্টা করিতে হইবে; আদর্শের অন্ধ প্রয়োগই আমাদের লক্ষ্য হইবে না, লক্ষ্য হইবে মানব-জীবনের সুন্দরতম বিকাশ।

মুসলমান-পীর বৈষ্ণব-বাউল, যাহারই দ্বারা অলৌকিক (miraculous) কিছু সাধন সম্ভব, তাহারই চরণে আমাদের বাঙলা জীবন এ যাবৎ মূঢ়ের মতন গড্ডলিকা প্রবাহে গিয়া অন্ধভাবে সমস্ত বিকাইয়া দিয়াছে; আজিকার এই বিজ্ঞানের যুগে তাহার অবসান হউক, সবল মনুষ্যোচিত বিচার-বুদ্ধির দ্বারা জীবনের অবলম্বনকে গ্রহণ করি। এই গ্রহণ আমাদের জন্য কি হইবে, তাহা অবধারিত হইবে আমাদের চাহিদার ঐকান্তিকতার দ্বারা। যে মুক্তি-কামী অথচ অনুগ্র বাঙালীত্ব এ দেশের সমস্ত ধর্ম্মান্দোলনের অগ্রে-পশ্চাতে বার বার দেখা দিয়াছে, অবশ্য সহজভাবে তাহারই অনুকূলতা আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক। তবে আজিকার যুগে হয়ত এই কথাটি ভাবিবার আছে যে, আমাদের পূর্ব্বেকার ভৌগলিক পরিবেষ্টন এখন পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, সমস্ত জগতের ভাবধারা আর কৃষ্টি আমাদের এত-কালের সীমাবদ্ধ অতীতের আবহাওয়া-পুষ্ট জীবনের উপর নূতন রঙ ফলাইবার আয়োজন করিতেছে, এই অভিনব আয়োজনকে উপেক্ষা করিলে চলিবে না, তাহাকে সার্থক করিয়া তুলিতে হইবে;—জগত-বিকাশের আর অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগকে বিকশিত আর অগ্রগামী হইতে হইবে, নতুবা বৃহৎ জগতে উপজাতির পরিবর্ত্তে জাতি হিসাবে বাঁচিয়া থাকিবার অধিকার আমাদের থাকিবে না। বাঙালীর চির-বৈশিষ্ট্যকে ঘুচাইয়া ওহাবী-আন্দোলনের মতন কোনো-কিছুতে জোর করিয়া সায় দিবার বা দেওয়াইবার প্রচেষ্টা আমাদের জীবনে যেখানে হইয়াছে, আমাদের জীবন সেখানে ঊষর, উৎপাদন-অক্ষম এবং নিরানন্দ হইয়া পড়িয়াছে, জানি; কিন্তু যথার্থ সজাগ চিত্তে নিজেদের ক্ষুধার প্রকৃত তাড়নায় বৃহৎ জগতের সঙ্গে আমাদের মোকাবিলা হইলে তাহাতে বাঙালীত্ব ম্রিয়মাণ হইবে না, তাহারই একটা অভিনব ভঙ্গী মাত্র আমাদের জীবনে রূপ পরিগ্রহ করিবে। আর তাহা হইলেই, শুধু মুসলমানের কেন, বাঙ্‌লার সমস্ত অধিবাসীর জীবন-বৃক্ষ ফলে ফুলে লতায় পাতায় সুশোভিত হইয়া উঠিবে, বাঙ্‌লার পল্লীগান বহু ভাবে ও ধারায় বিকশিত ও প্রবাহিত হইবার অবসর পাইবে।

শিমূলফুলের ব্যথা

শ্রীকৃষ্ণধন দে

সমাজ-বাঁধন নাই যে আমার, কেউ ভোলে না সৌরভে,
মুক্ত আমি রুদ্রে বাসি ভালো,
শুষ্ক শাখার বক্ষ ভরি' বন্ধু, তোমার গৌরবে
দীর্ণ বুকের রক্তে জ্বালি আলো!
ঈশান কোণের আঁধাররাশি ভয় যে দেখায় ভাই,
কালবোশেখীর ঝঞ্ঝাশাসন নিত্য বুকে পাই!

মাথার উপর বজ্র ডাকে, রুদ্র নাচে তাণ্ডবে,
বন্ধু, আমার এই ত মহোৎসব!
চাই যে বিরাট্ বাড়ব-শিখায়, চাই যে জ্বলৎ খাণ্ডবে,
অগ্নি-বায়ুর চাই যে আর্ত্তরব!
বকুল বেলা শিউলি যূথীর অলস ঘুমের গান,
ক্ষুব্ধ আমার হিয়ার তলে পায় না কোন স্থান!

জন্ম আমার রিক্ত তরুর নিবিড়-বেদন-পঞ্জরে,
লক্ষ্মীছাড়ার ব্যথার হাসি আমি!
নির্ব্বাসিতের দুঃখ বাজে রুদ্ধ গোপন অন্তরে,
সঙ্গী কা'রেও পাই না দিবাযামী!
পথের পথিক চায় না মোরে,সবাই সরে' যায়;
রক্ত-প্রদীপ জ্বালিয়ে একা রাত্রি কাটাই হায়!

ওই যে হোথায় শেয়ালকাঁটা বাবলাবনের বক্ষে গো
ফুল ফুটেছে ক্ষুব্ধ অভিমানে,
কাঁটার ব্যথায় জন্মে ওরা আগুন ভরা চক্ষে গো,
কাঁটায় মরণ ধন্য বলি' মানে!
ওদের বুকেই ধরার ব্যথা রক্ত দিয়ে আঁকা,
ওদের মুখেই অনাদৃতের দরদটুকু মাখা!

বন্ধু, তুমি ভুলেই যেও কালবোশেখীর যাত্রীকে,
দুর্দ্দিনেরি ক্লান্ত পথিকটিরে;
আমরা চির বরণ করি নিবিড় অমারাত্রিকে
মলয় বাতাস তোমায় থাকুক ঘিরে!
বকুল-বেলা-গোলাপ-চাঁপা ফুটুক তোমার পথে,
উদয়-রাগের বিজয়-নিশান উড়ুক তোমার রথে।

অরণ্য

—গল্প—

—শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেন গুপ্ত

খুঁজ্‌তে খুঁজ্‌তে এসে গেলাম পাথুরিয়া-ঘাটা বাই-লেন। মোড়ের ওপর তেতলা বাড়ি,—সদর দরজার কাছে একটি মহিলা একটি হিন্দুস্থানি মেয়ের কাছ থেকে ঘুঁটে গুণিয়ে রাখ্‌ছেন। দুপুর তখনো প্রায় পুরোপুরি-ই।

মাসীমারা যে এখানে আছেন এবং এ-পাড়ারই,—এ রকম একটা জনশ্রুতি আমার কান এড়ায় নি। কিন্তু তখন বলসেবী বল্‌শেভিকদের মন্ত্র নিয়ে নয়,—অভিজাত জীবনের ওপর আমার স্বভাবজাত একটা বিতৃষ্ণা ছিল,—তাই মাসীমার সীমাতেও আমি আসিনি। আন্দামান থেকে মাতৃভূমিতে ফিরে এসে যখন মাকে ফিরে পেলাম না, তখন মাসীর দিকে একবার ফিরে চেয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, থাক্ গে; মোসাহেব মেসোমশায়ের মনোভাব আন্দাজ করবার মতো বুদ্ধি আমি আন্দামানে রেখে আসিনি।

কিন্তু আশ্চর্য্য, এই চোদ্দ বছর পরেও মাসীমা আমাকে চিনে ফেল্লেন। একেবারে দুই উৎসুক বাহু মেলে পথের কাছে নেমে এলেন,—মা যেন তাঁর দীর্ঘ প্রতীক্ষার করুণা-সিক্ত অধীরতাটুকু মাসীমার বুকে রেখে গেছে! রইল পড়ে' ঘুঁটে গোণা,—মাসীমা আমাকে একেবারে বাহুতে জড়িয়ে বারান্দা দিয়ে বাড়ির মধ্যে নিয়ে এলেন,—নিয়ে এসেই গলা ছেড়ে ডাক—ও ভ্রমর, ও হেনা,—দ্যাখ্ এসে তোদের ক্ষিতি-দা এসেছে!

ক্ষিতি-দা! যেন তেতলা বাড়ির তেত্রিশটা ঘর থেকে একসঙ্গে তিয়াত্তরটা আওয়াজ বেরুল। আমার নামটা যেন বোমা দিয়ে তৈরী।

মুহূর্তের মধ্যে তিন দিকের তিনটা সিঁড়ি দিয়ে একসঙ্গে ছোট-বড়ো কতগুলি প্রাণী যে নেমে এসে আমাকে ঘিরে দাঁড়ালো তার ইয়ত্তা নেই। মনে হ'ল, এরা যেন এই ঘটনার আগে, নিশ্বাস নেওয়ার আগে পর্য্যন্ত ক্ষিতি-দার জন্য জানলা দিয়ে বাইরে চেয়ে ছিল। যখন আন্দামান থেকে

মেসে আছি।—একটা চাক্‌রি জোটাতে পারি কি না সেই ফিকিরে।

চেষ্টা-চরিত্র করবার মতো চরিত্রে আর বল পাই না, ছেঁড়া তোষকের ওপর একটা রঙ্-চটা র‍্যাপার মুড়ি দিয়ে উপুড় হ'য়ে দুপুরটা কাটিয়ে দিই, বিকেলে এ দিক ও-দিক একটু হেঁটে আসি মাত্র,—শ্রদ্ধানন্দ পার্ক, নরসিং লেনের মোড়ে চা-এর দোকান,—বড় জোর ওয়াই এম্ সি এ। লোকে বলে, কুড়েমি করে' করে'ই আমি বুড়িয়ে যাব,—আমার দ্বারা কিছু হয় নি, হবেও না।

আমি মেসের তক্তপোষে শুয়ে শুয়ে স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন দেখি।—হাতে কোনোই ত' আর কাজ নেই, পর্য্যন্ত লম্বা একটা পেন্সিল পেলে বিছানায় চিৎ হ'য়ে জি কে চেষ্টারটন্-এর মতো সিলিঙে ছবি আঁক্‌তাম! হ্যাঁ, স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন দেখি, তেজস্বী ভারতের! চাক্‌রি-বাক্‌রি না জুটলে শেষ পর্য্যন্ত বেলুড় মঠে গিয়ে মাথা ন্যাড়া করব। চাক্‌রি পেলেই বিয়েটা করে' বেশ তৈলসিক্ত নিরীহ সংসারী বনে' যাই,—কতটুকুই বা আমাদের চাহিদা!

এর মধ্যে এক দিন আমাদের মেসের ঝি মেসের সব বাসন-কোসন নিয়ে সরে' পড়্‌ল। সবাই বল্‌লে,—আপনি ত' চুপচাপ্ বসে' আছেন, আমাদের শ্বাস গ্রহণ কর্‌বারো সময় নেই, যান একটা ঝি-কি জোগাড় করে' আনুন্ গে!...

ঝি খুঁজ্‌তে বেরুলাম। এ-গলি সে-গলি;—মনে হ'ল মিথ্যে কথা; সেই কবে থেকে বীর তপস্বীর বেশে ভারত-বর্ষের মুক্তি খুঁজ্‌তে বেরিয়েছি,—শ্রমিকের মুক্তি, কেরাণীর মুক্তি, মূকের মুক্তি! মনে হ'ল একটা প্রায়ান্ধকার চাপা পানা গলিতে একটা নোংরা এঁদো বস্তিতে ভারতবর্ষের আত্মা ঝি-গিরি করছে,—চীরবাসা, ম্লান-আঁখি—যেন মূর্ত্তিমতী কাকুতি,—অশ্রুমতী!

প্রথম কল্‌কাতায় এসে পা দিই, তখন কোথায় ছিল এতগুলি মুখ, স্নেহে সুকোমল, কল্যাণকামনায় লাবণ্যময়! সেদিন নিজের ভাগ্যকে নিষ্ঠুর বলে' তিরস্কার করেছিলাম,—কোথায় ছিল মাসীমার বাহু-উপাধান! আমার চোখ ভিজে' উঠ্‌লো।

মাসীমা কান্নামাখা সুরে বল্লেন—খবরের কাগজে কত দিন আগে—প্রায় দু'বছর হ'ল—জেনেছি তুই ছাড়া পেয়েছিস্, কত তোকে খোঁজ্,—কোথাও তোর হদিস নেই। আছিস্ কোথায়?

হেসে বল্লাম—মেসে। এখন একেবারে মেষ হ'য়ে গেছি কি না।

মাসীমা বল্লেন—কেন, তোর মাসীমা কি বাসি হ'য়ে গেছে? আমার ভালোবাসা দিয়ে কি তোর বাসা বেঁধে দিতে পারি না?

বলে' মাসীমা আদর করে' গালে একটি ছোট্ট চড় দিলেন।

বল্লাম—মেসের জন্য ঝি খুঁজ্‌তে বেরিয়েছিলাম, ঝি'র বদলে মাসী পেলাম।

আমাকে ঘিরে যতগুলি প্রাণী দাঁড়িয়েছিল, সবাই আমাকে প্রণাম করবার জন্য ভিড় করে' এগিয়ে আস্‌তে লাগ্‌লো। আমি যেন মৃত্যুর মতোই ভয়ঙ্কর ও মহিমাময়, অথচ মৃত্যুর মতোই দয়ার্দ্রহৃদয় অদূর-আত্মীয়! হটে' গেলাম, বল্লাম,—প্রণাম করে' অন্যকে প্রভুত্বের মর্য্যাদা দেবে,—আমি এই দৌর্ব্বল্য সহ্য করিনে। একটু দুর্বিনীত হও, দুর্দ্ধর্ষ হও!

একটি ছোট্ট ছেলে, হয় ত' সবে পাঁচে পৌচেছে কিম্বা ছয়ে—দুই চোখে খুসির ঢেউ দুল্‌ছে—আমার হাত ধরে' বল্লে—তুমি আমার ক্ষিতি-দা?

বুঝ্‌লাম ক্ষিতি-দা'র খ্যাতি এই শিশুটির কাছেও পৌচেছে। ছেলেটির নাম আগে ছিল রুসো,—এখন হয়েচে রুষ্। ওর মেজদি হেনা ওর নাম রেখেছে।

রুষ্ আমার আদর না নিয়ে বল্লে—আমি তোমার মতন হব, ক্ষিতি-দা!

আমি তাকে কোলে তুলে নিয়ে বল্লাম—আমার মতন কি। আমি ত' একটুখানি,—আমার চেয়েও ঢের বড়ো হবে।

রুষ্ বল্লে—তবে আমাকে তোমার কাঁধে চড়িয়ে দাও, তোমার থেকে এক্ষুনি বড়ো হ'য়ে যাই।

ভ্রমর হেসে বল্লে—নাম্ দুষ্টু ছেলে!

রুষ্ বল্লে—আর ক্ষিতি-দা বুঝি দুষ্টু নয়! দুষ্টু বলে'ই ত' তাঁকে এতদিন আটকে রেখেছিল,—দুষ্টুমি করলে আমাকে যেমন তুমি তোমার ঘরে বন্ধ করে' রাখ।

মেসোমশাইরা তিন ভাই,—বাড়িও তিন-তলা। মেসোমশায় মেজো—আলিপুরের জজ্;—বড় যিনি, তিনি গোটা পাঁচেক কয়লার খনির মালিক, ছোটটিও ব্যবসাদার।

একান্নবর্ত্তী পরিবার,—সেইটেই আশ্চর্য্য,—প্রতি বেলায় পাত-ও পড়ে একান্ন। বড়ো'র হাতে বারোটি সন্তান, মেসোমশায়ের দশটি, ছোটটি বিয়েতে দেরি কর্‌লেও দৌড়ে দাঁড়িয়ে পড়েন নি। তা ছাড়া চাকর-বাকর বয়-খানসামা মালি-মেড়ো ত' কতোই আছে। সব চেয়ে আশ্চর্য্য, সব কটিই বেঁচে আছে,—আয়ু আর বিত্ত এদের য়্যাল্‌ফা এবং ওমেগা!

ভ্রমর আমার মেসোমশায়ের বড়ো মেয়ে।

সন্ধ্যাসন্ধিতে মেসোমশায়ের ঘরে তলব পড়্‌ল। হেসে বল্লেন—শিং ভোঁতা করে' এসেছ ত', চরকা নিয়ে? তা বেশ! আমাদের চরকায় তেল দিতে চাইবে না আশা করি।

আমিও হেসে বল্লাম—চর্‌কার চেয়ে চক্রই আমার বেশি পছন্দ। যদিও ইদানী চক্র—

মাসীমা বল্লেন—বক্র হ'য়ে গেছে।

—যাও, একে ঘী-দুধ খাইয়ে বেশ একটি নধর তাকিয়া বানিয়ে ফেল,—সাপকে দড়ি বানানোটা কম কৃতিত্বের কথা নয়।

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেন গুপ্ত

বল্লাম—দড়িটা কি আপনি মারাত্মক মনে করেন না নাকি? দড়ি আপনাদের হাতে দৃঢ় করে' ধরা আছে বলে'ই ত' এত ভয়।

মেসোমশায় হেসে বল্লেন—যাও, ক'দিন বেশ জিরিয়ে নাও এখেনে, ভ্রমরের এস্রাজ শোনো, ক্লাই'র গান—মনটাকে ধুয়ে একেবারে সাফ করে' ফেল। সিনেমা ত্যাখ, মুর্গি কাট', ঘুমাও,—বেশ নিরীহ হ'য়ে যাও।

বল্লাম—তাই হ'য়ে গেছি। ভাবনা নেই আপনার এখানে থেকে আপনাকে জজিয়তি থেকে ডিস্‌লজ করব না।

কোথা থেকে কোথায় এসে মিশে' গেলাম। ছিলাম ধাবমান নির্ঝরের ফেনসঙ্কুল দুর্নিবার খরস্রোত—এখন হ'য়ে আছি পুষ্করিণী,—সীমাবদ্ধ, নিষ্প্রাণ, অগভীর! শেলির স্কাইলার্ক ওয়ার্ড্‌স্বার্থের হ'য়ে গেছি কিম্বা হার্ডির। যৌবন হারিয়ে বুড়ো যযাতি হাই তুল্‌ছেন।

প্রত্যেকের জন্য—মানে যারা বয়স্ক—এক একটি আলাদা ঘর,—এবং প্রত্যেক ঘরেই আমার নিমন্ত্রণ। তার কারণ এই নয় যে ষোলো বছর আগে পুলিশ আমার পকেটে পিস্তল পেয়েছিল, আমি চোদ্দ বছর বয়সে কালাপানি পেরিয়েছিলাম,—তার কারণ, আমি সবাইর চোখে একান্ত করে' আলাদা, সবাইর কাছে তাই একান্ত করে' আপন। আমাকে নিয়ে সবাই ব্যস্ত,—আমি ভাতের প্রথম গ্রাস মুখে তুল্‌বার আগে হাতটা কপালে ঠেকাই সবাই তাই উৎসুক হ'য়ে দেখে,—আমি আমার বাঁ হাতের কড়ে' আঙুলের নোখ্‌টা অনেক বড়ো রেখেছি, এবং সেই নোখ্ দিয়ে অন্ধকারে একজনের চোখ কাণা করে' দিয়েছিলাম—

সকাল থেকে রাত একটা পর্য্যন্ত এ বাড়িকে মনে হয় একটা কারখানা,—যেন অনবরত কল ঘুরছে;—পাঁচ বছরের ছেলে রুষ্‌ই হচ্ছে এ-কলের কলিজা। আমি কারো বন্ধু বনে' গেছি। রুষ্ মেয়ে-পুরুষ সবাইকে মাতিয়ে রেখেছে;—দু'-নলা বন্দুক ছোঁড়ে, নিজে-নিজে ঘোড়ায় চড়ে, মোটরে ড্রাইভারের কোলে বসে' হুইল্ না ধর্‌লে ওর কোথায় যাওয়াই হয় না,—ঘড়ি ভেঙে ফেলে তার কলকব্জা দেখে, কাঠ আর পেরেক দিয়ে এঞ্জিন বানায়, দোরের পাশে লুকিয়ে থেকে সমস্ত বাড়িকে তোল্‌পাড় করে' ছাড়ে,—পরে গুটি-সুটি বেরিয়ে এসে বেমালুম প্রশ্ন করে—কাকে খুঁজ্‌ছ, মেজদি?—রুষ্ যেন বাংলার পলি-মাটি দিয়ে তৈরি নয়,—রাশ্যার বরফ দিয়ে, কঠিন, হিম দুর্দ্দমনীয়;—ওর দুই চোখে যেন বন্য দস্যুতা আছে,—তীক্ষ্ণ ক্ষুরধার! ও যেন ভবিষ্য ভারতের বরপুত্র,—কৃপাণপাণি!

ইহসংসারে আমিই নিঃস্পৃহ,—তাই সবার কাছেই স্পৃহনীয়। আমাকে পেয়ে ওরা সবাই যেন হাঁপ ছেড়েছে,—ওদের আহার্য সুস্বাদু পানীয় সুশীতল হ'য়ে উঠেছে,—ওদের ঘরের বাতাসে সুবাস এসেছে, যে-কথা বল্‌বারো নয় ভুল্‌বারো নয়—সেই কথা যেন মুক্তি খুঁজ্‌ছে। বন্দী ভাষা, দুর্বোধ তার রহস্য!

তে-তলা এক-তলা আমি টানা-পোড়েন কর্‌ছি।

মোট্‌মাট্ সতোরোটি খোপ্‌রি,—সুতরাং হাতে আমার সাতঘন্টাও থাকেনা। আমাকে ওরা বলে—তুমি দিনে ঘুমিয়ো, ক্ষিতি-দা,—তুমি তো ঘানি ঘুরিয়েছ দিনেই,—রাতেও ঘোরাও এবার।

ভ্রমরের ঘর খোলাই ছিল। গিয়ে বলি—এস্রাজ শোনাও, ভ্রমর!

ভ্রমর তার খাটের ওপর বসে' একটা সুট্‌কেস উপুড়, উজাড় করে' কি-সব জিনিসপত্র নিয়ে একেবারে বিভোর হ'য়ে আছে। আমাকে দেখে খাট থেকে লাফিয়ে সোজা দাঁড়িয়ে পড়্‌ল। যেন বেশ একটু বিব্রত হয়েছে। বল্লে—আজ আর এস্রাজ নয়, ক্ষিতি-দা,—এস্রাজের চেয়েও মিষ্টি বাজ্‌না আছে, শুন্‌বে? বোস তা'লে।

ভ্রমর মাথার চুলটা ঠিক কর্‌তে-কর্‌তে ফের বল্লে—চা খাবে?

—এই ভাত খেয়ে এলাম। তোমাকেও নেয়ে-খেয়ে নিতে বল্লেন মাসীমা। তুমি এখন যাও। তোমার এ-সব জিনিসপত্র আমি পাহারা দিচ্ছি। তুমি খেয়ে এলে পর মিষ্টি বাজ্‌না শোনা যাবে'খন।

ভ্রমর আল্‌মারি থেকে শাড়ি-সেমিজ বার করলে,—তেল নিয়ে পিঠের ওপর মেঘের সাপের মতো বেণী খসিয়ে একটু এদিক ওদিক হেঁটে, দোল্‌নায় ঘুমন্ত ছেলেকে একটু আদর করে' যেতে-যেতে বল্লে—তোমার ওপর এই সবের ভার রইল ঝুঁকি পোয়াবার, উঁকি দেবার নয়।

বলে' একবার ছেলে ও আরেকবার খাটের ওপর বিশৃঙ্খল জিনিসগুলির দিকে করুণ দৃষ্টিপাত করে' চলে' গেল।

ভ্রমর যেন শরৎ-মেঘের বিদ্যুৎ দিয়ে তৈরি,—ওর মধ্যে যেন সেই নিষ্ফল নিরানন্দ উজ্জ্বলতা,—ভ্রমর যেন মরুভূমির শুষ্ক নিষ্করুণ দিগন্তলেখা,—সেই ঔদাস্য ওর ললাটে। এস্রাজের মাঝে ওর অজস্রতা নেই, গানে নেই প্রাণ,—কোনো উৎসবে নেই উৎসাহ! ও ভ্রমে ভ্রমর নাম নিয়েছে।

আধঘণ্টা বাদে ভ্রমর এসে হাজির,—হাতে এক বাটি চা। ঘরে পা দিয়েই কলকণ্ঠে বলে' উঠ্‌লো—তুমি এ চেয়ারটিতে বসেছ, ক্ষিতি-দা! বাঃ! চা-টা হাতে করে' এইটুকুন্ আসতে আমার কী ভালো যে লাগ্‌ছিল—

—তুমি কি পাগল হয়েছ ভ্রমর, এই দুপুর দুটোয় চা,—ভাত খেয়েই?

—চায়ে তোমার অরুচি আছে তা'লে। থাক্, রেখে দাও!

ভ্রমর সুন্দর করে' সীমন্তে সিন্দুর পর্‌লে,—মুখে গোধূলিবেলার নির্ম্মল আভা. দুই ঠোঁটের কোলে যেন ব্যথিত স্তব্ধতা ঘুমিয়ে আছে,—দু'টি হাতে যেন ক্লান্তির কাতরতা। সেই ক্লান্তিই যেন ওকে কমনীয় করেছে!

ছেলের দোল্‌নায় ছোট দু'টি ঠেলা দিয়ে বল্লে—গিলে আস্‌ছি। এলাম বলে'।

ভ্রমর এলো খেয়ে। দুপুর প্রায় ফুরিয়ে এলো।

বল্লাম—তোমার মিষ্টি বাজ্‌না শোনাবে না?

কাগজের স্তূপ থেকে কি-একটা বের করে' ভ্রমর বল্লে—শুনবে এস। এস এগিয়ে।

এগোলাম। ভ্রমর আমার চোখের কাছে একখান ফটো এনে ধর্‌ল। নষ্ট হ'য়ে গেছে,—বহুদিনকার নিশ্চয়ই,—কিছুই ভালো চেনা যায় না। তবু আন্দাজ করে' বল্লাম—নীরেশবাবুর? এ বাজ্‌না ত' খালি তোমারই কাছে মিষ্টি!

ভ্রমর বল্লে—তোমারো কাছে লাগ্‌বে, শুধু মিষ্টি নয়, মিস্‌টিক্! শ ডিলিট্‌ করে' দন্ত্য ন বসাও।

অবাক হ'য়ে বল্লাম—তার মানে?

—বান্দা হ'য়ে আন্দামানে থেকে এটুকুরো মানে তুমি করতে পারবে না ক্ষিতি-দা? সোজাসুজি মানে, নীরেন আমার বন্ধু ছিল।

হেসে বল্লাম—তোমার টেন্‌স্‌-জ্ঞান আমার টেন্‌সান্ কমিয়ে দিয়েছে, ভ্রমর। 'ছিল',—এখন আর নেই তা'লে? বাঁচা গেল।

ভ্রমর ফটোটা চোখের কাছে তেমনি ধরে'ই আছে। অস্ফুটস্বরে বল্লে—না, এখন আর নেই। সেইটেই বেদনার।

—কেন নেই?

—রেপুটেশান্ ক্ষিতি-দা, রেপুটেশান্। তুমি ওথেলো পড়েছ? ক্যাশিয়োকে মনে পড়ে?

হেসে বল্লাম—যদি দন্ত্য ন তালব্য শ হ'য়ে রুখে ওঠে, সেই ভয়ে দরজায় তালা দিয়ে তাকে বাতিল করে' দিলে। এই তোমার মিষ্টি বাজ্‌না, ভ্রমর?—থাক্, এ বিষের চেয়েও তেতো।

ভ্রমর জ্ঞানীর মতো বল্লে—এ বিষ নিরামিষ, ক্ষিতি-দা! সেইটেই বাঁচোয়া। আচ্ছা, তুমি এ ব্যাপারের প্রতি এত নিরুৎসাহ কেন? তুমি ত' কোনোদিন ভালোবাসার বেসাতি করনি, বেহাতও করনি। তুমি কি একে অন্যায় মনে কর?

মুরুব্বিয়ানা করে' বল্লাম—অন্যায় নয়, মূর্খতা।

—হ্যাঁ, মূর্খতা! নইলে তুচ্ছ একটা মেয়ের জন্য কেউ কৃচ্ছ্রসাধনা করে,—জীবন নিয়ে জুয়ো খেলতে বসে! শুনলাম বুড়ো মাকে ফেলে জাহাজের খালাসি হ'য়ে সাউথ আফ্রিকা যাবে।

সেন গুপ্ত

—তুমি আবার হাসালে, ভ্রমর। এখনো যায়নি তা'লে? ...বাচা গেল।...আচ্ছা, আচ্ছা, দাঁড়াও, দাঁড়াও ভ্রমর,—তোমার বন্ধুর নাম কি নীরেন চক্রবর্ত্তী?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ,—ভ্রমর লাফিয়ে উঠল—তুমি চেন তাকে? সুন্দর দোহারা চেহারা, পাঞ্জাবি ছাড়া কোনদিন কোট গায়ে দেয় না, মোজা পরে না,—খালি ক্রেভেন্ এ খায়, ডান দিক দিয়ে মাথার অদ্দেক্ অবধি টেড়ি কাটে! তার সঙ্গে তোমার কবে দেখা হ'ল? বিয়ে করেনি এখনো?

—মেসে দেখা হয়েছিল,—বোধ হয় দিন কয়েকের জন্য। পরে কোন্ দিকে যে পাল খুলে' দিল কেউ জানে না—

—কেউ জানে না? আমার ভারি ইচ্ছা করে, আবার সে আসুক্—এমনি নির্জ্জন দুপুরে—ঠিক ঐ চেয়ারটিতে এসে বসুক,—ভাত খেয়ে এসেই চা চা'ক্। কেন তা হয় না, ক্ষিতি-দা? জীবনের একটা চৌমাথার মোড়ে এসেও সে ট্র্যাফিক্ পুলিশের মতো আমার গাড়ির গতি বন্ধ করে' দেবে না,—এ তার কি অমানুষিক অভিমান!

—ঘৃণাও ত' হ'তে পারে, ভ্রমর?

—হ'তে পারে। কিন্তু কেনই বা সে ঘৃণা করবে? —আমাকে ত' সে কোনোদিন চায় নি। আমি তাকে বুঝতেই পার্‌লাম না, ক্ষিতি-দা। আমার আঙুলটির সঙ্গে তার আঙুলটিরো আত্মীয়তা হয় নি,—

—তবু, হৃদয় যে প্রতিবেশী ছিল সেটা আজ বেশি করে'ই বুঝছ।

—হ্যাঁ খুব বেশি করে'। বাড়ির সবাইর কাছে ছিল সে এন্‌সাইক্লোপিডিয়া, আমার কাছে সে ছিল শুধু সাইক্লোন্!—আমি তার সে-চেহারা আজো মনে করতে পারি, ক্ষিতি-দা। কিন্তু সত্যিই হয় ত' পারি না।

ভ্রমর ছেলেকে দোলা দিয়ে এসে ফের খাটের ওপর বস্‌ল।

বল্লাম—এও ত' হতে পারে, ভ্রমর,—যে সে মোটেই তোমাকে পাবার জন্ত করে' ভালবাসেনি,—এম্‌নিই তোমার পথের মাঝে ধূলির মত উড়ে' এসেছিল, এমনিই আবার উড়ে' গেছে।

—সুবাসের মত;—ক্ষীণ হ'য়ে এসেছে শুধু। আমি ত' তাকে তাই চাই। সে আমার য়্যাকোয়েন্‌টেন্‌স্,—তার সঙ্গে ফের চা খেতে ইচ্ছা হয়, এক সঙ্গে জর্জ্জ মুর্‌ পড়ি, এক দিন এক সঙ্গে 'টকিজ'্ শুনে আসি। সে সব চেয়ে আমাকে বেশি বোঝে, সে সমস্ত পৃথিবীর আহ্নিক গতির সঙ্গে পা ফেলে চলে, তার মাঝে আমি নিজেকে বেশি করে' আস্বাদ করি বলে'ই ত সে আমার বন্ধু। আমাদের দুই পাখীর এক পালক! সে নাই বা এল সন্দীপের মত, সে সোহার্দ্দ্যের প্রদীপ নিয়ে আসুক,—আমি তার বন্ধু, এও আমার একটা পরিচয় হোক্। তা কেন সম্ভব নয়, ক্ষিতি-দা?

—তার উত্তর ত' তুমি আগেই দিয়েছ। এর আরো একটা উত্তর হ'তে পারে, পুরুষের চাওয়াটা ভারি পুরু, মেয়েদের মিহি।—তোমার য়্যাকোয়েন্‌টেন্‌সে তার প্রয়োজন নেই।

—তুমি আমাকে কি ভাবছ জানি না,—কিন্তু তার সঙ্গে আমার দেখা করার সাঙ্ঘাতিক দরকার আছে।—হয় ত' শুধু আজকের জন্যই। তার কথা আমার প্রায়ই মনে পড়ে না,—শুধু আজকে হঠাৎ, একেবারে হঠাৎ মনে হ'ল ক্ষিতি-দা, তাকে আমি ভুলিনি। আরেকদিন হয়েছিল,—যেদিন হঠাৎ তুমি এলে। সেই হঠাৎ আসাটাই সেদিন ভারি রোমান্টিক লেগেছিল।

খানিক থেমে হঠাৎ ভ্রমর বল্লে—আমি আমার স্বামীকে খুব ভালোবাসি, সে-কথা বলাই বাহুল্য,—আমি ফোর্‌সাইট্‌ সাগা পড়লেও বুঝিনি, আমি Ireneও নই, Fleurও নই,—কিন্তু জান কি ক্ষিতি-দা, আমার স্বামী স্বামীই বটেন, বন্ধু নন্—বহু তপস্যার স্বামী; বিনা মূল্যের বন্ধু নন্। কিম্বা ঠিক তার উলটো। আমি ডাক্তার চাই বটে, হার্ট-স্পেশ্যালিষ্ট,—কিন্তু সঙ্গে একটি হার্টি বন্ধু পেলেই বেশ হয়।

ভ্রমরের ছেলে তখন কাঁদতে সুরু করেছে। ভ্রমর তাকে শান্ত করে।

উঠছি,—ভ্রমর বল্লে—তুমি মনে ভেবো না, তার সঙ্গে দেখা হয় না বলে' আমার ঘুম হয় না,—তা হয়। শুধু সে যেন বিয়ে করে, যেন ভদ্রলোক বনে' যায়,—এইটুকু।

হেসে বল্লাম—দেখা হ'লে ভদ্রতা শিখ্‌তেই তোমার কাছে পাঠিয়ে দেব'খন।

কে এই নীরেন্ চক্রবর্ত্তী? সে একদিন ভ্রমরের নিকট-বর্ত্তী হয় ত' হয়েছিল, কিন্তু আমি ত' তাকে জানি না,—আমি ভ্রমরকে ভাঁওতা দিয়েছি।

তবু মনে হয় মনে-মনে হয় ত' এই নীরেন চক্রবর্ত্তীকে চিনি। আমার মনে এক চীরবাসা ক্ষুধাপাণ্ডুর পদপীড়িত প্রতিমা আছে,—সে আমার ভারতবর্ষ; তার পাশে একটি প্রোজ্জ্বল মুখ ভেসে উঠ্‌ল,—দৃঢ়কায়, গর্ব্বোন্নত তার আকৃতি,—মাথায় তার মহিমা-মুকুট! প্রেমের জন্যে সে ত্যাগের তপস্যা করছে।

তুচ্ছ মেয়েই ত' বটে! ভ্রমর তার ভারতবর্ষ!

নীরেনের সঙ্গে আমার কোনোদিন দেখা হবে না জানি। সে হয় ত' এখন কেরাণী, হয় ত' বা স্পাই! তবু সে আমার বন্ধু। সে সাধ্যাতীতের জন্য সাধনা করেছিল—মন্দিরে পাষাণের বেদীকে সে দেবী বানায়!

সুধাংশুর ঘরে আসি। সুধাংশু মেসোমশায়ের দাদার ছেলে।

—কি করছ, সুধাংশু?

—এসো এসো ক্ষিতি-দা। কি আর করব বল? সেই ল'-সমুদ্র পাড়ি দেবার জন্য পারে থেকে লগি ঠেল্‌ছি। ইকুয়িটেব্‌ল্ সেট্‌-অফ্ মুখস্ত করতে-করতেই অস্ত যাব।

বসি এক পাশে। ভ্রমরের ঘরে একটি বিষণ্ণ দারিদ্র্য আছে,—এর ঘরে একেবারে রৌদ্রের প্রখরতা! হঠাৎ মনে হয় যেন মিউজিয়মে এসেছি। ছাত থেকে মেঝে পর্য্যন্ত ঝক্‌ঝক্ করছে,—কাশ্মীর থেকে বর্ম্মা ত' আছেই, সুদূর আইস্‌ল্যাণ্ড্‌ও তার কিউরিয়ো পাঠাতে ভোলে নি। সুধাংশু পড়ে আর তার চাকর চেয়ারের তলে বসে' পায়ের পাতায় সুড়্‌সুড়ি দেয়।

হঠাৎ সুধাংশু বল্লে—আমাকে একটা চাকরি জুটিয়ে দিতে পার, ক্ষিতি-দা?

যেন পাহাড় থেকে পড়্‌লাম। যার শালের এক ধারের পাড় বেচে' একটা লোকের এক মাসের ভাত জোটে সে চায় চাকরি? ঠাট্টা আর কা'কে বলে?

কিন্তু ঠাট্টা নয়। সুধাংশুর মুখে মালিন্য এসেছে। বল্লে—আমার দ্বারা পরীক্ষার সিংহদ্বার উত্তীর্ণ হওয়া চল্‌বে না, ক্ষিতি-দা। তিনবার ঘায়েল হয়েছি,—আমি আর বৌয়ের কাছে অপমান সইতে পারি না। একটা ছোটখাটো চাকরি নিয়ে কোথায় ভেসে পড়্‌তে ইচ্ছা করে।

—বল কি সুধাংশু?

—সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে গেরুয়ার লুঙ্গি পরে' আমি বেরিয়ে পড়তে চাই। বৌকে ছেড়েছিলেন বলে'ই ত' শুদ্ধোধনের ছেলে সিদ্ধার্থ হ'তে পেরেছিলেন, ক্ষিতি-দা। আমিও আমার বিলাসের-বস্তুটিকে ফেলে একান্ত সস্তা হ'য়ে বিকিয়ে যেতে চাই,—কেউ নেই আমার,—শুধু আমি আর আমার অকূল ভবিষ্যৎ। কোনো মহৎ কাজ করে' জেলে গিয়ে পচ্‌তেও চাই, ক্ষিতি-দা, কিন্তু এরকম জলো হ'য়ে যেতে চাই না।

বল্লাম—মাসে তোমার তামাকেই এক শ' টাকা লাগে—

—আর, জুতোর কালিতে পঞ্চাশ। তাইতেই ত' সব তেতো লাগে, ক্ষিতি-দা। আমার একেবারে আলাদা হ'য়ে যেতে ইচ্ছা করে,—ছোট সংসারে ছোট গণ্ডীর মধ্যে একান্ত স্বার্থপর, একান্ত একেলা। একটা ছোটখাট চাকরি তোমার হাতে নেই?

—আছে। রাস্তার ঝাড়ুদারের কাজ। এগারো টাকা মাইনে।

সুধাংশু যেন মরীয়া হ'য়ে উঠ্‌ল—দাও ঝাড়ু, সাগ্রহে আমি নর্দ্দমা পরিষ্কার করব,—

—তোমার শালের কোণ্‌টা মাটিতে পড়ে' গেছে, তুলে নাও।

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেন গুপ্ত

সুধাংশু শালটা কোলের ওপর তুলে নিয়ে শান্তস্বরে বল্লে—ঝাড়ুদার হয় ত' সম্ভব নয়, কিন্তু ছোটখাটো একটা ইস্কুলমাষ্টারির যোগ্যতা হয় ত' আমার আছে। এবারেই আমার শেষ চান্‌স্। এবারে লাফাতে না পারলে আমি চৈতন্য হ'য়ে যাব।

—মালকোঁচা বাঁধবার সময় সেই চৈতন্যটুকু থাক্‌লেই ত' ল্যাঠা চুকে' যায়

—তুমি ঠাট্টা কর্‌ছ, ক্ষিতি-দা, কিন্তু তুমি জান না, আমি কি অসহায়! বাবু বৌ, তিনটে রোগা ছেলে,—এত খায় তবু চেহারায় ছায়া নেই। মাসের বরাদ্দ টাকায় আমার চোদ্দ পুরুষের শ্রাদ্ধ হয় বটে, তবু সত্যি আমার মনে সুখ নেই। আমার গরীব হ'য়ে যেতে ইচ্ছা করে।

বল্লাম—এবারে কোলড্‌ ওয়েভ্‌ এসেছে,—টেম্পারেচার একান্ন। ভালো করে' শালটা বুকে জড়িয়ে নাও। জর্জ্জ দি ফিফ্‌থ্‌-এর মত ফুসফুসে জল জম্‌তে পারে।

সুধাংশু বোকার মত আবার বইয়ের ওপর ঝুঁকে' পড়ে।

হেনার সঙ্গে কা'র তুলনা দেব? গৃহস্থের গৃহকোণে স্তিমিত দীপশিখার, না মেঘম্লান বিষাদিত চন্দ্রালোকের? কি বলে' বোঝানো যায় ওকে? সুস্নিগ্ধ রজনীগন্ধা, না বৃষ্টিসিঞ্চিত তৃণকণা? ওকে বোঝানো যায় না,—স্বপ্নেও ও দিতে শেখেনি। ও একটা আইডিয়া!

ভ্রমরের সৌন্দর্য্য তার মুখের সুচারুতায়, হেনার মাধুর্য্য তার করতলে!

কিন্তু দুই চোখে ওর প্রতিভা ও প্রতিজ্ঞার দীপ্তি! ওকে ভাঙা যায়, বাঁকানো যায় না।

ওর ঘরে এলে মনে হয় যেন ছায়ায় এসেছি। সমস্ত ঘর যেন টোয়াইলাট্‌,—সব সময়। ওর ঘরের সব রঙ্‌ ফিকা,—ওর চেহারায় একটি ম্লানাভ নির্ম্মলতা আছে। ওকে দেখ্‌লে চট্‌ করে' মনে হয় যেন স্তিমিত সন্ধ্যালোকে একটি ক্ষীণধারা নদী দেখ্‌ছি। ও যেন নীল আকাশের একটি সঙ্কেত!

ঘর নয়,—মন্দির। কোথাও এতটুকু আড়ম্বর নেই,—ভূষণস্বল্পতা ওকেও অনির্ব্বচনীয় করে' তুলেছে। শুধু দু'টি চেয়ার, পশ্চিমের দেয়ালের ধারে একটি ছোট গোল টেবিল, দু'খানি বই;—উত্তরের দেয়াল ঘেঁষে একখানি নীচু খাট,—মাটি থেকে হয় ত' শুধু বারো ইঞ্চি উঁচু,—তোষকের ওপর গরদের চাদর পাতা আর তার ওপর কতগুলি ফুল!—হেনা গরদ ছাড়া পরে না,—গরদে ওর পাড় নেই।

—কি কর্‌ছ, হেনা?

—আরে, এসো ক্ষিতি-দা। কি আর করব? পড়্‌ছি।

—আজ্‌কে এমন একটা শুভসংবাদ পেয়ে বেরিয়ে পড়োনি যে?

হেনা অল্প একটু হেসে বল্লে—সেই শুভসংবাদে কোনো উত্তেজনার আস্বাদ ত' পাচ্ছি না, ক্ষিতি-দা,—বরং একটি পবিত্রতা পাচ্ছি। আমার এই ছোট ঘরটি দূর আকাশের মতো যেন পরমবিস্তার লাভ করেছে। একটা ভারি সুন্দর বই পড়্‌ছি। মেয়েটি বল্‌ছে—তুমি দুঃখ কোরো না,—আমার নিঃসঙ্গতার সঙ্গে তোমার নিঃসঙ্গতার বিয়ে,—তোমার লাঞ্ছনার সঙ্গে আমার লাঞ্ছনার!

টিপ্পনি কেটে বল্লাম—শেষ পর্য্যন্ত মেসোমশায় মত্‌ দিলেন তা'লে? যদি মত্‌ না দিতেন?

—মত্‌ না দিলে আমিও তেম্‌নি, সেই মেয়েটির মতো তার হাত ধরে' বল্‌তাম,—আমরা পরস্পরের স্পর্শ থেকে বঞ্চিত হলাম বটে, কিন্তু এই বিচ্ছেদই আমাদের অন্তরের স্পর্শমণি হোক্‌!...নারীর সতীত্বকে সবাই সম্মান করে, সম্ভব বলে' বিশ্বাসও করে, কিন্তু নারীর প্রেমের প্রতি-ই যত বিদ্রূপ। তাঁরা বলেন, নারী স্নেহ করতে জানে বটে, কিন্তু ভালবাস্‌তে জানে না,—সে তার গঠনগত অসম্পূর্ণতা। আমি সেই নিয়মের ব্যতিক্রম হতাম,—আমি প্রমাণ করতাম ক্ষিতিদা, যেমন অভিচারের চেয়ে সতীত্ব বড়, তেম্‌নি সতীত্বের চেয়ে বড় প্রেম—যে প্রেমে দুঃখদহন

আছে, আত্মত্যাগ আছে! তুমি জান না, এই দুঃখ সহ্য করবার সাহসের অভাবেই সমস্ত সৃষ্টি শীর্ণ, বিবর্ণ হ'য়ে যাচ্ছে। শকুন্তলা যেখানে তপোবনবাসিনী, তার চেয়ে উজ্জ্বল,—শকুন্তলা যেখানে তপশ্চারিণী! পার্ব্বতীর চেয়ে অপর্ণা!

—কিন্তু আই সি এস-এর চেয়ে শেষকালে আই এস সি-কে বরণীয় মনে করলে?

—তুমি আমাকে আর হাসিয়ো না, ক্ষিতি-দা! আমি পরীক্ষকদের পার্শ্যালিটির দরুণ একটা এম্ এ হয়েছি বলে'ই ত' আর ডানা গজাইনি, বাবার আপত্তি ছিল ত' সেইখানেই। তিনি বলেন—প্রেমে পেট ভরে না।—কিন্তু পেয়ালা ত' ভরে,—সেই উত্তরটা সেদিন দিলে ভারি বেখাপ্পা শোনাতো, বলিও নি। দিদি এই পেট ভরাবার জন্যেই প্যাট্রার উদ্দেশ্যে ডাক্তারের দোরে ধন্না দিলে। ডাক্তার অবশ্যি ওর হার্ট-ডিজিজ্ সারিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু জান ক্ষিতি-দা, আমার জীবনের চাহিদা ভারি সাদাসিধা,—এখন মনে হচ্ছে কিছুই হয় ত' আর চাই না,—নিশ্বাসের জন্য পরিমিত বায়ু, দেহধারণের জন্য স্বল্প আহার! প্রেম দীর্ঘস্থায়ী হয় না জানি, পরমায়ুও নয়—মানে প্রেমের প্রগাঢ়তা ধোপে টেঁকে না,—মানে, যেখানে পরস্পর পরস্পরকে পেয়ে ফেলে, পেতে থাকে না।—একটি ছোট নীড়, দু'টি ফোঁটা আঁখিনীর,—আর ধরণীর ধূলি! তোমার রবীন্দ্রনাথ পড়া আছে, ক্ষিতি-দা?

সোজা বল্লাম—না। সময় হয় নি।

—আমার আজ কবির সঙ্গে সুর মেলাতে ইচ্ছে করছে—

বহুদিন মনে ছিলো আশা
ধরণীর এক কোণে
রহিব আপন মনে;
ধন নয়, মান নয়, একটুকু বাসা
ক'রেছিনু আশা।
গাছটির স্নিগ্ধ ছায়া, নদীটির ধারা,
ঘরে-আনা গোধূলিতে সন্ধ্যাটির তারা,
চামেলির গন্ধটুকু জানালার ধারে,
ভোরের প্রথম আলো জলের ওপারে।
তাহারে জড়ায়ে ঘিরে
ভরিয়া তুলিব ধীরে
জীবনের ক'দিনের কাঁদা আর হাসা;
ধন নয়, মান নয়, এইটুকু বাসা
করেছিনু আশা॥

বল্লাম—রবীন্দ্রনাথের বাসা একটুকু নয়,—সমস্ত পৃথিবীতে। তোমার বাসা দেখলে তে-তলা, না দেখলে পীযূষের হৃদয়!

হেনা হেসে বল্লে—ও হচ্ছে কবির ideal existence! জান, ক্ষিতি-দা, আমিও একদিন কবিতা লিখেছিলাম, শুনবে?—

বহুদিন মনে মোর আশা—
চাহিনা পাখীর নীড়
আমি নহি ধরণীর;
গৃহতরে স্পৃহা নাই, পথের পিপাসা
করিলাম আশা।
তিমির-স্তিমিত রাত্রি নাহি দীপশিখা,
মৃত্যুর আহ্বান আসে,—কে অভিসারিকা,
শ্লথবেণী চলিয়াছ চঞ্চল উধাও,
কাহার অলক্ষ্য লক্ষ্মী, কা'রে তুমি চাও?
অজানারে জিনিবারে
নিরুত্তর অন্ধকারে
ডুবিলাম, চক্ষে মম সুদূর-দুরাশা;
গৃহতরে স্পৃহা নাই, ভবিষ্যের ভাষা
করিলাম আশা॥

এ কবিতাটি বহু দিন আগে লিখেছিলাম। কত দিন আগে বল ত'?

সঙ্ক্ষেপে বল্লাম—পীযূষে যখন তোমার গণ্ডূষ ভরে' ওঠেনি।

হেনার মুখ রাঙা হ'য়ে উঠ্‌ল। ওর দুই চোখে কবিতার বাতি জ্বলছে।

বল্লাম—কিন্তু সারা জীবন হয় ত' তোমাকে দারিদ্র্যের সঙ্গে পাঞ্জা কসতে হবে।

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেন গুপ্ত

—আমি তার শক্তি পরীক্ষা করব।—হেনার উত্তরে একটা প্রাবল্য আছে—আমি অর্থোপার্জ্জনে ত' অযোগ্য নই, এবং যিনি আমার অযোগ্য নন্ তিনিও নিশ্চয়ই অনর্থক হবেন না।

—পীযূষ-বাবুর সঙ্গে আমার কবে দেখা হবে?

-বোধ হচ্ছে আজ্‌কের দিনটি ছাড়া। বোধ হয় আজ সে আমারই মতো ঘরোয়া হ'য়ে আছে।...রং-পুরে চাকুরি করতে যাব ক্ষিতি-দা।

—সঙ্গে গাধাবোট্‌টি আছে?

—হাসিয়ো না বল্‌ছি। তোমার উপমাগুলি ভারি কাঠখোট্টা।

অবাক হ'য়ে যাই। কঠিন মাটিতে বসে' হেনা ফানুস্ ওড়াচ্ছে। ওদের বিয়ে হ'তে একমাসো দেরি নেই।

সিঁড়ি দিয়ে নাম্‌ছি,—সুবলের সঙ্গে দেখা। সুবল মেসোমশায়ের ছোট ভাইর চতুর্থ ছেলে। ষোলয় পড়েছে। ও সব সময় টগ্‌বগ্ করছে। দম্‌কার মতো সব সময়েই ও সজোরে ঝাপ্‌টা দিয়ে চলেছে।

আমাকে দেখেই বলে' উঠ্‌ল—জান ক্ষিতিদা, ব্যাপার? হামণ্ড্ সাট্‌ক্লিফের রেকর্ড ভাঙ্‌ল?

কথাটা মাথায় একেবারে ধাঁ ক'রে লাগ্‌ল। মনে হ'ল গ্রীক্ শুন্‌ছি।

—হাঁ হ'য়ে আছ কি? কোনো খবর রাখ না তা'লে? টেষ্ট্ ম্যাচ্ গো ফোর্থ টেষ্ট্ ম্যাচ্—ইংলণ্ডে অষ্ট্রেলিয়ায়। কুড়ি বছরের ছেলে জ্যাক্‌সন্ জীবনে প্রথম নেমে পাঁচ ঘণ্টার ওপর ব্যাট্ চালিয়ে এক শ' চৌষট্টি কর্‌লে,—ভাব্‌তে পার? যাবে য়্যাডিলেড্?

সুবল আমার হাত ধ'রে টেনে বল্লে—এস আমার ঘরে।

সুবলের ঘরটি ছোট,—বল্‌তে গেলে হকি-ষ্টিক্ আর ব্যাটে বোঝাই। কল্‌কাতায় যখন এম্ সি সি এসেছিল তখন একখানা ব্যাটের ওপর ও তাদের এগারো জন খেলোয়াড়ের সই নিয়েছে,—সেটা দরজার সাম্‌নে ঝুলিয়ে রেখেছে।—পড়ার বই ধূলায় গড়াগড়ি যাচ্ছে, টেবিলে খাটের ওপর খালি কতগুলি পিক্‌চার-শো আর স্ফিয়ার্ পত্রিকা।

সুবল কোনো ম্যাচে এখনো সেঞ্চুরি কর্‌তে পার্‌ল না—এই ওর আপ্‌শোষ।

বল্লাম—পড়াশুনা কি তোমার রসাতলে গেছে?

—রস পাই না ব'লে তাদের সেখানেই পাঠিয়েছি। ম্যাট্রিক পাশ কর্‌তে না পার্‌লে বাবা ডিস্‌ইন্‌হেরিট্ কর্‌বেন বলেছেন। ভারি নিশ্চিন্ত হ'য়ে আছি। ভালো লাগে না পড়াশুনো।

—কি ভালো লাগে?

—সত্যি বল্‌ব?—সিনারি আর মেশিনারি! সিনারির মধ্যে কি ভালো লেগেছিল শুন্‌বে?—একটি তামিল ভিক্ষুক-মেয়ে তার বুড়ো স্বামীর জন্য ভিক্ষা চাইছে, আর একবার দেখেছিলাম ইটের ফাটলে ছোট কচি একটি বট-পাতা। দেখ্‌বে সেই তামিল-মেয়ের ছবি?

ব'লে সুবল এক ব্যাগ ফটো বা'র কর্‌লে। সুবলের ক্যামেরার সাম্‌নে কে যে না দাঁড়িয়েছে তার ঠিক নেই। বুড়ো মজুর, ভাঙা বাড়ি, পচা ডোবা—সবই কেমন খাপ্‌ছাড়া।

—আর মেশিনারির মধ্যে কি আমাকে সব চেয়ে মুগ্ধ করেছিল, জান? গয়া এক্‌সপ্রেস্-এর চৌচির এঞ্জিনটা,—যেন দেশ্‌লায়ের কাঠি। আমি ছিলাম সেই গাড়িতে,—খালি এই দাঁতটা গেছে। জান ক্ষিতিদা, আমি একটা যন্ত্র আবিষ্কার কর্‌ছি?

—কি?

—তাতে ক'রে মানুষের astral body এক সেকেণ্ডে যে-কোনো জায়গায় চলে' যেতে পার্‌বে।

—সে ত' যাচ্ছেই। উড়ে যেতে মনের এক সেকেণ্ডও লাগে না।

—তেমন যাওয়া নয়। এ সত্যি গিয়ে বস্‌বে, শুন্‌বে, দেখ্‌বে, কথা কইবে—খালি ছোঁয়া যাবে না তাকে। হিমালয় তার বাধা হবে না, না বা আট্‌লান্টিক্। এ-বিষয়ে

কোনান্ ডয়েলের সঙ্গে পরামর্শ কর্‌তে পার্‌লে ভালো হ'ত।

কৌতূহলী হ'য়ে বল্লাম—আর কি ভাল লাগে তোমার?

—তিনটি বিস্ময়কর আবির্ভাব,—একটি আকাশে, একটি জীবনে, আরেকটি ষ্টেজে! সহসা একদিন খুব ভোরে জেগে উঠে সমস্ত রাত্রির ঝড়ের পর সূর্য্যোদয় দেখেছিলাম,—তা আজ ভাব্‌লেও আমার আনন্দে হৃৎকম্প হয়। দ্বিতীয়টি,—ভোরবেলায় স্নান ক'রে ক্ষৌমবাসে রবীন্দ্রনাথ যখন তাঁর জোড়াসাঁকোর বাড়ির দোতলার বৈঠকখানাটিতে এসে দাঁড়ান,—তুমি তা ধারণা করতে পার্‌বে না, ক্ষিতিদা,—যেন একটি স্তব মানুষের মূর্ত্তি নিয়েছে। আরেকটি দেখেছি—আলমগীরের ভূমিকায় শিশির ভাদুড়ি যখন রঙ্গমঞ্চে এসে প্রথম দেখা দেন,—কাছাকাছি একদিন আলমগীর দিলে দেখে এসো। ও! তুমি ত' আবার থিয়েটারের ওপর চটা। সিনেমার ওপরো?

—নিশ্চয়।

—কেন নিশ্চয়? যাও, যাও একদিন চার্লি মারে আর জর্জ সিড্‌নিকে দেখে এস, হেসে-হেসে সুস্থ হবে,—দেশের জন্য গুণ্ডামিটা ঠাণ্ডা কর দিন কতক। হলিউড্‌ ষ্টুডিয়োর ছবি দেখ্‌বে একটা? ডগ্‌লাস্ আর পিক্‌ফোর্ড। বল ত, কেমন সুখে আছে ওরা!

হঠাৎ সুবল গলাটা সাম্‌নের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বল্লে—তুমি নাচ ভালোবাসো?

—ভালুক-নাচ?

—না না, আনা পাভ্‌লোভার নাচ। এম্পায়ারে দেখ্‌তে গেছ্‌লাম সেদিন। সুপার্ব! কিন্তু যাই বল ক্ষিতি-দা, নটীর পূজার কাছে লাগে না। তুমি দেখনি ত'? তুমি কেন আছ তা'লে,—খালি মুগুর ভাঁজ্‌বে?—পাভ্‌লোভা মনকে অভিভূত করে বটে, কিন্তু প্রীত করে না, ঠিক হুইটম্যান্-এর কবিতার মত,—মনে একটি বিষাদশ্রী আনে না। আচ্ছা, তুমি রেস্ ভালোবাস? আমার কাছ থেকে টিপ্‌স্ নেবে? এই যা, তোমাকে একটা জিনিসই দেখানো হয় নি,—এই দেখ, এই পাখার ওপর পাভ্‌লোভা তার নাম লিখে দিয়েছে। আমি গেছ্‌লাম দেখা কর্‌তে গ্রাণ্ড হোটেলে।

বল্লাম—আজ ত' শনিবার, যাবে না বায়স্কোপ?

হঠাৎ সুবলের মুখ ম্লান হ'য়ে গেল। বল্লে—সেই ত' দুঃখ, ক্ষিতি-দা,—বাবা আর পয়সা দেন না। আজ He who gets slappedটা ছিল, শুনেছি খাসা ফিল্‌ম্,—আঁদ্রিভ্-এর ড্রামা, পড়েছ নিশ্চয়ই; দেখেছ লন্ চ্যানিকে? —সহস্রানন!—কিন্তু ট্যাঁকে আধলাও নেই একটা। সেদিনকার রানিং ফ্ল্যাশ্ একেবারে ফতুর ক'রে দিয়েছে। জানই ত' চার আনা আট আনায় আমার পোষায় না। আমাকে দেবে তিনটে টাকা ধার? ব'লে হাত পাত্‌লে।

ধমক দিয়ে উঠ্‌লাম। সুবল খিল্ খিল্ ক'রে হেসে উঠ্‌ল।

খানিক বাদে মুখ গম্ভীর ক'রে বল্লে—আজ যদি slumming করতে বেরিয়ে কোনো মজুরের দুঃখ দেখ, তা'লে নিশ্চয়ই তাকে তিনটে টাকা দিয়ে ফেলে তার দুঃখকে প্রশ্রয় দেবে। কিন্তু, আমি আজ বায়স্কোপ দেখ্‌তে পাচ্ছি না সেটা তোমার কাছে একটা দুঃখই নয়। তুমি ভারি সেন্টিমেণ্টাল্, ক্ষিতি-দা। আজ উপোস ক'রে থেকে সমস্ত রাত্রি তোমার মজুর-hero যে কষ্ট পাবে আমি তার চেয়ে ঢের বেশিই কষ্ট পাচ্ছি। মোটে তিনটি টাকা,—দেবে? আরো যদি দুটো টাকা বেশি দাও, একবার সোডা ফাউণ্টেনে ঢুঁ মেরে আসি। ব'লেই আবার হাসি।

উঠ্‌ছি, সুবল বল্লে—সেজদার ঘরে যাচ্ছ? নিশ্চয়ই কবিতা লিখ্‌ছে এখন। ওঁকে দেখেছ ত?

সুবল আবার হাস্‌লে। বল্লে—তুমি কাউন্টি কালেনের কবিতা পড়নি?

Yet do I marvel at this curious thing :
To make a poet black, and bid him sing !

যাও যাও, সেজদাকে একবার দেখে এস।—বাংলা কাব্য-মন্দিরের কালাপাহাড়!

চট্ ক'রে প্রশ্ন কর্‌লাম—ওঁর কি দুঃখ?

—বাংলা দেশে ওঁর নাম হচ্ছে না,—প্রশংসা-কাঙাল সেজদার এই দুঃখেই কবিতা অপাঠ্য হ'য়ে উঠ্‌ছে। বাংলা

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেন গুপ্ত

দেশে এতগুলো যে খিস্তির কাগজ আছে তার একটাও ওঁকে গালাগাল দিয়ে পরোক্ষে ওঁর অধ্যবসায়ের তারিফ্ করছে না—এ ওঁর অসহ্য। তুমি যাও দেখা করতে, তোমাকে এক্ষুনি ওঁর কবিতার সমালোচনা লিখে দিতে বলবেন। যদি বল অতি রোথো, থার্ড-রেট্ কবিতা, তবে একমাত্র রেগেই ওঁর passion দেখাবেন। এ রকম সত্যিই একটা কাণ্ড ঘ'টে গেছে।

বল্লাম—কবিতা শোন্‌বার মত আমার অস্বাস্থ্য নেই।

—Egg-zactly! বল না ওঁকে সে-কথা, থাম্‌চে দেবেন।...উনি নিজেই এক কাগজ বের ক'রে নিজের কবিতার কুকীর্ত্তি কীর্ত্তন করবেন ঠিক করেছেন—যদি তাতে অন্তত লোকের চোখ পড়ে। সেজদার জন্য আমার ভারি করুণা হয়, ক্ষিতি-দা! ওঁকে পিঁজরাপোলে কেন পুরে রাখে না? আমায় যদি বায়স্কোপ দেখতে কিছু টাকা দেন, আমি ওঁর কবিতার জন্য প্রোপাগাণ্ডা করি,—রুপার্ট ব্রুক্, ড্রিঙ্ক্‌ওয়াটার্ গিব্‌সন্‌রা যেমন করেছিল—

বেরুচ্ছি, সুবল চেঁচিয়ে বল্লে—সেজদার আরেক কীর্ত্তি শুনে যাও, ক্ষিতি-দা।

ফির্‌লাম।

—সেজদা কবিতায় কুস্তি ত করেনই, এমনিও করেন। এগিয়ো না ওঁর কাছে। ওঁকে তৎক্ষণাৎ সার্টিফিকেট্ লিখে দিতে হবে। এখানেই আরেকটু বোস। আমার অটোগ্রাফের খাতাটা দেখে যাও।

ব'লে এক খাতা বের করলে। ভাবছিলাম বুঝি মহর্ষি বাল্মীকিরো দস্তখৎ দেখতে পাব। কেন না সুবলের পক্ষে কিছুই অসাধ্য নয়।

সুবল বল্লে—এ সব খুব নিরীহ নগণ্য লোকদের সই—আমাদের উড়ে মালির, ঝাড়ুদারের, দরোয়ানের—

বল্লাম—ওরা লিখতে জানে নাকি?

—উড়ে মালিটাকে হাত ধ'রে ধ'রে লিখিয়েছি, ঝাড়ুদারটা আঁকি-বুঁকি দিয়েছে কতগুলি। এই দেখ, বই-বাঁধানো দপ্তরির, ফোটো-ফ্রেমারের, বাজার-সরকারের, বোতল-বিক্রিওলার,—কার নেই সই? এই একটা ভিখিরির। এ একটা দামী জিনিস বলতে হবে। আর এই দেখ সেজদার, একজন ব্যর্থ বোকা কবির।

হেসে উঠলাম। সুবল বল্লে—জীবনে যারা প্রতিজ্ঞ, ব্যথিত, পরাজিত—এই ক'টি আখরের আঁচড়ে তাদের দীর্ঘশ্বাস জমা ক'রে রেখেছি। তুমিও ত' কত গুণ্ডামি করলে, তবু ভারতবর্ষকে মুক্ত করতে পারলে না।—দেবে তোমার সই?

চুপ ক'রে রইলাম।

সুবল বল্লে—একটা কথা ভুল বলেছি। সেজদা যে-খিস্তির কাগজ বার করছেন, তাতে তোমাকেও গাল দিতে পারেন তুমি ওঁর কবিতার সার্টিফিকেট দাওনি ব'লে,—যদি তোমাকে গাল দেন তবে তুমিও কোনো কাগজে ওঁকে গাল দিয়ে ওঁকে একটু মর্য্যাদা দিয়ো, ক্ষিতি-দা। এত কষ্ট হয় ওঁর জন্য!

রুষের জন্য আলাদা ঘর নেই,—কিন্তু একটি বাক্স আছে। সেই বাক্স নিয়ে ওর দোকানদারি আর ফুরোয় না,—সেই বাক্সই ওর সম্পত্তি, ওর শৈশবকবিতা!

রুষ্ বলে—আমি কবে বড় হব, ক্ষিতি-দা?

হাত দুটো উঁচুতে ছুঁড়ে লাফিয়ে উঠে রুষ বলে—আমি বড় হ'য়ে কবে আকাশ থেকে সূর্য্য পেড়ে আন্‌ব? ঐ মেঘটাকে কেড়ে আন্‌বার জন্য মই'র মত লম্বা হব কবে?

এ ছাড়া রুষের মুখে আর কোনো কথা নেই।

রুষ্ সমস্ত বাড়ি মাতিয়ে রেখেছে,—রুষ্ ছাড়া কারো খাবার রোচে না। ভ্রমর রুষ্‌কে কাপড় পরিয়ে দেয়, হেনা কানে দেয় ফুল গুঁজে, ক্লাই দেয় চুল ছেঁটে, সুবল তার অটোগ্রাফের বইয়ে ওর আঁকিবুঁকি সই নেয়, মোটা সেজদা ওকে নিয়ে কবিতা লেখে।

রুষ্ ছোট সাইকেল চালায়, ছোট থালায় ভাত খায়—আর বড় হবার স্বপ্ন দেখে।

আমি থাকি নীচে একতলায়, ঠিক সদর দরজার পাশে।

সকলের সঙ্গে ঘুরে-ঘুরে আলাপ ক'রে শুতে-শুতে রাত দু'টো বাজে।

এরা সবাই যখন এক সঙ্গে থাকে, তখন মনে হয় এদের ঘিরে স্ফূর্ত্তির ফোয়ারা চলেছে,—বিলাসের প্রাচুর্য্য ও আড়ম্বরের কৃত্রিমতার মাঝে এদের দুঃখকে ছোঁয়াই যায় না, মনে হয় দুঃখটা এদের ভাবরচনা ছাড়া আর কিছুই নয়। মনে হয় না নীরেন চক্রবর্ত্তীর জন্য ভ্রমরের মন একদিনো উচাটন হয়েছিল, মনে হয় না পীযূষকে পাবে না জেনে হেনা কোনোদিন দুঃখের তপশ্চারণের প্রতিজ্ঞা করেছে। এক সঙ্গে থাক্‌লে মোটা সেজদাকেও মনে হয় না সে কবিযশভিখারী, মনে হয় বড় বড় হাঁ ক'রে ভাত খাওয়াই ওঁর কাজ।

কিন্তু যখন এরা একা থাকে, তখন যাও এদের কাছে। ভ্রমর অতীতের একটি ছায়াশীতল দিনের কোলে এখনো ঘুমায়, হেনার দুই চোখে এখনো অনিশ্চয়তার অন্ধকার, সুধাংশু স্বার্থপর সঙ্কীর্ণচিত্ত হ'য়ে যেতে চায়, মোটা সেজদা কবিতা ভালো লিখ্‌তে পাচ্ছে না ব'লে কপাল কোটে। যদি মেশোমশায়কে গিয়ে জিজ্ঞেস্ করি, শুন্‌ব হয় ত' তিনি ইন্‌সল্‌ভেন্ট্, তাঁর ছোট ভাইকে জিজ্ঞেস করলে জবাব পাওয়া যাবে—আরো লাখ্ সাতেক ক্যাপিট্যাল্ চাই হে। এমন কি, আকাঙ্ক্ষায় কুবেরো হৃদয় দুল্‌ছে—হয় ত' চিরজীবন এই আকাঙ্ক্ষায়ই মানবমন নিয়তচঞ্চল। যেখানে আকাঙ্ক্ষা, আশঙ্কাও সেইখানে।

কিন্তু কি ছোট ছোট দুঃখ ওদের! আচ্ছা, দুঃখ কি কখনো ছোট হ'তে পারে? নিশ্চয়ই পারে। ভারতবর্ষের মুক্তির জন্য কারো মনে এতটুকু তপস্যার বহ্নি নেই, সহ্য করবার শৌর্য্য নেই, দাহ্যতা নেই। মন বিদ্রোহী হ'য়ে উঠে,—যত মামুলি বক্তৃতা আবার আমূল আবৃত্তি করি। মহিমাময়ী লোকলক্ষ্মীর কেউ স্বপ্ন দেখে না, সবাই অন্ধ, নিশ্চেতন! নিজেকে একান্ত অসহায় মনে হয়, নিজের আলস্যকে ধিক্কার দিই।

রাত তখন কটা হবে?—তিনটা প্রায়। সদর দরজায় কে ধাক্কা দিচ্ছে।' উঠে দরজা খুল্‌লাম। যিনি ঢুকতে পার্‌ছিলেন না তিনি মেসোমশাইয়ের দাদার তৃতীয় পুত্র—নাম ললিত।

ছি ছি, সারা গা ঘিন্‌ঘিন্ কর্‌ছে। ললিতচন্দ্র দস্তুরমতো টল্‌ছেন।

ঘৃণার সুরে বল্লাম—এ কি ললিত, ছিঃ! এততেও তোমার লজ্জা নেই?

ললিত আমার পা দু'টো জড়িয়ে ধ'রে বল্লে—আমার পিঠে কয়েকটা লাথি মেরেও যদি তার আদ্ধেকের আদ্ধেক টাকা দাও, তা হ'লে আমি আরো খানিকটা খেয়ে বেহুঁস হ'য়ে যেতে পারি। দেবে না? সত্যি ক্ষিতি-দা, আমি বেহুঁস্ হ'য়ে যেতে চাই, থেমে যেতে চাই,—

আমার বিছানায় ওকে শুইয়ে দিলাম। ললিত জড়িয়ে জড়িয়ে বল্‌তে লাগ্‌ল—

I have been faithful to the Cynara! in my fashion.

বল্লাম—তোমার এই দুর্ম্মতি কেন, ললিত?

—দুর্ম্মতির জন্যই দুর্ম্মতি, ক্ষিতি-দা। পিপাসার জন্য জল খেতে গিয়ে দেখলাম গলায় কে কলসী বেঁধে দিয়েছে।

—আর কোনোদিন খেয়ো না।

—কে? তুমি বলছ ক্ষিতি-দা? সে এসে বল্‌লেও খেতাম, পেছ-পা হতাম না।

—কে সে?

—স্বয়ং Cynara।

ওর চুলে হাত বুলুতে বুলুতে বল্লাম—কাকে ভালোবেসেছিলে?

—মোট্টে না। কোথায় সুযোগ ভালোবাস্‌বার? ভালোবাসা ত' একটা air বই কিছু নয়। আমার উচ্ছন্নে যাবার কোনো ইন্‌টেলেক্‌চুয়েল্ ব্যাখ্যা নেই,—আমি এম্‌নি ডুবলাম।

বল্লাম—তবে কে এই Cynara?

—চেন না তাকে? যাকে শুধু in fashionই পাওয়া যায়।

বল্লাম—মিথ্যে কথা।

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেন গুপ্ত

—একটা সত্য কথা না শুন্‌লে বুঝি তোমর মন ওঠে না,—Cynara আমার ভাবী স্ত্রী, মদ ছাড়্‌বার জন্য ভালো হ'য়ে যাবার জন্য যাকে আমার বিয়ে কর্‌তে হবে, যাকে কোনোদিন আমি হারাতে শিখ্‌ব না। সেই,—আমার অনাগত প্রেমপাত্রী। তার জন্যে বড্ড ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছি কি না—

—কত উড়োলে ?

—বহু ;—রেখেই বা কি হ'ত ? দারিদ্র্য আর স্বাচ্ছন্দ্য দুইই আমার কাছে সমান। আচ্ছা, তোমার মনে হয় না ক্ষিতি-দা, সমস্ত সৃষ্টিটাই একটা নিরর্থক আর্ট! মনে হয় না, আমাদের জন্মটা একটা নিদারুণ পাপ,—সমস্ত জীবনটা আমাদের অন্তরীণ-বাস, মুক্তি আমাদের মৃত্যু। মনে হয় না ? তুমি ত' ভারতের মুক্তিকামী,—তুমি তা'লে মদ খাও না কেন ক্ষিতি-দা ?

বল্লাম—তোমাদের মত মেরুদণ্ড আমার কোমল নয়, ললিত।

ললিত বল্লে—ক্ষিতি-দা, তুমি একটা ইডিয়ট্‌।

খানিকবাদে ললিত বল্লে—ঘুমোচ্ছ ? শুন্‌লে না Cynara কে ? জীবনব্যাপারে তোমার কৌতূহল এত কম, ক্ষিতি-দা ?

ঘুমোবার ভাণ করে' রইলাম।

ললিত বল্‌তে লাগ্‌ল—Cynara ত এলেন, রূপ আর বেশের বর্ণনা নাই বা কর্‌লাম, রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা' পড়েছ ?—সেখান থেকে কিটিকে বেছে নিয়ো। এসে যা বল্‌বার বল্লেন।

—মানে ?

—বল্লেন, ভালোবাসি। আমি কি বল্লাম, জান ?

—না।

—বল্লাম, দাঁড়াও, কাগজ কলম ষ্ট্যাম্প আনি,—কণ্ট্র্যাক্ট-ফর্মে সই করতে হবে। ছ'মাসের জন্য ভালোবাসার কণ্ট্র্যাক্ট, ক্ষিতি দা।

—ছ'মাস ত' ছিল ?

—ছ'মাসের ছ'দিন কম। Cynara ম'রে গেছে।

এ বাড়িতে আমার আর থাকা চল্‌বে না। এদের নির্জ্জীবতা এদের অস্বাস্থ্যকর ভাবাকুলতা আমাকে অসহ্য পীড়া দিচ্ছে। আমাকে আবার বেরিয়ে পড়্‌তে হবে ঝড়ো হাওয়ার মত,—আমি পায়রার কোটরে কয়েদ থাক্‌ব না।

ভ্রমরের সঙ্গে দেখা। ছেলেকে নিয়ে খুব আদর কর্‌ছে।

বল্লাম—আমি যাচ্ছি, ভ্রমর।

—কোথায় যাচ্ছ ?

—আপাতত পথে, পরে হয় ত' ফের জেলখানায়।

—বা রে, আমরা যেতে দিলে ত!

বল্লাম—কাউকেই ধ'রে রাখ্‌তে পারনি, নীরেন্‌ চক্রকেও নয়। কিন্তু যাবার আগে তোমাকে একটা সুসংবাদ দিয়ে যাব। তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হয়েছে, ভ্রমর।

—আমার আবার মনস্কামনা কি ?

—তোমার ইচ্ছা ছিল নীরেন যেন ভদ্র ব'নে যায়। সে তাই হচ্ছে,—আস্‌চে সপ্তাহে তার বিয়ে

যেন উল্লাসে ভ্রমর বল্লে—বল কি ? সত্যি ?

কিন্তু কথার সুরে একটা কাতরতা প্রচ্ছন্ন ছিল।

বল্লাম—তোমাকে নেমন্তন্ন করতে ব'লে দিয়েছে।

ভ্রমর সহসা উদাসীন হ'য়ে গেছে। বল্লে—ভালই ত, কিন্তু কে না কে,—তার বিয়েতে আমি যাব কিসের জন্য ? সে আমার কাছে একটা পথের লোক ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু ক্ষিতি-দা, তোমরা ত মেয়েদের খুব ঠাট্টা কর, কিন্তু তোমাদেরই বা সেই আদর্শ-আরাধনা কই, তার জন্যে কঠোর কষ্টভোগ কই ? নীরেনের এই অধোগতি আমাকে যে কী অপমান কর্‌ছে বল্‌তে পারি না।

বল্লাম—এ মজা মন্দ নয়, তুমি যে ভারি স্বার্থপরের মত কথা কইছ, ভ্রমর।

—কিন্তু নীরেনকে আমি এত ছোট কোনোদিন মনে করিনি, ক্ষিতি-দা। তার থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে গেলেও তার নিষ্ঠার প্রতি আমার আসক্তি ছিল। ছি ছি।

—ঠিক এম্‌নি তোমাকে সেও ছি-ছি করেছে!

—তবু, তবু ক্ষিতি-দা, নীরেনকে আমি সত্যি সত্যি কত বড় মনে কর্‌তাম, ধূমলেশহীন বহ্নিশিখার মত! আমার সংসারজীবনের সমস্ত মাধুর্য্য যেন নিঃশেষে ফুরিয়ে

গেল আজ। নীরেনের স্মৃতি আমার কাছে আমার সন্তানের মতনই স্নেহাস্পদ ছিল! তুমি আমাকে এ কী শোনালে?

ভ্রমরের দুই চোখ ছলছল ক'রে উঠেছে। করুণ ক'রে বল্লে—আমার জীবনে কবিতার একটি কণাও আর রইল না, ক্ষিতি-দা। নীরেনের বেদনা আমার জীবনে পরম-মধুর একটি লাবণ্য বিস্তার করেছিল, আমি আজ একেবারে বিরস, বিগতসৌরভ, বিফল হ'য়ে গেছি। কেউ আমার জন্যে মার্টার হয়েছে,—এ ভাবার মধ্যে বেদনা ও স্নেহের সঙ্গে কী প্রকাণ্ড গৌরব ছিল,—আমি যে সত্যি সত্যিই তার কাছে তোমার ভারতবর্ষ ছিলাম!

মনে মনে বল্লাম—ছাই ছিলে! কে নীরেন্—তাই চিনিনা।

ভ্রমর উদাসীনের মতো চুপ ক'রে ব'সে আছে খাটের বাজুতে কনুই রেখে। ভ্রমরের চোখে জল দেখে মনটা যেন ভিজে উঠ্‌লো! বেচারা নীরেন!

হেনার ঘরে যেতে-যেতে শুনলাম সুধাংশু আর তার বউর বাক্‌যুদ্ধ চলেছে। সুধাংশু কেন এবারো পাশ করতে পারল না,—বউর আপত্তি সেইখানে; বউ কেন বাইবেলের প্রথম উপদেশ বৎসরে বৎসরে পালন করছে—সুধাংশুর আপত্তি অমানুষিক।

হেনার ঘরে এসে দেখি হেনা ভারি ব্যস্ত হ'য়ে জিনিস-পত্র গুছোচ্ছে। ওর দুই উৎসুক করতলে সেই দিৎসা, সেই চঞ্চল স্নেহাকুলতা!

বল্লাম—এত তাড়াহুড়ো কিসের, হেনা?

হেনা বল্লে—আমি যে রংপুরে যাচ্ছি ক্ষিতি-দা, এক হপ্তার মধ্যেই। আমাকে সেই মাস্টারিটা নিতেই হ'ল।

—কেন? তোমার বিয়ে?

—সে আর হচ্ছে না। তুমি বুঝি শোননি কিছু? পীযূষের টি বি...

হেনা যেন বল্তে বল্তে নিজেই শিউরে উঠ্‌ছে! বল্লাম—বল কি'?

—তুমি তার চেহারা দেখ্‌লে ভয়ে চেঁচিয়ে উঠ্‌বে, ক্ষিতি-দা,—একেবারে ফ্যাকাশে হ'য়ে গেছে। কি দিয়ে যে কি হ'য়ে গেল বুঝ্‌তে পারছি না! আমাদের মিলনের মাঝে মৃত্যুকে দেখ্‌লাম,—বিকৃত, দুর্ভিক্ষপীড়িত, রক্ত-পিপাসু! মৃত্যুর নিশ্বাসে প্রেম যদি পুড়ে যায়,—আমি যদি আবার কোনদিন পীযূষকে ভুলে যাই,—সে কী মারাত্মক ট্র্যাজেডি।

—তুমি তাকে ফেলে মাস্টারি করতে যাবে?

—সে-ই ত' আমাকে ফেলে যাচ্ছে। মৃত্যুটাই ত' তত শোচনীয় নয় ক্ষিতি-দা, মৃত্যুর পরে বিস্মৃতিটা যেমন। আর তাকে মনে রাখ্‌ব না,—তাকে ভুলে যাব, আবার তেমনি সময়ের চাকা গড়িয়ে চল্‌বে—আমার জীবনের সেই দুর্দ্দিনের চেহারা ভেবে আমি ভারি ভয় পেয়ে গেছি। আমাকে সারা জীবন যুদ্ধ করতে হবে, অথচ পরাস্ত হবার গৌরবটুকুও আমার রইল না।

হেনা ললাটের ঘাম মুছ্‌বার ছলে চোখের জল মুছে ফের বল্লে—আমি ত আমার বর্ত্তমান শক্তির তৌলে ভবিষ্যতের জরার পরিমাপ করতে পারছি না, তাই হয় ত' কোনোদিন অবশ্যম্ভাবী ঘটনার কাছে আমার বশ্যতা স্বীকার করতে হবে,—এ-টুকু দূরদর্শী হ'তে গেলেই আমার সমস্ত অস্তিত্ব সঙ্কুচিত হ'য়ে আসে। আমার অতীতকাল ম্লানমুখে প্রার্থীর মত চেয়ে থাকে। অতীতের প্রতি সেই অবমাননা কি নিদারুণ, ক্ষিতি-দা!

বল্লাম—আশায় একেবারে দেউলে হ'য়ে গিয়ে লাভ নেই, হেনা। জান, চোদ্দ বছর আন্দামান বাস ক'রে এসেও আমি ভারতের স্বাধীনতায় বিশ্বাস হারাইনি, আমার পথের দাবীও ফিরিয়ে নিই নি কোনোদিন। আশা কর।

—আশা করব, না? তা হ'লে রংপুরের পোস্‌ট্‌টা রিজাইন্ দি, কি বল? পুরী-ই যাই তা হ'লে। পীযূষ সেখানে আছে,—একবার প্রাণপণ দেখি না চেষ্টা ক'রে সে বাঁচে কি না। সত্যি ক্ষিতি-দা, আশা করতে পারলেই মনে আবার প্রভূত শক্তি আসে, বিশ্বাস আসে, ভাগ্যকে উদারহৃদয়ে ক্ষমা করতে পারি। তবে রইল রংপুর।

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেন গুপ্ত

বলে' হেনা সব জিনিষ পত্র ওলোট্‌ পালোট্‌ করতে লাগ্‌লো।

হঠাৎ বল্লে—প্রেমের মাঝে মৃত্যুর আবির্ভাব,—একটা এপিক্‌ লিখ্‌বার বিষয়, না ক্ষিতি-দা? যদি লিখে উঠ্‌তে না পারি নিজের জীবন দিয়ে তা প্রমাণ কর্‌ব। আশা,—আশা!

সুবলের ঘরে এসে দেখি দরজায় একটা পিজ্‌বোর্ড টাঙানো,—তাতে লেখা To Let।

কি ব্যাপার? বাপের সঙ্গে ঝগ্‌ড়া ক'রে সুবল নাকি বাড়ি ছেড়েছে, ও জাহাজের খালাসি হবে, এঞ্জিন-ড্রাইভার হবে, কলের কুলি হবে—তাও স্বীকার, ওর পয়সা চাই, ব'সে ব'সে পৈতৃক সম্পত্তি ভোগ করবার মত আলস্যকে ও বরদাস্ত করে না,—ও খেটে পয়সা কামাবে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে।

ওকে যেন কেউ না খোঁজে,—দৈনিক কাগজে যেন বিজ্ঞাপন না দেয়।

তার পর একদিন—সেই দিনের ঘটনাটা ব'লেই পাথুরিয়া-ঘাটা বাই-লেনের তেতলা বাড়ির ওপর যবনিকা টান্‌ব।

তার পর এক দিন—তেতলার ছাতের ওপর দিয়ে একটা চলন্ত ঘুড়ি উড়ে যাচ্ছিল, রুষ্‌ গেল হাত বাড়িয়ে ধরতে।

রুষ্‌ পলকের মধ্যে তেতলার ছাত থেকে প'ড়ে গেল বাড়ির সিমেণ্ট-করা উঠোনের ওপর। মাঝের ফাঁকাটা রুষ্‌কে ধ'রে রাখ্‌তে পারে নি, অদম্য রুষের গতি,—উঠোনই রুষ্‌কে আশ্রয় দিলে। স্তব্ধ রুষ্‌, রক্তাক্ত রুষ্‌!

সমস্ত অরণ্যে আগুন লেগেছে; প্রকাণ্ড জাহাজ রাত্রির ঝঞ্ঝাবিদীর্ণ অন্ধকারে সমুদ্রের তলায় ডুব্‌ছে; একটা আগ্নেয়গিরি যেন মুহূর্ত্তমধ্যে মরীয়া হ'য়ে উঠ্‌ল।

চিরকালের জন্য রুষ্‌ থেমে গেছে,—এর চেয়ে স্পষ্ট, এর চেয়ে বোধগম্য, এর চেয়ে অপ্রতিরোধ্য আর কি আছে পৃথিবীতে?

নীরেন্‌ বিয়ে করছে ব'লে ভ্রমরের আর তিলার্দ্ধ দুঃখ নেই, পীযুষের আসন্ন তিরোধানের অন্ধকার হেনার চক্ষু থেকে মুছে গেছে। Cynara ব'লে যে কেউ ছিল ললিত তা আজ মনে করতে পার্‌ছে না, মোটা সেজদা পর্য্যন্ত ভাব্‌ছে,—শিশুর মৃত্যুর অন্ধকার সমুদ্রের মতই বিশালবিস্তৃত,—কবিতার সঙ্কীর্ণ আয়তনে তার স্থান নেই। সুবল হয় ত' ভাব্‌ছে রুষের যাত্রা কত সুদুর-অভিমুখে, এভারেষ্ট ছাড়িয়ে, কামস্কাট্‌কা ছাড়িয়ে! সুধাংশু ভাব্‌ছে—হোক সে ধৃতরাষ্ট্র, কিন্তু তার সব ক'টি সন্তানই যেন বেঁচে থাকে।

সমস্ত বাড়ির ভিত্তি যেন ন'ড়ে উঠেছে,—যুদ্ধে সমস্ত দেশ যেন উজাড় হ'য়ে গেল। নির্জ্জন রাত্রির কল্পনামণ্ডিত ছোট খাটো সমস্ত দুঃখ শোকবন্যায় ভেসে চলেছে—মানুষের স্নেহবন্ধন কত ভঙ্গুর, মানুষের আশা কত ক্ষীণায়ু, মানুষের প্রতীক্ষা কি বিশ্বাসঘাতক!

শুধু আমিই বিচলিত হইনি। শুধু আমিই বল্‌তে পার্‌লাম—মাসীমা, রুষ্‌কে এবার ছাড়ুন, ওকে এবার নিয়ে যেতে হবে।

৫

অনেকদিন হইতে গ্রামের বৃদ্ধ নরোত্তম দাস বাবাজির সঙ্গে অপুর বড় ভাব। গাঙ্গুলি পাড়ার গৌরবর্ণ, দিব্যকান্তি, সদানন্দ বৃদ্ধ সামান্য খড়ের ঘরে বাস করেন। বিশেষ গোলমাল ভাল বাসেন না, প্রায়ই নির্জ্জনে থাকেন, সন্ধ্যার পর মাঝে মাঝে গাঙ্গুলিদের চণ্ডীমণ্ডপে গিয়া বসেন। অপুর বাল্যকাল হইতেই হরিহর ছেলেকে সঙ্গে করিয়া মাঝে মাঝে নরোত্তম দাসের কাছে লইয়া যাইত—সেই হইতেই দুজনের মধ্যে খুব ভাব। মাঝে মাঝে অপু গিয়া বৃদ্ধের নিকট হাজির হয়, ডাক দেয়,—দাদু আছো? বৃদ্ধ তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া তালপাতার চাটাইখানা দাওয়ায় পাতিয়া দিয়া বলেন—এসো দাদাভাই এসো, বসো বসো—

অন্যস্থানে অপু মুখচোরা, মুখ দিয়া তাহার কোনো কথা বাহির হয় না—কিন্তু এই সরল, শান্তদর্শন বৃদ্ধের সঙ্গে সে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্কোচে মিশিয়া থাকে, বৃদ্ধের সঙ্গে তাহার আলাপ খেলার সঙ্গীদের সঙ্গে আলাপের মত ঘনিষ্ঠ, বাধাহীন ও উল্লাস-ভরা। নরোত্তম দাসের কেহ নাই, বৃদ্ধ একাই থাকেন—এক স্বজাতীয় বৈষ্ণবের মেয়ে কাজকর্ম্ম করিয়া দিয়া চলিয়া যায়। অনেক সময় সারা বিকাল ধরিয়া অপু বসিয়া বসিয়া গল্প শোনে ও গল্প করে। একথা সে জানে যে, নরোত্তম দাস বাবাজি তাহার বাবার অপেক্ষাও বয়সে অনেক বড়, অন্নদা রায়ের অপেক্ষাও বড়—কিন্তু এই বয়োবৃদ্ধতার জন্যই অপুর কেমন যেন মনে হয় বৃদ্ধ তার সতীর্থ, এখানে আসিলে তাহার সকল সঙ্কোচ, সকল লজ্জা আপনা হইতেই ঘুচিয়া যায়। গল্প করিতে করিতে অপু মন খুলিয়া হাসে, এমন সব কথা বলে যাহা অন্যস্থানে সে ভয়ে বলিতে পারে না পাছে প্রবীণ লোকেরা কেহ ধমক দিয়া 'জ্যাঠা ছেলে' বলে। নরোত্তম দাস বলেন—দাদু, তুমি আমার গৌর,—তোমাকে দেখ্‌লে আমার মনে হয় দাদু, আমার গৌর তোমার বয়সে ঠিক তোমার মতই সুন্দর, সুশ্রী, নিষ্পাপ ছিলেন—ওই রকম ভাব-মাখানো চোখ ছিল তাঁর—

অন্যস্থানে এ কথায় অপুর হয়তো লজ্জা হইত, এখানে সে হাসিয়া বলে—দাদু তা হোলে এবার তুমি আমার সেই বই খানার ছবি দেখাও?

বৃদ্ধ ঘর হইতে 'প্রেম ভক্তি চন্দ্রিকা' খানা বাহির করিয়া আনেন। তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় গ্রন্থ, নির্জ্জনে পড়িতে পড়িতে তিনি মুগ্ধ বিভোর হইয়া থাকেন। ছবি মোটে দুখানি, দেখানো শেষ হইয়া গেলে বৃদ্ধ বলেন, আমি মরবার সময়ে বইখানা তোমাকে দিয়ে যাবো দাদু, তোমার হাতে বইয়ের অপমান হবে না—

তাঁহার এক শিষ্য মাঝে মাঝে পদ রচনা করিয়া তাঁহাকে শুনাইতে আসিত বৃদ্ধ বিরক্ত হইয়া বলিতেন,

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

পদ বেঁধেচো বেশ করেচো, ও সব আমায় শুনিও না বাপু, পদকর্ত্তা ছিলেন বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস—তাঁদের পর ও সব আমার কানে বাজে—ওসব গিয়ে অন্য জায়গায় শোনাও।

সহজ, সামান্য, অনাড়ম্বর জীবনের গতি-পথ বাহিয়া এখানে কেমন যেন একটা অন্তঃসলিলা মুক্তির ধারা বহিতে থাকে, অপুর মন সেটুকু কেমন করিয়া ধরিয়া ফেলে। তাহার কাছে তাজা তাজা মাটি, পাখী, গাছপালার সাহচর্য্যের মত অন্তরঙ্গ ও আনন্দপূর্ণ ঠেকে বলিয়াই দাদুর কাছে আসিবার আকর্ষণ তাহার এত প্রবল।

ফিরিবার সময় অপু নরোত্তম দাসের উঠানের গাছ তলাটা হইতে একরাশি মুচুকুন্দ-চাঁপা ফুল কুড়াইয়া আনে। বিছানায় সেগুলি সে রাখিয়া দেয়। তাহার পরেই সন্ধ্যায় আলো জ্বলিলেই বাবার আদেশে পড়িতে বসিতে হয়। ঘণ্টা খানেকের বেশী কোনো দিনই পড়িতে হয় না, কিন্তু অপুর মনে হয় কত রাতই যে হইয়া গেল! পরে ছুটি পাইয়া সে শুইতে যায়, বিছানায় শুইয়া পড়ে,—আর অমনি আজকার দিনের সকল খেলা-ধূলা, অনেকদূরের কামার পাড়ার পথটা, রায়েদের বড় ছাগল-ছানাটা ধরিবার জন্য কত ছুটাছুটি—সারাদিনের সকল আনন্দের স্মৃতিতে ভরপুর হইয়া বিছানায় রাখা মুচুকুন্দ-চাঁপার গন্ধ তাহার ক্লান্ত দেহ মনকে খেলা ধূলার অতীত ক্ষণগুলির জন্য বিরহাতুর বালক-প্রাণকে অভিভূত করিয়া বহিতে থাকে! বিছানায় উপুড় হইয়া ফুলের রাশির মধ্যে মুখ ডুবাইয়া সে অনেকক্ষণ ঘ্রাণ লয়।

পরদিন সকালে নীলমণি রায়ের জঙ্গলাকীর্ণ ভিটার ওধারের খানিকটা বন দুর্গা নিজের হাতে দা দিয়া কাটিয়া পরিষ্কার করিল। ভাইকে বলিল—দাঁড়িয়ে ত্যাখ্ তেঁতুল-তলায় মা আস্‌চে কিনা,—আমি চা'ল বের ক'রে নিয়ে আসি শিগ্‌গির ক'রে—

একটা ভাল নারিকেলের মালায় দুই পলা তেল চুপি চুপি তেলের ভাঁড়টা হইতে ও বাহির করিয়া লইল। অপহৃত মালামাল বাহিরে আসিয়া ভাইয়ের জিম্মা করিয়া বলিল—শীগ্‌গির নিয়ে যা, দৌড়ো অপু—সেইখেনে রেখে আয়, দেখিস্ যেন গরু টরুতে খেয়ে ফেলে না—

এমন সময় মাতোর মা তাহার ছোট ছেলেকে পিছনে লইয়া খিড়্‌কী দোর দিয়া উঠানে ঢুকিল। দুর্গা বলিল—এদিকে কোত্থেকে তমরেজের বৌ?

মাতোর মায়ের বয়সও খুব বেশী না, দেখিতেও মন্দ ছিল না, কিন্তু স্বামীর মৃত্যুর পর হইতেই কষ্টে পড়িয়া মলিন ও শীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। বলিল—কুঠীর মাঠে গিয়েছিলাম কাঠ কুড়ুতি—বুঁইচের মালা নেবা?

দুর্গা তো বন বাগান খুঁজিয়া নিজেই কত বৈঁচিফল প্রায়ই তুলিয়া আনে, ঘাড় নাড়াইয়া বলিল—সে কিনিবে না।

মাতোর মা বলিল—নেও না দিদি ঠাক্‌রোণ, বেশ মিষ্টি বুঁইচে, মধুখালির বিলির ধারের থে তুলেলাম,—কোঁচড় হইতে এক গাছা মালা বাহির করিয়া দেখাইয়া বলিল—ত্যাখো কত বড় বড় কাঠ নিয়ে বাজারে যেতি, বিক্রী কত্তি, পয়সা পেতি বড্ড বেলা হ'য়ে যাবে, মাতোরে ততক্ষণ এক পয়সার মুড়ি কিনে দেতাম। নেও, পয়সায় দু গাছ দোবনি—

দুর্গা রাজি হইল না, বলিল—অপু, ঘটিতে একগাল খানিক চা'ল ভাজা আছে, নিয়ে এসে মাতোর হাতে দে তো! উহারা খিড়্‌কী দোর দিয়াই পুনরায় বাহির হইয়া গেলে দুজনে জিনিষপত্র লইয়া চলিল।

চারিদিকে বনে ঘেরা। বাহির হইতে দেখা যায় না। খেলাঘরের মাটির ছোবার মত ছোট্ট একটা হাঁড়িতে দুর্গা ভাত চড়াইয়া দিয়া বলিল—এই ত্যাখ্ অপু, কত বড় বড় মেটে আলুর ফল নিয়ে এসিচি এক জায়গা থেকে। পুঁটুদের তালতলায় একটা ঝোপের মাথায় অনেক হ'য়ে আছে, ভাতে দেবো—

অপু মহা উৎসাহে শুক্‌না লতা-কাটি কুড়াইয়া আনে। এই তাহাদের প্রথম বন-ভোজন। অপুর এখনও বিশ্বাস হইতেছিল না, যে এখানে সত্যিকারের ভাত-তরকারী রান্না হইবে, না খেলা ঘরের বন-ভোজন যা কতবার হইয়াছে সে-

রকম হইবে,—ধুলার ভাত, খাপ্‌রার আলু ভাজা, কাঁটাল পাতার লুচি ?

কিন্তু বড় সুন্দর বেলাটি।—বড় সুন্দর স্থান বন-ভোজনের! চারিধারে বন ঝোপ, ওদিকে তেলাকুচা লতার দুলুনি, বেল-গাছের তলে জঙ্গলে সেওড়া গাছে ফুলের ঝাড়, আধপোড়া কটা দুর্ব্বাঘাসের উপর খঞ্জন পাখীরা নাচিয়া নাচিয়া ছুটিয়া বেড়াইতেছে, নির্জ্জন ঝোপ ঝাপের আড়ালে নিভৃত নিরালা স্থানটি। প্রথম বসন্তের দিনে ঝোপে ঝোপে নতুন, কচি পাতা, ঘেঁটুফুলের ঝাড় পোড়ো ভিটাটা আলো করিয়া ফুটিয়া আছে, বাতাবি লেবু গাছটায় কয়দিনের কুয়াসায় ফুল অনেক ঝরিয়া গেলেও থোপা থোপা শাদা শাদা ফুল উপরের ডালে চোখে পড়ে—ভুর্‌ভুরে সুমিষ্ট মাদকতাময় সুবাসে সকালের হাওয়া ভরাইয়া রাখিয়াছে! এই স্নিগ্ধ হাওয়া, এই হাল্‌কা-আনন্দ ভরা দিনগুলি এক অপ্রত্যাশিত, আকস্মিক খুসির বার্ত্তা মনে পৌঁছাইয়া দেয়। প্রথম বসন্তের এ রূপ-ভরা দিন-গুলি এখনও তাহাদের কাছে অজানার মোহে ঘেরা—শুধু তাহারা জানে যখন সজ্‌নে-ফুল তলা বিছাইয়া পড়ে, ঘেঁটুফুল ফোটে,—তখনই কি জানি কেন তাহাদের বড় ভাল লাগে।

দুর্গা আজকাল যেন এই গাছপালা, পথঘাট, এই অতি-পরিচিত গ্রামের প্রতি অন্ধি-সন্ধিকে অত্যন্ত বেশী করিয়া আঁকড়াইয়া ধরিতেছে। আসন্ন বিরহের কোন্ বিষাদে এই কত প্রিয় গাবতলার পথটি, ওই তাহাদের বাড়ীর পিছনের বাঁশবন, ছায়া-ভরা নদীর ঘাটটি আচ্ছন্ন থাকে। তাহার অপু—তাহার সোনার খোকা ভাইটি—যাহাকে এক বেলা না দেখিয়া সে থাকিতে পারে না, মন হুহু করে—তাহাকে ফেলিয়া সে কতদূর চলিয়া যাইবে!

আর যদি সে না ফেরে—যদি নিতম পিসির মত হয়?

এই ভিটাতেই নিতম পিসি ছিল, বিবাহ হইয়া কতদিন আগে কোথায় চলিয়া গিয়াছে, আর বাপের ভিটাতে ফিরিয়া আসে নাই। অনেক কাল আগের কথা—ছেলেবেলা হইতে গল্প শুনিয়া আসিতেছে। সকলে বলে বিবাহ হইয়াছিল মুরশিদাবাদ জেলায়,—সে কতদূরে কোথায়? কেহ আর তাহার খোঁজ খবর করে না; আছে কি নাই, কেহ জানে না। বাপকে নিতম পিসি আর দেখে নাই, মাকে আর দেখে নাই, ভাই বোন্‌কেও না। সব একে একে মরিয়া গিয়াছে। মাগো, মানুষে কেমন করিয়া এমন নিষ্ঠুর হয়! কেন তাহার খোঁজ কেহ যে করে নাই! কতদিন সে নির্জ্জনে এই নিতম পিসির কথা ভাবিয়া চোখের জল ফেলিয়াছে। আজ যদি হঠাৎ সে ফিরিয়া আসে—এই ঘোর জঙ্গল-ভরা জনশূন্য বাপের ভিটা দেখিয়া কি ভাবে?

তাহারও যদি ঐ রকম হয়? ঐ তাহার বাবাকে, মাকে, অপুকে ছাড়িয়া—আর কখনো দেখা হইবে না—কখনো না—কখনো না—এই তাহাদের বাড়ী, গাবতলা, ঘাটের পথ?

ভাবিলে গা শিহরিয়া ওঠে,—দরকার নাই।

চড়ুই-ভাতির মাঝামাঝি অপুদের বাড়ীর উঠানে কাহার ডাক শোনা গেল। দুর্গা বলিল—বিনির গলা যেন—নিয়ে আয় তো ডেকে অপু? একটু পরে অপুর পিছনে পিছনে দুর্গার সমবয়সী একটি কালো মেয়ে আসিল—একটু হাসিয়া যেন কতকটা সম্ভ্রমের সুরে বলিল—কি হচ্চে দুর্গা দিদি?

দুর্গা বলিল—আর কি বিনি, চড়ুই-ভাতি কচ্চি—বোস্—

মেয়েটি ওপাড়ার কালীনাথ চক্কত্তির মেয়ে—পরণে আধ ময়লা শাড়ী, হাতে সরু সরু কাঁচের চুড়ি, একটু লম্বা গড়ন, মুখ নিতান্ত সাধাসিধা। তাহার বাপ যুগীর বামুন বলিয়া সামাজিক ব্যাপারে পাড়ায় তাহাদের নিমন্ত্রণ হয় না, যুগী-পাড়ারই এক পাশে নিতান্ত সঙ্কুচিত ভাবে বাস করে। অবস্থাও ভাল নয়। বিনি দুর্গার ফরমাইজ খাটিতে লাগিল খুব। বেড়াইতে আসিয়া হঠাৎ সে যেন একটা লাভজনক ব্যাপারের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে, এখন ইহারা তাহাকে সে উৎসবের অংশীদার স্বীকার করিবে কি না করিবে—এরূপ একটা দ্বিধামিশ্রিত উল্লাসের ভাব তাহার কথাবার্ত্তায় ভাবভঙ্গিতে প্রকাশ পাইতেছিল। দুর্গা বলিল—বিনি, আর দুটো শুক্‌নো কাঠ স্থাখ্ তো—আগুনটা জ্বল্‌চে না ভাল—

বিনি তখনি কাঠ আনিতে ছুটিল এবং একটু পরে এক বোঝা শুক্‌না বেলের ডাল আনিয়া হাজির করিয়া বলিল—

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

...ত হবে দুগ্গা দিদি—না—আর আনবো ?...দুর্গা যখন বলল--বিনি এসেচে—ও-ও তো এখানে খাবে—আর দুটো চাল নিয়ে আয় অপু—বিনির মুখ খানা খুসিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। খানিকটা পরে বিনি জল আনিয়া দিল। আগ্রহের সুরে জিজ্ঞাসা করিল—কি কি তরকারী দুগ্গা দিদি ?

অপু বলে—শীগ্গির উঠে এসে ছাখ্ দিদি ? ভাত হইয়া গিয়াছে, নামাইয়া দুর্গা তেলটুকু দিয়া বেগুন তাহাতে ফেলিয়া দিয়া ভাজে। খানিকটা পরে সে অবাক্ হইয়া ছোবার দিকে চাহিয়া থাকে, অপুকে ডাকিয়া বলে—ঠিক একেবারে সত্যিকারের বেগুন-ভাজার মত রং হচ্চে দেখিচিস্ অপু! ঠিক যেন মার রান্না বেগুন-ভাজা, না ?

অপুরও ব্যাপারটা আশ্চর্য্য বোধ হয়। তাহারও এখনও যেন বিশ্বাস হইতেছিল না যে তাহাদের বন-ভোজনে সত্যিকার ভাত, সত্যিকার বেগুন-ভাজা সম্ভবপর হইবে! তাহার পর দুজনে মহা আনন্দে কলার পাতে খাইতে বসে শুধু ভাত আর বেগুনভাজা, আর কিছু না। অপু গ্রাস মুখে তুলিবার সময় দুর্গা সেদিকে চাহিয়াছিল, আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করে,—কেমন হয়েচে রে বেগুনভাজা ?

অপু বলে,—বেশ হয়েচে দিদি, কিন্তু নুন্ হয়নি যেন—

লবণকে রন্ধনের উপকরণের তালিকা হইতে ইহারা অজ্ঞ একেবারেই বাদ দিয়াছে, লবণের বালাই রাখে নাই। কিন্তু মহাখুসিতে দুজনে কোষো আলুর ফল-ভাতে ও পানসে আধ-পোড়া বেগুনভাজা দিয়া চড়ুইভাতির ভাত খাইতে বসিল। দুর্গার এই প্রথম রান্না, সে বিস্ময়মিশানো আনন্দের সঙ্গে নিজের হাতের শিল্প-সৃষ্টি উপভোগ করিতেছিল। এই বন-ঝোপের মধ্যে, এই শুকনা আতা পাতার রাশের মধ্যে, খেজুর তলায় ঝরিয়া-পড়া খেজুর পাতার পাশে বসিয়া সত্যিকারের ভাত তরকারী খাওয়া!

খাইতে খাইতে দুর্গা অপুর দিকে চাহিয়া হি হি করিয়া খুসির হাসি হাসিল। খুসিতে ভাতের দলা তাহার গলার মধ্যে আট্কাইয়া যাইতেছিল যেন! বিনি খাইতে খাইতে ভয়ে ভয়ে বলিল—একটু তেল আছে দুগ্গাদি, মেটের আলুর ফল ভাতে মেখে নিতাম। দুর্গা বলিল—অপু, ছুটে নিয়ে আয় একটু তেল—

যে জীবন কত শত পুলকের ভাণ্ডার, কত আনন্দ-মুহূর্ত্তের আলো-জ্যোৎস্নার অবদানে মণ্ডিত, ইহাদের সে মাধুরীময় জীবনযাত্রার সবে তো আরম্ভ! অনন্ত যে জীবন-পথ দূর হইতে বহুদূরে দৃষ্টির দুর কোন্ ওপারে বিসর্পিত, সে পথের ইহারা নিতান্ত ক্ষুদ্র পথিকদল, পথের বাঁকে ফুলেফলে দুঃখসুখে, ইহাদের অভ্যর্থনা একেবারে নতুন।

আনন্দ! আনন্দ! প্রসারের আনন্দ, জীবনের মাঝে মাঝে যে আড়াল আছে, বিশাল তুষারমৌলি গিরিসঙ্কটের ওদিকের পথটা দেখিতেছে না তাহার আনন্দ, অজানার আনন্দ! সামান্য সামান্য, ছোট খাটো তুচ্ছ জিনিষের আনন্দ!

অপু বলিল—মাকে কি বল্‌বি দিদি ? আবার ওবেলা ভাত খাবি ?

—দূর্, মাকে কখনো বলি! সন্দের পর দেখিস্ খিদে পাবে এখন—

যুগীর বামুন বলিয়া পাড়ায় জল খাইতে চাহিলে লোকে ঘটিতে করিয়া জল খাইতে দেয়, তাহাও আবার মাজিয়া দিতে হয়। বিনি দুএকবার ইতস্তত করিয়া অপুর গ্লাসটা দেখাইয়া বলিল—আমার গালে একটু জল ঢেলে দেও তো অপু ? জল তেষ্টা পেয়েচে! অপু বলিল—নাও না বিনি-দি, তুমি নিয়ে যাও না, চুমুক দিয়ে খাও না!

তবু যেন বিনির সাহস হয় না। দুর্গা বলিল—নে না বিনি, গেলাসটা নিয়ে খা না ?

খাওয়া হইয়া গেলে দুর্গা বলিল—হাঁড়িটা ফেলা হবে না কিন্তু, আবার আর একদিন বনভোজন করবো—কেমন তো ? ওই কুলগাছটার ওপরে টাঙিয়ে রেখে দেবো ?

অপু বলিল—হাঁা, ওখানে থাক্‌বে কিনা ? মাতোর মা কাঠ কুড়োতে আসে, দেখতে পেলে নিয়ে যাবে দিদি—ভারী চোর—

একটা ভাঙ্গা পাঁচিলের ঘুলঘুলির মধ্যে ছোবাটা দুর্গা রাখিয়া দিল।

অপুর বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করিতেছিল। ঐ ঘুলঘুলিটার ওপিঠে আর একটা ছোট ঘুলঘুলি আছে. তাহার মধ্যে অপু লুকাইয়া চুরুটের বাক্স রাখিয়া দিয়াছে, দিদি সেদিকে যদি যাইয়া পড়ে।

নেড়াদের বাড়ীতে কিছুদিন আগে নেড়ার ভগ্নীপতি ও তাহার এক বন্ধু আসিয়াছিল। তাহারা খুব বাবু, খুব চুরুট খায়। এই একবার খাইল, আবার এই খাইতেছে। অপুর মনে মনে অত্যন্ত ইচ্ছা হইয়াছিল সেও একবার চুরুট খাইয়া দেখিবে, কেমন লাগে। সে একটি পয়সা বাড়ী হইতে যোগাড় করিয়া লইয়া নেড়ার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া গ্রামের হরিশ যুগীর দোকান হইতে তিন পয়সায় (বাকী দুই পয়সা নেড়া দেয়) রাঙা কাগজ মোড়া দশটি চুরুট কিনিয়া আনে। অপুর যাইবার সাহস হয় নাই, নেড়া গিয়া তাহার ভগ্নীপতির অজুহাতে কিনিয়া আনে। পরে অপু সেদিন এই ঘন জঙ্গলের মধ্যে একা বসিয়া চুপি চুপি একটা সিগারেট ধরাইয়া খাইয়াছিল—ভাল লাগে নাই,তেতো,তেতো, কেমন একটা ঝাঁঝ—তাহার মাথা ঘুরিয়া উঠিয়া বুকের মধ্যে কেমন করিয়া উঠিয়াছিল। দুটান্ খাইয়া সে আর খাইতে পারে নাই, কিন্তু তাহার ভাগের বাকী চারিটি চুরুট সে ফেলিয়াও দিতে পারে নাই, নেড়ার ভগ্নীপতির নিকট সংগৃহীত একটা খালি চুরুটের বাক্সে সে কয়টি সে অই পোড়োভিটের জঙ্গলে ভরা ভাঙ্গা পাঁচিলের ঘুলঘুলিতে লুকাইয়া রাখিয়া দিয়াছে। প্রথম চুরুট খাইবার দিন চুরুট টানা শেষ হইয়া গেলে ভয়ে তাহার বুকের মধ্যে কেমন করিয়া উঠিতেছিল পাছে মুখের গন্ধে মা টের পায়। পাকাকুল অনেক করিয়া খাইয়া নিজের মুখের হাই হাত পাতিয়া ধরিয়া অনেকবার পরীক্ষা করিয়া তবে সে সেদিন পুনর্ব্বার মনুষ্যসমাজে প্রবেশ করিয়াছিল। যায় বুঝি আজ বামালশুদ্ধ ধরা পড়িয়া!

কিন্তু দিদির পাঁচিলের ওপিঠে যাইবার দরকার হয় না। এপিঠেই কাজ সারা হইয়া যায়।

কথাটা সর্ব্বজয়া ঘাটে গিয়া পাড়ার মেয়েদের মুখে শুনিল। আজ কয়েকদিন হইতে নীরেনের সঙ্গে অন্নদা রায়ের, বিশেষ করিয়া তাঁহার ছেলে গোকুলের, মনান্তর চলিতেছিল। কাল দুপুর বেলা নাকি খুব ঝগড়া ও চেঁচামেচি বাধে। ফলে কাল রাত্রেই নীরেন জিনিষপত্র লইয়া এখান হইতে চলিয়া গিয়াছে। অন্নদা রায়ের প্রতিবেশী যজ্ঞেশ্বর দীঘড়ার স্ত্রী হরিমতী বলিতেছিলেন—সত্যি মিথ্যে জানিনে, ক'দিন থেকে তো নানা রকম কথা শুনতে পাচ্ছি—আমি বাপু বিশ্বেস্ করিনে, বৌটা তেমন নয়। আবার নাকি শুন্‌লাম নীরেন লুকিয়ে টাকা দিয়েচে, বৌ নাকি টাকা কোথায় পাঠিয়েছিল, নীরেনের হাতে লেখা রসিদ ফিরে এসে গোকুলের হাতে পড়েচে এই সব। সখী ঠাক্‌রুণ আবার মুখ টিপে টিপে বল্লে—যাক্ বাপু, সে সব পরের কুচ্ছ শুনে কি হবে? নীরেন শুন্‌লাম বল্‌চে—আপনারা সকলে মিলে এক জনের ওপর অত্যাচার কর্ত্তে পারেন,তাতে দোষ হয় না?—আপনারা যা ভাব্‌বেন ভাবুন, বৌ ঠাক্‌রুণ একবার হুকুম করুন আমি ওঁকে এই দণ্ডে আমার হারানো মায়ের মত মাথায় ক'রে নিয়ে যাবো—তারপর আপনারা যা করবার করবেন। তারপর খুব হৈ চৈ খানিকক্ষণ হোল—সন্দের আগেই সে গয়লাপাড়া থেকে একখানা গাড়ী ডেকে আন্‌লে জিনিষ পত্তর নিয়ে চ'লে গেল।

সর্ব্বজয়া কথা শুনিয়া বড় দমিয়া গেল। সে ইতিমধ্যে স্বামীকে দিয়া অন্নদা রায়কে নীরেনের পিতার নিকট এ বিবাহ সম্বন্ধে পত্র লিখিতে অনুরোধ করিয়াছে। নীরেনকে আরও দুইবার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল—ছেলেটিকে তাহার অত্যন্ত পছন্দ হইয়াছে। হরিহর তাহাকে অনেকবার বুঝাইয়াছে নীরেনের পিতা বড়লোক—তাহাদের ঘরে তিনি কি আর পুত্রের বিবাহ দিবেন? সর্ব্বজয়া কিন্তু আশা ছাড়ে নাই, তাহার মনের মধ্যে কোথায় যেন সে সাহস পাইয়াছে—এ বিবাহের যোগাযোগ যেন নিতান্ত দুরাশা নয়, ইহা ঘটিবে। হরিহর মনে মনে বিশ্বাস না করিলেও স্ত্রীর অনুরোধে অন্নদা রায়কে কয়েকবার তাগিদ দিয়াছিল বটে। কিন্তু এখন যে বড় বিপদ ঘটিল!

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ইতিমধ্যে একদিন পথে দুর্গার সঙ্গে গোকুলের বউয়ের দেখা হইল। সে চুপি চুপি দুর্গাকে অনেক কথা বলিল, নারেন কেন চলিয়া গেল তাহারই ইতিহাস। বলিতে বলিতে তাহার চোখ ছাপাইয়া ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

—এই রকম ঝাঁটা লাথি খেয়েই দিন যাবে—কেউ নেই দুগ্‌গা—তাই কি ভাইটা মানুষ? কোথাও যে দুদিন জুড়ুবো সে জায়গা নেই—

সহানুভূতিতে দুর্গার বুক ভরিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে খুড়ীমার কলঙ্কের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ও তাহার দুঃখে সান্ত্বনাসূচক নানা কথা অস্পষ্টভাবে তাহার মনের মধ্যে জোট পাকাইয়া উঠিল। সব কথা গুছাইয়া বলিতে না পারিয়া শুধু বলিল, ওই সখী ঠাকুরমা যা লোক! বলুক গে না, সে করবে কি? কেঁদো না খুড়ীমা লক্ষ্মীটি, আমি রোজ যাবো তোমার কাছে—

সর্ব্বজয়া শুনিয়া আগ্রহের সুরে জিজ্ঞাসা করিল, বৌমা কি বল্লে টল্লে রে দুগ্‌গা?...তা—নীরেনের কথা কিছু হোল না কি?

দুর্গা লজ্জিত সুরে বলিল—তুমি কাল জিগ্যেস্‌ কোরো না ঘাটে? আমি জানি নে—

অপু একবার জিজ্ঞাসা করিল—খুড়ীমার কাছে কি শুন্‌লি? মাষ্টার মশায় আর আস্‌বেন না?

দুর্গা ধমক দিয়া কহিল—তা আমি কি জানি—যাঃ—না আসুকে গে—

তাহার পর সে ভুবন মুখুয্যের বাড়ী গেল। রানুর দিদির বিবাহ শেষ হইয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু এখনও কুটুম্ব কুটুম্বিনীরা সকলে যান নাই। ছেলে মেয়েও অনেক। একটি ছোট্ট মেয়ের সঙ্গে দুর্গার বেশ আলাপ হইয়াছে, তার নাম টুনি। তাহার বাপও আসিয়াছেন, আজ দুপুরের পর স্ত্রী ও কন্যাকে কিছুদিনের জন্য এখানে রাখিয়া কর্ম্ম-স্থানে গিয়াছেন। ঘণ্টা খানেক পরে, সেজ ঠাকরুণ এ ঘরে কি কাজ করিতেছিলেন, টুনির মায়ের গলা তাহার কানে গেল। সেজ ঠাকরুণ দালানে আসিয়া বলিলেন—কি রে খুসি কি? টুনির মা উত্তেজিত ভাবে ও ব্যস্ত ভাবে বিছানা পত্র, বালিসের তলা হাতড়াইতেছে, উঁকি মারিতেছে, তোষক উল্টাইয়া ফেলিয়াছে; বলিল—এই মাত্তর আমার সেই সোনার সিঁদুর কৌটোটা এই বিছানার পাশে এই খানটায় রেখেছি, খোকা দোলায় চেঁচিয়ে উঠ্‌ল উনি বাড়ী থেকে এলেন—আর তুল্‌তে মনে নেই—কোথায় গেল আর তো পাচ্ছি নে?—

সেজ ঠাকরুণ বলিলেন—ওমা সে কি? হাতে ক'রে নিয়ে যাস্‌নি তো?

—না দিদিমা, এই খানে রেখে গেলুম। বেশ মনে আছে, ঠিক এই খানে—

সকলে মিলিয়া খানিকক্ষণ চারিদিকে খোঁজাখুঁজি করা হইল, কৌটার সন্ধান নাই। সেজ ঠাকরুণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন দালানে প্রথমটা এ বাড়ীর ছেলে-মেয়ে ছিল, তারপর খাবার খাওয়ার ডাক পড়িলে ছেলে-মেয়েরা সব খাবার খাইতে যায়, তখন বাহিরের লোকের মধ্যে ছিল দুর্গা। সেজ ঠাকরুণের ছোট মেয়ে টেঁপি চুপি চুপি বলিল—আমরা যেই খাবার খেতে গেলাম দুগ্‌গাদি তখন দেখি যে খিড়কী দোর দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, এই মাত্তর আবার এসেচে—

সেজ ঠাকরুণ চুপি চুপি কি পরামর্শ করিলেন, পরে রুক্ষসুরে দুর্গাকে বলিলেন—কৌটো দিয়ে দে দুগ্‌গা, কোথায় রেখেচিস্‌ বল্‌—বার কর এখ্‌খুনি বল্‌চি—

দুর্গার মুখ শুকাইয়া এতটুকু হইয়া গিয়াছিল, সেজ ঠাকরুণের ভাব ভঙ্গিতে তাহার জিব যেন মুখের মধ্যে জড়াইয়া গেল। সে অস্পষ্টভাবে কি বলিল ভাল বোঝা গেল না।

টুনির মা এতক্ষণ কোনো কথা বলে নাই—একজন ভদ্রঘরের মেয়েকে সকলে মিলিয়া চোর বলিয়া ধরাতে সে একটু অবাক্‌ হইয়া গিয়াছিল, বিশেষত দুর্গাকে সে কয়েকদিন এখানে দেখিতেছে, দেখিতে বেশ চেহারা বলিয়া দুর্গাকে পছন্দ করে—সে চুরি করিবে ইহা কি সম্ভব? সে বলিল—ও নেয় নি বোধ হয় সেজদি—ও কেন—

সেজঠাকরুণ বলিলেন—তুমি চুপ করে থাকো না? তুমি ওর কি জানো? নিয়েচে কি না নিয়েচে আমি জানি ভাল ক'রে—

একজন বলিলেন—তা নিয়ে থাকিস্ বের ক'রে দে, নয়তো কোথায় আছে বল,—আপদ চুকে গেল। দিয়ে দে লক্ষ্মীটি, কেন মিথ্যে—

দুর্গা যেন কেমন হইয়া গিয়াছিল—তাহার পা ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছিল—সে দেওয়ালে ঠেস্ দিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—আমি তো জানিনে কাকীমা—আমি তো—

সেজ ঠাকুরুণ বলিলেন—বল্লেই আমি শুনবো? ঠিক ও নিয়েচে—ওর ভাব দেখে আমি বুঝতে পেরেছি। আচ্ছা, ভাল কথায় বল্‌চি কোথায় রেখেচিস্ দিয়ে দে, জিনিস দিয়ে দাও কিছু বোল্‌বো না—আমার জিনিস পেলেই হোল—

পূর্ব্বোক্ত কুটুম্বিনী বলিলেন—ভদ্দর লোকের মেয়ে চুরি করে কোথাও শুনিনি তো কখনো। এই পাড়াতেই বাড়ী নাকি?

সেজ ঠাকুরুণ বলিলেন, তুমি ভাল কথার কেউ নও? দেখবে তুমি মজাটা একবার? তুমি আমার বাড়ীর জিনিস নিয়ে হজম কর্ত্তে গিয়েচো—একি যা তা পেয়েচ বুঝি?—তোমায় আমি আজ—

পরে তিনি দুর্গার হাত খানা ধরিয়া হিড়্ হিড়্ করিয়া টানিয়া তাহাকে দালানের ঠিক মাঝখানে আনিয়া বলিলেন, বল্ এখনও কোথায় রেখেচিস্?…বল্‌বি নে?…না তুমি জানো না তুমি খুকী—তুমি কিচ্ছু জানো না—শীগ্‌গির বল্, নৈলে দাঁতের পাটি একেবারে সব ভেঙ্গে গুঁড়ো ক'রে ফেল্‌বো এখুনি! বল্ শীগ্‌গির—বল্ এখনো বল্‌চি—

টুনির মা হাত ধরিতে আগাইয়া আসিতেছিল, একজন কুটুম্বিনী বলিলেন, রোসো না, দেখ্‌চো না অই ঠিক নিয়েচে। চোরের মারই ওষুধ—দিয়ে দাও এখুনি মিটে গেল,—কেন মিথ্যে—

দুর্গার মাথার মধ্যে কেমন করিতেছিল। সে অসহায় ভাবে চারিদিকে চাহিয়া অতি কষ্টে শুকনো জিবে জড়াইয়া উচ্চারণ করিল—আমি তো জানিনে কাকীমা, আমি নিই নি। ওরা সব চ'লে গেল আমিও তো—কথা বলিবার সময় সে ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া সেজ ঠাকুরুণের দিকে চোখ রাখিয়া দেওয়ালের দিকে ঘেঁসিয়া যাইতে লাগিল।

পরে সকলে মিলিয়া আরও খানিকক্ষণ তাহাকে বুঝাইল। তাহার সেই এক কথা—সে জানে না।

কে একজন বলিল—পাকা চোর—

টেঁপি বলিল—বাগানের আমগুলো তলায় পড়বার যো নেই কাকীমা—

শেষোক্ত কথাতেই বোধ হয় সেজ ঠাকুরুণের কোন ব্যথায় ঘা লাগিল। তিনি হঠাৎ বাজখাই রকমের আওয়াজ ছাড়িয়া বলিয়া উঠিলেন—তবেরে পাজি, নচ্ছার, চোরের ঝাড়, তুমি জিনিস দেবে না? দেখি তুমি দেও কি না দেও! কথা শেষ না করিয়াই তিনি দুর্গার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তাহার মাথাটা লইয়া সজোরে দেওয়ালে ঠুকিতে লাগিলেন। বল্ কোথায় রেখেচিস্—বল্ এখুনি—বল শীগ্‌গির—

টুনির মা তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া সেজ ঠাকুরুণকে হাত ধরিয়া বলিল, করেন কি—করেন কি সেজদি—থাকুগে আমার কৌটো; ওরকম ক'রে মারেন কেন?—ছেড়ে দিন—থাক্ হয়েচে—ছাড়ুন ছিঃ! টুনি মার দেখিয়া কাঁদিয়া উঠিল। পূর্ব্বোক্ত কুটুম্বিনী বলিলেন—এঃ, রক্ত পড়্‌চে যে—

ঝর্ ঝর করিয়া রক্ত পড়িতেছে কেহ লক্ষ্য করে নাই। বুকের কাপড়ের খানিকটা রক্ত পড়িয়া রাঙা হইয়া উঠিয়াছে।

টুনির মা বলিলেন, শীগ্‌গির একটু জল নিয়ে আয় টেঁপি—রোয়াকের বাল্‌তিতে আছে গ্যাখ্—

চেঁচামেচি ও হৈ চৈ শুনিয়া পাশের বাড়ীর কামারদের ঝি-বৌরা ব্যাপার কি দেখিতে আসিল। রাণুর মা এতক্ষণ ছিলেন না—দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পরে কামার বাড়ী বসিয়া গল্প করিতেছিলেন—তিনিও আসিলেন।

মারের চোটে দুর্গার মাথার মধ্যে ঝাঁ ঝাঁ করিতেছিল, সে দিশাহারা ভাবে ভিড়ের মধ্যে একবার চাহিয়া দেখিল অপু তাহার মধ্যে আছে কিনা এবং নাই দেখিয়া আশ্বস্ত হইল। অপু তাহার মার দেখিতেছে সে বড় লজ্জার কথা হইত!…

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

জল আসিলে রাণুর মা তাহার চোখে মুখে জল দিয়া তাহাকে ধরিয়া বসাইলেন। তাহার মাথার মধ্যে কেমন ঝিম্ ঝিম্ করিতেছিল, সে দিশাহারা ভাবে বসিয়া পড়িল। রাণুর মা বলিল—অমন করে কি মারে সেজ্‌দি?...রোগা মেয়েটা—

সেজঠাকরুণ বলিলেন—তোমরা ওকে চেনো নি এখনো। চোরের মার ছাড়া অষুদ নেই এই ব'লে দিলুম—মারের এখনও হয়েচে কি—

রাণুর মা বলিলেন—হয়েচে, এখন একটু সাম্‌লাতে দেও সেজদি—যে কাণ্ড করেচো—

টুনির মা বলিল, ও মা এত হবে জান্‌লে কে কৌটোর কথা বল্‌তো?...কে জানে যে এত হবে—চাইনে আমার কৌটো—ওকে ছেড়ে দাও সেজ্‌দি—

সেজঠাকরুণ এত সহজে ছাড়িবেন কিনা জানা যায় না, কিন্তু জনমত তাঁহার বিরুদ্ধে রায় দিতে লাগিল। কাজেই তিনি আসামিকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইলেন।

রাণুর মা তাহাকে ধরিয়া ওদিকের দরজা খুলিয়া খিড়কীর উঠানে বাহির করিয়া দিলেন; বলিলেন—খুব ক্ষেণে আজ বাড়ী থেকে বেরিয়েছিলি যা হোক! যা আস্তে আস্তে যা—টেঁপি খিড়কীটা ভাল ক'রে খুলে দে—

দুর্গা দিশাহারা ভাব হইয়া খিড়্‌কী দিয়া বাহির হইয়া গেল, সমস্ত মেয়েছেলে ও যাহারা উপস্থিত ছিল—সকলে চাহিয়া দেখিতে লাগিল।

একজন বলিল—তবুও তো স্বীকার কল্লে না—কি রকম দেখেচো একবার?...চোখ দিয়ে কিন্তু এক ফোঁটা জল পড়্‌লো না—

রাণুর মা বলিলেন—জল পড়্‌বে কি, ভয়েই শুকিয়ে গিয়েচে। চোখে কি আর জল আছে? ওই রকম ক'রে মারে?

গ্রামে বারোয়ারী চড়কপূজার সময় আসিল। গ্রামের বৈদ্যনাথ মজুমদার চাঁদার খাতা হাতে বাড়ী বাড়ী চাঁদা আদায় করিতে আসিলেন। হরিহর বলিল—না খুড়ো, এবার আমার এক টাকা চাঁদা ধরাটা অন্যায় হয়েচে—এক টাকা দেবার কি আমার অবস্থা? বৈদ্যনাথ বলিলেন—না হে না, এবার নীলমণি হাজ্‌রার দল। এ রকম দলটি এ অঞ্চলে কেউ চক্ষেও দেখেনি। এবার পাল পাড়ার বাজারে মহেশ সেকরার বালক কেত্তনের দল গাইবে, তার সঙ্গে পাল্লা দেওয়া চাই-ই—

বৈদ্যনাথ এমন ভাব দেখাইলেন যেন নিশ্চিন্দিপুর-বাসীগণের জীবন মরণ এই প্রতিযোগিতার সাফল্যের উপর নির্ভর করিতেছে।

অপুর স্নানাহার বন্ধ হওয়ার উপক্রম হইল। বারোয়ারী তলায় ঘাস চাঁচিয়া প্রকাণ্ড বাঁশের মেরাপ বাঁধিয়া সামিয়ানা টাঙানো হইয়াছে। যাত্রাদল আসে আসে—এখনও পৌঁছে নাই। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেলে লোকে বলে কাল সকালের গাড়ীতে আসিবে, সকাল চলিয়া গেলে বৈকালের আশায় থাকে। রাত্রে অপুর ঘুম হয় না, বাঁধ-ভাঙা বন্যার স্রোতের মত কৌতূহল ও খুসির যে কী প্রবল, অদম্য উচ্ছ্বাস! বিছানায় ছট্‌ফট্ এপাশ ওপাশ করে। যাত্রা হবে! যাত্রা হবে! যাত্রা হবে!

মায়ের বারণ আছে অত বড় মেয়ে পাড়া ছাড়িয়া কোথাও না যায়, দুর্গা চুপি চুপি গিয়া দেখিয়া আসিয়া রাজলক্ষ্মীর কাছে আসর-সজ্জা ও বাঁশের গায়ে ঝুলানো লাল নীল কাগজের মালার অভিনবত্ব সম্বন্ধে গল্প করে। অপুর মনে হয় যে-পঞ্চানন তলায় সে দুবেলা কড়িখেলা করে সেই তুচ্ছ অত্যন্ত পরিচিত সামান্য স্থানটাতে আজ বা কাল নীলমণি হাজ্‌রার দলের যাত্রার মত একটা অভূতপূর্ব্ব অবাস্তব ঘটনা ঘটিবে,এও কি সম্ভব? কথাটা যেন তাহার বিশ্বাসই হয় না।

হঠাৎ শুনিতে পাওয়া যায় আজ বিকালেই দল আসিবে। এক ঝলক রক্ত যেন বুক হইতে নাচিয়া চল্‌কাইয়া একেবারে মাথায় উঠিয়া পড়ে!...জগতে এক ধরণের লোক আছে যারা বড় মিন্‌মিনে। কি দুঃখ কষ্ট,কি সুখ ভালবাসা সবই তাহারা ভোগ করে ওপর ওপর, পান্‌সে পান্‌সে ভাবে; কিছুতেই তাহাদিগকে তেমন ধাক্কা দিয়া যায় না—চৈতন্যশক্তিহীন। অপু সে ধরণের ছেলে নয়; সে সেই ধরণের যারা জীবনের

ছোট বড় সকল অবদানকে দুহাতে প্রাণপণে নিংড়াইয়া চুষিয়া আঁটিসার করিয়া খাওয়ার ক্ষমতা রাখে—সুখও যেমন বেশী পায়, দুঃখও কিন্তু তেমনি। প্রথম বসন্তের দোয়েল কোকিলের ডাক ওদেরই তরুণ পল্লবান্তরাল থেকে প্রথম আসে, কালবৈশাখীর প্রথম ঝড়ে ওদেরই মগ্ ডালকে ঝঞ্ঝার সঙ্গে প্রাণপণে যুঝিতে হয়, বোধ হয় বা হুড়-মুড় শব্দে ভাঙ্গিয়াও পড়ে।

কুমার-পাড়ার মোড়ে দুপুরের পর হইতেই সকল ছেলের সঙ্গে দাঁড়াইয়া থাকিবার পর দূরে একখানা গরুর গাড়ী তাহার চোখে পড়িল! সাজের বাক্স বোঝাই গাড়ী এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ খানা! পটু একে একে আঙুল দিয়া গুণিয়া খুসির সুরে বলিল—অপু-দা, চলো আমরা এদের পেছনে পেছনে এদের বাসায় গিয়ে দেখে আসি, যাবে? সাজের গাড়ীগুলার পিছনে দলের লোকেরা যাইতেছে, সকলের মাথায় টেরিকাটা, অনেকের জুতা হাতে। পটু একজন দাড়ি-ওয়ালা লোককে দেখাইয়া কহিল—এ বোধ হয় রাজা সাজে, না অপু-দা?···আকাশ বাতাসের রং একেবারে বদ্লাইয়া গেল— কাল সকালেই যাত্রা! অপু মহা উৎসাহে বাড়ী ফিরিয়া দেখে তাহার বাবা দাওয়ায় বসিয়া কি লিখিতেছে ও গুন্‌গুন্ করিয়া গান করিতেছে। সে ভাবে যাত্রাদলের আসিবার কথা তাহার বাবাও জানিতে পারিয়াছে, তাই এত স্ফূর্ত্তি। সে উৎসাহে হাত নাড়িয়া বলে—সাজ একেবারে পাঁচ গাড়ী বাবা! এ রকম দল! হরিহর শিষ্য বাড়ী বিলি করার জন্য বালির কাগজে কবচ লিখিতেছিল, মুখ তুলিয়া বিস্ময়ের সুরে বলে—কিসের সাজ রে খোকা? অপু আশ্চর্য্য হইয়া যায়, এতবড় ঘটনা বাবার জানা নাই! বাবাকে সে নিতান্ত কৃপার পাত্র বিবেচনা করে।

সকালে উঠিয়া অপুকে পড়িতে বসিতে হয়। খানিক পরে সে কাঁদো কাঁদো ভাবে বলে—আমি বারোয়ারী তলায় যাবো বাবা, সকলে যাচ্চে আর আমি এখন বুঝি ব'সে ব'সে পড়্‌বো? এখ্‌খুনি যদি যাত্রা আরম্ভ হয়?

তাহার বাবা বলে—পড়ো, পড়ো এখন ব'সে পড়ো, যাত্রা আরম্ভ হ'লে ঢোল বাজ্‌বার শব্দ তো শুনতে পাওয়া যাবে? তখন না হয় যেও এখন। প্রৌঢ় বয়সের ছেলে, সব সময়ে আজকাল বিদেশে থাকে, অল্পদিনের জন্য বাড়ী আসিয়া ছেলেকে চোখ ছাড়া করিতে মন চায় না। থাক্ না—তবুও যতক্ষণ চোখের সাম্‌নে বসিয়া থাকে! অপুর অভিমানে রাগে চোখ দিয়া জল পড়িতে থাকে। সে কান্না-ভরা গলায় আবার শুভঙ্করী সুরু করে—মাস মাহিনা যার যত, দিন তার পড়ে কত?···

কিন্তু সকালে যাত্রা বসে না, খবর আসে ওবেলা বসিবে। ওবেলা অপু দুর্গার কাছে গিয়া কাঁদো কাঁদো ভাবে বাবার অত্যাচারের কাহিনী আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করে। মা আসিয়া বলে—দাও না গো ছেলেটাকে ছেড়ে?...বচ্ছর কারের দিনটায়! অপু দুপুরে ছুটি পায়। সারা দুপুর বারোয়ারী তলায় কাটায় তাহার। মা বলে—যাত্রা যখন আরম্ভ হবে তখন বাড়ী এসে কিন্তু খেয়ে যেও। বৈকালে খাইতে অপু বাড়ী আসে। বাবা রোয়াকে বসিয়া কবচ লিখিতেছে। অন্য দিন এ সময় তাহাকে তাহার বাবার কাছে বসিয়া পড়িতে হয়। পাছে ছেলে চটিয়া যায় এই ভয়ে তাহার বাবা তাহাকে খুসি রাখিবার জন্য নানারকম কৌতুকের আয়োজন করে। বলে—খোকা, চট্ ক'রে শেলেটে লিখে আনো দিকি ঐঃ ভূত বাপ্‌রে!...অপু সব অদ্ভুত ধরণের কথা শুনিয়া হাসিয়া খুন হয়, তাড়াতাড়ি লিখিয়া আনিয়া দেখায়। বলে—বাবা এইটে হ'য়ে গেলে আমি কিন্তু চ'লে যাবো?···তাহার বাবা বলে—যেও এখন, যেও এখন, খোকা—আচ্ছা চট্ ক'রে লিখে আনো দিকি—আর একটা অদ্ভুত কথা বলে। অপু আবার হাসিয়া উঠে।

আজ কিন্তু অপুর মনে হইল, বাহির হইতে কি একটা প্রচণ্ড শক্তি আসিয়া তাহাকে তাহার বাবার নিকট হইতে সরাইয়া লইয়া গিয়াছে। বাবা নির্জ্জন ছায়া-ভরা বৈকালে বাঁশবন-ঘেরা বাড়ীতে একা বসিয়া বসিয়া লিখিতেছে, কিন্তু এমন শক্তি নাই যে তাহাকে বসাইয়া রাখে। এখন যদি বলে—খোকা, এস পড়তে বসো—অমনি চারিদিক হইতে একটা যেন ভয়ানক প্রতিবাদের হট্টগোল উঠিবে। সকলে যেন বলিবে—না, না, না, এ হয় না, এ হয় না। যাত্রা যে বসে বসে!—কোন্ উল্লাসের প্রবল শক্তি তাহার বাবাকে যেন নিতান্ত অসহায়, নিরীহ দুর্ব্বল করিয়া দিয়াছে। সাধ

ব্রামলে

চৈত্র
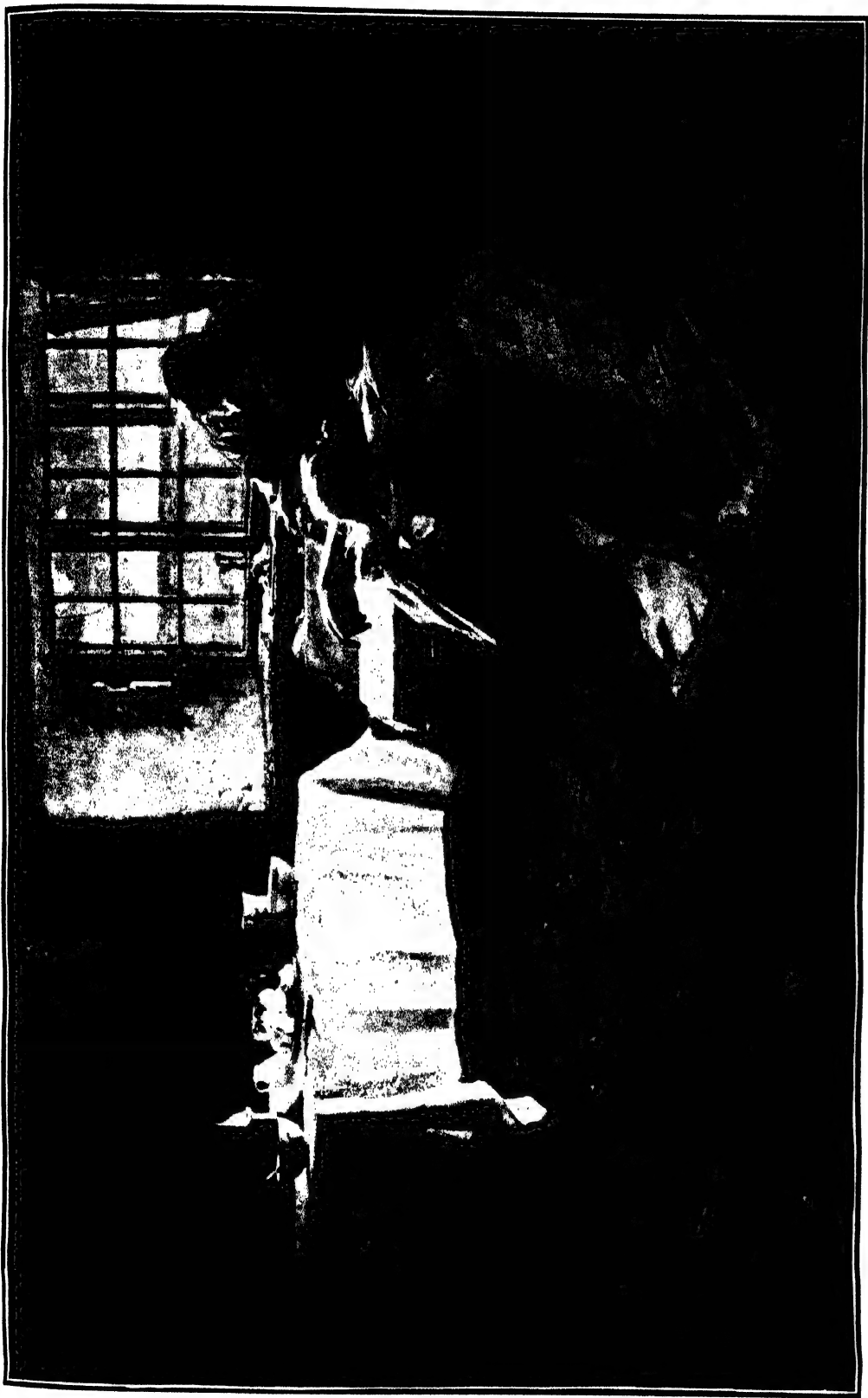
শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

নাই যে তাহাকে পড়িতে বসিবার কথা পর্য্যন্ত মুখে উচ্চারণ করে! বাবার জন্য অপুর মন কেমন করে।

দুর্গা বলিল—অপু, তুই মাকে বল না আমিও দেখতে যাবো? অপু বলে—মা, দিদি কেন আসুক না আমার সঙ্গে? চিক্ দিয়ে ঘিরে দিয়েচে সেইখেনে বস্‌বে? মা বলে—এখন থাক্, আমি ওই ওদের বাড়ীর মেয়েরা যাবে, তাদের সঙ্গে যাবো,—আমার সঙ্গে যাবে এখন। বারোয়ারী তলায় যাইবার সময় দুর্গা পিছন হইতে তাহাকে ডাকিল—শোন্ অপু! পরে সে কাছে আসিয়া হাসি হাসি মুখে বলিল—হাত পাত্ দিকি! অপু হাত পাতিতেই দুর্গা তাহার হাতে দুটা পয়সা রাখিয়াই তাহার হাতটা নিজের দুহাতের মধ্যে লইয়া মুঠা পাকাইয়া দিয়া বলিল—দু পয়সার মুড়্‌কী কিনে আন্,নয়তো যদি নিচু বিক্রি হয় তো কিনে আন্। ইহার দিন সাতেক পূর্ব্বে একদিন অপু আসিয়া চুপিচুপি দিদিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল তোর পুতুলের বাক্সে পয়সা আছে? একটা দিবি? দুর্গা বলিয়াছিল—কি হবে পয়সা তোর? অপু দিদির মুখের দিকে চাহিয়া একটু খানি হাসিয়াছিল,বলিয়াছিল—নিচু খাবো—কথা শেষ করিয়া সে পুনরায় লজ্জার হাসি হাসিয়াছিল। কৈফিয়তের সুরে বলিয়াছিল—বোষ্টমদের বাগানে ওরা মাচা বেঁধেচে দিদি, অনেক নিচু পেড়েচে দু ঝুড়ি-ই-ই—এক পয়সায় ছটা, এই এত বড় বড়, একেবারে সিঁদুরের মত রাঙা! সতু কিন্‌লে, সাধন কিন্‌লে—পরে একটু থামিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—আছে দিদি? দুর্গার পুতুলের বাক্সে সেদিন কিছুই ছিল না, সে কিছু দিতে পারে নাই। অপুকে বিরসমুখে চলিয়া যাইতে দেখিয়া সেদিন তাহার খুব কষ্ট হইয়াছিল, তাই কাল বৈকালে সে বাবার কাছে পয়সা দুটা চড়ক দেখিবার নাম করিয়া চাহিয়া লয়। সোনার ভাঁটার মত ভাইটা, মুখের আবদার না রাখিতে পারিলে ভারী মন কেমন করে।

(ক্রমশঃ)

বসন্তের জন্ম-লীলা

শ্রীমৈত্রেয়ী দেবী

কবে থেকে বয়েছিল দক্ষিণের বায়
দিকে দিকে দোলা দিয়ে
খুলে দিয়ে দ্বার
স্তব্ধবন-বীথিকারে করি অধিকার॥
আজি এই বসন্তের প্রথম সকালে
আকাশ রঙ্গীন হ'ল নীলে আর লালে
আনন্দ-সিন্দুরে—
তুলিল রঙ্গীন ক'রে শিশির-বিন্দুরে
শুষ্ক পত্র ঝ'রে গেল আম্র-বন তলে
বিকশিত কিশলয়ে সুগন্ধ উছলে॥

যে বীচিটি পড়েছিল প্রাঙ্গণের কোলে,
সে আজিকে হায়
কখন উঠিল কাঁপি পুষ্পিত লতায়।
পত্রহীন শুষ্ক বৃক্ষ আছিল দাঁড়ায়ে,
সে আজিকে আপনারে ফেলিল হারায়ে
সবুজের রঙ্গীন আভাতে।
লাল হ'ল কৃষ্ণচূড়া
যেন কার হৃদি-রক্ত-পাতে।
বাঁশ বনে প'ড়ে গেল সাড়া,
বন হতে বনান্তরে বাতাস বহিল আত্মহারা।

মোর বাতায়ন তলে খুলে গেল দ্বার,—
মুগ্ধ মম চিত্তটিরে করি একাকার
সমস্ত হারায়ে
প্রথম মুকুল-গন্ধে রহিনু দাঁড়ায়ে।
ঝাউ বনে বাতাসের দীর্ঘশ্বাস প'ড়ে
অব্যক্ত ব্যথারে মোর তোলে স্নিগ্ধ ক'রে।
আজ পার্শ্বে দেখি' চেয়ে শুধু মনে হয়
এ বিপুল ধরণী যে মহাপ্রাণময় !
নাহি কোনো অবসান, শেষ নাহি হেরি,—
ক্ষণে ক্ষণে সৃষ্টি চলে পুরোণোরে ঘেরি'।
নাহি রাখে স্থির,
সকল নূতন করে দক্ষিণ সমীর।
সে নূতন স্পর্শ লাগে কুঞ্জবীথি তলে,
রজনীগন্ধার বুকে সুগন্ধ উছলে,
নবীন অঙ্কুর জাগে আকুল বিহ্বল,
শুষ্ক মাঠে কেঁপে ওঠে শ্যাম শষ্পদল।
কলি যায় খুলে
অরুণ সূর্য্যের পানে স্নিগ্ধ আঁখি তুলে,
রক্তকরবীর শাখা ভ'রে যায় মুগ্ধ অনুরাগে,
মর্ম্মে ছোঁয়া লাগে,
চাঁপা হয় উল্লসিত, ঝরে সন্ধ্যামণি
আপনারে সূর্য্যালোকে ধন্য মনে গণি'।
শাল-বনে জাগে ধ্বনি,
তাল-শ্রেণী মাঝে
মোহ-মুক্ত বাতাসের প্রতিধ্বনি বাজে।

নামহীন ক্ষুদ্র পাখী শুষ্ক তৃণ ধরি'
প্রচ্ছন্ন পল্লব ছায়ে নীড় তোলে গড়ি',
তারো ক্ষুদ্র চিত্ত মাঝে এ আনন্দ রাশি
অব্যক্ত মূর্চ্ছনা ভরে উঠেছে উচ্ছ্বাসি॥
চারিদিকে এ আনন্দ মন্ত্র ভ'রে দিল,
সমস্ত পৃথিবী তাতে নব জন্ম নিল।
মোর মন হল আত্মহারা
এ উত্তাল আনন্দের লভি মত্ত সাড়া।
তৃণ হতে আকাশের অনন্ত হৃদয়ে
এ অপূর্ব্ব জনমের বার্ত্তা গেল ব'য়ে।
আজ মনে হয়
যারে শেষ মনে করি সে ত শেষ নয় ;—
সে ত শুধু জনমের নানা মুগ্ধ ছল
আপন প্রকাশ লাগি নতুন কৌশল॥
চারিদিক হ'তে এসে নানা সৃষ্টিধারা
এ জন্ম-জলধি মাঝে হ'ল আত্মহারা ;
বিপুল সাগর হ'তে মহাবন্যা ব'য়ে
মৃত্যুর উত্তপ্ত মরু গেল সিক্ত হ'য়ে।
ভিজাল সমস্ত বালু এ সমুদ্র কূলে
নির্ম্মল উচ্ছল স্নিগ্ধ কি তরঙ্গ তুলে॥
সে মহান তীর্থে তবে
বসন্তের পরশ পরম
মোর স্তব্ধ হৃদয়েরে
নতুন আলোতে দিল
নতুন জনম॥

প্রেমের খেলা

আর্থার স্নিত্স্লার

অনুবাদক—শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু

দ্বিতীয় অঙ্ক

(ক্রিস্‌টিনের ঘর, সাধারণ ও সুন্দর ঘর)

ক্রিস্‌টিনে

(বাহিরে যাইবার জন্য সাজগোজ করিয়াছে। কাথারিনা দরজায় টোকা মারিয়া শব্দ করিয়া প্রবেশ করিল)

কাথারিনা

শুভ সন্ধ্যা ফ্রয়লাইন ক্রিস্‌টিনে।

(ক্রিস্‌টিনে আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিল, ফিরিয়া দেখিল)

ক্রিস্‌টিনে

শুভ সন্ধ্যা।

কাথারিনা

আপনি কোথাও বেরোচ্ছেন দেখছি?

ক্রিস্‌টিনে

এমন কিছু তাড়াতাড়ি নেই।

কাথারিনা

আমি এলুম, আমার স্বামী পাঠিয়ে দিলেন আপনাকে নিমন্ত্রণ করতে। আপনি যদি আমাদের সঙ্গে আজ রাতে লেনার গার্ডেনে আসেন,—আজ ওখানে সঙ্গীত আছে।

ক্রিস্‌টিনে

অশেষ ধন্যবাদ, ফ্রাউ বিণ্ডার...কিন্তু আজ আমি যেতে পারছি না...আর একদিন, কেমন?—আপনি রাগ করলেন, না?

কাথারিনা

না, মোটেই না...কিন্তু কেন? হাঁ, আমাদের সঙ্গে গিয়ে আর কি এমন আমোদ হবে, তার চেয়ে আর কোথাও নিশ্চয় আপনি বেশী আমোদ উপভোগ করতে যাচ্ছেন।

ক্রিস্‌টিনে

(তাহার দিকে চাহিল)

কাথারিনা

বাবা এখনও থিয়েটার থেকে আসেন নি?

ক্রিস্‌টিনে

না, তিনি থিয়েটার যাবার আগে একবার বাড়ীতে আসবেন। এখন সাড়ে সাতটায় আরম্ভ হয় কি না।

কাথারিনা

ঠিক, আমি প্রত্যেকবার ভুলে যাই। আচ্ছা, তাঁর জন্যে আমি অপেক্ষা করবো। এই যে নতুন প্লে-টা দিয়েছে না, তার জন্যে যদি ফ্রি পাশ পাই...এখন বোধ হয় পাওয়া যেতে পারে?...

ক্রিস্‌টিনে

হাঁ, নিশ্চয়...আর এখন সন্ধ্যাকালটা এত সুন্দর, বেশী লোকে থিয়েটারে যায় না।

কাথারিনা

কিন্তু আমাদের মত লোকের থিয়েটারে যাওয়াই ভাল, যদি থিয়েটারের কোন জানা শোনা লোক থাকে, ফ্রি পাশ পাওয়া যায়।...কিন্তু ফ্রয়লাইন ক্রিস্‌টিন, আমার জন্যে আপনি দাঁড়াবেন না, আপনার যদি বাইরে কোথাও যাবার দরকার থাকে। আমার স্বামী সত্যই বড় দুঃখিত হবেন ...আর, আর একজনও...

ক্রিস্‌টিনে

কে?

কাথারিনা

বিণ্ডারের খুড়তুতো ভাই আমাদের সঙ্গে আসছে। জানেন কি ফ্রয়লাইন ক্রিস্‌টিনে, ও এখন একটা বেশ ভাল কাজ পেয়েছে?

ক্রিস্‌টিনে

(তাহাতে-কিছু-আসে-যায়-না ভঙ্গীতে) ও।—

কাথারিনা

আর বেশ মোটা মাইনে। কি চমৎকার লোক! আপনার প্রতি ভারী শ্রদ্ধা আর অনুরাগ—

ক্রিস্‌টিনে

আচ্ছা—এখন আসি ফ্রাউ বিণ্ডার।

কাথারিনা

আপনার নামে লোকে যাই বলুক না কেন, একটি কথাও বিশ্বাস করে না…

ক্রিস্‌টিনে

(তাহার মুখে দৃঢ় দৃষ্টিতে চাহিল)

কাথারিনা

সত্যি, এ রকম লোকও আছে…

ক্রিস্‌টিনে

আচ্ছা, ফ্রাউ বিণ্ডার, আসি।

কাথারিনা

হাঁ…(বিদ্রূপাত্মক স্বরে) দেখবেন, যেন মিলন-স্থানে (রাঁধে ভুতে) দেরীতে গিয়ে না পৌছান, ফ্রয়লাইন ক্রিস্‌টিনে!

ক্রিস্‌টিনে

আপনার সত্যি কি চাই বলুন ত?—

কাথারিনা

না, আপনিই ঠিক! যৌবন ত চিরজীবন থাকে না।

ক্রিস্‌টিনে

আসি।

কাথারিনা

কিন্তু ফ্রয়লাইন ক্রিস্‌টিন, একটি কথা আমায় বলতে হচ্ছে, আপনার একটু সাবধান হওয়া উচিত!

ক্রিস্‌টিনে

অর্থাৎ?

কাথারিনা

দেখুন—ভিয়েনা ত একটা খুব বড় সহর…কিন্তু আপনাদের মিলন-স্থানটি বাড়ী থেকে এক শ' পা দূরে করবার কি দরকার?

ক্রিস্‌টিনে

তাতে কা'র কি?

কাথারিনা

বিণ্ডার আমায় যখন এসে বল্লে আমি বিশ্বাস করতে চাইনি। সে আপনাকে দেখেছে…আমি তাকে বল্লুম, তুমি ভুল দেখেছ; ফ্রয়লাইন ক্রিস্‌টিনে সে রকম মেয়ে নয় যে, সন্ধেবেলায় ফ্যাসানেবল্ যুবকদের সঙ্গে বেড়াবে। আর যদিই বা বেড়ায়, তার এ-টুকু বুদ্ধি আছে, সে আমাদের গলিতে বেড়াবে না। সে বল্লে, আচ্ছা, তুমি তাকে জিজ্ঞেস ক'রে দেখো। তারপর সে বল্লে, তা আর আশ্চর্য্য কি, আমাদের দিকে আর ত সে মাড়ায়ই না, এখন সব সময়ই ওই স্লাগার মিত্‌সির পেছনে ছোটে;—কোন সম্ভ্রান্ত মেয়ের পক্ষে ওর সঙ্গে মেশা কি ভাল?—জানেন ত ফ্রয়লাইন ক্রিস্‌টিন, পুরুষমানুষদের মুখ কত মন্দই বলতে পারে!—হাঁ, ফ্রান্সকেও নিশ্চয় ও সব কথা বলেছে। সে বিণ্ডারের ওপর ক্ষেপেই যাবে,—আপনার বিরুদ্ধে কোন কথা সে সইতে পারে না, আপনার নামে কেউ কিছু খারাপ বল্লে সে ত হাতাহাতি ব্যাপার করবে। কিন্তু যখন আপনার পিসি বেঁচে ছিলেন—ঈশ্বর তাঁকে চিরশান্তি দিন—তখন আপনি বার-মুখো ছিলেন না, কি নম্র ছিলেন…(কিছুক্ষণ নীরবতা) আমাদের সঙ্গে বাজনা শুনতে আসবেন?

ক্রিস্‌টিনে

না…

(ভাইরিং প্রবেশ করিল, তাহার হাতে লিলাক-ফুলের গোছা)

ভাইরিং

শুভ সন্ধ্যা…আ, ফ্রাউ বিণ্ডার, কেমন আছেন?

কাথারিনা

বেশ, ধন্যবাদ।

ভাইরিং

আর ছোট মেয়েটি?—আপনার স্বামী? সব কুশল?

কাথারিনা

হাঁ ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, সবাই বেশ ভাল আছে।

শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু

ভাইরিং

বেশ,—(ক্রিস্‌টিনের প্রতি) এমন সুন্দর সন্ধ্যা আর তুই বাড়িতে ব'সে—?

ক্রিস্‌টিনে

আমি এই বাইরে বেড়াতে যাচ্ছিলুম।

ভাইরিং

বেশ!—আজ বাইরে এমন সুন্দর হাওয়া বইছে, জানেন ফ্রাউ বিণ্ডার, চমৎকার! আমি এই বাগানের মধ্যে দিয়ে এসেছি—কি লিলাক ফুল ফুটেছে—চমৎকার! কিছু ফুল চুরি ক'রে নিয়ে এলুম। (ক্রিস্‌টিন্‌কে ফুলের গুচ্ছ দিল)

ক্রিস্‌টিনে

ধন্যবাদ বাবা।

কাথারিনা

মালি যে দেখতে পায় নি, এই ভাগ্য।

ভাইরিং

একটা ছোট ডাল ভেঙে এনেছি বই ত নয়,—ফুলে ফুলে একেবারে ভরা।

কাথারিনা

সবাই যদি তাই ভেবে ডাল ভাঙে?

ভাইরিং

তা হ'লে অবশ্য অন্যায় হয়।

ক্রিসটিনে

আমি যাচ্ছি, বাবা!

ভাইরিং

কয়েক মিনিট অপেক্ষা করলে আমার সঙ্গে থিয়েটার যেতে পারতিস্‌।

ক্রিস্‌টিনে

আমি...আমি মিত্‌সিকে বলেছি, তার কাছে যাবো...

ভাইরিং

ও, তা বেশ বেশ। হাঁ, যৌবনের সঙ্গী যৌবন। আচ্ছা, এসো ক্রিস্‌টিন...

ক্রিস্‌টিনে

(পিতাকে চুমা খাইল, তারপর বলিল) বিদায় ফ্রাউ বিণ্ডার!—(ক্রিস্‌টিন চলিয়া গেল, ভাইরিং তাহার প্রতি স্নেহময় চোখে চাহিয়া রহিল)

কাথারিনা

ফ্রয়লাইন মিত্‌সির সঙ্গে বড় গভীর বন্ধুত্ব।

ভাইরিং

হাঁ, টিনির এই বন্ধুটি আছে ব'লে তাকে সারাক্ষণ বাড়ীতে একা ব'সে থাকতে হয় না, সেজন্য আমি খুসি। আমার এই মেয়েটি জীবন কি আর উপভোগ করছে!...

কাথারিনা

তা বটে।

ভাইরিং

জানেন ফ্রাউ বিণ্ডার, যখন রিহার্সেল থেকে ফিরে আসি আর দেখি ও একা কোণে ব'সে সেলাই করছে,—আমার যে কি কষ্ট হয় আপনাকে আর কি বলব! আর বিকেল বেলা খাবার পরেই আবার ও টেবিলে স্বরলিপি টুকতে বসে...

কাথারিনা

সেত বটেই, যারা লক্ষপতি তারা ত আমাদের চেয়ে অনেক সুখে সম্ভোগে থাকে। তা ওর গান শেখা কেমন হচ্ছে?

ভাইরিং

বিশেষ কিছু নয়। ঘরে গাইবার পক্ষে ওর গলা বেশ বটে, আর তার বাবার পক্ষে ওই গলাই খুব ভাল—কিন্তু ও গলায় পয়সা রোজগার হবে না।

কাথারিনা

এ বড় দুঃখের কথা।

ভাইরিং

ও যে তা বোঝে তা'তে আমি সুখী। অন্তত কোন রকম বেদনা পাবে না। আমাদের থিয়েটারের কোরসে ঢুকিয়ে দিতে পারি, তবে—

কাথারিনা

নিশ্চয়, অমন সুন্দর দেখ্‌তে।

ভাইরিং

কিন্তু তাতে ত উন্নতির, পরে বেশী পয়সা রোজগারের, কোন আশা নেই।

কাথারিনা

হাঁ, মেয়ে থাকলে অনেক ভাবনা ! আমি যখন-ভাবি আমার লিনারল্ পাঁচ ছ' বছরের মধ্যে একটি বড়-সড় মেয়ে হ'য়ে উঠবে—

ভাইরিং

ফ্রাউ বিণ্ডার, দাঁড়িয়ে কেন এতক্ষণ, বসুন !

কাথারিনা

ধন্যবাদ, আমার স্বামী শিগগিরই আমায় নিতে আসবেন ; আমি ক্রিস্টিনেকে নেমন্তন্ন করতে এসেছিলুম—

ভাইরিং

নেমন্তন্ন করতে ?

কাথারিনা

হাঁ, আজ লেনারগার্টেনে গানবাজনা শোনবার জন্যে। ভাবলুম, আমাদের সঙ্গে গিয়ে বাজনা শুনলে মনটা বেশ প্রফুল্ল হবে। ওকে প্রফুল্ল করা দরকার।

ভাইরিং

নিশ্চয়, ওর পক্ষে খুব ভালই—বিশেষতঃ এই নিরানন্দ শীতের পর। তা আপনাদের সঙ্গে ও গেল না কেন ?

কাথারিনা

কি ক'রে জানবো······বোধ হয় বিণ্ডারের ভাই আমাদের সঙ্গে আছে ব'লে।

ভাইরিং

খুব সম্ভব তাই। তাকে ও মোটেই দেখতে পারে না, তা আমায় বলেছে।

কাথারিনা

কিন্তু, কেন ? ফ্রান্স অতি সৎ, ভালোমানুষ লোক, —আর এখন তার একটা ভাল চাকরি হয়েছে, আজ-কালকার দিনে এ সৌভাগ্যের কথা······

ভাইরিং

হাঁ, গরীব মেয়ের পক্ষে বটে—

কাথারিনা

সব মেয়ের পক্ষেই।

ভাইরিং

আচ্ছা, বলুন ত ফ্রাউ বিণ্ডার, এরকম একটি সুন্দরী মেয়ের পক্ষে এক ভাগ্যক্রমে-চাকরি-পাওয়া সৎ ভালমানুষ লোককে পাওয়াই কি জীবনের সব ?

কাথারিনা

আবার কি চাই ! কোন জমিদারের ছেলে আসবে ব'লে ত কেউ ব'সে থাকতে পারে না। তারপর তিনি যদি বা কখনও আসেন, সাধারণত, বিয়ে না ক'রে এমন ভাবে চ'লে যান যে কেউ জানতেও পারে না···(ভাইরিং জানলার নিকট গিয়া দাঁড়াইল। নীরবতা) না, আমি বলি কি যুবতী মেয়েদের সম্বন্ধে খুব সাবধান হওয়া দরকার—বিশেষত এই দেখাশোনা—

ভাইরিং

প্রথম যৌবনের দিনগুলি এম্নি ক'রে বৃথা যেতে দেওয়া কি ঠিক ? তারপরে এই বেচারী এত ভালো মেয়ের কপালে কি হল—এত বছর অপেক্ষা ক'রে কে এল —এল এক তাঁতি, সে মেয়েদের মোজা তৈরী করে।

কাথারিনা

হেয়ার ভাইরিং, আমার স্বামী তাঁতি বটে, কিন্তু সে ধর্ম্ম-ভীরু সৎব্যক্তি, তার জন্যে আমি কোনদিন দুঃখিত নই।

ভাইরিং

(শান্ত করবার জন্য) ফ্রাউ বিণ্ডার, আমি আপনাকে মনে ক'রে কিছু বলিনি।···আপনি আপনার যৌবন অবশ্য বৃথা ব'সে মাটি করেননি।

কাথারিনা

সে সব কথা আমার কিছু মনে নেই।

ভাইরিং

তা বলবেন না—আপনি এখন যাই বলুন—আপনার জীবনের মধ্যে যৌবনের ওই স্মৃতিগুলি সব চেয়ে সুন্দর।

কাথারিনা

আমার কোন স্মৃতি নেই।

ভাইরিং

না, না···

কাথারিনা

আর আপনি যে রকম বলছেন, ওরকম স্মৃতির পর কি থাকে ?···অনুতাপ !

ভাইরিং

হুঁ, তার কি থাকে—যখন তার—তার কোন সুখ-স্মৃতিও নেই ?···যখন সমস্ত জীবন এম্নি ভাবে কেটে যায় (অতি সহজ সুরে, করুণ সুরে নয়) একটা দিন আর একটা দিনেরই মত, কোন সুখ নেই, প্রেম নেই—এর চেয়ে বোধ হয় ভাল হ'ত !

কাথারিনা

আচ্ছা হেয়ার ভাইরিং, আপনি আপনার বোনের কথা ভাবুন। কিন্তু তাঁর কথা বল্লে আপনার মনে কষ্ট হবে, হেয়ার ভাইরিং—

ভাইরিং

হাঁ, তার কথা ভাবলে আমার মনে বড় কষ্ট হয়...

কাথারিনা

তা ত হবেই,...ভাই-বোনের মধ্যে কি টানই ছিল··· আমি সব সময় বলতুম, এমন ভাই বড় খুঁজে পাওয়া যায় না।

ভাইরিং

(বিচলিত ভাব)

কাথারিনা

এ ত সত্যি কথা। আপনি সেই যুবাবয়সেই তাঁর বাপ-মার স্থান পূরণ করেছিলেন।

ভাইরিং

হুঁ, হুঁ—

কাথারিনা

এ ত আপনার জীবনের একটা বড় সান্ত্বনার কথা যে আপনি একটি মেয়ের সারাজীবনের শুভানুধ্যায়ী রক্ষক হয়েছেন—

ভাইরিং

হাঁ, আমিও আগে তাই মনে করেছিলুম। যখন সে সুন্দরী তরুণী ছিল,—তখন ভেবেছিলুম, খুব একটা মহৎ কাজ করছি। কিন্তু তার পর যখন ধীরে ধীরে তার চুল ধূসর হ'য়ে এল, তার মুখ বয়সের রেখায় ভ'রে গেল, দিনের পর দিন একইভাবে কেটে যেতে লাগল —তার সমস্ত যৌবন কেটে গেল—লোকে বুঝতেও পারলে না কেমন ক'রে ধীরে ধীরে সেই সুন্দরী তরুণী অবিবাহিতা প্রৌঢ়া হ'য়ে গেল—তখন আমার প্রথম মনে হ'ল, ছি, ছি, আমি এ কি করলুম।

কাথারিনা

কিন্তু হেয়ার ভাইরিং—

ভাইরিং

আমি তাকে যেন আমার সামনে দেখ্‌ছি। ঘরের ওইখানে সন্ধ্যেবেলায় ল্যাম্পের পাশে আমার সামনে যেমন বসত, শান্তহাসিভরা স্থিরসহিষ্ণুতামাখা মুখে সে আমার দিকে যেমন চাইত, তার সেই মূর্ত্তি দেখছি। সে যেন আমাকে তার ধন্যবাদ জানাত,—আর আমি,—আমার ইচ্ছে হ'ত তার সামনে নতজানু হ'য়ে তার ক্ষমা প্রার্থনা করি,—তাকে আমি জীবনের সকল বিপদ হ'তে রক্ষা করেছি—আর জীবনের সকল আনন্দ হ'তে! (নীরবতা)

কাথারিনা

আপনার মত ভাই পাওয়া ভাগ্যের কথা, এতে পরিতাপের কিছু নেই।

(মিত্‌সির প্রবেশ)

মিত্‌সি

শুভ সন্ধ্যা !...এখানে বড় অন্ধকার...কিছু দেখা যায় না—ও ফ্রাউ বিণ্ডার? আপনার স্বামী তলায় রয়েছেন ফ্রাউ বিণ্ডার, আপনার জন্যে অপেক্ষা করেছেন···ক্রিস্‌টিনে বাড়ী নেই ?

ভাইরিং

মিনিট পনেরো হল সে বেরিয়ে গেছে।

কাথারিনা

তাঁর সঙ্গে আপনার দেখা হয় নি ? আপনার সঙ্গে দেখা করবার কথা ছিল।

মিত্‌সি

না,···দেখা হয় নি...আপনি আপনার স্বামীর সঙ্গে বাজনা শুনতে যাচ্ছেন, আপনার স্বামী বল্লেন।

কাথারিনা

হাঁ, ও বিষয় ওঁর খুব উৎসাহ। ফ্রয়লাইন মিত্‌সি, আপনার ছোট হ্যাটটি স্নুন্দর ত ; নতুন ?

মিত্‌সি

নতুন কোথা— এর চেহারা আপনার মনে পড়ছেনা ? এ ত গত বসন্তের ; আমি একটু বদলে নতুন ক'রে নিয়েছি।

কাথারিনা

আপনি নিজেই করেছেন ?

মিত্‌সি

হাঁ।

ভাইরিং

খুব কাজের মেয়ে ত !

কাথারিনা

তাইত, আমি সব সময়ে ভুলে যাই, আপনি যে এক বচ্ছর টুপির দোকানে কাজ করেছেন।

মিত্‌সি

আমি বোধ হয় আবার সে কাজে যাবো—মা'র বড় ইচ্ছে—

কাথারিনা

আপনার মা কেমন আছেন ?

মিত্‌সি

ভালই,—তবে, একটু দাঁতের ব্যথা আছে,—ডাক্তার বলেন ও শুধু বাতের জন্য।

ভাইরিং

আচ্ছা, এখন আমায় যেতে হচ্ছে...

কাথারিনা

আমিও একসঙ্গে নামছি চলুন, হেয়ার ভাইরিং...

মিত্‌সি

আমিও যাই...হেয়ার ভাইরিং, আপনার ওভারকোট নিন্, আসবার সময় ঠাণ্ডা পড়বে।

ভাইরিং

ঠাণ্ডা পড়বে ?

কাথারিনা

নিশ্চয়...

(ক্রিস্‌টিনের প্রবেশ)

মিত্‌সি

এই যে, এসেছিস্...

কাথারিনা

এর মধ্যে বেড়ান শেষ হ'য়ে গেল ?

ক্রিস্‌টিনে

হুঁ, মিত্‌সি...আমার এমন মাথা ধরেছে !...(বসিয়া পড়িল)।

ভাইরিং

কেন ?

কাথারিনা

বোধ হয় এই বাতাস লেগে—

ভাইরিং

না, কি হ'ল ক্রিস্‌টিন !...ফ্রয়লাইন মিত্‌সি, অনুগ্রহ ক'রে যদি আলোটা জ্বালেন।

মিত্‌সি

(আলো জ্বালিতে উদ্যত হইল)

ক্রিস্‌টিনে

ও, আমি নিজেই জ্বালছি।

ভাইরিং

ক্রিস্‌টিন, আমি তোমার মুখ দেখতে চাই !...

ক্রিস্‌টিনে

বাবা, ও কিছু নয়। হাঁ বাইরের বাতাস লেগেই হয়েছে।

কাথারিনা

হাঁ, অনেকে এই বসন্তের বাতাস একেবারে সহ্য করতে পারে না।

ভাইরিং

ফ্রয়লাইন মিত্‌সি, আপনি তা হ'লে ক্রিস্‌টিনের কাছে থাকছেন ?

মিত্‌সি

নিশ্চয়, আমি আছি।

ক্রিস্‌টিনে

বাবা, কিছু হয় নি আমার।

শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু

মিত্‌সি

আমার যখন মাথা ধরে, আমার মা ত এত হৈ চৈ করেন না।

ভাইরিং

(ক্রিস্‌টিনের প্রতি) কি, বড় ক্লান্ত মনে হচ্চে ?

ক্রিস্‌টিনে

(চেয়ার হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া) না, সেরে গেছে। (হাসিল)

ভাইরিং

বেশ,—হাঁ, এখন মুখের ভাব বদলে গেছে—(কাথারিনার প্রতি) যখন ও হাসে একেবারে অন্যরকম দেখায়, নয় ? আচ্ছা, আমি এখন আসি, ক্রিস্‌টিন, (তাহাকে চুম্বন করিল) আর আমি যখন বাড়ী ফিরব ততক্ষণে যেন এই ছোট্ট মাথাটি থেকে সব 'ধরা' চলে যায় !... (দরজার কাছে গেল)

কাথারিনা

(মৃদুস্বরে ক্রিস্‌টিনের প্রতি) কি, ঝগড়া হয়েছে বুঝি ?

(ক্রিস্‌টিনে ক্রুদ্ধভাবে বিচলিত হইয়া উঠিল)

ভাইরিং

(দরজা হইতে) ফ্রাউ বিণ্ডার... !

মিত্‌সি

বিদায় !...

(ভাইরিং ও কাথারিনা চলিয়া গেল)

মিত্‌সি

জানিস্ কেন তোর মাথা ধরেছে ? কালকের ওই মিষ্টি মদ খেয়ে। আমারও যে কিছু হয়নি, আশ্চর্য্য।...কাল বেশ হয়েছিল, না ?

ক্রিস্‌টিনে

(মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইল)

মিত্‌সি

ওরা কি সুন্দর দু'জনেই—না ?—আর ফ্রিট্‌সের ঘর কি সুন্দর সাজানো। সত্যি, চমৎকার ! আর ডোরির ঘর... (থামিয়া) এখনও মাথা ধরা আছে ? কি, কিচ্ছু বলছিস না কেন ? কি হোলো ?

ক্রিস্‌টিনে

আচ্ছা, মনে কর দেখি—সে বাগানে আসেনি !

মিত্‌সি

কি, তোকে একা অপেক্ষা করিয়েছে ত ! বেশ হয়েছে তোর !

ক্রিস্‌টিনে

হুঁ, কিন্তু এর মানে কি ? আমি তার কি করেছি ?—

মিত্‌সি

তুই তাকে আদর দিয়ে নষ্ট করেছিস, মাথায় তুলে দিয়েছিস। পুরুষ মানুষের কাছে কড়া হ'তে হয়।

ক্রিস্‌টিনে

কি যে যা তা বলছিস।

মিত্‌সি

আমি ঠিকই বলছি—আমি সত্যি তোর ওপর চ'টে গেছি। সে দেখা করবার জায়গায় দেরী ক'রে আসে, সে তোকে বাড়ী পর্য্যন্ত পৌঁছে দেয় না, থিয়েটারের বক্সে অজানা অন্য লোকেদের সঙ্গে গিয়ে বসে, তোকে একা অপেক্ষা করায়, আসে না,—আর তুই, তুই কিছু বলিস না, তুই বরং (সব্যঙ্গে) এম্নি প্রেমগদগদ হ'য়ে তার দিকে চাস,—

ক্রিস্‌টিনে

যা, চুপ কর, নিজেকে অত খারাপ ক'রে দেখাস কেন ? তোর ও ত থিওডরকে খুব ভাল লাগে।

মিত্‌সি

ভাল লাগে—নিশ্চয় খুব ভাল লাগে। কিন্তু ডোরি তার সারা জন্মে কখনও দেখতে পাবে না, কোন মানুষই দেখতে পাবে না যে, আমি তার বিরহব্যথায় ম'রে যাচ্ছি। ও সমস্ত মানুষগুলোর দর আমাদের এক ফোঁটা চোখের জলও নয়।

ক্রিস্‌টিনে

না, বাপু, কখনও তোকে এ রকম বলতে শুনিনি।

মিত্‌সি

হুঁ, টিনের্‌ল্,—তোর সঙ্গে কোনদিন এত খোলাখুলি কথা বলিনি বটে,—সাহস হয়নি—জানিস, তোর প্রতি আমার একটা শ্রদ্ধা ছিল।...দেখ, আমি বরাবর ভেবেছি, তুই যখন প্রথম প্রেমে পড়বি, একেবারে রীতিমত প্রেমে পড়বি। প্রথম প্রেম সবাইকে দিশাহারা ক'রে দেয়,—কিন্তু

তোর বিশেষ ভাগ্যি যে তোর এই প্রথম প্রেমে পড়ার বেলায় তোর পাশে এখন একটি বন্ধু সাহায্য করতে আছে।

ক্রিস্‌টিনে

মিতসি!

মিতসি

তুই কি বিশ্বাস করিস না, আমি তোর সত্যিকার বন্ধু, মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিনী? আমি যদি এখন তোকে না বলি বাপু, ও মানুষটি আর সব মানুষেরই মত, আর সমস্ত পুরুষমানুষগুলোর দাম আমাদের একঘণ্টা মন খারাপ ক'রে থাকার উপযুক্ত নয়, তা হ'লে তোর মাথায় যে কি সব ঢুকবে তা ভগবান জানেন। আমি সব সময়ে বলি—পুরুষ মানুষদের মোটের ওপর একটা কথাও বিশ্বাস করতে নেই।

ক্রিস্‌টিনে

কি অনবরত বলছিস—পুরুষ মানুষ, পুরুষ মানুষ—তাদের সঙ্গে আমার কি! আমি অন্য কোন মানুষের কথা ভাবছি না।—আমার সমস্ত জীবনে ও ছাড়া আর কারো কথা ভাববো না!

মিত্‌সি

ও, তাই নাকি···ও কি তোকে বলেছে? জানি, জানি, এই রকমই সবাই বলে। ওরে তা যদি সত্যি ভাবিস, তাহলে ব্যাপারটা অন্য রকমে চালাতে হয়।

ক্রিস্‌টিনে

চুপ্ কর।

মিত্‌সি

না, কি চাস আমার কাছ থেকে?—আমি এর জন্যে দায়ী নই,—একথা আগে ভাবা উচিত ছিল, তা হ'লে প্রেমের লীলা কেন? তা হ'লে ব'সে থাকো যতদিন না সত্যি বিয়ে করবার জন্যে কেউ না আসে।

ক্রিসটিনে

মিত্‌সি, তোর ওসব কথা আজ আমি সইতে পারছি না—তুই আমায় ব্যথা দিচ্ছিস—

মিতসি

(ভাল ভাবে) সত্যি?

ক্রিস্‌টিনে

া, তুই এখন যা—রাগ করিস নি—একটু একা থাকতে দে!

মিত্‌সি

না, রাগ করব কেন? আমি যাচ্ছি। ক্রিস্‌টিন, দেখ, এর জন্যে একটা অসুখ ক'রে ফেলিস নি। (যাইবার জন্য উঠিল) এই যে, হেয়ার ফ্রিট্‌স্।

(ফ্রিট্‌সের প্রবেশ)

ফ্রিট্‌স্

গুটেন্ আবেণ্ড।

ক্রিস্‌টিনে

(হর্ষোৎফুল্ল) ফ্রিট্‌স্! ফ্রিট্‌স্! (তাহার দিকে ছুটিয়া গেল তাহার বক্ষের উপর)

মিত্‌সি

(অলক্ষিতে ধীরে বাহির হইয়া গেল, সে যে এখানে নেহাৎ অদরকারী তাহা তাহার মুখের ভাবে চলিয়া যাওয়ার ভঙ্গীতে বোঝা গেল।

ফ্রিট্‌স্

(ক্রিস্‌টিনের বাহুপাশ ছাড়াইয়া) কি—

ক্রিস্‌টিনে

সবাই বলছে, তুমি আমায় ছেড়ে গেছ! না, তুমি আমায় ছেড়ে চ'লে যাওনি—এখন পর্য্যন্ত নয়, এখনও পর্য্যন্ত নয়...

ফ্রিট্‌স

কে বলেছে?...কি হয়েছে তোমার? (তাহাকে হাত দিয়া আদর করিয়া) কি ক্রিস্‌টি!...আমি ভাবছিলুম, হঠাৎ এ রকম ভাবে এলে তুমি ভয় পাবে—

ক্রিস্‌টিনে

ও,—তুমি যে এসেছ, এসেছ!

ফ্রিট্‌স্

শান্ত হও।—তুমি অনেকক্ষণ আমার জন্যে দাঁড়িয়েছিলে?

ক্রিস্‌টিনে

কেন তুমি আসনি? কেন?

প্রেমের খেলা

শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু

ফ্রিট্‌স্

একটা কাজে আটকা প'ড়ে গেলুম, দেরী হ'য়ে গেল। তারপর আমি বাগানে গেছলুম, দেখলুম, তুমি নেই--ভাবলুম বাড়ী ফিরে যাই। কিন্তু সহসা তোমায় দেখবার এমন ইচ্ছে হ'ল, এই ছোট মিষ্টি মুখটি দেখবার জন্যে এত ইচ্ছে হল...

ক্রিস্‌টিনে

(আনন্দিতা) সত্যি ?

ফ্রিট্‌স্

হাঁ, তারপর, তুমি যে ঘরটিতে থাকো সে ঘরটি দেখবার জন্যে এমন একটা অবর্ণনীয় বাসনা আমায় অভিভূত করল—সত্যি—মনে হ'ল সে ঘরটি আমার একবার দেখা চাই-ই—আমি থাকতে পারলুম না, চলে এলুম এখানে। তুমি বোধ হয় বিরক্ত হও নি ?

ক্রিস্‌টিনে

ও গড্!

ফ্রিট্‌স্

আমায় কেউ দেখতে পায়নি; আর তোমার বাবা থিয়েটারে, আমি জানতুম।

ক্রিস্‌টিনে

ও, কেউ দেখল, তার জন্যে আমি কেয়ার করি না!

ফ্রিট্‌স্

আচ্ছা, বেশ! (ঘরের চারিদিকে দেখিয়া) এই তোমার ঘর? ভারি সুন্দর...

ক্রিস্‌টিনে

তুমি কিছু দেখতে পাচ্ছ না। (ল্যাম্পের ওপর হইতে ঢাকা তুলিয়া নিতে চাহিল)

ফ্রিট্‌স্

না, না, থাক, ওতে আমার চোখ ঝলসে যায়, এই বেশ... ওখানে কি? ও, এই জানলা? ওই জানলার কথা আমায় বলেছিলে, ওইখানে ব'সে তুমি সব সময়ে কাজ করো, কি?—জানলা থেকে বেশ সুন্দর দৃশ্য দেখা যায়? (হাসিয়া) ও, কত বাড়ীর ছাদ,...ওখানে কি...হাঁ, ওটা কি ঘনকালো দূরে?

ক্রিস্‌টিনে

ওটা হচ্ছে কালেনবেয়ার্গ পাহাড়।

ফ্রিট্‌স্

তাই ত! আমার ঘরের চেয়ে তোমার ঘর অনেক ভাল।

ক্রিস্‌টিনে

ও!

ফ্রিট্‌স্

আমার ভারি ইচ্ছে করে এম্নি খুব উঁচুতে বাস করি, সব ছাদের ওপর দেখা যাবে। এ ভারি সুন্দর। আর তোমাদের গলিটাও নিশ্চয় খুব নীরব?

ক্রিস্‌টিনে

ও, দিনের বেলায় যথেষ্ট শব্দ।

ফ্রিট্‌স্

খুব গাড়ী যায় নাকি?

ক্রিস্‌টিনে

মাঝে মাঝে যায়, তবে ওই সামনের বাড়ীটি হচ্ছে তালা-চাবির কারখানা।

ফ্রিট্‌স্

এ ত বড় বিশ্রী। (চেয়ারে বসিল)

ক্রিস্‌টিনে

ও অভ্যাস হ'য়ে যায়! কিছুদিন থাকলে ও শব্দ কানে লাগে না।

ফ্রিট্‌স্

(তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল) আমি এখানে সত্যিসত্যি এই প্রথমবার—? কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, এ সব আমার কতদিনের জানা!...দেখ আমি মনে মনে কত কল্পনা ঠিক-ভাবে করেছিলুম। (তাহার মুখের ভঙ্গীতে মনে হইল ঘরটিকে যেন আরও নিকট করিয়া নিখুঁত করিয়া দেখিতেছে)

ক্রিস্‌টিনে

না, ওদিকে কিছু দেখোনা।—

ফ্রিট্‌স্

কি, কিসের ছবি?...

ক্রিস্‌টিনে

ও থাক।

ফ্রিট্স

দেখিই না কেন। (সে ল্যাম্প হাতে লইয়া ছবিটিকে আলোকিত করিল)

ক্রিস্টিনে

'বিদায়'—আর 'গৃহে ফিরে-আসা'!

ফ্রিট্স্

ঠিক!—বিদায়, আর ঘরে ফিরে-আসা!

ক্রিসটিনে

ছবিটা এমন কিছু ভাল নয়,—বাবার ঘরে এর চেয়ে একটা ভাল ছবি আছে।

ফ্রিট্স্

কি ছবি?

ক্রিসটিনে

ছবিটি হচ্ছে, একটি মেয়ে জানলায় দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে চেয়ে আছে, বাইরে শীত, সব বরফ-চাপা, সাদা,—ছবিটির নাম, 'পরিত্যক্তা'—

ফ্রিট্স্

হুঁ...(ল্যাম্পটি রাখিয়া দিল) ও, এই তোমার লাইব্রেরী। (বই রাখার জায়গার কাছে বসিল)

ক্রিস্টিনে

যাও, দেখো না ওসব—

ফ্রিট্স্

কেন! আ! শিলার···হাউফ্...কন্‌ভারসেশন-ডিক্সনারি...ও!

ক্রিসটিনে

ও 'জি' পর্যান্ত আছে···

ফ্রিট্স্

(হাসিয়া) আ,...“বুক ফর অল্”, এ তোমার খালি ছবি দেখবার জন্যে?

ক্রিস্টিনে

হুঁ, আমি খালি উল্টে পাল্টে ছবি দেখি।

ফ্রিট্স্

(বসিয়া) ওই ফায়ার প্লেসের ওপর মানুষটি কে?

ক্রিস্টিনে

(শিখাইবার ভঙ্গীতে) উনি হচ্ছেন সুবার্ট।

ফ্রিট্স্

(দাঁড়াইয়া) হাঁ, তাই বটে—

ক্রিস্টিনে

সুবার্টকে বাবার বড় ভাল লাগে। বাবা আগে এক সময়ে গান লিখতেন, খুব সুন্দর।

ফ্রিট্স্

এখন আর লেখেন না?

ক্রিসটিনে

না, এখন আর না। (নীরবতা)

ফ্রিট্স

(বসিল) তোমার ঘরটি কি homely comfortable!—

ক্রিস্টিনে

তোমার সত্যি ভাল লেগেছে?

ফ্রিট্স্

খুব...এ কি? (টেবিলের উপর হইতে কৃত্রিম ফুলভরা একটি ফুলদানি তুলিয়া লইল)

ক্রিস্টিনে

আবার একটা কিছু খুঁজে পেয়েছ?

ফ্রিট্স্

না, ক্রিস্টি? এ নকল ফুল তোমার ঘরে মানায় না,... এই পুরানো ফ্যাকাসে ধূলোভরা—

ক্রিস্টিনে

ও গুলো সত্যি খুব পুরানো নয়।

ফ্রিট্স্

ও, নকল-ফুলগুলো সব সময়েই পুরানো দেখায়... তোমার ঘরে সত্যিকার ফুল থাকবে, টাটকা ফুলের গন্ধে ঘর ভরা থাকবে। এখন থেকে আমি তোমার··· (বলিতে বলিতে থামিয়া গেল, তাহার চঞ্চলতা ও আবেগ লুকাইবার জন্য একটু ঘুরিয়া বসিল)

ক্রিস্টিনে

কি?...বলতে বলতে থামলে কেন?

ফ্রিট্স্

না, কিছু নয়, কিছু নয়।

শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু

ক্রিস্‌টিনে

(উঠিয়া, অতি আদরের সুরে) কি ?

ফ্রিট্‌স

আমি কাল তোমায় তাজা ফুল পাঠাবো, এই আমি বলতে যাচ্ছিলুম···

ক্রিস্‌টিনে

ভেবেই,তার জন্যে পরিতাপ হচ্ছে ?---নিশ্চয় কাল তুমি আর আমার কথা ভাববে না।

ফ্রিট্‌স্

(আত্মসম্বরণ করিল)

ক্রিস্‌টিনে

সে ত বটেই, আমায় যখন দেখতে পাও না তখন আমার কথা ভুলে যাও।

ফ্রিট্‌স্

কি যা তা বলছিস ?

ক্রিস্‌টিনে

ও, আমি জানি, জানি, আমি বুঝতে পারি।

ফ্রিট্‌স

কেমন ক'রে তুমি এই সব কল্পনা করো।

ক্রিসটিনে

তার জন্যে তুমিই দায়ী। কারণ, তুমি সব সময়ই আমার কাছে তোমার সব কথা লুকোও! তুমি আমায় তোমার কোন কথা বল না।—আচ্ছা, আজ সারাদিন কি করলে ?

ফ্রিট্‌স্

বিশেষ কিছুই নয় ক্রিস্‌টি। সকালে লেকচার শুনতে গেলুম—কিছুক্ষণ কাটল—তারপর কাফি হাউসে গেলুম... তারপর কিছুক্ষণ পড়লুম...খানিকক্ষণ একটু পিয়ানো বাজালুম—তারপর এর সঙ্গে ওর সঙ্গে আড্ডা—তারপর বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে বেরোলুম...এম্নি দিনটা কেটে গেল।—হুঁ, এখন আমায় যেতে হবে ক্রিস্‌টি...

ক্রিস্‌টিনে

এখুনি, এত শিগ্‌গির—

ফ্রিট্‌স্

তোমার বাবা ত আর একটু পরেই এসে পড়বেন।

ক্রিস্‌টিনে

সে অনেক দেরী আছে, ফ্রিট্‌স্—থাকো—আর খানিকক্ষণ থাকো—

ফ্রিট্‌স্

কিন্তু...থিওডর আমার জন্যে অপেক্ষা করছে...তার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।

ক্রিস্‌টিনে

আজ ?

ফ্রিট্‌স

হাঁ, আজই।

ক্রিস্‌টিনে

তার সঙ্গে কাল দেখা করতে পারো।

ফ্রিট্‌স্

কাল বোধ হয় আমি ভিয়েনাতেই থাকবো না।

ক্রিস্‌টিনে

কি, ভিয়েনাতে থাকবে না ?

ফ্রিট্‌স্

(তাহার উদ্বিগ্নতা দেখিল, আপনাকে শান্ত করিয়া রাখিল) আ, ক্রিস্‌টিন, আমি একদিনের জন্যে অথবা দু'দিনের জন্যে বাইরে যেতে পারি—এতো হতে পারে ?

ক্রিস্‌টিনে

কোথায় ?

ফ্রিট্‌স্

কোথায়!...এই কোথাও—আ গড্, ওরকম মুখ কোরোনা...আমি আমাদের গাঁয়ে যাবো বাবা-মা'র কাছে...না...তার দরকার নেই ?

ক্রিস্‌টিনে

দেখো, তুমি তাঁদের কথা আমায় কিছু বলো নি!

ফ্রিট্‌স্

কি ছেলেমানুষ!···আচ্ছা, তুমি বুঝতে পারো না, আমরা দুজনে মিলে একাকী পরিপূর্ণ, বাইরের কোন সম্বন্ধ নেই। এ কত সুন্দর, তুমি অনুভব করো না ?

ক্রিস্‌টিনে

না, তুমি আমায় তোমার কথা কিছুই বল না, এ

মোটেই সুন্দর নয়।···দেখো, তোমার সম্বন্ধে আমি সব কথা জানতে চাই, সব, সব—তোমার কাছ থেকে আমি কোনো সন্ধ্যার এক ঘণ্টার চেয়ে অনেক বেশী চাই। কখনও কোন সন্ধ্যায় আমরা একটু মিল্‌লুম, তারপর তুমি চ'লে যাও, আমি কিছুই জানি না, কিছুই জানতে পারি না—তার পর সমস্ত রাত্রি যায়, সমস্ত দিনের সমস্ত ঘণ্টাগুলো কেটে যায়—আর আমি কিছু জানি না। তাই ভেবে আমার মন খারাপ হয়।

ফ্রিট্‌স্

কেন মন খারাপ হবে?

ক্রিস্‌টিনে

সত্যি, তোমার জন্যে আমার এমন মন কেমন করে, যেন তুমি এই সহরে নেই, যেন তুমি আর কোথাও চ'লে গেছ, যেন তুমি আমার কাছ থেকে দূরে স'রে গেছ, দূরে, কোথায় সুদূর পথে···

ফ্রিট্‌স্

(চঞ্চল হইয়া) ক্রিস্‌টি!

ক্রিস্‌টিনে

না, দেখো, এ সত্যি তোমায় বলছি!...

ফ্রিট্‌স্

ক্রিস্‌টি, আমার কাছে এসো...(সে তাহার অতি নিকট গেল) দেখো, তুমি জানো, আমিও জানি, আজ এই নিমেষে এই মুহূর্ত্তে তুমি আমায় ভালোবাসো... (ক্রিস্‌টিনে যেন কোন কথা বলিতে চাহিল) না, অনন্তকালের কথা বোলো না। জীবনে এমন মুহূর্ত্ত আসে যে মুহূর্ত্তে অনন্তকালের স্পর্শ অনুভব করা যায়, সেই অসীমতার গন্ধভরা মুহূর্ত্তে অন্তর ঝলমল করে—আমরা এই কথাই বুঝতে পারি, হাঁ, এই মুহূর্ত্ত আমাদের...(ক্রিস্‌টিনেকে চুম্বন করিল—নীরবতা—ফ্রিট্‌স্ উঠিয়া দাঁড়াইল—সহসা উচ্ছ্বসিত ভাবে বলিয়া উঠিল) আ, কি সুন্দর তোমার এ জায়গাটি, কি সুন্দর!...(জানালায় গিয়া দাঁড়াইল) ও, পৃথিবী হ'তে যেন কত দূরে, এই রাশ রাশ বাড়ীর ওপরে···কি নির্জ্জন মনে হচ্ছে! তুমি আর আমি মিলে একলা...(মৃদুস্বরে) শান্তির আশ্রয়···

ক্রিস্‌টিনে

তুমি যদি সব সময়ে এই রকম ভাবে বলো...আমি হয়ত সত্যি ব'লেই বিশ্বাস করবো···

ফ্রিট্‌স্

কি ক্রিস্‌টি?

ক্রিস্‌টিনে

যে, আমি যে রকম নিজের মনের স্বপ্ন বুনি, সেইরকম তুমি আমায় ভালবাসো। যেদিন তুমি আমায় প্রথম চুমু দিয়েছিলে···মনে আছে?

ফ্রিট্‌স্

(প্রেমাবেগের সহিত) তোমায় আমি সত্যি ভালবাসি, ভালবাসি! (ফ্রিট্‌স্ ক্রিস্‌টিনেকে দুই হাতে জড়াইয়া বক্ষে চাপিয়া ধরিল; আলিঙ্গনবন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া দিল) এখন যেতে হবে—

ক্রিস্‌টিনে

কি, আমায় যা বল্লে, তা ব'লেই অনুতাপ হচ্ছে? তোমাকে আমি বাঁধবোনা, বেঁধে রাখবো না, তুমি মুক্ত—যখন তোমার খুসি তুমি আমায় ছেড়ে চলে যেও,...তুমি আমার কাছে কিছু প্রতিজ্ঞা করোনি—আর আমিও তোমার কাছে কিছু চাই না···তারপর আমার কি হবে—তাতে কিছু আসে যায় না।—আমি ত জীবনে একবার সুখী হয়েছি, তার চেয়ে বেশি আমি জীবন থেকে কিছু চাই না। আমি শুধু চাই যে, তুমি আমার প্রাণের এই কথাটি জানো আর তুমি সত্যি বিশ্বাস করো যে, তোমার আগে আমি কাউকে ভালবাসিনি, আর তোমার পরেও আমি কাউকে ভালবাসব না, তুমি আমার জীবনের একমাত্র ভালবাসা—আর আমাকে যখন আর তোমার ভাল লাগবে না—

ফ্রিট্‌স্

(যেন নিজের প্রতি) আর বোলো না, বোলো না—কে দরজায় ঘণ্টা বাজালো—এর মধ্যে···

(দরজায় করাঘাত)

ফ্রিট্‌স্

(কাঁপিয়া উঠিয়া) থিওডর বোধ হয়...

শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু

ক্রিস্‌টিনে

(চমকিত ভাবে) সে জ'নে, তুমি এখানে ?

(থিওডর প্রবেশ করিল)

থিওডর

শুভসন্ধ্যা—বড় বিরক্ত করলুম ?

ক্রিস্‌টিনে

আপনার কি খুবই দরকারী কথা আছে ?

থিওডর

হাঁ,—ওকে আমি সমস্ত জায়গায় খুঁজে বেড়াচ্ছি।

ফ্রিট্‌স্

(মৃদুস্বরে) নীচে অপেক্ষা করলে না কেন ?

ক্রিস্‌টিনে

কি ফিসফাস হচ্ছে ?

থিওডর

(ইচ্ছা ক'রে উচ্চস্বরে) নীচে অপেক্ষা করলুম না কেন ? হাঁ, যদি আমি ঠিক জানতুম যে তুমি এখানে আছো কিন্তু নীচে ত আর দু'ঘণ্টা ধ'রে পায়চারি করতে পারি না···

ফ্রিট্‌স্

(অর্থসূচক স্বরে) হাঁ,···কাল তা হ'লে আমার সঙ্গে আসছ ?

থিওডর

(বুঝিয়া) হাঁ, নিশ্চয়.

ফ্রিট্‌স্

বেশ...

থিওডর

বড় ছুটে এসেছি, তোমাদের অনুমতি নিয়ে আমি একটু বসছি।

ক্রিস্‌টিনে

অনুগ্রহ ক'রে—(জানালার কাছে কি একটা কাজ করিতে গেল)

ফ্রিট্‌স্

(মৃদুস্বরে) নতুন কিছু খবর আছে ?—কিছু শুনেছো ?

থিওডর

(ফ্রিট্‌সের প্রতি মৃদুস্বরে) না। কিন্তু তুমি ও রকম ক'রে বেড়াচ্ছো কেন, কেন এই সব অযথা মানসিক উত্তেজনা ? এখন তোমার ঘুমোতে যাওয়া উচিত, তোমার বিশ্রাম দরকার !

(ক্রিস্‌টিনে তাহাদের নিকট আসিল)

ফ্রিট্‌স্

আচ্ছা বল ত, ক্রিস্‌টির ঘরটা কি চমৎকার আরামের !

থিওডর

হাঁ, বেশ ঘরটি···(ক্রিস্‌টিনের প্রতি) সারাদিন তুমি বাড়ীতে থাকো ?—সত্যি, তোমার এখানটি বেশ আরামের জায়গা বটে, তবে আমার মতে একটু বেশী উঁচু।

ফ্রিট্‌স

তাই ত আমার খুব ভাল লেগেছে।

থিওডর

কিন্তু এখন আমাকে ফ্রিটসকে কেড়ে নিয়ে যেতে হবে; ওকে কাল সকাল সকাল উঠতে হবে।

ক্রিস্‌টিনে

তা হ'লে সত্যি তুমি চ'লে যাচ্ছো ?

থিওডর

ফ্য়লাইন ক্রিস্‌টিন, ও আবার আসবে।

ক্রিস্‌টিনে

চিঠি লিখবে ত ?

থিওডর

কিন্তু, কালই যে ফিরে আসবে—

ক্রিস্‌টিনে

না, আমি জানি, ও বহুদূর যাচ্ছে.

ফ্রিট্‌স্

(একটু কাঁপিয়া স্কন্ধ দোলাইল)

থিওডর

(তাহা লক্ষ্য করিল) তা হ'লে চিঠি লিখতেই হবে ? আমি তোমাকে এত সেন্টিমেণ্টাল্ ভাবিনি···আমি বলছি কি—

আমরা…আচ্ছা, তা হ'লে বিদায়চুম্বন…তবে বেশীক্ষণ যেন না হয়…(থামিয়া গেল) ধর, আমি এখানে নেই।

(ফ্রিট্‌স্ ও ক্রিস্‌টিনে পরস্পরকে চুম্বন করিল)

থিওডর

(সিগারেট বাক্স বাহির করিয়া একটি সিগারেট মুখে পুরিল, দেশলাই'র বাক্সের জন্য ওভার-কোটের পকেট খুঁজিতে লাগিল। সেখানে দেশলাই না পাওয়ায় বলিল) প্রিয় ক্রিস্‌টিন, দেশলাই দিতে পারো ?

ক্রিস্‌টিনে

নিশ্চয়, এই যে! (ড্রয়ার হইতে একটি দেশলাইএর বাক্স বাহির করিয়া দিল)

থিওডর

এতে কোন কাটি নেই—

ক্রিস্‌টিনে

আচ্ছা, এনে দিচ্ছি। (পাশের ঘরে তাড়াতাড়ি ছুটিয়া গেল)

ফ্রিট্‌স্

(ক্রিস্‌টিনেকে দেখিতে দেখিতে) ও গড্, জীবনের এমন সময়ে মিথ্যে কথা বলা!

থিওডর

কি এমন সময়!

ফ্রিট্‌স

এখন আমি বুঝতে পারছি, এইখানে আমার জীবনের সুখ ছিল, এই চমৎকার মেয়েটি—(বলিতে বলিতে থামিয়া গেল), কিন্তু এই মুহূর্তগুলিকে কি ভয়ঙ্কর মিথ্যাতে ভ'রে তুলছি…

থিওডর

কি বাজে বকচ?…পরে তুমি এ সব কথা ভেবে হাসবে—

ফ্রিট্‌স

সে সময় হবে না।

ক্রিস্‌টিনে

(দেশলাই বাক্স লইয়া আসিল) এই নাও!

থিওডর

ধন্যবাদ—আচ্ছা, তা হ'লে আসি। (ফ্রিট্‌সের প্রতি) কি, আরও দেরী করবে ?

ফ্রিট্‌স্

(ঘরটির চারিদিক তৃষিত চক্ষে দেখিতে লাগিল, যেন সব ঘর আপনার অন্তরে ভরিয়া লইতে চায়) এ জায়গা ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করে না।

ক্রিস্‌টিনে

যাও, ঠাট্টা কোরো না।

থিওডর

এসো—বিদায়, ক্রিস্‌টিনে।

ফ্রিট্‌স্

সুখে থাকো…

ক্রিস্‌টিনে

আবার দেখা হবে!

(থিওডর ও ফ্রিট্‌স্ চলিয়া গেল)

ক্রিস্‌টিনে

(অভিভূতের মত দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর খোলা দরজার কাছে গিয়া ভাঙ্গা গলায় বলিল) ফ্রিট্‌স্…

ফ্রিট্‌স্

(সিঁড়ি হইতে আবার উঠিয়া আসিল,তাহাকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিল) সুখে থেকো!

যবনিকা পতন

তৃতীয় অঙ্ক

(ক্রিস্‌টিনের সেই ঘর। দুপুর বেলা)

ক্রিস্‌টিনে

(একা জানালার পাশে বসিয়া সেলাই করিতেছিল; সেলাইএর কাজ রাখিয়া দিল।)

(কাথারিনার ন'বছরের মেয়ে লিনা প্রবেশ করিল)

লিনা

শুভদিন, ফ্র্যলাইন ক্রিস্‌টিন!

জার্মান ভাষায় বহুপ্রকার বিদায়-সম্ভাষণ আছে। একটি হচ্ছে Leb' wohl অর্থাৎ ভালো থাকো; আর একটি হচ্ছে Auf Wiedersehn। আবার দেখা হওয়া পর্য্যন্ত। Adieu বা বিদায়।

শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু

ক্রিস্‌টিনে

(আনমনা) কি খুকি, কি চাই ?

লিনা

মা পাঠিয়ে দিলেন, থিয়েটারে যাবার টিকিট যদি এসে থাকে নিয়ে আসতে।

ক্রিস্‌টিনে

বাবা এখনও ত বাড়ী আসেন নি ; অপেক্ষা করবি ?

লিনা

না, ফ্রয়লাইন ক্রিস্‌টিন, আমি আবার খাবার পরে আসবো।

ক্রিস্‌টিনে

বেশ।

লিনা

(যাইতে যাইতে আবার ফিরিয়া বলিল) মা ফ্রয়লাইন ক্রিস্‌টিনেকে তাঁর নমস্কার জানিয়েছেন, আর জিজ্ঞাসা করেছেন, তাঁর মাথাধরা এখনও আছে কি ?

ক্রিস্‌টিনে

না, খুকি।

লিনা

বিদায়, ফ্রয়লাইন ক্রিস্‌টিন।

ক্রিস্‌টিনে

বিদায় !

(লিনা বাহিরে যাইতেছে মিত্‌সি ঘরে প্রবেশ করিল)

লিনা

শুভ দিবস ফ্রয়লাইন মিত্‌সি।

মিত্‌সি

সেয়ারভুস্‌, খুকি !

(লিনা চলিয়া গেল)

ক্রিস্‌টিনে

(উঠিয়া দাঁড়াইল, মিত্‌সি প্রবেশ করিলে তাহার মুখোমুখি দাঁড়াইল)--কি, তারা ফিরে এসেছে ?

মিত্‌সি

আমি কি ক'রে জানবো ?

ক্রিস্‌টিনে

কোন চিঠি পাস্‌নি ?

মিত্‌সি

না।

ক্রিস্‌টিনে

তুইও কোন চিঠি পাস্‌ নি ?

মিত্‌সি

কি লিখবে বল ?

ক্রিস্‌টিনে

পরশুদিন তারা গেছে !

মিত্‌সি

এ এমন কি দীর্ঘ সময় যে তার জন্যে মুখ ভার ক'রে সব সময় ব'সে থাকতে হবে। আমি বাপু, তোর কাণ্ড বুঝি না...দেখ দেখি মুখের কি শ্রী হয়েছে, খুব কেঁদেছিস বুঝি ? তোর বাবা যখন বাড়ী আসবেন, তিনিও বুঝতে পারবেন।

ক্রিস্‌টিনে

(সরলভাবে) বাবা সব জানেন।—

মিত্‌সি

(ভীতভাবে) কি ?

ক্রিস্‌টিনে

আমি তাঁকে সব বলেছি।

মিত্‌সি

তা বেশ করেছিস। লোকে ত সব তোর মুখ দেখেই বুঝতে পারছে।—শেষ পর্য্যন্ত সব জানেন ?

ক্রিস্‌টিনে

হ্যাঁ।

মিত্‌সি

তোকে ব'কেছেন কিছু ?

ক্রিস্‌টিনে

(মাথা নাড়িল)

মিত্‌সি

তা হ'লে কি বল্লেন ?

ক্রিস্‌টিনে

কিছু না।…তিনি চুপ ক'রে চ'লে গেলেন, যেমন তিনি যান।

মিত্‌সি

তাঁকে এই সব ব'লে কি বোকামি করলি বল্‌ত।… জানিস, কেন তোর বাবা এ বিষয়ে কিছু কথা বল্লেন না—? তিনি ভেবেছেন, ফ্রিট্‌স্‌ তোকে বিয়ে করবে।

ক্রিস্‌টিনে

তুই তা হ'লে ওসব কথা বলছিস কেন?

মিত্‌সি

আমি কি ভাবি জানিস?

ক্রিস্‌টিনে

কি?

মিত্‌সি

ওই বাইরে বেড়াতে যাওয়ার গল্পটা একেবারে মিথ্যে।

ক্রিস্‌টিনে

কেন?

মিত্‌সি

তারা বোধ হয় কোথাও যায়নি।

ক্রিস্‌টিনে

তারা বাইরে গেছে, সহরে নেই—তা আমি বেশ জানি। কাল সন্ধেবেলা তার বাড়ির কাছে গেছলুম, পর্দা সব নাবানো, সে এখানে নেই।—

মিত্‌সি

তা আমি বিশ্বাস করি। তারা চ'লে গেছে—তবে তারা আর ফিরে আসবে না—অন্তত আমাদের কাছে ফিরে আসবে না।

ক্রিস্‌টিনে

(শঙ্কার সহিত) কী—

মিত্‌সি

হুঁ, খুব সম্ভব তাই!

ক্রিস্‌টিনে

আর তুই তা অত শান্তভাবে বলছিস—

মিত্‌সি

হুঁ—হয় আজ অথবা কাল—অথবা ছমাস পরে, তাতে কি এসে যায়?

ক্রিস্‌টিনে

তুই যে কি বলছিস নিজে বুঝচিস না…না, তুই ফ্রিট্‌সকে জানিস না—তুই তাকে যা ভাবিস সে সেরকম নয়—আমার ঘরে এইখানে সে এসেছিল, আমি তাকে সেদিন সত্যি বুঝেছিলুম। মাঝে মাঝে সে দেখিয়েছে বটে সে যেন আমার জন্যে কেয়ার করে না কিন্তু সে আমায় ভালবাসে… (যেন মিত্‌সির উত্তর অনুমান করিয়া) হাঁ—হাঁ—চিরদিনের জন্য নয়, আমি তা জানি কিন্তু হঠাৎ এরকম ক'রেও শেষ হয় না!

মিত্‌সি

আমি অবশ্য ফ্রিট্‌সকে অত ক'রে জানি না।

ক্রিসটিনে

সে ফিরে আসবে, থিওডরও আসবে,—নিশ্চয়ই!

মিত্‌সি

(এমন ভঙ্গি করিল যে তাহাতে বোঝা যায় থিওডর আসুক বা না আসুক তাহাতে তার কিছু আসে যায় না)

ক্রিসটিনে

মিত্‌সি…আমার একটা কথা রাখবি?

মিত্‌সি

অত উতলা হসনি—কি বলছিস?

ক্রিসটিনে

দেখ, একবার থিওডরের বাড়ী যা,তার বাড়ী ত কাছেই। একবার উঁকি মেরে দেখে আয়…হাঁ, ওর বাড়ীতে জিজ্ঞেস করতে পারিস, ও বাড়ী আছে কিনা, আর যদি না থাকে নিশ্চয়ই বাড়ীর লোকেরা জানবে ও কখন ফিরে আসবে।

মিত্‌সি

দেখ্‌, আমি কখনও কোন পুরুষমানুষের পেছন পেছন ছুটবো না।

ক্রিস্‌টিনে

আচ্ছা, জান্‌তে দোষ কি, হয়ত তার সঙ্গে দেখাই হবে। এখন প্রায় একটা,—এখন সে নিশ্চয় খেতে আসে।

শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু

মিত্‌সি

তুই কেন ফ্রিট্‌সের বাড়ীতে যা না তার খবর নিতে?

ক্রিস্‌টিনে

আমার সাহস হচ্ছে না—সে হয়ত তা মোটেই পছন্দ করবে না...আর সে নিশ্চয়ই বাড়ীতে ফিরে আসেনি। কিন্তু থিওডর হয়ত ফিরে এসেছে, সে হয়ত জানে কবে ফ্রিট্‌স আসবে। মিত্‌সি, আমি তোকে করযোড়ে অনুরোধ করছি!

মিত্‌সি

না, তুই ছেলেমানুষী আরম্ভ করলি—

ক্রিস্‌টিনে

আচ্ছা, আমার জন্যে তুই একটু কষ্ট কর! যা, যা! তাতে কিছু খারাপ হবে না।—

মিত্‌সি

আচ্ছা, তোর মন যদি তাতে শান্ত হয়, আমি যাচ্ছি। কিন্তু কিছু লাভ হবে না। তারা নিশ্চয়ই ফিরে আসেনি।

ক্রিস্‌টিনে

ওখান থেকেই আমার কাছে আসবি...কেমন?

মিত্‌সি

আচ্ছা, তা আমার জন্যে মাকে খেতে বসতে একটু দেরী করতে হবে।

ক্রিস্‌টিনে

অশেষ ধন্যবাদ, মিত্‌সি, কি লক্ষী মেয়ে তুই···

মিত্‌সি

নিশ্চয়, আমি খুব লক্ষী মেয়ে;—আচ্ছা, এখন একটু শান্ত হ'...আমি যাই তা হ'লে!

ক্রিস্‌টিনে

ধন্যবাদ!

(মিত্‌সি চলিয়া গেল)

(একটু পরে ভাইরিং প্রবেশ করিল)

ক্রিস্‌টিনে

(একা ঘর গোছাইতে লাগিল। সেলাইএর জিনিষগুলি জড় করিয়া রাখিল, তারপর জানলায় গিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইল। কয়েকমিনিট পরে ভাইরিং যখন প্রবেশ করিল, সে তাহাকে দেখিতে পাইল না। ভাইরিং গভীরভাবে বিচলিত, উদ্বিগ্নতার সহিত তাহার মেয়ের দিকে চাহিল, ক্রিস্‌টিনে তখনও বাহিরের দিকে চাহিয়া জানালায় দাঁড়াইয়া)

ভাইরিং

ও এখনও জানেনা, ও এখনও জানেনা···

(ভাইরিং দরজায় দাঁড়াইয়া রহিল, যেন ঘরের ভিতর পা বাড়াইতে সাহস হইতেছে না।)

ক্রিস্‌টিনে

(জানলা হইতে ঘুরিয়া দাঁড়াইল, বাবাকে দেখিল, অজানা ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল)

ভাইরিং

(হাসিবার চেষ্টা করিল। ঘরের ভেতর প্রবেশ করিল) কি ক্রিস্‌টিন্! (যেন সে নিজের প্রতিই বলিল)

ক্রিস্‌টিনে

(তাহার দিকে অগ্রসর হইয়া গেল, যেন তাহার সামনে মাটিতে লুটাইয়া পড়িবে)

ভাইরিং

কি...কি ভাবছিস্ ক্রিস্‌টিন? আমরা (মনের দৃঢ়তার সহিত) আমরা ভুলে যেতে পারবো কি?

ক্রিস্‌টিনে

(তাহার মাথা তুলিল)

ভাইরিং

আমি—আর তুই!

ক্রিস্‌টিনে

বাবা, সকালবেলায় আমি যা বল্লুম তা কি তুমি বোঝ নি?

ভাইরিং

কিন্তু কি চাস তুই ক্রিস্‌টিন ?···আমি যা ভাবছি তা তো তোকে বলতে হবে! নয় কি?

ক্রিস্‌টিনে

বাবা, কি বলছ তুমি?

ভাইরিং

আয় আমার কাছে, মা,...আমার কথা শান্ত হ'য়ে শোন্। দেখ্, যখন তুই আমায় সব বলেছিলি, আমি তোর কথা শান্ত হ'য়ে শুনেছিলুম—আমরা—

ক্রিটিস্‌নে

বাবা, তোমায় অনুরোধ করছি, আমায় ও রকম ক'রে বোলো না...তুমি যদি সব দিক থেকে বুঝে থাকো যে, তুমি আমায় ক্ষমা করতে পারবে না, বেশ, আমায় বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দাও—কিন্তু ও সব কথা বোলো না।...

ভাইরিং

আমার কথাগুলো একটু শান্ত হ'য়ে শোন্ মা! তারপর তোর যা ইচ্ছে তুই কর্...দেখ ক্রিস্‌টিনে, তোর এখন কত অল্প বয়স···তুই কি কখনও ভাবিস নি···(অত্যন্ত ইতস্তত ভাবে) যে সমস্ত ব্যাপারটা একটা ভুল হতে পারে।

ক্রিস্‌টিনে

বাবা, তুমি কেন আমায় ওকথা বলছ?—আমি বেশ জানি আমি কি করেছি,—আর এ যদি একটা ভুল হ'য়ে থাকে, বেশ, তা হ'লে—আমি কিছু চাইনা—তোমার কাছ থেকে বা পৃথিবীর আর কারো কাছ থেকে···আমি ত বলেছি, তাড়িয়ে দাও, বাড়ী থেকে বার ক'রে দিতে পারো, কিন্তু...

ভাইরিং

(তাহাকে বাধা দিয়া) তুই কি বলছিস্...যদি ভুলই হ'য়ে থাকে তার জন্যে তোর অত অল্প বয়সের মেয়ের সমস্ত জীবন ব্যর্থ ভাবতে হবে?—ভাব্ মা, একবার ভেবে দেখ্, কি চমৎকার, কি অপরূপ এই জীবন! ভেবে দেখ্ দেখি, আমাদের আনন্দের কত জিনিষ রয়েছে, তোর সামনে যৌবনের কত দিন, কত সুখ, কত সৌভাগ্য রয়েছে···দেখ্, আমার দিকে, আমার আর পৃথিবীতে সম্পদ বেশী কিছু নেই,—কিন্তু তা হ'লেও কতরূপে কতভাবে আমি আনন্দ পেতে পারছি। তুই আর আমি কেমন একসঙ্গে থাকবো—আমরা আমাদের জীবন ইচ্ছামত আবার গুছিয়ে নিতে পারবো—তুই আর আমি।···আবার কেমন তুই—হাঁ, যখন আবার সুসময় আসবে, তুই আবার আগেকার মত গান গাইবি। তারপর আমার ছুটির দিনে কেমন আমরা দু'জনে সহর ছেড়ে বেড়াতে যাব, গাঁয়েতে, সবুজ মাঠে সমস্ত দিন কাটবে—পৃথিবীতে কত সুন্দর জিনিষ রয়েছে···কত, কত—তোর জীবনের প্রথম সুখস্বপ্ন পূর্ণ হ'ল না, শূন্যে মিলিয়ে গেল ব'লে, সমস্ত জীবনের সব সুখ সৌভাগ্য কি বিসর্জ্জন দিতে হবে? এ যে নেহাৎ পাগলামি—

ক্রিস্‌টিনে

(ভীত ভাবে) কেন?...কেন পূর্ণ হবে না...?

ভাইরিং

হায়, সত্যই যদি এ তোর সুখ সৌভাগ্য হ'ত! তুই কি সত্যি ভাবিস ক্রিস্‌টিন যে আজ তোর বাবাকে এসব বলা দরকার ছিল? আমি অনেকদিন থেকেই জানতুম!—আর তুই যে আমায় একদিন বল্‌বি তাও জানতুম। না, না, এ তোর পক্ষে সুখ নয়!···আমি কি তোর চোখ জানি না? তুই যাকে ভালবেসেছিস সে যদি সত্যি সে ভালবাসার যোগ্য হ'ত, তাহলে ও চোখ দু'টি দিয়ে এত অশ্রু ঝরত না, ও গাল দু'টি এমন রক্তহীন হ'ত না···

ক্রিস্‌টিনে

তুমি কেমন ক'রে জানলে...কি জানো তুমি···তুমি কি শুনেছো?

ভাইরিং

কিছু না, কিছু না···তুই নিজেই ত আমায় বলেছিস সে কে···সে একটা ছোকরা—সে কি জানে বল্, কি বোঝে? —সে যদি একটু বুঝত হঠাৎ ভাগ্যক্রমে সে কি রত্ন পেয়েছিল —নকল আর আসলের মধ্যে প্রভেদ কি সে জানে—আর তোর এই দিশাহারা ভালবাসা—সে কি তার কিছু বুঝেছে?

ক্রিস্‌টিনে

(উদ্বিগ্ন ভাবে) তুমি কি তাকে...—তুমি তার কাছে গেছলে?

ভাইরিং

তুই কি ভাবিস! সে ত বাইরে চ'লে গেছে। দেখ্, ক্রিস্‌টিন, এখনও আমার বুদ্ধি লোপ হয় নি, আমার এখনও দুটো চোখ আছে। শোন্ মা, ভুলে যা! এ ব্যাপার সব ভুলে যা! তোর ভবিষ্যৎ অন্যপথে অন্যদিকে! এ তুই জানিস, যে সুখ তোর প্রাপ্য সে সুখে তুই আবার সুখী হবি। তুই জীবনে এমন কাউকে পাবি, যে তোর সত্যি মূল্য বুঝবে—

ক্রিস্‌টিনে

(তাহার টুপি লইতে ছুটিল)

ভাইরিং

কি চাস? কি?—

ক্রিস্‌টিনে

ছেড়ে দাও, আমায় যেতে দাও. .

ভাইরিং

কোথা যাবি ?

ক্রিস্‌টিনে

তার কাছে...তার কাছে...

ভাইরিং

কি ভাব্‌ছিস্‌ তুই, কি ভাব্‌ছিস ?

ক্রিস্‌টিনে

তুমি সব লুকোচ্ছো, আমায় যেতে দাও—

ভাইরিং

(তাহার পথ আটক করিয়া) মা, পাগল হস্‌ নে। সে সত্যি তার বাড়ীতে নেই।...সে হয়ত বহু দূরে চ'লে গেছে।...এখন এখানে আমার কাছে যাক্‌, সেখানে গিয়ে কি করবি ...কাল অথবা সন্ধ্যেবেলা আমি তোর সঙ্গে যাব'খন। তুই ওরকমভাবে রাস্তায় যেতে পারবি না...জানিস কি তোকে কি-রকম দেখাচ্ছে ?...

ক্রিস্‌টিনে

তুমি আমার সঙ্গে যাবে ?

ভাইরিং

আমি তোকে কথা দিচ্ছি,—শুধু এখন তুই কোথাও যাস্‌ না, ওখানে বস্‌, শান্ত হ'।

ভাইরিং

(অসহায় ভাবে) আমি কি জানবো...আমি শুধু জানি, তোকে আমি ভালবাসি, তুই আমার একমাত্র মেয়ে, তুই আমার কাছে থাকবি—আমার কাছে তোকে সারাজীবন থাকতে হবে—

ক্রিস্‌টিনে

যথেষ্ট—যেতে দাও—(সে তাহার পিতাকে এড়াইয়া দরজার দিকে চলিল, ঠিক সেই সময় মিত্‌সি দরজার গোড়ায় আসিয়া উপস্থিত হইল)

মিত্‌সি

(ক্রিস্‌টিনে প্রায় তার ঘাড়ে গিয়া পড়াতে, মৃদুস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল) যা ভয় পাইয়ে দিয়েছিলি—

ক্রিস্‌টিনে

(মিত্‌সির পেছনে থিওডরকে দেখিয়া ঘরের ভেতর পেছনে ফিরিয়া আসিল)

থিওডর

(দরজার গোড়ায় দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার কালো পরিচ্ছদ)

ক্রিস্‌টিনে

কি...কি খবর...(কেহ তাহার প্রশ্নের উত্তর দিল না, সে থিওডরের মুখের দিকে চাহিল, থিওডর তাহার দৃষ্টি অন্যদিকে সরাইয়া লইল) কোথায় সে, সে কোথায় ? (অত্যন্ত উদ্বিগ্ন, কেহ তাহার জবাব দিল না, সে থিওডর ও মিত্‌সির বিষন্ন ও বিহ্বল মুখের দিকে চাহিল) কোথায় সে ? (থিওডরের প্রতি) থিওডর, বলুন !

থিওডর

(কথা বলিতে চেষ্টা করিল)

ক্রিস্‌টিনে

(থিওডরের আপাদমস্তক দেখিতে লাগিল, তাহার চারিদিক দেখিতে লাগিল। তারপর, ক্রিস্‌টিনের মুখের ভয়ঙ্কর পরিবর্ত্তনে বোঝা গেল, সত্যি কি ব্যাপার ঘটিয়াছে তাহা সে বুঝিতে পারিয়াছে, ভীষণ চীৎকার করিয়া উঠিল—) থিওডর !...সে কি...

থিওডর

(মাথা নাড়িয়া 'হঁ্যা' জানাইল)

ক্রিস্‌টিনে

(নিজের কপাল হাত দিয়া চাপিয়া ধরিল, যেন কিছু বুঝিতে পারিতেছে না, থিওডরের নিকট গেল, তাহার হাত ধরিল—যেন পাগলিনী) সে...সে...মারা গেছে...(যেন সে প্রশ্ন নিজেকেই করিতেছে)

ভাইরিং

মা আমার—

ক্রিস্‌টিনে

(পিতাকে ঠেলিয়া দাঁড়াইল) থিওডর, বলুন, বলুন,...

থিওডর

আপনি সব জানেন।

ক্রিস্‌টিনে

আমি কিছু জানি না...আমি কিছু জানি না, কি ঘটেছে...বাবা...থিওডর...(মিত্‌সির প্রতি) তুইও জানিস...

একটা দুর্ঘটনায়-

ক্রিস্‌টিনে

কি, কি ?

থিওডর

সে আর নেই।

ক্রিস্‌টিনে

কি ? সে...

থিওডর

ডুয়েলতে (Duel) সে মরেছে।

ক্রিস্‌টিনে

(চীৎকার) উঃ! (সে টলিয়া মেজেতে পড়িয়া যাইত, কিন্তু ভাইরিং তাহাকে ধরিল; ভাইরিং থিওডরের প্রতি এমন সঙ্কেত করিয়া চাহিল যে থিওডর বুঝিল সে এখন যাইতে পারে)

ক্রিস্‌টিনে

(পিতার সাঙ্কেতিক চিহ্ন দেখিল, থিওডরকে ধরিল) না, যাবেন না...আমি সব জানতে চাই। জানেন, এখন আমার কাছ থেকে কিছু লুকোতে পারবেন না···

থিওডর

আর কি জানতে চাও ?

ক্রিস্‌টিনে

কেন ?—কেন সে ডুয়েল লড়েছিল ?

থিওডর

আমি তার কারণ জানি না।

ক্রিস্‌টিনে

কার সঙ্গে, কার সঙ্গে—? কে তাকে হত্যা করেছে তা আপনি নিশ্চয় জানেন ?

থিওডর

তাকে আপনি জানেন না···

ক্রিস্‌টিনে

কে, কে ?

মিত্‌সি

ক্রিস্‌টিনে !

ক্রিস্‌টিনে

কে ? বলুন আমায় (মিত্‌সির প্রতি) ..বাবা ! (কোন উত্তর নাই। সে বাহিরে চলিয়া যাইতে চাহিল, ভাইরিং তাহাকে বাধা দিল) কে তাকে মেরেছে, কেন মেরেছে, এ কথা আমি নিশ্চয় শুনব—

থিওডর

কারণ···যৎসামান্য...

ক্রিস্‌টিনে

কেন, আপনি সত্যি বলছেন না···কেন, কেন···

থিওডর

প্রিয় ক্রিস্‌টিনে...

ক্রিস্‌টিনে

(যেন থিওডরের কথায় বাধা দিবার জন্য তাহার দিকে আগাইয়া গেল, প্রথমে কিছু বলিল না—তাহার দিকে দৃঢ়দৃষ্টিতে চাহিল, তারপর সহসা চেঁচাইয়া উঠিল)—ও, কোন মেয়েমানুষের জন্যে ?

থিওডর

না—

ক্রিস্‌টিনে

হাঁ—কোন মেয়েমানুষের জন্যে...(মিত্‌সির প্রতি ঘুরিয়া) ওই মেয়েমানুষটির জন্যে—হাঁ সেই মেয়েমানুষটির, তাকে ও ভালবেসেছিলো—আর তার স্বামী—হাঁ, হাঁ তার স্বামীই ওকে মেরেছে···আর আমি···আমি কি ? আমি তার কি ছিলুম ?...থিওডর...আমার জন্যে কিছু কি নেই...কিছু সে লিখে যায় নি, এক লাইন. . ? আমার জন্যে একটা কথাও ব'লে যায় নি··· ? কিছু নেই, কিছু নেই...একখানা চিঠি ...একটু কাগজের টুকরো—

থিওডর

(মাথা নাড়িল)

ক্রিস্‌টিনে

আর সেই সন্ধ্যা বেলায় ..যে সন্ধ্যায় সে আমার এখানে এসেছিলো আপনি এখান থেকে নিয়ে গেলেন...তখন সে জানত, তখনই সে জানত যে, হয়ত আমার সঙ্গে আর... আর এখান থেকে সে চলে গেল, আর একজনের জন্যে নিজের প্রাণ দিতে—না, না—এ সম্ভব নয়...তখন কি সে বোঝেনি, সে আমার কি ছিল...সে কি...

সে বুঝেছিল—শেষ প্রভাতে আমরা যখন যাচ্ছিলুম··· আপনার কথাও সে অনেক বলেছিলো।

শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু

ক্রিস্‌টিনে

হ্যাঁ, আমার কথাও বলেছিলো সে! আমার কথা! আরো সব কাদের কথা? যেমন অপর সব লোকেদের কথা বলেছিলো, অন্য অনেক জিনিষের কথা বলেছিলো, তেম্নি, আর সব লোকেদের মত, আর সব জিনিষদের মতই আমার স্থান তার জীবনে?—ও, আমারও কথা! ও গড্‌!...আর তার বাবার কথা, আর তার মায়ের কথা, আর তার সব বান্ধবীদের কথা, আর তার ঘরের কথা, আর বসন্ত ঋতুর কথা, আর এই সহরের কথা, আর, কত লোকের কথা, কত জিনিষের কথা —যা কিছু সব সে তার জীবনে পেয়েছিল, আজ ছেড়ে চ'লে যেতে হয়েছে, আমাকে যেমন ছেড়ে চ'লে গেছে···সকলের কথা সে বলেছিলো...আর তার সঙ্গে আমারও একটু কথা...

থিওডর

(আবেগে বিচলিত) আপনাকে সে সত্যি ভালবেসেছিলো।

ক্রিস্‌টিনে

ভালোবেসেছিলো! সে?—আমি, আমি তার অবসরের লীলাখেলা ছিলুম মাত্র—আর একজনের জন্যে সে প্রাণ দিয়েছে—! আর আমি—তাকে পূজো করেছি!—সে কি তা জানেনি?···যে তাকে আমি সব দিয়েছিলুম, আমার যা দেবার আছে সব দিয়েছিলুম, আমি তার জন্যে মরতে পারতুম —সে আমার ঈশ্বর, সে আমার সর্ব্বসুখ—সে কি তা কিছুই বোঝেনি?—আমার কাছ থেকে হাসিমুখে সে চ'লে যেতে পারলো, এই ঘর থেকে চ'লে গেলো, আর একজনের জন্যে গুলিতে মরতে···বাবা, বাবা,— তুমি কিছু বুঝতে পারছো কি?

ভাইরিং

ক্রিস্‌টিন্! (তাহার নিকট আসিল)

থিওডর

(মিত্‌সির প্রতি) দেখ, এ ব্যাপার হ'তে তুমি আমায় বাঁচাতে পারতে।

মিত্‌সি

(তাহার দিকে ক্রুদ্ধভাবে চাহিল)

থিওডর

এই শেষের ক'দিন···আমার উত্তেজনার পর উত্তেজনা যথেষ্ট হয়েছে···

ক্রিস্‌টিনে

(সহসা দৃঢ়সঙ্কল্পের সহিত) থিওডর, তার কাছে আমায় নিয়ে চলুন...আমি তাকে দেখতে চাই—তাকে আর একবার দেখবো, শেষ দেখা—সেই মুখখানি—থিওডর, চলুন আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে।

থিওডর

(এড়াইবার ভঙ্গী, ইতস্ততঃ) না, না,—

ক্রিস্‌টিনে

কেন না?—এতে বাধা কেন? আর একবার তাঁকে আমি দেখতে পারিনে?

থিওডর

দেরী হ'য়ে গেছে।

ক্রিস্‌টিনে

দেরী?—তার দেহ দেখবো···তারও জো নেই, দেরী? হ্যাঁ···হ্যাঁ—(সে কিছু বুঝিতে পারিতেছে না, কেন দেখিবার সম্ভাবনা নাই)

থিওডর

আজ সকালে তাঁকে কবর দেওয়া হয়েছে।

ক্রিস্‌টিনে

(ভয়ঙ্কর ভয়-ভরা গভীর বেদনাপূর্ণ মূর্ত্তিতে) কবর···আর আমি কিছু জানলুম না? গুলিতে সে মরল...তারপর কফিনেতে তাকে শোয়ান হ'ল, তারপর গোরস্থানে নিয়ে যাওয়া হ'ল, তারপর মাটির মধ্যে তাকে চাপা দেওয়া হ'ল— আর আমি কিছু, কিছুই দেখতে পেলুম না?—দু'দিন হ'ল সে মরেছে—আর আপনি আমার কাছে আসেন নি, একটি কথাও জানালেন না?—

থিওডর

(আবেগচঞ্চল) ও, এ দু'দিন...আপনি বুঝতে পারবেন, এ দু'দিন আমার ওপর দিয়ে কি গেছে...দেখুন, অনেক কর্ত্তব্যভার ছিল, তার পিতামাতাকে জানানো—আরও কত কি কাজ—তার ওপর আমার মনের অবস্থা...

ক্রিস্‌টিনে

আপনার...

হাঁ...সব খুব শান্তভাবে করতে হ'ল···কেবল নিকটতম আত্মীয় ও বন্ধুরা···

ক্রিস্‌টিনে

কেবল নিকটতম—! আর আমি—?···আমি কে?

মিত্‌সি

তুমি গেলে ওই কথাই আর সবাই বলত।

ক্রিস্‌টিনে

উঃ, আমি তার কে—? আর সবাইএর চেয়েও তুচ্ছ? হাঁ, তার সব আত্মীয়দের চেয়ে সামান্য, তুচ্ছ?

ভাইরিং

ক্রিস্‌টিন্‌, মা, আয় আমার কাছে, আমার কাছে... (ক্রিস্‌টিনেকে বুকে টানিয়া লইল। থিওডরের প্রতি) আপনি যান, আমাদের একটু একা থাকতে দিন।

থিওডর

আমি বড়ই...(তার গলার স্বর চোখের জলে ভারী হইয়া আটকাইয়া গেল) আমি ভাবিনি, ভাবিনি···

ক্রিস্‌টিনে

কি ভাবেন নি?—যে আমি তাকে ভালোবেসেছি?

(ভাইরিং ক্রিস্‌টিনেকে নিজের দিকে টানিয়া লইল, থিওডর ও মিত্‌সি ক্রিস্‌টিনের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল)

ক্রিসটিনে

(ভাইরিংএর স্নেহবন্ধন হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া) তার কবরেতে আমাকে নিয়ে চলুন!

ভাইরিং

না, না—

মিত্‌সি

যাস না, ক্রিসটিন—

থিওডর

ক্রিসটিনে...পরে, পরে—কাল...আগে একটু শান্ত হোন—

ক্রিস্‌টিনে

কাল?—যখন আমি শান্ত হব? !—হুঁ, তারপর এক মাস পরে ধীরে ধীরে ভুলে যাবো, কেমন?—তারপর ছ'মাস পরে আবার আমি হাসবো—? (হাসিয়া উঠিল) তারপর আবার নতুন প্রেমিকটি কখন আস্‌ছে?...কখন...

ভাইরিং

ক্রিস্‌টিন্‌!...

ক্রিস্‌টিনে

বেশ, থাকুন আপনি—আমি একাই পথ দেখে যেতে পারবো...

ভাইরিং

যাস না।

মিত্‌সি

যাস না।

ক্রিস্‌টিনে

সেই ভাল...আমি যখন···যেতে দাও···আমায় ছেড়ে দাও।

ভাইরিং

ক্রিসটিন্‌, থাক্‌···

মিত্‌সি

যাস্‌ না ওখানে!—হয়ত গিয়ে দেখবি সেখানে আর একজন—আর একজন প্রার্থনা করছে।

ক্রিস্‌টিনে

(যেন নিজের প্রতি স্থির তীব্র দৃষ্টি) আমি সেখানে প্রার্থনা করতে যাচ্ছি না...না···(সে সবাইএর পাশ কাটাইয়া চলিয়া গেল...অপরে সকলে নির্ব্বাক নিষ্পন্দ

ভাইরিং

শিগগির, শিগগির যান্‌ ওর পেছনে।

(থিওডর, মিত্‌সি ক্রিস্‌টিনের সন্ধানে গেল)

ভাইরিং

আমি আর পারি না, আর পারি না···(বেদনার সহিত দরজার দিকে অগ্রসর হইল, জানলা পর্য্যন্ত গিয়া থামিয়া দাঁড়াইল) সে কি চায়, কি করতে চায়···(জানলা দিয়া বাহিরের শূন্যতার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল) ও আর ফিরে আসবে না—না—সে আর ফিরে আসবে না! (কাঁদিতে কাঁদিতে ভাইরিং ঘরের মেঝের ওপর লুটাইয়া পড়িল)

যবনিকা পতন
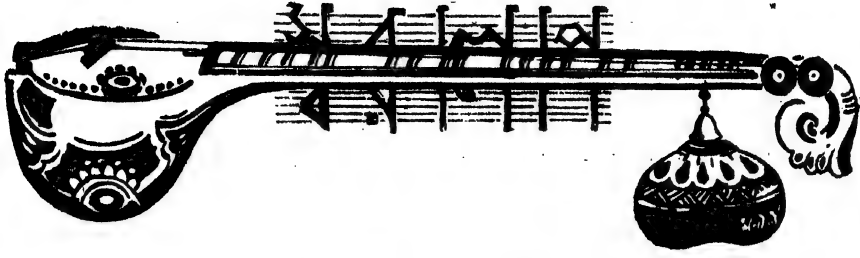
কাফি—কাওয়ালী

কেন, কেন মারিছ পিচকারী !
নীল বসন করিলে লাল শাড়ি ।
আবীর কুম্‌কুমে অন্ধ করিলে হে,
গুলালে গুলালে দিলে ভরি',
ভিজিল কঠিন মন, ভিজিল কঠোর পণ,
ভিজিল চুনরী আর ভিজিল কবরী ।
মাথায়ে মাথায়ে ফাগ প্রাণে লাগাইছ আগ,
বাড়াইছ পুন তাহে সিঞ্চিয়া বারি ।
কি খেলা খেলিছ হরি, লাজে তরাসে মরি ;
দোল্ দোল দোলে মন অসহায়া নারী !
পথ জন-সঙ্কুল চকিত কানন-তল,
গুরুজন পিছে পিছে ভ্রমিছে প্রহরী ।
বল কি বল কি করি নিদয় নিঠুর হরি,
অন্ধ বধির তুমি, কেমনে নিবারি !

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

II পধা র্র্সা ণা ধা । পা মা গা রগা I মা -া পা -া । -া -া পা পা] I
কে ০০ ন মা রি ছ পি চ কা ০ রী ০ ০ ০ (কে ন)

I মা ধপা ধা ধা । ধা ধা ধা ধণা I পধা র্সণা ণা ণা । ণধা পধা পা -া II
নী ০০ ল ব স ন ক রি লে০ ০ লা ল শা০ ০ ড়ি ০

II পা পা র্রা র্রা । র্রা -া র্রা র্রা I -া -া -া -া । র্রা র্গা র্রা র্রা I
আ বী কু ম্ কু মে অ ধ ক

I র্সা র্সা র্সা -া । -া -া -া -া I র্সা র্সর্রা র্সা ণা । ধা মা পা ধা I
রি লে হে ০ ০ ০ ০ ০ গু লা লে গু লা লে দি লে

I না -া র্সনা ধপা । পধা নর্সা র্রর্সা ধর্সা I নর্সা -া -া -া । -া -া -া (ন্ধপা)]I
ভ ০ ০০ ০০ রি ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০০০

I মা ধা ধা ধা ধা ধা ধা ধা I ধা ণা র্রা র্সা । ণা ণা ধা পা I
ভি জি ল ক ঠি ন ম ন ভি জি ল ক ঠো র প ণ

I পা না না না । র্সা র্সা র্সা -া I পা না না র্সা । নর্সা র্রা র্সণা ধপা II
ভি জি ল চু রী আ ভি জি ল ক ব ০ ০ রী ০ ০ ০

II সা রা রা রা । রা রা রা গা I সা রা রা পা । পা পা পা -া I
মা খা য়ে মা খা য়ে ফা গ্ প্রা ণে লা গা ই ছ আ গ্

I পা পধা পা পা । মা গা গা গা I গা -া গা মা । রগা মপা মা -া I
বা ড়া ই ছ পু ন তা হে সি ন্ চি য়া বা ০ ০ ০ রি ০

I মা ধা ধা ধা । ধা ধা ধা ধা I ধা ণা র্রা র্সা । ণা ধা পা পা I
কি খে লা খে লি ছ হ রি লা ০ জে ত রা সে ম রি

I মা -া মা -া । মা পা ধপা পা I মা মা মা মা । মজ্ঞা -া রা -া
দো ল্ দো ল্ দো লে ম ০ ন্ অ স হা য়া না ০ রী ০

I[পা র্রা র্রা র্রা । র্রা -া র্রা র্রা I র্রা র্গা র্রা র্রা । র্সা র্সা র্সা র্সা
প থ জ ন চ ন চ ল চ কি ত কা - ন ন ত ল

I র্সা র্সর্রা র্সা ণা । ধা মা পা ধা I না না না নর্সা । ধনা র্সর্রা র্সা (পা)]I
গু রু ০ জ ন পি ছে পি ছে ভ্র মি ছে প্র হ ০ ০ ০ রী

I মা ধা ধা ধা ধা ধা ধা ধা I ধা ণা র্রা র্সা । ণা ধা পা পা I
ব ল কি ব ল কি ক রি নি দ য় নি ঠু র হ রি

I পা না না না র্সা র্সা র্সা র্সা I পা না না র্সা । নর্সা র্রা র্সণা ধপা I
অ ন্ ধ ব ধি র তু মি কে ম নে নি বা রি

বসন্তে বিদ্যাপতি

শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য

প্রকৃতি-বর্ণনাই সমগ্র বৈষ্ণব-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। রাধাকৃষ্ণের প্রেমময় লীলাকে কেন্দ্র করিয়া বৈষ্ণব কবিগণ যে প্রকৃতি-বর্ণনার অসামান্য ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছেন তাহাই তাঁহাদের এই গীতি-রচনাকে চিরন্তন করিয়া রাখিয়াছে। সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলার নিবিড় স্নিগ্ধ অঞ্চলচ্ছায়ায় এই স্বভাব-কবিগণের চক্ষুর সম্মুখে ষড়ঋতুর যে অনবদ্য বাস্তব কান্তি পর্য্যায়ে পর্য্যায়ে ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাই তাঁহারা ভাষার তুলিতে চিত্রিত করিয়া রাখিয়াছেন, সেইজন্যই এই ছবি এমন জীবন্ত ও নূতন বলিয়া মনে হয়।

অন্যান্য বৈষ্ণব কবিগণের ন্যায় বিদ্যাপতিরও প্রধান বর্ণনাস্থল বৃন্দাবন। ইহাকে একদিন অফুরন্ত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের আধাররূপে কল্পনা করিয়া এই বৈষ্ণব কবিগণ ইহাতে আজিও চির-বসন্তের ছাপ লাগাইয়া রাখিয়াছেন। সেই জন্যই বৃন্দাবনের বসন্ত চিরন্তন।

একমাত্র বিদ্যাপতির পদ-রচনার ঐশ্বর্য্যই বৃন্দাবনের চিরবসন্তের কল্পনাকে সার্থক করিয়া তুলিয়াছে। বিদ্যাপতি মিথিলার কবি, দুর্ব্বোধ্য মৈথিলী ভাষায় তাঁহার সমগ্র পদাবলী রচিত; তথাপি সারা বাংলার বুক জুড়িয়া আজিও ভাঙ্গা ভাঙ্গা মৈথিলীভাষায় বিদ্যাপতির পদাবলী নিরক্ষরদের মুখেও শুনিতে পাওয়া যায়। তালপাতার পুঁথিতে লেখা বিদ্যাপতির বিকৃত ও অবিকৃত মৈথিলীগান আজিও বাংলার পল্লীতে পল্লীতে দৃষ্ট হয়। ইহা হইতেই অনুমিত হয় যে, বিদ্যাপতি প্রথম হইতেই এই বঙ্গদেশকে তাঁহার অসামান্য প্রতিভার ঐশ্বর্য্যে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। এককালে এই বৈষ্ণবের ভক্তিরসাপ্লুত গীতিমন্দাকিনীর এক প্রবল বন্যা এই দেশকে পবিত্র করিয়া দিয়াছিল। সেই জন্য আজিও বিদ্যাপতি বিদেশী ও ভিন্ন ভাষাভাষী হইয়াও বাংলার সহিত এমন নিবিড় আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ।

বর্ষার প্রাকৃতিক বর্ণনা বিদ্যাপতিকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। তাঁহার পদাবলী সম্যক্‌ভাবে পর্য্যালোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, বসন্তও একদিন অতুল সৌন্দর্য্যের ঐশ্বর্য্য লইয়া বাস্তব মূর্ত্তিতে তাঁহার কল্পনা-চক্ষুর সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, আর ভাষার তুলিতে তাহাই অঙ্কিত করিয়া মর্ত্ত্যের জীব আজিও অমর হইয়া রহিয়াছেন। এবং এই রচনাই ভক্তের বৃন্দাবনের চির-বসন্ত কল্পনাকে জীবন্ত মূর্ত্তিতে চিরপরমায়ু দান করিয়া গিয়াছে।

মাঘ মাসের শ্রীপঞ্চমী তিথিতে শুভক্ষণে শুক্লপক্ষে ধাত্রী বনস্পতির গর্ভে বসন্তের জন্ম হইল। কবির এই সুন্দর উৎপ্রেক্ষা ভাষার মুখে আরো সুন্দর হইয়া ফুটিয়াছে।

> মাঘ মাস সিরি পঞ্চমী গজাইলি
> নব এ মাস পঞ্চমহ রুআই।
> অতি ঘন পীড়া দুখ পাওল।
> বনস্পতি ভেলি ধাই হে॥
> শুভক্ষণ বেরা সুকলপখ হে
> দিনকর উদিত সমাই।
> সোরহ স'পুনে বতিস লখনে
> জনম লেল রিতুরাই হে॥

শিশু-বসন্তের জন্মোৎসব উপলক্ষে যুবতীগণ উল্লসিত হইয়া মঙ্গলগীত গাহিল, আর প্রকৃতি তাহার সম্বর্দ্ধনা করিল।

> নাচ এ জুবতিজন হরষিত
> জনম লেল বাল মধাই হে।

মধুর মহারস মঙ্গল গাব এ
মানিনি মান উতার হে ॥
বহ মলয়ানিল ওত উচিত হে
নব ঘন ভউ উজিয়ারা।
মাধবি ফুল ভল গজমুকুতা তুল
তেঁ দেল বন্দ নেবারা ॥

আর গণিতশাস্ত্রাভিজ্ঞ কোকিল এই নবজাত শিশুকে 'ঋতুবসন্ত' বলিয়া নামকরণ করিল।

কনএ কেসুআ সুতি পত্র লিখিএ হলু
রাশি নছত্র কএ লোলা।
কোকিল গণিত গুণিত ভাল জানএ
রিতু বসন্ত নাম থোলা ॥

কবি নবাগত বসন্তকে এখানে শিশুমূর্ত্তিতে কল্পনা করিলেন, তাহার নামকরণ হইল, ও বিশ্বপ্রকৃতি তাহার প্রসাধনের ভার গ্রহণ করিল।

দখিন পবনঘন আঙ্গ উগারএ
কিসলয় কুসুম পরাগে,
সুললিত হার মঞ্জরিঘন কজ্জল
অখিতো অঞ্জন লাগে।

চির-আনন্দময় বৃন্দাবন-প্রকৃতির শিরায় শিরায় এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দের অনুভূতি চঞ্চল হইয়া উঠিল। দক্ষিণ পবনে চূতাবনত সহকারের শাখা আন্দোলিত হইতেছে,আর মদনের দূত কোকিল তাহার বক্তব্য সঙ্গীতের ভাষায় বলিয়া যাইতেছে।

মলয়ানিলে সাহর ভার ডোল।
কল-কোকিল রবে মঅন বোল ॥

অতএব আজ তরুণী যুবতী প্রৌঢ়া বৃদ্ধা বসন্তের এই উৎসবানন্দে যোগ দিয়াছে।

নাচহু রে তরুনি তেজহু লাজ।
আএল বসন্ত-রিতু বণিক রাজ ॥
হস্তিনি চিত্রিনি পদ্মিনি নারী।
গোরি সামরি এক বুঢ়ি বারি ॥

ক্রমে বৃন্দাবনের লতায় পাতায় বসন্ত-সৌন্দর্য্যের অনবদ্য সুষমা যেন উপ্‌ছাইয়া পড়িতে লাগিল।

দিনকর কিরণ ভেল পয়গণ্ড।
কেশর কুসুম ধরল হেমদণ্ড ॥
মৌলিরসাল মুকুল ভেল তায়।
সমুখাহি কোকিল পঞ্চম গায় ॥
শিখিকুল নাচত অলিকুল যন্ত্র।
আন দ্বিজকুল পড়ু আশীষ মন্ত্র ॥
চন্দ্রাতপ উড়ে কুসুম-পরাগ।
মলয় পবন সহ ভেল অনুরাগ ॥
কুন্দবল্লী তরু ধরল নিশান।
পাটল তূণ অশোকদল বাণ ॥

এই রচনা কখনো কল্পনার ফল হইতে পারে না, ইহা কবির চক্ষুর সম্মুখস্থ বাস্তব ছবির বাঙ্ময় বিকাশ মাত্র।

বিদ্যাপতির কল্পনার চক্ষে বৃন্দাবন চিরনূতন।

নব বৃন্দাবন নব নব তরুগণ
নব নব বিকশিত ফুল।
নবল বসন্ত নবল মলয়ানিল
মাতল নব অলিকুল ॥

বৈষ্ণবের ভক্তির অনুভূতিতে বৃন্দাবন চিরমধুর; কবির সার্থক-লেখনীতে এই মধুর চিত্র মধুরতর হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে,—

মধুঋতু মধুকর পাঁতি।
মধুর কুসুম মধু মাতি' ॥
মধুর বৃন্দাবন মাঝ।
মধুর মধুর রসসাজ ॥

প্রতিভাবান লেখকের মন যেমন ক্রমে বাস্তবতার সসীম গণ্ডী স্তরে স্তরে অতিক্রম করিয়া অবশেষে অনন্ত কল্পনার রাজ্যে প্রবেশ করে, বিদ্যাপতির পদাবলীর সম্যক্ পর্য্যালোচনাও ইহাই প্রত্যক্ষ করাইয়া দেয় যে, অল্পদিনেই তাঁহারো বাস্তবতার মোহ কাটিয়া গিয়াছিল। কারণ, যদিও বিদ্যাপতির রচনাতে idealism জিনিষটার একান্ত

শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য

অভাব বলিয়া অনেকেই কবির দোষ খুঁটিনাটি করিয়া বাহির করিতেছেন, তথাপি অন্তঃসলিলা ফল্গুর ন্যায় তাঁহারো বস্তুতান্ত্রিক রচনার অন্তরালে যে একটি সূক্ষ্ম ভাবজগতের চিন্তার ধারা প্রচ্ছন্নপ্রবাহে বর্ত্তমান তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। সাহিত্যের তখন যে যুগ সেই যুগে idealismএর কতদূর অনাদর হইত তাহা আমরা অনুমান করিতে পারি। আর সেই যুগে এই সকল উচ্চাঙ্গের ভাববিশ্লেষণের ক্ষমতা কবিদের থাকিলেও হয়ত লোকের অপ্রিয়তার আশঙ্কায় তাঁহারা এই প্রকার রচনা হইতে বিরত হইতেন। অতএব বিদ্যাপতিতে বসন্ত-প্রকৃতির সম্বন্ধেও idealistic উক্তি একেবারে পাওয়া যায় না এমন বলিলে নিতান্তই ভ্রম করা হইবে, যদিও realism-এই বিদ্যাপতির চরম বিকাশ।

শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগের সঞ্চার করিতে কবি বসন্তের মধ্যস্থতা স্বীকার করিয়া কহিলেন, 'হে কৌশলময়ী রাধিকে, তুমি কানুকে অর্দ্ধলোচনে (কটাক্ষে) ক্রয় করিলে আর মদন-বসন্তকে তাহার সাক্ষী রাখিলে।—

"বড় কৌশল তুয় রাধে।
কিনল কহ্নাই লোচন আধে॥
ঋতুপতি হটব এ নহি পরমাদী।
মনমথ মধথ উচিত মূলবাদী॥
দ্বিজ পিক লেথক মসি মকরন্দা।
কাপ ভমরপদ সাঁথী চন্দা॥ *

শ্রীরাধার মানভঞ্জনের প্রচেষ্টায় মাধবের মুখ দিয়া কবি যে কয়টি কথা কহাইয়াছেন তাহাতে যে বস্তুতান্ত্রিকতার অন্তরালে এক প্রচ্ছন্ন ভাবজগতের কল্পনা-প্রবণতার সূক্ষ্ম আভাষ পাওয়া যায় তাহা বৈষ্ণব-সাহিত্যের এক অতুল সম্পদ হইয়া রহিয়াছে।—

মানিনি কুসুমে রচিলি সেজা মান মহথ তেজ
জীবন জউবন ধনে।
আজুকি রজনি যদি বিফলে জাইতি
পুনু কালি ভেলে কে জান জীবনে॥

মানিনি, মান ত্যাগ কর, জীবনে যৌবনই ধন। আজিকার রাত্রি যদি নিষ্ফলে যায় কাল জীবন কি হইবে কে জানে। চাহিয়া দেখ বসন্তের রজনী প্রভাত হইতে চলিল,—

বিরল নখত নভমণ্ডল ভাস।
সে' শুনি কোকিল মনে উঠ হাস॥
এ রে মানিনি পালটী নিহার।
অরুণ পিবএ লাগল অন্ধকার॥

কিন্তু আজিকার মধুযামিনী ব্যর্থ হইতে চলিল ভাবিয়া মাধব আকুল হইলেন।

অরে অরে ভমরা তোক্রে হিত হমরা
বঁউসি আনহ গজগামিনিরে।
আজু কি রূসলি কালি জক্রো বঁউসবি
তীতি হোইতি মধু যামিনীরে॥

জীবন-তত্ত্বের এই সূক্ষ্ম অংশটুকু লইয়াই ওমরখৈয়ামের সমগ্র দর্শন। কিন্তু বিদ্যাপতি এক কথায় প্রাকৃতিক বর্ণনার সাহায্যে সেই দার্শনিক সত্যটি কত সুন্দর ভাবে প্রকাশ করিলেন।

বিরহ বা মাথুরের বর্ণনায় কবির শতমুখী প্রতিভার পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির চিত্র-চিত্রনের যে অদ্ভুত ক্ষমতা দেখিতে পাওয়া যায় তাহা বিশ্বের সাহিত্যেও অভিনব। বিরহিনী রাধার মনের উপর বসন্ত-ঋতুর প্রভাবের ছবি কবি রাধার মনোবিশ্লেষণের সঙ্গে সঙ্গে সুন্দরভাবে আঁকিয়াছেন। বিদ্যাপতির বসন্তবর্ণনা এই খানেই idealistic। কবি বাস্তবরাজ্য হইতে এইখানে অনেক উর্দ্ধে সরিয়া আসিয়াছেন।

* রত্নাকর সুতাভার্য্যা যস্য কৃষ্ণস্য রাধিকে।
লোচনার্দ্ধেন স ক্রীতস্তয়া তে কৌশলম্মহৎ॥
হট্টাধিপো বসন্তস্য সোঽপ্রমাদী বিচক্ষণঃ।
যোগামূল্যার্থবাদীচ মধ্যস্থো মন্মথোঽভবত॥
ভ্রমরস্য পদং কর্পো লেথকঃ কোকিলঃ দ্বিজঃ।
অভূৎ কৃষ্ণ ক্রয়ে রাধে শশী পাত্রং মসী মধু॥
—বিদ্যাপতির স্বরচিত উর্দ্ধোদ্ধৃত অংশের ব্যাখ্যা।

বিরহিণীর অন্তরের অন্তস্থল ভেদ করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাসের মত এই কথা কয়টির গভীরতা কতদূর তাহা বিচার করিলে বিস্মিত হইতে হয়।—

কুসুমে রচল সেজ মলয়জপঙ্কজ
পেয়সি সুমুখি সমাজে।
কত মধু মাস বিলাসে গমাওল
অবপর কহইতে লাজে॥
দখিন পবন সউরভ উপভোগল
পিউল অমিয় রস সারে।
কোকিল কলরব উপবন পূরণ
তহি কত কয়ল বিকারে।

বসন্ত তাহার সমগ্র সৌন্দর্য্যের ঐশ্বর্য্যভাণ্ডার খুলিয়া দিয়াছে, ইহা দেখিয়া বিরহিণী কেমনে প্রাণ ধারণ করিয়া থাকিবে?

চৌদিশ ভমর ভম কুসুমে কুসুমে রম
নীরসি মাজরি পিবই।
মন্দ পবন বহ পিক কুহু কুহু কহ
শুনি' বিরহিণী কইসে জীবই॥

তাই,

কুসুমিত কানন হেরি' কমলমুখী
মুদি' রহুয় দু'নয়ান।
কোকিল কলরব মধুকর ধনি শুনি'
কর সেই ঝাঁপল কান॥

কিন্তু বৃন্দাবনের লতায় পাতায় বসন্তের সৌন্দর্য্যরাশি যেন ঝরিয়া পড়িতেছে এই দৃশ্য অসহ্য; অতএব সখীগণ, তোমরা মাধবকে বৃন্দাবনে আনয়নের উপায় কর।

সাহর মজর ভমর গুঞ্জর
কোকিল পঞ্চম গাব।
দখিন পবন বিরহ বেদন
নিঠুর কন্তুন আব॥
সজনি রচহ সেহে উপাএ।
মধুমাস যঞো মাধব আব এ
বিরহ বেদন জাব এ॥

কিন্তু মথুরার পথ চাহিয়া চাহিয়া এবারেরও নিষ্ফল বসন্ত কাটিয়া গেল,—

হিম হিমকর কর তাপে তপায়ল
ভৈ গেল কাল বসন্ত।
কান্ত কাক মুখে নহি সম্বাদই
কিয়ে করু মদন দুরন্ত॥

তবে নিশ্চয়ই আমার প্রিয় সেই দেশে গিয়াছে যেথানে ষড়ঋতুর ভেদ জানে না; পিক নাই কিম্বা কাননে কুসুম প্রস্ফুটিত হয় না।

জাহি দেশ পিক মধুকর নাহি গুঞ্জর
কুসুমিত নহি কাননে।
ছও ঋতু মাস ভেদ নহি জান এ
সহজহি অবল মদনে॥

বর্ষে বর্ষে বসন্তের পর বসন্ত বিরহিণীর অন্তর্দ্বারে নিষ্ফলে ঘা দিয়া চলিয়া যাইতেছে কিন্তু নিঠুর হৃদয়হীন মাধব আর বৃন্দাবনের কথা স্মরণও করিতেছে না। বিরহিণীর এই কাতর বিলাপ কবির সার্থক লেখনীতে কি সুন্দরভাবেই না ফুটিয়া উঠিয়াছে,—

ফুটল কুসুম নব কুঞ্জকুটির বন
কোকিল পঞ্চম গাওইরে।
মলয়ানিল হিম- শিখির সিধারল
পিআ নিজ দেশ না আওইরে॥
চান্দ চন্দন তনু অধিক উতাপয়
উপবন অলি উতরোল রে।
সময় বসন্ত কান্ত রহু দূর দেশ
জানল বিহি প্রতিকূল রে॥

তবে এই বৃন্দাবনে নব-বসন্তের আগমন-সংবাদ যদি মাধবের কানে যায় তবে নিশ্চয় তিনি না আসিয়া থাকিতে পারিবেন না।

অব যদি যাই সম্বাদহ কান।
আওব ঐসে হমর মন মান॥

শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য

তারপর এক বসন্ত-যামিনীর শুভ মুহূর্ত্তে দীর্ঘ বিরহ-যন্ত্রণার উপশম হইবার আশা হইল। মাধব স্বপ্নে রাধাকে আশ্বাস দিলেন।

সরস বসন্ত সময় ভল পাওলি
দছিন পবন বহু ধীরে।
স্বপনহুঁ রূপ বচন এক ভাখিয়
মুখ সৌ দূরি করু চীরে॥

বিরহিণীর মনে আশার সঞ্চার হইল। মথুরার পথ চাহিয়া প্রিয়ের আসার আশায় উন্মুখ হইয়া কুঞ্জ-দুয়ারে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু বসন্ত আবার বাম হইল।

সুরভি সময় ভল চল মলয় আনিল
সাহর সউরভ সার লো।
কাহুক বিপদ কাহুক সম্পদ
নানাগতি সংসার লো॥

এই বসন্ত সময় 'কণ্ঠাশ্লেষী প্রণয়িনী জনের' সম্পদের দিন আর বিরহিণীর বিষম বিপদের কাল।

তারপর বসন্তেরই এক শুভমুহূর্ত্তে রাধা'র এই দীর্ঘ বিরহ-জ্বালার অবসান হইল। প্রেমিকা প্রিয়ের মুখারবিন্দ দেখিয়া ধন্য হইল।

আজু রজনী হাম ভাগে গমাওল
পেখলু পিয়া মুখ চন্দা।
জীবন যৌবন সফল করি মানল
দশদিশ ভেল নিরদন্দা॥

অতএব আজ

সোই কোকিল অব লাখ ডাকউ
লাখ উদয় কর চন্দা।
পাঁচবাণ অব লাখ বাণ হউ
মলয় পবন বহু মন্দা॥

বসন্ত তাহার সমগ্র ঐশ্বর্য্যের সম্ভার খুলিয়া দিক। রাধা আজ তৃপ্তির চরিতার্থতায় সার্থক হইয়াছে।

শ্রীরাধা অতীতের দুঃসহ বিরহ-বসন্ত গুলির বেদনাময় স্মৃতি একমাত্র প্রিয়ের মুখ দেখিয়া ভুলিলেন—

দারুণ রিতুপতি যত দুখ দেল।
হরি মুখ হেরইতে সবি দূরে গেল॥

ভক্তবৈষ্ণবের কল্পনা চক্ষুর সম্মুখে বৃন্দাবনের যে চির-সুন্দর চিত্র একদিন ফুটিয়া উঠিয়াছিল তাহাই ভাষার রূপে অমরত্ব লাভ করিয়াছে। প্রকৃতির এমন বাস্তব চিত্রাঙ্কণ যদি কোনও যুগে কোনও শিল্পীর হাতে সার্থকতা অর্জ্জন করিয়া থাকে তবে এই স্বভাব-কবিগণের তুলিতেই তাহার বিকাশ হইয়াছে। প্রকৃতির সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত থাকায় এই স্বভাব-কবিগণের লেখনীতে যাহাই ফুটিয়াছে তাহাই সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে। সেইজন্য প্রাকৃতিক চিত্র-বর্ণনে তাঁহাদের এমন সিদ্ধহস্ততা। স্বভাবের সৌন্দর্যকে বিদ্যাপতি প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিয়াছিলেন, তাই তার স্তুতিগান গাহিয়াছেন।

কুন্দ পরিমল সঙ্গ সুন্দর নবা পল্লব পুঞ্জিতে।
কামদৈবত কর্ম্মনির্ম্মিত কোকিলকল কূজিতে॥
দেহি নবীন-দেব দৈব সমীর বিভ্রতি যোবতি বিভ্রমে।
মাধবী লতা সমং পরিনৃত্যতীব বনদ্রুমে॥
মাধব মাস মধু সময়ে। রাজতি রাধা রভসময়ে॥
বিরহি চিত্ত বিভেদ লক্ষণ চূতমুকুল ভয়ঙ্করে।
পাটলা মধু-লুব্ধ মধুকর নিকর নাদ মনোহরে॥
চন্দ্র চন্দন কুঙ্কুমা গুরুহার কুন্তল-মণ্ডিতা।
হার ভার বিলাস কৌশল কৌশল নিধুবন ক্ষণ-পণ্ডিতা॥

বিদ্যাপতির জন্মভূমি মিথিলা একদিন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের লীলাভূমি ছিল। মাতৃভূমির এই পবিত্র সুন্দর ছবিকে চির-বসন্তের বৃন্দাবনরূপে কল্পনা করিয়া তাহা হইতে কবির রস-পিপাসার তৃপ্তি হইত। কবি জন্ম হইতেই মিথিলার অফুরন্ত সৌন্দর্য্য ষড়্‌ঋতুর পর্য্যায়ে পর্য্যায়ে যাহা নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন তাহাই তাঁহার পরবর্ত্তী জীবনের কাব্যরচনায় মূর্ত্তি লাভ করিয়াছে।

"গঙ্গা বহথি জনিক দক্ষিণদিশি পূর্ব্ব কোশকী ধারা।
পশ্চিম বহথি গণ্ডকী উত্তর হিমবৎবল বিস্তারা॥
কমলা ত্রিযুগা অমৃতা ধেমূড়া বাগবতী কৃত সারা।
মধ্য বহতি লক্ষ্মণা প্রভৃতি সে মিথিলা বিদ্যাগারা॥"—

— চন্দা ঝা।

যাহার দক্ষিণে গঙ্গা প্রবাহিত, পূর্ব্বে কোশকী ধারা; গণ্ডকী পশ্চিমে, উত্তরে হিমাচলের বল বিস্তৃত, যাহার মধ্যে লক্ষ্মণা প্রবাহমানা আর যে ভূমি কমলা, ত্রিযুগা, অমৃতা, ধেমূড়া, বাগবতী প্রভৃতির পুণ্যতোয়ে নিত্যস্নাত তাহাই বিদ্যাপতির মিথিলা। তাহাই বিদ্যাপতির প্রবর্ত্তিত কাব্য-মন্দাকিনীর উৎসমূল। সেই জন্যই প্রকৃতি রূপ-পরিগ্রহ করিয়া তাঁহার রচনায় ধরা দিয়াছেন। সেইজন্যই বৃন্দাবন আজিও বৃন্দাবন; চিরন্তনের বৃন্দাবন, চিরবসন্তের আধার।

চণ্ডীদাস ব্যতীত পরবর্ত্তী যুগের সমস্ত বৈষ্ণব কবিই প্রকৃতির বর্ণনাতেও বিদ্যাপতির অনুকরণ করিয়া গিয়াছেন মাত্র। কিন্তু চণ্ডীদাসের একটা বিশিষ্ট সুর ছিল যাহা স্থানে স্থানে বিদ্যাপতিকেও ছাপাইয়া গিয়াছে। গোবিন্দদাসের ভণিতাযুক্ত বসন্তবর্ণনার কতগুলি পদ অনেকে বিদ্যাপতির বলিয়াই ভ্রম করেন; তাহাদের উভয়ের মধ্যে এমনই সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

বিদ্যাপতির বসন্ত-বর্ণনা শুধুই realistic নয়, তাহাতে idealismএর বহু সূক্ষ্ম আভাষের অস্তিত্বও বর্ত্তমান রহিয়াছে। একাধারে যেমন কবি প্রকৃতির স্বাভাবিক চিত্র নিখুঁতভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন, অন্যদিকে তেমনি তাঁহার কল্পিত নায়ক নায়িকার মনস্তত্ত্বের উপর তাহার প্রভাব (influence) সুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। কবির এই realism ও idealismএর মধ্যবর্ত্তী তাঁহার প্রকৃতির বর্ণনা যেন আলো ও ছায়ার খেলার মতন পাঠকের সমগ্র মন যুগপৎ বিস্ময়ে ও আনন্দে পরিপূর্ণ করিয়া দেয়। এইখানেই বিদ্যাপতির শ্রেষ্ঠত্ব। রাধাকৃষ্ণের যুগযুগান্তর চিরনূতন প্রেম বিদ্যাপতির সৃষ্টির তুলিকায় তাই আজ চিরন্তন।

দর্শনের দৃষ্টি

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

আমরা চোখে দেখি এবং মনে ভাবি, এ সম্বন্ধে কাহারও হয়ত সংশয় না উঠ্‌তে পারে। কিন্তু দেখার মধ্যেও ভাবা আছে কিনা এ কথা জিজ্ঞাসা করলেই একটা কূট্‌কচালে কথা উঠে পড়ে। লাল, নীল, সবুজ কত রকম রঙ্‌ আমরা চোখে দেখি, কিন্তু লাল রঙটাকে দেখা আর লাল রঙ্‌টাকে লাল ব'লে চেনা এ দুটোর মধ্যে যে একটু তফাৎ আছে সে কথা সহজে মনে আসে না, লালের বোধ এক রকমের বোধ নীলের বোধ এক রকমের বোধ, এ বোধ তখনই ফোটে যখন আমাদের চোখের ভিতরের বর্ণপটে বাহিরের রূপ তার রঙের ছোপ লাগায় আর সেই ছোপের সাড়া শততন্ত্রীতে আমাদের মস্তিষ্কের মধ্যে প্রবেশ করে। বাহিরের রূপ কেমন ক'রে রঙ্‌ হয় আর সেই রঙ্‌ কেমন ক'রে রঙের বোধ, জন্মায় তার রহস্য আজও আমাদের কাছে ধরা পড়ে নি। বাহিরের রূপ যে কি জিনিষ তা জান্‌বার তখনই সুযোগ হয় যখন আমাদের চোখের ও মস্তিষ্কের ভিতরের যন্ত্রগুলির জৈব ব্যাপারে সেই রূপ রঙে পরিবর্ত্তিত হয়; কোনও বৈজ্ঞানিককে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে রূপ কি, এবং রূপে রূপে ভেদ কি, তবে তিনি হয়ত বল্‌বেন যে আলোকের স্পন্দনের বেশী কমের নামই রূপ। সে রূপ কিন্তু রঙ্‌ নয়; সে রূপ আমরা চোখে দেখি না বৈজ্ঞানিক অনুমানে বুঝি মাত্র। চোখের ভিতরের কোনও বিশেষ যন্ত্রের মধ্যে যখন এই আলোকের রূপ এসে পড়ে তখন তাহারই জৈব ব্যাপারের ব্যবস্থায় আলোক পরিস্পন্দ তার স্পন্দনের বেশী কমের নির্দ্দিষ্ট নিয়মে বিভিন্ন রকমের রঙ্‌ হ'য়ে দাঁড়ায়; কিন্তু এই জৈব ব্যাপারের ফলে যে রঙ্‌ হয় সেই রঙ্‌টি যে কেমন ক'রে রঙ্‌বোধ হয় সে রহস্যের আজও কোনও মীমাংসা হয় নাই। কিন্তু রঙ্‌ বোধ এবং কোনও রঙ্‌কে লাল বা নীল ব'লে জানা এ উভয় এক কথা নয়। সদ্যোজাত শিশুরও চক্ষু আছে এবং তাহার চক্ষুতেও বাহিরের রূপ পড়ে এবং রঙের বোধ জন্মায় কিন্তু সে শিশু কোনও রঙ্‌কে লাল বা নীল ব'লে জানে এ কথা বলা চলে না। কোনও রঙ্‌ বোধকে লাল ব'লে জানা শুধু একটা জানা নয়, সেটা একটা পরিচয়। দুইকে এক না করতে পারলে পরিচয় হয় না। কোনও একটি রঙ্‌ বোধকে যদি ধ'রে রাখতে পারি এবং পুনরায় সেই বোধটি উৎপন্ন হলে এই দুইটির ঐক্য এবং অপর অপর বোধ হতে ইহাদের পার্থক্য বুঝিতে পারি তবেই সেই দুইটি বোধের ঐক্যের পরিচয় ঘটে এবং এই ঐক্যের পরিচয় হলেই, সেই রঙ্‌ বোধটিকে লাল বা নীল ব'লে বুঝতে পারি। যদি আমাদের মধ্যে প্রতিক্ষণে বিভিন্ন রকমের রঙের বোধ উৎপন্ন হ'ত এবং প্রতিক্ষণে তাহা ধ্বংস হ'য়ে যেত, তবে কোনও রঙের বোধের সহিত কোনও রঙের বোধের পরিচয় হওয়া সম্ভব হত না, এবং কোনও রঙ্‌কে লাল বা নীল ব'লেও চেনা যেত না। কোনও একটি বোধ একবার বা একাধিবার ঘটলে যে সেটি প্রচ্ছন্ন-ভাবে থেকে যায় এবং পুনরায় তৎসদৃশ বোধ উৎপন্ন হলে সেটি পুনরুদ্বুদ্ধ হয় এবং কালের ব্যবধান এড়িয়ে যে দুই কালের দুইটি বোধ পাশাপাশি দাঁড়ায় এবং ঐক্য সম্বন্ধ স্থাপন করে, এর নাম স্মৃতি; এটি যদি না থাক্‌ত তবে লালকে লাল বলিয়া নীলকে নীল বলিয়া চেনা বা জানা সম্ভব হোত না।

জড়ের মধ্যে প্রতিক্ষণে আমরা স্পন্দশক্তির যে নব নব বিকীরণ দেখ্‌তে পাই তাতে শক্তির যে আদান প্রদান দেখ্‌তে পাই তাতে কোনও ব্যাপারের সঞ্চয় বা পরিচয়ের চিহ্নমাত্রও দেখ্‌তে পাই না। কিন্তু যেই আমরা জৈবপর্য্যায়ের মধ্যে প্রবেশ করি সেই দেখি যে জৈব ব্যাপারের একটা প্রধান লক্ষণই হচ্ছে জৈব ব্যবহারের বা মূঢ় জৈব প্রত্যয়ের সঞ্চয় বা স্মৃতি এবং সেই অনুসারে স্বকার্য্যের নিয়মন। ক্ষুদ্র-

হাওড়া মাজু সাহিত্য-সম্মিলনে সভাপতির অভিভাষণ।

তম কীটেরও জীবনযাত্রা পর্য্যালোচনা করলে দেখা যায় যে সেই কীটটি তার আহারীয় বস্তুর অন্বেষণে বের হ'য়ে সেটিকে ধরে এবং হয়ত সেটি তাকে ছাড়িয়ে স'রে যায়, এবং সে তার পিছু পিছু গিয়ে আবার সেটিকে ধরে। ক্ষুদ্রতম প্রাণীর ব্যাপ'রের মধ্যেও এই যে একটি মূঢ় স্মৃতির পরিচয় পাওয়া যায় এটা জড় জগতের ব্যাপারের চেয়ে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। মানুষের যেমন বোধ জন্মে ক্ষুদ্রতম প্রাণীরও যে সেই রকম বোধ জন্মে এ কথা অবশ্য স্বীকার করা যায় না। কিন্তু বোধতুল্য তাহাদেরও যে অন্ততঃ একটা বোধভাস আছে এ কথা স্বীকার করতেই হয়। এই বোধাভাসের দ্বারা তাহাদের প্রাণযাত্রা যেভাবে নিষ্পন্ন হয়, তাতে স্বতই মনে হয় যে বিভিন্ন কালের এবং হয়ত কুলক্রমাগত পিতৃপুরুষের বোধাভাসগুলি তাহাদের মধ্যে সঞ্চিত থেকে তাদের জৈব ব্যাপারগুলিকে তাদের প্রাণযাত্রার অনুকূল ক'রে তোলে। একজন বিখ্যাত প্রাণিতত্ত্ববিদ্ বলেছেন—The effectiveness which characterises the behaviour of organisms (i.e. of those that show behaviour enough to be studied) seems to depend on profiting by experience in the individual lifetime or on the results of successful ancestral experiments, or, usually on both. It appears to us to be one of the insignia of life that the organism registers its experiments or true results of its experiences.

আর একজনও এই কথাই অন্যভাবে বলেছেন, "It is the peculiarity of living things not merely that they change under the influence of surrounding circumstances, but that any change which takes place in them is not lost, but retained, and as it were built into the organism to serve as the foundation of future actions". ক্ষণপরিবর্ত্তী কালের বিচ্ছেদ পরম্পরায় যে ব্যাপারগুলি সম্পূর্ণ পৃথক্ হ'য়ে সংঘটিত, জৈব বোধাভাসের সঞ্চয়বৃত্তিতে তাহা যে কি কৌশলে এমন করিয়া বিধৃত হ'য়ে থাকে তার জটিল রহস্য আমাদের নিকট এখনও সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। জড়জগতের মধ্যে যে নিরন্তর শক্তির ঘাতপ্রতিঘাত চলেছে তার প্রত্যেকটি শক্তি তার নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে নির্দ্দিষ্ট দিকে প্রতিনিয়ত কায করছে। এই যে সূর্য্যের চারিদিকে গ্রহগুলি নিরন্তর ঘুরছে, এতদিন ঘুরেও যে তাদের ঘোরার একটা অভ্যাস হয়েছে তা বলা যায় না। পৃথিবী যে তার বৈকেন্দ্রিক গতিতে ছুটে বেরিয়ে যেতে চায় এবং সূর্য্য যে তাকে নিজের দিকে টান্‌ছে, এই দোটানার সামঞ্জস্যে বর্ত্তুলাকারে ঘোরার সৃষ্টি। কিন্তু এতদিনের ঘোরাতেও পৃথিবীর কোনও ঘোরার অভ্যাস জন্মে নাই, এবং আজ যদি কোনও কারণে সূর্য্যের আকর্ষণ একটু হ্রাস হ'যে যায় তবে পৃথিবী সূর্য্য থেকে দূর দূরান্তরে আকাশের কোন্ অনন্ত পথে যে ছুটে যেতে থাকবে, কি কোথায় কার সঙ্গে ধাক্কা লেগে চূর্ণ হ'য়ে যাবে তার কোনও ঠিক্ ঠিকানা নেই। জড়ের মধ্যে আত্মরক্ষা, আত্মবর্ধন, আত্মধারণ বা আত্মপোষণের জন্য কোনও চেষ্টা বা ব্যাপার দেখা যায় না; জড়ের মূঢ়শক্তির আদান প্রদানে এমন কোনও চিহ্ন নেই যাতে একথা বলা যায় যে আত্মশক্তিপ্রকাশের চেষ্টায় জড় তার কোনও প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টা করচে। জড়ের মধ্যে যদি কোনও উদ্দেশ্য দেখা যায় সে উদ্দেশ্য জড়ের নিজের উপকারের জন্য নয়, সে উদ্দেশ্য জীবের উপকারের জন্য জীবের ভোগের জন্য জীবের ব্যবহারের জন্য। সাঙ্খ্যদর্শনকার জড়ের এই তত্ত্বটুকু ভাল ক'রেই বুঝেছিলেন তাই তিনি প্রকৃতিকে পরার্থা এবং পুরুষের ভোগাপবর্গসাধনে ব্যাপৃতা ব'লে বর্ণন করেছেন। সামান্য একটি পরমাণুসংশ্লেষের মধ্যেও জড়ের প্রচণ্ড আকর্ষণ বিকর্ষণ শক্তির খেলা দেখ্‌তে পাই; কিন্তু তার পরিমাণ, অন্যশক্তির সান্নিধ্যে বা পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিভিন্ন ব্যবস্থার মধ্যে তার ব্যবহার এ সমস্তই একান্তভাবে নির্দ্দিষ্ট এবং গণিতশাস্ত্রের আয়ত্তের মধ্যে সর্ব্বথা নিয়ন্ত্রিত। জড়ের কোনও প্রয়োজনসিদ্ধির আড়ম্বর নেই, তাই নানা অবস্থায় তার ব্যবহারের বৈচিত্র্য নেই। পূর্ব্বাপর ব্যবহারের সঞ্চয় নেই, স্মৃতি নেই, অবস্থার বৈশিষ্ট্যে পরিবর্ত্তনের ক্ষমতা নেই।

দর্শনের দৃষ্টি

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

জীবরাজ্যে প্রবেশ করলেই আমরা দেখি যে এ রাজ্যের নিয়মপদ্ধতি জড়রাজ্যের নিয়মপদ্ধতির থেকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। জড়ের উপাদানকে অবলম্বন ক'রেই জীব তার কার্য্য আরম্ভ করে, কিন্তু প্রত্যেক বিভিন্নজাতীয় উদ্ভিদ ও প্রাণী—তার নিজের শরীরের উপযোগী ধাতু গঠন করে। এই প্রোটিড্ ধাতু যেমন উৎপন্ন হয় তেম্নি ভেঙ্গে যায়, আবার গ'ড়ে ওঠে আবার ভেঙ্গে যায়, এবং এম্নি ক'রে জৈবশক্তির ব্যাপারে নিরন্তর শরীর ধাতুর ভাঙ্গাগড়া চল্‌তে থাকে। অথচ এই ভাঙ্গাগড়ার মধ্যে এমন একটি ঐক্য আছে এমন একটি ছন্দ আছে যে, সেই ভাঙ্গাগড়ার মধ্যে জীবদেহ এমন একটি বিশিষ্ট প্রণালীতে গ'ড়ে উঠে যে প্রত্যেকটি জীবদেহ সেই জাতীয় অন্যান্য জীবদেহের সজাতীয় হইয়াও সম্পূর্ণ বিভিন্ন, সম্পূর্ণ পৃথক্। ঐক্যের দিক্ দিয়ে দেখতে গেলে সমস্ত জীবদেহই জীবদেহ, কিন্তু পার্থক্যের দিক্ দিয়ে দেখতে গেলে প্রত্যেকটি জীবদেহ এমন কি তার প্রত্যেকটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অন্য যে কোনও জীবদেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থেকে পৃথক্। যে প্রোটিড্ ধাতু জীবদেহের প্রধান উপাদান সে ধাতু জড়জগতে পাওয়া যায় না ; সে ধাতু প্রাণস্পন্দনের দ্বারা এবং প্রাণশক্তির অভিষেকের দ্বারা জড়োপাদান হ'তে প্রাণকার্য্যের উপযোগিতার জন্য আহৃত ও উৎপাদিত। এ ধাতু জড় হ'লেও যতক্ষণ জৈবশক্তির দ্বারা আবিষ্ট থাকে ততক্ষণ এ জড় নয়। আমরা আমাদের শরীরকে জড় বলি, পার্থিব বলি, পাঞ্চভৌতিক বিকার বলি। এ দেহ ভৌতিক বিকার সে কথা ঠিক, কিন্তু অন্য ভৌতিক বিকার থেকে এর পার্থক্য এইখানে যে এ বিকার জীবশক্তির দ্বারা অনুগৃহীত, জীবশক্তির স্বপ্রয়োজনে জড় থেকে প্রাণাবেগে উত্থাপিত ও বিনির্ম্মিত। জীবশক্তির দ্বারা আবিষ্ট ও স্পন্দিত না ক'রে জীব কখনও জড়কে নিজের দেহধাতুরূপে ব্যবহার করতে পারে না। অথচ জীবশক্তির বৈশিষ্ট্য অনুসারে প্রত্যেক জীবের জীবধাতু বিভিন্ন। একবিন্দু ঘোড়ার রক্ত একবিন্দু গাধার রক্ত থেকে রাসায়নিক ও অন্যবিধ ধাতব লক্ষণে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এমন কি দুজন মানুষের রক্তের মধ্যে যে ধাতু পাওয়া যায় তাহাও বিভিন্ন, পুরুষের রক্ত স্ত্রীলোকের রক্ত থেকে বিভিন্ন। এতে এই বোঝা যায় যে প্রত্যেকটি জীবশক্তির প্রকাশের মধ্যে একটি স্বগতবৈশিষ্ট্য এমন রয়েছে যার দ্বারা সে ঠিক আপন প্রয়োজনের অনুকূল ধাতুকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে গঠন ক'রে তোলে। জৈবশক্তি ব'লে একটা শক্তি নয়, কিন্তু জীবরাজ্য একটা স্বতন্ত্র রাজ্য, সেখানে দেখি বিচিত্র জীবশক্তির বহুধা বিচিত্র প্রাণব্যাপার, প্রাণলীলা। সে লীলা এক নয়, সে লীলা বহু, অথচ সে লীলার মধ্যে একটা ঐক্যের সম্বন্ধ রয়েছে, তাল রয়েছে ছন্দ রয়েছে। প্রত্যেকটি জীবকোষের মধ্যে প্রাণব্যাপারের যে লীলা দেখ্‌তে পাওয়া যায় তাতে এই ঐক্যের ছন্দটির অন্য আর একটি দিক্ দেখ্‌তে পাওয়া যায়। প্রত্যেকটি জীবকোষ একদিকে যেমন স্বপোষণের জন্য স্বধাতু গঠন ক'রে তোলে, তেম্নি শক্তির ব্যবহারে সে ধাতু ক্ষয় হ'য়ে যায়, কিন্তু যেমন এক্ দিকে ক্ষয় হ'তে থাকে তেম্নি অপর দিকে আবার স্বধাতু গঠনের কায চল্‌চে, অথচ এই ক্ষয় ও উপচয়ের মধ্যে একটা এমন্ নির্দ্দিষ্ট নিয়ম, নির্দ্দিষ্ট ঐক্য বা ছন্দ বজায় থাকে যে উপচয় ও ক্ষয়ের দোটানার মধ্য দিয়ে জীবনের স্রোতটি তার যথানির্দ্দিষ্ট পদ্ধতিতে ব'য়ে চ'লে যায়। একজন বিখ্যাত প্রাণিতত্ত্ববিদ এ সম্বন্ধে বলেছেন, "In the ordinary chemical changes of the inorganic world, as in the weathering of rocks into soil, one substance changes into another. The same sort of thing goes on in the living body, but the characteristic feature is a balancing of accounts so that the specific activity continues. We lay emphasis on this characteristic, since it seems fundamental—the capacity of continuing in spite of change, of continuing, indeed, through change. An organism was not worthy of the name until it showed, for a short time at least not merely activity but persistent activity. The organism is like a clock inasmuch as it is always

running down and always being wound up; but unlike a clock, it can wind itself up, if it gets food and rest. The chemical processes are so correlated that up-building makes further down-breaking possible, the pluses balance the minuses; and the creature lives on. এম্‌নি ক'রে একটি জীবকোষের মধ্যে ক্ষয় ও উপচয়ের মধ্য দিয়ে তার জীবনস্রোত বইতে থাকে। আবার বৃহত্তর প্রাণীর মধ্যে দেখা যায় যে প্রত্যেকটি জীবকোষের জীবন ছাড়া, জীবকোষগুলির পরস্পরের সামঞ্জস্যে আর একটি জীবনস্রোত প্রত্যেকটি জীবকোষের সহিত একটা সুনির্দ্দিষ্ট সামঞ্জস্যে সমগ্র প্রাণীটির জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করতে থাকে। একদিকে যেমন প্রত্যেকটি জীবকোষের একটি স্বতন্ত্র প্রাণ পর্য্যায় আছে অপরদিকে আবার প্রত্যেকটি জীবকোষের জীবন সমস্ত প্রাণীটির সমগ্র জীবকোষের সহিত অবিচ্ছিন্ন ভাবে সম্বদ্ধ; এই সমগ্র থেকে বিচ্যুত হ'লে জীবকোষগুলির স্বতন্ত্র প্রাণপর্য্যায় রক্ষা পায় না। অনেকগুলি জীবকোষ নিয়ে একটি হাতের জৈবক্রিয়া চলেছে, তার প্রত্যেকটি কোষের স্বতন্ত্র জীবন স্বতন্ত্রভাবে কায করছে, কিন্তু যেই হাতখানি দেহ থেকে ছিন্ন করা যায় সেই দেখা যায় যে হাতের জীবকোষগুলির স্বতন্ত্র জীবন ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। গ্রহণবর্জ্জনের জমাখরচে যেটুকু জমা থাকে সেই শক্তির বলে একটি জীবকোষ যখন আপন শক্তিকে আপনার মধ্যে সন্ধারণ করতে পারে না, তখন সে আপ্‌না থেকে ক্রমশঃ ক্রমশঃ বিভক্ত হ'য়ে ক্রমে ক্রমে বহু জীবকোষের সৃষ্টি করে তাদের সঙ্গে এমন্ একটি অবিচ্ছেদ্য পারিবারিক সম্পর্কের সৃষ্টি করে যে তদন্তর্ভুক্ত প্রত্যেকটি জীবকোষের জীবন সেই সমগ্রের জীবনের উপর নির্ভর করে। এবং এম্‌নি ক'রে প্রত্যেকের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা ক'রেও সমগ্রের অধীন হ'য়ে থাকে এবং সমগ্রের জীবনও জীবকোষগুলির স্বতন্ত্র জীবনের উপর নির্ভর করে। আবার জীবকোষগুলির শুধু সমষ্টিতেই জীবদেহ নির্ম্মাণ হয় না। একটি বিশিষ্ট সম্বন্ধে বিশিষ্টরূপ পরম্পরায় বিশিষ্টরূপ আদানপ্রদানের কৌশলে, এই সমগ্রদেহের উৎপত্তি অবস্থান ও বৃদ্ধি। সেই সেই বিশিষ্ট সম্বন্ধের মধ্য দিয়ে প্রত্যেকটি জীবকোষ পরস্পরের উপর যে প্রভাব বিস্তার করে, সেই প্রভাবের মধ্যেই একদিকে যেমন সমগ্র জীবদেহের প্রাণপর্য্যায় রক্ষিত হয় অপরদিকে তেম্‌নি সেই প্রভাবকেই অবলম্বন ক'রেই প্রত্যেকটি জীবকোষ বেঁচে রয়েছে। বহুকে মুছে ফেলে এখানে এক দাঁড়ায় নি, এককে মুছেও বহু দাঁড়ায় নাই। এক দিক দিয়ে দেখ্‌লে যাকে দেখি এক, অপরদিক দিয়ে দেখ্‌লে সেই এককেই দেখি বহু। আমরা সাধারণতঃ জানি যে কোনও কিছু যদি এক হয় তবে সে বহু নয়, যদি বহু হয় তবে সে এক নয়; তাই দর্শনশাস্ত্রের ক্ষেত্রে যাঁরা বহুর মায়ায় পড়েছেন তাঁরা এককে জলাঞ্জলি দিয়েছেন, আর যাঁরা একের মায়ায় পড়েছেন তাঁরা বহুকে মিথ্যা বলেছেন, কেউ বা বলেছেন, বহুঅংশকে নিয়ে এক। কিন্তু প্রাণজগতে এসে আমরা যে লীলা দেখি তাতে দেখি এটা একটা এমন রাজ্য যেখানে কোনও একটি সত্তা বা সম্বন্ধই অপর সত্তা বা সম্বন্ধকে ছাড়া তার আপন স্বরূপকেই লাভ করতে পারে না। এখানে ক্ষয় ছাড়া বৃদ্ধিকে পাওয়া যায় না; বৃদ্ধির মধ্যেই ক্ষয়, ক্ষয়ের মধ্যেও বৃদ্ধি। বৃদ্ধির পর ক্ষয় আসে এ আমরা জানি, বা ক্ষয়ের পর বৃদ্ধি আসে এ আমরা জানি। কিন্তু এ যে বৃদ্ধি-ক্ষয়ের যৌগপদ্য এবং এমন যৌগপদ্য যেখানে ক্ষয়ের মধ্যেই বৃদ্ধি এবং বৃদ্ধির মধ্যেই ক্ষয়। একের সমষ্টিতেও বহু নয়, বহুর সমষ্টিতেও এক নয়, কিন্তু যাকে এক বলি তাই বহু এবং যাকে বহু বলি তা'ই এক। সাধারণতঃ য়ুরোপীয় দর্শনশাস্ত্রে যেটাকে organic view বা জৈবদৃষ্টি বলে সেটাতে একের জীবনের মধ্যে বহু এসে কেমন ওতপ্রোতভাবে মিলেছে এই কথাটিই বিশেষ ভাবে জোর দিয়ে দেখান হয়। দর্শনশাস্ত্রে এই জৈবদৃষ্টির প্রধান উদ্দেশ্যই হচ্ছে একের প্রাধান্য দেখাবার জন্য এবং একের সঙ্গে যে বহুর বিরোধ নেই, বহুকে নিয়েই যে এক আপ্‌নাকে সার্থক করছেন এই কথাটি জোর ক'রে দেখাবার জন্য। সকল সময়েই আমরা এই কথা শুনে থাকি যে ভেদদৃষ্টিতেই দুঃখ, বিচ্ছেদ, ধ্বংস, এবং

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

একাদৃষ্টিতেই মঙ্গল ও মুক্তি। কিন্তু এ সমস্ত মতবাদের মধ্যে জৈবদৃষ্টির যথার্থ শিক্ষাটি যে প্রকাশ পেয়েছে আমার তা মনে হয় না। জৈবদৃষ্টির যথার্থ তত্ত্ব এইখানেই প্রকাশ পায় ব'লে আমার মনে হয় যে এই দৃষ্টিতে এক ও বহুর চিরপ্রসিদ্ধ ভিন্নতাটি তিরোহিত হয়েছে। যেমন একত্বে না বোঝা গেলে বহুকে বোঝা যায় না তেমনি বহুকে না বোঝা গেলেও একত্বে বোঝা যায় না। বহুকে বোঝাও যেমন একপেশে বোঝা, একত্বে বোঝাও তেম্নি একপেশে বোঝা। একের স্বতন্ত্রতায় যে বহুর উৎপত্তি এবং একের স্বতন্ত্রতা যে বহুর স্বতন্ত্রতা ছাড়া হয় না এই যে কার্য্যকারণবিরোধী সত্য এতে এক এবং বহুর সীমানাকে এমন অনির্বাচ্য ক'রে তুলেছে যে এক বলাও পার্শ্বদৃষ্টি বহু বলাও পার্শ্বদৃষ্টি। বৃদ্ধির মধ্যে ক্ষয় ও ক্ষয়ের মধ্যে বৃদ্ধি এতে যে ক্রিয়াবিরোধ প্রকাশ পাচ্ছে তাতে দেখা যায় যে বৃদ্ধিও পার্শ্বদৃষ্টি ক্ষয়ও পার্শ্বদৃষ্টি। এ পার্শ্বদৃষ্টির সামঞ্জস্য কোথায় সে প্রশ্নের এখানে এখন অবতারণা করা সহজ নয়। সূক্ষ্মভাবে পর্য্যালোচনা করলে দেখা যায় যে সাধারণ বুদ্ধিতে যে সমস্ত সম্বন্ধকে আমরা এতকাল স্থির মনে ক'রে এসেছি সে সমস্ত সম্বন্ধগুলির একটিও স্থির নয়, একটিও আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ নয়। নাগার্জ্জুন থেকে Bradley পর্য্যন্ত অনেকেই সম্বন্ধগুলির আপেক্ষিকতা স্বীকার করেছেন এবং সম্বন্ধগুলি সমস্তই আপেক্ষিক ব'লে নাগার্জ্জুন বলেছেন যে সমস্ত বস্তুই নিঃস্বভাব, শ্রীহর্ষ বলেছেন ব্রহ্মভিন্ন সমস্তই অনির্বাচ্য, Bradley বলেছেন যে খ শঃ দেখি ব'লে সম্বন্ধগুলি আপেক্ষিক এবং পরস্পরবিরোধী, কিন্তু সকল সম্বন্ধকে যদি এক ক'রে ফেলি তবে সেই এক করার মধ্যে তাদের সমস্ত আপেক্ষিকতা নিঃশেষে শেষ হ'য়ে যাবে; জ্ঞান কর্ম্ম, ইচ্ছা সমস্ত একত্র মিশে গিয়ে এই সমগ্রটি যে কি তা বলা যায় না, তা অনির্বাচ্য কিন্তু তাই পরমার্থ সৎ। কিন্তু সম্বন্ধের আপেক্ষিকতায় যে সম্বন্ধগুলি মিথ্যা ব'লে মনে হয় তার প্রধান কারণ এই যে একটি সম্বন্ধ বুঝ্‌তে গেলে আর একটি বুঝ্‌তে হয় এবং সেটিকে বুঝ্‌তে গেলে আর একটিকে বুঝ্‌তে হয়, এম্নি ক'রে আমরা অনবরত যতই চলি ততই চলি এবং অনন্তকাল চ'লেও কোনও সম্বন্ধের নির্ণয় হয় না। একে সংস্কৃতে বলে অপ্রামাণিকী অনবস্থা, ইংরেজীতে বলে vicious infinite। আর একটি কারণ হচ্ছে এই যে একটি সম্বন্ধকে বা সত্যকে এক দিক দিয়ে হয়ত বেশ বোঝা যায় কিন্তু আর এক দিক দিয়ে দেখ্‌তে গেলে পূর্ব্বের বোঝার সঙ্গে গোল উপস্থিত হয়, বিরোধ হয়। এবং যেহেতু আত্মবিরোধই মিথ্যা সেই জন্য এই সম্বন্ধনির্ণয়ও মিথ্যা। ক্রিয়া ব্যাপারের মধ্যে আত্মবিরোধ খণ্ডিত হ'য়ে যায় দেখে Hegel ক্রিয়াব্যাপারের মধ্যেই সত্যের যথার্থরূপ প্রত্যক্ষ করেছেন ব'লে মনে করেছিলেন। কিন্তু ক্রিয়াব্যাপারটা যে নিজে কি সত্যের উপর দাঁড়িয়ে আছে তা তিনি কোথাও সুস্পষ্ট ক'রে বুঝিয়েছেন ব'লে মনে পড়ে না। সম্বন্ধগুলিকে পৃথক্ ক'রে দেখি ব'লেই ক্রিয়াব্যাপারের মধ্যে তাদের একত্র দেখে তাদের বিরোধ সমাধান করতে চেষ্টা করি, কিন্তু জৈব-দৃষ্টির মধ্যে এই কথাটি যেন আমাদের চোখে বেশ পরিষ্কার হ'য়ে আসে যে যে সম্বন্ধগুলিকে আমরা বুদ্ধির মায়ায় পৃথক্ ব'লে মনে করি সেগুলি পৃথক্ নয়, তাদের প্রত্যেকের সত্তা অপরের মধ্যে নিহিত হ'য়ে রয়েছে, তারা একও নয় বহুও নয়। প্রাণপর্য্যায়ের মধ্যে এই অপূর্ব্ব সত্তাসমাবেশের চরম সত্যটি পরিস্ফুট হ'য়ে ওঠে। শুধু ক্ষয় বৃদ্ধির মধ্যে নয়, শুধু এক বহুর পরস্পরের সংশ্লেষে নয়, বৃদ্ধি, উৎপাদন ও ক্রমবিকাশের লীলায়, পূর্ব্বতনকে ও ভবিষ্যৎকে বর্ত্তমানের মধ্যে সন্ধারণ করবার ব্যবহারে সর্ব্বত্রই আমরা যা দেখ্‌তে পাই তাতে শুধু এই পুরোণো কথাটি বুঝি না যে সম্বন্ধগুলি পরস্পরসাপেক্ষ, তাতে তার চেয়ে আরও একটা বড় কথা বুঝি সেটা হচ্ছে এই যে, সম্বন্ধগুলি পরস্পরের মধ্যে অপূর্ব্ব সত্তাসমাবেশে সমাবিষ্ট। যেটা বুদ্ধির চোখে অসম্ভব জৈবজীবনে সেটা মূর্ত্ত হ'য়ে দেখা দিয়েছে। এই জন্য বুদ্ধির জালে বা জড়জগতের শক্তির ঘাতপ্রতিঘাতে জৈবপর্য্যায়ের বিশেষত্বটুকু ধরা পড়ে না। এই জন্য জড়-জগতের নিয়মে জড়জগতের সংজ্ঞায় জড়জগতের ধারণায় জীবরাজ্যের ব্যাপার বা তথ্য ধরা পড়ে না। জীবরাজ্য একটি নূতন রাজ্য। জড়জগতের থেকে জীবজগৎ কেমন ক'রে উঠ্‌ল সে রহস্য এখনও নির্ণীত হয় নি, এবং হবে কি না তাও সন্দেহ। কেউ মনে করেন যে স্বতঃপ্রবাহী প্রাণশক্তির

সঙ্গে জড়শক্তির বিরোধের তারতম্য অনুসারে বিভিন্ন রকমের জীবপর্য্যায়ের উদ্ভব হয়েছে, কেউ বা হয়ত মনে করেন যে জড়শক্তিরই একটা নূতন পর্য্যায়ের আরম্ভেই প্রাণপর্য্যায়ের আরম্ভ। কিন্তু একজন অতি বিখ্যাত প্রাণিতত্ত্ববিদ বলেছেন যে, শুধু যে জড়ের প্রকার থেকে জীবপর্য্যায়ের প্রকার ধরা পড়ে না তা নয়, কিন্তু জীবপর্য্যায়ের মধ্যে যে সমস্ত স্তরে স্তরে প্রকার ভেদ রয়েছে তার কোনও প্রকার থেকে কোনও প্রকার ধরা পড়ে না। কাযেই কোনও পর্য্যায়ের দ্বারাই কোন পর্য্যায়ের প্রকার বা স্বভাব নির্ণয় করা যায় না। "There is no possibility of deducing or predicting true nature of the new from that of the old. No amount of reflection on the inorganic world leads to the idea of the organic. As no emergent can be predicted from, explained by, or accounted for by what goes before it in the course of evolution, each emergent has simply to be accepted as a fact and accorded its position in the scheme. A mind cannot be explained by life neither can life be explained by mind."

এম্নি ক'রে নূতন ধর্ম্ম নূতন প্রকার নূতন নিয়ম নূতন ব্যবহার নিয়ে জড়জগতের বুকের মধ্য থেকে জড়জগতের সঙ্গে সহযোগে যে প্রাণপর্য্যায় উৎপন্ন হোল সেটা সর্ব্বতোভাবে একটা নূতন রাজ্য। জড়ের নিয়মে এর ব্যাখ্যা করা চলে না। জড়কে আমরা যে চোখে দেখি সে চোখে প্রাণকে দেখ্‌তে গেলেই দেখি যে সে চোখে একে দেখা যায় না। জড়ের ভাষা প্রাণের ভাষা নয়। জড়জগতের শক্তিচক্রের ঘাতপ্রতিঘাতের যে নিয়ম সে নিয়ম প্রাণজগতে খাটে না। Thomson এই কথাটি তাঁর রকমে বোঝাতে গিয়ে লিখেছেন,"Making no pronouncement whatsoever in regard to the essence of the difference between organisms and things in general, we hold to what we believe to be a fact, that mechanical formulae do not begin to answer the distinctively biological questions. Bio-chemistry and Bio-physics added together do not give us one biological answer. We need new concepts, such as that of the organism as an historic being, a genuine agent, a concrete individuality, which has traded with time and has enregistered within itself past experiences and experiments and which has its conative bow ever bent towards the future. We need new concepts, because there are new facts to describe which we cannot analyse away into simple processes." Thomson এই যে বলেছেন যে জীবনপর্য্যায়ের ব্যাপার ও প্রকার জড়পর্য্যায়ের ব্যাপার ও প্রকার থেকে এতই বিভিন্ন যে জীবকে বুঝ্‌তে গেলে জৈবিক সংজ্ঞা ছাড়া চলে না। জড়ের সংজ্ঞা দিয়ে জীবের বৈশিষ্ট্যকে আমরা ধরতে পারি না। আমি এইখানে শুধু এইটুকু যোগ দিতে চাই যে জড়রাজ্যের সমস্ত শক্তিকে যদি একশক্তি ব'লে কল্পনা করি তা হ'লে জড়শক্তির যে বিচিত্র রূপ তাকে কিছুতেই আমরা পাই না। সমস্ত শক্তিকে যদি শক্তিমাত্রের সাদৃশ্যে একশক্তি বলি তবে চিন্তার তাড়না থেকে আমাদের চিত্ত আপাতবিশ্রাম পায় বটে, কিন্তু জড়শক্তির বিচিত্র-লীলার ব্যাখ্যা তাতে হয় না। জড়ের রাজ্য একটা স্বতন্ত্র রাজ্য, সে রাজ্যে নানাশক্তি তার নির্দিষ্ট ঘাতপ্রতিঘাতের লীলায় খেলা করচে; জড়কে নিতে গেলে তাকে তার এই বিচিত্র শক্তিচক্রের মধ্যেই নিতে হবে। জড়কে একশক্তি ব'লে সঙ্ক্ষেপ করা চলে না কারণ সে হচ্ছে নানা শক্তিপুঞ্জের পরস্পর সম্বন্ধ লীলারাজ্য।

কেহ কেহ মনে করেন যে জীবপর্য্যায়ে যে শক্তির খেলা দেখি সাধারণ জড়শক্তির মতন সেও একটা বিশিষ্ট জড়শক্তি (force)। জড়শক্তি যেমন অবস্থাভেদে বৈদ্যুতিক, চৌম্বক, মাধ্যাকর্ষণিক প্রভৃতি নানারকমের দেখা যায়, তেম্নি জীবকোষের মধ্যেও যে শক্তির ব্যাপার দেখা যায় সেও সেই রকমেরই একটি জড়শক্তি। যেমন বৈদ্যুতিক এবং মাধ্যাকর্ষণিক এই উভয় শক্তিই জড়শক্তি হ'য়েও সম্পূর্ণ বিভিন্ন রকমের জড়শক্তি, তেম্নি জৈব ব্যবস্থার মধ্যে

পকাশ ব'লে অন্য জড়শক্তির সহিত প্রকারগত বৈলক্ষণ্য থাক্‌লেও জৈবশক্তিও মূলতঃ একপ্রকার জড়শক্তিই। আবার অপরাপর অনেকে মনে করেন যে জৈবশক্তি জড়শক্তির রূপান্তর বা নামান্তর নয়; এটি একটি স্বতন্ত্র জাতীয় শক্তি এবং কেবলমাত্র জীবস্তরেই এর প্রকাশ, কোনও জড়শক্তির প্রেরণায় বা জড়শক্তির পরিণামে, পরিবর্ত্তনে বা ঘাত প্রতিঘাতের ফলে ইহার উৎপত্তি নয়। এটি একটি স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বশক্তি। ইহার স্বগত ব্যাপারে ইহা স্বাধীনভাবে আপনাকে প্রকাশ করে। জড়শক্তির সঙ্গে ইহার প্রধান পার্থক্য এই যে, জড়শক্তি আপনাকে দেশাবচ্ছেদে বা spatial উপায়েই প্রকাশ করে কিন্তু এই বিশিষ্ট জীবশক্তি দেশাবচ্ছেদে আপনাকে প্রকাশ করে না। ইহা একটি স্বতঃসিদ্ধ স্বতঃসঞ্চারী জীবশক্তি। জড়শক্তি যখন দূরস্থিত দুইটি বস্তুকে আকৃষ্ট বা বিকৃষ্ট করে, বা উত্তাপে ও আলোকের স্পন্দাকারে আপনাকে প্রকাশ করে তখন সেই ক্রিয়াব্যাপারটি একস্থান থেকে অন্যস্থানে সঞ্চরিত হ'তে থাকে। রাসায়নিক ব্যাপারে যে পরমাণুর স্থানবিনিময় ঘটে সেটি স্পন্দাত্মক এবং স্থানসঞ্চারী। এই দেশাবচ্ছেদে কেন্দ্র থেকে কেন্দ্রান্তরে স্থান সঞ্চারের মধ্যেই জড়শক্তির প্রকাশ। কিন্তু জীবশক্তি স্পন্দাত্মকও নয় স্থানসঞ্চারীও নয়। এ একটি নূতন স্তরের শক্তি, জড়শক্তির ভাষায় একে প্রকাশ করা যায় না; এটি একটি স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব প্রকাশের শক্তি (autonomous agent)। কাযেই এই শক্তি কোথায় থাকে এ প্রশ্নের জবাব নেই। কারণ এ শক্তি কোনও দেশাবচ্ছেদে থাকে না, কোনও জায়গায় থাকে না। সেই জন্য জড়শক্তির বেলায়ই বলা চলে যে, এ শক্তিটি এইখানে আছে, কিন্তু এ শক্তিটি একটি নূতন স্তরের জীবাত্মক শক্তি। ইহা নিজে কোনও দেশাবচ্ছেদে না থেকেও দেশাবচ্ছেদ অবস্থিত জড়শক্তিকে ও জড়পরমাণুকে নূতনভাবে সংহত ক'রে গ'ড়ে তুল্‌তে পারে—"It is immaterial and it is not energy; its function is to suspend and to set free in a regulatory manner pre-existing faculties of inorganic interaction. কিন্তু এইরূপ একটি স্বতন্ত্র জীবশক্তি মান্‌লেই যে জীবপর্য্যায়ের রহস্য ধরা প'ড়ে গেল তা মনে করা যায় না। জীবপর্য্যায়ে যে লীলাচক্র দেখ্‌তে পাই তাকে এক দিক্ দিয়ে দেখ্‌তে গেলে শক্তি বলা যায়, অপর দিক্ দিয়ে দেখ্‌তে গেলে বুদ্ধি বলা যায়, অপর দিক দিয়ে দেখ্‌তে গেলে শক্তি ও বুদ্ধির মিলনে ইচ্ছা ব'লে বলা চলে। একটি শরীরের মধ্যে যে অসংখ্য পরস্পরাপেক্ষী ব্যাপার পরস্পরের সামঞ্জস্যে স্রোতের মত ব'য়ে চলেছে, কোথায় নিয়ন্তা জানি না অথচ নিয়মের বাঁধনে, যেন ঠিক জেনে শুনে প্রত্যেকটি শরীর যন্ত্র তার কায ক'রে যাচ্ছে। বৃক্কযন্ত্র (kidney) শরীরের রক্ত থেকে যেটুকু যেটুকু মলভাগ শরীরের অপকারী হবে ঠিক ঠিক সেইটুকুকে কি কৌশলে রক্ত থেকে বেছে নিয়ে মূত্র প্রস্তুত ক'রে শরীর যন্ত্রকে শোধন করছে তা ভাবলে বিস্মিত হ'তে হয়। শুধু একটি মূঢ় অলৌকিক জীবশক্তিকে মান্‌লে তার দ্বারা বহুধাবিচিত্র জৈব ব্যাপারকে উপপন্ন করা যায় না। জৈবব্যাপারকে ব্যাখ্যা করতে হ'লে তার বিচিত্র আত্মপ্রকাশকে ব্যাখ্যা করতে হবে, শুধু জড়শক্তির অতিরিক্ত একটি স্বতন্ত্র জীবশক্তি মান্‌লে তা চলে না। একজন বিখ্যাত জীবতত্ত্ববিদ্ এই মতের প্রতিবাদ করতে গিয়ে বলেছেন—"In order to guide effectually the excessively complex physical and chemical phenomena occurring in living material, and at many different parts of a complex organism, the vital principle would apperently require to possess a superhuman knowledge of these processes. Yet the vital principle is assumed to act unconsciously. The very nature of this vitalistic assumpton is thus totally unintelligible." আমাদের দেশে প্রাণ সম্বন্ধে যে আলোচনা হয়েছে, তা মোটামুটি তিন প্রকার। চরক প্রাণকে জড়শক্তি ব'লেই ব্যাখ্যা করেছেন। বেদান্ত প্রাণকে জড়শক্তির একটি স্বতন্ত্র বিকার বা পরিণাম ব'লে ব্যাখ্যা করেছেন। সাংখ্য প্রাণকে মহৎতত্ত্ব থেকে

সমুদ্ভূত ব'লে ধ'রে নিয়ে বুদ্ধিব্যাপারেরই অবান্তর ব্যাপার ব'লে মনে করেছেন। এঁদের সকলেরই প্রাণ সম্বন্ধে আলোচনা বর্ত্তমান কালের য়ুরোপীয়দের আলোচনার তুলনায় অতি অল্প এবং অস্ফুট। ফলে দেখা যায় যে জৈব ব্যাপারের রহস্য কিছুতেই ব্যাখ্যা করা যায় না। এ রহস্য যখন ব্যাখ্যা করা যায় না তখন শুধু একটি জীবশক্তির ঘাড়ে একে চাপিয়ে দেওয়া চলে না। সেইজন্যই আমার বিবেচনায় শুধু একটি জীবশক্তি স্বীকার না ক'রে জীবলোক ব'লে একটি স্বতন্ত্র লোক স্বতন্ত্র রাজ্য স্বীকার করাই উচিত। এ রাজ্যের নিয়মপদ্ধতি ব্যবহার সমস্তই এই রাজ্যেরই বিশিষ্ট এবং স্বতন্ত্র নিয়ম। জড়লোক নানাবিধ শক্তির ঘাতপ্রতিঘাতে আপনাকে চালিত ক'রে চলেছে। এই সমস্ত শক্তিগুলির মধ্যে পরস্পরের সাদৃশ্য থাকলেও এক জড়শক্তির বিচিত্র আত্মপ্রকাশ বোঝা যায় না। অথচ জড়শক্তির এই বিচিত্রতা না বুঝলে জড়শক্তিকেই বোঝা গেল না। বিভিন্ন জড়শক্তির পরস্পর ঘাতপ্রতিঘাত, পরস্পরের বিচিত্র সমাবেশ পরস্পরের বিভিন্ন রূপ, জড়শক্তিকে বুঝতে গেলে এ সমস্তই বোঝা চাই এবং জড়বিজ্ঞানের সাধকগণ অহোরাত্র জড়শক্তির বহুধাবিচিত্র প্রকাশকে বিচিত্ররূপে উপলব্ধি করতে ব্যাপৃত রয়েছেন। জীবলোকও তেম্নি একটি শক্তি বা একটি সত্তা নয়, একটি নূতন স্তরের জৈবনিয়ম, জৈবব্যক্তিত্ব, জৈবব্যবহার, জৈবপদ্ধতি, পরস্পরের সহযোগে এবং জড়লোকের শক্তিচক্রের সহযোগে রচিত একটি নূতন লোক। একে শক্তি বলা চলে না কারণ ইহা স্পন্দাত্মক নয় অথচ জড়স্পন্দের নিয়ামক; এর কার্য্যক্ষমতা দেখে যখন একে শক্তি বলতে যাই, তখন বুদ্ধির সাধর্ম্য দেখে একে বুদ্ধিময় বলতে ইচ্ছা হয়। শুধু যে আমাদের দেশে সাঙ্খ্যদর্শন প্রাণকার্য্যকে বুদ্ধিকার্য্য বলেছেন তা নয়,য়ুরোপেরও অনেক মনীষীরা প্রাণব্যাপারকে একটা objective mindএর ব্যাপার ব'লে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু একে শুধু বুদ্ধিময় বলা চলে না, কারণ বুদ্ধি অনুসারে এর প্রবৃত্তি রয়েছে, সেই হিসাবে একে ইচ্ছাময় বলতে ইচ্ছা হয় এবং অনেক য়ুরোপীয়েরা একে blind will ব'লে ব্যাখ্যা করেছেন, অনেকে বা একে ঈশ্বরের ইচ্ছার গৌণ বিকাশ ব'লে মনে করেছেন। এর স্বচ্ছন্দ সৃষ্টির দিক থেকে দেখলে একে সৃজনী শক্তি ব'লে মনে হয় এবং সেই হিসাবে একে Bergson সৃজনাত্মক স্বচ্ছন্দশক্তি ব'লে (creative elan) ব'লে বর্ণনা করেছেন। নানাদিক থেকে এই জীবনলীলাকে নানারূপে সত্য ব'লে মনে হয়, কিন্তু এর কোনও একটিকেই জীবলীলার পরমার্থ সত্য রূপ ব'লে নির্দ্দেশ করা যায় না, অথচ এর প্রত্যেকটিই জীবলীলার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করছে। প্রত্যেকটি জীবকোষের স্বগতবিকাশে ও পরস্পরের সন্নিধানে পরস্পরের আত্মবিকাশে গ্রহণ বর্জ্জন সন্ধারণের সুনিবদ্ধ সামঞ্জস্যে, আপনা থেকে আপনাকে নব নব সৃষ্টিপ্রক্রিয়ায়, নিজের সরূপ ও বিরূপ সৃষ্টিতে যে বিচিত্র সম্বন্ধপরম্পরা ও সত্তাপরম্পরার পরস্পর সমাবেশ দেখতে পাই তাতে জীবপর্য্যায়ের মধ্যে একটি নূতন রাজ্য একটি নূতন লোকের পরিচয় পাই। এই লোকটি একদিকে যেমন নিজের বিচিত্রতার মধ্যে নিজের লীলাকৌশলে সুষমাময় হ'য়ে রয়েছে, অন্যদিকে তেম্নি জড়জগতের বিচিত্র নিয়মপরম্পরার সঙ্গে আপনাকে বেঁধে রেখেছে এবং জড়শক্তিকে আপন জৈব উপাদানে ব্যবহার ক'রে আপনার ক'রে তুলেছে। জড়রাজ্যের সঙ্গে জীবরাজ্যের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ রয়েছে, আদান প্রদান চল্‌ছে, তথাপি জীবরাজ্য তার নিয়ম পরম্পরা নিয়ে একেবারে স্বতন্ত্র হ'য়ে রয়েছে। পরস্পরের আদান প্রদান রয়েছে ব'লে পরস্পরের সাদৃশ্যও রয়েছে তথাপি তাদের বৈসাদৃশ্য এত বেশী যে পরস্পর যুক্ত থেকেও দুটিতে একেবারে দুটি বিভিন্ন লোক রচনা ক'রে বিরাজ করছে।

জীবলোকের সহিত ঠিক এই রকমেরই সাম্যবৈষম্যে মনোলোক বা বুদ্ধিলোকের সৃষ্টি। অথচ এই বুদ্ধিলোকের নিয়ম, প্রকার, সংগঠন সম্পূর্ণ বিভিন্ন রকমের। জড়লোকে দেখেছি রূপের খেলা, জীবলোকে দেখেছি অভিব্যক্তির খেলা, গ্রহণ বর্জ্জনের মধ্যে আত্মসন্ধারণের লীলা। সে লীলায় কোথাও স্থৈর্য্য নেই, যেটুকু বা স্থৈর্য্য আছে সেটুকু কেবল চাঞ্চল্যের সামঞ্জস্য মাত্র। কিন্তু বুদ্ধিলোকে প্রবেশ ক'রে সর্ব্বপ্রথম দেখতে পাই জ্ঞানের

দর্শনের দৃষ্টি

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

স্বপ্রকাশতা ও পরপ্রকাশতা। জ্ঞান কি, জ্ঞানের উৎপত্তি-প্রক্রিয়া কি, এ নিয়ে আমাদের দেশে ও য়ুরোপে বিস্তর আলোচনা হয়েছে। এ আলোচনার মধ্যে যে সমস্যাটি সব চেয়ে কঠিন, সেটি হচ্ছে এই যে, জ্ঞান পদার্থটি অন্য সমস্ত পদার্থের চেয়ে এত বেশী বিভিন্ন যে, কোনও জড়বস্তুর সহিত যে এর কি সত্য সম্বন্ধ থাকতে পারে তা কল্পনা করা যায় না। বেদান্ত এবং সাঙ্খ্যযোগ এ উভয়ই জ্ঞানস্বরূপ বা চিৎস্বরূপ পরমার্থসত্যস্বরূপ কূটস্থ নিত্য ব্রহ্ম ও পুরুষ এই পদার্থটিকে সমস্ত জড়পদার্থ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ব'লে মেনে নিয়েছেন। তাঁহাদের মতে জড়ের দ্বিবিধ অবস্থা, এক অবস্থায় বাহ্য জড়জগৎ, অপর অবস্থায় অন্তকরণ (বেদান্ত) বা বুদ্ধি (সাঙ্খ্যযোগ)। বেদান্ত মতে অবিদ্যা অনির্বচনীয় ভাব পদার্থ; ইহার একরকম বিকারে বা বিক্ষেপে বাহিরের জড়জগৎ, অন্যরকম বিকারে বা বিক্ষেপে অন্তঃকরণ। অন্তঃকরণ দ্রব্যটি অবিদ্যা-সম্ভূত জড়পদার্থ হ'লেও এটি এমন স্বচ্ছ যে এ'র উপর মূল চিৎপদার্থের প্রতিবিম্ব প'ড়ে অন্তঃকরণের যে কোনও আকারকে উদ্ভাসিত ক'রে তুলতে পারে। অন্তঃকরণ পদার্থটি যখন দীর্ঘপ্রভাকারে কোনও বাহ্যবস্তুর উপর পড়ে, তখন অন্তঃকরণটি বৃত্ত্যাকারে সেই বস্তুর উপর প'ড়ে সেই আকার গ্রহণ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে বহির্জগতে সেই বস্তুটি উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে এবং বৃত্তিদ্বারা সংযুক্ত ব'লে অন্তঃকরণেও অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন চৈতন্য বা জীবের সেই বস্তুর প্রমাতা বা জ্ঞাতারূপে জ্ঞান জন্মে, এবং বৃত্তিচৈতন্য বা প্রমাণচৈতন্য, জ্ঞানব্যাপার বা cognitive operation রূপে প্রকাশ পায়। অন্তঃকরণ বিষয়ের সহিত সংযুক্ত হ'লে সেই বাহ্যবস্তুর যে রূপ বা পরিমাণ, অন্তঃকরণও ঠিক সেইরূপ আকার প্রাপ্ত হয় এবং চিৎসম্পর্কে সেই আকারটি যে উদ্ভাসিত হয় তা'রই নাম সেই বস্তুর জ্ঞান হওয়া। সাঙ্খ্যযোগ মতেও ঠিক ঐরূপ ভাবেই বুদ্ধি বিষয় সংযুক্ত হয়, এবং বিষয়াকারে আকারিত বুদ্ধি পুরুষের ছায়া সংযুক্ত হ'য়ে চিন্ময়রূপে প্রতিভাত হয়। এ মতে বাহ্যজগতে বিষয়টি প্রকাশিত হয় না কিন্তু বুদ্ধির রূপটি পুরুষের নিকট প্রদর্শিত হয় এবং এই বুদ্ধির রূপটি পুরুষের নিকট প্রদর্শিত হওয়ায় সেটি জানা হোল এই বোধ জন্মে। সাঙ্খ্যমতে বুদ্ধিতে জ্ঞান প্রথম ক্ষণে অস্ফুট বা নির্ব্বিকল্প থাকে এবং পরক্ষণে স্ফুট হয়। বাচস্পতি বলেন যে, মনের সঙ্কল্প বিকল্প এই দুই বৃত্তিদ্বারা অস্ফুট জ্ঞান স্ফুটরূপে প্রতিভাত হয়; কিন্তু ভিক্ষু মনের এই ব্যাপার অস্বীকার করেন এবং বুদ্ধি ইন্দ্রিয়প্রণালী দিয়া বস্তুতে পতিত হয় ব'লে বুদ্ধির আত্মপ্রদর্শনের প্রথম ও দ্বিতীয়ক্ষণে নির্ব্বিকল্প ও সবিকল্প বোধ জন্মে এই কথা বলেন। বুদ্ধি যে ইন্দ্রিয়-প্রণালী দিয়ে বস্তুতে সংক্রান্ত হয় এ বিষয়ে বাচস্পতি ও ভিক্ষুতে ঐকমত্য আছে; কিন্তু বস্তুপ্রত্যক্ষে মনের যে সঙ্কল্প (synthesis) বিকল্প (abstraction) বৃত্তির কথা বাচস্পতি উল্লেখ করেছেন, ভিক্ষু তা অস্বীকার করেন। যদি বুদ্ধি নিজেই ইন্দ্রিয়প্রণালীদ্বারা বস্তুতে সংক্রান্ত হয় ব'লে মানা যায়, তবে মনের স্বতন্ত্র ব্যাপার মান্‌বার কোনও আবশ্যকতা আছে ব'লে মনে করা যায় না। এমন কি ক্ষণ ভেদে নির্ব্বিকল্প সবিকল্প ভেদেরও প্রয়োজন দেখা যায় না।

এই দুই মতেই বাহ্যজগতের রূপ অবিকৃতভাবে বুদ্ধিতে গৃহীত হয় এবং চিতের সম্পর্কে, ভিতরে বাহিরে উভয়ে চিৎ প্রকাশিত হয়। কিন্তু এই দুই মত সম্বন্ধেই একটা প্রবল আপত্তি এই যে, এই দুই মতেই জ্ঞান জিনিষটাকে শুধু যেন বস্তুর ছবি তোলার মতন ক'রে দেখান হয়েছে। জ্ঞান জিনিষটা যদি শুধু ছবি তোলার মতনই একটা যান্ত্রিক ব্যাপার হোত তবে সদ্যোজাত শিশুর বস্তুজ্ঞান ও পরিণত-বয়স্ক পণ্ডিতের বস্তুজ্ঞান দুইই এক হোত। কিন্তু তা ত নয়। এই প্রসঙ্গে পূর্ব্বে গোড়ায় যে আলোচনার অবতারণা করা গিয়েছিল সেই কথায় ফিরে যাওয়া যেতে পারে। বাহ্যজগতের রূপ যে অন্তর্জগতে বর্ণরূপে ফুটে ওঠে, সেই অস্ফুট ফুটে ওঠা থেকে জ্ঞানরাজ্যের আরম্ভ। বাহ্যজগতের আলোক কম্পন জৈবজগতের নাড়ীরাজ্যে এসে নাড়ীর বিশেষ কম্পন এবং বিচিত্র জৈবপরিবর্তন ও জৈবপরিস্ফুরণে পরিণত হয়। সে পরিবর্ত্তন জড়রাজ্যের আলোককম্পনের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কিন্তু তা যতই স্বতন্ত্র হোক্ তা কোনওরূপ জ্ঞানস্ফুরণ নয়। আলোককম্পনের অনুবর্ত্তী

জৈবব্যাপারটি যখন কোনও অব্যক্ত বর্ণবোধ রূপে ফুটে ওঠে, তখন সেই ফোটাটি যতই অব্যক্ত হোক্ সেটা একটা স্বতন্ত্র রাজ্যের স্ফূর্ত্তি বা প্রকাশ। কিন্তু যেমন জৈবজগতের প্রথম প্রাণক্রিয়া অস্ফুট অথচ ক্রমশঃ উচ্চতর প্রাণিশরীরে সেই প্রাণক্রিয়ার বহুধা বিচিত্র জটিল লীলাপ্রকাশ দেখা যায়, তেম্‌নি সদ্যোজাত শিশুর অব্যক্ত অস্ফুট শব্দ স্পর্শ রূপ রসাদির বোধ বিচিত্র জ্ঞানব্যাপারে পরিণত হয়। বাহিরের আলোককম্পনের রূপটি যখন অস্ফুট বর্ণবোধ রূপে পরিণত হয় তখন সে রূপটিকে লালও বলা যায় না, নীলও বলা যায় না। এ সম্বন্ধে বৌদ্ধ, ন্যায়বৈশেষিক ও মীমাংসার অনেকটা অল্প বিস্তর ঐকমত্য দেখা যায়। ধর্ম্মকীর্ত্তির প্রত্যক্ষ লক্ষণের ব্যাখ্যাবসরে শুধু ইন্দ্রিয়দ্বারা যেটুকুকে পাওয়া যায় সেইটুকুকে ধর্ম্মোত্তর স্বলক্ষণ ব'লে বর্ণনা করেছেন। স্বলক্ষণ কথাটি সোজা কথায় বল্‌তে গেলে এই বোঝায় যে, সেটা একটা বিন্দু বটে, কিন্তু সে বিন্দুটা কি তা বলা যায় না। কারণ তার কোনও পরিচয় নাই। পরিচয় হ'তে গেলেই পূর্ব্ব দৃষ্টের সহিত এক করা চাই। এক করা ব্যাপারটি চক্ষুরিন্দ্রিয়দ্বারা হয় না, কারণ পূর্ব্বদৃষ্টটি বর্ত্তমানে চোখের সাম্‌নে উপস্থিত নাই। পূর্ব্বদৃষ্টাপরদৃষ্টং চার্থমেকীকুর্ব্বদ্ বিজ্ঞানম্ অসন্নিহিতবিষয়ম্। পূর্ব্বদৃষ্টস্য অসংনিহিতবিষয়ত্বাৎ। অসন্নিহিতবিষয়ং চার্থ-নিরপেক্ষম্...ইন্দ্রিয়বিজ্ঞানং তু সন্নিহিতমাত্রগ্রাহিত্বাদর্থসা-পেক্ষম্। ইন্দ্রিয়দ্বারা যেটুকু পাওয়া যায় সেটুকু একটা কিছু বটে, কিন্তু কি তা বল্‌বার উপায় নাই। এই কিছু যা ইন্দ্রিয়দ্বারা পাওয়া গেল তাকে যে পূর্ব্বদৃষ্টের সঙ্গে পরিচয় ক'রে দেওয়া ও ত'র যে একটা লাল বা নীল নাম দেওয়া এটা প্রত্যক্ষ দৃষ্ট নয়, এটা কল্পনার খেলা। এই কল্পনাটা যে কোথা থেকে আসে, কেমন ক'রে কখন তাকে যথাযোগ্যভাবে নিবেশ করে, সে বিষয়ে ধর্ম্মোত্তর একরূপ নিরুত্তর। ন্যায়বৈশেষিকেও নির্ব্বিকল্প, সবিকল্প এই দ্বিবিধ জ্ঞান মানা হয়েছে। কিন্তু নৈয়ায়িকেরা বলেন যে, বস্তুর প্রত্যক্ষের সঙ্গে সঙ্গে তার জাতি ও গুণ প্রভৃতিরও প্রত্যক্ষ হয়, কিন্তু সবিকল্প দশায় নাম সংযুক্ত হয় ব'লে নির্ব্বিকল্প দশায় ঐ বোধটিই নামসংযোগে স্ফুটতর হয়। আমি যখন একটি কমলা দেখি আমার চক্ষু ইন্দ্রিয় এবং স্পর্শেন্দ্রিয় যে তখন কেবলমাত্র কমলাটির রূপ ও সেই বিশিষ্ট কাঠিন্যের সহিত সংযুক্ত থাকে তা নয়, কিন্তু সেই সেই রূপ ও কাঠিন্য যে রূপ ও কাঠিন্যজাতির সহিত সমবায় সম্বন্ধে সংযুক্ত এবং যে বস্তুটিতে ঐ রূপ ও কাঠিন্য গুণদ্বয় আশ্রয় করিয়া আছে তাহাদের সহিতও সংযুক্ত হয়। প্রথম অবস্থায় এই ইন্দ্রিয়সংস্পর্শে একটা মূঢ় আলোচন জ্ঞান হয়, এবং তাহার ফলে পূর্ব্বানুভূত স্বাদও তাহার সুখসাধনত্বের স্মরণ হয় এবং তাহার ফলে ঐ ফলটিকে সুখকর ব'লে বোধ জন্মে। কিন্তু এই মনের ব্যাপার থাকা সত্ত্বেও এই ব্যাপারটিকে এই কারণে প্রত্যক্ষ বলা যায় যে, যদিও স্মরণকে এ স্থানে সহকারী বলা যায় তথাপি যেহেতু এ ব্যাপারটি ইন্দ্রিয়স্পর্শ থেকে উৎপন্ন এবং যেহেতু ইন্দ্রিয়স্পর্শকে অবলম্বন ক'রে এটি গ'ড়ে উঠেছে, সেই জন্য এ'কে প্রত্যক্ষই বলা উচিত। "সুখাদি মনসা বুদ্ধা কপিত্থাদি চ চক্ষুষা। তস্য কারণতা তত্র মনসৈবাবগম্যতে॥" (ন্যায়মঞ্জরী, পৃষ্ঠা ৬৯)। বাচস্পতি তাৎপর্য্যটীকায় ন্যায়মত ব্যাখ্যাবসরে বলেন যে, প্রাথমিক নির্ব্বিকল্পদশায় রূপ, পরিমাণ, জাত্যাদি সমস্তই পাওয়া যায় কিন্তু তথাপি তখন নাম সংযুক্ত হয় না বলিয়া "এইটি একটি কমলা" এরকম বোধ হয় না।

এই অবিকল্প অবস্থায় সেই সেই রূপাদি ব্যক্তি ও রূপসমবেত জাতি এই উভয়েরই জ্ঞান হ'লেও সেই সেই রূপাদির সহিত জাত্যাদির সহিত সেই সেই বিশিষ্ট সম্বন্ধে জ্ঞান হয় না। আলোচিত পদার্থটির মধ্যে সামান্য, বিশেষ প্রভৃতি যা কিছু আছে সমস্তই পিণ্ডাকারে গৃহীত হ'লেও সেই সেই বিশিষ্ট সম্বন্ধে সেগুলিকে জানা যায় না। (জাত্যাদিস্বরূপগাহি ন তু জাত্যাদীনাম্ মিথো বিশেষণবিশেষ্যাবগাহীতি যাবৎ তাৎপর্য্যটীকা পৃষ্ঠা ৮২)। ন্যায়কন্দলীতে শ্রীধরও বৈশেষিক মতের প্রত্যক্ষ বিচার প্রসঙ্গে এই মতেরই পোষকতায় বলেছেন যে, নির্ব্বিকল্পদশায় সামান্য (universal) এবং বিশেষ (particular) বা স্বগতভিন্নতা এ উভয়ই পরিলক্ষিত হ'লেও তৎকালে অন্য বস্তুর স্মরণ হয় না ব'লে অপেক্ষামূলক তুলনায় যে ভেদ

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

এবং ঐক্যটি প্রকাশ পায় সেইরূপভাবে সামান্যবিশেষের জ্ঞান হয় না (সামান্যং বিশেষম উভয়মপি গৃহ্ণাতি যদি পরামদং সামান্যম্ অয়ং বিশেষঃ ইত্যেবং বিবিচ্য ন প্রত্যেতি বস্ত্বন্তরানুসন্ধানবিরহাৎ পিণ্ডান্তরানুবৃত্তিগ্রহণাদ্ধি সামান্যং বিবিচ্যতে ব্যাবৃত্তিগ্রহণাদ্ বিশেষোয়মিতি বিবেকঃ—ন্যায়-কন্দলী পৃষ্ঠা ১৮৯)। এই বিষয়ে বাচস্পতি ও শ্রীধরের মতের প্রধান ভেদ এই যে, শ্রীধর যে তুলনার কথা তু'লে বলেছিলেন যে অন্যবস্তুর কথা স্মরণ হ'লে তবে তাহার সহিত সমতায় সামান্য বোধ এবং পৃথকতার ভেদ বুদ্ধি জন্মে, বাচস্পতি তা না তু'লে নামসংযোগের ফলেই সবিকল্পদশায় বিশিষ্ট বুদ্ধি জন্মে এই কথাই মাত্র বলেছেন। গঙ্গেশানুবর্ত্তী নব্যনৈয়ায়িকেরা বলেন যে, নির্বিকল্প দশায় কেবলমাত্র বিশেষণের বা গুণাদির জ্ঞান জন্মে, কিন্তু সে অবস্থায় যে বিশেষ্যকে আশ্রয় ক'রে ঐ গুণগুলি রয়েছে তার জ্ঞান হয় না। যদিও এই নির্বিকল্প জ্ঞান আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারি না তথাপি আমাদের বিশিষ্ট প্রত্যক্ষের কারণস্বরূপ এইরূপ নির্বিকল্প প্রত্যক্ষ না মান্‌লে চলে না (বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যজ্ঞানম্ প্রতি হি বিশেষণতাবচ্ছেদব প্রকারম্ জ্ঞানম্ কারণম্—তত্ত্বচিন্তামণি পৃষ্ঠা ৮১২)। এই নামজাত্যাদিযোজনারহিত বৈশিষ্ট্যানবগাহী নিষ্প্রকারক জ্ঞান আমাদের ইন্দ্রিয়ব্যাপারে প্রত্যক্ষ না হ'লেও, এই নির্বিকল্প জ্ঞানকে আমাদের সবিকল্প জ্ঞানের কারণ ব'লে মানতে হয়। কুমারিল ও প্রভাকরও বলেন যে, নির্বিকল্প দশায় সামান্য ও বিশেষ লক্ষিত হ'লেও ঐ অবস্থায় অন্য বস্তুর স্মরণ হয় না ব'লে ঐ সামান্যবিশেষের বোধ "এটি একটি কমলা লেবু" এই বিশিষ্ট বোধরূপে প্রকাশ পায় না। এ সম্বন্ধে য়ুরোপীয় দার্শনিকদের মতের বিস্তৃত উল্লেখ এই ক্ষুদ্র বক্তৃতায় করা সম্ভব নয়। তবে এ সম্বন্ধে কেবলমাত্র কান্টের উল্লেখ ক'রে বল্‌তে পারি যে, বৌদ্ধেরা যে নির্বিকল্প দশায় কোনও একটা স্বলক্ষণ কিছু দেখা যায় ব'লে মেনেছিলেন, কান্ট্ তাও মানেন না। কান্ট্ বলেন যে, ইন্দ্রিয়পথে বহির্জগৎ থেকে কিছু একটা আসে কিন্তু সেটা যে কি তা আমরা জানি না। সেই অজ্ঞাত ইন্দ্রিয়জসামগ্রীকে অবলম্বন ক'রে ইন্দ্রিয়বিকল্প তা'র উপর দিক্‌কালের সৃষ্টি ক'রে তাকে দিক্‌কালে বিশেষিত ক'রে তোলে, এবং তৎপরে মনোবিকল্পে নামজাত্যাদি নানা বিকল্পে বিকল্পিত ক'রে "এটি লাল" "এটি এই বস্তু" ইত্যাদি বিশিষ্ট প্রত্যক্ষরূপে প্রকাশ করে ও সেগুলিকে সম্বন্ধরূপে বাক্যাকারনির্দ্দিষ্ট বোধে (judgments) পরিণত করে।

এ বিষয়ে আর বহু মত উল্লেখের প্রয়োজন নাই। যতটুকু বলা হয়েছে তা'তে এটুকু দেখা যায় যে, আমাদের দেখার মধ্যেও ভাবার অংশ প্রচুর পরিমাণে রয়েছে। অস্ফুট বর্ণ বোধটি লাল বা নীল ব'লে পরিচিত হওয়ার পূর্ব্বে তার মধ্যে অনেকখানি পরিমাণে মনোরাজ্যের কাজ চলেছে। বৌদ্ধেরা এই মনোরাজ্যের স্বতন্ত্র ব্যাপারকে বিকল্প ব'লে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এ বিকল্প যে কত রকমের এবং তাদের পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক কি, তারা কেমন ক'রে ইন্দ্রিয়লব্ধ স্বলক্ষণ সামগ্রীকে পরিবর্ত্তিত করে, সে সম্বন্ধে তাঁরা কিছুই বলেন নাই। কান্ট্ এই বিকল্পের নানাবিধ বৃত্তির বিস্তৃত বিশ্লেষণ করেছেন, কিন্তু এ বিকল্পগুলির মধ্যে কোনও মূলগত ঐক্যের সন্ধান দিতে পারেন নাই। মনের মধ্যে সকলেরই যদি এই বিকল্পবৃত্তিগুলি সমানভাবে কাজ করতে থাকে তবে সদ্যোজাত ও বৃদ্ধের, মূর্খ ও পণ্ডিতের জ্ঞানবৈষম্য কেন হয় এ প্রশ্নেরও তিনি কোনও উত্তর দিতে পারেন নি। জড়জগৎ হ'তে উপলব্ধ অজ্ঞাত ইন্দ্রিয়-সামগ্রীর উপর কি উপায়ে এই বিকল্পবৃত্তিগুলি প্রভাব বিস্তার করতে পারে সে সম্বন্ধেও তিনি কিছু বলেন নি। যদি সমস্ত সম্বন্ধই এই বিকল্পের অন্তর্ভুক্ত হয় তবে বহির্লব্ধ ইন্দ্রিয় সামগ্রীর কোনও ভেদ থাকে না, এবং সেগুলি দিক্‌-কাল প্রভৃতি কোনও উপাধি বা বিশেষণে বিশেষিত না হ'য়ে বিভিন্ন বিকল্প বৃত্তিদ্বারা কি উপায়ে নানাভাবে বিচিত্রিত হ'তে পারে সে প্রশ্নেরও কোনও সমাধান হয় না। আর একটা বড় কথা হচ্ছে এই যে, কি ন্যায়বৈশেষিক, কি বৌদ্ধ, কি মীমাংসক, কি কান্ট্ সকলকেই স্মৃতিশক্তিকে মেনেই নিতে হয়েছে; কিন্তু স্মৃতিটা যে কি ব্যাপার কেহই সে প্রশ্ন পর্য্যন্ত করেন নাই। অথচ মনোরাজ্যের অধিকাংশ গূঢ় ব্যাপারই এই অতীত স্মৃতির সহিত বর্ত্ত-

মানের আহৃত জ্ঞানসামগ্রীর সহিত সম্বন্ধস্থাপনের উপর নির্ভর কর্‌ছে। ন্যায়বৈশেষিক বলেন যে, সামান্য ও বিশেষ এ উভয়ই চক্ষুরিন্দ্রিয় দ্বারা বহির্জগতেই দৃষ্ট হয়; কিন্তু তাই যদি হয়, তবে সেগুলির বোধের জন্য স্মৃতির এমন আবশ্যকতা কেন মানি, সেগুলির যদি বোধই না হয় তবে সেগুলিকে অবলম্বন ক'রে স্মৃতিশক্তিদ্বারা পূর্ব্বদৃষ্ট বস্তুগুলিকে মানসপটে উপস্থাপিত করিয়া তুলনা বৃত্তিই বা কি ক'রে সম্ভব। যেগুলি জানা আছে সেই গুলির মধ্যেই তুলনা সম্ভব। কিন্তু কতকগুলি জানা কতকগুলি না জানা, এদের মধ্যে কি ক'রে তুলনা হ'তে পারে। তা ছাড়া কি ভারতীয় কি য়ুরোপীয় দর্শনশাস্ত্র এ'র কোনও বিভাগেই জ্ঞানের সহিত জ্ঞান বিভিন্ন থাকিয়াও কেমন ক'রে সংশ্লিষ্ট হয়, কেমন ক'রে পূর্ব্বাহৃত জ্ঞানসঞ্চয় পরকালের আহৃত জ্ঞানের প্রকার ও তাৎপর্য্যকে বিশেষিত ও পরিবর্ত্তিত করতে পারে তার কোনও কথাই বলেন নি। ন্যায়বৈশেষিক বলেন যে, কতকগুলি জ্ঞানসামগ্রীর সন্নিবেশে ও সংঘটনে আত্মার জ্ঞান উৎপন্ন হয়, এবং এইরূপে নূতন নূতন সামগ্রীর সন্নিবেশে আত্মায় নূতন নূতন জ্ঞান উৎপন্ন হয়। এই কথা যদি সত্য হয় তবে এই যে একটি জ্ঞান বিনষ্ট হয় এবং অপর আর একটি উৎপন্ন হয় এদের মধ্যে কি ক'রে সম্পর্ক স্থাপিত হয়, স্মরণই বা কি ক'রে সম্ভব হয়। এর উত্তরে হয়ত এ কথা বলা যায় যে, নূতন জ্ঞান যখন উৎপন্ন তখন পূর্ব্বজ্ঞানটি সংস্কাররূপে আত্মায় থাকে এবং পুনরায় সাদৃশ্য বোধে উদ্বুদ্ধ হয়। কিন্তু জ্ঞানটি সংস্কারে পরিণত হয় এবং সংস্কার থেকে পুনরায় জ্ঞান হয় এ কথার অর্থ কি, কোনও দার্শনিকই এ প্রশ্নের বিচার করেন নি। সংস্কারাবস্থায় স্থিত অনুদ্বুদ্ধ জ্ঞানের সহিত নির্বিকল্পস্থ মূঢ় জ্ঞানসামগ্রীরই বা কিরূপে সাদৃশ্য বোধ হয় এবং সেই সাদৃশ্যবোধই বা কার হয় এবং কিরূপেই বা এই সাদৃশ্যবোধ থেকে স্মরণ হয়, এসমস্ত প্রশ্নেরই আজ পর্য্যন্ত কোনও তথ্য নির্দ্ধারণ করা হয় নাই। এই সম্বন্ধে আমাদের দেশে যা কিছু আলোচনা হয়েছে তার মধ্যে যোগশাস্ত্রের আলোচনাটিই অপেক্ষাকৃত গভীর। যোগশাস্ত্রের মতে জ্ঞানের প্রকারটি বুদ্ধিরই একটি প্রকারভেদ মাত্র। চিদাভাসের দ্বারা এই বুদ্ধির প্রকার ভেদটি জ্ঞানাকারে প্রতিভাত হয় এবং বুদ্ধির অন্য আর একটি প্রকার উত্থাপিত হ'লে বুদ্ধির পূর্ব্ব প্রকারটি তা'র নিজের মধ্যে তিরোহিত হয়। এই তিরোহিত প্রকারটির নাম সংস্কার। বুদ্ধির মধ্যে যে এই সংস্কারের সঞ্চয় হয় এই দিক্‌ দিয়ে দেখ্‌তে গেলে বুদ্ধিকে চিত্ত বলে। অনাদি জন্মপরম্পরাসঞ্চিত সংস্কার গুলি এই ভাবে চিত্তের মধ্যে সঞ্চিত হয়। বুদ্ধির কোনও তিরোহিত প্রকার বা সংস্কারটি যখন উদ্বুদ্ধ হ'য়ে বুদ্ধিতে প্রকট হ'য়ে উঠে তখনই তাকে স্মৃতি বলে। এই ভাবে জ্ঞান থেকে সংস্কার এবং সংস্কার থেকে স্মৃতি এবং স্মৃতি থেকে পুনরায় সংস্কার এইরূপ পরম্পরা সর্ব্বদাই চলেছে। এবং এই জন্য বুদ্ধিরূপে যা কিছু প্রকাশ পেতে পারে তা সংস্কার দ্বারা অনেকটা পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হয় এবং অপর দিকে বুদ্ধিরূপে যা প্রকাশ পায় তা' নূতন সংস্কারকে উৎপন্ন ক'রে পূর্ব্ব সংস্কারকে পরিবর্ত্তিত করতে পারে। কিন্তু এই ব্যাখ্যার একটা প্রধান দোষ এই যে, এই মতটিতে বুদ্ধিকে একেবারে জড়বস্তুর ন্যায় ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেইজন্য এই মতের ব্যাখ্যাটি অনেক পরিমাণে বর্ত্তমান কালের মানসিক ব্যাপারের যে সমস্ত physiological এবং mechanical explanation দেখিতে পাওয়া যায় এ গুলিও অনেকটা সেই রকমের। এ মতে সমস্ত মানসিক ব্যাপারটাই একটা জড়ব্যাপার, কেবলমাত্র বুদ্ধির কোনও একটি বিশেষরূপ যখন পুরুষের চিদাভাসযুক্ত হয় তখন সেই রূপটি চেতন হ'য়ে ওঠে। কিন্তু মানুষের চিত্ত যদি অনাদি জন্মপরম্পরাসঞ্চিত সংস্কারে পূর্ণ হয়েই থাকে তবে শিশু ও পরিণতবয়স্কের মধ্যে পার্থক্য কেন দেখা যায়? Physiological ব্যাখ্যার মধ্যে না গিয়েও আজকাল ফ্রয়েড্‌ শিষ্যেরা sub-conscious mind এর নানা layerএ পূর্ব্বানুভূত বিষয় অভিলাষ প্রীতি অপ্রীতি প্রভৃতি সংস্কাররূপে সঞ্চিত হয় এ কথা জোর গলায় বলতে আরম্ভ করেছেন, কিন্তু mind জিনিষটি কি একথার ধার দিয়েও তাঁরা যান না, অথচ তাঁরা mindকে জড় ব'লেও স্বীকার করেন না। Mind যদি জড়ই না হয় তবে তার layer বা পর্দ্দা থাকা কিরূপে সম্ভব হয় এবং

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

পর্দ্দায় পর্দ্দায় পূর্ব্বানুভূত বিষয় সঞ্চিতই বা কিরূপে হয়। যদি যোগের মত অবলম্বন ক'রে বুদ্ধিকে একান্তই জড় ব'লে স্বীকার করি তবে হয়ত বুদ্ধির পর্দ্দায় পর্দ্দায় সংস্কার সঞ্চিত হয় একথা বেশ চল্‌তে পারে; কিন্তু তা হ'লে বিভিন্ন সংস্কারগুলি ও বুদ্ধির চিদাভাসসম্পন্ন জ্ঞানরূপটি ইহারা প্রত্যেকে পরস্পর দৈশিক বিচ্ছেদে বিচ্ছিন্ন। এই ভাবে দৈশিক বিচ্ছেদ মান্‌তে গেলে কোনও জ্ঞানের মধ্যেই কোনও সংস্কারকে পাওয়ার উপায় নেই এবং সেই জন্য কোনও জ্ঞানের মধ্যেই পূর্ব্বানুভূত বিষয়ের প্রভাব থাকা উচিত নয়: অথচ আমরা প্রতি পদেই দেখ্‌তে পাই যে, আমাদের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এবং অনুভূত বিষয়ের বৈচিত্র্য অনুসারে আমাদের প্রত্যেকটি জ্ঞানের যে শুধু একটি প্রকারের বৈশিষ্ট্য ঘটে তা নয়, প্রত্যেকটি জ্ঞানের সঙ্গে সেই জ্ঞানকে ছাড়িয়ে তার নানামুখী তাৎপর্য্য (যাকে ইংরেজী পরিভাষায় meaning বলা যায়) হীরকের প্রভার ন্যায় তার চারিদিকে ওতপ্রোত-ভাবে জড়িত রয়েছে; এই তাৎপর্য্য ছাড়া শুধু জ্ঞান মূক; এই তাৎপর্য্যের বিশেষত্ব এই যে, এতে আমাদের প্রত্যেকটি জ্ঞান সমস্ত পূর্ব্বানুভূত বোধ শরীরের মধ্যে ঠিক কি ভাবে গ্রথিত হচ্ছে সেইটি ইঙ্গিত ক'রে সূচনা করে। একজন উদ্ভিদ্বিৎ একটা গাছকে, কি একজন চিত্রী একটি চিত্রকে যে ভাবে দেখে সে দেখা একজন সাধারণ লোকের দেখা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক্। উদ্ভিদ্বিৎ বা চিত্রীর যে উদ্ভিদ বা চিত্র দেখে নানাকথা মনে পড়ে সেই জন্য যে তার দেখার সঙ্গে অন্যের দেখার তফাৎ তা নয়, কিন্তু দেখার সঙ্গে সঙ্গে অনেক কথা স্পষ্ট ভাবে স্মরণ না হ'য়েও তাদের যে কোনও দেখাটিই তার সমস্ত জীবনব্যাপী দেখা ও জানার ইতিহাসের সঙ্গে এমন ভাবে জড়িত এবং সেই জড়ানর জন্য এমন একটি বিশিষ্টভাবে বিশেষিত ও এমন কতকগুলি বিশেষ বিশেষ সঙ্কেত, ইঙ্গিত বা তাৎপর্য্যের দ্বারা উদ্ভাসিত যে, সেই দেখাটির মধ্যে সমস্ত জীবনের দেখা জানার ইতিহাসের একটি বিশেষ রকমের ছোপ্ লেগে থাকে। এই যে প্রত্যেক দেখার সঙ্গে আমাদের প্রত্যেকের জীবনের দেখা-জানার ইতিহাসের একটা মণি-বিচ্ছুরণ, একটা তাৎপর্য্য-ইঙ্গিত অনুষক্ত থাকে এটাকে স্মরণ বলা চলে না, সংস্কার বলা চলে না, অথচ এইটির দ্বারা সেই দেখাটির যথার্থ বিশিষ্টতা-টুকু প্রকাশ পায়। মনোরাজ্যের ব্যাপার এত জটিল এত বিস্তৃত যে, তার একটা মোটামুটি রকমের বিশ্লেষণ করতে গেলেও একটা বিরাট্ গ্রন্থ লেখবার আবশ্যক, এতটুকু ক্ষুদ্র প্রবন্ধে কখনও সে কায করা চলে না। কিন্তু একটু চিন্তা করলেই দেখা যায় যে, জীবরাজ্যের ব্যাপারের চেয়েও মনোরাজ্যের ব্যাপার আরও জটিল, আরও অনেক বিচিত্র, আরও গূঢ় ও দুষ্প্রবেশ্য। Psychology ও Epistemology এই দুই দিক্ দিয়ে মনোরাজ্যের ব্যাপার গুলি বুঝ্‌বার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা চলেছে, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত Mind জিনিষটা যে কি তা আমরা একরকম কিছুই জানিনা এবং মনোরাজ্যের ব্যাপারগুলির যতটুকু আমাদের কাছে ধরা পড়েছে তার অনেক বেশীগুণ জিনিষ আমাদের অজ্ঞাত রয়েছে। একটুখানি অস্ফুট ইন্দ্রিয়সামগ্রী থেকে একটু অস্ফুট বর্ণবোধ স্পর্শবোধ বা শব্দবোধ; এবং সেই থেকেই মনোরাজ্যের ব্যাপারের আরম্ভ; আর তারপর বরাবর এর নিগূঢ় রহস্যের বিচিত্র লীলাময় ব্যাপার। মানসিক ব্যাপারগুলি শারীর ব্যাপার থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব'লেই আমরা অনুভব করি এবং এই স্বাতন্ত্র্য ও পৃথকত্ব এত বহুল পরিমাণে সর্ব্বজন-স্বীকৃত ও মনোবিজ্ঞান শাস্ত্রে (Psychology) সুগৃহীত যে, কোনও মানস ব্যাপারের ব্যাখ্যা করতে গেলে শারীর প্রক্রিয়া দিয়ে তার ব্যাখ্যা করা চলে না। হয়ত প্রত্যেক মানস ব্যাপারের অন্তরালে আমাদের মস্তিষ্কের মস্তলুঙ্গের মধ্যে তদনুপাতী নাড়ীপদার্থের মধ্যে নানারূপ আশ্লেষ বিশ্লেষের কাজ চলেছে, কিন্তু তাই ব'লে আমাদের কোনও দার্শনিক চিন্তা বা অন্যবিধ তত্ত্বচিন্তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে যদি কেউ বলে যে ঐ চিন্তাটির মূল্য আর কিছুই নয়, এ কেবলমাত্র মস্তিষ্কের কোনও অংশের মস্তলুঙ্গ পদার্থের অর্দ্ধ আউন্সের ঈষৎ স্থান সম্বরণ বা আশ্লেষণ বিশ্লেষণ মাত্র, তবে সে ব্যাখ্যাটি কি নিতান্তই বাতুলের মত হবে না। প্রত্যেক চিন্তার সঙ্গে সঙ্গেই হয়ত মস্তলিঙ্গ পদার্থের কোনও না কোনও পরিবর্ত্তন ঘটে, কিন্তু সে পরিবর্ত্তন সম্পূর্ণরূপেই জৈব পরি-বর্ত্তন; সে পরিবর্ত্তনে শুধু এইটুকুমাত্র বুঝা যায় যে জৈব

ব্যাপারের সঙ্গে মনোব্যাপারের একটা অত্যন্ত নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, কিন্তু সে সম্বন্ধ যতই ঘনিষ্ঠ হ'ক্ তাতে কখনই মনোব্যাপারের স্বরূপকে বা পদ্ধতিকে কোনও রূপে স্পষ্টতরভাবে ব্যাখ্যা বা প্রকাশ করতে পারে না। যেমন জৈবব্যাপারের পিছনে সর্ব্বদাই নানারকম মতব্যাপার কাজ করছে, এবং এক হিসাবে যদিও জৈবশক্তিকে জড়-শক্তিরই বিকার ব'লে মনে করা যেতে পারে, কিন্তু তথাপি জৈব ব্যাপার জড়ব্যাপার থেকে সম্পূর্ণ পৃথক্, তেম্‌নি মনোব্যাপার ও জৈবব্যাপারের সহিত ওতপ্রোত ভাবে জড়িত থাকলেও জৈব ব্যাপার থেকে সম্পূর্ণ পৃথক্ এবং জৈব ব্যাপারে কোনও ব্যাখ্যাতেই মনোব্যাপারের কোনও ব্যাখ্যা হয় না। কারণ এ দুটি রাজ্যের ব্যাপার পরস্পর এতই পৃথক্ যে জৈব ব্যাপারের যতই সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করা যাক্ না কেন, জৈব ও মনোব্যাপারের পরস্পরানুপাতিত্ব নির্ধারণ করতে যতই চেষ্টা করি না কেন, মনোব্যাপারের প্রকৃতি জৈব ব্যাপারের প্রকৃতি থেকে এতই সম্পূর্ণভাবে বিভিন্ন যে মনোরাজ্যের সমস্ত ব্যাপারগুলি তদনুপাতী জৈব ব্যাপার থেকে সম্পূর্ণ একটা স্বতন্ত্র রাজ্যের। আধুনিককালে Russell, Watson প্রভৃতি মনোব্যাপার-গুলিকে জৈবব্যবহারের উপমায় ব্যাখ্যা করতে অনেক চেষ্টা করেছেন এবং প্রাচীনকালেও স্বয়ং শঙ্করাচার্য্য এই সাদৃশ্য লক্ষ্য ক'রে বলেছেন, "পশ্বাদিভিশ্চাবিশেষাৎ। যথা হি পশ্বাদয়ঃ শব্দাদিভিঃ শ্রোত্রাদীনাং সম্বন্ধে সতি শব্দাদিবিজ্ঞান প্রতিকূলে জাতে ততোনিবর্ত্তন্তে, অনুকূলে চ প্রবর্ত্তন্তে। যথা দণ্ডোদ্যতকরং পুরুষমভিমুখমুপলভ্য মাং হন্তুময়ম্ ইচ্ছতি ইতি পলায়িতুমারভন্তে, হরিততৃণপূর্ণপাণি-মুপলভ্য তংপ্রত্যভিমুখা ভবন্তি। এবং পুরুষা অপিব্যুৎপন্নচিত্তাঃ ক্রূরদৃষ্টান্ আক্রোশতঃ খড়্গোদ্যতকরান্ বলবত উপলভ্য ততোনিবর্ত্তন্তে, তদ্বিপরীতান্ প্রতি প্রবর্ত্তন্তে অতঃ সমানঃ পশ্বাদিভিঃ পুরুষাণাং প্রমাণপ্রমেয়ব্যবহারঃ। পশ্বাদীনাং চ প্রসিদ্ধোঽবিবেকপুরঃসরঃ প্রত্যক্ষাদিব্যবহারঃ। তৎসা-মান্যদর্শনাৎ ব্যুৎপত্তিমতামপি প্রত্যক্ষাদিব্যবহারস্তৎকালঃ সমান ইতি নিশ্চীয়তে। কিন্তু যদিও আমাদের অনেক বাহ্যব্যবহারের সঙ্গে পশু ব্যবহারের কথঞ্চিৎ সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু মনোব্যাপারের অনেকগুলিই এমন যে সে গুলিকে কিছুতেই পশুব্যবহারের সাদৃশ্যে ব্যাখ্যা করা যায় না। এবং Russell প্রভৃতিরা অনেক চেষ্টা করিয়াও যে সমস্ত সাদৃশ্য দেখাতে সক্ষম হয়েছেন, সেটুকু মনোব্যাপারের অতি অল্প স্থানই অধিকার করে। এই ব্যবহারিকদিগের (Behaviourist) মতে যেটুকু সত্যত' আছে তাতে শুধু এইটুকু প্রমাণ হয় যে যেমন জড়ব্যাপারের খানিকটা অংশ জৈবব্যাপারের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হ'য়ে রয়েছে তেম্‌নি জৈবব্যাপারেরও খানিকটা অংশ মনোব্যাপারের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হ'য়ে রয়েছে। উঁচু উঁচু ধাপের প্রাণিবর্গের মধ্যে যেমন দেখা যায় যে তারা তাদের প্রয়োজন অনুসারে অর্দ্ধমূঢ়ভাবে জীবনযাত্রার অনুকূল কার্য্যে তৎপরতা দেখায় এবং প্রতিকূল কার্য্য থেকে নিবৃত্ত হয়, মানুষের মধ্যেও তা অনেক পরিমাণে দেখা যায়, কারণ মানুষও একটি প্রাণিবিশেষ; কিন্তু মানুষের মধ্যে জৈবকার্য্যের বা জীবনযাত্রাকার্য্যের সহিত সম্পূর্ণ অসংশ্লিষ্টও অনেক এমন ব্যাপার দেখা যায় যাকে কিছুতেই জৈব ব্যাপারের অন্তর্গত ব'লে মনে করা যেতে পারে না। এইটিই হচ্ছে যথার্থভাবে মনোরাজ্যের অধিকার। Russell বলেছেন, "Man has developed out of the animals, and there is no serious gap between him and the amoeba. Something closely analogous to knowledge and desire as regards its effects on behaviour exists among animals even where what we call 'consciousness' is hard to believe in; something equally analogous exists in oursIves in cases where no trace of 'consciousness' can be found. It is therefore natural to suppose that, whatever may be the correct definitions of consciousness, consciousness is not the essence of life or mind. কিন্তু এই কথা প্রমাণ করতে গিয়ে Russell তাঁর Analysis of Mindএ যে সমস্ত উদাহরণ দিয়েছেন এবং বিশ্লেষণ করেছেন তার অধিকাংশই হচ্ছে মানুষের জীবনের সেই দিকটা দিয়ে যে দিকটায় সে জৈবযাত্রার প্রয়োজনের সহিত

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

সম্বন্ধ বা যেদিকটায় মানুষ জড়প্রকৃতির সহিত সম্বন্ধ। কিন্তু আমাদের চিন্তাপ্রণালীর মধ্যে এবং গোটা মনোব্যাপারের আত্মগতি আত্মনিয়ম আত্মপ্রতিষ্ঠার মধ্যে সম্পূর্ণ নূতনরাজ্যের নূতন নূতন নিয়মপদ্ধতি দেখ্‌তে পাই যেগুলিকে কিছুতেই জৈবব্যাপারের কোঠায় ফেলা যায় না। কেমন ক'রে একটা অস্ফুট বর্ণবোধ ক্রমশঃ সঞ্চিত হ'য়ে স্ফুট লাল বা নীল বোধে পরিণত হয়, কেমন ক'রে বোধের মধ্যে বোধ সঞ্চিত থেকে স্মৃতিরূপে প্রকাশ পায় এবং সংস্কাররূপে থেকে জ্ঞানের প্রকারকে তাৎপর্য্যসমন্বিত করে, কেমন ক'রে বিশেষ বা concrete থেকে সামান্য বা universals এর নানা সম্পর্ক বিচার ক'রে সেই প্রণালীতে বিশ্বের নানা তথ্যকে জ্ঞানের জালের মধ্যে ধ'রে রাখে,কেমন ক'রে নানা বিচ্ছিন্নতার মধ্যে নানা জ্ঞানধারা, ইচ্ছাধারা, সুখ দুঃখ, প্রীতি অপ্রীতি, কুশলাকুশলের বিচিত্র বিভিন্নধারার মধ্য দিয়া মনোজীবনের ঐক্যটি নির্ব্বাহিত হয়, তা কোনও রূপেই ব্যাখ্যা করা যায় না বা তার কারণ নির্দ্দেশও করা সম্ভবপর নয়।

তাহা হইলে স্থূল কথা দাঁড়িয়েছে এই যে জড়রাজ্য, জীবরাজ্য ও মনোরাজ্য এই তিনটি রাজ্য পরস্পরসম্বদ্ধ হ'য়ে রয়েছে—জড়রাজ্য জীবরাজ্যে অনুপ্রবিষ্ট এবং জীবরাজ্য মনোরাজ্যের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট, অথচ প্রত্যেকটি রাজ্যের সমস্ত ব্যাপারেই তার নিজের বিশিষ্ট নিয়মে চালিত হয় এবং কোনও রাজ্যের নিয়মের দ্বারা কোনও রাজ্যের ব্যাপারের ব্যাখ্যা করা চলে না। প্রত্যেকটি রাজ্যের নানা ব্যাপারের মধ্যে যে একটি ঐক্য আছে সে ঐক্যটির অর্থ সামঞ্জস্য অর্থাৎ তাহার কোনও ব্যাপারটি অপর ব্যাপারগুলিকে অতিবর্ত্তন বা অতিক্রম করে না এবং পরস্পর পরস্পরের সহযোগে চলে এবং পরস্পরের সহিত পরস্পরে গ্রথিত হ'য়ে যে ইতিহাস রচনা করে সেই ইতিহাসের আনুগত্যে প্রত্যেকটি ব্যাপারের পদ্ধতি ও প্রণালী নিরূপিত হয়। এম্‌নি ক'রে প্রত্যেকটির নিজ নিজ রকমের স্বাতন্ত্র্য থেকেও সমগ্রের নিয়মের দ্বারা প্রত্যেকটি সমগ্রের অনুকূল ব্যবহারে নিয়ন্ত্রিত থাকে। কিন্তু তিনটি রাজ্যের মধ্যে পরস্পরের যে ঐক্য সে ঠিক্ এ জাতীয় ঐক্য নয়। সে ঐক্যের অর্থ তদর্থযোগিতা, অর্থাৎ একটি যে অপরটির কাজে লাগতে পারে, এ সেই জাতীয় ঐক্য। এই ঐক্যের নিয়মে জড়বস্তু জীবোপযোগী কার্য্যে ব্যবহৃত হ'য়ে জীবের সহায়ক হয়, আবার জৈব ব্যাপারগুলি মনোব্যাপারের সাহায্যে লেগে মনোরাজ্যের কাজে লাগে। এই ঐক্যের তিনটি রাজ্যের মধ্যে পরস্পর আদান প্রদান চ'লে প্রত্যেকটি রাজ্যকে গৌণমুখ্যভাবে অপর দুইটি রাজ্যের সহায়তায় নিযুক্ত করে। বিশ্বময় আমরা এই তিনটি রাজ্যের আদান প্রদানের পালায় নূতন নূতন সৃষ্টিপরম্পরা দেখ্‌তে পাই। এক্ দিকে দেখ্‌তে পাই যে জৈব শক্তি চক্রের সহিত জড়শক্তি চক্রের পরস্পরের অনুযোগিতায় ও সঙ্ঘর্ষে ও এই অনুযোগিতা ও সঙ্ঘর্ষের বিবিধবৈচিত্র্যে নানা জীব পরম্পরা গ'ড়ে উঠ্‌ছে। Struggle for existence or law of natural selection এ দুইটিই এই জীবজড় সঙ্ঘর্ষের নামান্তরমাত্র, আবার law of accidental, variation, law of mutation প্রভৃতি নানাবিধ বৈষম্যের মধ্যে জড়ের যে জীবানুযোগিতা আছে ও জৈবশক্তিচক্রের যে জড়জগৎ হইতে আহরণ করিবার ক্ষমতা আছে তাহারই পরিচয় পাওয়া যায়। এসম্বন্ধে বিশদ ব্যাখ্যা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে অসম্ভব। আবার অপরদিকে জৈবরাজ্যের ঠিক কোন্ স্থান থেকে মনোরাজ্যের বিচ্ছুরণ আরম্ভ হয়েছে তা বলা কঠিন। মনুষ্য পর্য্যন্ত পৌঁছবার পূর্ব্বে অনেকদূর পর্য্যন্ত উচ্চতর প্রাণিজীবনে দেখতে পাই যে মনোরাজ্যের আত্মপ্রকাশ অনেকখানি পরিমাণে জৈবরাজ্যের সঙ্ঘর্ষে ঘৃষ্ট হ'য়ে জৈব ব্যাপারের দ্বারা কবলিত হয়ে instinctive habit বা behaviour রূপে প্রকাশ পায়। মানুষের মধ্যে এসে দেখি যে, জৈবশক্তির পরিপুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে মনোরাজ্যের শক্তিও স্ফুটতর হ'য়ে ওঠে। কিন্তু তথাপি একটু অনুধাবন করলেই দেখা যায় যে, মনোব্যাপারের যতখানিকে আমরা নিছক মনোব্যাপারেরই অন্তর্ভুক্ত ব'লে মনে করি ঠিক ততখানিই যে খাঁটি মনোরাজ্যের ব্যাপার তা নয়। জৈবশক্তির অনেকখানি পরিমাণে মনোব্যাপারের মধ্যে অন্তর্নিবিষ্ট হ'য়ে মনঃশক্তিরূপে প্রকাশ পায়, আবার মনঃশক্তিরও অনেকখানি জৈবশক্তি দ্বারা অভিভূত হ'য়ে আত্মপ্রকাশ কর্‌তে পারে না। শুধু তাই নয়, সুখ দুঃখ প্রীতি বিষাদ প্রভৃতি যে গুলিকে আমরা খাঁটি মনোনুভূতি ব'লে মনে করি সেগুলিও অন্তত খানিকটা

পরিমাণে জৈবক্ষুধা বা জৈব আকর্ষণ প্রভৃতির প্রতিবিম্ব মাত্র। আর এই জৈবপ্রয়োজন সিদ্ধির দাবী জৈব অর্থ অর্থির দাবী মনোব্যাপারের মধ্যে সংক্রান্ত হয়ে মনোব্যাপারের নানা প্রকার সৃষ্টিরও নিয়ামক হ'য়ে ওঠে। একেও প্রকারান্তরে এক রকমের voluntarism বলা যায়। বৌদ্ধ ও যোগমতের বাসনা-বাদে শঙ্করাচার্য্যের অর্থ অর্থির দাবী স্বীকারের মধ্যেও বৌদ্ধদের অর্থক্রিয়াকারিত্ববাদের মধ্যে এই শ্রেণীর voluntarism এর পরিচয় পাওয়া যায়। বর্ত্তমান কালের pragmatism বা behaviourism এর মধ্যেও এর পরিচয় পাওয়া যায়। এই সমস্ত মতবাদের অনেকগুলির মধ্যেই কিছু না কিছু সত্য আছে, কিন্তু এঁদের ভ্রান্ততা এইখানে যে এঁরা একপেশে ভাবে কেবল তাদের দিক্ থেকেই সমস্ত জিনিষটা দেখ্‌তে চেয়েছেন। সত্য দর্শনশাস্ত্র তাকেই বলা যাবে যেটিতে সব দিক থেকে সত্য নির্দ্ধারণ করবার চেষ্টা থাক্‌বে। কোনও একদিকে প্রবল ক'রে দেখে যাঁরা অন্যদিক্‌গুলিকে খাট ক'রে দিতে চান বা উড়িয়ে দিতে চান তাঁদের দৃষ্টি একদেশী এবং তাঁদের দর্শনও একদেশী। কিন্তু শুধু যে জৈব ও মনো-ব্যাপারের মধ্যে দান প্রতিদান উপযোগিতা ও বিরোধিতা চলেছে তা নয়, প্রতি কেন্দ্রে প্রতি মানুষে যে মনোব্যাপার চলেছে, ভাষার মধ্য দিয়ে মুখ চক্ষু অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ইঙ্গিতের মধ্য দিয়ে অনবরত তাদের পরস্পরের যে বিনিময় চলেছে প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র মনোরাজ্য গঠনে তার স্থান বড় কম নয়। বস্তুত জৈবরাজ্যের কবল থেকে মানুষের মধ্যে যে একটি স্বতন্ত্র মনোরাজ্য গ'ড়ে উঠ্‌তে পেরেছে তার সর্ব্বপ্রধান কারণই হচ্ছে মনে মনে আদান প্রদান। জৈব জগতে যেমন দেখা যায় যে, বিভিন্ন জীবকোষের সান্নিধ্যে ও সাহচর্য্যেই উচ্চতর প্রাণীর জীবনে প্রত্যেক জীবকোষের জীবনে একটি অভূতপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য এনে দেয়, আবার সেই বৈশিষ্ট্যের দ্বারা জীবকোষ সমষ্টির মধ্যে একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য জন্মে এবং জীবকোষসমষ্টির বৈশিষ্ট্য দ্বারা প্রত্যেক জীবকোষের আবার একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য জন্মে, এখানেও তেম্‌নি নানা মনের সান্নিধ্যে ও সাহচর্য্যে প্রত্যেকটি মন তার নিজের মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্বাতন্ত্র্য লাভ করে এবং প্রত্যেক মনের এই বিশিষ্ট স্বতন্ত্রতার দ্বারা মনঃসমষ্টি ব'লে একটি স্বতন্ত্র মনোরাজ্যের সত্তা উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে, এবং এই মনোরাজ্যের বিশিষ্ট প্রকৃতির দ্বারা আবার প্রত্যেকটি মন অনুভাবিত হ'য়ে ওঠে। মানুষ যদি মানুষের মধ্যে সমাজের মধ্যে বেড়ে না উঠ্‌ত তবে মানুষের মন তার জৈবপ্রকৃতি থেকে কখনই নিজেকে উপরে তার নিজের যথার্থ রাজ্যের মধ্যে ভাসিয়ে তুল্‌তে পারত না। Trans-subjective ও intra-subjective intercourse এর যদি অবসর মানুষ না পেত তবে মানুষের মন কখনই তার চিন্ময় ও চিন্তাময়রূপে বেড়ে উঠ্‌তে পারত না।

এতক্ষণ যা কিছু বলা হোল তার তাৎপর্য্য হচ্ছে এই যে, মন ব'লে কোন একটি স্বতন্ত্র বস্তু বা শক্তি নেই, কতকগুলি বিশিষ্ট ব্যাপারপরম্পরা ও নিয়মপরম্পরাকে সংক্ষিপ্তভাবে বোঝাবার জন্য মন শব্দটি ব্যবহার করছি। যেমন জড়রাজ্য জৈবরাজ্য, তেম্‌নি মন বল্‌তেও একটি স্বতন্ত্র রাজ্য বোঝা যায়। এই রাজ্যের ব্যাপারপরম্পরা ও নিয়মপরম্পরার কোথায় সামঞ্জস্য, কোথায় তাদের বিশেষত্ব, ব্যক্তিত্ব, কি তাদের প্রকারপরম্পরা এ আলোচনা এ প্রবন্ধে সম্ভবপর নয়। এখন শুধু এই কথা বল্‌তে চাই যে জৈব রাজ্যকে আশ্রয় ক'রে স্তরে স্তরে অস্ফুট থেকে স্ফুটতরভাবে এই মনোরাজ্য তার বিচিত্র ব্যাপারপরম্পরা ও নিয়মপরম্পরার মধ্য দিয়ে আপনাকে প্রকাশ ক'রে তুলেছে। জৈবরাজ্যের প্রত্যেকটি জীবকোষের মধ্যে যে ব্যক্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্য দেখ্‌তে পাই, সে ব্যক্তিত্ব মূঢ়, সে ব্যক্তিত্বের মূল হচ্ছে জৈবব্যাপারের নিয়মকেন্দ্র, সামঞ্জস্যকেন্দ্র; তার প্রত্যেকটি ব্যাপার যে তার অন্য ব্যাপারগুলিকে অপেক্ষা ক'রে চলে, এবং প্রত্যেকটি ব্যাপার যে অন্য ব্যাপারগুলির আনুকূল্যে আপনাকে ব্যক্ত করতে চায়, কোনও সম্বন্ধটিই যে স্থির হ'য়ে না থেকে অপর সম্বন্ধগুলির সহিত স্বতই আবর্ত্তিত হ'তে থাকে, এইখানেই জীবকোষের ব্যক্তিত্বের মূল। কিন্তু মনোরাজ্যের ব্যক্তিত্বটিকে আমরা self ব'লে আত্মা ব'লে অনুভব ক'রে থাকি। কিন্তু আমি এতক্ষণ যা বলেছি তাতে আত্মা ব'লে কোনও স্থায়ী বস্তুর কথা বলিনি। এখনও বলিতে চাই নে। যা চাই সে হচ্ছে, এই আত্মপ্রত্যয়ের একটি ব্যাখ্যা দেওয়া। আত্মা কাকে বলে এ কথা নিয়ে আমাদের দর্শন

শাস্ত্রে খুব বিচার হয়েছে ; বৌদ্ধেরা বলেছেন যে আত্মা ব'লে কোনও স্বতন্ত্র বস্তু নেই ; রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান এই পঞ্চ স্কন্ধ বা বিবিধ psychological entitiesএর সমষ্টি ছাড়া কোনও স্বতন্ত্র আত্মা নেই। বেদান্ত বলেছেন যে, বিশুদ্ধ চিৎপ্রকাশের নামই আত্মা, কিন্তু আমি বল্‌তে আমরা যা বুঝি সেটা হচ্ছে এই অসীম চিৎপ্রকাশের একটা অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন মিথ্যা রূপ। ন্যায় বলেছেন যে, আত্মা হচ্ছে জড়বৎ একটি বস্তু, সে বস্তুকে আমাদের এই জন্য মান্‌তে হয় যে তা না হ'লে জ্ঞান, ইচ্ছা প্রভৃতি গুণগুলির ত কোনও একটা থাক্‌বার আশ্রয় চাই, কারণ গুণমাত্রকেই কোনও বস্তুকে আশ্রয় ক'রে থাক্‌তে হবে, অথচ আমাদের জানা এমন আর কোনও বস্তু নেই যাকে জ্ঞানের আশ্রয় বলা যায়। এর কোনও মতের সহিতই আমি সায় দিতে পারি নে। চিৎপ্রকাশ ব'লে স্বতন্ত্র একটি পদার্থ কেন মানি নে সে কথা সংক্ষেপে পূর্ব্বেই বলেছি। ন্যায়ের আত্মা প্রত্যক্ষানুভূতির উপর স্থাপিত নয় ব'লে তারও কোন বিচার করা প্রয়োজন মনে করি নে। বৌদ্ধমতের বিরুদ্ধে আমার প্রধান আপত্তি এই যে, প্রতিমুহূর্ত্তের ক্ষণধ্বংসী স্কন্ধসমষ্টি ছাড়া তাঁরা কোনও স্থায়ী আত্মা স্বীকার করেন না। অথচ আমরা আত্মা বা self বল্‌তে যা বুঝি সেটা শুধু চিৎপ্রকাশও নয় বা মুহূর্ত্তের চিন্তা ভাব প্রভৃতির সমষ্টিও নয়। আত্মা বা self বল্‌তে যা বুঝি সেটা হচ্ছে একটা জীবনের সমস্ত অনুভূতির সমস্ত experienceএর একটা সঞ্চিত ইতিহাসের অভিব্যক্তি। জৈবরাজ্যের সঙ্গে মনোরাজ্যের পরস্পরের সঙ্ঘর্ষ ও আদান প্রদানে, বিভিন্ন মনের পরস্পরের আদান প্রদানে, জৈবসংযোগের মধ্য দিয়ে জড়রাজ্যের সহিত আদান প্রদানে, জৈবপ্রয়োজনের অর্থার্থির ব্যবহারে, মনোরাজ্যের নানা ব্যাপারের সংযমন নিয়মনে যা কিছু মনে ভেসে উঠ্‌ছে এবং ডুবে যাচ্ছে, তার সবগুলিই একটা বিশিষ্ট নিয়মে পরস্পর অন্তর্নিবিষ্ট হ'য়ে গ্রথিত হচ্ছে, এবং এই সঞ্চয় ও গ্রন্থনের প্রাচুর্য্য ও বৈশিষ্ট্যের ইতিহাসের মধ্যে আমরা আমাদের আত্মবোধ বা অহমবোধকে প্রত্যক্ষ করতে পারি। এই হিসাবে দেখ্‌তে গেলে আত্মা ব'লে যা বুঝি সেটি একটি concrete entity, অথচ সে entityটি একটি স্থির পদার্থ নয় ; অথচ ক্রমধারারূপে সেটি প্রতিভাত হয় না; আমাদের যা কিছু অনুভূতি যা কিছু experience হয়েছে সেগুলি পরস্পরের মধ্যে পরস্পরে অন্তঃপ্রবিষ্ট হ'য়ে হ'য়ে একটি অখণ্ড সত্তায় পরিণত হয়েছে ; সে সত্তার মধ্যে অনুভূতির ক্রম নাই, আছে পূর্ব্বাপরের ক্রমাতীত অখণ্ড সত্তা। যত নূতন নূতন অনুভূতি, ক্রিয়া, ইচ্ছা, সুখদুঃখাদি নানা ভাবসম্বিৎ নূতন নূতন সঞ্চিত হ'তে থাকে সেগুলি সেই পূর্ব্বসঞ্চয়ের মধ্যে অন্তর্নিবিষ্ট হ'য়ে সেই অখণ্ড সত্তাটিকে স্ফুটতর বৈশিষ্ট্য দ্বারা নূতন নূতন ভাবে অভিব্যক্ত ক'রে তুল্‌তে থাকে। আমার ছেলেবেলা আমাকে আমি বলতে যা বুঝতাম্ তার অধিকাংশই খেলাধুলা ভোজনেচ্ছা প্রভৃতির মধ্যেই আবদ্ধ থাকে ব'লে একটা জৈববোধের মধ্যেই অনেকখানি আবদ্ধ। ক্রমশঃ নূতন অনেক দেখি শুনি, অনেক চিন্তা করি, অনেক নূতন কাজে প্রবৃত্ত হই, অনেক রকমের সুখদুঃখের আস্বাদ পাই, তখন সেই সঙ্গে সঙ্গেই আমার আমিত্বও বাড়তে থাকে। সত্য বটে আমাকে আমি ব'লে যখন আমি বলি, তখন কোনও একটা বিশেষ নির্দ্দিষ্ট অনুভূতি আমাদের কাছে আসে না, আসে যেটা সেটা হচ্ছে একটা অব্যক্ত অনুভূতি, অথচ সে অব্যক্ত অনুভূতির এমন একটি বিশিষ্টতা আছে, যে বিশিষ্টতাটুকুর একটা অদৃশ্যরূপ, একটা অস্পৃশ্য স্পর্শ এমন আছে যা কখনও ভুল হওয়ার নয়। এখনকার আমি যে কি তা আমি ব'লে বোঝাতে পারি না, কিন্তু দশ বৎসর পূর্ব্বে আমি বল্‌তে আমার মধ্যে যে সাড়া পেতাম তার চেয়ে যে এটি অনেকাংশে ভিন্ন এ কথা আমি বেশ বুঝতে পারি। এর কারণই হচ্ছে এই যে আমি বল্‌তে আমি যা বুঝি সেটি হচ্ছে আমার অন্তর্জীবনের সমস্ত অনুভূতির একটি অখণ্ড দীর্ঘ ইতিহাস ; অখণ্ড ব'লেই সেই ইতিহাসটি সকল সময়েই আমার সাম্‌নে জাগরূক, সেটি একটি ইতিহাস ব'লেই তার কোনও ধরা ছোঁয়া যায় এমন রূপ নেই ; এবং ক্রমাতীত অখণ্ড ইতিহাস ব'লেই মনোরাজ্যের সমস্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে সমস্ত বিচ্ছিন্নতার মধ্যে, এই আমির মধ্যে এমন একটি ঐক্য আছে যে ঐক্যটি তার সমস্ত ইতিহাসকে একটি অখণ্ড পদার্থের ন্যায় ব্যবহার কর্‌তে পারে ; এবং তার মধ্যে যে শক্তিটি ধৃত হ'য়ে রয়েছে তাকে নিয়ন্ত্রিত কর্‌তে পারে,

প্রয়োগ করতে পারে। কোনও আমিই তার ইতিহাসের পিণ্ডীকৃত প্রত্যয়সঞ্চয়কে অস্বীকার করতে পারে না। আমি প্রত্যয়ের মধ্যে সমস্ত প্রত্যয়সঞ্চয় এমন ক'রে পিণ্ডীকৃত হয় যে তার ভিতর থেকে কোনও একটি প্রত্যয়কে হয়ত সব সময়ে পৃথক ক'রে স্মরণ করতে পারে না, কিন্তু পৃথক করতে পারে না ব'লেই এই ইতিহাসের সঞ্চয়টি এত ঘন এবং অখণ্ড। অথচ এই আমিত্ববোধের মধ্যে সমস্ত মনোরাজ্যটি ধৃত হ'য়ে রয়েছে ব'লে এই অখণ্ড বোধটির মধ্যে মনের সমস্ত ক্ষমতা প্রচ্ছন্ন হ'য়ে রয়েছে। যখন এই আমি কোনও প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, তার মানে হচ্ছে যে সমস্ত মনটি তার অখণ্ড অতীত ইতিহাস নিয়ে তার জমাট্ শক্তি নিয়ে তার বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। সমস্ত মনের ইতিহাস আমির মধ্যে আছে ব'লে আমি একটা বিচিত্রতাময় complex unity বা entity এবং সেই জন্যই এর মধ্যে শারীর অনুভূতির অংশ কি জৈব অনুভূতির অংশগুলিও পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান। এই আমিটি স্থির না হ'য়েও স্থির, স্থির হ'য়েও সর্ব্বদাই বর্দ্ধনশীল পরিবর্ত্তনশীল। তা হ'লে ফল কথা দাঁড়াচ্ছে এই যে মানুষ বল্‌তে আমরা যা বুঝি সেটি জড় জীব ও মন এই তিন রাজ্যের সংঘাতে উৎপন্ন এবং এই তিন রাজ্যের সংঘাতে যে উপাদান প্রস্তুত হ'তে থাকে তারই উপাদানসঞ্চারে ক্রমবর্দ্ধনশীল। জড়রাজ্য, জীবরাজ্য ও মনোরাজ্য এ তিনটি যেমন সত্য, এই তিনটির পরস্পর সংঘাতে বা পরস্পরের উপযোগিতায় যা উৎপন্ন হয় তাও তেম্‌নি সত্য; সেইজন্য মানুষও মিথ্যা নয়, তার আমিত্বও মিথ্যা নয়, তারা উভয়েই সত্য। এ সংসার আদান প্রদানের সংসার, গ্রহণ বর্জ্জনের সংসার, পরস্পরোপযোগিতার সংসার; এবং এই দৃষ্টিই হচ্ছে এর তত্ত্বদৃষ্টি। এই চাঞ্চল্যের মধ্যে না দেখে যদি অন্যদৃষ্টিতে একে দেখ্‌তে যাওয়া যায় তবে একে দেখা যাবে না। সব জিনিষই সত্য যদি যে দিক্ থেকে তাকে দেখ্‌তে হবে সেই দিক্ থেকে তাকে দেখা যায়, আবার সব জিনিষই কিন্তু মিথ্যা যদি যে দিক্ থেকে তাকে দেখ্‌তে হবে সে দিক্ থেকে তাকে না দেখা যায়।

কিন্তু শুধু জড়রাজ্য, জীবরাজ্য ও মনোরাজ্য নিয়ে আলোচনা কর্‌লেই গোটা মানুষটি আমাদের কাছে ধরা পড়ে না। যেমন জীবরাজ্যকে আশ্রয় ক'রে মনোরাজ্য আত্মপ্রকাশ করে, তেম্‌নি মনোরাজ্যকে অবলম্বন ক'রে একটি স্বতন্ত্র বিজ্ঞানরাজ্য বা আনন্দরাজ্য প্রকাশ পায়। এই রাজ্যের প্রকাশের উপরই মানুষের চরম উৎকর্ষ নির্ভর করে। মানুষ যে শুধু বাঁচে, কি চিন্তা করে তা নয়, মানুষের মধ্যে একটা সত্যলিপ্সা, মঙ্গলেচ্ছা, সৌন্দর্য্যলিপ্সা, একটা ভক্তিলিপ্সাও কাজ করে। মনোরাজ্যটি অনেকখানি পরিমাণে জৈবভাবের দ্বারা অনুপ্রবিষ্ট এবং প্রয়োজন সম্বন্ধের সহিত যুক্ত, কিন্তু এই বিজ্ঞানানন্দ রাজ্যটি একেবারে প্রয়োজনসম্পর্করহিত। ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী তিনটি রাজ্যের মধ্যে যেমন নানাবিধ জটিলতা দেখতে পাওয়া যায় এতে তা নেই, এ যেন একটি ছায়ালোক; এই ছায়ালোকের দীপ্তিতে মানুষের মনোজীবন যখন উদ্ভাসিত হয়, তখন যেন সে এক নবীন জীবন লাভ করে। আমরা যত রকমের কাজ করি আর যত রকমের কাজ করি না, এর মধ্যে নিরন্তর একটা তুলনা উঠতে থাকে, এই কাজটা ভাল কি ঐ কাজটা ভাল, এটা উচিত কি ঐটা উচিত; এই যে ঔচিত্য অনৌচিত্যের তুলনা, ভাল মন্দের তুলনা, এটা ঠিক্ সুবিধা অসুবিধার তুলনা নয়। সুবিধা অসুবিধার তুলনা প্রয়োজনসিদ্ধির তারতম্যের তুলনা, জৈবব্যাপারের স্বতঃপ্রবৃত্তির মধ্য দিয়েই সেটা সুসম্পন্ন হ'তে পারে। কিন্তু এই ভাল মন্দের তুলনা সুবিধা অসুবিধার তুলনা নয়, হয়ত যেটা আপাতত নিতান্ত অসুবিধার সেইটাকেই ভাল এবং উচিত ব'লে প্রতিভাত হয়। এই যে ঔচিত্যের মূল্য নির্দ্ধারণ, ভালর মূল্য নির্দ্ধারণ, এটা আমাদের সমস্ত জৈবপ্রবৃত্তির উপরে দাঁড়িয়ে জৈবপ্রবৃত্তিকে দমন করতে চায়, অথচ আপাতদৃষ্টিতে অনেক সময়েই জৈবপ্রবৃত্তির প্রতিকূলে প্রয়োজনসিদ্ধির প্রতিকূলে আমাদের প্রণোদিত করে। জৈবপ্রবৃত্তির অনুকূলে প্রয়োজনসিদ্ধির অনুকূল যেটা সেইটাকেই ভাল ব'লে মূল্যবান ব'লে করণীয় ব'লে গ্রহণ করা সর্ব্বপ্রাণিসাধারণর বৃত্তি, এবং এই বৃত্তি অনুসরণ ক'রেই জীবজগতে নূতন নূতন স্তরের প্রাণীর উৎপত্তি হয়েছে এবং যারা এই বৃত্তিটিকে যত বেশী ক'রে পালন করতে পেরেছে তারা এবং তাদের সন্তানসন্ততিরাই জীবন-

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

যুদ্ধে জয়লাভ ক'রে আত্মরক্ষা ক'রে বেঁচে রয়েছে। তাই দেহ ও মনোব্যাপারের সমস্ত কাঠামটার মধ্যে এই অর্থ-অর্থির সম্বন্ধ ও এই প্রয়োজনসিদ্ধির দাবীটি আপনাকে ব্যাপ্ত ক'রে রেখেছে। অতিমূঢ় অবস্থা থেকে অতিনীচ বস্তুর থেকে জীব এই প্রয়োজনসিদ্ধির অনুসন্ধান ক'রে নিজকে জীবন যুদ্ধে জয়ী ক'রে রাখতে পেরেছে, তাই এই বোধটা তার শরীরের প্রত্যেক জীবকোষের মধ্যে এবং তার চিন্তাজালের শততন্তুর মধ্যে তাকে ব্যাপ্ত ক'রে রেখেছে। এর অভিভাবকতা স্বীকার না করলে জীবজগৎ চলে না। অথচ উন্নত মানুষের জীবনে যে একটা এমন বৃত্তি জন্মে যার দ্বারা সমস্ত জীবজগতের নিয়ম উল্লঙ্ঘন ক'রে একটা নূতন মূল্য নির্দ্ধারণের সূত্র আবিষ্কার ক'রে প্রয়োনজসিদ্ধির চেয়ে প্রয়োজন বিসর্জ্জনের দাবীকে বড় ক'রে তোলে, সমস্ত জীবজগতের ইতিহাসে এটি একটি অভিনব ব্যাপার। এই যে প্রয়োজনসিদ্ধির বাহিরে শ্রেয়ঃসিদ্ধির একটা স্বতন্ত্র দাবী মানুষের মধ্যে কাজ করে, একথা উপনিষদের যুগ থেকেই আমাদের দেশে স্পষ্টভাবে আলোচিত হয়েছে। কঠ উপনিষদ্ বল্‌ছেন, অন্যচ্ছ্রেয়োহন্যদুতৈব প্রেয়ঃ তে উভে নানার্থে পুরুষং সিনীতঃ। অর্থাৎ শ্রেয় এবং প্রেয়ের বাঁধন দুই দিক্ থেকে মানুষকে বাঁধে। ব্যাসভাষ্য এই কথাই অন্য ভাষায় বলেছেন, চিত্তনদী খলু উভয়তোবাহিনী বহতি পাপায় বহতি কল্যাণায়। সাঙ্খ্যযোগ মতে সমস্ত প্রকৃতি মানুষকে দুই দিক্ দিয়ে আকর্ষণ করে, একদিকে ভোগের দিকে প্রয়োজনসিদ্ধির দিকে, অপরদিকে প্রয়োজনবর্জ্জনের দিকে অপবর্গের দিকে। য়ুরোপে কাণ্ট্ একে বলেছেন rational willএর বাণী, তাঁর মতে এ বাণী নিত্যবাণী, এই নিত্যবাণী মানুষকে যেদিকে টানে তার মধ্যে প্রয়োজনের দাবীর গন্ধমাত্রও নেই। সকলের মধ্যে সমানভাবে এই অজর অমর অক্ষয় বাণী ধ্বনিত হ'য়ে প্রয়োজনসিদ্ধির গণ্ডী থেকে বহু উর্দ্ধে মানুষকে টেনে তুল্‌তে চায়। কাণ্টের সঙ্গে আমার মতের পার্থক্য এই যে, আমি এ বাণীকে নিত্য ব'লে মনে করি না; প্রয়োজনসিদ্ধির গণ্ডীর মধ্য থেকে ধীরে ধীরে এই বাণী উর্দ্ধে স্ফুরিত হ'য়ে ওঠে, এবং উন্নতির বিভিন্ন স্তরে ক্রমশঃ স্ফুটতর ভাবে আপনাকে প্রকাশ করে। মনোঃ যে ভাবে জীবরাজ্য থেকে মণি-বিচ্ছুরণের ন্যায় বিচ্ছুরিত হয়েছে, পুষ্পবৃক্ষের মুকুলসম্ভারের ন্যায় পুষ্পিত হয়েছে, এ রাজ্যটিও ঠিক্ তেম্‌নি ক'রে মনোরাজ্যের শীর্ষদেশ থেকে পুষ্পিত হ'য়ে উঠেছে। মনো-রাজ্যটি সাগরমধ্যস্থ দ্বীপখণ্ডের ন্যায় ধীরে ধীরে যেমন জীবরাজ্যের মধ্য থেকে উত্থিত হয়, এবং এই উত্থানের অনেকদূর পর্য্যন্ত জৈবরাজ্যের অভিষেকে অভিষিক্ত থাকে, এই বিজ্ঞানানন্দরাজ্যটিও ঠিক্ তেম্‌নি ক'রে মনোরাজ্যের মধ্য থেকে উত্থিত হয় এবং সেইজন্য নিত্য নয় কিন্তু উদ্ভবনশীল, এক নয় কিন্তু বিচিত্র প্রকাশে প্রকাশময়। এই জন্যই দেশভেদে জাতিভেদে শিক্ষাভেদে মানুষভেদে এই বিনাপ্রয়োজনের প্রয়োজনবিসর্জ্জনের আত্মত্যাগের বাণীটি নানা আকারে আপনাকে প্রকাশ করে। এম্‌নি ক'রে নূতন রাজ্যের মধ্যে মনোভূমির প্রান্তভাগে যুগে যুগে দেশে দেশে কালে কালে মানুষের জীবনের বিভিন্ন স্তরে স্তরে নূতন নূতন মূল্য-সৃষ্টি চলেছে এবং এই অলৌকিক মূল্য-সৃষ্টির প্রভাবে আমাদের সমস্ত কাজের ভালমন্দ নির্দ্ধারিত হচ্ছে এবং এরই আলৌকিক নিয়ন্ত্রণের ফলে মানুষ ভোগের আকর্ষণ থেকে ত্যাগের বহ্নিতে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে জগতের কল্যাণে ব্রতী হ'তে পারছে। তত্ত্বজিজ্ঞাসাও এই লোকেরই বাণী। কঠ উপনিষদের নচিকেতার উপাখ্যানে পাই যে নচিকেতা সমস্ত প্রলোভন প্রত্যাখ্যান ক'রে বলেছিলেন যে তিনি কিছুই চান না কেবল জান্‌তে চান মৃত্যুর পর কি হয়। উপনিষদের ঋষিরা এই তত্ত্ব-লোকের একটু স্পর্শ পেয়ে ব্রহ্মানন্দে অধীর হ'য়ে উঠতেন —এ যে আনন্দময় লোক, মনোরাজ্যের সমস্ত বন্ধন এখানে ছিন্ন হ'য়ে গেছে—যথা প্রিয়য়া স্ত্রিয়া সংপরিষ্বক্তো না বাহ্যং কিংচন বেদ নান্তরং এবমেবায়ং পুরুষঃ প্রাজ্ঞেনাত্মনা সংপরিষ্বক্তো ন বাহ্যং কিংচন বেদ নান্তরং তদ্বা অস্য এতদাপ্তকামম্ আত্মকামম্ রূপং শোকান্তরম্। অত্র পিতা অপিতা ভবতি মাতামাতা লোকা অলোকা দেবা অদেবা বেদা অবেদা অত্র স্তেনোহস্তেনো ভবতি ভ্রূণহা অভ্রূণহা চাণ্ডালো অচাণ্ডালঃ পৌল্কসোহপৌল্কসঃ শ্রমণোহশ্রমণস্তাপসোহতাপসঃ অনন্বাগতং পুণ্যেন অনন্বাগতং পাপেন তীর্ণোহি তদা

সর্ব্বাঙ্গোকান্ হৃদয়স্য ভবতি। মানুষ যখন তার কামনার রাজ্য থেকে প্রয়োজনের রাজ্য থেকে উর্দ্ধে আপনাকে তুলতে পারে তখনই এই ব্রহ্মলোকের স্পর্শ লাভ করতে পারে—যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি শ্রিতাঃ। অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে।

এই লোকের উপলব্ধির জন্যই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হ'য়ে বুদ্ধ বলেছিলেন, "ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং। ত্বগস্থিমাংসং বিলয়ং চ যাতু॥ অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্পদুর্ল্লভাং। নৈবাসনাৎকায়মতশ্চলিষ্যতে॥ সমস্ত দর্শন শাস্ত্রের জিজ্ঞাসার মূলে এই আনন্দলোকের এই বিজ্ঞানলোকের একটি স্পর্শ রয়েছে। ঋষি যিনি যোগী যিনি ব্রহ্মবিৎ যিনি তিনি এই লোকের স্পর্শে ডুবে যেতে চান। "স যথা সৈন্ধবঘনোঽনন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্নো রসঘনঃ এবৈবং বা অরেঽয়মাত্মা অনন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞানঘনঃ এব"। বিভিন্নদেশের বিভিন্ন কালের বিভিন্ন সাধকের নিকটএর স্পর্শের কিঞ্চিৎ তারতম্য আছে, কিন্তু সকল দেশের সকল সাধকই এর একটা রসাস্বাদ পেয়েছেন। দাদূ দয়াল্ এই উপলব্ধিকেই লক্ষ্য ক'রে বলেছেন :—

> জ্ঞান লহর্ জহাঁ থৈঁ উঠে বাণীকা পরকাস্
> অনভৈ জহঁা থৈ উপজৈ সবদৈ কিয়া নিবাস
> সো ঘর সদা বিচার কা তহঁা নিরংজন বাস
> তহাঁ তু দাদূ খোজিস লে ব্রহ্ম জীবকেপাম॥
> জহাঁ তন্ মনকা মূলহৈ উপজৈ ওঁকার
> অনহদ সেঝা সবদ্ কা আতম্ করৈ বিচার
> ভাবপ্রগতি লৈ উপজৈ সো ঠাহর নিজ সার্
> তহঁ দাদূ নিধি পাইয়ে নিরংতর নিধ'র॥

জালালুদ্দিন রুমি এই তত্ত্বকেই লাভ ক'রে বলেছিলেন,—

> I have put duality away, I have seen that the
> two worlds are one ;
> One I seek, one I know, one I see, one I call.
> I am intoxicated with love's cup, the two
> worlds have passed out of my ken ;

আবার

> In my heart thou dwellest else with blood I'll drench it;
> In mine eye thou glowest else with tears I'll quench it.
> Only to be one with thee my soul desireth—
> Else from out of my body, hook or crook, I'll wrench it.

আবার

O my soul, I searched from end to end ; I saw in thee naught save the Beloved ; call me not infidel, O my soul, if I say that thou thyself art He.

রামানন্দ রায় যখন শ্রীচৈতন্যের মনোভাব স্পর্শ করে পরতত্ত্ববর্ণনপ্রসঙ্গে বলেছিলেন—

> ন সো রমণ ন হমে রমণী
> দুঁহু মনোভব কোশল জানি।

তখনও তিনি এই তত্ত্বেরই আস্বাদ বর্ণন করতে চেষ্টা করেছিলেন। এম্নি ক'রে নানাদেশের নানাকালের সাধকেরা এই তত্ত্বের নানা আস্বাদ তাঁদের বাণীতে প্রকাশ করতে চেয়েছেন। এই সমস্ত আস্বাদের মধ্যে প্রকৃতিগত নানা বৈচিত্র্য আছে, কিন্তু এই নানা বৈচিত্র্যের মধ্যেও একটি কথা ফুটে উঠ্ছে যে এ যে-লোকের স্পর্শ তাকে মনোরাজ্যের চিন্তার জালে ধরা যায় না, একে কথায় বোঝা যায় না, একে খালি অলৌকিক স্পর্শে পাওয়া যায়।

এই অলৌকিক রাজ্যের স্পর্শ যে শুধু কর্ম্মসাধক বা ধর্ম্মসাধকের জীবনেই ধরা পড়ে তা নয়, যিনি সৌন্দর্য্যের সাধক তাঁরও অনুপ্রাণন এই লোক থেকেই আসে; এই লোকেরই একটু স্পর্শ তিনি বর্ণের ছন্দে কিম্বা কথার ছন্দে ধরতে চেষ্টা করেন; এই অলৌকিক রাজ্যের স্পর্শেই যে আমাদের জীবন সৌন্দর্য্যময় রাগময় হ'য়ে ওঠে সে কথা Shelley তাঁর একটি কবিতায় বোঝাতে চেষ্টা ক'রে বলেছেন :—

> The awful shadow of some unseen power
> Floats though unseen among us—visiting
> This various world with as inconstant wing
> As summer winds that weep from flower to flower,
> Like moon beams that behind some
> piny mountain shower,
> It visits with inconstant glance
> Each human heart and countenance ;

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

Like hues and harmonies of evening,
Like clouds in starlight widely spread,
Like memory of music fled,
Like aught that for its grace may be
Dear, and yet dearer for its mystery.

* * *

I vowed that I would dedicate my powers
To thee and thine—have I not kept the vow
With beating heart and streaming eyes, even now
I call the phantoms of a thousand hours
Each from his voiceless grave, they have in visioned bowers
Of studious zeal or love's delight
Outwatched with me the envious night
They know that never joy illumined my brow
Unlinked with hope that thou wouldst free
This world from its dark slavery,
That thou—O awful loveliness
Wouldst give whate'er these words cannot express.

রবীন্দ্রনাথ এই স্পর্শকেই তাঁর কাব্যের উৎস ব'লে বর্ণনা ক'রে লিখেছেন :—

একি কৌতুক নিত্য-নূতন
ওগো কৌতুকময়ী !
আমি যাহা কিছু চাহি বলিবারে
বলিতে দিতেছ কই ?
অন্তরমাঝে বসি অহরহ
মুখ হ'তে তুমি ভাষা কেড়ে লহ,
মোর কথা ল'য়ে তুমি কথা কহ
মিশায়ে আপন সুরে।
কি বলিতে চাই সব ভুলে যাই,
তুমি যা বলাও আমি বলি তাই,
সঙ্গীত স্রোতে কূল নাই পাই
কোথা ভেসে যাই দূরে।
বলিতেছিলাম বসি একধারে
আপনার কথা আপন জনারে,
শুনিতেছিলাম ঘরের দুয়ারে
ঘরের কাহিনী যত ;
তুমি সে ভাষারে দহিয়া অনলে
ডুবায়ে ভাসায়ে নয়নের জলে
নবীন প্রতিমা নব কৌশলে
গড়িলে মনের মত।
সে মায়ামুরতি কি কহিছে বাণী
কোথাকার ভাব কোথা নিলে টানি,
আমি চেয়ে আছি বিস্ময় মানি
রহস্যে নিমগন।
এ যে সঙ্গীত কোথা হ'তে উঠে,
এ যে লাবণ্য কোথা হ'তে ফুটে,
এ যে ক্রন্দন কোথা হ'তে টুটে
অন্তর-বিদারণ।
নূতন ছন্দ অন্ধের প্রায়
ভরা আনন্দে ছুটে চ'লে যায়,
নূতন বেদনা বেজে উঠে তায়
নূতন রাগিণী ভরে।
যে কথা ভাবিনি বলি সেই কথা,
যে ব্যথা বুঝি না জাগে সেই ব্যথা,
জানিনা এসেছে কাহার বারতা
কারে শুনাবার তরে।
কে কেমন বোঝে অর্থ তাহার,
কেহ এক বলে কেহ বলে আর,
আমারে শুধায় বৃথা বারবার,—
দেখে তুমি হাস বুঝি ?
কেগো তুমি কোথা রয়েছ গোপনে
আমি মরিতেছি খুঁজি।

এমনি ক'রে এই অলৌকিক একটি রাজ্য আমাদের মনোরাজ্যের ঊর্দ্ধে থেকে কখনও বা মনোরাজ্যের মধ্যে তার আলোক রশ্মি ফেলে তাকে উদ্ভাসিত ক'রে তুলছে, কখনও বা তার অলৌকিক শক্তির দাবীতে মনোরাজ্যের এবং দৈব-রাজ্যের সমস্ত দাবীকে ক্ষুদ্রতায় হীন ক'রে দিয়ে আপনার অসীম গৌরব ও বৈভবকে প্রকাশ করে। মনোরাজ্যের মধ্যে এ রাজ্যের সত্তার আভাস মাত্র পাই, কিন্তু এ রাজ্যের সম্পদকে মনোরাজ্যের নিয়মের দ্বারা ধরবার কোনও উপায় নেই। যে সমস্ত সাধকেরা এ রাজ্যের মধ্যে প্রবেশ করতে চেয়েছেন তাঁরা বলেছেন যে মনোরাজ্যের বিধ্বংস না হ'লে এ রাজ্যে প্রবেশ করা যায় না। কিন্তু যদি মনোরাজ্যের ধ্বংস ঘটে তবে এ রাজ্যে প্রবেশ হ'লে তার

অনুভূতি যে কি হবে সে কথা মনোরাজ্যের ভাষায় বলা যায় না। এইখানেই mysticদের রহস্য। যে দার্শনিক তাঁর দর্শনবিচারে এই রাজ্যের অনুভূতিকে তাঁর তথ্য-বিচারের মধ্যে গ্রহণ করেন নি সে দর্শনশাস্ত্র অতি দীন। কারণ এই রাজ্যের স্পর্শেই মানুষের মনুষ্যত্ব। কিন্তু দর্শনশাস্ত্রের বিচারের মধ্যে সমস্ত অনুভূতি সমস্ত তথ্য স্থান পাওয়া উচিত, সেইজন্য যে দর্শনশাস্ত্র শুধু এই পর-তত্ত্বকেই স্বীকার ক'রে পরিদৃশ্যমান আর সমস্তকেই মিথ্যা মায়া ব'লে একপাশে সরিয়ে রাখ্‌তে চান, দর্শনশাস্ত্র হিসাবে সে দর্শন অতি সঙ্কীর্ণ। বিভিন্ন রকমের বিশেষত্ব নিয়ে আমাদের চোখের সাম্‌নে এই অন্নময়, প্রাণময়, মনোময় ও আনন্দময় চারটি রাজ্য পরস্পরের সাহায্যে পরস্পরকে প্রকাশ ক'রে তুল্‌ছে, এই চারটি রাজ্যই সমান ভাবে সত্য এবং চারটি রাজ্যের পরস্পরের আদান প্রদানে যা কিছু প্রকাশ পাচ্ছে তাও ঠিক সেইভাবেই সমান সত্য। এ পর্য্যন্ত দর্শনশাস্ত্রে যত প্রচেষ্টা হয়েছে তার কোনোটাতে চারটি রাজ্যের কোনওটির তথ্য অপর কোনোটির নিয়মের দ্বারা বা ব্যাখ্যার দ্বারা ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয় নি। যদি কোনো একটি এমন তত্ত্ব পাওয়া যেত যার দ্বারা এই চারটিরই ব্যাপার ব্যাখ্যা করা চল্‌ত তাদের বৈচিত্র্যের উপপত্তি করা সম্ভব হোত তবে সেরকম অদ্বৈতবাদ স্বীকার করা যেতে পার্‌ত। এই চারটি জগতের যে পরস্পরাপেক্ষ বৈচিত্র্য এই নিয়েই হচ্ছে জগতের ও মানুষের জীবন; এ বৈচিত্র্যকে না মান্‌লে জীবনকেই মানা হয় না। ঐক্য আমরা খুঁজি বটে, কিন্তু বিচিত্রকে না মান্‌লে ঐক্যকেই মানা হয় না।—সমস্তকে হারিয়ে সমস্তকে মিথ্যা ব'লে সরিয়ে দিয়ে যে ঐক্য পাওয়া যায় সে ঐক্য রিক্ততার ঐক্য, মুক্তির ঐক্য নয়।

> "রাত্রিদেরা স্বপ্নমাঝে গর্ব্বে ছিনু ভরি,
> আপনাকে শূন্য দেখে মুক্ত মনে করি।
> এখন মনে হয়
> আপনারে রিক্ত করা মুক্ত করা নয়" ॥*

চারটি বিচিত্র জগতের ঐক্যের ও সামঞ্জস্যের ছন্দটি যে মানুষের মধ্যে ধরা পড়েছে এবং এই চারটি জগৎ যে মানুষের মধ্যে আত্মপ্রকাশ ক'রে তুল্‌ছে এবং তাদের চরম সার্থকতারূপে মানুষকে সৃষ্টি ক'রে তুলেছে, তাদের বিচিত্র সুরসঙ্ঘাত যে মিলিত হ'য়ে অখণ্ড একটি মানুষের স্বরে নিরন্তর ধ্বনিত হ'য়ে উঠ্‌ছে এই দৃষ্টিই দর্শনের দৃষ্টি, এই দৃষ্টিই মুক্তির দৃষ্টি।

* রিক্ত ও মুক্ত | কুমারী মৈত্রেয়ী দেবী - বিচিত্রা, ফাল্গুন।

এই প্রবন্ধটি বর্ত্তমান মাসে মাজু গ্রামে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনে দর্শন বিভাগের সভাপতি শ্রীযুক্ত ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মহাশয়ের অভিভাষণ

বিবিধ সংগ্রহ

কার্ডিনেল্ গ্রাণ্ভেলার উদ্যান

া-হাঙ্গেরীর রাজধানী 'ভিয়েনা' নগরে রাজকীয় শিল্পসংগ্রহ-ভাণ্ডারে কতকগুলি সুরমা সূচিশিল্পবিশিষ্ট ঝালর আছে। সেইগুলিকেই এই অদ্ভুত নামে অভিহিত করা হয়। ষোড়শ শতাব্দীর, ষোড়শ কেন, বোধহয় সকল যিনি পরে 'কার্ডিনেল' হইয়াছিলেন, এবং যিনি পঞ্চম চার্ল্স ও দ্বিতীয় ফিলিপের সর্ব্বশক্তিমান রাষ্ট্রীয় মন্ত্রণাদাতা ছিলেন, তাঁহারই আদেশ ও নির্দ্দেশক্রমে এই ঝালরগুলি প্রস্তুত হইয়াছিল। মৃত্যুকালে তিনি এগুলি রাজা ফিলিপকে

ছায়াশীতল কুঞ্জবীথি
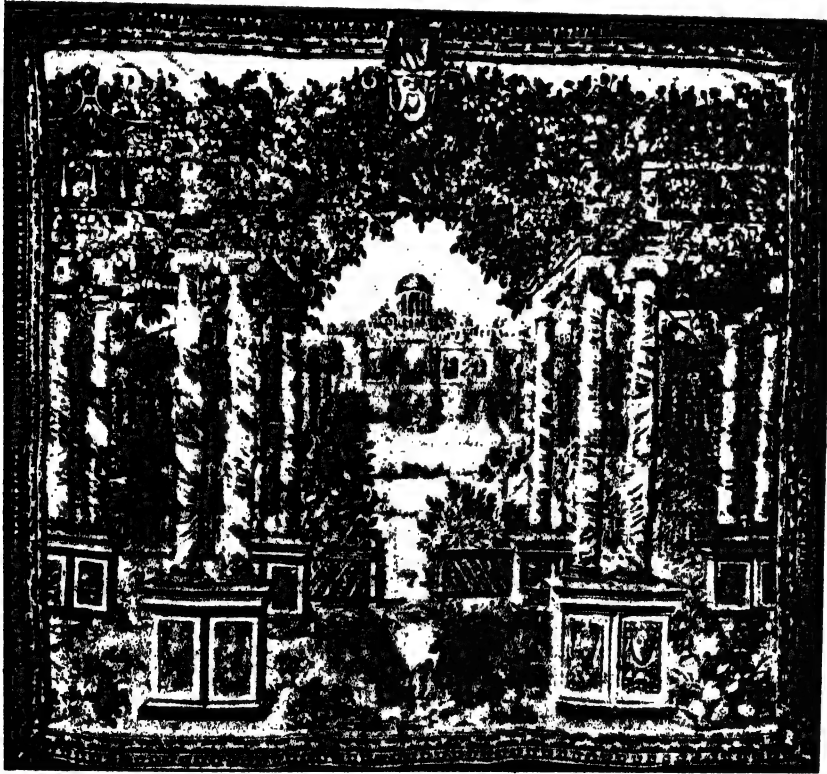
শতাব্দীরই শ্রেষ্ঠ বয়ন-শিল্পী, 'উইলিয়ম্ প্যানেমেকার্' এগুলি বয়ন করিয়াছেন। এ্যান্টনিও প্যারেনট্ গ্রাণভেলা, দিয়া যান এবং উহা প্রথমে 'ব্রুসেল্সে'ই ছিল, পরে ভিয়েনায় আসে।

এই ঝালরগুলি সংখ্যায় সর্ব্বসমেত ছয়টি। মর্ম্মরস্তম্ভ, চমৎকার বারান্দা-সংলগ্ন ছাদ, সৌষ্ঠব-সম্পন্ন খিলান, সারিবদ্ধ স্তম্ভ-শ্রেণী এই সব লইয়াই পুরোভূমি। পুরোভাগে মনুষ্যমূর্ত্তির পরিবর্ত্তে পশুপক্ষীদের দণ্ডায়মান ও শয়ান মূর্ত্তি খচিত হইয়াছে:—হরিণ, কুকুর, ময়ূর, বক, বিলাতী কুক্কুট, টিয়া, চিতাবাঘ প্রভৃতি আছে। বড়ই পরিতাপের বিষয় এই সব সুন্দর মূর্ত্তিগুলির মধ্যে কোনো কোনোটির সূতা বাহির হইয়া পড়িয়াছে, কোনো কোনোটি এত অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে যে চেনা যায় না।

বেষ্টন করিবার বিবিধ ভঙ্গী, তাহাদের বাড়িবার, ছড়াইয়া পড়িবার এবং জড়াইয়া জড়াইয়া উপরে উঠিবার দৃশ্যটি, এমন স্বাভাবিক হইয়াছে যে, ছবি দেখিতেছি বলিয়া মনেই হয়না। অনেকক্ষণ সেই দিকে চাহিয়া চাহিয়া মনে হয় বুঝি বা কোন এক মঞ্জুল-কুসুম-মঞ্জরী ও পত্র-পুঞ্জ-পরিশোভিত কুঞ্জ-কাননেই আসিয়াছি! বিশেষ পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে দেখিলে তবে ধরা যায় যে, চিত্রকর তাঁহার শিল্পকে কেবলই সজীবতা ও স্বাভাবিকতা-মণ্ডিত করেন নাই, কোনো কোনো স্থলে তাঁহার অদ্ভুদ সূচিচালনার নিপুণতায়

কুঞ্জভবন

ঝালরগুলির উপরকার মূর্ত্তিসমূহ এইরূপ। কিন্তু প্যানেমেকার মহাশয়ের এই চিত্রখচিত ঝালরগুলির বিশেষত্ব হইতেছে তদন্তর্গত লতা-পাতার পরিকল্পনা। ছবিগুলি দেখিলেই মনে হয় বুঝি কোন উদ্যান-রচনা সম্বন্ধে সুদক্ষ শিল্পী বয়নকারীকে পরিকল্পনা যোগাইয়াছেন। তাঁহারই নির্দেশমত প্যানেমেকার সমস্ত লতা-পাতা, ফুল ফল, ও তরুদলকে একটা এমন জীবন্ত ও বর্দ্ধনোন্মুখ রূপ দিয়াছেন যে, এ জাতীয় শিল্প-কার্য্যের মধ্যে তাঁহার চিত্রগুলিকে উহাই একটা অপরূপত্ব দান করিয়াছে। প্রথম দৃষ্টিতে, পুঞ্জীভূত সবুজ-পত্রপল্লবের সজীবতা, মর্ম্মর-স্তম্ভ ও খিলানকে

দ্বারা কোথাও মেঘচ্ছায়ার মেদুরান্ধকার, কোথাও এক ঝলক সোনার আলোর উজ্জ্বলতা, কোথাও তাহাদের লীলায়িত ভঙ্গীতে ছড়াইয়া পড়িবার চেষ্টা, কোথাও বা সঙ্কুচিত নববধূর মত গুটাইয়া পড়িবার ভঙ্গীটুকু ফুটাইয়া তুলিয়াছেন! এই ঝালরগুলির পাড় সূক্ষ্ম-কারুকার্য্য-বিশিষ্ট হইলেও খুবই অনাড়ম্বর। তাহারা লাল ও হলদে রঙের, ব্রুসেল্‌সের তৈয়ারী ফ্রেমে বাঁধাই, প্রত্যেকের উপর কার্ডিনেল্ গ্রাণভেলার শস্ত্র-সঙ্কেত ও চিত্রকর প্যানেমেকারের স্বাক্ষর-চিহ্ন বর্ত্তমান।

কারু-শিল্পের দিক দিয়া ইহার যে মূল্য অল্প নয় সে

শ্রীরামেন্দু দত্ত

কথা ত অবিসংবাদিত, আবার উহাদের একটা ঐতিহাসিক মূল্যও আছে। মধ্য-য়ুরোপের রাজন্য ও রাজপরিষদ-বর্গকে সেই সময় একটা প্রাচীন উদ্যান-প্রীতিতে পাইয়া বসিয়াছিল। এই চিত্রগুলির প্রেরণা সেকালে নিশ্চয়ই ইটালি হইতে আসিয়া থাকিবে। ইটালিতে সে সময় সুরক্ষিত প্রাকারান্তর্গত 'গথিক' দুর্গ ও প্রাসাদসমূহের পরিবর্ত্তে নগর-প্রাচীরের বাহিরে সুবিশাল 'রেনাসেন্স্'-সৌধমালা নির্ম্মিত হইতেছিল। মধ্যযুগের দুর্গ-মধ্যে যে সঙ্কীর্ণ প্রাঙ্গণ-

কুঞ্জভবনের স্তম্ভশ্রেণী

টুকু উদ্যানরচনার একমাত্র স্থান ছিল, তাহার পরিবর্ত্তে পরবর্ত্তী যুগে আসিল,—সুরম্য অট্টালিকার চতুষ্পার্শ্বস্থ সুবিস্তীর্ণ প্রান্তর। সুদক্ষ উদ্যান-শিল্পীরা সেই কুটির বেষ্টনকারী ভূমিখণ্ডকে রম্য হইতে রম্যতর উদ্যানে পরিণত করিবার জন্য পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতা করিতেন। তৎকালীন শিল্পীরা স্বতঃসিদ্ধেরই মত প্রতিপন্ন করিয়া দিয়াছিলেন যে, "উপ্ত তরু-লতার নিসর্গজ শোভা, কৃত্রিম স্থাপত্য-শোভা হইতে বহুতর মনোরম।" তবে গাছ-পালা সাজাইয়া রোপণ করিবার উৎকর্ষ, অন্য যে কোনো শিল্পকার্য্যেরই মত, রূপদক্ষের প্রতিভার তারতম্যের উপর নির্ভর করিত। পঞ্চদশ শতাব্দীতে এই বিষয়টা নিঃসন্দেহরূপে ইটালিতে প্রমাণিত হইয়া গিয়াছিল। এবং সে যুগে স্থপতি ও উদ্যান-শিল্পী যথাযথ যত্ন ও সতর্কতাসহকারে আপন আপন কৃতিত্ব দেখাইয়া অট্টালিকাগুলিকে উদ্যানের, ও উদ্যানগুলিকে অট্টালিকার যোগ্য করিয়া তুলিতেন। ইহারই একটা নমুনা পাঠকেরা শেষের চিত্রটিতে দেখিতে পাইবেন।

পূর্ব্বোক্ত কারণগুলির জন্যই এই ঝালরসমূহ এমন মনোহারী। উহাদের পরিকল্পনা, কারুদক্ষতা, শিল্প-সূক্ষ্মতা, সৌন্দর্য্য-বিন্যাস, সবই চমৎকার। উহাদের প্রতিলিপিগুলি দেখিলেই আমরা বুঝিতে পারি যে রেনাসেন্সের যুগের ইটালির ধনী ব্যক্তিগণ তাঁহাদের উন্মুক্ত বাতায়নের ভিত

দিয়া যে উদ্যান-শোভা নিরীক্ষণ করিতেন, কার্ডিনেল গ্রাণ্‌ভেলা তাঁহার পাঠ-গৃহে বসিয়া প্যানেমেকারের তৈয়ারী এই সকল ঝালর-গাত্রস্থ স্বপ্ন-সুষমা-মণ্ডিত উদ্যান-চিত্রগুলি দেখিতে পাইতেন।

কুঞ্জভবনের জীবজন্তুর মূর্ত্তি
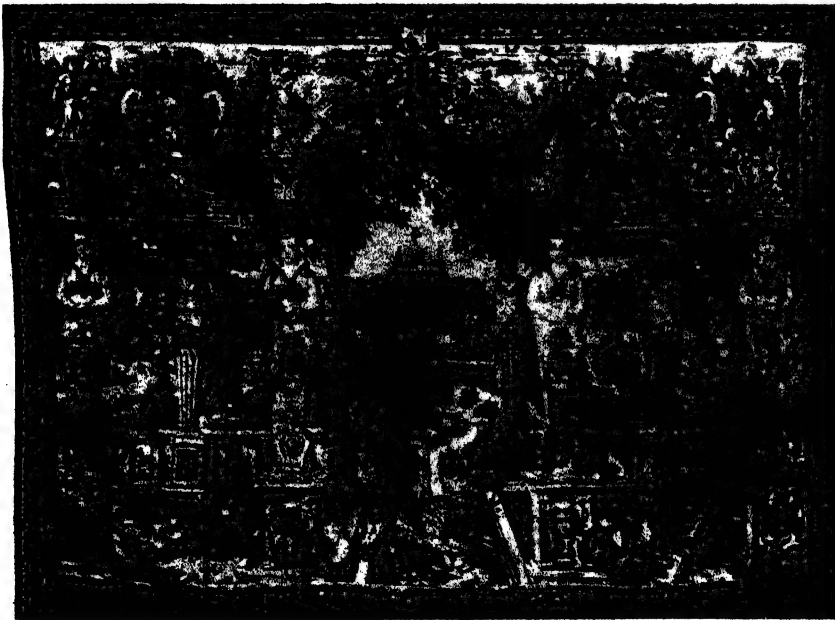
কুঞ্জভবনের পশুপক্ষীর মূর্ত্তি

শ্রীরামেন্দু দত্ত

শ্রীহিমাংশুকুমার বসু

অস্ত্র চিকিৎসা সম্বন্ধীয় প্রাচীনতম লিপি

আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্রের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির যুগে আমাদের মনে কখনও কি এই প্রশ্ন উদয় হয় যে কোন্ যুগে, কাহারা চিকিৎসাশাস্ত্রে সর্ব্বপ্রথম সম্যক জ্ঞান লাভ করিয়াছিল ? এই জাতীয় সংবাদ আহরণার্থ সময় অতিবাহিত করাকে আমরা নিতান্তই সময়ের অপব্যবহার বলিয়া মনে করি। এই দিকে কিছু অগ্রসর হইলে আমরা যে অনেক প্রকারের কৌতূহলোদ্দীপক তথ্য আবিষ্কার করিতে পারিতাম তাহার সন্দেহ নাই। প্রকৃত বিদ্যোৎসাহী ও অনুসন্ধিৎসুর সংখ্যা কম হইলেও, ইউরোপ ও আমেরিকায় তাঁহাদের সংখ্যা দিন দিনই বাড়িয়া যাইতেছে। তাঁহাদেরই প্রাণপাত পরিশ্রমের ফলে জানা গিয়াছে যে, প্রায় পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে প্রাচীন মিসরবাসীরা অস্ত্রচিকিৎসা শাস্ত্রের প্রভূত উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান যুগের পাশ্চাত্যশিক্ষায় ব্যুৎপন্ন অনেক শিক্ষাভিমানী চিকিৎসকেরা তর্কের খাতিরে পাশ্চাত্য ভেষজ-শাস্ত্রের বহু পূর্ব্বেই আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের অস্তিত্বের কথা স্বীকার করেন বটে, কিন্তু অস্ত্র-চিকিৎসা যে অতি-আধুনিকতম বিদ্যা এবং ইউরোপের আমদানি, ইহার বাহিরে কোন কিছুই বিশ্বাস করিতে চাহেন না। এই ধারণা যে একান্তই ভ্রমাত্মক তাহা প্রাচীন মিশরের অস্ত্র চিকিৎসা সম্বন্ধীয় যে লিপি আবিষ্কার হইয়াছে তাহার পাঠোদ্ধার হইতে বুঝিতে পারা যায়।

যে সময় পৃথিবীর অধিকাংশ জাতিই অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল, শিক্ষা দীক্ষার নাম মাত্র ছিল না, এমন কি সমাজ গঠন পর্য্যন্ত হয় নাই এবং বর্ব্বরোচিত ভাবে কালাতিপাত করিত, তাহার বহু বহু যুগ পূর্ব্বেই মিসরবাসীরা জ্ঞানে, গরিমায় ও সর্ব্বপ্রকার বিদ্যার অনুশীলনে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ ক্রমশই জগতের সম্মুখে প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে। জ্যোতিষ ও অঙ্কশাস্ত্রে 'ইউক্লিড্', স্থপতি-বিদ্যায় 'ইম্‌হোটেপ্' যে পথ-প্রদর্শক তাহা সর্ব্ববাদীসম্মত ; অধুনা অনুসন্ধানের ফলে জানা গিয়াছে যে 'ইম্‌হোটেপ্' স্থপতি বিদ্যা ব্যতিরেকে চিকিৎসাশাস্ত্রেও অগ্রণী ও বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন।

খৃঃ পূঃ ২৮০০ বৎসর পূর্ব্বে ফেরাও 'নেফারিরকেরি' যখন একদিন মেম্‌ফিস্ নগরীস্থ সাকারা সমাধিস্তূপের পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন সেই সময় তাঁহার প্রিয় অনুচর ওয়েশ্‌ফটাহ হঠাৎ বিশেষ অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং পরে মৃত্যুমুখে পতিত হন। সেই সময় ফেরাও চিকিৎসাশাস্ত্র সম্বন্ধীয় পাণ্ডুলিপি আনাইয়া তাহা হইতে রোগ নির্ণয় করিতে চেষ্টা করেন, এ বিষয়ের কথা ওয়েশ্‌ফটাহের কবরে লিখিত আছে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, সেই সময় চিকিৎসাশাস্ত্র সম্বন্ধে গ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়াছিল, যদিও সেই পূর্ব্বোক্ত পাণ্ডুলিপির কোনোটিই পরে খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। পিরামিড্ যুগে

স্থানচ্যুত চোয়ালের হাড় পুনঃসংস্থাপন

(খৃঃ পূঃ ৩০০০ হইতে ২৫০০ বৎসর) ভেষজ বিদ্যায় ও অস্ত্রচিকিৎসায় যে অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছিল তাহার বহুল প্রমাণ আছে। সেই সময়ের একটি চোয়ালের হাড় পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, চর্ব্বণ-দন্তের নিম্নে ঘা হওয়ায় চিকিৎসক সেই স্থানের চোয়ালের হাড় ফুটা করিয়া পুঁজ বাহির করিয়া দিয়াছিলেন। ফেরাও-দের রাজত্বকালে চিকিৎসকদের চিকিৎসাশাস্ত্র সম্বন্ধীয় বিশেষ বিশেষ বিষয়ে অনুশীলন করিবার জন্য সুযোগ দেওয়া হইত। রাজপরিবারের জন্য এইরূপ নানা বিভাগে নানা চিকিৎসক নিযুক্ত ছিলেন, তাহা তাঁহাদের পরিচয়-জ্ঞাপক

পদবী হইতেই বুঝা যায় ; যথা রাজপরিবারের দন্তচিকিৎসক, অস্ত্রচিকিৎসক, চক্ষুচিকিৎসক এবং 'পাকস্থলী ও অন্ত্র সম্বন্ধীয় জ্ঞান বিশিষ্ট' চিকিৎসক। এই শেষোক্ত চিকিৎসক 'শরীরাভ্যন্তরস্থ তরল পদার্থের বিষয় অভিজ্ঞ' বলিয়াও অভিহিত হইত। যতদূর প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে এই পর্যান্ত বলা যাইতে পারে যে খৃঃ পূঃ তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বে মেম্‌ফিস্ নগরীস্থ সাকারার সিঁড়িওয়ালা পিরামিডের নির্ম্মাতা ইম্‌হোটেপই সর্ব্বপ্রথম একাধারে স্থপতি বিদ্যায় পারদর্শী ও চিকিৎসাশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তাঁহার নির্ম্মিত সাকারার পিরামিড জগতের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম স্থপতি বিদ্যার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলিয়া পরিগণিত হইয়া আজ পর্য্যন্ত অটুট অবস্থায় রহিয়াছে।

তীরচিহ্নিত স্থানগুলির ক্ষত চিকিৎসা সত্ত্বেও আরোগ্য হয় নাই

আমেরিকার ওরিয়েন্টাল ইনষ্টিটিউট প্রাচ্য ভাষা সম্বন্ধে যে কোন পুরাতন লিপি বাহির হউক না কেন তাহার পাঠোদ্ধার করিতে চেষ্টা করেন এবং এই প্রকারে বহু মূল্যবান তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহাঁদেরই যত্নের ফলে মিসর-দেশীয় চিকিৎসাশাস্ত্র সম্বন্ধীয় একমাত্র লিপির পাঠোদ্ধার হইয়াছে। লিপিখানি বর্ত্তমান মিসরের লাক্সর নামক শহরের কোন কবর হইতে এক ব্যক্তি সংগ্রহ করিয়া উহা কোন আমেরিকান পরিব্রাজকের নিকট বিক্রয় করে। তিনি উহা আমেরিকায় লইয়া যান এবং তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার উত্তরাধিকারীগণ উক্ত ইনষ্টিটিউটকে উহা প্রদান করেন। ইহাঁরা অতি আগ্রহ সহকারে ঐ লিপির পাঠোদ্ধার করিয়া উহা নিউইয়র্ক হিস্‌টরিকেল সোসাইটির যাদুঘরে সযত্নে রাখিয়া দিয়াছেন। পিরামিড যুগে লিখিত চিকিৎসাশাস্ত্র সম্বন্ধীয় পাণ্ডুলিপি যদিও বহুকাল পূর্ব্বেই নষ্ট হইয়া গিয়া থাকিবে কিন্তু এই সকলের নকল নষ্ট হইবার পূর্ব্বেই পুনরায় তাহাদের নকল রাখা হইত। বর্ত্তমান লিপিখানি খৃঃ পূঃ ১৭শ শতাব্দীর লিখিত।

প্যাপিরস্ নামক মিসর দেশীয় তৃণ নির্ম্মিত একপ্রকার কাগজের উপর এই প্রসিদ্ধ লিপিখানি লেখা হইয়াছে। কাগজখানি লম্বায় ১৫ ফুট ও দৈর্ঘ্যে প্রায় ১৩ ইঞ্চি হইবে। ভুষির সহিত আঠা মিশাইয়া কালি তৈয়ার করিয়া তদ্বারা উক্ত কাগজের উপর লেখা হইয়াছিল। এক একটি বিষয় লেখা হইবার পর কাগজের পাশে ও ফুট্ নোট হিসাবে তলায় দুরূহ শব্দের সরল অর্থ বুঝাইয়া লেখা আছে। মাথা ও চোয়াল হইতে আরম্ভ করিয়া কণ্ঠনালী ও বক্ষ এবং পরে মেরুদণ্ড সম্বন্ধীয় প্রায় ৪৮টি বিষয়ের অস্ত্র চিকিৎসার নিদান ইহাতে দেওয়া আছে। সর্ব্বনিম্নে মূল লেখা হইতে অসংলগ্ন কতকগুলি যাদুবিদ্যার ঔষধাদির বিষয়ও লেখা হইয়াছে। কি করিয়া বৃদ্ধকে যুবকে পরিণত করা যায় তাহারও ঔষধের ব্যবস্থা আছে। এই সকল ভৌতিক ও যাদু বিদ্যা সম্পর্কিত ঔষধের সহিত কিন্তু মূল অস্ত্রচিকিৎসা বিষয়ক নিদানাদির কোনই সম্পর্ক নাই, কারণ প্রাচীন মিসরবাসীরা মানুষের শরীরে যে সব ব্যাধি দেখিতে পাওয়া যায় উহা শরীরের কোনও না কোন যন্ত্রের বিকৃতির ফলেই যে উৎপন্ন তাহা খুব ভাল রকমই অবগত ছিলেন। বর্ব্বর জাতির মত উহা

শ্রীহিমাংশুকুমার বসু

দৈত্য দানবের কীর্ত্তি বলিয়া বিশ্বাস করিতেন না।

লিপিতে উহা কোন স্থানে লেখা হইয়াছিল এবং উহার রচয়িতা কে তাহার কিন্তু কোন উল্লেখ নাই। খৃঃ পূঃ ত্রিংশ শতাব্দীর স্থপতি বিদ্যায় ও চিকিৎসাশাস্ত্রে সর্ব্বপ্রথম অভিজ্ঞ ইম্‌হোটেপই যে ইহার রচয়িতা তাহাও সঠিক বলা যায় না, যদিও রচনা হইতে ইহা বেশ বুঝা যায় যে তিনি তৎকালীন ব্যাধি ও চিকিৎসা সম্বন্ধে অত্যধিক মনোযোগী ছিলেন এবং তাঁহাকে প্রকৃতপক্ষে এই সব ব্যাধির নামকরণ শরীরতত্ত্ব, অস্থিতত্ত্ব ও নিদানশাস্ত্রের বহুবিধ শব্দের সর্ব্বপ্রথম শব্দকোষও তৈয়ার করিতে হইয়াছিল। এই জন্য চিকিৎসাশাস্ত্রের জটিল ব্যাপারগুলিকে সোজাসুঝি বুঝাইতে গিয়া তাঁহাকে সাধারণ পারিপার্শ্বিক জিনিষের সহিত তুলনা করিতে হইয়াছে; যথা মাথার ঘিলুর কুণ্ডলিতাবস্থার সহিত ধাতুমলের উপরিস্থিত সমকুঞ্চিত স্ফোটকগুলির সহিত তুলনা করিয়াছেন। চোয়ালের হাড়ের দুই পার্শ্বস্থিত দ্বিশাখাবিশিষ্ট উচ্চাংশটি যাহা শঙ্খাস্থির নিম্নকোটরে গিয়া শঙ্খাস্থির সহিত যুক্ত হয় উহাকে দুইটি নখবিশিষ্ট পাখী যদি সন্ধ্যাস্থিকে ধরিয়া থাকে তাহা হইলে যেমন দেখায় তাহার সহিত তুলনা করিয়াছেন। কোনও জলজ জীবাণুকে জমাট রক্তের আঁশের মত বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। মাথার খুলির উপরিভাগে কোন ছিদ্র হইলে উহাকে মাটীর কলসের ছিদ্রের অনুরূপ বলিয়াছেন। এই প্রকারের তুলনামূলক কথা দিয়া এই সব জটিল ব্যাপারকে খুব সরলভাবেই বুঝান হইয়াছে, ইহা তাঁহার বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক।

কবর খনন করিয়া এক স্থানে প্রায় পাঁচ হাজার মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে, উহার মধ্যে শতকরা প্রায় তিন চারিজনের কোন না কোন হাড় ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় যে তাহার চিকিৎসা করা হইয়াছিল তাহার প্রমাণ বর্ত্তমান রহিয়াছে। অস্ত্রচিকিৎসা সম্বন্ধীয় প্রায় তেত্রিশ প্রকারের বিষয়ের বর্ণন আমরা এই প্রাচীনতম লিপিতে দেখিতে পাই। মাংসপেশী ও মাংসতন্তু সম্বন্ধীয় জ্ঞানের বিষয়ও লিপিবদ্ধ আছে। পুঁজ নিষ্কাশন ও ক্ষত সারাইবার জন্য তাঁহাদিকে অস্থিতত্ত্ব ও শরীর বিজ্ঞানের যথেষ্ট আলোচনা করিতে হইত। মাংসপেশী ও মাংসতন্তু সম্বন্ধীয় জ্ঞানের বিষয় লিপিবদ্ধ দেখিয়া ইহাও বেশ বুঝা যায় যে, সেই চিকিৎসক শবব্যবচ্ছেদেরও ব্যবস্থা করিতেন। মস্তিষ্কই যে দৈহিক ও মানসিক সর্ব্বপ্রকার কার্য্যের পরিচালক ও কেন্দ্রবিশেষ তাহার বিষয়ও আমরা সর্ব্বপ্রথম এই লিপিতে উল্লেখ দেখিতে পাই। মস্তিষ্কের আঘাতের সহিত নিম্নাঙ্গের পক্ষাঘাতের যে ঘনিষ্ট সম্পর্ক আছে এবং হৃৎপিণ্ডকে কেন্দ্র করিয়া যে একটি তদ্‌সম্পর্কীয় মণ্ডলী আছে ও হৃৎপিণ্ড স্বাভাবিক অবস্থায় না থাকিলে তাহার ফলাফল যে তাহা হইতে দূরে অবস্থিত যে কোন শরীরযন্ত্রের উপর প্রতিফলিত হয়, এই সকল তথ্যের উল্লেখও লিপিতে পাওয়া যায়। স্থানচ্যুত অস্থিকে স্বস্থানে পুনঃস্থাপনের নিমিত্ত তাঁহাকে হস্ত-
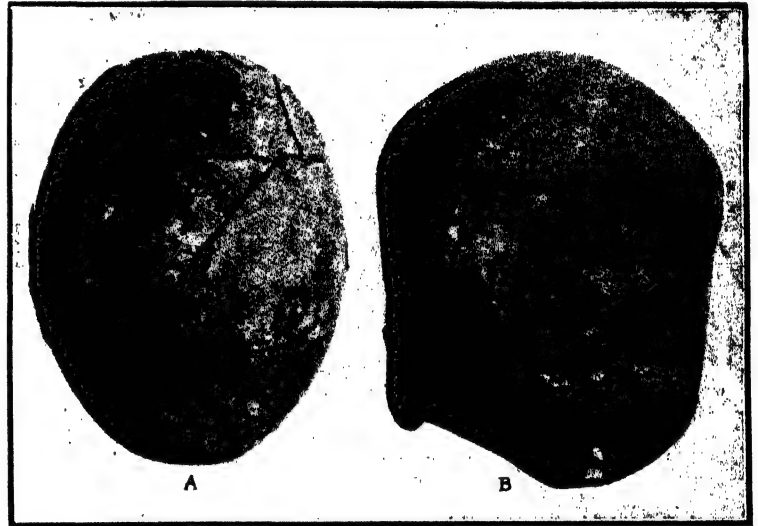
A—ক্ষত আরোগ্য হয় নাই

B—ক্ষত আরোগ্য হইয়াছে

কৌশলের সাহায্যও লইতে হইয়াছে। এই বিষয়ের একটী প্রাচীন চিত্র পরবর্ত্তী যুগে গ্রীসে পাওয়া গিয়াছে। চিত্র দেখিয়া বুঝিতে পারা যায় যে, চিকিৎসক অতি বিচক্ষণতার সহিত স্থানচ্যুত চোয়ালের হাড়কে স্বস্থানে পুনঃস্থাপন করিতেছেন। ক্ষতস্থান সেলাই করিয়া দিলে যে তাহা শীঘ্র আরোগ্য হয় এ মর্ম্মও তাঁহার জানা ছিল, এবং যেস্থানে সেলাই অসম্ভব সে স্থানটী অধুনা-ব্যবহৃত 'Z. O. Adhesive Plaster'য়ের ন্যায় কাপড়ের উপর চট্‌চটে পলস্তরা লাগাইয়া ক্ষতের উপর লাগাইয়া দিতেন।
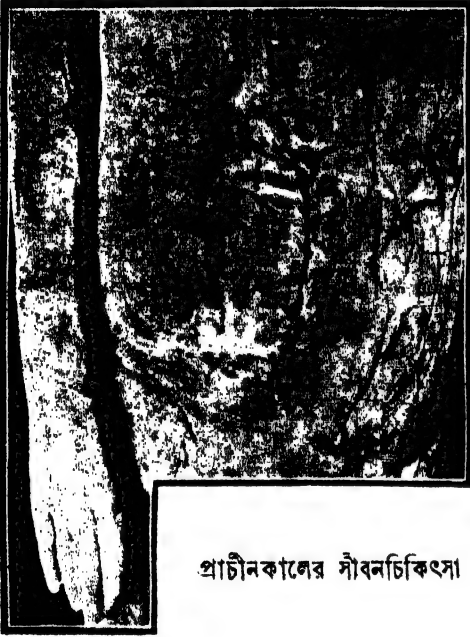
প্রাচীনকালের সীবনচিকিৎসা

লিপিখানির প্রত্যেক অংশে অতি যত্নের সহিত একটির পর একটি রোগের বিষয় বিশদভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। রোগের নাম সর্ব্বপ্রথমে উপরে লিখিয়া তন্নিম্নে রোগীকে পরীক্ষার ফলে যে সব বাহ্য লক্ষণাদি পাওয়া গিয়াছে তাহার বর্ণনা দেওয়া আছে এবং সর্ব্বশেষে রোগ নির্ণয় করা হইয়াছে। কাজেই আমরা দেখিতে পাইতেছি যে পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বের মিসরবাসীরা সমাজবদ্ধভাবে বাস করিতেন এবং প্রায় সর্ব্বপ্রকার বিদ্যা ও বিজ্ঞানে পারদর্শী ছিলেন। পরবর্ত্তী যুগে খৃঃ পূঃ প্রায় ৩০০ শতাব্দীর সময় গ্রীসবাসীরা আলেকজেন্দ্রিয়া সহরে একটি বিখ্যাত
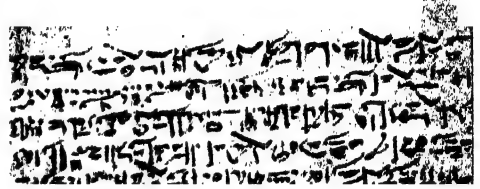
অস্ত্রচিকিৎসা সম্বন্ধীয় প্রাচীনতম লিপি

আয়ুর্বিজ্ঞান বিদ্যালয় খুলিয়াছিলেন এবং প্রাচীন মিসরবাসীদের চিকিৎসা পদ্ধতির উপর অনেক কিছু উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন।

শ্রীহিমাংশুকুমার বসু

বনভোজন

শ্রীঅক্ষয়কুমার সরকার

৮

দুর্দ্দিনের রাত্রি শীঘ্র কাটে না।

রাত্রি তখন মোটে নয়টা। কিন্তু ভরা ভাদ্রের জল-বৃষ্টির আঁধারে তাহাকেই বেশী মনে করিয়া সহানুভূতিশীল আগন্তুকেরা প্রায় সকলেই চলিয়া গেল। তখন ঘরের ভিতরে প্রদীপের মিটমিটে আলোকে বিভা ও অতুলের মা রোগীর শুশ্রূষা করিতেছিল, বাহিরে নব চাঁড়াল অন্ধকারে বসিয়া তাহার খালি হুঁকাটিতে তামাক খাইতেছিল, এবং হেমন্ত একটু দূরে বসিয়া কি ভাবিতেছিল।

হঠাৎ একবার বামুনমার সহজ অবস্থা ফিরিয়া আসিলে তিনি বিভার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "মা, একবার আমার বুকে আয়!" তাহার পর তাহাকে ডান হাত দিয়া বুকে চাপিয়া ধরিয়া যেন তাহার স্পর্শের স্নিগ্ধ প্রলেপে আপনার সর্ব্বাঙ্গের তীব্র যন্ত্রণা শান্ত করিয়া রাখিতে চাহিলেন। তিনি কি যেন একটা উপদেশের কথা বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু তাহা উচ্চারিত হইবার আগেই অসহনীয় যন্ত্রণার পুনরাক্রমণে "কখন শেষ হবে মা?" বলিয়া একটা আর্ত্তনাদের সঙ্গে সঙ্গেই আবার জ্ঞানহারা হইয়া পড়িলেন। বিভার মাথাটি তখনও তাঁহার বুকের উপর ছিল, এবং বোধ হয়, সমস্ত দিনের মধ্যে এই প্রথম তাহার চক্ষু ফাটিয়া জল বাহির হইয়া তাহার আজন্ম আশ্রয় স্থল সেই পুরাতন স্নেহপূর্ণ বুকটি ভাসাইয়া দিল। বিভা তাহার ঝিমার যন্ত্রণার তীব্রতা সমস্ত দিন ধরিয়া অনুভব করিতেছিল, কিন্তু এখন তাহার দেহ সেই স্নেহ-ময়ীর বক্ষের সহিত সংলগ্ন ছিল বলিয়াই তাঁহার এই মুহূর্ত্তের আর্ত্তনাদ বিভার পক্ষে একটা তড়িৎস্পর্শ রূপে সেই যাতনার তীব্রতার পরিমাপ তাহার মর্ম্মের ভিতর সম্যকরূপে অঙ্কিত করিয়া দিল। একবার মাত্র কাতর চীৎকার করিয়া উঠিয়া বিভা অকস্মাৎ স্তব্ধ হইয়া গেল। বাহিরে নব চাঁড়াল আশঙ্কার স্বরে বলিয়া উঠিল, "কি হ'ল দিদিমণি!" এবং হেমন্ত তাড়াতাড়ি উঠিয়া ঘরের ভিতর আসিয়া পড়িল।

মুহূর্ত্তের মধ্যেই আপনাকে সামলাইয়া লইয়া "কিছু না" বলিয়া হেমন্তের দিকে দৃষ্টি পড়িতেই বিভা শান্ত দৃঢ়তার স্বরে তাহাকে বলিল, "আমার সঙ্গে একবার বাইরে এস ত, তোমাকে একটা কথা বল্‌ব।"

বাহিরে গিয়া সে বলিল "দেখ, আমরা বড় নিঃসহায়। কোন উপায় নেই ব'লেই তোমাকে একটা অনুরোধ কর্‌ছি।"

"কি কর্‌তে হবে বল।"

"তোমাকে একবার হরিপুরের ম্যানেজারের কাছে যেতে হবে। আর সেখানে ম্যানেজারকে আমার নাম ক'রে বল্‌তে হবে যে, আমাদের এই বিপদে তিনি যদি চেষ্টা ক'রে জেলার বড় ডাক্তারকে আনিয়ে দেন—তা হ'লে" একটু থামিয়া বলিল, "তিনি যা চান তাই হবে।"

"যাচ্ছি" বলিয়া হেমন্ত তাহার মুখের উপর দৃষ্টিপাত করিতেই সেখানে এমন একটা কিছু দেখিতে পাইল যাহাতে সেই চিরকেলে ডান্‌পিটে ছেলেটিকেও কয়েক মুহূর্ত্ত স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইল। তাহার পর সে বাঁশের আল্‌নায় ঝুলান তাহার কোটটি গায়ে দিয়া, একটা বাঁশের ছোট লাঠি হাতে লইয়া যখন তাহার গন্তব্য পথে যাত্রা করিতেছিল, তখন বিভা হারিকেন লণ্ঠনটা ঘর হইতে বাহির করিয়া নব চাঁড়ালকে বলিল, "তুমি এই আলোটা নিয়ে এঁর সঙ্গে যাও ত নব।"

"কোথায় দিদিমণি?"

"হরিপুরের কাছারিতে—"

অতিমাত্রায় বিস্মিত হইয়া নব বলিয়া উঠিল, "হরিপুর! এই রাত্রিতে!"

বিভা একটিমাত্র কথায় উত্তর দিল, "হাঁ।"

"কিন্তু নদী যে তিন পো দিদি। নৌকা নেই, পার হ'বার উপায়—"

হেমন্ত তাহার কথায় বাধা দিয়া বলিল, "এস, সাঁতার জান ত।"

বিভা একবার শিহরিয়া উঠিয়া হেমন্তর মুখের উপর চাহিয়া বলিল, "কাজ নেই তবে।"

নব বলিল "মানুষের সাধ্যি নয় দিদি; বানের জোরে খড় পড়লে কুটি কুটি হ'য়ে যাচ্ছে।"

হেমন্ত লণ্ঠনটা হাতে তুলিয়া লইয়া বলিল, "আমি চল্‌লুম। কিন্তু রাস্তাটা ত জানি না। একটু ব'লে দিতে হবে, নব।"

ঘরের ভিতর হইতে বামুনমার কণ্ঠে স্পষ্ট স্বরের আহ্বান আসিল, "বিভা, মা আমার, কোথায় গেলি মা?"

অতুলের মা তাড়াতাড়ি তাহাকে ডাকিতে আসিতেছিল, কিন্তু তাহার আগেই বিভা একরকম ছুটিয়াই ঘরে ঢুকিল। তাহার মুখের দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন, "হেমন্ত কোথায় মা?" তাহার পর অতুলের মাকে ডাকিয়া বলিলেন, "তাকে একবার ডাক ত অতুলের মা, আর তুমিও শোন আমি যা বলি।"

হেমন্ত আসিয়া কাছে দাঁড়াইতেই তিনি ইঙ্গিতে তাহাকে পাশে বসিতে বলিয়া তাহার হাতটা টানিয়া আনিয়া আপনার বুকের উপর রাখিলেন। তাহার পর অপর পার্শ্বে উপবিষ্টা বিভার হাতখানি লইয়া হেমন্তের হাতের উপর রাখিয়া বলিলেন, "অনেক কথা বুঝিয়ে বল্‌তে হয়, কিন্তু তার সময় নেই আমার সামর্থ্যও নেই, এবং হয় ত বা তোমরা সব বুঝতেও পারবে না। তবু যা পারি তা বলছি। তুমি আমাকে ফাঁকি দিতে পার নি, বাবা। তোমার কাহিনী শুনেই আমি তোমাকে ধ'রে ফেলেছি। তুমি ওরকম ক'রে পুরোনো কথায় কৌতূহলী না হ'লেও, তোমার চেহারা, তোমার ঐ মুখের, বিশেষত নাকের গড়ন সেকালে যারা দেখেছিল তাদের মনে ক'রে দিতই দিত যে রায়গোষ্ঠির, যদুরায়ের, শরীরের ছাপ তোমার দেহের উপর আছে। বুড়ো শশীমুখী পর্য্যন্ত—যাক সে কথা। এতদিন পরে তুমি যে কি মনে ক'রে এই গাঁয়ে তোমাদের পড়ো ভিটায় এসে অধিষ্ঠান হয়েছিলে তা তুমিই জান। আমার কিন্তু কেবলই মনে হচ্ছিল এতদিন পরে ঈশ্বর এ অদ্ভুত সংঘটন ঘটালেন কোন উদ্দেশ্যে। একটা বড় আশা হচ্ছিল, আবার তা'র পথে অনেক বাধাবিঘ্নও দেখ্‌ছিলুম। বিভা হয়ত তোমার চেয়ে বয়সে একটু বড়—তা কুলীনের ঘরে অমন অনেক হয়—আমি নিজে দেখেছি। তারপর তোমার হয়ত চালচুলো নেই—হয়ত বা বিয়ে সাধ্যিও নেই। কিন্তু তোমার যে বুদ্ধি আছে তোমার যে হৃদয় আছে, তোমার ভিতর যে অনেক মিষ্টি জিনিষ ভাল জিনিষ আছে, তা তোমার মুখ দেখে আর এই চার দিন একসঙ্গে থেকে যে না চিন্‌তে পারবে সে অন্ধ। লোকে বলে পার্ব্বতী বামনি মুখ দেখে মানুষের অন্তরের কথা ব'লে দিতে পারে। তোমার সম্বন্ধে অন্ততঃ আমি যে ভুল করিনি—যাক সেকথা। সব চেয়ে বড় বাধা ছিল যদি তুমি স্বীকার না কর, আরও একটা বড় বাধা, বিভার।" হঠাৎ বামুনমা একটু থামিয়া গেলেন। হয়ত বা যন্ত্রণার একটা নূতন তীব্রতা তাঁহার মস্তিষ্কে দারুণ আঘাত করিল। আবার বলিতে লাগিলেন, "তারপর বুড়ো সতীশ মুখুয্যের কথা। যা সম্ভব নয় তাও। বিভার বিয়ের কথা বহুকা'ল ধ'রে ভেবে ভেবে, বহুস্থানে হতাশ হ'য়ে আমার মতিভ্রম হ'বার উপক্রম হয়েছিল। তা' না হ'লে আমার অমন গৌরী-প্রতিমা মাকে বিসর্জ্জন দেবার—" ঘরের ভিতর দুইজন আগন্তুকের ছায়া পড়িতে দেখিয়া তিনি বলিলেন, "কারা তোমরা?"

অতুলের মা চাহিয়া দেখিয়া বলিল, "বিভার সই আর তার বর।"

আনন্দের তৃপ্তিতে বামুনমা'র চক্ষু দুইটি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি যে হাতটি দিয়া বিভা ও হেমন্তের সংলগ্ন কম্পমান স্বেদসিক্ত হাত দুইটি আপনার বক্ষের উপর চাপিয়া রাখিয়াছিলেন, সেই হাতটি তুলিয়া কপালে ঠেকাইয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে আবার পূর্ব্বের ভাবে রাখিয়া বলিতে লাগিলেন, "ভগবানের দয়া! আয় মা, এস বাবা। তোমরাও সাক্ষী—" একটু ম্লান হাসি হাসিয়া তাহাদের

শ্রীঅক্ষয়কুমার সরকার

দিকে চাহিয়া আবার বলিলেন, "বিভার বিয়ে—এই সত্যিকার বিয়ে—মনের বিয়ে—বাইরের বিয়েটা—"

বিভার দৃষ্টি অকস্মাৎ একবার হেমন্তের মুখের উপর পড়িল, এবং তাহার পরেই তাহার কণ্ঠ হইতে দৃঢ় স্পষ্টস্বরে উচ্চারিত হইল "ঝি মা!"

"হাঁ মা! মনকে ফাঁকি দিও না। আর তুমি ত সে মেয়েও নও মা! যা সত্য যা উচিত তাতে লজ্জাও নেই—দোষও নেই—তা তুমি ত আমার চেয়ে কম জান না মা—"

"তোমার পায়ে পড়ি ঝি মা—এমন কাজ তুমি ক'রে যেও না—এমন ক'রে তুমি আমাকে বেঁধে ফেলে—"

ঝি মার চক্ষুর আনন্দের তৃপ্তি অন্তর্হিত হইয়া সেখানে একটা নিরাশার ছায়া আসিয়া পড়িল। কিন্তু বিভার মুখের দিকে আর একবার চাহিবামাত্রই তাঁহার চক্ষুর দীপ্তি পুনর্ব্বার ফিরিয়া আসিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে তত যন্ত্রণার মধ্যেও বদনমণ্ডলে মৃদু প্রসন্নভাব উদয় হইল। স্বগতভাবে বলিয়া উঠিলেন, "যা ভয় হচ্ছিল, তা ত নয়। অনিচ্ছা নয়; সঙ্কোচ, তাও নয়। তবে—? যাই হোক—ভাববার ত আর সময় নেই।" একটু থামিয়া কি ভাবিয়া লইয়া আবার বলিলেন, "হেমন্ত, তোমাকে আমি বিভাকে দিয়ে গেলাম। পুরুত এখন মন্তর পড়লে না বটে, কিন্তু ভগবানের কাছে আমি মন্তর প'ড়ে তোমাদের এই বন্ধন অচ্ছেদ্য ক'রে যাচ্ছি। বিভা যে কারণেই যাই বলুক, তোমার দাবি তুমি ছেড়ো না। তাতে তোমার পাপ হবে, পৌরুষের হানি হবে। বিভাকে তুমি পতিতা হ'তে,—দ্বিচারিণী হ'তে-

মুমূর্ষুর কণ্ঠের এই উত্তেজনাময় গম্ভীর বাণীতে সেই গৃহের কয়টি প্রাণীই তখন রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছিল। বামুন মা মুহূর্ত্তের জন্য অন্যমনস্ক হইয়া আবার বলিতে লাগিলেন, "তোমরা সুখী হবে, আমি আশীর্ব্বাদ করচি। অনেক আশঙ্কা হয়েছিল। এত যন্ত্রণার মধ্যে কেবলমাত্র একটি চিন্তা আমার সমস্ত মনকে দখল ক'রে ব'সে ছিল। কি যে কর্ত্তব্য তা' ঠিক ক'রে উঠ্‌তে পার্‌ছিলুম না। তারপর একটু আগে যেন তন্দ্রার মত এসেছিল আর তারই মধ্যে আমার অন্তরের দেবতা যেন আমাকে বলেছিলেন—সতীশ মুখুর্য্যে! অমন মহাপাপ তুই করিস্ নে—জেনে শুনে মেয়েটাকে আজীবন জলন্ত আগুনে ঝল্‌সাবার ব্যবস্থা—" তাহার পর আবার একটু থামিয়া, বোধ হয় তন্মুহূর্ত্তাগত যন্ত্রণার তীব্রতাকে সামলাইয়া লইয়া বলিলেন, "অতুলের মা, তুমি আমার পেটের মেয়ে নও কিন্তু তার চেয়ে কমও নও। তুমি এদের বিপদে আপদে দেখো, আর যাতে মন্তরটা পড়া হয়, সামাজিক ক্রিয়াটা—" সেই সময় বিভার সইএর দিকে দৃষ্টি পড়াতে তাহাকে বলিলেন "সুভাষ, মা, তুমি আর বিভা ভিন্ন-প্রাণ নও জানি—তোমাকেও বলচি তোমার বরকেও বলচি, তোমরা আমার এই সম্প্রদানের সাক্ষী রইলে, দেখো যেন পার্ব্বতী বামণীর এই দান অক্ষুণ্ণ থাকে, সার্থক হয়।" আবার অতুলের মায়ের দিকে চাহিয়া বলিলেন "যদি তেমন বাধাবিঘ্ন কিছু দেখ, কালীঘাটে আমার শিষ্যবাড়িতে—"

বোধ হয় হঠাৎ যন্ত্রণাটা একবারে অসহ্য হওয়ায় একটা আর্ত্তনাদ করিয়া বামুন মা আবার অচেতন হইয়া গেলেন। তন্মুহূর্ত্তে যে হাতটি একান্ত আগ্রহে বিভা এবং হেমন্তের সংলগ্ন হাত দুইটি এতক্ষণ পরম প্রিয় সামগ্রীর মত হৃদয়ের উপর চাপিয়া রাখিয়াছিল তাহা শিথিল হইয়া পড়িল। বিভা তাহার হাতটি তুলিয়া লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং হেমন্তকে চক্ষুর ইঙ্গিতে তাহার সহিত বাহিরে আসিতে বলিল। হেমন্ত তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বাহিরে আসিতে আসিতে শুনিতে পাইল, "নব দাদা, তুমি কি এঁর সঙ্গে হরিপুরে—"

"দরকার নেই। রাস্তার কথাটা ব'লে দিলে আমি একাই যেতে পারব" বলিয়াই হেমন্ত উঠানে কিছুক্ষণ আগে পরিত্যক্ত আলোটা এক হাতে আর লাঠিটা অপর হাতে তুলিয়া লইয়া যাইবার উপক্রম করিল; তারপর হঠাৎ একবার কি ভাবিয়া বিভার চক্ষুর উপর দৃষ্টিপাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "সতীশ মুখুর্য্যেকে কি বল্‌ব?" সেই সময়ে বিভার চক্ষুর অস্বাভাবিক উজ্জ্বল দৃষ্টি তাহার নয়নে পতিত হওয়াতে তাহার দৃষ্টি সঙ্কোচে নত হইয়া গেল;

এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার কর্ণে তীব্র স্পষ্ট স্বরে ধ্বনিত হইল, "যা বল্‌তে হবে তা'ত বলেছি।"

বিভার সই তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। সে বলিল, "সয়া কোথায় গেল সই?

"হরিপুরে।"

বোধ হয় সতীশ মুখুয্যের তদ্বির বা অর্থের জোরেই পরদিন প্রাতঃকালের অল্পক্ষণ পরেই জেলার বাঙ্গালী সিভিল সার্জ্জন এবং তাঁহার সহকারী আসিয়া পৌঁছিলেন। রোগীর তখন প্রায় শেষ অবস্থা। হেমন্তের হস্তে বিভাকে সেই সম্প্রদানের পর তিনি যে জ্ঞানহারা হইয়া পড়িয়াছিলেন সমস্ত রাত্রির জ্বর বিকার এবং প্রলাপের মধ্যে তাঁহার জ্ঞান আর ফিরিয়াছিল কি না কেহ ঠিক বুঝিতে পারে নাই। তবে অনেকেই লক্ষ্য করিয়াছিল যে মাঝে মাঝে তাঁহার চক্ষু পার্শ্বে উপবিষ্টা বিভার মুখের উপর সস্নেহ দৃষ্টিপাত করিয়াই যেন আর কাহাকে খুঁজিতেছিল; কিন্তু তাঁহার মুখ হইতে কোন জ্ঞানের কথা উচ্চারিত হয় নাই।

সিভিল সার্জ্জন রোগীকে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "এত রক্তস্রাব হ'য়ে গেছে যে, এখন বাঁচান এক রকম অসম্ভব; সময়ে যদি হাতটা কেটে ফেলা হ'ত—" এই সময়ে তাঁহার দৃষ্টি হেমন্তের উপর পড়াতেই বলিয়া উঠিলেন, "তুমিই কাল রাত্রিতে আমার কুঠিতে গিয়েছিলে না? বাহাদুর ছোকরা বটে! রোগী কি তোমার মা?"

সুভাষিণীর স্বামী সেখানে দাঁড়াইয়াছিল। সে কি বলিতে যাইতেছিল, তাহাকে বাধা দিয়া হেমন্ত যেন একটা উত্তেজনার সঙ্গে বলিয়া উঠিল, "না, মা নন্, কেউ নন্।"

বৃদ্ধ ডাক্তার হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া হেমন্তের কাছে সরিয়া আসিয়া তাহার মুখের উপর কিয়ৎকালের জন্য দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া বলিলেন, "পরের জন্য মানুষ এতটা করতে পারে!" তাহার পর তাঁহার দৃষ্টি হেমন্তের ক্ষতবিক্ষত পাদুটির উপর পড়িতেই তিনি সুভাষিণীর স্বামীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "এরও যে শুশ্রূষার দরকার। এ মহাপ্রাণ কাল সমস্ত রাত ধ'রে—"

অতুলের মা আসিয়া বলিল, "বিভাদিদি তোমাকে ডাকছে।" হেমন্ত বোধ হয় সিভিল সার্জ্জেনের প্রশংসমান দৃষ্টি হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্যই তাড়াতাড়ি ঘরের বাহির হইয়া গেল।

রান্নাঘরের দ্বারে বিভা দাঁড়াইয়াছিল। একটা গাড়ুর উপর গামছা এবং গরম সরিষার তেলের একটা বাটি তাহার পায়ের কাছে রাখিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "আমারত সময় নেই, তুমি পাটা ধুয়ে একটু পায়ে—" অতুলের মা একখানা শুকনা কাপড় হাতে করিয়া আসিয়া দাঁড়াইতেই তাহার কথা আটকাইয়া গেল। কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই হেমন্ত সেই তরুণীর চক্ষুর উপর দৃষ্টিপাত করিয়া সেখানে এমন একটা অননুভূতপূর্ব্ব নারীস্নেহের স্নিগ্ধ মধুরতার আস্বাদ পাইল যে, তাহার প্রকৃতি সে ঠিক ধারণা করিতে না পারিলেও, তাহাতে তাহার অন্তরাত্মা পুরস্কারের অপূর্ব্ব পরিতৃপ্তিতে একান্ত প্রসন্ন হইয়া উঠিল। সে বিভার চক্ষুর উপর সলজ্জ হাসিমাখা দৃষ্টি রাখিয়া বলিল, "তেল কি হবে? তুমি ঝি মা'র কাছে যাও। আমিও পাটা ধুয়েই যাচ্ছি।"

অতুলের মাকে দিয়া রমেশকে ডাকাইয়া বিভা জিজ্ঞাসা করিল, "ডাক্তার সাহেব কি বল্‌ছেন?" রমেশ সব কথা বলিতে ইতস্ততঃ করিতেছিল, এমন সময়ে হেমন্ত আসিয়া সেইখানে দাঁড়াইলে বিভা তাহার দিকে একান্ত নির্ভরে চাহিয়া বলিল, "তুমি একবার ডাক্তার সাহেবকে বল আমার ঝিমাকে ভাল ক'রে দিতে।"

তাহার দিকে একবার মাত্র চাহিয়া হেমন্ত রমেশের সঙ্গে রোগীর ঘরের দিকে অগ্রসর হইল। সেখানে কিছুক্ষণ পরামর্শের পর ডাক্তার বলিলেন, "কোন আশাই নেই। তবে যখন এসেছি হাতটা কেটে দিয়ে একবার দেখ্‌তেও ক্ষতি ছিল না। কিন্তু তা হ'লে আর কারও রক্ত খানিকটা শরীরে—"

সাগ্রহে হেমন্ত বলিল, "তা'হলে রক্ষা পাবেন?"

ডাক্তার বলিলেন, "তা'র বিশেষ সম্ভাবনা নেই। তবে আমাদের শাস্ত্রে এরকম ক্ষেত্রে চিকিৎসা এইরূপই—"

হেমন্ত বলিল, "তাহলে শীঘ্র ব্যবস্থা করুন।"

"রক্ত কে দেবে?"

শ্রীঅক্ষয়কুমার সরকার

হেমন্ত একটু লজ্জিত ভাবে বলিল, "তা হ'বে এখন—"

ডাক্তার তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তুমি ? তা তোমার দেহ বলিষ্ঠ। তেমন কোন বিপদের সম্ভাবনা দেখচি না। কিন্তু রক্তও অনেকটা লাগ্‌বে, আর কাল সমস্ত রাত ধ'রে তুমি যে পরিশ্রম করেচ তা'র ফলে হয় ত বা তোমাকে কিছু দিন শয্যাগত থাকতে হবে। তোমার ত কেউ নন্‌ শুনচি –"

হেমন্ত মৃদু হাসিয়া বলিল, "আপনি বন্দোবস্ত করুন।"

বিভা সেখানে দাঁড়াইয়াছিল বলিয়া ইংরেজীতে কথা হইতেছিল।

হেমন্তের বামহ'তের একটা স্থানে কি একটা ঔষধ লাগাইয়া ডাক্তার যখন তাহাকে রোগিণীর পাশে শুইতে বলিলেন তখন বিভা আশ্চর্য্য হইয়া রমেশকে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন ?"

রমেশের কথায় কারণ অবগত হইবামাত্র বিভার শরীরটা যেন তাহার অজ্ঞাত সারেই কাঁপিয়া উঠিল, এবং সেই ভাবেই তাহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল, "রক্ত দিতে হবে !"

মুহূর্ত্ত মধ্যেই কিন্তু সে বেশ ধীরতার সহিত বলিল "কিন্তু এর রক্ত কেন ? আমি ত রয়েচি।"

হেমন্ত অতুলের মাকে ইঙ্গিত করিয়া তাহাকে বাহিরে লইয়া যাইতে বলিল। সে কিন্তু হেমন্তের দিকে চাহিয়া বলিল, "তুমিও একটিবার আমার সঙ্গে এস।"

তাহারা বাহির হইলে ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিলেন, "মেয়েটি ছেলেটিতে কি সম্পর্ক ?"

রমেশ একটু সঙ্কোচের হাসি হাসিয়া বলিল "কি বল্‌ব ? ইংরেজ হ'লে বল্‌তুম Fiancee (বাগ্‌দত্তা)"

ডাক্তারও একটু হাসিয়া বলিলেন "ওঃ, বুঝেচি, কিন্তু বয়স ত প্রায় সমান। ব্রাহ্ম ? না, পইতে রয়েচে যে--"

বিভা বাহিরে হেমন্তকে বলিল, "রক্ত আমি দেব" এবং হেমন্তের মুখে একটা প্রতিবাদের আভাষ মাত্র পাইয়া অকস্মাৎ উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠিল, "তুমি কোথাকার কে পর ! তোমার রক্ত আমার ঝিমা'র পবিত্র দেহে—"

"আমি ত আর এখন পর নই, বিভা, ঝি, মা ত কাল রাত্রিতে আত্মীয়ের অধিকার—"

কথা শেষ হইবার আগেই একটা অপ্রত্যাশিত তীব্র স্বরে চমকিত হইয়া হেমন্ত তাহার সম্মুখস্থিতা তরুণীর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিতে পাইল যে, তাহার সে অঙ্গটা যেন একটা বিশ্রী ভাবে—ঘৃণায়, তাচ্ছীল্যে বা বিরক্তিতে অথবা ঐ তিনটারই সংমিশ্রণে ভরিয়া উঠিয়াছে,—এবং তাহার নেত্র দুইটি ক্রোধে স্ফীত এবং উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে। স্তম্ভিত হেমন্তের কর্ণে প্রবেশ করিল, "তুমি এত হীন, এত নির্লজ্জ যে, আমার এই মহাবিপদের কালে, আর মুমূর্ষু ঝিমা'র কথা আমি না-করতে পারবনা জেনে, তাঁর বিকারের ঝোঁকের একটা অর্থহীন উচ্চারণের বলে আমাকে বাঁধ্‌তে আসচ ?"

কথাগুলি বলিতে বলিতে কেন যে তাহার চক্ষু দুইটি জলে ভরিয়া আসিল তাহা বলা শক্ত। কিন্তু তাহার পরেই হেমন্তের মুখের উপর তাহার দৃষ্টি পড়িবামাত্র সে যে কাণ্ডটা করিয়া বসিল তাহা মানব-বুদ্ধির একবারেই অবোধ্য। বিভা হঠাৎ হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পড়িয়া হেমন্তের পা দু'খানির উপর তাহার মুখটি রাখিয়া চক্ষুর জলে তাহা ভাসাইয়া দিয়া ভূত-গ্রস্তের মত বলিয়া উঠিল, "আমাকে মাপ কর, মাপ কর !" কিন্তু তাহার সে মনের ভাব মুহূর্ত্তের মধ্যেই আবার অন্তর্হিত হইয়া গেল, এবং যখন হেমন্ত তাহার হাতখানি ধরিয়া তাহাকে তুলিয়া দাঁড় করাইল, তখন সে পূর্ব্বের মতই স্পষ্ট এবং দর্প-পূর্ণ স্বরে বলিল, "আমার ঝিমার দেহে আমারই রক্ত যাবে, আর কারও নয়।" হেমন্ত কি বলিয়া প্রতিবাদ করিবে তাহা স্থির হইবার আগেই বিভা ঘরের ভিতর ঢুকিয়া পড়িয়া ডাক্তারকে বলিল, "রক্ত আমার দেহ থেকে নিন্‌।"

সেখানকার সকলের আন্তরিক প্রতিবাদ সত্ত্বেও তাহার পণ অক্ষুন্ন রহিল। তাহার সুস্থ সবল দেহ হইতে রক্ত লইলে তাহার কোন অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই জানিয়া ডাক্তার তাহাতে মত দিলেন।

(ক্রমশঃ)

পুস্তক সমালোচনা

শ্রীঅরবিন্দের গীতা—১ম খণ্ড, ২য় সংস্করণ; শ্রীঅনিলবরণ রায় অনূদিত। প্রকাশক—শ্রীবিভূতিভূষণ রায়, গুইর, কৈয়ড় পোঃ, বর্দ্ধমান। ১৬ পেজী ডঃ ক্রাঃ ১৪৫ পৃষ্ঠা। মূল্য ১।০ টাকা।

শ্রীঅরবিন্দের গীতা আমাদের দেশের গৌরব শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ কর্ত্তৃক লিখিত Essays on the Gita নামক ইংরাজী গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ। শ্রীযুক্ত অনিলবরণ রায় খুবই প্রাঞ্জল ভাষায় এই অনুবাদ করিয়াছেন, যদিও ইহা অবিকল অনুবাদ তথাপি পড়িতে পড়িতে মনে হয় যেন একখানি উপাদেয় মৌলিক গ্রন্থ পাঠ করিতেছি। ইংরাজি ও বাংলা উভয় ভাষাতেই অনিলবরণ সতেজ ও সরল হস্তে লিখিয়া থাকেন, তাঁহার লেখা যথাযোগ্য সুষ্ঠু চিন্তায় পরিপূর্ণ উচ্চ সাহিত্যিক শক্তি ও উদার ভাবের পরিচায়ক।

গীতা হিন্দুধর্ম্মের সার। গীতাকে কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের ধর্ম্মগ্রন্থ মনে করিলে ভুল করা হইবে, গীতার ভাব সার্ব্বজনীন। সংক্ষেপে সকল ধর্ম্মের সার সাধারণ সত্যগুলি গীতাতে প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু, যদিও গীতার রচনা-ভঙ্গি সরল ও মনোরম তথাপি যে সব উচ্চ অধ্যাত্মসম্পদ ইহাতে গূঢ়ভাবে ব্যক্ত হইয়াছে তাহা বুঝিতে হইলে উপযুক্ত ব্যক্তির দ্বারা বিস্তৃত ব্যাখ্যা আবশ্যক। এইরূপ সাহায্য ব্যতীত পাঠকের পক্ষে গীতার বহুমূল্যবান শিক্ষা ধারণা করা সম্ভব নহে। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে গীতার ব্যাখ্যা করিয়াছেন আধুনিক বঙ্গের অধ্যাত্মসাধনার ঋষি, বিশ্ববিশ্রুত শ্রীঅরবিন্দ। তিনি এই মহান্ গ্রন্থের রত্নভাণ্ডার হইতে গুপ্ত অর্থসকল উদ্ধার করিয়াছেন। এই উৎকৃষ্ট ব্যাখ্যা পাঠ করিলে গ্রন্থকার অধ্যাত্মবিষয়ের বিশ্লেষণে যে মৌলিকতা ও গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন তাহা দেখিয়া বিস্ময়ে মুগ্ধ হইতে হয়। আমার কাছে জিনিষগুলি এক নূতন আলোকে উদ্ভাসিত হইয়াছে; পূর্ব্বে গীতা পাঠ করিবার সময় যাহা লক্ষ্য করিতে পারি নাই এখন অনেক তথ্য আমার নিকট সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। শ্রীঅরবিন্দ দেখাইয়াছেন যে গীতা কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের গ্রন্থ নহে, কোন বিশেষ মতবাদের অঙ্গীভূত নহে। কোন কোন বিষয়ে গীতা বেদ, উপনিষদ ও ষড়দর্শনকে ছাড়াইয়া গিয়াছে, কেবল তাহাদের শিক্ষার সারটুকুই নিজের শিক্ষার অঙ্গীভূত করিয়া লইয়াছে। বিরোধী ধর্ম্মমত সকলের গীতা মন্থন সমন্বয় ও সামঞ্জস্য-সাধন করিয়াছে এবং যে উচ্চ স্তর হইতে গীতা সকল বিষয়কে দেখিয়াছে এমনটি আর জগতের কোন ধর্ম্মগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় না।

জগতের বিভিন্ন ধর্ম্মে যে সব মহান্ সমস্যা আছে, গীতা অকুণ্ঠিত ভাবে সে সবের সম্মুখীন হইয়াছে এবং শুভ ও অশুভের যে দ্বন্দ্ব চিরকাল দার্শনিকগণকে বিষম সমস্যায় ফেলিয়াছে, যাহার জন্য খ্রীষ্টান ধর্ম্মকে জগতের উপরে ভগবান ও সয়তান এই দুই বিরোধী শক্তির প্রভুত্ব স্বীকার করিতে হইয়াছে, গীতা সে সমস্যার অত্যুচ্চ সমাধান করিয়াছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি শ্রীযুক্ত অনিলবরণ রায়ের অনুবাদে মৌলিক গ্রন্থের স্বাচ্ছন্দ্য ও সরলতা বিদ্যমান আছে। যদিও বিষয়বস্তুটি খুবই জটিল ও আধ্যাত্মিক, তথাপি অনুবাদের গুণে উহা সরল ও সহজবোধ্য হইয়াছে। তাঁহার লেখার ভঙ্গি একই সঙ্গে হৃদয়কে স্পর্শ করে এবং বুদ্ধিকেও আকৃষ্ট করে।

গীতা পাঠ করিতে হইলে এই সারবান বইখানিও পাঠ করা কর্ত্তব্য ইহাই আমার অভিমত। মূল গ্রন্থের সহিত এই অনুবাদটীও যদি পাঠ করা না যায় তাহা হইলে অনেক কথা অস্পষ্ট থাকিয়া যাইবে, অনেক প্রয়োজনীয় অংশের প্রকৃত অর্থ ধরিতে পারা যাইবে না। আমার পক্ষে আমি সর্ব্বান্তঃকরণের সহিতই বলিতে পারি যে, এই ক্ষুদ্র বাংলা বইখানি পাঠ করিয়া আমার অনেক লাভ হইয়াছে। অনিলবাবু যে কেবল বাংলা

রচনাতেই সিদ্ধহস্ত তাহাই নহে, তিনি একজন গভীর চিন্তশীল ব্যক্তি, তিনি মনীষীর অন্তর্দৃষ্টি লইয়াই আমাদের সমাজের ক্রমিক বিকাশ পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন। এই বইটিতে তাঁহার সুপরিচিত রচনাপ্রণালীর মনোজ্ঞতা আছে। আমি আশা করি গীতার প্রত্যেক বাঙ্গালী পাঠক যখন অধ্যাত্ম ধর্ম্ম ও নীতি সম্বন্ধে জগতের এই শ্রেষ্ঠ সম্পদটি পাঠ করিবেন, তখন এই মূল্যবান ব্যাখ্যাটিও পাঠ করিতে ভুলিবেন না।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

দুই চিঠি—শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক এম, এ, বি, এল, প্রণীত। মূল্য পাঁচ সিকা। প্রকাশক- শ্রীবিষ্ণুপদ চক্রবর্ত্তী বি, এল, ; চক্রবর্ত্তী সাহিত্য-ভবন বজ্‌বজ্, পোঃ, ২৪ পরগণা।

একখানি গল্প পুস্তক—দশটি গল্পের সমষ্টি। কথা-সাহিত্যে সতীশবাবু একজন ক্ষমতাবান লেখক। এ পুস্তকের প্রত্যেক গল্পে তাঁর সুমার্জ্জিত শিল্প-বোধের পরিচয় বিদ্যমান। গল্পগুলি বিভিন্ন রসাশ্রিত বলিয়া পুস্তকটি পড়িতে পড়িতে পাঠক-চিত্ত হর্ষ-বিষাদ-বিস্ময়-কৌতুকের পথে অনলস ঔৎসুক্যের সহিত অগ্রসর হয়।

পুস্তকটির বাঁধাই ও ছাপা উৎকৃষ্ট ; প্রিয়জনকে উপহার দিবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত।

জাপানে বঙ্গনারী—সরোজ-নলিনী দত্ত, এম, বি, ই, প্রণীত। মূল্য একটাকা। প্রকাশক—শ্রীসুধীর-চন্দ্র সরকার, ৯০।২এ, হ্যারিসন রোড্, কলিকাতা।

জাপান ভ্রমণ কালে গ্রন্থকর্ত্রী দৈনন্দিন জীবনের যে দিন-লিপি গুলি লিখিয়াছিলেন তাহাই একত্র করিয়া এ পুস্তকখানি বিরচিত। শুধু জাপানেরই নয়, জাপান পথে সিঙ্গাপুর চায়না প্রভৃতি স্থানেরও বহু কৌতূহল পূর্ণ জ্ঞাতব্য কথা এই পুস্তকখানিতে স্থান পাইয়াছে। পুস্তকখানির ভাষা সরল, প্রাঞ্জল, গতিশীল,—ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিবার পক্ষে উপযোগী। এ পুস্তকের একটি বৈশিষ্ট্য, বিদেশ দেখিবার সময় লেখিকা তাঁর স্বদেশকে ভুলিয়া যান নাই। মনের মধ্যে স্বদেশকে ধারণ করিয়া চক্ষে তিনি বিদেশকে দেখিয়াছেন—তাই যখনই প্রয়োজন হইয়াছে তিনি জাপানের রীতি, নীতি, পদ্ধতির কথা বলিতে গিয়া স্বদেশের রীতি, নীতি, পদ্ধতির আলোচনা করিয়াছেন। সুতরাং বইখানি শুধু উপভোগ্যই নহে, উপকারীও।

বইখানির বাঁধাই সুদৃশ্য—আয়তন ১৬ পৃঃ ডঃ ক্রাঃ ১৩১ পৃষ্ঠা, এবং পাঁচখানি রঙিন এবং ৭০ খানি একরঙা ছবি দিয়া সুশোভিত। সে হিসাবে পুস্তকখানির মূল্য যথেষ্ট অল্প। ইহার বিক্রয় লব্ধ অর্থ "সরোজ নলিনী দত্ত নারী মঙ্গল সমিতির" তহবিলে অর্পিত হইতেছে। আমরা আশা করি অবিলম্বে এ পুস্তকখানির পরবর্ত্তী সংস্করণ আমাদের হস্তগত হইবে।

গিরিশ-প্রতিভা—শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত প্রণীত। ডিমাই ৮ পেঃ ৬৩৮ পৃষ্ঠা। মূল্য পাঁচ টাকা। প্রকাশক —গ্রন্থকার, ৩১, হালদার পাড়া রোড্, কালীঘাট, কলিকাতা।

বর্ত্তমান পুস্তকের গ্রন্থকার "দেশবন্ধু স্মৃতি" নামে পরলোকগত চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের জীবনী লিখিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। স্বনামখ্যাত নাট্যকার এবং অভিনেতা ৺গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের সুবৃহৎ জীবনী লিখিয়া তিনি সকলের ধন্যবাদ-ভাজন হইয়াছেন। সাধারণত যে অর্থে "জীবনী" শব্দের প্রয়োগ হয়, সে অর্থে এ পুস্তকখানিকে জীবনী বলিলে বোধহয় একটু ভুল করা হইবে। গিরিশচন্দ্রের জীবদ্দশায় তাঁহার সহিত গ্রন্থকারের পরিচয় ছিল না, সুতরাং গিরিশচন্দ্রের জীবনের ঘটনাবলী যাহা কিছু এ পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছে সে বিষয়ে তাঁহার স্বকীয় জ্ঞান নাই, যদিও গিরিশচন্দ্রের আত্মীয় সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের নিকট হইতে তিনি সে বিষয়ে অনেক সন্ধান এবং সাহায্য পাইয়াছেন। যে প্রতিভা বলে গিরিশচন্দ্র বাঙলা নাট্যসাহিত্য এবং নাট্য-মঞ্চের জনক বলিয়া সম্মানিত, এ পুস্তকখানি প্রধানত সেই প্রতিভারই আলোচনা—সুতরাং সাধারণ জীবনী পুস্তক অপেক্ষা এরূপ জীবনী পুস্তকের মূল্য অনেক বেশি। গিরিশচন্দ্রের সাহিত্য-প্রতিভা বিশ্লেষণে হেমেন্দ্রবাবু যথেষ্ট

যত্ন, পরিশ্রম এবং দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। এ পুস্তকখানি বঙ্গ-সাহিত্য ভাণ্ডারে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

সুরধুনী—শ্রীসুধীরচন্দ্র কর প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়, প্রবাসী কার্য্যালয়, ৯১, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা। মূল্য বার আনা।

এখানি একটি গীতিকাব্যের পুস্তক—পঞ্চাশটি গীতি-কবিতায় গ্রথিত। কবিতাগুলি মিষ্ট, সুরচিত—ভাষা এবং ছন্দের লালিত্যে প্রশংসার্হ—তবে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব অতিশয় সুস্পষ্ট। সাধনার পথে অনুসরণ গোড়ার দিকে একটা প্রক্রিয়া বটে—কিন্তু অনতিবিলম্বে তাহা হইতে নিজেকে মুক্ত করিতে না পারিলে স্বকীয়তা হারাইবার সম্পূর্ণ আশঙ্কা থাকে। আশা করি সুরধুনীর কবি সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবেন।

রামায়ণের সমাজ—৺ কেদারনাথ মজুমদার প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এ সন্স্—কলিকাতা। মূল্য ৪৲ পৃঃ ৮০+।৴০+৪২০। গ্রন্থকার মহাশয় সুদীর্ঘ পঁচিশ বৎসরের সাধনার ফল বাঙ্গালার পাঠক-সমাজের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। দুঃখের বিষয় তিনি এই পুস্তক সম্পূর্ণভাবে মুদ্রিত অবস্থায় দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। কত কঠোর পরিশ্রমের সহিত তাঁহাকে এই সুদীর্ঘ সময় পুস্তকখানির ক্রমোত্তর উন্নতির জন্য ব্যয় করিতে হইয়াছে, সাংসারিক দুঃখ ও অশান্তি কিছুই তাঁহার সাহিত্য-সাধনার পথের অন্তরায় হইতে পারে নাই, তাহা প্রকাশকের ভূমিকায় উক্ত হইয়াছে। সফলতা যখন আসিয়া পৌঁছিল, সুদীর্ঘ পথ-যাত্রায় তার গন্তব্যস্থান পৌঁছাতে আর দেরী নাই, তখন কাল আসিয়া তাঁহাকে লইয়া গেল। গ্রন্থকারের পক্ষ হইতে নহে, বাঙ্গলার সুধী পাঠক সমাজের পক্ষে ইহা নিতান্ত পরিতাপের বিষয়। কবি তাঁহার কাজ করিয়া গিয়াছেন, বাংলার পাঠক-সমাজ তাঁহার স্বর্গীয় স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিয়া ধন্য হউন।

রামায়ণ কোন সময়ের রচিত তাহা আজও যথার্থ ঐতি-হাসিক ভাবে নির্দ্ধারিত হয় নাই,—রামায়ণের কতগুলি শ্লোক প্রক্ষিপ্ত আর কতগুলি শ্লোক মূল কবির রচনা তাহা লইয়া বাদানুবাদের শেষ হয় তো না হইতে পারে, কিন্তু এ কথা অস্বীকার করার উপায় নাই—ইহা তৎকালীন আর্য্য সমাজের চিত্র অঙ্কন করিয়াছে; কবির কল্পনাজালে বা উচ্ছ্বাসতরঙ্গে হয় তো ইহা স্থানে স্থানে আবৃত বা জটিল হইয়া উঠিয়াছে। যাঁহারা বলেন সমস্ত রামায়ণই কবির কল্পনাপ্রসূত, ইহাতে বাস্তবতার ছায়ামাত্র নাই, তাঁহাদিগকে কবির কথায় আমার বলি "কাব্য কল্পনার সৃষ্টি হইলেও কল্পনা যে প্রকৃত সৃষ্টিকে বা দেশকাল পাত্রকে অতিক্রম করে না, ইহা অস্বীকার করা যাইতে পারে না। স্বপ্ন যেমন দ্রষ্টার চিন্তার বাহিরের কোন অ-দৃষ্টপূর্ব্ব অপ্রত্যক্ষ পদার্থের কল্পনা করিতে অসমর্থ, কবিও সেইরূপ তাঁহার কল্পনাকে অবাস্তবের উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন না।"—উপক্রমণিকা পৃ ৩।

বাঙ্গলায় ঐতিহাসিক গ্রন্থ কমই লিখিত হইতেছে, আজকাল অনেকে ভারতের প্রাচীন ইতিহাস—কোন কোন বিশেষ অধ্যায় ধরিয়া লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন—অনেক ক্ষেত্রে সফলকামও হইয়াছেন। পণ্ডিত শ্যাম শাস্ত্রী কর্ত্তৃক কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের আবিষ্কারের পরে এ বিষয়ে কাজ দ্রুত গতিতে অগ্রসর হইতেছে—কিন্তু দুঃখের বিষয় সমস্তই ইংরাজী ভাষায় লিখিত হইতেছে। বাংলা ভাষায় ইহা একখানি অভিনব পুস্তক হইল,—বিষয়নির্ব্বাচন যেমন মনোহর এবং শিক্ষাপ্রদ এবং ইতিহাস-সংকলনের পক্ষে মূল্যবান, তেমনি রচনা পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও সংযত। তিনি রামায়ণী যুগের আর্য্যগণের সমাজ, ধর্ম্ম, ক্রিয়া অনুষ্ঠান, দেবতা, আহার্য্য ও আহার, সামাজিক নিয়ম ও লৌকিক আচরণ ও শাস্ত্রানুশাসন ইত্যাদি বিষয়ের বিশদ আলোচনা করিয়াছেন এবং এইযুগের সহিত পূর্ব্ববর্ত্তী বৈদিকযুগের এবং পরবর্ত্তী মহাভারতীয় যুগের তুলনা-মূলক সমালোচনা করায় পুস্তকখানির মূল্য শতগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষায় যাঁহারা প্রাচীন ভারতের ইতিহাস ও সভ্যতা অধ্যয়ন করিয়া থাকেন, তাঁহারা এই বই খানি পড়িলে বিশেষ উপকৃত হইবেন আশা করা যায়।

গল্পে উপনিষৎ—শ্রীসুধীরকুমার দাস এম, এ; মূল্য ২৲ পৃঃ ২৩৬। ছয়খানি একরঙা চিত্র আছে। প্রাপ্তিস্থান—বুক কোম্পানি, কলেজ স্কোয়ার।

বাংলায় এই ধরণের বই এই বোধ হয় প্রথম। উপনিষদের ব্রহ্মবিজ্ঞানক তত্ত্ব-রত্নগুলি ভারতবর্ষের কেন, সমগ্র পৃথিবীর গৌরবস্থল, অথচ এই দেশে উপনিষদের জন্মভূমিতে তাহার তেমন আলোচনা নাই—তাহার নানা কারণ। সে বিষয়ের আলোচনা আমরা এখানে করিব না। যাঁহারা এই দেশে এই স্বর্গীয় অমূল্য জ্ঞানগর্ভ বিষয়টিকে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিবার প্রয়াস পাইতেছেন, তাঁহারা ধন্য। যে যুগে সর্ব্বপ্রকারে জাতীয় প্রাচীন গৌরব মালার পুনরুদ্ধারের চেষ্টা চলিতেছে—সেই যুগে এই প্রচেষ্টা কি আধ্যাত্মিকতার দিক্ হইতে—কি মানুষ গড়ার দিক্ হইতে কত যে মূল্যবান ও আকাঙ্ক্ষিত তাহা বলা যায় না।

গ্রন্থকারের সাধ হইয়াছে—তিনি বাঙ্গালী সাধারণকে, বিশেষভাবে বাঙ্গালার ছাত্র ও যুবকগণকে, নূতন করিয়া উপনিষৎ শুনাইবেন। আমরা বলি তাঁহার শ্রম সার্থক হইয়াছে, তিনি নূতন ভঙ্গীতে, অপরূপ কৃতিত্বের সহিত উপনিষদের বাণী বাংলার তরুণদিগকে শুনাইয়াছেন, দেশ এজন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ রহিল। তাঁহার নিপুণ রচনা-ভঙ্গী, মনোহর কল্পনাশক্তি, আখ্যানভাগমালা এবং সত্য-গুলিকে সজীব এবং প্রাণস্পর্শী করিয়া তুলিয়াছে। উপনিষদের এই বাহ্যতঃ জটিল বিষয়গুলিকে এরূপ মনোহর করা যাইতে পারে তাহা আমাদের ধারণা ছিল না।

আমরা আশা করি বাংলার বিদ্যালয়সমূহের কর্ত্তৃপক্ষগণ এই বইখানি ছাত্র ও ছাত্রীগণের শিক্ষাপর্য্যায়ভুক্ত করিয়া দিবেন।

ছাপা ও বাঁধাই চমৎকার। সব দিক হইতে উপহার দিবার মত একখানি বই।

ঋষিদের প্রার্থনা—শ্রীসুধীরকুমার দাস এম, এ। পৃঃ ৬৪ মূল্য ৷৵০ আনা প্রাপ্তিস্থান:—বুক কোম্পানি, কলেজ স্কোয়ার; কলিকাতা।

গ্রন্থকার উপনিষৎ সমূহের সমুদয় শান্তিপাঠ ও সমুদয় প্রার্থনা মন্ত্রগুলির এবং বেদের কয়েকটি প্রসিদ্ধ প্রার্থনা মন্ত্রে বাংলা গদ্যে ও পদ্যে অনুবাদ করিয়াছেন, সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রগুলির 'সরলা' নামে সংস্কৃত টীকাও সন্নিবেশিত করিয়াছেন। কার্য্যটি অত্যন্ত দুরূহ এবং শ্রমসাধ্য; আনন্দের বিষয় তিনি বিশেষ কৃতিত্বের সহিত ইহা সম্পাদন করিয়াছেন। বাংলা সরল পদ্যে মন্ত্রগুলি অনূদিত ও গ্রথিত হওয়ায় বাংলা সাহিত্যের একটি অভাব মোচন করিল। যাঁহারা ছোট ছোট ছেলে মেয়েকে সংস্কৃত মন্ত্রাদির আবৃত্তি শিখাইতে চান্ তাঁহারা ইহার মূল্য বুঝিতে পারিবেন। আশা করি বইখানির বহুল প্রচার হইবে।

নানা কথা

মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়

গত ২৩শে ফাল্গুন সুবিখ্যাত সাহিত্যিক মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের অকাল মৃত্যুতে বঙ্গ-সাহিত্য বিশেষ-ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। বঙ্গ-সাহিত্যকে যদি আকাশের সহিত তুলনা করা যায়, তাহা হইলে মণিলাল তন্মধ্যে একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক ছিলেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

পরিমাণ ওজন করিয়া বঙ্গ-সাহিত্যে মণিলালের দান নির্ণয় করিতে গেলে ভুল করা হইবে, কারণ বেশি পরিমাণে তিনি লিখিতেন না বলিয়া বেশি লেখা তিনি লিখিয়া যান নাই। কিন্তু রচনার উৎকৃষ্টতা যদি মণিলালের রচনার মাপ-কাঠি করা যায় তাহা হইলেই মণিলালের সাহিত্য-সৃষ্টির যথার্থ মূল্যনির্ণয় সম্ভব হইবে। মণিলাল সাহিত্য-ক্ষেত্রের চাষী ছিলেন না,—তিনি ছিলেন সাহিত্য-কাননের উদ্যান-পাল। সেই জন্য তিনি যাহা উৎপন্ন করিতেন তাহাতে পেট ভরিত না, কিন্তু মন ভরিত। তাঁহার 'মনে মনে' গল্প এবং ঐ শ্রেণীর আরো কয়েকটি গল্প অনেক সাহিত্যসেবীরই মনে মনে আছে। তাঁহার রচিত গীতি-নাট্য "মুক্তার মুক্তি" উচ্চাঙ্গের সাহিত্য-সৌষ্ঠবসম্পন্ন রচনা।

অল্প বয়সে মণিলালের মৃত্যু ঘটিল। সুশ্রী মূর্ত্তি, শান্ত স্বভাব, সহাস্য আনন এবং সদয় হৃদয়ের আকর্ষণে তিনি বহুজনকে মিত্রতার বন্ধনে বাঁধিয়াছিলেন—তাঁহার তিরোধানে সেই জন্য বহুলোক ব্যথিত হইয়াছে। কিছু কাল পূর্ব্বে মণিলালের স্ত্রী-বিয়োগ হইয়াছিল। এই সুগভীর শোকের বেদনা তাঁহার মনে অনেকটা নিরুদ্যম এবং বৈরাগ্য আনিয়া দিয়াছিল; সেই হেতু সম্প্রতি সাহিত্য-সাধনায় অনেকটা শৈথিল্য আসিয়া পড়িয়াছিল। মণিলাল ছিলেন শিল্পাচার্য্য শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের জামাতা, এবং শিশু-সাহিত্যে সুপরিচিত মোহনলাল ও শোভনলালের পিতা।

* * *

বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন

আগামী ১৫ই ও ১৬ই চৈত্র হাওড়া জেলার মাজু গ্রামে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের ১৮শ অধিবেশন হইবে। মাজুগ্রাম বাঙ্গলার অন্যতম অমর কবি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের পুণ্য জন্মভূমি। ১৩৩০ সালে সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মভূমি কাঁটালপাড়া ও ১৩৩২ সালে সাহিত্যগুরু রাজা রামমোহন রায়ের জন্মভূমি রাধানগরে এই সম্মিলনের অধিবেশন হয়। এই বারের অধিবেশনে বিরাট আয়োজন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুপস্থিতিতে শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মূল সভাপতিরূপে বৃত হইয়াছেন। সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন ও বিজ্ঞান শাখার সভাপতিগণ যথাক্রমে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ও শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার সেন। এই সম্মিলনের সাফল্যের জন্য প্রত্যেক সাহিত্যরসপিপাসু বাঙ্গালীর সাহায্য ও সহানুভূতি বাঞ্ছনীয়।

* * *

বার্নার্ড শ

বিখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত বার্নার্ড শ-কে আয়ার্ল্যাণ্ডের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অনারারি ডিগ্রি প্রদান করিবার প্রস্তাব হইয়াছিল। সদস্যগণের দ্বারা ভোটের বিচারে ২৫, ৮ হিসাবে তাহা না-মঞ্জুর হইয়া গিয়াছে। বিদ্বান সম্প্রদায়ের কথার সত্যতার প্রতি ক্রমশঃ আস্থা হারাইতে হইতেছে।

* * *

বিলাতে ভারতীয় চিত্রশিল্প প্রদর্শনী

আগামী জুলাই মাসে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন সমিতির উদ্যোগে লণ্ডনে একটি ভারতীয় চিত্রশিল্পের প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হইবে। এই প্রদর্শনীতে অজন্তার যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত ভারতীয় চিত্রশিল্প যে ভাবে বিবর্ত্ত লাভ করিয়াছে তাহাই দেখানো হইবে। এ জন্য শ্রীমতী পি, ভি, ষ্টুয়ার্ট শ্রীযুক্ত লরেন্স বিনিয়নের সহযোগিতায় সরকারী এবং স্বতন্ত্র সংগ্রহ হইতে বিভিন্ন যুগের চিত্রাদি যথাসম্ভব সংগ্রহ করিতেছেন। কিন্তু আমাদের মনে হয়, শুধু ইংলণ্ড অথবা ইয়োরোপ হইতে সংগৃহীত চিত্র প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য-সাধনের পক্ষে যথেষ্ট হইবে না। ভারতবর্ষে বিভিন্ন প্রদেশে যে সকল শিল্পী-সঙ্ঘ আছে সেগুলির সহায়তা লাভ করিতে পারিলে ভাল হইত।

* * *

দুইশত ভাষাজ্ঞ পণ্ডিত

বিভিন্ন ভাষা শিক্ষা বিষয়ে জার্ম্মাণীর জনৈক অঙ্কশাস্ত্রের অধ্যাপক সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। ইনি সর্ব্বশুদ্ধ দুইশত ভাষার জ্ঞান অধিকার করিয়াছেন; সংস্কৃত ভাষা হইতে আরম্ভ করিয়া চীন দেশের চিত্র লিখন, মিশর দেশের প্রাচীন চিত্রাক্ষর, কিছুই তাহার মধ্যে বাদ পড়ে নাই। যথেষ্ট বয়স হওয়া সত্ত্বেও ইনি এখনো নিয়মিত নূতন নূতন ভাষার অনুশীলন করিতেছেন। বিভিন্ন ভাষা শিখিবার অবসরে তাঁহার সবশুদ্ধ বিভিন্ন ভাষার পনের হাজার বই সংগৃহীত হইয়াছে। তাঁহার মতে যে দুইশত ভাষা তিনি শিখিয়াছেন তন্মধ্যে ফিনিসিয়ার ভাষাই শ্রেষ্ঠ।

Printed at the Susil Printing Works, 47, Pataldanga Street, Calcutta.
by Srijut Probodh Lal Mukherjee and published by him from 51 Pataldanga Street, Calcutta.
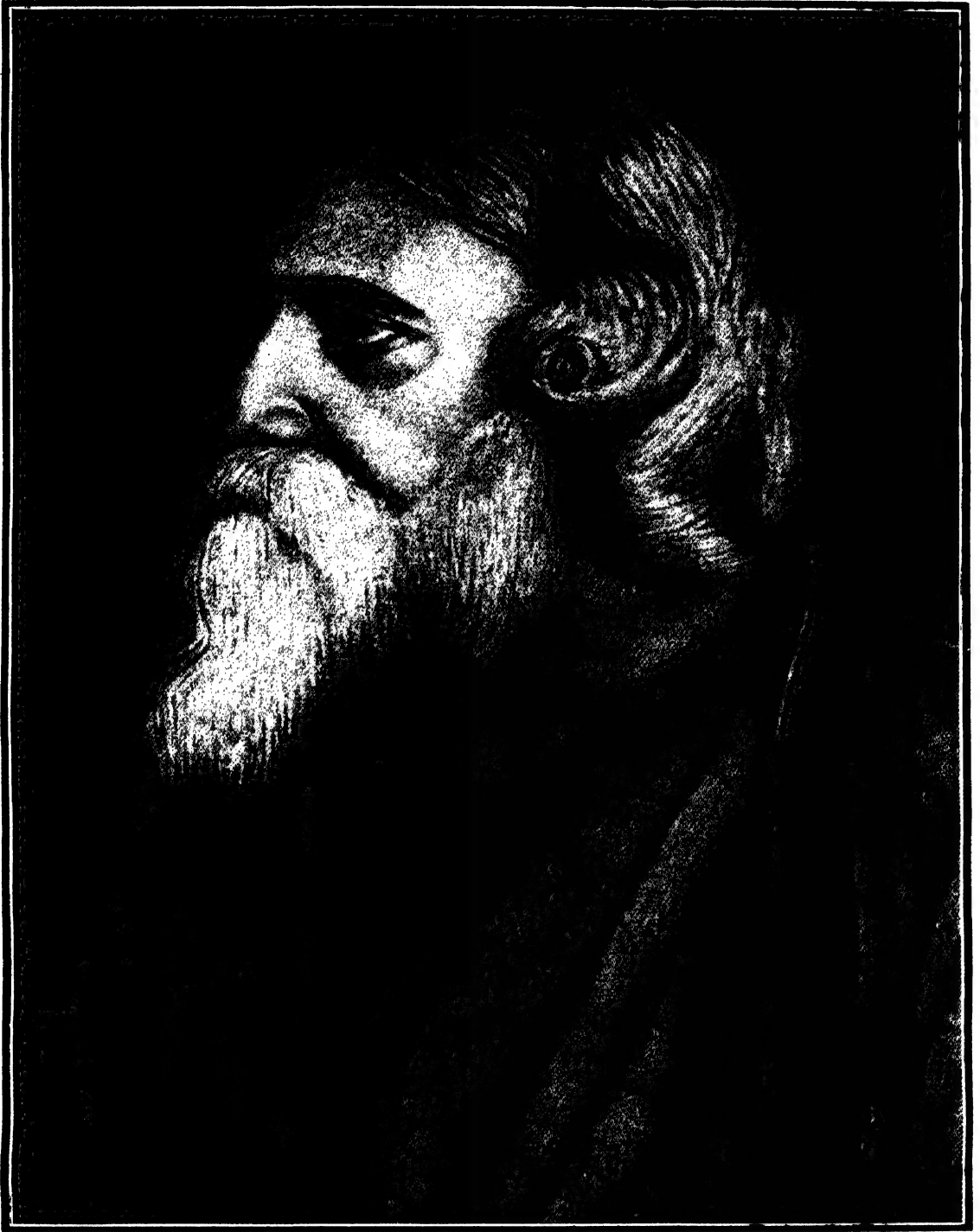
রবীন্দ্রনাথ

শুভ জন্মদিন ২৫-এ বৈশাখ, ১২৬৮ সাল

দ্বিতীয় বর্ষ, ২য় খণ্ড	বৈশাখ, ১৩৩৬	পঞ্চম সংখ্যা

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মনে মনে ওঙ্কার ধ্বনি উচ্চারণ দ্বারা ধ্যানের তন্ময়তা জন্মে—সেই ধ্যানের শর ওঙ্কারের ধ্বনিবেগের দ্বারা চিত্তকে ব্রহ্মের মধ্যে সম্পূর্ণ নিবিষ্ট করিয়া দিতে পারে, মুণ্ডক উপনিষদের শ্লোকটির এই তাৎপর্য্য আমি বুঝিয়াছি—কিন্তু জোর করিয়া কিছু বলিবার অধিকার আমার নাই। ব্রহ্মের যে-সকল তত্ত্ব-বাচক নাম আছে তাহা বিশেষ অর্থের প্রতি মনকে বিক্ষিপ্ত করে। কিন্তু ওঁ শব্দ ধ্বনি মাত্র, তাহা একটি পরিপূর্ণতার ভাবকে কেবল মাত্র স্বরের দ্বারা ব্যক্ত করে, এই জন্য তাহার বেগ অব্যবহিত ভাবে চিত্তকে গতিবান করিতে পারে। ৩রা বৈশাখ, ১৩৩৪

শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ দত্ত
মহাশয়কে লিখিত

সুর-ফল্গু

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভিড় ঠেলে আসতে হ'ল মন্দিরের দ্বারে। কিন্তু আমরাও ত ভিড়ের মানুষ, এর বাইরে যাব কোথায়? শান্ত হ'য়ে ব'সে শোনা যাক্ এই কোলাহলের কেন্দ্র হ'তে যে বাণী উৎসারিত হচ্চে।

আজকের মেলায় কত লোক মাঠে মাঠে কতদিকে ছড়িয়ে রয়েচে,—কেউ এ বাজারে কেউ ও বাজারে, কেউ আলো দেখচে কেউ যাত্রা শুনচে—তাদের প্রত্যেকের ডাক-হাঁক কথাবার্ত্তা সমস্ত স্বতন্ত্র। এই ভিড়ের মধ্যে আমরা পৃথিবীর লোকালয়কে সংহত ক'রে দেখচি। একবার তাকে কল্পনা ক'রে দেখ। সমস্ত পৃথিবী জুড়ে আজ এই মুহূর্ত্তে কত হাট কত বাজার, কত ঘর কত পথ, কত কাজ কত কথা, কত আমোদ কত কান্না, তার অন্ত নেই। তারি কণা পরিমাণ একটুখানিকে এই মাঠে একটি মেলায় আমরা যেমনি সংহত করেচি অমনি অসীম নক্ষত্রলোকের নীরবতা লুপ্ত হ'য়ে গেল

এই সর্ব্বগ্রাসী কোলাহলটাই কি লোকালয়ের সত্যকার জিনিষ? এরই সঙ্গে সঙ্গে আকাশের যে বিপুল শান্তি আছে তাকে কি বাদ দিয়েই দেখ্‌তে হবে? আজ তাকে বাদ দিয়ে মাঠের মধ্যে যে অবিমিশ্র কোলাহলটাকে পাচ্চি সেইটেই যদি সমস্ত পৃথিবীর জিনিষ হ'ত তা হ'লে আমাদের কান ফেটে যেত, আমাদের মন উদ্‌ভ্রান্ত হ'য়ে যেত। কিন্তু আসলে, দেশ ও কালের ভিতরকার উদার শান্তি মানুষের সংসার-কোলাহলের চেয়ে ঢের বড় ব'লেই আমরা বেঁচে আছি, নইলে আমরা নিজেদের সম্মিলিত তাপে দগ্ধ হ'য়ে সম্মিলিত বেগে পিষ্ট হ'য়ে পাগল হ'য়ে মারা যেতুম।

বৈজ্ঞানিকেরা জীবের জীবনসংগ্রামকে মনে মনে অনেক সময়ে এই রকম সংহত ক'রে কল্পনা করেন। তখন তাঁরা কেবল একান্ত ক'রে এই দেখ্‌তে পান যে, প্রাণীরা টিঁকে থাক্‌বার জন্যে ভীষণ উদ্যমে ঠেলাঠেলি হানাহানি করচে। এই রকম ক'রে দেখবামাত্রই তাঁরা এই মেলার কোলাহলের মতই একটা জিনিষ মনে মনে তৈরি ক'রে তোলেন যে জিনিষটা কৃত্রিম, কেন না এর সঙ্গে সঙ্গে এর উপরকার বড় জিনিষটা নেই। জীবজন্তুর হানাহানি যে স্নেহের সঙ্গে সহযোগিতার সঙ্গে শান্তির সঙ্গে মিশিয়ে আছে, সে এই হানাহানির চেয়ে অনেক বড়।

যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ চল্‌চে, সে দৃশ্য দুঃসহ। কিন্তু সমস্ত পৃথিবীতে এই যুদ্ধ ত অন্য নামে ব্যাপ্ত হ'য়ে রয়েচে;—প্রতিযোগিতা, হিংসা ও মৃত্যুর সমগ্র পরিমাণ যুদ্ধক্ষেত্রের পরিমাণের চেয়ে অনেক গুণে বেশী, কিন্তু তবু ত এই যুদ্ধের নিদারুণতা আমরা প্রত্যহ এবং সর্ব্বত্র দেখতে পাইনে। কল্পনায় সংহত ক'রে দেখ্‌লে যে জিনিষটা জীবনসংগ্রামরূপ ধারণ করে, সেইটেকেই স্বস্থানে যখন দেখি তখন সে হয় জীবনযাত্রা এই জীবনযাত্রার মধ্যে সংগ্রাম আছে, কিন্তু তার চেয়ে অনেক বড় ক'রে আছে শান্তি, নইলে মানুষ বাঁচতেই পারত না।

অনেক সময়ে নীতিপ্রচারকেরা আক্ষেপ ক'রে ব'লে থাকেন মৃত্যু অহরহ এবং চারিদিকেই ঘটচে অথচ মানুষ মৃত্যুকে কিছুতেই মানতে চাচ্চে না। কিন্তু কেন চাচ্চে না? কেন না মানুষ মৃত্যুর মধ্য দিয়ে জীবনের বিকাশকেই সুস্পষ্ট দেখতে পাচ্চে, সুতরাং নীতিপ্রচারকেরা মৃত্যুকে যে একান্ত ক'রে জান্‌চেন সেটা তাঁদের কল্পনা মাত্র। আমরা যখন চলি তখন দুই পায়ে লাফিয়ে চলিনে। আমাদের একটা পা যখন চলে তখন আর একটা পা থামে। এই থামাটাকেই মনে মনে যোগ ক'রে যদি মস্ত বড় একটা

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অঙ্ক ক'রে তুলি তা হ'লে চলাটা আর সপ্রমাণ হয় না। কিন্তু আমরা থামা চলা দুইকে নিয়ে সমগ্র গতিটাকেই স্পষ্ট উপলব্ধি করচি, এই জন্যেই চলাকে আমরা চলা বলচি।

মানুষকে যদি আমরা ছোট ক'রে দেখি তা হ'লে দেখ্‌তে পাই, সে খাচ্চে বেড়াচ্চে কাজ করচে ঘুমোচ্চে। তখন সমস্ত মানুষের ইতিহাসের সঙ্গে তার যে যোগের সূত্র আছে সে সূত্র আমরা দেখতে পাইনে। তখন ব্যক্তিগত প্রাত্যহিক জীবনের তুচ্ছতাই বিশেষ ক'রে চোখে পড়ে। সেই তুচ্ছতাকেই যদি মনে মনে দেশে ও কালে পুঞ্জীভূত ক'রে দেখি তা হ'লে যে সমষ্টি পাই সেইটেই কি মানুষের ইতিহাস? এই সমস্ত তুচ্ছতার এই সমস্ত বিক্ষিপ্ত কর্ম্মের অন্তরে অন্তরে অন্তর্গূঢ় হ'য়ে একটি তপস্যা রয়েচে, সেই তপস্যাই বিপুল তুচ্ছতার ভিতর থেকে জ্ঞানে কর্ম্মে ধর্ম্মে নানা আকারে মনুষ্যত্বকে বিকশিত ক'রে তুলচে। প্রকৃত ইতিহাস সেই মনুষ্যত্বেরই ইতিহাস, তুচ্ছতার ইতিহাস নয়।

মানুষের এই ভিড়ের মাঝখানেই ভূমা আছেন, তাই এ ভিড় তার সমস্ত ঠেলাঠেলির ভিতরেও এই বাণীকে বল্‌তে পারচে—

এষাস্য পরমাগতিঃ এষাস্য পরমা সম্পৎ
এষোস্য পরমোলোক এষোস্য পরমানন্দঃ —

ইনিই পরম গতি, ইনিই পরম লাভ, ইনিই পরম আশ্রয়, ইনিই পরম আনন্দ। অর্থাৎ চোখে দেখচি বটে নানাদিকে সবাই ছড়িয়ে পড়চে, নানা ইচ্ছা, নানা কর্ম্ম, নানা ভাষা, নানা রুচি; এই সমস্তকে যোগ ক'রে দেখলে রাশীকৃত জটিলতা এবং অভ্রভেদী কোলাহল মাত্র পাওয়া যায়। তবুও এই অতি-প্রকাণ্ড বিক্ষিপ্ততাই এর আসল সত্য নয়—এরই অন্তরে অন্তরে সেই এক আছেন যিনি এর সকল গতিকে সকল প্রাপ্তিকে আপনার মধ্যে আহ্বান করচেন; যিনি আশ্রয়রূপে সঙ্গে সঙ্গে আছেন ব'লেই এত চলাও সংঘাত আকারে সংহার করচে না, এবং সংসারের বিপুল আবর্জ্জনাও সৃষ্টির নিয়মে রূপ ধারণ করচে।

পূর্ব্বেই বলেচি, মানুষের চলার মধ্যে একটা পায়ে থামা এবং একটা পায়ে এগোনো আছে। অর্থাৎ চলার মধ্যে একটা ভাগ আছে যেটা হচ্চে "না" আর একটা ভাগ আছে যেটা হচ্চে "হাঁ"। গতির এই হাঁ-কেই স্পষ্ট ক'রে দেখতে পাই ব'লে চলাকে দেখি। কিন্তু একটা তালগাছের চারার দিকে চেয়ে দেখ—সেও বেড়ে উঠ্‌চে, কিন্তু তার সেই বেড়ে ওঠার "না"-টাকেই বড় ক'রে দেখচি, তাই আমাদের মনে হচ্চে গাছটা থেমেই আছে। দীর্ঘকালের ইতিহাসের মধ্যে একে রেখে দেখ্‌লে তবেই এর চলার যে "হাঁ" সে প্রকাশ পায়।

তেমনি, আমাদের নিজের জীবনের এবং সমস্ত মানুষের ভিড়ের চঞ্চলতা ও তুচ্ছতার ভিতর দিয়েই সেই পরম গতি পরম সম্পদ পরম আশ্রয় পরম আনন্দের প্রকাশ আছে এইটেই হচ্চে সত্য, এইটেই হচ্চে হাঁ। একে জান্‌লেই ঠিক দেখা হ'ল, এর উল্টোকে জান্‌লে দেখাই হল না। সমস্তই কেবল উদ্ভ্রান্ত হচ্চে, এর অন্তরে কোন ঐক্য নেই, এর সম্মুখে কোন লক্ষ্য নেই, এমনতর নিদারুণ মতের যে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না তা বলিনে, কিন্তু সে সমস্ত প্রমাণই সংসারের সেই "না" বিভাগ হ'তেই আহরিত। মোটের উপর, সহস্র প্রমাণসত্ত্বেও মানুষ এই না-কে কিছুতেই স্বীকার করে না। যদি করত, তা হ'লে কোন দিকেই মানুষ কিছু মাত্র উন্নতির চেষ্টা করত না; কেন না হাঁ-কেই সত্য ব'লে মানা সকল উন্নতির আশা। জীবনের যে অংশে এই হাঁ-কে সত্য ব'লে স্বীকার না করি, সেই অংশেই আমাদের দুর্গতি ঘটে।

অতএব এই ভিড়ের ভিতর থেকে এই ভিড়ের ভিতরকার সত্যকে দেখ্‌তে হবে, তা হ'লেই জীবন সার্থক হবে। কেবল মাত্র ভিড়ের চলার বেগে চালিত হওয়া মানুষের ধর্ম্ম নয়। কেন না মানুষ গাছপালা পশুপক্ষীর মত অভ্যাসের পথে প্রবৃত্তির বেগে প্রকৃতির নিয়মকে অন্ধভাবে বহন করবার জীব নয়, মানুষের নিজের মধ্যেও কর্ত্তৃত্বশক্তি আছে। সেই জন্যে কেবলমাত্র সৃষ্ট হওয়া তার যথার্থ পরিণাম হ'তে পারে না, সৃষ্টি করাই তার আত্ম-বিকাশের পক্ষে আত্ম-উপলব্ধির পক্ষে একান্ত আবশ্যক। এই জন্য মানুষের

ভিড়ের মধ্যে কেবল মাত্র অন্ধ উদ্যমকে স্বীকার করলে মানুষকে অপমান করা হয়, মানুষের আত্মাকে স্বীকার করতে হবে।

অন্ধ উদ্যমকেই যখন দেখি তখন প্রকৃতিরই ক্রিয়াশক্তিকে দেখি, তখন মানুষকে প্রকৃতির বাহুক্ষেত্রেই দেখা হয়, অর্থাৎ জীববিজ্ঞান যে ক্ষেত্রে বৃক্ষকে পশুপক্ষীকে দেখে সেই ক্ষেত্রেই মানুষের পরম গতি পরম আশ্রয় কল্পনা করি। কিন্তু মানুষের আত্মাকে যখন জানি অর্থাৎ যখন তার কর্ত্তৃত্ব দেখি, যখন তার ইচ্ছাময় সৃষ্টি-শক্তিকে জানি তখন তার পরমগতি পরম-আশ্রয়কে সেই জীববিজ্ঞানের ক্ষেত্রে খুঁজে পাইনে যেখানে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন নামক একটা কর্ম্মপ্রণালীই কলের মত কাজ ক'রে যাচ্চে। যখন মানুষকে অধ্যাত্ম ক্ষেত্রে দেখি, তখন পরম ইচ্ছার মধ্যে মানুষের ইচ্ছাকে জানি, পরম পুরুষের মধ্যে মানুষের আত্মপুরুষকে উপলব্ধি করি। তখন বুঝতে পারি, মানুষকে চলতে হবে, কিন্তু পশুর মত নয়; তাকে চলতে হবে জ্ঞানের সঙ্গে, আত্ম-চালনার আনন্দের সঙ্গে; তাকে বুঝতে হবে যে সেও কর্ত্তা, অতএব তাকেও সৃষ্টি করতে হবে।

আরেকবার মানুষের চলাটাকে তার হাঁ এবং না-এর দিকে বিচার করি। এমন কথা বলা যেতে পারে যে মানুষ নিয়মের যন্ত্রে চালিত হচ্চে, কার্য্যকারণের পারম্পর্য্যই তার একমাত্র বিধাতা। কিন্তু এটা হল "না"-এর দিক, এই দিক থেকে মানুষকে বিচার করাও যা আর পিঠের দিকটাই মানুষের আসল চেহারা বলাও তা। মানুষের আত্মকর্ত্তৃত্ব আছে মানুষের সংসারযাত্রায় এইটেই হ'ল তার "হাঁ"-এর দিক। তার সমস্ত কল্যাণ সমস্ত উন্নতি এই উপলব্ধিতে।

কিন্তু তার এই উপলব্ধিই যে সত্য, এটা যে মায়ামাত্র নয় এ যদি হয়, তবে এটা তাকে বুঝতেই হবে যে একটি অনন্ত সত্যে তার এই আত্মোপলব্ধির প্রতিষ্ঠা আছে, সেই সত্যই পরমাত্মা। এখানে যন্ত্রের দ্বারা যন্ত্র চালিত, বা অন্ধের দ্বারা অন্ধ নীয়মান হচ্চে না। এখানে ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছার যোগ, অর্থাৎ এখানকার পূর্ণ যোগ প্রেমে।

তাই ভিড়ের সঙ্গে সঙ্গে যখন চলেছি, তখন যদি কেবল সংস্কারের বাঁধা পথ এবং প্রবৃত্তির অন্ধ বেগকেই একান্ত ক'রে মানি তা হ'লে পরম সত্যকে দেখতে পাইনে। কেন না, পরম সত্য শুধু সত্য নন, তিনি হচ্চেন সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম। নিজের জ্ঞানকে অহমিকার আবরণ থেকে মুক্ত ক'রে বিশুদ্ধভাবে উদ্বোধিত করলেই সেই জ্ঞান-স্বরূপকে সর্ব্বত্র দেখতে পাওয়া যায়। নিজে যখন কর্তৃত্ব হারাই যখন কেবল অভাবের দায়ে বাহিরের শাসনে কিম্বা দুর্দ্দাম আবেগের দ্বারা তাড়িত হ'য়ে চলি তখন নিজের মধ্যে সেই বোধশক্তি দুর্ব্বল ও নিস্তেজ হ'য়ে থাকে যার দ্বারা আত্মা আপনার পরম লোককে উপলব্ধি করতে পারে। সেই জন্য আমাদের প্রতি উপদেশ আছে আত্মানং বিদ্ধি— আত্মাকে জান, অর্থাৎ আপনাকে আত্মা ব'লেই জান।

অতএব এই ভিড়ের মধ্যে থেকে ভিড়ের উর্দ্ধে মনকে জাগিয়ে রাখতে হবে। এই ভিড়কে অতিক্রম ক'রে যখন দৃষ্টি চলবে তখনি এই ভিড়কে সত্য ক'রে জানতে পারব। তা যখন জানব তখন সকল কোলাহলের মধ্যে শান্তকে জানব। তা হ'লে ভয়ে ভয়ে মরব না, ধূলো মাটিকে কেবলি আঁকড়ে আঁকড়ে ধরব না, তা হ'লে আমাদের কর্ম্ম বিশুদ্ধ হবে, এবং যা কিছু লাভ করব তা কাঙালী-বিদায়ের অকিঞ্চিৎকর কাড়াকাড়ির কড়ি হবে না। তার মধ্যে আত্মার স্বত্বাধিকারের জোরের দাবী থাকবে।

আমাদের এই ভিড়ের যাত্রা কেবলমাত্রই একটা চলা, এর মধ্যে সত্য নেই, চলার সম্মুখেই এবং তার সঙ্গে সঙ্গেই কোন প্রাপ্তি নেই, এ কথা যদি মনের সঙ্গে বলতে পারতুম তা হ'লে এক মুহূর্ত্তও বাঁচতে পারতুম না। সমস্ত জীবন দিয়েই এই সত্যকে প্রণাম করচি,—কেন না ভালবেসেচি ভালকে, বিশ্বাস করেচি, যা-কিছু আছে তাকেই চরম ব'লে স্বীকার করিনি।

এই ভিড়ের মধ্যে কান দিয়ে শোন, কেবলি কি কোলাহল? একটি সুর কি নেই? সেই সুর কি এই কোলাহলের অন্তর থেকে এই কোলাহলকে অতিক্রম ক'রে উর্দ্ধে উৎসারিত হচ্চে না? তাই যদি না হবে, তা হ'লে মানুষ আপনার সঙ্গীতকে পেলে কোথা থেকে? কোলাহলই

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

যেখানে একান্ত সত্য সেখানে মানুষ কি অকস্মাৎ আপনার সঙ্গীতকে সৃষ্টি করতে পারে? মানুষের সঙ্গীত কোন্ ধ্রুব সত্যকে প্রকাশ করচে? না, সমস্ত ছড়াছড়ির মূলে একটি গভীর মিল আছে, একটি অনির্ব্বচনীয় আনন্দময় মিল। সেই মিলের কথাটি ভাষায় বলা যায় না, কেবল মাত্র সুরেই বলা যায়, এই জন্যেই মানুষকে গান গাইতে হয়েচে। মানুষের এই গান বিশ্বের ভিতরকার গানের রসটিকেই, তার অন্তরতম অনির্ব্বচনীয়তাকে প্রকাশ করচে ব'লেই জীবনযাত্রার সমস্ত তুচ্ছতার মধ্যে, প্রতিদিনের সমস্ত দীনতার মধ্যে, গান এমন ক'রে আমাদের হৃদয়ের কাছে অব্যবহিতভাবে প্রত্যক্ষভাবে প্রকাশ করচে অমৃতলোকের রসস্বরূপের কথা। আমাদের সমস্ত গভীর ভালবাসাও তাই করে। ফুল বল, তারা বল, প্রভাত ও সন্ধ্যাকাশের শান্তি বল সকলেরই এই বাণী। এই বাণী কোনো বিরুদ্ধ প্রমাণের প্রতিবাদ করে না, কোন স্বপক্ষের প্রমাণকে সংগ্রহ ক'রে দেখায় না,—কিন্তু আলোক যেমন সহজেই আলোকিত করে তেমনি সহজেই বলতে থাকে, রসো বৈ সঃ রসং হি লব্ধানন্দী ভবতি। ভিড়ের মধ্য দিয়ে বইতে বইতে আমাদের জীবন একটি সঙ্গীতধারার মত সহজে ধ্বনিত হ'য়ে উঠ্‌বে—সহজেই অনির্ব্বচনীয়কে সমস্ত সুখদুঃখ বিপদসম্পদের মধ্যে প্রকাশ করতে থাকবে—এই আমাদের পরম সার্থকতা। কেবল তর্ক নয়, প্রমাণের প্রয়াস নয়, আমাদের সমস্ত জীবনই একটি অখণ্ড সুরে এই বাণীকে বহন করবে—শান্তং শিবমদ্বৈতঃ—এই আমাদের প্রার্থনা।

ফুল-ওয়ালার দোকান

শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায় কর্ত্তৃক ইয়োরোপ হইতে নির্ব্বাচিত ও প্রেরিত।
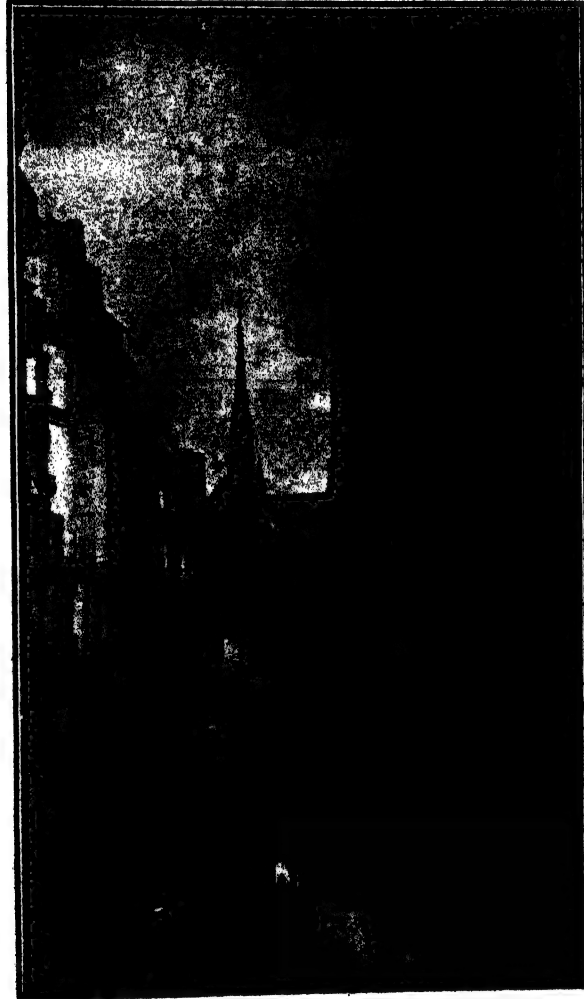
একটা গলি
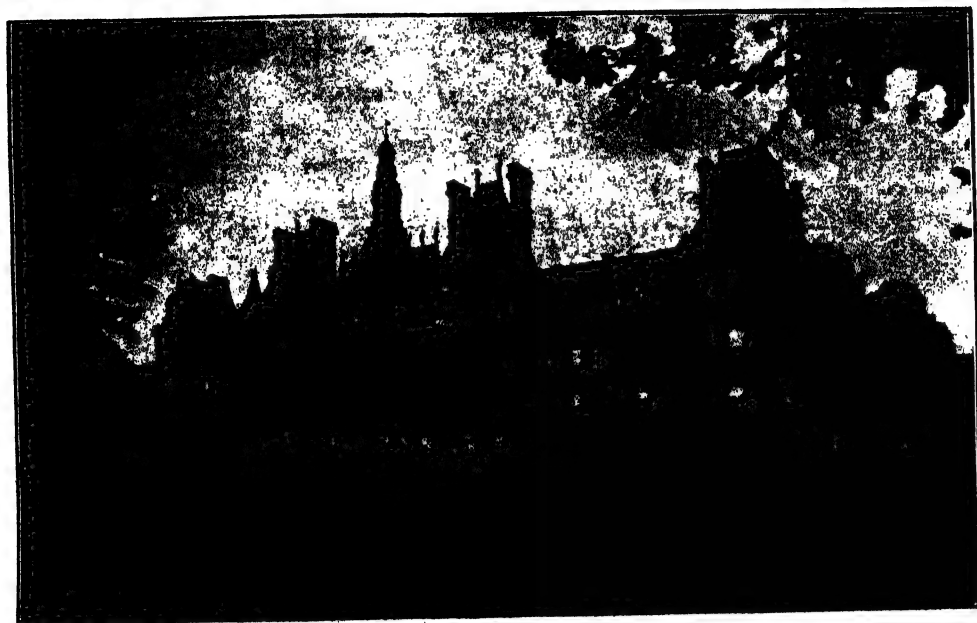
টাউন হলের কাছে
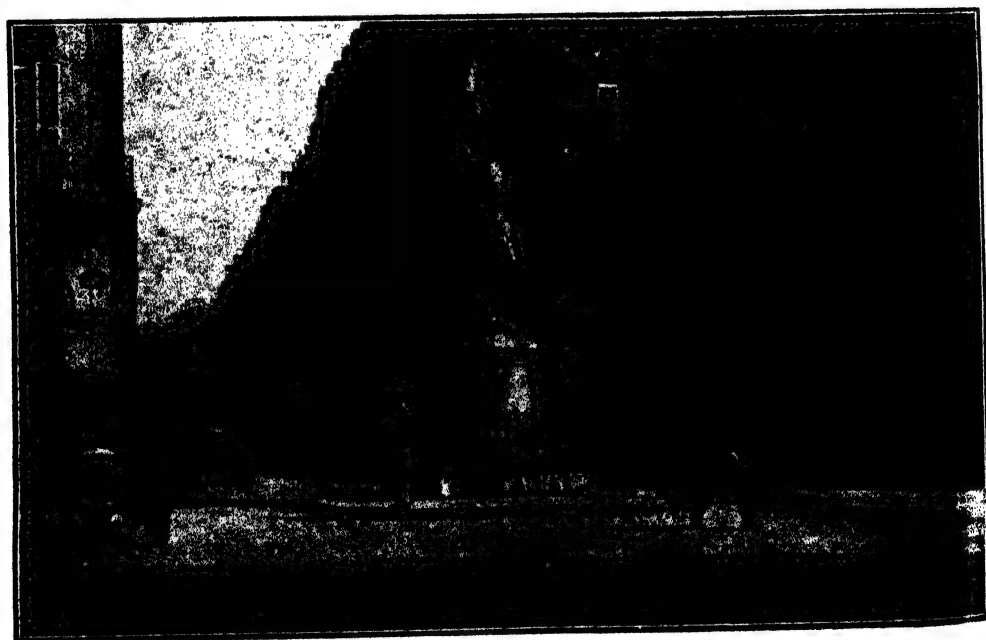
জোয়ান অফ্ আর্কের মূর্ত্তি

সেন্ নদীর ধারে ওল্ড্ বুক্ শপ্
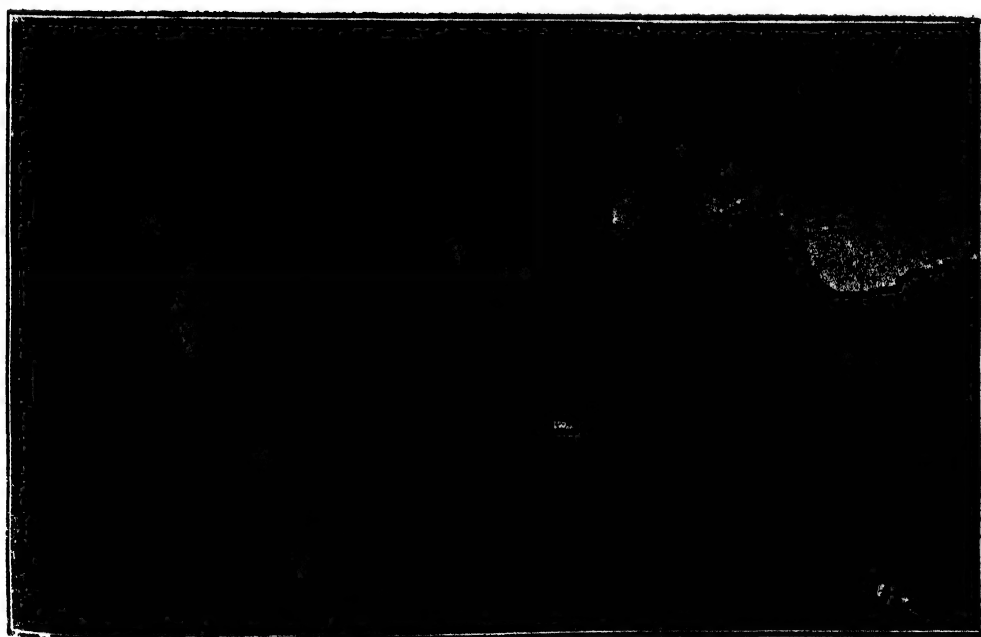
মাছ ধরা

মাছ ধরা

ছবি আঁকা

বিবাহ-বিচ্ছেদ

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী

লর্ড রোনাল্ডশে ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে ইষ্টইণ্ডিয়া এসোসিয়েসনের সভায় বলিয়াছিলেন,—

"আমি যদি ভারতবাসী হইতাম, তাহা হইলে আমি হিন্দুর যুগযুগান্তরব্যাপী সামাজিক ব্যবস্থার অধিকারী হইয়াছি বলিয়া গর্ব্বানুভব করিতাম। হঠকারিতার সহিত এই ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে দিতাম না। যে সামাজিক ব্যবস্থা এযাবৎ ভারতবাসীর কল্যাণসাধন করিয়া আসিতেছে, লঘুচিত্তে ভারতবাসী তাহার পরিবর্ত্তন ও বিপ্লবসাধন করিবার পূর্ব্বে যেন বিষয়টি বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া দেখেন।"

ঠিক এই কথাটাই আমারও মনে হয়। আমাদের দেশেও পৃথিবীর বহুতর দেশের মতই সংস্কারের একটা জোর হাওয়া লাগিয়াছে, এটা অবশ্য অস্বাভাবিক নয়। যুগে যুগেই চিরদিন এমন হইয়াছে ও হইতেছে এবং পরেও আবার হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্টির পর হইতেই মানবসমাজের গঠন ও সংস্কার চিরদিন ধরিয়াই চলিয়া না আসিলে আমরা বর্ত্তমানকালে যে সমাজকে দেখিতে পাইতেছি, তাহা নিশ্চয়ই দেখিতে পাইতাম না। যেমন মানুষের জীবদেহ থাকিলে তাহাতে রোগ শোক ভোগ এবং উহা হইতে আত্মরক্ষার চেষ্টা অনিবার্য্য, তেমনই সমাজ থাকিলেই তাহাতে দোষ ত্রুটি থাকা এবং তাহার প্রতিকারচেষ্টাও অনিবার্য্য। তা' সে সমাজ যতই কেন না বিচক্ষণতার সহিত গঠিত হউক, কালক্রমে সকল জিনিষই কিছু না কিছু ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং ক্ষয়িত স্থলে ছিদ্র হইতেও বাকি থাকে না; সেই মত মনীষীমনগণ দ্বারা গঠিত সমাজেরও ক্ষয়িত জীর্ণ অংশে ছিদ্র প্রবেশ করিয়া থাকে।

আধুনিকদের মতে এই পুরাতন নমুনার দুর্গটিকে সম্পূর্ণরূপেই ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া দিয়া তাহার স্থলে নূতন করিয়া হালফ্যাসানের একটি কোর্ট গঠিত হওয়া উচিত এবং প্রাচীনরা বলিতেছেন, পুরণো জিনিস যেমন খাঁটি তোমরা নূতন তৈরি কর, তেমনটি হইবে না; অতএব ও'তে হাত দিতে যেওনা ও যেমন আছে তেমনি থাক।

দুই দলে এই লইয়া তর্কাতর্কি মনোমালিন্য চলিতেছে, এবং চলিতেই থাকিবে কারণ নূতনের সৃষ্টি নিত্যকাল ধরিয়াই চলিবে, আর পুরাতনেরও ধ্বংস হইবার নয়, নূতন ভবিষ্যৎ পুরাতন অতীত, আজ যাহা নূতন, কাল তাহাই পুরাতন, এ খেলা নিত্যকালের। এখন কথা এই, জিনিষ পুরান হয়, পুরাতনের সংস্কারের প্রয়োজন ঘটে, এ কথাটা ঠিকই, তবে সেই সংস্কারটা সম্পূর্ণরূপে পুরাতনকে চূর্ণ করিয়া ফেলিয়া দিয়া করা আবশ্যক কি না, সেইখানেই মতদ্বৈধ।

মনে করুন তাজমহলটি পুরাতন হইয়াছে, উহাকে সংস্কার করিতে হইবে, করা প্রয়োজন—তাই বলিয়া ঐ অচলের আয়তনটিকে কি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া তারই চূর্ণ-করা কনক্রিট দিয়া নূতন সৌধের রাস্তা তৈরি করিতে হইবে? না, উহারই গায়ে যেখানে যেটুকু নেহাৎ নোংরা হইয়াছে তাহাকেই যথাসাধ্য সাফ করিয়া বা বদলাইয়া দিতে হইবে? বড় জিনিষ, ভাল জিনিষ বড় সহজে ভাঙ্গে না, বড় সহজে ভাঙ্গাও যায় না এবং ভাঙ্গিবার প্রয়োজনও ঠিক ঘটে না। দরকার হয় তার জীর্ণ সংস্কারের। জগন্নাথের মন্দির ভাঙ্গিয়া সংস্কার করা হয় না; নবকলেবর তৈরি হয় জগন্নাথের।

ইদানীং সকল দেশেই সমাজ ভাঙ্গার আগ্রহটা কিছু বেশি মাত্রায় জোর করিয়া উঠিয়াছে, সেটা খুবই স্বাভাবিক বোধ হয় না এবং তার ফলও সেইজন্য খুব সুফলপ্রসূ নাও হইতে পারে। যেমন কাবুলের রাজমহিষী রাণী সৌরিয়ার অত্যন্ত দ্রুতহস্তের সমাজসংস্কার তাঁর স্বামীর পুত্রের, দেশের এবং সমাজের পক্ষে শুভকারী হয় নাই।

সংস্কার খুব বিচক্ষণতার সহিত দূরদৃষ্টির সহিত সংস্কারকের যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তির দ্বারা এবং যাহাদের জন্য সংস্কার

তাহাদের গ্রহণশক্তির পরিমাপ করিয়া ধীরে ধীরে হওয়াই সঙ্গত। সমাজসংস্কার এবং রাষ্ট্রবিপ্লব ঠিক একই পর্য্যায়ে হইতে পারে না,—হইলেই তাহা স্থায়ী হয় না, বলশেভিক রাশিয়াতেও তাহার উপক্রম দেখা দিতেছে। সেখানে বিবাহসংস্কারের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন উঠিয়াছে।

আমাদের দেশের নারীসমাজে অনেক কিছু সংস্কার করিবার আছে, সে সব দিকে মন না দিয়া জনকতক ব্যক্তি বিশেষ একটা বিলাতি বাহাদুরী লওয়ার আগ্রহে তাঁদের যোগ্যতার বহির্ভূত কতকগুলি গুরুতর বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়া বসিয়াছেন এবং আমাদের দেশের কতকগুলি সম্পূর্ণ বিলাতি-আদর্শে গঠিত, পালিত নরনারী তাঁদের এই খেয়াল (whim)-কে উৎসাহ দান করিয়া প্রবর্দ্ধিত করিতেছেন। আগুনকে ক্রীড়নক করা যে সকলক্ষেত্রেই নিরাপদ নয় সে কথা বুঝিবার শক্তি শিশুর থাকে না এবং অনেক মানুষ শৈশবাবস্থা পার হইয়াও শিশুপ্রকৃতি ত্যাগ করিতে পারেন না।

হিন্দু-বিবাহ-বিচ্ছেদ-বিল সম্বন্ধেই ধরা যাক। হিন্দুনারীর শিক্ষাদীক্ষা এবং জীবনের আদর্শের সহিত বিবাহবিচ্ছেদের কিছুমাত্রও ঐক্য নাই। আমার যতদূর জানা আছে, কোন দেশেরই সতী সাধ্বী নারী ডিভোর্সের স্বপক্ষ নহেন। কলিকাতা নিখিল ভারতমহিলা সম্মিলনীতে যখন অবৈধভাবে এই প্রস্তাবটিকে গৃহীত করানর চেষ্টা হয়, তখন এবং তাহার পরেও সেখানে উপস্থিত বহুতর গণামান্য সকল সাম্প্রদায়িক আর্য্যমহিলাই ইহার প্রতিবাদ করিয়া এই প্রস্তাবটিকে অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন।

"Divorce for a Hindu lady should not be thought of."—

কোন একটি নব্যশিক্ষাপ্রাপ্তা কিশোরী আমার এই কথাটির প্রতিবাদপূর্ব্বক এইরূপ লিখেন।

"Regarding her remark that "divorce for a Hindu lady should not be thougt of" I would only beseech her not to take charge of the thoughts of the Hindu ladies but leave them alone to think for themselves and no one is denying the right of firm faith that she may choose to have for herself in the matter."

আচ্ছা তাই যদি হয়, আমিও কি তাঁকে ঠিক এই কথাটাই বলিতে পারি না? তাদের জন্য যদি আমার মাথা-ব্যথার দরকার না থাকে, তবে এই সব অপরিণতবয়স্কা নব্যশিক্ষিতা অবিবাহিতা বা সদ্যবিবাহিতা মেয়েদেরই বা সমস্ত হিন্দুসমাজের মেয়েদের ভালমন্দ চিন্তায় কিসের অধিকার আছে? এবং আমার চেয়ে কোন্ বড় অধিকারের দাবীতে তাঁরা হিন্দুসমাজের উপর যথেচ্ছ সংস্কার চালাইতে চান? এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে ধৃষ্টতা প্রকাশ পাইবে কি?

ডিভোর্স ব্যাপারটার যথার্থরূপ অল্পশিক্ষিতা সাধারণ মেয়েরা হয়ত সবাই ভাল করিয়া জানেনও না, ইংরাজীতে আগাগোড়া বক্তৃতা দিয়া এক কথায় তার অর্থটুকু বুঝাইয়াই হাত তুলিতে বলিলে তাও মাত্র জনকতকের কানে মাত্র সেই ব্যাখ্যাটুকু ঢুকিল কি না ঢুকিল, জনকতক হিন্দু মেয়ে যদি স্বপক্ষেই আরও অনেকগুলি ইউরেশিয়ান অবিবাহিতা মেয়ে ও ব্রাহ্ম বা হিন্দু নিতান্ত কমবয়সী নব্য মেয়েদের সঙ্গে হিন্দু মেয়েও ভুল বুঝিয়া বা না বুঝিয়া হাত তুলিয়া বসে, তাকে হঠকারিতার সহিত হিন্দু সমাজের এই মত বলিয়া ধরা 'কত বড় ধৃষ্টতা তা' জনসাধারণেরই বিবেচ্য!

হিন্দু মেয়েদের মঙ্গলচিন্তার অধিকার ও চেষ্টার দাবী হিন্দু সমাজের হিতাকাঙ্ক্ষিনী বা হিতাকাঙ্ক্ষী মাত্রেরই আছে, তিনি যে সাম্প্রদায়িক হিন্দুই হোন, অথবা হিন্দু নাই হোন। এমন কি তথাকথিত অল্পজ্ঞান স্বল্পদৃষ্টি কিশোরীদের চেয়ে পরিণতবুদ্ধি লর্ড রোনাল্ডশেরও আছে, ইহা সুনিশ্চিত।

কোন সমাজেরই সকল নর বা নারী সুচরিত্র বা সাধ্বী অথবা উন্নতচরিত্র হইতে পারে না। যে সমাজের লোকসংখ্যা যত বেশি হয় তাহাতে গলদ থাকা তত বেশি অন্ততঃ সম্ভব হইলেও সে হিসাবে হিন্দু সমাজ অন্যান্য অনেক সমাজেরই অনেক উপরে; তথাপি হিন্দু স্বামীর হস্তে পত্নী-নির্য্যাতনের নিশ্চয়ই অভাব নাই, এ সব ক্ষেত্রে সতীনারী পতিবিযুক্তা থাকিয়া জীবনযাপনে হয়ত বাধ্য হইতে

অনুরূপা দেবী

পারেন, এর জন্য 'মেন্‌টেন্যান্স' বা জুডিসিয়াল সেপারেশন যাহাতে আইনের হাতে সহজে পান এবং ঐ অত্যাচারী পতি যাহাতে পুনঃ বিবাহ করিতে না পারেন, সে চেষ্টা হওয়া অসঙ্গত নয়, কিন্তু বিবাহ বিচ্ছেদপূর্ব্বক হিন্দুনারী পত্যন্তর গ্রহণের অধিকারিণী হইবেন, এর চেয়ে হিন্দু সমাজের অধঃপতন আর কিছু কল্পনা করিবার নাই।

হিন্দুনারীর বিবাহবিচ্ছেদ হইতে পারে না, হিন্দুবিবাহ কণ্ট্রাক্ট বা চুক্তি মাত্র না, হিন্দুবিবাহ বলিয়া স্বীকার করিলেই ইহা হিন্দুশাস্ত্রমতে ইহপরলোকের সহিত সংযুক্ত। এইটুকু স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া না চলিলে ভারতমহিলার আর্য্যনারীর, হিন্দুসতীর নিজস্ব পুর্ণ স্বাতন্ত্রিকতা তাঁর সমস্ত মহিমা গরিমা, চিরদিনের জন্যই বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। ভারতের সতীত্বগৌরব পুরাতন গল্পগাথায় পরিণত হইবে। জগতের ইতিহাসে ভারতের পক্ষে এত বড় ক্ষতি বোধ করি তার এই শত শতবর্ষব্যাপী পরাধীনতাতেও লিখিত হয় নাই।

আমাদের দেশে বিশেষতঃ বিহার অঞ্চলে কাহার কুর্ম্মি প্রভৃতি জলচল জাতির ভিতরে প্রচুরভাবেই এই বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রথা প্রচলিত আছে, 'সাগাই' সম্বন্ধে সেখানে মেয়ে পুরুষের equal rights। জল-অনাচরণীয় বহুতর জাতির মধ্যেও ঐ ব্যবহার। Law of Evolution theoryর অনুক্রমে জীব ক্রমশঃই উন্নতির উচ্চস্তরে আরোহণ করিতে থাকে, নিম্নগামী হয় না ; যে স্তর হইতে আমরা বহু পুর্ব্বে উত্তীর্ণ হইয়া আসিয়াছি, আজ আবার কোন দুষ্কৃতিবশে ফিরিয়া তাহাতেই পুনরাবর্ত্তন করিতে যাইব? "অনেক জন্ম সংসিদ্ধি" লোকে উত্তম গতি লাভ করিয়া থাকে, উচ্চবর্ণের হিন্দুর মেয়ের নিম্নগামী হওয়ার প্রয়োজন আছে মনে করি না।

সমাজে ন্যায় অন্যায় সর্ব্বত্রই আছে, তার প্রতিকার অন্য ভাবেই বাঞ্ছনীয়। ইহার প্রতিকারহেতু নরনারীর উভয়তঃ বিদ্যাশিক্ষা ধর্ম্মশিক্ষা নীতিশিক্ষা উচ্চশিক্ষা মেয়েদের শিক্ষার মধ্যে পুরাতন ভারতবর্ষীয় সতীধর্ম্মের নারীধর্ম্মের উচ্চাদর্শের পুনঃ প্রতিষ্ঠার চেষ্টাই সুসঙ্গত। সমস্ত দেশব্যাপী ইউরোপীয় মহিলা গঠনের কোন প্রয়োজনীয়তা ঘটিয়াছে বলিয়া মনে করি না এবং ইউরোপীয়া-ভাবাপন্না হইয়া না উঠিলেই এ যে. দেশের মেয়েদের সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইবে তাহারও কোন সম্ভাবনা দেখিতে পাইতেছি না, বরং ঐরূপ সর্ব্ব বিষয়ে বিবি বনিলেই যে এদেশের সর্ব্বনাশ অনিবার্য্য তাহারই উপক্রম দেখা যাইতেছে।

মেয়েদের ডিভোর্সের অধিকার না পাইয়া বরং পুরুষ যাহাতে কথায় কথায় স্ত্রী ত্যাগ করিতে না পারে, এক স্ত্রী বর্ত্তমানে দ্বিতীয় বিবাহ করিতে না পারে, সে চেষ্টা করাই সঙ্গত। বঙ্গের একজন দূরদর্শী মহাপুরুষ মহাত্মা ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার পারিবারিক প্রবন্ধে বিপত্নীক পুরুষের পক্ষে দ্বিতীয়বার বিবাহের বিরুদ্ধে (যেদিনে পুরুষের বহু বিবাহও বিশেষ ভাবে নিন্দিত ছিল না, কুলীন সম্প্রদায়ে বরং সংখ্যাধিক্যই খ্যাতিজনক ছিল সেই দিনে) লিখিয়া গিয়াছেন :—

"তেমন ভালবাসা দুইবার হয় না, দুইজনের উপরও হয় না, যে ভালবেসেছে সেই একমেবাদ্বিতীয়ম্ এই বেদ বাক্যটী বুঝিয়াছে।—যে সন্ন্যাসী হইয়াছে, সে কি আর গৃহী হইতে পারে? যদি হয়, তবে সে প্রকৃত আশ্রমভ্রষ্ট। সামান্য যুক্তিমুখেই দেখ, যে গিয়াছে তাহাকে মনে করিতেই হইবে যদি তাহাকে ভুলিতে পার তবে না পার কি? আবার যাহাকে গ্রহণ করিলে তাহাকে বই তো আর কাহাকেও মনে করিতে নাই। তবে দুইবার বিবাহ করিলে মহাশঙ্কট বাধিল। এক পক্ষে মনে করিতেই হইবে, পক্ষান্তরে মনে করিতেও নাই। ঐ দুইয়ের যে পক্ষ অবলম্বন করিবে, কর্ত্তব্যের ক্রুটি হইবে, ধ্যানের ব্যাঘাত জন্মিবে, পবিত্রতা নষ্ট হইবে।

এইরূপে ভাবিয়া দেখিলে কোম্‌তের মতই ভাল বলিয়া বোধ হয়। তিনি বলেন, কি স্ত্রী কি পুরুষ কেহই একাধিক বার বিবাহ করিবে না। আমাদের শাস্ত্রেও বলে, প্রথম বিবাহই সংস্কার তাহার পর আর সংস্কার হয় না।"

এর চেয়ে বড় আদর্শ আর কোথাও আছে বোধ হয় না। বহুবিবাহ অর্থাৎ এক স্ত্রী বর্ত্তমানে অপর স্ত্রী গ্রহণ সম্বন্ধে তাঁর পারিবারিক প্রবন্ধের লিখিত হইয়াছে—

"যখন এক পত্নী গতাসু হইলেও অপর দারপরিগ্রহ অবৈধ তখন একপত্নী বিদ্যমান থাকিতে অপর স্ত্রীর পাণি-

গ্রহণের কথা উল্লেখ করিতেই পারা যায় না। বাস্তবিক তাহাই বটে—"

অধিক উদ্ধৃত করা বাহুল্য। আধুনিক এবং বয়সে প্রবীণ হইয়াও যাঁহারা নিজেদের একান্ত আধুনিক বোধ করিয়া থাকেন, তাঁদের কাছে এ সব যুক্তি বিচার কিছুই গ্রাহ্য নহে। পুরাতন ঋষি হইতে আরম্ভ করিয়া ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় পর্য্যন্ত যে সব পবিত্র চরিত্র মহাত্মারা নিবৃত্তিমার্গের উপদেশ দান করিয়াছেন সবই তাঁদের কাছে সমান উপেক্ষার। তাঁরা নারী পুরুষের সমান ভাবে প্রবৃত্তিস্রোতে ভাসমান হওয়ারই পক্ষপাতী। আধুনিক নারী পুরুষের উচ্ছৃঙ্খলতা সহিতে অনিচ্ছুক থাক, তুমিও প্রবৃত্তিমার্গ গ্রহণ কর, আমি তোমার জন্য তা বলিয়া নিবৃত্তিমার্গের পথিক হইতে পারিব না, আদর্শ এর ইউরোপ! মেকলে লিখিয়াছিলেন,—

"We must do our best to form a class of persons Indian in blood and colours but English in taste in opinions and intellect.

রক্তে এবং গাত্রবর্ণে ভারতীয় কিন্তু রুচি মত এবং বুদ্ধিতে ইংরাজ এইরূপ একদল লোক গড়িয়া তুলিতে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।"

Educated in the same way, interested in the same objects, engaged in the same pursuits with ourselves they will become more English than Hindu,—just as the Roman Provincials became move Romans than Gauls.

Trevellgan's Despatch. 1853.

আমাদের সহিত একই পদ্ধতিতে শিক্ষিত একই বিষয়ে আগ্রহান্বিত একই উদ্দেশ্যে কার্য্যনিরত তাহারা হিন্দুর অপেক্ষা বেশী ইংরাজ হইয়া পড়িবে, রোমান সম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশবাসীগণ যেমন 'গলের' অপেক্ষা অধিকতর রোমান হইয়া পড়িয়াছিল।—ট্রাভেলগানের প্রেরিত লিপি, ১৮৫৩।

আমরা কি সত্যই এঁদের এই স্পর্দ্ধিত ভবিষ্যৎ বাণীকে সফল করিতে যাইতেছি?

য়ুরোপ

শ্রীঅষ্টাবক্র

১

কাউণ্ট হারমোন কাইসারলিঙ্ একজন জার্ম্মান পণ্ডিত। 'দার্শনিকের ভ্রমণকাহিনী' লিখে এঁর সুখ্যাতি হয়। সম্প্রতি ইনি "য়ুরোপের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ" Das Spectras Europas নামক একটা বই লিখেছেন। উক্ত বইএর ইংরাজী অনুবাদ—'য়ুরোপ'।

'য়ুরোপ' টমাস্ কুকের গাইড বুক্ নয়। এতে দেশ-বিদেশের প্রাকৃতিক বর্ণনা কিংবা হোটেল রেস্তরঁর সংবাদ নেই। মানুষ নিয়েই কাইসারলিঙের কারবার 'য়ুরোপ' ভিন্ন ভিন্ন য়ুরোপীয় জাতির আলোচনা।

একটা সমগ্র জাতি কিংবা অনেক ভিন্ন ভিন্ন জাতির উপর অভিমত প্রকাশ করবার অধিকার একজন ব্যক্তির আছে কিনা, এর মীমাংসা কাইসারলিঙ্ স্বয়ং তাঁর ভূমিকায় করেছেন। তিনি বলেন যে এ রকম অধিকার ব্যক্তিমাত্রেরই আছে। কোন জাতিকে জানা শক্ত, বোঝা সহজ। জানবার জন্য অনেক কিছু পড়তে হয়, দেখতে হয়, হিসেব ক'রে একটা ধারণায় আস্‌তে হয়। বোঝবার জন্য অনুভূতিই যথেষ্ট। এমন অনুভূতি স্বতঃস্ফূর্ত্ত। আলোচকের মতামতের মূল্য নির্ভর করে এরই উপর। কাইসারলিঙের অনুভব-শক্তি প্রবল; সুতরাং এঁর চিন্তা মূল্যবান।

প্রথমেই ব'লে রাখা উচিত যে য়ুরোপ মরে নি; নিকট ভবিষ্যে মরবেও না। আমাদের দেশে এমন লোকও আছেন যাঁরা ভাবেন যে য়ুরোপ আসন পেতে ভারতবর্ষের কাছ থেকে অধ্যাত্ম দীক্ষা গ্রহণ করবার জন্য ব'সে আছে। এটা আমাদের ভুল। য়ুরোপ যদি কোনোদিন নিজের আত্মা হারায় ত সে ভারতবর্ষ থেকে আধ্যাত্মিক স্পেশালিষ্ট ডাকবে না—স্বয়ং নিজের আত্মা খুঁজে বের করবে। আমরা যখন ভাবি, য়ুরোপ আর নেই, মাঝে মাঝে রবীন্দ্রনাথ এসে একটু জাগিয়ে তোলেন, গান্ধী এলেই মৃত য়ুরোপ উঠে বস্‌বে—তখন য়ুরোপীয় চিন্তাশীল ব্যক্তিরা হাসেন। কাইসারলিঙ্ স্পষ্ট ভাষায় আমাদের বলেছেন, "তোমরা আগে জড়বাদের যুগ দিয়ে বেরিয়ে এসো, তারপর অন্য কথা।" যারা নিজেই বাঁচতে শেখে নি তারা যদি আর কাউকে বাঁচাবার উপদেশ দেয় তা হ'লে তারা হাস্যাস্পদ। তার উপদেশ অনধিকারচর্চ্চা—ধৃষ্টতা।

আশ্চর্য্য এই যে (ভিন্নভাবে) কাইসারলিঙ্ নিজেই এরকম ধৃষ্টতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি বলেন যে, সমস্ত-সংসার খুব শীঘ্রই ঘোর জড়বাদে ডুবে যাবে; মানবের সেই মোহনিশায় জগতের উদ্ধার সাধন করবে য়ুরোপ। এটা কাইসারলিঙের কল্পনা।

গত মহাযুদ্ধের পর য়ুরোপের ভিন্ন ভিন্ন দেশ য়ুরোপ সম্বন্ধে ভাবতে শিখেছে। কারণ, যুদ্ধের সময় আমেরিকার সমৃদ্ধি এত বেশী হ'ল যে য়ুরোপ এখন আমেরিকার তুলনায় অনেক পেছনে। য়ুরোপে আমেরিকার বিরুদ্ধে যা মানসিক ষড়যন্ত্র চলছে তার কারণ য়ুরোপের হীনতার ভাব (inferiority complex)। উক্ত ভাবের পরিণাম প্যান্ য়ুরোপীয়ন মুভমেণ্ট। এইটি বর্ত্তমান য়ুরোপের মুখ্য চিন্তাধারা। কাইসারলিঙ্ এর উল্লেখও করেন নি।

প্যান্ য়ুরোপীয়ন মুভমেণ্ট ছাড়া য়ুরোপে অন্য একটি ভাবের প্রাধান্য পাওয়া যায়, যার নাম সাম্রাজ্যবাদ। য়ুরোপ যখন আমেরিকার দিকে তাকায় তখন সে হীনতার ভাবে অভিভূত হয়। কিন্তু এসিয়া আফ্রিকার দিকে তাকালে তার গৌরববোধের শেষ নেই; তখন সে প্রভুতার আনন্দে নেচে ওঠে।

Europe by Count Herman Keyserling (Jonathan Cape; price 21 shillings.)

সম্প্রতি এ দুটি ভাব ছাড়া য়ুরোপে আর কোনো ভাব নেই। স্মরণ রাখা উচিত যে আমি য়ুরোপের ভিন্ন ভিন্ন দেশের কথা বলছি না—য়ুরোপ-সমষ্টির কথা বল্‌ছি। কাইসারলিঙ্‌ যদি বলতেন যে সমস্ত সংসারের মুক্তির ভার রয়েছে ইংলাণ্ড কিংবা ফ্রান্স্‌ কিংবা বাল্‌কান পেনিন্‌স্‌লার উপর তা হ'লে আমি তার যুক্তির আলোচনা করতুম। কিন্তু কাইসারলিঙ্‌ বলেন য়ুরোপ as a whole মানুষের উদ্ধার সাধন করবে; আমার মতে য়ুরোপের এমন কোনও অধিকার কিংবা ক্ষমতা নেই।

কাইসারলিঙের কথানুসারে, নব-ইতালীর জন্ম হ'ল সে দিন; বাস্তব পক্ষে স্পেন আফ্রিকার অংশ; অষ্ট্রীয়া মৃতপ্রায়; স্যুইট্‌জারল্যাণ্ড পাণ্ডার দেশ; রাশিয়ায় এসিয়ার বিকাশ; স্কাণ্ডিনেভিয়া প্রভুতাবিহীন—একাঙ্গী; হল্যাণ্ড্‌ বেল্‌জীয়ম্‌ ফ্রান্সের সাহায্য-সাপেক্ষ। সুতরাং, কাইসারলিঙের য়ুরোপের অর্থ ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স আর জার্ম্মাণী। ইংল্যাণ্ডে রাজনৈতিক বিকাশ ব্যতীত কাইসারলিঙ্‌ কিছুই পান নি; জার্ম্মাণীর বিশেষত্ব ব্যক্তিত্বের আদর। স্পষ্টভাবে দেখা যায় যে রাজনীতি নিয়েই সংসারের উদ্ধার সাধন হবে না; ব্যক্তিত্বের আদর কিংবা সাধন ভারতবর্ষ কিংবা যে কোনো দেশে হ'তে পারে। সুতরাং ইংল্যাণ্ড কিংবা জার্ম্মাণী প্রলয়ের সময়ের নোয়ার আর্ক হ'তে পারে না। থেকে গেল ফ্রান্স।

ফ্রান্স্‌ সম্বন্ধে কাইসারলিঙের অভিমত খুবই উচ্চ, আমারও। কিন্তু ফ্রান্স ত য়ুরোপ নয়, য়ুরোপের একটা দেশ। এর মহত্ত্ব যতই হ'ক না কেন, কেবল ফ্রান্সের অর্থ য়ুরোপ নয়। কাইসারলিঙ্‌ স্বয়ং বলেছেন যে ফরাসী ফ্রান্স ছাড়া কিছুই বোঝে না। এইটা যদি সত্য হয়, তবে ফ্রান্সই বা জগতের কল্যাণসাধন করবে কি ক'রে? আর এক জায়গায়,তার বিবেচনার পরিধি সঙ্কুচিত ক'রে, কাইসারলিঙ্‌ বলেছেন যে য়ুরোপের ভবিষ্যৎ অনেকটা ফ্রান্সের উপর নির্ভর করে এবং ফ্রান্স্‌ য়ুরোপের সকল ক্ষেত্রে অগ্রগণ্য হ'তে পারে অনেকটা ত্যাগ ক'রে। কি ত্যাগ ক'রে—তা কাইসারলিঙ্‌ বলেন নি। ওঁর মতে—"Should France make its decision in favour of the Poincare attitude, it signs its own deathwarrant as a factor of significance in the Europe of the future."

Poincare—আধুনিক ফ্রান্সের প্রধানামাত্য। সাম্প্রতিক অধোগতি থেকে ফ্রান্সকে বাঁচাবার বাহাদুরী এঁরই। ইনিই এ দেশের বাস্তবিক প্রতিনিধি। এই বৎসরের জানুয়ারী মাসে একজন ফরাসী লেখক "আমার জন্মভূমি য়ুরোপ"-নামক এক বই লিখে উক্ত ফরাসী মহাপুরুষকে ভূমিকা লিখতে অনুরোধ করেন। ভূমিকা তিনি লিখলেন। তাঁর একটা বাক্য এই; "বাস্তবপক্ষে, আমি আপনার বইএর নাম মানি না। আমার জন্মভূমি য়ুরোপ? না। সে ত ফ্রান্স্‌—স্বাধীন এবং এক।" ("Je ne vais, a vraidire, souscrire a votre titre: 'Eorope, ma Patrie' Ma Patrie, c'est la France, in dependenteet integrele.")

এঁর মত ফ্রান্সেরই মত। সুতরাং, কাইসারলিঙের বাক্যানুসারে ফ্রান্সের দ্বারা য়ুরোপের কল্যাণ সাধনা হবে কি না সন্দেহ, জগতের ত কথাই নেই।

য়ুরোপে আর যাই হ'ক, এর মধ্যে সংসারের গুরু হ'বার ক্ষমতা নেই। যে য়ুরোপের স্বপ্ন কাইসারলিঙ্‌ দেখেছেন তার কোনো ভিত্তি নেই। কাইসারলিঙ্‌ স্বপ্ন দেখেন কেননা তিনি কবি, দার্শনিক, রাজনৈতিক, সাংবাদিক। তাঁর নিজের বাক্য এই; "আমি প্রথমত আমিই, দ্বিতীয়ত একজন বড়লোক, তৃতীয়ত কাইসারলিঙ্‌, তারপর ক্রমশ পশ্চিমা, য়ুরোপীয়ন, বাল্‌কন, জার্ম্মান, রশিয়ন আর ফ্রেঞ্চ্‌।" (P. 341)

২

সমস্ত বইএর মধ্যে যে কথাটি আমার সব চেয়ে বেশী মহত্ত্বপূর্ণ মনে হয়েছে, সে এই; "খুব শীঘ্রই এমন সময় আসবে যখন ফ্রান্সছাড়া সংসারের সব দেশ থেকে প্রেম লুপ্ত হ'য়ে যাবে।" এই বিপদের সন্ধান সংসারের কম লোকই পান; কিন্তু বিপদ অবশ্যম্ভাবী এবং নিদারুণ।

প্রেম প্রলয়ের সময়, ফ্রান্স কিংবা ভারতবর্ষ কিংবা আফ্রিকা কিংবা কোনো একটি দেশ—কি কারণে বেঁচে থাকবে তার মীমাংসা আমি এই স্থলে করব না। কাই-

সারলিঙ্ বলেন যে ফরাসীরা প্রেমের পদ্ধতি জানে। সুতরাং প্রেম তাদের দেশে থেকে যাবে। আমি বলি, আমরা প্রেমের দীক্ষা নূতনভাবে গ্রহণ করছি, সুতরাং ভারতবর্ষই ভবিষ্যৎ প্রেমগুরু। যাঁরা পুরাতন দার্শনিক তাঁরা স্বাভাবিকতার দোহাই দিয়ে বলেন, আফ্রিকার মরুভূমিতেই প্রেমের একমাত্র নিবাস এবং বিকাশ। হয়ত সকলেরই মত ভ্রান্ত; হয়ত সকলেরই মত সত্য। আমি জানি, এই যে, য়ুরোপের কয়েকটি দেশ থেকে প্রেম লুপ্ত হ'য়ে গেছে। সংসারের অন্যান্য দেশ থেকে কোন্ তারিখের কোন্ মুহূর্ত্তে যে এ মহাপ্রসাদ উঠে যাবে—কাইসারলিঙ্ বলতে পারেন।

নারীর নিজের কোনো বিবেক নেই। তার নীতিজ্ঞান নিয়মপালন ছাড়া আর কিছু নয়। দশ বছর আগে সতী হওয়া ছিল ধর্ম্ম, এখন সেটা 'আধুনিক নয়' (unmodern)। ফলে সকলে অসতী হওয়াতেই আনন্দ বোধ করছে। এমন কি সতী শব্দের উল্লেখ ভীষণ সেকেলে (unmodern)।

স্বভাবতঃ, নারীর লজ্জাজ্ঞানও নেই। নিয়মপালনেই নারীর গর্ব্ব। দশ বছর আগে যে বৃদ্ধা ব'ব্ করানো অনুচিত মনে করত সে আজ শিঙ্গল্ ক'রে ঘুরে বেড়ায়। এটা অধর্ম্ম নয়, খারাপও নয়। এতে প্রমাণ হয় শুধু এই যে, নারীর লজ্জাজ্ঞান সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে দশজনের মতামতের উপর। এমন মতামতের কর্ত্তা (অন্ততঃ য়ুরোপে) ফ্যাশনের প্রবর্ত্তকগণ। এঁদেরই চোখে প্রেম পুরাতন ভ্রান্তি—আধুনিক নয়। কাইসারলিঙ্ বলেন, এরা যদি ঠিক ক'রে দেয় যে বছরের অমুক দিনে সকল নারীদের অসতী হওয়া উচিত, নারীদের আপত্তি থাক্‌বে না। আমি স্মরণ করিয়ে দিই, কথা হচ্ছে য়ুরোপের।

এই প্রশ্নের বিবেচনা কাইসারলিঙ্ অন্য ভাবেও করেছেন, যাতে এঁর প্রখর প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়।

তিনি বলেন, নারীর গৌরব তার মাতৃত্ব। এইটি তার সব রকমের চিন্তার কষ্টিপাথর এবং নীতিজ্ঞানের মূল। এখন য়ুরোপের নারীরা এই সম্পদটিকে অধিকাররূপে পরিণত ক'রে তুলছে। ভোট দেওয়া অধিকার, তর্ক করা অধিকার, পায়জামা পরা অধিকার, পুরুষদের পায়ের তলায় রাখাও অধিকার। এ সকল অধিকারের মতনই হচ্ছে এখন মা হবার অধিকার। ফলে, নারীরা বলে, 'স্বামী'দের (আর য়ুরোপের বেচারা পুরুষদের 'স্বামী' বলা চলে কি?) শিশুপ্রজননের ক্ষমতা না থাকে আমরা অন্য পুরুষের দিকে তাকাব।' গত বৎসর একজন লেখিকা বিয়ে না ক'রে অজানা পুরুষের কাছে প্রজনন ভিক্ষা নিয়ে মা হ'লেন—এই প্রবৃত্তি খুব শীঘ্রই সাধারণ হ'য়ে যাবে। ঠিক এই কথা লর্ড বর্কেন্‌হেড অন্যভাবে Nash পত্রিকায় বলেছেন।

বাস্তবপক্ষে, যদি নারীর চিন্তাশক্তি খুব প্রবল হয়, যদি তার মাতৃত্বভাবের দাবী এতই বেশী যে সে নীতিজ্ঞানের উপরে উঠতে পারে—(নীতিজ্ঞান হারানো অন্য)—তবে আমি প্রজননভিক্ষাকেও অন্যায় মনে করি না। কিন্তু এরকম দাবীর প্রমাণ পাওয়া যাবে কি ক'রে? য়ুরোপের সব জায়গায় নারীরা শিশুকে যত ভালবাসেন তার চেয়ে বেশী ভালবাসেন মোটরকে।

নারীর কাছ থেকে পুরুষ কি চায়? এর উত্তর কাইসারলিঙ্ দেন নি, আমি দিলাম।

পুরুষের আত্মা একাকী। সে যেন কি খুঁজছে অথচ পাচ্ছে না। তার সহস্র সাধনার মধ্য দিয়ে এই না-পাওয়ারই ভাব ফুটে উঠছে। হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশে সে কখন এক মস্ত অবোধ শিশুর মতন কাঁদে, তখন সে নারীর পানে তাকায়, শুধু তাকায়। সেই মুহূর্ত্তে সে নিজের সব অভাব ভুলে যায়। মানবের চিরন্তন শিশু-আত্মা নারীর পায়ে শায়িত। নারী এ কথা ভুলে যাচ্ছে। সে চায় অধিকার; পাবে। কিন্তু যে দিন পুরুষ নারীর মধ্যে পবিত্র মাতৃমূর্ত্তির আত্মভোলা দর্শন পাবে না, সে দিন একাই সে ফিরে যাবে; সে দিন নারার শূন্য বেদী পূর্ণ হবে না। এমন দিন শীঘ্রই আসবে।

পরিশিষ্ট

[নিম্নোল্লিখিত অভিমতের সহিত আমার মিলের কোনো সম্পর্ক নেই। কাইসারলিঙের মৌলিকতার উপর আমার এতই শ্রদ্ধা যে আমি

কতকগুলি বাক্য উদ্ধৃত ক'রে দিলাম। কাইসারলিঙের পাবলিশার মেসার্স জোনাথান কেপ আমায় এরকম উদ্ধৃত করবার অনুমতি দিয়েছেন, সেজন্য আমি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। কাইসারলিঙের ভাব-প্রকাশ এতই কঠিন যে আমি অনুবাদ করতে অক্ষম]

On the Englishman

"Yet the same Englishman, whose distaste for intellectual problems borders on disgust, is often capable of uttering surer judgments in the intellectual field than any but the most gifted continentals; but on one condition: the problem in question must be of inmost concern to him. If, on the other hand, he is not thus concerned, he passes no judgment at all. Again we perceive the advantage of this animal psyche: animal instinct is unerring, but it only comes into play where the life of the animal makes it proper and necessary; whatever does not affect it just does not exist. Young people 'do' something together; they hardly speak, or, if they do, it is to utter either an obvious triviality or a piece of nonsense; the rising to emergencies is typical for all of them; when the moment comes for a practical decision, for effective action, the decision comes and the action follows; and all of them see more sense

শ্রীঅষ্টাবক্র

in panting after a ball than in the perusal of *good* books. It further becomes clear, at this point, to what extent the strong-willed Englishman, with whom self-control is a national ideal, is no man of will at all." (P. 20-21.)

On the French

"The Frenchman believes in 'definition' as natural peoples believe in the fetish. But we can clearly define in the French sense, only that which we already know. In order to understand something which is new in essence we must yield ourselves to it until the new, necessary organs of cognition evolve. Submission of this sort is beyond the capacity of the Frenchman. This renders him incapable of adding to his knowledge; he is incapable of inner transformation. Hence the unequalled stupidity of French criticism in regard to those matters which can be understood only from the premise of the new world in the making. It is for this very reason that the French often see depth in the shallowest things, if only they lift whatever seems to them misty and undefined on to the plane of the 'already known.' The blazing of new paths is not for this race." (P. 64.)

On the German

"It was an Englishman who made this quip: 'If there were two gates, on the first of which was inscribed *To Heaven*, and on the other *To Lectures about Heaven*, all Germans would make for the second.' This man saw deep."

(P. 99.)

On Europe

The material prosperity of Europe is of course at an end. Its power in the East will end before long. It may be that the industrial centre of this planet will shift over to Asia. Invention is diffcult, but even the ape can imitate Before long all our technical ability will be common human property. Before long, if we continue to plume ourselves on our achievements, we Europeans will be stared at just as Cornelius Nepos would be if he suddenly appeared in our midst with a general claim to the world's worships; we have become our own classics. *Under these circumstances the mere self-preservation of Europe compels it to adjust itself to what it can do best, to what no one can take away from it. And that is its intellectuality*". (জার্মান ভাষায়—Geistigkeit. P. 359.)

On Himself

"Inded, when I analyse my own self-consciousness, what do I find myself to be? First and foremost, I am myself; second, an aristocart; third, a Keyserling; fourth, a Westerner; fifth, a European; sixth, a Balt; seventh, a German; eighth, a Russian; ninth, a Frenchman." (P. 341.)

মিলিন্দপন্থে নাগসেন

শ্রীভূপেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

চন্দ্র সূর্য্যের উদয়াস্তের মধ্যে জন্ম-জন্মান্তরের অপূর্ব্ব রূপক অনন্তকাল ধরিয়া লেখা হইয়া চলিয়াছে, চন্দ্র জাগিতেছে সূর্য্য ডুবিতেছে একের আলোতে অন্য দীপ্তি পাইতেছে। মানুষের জীবন-সূর্য্য অস্তমিত হইতেছে আবার জন্মান্তর জাগিতেছে ;—এ জন্মের কর্ম্মশক্তি জন্মান্তরকে জাগাইতেছে। সুতরাং জীবন-সূর্য্য জন্মান্তরের জীবন-শশীকে উদ্বোধনী শুনাইতেছে। বৌদ্ধ-মনীষী নাগসেন, কাবুল পতি মিলিন্দকে যে ভাবে এই জীবন-সঙ্গীতের আলাপ শুনাইয়াছিলেন তাহাতে যথেষ্ট বিচিত্রতা ও ঐতিহাসিকতা দেখা যায়। দুই হাজার বৎসর এই বার্ত্তা কাণমন্ত্রের মত জপ করিয়া, বর্ত্তমানের ইতিহাস-মণ্ডপে পৌছাইয়া দিতে পারিয়াছে।

কাবুলরাজ প্রশ্ন করিলেন, "আপনাকে কি নামে আহ্বান করিব?" নাগসেন বলিলেন, "মহারাজ! নাগসেন নামেই আমার পরিচয়!...নাগসেন প্রত্যুত একটা ডাক ছাড়া আর কিছু নয়, ইহা নিছক ফাঁকা, ইহার ভিতরে আমিত্বাভিমানী কেহ নাই, কোন পুরুষ নাই!"

এই প্রকার অনাত্ম-বাদ শুনিয়া মিলিন্দ অবাক! "বেশ কথা ; যদি আপনাতে আত্মা না থাকে তবে বৈরাগ্য, অশনে ভূষণে সহযাত্রী শ্রমণগণের বিধি-নির্দ্ধারণে কেমন করিয়া আত্ম-প্রকাশ করিতেছে, তবে আপনাতে বুদ্ধ-বাণীর মর্ম্ম-জ্ঞাপক কে? কে আপনার ভিতরে অহোরাত্র বুদ্ধ-নির্দ্ধারিত নির্ব্বাণলাভে তপস্যাপরায়ণ? মানুষের যদি আত্মার আসন খালি থাকে তবে এই মহা দ্বন্দ্ব কেন? পাপ পুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্মের জগঝম্প কেন চলিতেছে? সকলের বৈষম্য মুছিয়া ফেলাই তবে উচিত? শ্রমণের হত্যাকারীর যেমন কোন পাপের বালাই নাই, তেমনি শ্রমণদেরও গুরু-অন্বেষণে কোন ফল নাই?"

হেলেনিক কাবুলরাজ, নাগসেনের প্রতি বেশ চোখা শর হানিলেন। রাজা চান, মানুষের ভিতরে চিরন্তন অভিনয়কারীকে ধরিতে, আর নাগসেন চান তাহাকে কর্পূরের মত উবিয়া দিতে। কিন্তু ইহার পরে মিলিন্দ যেন কেমন বাঁধা গৎ আওড়াইতে লাগিলেন অর্থাৎ বৌদ্ধ তর্কের খোলসে মাথা ঢুকাইয়া প্রশ্ন করিলেন, "আচ্ছা আপনার মাথার চুল কি নাগসেন?..."

এইরূপে সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ধরিয়া মেডিকেল কলেজের anatomyটা নাড়িয়া চাড়িয়া অতিপরিসরব্যাপী প্রশ্ন সকল করিলেন—ইহাদের মধ্যে কোনটি নাগসেন? আর নাগসেন এক শ্বাসে কহিয়া যাইতে লাগিলেন, "না মহারাজ! এটা নয়, এটা নয়...নয়...নয়...!" সবই 'নেতি নেতি'—অর্থাৎ নাগসেনকে খুঁজিয়া পাইলেন না। তখন রাজা কহিলেন, "হোঃ হোঃ—নাগসেন তবে একেবারে ফাঁকা—এত বড় মিথ্যা কথাটা কেন বলিলেন, যে আপনার নাম নাগসেন? আমি ত রাশি রাশি প্রশ্ন করিয়াও নাগসেন খুঁজিয়া পাইলাম না।"

নাগসেন অমনি বলিলেন, "আচ্ছা মহারাজ, আপনি সভামণ্ডপে যানবাহিত হইয়া বা পদব্রজে আসিয়াছেন?" রাজা যখন জানাইলেন তিনি রথে আসিয়াছেন, তখন দার্শনিক প্রশ্ন তুলিলেন, "রথ কাহার নাম? রথ-চক্র কি রথ?"—এইভাবে পূর্ব্ববারের ন্যায় রথের anatomy সুরু হইল—আর রাজা 'না' 'না' হাঁকিতে লাগিলেন। অবশেষে নাগসেনের মুখে সেই কথা বাহির হইল, "হোঃ হোঃ মহারাজ, কোথায় রথ? এত বড় মিথ্যা কথাটা কেন বলিলেন যে আপনি রথারূঢ় হইয়া আসিয়াছেন—আমি ত রাশি রাশি প্রশ্ন করিয়াও রথ খুঁজিয়া পাইলাম না।"

তখন রাজা বলিলেন, "আমি মিথ্যা বলি নাই, রথ একটি নাম মাত্র, সর্ব্বাবয়বের সমষ্টীভূত অবস্থার নামই 'রথ'।" অমনি নাগসেন কহিয়া উঠিলেন, "ঠিক ঠিক ; মহারাজ, 'রথ' যেমন চিনিয়াছেন, 'নাগসেন'ও তেমনি। যখন ভিন্ন

শ্রীভূপেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

ভিন্ন অংশসমূহ একত্রিত হয়, সর্ব্বাবয়বের মিলন ঘটে, তখনই 'নাগসেন' নামের উৎপত্তি। কিন্তু ইহাতে কোন একটি অমিত্বাভিমানী পুরুষ নাই।"

এই ভাবে অনাত্মবাদ জয় জয়কার লাভ করিল। প্রসঙ্গটিকে দুই ভাগে বিভাগ করা অনায়াসেই চলে। প্রথম ভাগটি শেষ করিয়া আমরা যৎকিঞ্চিৎ মন্তব্য করিয়াছি, ইহার উত্তর কুত্রাপি নাই—গ্রন্থকার যেন কৌশলে ইহাকে চাপিয়া গিয়াছেন মনে হয় এবং মিলিন্দকে দিয়া এমন সব প্রশ্ন করান হইয়াছে, যেগুলির সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে নাগসেনের 'রথ'-সম্পর্কিত প্রশ্নাদির মিল হইতে পারে। অপ্রকৃত সাদৃশ্যের (false analogy) ফল যাহা হয় এক্ষেত্রে তাহার ব্যতিক্রম হইবার উপায় নাই। রথের সঙ্গে মানুষের উপমা কখন খাটিতে পারে না। অ-প্রাণের সহিত জীবনের উপমা খাটাইতে হইলে মানুষ প্রাণহীন একথা অবশ্যই বলিতে হইবে। নাগসেনও তদ্রূপ অনাত্ম-রথের সহিত আত্মক-মানুষের উপমা খাটাইতে গিয়া আত্মাকে যত সহজে এড়াইতে পারিয়াছেন, তত সহজে মিলিন্দকথিত প্রথম ভাগের উত্তরে অনাত্ম-সঙ্গতি করিতে পারিতেন না।

ইহাই ঐতিহাসিক Rhys-Davidsএর theory of putting together। যে পুগ্‌গল (পুরুষ) নাগসেনের মধ্যে নাই সেই পুরুষ সম্বন্ধে সাংখ্য বলিতেছেন,—শরীরাদি ব্যতিরিক্তঃ পুমান—পুরুষ শরীর হইতে অতীত। (1.139.) নাগসেন যে অনাত্ম জড়বাদ দাঁড় করাইয়াছেন, সাংখ্য ইহার খণ্ডন করিতেছেন, পাত্রচ ভৌতিকো দেহঃ (3.17.); জীবের দেহোপাদান ক্ষিতি অপ্‌ তেজ ইত্যাদি। ন সাংসিদ্ধিকং চৈতন্যং প্রত্যেকাদৃষ্টেঃ (3.20.)। জীবের যে চৈতন্য উহা পঞ্চভূতের সমবায়লব্ধ নহে কারণ পৃথক পৃথক রূপে ইহাদের মধ্যে চৈতন্য থাকিতে দেখা যায় না।

প্রপঞ্চমরণাদ্যভাবশ্চ। (3. 21.) চৈতন্য যদি পঞ্চভূতের শক্তি হইত তবে মরণাদি চৈতন্যহীন অবস্থা কখনো ঘটিত না। ভোক্তুরধিষ্ঠানাৎ ভোগায়তননির্ম্মাণমন্যথা পূতিভাব প্রসঙ্গাৎ। (5. 114.) দেহকে পরীক্ষা করিলে ইহা যে কাহারও ভোগের যন্ত্র তাহাই প্রতীত হইবে, ভোক্তা না থাকিলে দেহ পচিয়া যায়। তাই সাংখ্যকার শেষ উত্তর দিতেছেন—অস্ত্যাত্মা নাস্তিত্ব সাধনাভাবাৎ। (6. 1.)

নাগসেন যে রথ-প্রসঙ্গ তুলিয়া আত্মার অস্তিত্ব বিলোপ করিলেন, সে রথ উপনিষদে গীতায় প্রযুক্ত হইয়াছে—সেখানে বিচার কি সুষ্ঠু! শ্বেতাশ্বতর বলিতেছেন, "আত্মানং রথিনং বিদ্ধি, শরীরং রথমেব তু, বুদ্ধিন্তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ।" ইহাকেই গীতার অমরাক্ষরে পুনরুক্তি করা হইয়াছে। রাজা মিলিন্দকে রথের উপর চাপাইয়া, যদি নাগসেন দেহতত্ত্ব বিচার করিতেন তবে খাঁটি খোঁজ মিলিত—কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে যেমন শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে রথের রথী করিয়া স্বয়ং সারথ্য স্বীকার করিয়া জীবন-রথের মহা সঙ্গীত শুনাইয়াছিলেন। এই ভাবে নাগসেন জীবন-সূর্য্যের রাগালাপ শুনাইলেন, এখন দেখা যাক্ তিনি জন্মান্তরের জীবন-শশীকে কোন্ সুরে আঁকিতে চাহিয়াছেন!

আবার সভা বসিয়াছে। কাবুলেশ্বর মিলিন্দ প্রশ্ন তুলিতেছেন, "আচ্ছা আচার্য্য, জন্মান্তর কি?—এ জন্মের কোন কিছু কি পরজন্মে প্রবিষ্ট হইয়া উহার সঞ্চার করে না?" নাগসেন কহিয়া উঠিলেন, "না মহারাজ।" তখন রাজা বলিলেন, "দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইয়া দিন।" নাগসেন পূর্ব্ববারের ন্যায় আবার উপমা ফাঁদিলেন—"আচ্ছা যদি কোন লোক একটি দীপ হইতে আর একটি দীপ জ্বালে, তবে কি প্রথমোক্ত দীপটির দ্বিতীয়টিতে উৎক্রান্তি ঘটে?" মিলিন্দ কহিলেন, "না"। অমনি দার্শনিক প্রতিপন্ন করিলেন, "ঠিক তেমনি এ জন্ম হইতে জন্মান্তরে কোন কিছুর উৎক্রমণ নাই।" এইরূপে আত্ম-বাদ নিরস্ত হইল। রাজা মিলিন্দ প্রদীপের নীচের অন্ধকার দেখিতে পাইলেন না, সেখানেই নাগসেনের যুক্তির দুর্ব্বলতা লুকাইয়াছিল। এই উপমা খাটিতে পারে না, রথের ন্যায় ইহাও দোষদুষ্ট। দুইটি দীপ,—এক অন্য হইতে জাত হইয়া পিতাপুত্রের সমকালীন অবস্থিতির সহিত উপমার্হ হইতে পারে, কিন্তু যে ক্ষেত্রে একটির সম্যক্ উচ্ছেদ সাধিত না হইয়া অপরটির অভ্যুদয় ঘটে না—সে ক্ষেত্রে ত ইহার প্রয়োগ যুক্তি-বহির্ভূত। একই সময়ে সূর্য্য চন্দ্র আকাশে কিরণ-কিরীট

পরিতে পারে না, একের অন্ত অন্যের অভ্যুদয় সূচিত করে, একের জ্যোতি অন্যে অধিগত হইয়া তবে সুধাংশুর সৃষ্টি। জন্ম-জন্মান্তরের সম্বন্ধ, সূর্য্য-শশীতে প্রতিদিন একবার করিয়া অনন্তকাল ধরিয়া অভিনীত হইতেছে। কিন্তু নাগসেন ইহার স্বরলিপি একটু বৈচিত্র্য মাখাইয়া মিলিন্দকে শুনাইলেন।

এই এক প্রকারের একতালা রাগিণী ক্রমাগত চলিল—ইহাদের সবগুলিই ছিদ্রযুক্ত মৃন্ময় ভাণ্ড! নাগসেন পৃষ্ট হইয়া বলিতেছেন,—"যে জিনিস পরজন্মে জন্মগ্রহণ করে উহা নামরূপ, তবে এ জন্মের নামরূপ নহে—এ জন্মে নামরূপ দ্বারা যে কিছু সদসৎ কৃত হইয়া থাকে উহার ফলস্বরূপ, পরজন্মে নামরূপের আধার সৃষ্ট হয়…।" এখন প্রশ্ন হইতেছে এ জন্মের নামরূপ ত চিতার অনলে ছাই হয়, কর্ম্মভাণ্ডার সঞ্চিত থাকে কিসে—যাহা উৎক্রান্ত হইয়া পরলোকপ্রাপ্ত হয়! এ দিকে প্রশ্ন হইলে উত্তর সহজ নহে।

ঐতিহাসিক রিস্-ডেভিডস্ (Rhys-Davids) তাঁহার American Lecturesএ বলিয়াছেন,—'There is no passage of soul or of an I in any sense from the one life to the other.' 'প্রবাসী'তে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় তাঁহার সুগভীর পাণ্ডিত্য দ্বারা অঙ্গোত্তরনিকায়ের মৃত্যুদূত এবং ভারবাহী পুরুষ ইত্যাদি বিশ্লেষণ করিয়া ইহার যথোচিত উত্তর দিয়াছেন। রিস্-ডেভিডস্ পালি-শাস্ত্রকে বিচারের চক্ষে যেন অতি কমই দেখিয়াছেন। Mrs Rhys-Davids তাঁহার 'Buddhism'এ এই সব মিলিন্দপঞ্হের আবৃত্তি যথাযথ করিয়াছেন, কিন্তু একটুও প্রশ্ন তোলেন নাই ইহাদের সারবত্তা কোথায়। গৌতম বুদ্ধের মুখে, তাঁহার ধর্ম্মকথা যে অমল সরলতায় প্রভাত-নীহারের মত ঝলমল্ করে, শিষ্যের মুখেই যেন সে শিশির-কণা জমাট বাঁধিয়া মিছ্রির দানার মত শক্ত হইতে বসে—আর দূর দূরান্তের বহু শতাব্দীর শেষে সমাগত বৌদ্ধ দার্শনিকের হাতে সে জিনিস কতদূর পাষাণ-কল্পতা ধারণ করে, Mrs Rhys-Davids-এর মিলিন্দ-পঞ্হ ও কথাবস্তুর সম্পর্কে কৃত টিপ্পনীই তাহার একটি আলেখ্য—"...the belief, not that man's body and mind were not Divine Spirit, not that man's self was not body or mind, but that man was just body and mind, and nothing else." (Samyutta Nikaya—Part III, p. ix)

এইরূপে শরীরের পরিধিতে যখন মানুষের সর্ব্বস্ব সঙ্কুচিত হইল—শরীরের বাড়া আর কিছুই রহিল না তখন "বৌদ্ধ" আখ্যা প্রদীপের গাছটিকে যত জুড়িয়া রহিল প্রদীপটিকে ততই দূরে ছুঁড়িয়া মারিল।

স্মরণে

শ্রীশ্যামরতন চট্টোপাধ্যায়

জীবনে জাগিত মনে বিরহের ভয়
মরণে সে ভীতি মোর গিয়াছে টুটিয়া,
ঘুচিয়াছে এবে সেই উদ্বেগ সংশয়
রহিব কেমনে আমি তোমারে ভুলিয়া।
তুমি মোর শূন্য চিত্ত করি অধিকার,
হে বন্ধু, অজ্ঞাতে হেরি এসেছ কখন,
শত স্মৃতিবিজড়িত হৃদয় আমার
তোমার মিলন-সুখ ভুঞ্জে অনুক্ষণ।
মনে পড়ে তোমার যে মূরতি মধুর,
বিগলিত করুণায় জাহ্নবীর মত,
ভগবতৎ প্রেমে চিত্ত ছিল ভরপুর,
হরিনামামৃতপানে কীর্ত্তনে সতত।
সরল উদার প্রাণ, নিষ্ঠায় অটল,
দীন দুঃখী স্মরি' তোমা মুছে আঁখিজল।

* বন্ধুবর অচলনাথ মিত্রের বিয়োগে

সর্ব্ব-হারা

শ্রীকল্পনা দেবী

ধরণী তো কোলাহলে ভরা—
সুখে দুখে গড়া এ সংসার,
সব ব্যথা সব দুখে ব'হে নিতে পারি বুকে
তুমি যদি হাসি মুখে চাও একবার।

নয়নের ক্ষণিক চাহনি
অধরের সেই মৃদু হাসি,
তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের জ্বালা মনে হয় ফুলমালা—
যেন সে অমিয়-ঢালা কাণে বাজে আসি'।

সকলের মাঝখানে থেকে—
আছ তুমি সবার উপরে;
আছ এ বুকের মাঝে, আছ তুমি সব কাজে
শশধর রাজে যথা—তারকা-মাঝারে।

কাছে পেতে চাহিনি কখনো
চাহি শুধু করুণার কণা;
দূরে আছ তাই ভাল, সবারে দিতেছ আলো,
এতটুকু রশ্মিকণা—তাওকি পাব না?

এতটুকু কামনা যাহার—
তার কেন ঝরে আঁখিজল ?
ভুলাতে ব্যথিত চিতে এটুকু পার না দিতে ?
যদি সে সান্ত্বনা পায়—বুকে বাঁধে বল।

একদিন—ছিল একদিন—
যদিও সে স্বপন আমার,
তবু আজ পড়ে মনে লভিয়াছি এ জীবনে
দেবতার আকাঙ্ক্ষিত স্নেহ-প্রেমধার।

আজ আমি যাহার ভিখারী—
সেদিন তা' অবিরল ধারে
ঝরেছে আমার বুকে, ধরণীর শ্রেষ্ঠ সুখে
যে কভু হয়েছে সুখী,—ভুলিতে কি পারে?

সে ধরণী তেমনই আছে—
সে আকাশে সেই নীল ছবি,
সেই শশী তারা হাসে, জোছনা আলোকে ভাসে
নিশিশেষে সেই আসে সমুজ্জ্বল রবি।

সেই বর্ষামাস ফিরে আসে—
সেই ঋতু আসে পায় পায়,
তেমনিই ফুল ফোটে বাতাস তেমনি ছোটে
সৌরভ হরিয়া ল'য়ে দিগন্তে বিলায়।

সেই তুমি—সেই আমি আছি
আমরা তো ভিন্ন কেহ নই,
তবে সে বিশ্বাস কই ? সেই নির্ভরতা কই ?
মনের কাহিনী ভরা—সে নয়ন কই ?

মাঝখানে এ কি ব্যবধান !
আমি আসি—তুমি চ'লে যাও,
কি কথা বলিতে চাই— ভয়ে ভয়ে ফিরে যাই—
মনে করি কি শুধাব,—পরি না যে তাও !

জীবনের ক্ষণিক সময়—
কখন ঝরিয়া যাবে ফুল,
যে ভুলে এ অভিমানে বেদনা পেতেছি প্রাণে
হয়তো জনমে আর ভাঙিবেনা ভুল !

এতদিন সহিয়াছি যদি—
আজও তবে সহিব সকল,
তুমি কোরো নাকো রোষ, নিয়ো না নিয়ো না দোষ,
যদি কভু ভুলে ভুলে চোখে আসে জল।

পুরাণো সে অতীতের কথা
একবার ভেবো মনে মনে,
আমি যা হারানু হায়, ভেবে দেখো এ ধরায়—
কে পেরেছে এত ক্ষতি সহিতে জীবনে ?

গেছে আশা—গিয়েছে হরষ—
আছে শুধু ছায়াটুকু তার,
তাই নিয়ে বেঁচে আছি আজি যোড় করে যাচি,
নিয়ো নাক নিয়ো নাক সেটুকু আমার !

জীবন ও আর্ট

শ্রীঅনিলবরণ রায়

আমাদের দেশে আজকাল অন্নচিন্তা এমনই চমৎকার হইয়া উঠিয়াছে যে, এ অবস্থায় আর্টের চর্চ্চা, আর্টের অনুশীলন অনেকের কাছেই নিতান্ত বিসদৃশ বলিয়া মনে হয়। মানুষকে আগে খাইয়া বাঁচিতে হইবে, দেহ প্রাণ মনের স্বাধীন বিকাশের সুযোগ লাভ করিতে হইবে, তবে ত সে আর্টের রস উপভোগ করিতে পারিবে। যেমন ধর্ম্ম সম্বন্ধে, তেমনিই আর্ট সম্বন্ধেও বলা যাইতে পারে, শরীরমাদ্যম্। শরীর ও প্রাণ রক্ষা যে আগেই চাই, তাহা কেহই অস্বীকার করিবে না; কিন্তু আমাদের বর্ত্তমান দৈন্যের জন্য জীবনের এই প্রয়োজনটাকেই এত বড় করিয়া দেখা হইতেছে যে এইটি শুধু আদি নহে, এইটিই আদি মধ্য অন্ত সব, লোকের মনে এইরূপ একটা ধারণা বদ্ধমূল হইয়া যাইতেছে। শরীরপালন, প্রাণের ভোগ, আমাদের ভারতীয় ভাষায় আহার নিদ্রা মৈথুন, ইহাই মানবজীবনের সার সত্য, ইহাই মনুষ্যত্বের চরম। আর যাহা কিছু, ধর্ম্ম নীতি বিজ্ঞান আর্ট, সে-সব মানুষের আহার নিদ্রা মৈথুন ব্যাপারেই সহায়তা করিবে, তাহা ছাড়া তাহাদের নিজস্ব কোন মূল্যই নাই। মানুষ তাহার সকল চেষ্টা ঐ সব মূল ও আদিম ব্যাপারে নিয়োজিত করিবে, অবসর সময়ে একটু চিত্তবিনোদনের জন্য বা সান্ত্বনার জন্য বা শোভা ও অলঙ্কারের জন্য ধর্ম্ম, দর্শন বা আর্টের চর্চ্চা করিবে

মানবজীবনের আদর্শ সম্বন্ধে এই ধারণা যে শুধু ভারতেই প্রচলিত তাহা নহে, বর্ত্তমান সভ্যজগতে সর্ব্বত্রই ইহা প্রচলিত। ইহা বর্ত্তমান সভ্যতারই মূলস্বরূপ, ভারতে তাহারই হাওয়া লাগিয়াছে, ভারতের বর্ত্তমান দারিদ্র্য ও অধঃপতিত অবস্থা এইরূপ আদর্শ অনুকরণেরই একান্ত অনুকূল হইয়া পড়িয়াছে। আধুনিক শাস্ত্র Psycho-analysis বা মনোবিকলন বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়া দিতেছে যে, মানুষ ধর্ম্ম, বিজ্ঞান, আর্ট লইয়া যে সভ্যতার গর্ব্ব করে সে-সবের মূলে রহিয়াছে আহারাদির প্রবৃত্তি, বিশেষতঃ যৌনপ্রবৃত্তি sexual instinct। এই জন্যই বর্ত্তমান সভ্যতাকে জড়বাদী বা materialistic বলা হয়।

কিন্তু প্রাচীন কালে সভ্যমানুষের আদর্শ ছিল স্বতন্ত্র। আহারাদিকে প্রাচীনেরা অবহেলা করিতেন না, কিন্তু এই-গুলিকেই তাঁহারা জীবনের প্রধান ব্যাপার করিয়া তোলেন নাই। শরীর ও প্রাণ মানুষের সকল ব্যাপারের ভিত্তি ও আধার তাহা তাঁহারা অস্বীকার করিতেন না, কিন্তু তাঁহারা দেখিয়াছিলেন যে, শরীর ও প্রাণ লইয়াই মানুষের মনুষ্যত্ব নহে। স্থূল শরীরে মানুষ জড়পদার্থের সহিত এক, আহার নিদ্রা প্রভৃতি প্রাণের ব্যাপারে মানুষ পশুর সহিত এক, কিন্তু মন-বুদ্ধি লইয়াই মানুষের মনুষ্যত্ব। দেহ ও প্রাণের আধারে মন-বুদ্ধির বিকাশ করিয়া মনুষ্যত্বের বিকাশ করিতে হইবে। ধর্ম্ম, নীতি, দর্শন, বিজ্ঞান, আর্ট এই গুলি হইতেছে মনের ও বুদ্ধির নিজস্ব ব্যাপার, এই গুলিকে লইয়াই মানুষের মনুষ্যত্ব। দেহ ও প্রাণকে কেবল এই সকলের সহায় ও যন্ত্র বলিয়া দেখিতে হইবে, দেহ ও প্রাণের জীবনে আমরা মনের অনুশীলন করিবার সুযোগ পাইয়াছি, শুধু এই জন্যই মানুষের কাছে দেহ ও প্রাণের আদর। বর্ব্বর ও সভ্য মানুষের মধ্যে প্রভেদ এই যে, বর্ব্বরেরা দেহের ব্যাপারকেই জীবনের প্রধান বস্তু বলিয়া গ্রহণ করে, সভ্য মানুষ মন-বুদ্ধির অনুশীলনকে সকলের উপরে স্থান দেয়। এই সূত্র লইয়া বিচার করিলে দেখা যায় যে, বর্ত্তমানে আমরা যাহাকে সভ্যতা বলি তাহা বর্ব্বরতারই নামান্তর। বস্তুতঃ বর্ত্তমান জগতে দেহ ও প্রাণের ভোগকে এবং তাহার সহায় অর্থকে যেরূপ উচ্চ স্থান দেওয়া হইয়াছে, লোভের বশে মানুষে মানুষে, শ্রেণীতে শ্রেণীতে, জাতিতে জাতিতে যে দ্বন্দ্ব প্রতিযোগিতা, যে

মারামারি কাটাকাটি চলিতেছে, তাহাতে বর্ত্তমান যুগের মানুষকে বর্ব্বর বলিলে খুব বেশী ভুল করা হয় না। তবে প্রাচীনকালে যাহাদিগকে বর্ব্বর বলা হইত, বর্ত্তমান যুগের সভ্য মানুষদের সহিত তাহাদের একটা বিশেষ প্রভেদ রহিয়াছে। প্রাচীন বর্ব্বরেরা মনের পরিচালনা বিশেষ করিত না, যাহা করিবার সোজাসুজি গায়ের জোরেই করিত। কিন্তু এখন বিজ্ঞানের যুগ, মানুষ বুদ্ধির অনুশীলন করিয়া জড়জগৎ সম্বন্ধে বহুজ্ঞান সংগ্রহ করিয়াছে ও করিতেছে, জনসাধারণের মধ্যেও মন-বুদ্ধির অনুশীলন অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। এখন যাহাতে দেশের প্রত্যেক স্ত্রী ও পুরুষ লিখিতে ও পড়িতে পারে সকল দেশেই সে চেষ্টা চলিতেছে এবং এ চেষ্টা অনেক স্থানেই খুব অগ্রসর হইয়াছে। অতএব বর্ত্তমান যুগের মানুষকে সেই প্রাচীন বর্ব্বরদের সহিত আর সমপর্য্যায়ে ফেলা যায় না। বর্ত্তমানের লোক বেশী বুদ্ধিমান ও চালাক হইয়াছে, গায়ের বল অপেক্ষা ছল ও কৌশলেই কার্য্য উদ্ধার করিতে যায়। কিন্তু এই যে মন-বুদ্ধির চালনা, মানুষ ইহাকেও সেই দেহ ও প্রাণের ভোগেই লাগাইতেছে। বিজ্ঞানের চর্চ্চা করিয়া জড়প্রকৃতির উপর মানুষ যে ক্ষমতা লাভ করিয়াছে, ধনবৃদ্ধি করিয়া ভোগের সুবিধা করিতে, শত্রুকে ধ্বংস করিয়া প্রতিযোগিতা নিবারণ করিতে, সর্ব্ববিধ উপায়ে নিজেদের ভোগের পথ নিষ্কণ্টক করিতে তাহা প্রয়োগ করিতেছে। বিজ্ঞানের যে প্রকৃত উদ্দেশ্য, বুদ্ধির চর্চ্চায় জগৎ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা এবং এই চর্চ্চাতেই পরম তৃপ্তি লাভ করা, সে উদ্দেশ্য দুই চারিজন বৈজ্ঞানিকের মধ্যে থাকিলেও সাধারণে বিজ্ঞানকে এভাবে দেখে না। জগদীশচন্দ্র উদ্ভিদের জীবনপ্রণালী আবিষ্কার করিতেছেন, কিন্তু ইতিমধ্যেই জল্পনা কল্পনা আরম্ভ হইয়াছে ইহাতে কৃষিকার্য্যের কি সুবিধা হইবে, চিকিৎসাশাস্ত্রের কি উন্নতি হইবে।

যেমন বিজ্ঞান সম্বন্ধে, তেমনিই ধর্ম্ম, নীতি, আর্ট সকল বিষয়েই। লোকে সপ্তাহে একদিন ধর্ম্মালোচনা করে, সেটা বিশ্রামের মধ্যেই। কাজ ছয় দিন, আর ধর্ম্ম একদিন! ধর্ম্মকে বাদ দিলেও জীবনের বিশেষ কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই, অনেকে ছাড়িয়াও দিতেছে। আমার ভোগের সামগ্রী যাহাতে অপরে হরণ করিয়া না লয়, আমি যেন নিশ্চিন্ত হইয়া স্ত্রী, পুত্র, ধন, রত্ন উপভোগ করিতে পারি, তাহার প্রতিবিধান করাই নীতিশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য! আর্টও ঠিক তাই; যাহাদের পয়সা আছে, সখ আছে, তাহাদের জন্যই আর্ট, জীবনে ইহার কোন মূল প্রয়োজনীয়তা বা উপযোগিতা নাই, আর্টের নিজস্ব কোন মূল্য নাই। থিয়েটার বায়স্কোপ দেখা, কাব্য উপন্যাস পাঠ করা, চিত্রকলা স্থাপত্য ভাস্কর্য্য সঙ্গীত চর্চ্চা করা এ সব যে শুধু বাজে কাজ, বাজে খরচ কেবল তাহাই নহে, অনেকেই এ সকলকে সমাজের পক্ষে বিশেষ অনিষ্টকর বিবেচনা করেন। আমাদের দেশে আজকাল অনেক দেশহিতৈষী এ সকল আর্টচর্চ্চার সম্পূর্ণ বিরোধী, তাঁহাদের মতে তৎক্ষণ বসিয়া চরকার সুতা কাটিলে দু'পয়সা আয় হইবে।

অতএব History repeats itself, সেই প্রাচীন বর্ব্বরতাই আবার ফিরিয়া আসিয়াছে, তবে মানবজাতির ক্রমবিকাশের ফলে তাহার ধরণটা একটু বদ্‌লাইয়া গিয়াছে। আগেকার বর্ব্বরেরা মন-বুদ্ধির অনুশীলন না করিয়া দেহ প্রাণের ব্যাপার লইয়াই থাকিত, আজকালকার সভ্য বর্ব্বরেরা মনবুদ্ধির অনুশীলন করিয়া ঐ দেহ প্রাণের ভোগের সামগ্রীই সংগ্রহ করে, কিন্তু মন-বুদ্ধির অনুশীলনের যে নিজস্ব মূল্য আছে এবং তাহাই যে মানুষের প্রকৃত মনুষ্যত্ব তাহা তাহারা স্বীকার করে না।

ভারতীয় অধ্যাত্মশাস্ত্রের ভাষায় বলা যাইতে পারে, প্রাচীন বর্ব্বরতা ছিল তামসিক, এবং আধুনিক সভ্যতা রাজসিক। প্রাচীন বর্ব্বদের ঝোঁক ছিল দেহের উপর; মনের খেলা তাহাদের খুব কম ছিল। আধুনিক সভ্য মানুষদের জীবনের কেন্দ্র প্রাণ, তাহাদের মধ্যে মনের খেলা অপেক্ষাকৃত বেশী। রাজসিকতার প্রেরণায় মানুষ কর্ম্মের জন্য, ভোগের জন্য, আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য ছুটিয়া বেড়ায়, ইহাই প্রাণের খেলা। প্রাণের নীতি হইতেছে, বাঁচিয়া থাকা, আত্মপ্রতিষ্ঠা করা, যশ মান প্রভাব প্রতিপত্তি অর্জ্জন করা, ধন সম্পদ্‌ অর্জ্জন করা, বংশবৃদ্ধি করা, ভোগ করা। তিন প্রকার অনুষ্ঠানের দ্বারা মানুষ এই সকল বাসনার তৃপ্তি

শ্রীঅনিলবরণ রায়

করে। প্রথম, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে স্ত্রী, পুত্র, পরিজন লইয়া; দ্বিতীয়, অর্থনীতিক ক্ষেত্রে ধন উৎপাদন ও ভোগ করিয়া; তৃতীয় রাজনীতিক ক্ষেত্রে প্রভাব ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া। বর্ত্তমান সভ্যতার আদর্শ হইতেছে, এই তিনটি অনুষ্ঠানকেই সুষ্ঠুভাবে গড়িয়া তোলা; ইহা ছাড়া মানবজীবনের, মানবসমাজের মূলতঃ আর কোন লক্ষ্য, কোন প্রয়োজন নাই। জ্ঞান, বিজ্ঞান, ধর্ম্ম, নীতি, আর্ট, এ সব কেবল ঐ মূল লক্ষ্যসাধনে আনুষঙ্গিক ব্যাপার বলিয়া গণ্য।

কিন্তু প্রাচীন সভ্য জগতে মানুষের আদর্শ এরূপ ছিল না। সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি এ সকলের মূল্য তাহাদের কাছে কেবল এইটুকুই ছিল যে, এই সকলকে ভিত্তি করিয়া মানুষ জ্ঞানবিজ্ঞানের, নীতির, আর্টের ও ধর্ম্মের অনুশীলন করিতে পারে। প্রাচীন গ্রীস্ ও রোম প্রথম তিনটির উপরেই ঝোঁক দিয়াছিল, এসিয়া আরও অগ্রসর হইয়া ঐ তিনটির উপরেও ধর্ম্মকে স্থান দিয়াছিল এবং ঐ তিনটিকেই অধ্যাত্মজীবনেরই সহায়রূপে গণ্য করিয়াছিল। প্রাচীন সভ্য ইউরোপ মনকেই মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ্ বলিয়া দেখিয়াছিল। প্রাচীন ভারত মন-বুদ্ধির উপরেও আত্মাকে দেখিয়াছিল, যঃ বুদ্ধেঃ পরতাস্তু সঃ এবং দেহ প্রাণ, মনকে সেই আত্মারই আত্মপ্রকাশের আধার ও যন্ত্র বলিয়া জানিয়াছিল। প্রাচীন সভ্য ইউরোপ মনের চর্চ্চাকেই শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়াছিল, অতএব সেই সভ্যতাকে বলা যাইতে পারে সাত্ত্বিক; এবং ভারত আত্মার আলোকে, আত্মার শক্তিতে দেহ প্রাণ মনকে অধ্যাত্মভাবে গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছে, তাই বলা হয় যে, ভারতের সভ্যতা আধ্যাত্মিক।

মনের পূর্ণতম উচ্চতম বিকাশই মনুষ্যত্ব। কিন্তু এই বিকাশের জন্য যেমন নীচের দেহ ও প্রাণকেও পূর্ণভাবে বিকশিত করা প্রয়োজন, তেমনিই মনকেও ছাড়াইয়া উঠিয়া মানুষের প্রকৃত মূল সত্তা আত্মাকে ধরা প্রয়োজন; আত্মার সহিত সাক্ষাৎ যোগে, আত্মার আলোক ও শক্তিতেই দেহ প্রাণ মনের পূর্ণতম বিকাশ হইতে পারে, মানুষ অতিমানবত্ব লাভ করিতে পারে, মানুষের দেহ প্রাণ মনের আধারেই দেবজীবনের বিকাশ করিতে পারে ইহাই ভারতীয় সভ্যতার চরম লক্ষ্য ও আদর্শ।

মানুষ সত্যের সন্ধান করে, কিন্তু যতই অগ্রসর হয়, ততই সত্যের নূতন নূতন রূপের প্রকাশ হয়। সত্য অনন্ত, মন তাহাকে ধরিতে চেষ্টা করিতেছে কিন্তু কিছুতেই পূর্ণভাবে ধরিতে পারিতেছে না। অনন্ত সত্য মনের বহু উপরে। তাই যাহারা শুধু মন-বুদ্ধি দিয়াই সত্যকে ধরিতে চেষ্টা করে তাহাদিগকে যেন কেবলই বলিতে হয়,—

ধরি ধরি করি ধরিতে না পারি
কেন স'রে যাও বল না?

মানুষ শুভের সন্ধান করে, ন্যায় অন্যায়, ভাল মন্দ বিচার করে, কিন্তু দেখিতে পায় শুধু মনের দ্বারা ইহার চরম সমাধান হয় না, কতকদূর গিয়া বুদ্ধিতে আর কুলায় না, মানুষ নিজের মধ্যে যে পূর্ণ কল্যাণের আদর্শ উপলব্ধি করে, মনবুদ্ধির দ্বারা সেটিকে ধরিতে পারে না, জীবনে তাহাকে প্রকট করিতে পারে না। মানুষ সুন্দরের সন্ধান করে, কিন্তু কোন্ শিল্পী সৌন্দর্য্যকে পূর্ণরূপ দিতে পারিয়াছে? তাহার অন্তরের আদর্শকে বাহিরে পূর্ণভাবে প্রকাশ করিতে পারিয়াছে? যতই সে অগ্রসর হয় ততই দেখে, সৌন্দর্য্যের সীমা নাই, অন্ত নাই,—সেই অনন্ত সৌন্দর্য্যকে পূর্ণভাবে প্রকাশ করা দূরে থাকুক, মানুষের মন তাহা ধারণা করিতেও পারে না। এই সকল আদর্শের অনুসরণ করিয়া মানুষের মন যে অনন্ত সত্য, অনন্ত শুভ, অনন্ত সুন্দরের আভাষ পায়, তাহাই আত্মা, তাহাই ভগবান, সত্যং শিবং সুন্দরং। জীবনে এই অনন্তের অনুসরণ করিতে হইবে, দেহ, প্রাণ, মনের ক্ষুদ্রতা, অপূর্ণতা দূর করিয়া দিয়া তাহাদের রূপান্তর সাধন করিয়াই তাহাদের মধ্যে সেই অনন্ত সত্য, শিব, সুন্দরকে প্রকট করিতে হইবে, তবেই ভগবানের পার্থিব মানবলীলা সার্থক হইবে, ইহাই ছিল প্রাচীন ভারতের সভ্যতার শিক্ষা-দীক্ষার আদর্শ, ইহাই ভারতের আধ্যাত্মিকতা।

তাই ভারতে ধর্ম্মকে জীবন হইতে পৃথক করা হয় নাই, যাহাতে জীবনের পূর্ণবিকাশ ও শ্রেষ্ঠ পরিণতি হইতে পারে ভারতে তাহাই ধর্ম্ম নামে অভিহিত। যখন বলা যায় যে, ভারতে জীবনের সহিত ধর্ম্মের সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য, সমস্ত জীবনকেই ধর্ম্মে পরিণত করা ভারতের জাতীয় বৈশিষ্ট্য, তখন বুঝায়

না যে, পদে পদে মনুসংহিতার বিধান এবং অসংখ্য প্রকারের বিধিনিষেধের বন্ধন মানিয়া জীবনের পথে চলিতে হইবে।—ইহা ভারতের মহান্ আদর্শ নহে, পরন্তু সেই আদর্শেরই বিকৃতি, গ্লানি! চিন্তায়, ভাবে, কর্ম্মে, দেহে, প্রাণে, মনে জীবনের অতি খুঁটিনাটি ব্যাপারেও প্রতি মুহূর্ত্তে সত্য, শুভ, সুন্দরের আদর্শ অনুসরণ করিয়া ক্রমশঃ ভগবানের দিকে, দিব্য অধ্যাত্মজীবনের পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতে হইবে। ইহাই ভারতের সনাতন আদর্শ। ভারতের দর্শন, বিজ্ঞান, নীতি, আর্ট মানুষকে জীবনে এই আদর্শের অনুসরণ করিতেই বরাবর সাহায্য করিয়াছে। সত্য, শুভ, সুন্দর এই তিনটির যে কোনটিরই অনুসরণ যদি ঐকান্তিকতার সহিত করা যায় তাহা হইলে শেষ পর্য্যন্ত ভগবানেই পৌঁছান যায় এবং ভগবানকে ধরিতে পারিলে আর পাইতে কিছুই বাকী থাকে না। কিন্তু মানুষের পক্ষে সত্য ও শুভের অনুসরণ করা অপেক্ষা সুন্দরের অনুসরণ করা সাধারণতঃ অনেক সহজ। সৌন্দর্য্যের উপাসনা করিয়া ভগবানকে যেমন সহজে লাভ করা যায় এমন আর কিছুতেই সম্ভব নহে। তাই ভারতের শিক্ষা দীক্ষায় সৌন্দর্য্য-উপাসনা এতখানি স্থান অধিকার করিয়াছে। বৈষ্ণবধর্ম্ম ইহার সুন্দর দৃষ্টান্ত। সেই কালিন্দী-পুলিন, বংশীবট, ফলে ফুলে পল্লবে সুশোভিত নিকুঞ্জবন, পূর্ণ জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে কেলিকদম্বমূলে দাঁড়াইয়া ত্রিভঙ্গিমঠাম মদনমোহন শ্যামসুন্দরের বংশীধ্বনি, যমুনার জল উজানে বহিতেছে, গোপীরা অভিসারে আসিয়া সেই চিরসুন্দরের চরণে জীবন যৌবন ডালি দিতেছে। বহির্জগতে সকল সৌন্দর্য্যের অপরূপ সমাবেশ, অন্তর্জগতে গোপীদের পূর্ণ সমর্পণের অপূর্ব্ব মাধুরী, জগতের আর কোথায় কোন্ শিল্পী একাধারে এত সৌন্দর্য্য ফুটাইতে পারিয়াছেন? চণ্ডীদাস শ্রীরাধার ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন,—

বঁধু, তুমি যে আমার প্রাণ।
দেহ মন আদি, তোমারে সঁপেছি,
কুলশীল জাতি মান॥
অখিলের নাথ, তুমি হে কালিয়া,
যোগীর আরাধ্য ধন।
গোপ গোয়ালিনী, হাম অতি হীনা,
না জানি ভজন পূজন॥
পিরীতি রসেতে, ঢালি তনু মন,
দিয়াছি তোমার পায়।
তুমি মোর পতি, তুমি মোর গতি,
মন নাহি আন ভায়॥
কলঙ্কী বলিয়া ডাকে সব লোকে,
তাহাতে নাহিক দুঃখ।
তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার
গলায় পরিতে সুখ॥
সতী বা অসতী তোমার বিদিত
ভাল মন্দ নাহি জানি।
কহে চণ্ডীদাস, পাপ পুণ্য সম,
তোহারি চরণখানি॥

শ্রীকৃষ্ণের উত্তর,—

জপিতে তোমার নাম, বংশীধারী অনুপাম,
তোমার বরণের পরি বাস।
তুয়া প্রেম সাধি গোরি, আইনু গোকুলপুরী,
বরজ মণ্ডলে পরকাশ॥
ধনি, তোমার মহিমা জানে কে?

* * *

তব রূপ গুণ, মধুর মাধুরী,
সদাই ভাবনা মোর।
করি অনুমান, সদা করি গান,
তব প্রেমে হৈয়া ভোর॥

* * *

আমার ভজন, তোমার চরণ,
তুমি রসময়ী নিধি॥

ভগবানকে যে যেমনভাবে ভজনা করে, ভগবান তাহাকে ঠিক সেই ভাবে ভজনা করেন; যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্। ভগবানের সহিত জীবের এই যে নিত্য সম্বন্ধ এমন জীবন্তভাবে কে কোথায় পরিস্ফুট করিতে পারিয়াছে? ভগবানকে পাইতে হইলে যাগ যজ্ঞ ভজন পূজনের কিছুই প্রয়োজন হয় না, যদি কেহ শ্রীরাধার ন্যায় "পিরীতিরসেতে ঢালি তনুমন" ভগবানের চরণে দিতে পারে ভগবান নিজে আসিয়া সাধিয়া সাধিয়া তাহার সেই

জীবন ও আর্ট

শ্রীঅনিলবরণ রায়

প্রেম গ্রহণ করেন এবং প্রতিদানে নিজেকে সমর্পণ করেন। এই বৃন্দাবনলীলা জাতির প্রাণে যে কি অফুরন্ত রসের সঞ্চার করিয়াছে, অতি সহজ সরল স্বাভাবিক ভাবে কত নর নারীকে অধ্যাত্মসাধনায় অত্যুচ্চসিদ্ধি প্রদান করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা কে করিবে ?

একান্তভাবে সৌন্দর্য্যের অনুসরণ করিয়া বৈষ্ণব কবিগণ মদনের শ্রেষ্ঠ যাগ বর্ণনা করিতেও বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই। জয়দেবের "রতিসুখ সারে গতমভিসারে" পাঠ করিয়া যিনি নাসিকা কুঞ্চিত করিবেন, তিনি আর যাহাই হউন, অনন্ত-সুন্দরকে পূজা করিবার শক্তি তাঁহার মধ্যে নাই। ভক্ত-চূড়ামণি পরম পবিত্রতার আধার শ্রীগৌরাঙ্গ এই সকল গান শ্রবণ করিতে করিতে ভগবদ্‌প্রেমে বিভোর হইয়া পড়িতেন। জগন্নাথের রথের সম্মুখে নৃত্য করিতে করিতে তন্ময় হইয়া তাঁহার সেই গান,—

> সেই ত পরাণনাথে পাইনু,
> যার লাগি মদন দহনে ঝুরি গেনু।

ইহার মর্ম্ম যিনি বুঝিবেন, তিনি বৃন্দাবনলীলার অশ্লীলতা দেখিয়া আর মূর্চ্ছিত হইবেন না।

সাধারণ জীবনে সত্য, শুভ ও সুন্দরের যে সমন্বয় ও সামঞ্জস্য করা হয় তাহাতে তিনটিকেই খর্ব্ব ও ক্ষুণ্ণ করিয়া একটা কাজচলা ব্যবস্থা করা হয়। তাহাতে লৌকিক জীবনের প্রয়োজন হয়ত সিদ্ধ হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে দিব্য অধ্যাত্মজীবনের পূর্ণতা নাই, তাহাতে ভগবানকে প্রকাশ করা হয় না, আড়াল করিয়াই রাখা হয়। তবে এই যে সত্যের সহিত শুভের, শুভের সহিত সুন্দরের বিরোধ, আর্টের সহিত জীবনের ও নীতির বিরোধ, ইহা আছে শুধু মনের রাজ্যে ; কারণ মন কোন জিনিষকেই পূর্ণভাবে গ্রহণ করিতে পারে না, কাটিয়া কাটিয়া ভাগ করিয়া আংশিকভাবে দেখে, তাই সত্যের অনুসরণ করিতে শুভকে খর্ব্ব করিতে হয়, শুভের অনুসরণ করিতে সুন্দরকে ক্ষুণ্ণ করিতে হয়। কিন্তু যাঁহারা মনের রাজ্য ছাড়াইয়া আধ্যাত্মরাজ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, তাঁহারা অনন্তের মধ্যে এই তিনেরই পূর্ণ সামঞ্জস্য পাইয়াছেন।

সৌন্দর্য্যের উপাসনা আমাদিগকে সহজে ভগবানের নিকট পৌঁছাইয়া দেয় এবং ভগবানের সহিত সাক্ষাৎ যোগেই মানুষ দিব্য অধ্যাত্মজীবন লাভ করিয়া মানবজন্ম সার্থক করিতে পারে। ভারত ইহা পূর্ণভাবেই উপলব্ধি করিয়াছিল, তাই ভারতের সভ্যতায় আর্টের স্থান এত উচ্চে। এ বিষয়ে অন্যান্য দেশের সহিত ভারতের তফাৎ এই যে, অন্যান্য দেশে মানুষ মনের দ্বারা সৌন্দর্য্যের যে কল্পনা করে সেইটিকে প্রকাশ করাই আর্টের উদ্দেশ্য, আর ভারতে আর্টের লক্ষ্য হইতেছে মনের অতীত অধ্যাত্মরাজ্যের সৌন্দর্য্যকে বাহ্যমূর্ত্তি দেওয়া। অন্যান্য দেশ জীবন ও প্রকৃতি হইতেই সৌন্দর্য্যের আদর্শ গ্রহণ করিয়াছে, ভারত অধ্যাত্ম উপলব্ধি হইতে সৌন্দর্য্যের আদর্শ গ্রহণ করিয়া তাহাকেই বাহিরে প্রকাশ করিতে চাহিয়াছে ; তাহাতে যদি বাহ্য দৃশ্যের সহিত, প্রাকৃত সত্যের সহিত বা নীতিধর্ম্মের সহিত মিলরক্ষা না হইয়াছে, তাহাতে তাহারা কুণ্ঠিত হয় নাই। এইরূপে ভারতে যে অপূর্ব্ব শিল্প ও সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে, ভারতবাসীর অধ্যাত্মজীবনগঠনে তাহা বিশেষ সহায়তা করিয়াছে। যখন বলা হয় ভারত আধ্যাত্মিক, তাহার অর্থ ইহা নহে যে, ভারতের অধিকাংশ লোক বা অনেক লোক কাম, ক্রোধ, লোভকে জয় করিয়াছে, উচ্চ অধ্যাত্মজীবন লাভ করিয়াছে ; জগতের কোন দেশ, কোন সভ্যতা সম্বন্ধেই ইহা এখনও বলা চলে না। কিন্তু ভারতের সহস্র সহস্র বৎসরব্যাপী বিশিষ্ট শিক্ষাদীক্ষার দ্বারা ভারতবাসীর মন প্রাণ এমন ভাবে তৈয়ারী হইয়াছে এবং এখানে এমন একটা atmosphere হইয়াছে যে, ভারতবাসী সহজেই অধ্যাত্মজীবনের দিকে ফিরিতে পারে। ভোগসুখের মধ্যে মগ্ন থাকিয়াও হঠাৎ হয়ত এক কথাতেই সব ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হওয়া এই ভারতেই সম্ভব। ভারতের জনসাধারণ যেমন উচ্চ অধ্যাত্ম বিষয় বুঝিতে পারে ও অল্প চেষ্টাতেই অধ্যাত্মসাধনার পথে চলিতে পারে, এবং এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের আবহাওয়ায় বসিয়া অধ্যাত্মসাধনায় সিদ্ধিলাভ করা যত সহজ, এমনটি আর জগতের কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না।

ভারতকে এই অধ্যাত্মভাব দিতে বিশেষ সাহায্য করিয়াছে ভারতের আর্ট, ভারতের সাহিত্য, স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য,

চিত্রকলা। আজ আমরা সেই আর্টের গৌরব, আর্টের মূল্য ভুলিয়া গিয়াছি, আর অন্য দেশের লোক আসিয়া আমাদের প্রাচীন শিল্পকলার অবশিষ্ট নিদর্শনসকল দেখিয়া মোহিত হইয়া যাইতেছে। ভারতবাসী এককালে কত বড় সৌন্দর্য্য-উপাসক ছিল এখনও তাহার সমস্ত প্রমাণ লুপ্ত হইয়া যায় নাই। মন্দিরে মঠে পাহাড়ের গাত্রে খোদিত হইয়া প্রাচীন ভারতের অত্যুচ্চ আর্টের নিদর্শন এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। ভারতের প্রাচীন সাহিত্য ভারতবাসীর সৌন্দর্য্য-উপাসনার বর্ণনায় পরিপূর্ণ। এখনও আমাদের দেশে ধর্ম্মে কর্ম্মে সামাজিকতায় যে সকল আচার অনুষ্ঠান প্রচলিত রহিয়াছে তাহা হইতে ভারতবাসীর গভীর সৌন্দর্য্য-নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়। এখনও ভারতীয় রমণীদের হাবভাব চালচলনে যে অনুপম লালিত্য ও সুষমা দেখা যায় তাহা দেখিয়া বিশ্ব-বিখ্যাত পাশ্চাত্য নর্ত্তকীগণও মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিতেছেন। ভারত বাহিরের জীবনে সকল গৌরব হারাইয়া ফেলিয়াছে, কিন্তু যুগযুগান্তরের সাধনা তাহাদের অন্তর হইতে আজিও মুছিয়া যায় নাই। সেই সুপ্ত শিক্ষাদীক্ষাকে জাগ্রত ও মার্জ্জিত করিতে পারিলে ভারত আবার এমন নূতন জীবন লাভ করিবে যাহা জ্ঞানে শক্তিতে সৌন্দর্য্যে প্রাচীন মহান্ গৌরবের যুগকেও ছাড়াইয়া উঠিবে।

দেশের দুঃখ দারিদ্র্য ও অভাব দূর করিতে, সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করা হউক, তাহাতে কোনও আপত্তি থাকিতে পারে না, কিন্তু ভারতের যে-সব শ্রেষ্ঠ সম্পদ্ আমরা খোয়াইতে বসিয়াছি, এখনও চেষ্টা করিলে যাহা রক্ষা করা যায়, যাহা হারাইলে ভারতের ভারতীয়তাই নষ্ট হইবে, সেইগুলিকে রক্ষা করার ব্যবস্থা এই সঙ্গেই প্রয়োজন। তাই দেশে যে আবার নূতন করিয়া আর্টের চর্চ্চা আরম্ভ হইতেছে, ইহা খুবই আশার কথা। শিল্পীরা সাহিত্যে ও শিল্পে সৌন্দর্য্যের আদর্শ সৃষ্টি করিবেন, সেই আদর্শের অনুসরণ করিয়া লোক তাহাদের জীবনকে সুন্দরভাবে গড়িয়া তুলিবে, জীবনে ইহাই আর্টের উপযোগিতা ও সার্থকতা। সমস্ত জীবনকে করিতে হইবে একটা আর্ট, সৌন্দর্য্যের লীলা। বৈষ্ণব কীর্ত্তনিয়ারা গৌরাঙ্গসুন্দরের বর্ণনা করেন,

> গমন নর্ত্তনলীলা
> বচন সঙ্গীতকলা।
> চ'লে যেতে নেচে যায়,
> সঙ্গীতেতে কথা কয়!

আমাদের চলা ফেরা, আমাদের কথা, আমাদের কর্ম্ম সব যেন হয় দিব্য সৌন্দর্য্যের অভিব্যক্তি ইহাই ভারতের সনাতন আদর্শ। সেই ভারতে আজ যদি কোন স্ত্রীলোক একটু সুন্দর বেশ ভূষা করিয়া বাহির হয়, অমনিই লোকে মনে করে advertisement, বিজ্ঞাপন! দেশের কি অধঃ-পতনই ঘটিয়াছে! কিন্তু, হিন্দুর সংসারে যে দেবীটি সর্ব্বা-পেক্ষা প্রিয়, তাঁহার নাম শ্রী। কেহ কোন খারাপ কাজ করিলে হিন্দু সেটাকে বলে, বিশ্রী। যাহা করিবে সুন্দর-ভাবে কর,—দেহ, প্রাণ, মনে সৌন্দর্য্যের পূর্ণতম বিকাশ কর, ইহা অপেক্ষা জীবনের বড় আদর্শ আর কিছুই হইতে পারে না, কারণ সৌন্দর্য্যের বিকাশ করিয়া আমাদের অন্তরস্থিত ভগবানকেই আমরা জীবনের মধ্যে প্রকাশ করি। গীতায় ভগবান বলিয়াছেন,

> যদ্ যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
> তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশ সম্ভবম্॥

বল্ সখি

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ রায়

বল্ সখি! চোখে তোর ফুটে কি ভাষা;
দুলে দুলে ওঠে বুকে কোন্ তিয়াষা!
পলক-বিহীন দুটি নয়ন-কোণে,
কি বাণী ঘুমায়ে পড়ে আপন মনে!
তোরই এ দিঠির মিঠি পুষ্প-ধারা
কার পথে ঝ'রে পড়ে উতল-পারা!
শিহরায় কোন্ সুর গোপন বুকে;
কি অনুরাগের মায়া চোখে ও মুখে!
ব্যথারুণ সকরুণ কি বাণী জাগে—
অনাহুত মুকুলিত হাসির রাগে!
এলায়িত মুক্ত এ অলক-মাঝে
কাজল-পরাণী বল্ কি মায়া রাজে!
চঞ্চল অঞ্চল বাতাসে দোলে,—
সরম-সায়রে সখি! কি ঢেউ তোলে!
আঁখিতে ঘনায় কোন্ মায়ার ছায়া,—
স্বপন কি ওরি মাঝে লভিল কায়া!
নধর অধরে ফুল-ধনু শিয়রে
অতনু কি লুটাইল ঘুমের ঘোরে!
কপোলে কি ভুল ক'রে স্বর্গ হ'তে
দুটি পারিজাত টুটে এল মরতে!
শান্তির ঝারি বুকে তিয়াষা-ভরা—
অমরার সুধা দুটি কুম্ভ-ভরা!

বল্ সখি! ফাগুনের আগুন-জ্বালায়
বুকে গুরু গুরু কোন্ বেদন ঘনায়!—
দখিন বাতাস দেহে লুটিয়া মরে;
আঁচল কেন লো বল্ খসিয়া পড়ে!
বলিতে সরমে বাধে সে কোন্ কথা;
নয়নে ঘনাল যার উচ্ছলতা!
কোন্ ব্যথা ওঠে সেথা মর্ম্মরিয়া
বেদন-বেহাগ সুরে গুঞ্জরিয়া!
কমনীয় ভুজ-লতা জড়ায়ে কি লো,
স্বরগের শত পারিজাত ফুটিল!
ও দুটি বাহুর পাশে বাঁধিবি কাকে;
উন্মদ মিনতির কঠিন পাকে!
লীলায়িত সচকিত গতির বেগে
কি বা মূর্চ্ছনা সখি! উঠিল জেগে!
চলিতে চরণে বাজে কোন্ মিনতি;
চকিতে টুটিল কেন গতির যতি!
চপল চরণ কেন থমকে লাজে;
সরমে মরমে বল্ কি সুর বাজে!
বিশ্বের হৃদয়ের স্বপন-ছায়া
মনের মাধুরী-পটে রচিল মায়া!
মানসী রূপসী হ'য়ে ফুটিলি মরি!
জগতের প্রেয়সীর মূরতি ধরি'!

মাসীর দেওর-ঝি

—গল্প—

-শ্রীউমা দেবী

সুপ্রকাশ সকালে উঠেই তার মাসীকে ডাক দিয়ে বল্‌লে, "মাসি, আজই তোমার দেওর-ঝি আস্‌চেন নাকি ?"

মাসী তখন ভাঁড়ারের কাজে ব্যস্ত ছিলেন—ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বল্লেন—"কাল সন্ধ্যেবেলা তো সেই রকমই তার পেলুম বাবা। তুই আর নেয়ে খেয়ে কোথাও বেরসনি প্রকাশ—তাকে শেয়ালদা থেকে নিয়ে আস্‌বি, বাপের কোন্ বন্ধুর সঙ্গে আস্‌চে তিনি ত শেয়ালদা অবধি এনেই খালাস, আমাদের বাড়ী তো চেনেন না।"—

"মাসি, তুমি আমাকে এত বিপদে ফেল কেন বল ত ? আমার First-period এ ক্লাস—আসাম মেল তো আসে ১১টার পর, প্রফেসর নিজেই যদি ফাঁকি খোঁজে, তবে আর ছাত্রদের কি দোষ বল ? দাও না তোমার হীরা সিংকে পাঠিয়ে—তোমার দেওর-ঝিটি তার কাছেও যেমন—আমার কাছেও তেম্‌নি অপরিচিত।"

"সেটা কি ভাল হবে প্রকাশ ? হাজার হোক্ বেচারী এই প্রথম বাড়ী ছেড়ে কোলকাতা আস্‌চে। ঠাকুরপোর ত চিরটা কাল আসামের জঙ্গলেই কাটলো, নিজে কখনো ছুটি পায় না—বছর চারেক আগে একবার এসেছিল—তখন তুই বিলেতে—মা-মরা মেয়ে আমার কাছে এবার পাঠিয়ে দিচ্ছে—যদি একটি ভাল পাত্তর খুঁজে দিতে পারি। তা' আমার ঘরে কি আর ভাল পাত্তরের অভাব,—তা' সে যদি বিমুখ হয় তা' আমি কি করব—থাক্‌গে, তুই নিজে চিরকাল আইবুড়ো কাত্তিক হোয়ে দিন কাটাবি ব'লে তো আর বাঙালী ঘরের মেয়ে তা' পারবেনা। তাই ঠাকুরপো নিতান্তই ধ'রে পড়েছে তার মা-মরা মেয়েটিকে মার মত—"

সুপ্রকাশ বাধা দিয়ে বল্‌লে, "মা-মরা কি রকম ? এই না তাঁর কোলের ছেলেটি ছোট ব'লে স্ত্রীকে পাঠাতে পারবেন না লিখেছেন ?

"সে কি আর ওর নিজের মা প্রকাশ ? আহা ওই একরত্তি তিন বছরের মেয়ে অমিতাকে নিয়ে হৈম যে আসামে চ'লে গেল—আর তো তার সঙ্গে দেখা হোলনা—সেখানেই তার কাল হোল—সে আজ উনিশ বছরের কথা।

"তবে তোমার দেওর-ঝি-টি নিতান্ত বালিকা নয় দেখ্‌ছি ! আচ্ছা, আমায় চা-টা আজ দেবে মাসি, না তোমার দেওর-ঝির জন্ম-নক্ষত্র শুন্‌লেই আমার পেট ভরবে ?'

'তা বল্লেই হয় চা খাস্‌নি ? ও খেন্তর মা, দাদাবাবুর চা-টা এই ভাঁড়ারের দালানেই দিয়ে যেতে বল্—এখানে তোর চা খাওয়াও হোক্ আমার কাজ সারাও হোক্। এত বেলা অবধি কি ক'রে যে ঘুমোস তার ঠিক নেই। তার পরে ত কলেজের বেলা হোতে ভাত দাও, একটু দেরী সয় না।"—

সুপ্রকাশের চা খাওয়ার পালা সাঙ্গ হোতেই উঠে দাঁড়িয়ে বল্লে, "আচ্ছা, যাব এখন তোমার দেওর-ঝিকে আন্‌তে—কি নাম বল্‌লে ? অমিতা না ? ভারী তো গ্রাম সম্পর্কে দেওর, তার খুবড়ো মেয়ে—তার জন্যে তোমার সত্যি আহার নিদ্রা ত্যাগ হোয়েচে দেখ্‌ছি। তা দেখ মাসি, সে এলে বাবু, আমার আদরে কম পড়েনা যেন—আমিও তোমার মা-বাপ-মরা বোন্‌পো !"

মাসী তাড়াতাড়ি ওর পিঠে হাত বুলিয়ে বল্লেন, "ষাট ষাট, কি যে তুই বলিস প্রকাশ, নিজে হাতে মানুষ করলুম—তোকে কি অনাদর করতে পারি।"

"তাই বল, মাসি, আমারও ভাবনা যায়—বেশ আছি আমরা মা ছেলে, এর মধ্যে আর কেউ এসে পড়লেই—"

'কিন্তু এমনি একা থাকা তো চল্‌বেনা প্রকাশ—বিয়ে তোমায় করতেই হবে। ঠাকুরপো তো এই এক বছর

শ্রীউমা দেবী

ধ'রে পড়েছে তোর সঙ্গেই যাতে অমিতার বিয়েটি হয়। আমি ব'লে রেখেছি আমার ছেলের বিয়েতে মত নেই, তার ওপরে ও আজকালকার শিক্ষিতা সুন্দরী মেয়েদের ওপর ভারী চটা—ওর যে কেমন সেকেলে ধরণ—up-to-date মেয়ে দেখলেই নাক সিঁটকায়। তোমার মেয়েটিকে কেমন ক'রে মানুষ করেছ তা তো জানিনে—তা এখানে পাঠিয়ে দাও—আমি চেষ্টা ক'রে দেখ্‌ব।''

"কি সর্ব্বনাশ মাসি, আমাকে আগে বলনি কেন? তোমার শিক্ষিতা সুন্দরী মেয়ের জন্ম জন্ম সুপাত্র জুটুক্, আমাকে রেহাই দিও! আমার গলায় যদি ও ফাঁস জড়াও—তবে আমি সত্যি মরব

প্রকাশ উৰ্দ্ধশ্বাসে পালালো, যেন এখুনি কেউ তাকে বিয়ে করতে বল্‌চে।

ভাগ্যক্রমে দ্বিতীয় ঘণ্টায় ক্লাস ছিলনা। প্রকাশ গলদঘর্ম্ম হ'য়ে ষ্টেশনে এসে দেখে, গাড়ী আগেই এসে গেছে। সে এদিক ওদিক কৌতূহল-দৃষ্টিপাত ক'রে মাসীর দেওর-ঝিকে খুঁজে বেড়াতে লাগল। তার ধারণামত হাইহীল জুতো, স্লিভ্‌লেস্ জামা, হাতে ঝোলা ব্যাগ, হাঁটুর নীচে কাপড়—ববড্ হেয়ার অথবা কুণ্ডুলী-পাকানো কানের দুপাশে দুই খোঁপা-অলা মেয়ে একটিও খুঁজে পেলনা। যাক্ বাঁচা গেল, আসেনি,—এই কথা মনে করবামাত্র এক ভদ্রলোক ব্যস্তভাবে ছুটে এসে বল্লেন, "আপনি কি সুপ্রকাশ রায়?"

সচকিত হোয়ে সুপ্রকাশ দেখ্‌ল, তাঁর পেছনে একটি লজ্জাশীলা নারী, মাথায় ঘোমটার মত ক'রে বেগুণী রংএর ধোসা আলোয়ান ঢাকা, ফুল-হাতা জ্যাকেটের কালো লেশ কব্জি ছাড়িয়ে ঝুলচে, পায়ে একটা বুট-জাতীয় পুরুষে জুতো, চোখে মস্ত একটা কালো চশ্‌মা, পরণের ঘোর নীল রংএর আলপাকার শাড়ীটা এত কুঁচ্‌কোনো যে ট্রেণের দুটি রাত্রিবাস তার ওপর দিয়েই গেছে বেশ বোঝা যাচ্ছে। মাসীর দেওর-ঝির এ হেন সজ্জা দেখে প্রকাশ একেবারেই ভড়কে গেল। তাড়াতাড়ি বল্লে, "হ্যাঁ আমিই বটে, আপনি কি প্রাণতোষ বাবু?"

ভদ্রলোকটি অমিতাকে দেখিয়ে বল্‌লে, "হ্যাঁ, আমি প্রাণতোষ চক্রবর্ত্তী, এই আমার বন্ধু কন্যা অমিতা, রাজেন বাবুর মেয়ে; এই নিন্, বুঝে নিন্ মশাই, আমার আবার সাড়ে বারোটায় এক এপয়ণ্টমেণ্ট—আর দাঁড়াবার সময় নেই। রানু, যাও মা, এনার সঙ্গে যাও, আমি একদিন দেখা ক'রে আসব'খন। আচ্ছা তবে আসি, নমস্কার।''

ভদ্রলোক উত্তরের অপেক্ষা না রেখে দৌড়লেন। সুপ্রকাশ সেই অৰ্দ্ধাবগুণ্ঠিতা প্রকাণ্ড-চশ্‌মা-পরা মেয়েটিকে সম্বোধন ক'রে বল্‌লে, "আসুন তবে। এই আপনার সব জিনিষ তো?"—

মেয়েটি ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চারিদিকে চাইতে লাগ্‌ল, উত্তর দিল না; তারপরে অনভ্যস্ত চরণে সুপ্রকাশের পেছন পেছন চল্‌তে লাগ্‌ল।

তাকে গাড়িতে বসিয়ে নিজে ড্রাইভারের আসনে ব'সে drive করতে করতে শেয়ালদা থেকে বালিগঞ্জ অবধি সমস্ত পথটা ও ভাব্‌ল—বাবা! এই নাকি মাসীর দেওরের মেয়ে—এ যে একেবারে সং! কথা কইতেও জানেনা দেখ্‌ছি।

বাড়ি পৌছে মাসীর হাতে অমিতাকে স'পে দিয়ে বল্লে, "চল্লুম এখন কলেজ।" বিকেল চারটের আগে যে বাড়ি আস্‌তে হবে না—তাতে পরম নিশ্চিন্ত ও আরাম বোধ করল।

বিকেলে বাড়ি এসে মাসীকে চিরাভ্যস্ত জলখাবারের থালা নিয়ে ব'সে থাকৃতে না দেখে ওর সমস্ত মনটা জ্ব'লে উঠ্‌ল—এই মাসি সুরু করেছেন আদরের ভাগ বট্‌রা, আমি আজই মেসে পালাচ্ছি। ভাঁড়ারে গিয়ে মাসীকে ফল ছাড়াতে দেখে বল্‌লে, "থাক্, থাক্, মাসি, অত কষ্ট করতে হবে না—আমি নরেশের ওখান থেকে এক বাটি চা খেয়ে আস্‌চি।"

"কি ছেলেমানুষি করিস্ প্রকাশ, একদিন দেরী হোয়ে গেছে একটু বোস্, আমি এখুনি সাজিয়ে দিচ্ছি। আমি কেবল ঠাকুরপোর ওপর রাগ করছি, তিনি কি ব'লে এই

লাজুক মেয়েটাকে সম্পূর্ণ অজানা জায়গায় ঝুপ্ ক'রে পাঠিয়ে দিলেন। তাকে নাওয়াতে খাওয়াতে মুখ থেকে কথা বের করতে যে কি নাকাল হোয়েচি বাবা—সে বল্‌তে পারি না। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা হেসে খুসে বেড়াবে, তা না এ একেবারে গোমসামুখো! কোলকাতায় এর বর জুটবে ভেবেছিস্?"

"চুপ চুপ মাসি, বর্ণনাটা বড় বেশী হোয়ে যাচ্ছে, শোনে যদি—"

"না, তা শুন্‌বেনা; এই তো কত ক'রে গা ধুতে পাঠালুম—এসে অবধি গা থেকে সেই আলোয়ানখানা খুল্‌বেনা—চিম্‌সে গন্ধ বেরোচ্ছে—কি জানি বাবু কেমন ধারা মেয়ে ও!"

সুপ্রকাশ জলযোগ সেরে বাইরে বেরোবার উদ্যোগে উঠে পড়ল। মাসীরও যে এই মেয়েটি মনে ধরেনি এটা একটা সুসংবাদ বটে! সে চিরকালই সরল সাধাসিধে গ্রামের মেয়ে পছন্দ করে-কিন্তু এ যে একেবারে কাদার তাল!

হেমন্তের সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছিল। তার ঘরের সামনে যে অল্প একটু খোলা ছাত—চোখ পড়ল—অমিতা সেখানে পা ছড়িয়ে গোল চষমা প'রে আলোয়ান মুড়ি দিয়ে বই পড়চে। ক্ষীণ আলোকেও বুঝ্‌তে পারল বইটি বটতলা অথবা কমলিনী সাহিত্যমন্দির সিরিজ। পায়ের শব্দ শুনে ও আলোয়ানটা আরো মাথা অবধি ঢেকে দিল।

সুপ্রকাশ সাম্‌নে এসে বল্‌লে, "শীত বোধ হয় তো ঘরে এসে বসুন না।"

অমিতা ঘাড় গুঁজে ব'সে রইল, জবাব দিল না। ওর ভারী মজা লাগ্‌ল এত বড় বাইশ বছরের মেয়ে না হয় লেখা পড়াই শেখেনি—তাই ব'লে কথার উত্তরও কি দিতে জানে না?

আবার বল্লে, "মাসীকে না হয় ডেকে দিই—হিম পড়চে এখানে থাক্‌লেই জ্বর হবে।"

মাটির পুতুল আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল, কোনো জবাব না দিয়ে বাড়ীর ভেতর চ'লে গেল।

পরদিন সকালে উঠেই সুপ্রকাশ কাজের ছুতোয় বেরিয়ে গেল। ব'লে গেল এক ছাত্রের ওখানে নেমন্তন্ন, সারাদিন আস্‌বে না। মাসী বুঝ্‌লেন এটা অভিমান; হোটেলে খাবার বন্দোবস্ত করেচে—এই মেয়েটাকে পছন্দ করচে না তাই দূরে থাক্‌তে চায়। তা যাক্, ভালই হোল, আজ সমস্ত দিন ওকে একটু গ'ড়ে পিটে তুল্‌তে হবে, নইলে বর পাব কেমন ক'রে? আহা ও হৈমবতীর জিনিষ—মা নেই, কেই বা শেখায়—সৎমা বোধহয় গঞ্জনা দেয়!

রবারের ক্যাম্বিশ জুতো প'রে, সর্ব্বাঙ্গে আলোয়ান ঢেকে ও কালো বড় চশ্‌মা প'রে দেওর-ঝিকে আস্‌তে দেখেই উপদেশ দিতে সুরু করলেন।

"ছিঃ মা, এত লাজুক হোলে কি চলে? তিনবার ঝি পাঠিয়ে তবে ঘর থেকে বেরোলে। এখনকার মেয়েরা বেশ চট্‌পটে হাসি খুসী হবে। এই দেখ না, আমার বকুল ফুলের মেয়ে সবে ষোলয় পড়েচে—এখন থেকেই সে পুরুষের সঙ্গে সমানে সমানে কথা বল্‌তে পারে—কেউ তাকে হার মানাতে পারে না। অবিশ্যি আমার প্রকাশ ওসব মেয়ে পছন্দ করে না, তবু আজকালকার সমাজ তো ঐ চায় মা। কাল সন্ধ্যে বেলা থেকে তুমি প্রকাশের কাছে একটু পড়াশুনো কর। ইংরিজি কি কিছুই জান না মা?"

অমিতা একটু ঘাড় নাড়ল, তা রাম কি গঙ্গা বোঝবার জো নেই। মাসী গলার সুর আরো কোমল ক'রে বল্লেন, "কেমন ক'রেই বা শিখ্‌বে—বাপ তো থাকে কাজে, মায়ের এতগুলি ছেলেপুলে। তা আমি তোমায় সব শেখাব মা। আহা তুমি আমার হৈমর মেয়ে—সে আমায় কত ভালবাস্‌তো।"

তারপর একটু চোখের জল মুছে নির্ব্বিকারচিত্ত অমিতার দিকে চেয়ে বল্‌লেন, "তোমার চোখে যে কালো চশ্‌মা, এ তো রোদ্দুরে পরে মা। তুমি তো সারাক্ষণই প'রে রোয়েচ—"

শ্রীউমা দেবী

অমিতা সমস্ত শরীরটাকে নাড়া দিয়ে মুখটাকে বিকৃত ক'রে বল্‌লে, "আমার চোখে ব্যামো আছে যে—"

"আহা ষাট ষাট, এখানে চিকিচ্ছে করলেই সেরে উঠ্‌বে। বাপ বুঝি কিছুই দেখত না? আর দেখ অমিতা, এই আলোয়ানটা এমন ক'রে মাথায় গায়ে জড়িও না। আমি বুড়োমানুষ আমিও তো একটু সুচ্ছিরি ক'রে গায়ে দিই। চুলটাকে পেটে পেড়ে পেছনে চাকৃতি ক'রে রেখে দাও; আজকালকার মেয়েরা কত ঢংএই চুল বাঁধে, সব দেখে দেখে শিখে নেবে। আমি কাল তোমায় বকুলফুলের বাড়ি নিয়ে যাব। তোমার জুতোও দেখ্‌ছি ভাল না— সকালে বিকেলে চটি পায়ে দেবে—বেরোতে হোলে নাগ্‌রা পরবে। সকালে উঠেই এই মকমকে গোলাপি রংএর শাড়ী পরেছ, প্রকাশ দেখ্‌লে দুঃখিত হোত। নেয়ে ধুয়ে একখানি নীলাম্বরী পোর। তুমি মনে মনে হাস্‌ছ মা— ভাব্‌ছ এই সেকেলে বুড়ী কি জানে? কিন্তু আমি সব জানি। ভগবান কোলে সন্তান দেন্‌নি—প্রকাশ ছেলের মত—ও বাইরে বাইরে ঘোরে; তোমাকে কদিন নেড়ে চেড়ে মেয়ের সাধ মেটাই—"

রান্নাঘরের দাসী-বামুনের ঝগ্‌ড়ার শব্দ শুনে তিনি তাড়াতাড়ি সেদিকে ছুটলেন। অমিতা উপদেশের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচ্‌লো।

অনেক রাত্রে সুপ্রকাশ বাড়ী এসে শুন্‌ল, অমিতার ঘর থেকে অত্যন্ত নাকি সুরে গান ভেসে আস্‌চে, "তুমি কাদের কুলের বউ"! তার সমস্ত মনটা বিষিয়ে উঠ্‌ল! হা কপাল, ও কি একটা ভাল গানও জানেনা?--

ওদের বাড়ীর পেছন দিকে একটু পোড়ো জমিতে সুপ্রকাশ নিজের হাতে বাগান করেছিল। রবিবার দিন শেষ রাত্রে হঠাৎ একটা দুঃস্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে গিয়ে প্রকাশ ভারী অস্বস্তি বোধ করল, ভাব্‌লে বাগানে একটু বেড়িয়ে মাথাটা ঠাণ্ডা ক'রে আসি। তখনো ভাল ক'রে আলো হয়নি, বাড়ীর দাসী চাকর কেউ ওঠেনি—কিন্তু বাগানে এসেই দেখ্‌লে শিউলি গাছের তলায় ব'সে কে ফুল কুড়োতে ব্যস্ত! মেয়েটি যে তাদেরই অমিতা একথা বিশ্বাস করতে তার ভাল লাগ্‌ল না। অথচ সে ছাড়া কেই বা হবে। ইতিমধ্যে তার স্নান সারা হোয়ে গিয়েছিল বোধ হয়, পিঠের ওপর একরাশ কালো চুল ছড়ানো, শুভ্র সুন্দর সুগোল হাতটি অনাবৃত—অন্ধকারে মুখ ভাল ক'রে না দেখা গেলেও তার প্রত্যেকটি রেখা অতি সুশ্রী ও কোমলতাময় মনে হচ্ছিল। সুপ্রকাশ অভিভূত হোয়ে দাঁড়িয়ে রইল। পাছে আলোর সঙ্গে সঙ্গে ও চ'লে যায়—আবার সেই কালো চশ্‌মা, সেই বেগুনী আলোয়ান, সেই রবারের জুতোয় নিজের শরীরটাকে সম্পূর্ণ কুশ্রী ক'রে সাম্‌নে এসে দেখা দিয়ে স্বপ্ন ভেঙে দেয়, এই মনে ক'রে সে যতক্ষণ পারে ওকে দেখে নিতে লাগ্‌ল। অমিতা গাছের চারিপাশে ঘুরে ঘুরে ফুল কুড়োচ্ছে, চলার সঙ্গে সঙ্গে মুখের দুই পাশের চুলগুলো দুলে দুলে উঠ্‌ছে আর গুণ গুণ ক'রে অত্যন্ত মিঠে গলায় গান গাইছে, "ওগো শেফালি বনের মনের কামনা—"

সুপ্রকাশের মনে হোল আজ স্বয়ং বনলক্ষ্মী তার নিজের হাতের রচিত বাগানটিতে নেমে এসেছেন। সে তন্ময় হোয়ে একটা হাস্‌নাহানার ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে রইল।

হঠাৎ "উঃ মা" শুনেই চম্‌কে উঠ্‌ল, দেখ্‌ল অমিতা ফুল কুড়োনো বন্ধ রেখে গাছের তলায় ব'সে পড়েছে। সে আর নিজেকে গোপন রাখ্‌তে পারলে না—দৌড়ে এসে তার সামনে দাঁড়িয়ে বল্লে, "কি হোয়েছে?"

অমিতা তাকে দেখে এম্‌নি চম্‌কে উঠ্‌ল যে, পারলে সে তক্ষুনি ছুটে পালাতো। কিন্তু সে শক্তি বোধ করি তার ছিল না—তার পা দিয়ে দর দর ক'রে রক্ত পড়ছিল।

সুপ্রকাশ ভয় পেয়ে বল্‌লে, "একি কেমন ক'রে কাটলেন?"—ও একটা বোতল ভাঙা মোটা কাচ দেখিয়ে দিল। আঘাতের স্থানটা পরীক্ষা করবার জন্যে প্রকাশ সেখানে ব'সে প'ড়ে বল্লে, "খুব deep হোয়েচে দেখছি! নিন্ নিন্ ছাড়ুন, আমাকে দয়া করে ধরতে দিন; টিপে না ধরলে রক্ত বন্ধ হবে না। এখুনি পরিষ্কার জলে ধুয়ে আইডিন দিতে হবে—কাচের কাটা সাংঘাতিক।"

অমিতা ঘাড় নেড়ে বল্লে, "কাজ নেই।—"

"কাজ নেই বইকি? কেন আপনার সেই রবারের জুতো কোথা গেল? খালি পায়ে কেউ এসব জায়গায় আসে? আসুন আমার কাঁধে ভর দিয়ে একটু দাঁড়াবার চেষ্টা করুন। এই পাশেই আমার লেখবার ঘর সেখানে সব আছে।"

অমিতাকে প্রকাশ একরকম জোর ক'রে টেনে এনে তার ঘরের বড় চেয়ারটার ওপর বসালো।

লজ্জাজড়িত সুরে অমিতা বল্লে, 'ছি, ছি, আপনাকে কি কষ্ট দিলুম"।

সুপ্রকাশ হেসে বল্লে, "এই যে কথা ফুটেছে দেখছি—সাধে কি কথা বলায়, ব্যথার চোটে কথা বলায়।" সে অতি যত্নে তার লক্ষ্মীঠাকরুণের মত কুসুমকোমল পা-খানি ধ'রে ধুয়ে ওষুধ লাগিয়ে দিল। যন্ত্রণায় যখন তার বড় বড় চোখ ফেটে জল আস্‌ছিল, আর লজ্জায় যখন তার সমস্ত মুখটা রঙিয়ে উঠছিল, প্রকাশ মনে মনে ভাবছিল, মাসীর দেওর-ঝির চোখ দুটো এমন চমৎকার জানলে কোনকালে চশ্‌মাটা টেনে ফেলে দিতুম!

ব্যাণ্ডেজ হোয়ে যেতেই অমিতা বল্লে, "আমি যাই,—এখুনি সবাই উঠে পড়বে। আপনার মাসী যদি দেখেন?"

"না না সে ভয় নেই, মাসীর পূজো আহ্নিক সারা হোতে ঢের দেরী। আপনি তাড়াতাড়ি করবেন না, আমি আপনাকে ধ'রে ধ'রে ঘর অবধি পৌঁছে দিয়ে আসি চলুন।

অমিতা বাধা দিল না—কারণ নিজে হেঁটে সিঁড়ি দিয়ে ওঠা এখন তার সাধ্যাতীত।

ঘর অবধি এসে সুপ্রকাশ তার কানের কাছে মুখ এনে বল্লে, "দোহাই আপনার! সেই কালো চশ্‌মা আর আলোয়ানটা আজ পরবেন না।"

অমিতার সমস্ত মুখটা রাঙা হোয়ে উঠ্‌ল।

৬

এমন একটি ভোরবেলা যেন সুপ্রকাশের জীবনে প্রথম এল। তার সমস্ত মনটা খুসী হোয়ে উঠল; কেবলি মনে হোতে লাগ্‌ল—আজ কি অঘটন ঘটবে, আজ সে নিজেকে কিছুতেই স্থির রাখতে পারবে না। আজ যেন তার জীবনের অনেকগুলো পাতা বাদ দিয়ে এক নতুন পরিচ্ছেদ সুরু হোল। মনে মনে বললে, "আজকের সকালের প্রথম আলোটির সঙ্গে সঙ্গে ওকে যে আমি ওর যথার্থ রূপে দেখলুম—তখনই ওকে আমার পাওয়া শুরু হয়েচে; আর কোনো বাধাকেই বাধা ব'লে মানব না।

নিজের মনে নানারকম কল্পনা করতে তার ভাল লাগল। অমিতার ফুল কুড়োবার সময় সেই হাতের বিশেষ ভঙ্গীটি, সকরুণ ব্যথাকাতর চাহনি ও লজ্জা জড়িত মুখের হাসিটি যেন তাকে এক স্বপ্নলোকে ভাসিয়ে নিয়ে চল্‌ল।

বেলা হোল। চাকরের কাছে স্নানের তাগাদা পেয়ে বাড়ীর ভিতর গিয়ে দেখ্‌লে মাসী অমিতার চুলগুলো নিয়ে নাড়া চাড়া করছেন, সাম্‌নে তেলের বাটি। বেচারী বোধ করি লজ্জায় বল্‌তে পারেনি তার স্নান পূর্ব্বেই সারা হোয়ে গেছে।

অমিতার সর্ব্বাঙ্গে সেই বেগুনী রং এর ধোসা আলোয়ানটি নেই বটে, কিন্তু সেই প্রকাণ্ড কালো চশ্‌মাটা তার সুন্দর মুখখানাকে কুশ্রী ক'রে রেখেছে।

সুপ্রকাশকে দেখেই ওর সমস্ত মুখখানা লাল হোয়ে উঠ্‌ল—কিন্তু আলোয়ানটি না থাকায় মুখ লুকোতে পারল না। মাসী বল্লেন, "হ্যাঁরে প্রকাশ, তোর কি হোয়েচে? চাকরকে দিয়ে নিজের ঘরে চা নিয়ে খেলি, সকাল থেকে একবারটি এলিনে? রাগ করেছিস্ বুঝি?"

সুপ্রকাশ অপ্রস্তুত হোয়ে বল্লে, "রাগ কেন করব? তোমার ছেলে যদি একটু কাজে মন দেয় তাও সইতে পার না—বেলা অবধি ঘুমতেও দাওনা। আজ সকালে উঠে এত এত খাতা দেখলুম। বেলা হোয়েচে তা টেরই পাইনি। আপনি কেমন আছেন?" সে দুষ্টুমি ভরা চোখে অমিতার দিকে চাইল।

অমিতা জবাব দিল না; মাসী বল্লেন, "ভাল আর কই, আজ আবার নাবার ঘরে প'ড়ে গিয়ে ভীষণ পা কেটেছেন! ভেবেছিলাম আজ তোর সঙ্গে ওকে চোখের ডাক্তারের কাছে পাঠাব, এখন এই খোঁড়া পা নিয়ে যাবেই বা কি ক'রে?"

দেবী

সুপ্রকাশ বল্লে, "চোখে আবার কি হল?"

"চোখে নাকি দোষ আছে, ওই কালো চশ্‌মাটা তাই প'রে থাক্‌তে হয়।"

"তা বেশ তো, এর পরে নিয়ে যাওয়া যাবে'খন। আমি না হয় তোমার দেওর-ঝির জন্যে আর একদিন কলেজ কামাই করব।"

মাসী প্রকাশকে অমিতার সম্বন্ধে এত ভাল মেজাজে কথা কইতে দেখে অবাক হোয়ে বল্লেন, "তা করিস, এখন যা চানটা সেরে আয়, আমি দেখি রান্নার কতদূর"— ছুটির দিনে তিনি বোনপোকে নিজে দুটো তরকারী রেঁধে খাওয়ান।

মাসী চ'লে যেতেই প্রকাশ বল্লে, "আপনার পা কেমন আছে?"

"ভালই।"

"ব্যথা করছেনা?"

"একটু একটু করছে।"

"বেশী হাঁটাহাঁটি না করাই ভাল।"

"করছি না ত।"

"মাসী যে চোখের অসুখ বল্‌ছিলেন, সত্যি কথা? চোখ দেখ্‌লে তো মনে হয় না কোনো দোষ আছে।"

"দোষ নেই।"

"সে তো আমি বুঝ্‌তেই পেরেছি, কিন্তু একটি জিনিষ বুঝ্‌তে পারছিনা। এই চশ্‌মা, এই বেগুনী আলোয়ান, এই রবারের জুতো, এই বুট—এই গেঁয়োভুত পানা, এই নিজেকে শত রকমে কুশ্রী করবার চেষ্টার মানে কি?"—

অমিতা কিছুক্ষণ কথা বল্লেনা—তারপরে খুব লজ্জাজড়িত নম্র সুরে বল্লে, "আপনি আমায় ক্ষমা করবেন, আমার অপরাধ হোয়েচে।"

সুপ্রকাশ অবাক হোয়ে তার দিকে চাইল। অমিতা বল্‌লে, "আমি একবারো ভাবিনি আমার দুষ্টুমিটা এতখানি হোয়ে উঠ্‌বে। বাবার কাছে জ্যেঠিমার একটা চিঠিতে দেখেছিলুম আপনি সুন্দরী শিক্ষিতা ও Up-to-date মেয়ে পছন্দ করেন না। আমার ভারী রাগ হোল—আজকালকার মেয়েদের কি সবই দোষ? আমি মনে মনে ঠিক করলুম কোলকাতায় গিয়ে জংলী কুশ্রী অশিক্ষিত সেজে আপনাকে খুব জব্দ করব। কিন্তু আরম্ভ ক'রে আর শেষ করতে পারছিলুম না। ভালই হোল আজ আপনা থেকে আমার সব দুষ্টুমি ধরা প'ড়ে গেল। এখন আমার একটি মাত্র ভয় আপনার মাসী আমায় কক্‌খনো ক্ষমা করবেন না।"

প্রকাশ উৎফুল্ল হোয়ে বল্লে, "নিশ্চয় করবেন, একশো বার করবেন। সব বলবার ভার আমায় দাও, তিনি নিশ্চয় তাঁর ছেলের দুষ্টু বউটিকে ক্ষমা না ক'রে পারবেন না।"

লজ্জায় আড়ষ্ট হোয়ে অমিতা বল্লে, "না, না, ছিঃ কি বল্‌ছেন।"

সুপ্রকাশ জোর ক'রে ওর চশ্‌মাটা খুলে দিয়ে মাসীকে বল্লে, "মাসি, এবার তোমার বউএর রূপটা একবার দেখে যাও।"

ইংরিজি গল্পের ছায়াবলম্বনে

রসের নিত্যতা

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত

শরৎচন্দ্রের ত্রিপঞ্চাশৎ জন্মতিথিতে কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউট্ হলে তাঁর সম্বর্দ্ধনা সভায় শরৎচন্দ্র যে অভিভাষণটি পাঠ করেন তার একস্থানে তিনি বলেছেন,—

"একথা সত্য ব'লেই বিশ্বাস করি যে,কোন দেশের কোন, সাহিত্যই কখনো নিত্য কালের হ'য়ে থাকে না। বিশ্বের সমস্ত সৃষ্ট বস্তুর মত এরও জন্ম আছে, পরিণতি আছে, বিনাশের ক্ষণ আছে। মানুষের মন ছাড়া ত সাহিত্যের দাঁড়াবার জায়গা নেই, মানবচিত্তেই তো তার আশ্রয়, তার সকল ঐশ্বর্য্য বিকশিত হ'য়ে ওঠে। সেই মানবচিত্তই যে এক স্থানে নিশ্চল হ'য়ে থাকৃতে পারে না। তার পরিবর্ত্তন আছে, বিবর্ত্তন আছে,—তার রসবোধ ও সৌন্দর্য্যবিচারের ধারার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। তাই এক যুগে যে মূল্য মানুষে খুসি হ'য়ে দেয়, আর এক যুগে তার অর্দ্ধেক দাম দিতেও তার কুণ্ঠার অবধি থাকে না।

সমগ্র মানব জীবনের কেন, ব্যক্তিবিশেষের জীবনেও দেখি এই নিয়ম বিদ্যমান। ছেলেবেলায় আমার ভবানী পাঠক ও হরিদাসের গুপ্ত কথাই ছিল একমাত্র সম্বল। তখন কত রস, কত আনন্দই যে এই দুখানি বই থেকে উপভোগ করেছি তার সীমা নেই। অথচ আজ সে আমার কাছে নীরস। কিন্তু এ গ্রন্থের অপরাধ, কি আমার বৃদ্ধত্বের অপরাধ বলা কঠিন।"

শরৎচন্দ্র যা বলেছেন সোজা কথায় অল্পের ভেতর তা বল্‌তে গেলে এই দাঁড়ায় যে, সাহিত্যের যা কিছু মূল্য তা মানুষের ভাল লাগে ব'লেই। যতক্ষণ কোন সাহিত্য মানুষের ভাল লাগে ততক্ষণই তার একটা মূল্য থাকে। যখনই তা মানুষের অপছন্দ হয় তখনই তার মূল্য চ'লে যায়, তার মৃত্যু ঘটে। মানুষের এই ভাল লাগা জিনিষটা নিত্য পরিবর্ত্তনশীল; আজ যা ভাল লাগে দশ বৎসর পরে আর তা ভাল লাগে না। সুতরাং মানুষের এই ভাল লাগার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যেরও পরিবর্ত্তন ঘটে। কোন সাহিত্যই অমর নয়, সবই ক্ষণস্থায়ী, পাঠকের ভাল লাগার উপরেই তার অস্তিত্ব নির্ভর করে। সেই ভাল লাগা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই তারও জীবনের শেষ হয়।

সাহিত্যসম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের এই মন্তব্য অনেকেই খুব একটা বড় সত্য ব'লে মেনে নিয়েছেন। কেউ কেউ এমন কথাও বল্‌ছেন যে, সাহিত্যের ধর্ম্মের এমন স্পষ্ট পরিচয় আর কারও কাছ থেকেই পাওয়া যায় নি।

আপাতদৃষ্টিতে শরৎচন্দ্রের এ কথাটা খুবই সত্য ব'লে মনে হয়। সত্যই ত যুগে যুগে মানুষের রসবোধের পরিবর্ত্তন হচ্ছে। এ যুগে যিনি সর্ব্বজনসমাদৃত লেখক, পরের যুগে সাহিত্যের আসরে তাঁর স্থান খুঁজে পাওয়াই হয়ত শক্ত হ'য়ে ওঠে। সাহিত্যের ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্তের ত অভাব নেই। এক সময় ইংরাজি সাহিত্যে পোপ ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী কবিসম্রাট। আজ সে সাহিত্যে পোপের স্থান কোথায়, কত নিম্নে! সাহিত্যের ইতিহাসের এ সমস্ত ঘটনা শরৎচন্দ্রের উক্তির সত্যতাই সপ্রমাণ করে ব'লে মনে হয়।

কিন্তু আর একটু ধীর ভাবে বিবেচনা করলে আমরা দেখ্‌তে পাব যে, সাহিত্যসম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের এ উক্তি কোন মতেই মেনে নেওয়া চলে না। তাঁর এ উক্তি যদি সত্য হয় ত সাহিত্যে সমালোচনার কোন স্থান থাকে না। শেলি বড় কবি, কি ব্রাউনিং বড় কবি,—বাংলা সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ কথা-সাহিত্যিক কে, নাট্যকার হিসাবে সেক্‌স্‌পিয়ার ও ইব্‌সেন-এর মধ্যে কার স্থান ঊর্দ্ধে, এ সমস্ত তর্ক আলোচনা সম্পূর্ণ নিরর্থক হ'য়ে পড়ে। এক এক যুগে এক এক সাহিত্য ভাল লাগে, তাতে ক'রে মানুষের রসবোধের পরিবর্ত্তনশীলতা বাদে আর কিছুই প্রমাণ হয় না। এক কালে দাশু রায়ের কবিতা বাঙালীর খুব প্রিয় ছিল, আজ কেউ তাঁর নামও

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত

করে না, সমস্ত দেশটা রবীন্দ্রনাথের কবিতা নিয়ে মেতে আছে। শরৎচন্দ্রের উক্তি সত্য হ'লে এতে ক'রে শুধু এই প্রমাণ হয় যে, বাঙালীর রসবোধের পরিবর্ত্তন হয়েছে; দাশু রায়ের লেখারও দোষ দেওয়া যায় না, রবীন্দ্রনাথেরও প্রশংসা করা চলে না। রবীন্দ্রনাথ যে দাশু রায়ের চেয়ে বড় কবি এ কথাও বলা যায় না। এক কালে দাশু রায় ভাল লাগত, আজ রবীন্দ্রনাথ ভাল লাগছে, আবার হয়ত' এমন দিন আসবে যখন লোকের রবীন্দ্রকাব্য ভাল লাগ্‌বে না। এতে কারই দোষ নেই, দোষ শুধু মানুষের ভাল লাগার এই অহৈতুক পরিবর্ত্তনের। এক যুগের মানুষের সাহিত্যবোধের সঙ্গে অন্য যুগের মানুষের সাহিত্যবোধের বিরোধ ঘটলে যদি কোন যুগের সাহিত্যবোধকেই দোষ দেওয়া না যায় ত, এক জন মানুষের সাহিত্যবিচারের সঙ্গে অন্য এক জন মানুষের সাহিত্যবিচারের অনৈক্য ঘটলেই বা কোন এক জনের সাহিত্যবিচারকে ভুল বলা চলে কি ক'রে? শরৎচন্দ্রের উক্তি সত্য হ'লে সাহিত্যের বিচারে ব্যক্তি বিশেষের মতামতে নিরপেক্ষ কোন সত্য থাক্‌তে পারে না। আরও একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে।—এ কথা যদি সত্য হয় যে যুগে যুগে মানুষের রসবোধের অহৈতুক পরিবর্ত্তন হচ্ছে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের পরিবর্ত্তন চলেছে, এক যুগের সাহিত্য অন্যযুগে অচল, সে জন্যে কোন যুগের সাহিত্যকেই নিন্দা বা প্রশংসা করা চলে না—তা হলে আজ বাঙ্গালীর রসবোধের পরিবর্ত্তন হয়ে শরৎচন্দ্রের লেখা তার ভাল লেগেছে তাতে শরৎচন্দ্রের বাহাদুরী কোথায়! আজ তাঁর লেখা ভাল না লেগে অন্য যে কোন সাহিত্যিকের লেখা ভাল লাগতে পার্‌ত। এর জন্য দায়ী আমাদের রসবোধের অহেতুক পরিবর্ত্তন, সুতরাং শরৎচন্দ্রকে আমরা সম্বর্দ্ধনা কর্ত্তে যাব কেন? শরৎচন্দ্রের এ উক্তিকে সত্য বলে মেনে নেওয়া মানে রসের অস্তিত্বই অস্বীকার করা; সমস্ত রস বস্তুটাকে subjective, individualistic ব'লে প্রচার করা। রস যদি subjective individualistic হয়, ব্যক্তিগত ভাল লাগা মন্দ লাগার উপরেই যদি রসের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ নির্ভর করে, ত এই বিরাট বিশ্বসাহিত্যের কোনো মূল্যই থাকে না। অবশ্য একথা ঠিক যে, উপভোগের জন্যেই রস, উপভোগের মধ্যেই রসের সার্থকতা। তাই ব'লে রস subjective নয়। Hegel প্রমুখ দার্শনিকগণ নিঃসন্দেহ প্রমাণ করেছেন যে, এই দৃশ্যমান বাহ্য জগতের অস্তিত্ব দেখার উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর করে; তা থেকে এ সিদ্ধান্তে তাঁরা উপনিত হন নি যে, এই দৃশ্যমান জগৎ সম্পূর্ণ subjective, এর সত্যিকারের কোন অস্তিত্ব নেই। ঠিক সেই রকম উপভোগের উপরেই রসের অস্তিত্ব নির্ভর করলেও তার একটা সত্যিকারের অস্তিত্ব আছে; ব্যক্তিগত বা কোন যুগ বিশেষের ভাল লাগা মন্দ লাগাতেই সে অস্তিত্ব সম্পূর্ণ পর্য্যবসিত নয়।

একথা খুবই ঠিক্ যে, যুগে যুগে মানুষের রসবোধের পরিবর্ত্তন হচ্ছে; এটা ঐতিহাসিক সত্য, একে অস্বীকার করা চলে না; কিন্তু সে পরিবর্ত্তন অহেতুক খামখেয়ালী পরিবর্ত্তন নয়—সে পরিবর্ত্তন হচ্ছে বিকাশ। যুগে যুগে মানুষের রসোপলব্ধির ক্রমবিকাশ হচ্ছে; যতই যুগের পর যুগ কেটে যাচ্ছে মানুষের রসবোধ ততই সূক্ষ্মতর, গভীরতর, ব্যাপকতর হচ্ছে। তাই এক যুগের ভাল লাগার মধ্যে যে টুকু খাঁটি রসবোধ সে টুকু পরবর্ত্তী যুগের ভাল লাগার মধ্যে থেকে যায়, আর যে টুকু ঝুটা সেই টুকুই বাদ পড়ে। এই জন্যেই দাশু রায়ের লেখা ম'রে গেলেও "চণ্ডীদাসের বৈষ্ণব পদাবলী আজও আছে, কালীদাসের শকুন্তলা আজও তেমনি জীবন্ত।" এই জন্যেই "এক যুগে যে মূল্য মানুষ খুসি হয়ে দেয়, আর এক যুগে তার অর্দ্ধেক দাম দিতেও তার কুণ্ঠার অবধি থাকে না।"

যথার্থ রস-সাহিত্য অমর, তার কখনও মৃত্যু নেই। সব যুগের মানুষ সব সময়ে তার একই দাম নাও দিতে পারে এই পর্য্যন্ত। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে যদি যথার্থ রস থাকে ত তা চিরকাল অমর হয়ে থাক্‌বে। যদি কখনও তাঁর চেয়েও বড় কবি আমাদের দেশে জন্মায় তখন সে কবির কাব্যের সঙ্গে তুলনায় আজ আমরা রবীন্দ্রকাব্যের যে মূল্য দিচ্ছি ততটা মূল্য দিতে হয়ত কুণ্ঠিত হব। তাই ব'লে সে কাব্যের কখনও বিনাশ হবে না।

শিলঙে দুর্গোৎসব

শ্রীভূপেন্দ্রচন্দ্র লাহিড়ী

দুর্গাপূজাকে দুর্গোৎসব নাম না দিয়া শারদোৎসব নাম দিলে দেখা যায় যে, তাহা হিমালয় হইতে আরম্ভ করিয়া কুমারিকা পর্য্যন্ত হিন্দুভারতের সর্ব্বত্রই কোনও না কোনও নামে প্রচলিত আছে,—তাহা বাঙ্গলার দুর্গাপূজাই হউক, যুক্তপ্রদেশের ও পাঞ্জাবের রামলীলাই হউক, আর দাক্ষিণাত্যের দশরা অথবা বোম্বাই ও গুজরাটের নবরাত্রিই হউক; কিন্তু দুর্গার সিংহবাহিনী, মহিষমর্দ্দিনী, দশভুজা প্রতিমার পূজা বাঙ্গলার একান্ত নিজস্ব। আর বাঙ্গলার বাহিরে এই পূজার প্রচার এবং প্রচলন, বাঙ্গলার বাহিরে বাঙ্গালীর 'কালচারের' জয়যাত্রার দৃষ্টান্ত।

বাঙ্গালী লাহোর হইতে রেঙ্গুন পর্য্যন্ত বাঙ্গলার বাহিরে যেখানেই গিয়াছে, সেখানেই তাহার এই প্রিয় উৎসবটির প্রতিষ্ঠা করিয়াছে; কিন্তু সর্ব্বত্র ইহার প্রচার করিতে পারে নাই। বাঙ্গলার বাহিরে তিনটি প্রদেশে কিন্তু বাঙ্গালীর এই প্রকাণ্ড নিজস্ব উৎসবটি তাহার নিজস্ব রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে,—এই তিনটি প্রদেশ, বাঙ্গলার উত্তরে নেপাল, পূর্ব্বে আসাম এবং দক্ষিণ পশ্চিমে উড়িষ্যা।

শিলঙে বাঙ্গালী, আসামী ও নেপালীদের দুর্গোৎসব পাশাপাশি দেখা গেল। সব কয়টি উৎসব মূলতঃ এক হইলেও তাহার মধ্যে বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন সাধনা, সভ্যতা, পারিপার্শ্বিক ও সামাজিক রীতি নীতির ধারা ফুটিয়া উঠিয়াছে। বাঙ্গালীর পূজার মধ্যে বাঙ্গালার সেই চিরন্তন বেদনাটুকু,—অল্পবয়সে বিবাহিতা কন্যাকে শ্বশুরবাড়ী-প্রেরণের ব্যথা, উমার জন্য গিরিরাজের দুঃখ বাপ মায়ের স্নেহার্ত্ত হৃদয়ের করুণ রসে অভিষিক্ত হইয়া দেখা দেয়। আসামীদের পূজা জীববলিহীন পূজা; শঙ্করদেবের জন্মভূমি ও প্রচারক্ষেত্র আসাম বাঙ্গলার এই অনুষ্ঠানটিকে বৈষ্ণবী ভক্তির উৎসে স্নান করাইয়া আপনার নিজস্ব সাধনা ও চিন্তাধারার উপযোগী করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছে।

নেপালীদের দুর্গাপূজা এই উভয় পূজা হইতেই পৃথক। শিলাময় পার্ব্বত্য দেশে মৃৎপ্রতিমা প্রস্তুত করা কঠিন। সেজন্য নেপালীদের পূজায় বৃহৎ মৃৎপ্রতিমা প্রস্তুত করা হয় না, তাহার স্থানে ক্ষুদ্র স্বর্ণপ্রতিমার পূজা করা হয়। কিন্তু নেপালীদের পূজার সঙ্গে আসামী ও বাঙ্গালীদের পূজার পার্থক্য শুধু বাহিরের পার্থক্য নয়; তাহা অন্তরের পার্থক্যও বটে। এখানে বাঙ্গালীর স্নেহবিগলিত হৃদয়ের করুণ রসের প্রবাহ নাই, আসামী বৈষ্ণবী ভক্তির মধুর ধারা নাই; আছে যুদ্ধপ্রিয় পার্ব্বত্য জাতির সমরসাধনার অভিব্যক্তি।

কিন্তু শুধু পার্থক্যই চোখে পড়ে না, সাদৃশ্যও চোখে না পড়িয়া যায় না। সব প্রদেশের পূজাতেই সেই একই ধূপ দীপ, পঞ্চপ্রদীপ, আমান্ন, নৈবেদ্য দিয়া ষোড়শোপচারে শরতের শুক্লা সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী তিথিতে দেবীর আরাধনা আর সর্ব্বত্রই দেবীভাগবত ও চণ্ডীপাঠ। এই সকল অনুষ্ঠানই যে মূলতঃ এক, একই স্থান হইতে উদ্ভূত, একই শাস্ত্র হইতে প্রচারিত তাহাতে লেশমাত্রও সন্দেহ থাকে না। এককালে বাঙ্গলার কালচার, বাঙ্গলার বৈষ্ণব ধর্ম্ম ও শক্তি-উপাসনা কেমন করিয়া বাঙ্গলার বাহিরে প্রচারিত হইয়া এক বৃহত্তর বঙ্গের সৃষ্টি করিয়াছিল, আজও তাহা ধীরে ধীরে বিস্তৃত হইতেছে, তাহা দুর্গম গিরিপর্ব্বত, শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যের বাধা ও ব্যবধান মানে নাই, সভ্যতার স্তরভেদ, বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন অবস্থান ও জীবনযাত্রাপ্রণালী তাহার গতিরোধ করিতে পারে নাই,—একথা ভাবিয়া আনন্দ ও গৌরব বোধ না করিয়া থাকা যায় না।

শিলং সহরে মোট আটখানা পূজা হয়। ইহার মধ্যে একখানা গুর্খাদের, একখানা থানার বাঙ্গালী আসামী ও নেপালী কর্ম্মচারীরা মিলিয়া করিয়া থাকেন; আর বাকি ছয় খানার মধ্যে তিনখানা বাঙ্গালী অধিবাসীদের এবং

শ্রীভূপেন্দ্রচন্দ্র লাহিড়ী

তিনখানা আসামী অধিবাসীদের। মোটামুটি, সহরের প্রত্যেক অংশের অধিবাসীরাই একত্র হইয়া চাঁদা তুলিয়া বৎসারান্তে এই উৎসবটির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন।

শিলং সহরে নেপালীর সংখ্যা প্রায় আট দশ হাজার হইবে। দুইটি গুর্খা ব্যাটালিয়ান এখানে স্থায়ীভাবে বাস করে। তাহাদের পরিবার পরিজন লইয়া সহরের এক অংশে একটি নেপালী পাড়া গড়িয়া উঠিয়াছে। তাহাকে 'পল্টন' বলে। গুর্খাদের দুর্গোৎসব এই পল্টনে সৈন্যদের বারিকের পাশে গুর্খা সৈন্যদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়। বাঙ্গালী হিন্দুদের

গুর্খাদের মহিষ-বলি

মত গুর্খাদেরও দুর্গাপূজা প্রধান জাতীয় উৎসব। সেজন্য পূজার কয়দিন সমস্ত গুর্খাপল্লী উৎসবসজ্জায় সজ্জিত হইয়া উঠে। পাড়ার মধ্যে স্থানে স্থানে পাহাড়ের উপর চারখানা করিয়া বাঁশ পুঁতিয়া তাহার সঙ্গে দড়ি ঝুলাইয়া দোলনা প্রস্তুত হয় এবং গুর্খারা স্ত্রী-পুরুষ বালক-বালিকা নির্ব্বিশেষে এই দোলনায় দোল খাইতে থাকে, সারাদিনের মধ্যে দোলনাগুলিতে লোক-সমাগমের বিরাম নাই। পল্টনের মধ্যে একটি অনুচ্চ পাহাড়ের উপর গুর্খাদের রঙ্গমঞ্চ নির্ম্মিত হয়। রঙ্গমঞ্চটি আধুনিক সিন্ ও সজ্জিত করা হয় এবং ইলেকট্রিক লাইটে আলোকিত হয়। পূজার কয়দিন প্রতি রাত্রে এখানে নেপালীরা নিজেদের ভাষায় তাহাদের নাটক অভিনয় করে।

সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী তিন দিনই গুর্খাদের পূজা অনুষ্ঠিত হইলেও, নবমীর পূজাই উল্লেখযোগ্য। সপ্তমীর দিন দিবাভাগে যথারীতি পূজা ও বলি হয়। অষ্টমীর দিন দিনে পূজা নাই—সারাদিন ধরিয়া নেপালী পুরোহিতেরা চণ্ডী ও দেবী ভাগবত পাঠ করেন; রাত্রে অষ্টমী ও নবমীর সন্ধিক্ষণে পূজা ও বলি হয়।

নেপালীদের নবমীর পূজা ও বলি শিলং সহরের এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই জন্য পূজামণ্ডপের সম্মুখে বিস্তৃত-প্রান্তরে যূপকাষ্ঠ পুঁতিয়া তাহার পাশে নিমন্ত্রিত লোকদিগের বসিবার জন্য প্রকাণ্ড মঞ্চ প্রস্তুত হয়। শিলং সহরের ইংরাজ, বাঙ্গালী, আসামী সকল শ্রেণীর লোক নিমন্ত্রিত হইয়া বলি দেখিবার জন্য উপস্থিত হন। স্থানীয় আবালবৃদ্ধ বনিতা বলি দেখিবার জন্য সমবেত হয়। সৈন্য বিভাগের সমস্ত ইংরাজ কর্ম্মচারীরা এই উৎসবে যোগদান করেন।

নেপালীদের যূপকাষ্ঠ বাঙ্গলার যূপকাষ্ঠ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। নেপালীদের যূপকাষ্ঠকে মৌলা বলে। মৌলা একখানা চতুষ্কোণ সরল কাঠ; উঁচুতে প্রায় ছয় হাত হইবে। কাঠখানার গায়ে বন্দুক, কুকরি এবং অন্যান্য অস্ত্র খোদাই করিয়া অঙ্কিত। কাঠখানা খাড়া করিয়া মাটিতে পুঁতিয়া রাখা হয়। কাঠখানার নীচে প্রায় ভূমিসংলগ্ন স্থানে একটি ছিদ্র। বলির পশুটিকে কাঠের সামনে আনিয়া তাহার গলার দড়ি মাথার উপর দিয়া টানিয়া লইয়া এই ছিদ্রের মধ্য দিয়া ঢুকাইয়া শক্ত করিয়া ধরিলেই পশুর মাথা হেঁট হইয়া কাঠখানার গোড়ায় সংলগ্ন হইয়া যায়। পিছন হইতে কয়েকজন লোক পশুটির পা ধরিয়া থাকে। এইভাবে বলি সমাধা হয়।

নবমীর দিন বাইশটি মহিষ ও অসংখ্য ছাগাদি বলি দেওয়া হয়। বলির জন্য প্রস্তুত ভূমির পার্শ্বে একদল গুর্খাসৈন্য বন্দুকহস্তে দাঁড়াইয়া যায়। তাহাদের পার্শ্বে গুর্খাদের সামরিক ব্যাণ্ড বাদ্য বাজিতে থাকে। চারিদিকে মেসিন-গান ও কামান স্থাপিত হয়। দুই তিন জন গুর্খা মিলিয়া একটি মহিষকে বলির ভূমিতে লইয়া আসে। তাহাকে যূপকাষ্ঠে লাগান হয়। ভীত পশুগুলিকে যূপকাষ্ঠের নিকট লইয়া যাইতে অনেক সময়ই খুব বেগ পাইতে হয়। পশুটিকে যূপকাষ্ঠের সঙ্গে লাগান হইলে ঘাতক দেবীর নিকট উৎসর্গীকৃত প্রকাণ্ড একখানা কুকরি লইয়া আসিয়া উপস্থিত হয়; পুরোহিত আসিয়া পশুর মস্তকে জল ও নির্ম্মাল্যের ফুল ছিটাইয়া দেন। এই সময় প্রায় পঞ্চাশটি বন্দুক একসঙ্গে গর্জ্জিয়া উঠে এবং সামরিক বাজনা বাজিয়া উঠে; সঙ্গে সঙ্গেই ঘাতকের খড়্গ পশুর মস্তককে দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলে।

গুর্খাদের পূজার সঙ্গে তাহাদের সামরিক জীবনের কতগুলি প্রথা মিলিয়া এক অদ্ভুত অনুষ্ঠানের সৃষ্টি হইয়াছে। গুর্খাদের পূজা দেখিতে গিয়া এই কথাটাই সব চেয়ে বেশী করিয়া চোখে পড়ে।

থানার পুলিশ কর্ম্মচারীদের পূজাটিকে এখানকার সার্ব্বজনীন পূজা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। থানার ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারীরা প্রায় সকলেই বাঙ্গালী অথবা আসামী। কনেষ্টবলেরা হয় হিন্দুস্থানী নয় নেপালী। বিশেষত রিজার্ভ পুলিশ প্রায় সবই নেপালী। থানার পূজাটি এই সকল শ্রেণীর কর্ম্মচারীর উদ্যোগে নির্ব্বাহিত হয়। বাঙ্গালী পুরোহিত, হিন্দুস্থানী তন্ত্রকার, অভিনব দৃশ্য। পূজামণ্ডপের সামনে বৃহৎ ঘরের মধ্যে গুর্খাদের নাচ গান ও সং চলিতেছে। গুর্খাবাদকেরা তাহাদের ছোট ছোট ঢোল বাজাইতেছে। সেখানে গুর্খা নরনারী ও শিশু আসিয়া ভিড় করিতেছে। পূজামণ্ডপের সামনে গুর্খাদের 'মৌলা' স্থাপিত হইয়াছে। আসামী ও বাঙ্গালী কর্ম্মচারীরা সমস্ত তত্ত্বাবধান করিতেছেন এবং সমাগত লোকদিগকে অভ্যর্থনা করিতেছেন। হিন্দুস্থানীরা পূজার উদ্যোগ আয়োজনে ব্যস্ত আছে।

বাঙ্গালীদের পূজার মধ্যে জেলরোডের পূজাই সব চেয়ে প্রাচীন। ওই পূজা প্রায় কুড়ি বৎসর হইল চলিয়া আসিতেছে। শিলং সহরের এই অংশের অধিবাসীরা একটি স্থায়ী ঠাকুরবাড়ী নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। এই ঠাকুরবাড়ীতে দুর্গাপূজা ও বারোমাসের তেরো পার্ব্বণ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। জেলরোডের ঠাকুরবাড়ী ব্যতীত, শিলংএর বৃহৎ বাঙ্গালী পল্লী লাবানেও একটি হরিসভাগৃহ আছে। এখানে লাবানের বাঙ্গালী অধিবাসীরা একটি পূজা অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। এতদ্ভিন্ন পুলিশবাজারের নিকটবর্ত্তী অপেরা-হাউস নামক গৃহেও বাঙ্গালীরা একটি পূজা করিয়া থাকেন।

আসামীদের পূজার মধ্যে লাবানের পূজাই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আসামীদের পূজার বলি নাই। এতদ্ব্যতীত সাজে সজ্জায় ক্রিয়াকর্ম্মে অনুষ্ঠানে বাঙ্গালী-পূজার সঙ্গে কোথাও পার্থক্য নাই। আসামীদের পূজার সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য আসামীদের ঢাক। বাঙ্গলার ঢাকবাদকেরা ঢাকটিকে একপাশে প্রায় পিঠের উপর লইয়া বাজায়। আসামী ঢাকবাদকেরা ঠিক অত বড় ঢাকটিকে ঢোলকের মত শরীরের সম্মুখে ঝুলাইয়া বাজায়। এইজন্য, ও হাত দিয়া বাজানের ফলে আসামী-ঢাকের বাদ্য বাঙ্গলার ঢাকের মত অত গম্ভীর ও উচ্চ হয় না।

শিলঙে দুর্গোৎসব

শ্রীভূপেন্দ্রচন্দ্র লাহিড়ী

বিজয়া দশমীর দিন শিলং সহরের সমস্ত প্রতিমা পুলিশবাজারের মোড়ে আসাম কাউন্সিল হাউসের সম্মুখে চৌরাস্তার উপর শোভাযাত্রা করিয়া লইয়া আসা হয়। সহরের সমস্ত লোক, বাঙ্গালী, আসামী, খাসিয়া নরনারী এইস্থানে আসিয়া সমবেত হয়। বাঙ্গালীদের ও আসামীদের প্রতিমার সঙ্গে সঙ্কীর্ত্তন এবং পুলিশদের পূজার সঙ্গে হিন্দুস্থানীদের ভজন ও গুর্খাদের নাচগান চলিতে থাকে। ক্রমে সমস্ত প্রতিমা একত্র জড় হইলে প্রতিমাগুলি লইয়া এক বিরাট শোভাযাত্রা সহরের নিম্নে উমউখরা নামক 'কুরুঙ্গ'টির (ছোট পার্ব্বত্য সরিৎ) তীরে উপস্থিত হয়। সেখানে একটি উচ্চ পাহাড়ের নীচে আটখানা প্রতিমা এক সারিতে বসানো হয়। নির্জ্জন পাহাড়, নীরব বনস্থলী, ব্যাণ্ড বাদ্য, ঢাকের শব্দে 'দুর্গামাইকি জয়' রবে মুখরিত হইয়া উঠে। পশ্চাতে অন্ধকারে বনানী লইয়া পাহাড়টি দাঁড়াইয়া আছে, সম্মুখে আলোকমালাসজ্জিত আটখানি প্রতিমা এক সরিতে স্থাপিত হইয়াছে;—এ দৃশ্য যেন ছবির মত সুন্দর।

প্রতিমা-বিসর্জ্জনের পর আলিঙ্গন ও প্রীতি-সম্ভাষণ। এ দৃশ্য বাঙ্গালারই মত, তবে বোধহয় শিলং বাঙ্গালীর পক্ষে প্রবাসস্থান বলিয়া অনুষ্ঠানটি একটু বেশী করুণ ও আন্তরিক। কেহ হয়ত পূজার ছুটিতে বাড়ী ছাড়িয়া বিদেশে বেড়াইতে আসিয়াছে—আজকার দিনে গৃহের কথা মনে পড়িয়া যায়; কেহ হয়ত চাকরী অথবা ব্যবসা উপলক্ষে এদেশে বাস করিতেছে—পূজার ছুটিতে গৃহে যাইতে পারে নাই; আজকার দিনে এই শত সহস্র লোকের মধ্যেও নিজকে বিশেষ করিয়া একাকী ও নিঃসঙ্গ বোধহয়। কাহারও বিগত শোক উছলিয়া ওঠে; কাহারও অতীত সুখের স্মৃতি বর্ত্তমানের আনন্দকে বিস্বাদ করিয়া তোলে। এমনি করিয়া শিলংএ দুর্গোৎসবের অবসান হয়, বাঙ্গালীর এই জাতীয় উৎসবের উপর একবৎসরের জন্য যবনিকার পতন হয়।

কবীর

শ্রীকান্তিচন্দ্র ঘোষ

অমিয় রস যেথা ক্ষরিছে চারিধার
আকাশ ভেদি উঠে শবদ অনিবার,
সাগরে বুকে টেনে তটিনী কূল ছায়—
সে-লোক কথা কিগো বাখানি বলা যায়!
সুরয নাহি চাঁদ তারকা-ভাতি নাহি
রাতি না জাগি রহে প্রভাত মুখ চাহি;
বাঁশরী-ধ্বনি সনে বীণার মৃদু সুর—
অনাদি বাণী কার বাজে সে সুর-পুর!
অযুত প্রভা সেথা জ্বলিছে ঝলমল
বরষা বিনা ধারা ঝরিছে অবিরল;
কবীর কহে আজি গোপন কথা তার—
বিরল কেহ বুঝে—বুঝিবে কেবা আর—
জানে সে গেছে যেই উৎস পরপার
জনম-মরণের— সে নাহি ফিরে আর!

যাত্রা আরম্ভ হয়। জগৎ নাই, কেহ নাই- শুধু অপু আছে, আর নীলমণি হাজরার যাত্রার দল আছে সামনে। বাকী সব লুপ্ত। সন্ধ্যার আগে বেহালায় ইমন্ আলাপ করে। ভাল বেহালাদার, পাড়াগাঁয়ের ছেলে কখন সে ভাল জিনিস শোনে না,—উদাস করুণ সুরে হঠাৎ মন কেমন করিয়া উঠে···মনে হয় বাবা এখনও বসিয়া বসিয়া বাড়ীতে সেই কি লিখিতেছে—দিদি আসিতে চাহিয়াও আসিতে পারে নাই। প্রথম যখন জরির সাজ পোষাক পরিয়া টাঙানো ঝাড় ও কড়ির ডুমের আলো-সজ্জিত আসরে রাজা মন্ত্রীর দল আসিতে আরম্ভ করে, অপু মনে ভাবে এমন সব জিনিস তাহার বাবা দেখিল না!... সবাই তো আসরে আসিয়াছে, গ্রামের, তাহাদের পাড়ার কোনও লোক তো বাকী নাই। বাবা কেন আসিল না? পালা দ্রুত অগ্রসর হইতে থাকে। সে বার সে বালক কীর্ত্তনের দলের যাত্রা শুনিয়াছিল—সে কি, আর এ কি!... কি সব সাজ! কি সব চেহারা!···হঠাৎ পিছন হইতে কে বলে—খোকা বেশ দেখ্তে পাচ্ছ তো?...তাহার বাবা আসিয়াছে!...কখন আসিয়া আসরে বসিয়াছে—অপু বাবার দিকে ফিরিয়া বলে—বাবা দিদি?···তাহার বাবা ঘাড় নাড়িয়া জানায় আসিয়াছে।

মন্ত্রীর গুপ্ত ষড়যন্ত্রে যখন রাজা রাজ্যচ্যুত হইয়া স্ত্রীপুত্র লইয়া বনে চলিতেছেন, তখন কাঁদুনে সুরে বেহালার সঙ্গত হয়। তারপর রাজা করুণ রস বহুক্ষণ জমাইয়া রাখিবার জন্য স্ত্রীপুত্রের হাত ধরিয়া এক এক পা করিয়া থামেন, আর এক এক পা অগ্রসর হইতে থাকেন, সত্যিকার জগতে কোনো বনবাস গমনোদ্যত রাজা নিতান্ত অপ্রকৃতিস্থ না হইলে এক দল লোকের সম্মুখে সেরূপ করে না। বিশ্বস্ত রাজসেনাপতি রাগে এমন কাঁপেন যে, মৃগীরোগগ্রস্ত রোগীর পক্ষেও তাহা হিংসার বিষয় হইবার কথা। অপু অপলক চোখে চাহিয়া বসিয়া থাকে, মুগ্ধ, বিস্মিত হইয়া যায়। এমন তো সে কখনো দেখে নাই!

তারপর কোথায় চলিয়া গিয়াছেন রাজা, কোথায় গিয়াছেন রাণী।...ঘন নিবিড় বনে শুধু রাজপুত্র অজয় ও রাজকুমারী ইন্দুলেখা ভাইবোনে ঘুরিয়া বেড়ায়। কেউ নাই যে তাহাদের মুখের দিকে চায়, কেউ নাই যে নির্জ্জন বনে তাহাদের পথ দেখাইয়া লইয়া চলে। ছোট ভাইয়ের জন্য ফল আনিতে একটু দূরে চলিয়া যাইয়া ইন্দুলেখা আর ফেরে না। অজয় বনের মধ্যে বোন্‌কে খুঁজিয়া বেড়ায়—তাহার পর নদীর ধারে হঠাৎ খুঁজিয়া পায় ইন্দুলেখার মৃতদেহ—ক্ষুধার তাড়নায় বিষফল খাইয়া সে মরিয়া গিয়াছে। অজয়ের করুণ গান—"কোথা

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ছেড়ে গেলি এ বন কান্তারে প্রাণ প্রিয় প্রাণ সাথী রে”—শুনিয়া অপু এতক্ষণ মুগ্ধ চোখে চাহিয়াছিল—আর থাকিতে পারে না, ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদে। ইন্দুলেখা যেন ঠিক তার দিদি। দিদিকে ও অবস্থায় কল্পনা করিয়া অপুর বুকের মধ্যে হুহু করিয়া উঠে।...কলিঙ্গরাজের সহিত বিচিত্রকেতুর যুদ্ধে তলোয়ার খেলা কী!...যায়, বুঝি ঝাড়গুলা গুঁড়া হয়, নয় তা কোনো হতভাগ্য দর্শকের চোখ দুটি বা যায়! রব ওঠে—ঝাড় সাম্‌লে—ঝাড় সাম্‌লে!...কিন্তু অদ্ভুত যুদ্ধকৌশল—সব বাঁচাইয়া চলে—ধন্য বিচিত্রকেতু!

মধ্যে অনেকক্ষণ ধরিয়া জুড়ির দীর্ঘ গান ও বেহালার কসরৎএর সময় অপুকে তাহার বাবা ডাকিয়া বলে—ঘুম পাচ্ছে—বাড়ী যাবে খোকা?...ঘুম! সর্ব্বনাশ!...সে বাড়ী যাইবে না, বাবা যাইতে পারে। বাহিরে ডাকিয়া লইয়া তাহার বাবা তাহাকে দুইটি পয়সা দেয়। অপুর ইচ্ছা হয় সে একপয়সার পান কিনিয়া খাইবে, পানের দোকানের কাছে অত্যন্ত কিসের ভিড় দেখিয়া অগ্রসর হইয়া দেখে অবাক্! সেনাপতি বিচিত্রকেতু হাতিয়ারবন্দ অবস্থায় বিড়ি কিনিয়া খাইতেছেন—তাঁহাকে ঘিরিয়া রথযাত্রার ভিড়। আশ্চর্য্যের উপর আশ্চর্য্য!...রাজকুমার অজয় কোথা হইতে আসিয়া বিচিত্রকেতুর কনুইএ হাত দিয়া বলিল—একপয়সার পান খাওয়াও না কিশোরী-দা?...রাজপুত্রের প্রতি সেনাপতির বিশ্বস্ততার কোনো নিদর্শন দেখা গেল না—হাত ঝাড়া দিয়া বলিল—যাঃ, অত পয়সা নেই—ওবেলা সাবান খানা যে দুজনে মাখ্‌লে—আমাকে কি বলেছিলে? রাজপুত্র পুনরায় বলিল—খাওয়াও না কিশোরী দা? আমি বুঝি কখনো—বিচিত্রকেতু হাত ছাড়াইয়া চলিয়া গেল।

অজয় অপুরই সমবয়সী হইবে। টুকটুকে, বেশ দেখিতে, গানের গলা বড় সুন্দর। অপু মুগ্ধ হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া থাকে—বড় ইচ্ছা হয় আলাপ করিতে। হঠাৎ সে কিসের টানে সাহসী হইয়া আগাইয়া যায়—একটু লজ্জার সঙ্গে বলে—পান খাবে?...অজয় একটু অবাক্ হয়, বলে—তুমি খাওয়াবে? নিয়ে এস না। দুজনে ভাব হইয়া যায়। ভাব বলিলে ভুল হয়। অপু মুগ্ধ, অভিভূত হইয়া যায়! ইহাকেই সে এতদিন মনে মনে চাহিয়া আসিয়াছে—এই রাজপুত্র অজয়কে!...তাহার মায়ের শত রূপকথার কাহিনীর মধ্য দিয়া, শৈশবে শত স্বপ্নময়ী মুগ্ধ কল্পনার ঘোরে তাহার প্রাণ ইহাকেই চাহিয়াছে, এই চোখ, এই মুখ, এই গলার স্বর। ঠিক সে যাহা চায়, তাহাই। অজয় জিজ্ঞাসা করে—তোমাদের বাড়ী কোথায় ভাই!...আমাকে এক জনেদের বাড়ী খেতে দিয়েচে, বড্ড বেলায় খেতে দেয়। তোমাদের বাড়ীতে খায় কে?...

খুসিতে অপুর সারা গা কেমন করে, সে বলে—ভাই, আমাদের বাড়ীতে একজন খেতে যায়, সে আজ দেখলাম ঢোলক বাজাচ্ছে—তুমি কাল থেকে যেও, আমি এসে ডেকে নিয়ে যাবো—ঢোলকওয়ালা না হয় তুমি যে বাড়ীতে আগে খেতে, সেখানে খাবে?—

খানিকক্ষণ দুজনে এদিক ওদিক বেড়াইবার পর অজয় বলে—আমি যাই ভাই, শেষ সিনে আমার গান আছে—আমার পার্ট কেমন লাগ্‌চে তোমার?

শেষ রাত্রে যাত্রা ভাঙ্গিলে অপু বাড়ী আসে। পথে আসিতে আসিতে যে যেখানে কথা বলে, তাহার মনে হয় যাত্রার একটো হইতেছে। বাড়ীতে তাহার দিদি বলে—ও অপু কেমন যাত্রা শুন্‌লি?...অপুর মনে হয়, গভীর জনশূন্য বনের মধ্যে রাজকুমারী ইন্দুলেখা কি বলিয়া উঠিল। কিসের যে ঘোর তাহাকে পাইয়া বসিয়াছে! মহা খুসির সহিত সে বলে—কাল থেকে অজয় যে সেজেছিল মা—সে আমাদের বাড়ী খেতে আস্‌বে—

তাহার মা বলে—দুজন খাবে?—দুজনকে কোত্থেকে—অপু বলে, তা না, একজন তো চ'লে যাবে, শুধু অজয় খাবে—

দুর্গা বল্লে—কেমন যাত্রা রে অপু?...এমন কক্ষনো দেখিনি—কেমন গান কল্লে যখন সেই রাজকন্যা ম'রে গেল? অপুর তো রাত্রে ঘুমের ঘোরে চারিধারে যেন বেহালা সঙ্গত হয়। ভোর হইলে একটু বেলায় তাহার ঘুম ভাঙে—

শেষ রাত্রে ঘুমাইয়াছে, তৃপ্তির সঙ্গে ঘুম হয় নাই, সূর্য্যের তীক্ষ্ণ আলোয় চোখে যেন সুঁচ বিঁধে। চোখে জল দিলে জ্বালা করে। কিন্তু তাহার কানে একটা বেহালা ঢোল মন্দিরার ঐক্যতান বাজ্‌না তখনও যেন বাজিতেছে—তখনও যেন সে যাত্রার আসরেই বসিয়া আছে। ঘাটের পথে যাইতে পাড়ার মেয়েরা কথা বলিতে বলিতে যাইতেছে, অপুর মনে হইল কেহ ধীরাবতী, কেহ কলিঙ্গদেশের মহারাণী, কেহ রাজপুত্র অজয়ের মা বসুমতী। দিদির প্রতি কথায়, হাত পা নাড়ার ভঙ্গিতে, রাজকন্যা ইন্দুলেখা যেন মাখানো! অজয়ের মুখ মনে পড়িয়া অপুর বুকের মধ্যে কেমন করে! তাহার আর একটা কথা মনে হয়—কাল যে ইন্দুলেখা সাজিয়াছিল তাহাকে মানাইয়াছিল মন্দ নয় বটে, কিন্তু তাহার মনে মনে রাজকন্যা ইন্দুলেখার যে প্রতিমা গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা তাহার দিদিকে লইয়া, ঐ রকম গায়ের রং অমান বড় বড় চোখ, অমন সুন্দর মুখ, অম্‌নি সুন্দর চুল! ইন্দুলেখা তাহার সকল করুণা, স্নেহ, মাধুরী লইয়া কোন্ সে কালের দেশের অতীত জীবনের পারে আবার তাহার দিদি হইয়া যেন ফিরিয়া আসিয়াছে—কাল তাই ইন্দুলেখার কথায় ভঙ্গিতে, প্রতি পদক্ষেপে দিদিই যেন ফুটিয়া ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। যখন গভীর বনে সে শতস্নেহে ছোট ভাইকে জড়াইয়া রাখিয়াছিল, তাকে খাওয়াইবার ফল আহরণ করিতে গিয়া একা নির্জ্জন বনের মধ্যে হারাইয়া গেল—সেই একদিনের মাকাল ফলের ঘটনাটাই অপুর ক্রমাগত মনে হইতেছিল।

কাল তো যাত্রার আসরটা তাহার কাছে বাঁশের মেরাপ্ বাঁধা বারোয়ারীতলা ছিল না!···বালকের কল্পনাদণ্ডে তাহা অতীত কালের যে অজ্ঞাত রাজপ্রাসাদের পাষাণ-অলিন্দে, গুপ্ত মন্ত্রণাকক্ষে, গভীর বনে, নির্জ্জন নদীর ধারে, সুন্দর মুখের দেশে, বীরের দেশে পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল—শুধু শৈশব কালেই তাহাদের দেখা মেলে।

দুপুর বেলা খাইবার জন্য অপু গিয়া অজয়কে ডাকিয়া আনিল। তাহার মা দুজনকে এক জায়গায় খাইতে দিয়া অজয়ের পরিচয় লইতে বসিল। সে ব্রাহ্মণের ছেলে, তাহার কেহ নাই, এক মাসী তাহাকে মানুষ করিয়াছিল, সেও মরিয়া গিয়াছে। আজ বছর খানেক যাত্রার দলে কাজ করিতেছে। সর্ব্বজয়ার ছেলেটির উপর খুব স্নেহ হইল—বার বার জিজ্ঞাসা করিয়া তাহাকে খাওয়াইল। খাওয়াইবার উপকরণ বেশী কিছু নাই, তবু ছেলেটি খুব খুসির সঙ্গে খাইল। তাহারপর দুর্গা মাকে চুপি চুপি বলিল—মা, ওকে সেই কালকের গানটা গাইতে বলনা—সেই "কোথা ছেড়ে গেলি এ বন কান্তারে প্রাণপ্রিয় প্রাণ সাথীরে"—

অজয় গলা ছাড়িয়া গানটি গাহিল—অপু মুগ্ধ হইয়া গেল, সর্ব্বজয়ার চোখের পাতা ভিজিয়া আসিল। আহা এমন ছেলের মা নাই! তাহার পর সে আরও গান গাহিল। সর্ব্বজয়া বলিল—বিকেলে মুড়ি ভাজ্‌বো তখন এসে অবিশ্যি করে মুড়ি খেয়ে যেও—লজ্জা করো না যেন—যখন খুসি আস্‌বে, আপনার বাড়ীর মত—বুঝ্‌লে?

অপু তাহাকে সঙ্গে করিয়া নদীর ধারের দিকে বেড়াইতে গেল। সেখানে অজয় বলিল, ভাই তোমার তো গলা বড় মিষ্টি—একটা গান গাও না?···অপুর খুব ইচ্ছা হইল ইহার কাছে গান গাহিয়া সে বাহাদুরী লইবে। কিন্তু বড় ভয় করে—এ একজন যাত্রাদলের ছেলে—এর কাছে তার গান গাওয়া? নদীর ধারে বড় শিমুলগাছটার তলায় চলা-চল্‌তির পথ থেকে কিছুদূরে বাঁশ ঝোপের আড়ালে দুজনে বসে। অপু অনেক কষ্টে লজ্জা কাটাইয়া একটা গান ধরে—"শ্রীচরণে ভার একবার গা তোল হে অনন্ত"—দাশু রায়ের পাঁচালি গান, বাবার মুখে শুনিয়া সে লিখিয়া লইয়াছে। অজয় অবাক্ হইয়া যায়, বলে—তোমার এমন গলা ভাই? তা তুমি গান গাও না কেন?···আর একটা গাও। অপু উৎসাহিত হইয়া আর একটা ধরে—"বেলার আশে বসে রে মন ডুব্‌ল বেলা খেয়ার ধারে।" তাহার দিদি কোথা হইতে শিখিয়া আসিয়া গাহিত, সুরটা বড় ভাল লাগায় অপু তাহার কাছ হইতে শিখিয়াছিল—বাড়ীতে কেহ না থাকিলে মাঝে মাঝে গানটা তাহারা দুজনে গাহিয়া থাকে।

গান শেষহইলে অজয় প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বলিল—এমন গলা থাক্‌লে যে কোনো দলে ঢুক্‌লে পোনোরো টাকা করে মাইনে সেধে দেবে বল্‌চি তোমায়—এর ওপর একটু যদি শেখো !—বাড়ীতে কেহ না থাকিলে দিদির সাম্‌নে গাহিয়া অপু কতদিন দিদিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছে—হ্যাঁ দিদি, আমার গলা আছে ? গান হবে ?··· দিদি তাহাকে বরাবর আশ্বাস দিয়া আসিয়াছে। কিন্তু দিদির আশ্বাস যতই আশাপ্রদ হোক্, আজ একজন সঙ্গীতদক্ষ খাস যাত্রার দলের নামকরা মেডেলওয়ালা গায়কের মুখে এ প্রশংসার কথা শুনিয়া আনন্দে অপু কি বলিয়া উত্তর করিবে ঠাওর করিতে পারিল না। বলিল—তোমার ঐ গানটা আমায় শেখাও না ?···তাহারপর দুইজনে গলা মিশাইয়া সে গানটা গাহিল। অনেকক্ষণ হইয়া গেল। নদী বাহিয়া ছপ্ ছপ্ করিয়া নৌকা চলিতেছে, নদীর পাড়ের নীচে জলের ধারে একজন কি খুঁজিয়া বেড়াইতেছে, অজয় বলিল—কি খুঁজ্‌চে ভাই ? অপু বলিল—ও ব্যাঙাচি খুঁজচে, ছিপে মাছ ধরবে—তাহারপর বলিল—আচ্ছা ভাই তুমি আমাদের এখানে থাকো না কেন ?···যেও না কোথাও, থাক্‌বে ?·

সে বছর দোলপূর্ণিমার রাতে তাহার সেই বন্ধুটি তাহার মনে যে দোল্ দিয়াছিল আবার আজ সেই ঠিক ঘোর ঘোর, আচ্ছন্ন ভাব! সে যেন কোথায় আছে ,···সুন্দর মুখের মোহে আবার তাকে পাইয়া বসিয়াছে! এমন চোখ, এমন মিষ্টি গলার সুর! তাহার উপর অপুর কাছে সে সেই রাজপুত্র অজয়! কোন্ বনে ফিরিতে ফিরিতে অসহায় ছন্নছাড়া রূপবান্ রাজার ছেলের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হইয়া ভাব হইয়া গিয়াছে—চিরজন্মের বন্ধু! আর তাহাকে কি করিয়া ছাড়া যায়!

অজয়ও খুব খুসি হইয়াছে। অনেক মনের কথা বলিয়া ফেলিল। এমন সাথী তাহার আর জুটে নাই। সে প্রায় চল্লিশ টাকা জমাইয়াছে। আর একটু বড় হইলে সে এদল ছাড়িয়া দিবে। অধিকারী বড় মারে। সে আশুতোষ পালের দলে যাইবে—সেখানে বড় সুখ, রোজ রাত্রে লুচি। না খাইলে তিন আনা পয়সা খোরাকী দেয়। এ দল ছাড়িলে সে আবার অপুদের বাড়ী আসিবে ও সে সময় কিছুদিন থাকিবে। বৈকালের কিছু আগে অজয় বলিল—চল ভাই, আজ আবার সন্দের সময় আসর হবে, সকাল সকাল ফিরি। যদি "পরশুরামের দর্প-সংহার" হয়, তবে আমি নিয়তি সাজবো দেখো কেমন একটা গান আছে—

আরও তিন দিন যাত্রা হইল। গ্রামশুদ্ধ লোকমুখে যাত্রা ছাড়া আর কথা নাই। পথে ঘাটে মাঠে গাঁয়ের মাঝি নৌকা বাহিতে বাহিতে, রাখাল গরু চরাইতে চরাইতে যাত্রার পালার নতুন-শেখা গান গায়। গ্রামের মেয়ের দলের ছেলেদের বাড়ী ডাকাইয়া যাহার যে গান ভাল লাগিয়াছে তাহার মুখে সে গান ফরমাইস করিয়া শুনিতে লাগিলেন। অপু আরও তিন চারটা নতুন গান শিখিয়া ফেলিল। একদিন সে যাত্রার দলের বাসায় অজয়ের সঙ্গে গিয়াছে, সেখানে তাহাকে দলের সকলে মিলিয়া ধরিল তাহাকে একটা গান গাহিতে হইবে। সেখানে সকলে অজয়ের মুখে শুনিয়াছে সে খুব ভাল গান গাইতে পারে। অপু বহু সাধ্যসাধনার পর নিজের বিদ্যা ভাল করিয়া জাহির করিবার খাতিরে একটা গাহিয়া ফেলিল। সকলে তাহাকে ধরিয়া অধিকারীর নিকটে লইয়া গেল। সেখানেও তাহাকে একটা গাইতে হইল। অধিকারী কালো রংএর ভুঁড়িওয়ালা লোক, আসরে জুড়ি সাজিয়া গান করে। গান শুনিয়া বলিল, এস না খোকা, দলে আস্‌বে ? অপুর বুকখানা আনন্দে ও গর্ব্বে দশহাত হইল। আরও সকলে মিলিয়া তাহাকে ধরে—এস, চল তোমাকে আমাদের দলে নিয়ে যাই। অপুর তো ইচ্ছা সে এখনি যায়। যাত্রা দলে কাজ করা যে মনুষ্য-জীবনের চরম উদ্দেশ্য, সেকথা এতদিন সে কেন জানিত না, ইহাই তো আশ্চর্য্যের বিষয়। সে গোপনে অজয়কেবলিল, আচ্ছা ভাই, এখন যদি আমি দলে যাই, আমাকে কি সাজতে দেবে ? অজয় বলিল, এখন এই সখী টখী, কি বালকের পার্ট এইরকম, তারপর ভাল ক'রে শিখলে—

অপু সখী সাজিতে চায় না—জরির মুকুট মাথায় সে সেনাপতি সাজিয়া তলোয়ার ঝুলাইবে, যুদ্ধ করিবে। বড়

হইলে সে যাত্রার দলে যাইবেই উহাই তাহার জীবনের ধ্রুব লক্ষ্য। অজয় তাহাকে চুপি চুপি কষ্টিপাথরের রং একটা ছোক্‌রাকে দেখাইয়া কহিল, এই যে দেখচো, এর নাম বিষ্টু তেলি। আমার সঙ্গে মোটে বনে না, আমি নিজের পয়সায় দেশলাই কিনে বালিশের তলায় রেখে শুই, দেশলাই উঠিয়ে নেয় চুরুট খেতে, আর দেয় না। আমি বলি আমার রাত্রে ভয় করে, দেশলাইটা দাও। অন্ধকারে মন ছম্‌ ছম্‌ করে, তাই সেদিন চেয়েছিলাম ব'লে এমনি থাপড়া একটা মেরেচে! নাচে ভালো ব'লে অধিকারী বড় খাতির করে, কিছু বল্‌বারও যো নেই—

দিন পাঁচেক পরে যাত্রা দলের গাওনা শেষ হইয়া গেলে তাহারা রওনা হইল। অজয় বাড়ীর ছেলের মত যখন তখন আসিত যাইত, এই কয় দিনে সে যেন অপুরই আর এক ভাই হইয়া পড়িয়াছিল। অপুরই বয়সী ছোট ছেলে, সংসারে কেহ নাই শুনিয়া সর্ব্বজয়া তাহাকে এ কয়দিন অপুর মত যত্ন করিয়াছে, একটু বেলা হইলে অস্থির হইয়া পড়িয়াছে,—কখন্‌ রান্না হবে, সে আবার সকালে খায়. কাল রাত্রে তো খেয়ে তার পেটই ভরেনি? অপু যাহা যাহা খাইতে ভালবাসে,—মুড়ি ও ছোলাভাজা, গুড় দিয়া নারিকেল কোরা, চুনা মাছ দিয়া কচুর শাকের ঘণ্ট, জবার পাতা দিয়া তেলপিটুলি ভাজা,—এ কয়দিনে তৈয়ারী করিয়া খাওয়াইয়াছে, যদিও গরিবের ঘরে জুটানো কষ্ট, তবুও ছাড়ে নাই। দুর্গাও তাহাকে আপন ভাইয়ের চোখে দেখিয়াছে—তাহার কাছে গান শিখিয়া লইয়াছে, কত গল্প শুনাইয়াছে, তাহার পিশিমার কথা বলিয়াছে, তিনজনে মিলিয়া উঠানে বড় ঘর আঁকিয়া গঙ্গা-যমুনা খেলিয়াছে, খাইবার সময় জোর করিয়া বেশী খাইতে বাধ্য করিয়াছে। যাত্রা দলে থাকে, কে কোথায় ত্যাখে, কোথায় শোয়, কি খায়, আহা বলিবার কেউ নাই; গৃহ সংসারের যে স্নেহস্পর্শ বোধহয় জন্মাবধিই তাহার ভাগ্যে ঘটে নাই, অপ্রত্যাশিত ভাবে আজ তাহার স্বাদ লাভ করিয়া লোভীর মত সে কিছুতেই ছাড়িয়া যাইতে চাহিতেছিল না।

যাইবার সময় সে হঠাৎ পুঁটুলি খুলিয়া কষ্টে সঞ্চিত পাঁচটি টাকা বাহির করিয়া সর্ব্বজয়ার হাতে দিতে গেল। একটু লজ্জার সুরে বলিল—এই পাঁচটা টাকা দিয়ে দিদির বিয়ের সময় একখানা ভাল কাপড়—

সর্ব্বজয়া বলিল—না বাবা, না—তুমি মুখে বল্‌লে এই খুব হোল, টাকা দিতে হবে না, তোমার এখন টাকার কত দরকার--বিয়ে থাওয়া ক'রে সংসারী হতে হবে—

তবু সে কিছুতেই ছাড়ে না। অনেক বুঝাইয়া তবে তাহাকে নিরস্ত করিতে হইল।

তাহার পর সকলে উহাদের বাড়ীর দরজার সামনে খানিকটা পথ পর্য্যন্ত তাহাকে আগাইয়া দিতে আসিল। যাইবার সময় সে বার বার বলিয়া গেল, দিদির বিয়ের সময় অবশ্য করিয়া যেন তাহাকে পত্র দেওয়া হয়। গাবতলার ছায়ায় ছায়ায় তাহার সুকুমার বালকমূর্ত্তি ভাঁট্‌ শেওড়া ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য হইয়া গেলে হঠাৎ সর্ব্বজয়ার মনে হইল, বড্ড ছেলে মানুষ, আহা, এই বয়সে বেরিয়েছে নিজের রোজগার নিজে কর্ত্তে। অপুর আমার যদি ঐরকম হোত-- মাগো!...তাহার পর তাহার ও দুর্গার দুজনেরই চোখের পাতা ভিজিয়া উঠিল। (ক্রমশঃ)

বৎসহার

—শ্রীপ্রভাতমোহন ধ্যায়

নারীর মূল্য

শ্রীভবানী ভট্টাচার্য্য

শ্রীমতী ইলা দেবীকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি দু'টি কারণে। প্রথমটি স্বার্থগত; যাঁরা আমার নারীর মূল্য প্রবন্ধ এ পর্য্যন্ত পড়েননি, প্রতিবাদ বেরুবার পর বোধ করি তাঁদের অনেকেই ও লেখা প'ড়ে দেখবেন। দ্বিতীয় কারণটি পরার্থগত; আমার পূর্ব্বোক্ত লেখায় আমি এমন অনেক কঠিন কথা বলেছিলাম, মেয়েদের তরফ্ থেকে যার প্রতিবাদের প্রয়োজন ছিল।

কিন্তু এ প্রতিবাদে আমাকে নারীর শত্রু মনে করা দরকার হ'ল কেন? আমি আমার পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধের গোড়াতেই বলেছিলুম, সব জিনিষের দু'টো পিঠ্ থাকে, এবং সব জিনিষের দুটো পিঠের যে কোনো একটার সমর্থনে দু'চার কথা বলা যেতে পারে। নারীর মূল্য সম্বন্ধেও ভালো এবং মন্দ দুই বলা যায়। ভালোই বলি আর মন্দই বলি, তার মধ্যে থাকবে খানিকটা শুধু 'বাক্যের ঝড়, তর্কের ধূলি'—intellectual gymnastic। কারণ কথাটা শুধু তর্ক করবারই মত; তর্ক ক'রে মন আরাম পায়, তাতে মীমাংসা কিছু হোক্ বা না হোক্। আমি নারীর মূল্যের একটি বিশেষ দিক্ নিয়ে তর্ক করেছিলুম—লুডোভিচিও তাই করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে বাংলার পাঠকদের সঙ্গে লুডোভিচির পরিচয় করিয়ে দেওয়াও আমার উদ্দেশ্য ছিল; ইউরোপে চিন্তাশীল লেখক ব'লে লুডোভিচির নাম আছে, সুতরাং তাঁর কথাগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করায় অপমান নেই। লুডোভিচির যুক্তির আমিও প্রতিবাদ করতে পারতুম এবং লুডোভিচির পক্ষে সে প্রতিবাদের জবাব দেওয়াও শক্ত হ'ত না। এ সব কথাই আমি আমার প্রবন্ধের গোড়ায় দু'কথায় বলেছিলুম—'তর্কের শেষ নেই; ও বস্তু টানলে বাড়ে'।

কিন্তু শ্রীমতী ইলা দেবী তর্কের উত্তরে তর্ক করেননি। যুক্তির উত্তরে তিনি কোথাও দিয়েছেন উক্তি (proverb), কোথাও 'dogma, কোথাও শুধু ভাষার বাহুল্য। অবশ্য factsও তিনি দিয়েছেন, কিন্তু প্রায় সব ক্ষেত্রেই সে facts ভুল। তাঁর লেখার প্রত্যেকটা ভুল শুধ্‌রোবার আমার প্রয়োজন নেই, কেননা যে কোনো সমাজতত্ত্ববিদ্ পাঠকের কাছে ওগুলো ধরা পড়বে। তবে একটা কথা বলা দরকার। কোনো বৈজ্ঞানিক যখন আজীবন পরিশ্রম ক'রে কতকগুলো facts আবিষ্কার করেন, তখন আমার কিম্বা শ্রীমতী ইলা দেবীর সেগুলো মেনে চলাই ভালো, তার কারণ আমি এবং ইলা দেবী এমন কোনো facts বা'র করিনি যেগুলো বৈজ্ঞানিকভাবে উক্ত বৈজ্ঞানিক facts এর প্রতিপাদ্য বস্তুর প্রতিবাদ করতে পারে। লুডোভিচি কিম্বা Schultze কিম্বা Keith যদি বলেন, পুরুষের দৈহিক গঠন এমন যার জন্য সে স্বভাবতই নারীর চেয়ে বলিষ্ঠ, * কিম্বা পুরুষ as a species নারী as a speciesএর চেয়ে লম্বা বেশী হয়, কথাগুলো (বায়োলজিতে যা facts ব'লে গৃহীত হয়েছে) আমাদের নীরবে স্বীকার ক'রে নিতেই হবে, সে স্বীকৃতি প্রীতিকর হোক্ বা অপ্রীতিকর হোক্। এগুলো জীবতত্ত্বের এত গোড়ার কথা যে, এগুলো জানা না থাকলে সমাজতত্ত্ব নিয়ে (জীবতত্ত্বের সঙ্গে সমাজতত্ত্বের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ) আলোচনা করা উচিত কিনা সন্দেহ। আর এ ধরণের আলোচনায় 'দেবাদিদেব মহাদেবে'র পৌরুষ ছিল কিনা—কিম্বা পৌরাণিক পরশুরাম কোথায় কি করেছিলেন—এ সব কথার কোনো যুক্তিগত সম্পর্ক নেই।

---

* পল্লীবালা গায়ের জোরে পল্লীবালকের সমান হতে পারে, তার কারণ বালক এবং বালিকার muscle fibreএ বেশী তফাৎ নেই। ও তফাৎ আসে যৌবনোদ্গমে—যখন উভয়ের muscles ভিন্ন ভাবে পরিণত হ'য়ে ওঠে। এই ভিন্ন পরিণতির জন্যই তরুণের দেহের চেয়ে তরুণীর দেহ বেশী কোমল। শক্তির তারতম্য নির্ভর করে—muscle fibreএর বিশেষ পরিণতির উপর।

এ প্রবন্ধে আমি আমার পূর্ব্বেকার প্রবন্ধের কতকগুলো কথা নূতন ক'রে বলব।

গত শতাব্দীর শেষের দিকে মারি-উলষ্টনক্রাফ্‌ট্‌এর লেখা ইউরোপকে এক নূতন বার্ত্তা শোনাল। মারি লিখলেন, পুরুষের চেয়ে নারীর স্থান নীচু নয়; পুরুষ যা পারে নারীও তা পারে; সুতরাং সমাজের চোখে এ দুয়ের অধিকার সমান হওয়া উচিত। অধিকার বলতে বোঝায় রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক অধিকার।

দেখতে দেখতে মারির নাম ইউরোপের দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়ল। পুরুষরা তার লেখা প'ড়ে মনে মনে হাসল; কিন্তু মেয়েরা চীৎকার ক'রে বলল, মারি নারী নামের কলঙ্ক, নারীসমাজে ওর স্থান নেই। শুধু একদল মেয়ে বলল, না, হয়তো মারির কথা মিথ্যা নয়; আমরাও মানুষ—সুতরাং পুরুষের অধিকারে হাত দেবার অধিকার আমাদের আছে। তারপর মহাযুদ্ধ এল; ইউরোপের আধুনিক সমাজ মহাযুদ্ধের হাতে গড়া। ও যুদ্ধের ফলে দেশে দেশে পুরুষের দারুণ অভাব সুরু হল; তাদের স্থান গ্রহণ করল নারী। অর্থনীতির দিক্ থেকে বিনা চেষ্টায় নারী আর পুরুষ হ'ল এক। দেখা গেল পুরুষের চেয়ে নারী ঢের ভাল করতে পারে—শুধু কেরাণী, দোকানী, টাইপিষ্ট্, সেক্রেটারির কাজ। এর কোনোটাতেই বুদ্ধির বা মৌলিকতার দরকার করে না। দরকার করে একাগ্রতার; দরকার করে হাতের কাজে সমস্ত মন ঢেলে দেবার শক্তির। যে মেয়ে টাইপিষ্ট্ সে টাইপিষ্ট্ ছাড়া আর কিছু নয়; তার কাছে ঐ যন্ত্রটাই একটা জগৎ। আফিসের কর্ত্তারা দেখলেন, মহা সুবিধা! এর ট্র্যাজেডি ধরা পড়ল শুধু দু'চার জন চিন্তাশীল লেখকের চোখে। চেষ্টারটন্ লিখলেন, "Modern women defend their office with all the fierceness of domesticity, ...and develop a sort of wolfish wifehood on behalf of the invisible head of the firm. That is why they do office work so well; and that is why they ought not to do it."

What's Wrong with the World, P. 133.

রাজনৈতিক অধিকার কিন্তু এত সহজে আসেনি; ও অধিকারের আইডিয়া শুধু দু'দশ জন সাফ্রেজিটের মনে এসেছে, বাকি সবাই ও সম্বন্ধে বেপরোয়া। Pankhurst-এর মতো মেয়ে ইউরোপেও দুর্লভ; তাঁর মতন দু'দশ জনের অনুকরণে দু'এক হাজার মেয়ে সফ্রেজিট্ হল। তাও শুধু ইংলণ্ডে। ফ্রান্সেও সফ্রেজিট্-আন্দোলন চলেছিল, কিন্তু তার নেত্রীদের তিন জন ছিলেন ইংরেজ। ও আন্দোলন বেশী দিন বাঁচেনি। ফ্রান্সের মেয়েরা 'অধিকার' সম্বন্ধে মোটেই সচেতন নয়। জার্ম্মানির অবস্থা কতকটা ইংলণ্ডেরই মতো; ইটালির সম্পূর্ণ ভিন্ন, ওদেশে মেয়েদের অধিকার ব'লে কোনো আইডিয়া আজ পর্য্যন্ত জন্মায়নি। (পরিশিষ্ট—ক)

আসলে, ইউরোপীয় মেয়ের সঙ্গে ভারতীয় মেয়ের খুব বেশী তফাৎ নেই; দুইয়ের পিছনেই একই মন কাজ করছে এবং সে মন সম্পূর্ণ 'মেয়েলি'। যে মেয়ে সাঁতারে সমুদ্র পার হয় এরা তাকে প্রশংসা করে, কিন্তু শ্রদ্ধা করে না। তাকে দেখতে লক্ষ লক্ষ স্ত্রীপুরুষ ছোটে, আবার তাকে ঠাট্টা ক'রে তারা she-man বা tom-boy বলতেও ছাড়ে না। মনের দিক্ থেকে ইউরোপের মেয়ে ভারতীয় মেয়ের মতোই 'সঞ্চারিণী পল্লবিনী।' যতই সে আলোকপ্রাপ্ত হোক্, সে চায় পুরুষের আশ্রয়, গৃহ এবং সন্তান।

কয়েদিকে আমি নীতিশীল বলি না, কারণ তার সুযোগ নেই। আমাদের দেশের মেয়েরা সবাই কয়েদি; কতক দেহে, কতক মনে। যাঁরা পর্দার আড়ালে থাকেন তাঁরা প্রলুব্ধ হ'তে পারেন না, প্রলোভনের অভাবে। জীবনে কখনো তাঁদের পরীক্ষা হয়নি। সীতাকে সতী বলতে পারি তখনি যখন দেখি কঠিন অগ্নি-পরীক্ষায় তাঁর গায়ে আঁচ্

শ্রীভবানী ভট্টাচার্য্য

লাগল না। যাঁদের পর্দ্দার বাঁধন নেই তাঁদের আছে মানসিক বন্দীত্ব। যুগযুগান্তের সংস্কার তাঁদের নীতির কড়া পাহারায় নিযুক্ত। সংস্কার, সংসার এবং সমাজ এই তিনের হাত এড়ানো ভারতীয় নারীর পক্ষে সম্ভব নয়; সুতরাং ও তিনের হুকুম মেনে চলা ছাড়া তাঁরা অনন্যোপায়। তা ছাড়া নারীমনের একটা বিশেষ ধর্ম্ম এই যে, ও-মনকে একবার কিছু ধরিয়ে দিলেই হ'ল—তারপর সে প্রাণপণে সেটা আঁকড়ে ধ'রে থাকবে। তাই নারীর সংস্কার, আচার, নিষ্ঠা এ সবের প্রতি টানও খুব বেশী। তরুণী ব্রহ্মচারিণী-দের এই দুরকম বন্দীত্ব তো আছেই তা ছাড়া পরলোকে কিম্বা পরজন্মে সুখলাভের আশাও তাঁদের ব্রহ্মচর্য্য-আচরণের পিছনে রয়েছে। (*) সুতরাং ভারতীয় নারীর নীতি এবং কয়েদির নীতি—এ দুই এক।

ইউরোপের মেয়েদের অবস্থা এরকম নয় দেহে মনে এরা অনেকটা স্বাধীন; পর্দ্দা, মনু-পরাশর, পরজন্ম এসব উৎপাত থেকে এ দেশের মেয়ে মুক্ত; তার প্রলোভনও প্রচুর। সুতরাং নারীর নীতি আছে কি না এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে শুধু ইউরোপ। ইউরোপ বলতে আমি ইউরোপের সহধর্ম্মী অন্যান্য দেশকেও ধরছি—যেমন আমেরিকা।

জার্মানি, রাশিয়া এবং আমেরিকায় sex-act শুধু একটা biological function ব'লে আজকাল গণ্য হচ্ছে; আহার নিদ্রা, নিশ্বাস-প্রশ্বাস এ সবের থেকে ওর কোনো যুক্তিসঙ্গত তফাৎ আছে, এ বিশ্বাস জার্মানি এবং রাশিয়ায় মৃত, এবং আমেরিকায় মৃতপ্রায়। সোভিয়েট্ রাশিয়ার মেয়েরা আজকাল সতী হওয়াকে বুর্জোয়া (bourgeois) মনোভাব ব'লে বিদ্রূপ করছে। নব প্রকাশিত রাসিয়ান্ নাটক Red Rustএ এ কথার সব চেয়ে আধুনিক প্রমাণ পেলুম। জার্মান মেয়ের sex act সম্বন্ধে যে মনোভাবের আমি উল্লেখ করেছি তার একটা প্রমাণ জার্মান film—"Sex in fetters"। আমেরিকান্ মেয়ে সম্বন্ধে Judge Lindsayর "Revolt of Youth" দ্রষ্টব্য।

ফরাসি মেয়ে এ বিষয়ে ঢের ভাল। ফরাসির এক মহা গুণ এই যে, তার মধ্যে পাশবিক instinct বোধ করি একেবারেই নেই। অথচ ফরাসির মতো এমন সংস্কার ও সমাজ হতে সম্পূর্ণ মুক্ত জাতি ইউরোপে দ্বিতীয় নেই। পৃথিবীতে একমাত্র ফরাসি মেয়েই বিষপান ক'রে নীলকণ্ঠ হ'তে পেরেছে। ফরাসি মেয়েকে আমি বিশ্বমানবীর টাইপ্ ব'লে ধরতে পারি না, তার কারণ এরা বিশ্বের বাইরে। ভারতীয় মেয়ের মতো এরা দেহ সম্বন্ধে শুচিবাইগ্রস্ত নয়,—চুম্বন, আলিঙ্গন এগুলো ফ্রান্সে নমস্কারের চেয়ে সামান্য একটু বেশী। ৩১এ ডিসেম্বরে ফ্রান্সে যে কোন পুরুষ ঘরে বাইরে সর্ব্বত্র যে কোনো অজানা মেয়েকে চুম্বন করতে পারে, এবং যে কোনো মেয়ে যে কোনো পুরুষকে চুম্বন করতে পারে। এর মধ্যে বাস ক'রেও ফরাসি মেয়ে এখনো নিজেকে হারায়নি; কোন্ মন্ত্রবলে ওরা নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছে সে আমি জানি না।

প্রথম দৃষ্টিতে ইংরেজ মেয়েকে দেখে নীতিশীল মনে হতে পারে। কিন্তু আসলে এদের নীতি নেতিমূলক (negative morality)। সমাজের নিষেধ এরা প্রাণপণে মেনে চলে, আর এমন নিষেধ আছেও বিস্তর। ইংরেজের মতো সাবধানী এবং শুচিবাইগ্রস্ত জাতি বোধহয় শুধু ভারতে ছাড়া অন্যত্র নেই। এদের প্রতি কথায় prudery অর্থাৎ সত্যগোপনের চেষ্টা; সুতরাং এদেশের মেয়েরাও কতকটা কয়েদির মতো—সংস্কারের না হোক্ সমাজের। তাই এরা জার্মান্ যা করে তার সবই করে, কিন্তু গোপনে। সমাজের পাহারা বন্ধ হয়েছিল কয়েক বছরের জন্য—গত যুদ্ধের সময়ে। যে বিষ ভিতরে ভিতরে কাজ করছিল সে বিষ সুযোগ পেয়ে সহসা সমস্ত দেশটার গায়ে ছড়িয়ে পড়ল। সে সময়ে ইংলণ্ডের অবস্থা কত অসুন্দর এবং কত বিকৃত (perverse) হয়ে পড়েছিল—তার পরিচয় পেলুম একজন ইংরেজ মহিলার মুখে, যাঁর দেখবার সুযোগ্ ছিল বিস্তর।

(*) চিরন্তন সত্য ব'লে জগতে কিছু নেই। কাল যা সত্য ছিল আজ তা মিথ্যা হ'য়ে যেতে পারে। সুতরাং যে ক্ষেত্রে পত্নীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে পত্নীর প্রতি ভালবাসার মৃত্যু হয়, সে ক্ষেত্রে উক্ত ভালবাসার মৃতকে নিয়ে বাস করার প্রশংসা পাবার মতো আমি কিছু দেখি না।
—লেখক

সুইডেনের মেয়েদের সম্বন্ধে Keyserlingএর মত উদ্ধৃত করলুম। (পরিশিষ্ট খ)

নীতি বস্তুটা আসলে ইউরোপে সেকেলে ব'লে গণ্য হ'তে সুরু হয়েছে। এতদিন মেয়েরা জানত নীতিশীল হওয়াটাই fashion; এখন জানছে নীতি না থাকাই fashion। সুতরাং ও বস্তু এখন এদের কাছে জীর্ণ বস্ত্রের মতো পরিত্যাজ্য। (পরিশিষ্ট গ)

ইংলণ্ডে আজকাল sex novel লেখা ফ্যাসন্ হয়েছে। সুতরাং মেয়েরা যে ও জাতীয় নভেল চূড়ান্তভাবে লিখবে—তা বলাই বাহুল্য। গত চার পাঁচ মাসের মধ্যে ইংলণ্ডে যে তিনখানা উপন্যাস গবর্ণমেণ্টের হাতে অশ্লীলতা দোষে বাজেয়াপ্ত হয়েছে, সে তিনখানাই মেয়েদের লেখা। কোন বই বাজেয়াপ্ত করা আমি উচিত মনে করি না, কিন্তু এ বইগুলোর অশ্লীলতার মধ্যে একই সত্য প্রকাশ। Sir Joynson Hicks শেষের বইখানা বাজেয়াপ্ত করবার সময়ে বলেন, মেয়েরা যখন sex নিয়ে নভেল লিখতে বসে তখন কাজটা বড় ভয়প্রদ হয়, কারণ তারা যে কোথায় গিয়ে থাম্‌বে বলা যায় না। কথাটা সত্য।

সেদিন ডিনার-টেবিলে এক ফরাসি মহিলা তাঁর স্বামীর সমক্ষেই ব'লে বসলেন, "আমার স্বামী যদি impotent হতেন, আমি অন্য কোনো পুরুষের কাছে সন্তান-ভিক্ষা করতুম।" সন্তান-আকাঙ্ক্ষার পিছনে আছে অধিকারের দাবী, এবং মাতৃত্বের আনন্দলাভের লোভ। সুতরাং উক্ত মহিলার কাছে নীতির চেয়ে মাতৃত্বের অধিকার বড়। ইনি ফরাসি হ'লেও বোধ করি বহুদিন লণ্ডনে বাস করার ফলে এমন একটা typical ইউরোপীয় মনোভাব লাভ করতে পেরেছেন।

এ সব কথাই প্রমাণ করেছে ইউরোপীয় মেয়ের নীতি নেই। পূর্ব্বেই দেখিয়েছি নারীর নীতি আছে কি না এর বিচার জগতে চলতে পারে শুধু ইউরোপে; সুতরাং নিঃসংশয়ে বলতে পারি বিশ্বমানবীর নীতি নেই। (*)

নারীর সৌন্দর্য্যদৃষ্টি কতদূর তা দেখা যাক্।

ইউরোপে মেয়েদের কাছে লক্ষ্যের চেয়ে উপলক্ষ্য বড় হ'য়ে উঠেছে—দেহের চেয়ে দেহসজ্জা। নতুন ফ্যাসনের skirts পরতে পাওয়া এদের কাছে জীবনের এক মহা আনন্দ। যাদের কেনবার সামর্থ্য নেই তাদের অনেকে একবার ক'রে রিজেণ্ট ষ্ট্রীটের দোকানগুলো ঘুরে আসে; পাওয়ার তৃষ্ণা দেখে মিটোয়। কত বার কত মেয়েকে কাচের আড়ালে সাজানো ঝক্‌ঝকে পোষাকগুলোর দিকে নীরবে, করুণ নয়নে চেয়ে থাকতে দেখেচি। মজার কথা এই যে, এ সব পোষাকের ফ্যাশন নির্দ্দেশ করে নারী নয়—পুরুষ; রু ম্বলা পে'র (প্যারিসের একটা রাস্তার নাম) জনকয়েক পুরুষ ড্রেস্‌মেকার। ইউরোপ আমেরিকার সব মেয়ে এদের ইঙ্গিত অনুসারে নিজেদের সাজায়। নারী শুধু অনুকরণ করতে পারে—নতুন কিছু একটা সৃষ্টি (এমন কি ফ্যাসানও) করবার মত ক্ষমতা তার নেই।

এই যে ঝাঁকে ঝাঁকে মেয়ে আজকাল মাথার চুল কেটে বব্ কিম্বা শিঙ্‌ল্ করছে, এরও মূলে আছে প্যারিসের একজন পুরুষ। চুলকাটার নতুন কায়দাগুলো তারই আবিষ্কার। ইউরোপের মেয়েমহলে ডিক্টেটরের মতো তার সম্মান। শুধু তাই নয়।—মেয়েরা সচরাচর সেই সব coiffure পছন্দ করে যেখানে চুল কাটে পুরুষ। লণ্ডনে এসে ভারতীয় মেয়েদেরও অনেকে বব্ করছেন দেখছি।

পূর্ব্বোক্ত দুটি দৃষ্টান্ত থেকে বলতে পারি, নারীর নিজস্ব কোনো সৌন্দর্য্যদৃষ্টি নেই। পুরুষ যা চায়, নারী করে তাই। নিজেকে সে বিচিত্র ক'রে সাজায়, কিন্তু সে বৈচিত্র্যও ধার-করা। পুরুষ করে নির্দ্দেশ, নারী করে অনুকরণ। পুরুষ শেখায়, নারী শেখে।

(*) 'Love institution' ব'লে ইংরেজিতে কোনো কথা নেই। আমি লিখেছিলুম 'love initiation'—ছাপায় ভুলে বিচিত্রায় বেরোয় institution। —লেখক

ভট্টাচার্য্য

ডাক্তারি মোক্তারি দোকানদারি এগুলো যেমন পুরুষের কাছে এক একটা পেশা (career), বিবাহ তেম্নি নারীর কাছে একটা পেশা ; ভারতবর্ষে, ইউরোপে—সর্ব্বত্র। এদেশে 'art of husband-hunting' সম্বন্ধে লেখা বেরোয়। আজকের Sunday Expressএ দেখলুম, একটি মেয়ে Home Pageএর সম্পাদিকাকে লিখছে, "রোজ দিন কাটে বাবার ব্যবসায়-কর্ম্মে সহায়তা ক'রে। শুক্রবারে তাঁর আর মায়ের সঙ্গে থিয়েটারে যেতে পাই,—শনিবারে সিনেমায়। রবিবারে আমরা সবাই মোটরে বেড়িয়ে আসি। তারপর আবার সোমবার—আবার কাজ। দিন যায়, দিন আসে। সপ্তাহ যায়, সপ্তাহ আসে। কেউ আমার কাছে আসে না ; স্বপ্নই সার। There must be something the matter with me. I can see other girls having such good times with their men friends. Perhaps I lack some subtle qualities that attract, but I'm willing to learn if you can tell me what sort of girls men do like." (১)

এত যে coquetry, তার মূলই এইখানে। মেয়েদের ইভ্‌নিং ড্রেস নিজেদের দেহ দেখাবার উপায় ছাড়া আর কিছু নয়। যাদের রূপ নেই তারা আরো daring স্কার্ট্‌স্ পরে। ট্রেনে বাসে রেস্তোরাঁয় যখন তখন মেয়েরা সবার সাম্নে আয়নায় মুখ দেখতে দেখতে ঠোঁটে lipstick ঘসে, মুখে পাউডার মাখে। বিশেষ ক'রে কোনো পুরুষ যদি বারকয়েক তার দিকে চেয়ে দেখে তাহলে তার প্রসাধনের আগ্রহ দ্বিগুণ বেড়ে যায়। ইউরোপীয় মেয়ে দিনে দুশোবার পাউডার মাখে বললে অত্যুক্তি হয় না। সাদা কথায় এর নাম coquetry। এর জন্য নিজেদের বঞ্চিতও কি এরা কম করে! এ দেশের মেয়েরা অনেকে সন্তানকে স্তন্যদান করে না দেহ গঠন খারাপ হ'য়ে যাবার ভয়ে।

সাহিত্যে এ পর্য্যন্ত নারী বড় কিছু দিতে পারেনি—তার কারণ নারী সুপ্রসারিত দৃষ্টিতে কিছু দেখতে শেখেনি। (২) ইংরেজী সাহিত্যে নারীর কোনো স্থানই নেই। জর্জ্জ ইলিয়টের কিছু শক্তি ছিল ; আমি তাঁকে তৃতীয় শ্রেণীর ঔপন্যাসিক বলি। সার্ল্‌ৎ ব্রঁতের স্থান সাহিত্যে নয়—সাহিত্যের ইতিহাসে। মারি করেলিকেও আমাদের দেশে ঔপন্যাসিক বলা হ'য়ে থাকে! তার কারণ বোধ করি ভারতীয়ের ইংরেজির সঙ্গে মারি করেলির ইংরাজি বেশ মেলে। মারি করেলি ইংরেজি লিখতেই শেখেননি—সৃষ্টি করবেন কোথা থেকে! ইংলণ্ডের যাঁরা আধুনিক লেখিকা, যেমন এথেল্ ম্যানিন্, মার্জোরি লরেন্স্, উরসুলা ব্লুম্—এঁদের ভাবের দারিদ্র্য দেখলে দুঃখ হয়। সেদিন এক আইরিশ্ ঔপন্যাসিকের মুখে শুনলুম, "The modern women writers have no greater rights to call themselves novelists than a street-sweeper has." কথাটা মানি। ভার্জিনিয়া উল্‌ফ এবং র‍্যাডক্লিফ হলকে বাদ দিয়ে—এরা তৃতীয় শ্রেণীর।

কন্টিনেণ্টের জনকয়েক লেখিকার শক্তি আছে, যেমন—সেল্‌মা লেগারলফ বা সিগ্‌ফ্রিড্ উণ্ড্‌সে। কিন্তু সেক্‌সপীয়রের পাশে এঁদের দাঁড় করানো হাস্যকর হবে। সমস্ত ইউরোপীয় সাহিত্যে আমি একজনও লেখিকা খুঁজে পাইনি যাঁকে খাঁটি শিল্পী ব'লে সর্ব্বান্তঃকরণে শ্রদ্ধা করতে পারি।

(১) ইউরোপে chivalry আছে এ ধারণা ভুল। এক সময়ে ছিল—মধ্যযুগে। বহুদিন হ'ল ইউরোপ ওর থেকে মুক্ত হয়েছে। কোনো একটা আইডিয়া ইউরোপে বাসি হ'য়ে গেলে তবে সেটা ভারতবর্ষে পৌঁছয়। ভারতবর্ষে পাশাপাশি দুটো যুগ বাস করছে, এ-যুগ এবং মধ্যযুগ। সুতরাং ইউরোপের পরিত্যক্ত chivalry ভারতবর্ষে এখন একটা নূতন জিনিষ।

তা ছাড়া chivalryর জন্ম হয়েছিল নারীর প্রতি শ্রদ্ধা থেকে নয়। সেকালের knights-errantদের মধ্যে ego ভারি প্রবল ছিল ; chivalry ছিল উক্ত egoর খাদ্য জুগোবার একটা উপায়।

এ দেশে কোনো পুরুষ ট্রেনে বা বাসে মেয়েদের জন্য জায়গা ছেড়ে দেয় না। মেয়েরা দাঁড়িয়ে থাকে—পুরুষদের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। তার কারণ পুরুষ নারীকে আগের চেয়ে শ্রদ্ধা করছে—weaker sex কথাটা উঠে যাচ্ছে।　—লেখক

(২) অন্য কোনো ক্ষেত্রেও নারীর শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় না। রিজিয়া রাণী ছিলেন, কিন্তু রাজত্ব করা তাঁর ভাগ্যে ঘটেনি। এলিজাবেথের প্রতিভা ছিল না ; তাঁর সাফল্যের কারণ তাঁর স্বাদেশিকতা, double-dealing, ("greatest lier in Christendom" ব'লে এলিজাবেথের নাম ছিল) এবং Burghleyর সহায়তালাভ। ভিক্টোরিয়া ছিলেন সাধারণ মেয়ে ; আমাদের দেশের যে কোনো রমলা বিমলা কমলার মতো।　—লেখক

নারী শিল্পী হতে পারেনি তার জন্য দোষ তার নয়—তার স্বভাবের। বায়োলজি বলে, নারী monogamic এবং পুরুষ polygamic। নারী একক নিয়েই তৃপ্ত, পুরুষ একাধিক পেয়েও অতৃপ্ত। শেষোক্ত অতৃপ্তির মধ্যে আছে সৃষ্টি-শক্তির বীজ। আর ঠিক্ এই কারণেই, (ছোটখাট কাজের কথা বলছি না— খুব একটা বড় কাজে) নারী পুরুষকে প্রেরণা দিতে পারে না। নারী সাধারণ পুরুষের গৃহিণী হ'তে পারে, সঙ্গিনী হ'তে পারে, সব কিছু হতে পারে—কিন্তু প্রতিভাবান্ পুরুষের নারীর কাছে বিশেষ কিছু আশা করবার নেই। (*) মনের দিক থেকে নারী অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ এবং নিজস্ব-ভাবে (sense of possession) ভরা,—তা সে স্বামীর প্রতিই হোক্ বা পুত্রকন্যার প্রতিই হোক্। নারী একটি মানুষ বা একটি আইডিয়া নিয়ে আজন্ম কাটিয়ে দিতে পারে। অপর পক্ষে পুরুষ স্থিতিশীল নয়—সে চলেইছে, মিথ্যা হতে সত্যে, সত্য হতে সত্যান্তরে। তার যাত্রার শেষ নেই, তার প্রতিভা জগদ্‌গ্রাসী। এ যাত্রাপথে নারী তার সহায় হতে পারে না—পুরুষের মনের এই বিশেষ ধরণটি নারীর কাছে অবোধ্য। দুটি মনের বিবাহবন্ধনের এইখানে শেষ, আর পুরুষের নিদারুণ নিঃসঙ্গতার সুরু। এই ভয়ঙ্কর নিঃসঙ্গতার মধ্যে পুরুষ নিজকে নিজে বারম্বার প্রশ্ন করে, কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম? তার পূজার হবি দিতে চায় সে নারীকে। কিন্তু দেবার উপযুক্ত নারী কোথায়? নারীকে পাশে না পেয়ে সে মানসী নারীর সৃষ্টি করতে থাকে, যার সঙ্গে পূর্ব্বোক্তের আপাদমস্তক তফাৎ। এম্নি সৃষ্টি করেছিলেন দান্তে; দান্তের মানসী বিয়াত্রিচে এবং তাঁর শৈশবসঙ্গিনী মানবী বিয়াত্রিচে সম্পূর্ণ আলাদা মানুষ।

লণ্ডন—১১ই মার্চ্চ

(*) বিশেষত শিল্পীর পক্ষে এই জন্য বিবাহিত জীবনে সুখের আশা না করাই ভাল। সে স্ত্রী পেতে পারে—এমন স্ত্রী যার প্রেম আছে, সহানুভূতি আছে, ধীশক্তি আছে। কিন্তু সাথী পাবার আশা করলে তাকে ঠক্‌তে হবে। তবে মজা এই, পায়ে পায়ে সত্যের সঙ্গে compromise ক'রে মানুষ পথ চলেছে; তা না করলে না-পাওয়ার দুঃখ অসহ্য হ'য়ে ওঠে। সুতরাং শিল্পী, হয় সাথীর আকাঙ্ক্ষা ভুলতে চেষ্টা করে, নয়তো realএর কাঠামোয় আইডিয়াল্ সৃষ্টি ক'রে নিয়ে নিজেকেই ভুলোয়।

—লেখক

পরিশিষ্ট

ক "The working objection to the Suffragette philosophy is simply that over-mastering millions of women do not agree with it"........

WHATS WRONG WITH THE WORLD, P. 116.

"Many voteless women regard a vote as unwomanly. Nobody says that any voteless men regarded it as unmanly". Ibid. P. 288.

খ (In Sweden) "It is no uncommon thing for a girl to say over the telephone to a young man whom she has seen only once, 'I long for you'—meaning just about everything that one can mean; and if she happens to be out picknicking with some acquaintance—not necessarily a very intimate one—the same thing is considered part of the dessert."

EUROPE (Keyserling) P. 262.

গ "Except as a mother the woman, by her nature, has no instinct for morality, but only for rules of conduct. It was a practice in Babylon, on certain holidays, for the noblest damsels in the land to give themselves as a matter of course to strange men. Of course only on those occasions otherwise they would have considered it an abomination......Shame 'as such' is unknown to women for her the decisive factor is the rule of conduct.".

Ibid. P. 70.

আধুনিক আফ্‌গান

জরীন কলম

ও

শিরীন কলম

বহু বৎসরের ঘুমন্ত মুসলিম জগতে আবার জাগরণের সাড়া প'ড়ে গিয়েছে। নিদ্রাচ্ছন্ন জাতি আবার জগতের সঙ্গে তাদের কর্ম্মবীণার সুর সংযোগ ক'রে দিয়েছে। তুর্কী এই নব জাগরণের অগ্রদূত, মুক্তি-যোদ্ধা। তারপর মিশর, রিফ, পারশ্য এই মুক্তি-আহবে যোগ দিয়েছে। সকল দেশের চেয়ে বেশী রক্ষণশীল ও অশিক্ষিত আফগান জাতির কাছেও এই মুক্তি-বাণী ব্যর্থ হ'য়ে যায় নাই। অসাধারণ প্রতিভা-শালী দূরদর্শী আমানুল্লাহ্ এই কুম্ভকর্ণ জাতির ঘুম ভাঙাতে চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। আমানুল্লাহ্ ও কামালপাশা উভয় মনীষীই জাতির আঁতে ঘা দিয়ে সংস্কার প্রবর্ত্তন প্রচেষ্টা করেছেন। প্রাচ্যের মন এত মোহ-গ্রস্ত ও অবসাদগ্রস্ত হ'য়ে রয়েছে যে তার মর্ম্মমূলে আঘাত না হান্‌লে, সেই পচা ভিৎ উৎখাত ক'রে না ফেল্‌লে, সত্যিকার ভাবে নূতন গঠন সম্ভবপর নয়। কামালপাশার সঙ্গে যেমন একদল উৎসাহী ও অক্লান্তকর্ম্মী যুবক তাঁর ব্রতে দীক্ষা গ্রহণ করেছিল, আমানুল্লার দুর্ভাগ্য, তাঁর তেমন কোন সঙ্গীদল জুটে নাই। তবুও তিনি একলা চলার গান গেয়ে পথে যাত্রা সুরু করেছিলেন। তাঁর প্রভাবে বহু যুগযুগান্ত-সঞ্চিত গ্লানি ও কুসংস্কার দ্রুতগতিতে ঝরা পাতার মত ঝ'রে পড়ছিল।

বিধাতা বোধ হয় আমানুল্লার এই অসমসাহসিকতা দেখে হাস্‌ছিলেন। হঠাৎ সেদিন রয়টারের মারফতে আমানুল্লার সিংহাসন ত্যাগসংবাদ সমগ্র জগৎকে চমকিত ও বিস্মিত ক'রে দিয়েছিল অতর্কিত ও অপ্রত্যাশিত এই সংবাদে সমগ্র মুসলিম জগত বজ্রাহতের ন্যায় স্তম্ভিত হ'য়ে পড়েছিল। কি ক'রে যে এই অসম্ভব সম্ভবে পরিণত হয়েছিল তা এখনও সকলের কল্পনা-জল্পনার বিষয়ীভূত

যুদ্ধ-রত আফগান জাতি

হ'য়ে রয়েছে। সংবাদপত্রে এবং লোকমুখে যেটুকু খবর পাওয়া যাচ্ছে, সত্য নির্ণয়ের পক্ষে তা যথেষ্ট নয়। তথাপি কেন যে এই অঘটনা সংঘটিত হ'ল তার কারণ যতদূর সম্ভব খুঁজে দেখা যাক্।

এইখানে একটা কথা ব'লে রাখা ভাল যে আমানুল্লাহ্ যে ভাবে হঠাৎ প্রজাবিদ্রোহে বিপন্ন হয়েছিলেন, ইসলামের আদিযুগে ইসলামের সম্মানিত খলিফাদের ভাগেও এই

আমানুল্লা ও সুরাইয়া

নির্য্যাতন ঘটেছিল। যাঁরা ইসলামের ইতিহাস জানেন তাঁরা অবগত আছেন যে, হজরত ওসমান ঠিক এমনি এক ভয়ঙ্কর প্রজাবিদ্রোহের সম্মুখীন হ'য়ে মারা যান। হজরত ওস্মান ছিলেন হজরত মুহম্মদের অন্যতম প্রিয়তম পার্ষদ, অথচ তাঁর এই দুর্ভাগ্য ও লাঞ্ছনা। হজরত ওসমানের ন্যায় আমানুল্লাহ্ আজরাইলের মৃত্যুশীতল স্পর্শ পান নাই এই যথেষ্ট। শুধু হজরত ওসমান নন্, হজরত আলীকেও এই ভাবে নাকাল করেছিল প্রজাবিদ্রোহীদল। সুতরাং ইসলামের ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে যে এটা নতুন কিছু নয়। কিন্তু জিজ্ঞাসা হচ্ছে, হজরত আলী বা হজরত ওসমানের বিরুদ্ধ উত্থানের যেসকল মূলীভূত কারণ, তার সঙ্গে অমানুল্লার বিরুদ্ধে উত্তেজিত দলের কোন সামঞ্জস্য আছে কি? এ প্রশ্নের উত্তরে ইসলামিক ইতিহাসের অতি আনাড়ীও উত্তর দিবে যে, অমানুল্লার সঙ্গে ওর কোনই সৌসাদৃশ্য নেই।

ইসলাম ধর্ম্মের ইতিহাস খুঁজলে দেখ্‌তে পাওয়া যাবে গোঁড়া দল চিরদিনই গোঁড়া, তাঁদের পরিবর্ত্তন কোন দিনই হয় নাই, অথচ ইসলামের চিন্তাপ্রণালীতে অসম্ভব রকম প্রশস্ততা ও উদারতা দেখা দিয়েছে। সুফীমতবাদ, মোতাজেলা মতবাদ, ইসমাইলি মতবাদ, এ সকলের উপযুক্ত সাক্ষ্য। ইসলামকে নূতন ক'রে রূপ দেবার চেষ্টা চিরদিন থেকে চ'লে আস্‌ছে। আমরা যদি অলোকসামান্য পণ্ডিত ও সুফীসাধক আল-গাজ্জালীর দার্শনিক ব্যাখ্যা ও মতবাদ আলোচনা করি তা হ'লে দেখ্‌তে পাব ইসলামকে তিনি নতুন ক'রে গ'ড়ে তুলেছেন। অথচ এই পণ্ডিত গাজ্জালীর বইগুলো কর্ডোভায় আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল; শুধু তাই নয়, তিনি কাফের আখ্যায় ভূষিত হয়েছিলেন। সাধারণ লোকের কাছেও তাঁকে যথেষ্ট নিগ্রহ ভোগ করতে হয়েছিল।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, যাঁরাই ইস্‌লামের মঙ্গল সাধনে চেষ্টা করেছেন, নতুন ভাবে চিন্তা করেছেন তাঁরাই যথেষ্ট অপমান সহ্য করেছেন। আমানুল্লাহ্ কামালপাশা প্রভৃতি পুরাতন ইস্‌লামকে নতুন দিনের আলোতে দেখতে চেষ্টা পেয়েছেন, যেখানে তার দৈন্য, তার গ্লানি, তার কদর্য্যতা ধরা পড়েছে তাঁরা তা প্রাণ-পণ চেষ্টা ক'রে ধুয়ে মুছে ফেলতে চেয়েছেন। বহুদিনকার জীর্ণ ও শ্লথ আচারগুলিকে তাঁরা দূরে ছুঁড়ে ফেল্‌তে চেয়েছেন। মানুষের মন চিরদিন পুরাতনকে আঁক্‌ড়ে ধ'রে রাখ্‌তে চায়, গলিত সংস্কার-গুলিকে রুগীর মত বেমালুম হজম করতে চায়, মমতায় সেগুলিকে বুকের কাছে তুলে ধরে। যে যা বলুক, তাতে মন না দিয়ে সেগুলোকে নিষ্ঠুরভাবে আঘাত করবার দুঃসাহস যাঁরা

জরীন কলন ও শিরীন কলন

রাখেন তাঁরা দুঃখ ভোগ করবেন তাতে আশ্চর্য্য কিছুই নেই।

আমানুল্লাহ যে সিংহাসন ত্যাগ করেছেন তাতে প্রথম খুব আশ্চর্য্য লাগলেও গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে যে এটা বিচিত্র নয়। বিদ্রোহী প্রজার দল যে সকল সর্ত্ত দিয়েছে তাতে বেশ বুঝা যায় আমানুল্লাহ্ কোন পথের যাত্রী এবং কোনখানে প্রজাদের কুসংস্কারে আঘাত লেগেছে। নীচে

সর্দ্দার আলি আহ্মদ জান

সর্ত্তগুলা তুলে দিচ্ছি, তা হ'লে বোঝবার পক্ষে সুবিধে হ'বে।

(১) রাজা ৫০ জন সভ্যকে লইয়া একটি পরিষদ গঠন করবেন। এই পরিষদের অধিকাংশ সভ্যই মোল্লাশ্রেণীর মধ্য হ'তে গ্রহণ করতে হবে এবং বাকি সদস্যগণও আফগানীস্তানের বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের মধ্য হতে হবে। পরিষদ সামরিক, রাষ্ট্রীক এবং ধর্ম্ম প্রভৃতি সর্ব্ববিষয়ে পূর্ণ কর্তৃত্ব খাটাবেন।

(২) রাজা যে নিজে একজন খাঁটি মুসলমান তা' তাঁকে প্রমাণ করতে হবে। অর্থাৎ মুসলমান ধর্ম্মের বিধান অনুযায়ী সমস্ত প্রকার রীতি-নীতি তাঁকে মেনে চলতে হবে।

(৩) ফৌজদারী এবং দেওয়ানী সমস্ত প্রকার মামলা-তেই বিবদমান দল স্ব স্ব পক্ষে উকীল মোক্তার নিযুক্ত করতে পারবেন। (পূর্ব্ব নিয়ম ছিল, কোন সাক্ষী বা প্রতিনিধি কোন মামলায় খাড়া করান চলবে না। একজন জজ বিচার করতেন এবং তাঁর সঙ্গে কোন জুরি থাকত না।)

(৪) যে ৫০টি বালিকাকে চিকিৎসা বিদ্যা শেখাবার জন্য তুরস্কে প্রেরণ করা হয়েছে, তাদের ফিরিয়ে আনতে হবে।

(৫) বর্ত্তমান বাদশাহ্ ভারতের দেওবন্দ্ মাদ্রাসার মোল্লাদের আফগানিস্তান-প্রবেশ নিষিদ্ধ করেছিলেন। এই নিষেধাজ্ঞা তুলে দিতে হবে।

(৬) যে সমস্ত গবর্ণমেণ্ট অফিসার ঘুষ লবে এবং যারা তাদের ঘুষ দেবে তাদের সকলকেই অতি কড়াকড়ি ভাবে শাস্তি দেওয়া হবে।

(৭) রমণীগণ ঘরের বাহিরে এলে অবগুণ্ঠন পরতে হবে এবং কড়াকড়ি ভাবে পর্দ্দা রাখতে হবে।

(৮) মোল্লা ও মৌলবীকে কোনও সুপ্রতিষ্ঠিত মর্য্যাদাশালী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে সার্টিফিকেট ও ডিপ্লোমা গ্রহণ করতে হবে না।

(৯) বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষার আইন পরিত্যক্ত হবে।

(১০) যে কোন আফগান প্রজা মদ্য পান করবে তাকেই অতি গুরুতররূপে শাস্তি দেওয়া হবে।

(১১) মোল্লারা যে কোন ব্যক্তিকে রাস্তায় থামিয়ে তাকে মোস্লেম আইন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করবার অধিকার পুনরায় পাবেন। ইসলামীয় বিধান সম্পর্কে যার অজ্ঞতা প্রকাশ পাবে, তাকেই কঠোর শাস্তি দেওয়া যাবে।

(১২) শুক্রবারই পুরাতন রীতি অনুসারে ছুটির দিন ছিল, এই নীতি পুনরায় চালাতে হবে।

(১৩) স্ত্রীলোকদিগকে বোরকা পরতে হবে। রাণী

সুরাইয়া এবং অন্য কোন রমণীই কোন প্রকার ইউরোপীয় পরিচ্ছদ পরতে পারবেন না।

(১৪) বাদশাহ্ আবার লোকদিগকে প্রত্যেক জেলার সম্মানিত ফকির প্রভৃতির নিকট যেতে অনুমতি দেবেন।

জেনারেল নাদির খান

লোকেরা এই সমস্ত সাধু ব্যক্তির পদচুম্বন করতে এবং তাঁদের পদসমক্ষে ভূলুণ্ঠিত হতে পারবে। এই সব সাধুব্যক্তি যে সমস্ত উপদেশ দেবেন তাই দেশের আইনের মত পালিত হবে এবং গবর্ণমেণ্ট কিম্বা অন্য কেহই তাতে কোন প্রকার বাধা দিতে পারবে না।

(১৫) বালকেরা স্কুলে পড়বার সময়ও বিবাহ করতে পারবে।

(১৬) জামিন প্রভৃতি না রেখেও লোকে টাকা ধার নিতে বা ধার দিতে পারবে এবং এই পুরাতন বিশৃঙ্খল নীতিই বজায় রাখতে হবে।

(১৭) বালিকাদের স্কুল সমূহ অবিলম্বে বন্ধ করে দিতে হবে।

(১৮) যে কোন ব্যক্তি মুস্‌লিম আইনসম্মত যে কোন পোষাক পরতে পারবে।"

এই সত্তের কতকগুলি এমন ছেলেমি ও মোল্লাকী যে, বর্ত্তমান যুগে সেগুলো আত্মহত্যার নামান্তর মাত্র। সতের নম্বরের প্রস্তাবটির কথা ধরা যাক্। বালিকাদিগের ইস্কুল অবিলম্বে বন্ধ ক'রে দিতে হবে। আমানুল্লাহ্‌কে সিংহাসন থেকে তাড়ানোর যদি এই সব কারণ হয়, তা হ'লে বল্‌তে হবে আফগান জাতি কত পিছু ও নীচুতে প'ড়ে আছে। আজ সমগ্র বিশ্বজগৎ জুড়ে মানব-জাতির জয়যাত্রার গান সুরু হয়েছে, এখনও যদি তাকে বিকল, স্থবির ক'রে রাখ্‌তে চায়, মধ্যযুগের সিন্দবাদের ঘাড়ের বুড়োর মত কুসংস্কারগুলি পরম নির্ব্বিকারচিত্তে ও ভয়ভাবনাহীন হ'য়ে চলে, তা হলে ও জাতির উন্নতির আশা সুদূরপরাহত।

ইনায়েতুল্লাহ্ খান

জগৎ চল্‌ছে ভবিষ্যতের দিকে। পিছনদিকে ফেরবার অবসর তার নেই। এখন যারা পিছন পানে টান্‌তে চায় তারা বিশ্বদ্রোহী। সৃষ্টির আদিম প্রভাত হ'তে নব নব রূপে জগত গৌরবময় ভবিষ্যতের আদর্শের সন্ধানে বের হয়েছে। সুতরাং আমানুল্লাহ্ জগতের সঙ্গে

সমান তালে পা ফেলে চলবার জন্য চেষ্টা করেছিলেন এবং সেই জন্যই তাঁকে সিংহাসন ত্যাগ করতে হয়েচে। তথাপি বল্‌তে হ'বে আমানুল্লাই সত্য সত্যই বীর। তিনি প্রকৃত যোদ্ধারই ন্যায় কাজ করেছেন।

আমানুল্লাহ্ সিংহাসন ত্যাগ করার পরে ইনায়েতুল্লাকে রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট করান। আমানুল্লাহ্ বোধ হয়

বাচ্চা-ই-সা'কো।

কাণ্ডজ্ঞানহীন অর্বাচীন মোল্লাদলের জুলুম হ'তে আফগানকে বাচানোর জন্য, অযথা রক্তপাত হ'তে দেশকে বাঁচানোর জন্য আপন ভ্রাতা সূফী-প্রকৃতির ইনায়েতুল্লাকে সিংহাসন প্রদান করেন। কিন্তু যে আগুন একবার শুষ্ক কাঠে লেগে জ্ব'লে ওঠে, সে আগুন কাঁচা কাঠও পুড়িয়ে দেয়। এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হ'লনা। ইনায়েতুল্লা সে মোল্লা-বিদ্রোহের আগুন নিভাতে পারলেন না। তাঁকে পেয়েও তারা খুসী হ'লনা। মানুষের মধ্যে যে হিংস্রতা আছে, যে রক্তলোলুপতা সুপ্ত আছে তা একবার জেগে উঠলে আর সহজে মিটতে চায় না। বিদ্রোহী দল ধ্বংসের তাণ্ডবে মেতে উঠল। তারা শত সহস্র নিরীহ মানুষের রক্তে আফগান প্লাবিত ক'রে দিল। তারা রক্তের হোরী খেলা আরম্ভ করল। তারা সাদাসিদে মানুষ ইনায়েতুল্লাকেও সিংহাসন থেকে তাড়ানোর জন্য দৃঢ়বদ্ধ হ'ল।

এই বিদ্রোহী দলের সর্দ্দার বাচ্চা-ই-সাকো শেষকালে আপনাকে রাজা ব'লে ঘোষণা করবার মতলবে মেতে উঠল। শক্তির একটা মত্ততা আছে। ভিশ্‌তীর ছেলে বাচ্চা-ই-সাকো এই শক্তির নেশায় বিভোর হ'য়ে গেল। তার ব্যক্তিগত দুরাকাঙ্ক্ষার পরিপূরণের জন্য বিদ্রোহী আগুন বেশী ক'রে ছড়িয়ে দিল।

ইনায়েতুল্লা সিংহাসনে বসতে না বসতেই চারিদিক থেকে বিদ্রোহ আরো তুমুল বেগে ঝড়ের মত বইতে শুরু করল। বাচ্চা-ই-সাকোর সৈন্যদল জালালাবাদের মনোরম প্রাসাদ ভস্মীভূত ক'রে দিল। ইয়োরোপ হ'তে সংগৃহীত যে সকল চারু শিল্পের নিদর্শন ছিল তা পুড়িয়ে দেওয়া হ'ল। বাচ্চা-ই-সাকো কান্দাহার দখল ক'রে ফেল্‌লে। বাচ্চা-ই-সাকো নিজেকে কাবুলের রাজা ব'লে ঘোষণা করল।

আমানুল্লা মনে করেছিলেন ইনায়েতুল্লাহ্ বাদশাহ্ হ'লে বোধ হয় বিদ্রোহ নিভে যাবে কিন্তু তাঁর সে আশা সফল হয় নি। প্রত্যুত আফগানে অশান্তি চারিদিক থেকে প্রধূমিত হ'য়ে উঠছিল। বাচ্চা-ই-সাকো সিংহাসন অধিকার করার সঙ্গে সঙ্গে আলী আহমদ জানও সিংহাসন দখল করবার চেষ্টা পেতে লাগলেন। আফগানিস্থান অরাজক হ'য়ে উঠল। এখনও এই অরাজকতা পূর্ণমাত্রায় চল্‌ছে। বিভিন্ন যুধ্যমান শক্তি সিংহাসনের জন্য উদ্‌গ্রীব হ'য়ে রয়েছে।

গৃহলক্ষ্মী

—গল্প—

—শ্রীবাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায়

স্ত্রী মারা যাইবার পর হইতে অমিয়র বাড়ীতে রোজ আড্ডা বসিত। বিশেষ কারণ না ঘটিলে আড্ডা বসা বন্ধ হইত না। চা এবং জলযোগের পর সেই যে গল্প চলিত, রাত্রি দশটার আগে শেষ হইত না।

নিত্যকারের মত আজও মজলিস্ জমিয়া আসিতেছিল, এমন সময়ে গৃহকর্ত্তার একটা অসতর্ক কথায় গল্পের ধারাটা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল।

পাশেই একটা বাড়ী আছে, এতদিন খালি ছিল, আজ দিন দুই হইল ভাড়া আসিয়াছে। বারান্দায় লাল-পেড়ে একটা শাড়ি শুখাইতেছিল, সেটা আর তোলা হয় নাই। গ্যাসের আলোয় পাড়টা বেশ উজ্জ্বল দেখাইতেছিল। অমিয় সেই দিকে চাহিয়া এক সময়ে বলিয়া উঠিলেন, মেয়েমানুষ না থাকলে ঘরে লক্ষ্মী থাকে না। ঘরের সৌন্দর্য্যই হয় না।

সকলে একটু বিস্মিত হইয়া অমিয়র দিকে চাহিল। অমিয় পুনরায় কহিলেন, 'ওই যে বাড়ীটা এতদিন খালি পড়েছিল, তখনও যেমন মনে হ'ত, যখন একপাল কেরাণী এসে মেস খুললে, তখনও ঠিক তেমনিই মনে হ'ত। আজ একটা শাড়ি শুখুতে দেখে মনে হচ্ছে, হ্যাঁ, এতদিনে ঘরটা ভরলো বটে!

একজন বলিল, তা তোমার ঘরটা এমন ক'রে খালি রেখেছো কেন, অমিয় দা'?

অমিয় একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন, আমার ত' শেষকালে এসে ঠেকেছে, এখন আমার পক্ষে ভরা ঘরও যা, শূন্য ঘরও তাই।

লোকটি বলিল, সে কেমন ক'রে হয়, অমিয় দা'? এই শেষকালেই ত' ভরা-ঘরের দরকার, নইলে কিসের ভরে চলবেন?

অমিয় প্রসঙ্গটা চাপা দিবার জন্য বলিলেন, আচ্ছা, আচ্ছা, থাক্—

কিন্তু এত বড় একটা কৌতুকের সন্ধান পাইয়া বন্ধুরা চুপ করিয়া থাকিতে রাজী হইলেন না। তাঁহারা নানারূপে এই কথাটাই বজায় রাখিলেন।

এজন্য অমিয়র সেদিন লজ্জা ও ক্ষোভের শেষ রহিল না।

অবশেষে এই স্থির হইল, অমিয়'র যখন ভোগ করিবার মত সম্পত্তি আছে, অথচ ভাগীদার কেহ নাই, এবং যখন তাঁহার বয়স একেবারে উত্তীর্ণ হইয়া যায় নাই, অথচ বাংলা দেশে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে মেয়ে আছে, তখন শুভস্য শীঘ্রম্—পাত্রী দেখিতে যেন কোনরূপ বিলম্ব বা ত্রুটি না হয়।

সেদিনকার সভায় ইহাই স্থির হইয়া সভা-ভঙ্গ হইল, এবং যাইবার সময়ে সকলে বলিয়া গেলেন, তাঁহারা যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন। অমিয় অতিশয় লজ্জিত হইয়া বন্ধুদের তিরস্কার করিতে লাগিলেন।

হরিঠাকুর আজকের আলোচনায় বড় একটা যোগ দেন নাই। যাইবার সময় অমিয়কে বলিলেন, ভায়া ও-কাজটি ক'রো না। একেবারে মরবে।

অমিয় তাড়াতাড়ি তাঁহার হাতটা চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, তুমিও কি পাগল হ'লে নাকি, দাদা?

হরিঠাকুর মাথা নাড়িয়া বলিলেন, ও সব কথা কোন কাজের নয়, ভাই! শেষ পর্য্যন্ত হয়ত' পাগল হবে তুমিই। একটু বুঝে কাজ ক'রো। একটু থামিয়া বলিলেন, বেশ আছো, কেন ঝঞ্ঝাট বাড়াবে? আমার হালটা দেখছো ত'? এখন শূন্য ঘরে হাওয়াটা পাচ্ছো, তখন ভরা-ঘরে নিশ্বাস পর্য্যন্ত বন্ধ হ'য়ে আসবে। এ একেবারে খাঁটি কথা, ভাই।

শ্রীবাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায়

অমিয় কি যে বলিবে ভাবিয়া পাইল না। শেষ পর্য্যন্ত আম্‌তা-তামতা করিয়া কিছুই বলিতে পারিল না,—তাড়াতাড়ি ভিতরে চলিয়া গেল।

ইহার পরের কয়দিনের মজ্‌লিসে এইটাই আলোচনার বিষয় হইয়া রহিল। কে কতদুর অগ্রসর হইল, কোন পাত্রীটি দেখিতে কেমন, কাহার ভাই-ঝি এখনও অনূঢ়া রহিয়াছে,—সমস্তক্ষণ ধরিয়া ইহারই হিসাব-নিকাশ চলিত। ধূমধাম কিরূপ হইবে, খাওয়ার আয়োজনই বা কেমন হইবে, এ সকল কোন ব্যাপারটাই বাদ পড়িত না। অমিয় কোনমতে ইহাদের চুপ করাইতে না পারিয়া অবশেষে ভয় দেখাইলেন এ সকল কথা হইলে তিনি বৈঠক বন্ধ করিয়া দিবেন। কিন্তু কথাও বন্ধ হইল না, বৈঠকও চলিতে লাগিল। অগত্যা অমিয়কে নীরব হইয়া থাকিতে হইত।

একদিন বন্ধুরা আসিয়া শুনিলেন, অমিয় কোথায় গিয়াছেন, আসিতে চার-পাঁচ দিন দেরী হইবে। বুঝিতে কাহারও বাকী রহিল না। বন্ধুরা বলিতে লাগিলেন, অমিয়কে এত শীঘ্র ভীমরতি ধরিবে, তাহা তাঁহারা আশা করিতে পারেন নাই। আর দু'টো দিন সবুর সহিল না, ইত্যাদি।

হরিঠাকুর বলিলেন, তোমরাই ত' ওকে নাচিয়েছো। এখন সব হাততালি দিচ্ছো।

আর সকলে রুখিয়া উঠিয়া বলিলেন, কি রকম? আমরা নাচালুম, না উনি আগে থেকেই নাচতে সুরু করেছিলেন! নইলে এত শিগগির—

অমিয়র চার-পাঁচ দিনের জায়গায় বার দিন কাটিয়া গেল।

বাড়ী ফিরিয়া অমিয় বন্ধুদের খবর পাঠাইলেন, তাঁহারা যেন সকাল সকালই সভা আলোকিত করিতে আসেন।

সকলে প্রায় এক সঙ্গেই আসিলেন। কথাবার্ত্তা কিরূপ হইবে, পূর্ব্ব হইতেই স্থিরীকৃত ছিল। বিলাস বেশ একটু গম্ভীর চালে বলিল, তারপর দাদা, এতদিন কোন মথুরাপুরী আলো করতে গিছ্‌লে?

এই কথাতেই অমিয়র মুখখানা বিলাতী বেগুনের মত লাল হইয়া উঠিবে, সকলে এইরূপই আশা করিয়াছিলেন, কিন্তু অমিয়র মুখে সেরূপ কোন ব্যতিক্রমই দেখা গেল না। বরং একমুখ হাসিয়া বলিলেন, আমি আর কোন মথুরাপুরী আলো করবো বল? এই মর্ত্ত্যপুরীর জন্যই একটা আলো আন্‌তে গেছ্‌লুম। পরে পাশের বাড়ীর রেলিংএর দিকে চাহিয়া বলিলেন, মা লক্ষ্মীকে বলবো যেন ওদের দেখিয়ে দেখিয়ে কাপড় শুখুতে দেয়। আর তোমরাও দেখবে, ঘর আলো হয় কিনা! বলিয়া পরম পরিতৃপ্তিতে সকলের মুখের দিকে চাহিতে লাগিলেন।

সকলে অবাক্ হইয়া গেল। বিশেষ কিছুই বোঝা গেল না। অবশেষে হরিঠাকুর অন্ধকারে শেষ অস্ত্র ছুঁড়িলেন। বলিলেন, নিদেন বৌমাটিকে একবার দেখতেও ত' পাবো!

অমিয় তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, নিশ্চয়ই, তাতে আর কোন সন্দেহ আছে? তবে ভায়া সবুরে মেওয়া ফলে। বনের পাখী, এখনও ধড়ফড় করছে, এখনই টেনে আনাটা কি ভালো? তা'র চেয়ে আজ মা-লক্ষ্মীর হাতের এক কাপ ক'রে চা হ'ক। কি বল? রোজ রোজ চাকরের হাতে— বলিতে বলিতে অমিয় উঠিয়া ভিতরে চলিয়া গেলেন।

ব্যাপারটা তেমনই অন্ধকারে রহিল। এই বিষয় লইয়াই বন্ধুরা অনুচ্চ স্বরে কথা কহিতে লাগিলেন।

মিনিট তিনেক পরে অমিয় ফিরিয়া আসিয়া একটু অপ্রস্তুতের হাসি হাসিয়া বলিলেন, না ভাই, আজ আর লক্ষ্মীর কৃপা হ'ল না। চাকর ব্যাটার হাতেই আজ খেতে হবে। একটু থামিয়া বলিলেন, নতুন এসেছে, ভারী লজ্জা! বলে, আমি কি ও-সব জানি? সব জানে, এ শুধু লজ্জা বৈ কিছু না। হাজার হ'লেও ছেলেমানুষ ত'!

এইবার শান্তি স্পষ্ট করিয়া বলিল, একটু খুলেই বল না, দাদা! কোন্ লক্ষ্মীটি এলেন, তাঁর পরিচয় ত' কিছুই খুঁজে পাচ্ছি না।

অমিয় চোখ কপালে তুলিয়া বলিলেন, সে কি, তোমরা কিছু জান না?

অর্থাৎ লক্ষ্মীটির পরিচয় পূর্ব্ব হইতেই সকলের জানিয়া রাখা উচিত ছিল।

অমিয় লক্ষ্মীর পরিচয় দিলেন। গ্রামে তাঁহার সম্পর্কীয় এক বোন ছিলেন. এটি তাঁহারই পুত্রবধূ। তাঁহার হঠাৎ অনুপস্থিতির কারণ এই, এই ভগিনীটির শেষ অবস্থার কথা শুনিয়া তিনি গ্রামে যান। ভগিনীর অন্তিম-কার্য্য শেষ করিয়া অনেক বুঝাইয়া বোনের পুত্র ও পুত্রবধূকে আনিয়াছেন। সে জংলা দেশে তাহারা করিতই বা কি? কাজ-কর্ম্ম নাই, অভাব-অনটনও আছে,—এক্ষেত্রে তাহাদের এখানে আনাটা তাঁহার এক কর্ত্তব্যবিশেষ। তা ছাড়া তিনি নিজেও লক্ষ্মী বিনা লক্ষ্মীছাড়া হইয়া আছেন। তাঁহারও ত' দরকার ছিল।

সমস্ত ইতিহাসটা বলিয়া তিনি প্রচ্ছন্ন-পরিতৃপ্তিতে নীরব হইয়া রহিলেন।

ভৃত্য চা এবং পান আনিল।

চা'য়ে কয়েক চুমুক দিয়া বিলাস বলিল, তা হ'লে সপরিবারে দাদার ভাগ্নে এসেছেন। ভাগ্নে-বধূর স্থান অবশ্য অন্তঃপুরে, ভাগ্নেটি কি এক-আধবার বাইরে আসবেন না? পরিচয়টা ক'রে রাখা ভাল।

প্রস্তাবে সকলেই সায় দিলেন।

অমিয় বলিলেন, সে ত' বাড়ী নেই। বোধ হয় এখুনিই আসবে।

বিলাস অতিশয় উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিয়া বলিল, গ্রামের লোক, এসেই রাস্তায় বেরিয়েছেন, হারিয়ে না যান্।

তাহার কথার ধরণে অমিয় একটু আহত হইল, কিন্তু মুখে কিছু প্রকাশ করিল না।

সবাই যখন উঠি উঠি করিতেছেন, একজন লোক প্রবেশ করিল। দেখিতে কালো, মাথা নেড়া, মুখশ্রী বিশ্রী, কিন্তু শরীরটা বিশাল। আসিয়াই ঘরে এতগুলো লোক দেখিয়া প্রথমটা সে কেমন সঙ্কুচিত হইয়া গেল, পরে তাড়াতাড়ি ভিতরের দিকে চলিল। কিন্তু সে অতিক্রম করিবার পূর্ব্বেই অমিয় তাহাকে ডাকিয়া সকলের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিলেন! বলিলেন, এইটি আমার ভাগ্নে। বিপিন, এঁরা হচ্ছেন আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু। রোজই এঁদের সঙ্গে দেখা হবে তোমার।

বিপিন হাত তুলিয়া সকলের উদ্দেশ্যে নমস্কার জানাইল, ও মিনিট খানেক নীরবে দাঁড়াইয়া ভিতরে চলিয়া গেল।

অমিয় ভাগ্নেকে ইঙ্গিত করিয়া বলিল, কি রকম শরীরটা দেখলে ত'? ও এক ঘুসিতে একবার একটা সাহেবের মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিলো!

বিলাস ক্ষণকাল কি চিন্তা করিয়া কহিলেন, ভদ্রলোককে কোথায় দেখেছি ব'লে মনে হচ্ছে। আচ্ছা দাদা, ওঁর বাড়ীটা কোন গ্রামে?

অমিয় বলিলেন, গোবিন্দপুর।

বিলাস তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, তাই বল, গোবিন্দপুর! আমার এক মাসী ওখানে থাকেন। তোমাদের বাড়ীটা বামুন-পাড়ায় ত'? ওইখানেই বোধ হয় ভদ্রলোককে দেখেছিলুম। আচ্ছা, আজ উঠি, দাদা!

বাহিরে আসিয়া হরিঠাকুর বলিলেন, ভাগ্নেটিকে বেশ ওস্তাদ লোক ব'লেই বোধ হ'ল।

বিলাস প্রতিধ্বনি করিয়া বলিল, মামার সম্পত্তিটি মারবার মৎলব আর কি!

অমিয় ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, বিপিন স্ত্রীর সহিত কথা কহিতেছে। তাঁহাকে দেখিয়া কুন্তী তাড়াতাড়ি ঘোমটা টানিয়া দিল।

অমিয় নিকটে গিয়া সহাস্যে বলিলেন, অত ঘোমটা টানলে চলবে না, মা। ঘোমটাই যদি টানলে, তবে ছেলের দিকে দেখবে কি ক'রে?

কুন্তী চুপ করিয়া রহিল।

অমিয় পুনরায় কহিলেন, দেখ ত' মা, আজ তুমি চা'টা ক'রে দিলে না, এতগুলো ছেলেকে আশা থেকে বঞ্চিত করলে। সে যাক্, কাল থেকে আর যেন ও-ব্যাটা চাকরের হাতে চা খেতে না হয়। কি বল?

শ্রীবাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায়

কুন্তী সহসা কোন উত্তর করিল না। পরে ধীরে ধীরে কহিল, শুধু চা-টাই ক'রে দেবো। খাবার আমি করতে জানি না।

অমিয় মৃদু হাসিয়া বলিলেন, এখন তাই হ'লেই চলবে। পরে ধীরে সুস্থে সবই কাঁধ পেতে নিতে হবে;—মায় এই বুড়ো ছেলেটিকে পর্য্যন্ত। বলিয়া তিনি প্রচুর আনন্দে অন্যত্র চলিয়া গেলেন।

সেদিন আহারে বসিয়া অমিয় রাজ্যের গল্প জুড়িয়া দিলেন। কুন্তী নীরবে তাঁহাকে পাখা করিতেছিল, সে তেমনি নীরবেই রহিল। কচিৎ দু' একটা কথা কহিল।

এক সময়ে অমিয় বলিলেন, দেখ ত' মা, তুমি আসতে না আসতে খাবারের চেহারা বদলে গেছে। এ সব কি আর ঐ পাঁড়েটার কাজ! তুমি নিশ্চয়ই দেখিয়ে-শুনিয়ে দিয়েছ!

বাস্তবিকপক্ষে কুন্তী রান্নার ব্যাপারে কোন হাত দেয় নাই। কিন্তু কিছু বলা নিতান্তই বাহুল্য; তাই কুন্তী চুপ করিয়া রহিল।

অমিয় আজ যেন ঘোড়া দেখিয়া খোঁড়া হইল। বলিল, দুধের বাটিটা একটু এগিয়ে দাও ত', মা!

কুন্তী যেন একটু সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল।

অমিয় তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিল, দাও না, মা, দাও।

কুন্তী উঠিয়া পড়িয়া বলিল, আমি চিনি আনছি। বলিয়া সে চলিয়া গেল।

একটু পরে ঠাকুর চিনি দিয়া গেল। আরও ক্ষণকাল গেল, কুন্তী আসিল না। মনে মনে একটু বিস্মিত হইয়া অমিয় অবশেষে নিজেই দুধের বাটি টানিয়া লইলেন।

এমনি করিয়া দিন কাটিতে কাটিতে অমিয়র ভিতরের আকর্ষণে বাহিরের বন্ধনটা কমিয়া আসিতে লাগিল। ক্রমে এমনি দাঁড়াইল, বন্ধুরা আসিয়া ডাকিয়া না পাঠাইলে তিনি বাহিরে যাইতেন না। বন্ধুরাও গা' আলগা দিলেন। এত-দিনের সভাটা এমনি করিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল।

সভা যখন একেবারেই বন্ধ হইয়া গেল, তখন সহসা একদিন অমিয়র মনে বন্ধুদের স্মৃতি জাগিয়া উঠিল, এবং তাহাদের প্রতি যাহা ত্রুটি করিয়াছেন, তাহা পরিশোধনার্থে একদিন বন্ধুবর্গকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন।

রাঁধিল কুন্তী। কিন্তু পুর্ব্বের একটু ইতিহাস আছে।

সব কাজেই যেমন হইয়া আসিয়াছে,—কুন্তী ঘোরতম প্রতিবাদ করিয়া জানাইল, সে রাঁধিতে পারিবে না,—বিশেষত নিমন্ত্রণের রান্না। অমিয় বলিলেন, যাহার নাম কুন্তী, যে-লক্ষ্মীকে সে পল্লী হইতে কুড়াইয়া আনিয়াছে, সে কিনা রাঁধিতে জানে না?

অবশেষে অমিয়রই জিত হইল।

সেদিন অমিয়র এক উৎসব দিন। বন্ধুরা আহার্য্যের যত প্রশংসা করিলেন, তাহার চারগুণ তাঁহার বুক ফুলিয়া উঠিল।

তবে নাকি রাঁধিতে জানে না? সব লজ্জা,—কেবল লজ্জাতেই নিয়ত অবনত হইয়া আছে।

বন্ধুদের বিদায় দিয়া অমিয় সোল্লাসে অন্তঃপুরে ঢুকিলেন, এবং কিছুদুর যাইতেই বিপিনের ঘর হইতে কণ্ঠস্বর শুনিয়া থামিয়া পড়িলেন। বিপিনের উচ্চ কণ্ঠস্বরে তাঁহার মনে কেমন একটা সন্দেহ হইল। কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিবার পর তিনি স্থির বুঝিলেন, বিপিন স্ত্রীর সহিত বিবাদ করিতেছে। ছেলেমানুষী কাণ্ড ভাবিয়া চলিয়া যাইতেছিলেন, হঠাৎ কুন্তীর কথা অতি স্পষ্টভাবে তাঁহার কানে আসিল।

কুন্তী বলিল, তোমার কেমন মন জানি না, আমি পারছি না। এমন ক'রে ঠকাতে পারবো না।

উত্তরে বিপিন ধমক দিয়া একটা বিশ্রী ইঙ্গিত করিয়া কহিল, কেউটে সাপ যতই ধার্ম্মিক হ'ক, সুবিধে পেলেই ছোবলাবে।

অমিয়র কানে কে যেন গরম শিশা ঢালিয়া দিল। তিনি আর দাঁড়াইতে পারিলেন না, তাড়াতাড়ি চলিয়া গেলেন।

অন্তকার সমস্ত আনন্দ তাঁহার মন হইতে নিঃশেষে মুছিয়া গেল।

এক সময়ে কুন্তী তাঁহাকে আহার করিতে আহ্বান করিল। তিনি মাথা নীচু করিয়া আহারে বসিলেন, এবং সমস্ত ক্ষণ একটি কথাও কহিলেন না। যেন সমস্ত অপরাধ তাঁরই।

ইহার পর তাঁহার মনে আর তিলমাত্র শান্তি রহিল না। কেবলই তাঁহার মনে জাগিতে লাগিল, তাঁহারই এই আচ্ছাদনতলে একটি নারী অপরিসীম লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা সহ্য করিয়া যাইতেছে। একটি প্রতিবাদও সে করে না। প্রতিকারের কোন উপায়ও নাই।

বিপিন ও কুন্তীর মুখ দুটো কেবলই তাঁহার মনে ভাসিয়া উঠিতে লাগিল, এবং নিজ মনেই বার বার বলিতে লাগিলেন, বাঁদরের গলায় মুক্তাহার—

এতদিন পরে একটা সমাধানও খুঁজিয়া পাইলেন। কুন্তী কেন প্রতিপদে একটু কুণ্ঠিত ও সঙ্কুচিত হইয়া চলিত, তাহার ব্যবহারে কেন এমন একটা দূরত্বের ব্যবধান থাকিয়া যাইত, —তাহার কারণ অতি স্পষ্টরূপে তিনি দেখিতে পাইলেন।

সবের মূলে ঐ বিপিন।

সেই হইতে অমিয় কুন্তীর সহিত আর ভাল করিয়া কথা কহিতে পারিতেন না। মুখ তুলিয়া কুন্তীর দিকে চাহিলেই মনে হইত, তাহার সমস্ত মুখখানা বিষাদ ও ম্লানিমায় পূর্ণ হইয়া আছে।

এই ভাবে বেশীদিন থাকিতে পারিলেন না। একদিন বিপিনকে ডাকিয়া স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করিলেন, সে বৌকে পীড়া দেয় কিনা।

বিপিন বিস্মিত হইয়া বলিল, কৈ, না।

অমিয় তাহাকে সহজে ছাড়িলেন না। বেশ করিয়া ভয় দেখাইয়া দিলেন।

কিন্তু সেই রাত্রে শুইয়া থাকিতে থাকিতে অমিয়র মনে বিপরীত ভাবনা ঢুকিল। ভাবিলেন বিপিনকে বকাটা ভাল কাজ হয় নাই। সে হয় ত' স্ত্রীকে এজন্য অধিক গঞ্জনা দিবে। চাই কি প্রহারও করিতে পারে।

তিনি আর শুইয়া থাকিতে পারিলেন না,—রাত্রের এই দুরন্ত শীতে কোঁচার কাপড়টা গায়ে জড়াইয়া বিপিনের ঘরের দোরে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

ঘরে কোন শব্দ নাই। গভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে কে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল, শুধু সেইটুকুই যা শোনা গেল।

অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়া অমিয় ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু আর ঘুম আসিল না। পায়ের দিকের জানালাটা একটু খুলিয়া দিয়া বাহিরে চাহিয়া রহিলেন। পাণ্ডুর জ্যোৎস্না যেন স্তরে স্তরে নিশ্চল হইয়া জমিয়া আছে; চাঁদ জানালার অন্তরালে কোথায় আছে, দেখা যায় না; আকাশে শুধু একটি তারা দেখা যাইতেছে। সেইদিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে অমিয়র মনে অনন্ত কালের এক স্মৃতি ভাসিয়া উঠিল।

ঠিক এমনিই সুন্দর একজনের রং ছিল। তাহার অন্তর বাহির এমনিই স্নিগ্ধ, এমনিই মমতাময় ছিল। আজ কতদিনের কথা, কিন্তু এখনও কত স্পষ্ট মনে আছে।

তাঁহার চোখ হইতে কখন দু'ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িয়াছিল, তাহা হাত দিয়া মুছিয়া ফেলিয়া আপন মনেই বলিতে লাগিলেন, আমাকে যে স্ত্রৈণ বলতো, মিছে নয়। এখনও কি না, এই বয়সে—বলিয়া নিজ মনেই একটু হাসিয়া পুনশ্চ কহিলেন, আর ক'দিনই বা! আমিও যাচ্ছি বড় বৌ, দেখবো কতদূরে থাকতে পারো!

পরদিন সকালে কুন্তীকে ডাকিয়া কহিলেন, মা আজ শরীরটা তেমন ভাল লাগছে না, ভাবছি কিছু খাবো না।

কুন্তী তাঁহার জাগরণ-ক্লিষ্ট মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, জ্বর হয় নি ত'? বলিয়া সহসা তাঁহার কপালে হাত ঠেকাইয়া বলিল, একটু যেন গরম বোধ হচ্ছে। ঠাণ্ডা লাগে নি ত'?

অমিয় ক্লান্ত স্বরে কহিলেন, কাল রাত্রে জান্‌লাটা একবার খুলেছিলুম, তারপর বন্ধ করতে ভুলে গেছি। বোধ হয় ঠাণ্ডাই লেগেছে।

সন্ধ্যার সময় অমিয়র জ্বরটা বাড়িয়া উঠিল।

কুন্তী অনেক রাত্র অবধি তাঁহার শিয়রে বসিয়া রহিল।

অমিয় বলিলেন, আর বসতে হবে না, মা, এইবার যাও। বুড়ো মানুষ, অমন একটু আধটু জ্বর ভোগ করতেই হয়।

কুন্তী কোন উত্তর করিল না। অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল, উঠিবারও কোন লক্ষণ প্রকাশ করিল না।

অমিয় এইবার আসল কথাটা পাড়িলেন। বলিলেন, বিপিন কি খেলো-না-খেলো দেখ'গে যাও,—সমস্ত দিন ত' এইখানেই ব'সে আছো; এইবার যাও, নৈলে রাগ করবে যে!

কুন্তী শুধু বলিল, না, রাগ করবেন কেন?

অমিয় একটু হাসিয়া বলিল, কার কাছে লুকুবে, মা, আমি সব জানি। বিপিন যে তোমায় কত তিরস্কার করে আমার অজানা নেই, সব জানি,--কিন্তু কি করি বল? বলিতে বলিতে বৃদ্ধ সহসা উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, সত্যি বল ত' মা, বিপিন কি তোমার গায়ে কোন দিন হাত তুলেছে?

কুন্তী কোন উত্তর করিল না, মুখটা যতদূর সম্ভব হেঁট করিয়া বুকের মধ্যে লুকাইয়া রাখিল। বৃদ্ধ উত্তরের অপেক্ষায় ক্ষণকাল বসিয়া থাকিয়া পুনরায় শুইয়া পড়িয়া অবসন্ন-কণ্ঠে কহিলেন, চোখের ওপর এ' কেমন ক'রে দেখি, মা?

কুন্তী এবারেও কোন উত্তর করিল না, মুখও তুলিল না। উচ্ছ্বসিত অশ্রু কোন মতে দমন করিতে না পারিয়া তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। এই কথাটা সে কোনমতেই বলিয়া আসিতে পারিল না যে, বিপিন তাহাকে যতই তিরস্কার করুক, আজ পর্য্যন্ত কোনদিন তাহার গায়ে হাত তুলে নাই।

অমিয়র জ্বর বিশেষ বাড়িলও না, কমিলও না। এমনি ভাবেই তিনদিন কাটিয়া গেল।

আজ বিকালে তাঁহার বন্ধুরা একসঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অমিয় উঠিয়া বাহিরে যাইতেছিলেন, কুন্তী বাধা দিয়া বলিল, ওঁরাই বরং এ-ঘরে আসুন।

তাহাই ঠিক হইল। বিপিন অভ্যাগতদের ভিতরে ডাকিয়া আনিতে গেল, কিন্তু মিনিট-দুয়েকের মধ্যে কেহই আসিল না। বাহিরে কিসের তুমুল তর্কের কোলাহল শোনা গেল, তারপর সব একসঙ্গে ভিতরে আসিয়া পড়িল।

শুধু বিপিন কোথায় সরিয়া পড়িল।

বিলাস প্রথমে ঘরে ঢুকিয়াই বলিল, তোমার এই জ্বরের ওপর বিরক্ত করতে এসেছি, কিছু মনে ক'রো না, অমিয়দা'—

অমিয় বলিলেন, না না, মনে কি করবো? পরে এক নূতন মুখ দেখিয়া বলিলেন, এঁর পরিচয় ত' জানি না?

বিলাস বলিল, ওঁর নাম হরি ভট্টাচার্য্য। আপনাদের ওই গোবিন্দপুরেই এঁর বাড়ী।

অমিয় হাসিয়া বলিলেন বেশ বেশ। আপনি কি এখানেই থাকেন?

আগন্তুককে আর সে কথার উত্তর দিতে হইল না। হরিঠাকুর বলিলেন, ইনি তোমাকে একটা কথা বলতে এসেছেন।

অমিয় হরি ভট্টাচার্য্যের দিকে চাহিয়া বলিলেন, বলুন।

হরি ভট্টাচার্য্য বলিলেন, আপনার ভাগ্নে বিপিনকে আমি বিশেষ ক'রে চিনি।

অমিয় বলিয়া উঠিলেন, তা ত' চিনবেনই। একজায়গায়ই বাড়ী।

বিরক্ত হইয়া বিলাস বলিল, আগে ব্যাপারটাই শোন না।

আগন্তুক পুনশ্চ কহিলেন, আপনার ভাগ্নে যাকে স্ত্রী ব'লে আপনার বাড়ীতে এনে রেখেছে, সে তার স্ত্রী নয়, একটা বেশ্যার মেয়ে।

অমিয় মুখ এবং চোখ যতদূর সম্ভব বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন, তার স্ত্রী,—কি বলছেন?

বিলাস আরও ভাল করিয়া ব্যাপারটা বুঝাইয়া দিয়া বলিল, রাস্কেলটা ত' বাইরে থেকেই পালিয়েছে। ঘরে যিনি আছেন, তাঁকে জিজ্ঞাসা ক'রে আসুন। প্রতারণা ক'রে আমাদের ওই স্ত্রীলোকটার হাতে খাওয়ান'র জন্যে

রাস্কেলটার নামে মোকদ্দমা আনতুম, শুধ্‌ধু তোমার জন্যে কিচ্ছু করছি না। দেখ ত' কি লজ্জার কথা,—ছি, ছি।

অমিয় কিছুক্ষণের জন্য স্তব্ধ হইয়া গেলেন। তারপর তাঁহার জ্বর, দুর্ব্বলতা,—সব ভুলিয়া গেলেন। ধীরে ধীরে বিছানা হইতে উঠিয়া বাহিরে আসিতেই দেখিলেন, কুন্তী মাটির সঙ্গে মাথা ঠেকাইয়া এক কোণে বসিয়া আছে।

তাহাকে দেখিয়া ক্রোধে অমিয়র ব্রহ্মরন্ধ্র অবধি জ্বলিয়া উঠিল। যাহা মুখে আসিল তাহাই বলিয়া যাইতে লাগিলেন।

যেন পাথরের মূর্ত্তিকে বলা হইতেছে—কুন্তীর নিকট হইতে একটা স্পন্দনও আসিল না।

অমিয়র বিপিনের কথা মনে পড়িল। কুন্তীকে আপাতত এইখানেই ফেলিয়া রাখিয়া তিনি বিপিনকে সারা বাড়ী তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিতে লাগিলেন।

বিপিনকে কোথাও পাওয়া গেল না। পুনরায় কুন্তীর নিকট ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, শিগ্‌গির বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাও! পাঁচ মিনিট সময় দিলুম, তারপরেও যদি ফের দেখতে পাই, তবে পুলিশ ডাকবো।

দারুণ শ্রমে তিনি আর কথা কহিতে পারিলেন না। কোনরূপে শয্যায় গিয়া চিৎ হইয়া পড়িয়া হাঁপাইতে লাগিলেন।

বন্ধুরা ততক্ষণ বাহিরের ঘরে গিয়া বসিয়াছেন।

কিছুক্ষণ শুইয়া থাকিবার পর অমিয়র মনে পড়িল, এই শয্যার উপরেই ওই মেয়েটা যে কতবার বসিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। মনে হইল এ সমস্তই অশুচি হইয়া গিয়াছে। এতদিনের পুঞ্জীভূত অপবিত্রতার মধ্যে বাস করিতে করিতে তাঁহার দেহের প্রতি রক্তকণাটা পর্য্যন্ত যেন কলুষিত হইয়া উঠিয়াছে।

মুহূর্ত্তের জন্যও তিনি আর এই শয্যার উপর থাকিতে পারিলেন না। উঠিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বাহিরে চলিয়া গেলেন।

পথে কুন্তীকে দেখিলেন। তাহার সর্ব্বশরীর কেমন নড়িয়া উঠিতেছে,—বোধ হয় কাঁদিতেছে। পাঁচ মিনিট সময়,—ইহার পরে তিনি নিশ্চয়ই পুলিশ ডাকিবেন।

অমিয়র অবস্থা দেখিয়া বন্ধুরা বিশেষ কিছু আর কেহ বলিলেন না। অল্পক্ষণ পরে এই অশুভ-ঘটনার জন্য দুঃখপ্রকাশ করিয়া সকলে চলিয়া গেলেন।

অমিয় একা চিন্তাভারাক্রান্ত মস্তিষ্ক লইয়া শুইয়া রহিল।

বাড়ীটা যেন নীরবতায় ডুবিয়া গেল।

একটু একটু করিয়া সন্ধ্যা নামিল। কোণ হইতে একটা চামচিকা নামিয়া বার দুই অমিয়র মাথার উপর দিয়া ঘুরিয়া জানালা দিয়া বাহির হইয়া গেল। পাশের বাড়ী হইতে তিনবার শঙ্খধ্বনি উঠিয়া অস্পষ্ট কোলাহলে মিলাইয়া গেল।

অমিয়র মনে সহস্রচিন্তা জুড়িয়া রহিল, কিন্তু বাহির হইবার একটি পথও পাইল না, শুধু ঘুরিয়া ঘুরিয়া হৃদয়ের মধ্যে এক বিরাট ঘূর্ণাবর্ত্তের সৃষ্টি করিল। ভৃত্য আলো জ্বালিতে আসিলে তিনি মুখ না ফিরাইয়াই তাহাকে নিষেধ করিলেন।

ঘরটা অন্ধকারে ভরিয়া গেল। এই অন্ধকারের মধ্যে শুইয়া থাকিতে থাকিতে একসময়ে অমিয়র সর্ব্বশরীর এক অভূতপূর্ব্ব স্পন্দনে বার বার কাঁপিয়া উঠিল। যে চিন্তা-গুলো এতক্ষণ তাঁহার মাথায় জোট পাকাইয়াছিল, হঠাৎ সেগুলো অতি স্বচ্ছ হইয়া অশ্রু-আকারে তাঁহার দুই-চোখ দিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

ভৃত্য জানিতে আসিল, রাত্রে তিনি কি আহার করিবেন। কোনরূপে আত্মসংযম করিয়া বলিলেন, কিছু না।

ভৃত্য আর দ্বিতীয় কথা কহিতে সাহস করিল না।

এমনি করিয়া কখন কোনখান দিয়া ঘণ্টাখানেক কাটিয়া গেল। এক সময়ে অমিয় উঠিয়া বসিলেন। কুন্তী নিশ্চয়ই চলিয়া গিয়াছে, তবু তাঁহার স্নেহাচ্ছন্ন মন বার বার বলিতে লাগিল, সে হইতেই পারে না,—এতবড় অপবাদ ঘাড়ে করিয়া সে নিঃশব্দে চলিয়া যাইবে, এ মোটেই বিশ্বাস্য নহে। অলক্ষ্মীর মধ্যে লক্ষ্মী বাস করিতে পারে না। কুন্তী কখনই অমন নহে। হয় ত' বিপিনই দোষী, কুন্তীকে অকারণ জড়ানো হইয়াছে।

শ্রীবাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায়

সহসা তাঁহার মন অনুতাপে ভরিয়া উঠিল। বিনা ‌বচারে এমন করিয়া কঠোর দণ্ড দিয়াছেন! সত্য নির্ণয় করিবার জন্য তিনি আকুল হইয়া উঠিলেন। ভিতরে গিয়া দেখিলেন, চাকরটা তাঁহার ঘরের সম্মুখে বসিয়া আছে। নিকটে গিয়া শুষ্ককণ্ঠে বলিলেন, চ'লে গেছে?

ভৃত্য সবই শুনিয়াছিল। বলিল, আজ্ঞে হ্যাঁ।

পুনরায় তিনি প্রশ্ন করিলেন, কখন গেল?

ভৃত্য বলিল, সন্ধ্যে বেলা। দাদা-বাবু গাড়ী এনে খড়কির দোর দিয়ে—

হতবাক্ অমিয়র মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল, তবে ক সত্যি?

ভৃত্য বিলাস এবং হরি ভট্টাচার্য্যের নিকট আসল ব্যাপারটা জানিয়া লইয়াছিল। বলিল, আজ্ঞে হ্যাঁ, সত্যি। কিন্তু দিদিমণির দোষ নেই, তেনার জন্মের পরে তেনার মা—

সমস্ত কথা শুনিবার জন্য অমিয় দাঁড়াইতে পারিলেন না। স্খলিতপদে বাহিরের ঘরে ফিরিয়া আসিয়া ফরাসের উপর শুইয়া পড়িলেন। চিন্তা ভাবনা কোনটাই তাঁহার মনে আসিল না। সুখ-দুঃখও তাঁহাকে স্পর্শ করিল না। কেবল এক বিরাট শূন্যতা তাঁহাকে অন্তরে বাহিরে ঘেরিয়া রাখিল। সহসা তাঁহার দৃষ্টি পাশের বাড়ীতে পড়িল। দেখিলেন, রেলিংএর উপর একটা লাল-পেড়ে সাড়ি শুখাইতেছে, এবং গ্যাসের অজস্র আলো গিয়া তাহার উপর পড়িয়াছে।

মৌনভঙ্গ

শ্রীনবেন্দু বসু

যত কথা ছিল বুঝি আজো ভুলে যাই,
যা' কভু তোমারে প্রিয়া হয় নি কো বলা.
এ জীবন হ'ল শুধু দিনে পথ চলা,
রাত্রি এসেছিল কত, লগ্ন আসে নাই।
বিরল বাসরে শুধু প'ড়ে আছে তাই
না-পরা সুরভিহার ছিন্ন ফুল দলা,
উৎসব-মুখর রাতি গন্ধদীপ-জ্বলা,
রজনীর শেষে তার ম্লানিটুকু পাই।
কথা নাই আছে ব্যথা, তারি রঙে আজো
অন্তরবাসিনী মোর নবরূপে সাজো।
সেটুকু জানিলে তাই আজো তো বাজিল
মিলন পুলকছন্দ চরণে তোমার,
মৌন মাঝে না বলার উপহাস ছিল,
ভেঙ্গে গেল পরিহাসে মুখর হিয়ার।

তুর্ক সাধারণ-তন্ত্রে নারীর মুক্তি

শ্রীমনোমোহন ঘোষ

একে প্রাচ্যদেশ, তাহার উপর ইস্‌লামের কঠোর ধর্ম্মানুশাসন। এই উভয় কারণে তুর্ক-নারীর বন্ধনের অন্ত ছিল না। এই বন্ধনের ফলে যে দুর্গতি ঘটিয়াছিল, তাহা যে একা নারীকেই ভোগ করিতে হইত তাহা নহে; পরন্তু অনুন্নত নারী-সমাজের জন্য সমগ্র জাতিকেই তাহার জীবন-সংগ্রামে পদে পদে বাধা পাইতে হইতেছিল। উন্নতিকামী নব্য তুর্কী সম্প্রদায় (Young Turks) এই সত্যটি ভাল করিয়া বুঝিয়াছিলেন বলিয়া নারী জাতির মুক্তিবিধানও তাঁহাদের কার্য্যতালিকাভুক্ত ছিল; কিন্তু তৎকালীন তুর্ক জনসাধারণের অন্ধতা ও রক্ষণশীলতার নিকট নব্য তুর্কীর বিপ্লবীগণকে হার মানিতে হয়। সুলতান দ্বিতীয় আব্দুল হামিদের স্বৈরচারকে বাগ মানাইতে পারিলেও জন-সাধারণের কুসংস্কারকে আঘাত করা তাহাদের শক্তিতে কুলায় নাই। এই কাজের জন্য কামাল পাশার মত লোকের অসাধারণ ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন ছিল। এই বীর-পুরুষের নায়কতায় ধ্বংসোন্মুখ তুর্কী যে কেবল গ্রীক্ আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিয়াছে তাহা নয়, পরন্তু সর্ব্ববিধ কুসংস্কার হইতে তাহার জাতীয় মন ও কর্ম্মশক্তিকে মুক্তি দান করিয়াছে। এই মুক্তিদানের উপায় হিসাবে নারী-জাতির মুক্তি সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য।

পরদা বা অবরোধ

তুর্ক নারীর সর্ব্ববিধ দুর্দ্দশার মূলে ছিল পরদা বা অবরোধপ্রথা। এই কুপ্রথার জন্য বাহিরের জগতের সহিত তাহার সম্পর্ক ছিল না বলিলেই হয়।

অস্বাস্থ্য, অজ্ঞতা, কুসংস্কার তুর্ক নারীর একচেটিয়া সম্পত্তি হইয়া দাঁড়াইতেছিল। অল্পশিক্ষিত হোজা বা মোল্লার কথা সে অভ্রান্ত বলিয়া বিশ্বাস করিত; রোগব্যাধি হইতে মুক্তি পাইবার জন্য মন্ত্র তন্ত্র ও মাদুলী-তাবিজের শরণ লইত, এবং জিন্, পরী, ডাইনী, শয়তান ও অন্যান্য উপদেবতার ভয়ে সর্ব্বদা সশঙ্ক থাকিত। বলা বাহুল্য এরূপ মার সন্তান হইয়া তুর্ক জাতির পক্ষে য়ুরোপের শক্তিমান্ জাতিদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় টিঁকিয়া থাকা বড়ই দুঃসাধ্য ব্যাপার ছিল। কারণ ঐ সকল জাতি আদর্শ গণতন্ত্র গড়িবার প্রয়াস করিয়াই তাহাদের শক্তিবৃদ্ধি করিয়াছে এবং গণতন্ত্র গড়িবার মূলে রহিয়াছে সাহসিকতা ও যুক্তিবাদ। তুর্ক শিশুরা যে এতদিন তাহাদের স্ব স্ব জননীর নিকট ইহার বিপরীত শিক্ষাই পাইত। কাজেই তুর্কী-গণতন্ত্র গড়িয়া উঠার প্রধান বাধা ছিল অন্তঃপুরে। এই জন্যই কামাল পাশা একদা বলিয়াছিলেন "নারী যেখানে দাসত্বে বদ্ধ এবং সমস্ত সমাজের দৃষ্টি যেখানে হারেমের কায়দাকানুন দ্বারা পঙ্গুত্বপ্রাপ্ত, সেখানে গণতন্ত্র স্থাপন করা যায় কিরূপে?" সঙ্গে সঙ্গেই তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, "এই সব বাজে জিনিষ বাদ দিতেই হইবে। তুর্কী এক নিখুঁত গণতন্ত্র গড়িতে যাইতেছে। দেশের অর্দ্ধেক লোককে দাসত্বে রাখিয়া নিখুঁত গণতন্ত্র স্থাপন কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? আজ হইতে দুই বছরের মধ্যে প্রত্যেক পুরুষ 'ফেজে'র বদলে 'হ্যাট্' পরিবে এবং প্রত্যেক নারী তাহার মুখ অনাবৃত রাখিবে। - নারীর সাহায্য একান্ত প্রয়োজন। দেশসেবার ন্যায্য অংশ বহন করিতে হইলে নারীর পক্ষে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রয়োজন।" কামালের এই প্রতিজ্ঞা ব্যর্থ হয় নাই। জাপানকে বাদ দিলে তুর্কনারী আজ এশিয়ায় অন্য সকল দেশের নারী অপেক্ষা অধিক ও পাশ্চাত্য নারীর সমান স্বাধীনতা ভোগ করিতেছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে তুর্ক-নারীর অতীতের সহিত বর্ত্তমানের তুলনা করিলেই এই স্বাধীনতার গুরুত্ব ভাল করিয়া বোঝা যাইবে।

শ্রীমনোমোহন ঘোষ

শৈশব ও শিক্ষা

জীবনের প্রথম এগার বার বছরই তুর্কী-নারীর পক্ষে একমাত্র আনন্দের সময় ছিল। এই সময়ই তাহাকে ঘোমটা পরিতে হইত না এবং অন্তঃপুরের বাহিরে বেড়ান বা পিতা ভ্রাতা ব্যতীত অন্য পুরুষের সঙ্গে কথা বলা তাহার পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল না। এই সময়ে বিদ্যাশিক্ষার জন্য সে মস্‌জিদ-সংলগ্ন ছেলেদের পাঠশালায় প্রেরিত হইত; ছেলেদের হইতে পৃথক ভাবে বসিলেও এক ঘরে এক শিক্ষকের নিকট শিক্ষালাভ করিত, ছেলেদের মত ছুটাছুটি করিয়া খেলাধূলা করিত, এমন কি অপরাধের জন্য ছেলেদের মত বেত্রদণ্ডও লাভ করিত। তবে এই বেত্রদণ্ডের একটু বিশেষত্ব ছিল; ছেলেদের মত মেয়েদের পায়ের তালুতে বেত মারা হইত না। তাহাদিগকে বেত মারা হইত হাতে। তুর্ক বালক-বালিকার এক পাঠশালায় পড়িবার কথায় অনেকে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে পারেন, কিন্তু এই তথ্য একজন খাঁটি তুর্কের স্বলিখিত বৃত্তান্ত হইতে পাওয়া গিয়াছে। *

মস্‌জিদের পাঠশালায় ছেলে মেয়েদের শিক্ষণীয় বিষয় ছিল লিখিতে ও পড়িতে শেখা, এবং অর্থ না বুঝিয়া কোরাণের কতিপয় বচন সুরসহকারে আবৃত্তি করা। কিন্তু উহারা যে প্রাথমিক পুস্তক পড়িত তাহার মধ্যে তথ্যের চেয়ে নীতি-উপদেশই বেশী থাকিত, যথা "আল্লাকে মানিয়া চলা উচিত কারণ তিনি ভাল ছেলেকে ভাল বাসেন এবং মন্দ ছেলেকে ঘৃণা করেন। আলি একটি সুবোধ ছেলে, সে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোকের লাঠি কুড়াইয়া দিয়া একটি সন্দেশ পুরস্কার পাইয়াছিল। সেলমা একটি ভাল মেয়ে, সে ভাল খাবার পাইলে তাহার ছোট ভাইকে অর্দ্ধেক দিয়া তবে খায়। ওর্‌খান্‌ দুষ্ট ছেলে, সে ওস্তাদের (শিক্ষক) প্রতি অভদ্র ব্যবহার করিয়াছিল তাই ভগবান তাহাকে ভাল বাসেন নাই।" ইত্যাদি।

তুর্ক বিদ্যালয়ে বালক-বালিকাদের একত্র-শিক্ষা—একটি ড্রয়িং ক্লাশ

* The Diary of a Turk. London. 1903. P. 30.

প্রাথমিক পুস্তক সমাপ্ত হইলে কেবল মেয়েদের পড়ার জন্য পৃথক পাঠ্য পুস্তক নির্দ্দিষ্ট ছিল। নিজ মাতার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিবে, স্বামীর প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিবে এবং শ্বশ্রূর প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিবে এই সকল সম্বন্ধে উক্ত পুস্তকে সবিস্তার উপদেশ থাকিত। শাশুড়ী অবশ্য ভাবী বধূদের পক্ষে একজন খুব মহামান্য ব্যক্তি, কিন্তু উক্ত গ্রন্থে স্বামীর উপরই বেশী জোর দেওয়া হইত নানাভাবে দেখান হইত যে স্বামী নামক পদার্থটিকে মানাইয়া চলা কেমন শক্ত। জানা গিয়াছে, এরূপ পুস্তক মেয়েরা খুব আগ্রহের সহিত পড়িত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষার্থিনী মেয়েদের পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট ডাঃ শ্রীযুক্ত দীনেশ-চন্দ্র সেন মহাশয়ের "গৃহশ্রী" নামক পুস্তকখানিতেও এই শ্রেণীর উপদেশ রহিয়াছে। * কাজেই তুর্কী এ বিষয়ে আমাদের মতই অগ্রসর ছিল বলিয়া মনে হয়। সে যাহাই হোক, অতীতে তুর্কীর প্রাথমিক শিক্ষা ছিল পূর্ব্বোক্ত রকমের। কিন্তু ইহা যে বেশী প্রাচীন সময়ের ইতিহাস তাহা মনে হয় না, কারণ শোনা যায় খুব আগে নাকি মেয়েদের পক্ষে লিখিতে শেখা নিষিদ্ধ ছিল। ইহা সত্য, যেহেতু সেকালের তুর্কীতে লিখিতে জানিতেন না এমন অনেক স্ত্রীকবি জন্মগ্রহণ করিয়া গিয়াছেন। অন্যে তাহাদের মুখ হইতে শুনিয়া লিখিয়া যাইত। মেয়েদের পক্ষে লেখা নিষেধের এই কারণ দেওয়া হইত যে, নানাবিধ মন্ত্র তন্ত্র লিখিয়া তাহারা তাবিজ, তুমার তৈরী করিবে ও ডাইনী হইবে। আসল কারণ কিন্তু ছিল অন্য প্রকার; সমাজপতিদের ভয় ছিল যে লিখিতে শিখিলে পর্দ্দার ভিতরে বদ্ধ থাকিয়াও তাহারা অনাত্মীয় পুরুষের সঙ্গে পত্রের আদান-প্রদান চালাইবে। ইহা শুনিয়া হাসি পাইতে পারে, কিন্তু স্ত্রী-শিক্ষা-প্রবর্ত্তনের আগে এদেশেও কি এই জাতীয় হাস্যকর ভয় ছিল না? সেকালের মুরুব্বিদের কেহ কেহ কি বলিতেন না যে, লেখা পড়া শিখিলে মেয়ে দুর্ভাগা ও বিধবা হইবে? নারী-স্বাধীনতাকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করিয়া এদেশে এক সময়ে যে ছড়া-গান ও নাটকাদি রচিত হইয়াছিল তাহার মনস্তত্ত্বও এই শ্রেণীর। অবশ্য এসকল বাধা স্ত্রী স্বাধীনতার অগ্রগতিকে রোধ করিতে পারে নাই। তবে তাহাতে বিশেষ ভাবে বিলম্ব ঘটিয়াছে। যাহা পাঁচ বছরে হইতে পারিত, তাহাতে পঞ্চাশ বছর লাগিয়াছে। কামাল পাশার দেশপ্রেম কিন্তু এরূপ দেরী সহ্য করিতে নারাজ, তাই তিনি নারী-স্বাধীনতার বিরুদ্ধে সামান্য মাত্র আন্দোলনকেও কঠোর ভাবে বাধা দান করেন। একবার কোন কাগজের ব্যঙ্গচিত্রে দেখান হইয়াছিল যে, নারী-স্বাধীনতার প্রতীকস্বরূপ এক বেলুন আকাশে উঠিবার চেষ্টায় ভারমোচনের জন্য 'নারী-ধর্ম্ম' (Women's virtues) নামক পদার্থটিকে নীচে ফেলিয়া দিতেছে। এই বিদ্রূপের জন্য কাগজের সম্পাদককে অভিযুক্ত করা হইলে আত্মপক্ষ

তুর্কী বালকবালিকাগণ একত্রে ড্রিল করিতেছে

* ৬ষ্ঠ সংস্করণের ১০২—১৩০ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

শ্রীমনোমোহন ঘোষ

সমর্থনের জন্য সম্পাদক বলিলেন যে, ছবিটি তিনি অপর কাগজ হইতে লইয়াছেন এবং উহাতে শুধু তুর্ক-নারীকে নয় পরন্তু সমস্ত নারীকে লক্ষ্য করা হইয়াছে, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। সম্পাদক মহাশয়কে কারাগারে যাইতে হইল। সংবাদপত্রের মতামতের প্রতি এরূপ কঠোরতা অবশ্য গণতন্ত্রের অনুকূল নহে, তবে যখন তুর্ক-নারীর অতীত দুঃখ ও ভাবী মঙ্গলের কথা মনে করা যায় তখন এই ব্যতিক্রমকে ক্ষমা না করিয়া পারা যায় না।

বর্ত্তমান তুর্কীতে নারীকে শুধু যে শিক্ষায় অবাধ সুবিধা দেওয়া হইয়াছে তাহা নয়, পরন্তু শিক্ষার পদ্ধতিও অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। তুর্করা আর মসজিদ-সংসৃষ্ট মোল্লার উপর ছেলে মেয়েদের শিক্ষার ভার দিতে রাজী নহে। উপযুক্তসংখ্যক মেয়ে-শিক্ষক তৈরী করিবার জন্য স্থানে স্থানে মেয়েদের নর্ম্মাল স্কুল স্থাপিত হইয়াছে। ঐ সকল বিদ্যালয়ে বহু নবীন তুর্ক-নারী জাতির শিক্ষাদাত্রীরূপে প্রস্তুত হইতেছেন। বর্ত্তমান ছেলে মেয়েদের যে সকল বিদ্যালয় আছে তাহাতে শিক্ষার বিষয়েও উন্নতিবিধান হইয়াছে। ইতিহাস শিক্ষার উপর জোর দেওয়া হইতেছে। এই ইতিহাসকে ভিত্তি করিয়াই নব্য তুর্কীর বালক বালিকাগণকে একদিকে জাতীয়ভাবাপন্ন (nationalist) অপর দিকে বিশ্বানুরাগী (internationalist) বা উদার করিবার চেষ্টা হইতেছে। আরবী ও পারসী পড়া তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। তৎপরিবর্ত্তে ছেলেমেয়েদের অনুসন্ধান ও পর্য্যবেক্ষণের ক্ষমতাবৃদ্ধির চেষ্টা হইতেছে। অণুবীক্ষণাদি যন্ত্র ব্যবহারের অভ্যাস করিয়া তাহারা জগৎকে নূতন ভাবে দেখিতে পাইতেছে। অঙ্কন (Drawing) অভ্যাস করিয়া তাহারা সৃজনীশক্তির চর্চ্চায় এক নূতন আনন্দলাভ করিতেছে।

কোন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গরীব ছাত্রগণ আহার করিতেছে

যে প্রণালীতে আগে শিক্ষাদান হইত তাহারও পরিবর্ত্তন হইয়াছে। মোল্লা-শিক্ষকের নীতি ছিল, 'Spare-the-rod—Spoil-the-child'। দেশের মুরুব্বিস্থানীয় লোকেরাও অবশ্য ইহাতে বিশ্বাস করিতেন। তুর্কী প্রবাদ বাক্যে আছে 'বেত্র স্বর্গের দান' অর্থাৎ বেত্রাঘাতের ফলে উচ্ছৃঙ্খল লোক শিষ্ট হয়। পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, এই শিষ্টতা অবলম্বন করাইবার জন্য মোল্লা-শিক্ষক মেয়েদেরও বেত্রাঘাত করিতে কসুর করিতেন না। কিন্তু তুর্কীর রাষ্ট্রনায়ক কামাল পাশা এই বর্ব্বরোচিত শিক্ষা-প্রণালীর বিরোধী। তাঁহার আদেশে শারীরিক দণ্ড শিক্ষাবিভাগ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছে। শিক্ষকেরা বর্ত্তমানের ছেলেমেয়েদের মনের ক্ষমতা বুঝিবার চেষ্টা করেন। তাহার ফলে শিক্ষার্থীরা শিক্ষকদের প্রতি অধিকতর অনুরাগী হইতেছে। ইহা ছাড়া মেয়েদের শিক্ষাসম্বন্ধে বিশেষ ব্যবস্থা এই যে, তাহাদের শরীরকে পটু ও কর্ম্মক্ষম করিবার দিকেও মনোযোগ দেওয়া হইতেছে। মেয়ে-

শিক্ষক তৈরী করার জন্য নর্ম্মাল স্কুল স্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে সুইডিস্ ড্রিল শিখাইবার বন্দোবস্ত আছে। একজন সুইডিস মহিলা প্রথম দল তুর্ক নারীকে (সংখ্যায় ত্রিশ) নয়মাসের মধ্যে সুইডিস্ ড্রিলের সমস্ত কোর্স শিখাইয়া দিয়াছেন। এই ব্যাপার হইতেই বোঝা যায় যে, তুর্ক-নারী কিরূপ আগ্রহসহকারে শরীরচর্চ্চায় মনোযোগ দিয়াছে। উক্ত ত্রিশটি নারী তুর্কীর বিভিন্ন স্থানের স্কুলে ছোট ছেলে-মেয়েদের ব্যায়াম-শিক্ষয়িত্রীরূপে কার্য্য করিবেন। বলা বাহুল্য ছোটমেয়েরা ছোটছেলেদের সঙ্গে বসিয়া যেমন পাঠাভ্যাস করে তেমনি তাহাদের সঙ্গে একত্রে দাঁড়াইয়া ড্রিল ব্যায়ামাদি চর্চ্চা করে। কে না বলিবে বর্ত্তমানের তুর্ক-বালিকা তাহার সেকালের দিদিমা'দের চেয়ে বেশি সৌভাগ্যবতী নয়?

যৌবনকাল ও পরদা

দশ এগার বছর শেষ হইতে না হইতেই তুর্ক-নারীর জীবনে এক মহা পরিবর্ত্তন আসিত। মা তাহার দিকে তাকাইয়া ভাবিতেন মেয়ে যে বড়-সড় হইয়া উঠিল ইহাকে 'সার্‌শফ' পরাইতে হইবে। এই চিন্তা কিয়দংশে আমাদের দেশের বিবাহের চিন্তার সঙ্গে তুলনীয়। 'সারশফ্' একটি বৃহৎ পাতলা জামার নাম; উহা পরিধান করিলে মাথার চুল হইতে পায়ের গোড়ালি পর্য্যন্ত সমস্ত ঢাকা পড়িত। বলা বাহুল্য এই অদ্ভুত পোষাকের দৌলতে নারীর স্বাভাবিক ভাবে চলাফেরার ব্যাঘাত ঘটিত; কিন্তু কেবল ইহাতেও রক্ষা ছিল না। মাথার উপর হইতে মুখের উপর একখণ্ড বস্ত্র ঝুলাইয়া অবগুণ্ঠন রচনা করা হইত। এই অবগুণ্ঠন পরার সঙ্গে সঙ্গে তুর্ক-নারীর পক্ষে সমস্ত জগৎ অন্ধকারময় হইয়া যাইত। তখন হইতে বেশীর ভাগ সময় তাহাকে হারেমের মধ্যেই কাটাইতে হইত, অথচ তাহার চেয়ে দুই এক বছরের ছোট ভগ্নিনীরা তখন আনন্দে ছুটাছুটি করিয়া বাহিরে বেড়াইতেছে। তাহাদের সম্বন্ধে তাহার কি ঈর্ষ্যাই না হইত! কিন্তু অতীতের তুর্ক-নারী এসমস্তই মুখ বুজিয়া সহ্য করিয়াছে। বর্ত্তমান কালে এ দিক দিয়া তুর্ক-নারীর মনে বিপ্লব ঘটিয়াছে; শুধু তুর্ক-নারী নয়, পশ্চিম এশিয়ার অন্যান্য দেশের মুসলমান নারীর মনেই আজ এদিক দিয়া মহা বিপ্লব ঘটিয়া গিয়াছে। সে আর তাহার পূর্ব্বের ন্যায় বদ্ধ থাকিতে রাজী নয়। (১) আশা করা যায় অচিরে এসকল দেশেও নারী তাহার যথার্থ অধিকার প্রাপ্ত হইবে। যে আব্‌হাওয়ার মধ্যে পরদা স্থায়ী হইতে পারিত, নারীর মনোজগৎ নানা ঐতিহাসিক কারণে আজ সেই আব্‌হাওয়া হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছে।

বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় পর্‌দা-প্রথার উল্লেখ নাকি কোরাণের কোথাও নাই। প্রেরিত পুরুষ মহম্মদের সময়ে বর্ত্তমান কালের মুসলমানদের চেয়ে বেশী নারী-স্বাধীনতা ছিল। এবং তাহার পরেও কিছুকাল পর্য্যন্ত মহম্মদের সময়ে আরব-নারীরা সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে যাইত এবং গান গাহিয়া সৈনিকদের উৎসাহিত করিত ও আহতগণের সেবা শুশ্রূষা করিত। (২) অবগুণ্ঠন-প্রথা আদিতে আরবদের মধ্যে ছিল না। তবে আরবদের চরিত্রগত দুর্ব্বলতার জন্য মহম্মদ উপদেশ দিয়াছিলেন (আইন করেন নাই) যে, বিবাহিতা নারীর পক্ষে মুখ ও কেশ আবৃত করা উচিত। কারণ সুন্দর ও সুদীর্ঘ কেশদামই নাকি বিশেষভাবে আরবদিগের মনোহরণ করিত। ইহা যদি সত্য হয় তবে বর্ত্তমান দিনের বব্‌ড্ (bobbed) ও শিঙ্গল্‌ড্ (shingled) চুল দেখিয়া মহম্মদ খুসী হইতেন নিশ্চয়। সে যাহাই হোক, মহম্মদ সকল নারীকেই অবগুণ্ঠন ব্যবহার করিতে বলেন নাই; কেবল বিবাহিতা নারীকেই তিনি মুখ আবৃত করিতে বলিয়াছিলেন। শোনা যায়, তিনি যখন ধর্ম্মোপদেশ দিতেন, তখন পুরুষ ও নারী একত্রে বসিয়া তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করিত। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও যে অবগুণ্ঠন-প্রথা তুর্কীতে বদ্ধমূল সংস্কাররূপে পরিণত হইয়াছিল তাহার কারণ বাইজান্তিয়ান্ প্রভাব। (৩)

(১) Grace Ellison—Turkey Today. London, 1928. p. 169.

(২) The Diary of a Turk. p. 51.

(৩) Turkey Today p. 130.

শ্রীমনোমোহন ঘোষ

বাহুবলে বাইজান্তিয়ান্ গ্রীক্‌গণকে পরাজিত করিলেও ঐতিহাসিক নিয়মে সভ্যতাসম্পদে হীনতর তুর্কী সুসভ্য গ্রীকদের অনুকরণ করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছিল। এইরূপ অনুকরণ প্রায়ই অন্ধ অনুকরণে পর্য্যবসিত হয়; তাহার ফলে আন্তরিক গুণগুলি আয়ত্ত না হইয়া বাহ্য দোষগুলিই সহজে অভ্যস্ত হইয়া আসে। গ্রীকদের শিল্প সাহিত্য দর্শন আয়ত্ত না করিয়া তুর্কী কাজে কাজেই তাহাদের ফেজ্ (Fez) ও অবগুণ্ঠন (অংশতঃ), হারেম ইত্যাদি খুব আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিল। (১) পাশ্চাত্য শিক্ষা এদেশে প্রথম প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে এদেশের একদল লোক যে হ্যাট্‌কোট্ পরিতে ও দেশ-ভাষাকে ঘৃণা করিতে সুরু করিয়াছিল তাহারও কারণ—অন্ধ অনুকরণের চেষ্টা।

পরদা-প্রথার জন্যই অধিকাংশ তুর্কনারীকে মস্‌জিদের পাঠশালার পাঠ সমাপ্ত করার সঙ্গে সঙ্গেই বিদ্যাচর্চ্চা সমাপ্ত করিতে হইত। কেবল অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে উদার মতাবলম্বী পরিবারের মেয়েরা অন্তঃপুরে থাকিয়াও ইংরেজ, জর্ম্মন বা ফরাসী গবর্ণেস বা শিক্ষয়িত্রীর নিকট শিক্ষালাভের সুযোগ পাইতেন। বর্ত্তমান তুর্কীতে স্ত্রীশিক্ষা আর অতিক্ষুদ্র সম্প্রদায়বিশেষের একচেটিয়া নহে। কনষ্টান্টিনোপলে মেয়ে-কলেজ স্থাপিত হইয়াছে ও অনেক নবীনা নারী উহাতে উচ্চাঙ্গের শিক্ষালাভ করিতেছেন।

বিবাহিত জীবন

'সারশফ' পরিধানের সময় হইতেই তুর্ক-কন্যাকে বিবাহ-যোগ্যা মনে করা হইত। যতদিন সে পাঠশালায় পড়িত ততদিন বিবাহ সম্বন্ধে তাহার কোন ভাবনা ছিল না, তবে তাহার পিতামাতা যে এ বিষয়ে উদাসীন থাকিতেন তাহা নয়; তাঁহারা খোঁজ করিতেন কোন উপযুক্ত বর পাওয়া যায় কিনা, কিন্তু মেয়ে পাঠশালা ছাড়িলে এবং 'সারশফ' পরিধান করিলে তাঁহাদের 'কন্যাদায়' রীতিমত আরম্ভ হইত। অন্য কোন ভাল কাজের অভাবে এবং আশে পাশের যে সকল কথা-বার্ত্তা চলিত তাহার প্রভাবে মেয়েও নিজ কল্পনায় বিবাহ ও প্রেমের কথা ভাবিতে সুরু করিত এবং ব্যগ্রভাবে অপেক্ষা করিত কবে তাহার সুখের স্বপ্ন সফল হইবে। অপেক্ষাকৃত অপরিণত বয়সে এরূপ ভাবপ্রবণতার অনুশীলন করাতে শীঘ্রই তাহার মধ্যেই এক অকালপক্কতা আসিয়া উপস্থিত হইত। এরূপ অস্বাভাবিক পক্কতা যে স্বাস্থ্যকর নয় তাহা কে অস্বীকার করিবে? আমাদের দেশেরও অনেক স্থানে এরূপ শোচনীয় অবস্থা লক্ষিত হয়। বালিকারা যৌবনপ্রাপ্ত না হইতেই মনের দিকে তাহাদিগকে প্রবীণা করিয়া দেওয়া হয়। যে বয়সে তাহাদের পুতুল খেলা করিবার কথা, সে বয়সে তাহারা সংসার পাতাইবার স্বপ্ন দেখিতে আরম্ভ করে।

বিবাহের আগে তুর্ক-নারীর পক্ষে ভাবী স্বামীকে দেখা সম্ভবপর ছিল না। মাতাপিতা ও ঘটকের দেখার উপরই তাহাকে নির্ভর করিতে হইত। তাহার ফলে অর্থ বা পদ-মর্য্যাদালোভী লোকদের কন্যাগণকে প্রায়ই বৃদ্ধ স্বামীর হস্তে পড়িতে হইত। বর ও কন্যার বয়সের প্রভেদ কোন কোন স্থলে ত্রিশ চল্লিশ এমন কি পঞ্চাশ বৎসরেও গিয়া ঠেকিত। অবশ্য পাশ্চাত্য দেশেও অল্পবয়স্কা নারীর সহিত বৃদ্ধের বিবাহ হয় না এমন নহে, কিন্তু তাহার সহিত তুর্কীর এই জাতীয় বিবাহের প্রভেদ ছিল। এ প্রসঙ্গে কোন ইংরেজ-মহিলা লিখিতেছেন, "আমাদের দেশে কোন পঁচিশ বছরের মেয়ে যখন পঁচাত্তর বছরের বৃদ্ধকে বিবাহ করে, তখন আমরা সেই মেয়েকে হিসাবী লোকের দলে ফেলি; কারণ পদমর্যাদা বা অর্থের লোভেই সে ইচ্ছাপূর্ব্বক আত্মবিক্রয় করিয়াছে। কিন্তু তুর্কীতে যখন ষাট বছরের বুড়াকে একটি তের কি চৌদ্দ বছরের মেয়ে বিবাহ করিতে দেখি তখন ঐ হতভাগিনী মেয়েটির জন্য দুঃখ হয় এবং ইচ্ছা হয় তাহার দেহ ও মনটি কলুষিত করার আগে ঐ বুড়াটাকে গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলি।" (২) সৌভাগ্য বশতঃ তুর্কসুলতানের পদচ্যুতির সঙ্গে সঙ্গে এইরূপ জঘন্য বিবাহ সম্ভাবনায় উচ্ছেদ ঘটিয়াছে। মেয়েরা এখন নিজ নিজ পছন্দমত স্বামী-

(১) Turkey Today P. 132, and H. Halid-The Diary of a Turk—London 1903. P. 51.

(২) Turkey Today Pp. 147-148.

নির্ব্বাচন করে এবং এই ব্যাপারে তাহারা যে বৃদ্ধদের প্রতি কোন পক্ষপাত দেখায় না, তাহা বোধ হয় না বলিলেও চলে।

সপত্নী-কণ্টক

বৃদ্ধ স্বামীকে বিবাহ করা ছাড়াও তুর্ক-নারীর জীবনে আর এক বিপদের সম্ভাবনা ছিল। উহা স্বামীর একাধিক বিবাহ। এই বহুবিবাহের প্রথা আরব দেশ ও ইস্‌লামধর্ম্ম হইতে তুর্কদের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। কিন্তু ইস্‌লাম ধর্ম্মে কেন বহুবিবাহপ্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল তাহার একটি ঐতিহাসিক কারণ আছে। মহম্মদের আবির্ভাবের পূর্ব্বে আরবদের মধ্যে বাড়তি মেয়েদের (surplus girls) সংখ্যা কমাইবার জন্য জন্মিবামাত্র অধিকাংশ শিশুকন্যাকে মাটিতে পুঁতিয়া ফেলিত। বহুবিবাহ প্রবর্ত্তনের ফলে এই বর্ব্বর প্রথার লোপ হইয়া যায়। ইস্‌লাম-প্রতিষ্ঠার পরে বিধর্ম্মীদের সহিত যুদ্ধে যখন বহু আরব নিহত হইতেছিল তখনও একবার আরব-স্ত্রীদের সংখ্যাধিক্য ঘটিয়াছিল। মহাযুদ্ধের পরেও বর্ত্তমান য়ুরোপে নারীর সংখ্যা বেশী দাঁড়াইয়াছে। মহম্মদ এইরূপ সংখ্যাবৃদ্ধি সমস্যার সমাধানের জন্যও বহুবিবাহকে আইন সঙ্গত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কালক্রমে লোকে এই ঐতিহাসিক কারণ ভুলিয়া ইহাকে একটি অপরিবর্ত্তনীয় নিয়মের মত ভাবিয়া তাহার সুবিধা গ্রহণ করিতে লাগিল। কিন্তু অর্থ-নৈতিক কারণে ধনী লোকেরাই এই সুবিধা বিশেষ ভাবে গ্রহণ করিত। যেহেতু কোরাণের বিধান অনুসারে চারিটি স্ত্রী গ্রহণের অধিকার প্রত্যেক পুরুষের আছে বটে, কিন্তু তৎসঙ্গে সঙ্গে এই দায়িত্বও রহিয়াছে যে প্রত্যেক স্ত্রীর প্রতিই সমান ব্যবহার করিতে হইবে ; এক জনকে কোন উপহার দিলে অন্য জনকেও ঠিক তার অনুরূপ উপহার দিতে হইবে। লোকের জীবনযাত্রার আদর্শ যখন খাটো ছিল, যখন স্ত্রীলোকদের প্রসাধনের ও অন্যান্য প্রয়োজনের মধ্যে উপকরণ-বাহুল্য উপস্থিত হয় নাই, তখন একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করা পুরুষের পক্ষে তত কষ্টকর ব্যাপার ছিল না, কিন্তু বর্ত্তমান সভ্যতার দিনে অর্থনৈতিক কারণেও বহুবিবাহ আর সহজসাধ্য নহে। (১) অবশ্য সমাজের কৃষকশ্রেণীস্থ লোকের পক্ষে বহুবিবাহের এই বাধা নাই। বরং একাধিক স্ত্রী থাকিলে তাহাদের নিজ চাষবাসের কাজে সাহায্য হয়। এই কারণে তুর্ক-চাষাভুষাদের মধ্যে বহুবিবাহ ছিল। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের প্রায় সকলেই একপত্নীক। তাহার উপরের শ্রেণীই এই বহুবিবাহের পাপে বেশী রকমে পাপী। কিন্তু তাহাদের মধ্যেও যাহারা ধনী ও সম্ভ্রান্ত ঘরের কন্যা বিবাহ করিত, তাহাদের প্রভাবশালী আত্মীয়দের ভয়ে দ্বিতীয় বার বিবাহ করা সম্ভবপর হইত না।

এই বহুবিবাহ মন্দ হইলেও উহার যে কোন ভাল দিক একেবারেই নাই তাহা নহে। এজন্য তুর্ক-পুরুষদের কেহ কেহ বহুবিবাহের পাশ্চাত্য সমালোচকদের আক্রমণের উত্তরে বলিয়াছেন, "য়ুরোপে কি এমন অনেক ব্যক্তি নাই যাহাদের গৃহে বিবাহিত পত্নী থাকা সত্ত্বেও অন্যত্র একাধিক উপপত্নী রহিয়াছে? ইহা মুসলমান-প্রাচ্যের বহুবিবাহ অপেক্ষা খারাপ ; কারণ এক ক্ষেত্রে একাধিক জীবনসঙ্গিনীর সকলেরই আইনসঙ্গত অধিকার আছে ; বিবাহের সন্তান সন্ততি বৈধভাবে জাত পুত্র-কন্যা বলিয়া গণ্য হয়, কিন্তু য়ুরোপীয় স্বাধীন-সংযোগ (*Union libre*) জাত সন্তানেরা উত্তরাধিকার-বঞ্চিত অন্ত্যজ শ্রেণী বলিয়া গণ্য হয় এবং তাহাদের মাতৃগণ যে কোন সময়ে গণিকাবৃত্তি অবলম্বন করিতে বাধ্য হইতে পারে।" (২) এই কথায় কিছু সত্য থাকিলেও বহুবিবাহকে সমর্থন করা যায় না। বহুবিবাহ দ্বারা যে হীনতা ও পাপ প্রশ্রয় পায়, তাহা মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দৈন্য বৃদ্ধি করে। গৃহের শান্তি উহাতে কখনো অক্ষুণ্ন থাকিতে পারে না। জনৈক ভুক্তভোগী তুর্ক-মহিলা (যাঁহার পিতার একাধিক পত্নী ছিল) পূর্ব্বোক্ত যুক্তি খণ্ডন করিয়া লিখিতেছেন, "নারী তাহার স্বামীর গুপ্ত প্রেমের জন্য যে মানসিক কষ্ট ভোগ করে তাহা কঠোর হইতে পারে, কিন্তু সপত্নী যখন আসিয়া

(১) এ দেশের হিন্দু সমাজে যে বহুবিবাহ ছিল অর্থনৈতিক কারণে তাহ প্রায় লোপ পাইয়াছে।

(২) The Diary of a Turk P. 45.

শ্রীমনোমোহন ঘোষ

গৃহে প্রবেশ করে এবং নারীকে তাহার অর্দ্ধেক অধিকার হইতে বঞ্চিত করে, তখন সেই নারী প্রকাশ্য ভাবে 'শহীদ' শ্রেণীভুক্ত হয়, কারণ তখন হইতে সে অন্য দশজনের কৌতূহল ও অনুকম্পার পাত্র।...দ্বিপত্নীকের স্ত্রী ও উপপত্নিতে আসক্ত স্বামীর স্ত্রী এই উভয়ের ভাবী ও বর্ত্তমান ক্লেশের মধ্যে যে পার্থক্য, তাহা শ্রেণীগত ও পরিমাণগত। পূর্ব্বস্ত্রীর ক্লেশ বহুদূরব্যাপক, কারণ তাহার সন্তান সন্ততি, ভৃত্যাদি ও বন্ধুবর্গ পর্য্যন্ত তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীর সন্তানাদির সহিত স্বাভাবিক বিরোধ পোষণ করে। তাহার ফলে গৃহ এক দীর্ঘকালস্থায়ী অশান্তির আগার হইয়া উঠে।" (১)

বর্ত্তমান তুর্কীতে এই অনিষ্টকর বহুবিবাহের প্রথা আইনের সাহায্যে দূরীকৃত হইয়াছে। বহুপত্নী ও উপপত্নী-পরিবৃত সুলতানকে স্বপদে রাখিয়া এই বহুবিবাহ ও তদ্রূপ অন্যান্য সামাজিক কুরীতি দূর করা যায় না বলিয়া তুর্কী তাহার খলিফা-পদের উচ্ছেদ সাধন করিয়াছে। যে সকল দেশের স্ত্রীজাতি এখনো স্ব স্ব অধিকার ফিরিয়া পায় নাই, তুর্কীর এই বিপ্লব সেই সকল দেশের নেতৃগণের প্রণিধানের বিষয় হওয়া উচিত

বিবাহচ্ছেদ

তুর্ক-বিবাহে সর্ব্বাপেক্ষা মারাত্মক দোষ এই ছিল যে, ইহাতে স্ত্রী ও পুরুষকে সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখা হইত। অর্থাৎ কেবল পুরুষকেই মানুষ আর নারীকে কোন ব্যবহার্য্য বস্তুর সামিল মনে করা হইত। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই বিবাহের সময় তুর্কীতে নববিবাহিতা বধূকে তপ্ত লোহার তারের দ্বারা চিহ্নিত (branded) করা হইত। (২) বিবাহচ্ছেদ সম্বন্ধে যে আইন প্রচলিত ছিল তাহাও এই হীন সংস্কারের ফল। "আমি তোমাকে তালাক দিলাম" এই কথাটি কেবল তিনি বার বলিলেই তুর্ক-পুরুষ তাহার স্ত্রীর সহিত বিবাহ সম্বন্ধ ছেদ করিতে পারিত। অবশ্য পরিত্যক্তা স্ত্রীকে কিছু অর্থ দান করিতে হইত, কিন্তু সে অতি সামান্য। প্রায় ৭৷৵০। এরূপ ভাঙ্গাচোরা সংখ্যা নির্দ্দেশ করার কারণ এই যে, ভাঙ্গানি খুঁজিতে যে সময় দরকার স সময়টার মধ্যে সে যেন পুনর্বিবেচনার সময় পায় ও নিজ কথা ফিরাইয়া নিতে পারে। অবশ্য পরিত্যাগ, নির্দ্দয়ব্যবহার ও ভরণপোষণের অভাব ইত্যাদি গুরুতর কারণে নারীও তাহার স্বামীকে ত্যাগ করিতে পারিত, কিন্তু এই ক্ষেত্রে এবং নারীর অন্যান্য অধিকারের বেলায় নারীর অধিকার প্রায় পুঁথিগতই ছিল। তুর্ক-আইন অনুসারে নারীর নিজ ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে স্বাধিকার ছিল; এই সম্পত্তিরক্ষার জন্য সে নিজ স্বামীর বা অন্য কাহারও বিরুদ্ধেও মামলা আনিতে পারিত। অবশ্য তাহার স্বামীকে না জড়াইয়া লোকে তাহার বিরুদ্ধে মাম্‌লা আনিতে পারিত। শিশু সন্তানের রক্ষণাবেক্ষণে মাতার অধিকার ছিল। মাতার অন্তে নিকটতম মাতৃবন্ধু দিদিমা, মাসী অথবা জ্যেষ্ঠা ভগিনী এই রক্ষণা-বেক্ষণের অধিকার পাইতেন। কিন্তু কার্য্যকালে এই সকল অধিকার আইনের পুস্তকেই থাকিয়া যাইত; স্বামী অত্যাচার করিতে ইচ্ছা করিলে, পুরুষানুক্রমে পুরুষের দাসত্বে দুর্ব্বল নারী তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার কোন চেষ্টা করিতে পারিত না। বড় জোর বিবাহচ্ছেদ ছিল তাহার ভরসা। আইনমতে উপযুক্ত কারণে বিবাহ ছিন্ন করা বিশেষ শক্ত ছিল না, কিন্তু বিবাহ ছিন্ন করিয়া দাঁড়াইবার জায়গা না থাকিলে কোন নারীই ঐ পথে অগ্রসর হইত না। কারণ আজন্ম স্বাধীনতার শিক্ষা না পাওয়াতে তুর্ক-নারী একাকী বাস করিতে একান্ত অনভ্যস্ত ছিল; কাজেই যদি পিতৃকুলে আশ্রয় গ্রহণের সুবিধা, অথবা কোন দ্বিতীয় ব্যক্তি তাহাকে পত্নীহিসাবে গ্রহণ করিবে এই ভরসা তাহার না থাকিত, তবে বিবাহবন্ধন ছিন্ন করিলে তাহার বিপদ বাড়িয়াই যাইত। এই সকল কারণে তুর্ক-নারী মুখ বুজিয়া স্বামীর সকল অত্যাচার সহ্য করিতে বাধ্য হইত। কিন্তু তুর্কী বর্ত্তমানে সুইস্ সিভিল কোড গ্রহণ করিয়া সিভিল-বিবাহ প্রবর্ত্তন দ্বারা যে কেবল পুরুষের বহুবিবাহ রহিত করিয়াছে তাহা নহে, পরন্তু বিবাহচ্ছেদব্যাপারে

(১) Turkey Today. P. 165.

(২) Behind Turkish Lattices P. 50.

পুরুষ ও নারীকে সমান অধিকার দিয়াছে। বিবাহচ্ছেদ ইচ্ছা করিলে উভয়কেই তিনমাস অপেক্ষা করিতে হইবে। তাহার পর উপযুক্ত আদালতে বিবাহচ্ছেদের মীমাংসা হইবে। শিক্ষা ও স্বাধীনতার প্রসার ঘটিয়াছে বলিয়া আগেকার দিনের আইনসঙ্গত অধিকারের ন্যায় এ সব অধিকার নেহাৎ পুঁথিগত নহে। তুর্কী সাধারণতন্ত্রে পুরুষের নিকট যে নারীর মর্য্যাদা বাড়িয়াছে তাহা বলাই বাহুল্য।

নারীর কর্ম্মক্ষেত্র—অতীতে

পরদার ফলে হারেমের চতুঃসীমার মধ্যে আবদ্ধ তুর্ক-নারীর কর্ম্মক্ষেত্র অতীতে খুবই সঙ্কীর্ণ ছিল। ঘরকন্নার কাজ বা তত্ত্বাবধান, প্রসাধন, স্বামীর মনোরঞ্জন, সপত্নী থাকিলে তাহার সহিত কলহ বিবাদ ইত্যাদি করিয়াই তাহার সময়ের বেশীর ভাগ কাটিত। তাহার পরও যেটুকু সময় উদ্বৃত্ত থাকিত তাহা সূচের কাজ করিয়া অলসভাবে বসিয়া বা ধূমপান করিয়াই ব্যয় করিত। তুর্ক-মেয়েদের মধ্যে ধূমপান খুব প্রচলিত; তাহাদের প্রায় সকলেই ব্রহ্মবাসিনী-দের মত সিগারেট পাকাইতে পারে। সিগারেট জ্বালাইতেও তাহারা বেশ সিদ্ধহস্ত। অন্তঃপুরে অভ্যাগত নারীসমাগম হইলে কাফি পানের অন্তে তাহাকে সিগারেট দেওয়া হয়। এই ধূমপানের ব্যাপারে তুর্ক-নারী য়ুরোপীয় নারীর প্রায় সমকক্ষ। বরং কোন বিশেষ কাজ না থাকায় তুর্কনারী অনেক বেশী সিগারেটই দগ্ধ করে।

তুর্ক-নারী যে কখনো কখনো তাহার আপাদমস্তক বস্ত্রাবৃত দেহে বাহিরে বেড়াইতে যাইত না তাহা নয়। শুক্রবার দিন ছিল তুর্কীর সাপ্তাহিক বিশ্রামের দিন। ঐ দিবস বড় বড় সহরের মেয়েদের অনেকে স্বামীর সহিত বেড়াইতে বাহির হইতেন। অনেকে বা ভৃত্য সঙ্গে লইয়াও বাহিরে আসিতেন। এ বিষয়ে যে তুর্কী আমাদের দেশের লোকদের চেয়ে অগ্রসর ছিল তাহা বোধ হয় না বলিলেও চলে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় পুরু ঘোমটা চোখের উপর থাকায় তুর্ক-মেয়েরা কিছুই ভাল করিয়া দেখিতে পাইতেন না। তাহাতে বাহির হওয়ার প্রধান উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইত।

পরিচিত ব্যক্তিদের অন্তঃপুরে যাওয়া আসা করাও তুর্ক-নারীর একটি কাজ ছিল। ঐ সময়ে কফিপান, সিগারেট খাওয়া ও কথাবার্ত্তায় অনেক সময় কাটিত, কিন্তু তুর্ক-নারীর সব চেয়ে আনন্দ উপভোগের ব্যাপার ছিল বিবাহ-উৎসব। তুর্ক-নারীর আর এক বিশেষ আনন্দ ছিল স্নান-শালায় গমন। টার্কিশ বাথ্ (Turkish Bath) কথাটির সহিত আমরা অনেকেই পরিচিত, কিন্তু উহার মূল অর্থ বোধ হয় বেশী লোকের জানা নাই। কনষ্টান্টিনোপলে অনেক-গুলি বাথ (Bath) বা স্নানশালা আছে। হল্‌দে চূড়া (dome) দেখিলেই সেগুলিকে চেনা যায়। ওগুলি প্রায়ই পাথরে তৈরী। ছাতের দিকে ছাড়া উহাদের কোন জানালা থাকে না। তাহাতেই বেশ আলো হয়। চার পাঁচটি চূড়াযুক্ত কক্ষ একত্র সংলগ্ন। সর্ব্বমধ্যের কক্ষটিতে সর্ব্বাপেক্ষা উষ্ণ জল ও তাহার পরে অপেক্ষাকৃত অল্প উষ্ণ ও সব চেয়ে বাহিরের প্রকোষ্ঠে শীতল জল রাখা হইয়া থাকে। এখানে আশে পাশের মেয়েরা একত্র হয়, স্নান করে, গাত্র মার্জ্জন করে, কেশসংস্কার করে। কফি খাওয়া, ধূমপান, গল্পগুজব পরচর্চ্চা ইত্যাদি কিছুই বাদ যায় না।

নারীর কর্ম্মক্ষেত্র—বর্ত্তমানে

তুর্ক-নারী আজ পরদা-বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে। অতীতে কোন তুর্ক-নারী বিদেশ যাত্রা করিলে একটা মহা সোর গোল পড়িয়া যাইত। কারণ পরদায় আবদ্ধ থাকিয়া বিদেশে গমন করিলে পদে পদেই প্রায় জাতি-নাশের ভয় ছিল। তাই কোন তুর্ক-নারীকেই বিদেশে যাইতে উৎসাহ দেওয়া হইত না। কিন্তু বর্ত্তমান সাধারণ-তন্ত্রের অধীনে তুর্কেরা এই বিষয়ে এক মহা পরিবর্ত্তন আনিয়াছে। যাঁহারা রাষ্ট্রীয় কর্ম্মে—অর্থাৎ রাষ্ট্রদূত, কনসল্ প্রভৃতি হইয়া য়ুরোপে যাইতেছেন তাঁহারা নিজ নিজ স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া যাইতেছেন। ইঁহাদের মধ্যে মাদাম ফেরিদ বে ও মাদাম কেতি বে'র নাম বিশেষ

শ্রীমনোমোহন ঘোষ

ভাবে উল্লেখযোগ্য। এই দুইটি মহিলার নাম তুর্কীর অধিকাংশ নারীহিতকর অনুষ্ঠানের সহিত যুক্ত। উপস্থিত মাদাম ফেরিদ তাঁহার স্বামীর সহিত লণ্ডনে, আর মাদাম ফেতি তাহার স্বামীর সহিত প্যারিসে আছেন। বলা বাহুল্য উভয়েই তুর্কনারী সম্বন্ধে পাশ্চাত্য জগতের ধারণাকে বিশেষ ভাবে পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন

কিন্তু কেবল বিদেশে নহে, দেশে থাকিয়াও আধুনিক তুর্ক-নারী বিবিধ কর্ম্মে লিপ্ত হইয়া দেশের উন্নতিসাধন করিতেছেন। এই সকলের মধ্যে শিক্ষাপ্রচারের কর্ম্মই সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, বহু তুর্ক-নারী শিক্ষকতা কার্য্যের জন্য শিক্ষালাভ করিতেছেন। অনেকে বিদ্যালয় পরিদর্শনের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। কেবল মেয়ে-বিদ্যালয় নয়, ছেলেদের বিদ্যালয়ও তাঁহারা পরিদর্শন করেন।

কেবল শিক্ষায় নহে, জাতীয় স্বাস্থ্যবিধানের ক্ষেত্রেও নারীর সহযোগিতা বিশেষভাবে দেখা যাইতেছে। বলা বাহুল্য এই কারণে জাতীয় স্বাস্থ্যের উন্নতি দ্রুততর হইয়াছে। তুর্কীতে যে ভাল ডাক্তারের সংখ্যা কম ছিল তাহা নয়। কিন্তু প্রাচীন কায়দা-কানুন অনুসারে মেয়ে-রোগীকে পুরুষ ডাক্তারের দেখা নিষিদ্ধ ছিল। মেয়ে-ডাক্তারের সংখ্যা অবশ্য খুব বেশী ছিল না। আজ কাল অনেকে মেয়ে-চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়ন করিতেছেন। নবীন তুর্কীকে গড়িয়া তুলিবার জন্য তাহাদের সাহায্য বিশেষভাবে প্রয়োজন, কারণ পরদা ইত্যাদি প্রথার বিচ্ছেদসাধন ঘটিলেও প্রাচীনতন্ত্রী মেয়েরা এখানে পুরুষ-ডাক্তার দেখাইতে নারাজ। তুর্কীতে এখন একজন বিশেষ অভিজ্ঞ মেয়ে-ডাক্তার আছেন; তাঁহার নাম ডাঃ আতাউল্লা। তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের এম ডি (M. D.)। ইনি এবং একজন জর্ম্মন মহিলা-ডাক্তার (যিনি তুর্ক স্বামী গ্রহণ করিয়াছেন) সারাদিন খাটিয়া মেয়ে-রোগীদের চিকিৎসা করেন। তাঁহাদের এই কঠিন পরিশ্রমের কারণ এই যে, তাঁহারা যত রোগী দেখিতে পারেন তাহা অপেক্ষা বেশী লোকে তাঁহাদিগকে ডাকিতে আসে।

কেবল শিক্ষাদান ও চিকিৎসাবিদ্যায় নহে, সাহিত্য ও ললিতকলাতেও তুর্ক-নারী প্রবেশ করিয়াছেন। মাদম ফেরিদ্ বে (মুফিদে হানুম) বর্ত্তমান তুর্কীর একজন শ্রেষ্ঠ সমালোচক। সুয়াতে দারবিশে হানুম একজন সুবিখ্যাত লেখিকা; বয়সে নবীনা হইলেও এইটি মহিলা; জর্ম্মনীতে খুব সুপরিচিত। তিনি যাহা লেখেন তাহাই জর্ম্মন ভাষায় অনূদিত হয় (১)

সাহিত্যের পরে ললিতকলা। তুর্কীতে চল্লিশ বছরেরও আগে কলা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলেও সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আগে তাহাতে নারীর প্রবেশাধিকার ছিল না। সম্প্রতি সে সকল বাধা দূর হইয়াছে। কতিপয় ছাত্রী তাহাতে মূর্ত্তি-গঠনকার্য্য শিক্ষা করিতেছে। এই মূর্ত্তি-গঠনও একদিন অবশ্য ইস্‌লামের অনুশাসনে নিষিদ্ধ ছিল, কিন্তু বীরপুরুষ কামাল পাশা খলিফার সহিত ধর্ম্মসংসৃষ্ট এরূপ অনেক কুসংস্কারকেও নির্ব্বাসিত করিয়াছেন বলিয়া আজ আর ওরূপ কোন বাধা নাই। নৃত্যবিদ্যা ললিতকলার এক প্রধান অঙ্গ। নব্য তুর্ক-রমণী এ বিষয়েও অসাধারণ উৎসাহ দেখাইয়াছে। সেলিম সিরি বে' নামক জনৈক প্রফেসারের কন্যাদ্বয় নৃত্যবিদ্যা শিক্ষা করিবার জন্য য়ুরোপে গিয়াছেন। মুস্তাফা কামাল পাশার ইচ্ছা ইঁহারা দেশে ফিরিয়া আসিয়া প্রচলিত কোন কোন নৃত্যকে বর্ত্তমান কালোপযোগী করিয়া লন (২)

দলগঠনে তুর্ক-নারী

সর্ব্ববিষয়ে নিজ নিজ ন্যায্য অধিকার পাইয়াও তুর্কনারী পাশ্চাত্য নারীর মত পুরুষের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠে নাই। তাহার ফলে তুর্কীতে অন্য দেশের মত "নারী আন্দোলন" নামক কোন জিনিষ গড়িয়া উঠে নাই। মেয়েদের যে সব প্রতিষ্ঠান আছে তাহাদের উদ্দেশ্য পুরুষদের পরিচালিত উন্নতিকর কার্য্যসমূহে যথাসাধ্য সাহায্য করা।

(১) Turkey Today. P. 251.

(২) Turkey Today. P. 227.

এই কারণে পৃথক নারী-আন্দোলন সম্ভবপর হয় নাই। শুধু মেয়েদের জন্য যে সকল ক্লাব স্থাপিত হইয়াছিল তাহার কোনটিই ভাল চলে নাই। কনষ্টান্টিনোপলে "Union des Femmes Turques" নামক তুর্ক-নারী-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহারও এই দশা। এই সমিতির কতিপয় সভ্যা মেয়েদের যাহাতে জাতীয় ব্যবস্থাপরিষদে নির্ব্বাচিত হইতে পারে তাহার আন্দোলন চালাইতে ইচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু নেতৃস্থানীয় মহিলারা কেহই উহাতে সহানুভূতি দেখান নাই। বাস্তবিক তুর্ক-নারীর এ বিষয়ে সংগ্রাম করার কোন কারণ নাই। যেহেতু সংগ্রাম না করিয়াও তুর্ক-নারী কামাল পাশার উদারতার জন্যে অনেক অধিকার পাইয়াছে। তাঁহার আদেশ, ঠিক পুরুষের সমান যোগ্যতা দেখাইলে নারীও অধ্যাপক, ডাক্তার, আইনজীবী, শিল্পী ও সাহিত্যিক বলিয়া গণ্য হইবে। তিনি বলেন, "নারী শিল্পী," "নারী নাট্যকার" এরূপ কথার কোন অর্থ নাই। কেন এসকল কথার আগে নারী শব্দটি যোগ করা? এর দ্বারা কি অনুকম্পা ভিক্ষা হইতেছে? না, অপেক্ষাকৃত অপটুদিগকে উৎসাহিত করা হইতেছে? প্রতিভার কোন জাতিভেদ নাই। কাজেই দেশকে পুরুষ ও নারী এই দুই ভাগে ভাগ করা একান্তই বিড়ম্বনা।" তুর্কীতে তাই স্ত্রীপুরুষ সহযোগিতার পথে জাতীয় উন্নতি করিতে চলিয়াছে। তুর্ক জাতীয় ক্লাবে স্ত্রীপুরুষ ঠিক সমান ভাবে সদস্য হইতে পারেন। কর্ম্মকর্ত্তা ও সভাপতি নির্ব্বাচিত হইতে উভয়েরই সমান অধিকার। 'নাফিএ হানুম' নামক মনস্বিনী মহিলা সম্প্রতি তুর্কীর পূর্ব্বোক্ত জাতীয় ক্লাবের সভাপতি। পুরুষ-নারীর এই নির্দ্বন্দ্ব সহযোগিতায় তুর্কী যে অচিরে তাহার নষ্ট গৌরব উদ্ধার করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

ঝরা পাতার গান

শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী

চলিতে পথে পড়িলে ঝরি' কেশের 'পরে মোর
মলিন ঝরা পাতা গো, ঝরা পাতা,
টুটিয়া-যাওয়া গানের বীণা, আনিলে মোহ-ঘোর ;—
ধূলায় হ'ল আসনখানি পাতা!
বসন্তেরি শুভ্র ধূলি, পথের ধূলি গো,
মনের দ্বার তোমারি লাগি' নীরবে খুলি গো,
গানের বাতি জ্বালায়ে ধ'রি রাত্তি যে করি ভোর ;—
এ-গানখানি র'বে কি মনে গাঁথা?
খুলিয়া এলে মাটির রাখী, কাটিয়া এলে ডোর
মলিন ঝরা পাতা গো, ঝরা পাতা!

প্রভাতীসুরে কাঁপন লাগে অশথ-শাখা 'পরে—
শ্যামল পাতা মাটিরে ভুলে কি সে!—
মাটির রঙ, মাটির সুর পাতায় থরে থরে
মাটিরে ভুলি' মরে না দাহ-বিষে!
মাটি গো মাটি, পথের মাটি, প্রাণের মাটিরে,
দেহের ক্ষুধা মিটাও তুমি, বাঁধ' গো পা'টিরে ;
তাইত মোর স্বপনগুলি উড়াই বায়ু-ভরে,
ঝরিয়া কভু ধূলায় রই মিশে ;
প্রভাতীসুরে কাঁপন লাগে অশথ-শাখা 'পরে,
শ্যামল পাতা মাটিরে ভুলে কিসে!

ঝরা পাতার গান

শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী

ভুলিয়া-যাওয়া বাউল-কবি জাগিল প্রাণে আজি
পাতার সুরে মনের সুর দে রে !
গ্রামের পথে মাঠের শেষে যে সুর উঠে বাজি'
ঝরা সে সুরে পরাণ লয় কেড়ে !
হায়রে গান, মাঠের গান, বটের গান গো,
দোলাও জটা, পাতার ঘটা— মাতাও প্রাণ গো !
দিনের শেষে ফুরা'লে দাহ, কি সাজে রও সাজি'
রাতের বায়ু পাতায় দেয় নেড়ে,
অমনি ঝরে শুকানো কুঁড়ি, লুকানো ফুলরাজি —
কহে কি ধীরে, 'মনের সুর দে রে !'

আজিকে শুধু ঝরিতে চাই ধূলি-আসন 'পরে
একটি সুরে রণিবে প্রাণখানি ;
একটি তার মাতিবে শুধু গানেরি নির্ঝরে,
নয়নে-মুখে খেলিবে মহাবাণী !
সেই সে দেশে ধূলির 'পরে চাহি যে মিশা'তে
হৃদয়খানি জাগায়ে তুলি' অধীর নিশাতে !
তাহারি সাথে চলিবে লীলা নবীনগান তরে ;
ঝরার পথে কে রয় মোরে টানি' !
আজিকে শুধু ঝরিতে চাই ধূলি-আসন 'পরে,
একটি সুরে রণিবে প্রাণখানি !

মনের সুর খুঁজিয়া ফিরি বনের পথে তাই
পথের শেষে এলো না আজো মনে !
পাতারই মত ঝরিনু ; বুকে অসীম নিরাশা-ই—
মনের পাখী মরে কি বনে বনে !
কোথারে পাখী, বনের পাখী, মনের পাখীটি,
তোমারে পেলে তোমারি পায়ে বাঁধিব রাখীটি ;
উড়িবে তুমি অপার নীলে ;—এমনি গান গাই ;
ভাসে কি সুর পরাণে অকারণে !
মনের সুর খুঁজিয়া ফিরি বনের পথে তাই
পথের শেষ এলো না আজো মনে !

জানি গো জানি ঝরিয়া এনু একটি মন হ'তে,
ঝরিয়া এনু মনেরি শিলা-তলে !
জানি গো জানি উড়িয়া যা'ব অসীম বায়ু-স্রোতে
সে শিলা হ'তে কাহার মায়া-বলে !
হায়রে মায়া, প্রাণের মায়া, মোহন মায়া গো,
ঝরার পথে ঘনায়ে দিলে নিবিড় ছায়া গো,
মাটির ডোরে বাঁধিলে মোরে ধূলি-উড়ানো পথে
কাঁকন-রণা কোমল করতলে !
জানি গো জানি ঝরিয়া এনু একটি মন হ'তে,
ঝরিতে চাই মনেরি শিলাতলে !

সে মনখানি কোথায় আজি বলিবে মোরে তুমি
ব্যাকুল ঝরা পাতা গো, পাতা,
কালো কবরী একদা কবে বক্ষ মোর চুমি'
প্রাণ-পরতে ছিল গো সে কি গাঁথা !
ছিল গো গাঁথা, তাইত গাথা, তাইত গান গো,
তাইত আলো নয়নে তব মাতায় প্রাণ গো ;
বিরহলীলা আজি সে বীণা লুটায় বুঝি ভূমি—
চাঁদিনীরাতে শূন্য শেজ-পাতা !
সে মনখানি কোথায় আজি বলিবে মোরে তুমি
ব্যাকুল ঝরা পাতা গো, ঝরা পাতা !

সনেট-পঞ্চাশৎ

শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্ত্তী

একখানা ফরাসী উপন্যাসের ইংরাজী অনুবাদে এই ব'লে ভূমিকা সূচনা করা হয়েছে যে, ক্লাসিক অর্থাৎ কুলীন কি না, এ বিচার পণ্ডিতদের জন্যে মুলতুবি রেখে, আমাদের যে বই পড়তে ভাল লাগে সেই বই পড়ব। উক্ত বচনের অনুসরণ ক'রে, সন্দেহের ভার সমালোচকের হাতে দিয়ে, যে বইতে নিঃসংশয় কিছু নূতনত্ব আছে তৎসম্বন্ধে পাঠক হিসাবে যা মনে হয়েছে লিখ্‌ব।

স্বীকার করছি যে-বই অনেকের নিকট পুরোনো হ'য়ে গিয়েছে, সেই বই আমি সম্প্রতি পড়েছি। দিল্লীতে প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনে চৌধুরী মহাশয় নিজেই স্বীকার করেছেন অশরীরী বীরবল সশরীর প্রমথ চৌধুরীর চাইতে খ্যাত। রূপ যে দেহকে অতিক্রম করবে এ আর বিচিত্র কি! আর সেই খ্যাতির আওতায়, বীরবল নয়, প্রমথ চৌধুরী-লিখিত চৌদ্দ পংক্তির কবিতা যদি কোন পাঠকের নিকট অপাংক্তেয় হ'য়ে ওঠে, তা' হ'লেও আশ্চর্য্যজনক কিছু হয় না, নাম-মাহাত্ম্যের একটা দৃষ্টান্ত পাওয়া যাওয়া মাত্র। ভানুসিংহের পদাবলী নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে সিংহবিক্রম প্রকাশ করে কি।

কিন্তু অসমছন্দের দীর্ঘকায় ব্যর্থ অনুকরণের যুগে আঁটসাঁট বাঁধা ক্ষুদ্রকায় কবিতা সত্যই অপাংক্তেয় কি না, এই হচ্ছে এ প্রবন্ধের বিচার্য্য।

সনেটের জন্ম অবশ্য বাঙলায় নয়। স্কুলের ছেলেরা ভূগোল পড়বার সময় ইউরোপের যে দেশের সঙ্গে ভারতবর্ষের অবস্থান তুলনা করে, সেই ইতালীতে। ইতালীয় সাহিত্য হ'তেই ইংরাজী কাব্যে সনেটের আমদানী। Shakespeareএর সনেটে ইতালীয় সনেটের ছন্দরক্ষা হয় নি, সেই জন্যে তা'কে দু কূল বাঁচিয়ে বলা হয় English Sonnet, তা'ও বোধ হয় গৌরবে; আসলে ও হচ্ছে quatorzain, নিছক চতুর্দ্দশপদী; যেমন আমাদের মাইলের চতুর্দ্দশপদী কস্মিন্‌কালে সনেট নয়। ভাল কথা, বাঙ্‌লায় সনেটের প্রবর্ত্তক কে? শ্রীযুক্ত প্রমথচৌধুরী ন'ন কি? সনেট চৌদ্দ লাইনের মিত্রাক্ষর কবিতা, এবং তা' আবার দুই ভাগে বিভক্ত, প্রথম ৮ লাইন ও শেষ ৬ লাইন। প্রথম ৮ লাইনের মিল-সন্নিবেশ এইরূপে: ১,৪,৫,৮ লাইনের পরস্পর মিল থাকবে, ও ২,৩,৬, ৭ পরস্পর যুক্তমিল হবে। শেষ ৬ লাইনের কোন বাঁধাধরা নিয়ম নেই, ওখানে কবির অনেকটা স্বাধীনতা আছে। কিন্তু প্রথম ৮ পংক্তিতে নান্যঃ পন্থাঃ; এবং অষ্টম পংক্তির অন্তে অবশ্য অবশ্য ছেদ প'ড়ে প্রথম ভাগ শেষ হবে। তা' না হ'য়ে, অষ্টম পংক্তি নবমের সহিত একটানা হ'য়ে যদি নবম পংক্তির মাঝে গিয়ে থামে, তাহ'লে ছন্দশাস্ত্রসঙ্গত সনেট হয় না।—যেমন, Miltonএর "Massacre in Piedmont," "To Cyriack Skinner upon his blinndness," Wordsworthএর "Scorn not the Sonnet," "I thought of thee," Keatsএর "The Human Season" প্রভৃতি। ইংরাজী উদাহরণ নিয়ে মাথা ঘামাবার বেশি প্রয়োজন নেই, সার্থকতাও নেই; তবে এইটুকু সার্থকতা আছে যে উদাহরণ থেকে বুঝা যায় কবি-শিরোমণিদের পক্ষেও সনেটের একটা প্রধান নিয়ম বজায় রাখা ভাবের স্রোতে সব সময় সহজ হয় নি। সে যা হোক্, বাঙ্‌লায় চৌদ্দ লাইনের কবিতা অনেক থাকলেও, সনেট পঞ্চাশতের পূর্ব্বে কেহ যথার্থ সনেট্ রচনা করেন নি; অন্য যাঁরা সনেট লিখেছেন এবং লিখছেন তাঁরা সকলেই সনেট পঞ্চাশতের পরে কলম ধরেছেন বল্‌লে বোধ হয় ভুল হয় না।

এখন, চৌধুরী মহাশয়ের সনেট আকারে ও প্রকারে কিরূপ দেখা যাক্। ইংরাজী হিসাবে নির্ভুল সনেটেও বাঙালীর ছাপ এবং বাঙ্‌লার ছোপ না থাকতে পারে;

শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্ত্তী

তার সোজা কারণ, তুই এক ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ঘট্‌লেও, সকল অনুবাদকেই, এমন কি ছন্দের অনুবাদকেও, মূল ব'লে ভ্রম হয় না। আর বাঙ্‌লার ধারার সহিত যোগ না থাকলে বিদেশী ছন্দ বিসদৃশ হ'য়ে উঠ্‌তে পারে। আমাদের আলোচ্য কবি সনেট-রচনায় বাঙ্‌লার সনাতন ছন্দসূত্র পয়ারের গ্রন্থিই একটু ঘুরিয়ে বেঁধেছেন, অথচ প্রথম আট পংক্তিতে খাঁটি সনেটের স্তবক রচিত হয়েছে; এবং শেষ ছয় লাইনকে তুই ভাগ ক'রে পয়ারের ঘন ঘন মিলকে আরও স্পষ্ট ক'রে তুলেছেন। ভাগে ভাগে দলাদলি আর মাঝে মাঝে Pact যে আমাদের খাঁটি দেশী জিনিষ এ কথা অস্বীকার ক'রবার উপায় কই!

বস্তুত, যে প্রাচীন চৌদ্দ অক্ষরের মাটির উপর অমিত্রাক্ষরছন্দে মেঘনাদবধের দৃঢ় সৌধ ও চিত্রাঙ্গদার স্বপ্নময় কুঞ্জবন বিরচিত হয়েছে, সেই চৌদ্দ অক্ষরের একটানা পংক্তিই "সনেট পঞ্চাশৎ" এর বিদেশী সনেট ছন্দকে দেশী ধারার সহিত যুক্ত রেখেছে। শুধু তাই নয়; নবম ও দশম পংক্তি পরস্পর যুক্তমিল হওয়াতে এবং শেষ চার পংক্তিতে হয় পিঠ-পিঠ মিল, নয় একান্তর অর্থাৎ একপংক্তিপর মিল থাকাতে, পয়ারের ঝঙ্কার-রেশ সর্ব্বত্রই কম-বেশী বেজে উঠেছে। সেই কারণে চোখে বিশ্লেষণ ক'রে না দেখলে কানের কাছে এ'র বিদেশীত্ব সহসা ধরা পড়ে না, এবং এই না-পড়াটাই শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরীর সনেটের প্রশংসনীয় বিশেষত্ব। নবম দশম পংক্তির পৃথক্‌বিন্যাস বাঙ্‌লায় আরও বিভিন্ন সনেটে দেখা যায়। কিন্তু সনেট পঞ্চাশতের একটু পার্থক্য হচ্ছে এই যে, ছন্দব্যতীত ভাবের দিক্ দিয়েও ঐ তুই পংক্তি যেন পঞ্চাঙ্ক নাটকের তৃতীয় অঙ্কের মতো, ভূমিকার ফুল ও উপসংহারের মূল।

হয় তো প্রথম যখন সনেট লিখতে আরম্ভ করেন তখন চৌধুরীমহাশয়ের নিজেরই সন্দেহ ছিল যে, বাঙলা সনেটে বিলেতী গন্ধ থাকবে, সেইজন্যে "সনেট পঞ্চাশৎ"এর প্রথম সনেটেই "সরস্বতী দেখা দিবে পরিয়া বনেট" ভূমিকা ক'রে পাঠকের মুখ বন্ধ করেছেন। কিন্তু আমরা হচ্ছি এ যুগের পাঠক; কৃত্তিবাসের আমলে যে ভূমিকায় পাঠকের কিছুমাত্র মুখবন্ধ হ'ত না, সে কথা এখন আমাদের কাছে কবির বিনয় ও বীরবলের রহস্য ব'লে মনে হয়। পয়ারের ধুতির উপর সনেটের কোট আমাদের এ যুগের আর্টের চোখে বেমানান লাগে না। কিন্তু যুগধর্ম্মেরও একটা সীমা আছে। তাই, সে কোট যদি হয় বুকখোলা আর পায়ে থাকে বুট, তা' হ'লে আবার বরদাস্ত করা কঠিন হয়। পঞ্চাশতের কোন সনেটের কোন পংক্তিই মাঝখানে দীর্ঘচ্ছেদদ্বারা বিভক্ত হয় নি, এবং শেষ ছয় পংক্তি তুইভাগে পৃথক্ থাকায় ফিতেবাঁধা আষ্টেপৃষ্ঠে বদ্ধ বুটজুতোর রূপধারণ করে নি।

উপরের সকল কথা চার পাঁচটি সনেট সম্বন্ধে সর্ব্বতো-ভাবে প্রযুজ্য না হ'তে পারে, কিন্তু অল্পসংখ্যাকে যে রূপের ইতরবিশেষ ঘ'টে থাকে, অধিকাংশ সম্বন্ধে প্রযুজ্য হ'লে তা'ই হয় সাধারণ নিয়ম। আর সেই সাধারণভাবে দেখলে "সনেটপঞ্চাশৎ"এর অধিকাংশ সনেটে আকারগত সাদৃশ্য ছাড়া একটা ভাব-সাযুজ্যও আছে।

বর্ত্তমান কবি গ্রন্থারম্ভে তুইজন পূর্ব্বসূরির বন্দনা করেছেন। প্রথমে পেত্রার্ককে (১ নং সনেট) স্মরণ করেছেন সনেটকার হিসাবে, পরে ভাসের (২ নং) বন্দনা করেছেন উক্ত মহাকবিকৃত কাব্যের মর্ম্মকথার জন্য। জয়দেব, ভর্ত্তৃহরি, চোরকবি প্রভৃতি সম্বন্ধে যে কয়টি সনেট আছে তা'র কোনটিই বন্দনা নয়; এবং ওগুলির সঙ্গে ভাসশীর্ষক সনেটটির ভাষার তুলনা করলেই বুঝা যায় ভাসের, ভাষা না হোক্, ভাবের উপর লেখকের লোভ অতি বেশী। আর,—লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু—শাস্ত্রের বচন। লুব্ধ হ'য়ে তিনি যে বৈশিষ্ট্যের প্রশংসা করেছেন, তাঁর নিজের লেখায় তা'রই ছায়া পড়েছে। কিন্তু ভাসের "পারিষদ ছিল মহাপ্রাণ আর্য্য" (২), আর বর্ত্তমান কবির পাঠক ক্ষীণপ্রাণ বাঙালী; তাই, যাঁর "পৌরুষের পরিচয় আশ্লেষে চুম্বনে" (৩) নয়, যাঁর 'বাঙ্গালার যমুনা' (৯) "বিলাসে ঢলিয়া উজান" বহে না, যিনি পঞ্চাশটি সনেটের একটিতেও "বৃন্দাবনী প্রণয়ের গদগদ ভাষ" (২) আওড়াতে পারেন না, অপরপক্ষে "আদিরসে দেশ ভাসে অজয় জোয়ার" (৩) লিখেই পরবর্ত্তী পংক্তিতে লিখে

বসেন "বঙ্গভূমি পদে দলে তুরঙ্ক সোয়ার" (৩), এরকম বেরসিক কবির কবিতা যদি এতদিন শনির দৃষ্টিতে ভস্ম না হ'য়ে গিয়ে থাকে তা' হ'লে উপরে উক্ত শাস্ত্রের বচন মিথ্যা হয়! ইংরাজী ১৯১৩ সনে বইখানা প্রথম প্রকাশিত হয়েছে ; এই ষোল বছরের মধ্যে সংস্করণের নমুনা দেখে মনে হচ্ছে লেখকের কাব্য-সরস্বতীতে না হোক্ তাঁর প্রকাশকের কবিতা-লক্ষ্মীতে শনির দৃষ্টি ঘটেছে ; কাজেই শাস্ত্রের বচন মিথ্যা নয়!

পঞ্চাশটি সনেটের সবগুলিতে না হোক্, অধিকাংশে মোটামুটি ভাব-সামীপ্য আছে, এবং সে বীজ এই : প্রাণের ছায়ানৃত্যের উপর বুদ্ধির আলো পড়ুক।

কবিতার তত্ত্ব আলোচনা করতে হ'লে অনুমান ছাড়া দ্বিতীয় গতি নেই, তার কারণ কবিতা প্রবন্ধ নয়। বিশেষ, "সনেট পঞ্চাশৎ"এর কবি নিজেই স্বীকার করেছেন ভাষার নীচে "সত্য মুখ ঢেকে হাসে" (২৬), আর ভাষার স্থান কবিতায় যে কতখানি তা' যাঁরা কবিতা লেখেন শুধু তাঁরা নন, যাঁরা চোখ কান খুলে কবিতা পাঠ করেন তাঁরাও জানেন।

সনেট পঞ্চাশৎ প'ড়ে মনে হয়েছে শেষ সনেট "আত্মকথা।" সত্যই কবির নিজের কথা :

"নাহি জানি অশরীরী মনের স্পন্দন,—
আমার হৃদয় যাচে বাস্তব বন্ধন॥" ৫০

কল্পনা ও বাস্তব দুটোতে মিলিয়ে মিশিয়েই এ কাব্য এবং মানুষের জীবন।

"কবিতার যত সব লাল নীল ফুল,
মনের আকাশে আমি সযত্নে ফোটাই,
তাদের সবারি বদ্ধ পৃথিবীতে মূল,—" ৫০

সনেট পঞ্চাশতের কবিতাগুলি আকাশের দিকে ঊর্দ্ধমুখ মাটির গাছের ফুল, নিছক আকাশ-কুসুম নয়। কল্পনায় "কবির সৃজন" পত্রলেখাকে অঙ্কে আহ্বান করা আনন্দের (৭), স্বপ্নের "সুবর্ণ-পালঙ্কে" কঙ্কাবতীর সহিত মিলন সুখের (৪৯), তথাপি মাঝে মাঝে জেগে উঠে "নবডঙ্কা" (৪৯) না দেখলে, শুধু স্বপ্নে যা' দেখা যাবে সে হচ্ছে—"প্রমাদের রাশিসম অবিদ্যা সুন্দরী" (৫); এবং ঐ "নবডঙ্কা" ও "সুবর্ণ-পালঙ্ক" কোনটাই একা পূর্ণ সত্য নয়, "সত্য শুধু মানবের অনন্তপিপাসা" (৪) আর সেইজন্য মানুষের ধর্ম্ম "মনোরাজ্যে বহুরূপী সাজা।" (৪) "চির দিবাস্বপ্নে যারা আছে মশ্‌গুল" তাদের নেশাও চাই, (২২) আবার "তন্দ্রাসুখে আছে যারা মুদিয়া নয়নে" তা'দেকেও জাগাতে হবে (১৮),—জাগাতে হবে, কেননা. জেনে শুনে আলেয়ার পিছে ছুটা কিছু নয়, (৩৫) বিশেষত তন্দ্রাস্বপ্ন স্থায়ী হয় না, "শাদা চোখে সব দেখি নেশা গেলে ছুটে।" (৩৪)—জাগতে হবে, কারণ, জীবন প্রাণের চেয়ে অধিক। (২৪) সে জীবনের পরিচয় "বৃন্দাবনী প্রণয়ের" (২) "আশ্লেষে"ও (৩) নয়, ধরণী'ক চূর্ণ-করা "জ্ঞানের বটিকা"তেও নয় (৩০)—"উভয়ের দ্বন্দ্বে মেলে জীবনের ছন্দ।" (৩২) সেইজন্যে জীবনের "বৃত্তি চিত্র-আবরণ" (২৮), জীবনের গান হচ্ছে "গতির লীলা" (৯); আর "জীবনের মর্ম্ম" (১০) সেই "উজ্জ্বল, চঞ্চল, নির্ম্মম" (১৫) "পরিহাস" যা বীর ও করুণ রস সমান জেনে (২) আঁধারের মধ্যে অনলের মত ফুটে ওঠে। (১৫)

এ হেন জীবনের বাণী ভাষায় প্রকাশ করতে হ'লে সে বাণীর আকার চাই, কারণ,

"ধরিতে পারি না আমি নেত্রে কিম্বা মনে
আকার বিহীন কোন বিশ্বের দেবতা॥" (২৮)

বিশেষ কবিতায় প্রকাশ ক'রতে হ'লে আকার তো নিতান্তই চাই, কেননা,

"বাণী যার মনশ্চক্ষে না ধরে আকার
কবিতা তাহার মাত্র মনের বিকার।" (১)

সেই আকারের মধ্যে দিয়েই

"রূপের মাঝারে চাহি অরূপ দর্শন,
অঙ্গের মাঝারে মাগি অনঙ্গস্পর্শন।" (২৫)

এই টুকুর মধ্যেই কতকগুলি সনেট ওলট্‌পালট্ করা গেল ; তালিকা বাড়ানো কিছু শক্ত নয়। আর বেশী টানাপোড়েন্ না ক'রে বলা যাক্ অধিকাংশ সনেটের পরস্পর ভাবসাযুজ্য আছে। আর সেই ভাব ভাবালুতার ধোঁয়াটে না হ'য়ে বিচারবুদ্ধির আলোকে শাণিত ভাষার নির্ম্মল

শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্ত্তী

শিখায় ফুটে উঠেছে। এ সনেটগুলির মসৃণতা পদ্মের বা কচুর পাতার মতো নয়; কুশাগ্রে শিশিরবিন্দুর মতো তীক্ষ্ণতাতেই এদের মসৃণতা। পাঠকের মন ভাষার উপর দিয়ে পিছ্‌লে যায় না, ভাষা ও ভাবের সন্ধিস্থলে লেগে থাকে।

আসল কথা, সনেটের নিয়মিত বন্ধন বজায় রেখে চৌদ্দ লাইনে একটি সমগ্র কবিতা সৃষ্টি করতে হ'লে প্রসাদগুণের প্রতি পদে পদে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। স্পষ্ট ক'রে ভাব্‌বার শক্তি না থাকলে কলমের মুখে সে গুণ ফুটে ওঠে না, আর কাব্যে সে গুণ না থাকলে পড়া মাত্র অর্থপ্রতীতি হয় না, এবং চৌদ্দ পংক্তির কবিতা আগে বিশ্লেষণ ক'রে পরে পাঠক তা'র সৌন্দর্য্যসম্বন্ধে সজ্ঞান হবে এ হচ্ছে লেখকের পাঠকের উপর জুলুম। Love at first sight তো কবিরাই কল্পনা করেন, নিজের লেখার বেলায় ভুললে চলবে কেন? কি গদ্যে কি পদ্যে বীরবল বা প্রথম চৌধুরীর প্রসাদগুণ নেই একথা সম্ভবত কোন সমালোচকই প্রকাশ্যে কবুল করবেন না।

শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী যে সর্ব্বপ্রথম সনেটকে বাঙ্‌লায় রূপান্তরিত করেছিলেন, এ উপযুক্তই হয়েছে। অল্প কথায় বেশি বল্‌তে তিনি বর্ত্তমান বাঙ্‌লা সাহিত্যে অদ্বিতীয়। তা'র প্রমাণ তাঁর গদ্য লেখায় ছড়ানো আছে। পদ্যে তা'র প্রকৃষ্ট প্রমাণ "পদচারণ'' কাব্যগ্রন্থের triolet বা 'তেপাটি' কয়টি। আট লাইনে কবিতা হবে; কথার দিকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে প্রথম-চতুর্থ-সপ্তম পংক্তিতে একই ভাবের পুনরাবৃত্তি করতে হবে, এবং দ্বিতীয়-অষ্টম পংক্তিতে তদ্রূপ সৌসাদৃশ্য থাকবে; ছন্দের বেলায় প্রথম-তৃতীয়-চতুর্থ-পঞ্চমে, এবং দ্বিতীয়-ষষ্ঠে পরস্পর মিল থাকবে। এই, কথা ও ছন্দের, উভয়বিধ বন্ধনের মাঝে যিনি কাব্যের বিকাশ ও ভাবের প্রকাশ করতে পারেন তাঁরই সনেটপঞ্চাশতে বলা সাজে,

"ভালবাসি সনেটের কঠিন বন্ধন,
শিল্পী যাহে লভে মুক্তি অপরে ক্রন্দন।'' (১)

—তাঁর সনেট স্বেচ্ছায় কখনো "পদচারণে''র 'অকাল বর্ষা'র ন্যায় "বাজিকর,'' কখনো 'বর্ষা'র মতো "মেদুর''

ছন্দ ও ভাব দুয়ে মিলে কবিতা। ও দুটো সমান তালে না চ'লে, ভাব পিছিয়ে থাকলে হয় পদ্য, আর ছন্দ পিছিয়ে থাকলে গদ্য। কবিতার ছন্দ যদি কবির মনের ছন্দের সহিত সঙ্গত করে তা হ'লেই লেখকের পক্ষে তা' লেখা এবং পাঠকের পক্ষে তা পড়া সচ্ছন্দ হয়। একদিকে সনেটের বন্ধন কঠিন। অপরদিকে ১৩৩২ সনের ভাদ্র সংখ্যা "সবুজপত্রে" শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত আর্য্যমনের যে "ঋজুকাঠিন্য"-গুণের পরিচয় দিয়েছেন পঞ্চাশতে তা'র ছাপ রয়েছে। ফলে, দুই কঠিনে মিলে সরস সনেটপঞ্চাশৎ গ'ড়ে উঠেছে। সনেটের পরিসর অল্প, চৌধুরী মহাশয়ও অল্প পরিসরে তাঁর বক্তব্য সরাসরি বলতে পারেন। সনেট ছন্দবন্ধনে সংযত, সনেট পঞ্চাশতের ভাবধারাও ধীশক্তিসংহত।

অবশ্য এ সব কথার পরও অনাদি প্রশ্নের অন্ত হয় না; প্রশ্ন উঠতে পারে, যাঁকে কবি বলা হচ্ছে তাঁর লেখায় আদৌ কাব্যরস আছে কিনা। ভিন্ন সূত্রে উক্ত আলোচ্য কবির কথাই এ সূত্রে লাগিয়ে দিই,—রসের "ব্যাখ্যান করা জ্ঞানের মূর্খতা।" ("ওঁ," "পদচারণ")।—রসের অস্তিত্ব ও রসের উৎকর্ষ মতভেদের বস্তু, কিন্তু তর্কের বিষয় নয়। "উর্ব্বশী" ও "বলাকা" কোন্‌টা কাব্যাংশে শ্রেষ্ঠ সে সম্বন্ধে প্রকাশ্যে দীর্ঘ আলোচনা না হ'লেও অপ্রকাশ্যে কখনো কখনো মতভেদ শুনা যায়। কিন্তু "তোমার মদিরগন্ধে অন্ধ বায়ু বহে চারিভিতে", এবং "পর্ব্বত চাহিল হ'তে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ,"—দুইয়ের মধ্যে কোন্‌টি কাব্যাংশে গরীয়সী তা'র মীমাংসায় 'ভিন্নরুচির্হি লোকঃ' প্রবচন স্মরণ করা ছাড়া অন্য কোন সমাধান আছে ব'লে মনে হয় না।

বসন্ত শেষে

শ্রীসুধীরচন্দ্র কর

শেষ হ'য়ে যায় বসন্তের হায় মধু-পূর্ণিমা রাতি,
সরোবরে মোর কমলকলিকা সহসা উঠিল মাতি ॥
কোথা উৎসব কোথা গেল চতুরঙ্গ,
অবসাদে সব সুপ্তি-শিথিল-অঙ্গ,
মলয় শ্বসিছে, কোকিলা মৌনকণ্ঠ
আকাশের কোণে স্তিমিত চন্দ্র-ভাতি

নিশাশেষে যবে পূরবে ঈষৎ প্রভাতি উঠিল ফুটে,
হেরি বিস্ময়ে সে কুণ্ঠিতার গুণ্ঠন গেছে টুটে।
উত্তরী তার ভ'রে গেছে ফাগে ফাগে,
পেলব কপোল রক্তিম অনুরাগে,
পুলকের হাসি ধরে না কো আর মুখে,
অরূপ বাণীতে কাঁপিছে কোরকপাতি

রূপে রসে ভরি' যৌবন ডালা বন্ধু বরিল সবে,
কলিকা আমার ম্রিয়মাণা কোণে বুঝিবা অগৌরবে ॥
সুর-সৌরভ অন্তরে তার ভরা,
তবু তা বাহিরে রূপে নাহি দিল ধরা ;
ভাবি হল তার বিফল এবার হো'লী
কারে কে রাঙায়,—না মিলে মনের সাথী

শুধানু সোহাগে—"ওলো ফুল্লরা, কেন এত উতরোলী ?
হেসে বলে,—'সখি, এতখণে হল সফল যে মম হোলী ॥
সুখ-মিলনের রঙ্গীণ রসাবেশ,
রতি-উচ্ছ্বাসে হল না কি নিঃশেষ !
যত ফুলদল অদূরে পড়িবে ঝরি'
বৈশাখী দিনে বিরহ-রৌদ্রে তাতি' ॥

সাধনা আমার নির্ব্বাণহীন বিচ্ছেদ হোমানলে,
রুদ্রের দাহ করে তা মধুর বেদনার আঁখিজলে ॥
আর সখীদের বুকে যে অরুণরাগ
অকরুণ ক'রে আঁকে মৃত্যুর দাগ,
সে-ই আজি সেজে দয়িত-মাধবী-দূত
দিল যৌবন-জয়টীকা শিরে গাঁথি ॥

বনভোজন

শ্রীঅক্ষয়কুমার সরকার

১০

তাহার ঝি-মা'র পাশে শুইয়া বিভা যেমন চিরকাল তাঁহার গলা জড়াইয়া ঘুমাইয়া আসিয়াছে একটা হাত তাঁহার গলায় দিয়া সেইরূপ ভাবে চক্ষু মুদিয়া শুইয়া রহিল। তাহার আর একটা হাত পার্শ্বে উপবিষ্ট রমেশ ধরিয়া তাহার নাড়ীর গতি-পরীক্ষায় নিযুক্ত হইল। অদূরে দাঁড়াইয়া হেমন্ত নির্ণিমেষ চক্ষুতে এই প্রক্রিয়া অবলোকন করিতে-ছিল। রক্তনাশেই হউক, বা কোন অনিবার্য্য আশঙ্কাতেই হউক, বিভার মুখ ক্রমশঃ যেন সাদা হইয়া আসিতেছিল। হেমন্তের স্নেহশঙ্কী নয়নে তাহা যেন একবারে মরা মানুষের মুখের মত বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হওয়াতে সে বলিয়া উঠিল, "আরও চাই ?"

ডাক্তার রমেশের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "নাড়ীর কোন গোলযোগ—"

রমেশ সে কথার উত্তর দিবার আগেই হেমন্ত অত্যন্ত ব্যাকুলতার সহিত বলিয়া উঠিল, "আর না, আর না, ডাক্তারবাবু! ম'রে যাবে যে !"

হেমন্তের এই ব্যাকুল চীৎকারে সেথানকার সকলেরই দৃষ্টি তাহার দিকে আকৃষ্ট হইল। বিভারও ক্লান্ত মুদ্রিত দৃষ্টি অকস্মাৎ উন্মুক্ত হইয়া তাহার চক্ষুতে মুহূর্ত্তের জন্য লগ্ন হইল, এবং তাহার পর এই অতুল স্নেহের আস্বাদনে কৃতজ্ঞতা এবং তৃপ্তি জানাইয়া এবং তাহাকে নির্ভয় থাকিবার একটা আশ্বাসের বাণী নীরবে জ্ঞাপন করিয়া আবার মুদ্রিত হইয়া গেল। রমেশ ডাক্তারের প্রশ্নে উত্তর দিল, "না, তেমন কিছু নয়।"

রক্ত লওয়া শেষ হইল। বিভার ক্ষতস্থান বাঁধিতে বাঁধিতে তাহার আহত রসহীন লতিকার মত বিবর্ণ অবসন্ন দেহটিকে একটু ঠেলিয়া বৃদ্ধ চিকিৎসক বলিলেন, "কেমন আছ মা ? একবার চোখ্ চেয়ে দেখ।"

বিভা চক্ষু চাহিতেই হেমন্তের স্নেহ-ব্যাকুল দৃষ্টির উপর তাহার দৃষ্টি পড়িল। কি যেন একটা কথা সে উচ্চারণ করিতে যাইতেছিল, কিন্তু তাহার ক্লান্ত অবসন্ন দেহযন্ত্র হইতে কোন সুর বাহির হইল না, কেবল একটা স্নিগ্ধ হাসির ছায়ার মত কিছু তাহার সাদা চোপসান ঠোঁটের উপর দিয়া ভাসিয়া গেল। ডাক্তার একটু ব্যস্ততার সহিত তাহার অক্ষত হাতটা ধরিয়া যখন তাহার নাড়ী পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন হেমন্তের সাগ্রহ স্থির দৃষ্টি তাঁহার মুখের ভাব পরীক্ষা করিতেছিল। চিকিৎসকের মুখের উপর দিয়া একটা বিস্ময়ের ত্রাসের ভাব খেলিয়া গেল এবং তাঁহার দৃষ্টি সম্মুখস্থ সহকারী দুইজনের উপর পড়িতেই তাহারা সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল। তিনি তিরস্কারের স্বরে বলিলেন, "তোমরা কি একবারেই—"কিন্তু কথাটা সমাপন না করিয়াই আবার গম্ভীরভাবে বলিলেন, "যাই হ'ক, এখনও উপায় করলে হয়।"

হঠাৎ রমেশ তাড়াতাড়ি উঠিয়া হেমন্তের হাতটা ধরিয়া ফেলিয়া বলিয়া উঠিল, "একি করছেন, হেমন্তবাবু!" সকলে সেদিকে চাহিয়া দেখিল ডাক্তারের পরিত্যক্ত ছুরি-খানা লইয়া বিভার হাতের যেথানটা কাটা হইয়াছিল, হেমন্ত তাহার নিজের হাতের সেইখানকার একটা শিরা কাটিয়া ফেলিয়াছে। ঘরের সকলের আকস্মিক চীৎকারে, বিশেষত অতুলের মা'র উচ্চ কোলাহলের শব্দে বিভার অবসন্ন মূর্চ্ছিত দৃষ্টি মুহূর্ত্তের জন্য খুলিয়া গিয়া হেমন্তের যে অঙ্গটা হইতে রক্তের ধারা ফিন্‌কি দিয়া ছুটিতেছিল, তাহার উপর পড়িল। মুহূর্ত্ত মাত্র তাহার বিহ্বল দৃষ্টি সেখানে সংলগ্ন রহিল, তাহার পর অস্ফুট চীৎকার এবং আকস্মিক মোহের সঙ্গে তাহা আবার মুদ্রিত হইয়া গেল।

ডাক্তার হেমন্তের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ঠিক হয়েছে। এ ছাড়া আর উপায় ছিল না।"

তাহার পর বিভার পাশে হেমন্তকে শোয়াইয়া দিয়া প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া আরম্ভ করা হইল। প্রসন্নমুখে হেমন্ত

সেখানে শয়ন করিয়া রহিল। ক্রমশঃ তাহার শরীর এবং মন অবসন্ন হইয়া আসিতে লাগিল, এবং রমেশের কথায় সে চক্ষু মুদ্রিত করিল।

প্রক্রিয়া শেষ হইলে, সকলে দেখিল বুদ্ধির আচ্ছন্ন অবস্থায় কখন হেমন্তর সুস্থ হাতটি বিভার হস্তের উপর পড়িয়াছে। স্নিগ্ধ স্নেহের দৃষ্টিতে সে দৃশ্য দেখিয়া মনে মনে কি একটা কথা আবৃত্তি করিয়া বৃদ্ধ ডাক্তারটি বলিলেন, "এদের এখন একান্ত বিশ্রামই দরকার। যেন কোন রকম নাড়াচাড়া না হয়।"

১১

মাসাধিক কাটিয়া গিয়াছে। তিনটি রোগীই আবার উঠিয়া বসিয়াছে। বামুনমা'র বাম হাতের কতকটা বিচ্ছিন্ন হওয়ার দরুণ অপরিহার্য্য অক্ষমতা তদ্ব্যতীত এখন আর তাঁহার কোন কায়িক অসুবিধা নাই। বিভা এখনও একটু দুর্ব্বল ও বিশীর্ণ। হেমন্ত বেশ সারিয়া উঠিয়াছে। তাহার সুস্থ সবল শরীর জীবনের স্ফুর্ত্তিতে আগেকার মতই ভরপুর। সুজাপুর গ্রামে, কেবল মাত্র তাহার সমবয়সীগণের মধ্যেই নহে, তাহার অপেক্ষা অনেক অধিক এবং অল্প বয়সের অধিবাসীদের মধ্যেও, তাহার প্রভাব প্রতিপত্তি বেশ দ্রুত গতিতে বাড়িয়া চলিয়াছে। সকলেই জানিয়াছে যে, এই নবাগত উজ্জ্বল উল্কারূপী চাটুয্যে মহাশয়টি তাহাদের আজন্ম শ্রদ্ধার পাত্রী বামুন'মার শ্বশুরবাটির সম্পর্কে নিকট আত্মীয়, এবং তাঁহাদের জনবিরলগ্রামে উচ্ছিন্নপ্রায় বনিয়াদি বাঁড়ুয্যে পরিবারটিকে বজায় করিবার জন্য সমাগত। সঙ্গীতে পটু, রহস্যে সপ্রতিভ, ইংরাজী-জানা এই মিষ্টভাষী ও মজলিসী নবাগত ব্যক্তিটির সঙ্গ সেই পল্লীর অনেকেরই লোভনীয় হইয়া উঠিয়াছে; এবং বহুকাল পরে বন্দ্যোপাধ্যায়দের ভগ্নপ্রায় চণ্ডীমণ্ডপে আবার রীতিমত সান্ধ্য বৈঠক বসিতে আরম্ভ হইয়াছে। সেখানে আবার মরা নদীতে জোয়ারের মত, গানগল্প চলিতেছে, তবলায় চাঁটি পড়িতেছে এবং হাসির লহর ছুটিতেছে।

সেদিন বিজয়া-দশমীর সন্ধ্যা। হেমন্ত কোথা হইতে বাটির ভিতর আসিয়া তুলসীতলায় প্রদীপ হাতে বিভাকে দেখিয়া বলিল, "আজ সিদ্ধি খেতে হয়, জান?"

বিভা একটু হাসিয়া বলিল, "না। এই তোমার কাছে শিখলুম।"

"সত্যি বলছি আজ সকলকে সিদ্ধি খাওয়াতে আর মিষ্টিমুখ করাতে হবে।"

"তা সবাই জানে গো মশাই। আমরাও জানি। দেখবে এখন গাঁ শুদ্ধু লোক ঝিমা'কে প্রণাম করতে আস্‌বে আর মিষ্টিমুখ করে' যাবে।"

"আজ দশমীর দিন, গুরুজনকে প্রণাম করতে হয়, নয়?"

তাহার এই অদ্ভুত প্রশ্নে মুখখানি তুলিয়া বিভা বলিল, "হাঁ। জাননা না কি?"

"তা হ'লে তুমিও আমাকে আজ প্রণাম করবে?"

মৃদু মধুর হাসিয়া হেমন্তের মুখের দিকে চাহিয়া মনোরম কৌতুকের সহিত বিভা বলিল, "তুমি আমার গুরুজন না কি?" তাহার পরেই অকস্মাৎ আঁচলটা গলায় জড়াইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া হেমন্তের পাদস্পর্শ করিল। হেমন্ত হাতখানি ধরিয়া তাহাকে তুলিতে যাইতেছিল। সে "ছি" বলিয়া হাতটা জোরে ছাড়াইয়া লইয়া নিমেষের মধ্যে সরিয়া দাঁড়াইল।

হেমন্ত বলিল, "কি আশীর্ব্বাদ করব ব'লে দাও?"

"যেন শিগগির মরণ হয়", বলিয়া যখন বিভা চলিয়া গেল হেমন্ত আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল তাহার চক্ষু দিয়া দুই ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িতেছে।

বাহির হইতে নবচাঁড়াল ডাকিল, "চাটুর্য্যে মশায়, বাড়ি আছেন?" সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীর ভিতর আসিয়া হেমন্তকে দেখিয়া বলিল, "আলোটা দিন, ঠিক ক'রে জেলে রেখে আসি। মালসাটা আবার সাজতে হবে।" হেমন্ত ফিস ফিস করিয়া বলিল, "আলোটা আমি জেলে দিচ্ছি, মালসাটা সেজে রেখে তোকে এক জায়গায় যেতে হবে।"

"কোথায় দাদাঠাকুর?"

"রামেশ্বরের দোকানে সিদ্ধি আন্‌তে।"

"বিকালে ত দিদিমণিকে এনে দিয়েছি।"

শ্রীঅক্ষয়কুমার সরকার

"কতটুকু ?"

আনীত সিদ্ধির পরিমাণ শুনিয়া হেমন্ত মুখে একটা তাচ্ছীল্যব্যঞ্জক শব্দ করিয়া বলিয়া উঠিল, "সে ত নস্যি রে ! আজকে বিজয়ার দিন বহুকাল পরে—"

"অভ্যেস আছে দাদাঠাকুর ?"

"খুব ছিল রে নব, তোদের এখানে এসে অবধি কিন্তু সুবিধে হয় নি।"

রাত্রি তখন প্রায় দ্বিপ্রহর। বিভা তাহার নিদ্রিত ঝিমা'র পাশে বসিয়া ঢুলিতেছিল। একবার বাহিরে আসিয়া শারদা-কাশের স্নিগ্ধোজ্জ্বল চন্দ্রমার দিকে চাহিয়া আপনার মনে মনে বলিল, 'কত রাত হয়ে গেছে। গান বাজনার আমোদে খাবার কথা মনেই নেই !' একটু থামিয়া আবার বলিল, 'বেশ মানুষটি কিন্তু! যাকে নিয়ে ঘর কর্‌তে হ'বে—' কথাটা অসমাপ্ত রাখিয়া, একটু অকারণ সলজ্জ হাসি হাসিয়া, বিভা রসুই ঘরে গিয়া ঢুকিল। সেখানে ভাতের হাঁড়িটার ভিতর হাত দিয়া বলিল, 'ভাতগুলি যে এদিকে জল হ'য়ে গেল, পাতে দেব কি ক'রে, দেখি উনুনটায় আগুন আছে কি না !' তাহার পর উনুনে একটা নারিকেল ছোবড়া গুঁজিয়া দিয়া পাখার বাতাসে আগুন জ্বালিয়া এক কড়া জল গরম করিয়া তাহার উপর ভাতের হাঁড়িটা বসাইয়া দিল

ঠাণ্ডা ভাত আবার গরম হইয়া আসিল, কিন্তু তখনও ভোক্তার দেখা নাই। বিভা কি একটু ভাবিয়া বৈঠকখানায় গিয়া উঠিল। সেখানে হেমন্ত কোণের চৌকিটায় চোখ বুজিয়া শুইয়াছিল। বিভা একবার মনে করিল সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু পরক্ষণেই তাহার সে ভ্রম দূর হইয়া গেল। হেমন্ত, যাহাকে অকারণ হাস্য বলে, একবার মাত্র সেইরূপ হাসি হাসিয়া পরক্ষণেই কাঁদিয়া উঠিবার মত আঁৎকাইয়া উঠিয়া বলিল, "ধর ধর ! প'ড়ে যাচ্ছি, প'ড়ে যাচ্ছি !"

সে স্বপ্ন দেখিতেছে ভাবিয়া বিভা তাহার কাছে গিয়া পরম স্নেহে বলিল, "অমন কর্‌ছ কেন ? উঠে বস।"

হেমন্ত একবার চক্ষু খুলিয়া বিভাকে সেখানে দেখিয়া একটা কিসের লজ্জায় বা ভয়ে কাঁপিয়া উঠিয়া নিস্তব্ধ হইয়া গেল। কিন্তু সে মুহূর্ত্তের জন্য ; তখনই আবার উচ্চ হাসি হাসিয়া বলিল, "বাঃ বাঃ বৌ যে! পরীর মত বৌ—"

পাষাণমূর্ত্তির মত কয়েক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া বিভা দ্রুত পদে অন্দরের পথে চলিয়া গেল। তখন তাহার মুখখানি ঘৃণায় এবং ক্রোধে বিকৃত হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু রান্নাঘরে গিয়া সে যখন পূর্ণ তপ্ত ভাতের হাঁড়িটা নামাইয়া রাখিল তখন কোথায়ই বা গেল সে ঘৃণা আর কোথায়ই বা গেল সে ক্রোধ। তাহাদের স্থানে তাহার তরুণ মুখশ্রীর উপর একটা দুঃসহ দুঃখের কাল ছায়া ফুটিয়া উঠিল, এবং চক্ষু দুইটি হইতে দুইটি ধারা বহিয়া তাহার বুক ভাসাইয়া দিল।

এই শুভ বিজয়ার দিন একি কাণ্ড ! আজ সমস্ত দিন সে যে কত যত্নে তাহার ক্ষুদ্র সামর্থ্যের মধ্যে যাহা কিছু সম্ভব তাহার আয়োজন করিয়া, সেই স্বল্প আয়োজনে তাহার তরুণ প্রাণের ভালবাসার স্নিগ্ধ আগ্রহে মাখাইয়া, তাহাদের এই অতিপ্রিয় অতিথিটির সৎকারের জন্য ব্যগ্র হইয়া বসিয়া আছে। মাসাধিক কাল ধরিয়া এই যে খেয়ালী লোকটি, তাহার বালকোচিত সারল্যে, ধীর পৌরুষের ও নির্ম্মল আনন্দের অবিরাম বর্ষণে তাহাদের নিরুৎসব আবাসে অনেক কালের পর অফুরন্ত আনন্দের প্রস্রবণ ছুটাইয়াছে, এবং বিভার নিঃসঙ্গ কুমারী জীবনে যৌবন সরসতার উদ্রেক ও তাহার তরুণ মনের গুপ্ত কোণে বিবিধ সুখময় কল্পনার উৎস খুলিয়া দিয়াছে, তাহার মনোহর মূর্ত্তির ভিতরটা কি কদর্য্য ! সে যে একজন ইতর লোকের মত নেশার বশ হইয়া এমন বীভৎস মূর্ত্তিতে রূপান্তরিত হইতে পারে, তাহা ত কখনও ঘুণাক্ষরেও বিভার মনে উদয় হয় নাই। এই অঘটনটা যত দোষের তাহা অপেক্ষাও বহুগুণ অতিরঞ্জিত হইয়া সেই কুমারীর চিরপবিত্র মনটিকে যন্ত্রণার্ত্ত করিয়া তুলিল। প্রথমেই তাহার মনে হইল যে, এ জন্মে কখনও সে সেই নেশায় কদর্য্য শূন্যদৃষ্টি মুখটার উপর চোখ তুলিয়া চাহিতে পারিবে না। তাহার পর সে দিন সেই বিপদের রাত্রিতে ঝি-মা তাহাদের মধ্যে যে বাঁধনটা দিতে চাহিয়াছিলেন তাহা মনে করিয়া সে শিহরিয়া উঠিল। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, সেই বাঁধনের এখন যে নিশ্চিত মুক্তির সম্ভাবনা হইল সে কথা মনে হওয়াতেও তাহার হৃদয় উল্লাসে লঘু না হইয়া হতাশার অব্যক্ত বেদনায় ভারী হইয়া উঠিল।

সে দিন সে তাহার মৃত্যুদ্বারবর্ত্তিনী ঝিমা'কে বাঁচাইবার আশায় নহে—কেন না সে আশা তখন অণুমাত্রও তাহার ছিল না—সেই মুমূর্ষুর মরণযন্ত্রণা লাঘবের উদ্দেশ্যে, বর্ব্বর বৃদ্ধ সতীশ মুখুয্যের কবলেও আত্মবলি দিতে প্রস্তুত হইয়াছিল, সে কথা মনে পড়িল। কিন্তু তখনও সেই ভীষণ মুহূর্ত্তে আপনাকে সত্যের বন্ধনে বাঁধিবার সময়েও তাহার মন ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিতে ছাড়ে নাই যে, এ জন্মটা ত বৃথা গেল, কিন্তু পরজন্মে যেন বাঞ্ছিতকে পায়! তাহার পর হইতেই প্রবৃত্তি এবং প্রতিশ্রুতির মধ্যে যে লড়াই চলিতেছিল তাহার মধ্যে হেমন্তের সান্নিধ্যের এবং তাহার সেবার আনন্দ বিভার দহমান অন্তরের উপর একমাত্র সান্ত্বনার বারিধারার কার্য্য করিতেছিল। আজ যেন তাহার সেই আনন্দের উৎস অকস্মাৎ শুষ্ক হইয়া যাওয়াতে তাহার অন্তরের জ্বালা বহুগুণ বর্দ্ধিত হইয়া তাহাকে ভস্মসাৎ করিতে লাগিল।

কিন্তু এইরূপ হতাশভাবে বহুক্ষণ বসিয়া থাকা অসম্ভব। অবশেষে সে উঠিয়া রান্নাঘরটাতে শিকল দিয়া সে রাত্রের মত হেমন্তের ও নিজের আহারের আশা ত্যাগ করিয়া শুইতে যাইবার কথা ভাবিল, এবং হয়ত সেই উদ্দেশ্যেই শয়ন গৃহের দিকে অগ্রসর হইল। কিন্তু মধ্যপথে তাহার পাদুখানি যেন তাহার অজ্ঞাতসারেই তাহাকে আবার চণ্ডীমণ্ডপের দিকে চালিত করিল, এবং সে অতিসন্তর্পণে ধীরে ধীরে অনিচ্ছার পদবিক্ষেপে হেমন্তের নিকটে গিয়া দাঁড়াইল। সেখানে বিভা এখন যে দৃশ্য দেখিল তাহা তাহার সম্পূর্ণ অপরিচিত বলিয়াই হউক, অথবা সেরূপ উগ্র নেশার পরিণাম সম্বন্ধে কোন কল্পিত ভীষণতা মনে করিয়াই হউক, মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহার মন হইতে পুঞ্জীভূত ক্রোধ ও ঘৃণা অন্তর্হিত হইয়া গেল, এবং তাহা করুণা ও আশঙ্কায় ভরিয়া উঠিল। সে কবে শুনিয়াছিল সিদ্ধির নেশার ঔষধ তেঁতুল গোলা। তাই তাড়াতাড়ি ফিরিয়া গিয়া একবাটি তেঁতুল গোলা আনিয়া উন্মত্তপ্রায় হেমন্তকে তাহা খাওয়াইয়া দিয়া বলপূর্ব্বক তাহাকে বিছানায় শোয়াইয়া মাথায় কপালে জলসিক্ত হাত বুলাইয়া তাহার শুশ্রূষা করিতে লাগিল। হেমন্ত সিদ্ধির ঝোঁকে কখনও বলিতে লাগিল, "বৌ, বৌ, বৌ! বক্‌বে না, রাগ কর্‌বে না! বল রাগ কর্‌বে না!" কখনও বা কিসের একটা আন্তরিক আনন্দে হাসিয়া উঠিয়া বিভার নাম অতি স্নেহে আনন্দে জপমালার মত উচ্চারণ করিতে লাগিল। প্রথমে বিরক্তিকর মনে হইলেও পরে তাহা বিভার মিষ্ট লাগিতে লাগিল, এবং সেই গভীর রাত্রির নির্জ্জনতার মধ্যে তাহাদের দুইজনের অতি সান্নিকট্যের ক্রমবর্দ্ধনশীল উপলব্ধি ক্রমশঃ তাহার তরলায়িত মনকে দুর্ব্বার আকর্ষণে চাপিয়া ধরিতে লাগিল। সে বুঝিতে পারিল এই লোকটির প্রতি তাহার যে টান, তাহা ইহার ব্যবহারের ইতরতায় বা অন্য কোন কারণেই হ্রাস হইবার নহে! সে ভাবিল সেদিন রাত্রিতে যাহা ঘটিয়া গিয়াছিল তাহার মধ্যে যদি কণামাত্রও সত্য থাকে যাহা তাহার পুণ্যশীলা সত্যপরায়ণা ঝিমা'র নিকটে অখণ্ড সত্য—তাহা হইলে হেমন্তের সঙ্গ বিভার ভাল লাগুক আর নাই লাগুক, সতীধর্ম্মের অপরিহার্য্য নিয়মে তাহাকে ত গ্রহণ করিতেই হইবে। এ যতই মন্দ হউক, বিভাকে জীবনে মরণে ইহার সঙ্গিনীরূপে থাকিতেই হইবে! তন্দ্রাচ্ছন্ন মনের উপর দিয়া এই সকল চিন্তা যখন ভাসিয়া যাইতেছিল তাহারই মধ্যে বিভার হৃদয়ের আসক্তি ও অনুরাগ কর্ত্তব্যের দোহাই দিয়া তাহার কায় এবং মন দুইটিকেই তাহার পরম-প্রীতিভাজনের সঙ্গীরূপে সেই নিশীথে নির্জ্জন গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখিল।

বিভা কখন যে হেমন্তের পাশে ঢুলিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল তাহা সে বুঝিতে পারে নাই। অতুলের মা ভোরের দিকে সেই বাড়িতে ধান সিদ্ধ না-কি একটা কাজে আসিতেছিল, চণ্ডীমণ্ডপের এই দৃশ্যটি তাহার নজরে পড়াতে সে মর্ম্মাহত হইয়া গেল। বিভাকে সে হাতে করিয়া মানুষ করিয়াছিল, এবং তাহার যে পাঁচ বৎসরের মেয়েটি পেটজোড়া প্লীহা লইয়া এবং দোকালীন জ্বরে ভুগিয়া ম্যালেরিয়া রাক্ষসীর গর্ভগত হইয়াছিল, সে যদি আর বারো তেরো বৎসর বাঁচিয়া থাকিত, তাহা হইলে তাহার উপর এই পল্লী-মাতাটির যে স্নেহ সঞ্চিত হইত, তাহার প্রতিপালিতা এই ব্রাহ্মণ-কুমারীটির উপরও সেইরূপ স্নেহই জন্মিয়াছিল। আজন্ম শান্ত এবং শিষ্ট

বনভোজন

শ্রীঅক্ষয়কুমার সরকার

তাহার প্রীতি পাত্রীটির এই অধঃপতনে অতুলের মা'র মন যে কতটা তিক্ত বিরক্ত ও কাতর হইয়া উঠিল, তাহা বলিবার নহে। কিন্তু তাহার মনে তখন সর্ব্বাপেক্ষা বলবতী ইচ্ছা হইল যে, এই অসঙ্গত দৃশ্য যাহাতে আর কাহারও চক্ষে না পড়ে তাহারই ব্যবস্থা করা, এবং সেই জন্যেই সে সর্ব্বপ্রকার দ্বিধা পরিত্যাগ করিয়া বিভাকে ডাক দিয়া জাগাইয়া তুলিল। হঠাৎ জাগ্রত বিভা উঠিয়া বসিয়া অতুলের মা'র ঘৃণায় এবং ক্রোধে গম্ভীর মুখ দেখিয়া প্রথমে আশ্চর্য্য হইল, কিন্তু পরক্ষণেই পার্শ্বে অকাতরে নিদ্রিত হেমন্তকে দেখিয়া রাত্রির সমস্ত ঘটনা মনে পড়ায় চৌকির উপর হইতে ত্বরিত গতিতে নামিয়া পড়িয়া অন্দরের দিকে ছুটিল। তখন তাহার মনটা নিজের উপর ধিক্কারে এবং হেমন্তের উপর বৈরূপ্যে একেবারে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

১২

সেদিন কি একটা উপলক্ষে বিভাদের গৃহে অতুলের মার নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। অতুলের মা, বিভা ও তাহার ঝিমা একত্রে বসিয়া খাইতেছিলেন। খাওয়া যখন প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছে বিভার পাতের দিকে চাহিয়া বামুন মা বলিলেন, "পাতের ভাত যে পাতেই রইল মা! কি খেলি?"

বিভা একটু ক্ষীণ হাসি হাসিয়া বলিল, "খুব ত খেয়েছি ঝিমা, আর কত খাব?"

বিভাকে বামুন মা'র উচ্ছিষ্ট পাথরখানা লইবার জন্য হাত বাড়াইতে দেখিয়া অতুলের মা বলিল, "ওটা আমি নিয়ে যাচ্ছি। তুমি আঁচাতে যাও।" সে চলিয়া গেলে বামুন মাকে লক্ষ্য করিয়া অতুলের মা বলিল, "মেয়ে যেন কি ভেবে ভেবে দিনকের দিন কাঠ হ'য়ে যাচ্ছে। কিন্তু তোমাকেও বলি বামুন মা, তুমি যে তখন রোগের ঝোঁকে কি একটা কাণ্ড ক'রে বস্‌লে! এখন এগোবার যো নেই পেছোবারও যো নেই—"

একজন তত্ত্ববাহিকা সেখানে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার হাতে তত্ত্বের সামগ্রী দেখিয়া বামুন মা বিশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও তাঁহার আন্তরিক বিরক্তির সবটা গোপন করিতে পারিলেন না। শুষ্ক ভাবে বলিলেন, "আবার তত্ত্ব কেন?"

স্ত্রীলোকটি উত্তর করিল, "ম্যানেজার বাবু মফঃস্বল থেকে এসেই পাঠালেন্। বল্‌লেন বিয়েটা এখনও হয়নি বটে, কিন্তু জানিস পারির মা, নূতন গিন্নিটিকে পূজোর কাপড় চোপড় না পাঠালে হয় ত রাগ ক'রে বসবেন। তা তুই একবার যা, আমার হ'য়ে দু একটা ভাল কথা ব'লে আয়। বুড়োর আর—" হঠাৎ পার্ব্বতীর মা থামিয়া জিভ কাটিয়া বলিল, "তা মা বয়স আর কতই বা!"

অতুলের মা কি বলিতে যাইতেছিল, রামেশ্বর চক্রবর্ত্তীকে আসিতে দেখিয়া থামিয়া গেল।

"কি গো, পারির মা যে" বলিতে বলিতে আসিয়া আনীত দ্রব্যগুলির উপর লক্ষ্য করিয়া রামেশ্বর পরম প্রসন্নতার সহিত বলিল, "এসব বিভার জন্যে বুঝি, দেখি দেখি!" সে এসেন্সের শিশিগুলি উল্টাইয়া পাল্‌টিয়া দেখিয়া ঢাকাই শাটিখানি হাতে তুলিয়া ধরিয়া "বাঃ, বেশ দামী জিনিস ত—" বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতেছিল, এমন সময় বিভা আঁচাইয়া ফিরিয়া আসিয়া তাহার হাতে কাপড় দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কার কাপড় রামু দা?"

উত্তরে রামেশ্বর তাহার দন্ত পংক্তি বিকশিত করিয়া জবাব দিল, "তোমারই দিদি, আর কার? জামাই বাবু ম্যানেজার বাবু পাঠিয়েছেন।"

শুনিয়া বিভা সেখান হইতে সরিয়া ঘরের ভিতরে গিয়া ঢুকিল। এই সময়ে হেমন্ত কি একটা কাজে সেখানে আসাতে রামেশ্বর তাহার দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল, "দেখ হে চাটুয্যে, জামাই বাবু কেমন তত্ত্ব পাঠয়েছেন!"

"জামাই বাবু?"

"হাঁ হে, ম্যানেজার বাবু আর কার্ত্তিক মাসের এই কটা দিন গেলেই তোমাদের সকলকেই ত ঐ কথা বল্‌তে হবে। আমি না হয় দুদিন আগে থেকেই"—হঠাৎ হেমন্তের মুখের উপর দৃষ্টিটা পড়াতে যেন একটু চিবাইয়া কথাটা শেষ করিয়া দিল, "তোমার উপর কিন্তু খুব সন্তোষ। বলছিলেন, ছোকরা বড় পরোপকারী। সম্পর্কটা হ'য়ে গেলেই বড়বাবুকে ব'লে ওকে একটা নকলনবিশী ক'রে দিতে হবে।"

ঘরের ভিতর হইতে বিভার তীক্ষ্ণোজ্জ্বল চক্ষু দুইটি এবং বাহির হইতে বামুন মা এবং অতুলের মা'র দৃষ্টি এক সঙ্গেই

হেমন্তের অলক্ষ্যে তাহার মুখের উপর স্থাপিত হইল। সে তখন রামেশ্বরকে শ্লেষের স্বরে জিজ্ঞাসা করিতেছিল, "আর আপনার ?''

সপ্রতিভ রামেশ্বর হাহা করিয়া হাসিয়া বলিল, "আরে ভাই, তুমি হ'তে চল্‌লে আপনার লোক—বড় কুটুম—আর আমিই পর।"

তখন সন্ধ্যা অতীত হইয়া গিয়াছে। চণ্ডীমণ্ডপের চৌকিখানির উপর বসিয়া হেমন্ত কি ভাবিতেছিল। একটি ছেলে আসিয়া বলিল, "চাটুয্যে মশায়, আপনি একলা অন্ধকারে ?''

হেমন্ত অন্যমনস্কভাবে বলিল, "কৈ, এখনও আলো দিয়ে যায় নি।''

"আমি আনি গে" বলিয়া ছেলেটি বাটির ভিতর হইতে একটি আলো আনিয়া দিলে হেমন্ত তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "ভিতরে সব কি করছে রে রামু ?''

''বিভা দিদি সল্‌তে পাকাচ্ছে। বামুন মা অতুলদের বাড়িতে গেছেন, এখনও ফেরেন নি।''

হেমন্ত কি একটু ভাবিয়া বলিল, "রাম, এখনও যে কেউ আস্‌ছে না। আজও কালকের মত আড্ডাটা ফাঁক যাবে না কি ?''

"না, চাটুয্যে মশায়, আড্ডা কি ফাঁক যায়। তবে এখন বড় জ্বরজাড়ি হচ্ছে, আর পুজোতে শ্যামপুকুরের বাঁড়ুয্যেদের বাড়ি থিয়েটর এসেছে। কাল গাঁ শুদ্ধ লোক তাই দেখতে গেছ্‌ল ব'লে—"

"তা যাই হ'ক ভাই, কাল তোমরা কেউ এলে না, আমার বড় একা ব'লে মনে হচ্ছিল—"

"তা হবেই ত। আপনি হলেন মজলিসি মানুষ।"

"আচ্ছা, আজ একটু ভাল ক'রে মজলিস্ করা যাক্। কামারদের বংশীকে আর পালেদের হংসকে ডেকে নিয়ে এস।"

"ডাক্‌তে হবে না চাটুর্য্যে মশাই তারা—আপনিই এসে প'ড়ে এই—"

"না হে। ডুগি তবলাটাও আনা চাই কিনা। তোমাকে একবার যেতেই হবে।"

"আচ্ছা যাচ্ছি—" বলিয়া রামচন্দ্র চলিয়া যাইবামাত্র হেমন্ত উঠিয়া দাঁড়াইয়া একটু ইতঃস্তত করিয়া নিঃশব্দ পদ-সঞ্চারে অন্দরের পথে চলিল।

বিভা যেখানে নির্জ্জনে বসিয়া সলিতা পাকাইতেছিল, হেমন্ত সেখানে আসিয়া দাঁড়াইতেই সে একবার মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল, কিন্তু তখনই বিরক্তি ভরে মুখ নত করিল। হেমন্ত একবার পিছনের উঠানের দিকে চাহিয়া লইয়া বলিল, "বিভা, তুমি কি আর আমার সঙ্গে কথা ক'বে না ?" কোন উত্তর না পাইয়া সে আবার বলিতে লাগিল, "দোষ আমার খুব হয়েছিল মানি। রাগও তোমার খুব হ'তে পারে সত্যি। কিন্তু আজ তোমাকে যে কথাটা বলতে এসেছি, তার শেষ মীমাংসা এত দরকারী—"

বিভা তাহার বিরক্ত-মলিন মুখখানি তুলিয়া হেমন্তের মুখের উপর দৃষ্টিপাত করিতেই সে বলিয়া উঠিল, "আজ আবার হরিপুর থেকে তত্ত্ব এসেছে—"

বিভা তাহার কথা শেষ হইবার আগেই ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিল, "হাঁ, তাতে তোমার কি ?"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া হেমন্ত আবার ধীরে ধীরে বলিল, "আমার নিজের কিছু কি না, সে কথা তোমাকে আমি জানাতে চাই না, আর জানিয়েও হয়ত কোন ফল নেই। কিন্তু সে দিনকার রাত্রে ঝি-মা আমাকে যে সত্যে আবদ্ধ—"

বিভা অস্বাভাবিক তীব্রতার সহিত বলিয়া উঠিল, "তোমাকে একশ বার বলেছি ঝি-মা বিকারের ঝোঁকে কি বলেছেন তা' নিয়ে তুমি আমাকে বারবার অপমান করো না, কিন্তু তুমি এত ইতর, নির্লজ্জ, নিষ্ঠুর—"

"আমাকে এই শেষবার মাপ কর বিভা। আমি সত্যই তোমাকে নানা রকমে জ্বালাতন করেছি—কিন্তু আজ থেকে—"

বাহিরে বামুন মার সাড়া পাইয়া হেমন্ত সে স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। (আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

কোরিয়া ও জাপানে হিন্দুসাহিত্য

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসুধাময়ী দেবী

বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া চীন ক্রমশ নিজেই বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হইল। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে কোরিয়া তাহার নিকট হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করে। ৩৭২ খৃষ্টাব্দে Tsin রাজত্বকালে Sunto নামক এক চীনা শ্রমণ কতকগুলি মূর্ত্তি ও ধর্ম্মগ্রন্থ লইয়া Kokuryoতে আসেন। কোরিয়া তখন তিনটি রাজ্যে বিভক্ত ছিল— Kokuryo, Paikche এবং Silla। চীন ও কোরিয়া উভয় স্থানেই এই কিম্বদন্তী প্রচলিত যে, খৃষ্টপূর্ব্ব ১১২২ অব্দে কয়েক হাজার চীনবাসী কোরিয়ায় আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করে। বস্তুত কোরিয়ার আদিম অধিবাসীগণের ইতিহাস সঠিক জানা নাই; তবে তাহারা মঙ্গোলীয় ছিল ইহা নিশ্চিত এবং তাহাদের ভাষা ছিল তুরাণীয় (Turanian Group) বর্গের। যাহা হউক, চতুর্থ শতাব্দীতে কোরিয়ায় বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবেশ করিবার পর অতি অল্পসময়ের মধ্যে কোরিয়ার সর্ব্বত্র বৌদ্ধপ্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। কোন কোন স্থানে বৌদ্ধ শ্রমণদিগের ক্ষমতা, উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীদিগের অপেক্ষা অধিক ছিল। মাঝে মাঝে এই ক্ষমতার অপব্যবহার করার দরুণ বৌদ্ধদিগকে উৎপীড়নও ভোগ করিতে হইত। তৎসত্ত্বেও বৌদ্ধধর্ম্ম তথা হইতে সম্পূর্ণ বিনষ্ট হইয়া যায় নাই। চীনে যখন রাজনৈতিক অন্তর্বিরোধ ও অশান্তির ফলে বৌদ্ধধর্ম্মের Tientai শাখা প্রায় বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, তখন কোরিয়ায় একজন শ্রমণ সেই শাখাকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। চীনা ত্রিপিটকের যে প্রাচীনতম সংস্করণটি এখন পাওয়া যায়, তাহা কোরিয়াতেই ছিল; সেখান হইতে সেটি জাপানে লইয়া যাওয়া হয়। ইৎসিং পরিব্রাজকদিগের জীবনীতে কতিপয় কোরিয়াবাসী পরিব্রাজকেরও উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি।

কোরিয়ার বর্ণমালা সম্বন্ধে বহু গবেষণার পর অনেকে স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে তাহা ভারতীয়। ঠিক কোথা হইতে কেমন করিয়া ভারতীয় বর্ণমালা তথায় যাইল সে সম্বন্ধে এখনও নিশ্চিত বলা না যাইলেও Leonde Rosuy তাঁহার 'Les Coreans' নামক গ্রন্থে বলেন যে, কোরিয়ার বর্ণমালা মূলত যে ভারতীয় এসম্বন্ধে তাঁহার কোনও সন্দেহ নাই। তাহার পর আরও বহু পণ্ডিত এবিষয়ে একমত হইয়াছেন। কোরিয়ায় বর্ণমালা সর্ব্বশুদ্ধ ২৫টি; তাহার মধ্যে ১৪টি ব্যঞ্জন, ১১টি স্বর। হুয়েনসাঙের বিবরণে দেখা যায় তিনি লিখিয়াছেন তুখারদেশে, কুচায় যে অক্ষর ব্যবহৃত হয় তাহা সংখ্যায় ২৫টি; এবং বামদিক হইতে দক্ষিণে লেখা হয়। ইহা খুবই সম্ভব যে, কোরিয়াবাসী পরিব্রাজকগণ ঐসকল স্থান হইতে তথাকার বর্ণমালা নিজেদের দেশে লইয়া যান।

কোরিয়া আবার জাপানকে বৌদ্ধধর্ম্মের বাণী শুনাইল। শুনা যায় যে, ৫২২ খৃষ্টাব্দে Shibo Tachito নামক এক চীনা শ্রমণ তথায় যাইয়া এক বিহার নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন এবং বুদ্ধের এক মূর্ত্তি তথায় স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রচেষ্টায় তেমন ফল হয় নাই। ইহার তেইশ বৎসর পরে ৫৪৫ খৃষ্টাব্দে কোরিয়ার রাজা রাজনৈতিক সখ্য স্থাপনের নিমিত্ত বুদ্ধের একটি প্রতিমূর্ত্তি সঙ্গে দিয়া Yamatoর রাজসভায় দূত প্রেরণ করেন। ৫৫২ খৃষ্টাব্দে আবার কতকগুলি বুদ্ধের মূর্ত্তি এবং বৌদ্ধগ্রন্থ লইয়া কোরিয়া হইতে দূত আসে। জাপানে বৌদ্ধধর্ম্ম স্থায়ীভাবে প্রভাব বিস্তার করিবার পূর্ব্বে নানারূপ প্রতিকূল অবস্থার ভিতর দিয়া তাহাকে যাইতে হয়।

কোরিয়া হইতে বৌদ্ধ শ্রমণগণ ক্রমাগত জাপানে যাইতে লাগিলেন; ধীরে ধীরে জাপানেও একটু দল তাঁহাদিগকে

উৎসাহ প্রদান করিতে লাগিলেন। ৫৭৭ খৃষ্টাব্দে এক ভিক্ষুণী আসেন জাপানে। আবার ৫৮৪ খৃষ্টাব্দে বিনয় অধ্যয়ন করিবার জন্য কয়েকজন জাপানী শ্রমণ যান কোরিয়ায়। ইহার পর চীনা সভ্যতা ধীরে ধীরে জাপানের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিল। খৃষ্টীয় ষষ্ঠশতাব্দী পর্য্যন্ত জাপানে কোনও বর্ণমালা ছিল না। ক্রমশ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে চীনা শিখিবার প্রচলন হইল; এবং বৌদ্ধভাবে অনুপ্রাণিত শিক্ষাই জাপানকে উন্নতির পথে আগাইয়া দিল। সপ্তম শতাব্দীর প্রথম দিকে Shotoku Taishi নামক জনৈক জাপানী রাজকুমার জাপানের শিক্ষাদীক্ষার আমূল সংস্কার-কার্য্যে আপনাকে উৎসর্গ করিয়া দিলেন। তখন হইতে চীন হইল জাপানের শিক্ষাগুরু। কি সাহিত্যে, কি শিল্পে সর্ব্বত্রই বৌদ্ধপ্রভাব আসিয়া পড়িল। কুমার শতকু যে বিহারটি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, তাহা হইতেই সেই যুগের শিল্পের নমুনা পাওয়া যায়। শতকু বৌদ্ধ চিত্র ও পতাকা-সমূহ চিত্রিত করিবার জন্য মুদ্রাযন্ত্রের সংস্কার করিলেন। এই যুগে নৃত্য গীত সমুদায়ই বৌদ্ধপ্রভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া নূতন আকার গ্রহণ করিল। শতকু-নির্মিত বিহারটি রীতিমত একটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ছিল। তাহাতে একাধারে বৌদ্ধধর্ম ও শিল্পবিজ্ঞান প্রভৃতি শিখাইবার ব্যবস্থা ছিল। বিজ্ঞান শিল্প ও বৌদ্ধধর্ম শিখিবার জন্য শতকু দলে দলে ছাত্র চীনে প্রেরণ করিতেন। ৬০৬ খৃষ্টাব্দে তিনি স্বয়ং সম্রাজ্ঞীর সম্মুখে তিনটি বৌদ্ধ সূত্র সম্বন্ধে ধারাবাহিক বক্তৃতা করেন। তখন জাপানের সম্রাজ্ঞী ছিলেন রাণী Suiko; শতকু ছিলেন ইঁহারই ভাগিনেয়। তিনটি সূত্রের একটি হইল শ্রীমালাদেবীসিংহনাদ, দ্বিতীয়টি বিমলকীর্ত্তিনির্দ্দেশ, তৃতীয় হইল সদ্ধর্মপুণ্ডরীক। প্রথমটিতে স্ত্রীজাতির কর্ত্তব্য নির্দেশিত হইয়াছে। দ্বিতীয়টি সম্বন্ধে আমরা পূর্বে চীনা সাহিত্যপ্রসঙ্গে বলিয়াছি। ইহাতে একজন আদর্শ গৃহীর চিত্র দেওয়া হইয়াছে। সদ্ধর্মপুণ্ডরীক সম্বন্ধেও আমরা পূর্বে বলিয়াছি। চীনে যে Tientai শাখা ছিল, সদ্ধর্মপুণ্ডরীক তাহার একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ। এই Tientai মত জাপানেও বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। সদ্ধর্মপুণ্ডরীকে বলা হইয়াছে যে, প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে বুদ্ধভাব নিহিত রহিয়াছে। অজ্ঞানতা ও বাসনা দূর করিয়া এই বুদ্ধত্ব-উপলব্ধিই হইতেছে একমাত্র লক্ষ্য; বুদ্ধযানই একমাত্র সত্য পথ। সমগ্র বিশ্ব এই একই সত্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত।

প্রথমে জাপানে যখন বৌদ্ধধর্ম প্রবেশ লাভ করিল তখন বিশেষ কোনও শাখার মধ্য দিয়া তাহা যায় নাই। ক্রমশ মাধ্যমিক শাখার শূন্যতাবাদ, যোগাচারবাদ, অবতংসকবাদ প্রভৃতি বিভিন্ন মত জাপানে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে লাগিল। বিনয়ের বহুগ্রন্থও জাপানের প্রাচীন মন্দিরগুলিতে পাওয়া যায়। অষ্টম শতাব্দীতে Tientai মত জাপানে বিশেষ উৎকর্ষলাভ করে। সদ্ধর্মপুণ্ডরীক এই শাখার প্রামাণ্য গ্রন্থ বটে, কিন্তু চীন ও জাপান উভয়স্থানেই এই মত কিছু কিছু পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া বিভিন্ন আকার গ্রহণ করে।

তন্ত্রবাদ চীন হইতে জাপানে লইয়া যান Kobo Daishi। Kobo Daishi চীনে ভারতীয় শ্রমণ প্রজ্ঞার নিকট সংস্কৃত শিক্ষা করেন। তৎপরে বৌদ্ধধর্ম ও বিশেষভাবে তন্ত্রযান শিক্ষা করিয়া দেশে ফিরেন। সেখানে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন Shingon মতের।

বর্ত্তমানে জাপানে প্রধানত চারিটি বৌদ্ধশাখা রহিয়াছে। প্রথম হইল Jodo বা সুখাবতী শাখা। ১১৭৪ খৃষ্টাব্দে জাপানে এই শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১২২৪ খৃষ্টাব্দে Shin শাখা গড়িয়া উঠে। Jodoরই সংস্কৃত শাখা হইল Shin, Shinএর অর্থই হইল সংস্কৃত (Reformed)।

১১৯১ খৃষ্টাব্দে ধ্যান বা Zen শাখার উৎপত্তি হয়। পূর্বে ইহা Tientai শাখারই অন্তর্গত ছিল, এখন হইতে বিভিন্ন একটি শাখায় পরিণত হয়। জাপানে ইহার প্রভাব খুব বেশী। ১২৫৩ খৃষ্টাব্দে Nichiren নামক আর একটি শাখাও প্রতিষ্ঠিত হয়; ইহার প্রভাবও কম ছিল না।

বৌদ্ধধর্ম ভিন্ন অন্যান্য হিন্দুদর্শনও জাপানীগণ শ্রদ্ধার সহিত আলোচনা করিতেন। আমরা জানি হুয়েনসাঙ্ বৈশেষিকের একটি গ্রন্থের চীনা অনুবাদ করিয়া-

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ও

ছিলেন। ইহার কোনও টীকা চীনাগণ লিখেন নাই। কিন্তু পরে জাপানে এই গ্রন্থের দশটি টীকা লিখিত হয়। নৈয়ায়িক দিঙ্‌নাগের গ্রন্থ যেমন চীনে সমাদর লাভ করিয়াছিল, তেমনি করিয়াছিল জাপানে। জাপানী শ্রমণগণ ন্যায়শাস্ত্রের বহুগ্রন্থ লিখিয়াছেন।

আজকাল জাপানের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক কেবল বাণিজ্যের দিক্ দিয়া। কিন্তু এক সময় তাহাদের মধ্যে গভীরতর একটি সম্বন্ধ যে ছিল, অল্প হইলেও তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। জাপানী পণ্ডিত তাকাকাসু বলেন, "দুর্ভাগ্যবশতই আমাদের ইতিহাস সেই ভারতীয় ভিক্ষুদের ও ভারত-পর্য্যটক জাপানী ভিক্ষুদের কাহিনী লিপিবদ্ধ করে নাই। ভারতের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধের যে সামান্য দু'একটি নিদর্শন ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়, সেগুলিও ক্রমশ বিস্মৃতির অতলগর্ভে ডুবিয়া যাইবে বলিয়া ভয় হয়।" ইৎসিংএর কাহিনীতে যে ৬৫ জন ভারত-পর্য্যটক শ্রমণের উল্লেখ রহিয়াছে, তাহার মধ্যে কয়েকজন ছিলেন কোরিয়াবাসী। সম্প্রতি Tun-huangএর গুহায় ফরাসী পণ্ডিত Pelliot একটি গ্রন্থ পাইয়াছেন। গ্রন্থটি Huichiao নামক কোরিয়াবাসী এক শ্রমণকর্ত্তৃক লিখিত একটি ভ্রমণ কাহিনী। তাহাতে দেখা যায় যে, জাপানী শ্রমণও কেহ কেহ ভারত পর্য্যটনে আসিয়াছিলেন।

একটি প্রসিদ্ধ চীনা গ্রন্থে দেখা যায় যে, ৮১৮ খৃষ্টাব্দে Kongo Sammai বা বজ্রসমাধি নামক এক জাপানী শ্রমণ ভারতে আসেন। তিনি 'মধ্যদেশ' পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। সেখানকার কতকগুলি মন্দিরে তিনি বিচিত্র বর্ণের মেঘের চিত্র আঁকিয়া আসিয়াছিলেন। বহুদিন পর্য্যন্ত কোনও উৎসবের দিনে ভারতবাসীগণ সেই সকল মন্দিরে আসিয়া জাপানী চিত্রীর সেই সকল চিত্রের নিকট মস্তক অবনত করিতেন।

৮৬৬ খৃষ্টাব্দে Takaoka নামক এক জাপানী রাজকুমার ভারতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। তাঁহার জ্ঞান ও ধর্ম্মপিপাসু মন চীন ও জাপানের বিদ্যাসম্ভারে তৃপ্ত হইতে পারে নাই। সেই কারণে ভারতে আসিতে তিনি প্রয়াস পাইয়াছিলেন। কিন্তু সমুদ্রপথে যাইতে যাইতে Laot নামক স্থানে আসিয়া অসুস্থ হইয়া পড়েন ও সেখানে মারা যান। কিওটোর প্রফেসর Shinnua অনুমান করেন যে এই Laot স্থানটি সিঙ্গাপুরের নিকটবর্ত্তী কোনও স্থান হইবে। সিঙ্গাপুরে কুমার Takakoaর একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করিবেন বলিয়া জাপানীগণ মনস্থ করিতেছেন।

ভারতীয় শ্রমণদিগের পক্ষে সমুদ্র বেষ্টিত জাপানে যাওয়া তখনকার দিনে তেমন সহজ ছিল না। সুতরাং মধ্যএশিয়া দিয়া তাঁহারা প্রায়ই চীনে যাইতেন। সমুদ্রপথ দিয়া যাঁহারা যাইতেন তাঁহারাও ক্যাণ্টনে আসিয়া চীনে চলিয়া যাইতেন। জাহাজে করিয়া জাপানে যাইবার তেমন সুবিধা ছিল না। এই সকল অসুবিধাসত্ত্বেও অল্প কয়েকজন ভারতীয় শ্রমণ জাপানে আসিয়াছিলেন।

কুমার শতকুর সময় Yamatoর এক গ্রামে ভারতীয় এক ভিক্ষু ছিলেন। ভিক্ষা করিয়া তিনি জীবিকানির্ব্বাহ করিতেন। শতকু তাঁহার সহিত একবার সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার মৃত্যুর পর মহাসমারোহে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করেন। কেহ কেহ মনে করেন, এই ভিক্ষু হইলেন বোধিধর্ম্ম। চীনে বহুকাল থাকিয়া জাপানে চলিয়া যান। এ সম্বন্ধে নিশ্চিত কোনও প্রমাণ নাই। তবে শতকু যাঁহাকে দেখিয়াছিলেন তিনি যে একজন ভারতীয় যোগী, এ বিষয়ে কোনও ভুল নাই। কুমার শতকু তাঁহার নামে এক পদ্য রচনা করিয়াছিলেন, সেই কবিতা এখনও জাপানে প্রচলিত আছে।

শুভকর সিংহ চীন হইতে জাপানে গিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ। সম্প্রতি তাকাকাসু, ধর্ম্মবোধি নামক আর একজন ভারতীয় শ্রমণের ইতিহাস আবিষ্কার করিয়াছেন। ইনি রাজগৃহের গৃধ্রকূট পর্ব্বতে ঋষির জীবন যাপন করিতেন। চীন ও কোরিয়া হইয়া ইনি জাপানে আসেন। তাঁহার সহিত একটি লৌহনির্ম্মিত কমণ্ডলু ও সহস্রহস্তসমন্বিত অবলোকিতের একটি ক্ষুদ্র পিত্তলমূর্ত্তি ছিল। তাঁহার সম্বন্ধে বহু অলৌকিক কাহিনী জাপানে প্রচলিত আছে। একবার তিনি তাঁহার অলৌকিক শক্তিবলে তথাকার সম্রাটকে নীরোগ করিয়াছিলেন। সেই সময় কিছুদিন রাজপ্রাসাদে থাকিয়া তিনি ধর্ম্ম প্রচার করেন। তাঁহাকে রাজকুমারগণ খুবই শ্রদ্ধা করিতেন।

তাঁহার অনুরোধে পঞ্চ-বার্ষিক মতঃ নামক একটি ভোজের আয়োজন তাঁহারা করেন। এই ভোজে ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর লোক আসিয়া যোগদান করে। তিনি যেখানে থাকিতেন সম্রাট পরে সেই পর্বতের উপর একটি মন্দির নির্মাণ করাইয়া দেন। ধর্মবোধির জীবন ও উপদেশের প্রভাবে বহুলোক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে। ৬৫১ খৃষ্টাব্দে ধর্মবোধির উপদেশানুসারে Dai-Zo-Ye নামে ত্রিপিটকের একটি উৎসব রাজপ্রসাদে সম্পন্ন হয়। এই উৎসবটি বহুকাল পরে আবার ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে পুনরুজ্জীবিত করা হয়। তখন হইতে প্রতিবৎসর নির্দ্দিষ্টদিনে বক্তৃতাদির আয়োজন হয়। ধর্মবোধি দশ বৎসর জাপানে থাকেন, তারপর সহসা ভারতে ফিরিয়া আসেন।

বুদ্ধসেন নামক দক্ষিণভারতবাসী এক ব্রাহ্মণ ৭৩৬ খৃষ্টাব্দে জাপানে আসেন। Gyogi নামক জাপানী এক পণ্ডিত সম্রাটের আদেশানুসারে বুদ্ধসেনকে অভ্যর্থনা করিয়া আনিলেন। Gyogi সংস্কৃত ও জাপানী উভয় ভাষার সংমিশ্রণে এমন এক ভাষায় বুদ্ধসেনের সহিত আলাপ করিলেন যে, বুদ্ধসেন সহজেই তাহা বুঝিলেন। আলাপ আলোচনার মধ্য দিয়া উভয়েই দেখিলেন যে, তাঁহাদের মতামত প্রায় সম্পূর্ণ মিলে। বুদ্ধসেন Daianji বিহারে থাকিয়া জাপানী শ্রমণদিগকে সংস্কৃত শিক্ষা দিতে লাগিলেন, অমিতায়ুবাদও ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। ক্রমশ তিনি নিজে একটি বিহার স্থাপন করেন; বিহারটির নাম Ryosenji বা গৃধ্রকূটবিহার। ৭৬০ খৃষ্টাব্দে সেখানেই তিনি মারা যান।

বুদ্ধসেন সংস্কৃত শিখাইবার সময়ই জাপানী বর্ণমালা সংস্কৃত ছাঁচে গঠিত হইয়া উঠে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। কারণ সংস্কৃত না জানা কোনও ব্যক্তির পক্ষে এইরূপভাবে বর্ণমালা সাজান অসম্ভব। আমরা জাপানী বর্ণমালার নমুনা দেখাইলেই বুঝা যাইবে সংস্কৃত প্রভাব ইহাতে কতখানি।

স্বরবর্ণ

অ ই উ এ ও

(এইরূপ দীর্ঘ স্বরবর্ণও আছে)

ব্যঞ্জনবর্ণ—পঞ্চবর্গ

ক	কি	কু	কে	কো
চ	চি	চু	চে	চো

(এই বর্গে জ ঝ ও শ ষ স ও উচ্চারিত হয়)

ট	টি	টু	টে	টো
ত	তি	তু	তে	তো

দ ধ (প্রভৃতি)

হ ম য র ব ইত্যাদি

এইরূপে দেবনাগরী অক্ষরের ৪৭টি বর্ণই ইহাতে অবিকল রহিয়াছে।

চীনা ও জাপানী বৌদ্ধগণ সংস্কৃত গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতেন। কিন্তু চীনে সংস্কৃত গ্রন্থ এখন আর পাওয়া যায় না; কেবল চীনা ত্রিপিটকের মধ্যে স্থানে স্থানে সংস্কৃত অক্ষর দেখা যায়। কিন্তু জাপানে সংস্কৃত পুঁথিসব এখনও পাওয়া যায়। সেগুলির মধ্যে কতকগুলি চীন হইতে আনীত; কতকগুলি মূল গ্রন্থ হইতে জাপানেই অনুলিখিত। মাক্সমুলার তাঁহার Buddhist Texts from Japan গ্রন্থে এইরূপ বহু সংস্কৃত পুঁথির উল্লেখ করিয়াছেন। জাপানে অতি পুরাতন কয়েকটি বৌদ্ধ বিহারে এই সকল মূল্যবান পুঁথি পাওয়া গিয়াছে; তাহাদের মধ্যে ৬টি সম্পূর্ণ গ্রন্থ। অবশিষ্টগুলি অসম্পূর্ণ; তবে কোনযুগে সেগুলি লিখিত তাহা সেই ছিন্নপুঁথিগুলি হইতেই বেশ বুঝা যায়। যে সকল সংস্কৃত পুঁথি এখন পাওয়া যায় তাহাদের মধ্যে এগুলিই প্রাচীনতম। খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে নালন্দা বিহারের একটি ভিক্ষুর স্বহস্তলিখিত। ভিক্ষুটির নাম প্রজ্ঞতর। ইনি পুঁথিটি চীনে লইয়া যান। সেখান হইতে তাঁহার এক জাপানী শিষ্য এটি জাপানে লইয়া আসেন।

৬৫২ খৃষ্টাব্দে আমরা প্রথম জাপানী ত্রিপিটক Issikyoর উল্লেখ দেখিতে পাই। ত্রিপিটক নকল করা জাপানে একটি পুণ্য কার্য্য মনে করা হইত। একজন সম্রাট নাকি একদিনে ইহা নকল করিয়া দিবার জন্য ১০০০০ অনুলেখক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। জাপানের পক্ষে ইহা বিচিত্র নহে।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসুধাময়ী দেবী

জাপানই প্রথম movable অক্ষর দিয়া ত্রিপিটক ছাপাইবার চেষ্টা করে। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে জাপানে একটি সভা স্থাপিত হয়। সেই সভা ১৯১৬খানি গ্রন্থ প্রকাশ (publish) করে। এখনও বৌদ্ধগ্রন্থ প্রকাশের কার্য্য এই সভা হইতে চলিয়া আসিতেছে। সম্প্রতি ত্রিপিটকের একটি আধুনিকতম সংস্করণ ৫৫খণ্ডে জাপান হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। এই সংস্করণে সমস্ত বৌদ্ধগ্রন্থ, এমন কি মধ্য এশিয়ায় যেগুলি পাওয়া গিয়াছে সেগুলিও, আছে।

এখন জাপানী পণ্ডিতগণ বৌদ্ধ সাহিত্য ও অন্যান্য ভারতীয় সাহিত্য আলোচনার নিমিত্ত কি করিতেছেন সে সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। বৌদ্ধধর্ম চীন হইতে জাপানে গিয়াছে সে আজ প্রায় হাজার বছরেরও অধিক। সেখানে নানা পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া গিয়া এখন জাপানী বৌদ্ধধর্ম সম্পূর্ণ বিভিন্ন আকার গ্রহণ করিয়াছে—অথচ মূল সূত্রগুলি একই আছে। বর্ত্তমান জাপানে ১৩টি বৌদ্ধ সম্প্রদায়—তাদের শাখা হইল ৫৮টি। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের শিক্ষার জন্য পৃথক্ বিদ্যালয় আছে। এমন কি টোকিও, কিওটো, টোহাকু, কিউসু প্রভৃতি রাজকীয় বিশ্ববিদ্যালয়েও সংস্কৃত ও পালি বৌদ্ধসাহিত্যের জন্য একটি কি দুটি শিক্ষা বিভাগ রহিয়াছে। Otani বিশ্ববিদ্যালয় হইল বৌদ্ধ কলেজগুলির মধ্যে প্রধান। বৌদ্ধ কলেজ ব্যতীত নানা বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠান সেখানে রহিয়াছে; সে সব স্থান হইতে বৌদ্ধ পত্রিকা সব প্রকাশিত হয়। এগুলির মধ্যে Eastern Buddhistএর নাম উল্লেখযোগ্য। জাপানের লোকসংখ্যার মধ্যে এখন বেশীর ভাগ বৌদ্ধ। গত চল্লিশ বৎসর ধরিয়া আধুনিক জাপান সংস্কৃতের চর্চ্চা আরম্ভ করিয়াছে। এই অল্প সময়ের মধ্যে সে অনেকখানি আগাইয়াছে। জাপানী পণ্ডিতগণের মধ্যে Nonjio, Kasawara, Takakasu, Watanabe, Anesaki, Ui প্রভৃতির নাম আজকাল সর্ব্বত্র বিদিত। ঋগ্বেদের অনুবাদ, ১২৬টি উপনিষদের অনুবাদ, শঙ্করের টীকা সমেত ভগবদ্গীতার অনুবাদ ইতিমধ্যে জাপানী ভাষায় হইয়া গিয়াছে। এখন প্রাচীন হিন্দুসাহিত্য আলোচনা করিতে যাইলে বর্ত্তমান জাপানী সাহিত্যের সাহায্য লইতে হয়। আধুনিক ভারত সম্বন্ধেও জাপান জানিতে উৎসুক। রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ গ্রন্থই জাপানী ভাষায় অনূদিত হইয়াছে।

অমরনাথের পথে

শ্রীঅশ্বিনীকুমার দাশ

উপক্রম

শ্রীনগরে পৌঁছিবার একদিন পরে শ্রীনগর কলেজের অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় শ্রীযোগীন্দ্রনাথ দাস মহাশয়ের নিকট শুনিলাম যে, মহারাজা যাত্রীগণকে অমরনাথের পথে যাইতে দিবেন। অমরনাথ দর্শনের সময় আসন্নপ্রায়। মাত্র চারিটি দিন অবশিষ্ট আছে। আরও শুনিলাম যে, এই অল্প সময়ের মধ্যে অমরনাথের পথে যাত্রীগণের যাত্রার সুবিধার জন্য যাহা কিছু বন্দোবস্ত করা সম্ভবপর তাহাও রাজসরকার হইতে করা হইবে। বৎসরের প্রায় সমস্ত সময়টি অমরনাথের গুহা ও গুহার পথ নিরবচ্ছিন্ন তুষারে আবৃত থাকে। বৎসরের এই সময়টিতে অর্থাৎ শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে যে বৎসর তুষার অল্প থাকে সেই বৎসর কাশ্মীর-রাজ বিপুল অর্থ ব্যয় করিয়া যাত্রীগণের যাতায়াতের উপযোগী অস্থায়ী পথ প্রস্তুত করাইয়া দেন। পথের মধ্যে অসংখ্য ক্ষুদ্র বৃহৎ খরস্রোতা নদী ও ঝরণা আছে, সেগুলির উপরও অস্থায়ী সেতু নির্ম্মিত হয় এবং রাজ-সরকারের কর্ম্মচারীগণ দুর্গম স্থানে উপস্থিত থাকিয়া যাত্রীগণের গতি নিয়ন্ত্রিত করেন। শুনিতে পাই, একটি দাতব্য চিকিৎসা-বিভাগও যাত্রীগণের সহিত প্রতি বৎসর যাইয়া থাকে। এই সকল বন্দোবস্ত না হইলে যাত্রীগণের পক্ষে তুষারাচ্ছন্ন দুর্গম অমরনাথ যাত্রা অসম্ভব হইয়া পড়ে। যে বৎসর গুহা ও তাহার পথে অত্যধিক তুষার থাকে, সে বৎসর যাত্রীগণকে যাইতে দেওয়া হয় না। কাশ্মীরের পথে, রাউলপিণ্ডিতে উপনীত হইয়া, বাঙ্গালীদিগের কালীবাড়ীতে বাঙ্গালী পুরোহিত মহাশয়ের নিকট এই বৎসর অমরনাথের পথ বন্ধ থাকার কথা শুনিয়া আমাদিগের সকলের মন নিরাশায় ভরিয়া গিয়াছিল। যখন এত ক্লেশ স্বীকার করিয়া এতদূর আসিয়াছি তখন শেষ পর্য্যন্ত কি হয় তাহাই দেখিবার জন্য অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া আমরা শঙ্কান্দোলিত চিত্তে শ্রীনগর অভিমুখে রওয়ানা হইয়াছিলাম সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে শ্রদ্ধেয় যোগীন্দ্রবাবুর নিকট এই আনন্দ সংবাদ শ্রবণ করিয়া আমাদের মনে যে কি আনন্দ হইল তাহা ভাষায় বর্ণনা করা অসম্ভব।

বিপুল আগ্রহে আমরা সেই দিনই বৈকালে শ্রীনগরের বাজারে—আমিরা কদল্ বাজার (Amira Käddl)—গমন করিলাম; এবং একজন পরিচিত মোটারওয়ালার নিকট যাইয়া শ্রীনগর হইতে ৬২ মাইল দূরবর্ত্তী প্যাহলগাঁ (Pahlgaon) পর্য্যন্ত একটি 'বাস' যাতায়াতের ভাড়া এক শত টাকায় ঠিক করিয়া আসিলাম।

বৃহস্পতিবার, ১৪ই শ্রাবণ—যাত্রারম্ভ

প্রভাতে শয্যাত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিলাম। পূর্ব্বরাত্রে অবিরাম ধারায় বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। তখনও বারিবর্ষণের নিবৃত্তি হয় নাই। সমস্ত আকাশ একখণ্ড কালো মেঘে আচ্ছন্ন। প্রকৃতির বিরস বদন দেখিয়া আমরা বিমর্ষ হইলাম, কিন্তু আমাদের বিমর্ষতা ক্ষণিক। অমরনাথ দর্শনের প্রবল আকাঙ্ক্ষার নিকট অন্তরের বিমর্ষতা মুহূর্ত্তে বিলীন হইল। অমরনাথ যাত্রার আয়োজনে আমরা বিরত হইলাম না। যথা সময়ে আমরা ভোজন সমাপ্ত করিয়া আমাদের প্যাহলগাঁ পর্য্যন্ত যাইবার জন্য যে 'বাস' ঠিক করিয়াছিলাম সেই বাসের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। মধ্যাহ্নের পর আকাশ একটু পরিষ্কার বলিয়া বোধ হইল। বৃষ্টি বন্ধ হইয়াছে; কিন্তু তখনও আকাশে অল্প অল্প মেঘ দেখা যাইতেছে।

বেলা তিনটার সময় মোটার বাস লইয়া 'হবিবুল্লা' যোগীন্ বাবুর বাসায় উপস্থিত হইল এবং জানাইল যে, মোটার প্যাহলগাঁ পর্য্যন্ত যাইতে পারিবে না, যেহেতু রাত্রে বৃষ্টি হওয়ায় শ্রীনগর ও প্যাহলগাঁর মধ্য পথে একস্থানে

শ্রীঅশ্বিনীকুমার দাশ

পাহাড় পড়িয়া পথ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। আমাদিগকে সে 'ভবন' পর্য্যন্ত ৩৪ মাইল পথ মোটারে লইয়া যাইবে; যদি 'ভবনের' পরে পথ ইতিমধ্যে পরিষ্কার করা হইয়া থাকে ত' প্যাহলগাঁ পর্য্যন্তই লইয়া যাইবে; নতুবা আমাদিগকে 'ভবন' হইতে প্যাহলগাঁ যাইবার স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করিয়া লইতে হইবে। আমরা অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়াই ত' রাউলপিণ্ডি হইতে রওয়ানা হইয়াছিলাম। সুতরাং হবিবুল্লার এই দুঃসংবাদে দুঃখিত হইলাম কিন্তু নিরাশ হইলাম না। অদৃষ্টের উপরই পুনরায় নির্ভর করিয়া আমরা হবিবুল্লার 'পুষ্পরথে' আরূঢ় হইয়া অমরনাথের পথে যাত্রা আরম্ভ করিলাম।

আকাশে তখনও অল্প অল্প মেঘ। বর্ষণক্লান্ত মেঘরাশি ধীর মন্দ সমীরণস্পর্শে গগনমার্গে ইতস্তত উড়িয়া বেড়াইতেছে। ক্ষীণ মেঘ-জাল ভেদ করিয়া বৈকালিক সূর্য্যের স্বর্ণ কিরণ বৃক্ষশিরে পতিত হইয়া অপরূপ শোভায় প্রকৃতি সুন্দরীকে সৌন্দর্য্যশালিনী করিয়াছে। পথের উভয় পার্শ্বে সমুন্নত পপ্‌লার বৃক্ষ শ্রেণীবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান। বৃক্ষ সকলের পত্রসমূহ তখনও সিক্ত। পল্লবপ্রান্ত হইতে সঞ্চিত বারিরাশি বিন্দু বিন্দু পতিত হইয়া ধরণীর বুকের উপর ছড়াইয়া পড়িতেছে। পপ্‌লার শ্রেণীর মধ্য দিয়া আমাদের মোটার ছুটিয়া চলিয়াছে। Kashmir Gazetteerএ দেখা যায় যে এই পপ্‌লার বৃক্ষ কাশ্মীরজাত নহে; মোগলরাজত্ব কালে জনৈক মোগল রাজপ্রতিনিধি দ্বারা অন্য দেশ হইতে (সম্ভবতঃ চীন হইতে) ইহা কাশ্মীরে আনীত হয়। ইহা ভারতের কুত্রাপি নাই। দেখিতে এই বৃক্ষ অতীব সুন্দর; এত লম্বা আর কোনও বৃক্ষ হয় কিনা জানি না। কাণ্ড-দেশ অত্যন্ত সরল; অনেকটা ইউক্যালিপ্টাস্ বৃক্ষের ন্যায়। বৃক্ষের কাণ্ড দেশে কোনও পল্লব হয় না।

আমরা এগার জন আরোহী ছিলাম; চারজন মহিলা এবং সাত জন পুরুষ। এতদ্ব্যতীত, শ্রীনগর হইতে যোগীন্দ্র বাবু একজন কাশ্মীরী ভৃত্য সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন, তাহাকেও সঙ্গে লওয়া হইয়াছিল।

অমরনাথের গুহা

শঙ্করাচার্য্যের পাহাড়

অতি অল্প সময়ের মধ্যে সমুন্নত পপ্‌লার-বীথি পশ্চাতে ফেলিয়া, একটি ক্ষুদ্র কিন্তু মনোহর সেতু সাহায্যে আমরা ঝিলাম নদীর একটি 'খাল' পার হইয়া শ্রীনগরের সীমানা অতিক্রম করিলাম। পথের সম্মুখে একটি পর্ব্বত, যেন পথ রোধ করিয়া প্রকাণ্ড দৈত্যের মত দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। পর্ব্বতটিকে বামে রাখিয়া মোটর তীব্র গতি-ভরে শ্রীনগর হইতে দক্ষিণ অভিমুখে ছুটিয়া চলিল। এই পাহাড়টিকে স্থানীয় লোকেরা শঙ্করাচার্য্যের পাহাড় বলে। বিদেশী পর্য্যটকগণ ইহাকে King Solomon's Throne or

Tower নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। পাহাড়ের শিখরদেশে একটি গোলাকার মন্দির আছে। মন্দিরটি প্রস্তরনির্ম্মিত। পর্ব্বতের প্রান্তভাগ হইতে একটি পথ মন্দিরের দ্বারদেশ পর্য্যন্ত গিয়াছে। মন্দিরে উঠিবার চওড়া চওড়া ধাপ আছে। আজকাল একটি তীব্র বৈদ্যুতিক আলোক প্রতি সন্ধ্যায় মন্দিরের উপর প্রজ্বলিত করা হয়; তাহার রশ্মি বহুদূর হইতে দেখা যায়। কবে কাহার দ্বারা এই মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহার কোনও প্রমাণ নাই। Solomon রাজার সিংহাসন কথনও ছিল কিনা তাহার কোনও ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই। কোনও কোনও লেখক ইহাকে বৌদ্ধ যুগের 'বিহার' আখ্যা দিয়া থাকেন। যখন কাশ্মীরে বৌদ্ধগণের প্রভাব বিস্তৃতি লাভ করে সেই সময় কোনও বৌদ্ধরাজদ্বারা ইহা নির্ম্মিত হইয়া বিহারস্বরূপে ব্যবহৃত হইত। পরে যখন কাশ্মীর পাঠানগণের প্রভুত্বাধীনে আসে সেই সময় পাঠানরাজ সুলেমান ইহা তাঁহার Tower রূপে ব্যবহার করিতেন। কাশ্মীরের পাঠান মুসলমান অধিবাসীরা ইহাকে কাশ্মীরে পাঠানগণের বিজয়-কেতন বলিয়া থাকে। হিন্দুরা ব'লন প্রভু শঙ্করাচার্য্য তাঁহার শিষ্যগণ সহ এইস্থানে আসিয়া কিছুকাল বসবাস করিয়াছিলেন। মন্দিরটি যে অতি প্রাচীন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

শঙ্করাচার্য্যের পাহাড়ের উপর হইতে শ্রীনগরের নৈসর্গিক দৃশ্য অতি সুন্দর। পাহাড়ের এক পার্শ্বে ডালহ্রদ (Dhal Lake)—বিকশিতকমলদল বক্ষে ধারণ করিয়া দিগন্তে যাইয়া চক্রবালে মিলিত হইয়াছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাশ্মীরী 'শিকারা' নৌকা ইতস্তত ভাসিয়া বেড়াইতেছে। পাহাড়ের অপর পার্শ্বে বর্ষণ-স্ফীতা, কলরবমুখরিতা ঝিলাম নদী। শঙ্করাচার্য্য পাহাড়ের উত্তরে অনতিদূরে 'হরিপর্ব্বত'। পূর্ব্বে মহামতি আকবর এই পর্ব্বতের উপর তাঁহার দুর্গ স্থাপন করিয়াছিলেন; এক্ষণে উহা কাশ্মীররাজের সেনানিবাস। শঙ্করাচার্য্য পাহাড়ের পাদদেশে একটি সুন্দর উপবন ও মন্দির এবং পাহাড়ের পশ্চাতে কাশ্মীরের যুবরাজ (বর্ত্তমান মহারাজা) স্যার হরিসিংএর রাজপ্রাসাদ; সাহেবী ধরণে প্রাসাদটি নির্ম্মিত। অসংখ্য আখরুট ও চেনার বৃক্ষের মধ্যে প্রাসাদটি আত্মগোপন করিয়া রহিয়াছে।

শঙ্করাচার্য্যের পাহাড় অথবা তখ্ত-ই-সুলেমানি পশ্চাতে রাখিয়া আমাদের মোটার দক্ষিণ-পূর্ব্ব অভিমুখে ছুটিয়া চলিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাশ্মীরী গ্রামগুলি ক্রমে ক্রমে আমাদের নয়নপথে পড়িতে লাগিল। চারিদিকে দিগন্তপ্রসারী মাঠ। প্রকৃতিদেবীর সরল গ্রাম্য-চিত্রের যবনিকা যেন সহসা আমাদের সম্মুখে উদ্ঘাটিত হইল। চারিদিকেই

"অবারিত মাঠ, গগন ললাট চুমে তব পদধূলি,
ছায়া সুনিবিড়, শান্তির নীড় ছোট ছোট গ্রামগুলি।"

একগাড়ী বাঙ্গালী আরোহী দেখিয়া গ্রাম্য রমণীরা ও পুরুষগণ কৌতূহলদীপ্ত নয়নে আমাদের পথের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইতে লাগিল। তাহাদের পরিহিত বিচিত্রবর্ণের ঘাঘ্রা ও আলখোল্লাগুলি দেখিয়া মনে হইত যেন গোধূলি সময়ে শ্যামা ধরণীর বুকের উপর কতকগুলি বিচিত্রবর্ণের পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া রহিয়াছে। নয়নরঞ্জন প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিতে দেখিতে আমরা বিপুল পুলকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম।

পাণ্ড্রেথান

শঙ্করাচার্য্য পাহাড়ের প্রায় তিন মাইল দক্ষিণে, পান্ড্রেথান নামক গ্রাম আমাদিগের দৃষ্টিপথে পতিত হইল। এই গ্রামটি ঝিলাম নদীর দক্ষিণে, শ্রীনগর হইতে চারিমাইল দূরে অবস্থিত। বর্ত্তমান সময়ে ইহা একটি সামান্য গণ্ডগ্রাম, কিন্তু পুরাকালে এইস্থানের প্রসিদ্ধি সমগ্র কাশ্মীর ও পঞ্চনদ প্রদেশে ব্যাপ্ত ছিল। পণ্ডিত কহ্লন (মিশ্র) তাঁহার 'রাজতরঙ্গিণী'-গ্রন্থে বহুবার এই স্থানের উল্লেখ করিয়াছেন। পুরাকালে এইস্থান পুরদ্ধিস্থান নামে খ্যাত ছিল। পুরদ্ধিস্থান অর্থে পুরাতন রাজধানী। বর্ত্তমান নাম 'পান্ড্রেথান' পুরাতন সংস্কৃত 'পুরদ্ধিস্থানের' অপভ্রংশ। কাশ্মীরের ভূতপূর্ব্ব রেসিডেণ্ট লরেন্স সাহেব তাঁহার পুস্তকে বলিয়াছেন যে, অতি প্রাচীনকালে কাশ্মীরের রাজধানী এইস্থানে অবস্থিত ছিল এবং সেই পুরাকালে ধনজন পরিপূর্ণ সমৃদ্ধিশালী পুরদ্ধিস্থানের বিস্তৃতি চারি মাইলের অধিক ছিল। হিন্দুরাজগণের

শ্রীঅশ্বিনীকুমার দাশ

অধঃপতনের পর কাশ্মীর যখন বৌদ্ধরাজগণের প্রভাবে বিস্তৃতি লাভ করে, সেই সময় মৌর্য্যবংশীয় বৌদ্ধরাজা অশোকের রাজত্বকালে এইস্থানে একটি সুবিশাল প্রস্তর-মন্দির নির্ম্মিত হয় (আনুমানিক ২৫০ খৃঃ পূঃ)। সম্রাট অশোকের সাম্রাজ্য কাশ্মীর হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল; তাঁহার কীর্ত্তিকেতন সুবিশাল ভারতভূমির প্রায় প্রত্যেক প্রদেশেই এখনও—দুই হাজার বৎসর পরেও—দেখিতে পাওয়া যায়। এই মন্দিরের মধ্যে বুদ্ধদেবের একটি দন্তসংরক্ষিত হইয়াছিল এবং যতদিন কাশ্মীরে বৌদ্ধপ্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল ততদিন এই মন্দির বৌদ্ধগণের নিকট পুণ্য-পীঠ বলিয়া পরিগণিত হইত। 'বার্ণিয়োর' ভ্রমণ বৃত্তান্তে (Bernio's Travels) এই পুরন্ধিস্থান ও তাহার মন্দির সম্বন্ধে যথেষ্ট উল্লেখ আছে। কাশ্মীরে হিন্দুরাজত্ব পুনঃস্থাপনের পর, কাশ্মীরের হিন্দু রাজা বৌদ্ধবিদ্বেষী অভিমন্যু রোমক সম্রাট অত্যাচারী নিরোর মত (Nero) এই মন্দিরটির ও তৎসংলগ্ন জনপদের ধ্বংস সাধন করেন (৭ম খৃঃ অব্দে)।

শুনিতে পাওয়া যায়, বর্ত্তমান সময়ে পানড্রথান গ্রামের মধ্যে একটি বৃহদাকার প্রস্তর-মূর্ত্তি পতিত আছে। মূর্ত্তিটি অনেকটা আকৃতিতে Indian Museumএ রক্ষিত কুশান সম্রাট কণিষ্কের সময়কার যক্ষমূর্ত্তির অনুরূপ। এইরূপ মূর্ত্তির ভগ্নাবশেষ বেনারস সারনাথের মিউসিয়ামেও রক্ষিত আছে। পানড্রথানে মূর্ত্তিটির সমস্তটা নাই। মূর্ত্তিটি গ্রীক্ আর্টের উৎকৃষ্ট নমুনা এবং এই মূর্ত্তি ও মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ হইতেই যথেষ্ট প্রমাণিত হয় কাশ্মীর উপত্যকার অভ্যন্তরেও গ্রীক ভাস্কর্য্য-বিদ্যা কতটা প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। পূর্ব্বে মূর্ত্তিটি মন্দিরের অভ্যন্তরে স্থাপিত ছিল। বিদেশী পর্য্যটকেরা বলেন যে, মূর্ত্তিটি সম্ভবতঃ বৌদ্ধরাজত্বের অবসানের অব্যবহিত পূর্ব্বে স্থাপিত হয়। বার্ণিয়ো যখন ভ্রমণ উপলক্ষে এইস্থানে উপনীত হন, তখনও মন্দিরটি ধ্বংসপ্রায় অবস্থায় মনুষ্য ও প্রকৃতির সর্ব্ববিধ অত্যাচার সহ্য করিয়াও কালের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া দণ্ডায়মান ছিল এবং মন্দিরের মধ্যে ছত্রতলে অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর নারীমূর্ত্তি খোদিত ছিল; সম্ভবতঃ সেগুলি অপ্সরা মূর্ত্তি প্রত্যেক মূর্ত্তির হস্তে এক একটি মালা।

পাণ্ডুচক্

পুরন্ধিস্থানের এক মাইল দক্ষিণে পাণ্ডুচক্। ইহাও অতি ক্ষুদ্রগ্রাম। আমাদের পথের পার্শ্বে ও ঝিলাম নদীর দক্ষিণ কূলে অবস্থিত। পূর্ব্বে এই স্থানের প্রাকৃতিক শোভা অতুলনীয় ছিল। দূরে ও নিকটে ক্ষুদ্র বৃহৎ পর্ব্বত মালা। অসমতল শস্যক্ষেত্র সবুজশস্যে পরিপূর্ণ। মাঝে মাঝে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য প্রস্রবণ কুল্ কুল্ শব্দে ঝিলামে যাইয়া মিশিতেছে; তটিনী তীরে স্থানে স্থানে (willow) উইলো-কুঞ্জ। শুনিতে পাই, এই স্থানের প্রাকৃতিক শোভায় মুগ্ধ হইয়া মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীর ১৬০৮ খৃঃ অব্দে জগজ্জ্যোতি নূরজাহানের ইচ্ছা অনুসারে এক অতি মনোরম উপবন নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। এখন সে উপবনের অস্তিত্ব নাই। যাহা একদিন প্রাকৃতিক শোভা-সম্পদে অতুলনীয় ছিল, সেই সাধের উপবন এখন জঙ্গলে পরিপূর্ণ। সম্রাট জাহাঙ্গীর কৃত একটি অতি সুন্দর প্রস্তর-সেতুর ধ্বংসাবশেষ অতীতের সাক্ষীস্বরূপ এখনও পথের পার্শ্বে পড়িয়া রহিয়াছে।

পাম্পুর

পাণ্ডুচক্ গ্রামের প্রায় দুই মাইল দক্ষিণে চতুর্দ্দিকে পর্ব্বতমালাবেষ্টিত এক বিস্তীর্ণ সমতল ক্ষেত্র আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিল। এই স্থান পাম্পুর (Pampur) নামে খ্যাত। পাম্পুর কাশ্মীরের একটি অন্যতম প্রাচীন স্থান। রাজা পদ্মাদিত্য খৃঃ অব্দ ৮৩২ এই পাম্পুরের প্রতিষ্ঠা করেন এবং প্রতিষ্ঠাতা পদ্মাদিত্যের নাম অনুযায়ী এই স্থান 'পদ্মাপুর' বলিয়া খ্যাত ছিল। বর্ত্তমান নাম প্রাচীনের অপভ্রংশ মাত্র। পাঠান রাজগণের কীর্ত্তি-চিহ্ন একটি বিশাল মস্‌জিদ এখনও পাম্পুর গ্রামের প্রাচীনতার স্বরূপ দণ্ডায়মান আছে। পাম্পুরের বর্ত্তমান প্রসিদ্ধি কেবল কাশ্মীরেই পর্য্যবসিত নহে। বিখ্যাত জাফরাণ্ চাষের জন্য পাম্পুর যথেষ্ট প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। পাম্পুর ও তাহার জাফ্‌রাণ্ চাষ সম্বন্ধে Kashmir Gazetteerএ এইরূপ লিখিত আছে,—"At Pampur, the saffron grows in abundance. Saffron or keshar is the

stamina of the flowers of the crocus sativas. The plants flower about the end of October. At that time, a large number of villagers of both the sexes, and of all ages, gather there to collect flowers and Sepoys are stationed there to prevent their pilferings. The flowers are of purple complexion, ইত্যাদি।

ভারতের কুত্রাপি জাফরাণ্ চাষ হয় না; ইহা কেবল কাশ্মীরেই হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা কাশ্মীরের নিজস্ব বস্তু নহে; সম্ভবতঃ ইহা চীন হইতে প্রথমে ভারতে আমদানী করা হইয়াছিল। কবে এবং কোন যুগে তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই। Times of India, March 18, 1928 সংখ্যার ১৩ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, "The cultivation of saffron is a very old industry. In ancient times the centre of the industry appears to have been the town of Corycus in Cilicia (Asia Minor), though authorities disagree as to whether the plant (crocus) was named after the town (Corycus) or the town after the plant. Presumably the cultivation of the saffron crocus spread from Asia Minor eastward into Central Asia and westward to the countries about the Mediterranean. The industry in Kasmir is of ancient standing. By the time of Akbar it had attained considerable proportions and the 'Ain-i-Akbari' mentions 10,000 to 12,000 bighas—say 4,000 acres—as the area under cultivation. At present the area is 2000 acres."

বর্ত্তমান সময়ে জাফরাণ্ আবাদ করায় রাজসরকারের একচেটিয়া অধিকার (State monopoly)। প্রতি বৎসর জাফরাণ্ আবাদ করিবার অধিকার জনৈক ঠিকাদারকে রাজসরকার হইতে দেওয়া হয়। বর্ত্তমান সনে বাৎসরিক ৫৩,০০০ টাকা খাজনায় জাফরাণ্ জমি বিলি করা আছে। ঠিকাদার আপন লোকদ্বারা জমিতে চাষ করাইয়া লয়। এক একার জমিতে প্রায় অর্দ্ধসের ভাল জাফরাণ পাওয়া যায় এবং অর্দ্ধসের জাফরাণের দাম কাশ্মীরে ৮০্ হইতে ১২০্ টাকা পর্য্যন্ত। জাফরাণ্ ক্ষেত্রগুলি অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র; প্রায় ৮ ফিট দীর্ঘ ও প্রস্থ। প্রত্যেক ক্ষেত্রের চতুর্দ্দিকে আল আছে এবং দুইটি ক্ষেত্রের আলের মধ্যস্থলে পয়ঃপ্রণালী। জাফরাণ্ চাষে জল সেঁচের প্রয়োজন হয় না। এক একটি ক্ষেত্রে একাদিক্রমে ৮।১০ বৎসর জাফরাণ্ চাষ হইয়া থাকে। অক্টোবর মাসের শেষভাগে কিম্বা নভেম্বর মাসের প্রথমভাগে জাফরাণ্ বৃক্ষে বেগুনি রংএর সুন্দর পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়, পুষ্পের পরাগ কেশর (anthers) পীত বর্ণের ও জর্দ্দা রংএর। পুষ্পচয়ন শেষ হইলে পুষ্পগুলিকে শুষ্ক করা হয় ও শুষ্ক পুষ্প হইতে জাফরাণ্ সংগ্রহ করা হয়।

পথের উভয় পার্শ্বে দিগন্তপ্রসারিত জাফরাণ্ ক্ষেত্র। দূরে, চারিধারে পাহাড়ের প্রাচীর,—যেন ক্ষেত্রগুলির প্রহরায় নিযুক্ত। পূর্ব্বে ঝিলাম নদী পাম্পুর গ্রামের অতি সন্নিকটে ছিল, কিন্তু আজকাল নদী অনেকটা দূরে সরিয়া গিয়াছে। পাম্পুর গ্রামের দক্ষিণ প্রান্তে একটি পাহাড়ের সানুদেশে কাশ্মীরের মহারাজ স্যার প্রতাপসিংএর রাজপ্রাসাদ। প্রাসাদটির চতুর্দ্দিকে অসংখ্য চিনার বৃক্ষ।

পাম্পুর গ্রামের প্রায় দুই মাইল দক্ষিণে উইয়ান (Weean) গ্রাম। কতকগুলি স্বাভাবিক উৎস থাকার জন্য এই গ্রাম প্রসিদ্ধ। এই উৎসগুলি একটি ক্ষুদ্র পর্ব্বতের পাদদেশ বিদীর্ণ করিয়া নির্গত হইতেছে এবং উৎসগুলির জলে গন্ধক মিশ্রিত থাকার জন্য নানাবিধ ব্যাধির প্রতিকারার্থে অনেকেই উইয়ান গ্রামে আসিয়া থাকেন। স্থানীয় লোকেরা এই উৎসগুলিকে Fook Nag 'ফুক্-নাগ' বলিয়া থাকে। উইয়ান গ্রাম পশ্চাতে রাখিয়া আরও কিছু দূর যাইবার পর, শ্রীনগর হইতে উনিশ মাইল দক্ষিণে, অবন্তীপুর নামক স্থানে আমরা উপনীত হইলাম। তখন সন্ধ্যা হয় হয়।

অবন্তীপুর

ঝিলাম নদীর সন্নিকটে, তাহার দক্ষিণ তটে অবস্থিত, চতুর্দ্দিকে শোভাশালিনী-পর্ব্বতমালা-পরিবেষ্টিত

অমরনাথের পথে

শ্রীঅশ্বিনীকুমার দাশ

প্রকৃতির রম্য নিকেতন এই স্থানে কাশ্মীরের তদানীন্তন হিন্দুরাজা অবন্তীবর্ম্মা খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে এক সমৃদ্ধিশালী নগরের প্রতিষ্ঠা করেন এবং প্রতিষ্ঠাতার নাম অনুযায়ী নগরের নাম অবন্তীপুর রাখেন। অবন্তীপুরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া রাজা অবন্তীবর্ম্মা এই স্থানে তাঁহার সুবিশাল রাজপ্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়া রাজধানী এই অবন্তীপুরেই স্থানান্তরিত করেন।

অসংখ্য প্রাসাদ ও হর্ম্ম্য-শোভিত অবন্তীপুরের পূর্ব্ব সমৃদ্ধি লুপ্তপ্রায়। এক্ষণে উহা একটি ক্ষুদ্র জনপদে অনেকগুলি স্তম্ভ রহিয়াছে; স্তম্ভসকল মসৃণ, ও মন্দিরের গাত্রে অসংখ্য মূর্ত্তি খোদিত দেখা যায়। মূর্ত্তিগুলি দেখিলে বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি বলিয়াই মনে হয়। মন্দিরের গাত্রে দুই একটি শিলালিপি ছিল, কিন্তু অধুনা লুপ্ত। রাজা অবন্তীবর্ম্মার বিশাল রাজপ্রাসাদ নগরের অন্যান্য অট্টালিকার সহিত ভূমিকম্পে অথবা অন্য কোনও কারণে ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়া যায়।

বহু শতাব্দী পরে, বিশপ-কটনের (Bishop Cotton-এর) চেষ্টা ও প্রত্নতত্ত্ববিভাগের তত্ত্বাবধানে পুরাকালের

চন্দন ওয়ায়ার দৃশ্য

পর্য্যবসিত হইয়াছে। এখনও পথের পাশে দুইটি ভগ্নপ্রায় প্রস্তর মন্দির দেখা যায়। এই মন্দির দুইটি দেখিলে মনে হয় যে, ইহারা যেন কোনও মতে ধ্বংসের গ্রাস হইতে আত্মরক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। এই মন্দির দুইটি অবন্তীপুরের প্রতিষ্ঠাতা রাজা অবন্তীবর্ম্মার কীর্ত্তি। তিনি মন্দির দুইটি নির্ম্মাণ করাইয়া তাহা যথাক্রমে বিষ্ণু ও কালদেবের নামে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। একটি মন্দিরের মধ্যে মূর্ত্তি রহিয়াছে; উহা বিষ্ণু অথবা বুদ্ধ দেবের মূর্ত্তি তাহা জানিবার উপায় নাই। কালদেবের মন্দিরের মধ্যে কোনও মূর্ত্তি নাই। মন্দির দুইটি উচ্চ প্রায় ৪০ ফিট হইবে; ভুবনেশ্বরের মন্দিরের অনুরূপ। প্রত্যেক মন্দিরের চতুর্দ্দিকে

অবন্তীপুরে খননকার্য্য আরম্ভ হয়। অবন্তীবর্ম্মার লুপ্ত রাজ-প্রাসাদের সমস্তটি পুনরুদ্ধার ঘটিয়া উঠে নাই। কার্য্য আরম্ভ করিবার অল্পদিন পরেই অর্থাভাবে খননকার্য্য বন্ধ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু প্রাসাদ সংলগ্ন দুই চারিটি প্রকোষ্ঠের পুনরুদ্ধার সাধিত হয়—এবং তাঁহাদের চেষ্টার ফলে পুরাকালের অনেক দ্রব্য ভূগর্ভ হইতে উদ্ধার করিয়া এখন পথের পার্শ্বে একটি নূতন গৃহে রক্ষিত হইয়াছে। মন্দির দুইটির গঠন ও অধুনালুপ্ত রাজপ্রাসাদের দ্রব্যাদি ও মূর্ত্তিগুলি দেখিয়া প্রত্নতাত্ত্বিকগণ এই সিদ্ধান্ত করেন যে, যখন রাজা অবন্তীবর্ম্মা মন্দির ও প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, তখন কাশ্মীরী মৌলিক শিল্পকলা গ্রীক্

শিল্প কলার সহিত সংমিশ্রিত হইয়া গিয়াছিল। গ্রীক্‌গণ ইউ-থি-ডি-মস্ (Euthedymos) এর অধীনে পাঞ্জাব ও আফগানিস্থান প্রদেশে বহুকাল বসতি করিয়া উত্তর ভারতের নানাস্থানে অনেক মন্দির, প্রাসাদ প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়াছিল। তক্ষশীলার প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার হইতে ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইবে। কাশ্মীরীগণ যে সেই কলাকুশল গ্রীক্‌দিগের নিকট তাহাদের ভাস্কর্য্য বিদ্যা শিক্ষা করিয়া গ্রীক্ ভাস্কর্য্য বিদ্যার অনুকরণে তাঁহাদের নিজ শিল্প-কলা পরিবর্ত্তিত করেন নাই, এ কথা কে বিশ্বাস করিবে।

অবন্তীপুর অতিক্রম করিয়া আমাদের পথের উভয় পার্শ্বে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম দেখিতে পাইলাম। সন্ধ্যার অন্ধকারে স্পষ্ট ভাবে গ্রামগুলি দেখিবার সৌভাগ্য হইল না। এইস্থানে ঝিলামের পরপারে যাইবার জন্য কাশ্মীরের ইঞ্জীনীয়ার Michael Nethersole একটি সেতু নির্ম্মাণ করেন, কিন্তু ১৮৯৩ সালের প্রবল বন্যায় ঐ সেতুটি ভাসিয়া যাওয়ায় তাহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়াছে। এইস্থানে নদীর অপর পারে কশ্যপ মুনির আশ্রম। আশ্রম দেখিবার সৌভাগ্য হইল না।

বিজ্-বিহার

সন্ধ্যার অন্ধকারের মধ্যে আমাদের মোটার অবন্তীপুরের আট মাইল দক্ষিণে শ্রীনগর হইতে ২৭ মাইল দূরে অবস্থিত বিজবিহার গ্রামে প্রবেশ করিল। আমাদের গন্তব্য পথ এই গ্রামটিকে দ্বিধা-বিভক্ত করিয়া চলিয়াছে। মোটার থামাইয়া দেখিবার সৌভাগ্য হইল না। আকাশে পুনরায় মেঘ দেখা দিল। সুতরাং যথাশীঘ্র সম্ভব যাহাতে আমরা আমাদের গন্তব্য স্থানে পৌঁছাইতে পারি তাহারই চেষ্টা করিতে লাগিলাম। সেই দিন আমাদিগকে আরও ৪ মাইল যাইয়া 'ভবন' গ্রামে পৌঁছিতে হইবেই। অমরনাথ হইতে ফিরিবার সময় আমরা এই গ্রামটি ও ইস্‌লামাবাদ দেখিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম।

ঝিলাম নদীর দক্ষিণে বিজ্‌বিহার গ্রাম অবস্থিত। গ্রামের নাম হইতেই অনুমিত হয় এই গ্রাম কোনও বৌদ্ধ রাজা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কাশ্মীরে বৌদ্ধগণের সময়ে এই স্থানে একটি প্রকাণ্ড 'বিহার' ছিল। নানা দেশ হইতে সমাগত বিদ্যার্থী বৌদ্ধগণ এই বিহারে বাস করিতেন। গ্রামে বিহার থাকা হেতু এই স্থানকে বিজ্‌বিহার অর্থাৎ 'বিদ্যা-মন্দির' বলা হইত। কাশ্মীরের প্রাচীনতম হিন্দু-মন্দির এই গ্রামের সন্নিকটে ছিল। অতীতের স্মৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া বৌদ্ধ-বিহার ও হিন্দু-মন্দির বহু শতাব্দী এই গ্রামের শোভা বর্দ্ধন করিয়াছিল কিন্তু পরে হিন্দুদ্বেষী পাঠানরাজ সিকেন্দার সাহ সেই প্রাচীন মন্দিরটি ও বিহার প্রভৃতি বিধ্বস্ত করিয়া মন্দির প্রভৃতির উপাদান দ্বারা শ্রীনগরে একটি পাঠান-মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। হিন্দু-মন্দির ও বিহার বিস্মৃতির অতল গর্ভে লীন হইয়াছে। লুণ্ঠিত উপাদানে গঠিত, অত্যাচারী ধর্ম্মান্ধ পাঠানরাজের অত্যাচার-কাহিনী জগতে প্রচার করিতে, সেই মস্‌জিদটিও পৃথিবীর বুকের উপর হইতে চির বিদায় গ্রহণ করিয়াছে। মুসলমান-রাজত্বের অবসানের পর কাশ্মীরে পুনরায় হিন্দু-প্রাধান্য স্থাপিত হইলে, পরবর্ত্তী হিন্দুরাজা গোলাব সিং সেই মস্‌জিদটি বিধ্বস্ত করেন। অত্যাচারের চিহ্ন অত্যাচার দ্বারাই লুপ্ত হইল। বিজ্‌বিহারে কাশ্মীরের ভূতপুর্ব্ব মহারাজ স্যার প্রতাপ সিংএর এক রাজপ্রাসাদ আছে। প্রাসাদটি ১৯০০ সালে নির্ম্মিত হইয়াছিল। প্রায় সাতশত গজ ব্যাপী এক চিনার বৃক্ষবীথির অন্তরালে রাজপ্রাসাদ অবস্থিত। প্যাহলগাঁএর পথ হইতে 'বীথি' রাজপ্রাসাদ পর্য্যন্ত বিসর্পিত।

বিজ্‌বিহারের অনতিদূরে 'কানাবাল'। এই স্থানের সন্নিকটে 'লিদার' নদী ঝিলামে যাইয়া মিশিয়াছে। যে স্থানে 'লিদার' নদী আসিয়া ঝিলামে মিশিতেছে এই স্থানটির নাম 'সঙ্গম'।

ইস্‌লামাবাদ

কানাবালের পরেই ইস্‌লামাবাদ। কাশ্মীরের মধ্যে ইস্‌লামাবাদ একটি প্রসিদ্ধ স্থান। কাশ্মীর-জাত বিবিধ প্রকারের শিল্প এই ইস্‌লামাবাদে প্রস্তুত হয়। অনেকগুলি

শ্রীঅশ্বিনীকুমার দাশ

কুটির-শিল্পাগার দেখিবার সৌভাগ্য হইল বিখ্যাত কাশ্মীরী শাল, জামিয়ার, 'নাম্‌দা' 'গাব্‌বা', কার্পেটের নানাপ্রকার দ্রব্যাদি অনেক রকম খেলনা, papier works, willow works ইত্যাদি এই ইস্‌লামাবাদে উৎপাদিত হইয়া থাকে। এই স্থানের উৎপন্ন শিল্পাদি ভারতও বাহিরের অনেক স্থানে রপ্তানি করা হয়। উইলো ওয়ার্কস (willow works)এর কারখানা শ্রীনগরেও কয়েকটি আছে, কিন্তু ইস্‌লামাবাদের কারখানাগুলি সংখ্যা ও আকৃতিতে শ্রীনগরের গুলি অপেক্ষা বৃহত্তর। বাংলা দেশের বেত্র-শিল্পের মতো কাশ্মীরে উইলো শাখার দ্বারা সুন্দর সুন্দর মজ্‌বুত চেয়ার, সুটকেস, বাক্স, টেবিল প্রভৃতি নির্ম্মিত হয়। সে সকল দেখিতে সুন্দর ও মজবুত, দামও বেত অপেক্ষা অল্প। উইলো বৃক্ষের ডালগুলিকে জলে ভিজাইয়া রাখা হয়, পরে ঐ 'ডাল' দ্বারা বাক্স প্রভৃতি তৈয়ারী করা হয়।

'নাম্‌দা' শিল্প কাশ্মীরের একটি প্রসিদ্ধ শিল্প। শাল আলোয়ানে যে সমস্ত পশম ব্যবহার করা যায় না, সেই নিকৃষ্ট পশম কোনও বিশেষ প্রক্রিয়া দ্বারা জমাইয়া নাম্‌দা প্রস্তুত হয়। ইহার আকার ছোট সতরঞ্চির ন্যায়; ইহার উপরে নানাবিধ লতাপাতার চিত্র চিত্রিত থাকে। সতরঞ্চির ন্যায় ব্যবহার করিতে পারা যায়। সৌখিন্ ব্যক্তিদের বৈঠকখানার মেঝেতে Matting রূপে ইহা ব্যবহৃত হয়। শ্রীনগর কিংবা ইস্‌লামাবাদে এক একটি 'নাম্‌দা'র মূল্য ৭৲ কিংবা ৮৲, কিন্তু কলিকাতা সহরে ঐ নাম্‌দা বড়বাজার কিংবা হগসাহেবের বাজারে তিনগুণ দামে বিক্রীত হইয়া থাকে। ইস্‌লামাবাদে একপ্রকার মোটা কাপড়ের টেবিল ক্লথ্ পাওয়া যায়; দেখিতেও সুন্দর এবং দামেও সস্তা।

অমরনাথে যাইবার সময় সন্ধ্যা হইয়া যাওয়ায় ইস্‌লামাবাদ দেখিবার সৌভাগ্য হয় নাই; কিন্তু ফিরিবার পথে ইস্‌লামাবাদ বেশ ভাল করিয়া দেখিয়া লইয়াছিলাম। ঝিলাম নদী ইস্‌লামাবাদ হইতে সামান্য দূরে। শ্রীনগরের মধ্যে যেমন অনেকগুলি খাল (Canal) আছে, সেই রকম ইস্‌লামাবাদের মধ্যেও দুইটি খাল আছে। খালের সহিত ঝিলাম নদীর সংযোগ আছে। শ্রীনগরকে ভারতবর্ষের ভিনিস্ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ইস্‌লামাবাদের খালে অনেক হাউস্ বোট্ ও শীকারা নৌকা রহিয়াছে।

এই হাউস্-বোট্ ও শীকারা নৌকা কাশ্মীরের শ্রীনগরে প্রচুর দেখিতে পাওয়া যায়। যাঁহারা কাশ্মীরে গিয়াছেন কিংবা কাশ্মীর সম্বন্ধে কোনও বর্ণনা পড়িয়াছেন তাঁহারা নিশ্চয়ই কাশ্মীরী হাউস্-বোট্ নৌকার সহিত পরিচিত। যাঁহারা সৌখিন ভ্রমণকারী, বিশেষতঃ সাহেব ভ্রমণকারী, তাঁহারা অধিকাংশ সময়ে হাউস্-বোটেই বাস করিয়া থাকেন। ত্রিশ চল্লিশ হইতে তদূর্দ্ধে তিনশত চারিশত টাকা পর্য্যন্ত এক একটি বোটের ভাড়া। প্রত্যেক হাউস্-বোট্ নানা প্রকোষ্ঠে বিভক্ত; কোনটি বসিবার ঘর, কোনটি রন্ধন-শালা, শয়ন ঘর প্রভৃতি। অনেক হাউস্-বোটের উপরে টবে করিয়া ফুলগাছ সাজান আছে। যখন কোনও স্থানে হাউস্-বোট্ কিছুদিনের জন্য থাকে, তখন সেই স্থান হইতে হাউস্-বোটের সহিত বৈদ্যুতিক সংযোগ করিয়া দেওয়া হয়। কুলি নিযুক্ত করিয়া একস্থান হইতে স্থানান্তরে হাউস্-বোট্ টানিয়া লইয়া যাওয়া হয়। অনেকে সখ করিয়া শ্রীনগর হইতে ইস্‌লামাবাদ পর্য্যন্ত হাউস্-বোটে আসিয়া থাকেন।

ইস্‌লামাবাদের অধিবাসী সংখ্যা প্রায় তের হাজার। অনেক ধনী ব্যবসায়ী ইস্‌লামাবাদে আছেন। কাশ্মীররাজের ইস্‌লামাবাদ একটী প্রসিদ্ধ মহাকুমা (Sub-division) এখানে রাজসরকারের আফিস্, আদালত প্রভৃতি সকলই আছে। একটি ছোট চিকিৎসালয়, উচ্চপ্রাইমারী বিদ্যালয় ও আছে। আদালতগৃহ ও স্কুলটি রাস্তার ধারেই অবস্থিত। ইস্‌লামাবাদের এক প্রান্তে কাশ্মীর মহারাজার একটি রাজপ্রাসাদ আছে। কানাবাল হইতে রাজপ্রাসাদ পর্য্যন্ত পথের উভয় পার্শ্বে সমুন্নত পপ্‌লার শ্রেণী। রাজপ্রাসাদের চারিধারে চিনার ও উইলো বৃক্ষ এবং প্রাসাদটিকে বেষ্টন করিয়া পার্ব্বত্য ঝরণা প্রবাহিত। ইস্‌লামাবাদের বিস্তৃতি তিন মাইলের অধিক হইবে না। শুনিলাম, প্রতিবৎসর ইস্‌লামাবাদে কলেরা

রোগে বহু লোকক্ষয় হইয়া থাকে। অধিবাসীগণের প্রায় অধিকাংশই মুসলমান। কানাবাল হইতে ইস্‌লামাবাদে প্রবেশ করিতে হইলে একটি খাল পার হইতে হয়; খালের উপর একটি সুন্দর সেতু আছে।

আস্থান মার্গ

পুরাকালে ইস্‌লামাবাদ শ্রীনগর অপেক্ষা অধিকতর সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল। পাঠানগণের রাজত্বসময়ে ইস্‌লামাবাদই কাশ্মীরের রাজধানী ছিল। A. Vigne ও অন্যান্য বিদেশী পর্য্যটকগণ এই স্থানকে the abode of Islam বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এক সময়ে অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর মস্‌জিদ ও মুসাফিরখানা, মোক্‌তার প্রভৃতি এই স্থানের শোভা বর্দ্ধন করিয়াছিল, কিন্তু সেগুলি প্রায় সকলই ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়াছে; মাত্র একটি বৃহদাকারের মস্‌জিদ ও তৎসংলগ্ন একটি মোক্‌তাব অতীতের স্মৃতি বক্ষে লইয়া কালের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া আজিও কোনও রূপে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। মস্‌জিদটিও সংস্কার অভাবে ভগ্নপ্রায়; 'জিয়াৎ'টিও জনহীন।

শ্রীঅশ্বিনীকুমার দাশ

ইস্‌লামাবাদের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোরম। আশে পাশে চারিদিকেই ক্ষুদ্র বৃহৎ পর্ব্বতমালা। অসংখ্য নিঝরিণী পর্ব্বতগাত্র হইতে প্রবাহিতা হইয়া ইস্‌লামাবাদ ও তৎসন্নিকটস্থ ভূভাগ সুজলা-সুফলা-শস্য-শ্যামলা করিতেছে। অনেকগুলি উৎসও ইস্‌লামাবাদের নিকটেই আছে। 'অনন্তনাগ' ও 'ভেরিনাগ' ইস্‌লামাবাদের অনতিদূরে।

আচিয়াবাল

ভারত বিখ্যাত 'আচিয়াবাল' উদ্যান এই ইস্‌লামাবাদের ছয় মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত। একটি সুন্দর রাজপথ ইস্‌লামাবাদ হইতে আচিয়াবাল পর্য্যন্ত গিয়াছে। এই পথের একস্থানে কাষ্ঠফলকে লিখিত রহিয়াছে To Veri Nag। সময় না থাকা হেতু Veri Nag দেখিবার সৌভাগ্য হইল না। আচিয়াবাল উদ্যান মোগল সম্রাটগণের এক অপূর্ব্ব কীর্ত্তি। কেহ কেহ বলেন যে, এই উদ্যান মোগলগণ কাশ্মীরে রাজত্ব করিবার পূর্ব্বেই রচিত হইয়াছিল; মোগল সম্রাট বাবর কেবল উদ্যানের সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন। উদ্যানটি যে বহু শতাব্দীর পুরাতন সে বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে না; যেহেতু প্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী বার্ণিয়ো (Bernio's Travels) কাশ্মীর প্রদেশে ভ্রমণ করিবার সময় খৃঃ ১৬৬৩ অব্দের শেষ ভাগে ভ্রমণব্যপদেশে 'আচিয়াবালে' আসেন এবং এই উদ্যানের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্ত পুস্তকে এইরূপ লিখিতেছেন।

"In returning from Sind-Bray (Bhawan) I turned a little out of the high way in order to sleep at 'Archiaval' which is a place of pleasure belonging to the old kings of Kashmir and at present to the Great Moghals. Its principal beauty is a fountain; of which, the water disperses itself on all sides around a building which is not devoid of elegance and flows through the garden by a hundred canals. Its water is admirably cold—so cold that to hold the hand within it, could scarcely be borne. The garden is very beautiful on account of its alleys, great quantity of fruit trees, of reservoirs full of fish, and a kind of cascade very high which in falling makes a great sheet of 30 or 40 paces in length. Throughout the garden, specially at night when innumerable lamps, fixed in parts of the wall adapted for that purpose, are lighted under these sheets of water.

উদ্যানের যে সৌন্দর্য্যরশ্মি একদিন একাধিক ভ্রমণকারীকে চমৎকৃত করিয়া এই উদ্যানটিকে ভারতের অন্যান্য শোভাশালী শ্রেষ্ঠ উদ্যান সমূহের সহিত তুলনা করিয়া তাহাদেরই অন্যতম শ্রেষ্ঠ উদ্যানে পরিণত করিয়াছিল, অযত্নে ও কালপ্রবাহে তাহার সে সৌন্দর্য্যরশ্মি ম্লান হইয়া গিয়াছে। উদ্যানে অনেকগুলি উৎস আছে সত্য, কিন্তু সে উৎস সকলের মুখ হইতে জলরাশি বিচ্ছুরিত হইয়া বিচিত্র হীরকমালার সমাবেশ করে না; সুরভিপূর্ণ দীপ-সকল প্রজ্জ্বলিত হইয়া বাগানের শোভা বর্দ্ধন করে না। যাহা হউক, উদ্যানের শোভা সমূলে বিনষ্ট হয় নাই; অতীত গৌরবের চিহ্ন অনেক স্থানেই বর্ত্তমান আছে।

আমরা একখণ্ড শ্যামশস্যসুশোভিত ভূমি অতিক্রম করিয়া একটি দ্বার দিয়া উদ্যানের মধ্যে প্রবেশ করিলাম উদ্যানের উপরিভাগ সমতল ভূমি হইতে ৫।৬ হাত উর্দ্ধে অবস্থিত। উদ্যানের চারিধার প্রাচীরবেষ্টিত। সম্মুখে চারিধারে শস্য ক্ষেত্র, মাঝে মাঝে 'ফুলের-কেয়ারী'। এই ক্ষেত্রটির মধ্য দিয়া একটি ঝরণা প্রবাহিতা। পয়ঃপ্রণালীর উপর মোগল সম্রাট সাহাজাহানের গ্রীষ্ম-নিবাস। গ্রীষ্ম নিবাসের তল দিয়া ১০ ফিট প্রশস্ত প্রণালীযোগে উৎস বারি প্রবাহিতা। উদ্যানের পার্শ্বেই একটি নানাবিধ বৃক্ষ-সুশোভিত ছোট পাহাড়। পাহাড়ের তলদেশ বিদীর্ণ করিয়া জলরাশি ভীমগর্জ্জনে উৎসারিত হইয়া প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতেছে। এই জল প্রণালী দ্বারা উদ্যানের মধ্যে সঞ্চারিত হইয়া অবশেষে উদ্যানের বাহিরে নিঃসৃত হইতেছে। আজকাল কাশ্মীর রাজ Trout Fishery এই উদ্যানের

মধ্যে করিয়াছেন। শুনিলাম, ঐ মৎস্য সাধারণকে বিক্রয় করা হয়। প্রতি সের মৎস্যের মূল্য ৪৲ টাকা। আমরা জলের মধ্যে মৎস্যের আহার নিক্ষেপ করিবামাত্র শত শত ক্ষুদ্র বৃহৎ Trout জলের উপর ভাসিয়া উঠিল। আরও শুনিলাম যে কাশ্মীরের বর্ত্তমান মহারাজা স্যার হরিসিং এই মৎস্য বিলাত হইতে আমদানী করিয়াছিলেন। আচিয়াবাল উদ্যান, 'ভেরিনাগ' ও 'অনন্তনাগ' দেখিবার জন্য বহু বিদেশী পর্যাটক ও ভ্রমণকারী ইস্‌লামাবাদে আগমন করেন।

শেষ নাগ

মার্ত্তাণ্ড

ইস্‌লামাবাদের ছয় মাইল উত্তরে মার্ত্তাণ্ড (Martand)। অমরনাথের পথে মার্ত্তাণ্ড পড়ে না, সদর রাস্তা হইতে প্রায় দুই মাইল পশ্চিমে অবস্থিত; ফিরিবার পথে, মোটর-চালকের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া লইয়া মার্ত্তাণ্ড ও আচিয়াবাল উদ্যান দেখিয়া লইয়াছিলাম। আচিয়াবাল হইতে মার্ত্তাণ্ড প্রায় ৭ মাইল হইবে। কেহ কেহ বলেন সংস্কৃত 'মার্ত্তণ্ড' শব্দ হইতে এই স্থানের নামোৎপত্তি হইয়াছে। মার্ত্তণ্ড শব্দের অপভ্রংশ মার্টাণ্ড। কহ্লন পণ্ডিতের রাজতরঙ্গিণী পুস্তকে 'মার্টাণ্ডের' উল্লেখ আছে। ইহা অতি প্রাচীন স্থান। স্থানীয় কোনও পণ্ডিতের নিকট শুনিলাম, অতি প্রাচীন কালে এই স্থানে একটি সূর্য্য-মন্দির ছিল। যাঁহারা মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সূর্য্যোপাসক ছিলেন; এবং সূর্য্য-মন্দির থাকা হেতু এই স্থানকে মার্ত্তণ্ড অথবা মার্টাণ্ড বলা হইত। সে-মন্দিরের অস্তিত্ব নাই। পণ্ডিত কহ্লন অনুমান করেন, ৪র্থ শতাব্দীতে রাজা রাণাদিত্য এই মন্দিরের নির্ম্মাণ আরম্ভ করেন, তিনি ইহা শেষ করিতে পারেন নাই। পরবর্ত্তী রাজা ললিতাদিত্য ইহার নির্ম্মাণ শেষ করেন সপ্তম শতাব্দীতে। Cunningham 'Accounts of Kashmir' পুস্তকে বলিয়াছেন, মার্টাণ্ডের পূর্ব্ব নাম পাণ্ডুকোরু (Pandu Koru) ছিল। তাঁহার মতে, পাণ্ডবেরা তাহাদের অজ্ঞাতবাসকালে এই স্থানে বাস করিয়াছিল। জানি না ইহার কোনও ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে কিনা, এবং কোন্ প্রমাণের বলে সুপণ্ডিত Cunningham তাঁহার এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহাও জানা যায় না। কাশ্মীর প্রদেশের মধ্যে মার্টাণ্ড যে একটি অতি প্রাচীন স্থান সে সম্বন্ধে কাহার মতদ্বৈধ নাই।

বার্ণিয়ো ১৬৬৩ খৃঃঅব্দে সম্রাট্ সাজাহানের সময় মার্টাণ্ডে পদার্পণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তে মার্টাণ্ড সম্বন্ধে যথেষ্ট লিখিয়াছেন। তাঁহার 'Travels' পাঠে জানা যায় যে, মার্টাণ্ডে হিন্দুদিগের একটি বিশালকায় প্রস্তরনির্ম্মিত মন্দির ছিল; মন্দিরটি অতি প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ। সমৃদ্ধিশালী নগরী দ্বারা ঐ মন্দির পরিবেষ্টিত ছিল। কালের করাল গ্রাসে এক্ষণে ঐ মন্দির ধ্বংসস্তূপে

শ্রীঅশ্বিনীকুমার দাশ

যদিও পরিণত, তথাপি অতীত-গৌরব-সমন্বিত সেই ধ্বংস-স্তূপ হইতেই সেই অধুনালুপ্ত মন্দিরের বিশালতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় এবং মন্দিরটির প্রতি সম্ভ্রমে মস্তক আপনা হইতেই অবনমিত হয়। বর্ত্তমান সময়ে যে দিকে যতদূর দৃষ্টি যায়, কেবলই মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। শুনিলাম, পুরাকালে বহুসংখ্যক সাধু সন্ন্যাসী এই স্থানে আসিয়া বাস করিতেন; সন্ন্যাসীগণের মধ্যে "হারুৎ" ও "মারুৎ" এর নামই প্রসিদ্ধ। যখন বার্ণিয়ো মাটাণ্ডে পদার্পণ করেন, তখন মন্দিরটি ভগ্ন অবস্থায় জীর্ণ কলেবরে কালের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া কোনও মতে দাঁড়াইয়াছিল, কিন্তু তাহার জীর্ণ কলেবর আর বেশীদিন আত্মরক্ষা করিতে না পারিয়া এক্ষণে ধ্বংসের পথের পথিক হইয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর ভ্রমণকারিগণ, যথা Arthur Vignes, Neve প্রভৃতি যখন এই স্থানে পদার্পণ করেন, তাঁহারা ধ্বংস স্তূপ ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পান নাই

শুনিলাম, এক কালে সিন্ধু নদের একটি শাখা মাটাণ্ডের নিকটে প্রবাহিতা হইয়া এই স্থানকে শস্যসম্পদে সম্পদশালী করিয়াছিল। সেই নদীর শাখা এখন মাটাণ্ডের নিকট হইতে বহুদূরে অপসৃত হইয়াছে। স্থানীয় লোকের জলকষ্ট নিবারণের জন্য রাজা রণবীর ঐ স্থানে ১৮০ ফিট গভীর এক প্রকাণ্ড কূপ খনন করাইয়া দেন, কিন্তু ঐ কূপের জল গ্রীষ্মকালে শুষ্ক হইয়া যাওয়ায় স্থানীয় অধিবাসীগণের দুর্দ্দশার আর সীমা ছিল না। পরে ১৯০১ সালে মহারাজা স্যার প্রতাপ সিং ইস্‌লামাবাদ হইতে খাল কাটিয়া মাটিতে জল সরবরাহের চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সে চেষ্টা সফল হয় নাই। দারুণ জলকষ্ট থাকা হেতু মাটাণ্ডে অধিবাসী নাই বলিলেই চলে। নির্জ্জন শ্মশানের ন্যায় এক্ষণে উহা প্রতীয়মান হয়।

পূর্ব্বে মন্দিরের চতুর্দ্দিকে সুউচ্চ প্রাচীর ছিল, প্রাচীর দৈর্ঘ্যে ৫০০ গজ ও প্রস্থে ৩০০ গজ ছিল। প্রাচীরের তিন দিকে তিনটি বিশাল তোরণ ছিল। প্রত্যেক তোরণের গাত্রে অসংখ্য মূর্ত্তি খোদিত ছিল। মূর্ত্তিগুলি সুন্দর, দেখিলেই গ্রীক শিল্পের নমুনা বলিয়া মনে হয়। প্রাচীরের মধ্যে সুপ্রশস্ত চত্বাল ভূমি। চত্বাল ভূমি প্রস্তরমণ্ডিত, এবং চত্বালের মধ্যস্থানে একটি তিন ফিট উচ্চ পাটাতনের উপর মন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল। মন্দিরটির গঠন অনেকটা ভুবনেশ্বরের মন্দিরের অনুরূপ। প্রত্যেক তোরণ হইতে মন্দিরের দরজা পর্য্যন্ত সুদর্শন মসৃণ স্তম্ভশ্রেণী। স্তম্ভগুলি খাদকাটা (fluted)। মন্দিরের উভয় পার্শ্বে একটি করিয়া গৃহ ছিল। মন্দিরের আকৃতি প্রায় ৩০ হাত সমচতুষ্কোণ ছিল। বার্ণিয়ো এই মন্দিরটিকে পৃথিবীর অন্যান্য শ্রেষ্ঠ মন্দিরের সহিত তুলনা করিয়াছেন; এবং তিনি বলেন, "যদিও আকৃতিতে ইহা (Palmyra) পামিরা'র মন্দির কিংবা পার্সিপলিসএর (Persipolis) মন্দিরের সমকক্ষ নহে, তথাপি গৌরবে এই মন্দির জগতের কোনও মন্দির অপেক্ষা হীন নহে। পৃথিবীর মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ পর্ব্বতের উপত্যকা-ভূমিতে ইহা স্থাপিত; যোজনের পর যোজন ব্যাপিয়া মন্দিরটিকে বেষ্টন করিয়া শস্য-শ্যামলা উপত্যকাভূমি। মন্দিরের বহু নিম্নে আর্য্যাবর্ত্ত, যাহা প্রাচীন সভ্যতার আকর এবং জ্ঞান ও গৌরবে যাহা ইতিহাসবিশ্রুত।" সর্ব্বসংহারক কাল তাহার নির্ম্মম হস্তে মন্দিরের সকল গৌরব চূর্ণ করিয়া মন্দিরটীকে প্রকাণ্ড ধ্বংসস্তূপে পরিণত করিয়াছে।

ভবন

মাটাণ্ডের সন্নিহিত মাটাণ্ডের উত্তরে অবস্থিত 'ভবন'। 'ভবন' হিন্দুপ্রধান গ্রাম। অমরনাথের পাণ্ডারা ভবনের অধিবাসী। শ্রীনগর হইতে রওয়ানা হইয়া ইস্‌লামাবাদ পর্য্যন্ত আমরা দক্ষিণ অভিমুখে আসিয়াছি। ইস্‌লামাবাদ হইতে প্যাহল গাঁ পর্য্যন্ত আমাদিগকে উত্তর-পূর্ব্ব অভিমুখে যাইতে হইবে।

আমাদের মোটার সন্ধ্যার অন্ধকার ভেদ করিয়া ভবন গ্রামের একপ্রান্তে আসিয়া থামিল। আকাশে তখনও মেঘ। শুক্লপক্ষের একাদশীর চন্দ্র মেঘের অন্তরালে আত্মগোপন করিয়াছে। পথের আশে পাশে অতিকায় বৃক্ষ-সকল দণ্ডায়মান; তাহাদের পল্লবপ্রান্ত হইতে তখনও জলকণা পৃথিবীর বুকের উপর ছড়াইয়া পড়িতেছিল। মোটর একটি বৃহদাকার 'চিনার' বৃক্ষের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। সেই রাত্রে আমাদিগকে 'ভবনে'ই অতিবাহিত

করিতে হইবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পূর্ব্ব রাত্রের অত্যধিক বৃষ্টিপাতহেতু ভবনের পরেই প্যাহলগাঁয়ের পথ এক স্থানে ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল; যদি ইতিমধ্যে পথ মেরামত হইয়া থাকে তবেই মোটারে আমরা বরাবর প্যাহলগাঁ পর্য্যন্ত যাইতে পারিব নতুবা ভবনেই মোটার বিদায় দিয়া প্যাহলগাঁ যাইবার স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

ভবন হইতে প্যাহলগাঁ ২৮ মাইল হইবে। শ্রীনগর হইতে ভবন পর্য্যন্ত রীতিমত মোটার-সার্ভিস আছে। প্রত্যহ মোটার-বাস যাত্রী লইয়া শ্রীনগর ও ভবনের মধ্যে যাতায়াত করে। কিন্তু ভবন হইতে প্যাহলগাঁ পর্য্যন্ত
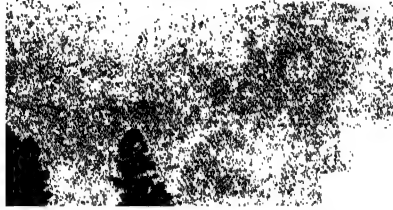
প্যাহল গাঁ

যাতায়াতের কোনও রীতিমত বন্দোবস্ত না থাকায় যাত্রীগণ 'টোঙ্গা' গাড়ী, অশ্ব, কিংবা ডুলিতেই যাইয়া থাকে। অমরনাথ যাইবার সময় যাত্রীগণ এইস্থান হইতে অশ্ব, ডুলি প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া লয়। শুনিলাম ভবনে ঠিকাদার (contractor) আছে; সেই ঠিকাদারই সকল বন্দোবস্ত করিয়া দেয়।

মোটর থামিবামাত্র অমরনাথের পাণ্ডারা দলে দলে আসিয়া আমাদের গাড়ীটিকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল। চারিদিকে ঘন অন্ধকার; পাণ্ডাদের অনেকের হস্তে হ্যারিকেন লণ্ঠন এবং প্রত্যেকের নিকট প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড খাতা। এক একটি খাতা এতই বৃহদাকার যে অতিকষ্টে সেটিকে বহন করিয়া লইয়া যাইতে হয়। এই খাতাগুলিতেই পাণ্ডারা তাহাদের আপন আপন যজমানের নাম ধাম ও পরিচয় লিখিয়া রাখে, এবং যখনই কোনও যাত্রী উপস্থিত হয় পাণ্ডারা আপন আপন পুস্তক হইতে আশ্চর্য্য তৎপরতার সহিত নবাগত যাত্রীর পরিচয় বাহির করিয়া দেয়। মস্তকে শ্বেত গোলাপী পাগ্‌ড়ি, চন্দন-চর্চ্চিত ললাট এবং আল্‌খাল্লা পরিহিত সরল-স্বভাব কাশ্মীরী পণ্ডিতগণ আমাদের গাড়ীর চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল এবং একই সঙ্গে সকলেই প্রশ্ন করিতে লাগিল, আমরা কোন্ দেশ হইতে আসিতেছি, কাশ্মীরে কাহার বাড়ী হইতে আসিতেছি; অমরনাথের পাণ্ডা কে ইত্যাদি। তাহারা সকলে এত গণ্ডগোল আরম্ভ করিল যে, আমাদিগকে গাড়ীর মধ্যে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইল; গাড়ী হইতে অবতরণ করিবার অবকাশ পাইলাম না। অনেক কষ্টে তাহাদের প্রশ্নের একরকম উত্তর দিলাম। তাহাদিগকে জানাইলাম যে আমরা সকলেই বঙ্গদেশবাসী এবং কাশ্মীরে যোগীন্দ্রবাবুর বাড়ী হইতে আসিতেছি। তখন অনেক পাণ্ডাই বলিতে লাগিল, 'আমিই দাস বাবুর পাণ্ডা।' যোগীন্দ্রবাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র আমাদের সঙ্গে ছিলেন; তিনি প্রস্তাব করিলেন যাঁহার পুস্তকে অধ্যাপক দাস মহাশয়ের নাম পরিচয় বাহির হইবে তিনিই 'পাণ্ডা' হইবেন। যোগীন্দ্রবাবু বহুকাল কাশ্মীরে আছেন এবং তাঁহার আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুবান্ধব ইতিপূর্ব্বে বহুবার অমরনাথ দর্শনে গিয়াছিলেন, সুতরাং একাধিক ব্যক্তির বহিতে যোগীন্দ্রবাবুর নাম, ধাম, পরিচয় প্রভৃতি বাহির হইবে, ইহা কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। প্রকৃতই একাধিক পাণ্ডা যখন অতি তৎপরতার সহিত আপন

শ্রীঅশ্বিনীকুমার দাশ

আপন পুস্তক হইতে যোগীন্দ্রবাবুর নাম বাহির করিয়া চীৎকার করিতে লাগিল, 'আমিই যোগীনবাবুর পাণ্ডা, আমার বইতে তাঁহার নাম রহিয়াছে' ইত্যাদি, তখন আমরা আরও মুস্কিলে পড়িলাম। চারিদিকে জনতা এতই বাড়িতে লাগিল যে, জনতার কোলাহল আমাদের অসহ্য বলিয়া বোধ হইল। অবশেষে মোটার-চালক হবিবুল্লা ও আমাদের ভৃত্য হুকুম সিং মোটার হইতে কোনও উপায়ে ভূমিতে অবতরণ করিয়া বলপ্রকাশে সেই বিপুল জনতাকে বিদূরিত করিবার চেষ্টা করিল; তাহাতে কোলাহল আরও বর্দ্ধিত হইল। তখন একজন পণ্ডিতজী প্রস্তাব করিলেন, "আপনারা আমাদের মধ্যে আপনাদের ইচ্ছামত কোনও পণ্ডিতকে পাণ্ডা বলিয়া স্বীকার করিয়া লউন, জনতা আপনা হইতেই অপসৃত হইবে।" তাঁহার প্রস্তাব অনুযায়ী আমরা ঐ ব্যক্তিগণের মধ্যে কোনও ব্যক্তিকে আমাদের পাণ্ডা বলিয়া মনোনীত করিয়া তাঁহার নাম উচ্চৈঃস্বরে প্রচার করিলে সমবেত জনতা শান্ত-ভাব ধারণ করিল এবং সকলেই কিছুক্ষণ বাদে নিজ নিজ স্থানে প্রস্থান করিল। আমরাও একে একে ভূতলে অবতরণ করিলাম। যিনি আমাদের পাণ্ডা হইলেন তাঁহার নির্দ্দেশ অনুযায়ী আমরা রাস্তা পার হইয়া অল্পদূরে যাইয়া এক আখ্‌রুট-কাননমধ্যে হুকুম সিংএর চেষ্টায় আমাদের রাত্রিবাসের জন্য তাঁবু ফেলিলাম। যে স্থানে তাঁবু ফেলা হইল সেই স্থানের পাশ দিয়া এক স্বচ্ছতোয়া স্রোতস্বতী কুল কুল শব্দে প্রবাহিতা। মোটার হইতে আমাদের মালপত্র হুকুম সিং তাঁবুতে আনাইল।

আহার শেষে আমরা তাঁবুর মধ্যে বসিয়া পাণ্ডার সহিত গল্প জুড়িয়া দিলাম। সেই রাত্রেই রাজসরকারের একজন কর্ম্মচারীর সহিত পরিচয় হইল। ইনি যাত্রীগণের গতি নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য নিযুক্ত হইয়া অমরনাথ যাইতেছেন। রাজকর্ম্মচারী মহাশয় আমাদের সাবধানে রাত্রিযাপন করিতে বলিয়া দিলেন; অমরনাথের পথে প্রায়ই যাত্রীগণের তাঁবুর মধ্য হইতে চুরি যায়। আমরাও তাঁহার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া লইয়া রাত্রে সতর্ক থাকিতে মনস্থ করিলাম। গল্প গুজবে অনেক রাত্র অতিবাহিত হইল। বিনিদ্রভাবে রাত্রি যাপন করা হইল না। ক্লান্তি আসিয়া সর্ব্বাঙ্গে তাহার আধিপত্য বিস্তার করিল। আমরা আর স্থির থাকিতে পারিলাম না। সেই নির্জ্জন প্রদেশে, শান্ত প্রকৃতির ক্রোড়ে, সেই নির্ঝরিণীর মর্ম্মর তানে আবিষ্ট হইয়া কখন যে সুষুপ্তির ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম, তাহা জানি না। হুকুম সিং তাহার কম্বল গ্রহণ করিয়া তাঁবুর বাহিরে একটি প্রকাণ্ড চিনার বৃক্ষতলে আপাদমস্তক আবৃত করিয়া শয়ন করিল।

শুক্রবার, ১৫ই শ্রাবণ

প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে আমরাও শয্যা ত্যাগ করিয়া তাঁবুর বাহিরে আসিলাম। আমাদের পূর্ব্বেই মিঃ দত্ত শয্যা ত্যাগ করিয়া তাঁবুর বাহির হইয়াছিলেন। আমরা তাঁবুর নিকটবর্ত্তী ঝরণার জলে হস্তমুখ প্রক্ষালন করিতে যাইতেছিলাম, কিন্তু মিঃ দত্ত আমাদের নিকটে আসিয়া বলিলেন, 'ভবনের কুণ্ডের জলে হাত-মুখ ধুইয়া আইস, ভবনের কুণ্ড দেখিবার মত জিনিস।' তাঁহার নিকট কুণ্ডের বিষয় অবগত হইয়া আমরা কুণ্ডের অভিমুখে রওয়ানা হইলাম এবং তাঁবু হইতে বাহির হইয়া যেস্থানে রাস্তার উপর মোটরখানি ছিল সেইস্থানে আসিয়া পৌঁছিলাম। ইহার সন্নিকটেই ভবনের কুণ্ডে প্রবেশ করিবার পথ। রাস্তার পাশেই কুণ্ড, কিন্তু কুণ্ডের তিনদিকে বেড়া। রাস্তার পাশ হইতে একটি পথ কুণ্ডের মধ্যে গিয়াছে। প্রবেশ পথের দক্ষিণ দিকে একটুক্‌রা কাষ্ঠ-ফলকে লেখা রহিয়াছে "Killing fish or any other animal within the area is highly punishable." কুণ্ডের পশ্চাতে তাম্রবর্ণের পাদপহীন একটি পর্ব্বত মালা। কুণ্ডের একপাশে একটা বৃহদাকার পত্রবহুল (Elm) এলম্ বৃক্ষ; তাহার পত্রচ্ছায়ায় সমস্ত কুণ্ডটিকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছে। দুইটি কুণ্ড আছে। কুণ্ড দুইটি সমচতুষ্কোণ এবং একটি কুণ্ড আর একটির উপর স্থাপিত। অসংখ্য মৎস্য, ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ, উভয় কুণ্ডের মধ্যে আনন্দে বিচরণ করিতেছে। কুণ্ডের

জল স্বচ্ছ ও শীতল। এই কুণ্ডকে তাহারা 'চশ্‌মী' বলে। চশ্‌মীর জল পবিত্র। কাহাকেও কুণ্ডের মধ্যে অবগাহন করিতে দেওয়া হয় না। একজন বৃদ্ধ কাশ্মীরী পণ্ডিতজীর নিকট শুনিলাম ভগবান বিষ্ণু ঐ স্থানে দারুণ জলকষ্ট দেখিয়া ভক্তগণের ক্লেশে কাতর হইয়া পর্ব্বত-হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া একটি উৎসের সৃষ্টি করেন। উৎস হইতে অজস্র শীতল জলরাশি নির্গত হইয়া এই কুণ্ডের মধ্যে পড়ে, এবং এই কুণ্ড হইতে অতিরিক্ত জলরাশি পয়ঃপ্রণালী যোগে বহির্গত হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোতস্বতীর সৃষ্টি করে। কুণ্ডের স্বচ্ছ শীতল সলিলে হাত-মুখ প্রক্ষালন করিয়া তৃপ্ত হইলাম।

তাঁবুতে প্রত্যাগমন করিয়া দেখি ইতিমধ্যেই আমাদের পণ্ডিতজী আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। সঙ্গে তাঁহার একজন ঠিকাদার। আমাদের প্রয়োজন মত একটি ডুলি ও সাতটি অশ্ব ভাড়া লইলাম। ডুলির জন্য ৬০৲ টাকা ও প্রতি অশ্বের জন্য ১০৲ হিসাবে দিতে হইবে। আটজন বাহক ডুলি বহন করিবে এবং প্রত্যেক অশ্বের সহিত একজন 'সহিস' অশ্বের লাগাম ধরিয়া চলিবে। যথাশীঘ্র সম্ভব ভবন পরিত্যাগ করিতে মনস্থ করিয়া stove ধরাইয়া চা ও হালুয়া প্রস্তুত হইল,—এবং শ্রীনগর হইতে আনীত মিষ্টান্নের সহযোগে চা পান করিয়া সেইদিনকার প্রাতঃরাশ সম্পন্ন করিলাম। ঠিক্ এমন সময় আমাদের মোটার-চালক আসিয়া জানাইল যে, 'পথ পরিষ্কার করা হইয়া গিয়াছে; মোটার প্যাহলগাঁ পর্য্যন্তই যাইবে।' অপ্রত্যাশিত ভাবে হবিবুল্লার নিকট এই সংবাদশ্রবণে আমাদের সকলের মন উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। কালবিলম্ব না করিয়া অবিলম্বে সেইস্থান পরিত্যাগ করিবার মানসে আমাদের ভৃত্য হুকুম সিংকে তাঁবু ভাঙ্গিতে ও মালপত্র মোটারে চাপাইতে আদেশ দিলাম। আমরাও ইতিমধ্যে প্রস্তুত হইতে লাগিলাম। যথাশীঘ্র সম্ভব আমরা আন্দাজ সাতটার সময় ভবনগ্রাম পরিত্যাগ করিলাম। যাইবার পূর্ব্বে প্রত্যেক ডুলিওয়ালা ও অশ্বওয়ালাকে ১৲ একটাকা করিয়া অগ্রিম (পেশ্‌কী) দিতে হইল এবং ঠিকাদারকে বলিয়া দেওয়া হইল যে, সেইদিনই যেন ডুলি ও অশ্বগুলি প্যাহলগাঁতে পৌঁছায়।

ভবন পরিত্যাগ করিলাম। আকাশের কোথায়ও মেঘ নাই; সবেমাত্র সূর্য্য পূর্ব্বদিকে উঠিতেছে। নবীন অরুণ কিরণজালে অদূরের পাহাড়ের চূড়া তরল সোনালী বর্ণে অনুরঞ্জিত হইয়াছে। পূর্ব্বদিকের বৃষ্টিপাত হেতু চারিধারের বৃক্ষসকল তখনও সিক্ত এবং সিক্ত পল্লবসমূহ জলভারে অবনমিত।

ভামজু গুহা

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভবন-কুণ্ডের ঠিক পশ্চাতেই একটি পাহাড় আছে। আমাদের পথ এই পাহাড়টিকে প্রদক্ষিণ করিয়া চলিল। পথের এক পার্শ্বে শস্যক্ষেত্র ও পাহাড়ীগ্রাম এবং অপর পার্শ্বে পর্ব্বতমালা। এই পাহাড়টির মধ্যে অনেকগুলি গুহা আছে। কাশ্মীরীগণের নিকট এই গুহাগুলি ভামজুগুহা (Bhoomju Caves) নামে প্রসিদ্ধ। এই গুহাগুলির মধ্যে অনেকগুলিতে দেবমূর্ত্তি আছে। কাশ্মীরীগণ এই গুহাসকলকে অতিশয় শ্রদ্ধা করিয়া থাকে। দুইটি গুহার নামই সমধিক প্রসিদ্ধ; এই দুইটির নাম Long Cave 'লম্বা গুহা' ও Temple Cave 'মন্দির-গুহা'। ভবনগ্রামের নিকটতম গুহাটি লম্বাগুহা। পাহাড়ের গায়ে ভূমি হইতে প্রায় চল্লিশ ফিট উচ্চে এই গুহাটি অবস্থিত। ভূমি হইতে গুহার প্রবেশদ্বার অবধি পাহাড় কাটিয়া পথ করা আছে। প্রবেশ-পথটি অপরিসর। এই গুহাটিকে লম্বা গুহা বলা হয়, তাহার কারণ প্রবেশপথে গুহাটির অভ্যন্তরে ২০০ ফিটেরও অধিকদূর অগ্রসর হওয়া যায়। স্থানীয় লোকেরা বলে যে এই পথটি অনন্ত—কতদূরে যে ইহার শেষ হইয়াছে তাহা কেহ জানে না। গুহার মধ্যে সূচীভেদ্য অন্ধকার; প্রবেশ করিতে হইলে সঙ্গে আলোকের সাহায্য লইতে হয়, নতুবা অপরিসর পথে পাহাড়ের গায়ে আঘাত লাগিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। বহুকাল যাবৎ অসংখ্য বাদুড় নিরুপদ্রবে এই গুহার অভ্যন্তরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া রহিয়াছে। বিদেশী পর্য্যটকগণের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত পাঠে জানা যায় যে,

শ্রীঅশ্বিনীকুমার দাশ

এই গুহাটির মধ্যে প্রবেশ করিলে প্রবেশ-পথের কিছু দূরে বাম পার্শ্বে পাহাড়ের গায়ে একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ আছে। এই প্রকোষ্ঠের মধ্যে বহুসংখ্যক নরকপাল সঞ্চিত আছে। তাঁহারা অনুমান করেন যে, কোনও সময়ে ইহা কোনও কাপালিক সম্প্রদায়ের আড্ডা ছিল। যাহা হউক এই ফিট উচ্চে অবস্থিত। ইহার প্রবেশ-পথ অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত। ভূমি হইতে গুহার দ্বারদেশ পর্য্যন্ত পাহাড়ের উপর সিঁড়ি রহিয়াছে। আকৃতিতে একটি মন্দিরের ন্যায় বলিয়া ইহাকে 'মন্দির গুহা' বলা হয়। গুহাটি ২৭ ফিট লম্বা ও ৪০ ফিট চওড়া এবং আন্দাজ ১২ ফিট উচ্চ হইবে।

পঞ্চ তরণী

গুহাটি কালদেবের নামে উৎসর্গীকৃত। কবে কাহার দ্বারা এই গুহাটি নির্ম্মিত হইয়াছিল, কেহ জানে না।

অপর গুহাটির নাম মন্দিরগুহা (Temple Cave)। এই গুহাটি, লম্বাগুহার অদূরেই, ভূমি হইতে প্রায় দুইশত প্রবেশ পথের উপর তোরণাকারে বৃহৎ একখণ্ড প্রস্তর রহিয়াছে। এই প্রস্তর খণ্ডটি মসৃণ ও তাহাতে নানাবিধ মূর্ত্তি খোদিত। মন্দিরের প্রবেশ-পথে ও মন্দিরের ভিতরে অনেক 'লিপি' খোদিত রহিয়াছে। সর্ব্ব-ধ্বংসী কাল

তাহার নির্ম্মম হস্তে লিপিসমূহের শ্রী নষ্ট করিয়া দিয়াছে। এই সকল লিপি ও মূর্ত্তি দর্শন করিয়া অনুসন্ধিৎসু প্রত্নতাত্ত্বিকগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, এই গুহা কাশ্মীরে যখন বৌদ্ধপ্রভাব প্রতিষ্ঠা লাভ করে সেই সময় কোন বৌদ্ধ-রাজ দ্বারা নির্ম্মিত হয়। এই গুহাটির মধ্যে প্রবেশ করিলে দুইটি স্তর বা পাটাতন দেখিতে পাওয়া যায়। উপরের পাটাতনের উপরেই মন্দিরটি অবস্থিত। মন্দিরের গাত্রে যে সকল মূর্ত্তি খোদিত রহিয়াছে তাহা বিষ্ণু অথবা বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি তাহা বলা যায় না। মন্দিরের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া প্রবেশ পথের বাহিরে দৃষ্টিপাত করিলে চক্ষু ও মন নয়ন-রঞ্জন প্রাকৃতিক দৃশ্যে পুলকিত হয়। সম্মুখে উভয় পার্শ্বে যতদূর দৃষ্টি যায়, কেবলই পাহাড় এবং সেই পাহাড়গুলিকে দ্বিধা-বিভক্ত করিয়া লিদার উপত্যকা। পাহাড়ের পাদতলে ক্ষুদ্র ভবনগ্রামের এক অংশ পত্রবহুল চেনার ও আখ্‌রুট বৃক্ষসকলের মধ্যে যেন আত্মগোপন করিয়া রহিয়াছে।

ভবন পরিত্যাগ করিয়া আমরা পার্ব্বত্য পথে প্রবেশ করিলাম। পথ অসমতল; কোথাও পথ নামিয়া গিয়াছে, কোথাও উপরে উঠিয়াছে। পথের এক পার্শ্বে পাহাড়, অপর পার্শ্বে শস্যক্ষেত্র। একটি খরস্রোতা নদী পথের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া উদ্দাম আবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। এই নদীটির নাম লিদার নদী এবং এই নদীর নাম হইতেই স্থানের নামোৎপত্তি 'লিদার উপত্যকা' হইয়াছে। কতপ্রকার বন্যকুসুম প্রস্ফুটিত হইয়া নির্জ্জন পার্ব্বত্য প্রদেশের শোভা বৃদ্ধি করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। মাঝে মাঝে উইলো বীথিকা। উইলো মূল ধৌত করিয়া পার্ব্বত্য নির্ঝরিণী সকল কুল কুল শব্দে প্রবাহিতা। মাঝে মাঝে কাশ্মীরী গ্রাম, গ্রামবাসীরা তাহাদের কাষ্ঠ-নির্ম্মিত আবাস পরিত্যাগ করিয়া আবালবৃদ্ধবনিতা মোটারের শব্দে চকিত হইয়া পথের পার্শ্বে দলে দলে আসিয়া দাঁড়াইতেছে; তাহাদের হৃদয়ের আবেগ তাহাদের কৌতূহল-পূর্ণ নয়নের মধ্যেই প্রকটিত হইতেছে।

ক   র গঙ্গা

মনীষী দে

বিসর্জ্জন

—গল্প—
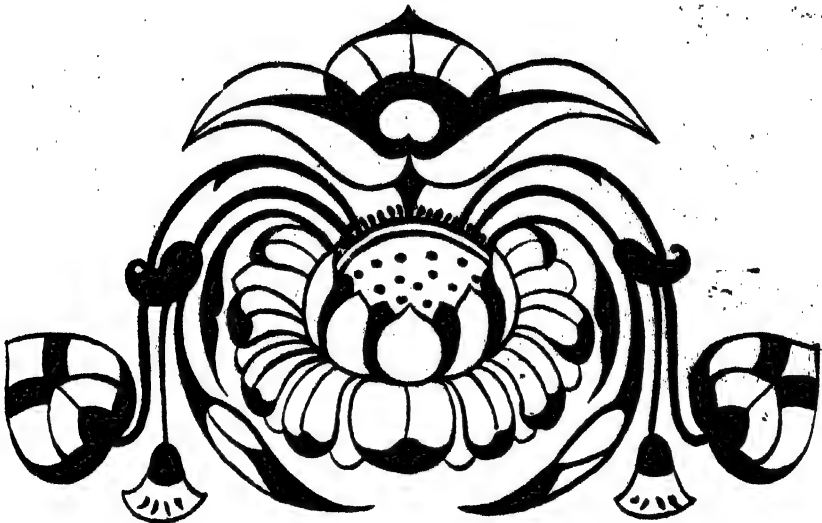
—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

"কি বৌমা, তোমার কি রকম আক্কেল বল দেখি? কি জাত না কি জাতের মেয়ে, অমনি পথের ধারে দেখ্‌লে আর কুড়িয়ে নিয়ে এলে? বামুনের মেয়ে হ'য়ে তোমার এমন প্রবৃত্তি কেমন ক'রে হোল, আমরা ত বুঝে উঠ্‌তে পারি না। এ সংসারেও ত এতদিন কাটালে। সেই বারো বছরের ছোটটি এনেছিলাম আজ পনেরো বছর এই সংসার করচ, আর তোমার এমন প্রবৃত্তি! তোমার আর কি দোষ দেব মা, কাল যে কলি।"

"তা কি করব মা, পথের ধারে ঝোপের মধ্যে এতটুকু মেয়ে প'ড়ে কাঁদ্‌ছিল, আর একদণ্ড থাকলে হয় শেয়ালকুকুরে ছিঁড়ে খেয়ে ফেল্‌ত, নয় ঠাণ্ডায় ম'রে যেত। আমরা যদি না নিয়ে আস্‌তুম সে পাপ কি আমাদের লাগ্‌ত না?"

"আমাদের আবার পাপ লাগ্‌তে যাবে কেন? যাদের মেয়ে তারা ফেলে দিয়েছে, তাদের পাপ না হ'য়ে হবে আমাদের? মেয়ের যারা বাপ মা, তারা জন্মমাত্র টেনে ফেলে দিতে পার্‌ল, তাদের মায়া হলো না, মায়া হলো তোমার? কি জানি বাপু, তোমাদের ভাবগতিক বুঝ্‌তে পারি না।"

"এই দেখুন দেখি কেমন ছোট মেয়েটি? কেমন চোখ মিট্‌ মিট্‌ কর্‌চে। দেখুন মা, একবার তাকিয়ে দেখুন্ না মা।"

বধূর কথায় শাশুড়ির মনটা একটু নরম হইল। তিনি কেরোসিনের ল্যাম্পটা হাতে করিয়া একটু আগাইয়া আসিয়া খানিকটা তফাৎ থেকে মাথা বাড়াইয়া তাকাইয়া দেখিয়া বলিলেন, "আহা, কাদের বাছা গো। এমন ক'রে বনে বাদাড়ে ফেলে দিয়ে গেল, একটু মায়াও হলো না। কি জানি বাবা! এমন নিষ্ঠুর ত দেখি নি। মা হ'য়ে কেমন ক'রে নিজের পেটের কচি বাচ্ছাকে শেয়াল কুকুরের মুখে এমন ক'রে ফেলে দেয়! আহা কি নির্দ্দয় মা!"

শাশুড়ির কথায় সাহস পাইয়া বধূ বলিল—"দেখ মা কেমন যেন হাস্‌ছে, কেমন সুন্দর দেখ্‌তে, দেখে মায়া হয় না?"

"আহা মায়া আবার হয় না! আমার গোবিন্‌ যখন হোল একটুও কাঁদেনি; হ'য়েই অম্‌নি চারিদিকে টুল্‌ টুল্‌ করে তাকাতে লাগল। তারপর বল্‌তে নেই—কত কষ্ট ক'রে মানুষ কর্‌লুম। কর্ত্তা মারা গেলেন কত দুঃখ সইতে হয়েছে আমার গোবিন্‌কে। ঐ গোষ্ঠীরা মিলে কত শত্রুতাই না কর্‌লে, তবু ত লক্ষ্মীনারায়ণের দয়ায় এখন মানুষ হ'য়ে উঠেছে। ছেলে কি কম কষ্টের ধন। নিশ্চয় কিছু দোষ ছিল, নইলে অমন ক'রে ফেলে দেবে কেন?"

"এতটুকু শিশু, ওর কি দোষ মা? দোষ থাক পাপ থাক্‌ সে ওর মারই ছিল, ওর ত কোনও অপরাধ নেই।"

"ওর মা অভাগীর ত পাপের সীমাই নেই, ওরই বা অপরাধ না থাকলে এমন হবে কেন? জন্ম জন্মান্তরের পাপ। তুমি কেন মা পরের পাপ ঘাড়ে ক'রে নিয়ে এলে? নিজের ত এতদিনে একটা কিছুই হ'ল না। এখন কোন জাত না কোন জাতের মেয়ে কুড়িয়ে নিয়ে এলে, কি সর্ব্বনাশ করলে বল দেখি! লোকে যখন জানতে পারবে তখন কি আর রক্ষা রাখবে? আর তুমি ওর নেকড়া কানি কাচ্‌বে ত আমার কাজই বা করবে কেমন ক'রে, ঘরে লক্ষ্মীনারায়ণ রয়েচেন তারই বা কাজ হবে কেমন ক'রে? বৌমা, কি সর্ব্বনাশই তুমি করেছ বাবুরা জানতে পারলে হয়ত তাঁরাও রেগে যেতে পারেন। ঐ যা—তুমি সর্‌তে সর্‌তে এসে আমার রান্নাঘরের বেড়াটা ছুঁয়ে দিলে, দুখানা শশা কেটে রেখেছিলুম, একঘটি জল ছিল, সব ত নষ্ট হ'য়ে গেল। কি অদৃষ্টই ক'রে এসেছিলুম, দুদিন যে একটু স্বস্তিতে থাকব তার যো নেই। কোথাকার কোন অভাগীর পাপ এসে আমাদের ঘাড়ে পড়্‌ল।" এইকথা বলিয়া ঘটির জলটা

ঢালিয়া ফেলিয়া দিয়া বিড়্ বিড়্ করিয়া বকিতে বকিতে পুকুরের দিকে চলিয়া গেলেন।

বধূ কমলা এতটা মনে করে নাই। হঠাৎ এতদূর গড়াইল দেখিয়া প্রথমটা একেবারে অপ্রস্তুত হইয়া গিয়া চুপ করিয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল।

গোবিন্দ ভট্টাচার্য্য এখন এ বাড়ীর কর্ত্তা। পরিবারের মধ্যে মাতা ও স্ত্রী। গোবিন্দের পিতা নীলমণি ভট্টাচার্য্য গোবিন্দের পনেরো বৎসর বয়সের সময় লোকান্তরপ্রাপ্ত হ'ন। সেই অবধি এই সংসার গোবিন্দের ঘাড়ে পড়িয়াছে। গোবিন্দের বিষয় সম্পত্তি কিছুই নাই, যজমানি করিয়া যাহা কিছু পায় তাহাতেই এক রকম চলিয়া যায়। লেখাপড়া টোলে হিতোপদেশের কিয়দ্দূর ও মুগ্ধবোধের কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল, তার পরই পিতার মৃত্যুতে টোল ছাড়িয়া যজমানি ব্যবসা ধরিতে হয়। গ্রামের মধ্যে চৌধুরীরা বড়লোক, খুব নিষ্ঠাবান। সমস্ত ক্রিয়াকর্ম্মই তাঁহাদের বাড়ীতে হয়। তাঁহাদের আশ্রয়েই গোবিন্দ প্রতিপালিত। আজ বৈকালে গোবিন্দের স্ত্রী দূরসম্পর্কীয়া এক ভগ্নীর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খাইতে গিয়াছিল, ফিরিয়া আসিতে সন্ধ্যা হয়। খালের ধারে ঝোপের মধ্যে একটি ছোট শিশুর ক্রন্দন শুনিয়া সেই দিকে গিয়া দেখে যে একটি সদ্যোজাত শিশু পড়িয়া রহিয়াছে। ঐরূপ অবস্থায় শিশুটিকে দেখিয়া সে কোন মতেই সেটিকে ঐ ভাবে ফেলিয়া আসিতে পারিল না। বুকে করিয়া শিশুটিকে চাপিয়া লইয়া আসিয়াছিল।

গোবিন্দের স্ত্রী কমলার সন্তান হয় নাই। কমলা রূপবতী বলিয়া গ্রামে তেমন খ্যাতি নাই। তবে নাকটা আর একটু চোখা, চোখ দুটি আর একটু বড় ও পা দুখানা আর একটু ছোট হইলে তাহাকে যে বেশ সুন্দরী বলা যাইতে পারিত, এরকম সমালোচনা মেয়েদের মধ্যে প্রায়ই শোনা যাইত। সুন্দরী না হইলেও তাহার মধ্যে এমন একটা আকর্ষণ ছিল যাহাতে তাহার দিকে তাকাইলে সহসা কাহারও চোখ উঠাইয়া লইবার ইচ্ছা করিত না। যে ফুল ফলের অপেক্ষা রাখে না সে যেমন দর্শকের সমস্ত দৃষ্টিটুকুকে সহজেই টানিয়া লইতে পারে, এও যেন কতকটা তাই। বয়সে তার ভাটি পড়িয়া আসিতেছিল, কিন্তু তারুণ্য তখনও তাহাকে পরিত্যাগ করিবার সুযোগ পায় নাই। ছোট মুখের খালের মধ্যে প্রবল জোয়ারের বেগে অতিপরিমাণ জল ঢুকিলে ভাটার সময়ও যেমন সে জল বাহির হইবার পথ না পাইয়া পাক খাইয়া ফুলিয়া ফুলিয়া স্থির হইয়া ওঠে, এই সন্তানহীনা কমলার দেহ হইতে যৌবন তেম্‌নি পলাইবার পথ পাইতেছিল না।

নিরামিষ ও আমিষ দুই ঘরের কাজই সে একলা করিত। তার উপর বাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত লক্ষ্মীনারায়ণ বিগ্রহ, তাহারও সমস্ত কাজ তাহারই উপর ছিল। শাশুড়ির দেহে কষ্টের বাতাসটি পর্য্যন্ত লাগিতে দিত না। সমস্ত কাজ এম্‌নি করিয়া পরিপাটির সহিত করিয়া যাইত যে, ইচ্ছা হইলেও শাশুড়ী সেই কর্ম্মের জালের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিতেন না, খুঁতও ধরিতে পারিতেন না। অনাবশ্যক গল্প করিতে, পরনিন্দা করিতে, পাড়াপড়্‌শী বউঝির রূপের সমালোচনা করিতে সে একটুও ভালবাসিত না, অথচ তাহাকে কেউ অহঙ্কারী বলিতে সাহস পাইত না। এম্‌নি সহজে সে লোকের মনের মধ্যে প্রবেশ করিত ও এত সহজে বাহির হইয়া আসিত যে, কেহ তাহাকে কোনও স্থানে জড়াইতে পারিত না। সে কাহারও রাগ গায় করিত না, তাই তাহার উপর রাগ করিয়া থাকা সহজ ছিল না; কাহারও নিন্দা সে গ্রাহ্য করিত না বলিয়া তাহার বিরুদ্ধে নিন্দা পাকাইয়া উঠিতে পারিত না; এবং নিজে কাহারও নিন্দা করিত না বলিয়া ছিদ্রান্বেষিণীদিগের কিঞ্চিৎ অতৃপ্তি হইলেও তাহাকে নিন্দা করিবার ফাঁক সহজ হইত না। ঘোষালদের বাড়ী—একটি মাত্র বৌ; বিধবাদের চিড়া কুটিবার সময় কমলা গিয়া সেখানে উপস্থিত হইত। রামমোহন সরকারের মা-মরা ছেলের যখন জ্বর হইত, পাশের বাড়ীর খুকিকে দিয়া সাগুটুকু জ্বাল দিয়া সেখানে সময়মত পাঠাইতে তাহার কখনও ভুল হইত না; অথচ এ সমস্ত কোনও কাজ লইয়া সে কোনও দিন কোনও আন্দোলন করিত না, এবং ইহা লইয়া যদি কেহ কোনও দিন তাহাকে প্রশংসা করিত বা পরের বাড়ীর কাজ লইয়া অনাবশ্যক ব্যস্ততায় শাশুড়ি যদি তিরস্কার

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

করিতেন তাহা সে কানেই তুলিত না। নিজের ছোট সংসারটির মধ্যে এই কর্ম্মশীলা এক অঞ্জলি পারদের মত সর্ব্বদা আপনার স্নিগ্ধতায় উজ্জ্বলতায় চঞ্চল হইয়া বেড়াইত, অথচ কোনও স্থানে তাহাকে বাঁধিয়া রাখিবারও উপায় ছিল না। কোনও কাজে সে নিন্দা প্রশংসার অনুমতির অপেক্ষা করিত না। তাহার নিজের মধ্যে এমন একটা তাল ছিল, যাহা কখনও কোনো কারণে ঠকিতে বা কাটিতে দেখা যাইত না।

তাই এ দিন যখন সে পথের ধারে শিশুটিকে নিরাশ্রয়-ভাবে দেখিতে পাইল, তখনই সে শিশুটিকে বুকে করিয়া লইয়া আসিল। এ কথা লইয়া কোনো গোলযোগ হইতে পারে কিনা সে কথা তার মনেই উঠে নাই। কিন্তু শাশুড়ির নিকট তিরস্কৃত হইয়া সে যখন কুড়ানো শিশুটিকে লইয়া ঘরে আসিয়া বসিল, তখন এই ক্ষুদ্র হতভাগা শিশুটিকে আনিয়া তাহাদের শান্ত সংসারটিতে সে যে কত গোলযোগের সৃষ্টি করিয়াছে তাহা ধীরে ধীরে বুঝিতে লাগিল। শুধু তাহার নিন্দা গঞ্জনা হইলে সে তাহা গ্রাহ্য করিত না, কিন্তু শাশুড়ী, স্বামী, সকলকে যে সে কি বিষম বিপদে ফেলিয়াছে তাহা যতই চিন্তা করিতে লাগিল ততই সে ভীত হইতে লাগিল। শিশুটিকে কুড়াইয়া না আনিয়াই বা সে কি করিতে পারিত—তাহাও সে ভাবিয়া পাইল না। লক্ষ্মীনারায়ণের ভোগের কাজ, শাশুড়ির কাজ সমস্তই ত সে একা করিত, এখন ত তাহার দ্বারা কোনো কাজই হইবে না। স্বামীই বা ইহা লইয়া কত নির্য্যাতিত হন তাহারই বা ঠিক কি? দমকা বাতাসে ঘাটের দড়ি ছিঁড়িয়া নৌকা-খানাকে একবার যদি মাঝ-দরিয়ায় আনিয়া পাক খাওয়াইতে থাকে তাহা হইলে আরোহীর মন যেমন একটা আশ্রয়হীন অনির্দিষ্ট শঙ্কায় ক্রমশ আকুল হইয়া উঠে, কমলার মনও যেন তেম্নি একটা অনির্দেশ্য উদ্বেগে ভয়াতুর হইয়া উঠিতে লাগিল। কোনও দিক হইতে সে একটা আশ্রয় বা আশ্বাস পাইল না।

কোথায় একটা সত্যনারায়ণের পূজা ছিল গোবিন্দ সেই উপলক্ষে সন্ধ্যার খানিক পূর্ব্বেই বাহির হইয়া গিয়াছিল এবং খানিকটা রাত হইয়া গেলে চাল কলার পুঁটলি ও একবাটি সিন্নি লইয়া বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। আসিয়াই মার কাছে সমস্ত শুনিল।

গোবিন্দ লোকটা টোলে পড়িয়াছিল, বিশেষ কোনোও প্যাঁচ বুঝিত না, বা দূর ভবিষ্যতে কোন কাজটার ফল কতদূর গড়াইতে পারে তাহারও কোনো ধারণা করিতে পারিত না। তথাপি কাজটা যে একেবারেই ভাল হয় নাই, এ কথা সে বেশ বুঝিল। তা ছাড়া মার কাজেরই বা কি হয়, ঠাকুর সেবারই বা কি হয়। অতটুকু শিশুর লালন পালন করিতে হইলে কমলা ত তাহার স্পর্শে সর্ব্বদাই অশুচি হইয়া থাকিবে। অথচ এই গোত্রহীন শিশুর অন্য কোনও বন্দোবস্ত করাও সহজ নহে।

স্ত্রীর উপর তাহার ভারী রাগ হইল। এতদিন ধরিয়া এই শ্রমপরায়ণার নিপুণ হস্তের সেবা সে পাইয়া আসিতেছিল। কতদিন সে আপনার অকর্ম্মণ্যতায় কমলার কাছে লজ্জিত হইয়াছে, অথচ কমলা তার কোনই হিসাব না লইয়া তাহাকে নিষ্কৃতি দিয়াছে। গোবিন্দ তাহার সমস্ত সেবা ও যত্নের মর্য্যাদা বুঝিত না, কিন্তু ফলের মধ্যে রস যেমন কিছু কিছু করিয়া অলক্ষ্যে সঞ্চিত হইয়া তাহাকে রসে ও গন্ধে পূর্ণ করিয়া তোলে, কমলার মাধুর্য্য ও স্নেহও তেম্নি করিয়া অলক্ষ্যে একটু একটু করিয়া এতদিন ধরিয়া গোবিন্দের হৃদয়কে পূর্ণ করিয়া দিয়াছিল। তাই কমলাকে তিরস্কার করিতে আজ তাহার মুখ উঠিল না। তাই সে ধীরে ধীরে তাহার কাছে গিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "কি হবে"?

নারী-হৃদয়ের সমস্ত দুর্ব্বলতা আসিয়া কমলার কণ্ঠরোধ করিয়া ধরিল। গোবিন্দের দুই পা জড়াইয়া ধরিয়া সে কাঁদিয়া কহিল, "কি হবে? তুমি যা হয় একটা উপায় কর।"

যা হয় যে কি করিবে তাহা গোবিন্দ কিছুই ভাবিয়া পাইল না। কোনো কিছু উপায় না দেখিয়া মনে মনে ভাবিল, আচ্ছা দিন কতক চুপ করিয়া থাকিয়া দেখা যাক্ কি হয়?

গৌরচন্দ্রের পিতা ও গোবিন্দের পিতা উভয়ে খুড়তুত জেঠতুত ভাই ছিল। অনেকদিন এক অন্নে থাকিলেও

গৌরচন্দ্রের মা ও গোবিন্দের মার মধ্যে একটা মনকষাকষি চলিত। হঠাৎ ঠাকুর সেবা লইয়া কি একটা তুচ্ছ কারণে একদিন দুই ভাইর মধ্যে তুমুল ঝগড়া হইল এবং উভয়েপৃথক হইয়া গেল। গোবিন্দের পিতা একটু শক্ত লোক ছিল। সে আপন অংশ বেচিয়া ফেলিয়া সেই গ্রামেরই অন্যত্র গিয়া বাস উঠাইল। গৌরচন্দ্রের পিতার যখন মৃত্যু হয় গৌর-চন্দ্রের তখন বেশ বয়স হইয়াছিল। যতদিন গোবিন্দের পিতা জীবিত ছিল ততদিন গৌরচন্দ্র কোনও সুবিধা করিয়া উঠিতে পারে নাই। কিন্তু যখন পনেরো বৎসরের গোবিন্দকে রাখিয়া গোবিন্দের পিতা পরলোক গমন করিল, তখন চৌধুরী বাড়ির ক্রিয়াকর্ম্ম যাহাতে ভাগাভাগি না হইয়া একা গৌরচন্দ্রেই বহাল থাকে, সে পক্ষে গৌরচন্দ্র বিধিমত চেষ্টা করিয়াছিল।

গৌরচন্দ্রের সপক্ষে বলিবার ছিল এই যে, অনেক দিন বিদেশে থাকিয়া অধ্যয়নের বিশ্বজয়ী মেডেল স্বরূপ একটি গাড়ু ও স্মৃতিরত্ন উপাধি লইয়া সে যখন দেশে ফিরিয়া আসিয়াছিল, তখন তাহার বিদ্যাবত্তা সম্বন্ধে গ্রামের টোলের ছাত্রদের মধ্যে কিছুদিন করিয়া পথে ঘাটে একটা রীতি-মত আন্দোলন চলিয়াছিল। অবশ্য শত্রুপক্ষের লোকের মধ্যে এমন অনেক কানা ঘুষা শুনা যাইত যে, গাড়ুটা সে নিজেই আসিবার সময় কলিকাতা হইতে কিনিয়া আনিয়াছিল। কিন্তু ইহা বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া নাও মনে করা যাইতে পারে, কারণ ইহার কোনোও নির্দ্দিষ্ট প্রমাণ ছিল না।

গৌরচন্দ্র চৌধুরী বাবুদের বুঝাইতে চেষ্টা করিয়া-ছিল যে, গোবিন্দ একেবারে মূর্খ, তার দ্বারা কি ঠাকুর সেবা, কি নৈমিত্তিক কার্য্য কোনটাই সুসম্পন্ন হওয়ার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু চৌধুরীদের বড় কর্ত্তা গোবিন্দের নিরাশ্রয় অবস্থা দেখিয়াই হোক, অথবা নিরীহ স্বভাবের জন্যই হোক গৌরচন্দ্রের কথা কানে তুলিলেন না, বরং তাহাকে দুই কথা শুনাইয়া দিয়া বলিলেন যে, গোবিন্দের সহিত শত্রুতা করা তাহার পক্ষে অত্যন্ত অশোভন। সেই অবধি গৌরচন্দ্র বরাবরই গোবিন্দের সহিত মৌখিক শিষ্টাচার রাখিয়াই চলিয়াছে।

কাক চোখ বুজিয়া ঘরের চালে খাবার গুঁজিয়া রাখিয়া মনে করে কেহ দেখিবে না, গোবিন্দও নিজে চুপ্ করিয়া থাকিয়া ভাবিল কথাটা চাপিয়া গেল, কিন্তু কথা চাপা রহিল না; অনেকেই শুনিল এবং গৌরচন্দ্রও শুনিল।

গৌরচন্দ্র গিয়া চৌধুরীদের বাড়ীতে বলিল, ঠাকুরের পুনঃসংস্কার প্রয়োজন। সমস্ত বিষয় গোবিন্দকে ডাকাইয়া যখন জিজ্ঞাসা করা হইল, তখন গোবিন্দ কোনও জবাবই করিতে পারিল না। গোবিন্দের স্পর্শজনিত অপবিত্রতা দূর করিবার জন্য গৌরচন্দ্র ঠাকুরের সংস্কার করাইল। বড় কর্ত্তা গোবিন্দকে বলিয়া দিলেন, যত দিন তাহারবাড়ীতে শিশুটি থাকিবে ততদিন যেন সে কখনও ঠাকুর ঘরে প্রবেশ না করে।

ইচ্ছা থাকিলেই কাজ করা সহজ নয়, অধিকার থাকা আবশ্যক। কমলার ইচ্ছা ছিল, মমতা ছিল, কিন্তু মাতৃত্বের অধিকারে বিধাতা তাহাকে বঞ্চিত করিয়াছিলেন; তাই শিশুটিকে নিয়া সে মহা বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিল। মাতৃহীন একটি শিশু ঘরে থাকিলে সমস্ত পরিবারের অক্লান্ত মনোযোগ না হইলে তাহাকে বাঁচান সহজ নয়। কমলা নিজে কোনও দিন শিশু পালন করে নাই। এ বাড়ীতে দুধের কোন রীতিমত ব্যবস্থা ছিল না; গোবিন্দের মার একাদশীর প্রভৃতি উপলক্ষে মধ্যে মধ্যে পাড়া হইতে সংগ্রহ করিয়া আনা হইত। কাজেই এখনও নিত্য দুধ জুটিবার কোনও উপায় ছিল না, যদি বা কোন দিন পাড়ার কোন মেয়েকে ধরিয়া এ বাড়ী ও বাড়ী হইতে একটু আধটু দুধ সংগ্রহ হইত, তবুও তাহা সময়মত পাওয়া যাইত না; শটির পালো, ভাতের মাড়, ময়দা ইহাই ছিল নিত্য বরাদ্দ। কাজেই শিশুটির পেটের অসুখ প্রায়ই লাগিয়া থাকিত। কমলাকে তাহা লইয়া প্রায় অপরিষ্কৃত অবস্থায় থাকিতে হইত। কমলার শাশুড়ী ঘৃণায় তাহাকে স্পর্শ করিতেন না। প্রথম প্রথম কমলা শিশুটির জন্য যখন যাহা করিত তাহাতে যেন একটু বিশেষ সঙ্কুচিত হইত। শাশুড়ীর ঘরের খুব কম কাজই সে করিতে পাইত। বিশেষত যে দিন হইতে চৌধুরী বাড়ীর পূজা বন্ধ হইল ও ঠাকুরের

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

পুনরভিষেক হইল সে দিন হইতে সে ঠাকুর ঘরের কোনও কাজেই হাত দিতে পারিত না। যতটা বা গোবিন্দের মা পারিতেন করিতেন, যতটা বা গোবিন্দ নিজে এ দিক ও দিক হইতে ঘুরিয়া আসিয়া পারিত করিত। বেলা দুটা তিনটার আগে ঠাকুর সেবা হইত না এবং গোবিন্দের খাইতে প্রায়ই চারটা পাঁচটা বাজিয়া যাইত। অধিক গোলযোগের ভয়ে গোবিন্দ তার মার ঘরেই খাইত।

অলসকে কর্ম্মের পাকের মধ্যে ছাড়িয়া দিলে তাহাকে অনেক নিগ্রহ ও লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয় বটে, কিন্তু চাপ খাইতে খাইতে দু এক যায়গায় টোল খাইয়া সহিয়া যায়। কিন্তু কর্ম্মপরকে একেবারে কর্ম্মের বাহিরে আনিয়া ছাড়িয়া দিলে সে এমন ভীষণ ভাবে নিরালম্ব ও নিরাশ্রয় হয় যে, জগৎ তাহার কাছে একেবারে ফাঁকা হইয়া যায়। সে যেন একটা অতল শূন্যতার মধ্যে তলাইয়া যাইতে থাকে। কোনও একটা অবলম্বন আঁকড়িয়া ধরিতে না পারিলে তাহার বাঁচা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। কর্ম্মপরায়ণা কমলার যখন সমস্ত কর্ম্ম হইতে ছুটি হইল, তখন সে এই শিশুটিকে লইয়া পড়িল। চারিদিকের উপেক্ষা ও ঘৃণায় যেন আছড়াইয়া আছড়াইয়া তাহাকে ও তাহার কুড়ানো মেয়েটিকে একত্র করিয়া একটা নির্জন দ্বীপের মধ্যে ফেলিয়া দিল। সেখানে তাহারা দুইজনে দুইজনের আশ্রয়, তাহাদিগকে দেখিবার আর কেহ নাই। এখন তাহার আর তেমন সঙ্কোচ বা ভয় রহিল না। ভয়ের মধ্যে এই ক্ষুদ্র শিশুটি তাহাকে অভয় দিল। এই অত্যধিক যত্ন তাহার স্বামী ও শাশুড়ীর নিকট দিন দিন নিরতিশয় অপ্রীতিকর হইয়া তাহাকে ক্রমশ তাহাদের নিকট হইতে দূরে সরাইয়া নিয়া শিশুটির সহিত তাহার বন্ধন ঘনিষ্ঠ করিয়া তুলিল; কিন্তু গাছের পক্ষে শিকড় গজাইয়া সতেজ হইয়া উঠিতে হইলে যেমন শুধু তার গোড়ার মাটিটুকু ভিজা থাকিলে চলে না, আশে পাশের খানিকটা জমিই সরস ও নরম থাকা আবশ্যক, শিশুর বৃদ্ধির পক্ষেও চারিদিক হইতে একটা স্নেহ ও রসসঞ্চার তেমনি ভাবেই আবশ্যক। জন্ম হইতেই যে দুর্ভাগা শিশু দেবদত্ত মাতৃস্নেহের অতুল সম্পদ্ হইতে বঞ্চিত, আসিবামাত্রই সমাজ যাহাকে ক্রূর অভিসম্পাতের আগুনে দগ্ধ করিতে চায়, অমঙ্গলের উল্কার মত সকলে যাহাকে পরিহার করিতেছিল, শুধু কমলাকে আশ্রয় করিয়া সে কেমন করিয়া পুষ্ট হইয়া উঠিবে। চারিদিকের বিষাক্ত হাওয়ায় শিশুটি শুকাইয়া যাইতে লাগিল। কমলা নিজে যতদূর সাধ্য করিত, কিন্তু শিশুর পক্ষে তাহা পর্যাপ্ত হইত না।

চৌধুরী বাড়ী হইতে তাড়িত হওয়ার দিন হইতে গোবিন্দের কষ্টের পালা আরম্ভ হইয়াছিল। চৌধুরীরা অনেকদিনের বুনিয়াদি ঘর। তাহাদের প্রাত্যহিক পূজানুষ্ঠানের বিধি-বরাদ্দ বেশ প্রচুর। তা ছাড়া একটা না একটা ছোট খাট ক্রিয়া কর্ম্ম প্রায়ই লাগিয়া থাকিত, কাজেই সেখানে কাজ করার পর আর নানা স্থানে ঘোরাঘারির বড় প্রয়োজন হইত না। কিন্তু সে দিক বন্ধ হওয়াতে গ্রামময় ছোট খাট পূজা কুড়াইয়া বেড়াইতে হইত। এমন কি অন্যের গোমস্তা হইয়া ভিন্ন গ্রামেও গিয়া পূজা সারিয়া আসিতে হইত। তা ছাড়া, বাড়ীর অনেক কাজও এখন তাহার উপর পড়িয়াছিল। এত কষ্ট করা গোবিন্দের কোনও দিন অভ্যাস ছিল না।

কুড়ানো শিশুটার প্রতি কমলার এত অধিক টান গোবিন্দের পক্ষে দিন দিনই অসহ্য হইয়া উঠিতেছিল। গ্রহ-সন্নিবেশের আকর্ষণ বিকর্ষণের এমনই নিয়ম যে কোনও দিকের একটা আকর্ষণ যদি একটু বাড়িয়া যায় তবে সমস্ত গ্রহমণ্ডলেই একটা বিপ্লব বাধিয়া উঠে। আজ ক্ষুদ্র শিশুটির জন্য কমলার আকর্ষণটুকু ক্রমশ তাহাকে গোবিন্দের স্নেহ-কক্ষ হইতে দূরে লইয়া যাইতেছিল। সামান্য উপলক্ষ লইয়া সে প্রায়ই শিশুটিকে ও কমলাকে তিরস্কার করিত, কিন্তু কমলার তরফ হইতে কোনও জবাব আসিত না। সাড়া না পাইয়া গোবিন্দের সাহস বাড়িয়া গিয়াছিল। অনেক সময়েই হয়ত অত্যধিক উত্তেজনায় মাত্রা ছাড়াইয়া যাইত। কিন্তু কমলা এমন নিঃশব্দে পাশ কাটাইয়া যাইত যে তিরস্কারের উত্তাপটুকুও যেন তাহার গায় লাগিত না। ব্যর্থ কোপের আগুনে গোবিন্দ নিজেই জ্বলিয়া মরিত। ইহার ফল হইল এই, সে দিনে দিনে একটি বিচ্ছেদের

ব্যবধান গড়িয়া উঠিয়া পরস্পরের দৃষ্টিকে আবৃত করিয়া দিতে লাগিল, কিন্তু গোবিন্দের পক্ষে ইহা যেমন মর্ম্মান্তিক হইল, কমলার পক্ষে তেমন নয়; তাহার প্রধান কারণ এই যে, কমলার আশ্রয় ছিল সেই ক্ষুদ্র শিশুটি, কিন্তু গোবিন্দ ছিল একেবারে নিরবলম্বন। তা ছাড়া গোবিন্দ রাগিত, বকাঝকা করিয়া আপনাকে চঞ্চল করিয়া তুলিত, কমলা থাকিত শান্ত স্তব্ধ।

গোবিন্দ কত সময় বসিয়া বসিয়া তাহাদের পূর্ব্বের সুখের সংসারের কথা ভাবিত। শিশুটির উপর একটা ক্রোধ ও বিদ্বেষে তাহার মন তিক্ত হইয়া উঠিত এবং একটা দারুণ অশান্তিতে তাহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া যাইত। ইহা হইতে মৃত্যু যদি কমলার সহিত চির-বিচ্ছেদ ঘটাইত, তাহাও বুঝি সহজে সহ্য করা যাইতে পারিত। চন্দ্রহীন অমাবস্যার অন্ধকার স্বাভাবিক বলিয়া সহ্য করা যায়। কিন্তু পূর্ণচন্দ্রের রাহুগ্রাস হৃদয় বিদীর্ণ করে।

এদিকে গৌরচন্দ্রের চক্রান্ত যে পাকিয়া উঠিতেছিল, গোবিন্দ তাহা তেমন বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই। একদিন শ্রাদ্ধ উপলক্ষে গ্রামের রসময় চক্রবর্ত্তীর বাড়ীতে অপরাহ্ণ-প্রায় মধ্যাহ্নে গোবিন্দ যখন কদলীপত্রশ্রেণীশোভিত নিমন্ত্রণ-সভায় গিয়া প্রবেশ করিল তখন সমস্ত ব্রাহ্মণেরা আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। জাতিহীন গোবিন্দ অপমানের ভরা লইয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিল। সেইদিন হইতে গোবিন্দের পৌরহিত্য একেবারে বন্ধ হইয়া গেল।

গোবিন্দ গিয়া চৌধুরী বাড়ীর বড়কর্ত্তার পা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া পড়িল। বড়কর্ত্তা বরাবরই গোবিন্দকে একটু ভালবাসিতেন। তিনি বলিলেন, শিশুটার একটা বন্দোবস্ত করিয়া ফেলিতে পারিলেই তিনি সমস্ত গোলমাল চুকাইয়া দিবেন; অন্যথা কিছু করা অসম্ভব।

পঙ্কজলক্ষণা শরৎলক্ষ্মী কাশবনের চামররাজি কম্পিত করিয়া আকাশের নীল চন্দ্রাতপতলে রাজপটে অধিষ্ঠিতা হইয়াছেন। প্রাতঃকালে ধূলিবিধৌত নির্ম্মল বায়ু নবারুণোদ্ভাসিত শস্য-ক্ষেত্রের উপর সুবর্ণের তরঙ্গ তুলিয়া দিয়া শেফালিকুসুমের শিথিল বৃন্তের উপর মৃদু চুম্বন করিয়া বহিয়া চলিয়াছে। বর্ষার বজ্রময় বর্ষণময় তাণ্ডবনৃত্যের পর এ যেন শান্তি ও প্রীতির সুসমাচার। চারিদিকের দিগন্তবিসারী সবুজ সভামণ্ডপের উপর সূর্য্যের কিরণকন্যাগণের আনন্দ-নৃত্যের লীলা চলিয়াছে। ছেলে মেয়ে দল বাঁধিয়া সেফালি ফুল কুড়াইতেছে, কিশোরীরা আনন্দে বাড়ী বাড়ী প্রতিমা দেখিয়া ফিরিতেছে, যুবতীরা পতি-সমাগমের আশায় উৎফুল্লা হইয়া উঠিয়াছে, যুবকেরা উৎসবের আয়োজনে মত্ত হইয়াছে। পথে, ঘাটে, রেলে, ষ্টিমারে, নৌকায় চারিদিকে প্রীতিবিহ্বল, মিলন-সমৎসুক, উৎসবপরায়ণ নরনারীর আনন্দময় প্রাণের ভরা নাচিয়া চলিয়াছে। আজ শারদোৎসবের বোধনের দিন, আজ আনন্দের দিন।

এমন দিনে আজ কমলা নিরানন্দ, গোবিন্দ নিরানন্দ। শান্তি কি বস্তু এ কয় মাস কমলা তাহা জানে নাই। তাহার হৃদয়ের মধ্যে সূর্য্যের আলো ও মুক্ত বাতাসের প্রবেশের পথ নাই। এক অন্ধকারময় গহ্বরের মধ্যে সে এতদিন পড়িয়াছিল। কোনও অবলম্বন না পাইয়া শিশুটিকেই চাপিয়া ধরিয়াছিল। চিন্তায় অপমানে লাঞ্ছনায় অযত্নে অর্দ্ধাশনে তার দেহ কঙ্কালসার হইয়া গিয়াছিল। শরীরের সে লাবণ্য ও কান্তি আর ছিল না। চোখের পাতার নিম্নে দুইটা বড় বড় কালো দাগ পড়িয়াছিল। দীর্ঘদিনের অসংস্কারে কেশভার প্রায় জটাভারে পরিণত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। কিন্তু এত দীনতার মধ্যেও একটি মাতৃ-হৃদয়ের বাৎসল্যে তাহার মুখশ্রীকে মাধুর্য্যমণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছিল। শিশুটির প্রতি ভালবাসা তাহার মধ্যে একটা নূতন জীবন সঞ্চার করিয়াছিল। একদিকে যেমন সে এই ভালবাসার স্বাদে জীবনের মধ্যে একটা নূতন মাধুর্য্য বোধ করিত, অপরদিকে তেমনি এই শিশুটিকে উপলক্ষ করিয়া যে প্রলয়ের অগ্নিশিখা জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, তাহাতে সে ভীত ও বিপর্য্যস্ত হইত। এই ত সেদিন এই সংসারখানি কি আনন্দে, কি শান্তিতে, পরিপূর্ণ ছিল। যে দিন ধূমকেতুর মত এই শিশুটি আসিয়া এ সংসারে প্রবেশ করিল, সেই দিন হইতেই এই অশান্তির আরম্ভ। এই অমঙ্গলের বীজ ত সেই বহিয়া আনিয়াছে। আজ তাহার সমস্ত জীবনের সেবার সামগ্রী, তাহার নিজের হাতের গড়া এই সংসারখানি

:শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

একেবারে পর্য্যাকুল হইয়া পড়িয়াছে নিপুণ সেবার উপহারে যে স্বামীকে সে এতদিন ধরিয়া পূজা করিয়া আসিতেছিল, আজ তাহারই জন্য তিনি জাতিচ্যুত উপায়-হীন। যে পরিবারে কাঙাল গরীব আসিয়া কখনও ফিরিয়া যাইত না, সেই পরিবার এখন অনশনের দ্বারে উপস্থিত।

কোনও শাস্তি, তিরস্কার বা লাঞ্ছনাই তাহার পক্ষে যথেষ্ট নয় ইহা মনে করিয়া কমলা আপনাকে শতধিক্কার দিত। অনেক সময় ঐ শিশুর উপর তাহার রাগ হইত। শিশুর অজ্ঞাত পিতামাতার উপর অজস্র গালিবর্ষণ করিত। যেমন প্রবল দুঃখ ও যন্ত্রণার হাত হইতে মুক্তি পাইবার জন্য মানুষ আত্মহত্যার জন্য উৎসুক হইয়া উঠে, তেম্‌নি এই শিশুটিকে কোথাও বিসর্জ্জন করিয়া দিবে এ চিন্তাও অনেক সময়ে তাহার মনে উঠিত। এই শিশুই সমস্ত সর্ব্বনাশ সঞ্চয় করিয়া আনিয়াছে, ইহাকে পরিত্যাগ করিয়া সে নিজে মুক্ত হইবে এবং পরিবারের সকলকে মুক্তি দিবে। আর এ যন্ত্রণা সহ্য করা যায় না।

যেদিন হইতে জাতিচ্যুত হইয়াছিল, সেইদিন হইতেই যেমন করিয়া শিশুটির এই দারুণ বোঝা স্কন্ধ হইতে নামাইতে পারে তাহার জন্য গোবিন্দ নানা উপায় উদ্ভাবন করিতেছিল, কিন্তু কাজে খাটাইতে পারে এমন কোন উপায়ই তাহার বুদ্ধিতে আসিতেছিল না; এদিকে দিন দিনই পূজা ঘনাইয়া আসিতেছিল। দুর্গাপূজার মধ্যে কোন ব্যবস্থা না হইলে তাহার কোনও উপায় নাই। বিনা অধিকারে যে একটি সামান্য ক্ষুদ্র শিশু সংসারে একবার প্রবেশ করিয়াছে তাহাকে নড়ান কত কঠিন, তাহা গোবিন্দ হাড়ে হাড়ে বুঝিতেছিল। এমন সময় সংবাদ পাইল সেই গ্রামের বিন্দু বোষ্টমী এরূপ একটি কন্যাপালন করিতে ইচ্ছুক আছে

বিন্দু বোষ্টমীর এখন বয়স পড়িয়া আসিয়াছে। তাই বৃদ্ধবয়সের অবলম্বনের জন্য সে একটি কন্যা পাইলে রাখিতে চায়। পূর্ব্বদিন গোবিন্দ সমস্ত ঠিক করিয়া আসিয়াছে, আজ বোধনের দিন প্রাতঃকালে তাহার হাতে শিশুটিকে দিয়া আসিবে। শিশুটিকে একবার বাড়ী হইতে বাহির করিতে পারিলেই যে সে আবার চৌধুরী বাড়ীর দুর্গাপূজার ভার পাইবে এবং অন্যান্য সমস্ত গোলমালও মিটিয়া যাইবে, সে সম্বন্ধে বড় কর্ত্তা তাহাকে বিশেষ করিয়া বারংবার আশ্বাস দিয়াছেন।

অনেকদিন পর সর্ব্বনাশের বোঝাটা ফেলিয়া দিতে পারিবে সেই চিন্তায় মনটা আজ উৎসাহে দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু কমলার কাছে এই প্রস্তাব করিতে কেমন যেন সে সাহস পাইতেছিলনা। নানা ব্যাপারে এ কয় মাসে কমলা তাহার অনেক দূরে গিয়া পড়িয়াছিল। এত বড় ব্যবধান, এত বিচ্ছেদ সহ্য করিতে যে কমলা পারিয়াছিল, তাহার শক্তি যে ঐ শিশুটির মধ্যেই সঞ্চিত ছিল, ইহা গোবিন্দ যে একটু একটু না বুঝিত তাহা নয়। যে লাঞ্ছনা যন্ত্রণা সে ঐ শিশুটির জন্য এতদিন নীরবে সহ্য করিয়াছে এবং যে স্নেহপক্ষ বিস্তার করিয়া সে চারিদিকের আঘাত হইতে তাহাকে এতদিন বাঁচাইয়া আসিয়াছে, তাহাতেই সকলের অলক্ষ্যে শিশুটির উপর তাহার এমন একটি অধিকার স্থাপন করিয়াছিল যে, গোবিন্দ যখন কথাটা লইয়া কমলার নিকট উপস্থিত হইল, তখন সে প্রথম এমন থতমত খাইয়া গেল যে, কথাটা ভাল করিয়া বলিতে পারিল না।

কিছুদিন হইতে কমলা নিজেও ভাবিতেছিল, শিশুটা কাহাকেও দিয়া ফেলিতে পারিলে হয়, এ উদ্বেগ আর সহ্য হয় না। কিন্তু সেই পরিত্যাগ করিবার কাল যখন তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন কেমন একটা দম্‌কা আঘাতে তাহার হৃদয়টা ফিরিয়া গেল। এতদিন ধরিয়া অন্য সমস্ত দিকে সে ক্ষয় পাইয়া আসিতেছিল, শুধু বাৎসল্যরসে তাহার হৃদয়ের মাতৃত্বের দিকটি ক্রমশঃই পূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল। মমতায়, ত্যাগে, নিষ্ঠায়, সে পরের সন্তানে সন্তানবতী হইয়াছিল। বিশ্বের মাতৃমূর্ত্তি তাহার মধ্যে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল এক মুহূর্ত্তের আঘাতে আজ এই সত্যটি তাহার নিকট পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। সে দেখিল সে মা।

গোবিন্দ যখন দেখিল কমলা তাহাকে কোন মতেই দিবে না, তখন সে সম্মুখে অন্ধকার দেখিল। এ কয়দিন ধরিয়া সে যে আশা গড়িয়া তুলিতেছিল বুঝি আজ তাহা চূর্ণ হইয়া যায়। এক মুহূর্ত্তে তাহার মনে এ কয়মাসের সহ্য করা সমস্ত কষ্ট লাঞ্ছনা উদিত হইল। আজ যদি সে এই দুর্গা

পূজায় বসিতে না পায় তবে আর ভবিষ্যতে তাহার কোনো উপায় নাই, অন্যভাবেই হয়ত তাহাকে মারা যাইতে হইবে। নিমেষের মধ্যে বৈদ্যুতিক গতিতে এই সমস্ত কথাগুলি যখন তাহার মনে হইল, তখন সমস্ত শরীরের রক্ত যেন যুগপৎ শিরায় শিরায় তাহার মাথার মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ বিবশ ও অবসন্ন হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া হঠাৎ এক লম্ফে শিশুটিকে ছিনাইয়া লইয়া দৌড় দিল। কমলা কাৎ হইয়া পড়িয়া গেল, এবং শিশুটি আঁৎকাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

সপ্তমীর দিনই পূজায় বসিয়া গোবিন্দ সংবাদ পাইল, শিশুটি সেই যে আঁৎকাইয়া উঠিয়াছিল তাহাতেই জ্বর হইয়া সেইদিনই রাত্রে মারা গিয়াছে। একটা প্রচ্ছন্ন বেদনায় গোবিন্দের মন বিপর্য্যস্ত হইয়া উঠিল। ছিনাইয়া আনিবার পর হইতে তাহার পরম-ক্লিন্ন মনে কমলার বেদনার্ত্ত বিহ্বল মূর্ত্তিটি নিরন্তর জাগিয়া থাকিয়া তাহাকে উদ্ভ্রান্ত করিয়া রাখিয়াছিল। নানা কার্য্যে রত থাকিয়া সে বৃথা নিজেকে ভুলাইতে চেষ্টা করিতেছিল। একবার স্থির করিয়াছি গোপনে নৃত্য বোষ্টমীকে মাসে মাসে কিছু অর্থ সাহায্য করিবে যাহাতে শিশুটির ভরণপোষণের কোনও কষ্ট না হয়।

সপ্তমী অষ্টমী এ দুই দিনের মধ্যে বাড়ী ফিরিয়া কমলাকে দেখা দিতে গোবিন্দ সাহস পাইল না। নবমীর দিন রাত্রে সে এক সময়ে আসিয়া ঘরে শুইয়া পড়িল। রাত্রে কি একটা দুঃস্বপ্ন দেখিয়া তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। মনে হইল কমলার তপ্তশ্বাস তাহার গায়ে লাগিতেছে; কিন্তু ফিরিয়া দেখিবার সাহস হইল না।

তখন চৌধুরী বাড়ীর নহবৎখানা হইতে শানাইয়ের গানে বিসর্জ্জনের রাগিণী গাহিতেছিল—

"আমার প্রাণের গৌরী তোরে কে হ'রে নিল।"

সোশ্যালিজম্

শ্রীশচীন সেন

বৎসর গুণে দেখ্‌তে গেলে সোশ্যালিজম্-এর বয়স এক শ বৎসরও হয়নি, বিশেষতঃ আমাদের দেশে ওটা আধুনিক আমদানি। কিন্তু যখন আমাদের দেশে নেতা বা অভিনেতা সবাই ওই বুলি আওড়াচ্ছেন তখন বুঝতে হবে ওটা স্বাভাবিক নয়—পশ্চিম হ'তে কোন নজীর পাওয়া গেছে। উন্মাদনা যখন আসে তখনই বুঝতে হবে ওটা ধার করা জিনিষ; কারণ উন্মাদ হওয়া ভারতের স্বভাবধর্ম্ম নয়। হিন্দু-সম্মেলন, যুব-সম্মেলন বা রাষ্ট্র-সম্মেলন—সব জায়গায়ই সোশ্যালিজম্‌এর জয়ধ্বনি। বক্তৃতা জোর গলায় চলে, মানুষ ক্ষেপে ওঠে। বক্তৃতায় যদি মানুষ না ক্ষেপল তা হ'লে বক্তৃতা দিয়ে লাভ কি। আর ক্ষিপ্ত অবস্থার সঙ্গে নির্ব্বাণ অবস্থার কোন প্রভেদ নেই, কারণ ওই দুই অবস্থায়ই ভালমন্দ বিচার করবার বুদ্ধি থাকে না।

সোশ্যালিজম্‌এর জয় হোক্ আপত্তি নেই; কিন্তু কথা দাঁড়াচ্ছে এই যে, ভারতের সঙ্গে সোশ্যালিজম্‌এর কোন রফা হওয়া সম্ভব কি না, এবং সম্ভব হ'লেও সেটা হিতকর কি না। হিতকর কথা সভয়ে বল্‌ছি, কারণ হিত বা মঙ্গলকে অগ্রাহ্য ক'রে সোশ্যালিজম্‌এর উৎপত্তি। সোশ্যালিজম্‌এর জয় গতিতে, যতিতে নয়। তার পুষ্টি আস্ফালনে, সৃষ্টিতে নয়। শুধু এই কথাটি বল্‌বার জন্যই এই প্রবন্ধের অবতারণা। আজ এই কথাটা বল্‌বার দরকার হয়েছে, কারণ এটা বিশেষ লক্ষ্য ক'রে দেখেছি যে, যার গলায় সোশ্যালিজম্‌এর জয়ধ্বনি হয় তার মগজে সোশ্যালিজম্ প্রবেশ করে না। মগজে যখন ধরা পড়ে না, চীৎকার তখনই বাড়ে এবং মানুষ তখনই ক্ষেপে ওঠে। এই সহজ জাতীয়তায় নেতাদের লাভ হ'তে পারে, কিন্তু দেশের এতে ক্ষতি। দেশের দিকে না তাকিয়ে স্বাদেশিকতা করা বোধ হয় শুধু আমাদের দেশেই সম্ভব।

সোশ্যালিজম্ জিনিষটা কি? সেদিন এক সভায় শুন্‌ছিলাম যে, মজুর নেতারা বল্‌ছেন উপনিষদে সোশ্যালিজম্ আছে—অশোক, যীশু, বুদ্ধ সবাই সোশিয়ালিষ্ট; অতএব কে বলে সোশ্যালিজম্ হেয়। কিন্তু সমস্যা এই যে, সব ধর্ম্ম-গ্রন্থ সোশ্যালিজম্ প্রচার করে না,—সব বড় লোক সোশিয়ালিষ্ট নয়। সোশিয়ালিষ্ট না হ'য়েও পরের উপকার করা যায়—অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়ান যায়।

"এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে
দিতে হবে ভাষা; এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা; ডাকিয়া বলিতে হবে—
মুহূর্ত্তে তুলিয়া শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে
যার ভয়ে তুমি ভীত, সে অন্যায় ভীরু তোমা চেয়ে,
যখনি জানিবে তুমি তখনি সে পলাইবে ধেয়ে।"

(রবীন্দ্রনাথ)

এই "গর্ব্বান্ধ নিষ্ঠুর অত্যাচারের" বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ যে বাণী প্রচার ক'রে গেছেন, তাতে সোশ্যালিজম্‌এর রং নেই। মজুরকে ভাল মাইনে দিতে হবে—ঘর বাড়ী আলো বাতাস সব দিতে হবে -তার সমর্থন করাকে সোশ্যালিজম্ বলে না। যিনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে বদ্ধপরিকর হন তিনিই সোশিয়ালিষ্ট—তার কোন মানে নেই। Socialism আর Humanity এক বস্তু নয়—তাদের জাতি, গোত্র, রাশি সবই বিভিন্ন। Socialism হ'ল মানুষের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা—উহার ব্যবসা কাঞ্চনকে নিয়ে। আর্থিক অসামঞ্জস্যকে দূর করা তার ধর্ম্ম—এই Marxএর প্রথম কথা আর Leninএর শেষ কথা।

সোশিয়ালিষ্টদের রাগ এবং ক্ষোভ সম্পত্তির ওপর। কারণ এই দুনিয়ায় সমস্ত অন্যায়ের গোড়ার কথা হ'ল Property ও Poverty। অতএব দারিদ্র্যকে নির্ব্বাসন করতে হ'লে সম্পত্তিকে নির্ব্বাসন দেওয়া চাই। তাই প্রথম দফা হ'ল—দারিদ্র্য ও সম্পত্তি এই দুয়ের নিষ্পত্তি

করবার ভার নেবে State। সম্পত্তি কাড়তে হলে জমিদার রাগ করবে—অতএব দ্বিতীয় দফা হ'ল—Class war। এই যুদ্ধ নৈতিক নয়—অর্থনৈতিক, অতএব তৃতীয় দফা হল Revolutionary। তাই সোশিয়ালিজম্ প্রচার করতে হ'লে আমাদের ভাবতে হবে যে, এই তিন দফাতেই আমরা রাজী কি না।

আজ চতুর্দ্দিকে যে ইসারা চলেছে যে, জমিদারকে পিষে ফেল, টাকা কেড়ে নেও, বিদ্রোহের আগুন জ্বেলে দাও মজুর ও রায়তের জন্য—আজ দেখতে হবে এর পিছনে কি আছে—শুধু কি চিত্তহীনতা বা অসন্তোষ,—না, এর পিছনে আছে সত্যিকারের জাগ্রত দেবতার দাবী? একথা আজ মেনে নিতেই হবে যে, গুণ্ডামি দ্বারা কিছু লাভ করা যায় না—হাত পা ছুঁড়্লেই অসামঞ্জস্য দূর হয় না। হিষ্টিরিয়াতে নতুন হিষ্ট্রির সৃষ্টি হয় না। কাঞ্চন-বণ্টনের চেয়ে কাঞ্চন বাড়ানো ঢের শ্রেয়। ধ্বংসলীলায় তাণ্ডব নৃত্য হয়—সৃজনলীলায় মঙ্গলশঙ্খ বেজে ওঠে। বেদনা সৃষ্টিকে পুষ্ট করে বটে, কিন্তু বেদনার ভাণ সৃষ্টিকে নষ্ট করে। চিত্ত-বেদনা আর বিত্ত-বেদনা ত এক নয়।

জমিদারদের ওপর জনসাধারণের এই অভিমান—এটা অবশ্য নতুন কথা নয়। প্লেটোর আমল থেকে ফরাসী বিদ্রোহ পর্য্যন্ত বহু লেখক ও ভাবুক জমিদারদের উপর অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন—কিন্তু সেটা ন্যায়ের দিক দিয়ে। ফরাসী-বিদ্রোহের সময় জমিদারদের উপর যথেষ্ট আক্রমণ হয়েছিল এবং Class warও ছিল, কিন্তু তা ছিল রাজনৈতিক,—অর্থনৈতিক নয়। অর্থনৈতিক দিক্ দিয়ে সম্পত্তি আক্রমণ করার জন্য দায়ী প্রথম Saint Simon। কিন্তু তিনি সমাজকে ঔষধ বাতলে দিলেন Collectivism। তারপর এলেন Robert Owen। কিন্তু তিনি বল্লেন -Co-operation। তারপর Louis Blanc। তিনি সংস্কারের ভার দিলেন Stateএর উপর (State-socialism)। তারপর এলেন Proudhen। তিনি বলেন—Property is theft; অতএব কর বিদ্রোহ আর বিদ্রোহই বা কি—শুধু জমিদারদের অন্যায় আইনের বিরুদ্ধে দাঁড়ান। অতএব জগতের সমস্ত মূক ব্যথাকে মুখর করতে হবে বিদ্রোহ ক'রে। তারপর Marx। তিনি প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন করলেন—সোশ্যালিজম্—অর্থাৎ মজুরদের জাগাও, সম্পত্তি হরণ কর, রাষ্ট্রের হাতে বণ্টনের ভার দাও, দরকার হ'লে বিদ্রোহ কর, সমস্ত জনসাধারণকে এক করতে হবে। Profit আর Rentই সব নয়—শ্রমের উচিত মূল্য দিতে হবে। সমাজের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা এবং তার উপর নতুন সমাজের পত্তন। অতএব Karl Marx সোশ্যালিজম্‌এর পিতা না হ'লেও অন্ততঃ ভর্ত্তা। এবং এই সোশ্যালিজম্‌এর ঝরণা থেকে বেরিয়ে এল কম্যুনিজম, এনার্কিজম, ফেবিয়ানিজম্, সিণ্ডিকালিজম, ট্রেডইউনিয়নিজম্, বলসেভিজম ও সলিডারিজম। সত্যি কথা বল্‌তে কি, কেপিটালিজমএর সহোদর ভাই ফ্যাসিজম এবং বৈমাত্রেয় ভাই সোশ্যালিজম; কারণ যাকে State-socialism বলা হয় তাকে অন্য ভাষায় State-capitalismও বলা যায়। Capitalism সমাজের ওষ্ঠে পৃষ্ঠে। যে মীমাংসাই করা যায় তা হয় Capitalismএর কায়া অথবা ছায়া। কায়ার চেয়ে ছায়াই যে মারাত্মক—তা বোধ হয় কেউ অস্বীকার করবেন না।

অতএব সোশ্যালিজম্ চালাতে হ'লে প্রথম চাই সংঘবদ্ধ হওয়া এবং এই সংঘবদ্ধ হবার মালমশলা হ'ল—লোভ, ক্রোধ হিংসা, অবিশ্বাস ও অধৈর্য্য। জমির স্বামিত্ব থেকে জমিদারকে বঞ্চিত কর্‌তে হবে—এই divorce আন্‌তে পারলে অসামঞ্জস্য যেতে পারে কিন্তু অশান্তি এসে পড়বে। এই অশান্তির জন্য যাঁরা দায়ী হবেন—সত্যিকারের অশান্তি হ'ল তাঁদের। যে সংঘ মানুষকে ঘৃণা করতে শেখায়, মানুষকে অবিশ্বাস করতে শেখায়, সে অন্যায়ের ভারে নিজেই মারা যাবে। যে অবিচার Capitalist করছে—সে অবিচারের প্রতিকার মজুরের ক্রোধান্ধ অন্যায় আস্ফালন নয়। বাঁ হাতের ব্যথা ডান হাতে গেলে শরীরকে ব্যাধিমুক্ত বলা যায় না। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বল্‌তে হয়;—

"যেন জবরদস্তির দ্বারা পাপ যায়, যেন অন্ধকারকে লাঠি মারলে সে মরে। এ কেমন, যেন বৌয়ের দল বল্‌চে, শাশুড়িগুলোকে গুণ্ডা লাগিয়ে গঙ্গা যাত্রা করাও—তাহ'লেই বধূরা নিরাপদ হবে। ভুলে যায় যে মরা শাশুড়ির

সেন

ভূত ঘাড়ে চেপে তাদের শাশুড়িতর শাশুড়িতম ক'রে তুলতে দেরী করে না।"

যেটা সোজা পথ সেটা সব সময়ে শ্রেষ্ঠ পথ নয়; জনসাধারণের মুক্তির পাথেয় গুণ্ডামি দ্বারা নির্জমিদার ক'রে দেওয়া নয়। গুণ্ডামি যে শ্রেষ্ঠ নয় তার প্রমাণ—মোছোবাজারের বহু বাসিন্দা হাজতে আছে শুনা গেছে—মুক্তি লাভ করেছে ব'লে জানা যায়নি। মানবজাতির ওপর শ্রদ্ধা আছে ব'লেই আমার বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না যে, এই বিরাট মানবজাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করবে জনসাধারণের ওপর। যিনি যথার্থই বুদ্ধ মুক্তির বাণীর প্রচার করবার অধিকারী তিনি—মথিত বা ব্যথিত মজুরগণ নয়। এটা একটা জীবনের ট্রেজেডি যে, ব্যথার ব্যথী তিনি নন যিনি ব্যথার বোঝা বইছেন; জীবনে যারা অকৃতকার্য্য, কৃতকার্য্য হবার পথ যদি তাঁরা দেখাতে আসেন—তাঁদের জন্য সমবেদনা দেখাতে পারি, কিন্তু বাহাবা দেবার কিছু নেই। তাই Wells বলেছেন, "The path of human progress can never lie in crowd psychology."

২

আজ পশ্চিমকে দেখে আমাদের ভুললেও চলবে না, টললেও চলবে না। যা বৃহৎ তা মহৎ নয়। পশ্চিম আজ নিজের ভারে চল্‌তে পারছে না মত্ত অবস্থায় চার পাশে হাতড়ে বেড়াচ্ছে, কোথায় শান্তি পাবে। তাই আজ সে সোশ্যালিজম্ করছে, কাল ফ্যাসিজম করছে। মনে যার শান্তি নেই—বাইরের জবরদস্তিতে সে শান্তি কি ক'রে পাবে। ধ্বংসের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দৌড়ে যাচ্ছে—থামবার তার শক্তি নেই। সূর্য্যের প্রখরতা যার ভাল লাগে, চন্দ্রের স্নিগ্ধতা সে ভোগ করবে কি ক'রে। পশ্চিম আজ তাই শক্তিমান, কিন্তু স্বাধীনতা আজ সে হারিয়ে বসেছে; সংঘের বেড়াজালে আবদ্ধ।

তাই প্রশ্ন দাঁড়াচ্ছে, সোশ্যালিজম্ এর সঙ্গে রফা করার অর্থ হ'ল বিরোধ ও সংঘর্ষের সঙ্গে মিতালি করা কি না। কিন্তু ভারতের একটা নিজস্ব ধর্ম্ম আছে—আমি Mission অর্থে বলছি না। আজকাল নাস্তিক জগতে Mission কথাটা উপহাসের জিনিষ। আমি বলছি Traditionএর কথা, যা বৈজ্ঞানিক যুগেও লোকে মানে। আমাদের Traditionটা প্রথম জানতে হবে, তার পরে মান্‌তে হবে। এতে দুঃখ করবার নেই, এতে গর্ব্ব করবারও নেই। আমাদের ইতিহাস, দর্শন, কাব্য ইত্যাদি যদি একটা বিশেষ পথে এগিয়ে থাকে তাতে লজ্জার কিছু নেই—সেটাকে মেনে নেওয়ার চেয়ে জেনে নেওয়াটা দরকার বেশী আমরা জানি মানুষ শুধু food seeking machine নয় তার ক্ষুধাও যেমন আছে, মনও তেমন আছে।

মানুষ যখন পূর্ণ তখন সে সুন্দর, তখন সে শক্তিমান নয়। শক্তির প্রয়োজন আছে, অতএব সে কাম্য। শক্তির অন্ধতা আছে, অতএব শক্তির অসংযমকে সংহত করতে হবে। কিন্তু শ্রী, সৌন্দর্য্য, পূর্ণতা মানুষ প্রচুর পরিমাণে গ্রহণ করতে পারে।

আমরা সমাজে বিরোধকে কখনও স্থান দিইনি, শৃঙ্খলাকেই বরণ করে নিয়েছি। আমরা harmonyকে সব চেয়ে বড় স্থান দিয়েছি, পশ্চিমের মত জবরদস্তি ক'রে বহুকে এক করবার প্রচেষ্টা আমরা করিনি। আমরা বৈচিত্র্যকে স্থান দিয়েছি, অথচ বিরোধ তাতে বাড়েনি। আমাদের বর্ণবিভাগের ভিতরও সেই harmony রক্ষা করবার চেষ্টা দেখ্‌তে পাওয়া যায়। আমাদের দেশে ছত্রিশ জাতি আছে বটে, কিন্তু তাদের ভিতরেও একটি যোগসূত্র আছে যাতে বিরোধ ও সংঘর্ষকে বাধা দিয়েছে। আজকাল সেই বর্ণবিভাগের বিকৃত মূর্ত্তি দেখে পূর্ব্বপুরুষদের উদ্দেশ্য ভুলে যাওয়া ঠিক নয়। অন্ততঃ Patrician আর Plebian এর বিরোধ আমাদের দেশে হয়নি। কারণ মানুষের শ্রেষ্ঠ পরিচয় মনুষ্যত্ব সে কথা আমরা কখনো অস্বীকার করিনি;—যখনি করেছি শাস্তি আমরা তখনি পেয়েছি। কত বিদেশী এসে আমাদের সমাজের দ্বারে উপস্থিত হল—আমরা কখনো তাদের ধ্বংস করতে চেষ্টা করিনি; তাদের আদরে স্থান দিয়েছি—সমাজের পরিধি বেড়েছে, কিন্তু শৃঙ্খলা নষ্ট হয় নি। কত ধর্ম্ম এসে ঘা দিল, কিন্তু Thirty years' war আমাদের দেশে হয়নি।

পরকে স্থান দিয়েছি, তবুও বিরোধ ও সংঘর্ষের যূপকাষ্ঠে সমাজের শৃঙ্খলা আমরা বলি দিই নি, নম্রভাবে, শ্রদ্ধার সহিত আমরা আমাদের জীবন কাটিয়েছি। আজকেও যদি আমাদের সমাজে নতুন কোন সমস্যা এসে উপস্থিত হ'য়ে থাকে সেই সমস্যার সমাধান করতে যেন আমরা মনুষ্যত্ব না হারাই, শৃঙ্খলাকে যেন নষ্ট না করি। বিরোধ যেন আমাদের পরস্পরের সম্বন্ধকে অস্পষ্ট না ক'রে দেয়, শক্তির অসংযত চেষ্টা যেন আমাদের জীবনের শ্রীকে কুৎসিত না করে।

যাক্‌গে, আমরা শৃঙ্খলাও যেমন নষ্ট করিনি তেমনি শৃঙ্খলা-রক্ষার ভার আমরা ষ্টেটের ওপর দিইনি। আমাদের সমাজ নিজেকে নিজে রক্ষা করেছে, তার পরমুখাপেক্ষী হ'য়ে থাকতে হয়নি। আমরা নিজেরা ব্যস্ত থাক্‌তাম নিজেদের ঘরবাড়ী, ঘাট, মাঠ, বাট, মন্দির, বিদ্যালয়, গ্রাম নিয়ে; কত রাজা আসত, রাজত্ব গড়ত, আবার স'রে যেত; অস্ত্রের ঝন্‌ঝন্ শব্দ আমাদের সমাজ পর্যান্ত পৌঁছাত না; রাজনীতির কুটিল চক্র আমাদের সমাজকে বক্র কর্‌তে পারত না। আমাদের সমাজ ছিল পূর্ণ, তার স্বকীয় সমস্যার মীমাংসা সে নিজেই করত। আজ রাষ্ট্রের হাতে গোষ্ঠীর ভার তুলে দিলে সুবিধে কি হবে বুঝতে পারিনে। সামাজিক বা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এরূপভাবে সংকীর্ণ ক'রে ফেল্‌লে তা কি ধনীর অত্যাচারের চেয়েও দুর্ব্বিষহ হবে না? জবরদস্তিই যদি সইতে হয় তা হ'লে আর এত হাঙ্গামা কেন? মোট কথা, নির্জমিদার কর্‌লেই অবথা রাষ্ট্রের হাতে সংস্কারের ভার দিলেই millennium আসবে না। নিজেদের উন্নতি নিজেদের হাতে—নিজেদের শান্তি নিজেদের মনে। এই হাত ও মন পরের কাঁধে ফেলে রাখলে উন্নতিও হবে না শান্তিও পাব না। যা হবে বা পাওয়া যাবে তার জন্য সোশ্যালিজম্ প্রচার করা অশোভন হবে। পায়ে কুড়াল মেরে গাছে ওঠবার চেষ্টা করলে গাছে ওঠা সহজ হয় না। এর জন্য দায়ী গাছও নয়, বিধাতাও নন্; সম্পূর্ণ দোষী নিজে—দোষের ভাগী কুড়াল।

তাই বল্‌ছিলাম, সমাজ যদি নিজেকে বাঁচাতে না শেখে তা হ'লে সমাজ বাঁচবে না। তাই সোশ্যালিজম্ বল, আর যে কোন "ইজম"ই বল—রোগ নিজেদের ভিতরে—বাইরের ষ্টেটই বা কি করবে, আর ট্রেডইউনিয়নিজমই বা কি করবে। তাই রবিবাবুর কথা মনে পড়ে—

"আসল কথা, যে মানুষ নিজেকে বাঁচাতে জানে না কোন আইন তাকে বাঁচাতে পারে না; নিজেকে এই যে বাঁচানর শক্তি, তা জীবনযাত্রার সমগ্রতার মধ্যে, কোন একটা খাপছাড়া প্রণালীতে নয়।"

আর এক কথা। Non-industrial দেশে সোশ্যালিজম্ ইত্যাদি ঠিক জমে না, আমাদের শ্যামল শস্যক্ষেত্রে দরকার কৃষকের লাঙল, তাদের "রেড শার্ট" নয়। আর য়ুরোপের মত industrial করবার ইচ্ছে থাক্‌লেও যে আমাদের দেশ industrial হবে, তা মনে হয় না। শুধু উপসর্গ বাড়িয়েই বা লাভ কি। আমাদের অভাব অভিযোগ ত যথেষ্ট। গোঁয়ার্ত্তুমিদ্বারা মানুষকে আঘাত করা যায়—কিন্তু ব্যাধি যখন মনে—তার শরীরকে আঘাত ক'রে লাভ কি।

আর আমাদের মজুর বা রায়ত—তাদের দিয়ে সোশ্যালিজম কর্‌তে হ'লে—বহুদিন অপেক্ষা করতে হবে। এই অবস্থায় তাদেরকে টেনে হিঁচ্‌ড়ে বাইরে না এনে—তাদের উন্নতির ব্যবস্থা করা দরকার। শিক্ষা তাদের পক্ষে দরকার—দীক্ষা নয়। আমাদের নেতারা বন্দোবস্ত কর্‌ছেন তাদের দীক্ষা দেবার জন্য—শিক্ষা দেবার কথাটি নেই। ভয় হয় পাছে তারা দাসত্বসম্বন্ধে সজ্ঞান হ'য়ে নেতাদেরই হুম্‌কি অমান্য করে। আমাদের নেতাদের কান্নার ইতিহাস হ'ল—চাষী যাতে জমিদারের কবল থেকে তাদের কবলে এসে পড়ে—শ্রমিক যাতে শ্রম ছেড়ে তাদের আদেশ পালন করবার জন্য প্রস্তুত থাকে। রায়ত ও শ্রমিকের এই হস্তান্তরে তাদের কিছু সুবিধে হবে ব'লে ত মনে হয় না।

মোটকথা, সোশ্যালিজম আমাদের রক্তে নেই—ধাতে সয় না—মগজে ধরা পড়ে না—আর মনে বাসা বাঁধতে পারেনি। তাই ফাঁকা আওয়াজ শোনা যায়। তাই দেখ্‌তে পাই, যে সভায় সোশ্যালিজম পাশ হ'য়ে যায়—

শ্রীশচীন সেন

সেই সভায়ই বাল্যবিবাহ নিয়ে তুমুল বাক্‌বিতণ্ডা হয়। যে যুব-সম্মেলনে সোশ্যালিজম সম্বন্ধে সবাই একমত—সেই সম্মেলনই আবার অসবর্ণ বিবাহে আপত্তি তোলে। তাই মনে হয়—সোশ্যালিজমকে আমরা গ্রহণ করতে প্রস্তুত নই—অথবা সোশ্যালিজম্‌এর অর্থ আমাদের বোধগম্য হয় নি।

আজ আমি শুধু এই কথাটিই বল্‌তে চাই যে, আমাদের সমস্যা দেশকে নিজমিদার বা নির্ধনী করা নয়। গোঁয়ার্ত্তুমিদ্বারা সত্যিকারের কোন মীমাংসা হয় না। ভারতকে মঙ্গলের পথে চালাতে হ'লে—গোড়াতেই অমঙ্গলকে ডেকে লাভ নেই। মাংসপেশীর বিকৃত প্রকাশ শক্তির পরিচয় দেয় না। দেশোদ্ধার করতে হ'লে দেশের প্রাণীকে ভালবাসতে হবে। ভালবাসা যেমন নিতে চায়—তেমনি দিতেও চায়। এই ভালবাসার শত্রু হ'ল—লোভ ও ক্রোধ; এবং যে প্রণালী লোভ ও ক্রোধকে নষ্ট করতে সহায়তা করবে না—সেই প্রণালী সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়। আমাকে ভুল বুঝবার অধিকার পাঠকদের আছে, কিন্তু দেশকে ভুলপথে চালাবার অধিকার কারো নেই। সেই অনধিকারের কথা স্মরণ করিয়ে দেবার জন্যই আজকের এই প্রবন্ধ।

গান

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার

মেঘে মেঘে বেড়ে গেল অনেক বেলা।
ভুলে ভুলে হ'ল কাজের কাজে হেলা।
জাগে দূরের পথের সাড়া, তবু লাগে কাজের তাড়া;
কুড়িয়ে চলি, আছে যা'-যা' ছড়িয়ে ফেলা।
হাত চালাতে হাতে লাগে, সারতে হবে সাঁঝের আগে;
শেষের খেপে হ'বে কি সে বেগার ঠেলা!
দূরের দেশের কাজের তরে যেতে কি গো হ'বে পরে?
ঐযে বুঝি আস্‌ছে মাঝি সাজিয়ে ভেলা।

তাজমহল

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

ক

ক, খ, গ, ঘ, ঙ; বি, এল, এ ব্লে; সি, এল, এ, ক্লে; প্রভৃতি সমবেত পাঠাভ্যাস-ধ্বনি বিহঙ্গ-কূজনের মত সন্ধ্যা-সমাগম জানাচ্ছে। পাশের ঘরে তখন শেফালি কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলিয়ে বালিশে মুখ গুঁজে প'ড়ে আছে। তার মা ও ছাই গল্প-উপন্যাস প'ড়ে চোখের জল ফেল্‌তে এত বারণ করেছেন কিন্তু শেফালি কিছুতেই শোনে নি। তার মা সেকেলে মেয়ে, তিনি আর কেমন ক'রে বুঝবেন যে আনন্দ জিনিষটা হাসিরই একচেটে নয়—কান্নার ভিতরও আনন্দ পাওয়া যায়।

হঠাৎ ছেলেদের অশ্রান্ত একঘেয়ে পাঠাভ্যাস থেমে যেয়ে শেফালির মাষ্টার মশায় আমার কথা জানিয়ে দিল। শেফালি তাড়াতাড়ি ঝিকে চা নিয়ে আস্‌তে ব'লে মাষ্টার মশায়ের কাছে গেল।

মাষ্টার মণীন্দ্র বাবু শেফালির দিকে চেয়ে আশ্চর্য্য হ'য়ে বললেন, 'তোমার অসুখ করেছে শেফালি? চোখ দুটো অত রাঙা হ'য়েছে কেন?'

শেফালি বিনয়ের সঙ্গে বলল, 'না না অসুখ করেনি।—পত্রিকায় একটি গল্প প'ড়ে চোখের জল আর সাম্‌লাতে পারি নি।'

'নাঃ, লেখকগুলোও যেমন লেখে। কাঁদবি নিজেরা কাঁদ, না দেশশুদ্ধ লোক কাঁদায়, আর সম্পাদকগুলো—'

'আপনি বীরেন মুখার্জ্জির গল্প পড়েন নি বোধ হয়, খুব সুন্দর লেখেন। তার লেখা প'ড়ে কাঁদতে আমার খুব ভাল লাগে।'

'গল্পটা কার লেখা?'

'বীরেন মুখার্জ্জির।'

'আচ্ছা হতভাগাকে আমি এরকম গল্প লিখ্‌তে বারণ করবো। পড়া নেই, শোনা নেই, কেবল সাহিত্যচর্চ্চা!'

শেফালি ব্যস্তসমস্ত হ'য়ে বললে, 'বীরেন বাবুকে চেনেন নাকি?'

'ও লক্ষ্মীছাড়াটা আমার ভাই, তাকে আচ্ছা ক'রে ব'কে দেব এখন যাতে আর অমন গল্প না লেখে।'

শেফালি ভাবলে যার সঙ্গে পরিচিত হওয়া দুরাকাঙ্ক্ষা ব'লে মনে হয়েছে, তা'ত নেহাত দুরাকাঙ্ক্ষা নয়। মণীন্দ্রবাবু পড়াতে লাগ্‌লেন, কিন্তু শেফালি তার কিছুই বুঝলে না।

শেফালি ক্লাসে একদিকে যেমন সাহিত্যে খুব নম্বর পেত, অন্যদিকে অসরস বিষয়গুলিতে মোটেই নম্বর পেত না। সাহিত্যের অনুরাগ তার সবুজ স্বচ্ছ মনকে কাব্যের সুকুমারী নায়িকার মত ক'রেই গ'ড়ে তুলেছিল।

মণীন্দ্রবাবু পড়া শেষ ক'রে ব'ললেন, 'ছাখ শেফালি, কাল পরশু দুদিন আমি আর আস্‌তে পারবো না, বিশেষ দরকার একটু বাড়ী যেতেই হবে।'

শেফালি বললে, 'তা আর একজনকে সাবষ্টিটিউট্‌ দিয়ে যান্‌।'

'কোথায় পাই শেফালি, আমার বাড়ী যাওয়া তা হ'লে—

'শুনেছি আপনার ভাই নাকি বি, এ, পাশ, এম, এ, পড়ছেন, তাঁকে—'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমিই সত্যিই বুদ্ধিমতী, কিন্তু সে ছেলেমানুষ সে কি পড়াতে পারবে?'

'তা পারবেন বৈ কি?'—

মণীন্দ্রবাবু হেসে বললেন, 'তা হ'লে তাই ঠিক রইল মা, বীরুকে কাল পাঠিয়ে দেব।'

খ

শেফালি হঠাৎ সেদিন খুব বেশী রকম প্রসাধন সুরু করলে। বিকেলে গা ধুয়ে নিখুঁত ভাবে বেশ ভূষা ক'রে বীরেনের প্রতীক্ষায় ব'সে থাক্‌লো।

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

অন্যমনস্ক হ'য়ে দোতালার জানলা দিয়ে সে রাস্তার লোক দেখতে লাগ্‌লো।

ময়লা ছেঁড়া একটা সার্ট, চার পাঁচ দিনের সঞ্চিত দাড়ি, গোড়ালি-হীন চটি নিয়ে বীরেন পটাস্‌ পটাস্‌ করতে করতে এসে ছাত্রীটির আগমনের প্রতীক্ষায় ব'সে ছিল। চা হাতে ক'রে যখন শেফালি ঘরে প্রবেশ করলো বীরেন তখন দেখতে পায় নি। কাপ প্লেটে ঠোকাঠুকির শব্দে সজাগ হ'য়ে চেয়ে দেখলে—শেফালি দোকানঘরের মত দেহখানি সাজিয়ে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে চেয়েছে, অথবা তাদের অর্থ-স্বচ্ছলতা।

শেফালি হেসে বললো, 'বীরেন বাবু, আপনার অনেক লেখা আমি পড়েছি, আপনার লেখা আমার খুব পছন্দ হয়।'

বীরেন হেসে বললে, 'আমার লেখা পছন্দ হয় এমন একজন পাঠিকার সন্ধান পেয়ে বাস্তবিকই সুখী হলুম।—আচ্ছা তা এখন একটু কাজ হোক। আর ওই চা'টা আমি খাইনে, ওটা আর কাউকে দিয়ে দিন।'

'চা খান না?'

'যারা ভাত পায় না, তারা চা খাবে কোত্থেকে?'

শেফালির মাথাটা লজ্জায় নীচু হ'য়ে গেল। তার সযত্ন প্রসাধন, মূল্যবান বেশভূষা যেন একটা বিড়ম্বনা হ'য়ে উঠ্‌লো। এই সোজা সরল অকপট লোকটির সাম্‌নে এই দোকানদারি শেফালির কাছে অর্থহীন উপহাসের মতই অসহ্য হ'য়ে উঠ্‌লো।

শেফালি আব্দার ক'রে বললে, 'আজ আর না হয় পড়াটা নাই হ'ল, আপনার সঙ্গে একটু সাহিত্যালোচনা করা যাক্‌—'

'প্রথমত, পড়াটা না করলে কর্ত্তব্যের ত্রুটি থেকে যাবে; দ্বিতীয়ত, সাহিত্যে আমার এত জ্ঞান নেই যে তা নিয়ে আলোচনা করা চলে।'

শেফালি একটু সাম্‌লে নিয়ে জোর ক'রেই বললে, 'আপনার 'ব্যক্তি' গল্পটার নায়িকার চরিত্রে আপনি মেয়েদের মনটাকে বড়ই ছোট ক'রে দেখিয়েছেন।'

'ওই নায়িকাটির ভিতরেই ত আর সমস্ত নারীজাতটিকে পোরা হয়নি। দু-একটা মেয়ে কি ও রকম থাকতে নেই?'

শেফালি চেয়ে চেয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌লো এই লোকটির বুকের জমাট কান্না বাংলার সমস্ত পাঠক পাঠিকারা এক-সঙ্গে মিলেও কেঁদে ফুরোতে পারে নি!

তার ঐশ্বর্য্যের উজ্জ্বলতায় যাকে মুগ্ধ করবার জন্য এত করেছে তার পায়ের নীচে শ্রদ্ধার অঞ্জলি দিতে সহসা শেফালি উন্মুখ হ'য়ে পড়লো।

গ

শেফালি সেদিন মণীন্দ্রবাবুর কাছে বায়না ধ'রলে, 'আপনাদের বাড়ীর মেয়েছেলে রাতদিন কেমন করে কাটায়—তাদের জীবনের বৈচিত্র্য কতখানি!'

মণীন্দ্রবাবু হেসে ব'ললেন, 'ত্যাখ মা, তা শুন্‌লে মনে করবে যে তোমার এই মাষ্টার মশায়রা কুলিমজুরের জাত—সে শুনে কাজ নেই! তাদের জীবন বড়ই দুর্ব্বহ।'

'তবু বলুন না শুনি।'

মণীন্দ্রবাবু ব'লতে লাগ্‌লেন, 'ধর সকালে উঠে রাতের বাসন মেজে ফেলে মেয়েদের ভাত রেঁধে দিয়ে তারপর দুপুরের রান্না। দুপুরে কাঁথা সেলাই—তারপর ধান ভানা...'

শেফালি ভাবলো ওই টুকুর ভিতরই ওদের জীবন আবদ্ধ, তার ভিতর থেকে স্বামীসেবা ক'রে নিজেকে ধন্য মনে করে।

শেফালি মনে মনে তুলনা ক'রে দেখে—ভালমন্দ বুঝে পায় না। পোকড়া আমের মত, কোনটার ভিতর পোকা আছে বুঝতে পারে না—দুটোই সমান লাল।

শেফালি আবার শোনে মেসের জীবন। সেই তিনতলা ডাল,—উপরে জল মাঝে একটু সার অংশ তলায় ছাঁকা ডাল চোখ মেলে থাকে!—বিকেলে কোনদিন খাওয়া জোটে, কোনো দিন জোটে না। অন্ধকার ঘর; মাথায় ছাদ ঠেকে যায়।

শেফালি ভাবে এদের আশা আছে কিন্তু উপায় নেই। আশা গেছে কিন্তু খোঁজার অভ্যাস যায় নি।—সারাদিন খেটে খেটে বৃথা শক্তিক্ষয় করে

ঘ

শেফালি কিছুতেই ছাড়বে না—রাঁধবেই। মা জিজ্ঞাসা করলো, 'তোর রান্না শেখবার কি দরকার—কোন দিন ত রাঁধতে হবে না।'

শেফালি উত্তর দিল, 'জীবনের অনেক কাজে লাগ্‌বে।'

নিজে নিজে বালতি ধ'রে টানাটানি করে। দেহখানাকে মাষ্টার মশায়ের বাড়ীর উপযোগী ক'রে নিতে চেষ্টা করে।

মোটা মিলের কাপড় প'রে থাকে।

মা জিজ্ঞাসা করেন, 'তোর কি হয়েছে? ও কাপড়গুলো কি করলো?'

শেফালি বলে, 'ও সব কাপড় তো এতদিন পরেছি, এসব কাপড় প'রে থাকা যায় কিনা দেখছি।'

শেফালির ভেলভেটের জুতোগুলোর ভিতর মাকড়সা বাসা করেছে। মা বলেন, 'শেফালি জুতো পায় দেওয়া ছেড়ে দিলি মা? তোর কি হয়েছে?'

শেফালি হেসে বলে, 'ওগুলো যেন আমার জন্যে নয় মা, বাংলার কয়টা লোক আর জুতো পরে!'

মা ভাবেন স্বদেশী আন্দোলনে মেয়ের মন বিগড়ে গেছে। এত অর্থ, ভোগ করে না দেখে মাতা ক্ষুব্ধা হন।

ঙ

শেফালির বাবা মাষ্টার মশায়কে ডেকে নিয়ে বললেন, 'মণীন্দ্রবাবু, আপনারা ত মুখুজ্যে, ভরদ্বাজ। বংশজ?'

মণীন্দ্রবাবু বললেন, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'তা হ'লে ত মণীন্দ্রবাবু, আপনাদের সঙ্গে আমাদের কাজ কর্ম্ম বাধে না। শেফালির সঙ্গে আপনার ভাই বীরেনের বিয়ে দিলে—'

'আজ্ঞে আমার বড়ই অন্যায়, ভাইটির বিয়ে এই জষ্টিমাস নাগাদ দেব বই কি?—আমার ততটা খেয়াল ছিল না।'

'আমার শেফালির সঙ্গে দিতে আপনার কি অমত আছে? বীরেন একদিন পড়াতে এসেছিল, আমার মনে হয় শেফালির—বুঝ্‌লেন কি না?'

'বীরু শেফালিকে অপমান করেছে, আজই তাকে তার উচিত শিক্ষা দেব।'

'সে কি? সে কি করলো? শেফালির সঙ্গে বীরুর বিয়ে দিতে আপনার মত নেই?'

'হেঁ হেঁ, ঠাট্টা করছেন কেন?'

'ঠাট্টা নয় মণীন্দ্রবাবু, আপনি যদি স্বীকৃত হন তা হ'লে সত্যিই শেফালির সঙ্গে বীরুর বিয়ে দিতে সংকল্প করেছি।'

মণীন্দ্রবাবু হাঁ ক'রে চেয়ে থেকে বললেন, 'আমরা ত গরীব। শেফালি মায়ের কি আর গ্রামের জল হাওয়া সইবে?'

'আমার যা আছে আমি তাতে নিজে বড়লোক থেকেও আর এক জনকে বড়লোক ক'রে দিতে পারি। আর দেখুন, সংসারে দেহের সুখ শান্তিই সব নয়, মন ব'লেও ত একটা জিনিষ আছে; তার উপরেও অনেক কথা নির্ভর করে।'

মণীন্দ্রবাবু উৎফুল্ল মুখে বললেন, 'আপনার যেদিন খুশী বলবেন বীরুকে বর সাজিয়ে নিয়ে আস্‌বো।'

'বীরুর মতামতটা—'

'তার আবার মতামত কি! আমার ভাই, আমি যখন বলবো তখন বিয়ে করবে। আমার কথা কোনদিন অবহেলা করেছে এমন ত মনে হয় না।'

শেফালির বাবা নিশ্চিন্ত হ'য়ে বল্‌লেন, 'আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।'

মণীন্দ্রবাবু উল্লাসে ছেঁড়া ছাতাটী সে বাড়ীতেই ফেলে চ'লে আস্‌লেন। বগলটা যে খালি হ'য়ে র'য়েছে তা দেখবার অবসর হ'ল না।

মণীন্দ্রবাবুর ভাঙ্গা ফাটল ধরা গৃহের একটি ঘরের পঙ্কোদ্ধার হ'য়েছে। নুতন ক'রে বালি কাজ, সিমেণ্ট ক'রে ঘরটিকে টেবিল চেয়ার আলমারী দিয়ে সাহেবী ধরনে সাজান হ'য়েছে। দালানের অপর অংশটীর নোনাধরা ইটগুলো তাদের পূর্ব্বকার জীর্ণ অবস্থা প্রকাশ ক'রে রইল।

তাজমহল

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

শেফালি প্রথম যেদিন শ্বশুরবাড়ী যাবার জন্যে প্রস্তুত হ'ল, সেদিন তার মা চোখের জলে ভাস্‌তে ভাস্‌তে বললেন, 'মা, তুমি কি আর গ্রামে থাক্‌তে পারবে? সুকিয়া ষ্ট্রীটের বাড়ীটায় ওদের এসে থাক্‌তে বলবো ভাব্‌চি।'

শেফালি সকাতরে বললে, 'তা হ'লে ত সবই পণ্ডশ্রম হ'ল মা। তার দরকার নেই।'

সে ইচ্ছে ক'রেই পল্লীর শান্ত আশ্রয়ের এক কোণে স্থান পাবার আশায় মণীন্দ্রবাবুর বাড়ীতে এসেছে। সব এয়ো মিলে সন্ধ্যার সময় শাঁখ বাজিয়ে নূতন বৌ বরণ ক'রে ঘরে তুলে নিলে।

নিস্তব্ধ নিঝুম রাত্রি।

পল্লীর সকলেই সুখতন্দ্রায় বিভোর। মাঝে মাঝে নিশাচর পাখীর একটু সজীবতায় বায়ুমণ্ডলে সাড়া পড়্‌ছে।

শেফালি বহুক্ষণ ঘুমিয়ে পড়েছিল। পায়ের উপর যে জ্যোৎস্না পড়েছিল এখন ধীরে ধীরে মুখের উপর এসে পড়েছে—তার স্ফুরিত মুখশ্রী মোমের পুতুলের মত শান্ত।

একটা ফোঁস্‌ ফোঁস্‌ শব্দ পেয়ে শেফালি হঠাৎ জেগে তাকাতে লাগ্‌লো—

বীরেন কাঁদছে—

বাঁ হাতের পিঠে চোখের জল মুচ্‌ছে, ডান হাতে কলম চলছে—

এই গভীর রাত অবধি বীরেন বই লিখ্‌ছিল।

শেফালি ভাবলে, 'এমনি কাঁদতে কাঁদতে বই লিখেই ত সকলকে কাঁদায়।...ওগো তুমি থাম, তোমার আর কাঁদতে হবে না।'

শেফালির চোখেও দু ফোঁটা জল দেখা দিল। সে উঠে বীরেনের হাতের কলম কেড়ে নিয়ে বললে, 'তোমাকে আর লিখ্‌তে হবে না। কেঁদে কেঁদে চোখ যে ফুলিয়ে ফেলেছ—তোমার—'

শেফালির গলার স্বর জড়িয়ে গেল। সে চোখে আঁচল দিয়ে ফিরে দাঁড়াল।

বীরেন চোখের জল মুছে বললে, 'তুমি আমাকে এমন ক'রে বাধা দিয়ে একটু ক্ষতি করলে শেফালি। তা হোক্‌-ও কি তুমি কাঁদছ!'

বীরেন তার হাত ধ'রে পাশের চেয়ারে বসিয়ে বললে, 'কাঁদ কেন, তুমি নেহাত ছেলেমানুষ।'

শেফালি বাদল-ভাঙা রোদের মত একটু হেসে বললে, 'তুমি কাঁদছিলে কেন?'

'ও এই কথা! আমি ত পরের কথা মনে ক'রে কেঁদেছি, আর তুমি কেঁদেছ আমার কান্না দেখে—বেশ যা হ'ক্‌।'

শেফালি হেসে বললে, 'তুমি কার জন্যে কেঁদেছ তা আমাকে ব'লতে হবে।'

'সে ত' কল্পনার লোক—'

'তা কি হয় কখনও?'

'তা-ও ঠিক বলতে পারিনে।'

'তবে একটা সত্যি মানুষের জন্যই কেঁদেছ বল।'

'সে কথা সত্যি হ'লে তুমিই ত সুখী হবে না শেফালি।'

'তা হ'ক তবু তুমি বল'

বীরু ব'লতে সুরু করলো, 'গ্যাখ, আমি যখন মেসে থাকতাম তখন আমার কেবলই কলম পেন্‌সিল হারিয়ে যেত এখন কিন্তু যায় না; তুমি সত্যিই বেশ গুছিয়ে রাখতে পার। আমার ঘরটি পরিষ্কার করতে করতে মনে হ'ত এটা কি আর পুরুষের কাজ, মেয়েদেরই সাজে—'

শেফালি বাধা দিয়ে বললে, 'না, ফাঁকি দিলে চল্‌বে না, তুমি বল।'

'রাত্তির অনেক হ'য়ে গেছে, চল শুয়ে পড়ি।'

'না, তুমি বল।'...

বীরু তখন সুরু করলে, 'এই গ্রামেরই একটি মেয়েকে আমি ভালবেসেছিলাম, তখন থার্ড ইয়ারে পড়তাম। সে কোন মেয়ে শুনবে? এই আজ দুপুরে যে খুব গল্প করছিল আমার সঙ্গে। ওর বিয়ে হয়েছে এই পাশের গাঁয়েই। এবার যে ট্র্যাজিডি টা লিখ্‌ছি সেটা একরকম আমার জীবনের ঘটনাই। কল্পনায় নিজের দুঃখে নিজেই কাঁদছিলাম।'

বীরেন হো হো ক'রে হেসে উঠ্‌লো। বললে, 'ভেবো না, এখনও ওই রকমই কাঁদি তার জন্যে।'

গম্ভীরভাবে বললে, 'তবে তুমি ছাড়া বোধ হয় আর কাউকে বিয়ে করলে ওই রকমই কাঁদ্তে হ'ত। সব মেয়েই যদি তোমার মত ভালবাস্তে পারতো—'

শেফালি ব'ললে, 'সাহিত্যিকদের খুব পসার হ'ত, না?'

মণীন্দ্র বাড়ী থেকে কলকাতা যাবার দিন সকলকে বার বার ক'রে ব'লে গিয়েছিলেন, 'তোমরা কেউ যদি বৌমাকে কুটোটা ভাগ করতে বলবে তা হ'লে আমার সঙ্গে বোঝা-পড়া আছে। বৌমা ত আর আমাদের মত হা-ঘরের মেয়ে নয়।'---আরও কতকি।

দুপুরে একখানা বই পড়তে পড়তে উন্মনা হ'য়ে শেফালি ভাবছিল, সে যেন চিড়িয়াখানার খাঁচায় পোরা একটা বিচিত্র জন্তু, যারা দেখবার দূর থেকে একটু চুপিচুপি দেখে চ'লে যায়, কেউই কাছে আসে না। শ্বশুরবাড়ীতে এক স্বামী ছাড়া যেন আর কেউ নেই। বড় জা দাসী, ননদ ভয়ে ভয়ে পালিয়ে বেড়ায়। সঙ্গীহীন নিরানন্দ শ্বশুর বাড়ী।

দুপুরে বড় জা এসে ভাত বেড়ে আসন দিয়ে বললেন, 'ছোট বৌ, ভাত রেখেছি ঠাণ্ডা হ'য়ে যাবে।'

শেফালি বললে, 'এ ঘরে কেন, আমাকে ত ডাক দিলেই খেয়ে আস্তুম।'

বড়বৌ ব্যস্ত হ'য়ে বললেন, 'তাকি হয়! মেটে ঘরে কি আর তুমি খেতে পারো?'

শেফালি রেগে বললে, 'ও ঘরে না দিলে আর আমি খাব না।'

বড়বৌ বললেন, 'কেন, ভাই রাগ করচ? বাড়ী-শুদ্ধ লোক উপোস ক'রে যাকে মানুষ করেছি তার বৌ নিয়ে আমোদ-আহ্লাদ ক'রে একসঙ্গে থেতে কার না সাধ হয়।'

'তবে কেন দূরে রেখে আমাকে এমন ক'রে কষ্ট দিচ্ছেন।'

'তোমার ভাসুর টের পেলে ব'লে গেছেন—বাড়ী-শুদ্ধ তোলপাড় করবেন।'

... বাংলা সাহিত্যের পাঠক-পঠিকারা যার বই-এর শেষের লতাপতায় ঘেরা 'সম্পূর্ণ' কথাটি প'ড়ে শেষ না করা অবধি খাবার অবসর পায় না, তার একখানা বই পড়তে পড়তে ক্লান্ত হ'য়ে শেফালি উন্মুক্ত দরজার দিকে তাকাতেই দেখ্লে বীরেনের বোন শৈল দাঁড়িয়ে আছে। শৈলর বিয়ে হয়নি।

শেফালি ডাক্লে, 'ঠাকুরঝি, ওখানে দাঁড়িয়ে কেন? এস ঘরের ভিতর।'

শৈল দরজার চৌকাঠ না মাড়িয়েই বললে, 'আপনার ঘরটা ঝাঁট্ দিয়ে যাব?'

শেফালি তার হাত ধ'রে ঘরে এনে বললে, 'বস আমি ঝাঁট্ দি, তুমি দেখ।' ঝাঁটা কেড়ে নিয়ে ঝাঁট্ দিতে সুরু ক'রলে।

শৈল কাঁদছে।

শেফালি তার নিরর্থক কান্নার অর্থ খুঁজে না পেয়ে বললে, 'কাঁদছো কেন ঠাকুরঝি?'

শৈল ফুঁপিয়ে কাঁদ'তে কাঁদতে বললে, 'তুমি ঘর ঝাঁট্ দিলে বড়দা ব'ক্বে।'

শৈলকে বুকের উপর নিয়ে শেফালি বললো, 'এই কথা? তিনি আর জান্বেন কেমন ক'রে।...আচ্ছা তোমার বৌদির সঙ্গে কি এসে একটু গল্পও করতে নেই।'

'আমরা কি আর তোমার সঙ্গে কথা বলতে পারি?'

শেফালি তাকে বুঝিয়ে অনেক কথা ব'লে শেষে বললে, 'আমার কাছে আস্বে বল, তা না হ'লে ছাড়বো না।'

'দাদা বক্বে।' সেই এক কথা—

শেফালি তাকে ছেড়ে দিয়ে রাগে গরগর করতে করতে শ্বাশুড়ীর কাছে গিয়ে দেখলে শ্বাশুড়ী দরজার পাশে ব'সে ছুঁচে সুতো গলাতে চেষ্টা করছেন, কিন্তু কোনবারই সফল হ'চ্ছেন না।

'মা, আমি ত আর এমন ক'রে থাক্তে পারিনে।'

বীরুর মা ব'ললেন, 'কি হ'য়েছে মা?'

'এমন একা একা ত আর থাক্তে পারিনে—' শেফালি রাগে ক্ষোভে অসহায়ের মত ঝর ঝর ক'রে কেঁদে ফেল্লে।

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

মা বললেন, 'মণিন্দরকে বই কিনে আনতে বলবো—'

'না, আমি বই চাইনে—দিদির সঙ্গে ঠাকুরঝির সঙ্গে কাজকর্ম্ম ক'রে বেড়াব।'

'তা কি হয়, মণিন্দর তা হ'লে—'

স্নেহ পাষাণের কারা হতে মুক্তির আদেশ না পেয়ে অসহায় শেফালির বড়ই রাগ হ'লো। সোনার শিকলের নিপীড়নে তার সমস্ত দেহ মন বিদ্রোহী হ'য়ে উঠ্‌ল।

জ

শনিবারে মণীন্দ্র বাড়ী এলে শৈল কোনো এক সুযোগেতে বললে, 'ছোট বৌদির মোটে লজ্জা নেই দাদা, তোমার সঙ্গে কথা বলতে চায়—'

মণীন্দ্র হেসে বললেন, 'আমার ভাই, যাকে না খেয়ে মানুষ করলুম, তার বৌ আমার সঙ্গেই যদি কথা না বলবে ত' কার সঙ্গে ব'লবে। বৌমার খুব লজ্জা আছে, তোরই বুদ্ধি নেই।'

মণীন্দ্র পুনরায় আদেশ দিলেন বৌমার যা ইচ্ছে তাই তাঁকে ক'রতে দিতে হবে।

শেফালি একেবারে রান্নাঘরে গিয়ে উঠ্‌ল, বললে, 'দিদি আজ আমি রাঁধবো।'

মণীন্দ্র শেফালির রান্না খেয়ে বললেন, 'বৌমা এমন রাঁধতে কবে শিখ্‌লে—চমৎকার!

হেঁ হেঁ ক'রে হেসে বলেন, 'আমার বীরুর বউ যদি এমন না হয় ত জগতে সাধনা সিদ্ধি ব'লে দুটো কথা থাক্‌বে কেন!'

দুপুরে বীরুর মা বড়জা শৈল সকলে ব'সে বই শোনে। চিড়িয়াখানার কথা মিউজিয়মের কথা বড়জা শৈল হাঁ ক'রে শোনে। মা বলেন, 'তার পর এককড়ির কি হ'ল?' এককড়ি সাম্‌নের খোলা বইখানার নায়ক—

পাড়ার লোকে জিজ্ঞাসা করে, 'শৈল, তোর বৌদি কেমন হ'ল রে?'

শৈল হাসে। বলে, 'খুব ভাল।'

পাড়ার মেয়েরা বই শুনতে আসে। কার্পেটে ফুল তুলে নিয়ে যায়।

দুই দিকের স্নেহের ভিতর যে নিঃসঙ্গতার প্রাচীর গ'ড়ে উঠছিল, শেফালি আঘাতের পর আঘাত দিয়ে ভেঙে সব এক ক'রে দিলে।

কলকাতা থেকে চিঠি আসে, 'মা শেফালি, কবে আসবে?'

শেফালি উত্তর দেয়, 'এখন যাওয়া যাবে না মা, একটু অবসর পেলেই যাব।'

অবসর আর হ'য়ে ওঠে না।

ঝ

নিশীথ-নির্জ্জনে বীরু ব'সে বই লিখছে—নায়কের বিরহ। তার চোখের জলে খাতা ভিজে আর্দ্র হ'য়ে ওঠে। নায়িকা কি পাষাণ!

সহানুভূতিতে শেফালিরও চোখেও জল আসে। আহা, এত অকরুণ!

জলের গ্লাস টেবিলের উপর রেখে সে বলে, 'কি লিখছো ছাই। কি দরকার বই লিখে, নাম ত যথেষ্টই হয়েছে—'

বীরু বলে, 'নামের জন্যেই কি মানুষে বই লেখে শেফালি? বই লিখেই সুখ, তাই—'

'তোমাকে আর অমন ক'রে কাঁদতে হবে না—'

'এখন ট্রাজিডি হচ্ছে—নিজে না কাঁদলে আমার বই প'ড়ে অপরে কাঁদবে কেন।'

'তোমাকে আর ট্রাজিডি লিখ্‌তে হ'বে না। কেন, কমিডি লেখো না একটা?'

'আজ এ বইটা শেষ হ'য়ে যাবে। এবার থেকে কমিডি লিখ্‌বো। তুমি ত আমার জীবনের সব চেয়ে বড় কমিডি, না শেফালি!'

বীরু শেফালির হাত ধ'রে আকর্ষণ করে।

শেফালি আকর্ষণে ঢ'লে প'ড়ে বলে, 'যাও।'

হো হো ক'রে বীরেন হাসে।

বীরেনের ট্রাজিডি প'ড়ে বাংলার বিশ্বনিন্দুক সমালোচক লেখেন—'বীরেনবাবুর এ ট্রাজিডি বাংলা সাহিত্যে যুগান্তর আন্‌বে। চোখের জল সাম্‌লানো যায় না।' চমৎকার!'

এ ট

একদিন মণীন্দ্রকে শেফালি বললে, আপনি আর কেন খেটে খেটে শরীর নষ্ট ক'রছেন। টাকা যা আছে তাতেই ত চ'লে যাবে।'

'খাটুবো না? কি ব'ল শেফালি, আমার বুড়ো জীর্ণ শরীরেও যে যৌবনের সঞ্চার হয়েছে। এমন সংসার ক'জন করেছে? আর একটা কথা ভাবি মা, স্বর্গ ব'লে একটা জায়গা নাকি কোথায় আছে শুনেছি, সে কিন্তু আমার বিশ্বাস হয় না। সত্যিই যদি কোথাও থাকে ত' আমার ভাঙা দালানের মাঝেই সেটা খুঁজে পাওয়া যাবে। তোমার কি মনে হয়—ও বীরু, বীরু।'

বীরু এসে হেসে বলে, 'দাদা, ও বুঝি আমার নামে কি লাগিয়ে গেল, না?'

মণীন্দ্র বাবু হেসে বলেন, 'শেফালি, মা! বীরু তোমার নামে আমার কাছে লাগাচ্ছে। মা—ও মা, তুমি এর বিচার ক'রে দাও।'

মা বল্লেন, 'আজ তা হ'লে ছোট বৌমাকে পিঠে তৈরি ক'রতে দাও।'

মণীন্দ্র হো হো ক'রে হেসে বললেন, 'তাই ঠিক শাস্তি হয়েছে। বড় বৌ, দেখি চাদরটা, বাজারে যাই।'

'বীরু বাজারে যাক্ না।' মা বললেন।

'তাকি হয় মা, ও ছেলেমানুষ, ও কি বাজার করতে জানে? আর বৌমার বাজার আমি না করলে পছন্দই হবে না।'

মণীন্দ্র চাদরটা কাঁধে ফেলে বললেন, 'বীরু ভাল একখানা মিলনান্ত বই লেখতো। প'ড়ে দেখবো কেমন হয়—'

বীরু তিনমাসের মধ্যেই একখানা কমিডি লিখে প্রকাশ ক'রে ফেল্লে।

ধামাধরা কাগজগুলো পর্য্যন্ত লিখলে, 'বীরেন বাবুর বই প'ড়ে আমরা হতাশ হয়েছি। কোথায় গেল তাঁর ঐকান্তিকতা, তাঁর প্রাণঢালা লেখার ভঙ্গি।'—কোন কাগজেই সুখ্যাতি বেরুল না।

শেফালির অসুখ—

কলকাতা থেকে সায়েব ডাক্তার নিয়ে মা বাবা দুজনেই এসেছেন।

রোগীর বিশীর্ণ পাণ্ডুর মুখের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে সকলের চোখেই জল পড়ছে।

শৈল কেঁদে কেঁদে মেঝেয় ঘুমিয়ে পড়েছে।

বড়বৌ কেবল গরম জল ক'রে এনে দিচ্ছে। ধোঁয়া আর চোখের জলে তার মুখ খানা লাল হ'য়ে গেছে।

মণীন্দ্রর মা চৌকাঠ হেলান দিয়ে কেঁদে কেঁদে ভগবানের কাছে আকুল প্রার্থনা জানাচ্ছেন।

ডাক্তারটি কেবল ব'লছেন, 'ট্রেন পাওয়া যাবে না, এখন যাই। হাতে অনেক কাজ।'

আবার অনুরোধে বিরক্ত হয়ে বলছেন, 'একটা রোগী নিয়ে থাকলে ত চলে না।'

মণীন্দ্র ব্যস্ত হ'য়ে ব'ল্লেন, 'বীরু, বীরু, সাবধান আমাদের লক্ষ্মীকে কখনও ছেড়ে দিস্‌নে! কিছুতেই যেতে দিবিনে, বুঝ্‌লি?'

নিশাচর বাদুড়দেরও পেট ভ'রে গেছে। তারাও গাছে গাছে খড়্ খড়্ ক'রে উড়ে বেড়াচ্ছে না।

শেফালি হঠাৎ চোখ মেলে চারি দিক চেয়ে দেখ্‌লে।

বীরু ব'ললে, 'কি?'

শেফালি তার হাতখানা বুকের মাঝে নিয়ে বললে, 'মানুষ ম'রে কোথায় যায় জানো?'

বীরু চোখের জল মুছে বললে, 'হয় স্বর্গে, না হয় নরকে।'

'স্বর্গ ত ছেড়েই যাচ্ছি, নরকেই যাচ্ছি তা হ'লে।'

বীরু চুপ ক'রে রইল।

'আমি একটু বড় ঠাকুরকে দেখবো।'

মণীন্দ্র এসে বললেন, 'বৌমা, বৌমা, আমায় ডাক্‌ছো?'

শেফালি একবার চোখ মেলে দেখে উঠ্‌তে চেষ্টা করতেই প'ড়ে গেল। তার চোখ দুটি চেয়েই রইল,

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

দেহখানা অবশ শক্ত হ'য়ে গেল।

মণীন্দ্র চীৎকার ক'রে উঠলেন, 'বীরু, ধ'রে রাখতে পারলিনে। করেছিস্ কি—'

কাঁদতে কাঁদতে ছুটে বেরিয়ে গেলেন।

শোকক্রন্দন নৈশ স্তব্ধতার বুক বিদীর্ণ ক'রে আকাশে মিশে গেল। মর্ম্মভেদী হাহাকারে প্রতিবেশীরা ঘুমের ঘোরে বিছানায় উঠে বস্‌লো।

শেফালি চ'লে গেল

ছয়মাস পরে—

মণীন্দ্রের মা বললেন, 'মণীন্দ্র, তুই কিছু দেখ্‌ছিস্‌নে? বীরু যে রোজ কি খেয়ে এসে সারারাত্রি জেগে লেখে। শরীর ভেঙে যাচ্ছে। বীরু যে মাতাল লক্ষ্মীছাড়া হ'য়ে যাচ্ছে।'

'লক্ষ্মী সকলেরই ছেড়ে গেছে মা। বীরুকে ভাল করবার ক্ষমতা আর নেই। হ্যাঁ মা, আমার বয়েস কত হ'ল—আমি যেন অনেক বুড়ো হ'য়ে গেছি।'

* * * *

বীরু নিশীথ রাত্রে নিজের চোখের জলে ভিজিয়ে এক-খানা কমিডি লিখ্‌ছে—

রোজ রাত্রেই লেখে। কমিডি যে পাঁচশো পাতার উপর হ'য়ে গেছে সেদিকে খেয়াল নেই।

পল্লীর কোলে একখানা ভাঙ্গা টেবিলের উপর বীরেনের অমর সাহিত্যের নায়ক নায়িকা প'ড়ে থাকে। রাত্রের গভীরতার সঙ্গে সঙ্গে তারা জীবন্ত হ'য়ে লেখকের বুক দখল ক'রে বসে—

নায়িকার কোঁকড়া চুলের মাথাটি বুকের মধ্যে ক'রে নায়ক যখন বলে, 'আচ্ছা রেবা, জগৎটা সারা বছর চ'লে যদি আজ বসন্তের এই জ্যোৎস্নাভরা পূর্ণিমার দিনে এসে থেমে যেত, তবে কী সুন্দর হ'ত!' তখন বীরুর গাল বেয়ে জল প'ড়তে থাকে—

কেউ বারণ করেনা, প্রাণ ঢেলে কেবল লেখে।

বই প্রকাশিত হ'লে বাংলার সকল সমালোচক একসঙ্গে লিখ্‌লে, 'বীরেনবাবুর কমিডি চমৎকার হয়েছে। পৃথিবীর সাহিত্যে অমর হ'য়ে থাকবে।'

বীরেনের সুখ্যাতিতে বাংলা ভরে উঠ্‌লো।

বিবিধ সংগ্রহ

লরেন্স্ য়্যাট্কিন্সন্

১

হিন্দুস্থানী গান যেমন কথাকে ছেড়ে ও ছাড়িয়ে শুদ্ধ সুরের উচ্ছ্বাসে পরিণত হয়, য়্যাট্কিন্সনের শিল্পও তেমনি অতীন্দ্রিয়। হিন্দুস্থানী গান যেমন অনেকেই বোঝেন না, য়্যাট্কিন্সনের শিল্পও তেমনি বোঝা কঠিন।

আমরা কোনো কিছুর প্রতিচিত্র দেখ্তেই অভ্যস্ত। আমাদের অশিক্ষিত চোখ বস্তু, জন্তু বা মানুষের প্রতিচিত্র দেখ্তে ভালোবাসে ও বোঝে। যে রূপ আমরা বাস্তবে দেখিনা, সেই নিছক ভাবমূর্ত্তির রূপ আমাদের কাছে প্রথমে অর্থহীন ব'লে মনে হয়। য়্যাট্কিন্সন্ ভাবলোকের শিল্পী।

পিকাশো ও তাঁর সহশিল্পী কিউবিষ্ট্রা যা চোখে পড়েছে তারই ওপর নিজেদের মতামতের আভাস দিয়ে ছবি এঁকেছেন। এট্কিন্সন্ দৃষ্টিগ্রাহ্য বস্তুর ভিতর সূক্ষ্ম, বস্তু-মর্ম্মটি আছে, তারই সন্ধিৎসু।

য়্যাট্কিন্সনের শিল্পের উদ্দেশ্য ইন্দ্রিয়লোক ও অতীন্দ্রিয় লোক বা মানস-লোকের মধ্যে সেতুবন্ধন। হোরেস্ শিপের মতে সে উদ্দেশ্য সফল হয়েচে।

রচনানিরত য়্যাট্কিন্সন্

প্রথমে য়্যাট্কিন্সনের শিল্প ততটা—ভাবাত্মক হ'লেও, ভাবসর্ব্বস্ব ছিল না। তখনও তিনি ভাবের ওপর ঝোঁক দিলেও তখন তাঁর শিল্প রঙীন ছিল। তখন তিনি শিল্পশাস্ত্র মোটামুটি মানতেন—বিশেষত প্রমাণ ও বর্ণিকা-ভঙ্গ। অংশের সঙ্গে অংশ ও সমগ্রের ছন্দ বজায় রাখায় আর রঙের খেলায় য়্যাট্কিন্সনের প্রচুর আনন্দ ছিল। কিন্তু তাঁর গভীরতাব্যাকুল মন তৃপ্তি পেল না। তাই তাঁর রং ফিকে হ'য়ে এল। প্রখর রঙে যে, চো'খ ব্যস্ত

শ্রীবিষ্ণু দে

হয়ে থাকবে, দৃষ্টিসর্ব্বস্ব হ'য়ে পড়বে, অন্তর্য্যামী হবে না, মন জাগবে না। ক্রমে তাঁর ছবি রং-হীন হ'য়ে এল। আর ছবির তবু একটু আলঙ্কারিক মূল্য থাকে—য়্যাট্‌কিন্‌সন্ ক্রমে ভাস্কর্য্যের দিকেই মন দিলেন।

বুদ্ধির আবির্ভাব

প্রকাশব্যাকুল গভীরচিত্ত য়্যাট্‌কিন্‌সন্ সারা য়ুরোপের চিত্রশালাসমূহে ঘুরেছেন, বড়ো বড়ো আর্টিষ্টের সঙ্গে আলাপ করেছেন। জীবনের রহস্যে মুগ্ধ হ'য়ে কত নরনারীর সঙ্গে মিশেছেন। অধ্যাত্মতত্ত্ব, দর্শন, রাজনীতি, সমাজতত্ত্ব, সাহিত্য তাঁর পাঠ্য বিষয়। নিজে তিনি কবিতাও রচনা করেছেন; আর তাঁর জীবনব্যাপী আর একটি সাধনা আছে, সেটি হচ্ছে সঙ্গীত। য়্যাট্‌কিন্‌সনের শিক্ষা ব্যাপক। তিনি শুধু সাধারণ শিল্পার্থীর মতো ছবি আঁকতে, মূর্ত্তি গড়তেই শেখেন নি।

য়্যাট্‌কিন্‌সনের শিল্প তাই গভীরতার ভক্ত। তাই তিনি কোনো বিশেষ দলের নন। পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য সব কিছুই তাঁকে আকর্ষণ করে। তিনি শুধু তথাকথিত শিল্পী নন, তিনি মানুষ।

এট্‌কিন্‌সনের 'বুদ্ধির আবির্ভাব' যদিও তাঁর খুব শেষের মূর্ত্তি নয়, তাহ'লেও তাতে তাঁর শিল্পবৈশিষ্ট্য সপ্রকাশ। মানুষ আদিতে ছিল একটা প্রচণ্ড শারীরশক্তি। তারপর একদিন তার মধ্যে এল বুদ্ধি। পশু হ'য়ে উঠ্‌ল মানুষ।

গীতি-উচ্ছ্বাস

অকস্মাৎ এ চেতনায়, সে চিন্তায় ও বিস্ময়ে ভারাক্রান্ত বিমূঢ় হ'য়ে পড়্‌ল। বিশ্বের সমস্যা তাকে ব্যাকুল ক'রে তুল্‌ল।

য়্যাট্‌কিন্‌সন্ একটি সুস্থ নগ্ন নর বা নারী বনের মধ্যে পড়ে' কাঁদ্‌ছে বা আকাশের দিকে চেয়ে ভাব্‌ছে—এ না

লাইম্ লাইট্

ক'রে যে ঐ ভাবটি—সুধু ঐ ভাবটি পাথরের রূপকের ভিতর দিয়ে প্রকাশ করেছেন, এই তাঁর বৈশিষ্ট্য।

তাঁর 'গীতিউচ্ছ্বাস' মূর্ত্তিখানি,—যে গীতি অকস্মাৎ উচ্ছ্বসিত হয়ে' পড়ে, সমুদ্রের ঢেউয়ের ওঠার মতো উচ্ছ্বসিত হয়ে' ওঠে, তারই ভাবমূর্ত্তি।

'লাইম্‌লাইট্', যাঁরা গগনবাবুর 'নর্ত্তকী' প্রভৃতি দেখেছেন, তাঁরা অনেকটা বুঝবেন। নাট্যমঞ্চের ওপর প্রখর আলোয়, শত শত দর্শকের উৎসুক চোখের সাম্‌নে অভিনেতা বা অভিনেত্রী দাঁড়িয়ে,—সে চঞ্চল, আশান্বিত, ব্যগ্র এবং ঈষৎ ন্যর্ভস্। তারই ভাবচিত্র এই জলচিত্রটি।

তারপর ধরা যাক্ 'নৃত্য'। নৃত্যশীলা সুন্দরীর আশা যাঁরা করবেন, তাঁরা হতাশ হবেন। এ চিত্রে শিল্পী শুধু স্বচ্ছন্দতাল যে নৃত্যের গতি, তাকেই রূপ দিয়েছেন—নর্ত্তক বা নর্ত্তকীকে নয়।

পালিশ্-করা কালো কাঠের মূর্ত্তি 'aloof', জনতার মাঝে থেকেও তার থেকে উচ্চতর লোকবাসীর ভাবমূর্ত্তি

নৃত্য

ব'লে ধরা যেতে পারে। এ রকম প্রাণবন্ত চিত্র দুর্লভ। শুধু কাঠের আঁকাবাঁকায় কি রহস্যময় প্রাণবন্ত aloofness!

শ্রীবিষ্ণু দে

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী

ফুজিহাসা-শিখরে

বিশাল ফুজিহাসা পর্ব্বত জাপানের আত্মার প্রতীকস্বরূপ। সমুদয় জাপানে এই পর্ব্বত সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও পবিত্র ব'লে গণ্য। ইহা সমুদ্র হ'তে ১২ হাজার ফীটের বেশী উঁচু হ'লেও প্রতি বৎসর গ্রীষ্মকালে হাজার হাজার যাত্রী এর

Aloof লরেন্স্ য়্যাটকিন্‌সন্

শিখরপ্রদেশে তীর্থযাত্রা ক'রে থাকে। এ পবিত্র পর্ব্বতের উৎপত্তি সম্বন্ধে জাপানীদের মধ্যে এক অদ্ভুত পৌরাণিক কথা চলিত আছে। তাদের বিশ্বাস যে, একরাত্রে পৃথিবীর গর্ভদেশ থেকে ফুজিপর্ব্বত উপর দিকে নিক্ষিপ্ত হয়েছে ও ঠিক সেই সময়ে ৩০০ মাইল দূরে ওমি প্রদেশে কিয়োটোর নিকটে অনেকখানি স্থান হঠাৎ নেবে গিয়ে বিশাল হ্রদের সৃষ্টি করেছে। এ হ্রদের আকার একটা জাপানী অদ্ভুত বাদ্য-যন্ত্রের মত। হ্রদটি Biwa Lake বলে খ্যাত।

গোটেম্বা ফুজিপর্ব্বতের পাদদেশে অবস্থিত। পথ ক্রমশ উঠে গেছে। গাছ-গাছড়া অনেকটা গরম দেশের মতো। জমি রক্তবর্ণ, কিছু দূরে যাবার পর সুগন্ধী দেবদারু গাছের নীচে শৈবালভূমিতে নানাবিধ ফুল দেখা যায়। উন্মুক্ত প্রান্তর ও বনভূমি থেকে কলকণ্ঠ পাখীর মধুর গানের সুর কানে ভেসে আসে। গোটেম্বা হ'তে পাহাড়ের শিখর অবধি ১০টা বিশ্রামাগার আছে। ক্রমশঃ অগ্নিস্রাব (lava) ও কঙ্কর আরও আল্‌গা ও গভীর হ'য়ে ওঠে—চলা বেশী শক্ত হ'য়ে আসে। উদ্ভিজ্জ পদার্থসম্ভূত মাটি (loam) ক্রমশঃ শেষ হওয়ার দরুণ মাটি কম দৃঢ় হ'য়ে এসেছে। ঢালু প্রদেশ এমন ক্রমোচ্চ যে, যে-ব্যক্তি পাহাড়ে ওঠায় অপটু, সেও অক্লেশে উঠ্‌তে পারে। ফুজির শিখরচূড়া তিন কোণা;—পাশের দিকে কোথাও কোথাও সাদা সাদা দাগ দেখা যায়। অন্যান্য পর্ব্বতচূড়ায় তুলনায় বেশী কালো বোধ হয়—ভিজা অগ্নিস্রাবের উপর মেঘের আড়াল থেকে মাঝে মাঝে রোদ পড়ায় আবলুশ কাঠের মত চিক্‌চিক্ করে। সেখান থেকে নীচের দিকে কি মনোহর পার্ব্বত্য দৃশ্য! বেলা শেষে সূর্য্যের প্রখর আলোয় কুয়াশা দূর হ'য়ে যাচ্ছে। কুয়াশার ধূসর-বর্ণের আবরণ দূর হওয়ায় নিম্ন পাহাড় শ্রেণী একটার পর একটা চোখের সম্মুখে ভেসে উঠ্‌ছে। ঢালু জায়গায় মাঝে মাঝে হ্রদ ঢালু সবুজ ক্ষেতে ঘেরা। ছোট ছোট ধানের ক্ষেত—নানা আকারের—বিচিত্রতায় ছবির আভাস মনে এনে দেয়। কি অমানুষিক পরিশ্রমে বিভিন্ন পরিবারবর্গ এ-সব ক্ষেত চাষ করছে। জাপান-সাম্রাজ্য কয়েকটি ছোট দ্বীপপুঞ্জের সমষ্টি মাত্র; তারও অধিকাংশ পার্ব্বত্য,—ভারতের যে কোন প্রদেশ হ'তে অনেক ছোট। "Yet here is an area teeming with a proud, hardy, war-steeled island people, increasing now at the rate of nearly one million a year; such a people is bound to knock upon the gates of the world. It must do that or accept the alternative of race suicide."

জাপানে বিছানাপত্রের তেমন কোন বন্দোবস্ত নেই—অবশ্য তোকিয়োর Imperial Hotel এ' বিছানার সুবিধা

আছে। কিন্তু ফুজি পর্ব্বতের বিশ্রামাগারে এ সবের কিছু 'পাট' নেই। এ সব পথের ধারের সরাইএ মাদুরে শোবার জায়গা ভাড়া পাওয়া যায়—তার ফলে সুন্দর পরিষ্কার সুগন্ধি ঘাষের মাদুরে হাত পা ছড়িয়ে ঘুমান যায়। এই মাদুরই

ফুজি-পর্ব্বত

পাটি জাপান গৃহে মেঝে পাত্‌বার জন্য ব্যবহৃত হয়। জুতা কথনো গৃহের ভিতর আনা হয় না—কাদামাখা জুতা প'রে মাদুর মাড়ান জাপানীদের কাছে বিছানায় ও সাজান টেবিলে বেড়ানর সমান। ফুজি পর্ব্বতে ওঠার সময় নিজেদে আহার্য্য নিয়ে যাওয়া উচিত—এসব বিশ্রাম-আগারে শুধু ভা ও জাপানী তরকারী পাওয়া যায়—তা আবার রাত কাটাতে গেলে বেশী পাওয়া সম্ভব হয় না। জাপানীরা কাঁচা ডিম খেতে অভ্যস্ত—কিন্তু আমেরিকানদের পক্ষে সিদ্ধ করা দরকার হয়।
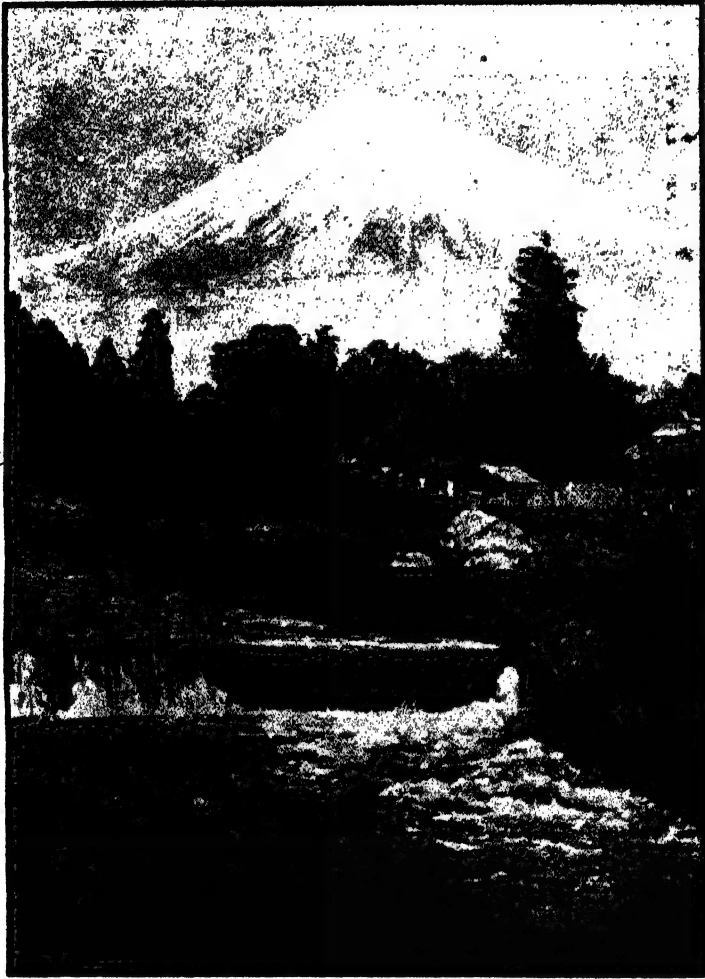
ফুজি পর্ব্বতের উপর সূর্য্যাস্ত অতি সুন্দর। দূরে পাহাড় শ্রেণীর পিছনে সোনালী বর্ণের অর্দ্ধবৃত্তাকারে সূর্য্য ওঠে—যেন

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী

গলিত সোনার উৎস ধীরে ধীরে অন্ধকারময় জগতকে রক্তিম বর্ণে রঞ্জিত ক'রে দেয়। জাপানী তীর্থযাত্রীরা এস্থানে সূর্য্য-উদয়ের উপাসনা ক'রে থাকে। ধার্ম্মিক মুসলমানের কাছে মক্কার ন্যায়—পবিত্র ফুজি পর্ব্বতে সূর্য্য-উদয় জাপানীদের মনে ভক্তির ভাব উদ্রেক ক'রে দেয়।

ফুজি শিখরদেশ—সূর্য্যের আলোয় খুব উজ্জ্বল—পথ ক্রমশঃ আরও খাড়া—আরও অপ্রশস্ত ; পায়ের চাপে পাথর ও কাঁকর প্রভৃতি গুঁড়ো হ'তে থাকে। প্রতি ১০০ ফীট ওঠার পর নিঃশ্বাস নিতে একটু কষ্ট বোধ হয়। মাঝে একটা তুষার-প্রান্তর পার হ'তে হয়। চারধারে ছেঁড়া ঘাসের

মিয়াজিমা মন্দিরের প্রবেশ-পথ

জুতা—তীর্থ যাত্রীরা ফেলে দিয়ে গেছে।

শিখরপ্রদেশে আগ্নেয়গিরির বিশাল মুখ-গহ্বর দেখলেই পথ-ক্লেশ সফল ব'লে মনে হয়। এসব আগ্নেয়গিরি কতদিন আগে নির্ব্বাপিত হ'য়ে গেছে—কিন্তু এদের মুখ-গহ্বর এখনো বেশ বড়। এই বিশাল মুখের এক দিকে ঘণ্টাখানেক ঘুরলেই দূরত্ব কত ভ্রান্তিকর তা উপলব্ধি হয়! এ শিখর দূর থেকে পিরামিডের সরু চূড়ার মত ব'লে বোধ হয়। এর ধার দিয়ে যেতে এখনও অগ্নিস্রাবের গর্ভদেশে উত্তাপের আভাস পাওয়া যায়। অথচ কত শতাব্দী হ'ল ফুজির শেষ অগ্নিস্রাব কবে হ'য়ে গেছে।

বিওয়া হ্রদ

শ্রীরামেন্দু দত্ত

হিমেজী নগর—জাপান

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী

আউড্‌শূর্ণ্‌

—দক্ষিণ আফ্রিকা—

যে মহাদেশ যুগ যুগ ধরিয়া যে কোনো অন্য মহাদেশের অনুরূপ ও অধিক গৌরব বক্ষে বহিয়া আজও নানা আকর্ষণের কেন্দ্র হইয়া বাঁচিয়া আছে, আমি আজ তাহারই অন্তর্গত একটি অনতি-বিখ্যাত শহরের পরিচয় দিতে বসিয়াছি। এই শহরটির নাম অত্যন্ত উদ্ভট, কারণ উহা এক ডাচ্‌ সাহেবের (Baron van Rheede van Oudtshoorn) নামানুসারে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। হাত থাকিলে আমরা এখনি উহা বদ্‌লাইয়া জলধর, পটল গোছের এমন একটি করিয়া দিতাম যে পাঠকের পড়িবারও সুবিধা হইত এবং লেখকের পক্ষে উহা যথেচ্ছ ব্যবহারেরও কোনো অন্তরায় থাকিত না। কিন্তু নারিকেলের কঠিন বহিরাবরণের মধ্যে সৃষ্টিকর্ত্তা যেমন সুমিষ্ট জল ও সুখাদ্য ফলের ব্যবস্থা করিয়া নিজের কৌশলের পরিচয় দিয়াছেন, তেমনি কৌশলের অধিকারী হইবার লোভ সামলাইতে না পারিয়াই বোধ হয় মানুষ এমন একটি সুন্দর যায়গার এরূপ একটা কাঠ-খোট্টা নাম দিয়া তাঁহার সহিত্ব পাল্লা দিয়াছে।

এই শহরটি দক্ষিণ-আফ্রিকার 'কেপ-কলোনি' প্রদেশের অন্তর্গত ও ইহার ঠিক দক্ষিণে, সোজাসুজিভাবে ধরিলে, সমুদ্রতীর আন্দাজ চল্লিস্ মাইল দূরবর্ত্তী হইবে। ভ্রমণ-কারীদের অনেক দ্রষ্টব্য দ্রব্যাদি থাকায় রেল-কোম্পানী সহরটিকে সর্ব্বদিক হইতে মনোরম রেলপথের দ্বারা অধিগম্য করিয়া তুলিয়াছে। বৈদেশিক ভ্রমণকারী কেপটাউন্ বন্দর হইতে প্রসিদ্ধ 'গার্ডেন্ রুট্' (Garden Route) দিয়া ২৬ ঘণ্টায় এখানে পৌছিতে পারেন। এই পথটি এত মনোরম যে, কোন ভ্রমণকারীরই ইহা দেখিবার সুযোগ পরিত্যাগ করা উচিত নয়; তাই সর্ব্বাগ্রে ইহার নাম করা গেল। তবে 'এলিজাবেথ্' বন্দর দিয়া আসিলে এই শহর মাত্র ১৫ ঘণ্টার পথ; ব্লুমফনটিন্ হইতে ৩০ ঘণ্টার, কিম্বার্লী হইতে ৩৯ এবং জোহানেস্‌বর্গ হইতে ৪০ ঘণ্টার পথ। রেল ষ্টেশনটি মূল শহর হইতে প্রায় দেড় মাইল দূরে। সরাসরি দক্ষিণে 'মোসেল্ বে' নামক বন্দরে জাহাজ হইতে নামিলে মাত্র ছয় ঘণ্টায় অথবা মোটরে আড়াই ঘণ্টায় এই শহরে পৌছানো যায়। মানচিত্র দেখিলে সহরটিকে নিতান্ত স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিত বলিয়া মনে হইলেও প্রকৃতপক্ষে সর্ব্বদিক হইতেই এখানে আসিবার ও এখান হইতে চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রাম, দ্রষ্টব্য স্থানসমূহ ও সমুদ্রতীরে যাইবার অসংখ্য সুন্দর সুন্দর পথ আছে। ইহার চতুর্দ্দিকে এত দ্রষ্টব্য স্থান ও মনোরম ভ্রমণ-স্থান আছে এবং তাহাদের আকর্ষণীয়তা এত বিভিন্ন প্রকারের যে, প্রতিদিনই, কোন্‌দিকে যাইব, কি আগে দেখিব, এই লইয়া যথেষ্ট মস্তিষ্কের পরিশ্রম করিতে হয়।

ক্যাঙ্গো কেভ্‌সে যাইবার পথে গ্রোবেলার্স নদী

ক্যাঙ্গো কেভ্‌সের প্রবেশ-পথ

'ক্যাঙ্গো কেভ্' (Cango Cave) নামক প্রসিদ্ধ গুহা দেখিতে যাইবার সময় যাত্রীরা আউড্শূর্ণের আতিথ্য গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই গুহাশ্রেণীই এখানকার প্রধান আকর্ষণ। ভ্রমণকারী এখানে পৌছিয়া প্রথমেই ঐ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়া থাকেন। তদ্ব্যতীত, যাঁহারা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ভালবাসেন তাঁহাদের জন্য প্রকৃতি দেবী এখানে রম্য গিরিসঙ্কট, সৌন্দর্য্যশালিনী নির্ঝরিণী, বিস্ময়োৎপাদনকারী গিরিগুম্ফা বনে বনে সবুজ শোভার মহোৎসব ও নয়ন-মুগ্ধকর জলপ্রপাত প্রভৃতির আয়োজন রাখিয়াছেন।

আউডশূর্ণের আবহাওয়া শুষ্ক, পরিষ্কৃত এবং স্বাস্থ্যকর। ইউরোপের আল্পস্ পর্ব্বত-মালার শোভা স্মরণ করাইয়া দিয়া, শীতকালে ইহার চতুষ্পার্শ্বস্থ গিরিশ্রেণীর শুভ্রতুষার-মণ্ডিত শির রৌদ্রোজ্জ্বল শোভা ধারণ করে। সেইজন্য শীতকালে এখানে প্রবাসী ইউরোপ বাসীর ভীড় হইয়া থাকে। যাঁহারা অসুস্থ, যাঁহাদের জলীয়তা-বৰ্জ্জিত আবহাওয়ার প্রয়োজন, তাঁহাদের পক্ষে ইহার স্বাস্থ্যকর ক্রোড়ে কয়েকমাস অবস্থান অনেক ঔষধ ও ডাক্তারের খরচ বাঁচাইয়া দিবে।

আউডশূর্ণে প্রবেশ করিলেই শহরটির সমৃদ্ধ ও পরিচ্ছন্ন অবস্থা সর্ব্বাগ্রে চোখে পড়ে। সর্ব্বপ্রকার পণ্যদ্রব্য-পূর্ণ বিপণি, প্রাসাদোপম বাসগৃহ ও হোটেলসমূহ, চওড়া ফুটপাথ বিশিষ্ট পীচ-ঢালা রাস্তা, শহরটিকে যেন কুম্ভীর-ভল্লুক-গরিলা-হস্তী-সঙ্কুল আফ্রিকার বাহিরে আনিয়া ফেলিয়াছে! এই শহরের অনেক বাড়ীই মনোরম পুষ্প বাটিকা ও নয়নরঞ্জন শ্যামল শষ্পাচ্ছাদিত ভূমিখণ্ডদ্বারা পরিবেষ্টিত। সন্ধ্যার প্রাক্কালে এই নগরী যখন আলোকমালায় সজ্জিত হয় তখন ইহাকে দ্যুতিমান রত্নালঙ্কার-শোভিতা স্নিগ্ধসুষমা মণ্ডিতা রূপসী রমণীর ন্যায় মনে হইয়া থাকে। ভুলিয়া যাইতে হয় যে ভীষণ বন্যজীবজন্তুপূর্ণ জঙ্গলসমাকীর্ণ বঙ্গোদেশের এত নিকটে আমরা রহিয়াছি! সাংসারিক ও শারীরিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য যাহা যাহা দরকার, পাশ্চাত্যসভ্যতা প্রসাদাৎ জীবনের সুখকর যাহা কিছুর ব্যবস্থা, সকলই এখানে পাওয়া যায়। এই অঞ্চলের মধ্যে ইহার তুল্য পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, স্বাস্থ্যকর সুখকর শহর আর নাই। স্কুল, কলেজ, ইলেক্ট্রিক্, খেলিবার মাঠ, হাসপাতাল, গির্জ্জা-মসজিদ্-মন্দির প্রভৃতি বিভিন্নধর্ম্মাবলম্বীদের উপাসনা ও প্রার্থনার স্থান, ভ্রমণকারীদের জন্য থাকিবার ভাল হোটেল, সমস্তই এখানে আছে।

স্ফটিক-শোভা ; গুহাভ্যন্তর

পূর্ব্বে যে প্রধান আকর্ষণ ও দ্রষ্টব্যস্থান ক্যাঙ্গো কেভ্সের কথা বলিয়াছি, এবার সেই সম্বন্ধে কিছু পরিচয়

দিতেছি। পৃথিবীর যেমন সপ্তাশ্চর্য্য আছে, মিসরীয় সভ্যতার আভাসভূমি এই অদ্ভুতজীব-জন্তু-অধ্যুসিত, সাহারা, নায়েগ্রা, পিরামিড, নীলনদ বিশিষ্ট মহাদেশেরও তেমনই সপ্তাশ্চর্য্য বর্ত্তমান। ক্যাঙ্গো কেভ্‌স্ তাহারঅন্যতম। আউডশূর্ণ শহর হইতে এই গুহাশ্রেণী ১৮ মাইল দূরে অবস্থিত ও ঝোয়ার্টবর্গ পর্ব্বত-মালার অন্তর্গত। এই বহু-প্রসারী অন্ধকারময় গুহাশ্রেণী শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে ভ্যান্ ঝিল্ (Van Zyl) নামক একজন ওলান্দাজ কৃষিজীবি কর্ত্তৃক প্রথম আবিষ্কৃত হয়। তাহারই নামানুসারে ইহার প্রথম ও প্রধান কক্ষটির নাম-করণ হইয়াছে। আউডশূর্ণ শহরের মিউনিসিপ্যালিটির কর্ত্তারাই ১৯২১ খৃষ্টাব্দ হইতে এই গুহাগুলির তত্ত্বাবধান করিয়া আসিতেছেন। এই গুহায় প্রবেশ করিবার সময় একটা সামান্য দক্ষিণা দিতে হয়; সেই অর্থ হইতে একজন অভিজ্ঞ পথপ্রদর্শকের ব্যয়- নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। এই ব্যক্তি সর্ব্বদাই যাত্রীদিগকে গুহার অভ্যন্তরভাগ দেখাইয়া আনিবার জন্য প্রস্তুত থাকে। আউড্‌শূর্ণের মিউ-নিসিপ্যালিটি হইতে এই গুহাগুলিকে বৈদ্যুতিক আলোকে আলোকিত করিবার ব্যবস্থা করার চেষ্টা চলিতেছে। বৎসরের যে কোনো দিনেই এই গুহা পরিদর্শন করা চলে।
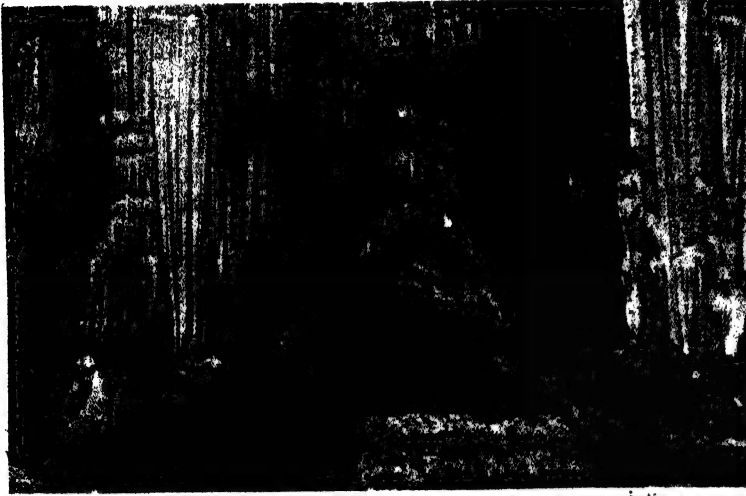
গুহামধ্যস্থ স্তূপাকার পাষাণ-শোভা; 'সিংহাসন' নামে অভিহিত।

এখানে মোটরে আসিবার জন্য যে আঠার মাইল পথ আছে, তাহার দুইপাশে প্রাকৃতিক শোভারপ্রাচুর্য্য যাত্রা-পথটিকে পরম উপভোগ্য ও রমণীয় করিয়া রাখিয়াছে। দুইপার্শ্বে উদ্ভিজ-শ্যামল উর্ব্বর উপত্যকা; সুদীর্ঘ তৃণাচ্ছন্ন প্রান্তর, সেই প্রান্তরমধ্যবর্ত্তী বিচরণশীল কৌকপ্রদত্ত

পশুপালক ও তাহার সম্পত্তি

দত্ত

উট পাখীর পাল ; বিঘার পর বিঘা যোড়া তামাকের চাষ, —অদূরে ছায়াশীতল কুঞ্জ-বীথি ; শান্তিময় কুটিরনিচয় ; গ্রোবেলাস্ নদীর তরঙ্গোচ্ছল স্বচ্ছ সলিলপ্রবাহ, ও সেই প্রবাহিনীর দুই পার্শ্বস্থ নয়ন-রঞ্জন তরুশ্রেণীবিশোভিত উচ্চাবচ গিরিচূড়া,—সমস্তই কী মনোরম ! মধ্যে মধ্যে এক এক দল 'বেবুন্' নিজেদের স্বভাবসিদ্ধ কোলাহলে এই সমস্ত নীরব সৌন্দর্য্যকে মুখর করিয়া বৈচিত্র্যেরও সৃষ্টি করে।

গুহার প্রবেশপথটি চিত্রবৎ সুন্দর প্রতীয়মান হইলেও গুহাভ্যন্তরস্থ অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের কিছুমাত্র আভাষ উহা হইতে পাওয়া যায় না। একটি প্রকাণ্ড তোরণবৎ অর্দ্ধবৃত্তাকার প্রবেশপথ যাত্রীদিগকে পর্ব্বতের কুক্ষিমধ্যে গমনাধিকার দান করে। উহা উর্দ্ধে পনর ফিট্ গিয়াছে এবং প্রস্থে দশ ফিট। প্রথম কিস্তীতে, প্রবেশ পথের দুইদিকের পর্ব্বতগাত্রে কতকগুলি প্রাচীন চিত্র অঙ্কিত দেখা যায়। একটি আঁকাবাঁকা পথ ধরিয়া কিয়দ্দূর যাইবার পর একটি নিম্নগামী সোপান-শ্রেণীর পাদদেশে পৌছাই ; উহা বাহিয়া নীচে নামিয়া গেলেই প্রশস্ত কক্ষাবলীর প্রথমটিতে আসা যায় ; এই কক্ষটির নাম পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে—ভ্যান্ ঝিল্-হল্ (Van-Zyls'Hall)। ইহা সুপ্রকাণ্ড ও চমৎকার। এই কক্ষের প্রান্তভাগে মর্ম্মরস্তম্ভশ্রেণী নয়নগোচর হয়। উজ্জ্বল আলোকে এগুলিকে বহুমূল্য বিচিত্রবর্ণ মণিমাণিক্যখচিত বলিয়া মনে হয়। অগণিত শতাব্দীর অন্তরালে প্রকৃতির গোপন রহস্য-ভাণ্ডারে ইহাদের নির্ম্মাণেতিহাস লুক্কায়িত আছে! মানববুদ্ধি সে রহস্য ভেদ করিতে পারে না।

এই কক্ষ পার হইয়া যত অভ্যন্তরে যাওয়া যায়, পথ ততই সঙ্কীর্ণ অসরল অন্ধকার হইয়া মধ্যে মধ্যে প্রস্তরের স্বপ্নরাজ্যে উপস্থিত হইতে থাকে। কোথাও বিরাট মর্ম্মরস্তম্ভ, কোথাও স্তূপাকার প্রস্তরের অপূর্ব্ব স্বাভাবিক শোভা,—আবার কোথাও বা বহুবর্ণসম্পন্ন প্রবালশোভাময় আশ্চর্য্য পাষাণ-পুষ্পের প্রচুরতা ! কোথাও আবার প্রস্তর এত সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছে যে মনে হয় বুঝি ছুঁইলেই ভাঙ্গিয়া পড়িবে ! যেন কামিনীপুষ্পের স্পর্শভীতু পাপ্ড়ি !

ক্যাঙ্গোকেভস্ ব্যতিরেকে আউড্শূর্ণ্ হইতে ভ্রমণকারিগণ আরও একটি দ্রষ্টব্য স্থানে যাইয়া থাকেন। উহা 'রাস্তেঁভ্রীদ্' নামক একটি রম্য কৃষীস্থলী। এই শহরের

উটপাখীর আস্তানা

২১ মাইল উত্তরপূর্ব্বে স্থাপিত। এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, নয়নস্নিগ্ধকর শ্যামলতা, একটি রমণীয় জলপ্রপাত, সকল কষ্ট সার্থক করিয়া মনকে অপূর্ব্ব আনন্দরসে অভিষিক্ত করিয়া থাকে। এখানকার নানাবিধ দুষ্প্রাপ্য ফুল ও লতাপাতাকে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা আছে। আউড্শূর্ণের প্রান্তরে জগতের শ্রেষ্ঠ উটপাখীর পালক পাওয়া যায় ; এখানকার উদ্ভিজ্জ উটপাখীর পক্ষে সাতিশয় উপযোগী। চাষবাস ও পশুপালন দ্বারা অধিবাসীরা প্রধানতঃ জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। প্রকৃতি কিছুমাত্র কৃপণতা না করিয়া এই স্থানটিকে পরম রমণীয় করিয়া তুলিয়াছে।

রামমোহন রায়

গত চৈত্রমাসের "প্রবাসী"তে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় লিখিয়াছেন—

আমাদের জীবনে যে-সব লাভ পরম লাভ, মাঝে মাঝে তাই উপলব্ধি করবার জন্যে আমাদের উৎসবের দিন। সেদিন যা আমাদের শ্রেষ্ঠ, যা আমাদের সত্য, যা আমাদের গৌরবের, তারই জন্যে আসন প্রস্তুত হয়, অন্তরের আলো বড়ো ক'রে জ্বালাই, যা আমাদের চিরন্তন সেদিন তাকে ভালো ক'রে দেখে নেবার জন্যে আমরা মিলি।

পশুপাখীদেরও প্রাণের ঐশ্বর্য্য আছে। সে তাদের প্রাণশক্তিরই বিশেষ বিকাশ। পাখী উড়তে পারে, এ তার একটি সম্পদ। মাঝে মাঝে এই সম্পদকে সে উপলব্ধি করতে চায়, মাঝে মাঝে সে ওড়ে, কোন প্রয়োজনে নয়, ওড়বারই জন্যে; সে তার পক্ষচালনা দিয়ে আকাশে এই কথা ঘোষণা করে যে, আমি পেয়েছি। এই তার উৎসব। বুনো ঘোড়া খোলা মাঠে এক এক সময় খুব ক'রে দৌড়ে নেয়,—কোন কারণ নেই। সে নিজেকে বলে, আমার গতিবেগ আমার সম্পদ; আমি পেয়েছি। এই উৎসাহ ঘোষণা ক'রেই তার উৎসব। ময়ূর এক একবার আপন মনে তার পুচ্ছ বিস্তার করে, আপন পুচ্ছ-শোভার প্রাচুর্য্য-গৌরব সে আপনারই কাছে প্রকাশ করে, আপন অস্তিত্বের ঐশ্বর্য্যকে উদ্ঘাটিত ক'রে দিয়ে সে অনুভব করে যে জীবলোকে তার একটি বিশেষ সম্মান আছে। সেও বলে, আমি পেয়েছি।

কিন্তু মানুষের উৎসব তার প্রাণ-সম্পদের চেয়ে বেশী কিছু নিয়ে। যা সে সহজে পেয়েছে তাতে সে অন্য জীবজন্তুর সঙ্গে সমান, যা সে সাধনা ক'রে পেয়েছে তাতেই সে মানুষ। সে আপনার ঐশ্বর্য্য আপনি যখন সৃষ্টি করে তখনই সে আপনাকে সত্য ক'রে পায়। তখনই সে বলে, আমি পেয়েছি। তার আনন্দ সৃষ্টির আনন্দ।

যা খুশী তাই বানিয়ে তোলা মাত্রকেই সৃষ্টি বলে না। কোন বিশ্বসত্যকে লাভ করার যোগে প্রকাশ, ও প্রকাশ করার যোগে লাভ করাকেই বলে সৃষ্টি। সুতরাং সে কারো একলা নয়। পশু-পক্ষীর যে উৎসবের কথা পূর্ব্বে বলেছি সে তাদের একলার, মানুষের উৎসব সকলকে নিয়ে। লক্ষপতি তার ব্যবসায়ে মস্ত লাভ করতে পারে,—তা নিয়ে সে ঘটা ক'রে ভোজ দিতেও পারে, কিন্তু সেইখানেই সেটা ফুরাল, মানুষের উৎসবলোকে সে স্থান পেল না। সে আপন লাভকে অতি সতর্কতা ও কৃপণতার সঙ্গে লোহার সিন্দুকের মধ্যে বন্দী ক'রে রাখে, তারপরে একদিন সে অতি কঠিন পাহারার ভিতর থেকেও শূন্যে অন্তর্দ্ধান করে। সে নিজে সৃষ্টি নয় ব'লেই উৎসব সৃষ্টি করতে পারে না। সৃষ্টি মানে উৎসৃষ্টি, যা সকল ব্যয়কে অতিক্রম ক'রে দানরূপে থেকে যায়।

চিরকালের ঐশ্বর্য্য যখন তার কাছে প্রকাশ পায় তখন মানুষ বড়ো ক'রে বলতে চায় "আমি পেয়েছি"। একথা সে বলতে চায় সকল দেশকে, সকল কালকে, কেন-না পাওয়া তার একলার নয়। ঋষি একদিন বিশ্বকে বলেছিলেন, পেয়েছি, জেনেছি। বেদাহং। ঋষি সেই সঙ্গেই বলেছেন, আমার পাওয়া তোমাদের সকলের পাওয়া—শৃণ্বন্তু বিশ্বে। এই বাণীই উৎসবের বাণী। মানুষের উৎসবে চিরন্তন কালের আনন্দ ও আহ্বান।

ঘরে যখন কোনো শুভ ঘটনা ঘটে, যেমন সন্তানের জন্ম বা বিবাহ, সেটাতেও আমাদের দেশের মানুষ সকলকে ডাকে, বলে, "আমার আনন্দে তোমরাও আনন্দ কর। আমার গৃহের উৎসব যখন বাইরে গিয়ে পৌঁছবে তখনই তা সম্পূর্ণ হবে।" বস্তুত মানুষের ব্যক্তিগত শুভ ঘটনা, যা মানব সম্বন্ধের কোনো একটি

বিশেষ রূপকে প্রকাশ করে যেমন জননীর সন্তানলাভ বা নর-নারীর প্রেমসম্মিলন, তাও একান্ত ব্যক্তিগত নয়, নবজাত শিশু বা নবদম্পতি শুধু মাত্র ঘরের না, তারা সমস্ত সমাজের। এইজন্যে গৃহের উৎসবকে সর্ব্বজনের উৎসব যখন করি তখনই তা সার্থক হয়।

'আজকের উৎসবের বাণী হচ্ছে এই যে, সমস্ত মানবের হ'য়ে আমরা একটি ব্রত লাভ করেছি, ব্রতপতি আমাদের এই ব্রতকে সার্থক করুন। এ আমাদের মিলনের ব্রত। একটি মহৎ জীবনের ভিতর থেকে এই ব্রত উদ্ভাবিত, একজন মহামানব এর প্রতিষ্ঠা ক'রে গেছেন, আমরা যেন একে গ্রহণ করি।

মানুষ তার যে জীবনকে সহজে পেয়েছে সেই জীবনকে সৃষ্টি দ্বারা বিশিষ্টতা দিলে তবেই তাকে যথার্থ ক'রে পায়। তা করতে গেলেই কোনো একটি বড়ো সত্যকে আপন জীবনের কেন্দ্ররূপে আশ্রয় করা চাই। সেই কেন্দ্রস্থিত ধ্রুব সত্যের সঙ্গে আপন চিন্তাকে কর্ম্মকে আপন দিনগুলিকে সংযুক্ত ক'রে জীবনকে সুসংযত ঐক্য দিতে পারলে তবেই তাকে বলে সৃষ্টি। এই সৃষ্টির কেন্দ্রটি না পেলে তার দিনগুলি হয় বিচ্ছিন্ন, তার কর্ম্মগুলির মধ্যে কোন নিত্যকালের তাৎপর্য্য থাকে না। তখন জীবনটা আপন উপকরণ নিয়ে স্তূপাকার হ'য়ে থাকে, রূপ পায় না। তাতেই মানুষের দুঃখ। এই বিশ্বসৃষ্টির যজ্ঞে যা কিছু থাকে অস্পষ্ট, বিক্ষিপ্ত, যা কিছু রূপ না পায় তাই হয় বর্জ্জিত। একেই বলেই বিনষ্টি। যাঁরা আপনার মধ্যে সৃষ্টির সার্থকতা পেয়েছেন যাঁরা নিজের জীবনের মধ্যে সত্যকে বাস্তব ক'রে তুলেছেন তাকে রূপ দিতে পেরেছেন, অমৃতাস্তে ভবন্তি।

অধিকাংশ মানুষ বিষয়লাভের উদ্দেশ্যকেই জীবনের কেন্দ্র করে। তার অধিকাংশ উদ্যম এই এক উদ্দেশ্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এতেও জীবনকে ব্যর্থ করে, তার কারণ এই যে মানুষ মহৎ, যতটুকু তার নিজের পোষণের জন্য, যতটুকু কেবল তার অদ্যতন, তাতে তার সমস্তটাকে ধরে না। এই সত্যটিকে প্রকাশ করবার জন্যে মানুষ দুটি শব্দ সৃষ্টি করেছে, অহং আর আত্মা। অহং মানুষের সেই সত্তা যার সমস্ত আকাঙ্ক্ষা ও আয়োজন চিরকালের থেকে ক্ষণিকতার মধ্যে, সর্ব্বলোকের থেকে এককের মধ্যে তাকে পৃথক ক'রে রেখেছে। আর আত্মার মধ্যে তার সর্ব্বজনীন ও সর্ব্বকালীন সত্তা। সমস্ত জীবন দিয়ে যদি মানুষ অহংকেই প্রকাশ করে তবে সে সত্যকে পায় না, তার প্রমাণ, সে সত্যকে দেয় না। কেন না সত্যকে পাওয়া আর সত্যকে দেওয়া একই কথা, যেমন প্রদীপের পক্ষে আলোকে পাওয়া। মানুষের পক্ষে আত্মাকে উপলব্ধি ও আত্মাকে দান করা একই কথা। আপনার সৃষ্টিতে মানুষ আপনাকে পায় এবং আপনাকে দেয়। এই দান করার দ্বারাই সে সর্ব্বকাল ও সর্ব্বজনের মধ্যে নিত্য হয়।

আমাদের মধ্যে বিচিত্র অসংলগ্ন ও পরস্পর-বিরুদ্ধ কত প্রবৃত্তি রয়েছে। এগুলি প্রাকৃতিক; মাটি যেমন, শিলাখণ্ড যেমন প্রাকৃতিক। এরা সৃষ্টির উপকরণ। প্রকৃতির ক্ষেত্রে এদের অর্থ আছে, কিন্তু মানুষ এদের ভিতর থেকে আপন সঙ্কল্পের বলে যখন একটি সম্পূর্ণ মূর্ত্তি উদ্ভাবিত করে, তখনই মানুষ এদের প্রতি আপন সার্থকতার মূল্য অর্পণ করে। বাঘের অস্তিত্বরক্ষায় প্রাকৃতিক প্রবৃত্তির প্রয়োজন আছে, তার হিংস্রতা তার জীবনযাত্রার উপযোগী, এইজন্য তার মধ্যে ভালোমন্দর মূল্যভেদ নাই। কিন্তু কেবলমাত্র জৈব অস্তিত্বরক্ষায় মানুষের সম্পূর্ণতা নয়; বহুযুগের ইতিহাসের ভিতর দিয়ে মানুষ আপনাকে সৃষ্টি ক'রে তুলছে,—সেই তার মনুষ্যত্ব। এই তার আপন সৃষ্টির পক্ষে তার প্রকৃতিগত যে উপাদান অনুকূল তাই ভালো, যা প্রতিকূল তাই রিপু। এইজন্যে মানুষের জীবনের মাঝখানে এমন একটি মূল সত্যের প্রতিষ্ঠা থাকা চাই যা তার সমস্ত বিচ্ছিন্নতা বিরুদ্ধতাকে সমন্বয়ের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ক'রে ঐক্য দান করতে পারে। তবেই সে আপনার পরিপূর্ণ চিরন্তন সত্যকে পায়। সেই সত্যকে পাওয়াই অমৃতকে পাওয়া। না পাওয়া মহতী বিনষ্টি। অর্থাৎ যে বিনাশ তার দৈহিক জীবনের অভাবের বিনাশ সে নয়, তার চেয়েও বেশী, যা তার অমৃত থেকে বঞ্চিত হওয়ার বিনাশ, তাই।

যেমন ব্যক্তিগত মানুষের পক্ষে তেমনি তার সমাজের পক্ষে একটি সত্যের কেন্দ্র থাকা চাই; নইলে সে বিচ্ছিন্ন হয়, দুর্ব্বল হয়, তার অংশগুলি পরস্পর পরস্পরকে আঘাত করতে থাকে। সেই কেন্দ্রটি এমন একটি সর্ব্বজনীন সত্য হওয়া চাই, যা তার সমস্ত বিচ্ছিন্নতাকে সর্ব্বাঙ্গীণ ঐক্য দিতে পারে,—নইলে তার না থাকে শান্তি, না থাকে শক্তি, না থাকে সমৃদ্ধি, সে এমন কিছুকে উদ্ভাবন করতে পারে না, যার চিরকালীন মূল্য আছে। সমাজ মানুষের সকলের চেয়ে বড় সৃষ্টি। সেই জন্যেই দেখি ইতিহাসের আরম্ভ হ'তেই যখন থেকে মানুষ দলবদ্ধ হ'তে আরম্ভ করেছে তখন থেকেই সে তার সম্মিলনের কেন্দ্রে এমন একটি সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে যা তার সমস্ত খণ্ডকে জোড়া দিয়ে এক করতে পারে। এইটের উপরেই তার কল্যাণের নির্ভর। এইটেই তার সত্য, এইটেই তার অমৃত, নইলে তার বিনষ্টি।

বস্তুত এই ঐক্যের মূলে মানবজাতি এমন কিছুকে অনুভব করে যার প্রতি তার ভক্তি জাগে, যার জন্যে সে প্রাণ দেয়, যাকে সে দেবতা ব'লে জানে। মানুষ বাহ্যত বিচ্ছিন্ন, অথচ তার অন্তরের মধ্যে পরস্পর যোগের যে শক্তি নিয়ত কাজ করছে তা পরম রহস্যময়, তা অনির্ব্বচনীয়। তা প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত, অথচ প্রত্যেক ব্যক্তিকেই দেশে কালে বহুদূরে অতিক্রম ক'রে চলে।

বিশেষ বিশেষ উপজাতি আপনাদের ঐক্যবন্ধনের গোড়ায় যে দেবতাকে স্থাপিত করেছে সেই দেবতাই বিশেষ সমাজের মধ্যে ঐক্য

বিস্তার করলেও অন্য সমাজের বিরুদ্ধে ভেদবুদ্ধিকে একান্ত উগ্র ক'রে তোলে। ধর্ম্মের ঐকাতত্ত্বকে সঙ্কীর্ণ সীমায় স্থানিক রূপ দেবামাত্রই তা বাহিরের সঙ্গে বিচ্ছেদের সাঙ্ঘাতিক অস্ত্র হ'য়ে দাঁড়ায়। পৃথিবীতে প্রাকৃতিক বিভীষিকা অনেক আছে, ঝড়, বন্যা, অগ্ন্যুৎপাত, মারী, কিন্তু মানুষের ইতিহাস খুঁজে দেখলে দেখা যায় ধর্ম্মের বিভীষিকার সঙ্গে তাদের তুলনাই হয় না। সর্ব্বমানবের অন্তরতম যে গভীর ঐক্য মানুষের ধর্ম্মই তার সকলের চেয়ে বড়ো শত্রু ছিল, এবং সেই শত্রুতা যে আজো ঘুচে গেছে তা বল্‌তে পারি নে।

তাই যুগে যুগে যাঁরা সাধকশ্রেষ্ঠ তাঁদের সাধনা এই যে, দেবতার সম্বন্ধে মানুষের যে বোধ স্থানে, রূপে ও ভাবে খণ্ডিত তাকে অখণ্ড করা; সাম্প্রদায়িক কৃপণতা যে ধর্ম্মকে আপন আপন বিশেষ বিশ্বাস, বিধি ও ব্যবহারের দ্বারা বদ্ধ করেছে তাকে মুক্ত ক'রে দিয়ে সর্ব্বমানবের পূজাবেদীতে প্রতিষ্ঠিত করা। যখনই তা ঘটে তখনই সেই ধর্ম্মের উৎসবে জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সকল মানুষের প্রতি আহ্বান ধ্বনিত হয়, সেই উৎসব-ক্ষেত্রে কোনো বিশেষ ঐতিহাসিক বেড়া দিয়ে ঘেরা থাকে না। তখন ধর্ম্মবোধের সঙ্গে যে অবাধ ঐকাতত্ত্ব একাত্ম তা উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে।

ইতিহাসে দেখা গেছে, একদা য়িহুদিরা তাঁদের ঈশ্বরকে তাঁদের জাতিগত অধিকারের মধ্যে সঙ্কীর্ণ করে রেখেছিলেন; তাঁদের ধর্ম্ম তাঁদের দেবতার প্রসাদকে নিজেদের ইতিহাসের মধ্যে একান্ত পুঞ্জিত ক'রে রাখবার ভাণ্ডারঘরের মত ছিল। সেই দেবতার নামে ভিন্ন সম্প্রদায়ের সর্ব্বনাশ করাকে নিজ দেবতার পূজার অঙ্গ ব'লেই তাঁরা মনে করেছিলেন। তাঁদের দেবতাকে হিংস্র, বিদ্বেষপরায়ণ, রক্তপিপাসু-রূপে ধ্যান করাই তাঁদের বিশেষ গৌরবের বিষয় ছিল। সেদিন তাঁদের ধর্ম্মোৎসব তাঁদেরই মন্দিরের প্রাঙ্গণে ছিল সঙ্কুচিত, সেখানে বিশ্বের অধিকাংশ মানুষই শুধু যে ছিল অনাহূত তা নয়, তারা শত্রু ব'লেই গণ্য হ'ত।

যিশু এলেন ধর্ম্মকে মুক্তি দিতে। ঈশ্বরকে তিনি সর্ব্বমানবের পিতা ব'লে ঘোষণা করলেন,—ধর্ম্মের সকল মানুষের সমান অধিকার, ঈশ্বরে মানুষের পরম ঐক্য এই সাধন-মন্ত্র যখন তিনি মানুষকে দান করলেন তখন এই সাধনার সম্পদ সকল মানুষের উৎসবের যোগ্য হ'ল।

যিশুর শিষ্যেরা এই মন্ত্র সকলেই সত্যভাবে গ্রহণ করেছে এমন কথা বলতে পারি নে। মুখে যাই বলুক, পাশ্চাত্য জাতির ধর্ম্মবুদ্ধি মোটের উপর ওল্‌ড্ টেষ্টামেণ্টের ভাবেই সংঘটিত। এইজন্য যুদ্ধ-বিগ্রহের সময় তারা ঈশ্বরকে নিজেদের দলভুক্ত ব'লেই গণ্য করে, যুদ্ধে প্রতিকূল পক্ষ বিনষ্ট হ'লে তাতে তারা ঈশ্বরের পক্ষপাত কল্পনা ক'রে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। ঈশ্বরের নামে যে য়ুরোপে হিংস্রতা বহু শতাব্দী ধ'রে প্রশ্রয় পেয়েছে—শুধু তাই নয় যখন তারা যিশুর বাণীর প্রতিধ্বনি ক'রে স্বর্গরাজ্যস্থাপনের কথা বলে তখন সেই সঙ্গেই নিজেদের রাজার জন্যে দেশের জন্যে ঈশ্বরের কৃপায় সকল প্রকার উপায়ে মর্ত্ত্যরাজ্য-বিস্তারের আকাঙ্ক্ষাকেই জয়ী করতে চেষ্টা করে। এমন কি, যুদ্ধবিগ্রহের সময় তাদের ধর্ম্ম-যাজকেরা যত বিদ্বেষের উত্তেজনার অনুমোদন করেছে এমন সৈনিকেরাও নয়।

এর কারণ বাইবেলে যে অংশে ঈশ্বর রাগদ্বেষচালিত দলপতিরূপে কল্পিত ও বর্ণিত সেই অংশই তাদের নিজের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির সহায় হ'য়ে তাদের অহমিকা ও পরজাতিবিদ্বেষকে বল দিয়েছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও খৃষ্টের বাণী যে কাজ করছে না তা হ'তেই পারে না। তার কাজ গূঢ়, গভীর। বস্তুত আমাদের স্বাভাবিক অহঙ্কার দেবতাকে ক্ষুদ্র ক'রে আমাদের শুভবুদ্ধিকে খণ্ডিত করে ব'লেই পরম সত্যের অদ্বৈতরূপ উপলব্ধির জন্যে আমাদের আত্মার গভীর প্রয়োজন।

বুদ্ধদেব জাতিবর্ণ ও শাস্ত্রের সমস্ত ভাগবিভাগ অতিক্রম ক'রে বিশ্বমৈত্রী প্রচার করেছিলেন। এই বিশ্বমৈত্রী যে মুক্তি বহন করে সে হচ্চে অনৈক্য-বোধ থেকে মুক্তি। রিপুমাত্রই মানুষের সঙ্গে মানুষের ভেদ ঘটায়, কেন না ভেদ আমাদের অহং-এর মধ্যে, এবং আমাদের রিপুগুলি এই অহং-এরই অনুচর। তারা আত্মাকে অবরুদ্ধ করে। সাধকেরা যখন ঐক্যের বিশ্বক্ষেত্রে আত্মাকে মুক্তি দান করেন তখনই তার আনন্দকে তার উৎসবকে সর্ব্বদেশে কালে প্রতিষ্ঠিত করেন।

ভারত-ইতিহাসের মধ্যযুগে যখন মুসলমান বাহির থেকে এল তখন সেই সংঘাতে দুই ধর্ম্মের পরীক্ষা হয়েছিল। দেখা গেল এই দুই ধর্ম্মের মধ্যেই এমন কিছু ছিল যাতে মানুষে মানুষে শান্তি না এনে নিদারুণ বিরোধ জাগিয়েছে। হিন্দুধর্ম্ম সেদিন হিন্দুকেও ঐক্যদান করেনি, তাকে শতধা বিভক্ত ক'রে তার বল হরণ করেছে। মুসলমান-ধর্ম্ম আপন সম্প্রদায়কে এক-করা দ্বারা বলীয়ান করেছিল, কিন্তু তার মধ্যে সাম্প্রদায়িক ভেদ-বোধ নির্দ্দয়ভাবে প্রবল ছিল ব'লেই সাম্প্রদায়িক ভিন্নতার ভিতর দিয়েও মানুষের অন্তরতর ঐক্যকে উপলব্ধি করেনি। বাইরের দিক থেকে আঘাত ক'রে মুসলমান মানুষের বাহ্যরূপের প্রভেদকে সবলে একাকার ক'রে দিতে চেয়েছিল। অপর পক্ষে ধর্ম্মের বাহ্যরূপের বেড়াকে বহুগুণিত ক'রে হিন্দু মানুষে মানুষে যে বাহ্য ভেদ আছে তার উপর স্বয়ং ধর্ম্মের স্বাক্ষর দিয়ে তাকে নানা বিধি বিধান ও সংস্কারের দ্বারা আটঘাট বেঁধে পাকা ক'রে দিয়েছিল। সেদিন এই দুই পক্ষে ধর্ম্মবিরোধের অন্ত ছিল না,—আজও সেই বিরোধ মিটতে চায় না।

সেদিন ভারতে যে-সব সাধক জন্মেছিলেন তাঁরা ভেদবুদ্ধির নিদারুণ প্রকাশ দেখেছেন। তাই মানুষের চিরকালীন সমস্যার সমন্বয় করবার জন্যে তাঁদের সমস্ত মন জেগেছিল, এই সমস্যা হচ্চে, ধর্ম্মের বলে ভেদের মধ্যে অভেদের সেতু স্থাপন করা। সে কেমন ক'রে হ'তে পারে? না,

সকল ধর্ম্মের বাহিরে দেশ কালের আবর্জ্জনা জ'মে উঠে তার সাম্প্রদায়িক রূপকে কঠিন ক'রে তোলে, সেদিকে এক সম্প্রদায়ের লোক অন্য সম্প্রদায়কে বাধা দেয়, আঘাত দেয়, কিন্তু তাদের মধ্যে যে অন্তরতম সত্য সেখানে ভেদ নেই বাধা নেই। এক কথায় অবিদ্যার মধ্যেই বাধা, অজ্ঞানের বাধা, যেখানে কোন এক শাস্ত্রে বলে বাসুকীর মাথার উপরে পৃথিবী স্থাপিত সেখানে আর এক শাস্ত্র বলে দৈত্যের কাঁধের উপর পৃথিবী স্থাপিত,—এই মতভেদ নিয়ে আমরা যদি খুনোখুনি করি তবে সেই অজ্ঞানের লড়াই বাইরের দিক থেকে কিছুতেই মিট্‌তে পারে না। কিন্তু জ্ঞানের দিকে বিরোধ মেটে এইজন্যে যে, সেখানে বিশ্বাসের যে আদর্শ সে বিশ্বজনীন বুদ্ধি, সে প্রথাগত বিশ্বাস নয়, লোকমুখের কথা নয়।

আধ্যাত্মিক সাধনার মধ্যে বিশ্বজনীনতা আছে, সাম্প্রদায়িক প্রথার মধ্যে নেই। সেইজন্য ভারতবর্ষের ঐক্যসাধক ঋষিরা সকল ধর্ম্মের মূলে যে চিরন্তন ধর্ম্ম আছে তাকেই ভেদবোধপীড়িত মানুষের কাছে উদ্‌ঘাটিত করেছিলেন। শাস্ত্র সাময়িক ইতিহাসের; আত্মপ্রত্যয় চিরকালের। শাস্ত্র ভেদ ঘটায়, আত্মপ্রত্যয় মিলন আনে। দাদু কবির নানক প্রভৃতি মধ্যযুগের ভারতীয় সাধকেরা ধর্ম্মের শাস্ত্রীয় বাহ্যরূপের বাধা ভেদ ক'রে এক পরম সত্যের আধ্যাত্মিক রূপকে প্রচার করেছিলেন। সেইখানেই সকল বিরোধের সমন্বয়।

এই বিরোধ-সমন্বয়ের প্রয়োজন ভারতে যেমন এমন আর কোথাও নয়। এই ভারত-ইতিহাসে সকলের চেয়ে উজ্জ্বল নাম তাঁদেরই যাঁরা আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষেত্রে মানুষের বিরোধ শান্তি করতে চেয়েছেন। তাঁদের যে গৌরব সে রাষ্ট্রনীতির কূটবুদ্ধির গৌরব নয়, সে গৌরব সহজ সাধনার। এদেশে বড় বড় যোদ্ধা ও সম্রাটের জন্ম হয়েছিল, ঐতিহাসিক বহু অন্বেষণে কালের আবর্জ্জনাস্তূপের মধ্য থেকে তাদের লুপ্তপ্রায় নাম উদ্ধার ক'রে আনেন। কিন্তু এই যে-সব সাধক বাহ্যিকতার আবরণ দূর ক'রে ধর্ম্মের আধ্যাত্মিক সত্যকে সর্ব্বজনের কাছে প্রকাশ করেছেন তাঁরা একদা সর্ব্বজনের কাছে যতই আঘাত ও প্রত্যাখ্যান পেয়ে থাকুন দেশের চিত্ত থেকে তাঁদের নাম কিছুতে লুপ্ত হ'তে চায় না। এঁরা অনেকেই ছিলেন অবিদ্বান অন্ত্যজ জাতীয়, কিন্তু এঁদের সম্মান সর্ব্বকালের; এঁরা ভারতের সব চেয়ে বড়ো অভাব মেটাবার সাধনা করেছেন,—এবং ভেবে দেখতে গেলে সেই অভাব সমস্ত মানুষের।

আধুনিক ভারতে সেই সাধনার ধারা বহন ক'রে এনেছেন রামমোহন রায়। তিনি যখন এলেন তখন সমস্যা আরো জটিলতর, তখন প্রবল রাজশক্তির হাত ধ'রে খৃষ্টান-ধর্ম্মও এই ধর্ম্মভার-বিদীর্ণ দেশে এসে প্রবেশ করেছে। রামমোহন রায় অপমান ও অত্যাচার স্বীকার ক'রে ধর্ম্মের সর্ব্বজনীন সত্যের যোগে মানুষের বিচ্ছিন্ন চিত্তকে মেলাবার উদ্দেশ্যে তাঁর সমস্ত জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। মানবলোকে যাঁরা মহাত্মা তাঁদের এই সর্ব্বপ্রধান লক্ষ্য; মানুষের পরমসত্য হচ্ছে মানুষ এক, এই সত্যকে প্রশস্ত ও গভীরতম ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করাই তাঁদের কাজ। রামমোহন আত্মার দৃষ্টিতে সকল মানুষকে দেখেছিলেন এবং আত্মার যোগে সকল মানুষকে ধর্ম্মসম্বন্ধে যুক্ত করতে চেয়েছিলেন।

সৌভাগ্যক্রমে আমাদের প্রাচীনতন সাধকরাও এই ঐক্যের বাণী চিরকালের মতো আমাদের দান ক'রে গেছেন। তাঁরা বলেছেন, শান্তং শিবমদ্বৈতং—যিনি অদ্বৈত যিনি এক তাঁর মধ্যেই মানুষের শান্তি, তাঁর মধ্যেই মানুষের কল্যাণ। এই বাণী অনেক কাল ভারতে সাম্প্রদায়িক কোলাহলে প্রচ্ছন্ন হয়েছিল। তিনি তাকেই তাঁর জীবনে তাঁর কর্ম্মে ধ্বনিত ক'রে তুললেন। আজ প্রায় একশো বছর হোলো তিনি এই একের মন্ত্র ঘোষণা করেছিলেন। যে ইচ্ছা ভারতবর্ষের গূঢ়তম ইচ্ছা, সেই তার চিরকালের ইচ্ছার সঙ্গে আজকের দিনের যোগ আছে। ভারতের সেই ইচ্ছাই একশত বৎসর পূর্ব্বে ভারতের এক বরপুত্রের জীবনে আবির্ভূত হয়েছিল এবং এইদিনেই তাকে তিনি সফলতার রূপ দিতে চেয়েছিলেন। জানি সকলে তাঁকে স্বীকার করবে না এবং অনেকে তাঁকে বিরুদ্ধতার দ্বারা আঘাত করবে। কিন্তু জীবনে যাঁরা অমৃত লাভ করেছেন প্রতিকূলতার সাময়িক কুহেলিকায় তাঁদের দীপ্তিকে গ্রাস করতে পারবে না। তাই যাঁদের মনে শ্রদ্ধা আছে, তাঁরা ভারতের সনাতন ঐক্যবাণীর একটি উৎস-মুখ ব'লেই আজকের এই দিনের পবিত্রতাকে অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করবেন এবং রামমোহনের মধ্যে যে প্রার্থনা ছিল সেই প্রার্থনাকে কায়মনোবাক্যে উচ্চারিত করবেন যে, ভারতবর্ষ বিচ্ছিন্নতা থেকে, জড়বুদ্ধি থেকে, বহিরন্তরের দাসত্ব-দশা থেকে, মুক্তি লাভ করুক্—য একঃ—স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু।

মার্কিনের মেয়েদের কথা

গত মাঘ ও ফাল্গুনের "বঙ্গলক্ষ্মী"তে শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় মার্কিনের 'মেয়েদের কথা' শীর্ষক যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন নিম্নে আমরা তাহার অংশ উদ্ধৃত করিলাম।

* * *

ছয়-সাত বার ত কালাপানি পার হইয়াছি কিন্তু এ পর্য্যন্ত সমুদ্রের সঙ্গে আমার বনিবনাও হয় নাই। সমুদ্রে জাহাজে চড়িলেই আমার মাথা ঘুরিতে আরম্ভ করে। আমেরিকার পথে একবারও আমি আমার কামরা ছাড়িয়া বাহিরে যাইতে পারি নাই। একদিন প্রাতঃকালে আমার কামরার ইংরাজ খানসামা এক প্লেট ফল আনিয়া আমাকে দেয়। একজন সহযাত্রী মার্কিনী মহিলা, আমি এই জাহাজে আছি

এবং অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছি শুনিয়া, এ উপহার আমাকে পাঠাইয়াছেন। আমি পাইলাম কি না, ইহা সঠিক জানিবার জন্য তিনি এই খানসামার মারফৎ আমাকে আমার কামরায় যাইয়া আমার হাতখানা বাড়াইয়া দেখাইতে অনুরোধ করিয়া পাঠান। নিউইয়র্ক বন্দরে জাহাজ পৌঁছিলে আমি যখন কামরা হইতে বাহির হইয়া উপরে গেলাম, তখন এই মহিলাটি অতিশয় আগ্রহসহকারে আমাকে আসিয়া অভিবাদন করিয়া বলিলেন, "তুমি বিবেকানন্দের দেশের লোক; এই জাহাজে আছ শুনিয়া অবধি আমি তোমাকে দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়াছিলাম। সেদিন তোমার হাতখানা দেখিবার জন্য আমি কিছু সামান্য ফল তোমাকে পাঠাইয়াছিলাম। তুমি জান না বিবেকানন্দ আমাদের কি দিয়াছেন। তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতাতেই তুমি তাঁর দেশের জাতের লোক জানিয়া তোমাকে দেখিবার জন্য এত উৎসুক হইয়াছিলাম।" বিবেকানন্দ অদৃশ্যে থাকিয়াও এই অপরিচিত মার্কিণ মহিলার সঙ্গে আমার পরিচয় করাইয়া দিয়াছিলেন।

একদিন প্রাতঃকালে খবরের কাগজ খুলিয়া দেখিলাম যে বেলা ১০টার সময় হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের অধ্যাপক কার্ণেজি-হলে রামায়ণ ও মহাভারত সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবেন। কার্ণেজি-হল—নামেই পরিচয়, ধনকুবের কার্ণেজির দান, নিউইয়র্ক সহরে একটা প্রসিদ্ধ ও সম্ভ্রান্ত প্রতিষ্ঠান। এই বক্তৃতা শুনিবার জন্য আমার কৌতূহল হইল। পয়সা দিয়া টিকিট কিনিয়া সভায় যাইয়া উপস্থিত হইলাম। হলটা থিয়েটারের মত সজ্জিত। আমি এক ডলার (তখনকার হিসাবে প্রায় ৩৲ টাকা) দিয়া ষ্টলের টিকিট কিনিয়াছিলাম। এই সভায় পুরুষ শ্রোতৃসংখ্যা অতি সামান্য দেখিলাম, বোধ হয় পাঁচজনের বেশী হইবে না। মেয়ের সংখ্যা প্রায় ২৫০ কি ৩০০ হইবে। দেখিয়া অবাক হইয়া গেলাম। রামায়ণ মহাভারতের কথা শুনিবার জন্য এতগুলি মার্কিণী মহিলা পয়সা খরচ করিয়া আসিয়াছেন, স্বচক্ষে না দেখিলে বিশ্বাস করা কঠিন হইত। বক্তৃতা আরম্ভ হইবার মুখে একটি মহিলা আমার কাছে আসিয়া উপরের একটি বক্সে ডাকিয়া লইয়া গেলেন। সেখানে ভারতবর্ষের হিন্দু-সাধনার অনুরাগিণী একজন মার্কিণী মহিলা বসিয়াছিলেন; বক্সটা তাঁহারই ছিল। বক্তার রামায়ণ-মহাভারতের কথার দাম যাচাই করিবার জন্যই এই ভদ্রমহিলা আমাকে অমন করিয়া তাঁহার কাছে ডাকিয়া লইয়া গেলেন। বক্তৃতার পরে বক্তাকে শ্রোতৃবর্গের জেরার জবাব দিতে হয়। যে ভদ্রমহিলা আমাকে তাঁহার বক্সে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার পীড়াপীড়িতে আমাকে দু'চারিটি কথা বলিতে হয়। কি কথা, এতদিন পরে তাহার বিন্দুবিসর্গ মনে নাই। কিন্তু সভার কাজ শেষ হইলে আমাকে মেয়েরা আসিয়া ঘেরিয়া দাঁড়ান ও আমার মুখে ভারতবর্ষের কথা শুনিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন; এবং কেহ কেহ আমাকে নিউইয়র্কের সকলের চাইতে বড় মেয়েদের ক্লাবে নিমন্ত্রণ করিয়া যান।

আমেরিকায় বিলাতের মত অভিজাত্য বা aristocracy নাই। বিলাতী সমাজে বড় লোকদিগকে "upper ten" বলে। ইহার অর্থ সমাজের উপরকার দশজন। সমাজের শতকরা দশজনই শীর্ষস্থানীয়; বাকী নব্বইজন সাধারণ লোক। মার্কিণে "upper ten" বলে না; "upper five hundred" বলে। অর্থাৎ মার্কিণের আভিজাত্যের মাপে সমাজের শতকরা পঞ্চাশজনই শ্রেষ্ঠী শ্রেণীর অন্তর্গত। যে মহিলাদের ক্লাবে আমাকে ইঁহারা নিমন্ত্রণ করেন, সেই ক্লাব সমাজে বড়লোকের ক্লাব। যতদূর মনে পড়ে ইহার নাম (Bernard Club) বার্ণার্ড ক্লাব। এই ক্লাবের সভ্য-সংখ্যা সহস্রাধিক। এখানে পুরুষদিগের প্রবেশাধিকার নাই; তবে পশ্চিমের পুরুষদের ক্লাবে যেমন মাঝে মাঝে মহিলাদিগকে নিমন্ত্রণ করা হয়, সেইরূপ এই মহিলা-ক্লাবেও মাঝে মাঝে পুরুষদের নিমন্ত্রণ করা হয়। মহিলা-ক্লাবের সভ্যেরা তাঁহাদের পুরুষ আত্মীয়-স্বজন বা বন্ধুবান্ধবদিগকে সেদিন ক্লাবের মজলিসে লইয়া যাইতে পারেন। আমি একদিন মাত্র এই ক্লাবে গিয়াছিলাম। সে কি বিরাট ব্যাপার! অনেক সভ্যেরা নিউইয়র্কে আসিয়া এই ক্লাবে বাস করেন। এ ছাড়া ক্লাবের স্থায়ী বাসিন্দাও আছেন। ক্লাবের বাড়ীটা বিস্তৃত ভূমির উপরে স্থাপিত। এখানে সভ্যদিগের সুবিধার জন্য সকল ব্যবস্থাই রহিয়াছে। ইহার সংলগ্ন একটা বড় পুস্তকাগারও আছে। এই সকল ব্যবস্থার জন্য প্রতিমাসে কত টাকা যে খরচ হয়, তাহা বলা যায় না। আমরা এদেশে সে কল্পনাও করিতে পারিব না। আর এই সব খরচই সভ্যেরা জগাইয়া থাকেন।'

একবার নিউইয়র্কের বাহিরে একটা মফঃস্বলের সহরে এক সভায় আমি বক্তৃতা দিতে যাই। ভারতবর্ষের কথা বলিবার জন্যই আমি অনুরুদ্ধ হইয়াছিলাম। সভাস্থলে যাইয়া দেখিলাম প্রায় সাত-আট শত মহিলাতে সভাস্থল পরিপূর্ণ হইয়াছে।—বক্তৃতামঞ্চের সম্মুখে জন দুই পাত্রী এবং মঞ্চের উপরে আমি—আর এ ছাড়া আরও দুই তিন জন মাত্র পুরুষ এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। মোট কথা এই মার্কিণের পুরুষেরা সারাদিন অর্থোপার্জ্জনেই ব্যস্ত থাকেন। সে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের পরে তাঁদের আর সন্ধ্যার পরে এক থিয়েটার ছাড়া আর কোথাও যাইবার দেহের শক্তি বা মনের প্রবৃত্তি থাকে না। স্বামীদিগের অর্জ্জিত অর্থে গৃহস্বামিনীরা গার্হস্থ্য কর্ম্ম হইতে স্বচ্ছন্দ অবসর লাভ করিয়া নানাবিধ মানসিক এবং সামাজিক উন্নতিকল্পে আপনাদিগের সময় এবং শক্তি নিয়োজিত করিয়া থাকেন। এইরূপে মার্কিণের শিক্ষিত ও উচ্চশ্রেণীর মহিলারাই একরূপ সমাজের উচ্চতর সাধনার দিকটা বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন ও ফুটাইয়া তুলিতেছেন।

মার্কিণের অভিনব সভ্যতা ও সাধনা টাকার ভারে পিষিয়া যাইত এবং ঐশ্বর্য্যের উত্তাপে একেবারে শুকাইয়া পড়িত যদি মার্কিণের মেয়েরা নিজেদের এই সাধনা ও সভ্যতার সেবাতে নিয়োজিত না করিতেন। মার্কিণের 'আসুরিক' সম্পদের প্রতিষ্ঠা পুরুষদিগের মনীষা ও কার্য্যকুশলতার উপরে। আর তাহার দৈবী সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণের ভার বিশেষভাবে পড়িয়াছে মার্কিণী মহিলাদের উপরে। মার্কিণের ধনকুবেরগণের পত্নী ও কন্যারা যদি কেবল ভোগবিলাসেই ডুবিয়া থাকিতেন, তাহা হইলে আমেরিকা যে একটা বিরাট ও উদার আধ্যাত্মিক সম্পদ অর্জ্জন করিতেছে এবং একটা নূতন সাধনা গড়িয়া তুলিতেছে ইহা কখনই সম্ভব হইত না।

মার্কিণের বাণিজ্যকেন্দ্র নিউইয়র্ক ও সিকাগো, আর সাধনার কেন্দ্র শতাধিক বর্ষাবধি হইয়াছিল বোষ্টন। একবার এই বোষ্টনের এক মহিলাসমিতি তাঁহাদের সভাতে আমাকে বক্তৃতা করিতে নিমন্ত্রণ করেন। আমি তখন নিউইয়র্কে ছিলাম। আমি যে হোটেলে ছিলাম সেখানকার একটি মহিলা আমি বোষ্টনে মেয়েদের কাছে বক্তৃতা করিতে যাইব শুনিয়া কহিলেন "মিষ্টার পাল, তুমি তাদের কাছে কি বলিবে? তারা কেবল ভাববাচ্যে কথা বলে। তারা তত্ত্বকথা ভিন্ন আর কোন কথা জানে না।" তাদের আলোচ্য বিষয়--"Whichness of the why and whyness of the which"। আমি ইঁহাদিগকে আমার বক্তব্যবিষয়ে একটা তালিকা পাঠাইয়া দিই। তাহার মধ্যে এ সকল বিষয় ছিল--"ভারতীয় ব্রহ্মতত্ত্ব", "এমার্স'ন ও হিন্দু-সাধনা", "ব্রিটিশ শাসনাধীনে ভারত" ইত্যাদি। আমি ভাবিয়াছিলাম ইঁহারা প্রথম বা দ্বিতীয় বিষয়টিই নির্ব্বাচন করিবেন। কিন্তু বর্ত্তমান ভারতের রাষ্ট্রকথা শুনিবার জন্য ইঁহারা বেশী উৎসুক হইলেন। যতদূর মনে পড়ে বোষ্টনের একটা বড় সভামণ্ডপে আমার এই বক্তৃতার বন্দোবস্ত হইয়াছিল। এই বাড়ীর নাম Tremont Temple। এই বাড়ীতে ছোটবড় অনেকগুলি সভামণ্ডপ আছে। সব চাইতে বড় মণ্ডপে তিন চার হাজার লোকের বসিবার ব্যবস্থা আছে। এখানে আমি একবার পরে বক্তৃতা দিয়াছিলাম। এবারে কিন্তু একটা মাঝারি মণ্ডপে মহিলাদের সভা হয়। বোধ হয় পাঁচ-ছয় শত মহিলা সে সভায় উপস্থিত ছিলেন। যতদূর মনে পড়ে মার্কিণ মহিলাদের মুকুটমণি অশীতিপরা বৃদ্ধা জুলিয়া ওয়ার্ড হাউই (Julia Ward Howe) সভানেত্রী হইয়াছিলেন। আমি ভারতবর্ষে বর্ত্তমান ইংরাজ-শাসনের ভালমন্দ দুই দিকই নিরপেক্ষভাবে বর্ণনা করি। আমেরিকায় কোন বক্তা কেবল বক্তৃতা করিয়াই অব্যাহতি পান না। আদালতে যেমন সাক্ষীর জেরা হয়, বক্তৃতান্তে সেইরূপ শ্রোতৃবর্গ তাঁর বক্তব্য বিষয় সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন করিয়া থাকেন। সে সকল প্রশ্ন মাঝে মাঝে বড়ই অদ্ভুত হয়। মনে পড়ে একটি মহিলা, যিনি স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে বিশেষ পরিচিত ছিলেন, আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,--"আপনি কি একজন স্বামী?" আমি একটু হাসিয়া জবাব দিলাম--"হাঁ ও না--স্বামী অর্থ আমাদের ভাষায় পতি (husband); কলিকাতায় আমার পত্নী (wife) রহিয়াছেন, সুতরাং আমি স্বামী ত বটেই। কিন্তু স্বামী শব্দে সন্ন্যাসীও বুঝায়। এই অর্থে বিবেকানন্দ স্বামী। তাঁদের স্ত্রী না থাকিলেও তাঁরা স্বামী; আমি সে স্বামী নহি।" আমার উত্তর শুনিয়া সভাস্থলে হাসির রোল উঠিল। আর একটি মহিলা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি ইংরাজ-শাসনে তোমাদের দেশে যে উপকারের কথা বলিলে, ইহা কি সত্য? পরদেশীর অধীনতাতে কোন দেশের কিছু কি ভাল হইতে পারে?" আমি বলিলাম, "আলোক ও ছায়ার মতন এই দুনিয়ায় ভালমন্দ মিশিয়া আছে। তোমাদের এমার্সনই কহিয়াছেন,--For every good there is a counterpoise of evil and for every evil there is some compensation of good; সুতরাং ভারতের ইংরাজ-শাসনেও ভালমন্দ মিশিয়া আছে।" এইরূপে আরও কত প্রশ্নের জবাব আমাকে দিতে হইয়াছিল; সে সকল জবাব যে ঠিক হইয়াছিল আজ এ কথা মনে করি না। কারণ ইংরাজ আসিবার পূর্ব্বে আমাদের দেশের সাধনা ও সভ্যতা সম্বন্ধে আমরা যাহা জানিতাম এই আটাশ বৎসরের মধ্যে তাহার চাইতে অনেক বেশী জানিয়াছি।

নিউ-ইয়র্কে যাইয়া আমি যে হোটেলে উঠিয়াছিলাম, সেই হোটেলের দুইটি ভদ্রমহিলার সঙ্গে আমার সর্ব্বাপেক্ষা বেশী আত্মীয়তা হয়। প্রথম দিন সন্ধ্যাবেলা খাবার ঘরে যাইবার সময় আমার পিছন হইতে কে একজন বলিলেন, "ইনি কি পাল মহাশয়? ভারতবর্ষ হইতে আসিয়াছেন?--Is that Mr. Pal from India?" আমি ফিরিয়া দাঁড়াইলাম, দাঁড়াইয়া দেখিলাম দুইটি ভদ্রমহিলা আমার দিকে আসিতেছেন। একজন বর্ষীয়সী কিন্তু অসাধারণ রূপলাবণ্যবতী। বয়সের অনিবার্য্য চিহ্নসকল মুখে প্রকাশিত; কিন্তু তাহাতে তাঁহার যৌবনের রূপকেই মনে করাইয়া দেয়, তাহার শেষ চিহ্ন নষ্ট করিতে পারে নাই। গ্রীসের ও রোমের সমাজের উচ্চতম শ্রেণীর মহিলাদিগের যে ছবি মাঝে মাঝে দেখিয়াছি, এই মহিলার অঙ্গসৌষ্ঠবে তাহাই যেন দেখিতে পাইলাম। ইঁহার বয়স পরে জানিয়াছিলাম, তখন ৮৩।৮৪ ছিল। ইঁহার সঙ্গিনী অপেক্ষাকৃত খর্ব্বাকৃতি, চেহারা সাদা-সিদা ধরণের। আমার কাছে আসিয়া বলিলেন, "আপনি এই হোটেলে আসিয়াছেন শুনিয়া অবধি আমরা আপনার পরিচয়-লাভের জন্য আগ্রহাতিশয্য-সহকারে অপেক্ষা করিতেছিলাম। আপনার সঙ্গে আমাদের পরিচয় করাইয়া দেয়, এখানে এমন কেহ নাই দেখিয়া নিজেরাই আসিয়া আপনার সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিলাম। আসুন, আমাদের টেবিলে বসিয়া একত্র আহার করা যাউক। বোধ হয় এখনও আপনার কোন

নির্দ্দিষ্ট টেবিলে বন্দোবস্ত হয় নাই।" এই হোটেলের খাবার-ঘরে শতাধিক লোকের বসিবার ব্যবস্থা ছিল। অনেকগুলি ছোট ছোট টেবিল চারিদিকে সাজান ছিল। কোন টেবিলে বা দু'জন, কোনটিতে বা চারিজন, আর দু'চারটা বড় টেবিলে একসঙ্গে ছয়জন বা আটজন বসিবারও আসন ছিল। হোটেলে যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারা অধিকাংশ সপরিবারে বাস করিতেছিলেন। তাঁদের এক-একটা নির্দ্দিষ্ট টেবিল ছিল। এ ছাড়া অন্য লোকেরা নিজেদের মধ্যে ছোট ছোট দল বাঁধিয়া এক-একটা নির্দ্দিষ্ট টেবিলে যাইয়া বসিলেন। এই দুইটি ভদ্রমহিলার একটা স্বতন্ত্র টেবিল ছিল। সেই টেবিলে চারিজন লোক বসিবার ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু টেবিলটা তাঁদেরই দু'জনার জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। আমাকে সঙ্গে করিয়া তাঁহারা এই টেবিলে যাইয়া বসিলেন। আমি যতদিন এই হোটেলে ছিলাম, এই টেবিলে বসিয়াই ইঁহাদের সঙ্গে দু'বেলা যাইয়া আহার করিতাম। টেবিলে যাইয়া বসিলে বর্ষীয়সী মহিলাটি কহিলেন, "এখানে তোমার কাহারও সঙ্গে তেমন আলাপ-পরিচয় এখনও হয় নাই। একেলা বসিয়া খাইতে তোমার বড় অসুবিধা হইবে ভাবিয়া আমরা উপযাচক হইয়া তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়া তোমাকে আমাদের টেবিলে আনিয়াছি। আমাদের স্বার্থ, ভারতবর্ষের সভ্যতা ও সাধনাকে আমরা অতিশয় শ্রদ্ধা করি; তোমার মুখে তার কথা শুনিবার জন্য এই সুযোগ সৃষ্টি করিলাম।"

এই বর্ষীয়সী মহিলাটির জীবনের ইতিহাস শুনিয়া তাঁহার প্রতি আমার অন্তরের সহানুভূতি ও শ্রদ্ধা আপনা হইতেই উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল। ইনি অন্ধ; দেখিলে কিন্তু তাহা বুঝা যায় না। কেবল কিছুক্ষণ ধরিয়া তাঁহার চোখের দিকে চাহিয়া থাকিলে এ সন্দেহ জন্মিতে পারে। বিংশতি বর্ষ বয়সে তাঁহার বিবাহ হয়। কিন্তু বিবাহের দিনেই তিনি বিধবা হইয়াছিলেন। স্বামী-স্ত্রীতে নূতন ঘরে প্রবেশ করিবার অল্পক্ষণ পরেই তাঁহার স্বামী ঘোড়ায় চড়িয়া সন্ধ্যা-কালে একটু বেড়াইতে যান। স্ত্রী এদিকে নূতন ঘরে নূতন টেবিল সাজাইয়া স্বামীর প্রতীক্ষায় বসিয়া আছেন। অল্পক্ষণ পরেই প্রতিবেশীরা স্বামীর মৃতদেহ বাড়ীর দেউড়ীর দরজার উপরে বহন করিয়া লইয়া আসিল। ঘোড়া হইতে পড়িয়া গিয়া সাংঘাতিক আঘাত পাইয়া রাজপথেই তাঁহার জীবন-লীলা পরিসমাপ্ত হয়। নববধূ এই আকস্মিক বজ্রাঘাতে কিছুদিন পর্য্যন্ত একরূপ বাহ্যচেতনাশূন্য হইয়া ছিলেন। শরীর তাঁহার কাজ করিতেছিল, চলাফেরা সবই করিতেন, কিন্তু মন বিকল হইয়া যায়। কিছুদিন চোখে এক ফোঁটা জল পর্য্যন্ত বাহির হয় নাই। ক্রমে একটু একটু করিয়া বাহ্যচৈতন্য ফিরিয়া আসিল, সঙ্গে সঙ্গে চোখের জল অবিরামধারাতে প্রবাহিত হয়। তিন মাসের মধ্যে দু'টি চক্ষুই একেবারে অন্ধ হইয়া যায়। সদ্যপরিণীত স্বামী এমন সংস্থান রাখিয়া যান নাই, যাহাতে বিধবার স্বচ্ছন্দে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ হয়। যে সামান্য সঙ্গতি ছিল, তাহা অবলম্বন করিয়া তাঁহার অন্ধ বিধবা একটা অন্ধদিগের স্কুলে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেখানে দুই-তিন বৎসর থাকিয়া ভাল করিয়া লেখাপড়া শিখিয়া ইনি সাহিত্যসেবায় আপনার জীবন উৎসর্গ করেন। "এলিস" নামে তাঁহার প্রথম উপন্যাস প্রকাশিত হয়। ইহাতে গল্পচ্ছলে তিনি তাঁহার নিজের কথাই বিবৃত করেন। রসসৃষ্টির হিসাবে বইখানি খুব উৎকর্ষলাভ না করিলেও লেখিকার জীবনীর করুণ কাহিনীতে মার্কিণের সাহিত্য-সমাজে "এলিস" খুব প্রতিষ্ঠালাভ করে। সেই হইতে গল্প লিখিয়া, প্রবন্ধ লিখিয়া, বিবিধ উপায়ে ইনি আপনার জীবিকা-উপার্জ্জন করেন। সম্পত্তিশালিনী না হইলেও স্বচ্ছলভাবে ইহাতেই তাঁহার ভরণপোষণের ব্যবস্থা হয়। যে অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্কা মহিলা তাঁহার সঙ্গে ছিলেন, তিনি সেক্রেটারীর কাজ করিতেন। ইঁহাকে তিনি "Little Eyes" বলিয়া ডাকিতেন। ইঁহার নাম ছিল কুমারী ফক্স। দু'জনেই যুক্তরাজ্যের ভার্জ্জিনিয়া প্রদেশের লোক ছিলেন। ইঁহারা দু'জনে আমাকে যে স্নেহ ও আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা কখনও ভুলিব না। নিউইয়র্ক সহরে আমি যখন যেখানে বক্তৃতা করিতাম সেখানেই তাঁরা আমার সঙ্গে যাইতেন। এইরূপে তিন-মাসাধিক কাল আমি ইঁহাদের সঙ্গে নিউইয়র্কে একই হোটেলে বাস করিয়াছিলাম। নিউইয়র্কেই আমার আড্ডা ছিল। এখান হইতেই আমি মার্কিণের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বক্তৃতা করিয়া বেড়াইতাম। মাস তিনেক পরে ইঁহারা নিউইয়র্ক ছাড়িয়া যুক্তরাজ্যের রাজধানী ওয়াশিংটনে চলিয়া যান। বিদায়কালে আমি শেষ বিদায় গ্রহণ করিতে গেলে তাঁরা কহিলেন, নিউইয়র্কে তোমার সঙ্গে শেষ দেখা হইতেই পারে না। তুমি আমেরিকায় আসিয়া আমাদের রাজধানী না দেখিয়া চলিয়া যাইবে, আমরা ইহা ভাবিতেই পারি না। ওয়াশিংটনে তোমার সঙ্গে দেখা হইবেই হইবে। আমি কহিলাম, আমি ত দেশ বেড়াইতে আসি নাই, সে সঙ্গতিও আমার নাই। যেখান হইতে কাজের ডাক আসে সেখানেই আমি যাই; তারাই আমার খরচপত্র জোগাইয়া থাকে, আপনারা ইহা জানেন। যদিও তাঁরা বলিলেন, ওয়াশিংটনে দেখা হইবে, আমি তাহার কোন সম্ভাবনা না দেখিয়া নিউইয়র্কের হোটেলেই তাঁহাদের নিকট হইতে বিদায় লইলাম।

ইহার পরে দুইমাস কাটিয়া গেল। ২রা জুন আমি ইংলণ্ডে ফিরিবার জন্য যাত্রা করিব ঠিক করিয়া তাহার ব্যবস্থা করিলাম। দিন ১০।১৫ পূর্ব্বে ইঁহাদিগকে আমার শেষ বিদায়লিপি পাঠাইলাম। ইহার উত্তরে কুমারী ফক্স আমাকে তার করিলেন যে, আমার ওয়াশিংটনে যাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

কি করিয়া আমার ওয়াশিংটনে আসার ব্যবস্থা হয় সে এক অদ্ভুত কাহিনী। এই কাহিনীতে মার্কিণসভ্যতার বৈশিষ্ট্য ও প্রাণবস্তু দেখিলাম ফুটিয়া উঠিয়াছে। মার্কিণ-রাষ্ট্রনীতি ও সমাজনীতির মূল কথা—মানুষ বলিয়াই একটা মৌলিক মহত্ত ও মর্য্যাদা আছে। উচ্চ-পদে কিম্বা বিপুল অর্থে এ মর্য্যাদা যে বাড়ায় না তাহা নহে; পদের বা অর্থের মূল্য এখনও পৃথিবীর কোথাও নষ্ট হয় নাই, মার্কিণেও নহে। কিন্তু অন্যান্য দেশে যার পদ বা অর্থ নাই, তার নিছক মনুষ্যত্বের মর্য্যাদা ও মূল্য প্রায় হয় না। যাঁরা কিঞ্চিৎ পরিমাণেও নিজেদের মনীষা কিম্বা চরিত্রের দ্বারা অতি-মানুষের কিম্বা আমাদের প্রাচীন পরিভাষা "লোকত্তরের" প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। উচ্চপদ না থাকিলেও কিম্বা আকাশবৃত্তি অবলম্বন করিয়াও ইঁহারা সকল দেশেই লোকসমাজে সম্মানিত হইয়া থাকেন। কিন্তু মার্কিণে অতি সামান্য লোকেরাও কোন ভাল বিষয় হাতে লইলে সমাজের শ্রেষ্ঠীরাও ইঁহাদের কথায় কর্ণপাত করেন, এবং ইঁহাদের কার্য্যে স্বচ্ছন্দভাবে সাহায্য করিতে কুণ্ঠিত হন না।

কুমারী ফক্স আমি ওয়াশিংটন না দেখিয়াই আমেরিকা পরিত্যাগ করিতেছি, এই সংবাদ পাইয়াই কি করিয়া আমাকে ওয়াশিংটন নেওয়া যাইতে পারে সে চেষ্টায় প্রবৃত্ত হ'ন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে ভারতীয় সাধনা ও সভ্যতার কথা যাঁহাদের আগ্রহসহকারে শুনিবার সম্ভাবনা আছে, তাঁহাদের দ্বারাই কেবল ওয়াশিংটনে আমার একটা বক্তৃতার ব্যবস্থা হইতে পারে। ওয়াশিংটনে একটা দার্শনিকমণ্ডলী বা Philosophical Society ছিল, বোধ হয় এখনও আছে। কুমারী ফক্স যে দিন আমার চিঠি পাইলেন, সেইদিনকার স্থানীয় সংবাদপত্র খুলিয়া দেখিলেন, সেইদিন অপরাহ্নেই এই মণ্ডলীর একটা অধিবেশন হইবে। তিনি যথাসময়ে সেখানে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। সেই মণ্ডলীর সম্পাদকের নিকটে আপনার নাম লিখিয়া একটু চিরকুট পাঠাইয়া দেখা করিতে চাহিলেন। সম্পাদক তখনই আসিয়া তাঁহার সঙ্গে দেখা করিলেন। তাঁহাকে কুমারী ফক্স কহিলেন, "আপনারা দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনা করেন। আমি ধরিয়া লইতেছি যে আপনারা হিন্দু দর্শনেরও ভারতীয় সাধনার কথা একজন ভারতবর্ষের লোকের মুখে নিশ্চয়ই শুনিতে চাহিবেন। নানাস্থানের সংবাদপত্রে আপনারা তাঁর নামও শুনিয়া থাকিবেন। নিউইয়র্ক, বোষ্টন, সিকাগো, সেণ্টলুই প্রভৃতি বড় বড় সহরে বিদ্বজ্জনমণ্ডলী-সমক্ষে ভারতীয় দর্শন ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছেন—তাঁর নাম বিপিনচন্দ্র পাল। তিনি ওয়াশিংটনে আসেন নাই। আগামী সপ্তাহেই আমেরিকা ছাড়িয়া যাইবেন। আমার অনুরোধ, এ সপ্তাহেই আপনারা তাঁহাকে আপনাদের সভাতে আসিতে আমন্ত্রণ করিয়া পাঠান। আপনাদের এ জন্য বেশীকিছু খরচের ব্যবস্থা করিতে হইবে না। কেবল একটা হলের ও সভার বিজ্ঞাপনাদির ব্যবস্থা করিলেই হইবে।" সম্পাদক তাঁহার কর্ম্মীসমিতিকে তখনই যাইয়া একথা জানাইলেন ও কুমারী ফক্সকে তাঁহাদের সঙ্গে পরিচিত করিয়া দিলেন। তাঁরা হলের ও সভার অন্যান্য বন্দোবস্ত করিতে রাজী হইলেন। পরবর্ত্তী বৃহস্পতিবারে সভার দিন ধার্য্য হইল; কুমারী ফক্স অমনি আমাকে তাহার পূর্ব্বদিনের গাড়ীতে ওয়াশিংটনে পৌছিবার জন্য তার করিলেন। সভার ঘর ত পাওয়া গেল। সভা যাঁরা আহ্বান করিবেন তাঁরাও অনেকেই সভাতে উপস্থিত থাকিবেন, ইহাও ঠিক হইল। কিন্তু তাঁরা ক'জন। Philosophical Societyর সভ্য-সংখ্যা কোথাও শতের ঘরে পৌছায় না। আমাকে ডাকিয়া আনিয়া ২০।২৫ জন লোকের সামনে দাঁড় করাইলে, কুমারী ফক্স ভাবিলেন, আমার প্রতিও উপযুক্ত সম্মান দেখান হইবে না, আর মার্কিণ যুক্তরাজ্যের রাজধানীরও তাহাতে মুখ থাকিবে না। সুতরাং সভাগৃহ যাহাতে শ্রোতৃবর্গে পরিপূর্ণ হয়, ইহার ত ব্যবস্থা করিতে হইবে। আমাদের দেশে যখন তখন হাজারখানেক বিজ্ঞাপন বিলি করিয়াই একটা বড় সভা করিতে পারা যায়। বিলাতে বা মার্কিণে ইহা সম্ভব নহে। সেখানকার লোকেরা সর্ব্বদাই নানা কাজে ব্যস্ত থাকে। বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই তাহাদের কাজের বরাদ্দ হইয়াও রহে। সুতরাং যখন-তখন একটা সভা ডাকিলেই তাহাতে লোকসংঘট্ট হয় না। বিশেষতঃ, সমাজের চিন্তানায়কেরা যদি আমার এই বক্তৃতায় উপস্থিত না হয়, তাহা হইলে সমুদয় শ্রম পণ্ড হইয়া যাইবে, ইহা ভাবিয়া কুমারী ফক্স তখন ওয়াশিংটনের শ্রেষ্ঠ মনীষীদিগের সন্ধানে ছুটিলেন। ডাঃ ডব্লিউ, টি, হ্যারিস সে সময়ে কেবল ওয়াশিংটনে নহে সমগ্র আমেরিকায় দার্শনিকদিগের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। ডাঃ হ্যারিস মার্কিণ যুক্তরাজ্যের শিক্ষাবিভাগের কমিশনার ছিলেন। ডাঃ হ্যারিসের নাম ইংলণ্ড এবং য়ুরোপেও দার্শনিক-সমাজে বিশেষ সুপরিচিত ছিল। তিনি জর্ম্মাণ দার্শনিক হেগেলের ন্যায়ের বা Logicএর ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছিলেন এবং হেগেলীয় দর্শনের একজন খুব বড় ব্যাখ্যাতা ছিলেন। "Journal of Speculative Philosophy" নামে একখানি উচ্চাঙ্গের দার্শনিক পত্রের সম্পাদক ছিলেন। কুমারী ফক্স সকলের আগে তাঁহার নিকটে যাইয়া উপস্থিত হইলেন, এবং আমার বক্তৃতার কথা বলিয়া এই সভায় তাঁহাকে সভানায়কের পদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। তিনি সভায় উপস্থিত হইবেন প্রতিশ্রুতি দিলেন, কিন্তু অবসর-অভাবে সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে পারিবেন না, বলিলেন। তারপর ডাঃ হ্যারিস সভার খরচপত্র কে যোগাইতেছে জিজ্ঞাসা করিলেন। কুমারী ফক্স বলিলেন, তার কোন বিশেষ বন্দোবস্ত তখনও হয় নাই, তবে বক্তাকে কোন দক্ষিণা দিতে হইবে না বলিয়া তিনি সেজন্য বিশেষ উদ্বিগ্ন হন নাই। ডাঃ হ্যারিস তখন তাঁহার হাতে একখানা দশ ডলারের নোট দিয়া কহিলেন,

"আমার এই সামান্য সাহায্য গ্রহণ করুন।" ডাঃ হ্যারিসের সঙ্গে দেখা করিয়া কুমারী ফক্স আরও দু'চারজনের সঙ্গে দেখা করিলেন। তাঁহাদের নাম আমার মনে নাই।

সভার বন্দোবস্ত ত একরূপ হইল। ওয়াশিংটনে আমার আতিথ্যের ব্যবস্থার কি হইবে? কুমারী ফক্সেরা একটা Boarding Houseএ ছিলেন। সেখানে আমার থাকার বন্দোবস্ত সহজেই হয়, কিন্তু তাহাতে আমি ইঁহাদেরই অতিথি হইব, ওয়াশিংটনের অতিথি হইব না। ওয়াশিংটনের সমাজের শীর্ষস্থানীয় কোন পরিবারে আমার আতিথ্যসৎকারের ব্যবস্থা না হইলে আমারও সম্মান থাকে না, ওয়াশিংটন-সমাজেরও মুখরক্ষা হয় না। ইহা ভাবিয়া কুমারী ফক্স তখন ওয়াশিংটনের অভিজাতশ্রেণীর য়ুনিটেরিয়ান সম্প্রদায়ভুক্ত একজন মহিলার সঙ্গে যাইয়া দেখা করিলেন। ইঁহার নাম মিসেস্ ব্লাণ্ট্, ইঁহার স্বামী জেনারেল ব্লাণ্ট্। ইনি আমার নাম জানিতেন। আমি ওয়াশিংটনে যাইতেছি, একথা শুনিবামাত্রই আমার আতিথ্যসৎকার করিতে রাজী হইলেন। কিন্তু ইহাতেও কুমারী ফক্সের মন উঠিল না। তিনি মিসেস্ ব্লাণ্ট্‌কে কহিলেন,--কেবল আতিথ্যসৎকার করিলেই ত চলিবে না, ওয়াশিংটন-সমাজের দ্বারা তাঁহার সম্বর্দ্ধনার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। অর্থাৎ তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিবার জন্য আপনাকে একটা সান্ধ্যসম্মিলনের বা Evening Partyর ব্যবস্থা করিতে হইবে। মিসেস্ ব্লাণ্ট কহিলেন, তিনি আহ্লাদসহকারে তাহা করিতেন, কিন্তু সম্প্রতি তাহার কন্যার বিবাহ হইয়া গিয়াছে, তিনি একলা পড়িয়া আছেন। তাঁহার পক্ষে এ অবস্থায় এত অল্প সময়ের মধ্যে এরূপ একটা সামাজিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা সম্ভব নহে। কুমারী ফক্স তখন নিমন্ত্রণপত্র পাঠাইবার ভার নিজে গ্রহণ করিতে রাজী হইলেন, এবং মিসেস্ ব্লাণ্টের নিমন্ত্রিতদিগের তালিকা আনিয়া মিসেস্ ব্লাণ্টের স্বাক্ষরিত কার্ডে তাঁহাদের নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন।

তারপর বাকী রহিল যুক্তরাজ্যের রাষ্ট্রপতির সঙ্গে আমার দেখা-সাক্ষাতের ব্যবস্থা করা। কুমারী ফক্স পরদিন পূর্ব্বাহ্নে রাষ্ট্রপতির প্রাসাদে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। স্বাধীন রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির দরজা সকলের কাছেই খোলা। কুমারী ফক্স একরূপ নগণ্য রমণী হইলেও এই অবারিত দ্বার দিয়া রাষ্ট্রপতির প্রাসাদে যাইয়া তাঁহার প্রাইভেট্ সেক্রেটারীর সঙ্গে দেখা করিলেন। মিঃ ম্যাক্‌কিন্‌লি তখন মার্কিনের যুক্তরাজ্যের রাষ্ট্রপতি। কখন তাঁহার সঙ্গে আমার দেখা হয়, এই কথা তুলিলে প্রাইভেট্ সেক্রেটারী সময়াভাব বলিয়া এ দায় এড়াইতে চাহিলেন। কুমারী ফক্স তখন তাঁহাকে কহিলেন, পাল মহাশয় মিসেস্ ব্লাণ্টের অতিথি হইবেন। মিসেস্ ব্লাণ্টের প্রতিনিধিস্বরূপেই আমি আপনার নিকট আসিয়াছিলাম। যাহা হউক, আপনি যাহা বলিলেন, মিসেস্ ব্লাণ্টকে যাইয়া তাহা বলিব। প্রাইভেট্ সেক্রেটারী তখন শশব্যস্ত হইয়া বলিলেন,—"না, না, দেখি কোন মতে একটু সময় করিতে পারি না কি!"--এই বলিয়া বোধহয় রাষ্ট্রপতির সঙ্গে যাইয়া কথা কহিয়া আসিয়া একটা দিন ও সময় নির্দ্ধারণ করিয়া আমাকে তখন লইয়া আসিতে বলিলেন। কুমারী ফক্স কহিলেন,—মিসেস্ ব্লাণ্টই আমাকে লইয়া আসিবেন। প্রাইভেট্ সেক্রেটারী তখন কহিলেন, "মিসেস্ ব্লাণ্টকে বিরক্ত করিবেন না, আপনিই ইঁহাকে সঙ্গে করিয়া আনিবেন।"

এখানে আমি আমার ওয়াশিংটনে অভিজ্ঞতার কথা লিখিতে বসি নাই, মার্কিনের মেয়েদের কথাই বলিতে বসিয়াছি। আর এই কাহিনীতে স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বাধীন রমণীরা কোন পদগৌরবের দাবী না করিয়াও কিরূপে উচ্চতম শ্রেণীর লোকের কাছে অবাধে উপস্থিত হইতে পারেন, এবং তাহাদের দ্বারা কতটা কাজ করাইয়া লইতে জানেন, এই প্রসঙ্গে তাহারই প্রমাণ পাইয়াছিলাম। স্বাধীনতা এমনই বস্তু। মানুষকে স্বাধীনতা এমনি করিয়া গড়িয়া তুলে। মার্কিণ যুক্তরাজ্যের আধুনিক বিধিব্যবস্থাতে ইহাই দেখিতে পাওয়া যায়।

২৯

কমলা তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে আঁচল দিয়ে একটু মুছে দ্বিজনাথের সম্মুখে স্থাপিত করলে। দ্বিজনাথ উপবেশন করলে নিজের শয্যার উপর আসন গ্রহণ ক'রে ঔৎসুক্যভরে জিজ্ঞাসা করলে, "কি কথা বাবা ?"

সিগার-কেস্ থেকে একটা চুরুট বার ক'রে মুখে দিয়ে দ্বিজনাথ বল্লেন, "বল্ছি।" তারপর দেশলাই জ্বেলে সিগারটা ধরিয়ে নিয়ে জ্বলন্ত কাঠিটা নিভিয়ে দূরে নিক্ষেপ ক'রে বল্লেন, "তার আগে আর একটা কথা বলি কমল। লজ্জা, সঙ্কোচ প্রভৃতি জিনিষগুলোর এক দিক্ দিয়ে যতই মূল্য থাক্, কোনো একটা গুরুতর বিষয়ের মীমাংসার সময়ে সেগুলোকে বিঘ্ন ক'রে তুলে বিড়ম্বিত হওয়া কখনো উচিত নয়। যে কথাটা তোমাকে অবিলম্বে জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক হয়েচে, সে কথা তোমার মা এখানে উপস্থিত থাক্‌লে তোমাকে যেমন সহজ ভাবে জিজ্ঞাসা করতেন আমি তেম্‌নি সহজ ভাবে জিজ্ঞাসা করব, আর তুমি তাঁকে যে রকম সহজ ভাবে উত্তর দিতে আমাকেও ঠিক তেম্‌নি সহজ ভাবে উত্তর দিয়ো।" ব'লে কমলাকে সঙ্কোচ কাটিয়ে প্রস্তুত হবার সময় দেবার উদ্দেশ্যে দ্বিজনাথ চুরুটে ঘন ঘন টান্ দিতে লাগলেন।

ভূমিকা থেকে আলোচ্য বিষয়ের ধারণা করতে কমলার বিলম্ব হ'ল না,—বিশেষত সন্তোষ যখন জশিডিতে উপস্থিত রয়েছে। তা ছাড়া অপর কোনও বিষয়ে সঙ্কোচই বা কিসের, আর লজ্জাই বা কেন হবে? সঙ্কোচের কারণ যত হোক না হোক, সঙ্কট-কাল যে আসন্ন, তা উপলব্ধি ক'রে কমলা উদ্বিগ্ন হ'য়ে উঠল। কোনো কথা না ব'লে সে নীরবে নত-নেত্রে ব'সে রইল

পকেট থেকে একখানা চিঠি বার ক'রে দ্বিজনাথ বললেন, "তোমার মা এখানে উপস্থিত না থাকলেও তাঁর কথা দিয়েই কথাটা আরম্ভ হ'ক ; তাঁর মুখ থেকে না শুন্‌লেও তাঁর চিঠি থেকেই কথাটা শোনো।" ব'লে বিমলার চিঠিখানা কমলার হাতে দিয়ে বল্লেন, "যে অংশটুকু লাল পেন্সিল দিয়ে ঘেরা আছে শুধু সেই অংশটুকু পড়লেই হবে।"

সৎপাত্র হিসাবে সন্তোষের যোগ্যতা সম্বন্ধে যে অংশে বিমলার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ছিল, সেই অংশটুকু দ্বিজনাথ লাল পেন্সিল দিয়ে চিহ্নিত ক'রে দিয়েছিলেন, বাদ দিয়েছিলেন যে অংশে পদ্মমুখীর চিঠিতে অবগত বিনয় সম্বন্ধে উদ্বেগ প্রকাশ এবং সতর্ককরণ ছিল। কমলা চিহ্নিত অংশটুকু পাঠ ক'রে চিঠিখানা দ্বিজনাথকে ফিরিয়ে দিয়ে নীরবে ব'সে রইল।

দ্বিজনাথ বল্লেন, "সন্তোষ সম্বন্ধে তোমার মার মত ত' জান্‌তেই পারলে। তোমার পদ্ম ঠাকুমারও একান্ত আগ্রহ

সন্তোষের হাতে তোমাকে সমর্পণ করি। আমার নিজের কথা যদি জিজ্ঞাসা কর, আমারো অমত নেই ;—রূপ গুণ বিদ্যা বুদ্ধি অর্থ, যে দিক দিয়েই দেখ না কেন, সন্তোষের মত একটি পাত্র পাওয়া কঠিন। এখন তোমার যদি সম্মতি থাকে ত' আজই সন্তোষের সঙ্গে কথা শেষ করি। আমার বিশ্বাস, এ কথার একটা পাকাপাকি ক'রে ফেলবার জন্যে সন্তোষ বিশেষ উৎকণ্ঠিত হ'য়ে অপেক্ষা করচেন। তাঁর প্রতি অন্যায় আচরণ হবে যদি না আমরা অবিলম্বে তাঁর উৎকণ্ঠা থেকে তাঁকে মুক্ত করি। তুমি অসঙ্কোচে তোমার মত জানাও কমল, কিছুমাত্র লজ্জা কোরো না।"

উদ্বেগে এবং উত্তেজনায় কমলার কপাল বিন্দু বিন্দু ঘামে ভ'রে উঠ্‌ল। মুখ দিয়ে কিন্তু কোনো কথা বার হ'ল না—সে পূর্ব্বের মত নির্ব্বাক হয়ে ব'সে রইল।

একটু অপেক্ষা ক'রে দ্বিজনাথ বল্‌লেন, "তবে যদি তোমার কোনো কারণে—তা সে যে কারণই হোক্ না কেন, প্রকাশ করতে তুমি কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয়ো না—যদি তোমার অমত থাকে, তা হ'লে কখনই আমরা সন্তোষের কথা আর ভাব্‌ব না, তা অন্য দিক দিয়ে সন্তোষ যতই বাঞ্ছনীয় হ'ন না কেন।"

এতটা আশ্বাস লাভ ক'রেও কমলার মুখ দিয়ে কোনো কথা নির্গত হ'ল না।

কমলার এই দুরুচ্ছেদ মৌনর সঙ্গে দ্বিজনাথ তাঁর অন্তরের কোনো নিভৃত-পালিত বাসনার মৈত্র্য উপলব্ধি ক'রে উৎসাহিত হ'য়ে উঠ্‌লেন ; বল্‌লেন, "ধর যদি কমল, এ বিষয়ে তোমার এমন কোনো আপত্তিই থাকে যা প্রকাশ করতেও তুমি সঙ্কোচ বোধ করছ, সে সঙ্কোচও তোমাকে কাটিয়ে উঠ্‌তে হবে। ধর যদি এমন কিছু—" মাছ ধরবেন অথচ জলস্পর্শ করবেন না, সে কৌশল সুকঠিন দেখে দ্বিজনাথ অর্দ্ধ-পথেই নিবৃত্ত হলেন।

পিতার বিপন্ন অবস্থা দেখে কমলার দুঃখ হ'ল। সমস্ত শক্তি সঞ্চিত ক'রে সঙ্কোচ কাটিয়ে মৃদুস্বরে সে বললে, "মা ফিরে আসা পর্য্যন্ত এ কথা বন্ধ থাক্ না বাবা।"

দ্বিজনাথ অধীর হ'য়ে উঠ্‌লেন ; ব্যগ্র কণ্ঠে বল্‌লেন, "না, না কমল, এ কথা আর অনির্দ্দিষ্টভাবে ফেলে রাখা যায় না। আমরা কিছু না বলি, এ যাত্রায় যাবার আগে সন্তোষ এ কথা তুলবেনই। তাঁর মনে যে, সংশয় আর উৎকণ্ঠা দেখা দিয়েছে, এ আমি তাঁর কথাবার্ত্তা আর আচরণ থেকে স্পষ্ট বুঝতে পেরেছি। তিনি যখন কথাটা তুলবেন তখন তাঁকে ত আর বলা চল্‌বে না যে, তোমার মা ফিরে আসা পর্য্যন্ত কথাটা বন্ধ থাক্। তা ছাড়া, যে কথাটা তোমার মাকে বল্‌তে পারবে ব'লে মনে করছ, সেটা আমাকে বল্‌তে তোমার এত সঙ্কোচ কেন? বাপের চেয়ে মা কি এতই বেশি আপনার?" ব'লে দ্বিজনাথ হাসতে লাগলেন।

আসলে কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক বিপরীত। মাতার চেয়ে পিতাকে কমলা ভালবাসতও বেশি, সঙ্কোচ করতও কম। এ শুধু সময় নেবার উদ্দেশ্যে সে একটা ছল করেছিল। কি ব'লে কথাটার একটা উত্তর দেবে মনে মনে কমলা ভাবছে এমন সময়ে দ্বিজনাথ প্রশ্ন করলেন, "তুমি আজ না খেয়ে উপোস ক'রে আছ কমল?"

ত্রস্ত হয়ে নত নেত্র ঈষৎ উন্নমিত ক'রে কমলা দেখলে পিতার মুখে-চক্ষে নিবিড় সহানুভূতি আর লঘু কৌতুক এক সঙ্গে খেলা করছে,—গভীর উদারা-স্বরের সঙ্গে তীক্ষ্ণ তারা-স্বরের অনুরণনের মতো। প্রথমে কমলার স্তব্ধ মুখ সন্ধ্যাকাশের মতো আরক্ত হ'য়ে উঠ্‌ল,তার পর তার আনত-স্থির চক্ষু দুটি থেকে টপ্ টপ্ ক'রে বড় বড় ফোঁটায় অশ্রু ঝ'রে পড়তে লাগল ; মুখের কথা আটুকে রাখতে গিয়ে শক্তির যে অপচয় হয়েছিল তারই দুর্ব্বলতায় চোখের জল নিরুপায় ভাবে বেরিয়ে এল। যে কথা নির্ণয়ের জন্যে দ্বিজনাথ এতক্ষণ নিষ্ফলভাবে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করছিলেন, একটি সমীচীন প্রশ্নের উত্তরে চোখের জল তা অসংশয়েও নিরূপিত ক'রে দিলে।

কমলার অশ্রু দেখে দ্বিজনাথেরও চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হ'য়ে এল, মুখে কিন্তু তিনি হাস্‌তে লাগলেন ; বললেন, "ছেলেমানুষ আর কা'কে বলে! যে কথা জানবার জন্যে কত রকম ক'রে পেড়াপিড়ি করছি মুখ ফুটে সে কথাটা

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

বল্‌লেই ত হোত। এতে লজ্জার কি আছে মা? তোমার ত' জান্‌তে বাকি নেই কমল, বিনয়কে আমি কত ভালবাসি, সুতরাং বুঝতেই পারছ এ'তে আমি কত সুখী হয়েচি।" তারপর চেয়ার ত্যাগ ক'রে উঠে কমলার পাশে ব'সে তার মাথায় দক্ষিণ হাতটি সস্নেহে বুলোতে বুলোতে বল্‌লেন, "আজ সন্ধ্যেবেলাই বিনয়ের সঙ্গে আমি এ কথার শেষ করব। আশা করি তোমার মা ফিরে আসা পর্য্যন্ত এ কথা বন্ধ না রাখলে চল্‌বে?" ব'লে উচ্চস্বরে হা হা ক'রে হেসে উঠলেন।

নিবিড় সঙ্কোচে ও সুখে কমলা তার আরক্ত মুখ দ্বিজনাথের দেহের মধ্যে লুকোলো।

৩০

বৈকাল সাড়ে চারটের গাড়িতে বিনয় মধুপুর থেকে ফিরছিল। তার পীড়িত বন্ধুর মধুপুরে আসা হয় নি। যে গৃহ ভাড়া হ'য়ে আছে মধ্যাহ্নে তথায় উপস্থিত হ'য়ে সংবাদ পাওয়া মাত্র সেই গাড়িতেই বিনয় ষ্টেশনে ফিরে আসে। সাড়ে চারটের আগে অন্য কোনো গাড়ি না থাকায় অগত্যা সাড়ে চারটের গাড়িতেই ফিরে আসছে।

সমস্ত দিন সে অভুক্ত রয়েছে। শুধু অভুক্তই নয়, সকালে সুকুমারদের বাড়ি থেকে যে চা আর খাবার খেয়ে বেরিয়েছিল তারপর জলস্পর্শ পর্য্যন্ত করে নি। মধুপুরে খাবারের অভাব ছিল না, দিশি বিলিতি হোটেল ছিল, ষ্টেশনে রিফ্রেশ্‌মেণ্ট রুম ছিল, তা ছাড়া ময়রার দোকানের ত' সংখ্যাই নেই;—কিন্তু বিনয়ের আহারের প্রবৃত্তি ছিল না। এমন কি ক্ষুধায় তৃষ্ণায় যখন দেহটা কষ্ট ভোগ করছিল তখন পর্য্যন্ত না। দেহ যে-টা স্বভাবের তাড়নায় চাচ্ছিল, মন তাকে বাধ দিচ্ছিল অস্বাভাবিক উত্তেজনায়। কিন্তু সেই উত্তেজনার মূল যে কোথায় নিহিত ছিল,—অভিমানে, না অনুশোচনায়, না রাগে, না বৈরাগ্য,—সে বিষয়ে তার কোনো সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না; শুধু মনে হচ্ছিল আহারে ও পানে আজ বাধা পড়েছে, আজ ও দুই ব্যাপারের দ্বারা ক্ষুধা তৃষ্ণার শান্তি নেই।

একটি সেকেণ্ড ক্লাস্ কামরার জান্‌লার ধারে ব'সে বিনয় বারের দিকে চেয়ে ছিল। জশিডি পৌঁছবার বহু পূর্ব্ব থেকে রেলগাড়ির বাঁ দিকে ডিগ্‌রিয়া পাহাড় দেখা যায়; তাই দেখ্‌তে দেখ্‌তে তার মনের মধ্যে ডিগ্‌রিয়ারই মতো সঙ্কল্পের একটি বিশাল পাহাড় তৈরী হ'য়ে উঠ্‌ছিল,—ডিগ্‌রিয়ারই মতো যার পিছন দিকে আনন্দের সূর্য্য অস্তগমনোন্মুখ, ডিগ্‌রিয়ারই মতো যার সম্মুখ দেশ বিষাদের ছায়ায় ম্রিয়মাণ। যেরূপেই হ'ক কাল সকাল দশটার গাড়িতে কমলার সান্নিধ্য পরিত্যাগ করতে হবে, নচেৎ নিস্তার নেই। যে বাঁধন মিলিত করে না আবদ্ধ করে, তা থেকে মুক্তি না পেলেই নয়!

কিন্তু এই সঙ্কল্পের কথা মনে ক'রেই বিনয়ের মন বিরক্তিতে ভ'রে উঠ্‌ল। লোভকে জয় করবার জন্যেই ত সঙ্কল্প, রোগকে প্রশমিত করবার জন্যে যেমন ওষুধ। কিন্তু এই লোভ মনের মধ্যে আসে কেন? আজ সকালে কমলার সামান্য কথায় আহার না ক'রে চ'লে আসা, সমস্ত দিন অকারণ উপবাসে নিজেকে নিপীড়িত করা, লোভের প্রভাব থেকে দূরে পলায়নের সঙ্কল্প প্রভৃতি দুর্ব্বলতার পরিচায়ক আচরণ স্মরণ ক'রে বিনয় নিজেকে মনে মনে তিরস্কার করতে লাগ্‌ল। সেখানে সহজ হ'য়ে অবস্থান করবার কথা, সেখানে মন কঠোরতা অবলম্বন করে কেন?

একটা নির্ব্বিকল্প ঔদাসীন্যে নিজের মনকে নিরাময় ক'রে নেবার জন্যে বিনয় চেষ্টা করতে লাগ্‌ল,—যে অবস্থায় আসক্তি বিরক্তি, আকর্ষণ বিকর্ষণ কিছুই থাক্‌বে না, যে অবস্থায় কমলাকে দ্বিজনাথের কন্যা অথবা সন্তোষের বাগ্‌দত্তা বধূর অতিরিক্ত কিছুই মনে হবে না, সুতরাং পরদিন বেলা সাড়ে দশটার গাড়িতে দেওঘর পরিত্যাগ করা না করা প্রভেদশূন্য হবে।

কিন্তু মনে করবার চেষ্টা করলেই যদি সব কথা মনে করা সম্ভব হ'ত তা হলে মন হ'ত হিসেবের খাতার মত সত্যে-মিথ্যায় নির্ব্বিকার, জমা অথবা খরচের ঘরে মিথ্যা অঙ্ক ফেল্‌লেও হিসাব-নিকাশের সময় সত্যরই মত তা হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটাত।

এ কথার সভ্যতার পরীক্ষা হ'য়ে গেল হঠাৎ শোভার কথা মনে পড়ায় : জমার ঘরে শোভাকে ফেল্‌লে কি হয়? বিনয় মনে মনে হিসেব ক'রে দেখ্‌লে তাতে বৃদ্ধি কিছুই হয় না, পরন্তু হ্রাস হয়। বিস্মিত হ'য়ে হিসাব পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখ্‌লে জমার ঘরে শোভাকে ফেলতে গেলে সঙ্গে সঙ্গে খরচের ঘরে পড়ে দ্বিজনাথের কন্যা অথবা সন্তোষের বাগ্‌দত্তা বধূ কমলা। বুঝ্‌লে, খাতার হিসেবের নিয়মের সঙ্গে মনের হিসেবের নিয়মের প্রভেদ আছে।

ইতিমধ্যে জশিডি ষ্টেশনে গাড়ি পৌঁছে গিয়েছিল। পরদিন বেলা সাড়ে দশটার গাড়িতে দেওঘর পরিত্যাগের সঙ্কল্প পাকা ক'রে গাড়ি থেকে প্ল্যাটফর্ম্মে নেবেই বিনয় দেখ্‌লে সম্মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছেন দ্বিজনাথ। সমস্ত মনটা বিরক্তিতে ঘুলিয়ে উঠ্‌ল—একটা নিরুপায় হতাশায় সে মনে মনে অস্থির হ'য়ে পড়্‌ল,—এরা দেখচি আমাকে কিছুতেই নিস্তার দেবে না! অপ্রসন্ন স্বরে বল্‌লে, "আপনি কষ্ট ক'রে এসেছেন কেন?"

দ্বিজনাথের মুখে মৃদু হাস্য দেখা দিল;—বিনয়ের কাঁধে একটা হাত রেখে স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললেন,—"কেন কষ্ট ক'রে এসেছি তা বুঝ্‌তে আমার মতো বয়স হ'লে, আর কমলার মতো একটি মেয়ে থাক্‌লে। এখন চল।"

"কোথায়?"

"আপাতত আমার গাড়িতে, তারপর আমার বাড়িতে।"

দেহটা একটু কঠিন ক'রে নিয়ে বিনয় বল্‌লে, "কিন্তু—"

দ্বিজনাথ হাসিমুখে বললেন, "কিন্তু বল্‌লে আমি যদ্যপি তত্রাচ সুতরাং অনেক কথাই বল্‌ব, অতএব চল।" তারপর মনে মনে কি ভেবে ঈষৎ মৃদুকণ্ঠে বল্‌লেন, "কমলা সমস্ত দিন উপোস ক'রে রয়েচে।"

ব্যগ্রকণ্ঠে বিনয় বল্‌লে, "কেন?"

"তোমারই অবিবেচনার জন্যে। এখন চল।"

আর কোনো কথা না ব'লে নিরতিগভীর চিন্তিত মনে বিনয় দ্বিজনাথের সঙ্গে ওভার-ব্রিজের দিকে অগ্রসর হ'ল।

(ক্রমশঃ)

মরণ

কুমারী গীতা দেবী

মরণ, তোমায় বরণ করি গানে,
চরণ দুটি শীতল তব অতি ;
হরণ কর বেদন-ভরা প্রাণে,
হাওয়ার মত মৃদুল তব গতি।

জানিনে কোন্ মায়ার বলে তুমি
যাও গো নিয়ে অচেনা কোন দেশে ;
আগেই যারা দিয়েছিল পাড়ি
সবাই সেথা তাদের সাথে মেশে !

ওগো আমার চিরদিনের সখা,
আজকে সকল দুখের অবসান ;
তাই প্রণয়ের চিহ্ন-স্বরূপ আমি
তোমার পায়ে লুটিয়ে দিলেম প্রাণ

তোমার আগমনের সাথে সাথে
মনের বীণার তন্ত্রী বেজে ওঠে ;
আমার যত গোপন ব্যথাগুলি
ফুলের গাছে পুষ্প হ'য়ে ফোটে।

অশ্রু আমার মুক্তাসারি রূপে
তোমার গলে দুলিয়ে দিলেম মালা,
মনের মত সাজিয়ে দিনু প্রিয়,
হৃদয়দীপে তোমার বরণ ডালা।

কণ্ঠ শুধু তোমার গানে গানে
উঠছে ভরি আজকে দিবারাতি,
বিদায় নিলেম তোমার সাথে আজি
ওগো আমার অচিন্ লোকের সাথী।

নানাকথা

রবীন্দ্রনাথ

বৈশাখ মাস শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের জন্মমাস। সুতরাং বাংলা সাহিত্যের পক্ষে এ মাস শুভ-মাস। ১২৬৮ সালের ২৫-এ বৈশাখ রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার জন্মদিন আগতপ্রায়, আমরা তদুপলক্ষে কবির দীর্ঘায়ু, স্বাস্থ্য এবং সৌভাগ্য একান্তমনে প্রার্থনা করিতেছি। এ সংখ্যায় প্রকাশিত কবির আলেখ্যটি শিল্পী, সাধারণভাবে কবির যে চিত্রাদি দেখিয়াছেন তদ্লব্ধ ধারণা হইতে অঙ্কিত করিয়াছেন, কবিকে এ পর্য্যন্ত তিনি চাক্ষুষ দেখেন নাই। এ চিত্রটির ইহা বৈলক্ষণ্য।

* * *

আনন্দ-মেলা

আমাদের এই জাতিগত জীবনের যাবতীয় দুঃখ ও হীন বঞ্চনার মধ্যে এবং ব্যক্তিগত জীবনের সনির্ব্বন্ধ আশা-ভঙ্গ ও পরম দীনতা সত্ত্বেও যদি একবারও এমন একটি সম্মিলনের আয়োজন হয়, যেখানে পারিপার্শ্বিক বিরুদ্ধতা ভুলিয়া পরস্পরের সহিত মিলিত হওয়া এবং সেই মিলনের মধ্যে আনন্দ উপভোগ করা ভিন্ন অন্য কোনও মহত্তর উদ্দেশ্য না থাকে,—সেইরূপ সম্মিলনের অনুষ্ঠাতৃগণ যথার্থই আন্তরিক প্রশংসার যোগ্য।

কিন্তু সম্প্রতি আমরা এরূপ একটি প্রতিষ্ঠানের পরিচয় পাইয়াছি, যাহার ক্রিয়া-কলাপ ইহা অপেক্ষা অধিকতর বিস্তৃত। ইহার নাম আনন্দ-মেলা। এই স্থানে দেশমাতার কৃতী ও কর্ম্মী সন্তানগণের সহিত সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে পরিচিত হইবার এবং তাঁহাদের জীবনের বার্ত্তা তাঁহাদের মুখে শুনিয়া জীবন্ত প্রাণের সংস্পর্শে নিজেদের জীবন

করিবার একটি অবসর বহুলোকেরই হইয়া থাকে। প্রাণবন্ত সাহিত্যের সেবা এবং নব নব সাহিত্যের সৃষ্টি করা ইহাও আনন্দমেলার অনুষ্ঠান-পত্রের অন্তর্গত। জাতি, ধর্ম্ম, এবং বয়স নির্ব্বিশেষে যে কোনও পুরুষ অথবা নারী আনন্দ-মেলার এবং ইহার আনুসঙ্গিক অন্যান্য অনুষ্ঠানের সদস্য-শ্রেণীভুক্ত হইতে পারেন। মানবজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের যে সকল শিক্ষিত মান্য নর-নারী এই আনন্দ-মেলার আদর্শে সহানুভূতি জানাইয়া ইহার পরিচালনা এবং প্রচারের ভার লইয়াছেন, তাঁহাদিগের কয়েকজন: শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, বিচারপতি কলিকাতা হাইকোর্ট (সভাপতি), শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, প্রধান কর্ম্ম-সচিব কলিকাতা কর্পোরেশন, (সহ-সভাপতি) ডাক্তার শ্রীযুক্ত এডিথ্ ঘোষ (সহ-সভাপতি), সাহিত্যরসিক শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী (সহ-সভাপতি) সুকবি শ্রীযুক্ত অতুলপ্রসাদ সেন (সহ-সভাপতি), শ্রীযুক্ত জলধর সেন, শ্রীনরেন্দ্র দেব, (সম্পাদক, সাহিত্য বিভাগ) শ্রীসুনীতি দেবী, শ্রীসুরুচিবালা রায়, শ্রীঅশ্রু দেবী (সম্পাদিকা, সঙ্গীত-বিভাগ) শ্রীযুক্ত স্মরজিৎকুমার মুখোপাধ্যায় (সম্পাদক, শারীর-চর্চ্চা বিভাগ) প্রভৃতি। আশা করা যায় ইঁহাদের তত্ত্বাবধানে আনন্দ-মেলা উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করিবে।

গত দোলপূর্ণিমার দিন রামমোহন লাইব্রেরী-হলে এই আনন্দ-মেলার সপ্তম বার্ষিক মধুপর্ব্বের উৎসব-আয়োজন হইয়াছিল। এই উপলক্ষ্যে সমিতির বালক-বালিকাগণ কর্ত্তৃক 'বসন্তমঞ্জরী' নামে একটি ছোট গীতিনাটিকা অভিনীত হয়। আমরা এই প্রতিষ্ঠানের শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

*   *   *

বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন

গত ইষ্টারের ছুটিতে কবিগুণাকর ভারতচন্দ্র রায়ের জন্মভূমির নিকটবর্ত্তী মাজু গ্রামে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। মূল সভাপতির পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন রায় বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন। সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস প্রভৃতি বিভিন্ন শাখার বিভিন্ন সভাপতি বৃত হইয়াছিলেন। সাহিত্যশাখার নির্ব্বাচিত সভাপতি শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রঙ্গপুর যুব-সম্মেলনের সভাপতিরূপে আবদ্ধ হইয়া পড়ায় তাঁহার স্থলে বৃত হইয়াছিলেন ডাক্তার নরেশচন্দ্র সেন। দর্শন-শাখার সভাপতি ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত তাঁহার অভিভাষণে "দর্শনের দৃষ্টি" নামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। অধ্যাপক দাশগুপ্ত মহাশয় এই প্রবন্ধে অসাধারণ পাণ্ডিত্য এবং চিন্তা-শক্তির প্রভাবে একটি নূতন দার্শনিক সত্য প্রচার করিয়াছেন যাহা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের প্রচলিত মতবাদকে তদ্বিষয়ে অতিক্রম করিয়াছে। উক্ত প্রবন্ধটি জগতের জ্ঞান-ভাণ্ডারে একটি নূতন সম্পদরূপে পরিগণিত হইবার যোগ্য। চৈত্র মাসের বিচিত্রায় আমরা 'দর্শনের দৃষ্টি' প্রবন্ধটি সমগ্র আকারে প্রকাশিত করিয়াছি।

*   *   *

স্বর্গীয়া কৃষ্ণভাবিনী দাসী

প্রখ্যাত লেখক শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ মহাশয়ের জননী কৃষ্ণভাবিনী দাসীর পরলোকগমন ঘটিয়াছে। চন্দন-নগরে শেঠ মহাশয় যে নারীশিক্ষা-মন্দির, অঘোরচন্দ্র বালিকাবিদ্যালয়, নৃত্যগোপাল স্মৃতি-মন্দির লাইব্রেরী প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন তাহার মূলে ছিল তাঁহার স্বর্গগতা জননীর সহানুভূতি এবং অনুপ্রাণনা। এই মহীয়সী মহিলার মৃত্যুতে দুঃখিত হইয়া আমরা আমাদের সমবেদনা হরিহর বাবুকে জ্ঞাপন করিতেছি।

*   *   *

আফগানিস্থান প্রবন্ধ

এ সংখ্যায় প্রকাশিত আফগানিস্থান প্রবন্ধের চিত্রগুলি 'সওগাত' পত্রিকার সৌজন্যে প্রকাশিত হইল।

Printed at the Sasil Printing Works, 47, Pataldanga Street, Calcutta,
by Srijut Upendranath Ganguli and edited and published by him from 48, Pataldanga Street, Calcutta.
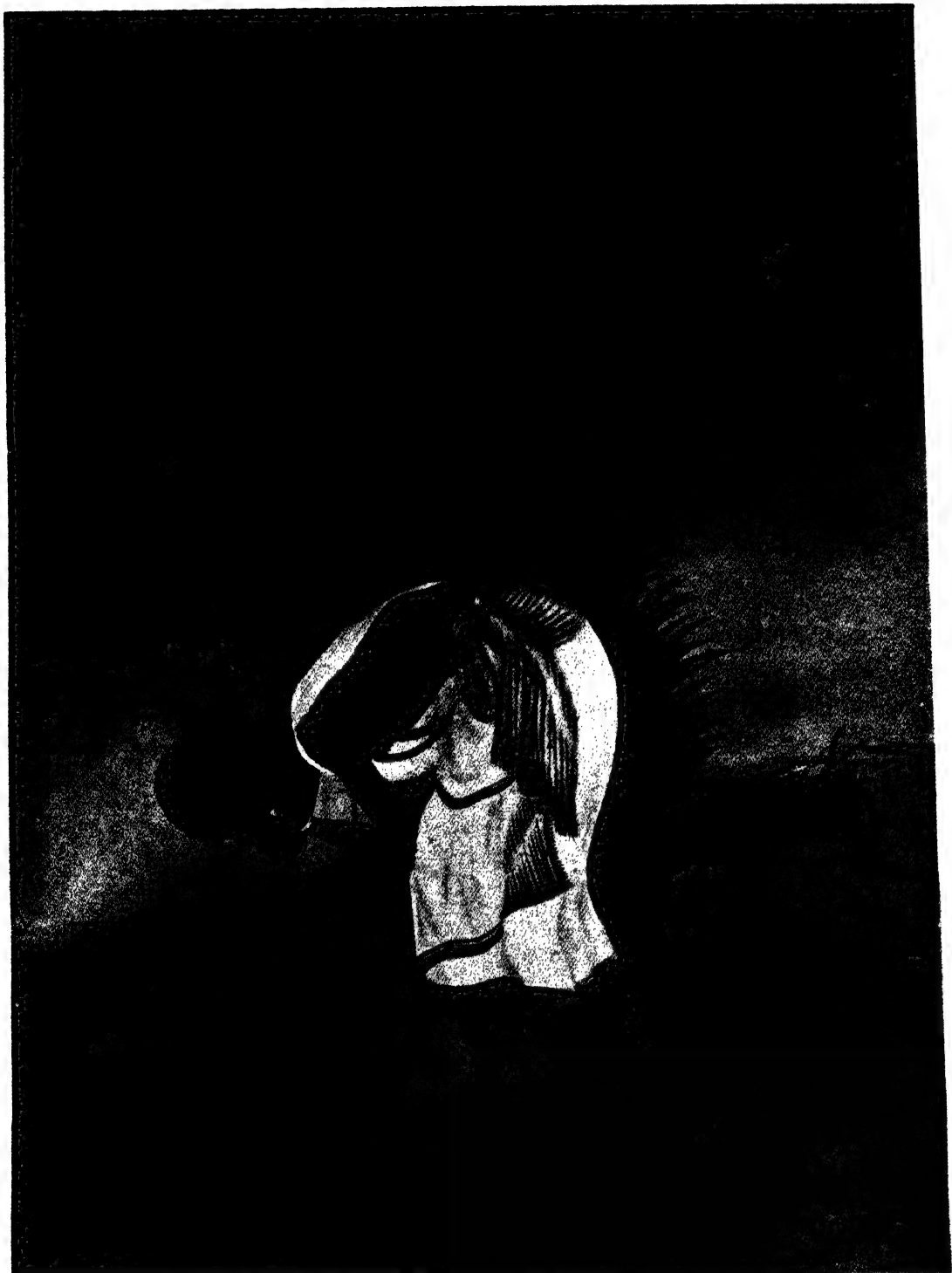
বনফুল

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৬ । শিল্পী—শ্রীমতী অনুকণা দাশগুপ্তা

দ্বিতীয় বর্ষ, ২য় খণ্ড　　　　জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৬　　　　ষষ্ঠ সংখ্যা

স্ত্রী-শিক্ষা

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্ত্রীলোক ও পুরুষের শিক্ষার এক অংশে মিল আছে, আর এক অংশে নাই। সাধারণ বিদ্যাশিক্ষা উভয়েরই পক্ষে সমান আবশ্যক—ব্যবসায়িক শিক্ষা উভয়ের পক্ষে স্বতন্ত্র। সংসারে যেমন পুরুষের তেমনি মেয়েদেরও একটা ব্যবসায়িক দিক আছে, সেখানে তাহাদের জন্য বিশেষ শিক্ষা চাই। বিশ্বভারতীতে সাধারণ শিক্ষায় ছাত্রছাত্রীর মধ্যে কোনও প্রভেদ করা হয় নাই, এই জন্য তাহারা সে-সকল ক্লাসে এক সঙ্গেই শিক্ষা লাভ করে। বিশেষ শিক্ষার জন্য বিশেষ আয়োজন করিবার চেষ্টায় আছি—প্রধান বাধা উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব। আমেরিকা প্রভৃতি দেশে গার্হস্থ্যতত্ত্ব স্বাস্থ্যতত্ত্ব রোগশুশ্রূষা-তত্ত্ব সম্বন্ধে যথার্থ বৈজ্ঞানিক শিক্ষা দেওয়া হয়। তাহাতে শুধু যে কার্য্যকুশলতা শেখা হয় তাহা নহে, মেয়েদের মন ভ্রান্ত ও অন্ধ সংস্কার হইতে মুক্ত হয়। এইরূপ সংস্কারের আবর্জ্জনায় আমাদের স্ত্রীপুরুষের মন ভারাক্রান্ত হইয়া আছে—ইহারই চাপে আমরা অন্তরে বাহিরে মরিতেছি। আমাদের পুরুষেরা বিজ্ঞান শিক্ষা করিয়াও মনের ভিতর মুক্তিলাভ করিতে পারেন নাই, প্রত্যহ তাহার সহস্র প্রমাণ পাই। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, বোঝা অত্যন্ত ভারি, অল্প ঠেলায় নড়ে না। অন্তঃপুরেও শিক্ষার প্রবেশ না ঘটিলে আমাদের মরণং ধ্রুবং। নিশ্চয় জানিবেন সাধ্যমত স্ত্রী-শিক্ষা সম্বন্ধে লক্ষ্যপথে চলিতে চেষ্টা করিব। কিন্তু আমার সামর্থ্য অল্প,—আমার দেশের লোক আমার কাজে আনুকূল্য প্রকাশ করিলে ধীরে ধীরে গড়িয়া তুলিতে পারিব। ইহা সত্য, যাহা মনে আছে তাহা বাহিরে প্রকাশ করিবার মত সম্বল আমার নাই।

এখানে মেয়েরা কেবল ভাষা ও সাহিত্য শিখিতেছে তাহা সত্য নহে—তাহারা গানবাজনা চিত্রকলা শরীরতত্ত্ব শিখিতেছে, তাঁতের কাজ শিখাইবার উপযুক্ত ব্যবস্থাও আছে। যাহাকে Domestic Science বলে তাহাও এখানে শেখানো হয়। ১৭ ফাল্গুন ১৩২৮।

শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র দত্ত
মহাশয়কে লিখিত

আকাঙ্ক্ষা

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এই যে ছাত্রেরা এখানে আমাকে আহ্বান করেচে, এটা আমার আনন্দের কথা। ছাত্রদের মধ্যে আমার আসন আমি সহজে গ্রহণ করতে পারি। সে কিন্তু গুরুরূপে নয়, তাদের কাছে এসে, তাদের মধ্যে ব'সে।

কিন্তু আমার বিপদ এই যে, হঠাৎ আমাকে বাইরে থেকে বৃদ্ধ ব'লে ভ্রম হয়, তাই যাদের বয়স অল্প তারা যখন আমাকে ডাকে, কাছে ডাকে না, আমার জন্যে তফাতে উচ্চ ক'রে মঞ্চ বাঁধে। এই বিপদ থেকে রক্ষা পাবার জন্যেই লোকালয়ের বাইরে আমি একটা জায়গা করেচি সেখানে ছেলেদের আমিই কাছে ডেকেচি। সে কেবল ছেলেদের উপকারের জন্যে নয়, আমার নিজের উপকারের জন্যে। উপকারটা কি একটু বুঝিয়ে বলি।

মানুষের মনে অহঙ্কার পদার্থ প্রবল। সেইজন্যে যখন তার বয়স বাড়ে তখন সে মনে করে সেই বয়স বাড়ার মধ্যেই বুঝি তার বিশেষ অহঙ্কার করার কারণ আছে। বিশেষত তখন যদি সে বুড়োদেরই সঙ্গ ধ'রে থাকে তাহ'লে তার সেই অহঙ্কারটা আরো বেড়ে ওঠে। তখন সে একটা মস্ত কথা ভুলে যায় যে, যেটাকে সে বাড়া বলচে সেটাই তার হ্রাস হ'য়ে যাওয়া। যার ভবিষ্যৎ ক'মে এল, অতীতের বাড়তির বড়াই ক'রে তার ফল কি? বৃদ্ধই যদি সংসারে গৌরবের জিনিষ হ'ত তাহ'লে বৃদ্ধকে বরখাস্ত করবার জন্যে ভগবান এত তাড়া করতেন না।

স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্চি, বুড়োদের উপর বাঁধা হুকুম রয়েচে জায়গা ছেড়ে দেবার জন্যে। নকীব হাঁক্‌চে, স'রে যাও, স'রে যাও। কেন রে বাপু, বাটপাঁয়ষট্টি বছরের পাকা আসন ছাড়ব কেন? ঐ যে আস্‌চেন মহারাজা, ঐ যে কুমার, ঐ যে কিশোর। ভগবান কেবলি ফিরে ফিরে তরুণকে মর্ত্ত্যের সিংহাসনে পাঠিয়ে দিচ্চেন। তার কি কোন মানে নেই? তার মানে এই যে, তিনি তাঁর সৃষ্টিকে পিছনে বাঁধা প'ড়ে থাক্‌তে দেবেন না। নূতন মন নূতন শক্তি বারে বারে নূতন ক'রে তাঁর কাজ আরম্ভ যদি না করে, তাহ'লে অসীমের প্রকাশ বাধা পাবে। অসীমের ত জরা নেই। এই জন্যে বৃদ্ধদের মত জরা কেবলি ফেটে মিলিয়ে যায়, আর পৃথিবীর কোল জুড়ে তরুণ ফুলের মধ্যে তরুণ প্রভাতের আলোয় দেখা দেয় তরুণের দল। ভগবান কেবলি নূতনকে বাঁশি বাজিয়ে ডাক্‌চেন, আর তারা দলে দলে আসচে, আর সমস্ত জগৎ আদর ক'রে তাদের জন্যে দ্বার খুলে দিচ্চে।

ভগবানের সেই আহ্বান শোনবার জন্যেই শিশুদের মধ্যে বালকদের মধ্যে আমি বসি। তাতে আমার একটা মস্ত উপকার হয়, অন্যান্য বৃদ্ধদের মত আমি নবীনকে অশ্রদ্ধা করিনে; ভাবীকালের আশার উপর আমার অতীতকালের আশঙ্কার বোঝা চাপিয়ে দিইনে। আমি বলি, "ভয় নেই! পরীক্ষা কর, প্রশ্ন কর, বিচার কর, সত্যকে ভেঙে দেখ্‌তে চাও; আচ্ছা, আঘাত কর, কিন্তু সামনের দিকে এগোও।" ভগবানের বাঁশির ডাক, দুঃসাহসিক অভিসারে নূতনকে আহ্বান, আমারো বুকের মধ্যে বেজে ওঠে। তখন আমি বুঝতে পারি যে, বৃদ্ধের সতর্ক বিজ্ঞতা বড় সত্য নয়, নবীনের দুঃসাহসিক অনভিজ্ঞতা তার চেয়ে বড় সত্য। কেননা এই অনভিজ্ঞতার ঔৎসুক্যের কাছেই সত্য বারে বারে আপন নূতন শক্তিতে নূতন মূর্ত্তিতে প্রকাশ পান; এই অনভিজ্ঞতা অক্ষুণ্ণ ব'লেই পুরাতনের পর্ব্বতপ্রমাণ বাধা ভাঙে এবং অসাধ্য সাধন হ'তে থাকে।

বৃদ্ধ সেজে আমি তোমাদের উপদেশ দিতে চাইনে। আমি কেবলমাত্র তোমাদের এই কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, তোমরা নবীন। তোমরা যে বার্ত্তা বহন ক'রে এনেচ সেই বার্ত্তা তোমরা ভুললে চলবে না। এই পৃথিবী থেকে সকল প্রকার জীর্ণতাকে তোমরা সরিয়ে দিতে এসেচ; কেননা জীর্ণতাই আবর্জ্জনা, জীর্ণতা যাত্রাপথের বাধা। এই জীর্ণতাকে

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

যারা আপন ব'লে মমতা করে তারাই সত্যকার বৃদ্ধ। পৃথিবীতে তাদের কাজ ফুরিয়েচে, মনিব তাদের জবাব দিয়েচেন, তারা স'রে পড়বে। কিন্তু তোমরা নবীন, তোমাদের হাতে পৃথিবীর ভার নূতন ক'রে পড়েচে, তোমাদের ভবিষ্যৎকে আচ্ছন্ন হ'তে দিয়ো না, পথ পরিষ্কার কর।

কোন্ পাথেয় নিয়ে তোমরা এসেচ? মহৎ আকাঙ্ক্ষা। তোমরা বিদ্যালয়ে শিখ্‌বে ব'লে ভর্ত্তি হয়েচ। কি শিখতে হবে ভেবে দেখো। পাখী তার মা বাপের কাছে কি শেখে? পাখা মেলতে শেখে, উড়তে শেখে। মানুষকেও তার অন্তরের পাখা মেলতে শিখতে হবে; তাকে শিখতে হবে কি ক'রে বড় ক'রে আকাঙ্ক্ষা করতে হয়। পেট ভরাতে হবে, এ শেখবার জন্যে বেশি সাধনার দরকার নেই। কিন্তু পুরোপুরি মানুষ হ'তে হবে এই শিক্ষার জন্যে যে অপরিমিত আকাঙ্ক্ষার দরকার, তাকেই শেষ পর্য্যন্ত জাগিয়ে রাখবার জন্যে মানুষের শিক্ষা।

এই যুগে সমস্ত পৃথিবীতে য়ুরোপ শিক্ষকতার ভার পেয়েচে। কেন পেয়েচে? গায়ের জোরে আর সব হতে পারে কিন্তু গায়ের জোরে গুরু হওয়া যায় না। যে মানুষ গৌরব পায় সেই গুরু হয়। যার আকাঙ্ক্ষা বড় সেই ত গৌরব পায়। য়ুরোপ বিজ্ঞান ভূগোল ইতিহাস প্রভৃতি সম্বন্ধে বেশি খবর রেখেচে ব'লেই আজকের দিনে মানুষের গুরু হয়েচে একথা সত্য নয়। তার আকাঙ্ক্ষা বৃহৎ, তার আকাঙ্ক্ষা প্রবল; তার আকাঙ্ক্ষা কোনো বাধাকে মান্‌তে চায় না, মৃত্যুকেও না। মানুষের যে বাসনা ক্ষুদ্র স্বার্থসিদ্ধির জন্যে, সেটাকে বড় ক'রে তুলে মানুষ বড় হয় না, ছোটই হ'য়ে যায়; সে যেন খাঁচার ভিতরে পাখীর ওড়া, তাতে পাখার সার্থকতা হয় না। কিন্তু জ্ঞানের জন্যে আকাঙ্ক্ষা, প্রাকৃতিক শক্তিগুলিকে আবিষ্কার ক'রে তাকে মানুষের অধিকারে আনবার জন্যে আকাঙ্ক্ষা, যাতে মানুষ মরুকে জয় ক'রে ফসল পায়, রোগকে জয় করে স্বাস্থ্য পায়, দূরত্বকে জয় ক'রে নিজের গতিপথ অবারিত করে,—তাতেই মানুষের মনুষ্যত্ব প্রকাশ পায়, তাতেই প্রমাণ হয় যে, মানুষের জাগ্রত আত্মা পরাভবকে বিশ্বাস করে না; কোনো অভাব দুঃখ দুর্গতিকেই যে অদৃষ্টের হাতের চরম মার মনে ক'রে মাথা পেতে নিতে অপমান বোধ করে; সে জানে যে তার দুঃখমোচন তার নিজেরই হাতে, তার অধিকার প্রভুত্বের অধিকার। য়ুরোপ এমনি ক'রে আপন আকাঙ্ক্ষার পাখা বড় ক'রে মেলতে পেরেচে ব'লেই আজ পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে শিক্ষা দেবার অধিকার সে পেয়েচে। সেই শিক্ষাকে আমরা যদি পুঁথির বুলি শিক্ষা, কতকগুলি বিষয় শিক্ষা ব'লে ক্ষুদ্র ক'রে দেখি তাহ'লে নিজেকে বঞ্চিত করলুম। মনুষ্যত্বের শিক্ষাটাই চরম শিক্ষা, আর সমস্তই তার অধীনে। এই মনুষ্যত্ব হচ্চে আকাঙ্ক্ষার ঔদার্য্য; আকাঙ্ক্ষার দুঃসাধ্য অধ্যবসায়, মহৎ সঙ্কল্পের দুর্জ্জয়তা।

য়ুরোপের লোকালয়ে য়ুরোপের মানুষ বিপুল আকাঙ্ক্ষাকে নিয়তই নানা ক্ষেত্রে প্রকাশ করচে এবং জয়ী করচে, সেই দেশব্যাপী মহৎ উদ্যমের সঙ্গে সঙ্গে তাদের শিক্ষা। তাদের বিদ্যালয়ের শিক্ষা এবং তাদের জীবনের শিক্ষা একেবারে পাশাপাশি সংলগ্ন। এমন কি যে বিদ্যা তারা শিক্ষকদের হাত থেকে গ্রহণ করেচে সে বিদ্যা তাদের আপন দেশেরই সাধনার ধন, তার মধ্যে শুধু ছাপার অক্ষর নেই; তাদের আপন দেশের লোকের কঠিন তপস্যা আছে। এই কারণে সেখানকার ছাত্র শুধু যে কেবল শিক্ষার বিষয়কে বইয়ের পাতায় দেখ্‌চে আর গ্রহণ করচে তা নয়,—মানবাত্মার কর্ত্তৃত্ব, তার দাতৃত্ব, স্রষ্টৃত্ব চারিদিকেই দেখচে। এতেই মানুষ আপনাকে চেনে এবং মানুষ হ'তে শেখে।

যে দেশে বিদ্যালয়ে কেবল দেখতে পাই, ছাত্র নোটবুকের পত্রপুট মেলে ধ'রে বিদ্যার মুষ্টি ভিক্ষা করচে, কিম্বা পরীক্ষার পাসের দিকে তাকিয়ে টেক্‌স্‌ট্‌ বইয়ের পাতায় পাতায় বিদ্যার উঞ্ছবৃত্তিতে নিযুক্ত; যে দেশে মানুষের বড় প্রয়োজনের সামগ্রী মাত্রেই পরের কাছে ভিক্ষা ক'রে সংগ্রহ করা হচ্চে, নিজের হাতে দেশের লোকে দেশকে কিছুই দিচ্চে না—না স্বাস্থ্য, না অন্ন, না জ্ঞান, না শক্তি; যে দেশে কর্ম্মের ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ, কর্ম্মের চেষ্টা দুর্ব্বল, যে দেশে শিল্পকলায় মানুষ আপন প্রাণ মন আত্মার আনন্দকে নব নব রূপে সৃষ্টি করচে না; যে দেশে অভ্যাসের বন্ধনে সংস্কারের জালে মানুষের মন এবং অনুষ্ঠান বদ্ধবিজড়িত; যে দেশে প্রশ্ন করা, বিচার করা, নূতন ক'রে চিন্তা করা, ও সেই চিন্তা

ব্যবহারে প্রয়োগ করা কেবল যে নেই তা নয় সেটা নিষিদ্ধ এবং নিন্দনীয়, সেই দেশে মানুষ আপন সমাজে আত্মাকে দেখ্‌তে পায় না, কেবল হাতের হাতকড়া, পায়ের বেড়ি এবং মৃতযুগের আবর্জ্জনা-রাশিকেই চারদিকে দেখতে পায়, —জড় বিধিকেই দেখে, জাগ্রত বিধাতাকে দেখে না।

যদি মূলের দিকে তাকিয়ে দেখি তা হ'লে দেখ্‌ব আমাদের যে দারিদ্র্য সে আত্মারই দারিদ্র্য। মানবাত্মারই অপমান চারিদিকে নানা অভাব নানা দুঃখরূপে ছড়িয়ে রয়েচে। নদী যখন ম'রে যায় তখন দেখ্‌তে পাই গর্ত্ত এবং বালি; সেই শূন্যতার সেই শুষ্কতার অস্তিত্ব নিয়ে বিলাপ করবার কথা নেই, আসল বিলাপের কারণ নদীর সচল ধারার অভাব নিয়ে। আত্মার সচল প্রবাহ যখন শুষ্ক তখনি আচারের নীরস নিশ্চলতা।

সৃষ্টিকে যে সত্য বহন করচে সে সত্য সচল। সে নিরন্তর অভিব্যক্তির ভিতর দিয়ে বিকাশের নব নব পর্ব্বে উত্তীর্ণ হচ্চে। তার কারণ, সত্য অসীমকে প্রকাশের জন্যই। যেখানেই তাকে কোনো একটা সীমার বাঁধ বেঁধে চিরকালের মত বদ্ধ করবার চেষ্টা করা হয় সেইখানেই তাকে ব্যর্থ করা হয়। মানবাত্মার ধারা নিয়ত এই অসীমের দিকে ধাবিত হচ্চে ব'লেই কেবলি নব নব রূপে সৃষ্টি-বিকাশ করতে সে অগ্রসর হচ্চে। আত্মার পক্ষে "স্বাভাবিকী জ্ঞানবল ক্রিয়া চ"; জ্ঞানের পথে বলের পথে নিত্য সক্রিয়তাই তার স্বভাব। বদ্ধ সংসারের বেড়ি হাতেপায়ে পরিয়ে দিয়ে তার এই ক্রিয়া বদ্ধ ক'রে দেওয়াই তাকে তার স্বভাব থেকে বিচ্যুত করা। এই নিষ্ক্রিয়তাকে মুক্তি বলে না, এইটেই তার বন্ধন।

আমাদের দেশে কেবলি এই বাণী শুন্‌তে পাই, যা চলবে না সেইটেই শ্রেষ্ঠ, জীবনের চেয়ে মৃত্যুটাই বড়। এর আর-কোনো মানে নেই—এর মানে অভ্যস্ত আচারের প্রতি, জড় ব্যবস্থার প্রতিই আস্থা। সেই আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা একেবারেই চ'লে গিয়েছে, যে আত্মার পক্ষে "স্বাভাবিকী জ্ঞানবল ক্রিয়া চ।" কিন্তু সত্য শিক্ষা মানুষকে কি বলচে? আত্মানং বিদ্ধি। আত্মাকে জান। "নাল্পে সুখমস্তি, ভূমৈব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ।" অল্পে সুখ নেই, ভূমাকেই জান। এই আত্মাকে জান্‌তে হ'লে, ভূমাকে জান্‌তে হ'লে পৈতৃক সম্বলটিকে বাক্সে বন্ধ ক'রে দিবানিদ্রা দিলে চলবে না। কেবলি চলতে হবে, সৃষ্টি করতে হবে। ভগবান নিয়ত সৃষ্টি ক'রেই আপনাকে জানচেন, মানবাত্মাও কেবল তেমনি ক'রেই আপনাকে জানতে পারে—মৃত পিতামহের কাছে কিম্বা জীবিত প্রতিবেশীর কাছে ধার ক'রে নয়, ভিক্ষা ক'রে নয়।

অতএব, প্রকৃত শিক্ষা জ্ঞানসমুদ্রের যে বন্দরে নিয়ে যাচ্চে সে বন্দর কোথায়? যেখানে এ উপদেশের সার্থকতা আছে—আত্মানং বিদ্ধি, ভূমৈব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ। মানুষ যেখানে আত্মাকে জানে, মানুষ যেখানে সুমহৎকে পায়। অর্থাৎ মানুষ যেখানে সেই ত্যাগের শক্তি পায় যে ত্যাগের দ্বারা সে সৃষ্টি করে, যে শক্তির দ্বারা সে মৃত্যুকে অতিক্রম করে। কিন্তু আজকের দিনে ভারতবর্ষ বিদ্যাসমুদ্রে এই যে মহা-ভিড়-করা খেয়ায় পাড়ি দিচ্চে, সাম্‌নের কোন্ বন্দর সে দেখতে পাচ্চে বল ত? দারোগাগিরি, কেরাণীগিরি, ডেপুটিগিরি। এইটুকু-মাত্র আকাঙ্ক্ষা নিয়ে এত বড় সম্পদের সামনে এসে দাঁড়িয়েচে, এর লজ্জাটা এত বড় দেশ থেকে একেবারে চ'লে গেছে। এরা বড় ক'রে চাইতেও শিখলে না? অন্য দারিদ্র্যের লজ্জা নেই, কিন্তু আকাঙ্ক্ষার দারিদ্র্যের মত লজ্জার কথা মানুষের পক্ষে আর কিছু নেই। কেননা, অন্য দারিদ্র্য বাহিরের, এই আকাঙ্ক্ষার দারিদ্র্য আত্মার।

এই জন্যে আজ আমি তোমাদের এই কথাটুকু বল্‌তে দাঁড়িয়েচি—আকাঙ্ক্ষাকে বড় কর। শক্তি কারো বড়, কারো ছোট—কিন্তু আকাঙ্ক্ষাকে আমরা ছোট করব না। আকাঙ্ক্ষাকে বড় করার মানেই আরামকে অবজ্ঞা করা, দুঃখকে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক গ্রহণ করা। এই দুঃখকে গৌরবে বহন করবার অধিকারই মানুষের। আমাদের শাস্ত্রে একটা কথা বলে, যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী। এই সিদ্ধিটা কিসের? শুধু বাইরের নয়—এই সিদ্ধি হচ্চে আপনাকে উপলব্ধি করা, সেই উপলব্ধি যা কর্ম্মে আপনাকে প্রকাশ করে।

আমাদের আকাঙ্ক্ষাকে শিশুকাল থেকেই কোমর বেঁধে আমরা খর্ব্ব করি। অর্থাৎ সেটাকে কাজে খাটাবার আগেই তাকে খাটো ক'রে দিই। অনেক সময়ে বড় বয়সে সংসারের ঝড়ঝাপটের মধ্যে প'ড়ে আমাদের আকাঙ্ক্ষার পাখা জীর্ণ হ'য়ে যায়, তখন আমাদের বিষয়বুদ্ধি, অর্থাৎ ছোট বুদ্ধিটাই

বড় হ'য়ে ওঠে। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে, শিশুকাল থেকেই আমরা বড় রাস্তায় চলবার পাথেয় ভার হালকা ক'রে দিই। নিজের বিদ্যালয়ে ছোট ছোট বালকদের মধ্যেই সেটা আমি অনুভব করি। প্রথমে কয় বৎসর একরকম বেশ চলে, কিন্তু ছেলেরা যেই থার্ডক্লাসে গিয়ে পৌঁছয় অমনি বিদ্যাঅর্জ্জন সম্বন্ধে তাদের বিষয়বুদ্ধি জেগে ওঠে। অমনি তারা হিসাব ক'রে শিখ্‌তে বসে। তখন থেকে তারা বল্‌তে আরম্ভ করে, আমরা শিখব না, আমরা পাস করব। অর্থাৎ যে পথে যথাসম্ভব কম জেনে যতদূর সম্ভব বেশি মার্কা পাওয়া যায় আমরা সেই পথে চলব।

এই ত দেখ্‌চি শিশুকাল থেকেই ফাঁকি দেবার বুদ্ধি অবলম্বন। যে জ্ঞান আমাদের সত্যের দিকে নিয়ে যায় গোড়া থেকেই সেই জ্ঞানের সঙ্গে অসত্য ব্যবহার। এর কি অভিশাপ আমাদের দেশের উপর লাগচে না? এই জন্যেই কি জ্ঞানের যজ্ঞে আমরা ভিক্ষার ঝুলি হাতে দূরে বাইরে ব'সে নেই? আপিসের বড়বাবু হ'য়েই কি আমাদের এই অপমান ঘুচবে? আজকের দিনে দেশের লোকেরা যুবকেরা পর্য্যন্ত যে বলচে যে, ঋষিরা যা ক'রে গেছেন তার উপরে আমাদের আর কিছুই ভাববার নেই, কিছুই করবার নেই, এর মানে বুঝতে পেরেচ? এইটেই ঘ'টচে আমদের কর্ত্তৃক প্রবঞ্চিত বিদ্যাদেবীর অভিশাপে। যে সমাজে কিছুই ভাববার নেই, কিছুই করবার নেই, সমস্তই ধরাবাঁধা, সে সমাজ কি বুদ্ধিমান শক্তিমান মানুষের বাসের যোগ্য? সে ত মৌমাছির চাক বাঁধবার জায়গা। দশ পনেরো বছর ধ'রে শিক্ষা লাভ ক'রে আপন চিত্তশক্তির পক্ষে এমন অদ্ভুত অপমানকর কথা অন্য কোনো দেশে এতগুলো লোক এত বড় নির্লজ্জ অহঙ্কারের সঙ্গে বলতে পারে নি। সকল বড় দেশে যে বড় আকাঙ্ক্ষা মানুষকে আপন শক্তিতে আপন ভাবনায় আপন হাতে সৃষ্টি করবারই গৌরব দান করে, আমরা সেই আকাঙ্ক্ষাকে কেবল যে বিসর্জ্জন করচি তা নয়, দল বেঁধে লোক ডেকে বিসর্জ্জনের ঢাক পিটিয়ে সেই তালে তাণ্ডব নৃত্য করচি।

কিন্তু আপন দুর্গতি নিয়ে খুব জোরে অহঙ্কার করলেই যে সেই দুর্গতির বিষ মরে এই আশা যেন না করি। আকাঙ্ক্ষাকে ছোট করব, সাধনাকে সঙ্কীর্ণ করব, কেবল অহঙ্কারকেই বড় ক'রে তুলব এও আপনাকে তেমনি ফাঁকি দেওয়া যেমন ফাঁকি, শিক্ষা এড়িয়ে পরীক্ষায় মার্কা পেয়ে নিজেকে বিদ্বান মনে করা। যেখানে ফল দেখা যায় সেখানে চেয়ে দেখি, ডিগ্রি পেলুম, চাকরী করলুম, টাকা হ'ল,—কিন্তু জ্ঞানের ঋণ জ্ঞানের ক্ষেত্রে শোধ করতে পারলুম না, সেখানে সমস্ত বিশ্বের কাছে মাথা হেঁট ক'রে রইলুম।

তোমাদের আমি দূর থেকে উপদেশ দিতে আসি নি। স্বদেশের এতদিনকার যে পুঞ্জীভূত লজ্জা, যে লজ্জাকে আমরা অহঙ্কারের গিল্‌টি ক'রে গৌরব ব'লে চালাতে চেষ্টা করচি সেইটের ছদ্মপরিচয় ঘুচিয়ে তোমাদের কাছে উদ্‌ঘাটিত ক'রে দেখাতে চাই। তোমাদের বয়স কাঁচা, তোমাদের বয়স তাজা, তোমাদের উপর এই লজ্জা দূর করবার ভার। তোমরা ফাঁকি দেবে না এবং ফাঁকিতে ভুলবে না, তোমরা আকাঙ্ক্ষাকে বড় করবে, সাধনাকে সত্য করবে। তোমরা যদি উপরের দিকে তাকিয়ে সামনের দিকে পা বাড়িয়ে প্রস্তুত হও তা হ'লে সকল বড় দেশ যে ব্রত নিয়ে বড় হয়েচে আমরাও সেই ব্রত নেব। কোন্ ব্রত? দানব্রত।

যখন না দিতে পারি তখন কেবল হয় ত ভিক্ষা পাই, যখন দিতে পারি তখন আপনাকে পাই। যখন দিতে পারব তখন সমস্ত পৃথিবী আগ বাড়িয়ে এসে বল্‌বে, "এস, এস, বোস।" তখন জোড়হাত ক'রে এ কথা কাউকে বলতে হবে না, "আমাকে মেরো না, আমাকে বাঁচিয়ে রাখ।" তখন সমস্ত মানুষ আপন গরজেই আঘাত হ'তে আমাদের বাঁচাবে। তখন নিজের দাবীর জোরে সকল অধিকার গ্রহণ করব, পরের কৃপার জোরে নয়। এখন আমরা ভয়ে ভয়ে বলচি, মানবসমাজে আমরা বড় আসন চাইনে, কোনমতে নিজের মাথা গুঁজে রাখবার একটু কোণ চাই মাত্র। না, এমন ছোট চিন্তা মনেও স্থান দিতে নেই, এমন ছোট প্রার্থনা মুখেও উচ্চারণ করতে নেই। ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি। সেই ভূমাকে যদি অন্তরে ভুলি এবং বাহিরে লক্ষ্য না করি তা হ'লে অন্য যে কোন সুখ সুবিধা আমরা চেয়ে চিন্তে যোগাড় করিনে কেন, তাতে আমাদের দেশের সর্ব্বনাশ হবে।

চৌরঙ্গি রোড্

হরিহর শেঠ
মহাশয়ের সৌজন্যে

চৌরঙ্গি রোড্

চিত্রশালা

পুরাতন কলিকাতা

দুর্গ

চৌরঙ্গি রোড

কিউ
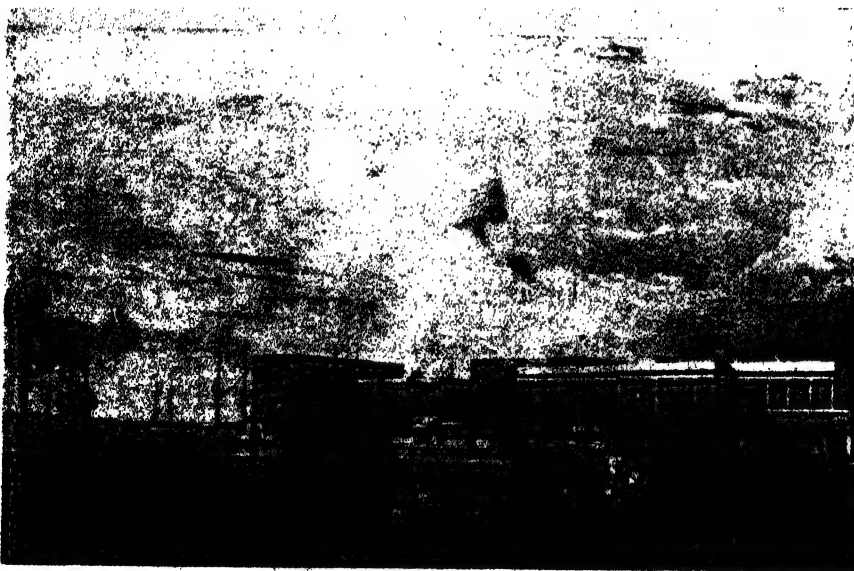
চাঁদপাল ঘাট

আলিপুর ব্রিজ্
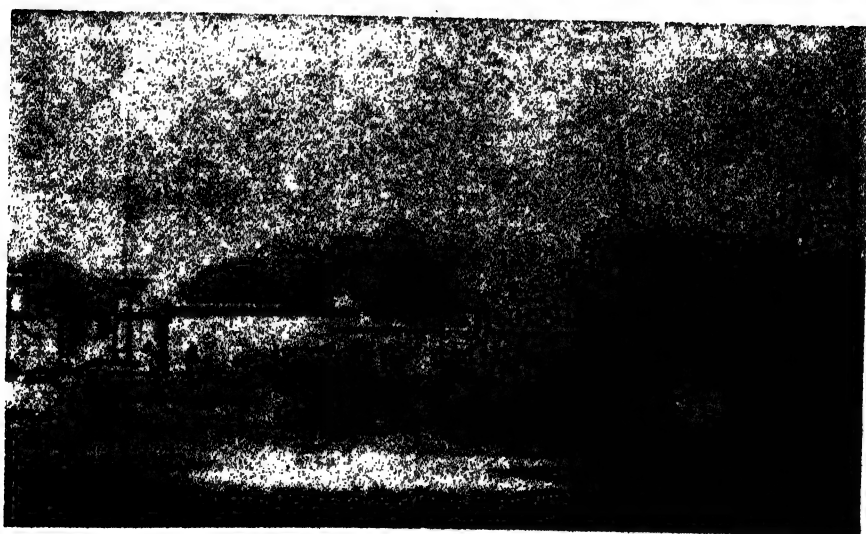
সদরদেওয়ানি আদালতের প্রবেশ পথ—চৌরঙ্গি রোড্

খিদিরপুর ব্রিজ্

এসিয়াটিক্ সোসাইটির গৃহ—পার্ক ষ্ট্রীট্

এই ছবি-গুলি চন্দননগর-নিবাসী শ্রীযুক্ত হরিচরণ রক্ষিতের নিকট হইতে পাইয়াছি। এই সুযোগে তাঁহাকে আমার ধন্যবাদ জানাইতেছি।

শ্রীহরিহর শেঠ

—শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়

১৭
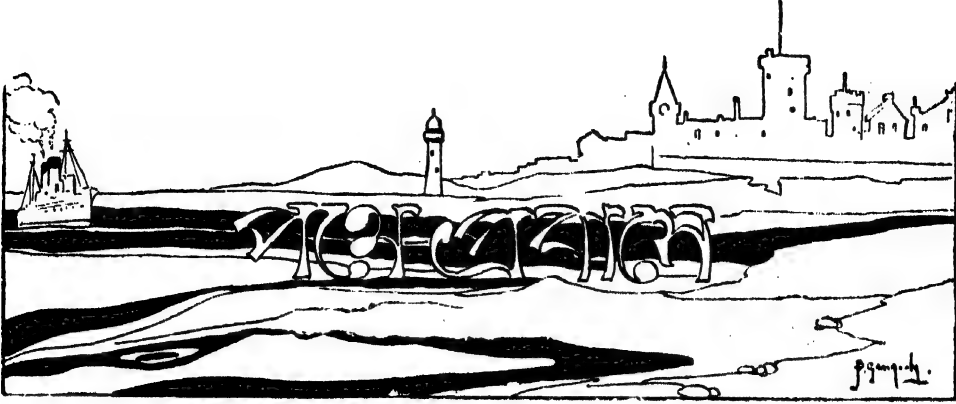
আবহতত্ত্ববিদ্‌দের মুখে ছাই দিয়ে আজ আবার সোনার সূর্য্য উঠেছে, দশদিক সোনা হ'য়ে গেছে।

কিছুদিন থেকে এমনি অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্য প্রতিদিন আমাদের চমক লাগিয়ে দিচ্ছে, এ যেন একটা প্রাত্যহিক miracle। আকাশ উজ্জ্বল নীল, পৃথিবী উজ্জ্বল শ্যাম,গাছেরা এখনো পাতা ফিরে পায় নি, কিন্তু ফুলের ভারে ভেঙে পড়্‌ছে, মেঠো ফুলের রঙের বাহার দেখে মনে হয় যেন ফুলের আয়নায় সূর্য্যের আলোর সব ক'টি রঙ, বিশ্লেষিত হয়েছে। পাখীরাও বসন্তের সঙ্গে দক্ষিণ দেশ থেকে ফিরল, তাদের নহবৎ আর থামেই না।

এমনি miracleএর উপর আস্থা রেখে আমরা মাঝে মাঝে লণ্ডন ছেড়ে বেরিয়ে পড়ি, যেদিকে চোখ যায় সেইদিকে চরণ যায়, আহার নিদ্রার ভাবনাটা একাদশম ঘটিকার আগে হাজির হয় না, এবং ভাবনা যদি বা হাজির হয় আহার নিদ্রাকে হাজির করানো সেও এক প্রাত্যহিক miracle। "মোটের উপর একটা কিছু হ'য়ে ওঠেই ওঠে।"

অথচ ঐটুকু অস্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে তাল কাট্‌তেও পারি নে। এত বড় উৎসবসভায় পান পায়নি ব'লে খুঁৎ খুঁৎ কর্‌বে কোন বেরসিক? একসঙ্গে এতগুলো আনন্দ মিলে আক্রমণ করেছে—রঙ, রূপ, গান। সৌন্দর্য্যের বাণ সর্ব্বাঙ্গ বিঁধে শরশয্যা রচনা করল। মুখ ফুটে ধন্যবাদ জানাবার ভাষা নেই, এত অসহায়। স্তবের মতো দেহমন লুটিয়ে পড়ে। পরস্পরকে অকারণে ভালবাসি, অপরিচিতকে হারোনো বন্ধুর মতো বুকে টানি। কুয়াশার মতো সংশয় উধাও হ'য়ে গেছে, ফেরার! আকাশব্যাপী আলোর মতো হৃদয়ব্যাপী প্রত্যয় দিবসে সূর্য্যের মতো নিশীথে চন্দ্রের মতো জাগরূক। জগতের পূর্ণতা জীবনের অপূর্ণতাকে সমুদ্রের কোলে স্পঞ্জের (sponge) মতো ওতঃপ্রোত করেছে। ধন্য আমরা—সৌন্দর্য্যসায়রের কোটি তরঙ্গাঘাত সইতে সইতে আমরা আছি, আমাদের দুঃখগুলি আনন্দসায়রের বীচিবিভঙ্গ। অভাব? এমন দিনে অভাবের নাম কে মুখে আন্‌বে? আমাদের একমাত্র অভাব—বাণীর অভাব, তৃপ্তি জানাবার বাণীর। আদিম মানবেরই মতো অন্তিম মানবও বাণীর কাঙাল থেকে যাবে, কৃতজ্ঞতা জানাবার বাণীর। সেই জন্যেই তো মানুষের মধ্যে কবি সকলের বড়—ঋষির চেয়েও, বীরের চেয়েও, ব্যবস্থাপকের চেয়েও, ক্ষুধা-নিবারকের চেয়েও, লজ্জা-নিবারকের চেয়েও। কবিকে বাদ দিলে সুন্দরের সভায় মানুষ বোবা, কবিকে কাছে রাখ্‌লে তার কথা ধার নিয়ে মানুষের মান থাকে। নইলে ঋষি থেকে ক্ষুধা-নিবারক পর্য্যন্ত কেউ একটা পাখীর সম্মানও পেতেন না।

শরৎকালে সেকালের রাজারা দিগ্বিজয়ে যেতেন, বসন্তকালে একালের আমরাও দিগ্বিজয়ে যাই। আমরা যাই কোন দিকে কোন আপনার লোক অচেনার মতো

আত্মগোপন ক'রে রয়েছে তাদের মুখোস খসাতে। এমন দিনে কি কেউ কারুর পর হ'তে পারে? এ কি কুয়াশা-কালো দিন যে শত হস্ত দূরের মানুষকে শৃঙ্গী ব'লে ভ্রম হবে? নিজের দুধের বাটিতে মুখ ঢেকে ভাব্‌বো পৃথিবী-শুদ্ধ আমাকে দেখে হিংসায় জ্ব'লে পুড়ে মর্‌ছে? না, বসন্তকালে আমাদেরও মুকুল খোলে, আমরা ভালোবাসার সীমা খুঁজতে ফুলের গন্ধের মতো দিশাহারা হই, কোন শহর থেকে কোন গ্রামে পৌছাই, কোন তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে কোন বেড়া টপ্‌কাই, কোন গাছের তলায় শুয়ে কোন কোকিলের গলা শুনি, কোন চেরির গুচ্ছ চুরি ক'রে কোন প্রিয়জনকে সাজাই, অতি অপরিচিত শিশুর গায় চকোলেটের ঢিল ছুঁড়ে ভাব করি। এটা আমাদের দোষ নয়, ঋতুর দোষ। নইলে আমাদের মতো কাজের লোকেরা কি টাইপ্‌রাইটারের খট্‌খটানি ফেলে মোরগের কু-ক্‌-রু-কু-উ শুন্‌তে যায়? না, রাজারা রঙমহাল ছেড়ে রণক্ষেত্রে রঙ্‌ মাখ্‌তে যায়?

শীতকালের ইংলণ্ড যদি নরকের মতো, গ্রীষ্মকালের ইংলণ্ড স্বর্গের মতো। প্রতিদিন হয় তো সূর্য্য ওঠে না, উঠ্‌লেও প্রতি ঘণ্টায় থাকে না, কিন্তু তাতে কি? ফুলের মধ্যে তার রঙ্‌, পাতার মধ্যে তার আলো, পাখীর গলায় তার ভাব জমা থাকে। মেঘলা দিনে ঐ সঞ্চয় ভেঙে খরচ কর্‌তে হয়। ইংলণ্ডের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের প্রথম কথা তার গড়ন। ইংলণ্ড বন্ধুরগাত্রী। যে কোনো একটা ছোট গ্রামে দাঁড়িয়ে চারিদিকে তাকালে কী দেখি? দেখি যেন একখানা concave আয়না। রেখার উপরে রেখা হুড়্‌মুড় ক'রে পড়েছে। অসমতল বল্লে ঠিক পরিচয়টি দেওয়া হয় না। বল্‌তে পারি অযুত-সমতল। সমতলের সঙ্গে সমতল মিলে অযুত কোণ রচনা করেছে, এবং এক কাঠা জমীকেও সমতল রাখেনি। যেটুকু সমতল দেখা যায় সেটুকু মানুষের কুকীর্ত্তি। সুখের বিষয় ইংলণ্ডের সমাজের মতো ইংলণ্ডের মাটিকেও মানুষ সরল রেখা দিয়ে সরল করেনি। এই এক কারণে শীতকালেও ইংলণ্ড অসুন্দর বা অস্বাস্থ্যকর হয় না, হয় কেবল অন্ধকার। শীত গ্রীষ্ম সব ঋতুতেই ইংলণ্ডে বর্ষা। কিন্তু বর্ষার জল দাঁড়াবার মতো একটু সমতল খুঁজে পায় না।

দেশের মাটির সঙ্গে মানুষের মনের যোগাযোগ বোধ হয়, কথার কথা নয়। প্রাণীসৃষ্টির একটা স্তরে মানুষ ও উদ্ভিদ্‌ একই পর্য্যায়ভুক্ত নয় কি? আমার মনে হয় ইংরেজের মন যে Law and orderএর জন্য এত ব্যাকুল এর কারণ তলে তলে সে তার মাটির মতো Law and order-হীন, অযুত-সমতল। ইংলণ্ডের মাটির উপরকার জল যেমন অহরহ সমতল পাবার চেষ্টা করছে, পাচ্ছে না, ইংরেজের সমাজও তেমনি যুগে যুগে সাম্যের চেষ্টা ক'রে এসেছে, পায়নি। Snobbery ইংরেজ সমাজের মজ্জাগত, উপর-তল না হ'লে তার সামাজিক রথ গড়িয়ে গড়িয়ে চল্‌তে পারে না। অথচ সাম্যকেও তার মন চায়; নইলে চেষ্টা থাকে না, সবই আপনা-আপনি ঘটতে থাকে, উপরের জল চোখ বুজে নীচে যায়, নীচের ধোঁয়া চোখ বুজে উপরে ওঠে। এমনি নিশ্চেষ্টতা আমাদের স্বভাব হ'য়ে দাঁড়িয়েছে ব'লে আমাদের সামাজিক রথ কোনো মতে চল্‌ছে, ও কোনোমতে থাম্‌বারও নয়। হিন্দুর মরণ নেই, সে হিন্দুবিধবার মতো, টিঁকে থাক্‌বেই।

ইংরেজের মনের ভিত্তি অস্থির—সে যেন পৃথিবীর কেন্দ্র পর্য্যন্ত পৌছেছে, সেখানে সবই বিশৃঙ্খল, সবই আগুন! অবচেতনভাবে সে ঝড় ঝঞ্ঝাকে ভালোইবাসে, সমস্যার অভাব সইতে পারে না, কিছু না হ'ক্‌ একটা crossword puzzle তার চাইই, কোনো রকম একটা। যুদ্ধ—হোক না কেন "যুদ্ধের বিরুদ্ধে যুদ্ধ"—না থাক্‌লে সে বেকার। "হরি হে, কবে শান্তি ও শৃঙ্খলা পাবো", এটা তার চেতনার কথা। তার অবচেতনার কথা কিন্তু "শান্তি ও শৃঙ্খলাকে পাবার চেষ্টা যেন কোনো দিন ক্ষান্ত না হয়, এম্‌নি চল্‌তে থাকে।" ইংলণ্ডের একটা হাত সমস্যার সৃষ্টি করে, আরেকটা হাত সমস্যার ধ্বংস করে, কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে উভয়ের মধ্যে ষড়যন্ত্র না থাক্‌লেও অন্তরালে দুই হাতের একই স্বার্থ—তারা পরস্পরের অন্তরটিপুনি অনুসারে সমস্যার বাড়্‌তি কম্‌তি ঘটায়, মীমাংসা কাঁচা-পাকা রাখে। আপিসের দুই চালাক কর্ম্মচারী তারা, অদরকারী ব'লে কোনো দিন তারা বেকারের দলে পড়লো না। ইংলণ্ডকে দেখলেই মনে হয়, সাবাস্‌, খুব খাট্‌ছে বটে, কী ব্যস্ত! কিন্তু তথায়থ কর্‌লে ধরা প'ড়ে যায়, সমস্যা ও মীমাংসার উপরে যে একটা স্তর আছে সে

রায়

স্তরে কি এদেশ কোনো দিন উঠ্বে! সাত্ত্বিকতার শিরস্ত্রাণ কি কখনো এর ললাটে জল্‌বে! এ যে সব পর্য্যবেক্ষণ করে, কিছুই দেখে না, সব জ্ঞাত হয়, কিছুই জানে না, সব বোঝে, কিছুই উপলব্ধি করে না। এর জীবন যেন জীবন ব্যাপী ছেলেমানুষি। সাড়ে তিন থেকে সাড়ে তিন কুড়ি বছর বয়স পর্য্যন্ত লাট্টুর সঙ্গে লাট্টুর মতোই ঘুর্‌ছে!

প্রকৃতি যখন উৎসবময়ী সাজে, মানুষ তখন তার সাজ দেখ্‌বার জন্য কাজ কর্ম্ম ফেলে রাখে; এই জন্যে আমাদের বারোমাসে তেরো পার্ব্বণ। ইংলণ্ডেও নাকি এককালে মাসে মাসে দোল দুর্গোৎসব ছিল, কিন্তু তে হি দিবসাঃ গতাঃ। এখন প্রতিরাত্রে পার্ব্বণ চলে নাচঘরে ও সিনেমায়, প্রতিদিন খেলার মাঠে। বড় দিন বা ঈষ্টার এখন নামরক্ষায় পর্য্যবসিত। ভারতবর্ষের লোকের কাছে এই হিসাবে ইংলণ্ড অত্যন্ত নিরানন্দ দেশ। এ দেশে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ পূজ্যের সঙ্গে পূজারীর সম্বন্ধ থেকে কখন্ নেমে এসে শিকারের সঙ্গে শিকারীর সম্বন্ধে দাঁড়িয়েছে। এখনকার আমোদ প্রমোদগুলো যেন যুদ্ধে জিতে শত্রুর মৃত দেহের উপরে মাৎলামি করা। এমন আমোদের শিরায় শিরায় ভয়, মৃত্যুভয় দারিদ্র্যভয় ব্যাধিভয়। প্রকৃতির প্রতিশোধগুলোর নামে মানুষ বিবর্ণ হ'য়ে যায়। প্রকৃতি যে কত রকমে প্রতিশোধ নিতে আরম্ভ করেছে হিসাব হয় না। একটা মস্ত প্রতিশোধ হচ্ছে যুদ্ধ। আধুনিক কালে আমরা অধিকাংশেই রুটিন দেখে ইস্কুলে পড়ি, আপিসে কাজ করি, খেল্‌তে যাই ও তামাসা দেখি। প্রত্যেক দেশেই এখন হাজার হাজার ইস্কুল কলেজ, লাখে লাখে আপিস কারখানা সংখ্যাতীত সিনেমা নাচঘর। প্রত্যেকটি মানুষ হয় সরকারী নয় বেসরকারী ব্যুরোক্রাট্—সরকারী ডাক্তারের মেয়ে কেরাণী থেকে Lyonsএর চায়ের দোকানগুলোর কর্ম্মচারিণী পর্য্যন্ত কেউ বাদ যায়নি। এই কোটি কোটি মৌমাছির চিত্তবিনোদনের জন্যে একই অভিনেতা অভিনেত্রী একাদিক্রমে তিনশো রাত একখানি নাটক অভিনয় ক'রে যান। তিনশোবার বাজালে একখানা গ্রামোফোনের রেকর্ডেরও ইজ্জৎ থাকে না, কিন্তু ধন্য এদের গলা!

এর পরিণাম জীবনে বিরক্তি। ছুটির দিন সস্তা টিকিট কিনে ট্রেনে বোঝাই হ'য়ে একই স্থানের পাশাপাশি হোটেলে যখন হাজার হাজার জন অভ্যাগত টমাস কুকের তর্জ্জনী সঙ্কেতে পরিচালিত হন্ ও charabancএর পিঠে চ'ড়ে প্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণ করতে যান তখন অন্তঃপ্রকৃতি ও বহিঃপ্রকৃতি দু'জনেই "ত্রাহি" "ত্রাহি" ক'রে ওঠেন। তাঁরা বলেন, "রুটিনের হাত থেকে আমাদের রক্ষা করো, মানচিত্রের হাত থেকে, এষ্টিমেটের হাত থেকে।" তখন এমন কোথাও যাবার জন্যে মানুষ ছট্‌ফট্ করে যেখানে টমাস কুক নেই, পাকা সড়ক নেই, শোবার ঘরওয়ালা মোটর কোচ নেই—এক কথায় আমাদের শিশুবর্জ্জিত পশু-অলঙ্কৃত সর্ব্বস্বাচ্ছন্দ্যযুক্ত ফ্ল্যাটের আরাম নেই। সমস্ত পৃথিবীটা যেমন শনৈঃ শনৈঃ একই রকম হ'য়ে উঠ্‌ছে, দেখে মনে হয় টমাস কুক গ্রামে গ্রামে দোকান খুল্‌বে, কাউকে প্রাণ হাতে ক'রে বেহিসাবীভাবে অজানা পথে বিবাগী হ'তে দেবে না। তখন মানুষের একমাত্র আশা ভরসার স্থল হবে যুদ্ধক্ষেত্র, সত্যিকারের ছুটি পাওয়া যাবে ঠিক সেইখানেই, সেখানকার কিছুই আগে থেকে জেনে রাখা যাবে না, প্রতি পদেই অকস্মাতের সঙ্গে দেখা।

গত মহাযুদ্ধে যে ক্ষতি হয়েছে তারই পূরণের জন্যে প্রকৃতি অপেক্ষা কর্‌ছে, তাই এখনো আমরা যুদ্ধের নামে জিভ্ কাট্‌ছি, মেয়েরা আগামী পার্লামেন্টটাকে Parliament of Peacemakers কর্‌বার জন্যে চেষ্টা কর্‌ছে। কিন্তু যে শিশুরা গোড়া থেকেই মোহমুক্ত হ'য়ে বাড়্‌ছে, যাদের কল্পনাকে খোরাক দেবার জন্যে দ্যুলোকে ভূলোকে একটিও অপরিচিত প্রাণী একটাও অপরিচিত স্থান নেই, সেই সব বাস্তববাদী যখন বড় হ'য়ে দলে দলে সরকারী বেসরকারী ব্যুরোক্রেসীর অন্তর্ভুক্ত হ'য়ে রুটিন্ সাম্‌নে রেখে কাজ কর্‌বে তখন তাদের প্রত্যেকের চোখের সুমুখে না হয় ঝুলিয়ে রাখা গেল "There is no fun like work" এবং সোশ্যালিষ্টদের দয়ায় তাদের কর্ম্মকাল না হয় ক'রে দেওয়া গেল দিনে পাঁচ ঘণ্টা, তবু তারা সেই সোনার খাঁচা থেকে উড়ে গিয়ে মর্‌তে চাইবে না কি? অত্যন্ত বেশী সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার পরিণাম চিরকাল যা হয়েছে তাই হবে, প্রকৃতি কোনো সঙ্ঘকেই টিঁক্‌তে দেয়নি,—না বৌদ্ধ সঙ্ঘকে, না

খ্রীষ্টান সঙ্ঘকে। এবং অন্নবস্ত্রের জন্যে যে নতুন সঙ্ঘটা প্রতি দেশেই নানা নাম নিয়ে শশীকলার মতো বাড়্ছে সোশ্যালিজ্‌ম্ তার শেষ অধ্যায় বটে, কিন্তু তার পরেও উপসংহার আছে। এবং সে উপসংহার তেমন মুখরোচক নয়।

প্রকৃতির প্রতি ইংরেজের দরদ এখনো লোপ পায়নি, ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থের নাতি নাৎনীকে এখনো দেখ্‌তে পাওয়া যায়। রাস্তার দু'ধারে গাছ রুইবার জন্যে সমিতি হয়েছে, উদ্যান-নগর বা উদ্যান-নগরোপান্ত (Garden Suburb) রচিত হচ্ছে, পল্লীর সৌন্দর্য্য অক্ষুণ্ণ রাখবার আন্দোলন তো কবে থেকে চ'লে আস্‌ছে, কিন্তু রেলগাড়ীওয়ালা মোটর-গাড়ীওয়ালা ও নতুন বাড়ীওয়ালাদের লুব্ধদৃষ্টির উপরে ঘোমটা-টেনে-দেওয়া পল্লীসুন্দরীর ক্ষমতার বাইরে। * দু'পাঁচজন অসমসাহসিক স্বপ্নদ্রষ্টা পল্লীর প্রাণ প্রতিষ্ঠা ক'রে দেশের নব সভ্যতাকে আবাহন করতে ব্যগ্র, কিন্তু হাটের কোলা-হলে তাঁদের কণ্ঠস্বর বড়ই ক্ষীণ। পলিটিসিয়ানদের কাছে তাঁরা আমাল পান না, কেননা পলিটিসিয়ানরা হয় বড় বড় কল কারখানাওয়ালাদের তাঁবেদার নয়, কল কারখানার শ্রমিকদের সর্দ্দার। দুই দলের স্বার্থই আরো অধিক-সংখ্যক কলকারখানা পাকা সড়ক নতুন বাড়ী ইত্যাদির সঙ্গে জড়িত। বেকার সমস্যা দূর কর্‌বার জন্য এরা যা হাতের কাছে পাচ্ছে তাই করতে উদ্‌গ্রীব, দশ বছর পরে তার ফলে দেশের চেহারাটা কেমন হবে তা ভাব্‌তে গেলে ভোট্ পাওয়া যায় না, ক্ষুধিতের ক্ষুধাও বাড়্‌তে থাকে। এমনিই তো দেশটাতে জমি যত আছে রাস্তা তার বেশী, রাস্তা যত আছে বাড়ী তার বহুগুণ; আরো দশ বছর পরে দেখা যাবে যে সারা ইংলণ্ডটা একটা বিরাট শহর, এবং এই শহরের লোক নিজেদের খাদ্য নিজেরা একেবারেই উৎপাদন করে না। বলা বাহুল্য সোশ্যালিষ্টরা শহুরে শ্রমিকদের ভোটের উপর নির্ভর করে; গ্রাম্য কৃষকদের জন্য তাদের মাথাব্যথা নেই। কৃষকদের ভোট পাবার জন্যে অন্যান্যদলের এক-একটা কৃষি-পলিসী আছে বটে, কিন্তু পলিটিসিয়ান জাতীয় প্রাণীদের কাছে দূরদর্শিতা প্রত্যাশা করা বৃথা, তারা তুব্‌ড়ির মতো হঠাৎ জ্ব'লে হঠাৎ নেবে, তাদের জীবদ্দশা বড় জোর বছর পাঁচেক। সমগ্র দেশের নব সভ্যতার আবাহন করা তাদের কাজও নয় তাদের সাজেও না। তাদের একদল আরেকদলের জন্যে বস্‌বার জায়গা রেখে যেতেই জানে, সমস্ত জাতিটার চলার ভাবনা তাদের অতি সূক্ষ্ম মস্তিষ্কে প্রবেশপথ পায় না।

এখনকার ইংলণ্ডকে দেখে দুঃখিত হবার কারণ আছে। সে কারণ এমন নয় যে ইংলণ্ডের নৌবহরকে আমেরিকার নৌবহর ছাড়িয়ে উঠ্‌ছে, ইংলণ্ডের উপনিবেশরা পর হ'য়ে যাচ্ছে, ইংলণ্ডের অধীন দেশগুলি স্বাধীন হ'য়ে উঠ্‌ছে, ইংলণ্ডের অন্তর্ব্বিবাদে তার ধনবৃদ্ধি বাধা পাচ্ছে। আসলে সাম্রাজ্যের জন্য ইংলণ্ড কোনদিন কেয়ার করেনি, যেমন ঐশ্বর্য্যের জন্যে চিত্তরঞ্জন দাশ কোনো দিন কেয়ার করেননি। ইংলণ্ড একহাতে অর্জ্জন করেছে অন্যহাতে উড়িয়ে দিয়েছে, একদিন যাদের ক্রীতদাস করেছে অন্যদিন তাদের মুক্ত ক'রে দিয়েছে, যেদিন আমেরিকা হারিয়েছে সেইদিন ভারতবর্ষ পেয়েছে। পুরুষস্য ভাগ্যম্। আধিভৌতিক লাভক্ষতির কথা ইংলণ্ড এতদিন ভাবেনি, এইবার ভাবতে সুরু করেছে দেখে মনে হয় এবার আর তার সেই পুরাতন অন্যমনস্কতা নেই, এবার সে অক্ষমের মতো নিজের অক্ষমতার কথাই ভাব্‌ছে। ব্যাপার এই যে ইতিমধ্যে কবে একদিন—উনবিংশ শতাব্দীতেই বোধ হয়—ইংলণ্ডের আত্মা অন্তর্হিত হয়েছে কিম্বা জীবন্মৃত হয়েছে। শেকস্‌পীয়ার থেকে ব্রাউনিং পর্য্যন্ত এসে সে ক্লান্ত হ'য়ে পড়্‌ল। যে ইংরেজের প্রাণ ছিল adventure বিপদ্‌বরণ, সে এখন মন্ত্র নিয়েছে, "Safety first"। যা-কিছু এক কালে অর্জ্জন করেছে তাই এখন সে নিরাপদে ভোগ করতে চায়। কিন্তু সংসারের নিয়ম এই যে, বীরছাড়া অন্য কেউ বসুন্ধরাকে ভোগ করতে পার্‌বে না, অর্থাৎ অর্জ্জন করা ও ভোগ করা একসঙ্গে চলা চাই। বস্তুত অর্জ্জন করাটাই ভোগ করা। অর্জ্জিত ধনকে র'য়ে ব'সে ভোগ করা হচ্ছে সংসারের আইনে চুরি করা। এ আলস্যকে সংসার কিছুতেই প্রশ্রয় দেবে

* একটি সমিতির সেক্রেটারী লিখছেন, "আপনি কি জানেন যে আমাদের বনফুলগুলি একে একে লোপ পেয়ে যাচ্ছে? তাদের বাঁচিয়ে রাখ্‌বার জন্যে এই সমিতির প্রয়াস ও উপায় উদ্ভাবনে আপনি যোগ দেবেন?"

শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়

না। যার might নেই তার right তামাদি হ'য়ে গেছে, যার হজম করবার ক্ষমতা নেই সে খেতে পাবে না।

কিছুকাল থেকে আধিভৌতিক ঐশ্বর্য্যের উপরে মন দেওয়া ছাড়া ইংলণ্ডের গত্যন্তর থাকেনি, কেননা মন দেবার মতো আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য্য তার কখন্ ফস্কে গেছে। এখন আধিভৌতিক ঐশ্বর্য্যও যায়-যায় দেখে তার মেজাজ বিগ্ড়ে যাচ্ছে। ধনকে যে মানুষ পরম কাম্য মনে ক'রে কোটিপতি হলো, সে যখন দেখে যে আরেকজন কেমন করে দ্বি-কোটি-পতি হয়েছে তখন সে চোখে আঁধার দেখে, তার পা টল্‌তে থাকে। ভদ্রলোকের ছেলে যখন ইতর লোকের ছেলের সঙ্গে কথা কাটাকাটি কর্‌তে যায় ও একটি অশ্লীল কথা বল্‌তে গিয়ে দশটি শুনে আসে, তখন তার যে অবস্থা হয় ইংলণ্ডের অনেকটা সেই অবস্থা। ধনবলকে সে সকলের থেকে শ্রেয় মনে করেছিল, আজ ধনবলে সে প্রথম থাকৃতে পার্‌ছে না, আমেরিকা তার চেয়ে বড় "power" হ'য়ে "জগৎ গ্রাসিতে করেছে আশয়"। ইংলণ্ডের এই অপমান এখনো তার মর্ম্মে বেঁধে নি, কিন্তু চাম্ড়ায় বিঁধ্‌ছে। বেশ একটু "inferiority complex"ও তার মধ্যেও লক্ষ্য করছি। ভারতবর্ষের মতো সেও বল্‌তে আরম্ভ করেছে, "আমি বড় গরীব, আমি গোবেচারা", কিন্তু সংসারের আইনে গরীব হওয়া হচ্ছে ফাঁসির আসামী হওয়া। হয় আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য্যে ধনী হ'তে হবে, নয় আধিভৌতিক ঐশ্বর্য্যে ধনী হ'তে হবে, অস্তিত্বের মূল্য দেবার জন্য ধনী না হ'লে চলে না। ইংলণ্ডের যদি আবার আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য্য আসে তবেই তার এই "inferiority comlex" স্থায়ী হবে না। ইংলণ্ডের আত্মা চায় একটা "Renaissence"—নবকলেবর-ধারণ। বনস্পতির জন্যে তার খর্ব্ব ক্ষীণ বনভূমি অপেক্ষা করছে। না সাহিত্যে না রাজনীতিতে না বাণিজ্যে না রণনীতিতে কোনো দিকেই একটা মহামানবের সাক্ষাৎ পাওয়া যাচ্ছে না। এত বড় একটা মহাযুদ্ধ গেল, কিন্তু তার থেকে পাওয়া আত্মিক অভিজ্ঞতা নিয়ে না দেখা দিল মহাকাব্য, না মহা-উপন্যাস। সেইজন্যে ইংলণ্ডের এই দারিদ্র্যপীড়িত আবহাওয়ায় নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয়।

(ক্রমশঃ)

পাহাড় পথে

শ্রীঅরীন্দ্রজিৎ মুখোপাধ্যায়

পথ চলেছে আঁকা বাঁকা
কোনখানে সে কোনখানে,
কোন সে সুদূর কেউ-না-জানা
গোপন পুরীর সন্ধানে!
বিরামহারা-কি-গান-গাওয়া
পাইন বনের বুক বেয়ে,
বরাস্ ফুলের রক্ত-রাঙা
হাসির দোলায় দোল খেয়ে,
সেঁউতি ফুলের গন্ধ মেখে,
বানের বনের মাঝখানে
অজগরের মাথায় চ'ড়ে
পথ চলেছে কোন খানে!

ওই লুকাল বাঁকের পথে,
শেষ বুঝি তা'র ওই খানে!
এই রয়েছে, হয়নি'ত শেষ,
চলেছে ঠিক এক টানে!
ওই উপরে ওই দেখা যায়
উঁচু পাহাড় বেড় দিয়ে,
আবার কোথায় আড়াল হ'ল
দেখতে হবে খোঁজ নিয়ে।
অভিমানে হারিয়ে যাওয়া,
ফিরিয়ে পাওয়ার সম্প্রতী
নিত্য খেলে লুকোচুরী—
পাহাড় পথের এই নীতি।

ওই শোন; ওই ঘণ্টা বাজে,
একটু দাঁড়াও পাশ দিয়ে,
পাহাড়ীরা আসছে নেমে
ঘোড়ার পিঠে বোঝ্ নিয়ে।
ভিড় সরেছে—এগিয়ে চল;
পাহাড়ী গাঁও ওই দূরে!
পাশ দিয়ে পথ খাড়া চড়াই
বাউড়ী-ঝরা জল ঘুরে।
ওই ক'খানা কাঠের বাড়ী
শ্লেট পাথরে ছাদ আঁটা,
ঢালু পাহাড় গায় সাজান
মক্কি-ক্ষেত ওই থাক্‌কাটা,
সুপ্তি-ঘেরা পাহাড় বুকে
ঘুম-ভাঙান কোন্ বাণী
সামনে হঠাৎ ওই দেখা যায়
পাহাড়ীদের গ্রামখানি!
হয়'ত হোথা ডালিম বনে
ডালিম-ফুলি কা'র হাসি
লাগবে চখে, ঘর ছাড়া মন
উঠ্‌বে সুখে উদ্ভাসি।
আড়ুব তলে কোন বিরহী
বাঁশীর সুরে ডাক দিয়ে
হয়'ত সেথা গান গাহিছে
হারা প্রিয়ার খোঁজ নিয়ে!
বিষম চড়াই! সাম্‌লে চল
খাড়া পাহাড়-আল ঘেঁসে
ডান দিকে ওই ধস্ নেমেছে
গভীর অতল কোন দেশে!
হয়'ত হবে হাজার ফিট ও
কিম্বা হবে দেড় হাজার,

বাংলা দেশের পাঠশালার
গুরুমশাই মিন সে ভার।
কিন্তু দেখো সেই অতলে
জল চলেছে খড় বেয়ে;
সবুজ বনের বুকের উপর
রূপার মালার রূপ ছেয়ে!
এগিয়ে পড়! ওই শোন ডাক!
একটু দাঁড়াও চুপ ক'রে;
ছড়ের ধারা ঝরছে কোথায়!
উঠতে হ'ল পথ ধরে।
রাস্তা বড় নয় সুবিধা,
একটু চল সাবধানে—
প্রেমের পথে অনেক বাধা
তাই ব'লে কি কেউ মানে!
ওই ছুটেছে পাহাড়-ঝরা
মত্ত ধারায় ঘোড়-সোয়ার,
মুক্তচূড়া মহাদেবের
জটায় যেন গঙ্গাধার!
দিগ্-বিদিকের নাইক খেয়াল,
গতির বেগে সব বাধা
পথ ছেড়ে দেয়, মরণ-হারা
মুক্তিবাণী তা'র সাধা!
ঠিক্‌রে পড়ে রোদের আলো
ইন্দ্রধনুর রূপ ধরি,
কাঁপছে গিরি, জলের ধোঁয়া
উঠ্‌ছে হাওয়ায় বুক ভরি।
পাশ দিয়ে তা'র পাহাড়ী পথ
চলেছে ওই কোনখানে,
চিরকালের কেউ-না-জানা
কোন সুদূরের সন্ধানে!

কবিবর দেবেন্দ্রনাথ সেন

শ্রীকৃষ্ণবিহারী গুপ্ত

আজ প্রায় দশবৎর হইল কবিবর দেবেন্দ্রনাথ সেন পরলোকে গমন করিয়াছেন। তিনি যে 'সত্য শিবসুন্দরের পবিত্র সঙ্গীত' গাহিয়াছিলেন তাহা আমরা ভুলিয়া যাইতে বসিয়াছি। তাই আজ তাঁহার কাব্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি।

কবি দেবেন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথের যুগে তাঁহার সমসাময়িক যে কয়জন প্রতিভাশালী কবি ও সাহিত্যিক তাঁহার প্রভাব এড়াইয়া বঙ্গসাহিত্যে অসামান্য প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছিলেন, দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁহারই অন্ততম। দ্বিজেন্দ্রলাল, অক্ষয়কুমার, ক্ষীরোদপ্রসাদ ও অমৃতলাল রবীন্দ্রনাথের আওতায় পড়িয়া আপনাদের স্বাতন্ত্র্য হারান নাই। ফলে আমাদের কাব্য ও নাট্যসাহিত্য ইঁহাদের অমূল্য দানে অপূর্ব্ব শোভায়, সম্পদে ও বৈচিত্র্যে মণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে। উপন্যাস ও গল্প-সাহিত্যসম্বন্ধেও এই কথা সত্য। নামোল্লেখের বোধকরি প্রয়োজন নাই। দেবেন্দ্রনাথ ইঁহাদেরই আসরে গান গাহিয়াছেন। সে গানের সুর ভাব ও চিন্তায় খুব উঁচু পর্দায় না পৌঁছিলেও তাহা যেমন মিষ্ট তেমনই পবিত্র।

দেবেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষা দুই কি তিন বৎসরের বড় ছিলেন। উভয়ের মধ্যে বিশেষ প্রীতি ও সৌহার্দ্দ্য ছিল। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'সোনার তরী' দেবেন্দ্রনাথের নামে উৎসর্গ করেন। দেবেন্দ্রনাথও তাঁহার 'গোলাপ-গুচ্ছ' রবীন্দ্রনাথকে ও তাঁহার 'অশোকগুচ্ছ' শ্রীমতী স্বর্ণ-কুমারী দেবীকে উৎসর্গ করেন। এই 'অশোকগুচ্ছ' লইয়াই আমরা তাঁহার কাব্যসমালোচনা আরম্ভ করিব।

কবির যৌবনে রচিত শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলি এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। সর্ব্বসম্মতিক্রমে এইখানাই তাঁহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট কাব্যগ্রন্থ, দেবেন্দ্রপ্রতিভার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এই পুস্তকখানিই তাঁহাকে বঙ্গসাহিত্যে অমর করিয়া রাখিবে। কবি গিরীন্দ্রমোহিনী যখন এই বইখানির নাম 'অশোকগুচ্ছ' রাখিলেন তখন কবি একটি মনোমত নাম পাইয়া পুলকিত হইলেন বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে ভয়ও হইল বুঝি বা ইহা সার্থক হইবে না। এই ভাবটি অশোকগুচ্ছের প্রথম কবিতাতেই ব্যক্ত হইয়াছে।

> অশোকের গুচ্ছ? কই মা, ইহাতে কোথা
> নব বসন্তের কচি চিক্কন পল্লব!
> রতির সীমন্ত-শোভী সিন্দুরের মত
> আকাশপুষ্পের কই পদ্মরাগছটা!

নবোঢ়ার ব্রীড়া-দীপ্ত আরক্ত কপোলে
হাসি সম, কোথায় মা, আনন্দের রাশি ?
পবিত্র বিষাদ কই ! যে মাধুরী হেরি,
মুছিয়া চক্ষের জল মলিন অঞ্চলে,
হাসিত মধুর হাসি চিরদুঃখী সীতা !

কিন্তু কবির এইরূপ ভাবনার কোন কারণ ছিল না। একটা বাসন্তী হাওয়ার মধুর হিল্লোল এই গ্রন্থের সর্ব্বত্রই পাঠকের প্রাণ স্পর্শ করিয়া তাঁহাকে আনন্দ-বিহ্বল করিয়া তোলে। আর বাঙ্গালীর দাম্পত্যজীবনের মাধুর্য্য ও বিষাদ, আনন্দরূপিনী নবোঢ়ার ব্রীড়াদীপ্তি আর বিষাদময়ী বালবিধবার অন্তর-ব্যথা কবি দেবেন্দ্রনাথের নিপুণ তুলিকা সম্পাতে যেরূপ নানাবর্ণে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে সেরূপটি বুঝি আর কাহারও কাব্যে বড় বেশী দেখিতে পাই না। কিন্তু এই নানাবর্ণের মধ্যে যে রংটি প্রাধান্য লাভ করিয়াছে সেটি হইতেছে অশোকের লালিমা। সে লাল কখনও স্বামীসোহাগিনী তরুণীর সীমন্তশোভী সিন্দুরের মত তাহার পবিত্র দাম্পত্যলীলার উচ্ছ্বসিত আনন্দরাশি আমাদের চক্ষের সম্মুখে আনিয়া দেয়; কখনও বা তাহা নবপরিণীতা কিশোরীর কপোলে গণ্ডে বাসরের প্রথমচুম্বন যে লজ্জারুণরেখা আঁকিয়া দেয় তাহারই রক্তিমাভা, মনে হয় যেন তাহা বালসূর্য্যের সমস্ত শোভা লইয়া দম্পতীর জীবন প্রভাত রাঙ্গিয়া দিতেছে। আবার এই লাল দেখি কবি-প্রিয়ার 'অলক্তাক্ত দু'চরণে,' যাহার অনবদ্য সৌন্দর্য্যের উপর অলক্তরাগের অত্যাচার দেখিয়া কবি এইরূপে অনুযোগ করিতেছেন :

উদার উষার কাল :
সান্ধ্য মেঘ রক্তজাল
রঞ্জিল গগনাঙ্গন। বল, বল আলি,
বসন্তে সাজালে কেন শারদীর ডালি।

কবি তাই চুপি চুপি খোকার হাতে জলের ঘটি দিয়া তাহাকে তাহার জননীর পায়ের উপর ঢালিয়া দিতে শিখাইয়া দিয়াছেন। এই কারণে কিংবা যখন ঘোম্‌টা খোলার অত্যাচারে

ক্ষুদ্র রোষ জেগে উঠে
রাঙা ভোর ওষ্ঠপুটে
আরো রাঙাইয়া দিল, করি রঙ্গ কেলি,
কে যেন সিন্দুর দিল লাল পুষ্পে ফেলি !

তখনও অভিমানিনী নারীর রোষারুণরঞ্জিত বদনমণ্ডল কি অশোকগুচ্ছের লোহিত রাগ ধারণ করে না? দাম্পত্যজীবনের বিবিধ বর্ণবৈচিত্র্যের মধ্যে এই যে লালের খেলা ইহার মধ্যে বেদনার রক্তরাগ আসিয়া মিশিয়াছে। বঙ্গবিধবার মর্ম্মন্তুদ হৃদয়-ক্ষত হইতে নিরন্তর যে রক্ত নিঃসরিত হইতেছে তাহাও কবি অনাবৃত করিয়া দেখাইতে ভুলেন নাই। তাঁহার অশোকগুচ্ছের লাল রং বুঝি বা তাহাতে আরও বেশী গাঢ়তর হইয়াছে।

কিন্তু কবির মন ইহাতেও তৃপ্তিলাভ করে কই? অশোক নিজে এত লাল কেন সে সমস্যার ত সমাধান হইল না! 'চেতনাচেতনে প্রকৃতিকৃপণ' কবি প্রকৃতির দুলাল অশোক-তরুকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন :

হে অশোক, কোন্ রাঙ্গা চরণ চুম্বনে
মর্ম্মে মর্ম্মে শিহরিয়া হ'লি লালে লাল ?
কোন্ দোলপূর্ণিমায় নব বৃন্দাবনে
সহর্ষে মাখিলি ফাগ প্রকৃতি-দুলাল।
কোন্ চিরসধবার ব্রতউদ্‌যাপনে
পাইলি বাসন্তী শাড়ি সিন্দুরবরণ।
কোন্ বিবাহের রাত্রে বাসর-ভবনে
একরাশ ব্রীড়া-হাসি করিলি চয়ন!
বৃথা চেষ্টা—হায়! এই অবনী মাঝারে
কেহ নহে জাতিস্মর—তরুজীবপ্রাণী।
পরাণে লাগিয়া ধাঁধা আলোক আঁধারে
তরুও গিয়াছে ভুলে অশোক-কাহিনী।
শৈশবের আবছায়ে শিশুর দেয়ালা;—
তেমতি অশোক তোর লালে লাল খেলা।

কিন্তু কবি-চিত্ত ইহাতেও সন্তোষলাভ করিল না। অশোকের ত প্রকৃত পরিচয় তিনি পাইলেন না। আবার তিনি একটি সনেটের মধ্যে উপমা-ভরা প্রশ্নের পর প্রশ্ন সাজাইয়া অশোকের জন্ম-ইতিহাস আবিষ্কার করিয়া ফেলিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

শ্রীকৃষ্ণবিহারী গুপ্ত

কোথায় সিন্দুর গাঢ়—সধবার ধন !
আবির, কুঙ্কুম কোথা, গোপিনী-বাঞ্ছিত !
কোথায় মুরীর কণ্ঠ আরক্ত বরণ !
কোথায় সন্ধ্যার মেঘ লোহিতে রঞ্জিত !
কোথায় বা ভাঙে রাঙ্গা রুদ্রের লোচন !
কোথা গিরিরাজ পদ অলক্ত-মণ্ডিত !
মদন বধূর কোথা অধরের কোণ
ব্রীড়ার বিক্ষেপে মরি সতত লোহিত !
সকলেরি কিছু কিছু চারুতা আহরি'
ধরি রাগ অপরূপ গাঢ় ও তরল,
গুচ্ছে গুচ্ছে তরুবরে করিয়ে উজ্জ্বল
রাজিছে অশোক ফুল, মরি কি মাধুরি !

উপরে যে কয়টি ছত্র উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা হইতেই দেবেন্দ্রনাথের ভাষা ও ছন্দের লালিত্য এবং চিত্রাঙ্কনী প্রতিভার কিছু পরিচয় পাওয়া যাইবে। তাঁহার ভাব ভাষা ও ছন্দ সর্ব্বত্র সুমধুর ও স্বচ্ছন্দগতি; একটিমাত্র ভাবের ব্যঞ্জনায় চিত্রের পর চিত্র, উপমার পর উপমা দিতে তিনি বোধহয় অদ্বিতীয়। ভাষার মধ্যে কোথাও ধোঁয়াটে বা আবছায়া ভাব নাই, এবং এই ভাষার মাধুর্য্য ও ছন্দের সলীল প্রবাহ সর্ব্বত্র অপ্রতিহত। কবি যেন সৌন্দর্য্যের পসরা খুলিয়া বসেন। সেথায় 'কহিনুরে কোহিনুরে আলো যে উথলি পড়ে, ছড়াছড়ি ইন্দ্রনীলে হীরায় মুক্তায়।' আরও দুএকটি উদারণ দিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। একটি সনেটে কবি 'যুবতীর হাসি' এইরূপে বর্ণনা করিতেছেন :

হে রূপসী, নিশিশেষে কোন্ নদীধারে,
কোন্ স্বপ্নময় পুরে, কোন কামাখ্যায়,
চরণে নূপুর যেন, অন্তর মাঝারে,
বহিয়া সে কুলুধ্বনি আইলে হেথায় ?
নাগেশর চাঁপাতলে কোন্ অলকায়
দাঁড়াইয়া ছিলে তুমি, মদনমোহিনী ?
এক রাশি জাতি যুথি মল্লিকা কামিনী
কাঁপাইয়া কোলে তব পশিল হিয়ায় !
গান নাহি বোঝা যায়, ভাসে শুধু সুর ;
ফুল নাহি দেখা যায়, সৌরভ কেবলি ;
প্রাণের গবাক্ষ দিয়া জোৎস্না মধুর
উছলিয়া অধরেতে পড়ে আসি চলি।
সে কাহিনী তুমি আমি গেছি এবে ভুলি !
এ কি হাসি ! এ যে শুধু আকুলি ব্যাকুলি !

আবার উচ্চ হাসি কবির প্রাণে কিরূপ ভাবের লহরী তুলিয়াছে তাহারও একটু পরিচয় দেওয়া দরকার :

মূর্ত্তিমতী রাগিণীর ভুজমেখলায়
বাজি যেন উঠিয়াছে কঙ্কণ কিঙ্কিণী,
হৃদয়ের কুঞ্জে কুঞ্জে বাসন্তী উষায়
জাগি যেন উঠিয়াছে নূপুর শিঞ্জিনী !

'ডায়মণ্ড কাটা মল', 'আলতা মোছা', 'ঘোমটা খোলা' 'খোঁপা খোলা' প্রভৃতি অনেক কবিতায় কবি তাঁহার এই চিত্রাঙ্কনী শক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। মলের রেওয়াজ অনেক দিন হইল উঠিয়া গিয়াছে; আলতাও অদৃশ্য হইতে আরম্ভ হইয়াছে, কিংবা হয়ত পাদুকা-শোভিত চরণকমলে এখন আর তাহার স্থান নাই; ঘোমটা বা খোঁপা খুলিয়া এখন আর নববধূর লাজ ভাঙ্গাইতে হয় না, ঘোমটা এখন সীমন্তের শেষ প্রান্তে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কোনরূপে টিঁকিয়া আছে, তাহাও বুঝি আর বেশীদিন থাকে না। আর বাঙ্গালীর মেয়ের বড় আদরের খোঁপাও এখন অনাদৃত, বুঝি তাহারও দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে। স্বাধীনতা-প্রয়াসিনী বঙ্গনারী যদি আজ বলিয়া বসেন, 'আমার আকুল কবরী আবরি কেমনে যাইব পথেরি মাঝে' এবং কালই যদি bobbed hairএর সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া তাঁহারা খোঁপার মায়া ত্যাগ করেন তাহা হইলে কবরীমুগ্ধ পুরুষ-কবি কি তাহা প্রতিরোধ করিতে পারিবেন ? কিন্তু সেজন্য আক্ষেপ করাও বৃথা। কালের প্রবাহে অনেক বস্তুই ভাসিয়া যায়। সে সব বস্তু যদি কাব্যের উপাদান রূপে কোন কবি গ্রহণ করিয়া থাকেন তাহা হইলেও আমাদের কাব্যরস উপভোগের পক্ষে কোনই হানি হয় না, যদি সেই কবির সৌন্দর্য্যসৃষ্টি খুব উচ্চশ্রেণীর হয়। বাঙ্গালীর গার্হস্থ্য জীবনের চেহারাটা যদিও কালক্রমে বদ্লাইয়া যায় তাহা হইলেও দেবেন্দ্রনাথের কাব্যসৌন্দর্য্য ম্লান হইবে না।

আমাদের সাহিত্যভাণ্ডারে তাঁহার কবিতাগুলি চিরসম্পৎ-স্বরূপ বিরাজ করিবে।

করুণ রস ফুটাইতেও দেবেন্দ্রনাথ সিদ্ধহস্ত। বাঙ্গালীর গৃহে গৃহে বিধবা নারীরূপে যে বিষাদ-প্রতিমা ও মূর্ত্তিমতী সহিষ্ণুতা আমাদের জীবনকে বেদনাতুর করিয়া রাখিয়াছে কবি তাহাদের কথা বিস্মৃত হন নাই। পূর্ব্বে ইহার একবার উল্লেখও করিয়াছি। এখানে যেমন একদিকে দাম্পত্যলীলার উচ্ছল হাসিরাশি আছে, অপর দিকে তেমনিই আবার যুবতী বিধবার তপ্ত অশ্রুও তাহারই অন্তরালে নিরন্তর ঝরিতেছে। ইহার জন্য কবির প্রাণ কাঁদিয়াছে এবং তিনি তাঁহার মোহিনী তুলিকার স্পর্শে কয়েকটি কবিতায় বঙ্গবিধবার যে অনুপম চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা যেমন করুণ তেমনই সুন্দর। স্বামীবিয়োগ-বিধুরা নারী যখন বিলাপ করিতেছে—

> সকলি ত হইল স্বপন!
> তোমার সহিত নাথ! ইহ জনমের সাধ
> চিতায় করিল আরোহণ।
> অভাগীর রূপ নাও সিন্দুরের কৌটা নাও
> নাও নাও বসন ভূষণ;
> অন্ধকার একরাশ নিবিড় এ কেশপাশ
> করিত যা চরণ চুম্বন।

তখন এই কাতরোক্তি শুনিয়া আমাদের নয়ন বাষ্পাকুল হইয়া উঠে। কিন্তু পরক্ষণেই তাহার মধ্যে যে অসীম প্রেম, ধৈর্য্য ও আত্মসমর্পণের ভাব দেখি তাহা কি হৃদয়স্পর্শী!—

> দাও দাও স্মৃতিটি তোমার,
> ওই স্মৃতি বুকে করে সারাদিন সারাক্ষণ
> করিব মূরতি স্মরণ।
> হে নাথ! কিছু না চাই, এই ভিক্ষা তব ঠাঁই
> দাও দাও অনুভোগী তোমার জীবন।

এই দেবীতুল্যা বিধবার উপর হিন্দু সমাজের নিষ্ঠুরতা তিনি 'রাধারাণী' শীর্ষক কবিতায় দেখাইয়াছেন।

কিন্তু কবির এই করুণাধারা শুধু যে বিধবারই উপর বর্ষিত হইয়া নিঃশেষ হইয়াছে তাহা নয়। হিন্দু সমাজ নারী-জাতির উপর যে অত্যাচার করিয়া আসিয়াছে বা এখনও করিতেছে তাহা হৃদয়বান্ কবির হৃদয় বিগলিত না করিয়া থাকিতে পারে না। কৌলীন্য ও পণপ্রথার যূপকাষ্ঠে হিন্দু সমাজে যে নারী বলি হইয়া থাকে দেবেন্দ্রনাথ তাহার যথার্থ চিত্র দিয়াছেন। কুলীন যুবতী সুদীর্ঘকাল স্বামীদর্শনাকাঙ্ক্ষায় অতিবাহিত করিয়া শেষে যখন একদিন তাহার সেই চির-অভীপ্সিত বস্তুটিকে পাইল তখন তাহার তস্করবৎ নৃশংস ব্যবহারে কিরূপে সে

> ঘৃণায় ও রোষে
> ভালের সিন্দূর বিন্দু ফেলিল মুছিয়া।

এবং পরে সে কিরূপে ধীরে ধীরে বিপথে পদার্পণ করিল তাহা 'কলঙ্কিনীর আত্মকাহিনী'তে উজ্জ্বল ভাবে চিত্রিত হইয়াছে। কৌলীন্যের যুগ অতীত হইয়া গিয়াছে। এরূপ চিত্র বোধ হয় আর কোন কবিকে অঙ্কিত করিতে হইবে না। কিন্তু পণপ্রথার শাণিত খড়্গ এখনও বঙ্গবালার মস্তকোপরি উদ্যত রহিয়াছে। দেবেন্দ্রনাথ কখনও শ্লেষবর্ষণ দ্বারা, কখনও বা করুণ রসের উৎস ছুটাইয়া এই প্রথার জঘন্যতা প্রকটিত করিয়াছেন। কবি বিংশ শতাব্দীর বরকে দশহাজার টাকার ভি পি পার্শেলে বিবাহসভায় পাঠাইয়াছেন। আবার অন্যত্র দেখি কন্যার পিতা প্রতিশ্রুত দশ সহস্র মুদ্রা দিতে না পারায় 'বাকি পাঁচশত রূপেয়া'র জন্য শ্বশুরগৃহে বন্দিনী কন্যা মনের দুঃখে তিলে তিলে পুড়িয়া প্রাণত্যাগ করিল। হায়!

> অকাল হেমন্ত আসি লয়ে পাণ্ডু হিম রাশি
> তুষারে ডুবায়ে দিল সে কনক-নলিনী।

নারীর প্রতি এই ঘোর অনাদরে হিন্দু সমাজ উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে। কবি তাই তাঁহার 'দুহিতামঙ্গলশঙ্খ' বাজাইয়া বলিতেছেন—

শ্রীকৃষ্ণবিহারী গুপ্ত

নাহি ঘৃণা, নাহি লজ্জা! ধিক্! ধিক্! অধম বাঙ্গালী
তোমাদের বিদ্যাবুদ্ধি ভস্মে ঘৃত! কি অন্ধ নয়ন!
পুত্র হ'লে শাঁখ বাজে, কন্যা হ'লে আঁধার ভবন।
নারীর অবজ্ঞা করি মাখিয়াছ মুখে চূণকালি।
* * * *
মাতা নারী, ধাত্রী নারী, ভয়হরা দেবতারূপিনী,
নারীই শৃঙ্খলা বিশ্বে, মিষ্টরস, সৌন্দর্য্য আধার!
নারীর মাহাত্ম্য মূঢ়, বুঝিলে না, তাই হাহাকার
আজি বঙ্গে গৃহে গৃহে।

তিনি যে হাস্যরসের অবতারণা করিতেও বিলক্ষণ পটু ছিলেন তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ তাঁহার 'দগ্ধকচু' নামে সরস গদ্য গ্রন্থখানি। শ্বশুরালয়ে শ্যালিকারা মিলিয়া কবিকে দগ্ধ কচু খাওয়াইয়া কিরূপ লাঞ্ছিত করিয়াছিল এবং অতঃপর তিনি নিজে তাহার কিরূপ প্রতিশোধ লইয়াছিলেন, তাহাই এই গ্রন্থের বর্ণনীয় বিষয়। ইহার ছত্রে ছত্রে চটুল হাসির ফোয়ারা ছুটিয়াছে। তাঁহার কবিতার মধ্যেও হাস্যরসের অভাব নাই। 'কোন বিশ্বনিন্দুক সমালোচকের প্রতি' শীর্ষক ব্যঙ্গকবিতা হইতে কয়েক ছত্র এখানে তুলিয়া দিতেছি:

পূর্ব্বজন্মে ছিলে তুমি শোণিত-শোষক
কোরিয়ার জোঁক বুঝি, হে সমালোচক?
পায়স পানসে বড়, অমৃত ও টক্।—
মানুষের রক্ত বিন্দু মরি কি রোচক!
আঁকা বাঁকা গতি তব কথাগুলি বক্র;
এক রত্তি বিষ নাই, কুলোপানা চক্র!
রসনা-ধনুকে তীক্ষ্ণ বচনের তীর;
ঢাল নাহি, খাঁড়া নাহি, তবু মহাবীর!
তুবড়ি ছুঁড়িয়া ভাব দাগিয়াছ তোপ;
বজ্রধর! থাম থাম;—বোঝা গেছে কোপ!
পরচুলে হে সুন্দর, ঢাকিয়াছে টাক্;
ঝুটো চুনি, ঝুটো পান্না—তারি এত জাঁক?

এ পর্য্যন্ত আমরা 'অশোকগুচ্ছ' লইয়াই প্রধানতঃ আলোচনা করিয়াছি। এইবার দেবেন্দ্রনাথের অন্যান্য কাব্যগ্রন্থগুলি সম্বন্ধে কিছু না বলিলে প্রবন্ধ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। ১৩১৯ সালে শারদীয়া পূজার পূর্ব্বে তিনি একসঙ্গে 'গোলাপগুচ্ছ', 'শেফালিগুচ্ছ', 'পারিজাতগুচ্ছ', 'অপূর্ব্ব নৈবেদ্য', 'অপূর্ব্ব শিশুমঙ্গল' ও 'অপূর্ব্ব বীরাঙ্গনা' এই ছয়খানি নূতন কবিতা পুস্তক ও অশোকগুচ্ছের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন। তাঁহার স্থাপিত শ্রীকৃষ্ণপাঠশালা হইতে এই সময়ে যথেষ্ট অর্থাগম হইতে থাকে। সেই অর্থে তাঁহার এই সমগ্র গ্রন্থপ্রকাশ সহজেই সুসম্পন্ন হইয়াছিল। বিভিন্ন মাসিকপত্রে বহুকাল ধরিয়া যে সকল অসংখ্য কবিতা ছড়াইয়া রহিয়াছিল, সেইগুলি সংগ্রহ করিয়া তিনি এই কয়খানি গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করেন। এই কবিতারাশির সর্ব্বত্র দেবেন্দ্রনাথের প্রতিভার দীপ্তি জাজ্বল্যমান; কিন্তু তথাপি আমাদের মনে হয়, 'অশোকগুচ্ছে'র শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলির ন্যায় সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর কবিতা এই গ্রন্থগুলির মধ্যে বড় বেশী নাই। সেই দাম্পত্যলীলার চিত্র, সেই কুপ্রথাপীড়িতা হিন্দুনারীর দুঃখকাহিনী, সেই নিছক সৌন্দর্য্যসৃষ্টির অশ্রান্ত প্রয়াস এ সমস্তই আছে; কিন্তু তথাপি যেন পাঠকের মন তৃপ্তির রসে ভরিয়া উঠে না। কোন কোন কবিতা ভাবে, ভাষায় ও ভঙ্গীতে মধুসূদন ও ও হেমচন্দ্রকে স্মরণ করাইয়া দেয়। দেবেন্দ্রনাথ বলিতেন যে, এই দুই জনকেই তিনি তাঁহার কাব্যগুরু বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহার 'অপূর্ব্ব বীরাঙ্গনা কাব্যে'র প্রারম্ভে তিনি মাইকেলের উদ্দেশে বলিতেছেন—

হে গুরু, কখনও তোমা দেখিনি নয়নে,
কিন্তু দেব! দ্রোণ শিষ্য একলব্য সম
মানসে গড়িয়া তব মূর্ত্তি নিরুপম
শিখিয়াছি ধনুর্বিদ্যা তোমারি সদনে।

কিন্তু এই গুরু-শিষ্য সম্পর্ক মানিয়া লওয়া কঠিন। কারণ হেমচন্দ্রের পৌরুষ ও রৌদ্ররস কিংবা মাইকেলের জলদনির্ঘোষ দেবেন্দ্রনাথে কুত্রাপি নাই। তাঁহার বৃহত্তর রচনাগুলি প্রায়ই ব্যর্থ হইয়াছে। পক্ষান্তরে দেবেন্দ্রনাথের যাহা বৈশিষ্ট্য—তাঁহার মাধুর্য্য, লালিত্য ও চিত্রপ্রাচুর্য্য—হেমচন্দ্রের 'কবিতাবলী'র মধ্যে খুব বেশী পাওয়া যায় বলিয়া মনে করি না। অবশ্য মাইকেলের 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' বাঙ্গলার গীতিকাব্য সাহিত্যে অতুলনীয়। সুতরাং আধুনিক

যুগের কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বা কালিদাস রায় বিশেষরূপে রবি-ভক্ত হইলেও যেমন রবীন্দ্রনাথের অনুকারী বা তাঁহার কাব্য শিষ্য নহেন, তেমনই দেবেন্দ্রনাথও নিজেকে মধুসূদনের সাক্‌রেদ বলিয়া প্রচার করিলেও তাঁহার কাব্যে তাহার বিশেষ প্রমাণ নাই। একস্থলে তিনি রবীন্দ্রনাথের প্রভাবও স্বীকার করিয়া লিখিয়াছেন, 'আমার এ রবিতপ্ত কল্পনা-কুমুদী ফুটিবে কি পুনর্ব্বার?' তাঁহার এই উক্তি রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি ব্যতীত আর কিছুই নহে। কারণ রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কাব্যের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন বলিয়া ত আমরা মনে করি না।

সে যাহা হউক, আমরা এখন তাঁহার শেষ কয়খানি পুস্তকের একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে দিয়া প্রবন্ধ শেষ করি। 'অশোক গুচ্ছের' পরই 'গোলাপ গুচ্ছে'র স্থান। ইহার প্রথম কবিতা—

এবে গোলাপে গোলাপে ছাইয়ে ফেলেছে
এ মধু কানন দেশ—

পূর্ব্বেই প্রভাত বাবুর বর্ণনায় উল্লিখিত হইয়াছে। কবি যে ইহার পরেই অন্য একটি কবিতায় বলিতেছেন—

চিরদিন চিরদিন রূপের পূজারি আমি
রূপের পূজারি

তাহার যথেষ্ট প্রমাণ কবি এই গ্রন্থেও দিয়াছেন। তাঁর 'প্রাণ-বাতায়নে ভাবগুলি সব গোলাপি নেশায় চুর।' নারীর দেহে, দম্পতীর প্রেমলীলায় ও শিশুর হৃদয়-রাজ্যে একই সৌন্দর্য্যের বিভিন্ন বিকাশ দেখিয়া কবি আত্মহারা। তাই কখনও তিনি 'মধুর জ্যোৎস্না'-রূপিনী শ্যামাঙ্গী সুন্দরীকে 'আধ আলো আধ ছায়া বনরাজি গাঢ়' বলিয়া বর্ণনা করিতেছেন। আবার কখনও বা বালার্ককিরণ-সন্নিভা গৌরাঙ্গীর 'রূপরৌদ্রে দু'নয়নে ধাঁধাঁ লেগে যায়।' যখন 'আগ্রহে দম্পতী করে প্রথম চুম্বন' তখন সেই মুগ্ধ বিহ্বল নব-দম্পতীর ন্যায় কবির হৃদয়েও—

কুহরিয়া উঠে পিক, শিহরিয়া উঠে দিক
ভরে যায় ফলে ফুলে শ্যামল যৌবন।

আর তিনি ভাবিয়া আকুল—

কি জানি কি নিধি দিয়া গড়িল চতুর বিধি
প্রথম চুম্বন।

আবার সদ্যপত্নীবিয়োগব্যথিতের 'শেষ চুম্বন' কামনা—

দাও দাও বিদায়-চুম্বন!
জীবনের রত্নাগারে একেবারে করি খালি
অভাগারে ফাঁকি দিয়ে মরণে দিতেছ ডালি!
ল'য়েও হীরার কুচি চক্ষের সলিল মুছি
দরিদ্র করিবে সখি, জীবন যাপন।

'অশোক গুচ্ছের' বিধবার বিলাপস্মৃতি আনিয়া দেয়। এই কারুণ্যধারা 'বিরাগীর আক্ষেপ,' 'উন্মাদিনীর কাহিনী' প্রভৃতি কবিতারও ছত্রে ছত্রে প্রবাহিত হইয়াছে। 'বাকি পাঁচশ' রূপেয়া'র উল্লেখ পূর্ব্বেই করিয়াছি। এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'কদম্বসুন্দরী' নামক সুদীর্ঘ কবিতাটি নির্দ্দোষ না হইলেও নানা রসের সমাবেশে বেশ উপভোগ্য।

'অপূর্ব্ব নৈবেদ্য' ও 'অপূর্ব্ব শিশুমঙ্গল' ব্যক্তিগত কবিতার সমষ্টি; প্রথম খানি কবির বন্ধু-বান্ধব এবং তাঁহার পরিচিত কবি ও সাহিত্যিকদের স্তুতিবাদে পূর্ণ, এবং অপর খানিতে কবি শিশুদের সম্বন্ধে লিখিত নানা কবিতার মালা গ্রথিত করিয়াছেন। এই গ্রন্থগুলি 'অপূর্ব্ব' কেন, তাহার উত্তরে কবি স্বলিখিত ভূমিকায় বলিয়াছেন, 'এই কাব্যগুলির অধিকাংশ কবিতাই শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে বিরচিত হইয়াছে।' এ সম্বন্ধে দেবেন্দ্রনাথ একদিন আমাকে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক মনে করি। তিনি বলিয়াছিলেন, 'আমি যে সকল মহিলা কি বালিকার স্তুতিবাদ করিয়াছি তাঁহারাই আমার কবিতার মুখ্য বিষয় নহেন। আমি তাঁহাদের অবলম্বন করিয়া বিভিন্ন দিক হইতে একটা ideal womanhood—নারীত্বের পূর্ণ আদর্শ অঙ্কিত করিতে চেষ্টা করিয়াছি। সেইজন্য এই সকল কবিতাতেও প্রায়ই আধ্যাত্মিকতা আসিয়া পড়িয়াছে; কারণ নারীজাতিকে আমি জগন্মাতার অংশরূপিণী, ভগবানের সৌন্দর্য্য বিকাশ ব্যতীত আর কিছু মনে করিতে পারি না। আমার শিশু-সম্বন্ধীয় কবিতাগুলিও এই অর্থে ব্যক্তিগত হইয়াও সার্ব্বজনীন। এখানেও আমি শিশু-চরিত্রে মুগ্ধ হইয়া বিভিন্নভাবে

শ্রীকৃষ্ণবিহারী গুপ্ত

সেই অনন্ত সৌন্দর্য্যের আভাস দিতে প্রয়াস পাইয়াছি। একটা আদর্শ শিশুজীবন যাহার প্রকাশ ভিন্ন হইলেও মূলতঃ এক, ইহাই আমার শিশু-কবিতাগুলির বিষয়।' সুতরাং এই 'অপূর্ব্ব' কবিতাগুলি কোন্ অর্থে 'শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে রচিত' তাহা কবির এই উক্তি হইতে বোঝা যায়। 'জগাই ডাকাত' নামক কবিতার শেষ ভাগে তিনি ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন। জগাই অর্থাৎ জগন্নাথ একটি তিন বছরের শিশু। এই শিশুতে তিনি জগন্নাথকেই মূর্ত্তিমান রূপে দেখিতেছেন :

অমৃতের মহাসিন্ধু অপূর্ব্ব হিল্লোলে
আমার এ কবি-চিত্তে বহিছে কল্লোলে।
তারি বেলাভূমে আমি রয়েছি সুন্দর
সৌন্দর্য্যের জগন্নাথপুরী মনোহর।
সুন্দর দেউল রবি করেছি স্থাপন
রে সুন্দর! তোর ওই মূরতি মোহন।
প্রসারি অন্তরদৃষ্টি হের এ অমর সৃষ্টি
এ নহে কল্পনা-কথা, এ নহে স্বপন;
শিশুই মানববেশে দেব নারায়ণ।

এই আধ্যাত্মিকতা শেষ বয়সে তাঁহাকে পাইয়া বসিয়াছিল, এবং অনেক স্থলে ইহা যে তাঁহার সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির অন্তরায় হইয়াছিল তাহা আমাদিগকে দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হইবে। তাই দেখি যখন তিনি সর্ব্বগ্রাসিনী আধ্যাত্মিকতার হাত এড়াইয়াছেন তখন তাঁহার কবিতাও খুব সুন্দর হইয়াছে। দু' একটা উদাহরণ দিই। তাঁহার শিশুকন্যা জন্মের পূর্ব্বে যে কি ছিল এবং কোথায় ছিল কবি সে সম্বন্ধে তাহাকে এইরূপে প্রশ্ন করিতেছেন :

এতদিন কোথা ছিল পাগলিনি মেয়ে?
সুধাংশু মণ্ডলে তুই　　　ছিলি কি আনন্দময়ি,
চকোরেরা উড়ে যথা সুধাকর ছেয়ে?
জ্যোৎস্না কিরণ-মাথে　　　তুইও তাদের সাথে
খেলাতে মগন ছিলি গান গেয়ে গেয়ে?
অপ্সরার কণ্ঠে যথা　　　আরক্ত অপরাজিতা
পারিজাত লতাগুলি উঠে বেয়ে বেয়ে,
তুইও ইন্দ্রাণী গলে　　　হেলে দুলে কুতূহলে
ছিলি লগ্ন, মগ্ন দেবী তোর স্পর্শ পেয়ে।
এতদিনে কোথা ছিলি পাগলিনী মেয়ে?

ইহার সহিত রবীন্দ্রনাথের 'খোকার জন্ম' তুলনা করা যাইতে পারে। দেবেন্দ্রনাথের কবিতা নিছক সৌন্দর্য্যের প্রস্রবণ, আর রবীন্দ্রনাথে সৌন্দর্য্যের সহিত সত্যের অপূর্ব্ব সমন্বয়।

আর একটি ছোট মেয়েকে দেখিয়া কবির দশভুজা প্রতিমা মনে পড়িয়াছে বটে, কিন্তু তাহা শুধু তাহার রূপের জন্য।

দেখ্ রে দেখ্ চেয়ে　　　মোহিনী রাঙা মেয়ে,
ভুবন-আলো-করা মোহন রূপ!
আয়রে করি পূজা　　　এসেছে দশভুজা—
বাজারে শাঁখ তোরা জ্বালারে ধূপ!
যেন রে মুখ দিয়া　　　অমিয়া উথলিয়া
পড়িছে মার মোর। এ কি রে রূপ!
জোছনা পড়ে খসি,　　　হের রে মুখশশী।
আলোকে ভরি গেল মানস-কূপ।
কোথা সে সারি সারি　　　গোকুলে গোপনারী'
কাঁকণ ভুজে বাজে, চরণে মল,—
গলেতে বনমালা,　　　(যেন রে বনবালা)
চুলেতে থাকে থাকে বকুল দল,—
তাদেরও জারি জুরি　　　তাদেরও ভারিভুরি
মোর মায়ের কাছে কেবলি ছল।

প্রকৃত আধ্যাত্মিক ভাবের সঙ্গে এই সব কবিতার বিশেষ সম্পর্ক আছে বলিয়া মনে হয় না। 'শিশুমঙ্গলে' এরূপ সুন্দর কবিতার অভাব নাই।

আজ এই খানেই শেষ করি। বাঙ্গলার গীতি-কবিদের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথের স্থান যে খুব উচ্চে তাহাই আমি এই প্রবন্ধে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। বাঙ্গালীর ভাবপ্রবণ ও সৌন্দর্য্য-পিপাসু প্রাণ চিরকাল গীতি-কবিতার কোমলকান্ত সঙ্গীতে আপনাকে শতধারে উচ্ছ্বসিত করিয়া আমাদের জাতীয় সাহিত্যকে এক অসামান্য বিশেষত্ব দান করিয়াছে। এই সঙ্গীতের সুর কখনও বা নরনারীর প্রেমলীলার শাশ্বত

রহস্য ও অনন্ত মাধুর্য্য ব্যক্ত করিয়াছে, কখনও বা বাঙ্গালীর নিজস্ব দাম্পত্য জীবনের অন্তর্নিহিত সুখ-দুঃখের সহিত মিলিত হইয়া তাহাকে আরও বেশী সুন্দর, আরও বেশী উজ্জ্বল ও বৈচিত্র্যময় করিয়া তুলিয়াছে। এই শেষোক্ত সুরই আমরা দেবেন্দ্রনাথের কাব্যে ধ্বনিত হইতে দেখি। তাহাতে রবীন্দ্রনাথের মনস্বিতা বা হেমচন্দ্রের তেজস্বিতা না থাকিতে পারে। তাহাতে হয়ত দেশহিতৈষণার উন্মাদনা নাই বা বিশ্বরহস্যের নিগূঢ় সঙ্গীতও শুনিতে পাই না। কিন্তু তাহা হইলেও এই সুর বাঙ্গালী মাত্রেরই প্রাণস্পর্শ করে, কারণ তাহার প্রাণের তারে নিরন্তর যাহা ঝঙ্কৃত হইতেছে তাহারই এক সঙ্গীতময় প্রতিধ্বনি সে তাহাতে শুনিতে পায়, তাহারই গার্হস্থ্যজীবনের সৌন্দর্য্যময় চিত্র তাহার চক্ষের সম্মুখে সে দেখিতে পায়। সে গানে ও চিত্রে অস্বাস্থ্যকর বৈদেশিক প্রভাবের লেশমাত্র নাই, অসংযমের কলুষ কোথাও তাহার পবিত্রতা নষ্ট করে নাই। তাহা স্বচ্ছ, নির্ম্মল ও পূত স্রোতস্বিনীর ন্যায় তরতর বেগে বহিয়া চলিয়াছে। বঙ্গবাসী তাহা আকণ্ঠ পান করিয়া ধন্য হউক। *

* কয়েক বৎসর পূর্ব্বে 'উপাসনা'য় প্রকাশিত মল্লিখিত দেবেন্দ্রনাথ শীর্ষক প্রবন্ধের অংশবিশেষ এই প্রবন্ধে গৃহীত হইয়াছে। লেখক।

যাযাবর

শ্রীজ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

সঙ্গে ওদের ফেরে সংসার,
নাহিক ঘরের ভাবনা ;
আপন বলিতে নাহি কোন ঠাঁই,
সব ঠাঁই যেন আপনা।

পথে পথে করে জীবন যাপন,
পথেই জীবন করে সমাপন,
হাসিমুখে চলে দু'পদে দলিয়া
পথের দুঃখ যাতনা।

নহে সে গোলাম, নহে তাঁবেদার,
দুনিয়ায় কারো ধারে নাকো ধার ;
সুপথ কুপথ না করে বিচার,
সব পথে পদচারণা।

কত গিরি মরু প্রান্তর'পরে,
গ্রামে গ্রামে কত নগরে নগরে
ছাউনি নিয়ত উঠিছে পড়িছে
কে করে তাহার ধারণা ?

চলার নেশায় চল-চঞ্চল
চলে উচ্ছল যাত্রিক দল !
নাহি মানে বিধি না মানে বিধান,
স্বাধীনতা শুধু সাধনা !

মুখে মুখে

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক

নাটকীয় চরিত্র

কেদার	...	...	দালাল
মহিম	...	...	স্কুলমাষ্টার
রসিক	...	...	রঙ্গপ্রিয় প্রৌঢ়
নিশীথ	...	...	কবি
বিনোদ	...	...	ডাক্তার
কামাখ্যা	...	...	দাবা-খেলোয়াড়
সারদা	...	...	কেরাণী
পঞ্চানন	...	...	বেনে
নেপাল	...	...	কেদারের ভাই
দশরথ	..	...	উড়ে
অপূর্ব্ব	...	...	উকীল
ছকড়ি	...	...	অগ্রদানী
বিমল	...	...	কেদারের ছেলে
জগদীশ	...	...	পুরোহিত

প্রথম দৃশ্য

কলকাতার রাস্তা। রাস্তার উপর একটি বেনের দোকানের মাথায় সাইনবোর্ড—"বেনের দোকান শ্রীপঞ্চানন পান"। দোকানের ঝাঁপতাড়া বন্ধ। ফুটপাথে মহিম পাইচারি করচেন তাঁর গায়ে কোঁচার কাপড় ঘুরিয়ে দেওয়া

মহিম

আঃ, এই ঝির্‌ঝিরে ভোরের হাওয়াটুকু কলকাতার আয়েস। সারারাত গরমে ছটফট ক'রে এই এখন যা একটু—আঃ।

(কেদারের প্রবেশ—তাঁর গায়ে কোট, গলায় কম্ফর্টার জড়ানো)

মহিম

কেদার বাবু যে, নমস্কার! এই গরমে কম্ফর্টার জড়িয়েছেন ?

কেদার

(চিবোনো স্বরে) জড়িয়েছি আর সাধে ? উঃ, কথাটি কইবার যো নেই—হাঁ কল্লেই—উঃ—

মহিম

হাঁ। কি হয়েছে—কারবঙ্কল নাকি ?

কেদার

হাঃ, হাঃ, হাঃ—উঃহুঃ হুঃ—হাসলে আরও সর্ব্বনাশ কারবং—কথনও মুখে—হাঃ হাঃ—উরে ববাবারে—শক্রুরও যেন—মাড়ির দাঁত কিনা—

মহিম

নড়েছে বুঝি ?

কেদার

নড়লে ত বাঁচতুম্, সুতো বেঁধে দিতুম একটান—এ যে টাটিয়ে ফুলে—এই দেখুন না।—(কম্ফর্টার খুলে দেখালেন)

মহিম

হুঁ! ফোসা ফোলাইত ঠেক্‌ছে! বোধ হয় আক্কেল দাঁত—

কেদার

হাঃ, হাঃ—উ হু হু, বলছি হাসাবেন না—আক্কেল দাঁত কথনো এ বয়সে—হুঃ হুঃ—না চেপে বাঁধি—(কম্ফর্টার এঁটে বাঁধলেন)

মহিম

তাই ত, তা হ'লে—ডাক্তার দেখিয়েছেন ?

কেদার

ডাক্তার কি কর্ব্বে ? বড় জোর একটা কুলকুচো দেবে। আমি ঢের কুলকুচো—উঃ! পেয়ারা পাতা, ফিটকিরি কিছুতেই কিছু—

মহিম

আচ্ছা, একটু চিরে দিলে কেমন—

কেদার

বেশ বল্লেন যা হোক—উ হু হু—নিজের হ'লে বুঝতেন—জন্মে কথনো ছুরি—

মহিম

তা হ'লে না হয় ক্লোরোফরম্ ক'রে—

কেদার

আঃ—ওরে বাবাঃ—থামুন—পার্ব্বো না।

মহিম

এঃ তাই ত। তা হ'লে কেন এই ভোরের ঠাণ্ডায়—

কেদার

সাধে বেরিয়েছি ? ধুত্‌রো, আফিং, সমুদ্রের ফেনা—জানেন ত ?

মহিম

হ্যাঁ হ্যাঁ তাও দিতে পারেন—সে শুনেছি খুব ভাল।

কেদার

না, না, কিছু না—ও হো হো—শুদ্ধ শুনে যান্—কিছু হয়নি। বাকি আছে এক মুসব্বর তাই কিন্‌ব ব'লে—তা দেখুন না বেটা পঞ্চা—উ হু হু—পঞ্চু, ওই যে সাইন-বোর্ড—বেটু বেনে এথনো দোকানের—ও বাবা—আর বল্‌তে পার্ব্বুনি।

মহিম

তাই ত, ছটা বাজল এথনো বেটা ঘুমুচ্ছে!

কেদার

ঘুমুবে কেন ? জেগেছে—কেবল গড়িমিশি ক'রে এথনও ঝাঁপতাড়া—উরে ববাবুরে—কেন বল্লুম—বাড়ী যাই দুণ্টু থানেক পরে ফের উসবো—

(কেদারের প্রস্থান)

মহিম

হাঃ হাঃ উস্‌বো! হয়েছে কি ? ঠেলা বোঝো—ইস্‌বোয় দাঁড়াবে। আমরা চিরটা কাল মাষ্টারি ক'রে দাড়ি পাকিয়ে গেলুম—আর তুমি দালালি ক'রে দুবচ্ছরেই তল্লা বাঁশের মত ফেঁপে উঠেছ—এসেছ একপয়সার মুসব্বর কিন্‌তে ? —আচ্ছা, ভগবান আছেন, তিনি ইচ্ছে কল্লে—ঐ দাঁত ছুঁচ ফোটাবে—ঐ গলা ফুলে কোলা ব্যাং হবে। হুঁ, হুঁ এর নাম নিয়তির বিচার। ডাক্তার ডাকবে না? ডাকতেই হবে। আর তা হ'লেই বাস—কিছু না হোক—যা দুপয়সা খ'সে।

(রসিকের প্রবেশ)

রসিক

কি মহিম দা, হাত নেড়ে নেড়ে ছেলে ঠেঙাচ্ছ নাকি ?

মহিম

এঁ্যা, রসিক ? না, এই কেদার বাবুর কথা ভাবছি।

রসিক

বড় জোর ভাবনা ত। তাঁর ছেলের কি প্রাইভেট টিউটরি থালি হয়েছে ?

মুখে মুখে

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক

মহিম

আরে, না, না! তুমি দেখ্‌ছি কিছু খবর রাখ না, তিনি এখানে একলা থাকেন। তাঁর ফ্যামিলি ত সব দেশে।

রসিক

তাই নাকি? তা হ'লে বুঝি স্কুলের জন্য কিছু চাঁদা—

মহিম

আঃ, কি বল তার ঠিক নেই। তাঁর এখন নিজেকে নিয়ে আমাবস্যে—

রসিক

বল কি—আমাবস্যে! তাই তোমার মুখে পূর্ণিমার আলো চিক্ চিক্ কচ্ছে!

মহিম

এত বয়েস হোলো তোমার ছিপলেমি ভাবটা গেল না। না হয় বাপ কিছু রেখে গেছেন—ফুর্ত্তির প্রাণ গড়ের মাঠ ক'রে বেড়াচ্ছ—তা ব'লে কি সব সময়েই ঐ? শুনছো তাঁর একটা অসুখ, আর সে নেহাৎ হাসি ঠাট্টার নয়,—যেমন যন্ত্রণা, তেমনি ফুলো।

রসিক

এ্যাঁ ফুলো! কোথায় ফুলেছে?

মহিম

কোথায় আবার—গালে।

রসিক

কতটা ফুলেছে?

মহিম

তা নিহাৎ মন্দ নয়—একটা গাল বালিশের মতই।

রসিক

এ্যাঁ! এমন ব্যাপার?

মহিম

নৈলে আর ভদ্রলোক ওপাড়া থেকে এপাড়া আসেন আমাকে ওষুধ জিজ্ঞেস কর্ত্তে?

রসিক

কেন, ডাক্তার কি সব ম'রে গেছে?

মহিম

ওই ত—এই তোমাদের—কথায় কথায় কেবল ডাক্তার আর ডাক্তার! ডাক্তার দেখাতে কি আর বাকী রেখেছেন? সব ফেল মেরে গেছে। এই ব'লে দিচ্ছি শোন—যা টোটকা-টাটকা জানি—ডাক্তারের বাবাও—

রসিক

আর কেন বেচারাদের বাপান্ত কর?

মহিম

তোমার যে দেখছি কিছু গায়ে সয় না? সাধ ক'রে বাপান্ত করি—কি জানে ওরা? কেবল পয়সা খাবার যম। ঐ পয়সা আমায় দিলে—যাক আর নয়—শেষে পরনিন্দে বেরিয়ে পড়্‌বে। মধ্যাৎ যা টোটকা ব'লে দিয়েছি লাগান ত ওতেই চুপ্‌সে যাবে—আর ওতে যদি না যায়—

রসিক

তা হ'লে?

মহিম

তা হ'লে আর যাবে না।

রসিক

তার মানে?

মহিম

মানে—ঐতেই শেষ।

রসিক

তুমি ত বড় সাংঘাতিক লোক দাদা!

মহিম

কেন খামকা গালাগালি দেও? জিগ্‌গেস কল্লে, আর মিথ্যা কথা বল্‌ব?

রসিক

ও, তাও ত বটে! তা তুমি যত বড় সত্যপীর হও তোমার ওষুধ কিন্তু সাংঘাতিক—হায় হায় এমন ওষুধ ঝেড়েছ—যে হয় এস্পার নয় ওস্পার—

মহিম

হাঃ, হাঃ, হাঃ—ওকেই বলে ওষুধ, রসিক—ওকেই বলে ওষুধ। যাকে তাকে কি আর দিই? তবে নাকি

একে কেদার বাবু—তায় নিপট্ট ভাল মানুষ—তায় লাঠিটি ধ'রে আস্‌ছেন তাও টলতে টলতে—

রসিক

আ, হা, হা—

মহিম

কি আ, হা হা কর—দেখেছ? সে কষ্ট দেখ্‌তে ত বুঝ্‌তে—বাবারে মারে কচ্ছেন—আমার চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে গেল—সুখের শরীর ত—

রসিক

আর তোমার দয়ার শরীর—

মহিম

কি কর্ব্বো বল—একটা কথাই আছে নির্দ্দয় লোক পশুর সমান। যাক্, একবার সেক্রেটারির বাড়ী যাই—তাত ফুটে গেল বেটারা মর্ণিং স্কুল কচ্ছে না—

(মহিমের প্রস্থান)

রসিক

বাবারে মারে করচেন! আহাহা—যত রোগ ঐ কাজের লোকদেরই ধরে। আর আমি বেটা বেকার—গোকুলের ষাঁড়ের মত চ'রে বেড়াই—মাথা ধরাটা পর্য্যন্ত কাছে আসে না! আরে, বেশ মজা তো! কষ্ট হয়েচে আর অম্‌নি হাসি পালিয়েচে। ও বাবা হাসি, কোথায় পালালি? আয়, আয়—কষ্ট থাক্‌বে বুকে, তুই থাক্‌বি মুখে, এতেও তোদের বনে না! ও কে! তরুণ কবি নিশীথচন্দ্র। দিব্বি ছোকরা—বিয়ে হয়নি—দেখতেও সুশ্রী, পয়সাও আছে—ওকে যে কোন ইয়ে এখনো—কেন ইয়ে করতে—ওকে আজ আমার বাড়ীতে—যাক্।

(খাতা হাতে নিশীথের প্রবেশ। তার চুল এলোমেলো, দৃষ্টি উদাস)

নিশীথ

বাদ্‌লা দিনের কাজলা মেয়ে
ঘোমটা চিরে চায়,
কেয়ার ঝাড়ের দোদুল দোলা
দুলিয়ে পিছে ধায়।
আব্‌ছা মাঝে আঁচলা খসে
হাতছানি দেয় ডাল,
রাঙিয়ে ওঠে ডালিম ফুলে
অপ্‌রাজিতার গাল।
হায় কি ছবি ভুললো কবি
ফুল্‌লো হঠাৎ দিল,
উস্‌খুস্‌মনির খুসবু ছোটে
সঙ্গীতে হালফিল।

রসিক

বাঃ বাঃ, এটি বুঝি নিশীথ বাবুর হালফিল রচনা?

নিশীথ

হাঁ, এই বড় জোর মাস খানেক—শুনলেন নাকি?

রসিক

শুধু শুনলুম—প্রাণে শান্তির তুলি বুলিয়ে দিলেন। বাঃ বাঃ, যেমন সুন্দর, তেমনি পবিত্র—

নিশীথ

কিন্তু লোকে ত তা বলচে না। সম্পাদকরা দুর্ব্বোধ আর অশ্লীল ব'লে ফেরত পাঠাচ্চে।

রসিক

অশ্লীল! তরুণ প্রাণের অদম্য টগ্‌বগে উচ্ছ্বাস কখনো অশ্লীল হ'তে পারে? খর-স্রোতা নদীর মতো যে ভাব-ধারা সর্ব্বদা দুর্ব্বার গতিতে ব'য়ে চলেছে, তার মধ্যে অশ্লীলতার স্থান নেই। অশ্লীল বলি শুধু তাকেই যার গতি নেই, পুকুরের মতো যা নিশ্চল। চলুন, আমার বাড়ীতে গিয়ে এক কাপ চা—

নিশীথ

না, আমি এখন কেদার বাবুর বাড়ী যাচ্ছি।

রসিক

কেন, কেন সেখানে কেন?

নিশীথ

মনে করচি তাঁকে জপিয়ে একখানা কাগজ বের করবো—দেখি আমার কবিতা ছাপা হয় কি না।

রসিক

কিন্তু কেদার বাবু ত—

মুখে মুখে

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক

নিশীথ

নিমরাজী হয়েচেন—কেবল নাম নিয়ে গোল বাধচে। আমি বল্‌চি 'বিদ্রোহী ফাল', তিনি বলচেন 'পরিবারের ঝাঁটা।'

রসিক

কিন্তু কেদার বাবুর যে বড্ড অসুখ।

নিশীথ

এঁ্যা? বড্ড অসুখ! আহা! বড্ড মনে প'ড়ে গেল। আমারই কবিতা। গিরিডি ব'সে লিখেছিলুম।

আমি অসুখী, বড় অসুখী!
উচ্ছ্বাসীর দ্বারে সুখী ত কেউ
হয় না আমার সমুখী;
বড় অসুখী, আমি অসুখী।

কেদার বাবু কি এর মধ্যে কোথাও বেড়াতে গিয়েছিলেন?

রসিক

না, তাঁর অসুখ একটু অন্য ধরণের—বৃদ্ধ বয়সের অসুখ কিনা—

নিশীথ

ওঃ, বুঝেছি—

যৌবন স্মৃতি　　দুর্মদ অতি
বৃশ্চিক সম দংশে
হাড়-চাটানিয়া　　বুড়ো কুকুরের
মৃত্যু ভাল বরং সে।

রসিক

আপনি স্বভাবকবি, যেমন ভাব, তেম্‌নি ছন্দ, তেম্‌নি মিল। কিন্তু কেদার বাবুর অসুখ ঠিক ও ভাবেরও নয়।

নিশীথ

তবে, তবে? নিহাৎ গন্ধময় অসুখ নাকি?

রসিক

গন্ধময় জীবনে আর কত হবে?

নিশীথ

তা হ'লে গুরুতর বটে!

রসিক

গুরুতর কেন, গুরুতম। গাল গলা ফুলে ঐ আপনারা যাকে বলেন—ঢোল।

নিশীথ

ঢোল!

রসিক

ঢোলই! আর এত যন্ত্রণা যে চেঁচাতে চেঁচাতে অজ্ঞান হ'য়ে যাচ্ছেন।

নিশীথ

এঃ! আমার কাগজটা দেখ্‌ছি—

রসিক

বেরোয় কি না সন্দেহ। ধাঁ ধাঁ করচে জ্বর, উত্থান-শক্তিরহিত, ডাক্তারে জবাব দিয়ে গেছে।

নিশীথ

জবাব দিয়ে গেছে! আহা

ডাক্তার, ডাক্তার!
ডাক্ তারে আজ　　দেখে নোব আমি
কত বড় নাম-ডাক তার।

রসিক

(স্বগত) এই সেরেচে। একজন ডাক্তার এই দিকে আস্‌চে—পকেটে ষ্টেথিস্‌কোপ্—বেশী কিছু না বলে।

নিশীথ

জ্বলিছে হৃদয় পারে কি সারিতে?
গলিছে নয়ন পারে কি বারিতে?
কোটি কোটি রোগ ঘটায় নারীতে
সারিতে পারে ক'লাপ তার!
পারে না যখন আন্ ছুরি দিয়ে
কেটে দোব আমি নাক তার;
ডাক্তার, ডাক্তার!

(বিনোদের প্রবেশ)

রসিক

ফেসাদ বাধালে দেখ্‌চি—স'রে পড়া যাক্

(প্রস্থান)

বিনোদ

(নিশীথের পিঠ চাপ্‌ড়ে) কি হে কবি, আমাদের উপর এত খাপ্পা কেন?

নিশীথ

কে—বিনোদ? একটা ভাব এসেছিল।

বিনোদ

ভাবের উৎপত্তি হ'ল কিসে ?

নিশীথ

কেদার বাবুর অসুখ থেকে।

বিনোদ

কোন্ কেদার বাবুর ?

নিশীথ

ঐ যে যিনি—ঐ যে যাঁর—ঐ যে—

বিনোদ

থাক্ থাক্ বুঝেছি—যাঁর বাড়ীতে তুমি যাও। কি হয়েছে তাঁর ?

নিশীথ

কি হয়েছে ? শুন্‌বে ? শুন্‌লে গায়ের মধ্যে শিহরণ দেবে।

বিনোদ

তোমার শিহরণ ত কথায় কথায় ভাই।

নিশীথ

বটে ? আচ্ছা, দেখো শিহরণ দেয় কি না—

গাল গলা ফুলে উঠেচে এতই
নাক চোখ অবলুপ্ত,
যাতনার ঘোরে অচেতন সদা
আছেন পড়িয়া সুপ্ত।
গায়ে ধান দিলে খই ফুটে যায়,
চোখ দুটি জবাফুল,
পাশ ফিরিবার নাহিক শকতি
কেবল বকেন ভুল।

বিনোদ

বল কি ? কেস্ ত বড় সুবিধার ঠেক্‌চেনা।

নিশীথ

অসুবিধা বুঝি ডাক্তারগণে
ছেড়েছে ভিজিট-লোভ
আগুন যেমন দায়ে পড়ে ছাড়ে
স্পিরিটবিহীন ষ্টোভ।

বিনোদ

হাঃ হাঃ—খাসা উপমা। কিন্তু কেসটা আমার মনে হচ্ছে—যাক্—তুমি আর সেদিকে যেয়ো না।

নিশীথ

আর গিয়ে কি হবে ? কাগজটা আর বেরুলো না। চলুন্ রসিক বাবু, আপনার বাড়ীতেই—কই কোথায় গেলেন ?

বিনোদ

হাঃ হাঃ, তিনি ত অনেকক্ষণ—লোকের ত কাজকর্ম্ম আছে।

নিশীথ

তার মানে! আমরা কি বেকার ? আমরা যা করি তার মর্ম্ম বোঝা তোমাদের কাজ নয়।

(ক্রুদ্ধভাবে প্রস্থান)

বিনোদ

হাঃ হাঃ হাঃ, পাগলের এক ধাপ নীচে। কিন্তু কেদার বাবু—এ রোগ কোত্থেকে—কলকাতায় ত বহু কাল ছিল না।

(কামাখ্যার প্রবেশ। তাঁর বগলে একটি কাঠের বাক্স—তার মধ্যে দাবার সরঞ্জাম)

কামাখ্যা

কিস্তী।

বিনোদ

(চমকে) কামাখ্যা বাবু যে! কার সঙ্গে খেল্‌চেন ? গ্যাসপোষ্টের সঙ্গে ?

কামাখ্যা

দিলুম ব'ড়ের মুখে গজ। মেরেচেন কি নৌকোর ওঠ-সার—আর না মারেন তো ঘোঁড়ার কিস্তী—ব্যস্ মাৎ।

বিনোদ

(স্বগত) এ আর এক ধাপও নীচে নয়—(প্রকাশ্যে) কি মাৎ বল্‌চেন ?

কামাখ্যা

কে, ডাক্তার বাবু! ঠিক বল্‌চি। আপনি ত একটু-আধটু বোঝেন—এই দেখুন না—এর সামাল আছে ?

(বাক্স খুলে ফুটপাথের উপরেই ছক পেতে বল সাজাতে লাগলেন)

ঠিক এই অবস্থা—কেদার বাবুর সাদা, আমার কালো—

বিনোদ

কেদার বাবুর সঙ্গে খেল্‌তে যাচ্ছেন ?

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক

কামাখ্যা

আবার কার সঙ্গে খেল্‌বো? আর খেল্‌তে জানে কে? তিনি তবু খানিকক্ষণ যুঝতে পারেন।

বিনোদ

সর্ব্বনাশ!

কামাখ্যা

কার সর্ব্বনাশ? আমার? দেখলে তাই মনে হয় বটে। তিনিও তাই ভেবে আছেন। কিন্তু আমি দেখিয়ে দেবো যে সর্ব্বনাশটা তাঁরই। তিনটি চালে—এই দেখুন্।

বিনোদ

কবে তাঁর সঙ্গে খেলেচেন?

কামাখ্যা

কবে? দাঁড়ান্—পরশুদিন রাত্রে। বাজী তোলাই আছে। কাল আর যাইনি। কাল বাড়ীতে ব'সে ভেবেছি। সারাটা দিন গেল, চাল আর বেরোয় না। রাত্রে থাল কোলে ক'রে তখনো ভাবচি। ভাবতে ভাবতে যেই আলুর গায়ে পটলের কিস্তী দেওয়া—ব্যস্ চড়াৎ ক'রে মাথায় এসে গেল। একে বলে গ্যাম্বিট্—এই দেখুন বল কাটিয়ে—

বিনোদ

এই বল নিয়ে খেলেছিলেন?

কামাখ্যা

এই বল নিয়ে। এই ছক, এই বল, এই সব। বল্‌তে পার্ব্বেন না যে, কিছু বদলেচে।

বিনোদ

এ বল আমি পুড়িয়ে দোব।

কামাখ্যা

এঁ্যা? পোড়াবেন কি? (বল কুড়িয়ে বাক্সর মধ্যে পুরে) এ যে-সে বল নয়—কাশী থেকে আনা—

বিনোদ

তা হ'লে পারক্লোরাইড অব মার্কারি দিয়ে ডিস্‌ইন্‌ফেক্‌ট্ কর্‌তে হবে।

কামাখ্যা

(বাক্স বুকে আঁকড়ে ধ'রে) কেন, কেন, কি হয়েচে?

বিনোদ

প্লেগের রুগীর ছোঁয়া যে।

কামাখ্যা

প্লেগের রুগী! কেদার বাবুর প্লেগ হয়েচে!

বিনোদ

নিশ্চয়।

কামাখ্যা

প্লেগ হ'লে যে শুনেছি বাঁচে না।

বিনোদ

তা ত বাঁচেই না।

কামাখ্যা

(ব্যাকুলস্বরে) তবে কি হবে?

বিনোদ

কি আর হবে? সবই ভগবানের ইচ্ছে।

কামাখ্যা

তিনি গেলে কার সঙ্গে খেল্‌বো?

বিনোদ

হাঃ হাঃ এই জন্যে? তা খেলোয়াড়ের ভাবনা কি?

কামাখ্যা

ভাবনা নয়? যথেষ্ট ভাবনা। এ তাস পাশা দশপঁচিশ নয়, যা মেয়েরাও খেলে। এতে মাথার দরকার। এক কাজ করুন্,—আপনি ভাল ক'রে শিখে নিন্।

বিনোদ

তা শেখা যাবে। আপাতত বাক্সটা দিন্—আপনাকে কাল ফেরত দোব। দিন্।

কামাখ্যা

দোব? আচ্ছা। দেবেন কিন্তু ফেরত।

(বিনোদের হাতে বাক্স দিলেন)

বিনোদ

যান্, ফিনাইল দিয়ে হাত ধুয়ে ফেলুন্ গে।

কামাখ্যা

হাত ধুয়ে—তাই ত! এমন খেলাটা দেখাতে পারলুম না। শেষকালে প্লেগ! ঐ জন্যে পরশু দিন গাল চেপে ধ'রে খেলছিলেন।

(হনহন ক'রে সারদার প্রবেশ। তাঁর বগলে ছাতা, গায়ে ভিলে বরা ময়লা সার্ট, সার্টের বোতাম নেই—লাল সুতো দিয়ে বোতামের ঘর বাঁধা, মুখে একটি আধপোড়া বিড়ি। নিম্নলিখিত কথোপকথনের সময় পঞ্চানন তার দোকানের ঝাঁপ তুলবে, গন্ধেশ্বরীকে প্রণাম ক'রে ধূনো দিয়ে চার দিকে গঙ্গা জলের ছিটে দেবে)

সারদা

(বিড়িটাকে হাতে নিয়ে) দেশলাই আছে কামাখ্যা—দেশলাই আছে ?

কামাখ্যা

না—কেন ?

সারদা

অত কথা বল্‌বার সময় নেই।

(বিড়ি মুখে দিয়ে হন হন ক'রে এগিয়ে চল্লেন)

কামাখ্যা

(পিছন হ'তে সারদার জামা টেনে ধ'রে) আচ্ছা সারদা, তুমি না এক সময় দাবা খেলতে ?

সারদা

(বিড়ি হাতে নিয়ে) সে সব ভুলে গেছি—ছেড়ে দাও।

কামাখ্যা

কিচ্ছু মনে নেই ? আছে বৈকি। আমার সঙ্গে দু'চার দিন বসলেই—

সারদা

কখন বসবো ? ছেড়ে দাও—লেট হ'য়ে যাবে।

কামাখ্যা

কসরৎ ক'রে ঝালিয়ে নেওয়া বৈ ত নয়। আচ্ছা ঘোঁড়া ক'ঘর যায় বল ত ?

সারদা

আঃ কামাখ্যা—দেখ্‌চো আপিস যাচ্ছি—এর পর দৌড়তে হবে।

কামাখ্যা

তা দৌড়ো—বলনা ক'ঘর যায়।

সারদা

আঃ, কেদার বাবুর কাছে যাও না।

কামাখ্যা

আর কেদার বাবু—তাঁর যা হয়েচে—এখন যান্ কি তখন যান্।

সারদা

এ্যাঁ বল কি !

কামাখ্যা

প্লেগ যে—

সারদা

কবে হ'ল ?

কামাখ্যা

পরশু থেকেই একরকম—

সারদা

পরশু থেকে ! তা হ'লে আর এতক্ষণ নেই—ছাড়ো।

কামখ্যা

আচ্ছা যাও—কিন্তু দাবা তোমাকে ধরাবোই।

(কামাখ্যার প্রস্থান। সারদা বিড়ি মুখে দিয়ে হন্ হন্ ক'রে পঞ্চাননের দোকান পর্য্যন্ত গেলেন)

সারদা

(থমকে দাঁড়িয়ে বিড়িটা হাতে নিয়ে) একবার দেশলাইটা দাও ত পঞ্চানন।

পঞ্চানন

আজ্ঞে এখনো বৌনি হয়নি।

সারদা

তা নাই বা হ'ল। একটা কাঠি জ্বালাবো বৈ ত নয়।

পঞ্চানন

আজ্ঞে মাপ করবেন—কাঠিও যা বাক্সও তাই—

সারদা

তুমি দেখ্‌চি আসল বেনে—দাও একটা কিনেই নিচ্ছি।

(একটা আধ্‌লা বের ক'রে পঞ্চাননের হাতে দিলেন)

পঞ্চানন

আধ পয়সা ! আধ পয়সার দেশলাই আমার নেই।

সারদা

(পকেট হাতড়ে) কিন্তু আমারও ত আর কিছু নেই।

মুখে মুখে

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক

পঞ্চানন

দিশী দেশলাই আছে নেবেন? আধপয়সায় দিতে পারি।

সারদা

দাও, দাও—দিশীর চেয়ে আর জিনিষ আছে?

(পঞ্চানন দেশালাই বের ক'রে সারদার হাতে দিলে—সারদা ছাতিটা দোকানের গায়ে ঠেস দিয়ে রেখে, বিড়ি ধরাবার চেষ্টা করতে লাগলেন। দুতিনটে কাঠি ঠুকতে ঠুকতে নষ্ট হ'য়ে গেল)

সারদা

আরে কি ছাই দিলে—দিশীর কাঁথায় আগুন—যাক্ জ্বলেছে।

(বিড়ি টানতে টানতে দ্রুতবেগে প্রস্থান। নেপালের প্রবেশ। তাঁর হাতে একটি ছোট গ্লাডষ্টোন্ ব্যাগ)

পঞ্চানন

প্রাতঃপ্রণাম হই। অনেকদিন পরে দেবতার দেখা—

নেপাল

হাঁ, এই কলকাতায় এলুম তোমারই কাছে।

পঞ্চানন

আসুন আসুন—এ নৈলে আর অন্নগ্‌গুরু—দোকান কেমন চল্‌চে?

নেপাল

তা চল্‌চে মন্দ নয়। এবার কিছু বেশীই কিন্‌বো ভাবচি।

পঞ্চানন

কিনবেন বৈ কি। দোকান যখন দিয়েচেন—বেশী না কিন্‌লে চলে? আর এ বেনের মসলা—এর হাজা নেই, শুকো নেই, পচা নেই, সড়া নেই। তা মিথ্যে কেন কষ্ট ক'রে এলেন? আমাকে চিঠি লিখ্‌লেই হতো—সব প্যাক ক'রে পাঠিয়ে দিতুম।

নেপাল

হ্যা হ্যা তা বটে, তবে ভাবলুম দাদার সঙ্গে একবার দেখা ক'রে যাই, অনেক দিন দেখা হয়নি।

পঞ্চানন

ও, কেদার বাবুর সঙ্গে? তা ত করবেনই। তা দেখুন এবার তাঁর কাছ থেকে মবলগ কিছু নিয়ে দোকানটা একটু জাঁকিয়ে বসান্—হাঁসমার্কা ঘি, সূর্য্যিমার্কা কেরাসিন বাঁদরমার্কা সাবান—(নিম্নস্বরে) কেন না দোকানের ভাগীদার ত আপনার ভাইপোও হবে।

নেপাল

সে আর তুমি বল্‌বে পঞ্চু? সেই জন্যেই ত আসা। শ' দুই নিজে এনেছি—আর শ' চারেক তাঁর কাছ থেকে নিয়ে—বুঝলে কিনা—

পঞ্চানন

আজ্ঞে বুঝবো না কেন? এই ক'রেই ত চুল পাকালুম—আমারো ত দাদা ছিল। যাক্ বসুন্—একটু তামাক ইচ্ছে করুন্।

নেপাল

তামাক? আচ্ছা সাজো।

(নেপাল দোকানের চৌকিতে উঠে বসলেন—পঞ্চানন একটা ডাবা হুঁকোয় জল ফিরিয়ে, তামাক সাজতে লাগ্‌লো দ্রুতবেগে সারদার প্রবেশ)

সারদা

ছাতি—পঞ্চানন—ছাতি? এই যে, দুর্গা রক্ষে করেচেন!

পঞ্চানন

ফেলে গেছ্‌লেন বুঝি?

সারদা

আর কেন বলো? তাড়াতাড়িতেই মানুষ ফকির হয়। ওঃ ভাগ্যি যে কেউ চক্ষু দান করেনি

পঞ্চানন

করতো, যদি না পঞ্চাননের দোকান হতো।

সারদা

(ছাতি খুলে) তবে বেশী লাভ করতে পারতো না। হ্যা হ্যা—যে ঝাঁজরা আর তালি। কিন্তু বড্ড দেরী হ'য়ে গেল—সে যে-সে এন্‌ড্রুজ নয়—এখন বাসেই যেতে হবে। ছ'টা পয়সা দিয়ো ত পঞ্চু, ও বেলা ফিরিয়ে দোব।

পঞ্চানন

ছটা পয়সা! কি ক'রে দিই? তামাক সাজছি যে।

সারদা

দাও, চট্ ক'রে হাতটা ধুয়ে দাও।

(দশরথের প্রবেশ)

দশরথ

এ বেনিয়া ভাই, পয়সাটা কর সাজিমাটি দি অ ত—

পঞ্চানন

সাজিমাটি—আর কি ?

দশরথ

আউ অধ্‌ধেলাটাকার গুণ্ডী—

পঞ্চানন

আচ্ছা, আর কি ?

দশরথ

আউ ? মুগ্‌গা কাচিবি, পান খাইবি—আউ কঁড় ?

সারদা

দাও পঞ্চানন, ব্যস্‌ আস্‌চে।

পঞ্চানন

কত বল্লেন ? তিন পয়সা বুঝি ?

সারদা

না, না ছ'পয়সা।

পঞ্চানন

ছ'পয়সা ! (হুঁকো কল্‌কে নেপালের হাতে দিয়ে) একটু ফুঁ দিয়ে নিন্‌ দেবতা—(হাত ধুয়ে পয়সা বের ক'রে সারদার প্রতি) ধরুন্‌ (সারদার হাতে পয়সা দিয়ে) ও বেলা কিন্তু যেন পাই।

সারদা

তা পাবে, যদি না এর মধ্যে সেঁটে যাই—

পঞ্চানন

ও কি কথা বাবু ? আপনারা হচ্চেন আমাদের ভরসা।

সারদা

তা বটে, কিন্তু মানুষের শরীর তো—কিচ্ছু বলা যায় না। এই যে কাল কেদার বাবুটির হ'য়ে গেল।

পঞ্চানন

হ'য়ে গেল ! (নেপালের দিকে চেয়ে নিয়ে স্বর নীচু ক'রে) কোন্‌ কেদার বাবু ?

সারদা

(নিম্নস্বরে) ওই যে নীলরঙের বাড়ী—

দশরথ

নীল কুঠ্‌ঠির বাবু ! (কপালে চাপড় দিয়ে) এ জগন্নাথ, এ জগন্নাথ, এ জগন্নাথ। (কান্নার মুখভঙ্গী ক'রে ব'সে পড়লো)

পঞ্চানন

আঃ—চুপ্‌ চুপ্‌ (নিম্নস্বরে) কি হয়েছিল ?

সারদা

প্লেগ—প্লেগ—এই বাঁধো, বাঁধো—

(হাত তুলে প্রস্থান)

দশরথ

ফু-ফু-ফু—বাপ্‌ পইরে।

পঞ্চানন

আবার চেঁচায় ! (দুটো টোপ্‌লা বেঁধে) এই ধর্‌ তোর সাজিমাটি আর গুণ্ডী।

দশরথ

(উচ্চ ক্রন্দনের স্বরে) ফাঁকি দিলা, চারি টঙ্কা—মু তলব—বাকি থলা—এ জগন্নাথ !

নেপাল

ও কাঁদে কেন পঞ্চু ?

পঞ্চানন

আজ্ঞে ও কিছু নয়। (স্বগত) ভালা উড়ের আপদ—(প্রকাশ্যে সারদার প্রতি) আপনার মস্‌লার ফর্দটা দিন, (দশরথের প্রতি) নে পালা—(টোপ্‌লা দুটো দশরথের কোলে ছুঁড়ে দিয়ে) ও বেলা দাম দিয়ে যাস্‌।

দশরথ

কেদার বাবু—নীলকুঠ্‌ঠির বাবু—আপ্‌পনি বি মরি গলা, মতে বি মারি গলা—

নেপাল

এঁ্যা পাঁচু—কি বলে ? দাদা কি আমার—চুপ ক'রে রইলে যে ? দাদা কি তা হ'লে নেই ?

(হুঁকো নাবিয়ে রাখলেন)

পঞ্চানন

(মাথা চুলকে) এঁ্যা দাদা ? হঁ্যা—তাই ত শুন্‌চি।

নেপাল

নেই ! দাদা নেই ! ওহোহো, দাদা, দাদা !

(চোখে কাপড় দিলেন)

মুখে মুখে

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক

পঞ্চানন

(স্বগত) হ'ল মস্‌লা বেচা—ইচ্ছে করে বেটাকে—(দশরথের প্রতি) দে পয়সা দে—

দশরথ

আস্তে ত দেউছুঁ—(পঞ্চাননের হাতে পয়সা দিয়ে) আউ সে গুটে পয়সা মুহে, গুটে টঙ্কা মুহে—দ্বিটা মুহে, তিনিটা মুহে, চারি চারি টঙ্কা—অঃ মতে সারি দেই গলারে, সারি দেই গলা।

(অপূর্ব্বের প্রবেশ)

অপূর্ব্ব

দাও ত পঞ্চানন, এক টাকার গোটার মস্‌লা বেঁধে।

পঞ্চানন

গোটার মস্‌লা ? দিচ্চি। (তাড়াতাড়ি পোঁটলা বেঁধে ঠোঙার মধ্যে পুরতে লাগ্‌লো) এই ধনে, এই লঙ্কা, এই জিরে মরিচ।

দশরথ

(কপাল চাপ্‌ড়ে) মোর কপ্‌পাল, মোর কপ্‌পাল।

অপূর্ব্ব

কি রে দশরথ—কি হয়েচে ?

দশরথ

(বুক চাপড়ে) ফাট্‌টি গলা, ফাট্‌টি গলা।

অপূর্ব্ব

বল্ না বেটা শুনি—

পঞ্চানন

কি শুন্‌বেন উকীল বাবু ?—পাজি বেটা, আমার দফাটি খেয়ে—'ফাট্‌টি গলা'—বেরো, বেরো দোকান থেকে।

দশরথ

হৌচি—আস্তর দশরথ তাংক ঘরোরে কাম করুতয়ে। মো তলব তাংক হাতরে দেই থিবে পরা—যাউ।

(প্রস্থানোদ্যত)

পঞ্চানন

যা, প্লেগের বাড়ী গিয়ে মর্।

দশরথ

আউ বাঁচিবি কঁড় ? মরিবি ত টঙ্কা ধরিকিরি মরিবি—

(প্রস্থান)

পঞ্চানন

(টোপ্‌লা বাঁধতে বাঁধতে) এই লবঙ্গ—এই জায়ফল—এই কর্পূর।

নেপাল

দাদা ! দাদা !

অপূর্ব্ব

উনি কে ?

পঞ্চানন

কেদার বাবুর ভাই—

অপূর্ব্ব

কেদার বাবু কি তা হ'লে—

পঞ্চানন

আজ্ঞে হ্যাঁ। ভাবলুম এখন শোনাব না, সবে দেশ থেকে আস্‌চেন—তা বেটা উড়ে—

নেপাল

ওঃ পঞ্চানন—সত্যি তো ?

পঞ্চানন

দুস্ খবর কখনো মিথ্যে হয় ছোটবাবু ?

নেপাল

ওঃ—যাই দেখি তাঁর গতির ব্যবস্থা—

পঞ্চানন

সে এতক্ষণ হ'য়ে গেছে—সরকারী গাড়ীতে তুলে—

নেপাল

সরকারী গাড়ীতে ! ওহোহো—আপনার জন থাকতে—আমার ঠিক মন টেনেছিল—ওহোহো পঞ্চানন, সব ভেস্তে—যাই দেখিগে।

পঞ্চানন

কোথায় যাচ্ছেন ? সে বাড়ীর দিকে আর যাবেন না।

নেপাল

যাবো না ! বল কি ? তাঁর যে অনেক জিনিষপত্তর—

পঞ্চানন

সে সব এতক্ষণ পুড়িয়ে দিচ্চে—প্লেগের রুগী তো।

নেপাল

ও ব্বাবা—তবে আর—ওঃ দাদা, গেলে ত এমন রোগেই গেলে !

অপূর্ব্ব

(স্বগত) হুঁ—দাদার চেয়ে দাদার জিনিষের উপর টান।

নেপাল

ওহোহো—এমন দাদা কারো হয় না—যখন যা চেয়েছি—কোথায় কি রেখে গেলেন—

অপূর্ব্ব

(নেপালের কাছে এগিয়ে গিয়ে) কোথায় কি রেখে গেছেন, জানেন না ?

নেপাল

কিছু কিছু জানি। হাজার পাঁচেক আছে নর্থব্রিটিশে আর হাজার দশের চার্টার ব্যাঙ্কে—

অপূর্ব্ব

তাঁর ত এখন ওয়ারেশ আপনিই ?

নেপাল

না আমি আর কই ? আমার ভাইপো আছে—

অপূর্ব্ব

ওঃ ভাইপো! নাবালক বুঝি ?

নেপাল

হ্যাঁ—বছর খানেক গার্জ্জেন থাকৃতে পারবো।

অপূর্ব্ব

তাতে আর কি হবে? আচ্ছা (চাপা স্বরে) আপনার দাদা যদি আপনাকে সব উইল ক'রে দিয়ে থাকেন ?

নেপাল

এঁ্যা—দিয়েচেন নাকি ?

অপূর্ব্ব

(হেসে) দিয়েচেন বৈকি রেজেষ্ট্রী উইল—বুঝচেন না ?

নেপাল

ও বাবা—সে টিঁকৃবে ?

অপূর্ব্ব

হাঃ হাঃ—আপনার ভাইপো ত দেশে আপনার কাছেই থাকে ?

নেপাল

হ্যাঁ।

অপূর্ব্ব

নিশ্চয় আপনার বাধ্য ?

নেপাল

এখনো ত অবাধ্য হয় নি।

অপূর্ব্ব

আপনি প্রোবেট নিতে গেলে সে আপত্তি দেবে ?

নেপাল

মনে ত হয় না।

অপূর্ব্ব

তবে আর টিঁকৃবেনা কেন ? তাঁর নাম সই করা—একখানা চিঠি পেলেই হয়—

নেপাল

চিঠি তো এই একখানা আছে।

(পকেট থেকে একখানা পোষ্টকার্ড বের ক'রে অপূর্ব্বের হাতে দিলেন)

অপূর্ব্ব

বাস্ এই তো—আর সব আমি আছি।

নেপাল

সাক্ষী ?

অপূর্ব্ব

বল্‌চি আমি আছি। আজ রাত্রে আমার সঙ্গে দেখা করবেন। উকীল অপূর্ব্বকৃষ্ণ—ঐ মোড়ের মাথায় বাড়ী।

নেপাল

যে আজ্ঞে।

অপূর্ব্ব

কিন্তু অল্প ফিসে হবে না—বুঝচেন তো ?

নেপাল

সে আপনি ক'রে দিয়ে যা চাইবেন!

অপূর্ব্ব

না না—আগেও কিছু—যাক্ আজ দেখা করবেন।

নেপাল

যে আজ্ঞে।

অপূর্ব্ব

(পঞ্চাননের প্রতি) কৈ পঞ্চানন, হলো ?

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক

পঞ্চানন

আজ্ঞে এই হয়েচে—আসুন্। (অপূর্ব্বের হাতে ঠোঙা দিলে। ছকড়ির প্রবেশ তাঁর খালি পা, গায়ে পাতলা চাদর)

ছকড়ি

পাঁচু পাঁচু, একপয়সার তিল আর এক পয়সার কুশো—

নেপাল

ওঃ দাদা—দাদা !—সব আমার ঘাড়ে দিয়ে গেলে !

(চোখে কাপড় দিলেন)

অপূর্ব্ব

আর আমার ঘাড়েও কিছু—

ছকড়ি

কি হয়েচে উকীল বাবু ?

অপূর্ব্ব

তুমি ছকড়ি, কিসের অগ্রদানী ? মানুষ মরলে টের পাও না ?

ছকড়ি

এঁ্যা—ওঁর বুঝি দাদা মরেচেন ?—কবে শ্রাদ্ধ ?

অপূর্ব্ব

সে তুমি শোনো—(পঞ্চাননের প্রতি) আসি পঞ্চু, খাতায় লিখে রেখো—

(প্রস্থান)

পঞ্চানন

আবার খাতায় ?—আজ কার মুখ দেখেই—

ছকড়ি

বাবুটি কোথায় থাকেন পাঁচু ?

পঞ্চানন

(ছকড়ির প্রতি চোখের ইসারা ক'রে জনান্তিকে) হচ্চে দাঁড়াও না। (প্রকাশ্যে) আর কেঁদে কি হবে ছোট বাবু ? তিনি যা গেছেন—ভালই গেছেন। সুনামধন্যি পুরুষ। এখন তাঁর ছেরদ্দোটা যাতে ভালো ক'রে হয়—আপনাদের ত মোটে—এক দিন ত বেরিয়েই গেল—আর ন'টা দিন মাত্তর।

নেপাল

ওঃ—শ্রাদ্ধ ! হ্যাঁ, এখন শ্রাদ্ধই—

পঞ্চানন

আর সেটা চুক্‌লেই—দোকানটা যাতে—সেটাও বড় কম নয়—

নেপাল

হ্যাঁ সেটাও—কিন্তু এখন আর—

পঞ্চানন

বেশী না কিনুন—কিছু অন্তত—আস্তে আস্তে এখন আপনাকেই ত চালাতে হবে—(ছকড়ির প্রতি) এই নাও দাদা—তোমার তিল আর কুশো।

(ছকড়ির হাতে দুটো পোঁটলা দিয়ে পয়সা নিলে)

ছকড়ি

(আস্তে আস্তে নেপালের কাছে গিয়ে) বড় ভাই না পিতৃতুল্য। এ একটা পিতৃদায় বল্‌লেই হয়।

নেপাল

এঁ্যা—হ্যাঁ—ওঃ।

ছকড়ি

এখন আপনার হাতেই তাঁর স্বর্গ—শুধু স্বর্গ কেন, অক্ষয়-স্বর্গ।—যদি বৃষোৎসর্গটাও করেন। আর করবেনই বা না কেন ? এ ধরুন্ আপনার একটা শেষ তৃপ্তি—একটা ক্ষোভ মেটানো। যে, হ্যাঁ বেচে থাক্‌তে কিছু করতে পারিনি, কিন্তু এখন যা করলুম চূড়ান্ত। আর শাস্ত্রেও বলেচে—'আত্মশ্রাদ্ধে বৃষোৎসর্গে চিরং কালং সুখোঽভবৎ।'

নেপাল

দেখি কি করতে পারি।

ছকড়ি

পার্ব্বেন বৈকি—যখন মন হয়েচে, নিশ্চয় পার্ব্বেন। আর এমন কিছু খরচও নয়। আমি দেখা শুনা করলে কোনো বেটা ভট্‌চাযিযর সাধ্যি নেই যে এক পয়সা হুড়িয়ে নেয়। তা বাবু কি কলকাতাতেই শ্রাদ্ধ করবেন ?

নেপাল

না, দেশে।

ছকড়ি

তা বেশ, তাতেও ক্ষতি নেই। যাতায়াত দিলে যাবো বৈকি। এটা একটা পরোপকার, আমাদের কাজই হচ্চে এই—তা বাবু দেশে যাচ্ছেন কবে ?

নেপাল

কাল সকালে।

ছকড়ি

তা হ'লে ত জিনিষ পত্তর আজই কিন্‌তে হয়।

নেপাল

হ্যাঁ, ভট্‌চার্য্যিকে দিয়ে একটা ফর্দ্দ করিয়ে—

ছকড়ি

কিচ্ছু লাগবেনা—ফর্দ্দ আমার মুখে। ভট্‌চাযিরা যতক্ষণ পুঁথি হাঁট্‌কাবে ততক্ষণ আমি—চলুন, এখনো রোদ চাগেনি—সকাল সকাল দুটিতে বেরিয়ে পড়ি বড়বাজার নতুন বাজার, বউবাজার, সব সেরে দুপুর না ঘুরতেই—আসুন্—ব'সে থাকলেই শোক চেপে ধরে—কাজই ওর ওষুধ—আসুন, ব্যাগটা না হয় আমিই নিয়ে যাচ্ছি।

(ব্যাগ নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন)

পঞ্চানন

ছকড়িদা, একটু শুনে যেয়ো!

(ছকড়ি পঞ্চাননের কাছে গেল)

ছকড়ি

কি—কি?

পঞ্চানন

(চাপা স্বরে) না, এই দোকানে দোকানে ত দস্তুরী পাবেই—মোদ্দা আমার জন্যেই পেলে এটা যেন মনে থাকে।

ছকড়ি

(ঈষৎ বিরক্তির সুরে) আচ্ছা, আচ্ছা জানি। (দু এক পা এগিয়ে স্বগত) বড্ড ছোট নজর—বেনে তো। (নেপালের প্রতি) আসুন বাবু, জুতো পায়ে দিয়ে আস্‌চেন? ওটা ছেড়ে ফেলুন—

(নেপাল অপ্রস্তুত হ'য়ে জুতো খুলে ফেল্‌লেন)

ওটা আমিই পায়ে দিয়ে নিয়ে যাচ্ছি—

(জুতো পায়ে দিলে)

পঞ্চানন

(স্বগত) জুতো জোড়াও নিলে—বড্ড ছোট নজর—ওঁচা বামুন কিনা (প্রকাশ্যে নেপালের প্রতি) দেবতার তামাকটা খাওয়া হ'ল না।

নেপাল

আর তামাক—আমার যা হলো—

ছকড়ি

কিছু হবে না, সব ঠিক ক'রে দোব—আসুন।

(আগে আগে ছকড়ি ও তার পিছনে পিছনে নেপাল চল্লেন)

পঞ্চানন

ফিরে আবার দোকানে আসবেন—আপনার ফর্দ্দটা ধ'রে কিছু সঙ্গে দিয়ে দোব—

নেপাল

এখন কি আর টাকায় কুলোবে?

পঞ্চানন

আজ্ঞে দাম না হয় এখন বাকীই থাক্‌বে—আপনি ত আর পর ন'ন—শ্রাদ্ধের পর যখন খুসী পাঠিয়ে দেবেন—

(ছকড়ি ও নেপালের প্রস্থান)

একেই বলে মুখের গ্রাস ছুটে যাওয়া। আর আপদও ঢের—এক উড়ে—এক উকীল, এক অগ্রদানী—আমার হাতে ঠোঙা—ওরা মারচে ছোঁ। যত চিলের মরণ।

দ্বিতীয় দৃশ্য

পাড়া গাঁয়ের বাড়ীর আঙিনা। আঙিনায় এক কোণে বৃষ কাঠ পোঁতা—তাতে দুটো বাছুর বাঁধা। আঙিনার মাঝখানে বিমল নেড়া মাথায় কাচা গলায় দিয়ে শ্রাদ্ধ করতে বসেচে। সাম্‌নে জগদীশ ভট্টাচার্য্য পুঁথি খুলে উবু হ'য়ে বসেচেন। চার পাশে কলার খোলায় নৈবেদ্য সাজানো—কলাপাতায় ফুল দুর্ব্বো তিল আলোচাল—একটা মালসায় পিণ্ডীর ভাত। অদূরে ছকড়ি একটা কাটারি নিয়ে ডোঙ্গা তৈরী করচে। বিমল মাঝে মাঝে উত্তরীয় দিয়ে চোখ মুছচে।

(নেপালের প্রবেশ)

নেপাল

কাঁদিস্‌নি বিমল, কাঁদিসনি—দাদা গিয়েচেন, আমি ত আছি। আমি তোকে ডানা চাপা দিয়ে রাখবো।

জগদীশ

রাখবেনই তো। পিতৃব্য আর পিতা কি আলাদা? পড়— 'ওঁ দেবতাভ্যঃ ঋষিভ্যশ্চ'—আহাহা চোখের জল ফেলো না—ওতে শ্রাদ্ধের অমঙ্গল হয়।

ছকড়ি

শ্রাদ্ধের অমঙ্গল! অপব্যয় বলুন্।

মুখে মুখে

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক

জগদীশ

আঃ তুমি কেন—তুমি এ সবের কি বোঝ? এসেছ ছাঁদা বাঁধতে—

ছকড়ি

হ্যাঁ হ্যাঁ চুপ করুন্—আপনার মত অনেক ভট্চাজ্জিকে ট্যাঁকে—

নেপাল

কি করেন্ আপনারা—কাজ করুন্!

জগদীশ

কাজে আমার ভুল হবে না। আমরা আদ্যশ্রাদ্ধের শকুন নই। পড়—

'ওঁ দেবতাভ্যঃ ঋষিভ্যশ্চ মহাযুগিভ্য এবচ
নমঃ স্বধায়ৈ স্বহায়ৈ নিত্যমেব ভবন্তু থি'

কৈ—পড়লে না?

বিমল

(চোখ মুছে) পড়েছি।

জগদীশ

মনে মনে পড়লে কি হয় বাবা? এর নাম মন্তর। এর উচ্চারণেই ফল।

ছকড়ি

মশায় যে উচ্চারণ করলেন—যুগিভ্য! যৈগিভ্য আর বেরুলো না।

জগদীশ

আরে কেহে বাপু, তুমি টিক টিক করচো—সংস্কৃতের স জানো না।

নেপাল

কেন গোল করচেন? ওতে যে আরো গুলিয়ে ফেল্বে। পড়্ বিমল, পড়্—কাঁদিসনি—তোর কিছু ভাবনা নেই—দাদা কি আর না বুঝে আমার নামে সব লিখে দিয়ে গেছেন?

বিমল

এঁ্যা!

জগদীশ

সব আপনার নামে!

নেপাল

কেন না আমাকে দেওয়াও যা ওকে দেওয়াও তাই। তবে ও ছেলে মানুষ, কাঁচা পয়সা হাতে পড়া ভালো নয়—সেই জন্যেই—

(বিমল চোখে উত্তরীয় দিলে)

জগদীশ

তা তুমি কাঁদচো কেন বাবা? তোমার কাকা তেমন লোক ন'ন্। তোমার কুটোটুকুও যাবে না।

ছকড়ি

আর ওঁর যখন ছেলে পুলে নেই—

জগদীশ

আ. কেন বক্‌চো? তবিষ্যে করলে অমন কাকা মেলে।

ছকড়ি

কেন মশায় বাজে কথা কইচেন? উনি সাক্ষাৎ দেবতা।

নেপাল

ওকে মানুষ ক'রে রেখে—মরবার সময় ওকেই সব দিয়ে যাবো।

জগদীশ

আহা, শোনো বাবা শোনো—এমন কথা আর কেউ বলবে না।

ছকড়ি

সে ত জানা কথাই। নতুন কি বল্‌বেন? তুমি মনে কর বাবা, তুমি পর্ব্বতের আড়ালে রয়েছ।

জগদীশ

ভারি নতুন কথা বল্লে! তুমি ওঁকে ক'দিন জানো বাপু? উনি আমার তিন পুরুষের যজমান। (বিমলের প্রতি) ছিঃ বাবা, তবু কাঁদচো? আমি যে-সে ব্রাহ্মণ নই—আমার মুখ দিয়ে যা বেরিয়ে গেছে তার নড়চড় হবে না—আমি যখন বলেছি তোমার কিছু যাবে না—

বিমল

বাবা যে এত শীগ্‌গির—

জগদীশ

ওঃ সেই জন্যে! তা দেখো বাবা এর প্রমাণ মার্কণ্ড পুরাণেই আছে—'নাকালে ম্রিয়তে জন্তুঃ' অর্থাৎ নাকাল

হ'লেই জন্তু মরে। তোমার বাবা জন্তু না হ'লেও টাকা টাকা ক'রে অনেক নাকাল হয়েছিলেন কিনা।

ছকড়ি

আর ঐ যে কিসে আছে—

জগদীশ

হ্যাঁ হ্যাঁ কিসে আবার? বরাহসংহিতায়—'জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুঃ' অর্থাৎ ধ্রুব বল্‌চেন—'মানুষ তো ভালো মানুষের জাতই মরবে।' কাজেই দুঃখ করবার কিছুই নেই।

বিমল

বাবাকে একবার দেখ্‌তে পেলুম না।

জগদীশ

দেখ্‌তে পেলে না? আহা! তা তুমি না দেখ্‌লেও তিনি তোমায় দেখ্‌চেন।

বিমল

দেখ্‌চেন!

জগদীশ

দেখ্‌চেন বৈকি। নৈলে পূরক পিণ্ড দিয়েছ কি জন্যে? ছিলেন 'আকাশস্থো নিরালম্বঃ বায়ুভূতো নিরাশ্রয়ঃ' অর্থাৎ আকাশে থ হ'য়ে, নিরালম্বঃ কিনা জলে লম্বা হ'য়ে, বায়ুভূতঃ কিনা বাতাসে ভূত হ'য়ে, নিরাশ্রয়ঃ কিনা নিরন্তর পরিশ্রম করছিলেন—আর এখন—

ছকড়ি

এখন সূক্ষ্ম শরীর পেয়েচেন।

জগদীশ

চুপ্ করো। ছেলে মানুষ কখনো সূক্ষ্ম শরীর বোঝে? এখন প্রেতদেহ বুঝলে বাবা, প্রেতদেহ পেয়েচেন। এই এখন যা মন্ত্র পড়াবো তাতে তিনি সরাসর নেবে এসে ঐ কাপড় পরবেন, ঐ পিণ্ডী খাবেন।

বিমল

তবু আমি তাঁকে দেখ্‌তে পাব না?

জগদীশ

কি ক'রে পাবে বাবা! সত্যকাল হ'লে পেতে। সে ভক্তি কি আর আছে? না, তেমন ব্যাকুল হ'য়ে কেউ ডাক্‌তে পারে?

বিমল

পারবো।

জগদীশ

হাঃ হাঃ, এত সরল নৈলে আর বালক। যাক্ অনেক কথা হয়েচে—বল 'ওঁ বিষ্ণুঃ', বলেছ? আচ্ছা এইবার হাত জোড় ক'রে তাঁকে আহ্বান কর।

'ওঁ এহি প্রেত সোম্যাশো গম্ভীরেভিঃ পথিভিঃ'—কৈ পড়—তাড়াতাড়ি হ'য়ে যাচ্ছে? আচ্ছা আস্তে আস্তেই বলচি—'ওঁ এহি প্রেত'—অর্থাৎ কিনা হে প্রেত তুমি এসো—'ওঁ এহি প্রেত,—

বিমল

(গদগদস্বরে) ওঁ এহি প্রেত—

(কেদারের প্রবেশ)

ঐ আস্‌চেন।

জগদীশ

কে—কে? ওরে ব্বাবা!

(উঠে দাঁড়িয়ে ঠকঠক ক'রে কাঁপতে লাগলেন—তাঁর কাচা খুলে গেল)

ছকড়ি

(দু তিনটে ডোঙ্গা মাথায় দিয়ে) রাম রাম দুর্গা দুর্গা দুর্গা দুর্গা রাম রাম—

বিমল

বাবা—বাবা!

জগদীশ

আর ডেকো না বাবা—যে ডাক ডেকেছ—

কেদার

এ সব কি হচ্ছে?

(ছকড়ি ও জগদীশ পরস্পরকে জড়িয়ে ধ'রে নামাবলী মুড়ি দিলেন)

(স্বগত) ওই জন্যে পঞ্চু ব'লেছিল যে শীগগির বাড়ী যান্—একটা কি বড্ড গোলমাল হয়েচে।

নেপাল

(হাত জোড় ক'রে) দাদা, আর কেন—আর কেন? মায়া কাটিয়েছ ত আর কেন—অন্তর্ধান হও—আমি কালই গয়ায় গিয়ে—

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক

কেদার

(ঈষৎ হেসে স্বগত) এতদূর গড়িয়েচে! (বিমলের প্রতি) বাবা বিমল, ওঠো আর শ্রাদ্ধ করতে হবে না। (কৌতুকস্বরে নেপালের প্রতি) আর নেপাল, তোর সঙ্গে আমার বোঝাপড়া আছে।

নেপাল

এ্যাঁ এ্যাঁ—বোঝাপড়া! না দাদা—আমার দোষ হয়েচে—আমায় ক্ষমা করো।

কেদার

(হেসে) ক্ষমা! কখ্‌খনো না। এত বড় গুরুতর কাজ কেউ কখনো করে?

নেপাল

আমি নিজের বুদ্ধিতে করিনি।

কেদার

তা ত বুঝতেই পেরেছি। কল্‌কাতায় গিয়ে উড়ো লোকের উড়ো কথা শুনে—

নেপাল

মস্ত উড়ো লোক—জালিয়াৎ উকীল—অপূর্ব্ব ঘোষ; তুমি ত এখন অন্তর্য্যামী, সবই বুঝতে পারচো। আমার মোটেই ইচ্ছে ছিল না—আমায় এক রকম ধ'রে বেঁধে—সে উইল আমি এখনই গিয়ে ছিঁড়ে ফেল্‌চি।

কেদার

কোন উইল?

বিমল

ঐ যাতে আপনি কাকার নামে সব লিখে দিয়ে গেছেন।

কেদার

হুঁ—আচ্ছা আমি কল্‌কাতায় গিয়ে অপূর্ব্ব ঘোষের ঘাড় ভাঙ্‌বো। এখন যাও তো ভাই, বাড়ীর ভিতর গিয়ে দুটি ঝোল ভাতের ব্যবস্থা করোগে—কেননা ও পিণ্ডী ত আমার গলা দিয়ে নাব্‌বেনা। যা—যা—অত আড়ষ্ট হ'য়ে যাচ্ছিস্‌ কেন?

নেপাল

আড়ষ্ট! না যাচ্ছি।

(নেপালের প্রস্থান)

জগদীশ

নেপাল বাবু যাচ্ছেন নাকি? আমাদের নিয়ে যান্‌!

কেদার

কেন, আপনাদের কি পা নেই?

ছকড়ি

পা পেটের মধ্যে ঢুকে গিয়েচে। আপনি অদৃশ্য না হ'লে আর বেরোবে না।

কেদার

হাঃ হাঃ হাঃ—আচ্ছা, আপনাদের কিছু বলবো না—আপনারা স্বচ্ছন্দে পা বের করুন্‌। মোদ্দা ঐ নৈবিদ্যি, দক্ষিণে, কাপড় গামছা, কিছু যেন না প'ড়ে থাকে—খুঁটিয়ে নিয়ে যাবেন। আর তা যদি না নেন্‌—

ছকড়ি

নিচ্চি—নিচ্চি—

জগদীশ

তুমি কেন, আমিই নিচ্চি।

(দুজনে কাড়াকাড়ি ক'রে শ্রাদ্ধের জিনিষ গামছা বাঁধতে লাগলেন)

ছকড়ি

কি দয়াল ভূত!

জগদীশ

বেশী কথা বোল না। দয়াল ছেড়ে ভয়াল হ'তে কতক্ষণ লাগে?

(দুজনে পোঁটলা বেঁধে হুড়মুড় ক'রে বেরিয়ে গেলেন)

কেদার

(বিমলের কাছে গিয়ে তার মাথায় হাত বুলিয়ে) এবার বেশ ঘন কালো চুল উঠবে।

বিমল

(কেদারের হাত নীচে থেকে উপর পর্য্যন্ত টিপে) বাবা, তুমি মরোনি—না?

কেদার

মরতে পারি কখনো? তুমি এখনো বড় হওনি।

বিমল

তবে যে কাকা বলেছিলেন তুমি মরেছ?

কেদার

তোমার কাকাও মিথ্যে বলেননি। মানুষ দুরকমে মরে—এক সত্যি সত্যি, আর এক মুখে মুখে। আমি মুখে মুখে মরেছিলুম।

যবনিকা

কোলনের প্রেসা

শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু

বিমান-পোত কাউণ্ট জেপেলিনের আট্‌লান্টিক পারাপারের মত কোলনের প্রেসা কেবলমাত্র গত বৎসরের (১৯২৮) জার্ম্মানীর নয়, সমস্ত পৃথিবীর ইতিহাসে একটি প্রধান ঘটনা। প্রেস সম্বন্ধে ওরকম আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী বোধ হয় এই প্রথম। প্রেসা প্রধানত প্রেস অর্থাৎ খবরের কাগজের প্রদর্শনী হ'লেও, ওখানে 'প্রেস' অতি ব্যাপক অর্থে ধরা হয়েছে। প্রেসার জার্ম্মান-বিভাগে ছাপাখানার জন্ম-কথা তার পরিণতির ইতিহাস দেখান হয়েছে, তা ছাড়া তার অনেক আনুষঙ্গিক বিষয়ও দেখান হয়েছে।

পৃথিবীর সভ্যতার ইতিহাসে মুদ্রাযন্ত্র হচ্ছে জার্ম্মানীর দান। অবশ্য চীনেতে বহুপূর্ব্বে মুদ্রাযন্ত্র ছিল, খৃষ্টীয় সাত শতাব্দীতে টাঙ্‌-রাজবংশের সময় রাজসভার খবরের কাগজ বার হ'ত; কিন্তু চীনদেশীয় মুদ্রাযন্ত্রের বিশেষ উন্নতি হয় নি, তা পৃথিবীর অপরদেশে ছড়িয়ে পড়েনি। গুটেন-বেয়ার্গের (Gutenberg) মুদ্রাযন্ত্রের উদ্ভাবনের পর মানবসভ্যতার এক নূতন পর্ব্বের আরম্ভ হ'ল। এই গুটেনবেয়ার্গের বাড়ী ছিল মাইন্‌সে (Mainz) কোলনের খুব কাছে। মাইন্‌স্ সহরে ১৪৫৪ খৃঃঅব্দে গুটেনবেয়ার্গ তাঁর নব-উদ্ভাবিত মুদ্রাযন্ত্রে প্রথম বই ছাপেন, তার পরের বৎসর প্রথম বাইবেল ছাপা হয়। যিশুর জন্মের মত এই মুদ্রাযন্ত্রের জন্ম মানবসভ্যতার ইতিহাসে এক মহান বিশেষ ঘটনা; এই মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে মানবসভ্যতা যেমন শক্তি ও ব্যাপকতা লাভ করেছে, তেম্নি তার গতি দ্রুত ক্ষুব্ধ হয়েছে। রাইন-নদীর পোলের উপর দাঁড়িয়ে একদিকে কোলনের চার্চ্চ-চূড়াগুলি ও অপরদিকে প্রেসার গগনচুম্বী বুরুজগুলির দিকে চেয়ে মনে হ'ল, গুটনবেয়ার্গ কি স্বপ্নেও ভাবতে পেরেছিলেন যে, তাঁর এই উদ্ভাবিত যন্ত্র আরও পরিণত হ'য়ে পাঁচ শতাব্দী পরে মানব ইতিহাসে সব চেয়ে বড় শক্তি হবে; কারণ যে সব শক্তির বাহক পরিচালক হবে, তাহারি জোরে যুদ্ধ বিপ্লব ঘটবে, রাজ্য ওলটপালট হ'য়ে যাবে।

গুটেন্‌বেয়ার্গের মুদ্রাযন্ত্র শীঘ্রই চারিদিকি ছড়িয়ে পড়ল। ১৪৬৫তে এল ইতালীতে, ১৪৬৮তে এল সুইজারল্যাণ্ডে,
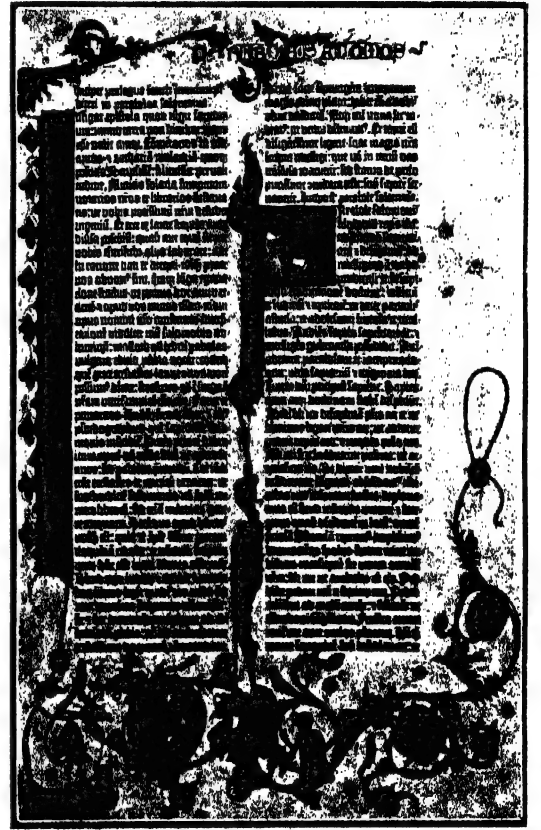
গুটেন্‌বেয়ার্গের বাইবেলের একটি পাতা
সচলহরফে ছাপা প্রথম বই

১৪৭০তে এল ফ্রান্সে, ১৪৭৭তে এল ইংলণ্ডে; উইলিয়াম কাক্সটোন বেলজিয়াম থেকে মুদ্রাযন্ত্রের চালন শিখে লণ্ডনে ওয়েষ্টমিন্‌ষ্টারে তাঁর ছাপাখানা খোলেন ১৪৭৭তে। আর

কোলনের প্রেসা

শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু

বাংলাদেশে মুদ্রাযন্ত্র আসে আঠারো শতাব্দীর মধ্যভাগে; ১৭৭৮তে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একটি সাহেব হুগ্‌লীতে একটি বাঙ্গলা মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেন, তারপর শ্রীরামপুরে কেরি সাহেব আর একটি বাঙ্গলা মুদ্রাযন্ত্র চালান, এইরূপে বাংলাতে মুদ্রাযন্ত্রের সুরু হয়। ইয়োরোপের মত ভারতে মুদ্রাযন্ত্র যদি পনেরো শতাব্দীতে স্থাপিত হ'ত, ত' হ'লে ভারতের ইতিহাস সম্পূর্ণ নব রূপ নিত। বস্তুত, মুদ্রাযন্ত্র ছিল ব'লেই লুথার জার্ম্মানীতে রিফরমেসন্-আন্দোলন (Reformation) চালাতে পেরেছিলেন, মুদ্রাযন্ত্র ছিল ব'লেই ফরাসী বিপ্লবের আগুন জ্বলেছিল; আর বর্ত্তমান শতাব্দীতে খবরের কাগজই সকল রাজনৈতিক আন্দোলনের বাহক ও চালক, খবরের কাগজই লোকমত গড়্‌ছে, ভাঙ্‌ছে, নব রূপ দিচ্ছে; জাতির সহিত জাতির, দেশের সহিত দেশের সখ্যতা বা শত্রুতা খবরের কাগজের প্রপাগাণ্ডার ওপর নির্ভর করছে।

ঐতিহাসিক বিভাগ থেকে প্রেসা দেখা সুরু করা গেল। প্রথম ঘরটির নাম হচ্ছে "দর্পণ-গৃহ"; 'খবরের কাগজ হচ্ছে কালের দর্পণ'—এই ঘরটির গোড়ায় লেখা, আর এই কথাই হচ্ছে ঐতিহাসিক বিভাগের মর্ম্মবাণী। গথিক্‌চার্চ্চের রঞ্জিত কাঁচের বৃহৎ জানালাগুলির মত রঙীন কাঁচের বৃহৎ ছবি দিয়ে ঘরখানি গড়া, চার্চ্চেতে যেমন সব সাধুদের মূর্ত্তি, এই ঘরখানিতে তেমি সংবাদপ্রচারসহায়কদের মূর্ত্তি,—জার্ম্মনীর প্রাচীন চারণ কবি (Minnesinger) ওয়াল্টার অফ্ ভোগেল ভাইডের ছবি প্রথমে, ইনি গান বেঁধে রাজনৈতিক মত প্রচার করতেন; তারপর গুটেনবেয়ার্গের ছবি, সংবাদপত্রের স্বাধীনতার মহাযোদ্ধা মিল্টনের ছবি ইত্যাদি নানা ছবি।

তারপরের ঘরটিতে দেওয়ালে বৃহৎ বৃহৎ অক্ষর জুড়ে ইয়োরোপীয় ভাষাগুলির বর্ণমালার উৎপত্তি, পরিণতি দেখান হয়েছে,—গথিক্ লাটিন, ইত্যাদি বর্ণমালা তলায় গ্লাসকেসে পুরাতন দিনের ছাপা কতকগুলি বই সাজান; কোন বই ১৫৭৩তে আন্টওয়ার্পে ছাপা, কোন বই ১৪৭১তে ভেনিসে ছাপা ইত্যাদি।

বৈদ্যুতিক আলোকমালা দীপ্ত কোলন

তারপর কয়েকটি বৃহৎ ঘর জুড়ে মডেল ক'রে দেখান হয়েছে, বর্ত্তমান খবরের কাগজ ছাপার আগে কি ক'রে সহরে গ্রামে সংবাদ ছড়াত। বস্তুত, খবর জানবার উৎসুকতা মানুষের একটি স্বাভাবিক আদিম প্রবৃত্তি। পাশের বাড়ীতে কি হয়েছে, পাশের গ্রামে সহরে কি ঘটছে, পাশের দেশে কোন যুদ্ধ বিপ্লব হচ্ছে কিনা এম্নি সব খবর

জানবার জন্যে সকল শতাব্দীর লোকই উদ্গ্রীব ছিল। গান ছিল খবর ছড়াবার এক উপায়, হাটে বাজারে চারণেরা গান গেয়ে খবর দিত, তার সঙ্গে রাজনৈতিক মতও প্রচার করত; ছবি ছিল আর এক বাহক, হাটেতে কোন জায়গায় ছবি এঁকে দেখান হত, কি ঘটেছে; তারপর চিঠি ছিল খবরের কাগজ। বস্তুত, ইংলণ্ড প্রভৃতি নানাদেশে বর্ত্তমান ছাপা খবরের কাগজের আগে হাতে-লেখা খবরের চিঠি সংবাদপত্রের কাজ করত। অতি প্রাচীন কাল থেকে "royal letters" বা রাজার চিঠি রাজ্যের প্রধান দরকারী ঘটনা জানবার জন্য লণ্ডন থেকে হাতে লেখা হ'য়ে চিঠির মত নানা সহরে গ্রামে পাঠান হ'ত; সেখানে হাটে বাজারে রাজার লোক সবাইকে সেই চিঠি শুনিয়ে খবর প্রচার করত। যখন মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হ'ল, তখন গভর্ণমেণ্টের এত কড়া নজর ও শাসন এই নবশক্তির উপর পড়ল যে, সংবাদপত্র ছাপান সহজ ও সুবিধার রইল না। তখন news-letter ও news-book বা সংবাদের চিঠির খুব প্রচলন হ'ল; এই হাতে লেখা চিঠিতে সব সংবাদ জড় ক'রে লিখে সপ্তাহে একবার বা দুবার গ্রাহকদের ডাকে পাঠান হ'ত। তখন সংবাদপত্র সত্যই সংবাদপত্র ছিল।
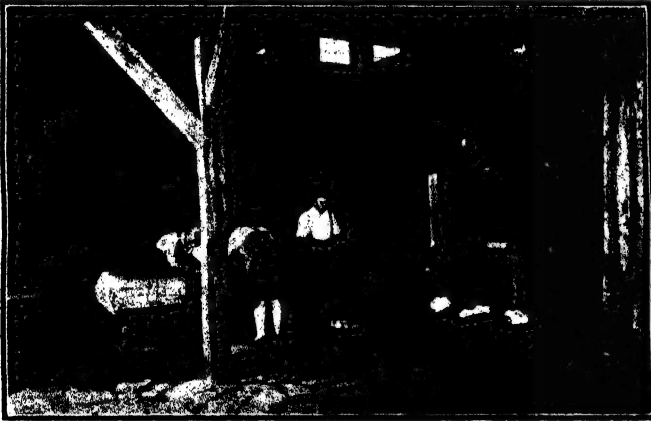
জল-প্রবাহ চালিত কাগজ তৈরির কল

হাতে লেখা সংবাদপত্রের ঘর দেখে পরের ঘরে দেখলুম গুটেনবের্গের সেই আদিম মুদ্রাযন্ত্রের একটি বৃহৎ মডেল রয়েছে; পনেরো শতাব্দীর সাধারণ লোকের সাজ প'রে কয়েকটি লোক গুটেনবেয়ার্গের সময়ের জার্ম্মান গথিক হরফে বইয়ের পাতা ছাপ্‌ছে প্রদর্শনীর পরিদর্শকদের দেখাবার জন্যে—আর ছাপা পাতা অভ্যাগতদের বিতরণ করছে। এ ঘরটি দেখে গুটন্‌বেয়ার্গের আদিম ছাপাখানার সুন্দর চিত্র পাওয়া গেল।

এ ঘরটির পাশে একটি অন্ধকার বৃহৎ ঘর, ঘরের মাঝখান জুড়ে আঠারো শতাব্দীতে কাগজ তৈরী করবার একটি বৃহৎ জলপ্রবাহচালিত যন্ত্র, দু'শত বছর আগে কি ক'রে কাগজ তৈরী হ'ত তা কয়েকজন লোক ছেঁড়া ন্যাকড়া থেকে কাগজ তৈরী ক'রে দেখাচ্ছে। অবশ্য বর্ত্তমান যুগের মুদ্রা যন্ত্রগুলির কাগজের ক্ষুধা এই ছোট জলযন্ত্রগুলি দ্বারা মেটান অসম্ভব। প্রদর্শনীর গাইড্‌বুকে লেখা আছে, ১৮০০ খৃঃ অব্দে জার্ম্মানীতে প্রায় ১৫,০০০ টন কাগজ তৈরী হ'ত। তখন একটা বৃহৎ কাগজ তৈরী করবার যন্ত্র খুব জোর ৩০,০০০ ত্রিশ হাজার কিলোগ্রাম কাগজ তৈরী করত; আর এখন ১৯২৭তে জার্ম্মানীতে ২০,০০০০০ কুড়ি লাখ টন কাগজ তৈরী হয়েছে। বর্ত্তমান বৈদ্যুতিক শক্তিচালিত কাগজ তৈরীকরবার যন্ত্র বছরে তিন শ' লক্ষ কিলোগ্রাম কাগজ তৈরী করেছে, অর্থাৎ পুরাতন আঠারো শতাব্দীর কাগজ তৈরী করবার যন্ত্রের একশত গুণ বেশী! অবশ্য জার্ম্মানীতে যত বই, খবরের কাগজ, পত্রিকা ছাপা হয় ইয়োরোপের কোন দেশে তত হয় না। এক খবরের কাগজই জার্ম্মানীতে তিন হাজারের ওপর আছে, সাপ্তাহিক মাসিক ইত্যাদি পত্রিকা প্রায় ছয় হাজার হবে। ১৯২১তে জার্ম্মানীতে ৩৩ হাজারের ওপর বই ছাপা হয়েছিল, এখন আরও বেশী, কারণ ১৯২১ জার্ম্মানীর দুঃসময় গেছে।

কাগজ তৈরী করবার যন্ত্রের ঘর পার হ'য়ে পুরাতন সংবাদপত্রগুলির ঘরে আসা গেল; ঘরের পর ঘরে কি ভাবে খবরের কাগজের পরিণতি উন্নতি হয়েছে তাই দেখান হয়েছে।

কোলনের প্রেসা

শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু

একটি ঘরে ষোল শতাব্দীর ছাপা বই, তার পরের ঘরে সতেরো শতাব্দীর জার্ম্মান সংবাদপত্র, তার পরের ঘরে আঠারো শতাব্দীর ও ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের সময়ের—এম্নি সব পুরাতন দিনের খবরের কাগজ, ছবি, ব্যঙ্গচিত্র, প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ঘটনার সংবাদপত্রে বিবরণ, বই ইত্যাদি গ্লাস-কেসে সাজান—লুথারের বাইবেল, ফ্রেড্রিক দি গ্রেটের যুদ্ধজয়ের বিবরণ, নেপোলিয়নের যুদ্ধের কথা ইত্যাদি।

বর্ত্তমান কালের সংবাদপত্রের মত জার্ম্মানীর প্রথম সংবাদপত্র বাহির হয় ১৬০৯তে 'মুানসেন-আউসবুরগার সান্ধ্য-সংবাদ পত্র' (Munchen-Ausburger Abendzeitung), মুানসেন থেকে বাহির হয়। সতেরো শতাব্দীর মধ্যে জার্ম্মানীর সব প্রধান সহরে অন্তত একখানা ক'রে সংবাদ পত্র বাহির হয়।

বর্ত্তমান কালের সংবাদপত্রের মত ইংলণ্ডের প্রথম ছাপা সংবাদ পত্র হচ্ছে "অক্সফোর্ড গেজেট" (১৬৬৫ খৃঃ অব্দে); তার আগে হাতে লেখা সংবাদপত্রের খুব চলন ছিল, যেমন Paston Lettres, Sidney Papers। এই হাতে লেখা সংবাদপত্রের চলন পরেও বহুদিন টিঁকে ছিল, তার কারণ মুদ্রাযন্ত্রের ওপর রাজশক্তির কঠিন নিয়মাবলী।

প্রেসার ঐতিহাসিক বিভাগের মধ্যে Press and Censor ঘরটি বিশেষভাবে দেখবার। রাজশক্তি ও চার্চ্চের সহিত লেখকগণ কি ভাবে শতাব্দীর পর শতাব্দী যুদ্ধ ক'রে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা লাভ করেছিলেন, এ ইতিহাস মানবাত্মার এক মহা সংগ্রামজয়ের ইতিহাস। মধ্য যুগের ইয়োরোপে চার্চ্চই সব বই লেখার বই কপি করার কেন্দ্র ছিল; চার্চ্চের বিরুদ্ধে কিছু লিখলে কেবল সে বই নয়, বইএর লেখককেও পুড়িয়ে মারা হ'ত। মুদ্রাযন্ত্রের সৃষ্টিতে এক নব শক্তির জন্ম হ'ল। এই শক্তিকে আপনার কাজে লাগাবার জন্যে, বিরুদ্ধমত প্রচারের সব পথ বন্ধ করবার জন্যে রাজশক্তি ও চার্চ্চ উঠে প'ড়ে লাগল। মুদ্রাযন্ত্র শৃঙ্খলিত হ'ল। আইনের পর আইন ক'রে মুদ্রাযন্ত্রের ওপর নজর রাখা হ'ল। Censorship, অর্থাৎ কোন সংবাদপত্র বা পুস্তক বা পুস্তিকা ছাপবার আগে রাজার বা চার্চ্চের নিযুক্ত কর্ম্মচারীকে তা দেখাতে হবে, তিনি সেই জিনিষ ছাপতে অনুমতি দিলে বা আপত্তি না করলে পরে ছাপা হবে, এই আইন দিয়ে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা কয়েক শতাব্দী লুপ্ত হয়। জার্ম্মানীতে প্রথম সংবাদপত্র বাহির হবার কিছু পরেই ১৫২৯তে সেন্সার আইন পাশ হ'ল; তারপরেও নানাপ্রকার আইন দিয়ে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বন্ধ করা হয়, কিন্তু স্বাধীন-মতাবলম্বী লেখকগণ ওই সব আইনের বিরুদ্ধে কিরূপ যুদ্ধ ক'রে এসেছেন প্রেসায় তাই দেখান হয়েছে। ১৮৪৮এর

কোলনের গির্জ্জা

বিপ্লবের পর কেবলমাত্র জার্ম্মানীতে নয়, অষ্ট্রিয়াতেও সেন্সরসিপ আইন রদ হয়। এর পর হ'তে মুদ্রাযন্ত্র নবজন্ম লাভ করে, খবরের কাগজ ও পত্রিকার সংখ্যা অগণিত ভাবে বৃদ্ধি পায়। সেন্সারসিপ গেল বটে, কিন্তু অন্য নানা আইন দ্বারা মুদ্রাযন্ত্রকে নিয়ন্ত্রিত করবার চেষ্টা চলল। গত বিপ্লবের পর হ'তে জার্ম্মান মুদ্রাযন্ত্র সম্পূর্ণ স্বাধীন

হয়েছে বলা যেতে পারে ; এখন সবাই আপনার রাজনৈতিক স্বাধীনমত ব্যক্ত করতে পারে।

মুদ্রাযন্ত্র ইংলণ্ড এলে তার শক্তি নিয়ন্ত্রিত করবার চেষ্টা হ'ল ; রাজশক্তি যাকে অনুমতি বা অধিকার দেবেন কেবল সেই বই ছাপতে পারবে। অবশ্য আবেদন করলেই এ অনুমতি পাওয়া যেত না ; রাজা তাঁর বিশ্বস্ত ব্যক্তি বা কোম্পানীকেই এই অনুমতি দিতেন। ইলিজাবেথের সময় ষ্টার চেম্বার কেবলমাত্র লণ্ডন, অক্সফোর্ড ও কেমব্রিজে কয়েকটি ছাপাখানাকে ছাপার অধিকার দিয়ে মুদ্রাযন্ত্রকে সীমাবদ্ধ ক'রে রাখে। মিল্টন এই বদ্ধ মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার জন্যে Areopagiticaতে লিখেছিলেন, "Give me the liberty to know, to utter, and to argue freely

প্রেসার জার্ম্মান বিভাগ

according to conscience above all liberties." ১৬৯৫তে হাউস অফ্ কমনস্ প্রেসের বিরুদ্ধে লাইসেন্সিং আইন (Licensing Act) পাশ করতে রাজী হলেন না ; সেই সময় থেকে ইংলণ্ডের মুদ্রাযন্ত্র স্বাধীনতা লাভ করল বলা যেতে পারে ; আর সেই সময় থেকে সত্যিকার খবরের কাগজের পরিণতি ও উন্নতি আরম্ভ হ'ল। খবরের কাগজ যদি গভর্ণমেণ্টকে সমালোচনা করতে না পারে, স্বাধীন মত ব্যক্ত না করতে পারে, যা সত্য তা প্রচার করতে না পারে, তবে তার মূল্য কি ? আমাদের দেশে মুদ্রাযন্ত্র আইনের পর আইনের নিগড়ে বাঁধা। প্রেসার এই ঘরটি দেখ্‌তে দেখ্‌তে মনে হল, মুদ্রাযন্ত্রের অধীনতার জন্য ভারতে যে সব স্বাধীনচেতাদের কারাগার হয়েছে, যে সব সত্যভাষী সংবাদপত্র বাজেয়াপ্ত হয়েছে, স্বাধীনতার সংগ্রামের সেই জয়চিহ্নগুলি জড় ক'রে মানবাত্মার বীরত্বের পরিচায়ক প্রদর্শনী আমাদের দেশেও একদিন হবে।

রুসো লিখিত "সোসিয়াল কনট্রাক্টের" (Social Contract) প্রথম সংস্করণের বই, এডিসনের স্পেক্‌টেটার, কোনিগের (Konig) তৈরী দ্রুত মুদ্রাযন্ত্রের মডেল ইত্যাদি নানা জিনিস দেখে প্রেসার ঐতিহাসিক বিভাগ থেকে বর্ত্তমান জার্ম্মান প্রেসের বিভাগে আসা গেল। প্রকাণ্ড বৃহৎ বাড়ী,—ঘরের পর ঘরে সংবাদপত্রের পর সংবাদপত্র পত্রিকার পর পত্রিকা। জার্ম্মানীতে কত বিষয়ের কত যে কাগজ বাহির হয়, তা দেখে সত্যই অবাক হ'তে হ'ল। পৃথিবীতে এমন কোন বিষয় নেই যার সম্বন্ধে জার্ম্মান ভাষায় কোন না কোন পত্রিকা নেই। তলায় বৃহৎ হলে মাঝখানে একটি বৃহৎ রোটারি মুদ্রাযন্ত্র, তার পাশে লিনোটাইপ যন্ত্র ইত্যাদি নানা মুদ্রাযন্ত্র। যন্ত্রগুলি মাঝে মাঝে চালিয়ে প্রদর্শকদের দেখান হচ্ছে কি ভাবে এক রাতে হাজার হাজার খবরের কাগজ ছাপান হয়। তলায় ঘর জুড়ে কেবলমাত্র নানা সংবাদপত্র-কোম্পানীর প্রদর্শনীই নয়, সংবাদপত্রের বাহক রেল ও পোষ্ট অফিসের প্রদর্শনীও আছে। জার্ম্মানীর প্রতি প্রদেশে কত সংবাদপত্র আছে, সংবাদপত্রের অফিস কিরূপভাবে চালিত হয়, টেলিগ্রাম টেলিফোন চিঠি বেতার ইত্যাদির দ্বারা কিরূপে সংবাদ সংগ্রহ ক'রে প্রতি প্রাতে সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় ইত্যাদি সংবাদপত্রসম্বন্ধীয় নানা কৌতূহলপূর্ণ তথ্য, ছবি এঁকে বা মডেল ক'রে বা রঙীন নক্সা দিয়ে নানারূপে জনসাধারণকে বোঝান হয়েছে। একটি সুন্দর মডেলে দেখলুম—জার্ম্মানীর একটি প্রদেশের বৃহৎ মানচিত্র অগণিত বৈদ্যুতিক আলোকখচিত। সে প্রদেশের যে যে সহর

শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু

বা গ্রাম হ'তে খবরের কাগজ বাহির হয় সেই জায়গায় একটি ক'রে আলো লাগান। আলোগুলি একবার জ্বলছে, একবার নিভছে, তাই দেখে বেশ আইডিয়া হয় এই প্রদেশের কতকগুলি স্থানে প্রতিদিন সংবাদপত্রের দীপ্ত অগ্নি প্রজ্বলিত হয়।

জার্ম্মানীতে ৩৩৫৬ খানি সংবাদপত্র আছে, তার মধ্যে ২৩৪ খানি সপ্তাহে একবার বাহির হয়, ২০৪ খানি সপ্তাহে দু'বার, ৫২৯ খানি সপ্তাহে তিনবার, ৬৯ খানি সপ্তাহে চারবার বা পাঁচবার, ২১৩৯ খানি সপ্তাহে ছ'বার, ১৮১ সপ্তাহে ছ'বারের অধিক বাহির হয়। শুধু বার্লিন ও ব্রান্‌ডেনবুর্গে ২৭৯ খানি সংবাদপত্র বাহির হয়।

জার্ম্মানীতে নানা রাজনৈতিক দলের কতগুলি সংবাদ-পত্র আছে তারও একটি তালিকা দিচ্ছি। সোসিয়াল ডেমোক্রাট দলের ১৭২ খানি সংবাদপত্র আছে; লিবারেল দলের ৫৯ খানা; জার্ম্মান জনগণের দলের (Dentsche Volkspartei) ৫৭ খানি; গভর্ণমেণ্টের ১৪৩ খানি; জার্ম্মান ন্যাশানল দলের ৩৭৪ খানি, এ দল ধনী অভিজাতের দল, এদের অর্থ সুপ্রচুর তাই কাগজের সংখ্যাও বেশী; সেণ্টার বা ক্যাথলিক দলের ২৭৭ খানি; ডেমোক্রাট দলের ৮৮ খানি; কমিউনিষ্ট দলের ৩৫ খানি; বাভেরিয়া রজনগণের দলের ১০৬ খানি; ১৮০৪ খানি কাগজ কোন দলের নয়। তা ছাড়া আর কয়েকটি ছোট রাজনৈতিক দলের কয়েকখানি ক'রে কাগজ আছে।

এই সংবাদপত্রগুলির অফিসে ও মুদ্রাযন্ত্র বিভাগে প্রায় ৮৭ হাজার লোক কাজ করে; এদের মধ্যে ৬৫ হাজারের ওপর পুরুষ ও ২১ হাজারের ওপর স্ত্রীলোক। তারপর সংবাদপত্রপ্রকাশকের আফিসে ও বিতরণ-বিভাগে প্রায় ১১ হাজার লোক কাজ করে; তার মধ্যে পাঁচ হাজার পুরুষ ও প্রায় ছ' হাজার স্ত্রীলোক। সুতরাং সংবাদপত্র থেকে প্রায় ৯৮ হাজার স্ত্রীপুরুষের অন্ন হয়; তা ছাড়া কত সংবাদদাতা, লেখক, ইত্যাদি আছে।

সংবাদপত্রের সংখ্যা এত অধিক হ'লেও প্রধান প্রধান খবরের কাগজগুলির বিক্রি বড় কম নয়। বার্লিনের প্রধান প্রধান খবরের কাগজের বিক্রি ২৫০ হাজারের ওপর। বার্লিনের বাহিরের কাগজের বিক্রিও বেশ, যেমন Leipziger Neuste Nachrichtenর বিক্রি ১৭৫ হাজার; Munchner Neuste Nachrichtenর বিক্রি ১৪৫ হাজার। জার্ম্মান শ্রমজীবী সঙ্ঘের ৪২টি সংবাদপত্র ১৯২৭ খৃঃ অব্দে যত সংখ্যা ছাপা হয়েছিল তা যোগ করলে ২২১ মিলিয়ান হয়। কমিউনিষ্টদের মুখপত্র খবরের কাগজ "রক্ত-পতাকা"র (Dee Rote Fahne) বিক্রি ৬৫ হাজারের ওপর। যে দেশে প্রতি নরনারী লেখাপড়া জানে এবং পৃথিবীর খবর জানতে চায়, নিজদেশের শাসন সম্বন্ধে প্রত্যেকেই চিন্তা করে, সে দেশে যে এত খবরের কাগজ বিক্রি হবে তা আশ্চর্য্য কি! তবে জার্ম্মানীতে এত খবরের কাগজ বিক্রি দেখে কিছু অবাক হ'তে হয়, কারণ জার্ম্মানীর খবরের কাগজগুলি বড় গম্ভীর রকমের, কিছু শিক্ষাপ্রদ; তাতে কোন বিবাহবিচ্ছেদ মোকদ্দমার রির্পোট, পুলিসকোর্টের কোন মোকদ্দমায় প্রকাশিত কৌতুকপ্রদ বা লোমহর্ষণ ঘটনার বিবরণ, ইত্যাদি sensational news থাকে না; তাতে বর্ত্তমান রাজনৈতিক বা সামাজিক সমস্যা সকল আলোচনা করা হয়, লোকশিক্ষা দেবার জন্য চিন্তাপ্রদ প্রবন্ধ থাকে। এ বিষয়ে জার্ম্মান খবরের কাগজগুলি পৃথিবীর অপর সব দেশের খবরের কাগজের আদর্শ হ'তে পারে।

জার্ম্মানীতে সাপ্তাহিক পাক্ষিক মাসিকপত্র ও নানা সাময়িক পত্রিকাও অগণিত ভাবে প্রকাশিত হয়। ১৯২৬তে জার্ম্মানীতে ১৬,২৮৮ খানি সাময়িক পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। অবশ্য এতগুলি পত্রিকা বরাবর বাহির হয়নি, অনেকগুলি হয়ত দু'সংখ্যা বা তিন সংখ্যা বাহির হবার পরই বন্ধ হ'য়ে গেছল। তবে নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত সাময়িক পত্রিকার সংখ্যা প্রায় সাত হাজার, তার মধ্যে আড়াই হাজার মাসিক, ষোল শ' সাপ্তাহিক। গত অর্দ্ধ শতাব্দীতে জার্ম্মানজাতির কত শিক্ষা ও জ্ঞানের উন্নতি হয়েছে তা পত্রিকাসংখ্যার বৃদ্ধি দেখে বোঝা যায়। ১৮৭৪তে প্রাসিয়ার নৃপতি দ্বারা জার্ম্মান সাম্রাজ্য স্থাপনের সময় সমস্ত জার্ম্মানীতে ১৭৫০ খানি সাময়িক পত্রিকা ছিল, আর এখন একমাত্র বার্লিন হ'তেই তার চেয়ে বেশী সাময়িক পত্রিকা বাহির হয়।

জার্ম্মান প্রেসের প্রদর্শনীর বাড়ীতে সংবাদপত্র ও পত্রিকার বিভাগ ছাড়া আরও অনেক বিভাগ ছিল। প্রেসের কাজ, ছবি ছাপা, ব্লক করা ইত্যাদি বিষয় শিখবার জন্য জার্ম্মানীতে অনেক স্কুল আছে; সেই স্কুলগুলির ছাত্রদের কাজের প্রদর্শনী-বিভাগ খুব ভাল লাগল। রঙীন সব ছবি কি সুন্দর ছাপা! বইছাপা দেখে চোখ জুড়োয়, যেন এক আর্টিষ্টের সুন্দর সৃষ্টি। এই সব স্কুলগুলির মধ্যে Leipzigএর
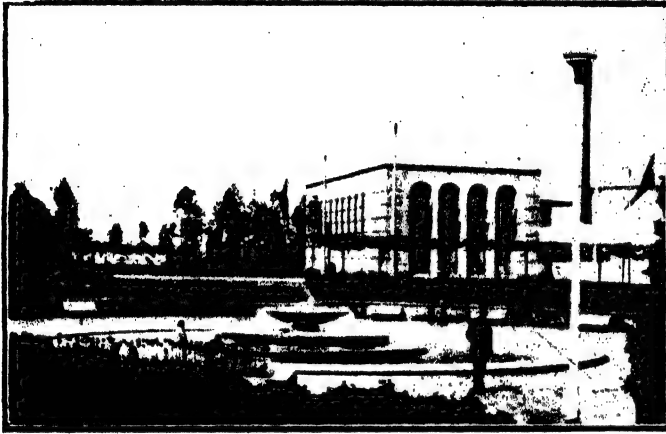
নব রুসিয়ার প্রদর্শনী গৃহ

Technikumfur Buchdruker, Munchenএর Graphische Berufsschule, Stuttgartএর Wurttembergische Staatliche Kunstgewerbeschule নাম দিলুম। আমাদের দেশের অনেক যুবক এখন প্রেসের কাজ ব্লক তৈরী ইত্যাদি শিখতে চান, জার্ম্মানীতে এ সব স্কুলে এসে তাঁরা অধুনাতন জ্ঞান লাভ করতে পারেন।

জার্ম্মান প্রেস-প্রদর্শনীর বৃহৎ বাড়ী থেকে বাহির হ'য়ে একটি সুন্দর বাগান ও ফোয়ারা পার হ'য়ে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি সুন্দর বাড়ীর সারির সামনে আসা গেল। এ হচ্ছে সর্ব্বজাতীয় সংবাদপত্রের প্রদর্শনী-বিভাগ (Internationales Staatenhaus)। পৃথিবীর প্রধান প্রধান প্রায় সর্ব্বদেশের সব জাতির খবরের কাগজের প্রদর্শনী ঘরের পর ঘর জুড়ে; অবশ্য ভারতবর্ষের কোন ঘর নেই। ইংলণ্ডের একটি ঘর আছে বটে, তবে তার উপনিবেশগুলির, যেমন অষ্ট্রেলিয়া বা সাউথ আফ্রিকার, কোন ঘর দেখলুম না। তবে প্রেসাতে "প্রেসা ও বিশ্ববিদ্যালয়" বিভাগে ভারতীয় কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে প্রকাশিত পুরাতন সংখ্যা দেখেছিলুম, যথা-Dacca University Journal, Patna College, শতদল, বাসন্তিকা ইত্যাদি।

প্রথম ঘরটি হচ্ছে সোসিয়লিষ্ট-সোভিয়েট-রিপাবলিক-সম্মিলনী বা নব রুসিয়ার ঘর। বিপ্লবের পর সোভিয়েট গভর্ণমেন্টের অধীনে শিক্ষাতে জ্ঞান-বিতরণে রুসিয়ার কত উন্নতি হয়েছে তাই নানা বিচিত্র মডেলে নক্সায় ছবিতে লেখায় দেখান হয়েছে। প্রেসার "প্রেসা ও নারী" বিভাগে রুসিয়ার শাখায় কাঠের বৃহৎ এক নারীমূর্ত্তি দেখেছিলুম; তার এক হাতে কাস্তে আর এক হাতে হাতুড়ি, তার মুখে ও বুকে রুস-নারীর প্রতি লেনিনের নানা বচন, ও তলাতে নারীদের কাজ সম্বন্ধে নানা তথ্য লেখা। মুখেতে লেখা। "প্রত্যেক রাঁধুনীকে জানতে হবে শিখতে হবে রাজ্য কি ক'রে চালাতে হয়, শাসন করতে হয়। লেনিন।" তলায় লেখা, "সোভিয়েট-রাসিয়াতে পুরুষ ও নারীর সমান অধিকার ও সমান কর্ত্তব্য, সোসিয়ালিষ্ট সোভিয়েট রাসিয়াতে ৩৫ মিলিয়ন নারীর ভোট দেবার অধিকার আছে"; "সোসিয়ালিষ্ট-সোভিয়েট-রিপাবলিক-ইউনিয়নের শাসন-কমিটিতে ৬৮ জন নারী আছেন, রুস-সোসিয়লিষ্ট ফেডারল-সোসিয়লিষ্ট-রিপাবলিকের শাসন-কমিটিতে ৫৯ জন নারী আছেন।" (বর্ত্তমান রাসিয়া হচ্ছে Union of Socialist Soviet Republic; এই Unionতে ছ'টি স্বাধীন রিপাবলিক আছে; Russian Socialist Federal Soviet Republic, The White Russian S. S. Republic, The Transcaucasian Soviet Federal Socialist Republic, The Turkoman Soviet Socialist Republic, The Uzek Soviet Socialist Republic.)

বসু

১৯১৩তে রুসিয়াতে (বর্ত্তমান সোভিয়েট রুসিয়ার আয়তনে) ৫৩২ খানি খবরের কাগজ ছিল, সব খবরের কাগজের সর্ব্বশুদ্ধ ২৫ লাখ কপি ছাপা হ'ত; আর ১৯২৮তে সোভিয়েট রাসিয়াতে ৫৫৯ খানি খবরের কাগজ ছিল, এক সংস্করণে সব কাগজগুলির ৮২,৫০,০০০ কপি ছাপা হ'ত। রুসিয়াতে রুস-ভাষী ছাড়া অন্যান্য ভাষার লোক অনেক আছে; ১৯১৩তে রুস-ভাষা ছাড়া ১৭টি বিভিন্ন ভাষার ৬৩টি খবরের কাগজ বাহির হ'ত, আর এখন ৪৮টি বিভিন্ন ভাষায় ২১২ খানি খবরের কাগজ বাহির হয়।

১৯১৩তে রুসিয়ায় ১০৮২ খানি পত্রিকা ছিল, ১৯২৭তে ১২৯১ খানি পত্রিকা বাহির হয়, তাদের প্রতি সংস্করণের সবশুদ্ধ ছাপার সংখ্যা হচ্ছে ৮৪ লক্ষ। বস্তুত, লোক-শিক্ষার জন্যে খবরের কাগজ ও পত্রিকার বিশেষ প্রয়োজন; এ বিষয়ে সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট প্রাণপণ চেষ্টা করছেন। লোক-শিক্ষার জন্যে স্কুলের খরচের হিসাবে ১৯২৭।২৮র বাজেটে ৮৫৭ মিলিয়ন রুবল খরচ ধরা হয়েছিল। ১৯১৩তে রাসিয়াতে ৩৪ হাজার বই ১১৮ মিলিয়ন কপি ছাপা হয়েছিল, আর ১৯২৭তে ২৯ হাজারের ওপর বই সর্ব্বশুদ্ধ ২১২ মিলিয়ন কপি ছাপা হয়েছিল। একটি পোষ্টার (Poster) দেখলুম, তাতে দেখান হয়েছে ১৯২৩ থেকে ১৯২৭ পর্য্যন্ত রুসিয়াতে যত বই ছাপা হয়েছে, সে সব পরের পর পাশাপাশি সাজালে ৩৬০ হাজার কিলোমিটার হয়, অর্থাৎ শূন্যেতে এই-বই-এর পাতায় পথ তৈরী করতে পারলে পৃথিবী থেকে চাঁদে প্রদক্ষিণ ক'রে আসা যায়।

রুস খবরের কাগজগুলির অনেক বিশেষত্ব আছে। একটি বিশেষত্ব হচ্ছে, সংবাদপত্রের

রুস্ প্রদর্শনীতে কাঠের নারী-মূর্ত্তি

সংবাদদাতা পত্রলেখকরা অধিকাংশ মজুর বা চাষা। এই মজুর ও চাষা সংবাদদাতারা তাদের ফ্যাক্টরীর সহরের গ্রামের বিশেষ সংবাদ দিতে পারে, বিশেষ সমস্যা আলোচনা করতে পারে। রুসিয়ার সব খবরের কাগজে তিনলক্ষের ওপর নিযুক্ত মজুর-চাষা-সংবাদদাতা আছে। রুস কাগজগুলির আর একটি বিশেষত্ব হচ্ছে, সংবাদপত্রের পাঠক পাঠিকাদের জন্য মাঝে মাঝে সভাসমিতির উদ্যোগ করা, সেখানে লোকশিক্ষার বিষয়ের আলোচনা করা। রুসিয়ার একটি প্রধান সংবাদপত্র এক বৎসরে পাঠক পাঠিকাদের জন্য তিন শ' কনফারেন্সের অধিবেশন করিয়েছিলেন।

রুস প্রদর্শনীতে কাঠের নারী-মূর্ত্তি

রুস-প্রদর্শনীঘরের এক কোণে লেনিনের মূর্ত্তি, তার সামনে গ্লাস-কেসে লেনিনের বই, পৃথিবীর পঞ্চাশটি বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত লেনিনের বই সাজান রয়েছে। ঘরের আর এক কোণে একটি ছোট ছাপাখানার মডেল রয়েছে, ১৯০৫তে মস্কোতে বলশেভিক সেন্ট্রাল কমিটির একটি গুপ্ত ছাপাখানা এক মাটির তলার ঘরে ছিল, সেই ছাপাখানার এই মডেলটি। এই গুপ্ত ছাপাখানা থেকে কত বিদ্রোহ-সূচক পুস্তক পুস্তিকা ছাপা হয়েছে।

রুস-প্রদর্শনী-ঘরটি দেখে বেশ বোঝা গেল বর্ত্তমান রাসিয়াতে সোভিয়েট তন্ত্রের অধীনে জনগণের মধ্যে শিক্ষার প্রসার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, জ্ঞানের উন্নতিই হচ্ছে।

নবরুসিয়ার প্রদর্শনী-গৃহের পাশে সুইডেনের প্রদর্শনী-গৃহ, তারপর ডেনমার্কের, তারপর নরওয়ের, তারপর অষ্ট্রিয়ার, এইরূপ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের খবরের কাগজের প্রদর্শনীর ঘরের সারি। প্রতি ঘরে, সেই দেশের অতি প্রাচীন হ'তে আধুনিক সব খবরের কাগজ সাজান, খবরের কাগজের আরম্ভ, বিবর্ত্তন, উন্নতির ইতিহাস দেখান হয়েছে, নানা ছবিতে নানা পোষ্টারে বা তালিকা দিয়ে সে দেশের খবরের কাগজের সংখ্যা, জনসংখ্যা ক্রমবৃদ্ধির ইতিহাস ইত্যাদি জানান হয়েছে।

ষ্ট্রিণ্ডবেয়ার্গমূর্ত্তিমণ্ডিত সুইডেনের ঘরে যা দেখলুম তা কেবল খবরের কাগজের প্রদর্শনী নয়; সুন্দর সুইডেনের প্রাকৃতিক শোভার বৃহৎ চিত্রসজ্জিত ঘরটিতে সর্ব্বদেশের ভ্রমণকারীদের লুব্ধ করবার বিশেষ প্রয়াস আছে। নরওয়ে ও সুইজারলণ্ডের ঘরেও সে সব দেশের এরূপ প্রাকৃতিক শোভার চিত্র দিয়ে পথিকজনের মন আকর্ষণের চেষ্টা দেখেছি। সুইডেনে প্রথম বই ছাপা হয় ১৪৮৩ খৃঃ অব্দে; খবরের কাগজের অগ্রদূত "ওড়াপাতা" (Flugblatt) ছাপা হয় ১৫৭৩তে; আর প্রথম সংবাদ-পত্র ছাপা হয় ১৬৪৫তে। বর্ত্তমান সময়ে সুইডেনে ১৩৭ বিভিন্ন সহর ও গ্রাম থেকে সংবাদপত্র ও পত্রিকা বাহির হয়। সংবাদপত্রের সংখ্যা ৩১৩, তার মধ্যে একশখানির উপর সংবাদপত্র সপ্তাহে ছ'বার বাহির হয়; সাপ্তাহিক পত্রিকা ও নানা বিষয়ে মাসিক ইত্যাদি পত্রিকার সংখ্যা ১২০০। একথা মনে রাখতে হবে যে সুইডেনের লোকসংখ্যা ৬০ লাখ।

নরওয়ের ঘরটি ইবসেন, নান্‌সেন, মুন্‌চ্‌ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ নরওয়ে-বাসীর মূর্ত্তি দ্বারা সজ্জিত, নরওয়ের তুষারমণ্ডিত পাহাড়, ঝর্ণাধারার চিত্রমালা-শোভিত। নরওয়ের প্রথম

কোলনের প্রেসা

শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু

সংবাদপত্র বাহির হয় ১৭৬৩তে। ১৮১৪তে নরওয়ে যখন নব শাসনতন্ত্রের মূল নীতি (constitution) অনুসারে মুদ্রাযন্ত্রের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করল, সংবাদপত্রের নব যুগ আরম্ভ হল। "রাজাসংক্রান্ত সকল ব্যাপার ও অন্যান্য সব বিষয় সম্বন্ধে প্রত্যেকে স্বাধীন ও মুক্তভাবে আপন মতামত ব্যক্ত করতে পারবে"—এই মহান অধিকার পাওয়াতে সংবাদপত্র-লেখকগণ খুব শক্তি লাভ করলেন। ভাববার ও লেখবার এরূপ স্বাধীনতা থাকার জন্যই নরওয়ের সাহিত্যের এরূপ উন্নতি শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে। বর্ত্তমান সময়ে নরওয়ের সংবাদপত্র ও পত্রিকার সংখ্যা প্রায় এক হাজার। ১৯২৭তে পোষ্ট আফিস জনসাধারণকে ১৬১ মিলিয়ন কপি সংবাদপত্র ও পত্রিকা সরবরাহ করেছে। নরওয়েতে কোন প্রেস আইন নেই সেজন্য এত ছোট দেশেও এত সংবাদপত্রপ্রচলন সম্ভব হয়েছে। ২৫০ খানি দৈনিক ও সাপ্তাহিক সংবাদপত্রের কাটতি ১ মিলিয়ন কপি, আর নরওয়ের জনসংখ্যা হচ্ছে পৌনে তিন মিলিয়ন। প্রতি সহরের প্রতি গ্রামের প্রত্যেক বাড়ীতে পুরুষ ও নারী খবরের কাগজ পড়ে। এক ওসলোতে (Oslo) ১৫ খানি দৈনিক সংবাদপত্র আছে।

ডেনমার্কের লোক সংখ্যা সাড়ে তিন মিলিয়নও নয়, কিন্তু সে দেশে যত সংবাদপত্র আছে তাদের দৈনিক প্রকাশিত সংখ্যার মোট হচ্ছে ১১,৫৪,০০০, অর্থাৎ প্রতি তিনজন মানুষের জন্য এক কপি খবরের কাগজ! অনেকে ডেনমার্ককে তাই খবরের কাগজের দেশ বলে।

কিন্তু জনসংখ্যার তুলনায় সুইজারলাণ্ডের মত এত বেশী খবরের কাগজ ও পত্রিকা কোন দেশেই নাই। সুইজারলাণ্ডের ঘরে ঢুকেই দেখলুম, সামনের দেওয়ালে সুইজারলাণ্ডের বৃহৎ ম্যাপ, যে যে সহর ও গ্রাম হ'তে সংবাদপত্র বাহির হয় সেগুলি নানারংএর চিত্র দিয়ে দেখান হয়েছে। ম্যাপের এক পাশে লেখা সুইজারলাণ্ড হচ্ছে সংবাদপত্রপ্রচুরতম দেশ; আর একদিকে লেখা সুইজারলাণ্ডের জনসংখ্যা হচ্ছে ৩৯,৫৯,০০০, আর তার সংবাদপত্র ও পত্রিকাসংখ্যা হচ্ছে ৩১৩৭। বস্তুত, সুইজারলাণ্ড ছোট হ'লেও, তার বাইশটি বিভিন্ন কান্তন, (canton) তার তিনটি বিভিন্ন ভাষা। প্রতি কান্তন্ আভ্যন্তরীণ শাসনে স্বাধীন, সাধারণতন্ত্রের আইডিয়া এখানে এত সজাগ ও তীব্র ব'লে খবরের কাগজের সংখ্যাও প্রচুর। সর্ব্বশুদ্ধ সংবাদপত্রের সংখ্যা হচ্ছে ৪০৬, তার মধ্যে ২৮২খানি জার্ম্মানভাষায় প্রকাশিত হয়, ১০৫খানি ফরাসীভাষায় আর ১৯খানি ইতালীয়ান ভাষায় প্রকাশিত। সংবাদপত্রসংখ্যা বেশী বটে কিন্তু সব সংবাদপত্র খুব বেশী কপি ছাপা হয় না। পঞ্চাশ হাজার কপির ওপর দৈনিক ছাপা হয় এরকম সংবাদপত্র তিনখানি আছে, বিশ হাজার থেকে পঞ্চাশ হাজার কপি

প্রেসার খবরের কাগজের রাস্তা

ছাপা হয় এমন কাগজ ন'খানি আছে, দশ হাজার থেকে বিশ হাজার কপি ছাপা হয় এ রকম খবরের কাগজ পনেরো খানি আছে।

সুইস্ কাগজগুলির একটি বিশেষত্ব এই যে, প্রতি কাগজের প্রায় আলাদা আলাদা মালিক। এ হচ্ছে decentralised press, এক বৃহৎ কোম্পানীর হাতে অনেকগুলি কাগজের স্বত্ব ও পরিচালনা কেন্দ্রীভূত হয়নি। তাতে প্রতি কাগজের যেমন মতের স্বাধীনতা আছে, তেমি প্রতি কাগজের স্বত্বাধিকারীকে কাগজ বাঁচিয়ে রাখতে কিছু সংগ্রামও করতে হয়।

একটি ঘর ভাগাভাগি ক'রে চীন ও জাপানের সংবাদপত্রের প্রদর্শনী। চীনের খবরের কাগজ বিশেষ কিছু নেই।

চীনেতেই পৃথিবীর প্রথম মুদ্রাযন্ত্রের উদ্ভাবনা হয়; পৃথিবীর সব চেয়ে পুরাতন ছাপা খবরের কাগজ চীনেতে বাহির হয়। খৃষ্ট জন্মাবার দু'শত বছর আগে ছাপা রাজা পাও, (King-Pao) সেই পৃথিবীর প্রাচীনতম খবরের কাগজের এক কপি সুন্দররূপে সাজান রয়েছে দেখলুম। জাপানের লোকেরা যে এই ইংরাজ বা জার্ম্মানের চেয়ে কিছু কম সংবাদপত্র পড়ে না তা জাপানী খবরের কাগজের দৈনিক প্রকাশ-সংখ্যা দেখে বেশ বোঝা গেল। জাপানের একটি প্রধান সংবাদপত্র Osaka-Mainichi প্রতিদিন ১৩৭০ হাজার কপি প্রকাশিত হয়; আর একটি কাগজ Takyo-Nichinichi প্রতিদিন সাড়ে আট লাখের বেশী ছাপা হয়।

মহাযুদ্ধের পরে খৃষ্ট ইয়োরোপের নূতন রাজ্যগুলির সংবাদপত্র সংখ্যা নবজাতীয়তার প্রেরণাতে খুব বেড়েই চলেছে। পোলাণ্ডে সংবাদপত্রের সংখ্যা ২৮৫। জেকোশ্লোভাকিয়ার সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রিকার সংখ্যা প্রায় চার হাজার। দৈনিক সংবাদপত্র সংখ্যা ১৩১ খানি, তাদের মধ্যে ৬৭ খানি জার্ম্মানভাষায় প্রকাশিত।

ফ্রান্সের সংবাদপত্রসংখ্যা জার্ম্মানীর মত অত বেশী নয়। ১৯২৬তে পারি হইতে প্রকাশিত রাজনৈতিক দৈনিক সংবাদপত্র সংখ্যা ছিল ৪৮খানি। পারির বাহিরে প্রকাশিত সকল প্রকার সংবাদপত্র সংখ্যা তিন হাজারের কিছু ওপর। তবে সংবাদপত্রের কাটতি খুব। Le Petit Parisienর কাটতি বারো লাখ, La Petit Jaurnalর কাটতি দশ লাখ; আট লাখ কপি ছাপা হয় এরূপ কাগজ অনেকগুলি আছে।

গ্রেট-ব্রিটেনের ছাপা প্রদর্শনী ঘরে, ১৪৭৬ খৃঃ অব্দে কাক্সটোন্নের ছাপা বই বিশেষ দেখবার জিনিষ ছিল; তা ছাড়া British Institute of Industrial Artএর ছবি ছাপা, বই বাঁধাই, ইত্যাদি প্রদর্শনী বেশ সুন্দর। গ্রেট ব্রিটেন ও আয়লণ্ডের সংবাদ পত্রের সংখ্যা দু' হাজারের কিছু অধিক; লণ্ডন সহরেই ৪০৬ খানি খবরের কাগজ আছে, তার মধ্যে ২৩খানি প্রতি সকালে বাহির হয়। আয়র্লণ্ডের সংবাদপত্র সংখ্যা ১৬৬ খানি, স্কটলণ্ডের ২৩৫খানি। ১৯১০ খৃঃ অব্দে গ্রেট ব্রিটেনে যত খবরের কাগজ ছিল, বর্ত্তমান সময়ে তত নেই, এখন সংখ্যা কিছু কমেছে, তার কারণ হচ্ছে গ্রেট-ব্রিটেনের অনেক সংবাদপত্রের স্বত্ব এক বড় কোম্পানী বা ট্রাষ্টের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়েছে; কয়েকটি বৃহৎ সংবাদপত্র-সঙ্ঘ ইংলণ্ডের প্রায় অধিকাংশ কাগজের মালিক, তারাই লোকমত গড়ছে, ভাঙছে। Rothermer Group হচ্ছে সব চেয়ে বড় সংবাদপত্র-সঙ্ঘ। ডেলি মেল, ডেলি মিরার, প্রভৃতি ৭।৮ খানি কাগজের মালিক এরা। ১৯২৫তে এই সঙ্ঘের সকল দৈনিক সংবাদপত্রের মোট বিক্রি হয়েছিল ৩৫ লক্ষ, আর সকল সাপ্তাহিকের মোট বিক্রি হয়েছিল
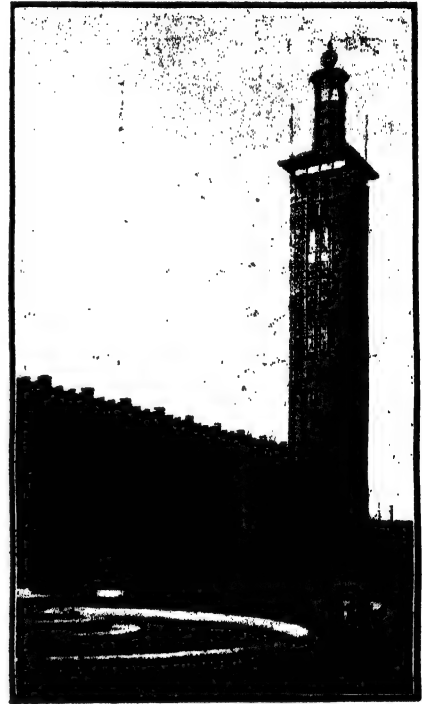
প্রেসার বুরুজ

ত্রিশ লক্ষ। বর্ত্তমান যুগের জনসাধারণের সংবাদপত্রের ক্ষুধা যে কি ভীষণ তা এসব সংখ্যা দেখেই বোঝা যায়; তবে নিছক রাজনৈতিক সংবাদপত্র নয়, চমকপ্রদ উত্তেজনাকর ঘটনাপূর্ণ sensational news ভরা সংবাদপত্রেরই সব চেয়ে বেশী বিক্রি। তার দৃষ্টান্ত স্বরূপ The News of the Worldর নাম করা যেতে পারে। এই সাপ্তাহিকের বিক্রি সমস্ত পৃথিবীতে প্রায় চল্লিশ লাখ। বর্ত্তমান "রোটারি মুদ্রাযন্ত্র" দ্বারাই ...ীর লোকেদের যত কেলেঙ্কারীর খবর রোমাঞ্চকর

শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু

ঘটনার বিবরণ জানবার ক্ষুধা মেটান সম্ভব হয়েছে। The News of the Worldর ছাপাখানায় তড়িৎ-চালিত মুদ্রাযন্ত্র-গুলি হ'তে মিনিটে সাত হাজার কপি কাগজ ছাপা হয়, এই একটি সাপ্তাহিকের কাগজের জন্য বছরে ৩৯০ হাজার গাছ কাটতে হয়।

৩ সর্ব্বজাতীয় প্রদর্শনী বিভাগের শেষ ঘরটি হচ্ছে আমেরিকার যুক্ত-রাজ্যের। যুক্ত-রাজ্যের প্রথম সংবাদপত্র বাহির হয় ১৭০৪তে, ইংলণ্ড থেকে প্রথম ঔপনিবেশিকগণের প্রায় একশত বৎসর পরে। যুক্ত-রাজ্যের দৈনিক সংবাদ-পত্রের সংখ্যা হচ্ছে ২৩৮৮, তাদের মধ্যে সকাল বেলায় প্রকাশিত ৪২৭ খানি সংবাদপত্রের দৈনিক কাটতি হচ্ছে ১২৪ লক্ষের ওপর, আর ১৫৮১খানি সান্ধ্য-পত্রের দৈনিক প্রচার হচ্ছে ২১২ লক্ষের ওপর। সাপ্তাহিক সংবাদপত্রের সংখ্যা ১২৫২৯, তার মধ্যে রবিবারে প্রকাশিত ৫৪৮খানি সংবাদপত্রের সাপ্তাহিক বিক্রি ২৩৩ লক্ষের ওপর। সকল প্রকার ম্যাগাজিনের সংখ্যা সাত হাজারের ওপর। The New York Times হচ্ছে যুক্ত-রাজ্যের একটি প্রধান সংবাদ পত্র, তার দৈনিক প্রচার (circulation) হচ্ছে চার লক্ষের ওপর, আর রবিবারে সাত লক্ষের ওপর। এই এক কাগজের আফিসে ছাপাখানায় তিন হাজারের ওপর লোক খাটে। আমেরিকায় ছাপাখানা ও প্রকাশকের ব্যবসা খুব বড় ব্যবসা, ও দেশের সকল ব্যবসার মধ্যে পঞ্চম স্থান অধিকার করে; প্রথম স্থান নিচ্ছে মোটরের ব্যবসা। বিভিন্ন বিষয়ের পাঁচ শত সাময়িক পত্রিকার নমুনা-সংখ্যাগুলি দ্বারা সাজান যুক্ত-রাজ্যের প্রদর্শনী ঘরটি থেকে বাহির হ'য়ে এক সুন্দর ফোয়ারার পাশে বেঞ্চে বসা গেল, সামনে বৃহৎ মঞ্চে কনসার্ট হচ্ছিল, চারিদিকে নানাদেশের পুরুষ ও নারীর ভিড়।

কোলনের প্রেসা দেখে মনে হ'ল মানব সভ্যতার কি মহান উন্নতির রূপ দেখলুম, বিরাট অগ্রসরের পরিচয় পেলুম। প্রতিদিন সকালে যখন খবরের কাগজ পাই, তা পেয়ে কি ভাবি কত শতাব্দীর কত বৈজ্ঞানিকের তপস্যার, কত যান্ত্রিকের সাধনার, কত মানবের প্রচেষ্টার ফল এই খবরের কাগজখানি। গুটেনবের্গের সেই আদিম মুদ্রা-যন্ত্র, তারপর কোনিগের মুদ্রাযন্ত্র, তারপর রোটরী-মুদ্রাযন্ত্র, এইরূপ শতাব্দীর পর শতাব্দীর মুদ্রাযন্ত্রের ক্রমোন্নতি হয়েছে,—তার সঙ্গে ষ্টিম-ইঞ্জিন, বৈদ্যুতিক মোটর, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, বেতার, তার সঙ্গে ষ্টিমার, রেলগাড়ী, বাইসিক্ল, আর কাঠ হ'তে কলে দ্রুতভাবে কাগজ তৈরী করবার উপায়—এম্নি কত বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনার পর বর্ত্তমান খবরের কাগজ সম্ভব হয়েছে। বস্তুত সকালে যে খবরের কাগজখানি পাই তাতে সমস্ত মানবসভ্যতার প্রগতির রূপ দেখতে পাই।

প্রেসা দেখে আর একটি কথা মনে হ'ল—বর্ত্তমান সময়ের সংবাদপত্রগুলির শক্তি ও দায়িত্ব। সংবাদপত্র কেবলমাত্র দৈনিক সংবাদ সরবরাহের জন্য নয়, তার প্রধান কাজ হচ্ছে লোকশিক্ষা দেওয়া। বস্তুত এই ডেমোক্রেসির যুগে সংবাদপত্রের দায়িত্ব গুরুতর। সত্য সংবাদ দেওয়া, জাতিকে গ'ড়ে তোলা, পৃথিবীর দেশের সহিত দেশের সখ্য বৃদ্ধি করা, শান্তি স্থাপন করা, অন্যায়ের সহিত যুদ্ধ করা, দাসত্ব শৃঙ্খল ছিন্ন করা—এম্নি কত কর্ত্তব্য সংবাদপত্রের। বর্ত্তমানকালের সংবাদপত্রগুলি বেশীর ভাগই রাজনৈতিক, কিন্তু রাজনীতি হচ্ছে জাতীয় জীবনের একটা অংশমাত্র, স্বাস্থ্যের উন্নতি, সামাজিক উন্নতির দিকেও দৈনিক সংবাদপত্রগুলির চেষ্টা করা দরকার; সংবাদপত্র ও পত্রিকা হচ্ছে জন-সাধারণের নিকট জ্ঞানের চিন্তার বাহক। যেদিন সংবাদ-পত্রগুলি সত্যিকার জ্ঞানের প্রদীপ হ'য়ে উঠবে, কেবল রেষারেষি, দলাদলি নয়, কেবল লোমহর্ষক কৌতুকপ্রদ ঘটনা বা সংবাদের বাহক নয়, যখন তারা জাতির সর্ব্ববিধ কল্যাণের সাধক হবে, জাতির সহিত জাতির ন্যায়, শান্তি স্থাপনের মন্ত্রপ্রচারক হবে, যখন পৃথিবীতে কোন দুর্ভাগা দেশ বা দুর্ব্বল জাতির উপর প্রবল শক্তিমত্ত কোন জাতির অত্যাচার-অধীনতাশৃঙ্খলবন্ধনের বিরুদ্ধে পৃথিবীর সকল দেশের সংবাদপত্রে প্রতিবাদ ও যুদ্ধঘোষণা হবে, তখনই সংবাদপত্রগুলি সর্ব্বমানবকল্যাণের কাজে লাগবে, শতাব্দীর পর শতাব্দীর এত বৈজ্ঞানিক যান্ত্রিকের সাধনার সার্থকতা হবে।

বনভোজন

শ্রীঅক্ষয়কুমার সরকার

১২

অগ্রহায়ণ মাসের প্রথমেই একটা বিবাহের লগ্ন ছিল। রামেশ্বর চক্রবর্ত্তী এবং সতীশ মুখুয্যে দিনটি ধার্য্য করিয়াছিলেন। কিন্তু বিবাহ সে দিন হইল না। বাহিরের লোক জানিল জ্বর গায়ে বিবাহ দিতে বামুন-মা কিছুতেই রাজী হইলেন না। কিন্তু ভিতরের কথা অতুলের মা'র অজ্ঞাত ছিল না। বামুন-মা তাহাকে বেশ ধীর ভাবেই বলিয়া দিলেন যে, বামুনের মেয়ের বিবাহ দুইবার হইতে পারে না।

সতীশ মুখুয্যের সাথে বাদ পড়িল। কিন্তু কথাটা ক্রমে কানাঘুষায় একটা বিশ্রী ভাব ধারণ করিয়া গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। হেমন্ত সেই দিন সন্ধ্যার পর হইতে নিরুদ্দেশ হইয়াছিল; এবং রামেশ্বর চক্রবর্ত্তীর নিঃস্বার্থ সমাজহিতৈষণায় তাহার নাম বিভার নামের সহিত জড়িত হইয়া, মেয়েকে বড় করিয়া রাখার পরিণাম সর্ব্বত্র ঘোষিত হইতে লাগিল। বামুন-মা ইঙ্গিতে আভাষে এবং সময়ে সময়ে স্পষ্ট বাক্যে বিভাকে এই কথাই বুঝাইতে চাহিলেন যে, মিথ্যা দুর্ণাম কাহাকেও কলঙ্কিত করিতে পারে না। অতুলের মা কিন্তু বামুন-মারচেষ্টার বিফলতা দেখিয়া ধারণা করিয়া লইল যে, দুর্ণামটা মিথ্যা নয় বলিয়াই বিভা তাহার ঝিমার কথায় সান্ত্বনা পাইতেছে না, এবং কলঙ্কের জন্য যত না হউক হেমন্তকুমারের আকস্মিক অন্তর্ধানেই মেয়েটা শুকাইয়া যাইতেছে। তাহার এই মনের কথাটা ইঙ্গিতে ইসারায় সে প্রায়ই বামুন-মা'র কাছে ব্যক্ত করিত; কিন্তু সে রাত্রির কথাটা গোপন রাখিয়াছি। হেমন্ত যে এই সরলা মেয়েটার সর্ব্বনাশ করিয়া কেন, কোথায়, পলাইল, তাহা অতুলের মা জানে না। কিন্তু সেই হতভাগার জন্যই যে তাহার সোনার বিভা কালী হইয়া যাইতেছে, এবং তাহাকে ফিরিয়া পাওয়া ব্যতীত যে বিভার আরোগ্যের উপায় নাই, তাহা স্থির বলিয়া মনে করিল। তাই সে নানা দেব দেবীর নিকট কেবলই মাথা কুটিতেছিল যেন তাঁহারা দয়া করিয়া তাহাকে ফিরাইয়া আনিয়া দেন। যথাসাধ্য তাহার অনুসন্ধানও চলিতেছিল, কিন্তু তাহা একেবারেই বিফল হইয়াছিল।

মাস তিনেক পূর্ব্বে একদিন সন্ধ্যার পর লক্ষ্যহীন ভ্রাম্যমাণ গ্রহের মত যে এই গ্রামে উপস্থিত হইয়াছিল, এই ব্রাহ্মণ কন্যার ভাগ্যগগনের গ্রহরূপী তাহার অন্তর্ধানও সেইরূপ আকস্মিক এবং অবোধ্য ইহা ব্যতীত আর কিছুই নির্দ্ধারণের সম্ভাবনা ছিল না। কেবল একমাত্রই বিভাই ইহার কারণ ঠিক বুঝিয়াছিল। তাহারই ব্যবহারে, তাহারই কথায় যে সে চিরকালের জন্য সে স্থান ত্যাগ করিয়াছে, এই কথা আত্মীয় দরদীদের নিকট বলিবার জন্য ব্যস্ত হইলেও সে বলিতে পারে নাই। এই যে মাসাধিক কাল সে বিনিদ্র রাত্রি যাপন করিতেছে, এই যে শত চেষ্টা সত্ত্বেও তাহার কথা, তাহার মূর্ত্তি, তাহার সংশ্লিষ্ট যা কিছু সমস্ত মনের উপর অনুক্ষণ আনাগোনা করিয়া তাহার শ্রান্ত চিত্তকে মুহূর্ত্তমাত্রের বিশ্রাম না দিয়া অতিষ্ঠ পীড়িত করিয়া তুলিতেছে, ইহার ত কোনও উপায়ই নাই। বিধাতা তাহাকে সুখী করিবার জন্য জগতে পাঠান নাই বলিয়াই বোধ হয় শিশুকাল হইতে জগতে যত রকম দুঃখের বোঝা থাকিতে পারে, তাহার মাথায় চাপাইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। মাতা তাহার জন্মের পরেই সূতিকা-গৃহে মরিয়াছিলেন, পিতার আদর সে স্মরণ মাত্র করিতে পারে, তাহার দিদিমাকেও তাহার সামান্য মাত্রই মনে পড়ে; তার পরেই মনে পড়ে তাহার অনাথার অবস্থা, এবং সেই অবস্থায় স্নেহময়ী বৃদ্ধার সমুদ্র জলের মত অগাধ স্নেহের মধ্যে তাহার আসিয়া পড়া। সেখানে

শ্রীঅক্ষয়কুমার সরকার

কি শান্তি, কি আদর, কি শিক্ষা! কিন্তু এই শান্তি, এই সুখ কয়দিনের জন্যই বা। বয়স তাহার যেমন বাড়িতে লাগিল তেমনি তাহার কানে অযাচিত তাহার বয়সের এবং বিবাহের প্রয়োজনীয়তার ও দরিদ্র কন্যার বিবাহের অন্তরায়ের কথা সময়ে অসময়ে আসিয়া পড়িয়া তাহার প্রাণটাকে তিক্ত বিষাক্ত করিয়া দিতে লাগিল। তাহার এই অশান্তি বাড়িতে বাড়িতে, শত অগ্নি-পরীক্ষার উত্তাপের ভিতর দিয়া, তাহার সোনার মত নির্ম্মল এবং সমুজ্জ্বল মনকে গলাইয়া অগ্নিময় করিয়া তুলিল। মনের সেই তপ্ত অবস্থায় অনেকবার সে ভাবিয়াছে, "আর পারি না! হে দেবতা, যেরূপে হউক এই অবস্থা হইতে আমাকে পরিত্রাণ কর। সুখ আমি চাহি না; ভবিষ্যতের ভাবনাও করি না। কেবল বর্ত্তমানের এই যে অসহনীয় বাসনা ইহা হইতে নিষ্কৃতি চাই!" এই সময়ে এক সন্ধ্যার সময় অপরিচিত হেমন্ত তাহার ভাগ্য-গগনে দেখা দিল; তারপর কি আনন্দ, কি শান্তি, কিন্তু সে কয়দিনের জন্যই বা। ক্রমশ তাহার অদৃষ্টলিপির ফলে তার জীবনের আকাশে ধ্রুবতারাটির উদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার এক কোণে একটি ধূমকেতুর ছায়া-মূর্ত্তি দেখা দিল। এখন কোথায় সে ধ্রুবতারা! ধূমকেতু সমস্ত আচ্ছন্ন করিয়া বসিয়াছে। সবই তাহার ভাগ্যলিপির ফল। তাহা না হইলে কেন সেদিন সেই দুর্ঘটনা ঘটিল। ঠিক যে সময়ে তাহার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইয়া আসিতেছিল, যে সময়ে সে কল্পনায় তাহার প্রিয়তমকে আশ্রয় করিয়া তাহার ভবিষ্য সংসার পাতিতে আরম্ভ করিয়াছিল, সেই সময়ে তাহার ঝিমার হাত ভাঙ্গিয়া তাঁহাকে মরণের পথে লইয়া গেল। উঃ, সে রাত্রির কথা সে কি কখন ভুলিতে পারিবে! বৃদ্ধার কি সে যন্ত্রণা, তাঁহার অসাধারণ সহিষ্ণুতার সীমা অতিক্রম করিয়া কি-ই সে আর্ত্তির অভিব্যক্তি। কিন্তু ঈশ্বর ত সে রাত্রিতে তাহার কাতর প্রার্থনা শুনিয়াছিলেন। সে যন্ত্রণার অবসানের জন্য সে যে তাহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় আকাঙ্ক্ষাটিকে ও তাহার নিজেকে বলি দিবার মানস করিয়া ভগবানকে ডাকিয়া বলিয়াছিল, "ঠাকুর, এই অনাথা ব্রাহ্মণকন্যার একটি মাত্র প্রার্থনা তুমি পূরণ কর। ঝিমার এই যন্ত্রণার অবসান করিয়া দাও। আর কখনও কোন প্রার্থনা আমি করিব না। যদি করি ত আমার সর্ব্বাপেক্ষা যে প্রিয় তাহারই ভিতর দিয়া তুমি আমাকে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের শাস্তি দিও।" ঠাকুর ত সত্যই তাহার কথা শুনিয়াছেন। তাহা না হইলে সেই দুর্যোগে কি সে সকল সম্ভব হইত, না তাহার ঝিমা'র যন্ত্রণার অবসান হইত। কি যে সত্য, আর কি যে কুসংস্কার, তা কে বলিবে? যদি এখন সে তাহার প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করে তাহা হইলে দেবতার অমোঘ বজ্র হয়ত তাহার উপর পড়িবে! কিন্তু অন্যথা সে আঘাত যে তাহার প্রিয়তমের মধ্য দিয়া আসিয়াই তাহাতে পৌঁছিত। সে কথার ভীষণতার কল্পনা মাত্রেই সে পাগল হইয়া যায়। সুতরাং সে যাহা করিয়াছে, হেমন্তকে তাহারই রক্ষার জন্য কটু বাক্যে দূর করিয়াছে,—তাহা ব্যতীত আর ত উপায়ান্তর ছিল না। তাহাকে সেই নারীমাংসলোলুপ জন্তুটার নিকট নিজেকে বলি দিতেই হইবে! এ তাহার অনতিবর্ত্তনীয় অদৃষ্টলিপি!

মনস্তত্ত্ববিদেরা বিচার করিতে পারেন, মাত্র সতের আঠার বছরের মেয়ের মনের উপর দিয়া এইরূপ চিন্তার স্রোত বহিয়া যাওয়া সম্ভব কি না। ডাক্তার রমেশ পত্নী সুভাষিণীর নিকট হইতে বিভার এই পীড়ার সময়ের লিখিত অনেকগুলি চিঠি মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করিয়া এবং বিভার গত জীবন সম্বন্ধে অনেক অনুসন্ধান করিয়া বিশেষ কিছু বুঝিতে না পারিয়া নিজের ডাইরিতে লিখিয়া রাখিয়াছিল, "এই মেয়েটির বুদ্ধি যেমন তীক্ষ্ণ, ভাবপ্রবণতা তেমনি প্রবল। এইরূপ তীক্ষ্ণবুদ্ধি এবং ভাবপ্রবণ মানুষই কি সংসারের ঘাত-প্রতিঘাতে দুর্ভাবনায় উন্মাদগ্রস্তাপন্ন হইয়া পড়ে?"

সেদিন দুপুর বেলা বিভা ঘরের মধ্যে তাহার শয্যায় পড়িয়া পড়িয়া কত কি ভাবিতেছিল। আজকাল সে এইরূপই করিত। এমন সময়ে তাহার কানে একটা কথা প্রবেশ করায় সে উঠিয়া বসিয়া মনোযোগ দিয়া শুনিতে লাগিল। সেদিন সুরেশ পালের ছেলের বিবাহ। পুরাকাল হইতে এই গ্রামের নিয়ম আছে যে, গ্রামে কোন বিবাহ হইলে বাঁড়ুয্যেদের বাটিতে ভেট পাঠাইতে হয়। এই

ভেটের পরিমাণ এবং মূল্য আগে যাহাই থাকুক এক্ষণে ইহা সম্মানের স্মৃতিরূপেই মূল্যবান। পুরাকালে হয়ত একটি কিছু পাত্র এবং তৎসঙ্গে ফলমূল মিষ্টান্নাদি উপহার রূপে দিয়া এই বনিয়াদি ব্রাহ্মণ পরিবারটির অনুমতি লইয়া শুভকার্য্য সম্পন্ন করিবার প্রথা ছিল; এখন শুধু একটা আধ পয়সার ভাঁড় এবং সেই রকম মূল্যের একটা পান ও একটি সুপারি ভেট আসিত। কিন্তু এই তুচ্ছ দ্রব্য সম্বন্ধীয় আন্দোলনেই আজ সুজাপুর গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা উত্তেজিত হইয়া পড়িয়াছিল; এবং সেই উত্তেজনারই একটা ঢেউ আসিয়া বিভার মূর্চ্ছিতপ্রায় চিত্তবৃত্তিকে উদ্বোধিত জাগরিত করিয়া দিল। সুরেশ পালের ছেলের বিবাহে যাহাতে বিভার ঝিমা'র ভেট না আসে এবং তৎপরিবর্ত্তে সেটা বাঁড়ুযোদের পরিবার হইতে চক্রবর্ত্তী পরিবারের রামেশ্বর মুহুরির ভাগে পড়িবার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়, তাহার জন্য ম্যানেজার সতীশ মুখুয্যের হুকুম আসিয়াছিল। জমিদারের অথবা তাহার কর্ম্মচারীর হুকুমের অর্থ যে কি, এবং ইহার বলে যে কত অঘটন সংঘটিত হয়, সুজাপুরের লোকে তাহা প্রাণে মনে জানিত।

তথাপি চিরাচরিত এই যে প্রথা, এবং বামুনমার উপর নির্য্যাতনের এই যে নূতন পন্থা, তাহাদিগকে বিচলিত করিয়াছিল। বিশেষত এই পরিবারের চিরানুগত অতুলের মার আত্মীয় সুরেশ পালকে। সে তাহার মাসির পরামর্শে ইহাই স্থির করিয়াছিল যে, রামেশ্বর চক্কোত্তিকে একটা ভাঁড় এবং পান দিতে হইবে, কিন্তু আসল ভেটটা বামুনমার পায়ের কাছে পৌঁছাইয়া না দিলে তাহার কন্যার অকল্যাণ হইবে। এ কথা সে কতকটা গোপন করিয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু কানাঘুষায় বামুনমার কাছে ইহা পৌঁছিতে বাকী রহিল না, এবং অন্যদিকে রামেশ্বরও এই কথা অবগত হইয়া সুরেশ পালকে শাসাইতে আরম্ভ করিল। সে এখন উভয় সঙ্কটে পড়িয়া বামুনমার নিকটে আসিয়া জানাইতেছিল যে, তাহার এখন মারীচের দশা,—অর্থাৎ এদিকে বামুনমার মনঃকষ্ট হইলে তাহাকে ব্রহ্মশাপগ্রস্ত হইতে হইবে, অন্যদিকে রামেশ্বর ম্যানেজারের নিকটে লোক পাঠাইয়াছে—তাহাকে জব্দ করিবার জন্য। তাহার এই কাতরোক্তির মধ্যে একটা কথা—"সে কথা মা, আমার জিভ দিয়ে বেরুবে না, কি ব'লে তারা আপনাদের একঘরে করতে চান" বিভার কানের ভিতর ঢুকিতেই সে সমস্ত কথাটার অর্থ বেশ স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে পারিল, এবং তাহার ঝিমার এই যে অপমান ইহার জন্য সে নিজেকেই দায়ী করিয়া কিরূপে ইহার প্রতিকার হয় তাহার জন্য তাহার দুর্ব্বল বিকারগ্রস্ত মনটিকে একান্তভাবে পীড়িত করিতে লাগিল।

সেইদিন সন্ধ্যাকালে সুজাপুরে সতীশ মুখুয্যে মহাশয়ের শুভ পদার্পণ হইল এবং ইহাও সাব্যস্ত হইয়া গেল যে, বিভার চরিত্রদোষের জন্য উহাদিগকে সমাজ বহির্ভূত করাই জমিদারের হুকুম এবং যে কেহ এই নির্দ্ধারণের বিরুদ্ধে কার্য্য করিবে সেই বিদ্রোহী প্রজা বলিয়া গণ্য হইবে ও শাস্তি ভোগ করিবে।

গ্রামে জমিদারের বা তাঁহার উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর আগমন একটা সাধারণ ঘটনা নহে। এইরূপ শুভাগমন সচরাচর ঘটে না বলিয়াই নিরীহ গ্রামবাসীরা অনেকটা শান্তিতে এবং নির্ভয়ে বাস করে। কিন্তু যখন এইরূপ শুভাগমন হয়, তখন বারবারদারি, পার্ব্বণী আদায়ে, বিবাহ বিসম্বাদের বিচারে,—বাকি খাজনা, চৌথ মাথটের কড়া তাগাদায় গ্রামবাসীদের জীবন দুর্ব্বহ হইয়া পড়ে। এই সমস্ত সাধারণ অর্থী প্রত্যর্থীর কার্য্য শেষ হইয়া গেলে গভীর রাত্রির অন্ধকারে বিদ্রোহী প্রজাদমনের ও মামলা মোকর্দ্দমা বাধাইয়া দুই পয়সা উপায় করিবার গুপ্ত মন্ত্রণা সমিতি বসিয়া থাকে। আজও সেইরূপ সমিতি বসিয়াছিল। সেই জন্য যখন রামেশ্বর কাছারি হইতে ঢুলিতে ঢুলিতে বাটিতে ফিরিতেছিল, তখন রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরের কাছাকাছি। সে তাহার খোলা সদর দরজাটা পার হইয়া মাঝের দরজায় আঘাত করিয়া তাহার সুপ্ত গৃহিণীকে উঠাইতে যাইতেছিল, চণ্ডীমণ্ডপের দ্বারের উপর একটা রুক্ষকেশী শুভ্র শীর্ণ মূর্ত্তি দেখিয়া হঠাৎ স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। তাহার ভূতের ভয় তেমন ছিল কিনা জানি না, নিশ্চয়ই সে ভূত শঙ্খচূর্ণীর অনেক গল্প বাল্যকালে শুনিয়াছিল। তাহার ফলেই হউক আর অমানুষিক শরীরিণীকে দেখিয়া হউক, তাহার মন এবং

শ্রীঅক্ষয়কুমার সরকার

শরীর দুইই মুহূর্ত্তের মধ্যে বিকল হইয়া যাইবার মত হইল। কিন্তু সেই মূর্ত্তিটা যখন তাহার সম্মুখে আসিয়া তাহার ঘোলাটে চোখের উপর উজ্জ্বল অস্বাভাবিক ভাবে দীপ্ত দৃষ্টি স্থাপন করিল, তখন সে আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল যে মূর্ত্তিটা তাহার একান্ত অপরিচিত নহে—বিভার প্রেত মূর্ত্তির মত! তাহার পরও সেই মূর্ত্তি যখন একটা তীব্র ভর্ৎসনার স্বরে তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়া উঠিল, "তোমরা এত নীচ কেন? আমার ঝি-মার উপর এই নির্য্যাতন কি ভগবান সইতে পারবেন!" তখন অল্পক্ষণ স্তম্ভিত থাকিয়া রামেশ্বর উত্তর করিতে গেল, "আমি কি করব বল। ম্যানেজার—" কিন্তু হয়ত বা রামেশ্বরের মনটা তখন অন্য একটা চিন্তায় বিভার সেই কোমল নবীন সরস মূর্ত্তির সহিত আজিকার এই কঙ্কালময়ীর তুলনায় এত ব্যস্ত ছিল যে, সে তাহার বক্তব্য ভাল করিয়া উচ্চারণ করিতে পারিল না, অথবা হয়ত বিকৃতমস্তিষ্ক বিভার মাথায় তাহার কথা স্থানই পাইল না।

বিভা স্বপ্নাশ্রিতার মত ঝোঁকের সহিত বলিয়া যাইতে লাগিল, "সতীশ মুখুয্যেকে গিয়ে বলগে যদি সে আমার এই হাড় কখানা পেলেই সন্তুষ্ট হয়, কালই বিয়ের দিন আছে—"

এই সময়ে বাহিরে একটা গোল উঠিল। তিন চারিজন লোক বিভার উচ্চস্বরের কথায় তাহার সন্ধান পাইয়া সেখানে ছুটিয়া আসিল। তাহার ঝি-মা তাহাকে আকুলবক্ষে ধারণ করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

১৪

পরদিন সুজাপুরের ইতিহাসে একটা স্মরণীয় ঘটনা ঘটিয়া গেল। গুরু ভোজনের ফলেই হউক বা অন্য কোন কারণেই হউক সতীশ মুখুয্যের অন্ত্রের মধ্যে একটা গোলযোগ ঘটিয়া শ্বাস রোধ হইবার মত অবস্থা হইয়াছিল। গ্রামের বিজ্ঞগণের মুষ্টিযোগ এবং রাম-কালী ডাক্তারের বিদ্যার যথাসাধ্য হইয়া যাইবার পর জেলার সিভিল সার্জ্জনকে আনা স্থির হইল। মধ্যাহ্নের পর তিনি আসিয়া চিকিৎসা আরম্ভ করিয়াছিলেন, এক্ষণে রোগীকে কতকটা সুস্থ দেখিয়া ফিরিবার উদ্যোগ করিতে-ছিলেন। পল্লীগ্রামে একজন যেমন-তেমন ডাক্তার আসিলেও কৌতূহলী লোকের ভিড় লাগিয়া যায়; সুতরাং ম্যানেজার মহাশয়ের পীড়া এবং সাহেব ডাক্তারের আগমন এই দুইটি মণিকাঞ্চনের সংযোগে সেদিন অপরাহ্ণে সুজাপুরের কাছারিতে যে একটা পর্ব্বের জনতার সমাবেশ হইয়াছিল, তাহাতে আশ্চর্য্যের কিছুই ছিল না। ডাক্তার সাহেব এই লোকগুলির দিকে চাহিয়া চাহিয়া যেন কাহাকে খুঁজিতে ছিলেন; কিন্তু সে লোকটি তাহার নজরে না পড়াতে একজনকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সেই যে আমি ভাদ্র মাসে এক বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর হাত কেটে দিয়ে গিয়েছিলাম, তাঁদের এখন খবর কি?

"তাঁদের বড় বিপদ" বলিয়া সুরেন পাল বিভার পীড়ার কথা উত্থাপন করিল।

ডাক্তার সাহেব বলিলেন, "সেই হেমন্ত ছেলেটিকে এখানে দেখছি না?"

কথাটায় সমবেত জনমণ্ডলীর মধ্যে একটা কানাঘুসা পড়িয়া গেল; কিন্তু তাহাদের কোন মন্তব্য ডাক্তার ঘোষের কানে আসিয়া পৌঁছিবার আগেই সুরেনপাল বলিল, "সে মাস খানেক কোথায় নিরুদ্দেশ হ'য়ে গেছে—"

"কেন? মেয়েটির সঙ্গে তার বিয়ে—"

সকলেই এই কথায় আশ্চর্য্য হইয়া গেল। সুরেন পাল বলিল, "সে রকম কথা ত কখন শুনি নি। আপনি—"

ডাক্তার সাহেব কি ভাবিয়া কথাটা শেষ না করিয়া একবার বিভাকে দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, এবং সুরেন পালকে সঙ্গে লইয়া বামুনমা'র বাড়িতে উপস্থিত হইলেন। তখন বিভা ঘরের মেঝেয় শুইয়া নিদ্রার ভাণ করিয়া গতরাত্রির সমস্ত ঘটনার কথা ভাবিয়া লজ্জায় মরিয়া যাইতেছিল।

ডাক্তার সাহেব বামুনমা'র নিকট সমস্ত কথা শুনিয়া রোগীকে পরীক্ষা করিয়া বুঝিলেন যে, সে স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের একটা অতি সঙ্কটের সীমায় পৌঁছিয়াছে। তাহার মানসিক এবং শারীরিক যে স্বাস্থ্য তিনি মাস দুই পূর্ব্বে দেখিয়া গিয়াছিলেন, এবং তাহার যে বয়স তাহাতে এই অল্পসময়ের মধ্যে তাহার এইরূপ অবস্থা

ডাক্তারের পক্ষে একটা সমস্যা বলিয়াই মনে হইল, এবং চিকিৎসাশাস্ত্রের জ্ঞান এবং সাধারণ বুদ্ধি দুইয়ের বিচারেই তিনি সেদিনকার সেই রক্তনাশই যে এইরূপ ব্যাধির একমাত্র কারণ নয়, তাহা নির্দ্ধারণ করিয়া অন্য কারণের অনুসন্ধান করিবার জন্য তাহার ঝিমাকে একটি একটি করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া তাহার জীবনের সমস্ত তথ্যগুলি সংগ্রহ করিয়া লইলেন। হেমন্তের অকস্মাৎ নিরুদ্দেশের পর হইতে বিভার পীড়া দ্রুতবেগে বৃদ্ধি পাইতেছে তাহা বুঝিতে পারিলেন। তাহার পর শেষ রাত্রির ঘটনার কথা শুনিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "সতীশ মুখুয্যের সঙ্গে বিয়ে কি? হেমন্তের সঙ্গেই ত—"

বামুন-মা সমস্ত কথা খুলিয়া বলিলে ডাক্তার নিজের কাছে বসাইয়া পিতৃস্নেহের সহিত তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া ক্রমে ক্রমে তাহার মনের যে গূঢ় দুশ্চিন্তাটি এ পর্য্যন্ত তাহার অতি অন্তরঙ্গ আত্মীয়েরাও বুঝিতে পারেন নাই, তাহা বাহির করিয়া লইলেন। সেই রাত্রিতে তাহার ঝিমার আরোগ্য কামনায় পরমেশ্বরের নিকট শপথ করিয়া আপনাকে উপকারক সতীশ মুখুয্যের উদ্দেশ্যে দান করিয়া ফেলিয়া এবং সেই অনিচ্ছার আত্মসমর্পণ হইতে নিষ্কৃতির কোন উপায় নাই ভাবিয়া হেমন্ত হইতে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিবার প্রচেষ্টায় অহরহঃ আপনাকে কয় মাস ধরিয়া নিযুক্ত রাখিয়া বিভা যে স্নায়ুর এবং মনের এই বিকৃত অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে ডাক্তার সাহেবের সে বিষয়ে আর সন্দেহ মাত্র রহিল না। কেবল ইহার মধ্যে একটা রহস্য তিনি কিছুতেই বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিন্তু সতীশ মুখুয্যে যে সে রাত্রিতে কি তোমাদের উপকার করলে তাত বুঝ্‌তে পারলুম না মা!"

"কেন, আমি তাঁকেই খবর দেওয়াতে তিনি আপনাকে ডাকিয়ে দেন।"

"না না। একথা তোমায় কে বললে? সতীশ মুখুয্যে হয়'ত জানেই না যে—"

"সে কি।" কথাটা বিভার মুখ দিয়া এমনিই একটা দুর্নিবার বিস্ময়ের সহিত বাহির হইল যে, ডাক্তার সাহেব অবাক হইয়া তাহার মুখের উপর কয়েক মুহূর্ত্ত চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিতে লাগিলেন, "সে দিনকার কথা আমি কখনও ভুলব না। সেই দুর্যোগের রাত্রিতে আমার বাংলোর কুকুর দুটো যখন চীৎকার ক'রে আমার ঘুম ভাঙিয়ে দিলে, তখন প্রথমেই আমার নজরে পড়ল একটি ছেলের উপর। তা'র হাত দুটা পেছমোড়া ক'রে বাঁধা আর তার উপর প্রহারের—সে কথা থাক।" একটু চুপ করিয়া ডাক্তার বলিতে লাগিলেন, "একটি সতের আঠার বছরের ছেলের অনুনয়ের প্ররোচনা এবং পশুর শক্তি যে সে রাত্রিতে কি ক'রে—" হঠাৎ বিভার কণ্ঠের কি একটা অস্পষ্ট শব্দে ডাক্তার তাহার দিকে চাহিয়া দেখিলেন সে তাহার হাত দুটা প্রাণপণে মুখে চাপিয়া কি একটা শব্দ নিবারণ করিতে চেষ্টা করিতেছে। বৃদ্ধ ভদ্রলোক তাহার মাথায় হাত দিয়া বলিলেন, "মা, আমি ব'লে যাচ্ছি, তোমার ঝি মা তাকে যে অধিকার দিয়েছেন, তা সে ছাড়বে না। সে ছেলে তার অধিকার এবং কর্ত্তব্য দুইই গ্রহণ করবে; সে আস্‌বেই আবার তোমার কাছে।"

ডাক্তার বাহিরে যাইবার সময় বামুনমাকে আশ্বাস দিয়া গেলেন যে, কোন ভয় নাই, রোগী ভাল হইবে। তবে বায়ু পরিবর্ত্তন করা দরকার।

১৫

বৈশাখী পূর্ণিমায় চট্টগ্রামের অন্যতম অংশে প্রসিদ্ধ মহামুনির যে মেলা হইয়া থাকে তাহা যিনি চাক্ষুষ না দেখিয়াছেন তাঁহাকে বর্ণনা করিয়া বুঝান সহজ নহে। মেলায় যে সকল অল্প মূল্যের বিদেশী পণ্য-বহু মূল্যে বিক্রীত হইয়া সরল পাহাড়ীকে তাহার সমস্ত বৎসরের তিল তিল সঞ্চিত বিত্ত হইতে বঞ্চিত করে, কলিকাতা প্রভৃতি সহরের বিদেশী বণিকের প্রতিনিধি ঐ সময়ে স্বল্পবুদ্ধি পাহাড়ী কৃষিজীবীকে তুলা প্রভৃতি সম্বন্ধে যে বার্ষিক চুক্তি করিয়া তাহার বহু শ্রমের দ্রব্যকে অযথা-সুলভ মূল্যে বিদেশে রপ্তানীর সুযোগ করিয়া দেয়, তাহা নিশ্চয়ই অর্থনীতিকের আলোচনার বিষয়। এই ভারতবর্ষে সে কালে অনেক মদনোৎসবের কথা নাট্যে কাব্যে বর্ণিত দেখিতে পাওয়া যায়; অসভ্য নরনারীর

বনভোজন *

শ্রীঅক্ষয়কুমার সরকার

মধ্যে স্থানে স্থানে যে সমষ্টি বিবাহের নীতি আচরিত হইয়া আছে, তাহাও মানবতত্ত্বান্বেষী অজ্ঞাত নহে। কিন্তু বঙ্গদেশের এক প্রান্তে এই যে যুবক যুবতীর বার্ষিক সমষ্টি সম্মিলনের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে, ইহা হয়ত অনেক শিক্ষিত বাঙ্গালীর জ্ঞানের বাহিরে।

বৎসরান্তে বসন্তকালের একটি দিনে এই ক্ষুদ্র মহামুনি গ্রামটি কয়েক সহস্র পাহাড়ী সুন্দর সুন্দরীর আগমনে, তাহাদের কলহাস্যে, লীলাচঞ্চল নৃত্যে এবং উন্মাদনায় এবং প্রেমের ললিতগানে মুখর হইয়া উঠে। সমস্ত বৎসরের মধ্যে যাহাদের মাতাপিতার অভিরুচিতে স্বামী স্ত্রীর নির্ব্বাচন হইয়া গিয়াছে, যাহাদের স্বীয় মনোনয়নে জীবন সহচর সহচরী স্থির হইয়া গিয়াছে, এবং যাহারা বয়স এবং চিত্তের পরিণতি-হেতু মনোমত সঙ্গী বা সঙ্গিনী নির্ব্বাচনের জন্য উন্মুখ হইয়া আছে, সকলেই দূর দুরান্ত হইতে সমস্ত বৎসরের উপার্জ্জন এবং সামান্য দুই একটা রন্ধনের তৈজসাদি লইয়া উৎসবের বেশে সজ্জিত হইয়া এইখানে উপস্থিত হয়। তাহার পর কেহ বা নিজের প্রতিশ্রুত পরিণয় এই স্থানে সম্পন্ন করে, কাহারও বা জনক জননীর নির্ব্বাচিত পতি বা পত্নীলাভ হয়, আবার কাহাকেও বা তাহার অজানা মনের মানুষটিকে এই স্থানে সমবেত অসংখ্য নরনারীর মধ্যে খুঁজিয়া বাহির করিয়া লইয়া ইঙ্গিতে আভাষে গানে নৃত্যে তাহার প্রাণের ইচ্ছা নিবেদন করিতে হয়। যখন এই নিবেদন ক্রমে ভাষায় ব্যক্ত হয়, তখনকার সার্থকতার উল্লাস একটা আনন্দের উচ্ছ্বাসে ব্যক্ত হইয়া শুধু সেই মনোনীতার সখী-সহচরীগণেরই নহে, সেখানে উপস্থিত অন্য নরনারীগণেরও, দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং কর্ণে একটা মধুর ধারা বর্ষণ করিয়া দেয়। পুরুষের সেবা করিয়া অনেক মোহিনী তাহাকে জয় করিয়াছেন, এ তথ্য বাঙ্গালার নাটক উপন্যাসে প্রত্যহ দেখিতে পাই; রমণীকে বীরত্বে মুগ্ধ করিয়া তাহার মনটি দখল করিয়া লওয়া জীবজগতে এবং মানবজগতে অতি পুরাতন প্রথা; কিন্তু তালপাতার পাখার বাতাসের সেবা অপরিচিতা ঘর্ম্মাক্তা নৃত্যশীলা তরুণীর মনোহরণ করে, এ কেবলমাত্র এই মহামুনির মেলাতেই বোধ হয় দেখা যায়।

কিন্তু দর্শকের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দময় ব্যাপার তখনই আরম্ভ হয় যখন তাহার উৎসুক এবং তথ্যান্বেষী দৃষ্টিতে পড়ে, কোন ব্রীড়াবিব্রতা তরুণী তাহার সদ্য নির্ব্বাচিত সহচরটির সহিত সেই পর্ব্বত এবং বনের কোন অজানা লুকান কোণের উদ্দেশ্যে ধীরমন্থর পদবিক্ষেপে যাত্রারম্ভ করিয়াছে। অল্পমূল্য বিলাতী প্রসাধনের দ্রব্য, ঝুটা মুক্তার হার, গিল্টির ইয়ারিং, মাটির দুইটা হাঁড়ি, একখানি চেটাই, একখানা হাত পাখা, রঙ্গীন দুইটুকরা কাপড় লইয়া মনের আনন্দে লোকচক্ষুর অন্তরালে পৃথিবীতে দেবতার যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান ভালবাসা তাহার সম্যক উপভোগের জন্য তাহারা কয়দিনের জন্য তাহাদের সমাজ হইতে অপসৃত হয়, তাহার পর ফিরিয়া আসিয়া স্বামীস্ত্রী রূপে সংসার পাতে।

সেদিন সন্ধ্যার পর এই মেলার অন্যান্য অনেক প্রমোদের মধ্যে রেঙ্গুনের একটা সখের বর্ম্মাযাত্রাদলের নাচ-গান হইতেছিল। নাটকখানির কথা একজন দোভাষী—সেখানে শান্তিরক্ষার জন্য উপস্থিত সব-ডিঃ অফিসারকে ও তাঁহার মেলাদর্শনেচ্ছু অতিথিগণকে বুঝাইয়া দিতেছিল। এক রাজকন্যা এক রাখালকে ভালবাসিয়াছিল। দিনের পর দিন রাখালের মনের এই বৃত্তি রাজকুমারীর সান্নিধ্য এবং দর্শনের মধ্যে বাড়িয়া উঠিতে লাগিল; অবশেষে উদ্যানের এক প্রান্তে জ্যোৎস্নারাত্রিতে নিদ্রিতা কুমারীর কর্ণে তাহার প্রেম নিবেদন কিরকম একটা দুঃসাহসিকতার সহিত ব্যক্ত হইয়া পড়িল। ফলে সে নির্য্যাতন এবং নির্ব্বাসন লাভ করিল। কিন্তু প্রেমের অদ্ভুত রহস্য! রাখালের নির্ব্বাসনের পরেই রাজকুমারী তাঁহার সম্মানজ্ঞান ভুলিয়া গিয়া প্রিয়তমের সন্ধানে একজন বিশ্বস্তা সহচরীর সহিত বাহির হইয়া পড়িলেন। কতদিন কতমাস ঘুরিয়া শ্রান্তা মলিনা রাজকন্যা এক বিজন বনে পথভ্রান্তা হইয়া পড়িলেন। সেই সময়ে তাঁহার কানে এক মধুর মুরলীধ্বনি প্রবেশ করিল। কুরঙ্গ যেমন বাঁশীর রবে ধাবিত হয় তিনিও সেইরূপ সেইস্বরে আকৃষ্ট হইয়া অনু-সন্ধান করিতে করিতে তাঁহার প্রিয়-সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া মিলিত হইলেন।

এই অভিনয়ে যে বাঁশী বাজাইতেছিল, তাহার কৃতিত্বে সেখানকার সকলেই মুগ্ধ হইয়া গেল। সকলেই বলিতে লাগিল এমন মধুর নিপুণ বাঁশী বাজনা তাহারা কখন শোনে নাই। ক্রমে বাঁশী বাজান হইতে প্রশংসাটা বংশী বাদকের উপর গিয়া পড়িল। তাহাকে দেখিতে ঠিক বাঙ্গালীর মত, বর্ম্মীর মত তাহার রং ও এবং মুখের গঠন নয়, এবং তাহার নাসিকাটি বর্ম্মাবাসীর নাকের কাছ দিয়াও যায় নাই, এমন কি তাহা অনেক বাঙ্গালীর পক্ষেও সুন্দর মুখশ্রীর উপাদান হইতে পারে, এ কথা অনেকেই স্বীকার করিল।

এই মেলা উপলক্ষে একজন উচ্চপদস্থ বাঙ্গালী রাজকর্ম্মচারী সপরিবারে সেখানে তাঁবু পাতিয়াছিলেন। তাঁহার পরিবারের রমণীগণ চিকের আড়ালে বসিয়া এই বর্ম্মী নাটকের অভিনয় দেখিতেছিল। তাহাদের মধ্যে একটি যুবতী অতি মনোযোগের সহিত সেই বংশীবাদন শুনিতেছিল এবং বাদকের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের উপর গভীর অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিক্ষেপ করিতেছিল। মধ্য রাত্রিতে অভিনয়ের অবসান হইলে যখন সব-ডিভিসনাল অফিসার বংশীবাদককে ডাকাইয়া তাহাকে রৌপ্য পদক পুরস্কার দিতেছিলেন, তখন এই রমণীটি বিশেষ মনোযোগের সহিত তাহাকে দেখিয়া লইল। সে শুনিল যে, এইবার সেই বংশীবাদক মহামুনির প্রতিমা ঘেরিয়া যে শত শত যুবক-যুবতী সমস্ত রাত্রি ধরিয়া আনন্দ-নৃত্য করিবে, তাহাদের সহিত মিলিয়া তাহাদের আনন্দ বৃদ্ধি করিবার জন্য বাঁশীর সুরে তাহাদের নৃত্যের উন্মাদনা জাগাইয়া তুলিবে।

রাত্রি তখন তৃতীয় প্রহর। মহামুনির মন্দির ক্রমেই জনবিরল হইয়া আসিতেছিল, এবং তাহারই এককোণে শ্রান্ত বংশীবাদক তাহার বাঁশি হইতে অস্পষ্ট মোহময় স্বর মন্দিরের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণের জাগ্রত এবং নিদ্রালস অসংখ্য নরনারীর উপর ছড়াইয়া দিয়া তাহাদের কর্ণে মধু বর্ষণ করিতেছিল। এই সময়ে সেই বাঙ্গালী মেয়েটি বর্ম্মী বংশী-বাদকের স্কন্ধে অসঙ্কোচে মুহূর্ত্তের জন্য হস্তার্পণ করিয়া "একবার আমার সঙ্গে ঐ বড় বট গাছটার তলায় দেখা কোরো" বলিয়াই কোথায় সরিয়া গেল।

১৬

পরদিন মধ্যাহ্নে মহামুনি হইতে কয় ক্রোশ দূরে একটা পাহাড়ের নীচে একটা গাম্ভার গাছের ছায়ায় হেমন্ত বিভার হাতটি ধরিয়া বসিয়া ছিল। তাহাদের সাজ পোষাক সবই পাহাড়িদের মত এবং তাহাদের সংসার পাতিবার উপকরণও সেই জাতিরই অনুকরণে সংগৃহীত। চতুর্দ্দিকে জন প্রাণী নাই, রৌদ্র এবং বায়ু আনন্দে মাতামাতি কোলাকুলি করিয়া তাহাদের এই মিলনকে আশীর্ব্বাদ করিতেছিল; এবং তাহারই মধ্যে অনেক দিনের অনেক ব্যথার কথা তাহাদের মুখ হইতে অনর্গল বাহির হইতেছিল। বিভার পীড়ার কথা সে চাপিয়া রাখিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু তাহার রুগ্ন শরীরের দিকে চাহিয়া চাহিয়া তাহায় গায়ে মাথায় স্নেহের হাত বুলাইতে বুলাইতে তাহার সব কথা হেমন্ত ধীরে ধীরে বাহির করিয়া লইল। ডাক্তারের সেই দিনের কথার পর কি রূপে সে তাহার ঝিমাকে সুজাপুর ত্যাগ করিয়া সতীশ মুখুয্যের সান্নিধ্য হইতে তাহাকে দূরে লইয়া যাইতে অনুরোধ করিয়াছিল, সে কথা বলিবার সময় বিভার অশ্রুর সহিত একটা লজ্জার হাসি মিশাইয়া গেল। তাহার পরে কালীঘাটে তাহার ঝিমার শিষ্যের বাটি আসিয়া তাহারা কয়মাস অতিবাহিত করে, এবং সেই সময়ে ঝিমার মৃত্যু হয়। তাহার পর কিরূপে যে সেই শিষ্যবাড়ীর বড়বাবুর পরিবারের সঙ্গে চট্টগ্রামে আসিয়া মহামুনির মেলায় আসিয়া পৌঁছিয়াছিল, সে কথা বলিয়া হেমন্তের চক্ষুর দিকে চাহিতে গিয়া কি ভাবিয়া হাসিয়া বিভা মাথাটি নীচু করিল।

পাশে বাঁশিটা পড়িয়াছিল, হেমন্ত সেটা হাতে করিয়া তুলিয়া লইয়া কি ভাবিয়া বলিল, "তুমি বাঁশী বাজাতে শিখবে বিভা?"

বিভা হাসিয়া বলিল, "কেন?"

"পাহাড়ী মেয়েরা ত বাজায়"

"আমরা কি পাহাড়ী?"

শ্রীঅক্ষয়কুমার সরকার

"এখন তা ছাড়া আর কি! আমাদের সভ্য সমাজে ত আর স্থান নাই—"

কি ভাবিয়া কথাটা হেমন্ত শেষ করিতে পারিল না। কিন্তু বিভা সে কথাটা টানিয়া লইয়া বলিতে লাগিল, "সভ্য সমাজে আমাদের স্থান হবে কি না জানি না, জানতে চাই না। আমার দীক্ষাদেবী ঝিমা মরণকালে কি ব'লে গেছ্‌লেন জান?"

"কি বলে গেছলেন?"

"আমার হাত দুটো তাঁর বুকের উপর—সেই সেদিনের রাত্রির কথা তোমার মনে আছে?—তেমনি ক'রেই রেখে ব'লে গেছলেন, মা সেদিনকার আমার সেই যে সম্প্রদান সেটা মিথ্যে নয়। আমি ত চ'লে যাচ্ছি, কিন্তু তুমি তার উপর তোমার যে দাবী এবং তার প্রতি তোমার যে কর্ত্তব্য দুইই রক্ষে কোরো। তাই ত আমি কাল অমন অসঙ্কোচে—" বিভা বোধ হয় লজ্জায় কথাটা শেষ করিতে পারিল না, হেমন্ত তাহার মাথাটা বুকের উপর টানিয়া লইয়া চুলের উপর মুখটি একবার ঠেকাইল। তাহার পর একটু নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিল, "কিন্তু আমার কর্ত্তব্য যে, আমাদের সমাজের যা করণীয় সেই মন্ত্র কটা প'ড়ে আমাদের ভবিষ্যতকে—"

"না, আর তাতে দরকার নেই, সেইদিনকার আমার ঝিমার সেই সম্প্রদান, আর কাল রাত্রিতে এই মহামুনির মেলায় আমার সেই অসঙ্কোচ—" লজ্জায় রাঙ্গা হইয়া বিভা থামিয়া গেল। মুহূর্ত্ত পরেই গলাটা পরিষ্কার করিয়া লইয়া বলিল, "এই যে সহস্র সহস্র পাহাড়ীদের মধ্যে কাল রাত্রিতে তাদেরই মতন আমাদের বাঁধন হ'য়ে গেল, তার চেয়ে সত্যের বাঁধন আর কি হ'তে পারে?"

হেমন্ত বিভার মুখটি দুই হাতে তুলিয়া ধরিয়া তাহার চোখের উপর অবাক গভীর দৃষ্টিপাত করিয়া স্থির হইয়া রহিল। মৃদু হাসিয়া চক্ষু দুইটি অর্দ্ধ মুদ্রিত করিয়া বিভা বলিল, "অমন ক'রে কি দেখছ?"

"সত্যি, বিভা! তোমার মুখ থেকে কি যেন একটা সত্যের আলো আমার অন্ধকার দুর্ব্বল মনের চিরকালের সংস্কার দূর ক'রে দিচ্চে। সত্যই কি আমাদের এই মিলনের উপর আর শাস্ত্রীয় বা সামাজিক কোন করণীয় নেই?"

"আমার ত তাই কায়মনোবাক্যে বিশ্বাস। তাতে যেন একটা সত্যকে এবং তার সঙ্গে আমার স্বর্গগতা ঝিমাকে অপমান করা হয়—"

"কিন্তু কি পরিচয়ে আমরা লোকালয়ে যাব?"

"যেটা সত্য পরিচয় তাতেই, এবং এমন নীচপ্রবৃত্তি কেউ যদি থাকে যে আমাদের কথা ছাড়া অন্য প্রমাণ চাবে, তাকে উপেক্ষা ক'রে।"

"কোথায় থাকব?"

"সে যেখানে তোমার সুবিধা হবে। তবে সুজাপুরে আমার আর আকর্ষণ নেই। একমাত্র অতুলের মাকে সময়ে সময়ে দেখতে ইচ্ছে হয়।"

বিভা এবং হেমন্ত কলিকাতাতেই থাকে। তাহারা যে সুখে এবং শান্তিতে আছে তাহা না বলিলেও চলে। কেননা বিদ্যা, খ্যাতি, প্রেম এবং স্বাচ্ছন্দ্যই যদি সাংসারিক সুখের পরাকাষ্ঠা হয়, উন্নত মন এবং নিষ্পাপ আত্মাই যদি ইহলোকে অমরত্ব উপভোগের উপাদান হয়, তাহা হইলে তাহাদের সুখ এবং ভোগকে অনন্যসাধারণ বলিয়াই মানিতে হইবে। কেবল এখনও একটা মাত্র সাধ তাহাদের অপূর্ণ আছে, সুজাপুরের রায়েদের ভিটেয় এবং ঝিমার ভগ্ন পবিত্র ঘরখানির মেঝের উপর এমন একটা কিছু করা যাহাতে সেখানকার স্মৃতি বাঙ্গলার বুকে চিরকাল অক্ষয় হইয়া থাকে।

সমাপ্ত

রুষ-কবি লার্‌মন্‌টফ্‌

শ্রীসত্যেন্দ্র দাস

১

রুষ-সাহিত্য জগতের রত্ন-ভাণ্ডারের একটি অপূর্ব্ব সম্পদ। দেশে দেশে যুগে যুগে মানবের অন্তরলোকে যত বেদনা, যত অশ্রু জমা হইয়া উঠিয়াছে—রুষিয়ার সাহিত্য তাহাকে চেতনা দিয়াছে, রূপ দিয়াছে; যত প্রেম, যত হর্ষ, যত আনন্দ-বোধ মানব-মনে জন্মলাভ করিয়াছে—রুষিয়ার শিল্পী-মন তাহার উদ্বোধন করিয়াছে। তাই আমরা দেখিতে পাই, বিশ্ব-সাহিত্যের একটা সুদৃঢ় গ্রন্থি আঁটিয়া গেছে,—আর সে-গ্রন্থিতে বিংশ-শতাব্দীর তরুণ বাঙালী মনই বেশী করিয়া জড়াইয়া পড়িয়াছে।

রুষ-সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের প্রথম পরিচয় হয়, তাহার গভীর বিষাদ-ভরা সুরের ভিতর দিয়া। যে-জীবনের চিত্র আমরা সেখানে অঙ্কিত দেখিতে পাই, সেখানে আনন্দের দীপ্তি নাই, সুখের রঙীন-রেখা বেদনার প্রলেপে অস্পষ্ট হইয়া গেছে—সমস্ত চিত্রখানি জুড়িয়া আছে একটি মৃত্যুম্লান বিষাদের সুর। পুশ্‌কিনের প্রথম বয়সের কবিতায় ও গোগলের প্রথম বয়সের উপন্যাসে যৌবনের আনন্দ ও তরলতা ফুলের মতো ফুটিয়া উঠিয়াছিল সত্য, কিন্তু জীবনের সেই প্রথম অধ্যায়ের অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই সে ফুল ঝরিয়া গেল—জীবনের বৃন্তে বৃন্তে দুঃখের কাঁটাই বড় হইয়া জাগিয়া উঠিল। টলস্টয়, তুর্গেনিয়েহ্ব্‌, দস্তয়্‌এহ্ব্‌স্কি, নেক্‌রাসফ্‌, কলট্‌সফ্‌ প্রভৃতি সকলেই সাহিত্যের কমলবনে বসিয়া যে-সুরের ঝঙ্কার তুলিয়াছেন—সে-ঝঙ্কার গিয়া মানুষের অন্তরের বেদনার স্থানটিই স্পর্শ করিয়াছে।

রুষ কবি লার্‌মনটফ্‌

বেদনার এই নিবিড় পরিচয়েই রুষ-সাহিত্য আমাদিগকে তাহার অন্তরের কাছে টানিয়া লইয়াছে।...অসীম দুঃখ-সাগর মন্থন করিয়া রুষ-সাহিত্যিকগণ এক অমৃত-ভাণ্ড লাভ করিয়াছেন,—তাহা মানবতার প্রতি সুগভীর দয়া ও সুবিশাল সহানুভূতি। রুষিয়ার বেদনা-যজ্ঞের প্রধান পুরোহিত দস্তয়্‌এহ্ব্‌স্কির সেই মহাবাণী মনে পড়ে—"I did not bow down to you individually but to suffering Humanity in your person." রুষ-সাহিত্যের এই অমৃতত্বের বার্ত্তা

রুষ-কবি লার্মনটফ্

শ্রীসত্যেন্দ্র দাস

চিরদিন বিশ্ব-মানবের বুকে অমর হইয়া থাকিবে।—ইহাই রুষ-সাহিত্যের বড় পরিচয়।

২

পুশ্‌কিনের জীবিত-কালে যে সকল তরুণ-কবি তাঁহার চারিপাশে থাকিয়া আপন আপন বৈশিষ্ট্যের জন্য রুষ-সাহিত্যের কমল-বনে প্রবেশাধিকার পাইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে লার্মনটফের (Mihail Yuryevich L'ermontov) নামই প্রথমে মনে হয়। রুষ-কবির বৈশিষ্ট্য তাঁর মধ্যে পূরা মাত্রাতেই ছিল; তাহা ছাড়া তিনি আসিয়াছিলেন আলাদা একটি নতুন সুরের অগ্রদূত হইয়া। একথা সত্য যে, রুষিয়ার জনসাধারণ তাঁহাকে চিনিল অনেকটা বিলম্বে; কিন্তু যখন চিনিল, এমন করিয়াই চিনিল যে, লারমন্‌টফের বেদনার বাণী তাহাদের অস্থিমজ্জায় শিরায় রক্তস্রোতে মিশাইয়া গেল; তাহাদের মনের মহলে কবির সিংহাসনখানি চিরস্থায়ী ভাবে পাতা হইল। তাহারা বুঝিল, লার্মন্‌টফ্ আর কাহারো কথা বলেন নাই, আর কাহারো বেদনা তাঁহার মর্ম্মকে রক্তাক্ত করে নাই,—শুধুই তাহাদের বেদনা, দুঃখ-প্রপীড়িত রুষিয়ার মানুষের বেদনা তাঁহার লেখনীর মুখে সহানুভূতির প্রস্রবণ ছুটাইয়াছে। সেইদিনই তাহারা রুষিয়ার এই লাজুক তরুণ কবিটিকে তাঁহার ক্ষুদ্র ঘরের কোণ হইতে বিশাল বিশ্ব-প্রাঙ্গণে টানিয়া আনিয়া গৌরবের আসনে বসাইয়া দিয়া সমস্বরে গাহিয়া উঠিল—'জন-গণ-মন-অধিনায়ক জয় হে!'

৩

১৬১৩ খৃষ্টাব্দে রুষ-সৈন্যদল একটি ক্ষুদ্র স্প্যানিশ্ সহর আক্রমণ করে, এবং দুর্গ অধিকার করিয়া কয়েকজন সৈন্যকে বন্দীভাবে রুষিয়ায় লইয়া যায়। বন্দীদের মধ্যে জর্জ্জ লার্মন্থ (George Learmonth) নামে একজন স্কচ্ ছিল।

লার্মন্থ অতঃপর রুষিয়াতেই বসবাস করিতে থাকে, এবং এইরূপে সেখানে একটি নতুন রুষ-পরিবারের সৃষ্টি হয়। কবি-লার্মন্‌টফ্ এই বংশেই জন্মগ্রহণ করেন।

লার্মন্‌টফের পূর্ব্ব-পুরুষগণ সকলেই রুষ-সৈন্যদলে কাজ করিয়াছেন। তাঁহার পিতা একজন সামান্য সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি ধনী উচ্চ-বংশীয়া একটি সুন্দরী কুমারীর প্রেম-বন্ধনে আবদ্ধ হন এবং অনেক বাধা-বিঘ্ন থাকা সত্ত্বেও তাঁহাদের বিবাহ হয়। মেয়েটি তাহার দরিদ্র স্বামীকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসিত এবং সে নিজে অগাধ ঐশ্বর্য্যের মধ্যে প্রতিপালিতা হইয়াও স্বামীর সংসারের দারিদ্র্যের রুদ্র-দাহের মাঝে একটি প্রফুল্লমুখী কমলের মতোই বিরাজ করিত। তাহার সতের বছর বয়সে লার্মন্‌টফের জন্ম হয়। দরিদ্র সৈনিকের ঘরে সেদিন আনন্দের জোয়ার বহিয়া গিয়াছিল।

তিন বছর পরেই মেয়েটি হঠাৎ মারা যায়। কিন্তু শিশু লার্মন্‌টফের মনে সেই বয়সেই মায়ের অস্পষ্ট ছবি মুদ্রিত হইয়া গিয়াছিল। পরিণত বয়সেও সেই ছবিটির চারিপাশে তাঁর বেদনা-দগ্ধ মন শান্তির আশায় ঘুরিয়া মরিত। কোন্ এক নিরালা সন্ধ্যায় সেই মধুর স্মৃতিটুকুকে ঘিরিয়া অন্তর তাঁহার জোয়ার জলের ঢেউয়ের মতো ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিত—চোখের জলে তরুণ কবির বুক ভাসিয়া যাইত।

মাতার মৃত্যুর পর শিশু-কবি পিতার ন্যাওটা হইয়া পড়েন। পিতাও এই মা-হারা শিশুটিকে সংসারের সকল রকমের কঠোরতার ছোঁয়াচ হইতে সরাইয়া রাখিতে সবিশেষ চেষ্টা করিতেন। মাঝে মাঝে দারিদ্র্য রাক্ষস যখন রুদ্র-তেজে জ্বলিয়া উঠিয়া তাহাকে গ্রাস করিবার উপক্রম করিত, তিনি দিশা-হারা হইয়া শিশু-কবিকে তাঁহার বুকের আশ্রয়টিতে আড়াল করিয়া রাখিতেন। শিশু হইলেও বালক তাহা বুঝিতে পারিত এবং পিতার অভাব-অভিযোগ দুঃখ-বেদনা তখন হইতেই তার শিশু-হৃদয়ের কোমল অনুভূতির কাছে ধরা পড়িত।

কিন্তু লার্মনটফের কপালে এই দুঃখবোধের মধুরতাটুকুও বেশী দিন সহ্য হইল না। তাঁহার মাতামহী তাঁহাদের সংসারের এই দুরবস্থা দেখিয়া একদিন লার্মন্‌টফ্‌কে তাঁহার কাছে লইয়া গেলেন।

দরিদ্র দারিদ্র্যের হাত এড়াইল বটে, কিন্তু সুখী হইতে পারিল না। তাহার দরিদ্র পিতা চিরদরিদ্রই রহিয়া গেলেন—এই বেদনা বালক-কবির মনে কাঁটা হইয়া বিঁধিয়া রহিল।

আর, এ বাড়ীতে আসিয়া তাহার পিতার সঙ্গে সকল সম্বন্ধই এক রকম ছিন্ন হইয়া গেল। দরিদ্র সৈনিকের ধনীর মেয়ে বিয়ে-করা মস্ত অপরাধ—এই অপরাধেই লার্‌মনটফের পিতার সঙ্গে এবাড়ীর লোকের কোনো সদ্ভাব ছিল না। লার্‌মনটফ্‌ও জানিত দারিদ্র্যাভিমানী পিতা কোনোদিন এ বাড়ীর দুয়ার মাড়াইবেন না।

পিতার সঙ্গে আর সে-রকম দেখা করিতে পারিবে না,—এই বেদনা বালক-কবির মনের সকল শান্তি কাড়িয়া লইল। কতদিন স্তব্ধ দ্বিপ্রহরে ঘর হইতে পলাইয়া বাহির হইয়া বাড়ীর চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইত,—পিতার সে 'ছায়া-ঢাকা পাখী-ডাকা' ছোট্ট কুটীরখানি কতদূরে আছে, কে জানে? কোন্ পথে গেলে তাঁহার দেখা পাওয়া যাইবে—কে তাহাকে বলিয়া দিবে? পিতার আদর-যত্ন, তাঁহার স্নেহ-ভরা মুখখানি স্মরণ করিয়া কত রাত্রি তাহার বিনিদ্র কাটিয়া যাইত,—চোখের জলে উপাধান ভিজিয়া যাইত,—এই অতুল ঐশ্বর্য্য তাহার কাছে অসহ্য হইয়া উঠিত।

লার্‌মনটফ্‌ চৌদ্দ বৎসর বয়সেই ফরাসী, জার্ম্মান ও ইংরাজী তাঁহার মাতৃ-ভাষার মতোই আয়ত্ত করিয়া লইয়াছিলেন। সেই বয়সেই তিনি শ্বিলরের (Schiller) সমস্ত কাব্য-গ্রন্থ (original) পাঠ করেন এবং *Menschen und Leidenschaften* নামক একখানা গীতি-নাট্য লিখিয়া ফেলেন। এই নাটক রুষীয় ভাষায় লেখা হইলেও বইখানার নাম জর্ম্মানে রাখা হয়। এই ক্ষুদ্র নাটকখানাতে তাঁহার পিতার সংসারের দুঃখময় বর্ণনা আছে। শৈশবের বেদনার স্মৃতি কবির মনের উপর যে বিষাদের ছাপ আঁকিয়া দিয়াছিল—কৈশোরের এই প্রথম সাহিত্য-প্রচেষ্টায় তাহাই রূপ পাইয়াছে।

এই নাটক-রচনার কিছুদিন পরেই কিশোর-কবি তাঁহার স্নেহময় পিতার লোকান্তর-গমনের সংবাদ পান। এই দারুণ সংবাদ তাঁহার বুকে শেলের মতো আসিয়া বিঁধিল। মাতামহীর নিষ্ঠুরতার জন্য তিনি শেষ মুহূর্ত্তেও পিতার সঙ্গে দেখা করিতে পারিলেন না—যে পিতা রোগ শয্যায় কেবল তাঁহারি কথা স্মরণ করিতে করিতে তিল তিল করিয়া মৃত্যুর পথে অগ্রসর হইয়া গেলেন। এ আঘাত সহ্য করিতে কিশোর-কবির বুক একেবারে ভাঙিয়া পড়িল।

কবির এই সময়কার সকল কবিতাতেই একটা নিবিড় বেদনার সুর ধ্বনিত হইত। এই pessimismএর ভাবটা অনেকটা বায়রণের কবিতার মতোই ছিল বলিয়া অনেকে তাঁহাকে বায়রণের অনুকারক বলিয়া নিন্দা প্রকাশ করিত। কিশোর-কবি এসব কথায় কান দিতেন না, দিনের পর দিন ধরিয়া তিনি তাঁহার দুঃখের বীণায় ঝঙ্কার তুলিতেন। একদিন এক বন্ধুকে শুধু বলিয়াছিলেন—"I am not Byron, but another exile, so far unknown to men."

পিতার ন্যায় সৈনিকের জীবন যাপন করা শৈশব হইতেই তাঁহার লক্ষ্য হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি প্রায়ই বলিতেন—"This may not bring me to my first and foremost aim (a literary career), but it will serve the final one : it is certainly more pleasant to die with a bullet in one's chest than to fade away exhausted with old age."

পনেরো বছর বয়সে তিনি সেন্টপিটর্সবার্গের মিলিটারী কলেজে ভর্ত্তি হন। কিন্তু কবিতা-রচনার ভূত তাঁহার কাঁধ হইতে কিছুতেই নামিয়া যাইতে চাহে নাই। অনেক সময় তাঁহাকে ক্লাস ফাঁকি দিয়া পাশের শূন্যঘরে বসিয়া একাগ্র-চিত্তে কাব্য-রচনায় নিমগ্ন দেখা যাইত। কবির *The Angel* প্রভৃতি অনেক উঁচুদরের কবিতা এই সময়কার রচনা।

কবির প্রসিদ্ধ কাব্য-গ্রন্থ *The Demon*-এর খানিকটাও এই সময়কার রচনা। তখনকার একজন বড় সমালোচক *The Demon*-এর অসমাপ্ত পাণ্ডুলিপি পড়িয়া মুগ্ধ হইয়া আর এক বন্ধুকে লিখিয়াছিলেন,—"I was startled by the vividness of the tale and the sonorous music of the verse."

রুষ-কবি লার্‌মন্‌টফ্‌

শ্রীসত্যেন্দ্র দাস

৬

উনিশ বছর বয়সে লার্‌মন্‌টফের military training শেষ হয় এবং রুষ-সৈন্যদলে এক সৈন্যাধ্যক্ষের পদ প্রাপ্ত হন।

ইতিমধ্যে নানা কাগজে তাঁহার কবিতা বাহির হইতে থাকে এবং দেশের সুধীমণ্ডলীর দৃষ্টি ধীরে ধীরে এই নবীন কবির উপর আসিয়া পড়ে। সকলেই বুঝিতে পারিলেন, রুষ-সাহিত্যে এক নতুন চিন্তার ধারা শীঘ্রই প্রবাহিত হইবে, এবং সে-প্রবাহের উৎস এই তরুণ কবিটির মধ্যেই আছে।

এই সময় তিনি বায়রণের *The Dying Gladiator* এবং *Hebrew Melodies* অনুবাদ করেন। এতদ্ভিন্ন হাইনে (Heine) এবং গোটের (Goethe) কয়েকটি কবিতাও ভাষান্তরিত করেন।

তাঁহার এই সময়কার লেখা একখানি বিদ্রূপাত্মক প্রহসন censor দ্বারা বাজেয়াপ্ত হয়।

এর পরেই ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের শীতকাল আসিয়া পড়িল। এই শীতকালই রুষিয়ার কবিগুরু পুশ্‌কিনের শেষকাল। সমগ্র রুষিয়া তাহার প্রিয় কবির মৃত্যুতে শোকাচ্ছন্ন হইল। লার্‌মন্‌টফের চিত্তেও কবির অভাবের বেদনা শেলের মতো আসিয়া বাজিল। তিনি *On the Pushkin's Death* শীর্ষক এক কবিতায় কবি-গুরুর প্রতি তাঁহার মনোভাব ব্যক্ত করেন। সেই কবিতার শেষের দিকে অত্যাচারী রাজ-পুরুষদের অনাচার ও উদাসীনতার প্রতি তীব্র কষাঘাতও আছে,—"those standing, a greedy crowd, round the throne, the hangmen of Freedom, Genius, and Fame, hiding themselves under the shelter of the law and forcing righteous judgment and truth into silence."

এই কবিতাটি ছাপা হওয়ার আগেই জনসাধারণের মুখে মুখে এতদূর ছড়াইয়া পড়ে যে,ছাপানোর আর বিশেষ কোনো আবশ্যকতা থাকে না। পুশ্‌কিনের শবানুগমনকারী বিরাট জনতার সকলেই এই কবিতা হাতে হাতে নকল করিয়া লইয়াছিল।

এই কবিতার জন্য কবিকে তখনই বন্দী করা হয় এবং বিচারে তাঁহাকে ককেসসের পার্ব্বত্য-প্রদেশে নির্ব্বাসিত করা হয়। কিন্তু ককেসস্ পর্ব্বতের নিবিড় ধূসর সৌন্দর্য্যের মাঝে নির্ব্বাসনের দিনগুলিও তাঁহার কাছে মধুর হইয়া উঠিল। তিনি এই পার্ব্বত্য-দেশটিকে ভালবাসিয়া ফেলিলেন। প্রকৃতির এই মুক্ত-ধারার মাঝে নিত্য অবগাহন করিয়া তাঁহার কাব্য-প্রতিভা প্রদীপ্ত তেজে ও সরসতায় জাগিয়া উঠিল।

কিছুদিন পরেই মাতামহীর আবেদনে রুষ-সম্রাট তাঁহাকে নির্ব্বাসন হইতে মুক্তি প্রদান করেন। রাজধানীর কর্ম্ম-কোলাহলের মাঝে আবার তাঁহার জীবনের দিনগুলি অশান্তিতে কাটিতে থাকে।

৭

লার্‌মন্‌টফ্‌ 'লাইফ্‌ গার্ড' সৈনিকশ্রেণীভুক্ত ছিলেন। রাজনিন্দা অপরাধে তিনি ইহার কিছুদিন পরেই আবার অপর দলভুক্ত হইয়া ককেসসের পার্ব্বত্য-প্রদেশে প্রেরিত হইলেন। দক্ষিণ রুষিয়ার নীল নির্ম্মল আকাশতলে পরিভ্রমণ করিয়া তাঁহার সন্তপ্ত হৃদয় শান্ত হইয়া আসিল। দিগন্ত-বিস্তৃত তুষার-শুভ্র গিরিপুঞ্জের সান্নিধ্যে তাঁহার কল্পনা আবার তেজোময়ী হইয়া উঠিল। তিনি অজস্র কবিতা লিখিতে লাগিলেন। কবিতা লিখিতে হইবে বলিয়া তিনি কখনো কবিতা লেখেন নাই। কারণ, "Literary success did not impress L'ermontov in the least ; fame was nothing to him." তিনি প্রাণের আবেগে মনের চিন্তা-ধারাকে শুধু রূপ দিতেন। তাই তাঁহার প্রত্যেকটি কবিতা হইয়াছে তাঁহার জীবনেরই প্রতিবিম্ব। তাতে আছে প্রচুর রস-সৌন্দর্য্য, তাতে আছে প্রাণের প্রাচুর্য্য। কেবল তাঁহার কবিতা দিয়াই আমরা তাঁহাকে চিনিতে পারি।

এই সময়ে তাঁহার "*Song of the Tzar'Ivan Vasilyevich, the Young Oprichnik, and the Brave Merchant. Kalashnikov*" প্রকাশিত হয়। এই কাব্যে একটি নাটকের আকারে রুষিয়ার সামাজিক মনের সুন্দর একটি হুবহু চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। অনেকে ইহাকে হোমারের (Homer) Iliad-কাব্যের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। একজন নামজাদা সমালোচক এই

কাব্য সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন—"It crtainly places the author high above the personally lyric eliment; it is art itsef, pure art, stripped of all the individual veiling with which suffering humanity is apt to enwrap its creations—a thing which the poets and artists, after all, have the indisputable right to do!"

কবি নিজের চিত্ত-বিনোদনের জন্য হাইনের (Heine) সেই বিখ্যাত গীতি-কবিতাটির অনুবাদ করেন, যাহাতে উত্তর-দেশীয় তুষার-ভারাক্রান্ত মহীরুহ সূর্য্যালোক-প্রভাসিত দক্ষিণ দেশবাসী বৃক্ষটির স্বপ্ন দেখে! এই কবিতাটির ভিতর লারমন্‌টফ্‌ নিজের জীবনের অনেকখানি সত্যের সন্ধান পাইয়াছিলেন। কারণ, তিনি দেশে থাকিতে নিজের মনের সমস্ত অশান্তি ও বিষাদের জন্য উত্তর-দেশের জল-বায়ুকেই বিশেষ করিয়া দায়ী মনে করিতেন। দক্ষিণের ককেসস্‌ প্রদেশের ছোট তুচ্ছ দৃশ্যটি পর্য্যন্ত তাঁহার মনে স্বপ্ন রচনা করিত।

মাত্র তেইশ বছর বয়সে কবি তাঁহার সেই অসম্পূর্ণ কাব্য-গ্রন্থ *The Demon* শেষ করেন। *The Demon* লারমন্‌টফের, তথা রুষ-সাহিত্যের, মহাকাব্য। ককেসসের নিরালা উপত্যকাতে কবি একদিন তাঁহার কাব্য-মনকে একটি ফুলের মতো কুড়াইয়া পাইয়াছিলেন, সেই মনকেই নিয়োজিত করিলেন ডিমন আর তামারার (Tamara) সৃষ্টিতে, আর তাঁহার সৃষ্টির ফুলটিকে উৎসর্গ করিলেন সেই বিরাট ককেসসেরই উদ্দেশ্যে। ভূমিকায় লিখিয়াছেন,—

"হে ককেসস্‌! হে ভীমকান্তি নগাধিরাজ! আমার এই আলস্য-প্রসূত কাব্য তোমারই নামে উৎসর্গ করিলাম। তুমি ইহাকে সন্তান-স্বরূপে আশীর্ব্বাদ কর; তোমার তুষার-শুভ্র স্নিগ্ধ শিখর-ছায়া ইহার উপর বিস্তৃত কর। আমার আশৈশব চিন্তারাশি অদৃষ্টবশে তোমারই স্নেহ-বন্ধনে সম্বদ্ধ। এমন কি যেখানে তোমার মাহাত্ম্য সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত—সেই উত্তর-প্রদেশে থাকিয়াও আমি তোমারি হৃদয়াভ্যন্তরে বাস করিতাম। সর্ব্বদা—সর্ব্বত্র আমি তোমারই ছিলাম।

"শৈশবে শঙ্কিত-পদে আমি তোমার শুভ্র শিরস্ত্রাণ-শোভিত সর্ব্বোচ্চ গিরি-শিখরে অধিরোহণ করিতাম। যেখানে পবন-দেব তাঁহার স্বাধীন পক্ষপুট প্রসারিত করেন, ঈগলেরা কোন্‌ দূরদেশ হইতে বিশ্রাম-লাভের আশায় ছুটিয়া আসে,—আমিও মনে মনে আপনাকে তথায় উত্তোলিত করিয়া কল্পনাবশে তাহাদেরই একজন বিমানচারী সহচর হইয়া পড়িতাম।

"তারপর বিষাদে, বেদনায় কত বছর কাটিয়া গেল; আবার আসিয়া তোমার সহিত মিলিত হইলাম। আজন্মের সেই সুহৃদকে তুমি আবার সাদরে, সোল্লাসে আলিঙ্গন করিলে। সেই আলিঙ্গন আমার বিষাদে বিস্মৃতি ঢালিয়া দিল,—বন্ধুর ন্যায় বন্ধুর বিলাপ-গীতির প্রতিধ্বনি করিল।

"আজ আবার, হে পৃথিবী-পতি! এই নিশীথে উপত্যকা-তলে দাঁড়াইয়া আমার সমস্ত চিন্তা ও সঙ্গীত তোমারই করে সমর্পণ করিতেছি।"

লারমন্‌টফের Demon (ভগবানের প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি) একটি অপূর্ব্ব সৃষ্টি। গ্যেটের (Goethe) Mephisto বা বায়রণের Lucifer-এর মতো লারমন্‌টফের Demonএর মনে বিরাট প্রতিদ্বন্দ্বিতার বাসনা ছিল না। কিম্বা মিলটনের Satanএর মতো "the study of revenge, immortal hate" তাহার মনে স্থান পায় নাই।

লারমন্‌টফের Demon স্বর্গ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া এই মাটির পৃথিবীর উপর দিয়া যুগের পর যুগ ধরিয়া বিচরণ করিতে লাগিল। আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিল—

"The caravans of wandering planets
Thrown into vastness......"

মাটির দিকে চাহিয়া দেখিল—

"A carpet woven of rich splendour,
Luxurious vales of Grùzia's land.

শ্রীসত্যেন্দ্র দাস

A blissful, brilliant nook of Earth !
'Mid stately ancient pillared ruins,
Relucent, gurgling rivulets run
And ripple over motley pebbles ;
Between them, rose-trees where the birds
Sing love-songs, while the ivy girds
The stems, and crowns the foliage-temples
Of green chinara (১) ; and the herds
Of timid red-deer seek the boon
Of mountain eaves in saltry noon ;
And sparkling life, and rustling leaves,
And hum of voices hundred-toned,
The sweetly breathing thousand plants,
Voluptuous heat of skies sun-laden,
Caressive dew of gorgeous night,
And stars -as clear as eyes of maiden,
As glance of Grùzian maiden bright !"

কোথাও দেখিতে পাইল—

"And golden clouds, due north, all day
Flew rapidly along its way
From far-off southern countries roaming.

এমনি করিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। কোনও দৃশ্য বা দেশই তাহার কাছে ভালো লাগে না,—

"And everything that met his eyes
He did but hate, or else despise."

এমনি করিয়া তে ঘুরিতে একদিন ককেসস্ পর্ব্বতের তলায় Gruzia প্রদেশের বহু প্রাচীন একটি বিরাট প্রাসাদ তাহার নজরে পড়ে। এই প্রাসাদে থাকে তামারা (Tamara)—এই মাটির পৃথিবীর সুন্দরী প্রতিদিন যখন—

"The sun, behind a far-off mountain,
Is half set in a sea of gold"—

সেই রক্তগোধূলি-বেলায় তরুণী রূপসী তামারা—

"Her white veil fluttering down the path,
Descends the steps and fetches water
From clear Arágva's (২) azure bath."

তামারার প্রিয়তম থাকে দূর-দেশে।......সেই দূর আজ কাছে আসিবে, পর আজ আপন হইবে! তামারার বিবাহের লগ্ন আসিয়াছে। দূত আসিয়া খবর দিয়াছে—তামারার প্রিয়তম বিবাহের জন্য শোভাযাত্রা করিয়া আসিতেছে।

তামারা তাহার সঙ্গীদের লইয়া পাহাড়ের এক নির্জ্জন উপত্যকায় এক ঝরণার ধারে নৃত্য করিতেছে! কারণ সে জানে,—

"It was the last time she would dance :
To-morrow's morn would see her enter
A different world: wedlock would bring
The fate of servitude with it ;
Gudál's sole heiress, Freedom's darling,
She was to leave her home and dwelling,
Meet stranger kinsmen—and submit."

তামারার মুখের উপর কত বিচিত্র ভাবের ছায়াপাত হইতেছে! একবার তাহার সুন্দর মুখখানি অকারণে রক্ত-জবার মতো লাল হইয়া উঠিতেছে, পাত্‌লা রঙীন ঠোঁটদুটি কী এক আবেগে কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে—বুক দুলিতেছে; আবার কখনো বা একটা অজ্ঞাত আশঙ্কায় তাহার সুন্দর মুখখানি কালো হইয়া আসিতেছে। কিন্তু-

" Yet were her movements so expressive,
So stately, simple and caressive,
That if the Demon were to fly
Her way, and chance to gaze upon her,

(১)একরকম শাখাবহুল গাছ।

(২) গ্রাজিয়া (Gruzia) প্রদেশের একটি নির্ম্মলসলিলা স্রোতস্বিনী।

He'd to mind his former kin,

Would turn away and heave a sigh..."

ডিমন্ তাহাকে দেখিল। দেখিল, পৃথিবীর মাটিতে তাহার হৃত স্বর্গের পারিজাত আসিয়া ফুটিয়াছে—ফুটিয়া, রক্তে ফাটিয়া পড়িতেছে! তামারার দিকে সে চাহিয়া রহিল। চোখে আর পলক পড়ে না······নিঃশ্বাস যেন থামিয়া গিয়াছে!······এই শুভ মুহূর্ত্তেই তাহার চোখের সম্মুখে পৃথিবীর রূপ যেন বদ্‌লাইয়া গেল।—

"......................and at once

The silent desert of his spirit

Rang suddenly with joyful tones ;

And once again the sacred grandeur

Of Love and Good and Beauty shone

Within his soul. All gloom was gone."

দিনের কমলটি ধীরে ধীরে মুদিয়া আসিল—

"....................The scarlet glow

Has left the summits' ice and snow ;

A fog has risen round the place."

তামারার প্রিয়তম আসিয়াছে। ঐ বরযাত্রীদের আগমন-ধ্বনি পর্ব্বত-কন্দরে বাজিয়া উঠিল!—

"The impatient bridegroom, in great haste,

Has tired his steed: he cannot waste

A moment of his marriage feasting."

সহসা দূরে অসহায় কাতর-ধ্বনি উঠিল। কে যেন বিপন্ন হইয়া সাহায্যের জন্য চীৎকার করিতেছে। ······ বর সেই মুহূর্ত্তে কাহারো নিষেধ-বাক্য না শুনিয়া ঘোড়ায় চড়িয়া পাহাড়ের উপর ছুটিয়া গেল!

আর সে ফিরিয়া আসিল না!

ককেসসের আকাশচুম্বী চূড়ার পশ্চাতে সূর্য্য নামিয়া গেল। অন্ধকার তার কালো ডানা মেলিয়া সমস্ত উপত্যকা ঢাকিয়া ফেলিল।······

বিবাহের উৎসব-মেলা ভাঙিয়া গেল।

"The festival is all confusion ;

The maidens weep. The castle yard

Is crowded full..........."

তামারা তাহার শূন্য বাসর-শয্যায় এলাইয়া পড়িল। দুটি কাজল চোখে অশ্রুর শ্রাবণ নামিয়া আসিল।······ ওগো, তাহার প্রিয়তম তো প্রতিশ্রুতি পালন করিয়াছিল। মৃত্যুর দূত আসিয়া এমন অসময়ে তাহাকে ছিনাইয়া লইয়া গেল—সে কি করিবে? বিবাহের উৎসব-ক্ষেত্রের দুয়ারে তো সে আসিয়াছিল!······আহা, চিরদিনের মতোই সে চলিয়া গেল বুঝি! আর সে ঘোড়ায় চড়িয়া শোভাযাত্রা করিয়া তামারাকে লইতে আসিবে না!—

"Her prince had kept his word, though slain,

And to his bridal feast had come.

Alas! his life is gone for ever,

He mounts his steed never again!..."

বেদনার আঘাতে তামারার তরুণ হৃদয় ভাঙিয়া আসিল। জীবনের বেঁচে-থাকার সমস্ত সাধ-আকাঙ্ক্ষা যেন তাহার ফুরাইয়া গেছে।—

"Tamara, fallen on her bed,

Sobs with a lorn and piteous feeling.

Tear follows tear in painful fleetness,

Of grief she cannot have her fill..."

এমন সময় সে এক অপূর্ব্ব কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইল, কে যেন স্বপ্নে তাহাকে স্বর্গের প্রলোভন দেখাইয়া বলিতেছে,—

"Withhold thy tears: they burn the colour

Of virgin cheeks, and dull thy view ;

They cannot bring to life the dead—

They are not drops of magic dew."

....

"In the boundless azure ocean,

Without rudder, without sails,

Gently float in stately motion

Choirs of stars through misty ways,

শ্রীসত্যেন্দ্র দাস

"Cross the boundless fields of Heaven,
Moving leisurely through space,
Flocks of fleecy clouds evasive
Idly pass, and leave no trace.
Hour of meeting, hour of parting,
Are no joy or grief to them ;
Time to come begets no wishes,
Past finds no regret, with them..."

তমারার সমস্ত শরীর হিম হইয়া আসিতেছে ! কোন্ মায়াবী এমন করিয়া স্বপ্ন-পথে আসিয়া তাহাকে প্রলোভন দেখায় !—

একটু পরে আবার সে শুনিতে পাইল,—

As soon as night throws silky veiling
O'er Caucasus, and all the world
Grows still and fairy-like, bewitched
By Nature's magic wand and word ;
As soon as Zephyrs flutter shyly
Across the faded grass, and gaily
Flies out of it the lurking bird ;
As soon as under vine and maize
The flowers of night find dew, and raise
Unfolding petals with relief ;
As soon as from behind the mountains
The golden crescent glides, and steals
A glance upon thee furtively—
I shall fly down each night to thee,
Shall guard till dawn thy virgin slumber,
And on thy lashes dreams of amber
I'll waft, to woo them prettily......"

তার কণ্ঠস্বর যেন নিশীথ-রাত্রির অন্ধকারে গলিয়া গলিয়া পড়িতেছে। সে-স্বর তামারার মনে এক সুরের মায়াজাল বিস্তার করিল, তাহার অন্তরকে স্পর্শ করিল। সে চমকিয়া চাহিয়া দেখিল, এক বিষন্ন ছায়ামূর্ত্তি—স্বর্গবাসী দেবতা সে নয়, এই মাটির পৃথিবীতে এক নির্ব্বাসিত ভিখারী, কী বেদনা-ভরা দৃষ্টি তাহার !..."সে যেন গ্রীষ্ম-শেষের রক্ত-গোধূলি। দিনও নয়, রাতও নয়...আলোও নয়, অন্ধকারও নয় !"

"He was like lucid summer twilight :
Not day, nor night ; not sun, nor gloom !"

প্রতি রাত্রিতে স্বপ্নের পথে সেই ছায়া-মূর্ত্তি আসিয়া তামারাকে প্রেমের বাণী শুনায়—"তাহার কুমারী-সুপ্তির দুয়ারে প্রহরী হইয়া জাগিয়া থাকে,"—মুক্তি ভিক্ষা করে।

তামারা এক দিন ব্যাকুল হইয়া পিতাকে বলিল,—

"I'm haunted with the dire poisonous dreams :
A hellish spirit has the power
Of torturing me with them, it seems.......
I'm perishing ! Have pity ! Send me
To humble nunnery's holy sway :
There I shall be in Saviour's keeping,
He will behold my grief and weeping ;
To Him I'll come in my dismay.
Life's joyance all is doomed so quelling......
Beneath the holy church-towers boom
Let dusky cell become my dwelling,
My early grave and life-long tomb."

তামারা 'যৌবনে যোগিনী' সাজিল—তামারা সন্ন্যাসিনী হইল।

কিন্তু সেই ভীষণ স্বপ্ন-দুঃখের হাত হইতে সে মুক্তি পাইল না। সেখানেও সেই বিষাদ-মূর্ত্তি, বেদনা-কাতর দুটি চোখের নীরব আকূতি, সেই আর্ত্ত কণ্ঠস্বর, সেই মুক্তি-ভিক্ষা !... তামারা উপাসনায় বসিয়া সেই মুখ দেখিয়া চমকিয়া উঠে, তাহার উপাসনা ভাঙিয়া যায়—ভগবানের কাছে তাহার ব্যথিত অন্তরাত্মার নিবেদন পাঠানো হয় না! রাত্রিতে নিদ্রায় যখন তামারার দুটি চোখের পাতা ভারি হইয়া আসে, সেই মিনতি-কাতর কণ্ঠস্বরে তাহার তন্দ্রা ছুটিয়া যায়। ধূপ ধূনার ম্লান-অন্ধকারে সহসা সন্ধ্যার তারার মতো সে-মুখ ভাসিয়া উঠে—

"......in the bluish haze of incense
He gently glimmered like a star."

প্রকৃতির অপরূপ দৃশ্যসকল তাহার চোখের উপর দিয়া ছায়ার মতো ভাসিয়া যায়,—

"Both near the nunnery and far
The glens and mountains spread in silence.
Pale purple-hued the snowy range,
Clear-cut against the sky ; and strange
And beautiful its evening change
Into a veil of gold and scarlet."...

কিন্তু তামারার চোখে এ-সব সৌন্দর্য্যের মায়াঞ্জন বুলায় না।

"In joys supreme no more takes part,
The world she sees by shadows marred;
In Nature all is cause for torment.
First rays of dawn, or midnight moment,
Both see her prostrate on the floor,
And sobing 'fore the holy ikon."

তামারার প্রার্থনার সেই আর্ত্তস্বর শুনিয়া রাত্রির পথিক পথ চলিতে চলিতে চমকিয়া উঠে। মনে ভাবে—

"Is it a mountain spirit, chained
Within a cave, who thus is wailing ?"

পথিক ভগবানের নাম উচ্চারণ করিতে করিতে তাড়াতাড়ি সন্ত্রস্তচিত্তে সে পথ পার হইয়া যায়।

নিশীথ রাত্রে সঙ্গীতের সুর ডিমনের (Demon) কানে আসিয়া বাজিল। সে চমকিয়া উঠিল। সে তো সঙ্গীত নয়—যেন সুপ্তির অতল সায়র হইতে ভাসিয়া আসিল একটি সুরের শতদল !—

"...gently sounds, which flowed
In even streams, like tears of rare
Angelic tenderness a song
For earth in Heaven born and nourished..."

ডিমনের মনের ভিতরের একটা পর্দ্দা যেন এই সুরের আঘাতে ছিঁড়িয়া গেল। ডিমন এই প্রথম বুঝিল, সে ভালবাসিয়াছে......

"Then first the Demon knew he loved ;
Knew how he yearned, and longed for love,
In sudden fear, he thought to fly...
But in that first, heart-rending anguish
His wing was stayed—he had no power !
And, marvel ! from his veiled eye
There dropped a tear... .."

ডিমন ধীরে ধীরে তামারার কক্ষে প্রবেশ করে।

তামারা বলে, তুমি কে ? তোমার কথায় যে ভয় হয় !

"Oh, who art thou ? Thy words bring terror.
Who sent thee—Hell or Paradise ?
What wilt thou ? Tell me !"

ডিমন শুধু বলে, তুমি সুন্দর !

তামারা ব্যাকুল হইয়া আবার বলে, কিন্তু তুমি কে ? বল—উত্তর দাও ?

ডিমন বলে,—

"I am he whose voice has made thee listen
Throughout the midnight's calm and rest ;
Whose thoughts have reached thee like a whisper,
Whose vision through thy dreams would glisten,
Whose sadness thou hast dimly guessed."

'সুন্দরের স্বর্গ হইতে নির্ব্বাসিত আমি—আমি অভিশপ্ত, আমি এই পৃথিবীর পরবাসী।'

"I am he whose glance all hope doth wither
As soon as hope begins to bloom..."

স্বর্গে-মর্ত্ত্যে এমন কেউ নাই যে আমাকে ভালোবাসে।

"....................I am Nature's foe,
The world's despair, and Heaven's woe."

তবুও আমি তোমার পায়ের তলায় পূজার নৈবেদ্য লইয়া আসিয়াছি--

শ্রীসত্যেন্দ্র দাস

"Yet at thy feet I worship thee !
I bring to thee my gentle prayer
Of love, my awe and sacred fears ;
I come to thee in earthly torture—
My first humility of tears."

ওগো আমার 'অন্ধকারের অন্তরের ধন,' আমার সমস্ত প্রাণ-মন তুমিই লইয়াছ। আজ আর 'অনন্ত' লইয়া আমি কাল কাটাইতে পারি না,—মাটির পৃথিবীর একটি ক্ষুদ্র প্রাণের মধ্যে আমার অন্তর বাসা বাঁধিয়াছে, নীড়ের ব্যথায় আমার বুক ভরিয়া উঠিয়াছে! তোমাকে ছাড়া আমার 'অনন্তে' কি লাভ? "What is eternity without thee?"তোমার এককণা দৃষ্টির প্রসাদ আজ আমাকে দাও— এক টুক্‌রা ভালোবাসা আমার মুক্তির জন্য ব্যয় কর।—

"Thou couldst restore me to the good
By a single word ! I gladly would,
Clad in thy holy love, appear
An angel new in radiance clear."

আজ আমি তোমার দাক্ষিণ্যের দুয়ারে মুমূর্ষু ভিখারী। আমি যে তোমায় ভালোবাসি!......

তামারার সমস্ত অন্তর কাঁপিয়া ওঠে। চীৎকার করিয়া বলে, ওগো আমাকে তুমি ছাড়িয়া দাও—

"Oh, leave me, Spirit of Temptation !
Be silent, I'll not believe !
Thou art my foe......Alas ! I cannot
Pray any more. A fatal poison
Has pierced my weak and doubting mind...
Thou art my peril. Sounding kind,
Thy words are fire and destruction......
Oh, tell me—why thou lovest me ?"

বলো—কেন তুমি আমাকে ভালোবাসো?

ডিমন বলে, কেন? কেন তোমাকে ভালোবাসি— তাহা জানি না। কিন্তু ভালোবাসি—

"Inflamed with spirit new, I proudly
Down from my guilty head now throw
The wreath of thorns. I fling my woe,
My past—to dust. My paradise,
My hell, henceforth are in thine eyes !"

তুমি বুঝিবে না মানবী, আমার বেদনা—আমার ক্ষুধা! পৃথিবী-সৃষ্টির প্রথম দিন হইতে আমি তোমাকে চাহিয়াছি—

"Since first the earthly world began,
In my mind's eye imprinted ever
Thine image seemed to fill the ether,
And through eternity it ran.
Thy name was sounding in my ears,
Confusing peace and contemplation......"

তামারা বলে, তুমি স্বর্গের অভিশপ্ত, তোমার বেদনা-বোধে আমার অন্তর সাড়া দেয় না। তুমি ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ......

ডিমন বাধা দিয়া বলে, কিন্তু তোমার বিরুদ্ধে কোনো পাপ করিয়াছি কি?

আঃ, থামো। ওরা শুনতে পাবে—

না। আমরা এখানে একলা।

ভগবানও কি নেই?

তিনি আমাদের দিকে চাহিবেন না। তিনি তাঁহার স্বর্গ লইয়াই ব্যস্ত আছেন, কারণ, স্বর্গ আরো সুন্দর!

তামারা চীৎকার করিয়া বলে, কিন্তু নরক?—

"But Hell ? But punishment and
tortures ?"...

ডিমন বলে, আমি তাহা গ্রাহ্য করি না। তুমি তো আমার হইবে! ..আমি চাই মুক্তি...এই অনন্ত বেদনা থেকে মুক্তি, সে-মুক্তি আছে তোমার অতল কাজল-চোখে। একলা আমি ভগবানের ক্ষমা পাইব না, তুমি আসিলে আমার স্বর্গের দুয়ার আবার মুক্ত হইবে।

তামারা কিছুক্ষণ ভাবে। তারপর মোহাবিষ্টার মতো বলে, আমার চিন্তা সব মোহাচ্ছন্ন হইয়া গেছে। আমি কিছু বুঝি না. এতো প্রতারণা নয়?

ডিমন বলে, সৃষ্টির প্রথম উষার নামে শপথ করিতেছি—

"I swear by dawn of the Creation,
By the decay of earthly sooth,
By the disgrace of Crime and evil,
And by the triumph of the Truth.
....
I swear by Hell, I swear by Heaven,
I swear by sacredness, by thee,
Thy latest look my soul enslaving,
Thy first and guileless tear for me;
By breath from lips so pure and ireless,
Thy silky tresses' wave and shine,
I swear by suffering, elation,
And by my love for thee, divine."

আমি আমার বেদনা দিয়া শপথ করিতেছি...হে আমার অন্তরলোকচারিণী, তোমাকে আমার সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিলাম, আমি চাই তোমার প্রেম।...তুমি দাও একটি মুহূর্ত্ত—আমি দিব অনন্তকে তোমার কণ্ঠহার করিয়া।

"A host of spirits in my service
I'll bring, obedient, to thy feet;
Crows of ethereal fairy-maidens
Will wait, thy every wish to meet.
The Crown which Evening Star is wearing
I'll tear from her, and crown thy head;
I'll take the dew from evening flowers
To shine on it in diamonds' stead;
I'll take a sunset ray of scarlet,
And gird thee with its ribbon light;
I'll saturate the air around thee
With purest fragrance of the night..."

'সন্ধ্যা-তারার মায়া-মুকুট ছিনাইয়া আনিয়া তোমার মাথায় পরাইয়া দিব, আকাশ হইতে যে-শিশির পৃথিবীর ফুলে ঝরিয়া পড়ে—তাহা কুড়াইয়া তোমার মুকুটের হীরার পাশে বসাইয়া দিব, সূর্য্যাস্তের শেষ রক্ত-রেখাটুকু লইয়া তোমার কটিদেশ বেড়িয়া পরাইব—রাত্রির সুবাসে তোমার কেশকে সুবাসিত করিব...তুমি দাও শুধু একটি মুহূর্ত্ত একটি সঘন চুম্বনের পাত্রে...'

'তামারার ওষ্ঠ নড়িয়া উঠিল। ছায়া-মূর্ত্তির অধর তামারার অধর স্পর্শ করিল। একটি মুহূর্ত্ত! জীবন ও মৃত্যুর সংঘর্ষের মতো রহস্যময় শব্দ জাগিয়া উঠিল!'

তামারার পৃথিবীর জীবন সেই একটি মুহূর্ত্তেই নিঃশেষে ফুরাইয়া গেল।...

"But all was peace again, quiescence
Betraying only rustling leaves
And whisper of the brook that weaves
Itself into the mountain cleft..."

৯

১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে কবির *Duma* (A thought) কাব্য প্রকাশিত হয়। এই কবিতায় কবির সমসাময়িকদের প্রতি তাঁহার মনোভাব অনেক জায়গায় ব্যক্ত হইয়াছে। তা'ছাড়া —"as a piece af art it occupies a high place in Russian literature and it is the severest verdicts on one's own generation one could possibly imagine." (Wilfrid Blair)। তাঁহার রোমাণ্টিক কাব্য *The Demon*এর সঙ্গে এই pessimistic কাব্য *Duma*র একটা চমৎকার মিল আছে। এই দুই কাব্যেই মানবের দুঃখ-বোধের গভীরতার ভিতর দিয়া জীবনের রহস্যকে খুঁজিয়া বাহির করিবার প্রয়াস আছে।—আর আছে, জীবনের অদম্য পিপাসা—জীবনকে শত আঘাত বেদনা-নৈরাশ্যের ভিতর দিয়াও একটি অনাবিল মাধুর্য্য ও অক্ষত মহিমায় সফল করিয়া তোলা।...*Duma*র শেষের দিকে আমরা পাই,—

"There's no one with whom to shake
hands at the hour of heart's pain;
All's solitude, dulness, and sadness.
Desires? What's the use of e'er wishing
and longing in vain?
While years fly, the last years of youth
with its gladness.

পাহাড়ী ছাগল

শিল্পী—শ্রীমণিপ্রধান
(নেপালী চিত্রকর)

শ্রীসত্যেন্দ্র দাস

To love? But love whom? To love just
for a time is worth naught;
Eternity love cannot follow.
Look inward: all trace of the past with
oblivion is fraught—
Both torments and joys, all is worthless
and hollow.
What's passion? 'tis sure, soon or late
its sweet ailment will fly,
When reason's assertion is heareth...
And as one looks round with attentive and
passionless eye,
A silly and meaningless joke life appeareth."

ইহার পরে ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে কবির গদ্য উপন্যাস *The Hero of our Own Times* প্রকাশিত হয়। ইহাই "the first psychological novel that appeared in Russia." এই উপন্যাসের নায়ক Pechorin-এর চরিত্র কবির নিজের জীবনের সঙ্গে একবারে খাপ খাইয়া যায়। নিজের মনের বেদনাকে রূপ দিতে গিয়া তাঁহার সৃষ্টির মধ্যে তিনি নিজেকেই দাঁড় করাইয়া দিয়াছেন।...জীবনের নিষ্ফল ও সংক্ষুব্ধ প্রেমের গভীর দুঃখের কথা কবি কত না বিচিত্র ভাবে ও ভাষায় পাঠকের চোখের সমুখে মেলিয়া ধরিয়াছেন। তিনি যেন গৃহ, সমাজ ও জগৎকে এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে দেখিয়া, নিজের ও আমাদের অন্তঃপীড়ার নিগূঢ় তত্ত্বটি বাহির করিয়া দিয়াছেন! অবিচলিত সদাজাগ্রত আবেগ ও চেতনার জন্য তিনি চিরকাল রুষ-মনের মহলে অমর হইয়া থাকিবেন।

১০

এই সময় কবি অসুস্থতানিবন্ধন, চিকিৎসকের পরামর্শে ছুটি লইয়া পাতিগরস্কের সৈনিক-আশ্রমে অবস্থান করিতেছিলেন। বাইওভেজ্ নাম্নী এক মহিলার প্রণয় লইয়া তাঁহার সহিত মেজর মার্টিনফ্ নামক আর এক সৈনিকের কতকটা ঈর্ষার ভাব চলিতেছিল। কবি মার্টিনফ্‌কে দেখিতে পারিতেন না। তাহার সম্বন্ধে নানাপ্রকার ব্যক্তিগত কুৎসা রটাইয়া তাহাকে বাইওভেজের নিকট হীন ও অপদস্থ করিতে চেষ্টা করিতেন। কলহটা ক্রমশ বিলক্ষণ পাকিয়া উঠিল, এবং শেষ পর্য্যন্ত একটা 'ডুয়েল' অপরিহার্য্য হইয়া পড়িল। বন্ধুগণের সহস্র আয়াস ও সাবধানতা সত্ত্বেও উভয়ে একদিন মিলিত হইলেন।...এই 'ডুয়েলে' কবি মাত্র সাতাশ বৎসর বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হন।...মৃত্যুর পর তাঁহার পকেটে একটি সুবর্ণহার দৃষ্ট হয়। গুলির আঘাতে হারটি ছিন্ন ও রক্তাক্ত হইয়া গেছে।...কবি তাঁহার প্রণয়িনীর নিকট হইতে পূর্ব্বদিন উহা চাহিয়া লইয়াছিলেন।

লার্‌মন্টফের জীবনে দুঃখ-বেদনার আবিলতার মধ্যে সৌন্দর্য্যই সত্য—এই তত্ত্বটি সোনার পদ্মের মতো ফুটিয়াছিল। তাঁহার কাছে বহিঃসৌন্দর্য্য বা অন্তঃসৌন্দর্য্যের কোথাও একটুকু ফাঁক পড়িবার জো নাই।...বাস্তবের পৃথিবীতে সৌন্দর্য্যের স্বর্গ সৃষ্টি করাই আর্টিষ্টের কাজ—তাই তিনি তাঁহার প্রত্যেকটি লাইন পদলালিত্যে, উপমামাধুর্য্যে ও ভঙ্গীর সরসতায় অপূর্ব্ব করিয়া তুলিয়াছেন।

সাহিত্যিকের মনের উপর যুগের বা দেশের প্রভাব থাকে না—এমন নয়। লার্‌মন্টফের মনের উপরেও সে প্রভাব ছিল। কারণ, আমরা সাধারণত দেখিতে পাই—কোনো দেশের কবির 'কল্পনার ফানুস', সেই যুগের এবং সেই দেশের নরনারীর জীবনের সমস্যার ধোঁয়াতেই পূর্ণ,—তাঁহার রস-সৃষ্টির মাল-মশ্‌লা সেই যুগেরই কথা।

কিন্তু কোনো বিশেষ যুগের, বিশেষ দেশের কথা রসবস্তু হইয়া ওঠে তখনি, যখন তাহার সহিত অনন্ত যুগের, অনন্ত দেশের—অনন্ত মানব-মনের যোগ থাকে।

লারমন্টফের কাব্যে এই যোগ-সূত্রটুকু আছে বলিয়াই বিশ্বের সঙ্গে তরুণ-বাঙালীর মনও আজ তাঁহার কাব্যে সাড়া দিয়া উঠিয়াছে।

প্রতীক্ষা

-গল্প-

—শ্রীসমীরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়

সলিলের প্রভূত অর্থ ছিল না বটে, কিন্তু তাহার সংসারে কোন দুঃখ ছিল না। সংসারে সে আর তাহার অতি আদরের ভার্য্যা মণিকা। তাহাদের সন্তানাদি নাই। সলিল যা মাহিনা পাইত সুখে স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাইত। দুইটি তরুণ তরুণী দিবানিশি পরস্পরের প্রেমে ভরপুর হইয়া থাকিত। এবার পুজার সময় কোথায় বেড়াইতে যাওয়া হইবে ইহা লইয়াই সেদিন সকালে স্বামী স্ত্রীর ভিতর তর্ক চলিতেছিল।

মণিকা অভিমানিনী। সে যে জায়গার নাম বলিতেছে তাহাই সলিল 'না' বলিতেছে বলিয়া সেও সলিল যে জায়গা বলিতেছে তাহা মনঃপূত করিতেছে না। মণিকার পিতা পশ্চিমে চাকুরী করিতেন বলিয়া মণিকা অনেক দেশ দেখিয়াছিল; সে জন্য একটা সম্পূর্ণ নূতন জায়গা বাহির করিতে সলিলকে বেশ বেগ পাইতে হইতেছিল। শেষে বিরক্ত হইয়া সলিল বলিল, "দুর হোক গে, তা হ'লে তো দেখছি বিলেতে নিয়ে যেতে হয় বেড়াতে।"

মণিকা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া বলিল—"ওগো মশাই, আমি কি সে বরাত করেছি।"

সলিল বলিল, "উঃ, বরাত করলে তবে। বিলেতটা যে দেখছি তোমার কাছে মহাতীর্থ হ'য়ে দাঁড়াল।"

মণিকা জবাব দিল—"হবে না? তোমার মনিবের দেশ—তমসার তীরে নন্দন-নগরী। যাক্ ওসব কথা, এখন কোথায় যাবে ঠিক কর।"

আবার আরম্ভ হইল—"কাশী?"—"না।" "গয়া?" "পিণ্ডি দেবার দরকার নেই।"

"এলাহাবাদ?" "দেখে চোখ প'চে গেছে।"

সলিল এবার নিরুপায়ের মত বলিল, "আমি ত আর বাপু পারি না। যা হক্, এবার লটারী কর। চোখ বুজে এই জায়গার লিষ্টে যে জায়গার নামের উপর আঙুল দেবে সেই জায়গায় যাব।"

স্থান-নির্ব্বাচনের নূতন রকম ব্যবস্থা দেখিয়া মণিকা খুসী হইয়া চোখ বন্ধ করিয়া আঙুল রাখিল। স্থান নির্ব্বাচিত হইল গোরক্ষপুর। উভয়েই মহাখুসী; নূতন জায়গা কেহ দেখে নাই; তাহার উপর বেশ দুর।

তাহার পর জিনিষপত্র গুছাইবার পালা। মণিকা নিপুণা গৃহিনী, সে সারাদিন ধরিয়া সংসারের যাবতীয় প্রয়োজনীয় জিনিষ গুছাইয়া লইতেছিল। নূতন জায়গা, একমাস থাকিতে হইবে। সলিল মুগ্ধ হইয়া এই কর্ম্মপটু গৃহিনীর দিকে চাহিয়া থাকে। তাহার সংসারের মূর্ত্তিমতী শান্তি। যাহা পাইয়াছে তাহা লইয়াই ভরপুর খুসী। যাহা পায় নাই তাহা পাইবার আগ্রহও নাই। তাহার সুন্দর মুখ সারাদিনের পরিশ্রমে রাঙা হইয়া উঠিয়াছে, তাহার এলায়িত কেশরাশি পিঠ ছাপাইয়া পড়িয়াছে, তবু তার আয়ত নেত্রদুটি খুসীতে উজ্জ্বল, শান্তিতে ভরপুর। সংসার-সুখের পরিপূর্ণ আনন্দে এই তরুণীটি যেন নিজেকে আত্মহারা করিয়া ফেলিয়াছিল।

সপ্তমীর দিন তাহারা রওয়ানা হইল।

রাত্রি দশটার সময় বারাণসীতে গাড়ী বদল করিবার সময় সলিল দেখিল পুরুষের গাড়ীতে অত্যন্ত ভিড়,—বিশেষ অশিক্ষিত হিন্দুস্থানী লোকের। তাই মণিকাকে সে মেয়েদের গাড়ীতে দিল। গাড়ীতে অন্য স্ত্রীলোক ছিল না, শুধু একটি নেপালী স্ত্রীলোক চুপ করিয়া শুইয়াছিল। সে নাকি নারকাটিয়াগঞ্জে যাইবে।

গাড়ী চলিল, রাত্রির জমাট অন্ধকার ভেদ করিয়া নিস্তব্ধ প্রকৃতির নৈশ নীরবতা আলোড়িত করিয়া চলিল, দূরে

শ্রীসমীরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়

দূরান্তরে,—ক্ষুব্ধ দৈত্যের মত, ব্যথিত অজগরের মত গর্জ্জন করিতে করিতে, বহ্নি ছড়াইতে ছড়াইতে। রাত্রি গভীর, স্থান নির্জ্জন, এক একটি বৃহৎ ষ্টেশন শ্মশানের মত শূন্য, জনহীন। গাড়ী মাঝে মাঝে থামে আবার চলে, যাত্রীরা নিদ্রায় আচ্ছন্ন। গোরক্ষপুর পৌঁছিবার কিছু আগে কুসমীর জঙ্গল। গাড়ী অবিশ্রাম ছুটিয়াছে, তাহার উদ্দাম কলরোল ভেদ করিয়া সলিলের ঘুমের মধ্যে কোন দূর হইতে যেন একটা চাপা কান্নার আওয়াজ হঠাৎ আসিয়াই তখনি মিলাইয়া গেল। চারিদিক ঘোর অন্ধকার; দীর্ঘ শালগাছ গুলি দৈত্যসেনার মত সারি বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া আছে,—দীর্ঘ বিশাল। কুসমীর জঙ্গলে প্রবেশ করিবার মুখে গাড়ী একটুখানি থামিয়া আবার চলিল।

কুসমী একটি ছোট ষ্টেশন। সেখানে মিনিট দুই গাড়ী থামে। গাড়ী থামিলেই সলিল ছুটিল মণিকার গাড়ীর দিকে। গাড়ীতে মণিকা নাই, সেই নেপালী স্ত্রীলোকটিও অন্তর্দ্ধান। জিনিষপত্র চতুর্দ্দিকে ছড়ানো বিপর্য্যস্ত; দেখিলেই মনে হয় এখানে একটি মল্লযুদ্ধ হইয়া গিয়াছে।

সলিল চীৎকার করিয়া উঠিল। বিপদ হইয়াছে মনে করিয়া গাড়ী হইতে কয়েকটি লোক নামিয়া পড়িল। ষ্টেশন-মাষ্টার একটি ধূমায়িত লণ্ঠন হাতে করিয়া ছুটিয়া আসিল। ব্যাপার কি? সলিল উত্তেজিত হইয়া সমস্ত বলিল। কেহ কেহ মণিকাকে একা রাখার জন্য সলিলকে ধিক্কার দিল। কহিল—এ অঞ্চলের গাড়ীতে এরূপ বিপদ লাগিয়াই আছে। বিশেষ পাহাড়ী স্ত্রীলোকরা নানারূপ কৌশল করিয়া সুন্দরী মেয়েদের ধরিয়া বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। নিশ্চয় কুসমীর জঙ্গলে লুকাইয়া আছে, সকাল হইলেই ধরা পড়িবে। কিন্তু সলিল প্রভাতের অপেক্ষা করিতে পারিল না। পাগলের মত জঙ্গলের দিকে ছুটিল। দু'একজন বাধা দিয়া বলিল—"করেন কি, এই রাত্রে, অত জঙ্গলে!" কিন্তু সলিল তাহাদের ঠেলিয়া দিয়া ছুটিয়া চলিল। ষ্টেশন-মাষ্টারটি বৃদ্ধ, সলিলের অবস্থা দেখিয়া তাহার দয়া হইয়াছিল; সে পিছনে পিছনে গিয়া লণ্ঠনটি সলিলের হাতে দিয়া বলিল, "বাবুজী, এই বাতিটা নিয়ে যাও।"

সলিল আবার ছুটিল। ষ্টেশন ছাড়াইয়া জঙ্গলে প্রবেশ করিলে চীৎকার করিয়া ডাকিল, "মণিকা!" কেহ উত্তর দিল না। শুধু নিস্তব্ধ বনানী চকিত করিয়া আর্ত্ত প্রতিধ্বনি ছুটিয়া চলিল বন হইতে বনান্তরে। আবার ডাকিল "মণিকা", উত্তর নাই; শুধু সেই নিষ্ঠুর তীক্ষ্ন প্রতিধ্বনি তাহার ব্যথিত হৃদয়ে আসিয়া আঘাত দেয়, সমস্ত বনভূমিকে একটা অসীম ক্রন্দনসুরে দ্রবীভূত করিয়া ফেলে। মেঘলোক পর্য্যন্ত বুঝি সে আর্ত্তস্বর পৌঁছায়, ব্যর্থ হইয়া ফিরিয়া আসে। কেহ তাহার উত্তর সাদরে ফিরাইয়া দিয়া বলে না, "ওগো এই যে আমি।" কুসমীর সুবৃহৎ জঙ্গল তেমনি নিষ্ঠুর নীরবতায়, নৈশ-তিমিরে কলেবর আবৃত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, শুধু সলিল প্রিয়াহারা সীতাপতির মত ব্যর্থ অন্বেষণে রজনী কাটাইয়া দিল।

৩

তাহার পর অনেক দিন কাটিয়া গিয়াছে। সলিল মণিকার অনেক অন্বেষণ করিল। পুলিসে খবর দিল, কাগজে বিজ্ঞাপন দিল, কিন্তু কিছুই হইল না। মণিকার বা সেই নেপালী স্ত্রীলোকটার কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। তাহার পর আরও অনেক দিন কাটিল। সে পুরাতন ক্ষত সময়ের নিপুণ প্রলেপে ধীরে ধীরে পূর্ণ হইয়া সারিয়া গেল। ভাঙা সংসার আবার নূতন করিয়া গড়িয়া তোলা হইল। সাধারণ মানুষের জীবন-স্রোত যেমন একটানা হয় এও তেমনি হইল। কোথাও ব্যতিক্রম নাই, কোথাও বৈচিত্র্য নাই। নিবিড় দুঃখের তারে মানবের জীবন-বীণা বাঁধা, সুখের রাগিণী তাহাতে সহজে বাজে না, কিন্তু যখন বাজে তখন ক'জন মানুষ তাহাকে ছাড়িয়া, দুঃখের পূজারী হইয়া থাকিতে চায়? সলিলও চাহে নাই। তাই তাহার নূতন সংসার, নূতন সঙ্গিনী, নূতন সুখ। আজ সলিলকে দেখিলে মনে হয় না যে, এরই জীবনের উপর দিয়া এক অশুভ মুহূর্ত্তে বিষাদের একটা প্রলয়-প্লাবন বহিয়া গিয়াছে। আজ তাহার তরুণী স্ত্রী শৈল, তাহার আদরের তনয়া মঞ্জু। তাহার কোন ক্ষোভ নাই। কোন ক্ষোভ যেন তাহার কোনদিন ছিল না।

মঞ্জু চার বৎসরের বালিকা। বড় সুশ্রী। সারাদিন তাহার কলকণ্ঠে বাড়ীটি মুখরিত হইয়া থাকে। স্বামী স্ত্রী তাহাকে কেন্দ্র করিয়া জীবনের মধুচক্র রচনা করিয়াছিল।

সেদিন বৈকাল বেলায় সলিল বেড়াইতে বাহির হইয়াছিল। শৈল রান্নাঘরে বসিয়া লুচি বেলিতেছে, এমন সময় মঞ্জু হাঁপাইতে হাঁপাইতে ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "মা দ্যাখো মা, কি দুষ্টু।" মঞ্জু বিলক্ষণ ভয় পাইয়াছিল। শৈল তাড়াতাড়ি তাহাকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া কহিল, "কি হয়েছে মঞ্জু, ভয় পেয়েছিস কেন রে? কে দুষ্টু?" মঞ্জু চোখদুটি বড় বড় করিয়া বলিল, "ঐ ভিক্ষেউলিটা মা। আমায় ধ'রে চুমু খেলে, যদি ঝুলির ভেতর পুরে নিত তখন!"

শৈল ব্যস্ত হইয়া কহিল, "কে ভিখিরী মেয়ে চল্ ত দেখি। ও বামুন-দি, মঞ্জুর মুখটা ধুয়ে দে না ভাই। কি জানি কে চুমু খেলে? তুই বা দস্যি মেয়ে কি করছিলি বাইরে?"

শৈল বাহিরে আসিয়া দেখিল সত্যই একজন ভিখারিণী। পরণে গেরুয়া কাপড়। মাথায় কাল চুলগুলি জটা পাকাইয়া পিঠের উপর পড়িয়াছে। সমস্ত মুখে পোড়া দাগ। দেখিলে মনে হয় যেন মুখের সমস্ত সৌন্দর্য্যকে তিলে তিলে দগ্ধ করিয়া ফেলা হইয়াছে,—হয়ত বা রূপলোলুপ হিংস্র নরপিশাচদের হাত হইতে আত্মরক্ষার জন্য। হঠাৎ সে মুখ দেখিলে ভয় হয়, আতঙ্ক হয়, কিন্তু রূপ-রসিকের কাছে তাহার অনুপম নয়ন দুটির মধুরিমা যেন আজও ধরা পড়িয়া যায়। তাহাদের রূপ সে লুকাইতে পারে নাই।

একে বৈকালে গৃহস্থ বাড়ীতে ভিক্ষা দিতে নাই, তাহার উপর কন্যাকে চুম্বন করার জন্য শৈল বিরক্ত হইয়াছিল, কিন্তু কিছু বলিতে পারিল না। ভিখারিণীকে দেখিয়া যেন তাহার মনটা কেমন করিয়া উঠিল। মনে হইল ওর যেন কেহ নাই, ও যেন বড় দুঃখিনী। কিন্তু হয়ত চিরদিন অমন দুঃখিনী ছিল না। সে ভিক্ষা দিল। ভিখারিণী একবার করুণ নেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া দ্রুত প্রস্থান করিল। শৈলর মনে হইল মেয়েটা বোধ হয় পাগল, হয়ত সন্তানের শোকে অম্নি করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, পরের মেয়ে দেখিলে উহার স্নেহের উৎস বাধা মানে না, উথলাইয়া উঠে।

সন্ধ্যার পর যখন সলিল খাইতে বসিল তখন একথা সে কথার পর শৈল বলিল, "দেখো আজ একটা বড় মজার পাগলী এসেছিল।"

সলিল বলিল, "মজার পাগ্‌লী কি রকম?"

শৈল কহিল, "কি জানি, কি রকম ভাসা ভাসা চাহনি, কোন কথা বলে না,—আর দেখ মঞ্জুটাকে জড়িয়ে ধ'রে চুমা খেয়ে গেছে।"

সলিল আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "মঞ্জুকে কেন ভিখারীতে চুমা খেলে?" কিন্তু কথাটা বলিয়াই তাহার স্মৃতির অর্গলটা যেন হঠাৎ টুটিয়া গেল। এ কোন ভিখারিণী যে তাহার কন্যাকে চুম্বন করিবার স্পর্দ্ধা রাখে! তাই আগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা শৈল, তার চোখ দুটো কি খুব টানা টানা?"

শৈল বলিল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ। বড় সুন্দর, ভাসা ভাসা। তুমি দেখেছ বুঝি?"

ক্ষীণস্বরে সলিল বলিল, "দেখিনি, তবে যদি দেখ্‌তে পেতুম শৈল।" তাহার চীৎকার করিয়া কাঁদিতে ইচ্ছা করিতেছিল। তাহার আর খাওয়া হইল না, রাত্রে ঘুম হইল না। তাহার সমস্ত মন সেই অপরাহ্ণ বেলার আগমনের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া রহিল।

ভিখারিণী আর আসিল না। কিন্তু সলিল আশা ছাড়িল না। প্রতিদিন অপরাহ্ণে সে চুপ করিয়া পথের দিকে চাহিয়া বসিয়া থাকে। তাহার বেড়ান বন্ধ, তাহার বন্ধু-বান্ধবদের সহিত দেখাশুনা সব ত্যাগ করিল। শৈল কত বুঝাইল, কাঁদিল, কিন্তু যতই দিন যাইতে লাগিল, ততই যেন সলিল বেশী করিয়া তাহার প্রতীক্ষায় রহিল। তাহার অপেক্ষায় এতদিনে সে থাকে নাই, কিন্তু এবার থাকিতেই হইবে। কেন না হয়ত মণিকা আবার আসিবে।

সঙ্গীতে হারমোনিয়মের স্থান

শ্রীমণিলাল সেন

গান শিখিবার জন্য আজকাল সকলেই প্রথমে একটি হারমোনিয়ম কিনিয়া থাকেন। কিন্তু এই যন্ত্রটি কিরূপ, এবং ইহা সঙ্গীতের পক্ষে কতদূর উপযোগী তাহা অনেকেই জানেন না। বস্তুত হারমোনিয়ম সঙ্গীতের পক্ষে উপকারী নহে, বরং সম্পূর্ণ অপকারী। এই প্রবন্ধে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সঙ্গীতজ্ঞদিগের অনেকগুলি মত উদ্ধৃত করিয়া তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

প্রত্যেক সঙ্গীতজ্ঞ মাত্রেই জানেন যে, "স" হইতে "র" চড়া, "র" হইতে "গ" চড়া; এইরূপ প্রত্যেকটি সুরই (note) ঈষৎ চড়া হইয়া গিয়াছে। পাশ্চাত্য মনীষীগণ আবিষ্কার করিয়াছেন যে, যদি স্বাভাবিক স্বরগ্রামে (natural scaleএ) "স" হইতে "র" সুরের অন্তরকে (interval-কে) ৯ ধরা হয় তবে "র" হইতে "গ" ৮ হইবে। আবার "গ" হইতে "ম"-এর অন্তর ৫ হইবে। এইরূপ "ম" হইতে "প" ৯, "প" হইতে "ধ" ৮, "ধ" হইতে "ন" ৯, ও "ন" হইতে চড়া "স" ৫ হইবে। অর্থাৎ যদি এক অষ্টককে (octave) ৫৩ সূক্ষ্ম অংশে ভাগ করা যায় তবে সুরগুলির অন্তর নিম্নলিখিত মত হইবে—

। ৯ । ৮ । ৫ । ৯ । ৮ । ৯ । ৫ ।

স র গ ম প ধ ন স

কিন্তু হারমোনিয়ম, অর্গেন ও পিয়ানো প্রভৃতি চাবিযুক্ত যন্ত্রের (keyed instrumentsএর) সুরগুলি এইরূপ নহে। কোন কোন কারণে ইহাদের সুরগুলি কৃত্রিম (tempered scale) করিতে হইয়াছে। স্বাভাবিক স্বর-অন্তর তিন শ্রেণীভুক্ত; ৯ অন্তর, ৮ অন্তর ও ৫ অন্তর। কিন্তু চাবিওয়ালা যন্ত্রগুলির অন্তর দুই-ভাগে বিভক্ত। যথাঃ--

। ৮$\frac{৫}{৬}$ । ৮$\frac{৫}{৬}$ । ৪$\frac{৫}{১২}$ । ৮$\frac{৫}{৬}$ । ৮$\frac{৫}{৬}$ । ৮$\frac{৫}{১২}$ । ৪$\frac{৫}{১২}$ ।

স র গ ম প ধ ন স

যদি ৮$\frac{৫}{৬}$কে ১ ধরা হয় তবে

। ১ ; ১ । $\frac{১}{২}$ । ১ । ১ । ১ । $\frac{১}{২}$।

আবার উপরিলিখিত যন্ত্রগুলিকে ৮$\frac{৫}{৬}$ অন্তরকে সমান সমান দুইভাগে বিভক্ত করিয়া কড়ি কোমলের সুর (semitones) করা হইয়াছে। কাজেই যে কোন একটি চাবি হইতে চড়ায় বা খাদে ৪$\frac{৫}{১২}$ অন্তর পরে পরে এক একটি সুর পাওয়া যায়। কিন্তু ইহা সঙ্গীতের দিক দিয়া দেখিতে গেলে একেবারেই বিজ্ঞানসম্মত নয়।

তারযন্ত্রের (stringed instrument) খরজ পরিবর্ত্তন (scale change) করিতে প্রথমে প্রধান (main) তারটির সুর খাদ বা চড়ায় বাঁধিয়া লওয়া হয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে আর কয়েকটি তার সেই সুরের অনুপাতে খাদ বা চড়ায় বাঁধিতে হয়। মনে করুন একটি গানের বৈঠকে সেতার, এস্রাজ, সারেঙ্গী ইত্যাদি তারযন্ত্র দিয়া যদি গায়কের সঙ্গে সঙ্গত করা হয়, তবে, যত জন গায়ক হইবে প্রায় প্রত্যেক গায়কের জন্যই খরজ পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। কারণ সকলের গলার উচ্চতা (pitch) একরূপ নয়, কাহারো বা খাদে কাহারো বা চড়ায় থাকে। আবার যন্ত্রটিতে যে সুর বাঁধা থাকিবে সেই সুরেই রাখিয়া যদি "র" বা "গ"কে "স"-বৎ ধরিয়া গাওয়া হয় তবে প্রতি পর্দ্দা অল্প-বিস্তর নাড়িতে হয়। "র" সুরকে "স" ধরিলে সূক্ষ্ম স্বর অন্তর ভেদে "গ" সুর তাহার "র" হয় না। কারণ "র" হইতে "গ"এর অন্তর সংখ্যা ৮, কিন্তু "স" হইতে "র"এর অন্তর সংখ্যা ৯ হওয়াতে "গ"কে আরো এক অন্তর (degree) চড়া করিয়া লইলে তবে ঠিক সুর পাওয়া যায়। এইরূপ উপরোক্ত কারণে প্রতি পর্দ্দা নাড়িবার প্রয়োজন হইয়া উঠে। এই জন্যই তারযন্ত্রের তারগুলিকে খাদে বা চড়ায় বাঁধিয়া খরজ পরিবর্ত্তন করা হয়।

হারমোনিয়মে যদি স্বাভাবিক স্বরগ্রাম (natural scale) অনুযায়ী সুর করা হইত, তাহা হইলেও উপরোক্ত বিভ্রাট ঘটিত। অর্থাৎ "র" (note 'D') সুরকে "স" ধরা হইলে

"গ" ইহার স্বাভাবিক "র" হইত না। তারযন্ত্রে পর্দ্দাগুলি ঢিলা ভাবে বাঁধা থাকে বলিয়া ইহাতে যদি "র"কেই "স" ধরিতে হয় তবে ইহার পর্দ্দাগুলিকে এদিক ওদিক নাড়িয়া স্বাভাবিক সুর পাওয়া যায়, অবশ্য একটু সময়ের দরকার হয়। কিন্তু হারমোনিয়মের চাবিগুলি fixed হওয়াতে সেগুলিকে নাড়িবার উপায়ই নাই। অবশ্য এই খরজ পরিবর্ত্তনের সুবিধার জন্য, অর্থাৎ প্রত্যেকেই যেন গলার সঙ্গে কতক মিলাইয়া লইতে পারে এই জন্য হারমোনিয়মের সুরগুলি tempered gamut করা হইয়াছে। ইহাতে যদিও ইহার সাদা বা কাল চাবীর যে কোন একটিকে "স"-বৎ ধরিয়া অনায়াসে বাজাইতে পারা যায়, কিন্তু এক অষ্টকের (octave এর) দুইটি "স" সুর ছাড়া অন্য সব কয়টি সুরই অল্পবিস্তর ভুল থাকে। শ্রদ্ধেয় সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সিংহ মহাশয়ের Amrita Bazar Patrikaতে প্রকাশিত "Can Music Help Education"-প্রবন্ধে লেখা আছে—"The musical notes of the instrument (keyed) is tuned according to the tempered scale, and not according to the harmonies of the note'C'(Sa) which are the natural notes. This caused the fundamental diffience between the two scales, for example if the vibration of 'C' be taken as 240 then the successive notes of diatonic or natural scale and that of tempered scale will be found as shown below.

Diatonic Scale VIBRATION:—

Sa^{240} Re$^{272\cdot16}$ Ga$^{299\cdot5}$ Ma$^{318\cdot72}$ Pa$^{326\cdot96}$ Dha$^{410\cdot4}$ Ni$^{450\cdot96}$ Sa^{480}

Tempered Scale VIBRATION:—

C^{240} D$^{269\cdot4}$ E$^{302\cdot4}$ F$^{320\cdot3}$ G$^{359\cdot6}$ A$^{403\cdot6}$ B$^{453\cdot1}$ C^{480}

It will thus be seen that the above two scales are quite different."

হারমোনিয়মের আওয়াজ জোর করিবার জন্য দুই সেট রীড্ (double reed) সংযুক্ত করা হয়; অর্থাৎ এক একটা চাবিতে দুইটি করিয়া রীড্ সংলগ্ন করিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু এক চাবিতে ঠিক এক সুরের দুইটি রীড্ সাধারণত থাকে না। দুই সেট্ রীডের মধ্যে এক সেট্ রীডএর সুরগুলি আর এক সেট্ রীডের সুর হইতে খাদে বা চড়ায় থাকে। একই সুর টিপিয়া রাখিয়া দুই part রীড্ পৃথক পৃথক stop খুলিয়া বাজাইয়া দেখিলেই বুঝা যায় যে, একই চাবি হইতে দুই প্রকার সুর বাহির হয়। যন্ত্রের দোষ ঢাকিবার জন্য হারমোনিয়ম নির্ম্মাতাগণ এইরূপ করিয়া থাকেন। কেবল রীড্গুলি keyতে বসাইয়া লইলেই হয় না, রীড্গুলির জিহ্বাগুলি (tongue) ঈষৎ ঘষিয়া মাজিয়া সুর ঠিক করিবারও দরকার হয়। কিন্তু আমাদের হারমোনিয়ম-নির্ম্মাতাগণ এই ঘষা মাজার ব্যাপারে বিশেষ দক্ষ নন্। তাহাতে এই দাঁড়াইয়াছে যে, আজকাল বাজারের হারমোনিয়মগুলির খাঁটি tempered gamutও হয় না। Tempered gamut হইলেও বিলাতী হারমোনিয়মে কতক মিষ্টত্ব পাও যায়; কারণ সেখানকার হারমোনিয়ম-নির্ম্মাতাগণ এই বিষয়ে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়া থাকেন। একে ত keyed instrumentগুলির tempered scale থাকাতে ইহাদের সুর প্রকৃত নয়, তার উপর খাঁটি tempered gamutএর সুরযুক্ত না হওয়াতে আমাদের দেশীয় হারমোনিয়মের সুরগুলি বিকৃত।

পিয়ানোতে tempered scale থাকা সত্ত্বেও আওয়াজ মিষ্ট হয়, কারণ ইহাতে পিতলের রীড নাই। ইহার চাবি টিপিলেই একটা হাতুড়ী-বাঁধা তারের উপর আঘাত করে এবং তার কাঁপিয়া ধ্বনি হয়। ইহাতেও দুই বা ততোধিক সেট্ তার থাকে। এই সব তারের screw ঘুরাইয়া বাদক দুইটি তারের সুর এক করিয়া লইতে পারেন, কিন্তু হারমোনিয়মে ঐরূপ করা যায় না। কিছুদিন পরেই পিতলের রীড্গুলিতে ঠাণ্ডা লাগিয়া ইহার সুর কর্কশ ও ঝাঁঝাল হইয়া যায়, এবং tempered scaleএর সুরও থাকে না। "...the Brass Vibrators used in the harmonium are easily affected by climatic changes; the instrument, to be kept in the same tuning, would require adjustment at least once

a fortnight." ('Six lectures on Indian music., delivered in the Bombay University by Mr. E. Clements, I. C. S.)

হারমোনিয়ম ফ্রান্স দেশে আবিষ্কৃত হইলেও পাশ্চাত্য দেশে ইহার প্রচলন বড় নাই, পিয়ানোর প্রচলন আছে। পিয়ানো হারমোনিয়ম হইতে উন্নত, কিন্তু ইহাতেও tempered scale থাকে। পিয়ানো সম্বন্ধে The New Popular Encyclopedia, Vol IX, Music প্রবন্ধের এক স্থানে লেখা আছে :—"The disadvantage of equalising the tones and semitones is that the music obtained from these instruments is never agreeably in tune ; its melodies and harmonies are different in richness of effect, and the piece performed, whatever it may be, possesses much insipidity. This ought never to occur in music formed on free-toned instruments."

যদি বলেন, হারমোনিয়মের সুরের যে মাঝে মাঝে ভুল আছে তাহা ঠিক উপলব্ধি হয় না, সামান্য ভুল থাকিলেই বা কি আসে যায়,—ইহাতে প্রথমেই এই বলিতে হয় যে, ভুল সব সময়েই ভুল। দ্বিতীয়তঃ, প্রকৃত স্বরগ্রাম (natural scale) আমাদিগকে যত আনন্দ দেয় tempered scale ততটুকু আনন্দ দিতে পারে না। তারপর সূক্ষ্ম স্বর-অন্তর কানে উপলব্ধি হয় না একথাও বলিতে পারি না। আমাদের দেশে এখনও বীণাতে যে "অচল ঠাট" বাঁধা হয় তাহা প্রকৃত স্বরগ্রাম। আমরা হারমোনিয়ামের tempered gamut শুনিতে শুনিতে কান (musical ear) খারাপ করিয়া ফেলিয়াছি। কোন্‌টা প্রকৃত বা কোন্‌টা কৃত্রিম তাহা বুঝিতে পারি না। General Thompson বলিয়াছেন, "It may be hoped the time is approaching when neither singer nor violinist will be tolerant of a tempered instrument. Singers sing to a pianoforte because they have bad ears ; and they have bad ears because they sing to the pianoforte"

আমরা জানি যে কানে যাহা শুনিতে পাওয়া যায় কণ্ঠ তাহাই অজ্ঞাতে অনুকরণ করে। কাজেই একটা কৃত্রিম সুর কানের নিকট বাজিতে থাকিলে কণ্ঠেও কৃত্রিম সুর বসিয়া যায়, natural scaleএর সুর গলায় থাকে না এবং তাহাতে গান শ্রুতিমধুর হয় না। শ্রীযুক্ত হিমাংশুশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার "সঙ্গীতে বাঙ্গালীর কণ্ঠ" * নামক প্রবন্ধের এক স্থলে ঠিকই লিখিয়াছেন, "এদেশে এই হারমোনিয়মের কৃত্রিম সুরের ও বাজারের হারমোনিয়মের বিকৃত সুরের সঙ্গতে ভেজাল জিনিষ খাইয়া যেমন খাঁটি জিনিষের স্বাদ গ্রহণের ক্ষমতা কমিয়া যায়, তদ্রূপ সুরের কান ও তৎসহ গলার সুর নষ্ট হইতেছে। বাংলায় এ দোষ যতটা হইয়াছে পশ্চিম অঞ্চলে এখনও ততটা হয় নাই। পশ্চিমা বাইজীরা এখনও সারেঙ্গীর সঙ্গতেই গান করে। এমন কি পশ্চিম অঞ্চলে গান করিয়া ভিক্ষা করিতেছে এমন গায়ক গায়িকারাও তারযন্ত্রের সঙ্গতেই এখনও গাহিয়া থাকে। তাহাদের মধ্যে একারণে সুমিষ্ট গলা ও শ্রুতি-সুখকর গানের রাগরাগিণীর রূপপ্রকাশকারী সুর এখনও পাওয়া যায়।"

আমাদের সঙ্গীতের সুরে অনেকগুলি অলঙ্কার আছে। এইগুলি ছাড়া গীত করাই যায় না। ইহাদের নাম—মীড়, গমক, মূর্চ্ছনা, আশ ইত্যাদি। মীড়ের সাহায্য ছাড়া রাগরাগিণীর রূপ প্রকাশ করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু হারমোনিয়ম প্রভৃতি keyed instrumentএ মীড়, গমক ইত্যাদি বাজাইতে পারা যায় না। ইহাতে কাটা কাটা সুর বাহির হয় এবং সঙ্গীতের মাধুর্য্য নষ্ট করে। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ মহাশয় লিখিয়াছেন, "We know that now-a-days harmonium is used, with our music, higher or lower, throughout India, though the essential parts

* প্রতি বাঙ্গালীরই এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর প্রবন্ধটি পাঠ করা উচিত। "সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা" নামক মাসিক পত্রিকায় এই প্রবন্ধটি কিছুদিন পূর্ব্বে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। আমি বর্ত্তমান প্রবন্ধ লিখিতে উক্ত প্রবন্ধটি হইতে যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছি।—লেখক

of our music, such as murchhána, mirh, gamak etc, are impossible to produce in it." Rev. Popley ভারতীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি। তিনি বহুদিন যাবৎ ইহার চর্চ্চা করিতেছেন। তিনি বলিয়াছেন, "The custom has come in recently to use the harmonium for drone. This is undoubtedly convenient, but the noise is not by any means attractive, nor likely to add to the appreciation of Indian music by ears trained to quality as well as to pitch." Mr. A. H. Fox Strangways ভারতীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে নানাবিধ তথ্য সংগ্রহ করিবার জন্য ভারতের নানা প্রদেশে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। ইহার পর তিনি The Music of Hindustan নামে এক বই লিখেন। তাহাতে আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন—

"If the rulers of native States realised what a deathblow they were dealing at their own art by supporting or even allowing a brass band, if the clerk in a government office understood the indignity he was putting on a song by buying the gramophone which grinds it after his days of labour, if the Mohammedan "Star" singer knew that the harmonium with which he accompanies himself was ruining his chief asset, his musical ear, and if the girl who learns the pianoforte could see that all the progress she made was as sure a step towards her own denationalization as if she crossed the black waters and never returned—they would pause before they laid such sacrilegious hands on Saraswati. Excuses may be made for such practices, but there is one objection fatal to them all; the instruments are borrowed...... to dismiss from India these foreign instruments would not be to check the natural but to prune away an unnatural growth." তিনি ঐ পুস্তকের আর এক স্থানে লিখিয়াছেন—"......It (harmonium) dominates the theatre, and desolates the hearth; and before long it will, if it has not already, desecrate the temple. Besides its deadening effect on a living art, it falsifies it by being out of tune with itself. This is a grave defect, though its gravity can be exaggerated. A worse fault is that it is a borrowed instrument constructed originally to minister to the less noble kind of music of other land."

সাধারণত দেখা যায় যে, যিনি হারমোনিয়মের সঙ্গে সঙ্গত করিয়া গান শিক্ষা করিয়া থাকেন তিনি কখনও হারমোনিয়ম ছাড়া গান করিতে পারেন না। কেবল তাহাই নহে, যিনি যে জাতীয় হারমোনিয়মের সঙ্গে সঙ্গত করেন ঠিক ঐ জাতীয় যন্ত্রটি না হইলে গান গাহিতেই পারেন না। আবার, যাঁহাদের গলা সর্ব্বদা স্বরযুক্ত হারমোনিয়মের সঙ্গে গান করিয়া কর্কশ হইয়া গিয়াছে তাঁহারা হারমোনিয়ম এত জোরে বাতাস করিয়া বাজাইয়া গান করেন যে, তাঁহাদের গলার আওয়াজ মোটেই শুনিতে পাওয়া যায় না। হারমোনিয়ম দিয়া গান করিতে হইলে হারমোনিয়ম খুব আস্তে বাজাইয়া এবং হারমোনিয়মের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া সুরের ও কণ্ঠের আওয়াজের দিকে সম্পূর্ণ মনোযোগ দিয়া গান করিতে হয়। প্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ রায় সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার বাহাদুর মহাশয় লিখিয়াছেন—

"প্রায় চল্লিশ বৎসর ধরিয়া গলা সাধিয়াছি, কিন্তু শেষের বিশবৎসর হারমোনিয়ম স্বরূপ যষ্ঠি অবলম্বন করিয়া কণ্ঠ-স্বর অচৈতন্য, অকর্ম্মণ্য ও অন্ধ হইয়া গিয়াছে। এক একটা গমকের মধ্যে পূর্ব্বে যে ভাব আসিত তাহা আর নাই। তানের সৃষ্টিরও শক্তি কমিয়া গিয়াছে।

এখন ভাবিয়া দেখুন হারমোনিয়ম আমাদের সঙ্গীতের পক্ষে কতদূর উপকারী।

প্রথম প্রথম যখন হরিহর কাশী হইতে আসিল তখন সকলে বলিত তাহার ভবিষ্যৎ বড় উজ্জ্বল, এ অঞ্চলে ওরকম বিদ্যা শিখিয়া কেহ আসে নাই। তাহার বিদ্যার সুখ্যাতি সকলের মুখে ছিল, সকলে বলিত সে এইবার একটা কিছু করিবে। সর্ব্বজয়া অনভিজ্ঞ পল্লীবধূর সরল, মুগ্ধ কল্পনা লইয়া ভাবিত, শীঘ্রই উহারা তাহার স্বামীকে ডাকাইয়া একটা ভাল চাকুরী দিবে (কাহারা চাকুরী দেয় সে সম্বন্ধে তাহার ধারণা ছিল কুয়াসাচ্ছন্ন সমুদ্র বক্ষের মত অস্পষ্ট)। কিন্তু মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর করিয়া বহুকাল চলিয়া গেল, অর্দ্ধরাত্রির মাথায় কোনো জরির পোষাক পরা ঘোড়-সওয়ার রাজ-সভার সভাপণ্ডিত পদের নিয়োগ পত্র লইয়া ছুটিয়া আসিল না, বা আরব্য উপন্যাসের দৈত্য কোনো মণি-খচিত মায়া প্রাসাদ আকাশ বহিয়া উড়াইয়া আনিয়া তাহাদের ভাঙা ঘরে বসাইয়া দিয়া গেল না, বরং সে ঘরের পোকা-কাটা কবাট দিন দিন আরও জীর্ণ হইতে চলিল, কড়িকাঠ আরও ঝুলিয়া পড়িতে চাহিল; আগে যাও বা ছিল তাও আর সব থাকিতেছে না, তবুও সে একেবারে আশা ছাড়ে নাই। হরিহরও বিদেশ হইতে আসিয়া প্রতি বারই একটা একটা আশার কথা এমন ভাবে বলে যেন সব ঠিক, অল্পমাত্র বিলম্ব আছে, অবস্থা ফিরিল বলিয়া।

হয় কৈ ?...

জীবন বড় মধুময়, কিন্তু এই মাধুর্য্যের অনেকটাই স্বপ্ন ও কল্পনা দিয়া গড়া। হোক্ না স্বপ্ন মিথ্যা, কল্পনা বাস্তবতার লেশ শূন্য; নাই বা থাকিল সব সময় তাহাদের পিছনে সার্থকতা; তাহারাই যে জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, তাহারা আসুক, জীবনে অক্ষয় হোক্ তাহাদের আসন; তুচ্ছ সার্থকতা, তুচ্ছ লাভ।

হরিহর বাড়ী হইতে গিয়াছে প্রায় দুই তিন মাস। টাকাকড়ি খরচপত্রও অনেকদিন পাঠায় নাই। দুর্গা অসুখে ভুগিতেছে একটু বেশী, খায় দায় অসুখ হয় দুদিন একটু ভাল থাকে, হঠাৎ একদিন আবার হয়।

সর্ব্বজয়া মেয়ের বিবাহের জন্য স্বামীকে প্রায়ই তাগাদা দেয়। স্বামীকে দিয়া দুই তিন খানা পত্র নীরেন্দ্রের পিতা রাজোশ্বর বাবুর নিকট লিখাইয়াছে। সেদিকের আশাও সে এখনও ছাড়ে নাই। হরিহর বলে,—তুমিও যেমন, ওসকল বড় লোকের কাণ্ড, রাজোশ্বর কাকা কি আর এখন আমাদের পুঁছবেন? তবুও সর্ব্বজয়া ছাড়ে না; বলে, লেখো না, আর এক-খানা লিখেই দ্যাখো না—নীরেন ত পছন্দই ক'রে গিয়েছেন। দুই এক মাস চলিয়া যায়, বিশেষ কোন উত্তর আসে না, আবার সে স্বামীকে পত্র লিখিবার তাগাদা দিতে সুরু করে।

এবার হরিহর যখন বিদেশে যায়, তখন বলিয়া গিয়াছে এইবার সে এখান হইতে উঠিয়া অন্যত্র বাস করিবার একটা কিছু ঠিক করিয়া আসিবেই।

পাড়ায় একপাশে নিকানো পুছানো ছোট্ট খড়ের ঘর দু তিন খানা। গোহালে হৃষ্টপুষ্ট দুগ্ধবতী গাভী বাঁধা, মাচা ভরা বিচালী, গোলা ভরা ধান। দূরে চারিধারে ধানের ক্ষেত নীল আকাশের তলায় সবুজ আলের বাঁধ বাঁধিয়া রাখিয়াছে, মাঠের ধারের মটর ক্ষেতের তাজা, সবুজ গন্ধ খোলা হাওয়ায় উঠান দিয়া বহিয়া যায়। পাখী ডাকে—নীলকণ্ঠ, বাবুই, শ্যামা। অপু সকালে উঠিয়া বড় মাটীর ভাঁড়ে দোয়া এক পাত্র তাজা সফেন কাল গাইএর দুধের সঙ্গে গরম মুড়ির ফলার খাইয়া পড়িতে বসে। দুর্গা ম্যালেরিয়ায় ভোগে না। সকলেই জানে, সকলেই খাতির করে, আসিয়া পায়ের ধূলা লয়। গরীব বলিয়া কেহ তুচ্ছ তাচ্ছল্য করে না।

···শুধুই স্বপ্ন দেখে, দিন নাই, রাত নাই, সর্ব্বজয়া শুধুই স্বপ্ন দেখে। তাহার মনে হয় এতকাল পরে সত্য সত্যই একটা কিছু লাগিয়া যাইবে। মনের মধ্যে কে যেন বলে।

কেন এতদিন হয় নাই? কেন এতকাল পরে? সেই ছেলে বেলাকার দিনে জামতলায় সজিনাতলায় ঘুরিবার সময় হইতে সেঁজুতির আলিপনা আঁকার মন্ত্রের সঙ্গে এ সাধ যে তাহার মনে জড়াইয়া আছে, লক্ষ্মীর আল্‌তা পরা পায়ের দাগ আঁকা আঙ্গিনায় শ্বশুর বাড়ীর ঘর সংসার পাতাইবে। এরকম ভাঙা পুরানো কোঠা, বাঁশবন কে চাহিয়াছিল?

দুর্গা একটা ছোট্ট মানকচু কোথা হইতে যোগাড় করিয়া আনিয়া রান্নাঘরে ধর্ণা দিয়া বসিয়া থাকে। তাহার মা বলে, তোর হোল কি দুগ্‌গা? ..আজ কি ব'লে ভাত খাবি? কাল সন্ধ্যে বেলাও তো জ্বর এসেচে? দুর্গা বলে, তা হোক্ মা, সে জ্বর বুঝি—একটু তো মোটে শীত করলো?...তুমি এই মানকচুটা ভাতে দিয়ে দুটো ভাত—। তাহার মা বলে—যাঃ, অসুখ হোয়ে তোর খাই খাই বড্ড বেড়েছে। আজকাল ভাল যদি থাকিস্ তো কাল বরং দেবো—

অনেক কাকুতি মিনতির পর না পারিয়া শেষে দুর্গা মানকচু তুলিয়া রাখিয়া দেয়। খানিকটা চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, আপন মনে বলে, আজ খুব ভাল আছি, আজ আর জ্বর আসবে না আমার—ও'বেলা দুখানা রুটি আর আলুভাজা খাবো। একটু পরে হাই ওঠে, সে জানে ইহা জ্বর আসার পূর্ব্ব লক্ষণ। তবুও সে মনকে বোঝায়, হাই উঠুক, এমনি তো কত হাই ওঠে, জ্বর আর হবে না। ক্রমে শীত করে, রৌদ্রে গিয়া বসিতে ইচ্ছা হয়। সে রৌদ্রে না গিয়া মনকে প্রবোধ দেয় যে, শীত বোধ হওয়া একটা স্বাভাবিক শারীরিক ব্যাপার, জ্বর আসার সহিত ইহার সম্পর্ক কি?

কিন্তু কোনো প্রবোধ খাটে না। রৌদ্র না পড়িতে পড়িতে জ্বর আসে, সে লুকাইয়া গিয়া রৌদ্রে বসে, পাছে মা টের পায়। তাহার মন হুহু করে; ভাবে—জ্বর জ্বর ভেবে এরকম হচ্চে, সত্যি সত্যি জ্বর হয় নি—

রাঙা রোদ শেওলা ধরা ভাঙা পাঁচিলের গায়ে গিয়া পড়ে। বৈকালের ছায়া ঘন হয়। দুর্গার মনে হয় অন্যমনস্ক হইয়া থাকিলে জ্বর চলিয়া যাইবে। অপুকে বলে, বোস্ দিকি একটু আমার কাছে, আয় গল্প করি।

একদিন আর বছর ঘন বর্ষার রাতে সে ও অপু মতলব আঁটিয়া শেষরাত্রে পিছনে সেজঠাকুরুণদের বাগানে তাল কুড়াইতে গিয়াছিল, হঠাৎ দুর্গার পায়ে পট্ করিয়া এক কাঁটা ফুটিয়া গেল। যন্ত্রণায় পিছু হঠিয়া বাঁ পা খানা যেখানে রাখিল, সেখানে বাঁ পায়েও পট্ করিয়া আর একটা!... সকাল বেলা দেখা গেল, পাছে রাত্রে উহারা কেহ তাল কুড়াইয়া লয়, এজন্য সতু তালতলার পথে সোজা করিয়া সারি সারি বেল-কাঁটা পুঁতিয়া রাখিয়াছে। আর একদিন যা আশ্চর্য্য ব্যাপার!...ওরকম কোন দিন হয় নাই।

কোথা হইতে সেদিন এক বুড়া বাঙ্গাল মুসলমান একটা বড় রং চং করা কাচ-বসানো টিনের বাক্স লইয়া খেলা দেখাইতে আসে। ওপাড়ায় জীবন চৌধুরীর উঠানে সে খেলা দেখাইতেছিল। দুর্গা পাশেই দাঁড়াইয়াছিল। তাহার পয়সা ছিল না। আর সকলে এক এক পয়সা দিয়া বাক্সের গায়ে একটা চোঙের মধ্যে চোখ দিয়া কি সব দেখিতেছিল।

বুড়া মুসলমানটি বাক্স বাজাইয়া সুর করিয়া বলিতেছিল, তাজ বিবিকা রোজা দেখো, হাতী বাঘকা লড়াই দেখো! এক একজনের দেখা শেষ হইলে যেমন সে চোঙ্ হইতে চোখ সরাইয়া লইতেছিল, অমনি দুর্গা তাহাকে মহা আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিতেছিল, কি দেখলি রে ওর মধ্যে? সব সত্যিকারের?

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

উঃ! সে কি অপূর্ব্ব ব্যাপার দেখিয়াছে তাহা তাহারা বলিতে পারে না!...কি সে সব!

সকলের দেখা একে একে হইয়া গেল। দুর্গা চলিয়া যাইতেছিল বুড়া মুসলমানটি বলিল, দেখ্‌বে না খুকী?... দুর্গা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, নাঃ—আমার কাছে পয়সা নেই।

লোকটি বলিল—এসো এসো খুকী, দেখে যাও—পয়সা লাগ্‌বে না—

দুর্গার একটু লজ্জা হইয়াছিল; মুখে বলিল, নাঃ—কিন্তু আগ্রহে কৌতূহলে তাহার বুকের মধ্যে ঢিপ্‌ ঢিপ্‌ করিয়া উঠিল।

লোকটি বলিল—এসো এসো, দোষ কি?...এস, দ্যাখো—

দুর্গা উজ্জ্বলমুখে পায়ে পায়ে বাক্সের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল বটে, তবুও সাহস করিয়া মুখটা চোঙের মধ্যে দিতে পারে নাই। লোকটি বলিল, এই নলটার মধ্য দিয়ে তাকাও দিকি খুকি?...

দুর্গা মাথার উড়ন্ত চুলের গোছা কানের পাশে সরাইয়া দিয়া চাহিয়া দেখিল। পরের দশ মিনিটের কথার সে কোনো বর্ণনা করিতে পারে না। সত্যিকারের মানুষ ছবিতে কি করিয়া দেখা যায়? কত সাহেব, মেম, ঘর বাড়ী, যুদ্ধ, সে সব কথা সে বলিতে পারে না। কি জিনিষই সে দেখিয়াছিল!

অপুকে দেখাইতে বড় ইচ্ছা করে, দুর্গা কতবার খুঁজিয়াছে, ও খেলা আর কোনও দিন আসে নাই।

গল্প ভাল করিয়া শেষ হইতে না হইতে দুর্গা জ্বরের ধমকে আর বসিতে পারে না, উঠিয়া ঘরের মধ্যে কাঁথা মুড়ি দিয়া শোয়।

আজকাল বাবা বাড়ী নাই, অপুকে আর খুঁজিয়া মেলা দায়। ধই দপ্তরে ঘুণ ধরিবার যোগাড় হইয়াছে। সকাল বেলা সেই সে এক পুঁটুলি কড়ি লইয়া বাহির হয়, আর ফেরে একেবারে দুপুর ঘুরিয়া গেলে খাইবার সময়। তাহার মা বকে—ছেলের না নিকুচি করেছে—তোমার লেখাপড়া একেবারে ছিকেয় উঠ্‌লো?...এবার বাড়ী এলে সব কথা ব'লে দেবো, দেখো এখন তুমি—

অপু ভয়ে ভয়ে দপ্তর লইয়া বসে। বইগুলা খুব চারিদিকে ছড়ায়। মাকে বলে, একটু খয়ের দাও মা, আমি দোয়াতের কালিতে দেবো—

পরে সে বসিয়া বসিয়া হাতের লেখা লিখিয়া রৌদ্রে দেয়। শুকাইয়া গেলে খয়ের-ভিজানো কালি, চক্ চক্ করে—অপু মহাখুসির সহিত সেদিকে চাহিয়া থাকে—ভাবে—আর একটু খয়ের দেবো কাল থেকে—ওঃ কী চক্‌চক্ করছে দেখো একবার!...বাটা হইতে মাকে লুকাইয়া বড় একখণ্ড খয়ের লইয়া কালির দোয়াতে দেয়। পরে লেখা লিখিয়া শুখাইতে দিয়া কতটা আজ জলুজ্বল করে দেখিবার জন্য কৌতূহলের সহিত সেদিকে চাহিয়া থাকে। মনে হয়—আচ্ছা যদি আর একটু দি?

একদিন মার কাছে ধরা পড়িয়া যায়। মা বলে, ছেলের লেখার সঙ্গে খোঁজ নেই, কেবল ড্যালা ড্যালা খয়ের রোজ দরকার—রেখে দে খয়ের—

ধরা পড়িয়া একটু অপ্রতিভ হইয়া বলে, খয়ের নৈলে কালি হয় বুঝি?...আমি বুঝি এম্‌নি এম্‌নি—

—না খয়ের নৈলে কালি হবে কেন? এই সব রাজার ছেলে আর লেখাপড়া কচ্চে না—তাদের সের সের খয়ের রোজ যোগান রয়েচে যে দোকানে। যাঃ—

অপু বসিয়া বসিয়া একখানা খাতায় নাটক লেখে। বহু লিখিয়া খাতাখানা সে প্রায় ভরাইয়া ফেলিয়াছে,—মন্ত্রীর বিশ্বাসঘাতকায় রাজা রাজ্য ছাড়িয়া বনে যান, রাজপুত্র নীলাম্বর ও রাজকুমারী অম্বা বনের মধ্যে দস্যুর হাতে পড়েন, ঘোর যুদ্ধ হয়, পরে রাজকুমারীর মৃতদেহ নদীতীরে দেখা যায়। নাটকে সতু বলিয়া একটি জটিল চরিত্র দৃষ্ট হইবার অল্প পরেই বিশেষ কোনো মারাত্মক দোষের বর্ণনা না থাকা সত্ত্বেও প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়—নাটকের শেষদিকে রাজপুত্রী অম্বার নারদের বরে পুনর্জ্জীবন প্রাপ্তি বা বিশ্বস্ত সেনাপতি জীবনকেতুর সহিত তাঁহার বিবাহ প্রভৃতি ঘটনায় যাঁহারা বলেন যে, গত বৈশাখ মাসে দেখা যাত্রার পালা হইতে এক নামগুলি ছাড়া ইহা মূলতঃ কোনো অংশেই পৃথক্ নহে, বা সেই হইতেই ইহা হুবহু লওয়া, তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, প্রতিভাশালী ব্যক্তিদের

কল্পনার ও চিন্তার ধারা সাধারণ জীবের বুদ্ধির পক্ষে দুরধিগম্য—সে সম্বন্ধ কোনো মত না দেওয়াই যুক্তি।

অতীতের কোনো এক নীরব জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রিতে নির্জ্জন বাসকক্ষের স্তিমিতদীপ শয্যায় এক প্রাচীন কবির নীলমেঘের মত দৃশ্যমান ময়ূর-নিনাদিত দূর বনভূমির স্বপ্ন যদি কালিদাসকে মুক্ত মেঘের ভ্রমণ বর্ণনে অনুপ্রাণিত করিয়া থাকে, তাহা হইলেই বা কি?··সে বিস্মৃত শুভ যামিনীর বন্দনা মানুষে নিজের অজ্ঞাতসারে হাজার বৎসর ধরিয়া করিয়া আসিতেছে। আগুন দিয়াই আগুন জ্বালানো যায়, ছাইএর ঢিপিতে মশাল গুঁজিয়া কে কোথায় মশাল জ্বালে?...

অপুর দপ্তরে একখানা বই আছে,—বইথানার নাম চরিতমালা, লেখা আছে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত। পুরানো বই, তাহার বাবার নানা জায়গা হইতে ছেলের জন্য বই সংগ্রহ করিবার বাতিক আছে, কোথা হইতে এখানা আনিয়াছিল, অপু মাঝে মাঝে মাঝে খানিকটা খুলিয়া পড়িয়া থাকে। বইখানাতে যাঁহাদের গল্প আছে সে ঐ রকম হইতে চায়। হাটে আলু বেচিতে পাঠাইলে কৃষকপুত্র রস্কো বেড়ার ধারে বসিয়া বসিয়া বীজগণিতের চর্চ্চা করিত, কাগজের অভাবে চাম্‌ড়ার পাতে ভোঁতা আল দিয়া অঙ্ক কসিত, মেষপালক ডুবাল ইতস্ততঃ সঞ্চরণশীল মেষদলকে যদৃচ্ছাবিচরণের সুযোগ দিয়া এক মনে গাছতলায় বসিয়া ভূচিত্র পাঠে মগ্ন থাকিত—সে ঐ রকম হইতে চায়।··· 'বীজগণিত' কি জিনিস? সে বীজগণিত পড়িতে চায় ডুবালের মত। সে এই হাতের লেখা লিখিতে চায় না, ধারাপাত কি শুভঙ্করী এসব তাহার ভাল লাগে না। ঐ রকম নির্জ্জন গাছতলায়, বনের ছায়ায়, কি বেড়ার ধারে বসিয়া বসিয়া সে "ভূচিত্র" (জিনিষটা কি?) পাতিয়া পড়িবে, বড় বড় বই পড়িবে, পণ্ডিত হইবে ঐ রকম। কিন্তু কোথায় পাইবে সে সব জিনিস? কোথায় বা 'ভূচিত্র', কোথায় বা 'বীজগণিত' কোথায়ই বা 'লাটিন ব্যাকরণ?—" এখানে শুধুই কড়ি কসার আর্য্যা, আর তৃতীয় নামতা।

মা বকিলে কি হইবে, যাহা সে পড়িতে চায়, তাহা এখানে কই?

কয়দিন খুব বর্ষা চলিতেছে। অন্নদা রায়ের চণ্ডীমণ্ডপে সন্ধ্যাবেলায় মজলিস্ বসে। সেদিন সেখানে নীলকুঠীর ভূতের গল্প হইতে সুরু হইয়া পুরীর কোন্ মন্দিরের মাথায় পাঁচ মন ভারী চুম্বক পাথর বসানো আছে, যাহার আকর্ষণের বলে নিকটবর্ত্তী সমুদ্রগামী জাহাজ প্রায়ই পথ ভ্রষ্ট হইয়া আসিয়া তীরবর্ত্তী মগ্ন শৈলে লাগিয়া ভাঙিয়া যায় প্রভৃতি আরব্য উপন্যাসের গল্পের মত নানা আজগুবি কাহিনীর বর্ণনা চলিতেছিল। শ্রোতাদের কাহারও উঠিবার ইচ্ছা ছিল না, এ রকম আজগুবি গল্প ছাড়িয়া কাহারও বাড়ী যাইতে মন সরিতেছিল না। ভূগোল হইতে শীঘ্রই গল্পের ধারা আসিয়া জ্যোতিষে পৌঁছিল। দীনু চৌধুরী বলিতেছিলেন—ভৃগু সংহিতার মত অমন বই তো আর নেই? তুমি যাও, শুধু জন্ম রাশিটা গিয়ে দিয়ে দাও, তোমার বাবার নাম, কোন্ কুলে জন্ম, ভূত ভবিষ্যৎ সব ব'লে দেবে—তুমি মিলিয়ে নাও—গ্রহ ও রাশি চক্রের যত রকম ইয়ে হয়—তা সব দেওয়া আছে কি না? মায় তোমার পূর্ব্ব জন্ম পর্য্যন্ত—

সকলে সাগ্রহে শুনিতেছিলেন, কিন্তু রামময় হঠাৎ বাহিরের দিকে চাহিয়া বলিলেন—না ওঠা যাক্, এর পর আর যাওয়া যাবে না—দেখচো না কাণ্ডখান? একটা বড় ঝট্‌কা টট্‌কা না হোলে বাঁচি, গতিক বড় খারাপ, চলো সব—

বৃষ্টির বিরাম নাই। একটু থামে, আবার এমনি জোরে আসে, বৃষ্টির ছাটে চারিধার ধোঁয়া ধোঁয়া।

হরিহর মোটে পাঁচটা টাকা পাঠাইয়াছিল, তাহার পর আর পত্রও নাই টাকাও নাই। সেও অনেক দিন হইয়া গেল—রোজ সকালে উঠিয়া সর্ব্বজয়া ভাবে আজ ঠিক খরচ আসিবে। ছেলেকে বলে, তুই খেলে খেলে বেড়াস্ ব'লে দেখতে পাস্‌নে, ডাক বাক্সটার কাছে ব'সে থাক্‌বি—পিওন যেমন আস্‌বে আর অম্‌নি জিগ্যেস্ করবি—

অপু বলে—বা আমি বুঝি ব'সে থাকি নে? কালও তো এলো, পুঁটুদের চিঠি আমাদের খবরের কাগজ দিয়ে গেল—জিগ্যেস্ ক'রে এস দিকি পুঁটুকে? কাল তবে আমাদের খবরের কাগজ কি ক'রে এল? আমি থাকিনে বৈকি?

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বর্ষা রীতিমত নামিয়াছে, অপু মায়ের কথায় ঠায় রায়েদের চণ্ডীমণ্ডপে পিওনের প্রত্যাশায় বসিয়া থাকে। সাধু কর্ম্মকারের ঘরের চালা হইতে গোলা পায়রার দল ভিজিতে ভিজিতে ঝটাপট্ করিয়া উড়িতে উড়িতে রায়েদের পশ্চিমের ঘরের কার্ণিসে আসিয়া বসিতেছে, চাহিয়া চাহিয়া । আকাশের ডাককে সে বড় ভয় করে। বিদ্যুৎ চম্‌কাইলে মনে মনে ভাবে—দেবতা কি রকম নল পাচ্ছে দেখেচো, এইবার ঠিক ডাক্‌বে—পরে সে চোখ কানে আঙ্গুল দিয়া থাকে।

বাড়ী ফিরিয়া দ্যাখে মা ও দিদি সারা বিকাল ভিজিতে ভিজিতে রাশীকৃত কচুর শাক তুলিয়া রান্না ঘরের দাওয়ায় জড় করিয়াছে।

অপু বলে—কোত্থেকে আন্‌লে মা ?—উঃ কত !

দুর্গা হাসিয়া বলে—কত ! উঁ-উঃ ! তোমার তো ব'সে ব'সে বড় সুবিধে !···ওই ওদের ডোবার জাম তলা থেকে—এই এতটা এক হাঁটু জল ! যাও দিকি ?···

সকালে ঘাটে গিয়া নাপিত বৌয়ের সঙ্গে দেখা হয়। সর্ব্বজয়া কাপড়ের ভিতর হইতে কাঁসার একখানা রেকাবী বাহির করিয়া বলে, এই দ্যাখো জিনিস খানা খুব ভালো—ভরণ না, কিছু না, ফুল কাঁসা। তুমি বলেছিলে, তাই বলি, যাই নিয়ে—

অনেক দর দস্তুরের পর নাপিত বৌ নগদ একটি আধুলি আঁচল থেকে খুলিয়া দিয়া রেকাবীখানা কাপড়ের মধ্যে লুকাইয়া লয়। কাউকে যেন না প্রকাশ করে সর্ব্বজয়া এ অনুরোধ বার বার করে।

দুই একদিনে ঘনীভূত বর্ষা নামিল। হু হু পুবে হাওয়া-খানাডোবা সব থৈ থৈ করিতেছে—পথে ঘাটে একহাঁটু জল—দিন রাত সোঁ সোঁ বাঁশবনে ঝড় বাধে—বাঁশের মাথা মাটিতে লুটাইয়া লুটাইয়া পড়ে—আকাশের কোথাও ফাঁক নাই—মাঝে মাঝে একটু যেন ফরসা ফরসা দেখায়—আবার এখনি আগেকার চেয়েও অন্ধকার করিয়া আসে - কালো কালো মেঘের রাশ হু হু উঠিয়া পূব হইতে পশ্চিমে চলিয়াছে—দূর আকাশের কোথায় যেন দেবাসুরের মহা-সংগ্রাম বাধিয়াছে, কোন্ কৌশলী সেনানায়কের চালনায় জলস্থল আকাশ একাকারে ছাইয়া ফেলিয়া বিরাট দৈত্য-সৈন্য বাহিনীর পর বাহিনী অক্ষৌহিনীর পর অক্ষৌহিনী অদৃশ্য রথী মহারথীদের নায়কত্বে ঝড়ের বেগে অগ্রসর হইতেছে—ক্ষিপ্রগতিতে ঠেলাঠেলি করিয়া আক'শে বাতাসে মহাভীড় পাকাইয়া তুলিয়া, অধীর উৎসাহে, আগ্রহে !—এখনি গিয়া পৌছোনো চাই—শক্রকে চাপিয়া মারিতে হইবে !—হস্তীদলের সদর্প বৃংহতিতে কানে তালা ধরিয়া যায়, প্রজ্বলন্ত অত্যুগ্র দেববজ্র আগুন উড়াইয়া চক্ষের নিমিষে বিশাল কৃষ্ণচমূর এদিক্ ওদিক্ পর্য্যন্ত ছিঁড়িয়া ফাঁড়িয়া এই ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিতেছে—এই আবার কোথা হইতে রক্তবীজের বংশ করাল কৃষ্ণ ছায়ায় পৃথিবী অন্তরীক্ষ অন্ধকার করিয়া ঘিরিয়া আসিতেছে !

মহাঝড় !

দিন রাত সোঁ সোঁ শব্দ—নদীর জল বাড়ে—কত ঘরদোর কত জায়গায় যে পড়িয়া গেল !···নদী নালা জলে ভাসিয়া গিয়াছে—গরু বাছুর গাছের তলে, বাঁশবনে, বাড়ীর ছাঁচ্‌তলায় অঝোরে দাঁড়াইয়া ভিজিতেছে, পাখী-পাখালির শব্দ নাই কোনোদিকে। চার পাঁচ দিন সমানভাবে কাটিল—কেবল ঝড়ের শব্দ আর অবিশ্রান্ত ধারা বর্ষা !—অপু দাওয়ায় উঠিয়া তাড়াতাড়ি ভিজামাথা মুছিতে মুছিতে বলিল—আমাদের বাঁশতলায় জল এসেচে দিদি, দেখ্‌বি ? দুর্গা কাঁথা মুড়ি দিয়া শুইয়া ছিল—না উঠিয়াই বলিল—কতখানি জল এসেচে রে ?... অপু বলে, তোর জ্বর সার্‌লে কাল দেখে আসিস্ ?...তেঁতুল তলার পথে হাঁটু জল !...পরে জিজ্ঞাসা করে—মা কোথায় রে ?...

ঘরে একটা দানা নেই—দুটোখানি বাসি চালভাজা মাত্র আছে। অপু কান্নাকাটি করে,—তা হবে না মা, আমার খিদেপায় না বুঝি—আমি দুটো ভাত খাবো—

তার মা বলিল, লক্ষী মাণিক আমার—ওরকম কি করে !...অনেক ক'রে চালভাজা মেখে দেবো এখন—রাঁধ্‌বো কেমন ক'রে, দেখ্‌চিস্ নে কি রকম মেঘটা করেচে ?—উনুনের মধ্যে এক উনুন জল। পরে সে কাপড়ের ভিতর হইতে একটা কি বাহির করিয়া হাসিমুখে দেখাইয়া বলে—এই দ্যাখ্ একটা কই মাছ বাঁশতলায় কানে হেঁটে

দেখি বেড়াচ্চে—বন্যের জল পেয়ে সব উঠে আস্চে গাঙ্ থেকে—বরোজ পোতার ডোবা ভেসে নদীর সঙ্গে এক হ'য়ে গিয়েচে কিনা ?...

দুর্গা কাঁথা ফেলিয়া ওঠে—অবাক্ হইয়া যায়। বলে—দেখি মা মাছটা ?...হাঁা মা, কই মাছ বুঝি কানে হেঁটে বেড়ায় ? আর আছে ?...অপু এখনি বৃষ্টিমাথায় ছুটিয়া যায় আর কি- অনেক কষ্টে তাহার মা তাহাকে থামায়।

দুর্গা বলে—একটু জ্বর সার্‌লে কাল সকালে চল্ অপু, তুই আর আমি বাঁশবাগান থেকে মাছ নিয়ে আস্‌বো এখন। পরে সে অবাক্ হইয়া ভাবে—বাঁশবাগানে মাছ ! কি ক'রে এল ? বাঃ তো ?—মা কি আর ভাল ক'রে খুঁজেচে—খুঁজলে আরও সেখানে আছে—দেখ্‌তে পেলাম না কি রকম কই মাছ কানে হাঁটে—কাল সকালে দেখ্‌বো—সকালে জ্বর সেরে যাবে—

চারিদিকের বন বাগান ফিরিয়া সন্ধ্যা নামে। সন্ধ্যার মেঘে ও ত্রয়োদশীর অন্ধকারে চারিধার একাকার ! দুর্গা যে বিছানা পাতিয়া শুইয়া আছে, তাহারই এক পাশে তাহার মা ও অপু বসে। সর্ব্বজয়া ভাবে—আজ যদি এথ্‌খুনি একখানা পত্তর আসে নীরেন বাবাজির ?...কি জানি, তা হ'তে কি আর পারে না ?—নীরেন তো পছন্দই ক'রে গিয়েচেন—কি জানি কি হোল অদেষ্টে ! নাঃ, সে সব কি আর আমার অদেষ্টে হবে ? তুমিও যেমন ! তা হোলে আর ভাব্‌না ছিল কি ?

ওদিকে ভাইবোনে তুমুল তর্ক বাধিয়া যায়। অপু সরিয়া মায়ের কাছে ঘেঁসিয়া বসে—ঠাণ্ডা হাওয়ায় বেজায় শীত করে। হাসিয়া বলে—মা—কি ? সেই—শামলঙ্কা বাট্‌না বাটে মাটিতে লুটায় কেশ ?...

দুর্গা বলে—ততক্ষণে মা আমার ছেড়ে গিয়েচেন দেশ—

অপু বলে—দূর—হাঁ মা তাই ? ততক্ষণে মা আমার ছেড়ে গিয়েচেন দেশ ?—কথা বলিয়াই সে দিদির অজ্ঞতায় হাসে।

সর্ব্বজয়ার বুকে ছেলের অবোধ উল্লাসের হাসি শেলের মত বেঁধে। মনে মনে ভাবে—সাতটা নয়, পাঁচটা নয়—এই তো একটা ছেলে—কি অদেষ্ট যে ক'রে এসেছিলাম—তার মুখের আবদার রাখ্‌তে পারিনে—ঘি না, লুচি না, সন্দেশ না—কি না শুধু দুটো ভাত—নির্‌নক্যি !...আবার ভাবে—এই ভাঙা ঘর, টানাটানির সংসার—অপু মানুষ হোলে আর এ দুঃখ থাকিবে না—ভগবান তাকে মানুষ কোরে তোলেন যেন।...

তাহার পর সে বসিয়া বসিয়া গল্প করে, যখন প্রথম সে নিশ্চিন্দিপুরে ঘর করিতে আসিয়াছিল তখন এক বৎসর এই রকম অবিশ্রান্ত বর্ষায় নদীর জল এত বাড়িয়াছিল যে, ঘাটের পথের মুখুয্যে বাগানের কাছে বড় বোঝাই নৌকা পর্য্যন্ত আসিয়াছিল।

অপু বলে— কত বড় নৌকো মা ?

—মস্ত—ওই যে খোট্টাদের চূনের নৌকো, সাজিমাটীর নৌকো মাঝে মাঝে আসে দেখিচিস্ তো—অত বড়—

দুর্গা হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে—মা তুমি চারগুছির বিনুনি কর্ত্তে জানো ?

অনেক রাত্রে সর্ব্বজয়ার ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়—অপু ডাকিতেছে—মা, ওমা ওঠো—আমার গায়ে জল পড়্‌চে—

সর্ব্বজয়া উঠিয়া আলো জ্বালে—বাহিরে ভয়ানক বৃষ্টির শব্দ হইতেছে—ফুটা ছাদ দিয়া ঘরের সর্ব্বত্র জল পড়িতেছে। সে বিছানা সরাইয়া পাতিয়া দেয়। দুর্গা অঘোর জ্বরে শুইয়া আছে—তাহার মা গায়ে হাত দিয়া দ্যাখে তাহার গায়ের কাঁথা ভিজিয়া সপ্ সপ্ করিতেছে। ডাকিয়া বলে—দুগ্‌গা—ও দুগ্‌গা শুন্‌ছিস্ ?...একটু ওঠ্ দিকি ? বিছানাটা সরিয়ে নি—ও দুগ্‌গা—শীগ্‌গির ওঠ্ একেবারে ভিজে গেল যে সব ?...

ছেলে মেয়ে ঘুমাইয়া পড়িলেও সর্ব্বজয়ার ঘুম আসে না। অন্ধকার রাত—এই ঘন বর্ষা...তাহার মন ছম্ ছম্ করে—ভয় হয় একটা যেন কিছু ঘটিবে...কিছু ঘটিবে। বুকের মধ্যে কেমন যেন করে। ভাবে—সে মানুষেরই বা কি হোল ?...কেন পত্তরও আসে না—টাকা মরুক্ গে যাক্। এরকম তো কোনোবার হয় না ?...তার শরীরটা ভাল আছে তো ?...মা সিদ্ধেশ্বরী, স পাঁচ আনার ভোগ দেবো, ভাল খবর এনে দাও মা—

[বি]ভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

তারপরদিন সকালের দিকে সামান্য একটু বৃষ্টি থামিল। সর্ব্বজয়া বাটীর বাহির হইয়া দেখিল বাঁশবনের মধ্যের ছোট ডোবাটা জলে ভর্ত্তি হইয়া গিয়াছে। ঘাটের পথে নিবারণের মা ভিজিতে ভিজিতে কোথায় যাইতেছিল, সর্ব্বজয়া ডাকিয়া বলিল—ও নিবারণের মা শোন্—পরে সলজ্জভাবে বলিল—সেই তুই একবার বলিছিলি না, বিন্দাবুনি চাদরের কথা তোর ছেলের জন্যে—তা নিবি?...

নিবারণের মা বলিল—আছে?—দেয়া একটু ধরুক্, মোর 'ছেলেরে সঙ্গে ক'রে এখনি আস্‌বো এখন—নতুন আছে মা-ঠক্‌রুণ, না পুরোনো?...

সর্ব্বজয়া বলিল, তুই আয় না—এখুনি দেখ্‌বি?...একটু পুরোনো, কিন্তু সে কেউ গায়ে দেয় নি—ধোয়া তোলা আছে—পরে একটু থামিয়া বলিল—তোরা আজকাল চাল ভান্‌চিস্ নে?...

নিবারণের মা বলিল—এই বাদ্‌লায় কি ধান শুকোয় মা-ঠাক্‌রোণ...খাবার ব'লে দুটোখানি রেখে দিইচি অম্‌নি—

সর্ব্বজয়া বলিল—এক কাজ কর না—তাই গিয়ে আমায় আধকাঠা খানেক আজ দিয়ে যাবি?...একটু সরিয়া আসিয়া মিনতির সুরে বলিল—বিষ্টির জন্যে বাজার থেকে চাল আন্‌বার লোক পাচ্ছিনে—টাকা নিয়ে নিয়ে বেড়াচ্চি তা কেউ যদি রাজি হয়—বড় মুস্কিলে পড়িচি মা—

নিবারণের মা স্বীকার হইয়া গেল, বলিল—আস্‌বো এখন নিয়ে, কিন্তু সে ভেটেল ধানের চালির ভাত কি আপনারা খেতে পারবেন মা ঠাক্‌রোণ?...বড্ড মোটা—

বৈকালবেলা হইতে আবার ভয়ানক বৃষ্টি নামিল। বৃষ্টির সঙ্গে ঝড়ও যেন বেশী করিয়া আসে—ঘোর বর্ষণমুখর নির্জ্জন, জলে থৈ থৈ, হু হু পুবে হাওয়া বওয়া, মেঘে অন্ধকারে একাকার-ভাদ্রসন্ধ্যা! আবার সেই রকম কালো কালো পেঁজা তুলোর মত মেঘ উড়িয়া চলিয়াছে...বৃষ্টির শব্দে কান পাতা যায় না—দরজা জানালা দিয়া ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপ্‌টার সঙ্গে বৃষ্টির ছাট্ হু হু করিয়া ঢোকে—ছেঁড়া থলে, ছেঁড়া কাপড়-গোঁজা ভাঙ্গা কবাটের আড়ালের সাধ্য কি যে ঝড়ের ভীম আক্রমণের মুখে দাঁড়ায়!

বেশী রাত্রে সকলে ঘুমাইলে বেশী বৃষ্টি নামিল। সর্ব্বজয়ার ঘুম আসেনা—সে বিছানায় উঠিয়া বসে। বাইরে শুধু একটানা হুস্ হুস্ জলের শব্দ; ক্রুদ্ধ দৈত্যের মত গর্জ্জমান একটানা গোঁ গোঁ রবে ঝড়ের দম্‌কা বাড়ীতে বাধিতেছে!...জীর্ণ কোটাখানা এক একবারের দম্‌কায় যেন থর থর করিয়া কাঁপে...ভয়ে তাহার প্রাণ উড়িয়া যায়... গ্রামের একধারে বাঁশবনের মধ্যে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে লইয়া নিঃসহায়!...মনে মনে বলে—ঠাকুর, আমি মরি তাতে খেতি নেই—এদের কি করি? এই রাত্তিরে যাই বা কোথায়?...মনে মনে বসিয়া বসিয়া ভাবে—আচ্ছা যদি কোটা পড়ে, তবে দালানের দেয়ালটা বোধ হয় আগে পড়্‌বে—যেমন শব্দ হবে অম্‌নি পান্‌চালার দোর দিয়ে এদের টেনে বার ক'রে নেবো—

সে যেন আর বসিয়া থাকিতে পারে না—কয়দিন সে ওলশাক কচুশাক সিদ্ধ করিয়া খাইয়া দিন কাটাইতেছে—নিজে উপবাসের পর উপবাস দিয়া ছেলেমেয়েকে যাহা কিছু সামান্য খাদ্য ছিল খাওয়াইতেছে—শরীর ভাবনায় অনাহারে দুর্ব্বল, মাথার মধ্যে কেমন করে।

ঝড়ের গোঁ গোঁ শব্দ অনেক রাত্রে বড় বাড়িল। বাহিরে কি ঝট্‌কা আসিল! উপায়! একবার বড় একটা দম্‌কায় ভয় পাইয়া সে ঝড়ের গতিক বুঝিবার জন্য সন্তর্পণে দালানের দোয়ার খুলিয়া বাহিরের রোয়াকে মুখ বাড়াইল... বৃষ্টির ছাটে তাহার কাপড় চুল সব ভিজিয়া গেল—হু হু একটানা হাওয়ার শব্দে বৃষ্টিপতনের শব্দে ঝড়ের শব্দে ঢাকিয়া গিয়াছে—বাহিরে কিছু দেখা যায় না—অন্ধকারে মেঘে আকাশে বাতাসে গাছপালায় সব একাকার!...ঝড়বৃষ্টির শব্দে আর কিছু শোনা যায় না। এই হিংস্র অন্ধকার ও ক্রুর ঝটিকাময়ী রজনীর আত্মা যেন প্রলয়দেবের দূতরূপে ভীম ভৈরব বেগে বৃষ্টি গ্রাস করিতে ছুটিয়া আসিতেছে—অন্ধকারে, রাত্রে, গাছপালায়, আকাশে, মাটীতে তাহার গতিবেগ বাধিয়া শব্দ হইতেছে—সু-ইশ্...সু-উ-উ ইশ্... সু-উ-উ-উ ই-শ্-শ্...এই শব্দের প্রথম প্রথমাংশের দিকে বিশ্বগ্রাসী দূতটা যেন পিছু হটিয়া বলসঞ্চয় করিতেছে—সু-উ-উ—এবং শেষের অংশটায় পৃথিবীর উচ্চ নীচ তাবৎ

বায়ুস্তর আলোড়ন, মন্থন করিয়া বায়ুসমুদ্রে বিশাল তুফান তুলিয়া তাহার সমস্ত আসুরিকতার বলে সর্ব্বজয়াদের জীর্ণ কোটাটার পিছনে ধাক্কা দিতেছে—ই-ই-শ্...! কোটা দুলিয়া দুলিয়া উঠিতেছে···আর থাকে না! ইহার মধ্যে যেন কোনো অধীরতা, বিশৃঙ্খলতা, ভ্রমভ্রান্তি নাই—যেন দৃঢ়, অভ্যস্ত, প্রণালীবদ্ধ ভাবের কর্ত্তব্যকার্য্য!...বিশ্বটাকে নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে চূর্ণ করিয়া উড়াইয়া দেওয়ার ভার যে লইয়াছে···যুগে যুগে এরকম কত হাস্তমুখী সৃষ্টিকে বিধ্বস্ত করিয়া অনন্ত আকাশের অন্ধকারে তারাবাজির মত ছড়াইয়া দিয়া আসিয়াছে যে মহাশক্তিমান্ ধ্বংসদূত—এ তার অভ্যস্ত কার্য্য···এতে তার অধীরতা উন্মত্ততা সাজে না···

আতঙ্কে সর্ব্বজয়া দোর বন্ধ করিয়া দিল—আচ্ছা যদি এখন একটা কিছু ঘরে ঢোকে? মানুষ কি অন্য কোনো জানোয়ার? চারিদিকে ঘন বাঁশবন, জঙ্গল, লোকজনের বসতি নাই—মাগো!...জলের ছাটে ঘর ভাসিয়া যাইতেছে... হাত দিয়া দেখিল ঘুমন্ত অপুর গা জলে ভিজিয়া ন্যাতা হইয়া যাইতেছে...সে কি করে? আর কতরাত আছে?··· সে বিছানা হাতড়াইয়া দেশলাই খুঁজিয়া কেরোসিনের ডিবাটা জ্বালে। ডাকে—ও অপু ওঠ্‌তো?...জল পড়্‌চে...অপু ঘুমচোখে জড়িতগলায় কি বলে বোঝা যায় না। আবার ডাকে—অপু? শুনচিস্ ও অপু?... ওঠ্ দিকি...দুর্গাকে বলে—পাশ ফিরে শো তো দুগ্‌গা। বড্ড জল পড়্‌চে—একটু স'রে, পাশ ফের্ দিকি—

অপু উঠিয়া বসিয়া ঘুমচোখে চারিদিকে চায়—পরে আবার শুইয়া পড়ে। হুড়ুম করিয়া বিষম কি শব্দ হয়, সর্ব্বজয়া তাড়াতাড়ি আবার দুয়ার খুলিয়া বাহিরের দিকে উঁকি মারিয়া দেখিল—বাঁশবাগানের দিকটা ফাঁকা ফাঁকা দেখাইতেছে—রান্নাঘরের দেওয়াল পড়িয়া গিয়াছে!... তাহার বুক কাঁপিয়া ওঠে—এইবার যদি পুরাণো কোটাটা—? কে আছে কাহাকে সে এখন ডাকে? মনে মনে বলে—হে ঠাকুর, আজকার রাতটা কোনো রকমে কাটিয়ে দাও, হে ঠাকুর, ওদের মুখের দিকে তাকাও—

তখনও ভাল করিয়া ভোর হয় নাই, ঝড় থামিয়া গিয়াছে কিন্তু বৃষ্টি তখনও অল্প অল্প পড়িতেছে। পাড়ার নীলমণি মুখুয্যের স্ত্রী গোহালে গরুর অবস্থা দেখিতে আসিতেছেন, এমন সময় খিড়্‌কীদোরে বার বার ধাক্কা শুনিয়া আসিয়া দোর খুলিয়া বিস্ময়ের সুরে বলিলেন—নতুন বৌ!...সর্ব্বজয়া ব্যস্ত ভাবে বলিল—ন দি, একবার বট্‌ঠাকুরকে ডাকো দিকি?...একবার শীগ্‌গির আমাদের বাড়ীতে আস্‌তে বলো—দুগ্‌গা কেমন কর্‌চে! নীলমণি মুখুয্যের স্ত্রী আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন—দুগ্‌গা? কেন কি হয়েচে দুগ্‌গার?···সর্ব্বজয়া বলিল—কদিন থেকে তো জ্বর হচ্ছিল—হচ্চে আবার যাচ্চে—ম্যালেরিয়ার জ্বর, কাল সন্দে থেকে জ্বর বড্ড বেশী—তুমি—তার ওপর কাল রাত্রে কি রকম কাণ্ড তো জানই—একবার শীগ্‌গির বট্‌ঠাকুরকে—তাহার বিস্রস্ত কেশ ও রাত-জাগা রাঙা রাঙা চোখের কেমন দিশাহারা চাহনি দেখিয়া নীলমণি মুখুয্যের স্ত্রী বলিলেন—ভয় কি বৌ—দাঁড়াও আমি এখুনি ডেকে দিচ্চি—চল আমিও যাচ্চি—কাল আবার রাত্তিরে গোয়ালের চালাখানা পড়ে গেল—বাবা কাল রাত্তিরের মত কাণ্ড আমি তো কখনো দেখিনি—শেষ রাত্রে সব উঠে গরুটরু সরিয়ে রেখে আবার শুয়েচে কিনা?···দাঁড়াও আমি ডাকি—

একটু পরে নীলমণি মুখুয্যে, তাঁহার বড় ছেলে ফণি, স্ত্রী ও দুই মেয়ে সকলে অপুদের বাড়ী আসিলেন। রাত্রির সেই দৈত্যটা যেন সারা গ্রামখানা দলিত, পিষ্ট, মথিত করিয়া দিয়া আকাশ পথে অন্তর্হিত হইয়াছে—ভাঙা গাছের ডাল, পাতা, চালের খড়, কাঁচা বাঁশপাতা, বাঁসের কঞ্চিতে পথ ঢাকিয়া দিয়াছে—ঝাড়ের বাঁশ নুইয়া পথ আট্‌কাইয়া রাখিয়াছে। ফণি বলিল—দেখেচেন বাবা কাণ্ডখানা?··· সেই নবাবগঞ্জের পাকারাস্তা থেকে বিলিতি গাছটার পাতা উড়িয়ে এনেচে!...নীলমণি মুখুয্যের ছোট ছেলে একটা মরা চড়ুই পাখী বাঁশ পাতার ভিতর হইতে টানিয়া বাহির করিল।

দুর্গার বিছানার পাশে অপু বসিয়া আছে—নীলমণি মুখুয্যে ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন—কি হয়েচে বাবা অপু?—অপুর মুখে উদ্বেগের চিহ্ন। বলিল—দিদি কি সব বক্‌ছিল জেঠা মশায়।

নীলমণি বিছানার পাশে বসিয়া বলিলেন—দেখি হাত-খানা?···জ্বরটা একটু বেশী, আচ্ছা কোনো ভয় নেই—

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ফণী, তুমি একবার চট্ ক'রে নবাবগঞ্জে চ'লে যাও দিকি শরৎ ডাক্তারের কাছে—একেবারে ডেকে নিয়ে আস্বে। পরে তিনি ডাকিলেন—দুর্গা, ও দুর্গা ?—দুর্গার অঘোর আচ্ছন্ন ভাব, সাড়া শব্দ নাই। নীলমণি বলিলেন—এঃ ঘরদোরের অবস্থা তো বড্ড খারাপ ? জল প'ড়ে কাল রাত্রে ভেসে গিয়েচে···তা বৌমার লজ্জার কারণই বা কি—আমাদের ওখানে না হয় উঠ্‌লেই হোত ? হরিটারও কাণ্ড-জ্ঞান আর হোল না এ জীবনে—এই অবস্থায় এই রকম ঘরদোর সারানোর একটা ব্যবস্থা না ক'রে কি যে করচে, তাও জানি নে—

তাঁহার স্ত্রী বলিলেন—ঘর সারাবে কি, খাবার নেই ঘরে, নৈলে কি এরকম আথান্তরে ফেলে কেউ বিদেশে যায় ? আহা রোগা মেয়েটা কাল সারারাত ভিজেচে—একটু জল গরম করতে দাও—ওই জানালাটা খুলে দাও তো ফণী ?

একটু বেলায় নবাবগঞ্জ হইতে শরৎ ডাক্তার আসিলেন—দেখিয়া শুনিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন। বলিয়া গেলেন যে বিশেষ ভয়ের কোনো কারণ নাই, জ্বর বেশী হইয়াছে, মাথায় জলপটি নিয়মিত ভাবে দেওয়ার বন্দোবস্ত করিলেন। হরিহর কোথায় আছে জানা নাই—তবুও তাহার পূর্ব্ব ঠিকানায় তাহাকে একখানি পত্র দেওয়া হইল।

সেদিন এই ভাবেই কাটিল। পরদিন ঝড় বৃষ্টি থামিয়া গেল—আকাশের মেঘ কাটিতে সুরু করিল। নীলমণি মুখুয্যে দুবেলা নিয়মিত দেখাশোনা করিতে লাগিলেন। অপুদের খাওয়া দাওয়ার বন্দোবস্ত নীলমণি মুখুযোদের বাড়ীতেই হইল—এ সম্বন্ধে তাঁহার স্ত্রী সর্ব্বজয়ার কোনো আপত্তি শুনিলেন না। ঝড় বৃষ্টি থামিবার পরদিন হইতেই দুর্গার অবস্থা খারাপ হইতে লাগিল। শরৎ ডাক্তার সুবিধা বুঝিলেন না। হরিহরকে আর একখানা পত্র দেওয়া হইল।

অপু তাহার দিদির মাথার কাছে বসিয়া জলপটি দিতে-ছিল। জ্বর আবার বড় বাড়িয়াছে। জলপটি দিতে দিতে দিদিকে সে দু একবার ডাকিল—ও দিদি শুন্‌ছিস্, কেমন আছিস্, ও দিদি ? দুর্গার কেমন আচ্ছন্ন ভাব। ঠোঁট্ নড়িতেছে—কি যেন আপন মনে বলিতেছে, ঘোর ঘোর। অপু কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া দু একবার চেষ্টা করিয়াও কিছু বুঝিতে পারিল না। বৈকালের দিকে জ্বর ছাড়িয়া গেল। দুর্গা আবার চোখ মেলিয়া চাহিতে পারিল এতক্ষণ পরে। সে ভারী দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে, কথা এত ক্ষীণস্বরে বলিতেছে যে, ভাল করিয়া না শুনিলে বোঝা যায় না কি বলিতেছে।

মা গৃহকার্য্যে উঠিয়া গেলে অপু দিদির কাছে বসিয়া রহিল। দুর্গা চোখ তুলিয়া তাহার দিকে চাহিয়া বলিল—বেলা কত রে ?

অপু বলিল--বেলা এখনও অনেক আছে—রদ্দুর উঠেচে আজ দেখিচিস্ দিদি ? এখনও আমাদের নারকোল্ গাছের মাথায় রদ্দুর রয়েচে—

খানিকক্ষণ দুজনেই কোনো কথা বলিল না। অনেক দিন পরে রৌদ্র ওঠাতে অপুর ভারি আহ্লাদ হইয়াছে। সে জানালার বাহিরে রৌদ্রালোকিত গাছটার মাথায় চাহিয়া রহিল।

খানিকটা পরে দুর্গা বলিল—শোন্ অপু—একটা কথা শোন্—

কি রে দিদি ? পরে সে দিদির মুখের আরও কাছে মুখ লইয়া গেল।

—আমায় একদিন তুই রেলগাড়ী দেখাবি ?

—দেখাবো এখন—তুই সেরে উঠ্‌লে বাবাকে ব'লে আমারা সব একদিন গঙ্গা নাইতে যাবো রেলগাড়ী ক'রে—

পরদিন সকাল দশটার সময় নীলমণি মুখুয্যে অনেকদিন পরে নদীতে স্নান করিতে যাইবেন বলিয়া তেল মাখিতে বসিয়াছেন, তাঁহার স্ত্রীর উত্তেজিত সুর তাঁর কানে গেল—ওগো,এসো তো একবার এদিকে শীগ্‌গীর—অপুদের বাড়ীর দিক্ থেকে যেন একটা কান্নার গলা পাওয়া যাচ্চে--

ব্যাপার কি দেখিতে সকলে ছুটিয়া গেলেন।

সর্ব্বজয়া মেয়ের মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিতেছে—ও দুগ্‌গা চা দিকি--ওমা ভাল ক'রে চা দিকি—ও দুগ্‌গা—

নীলমণি মুখুয্যে ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন—কি হয়েচে—সরো সরো সব দিকি—আহা কি সব বাতাসটা বন্ধ ক'রে দাঁড়াও ?

সর্ব্বজয়া ভাসুর সম্পর্কের প্রবীণ প্রতিবেশীর ঘরের মধ্যে উপস্থিতি ভুলিয়া গিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—ওগো, কি হোল মেয়ে অমন করচে কেন ?

দুর্গা আর চাহিল না।

আকাশের নীল আস্তরণ ভেদ করিয়া মাঝে মাঝে অনন্তের যে হাতছানি আসে—পৃথিবীর বুক থেকে ছেলেমেয়েরা চঞ্চল হইয়া ছুটিয়া গিয়া অনন্তনীলিমার মধ্যে ডুবিয়া নিজেদের হারাইয়া ফেলে—অনন্তকোটী নতুন জগতের মধ্যে কোন পথহীন পথে—দুর্গার অশান্ত, চঞ্চল প্রাণের বেলায় জীবনের সেই সর্ব্বাপেক্ষা বড় অজানার ডাক আসিয়া পৌঁছিয়াছে। তখনি আবার রামকৃষ্ট ডাক্তারকে ডাকা হইল—বলিলেন—ম্যালেরিয়ার শেষ ষ্টেজ্‌টি আর কি—খুব জ্বরের পর যেমন বিরাম হয়েচে আর অমনি হাটফেল ক'রে—ঠিক এ রকম একটা কেস্ হ'য়ে গেল সেদিন দলুবরায়—

আধঘন্টার মধ্যে পাড়ার লোকে উঠান ভাঙ্গিয়া পড়িল।

১০

হরিহর বাড়ার চিঠি পায় নাই।

এবার বাড়ী হইতে বাহির হইয়া হরিহর রায় প্রথমে গোয়াড়ী কৃষ্ণনগর যায়। কাহারও সঙ্গে তথায় তাহার পরিচয় ছিল না। সহর বাজার জায়গা, একটা না একটা কিছু উপায় হইবে এই অজানার কুহকে পড়িয়াই সে সেখানে গিয়াছিল। গোয়াড়ীতে কিছুদিন থাকিবার পর সে সন্ধান পাইল যে, সহরের উকিল কি জমিদার বাড়ীতে দৈনিক বা মাসিক চুক্তি হিসাবে চণ্ডীপাঠ করার কার্য্য প্রায়ই জুটিয়া যায়। আশায় আশায় দিন পনেরো কাটাইয়া বাড়ী হইতে পথখরচ বলিয়া যৎসামান্য যাহা কিছু আনিয়াছিল ফুরাইয়া ফেলিল, অথচ কোথাও কিছু সুবিধা হইল না। সে পড়িল মহাবিপদে—অপরিচিত স্থান, কেহ একটি পয়সা দিয়া সাহায্য করে এমন নাই—মোড়ে বাজারের যে হোটেলটিতে ছিল, পয়সা ফুরাইয়া গেলে সেখান হইতে বাহির হইতে হইল। একজনের নিকট শুনিল স্থানীয় হরিসভায় নবাগত অভাবগ্রস্ত ব্রাহ্মণ পথিককে বিনামূল্যে থাকিতে ও খাইতে দেওয়া হয়। অভাব জানাইয়া হরিসভার একটা কুঠুরির এক পাশে সে থাকিবার স্থান পাইল বটে, কিন্তু সেখানে বড় অসুবিধা, কারণ অনেক গুলি নিষ্কর্ম্মা গাঁজাখোর লোক রাত্রিতে সেখানে আড্ডা করে, প্রায় সমস্ত রাত্রি হৈ হৈ করিয়া কাটায়, এমনকি গভীর রাত্রিতে এক-একদিন এমন ধরণের স্ত্রীলোকের যাতায়াত দেখা যাইতে লাগিল যাহাদের ঠিক হরিমন্দিরদর্শনপ্রার্থিনী ভদ্রমহিলা বলিয়া মনে হয় না। অতিকষ্টে দিন কাটাইয়া সে সহরের বড় বড় উকিল ও ধনী গৃহস্থের বাড়ীতে ঘুরিতে লাগিল। সারাদিন ঘুরিয়া অনেক রাত্রিতে ফিরিয়া এক-একদিন দেখিত তাহার স্থানটিতে তাহারই বিছানাটি টানিয়া লইয়া কে একজন অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তি নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতেছে। হরিহর কয়েকদিন বাহিরের বারান্দায় শুইয়া কাটাইল। প্রায়ই এরূপ হওয়াতে ইহা লইয়া গাঁজাখোর সম্প্রদায়ের সহিত তাহার একটু বচসা হইল। পরদিন প্রাতে তাহারা হরিসভার সেক্রেটারীর কাছে গিয়া কি লাগাইল তাহারাই জানে—সেক্রেটারী বাবু নিজ বাড়ীতে হরিহরকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন ও বলিলেন, তাঁহাদের হরিসভার তিনদিনের বেশী থাকিবার নিয়ম নাই, সে যেন অন্যত্র বাসস্থান দেখিয়া লয়।

সন্ধ্যার পরে জিনিষপত্র লইয়া হরিহরকে হরিসভার বাড়ী হইতে বাহির হইতে হইল। মোড়ে নদীর ধারে অল্প একটু নির্জ্জন স্থানে পুঁটুলিটা নামাইয়া রাখিয়া নদীর জলে হাতমুখ ধুইল। সারাদিন কিছু খাওয়া হয় নাই—সেদিন একটি কাঠের গোলাতে বসিয়া শ্যামাবিষয় গান করিয়াছিল—গোলার অধিকারী একটি টাকা প্রণামী দেয়—সেই টাকাটি হইতে কিছু পয়সা ভাঙ্গাইয়া বাজার হইতে মুড়ি ও দই কিনিয়া আনিল। খাবার গলা দিয়া যেন নামে না—মাত্র দিন দশেকের সম্বল রাখিয়া সে বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছে। অদ্য প্রায় একমাসের উপর হইয়া গেল—এপর্য্যন্ত একটি পয়সা পাঠাইতে পারে নাই—এতদিন কি করিয়া তাহাদের চলিতেছে! অপু বাড়ী হইতে আসিবার সময় বার বার বলিয়া দিয়াছে—তাহার জন্য একখানা পদ্মপুরাণ কিনিয়া লইয়া যাইবার জন্য। সে বই পড়িতে বড় ভাল বাসে—বাড়ীর রামায়ণ মহাভারত সব পড়িয়া শেষ করিয়া ফেলিয়াছে। মাঝে মাঝে ছেলে যে তাহার বাক্স দপ্তর খুলিয়া লুকাইয়া বই

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বাহির করিয়া লইয়া পড়ে, তাহা হরিহর বুঝিতে পারে—বাক্সের ভিতর আনাড়ি হাতের হেলাগোছা করা থাকে—কোন্ বই বাপ বাক্সের কোথায় রাখে, ছেলে তাহা জানে না—উল্টাপাল্টা করিয়া সাজাইয়া চুরি ঢাকিবার অক্ষম চেষ্টা করে—হরিহর বাড়ী ফিরিয়া বাক্স খুলিলেই বুঝিতে পারে ছেলের কীর্ত্তি। তাহার বাড়ী হইতে আসিবার পূর্ব্বে হরিহর ঘুগীপাড়া হইতে একখানা বটতলার পদ্য পদ্মপুরাণ পড়িবার জন্য লইয়া আসে—সে একটা পালা লিখিতেছিল, তাহাতে বইখানি একবার দেখিবার প্রয়োজন ছিল। অপু বইখানা দখল করিয়া বসিল—রোজ রোজ পড়ে—কুচুনী পাড়ায় শিবঠাকুরের মাছ ধরিতে যাওয়ার কথাটা পড়িয়া তাহার ভারী আমোদ—বইখানা সে ছাড়িতে চায় না। হরিহর বলে—বইখানা দ্যাও বাবা, যাদের বই তারা চাচ্চে যে? অবশেষে একখানা পদ্মপুরাণ তাহাকে কিনিয়া দিতে হইবে—এই সর্ত্তে বাবাকে রাজী করাইয়া তবে সে বই ফেরৎ দেয়। আসিবার সময় বার বার বলিয়াছে—সেই বই একখানা এনো কিন্তু বাবা, এবার অবিশ্যি অবিশ্যি? দুর্গার উঁচু নজর নাই, সে বলিয়া দিয়াছে, একখানা সবুজ হাওয়ায় কাপড় ও একপাতা ভাল দেখিয়া আলতা লইয়া যাইবার জন্য। কিন্তু সে সব তো দূরের কথা, কি করিয়া বাড়ীতে সংসার চলিতেছে সেই না এখন সমস্যা?

সন্ধ্যার পর পূর্ব্বপরিচিত কাঠের গোলটায় গিয়া সে রাত্রের মত আশ্রয় লইল। ভাল ঘুম হইল না—বিছানায় শুইয়া বাড়ীতে কি করিয়া কিছু পাঠায় এই ভাবনায় এপাশ ওপাশ করিতে লাগিল। সকালে উঠিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে সে লক্ষ্যহীন ভাবে পথের একস্থানে দাঁড়াইল। রাস্তার ওপারে একটা লাল ইটের লোহার ফটক-ওয়ালা বাড়ী। অনেকক্ষণ চাহিয়া তাহার কেমন মনে হইল এই বাড়ীতে গিয়া দুঃখ জানাইলে তাহার একটা উপায় হইবে। কলের পুতুলের মত সে ফটকের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। সাজানো বৈঠকখানা, মার্ব্বেল পাথরের ধাপের স্তরে স্তরে বসানো ফুলের টব, পাথরের পুতুল, পাম্, দরজায় ঢুকিবার স্থানে পা-পোষ পাতা। একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক বৈঠকখানায় খবরের কাগজ পড়িতেছিলেন—অপরিচিত লোক দেখিয়া কাগজ পাশে রাখিয়া সোজা হইয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কে তুমি? কি দরকার? হরিহর বিনীতভাবে বলিল—আজ্ঞে আমি ব্রাহ্মণ—সংস্কৃত পড়া আছে, চণ্ডী পাঠ-টাট্ করি—তা ছাড়া ভাগবত কি গীতা পাঠও—

প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি ভাল করিয়া কথা না শুনিয়াই তাঁহার সময় অত্যন্ত মূল্যবান্, বাজে কথা শুনিবার সময় নিতান্ত সংক্ষেপ জানাইয়া দিবার ভাবে বলিলেন—না, এখানে ওসব কিছু এখন সুবিধে হবে না, অন্য জায়গায় দেখুন। হরিহর মরিয়া ভাবে বলিল—আজ্ঞে নতুন সহরে এসেচি, একেবারে হাতে নেই—বড় বিপদে পড়িচি, কদিন ধ'রে কেবলই—

প্রৌঢ় লোকটি তাড়াতাড়ি আপদ বিদায় করিবার ভঙ্গীতে ঠেস দেওয়ার তাকিয়াটা উঠাইয়া একটা কি তুলিয়া লইয়া হরিহরের দিকে হাত বাড়াইয়া বলিলেন—এই নিন্, যান্, অন্য কিছু হবে টবে না, নিন্। সেটা যে শ্রেণীর মুদ্রাই হউক্ সেইটাই অন্য সুরে দিতে আসিলে হরিহর লইতে কিছুমাত্র আপত্তি করিত না—এরূপ সে বহুস্থানে লইয়াছেও; কিন্তু হঠাৎ যেন ঘরটার বড় দোলক-ঝুলানো ঘড়িটার সুস্পষ্ট গম্ভীর টক্ টক্ শব্দ, ফরাসের বিছানার চাদর মুড়িবার বিশেষ ভঙ্গিটি, ঘরের অনির্দ্দিষ্ট অপরিচিত ধরণের গন্ধ সবশুদ্ধ মিলিয়া তাহার কাছে অত্যন্ত অস্বাস্তিকর, অপ্রীতিকর ঠেকিল। সে বিনীতভাবেই বলিল—আজ্ঞে ও আপনি রাখুন, আমি এম্নি কারুর কাছে নিইনে—আমি শাস্ত্র পাঠ টাট্ করি—তা ছাড়া কারুর কাছে—আচ্ছা থাক্—

একটু শুভযোগ বোধ হয় ঘটিয়াছিল। রক্ষিত মশায়ের কাঠের গোলাতেই একদিন একটা সন্ধান জুটিল। কৃষ্ণনগরের কাছে একটা গ্রামে একজন বর্দ্ধিষ্ণু মহাজন গৃহ-দেবতার পূজা পাঠ করিবার জন্য একজন ব্রাহ্মণ খুঁজিতেছে, যে বরাবর টিকিয়া থাকিবে। রক্ষিত মশায়ের যোগাযোগে অবিলম্বে হরিহর সেখানে গেল—বাড়ীর কর্ত্তাও তাহাকে পছন্দ করিলেন। থাকিবার ঘর দিলেন, আদর আপ্যায়নের কোন ত্রুটি হইল না।

কয়েকদিন কার্য্য করিবার পরেই পূজা আসিয়া পড়িল। বাড়ী যাইবার সময় বাড়ীর কর্ত্তা দশটাকা প্রণামী ও

যাতায়াতের গাড়ীভাড়া দিলেন, গোয়াড়ীতে রক্ষিত মশায়ের নিকট বিদায় লইতে আসিলে সেখান হইতেও পাঁচটি টাকা প্রণামী পাওয়া গেল।

আকাশে বাতাসে গরম রৌদ্রের গন্ধ, নীল নির্ম্মেঘ আকাশের দিকে চাহিলে মনে হঠাৎ উল্লাস আসে, বর্ষা-শেষের সরস সবুজ লতা পাতায়, পথিকের চরণ-ভঙ্গিতে কেমন একটা আনন্দ মাখানো। রেল পথের দুপাশে কাশ ফুলের ঝাড় গাড়ীর বেগে লুটাইয়া লুটাইয়া পড়িতেছে, চলিতে চলিতে কেবলই সে বাড়ীর কথা ভাবিতে লাগিল।

একদল শান্তিপুরের ব্যবসায়ী লোক পূজার পূর্ব্বে কাপড়ের গাঁট ক্রয় করিতে কলিকাতায় গিয়াছিল, পারগামী খেয়ার নৌকায় উঠিয়া কলরব করিতেছে—সর্ব্বত্র একটা উৎসবের উল্লাস। রাণাঘাটের বাজারে সে স্ত্রী ও পুত্র-কন্যার জন্য কাপড় কিনিল। দুর্গা লালপাড় কাপড় পরিতে ভালবাসে, তাহার জন্য বাছিয়া একখানা ভাল কাপড়, ভাল দেখিয়া আল্‌তা কয়েক পাত। অপুর 'পদ্মপুরাণ' অনেক সন্ধান করিয়াও মিলিল না, অবশেষে একখানা 'সচিত্র চণ্ডী-মাহাত্ম্য বা কালকেতুর উপাখ্যান' ছয় আনা মূল্যে কিনিয়া লইল। গৃহস্থালীর টুক্‌টাক্ দু একটা জিনিস, সর্ব্বজয়া বলিয়া দিয়াছিল একটা কাঠের চাকী বেলুনের কথা, তাহাও কিনিল।

দেশের ষ্টেশনে নামিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে বৈকালের দিকে সে গ্রামে আসিয়া পৌছিল। পথে বড় একটা কাহারও সহিত দেখা হইল না, দেখা হইলেও সে হন্ হন্ করিয়া উদ্বিগ্ন-চিত্তে কাহারও দিকে বিশেষ লক্ষ্য না করিয়া বাড়ীর দিকে চলিল। দরজায় ঢুকিতে ঢুকিতে আপন মনে বলিল—উঃ, দ্যাখো কাণ্ডখানা! বাঁশ ঝাড়টা ঝুঁকে পড়েচে একেবারে পাঁচীলের ওপর, ভুবন কাকা কাটাবেনও না—মুস্কিল হয়েচে আচ্ছা—পরে সে বাড়ীর উঠানে ঢুকিয়া অভ্যাসমত আগ্রহের সুরে ডাকিল—ওমা দুগ্‌গা—ও অপু—

তাহার গলার স্বর শুনিয়া সর্ব্বজয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল।

হরিহর হাসিয়া বলিল,—বাড়ীর সব ভালো? এরা সব কোথায় গেল? বাড়ী নেই বুঝি? সর্ব্বজয়া শান্তভাবে আসিয়া স্বামীর হাত হইতে ভারী পুঁটুলিটা নামাইয়া লইয়া বলিল, এসো—ঘরে এসো— স্ত্রীর অদৃষ্টপূর্ব্ব শান্তভাব হরিহর লক্ষ্য করিলেও তাহার মনে কোনো খট্‌কা হইল না—তাহার কল্পনার স্রোত তখন উদ্দাম বেগে অন্যদিকে ছুটিয়াছে—এখনই ছেলে মেয়ে ছুটিয়া আসিবে—

দুর্গা আসিয়া হাসিমুখে বলিবে—কি বাবা এর মধ্যে? অমনি তাড়াতাড়ি হরিহর পুঁটুলি খুলিয়া মেয়ের কাপড় ও আল্‌তার পাতা এবং ছেলের 'সচিত্র চণ্ডী-মাহাত্ম্য বা কালকেতুর উপাখ্যান' ও টিনের রেলগাড়ীটা দেখাইয়া তাহাদের তাক্ লাগাইয়া দিবে! সে ঘরে ঢুকিতে ঢকিতে বলিল, বেশ কাঁঠাল কাঠের চাকী বেলুন এনিচি এবার—পরে কিছু নিরাশামিশ্রিত সতৃষ্ণ নয়নে চারিদিকে চাহিয়া বলিল, কৈ—অপূ দুগ্‌গা এরা বুঝি সব বেরিয়েচে—

সর্ব্বজয়া আর কোনো মতেই চাপিতে পারিল না। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল—ওগো দুগগা কি আর আছে গো—মা যে আমাদের ফাঁকি দিয়ে চ'লে গিয়েচে গো—এতদিন কোথায় ছিলে!—

গাঙ্গুলী বাড়ীর পূজা অনেক কালের। এ কয়দিন গ্রামের অতি দরিদ্রও অভুক্ত থাকে না। সব বনেদি বন্দোবস্ত, নির্দ্দিষ্ট সময়ে কুমার আসিয়া প্রতিমা গড়ায়, পোটো চালচিত্র করে, মালাকর সাজ যোগায়, বারাসে-মধুখালির দ' হইতে বাউরিরা রাশি রাশি পদ্মফুল তুলিয়া আনে।

আঁসমালির দীনু সানাইদার অন্য অন্য বৎসরের মত রসুন চৌকী বাজাইতে আসিল। প্রভাতের আকাশে আগমনীর আনন্দ সুর বাজিয়া ওঠে,—আসন্ন হেমন্ত ঋতুর স্নেহ অভ্যর্থনা,—নব ধান্যগুচ্ছের, নব আগন্তুক শেফালি দলের, হিমালয়ের পার হইতে উড়িয়া-আসা পথিক-পাখী শ্যামার, শিশির-স্নিগ্ধ মৃণাল-ফোটা হেমন্তসন্ধ্যার।

নতুন কাপড় পরাইয়া ছেলেকে সঙ্গে লইয়া হরিহর নিমন্ত্রণ খাইতে যায়। একখানি অগোছালো চুলে-ঘেরা ছোট মুখের সনির্ব্বন্ধ গোপন অনুরোধ দুয়ারের পাশের

বাতাসে মিশাইয়া থাকে—হরিহর পথে পা দিয়া কেমন অন্যমনস্ক হইয়া পড়ে—ছেলেকে বলে এগিয়ে চল, এগিয়ে চল, অনেক বেলা হ'য়ে গিয়েচে বাবা—

গাঙ্গুলী বাড়ীর প্রাঙ্গণ উৎসববেশে সজ্জিত হাসিমুখ ছেলে মেয়েতে ভরিয়া গিয়াছে। অপু চাহিয়া চাহিয়া দেখিল সতু ও তাহার ভাই কেমন কমলানেবু রং এর জামা গায়ে দিয়াছে—সবুজ সাড়ী পরিয়া ও দিব্য চুল বাঁধিয়া রানু-দিদিকে যা মানাইয়াছে! গাঙ্গুলী বাড়ীর মেয়ে সুনয়নী খোঁপায় রজনীগন্ধা ফুল গুঁজিয়া আর পাঁচ ছয়টি মেয়ের সঙ্গে পূজার দালানে দাঁড়াইয়া খুব গল্প করিতেছে ও হাসিতেছে। সুনয়নী বাদে বাকী মেয়েদের সে চেনে না, বোধ হয় অন্য জায়গা হইতে উহাদের বাড়ী পূজার সময় আসিয়া থাকিবে—সহরের মেয়ে বোধ হয়, যেমন সাজ গোজ, তেমনি দেখিতে! অপু একদৃষ্টে তাহাদের দিকে চাহিয়া রহিল। ওদিকে কে চেঁচাইয়া বলিতেছে—বড় সামিয়ানাটা আন্‌বার ব্যবস্থা এখনও হোল না? বাঃ—তোমাদের যা কাজকর্ম্ম, দেখো এখন এর পর মজাটা!

(ক্রমশঃ)

গরবিণী গেঁয়ো-বালা

শ্রীনীলিমা রায়

কে চলে পুকুর-ঘাটে কাঁখে কলসী,
জল নিতে যায় বুঝি গেঁয়ো রূপসী!
বাজিছে কাঁকন করে, পায়ে বাজে মল,
উড়িছে উদাস বায়ে শিথিল আঁচল!
উরসে দুলিছে হার, কানে দোলে দুল,
স্বপন-আবেশ-মাখা আঁখি ঢুলুঢুল্!
শ্যামল-নীরদ-নীল বসন মেলে—
গেঁয়ো-বালা! কোথা হতে নামিয়া এলে!
এলে কি সঘন বন-পথ চলিয়া,
শিরীষ-শেফালি-দল পায়ে দলিয়া!
দুটি ভীরু আঁখি তুলি কী ভাষা কহ!
নিখিলের সুধা-খনি হৃদয়ে বহ!
লাগিল পায়ে কি ব্যথা পথ চলিতে?
চপল নয়নে চাহ কারে ছলিতে?

ছায়া-কালো বন-পথ আলো করিয়া,
গরবিণী গেঁয়ো-বালা যায় চলিয়া!
দাড়িমের কুঁড়ি ঝরে মুক্ত-কেশে—
হাতে তুলি' ফেলে দেয় মধুর হেসে!
শ্রোণী-ভারে গতি তার শিথিল ভারী,
জল চল্‌কিয়া ভিজে সুনীল শাড়ী!
বন-পথ বাহি' চলে বনের রাণী!
বেতস-আঁকড় ধরে আঁচল টানি'!
সেথা ঝোঁপে খোঁজে 'ওরা' বেতসের ফল,
সরমে লাজুক মেয়ে আঁখি ছলছল্!
কাছে এসে 'একজন' চাহি' মুখ 'পর,
নীরবে ছাড়ায়ে দেয় বেতস-আঁকড়!
মুখখানি রাঙা করি' চলে সে ধীরে,—
অভিমানী গেঁয়ো-বালা চাহে না ফিরে!

জলধর সেন

শ্রীঅবনীনাথ রায়

সুলেখক জলধর বাবুর বয়স সত্তর পার হ'ল। শিশু-মড়কের প্রাবল্যে যে জাতি ধ্বংসের পথে এগিয়ে চলেচে, আর যাদের গড়পরতা আয়ুর পরিমাণ আটাশ বছরে দাঁড়িয়েচে, তাদের পক্ষে কেবলমাত্র দীর্ঘকাল বেঁচে থাকাটাই একটা আনন্দের কারণ। আবার জলধর বাবু যে শুধু বেঁচেই আছেন তাই নয়, জাতির সাহিত্য-ভাণ্ডারে তিনি কিছু সম্পদও দিয়েচেন। সুতরাং তাঁর সপ্ততিতম জন্মোৎসব উপলক্ষে আমরা তাঁকে স্মরণ করি এবং ভগবানের নিকট তাঁর দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করি।

আমাদের সাহিত্যকে তিনি যেটুকু সমৃদ্ধ করেচেন তার জন্যেই কৃতজ্ঞ হওয়ার প্রয়োজন আছে। প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী ধ'রে তিনি সাহিত্যের সেবা করেচেন,এ কথা বল্‌লে বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না। এর থেকে এই প্রমাণ হয় যে, সাহিত্যের প্রতি তাঁর দরদ আন্তরিক এবং আত্যন্তিক। এই অভাব অভিযোগের দিনে পোষ্য প্রতিপালনের গুরুভার নিয়ে তিনি সাহিত্যের দ্বারস্থ না হ'য়ে যদি কোন সওদাগরী আপিসের দ্বারস্থ হতেন তবে তাঁর অর্থনৈতিক অবস্থাটা সুচারু হ'তে পারত—উপরন্তু বৃদ্ধ বয়সে কিছু প্রভিডেণ্ট ফণ্ড আর gratuity নিয়ে কাশীবাস করতেও পারতেন। তা' না ক'রে তিনি যে-দেবীর শরণ নিয়েচেন লক্ষ্মীর সঙ্গে তাঁর চিরবিবাদ। দেবী বাণীর দীন সেবকের নির্লোভিতার ন্যায্য মূল্যটুকু দিতে আমরা যেন অপারক না হই।

জলধর বাবুর বইএর সমগ্র তালিকা আমি সংগ্রহ করতে পারি নি—আমাদের মীরাটের এই বীণা লাইব্রেরীতে তাঁর ৩৩ খানি বই আছে। আমার বিশ্বাস তাঁর বইএর সংখ্যা আরো বেশী। আমি যতদূর দেখেচি তাতে জলধর বাবুর বই গুলিকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে—ভ্রমণকাহিনী, উপন্যাস ও চরিতকথা।

জলধর বাবুর ভিতর একজন সুপ্ত ভবঘুরে বাস করে। সে মাথা নাড়া দিয়ে জেগে উঠ্‌লেই জলধর বাবুকে বিছানাপত্র বেঁধে বেরুতে হয়। ১৮৯০ সালে অর্থাৎ আজকের থেকে ৩৯ বচ্ছর আগে তিনি একবার খুব লম্বা পাড়ি দিয়েছিলেন। হিসাব মত তখন তাঁর বয়স ত্রিশ পেরিয়েছে। সংসারের একটা প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে তিনি হিমালয়ের বুকের মধ্যে জুড়ুতে এসেছিলেন। সেই হিমালয় ভ্রমণের রোজনাম্চা সংগ্রহ ক'রে সুসাহিত্যিক দীনেন্দ্র কুমার রায় "ভারতী" পত্রিকায় ছাপিয়ে দেন। পরে এর থেকে "হিমালয়" নাম দিয়ে জলধর বাবুর প্রসিদ্ধ বই ১৯০: সালে ছাপা হয়। স্কুলের বালকবালিকাদের উপযোগী ক'রে 'হিমাদ্রি' নাম দিয়ে 'হিমালয়ে'র একটি শিশু-সংস্করণও ছাপা হয়েচে।

'হিমালয়' বেরুনোর পর জলধর বাবুর খুব সুখ্যাতি হয়। এতাদনকার অনুভূত একটা অভাব দূর হওয়াই তার প্রথম এবং প্রধান কারণ ব'লে আমার ধারণা। ভ্রমণ-কাহিনী আমাদের সাহিত্যে বেশী নেই—অভাব এবং স্বভাবের দোষে আমরা কতকটা কুণো প্রকৃতির। সুতরাং যারা কোনদিন বদরিকাশ্রমে সশরীরে উপস্থিত হ'তে পারবেন না জলধর বাবুর ভ্রমণবৃত্তান্ত প'ড়ে তাঁদের ভ্রমণেচ্ছু আত্মা তৃপ্ত হয়। বিশেষতঃ হিন্দুর তীর্থস্থানের বিবরণ কোন দিনই এ জাতির নিকট অনাদরণীয় নয়। জলধরবাবু আবার সশ্রদ্ধভাবে এই তীর্থদর্শন করতে বেরিয়েছিলেন এবং স্থানগুলির সশ্রদ্ধ বর্ণনাই দিয়েছেন। ঝরঝরে ভাষায় ভ্রমণকাহিনী লিখ্‌তে পারার দক্ষতা তাঁর আছে এ কথাও স্বীকার্য্য। আর আজকের থেকে চল্লিশ বৎসর আগে তিনি যখন তীর্থযাত্রা করেছিলেন তখন পথঘাট এতটা সুগম এবং নিরাপদ ছিল না।

জলধর বাবুর ভিতরকার ভবঘুরে যে এখনো একেবারে মরে নি তার প্রমাণ তিনি এই বৃদ্ধ বয়সে এবং অপটু শরীর

শ্রীঅবনীনাথ রায়

নিয়ে অত্যন্ত শীতের সময় সাহিত্য-সম্মিলনে যোগ দিতে মীরাট এসেছিলেন এবং সভাপতিত্ব করতে ইন্দোর গিয়েছিলেন। কলকাতা থেকে দু জায়গারই দূরত্ব হাজার মাইলের কাছাকাছি।

উপন্যাস, ছোট গল্প এবং বড় গল্প জলধরবাবু অনেক লিখেছেন। এখন পর্য্যন্ত তাঁর কলম থামে নি। ছোট বড় সব মাসিকের পৃষ্ঠাতেই তাঁর গল্প বা প্রবন্ধের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে জলধর বাবুর সম্বন্ধে এইটুকু বলা যায় যে, তাঁর লেখায় gigantic intellectএর পরিচয় নাই থাকুক, gigantic heartএর পরিচয় আছে। বাংলা দেশের দুঃখ দারিদ্র্য, রোগ শোক, সমাজের পীড়ন তাঁর বুকের মধ্যে গিয়ে তীরের মত বেঁধে। তাতে কাতর হ'য়ে তিনি কাঁদতে জানেন, সুতরাং তাঁর পাঠকবর্গকেও কাঁদাতে পারেন। সমাজের একটা ব্যবস্থার প্রতি তিনি বিশেষ ক'রে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, সেটি এই যে, যদি কোন অল্পবয়স্কা বিধবা কোন অসতর্ক মুহূর্ত্তে হঠাৎ ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসে, অথচ প্রকৃত পাপ না করে, তবু সমাজ তাকে ত্যাগ করবে কেন? 'বিশুদাদা' উপন্যাসের ভিতর দিয়ে তিনি এইটি প্রমাণ করেছেন—এমন কি পথভ্রান্তা সেই মেয়েটিকে শেষে তিনি আদর্শ মহিলা-জীবনে রূপান্তরিত করেছেন। তাঁর বল্‌বার কথাটা বোধ হয় এই যে, সমাজ যদি সমস্ত খুঁটি নাটি জেনে শুনে সহৃদয়ভাবে এই সমস্ত ব্যাপারের বিচার করেন, এবং কারুর পা বাঁধা-পথ থেকে স্খলিত হয়েছে কেবলমাত্র এইটুকু শুনেই যদি নাক না সেঁট্‌কান তা হ'লে অনেক কিশোর-জীবন শুধু যে অকালেই ঝ'রে পড়া থেকে রক্ষা পায় তাই নয়, একটা ধাক্কা খাওয়ার ফলে তাদের পরবর্ত্তী জীবন মহীয়ান্ হ'য়ে উঠ্‌তে পারে। 'বিশুদাদা'র ভিতর দিয়ে কথাটা ব'লে তিনি তৃপ্ত হতে পারেন নি—আবার 'অভাগী'র ভূমিকায় বলছেন, "ইতঃপূর্ব্বে বিশুদাদা পুস্তকে একটি কথা বলিতে চাহিয়াছিলাম; আমার অক্ষমতাবশতঃ কথাটা যেমন করিয়া বলিলে হইত, তাহা বলা হয় নাই, তাই পুনরায় চেষ্টা করিলাম; কিন্তু এবারেও কথাটা ঠিকমত বলা হইল কিনা, বুঝিতে পারিতেছি না।" কথাটা ঐ এবং দু'খানি পুস্তকেই সেটা ভাল ভাবে দেখান হয়েচে। আমাদের সমাজ এখনো এ বিষয়ে উদারতার পরিচয় দেন নি—যদি কোন দিন দেন তা' হলে জলধর বাবুর অশ্রুপাত একেবারে নিরর্থক হবে না।

মানপত্র

রায় জলধর সেন বাহাদুর মহোদয়ের সপ্ততিতম জন্মোৎসব উপলক্ষে মীরাটস্থ প্রবাসী বাঙ্গালীগণের শ্রদ্ধাঞ্জলি।

"হে বঙ্গভাষাজননীর একনিষ্ঠ সাধক! সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের যুগে যাঁহারা দেবী বাণীর শ্রীচরণে পুষ্পাঞ্জলি দিতেছিলেন তাঁহাদের অধিকাংশ সাধকগণই ইহজগত হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। যাঁহারা অবশিষ্ট আছেন তুমি তাঁহাদিগের অন্যতম। যিনি তোমাকে এই সুদীর্ঘ কাল বীণাপাণির সেবায় নিরত রাখিয়াছেন সেই বিশ্বনিয়ন্তার নিকট ভক্তিপ্রণত হৃদয়ে আমরা তোমার সুদীর্ঘ জীবন কামনা করি।

"হে মাতৃভাষার সেবক! প্রকৃত সাধক যেমন নিজে সিদ্ধিলাভ করিয়া অপরকে তাঁহার সাধন পথের পথিক করিয়া লয়েন এবং দেশের ও দশের কল্যাণ সাধন করেন, তুমিও তেমনি নিজে সিদ্ধিলাভ করিয়া অপরকে সেই পথের পথিক করিয়া লইয়াছ এবং লইতেছ। তোমার জন্ম-বাসরের এই বাসন্তী সন্ধ্যায় আমরা আজ এই কথাই বলি,

'তোমারে যে ভালবাসি সে তোমারি গুণে"

মীরাট দুর্গাবাড়ী ৩১।৩।২৯ — শ্রীললিতমোহন রায় বিদ্যাবিনোদ কর্ত্তৃক পঠিত

জলধর বাবুর গল্প বা উপন্যাসের মধ্যে আর একটি বস্তু চোখে পড়ে—সমাজের পুরাণো রীতি নীতির প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা। জাতিতে গোয়ালা, বাগ্দী ইত্যাদি হ'লেও বাড়ীর পুরাণো চাকর ছেলেদের "দাদা"—তাদের উপর সে-দাদার অবাধ আধিপত্য। মনিব বাড়ীর ছেলে মেয়েই সে-দাদার ছেলে মেয়ে—তার আর পৃথক সংসার নেই বল্লেই হয়। এই বস্তুটি বাংলাদেশের সমাজ-জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব, অধুনা বিংশ শতাব্দীর সভ্যতার চাপে লোপ পেতে বসেচে। সুতরাং কথা-সাহিত্যের ভিতরে এর দর্শন পাওয়াটাকে অনেকে হয়ত residue of a barbaric trait ব'লে মনে করবেন, কিন্তু আমার কাছে বড় refreshing ব'লে মনে হয়।

তারপর চরিতকার জলধর বাবুর কথা। তিনি "কাঙ্গাল হরিনাথে"র জীবনবৃত্তান্ত সাধারণ্যে প্রকাশ ক'রে একটি মস্ত কাজ করেচেন। তিনি এই সাধুপুরুষের ছাত্র, শিষ্য এবং দাস ব'লে নিজেকে অভিহিত করেন। জলধর বাবু না জানালে আমরা এঁর কথা কিছুই জান্তে পেতুম না। কাঙ্গাল মানে হচ্ছে যাঁর বেদাদি ধর্ম্মশাস্ত্রে অধিকার নেই। কাঙ্গাল হরিনাথ সম্বন্ধে জলধর বাবুর নিজের কথা এখানে উদ্ধৃত ক'রে দিচ্ছি :—"উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধভাগে যে সকল কৃতী সুলেখকের চেষ্টা, যত্ন ও অধ্যবসায়ের ফলে বাঙ্গলা সাহিত্যের উন্নতি হইয়াছিল কাঙ্গাল হরিনাথ তাঁহাদিগের অন্যতম, একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। যখন সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম পুস্তক দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশিত হয় নাই, তখন কাঙ্গাল হরিনাথের 'বিজয়-বসন্ত' প্রকাশিত হইয়াছিল এবং সে সময় শত শত নরনারী সেই 'বিজয়-বসন্ত' পাঠ করিয়া অশ্রুপাত করিয়াছিল। কাঙ্গাল হরিনাথের 'বিজয়-বসন্ত' পুস্তকে যে ভাষার সৌন্দর্য্য, ভাবের মাধুর্য্য ছিল, তাহা এখনও অনেক সাহিত্যরথীর অনুকরণীয়। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, সেই বাঙ্গলা সাহিত্যের উন্নতিকল্পে উৎসর্গীকৃত জীবন কাঙ্গাল হরিনাথের কথা,—তাঁহার সাহিত্য-সাধনার কথা—তাঁহার একনিষ্ঠ সাহিত্য-সেবার কথা—তাঁহার পবিত্র ঋষিকল্প জীবনের কথা—তাঁহার আধ্যাত্মিকতার কথা—তাঁহার অতুলনীয় বাউল গানের কথা—তাঁহার অপরিমেয় জ্ঞানভাণ্ডার 'ব্রহ্মাণ্ডবেদের' কথা—তাঁহার সংবাদপত্র সম্পাদনের কথা;—সকল কথাই বাঙ্গালী ভুলিয়া গিয়াছিল—বাঙ্গালা সাহিত্য-সেবকগণ ভুলিয়া গিয়াছিলেন। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে, বাঙ্গালা সংবাদপত্রের ইতিহাস আলোচনায় কখন কোনদিন কাঙ্গাল হরিনাথের নাম তেমন করিয়া উল্লিখিত হয় নাই। পল্লীবাসী, জীর্ণ কুটীরবাসী, শতগ্রন্থিযুক্ত মলিনবেশধারী কাঙ্গাল হরিনাথের জীবনব্যাপী সাধনার সংবাদ কেহই গ্রহণ করেন নাই। কাঙ্গাল হরিনাথ কাঙ্গালের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কাঙ্গালভাবেই জীবনযাপন করিয়াছিলেন। কোনদিন তিনি ধন মান যশের পশ্চাতে ধাবিত হন নাই; তাই এই অর্থসর্ব্বস্ব ধনগর্ব্বিত যুগে কেহ কাঙ্গালের খোঁজ লইলেন না।" কাঙ্গাল হরিনাথের গানের একটি লাইন জলধর বাবু জীবনে গ্রহণ করেচেন ব'লে মনে হয়। সে লাইনটি হচ্চে এই, "বোঝ সোজা, চল সোজা"। কাঙ্গালের এই রকম অজস্র বাউল গান আছে তার মধ্যে একটি আমি অনেককে গাইতে শুনেচি, কিন্তু তাঁরা হয়ত জানেন না যে ঐ গানটির রচয়িতা কে। গানটি হচ্চে এই,

"যদি ডাকার মত পারিতাম ডাক্‌তে।
তবে কি মা! এমন ক'রে তুমি
লুকিয়ে থাক্‌তে পারতে।" ইত্যাদি

জলধর বাবু একদিন এই কাঙ্গালের যে শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন তা একেবারে বৃথা হয়নি ব'লেই আমার বিশ্বাস। আজ তিনি প্রৌঢ়ত্বের প্রান্তসীমায় উত্তীর্ণ, তাঁর সঙ্গী এবং সহচরদের আর বড় বেশী কেউ বেঁচে নেই—এক তিনি আছেন, আর সম্মুখে আছেন কাঙ্গাল হরিনাথ। এই কাঙ্গালই তাঁকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবেন। ওঁ শান্তিঃ

সপ্ততিতম জন্মোৎসব উপলক্ষে মীরাট
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সভায় পঠিত।

প্রথম পর্ব্ব

—নক্সা—

—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়

ক

"দা'ঠাউর যে! কি মনে ক'রে? আস্তে আজ্ঞা হোন্, আস্তে আজ্ঞা হোন, পাতোপ্পেন্নাম। দেখি একটু পায়ের ধুলো দিন দেবতা।" বলিয়াই সাধুচরণ উবু হইয়া রমাই ঠাকুরের চরণধূলি লইয়া জিহ্বায় লেহন করিয়া হাতখানা যথাক্রমে বক্ষ, কণ্ঠ ও মস্তকের উপর দিয়া ঘুরাইয়া লইল।

দেবতা উত্তর করিলেন, "থাক্, থাক্, হয়েছে হয়েছে—জয়োস্তু, শুভমস্তু।"

সাধুচরণ সমুখস্থ ক্ষুদ্র টুলখানি স্কন্ধস্থিত গামছার দ্বারা ঝাড়িয়া পুঁছিয়া একটুখানি আগাইয়া দিয়া বলিল,—"বসুন দেবতা, বসুন।"

দেবতা বসিলে সাধুচরণ প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিল। দেবতা বুঝি বা বিমুখ হইল; কিঞ্চিৎ তিক্ত কণ্ঠেই বলিয়া উঠিল,—"আরে বলছি, বলছি, অত ব্যস্ত করিস কেন? বামুন তোর দোকানে পায়ের ধুলো দিলে—একটু ধোঁয়া মুখ করা, তবে না অন্য কথা। কাজ তো একটা আছেই রে, নইলে রমাই ঠাকুর কি তেমনি শম্মা যে শুধু শুধু পায়ের ধুলো দিতে এসেছে।"

সাধুচরণ ব্যস্ত হইয়া অতি তৎপরতার সহিত তামাক সাজিয়া দিল। রমাই ঠাকুর তখন নিবিষ্ট মনে চক্ষু মুদিয়া ধূমপান করিতে লাগিল; সাধুও প্রসাদের নিমিত্ত ঠাকুরের মুখের দিকে উৎসুক নেত্রে চাহিয়া রহিল। কিন্তু বহুক্ষণ উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকিয়া যখন বুঝিল যে, কণিকামাত্র প্রসাদের আশাও নিতান্ত দুরাশা, তখন ক্ষুণ্ণ হইয়া একটা দীর্ঘ নিশ্বাস চাপিয়া লইল। সাধুচরণের দেব দ্বিজে ভক্তি অত্যন্ত নিবিড় ও গভীর হইলেও পূর্ব্বোক্ত প্রসাদের প্রতি তাহার আসক্তি কিছুমাত্র কম ছিল না।

রমাই ঠাকুর নীরবে বহুক্ষণ ধূমপান করিবার পর কড়ি-বাঁধা হুঁকাটির মস্তকোপরি হইতে কলিকাটি নামাইয়া বলিল,—"আর কি দেব-দ্বিজে তোদের ভক্তি টক্তি আছে রে সেধো! বলি বামুনের হুঁকো সিক করা কি জল বদলানো,—এটা বুঝি আর আবিশ্যক মনে করিস্ নি, না? হুঁকো কোথায় 'খুড়ো খুড়ো' ডাক্ ডাক্‌বে, তা নয়কো 'পিসে' ডাক্‌তেই দম বন্ধ!"

সময়মত প্রসাদের অভাবে সাধুর মনে ক্রোধের সঞ্চার হইলেও সে আপনাকে সামলাইয়া লইয়া কহিল,—"নিতাই তো ওনাকে জল সেবা, সিক্‌খড়কে করাই!"

"আচ্ছা, আচ্ছা, বেশ করিস, এখন নে, নে, একটু 'পেসাদ' পা।" বলিয়া রমাই ঠাকুর কলিকাটা আগাইয়া দিল।

সাধু কিন্তু চটিয়া উঠিল,—"রাখ ঠাকুর, তোমার 'পেসাদ!' এতই যদি সেঁধুলেন তবে আরও যদি ওতে কিছু থাকেন তবে তাও সেঁধোন। ওতে কি আর কিছু আছেন ঠাকুর?"

ঠাকুর কিন্তু এ তিরস্কারে রাগিল না। এতক্ষণ ধরিয়া তাম্রকূট সেবন করিয়া মেজাজটা তাহার প্রসন্ন হইয়াছে। সে হাসিয়াই বলিল,—"না হয় আর এক 'ছিলুম' ঢেলেই সাজ না সেধো! অত গরম হোস্ কেন বাপু? আমি বামুন মানুষ, সারা সকাল নানা কাজে ঘুরে ঘুরে আক্লান্ত হ'য়ে তোর দোকানে এসে ব'সে না হয় এক 'ছিলুম' একাই খেলুম! তা'তে আর এমন কি হয়েছে বাপু!"

সাধু আপনাকে একটু সংযত করিয়া লইয়া বলিল,—"না, তা' আর কি হয়েছেন দেবতা! তা' কিসির তরে 'ভোর বিহান'তক এত ঘুরলে, তা' তো কই প্রেকাশ করলে নি।"

"আরে কাজ কি আর একটা রে সেধো? মনে করছি কি জানিস্—একটা যাত্রার দল খুলি। ছোক্‌রারা ছুটিতে গাঁয়ে এসে, সেদিন কি এক জটের থিয়েচার না ফিয়েচার করেছে, দ্যামাক্ দেখ্ না! গপ্পের আর সীমে সংখ্যে নেই। গ্রামটাকে যেন চ'ষে ফেল্‌ছে আর কি! যেন কি না কি-ই একটা করেছেন! আরে, ধেৎত্তোরি তোর থিয়েটার! ওতো যে-সেই করতে পারে রে। যাদের 'গান-শক্তি' নেই বুঝলি কিনা সেধো, তারাই করে থিয়েটার; গান তো আর গাইতে হয় না, কেবল বক্তিমে ক'রেই ব্যস্।"

সাধু কহিল,—"না, ওরাও তো 'গায়ান' করেন দেবতা!"

রমাই ঠাকুর, হোঃ হোঃ করিয়া উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল, "ফুঃ! কি যে বলিস্ সেধো! অবেলায় আর হাসাস্ নি বাপু! ওকি আবার একটা গান? ওতো মেয়ে মানুষের নাকি কান্না। গান বলি যাত্রার গানকে।"

সাধু শুনিয়া উৎফুল্ল হইয়া উঠিল,—"তা ঠিক্ 'নিয্যস' কথা কইছেন দেবতা! 'জয়ত্রা' গানির তুল্যি কি আর 'গায়ান' আছে? তা' আপনি যদি একটা দল বাঁধ্‌তি পার 'তয়' তো ভালই হয়।"

"তাই তো এত 'মেহনৎ' ক'রে তোর কাছে আসা রে। নইলে 'শম্মারাম' বিনা কাজে 'পাদমেকং ন গচ্ছামি'—তা তো জানিস।"

"তা' আমার কাছে ক্যানে দেবতা! আমি আর কি করতি পারি?"

"পারিস্ রে, বাপু পারিস্। নইলে কি আর রমাই ঠাকুর তোর কাছে এসেছেন। তোর 'ব্যায়লা' খানা আছে তো, আর আমার ডুগি-তবলা! তা' তো জানিস্-ই। ও ওতেই চলে যা'বে একরকম! আর তোর দোকানে রঞ্জা আর ষষ্টে ব'লে যে ছেলে দুটো কাজ করে না? মনে কচ্ছি ওদিকে কোরবো রাম, লক্ষ্মণ! মন্দ হ'বে কি?"

"আম, নক্ষোণ মন্দ হবেন ক্যানে দেবতা, এক্কিবারে দিব্যি খাসা হবেন।"

দেবতা কিন্তু চটিয়া উঠিল,—হুঁ, খাসা হবেন, না ছাই হবেন। কেন মেলা ফ্যাচ ফ্যাচ করিস্ বল্‌তো? আর তা' না হয় হ'লই, কিন্তু 'সীতে' হবে কে তাই শুনি? না ভেবে চিন্তেই অমনি অমনি যা' তা' বলিস্ ওই তোর এক দোষ! এ আমি চিরকালই দেখে আসছি।"

সাধু হাত জোড় করিয়া কহিল,—"গোঁসা করেন ক্যানে কর্ত্তা, সে তখন একটা দেখে শুনে নিলেই হবি।" তারপর একটু ভাবিয়া সাধু পুনরায় বলিল,—"ক্যানে ওই মাল্লাকর-দের ভক্তকে নিলিই হয়। দেখেছেন তো 'চ্যায়রা' খানা! আর কিবে গলা! শোনেন নি বুঝি তা'র 'গায়ান'?"

রমাই এইবার অতিশয় খুসী হইয়া উঠিল। বলিল, "এতক্ষণ পরে একটা কথার মত কথা বলেছিস্ সেধো, মাঝে মাঝে তোর মগজটা বেশ একটু খেলে!—এ আমি চিরকালই দেখে আস্‌ছি কি না, তাই না তোকে অত ভালবাসি, নইলে রমাই ঠাকুর সে চিজ্-ই নয় যে অমনি অমনি—তা' বেশ বলেছিস্ সেধো, ও ভক্তাই ঠিক হ'বে।"

সাধু আত্ম-প্রশংসা শুনিয়া একেবারে গলিয়া জল হইয়া গিয়া হাসিতে হাসিতে কহিল,—"আবণ আজা সাজ্‌বেন কে দা'ঠাউর।"

"আরে রাবণ রাজা তোদের দা' ঠাকুরই সাজবেন, সেজন্যে ভাবিস্ নি সেধো! আর যা'-কিছু সে সব 'শম্মা' তিন তুড়িতে ঠিক ক'রে নেবে। তোর সে ছোকরা দুটো গেল কোথায়? রঞ্জা আর ষষ্টে?"

"তারা গেছেন কর্ত্তা, ওপাড়ায় একটু 'আমোদ' কর্ত্তি। রঞ্জা বল্লে,—'আজ কাজ করতি আর ভাল লাগছে নি ওস্তাদমশাই, আজ একটু আমোদ ক'রে আসি, একটু রেহাই দিতি হ'বি।' ভাবনু ছেলে-মানুষ, রাতদিন লোহা পিটুনি! যাক্ একটু—"

"তা' বেশ করেছিস্, মাঝে মাঝে একটু আধটু ছুটি ছাটা দিতে হবে বৈ কি! তা' কাল সকালে এলে সব কথা ব'লে ঠিক রাখবি, বঝলি?"

"ও ঠিক হ'য়ে যাবি, সে বিষয়ে কি গাফিলি করি?"

"বেশ! বেশ! সব তো এখন ঠিক্ হ'য়ে গেল। আর ভাবনা কি বল? এখন নিশ্চিন্দি হ'য়ে একটু ধোঁয়া মুখ করা তো সেধো।"

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়

সাধু তাম্রকূট রক্ষা করিবার পাত্রটির দিকে হস্ত প্রসারণ করিল।

রমাই ঠাকুর মুখ বিকৃত করিয়া বলিল,—"আরে ও তামাক রাখ রে সেধো। বড় তামাকই না হয় একটু সাজলি এতক্ষণ চেঁচামিচির পর কি আর ওই 'ফুস্-মন্তর' ভাল লাগে? তোর বাপু, ওই এক কেমন দোষ! বুদ্ধি বল্‌তে তোর একটুও নেই, এ আমি চিরকালই দেখে আস্‌ছি কি না! নতুবা মানুষ তো আর তুই মন্দ নোস্।"

সাধু অপ্রসন্ন মুখে উঠিয়া গঞ্জিকা প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইল। অপরূপ পদার্থটি ঠিকমত প্রস্তুত হইলে সাধু, ঠাকুরকে নিবেদন না করিয়া, নিজেই 'সেবা' করিতে আরম্ভ করিল দেখিয়া রমাই অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া উঠিল, "এ তোর কি রকম আক্কেল রে হতভাগা? ব্রাহ্মণ—নারায়ণ সুমুখে থাক্‌তে তাঁকে নিবেদন না ক'রে তুই যে বড় নিজেই—"

আর বলিতে পারিলেন না, রাগে তাঁহার কণ্ঠস্বর বন্ধ হইয়া গেল।

সাধু অপ্রতিভ না হইয়া বলিল,—"চটো ক্যানে দেবতা, আগুনটা একটু জম্‌কে দিচ্ছি ভাল ক'রে; সেবা করি আরাম পাবা—তাই না।"

"আরাম পাবে না তোর মাথা পাবে! এ ছোট তামাক কিনা যে জম্‌কে দিবি! ন্যাকামির আর জায়গা পেলি না, তাই মায়ের কাছে মাসির গল্প কত্তে এসেছিস্! বলে—পুরুতের কাছে ভুরুত গিরি! ব্রাহ্মণের 'আগবোল' উচ্ছিষ্ট করলি রে বনগরু! এখন দে দেখি কলকেটা একটু এগিয়ে।" বলিয়াই রমাই ঠাকুর সাধুর হস্ত হইতে কলিকাটি একরকম টান মারিয়াই কাড়িয়া লইল।

সাধু অত্যন্ত বেজার হইলেও ক্রোধ সামলাইয়া লইল। এমন তাহাদিগকে তো কতই করিতে হয়, এবারেও করিল; কিন্তু ছোট কলিকায় সাজিয়া যে বস্তুটির নেশা সমাধা করিতে হয়, তাহা সাধুর অত্যন্ত 'আদরের' জিনিষ, তাই ওদিকে রমাই ঠাকুরের বদনাকর্ষণে উহাও যেমন জ্বলিতে লাগিল, এদিকে সাধুর বুকের ভিতরও তেমনি পুড়িতে লাগিল।

হঠাৎ সাধু তাহার সমস্ত সততা ভুলিয়া গিয়া চেঁচাইয়া উঠিল,—"রাখ দেবতা, আর টান্‌তি হবি নি! দ্যাও, ঢের হইছে।" সাধু ঠাকুরের অভিমুখে হস্ত প্রসারিত করিল।

রমাই নাক মুখ দিয়া একরাশ ধূম ত্যাগ করিয়া খক্ খক্ করিয়া কাশিয়া হাঁচিয়া যাহা বলিল, তাহার ভাবার্থ হইতেছে—এখনও তাহার একটা টান 'পাওনা' আছে।

"পাওনা আছেন না আর কিছু! বাউন, তুমি 'স্থাখন' হতি 'টান চুরি' কর্‌তিছ! আবার বলে 'টান' পাওনা আছেন।"

ব্যাপারটা হইতেছে এই যে, সাধুর দোকানের গঞ্জিকা-সেবিদিগের মধ্যে একটা নিয়ম ছিল যে, কেহ কলিকা প্রাপ্ত হইলে কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট 'টান' টানিয়া অন্যের হস্তে কলিকাটি ফিরাইয়া দিবে। 'মৌখিক আকর্ষণ' একটিও কেহ অধিক গ্রহণ করিতে পারিবে না। কিন্তু সাধু বলিতে চায় যে, রমাই ঠাকুর তাহার ব্যতিক্রম করিয়া একটি টানের ভাণ করিয়া তাহার মধ্যেই কয়েকটি অধিক 'টান' টানিয়া লইয়াছে। এ অপরাধ অমার্জ্জনীয়!

সাধু বলিল,—"দেবতা আছ, পায়ের কাদা দেও তেলক সেবা করি, তাই ব'লে টান চুরি!"

তুবড়িতে অগ্নি সংযোগ হইল। রমাই ঠাকুর গুণ-ছেঁড়া ধনুকের মত লাফাইয়া উঠিয়া বলিল,—"বেটা ছোটলোক, যা' মুখে আসে তাই বল্‌বি? আমি নাকি টান-চোর? ওরে হতভাগা, তোর যখন জন্মোই হয় নি, তখন থেকে 'ওনার' আমি সেবা করছি! এই তোর মত, কম ক'রেও, দশটা লোকের মাথায় যত কেশ আছে তত ভরি এ পর্য্যন্ত সেবা করেছি, তা' জানিস? কেউ কোনদিন বল্‌লে না যে, রমাই ঠাকুর 'টান-চোর'! আর তুই হারামজাদা তাই বল্‌বি? ভারি তো গাঁজা তোর! ব'লে আধ পয়সার নেশা! আফিংয়ের পিছনে আমার কত টাকা খরচ হয় তা' জানিস্ রে ছুঁচো!" বলিয়াই কলিকাটি সজোরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল।

"বেশ তো ঠাউর! গালাগালি দিচ্ছ—দাও, কিন্তু 'কোল্‌কিটা' ফেল্‌লি কোন আক্কেলে?"

রমাই ঠাকুর ধাঁ করিয়া সাধুর গণ্ডদেশে এক ভীষণ চপেটাঘাত করিয়া বলিল,—"বেটা, তুই বামুনকে আসিস্ আক্কেল শেখাতে! এত বড় ওর নাম কি তোর আস্পর্দ্ধা! বেটা পাজি, নচ্ছার, ছুঁচো! তোর বড় তামাকে, তোর দোকানে, তোর 'ব্যায়্লাতে,' আমি লাথি মারি! তুই বেটা যে ওর নাম কি অতি 'ইয়ে' তা' আমি চিরকালই জানি!" বলিয়াই রমাই ঠাকুর ক্রোধে গর্ গর্ করিতে করিতে তথা হইতে নিক্রান্ত হইল।

খ

শ্যামাঠাকুরাণী স্নানান্তে পুকুর ঘাটের সভা ভঙ্গ করিয়া বাড়ী আসিয়া কক্ষস্থিত কলসীটি দাওয়ার উপর স্থাপন করিয়া গাত্র মার্জ্জনী হইতে জল নিষ্কাসন করিতে করিতে ঝঙ্কার তুলিলেন,—"বলি ও সৈরভি, উনুনে এখনও যে বড় আগুন দিস্ নি, তারপর আমার সাত পুরুষের পিণ্ডি তোয়ের হ'বে কোন বেলায় তা' শুনি? বেলা এখনও ব'সে আছে, নয়?"

সৌরভী বারন্দায় গালে হাত দিয়া পূর্ব্বেও যেমন বসিয়াছিল এখনও তেমনিই রহিল, কোনরূপ চাঞ্চল্য প্রকাশ করিল না।

ঝঙ্কার আর এক পর্দ্দা চড়িয়া উঠিল,—"তবু এখনও চুপ ক'রে ব'সে থাক্লি? কানের মাথা কি একেবারেই খেয়েছিস্? না 'গেরাজ্জি' হচ্ছে না।"

তথাপি সৌরভীর কোনরূপ ভাবান্তর উপস্থিত হইল না। এইবার কণ্ঠস্বর 'মুদারা' ছাড়িয়া একেবারে 'তারা'য় ঠেকিল,—" 'উপোসের কেউ নয় পারণার গোঁসাই।' বলি ও নবাবের পরিবার! তোমরা না হয় স্বর্গের বিদ্যাধর বিদ্যাধরী! তোমাদের পেটে কিছু না দিলেও যেন চলে, তা' ব'লে আমি তো আর তা' নই। আমি যে এই নরলোকেরই জীব, তাই ক্ষিধে তেষ্টাও আছে।"

সৌরভী অস্ফুটকণ্ঠে বলিল,—"কে বল্ছে নেই।"

শ্যামা ঠাকুরাণী যেন একেবারে ফাটিয়া পড়িলেন,—"বটে! আবার চোপা হচ্ছে! সাত চড়ে 'রা' ছিল না এখন আবার সে গুণও দেখা দিয়েছে। বলে—'অদন্তের দাঁত হ'ল, কামড় খেয়ে খেয়ে প্রাণ গেল।' তবুও যদি সোয়ামীর ভাত থাক্তো তো আরও কত দেখতুম। তা' আর হ'বে না! বলে—'যেমন কন্যা রেবতী, তেম্নি পাত্র জোলা তাঁতি।' তা' না হ'লে মানাবে কেন? দিন রাত্তির গাঁজা, আপিং আর শাশুড়ীর অন্ন-ধ্বংশ। এই তো মুরোদ! তেনার পরিবারের আবার 'চোপা' দেখ না। মুখে আগুন!"

সৌরভী উত্তর করিল,—"সে আগুনের কত দেরি তাই ভাবতে গিয়েই তো উনুনে আগুন পড়ে নি।"

শ্যামাঠাকুরাণী কণ্ঠ হইতে এক প্রকার বিচিত্র ধ্বনি নির্গত করিয়া বলিলেন,—"মরি মরি! শুনেও প্রাণটা শেতল হ'ল! অমনি 'রাজ-বনিতে'র গোসা হ'সে গেল। ব'সে ব'সে কর্ত্তা গিন্নি তিন বেলা গিল্বেন আর তুই বাঁদী মুখ বুঁজে দিবে রাত্তির খেটে মর্! একটা যদি কথা কয়েছিস্—অমনি কুলোপানা চক্কোর। তোদের এত চোখরাঙানির কি ধার ধারি বল্তো? ফের যদি অমন মেজাজ দেখাবি তো খেংরে বিষ ঝেড়ে দেব।"

ক্ষীণ কণ্ঠে ছোট্ট একটুখানি উত্তর শোনা গেল,—"তা দিলেই তো পার। সেটাই বা বাকী থাকে কেন?"

সৌরভীর চক্ষু ইতঃপূর্ব্বেই সিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল, এইবারে অশ্রু টপ্ টপ্ করিয়া ঝরিয়া পড়িল। শ্যামাঠাকুরাণী এক পর্দ্দা নামিয়া আসিলেন,—"বলে—'যার জন্যে বুক ফাটে, সে আমারে এঁকে কাটে।'—আমারও হয়েছে তাই, আমি দিবে রাত্তির ওর ভাল চাই কিনা, তাই আমার ওপরই ওর যত আক্রোশ!"

কন্যার কল্পিত অকৃতজ্ঞতার কথা মনে উদয় হওয়ায় শ্যামাঠাকুরাণী পুনরায় একটু চটিয়া উঠিলেন। আরও একটু চড়া সুরে পর্দ্দা বাঁধিলেন,—"দিবে রাত্তির গিল্বেন! আর 'উনি' এখানে ব'সে টিপে সুত্তো-কাট্বেন আর 'তিনি' সেখানে গাঁজা আপিংয়ের 'ছেরাদ্দ' করবেন। বলে—'ঘর জামায়ের পোড়ার মুখ, মরা বাঁচা সমান সুখ।'—তারপর গাঁজাখোরটা এসে যখন বল্বে,—'বাড়ী খাই কি দুয়োর খাই।'—তখন কি ছাই খেতে দেওয়া হবে, তাই শুনি?"

একটু অভিমান-ক্ষুব্ধ তিক্ত স্বরেই উত্তর আসিল,—"কেন যে ছাই উনুনে থাকে তাই। তারও কি আকাল প'ড়েছে না কি?"

এমন সময় ধূমকেতুর মতই অকস্মাৎ গাঁজাখোর রমাই ঠাকুর চীৎকার করিতে করিতে অন্দরে ঢুকিল,—"কিসের

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়

এত চেঁচামিচি রাতদিন লেগেই আছে শুনতে পাই? এতে কি আর গেরস্থর লক্ষ্মী থাকে?—তা থাকে না। এত গণ্ডগোল আমার বাড়ীতে পোষাবে না, তা' কিন্তু আগেই ব'লে রাখছি। এ সেধোর দোকান পাও নি কেউ, এ ভদ্রলোকের বাড়ী।"

সাপের মুখে ঈষার মূল পড়িলে যেমন হয়, রমাই ঠাকুরের আগমনে শ্যামাঠাকুরাণীরও তথৈব হইল। তাঁহার সমস্ত তর্জ্জন গর্জ্জন এক নিমিষে অন্তর্হিত হইল। রমাই ঠাকুর এ বাড়ীর ঘর-জামাই। রমাই ঠাকুরের সাতকুলে কেউ নাই, শ্যামাঠাকুরাণীরও ওই সবে ধনে নীলমণি এক সৌরভী। কয়েক বিঘা জমিজমা যা' আছে তাহাতেই দুঃখে কষ্টে কোনরকমে চলিতেছে। সে যাহা হউক, এবাড়ীতে এরূপ চেঁচামিচি নূতন নহে, প্রায়ই হয় এবং রমাই ঠাকুরের এক হুঙ্কারেই সব মিটিয়া যায়। ঠাকুর হয়ত বা কখন শুনিয়াও শোনেন না। আজ কিন্তু আর তাহা হইল না। এদিকে পূর্ব্ব হইতেই কোন কারণে ঠাকুরের প্রতি সৌরভীর দুর্জ্জয় অভিমান ক্রোধের আকার ধারণ করিয়া ভিতরে ভিতরে গর্জ্জাইতেছিল, তাহার উপর শ্যামাঠাকুরাণীর শ্লেষের হাওয়া পাইয়া বাহিরে দাউ দাউ করিয়া প্রকাশ পাইবার জন্য সামান্য একটু ছুতোর অবকাশ খুঁজিতেছিল; আর ওদিকে সাধুর সহিত টান-চুরি লইয়া কলহের ফলে রমাই ঠাকুরের মেজাজ বিগড়াইয়াই ছিল, তাহার পর বাড়ীতে আসিয়াই এই কোলাহল।

রমাই ঠাকুর মুখ বিকৃত করিয়া বলিল, "ভিজে বেরালের মত এখন যে দেখি সব চুপ্ চাপ্! বলি ব্যাপারখানা কি!"

শ্যামাঠাকুরাণী বলিলেন,—"ব্যাপার আর কি বাবা, এখন পর্য্যন্ত উমুনে আঁচ পড়লো নি, তাই সৌরভিকে বলছিলুম,—'এতখানি বেলা হ'ল, তারপর ভালমানুষের ছেলে তেতে পুড়ে আসলে, সময়মত একমুঠো দিবি কি ক'রে বলতো?"

রমাই ঠাকুর ঝাঁঝিয়া উঠিল,—"ওঃ সেজন্যে তো রাজ-নন্দিনীর ভাবনা-চিন্তেয় ঘুম হচ্ছে না! নিজেদের পিণ্ডিটা সাত সন্ধ্যে পরিপাটিরূপে হলেই হ'ল। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ঘুরে মরছি, আর নবাবপুত্রী ঘরে ব'সে নবাবীচাল চালছেন! এর ওষুধ পিঠের ওপর সাত খ্যাংরা ভাঙা।"

সৌরভীর ধূমায়িত ক্রোধ এতক্ষণে সম্পূর্ণরূপে দাউ দাউ করিয়া জলিয়া উঠিল, "হাভাতের পিঠে সাতশো খ্যাংরা না ভেঙে তাকে এনে যখন রাজতক্তে বসানো হয়েছে তখন এ 'ইনাম' তো পাওনাই আছে—বেশ তো শোধ ক'রে দাও।"

সৌরভীর কথা রমাই ঠাকুর সম্যক উপলব্ধি করিতে না পারিলেও এটুকু বেশ বুঝিল যে, সাত অপেক্ষা সাতশোর গুরুত্ব অনেক অধিক, অতএব ক্রোধের মাত্রা ততোধিক না চড়াইলে পরাভব হয় ভাবিয়া একটা হুঙ্কার ছাড়িয়া পদস্থিত কাষ্ঠ পাদুকা হস্তে লইয়া সৌরভীর অভিমুখে অগ্রসর হইল। সৌরভীও ফিরিয়া দাঁড়াইল। দাওয়ার এক পার্শ্বে মার্জ্জিত বাসন-কোসনগুলি উপুড় করিয়া রাখা হইয়াছিল, তথা হইতে একখানি লোহার হাতা উঠাইয়া লইয়া বলিল,—"এস না একবার, এগিয়ে এস, ওঃ! বলে ভাত কাপড়ের কেউ নয়, কিল মারবার গোঁসাই!"

শ্যামাঠাকুরাণী এক মুহূর্ত্তে ব্যাপারটির গুরুত্ব বুঝিয়া লইলেন। এখনই যে একটা লঙ্কাকাণ্ড ঘটিবার কিছুমাত্র বিলম্ব হইবে না, তাহা তাঁহার বুঝিতে বিশেষ বেগ পাইতে হইল না, কারণ পূর্ব্বে সেরূপ বহুবার হইয়া গিয়াছে। সাধারণত সৌরভী রমাইয়ের সমস্ত অত্যাচার নীরবে সহ্য করে। কিন্তু আজ সে করিতেছে কি! শ্যামাঠাকুরাণীর মনে আতঙ্কের সীমা ছিল না; সৌরভীর রণরঙ্গিনী মূর্ত্তি দেখিয়া রমাইয়ের মনেও ভীতির সঞ্চার হইয়াছিল, কিন্তু পতিদেবতা হইয়া তো আর খাটো হইতে পারা যায় না। তাই সৌরভীর যুদ্ধের আহ্বানে সে আর একটি বিরাট হুঙ্কার ছাড়িল। শ্যামাঠাকুরাণী ছুটিয়া যাইয়া উভয়ের মাঝখানে দাঁড়াইয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন,—"ও সৌরভি, পোড়ারমুখী, করিস কি? আমার মাথা খাস্, স'রে যা, স'রে যা!"

সৌরভী চোখ মুখ রাঙা করিয়া ঝাঁকিয়া উত্তর দিল, "কেন গা, কিসের ভয়? আমি কি ওর খাই, না পরি, যে দিন নেই রাত্তির নেই কথায় কথায় চোখ রাঙাবে আর খড়ম পেটা করবে!"

রমাই ঠাকুর আর সহ্য করিতে পারিল না। "আমার খুসী করব! শুধু কি খড়ম পেটা? মুখ তোর ঝামা

ঘ'সে ছিঁড়ে ফেলব।" বলিতে বলিতে অগ্রসর হইয়া হস্তস্থিত খড়মটা খটাখট্ সৌরভীর মাথায় ঠুকিতে লাগিল। সৌরভীর মাথা ফাটিয়া ঝর ঝর করিয়া রক্ত ঝরিতে লাগিল।

শ্যামাঠাকুরাণী কাঁদিয়া উঠিলেন,—"মেয়েটাকে একেবারে খুন ক'রে ফেল নি বাবা।"

একটু সরিয়া দাঁড়াইয়া সৌরভী বলিল,—"দাঁড়াও, আজ তোমারই একদিন, কি আমারই একদিন—দেখাচ্ছি। আমি এই রক্ত শুদ্ধ যাচ্ছি থানায়, দেখি এর কোন প্রতিকার আছে, কি নেই।" বলিয়া সত্য সত্যই যাইবার নিমিত্ত রুখিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল।

মুহূর্ত্ত মাত্র সময়। রমাই ঠাকুর দৌড়াইয়া গিয়া প্রাঙ্গণের প্রান্তস্থিত একটা পেয়ারাগাছের কাণ্ডে ক্রমাগত মাথা ঠুকিতে লাগিল। আঘাতে আঘাতে রক্তে সমস্ত মুখখানা বীভৎস করিয়া চীৎকার করিতে লাগিল,—"আমিও যাচ্ছি। দেখি মা আর তার মেয়েকে যদি আজ না বাঁধাতে পারি তবে আমার এই কান দুটো কেটে কুকুরের পায়ে দেব। বলে 'ঘুঘু দেখেছে ফাঁদ দেখে নি।' যাচ্ছি দশজন ভদ্রলোকের কাছে! গিয়ে বল্‌ছি—'আপন পরিবারকে দেশে নিয়ে যেতে চেয়েছিলুম, তাই মা মেয়ে দু'জনে এই শাস্তি করেছে।' দেখি, দেশে ভদ্রলোক আছে কি নেই।"

শ্যামাঠাকুরাণীর উচ্চ চীৎকারের মাত্র—"ও বাবা, তোমার পায়ে পড়ি।" ছাড়া আর কিছুই বোঝা গেল না।

গ

বেলা অনেক হইয়াছে। এক-টা অনেকক্ষণ বাজিয়া গিয়াছে। গ্রামের জমিদারবাবু তখন কেবল মাত্র দরবার ভঙ্গ করিয়া অন্তঃপুরে যাইবার নিমিত্ত উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন, এমন সময় গ্রামের বহুলোক পরিবেষ্টিত রমাই ঠাকুর 'হাঁউ মাউ' করিয়া বাবুর কাছারিতে আসিয়া কাঁদিয়া পড়িল—"আপনি দেশে থাকতে আমার এই দুর্দ্দশা কর্ত্তা!"

জমিদার বাবুর আর অন্তঃপুরে যাওয়া হইয়া উঠিল না। তিনি ফরাসে বসিয়া পুনরায় তাকিয়া গ্রহণ করিয়া বলিলেন,—"অত চেঁচামিচি না ক'রে, ব্যাপারখানা কি তাই খুলে বলুন না।"

রমাই ঠাকুরের উচ্চ চীৎকার হ্রাস হওয়া দূরে থাকুক আরও চতুর্গুণ বর্দ্ধিতই হইয়া উঠিল। রমাই উচ্চকণ্ঠে এই কথাটাই বার বার জাহির করিতে লাগিল, দেশে আর ভদ্রত্ব নাই, শাশুড়ী ও তাহার কন্যা, শ্বশুর-জামাতার এ হেন দুর্দ্দশা করিতে যে দেশে সমর্থ সে দেশে কখন মানুষ বাস করে? দেব দ্বিজে নাম মাত্র ভক্তিও আর লোকের নাই, নতুবা সাধু কামার এই রমাই ঠাকুরকে টান-চোর বলিয়া পার পাইয়া যায়! ঘোর কলি আর কাহাকে বলে!

যে সব জনমণ্ডলী মজা দেখিতে সমবেত হইয়াছিল কর্ত্তাবাবু তাহাদিগকে গৃহে ফিরিয়া যাইতে আদেশ করিলেন। তখন বাধ্য হইয়াই তাহারা এই চক্ষু-কর্ণ-পরিতৃপ্তি-দায়ক স্থানটি পরিত্যাগ করিল।

বাবু বলিলেন,—"দেখুন ঠাকুর মশাই, ও সব বাজে কথা রাখিয়া দিন। আপনাকেও আমি চিনি, সৌরভী পিসি গাঁয়ের মেয়ে তাঁকেও আমি জানি। আপনার প্রহার তো তাঁর দিবারাত্রির অঙ্গের ভূষণ। আপনার শ্বশুর বাড়ীতে স্ত্রীলোক দু'টি তো সর্ব্বদা আপনার ভয়ে কাঠ হ'য়েই বাস করেন। তবু আপনি যখন-তখনই কারণে অকারণে আপনার পুরুষত্ব ফলাতে ব্যস্ত থাকেন, এর মানেকি মশাই!"

এইরূপ উল্টা অনুযোগ শুনিতে হইবে রমাই তাহা ভাবিতে পারে নাই, তাই অতিশয় বিস্মিত হইয়া সে বলিল, "এ আপনি কি বল্‌ছেন কর্ত্তা বাবু! পুরুষ মানুষ পুরুষত্ব ফলাবে না তো কি ফলাবে মেয়েমানুষে? মেয়েমানুষ যত ভালই হোক তা'কে কি আর আস্কারা দিতে আছে কর্ত্তা! মেয়েমানুষ আর ময়লা কাপড়, ও যত আছড়াবেন ততই পরিষ্কার হ'বে। তাই মাঝে মাঝে বেশ একটু 'কড়কে' দিতে হয়, তবে তো ঘর সংসার করা চলে।"

জমিদার বাবু হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন,—"না, তা কি আর চলে—তার ফল তো আপনার মুখের ওপরেই দেখ্‌তে পাচ্ছি।"

রমাই ঠাকুরের পুরুষত্বে আঘাত লাগিল। সগর্ব্বে মস্তক উন্নত করিয়া সে বলিল,—"হুঁঃ! আপনি কি ভেবেছেন,

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়

এ কাণ্ড সৈরভি করেছে? তা'র মাথার উপর মাথা আছে যে, রমাই ঠাকুরের গায়ে হাত দেয়। তেমন পরিবার নিয়ে 'শম্মারাম' ঘর করে না এ নিশ্চয়! তবে ঘর করতে গেলে—দু'চারখানা বাসন-কোসনও যদি এক জায়গায় থাকে তবে টুংটাং ক'রে কি বাজে না? বাজে। এও তাই। নিজের পরিষ্কার, তায় অমন পরিবার! সাত চড়ে রা কাড়ে না, সেই কিনা হঠাৎ আজ একটুকুতেই খাপ্পা হ'য়ে উঠ্‌লো—বলি ব্যাপার খানাই কিরে! আচ্ছা দিইনা একটু শিক্ষা দিয়ে, তাই পেয়ারা গাছে মাথা ঠুকে,—বুঝলেন কিনা—"

বাবু হাস্য সংবরণ করিয়া বলিলেন,—"সে আমি অনেকক্ষণ পূর্ব্বেই বিশেষ ক'রে বুঝেছি ঠাকুর! তা বেশ করেছেন! কিন্তু এখন তা হ'লে আমার কাছে আসার কারণটা কি তা' শুনতে পাই?"

রমাই ঠাকুর গম্ভীর হইয়া বলিল, "আপনি দেশের মা-বাপ! মনের আক্ষেপে যদি আপনার কাছে বামুন মানুষ এসেই থাকি, তা'তে আর এমনই কি দোষ হয়েছে বাবু?"

"না না, দোষ আর কি, পাঁচশো বার আস্‌বেন; তবে বেলাটা কত হয়েছে, সেটা কি কিছু ঠিক রেখেছেন? দেশের মা-বাপেরও তো ক্ষুধা তৃষ্ণা নামক বালাইগুলি আছে—না নেই?"

রমাই ঠাকুর চটিয়া উঠিল,—"ক্ষুধা তৃষ্ণা বড় লোক ব'লে কি শুধু আপনাদেরই একচেটে? আপনি কি মনে করেছেন যে, আমি কালিয়া পোলাও খেয়ে উদ্গার তুলছি।"

"সেধোর দোকানে যে মহাপ্রসাদ সেবা করেছেন তাতে ক'রে উদরে কালিয়া পোলাওয়ের জন্য তিলমাত্র স্থান অবশিষ্ট থাক্‌লে তো তা' গ্রহণ করবেন।"

রমাই বুঝিল যে, বাবুর কানে টান-চুরির কথা ইতিমধ্যেই আসিয়া পৌঁছিয়াছে। কোথায় ব্রাহ্মণকে অপমান করিবার জন্য সাধুকে ডাকাইয়া আনিয়া তাহার জন্য বিশেষ করিয়া শাস্তির ব্যবস্থা করিবে, তাহা নহে, আবার ব্রাহ্মণকে পরোক্ষে অপমান! রমাই ঠাকুর তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল,—"দেশে আপনাদের মত মা-বাপ থাক্‌লে, এ ছাড়া আর কি হ'বে?"

বাবু রাগিলেন না, ঈষৎ হাসিলেন মাত্র, বলিলেন,— "সাধুর ব্যাপার আমি সবই শুনেছি। আপনি কি করতে বলেন?—সাধুকে শাস্তি দিতে তো? আপনি ইচ্ছে করলে নিজেই তো তাকে বেশ ক'রে সাজা দেওয়াতে পারেন। যান্ না থানায়, মাথা দেখিয়ে বল্‌বেন যে, টান-চুরির মিথ্যা ওজুহাতে সে আপনার এই দশা করেছে।"

রমাই ঠাকুর তাড়াতাড়ি দুই কানে অঙ্গুলি প্রদান করিয়া বলিল, "সে কি কথা বাবুমশাই, আপনি দেশের মা-বাপ, এত বড় মিথ্যা কথাটা হুজুরে গিয়ে 'হলফ' করতে শেষে কিনা আপনি বল্‌লেন—এতবড় দেশজানিত সাধু ব্যক্তি হ'য়ে। রমাই শম্মার বাবাও তা' পারবে নি। একটু আধটু গাঁজা আফিংই না হয় খেয়ে থাকি, তাই ব'লে কি মিথ্যে সাক্ষ্য! ওরে বাবা রে! এখনও চন্দ্র সূর্য্য উঠ্‌ছে, রাতদিন হচ্ছে!'

বাবু হাসিয়া বলিলেন,—"তা' হ'লে থানায় না গিয়ে এখন বাড়ীই ফিরে যান, বেলাও তো এদিকে যায় যায়। সৈরভি পিসি একে তো মারধোর খেয়ে আছেন, তারপর এতখানি বেলা আপনি কোথায় কি কচ্ছেন তার ঠিকানা নেই—তাঁদের মনের অবস্থা যে কেমন হ'তে পারে সেটা একটু বুঝতে চেষ্টা করবেন, তা' হ'লে মারধোর না করলেও ঘর সংসার ভাল ভাবেই চ'লে যাবে।"

এতক্ষণ পরে রমাই লজ্জিত হইল, মনে মনে ভাবিল, —"সৈরভির অবস্থাটা বাবু জান্‌লেন কি ক'রে? এঁর কাছে দেখ্‌ছি কিছুই চাপা থাকে না।"

রমাই ধীরে ধীরে উঠিয়া গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইল। গৃহে আসিয়া দেখিল,—জমিদার পূর্ব্বেই তাঁহাদের গৃহ-দেবতার প্রসাদ ব্রাহ্মণ দিয়া পাঠাইয়া দিয়াছেন। এ প্রসাদ কণিকামাত্র নহে, রমাই ঠাকুরদের পক্ষে অপর্য্যাপ্ত।

রমাই ঠাকুর মনে মনে বলিল,—"জমিদার, জমিদার, একেই তো বলি জমিদার! একেই তো বলি দেশের মা-বাপ!"

দেশের ভদ্রলোকেরা কিন্তু রমাই ঠাকুরের সমস্ত ব্যাপার শুনিয়া একবাক্যে 'রায়' দিল,—"রমাই ঠাকুরের রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডের প্রথম মহলা ভালই হইয়াছে।"

আলোচনা

বিবাহ-বিচ্ছেদ

বৈশাখের বিচিত্রায় শ্রদ্ধেয়া শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবীর "বিবাহ বিচ্ছেদ" প্রবন্ধ পাড়িয়া আমার মনে যে সব প্রশ্ন জাগিতেছে এবং বহুদিন যাবৎ এই বিষয়ে ভাবিয়া যাহা বুঝিয়াছি 'বিচিত্রা'র মারফতেই তাঁহাকে জানাইয়া বিনীতা শিষ্যার ন্যায় উত্তর প্রার্থনা করিতেছি। আমার বিদ্যা অতি সামান্য, কাজেই শাস্ত্রাদি পাঠ করিয়া নিজের জ্ঞানে সবগুলি সমস্যার সমাধান করিতে পারি না, অথচ সমাজের নানা স্তরের স্ত্রীলোকের মনোভাব ও সাংসারিক অবস্থা দেখিবার সুযোগ পাইয়া মনে যে-সমস্ত আলোচনার উদয় হয় তাহা বলিয়া বুঝাইবার মত ভাষাজ্ঞানের অভাব হইলেও বলিতে ইচ্ছা করে।

তাঁহার প্রবন্ধের উদ্ধৃত লর্ড রোণাল্ডশের মন্তব্যের মধ্যে আছে—"সামাজিক ব্যবস্থা এ যাবৎ ভারতবাসীর কল্যাণ সাধন করিয়া আসিতেছে—"। এখনও যদি সত্যই সামাজিক সমস্ত ব্যবস্থাই সমাজের কল্যাণ সাধন করিত তবে জীবনের প্রত্যেক আদর্শ এত গলদপূর্ণ হইয়া উঠিত না। তিনি লিখিয়াছেন সংস্কারের জোর হাওয়া লাগা অস্বাভাবিক নয় এবং চিরদিনই ইহা চলিয়া না আসিলে বর্ত্তমান অবস্থায় সমাজকে আমরা দেখিতে পাইতাম না। তাই যদি হয় তবে সমাজের যেখানেই দূষিত ক্ষত দেখা দিবে সেখানেই সংস্কারের অস্ত্র প্রয়োগ করিতে হইবে। ক্ষত যত দূষিত হয় ঔষধ তত বিষাক্ত হয়, এই রূপই দেখা যায়। এখন পুরাণ কালের পক্ষে কল্যাণকর ব্যবস্থা এবং হিন্দু নারীর অতি উচ্চ বিশিষ্টতা এই দুইটির প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাবশত আমরা যদি হিন্দু সমাজের সকল শ্রেণীর নরনারীর দাম্পত্য-জীবন বিশ্লেষণ করিয়া যাহা দেখিতে পাই তাহা স্বীকার করিতে এবং চরম প্রতীকারের ব্যবস্থা করিতে ভয় পাই—তবে নর্দ্দামার মুখ বন্ধ হইয়া গেলে জমা আবর্জ্জনা পচিয়া বাড়ীর যে অবস্থা হয় সমাজেরও ক্রমশঃ সেই অবস্থা হইবে। হিন্দুনারীর শিক্ষা দীক্ষা ও জীবনের আদর্শ এককালে যেরূপ নিয়ন্ত্রিত ছিল এখনও সেই রূপই আছে একথা স্বীকার করিতে পারিলে গৌরব বোধ করিতাম, আর কেন যে সেরূপ নাই তাহা এখানে না বলিলেও চলে, তবে চেষ্টা করিলেও যে, দেশের এরূপ পরিবর্ত্তিত অবস্থায় সমাজের সেরূপ অপরিবর্ত্তিত অবস্থা বজায় রাখা যাইবে না, তাহা বলিতেই হইবে। সমাজের অবস্থা এখন এরূপ ব্যাথাদায়ক যে আগুনে পোড়াইয়া খাঁটি করিয়া লওয়ার জন্যই অগ্নি-সংস্কারের প্রয়োজন। কালস্রোত ও যুগধর্ম্মকে অস্বীকার করিয়া কেহ জয়ী হইয়াছে কি? যুগধর্ম্মের সহিত সামঞ্জস্য রাখিবার জন্য পুরাতনকে ভাঙ্গিয়া গড়িতে হয়। বড় জিনিষ মাত্রেই অবিনশ্বর হইতে পারে না, আর যাহা বাস্তবিক অবিনশ্বর সংস্কার তাহাকে কি করিতে পারে?

কোন দেশের সতী সাধ্বী কোন নারীই নিজের অবস্থাটাই কেবল চিন্তা করিয়া ডিভোর্স বিলের পক্ষপাতী হইবে না, কিন্তু প্রত্যেক দাম্পত্য জীবন পবিত্রতার আধার এবং প্রত্যেক স্ত্রী সতী সাধ্বী একথাও তাঁহারা বলেন না। লোক সংখ্যার অনুপাতে হিন্দু-সমাজ যদি সুনীতিতে অন্যান্য অনেক সমাজের উপর হইয়াও থাকে, তবু তার যেটুকু দুর্ব্বলতা প্রচ্ছন্ন গতিতে চলিয়াছে তাতে বাধা দিতে হইলে যে শিক্ষার প্রয়োজন সেই শিক্ষা দিতে যে সময় লাগিবে ততদিনে দুর্নীতি কতখানি বাড়িয়া যাইবে, তাহাও ভাবিবার বিষয়। পঙ্কিল স্রোত আছেই বলিয়া যদি বিশ্বাস করি তবে তাহা বহিয়া চলিয়া যাইবার জন্য পাকা নর্দ্দামা করিতে বাধা দিই কেন? এককালে অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া হিন্দুনারী তার বৈশিষ্ট্যের প্রমাণ দিত, মৃত স্বামীর চিতায় পুড়িয়া সতীত্বের দৃষ্টান্ত রাখিয়া যাইত, এখন সে সব প্রমাণ

শ্রীসরযূবালা ঘোষ

ও দৃষ্টান্ত সতী সাধ্বীরা কয়জন দেখাইতে পারিবেন ? তা বলিয়া সতীর একান্ত অভাব হইয়াছে বলিয়া ত মনে করি না, আর সেই জন্যই তো ডিভোর্স বিলের পক্ষে ভোট দিতে দ্বিধা করি না। আজকের দিনে এই ডিভোর্স বিলই সতীদের অগ্নি-পরীক্ষা। যে দেশে এখনও পতির অবর্ত্তমানে প্রাপ্তবয়স্কা নারীর পত্যন্তর গ্রহণকে লোকে শ্রদ্ধার চোখে দেখে না, সে দেশে পতি বর্ত্তমানে পত্যন্তর গ্রহণকারিণীকে কি চোখে দেখিবে তাহা সহজেই অনুমেয়। এ দেশে ইহা কিরূপে ব্যবহৃত হয় তাহাও দেখিবার বিষয়।

প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় ও তাঁহার জননী আর্য্যসন্তান ও হিন্দুনারী হইয়াও বিধবাবিবাহের পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। আর এতাদন যাবৎ এই আইন ত বিধিবদ্ধ হইয়াছে, তবু দেশে এত অধিক বালবিধবা থাকা সত্ত্বেও, এবং অনেকেই অভিভাবক দ্বারা প্ররোচিত হইয়াও, কেন সকলে বিবাহ করিতেছে না ? এই আইনের দ্বারা বিধবাদের প্রত্যেকের যদি ক্ষতি না হইয়া থাকে তবে বিবাহবিচ্ছেদ ও পত্যন্তরগ্রহণ আইনের দ্বারা সতীদের কেন ক্ষতি হইবে ? যাহারা ভিন্ন প্রকৃতির তাহাদের পক্ষে আইনসঙ্গত ভাবে বাঞ্ছিত মিলনে কতকটা উপকারও হইতে পারে। যাহারা অযোগ্যপাত্রে পড়িয়া জীবনে ব্যর্থ ও অসুখী তাহাদের পক্ষে যোগ্যতর পতিলাভে সার্থকতা আসিতে পারে। দ্বিতীয়বার বিবাহকারী পুরুষের এরূপ সুখী হওয়ার দৃষ্টান্ত বিরল নয়। ইহকালটাকে একেবারে বাদ দিয়া কেবল পরকালের আশায় সকলপ্রকার লাঞ্ছনা সহিয়া এবং সকলপ্রকার অন্যায়কে প্রশ্রয় দিয়া যাদের জীবন কাটে তাদের পক্ষেও এই আইন একটু হয়ত কষ্টলাঘবকর হইতে পারে। কারণ এই শ্রেণীর স্বামীরা আর কিছুতেই সঙ্কুচিত না হইলেও পারিবারিক সম্মানহানির একটু ভয় করে। ইহারা যখন জানিবে যে, তাহাদের নির্য্যাতিতা নিরুপায় স্ত্রীদের মুক্তির জন্য একটা পথ হইয়াছে এবং সেই পথ অবলম্বন করিলে তাহার পৌরুষে আঘাত পড়িবে, তখন হয়ত একটুখানি নিজেকে সামলাইয়া চলিবে।

সমাজের এবং শাস্ত্রের যত কিছু বিধান, সে সমস্ত কতক কেবল পুরুষের জন্য, কতক কেবল স্ত্রীজাতির জন্য নির্দ্দিষ্ট, আর কতক সমগ্র মনুষ্যজগতের পক্ষে সমান ভাবে খাটে ; তেমনি প্রাকৃতিক বিধানও পুরুষনারী ভেদে নির্দ্দিষ্ট আছে, আবার মানবজাতির পক্ষে সমান ভাবে প্রযোজ্য কতকগুলি প্রাকৃতিক বিধানও আছে। হিন্দুজাতির জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত যে সব সংস্কার হয় পুরুষ নারীভেদে তাহার কোন পার্থক্য নাই, এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যে সংস্কার বিবাহ তাহাতে স্ত্রীপুরুষ উভয় জাতির সমান অংশ, এবং উভয়ের মিলিত ভাবে নহিলে ইহা সম্পন্ন হয় না ; অথচ আজকালকার হিন্দু-বিবাহে স্ত্রী একটি নিষ্ক্রিয় নির্ব্বাক জড়পদার্থবৎ অবস্থান করে, তাহাকে কোন মন্ত্র বলিতে হয় না,—আর কন্যাদাতা বর ও গুরুপুরোহিতেরা যে মন্ত্র দ্বারা এই বিবাহ কার্য্য সমাধা করেন তাহার অর্থ একবর্ণও হাজারে একটি নারী বুঝিতে পারে কিনা সন্দেহ। তবুও মানিয়া লইলাম যে, এরূপ বিবাহ দ্বারাও ইহকাল পরকাল জীবন মরণ এক হইয়া যায় ; কিন্তু যে ক্ষেত্রে পুরুষ দ্বিতীয় তৃতীয় ইত্যাদি যত ইচ্ছা ততবার বিবাহ করিতেছে সে ক্ষেত্রে, তাহা যখন সংস্কারই নয়, তখন সেই সব স্ত্রীরা কোন্ গতি লাভ করিবে ? আর সেই সব স্বামীদেরও কি "জীবনে মরণে জনমে জনমে" ততগুলি স্ত্রীর ভর্ত্তা হইয়াই চলিতে হইবে ? প্রথমবার ভিন্ন অন্যবারের বিবাহ সংস্কার না হইলেও অনুষ্ঠান ত একপ্রকারেরই হয়, আর সেই স্ত্রীরাও কিছু আগে বিবাহ করিয়া আসে না। পুরুষের বহুবিবাহ বন্ধ হইলে পূর্ব্বজন্মের কোন্ স্ত্রীটি স্বামীকে পুনরায় পাইবে ? মহাত্মা ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় এ বিষয়ে যাহা লিখিয়াছেন তাহা নিছক প্রেমের কথা, সেই প্রেম যাহার হৃদয়ে জন্মায় তার ধ্যানের ব্যাঘাত ও পবিত্রতা নষ্ট হইতে সে দিবে না ; কিন্তু অপর লক্ষ লক্ষ নর নারী যাহারা আদর্শ সম্বন্ধেও সচেতন নয় সেরূপ প্রেমের সন্ধানও পায় নাই, তাদের জন্য একটা সাধারণ ব্যবহার দরকার মনে করিয়াছিলেন বলিয়াই শাস্ত্রকারগণ দ্বিতীয়বার বিবাহ সংস্কার নয় বলিয়াও অসিদ্ধ বোধ হয় বলেন নাই, অথবা মধু অভাবে গুড়ের মত ব্যবস্থা দিয়াছিলেন। এই যে ব্যবস্থা ইহা যদি পুরুষপ্রকৃতির জন্য এতই আবশ্যক হইয়াছিল তবে স্ত্রী-প্রকৃতি সংযমে ত্যাগে পুরুষপ্রকৃতি হইতে এতই কি উচ্চতর যে, তার জন্য ঠিক উল্টা ব্যবস্থাটি হইল ? বাস্তবিকই স্ত্রী-প্রকৃতি উচ্চতর কিনা, তাহার পরীক্ষাই বা কি দিয়া

হইল? আর উচ্চতরই যদি হইবে তবে অত কড়াকড়ি কেন?

পুরুষ অন্যায় করিতেছে বলিয়া স্ত্রীরাও অন্যায় করুক, এরূপ ভাব হইতে কেহ ডির্ভোস বিল সমর্থন করে বলিয়া মনে করি না; তবে সতীত্বের সংস্কার যতই মজ্জাগত হউক না কেন তথাপি যখন সমাজে মেয়েদেরও পদস্খলন হইতেছে, অতি বড় সুশিক্ষিতা ও অতি বড় অশিক্ষিতা এই দুই শ্রেণীতে ঐ বিষয়ে বেশ সাদৃশ্যও দেখা যাইতেছে, তখন সমাজে এমন সব পথ খুলিয়া রাখা বোধ হয় দরকার যাহাতে রুচি অনুসারে চলিয়া মানুষ সমাজেরই আশ্রয়ে স্থান অধিকার করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারে। যে বিষয়ে পুরুষ ও নারীকে সমান অঙ্গ বলিয়া মনে করি সে বিষয়ে উভয় জাতির জন্য সমান ব্যবস্থা থাকাও দরকার মনে হয় নাকি? পুরুষরা যাহা পারে স্ত্রীরাও তাহা পারিবে, আবার স্ত্রীরা যাহা পারে না পুরুষরাও তাহা পারিবে না, এই দুই রকমের দাবী মোটের উপর একই; কাজেই পুরুষের বহু বিবাহ বন্ধ করিতে গেলে অদুর ভবিষ্যতে প্রস্তাব উঠিতে পারে যে, পতিতা নারীদের মত পতিত পুরুষদিগকেও সমাজের বাহিরে থাকিয়া দেহ বিক্রয় দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হইবে। তাহা হইলে সমাজে থাকিবেন কতিপয় সন্ন্যাসীকল্প মহাপুরুষ আর মুষ্টিমেয় আদর্শ স্বামী। বিধবা মাত্রেরই নির্ব্বিচারে ব্রহ্মচর্য্য ও অত্যাচারিতা স্ত্রীর একান্ত উপায়হীনতা এবং বিপত্নীকের, পত্নী কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত পুরুষের ও পত্নীত্যাগীর পুনরায় দারপরিগ্রহণের অধিকার যদি বিধিবদ্ধ হইয়া সমাজে চলে তবে এই হিন্দুজাতি বা সমাজের বিশিষ্টতা জগতকে দেখাইবার জন্য আর বেশী দিন ভাবিতে হইবে না,—রূপকথার গল্পের মত এই বিলুপ্ত জাতির ইতিহাস জগৎবাসী পুঁথি পত্রে পাঠ করিবে।

"ভারত মহিলার, হিন্দু সতীর, আর্য্য নারীর নিজস্ব পূর্ণ স্বতন্ত্রতা তাঁর সমস্ত মহিমা গরিমা" তবে কি এতই ঠুনকো জিনিস যে, নিম্ন অধিকারীর জন্য যাহা প্রয়োজন তাহা হাতের কাছে পাইলে নিজেকে আঘাত করিবেই এবং ভাঙ্গিয়া চুরমার হইবে? এই যে হিন্দু শাস্ত্র এবং সমাজ এর বৈশিষ্ট্য কোনখানে? যেখানে দেখি "যত মত তত পথ," যে যেমন অধিকারী তার জন্যে সেই রকম ব্যবস্থা, প্রত্যেকের রুচি অনুসারে একটা নির্দ্দিষ্ট স্থানে আশ্রয় লইবার পন্থা আছে, সেইখানে নয় কি? সীতা সাবিত্রী চিন্তা সুভদ্রার সতীত্ব-গাথা যে যুগের কাহিনী, দময়ন্তীর পুনঃ স্বয়ম্বরের উদ্যোগ, দ্রৌপদীর পঞ্চ স্বামী, অম্বা অম্বালিকার বৈধব্য অবস্থায় পুত্রোৎপাদন, কুন্তী সত্যবতীর কুমারী অবস্থায় মা হওয়া—এ সবও সেই যুগের কথা, এবং এই শেষোক্ত নারীগণ সমাজে ঘৃণিতা ছিলেন না। পঞ্চপাণ্ডবের জন্মকথাও আমাদের কাছে সুরুচিসঙ্গত নয়; সেই পাণ্ডবদের, বিশেষত শ্রীকৃষ্ণের যুগকে বর্ব্বর যুগ বা তাঁহাদিগকে অনার্য্য কেহ বলে কি? হিন্দুর মতে সেই চিরস্মরণীয় আদর্শ মহাপুরুষ বা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবতারের সময়ে যাহা হইত তাহারও সংস্কার পরবর্ত্তী সংস্কারকগণ আবশ্যক বোধে করিয়া গিয়াছেন, নহিলে আজও আর্য্যসমাজে সেই সব প্রথা প্রচলিত থাকিত। দেবতার ন্যায় পূজাপ্রাপ্ত রামায়ণ মহাভারতের সকল আদর্শ নির্ব্বিচারে অনুসরণ করিতে হিন্দু দ্বিধান্বিত হইত না। অতীত কালে যাহা ছিল তাহা যদি বর্ত্তমানে অনাবশ্যক বোধে পরিত্যাগ করিয়া থাকিতে পারি, তবে বর্ত্তমানে যাহার প্রয়োজন বোধ করিতেছি তাহা ভবিষ্যতেও হয়ত পরিত্যক্ত হইতে পারে। প্রথা এবং আইন অস্থায়ী জিনিষ, পক্ষান্তরে নরনারীর প্রেম শাশ্বত, চিরকালের জিনিষ; প্রথার পীড়নে প্রেম বিলুপ্ত হইবে বলিয়া বিশ্বাস করি না।

যতদিন পর্য্যন্ত না দেশ অতটা উচ্চ শিক্ষা পাইবে যাহাতে সমস্ত পুরুষ নারী একাধিক বার বিবাহে স্বেচ্ছায় বিরত হইবে, সমাজ হইতে জ্ঞানত ব্যভিচার ও অজ্ঞানত পদস্খলন একেবারে লোপ পাইবে, অন্তত ততদিনের জন্য যাহাতে অবস্থা ভেদে একেবারে নিরুপায় হইতে না হয় সেজন্য আইনত সকল রকম পথই খুলিয়া রাখা উচিত। সমাজে ব্যভিচারী নরনারীকে যদি সহিতে পারি তবে পত্যন্তর গ্রহণকারিণীকে সহিতে না পারিবার হেতু কি? যখন পথের আবশ্যক হয় অথচ পথ পাওয়া যায়না তখনই নরনারী বেপরোয়া হইয়া উঠে, এর পরিচয় কি আমরা এখনই পাইতেছি না? ইউরোপের ফলাফলের সহিত

শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

আমাদের দেশের ফলাফল তুলনা করা চলিবে না, কারণ এদেশের সতীত্ব অন্তদেশের সতীত্বের চেয়ে উচ্চ আদর্শের, ইহা সকলেই বলেন। দেশভেদে ও জলবায়ু ভেদে একই জিনিষের চাষ ভিন্ন ভিন্ন ফল প্রসব করে। আজ যাঁহারা বলেন যে, শত প্রহরার আবেষ্টনে আবদ্ধ রাখিয়া এই যে সতীত্ব ইহার কি মূল্য আছে, তাঁহারা দেখিয়া মুগ্ধ হইবেন যে, ভারতমহিলার এমন কিছু আছে যাহাতে প্রহরার বেষ্টন না দিলেও সে নিজেকে নিজে রক্ষা করিতে পারে। আর যাঁহারা হিন্দুনারীর পুরাতন আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাবান বলিয়া তাহাদের এই সমস্ত দাবী দাওয়ায় ক্ষুণ্ণ হন এবং নিম্নগামী হইবে বলিয়া আশঙ্কা করেন, তাঁহারা দেখিয়া সুখী হইবেন যে অধিকার হাতে পাইয়া তাহার যথেচ্ছ ব্যবহার যাহাতে না হয় সেজন্য হিন্দুনারী ভাবিতে শিখিয়াছে; যে বিষয়ে এতদিন সে মোহাবিষ্ট ছিল সে বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন হইয়া কিরূপ ছিল কিরূপ হইয়াছে এবং কিরূপ হইতে হইবে একথা ভাবিতেছে। যেদিন বুঝিবে যে, তাহার বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়া চলিতে পারিলে ডিভোর্স বিলের কোন আবশ্যকতা নাই তখন ডিভোর্স বিল আপনা হইতে অকর্ম্মণ্য হইয়া যাইবে। আর যদি সে এর দ্বারা উপকার পায় তবে ত এর প্রয়োজনই আছে। বিপত্নীকের দারপরিগ্রহে বাধা না থাকিলেও এমন বহু বিপত্নীক আছেন যাঁহারা প্রেমে শ্রদ্ধায় নিষ্ঠায় আচারে বিধবাকে হার মানাইতে পারেন।

তাজমহলের উপরে প্রত্যেক টালির সংযোগ স্থলে অসংখ্য ঘাসের চারা গজাইয়াছে, এগুলিকে বাছিয়া নির্ম্মূল করিতে পারে মানুষের সাধ্য নয়। কালক্রমে এই ঘাসেরই শিকড়ের অত্যাচারে তাহাতে ফাটল ধরিবে, তখন জীর্ণ সংস্কার সম্ভব হইলেও ধ্বংসের পথে উহার ধীরগতি কেহ ধরিয়া রাখিতে পারিবে না। ধ্বংস যাহার অনিবার্য্য নূতন কোন শিল্পী নূতন পরিকল্পনায় তাহাকে ভাঙ্গিয়া গড়িলে মন্দ হইবে কেন? সুতরাং গড়িবার পুর্ব্বে উহাকে ভাঙ্গিবারই আবশ্যক হইবে। ক্রমোন্নতিবাদের সিদ্ধান্ত মানিয়া লইলে প্রত্যেক সংস্কার দ্বারা লাভবানই হইব বলিয়া মানিতে হয়। রাণী সৌরিয়া ও আমীর আমানুল্লা এত বড় আঘাতে ও এত দ্রুত হস্তে সংস্কার করিতেছিলেন বলিয়াই আজ আফগানিস্থান এরূপ বিধ্বস্ত সত্য, কিন্তু এই বিপ্লবের পরে যখন শান্তি আসিবে তখনকার আফগানিস্থান যে ভারতের দৃষ্টান্তস্থল না হইবে তাহা কে বলিতে পারে? ধীরে ধীরে কাজ করিলে যে পরিবর্ত্তনে যুগ যুগান্তর বহিয়া যাইত, সেই আকাঙ্ক্ষিত পরিবর্ত্তন রাণী সৌরিয়া জীবনেই হয়ত দেখিয়া যাইবেন।

যাঁহারা সর্ব্বপ্রকার কাম্যবস্তু লাভে সার্থকজীবন তাঁহারা প্রবৃত্তিমার্গের দোষ কীর্ত্তন করিতে পারেন, এবং বাধ্য হইয়া ঐসব হইতে বঞ্চিতজীবন নিবৃত্তিমার্গ মানিয়াও লইতে পারে; কিন্তু প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির প্রভেদ সম্যকরূপে বুঝিতে পারিয়া আবশ্যক হইলে স্বেচ্ছায় নিবৃত্তিমার্গ গ্রহণ করিতে পারে এরূপ জ্ঞান ও শিক্ষা যাহাদের নাই তাহাদিগকে শিখাইবার জন্য শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী কোথায়? সেরূপ শিক্ষালয়ই বা কয়টা আছে? যাঁহারা মনে প্রাণে এসব অনুভব করেন তাঁহারা নিবৃত্তির আদর্শ ছড়াইয়া দিবার জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া সকলের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়ান না কেন? নিজে সমস্ত আরাম ও সম্ভোগের মধ্যে মগ্ন থাকিয়া নিবৃত্তিতত্ত্ব প্রচার করিলে সাধারণে কতটুকু শিক্ষা পাইবে? আমি কোন ব্যক্তিবিশেষকে একথা বলিতেছি না, সকল সমাজেই উপদেশদাতার চেয়ে আদর্শদর্শয়িতার সংখ্যা অত্যন্ত কম তাই বলিতেছি।

শ্রীসরযূবালা ঘোষ

২

বিবাহ-বিচ্ছেদ

বৈশাখের 'বিচিত্রা'য় শ্রীমতী অনুরূপা দেবী লিখিত 'বিবাহ-বিচ্ছেদ' প্রবন্ধ পড়িলাম। প্রবন্ধ সুরু হইয়াছে বাংলার ভূতপূর্ব্ব শাসক লর্ড রোনাল্ডশের উক্তি দিয়া। "যে সামাজিক ব্যবস্থা ভারতবাসীর কল্যাণসাধন করিয়া আসিতেছে,...লঘুচিত্তে...তাহার পরিবর্ত্তন" উচিত নয়, লাটসাহেব তার বিরোধী। ভালো কথা।

তারপর লেখিকার নিজের কথা—"আমাদের দেশেও পৃথিবীর বহুতর দেশের মতই সংস্কারের একটা জোর

হাওয়া লাগিয়াছে, এটা অবশ্য অস্বাভাবিক নয়। যুগে যুগেই চিরদিন এমন হইয়াছে ও হইতেছে এবং পরেও আবার হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্টির পর হইতেই মানবসমাজের গঠন ও সংস্কার চিরদিন ধরিয়াই চলিয়া না আসিলে আমরা বর্ত্তমানকালে যে-সমাজকে দেখিতে পাইতেছি, তাহা নিশ্চয়ই দেখিতে পাইতাম না। যেমন মানুষের জীবদেহ থাকিলে তাহাতে রোগ শোক ভোগ এবং উহা হইতে আত্মরক্ষার চেষ্টা অনিবার্য্য, তেমনি সমাজ থাকিলেই তাহাতে দোষ ত্রুটি থাকা এবং তাহার প্রতিকার চেষ্টাও অনিবার্য্য। তা' সে সমাজ যতই কেন না বিচক্ষণতার সহিত গঠিত হউক, কালক্রমে সকল জিনিষই কিছু না কিছু ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং ক্ষয়িত স্থলে ছিদ্র হইতেও বাকি থাকে না; সেই মত মনীষীমনগণ দ্বারা গঠিত সমাজেরও ক্ষয়িত জীর্ণ অংশে ছিদ্র প্রবেশ কারয়া থাকে।"

লেখিকা সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন বুঝা গেল। কিন্তু "সেই সংস্কারটা সম্পূর্ণরূপে পুরাতনকে চূর্ণ করিয়া ফেলিয়া দিয়া করা আবশ্যক" মনে করেন না। "সমাজ ভাঙ্গার" আগ্রহের আতিশয্য লেখিকা পছন্দ করেন না, কারণ, তা "খুব সুফলপ্রসূ নাও হইতে পারে। যেমন কাবুলের রাজমহিষী রাণী সৌরিয়ার অত্যন্ত দ্রুতহস্তের সমাজ সংস্কার তাঁর স্বামীর পুত্রের দেশের এবং সমাজের পক্ষে শুভকারী হয় নাই।"

সংস্কারটা দ্রুত হওয়াই বাঞ্ছনীয়—মানবদেহের মত সমাজ-দেহের ক্ষত আবিষ্কৃত হওয়ামাত্র অস্ত্রোপচার আবশ্যক, নতুবা অচিরে ঐ বিষ সমস্ত দেহে ব্যাপ্ত হইয়া অনর্থ ঘটাইতে পারে। কোনো সংস্কারই আপাতদৃষ্টিতে ক্ষীণপ্রাণ চিন্তা-লেশহীন মানুষের চোখে শুভকর মনে হয় না—ইতিহাসে তার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আছে—খৃষ্ট হইতে রামমোহন বিদ্যাসাগর পর্য্যন্ত। কালক্রমে মানুষ সংস্কারের উপকারিতা বুঝিতে পারে, এবং যে-সংস্কারক একদা দেশ বা সমাজের শত্রু বলিয়া আখ্যাত হন, তিনিই আবার দেশভক্তরূপে জনসাধারণের পূজা পাইয়া থাকেন। এরূপ ঘটনা মানব-সমাজে বারবার ঘটিয়াছে, আজও তার বিরাম নাই।

'হিন্দুবিবাহ-বিচ্ছেদ-বিল' সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া বিচলিত হইয়া লেখিকার বিরুদ্ধপক্ষের প্রতি নিম্নলিখিত কটুকথা প্রয়োগ করা উচিত হয় নাই।

১। "এই সব অপরিণতবয়স্কা নব্যাশিক্ষিতা অবিবাহিতা বা সদ্যবিবাহিতা মেয়েদেরই বা সমস্ত হিন্দুসমাজের মেয়েদের ভালমন্দ চিন্তার কিসের অধিকার আছে?"

২। "বিলাতি বাহাদুরী লওয়ার আগ্রহে তাঁদের যোগ্যতার বহির্ভূত…গুরুতর বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়া বসিয়াছেন এবং …কতকগুলি সম্পূর্ণ বিলাতি আদর্শে গঠিত, পালিক নরনারী তাঁদের এই খেয়াল (whim)-কে উৎসাহ দান করিয়া প্রবর্দ্ধিত করিতেছেন।"

৩। "হিন্দু মেয়েদের মঙ্গল চিন্তার অধিকার ও চেষ্টার দাবী হিন্দু সমাজের হিতাকাঙ্ক্ষিনী বা হিতাকাঙ্ক্ষী মাত্রেরই আছে, তিনি যে সাম্প্রদায়িক হিন্দুই হোন অথবা হিন্দু নাই হোন।"

যাই হোক লেখিকা স্বীকার করেন, "কোন সমাজেরই সকল নর বা নারী সুচরিত্র বা সাধ্বী অথবা উন্নতচরিত্র হইতে পারে না। যে সমাজের লোকসংখ্যা যত বেশি হয় তাহাতে গলদ থাকা তত বেশি অন্ততঃ সম্ভব…হিন্দু স্বামীর হস্তে পত্নী-নির্যাতনের নিশ্চয়ই অভাব নাই…"

তত্রাচ সতীনারীর কর্ত্তব্য লেখিকা নির্দ্ধারিত করিয়াছেন এইরূপ—"এ সব ক্ষেত্রে সতীনারী পতিবিযুক্তা থাকিয়া জীবনযাপনে হয়ত বাধ্য হইতে পারেন, এর জন্য 'মেনটেন্যান্স' বা জুডিসিয়াল সেপারেশন যাহাতে আইনের হাতে সহজে পান এবং ঐ অত্যাচারী পতি যাহাতে পুনঃ বিবাহ করিতে না পারেন, সে চেষ্টা হওয়া অসঙ্গত নয়।"

কিন্তু "বিবাহ-বিচ্ছেদ পূর্ব্বক হিন্দুনারী পত্যন্তর গ্রহণের অধিকারিণী হইবেন" হিন্দু সমাজের এর চেয়ে বড়ো অধঃপতন লেখিকা কল্পনা করিতে পারেন না! বরং "পুরুষ যাহাতে কথায় কথায় স্ত্রী ত্যাগ করিতে না পারে, এবং স্ত্রী বর্ত্তমানে দ্বিতীয় বিবাহ করিতে না পারে, সে চেষ্টা করাই সঙ্গত।"

সেই চেষ্টাই ত হইতেছে। হিন্দু বিবাহ-বিচ্ছেদ-বিলের উদ্ভব তবে কি জন্য? বিদুষী লেখিকা কি তাহা বুঝিতে

শ্রীসুনীতি বসু চৌধুরাণী

পারেন নাই ? যে সকল হিন্দু স্বামী তুচ্ছ অজুহাতে স্ত্রীকে ত্যাগ করে, এক স্ত্রী বর্ত্তমানে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করে, তাহাদিগকে সায়েস্তা করিতে হইলে হিন্দু স্ত্রীরও এক পতি ত্যাগ করিয়া অন্য পতি-গ্রহণের অধিকার পাওয়া উচিত। কুকুরের উপযুক্ত মুগুরও যে চাই !

এমন একটি আইন পাশ হইলেও পতিব্রতা সতী নারীদের আশঙ্কার কি হেতু আছে বুঝিতে পারি না। আইন নিশ্চয়ই কাহাকেও পত্যন্তর গ্রহণে বাধ্য করিবে না। মহাবীর কর্ণ ও পঞ্চপাণ্ডব কুন্তীর বিবাহিত পতি পাণ্ডুর ঔরসজাত ছিলেন না, দ্রৌপদী একই কালে পঞ্চপাণ্ডবের অঙ্কশায়িনী হইয়াছিলেন, অহল্যার কথাও শুনিয়াছি। সেই সব "হিন্দু সতীর সতীত্বগৌরব" ত ক্ষুণ্ণ হয় নাই, সেই সব "ভারতমহিলা আর্য্যনারীর মহিমা গরিমা" ত লুপ্ত হয় নাই, তবে আজ এতকাল পরে কলিযুগে অবস্থাবিশেষে হিন্দুনারীকে পত্যন্তর গ্রহণের অধিকার দেওয়ার প্রস্তাবে লেখিকার এই হাহাকার কি শোভন না সঙ্গত ?

শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

৩

নারী-জাগরণ

আজকাল ভারতে বহুবিধ আন্দোলন চলিতেছে; নারীকে জাগরিত করা, স্বাধীনতা দেওয়াও তাহার ভিতরে একটি।

কেহ কেহ বলেন, নারীকে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিতা কর, বিলাতের ন্যায় নারীকেও ভোটের অধিকার দাও, রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে তাহাদের সমান অধিকার হ'ক, সর্ব্ব বিষয়ে নারী পুরুষের সমকক্ষতা লাভ করুক, তাহা হইলেই স্ত্রী-স্বাধীনতা হইল, এবং স্ত্রী-স্বাধীনতা হইলেই দেশ স্বাধীন হইবে।

আর একদলের মত, নারীকে আমাদের প্রাচ্য আদর্শে শিক্ষিতা কর, সীতা দময়ন্তীর আদর্শ গ্রহণ করুক, রামায়ণ মহাভারত গীতা অধ্যয়ন করুক, তাহা হইলেই ভারতের নারী জাগরিত হইবে।

কিন্তু ব্যাপারটা হইতেছে—এই আন্দোলনের যুগে কতক পুরুষ চাহেন যে, নারীদের জন্য কিছু একটা করা নিতান্ত দরকার; আর নারীরাও তাহাদের নিজেদের দাবী পাইবার জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে। কিছু করা দরকার, একটা কিছু হওয়া দরকার ইহা আমরা সকলেই বুঝিতেছি—অথচ কি-যে হওয়া দরকার, কি-যে তাহার স্বরূপ, কোথায় তাহার সমাপ্তি, তাহা কেহই ঠাহর করিয়া উঠিতে পারিতেছিনা, আর পারিতেছি না বলিয়াই নানারকম গোলযোগের সৃষ্টি হইতেছে।

এই সমস্যার মীমাংসা কোথায় ? তবে একটা কথায় বোধহয় আর কোনদলের মতদ্বৈধ নাই যে, নারীকে শিক্ষিতা করা উচিত; কিন্তু তাহার পরেই গণ্ডগোল, প্রশ্ন উঠিল কিরূপ ভাবে শিক্ষিতা করা উচিত। এই "রূপ" ও "ভাব" লইয়াই মারামারি।

আমি নিজে নারী, তেমন শিক্ষাও কিছু আমার নাই, সুতরাং আমার মত যে অকাট্য অভ্রান্ত হইবে তাহাও বিশ্বাস করি না; কিন্তু প্রত্যেকেরই যেমন নিজের কথা বলিবার ব্যক্তিগত অধিকার আছে আমি শুধু সেই অধিকারটুকু দাবী করিয়া আজ আমার মনের কথা আপনাদের কাছে সরলভাবে বলিতেছি, বিচার করার ভার আপনাদের। যদি কিছু অপ্রাসঙ্গিক বলি বা কোনরকম ভুল চুক হয়, অনুগ্রহ করিয়া মার্জ্জনা করিয়া লইবেন।

কথাটা বলিতেছিলাম স্ত্রী শিক্ষার "রূপ" ও "ভাব" লইয়াই যত গণ্ডগোল। অনেকে মনে করেন যে, আমাদের দেশের লোকের হাতেই যদি শাসন থাকিত তাহা হইলে এত কথা ভাবিবার দরকার ছিল না; আইন করিয়া পর্দ্দাপ্রথা উঠাইয়া দেওয়া হইত, বিধবাবিবাহ প্রচলিত হইত, বিবাহের বয়স নির্দ্ধারিত হইত,—তাহা হইলে দশ বৎসরের কম সময়ের মধ্যেই সম্পূর্ণ নারী-জাগরণের পালা শেষ হইয়া যাইত, এবং সেই স্বাধীনতা-প্রাপ্ত নারীদের বিজয়-দুন্দুভিতে সমস্ত পাশ্চাত্য জগৎ চমকিত হইত।

কিন্তু বাস্তবিক তাহা হইত কি না-হইত তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত আমাদের সম্মুখে, ভাবিয়া চিন্তিয়া বাহির করিতে হইবে না। এই তো সেদিন আফগানরাজ আমানুল্লা সস্ত্রীক

পাশ্চাত্যদেশ ঘুরিয়া আসিলেন এবং নিজের দেশে আসিয়াই আইনের জোরে একেবারে পর্দ্দাপ্রথা উঠাইয়া দিলেন, স্ত্রী-শিক্ষা বাধ্যতামূলক করিলেন, নারীদের পোষাক পরিচ্ছদ সম্পূর্ণরূপে বদলাইয়া গেল, সহস্র সহস্র বৎসরের অন্ধকার আবর্জ্জনাপূর্ণ ঘর সহসা যেন সূর্য্যের আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

ফল তাহার কি হইল? দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ আফগানরাজের শক্তি ও আইনের সমস্ত ক্ষমতা ব্যর্থ করিয়া উঠিল এক ভীষণ মতবাদ যাহার ফলে আফগানরাজ সিংহাসনচ্যুত এবং বিপদগ্রস্ত হইলেন।

তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে যে, শাসনদণ্ড আমাদের হাতে থাকিলেও "নারীজাগরণ" সমস্যার মীমাংসা করা সহজসাধ্য নহে। এখানে বলিতে পারেন যে, আফগানে হয়তো নারীদের যথেষ্ট সহানুভূতি ছিল. কিন্তু এক ধর্ম্মান্ধ মোল্লার দল অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়াই এই বিপ্লব বাধাইয়া তুলিয়াছে।

কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি এই কথা, যদি সমস্ত নারীর অন্তরেরস হানুভূতি আফগানরাজ আমানুল্লার প্রতি ও তাঁহার সংস্কারের প্রতি থাকিত তাহা হইলে আগুন কি এইরূপভাবে জ্বলিয়া উঠিত? আমার মনে হয় আফগানে সমস্ত নারীর অন্তরের সহানুভূতি আফগানরাজ পান নাই, মোল্লাদের কতক দোষ থাকিতে পারে বটে, কিন্তু নারীরাও কতকাংশে তাহার জন্য দায়ী, কাজেই আমূল সংস্কার আফগানে সম্ভবপর হইল না।

কথাটা আরও একটু পরিষ্কার করিয়া বলি। এই নারী-সংস্কার সম্ভবপর হইয়াছে তুরস্কে, কামাল পাশার বাণীতে, কামাল পাশার পতাকাতলে সমস্ত তুরস্ক জাতি সম্ভ্রমে মাথা নত করিয়াছে; এবং তাহার ফলে গড়িয়া উঠিয়াছে সেখানে এক অদ্ভুত সভ্যতা। কথাটা একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলে প্রশ্ন উঠে, যে সংস্কার আফগানের সহ্য হইল না তাহা তুরস্কে সহ্য হইল কেমন করিয়া?

আফগান দেশ এখনও বহু পশ্চাতে, সেখানে লোকের ভাবের ধারা একটুও বদলায় নাই, কাজে কাজেই আফগান-রাজের রাজশক্তিতে কোন কার্য্য হইল না; অন্যদিকে কামালপাশা প্রমুখ যে আন্দোলন গড়িয়া তুলিল তাহার ফলে তুরস্কের রাজশক্তির নির্ব্বাসন ও গণতন্ত্রের শাসন-প্রতিষ্ঠা হইয়া গেল। ইহাতেই স্পষ্ট বোঝা যায় যে, কামালপাশার বাণীই তাঁহার দেশের বাণী, আর আফগান রাজের বাণী শুধু তাঁহারই বাণী, তাঁহার দেশের নহে।

এই দুইরাজ্যের বর্ত্তমান ইতিহাস আমাদের শুধু এই শিক্ষাই দেয় যে, কোন জাতিকে জাগরিত করিতে হইলে, নারীই হোক বা পুরুষই হোক, দেশে প্রথমত শিক্ষার প্রয়োজন। ইতিপূর্ব্বে বলিতেছিলাম যে, নারীর শিক্ষার 'ভাব' ও 'রূপ' কিরূপ হইবে? আমি কোন রকম শিক্ষার নিন্দা করি না, কারণ শিক্ষার ভিতরে জাতীয় বিজাতীয় নাই, তবে শিক্ষার প্রথম লক্ষ্য হওয়া চাই মনুষ্যত্ব কি নারীত্ব লাভ করা।

প্রকৃতি পুরুষ ও নারীর ভিতরে যথেষ্ট পার্থক্য দিয়াছে, প্রকৃতির নিয়মে পুরুষ ও নারীর কাজ সীমাবদ্ধ আছে, তাহা কেহ লঙ্ঘন করিতে পারে না, ইহাই যদি সত্য হয় তাহা হইলে প্রকৃতিকে বড় করিয়া শিক্ষাকে তাহার অনুকূল করিলে—আমার মনে হয় সেই শিক্ষাই প্রকৃতশিক্ষা হইবে। নারীকে শিক্ষা দেওয়া দরকার, কিন্তু একথাও সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখা দরকার যে দেশ কাল ও পূর্ব্বের সভ্যতার ভাবধারা একেবারে বাদ দিলে চলে না।

দেশের বীজ দেশের আবহাওয়ায় উপযুক্ত মাটি ও আলো বাতাস পাইলে গাছ যেমন সতেজে বর্দ্ধিত হয়, যেমন তাহার স্বাভাবিক স্নিগ্ধশ্যামল শোভা খোলে,—বিদেশের আওতার মধ্যে পড়িয়া বিদেশের আলো ও বাতাসে বর্দ্ধিত হইয়া সেই শোভা, সেই রূপ, সেই গন্ধ, সেই রস, কিছুই সেই রকমটি হয় না। ইহা প্রকৃতির পক্ষে যেমন সত্য, মানবজাতির পক্ষেও ইহা তেমনি স্বাভাবিক নিয়ম। এই নিয়মকে লঙ্ঘন করা হইলেই প্রকৃতিকে লঙ্ঘন করা হয়।

প্রত্যেক দেশেরই এক একটি বৈশিষ্ট্য আছে, প্রত্যেক দেশেরই ভাবধারা জীবনযাপন প্রণালী স্বতন্ত্র; সুতরাং সেই স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্যকে একেবারে বাদ দিয়া যে শিক্ষা লইতে চাই, সে শিক্ষা কোনকালে

সর্ব্বাঙ্গরূপে সুন্দর হয় না, তাহাতে একটু খুঁত থাকিয়াই যায়।

এই ভারতে বহুপূর্ব্বে ঋষিগণ যে সভ্যতা ও ভাবধারা দিয়া গিয়াছিলেন এবং জীবনযাপন-প্রণালী ও যে-সকল সামাজিক নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা এই দেশের নরনারীর হৃদয়ে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে নিহিত আছে। যে শিক্ষা এই ভাবধারা ও পূর্ব্বোক্ত নিয়ম-গুলির আমূল পরিবর্ত্তন করিয়া সংস্কারের নামে জাগরণের বিষাণ বাজায়, সেই শিক্ষা কখনই দেশের হিতকর হইতে পারে না। একথা নিশ্চয়,—তবে একথাও ঠিক, যে নিয়ম ও বিধিব্যবস্থা বহুসহস্র বৎসর পূর্ব্বে এই দেশের উপযোগী ছিল, তাহা এতকাল পরেও যে সবটাই সেইরূপ ভাবে উপযোগী হইবে ইহা কখনই সম্ভবপর নহে; কালের প্রয়োজনীয়তা অনুসারে তাহার সংস্কার ও পরিবর্ত্তন আবশ্যক। এবং সেই পরিবর্ত্তন ও সংস্কারের ফলে প্রত্যেক দেশের নিজস্ব ভাবধারা অধিকতর পরিস্ফুট হইয়া উঠে, উজ্জ্বলতর ভাবে জগতের সমক্ষে প্রতীয়মান হয়,—ইহারই শিক্ষা আবশ্যক।

কারণ, শিক্ষাই মনকে প্রশস্ত করিয়া দেয়, ও কালের উপযোগী পরিবর্ত্তন ও সংস্কারকে গ্রহণ করিবার শক্তি বাড়াইয়া তোলে।

এখন কথা হইতেছে, ভারতের নারীর শিক্ষা কিরূপ হইবে? আমি বলি, সব শিক্ষাই আমরা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি, যাহা দেশের ভাবধারার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া চলিবে; এবং সেইরূপ শিক্ষায় শিক্ষিতা হইয়া ভবিষ্যতে যে "নারী-সঙ্ঘ" গড়িয়া উঠিবে সেই "নারী-সঙ্ঘ"ই ভারতের সকল নারীর শিক্ষা ও কর্ত্তব্যের পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিবে।

পুরুষেরা এই অধিকারে হস্তক্ষেপ করিতে গেলে ভীষণ গোলযোগেরই সৃষ্টি হইবে, কার্য্যত কিছুই হইবে না, এবং ভারতের নারী আজ যে তিমিরে সেই তিমিরেই থাকিয়া যাইবে, ইহা সুনিশ্চিত কথা।

শ্রীসুনীতি বসু চৌধুরাণী

বয়স

শ্রীমৈত্রেয়ী দেবী

তখন সন্ধ্যাকালে
　　অস্ত রবি দূরের থেকে রঙ্গিন আলো ঢালে,
ফুলের যত পাপড়ি গুলি বিদায় ব্যথায় ভ'রে—
　　　　পড়্‌তেছিল ঝ'রে!
　　　　বইল বাতাস ধীরে,
দিনের আলো আস্‌ল তখন সন্ধ্যাসাগর তীরে,
রবি তখন চলতেছিল সুদূর গগন বেয়ে।
　　দূরের মাঠে খেলতেছিল একটি ছোট মেয়ে,
　　　　মধুর তার হাসি,
নবীন কচি পাতায় পাতায় বাজাচ্ছিল বাঁশি।
তখন ওই সে বুড়ো, সব কাজে যার হেলা,
　ব'সে ব'সে দেখতেছিল ছোট্ট মেয়ের খেলা।
　　ষাট পেরিয়ে এল বোধ হয় তার,
　ভালয় মন্দ, সকল দ্বন্দ্ব, ধূলোয় একাকার।

হঠাৎ ব'সে আপন মনে দেখছিল ওর খেলা,
অন্ধকারে ধীরে ধীরে নাম্‌তেছিল বেলা।
ছোট্ট মেয়ে তার
রূপের আলোয় ডুবিয়ে দিলো সকল অন্ধকার।
বাতাস কাঁপন লাগিয়ে গেল কোঁকড়া তাহার চুলে
বুড়োর মনের গোপন পুরের সকল দিয়ে খুলে।

বুড়ো তখন ভাব্‌তেছিল আপন মনে যেন,
এমন হল কেন—
এমন কেন হয়,
উহার বয়স আট যদি বা হবে, আমারে বা ষাট্ কেন গো কয়?
আমারও ত এমনি ছিল দিন, এম্‌নি ছিল খেলা,
আমারও ত বুকের উপর দিয়ে গেছে এমন মধুর সন্ধ্যা বেলা,
আমারও ত এম্‌নি ছিল হাসি, রঙ্গিন মায়ার জাল,
লোকে বলে অনেক দিনের কথা, সে যে অনেক কাল।

কে জানেরে কাল কাহারে বলে, কে জানেরে হায়!
কে জানেরে এমন ক'রে কেন বয়স শুধুই বেড়ে চ'লে যায়;
এ যে শুধু ভোলায় কথার ছলে,
কে জানেরে বয়স কারে বলে!
কে জানেরে কোথায় ধূলোয় ধূসর হ'য়ে হ'য়ে
কোন্ এক স্রোতে সুদূর পথে কাল চলেছে ব'য়ে!
তাহার মাতাল প্রাণের সাথে জড়িয়ে মোদের প্রাণ,
সে কেন রে, যাবার বেলায় দেয়রে আবার টান্!
জীর্ণ করে দীর্ণ করে পরাণ ছল ছল,
সে কেন রে মোদের, বল্‌বে চল্ চল্?
সকল তত্ত্ব সকল সত্য মিথ্যা হ'য়ে যায়,—
তারেই কিরে বয়স বলে হায়!

চাইনা আমি শুন্‌তে কোন কথা,
চাইনা আমি ভুল্‌তে কথার ছলে।
আমায় শুধু সত্যি ক'রে বল, বয়স কারে বলে।

———•———

অন্ধ বালিকা

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৬, শিল্পী—মিলে

পরিচয়

—গল্প—
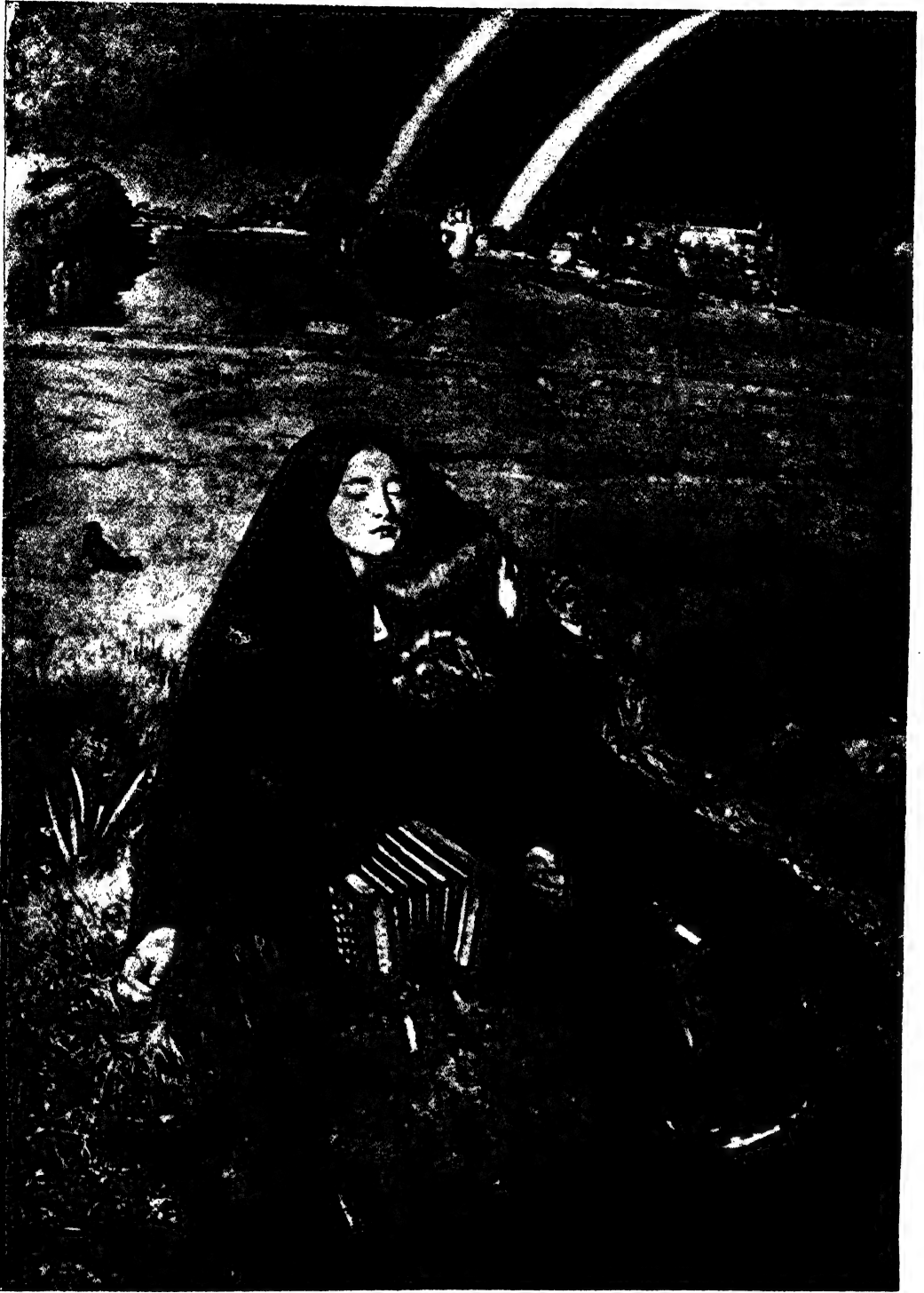
—শ্রীসুবোধ বসু

মেয়েটির নাম নীলা। সে কোন মেয়ে কলেজে পড়ে, ছেলেটির নাম অরুণ, সে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। তারা প্রতিবেশী, কিন্তু তাদের আলাপ নাই, মুখ চেনা মাত্র। অরুণ জানালা দিয়া নীচে চাহিয়া হয় তো দেখিত মেয়েটি বাসে গিয়া উঠিতেছে, না হয় বাড়ির গাড়িতে হাওয়া খাইতে চলিয়াছে। তাদের বাড়ির সমস্ত দেখা যাইত না, শুধু ছোট বারান্দাটা কৃষ্ণচূড়া গাছের ফাঁক দিয়া খানিকটা দেখা যাইত, আর কোণার ঘরটা পর্দ্দা দিয়া বন্ধ দেখাইত। দক্ষিণদিকের জানালাটার ধারে গিয়া দাঁড়াইলে দেখা যাইত মেয়েটি একটি দোলন্ চেয়ারে বসিয়া দুলিতে-দুলিতে পড়া তৈরী করিতেছে। সে না থাকিলে সেটা খালি পড়িয়া থাকিত। সন্ধ্যাবেলা বাড়ি ফিরিলে অরুণ শুনিত মেয়েটি মিষ্টিগলায় গান গাহিতেছে, তার ছোট ভাইটি কচি গলা দিদির গলার সাথে মিলাইয়াছে। কোণের ঘর হইতে পর্দ্দা, ঢাকা জানালা গলাইয়া ঘরের অধিবাসিনীর কথাবার্ত্তাও কিছু কাণে আসিত। ওমা, কলেজের বেলা হ'য়ে গেল যে; খোকার দৌরাত্ম্যি দেখেছ মা, খাতার উপর কালি ঢেলে দিলে, আর পারিনে বাপু; দাদা সত্যি আজ সিনেমাতে নিয়ে যাবে,—গাড়ি পাঠিয়ে দিও, কলেজের বাসে আসতে হ'লে সন্ধ্যা, না হয় ট্রামেই আস্‌ব।

অরুণ পড়িতে পড়িতে হঠাৎ চাহিয়া দেখিত হয়তো দোলন্ চেয়ারে বসিয়া পড়িতে পড়িতে বই রাখিয়া চোখ তুলিয়া মেয়েটি তাহার ঘরের দিকে তাকাইয়া আছে। চোখচোখি হইলে দু'জনেই ঘাড় গুঁজিয়া আবার পড়া সুরু করিত। কলেজে যাবার সময় নীচে অরুণের সাথে মেয়েটির মাঝে মাঝে মুখোমুখিও হইয়া যাইত। দু'জনেই একটু সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিত, তারপর অরুণ ট্রামে যাইয়া উঠিত, মেয়েটি যাইয়া বাসে বসিত।

এমনি অনেকদিন হইয়াছে। দু'জনের কলেজে যাইবার সময়জ্ঞান দু'জনেরই হইয়া গেছে; কে কেমন পোষাক সাধারণত পরে তাহাও তাদের অজানা নাই। নীলা দেখিত অরুণ পরে ঢিলাহাতা পাঞ্জাবী, গায়ে তসরের কিম্বা গরদের চাদর, পায়ে দেয় মখ্‌মলের স্যাণ্ডাল। অরুণ দেখিত মেয়েটী প্রত্যেকদিনই শাড়ি বদ্‌লায়, তার পাঁচজোড়া জুতো কোন্‌টা যে কোন্‌দিন পায়ে দিবে ঠিক নাই, কলার-দেওয়া ব্লাউস, নীল রঙ্‌টা ভারী পছন্দ। তারই মত লাল রঙের পার্কারের ফাউণ্টেন পেন্‌। দু'জনে দুজনের সোনার ঘড়ি চেনে, একজনেরটা ভায়োলেট রঙের মখমলের ব্যাণ্ড দিয়া বাঁধা আরেকজনেরটা চুড়ির সঙ্গে আঁটা। কোনদিন হয়তো মেয়েটির বাসে যাওয়া হইত না, বাস্ আসিবার দেরী দেখিয়া ট্রামে চলিয়া যাইত। কখন বা বাড়ির গাড়িতে যাইত। অনেকদিন তারা একট্রামেই গিয়াছে; এস্‌প্ল্যানেডে ট্রাম বদল করিয়া আবার একট্রামেই গিয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু তাদের আলাপ নাই। পরস্পর পরস্পরকে চেনে। এ জানে, ও বার নম্বরের বাড়িটার দোতলার উত্তর ধারের সাজান ঘরটীতে বসিয়া টেবিলে ঝুঁকিয়া বড় বড় বিলাতী মলাটের বই পড়ে, আর আব্‌লুসের টি-পয়টিতে রাখিয়া পেয়ালার পর পেয়ালা চা নিঃশেষ করে,—ট্রামে একসঙ্গে চাপিলে আশুতোষ-বিল্ডিংসের কাছে নামিয়া যায়, আর বোধ করি প্রতিদিনই বা সিনেমা দেখিতে যায়, না হইলে সিনেমাতে গেলেই ওর সঙ্গে দেখা হয় কি করিয়া। ও জানে, মেয়েটি এগারো নম্বরে থাকে, ট্রামে চাপিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে থামেনা, শেলীর "এডোনিস" হাতে লেডীস্ পরিয়া স্মার্ট হইয়া কলেজে যায়, নিজেদের মোটরে কমই কলেজে যায়, কিন্তু প্রতি-সন্ধ্যায় হাওয়া খাইতে বাহির হয়।

অরুণ নীলার নাম জানে না। বাড়িতে কি জানি কি বলিয়া ডাকে—ঠিক বোঝা যায় না। বকুল না বেবী,

ঠিক করিতে না পারিয়া মনে-মনে নাম রাখিল বেলা। নীলা কিন্তু অরুণের নাম জানে। অরুণের বন্ধুরা আসিয়া যখন-তখন নীচ হইতে চীৎকার করিয়া তাকে ডাকে, তাহাতেই সে জানিয়াছে। রবিবার দিন নীলা দেখিত অরুণ দুইটা না বাজিতেই টেনিস্ র‍্যাকেট হাতে বাহির হইয়া পড়ে, কিম্বা কোন বন্ধু আসিয়া মোটর করিয়া তাহাকে বেড়াইতে লইয়া যায়, না হয় ঘরে বসিয়া সে লাল-রঙের বাঁধান খাতায় কি লেখে। অরুণ দেখে শনিবার এস্রাজ হাতে নীলা কোথায় যায়, গাড়িতে তাহার যে মেয়ে-বন্ধুরা তাদের হাতেও অমনি কিছু একটা-না-একটা যন্ত্র।

তারা দুজনেই দুজনকে দূর হইতে দেখে, পরস্পরের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে অনেক কিছুই বলিতে পারে। অরুণ বলিতে পারে নীলা ভোরবেলা কখন উঠে, আর বারান্দায় পায়চারি করিতে করিতে গুণ গুণ করিয়া কোন্ একটা প্রভাতী সুর গুঞ্জরণ করে। নীলা জানে কখন অরুণ শেষ রাতের আবছা অন্ধকারে ডেভেলাপার টানে, কখন বা মুখ ধুইয়া আসিয়া বড় আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া মাথা ক্রস্ করে।

অরুণ দেখিত নীলা কবিতা খুব করিয়া পড়ে; এটা তার অভ্যাস। অরুণ সেদিকে চাহিলেও সে মনে মনে পড়ে না। পড়িতে বসিলে তার দুষ্টু ভাইটী আসিয়া তাকে বার বার ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে। নীলা রাগ দেখাইয়া বলে, দেখ্ খোকন্, মার খেতে চাস্; আঃ তোর জালায় আর বাঁচিনে; দুষ্টুমি করোনা লক্ষীটি, আচ্ছা ছবি দেখাচ্ছি, বলিয়া হয়তো সাদরে ভাইটিকে কোলের কাছে টানিয়া আনিয়া ছবি দেখায়।

এমনিভাবে পাখা মেলিয়া দিন চলিয়া যায়।

অরুণ তাহার লাল-খাতাটাতে বেলার কথা কল্পনার সাথে মিশাইয়া কবিতা লেখে। সে কবিতা কাহারও নামে নয়, কিন্তু নীলাই ভাব জুটাইয়া তার অধিষ্ঠাত্রী হইয়া উঠিয়াছিল। নীলা হয়তো কাজ না থাকিলে রঙ আর তুলি লইয়া বারান্দায় ছোট টেবিলে খাতা রাখিয়া ছবি আঁকিতে বসিয়া যাইত। কৃষ্ণচূড়ার প্রস্ফুট শাখার পানে তাকাইয়া কোন চিত্রই তার মনে ফুটিত না, এবং কোন অসতর্ক ক্ষণে পাশের বাড়ির পাঠ-রত ছেলেটিরই ছবির মত আঁকিয়া বসিত। তারপর লজ্জায় সে ছবি ছিঁড়িয়া ফেলিত।

অরুণ ভাবিত ঐ মেয়েটি যদি তাহার সাথে আলাপ করিত তবে সে সুখী হইত। নীলা ভাবিত অরুণ যদি আসিয়া তাহার সঙ্গে কথা বলে তবে সে খুসী হইয়াই আলাপ করিবে। কিন্তু অরুণ ভাবিল, সাধিয়া কথা কহিলে হয়তো অশোভন দেখাইবে—অতএব দরকার নাই। নীলা ভাবিল, সে কি করিয়া নিজেই আগাইয়া আলাপ করে। ইহাতে হয় তো তার চঞ্চলতা প্রকাশ পাইবে; অত গরজ সে দেখাইতে যায় কেন। অরুণের মামার সহিত নীলার বাবার আলাপ আছে, তবে যতটুকু না থাকিলে নয় মাত্র ততটুকু। কিন্তু পাশাপাশি এই দুটি বাড়ির মধ্যে অপরিচয়ই বেশি। কেবল এ বাড়ির ছেলেটির সহিত ও-বাড়ির মেয়েটির চেনা, কিন্তু সে চেনা এক অদ্ভুত রকমের। কারুর সাথে কারুর আলাপ নাই, কারুর সাথে কারুর সাম্না-সাম্নি জানা-শোনা নাই; কিন্তু তবু এক বিচিত্র ধরণের পরিচয়, যাকে একেবারে উপেক্ষা করাও চলে না।

একদিন মেয়েটির জন্ম-উৎসব আসিল। অনেক নিমন্ত্রিত অভ্যাগত আসিয়া মোটরে ফুটপাথের ধার ভরিয়া দিল। অরুণ দেখিতে পাইল নীলার দাদা মোটরে করিয়া একরাশ ফুলের তোড়া আর মালা কিনিয়া আনিল; মেয়েটির অনেক বন্ধুবান্ধব আসিল। এক সময় জান্লা দিয়া চাহিয়া অরুণ দেখিল মেয়েটি গরদের শাড়ি পরিয়া, গলায় ফুলের মালা দিয়া চন্দন-চর্চ্চিত মুখে বারান্দার রেলিঙ্ ভর করিয়া তাহার ঘরের দিকে তাকাইয়া রহিয়াছে। চোখো-চোখি হইতে নীলা সলজ্জ ভাবে তাড়াতাড়ি ঘরে চলিয়া গেল। অরুণ উৎসবের আর কিছুই দেখিতে পাইল না, শুধু দৃষ্টির বাহিরে হল-ঘরটার ভিতর হইতে গানের মৃদুশব্দ কানে আসিয়া পৌঁছিল। সে ভাবিল মেয়েটির সহিত আলাপ থাকিলে আজ সে তাকে বাদ দিতে পারিত না।

শ্রীসুবোধ বসু

সে রাত্রে নিজের ঘরে শুইয়া-শুইয়া নীলা শুনিল অনেক রাত পর্য্যন্ত অরুণ বাঁশী বাজাইল। নীলা ভাবিল ছেলেটি বেশ বাঁশীও বাজায়।

মাঝে-মাঝে যখন বন্ধুরা আসিয়া অরুণের ঘরটা জঁাকাইয়া বসিত, নীলা তাদের উচ্চ হাসি আর কথা-বার্ত্তা শুনিতে পাইত। অরুণের বন্ধুদের অনেককে সে মুখ চিনিয়া ফেলিয়াছে; কে কখন আসে, কতক্ষণ বা থাকিয়া চলিয়া যায়, দেখিতে-দেখিতে অনেকটাই নীলার অভ্যস্ত হইয়া গেল। অরুণ সময়ে-অসময়ে 'চয়নিকা' খুলিয়া পড়িতে থাকে, কিম্বা রবীন্দ্রনাথের নতুন গানের একটা-দুইটা কলি গাহিয়া উঠিয়া ইজি-চেয়ারটাতে গিয়া বই লইয়া শুইয়া পড়ে। নীলা তার 'গীতাঞ্জলি'খানি টেবিলের উপর খুলিয়া বসে।

এম্‌নি করিয়া দিন যায়। গ্রীষ্মের দিন নটরাজের নৃত্যের ছন্দে মাতিয়া শেষে মেঘ-মল্লারে সুর ধরিল। একদিন ভোর হইতেই আকাশ মেঘে অন্ধকার, মাঝে-মাঝে ঝির-ঝির করিয়া হয়তো একটু বৃষ্টিও হইতেছে। গাছগুলি দমকা-হাওয়াতে ক্ষণে ক্ষণে দুলিয়া উঠিতেছে। দূরে গম্বুজ-ওয়ালা বাড়িটার উপর দিয়া একটা মেঘের ঐরাবত চলিয়া গেল। কোন্ অলকার কল্পপুরীতে কোন্ রাজ্যের উপর দিয়া, কোন নগরে জনপদে ছায়া সঞ্চারিত করিয়া কোন্ নদী-পর্ব্বত ডিঙাইয়া সে যে যাইবে তাহা কে জানে। নীলা শুনিল ভোর হইতে অরুণ সুর করিয়া মেঘ-দূতের পূর্ব্ব-মেঘের শ্লোকগুলি পড়িয়া যাইতেছে। এই বর্ষার দিনে কল্পনা আর রূপ-সম্ভারে মণ্ডিত এই শ্লোকগুলি তার ভারী চমৎকার লাগিল। তার মনে হইল এ যেন বর্ষারই সুর।

অরুণ দেখিল নীলাদের বারান্দাটা জলের ঝাপটায় অনেকটা ভিজিয়া গেছে। মেয়েটি আসিয়া মসী-কালো দিগন্তের পানে ক্ষণেক চাহিয়া ঘরে চলিয়া গেল, আবার আসিল, আবার ঘরে গিয়া ঢুকিল। অরুণ শুনিল আজ অত্যন্ত অসময়ে পর্দ্দা-আড়াল ঐ ঘরটা হইতে এস্রাজের টানা সুর আসিতেছে। গানের পদ ও মৃদুস্বর দু-একটা কানে আসিল, কিন্তু অত্যন্ত বিরল। সেদিন অরুণ কলেজে গেল না। নীলারও বাস্ আসিয়া ফিরিয়া গেল। দুপুর বেলায় অরুণ 'চয়নিকা' পড়িতে-পড়িতে পড়া ভুলিয়া জান্‌লা দিয়া চাহিয়া হঠাৎ দেখিল নীলার ছোট ভাইটি একটা কদম ফুলের তোড়া লইয়া ছুটিয়া বারান্দায় চলিয়া আসিয়াছে, নীলা পিছনে-পিছনে আসিয়া সেটা কাড়িয়া লইল। ছেলেটি তাহাতে কাঁদিয়া উঠিল। নীলা তাহা হইতে একটি ফুল দিয়া আদর করিয়া ভাইটিকে ঘরে টানিয়া লইল। একটু পরে চাহিয়া দেখিল নীলা আবার বারান্দায় ফিরিয়া আসিয়া রেলিঙে ভর করিয়া উদাস-চোখে চাহিয়া আছে—তার খোঁপাতে গোঁজা একটি কদমফুল। এই নব মালবিকার অনিমিষ পথচাওয়ার মূর্ত্তিটি সে মুগ্ধ-বিস্ময়ে দেখিয়া লইল।

তারপর অকস্মাৎ ঝরঝর করিয়া বৃষ্টি নামিল; কাছে দূরের সব-কিছু আব্‌ছা হইয়া গেল। গান গাহিতে-গাহিতে নীলা শুনিল পাশের বাড়ীর ছেলেটির বাঁশী বৃষ্টির ঝরঝরানি ভেদ করিয়া যেন সুদূর পার হইয়া আসিয়া ক্ষীণ হইয়া বাজিতেছে। নীলা গান বন্ধ করিয়া তাহাই শুনিতে লাগিল।

সেই দিন নীলা ভাবিল সে নিজেই ঐ-ছেলেটির সহিত একদিন আলাপ করিয়া লইবে। পর্দ্দা তো তাদের ছিল না, তার বাবা-মা মেয়েদের স্বাধীনতা পছন্দও করিতেন।

নতুন একটা বাঙলা মাসিক-পত্রিকার পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে পুস্তক-সমালোচনার জায়গায় হঠাৎ অরুণের নামটা দেখিয়া নীলা আগ্রহে ঝুঁকিয়া পড়িল। অরুণের লেখা একটি কাব্য-গ্রন্থকে সমালোচনা করা হইয়াছে। বইখানার নাম 'বেলা'; সম্পাদক খুব প্রশংসা করিয়া লিখিয়াছে—এরই মধ্যে কবি বাঙ্‌লা-সাহিত্যে বেশ নাম করিয়াছেন, এ কাব্য-মঞ্জরীটি তাঁহার প্রতিভার পরিচয় দেয়। কয়েক টুক্‌রা কবিতা সমালোচনার মধ্যে ছড়ান ছিল, নীলা পড়িয়া দেখিল ভারী মিষ্টি।

সেদিন বিকাল-বেলা হাওয়া খাইতে গিয়া নীলা দাদাকে লইয়া বড় একটা বইয়ের দোকানে গিয়া উপস্থিত হইল। গোটা দুই অন্য বইয়ের সহিত অরুণের কাব্য-গ্রন্থটিও কিনিয়া আনিল। সে রাত্রে বইটি শেষ করিয়া মুগ্ধ হইয়া সে ভাবিল, কী চমৎকার!

পর দিন নীলার বন্ধু মাধবী আসিয়া বুক-কেসের বই নাড়া চাড়া করিয়া অরুণের বইটি টানিয়া বাহির করিল। নীলা অকারণ লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল। বইটি একটু উল্টাইয়া পাল্টাইয়া মাধবী কহিল, "ভারী চমৎকার হয়েছে, না?" নীলা কিছু বলিল না। মাধবী কহিল, "কি চমৎকার বাঁশী বাজায়।" নীলা কহিল, "হবে। তোর সঙ্গে চেনা আছে?" মাধবী কহিল, "মুখ চেনা গোছের। বিমলদার বন্ধু কিনা।" ইহার পর অরুণের কাব্য-সম্বন্ধে আরো কথা হইল। মাধবী চলিয়া গেলে নীলা ভাবিল সে কালই অরুণের সহিত আলাপ করিবে।

পর দিন নীলার বাস্ আসিয়া দেরী আছে দেখিয়া চলিয়া গেল। মোটর গাড়ি নীলার বাবাকে লইয়া বাহির হইয়া গেছে। নীলা স্নানাহার বেশ ভূষা সারিয়া কোন্ ট্রামে যাইবে বারান্দায় দাঁড়াইয়া তাই হয়তো ভাবিতেছিল। বারোটায় ক্লাস, তাড়াতড়ি যাইবার তেমন তাড়া ছিল না, গুণ গুণ করিয়া রেলিঙ ধরিয়া সে গান করিতেছিল। পায়ের শব্দে চাহিয়া দেখিল অরুণ কলেজে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া নীচে নামিতেছে। নীলা মনে করিল তাহারো সময় হইয়াছে, সে তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া আসিল। লোক-ভর্ত্তি ট্রামে নীলাকে একটু জায়গা দেওয়া হইল—অরুণ পিছনে গিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। এস্প্ল্যানেডে নামিয়া ট্রাম বদ্‌লাইয়া নীলা দেখিল অরুণ তাহার এক বন্ধুর সহিত একটা বাসে যাইয়া উঠিল।

কয়েকদিন এমনি করিয়া ট্রামে যাইবার পরে নীলা দেখিল সে যতই আগাইয়া যায়, অরুণ ততই দূরে সরিয়া চলে। একই সময়ে বাহিরে আসিয়া নীলা হয়তো ট্রামে উঠিল, অরুণ দাঁড়াইয়া পরের ট্রামের জন্য অপেক্ষা করিয়া রহিল। ওয়াল-ফোর্ডের দোতলা বাসে নীলা চড়িল, অরুণ পরের একতলা বাসে উঠিয়া বসিল।

অরুণ অত্যন্ত সাবধান হইয়া গেল, যাহাতে একই সময়ে প্রতিদিন তাদের কলেজে যাইবার সময় না হয়। সে অত্যন্ত সতর্ক হইয়া যাহাতে এক ট্রামে না যাইতে হয় তাহাও দেখে। আগে যখন তাদের এম্‌নি মৌন-পরিচয় নিবিড় হইয়া উঠে নাই, তখন তো অনেক দিনই এক ট্রামে চড়িয়া পাশাপাশি বসিয়া গেছে, তাহাতে তার একটুকুও বাধে নাই; কিন্তু আজ-কাল অরুণের কেমন সঙ্কোচ হয়। সে ভাবে এখন তাকে মাঝে-মাঝে এক ট্রামে চড়িতে দেখিলে মেয়েটি হয়তো কিছু ভাবিতে পারে। তাই অরুণ সাধ্যমত তাকে এড়াইয়া চলে। নীলার দেরী করার অভ্যাস শেষে শুধরাইল। সে এখন কলেজের বাসে চাপিয়াই কলেজে যায়। অরুণের ক্লাস দেরীতে থাকিলে সে দেখে নীলা এক তাড়া বই লইয়া বাসে উঠিতেছে।

একদিন সন্ধ্যাবেলা অনেককাল পরে ইডেন-গার্ডেনে বেড়াইতে গিয়া অরুণ দেখিল নীলারা বেড়াইতেছে। প্রথমে সে কিছু দেখিতে পায় নাই। হঠাৎ একেবারে মুখোমুখি হওয়াতে একেবারে থমকিয়া গেল। তারপর মুখে এক ঝলক রক্ত লইয়া তাড়াতাড়ি হাঁটিয়া আসিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। পরের দিন গার্ডেনে ব্যাণ্ড ছিল, তাহাকে তার এক বন্ধুর সহিত অনেকটা বাধ্য হইয়া আসিতে হইল। বাদ্য মন্দিরের চারপাশে ভীড় জমিয়া গেছে, তাহারা গিয়া একটা গ্যাস-পোষ্টের ধারে দাঁড়াইল। একটি পার্শী মেয়ে ক্রেপের শাড়ি পরিয়া তাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিল, মুখ দেখা যাইতেছিল না, শুধু বাতাসে চূর্ণ-অলক দুলিতেছে তাহাই দেখা যাইতেছিল। একটা টিউন শেষ হইলে মেয়েটি তাহাদের দিকে ফিরিয়া তাকাইতে সে মহা বিস্ময়ে দেখিল যে, সে তারই প্রতিবেশিনী। অরুণ তাহার বন্ধুকে কোন রকমে টানিয়া সেখান হইতে পালাইল। সে-সন্ধ্যায় বেড়াইতে-বেড়াইতে এই কথাটাই তার মনে হইতেছিল, ছিঃ নীলা কি ভাবিবে! তার চোখে সে যদি ছোট হইয়া যায় তবে তার দুঃখের পরিসীমা থাকিবে না।

ইহার পর অরুণ ভয়ে ইডেন-গার্ডেনে আর আসিত না। কিন্তু কান পাতিয়া নীলার সব গানই শুনিত। নীলার এস্রাজের সুর কানে আসিলে বই রাখিয়া বসিয়া থাকিত, আর নীলার বাসে উঠার সময় না চাহিয়া থাকিতে পারিত না। ছোট ভাইয়ের দৌরাত্ম্যের খবর নীলার কথাবার্ত্তার মধ্য দিয়া সে জানিতে পারিত, বারান্দায় দোলন্ চেয়ারে তাকে দুলিতে দুলিতে পড়িতেও দেখিত। কিন্তু মৌন-পরিচয়কে মনের গোপন কোঠা হইতে বাহির করিবার আর

শ্রীসুবোধ বসু

চেষ্টাই সে করিত না। এক জায়গায় যে না করিত তাহা নহে, সে তার কবিতায়, কিন্তু কেহ তাহা বুঝিত না।

সেদিন মেঘ ও বর্ষণের ভিতর কোন ফাঁকে একটু জ্যোৎস্না উঠিয়াছে, মৃদু অথচ মধুর। কৃষ্ণচূড়া গাছের পাতা হইতে তখনও ফোঁটা-ফোঁটা বৃষ্টির বিন্দু ঝরিয়া পড়িতেছে এবং কোথা হইতে নাম-না-জানা একটা ফুলের গন্ধ ভাসিয়া আসিতেছে। বৃষ্টির সময় কাচের জানালাটা বন্ধ করা ছিল, অরুণ সেটা খুলিয়া সেখানে দাঁড়াইয়া বাহিরের দিকে তাকাইয়াছিল। জলে-ভিজা রাস্তার পিচ চকচক করিতেছে। একটু দূরে ট্রামের রাস্তায় মোটরগুলি হু-হু করিয়া ছুটিয়া চলে। মাঝে মাঝে দুএকটা রিক্সর টুংটাং শব্দ কানে আসে। একটু পরে অরুণ শুনিল নীলা এস্রাজ বাজাইতেছে। কি যে সুর সে নাম জানে না, কিন্তু এ সময়ের সহিত তার ভারী চমৎকার মিল ছিল। শুনিতে শুনিতে আনমনা হইয়া গিয়াছিল, হঠাৎ চমকিয়া চাহিয়া দেখিল মেয়েটি কখন এস্রাজ থামাইয়া ঘরের পর্দ্দাটা সরাইয়া দিতেছে। অরুণ লজ্জায় একেবারে মরিয়া গেল। মেয়েটি তাকে অমনি ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিলে কি ভাবিবে! সারা সন্ধ্যাবেলা সে ইহাই ভাবিয়া কাটাইল যে, তার কাজটা অত্যন্ত অভদ্রের মত হইয়াছে, ইহাতে নীলা সত্যি সত্যিই রাগিতে পারে।

ইহার পরদিন নীলা দেখিল অরুণের ঘরের তাদের দিকের জানালায় পর্দ্দা পড়িয়াছে। নীলা ভাবিল হয়তো সে অমনি করিয়া তাকাইয়া থাকিত বলিয়া এ আব্রুর আবির্ভাব। সে দুঃখিত হইল, একটু লজ্জাও পাইল। ইহার পর অরুণ আর নীলাকে দোলন্ চেয়ারে দুলিতে দেখে না। নীলার কাছেও অরুণের জীবনযাত্রা আর চোখে পড়ে না। পর্দ্দার উপর দিয়া আয়নার যে-টুকু চোখে পড়ে তাহাতে কখন কখন অরুণের ছায়া দেখা যায়। হয়তো পড়িতেছে, নয়তো সেই লাল খাতাটাতে কি লিখিতেছে।

শব্দ তো আর পর্দ্দাতে বন্ধ হয় না, তাই সেটা চলে। অরুণ শোনে, নীলা তেম্নি আব্দারে ভাষায় মাকে ছোট ভাইয়ের দৌরাত্মির কথা জানাইতেছে, না হয় দাদার সহিত সিনেমা-থিয়েটারে যাবার চুক্তি করিতে কৃত্রিম ঝগড়া করিতেছে, না হয় গান করিতেছে, কিম্বা এস্রাজে কি সব মিষ্টি সুর তুলিতেছে। নীলা শোনে অরুণ 'চয়নিকা' হইতে কবিতা আবৃত্তি করিতেছে, না হয় কাহারও সাথে কথা কহিতে কহিতে উচ্চস্বরে হাসিয়া উঠিতেছে, না হয় রাত গভীর হইলে বাঁশীতে বাগেশ্রী রাগিণীতে সুর ধরিয়াছে।

হঠাৎ কখনো বড় রাস্তার ট্রাম-ষ্টপের ধারে তাদের দেখা হইত। কিন্তু সে ক্ষণিকের জন্য। তারপরেই অরুণ সামনের বাস্‌টাতে সমস্ত ভীড় অবজ্ঞা করিয়া উঠিয়া পড়িত। নীলা তখন অন্যদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ট্রামের অপেক্ষায় চাহিয়া থাকিত। সিনেমাতে হয়তো কখনও দেখা হইত, কিন্তু অনেক দূরে দূরে। অরুণ নীলার দিকে তাকাইত, নীলাও অরুণের দিকে তাকাইত; তারপর চোখোচোখি হইলে আর চাহিত না।

একদিন গ্রামোফনের নতুন রেকর্ড কিনিতে গিয়া অরুণ ও তার এক বন্ধু বিমল কিনিবার মতো কিছুই খুঁজিয়া পাইল না। দোকানের লোকটি বলিল, "নীলা দেবীর একটি রেকর্ড বেরিয়েচে, মেয়ে-কলেজের ছাত্রী।" অরুণের বন্ধুটি সোৎসাহে চলিল, "বটে! কেমন হয়েচে, আনুন শিগ্‌গির।" লোকটি রেকর্ডটি আনিতে গেল। অরুণ কহিল, "কেমন গায় মেয়েটি, ভাল?" বন্ধু তাহাকে নাড়া দিয়া কহিল, "চিনিস্‌নে গাধা, তোর পাশের বাড়ি যে থাকে। চমৎকার গায়। কেন গান কখনো শুন্‌তে পাস্ না?"

অরুণ সে রেকর্ড কিনিয়া লইল। নীলা দেবীর আরো রেকর্ড থাকিলে আরো লইত। সে রাত্রে উত্তর-চরিতের শ্লোক পড়িতে পড়িতে নীলা হঠাৎ আশ্চর্য্য হইয়া কান পাতিয়া শুনিল অরুণের গ্রামোফনে তারই গানের রেকর্ড বাজিতেছে। নীলার ভারী আনন্দ হইল। সে আসিয়া পর্দ্দাটা সরাইয়া নিজের গান শুনিয়া যাইতে লাগিল। তারপর রাত্রি যখন গভীর হইয়াছে বিনিদ্র শয্যায় শুইয়া নীলা শুনিল তাহার গানটি আবার বাজান হইতেছে, তারপর আবার, আবার, বারম্বার—সে গানের যেন শেষ হইবে না। নীলার চোখের জল আর বাধা মানিল না। অরুণের কাব্য-গ্রন্থ 'বেলা'র অনেক কবিতা যেন সহজ হইয়া যাইতে চাহিল।

তারপর প্রায় প্রতিদিনই রাত গভীর হইলে সে শুনিত অরুণের ঘরে তাহারই গানটি চলিয়াছে।

একদিন সিনেমা ভাঙিয়া যাইবার পরে অরুণ ভীড় ঠেলিয়া অগ্রসর হইয়া আসিতে সহসা একটি মেয়ের উপর আসিয়া পড়িল। মেয়েটি ফিরিয়া তাহার দিকে চাহিতেই অরুণ দেখিল মেয়েটি নীলা। অপ্রতিভ কণ্ঠে "মাপ করবেন" বলিয়া অরুণ কোন মতে ভীড়ের মধ্যে মিশাইয়া বাহিরে আসিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। মেয়েটি যে তাকে কত বড় অসভ্য ভাবিবে মনে করিয়া তাহার নিজের মাথা ঠুকিতে ইচ্ছা হইতেছিল। নীলা তাহার দিকে যে ডাগর দুটি চোখ উঠাইয়া তাকাইয়াছিল, সে ভাবিল এ তাহার নীরব ভৎর্সনা।

সে-রাত্রে নীলা দেখিল গ্রামোফনে তাহার রেকর্ড আর বাজিল না। অরুণের বাঁশীর সুরও আর শোনা গেল না। নীলা অনেকক্ষণ জাগিয়া প্রতীক্ষা করিল, তার পর রাত গভীর হইলে বিছানায় শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

পরের রাতেও গ্রামোফন বাজিল না। বাঁশী অনেক রাতে বাজিল। নীলা শুনিল বাঁশীতে বাজিতেছে,—বেদনার আর্ত্ত করুণ সুর। বালিসে মুখ গুঁজিয়া সে শুইয়া পড়িল।

কয়েকদিন পরে অরুণ দেখিল তাহার বন্ধু বিমল আসিয়া ও বাড়িতে ভাব জমাইয়া তুলিয়াছে। তাহার বোন মাধবীকে সে মাঝে মাঝে এ বাড়িতে আসিত দেখিত, বিমলকে সে আগে কোনো দিন দেখে নাই। বিমল এখন মাঝে মাঝে নীলাদের সহিত তাদের মোটরে হাওয়া খাইতে বাহির হয়, কখনও বা নিজের মোটরে ইহাদের বেড়াইয়া আনে। সিনেমাতে বিমলকে সে ইহাদের সহিত মাঝে-মাঝে দেখে। অরুণের মনে একটা বেদনা ঠেলিয়া উঠে।

একদিন অরুণ নিউ-মার্কেটে একটা ফুলের তোড়া কিনিয়া ষ্টল হইতে একটু দূরে আসিতেই দেখিল নীলা, তার দাদা, ছোট ভাই আর বিমল একটা ফুলের ষ্টলের ধারে গিয়া দাঁড়াইল। বিমল নীলার দাদাকে একটা শ্বেত-পদ্মের তোড়া আর ছোট ভাইটিকে একটি লাল-পদ্ম কিনিয়া দিল। তারপর নীলার জন্য মস্ত বড় একটা বস্‌রাই গোলাপের তোড়া আনিয়া বিলাতী কায়দায় নত হইয়া একটু হাসিয়া তোড়াটি উপহার দিল। অরুণ লিণ্ডসে ষ্ট্রীট দিয়া তাড়াতাড়ি হাঁটিয়া বাসে উঠিয়া বসিল।

নীলা রাত্রে অরুণের বাঁশী শোনে। তাহার সুর যে করুণ হইতে করুণতর হইতেছে তাহা তাহার কাছে গোপন থাকে না। তাহার কান্না পায়।

ইহার কিছুদিন পরে এক শুক্লসন্ধ্যাবেলা অরুণ তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরিল, কারণ পরের দিন তাকে এক মাসিক-পত্রের জন্য একটি গল্প লিখিয়া দিবার কথা ছিল। ঘরে ঢুকিয়া দেখিল জোৎস্নায় ঘর ভরিয়া গেছে, পূর্বদিকের জান্‌লা দিয়া রাস্তার পাশের গাছের ছায়া টেবিলের উপর নৃত্য করিতেছে। তাহার আলোটা জ্বালিতে ইচ্ছা হইল না। দক্ষিণের বাতাস জানালার পর্দ্দাটাকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল। সে গিয়া অনেক দিন পরে পর্দ্দাটা টানিয়া সরাইয়া দিল।

নীলাদের বারান্দায় চোখ পড়িতে সে হঠাৎ চমকাইয়া উঠিল। জোৎস্নায় বারান্দাটা ভরিয়া গেছে। তারই মধ্যে একটি মেয়ে ও একটি যুবক বসিয়া মৃদু-ভাষে কি কথা বলিতেছে। মেয়েটি তাহার দিকে পিছন ফিরিয়া বসিয়াছিল, তাহার পিঠ ও খোঁপা দেখা যাইতেছিল। কিন্তু অরুণ বুঝিল, সে নীলা। ছেলেটি অরুণের অপরিচিত নহে, তাহারই বন্ধু বিমল। অরুণ দেখিল বিমলের চোখ দুটি আনন্দে উজ্জ্বল। সে তাড়াতাড়ি পর্দ্দাটা আবার টানিয়া দিয়া বালিসে মুখ গুঁজিয়া পড়িল। সমস্ত ভাবনা-চিন্তা, কর্ত্তব্য, আশা আকাঙ্ক্ষা আবছা হইয়া গাছের ছায়ার মতোই চঞ্চল হইয়া দুলিতে লাগিল। ঈর্ষা? কিন্তু কেন? যে মেয়েটির সহিত তার আলাপ মাত্র নাই তার জন্য ঈর্ষা! সে কথাটা উড়াইয়া দিতে চাহিল, কিন্তু একটা বেদনার অনুভূতি তাহার সমস্ত চেতনার মধ্যে জাগিয়া রহিল।

একমাস পরে এক শুক্লা রজনীতে সাহানার তানে বিমলের সহিত নীলার বিবাহ হইয়া গেল। বিমল অরুণকে

দাস

নিমন্ত্রণ করিয়াছিল। কিন্তু সেদিন অরুণ নিতান্ত দরকার বলিয়া বিমলের একান্ত অনুরোধ অগ্রাহ্য করিয়া কলিকাতার বাহিরে কোথায় চলিয়া গিয়াছিল। ইহার পরের দিন কলেজে যাইতে অসুবিধা হয় বলিয়া অরুণ মামার কাছ ছাড়িয়া হোষ্টেলে চলিয়া আসিল। তার বন্ধুবান্ধবেরা অবাক্ হইয়া দেখিল অরুণ অসম্ভব রকম বাচাল হইয়া উঠিয়াছে এবং কোন না-কোন একটা হৈ-চৈ লইয়া মাতিয়া আছে। মামা শুনিয়া কহিলেন, অত হৈ-চৈ করো না। প'ড়ে-শুনে ফার্ষ্ট-ক্লাস পাওয়া চাই। অরুণ কিছু বলিল না।

নীলা বিবাহের পরে শ্বশুরবাড়ি হইতে প্রথম যেদিন সন্ধ্যাবেলা ফিরিয়া আসিল সেদিন নিজের ঘরের পর্দ্দা সরাইয়া দেখিল অরুণের ঘরটা খালি পড়িয়া রহিয়াছে, পর্দ্দা চলিয়া গেছে, আলো নাই, যে একটা চঞ্চল জীবনের সাড়া সেখান হইতে পাওয়া যাইত তাহা সরিয়া গেছে। শুধু পরিত্যক্ত ঘরটার মধ্যে ঘন অন্ধকার যেন দৈত্যের মত নীরবে বসিয়া রহিয়াছে। তার চোখদুটি ছলছলিয়া উঠিল। রাত্রে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সে জাগিয়া ছিল। যে বাঁশীটি প্রতি-রাতেই বাজিত তাহা আর বাজিল না, কি একটা নিশাচর পাখী কর্কশ-স্বরে ডাকিয়া গেল। একদিন রাত্রে তার গানের রেকর্ডটি ত্রিশ বার বাজিয়াছিল, সে রাত্রের কথাটা মনে পড়িয়া তাহার মন ব্যথায় ভরিয়া উঠিল। সে উঠিয়া গিয়া পর্দ্দা সরাইয়া অন্ধকার শূন্য ঘরটার পানে উদাস-চোখে চাহিয়া রহিল। ঘরের ভিতর আচম্‌কা বাতাস ঢুকিয়া দীর্ঘশ্বাস জাগাইতেছে। অশ্রু আসিয়া পড়িতেছিল। সে বাধা দিল না।

বিলাস-পরিচয়

শ্রীরমেশচন্দ্র দাস

তোমার সোনার অঙ্গে এত লজ্জা সরম ভয়,
সকল অঙ্গ দেয় যে তবু বিলাস-পরিচয়!
তোমার সিঁথির সিঁদুর রেখা
নিবিড় অনুরাগের লেখা,
তোমার শাড়ীর আঁচল-দোলায় ফাগুন হাওয়া বয়,
সকল অঙ্গ দেয় যে তোমার বিলাস-পরিচয়!

আল্‌গা চুড়ির রিনিক্-ঝিনি দেয় কত সংবাদ,
গৃহকর্ম্মের ফাঁকে ফাঁকে ঘটায় পরমাদ।
তোমার সলাজ ডাগর আঁখি,
হাতছানি দেয় থাকি থাকি,
আমার দেখে যায় যে বেধে তোমার চরণদ্বয়;
সকল অঙ্গ দেয় যে তোমার বিলাস-পরিচয়

তোমার তরুণ তনু-লতায় কতই বাণী জাগে,
তোমার রাঙা শাড়ীখানি লাল যে অনুরাগে;
পান-খাওয়া-লাল পাত্‌লা ঠোঁটে
বাসর রাতের ছন্দ ফোটে,
জোড়া ভুরুর মাঝখানে টিপ্ আগুন জেলেই রয়;
সকল অঙ্গ দেয় যে তোমার বিলাস-পরিচয়!

তোমার ঘাড়ের পিছন্‌দিকের দু'চার উড়ো চুল,
নয়তো খোঁপা নয়তো বেণী, তবুও ঢুলঢুল।
যতই টানো আঁচলখানি,
ততই যেন তোমায় জানি,
ঢাক্‌তে গিয়ে জানিয়ে দিলে এই লাগে বিস্ময়।
সকল কর্ম্ম দেয় যে তোমার বিলাস-পরিচয়!

মাথার কাঁটা ফুল-চিরুণী ছোটায় অনলকণা,
তোমার গলার সাতনরী হার জৌলসে যৌবনা।
আঁচলে ঐ চাবির গোছায়,
চরণ তলে আল্‌তা-মোছায়,
তোমার শাড়ীর ভাঁজে ভাঁজে আনন্দ-দুর্জ্জয়!
সকল অঙ্গ দেয় যে তোমার বিলাস পরিচয়!

চুলটি বাঁধো বৈকালে সই, আরসি খানি পাতি,
তখন মনে জাগে নাকি মধুর কত রাতি?
যখন তুমি সন্ধ্যাক্ষণে,
বিছ্‌না পাতো আপন মনে.
তখন তোমার মনের কোণে কিসের অভিনয়?
সকল কর্ম্ম দেয় যে তোমার বিলাস-পরিচয়!

যতই তুমি সাবধানেতে চলাফেরা করো,
তোমার মনের অজানাতেই নিজেই ধরা পড়ো,
তোমার নীরব দেহলতা
জানায় তোমার মনের কথা,
চুপ ক'রে সই, ব'সে থাকো, চুপ করা সে নয়,
তোমার মনের সাত-মহলের দাও যে পরিচয়!

ঘর-শত্রু তোমার ঘরে রয় যে রূপোন্মাদ,
আয়না সমান কবির মনে পাতা তোমার ফাঁদ;
যতই তুমি এড়িয়ে চলো
তোমায় তুমি বাড়িয়ে তোলো,
আব্‌রু বেণী ঢাকৃতে গিয়ে আবরু তোমার ক্ষয়।
সকল কর্ম্ম দেয় যে তোমার বিলাস-পরিচয়!

আল্‌গা খোঁপা যখন তোমার হঠাৎ খুলে পড়ে,
দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে তা নাও দাঁতে আঁচল ধ'রে,
সামান্য এই কাজটি নিয়ে,
মন যে আমার দাও রাঙিয়ে
এই টুকুতেই টলিয়ে দে' যাও, মন যে কেমন হয়!
সকল কর্ম্ম দেয় যে তোমার বিলাস-পরিচয়!

জীবন তোমার স্নিগ্ধ-শুচি লজ্জাটুকু নিয়ে,
কি রহস্য জানাও তুমি তার-ই আড়াল দিয়ে;
সর্ব্বাঙ্গে দাও আঁচল টানি,
দেখ্‌তে যা পাই একটু খানি,
সেই টুকুতেই তোমার দেহের পাই যে পরিচয়;
তোমার দেহের সকল খবর সেই টুকুতেই কয়!

ওগো রাণী, নিজেই তুমি জানো নাক হায়,
তোমার দেহের জ্বালায় তুমি কতই অসহায়।
তোমার চলন বসা দাঁড়া,
যৌবনেরি দেয় যে সাড়া,
ছলা কলার প্যাঁচ শেখনি, নিঃশঙ্ক নির্ভয়!
সকল অঙ্গ দেয় যে তোমার বিলাস-পরিচয়!

শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রজন্মোৎসব

শ্রীসুধীরচন্দ্র কর

রবীন্দ্রনাথের ৬৮তম জন্মতিথি উপলক্ষে শান্তিনিকেতনে বিগত ২৫শে বৈশাখ একটি উৎসবের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। বিদ্যালয়ের গ্রীষ্মাবকাশ অনেকদিন হইল আরম্ভ হইয়াছে। বৈশাখের শেষ—আকাশে এক ফোঁটা মেঘের সঞ্চার নাই, তাতে ভুবনডাঙার যোজনব্যাপী ভাঙা খোয়াই; আগুনে পোড়া লালটকটকে লোহার গুটির মত দুপুরবেলার রাঙা কাঁকরগুলি পথে ঘাটে চোখ পাকাইয়া পথিকের পদসঞ্চরণে ভীতি জন্মাইতেছে। শালবীথিকার শান্তিনিকেতন যেন এই মরুভূমিতে মরূদ্যান বিশেষ। কিন্তু জলের অভাবে এখানকার অবস্থাও শোচনীয়, নিদাঘের নিদারুণ শুষ্কতা ইহার কোমলকম শ্যামল শ্রীকে ধূম্রমলিন করিয়া তুলিয়াছে। বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী কর্ম্মী-অধ্যাপক সকলেই বাহিরে ছুটি উপভোগে চলিয়া গিয়াছেন, আশ্রম একরূপ শূন্য বলিলেই হয়। এই নির্জ্জন নীরসতার মধ্যে তবু যে-কয়জন শূন্যতাকেই আশ্রয় করিয়া আছেন, তাঁহারা স্মরণের মিলনমাধুর্য্য দিয়া প্রাণকে পূর্ণ করিবার জন্য উৎসাহ-সহকারে গুরুদেবের জন্মোৎসবের আয়োজন করিলেন।

২৫শে ভোরে উঠিয়া বাহিরে চোখ মেলিতেই আকাশের এক অভিনব রূপ হৃদয়কে আকর্ষণ করিল। মেঘে-মেঘে আকাশ ছাইয়া গিয়াছে, তাহার সুচিক্কণ শ্যামল ছায়া পড়িয়া ধরণীর দাহবিশীর্ণ মুখখানিতে এতদিন পরে একটু উল্লাসের স্নিগ্ধ আভা ফুটিয়া উঠিয়াছে। মনে হইল, দিগ্‌বধূ যেন বৈতালিক গান ধরিয়াছে—"এস হে এস সজল ঘন, বাদল বরিষণে—"

বিকালের দিকে,—আমাদের মধ্যে তখন উৎসবের সাজের সাড়া জাগিয়াছে, হঠাৎ একি শুনি—"গুরু গুরু গগন মাঝে"—বাদল মেঘে যে মাদল বাজিতে সুরু হইয়াছে। ভাবিলাম তাইতো—প্রকৃতির প্রাণের মানুষ রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথের প্রাণের মানসী প্রকৃতি। আজ কবির শুভ জন্মতিথি।—মাস-ভর গ্রীষ্মদগ্ধ কঙ্কালসার দেহে মুমূর্ষু থাকিয়া, আজ কেন যে সে বাহিরে ভিতরে আকস্মিক এত রসের প্লাবন সুরু করিল, এ রহস্য বুঝিতে আর বাকী রহিল না। চাহিয়া দেখি—সুন্দরের অর্চ্চনায় প্রকৃতি আমাদের হার মানাইয়া সুরু হইতেই তাহার অপরূপ রসসৌন্দর্য্যের অর্ঘ্য-নিবেদনে উন্মুখ হইয়া উৎসবকেন্দ্র জাঁকাইয়া বসিয়াছে।

তার উৎসবই আরম্ভ হইল আগে। সে কি মেঘ! সে কি তার জয়ধ্বনি, সে কি বায়ুবেগ আর বারিবর্ষণ। পথঘাট ভাসিয়া গেল। ছলছল কলকল রবে কূল ছাপাইয়া জলধারা ছুটিতে লাগিল। দাদুরীর কণ্ঠও নীরব রহিল না। দিন থাকিতেই সন্ধ্যা হইল। আঁধার গগনের কালো গায়ে নিকষে কনকরেখার মতো ক্ষণে ক্ষণে বাঁকাবিদ্যুৎ চম্‌কাইতে লাগিল। ভিজে মাটির গন্ধ দমকা বাতাসে উড়িয়া আসিয়া মনকে ভিজাইয়া দিল। আমরা জনকয়েক যুবক ও বালক তখন উৎসবক্ষেত্রে যাইবার পথে বাহিরের প্রতিকূলতায় একটা ঘরের বারান্দায় আটকা পড়িয়াছি। বাহিরের উন্মাদনায় ভিতরেও একটা আলোড়ন উঠিয়াছে। সঙ্গে ছিল একখণ্ড পূরবী ও 'বিচিত্রা'র নটরাজ-সংখ্যা। হল্লা করিয়া তারি পাতা হইতে বাছিয়া বাছিয়া বিচিত্র সুরতালে কবিতা-গানের ফোয়ারা ছুটাইতে লাগিলাম। ছেলেদের ধরিয়া রাখে কে। তাদের নাচ, তাদের ছুটাছুটি, সে কি স্ফূর্ত্তি! যেন সে ঝড়োহাওয়ারই মত অবাধ। এইরূপে বাহিরকে সেদিন ঘরে ডাকিয়া আনিয়া উৎসবের অধিবাস পর্ব্ব একযোগে সারা হইয়াছিল।

কিছুক্ষণ পরে বাহিরের বর্ষণ ক্ষান্ত হইল,—অমনি ঘরের উৎসবের মধুর আহ্বান শুনিলাম ঘণ্টারবে। "ঢং ঢং

ঢং ঢং—" দল বাধিয়া সকলে ছুটিলাম। উত্তরায়ণে রথীবাবুর উদয়ন-গৃহে ছিল উৎসবের অধিবেশন। সেখানে সাজের উপকরণ বেশী কিছু নয়—পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন একটি প্রশস্ত কক্ষে মেজের উপর ফরাস পাতা, তার এক ধারে একটি বেদী, বেদীর আশেপাশে গুটিকয়েক মৃণাল-শোভিত শুভ্র শতদল কুঞ্চিত অসহায় দেহলতা আনত করিয়া যেন প্রণতির ভঙ্গিতে হেলিয়া পড়িয়াছে। সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখি এই ঘনঘটার মধ্যেও জনসমাগম হইয়াছে মন্দ নয়। বীরভূমের প্রসিদ্ধ জমিদার ও সুসাহিত্যিক রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত নির্ম্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় ও রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত বিজয় বিহারী মুখোপাধ্যায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, তা ছাড়া শ্রীনিকেতন ও শান্তিনিকেতনের ছাত্র-কর্ম্মী ও মহিলাগণ, এবং অধ্যাপকদের মধ্যে শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায়, কালীমোহন ঘোষ, ও অনাথনাথ বসু, বৈদেশিকদের মধ্যে মিঃ বেনোয়া ও মিঃ প্র্যাট এবং বীরভূমবাসী সম্পাদক সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত সুধাকান্ত রায় চৌধুরী মহাশয়ও সেখানে মিলিত হইয়াছেন। ইঁহাদের সঙ্গলাভে বড় আনন্দ হইল। নিঃসঙ্গতার বৈচিত্র্যহীন শুষ্ক জীবনে অকস্মাৎ এই রস-উৎসবের পরিমিত জনসমষ্টি যে কতখানি পূর্ণতাপ্রদ তাহা মাত্র এতদবস্থাতেই উপলব্ধির বিষয়।

একটি গান দিয়া প্রথমে উপাসনা আরম্ভ হইল। শ্রীযুক্ত কালীমোহন বাবু আচার্য্যের আসন গ্রহণ করিলেন। প্রার্থনার সময় তিনি সংক্ষেপে বলিলেন—"যিনি আজ এ উৎসবের উপলক্ষ্য, তাঁর কবিতায়, তাঁর আদর্শে জগতের কত না লোক অনুপ্রাণিত! তারা তাঁকে নানাভাবেই সেজন্য শ্রদ্ধা করে, কিন্তু আমাদের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধটি একটু বিচিত্র রকমের। এ আশ্রম তাঁরই হাতে গড়া। আমরা তাঁর কাছ থেকে উপদেশ ও আচরণ শিখে শুধু ভাবুকতার ক্ষেত্রে খণ্ডভাবে নয়, অখণ্ড জীবনের পথে অগ্রসর হ'য়ে চলেছি। আমরা যদি অখণ্ড জীবন দিয়েই তাঁর আদর্শকে সার্থক করবার কাজে লাগতে পারি তবে সে-ই হবে আমাদের যথার্থ শ্রদ্ধা-প্রকাশ। তিনি এমনি আরো বহুদিন আমাদের মধ্যে থেকে আমাদের জীবন ও বিশ্ববাসীর জীবনকে জীবন্ত আদর্শ ও কাব্যালোকে উদ্ভাসিত ক'রে তুলুন, শুভ জন্মতিথি উপলক্ষ্য করে, ভগবানের কাছে আমরা এই কামনাই নিবেদন করছি।"

উপাসনা শেষ হইলে রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ বসে। সকলের আগ্রহে শ্রীযুক্ত নির্ম্মলশিব বাবুর উপরই আলোচনার পরিচালনা ভার ন্যস্ত হয়। শ্রীযুক্ত অনাথনাথ বসু "পূরবী" হইতে "২৫শে বৈশাখ" কবিতাটি পাঠ করেন, তারপর রবীন্দ্রনাথের নাট্যের উপর একটি গবেষণামূলক লেখা পাঠ করেন শ্রীযুক্তা সুধাময়ী দেবী। একটু দীর্ঘ হইলেও তাঁর রচনার প্রতিপাদ্য রহস্যটি আমরা বিষয়ের সারবত্তাবিচারে এখানে সঙ্কলিত করিয়া দিতেছি:—

—"অচলায়তন, অরূপরতন ও ফাল্গুনী, এই তিনটি নাটকের কাব্যপরিকল্পনা ও ঘটনাবলীর প্রভেদসত্ত্বেও একটি নিগূঢ় ভাবের ঐক্য আছে বলিয়া মনে হয়। এই ঐক্য যেমন কাব্যের দিক্ দিয়া চরম পরিণতির সাহায্য দিতেছে, তেমনি জীবনেরও পরিণতির দিক্ নির্দ্দেশ করিতেছে। কাব্যের বিচার ছাড়িয়া দিয়া জীবনের পরিণতির যে দিক্‌টি কবি ইহাদের মধ্যে নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহাই এখানে আমাদের আলোচ্য।

তিনটি নাটকের মধ্যে একদল লোক দেখা যায়, যাদের নিকট চোখে চাওয়া, কানে শোনা, হাতে পাওয়া, পায়ে চলাই একমাত্র সত্য। ফাল্গুনীর নব যৌবনের দল, অরূপরতনের সুদর্শনকে বলা যায় এই দলের। আবার বিপরীত দিকে একদল লোকের নিকট কর্ত্তব্য ও ত্যাগই একমাত্র লক্ষ্য। ফাল্গুনীর দাদা, অচলায়তনের অধিবাসীগণ এই দলে। ক্রমে দেখা যায় দুই দলের লোকেরই অবসাদ ঘনাইয়া আসে। আত্মপ্রতিষ্ঠার অভাব যেখানে, সেখানেই উদ্যম ও নিষ্ঠা সহজে বিচলিত হয়। আত্মশক্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত যারা, তারা শেষ পর্য্যন্ত একাই লড়িতে সক্ষম। ফাল্গুনীর চন্দ্রহাস, অরূপরতনের বিক্রম, অচলায়তনের খোনপাংশুগণ এবং স্থিতিশীল দলে মহাপঞ্চক এই শ্রেণীর। পথ ঠিক জানা না থাকিলেও দ্বিধাবিচলিত দুর্ব্বল চিত্তের অপেক্ষা এই দৃঢ়চিত্ত নিষ্ঠাবানেরাই আগে পথের সন্ধান পায়। দ্বিধাকম্পিত চিত্তকে পথ দেখাইয়া লইয়া চলে সংস্কারমুক্ত স্বচ্ছপ্রাণ সাধক;—যে সুরের পথের পথিক। ফাল্গুনীর অন্ধ বাউল,

কর

অরূপরতনের সুরঙ্গমা ও অচলায়তনের পঞ্চক—ইহারা বিশ্বের সুরের সহিত সুর মিলাইয়া সকল বিরোধের উর্দ্ধে উঠিয়াছে। ইহারা মুক্তির সুর গাহিয়া বিশ্বের অন্তর্নিহিত সেই 'বৃহৎ আমি'র সহিত ক্ষুদ্র আমির যোগসাধন করিয়া দেয়। এই মিলনক্ষেত্রে দুই বিপরীত দল আসিয়া দেখে তাদের দুই পক্ষেই আংশিক সত্য রহিয়াছে। মিথ্যা দম্ভ পরিত্যাগ করিতে পারিলেই দেখা যায় যে পরিপূর্ণ একই সকল বস্তুকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে; ব্যক্তিগত শক্তি অথবা আত্মশক্তি সেই বৃহৎ একেরই শক্তির অংশ। সুতরাং আত্মশক্তির উপলব্ধির পথ দিয়া যাইতেই বিশ্বের অন্তর্নিহিত বৃহৎ আত্মাকে উপলব্ধি করা যায় এবং এই উপলব্ধিতেই অমরত্ব লাভ হয়।"—

ইহার পরে এখানকার কলাভবনের জনৈক ছাত্র কর্ত্তৃক তাহার স্বরচিত একটি কবিতা পঠিত হইলে, একটি গান হয়; তখন মৌখিকভাবে আলোচনার সূত্রপাত করেন শ্রীযুক্ত বিজয়বিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয়। রবীন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক বাংলা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধিসাধন, বিশ্বসমাজ স্বদেশের গৌরবপ্রতিষ্ঠা ও তাঁর কাব্যের নিঁখুত ছন্দ, পদলালিত্য এবং অপূর্ব্ব ভাবসম্পদ বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব নিদর্শন করিয়া তিনি কবির প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন; পরে নির্ম্মলবাবুর আহ্বানে সুধাকান্ত বাবু বলেন,—"আমার কাছে রবীন্দ্রকাব্যে একটা জিনিষ খুব প্রাধান্য পেয়েছে মনে হয়—সে হচ্ছে "প্রকৃতি প্রেম"। প্রকৃতির কতকগুলি গুণ আছে যেগুলি পশুর মধ্যেই মুখ্যভাবে প্রকাশ পায়, আর কতকগুলি আছে মানুষের মধ্যেই যার বিশেষ স্ফূর্ত্তি। রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতিকে দেখেছেন প্রাণহীন পাশবিক মূর্ত্তিতে নয়—অনুভূতির রসদৃষ্টিতে দেখেছেন তিনি মানবীয় প্রেমময়ী জীবন্ত প্রতিমারূপে। তাই যখন তাঁর কাব্য পড়ি,—দেখি, সে তো শুধু জড়বস্তু মাত্র নয়, সে যেন আমারই সংসারে নিত্যকার পরমাত্মীয়। তার মধ্যেও মানবেরই আশা, মানবেরই ভাষা স্নেহ প্রেম, সুখ দুঃখ—সবই মানবের মত ক'রে স্বতঃ-উৎসারিত হচ্ছে। "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ" কবিতাটিতে নির্ঝরের মুখে শুনতে পাচ্ছি, আমাদেরই ব্যর্থতা হ'তে সফলতার নবালোকে নব আশা-প্রবুদ্ধ প্রাণের বিশ্ববিজয়ী অভিযানের তূর্য্যধ্বনি; গীতালির সেই—"শরৎ তোমার অরুণ আলোর অঞ্জলি—" গানটিতে ছন্দে সুরে যে ছবিটি মানসপটে ভেসে উঠে, সে কি আমাদেরই গৃহবিরাজিত শুভ্র-শুচি তন্বী কুমারীর লাবণ্যময়ী লক্ষ্মী মূর্ত্তিটি নয়? সব চেয়ে ভাল লাগে আমার—"সোনার বাংলা" গানটি। বস্তুতান্ত্রিক কবিতার এটি একেবারে চরম আদর্শ। সাদা চোখে জল মাটি আলো বাতাস প্রভৃতি পঞ্চভূতের সংমিশ্রণে যে বস্তু-জগৎ, তাই তাঁর অনুভূতির পরশমণির ছোঁয়া লেগে একেবারে "সোনার বাংলার" রূপ ধরেছে। এর মধ্যে দেখি, পঞ্চেন্দ্রিয় দিয়ে সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতর ভাবে প্রকৃতির সৌন্দর্য্যমহিমা উপলব্ধিতে তার সাথে তাঁর আত্মযোগ ঘটেছে। প্রথমে আকাশ বাতাস বাঁশীর সুরে তাঁর মন হরণ করল, তারপর আমের বনের ঘ্রাণ করল পাগল, শেষে অঘ্রাণের ভরা ক্ষেত মধুর হাসি দেখিয়ে তাঁকে রূপসৌন্দর্য্যের পূজায় আত্মবিহ্বল ক'রে ফেলল। যেখানে রূপ নাই সেখানে গন্ধ, যেখানে গন্ধ নাই সেখানে সুরের গোপন পথ ধ'রে কবি প্রকৃতির অন্তরগুহায় গিয়ে পৌঁছেছেন। বস্তু বাহ্যতঃ যতই নীরস হোক না কেন, তার হৃদয়দুয়ারে সহৃদয়তার আবেদনে ভিতরের অবরুদ্ধ রসনির্ঝরকে বাইরে না বইয়ে এনে তিনি ছাড়েন নি। প্রকৃতির সাথে এই প্রেমলীলাটি তাঁর যেমন মধুর, তেমনি পবিত্র, তেমনি সূক্ষ্ম ও সুন্দর।"

সুধাকান্ত বাবুর সুচিন্তিত আলোচনাটি তাঁহার সরস বাকপটুতার গুণে সকলেরই বড় হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। অতঃপর শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় মহাশয় শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রসাহিত্যের গবেষণার প্রসার কামনায় এই জন্মতিথিকে স্মরণীয় করিয়া রাখিবার জন্য বিশ্বভারতীয় কলেজ বিভাগ ও বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে রবীন্দ্রসাহিত্যের উপর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ রচনাকারকে দুইটি পুরস্কার ও তাহার অর্থ সংগ্রহ এবং যাবতীয় ব্যবহার জন্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী মহোদয়কে সভাপতি করিয়া একটি ধনভাণ্ডার স্থাপনের প্রস্তাব উত্থাপন করেন; সর্ব্বসম্মতি ক্রমে তাহা গৃহীত হয়। এই প্রসঙ্গেই শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্বভারতীতে রবীন্দ্রসাহিত্যের ধারাবাহিক উচ্চ

গবেষণার জন্য ১০০০৲ হাজার টাকার একটি বৃত্তিস্থাপনের অভিলাষ প্রকাশ করেন।

নির্ম্মলশিব বাবু উপসংহারে তাঁহার রসাল লেখনীর স্বাভাবিকতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া নাতিবৃহৎ নিবন্ধে রবীন্দ্রসাহিত্যে তাঁহার অকৃত্রিম অনুরাগ ও ব্যক্তিগতভাবে রবীন্দ্র-সঙ্গলাভের কৌতুককর বর্ণনা প্রদান করেন। সবার শেষে রবীন্দ্রনাথেরই একটি কীর্ত্তন গীত হইলে গৃহস্বামীর সুব্যবস্থায় জলযোগের অবসরে বিচিত্র রসবস্তুর বাস্তব রসাস্বাদনে দেহ মনের সর্ব্বাঙ্গীন পরিতৃপ্তি সাধন করিয়া সকলে আমরা এবারের মত উৎসব সমাধা করিলাম। বলা বাহুল্য শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ই ছিলেন এ উৎসবের অন্যতম উদ্যোক্তা।

পঁচিশে বৈশাখ

শ্রীনিশিকান্ত রায় চৌধুরী

মানবের কাছে কেন পূজা পাও পঁচিশে বৈশাখ,
তাকি জান ? আজ তব আগমনে দেশে দেশান্তরে
উৎসব-সভাঁর শঙ্খ ক্ষণে ক্ষণে সুগম্ভীর স্বরে
কি জানায় ?—নর নারী ছুটে আসে শুনি সেই ডাক।

সভাতলে ভীড় করে বৃদ্ধ, যুবা, বালিকা, বালক,
তোমারি চরণে সবে অর্ঘ্য দিল যাহা আছে যার ;
কবি সে গাহিল গান, বীণকার তুলিল ঝঙ্কার,
সভা মাঝে জ্বলি' উঠে কোন নব জন্মের আলোক।

সে আলোক জ্ব'লে ছিল কবে হ'তে—জান কি কোথায়,
—কোন প্রাণে, কোন খানে সে আলোক বাঁধিয়াছে বাসা,
কবে হ'তে এই বিশ্বে সুরু হোল সে আলোর ভাষা,
সে আলোর ছবিখানি সুন্দরের উজ্জ্বল প্রভায়

প্রভাত সঙ্গীত ধারে নির্ঝরের সপ্ন ভঙ্গ সনে
ভাঙালে স্বপ্নের ঘোর কোন দেশে, কোথায়—কেমনে ?

তুমি আজি ভাবিও না, হে উজ্জ্বল পঁচিশে বৈশাখ,
তোমার সম্মান-টীকা আঁকা হোল বৈশাখী-আকাশে
রবির কিরণ গানে, তাই এত আলোকে মাখা সে ;
প্রভাত-প্রাঙ্গণতলে তাই আজি উৎসবের ডাক

মঙ্গল শঙ্খের রবে ধরণীর দেশে দেশান্তরে
বরণীয় করিয়াছে তোমার গগন ; বুঝিও না ভুল,
রবি বটে, নহে তবু গগনের আলোর মুকুল ;
ভুবনের সূর্য্য সে যে দীপ্ত ছন্দে তূর্য্যধ্বনি করে ;

কবি বটে—তবু সে যে মানবের জীবনের কবি।
তোমার বক্ষের পরে জন্ম তার হয়েছিল ব'লে
নর-নারী সবে আজি সভাতলে আসে দলে দলে,
মনে করে, সেদিনের সেই কোন জন্মোজ্জ্বল ছবি।

—সে কবির, সে রবির নাই সন্ধ্যা, নাই ক্ষয় ক্ষতি,
কালের গগনে সে যে অনির্ব্বাণ, বাণীময় জ্যোতি।

সহযোগী-সাহিত্য

আধুনিক ফরাসী সাহিত্যের ধারা

শ্রীসুশীলচন্দ্র মিত্র

৫

রূপক কাব্য ও অতীন্দ্রিয়তা

রোমান্টিক-বিরোধী সমালোচকদের রোমান্টিজ্‌মের বিরুদ্ধে সব চেয়ে বড় অভিযোগ বোধ হয় এই যে, রোমান্টিক সাহিত্য আমাদের এমন অনেক জিনিস দিয়াছে যাহা নিছক্ কল্পনা-প্রসূত,—একেবারেই অলীক, মিথ্যা, মায়াময়। সত্যকারের বহির্জগতে তাহাদের কোনো প্রতিষ্ঠা ত নাই-ই,—মনোজগতেও তাহাদের সত্যতা সম্বন্ধে বিশেষ কোনো সাক্ষ্য মেলে না। সাহিত্যের উচ্চ আদর্শ এমনি করিয়াই খর্ব্ব করা হইয়াছে; এমন দাবীও না-কি করা হইয়াছে যে, সত্যকে প্রকাশ করা ও রূপদান করাটাই সাহিত্যের একমাত্র ধর্ম্ম বা উদ্দেশ্য নয়। ছেলে-খেলাও না-কি সাহিত্যের অন্যতম ধর্ম্ম,—অন্ততঃ পক্ষে এমন অনেক ধরণের সাহিত্য থাকিতে পারে যাহার কাজ সত্যকে প্রকাশ করা নয়,—কেবলমাত্র রূপকথার সাহায্যে চিত্ত-বিনোদন করা। ছেলে-খেলা হইলেও এই সব সাহিত্য না-কি উচ্চ-অঙ্গের সাহিত্যের মধ্যেই স্থান পাইবার যোগ্য,—শুধুই যদি তাহার মধ্যে কিছু সুরুচির পরিচয় থাকে, কিছু সৌন্দর্য্যের বিকাশ থাকে,—কিছু সত্যের প্রকাশ থাকিলে ত আরোই ভাল।

সুরুচি ও সৌন্দর্য্য যেখানে আছে,—সেখানে সত্যের অভাব ঘটিতে পারে কি-না,—এ বিষয়ে তর্কে প্রবৃত্ত হওয়া এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। তবে এ কথা ঠিক যে,—রোমান্টিজ্‌মের এমন একটা রূপ অনেক সাহিত্যেই পাওয়া যায়,—এবং ফরাসী সাহিত্যেও পাওয়া গিয়াছে যাহার প্রতি, জাগরণের মুহূর্ত্তে, বাস্তব অনুভূতিতে আমাদের প্রাণ সাড়া দেয় না,—স্বপ্নের মধ্যে হয়-ত দিতে পারে। ফরাসী সমালোচনার তীক্ষ্ণ বাণ অফুরন্ত বর্ষণে নির্দ্দয়ভাবে এই সব সাহিত্যের উপর বর্ষিত হইয়াছে, তথাপি বাস্তবতা ও বৈজ্ঞানিকতার বিপুল প্লাবনের মধ্যেও এই ধরণের সাহিত্য আজও ফরাসীদেশে টিঁকিয়া আছে। তাহার অনেক কারণ থাকিতে পারে,—একটি কারণ বোধ হয় এই যে,—যাহা কিছু জানা যায় না বা পাওয়া যায় না, তাহাই এমন একটা কুয়াসাচ্ছন্ন প্রহেলিকার মত মানুষের অস্পষ্ট চেতনার উপর প্রতিভাত হয় যে,—মানুষের মন একটা মুগ্ধ আকর্ষণী শক্তির তাড়নায় তাহার দিকে প্রধাবিত হয়। রোমান্টিজ্‌মের এই বিশিষ্ট রূপটি হয়-ত বা এই প্রচ্ছন্ন আকর্ষণী শক্তিরই একটা অস্পষ্ট প্রকাশ। ইহার মূল্য যাহাই হউক না কেন,—সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষবোধের সহিত তুলনা করিলে, ব্যবহারিক বুদ্ধি-বৃত্তির নিকট ইহা যতই ছেলে-মানুষী বলিয়া মনে হউক না কেন,—একটা কথা অস্বীকার করা যায় না যে, এই সাহিত্য যাহার প্রাণকে নাড়া দিয়াছে, তাহাকে এমনই অকৃত্রিম আবেগের সহিত নাড়া দিয়াছে যে, প্রতিদিনকার প্রত্যক্ষ জগৎ সেখানে রূপান্তরিত হইয়া নবীন বর্ণে উজ্জ্বলতর, আদর্শের মহিমায় মহত্তর, অনির্ব্বচনীয় মাধুরীতে মধুরতর হইয়া উঠিয়াছে।

এই দিক দিয়া এই ধরণের রোমান্টিক সাহিত্যের যে মূল্যই দেওয়া যাউক না কেন,—সমগ্রভাবে রোমান্টিক আন্দোলনের বিচার করিতে হইলে আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, রোমান্টিজ্‌মের আদি অনুপ্রেরণা যে আদর্শে,

সে আদর্শ অনেক উচ্চতর,—সামান্য চিত্ত-বিনোদনের জন্য একটা অলীক মায়ারাজ্য সৃষ্টি করা নয়। বস্তুতঃ সে আদর্শ ক্লাসিক সাহিত্যের আদর্শ হইতে বিভিন্ন নয়,—একই ;—সত্যের অনুসন্ধান ও নির্দ্ধারণ। রোমান্টিজ্‌মের নূতন অনুপ্রেরণা আমাদের কতদূর এই আদর্শের দিকে অগ্রসর করিয়া দিয়াছে,—সে বিষয়ে সঠিক বিচারের সময় এখনো আসে নাই ; তবে চারিদিকেই,—সাহিত্যের সকল ক্ষেত্রেই এখন দেখিতে পাওয়া যায়,—নূতন করিয়া একটা কিছু গড়িয়া তুলিবার বিরাট প্রয়াস।

ফরাসী গীতি-কবিতার জন্ম ত রোমান্টিক অনুপ্রেরণা হইতেই,—একথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এমন-কি, উপন্যাসে ও নাটকে যখন রোমান্টিজ্‌মের বিজয়-দুন্দুভি থামিয়া গিয়াছিল,—যখন বিজ্ঞানের নিকট নূতন উৎসাহ পাইয়া উপন্যাস-রচয়িতারা উপন্যাসের ভিতর দিয়া নানাবিধ বৈজ্ঞানিক তথ্যসমূহ প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, তখন হইতেই ফরাসী-কাব্যে দেখা দিয়াছিল এক নূতন কবি-সম্প্রদায়,—যাঁহাদের মতামত ও মানব-জীবনের অনুধাবনা বিজ্ঞান-বাদীদের মতামতের ঠিক উন্টা। ইঁহাদের কাব্যের নাম রূপক-কবিতা symbolisme। ইঁহাদের যে কল্পনা,—তাহা একেবারে নিছক্ কল্পনা,—অর্থাৎ অন্য কোনো মনোবৃত্তির সহিত সংমিশ্রিত নহে,—বুদ্ধি-বৃত্তির দ্বারাও ইহা অকলুষিত। বুদ্ধি-বৃত্তির দ্বারা আমরা যাহা বুঝি বা বিশ্লেষণ করি বা ব্যাখ্যা করি,—সেই বোঝা বা বিশ্লেষণ বা ব্যাখ্যার মধ্যেই তাহার সার্থকতা ;—কিন্তু এই রূপক-কবিদের কল্পনায় যে রূপ বা ছবি ফুটিয়া উঠে,—তাহার সার্থকতা আপনার মধ্যেই,—তাহার কোনো অন্তর্নিহিত অর্থের মধ্যে নয়। অর্থ হয়-ত সে ছবির একটা কিছু থাকিতে পারে ;—হয়-ত বা সে ছবি আত্মারই কোনো অবস্থা-বিশেষের একটা মূর্ত্তিমান্ প্রকাশ,—কিন্তু কবি সেটি অন্তরের মধ্যে উপলব্ধি করিতেই পারেন,—মনে প্রাণে অনুভব করিতে পারেন,—ভাষার ভিতর দিয়া বুদ্ধি-বৃত্তির নিকট আবেদন করিয়া তাহার একটি যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা করিতে পারেন না।

এই রূপক-কবিদের অগ্রণী ছিলেন পল্ ভেরার্লেন (Paul Verlaine) ও আর্থার র‍্যাঁবো (Arther Rimbaud)। র‍্যাঁবোর নিকট আমাদের এই পরিদৃশ্যমান জগৎটা ছিল একটা প্রতীয়মানতা মাত্র, সত্য নয়। তিনি বলিতেন,—'ভ্রান্তি যদি বল, ভ্রান্তিই ত আমি চাই। সে-ই ত সত্য। আমাদের যে ইন্দ্রিয়-বোধ,—তাহা ত একটি নিমিত্ত মাত্র, দৈবের যোগাযোগ। চরম সত্য ত আমাদের ইন্দ্রিয়-বোধ নয়, চরম সত্য আমাদের অন্তরের অনুভূতি ; ঠিক তরঙ্গে নিক্ষিপ্ত প্রস্তরখণ্ডের মত। আসল জিনিষ যেটুকু, ঐ তরঙ্গের কম্পন,—নিক্ষিপ্ত প্রস্তরখণ্ড নয়। আমাদের এই প্রাচীন পৃথিবীটা কঠিন,—ইহার বাণী মিথ্যা। এই পৃথিবীর ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের ভিতর দিয়া সত্যের মর্ম্মগ্রহণ ও রসাস্বাদন দুঃসাধ্য। কাব্যের ভিতর দিয়া সত্যের মর্ম্মগ্রহণ করিতে হইলে, এই প্রতীয়মান জগৎ হইতে একেবারে নিষ্ক্রান্ত হইতে হইবে,—ঝাঁপ দিতে হইবে, আমাদের অন্তরের সেই নূতন জগতের মধ্যে, যেখানে আমাদের সমস্ত স্বপ্ন জীবন্ত হইয়া উঠে, যেখানে যাহা কিছু সত্য সকলই ফুলের মত বিকশিত হইয়া উঠে।

এই রূপক-কবিদের অনুভূতিই ছিল সর্ব্বস্ব। ইঁহাদের মতে কাব্য কবির অনুভূতিরই একটি মূর্ত্তিমান্ বিগ্রহ। ইহার আবেদন পাঠকেরও অনুভূতিরই নিকট। কাহারও বুদ্ধি-বৃত্তির সহিত ইহার কোন সংশ্রব নাই,—না কবির,—না পাঠকের। এতদিন ফরাসী সাহিত্যে যে কাব্যের প্রচলন ছিল,তাহা প্রকৃতপক্ষে কাব্য ছিল না,—কেন-না কবির প্রাণের আবেগটুকু বোধগম্য ভাষায় অনূদিত হইয়া পাঠকের বুদ্ধি-বৃত্তির সাহায্যে মর্ম্ম-গ্রহণ-প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়া আসিতে আসিতে পথেই বিনষ্ট হইয়া যাইত, পাঠকের প্রাণে আসিয়া আর পৌছিতে পারিত না। তাই সত্যিকারের কবিতা যাহা, তাহার সহিত বুদ্ধি-বৃত্তির কোনো সংশ্রব থাকিতে পারে না। সে কবিতা পাঠকের প্রাণের নিকট কবির প্রাণের,—পাঠকের অনুভূতির নিকট কবির অনুভূতির একটি সোজাসুজি নিবেদন ;—এ নিবেদনে আর কিছুরই মধ্যস্থতা নাই ; কিছুরই ব্যাখ্যা নাই, বিশ্লেষণ নাই ;—আছে শুধু একটি ইঙ্গিত। একটি অব্যক্তের আভাস কবির ও পাঠকের অন্তরে অন্তরে একটি সাক্ষাৎ পরিচয়।

শ্রীসুশীলচন্দ্র মিত্র

কেমন করিয়া প্রাণে প্রাণে এই জানাজানি, এই সাক্ষাৎ পরিচয় সম্ভব? এই পরিচয়ের প্রধান বাধা হইতেছে, সুস্পষ্ট পরিষ্কার বোধের প্রতি আমাদের একটি মোহ। এই মোহ আমাদের পরিত্যাগ করিতে হইবে, কারণ কাব্যরসের উপযোগী যে প্রাণের আবেগ,—তাহা আর যাহাই হউক, সুস্পষ্ট ও পরিষ্কার নয়; ন্যায়-যুক্তির সাহায্যে তাহাকে পরিষ্কার করিয়া উপলব্ধি করিতে গেলে, আমরা আর যাহাই পাই না কেন, সেই আবেগটুকু পাইব না। কবি যতই এই আবেগ-বিজড়িত রহস্যের মধ্যে ডুবিয়া যাইবেন,—যতই তিনি সেই রহস্যের মধ্যে অনির্ব্বচনীয়কে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিবেন, যতই তিনি তাঁহার প্রাণের গোপন স্পন্দনগুলি অনুভূতির মধ্যে ফুটাইয়া তুলিতে চাহিবেন, ততই তাঁহার কবিতার অর্থটুকু অস্পষ্ট হইতে অস্পষ্টতর হইয়া মিলিয়া যাইবে একটি ইঙ্গিতের মধ্যে, তাঁহার প্রাণের রহস্যটুকু রূপ ধরিয়া উঠিবে তাঁহার কাব্যের মধ্যে। কাব্যের এই যে মূর্ত্তি,—ইহা বাক্য-অর্থের সাধারণ সম্বন্ধদ্বারা রচিত নহে;—এই মূর্ত্তি-রচনার যে উপকরণ,—তাহা ভাষার অলঙ্কার নহে,—তাহা কবির প্রাণের মধ্যে ভেসে-উঠা কতকগুলি ছবি। সে ছবি কবির ভাবের বা আবেগের একটা ভাষার অনুবাদ মাত্র নয়, সে ছবি সেই ভাবাবেগেরই আধার; পাঠক যদি তাহার প্রতি আপনার অন্তরখানি মেলিয়া দেন, তবে তাহা পাঠকের অনুভূতিতে আঘাত করিয়া তাঁহার অন্তরে আপনা-আপনিই ভাসিয়া উঠে,—এমন কি পাঠক কবির ভাষার অর্থ না বুঝিলেও।

বলা বাহুল্য, এই ইঙ্গিত-প্রধান রহস্যময় কাব্য সঙ্গীতের মধ্যে আপনাকে হারাইয়া ফেলে। বস্তুতঃ ফরাসী কাব্যের উপর সঙ্গীতের প্রভাব অপরিমেয়। বিশেষতঃ এই সময়ে Wagnerএর গীতি সর্ব্ব-সমক্ষে সপ্রমাণ করিয়া দিয়াছিল—সঙ্গীতের রহস্যময় আবেগ-প্রকাশের ক্ষমতা কতখানি গভীর, কেমন করিয়া একজনের প্রাণের অনির্ব্বচনীয় দুর্ব্বোধ্য আবেগরাজি সুরের মধ্যে মূর্ত্তিগ্রহণ করিয়া আর একজনের প্রাণে গুমরিয়া বাজিয়া উঠে। এমনি করিয়া কবিদের প্রাণেও আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিল—তাঁহারাও ছন্দের ঝঙ্কারের মধ্যে মানুষের গোপন প্রাণের সত্যটুকু ফুটাইয়া তুলিবেন। সে কাব্যের ভাষার মর্ম্মগ্রহণের কোন প্রয়োজন নাই, এমন কি, মর্ম্ম গ্রহণের চেষ্টাটিও ক্ষতিজনক, কেন-না প্রাণের গোপন সত্যটুকু ফুটিয়া উঠে ছন্দের ঝঙ্কারের মধ্যে, বাক্যের ধ্বনির মধ্যে, বাক্যের অর্থের মধ্যে নয়। এমন বাক্যের অর্থ অনুসন্ধান করিলে অর্থ হয়-ত মিলিবে, হয়-ত মিলিবে না, কিন্তু সত্যটুকু মিলিবে না ইহা নিশ্চয়। তার কারণ বাক্যের অর্থগ্রহণ করিতে হয় বুদ্ধি-বৃত্তির সাহায্যে, শুধু স্থির যুক্তির বিশ্লেষণ ও সংযোজন প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়া;—কিন্তু আমাদের গোপন প্রাণের সত্যটুকুর ধর্ম্মই হইতেছে এই যে, সে আত্মপ্রকাশ করে ঠিক সেইখানে, যেখানে আমাদের যুক্তির ধারা বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়।

এমনি করিয়া এক নূতন ধরণের সাহিত্যের সৃষ্টি হইতে চলিল,—যাহা বুদ্ধি-বৃত্তির স্থির যুক্তির নিয়ম আর মানিতে চাহিল না। মানুষের অস্পষ্ট চেতনার উপর প্রতিভাত হইয়া উঠিল একটা নূতন জগৎ যাহা বুদ্ধি-বৃত্তির দ্বারা ধারণা করা যায় না, যাহা ধারণা করিবার জন্য চাই অন্য অস্ত্র, আমাদের মননশক্তি (intuition)। এই অতীন্দ্রিয় জগতের কবি ছিলেন স্তেফান্ মালার্মে (Stèphane Mallarmé)। আমরা সাধারণতঃ যে জগতে বাস করি, কলহ করি, যুক্তি করি, তর্ক করি,—এই অতীন্দ্রিয় জগৎ সে জগৎ হইতে অনেক দূরে,—একেবারেই পৃথক। কবি বাস করেন এই অতীন্দ্রিয় জগতে,—এই জগতই তাঁহার কাব্যের বিষয়। এখানে তিনি যাহা অনুভব করেন, সাধারণ ব্যবহারিক জগতের ভাষায় তাহাকে যদি বল ভ্রান্তি, তবে সেই ভ্রান্তিই হইতেছে প্রকৃত সত্য, আমাদের ব্যবহারিক জগতের সত্যের চেয়ে অনেক বেশী সত্য; শুধু তাই নয়, আমাদের ব্যবহারিক জগতের সত্যটা হইতেছে সেই সত্যেরই একটা ছায়া মাত্র, ঠিক বলিতে গেলে,—একটা অতি জঘন্য বিকার। কবি যখন ব্যবহারিক জগতের এই দীন তুচ্ছ প্রতীয়মানতা হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া লইয়া আপনার অন্তরের মধ্যে ধ্যানে তন্ময় হইয়া থাকেন, তখনই এই অতীন্দ্রিয় উচ্চতর সত্য তাঁহার চেতনায় প্রতিভাসিত হইয়া তাঁহাকে টানিয়া লইয়া যায় অনেক ঊর্দ্ধে,—সেই অতীন্দ্রিয় জগতে। কবির কাব্যে এই জগতের

একটা পরিষ্কার ব্যাখ্যা বা বর্ণনা থাকিতে পারেনা,—থাকিবে শুধু ইহার প্রতি একটা ইঙ্গিত,—সুরের ভিতর দিয়া, বাক্যের ধ্বনির ভিতর দিয়া, ছন্দের ঝঙ্কারের ভিতর দিয়া।

এইখানে মালার্মে'র সহিত রূপক কবিদের একটা মিল দেখা যায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মালার্মে ঠিক রূপক কবিদের দলভুক্ত ছিলেন না। রূপক-কবিদের যে জগৎ, সেখানে অনুভূতিই ছিল সর্ব্বস্ব,—প্রাণের আবেগই সেখানে অনুভূতির মধ্যে রূপ ধরিয়া ফুটিয়া উঠিত,—কিন্তু মালার্মে'র অন্তরে নয়, সেখানে আবেগের চঞ্চলতা সংহত হইয়াছিল গম্ভীর ধ্যানের মধ্যে, সে জগৎ ধরা দিয়াছিল মালার্মে'র মনন-শক্তির নিকট। তাই মালার্মে'র কাব্য ছিল অনেকটা দার্শনিকতা-মিশ্রিত—তাঁহাকে অতীন্দ্রিয়তার কবি বলিলে বোধ হয় ভুল হইবে না। কিন্তু এই অতীন্দ্রিয়তার কাব্যে মালার্মে'র চেয়েও অগ্রসর হইয়াছিলেন পল্ ভালেরি (Paul Valéry)। তাঁহার মতে কবিতার বিষয় মানুষের আবেগ নয়, মানুষের ভাবরাজি। কবির যে জগৎ, তাহা মানুষের ধী-শক্তির দ্বারাই পরিচালিত,—তবে এই ধী-শক্তি আমাদের সাধারণ বুদ্ধি-বৃত্তির সহিত ঠিক একজাতীয় জিনিষ নয়। সাধারণ বুদ্ধি-বৃত্তি বলিতে আমরা যাহা বুঝি,—তাহা আমাদের ইন্দ্রিয়-বোধের সহিত মিশ্রিত। ব্যবহারিক জীবনে এই বুদ্ধি-বৃত্তি যুক্তির পরিচ্ছন্নতা ও ভাষার পরিস্ফুটতা অনুসন্ধান করে;—কিন্তু আমাদের যে ধী-শক্তি কবির অতীন্দ্রিয় জগৎকে পরিচালনা করে তাহার সহিত এই ব্যবহারিক জীবনের কোনো সংস্রব নাই। ব্যবহারিক জগৎ হইতে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইতে পারিলেই আমরা কবির এই অতীন্দ্রিয় জগতের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারি। এই জগতে আমাদের মনন-শক্তির আলোকে প্রাণের গভীরতম উৎস হইতে অজস্রধারায় কাব্য-স্রোত ঝরিতে থাকে। এই কাব্য বাহির হইতে যুক্তিদ্বারা ব্যাখ্যা করিবার নয়, ভিতর হইতে ধারণা করিয়া অন্তরের মধ্যে পুনঃসৃষ্টি করিয়া লইবার। তাই এই অতীন্দ্রিয় কবিদের মতে কাব্য বুঝিতে হইলে পাঠকেরও কবি হওয়া প্রয়োজন, অন্ততঃ এক মুহূর্ত্তের জন্ম।

মানবতা

ব্যবহারিক বা প্রতীয়মান জগৎ ও অতীন্দ্রিয় জগতের মধ্যে এই যে একটা পার্থক্য, বার্গসঁর কল্যাণে, শুধু কাব্যে নয়, সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগেও ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। ইহা মানবজীবনের ধারার অখণ্ডতার পক্ষে বিশেষ কল্যাণকর হইতে পারে না। বিজ্ঞানের একদিকে জয়-গৌরব, অন্যদিকে ব্যর্থতা বোধ হয় এমনি করিয়া মানুষের জীবনের অখণ্ড ধারাকে দ্বিধা বিখণ্ডিত করিয়া দিয়াছিল; রোমান্টিক আন্দোলন হয়ত বা এই বিচ্ছেদকে স্থানে স্থানে কোন কোন দিক দিয়া আরও তীব্রতর করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস এই বিচ্ছেদের পুনঃসংযোগ সূত্রটিও পাওয়া যাইবে,—রোমান্টিজ্‌মেরই মধ্যে, রোমান্টিক্ আমিত্ব-বোধের ভিতর মানুষের সেই সচেতন আত্মপ্রতিষ্ঠায়। এই আত্ম-প্রতিষ্ঠার ফলে আমাদের অনুসন্ধানের কেন্দ্রটি সরিয়া গিয়াছে বাহির হইতে অন্তরে, জগৎ হইতে আত্মার মধ্যে। আমাদের বিশ্বাস এই আমিত্ব-বোধেরই মধ্যে প্রতীয়মান জগৎ ও অতীন্দ্রিয় জগতের মধ্যে ঐক্যসূত্রটির সন্ধান মিলিবে। কিন্তু সে ভবিষ্যতের কথা। এখনই সে সম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা যায় না। তবে সে যাহাই হউক না কেন,—রোমান্টিক আন্দোলনের ফলে আধুনিক সাহিত্যে যতই জটিলতার সৃষ্টি হউক না কেন,—আজ মানুষের সমস্ত চিন্তারাজ্য জুড়িয়া উঠিয়াছে যে একটা মানবতার সুর, তাহাই রোমান্টিজমের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান।

আধুনিক ফরাসী সাহিত্যের সর্ব্বত্রই সকল সম্প্রদায়ের লেখকের মধ্যেই পাওয়া যায়,—এই মানবতার আভাস। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সমস্ত লেখকদের লেখার মধ্যেই অল্প বিস্তর এই মানবতার সুর আছে। এই প্রবন্ধে আমরা কেবলমাত্র রোমান্টিক আন্দোলনকে কেন্দ্র করিয়া ফরাসী সাহিত্যের কয়েকটি ধারা বর্ণনা করিলাম। কোনো লেখক বিশেষেরই রচনার কোনো আলোচনা করি নাই, এমন কি সকল বড় লেখকেরও নাম করি নাই। ভবিষ্যতে কোনো কোনো লেখকের রচনা লইয়া বিস্তৃততর আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

রূপক

শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী

সুন্দর গৌর, ছিপ্‌ছিপে শরীর, সে ছিল শাঁখারি ; শাঁখার ঝাঁপি নিয়ে দুয়ারে দুয়ারে ফিরি ক'রে বেড়াত—অন্দরে অন্দরে ফিরে ফিরে। সে ছিল তরুণ ; অসূর্য্যম্পশ্য রূপার আধোগুন্ঠিত সম্ভবে স্বতই সে সলজ্জ হ'য়ে উঠ্‌ত, পুর সুন্দরীর কর-প্রকোষ্ঠে শাঁখা পরাতে তার হাত কাঁপ্‌ত!

প্রভাতে বেরিয়ে তরুণ শাঁখারি দুপুরের দিকে সে দিন ফির্‌ছিল। তার হাতের ঝাঁপিতে ছিল অন্দর-তরুণীর কর-কম্পন-জড়া কয়েক জোড়া শাঁখার মোড়ক, আর তার বুকের ঝাঁপিতে ছিল কি একটা আশ্চর্য্য তরুণ অ-পূর্ব্ব অনুভব।

বাড়ী গিয়ে সে তার বন্ধ-করা ঝাঁপির মধ্যেকার মোড়কের থেকে বেছে এক জোড়া শুভ্র শাঁখা বের ক'রে নিয়ে মাথায় ঠেকাবার জন্যে তুলে নামিয়ে বুকে ঠেকালে ; অস্ফুটস্বরে বল্‌লে—ওগো গুন্ঠিতা, ওগো রহস্যময়ি, আমার হাতে তোমার প্রত্যহের রস-স্পর্শ-ভরা এই কর-কঙ্কণ। আমি এর প্রত্যেক স্পর্শে তোমার সলাজ কোমল করকম্পন পাচ্ছি, এর দীপ্ত শুভ্রতায় তোমার শুভ্র হৃদয়ের আভাস আস্‌চে, এর আনন্দ আমি বুকে রাখ্‌লাম—তোমার হৃদয়ের ছোঁয়া আমার হৃদয়ে লাগ্‌ল! কিন্তু, ওগো কৌতুকময়ী, কোন্ রঙে আমি রঙিয়ে তুল্‌ব এই শাঁখা দুটির গায়ে তোমার সেই ফর্‌মাইসি কারুজ—'ভোরের ফুল'?

সারাদিন ধ'রে সে ভাব্‌লে। শাঁখা দুটি দিয়েছিল নগর-শ্রেষ্ঠীর কন্যা বিদুষী 'মদয়ন্তী'—শাঁখারিকে এর উপর তুলির রঙে ফুটিয়ে দিতে হবে 'প্রভাত কুসুম'-কারুজ। কোন্ ফুল কেমন ক'রে আঁকতে হবে, সে কিছু ব'লে দেয়নি ; শুধু বলেচে—'ভোরের ফুল'।

সারাদিন ধ'রে সে ভাব্‌লে ; সারারাত ধ'রে তুলির পর তুলি নিয়ে নাড়াচাড়া কর্‌লে ; তারপর প্রত্যুষে যখন পদ্মদীঘিটার জলের উপর প্রথম অরুণ-আলোক এসে পড়্‌ল, তখন দীঘির দিকে চেয়ে চেয়ে শুভ্র শাঁখার গায়ে ধীরে ধীরে সে ফুটিয়ে তুল্‌লে—কণ্টকিত মৃণাল-পুটে একটি তরুণ কমল, সুন্দরীর গুণ্ঠনাবকাশের কপোল-অরুণিমার মতই স্ফুটনোন্মুখ! তারপর নীলের তুলির টান দিয়ে তার তলে ফুটালে দীঘির জলের নীল আকাশেরছায়া,—আর, সবুজ তুলির আঁচড়ে আঁক্‌লে একটি সজল পদ্ম-পাতা।

চিত্রিত শাঁখাদুটি মোড়কে জড়িয়ে আবার মোড়ক খুলে শাঁখা দুটি হাতে ক'রে কিছুক্ষণ সে কি ভাব্‌লে ; একটা নরম তুলি হাতে নিয়ে ফিরে সেটি তুলি-দানে রেখে দিলে ; শেষে সেটি আবার তুলে নিয়ে শাঁখার গায়ের কণ্টকিত মৃণাল-পুট-ছোঁয়া পদ্মপাতার উপর তুলি বুলিয়ে আঁক্‌লে একটি পাখা-ভাঙা ছোট্ট ভ্রমর—মৃণালের কাঁটার সঙ্গে তার ভাঙা পাখার একটি টুক্‌রা লেগে আছে।

শাঁখারির মুখে একটু করুণ হাসি ফুটে' উঠ্‌ল।

শাঁখার ঝাঁপি নিয়ে পরিচারিকার সঙ্গে শাঁখারি যখন শ্রেষ্ঠীর অন্তঃপুরে প্রবেশ কর্‌লে, তখন বেলা বেশী হয় নি ; স্নানান্তে প্রসাধন শেষ ক'রে শ্রেষ্ঠী-কন্যা সবে মাত্র তার বস্‌বার ঘরে এসে বসেচে। একটা স্নিগ্ধ সৌরভে ঘরের বাতাস ভর্‌পুর। তরুণকে দেখে তরুণী তার মাথার ওড়না আর একটু টেনে দিলে ; কিন্তু তার কৌতুক-স্মিত অপাঙ্গের দৃষ্টি তরুণের চোখে এড়াল না।

শাঁখারি একবার পূর্ণদৃষ্টিতে মদয়ন্তীর দিকে তাকিয়ে মুখখানি নত ক'রে দাঁড়িয়ে হাতের মোড়ক খুলে' সেই রঙীন শাঁখা জোড়াটি বের করে সম্মুখের একটি হাতীর দাঁতের কাজ করা ত্রিপদীর উপর রেখে আর একবার চোখ তুলে শ্রেষ্ঠী-কন্যার দিকে চেয়ে চোখ নামিয়ে নিলে।

মদয়ন্তী ত্রিপদীর উপর থেকে শাঁখা জোড়া হাতে তুলে নিয়ে একবার ভাল ক'রে দেখলে ; তারপর তরুণের দিকে একবার চেয়ে, পরিচারিকাকে ইঙ্গিতে ডেকে কি বল্‌লে বুঝা

গেল না ; কিন্তু দেখা গেল—তর্জ্জনীশীর্ষ দিয়ে শ্রেষ্ঠী-কুমারী চিত্রের 'ভ্রমর' নির্দ্দেশ কর্‌চে।

পরিচারিকা বল্‌লে—ওগো গুণী কারুক, তোমার চিত্র পেয়ে আমাদের দেবী পরম প্রীত হ'লেন ; তিনি বল্‌চেন, সুন্দর শতদল দীপ্ত প্রভাত-কুসুম ! কিন্তু পদ্মপাতায় পাখা-ভাঙা ভ্রমরের অর্থ কি ?

শাঁখারি এক মুহূর্ত্ত কি ভাব্‌লে। তারপর মৃদুস্বরে বল্‌লে—চিত্র-লেখা দেবীর ভালো লেগেচে ব'লে দীন কঙ্কণ-কারুক দেবীকে অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন কর্‌চে। কিন্তু দেবী যদি এর মধ্যে বিশেষ অর্থ খোঁজেন ত' নিরর্থক হবে। এ আমি অর্থ ভেবে আঁকি নি। পদ্মদীঘিরপদ্মপাতায় ভ্রমর দেখে ভ্রমর এঁকেচি। আর, ভ্রমরের ভাঙা পাখার টুক্‌রা নয় ওটা, ও আমার এক মুহূর্ত্তের অন্যমনস্কতার তুলির ভুল —চিত্রের মৃণাল-কাঁটায় তুলি-চোয়ানো রঙ।

শাঁখারির মন একটু ক্ষুব্ধ হ'ল। মদয়ন্তী কথাটা সত্য ব'লে বিশ্বাস কর্‌লে কি না, সে বুঝ্‌তে পার্‌লে না। কিন্তু মিথ্যা না ব'লে যে তার উপায় নেই ; সে গোপন কথা যে সে কইতে পারে না !

তার মনে পড়্‌ল গতকল্যকার কথা। কাল সকাল বেলা যখন সে তার ঝাঁপি খুলে বের করেছিল আর এক জোড়া ফুল-আঁকা শাঁখা মদয়ন্তীকে পরাবার জন্যে, তখন মদয়ন্তী সেই শাঁখায়-আঁকা ফুল 'সন্ধ্যামালতী'র দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে থেকে কি ভেবেছিল ; তারপর তার নিজের হাতের সাদা শাঁখা খুলে দিয়েছিল—'ভোরের ফুল' আঁক্‌বার জন্যে।

শাঁখারির শাঁখার ছবি সেই 'সন্ধ্যামালতী' ছিল—একটি চিত্র-কবিতা। তার অর্থ—"আমার দীনতার লজ্জায় দিনের বেলা আমি ফুটিনি ; এখন সান্ধ্য অন্ধকারের তলে বিরল-পথিক পথের নিরালায় আমার গোপন ব্যথিত হৃদয়ের দল ফেটে যাচ্চে। হায়, সাঁঝের পথিক কেউ যদিও এপথ দিয়ে যায়, আমার মৃদু গন্ধে হয়ত সে আমাকে চিন্‌তে পার্‌বে না !"

তার সেই কবিতার 'সন্ধ্যামালতীর' গন্ধ মদয়ন্তী পেয়েছিল কি না মদয়ন্তীই জানে। 'সন্ধ্যামালতী'—তারই দীন হৃদয়ের সন্ধ্যামালতী ; ক্ষুদ্র প্রাণ, ক্ষুদ্র গন্ধ !

তারপর আজকার এই 'ভোরের ফুল'—এও আর একটি রূপক কারুজ। তবে, এটি একটু অন্য রকমের। এর ভাব—"ওগো 'ভোরের ফুল', ওগো অর্দ্ধগুণ্ঠিতা রূপসী কিশোরি, তোমার সবখানি মুখচ্ছবি না দেখেই আমার চিত্ত-ভ্রমর তোমার জন্যে মুগ্ধ হ'ল, ব্যাকুল হ'ল। জানি আমি, তুমি পূজার পদ্ম ; তোমাকে পাওয়া আমার দুরাশা ! তবু আমি তোমাকে পাবনা জেনেও ভালোবেসেচি। এ ভালবাসার বেদনায় হয় ত' আমার চিত্ত ভেঙে যাবে—ঐ পাখা-ভাঙা ভ্রমরেরই মত, কিন্তু সে বেদনা আমি সহ্য কর্‌ব।"

এই গোপন রূপক গোপনে রাখ্‌বার জন্যেই শাঁখারি অমন অনৃতের আশ্রয় নিলে।

মদয়ন্তী অনেকক্ষণ চুপ ক'রে কি ভাব্‌লে। অনেকক্ষণ পরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেল্‌লে—বোধ হ'ল। তারপর পরিচারিকাকে ইসারায় কি ব'লে 'ভোরের ফুল' শাঁখা জোড়া তার হাতে দিয়ে শাঁখারির দিকে একটু স'রে বস্‌ল।

পরিচারিকা সেই শাঁখা শাঁখারিকে দিয়ে বল্‌লে—আমাদের ঠাকুরাণীকে শাঁখা পরিয়ে দাও, শাঁখারি !

মদয়ন্তী শাঁখারির দিকে তার শুভ্র প্রকোষ্ঠ বাড়িয়ে দিলে ; শাঁখারি সেই প্রকোষ্ঠে রাঙা শাঁখা পরাতে লাগ্‌ল। শাঁখারির হাত কাঁপ্‌ছিল, এবং তার বোধ হ'ল—মদয়ন্তীরও হাত কাঁপ্‌চে।

শাঁখা পরানো সারা ক'রে শাঁখারি উঠে দাঁড়িয়ে শ্রেষ্ঠী-কুমারীকে প্রথম বিদায় সম্ভাষণ জানাতেই 'ভোরের ফুল' পূর্ণ প্রস্ফুটিত হ'ল।...শ্রেষ্ঠী-কুমারী কুমারী-সুলভ লজ্জা পরিত্যাগ ক'রে তার মুখের ওড়না সবখানি সরিয়ে ফেলে শাঁখারির সম্মুখে দাঁড়াল।

শাঁখারি থতমত খেয়ে কুমারীর মুখে খানিক চেয়েই দুয়ারের দিকে পা বাড়ালে।

মদয়ন্তী শাঁখারির একখানি হাত হঠাৎ চেপে ধ'রে করুণস্বরে বল্‌লে—তরুণ, তোমার ব্যথায় আমি ব্যথিত !

তারপর শাঁখারি তার শাঁখা-চিত্রের মূল্য না নিয়েই চ'লে গেল।

মদয়ন্তী কি রূপকের অর্থ বুঝেছিল ?

স্মৃতিসভা

৺দ্বিজেন্দ্রনাথের শ্রাদ্ধবাসরে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় কর্তৃক কথিত নিম্নলিখিত প্রবন্ধটি আমরা গত বৈশাখ মাসের প্রবাসী হইতে সঙ্কলিত করিলাম—প্রত্যেক দেশের দুটি দিক্ আছে, এক হচ্চে তা'র জীবপ্রবাহ, জনতা, প্রতিদিনের কর্ম্ম-সংসারে যাদের নিয়ে আমাদের ব্যবহার। প্রত্যেক দেশেরই আবার একটি অমরাবতী আছে--যাঁরা অতীতে জন্মগ্রহণ ক'রে বর্ত্তমানে রয়েছেন, দেহমুক্ত হ'য়েও সর্ব্বব্যাপী যাঁদের প্রভাব তাঁরাই সেই শাশ্বত মঙ্গললোকের স্রষ্টা। এই স্মরণীয়দের সংখ্যা যে-দেশে বহু সেই দেশই মহৎ—যে-দেশে এঁদের অভাব সে-দেশ আয়তনে এবং জনসংখ্যায় যতই বড় হোক না কেন তার অস্তিত্ব-গৌরব নেই বল্লেই চলে। বস্তুত প্রতি দেশ আপনার সত্যরূপকে উদ্‌ঘাটিত ক'রে দেখায় তাঁদেরই মধ্যে যাঁরা বর্ত্তমান নেই—অশরীরী হ'য়েও তাঁরা সেই দেশের সত্যকে বহন করছেন। এই জন্যেই ইতিহাসের মূল্য। সব দেশের মানুষই তাঁদের সম্পদের ভাণ্ডার ক'রে রেখেছেন ইতিহাসকে—বহুমূল্য প্রাণের পরিচয় সেই ভাণ্ডারে। প্রত্যেক দেশেরই তার প্রতি একটি নিষ্ঠা, একটি অনুরাগ আছে।...

আমাদের আশ্রম সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। যাঁরা ইহলোক থেকে অপসৃত হয়ে এর সত্যকে উজ্জ্বল রূপকে প্রকাশিত করছেন, তাঁদের সংখ্যা বেশি নয়। তাঁদেরকে আমাদের বড়ো প্রয়োজন,--যদি দীর্ঘকাল এ আশ্রম থাকে তবে তাঁদের সংখ্যা বহু হবে, এই আশা করি। যাঁরা এ আশ্রমে বাস করছেন তাঁরা সেই মহাত্মাদের উপর নির্ভর করেন।...

যাঁরা বেঁচে আছেন তাঁদের সঙ্গে আমাদের সামাজিকতা রক্ষা করতে হয়, লৌকিকতা করতে হয়, নইলে তাঁদের মনে হ'তে পারে যে বুঝি তাঁদের অস্বীকার করছি। এই যে তাঁদের অস্তিত্বকে স্বীকার করি এদ্বারা তাঁরাও পুষ্টিলাভ করেন, লোকে তাঁদের সঙ্গসুখলাভ ক'রে আনন্দ অনুভব করছে এদ্বারা তাঁদের যে সত্তার আনন্দ তা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু যাঁরা চ'লে গিয়েছেন সে-রকম ব্যবহারের তাঁরা অতীত বরং তাঁরা যে আছেন সে প্রমাণ তাঁরাই দেন, আপনার গুণে অমর অক্ষয় হ'য়ে সমস্ত সংসারে নিজের প্রতিষ্ঠা রক্ষা করেন। আমাদের দেশে যাঁরা বিশ্বের সম্মুখে ভারতবর্ষের সত্য পরিচয় দিচ্ছেন, যেমন যাজ্ঞবল্ক্য, বা কবি বাল্মীকি বা কালিদাস, বা তত্ত্বজ্ঞানী শঙ্কর, এঁদের ত আমরা বাদ দিতে পারিনে। ভারতবর্ষের কতলোক প্রতিবৎসর ম্যালেরিয়ায় মারা যাচ্ছে, তারা ত ছায়ার মতন, তাদের আমরা সহজেই ভুলে যাই। কিন্তু এঁদের তো আমরা ভুলে যেতে পারিনে—তাঁরা নিজের সত্তা প্রমাণ করতে আমাদের সাহায্য প্রত্যাশা করেন না।...

য়ুরোপে মৃত ব্যক্তিকে বাইরে থেকে স্মরণ করবার উপায় করা হয়েছে। গোরস্থানে একখানা পাথর দিয়ে মৃত্যুকে ফাঁকি দেওয়া হল—যে স্মরণীয় নয় তাকেও স্মরণীয় ক'রে তোলা হ'ল। ফলে তাদের কথা পাথরে লেখা রইল, মনে লেখা রইল না। লোককে স্থূলভাবে দেখবার রীতি রয়েছে পাশ্চাত্যদেশে—সে দেশের শাস্ত্রে আছে যে, কালের শৃঙ্গ যখন বাজে তখন মানুষ আবার মর্ত্ত্য-দেহ ধারণ করে, তাই একে রক্ষা করবার প্রয়োজন আছে; এই যে আত্মার আচ্ছাদন একে জীর্ণ বস্ত্রের মতো পরিত্যাগ করতে গীতায় বলেছে, তাকেই কালের হাত থেকে, কীটের হাত থেকে রক্ষা করবার দুরাশা পাশ্চাত্য দেশে।

আমরা এই পাশ্চাত্য দেশের অনুষ্ঠানেরই নকল করেচি। বৎসরে বৎসরে আমরা বিদ্যাসাগরকে স্মরণ ক'রে থাকি—কিন্তু তা যে কত ব্যর্থ হয় তা সে-সব সভার যাঁরা অনুষ্ঠাতা তাঁরাই জানেন। কিন্তু

বাংলা সাহিত্য থেকে কে তাঁকে সরাতে পারে? কেউ তাঁর জীবনের অনুসরণ করে না, শুধু কথার ধ্বনি প্রতিধ্বনি ক'রে চলে—যতটুকু সয় ততটুকু বলে, বিধবা-বিবাহের সময় ঘাড় বাঁকায়। এই যে বছরে বছরে জয়দেবের মেলা হয়, এর তো সভাপতি নেই, সভা নেই, বক্তৃতা নেই। জয়দেবের যে একটি ব্যক্তিগত রূপ ছিল, জীবনযাত্রায় যে নানা লোকের সঙ্গে তার নানা সম্বন্ধ ছিল, তা লোকে বিস্মৃত হয়েছে। এখন তাঁর কাব্যরূপে তিনি সংস্কৃত সাহিত্যের বুকে কৌস্তুভ-মণি হ'য়ে রয়েচেন। আধুনিক যে-সব উৎপাত এর মধ্যে যেন বন্ধন আছে যা পরলোকগত মুক্ত ব্যক্তিকেও বেঁধে রাখতে চায়। আমাদের যে শ্রাদ্ধের মন্ত্র আছে পৃথিবী মধু, আকাশ মধু, বাতাস মধু, দিন-রাত্রি মধু, বিশ্বের সেই অমৃতরূপের সঙ্গে মুক্তরূপে পরলোকগত ব্যক্তিকে আমরা মিলিয়ে দেখতে চেয়েছি। তাঁর যে বদ্ধ ব্যক্তিগত স্বরূপ তাতে তিনি নানা ভাবে পীড়িত, সেখানে তিনি বড়ো নাও হ'তে পারেন; কিন্তু যেখানে তিনি বড়ো সেখানে মৃত্যুর দ্বারা সমস্ত কিছু বড়োর সঙ্গে তাকে যুক্ত ক'রে দেখি। এই পৃথিবীতে নানারূপ প্রয়োজনে তিনি বদ্ধ ছিলেন, দেহমুক্ত হবামাত্র আপনার যা কিছু চিরন্তন তাতে বিরাজ করছেন। যা কিছু মধুমৎ পার্থিবং রজঃ তারই সঙ্গে আপনাকে মিশিয়েছেন—তাঁর তো মৃত্যুর বিশেষ কোন দিন নেই— সাধনা দ্বারা যেখানে তিনি অন্তহীনকে পেয়েছেন সেখানেই তো দেহমুক্তের পরিচয়। আমাদের দেশে আমরা এই কথা স্বীকার করি—সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ যা আছে তা পরিবারের মধ্যেই বদ্ধ। সভা করাটা আমাদের দেশের নয়—আমরা কন্‌গ্রেস্ স্থাপিত করেছিলুম পার্লামেণ্টের নকল ক'রে। বছর বছর বড়ো বড়ো প্রেসিডেন্‌স্যাল্ এড্রেস্ ছাপা হ'ল, পড়া হ'ল, নানা বিষয় নিয়ে তর্কবিতর্ক চলল—তারপর সেখানেই রইল। আসল কাজ, ইংরেজিতে যাকে বলে কন্‌স্‌ট্রাক্‌টিভ ওয়ার্ক তা সিকি পয়সার হ'ল না। আমাদের যে-সুরে তার বাঁধা, তাতে হাত পড়ল না— কাজেই ব্যাজ্‌লও না—জলাভাব রইল, অন্নকষ্ট রইল। এ-সব প্রচেষ্টা দেশকে স্পর্শই করছে না। এ-সবই বৈলাতিক আনুষ্ঠানিকতা। প্রথমত অনুষ্ঠান মাত্রেরই একটা দৈন্য আছে। তবু সে অনুষ্ঠান যদি নিজস্ব হয় তবে একটা সার্থকতা খুঁজে পাওয়া যায়—যেমন শ্রাদ্ধের মন্ত্র, এ আমরা যতটা হৃদয়ে গ্রহণ করতে পারি বা না পারি, এর মধ্যে একটা কৈফিয়ৎ আছে, এ মন্ত্র যে পিতৃপিতামহের সময় হতে আমাদের দেশে উচ্চারিত হ'য়ে আসছে। কিন্তু অনুষ্ঠান যেখানে ধার করা সেখানে তার কোনো কৈফিয়ৎ নেই। বৎসরে বৎসরে রামমোহনকে আমরা স্মরণ করি। এ যে একটা কৃত্রিম আনুষ্ঠানিকতা মাত্র, সে-কথা স্মরণ করলে আমার মন বিমুখ হ'য়ে ওঠে। শুধু শুধু বাক্য রচনা করব কেন? তার বই কেউ পড়ব না, তাঁর বই প্রকাশিত হচ্ছে না—আমাদের এ ফাঁকিকে ধিক্। এ ফাঁকিটা য়ুরোপীয়, এ মিথ্যা। আমাদের অনেক সুহৃৎ, আশ্রমের ইতিহাসের সঙ্গে যাঁরা বিজড়িত রয়েছেন, তাঁদের কথা স্মরণ না ক'রে আমাদের উপায় নেই। ক্ষণে ক্ষণে তাঁদের মনে পড়বে, নানারূপে তাঁদের ভাব ও অভাবের কথা প্রতি পদক্ষেপে আমাদের মনে পড়বে।

মোগল বাদশারা নিজের সমাধিমন্দির নিজেরাই তৈরি করিয়ে যেতেন—আশঙ্কা ছিল খরচের ভয়ে পুত্রেরা মন্দিরনির্মাণ নাও করতে পারে। মৃত্যুর পূর্ব্বেই তাঁরা এসব বালাই চুকিয়ে যেতেন। আমিও তাই করতে চাই। আমার কথা যদি আপনাদের কখনো স্মরণ করতে হয় তবে এভাবে বিশেষ দিনে সভা ডেকে কখনো আমাকে স্মরণ করবেন না। আমার জন্মদিন মৃত্যুদিন দুটোই আমি সঙ্গে নিয়ে যাব—এ আপনারা পাবেন না। তাই ব'লে কি বৎসরে বাকি ৩৬৩ দিনই আমি জুড়ে থাকব? তা নয়—আমার গানে, আমার কবিতায় আমাকে ক্ষণে ক্ষণে আপনাদের মনে পড়বে, সেই আমার ভালো। আমাকে অনেকে বিদেশীভাবাপন্ন মনে করেন, কিন্তু এই আনুষ্ঠানিকতায় আমার মনে সত্যই বাধে, এগুলো যে ঘোর বিদেশী, মজ্জাগতভাবে বিদেশী। এর মধ্যে একটু কষ্ট আছে, কৃত্রিমতা আছে তা ফেলে দিন। মৃত্যুর পরে দিনক্ষণ নেই—মৃত্যুর দিনক্ষণ যাদের আছে তাদের কেউ স্মরণ করে না—সে দিনক্ষণ যাদের নেই, তাঁরাই স্মরণীয় হয়ে থাকেন।

সৌন্দর্য্যতত্ত্বে নন্দলাল বসু

গত বৈশাখের 'প্রবাসীতে' প্রকাশিত শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র কর লিখিত প্রবন্ধ হইতে আমরা নিম্নোদ্ধৃত অংশগুলি সঙ্কলিত করিলাম।

সৌন্দর্য্য কি, প্রথমে এই কথাটির ব্যাখ্যান দিতে গিয়া তিনি (নন্দলাল বাবু) বলিতে আরম্ভ করিলেন,—এ তত্ত্ব নিয়ে মনীষী-মণ্ডলে বহু আলোচনা চলেছে, তা থেকে মতবৈষম্যেরও সৃষ্টি হয়েছে কম নয়।

* * *

মহামতি টলষ্টয় তাঁর *What is Art* নামক বিখ্যাত গ্রন্থে এরূপ বহু সমালোচকের আদর্শ সংগ্রহ ক'রে, তার উপরে তাঁর নিজেরও একটি বিশেষ মত স্থাপন করেছেন। এ পর্য্যন্ত আমি যতদূর এ সম্বন্ধে অনুধাবনা করবার সুযোগ পেয়েছি, তার অভিজ্ঞতা থেকেই আজকের আলোচ্য বিষয়ের সমাধানে সচেষ্ট হব।

এক কথায় সৌন্দর্য্য কি তা বলা বড় শক্ত, তবে মোটামুটি এই পর্য্যন্ত বলা যেতে পারে যে, সৌন্দর্য্য হচ্ছে পূর্ণতারই প্রকাশ। বস্তু, মন ও অভিব্যক্তি (expression) এই তিনটি জিনিষ নিয়ে তবে পূর্ণতার উদ্ভব হয়। কবি তাঁর কাব্যে যে সৌন্দর্য্যের সমাবেশ করেন,

বিশ্লেষণ ক'রে দেখলে আমরা গোড়ায় গিয়ে দেখতে পাব, সেখানে রয়েছে মূলত: দুটি জিনিষ—একটি বস্তু, আর একটি তাঁর মন; তা ছাড়া 'মনের মাধুরী' ব'লে আরও একটি জিনিষ আছে সেখানে—দৃষ্টির অগোচরে। এই মনের মাধুরীই হচ্ছে—ইংরাজিতে যাকে বলা হয় mode of expression।

* * *

মনের এই মাধুরী-লাভ সাধনাসাপেক্ষ। মানবমাত্রেরই সৃষ্টির প্রথম থেকে হৃদয়বীণাটি নয় রকম অনুভূতির নয়টি তারে সমান ক'রে বাঁধা থাকে; এবং এ কথাও সত্যি যে, প্রতি বস্তুরই অন্তরে এক একটি বিশিষ্ট সত্তা বা ধর্ম্ম আছে—জগতে যা নিয়ে তার অস্তিত্ব। মানুষের সেই প্রাণের তারে বস্তুর যে গুণ (বা ধর্ম্মটি) যখনি যতখানি জোরে আঘাত করে, তখনি তার চেতনা তত বেশী জাগ্রত ও আবিষ্ট হ'য়ে পড়ে। এই আবেশের অবস্থায় দুটি ভাবের উদ্ভব হয়—একটি রস আর একটি ভাবাবেগ বা emotion।

* * *

রস ও ভাবাবেগ দুইটি একেবারে স্বতন্ত্র বস্তু। একটা উদাহরণ দিলে আশা করি, সে স্বাতন্ত্র্যটা বেশ স্পষ্ট হ'য়ে উঠবে একটি অসামান্য সুন্দরী ষোড়শীকে সাধারণভাবে দেখলে সাধারণ মানুষ মনে একটা নিবিড় আকর্ষণ অনুভব করে। সেটা নিছক ভাবাবেগ বা মোহ—কামজ ভোগেই তার পরিণতি। কিন্তু শিল্পীর চোখে যদি দেখতে যাই, তরুণীর যৌবন-বিকশিত তনুর তনিমা, রূপ-সায়রে সে যেন একটি সদ্যঃপ্রস্ফুটিত পূর্ণ শতদলের মতই আমার মানসপটে প্রতিভাত হবে এবং তখন তার রূপের স্বর্ণমায়াটি আমার চিত্তে নিরাবিল আনন্দ-রসের উদ্রেক ক'রে আমাকে সুন্দরের মহিমার ধ্যানে গভীর ভাবে সমাহিত ক'রে দেবে। শিল্পীও ভোগ করে, কিন্তু ধারাটি আলাদা।

* * *

সংযত ঘন ভাবাবেগই রসের স্রষ্টা, সুতরাং রস ও ভাবাবেগকে আমরা ঠিক একই পরিমাপে ফেলতে পারিনে। রস চিরন্তন—সে কিছু সৃজন করে, ভাবাবেগ বিহ্বলতায় ক্ষণিকের অবসরে বিলীন হ'য়ে যায়। রস বস্তুর প্রাণ, রূপ তার দেহ; যে পটের মধ্যে প্রাণ এবং দেহের পূর্ণযোগ ঘটে, সেইখানেই সৌন্দর্য্য আপনার রহস্য-অবগুণ্ঠন অনাবৃত ক'রে প্রকাশ পায়।

তবেই দেখতে পাচ্ছি,—সৌন্দর্য্য নিছক রসও নয় আবার রূপও নয়—অথচ এ দু'য়েরই যৌগিক পরিণতিতেই তার পত্তন। আপনি যাকে ব্যক্তিগত অনুভূতি বলেছেন—আমি আগেই ব'লে এসেছি, তা হচ্চে রসেরই নামান্তর।

* * *

এখনও সার্ব্বজনীনতার অভাবে সৌন্দর্য্যের পূর্ণ বিকাশ হ'তে একটু বাকি রয়েছে। সুন্দর যা তা শাশ্বত, আর একটা তার বিশেষ লক্ষণ এই যে, সহজ স্বাভাবিকতার গুণে সে সকলের চিত্তেই কোনো-না-কোনভাবে কিছু-না-কিছু আনন্দের স্পর্শ দিয়ে যাবেই,—কারোর সেই চিত্তবীণাটির তারগুলি যদি একেবারেই বিফল হ'য়ে না গিয়ে থাকে তবেই অবশ্য সেক্ষেত্রে এ কথা প্রযুক্ত হবে। নয়তো অনুশীলনের অভাবে অনুভূতি যার সমূলে বিলয়প্রাপ্ত হয়েছে, তার কাছে কোনো-দিনই সুন্দরের আবির্ভাব যে ঘটবে না বলাই বাহুল্য।

* * *

সৌন্দর্য্য তার পূর্ণতায় উপনীত হবার পথে প্রকাশ-পদ্ধতিরও কিছু অপেক্ষা রাখে।

* * *

এই modeটিই হচ্ছে শিল্পির শিল্পপ্রতিভা। এই জিনিষটিই সৌন্দর্য্যকে সার্ব্বজনীন ক'রে তুলবার পরম সহায়ক। বস্তুর মধ্যে কেমন ক'রে কোথায় আমি সৌন্দর্য্যের সন্ধান পেলুম, তার পরিচয়টি ফুটে উঠবে আমার শিল্পকলায়। সময়ে রূপ যেমন অনুভূতিকে আলোড়িত করে, দু'য়ে মিলে একটা সৌন্দর্য্য গড়ে তুলে, তেমনি অনুভূতিও রূপের উপর রং ফলিয়ে সময়ে সুন্দরের আবির্ভাব ঘটায়। কিন্তু আবির্ভাবকে আমরা পূর্ণ বলতে পারিনে—কারণ, তখনো তা বিশিষ্টজনে নিভৃত মনের উপভোগ্য হ'য়ে থাকে ব'লে। কিন্তু একবার যদি সে উপলব্ধ সৌন্দর্য্যকে 'মনের মাধুরী' দিয়ে বাইরে দশের দর্শন-স্পর্শন ও আস্বাদনের উপযোগী ক'রে তুলতে পারি, তখনই বলব—'এবার যথার্থই সৌন্দর্য্য সৃজিত হয়েছে।'

বিবিধ সংগ্রহ

প্রশান্ত সাগরের কয়েকটি মরুদ্বীপ

জীবনশক্তির কার্য্য আলোচনা করিতে গিয়া জীবতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ এই শক্তির নানা অদ্ভুত ক্রিয়া কলাপ অবলোকন করিয়াছেন, ও তাঁহাদের অনুসন্ধান প্রতিদিন তাঁহাদিগকে নব নব রহস্যের সম্মুখীন করিতেছে। ডারউইনের প্রসিদ্ধ নৌ-যাত্রার সময় হইতেই মহাসমুদ্রের মধ্যস্থ দ্বীপ সকল এই দৈবশক্তির প্রকৃতি পরীক্ষা করিবার ক্ষেত্র হইয়া উঠিয়াছে, ইহার বিশেষ কারণ এই যে, একই শ্রেণীর প্রাণী ও উদ্ভিদ বিভিন্ন আবহাওয়া ও প্রাকৃতিক কারণের মধ্যে পড়িয়া স্ব স্ব আকৃতি ও অভ্যাস কিরূপ বদ্‌লাইয়া ফেলিয়াছে—তাহা বুঝিতে হইলে মহাদেশের উপকূল হইতে দূরবর্ত্তী সমুদ্রগর্ভস্থ দ্বীপপুঞ্জের প্রাণী ও উদ্ভিদের পর্য্যবেক্ষণ ও আলোচনা করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

কালিফোর্ণিয়া ও দক্ষিণ আমেরিকার উপকূলবর্ত্তী বহু দ্বীপ এরূপ প্রাণীতে পরিপূর্ণ, যাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ বহুকাল পূর্ব্বে ভাসমান কাষ্ঠ, সামুদ্রিক শৈবাল, ভগ্ন জাহাজের টুক্‌রা, প্রভৃতি অবলম্বনে ঐ সকল জনশূন্য দ্বীপে গিয়া আশ্রয় লইয়াছিল। ঐ সকল দ্বীপগুলির প্রায় সমুদয়ই মনুষ্য বসতিশূন্য অনুর্ব্বর ও রুক্ষ। অনেক দিন হইতে জীবতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণের দৃষ্টি এই সকল দ্বীপে পড়িয়াছে, এবং নানাদিক্ হইতে দ্বীপস্থ উদ্ভিদ ও প্রাণীকুলের উৎপত্তি, বিচার ও তাহার কারণনির্ণয়ের চেষ্টার ফলে দৈবশক্তির নূতন নূতন ক্রিয়া গোচরীভূত হইতেছে।

কালিফোর্ণিয়ায় পশ্চিমোপকূলের অদূরে এরূপ বহু দ্বীপ আছে। এই সকল স্থানে প্রায়ই বৃষ্টি হয় না, হইলেও এত কম হয় যে জমির অনুর্ব্বরতা ঘোচে না। গুয়াডেলুপ্ দ্বীপ এই দ্বীপগুলির অন্যতম এবং কোনো দিক হইতেই কালিফোর্ণিয়ার উপকূলবর্ত্তী ভূভাগের সহিত কোনো সংযোগ না থাকাতে ইহা প্রকৃতপক্ষে সামুদ্রিক দ্বীপ। অথচ এই দ্বীপের তাবৎ প্রাণী ও উদ্ভিদ্ কালিফোর্ণিয়া হইতেই
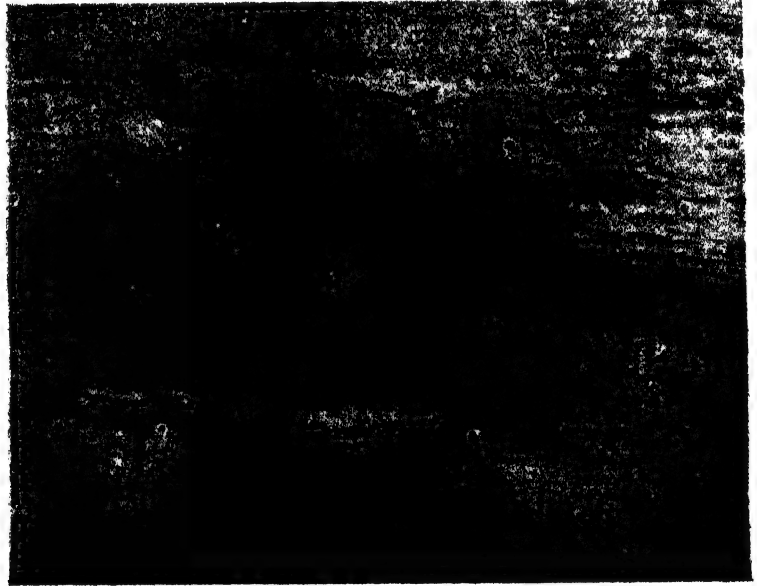
লোমশ শিল—অলস এবং নির্ব্বোধ

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

আসিয়াছে। সারা দ্বীপটি কোনো সুদূর অতীতে আগ্নেয় শক্তির তাড়নে নীল মহাসমুদ্রগর্ভ হইতে সহসা জন্মলাভ করিয়াছিল তাহার বহু প্রমাণ পাওয়া যায়—প্রকৃতপক্ষে দ্বীপের উত্তর ভাগ একটি অধুনা-নির্ব্বাপিত আগ্নেয়গিরির অংশ মাত্র, সমুদ্র জল হইতে প্রায় ৪৫০০ ফুট খাড়া, গলিতধাতু প্রস্তরের দেওয়াল এরূপভাবে দণ্ডায়মান যে সেদিক হইতে দ্বীপে উঠিবার কোনো উপায় নাই। যে সব প্রাণী একবার জাতীয় শিল দেখিতে পাওয়া যাইত না। ইহার লোমশ চর্ম্ম অত্যন্ত মূল্যবান, সেজন্য উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতেই তিমি-শিকারী দলের জাহাজ এ অঞ্চলে যাতায়াত সুরু করে এবং ১৮১০ খৃষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া ১৮৯২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অর্থলোলুপ তিমি-শিকারীর দল জাহাজের পর জাহাজ পাঠাইয়া এই নিরীহ প্রাণীদিগকে লোমের জন্য অবাধ হত্যা করিয়া প্রায় দুই কোটি টাকা মূল্যের চর্ম্ম এখান হইতে

শিকারীর দল দেখিয়াও শিলগুলি পলাইতেছে না

এখানে আসিয়া পড়িয়াছিল, কালিফোর্ণিয়ার উপকূলে ফিরিবার তাহাদের আর সুযোগ ঘটে নাই, বহুকাল ধরিয়া নূতন স্থানের নূতন অবস্থার মধ্যে পড়িয়া থাকিয়া তাহাদের বহু পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইয়াছে—যেগুলি জীবতত্ত্বের দিক হইতে বিশেষ অনুসন্ধান ও আলোচনার বিষয়।

পূর্ব্বে গুয়াডেলুপের সমুদ্রকূলে একজাতীয় লোমশ শিল বাস করিত; প্রশান্ত মহাসাগরের অন্য কোন স্থানে সে সংগ্রহ করে। ফলে ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের পর উক্ত জাতীয় শিলের বংশে বাতি দিতে কেহ অবশিষ্ট ছিল না। বর্ত্তমানে গুয়াডেলুপ ও নিকটস্থ কয়েকটি দ্বীপে অন্য এক জাতীয় অতিকায় শিল বাস করে, হয় তো সেগুলিকেও ইউনাইটেড্ ষ্টেট্স্ গবর্ণমেণ্ট আইন করিয়া উহাদের হত্যা নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা না করিলে এতদিন সে জাতীয় শিলও টিঁকিত কি না সন্দেহ।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে উপকূলবর্ত্তী দ্বীপসমূহের প্রাণী ও উদ্ভিদের প্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য আমেরিকার কয়েকটি বিভিন্ন সমিতি একদল বৈজ্ঞানিককে গুয়াডেলুপ দ্বীপে প্রেরণ করেন। তাঁহারা গিয়াই প্রথমে অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করেন যে লোমশ শিলের বংশে বর্ত্তমানে কেহ কোথাও অবশিষ্ট আছে কি না। কিন্তু কয়েক দিন ধরিয়া নানা সম্ভব অসম্ভব স্থান খোঁজাখুঁজি করিবার পর তাঁহারা বুঝিলেন লোমশ শিলের শেষ বংশধরকে কসাইদিগের ছুরি হইতে উদ্ধার করিতে তাঁহাদের যে সময়ে আসা উচিত ছিল তদপেক্ষা চল্লিশ বৎসর পরে তাঁহারা আসিয়াছেন। দ্বীপের কয়েকটি স্থানের বিশেষ চিহ্ন পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাঁহারা বুঝিতে পারেন সেই সেই স্থানে লোমশ শিলের সুবৃহৎ দল সমুদ্রতীরে শয়ন করিয়া থাকিত; স্থানগুলি পরিমাপ করিয়া তাঁহারা অনুমান করেন যে, সমগ্র দ্বীপটীতে প্রথম অবস্থায় প্রায় দশলক্ষ লোমশ শিলের আবাসভূমি ছিল। দ্বীপের যে দিকটা পর্ব্বতময়, ইহাদের দল সেই দিকেই বাস করিত, বহুকাল ধরিয়া সংঘর্ষের ফলে সেদিকের লাভা প্রস্তরের বড় বড় খণ্ড মার্ব্বেল পাথর মসৃণ ও চক্‌চকে হইয়া পড়িয়াছে—জলের ধারের, গুহামুখের এই সব মসৃণ প্রস্তরখণ্ড লুপ্তবংশ হতভাগ্য লোমশ শিল জাতির মূক্ স্মৃতিচিহ্ন-স্বরূপ বর্ত্তমান থাকিয়া মানুষের হৃদয়হীনতা ও অর্থ লোলুপতার লজ্জাজনক কাহিনী নীরবে প্রচার করিতেছে।

বর্ত্তমানে গুয়াডেলুপ দ্বীপে এক জাতীয় অতিকায় শিল বাস করে। তাহাদিগকে দেখিতে অতি অদ্ভুত। খুব বড় বড়, গায়ের ত্বক্ খস্‌খসে ও পুরু, একটা করিয়া বড় শুঁড়-ওয়ালা, অতি কদাকার জীব। এক সময়ে এই জাতীয় শিল দক্ষিণ মহাসাগরের দক্ষিণ জর্জিয়া প্রভৃতি দ্বীপে বাস করিত, কিন্তু যেদিন হইতে তিমি শিকারীর দল জানিতে পারিল যে ইহাদের চর্ব্বি হইতে প্রচুর পরিমাণে মূল্যবান তৈল পাওয়া যায়, সেই দিন হইতেই মেরুসাগরীয় দ্বীপসমূহে ইহাদের হত্যাকাণ্ড আরম্ভ হইল এবং যখন দেখা গেল যে ইহাদের সংখ্যা এত কম হইয়া গিয়াছে যে শিকারের খরচা পোষায় না, তখনই মাত্র ছাড়িয়া দেওয়া হয়। গুয়াডেলুপ দ্বীপের

অতিকায় ফণিমনসাজাতীয় গাছে পাখীর বাসা

নিকটস্থ সান্ বেনিটো, সেড্রোস প্রভৃতি দ্বীপেও পূর্ব্বে শিল ছিল কিন্তু মনুষ্যের অত্যাচারে তাহাদের বংশ লুপ্ত হইয়াছে। গুয়াডেলুপ দ্বীপের শিলের দল যে রক্ষা পাইয়াছে তাহা একটি দৈবঘটনা মাত্র।

উপরোক্ত বৈজ্ঞানিকদল দ্বীপের উত্তর ভাগের উপকূলে একদল অতিকায় শিলকে বালুসৈকতে শায়িতাবস্থায় দেখিতে

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

পান, ইহারা এত অলস এবং নির্ব্বোধ যে মানুষ দেখিলেও নড়ে না, পিট্‌পিট্‌ করিয়া কৌতূহলের দৃষ্টিতে চাহিয়া চাহিয়া দেখে। বোধ হয় লোমশ শিলগুলিও এইরূপই ছিল এবং বিশেষ করিয়া সেইজন্যই এত শীঘ্র তাহাদিগকে ধরাধাম হইতে বিদায় লইতে হইয়াছে—হিংস্র মানব এই নির্ব্বোধ, অসহায় প্রাণীদের উপর এতটুকু কৃপাপ্রকাশ করে নাই। তাহাদের নিরীহ রক্তে শুভ্র সৈকতভূমি রঞ্জিত করিয়াছে, শুধু ধন-লালসায় ও আমোদের পূর্ত্তির জন্য। ডাঃ এভার-

পাহাড়ের গায়ে পাখীর বাসা

ম্যান্ উপরোক্ত দলের অধিনায়ক ছিলেন, তাঁহারা একটি বড় শিলের দলের অত্যন্ত নিকটে গিয়া দলটির ফটোগ্রাফ গ্রহণ করেন, বর্ত্তমান প্রবন্ধের সেই ছবিটি দেখিলেই বোঝা যাইবে যে এই জীবগুলি এতই নির্ব্বোধ যে এত অত্যাচার সত্ত্বেও মানুষ দেখিলে পলায়নের চিন্তা তাহাদের মোটা বুদ্ধিতে আদৌ আসে না। এমন কি তাঁহাদের দলের কেহ কেহ পায়ে পায়ে ইহাদের অত্যন্ত নিকটে গিয়া ইহাদের পিঠ চাপড়াইতে থাকেন, কেহ কেহ বা ঘোড়ার ন্যায় ইহাদের পিঠে চড়িয়া বসেন, ইহারা শুধু পিট্‌পিট্‌ করিয়া চাহিয়া থাকে মাত্র, নড়েও না চড়েও না। এরূপ নিরীহ প্রাণীকেও হত্যা করিতে হাত উঠে !...

সে যাহা হউক্, ডাঃ এভারম্যান ও তাঁহার দল ফিরিয়া গিয়াই যাহাতে অতিকায় শিলগুলির অবাধ হত্যা বন্ধ হয় সেদিকে মেক্সিকো গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকৃষ্ট করেন, এবং সম্প্রতি মেক্সিকো গবর্ণমেণ্ট আইন জারি করিয়াছেন যে, তাঁহাদের বিনানুমতিতে এই সকল দ্বীপে অতিকায় শিল কেহ শিকার করিতে পারিবে না।

অতিকায় শিল ব্যতীত আরও নানাপ্রকার প্রাণী ইঁহারা গুয়াডেলুপ ও নিকটবর্ত্তী সেড্রোস্ দ্বীপে দেখিতে পান। সেড্রোস্ দ্বীপ একেবারে মরুময়, ইহার অধিকাংশই কঠিন লাভা প্রস্তরের উচ্চাবচ ভূমি ও বৃক্ষলতাশূন্য কটারংএর বালুস্তূপ। এই দ্বীপের পশ্চিমাংশে লাভা-ক্ষেত্র যেখানে ঢালু হইয়া সমুদ্রে নামিয়া আসিয়াছে, সেই সমতল নিম্নভূমিতে এক সময় উদ্বিড়াল জাতীয় এক প্রকার সামুদ্রিক প্রাণী (Sea Otter) বাস করিত। ইহারা পাথরের ফাঁকে ফাঁকে সামুদ্রিক কাঁকড়া খুঁজিয়া খাইয়া বেড়াইত ও সৈকতভূমিতে দলে দলে রৌদ্র পোহাইত। কিন্তু ইহাদের চর্ম্মও বাজারে উচ্চমূল্যে বিক্রয় হয়—ফলে ইহারাও প্রায় লোমশ শিলের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছে; বর্ত্তমানে যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহা অতি সামান্য। সান ডিয়েগো প্রভৃতি দ্বীপ হইতে বিভিন্ন সময়ে প্রায় তিন কোটি টাকা মূল্যের উদ্বিড়ালের চর্ম্ম ইউরোপ ও আমেরিকার বাজারে প্রেরিত হইয়াছে।

সেড্রোস্ দ্বীপের লাভাময় ভূমিতে এক জাতীয় ফণিমনসা গাছ ছাড়া অন্য গাছ বড় একটা জন্মে না, তবে এক প্রকারের অদ্ভুত বৃক্ষ স্থানে স্থানে দেখিতে পাওয়া যায় ইহাকে ডাঃ এভারম্যান নাম দিয়াছেন Elephant tree। এই বৃক্ষ দেখিতে অতি কদাকার, গুঁড়িটা খর্ব্বকায়, অত্যন্ত স্থূল এবং

দূর হইতে দেখিলে মনে হয় যেন গাছটার সর্ব্বাঙ্গে ফোড়া হইয়াছে। ইহার গুঁড়ির বেড় তিন হইতে পাঁচ ফুট, উচ্চতা প্রায়ই আট ফুটের বেশী হয় না, ছালের রং পীতাভ সাদা। অস্ত্র দ্বারা ছিদ্র করিলে গাছের গা হইতে ঘন দুগ্ধের মত এক প্রকার সাদা রস ঝরিতে থাকে। সেড্রোস্ দ্বীপে কূলবর্ত্তী অগভীর জলে নানা প্রকারের মৎস্য, চিংড়ি ও কাঁকড়া দেখিতে পাওয়া যায়—তন্মধ্যে কয়েকটির রং অতি সুন্দর, বিশেষ করিয়া ইন্দ্রধনু রংএর এক জাতীয় মাছ এত যে, ইউরোপ ও আমেরিকার মিউজিয়ামের জন্য নমুনা সংগ্রহ করিতে এখানে মাঝে মাঝে শিকারীর দল আসে। শীতকালে

সেড্রোস দ্বীপে Elephant tree

এখান হইতে এক প্রকার বৃহৎকায় চিংড়ি মাছ রাশি রাশি ধৃত হইয়া সান্ ফ্রান্সিস্কো রপ্তানী হইয়া থাকে।

সেড্রোস্ দ্বীপের পনেরো মাইল পশ্চিমে বেনিটো দ্বীপপুঞ্জে যথেষ্ট Sea-lion দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারাও শিলজাতীয় জন্তু, তবে ইহাদের চর্ব্বি বা চর্ম্ম এখনও পণ্যদ্রব্য মধ্যে স্থান না পাওয়াতে

বেনিটো দ্বীপপুঞ্জে ভীরুস্বভাবSea-lionএর দল

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

তিমি-শিকারীদের অত্যাচার এখনও ইহাদের উপর সুরু হয় নাই। তাহা ছাড়া ইহারা এত হুঁসিয়ার ও ভীরুস্বভাবের জন্তু যে, কোনোরূপ সন্দেহজনক শব্দ কানে যাইবামাত্র হুড়মুড়্ করিয়া দলশুদ্ধ গিয়া সমুদ্রের জলে পড়ে ও তৎক্ষণাৎ ডুব দিয়া অদৃশ্য হইয়া যায়।

সেড্রোস দ্বীপে সূর্য্যোদয়

এই সমুদয় দ্বীপের কঙ্কর বালুকা ও লাভাপ্রস্তরময় ভূমিতে এক প্রকার অতিকায় ফণিমনসা জাতীয় (cactus) উদ্ভিদ জন্মে। সান্টা মার্গারিটা, নেটিভিডাড্ প্রভৃতি দ্বীপের অনেক স্থানে এই গাছের উচ্চতা ৬০ ফুটেরও বেশী। (অন্যত্র ছবি দ্রষ্টব্য)'। শেষোক্ত দ্বীপে উত্তরাংশে এই বৃক্ষের অরণ্য আছে বলিলেও বেশী বলা হয় না। ডাঃ এভারম্যান লিখিয়াছেন, "জুলাই মাসের শেষ ভাগে যখন আমরা এই দ্বীপে যাই, তখন এই অতিকায় ফণিমনসা গাছের কণ্টকময় শীর্ষগুলি সুপক্ক ফলে ভরিয়া গিয়াছে এবং কাট্‌ঠোক্‌রা ও নানা বন্যপক্ষীদের দল মহাকলরবে ফলভোজনে মত্ত। আমরাও দু একটি ফল মুখে দিয়া দেখিলাম সুপক্ক ফলগুলির আস্বাদ অতি সুমিষ্ট, ঘ্রাণ ও ভিতরের শাঁস অনেকটা র‍্যাস্পবেরি ফলের ন্যায়। খাইলে তৃষ্ণা নিবারিত হয়—ফলগুলি বড় গাবের মত দেখিতে এবং অত বড়।"

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্রহ্মদেশে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য

যদিও ভারতবর্ষের মধ্যে কাশ্মীর প্রভৃতি এমন অনেক স্থান আছে যাহার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের তুলনা পৃথিবীতে আর কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, তথাপি ব্রহ্মদেশের সৌন্দর্য্যের এমন একটা বিশেষত্ব আছে যাহা অন্যত্র বিরল, উহা বর্ম্মারই নিতান্ত নিজস্ব সম্পত্তি। যখন উত্তর ভারতের ঐতিহাসিক স্থানসমূহের অথবা নৈনিতাল, মশুরি, সিমলার দৃশ্য একঘেয়ে হইয়া যায়, হিন্দি কথা বলিতে বলিতে এবং হিন্দুস্থানীদের এক রকমের চেহারা দেখিতে দেখিতে আমাদের বিরক্তি বাড়িয়া উঠে, তখন বর্ম্মার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাষা ও সর্ব্বোপরি তদ্দেশীয় নরনারীর কমনীয় চেহারা মধুর ব্যবহার ও বিচিত্র বেশভূষা আমাদের মধ্যে নূতনত্বের আনন্দ আনিয়া দেয়। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের দেশের খুব কম লোকই কেবলমাত্র ভ্রমণের উদ্দেশ্যে বর্ম্মায় গিয়া থাকেন। কোন কাজকর্ম্মের উপলক্ষ্য ভিন্ন কেবলমাত্র প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উপভোগ করিবার জন্য সে দেশে যাওয়া ঘটিয়া উঠে না। সমাজতত্ত্ব ও মানববিজ্ঞানের দিক্ দিয়াও তথায় শিখিবার অনেক জিনিষ আছে। ভারতবর্ষের একটি অংশ হইয়াও এই দেশের অধিবাসীরা চেহারায় আচারে ব্যবহারে যে কত পৃথক তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়।

বর্ম্মায় গেলে প্রথমেই এই দেশের সহরগুলির নাম আমাদের নিকট নূতন ও রহস্যময় বলিয়া মনে হয়, তাহার পরই এই দেশের নরনারী। আমাদের চিরপরিচিত কানপুর, মির্জ্জাপুর, বিলাসপুর, নাগপুর ইত্যাদির পরই পেগু, মিংগ্যমো, ভামো, মোলমিন, মোবিন ইত্যাদি নাম শুনিতে যেন কেমন একটু বেখাপ্পা ঠেকে এবং স্বভাবতঃই মনে করাইয়া দেয় যে ইহারা আমাদের নিকট আত্মীয় নহে।

নিম্ন-বর্ম্মার প্রধান সহর রেঙ্গুন ও মোলমিন অনেকেরই নিকট সুপরিচিত, আধুনিক যুগের আদর্শানুযায়ী নির্ম্মিত। রেঙ্গুনের শিউ ডাগোন প্যাগোডা বিখ্যাত বৌদ্ধ-মন্দির। প্যাগোডার নিকটবর্ত্তী হ্রদটির দৃশ্য অতি মনোরম।

ম্যাণ্ডালে হইতেই প্রকৃতপক্ষে উত্তর বর্ম্মার সীমা আরম্ভ হইয়াছে। রেঙ্গুন হইতে ম্যাণ্ডালে ট্রেনে যাওয়া যায়, কিন্তু ইরাবতী নদীর দুই পার্শ্বের দৃশ্য দেখিতে হইলে প্রোম অবধি ট্রেনে গিয়া তাহার পর ষ্টীমারে ম্যাণ্ডালে যাইতে হয়। ম্যাণ্ডালে বর্ম্মার পুরাতন রাজধানী। রাজা থিবোর নিকট হইতে এই নগর ইংরাজরা ১৮৮৫ সালে অধিকার করেন। রাজপ্রাসাদ ও কেল্লা ১৮৫৭ সালে বর্ম্মার সর্ব্বপ্রধান নরপতি মুন্-ডুন্-মিন্ তৈয়ার করাইয়াছিলেন। রাজপ্রাসাদের মধ্যস্থিত সিংহাসন-গৃহ ও সেগুন কাষ্ঠের নির্ম্মিত কারুকার্য্যখচিত স্তম্ভগুলি দেখিতে অতি সুন্দর ও চমকপ্রদ। ম্যাণ্ডালে পর্ব্বতের উপর হইতে চতুর্দ্দিকের দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। আরাকান প্যাগোডা এই স্থানের প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ-মন্দির।

মোটর যাইবার প্রশস্ত পথ

ম্যাণ্ডালেকে কেন্দ্র করিয়া বিভিন্ন রুচির লোক বিভিন্ন দিকে বাহির হইয়া পড়েন। যাঁহারা আমোদ প্রমোদ

শ্রীহিমাংশুকুমার বসু

নাচ গান ভাল বাসেন তাঁহাদের পক্ষে মিয়ামোই উপযুক্ত স্থান। যাঁহারা ইতিহাস চর্চ্চা করিতে বা প্রত্নতত্ত্বের খোঁজ লইতে চান অথবা ছবি আঁকার মাল মশলা সংগ্রহ করিতে চান তাঁহারা একাদশ শতাব্দীর পুরাতন রাজধানী পেগানে যান। তথায় ঐতিহাসিক যুগের বহু পুরাতন জিনিষ দেখিতে পাওয়া যায়। সহরটিকে প্যাগোডার সহর বলিয়াও অভিহিত করা যাইতে পারে। এতগুলি ছোট, বড় ও মাঝারি প্যাগোডার সমাবেশ আর কোথাও দেখা যায় না। ম্যাণ্ডালের নিকটবর্ত্তী আভা নগরীও এককালে সমৃদ্ধিশালী ছিল। জনবিরল স্তব্ধ প্রকৃতির সৌম্য সৌন্দর্য্যের ভিতর

মোলক খনিতে যাইবার পথ

দিয়া মুগ্ধনেত্রে যাঁহারা ভ্রমণ করিতে ভালবাসেন, তাঁহাদের পক্ষে ষ্টীমার ভ্রমণের ন্যায় আরামদায়ক আর কিছুই নাই। ইরাবতীর শাখা চান্দউইন নদীতে উত্তর পশ্চিম দিকে হোমালিন্ পর্য্যন্ত যাওয়া যায়। উত্তর পূর্ব্ব দিকে ইরাবতী দিয়া ভামো পর্য্যন্ত যাওয়া যায়।

নদীর দুই পার্শ্বের দৃশ্য অতি মনোহর। ছোট ছোট পাহাড় নদীর মধ্য হইতে ৬০০ ফিট ও তদূর্দ্ধ পর্য্যন্ত খাড়া উঠিয়া গিয়াছে, স্থানে স্থানে জলপ্রপাত ও ঘূর্ণীর আধিক্য দেখিয়া মনে যুগপৎ ভীতি ও বিস্ময়ের সঞ্চার হয়। বর্ম্মার জঙ্গলে নানা প্রকার মূল্যবান কাঠ প্রচুর পরিমাণে জন্মে। এই সব কাঠ কাটিয়া নদীতে ভাসাইয়া দেওয়া হয়; ভাসিতে ভাসিতে কাঠগুলি নিম্নপ্রদেশে আসিয়া পৌছিলে মালিকেরা ঐগুলিকে ডাঙ্গায় টানিয়া তুলে। অনেক কাঠ একত্র ভেলার মত করিয়া বাঁধিয়াও ছাড়িয়া দেয়। নদীগুলি না বাঁকিয়া স্থানে স্থানে এমন সরলগতিতে বহিয়া গিয়াছে যে জ্যোৎস্না রাত্রিতে মনে হয় যেন কেহ নদীপার্শ্বস্থিত পাহাড়ের গা ঘেঁসিয়া সাদা রেখা আগাগোড়া টানিয়া দিয়াছে।

ইরাবতী নদী দিয়া উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্তে ভামো সহরে পৌছান যায়। এই সহরটি চীন সীমান্তের নিকট অবস্থিত থাকায়, চীনের সহিত বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছে। সহরের অধিবাসীদের মধ্যে অধিকাংশই কাচীন, শান্ বা চীনা। ম্যাণ্ডালের নিকটবর্ত্তী গক্‌টেকের সেতুও একটি দেখিবার জিনিষ। এই খিলানবিশিষ্ট সুদীর্ঘ সেতুটি পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। সেতুটি পর্ব্বতগহ্বরের উপর নির্ম্মিত; ইহার উপর দিয়া রেল লাইন বর্ম্মার পূর্ব্ব সীমান্তের নিকটবর্ত্তী লাশিও নগর পর্য্যন্ত গিয়াছে।

ব্রহ্মদেশের উপরিভাগ আগা গোড়াই পর্ব্বত, জঙ্গল ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীতে সমাচ্ছন্ন। যাঁহারা সাহসী ও কষ্টসহিষ্ণু তাঁহারা পূর্ব্ব সীমান্তে শান্ ও কাচীন্‌দের দেশে, উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্তে পার্ব্বত্য অধিবাসীদের দেশে ও পশ্চিম সীমান্তে ওয়া, চিন্, নাগা প্রভৃতি আদিম অধিবাসীদের দেশে ভ্রমণ করিয়া অনেক বিষয় দেখিয়া শুনিয়া অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে পারেন। এই সব সীমান্ত প্রদেশের দৃশ্যও অতি মনোরম। নাম-না-জানা নানা প্রকারের পার্ব্বত্যফুল ও ফল এই সকল স্থানে প্রচুর দেখিতে পাওয়া যায়। দূরে তুষারাবৃত গিরিশৃঙ্গ

দেখিতে অতি চিত্তাকর্ষক। বর্ম্মার পূর্ব্বদিকে শান রাজ্যের অনেক স্থান মোটরে ভ্রমণ করা যায়, রাস্তাগুলিও ভাল। যেদিকে দৃষ্টি যায়, সেই দিকেই ঘাসের সবুজ আবরণ বহুদূর পর্য্যন্ত পর্ব্বতরাজির কোল ঘেঁসিয়া বিস্তৃত রহিয়াছে। কখনও বা উপরে উঠিয়া এবং তৎপরেই নীচে নামিয়া অধিত্যকা ও উপত্যকার উপর দিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া রাস্তা দূরে সীমান্তে মিশিয়া গিয়াছে। ১৫।২০ মাইল পরে কদাচিৎ কোথাও চীনা, শালা মৈন্‌গথা প্রভৃতি প্রাকৃতিক শোভা দেখিতে দেখিতে আপনাকে ভুলিয়া যাইবার এমন সুযোগ খুব অল্পই ঘটিয়া থাকে।

দক্ষিণ শান রাজ্যের মধ্যে কলউ (Kalaw) অতি মনোরম পার্ব্বত্য স্বাস্থ্য-নিবাস। স্থানটি সমুদ্র হইতে ৪৩০০ ফুট উচ্চে অবস্থিত, আবহাওয়া বৎসরের সকল সময়েই ঠাণ্ডা ও স্বাস্থ্যপ্রদ। বহু স্বাস্থ্যনিবাস ও হোটেল থাকায় অনেক লোক এখানে আসিয়া থাকে। এই সহর হইতে ৮০ মাইল

নামযুমের বান্দার

জাতীয় আদিম অধিবাসীদের গ্রাম দৃষ্টিগোচর হয়। জনবহুল সহরে অনেকদিন বাস করিবার পর এই সব প্রদেশে ভ্রমণে বাহির হইলে মুক্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচা যায়। অবসাদ-ক্লান্তদেহ স্বাস্থ্যসম্পদের সন্ধান পায়, চিন্তা-জর্জ্জরিত মন উৎফুল্ল হইয়া উঠে। পথচলায় মানুষের সহিত মানুষের ঠোকাঠুকির ভয় নাই, কাজকর্ম্মের তাড়াতাড়া নাই, উদ্বেগের কোন কারণ নাই, একাকী আপনার মনে পাহাড় পর্ব্বতের উপর ঘুরিয়া, শ্যামল তৃণরাজির উপর শয়ন করিয়া চতুর্দ্দিকের দূরে ইন্‌লে হ্রদ, তথাকার ভাসমান দ্বীপগুলি দেখিবার মত জিনিষ।

ম্যাণ্ডালের উত্তরে ইরাবতী নদীর ধারে থাবিট্‌কিন্‌ নামক স্থান হইতে ৬০ মাইল মোটরে করিয়া পূর্ব্ব দিকে গেলে বর্ম্মার প্রসিদ্ধ হীরকখনি মোগোকে পৌছান যায়। এই হীরক-খনির মালিক হওয়াই এ পর্য্যন্ত বর্ম্মার রাজাদের সর্ব্বাপেক্ষা গর্ব্বের কথা ছিল। এই স্থানে বিভিন্ন জাতীয় লোকের বিচিত্র সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীহিমাংশুকুমার বসু

ব্রহ্মদেশ ভ্রমণের পক্ষে শীতকালই সর্ব্বাপেক্ষা অনুকূল, যদিও বর্ষাকালের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যও উপেক্ষণীয় নহে। বর্ষাকালের সতেজ উদ্ভিদ্‌রাজি ও সদ্যস্নাত পর্ব্বতমালার সৌন্দর্য্য বিশেষ করিয়া মনোহরণ করে।

নটীর দল

শ্রীহিমাংশুকুমার বসু

তিব্বতীয় লামাদের আনুষ্ঠানিক নাচ

কাশ্মীরের উত্তর-পূর্ব্ব দিকে তিব্বতের মধ্যে 'লাঠাক' নামক একটি ক্ষুদ্র প্রদেশ আছে। লাঠাকে চারিটি পুরাতন বৌদ্ধ-মঠ আছে ও তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রধানটির নাম 'হিমিস্ গোম্পা'। এই মঠে প্রায় আটশত ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী বসবাস করে। এই স্থানে প্রত্যেক বৎসর জুন মাসে এক প্রকারের নিদর্শনাত্মক নাচ হইয়া থাকে। তিব্বতের অন্যান্য বৌদ্ধ মঠেও ইহারই অনুরূপ নাচ বৎসরে একবার হয়। বহুদূর হইতে বহুকষ্ট স্বীকার করিয়া অসংখ্য নরনারী নাচের সময় মঠে আসিয়া উপস্থিত হয়। নাচটি তিন দিন ধরিয়া চলে—ইহার বিশেষত্ব এই যে প্রধান ধর্ম্মযাজক হইতে মঠের ভিক্ষুরা পর্য্যন্ত ইহাতে যোগদান করেন। যদিও এতাবৎকাল সাধারণ লোকে ইহাকে প্রধানতঃ ভূত প্রেত তাড়াইবার নাচ বলিয়াই মনে করিয়া আসিতেছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই নাচের যে একটা বিশেষ অর্থ আছে তাহার ধারণা অনেকেরই নাই। বিভিন্ন প্রকারের ভয়াবহ ও বিকটাকার মুখোস পরিয়া এই নাচে লামারা যোগদান করিয়া থাকেন।

বৌদ্ধ-ধর্ম্মযাজকেরা পুনর্জ্জন্মে বিশ্বাস্ করেন এবং মৃত্যুর পর পরলোকে যাইবার পথে যমরাজের সাঙ্গোপাঙ্গেরা আত্মাকে তাহার পথ হইতে বিচ্যুত করিবার জন্য নানা-প্রকার বীভৎস মূর্ত্তি ধরিয়া ভয় দেখায়, এই ধারণা তাঁহাদের

মধ্যে বদ্ধমূল। যদি ভয় পাইয়া একবার কেহ শয়তানের কবলে পড়ে তাহা হইলে তাহাকে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য পথ খুঁজিয়া যথাতথা ঘুরিয়া মরিতে হইবে। সাধারণ লোকে যাহাতে এই সব বিকটাকার ভূত প্রেত দেখিয়া মৃত্যুর পর ভয় না পায় এবং নিজের গন্তব্যস্থলে অবিচলিত চিত্তে চলিয়া যাইতে পারে, তাহারই জন্য এই নাচের অনুষ্ঠান ও এই সব কিম্ভুত-কিমাকার মূর্ত্তির আমদানি। সকলেই যদি এই প্রকারের ভূত প্রেতের বিষয় অবগত থাকে ও অলৌকিক শক্তির ক্ষমতা-প্রদর্শন এই অনুষ্ঠানের প্রধান অঙ্গ। জল, স্থল, আকাশ, বাতাস কোন স্থানই পিশাচশূন্য নয় এবং তাহারা সকলেই যেন বিকট চেহারা লইয়া দর্শকদের অভিমুখে ছুটিয়া যাইতেছে এইরূপ অভিনয় করা হয়। একমাত্র ধর্ম্মনিষ্ঠ পুরোহিতেরাই যে এই পিশাচাদির দুষ্ট প্রভাব হইতে সকলকে মুক্ত করিতে পারেন, তাহা তাঁহাদের আগমনে এই সব ভূত প্রেতের পলায়ন হইতেই বুঝা যায়।

কাগজ-নির্ম্মিত ড্রাগন সহ মুখোসপরিহিত নর্ত্তকদল

সাবধান হয় তাহা হইলে মৃত্যুর পর সহসা ইহাদিগকে পথে দেখিতে পাইয়া কেহ আর বিচলিত হইবে না।

মন্দির প্রাঙ্গণে বিকটাকার মুখোস ও নানা প্রকারের অদ্ভুত পোষাক পরিহিত লোকেরা নাচ, গান, ঠাট্টা, মস্করা ইত্যাদি সমস্ত দিন ধরিয়াই করিয়া থাকে। কখনও ভয়াবহ দৃশ্যের অবতারণা, কখনও উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার, কখনও নানা প্রকারের অদ্ভুত বাদ্যযন্ত্রের ঐকতান একত্র মিশিয়া এক বীভৎস ব্যাপারের সৃষ্টি ও দর্শকদের মনে ভীতির সঞ্চার করে। চতুর্দ্দিকে হৈ হৈ রৈ রৈ, মারধর এবং দলের পর দলের আগমন, ভৌতিক ও যাদুবিদ্যার

সর্ব্বপ্রথমে একদল লোক অদ্ভুত অদ্ভুত ও ভয়ঙ্কর জীব জন্তুর আকৃতির মুখোস পরিয়া ঘণ্টাধ্বনি, কাঠির দ্বারা ঠক্ ঠক্ শব্দ ও চীৎকার করিতে করিতে প্রাঙ্গণে আসিয়া অবতীর্ণ হয়। বাজনদারেরাও ঐ সঙ্গে খুব জোরে বাজনা বাজাইতে থাকে। কিয়ৎক্ষণ এইরূপ উদ্দাম ও উচ্ছৃঙ্খল নাচ চলিবার পর সহসা সকলে একেবারে থামিয়া যায় এবং চীৎকার করিতে করিতে ইতস্ততঃ পলায়ন করে, কারণ এইবার পুরোহিতের দল জাঁকজমক পোষাক পরিয়া ও পবিত্র মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে মন্দিরের মধ্য হইতে ধীরে ধীরে প্রাঙ্গণে নামিয়া আসেন। সাত জন লামা বুদ্ধদেবের সাতটি

শ্রীহিমাংশুকুমার বসু

পূর্ব্বজন্মের মূর্ত্তির অনুরূপ মুখোস পরিয়া গম্ভীর ও ধীর পদক্ষেপে আসিয়া শ্রেণীবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান হইলে পর উপস্থিত দর্শকগুলি, অভিনেতারা ও দলের পর দল শ্রুতিমধুর সঙ্গীত বাদ্যযন্ত্র সহকারে গীত হয়।

এইরূপে প্রথম অঙ্ক অভিনীত হইবার পর সহসা বাদ্য ও সঙ্গীত থামিয়া যায় এবং একদল লোক ছিন্নবস্ত্র পরিয়া
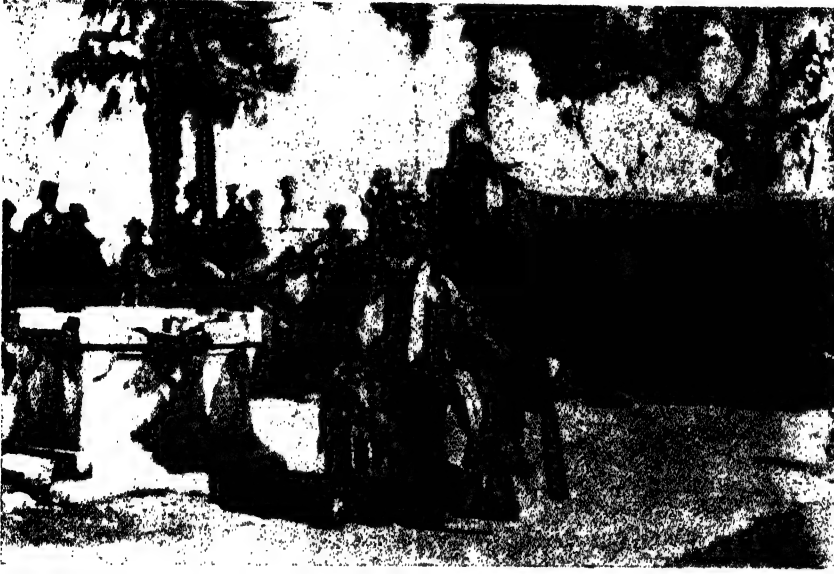
বিকটাকার মুখোসের নমুনা

মুখোস পরিহিত লামাদের নৃত্য

ভিক্ষুরা একে একে আসিয়া তাঁহাদের পায়ে সসম্ভ্রমে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিতে থাকে। এই সময় সর্ব্বক্ষণই মধুর ও গম্ভীর মন্ত্রধ্বনি উচ্চারিত হইতে থাকে ও ধীরে ধীরে সুন্দর আসরে উপস্থিত হয়। সকলেরই মুখে উদ্বেগ ও ভয়ের চিহ্ন পরিস্ফুট ; কেহ বা শীতে কাঁপে, কেহ বা অন্ধের মত ঘুরিতে ঘুরিতে এদিকে ওদিকে সম্মুখে যাহা পায় তাহাই

আঁকড়াইয়া ধরে ও মুখে ঝড়ের ন্যায় শাই শাঁই শব্দ করিতে থাকে। এই দৃশ্য ও শব্দের সমাবেশ দর্শকের মনে নিরানন্দ আনিয়া দেয়। ইহাই পথভ্রান্ত আত্মার দুর্গতির দৃশ্য। ইহার মধ্যেই আবার ভীষণ ভীষণ জীব জন্তুর মুখোস পরিহিত ভূত প্রেতেরা আবির্ভূত হয় ও ভয় দেখাইয়া ও পিছনে পিছনে তাড়া দিয়া তাহাদের উদ্বাস্ত করিয়া মারে। এক এক সময় মনে হয় যেন আত্মাগুলির পরিত্রাণের আর কোনই উপায় নাই, সকলেই করুণস্বরে চীৎকার করিতে

চারণবেশী লামা

করিতে এ উহাকে ধরিয়া কোনও মতে এদিকে ওদিকে পলাইয়া বাঁচিতে চেষ্টা করে। এমন সময় পুনরায় পুরোহিতের দল আসিয়া উপস্থিত হন ও কমণ্ডলুর জল মন্ত্রপূত করিয়া সকলের দিকে ছিটাইয়া দিলে পর আবার কিছুক্ষণের জন্য উহারা শান্ত হয়। এই অভিনয় বহুবার অনুষ্ঠিত হয় এবং পরিশেষে অসুরদের সহিত পুরোহিত দলের যুদ্ধের পর অভিনয় শেষ হয়। বলা বাহুল্য সর্ব্বশক্তিমান ধর্ম্মযাজকেরাই শেষ পর্য্যন্ত জয়ী হন।

এই অভিনয় ও নৃত্য হইতে সকলকে ইহাই বুঝাইয়া দেওয়া হয় যে, যাহারা ধার্ম্মিক ধর্ম্মযাজকেরা তাহাদের সাহায্য মৃত্যুর পরও করিয়া থাকেন ও প্রকৃত পথ দেখাইয়া দেন। সকলেই যে এই ব্যাখ্যা সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে তাহা মনে হয় না, কারণ দর্শকমণ্ডলী হইতে আরম্ভ করিয়া অনেক লামারা পর্য্যন্ত সময়োচিত গাম্ভীর্য্য বজায় রাখেন না, অযথা হাসি, ঠাট্টা, মস্করা, তামাসায় যোগদান করেন ও শেষবেলা এই অনুষ্ঠানটিকে প্রায় বাৎসরিক আনন্দোৎসবেই পরিণত করিয়াছেন। নানা ধর্ম্মের মতই এই স্থানেও বৌদ্ধ ধর্ম্ম-নিহিত প্রকৃত ব্যাখ্যার অর্থ না বুঝিয়া তাহার খোলসের উপরই সকলে বেশী দৃষ্টি দিয়াছেন। এখন কেবলমাত্র এই বাৎসরিক অনুষ্ঠানটিকেই সফল করিবার দিকে সকলের মন ও এত উদ্যোগ আয়োজন। *

* ইণ্ডিয়ান ষ্টেট্ রেলওয়ে ম্যাগাজিনের সৌজন্যে

শ্রীহিমাংশুকুমার বসু

বাউল গান

মৌলভী মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন

বাউল শব্দটা বাউর হইতে উৎপত্তি লাভ করিয়াছে বলিয়া কেহ কেহ বলেন। উত্তর ভারতের বাউরের শব্দে আমাদের দেশের বাউলের যথেষ্ট সৌসাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। ডক্টর ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহোদয় বলেন, বাউল শব্দটি আউল শব্দজ, কেন না আমরা সাধারণতঃ আউল বাউল বলি। আউল শব্দটি আরবী আউলিয়া সম্ভূত, আউলিয়া ঋষি।

বাউলের জন্ম ১৪শ শতাব্দীর শেষভাগে কি পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে। বাউল জন্ম গ্রহণ করিয়াছে সিদ্ধ ও মুসলমান ফকির হইতে। ১৬শ, ১৭শ ও ১৮শ শতাব্দীতে বাউল যথেষ্ট প্রবল ছিল। বাউল দলের সঙ্গে বৈরাগীদলের কোন সম্পর্ক নাই। বাউল দল তাহাদের নিজেদের গান ব্যতীত অন্য কোন গান গাহিত না; কিন্তু অন্য লোকেরা বাউল গান গাহিত।

বাউলের লক্ষণ হইতেছে, সে মনের মানুষ খুঁজিতেছে, তাহার ধর্ম্ম হইতেছে সহজ ভাব, দেহকে বিশ্বের ক্ষুদ্র সংস্করণ মনে করে, এই দেহের মধ্যে চন্দ্র সূর্য্য আছে, জোয়ার ভাটা চলিতেছে। তাহার ভাব চর্য্যা ভাব; জীবনের ব্যবসায় হইতে উপদেশ গ্রহণ করিতেছে। বাউলের মধ্যে মোটেই বৈরাগীর ভাব নাই। যদিও বা থাকে তাহা আছে শুধু মজা গ্রহণ করিবার জন্য মাত্র।

বাউল সম্বন্ধে বেশী কথা আমার জানিবার সৌভাগ্য হয় নাই। বিভিন্ন ধরণের বাউল গানের উদাহরণ প্রদান করিয়া বিদায় লইতেছি।

(১) (ক) মনের মানুষ—

* * * *

আমার মনের মানুষ যে রে
আমি কোথায় পাব তারে,
হারিয়ে সেই মানুষে দেশ বিদেশে
বেড়াই ঘুরে।

আমি মন পাইলাম মনের মানুষ পাইলাম না।
আমি তার মধ্যে আছি মানুষ তাহা চিনল না॥

* * * *

মানুষ হাওয়ায় চলে হাওয়ায় ফিরে, মানুষ হাওয়ার সনে রয়,
দেহের মাঝে আছেরে সোনার মানুষ, মানুষ ডাকলে কথা কয়।
তোমার মনের মধ্যে আর এক মন আছে গো—
তুমি মন মিশাও সেই মনের সাথে।
দেহের মাঝে আছেরে মানুষ ডাকলে কথা কয়।

* * * *

মনের মানুষ যেখানে
আমি কোন সন্ধানে যাই সেখানে।

* * * *

মনের মানুষ না হ'লে গুরুর ভাব জানা যায় কিসেরে

* * *

আমি দেখে এলেম ভবের মানুষ তোর
কোপনি এক নেংটি পরা—
সে মানুষ ক্ষণে হাসে ক্ষণে কাঁদে কোন যে
মণির মনোচোরা।
যে মানুষ ধরি ধরি
আশায় করি
সে মানুষ ধরতে গেলে না দেয় ধরা।

* * * *

তরিতে আছে আটা-মণি কোটা জলছে
বাতি রং মহলে
সেথানে মনের মানুষ বিরাজ করে
মন পরাণ তরী চলে।

* * *

এই মানুষে আছেরে মন
যারে বলে মানুষ রতন
লালন বলে পেয়ে সে ধন, পারলাম না চিন্‌তে।

* * *

কে কথা কয়রে দেখা দেয় না,
নড়ে চড়ে হাতের কাছে
খুঁজলে জনম ভর মিলে না।

আছে যার মনের মানুষ মনে সে কি জপে মালা
অতি নির্জ্জনে ব'সে ব'সে দেখ্‌ছে খেলা।
কাছে র'য়ে ডাকে তারে, উচ্চস্বরে কোন পাগলা।
ওরে যে যা বোঝে তাই সে বুঝে থাকরে ভোলা,
যথা যার ব্যথা নেহাৎ, সেইখানেতে হাত ডল মল
ওরে তেমনি জেনে মনের মানুষ মনে তোলা—।
যে জন দেখে সেরূপ করিয়ে চুপ রয় নিরালা
ও সে লালন ভেঁড়োর লোক জানানো
হরি বোলা—
মুখে হরি, হরি বোলা।

*　　*　　*

অটল মানুষ বইসা আছে, ভাব নাইরে তার চুপরে চুপ।

*　　*　　*

(খ) মনের মানুষের পর আমরা অচিন পাখীর খবর পাই। ইহাও বাউলের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ।

খাচার ভিতর অচিন পাখী
কেমনে আসে যায়।

*　　*　　*

মনের মনুরায় পাখী গহীনেতে চড়েরে
নদীর জল শুখায়ে গেলেরে
পাখী শুন্তে উড়ান ছাড়েরে
মাটির দেহ ল'য়ে।

*　　*　　*

আমার মন পাখী বিরাগী হ'য়ে
ঘুরে মরো না।

*　　*　　*

(২) সহজ ভাবে সকল জিনিষ করিবার আকাঙ্ক্ষা বাউলের একান্ত আপনার জিনিষ। অন্যের সঙ্গে তাহার স্থানে বিশেষ পার্থক্য।

সুখ পা'লে হও সুখ ভোলা,
দুখ পা'লে হও দুখ উতালা,
লালন কয় সাধনের খেলা
মন তোর কিসে জুৎ ধরে।

(৩) বৌদ্ধ সিদ্ধগণের চর্য্যা যে ধরণের রচনা, বাউল গানেও তদ্রূপ রচনা। জীবনের নানা ব্যবসায় (Ocupation) অবলম্বন করিয়া গান রচনা করা। এক্ষণে এই রীতির কয়েকটি গান তুলিয়া বিদায় লইতেছি।

গড়েছে কোন সুতারে এমন তরী জল ছেড়ে ডাঙ্গাতে চলে
ধন্ত তার কারীগরী বুঝতে নারি এ কৌশল সে কোথায় পেলে।
দেখি না কেবা মাঝি কোথায় বসে, হাওয়ায় আসে হাওয়ায় চলে।
তরিটি পরিপাটী মাস্তলটি মাঝখানে তার বাদাম খোলে,
লাগেনা হাওয়ার বল ওমনি সে কল সলিল দিকে সমান চলে।
তরীতে আছে আটা-মণি কোঁটা জলছে বাতি রং মহলে
যেখানে মনের মানুষ বিরাজ করে মন-পবনে তরী চলে।
সখিন কয় চলে ঝড়ি তুফান ভারী উঠ্‌বেরে ঢেউ মন-সলিলে,
যে দিন ভাঙ্গবেরে কল হবে অচল
চলবে না আর জলে স্থলে।

পদ্মা নদীর পুল বেঁধেছে ভালা—
কত ইট পাটকেল খাপ্‌ড়া কুচী পদ্মার কূলে দিল,
কত জায়গার মানুষ ঐ ডাঙ্গাতে ম'ল।
পুলের থাম্বা যোল জোড়া,
উপরে তার গিলটি করা,
কাকড়া কলে মাটি তুলে থাম্বা বসাইল
মেম সাহেবের বুদ্ধি খাসা,
পুল বেঁধেছে বড় খাসা।
যোল জোড়া থাম বসাতে তিনজন সাহেব ম'ল।
চৌদ্দশ কুলীর মধ্যে নয়শ কুলী ম'ল।
পুলের খরচ মোটামুটি
টাকার খরচ সাত কোটী —
আমার ক্ষ্যাপা চাঁদের কি কারখানা বুঝতে জনম গেল।

এই প্রবন্ধ লিখিতে আচার্য্য ডক্টর শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহোদয়ের নিকট অনেক উপদেশ ও সাহায্য পাইয়াছি। দূর হইতে তাঁহাকে শ্রদ্ধা জানাইতেছি।

* মাজুতে বঙ্গীয় অষ্টাদশ সাহিত্য-সম্মিলনীতে পঠিত।

৩১

গাড়ি ক'রে যেতে যেতে দ্বিজনাথ বিনয়ের বন্ধুর বিষয়ে অনুসন্ধান করলেন। বন্ধু মধুপুরে তখন পর্যান্ত পৌঁছোয় নি শুনে বললেন, "তুমি তা হ'লে এতক্ষণ সময় কাটালে কোথায়?"

বিনয় বল্‌লে, "ষ্টেশনে; ওরা আসে নি দেখে বাড়িওয়ালার কাছে কোনো চিঠিপত্র এসেছে কি না খবর নিয়ে ষ্টেশনে ফিরে এসে অপেক্ষা ক'রে ছিলাম।" অতঃপর স্বাভাবিক অনুক্রমে দ্বিজনাথের যে প্রশ্ন করবার সম্ভাবনা তা থেকে পরিত্রাণ পাবার আগ্রহে বিনয় কথাটাকে ভিন্ন ধারায় চালিত করবার চেষ্টা করলে; বল্‌লে, "বাড়িওয়ালার কাছে চিঠিপত্রও কিছু আসে নি; কি যে হ'ল, কিছু বুঝ্‌তে পারছি নে—মনে বড় ভাবনা হচ্চে।"

দ্বিজনাথ কিন্তু বিনয়ের এ উৎকণ্ঠায় কিছুমাত্র উদ্বিগ্ন না হ'য়ে বললেন, "তা হ'লে খেলে কোথায় বিনয়? ষ্টেশনের রিফ্রেশ্‌মেণ্ট্‌ রূমে?"

ঠিক এই কথাটাই বিনয় মনে মনে ভয় করছিল; এক পক্ষে কমলা অনাহারে রয়েচে সে সংবাদ বহন ক'রে এনে অপর পক্ষের সংবাদও যদি ঠিক একই রকম পাওয়া যায়, তা হ'লে উভয় পক্ষেরই আচরণের গুরুত্ব পৃথক ভাবে বৃদ্ধি পায়। কি বলবে সহসা স্থির করতে না পেরে একটু ইতস্তত ক'রে বিনয় বল্‌লে, "খাওয়ার বিশেষ দরকার ছিল না—সকালে ভাল ক'রে জল খেয়ে বেরিয়েছিলাম।"

দ্বিজনাথ বল্‌লেন, "অর্থাৎ, সমস্ত দিন উপোস ক'রে রয়েছ সে কথা স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হচ্চ। কি যে তোমাদের কাণ্ড কিছুই বুঝি নে!"

এ 'কিছুই বুঝিনে'র অর্থ যে কতক বুঝি, এবং 'কাণ্ড'র অর্থ কেবল মাত্র অনাহারই নয়,—তা বুঝ্‌তে বিনয়ের ভুল হ'ল না। সে অপ্রতিবাদের দ্বারা দ্বিজনাথের সমস্ত অভিযোগ স্বীকার ক'রে নিয়ে নীরবে ব'সে রইল। দেওঘর যাবার পাকা রাস্তা ছেড়ে দ্বিজনাথের বাড়ি যাবার কাঁচা রাস্তায় পড়বার আগে বিনয়ের একবার মনে হ'ল দ্বিজনাথের বাড়ি না গিয়ে একেবারে সোজাসুজি তাকে সুকুমারদের বাড়ি পৌঁছে দেবার জন্য দ্বিজনাথকে অনুরোধ করলে হয়, কিন্তু অপ্রত্যাশিত ঘটনার প্রবল উত্তেজনা তার মনের মধ্যে প্রতিক্রিয়ার এমন একটা অলসতা বিস্তার করেছিল যে, তার মুখ দিয়ে একটি বাক্য নির্গত হ'ল না; শুধু চোখের সামনে ফুটে উঠ্‌ল একটি অনাহার-খিন্ন তরুণীর বিষন্ন-মেদুর মাধুরী, এবং প্রাণের তারে ধ্বনিত হ'তে লাগ্‌ল একটি শ্রুতি-সুমধুর নাম—কমলা, কমলা, কমলা! বিনয়কে আহার করাতে পারে নি ব'লে কমলা স্বয়ং সমস্ত দিন উপবাসিনী রয়েছে!—যে আহার্য্য সে বিনয়ের মুখে দিতে পারে নি সে আহার্য্য সে নিজেও গ্রহণ করতে পারে নি! বিবাদ বিতর্ক কলহ বৈরূপ্যের মধ্যে কোথায় লুকিয়ে ছিল এই অন্তরের ঐকান্তিক সহযোগিতা,

যা প্রস্ফুটিত শতদলেরই মত চিত্তের যথার্থ স্বরূপটি বিকসিত ক'রে দিয়েছে ! অভুক্ত লঘু দেহের মধ্যে বিনয়ের মনখানি অচিন্তিত সৌভাগ্যের উজ্জ্বল আনন্দে কাঁপ্‌তে লাগল।

পথের দুধারে ইউক্যালিপ্‌টস্ গাছ থেকে একটা মিষ্ট গন্ধ ভেসে আস্‌ছিল। ডান দিকে একটা সাদা চুণকাম করা বাড়ির গেটে বিলিতি লতার দেহ অসংখ্য কমলালেবু রংএর ফুলে ভ'রে গিয়েচে। বিনয়ের মনে হ'ল আজ যেন আকাশে নূতন আলো, বাতাসে নূতন স্পর্শ, তরুগুল্মে নূতন সজীবতা ; আজ যেন শরৎ অপরাহ্ণ তার সমস্ত কমনীয়তা এবং রমণীয়তায় সজ্জিত হ'য়ে তার বহুদুঃখলব্ধ দয়িতার গৃহ-পথটি বক্ষে ধারণ ক'রে রয়েছে। কমলা এবং সে উভয়েই অভুক্ত ;--মনে হ'ল এ যেন মিলনের পূর্ব্বে সংযমের বিধি-পালন।

গেট অতিক্রম ক'রে গাড়ি গৃহ-প্রাঙ্গণে প্রবেশ করতেই বিনয়ের উৎসুক দৃষ্টি চতুর্দ্দিকে যে বস্তুর অন্বেষণ ক'রে এল কোথাও তার সন্ধান পাওয়া গেল না। গাড়ির শব্দ পেয়ে একজন ভৃত্য ছুটে এল ; তাকে দ্বিজনাথ জিজ্ঞাসা করলেন, "সন্তোষ বাবু এসেছেন ?"

"আজ্ঞে না হুজুর।"

"আচ্ছা, দিদিমণিকে শিগ্‌গির বৈঠকখানা ঘরে ডেকে দে।" ব'লে দ্বিজনাথ বিনয়কে নিয়ে বৈঠকখানা ঘরে প্রবেশ করলেন।

কমলা তখন নিজের ঘরে ব'সে একটা বই নিয়ে পাতা ওল্টাচ্ছিল। ভৃত্য দ্বারের কাছে এসে ডাকলে, "দিদিমণি !"

কমলা এসে পর্দ্দা সরিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "কি ?"

"বৈঠকখানায় সাহেব আপনাকে শিগ্‌গির ডাকচেন।"

হর্ণের শব্দ কমলার কানে গিয়েছিল ; জিজ্ঞাসা করলে, "সঙ্গে আর কেউ আছেন ?"

"সেই ছবি-ওয়ালা বাবু।"

কমলার মুখ ঈষৎ আরক্ত হ'য়ে উঠ্‌ল।

"আর কেউ ?"

"আর ত' কেউ না।"

"আচ্ছা, বল্‌ গে যাচ্ছি।"

মিনিট দুই পরে বৈঠকখানার দ্বারের পাশে হাজির হ'য়ে মৃদুস্বরে কমলা বল্‌লে, "বাবা, আমাকে ডাক্‌ছ ?"

দ্বিজনাথ ঘরের ভিতর থেকে বল্‌লেন, "হ্যাঁ, ডাকছি বই কি। ভিতরে এস।"

দ্বিধালস পদে ভিতরে প্রবেশ ক'রে কমলা দেখ্‌লে একটা বড় সোফায় দ্বিজনাথ এবং বিনয় ব'সে। দ্বিজনাথ ইঙ্গিতে কমলাকে নিকটে ডেকে নিজের পাশে বসিয়ে বল্‌লেন, "তুমি মনে কোরো না কমল, একা তুমিই উপবাস ক'রে রয়েছ ; আমার ডানদিকে যে ব্যক্তি ব'সে আছেন তোমার আচরণের সঙ্গে তাঁর আচরণের যে কোনো প্রভেদ নেই তা তাঁর মুখের দিকে একবার তাকিয়ে দেখ্‌লেই বুঝ্‌তে পারবে। আজ সকালে বাড়ি থেকে সামান্য যেটুকু খাবার খেয়ে বেরিয়েছিলেন তারপর সমস্ত দিনে মুখে অন্নজল পড়েনি।"

শুনে কমলার বিশুষ্ক মুখ আরক্ত হ'য়ে উঠ্‌ল ; একবার অচেষ্ট আগ্রহে বিনয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে গিয়ে দৃষ্টি নত ক'রে সে নীরবে ব'সে রইল। পাছে আহার করতে বিলম্ব হ'য়ে গিয়ে কষ্ট হয়, এই আশঙ্কায় সে সকালে বিনয়কে আহার ক'রে যাবার জন্য কত পীড়াপীড়ি করেছিল, কিন্তু এখন বিনয় সমস্ত দিন অভুক্ত রয়েছে শুনেও তার মুখ দিয়ে একটি বাক্য নির্গত হ'ল না। মনের মধ্যে একটা দুঃখ অনুভব করলে বটে, কিন্তু সে দুঃখের মধ্যেও একটা সুমিষ্ট তরল আনন্দ ঠিক তেমনি ভাবে পরিব্যাপ্ত হ'য়ে রইল—রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে জ্যোৎস্না যেমন ভাবে থাকে।

আহার না ক'রে কমলাকে না জানিয়ে চ'লে যাওয়ার জন্যেই কমলা অভুক্ত রয়েচে, অতএব সে অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত মনে হ'লেও, পরিবর্ত্তিত অবস্থায় সে কথাটা এখন নিতান্ত গৌণ হ'য়ে পড়েচে ব'লে বিনয়ের মনে হচ্ছিল। বন্যার প্লাবনের সময়ে বৃষ্টির কথা ছোট হ'য়ে গেছে। তবুও যথাসম্ভব সঙ্কোচ কাটিয়ে কমলার দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে সে বললে, "আমার অন্যায় আচরণের জন্যে আপনি সমস্ত দিন না খেয়ে রয়েচেন মিস মিত্র, সে জন্যে আমি—"

বিনয়কে কথা শেষ করবার অবকাশ না দিয়ে দ্বিজনাথ বল্‌লেন, "সে জন্যে তুমি যা, তা বলবার পরে যথেষ্ট সময়

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

পাবে—তার আগে আমার কাজটি আমি সারি বিনয়!" ব'লে অকস্মাৎ একটি কাণ্ড করলেন। এক হস্তে কমলার হাত এবং অপর হস্তে বিনয়ের হাত ধ'রে কমলার হাত বিনয়ের হস্তে স্থাপিত ক'রে বল্লেন, "কমলের চেয়ে আদরের জিনিষ আমার আর কিছু নেই বিনয়, কমলাকে আমি তোমাকে দিলাম। তুমি কমলাকে গ্রহণ কর।"

তড়িৎ-স্পৃষ্টের মত সহসা দাঁড়িয়ে উঠে বিনয় বল্লে, "এ আপনি কি করলেন?—আমাকে না জেনে না বুঝে, আমি যোগ্য কি অযোগ্য বিচার না ক'রে, এ আপনি কেন করলেন?"

দ্বিজনাথের মুখ উদ্বেগে পাংশুবর্ণ ধারণ করল; স্খলিত কণ্ঠে তিনি বল্লেন, "সে কি বিনয়। তবে কি আমি ভুল করলাম? তবে কি তুমি কমলার—"দ্বিজনাথের কণ্ঠ রুদ্ধ হ'য়ে গেল।

বিনয় বল্লে, "আজ্ঞে হাঁ, আমি কমলার অযোগ্য। আমি গৃহ-হীন, দরিদ্র,—আপনি আমার ইতিহাস জানেন না। কমলা আমার কামনার বস্তু হ'লেও আমি কমলাকে পাবার অধিকারী নই।"

দ্বিজনাথের মুখ থেকে দু'শ্চিন্তার ঘন মেঘ অপসৃত হ'ল। বিনয়কে হাত ধ'রে নিজের পাশে বসিয়ে বল্লেন, "যে বস্তু তুমি জয় করেছ সে বস্তুর তুমি অধিকারী;—অধিকারী ব'লে তোমার প্রতি আমার বিশ্বাস না হ'লে আমি তোমার হাতে কমলাকে দান করতাম না। তুমি গৃহ-হীন তা আমি জানি—তুমি ধনবান নও তাও আমি জানি—কিন্তু তোমাকে আমি উইল্ ক'রে অথবা দান-পত্র ক'রে আমার সম্পত্তি দিচ্ছিনে বিনয়! যে জিনিস তুমি নিজে জয় ক'রে অধিকার করেছ তাই আমি তোমাকে দিচ্ছি,—এ অনুগ্রহের দান নয়। আমার কথা বিশ্বাস না হয়, আমি বাইরে যাচ্ছি, তুমি কমলাকে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখ।"

সমস্ত ঘরখানা একটা অপরিমেয় বিস্ময়ের উৎকণ্ঠায় তম্‌তম্ করতে লাগ্‌ল। এক মুহূর্ত্ত নীরবে অবস্থান ক'রে বিনয় পুনরায় উঠে দাঁড়িয়ে বল্লে, তবে "আমাকে এই আশীর্ব্বাদ করুন, আমি যেন কমলার যোগ্য হ'তে পারি।"

দ্বিজনাথ সহাস্যমুখে বল্লেন, "পড়েছ ত' বিনয়, None but the brave deserves the fair।"

আরক্তমুখে কমলার দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে বিনয় বল্লে, "তাহ'লে এস কমলা, আমরা দুজনে বাবাকে এক সঙ্গে প্রণাম ক'রে তাঁর আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করি।"

প্রণাম করবার সময় কমলা দুই বাহু দিয়ে দ্বিজনাথের পদদ্বয় বেষ্টিত ক'রে ধ'রে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে কাঁদতে লাগ্‌ল। দ্বিজনাথ তাকে তুলে ধ'রে শান্ত ক'রে বল্লেন, "আমি তোমাদের দুজনকে আজ এই আশীর্ব্বাদ করি যে, জীবনে নিয়ত তোমরা একমাত্র সত্যকে অবলম্বন ক'রে থেকো। কোনো বিরুদ্ধ শক্তি কখনো যেন তোমাদের সত্য থেকে বিচ্যুত করতে না পারে। যথার্থ মিলন তোমাদের আজ হ'য়ে গেল, সামাজিক অনুষ্ঠান তোমাদের মা সীলোন থেকে ফিরে এলে হবে। এখন আমি নিশ্চিন্ত;—এখন আমি পরিতৃপ্ত।"

পশ্চিম গগন অস্তগামী সূর্য্যকিরণে আরক্ত হ'য়ে উঠেছিল—তার কিরণে উদ্ভাসিত গেটের পাশে একটা লাল স্থলপদ্মের গাছ তার অসংখ্য রক্তপুষ্প নিয়ে এই সহসা-সংঘটিত মিলন-অভিনয়ের সাক্ষ্য হ'য়ে রইল।

বিনয়কে স্নানাহার ক'রে রাত্রে খাবার জন্যে দ্বিজনাথ অনুরোধ করলেন—কিন্তু বিনয় স্বীকৃত হ'ল না। একটা তীব্র উল্লাসের উত্তেজনায় সে এমন একটা অবসন্নতা বোধ করছিল যে, একটু বিশ্রামের এবং নির্জ্জনতার জন্যে তার চিত্ত অধীর হ'য়ে উঠেছিল। এক পেয়ালা চা এবং সামান্য কিছু খাবার খেয়ে সে যাবার জন্যে প্রস্তুত হ'ল।

মনের অপরিসীম আনন্দে দ্বিজনাথ অতিশয় উৎসাহ বোধ করছিলেন; বল্লেন, "চল বিনয়, তোমাকে আমি পৌঁছে দিয়ে আসি।"

বিনয় এবং দ্বিজনাথ প্রস্থান করবার ঘণ্টাখানেক পরে রিকিয়া থেকে সন্তোষ ফিরে এল। সংবাদ পেয়ে পদ্মমুখী তাকে ভিতরে ডাকিয়ে পাঠালেন।

অন্দরে উপস্থিত হ'য়ে সন্তোষ পদ্মমুখীর ঘরে আসন গ্রহণ করলে তার সামনে একজন ভৃত্য চা এবং খাবার রেখে গেল।

সন্তোষ বল্‌লে, "আসবার আগেই অনেক খাবার টাবার খেয়ে এসেছি ঠাক্‌মা,—আর কিছু খাব না।"

পদ্মমুখী সহাস্য প্রসন্নমুখে বল্‌লেন, "তা না খাও না খাবে, কিন্তু আমাকে কি খাওয়াবে বল?—খোস-খবর আছে।"

সন্তোষ স্মিতমুখে বল্‌লে, "আপাততঃ বদ্দিনাথের পেঁড়া। তারপর ক্রমশ কাশীর চম্‌চম্‌ থেকে আরম্ভ ক'রে কৃষ্ণ-নগরের সরপরিয়া পর্য্যন্ত সমস্ত। কিন্তু কি খোস্‌-খবর তা বলুন। কমলার বিয়ে বিনয়ের সঙ্গে?"

সন্তোষ জান্‌ত এ কথাটা উপস্থিত অবস্থায় একেবারেই পরিহাস, এবং এ পরিহাসে পদ্মমুখী উত্তেজিত হবেন।

পদ্মমুখী ভ্রুকুঞ্চিত ক'রে বল্‌লেন, "বোলো না অমন অলক্ষণে কথা! তা হ'লে কি কি-খাওয়াবে জিজ্ঞাসা করতাম?—একেবারে চুভরি আফিমের ফরমাস দিতাম।" তারপর প্রসন্নমুখে বল্‌লেন, "কমলার বিয়ে বটে, কিন্তু সে তোমার সঙ্গে।"

এ বিষয়ে অনেকখানি আশা থাকলেও সম্প্রতি সন্তোষের মনে অনেকখানি আশঙ্কাও স্থানাধিকার করেছিল। উৎফুল্ল মুখে সে বল্‌লে, "আরো খুলে বলুন ঠাক্‌মা।"

তখন খানিকটা রং আর খানিকটা পালিশ্‌ দিয়ে পদ্মমুখী দ্বিপ্রহরে দ্বিজনাথের সঙ্গে তাঁর যে কথোপকথন হ'য়েছিল বিবৃত করলেন; বল্‌লেন, "শুভকর্ম্মে বিলম্ব করো না—সেই পটোটাকে নিয়ে দ্বিজ বদ্দিনাথ পৌঁছে দিতে গেছে—ফিরে এসেই তোমাকে সব কথা বলবে। কালই যাতে তোমাকে দ্বিজ আশীর্ব্বাদ করে তার ব্যবস্থা আমি করব। তারপর তুমি যদি আমাকে ভার দাও ত' তোমার পক্ষ হ'য়ে আমি কমলাকে আশীর্ব্বাদ ক'রে রাখব। কি বল?"

সন্তোষ হাসিমুখে বল্‌লে, "আপনার আশীর্ব্বাদেই যখন কমলাকে পাওয়া সম্ভব হয়েচে, তখন কমলাকে আপনি আশীর্ব্বাদ করবেন, সে ভার কি আমাকে দিতে হবে ঠাক্‌মা? আপনি কমলাকে আশীর্ব্বাদ করবেন আপনার নিজের মর্য্যাদায়।"

সন্তুষ্ট হ'য়ে পদ্মমুখী বল্‌লেন, "আচ্ছা, তাহ'লে তাই ঠিক রইল।"

আরো কিছুক্ষণ কথোপকথন এবং পরামর্শের পর সন্তোষ বাইরে এসে বারান্দায় বস্‌ল;—মনে হ'ল বাগানের একপ্রান্তে একটা শিলাখণ্ডের উপর কমলা ব'সে রয়েছে;—গাছপালার অবকাশ দিয়ে তার লালপাড় শাড়ীর অংশ দেখা যাচ্ছে। প্রথমে মনে হ'ল আজ যখন সন্ধ্যার পর সমস্ত কথা পাকা হবার কথা রয়েছে তখন তার পূর্ব্বে কমলার সহিত কোনো কথা না হওয়াই ভাল; কিন্তু সন্তোষ তার উন্মত্ত হৃদয়ের আবেগকে রোধ করতে পারলে না। ধীরে ধীরে কমলার সমীপে উপস্থিত হ'য়ে মৃদুস্বরে ডাক্‌লে, "কমলা!"

কমলা সন্তোষের আগমন জান্‌তে পেরেছিল; বল্‌লে, "আজ্ঞে?"

"তোমাকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে এলাম কমলা!"

চকিত হ'য়ে কমলা বল্‌লে, "কি প্রশ্ন?"

সহাস্যমুখে প্রসন্নস্বরে সন্তোষ বল্‌লে, "আজ আমাদের দুজনের মধ্যে কে বেশি সুখী—তুমি, না আমি,—তাই জিজ্ঞাসা করতে এসেছি।"

সন্তোষের কথা শুনে দুঃখে, ভয়ে, লজ্জায় কমলার হৃদয় মথিত হ'য়ে উঠ্‌ল। এই নিরতিশয় সঙ্কটের অবস্থায় সে কি বলবে, কি করবে কিছুই বুঝ্‌তে না পেরে অবসন্ন হ'য়ে পড়ল।

ক্ষণকাল অপেক্ষা ক'রে সন্তোষ বল্‌লে, "আমিই বেশি সুখী, কারণ আজ আমি তোমাকে পাব। আজ রাত্রে তোমার বাবা আমাকে আমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৌভাগ্যের কথা জানাবেন। তুমি আমার জীবনের আলো কমলা, আজ আমার জীবন আলোকিত হবে, ঠিক যেমন এই ফুলের বাগান আলোকিত হ'য়ে উঠ্‌ল মোটারের আলোয়।"

দ্বিজনাথের মোটর কম্পাউণ্ডে প্রবেশ করেছিল। সঙ্কট হ'তে অপ্রত্যাশিত ভাবে উদ্ধার লাভ ক'রে কমলা তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বল্‌লে, "বাবা এসেছেন, চলুন।" ব'লে আর উত্তরের জন্য অপেক্ষা না ক'রে দ্রুতপদে অগ্রসর হ'ল।

কমলা যেখানে বসেছিল সেখানে ব'সে প'ড়ে সন্তোষ মনে মনে বল্‌লে, "হে শিলাময়ী ধরিত্রী, তুমি আমাদের উভয়ের অটল মিলন-ক্ষেত্র হও।"

(ক্রমশঃ)

পুস্তক সমালোচনা

সতী—ডাঃ নরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত প্রণীত। ২৮৩ পৃষ্ঠা,—মূল্য আড়াই টাকা। প্রকাশক—শ্রীঅভয়হরি শ্রীমানি ২০৪, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

বিচিত্রার প্রথম বর্ষে এই উপন্যাসখানি ধারাবাহিক ভাবে মাসে মাসে বিচিত্রায় প্রকাশিত হইয়াছিল। সুতরাং বিচিত্রার অনেক পাঠক-পাঠিকা এই উপন্যাসখানির সহিত পরিচিত।

নরেশ বাবু বাঙ্‌লা সাহিত্যে খ্যাতনামা ঔপন্যাসিক; তাঁহার লেখার সহিত পরিচিত নন্ বাঙলা সাহিত্যে এমন পাঠক-পাঠিকা অল্প। শক্তিমান লেখকের এ উপন্যাসখানি পাঠ করিয়া পাঠক তৃপ্তিলাভ করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ভূমিকায় গ্রন্থকার বলিয়াছেন, " 'সতী' একটি সাধ্বী চরিত্রবতী নারীর জীবন-কাহিনী। বাঙ্গলার নারী সমাজে এ চরিত্রের যদি সমাদর না হইয়া থাকে তবে সেটা বাঙ্গালী নারীর এত বড় কলঙ্কের কথা যে আমি তাহা কোনও মতেই মানিয়া লইতে পারি না। অথচ কোনও সাময়িক পত্রে কোনও নারীর স্বাক্ষর দিয়া এই কথাই বলা হইয়াছে!'

প্রবীণ উপন্যাস-লেখক হইয়া নরেশ বাবুর এরূপ আক্ষেপ করা উচিত হয় নাই। প্রচলিত সংস্কার এবং মত-বাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বর্ত্তমান সমাজের মুখাপেক্ষী হইয়া কোন্ বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক অথবা দার্শনিক নূতন সত্য প্রচার করেন? সে সত্যের প্রভা বর্ত্তমান সমাজের তমসাচ্ছন্ন চক্ষু যদি সহ্য না করিতে পারে ত সে দোষ ঔপন্যাসিক অথবা দার্শনিকের নয়। তবে সত্য যেন সত্যই সত্য হয়;—মিথ্যার উপর কপট যুক্তির গিল্টি না হয়। কিন্তু, সত্য-মিথ্যা নির্ণয়ের একটা অচল পরীক্ষাই বা কোথায় আছে? সত্য-মিথ্যা নিরূপিত হয় জন-সাধারণের অধিকাংশের উপলব্ধির দ্বারা, বিচারের দ্বারা সব সময়ে নয়। সুতরাং যিনি সত্যের নূতন মূর্ত্তি প্রকাশ করেন তাঁহাকে অনেক সময়ে জনসাধারণের অধিকাংশের কাছেই লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়। অতএব কোনও সাময়িক পত্রে কোনও একটি নারী কি বলিয়াছেন তদ্দারা বিচলিত হইবার কিছু নাই।

চুম্বক—রায় সাহেব জগদানন্দ রায় প্রণীত। ৮৬ পৃষ্ঠা, মূল্য বারো আনা। প্রকাশক—শ্রীকালী-কিঙ্কর মিত্র, ইণ্ডিয়ান্ প্রেস লিমিটেড্, এলাহাবাদ।

চুম্বক সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক তথ্যপূর্ণ ছেলেদের জন্য একটি চমৎকার পুস্তক। বৈজ্ঞানিক সন্দর্ভ রচনায় জগদানন্দ বাবু সিদ্ধহস্ত। সহজ সরল প্রণালীতে বিজ্ঞানের কঠিন সমস্যাগুলিকে সাধারণের বোধগম্য করিতে তাঁহার মত ক্ষমতাশালী লেখক বাংলাদেশে অতি অল্পই আছেন। পুস্তক খানি আদ্যোপান্ত পড়িয়া আমরা দেখিয়াছি চুম্বক সম্বন্ধে সমস্ত কথাই ইহাতে চিত্তাকর্ষক ভাবে বলা হইয়াছে।

পুস্তকখানিতে দুইটি ত্রুটি আমরা লক্ষ্য করিলাম। প্রথমত—পুস্তকে ব্যবহৃত চিত্রগুলির বিভিন্ন অংশ নির্দ্দেশ করিবার জন্য ইংরাজী বর্ণমালার অক্ষর ব্যবহৃত করা হইয়াছে, ইহার কারণ মনে হয় চিত্রগুলি ইংরাজী পুস্তক হইতে অপরিবর্ত্তিত ভাবে গ্রহণ করা হইয়াছে। বাঙলা অক্ষর ব্যবহার করিলে, যাঁহারা ইংরাজী বর্ণমালার সহিত পরিচিত নন তাঁহাদের এই পুস্তক পাঠ করিতে অসুবিধা হইত না। দ্বিতীয়ত, পুস্তকে সাধুভাষা ব্যবহার না করিয়া চলিত ভাষা ব্যবহার করিলে বালক-বালিকাদের পক্ষে আরও প্রাঞ্জল হইত।

বই খানির ছাপা, কাগজ, বাঁধাই এবং প্রচ্ছদপট দেখিলে মনে হয় না যে ভারতবর্ষে বইখানি প্রস্তুত হইয়াছে। ইণ্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড্ কোম্পানীর অপ্রতিপক্ষ গৌরব এ পুস্তকে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।

তাপ—রায় সাহেব জগদানন্দ রায় প্রণীত। ১৫১ পৃষ্ঠা, মূল্য ১।০ টাকা। প্রকাশক—শ্রীআশুতোষ ধর, আশুতোষ লাইব্রেরী, ৫ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

জগদানান্দ বাবুর চুম্বক বইখানির রচনা বিষয়ে উপরে আমরা যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছি এ পুস্তকটি সম্বন্ধেও

সেই অভিমত প্রযোজ্য। এরূপ পুস্তক বাঙ্গালা ভাষায় যত প্রকাশিত হয় দেশের ততই মঙ্গল। এই অবসরে প্রকাশকগণকেও আমরা আমাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। আশা করি তাঁহারা ক্রমশ এই শ্রেণীর আরও পুস্তকাবলী প্রকাশিত করিবেন।

দীপান্বিতা—শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী প্রণীত। মূল্য দেড় টাকা। প্রকাশক—শ্রীদিলীপকুমার বাগচী। ৪।ই, রামধন মিত্র লেন, কলিকাতা। প্রাপ্তিস্থান—বরদা এজেন্সী, কলেজ ষ্ট্রীট্ মার্কেট, কলিকাতা।

বর্ত্তমান কালে ক্ষমতাশালী যে তরুণ কবিগণের সহিত আমরা পরিচিত তাঁহাদের মধ্যে হেমবাবুর স্থান অনেক উচ্চে। কোনো মাসিকের পৃষ্ঠায় ইঁহার কবিতা চোখে পড়িলে তাহা উপেক্ষা করিয়া পাতা ওল্টানো যায় না, ইহা কবিতা-প্লাবিত মাসিকের যুগে কম প্রশংসার কথা নহে।

দীপান্বিতার কবিতাগুলি সুমার্জ্জিত, সুকল্পিত। ছন্দ ও মিলের প্রতি একান্ত নিষ্ঠা, কবিতাগুলি রচিত করিবার বিষয়ে কবির যত্ন-সহিষ্ণুতার পরিচয় দেয়,—কিন্তু তজ্জন্য কবিতার সাবলীল গতি কোথাও বাধা পায় নাই।

হেমচন্দ্র অলঙ্কারের পক্ষপাতী ;—অধুনা-নিন্দিত অনুপ্রাসের প্রতিও ইঁহার লোভ কম নয়,—যথা 'ভঙ্গে ভঙ্গে মহারঙ্গে জটিল আবর্ত্তে তাই নবোন্মেষ-উদ্বেল উল্লাস।' কিন্তু অলঙ্কার ব্যবহার করিবার সুরুচির গুণে ইনি অলঙ্কার ব্যবহার করিবার বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছেন।

দীপান্বিতার কাগজ, ছাপা, বাঁধাই এবং মুদ্রণ-রীতি প্রশংসার্হ।

কল্যাণ-প্রদীপ—শ্রীমতী মোক্ষদা দেবী প্রণীত। ১৬ পেঃ ডঃ ক্রাঃ—৪২৯ পৃষ্ঠা ; মূল্য তিন টাকা। প্রকাশক—শ্রীসতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ব্যারিষ্টার, ৭ নং ওল্ড্ পোষ্ট অফিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

পুস্তকখানি মাতামহী কর্ত্তৃক লিখিত ৺ক্যাপ্টেন্ কল্যাণ কুমার মুখোপাধ্যায় আই, এম, এস-এর জীবন-কাহিনী। গত তুর্ক-ব্রিটিশ যুদ্ধে কল্যাণকুমার জেনারেল টাউশেণ্ডের সহিত উত্তর ইরাকে তুরস্ক সেনা কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হন এবং অবরোধকালে মাত্র চৌত্রিশ বৎসর বয়সে টাইফস্ রোগে তথায় মারা যান। যুদ্ধক্ষেত্রে কল্যাণকুমার সাহসিকতা এবং কর্ত্তব্যপরায়ণতা দেখাইয়া যে খ্যাতি ও সম্মান লাভ করিয়াছিলেন তাহা, এবং কল্যাণকুমারের আশৈশব জীবন-কাহিনী এই পুস্তকে স্থান পাইয়াছে।

বাঙালীর সাধারণ বৈচিত্র্যহীন জীবন যাপনের মধ্যে বাঙলা সাহিত্যে এ শ্রেণীর পুস্তক প্রকাশিত হইবার সুযোগ অল্প ; সে হিসাবে এ পুস্তকখানি আদরণীয়। তাহা ছাড়া, ভাষার প্রাঞ্জলতায় এবং বিবৃতির সহজ ভঙ্গিতে পুস্তকটি সুখ-পাঠ্য হইয়াছে। পুস্তকের শেষাংশ যুদ্ধক্ষেত্রের কথায় কৌতূহলোদ্দীপক।

পুস্তকটিতে পনেরোখানি চিত্র ও দুইখানি মানচিত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে।

জমা-খরচ—শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। ১৫০ পৃষ্ঠা—মূল্য দেড় টাকা। প্রকাশক—শ্রীরাধেশ রায়, পি ১৫৯ রসারোড, কালীঘাট, কলিকাতা।

পাঁচখানি গল্প লইয়া এখানি একটি গল্পের বই। অসমঞ্জ বাবুর গল্পের পরিচয় বিচিত্রার নিয়মিত পাঠকবর্গকে দিতে হইবে না, তাহা এই পুস্তকের প্রকাশকের নিবেদন পাঠ করিলেই বুঝা যাইবে। এই গ্রন্থের পাঁচটি গল্পের মধ্যে চারটি গল্প বিচিত্রায় প্রকাশিত হইয়াছিল। এই লেখকের লেখা পাইয়াই আমরা তাঁহার শক্তি উপলব্ধি করি, এবং বিচিত্রায় উপর্য্যুপরি তাঁহার গল্প প্রকাশিত হওয়ায় বাঙলা পাঠক শ্রেণীর সহিত তাঁহার যথার্থ-পরিচয় স্থাপিত হয়, তাহা প্রমাণিত হইবে প্রকাশকের নিবেদনের নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে :—"* * * লেখকের 'যাদুকরী' নামক গল্পটি 'বিচিত্রায়' প্রকাশিত হইয়া সাহিত্যসমাজে যথেষ্ট সমাদৃত হয়। 'যাদুকরী' হইতেই লেখকের 'রজত-মর্য্যাদা' নিরূপিত হইয়া যায়। তারপর 'জমা-খরচ' প্রকাশিত হয় 'বিচিত্রা'তে। 'জমা-খরচ' প্রকাশিত হইলে লেখকের যশ চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে।"

এ পুস্তকখানি বাঙলা কথা-সাহিত্য-ভাণ্ডারে সাদরে স্থানলাভ করিবে।

গেঁয়ো—শ্রীশচীন্দ্রলাল রায় এম, এ, প্রণীত। ৮৭ পৃষ্ঠা—মূল্য বার আনা। প্রকাশক—শ্রীগোপাল দাস মজুমদার, ডি, এম, লাইব্রেরী, ৬১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

গল্প পুস্তক। দুইটি বড় গল্পে এ বইখানি সমাপ্ত;—দুইটি গল্পই আমাদের ভাল লাগিয়াছে। ভাষা সুললিত, ভঙ্গী সুমার্জ্জিত, মনস্তত্ত্ব পরিমিত,—সাহিত্য-রস-পিপাসু এ বইখানি পাঠ করিয়া সুখী হইবেন।

বইখানির ছাপা বাঁধাই এবং কাগজের পক্ষে মূল্য সুলভ।

মেয়েদের কথা—শ্রীহেমলতা দেবী প্রণীত। ৭৪ পৃষ্ঠা, মূল্য আট আনা। প্রকাশক—শ্রীধীরেন্দ্রপ্রসাদ সিংহ; সরোজনলিনী দত্ত নারী-মঙ্গল-সমিতি, ৪৬ নং বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা।

'বঙ্গলক্ষ্মী' সম্পাদিকা সুলেখিকা শ্রীমতী হেমলতা দেবী প্রণীত এই সারগর্ভ পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আমরা অতিশয় সুখী হইয়াছি। সমস্ত পৃথিবী ব্যাপিয়া এখন নারী-জাগরণের বিপ্লব আরম্ভ হইয়াছে। একদল নারী স্ত্রীপুরুষের মধ্যে সর্ব্ববিধ অসাম্য মোচন করিয়া প্রগতির পথে যাহা কিছু বাধা বিঘ্নের রূপে উপস্থিত হইবে তাহাকে দলিত এবং লজ্ঘিত করিয়া স্বাধীনতার অভিন্ন ক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়াছেন। আমাদের দেশের নারীদের মধ্যেও এ চাঞ্চল্যের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে কেবল নারীগণের পক্ষেই নহে, পুরুষদের পক্ষেও এ বইখানি পড়িয়া দেখা একান্ত আবশ্যক বলিয়া আমরা মনে করি। এই পুস্তকগুলির অতি প্রয়োজনীয় নিবন্ধগুলির মধ্যে যুক্তির এবং ন্যায়ের এমন একটি অনুদ্ধত প্রভাব বর্ত্তমান যে, যাঁহারা অপরিমিত নারী-প্রগতির সমর্থক এবং যাঁহারা নন, উভয় শ্রেণীই এই পুস্তকে ভাবিয়া দেখিবার মত অনেক জিনিস পাইবেন।

স্ত্রীপুরুষ নির্ব্বিশেষে আমরা সকলকে এই পুস্তকখানি পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

দীপ-শিখা—শ্রীমতিলাল দাশ প্রণীত। ৮০ পৃষ্ঠা মূল্য আট আনা। প্রকাশক—শ্রীতারাপদ দাশগুপ্ত এম, এ, বেঙ্গল পাবলিশিং কোং, ২ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

এখানি একটি কবিতা পুস্তক। কবিতাগুলি পড়িলে মনে হয় গ্রন্থকার এ পুস্তকে তাঁহার প্রথম উদ্যমের সৃষ্টি হইতে পরিণত কালের লেখা পর্য্যন্ত সমস্ত লেখাই অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। বিভিন্ন কবিতার মধ্যে রচনা-কৌশলের অসমতা লক্ষিত হয়। যাহা হউক, কয়েকটি কবিতা পাঠ করিয়া লেখকের কবিত্বশক্তির পরিচয় পাইয়া আমরা সুখী হইয়াছি। নিজের স্বকীয়তার পথে অনুশীলন করিলে লেখক সফলতা লাভ করিবেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

ভারতের শিক্ষা—শ্রীবিষ্ণুপদ চক্রবর্ত্তী সঙ্কলিত। মূল্য চার আনা। প্রকাশক—শ্রীবিষ্ণুপদ চক্রবর্ত্তী, চক্রবর্ত্তী সাহিত্য ভবন, বজ্-বজ্, পোঃ বজ-বজ্, ২৪ পরগণা।

উপনিষদ্ এবং স্মৃতি-গ্রন্থসমূহ হইতে নির্ব্বাচিত উপদেশাবলী এবং তাহার সরল বঙ্গানুবাদ।

চার আনা ব্যয়ে এ পুস্তিকার ক্রেতা বহুমূল্য জ্ঞান-রত্ন লাভ করিবেন।

বিবাহ-কল্যাণ—শ্রীবিষ্ণুপদ চক্রবর্ত্তী প্রণীত। মূল্য ছয় আনা। প্রকাশক—শ্রীবিষ্ণুপদ চক্রবর্ত্তী, চক্রবর্ত্তী সাহিত্য-ভবন, বজ্-বজ্, পোঃ বজ্-বজ্ ২৪ পরগণা।

বিবাহের মন্ত্রাদি হইতে সংগৃহীত অংশ এবং তাহার সরল বঙ্গানুবাদ। রঙিন কালীতে মুদ্রিত এবং সুদৃশ্য কভার সংযুক্ত। এ বইখানি বিবাহকালে বর-বধূকে উপহার দিবার উপযুক্ত।

স্যানাটোজেন পঞ্জিকা—সন ১৩৩৬ প্রকাশক—দি ক্যালক্যাটা ট্রেডিং কোম্পানী, ৭৯-৯, লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

পরিচ্ছন্ন ভাবে মুদ্রিত এই দিন-পঞ্জিকাটির মধ্যে নূতনত্বের স্পর্শ আছে।

নানাকথা

রবীন্দ্রনাথ

আগামী ১লা জুন, শনিবার শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় জাপান হইতে কলম্বো পৌঁছিবেন এইরূপ কথা আছে। কলিকাতায় কবে পৌঁছিবেন তাহার এখনও স্থিরতা নাই।

ক্যানাডায় অবস্থান কালে রবীন্দ্রনাথ তদ্দেশবাসীগণের নিকট প্রভূত সম্মাননা এবং অভ্যর্থনা পাইয়াছিলেন। ভ্যানকুভারের জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের সম্মেলনে গ্রেট-ব্রিটেন্, ক্যানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, ভারতবর্ষ, দক্ষিণ-আফ্রিকা, নিউজিল্যাণ্ড, জাপান, ফ্রান্স, জার্ম্মানী, ইটালী এবং জেকো-শ্লোভাকিয়া হইতে সদস্যগণ উপস্থিত হইয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথই সর্ব্বোচ্চ স্থান গ্রহণ করিয়াছিলেন। অধিবেশনের প্রথম কয়েক দিবসে তিনিই প্রধান বক্তা ছিলেন—এবং স্থানীয় সংবাদপত্রসমূহে তাঁহার বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশিত হইত।

যে সম্মাননা রবীন্দ্রনাথকে প্রদর্শিত হইত, তাহা যে শুধু ব্যক্তিগতভাবে তাঁহার মহত্ত্বের মর্য্যাদাই নহে, পরন্তু ভারতবর্ষের প্রতি ক্যানাডার সৌহার্দ্দ্যেরও নিদর্শন, তাহা ক্রমশই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। ক্যানাডাবাসীগণের মুখে রবীন্দ্রনাথের কথা ক্রমশঃ ভারতবর্ষের কথা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল; তাঁহারা ভারতবর্ষকে ক্যানাডার জাতি-ভ্রাতা জ্ঞানে ভারতবর্ষের সহিত ক্যানাডার ঘনিষ্টতর পরিচয় বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করিয়াছেন।

পূর্ব্ব ক্যানাডার এবং প্রধানতঃ ভ্যানকুভার ও ভিক্টোরিয়ার জন-সাধারণ মনে করেন যে, রবীন্দ্রনাথের আগমন হেতু ভারতবর্ষের প্রতি এবং ক্যানাডার ভারতবর্ষীয় বাসিন্দাদিগের প্রতি তাঁহাদের মনোভাব বিশেষভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে; ইহার দ্বারা বিশিষ্ট সামাজিক এবং রাজনৈতিক লাভ অর্জ্জিত হইবে বলিয়া তাঁহারা মনে করেন।

শিক্ষা পরিষদের সম্মেলনে রবীন্দ্রনাথ মনীষিতায় সকলকেই অতিক্রম করিয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতা এবং বাণী, চিন্তার প্রগাঢ়তা এবং অভিব্যক্তির বৈচিত্র্য হেতু সাধারণের পক্ষে ঈষৎ কঠিন হইলেও, উপমা এবং উদাহরণের দ্বারা সহজ-বোধ্য হইয়া সকলের নিকট বিশেষভাবে উপভোগ্য হইয়াছিল। কবির সুদর্শন মূর্ত্তি এবং সুমধুর বাণী জন-সাধারণকে যে অপরিমিত আনন্দ দিয়াছিল, তেমন আনন্দ পশ্চিম ক্যানাডার অধিবাসীগণের অদৃষ্টে কদাচিৎ ঘটিয়াছে।

সম্মেলনের শেষভাগে একদিনের একটি ঘটনা হইতে কবির প্রতি ভ্যানকুভারবাসীগণের অনুরাগ প্রতীয়মান হইবে। একটি সিনেমা-রঙ্গালয়ে জার্ম্মাণ যুব-সঙ্ঘের ভারত পরিভ্রমণের চিত্র দেখান হইতেছিল। শান্তি-নিকেতনের চিত্রাভিনয়কালে হঠাৎ এক সময়ে দেখা গেল রবীন্দ্রনাথ আবির্ভূত হইয়া প্রসন্ন হাস্যে জার্ম্মাণ অতিথিদিগকে অভ্যর্থিত করিতেছেন। রবীন্দ্রনাথের সুপরিচিত মূর্ত্তি দৃষ্টি-গোচর হইবামাত্র দর্শকমণ্ডলী বিপুল উচ্ছ্বাসে হর্ষধ্বনি করিয়া উঠেন। প্রায় তিন মিনিট কাল রবীন্দ্রনাথকে দেখা গিয়াছিল,—এই সময়ে দর্শকগণ বারম্বার হর্ষধ্বনির দ্বারা রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁহাদের অনুরাগ ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

ক্যানাডা হইতে বিদায়কালে ভ্যানকুভার থিয়েটারে বিপুল শ্রোতৃ-মণ্ডলীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া রবীন্দ্রনাথ ক্যানাডার প্রতি তাঁহার বাণী প্রচার করেন। তিনি বলেন, "প্রাচীন সভ্যজাতির অনমুরূপ—যে প্রাচীন সভ্যজাতিসমূহ পরিশ্রান্তির মোহবশতঃ বিদ্বেষ-পীড়িত এবং অধ্যাত্মবোধ-বর্জ্জিত হইয়া পড়িয়াছে—ক্যানাডা এখন তরুণতায় অবস্থান করিতেছে;—তাহার ধর্ম্মের নবীনতা নূতনভাবে জগৎকে নির্ম্মাণ করিবার উপযোগী।"

রবীন্দ্রনাথের বিদায়-বাণী সমাপ্ত হইলে বিপুল উল্লাস-

ধ্বনির দ্বারা দর্শক-মণ্ডলী তাঁহাদের আনন্দ জ্ঞাপন করেন।

রবীন্দ্রনাথের ক্যানাডা দর্শন ক্যানাডা ও ভারতবর্ষকে ব্রিটিশ-জাতীয়-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত দুইটি মৈত্র রাজ্য করিবার কারণ হইবে বলিয়া ক্যানাডাবাসীগণের বিশ্বাস।

আমরা আনন্দে এবং সশ্রদ্ধায় রবীন্দ্রনাথকে অভিনন্দিত করিতেছি।

ঊনবিংশ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন

গত ১৭ই বৈশাখ আশুতোষ কলেজ গৃহে দক্ষিণ কলিকাতা বাসিদের একটি সাধারণ সভার অধিবেশন হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। মহামহোপাধ্যায় দুর্গাচরণ সাংখ্যতীর্থ মহাশয়ের প্রস্তাবে, এবং মিঃ পি' চৌধুরী, শ্রীযুক্ত হরিদাস হালদার, ডাঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তর সমর্থনে দক্ষিণ কলিকাতার সাহিত্যানুরাগীগণ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের আগামী অধিবেশন সাদরে ও সসম্মানে আহ্বান করিতেছেন,—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু, পরিচালন সমিতির সম্পাদক এই নিমন্ত্রণ সাদরে গ্রহণ করিয়াছেন। উক্ত সভায় একটি অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হইয়াছে, তাহাতে শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ মুখার্জ্জী কোষাধ্যক্ষ ও শ্রীযুক্ত জোতিন্দ্র ঘোষ আহ্বানকারী মনোনীত হইয়াছেন। অভ্যর্থনা সমিতির চাঁদা অনুন ৩৲ টাকা ধার্য্য হইয়াছে। আবশ্যক সংবাদ ৩৫।১০ পদ্মপুকুর রোড ঠিকানায় আহ্বানকারীর নিকট পাওয়া যাইবে।

ইণ্ডিয়া হাউস অলঙ্করণ

বিলাতে ইণ্ডিয়া হাউস অলঙ্করণের জন্য চার জন সুদক্ষ চিত্রকর বিলাতে যাইবেন স্থির হইয়াছে। এজন্য নিম্নলিখিত ছয় জন শিল্পীর নাম নির্ব্বাচিত হইয়া ভারত গভর্মেণ্ট্ কর্ত্তৃক বিলাতে পাঠানো হইয়াছে :—শ্রীযুক্ত ললিতমোহন সেন, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্ম্মণ, শ্রীযুক্ত সুধাংশু চৌধুরী, শ্রীযুক্ত রণদা উকীল, মিঃ ফৈজী রহমান এবং মিঃ আর, ভি, সি, সিতত্তদীয়া। এই ছয় জন শিল্পীর মধ্য হইতে চার জন নির্ব্বাচিত হইবেন। বিলাতের রয়াল কলেজ অফ্ আর্টএর প্রিন্সিপ্যাল অধ্যাপক রথেনষ্টাইনের (Prof, W. Rothenstein) হস্তে চারজনকে শেষ নির্ব্বাচিত করিবার ভার পড়িয়াছে।

নির্ব্বাচিত শিল্পীদিগকে বিলাতে রয়েল কলেজে অধ্যাপক রথেনষ্টাইনের নিকট এক বৎসর শিক্ষানবিশী করিতে হইবে, এবং তৎপরে ছয়মাস ইতালীতে পুরাতন চিত্র দেখিয়া বেড়াইতে হইবে। পরে উপযুক্ত বিবেচিত হইলে তাঁহাদের উপর ইণ্ডিয়া হাউস্ অলঙ্করণের ভার পড়িবে।

৺রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়

বিগত ১৬ই বৈশাখ সঙ্গীতাচার্য্য রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যু হইয়াছে। ইনি সঙ্গীত-বিশারদ ৺অনন্তনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং সঙ্গীতাচার্য্য গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অগ্রজ। সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে ইনি একজন খ্যাতনামা সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। বিষ্ণুপুর এবং বাকুড়ার অধিবাসীগণ ইঁহার বিয়োগে ম্রিয়মাণ হইয়াছেন। ইঁহার মৃত্যুতে বাংলা দেশের সঙ্গীত সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে সন্দেহ নাই।

নিখিল-ভারত চারুশিল্প প্রদর্শনী

আগামী জুলাই মাসে বাঙ্গালোরে মহীসুরের মহারাজা বাহাদুরের আনুকুল্যে নিখিল-ভারত চারুশিল্প প্রদর্শনীর সম্মেলন হইবে। কলিকাতার ইণ্ডিয়ান্ সোসাইটি অফ্ ওরিয়েণ্টাল্ আর্টস্ এই প্রদর্শনাতে চিত্রাদি প্রেরণ করিবেন।

রাষ্ট্র ভাষা সম্মেলন

রাষ্ট্র ভাষা সম্মেলনের সাধারণ কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বিষ্ণু দত্ত সুকলাল আশা করেন, অনতিবিলম্বে সমগ্র বঙ্গদেশ হিন্দিভাষা শিক্ষার বিদ্যালয়ে ভরিয়া যাইবে। এ বিষয়ে উদ্যোগের চার মাসের মধ্যে কলিকাতায় চারটি (আশীজন ছাত্র) এবং দিনাজপুরে ও কুমিল্লায় একটি করিয়া হিন্দি বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত রংপুর, মুর্শিদাবাদ বরিশাল, চাঁদপুর, বর্দ্ধমান প্রভৃতি স্থানেও সবিশেষ চেষ্টা

চলিতেছে। আসামের ভূম্যাধিকারীগণের মধ্যে কেহ কেহ হিন্দীভাষাকে তাঁহাদের সেরেস্তার ভাষা করিবেন বলিয়া ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। আগামী ১লা এবং ২রা জুন আসামে শিবসাগরে রাষ্ট্র ভাষা সম্মেলনের অধিবেশন বসিবে।

বঙ্গদেশে এই হিন্দীভাষা প্রচার কতদূর প্রসারিত করা হইবে, এবং পরিশেষে ইহা বাংলা ভাষার বৈরী হইয়া উঠিবে কি না, তাহা প্রগাঢ় অধিনিবেশের সহিত ভাবিয়া দেখা উচিত। আমরা এ বিষয়ে সুধীবর্গের মতামত আমন্ত্রণ করিতেছি।

শিল্পে নগ্নতা

শিল্পে নগ্নতা নিন্দনীয় নহে বলিয়া সকল দেশের শিল্পীগণ বহুদিন হইতে একটা অধিকার ভোগ করিয়া আসিতেছেন। সম্প্রতি পাশ্চত্য দেশেও ইহার বিরুদ্ধে অভিমান দেখা দিয়াছে। স্কট্‌ল্যাণ্ডের ডনফর্মলিন্ সহরে আন্তর্জ্জাতিক ছায়াচিত্র প্রদর্শনী হইতে একটি ফটোগ্রাফ এবং মন্‌ট্‌রোজের চারু শিল্প প্রদর্শনী হইতে দুইটি উৎকীর্ণমূর্ত্তি অশ্লীলতা হেতু অপ্রস্তুত করায় তদ্দেশীয় শিল্পীগণের মধ্যে একটা গভীর অসন্তোষ দেখা দিয়াছে। ফটোগ্রাফটি জেকো শ্লোভাকিয়ার সুবিখ্যাত ফটোগ্রাফার ফ্রেড্রিক ড্রিটিকোব মুদ্রিত একটি নগ্ন নারীমূর্ত্তি, এবং মূর্ত্তি দুইটি স্কট্‌ল্যাণ্ডের খ্যাতনামা ভাস্কর উইলিয়াম্ ল্যাম্ব কৃত একটি নগ্ন বালকের পরিকল্পন। শিল্প-প্রদর্শনী-সমিতির একজন সদস্য বলিয়াছিলেন, মূর্ত্তি দুইটিকে জাঙ্গিয়া না পরাইয়া কিছুতেই প্রদর্শনীতে রাখা যাইতে পারে না।

মিঃ ল্যাম্বের শিল্প-সৃষ্টি সমূহ রয়াল স্কটিশ্ একাডেমী এবং লণ্ডনের রয়াল একাডেমীতে প্রদর্শিত হইয়াছে, সুতরাং তিনি একজন উচ্চস্তরের শিল্পী; তথাপি তাঁহার শিল্প-ধারার মধ্যে বালকের নগ্নতাও জন-সাধারণ সহ্য করিতে পারিল না।

শিক্ষকতায় নারীর অধিকার

ইংলণ্ডে লিষ্টর্ সহরে ন্যাসনাল্ অ্যাসোসিয়েশন্ অফ্ স্কুলমাষ্টার্সের অধিবেশনে স্ত্রী-শিক্ষয়িত্রী কর্ত্তৃক বালকদিগকে মল্ল-ক্রীড়ায় শিক্ষাদানের সমীচীনতা বিষয়ে কথা উঠিয়াছিল। লীড্‌সের মিঃ এ, টি, এন, স্মিথ্ প্রস্তাব করেন যে, বালকদের হিত-কল্পে শিক্ষাপরিষদের নিয়ম করা উচিত যে বালকদের মল্ল-ক্রীড়া-শিক্ষা একমাত্র পুরুষ শিক্ষক কর্ত্তৃক প্রদত্ত এবং পরিচালিত হইবে। ক্রীড়া-শিক্ষকগণের ক্ষিপ্রকারী, সুকৌশলী এবং শক্তিমান হওয়া আবশ্যক; পুরুষদের মধ্যে স্বভাবত এই গুণগুলি নারীগণের অপেক্ষা বেশি পরিমাণে আছে।

শুধু ক্রীড়াশিক্ষাই নহে, সাধারণ শিক্ষা সম্বন্ধেও বিনা বিসংবাদে কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়, তন্মধ্যে একটির মর্ম্ম,—সমস্ত বয়স্ক বালকদের পুরুষ প্রধান-শিক্ষক এবং অন্যান্য পুরুষ শিক্ষকদের অধীনে পুরুষ-প্রভাবের মধ্যে থাকা আবশ্যক। অন্য একটি প্রস্তাবের মতে, যে শিক্ষানুষ্ঠানের মধ্যে বালক ও বালিকাগণের শিক্ষার জন্য বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা নাই সে শিক্ষানুষ্ঠান সন্তোষদায়ক হইতে পারে না।

ভ্রম-সংশোধন

এই সংখ্যার ৯৪১ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে ২৮ লাইনে "গীতি" স্থলে "গীতি-নাট্য" হইবে।

৯৪২ পৃষ্ঠায় প্রথম কলমের ৯ম লাইনে 'অন্তরে' এবং 'নয়' কথার মধ্যে এই কথাগুলি বসিবে :—

"প্রতিভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল যে ; জগৎ,—সেখানে অনুভূতি সর্ব্বস্ব"

Printed at the Susil Printing Works, 47, Pataldanga Street, Calcutta
by Srijut Upendranath Ganguli and edited and published by him from 48, Pat[illegible] ...cutta.